প্রবাসী

সচিত্র মাসিক পত্র

৩৩শ ভাগ, প্রথম খণ্ড

বৈশাখ—আশ্বিন

১৩৪০

শ্রীরামানন্দ চট্টোপাধ্যায় সম্পাদিত

বার্ষিক মূল্য ছয় টাকা আট আনা

বৈশাখ—আশ্বিন

৩৩শ ভাগ, ১ম খণ্ড—১৩৪০

বিষয়-সূচী

বিষয়-সূচী

বিষয়-সূচী

চিত্র-সূচী

চিত্র-সূচী

চিত্র-সূচী

লেখকগণ ও তাঁহাদের রচনা

লেখকগণ ও তাঁহাদের রচনা

"সত্যম্ শিবম্ সুন্দরম্"

"নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ"

৩৩শ ভাগ
১ম খণ্ড

বৈশাখ, ১৩৪০

১ম সংখ্যা

মানব সত্য

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

১

আমাদের জন্মভূমি তিনটি, তিনটিই একত্র জড়িত। প্রথম—পৃথিবী। মানুষের বাসস্থান পৃথিবীর সর্ব্বত্র। শীত-প্রধান তুষারাদ্রি, উত্তপ্ত বালুকাময় মরু, উত্তুঙ্গ দুর্গম গিরিশ্রেণী আর এই বাংলার মতো সমতল ভূমি, সর্ব্বত্রই মানুষের স্থিতি। মানুষের বস্তুত বাসস্থান এক। ভিন্ন ভিন্ন জাতির নয়, সমগ্র মানুষ জাতির। মানুষের কাছে পৃথিবীর কোনো অংশ দুর্গম নয়। পৃথিবী তার কাছে হৃদয় অবারিত ক'রে দিয়েচে।

মানুষের দ্বিতীয় বাসস্থান স্মৃতিলোক। অতীত কাল থেকে পূর্ব্বপুরুষদের কাহিনী নিয়ে কালের নীড় সে তৈরি করেচে। এই কালের নীড় স্মৃতির দ্বারা রচিত গ্রথিত। এ শুধু এক একটা বিশেষ জাতির কথা নয়, সমস্ত মানুষ জাতির কথা। স্মৃতিলোকে সকল মানুষের মিলন। বিশ্বমানবের বাসস্থান একদিকে পৃথিবী আর একদিকে সমস্ত মানুষের স্মৃতিলোক। মানুষ জন্মগ্রহণ করে সমস্ত পৃথিবীতে, জন্মগ্রহণ করে নিখিল ইতিহাসে।

তার তৃতীয় বাসস্থান আত্মিকলোক। সেটাকে বলা যেতে পারে সর্ব্বমানবচিত্তের মহাদেশ। অন্তরে অন্তরে সকল মানুষের যোগের ক্ষেত্র এই চিত্তলোক। কারুর চিত্ত হয়তো বা সঙ্কীর্ণ বেড়া দিয়ে ঘেরা, কারুর বা বিকৃতির দ্বারা বিপরীত। কিন্তু একটি ব্যাপক চিত্ত আছে যা ব্যক্তিগত নয় বিশ্বগত। সেটির পরিচয় অকস্মাৎ পাই। একদিন আহ্বান আসে। অকস্মাৎ মানুষ সত্যের জন্যে প্রাণ দিতে উৎসুক হয়। সাধারণ লোকের মধ্যেও দেখা যায়, যখন সে স্বার্থ ভোলে, যেখানে সে ভালবাসে, নিজের ক্ষতি করে ফেলে। তখন বুঝি—মনের মধ্যে একটা দিক আছে যেটা সর্ব্বমানবের চিত্তের দিকে।

বিশেষ প্রয়োজনে ঘরের সীমায় খণ্ডাকাশ বদ্ধ কিন্তু মহাকাশের সঙ্গে তার সত্যকার যোগ। ব্যক্তিগত মন আপন বিশেষ প্রয়োজনের সীমায় সঙ্কীর্ণ হলেও তার সত্যকার বিস্তার সর্ব্বমানবচিত্তে। সেইখানকার প্রকাশ আশ্চর্য্যজনক। একজন কেউ জলে পড়ে গেছে আর একজন জলে ঝাঁপ দিলে তাকে বাঁচাবার জন্যে। অন্যের প্রাণরক্ষার জন্যে নিজের প্রাণ সঙ্কটাপন্ন করা। নিজের সত্তাই যার একান্ত সে বলবে আপনি বাঁচলে বাপের নাম। কিন্তু আপনি বাঁচাকে সব চেয়ে বড় বাঁচা বললে না, এমনও দেখা গেল। তার কারণ সর্ব্বমানবসত্তা পরস্পর যোগযুক্ত।

আমার জন্ম যে-পরিবারে সে-পরিবারের ধর্ম্মসাধন একটি বিশেষ ভাবের। উপনিষদ এবং পিতৃদেবের অভিজ্ঞতা, রামমোহন এবং আর আর সাধকদের সাধনাই

আমাদের পারিবারিক সাধনা। আমি পিতার কনিষ্ঠ পুত্র। জাতকর্ম থেকে আরম্ভ ক'রে আমার সব সংস্কারই বৈদিক মন্ত্র দ্বারা অনুষ্ঠিত হয়েছিল, অবশ্য ব্রাহ্মমতের সঙ্গে মিলিয়ে। আমি স্কুল-পালানো ছেলে। যেখানেই গণ্ডী দেওয়া হয়েচে সেখানেই আমি বনিবনাও করতে পারিনি কখনও। যে অভ্যাস বাইরে থেকে চাপানো তা আমি গ্রহণ করতে অক্ষম। কিন্তু পিতৃদেব সে জন্যে কখনও ভর্ৎসনা করতেন না। তিনি নিজেই স্বাধীনতা অবলম্বন করে পৈতামহিক সংস্কার ত্যাগ করেছিলেন। গভীরতর জীবনতত্ত্ব সম্বন্ধে চিন্তা করার স্বাধীনতা আমারও ছিল। এ কথা স্বীকার করতেই হবে আমার এই স্বাতন্ত্র্যের জন্যে কখনও কখনও তিনি বেদনা পেয়েচেন। কিছু বলেন নি।

বাল্যে উপনিষদের অনেক অংশ বার-বার আবৃত্তি দ্বারা আমার কণ্ঠস্থ ছিল। সব-কিছু গ্রহণ করতে পারিনি সকল মন দিয়ে। শ্রদ্ধা ছিল, শক্তি ছিল না হয়তো। এমন সময় উপনয়ন হ'ল। উপনয়নের সময় গায়ত্রী মন্ত্র দেওয়া হয়েছিল। কেবলমাত্র মুখস্থভাবে না। বারম্বার সুস্পষ্ট উচ্চারণ ক'রে আবৃত্তি করেচি এবং পিতার কাছে গায়ত্রী মন্ত্রের ধ্যানের অর্থ পেয়েচি। তখন আমার বয়স বারো বৎসর হবে। এই মন্ত্র চিন্তা করতে করতে মনে হ'ত বিশ্বভুবনের অস্তিত্ব আর আমার অস্তিত্ব একাত্মক। ভূর্ভুবঃ স্বঃ—এই ভূলোক অন্তরীক্ষ, আমি তারি সঙ্গে অখণ্ড। এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের আদি অন্তে যিনি আছেন তিনিই আমাদের মনে চৈতন্য প্রেরণ করচেন। চৈতন্য ও বিশ্ব; বাহিরে ও অন্তরে সৃষ্টির এই দুই ধারা এক ধারায় মিলচে।

এমনি ক'রে ধ্যানের দ্বারা যাকে উপলব্ধি করচি, তিনি বিশ্বাত্মাতে আমার আত্মাতে চৈতন্যের যোগে যুক্ত। এইরকম চিন্তার আনন্দে আমার মনের মধ্যে একটা জ্যোতি এনে দিলে। এ আমার সুস্পষ্ট মনে আছে।

যখন বয়স হয়েচে, হয়ত আঠারো কি উনিশ হবে বা বিশও হ'তে পারে, তখন চৌরঙ্গীতে ছিলুম দাদার সঙ্গে। এমন দাদা কেউ কখনও পায়নি। তিনি ছিলেন একাধারে বন্ধু ভাই সহযোগী।

তখন প্রত্যুষে ওঠা প্রথা ছিল। আমার পিতাও খুব প্রত্যুষে উঠতেন। মনে আছে একবার ডালহৌসি পাহাড়ে পিতার সঙ্গে ছিলুম। সেখানে প্রচণ্ড শীত। সেই শীতে ভোরে আলো হাতে এসে আমাকে শয্যা থেকে উঠিয়ে দিতেন। সেই ভোরে উঠে একদিন চৌরঙ্গীর বাসার বারান্দায় দাঁড়িয়ে ছিলুম। তখন ওখানে ফ্রি স্কুল বলে একটা স্কুল ছিল। রাস্তাটা পেরিয়েই স্কুলের হাতাটা দেখা যেত। সেদিকে চেয়ে দেখলুম গাছের আড়ালে সূর্য্য উঠচে। যেমনি সূর্য্যের আবির্ভাব হ'ল গাছের অন্তরালের থেকে, অমনি মনের পর্দ্দা খুলে গেল। মনে হ'ল মানুষ আজন্ম একটা আবরণ নিয়ে থাকে। সেটাতেই তার স্বাতন্ত্র্য। স্বাতন্ত্র্যের বেড়া লুপ্ত হ'লে সাংসারিক প্রয়োজনের অনেক অসুবিধা। কিন্তু সেদিন সূর্য্যোদয়ের সঙ্গে সঙ্গে আমার আবরণ খসে পড়ল। মনে হ'ল সত্যকে মুক্ত দৃষ্টিতে দেখলেম। মানুষের অন্তরাত্মাকে দেখলেম। দু-জন মুটে কাঁধে হাত দিয়ে হাসতে হাসতে চলেচে। তাদের দেখে মনে হ'ল কী অনির্ব্বচনীয় সুন্দর। মনে হ'ল না তারা মুটে। সেদিন তাদের অন্তরাত্মাকে দেখলুম, যেখানে আছে চিরকালের মানুষ।

সুন্দর কাকে বলি? বাইরে যা অকিঞ্চিৎকর, যখন দেখি তার আন্তরিক অর্থ তখন দেখি সুন্দরকে। একটি গোলাপ ফুল বাছুরের কাছে সুন্দর নয়। মানুষের কাছে সে সুন্দর যে-মানুষ তার কেবল পাপড়ি না বোঁটা না, একটা সমগ্র আন্তরিক সার্থকতা পেয়েচে। পাবনার গ্রামবাসী কবি যখন প্রতিকূল প্রণয়িনীর মানভঞ্জনের জন্যে 'ট্যাহা দামের মোটরি' আনার প্রস্তাব করেন তখন মোটরির দাম এক টাকার চেয়ে অনেক বেড়ে যায়। এই মোটরি বা গোলাপের আন্তরিক অর্থটি যখন দেখতে পাই তখনই সে সুন্দর। সেদিন তাই আশ্চর্য্য হ'য়ে গেলুম। দেখলুম সমস্ত সৃষ্টি অপরূপ। আমার এক বন্ধু ছিল সে সুবুদ্ধির জন্য বিশেষ বিখ্যাত ছিল না তার সুবুদ্ধির একটু পরিচয় দিই। একদিন সে আমাকে জিজ্ঞাসা করেছিল, 'আচ্ছা, ঈশ্বরকে দেখেচ?' আমি বললুম 'না, দেখিনি তো।' সে বললে 'আমি

দেখেচি।' জিজ্ঞাসা করলুম,—'কী রকম?' সে উত্তর করলে 'কেন? এই যে চোখের কাছে বিজ বিজ করচে।' সে এলে ভাবতুম, বিরক্ত করতে এসেচে। সেদিন তাকেও ভাল লাগল। তাকে নিজেই ডাকলুম। সেদিন মনে হ'ল তার নির্ব্বুদ্ধিতাটা আকস্মিক, সেটা তার চরম ও চিরন্তন সত্য নয়। তাকে ডেকে সেদিন আনন্দ পেলুম। সেদিন সে অমুক নয়। আমি যার অন্তর্গত সেও সেই মানবলোকের অন্তর্গত। তখন মনে হ'ল এই মুক্তি। এই অবস্থায় চার দিন ছিলুম। চার দিন জগৎকে সত্যভাবে দেখেচি। তারপর জ্যোতিদা বললেন, 'দার্জ্জিলিঙ চলো।' সেখানে গিয়ে আবার পর্দ্দা পড়ে গেল। আবার সেই অকিঞ্চিৎকরতা, সেই প্রাত্যহিকতা। কিন্তু তার পূর্ব্বে কয়দিন সকলের মাঝে যাঁকে দেখা গেল তাঁর সম্বন্ধে আজ পর্য্যন্ত আর সংশয় রইল না। তিনি সেই অখণ্ড মানুষ যিনি মানুষের ভূত-ভবিষ্যতের মধ্যে পরিব্যাপ্ত, যিনি অরূপ, কিন্তু সকল মানুষের রূপের মধ্যে যাঁর অন্তরতম আবির্ভাব।

২

সেই সময়ে এই আমার জীবনের প্রথম অভিজ্ঞতা যাকে আধ্যাত্মিক নাম দেওয়া যেতে পারে। ঠিক সেই সময়ে বা তার অব্যবহিত পরে যে ভাবে আমাকে আবিষ্ট করেছিল, তার স্পষ্ট ছবি দেখা যায় আমার সেই সময়কার কবিতাতে—"প্রভাতসঙ্গীতে"র মধ্যে। তখন স্বতঃই যে ভাব আপনাকে প্রকাশ করেচে, তাই ধরা পড়েচে প্রভাত-সঙ্গীতে। পরবর্ত্তী কালে চিন্তা ক'রে লিখলে তার উপর ততটা নির্ভর করা যেত না। গোড়াতেই বলে রাখা ভাল, "প্রভাতসঙ্গীত" থেকে যে কবিতা শোনাবো তা কেবল তখনকার ছবিকে স্পষ্ট দেখাবার জন্যে, কাব্যহিসাবে তার মূল্য অত্যন্ত সামান্য। আমার কাছে এর একমাত্র মূল্য এই যে, তখনকার কালে আমার মনে যে একটা আনন্দের উচ্ছ্বাস এসেছিল তা এতে ব্যক্ত হয়েচে। তার ভাব অসংলগ্ন, ভাষা কাঁচা, যেন হাতড়ে হাতড়ে বলবার চেষ্টা। কিন্তু 'চেষ্টা' বললেও ঠিক হবে না, বস্তুত চেষ্টা নেই তাতে, অস্ফুটবাক্ মন বিনা চেষ্টায় যেমন ক'রে পারে তাকে ব্যক্ত করেচে, সাহিত্যের আদর্শ থেকে বিচার করলে স্থান পাওয়ার যোগ্য সে মোটেই নয়।

যে কবিতাগুলো পড়ব তা একটু কুণ্ঠিতভাবেই শোনাবো, উৎসাহের সঙ্গে নয়। প্রথম দিনেই যা লিখেচি, সেই কবিতাটাই আগে পড়ি। অবশ্য ঠিক প্রথম দিনেরই লেখা কি-না, আমার পক্ষে জোর ক'রে বলা শক্ত। রচনার কাল সম্বন্ধে আমার উপর নির্ভর করা চলে না; আমার কাব্যের ঐতিহাসিক যাঁরা, তাঁরা সে কথা ভাল জানেন। হৃদয় যখন উদ্বেল হয়ে উঠেছিল আশ্চর্য্য ভাবোচ্ছ্বাসে, এ হচ্চে তখনকার লেখা। একে এখনকার অভিজ্ঞতার সঙ্গে মিলিয়ে দেখতে হবে। আমি বলেচি আমাদের এক দিক 'অহং' আর একটা দিক 'আত্মা'। 'অহং' যেন খণ্ডাকাশ, ঘরের মধ্যেকার আকাশ, যা নিয়ে বিষয়কর্ম্ম মামলা-মোকদ্দমা, এই সব। সেই আকাশের সঙ্গে যুক্ত মহাকাশ, তা নিয়ে বৈষয়িকতা নেই; সে আকাশ অসীম, বিশ্বব্যাপী। বিশ্বব্যাপী আকাশে ও খণ্ডাকাশে যে ভেদ, অহং আর আত্মার মধ্যেও সেই ভেদ। মানবত্ব বলতে যে বিরাট পুরুষ, তিনি আমার খণ্ডাকাশের মধ্যেও আছেন। আমারই মধ্যে দুটো দিক আছে—এক, আমাতেই বদ্ধ আর এক সর্ব্বত্র ব্যাপ্ত। এই দুই-ই যুক্ত এবং এই উভয়কে মিলিয়েই আমার পরিপূর্ণ সত্তা। তাই বলেচি, যখন আমরা অহংকে একান্তভাবে আঁকড়ে ধরি, তখন আমরা মানবধর্ম্ম থেকে বিচ্যুত হয়ে পড়ি। সেই মহামানব, সেই বিরাট পুরুষ যিনি আমার মধ্যে রয়েচেন, তাঁর সঙ্গে তখন ঘটে বিচ্ছেদ।

> "জাগিয়া দেখিনু আমি আঁধারে র'য়েছি আঁধা,
> আপনারি মাঝে আমি আপনি র'য়েছি বাঁধা।
> র'য়েছি মগন হ'য়ে আপনারি কলস্বরে,
> ফিরে আসে প্রতিধ্বনি নিজেরি শ্রবণ 'পরে।"

এইটেই হচ্চে অহং, আপনাতে আবদ্ধ, অসীম থেকে বিচ্যুত হয়ে অন্ধ হয়ে থাকে অন্ধকারের মধ্যে। তারই মধ্যে ছিলেম, এটা অনুভব করলেম। সে যেন একটা স্বপ্নদশা।

> "গভীর—গভীর গুহা, গভীর আঁধার ঘোর,
> গভীর ঘুমন্ত প্রাণ একেলা গাহিছে গান,
> মিশিছে স্বপন-গীত বিজন হৃদয়ে মোর।"

নিদ্রার মধ্যে স্বপ্নের যে লীলা, সত্যের যোগ নেই তার সঙ্গে। অমূলক, মিথ্যা নানা নাম দিই তাকে। অহং-এর মধ্যে সীমাবদ্ধ যে জীবন, সেটা মিথ্যা। নানা অতিকৃতি দুঃখ, ক্ষতি সব জড়িয়ে আছে তাতে। অহং যখন জেগে উঠে আত্মাকে উপলব্ধি করে তখন সে নূতন জীবন লাভ করে। এক সময়ে সেই অহং-এর খেলার মধ্যে বন্দী ছিলেম। এমনি ক'রে নিজের কাছে নিজের প্রাণ নিয়েই ছিলেম, বৃহৎ সত্যের রূপ দেখিনি।

"আজি এ প্রভাতে রবির কর
কেমনে পশিল প্রাণের 'পর,
কেমনে পশিল গুহার আঁধারে
প্রভাত পাখীর গান।
না জানি কেনরে এতদিন পরে
জাগিয়া উঠিল প্রাণ।
জাগিয়া উঠেছে প্রাণ,
ওরে উথলি উঠেছে বারি,
ওরে প্রাণের বাসনা প্রাণের আবেগ
রুধিয়া রাখিতে নারি।"

এটা হচ্ছে সেদিনকার কথা, যেদিন অন্ধকার থেকে আলো এলো বাইরের, অসীমের। সেদিন চেতনা নিজেকে ছাড়িয়ে ভূমার মধ্যে প্রবেশ করল। সেদিন কারার দ্বার খুলে বেরিয়ে পড়বার জন্যে, জীবনের সকল বিচিত্র লীলার সঙ্গে যোগযুক্ত হয়ে প্রবাহিত হবার জন্যে অন্তরের মধ্যে তীব্র ব্যাকুলতা। সেই প্রবাহের গতি মহান্ বিরাট সমুদ্রের দিকে। তাকেই এখন বলেছি বিরাট পুরুষ। সেই যে মহামানব, তারই মধ্যে গিয়ে নদী মিলবে, কিন্তু সকলের মধ্যে দিয়ে। এই যে ডাক পড়ল, সূর্য্যের আলোতে জেগে মন ব্যাকুল হয়ে উঠল, এ আহ্বান কোথা থেকে? এর আকর্ষণ মহাসমুদ্রের দিকে, সমস্ত মানবের ভিতর দিয়ে, সংসারের ভিতর দিয়ে, ভোগ ত্যাগ কিছুই অস্বীকার ক'রে নয়, সমস্ত স্পর্শ নিয়ে শেষে পড়ে এক জায়গায় যেখানে—

"কি জানি কি হ'ল আজি, জাগিয়া উঠিল প্রাণ,
দূর হ'তে শুনি যেন মহাসাগরের গান।
সেই সাগরের পানে হৃদয় ছুটিতে চায়,
তারি পদপ্রান্তে গিয়ে জীবন টুটিতে চায়।"

সেখানে যাওয়ার একটা ব্যাকুলতা অন্তরে জেগেছিল। 'মানবধর্ম্ম' সম্বন্ধে যে বক্তৃতা করেছি, সংক্ষেপে এই তার ভূমিকা। এই মহাসমুদ্রকে এখন নাম দিয়েছি মহামানব। সমস্ত মানুষের ভূত ভবিষ্যৎ, বর্ত্তমান নিয়ে তিনি সর্ব্বজনের হৃদয়ে প্রতিষ্ঠিত। তাঁর সঙ্গে গিয়ে মেলবারই এই ডাক।

এর দু-চার দিন পরেই লিখেছি 'প্রভাত উৎসব'। একই কথা, আর একটু স্পষ্ট ক'রে লেখা—

"হৃদয় আজি মোর কেমনে গেল খুলি'।
জগত আসি সেথা করিছে কোলাকুলি।
ধরায় আছে যত মানুষ শত শত,
আসিছে প্রাণে মোর হাসিছে গলাগলি।"

এই তো সমস্তই মানুষের হৃদয়ের তরঙ্গলীলা। মানুষের মধ্যে স্নেহ প্রেম ভক্তির যে সম্বন্ধ সেটা তো আছেই। তাকে বিশেষ ক'রে দেখা, বড় ভূমিকার মধ্যে দেখা, যার মধ্যে তারা একটা ঐক্য, একটা তাৎপর্য্য লাভ করে। সেদিন যে দু-জন মুটের কথা বলেচি, তাদের মধ্যে যে আনন্দ দেখলেম, সে সখ্যের আনন্দ, অর্থাৎ এমন কিছু যার উৎস সর্ব্বজনীন সর্ব্বকালীন চিত্তের গভীরে। সেইটে দেখেই খুসি হয়েছিলাম। আরো খুসি হয়েছিলেম এই জন্যে যে, যাদের মধ্যে ঐ আনন্দটা দেখলেম, তাদের বরাবর চোখে পড়ে না, তাদের অকিঞ্চিৎকর বলেই দেখে এসেচি। যে মুহূর্ত্তে তাদের মধ্যে বিশ্বব্যাপী প্রকাশ দেখলেম, অমনি পরম সৌন্দর্য্যকে অনুভব করলেম। মানব সম্বন্ধের যে বিচিত্র রস-লীলা, আনন্দ, অনির্ব্বচনীয়তা, তা দেখলেম সেইদিন। সে দেখা বালকের কাঁচা লেখায় আকুবাঁকু ক'রে নিজেকে প্রকাশ করেচে কোনো রকমে, পরিস্ফুট হয় নি। সে সময়ে আভাসে যা অনুভব করেচি, তাই লিখেচি। আমি যে যা খুসি গেয়েচি, তা নয়। এ গান দু-দণ্ডের নয়, এর অবসান নেই। এর একটা ধারাবাহিকতা আছে, এর অনুবৃত্তি আছে মানুষের হৃদয়ে হৃদয়ে। আমার গানের সঙ্গে সকল মানুষের যোগ আছে। গান থামলেও সে যোগ ছিন্ন হয় না।

"কাল গান ফুরাইবে, তা ব'লে গাবে না কেন,
আজ যবে হয়েছে প্রভাত।"
"কিসের হরষ কোলাহল,
শুধাই তোদের, তোরা বল।
আনন্দ মাঝারে সব উঠিতেছে ভেসে ভেসে,
আনন্দে হ'তেছে কভু লীন,

চাহিয়া ধরণী পানে নব আনন্দের গানে
মনে পড়ে আর একদিন।"

এই যে বিরাট আনন্দের মধ্যে সব তরঙ্গিত হচ্চে, তা দেখিনি বহুদিন, সেদিন দেখলেম। মানুষের বিচিত্র সম্বন্ধের মধ্যে একটি আনন্দের রস আছে। সকলের মধ্যে এই যে আনন্দের রস, তাকে নিয়ে মহারসের প্রকাশ। "রসো বৈ সঃ।" রসের খণ্ড খণ্ড প্রকাশের মধ্যে তাকে পাওয়া গিয়েছিল। সেই অনুভূতিকে প্রকাশের জন্ম মরীয়া হ'য়ে উঠেছিলেম, কিন্তু ভালরকম প্রকাশ করতে পারিনি। যা বলেচি অসম্পূর্ণভাবে বলেচি।

প্রভাতসঙ্গীতের শেষের কবিতা—

"আজ আমি কথা কহিব না।
আর আমি গান গাহিব না।
হের আজি ভোর-বেলা এসেছে রে মেলা লোক,
ঘিরে আছে চারিদিকে
চেয়ে আছে অনিমিখে,
হেরে মোর হাসি-মুখ ভুলে গেছে দুখ শোক।
আজ আমি গান গাহিব না।"

এর থেকে বুঝতে পারা যাবে, মন তখন কী ভাবে আবিষ্ট হয়েছিল, কোন্ সত্যকে মন স্পর্শ করেছিল। যা-কিছু হচ্চে, সেই মহামানবে মিলচে, আবার ফিরেও আসচে সেখান থেকে প্রতিধ্বনিরূপে নানা রসে সৌন্দর্য্যে মণ্ডিত হয়ে। এটা উপলব্ধি হয়েছিল অনুভূতিরূপে, তত্ত্বরূপে নয়। সে সময় বালকের মন এই অনুভূতিদ্বারা যেভাবে আন্দোলিত হয়েছিল, তারই অসম্পূর্ণ প্রকাশ প্রভাতসঙ্গীতের মধ্যে। সেদিন অক্সফোর্ডে যা বলেচি, তা চিন্তা ক'রে বলা। অনুভূতি থেকে উদ্ধার ক'রে অন্য তত্ত্বের সঙ্গে মিলিয়ে যুক্তির উপর খাড়া ক'রে সেটা বলা। কিন্তু তার আরম্ভ ছিল এখানে। তখন স্পষ্ট দেখেচি, জগতের তুচ্ছতার আবরণ খসে গিয়ে সত্য অপরূপ সৌন্দর্য্যে দেখা দিয়েচে। তার মধ্যে তর্কের কিছু নেই, সেই দেখাকে তখন সত্যরূপে জেনেচি। এখনো বাসনা আছে, হয়তো সমস্ত বিশ্বের আনন্দরূপকে কোন এক শুভ মুহূর্ত্তে আবার তেমনি পরিপূর্ণভাবে কখনও দেখতে পাব। এইটে যে একদিন বাল্যাবস্থায় সুস্পষ্ট দেখেছিলেম, সেইজন্যেই "আনন্দরূপমমৃতং যদ্বিভাতি" উপনিষদের এই বাণী আমার মুখে বার-বার ধ্বনিত হয়েছে। সেদিন দেখেছিলেম, বিশ্ব স্থূল নয়, বিশ্বে এমন কোনো বস্তু নেই যার মধ্যে রসস্পর্শ নেই। যা প্রত্যক্ষ দেখেচি তা নিয়ে তর্ক কেন? স্থূল আবরণের মৃত্যু আছে, অন্তরতম আনন্দময় যে সত্তা, তার মৃত্যু নেই।

[বিশ্বভারতী পাঠভবনে রবীন্দ্রনাথের সাপ্তাহিক বক্তৃতার অনুলিপি। শ্রীপ্রভাতচন্দ্র গুপ্ত ও শ্রীবিজন বিহারী ভট্টাচার্য্য কর্ত্তৃক অনুলিখিত]

পত্রধারা

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

সেই কমলা লেকচার লিখতে অত্যন্ত ব্যস্ত থাকতে হয়েচে। মানবের ধর্ম্ম বিষয়টা নিয়ে অক্সফোর্ডে বক্তৃতা দিয়েছিলুম, সেটা বই আকারে বেরিয়েচে। বাংলা ভাষায় বক্তব্যটা সহজ ক'রে তোলা সহজ নয়, চেষ্টা করতে হচ্চে খুব বেশি করে। অন্য কিছুতে মন বিক্ষিপ্ত করতে সাহস হচ্চে না। অথচ ইতিমধ্যে অনেক রকম অভ্যাঘাত ঘটেচে। এই শীতের সময় এখানে নানা দেশের নানা অতিথি সমাগম হয়। কয়েকজন জাপানী এসেছিলেন তাঁরা সারনাথে বুদ্ধমন্দির চিত্রালঙ্কৃত করতে চলেছিলেন। মালবীয়জী এসেছিলেন তাঁকে নিয়ে দু-দিন কাটল। তা ছাড়া এখানকার কর্ম্মের ধারা আছে।

কলকাতার কাজে আমাকে যেতে হবে আগামী দশই ডিসেম্বর। প্রফুল্ল জয়ন্তীর তারিখ এগারই। বারোই তারিখে স্বদেশী ভাণ্ডারের আরম্ভ কর্ম্ম। সেই-দিনই অপরাহ্ণে জাপানীদের এক সভায় আমার আমন্ত্রণ। তারপরে কবে বিশ্ববিদ্যালয়ে বক্তৃতা এখনো নিশ্চিত জানিনে। এটা কমলা লেকচার নয়। আমার প্রোফেসারী পদের প্রথম অভিভাষণ। তারপরে

আরো বক্তৃতা পর্য্যায়ক্রমে চালাতে হবে। মনে করতে পীড়া বোধ হয়, ছুটির জন্যে প্রাণ হাঁপিয়ে ওঠে। অথচ এ কথাও সত্য যে, নিতান্ত দায়ে না পড়লে আমার কুড়েমির তালা ভাঙে না। অক্‌স্‌ফোর্ডেও যে বক্তৃতা দিয়েছিলুম তা বিস্তর পীড়াপীড়ির পরে। না দিলে আমার বলবার কথা অযুক্ত থাকত। কমলা লেকচারেও প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হয়ে লিখতে হ'ল, অথচ দায়ে পড়িনি বলে যদি না লিখতুম তা হ'লে সেটা আমার পক্ষে অকর্ত্তব্য হ'ত। বারে বারে আমার এই রকমই ঘটে থাকে। আমার অবস্থাটা ব্যস্ত, আমার স্বভাবটা কুঁড়ে—কেবলি দ্বন্দ্ব বাধে কিন্তু অবস্থারই জিৎ হয়। ছেলেবেলা থেকে আমি স্বভাবতই কুণো অথচ আমি যত দেশেবিদেশে মানুষের ভিড়ের মধ্যে ঘুরপাক খেয়ে বেড়িয়েচি এমন দ্বিতীয় ব্যক্তি আজ সমস্ত পৃথিবীতে আছে কি-না সন্দেহ; বিশ্রামের জন্যে ছুটির জন্যে আমার অকর্ম্মণ্য মন নিরতিশয় উৎসুক অথচ আমাকে যত প্রভূত পরিমাণে কাজ করতে হয়েচে, এমন ঘোরতর কেজো লোককেও না। সাধ্যমতে স্বদেশকে নানাপ্রকারে সেবা থেকে আমি বঞ্চিত করিনি অথচ আনন্দের সঙ্গে উৎসাহের সঙ্গে অব্যাঘাতে নির্ম্মমভাবে দেশের লোক আমাকে যত গাল দিয়েচে বাংলা দেশে দ্বিতীয় ব্যক্তি এমন কেউ নেই। এই এক অদ্ভুত দ্বন্দ্ব আমার জীবনে।

তোমার ইংরেজি লেখা দেখলুম। প্রকাশ করবার শক্তি তোমার স্বভাবতই আছে। বাল্যকাল থেকে যদি যথেষ্ট পরিমাণে ইংরেজীর চর্চ্চা করতে তা হ'লে ভাল লিখতে পারতে। তাতে লাভ কী হ'ত। যে লেখা শ্বেতদ্বীপের শ্বেতভুজা সরস্বতী অর্ঘ্যরূপে গ্রহণ করতে পারেন সে লেখা বাঙালীর কলমের মুখে প্রসন্ন হয়ে বিকাশ পায় না। বই পড়ার রাস্তায় ইংরেজি ভাষার সঙ্গে আমাদের যোগসাধনটাই প্রশস্ত। সে কম লাভ নয়। তুমি যদি দুই-তিন বছর এই অধ্যবসায়ে প্রবৃত্ত থাকো তা হ'লে তোমার বাধা কেটে যাবে। তাতে তোমার প্রকাশের উপকরণও অনেক বেড়ে যাবে। তা ছাড়া সাহিত্যের বিচারশক্তি ও প্রাদেশিকতা কাটিয়ে বুদ্ধি উদার হয়ে উঠবে। আমাদের মন আমাদের স্বদেশের, কিন্তু আমাদের কাল তার চেয়ে বৃহৎ দেশের। দুইয়ের মিল করতে না পারলে পিছিয়ে থাকতে হবে। কালকে ধিক্কার দিয়ে লাভ নেই, কেন না কালোহি বলবত্তরঃ। তোমার চেয়ে তার জোর বেশি—তার সঙ্গে রফা করতেই হবে। ইতি ৫ ডিসেম্বর ১৯৩২

২

দেহ মন ক্লান্ত। ভিতরের আলো যেন নিবে আসচে বলে মনে হয়। সমস্ত অন্তঃকরণ কর্ম্ম থেকে বিরত হয়ে বিশ্রাম চায় কিন্তু আমার প্রতি কারো করুণা নেই, নিজের নিজের অতি ছোটো ছোটো কাজও আমার কাছ থেকে আদায় করবার দাবী করে। কাল বুধবারে পরের দায়ে কলকাতায় যেতে হবে। যাওয়াটা আমার শরীরের পক্ষে কত ক্লান্তিকর কেউ অনুমান করতে পারে না। করলেও কেউ যে নিষ্কৃতি দেবে তার আশা ছেড়ে দিয়েচি অতএব শেষ পর্য্যন্ত এই ভাবেই চলবে। আমার জন্যে উদ্বেগ মনে রাখা বৃথা। আমার বয়সে দেহ সম্বন্ধে প্রশ্ন শেষ করবার সময় এসেচে। যৌবনে যে নৌকো মাঝদরিয়ায় তারই জন্যে ভাবনা করলে সেটা মানায়—যে এসে পৌঁছল ঘাটের কাছে তার তলায় ফুটো হলেই বা কী আসে যায়। ইতি ২ ফাল্গুন ১৩৩৯

৩

যাদের তোমরা অন্ত্যজ বলো তাদের নির্ম্মল ও শুচি হবার উপদেশ দিতে আমাকে অনুরোধ করেচ। করতে পারি যদি তুমি নিশ্চিত করে বলতে পারো যে অন্য জাতীয় যারা ঠাকুরের দর্শন স্পর্শন ও সেবার অধিকারী তারা সকলেই নির্ম্মল নিরাময়, তাদের কারো দুষ্টব্যাধি নেই, অন্তরে বাহিরে তারা সকলেই বা তাদের অনেকেই শুচি—তারা মিথ্যা মকদ্দমা করে না, তারা অকপট। তারা মন্দিরে প্রবেশ করলে দেবতা যদি অশুচি না হন, শত শত বৎসর তাদের সংশ্রবেও যদি তাঁদের দেবত্বে কোনো সঙ্কোচ না ঘটে থাকে, তবে কেবল জন্মগত হীনতাই কি দেবতার অসহ্য। দেবতা কি কেবল তোমাদেরই দেবতা, তোমাদের বিষয়সম্পত্তির মতো। দেবতা সম্বন্ধে এমন ধারণার মতো দেবতার অপমান আর কিছুই হ'তে পারে না. ভারতবর্ষে দেবতা অপমানিত এবং মানুষ অপমানিত। ইতি ৮ আশ্বিন ১৩৩৯

বাংলার শঙ্করাচার্য্য

শ্রীচিন্তাহরণ চক্রবর্ত্তী

গ্রন্থের গৌরববৃদ্ধির উদ্দেশ্যে গ্রন্থকার কর্তৃক নাম গোপন করিয়া কোনও প্রখ্যাতনামা গ্রন্থকারের নামে নিজ গ্রন্থ চালাইবার প্রথা ভারতীয় সাহিত্যের ইতিহাসে সুপরিচিত। ভারতের সুপ্রসিদ্ধ প্রায় সকল গ্রন্থকারের নাম নকল করিয়া এইরূপে যুগে যুগে বহু ভালমন্দ গ্রন্থের আবির্ভাব হইয়াছে। ফলে কোন প্রসিদ্ধ গ্রন্থকারের নামে প্রচলিত সকল গ্রন্থই তাঁহার ও তাঁহার সময়ের রচিত কি সময়ান্তরে অন্য গ্রন্থকার কর্তৃক রচিত এ বিষয়ে স্বভাবতই সন্দেহ জাগিয়া উঠে এবং প্রত্নতত্ত্ববিৎ সম্প্রদায়ের মধ্যে গ্রন্থবিশেষের রচয়িতা ও সময় লইয়া নানা মতবাদের সৃষ্টি হইয়া থাকে। ভারতীয় সাহিত্যের নিখুঁত ইতিহাস গড়িয়া তোলার পক্ষে এ এক বিষম অন্তরায় তাহা ভুক্তভোগী মাত্রেই অবগত আছেন।

তবে বিশেষ সৌভাগ্যের কথা এই যে, কোন কোন স্থলে অর্বাচীন গ্রন্থকারগণ প্রাচীন নাম গ্রহণ করিলেও বিশেষণাদির দ্বারা সেই নামের প্রাচীন গ্রন্থকার হইতে নিজেদের পার্থক্য সূচিত করিয়াছেন। 'কলিকালবাল্মীকি,' 'অভিনববাণ,' 'অর্ব্বাচীন শঙ্করাচার্য্য'* প্রভৃতি এই জাতীয় নামের উদাহরণ। তবে নিজের প্রকৃত নাম উল্লেখ না করিলে ঈদৃশ নাম নির্দ্দেশ হইতে গ্রন্থকারের প্রকৃত স্বরূপ নির্ণয় করিবার কোনও উপায় নাই।

বর্ত্তমান প্রবন্ধে আলোচ্য শঙ্করাচার্য্য সম্বন্ধেও এই কথাগুলি খাটে। তাঁহার রচিত গ্রন্থগুলির পুষ্পিকায় তিনি শঙ্করাচার্য্য নামে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছেন এবং সাধারণতঃ পণ্ডিতসমাজে তিনি গৌড়ীয় শঙ্কর নামে পরিচিত। আউফ্রেক্‌ট, রাজা রাজেন্দ্রলাল মিত্র ও মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী প্রভৃতি পণ্ডিতগণ ইঁহাকে বাংলার শঙ্করাচার্য্য নামেই অভিহিত করিয়াছেন।

শঙ্কর আচার্য্য নামের একাধিক গ্রন্থকারের গ্রন্থ সংস্কৃত সাহিত্যে পাওয়া যায়। কিন্তু তাঁহাদের প্রকৃত স্বরূপ জানা যায় না। আমাদের আলোচ্য শঙ্করাচার্য্য সম্বন্ধেও আমরা বিস্তৃত ও বিশ্বাসযোগ্য তেমন কোনও বিবরণ পাই না। তিনি স্বরচিত 'তারারহস্যবৃত্তিকা'র শেষে নিজের যে পরিচয় দিয়াছেন তাহা হইতে এই মাত্র জানা যায় যে তিনি লম্বোদরের পৌত্র এবং কমলাকরের পুত্র।* ইহা ছাড়া, তিনি স্বরচিত গ্রন্থগুলির পুষ্পিকায় নিজেকে গৌড়ভূমিনিবাসী বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। ইহা হইতে বুঝা যায় যে, এই শঙ্করাচার্য্য বাঙ্গালী। এই স্বল্পমাত্র পরিচয় ব্যতীত এই শঙ্করাচার্য্যের আর কোনও পরিচয় আমরা অবগত নহি। তাঁহার আসল নাম কি ছিল তাহাও আমরা জানি না। তাঁহার রচিত একাধিক গ্রন্থের মধ্যে 'তারা-রহস্যবৃত্তিকা'খানি বিশেষ প্রচলিত ও আদৃত ছিল তাহার প্রমাণ আছে। কিন্তু বড়ই দুঃখের বিষয় এই যে, গ্রন্থের প্রচার যথেষ্ট হইলেও গ্রন্থকার নিজের নাম আদৌ প্রচারিত হইতে দেন নাই বা প্রচারিত হইবার অবকাশ পায় নাই। ইহা তাঁহার অনভিপ্রেত না হইতে পারে কিন্তু ইহা ঐতিহাসিকের মহা ক্ষোভের কারণ হইয়া উঠিয়াছে।

আসল নাম যাহাই থাকুক না কেন, আমাদের আলোচ্য গ্রন্থকার যে একজন বড় তান্ত্রিক সাধক বা তান্ত্রিক পণ্ডিত ছিলেন তাহা তাঁহার রচিত গ্রন্থ হইতে বুঝিতে পারা যায়। গৌড়ীয় শঙ্কর রচিত যে কয়খানি গ্রন্থের নাম আমরা জানিতে পারিয়াছি তাহাদের সকলগুলিই তান্ত্রিক গ্রন্থ। অনুষ্ঠানপ্রধান তন্ত্রশাস্ত্রের একজন আচার্য্য বিশুদ্ধ জ্ঞানমার্গের সাধক বৈদান্তিকচূড়ামণি শঙ্করাচার্য্যের নাম

---

* Catalogus Catalogorum (প্রথম খণ্ড পৃঃ ৬৫১) গ্রন্থে উল্লিখিত 'হনুমৎপূজা' নামক গ্রন্থ অর্বাচীন শঙ্করাচার্য্য রচিত।

* লম্বোদরস্য পৌত্রেণ কমলাকরসূনুনা।
অকারি শঙ্করেণৈষা বাসনাতত্ত্ববোধিনী ॥

গ্রহণ করিলেন কেন আপাততঃ এ সন্দেহ সাধারণের মনে উঠিতে পারে বটে। কিন্তু একথা মনে রাখিতে হইবে যে, তান্ত্রিকসম্প্রদায়ের মধ্যে শঙ্করাচার্য্য নিছক বৈদান্তিক হিসাবে পরিচিত নন, তিনি একজন অসাধারণ তান্ত্রিক বলিয়াও সুপরিচিত। 'প্রপঞ্চসার', 'সৌন্দর্য্যলহরী' প্রভৃতি কতকগুলি প্রসিদ্ধ তান্ত্রিক গ্রন্থ এই শঙ্করাচার্য্যেরই রচিত, সুতরাং একজন অর্বাচীন তান্ত্রিকের পক্ষে প্রসিদ্ধ শঙ্করাচার্য্যের গৌরবময় নাম গ্রহণ করা মোটেই অস্বাভাবিক নহে।

তবে আধুনিক পণ্ডিতসম্প্রদায়ের মধ্যে এই তান্ত্রিক-প্রবর গৌড়ীয় শঙ্করাচার্য্য বলিয়া পরিচিত হইলেও তিনি আদৌ শঙ্করাচার্য্য এই নাম গ্রহণ করিয়াছিলেন কি-না সে বিষয়েও যে সন্দেহ করিবার কারণ নাই এমন নহে। তাঁহার গ্রন্থের পুথিগুলিতে সাধারণতঃ শঙ্করাচার্য্য এই নাম পাওয়া গেলেও 'তারারহস্যবৃত্তিকা' নামক গ্রন্থের লণ্ডন ইণ্ডিয়া অফিস লাইব্রেরীর পুথিখানির পুষ্পিকাটি মনে একটা সংশয় জাগাইয়া তোলে। পুষ্পিকাটি এইরূপ—'ইতি গৌড়ভূমিনিবাসিমহামহোপাধ্যায়শ্রীশঙ্করাগমাচার্য্যেণ কৃতা বাসনাতত্ত্বকৌমুদী সমাপ্তা।'* জানি না, লিপিকর শঙ্করাচার্য্য লিখিতে গিয়া ভ্রমক্রমে শঙ্করাগমাচার্য্য লিখিয়া বসিয়াছেন কি-না। তবে আপাততঃ এই পুষ্পিকাদৃষ্টে গ্রন্থকারের নাম সম্বন্ধে দুইটি অনুমান মনে উদিত হয়। প্রথমতঃ, এমন হইতে পারে যে 'শঙ্করাগমাচার্য্য' একটি উপাধিমাত্র—ইহার অর্থ শৈবাগমাচার্য্য। দ্বিতীয়তঃ, শঙ্করাগমাচার্য্য শব্দের মধ্যে গ্রন্থকারের নাম ও উপাধি যুক্তভাবে বর্ত্তমান থাকিতে পারে। তাহা হইলে গ্রন্থকারের নাম শঙ্কর এবং উপাধি আগমাচার্য্য। এই দ্বিতীয় অনুমানটিই অধিকতর যুক্তিযুক্ত বলিয়া মনে হয়, কারণ, তারারহস্যবৃত্তিকার শেষ শ্লোকে গ্রন্থকার নিজের নাম শঙ্কর বলিয়া স্পষ্টই নির্দ্দেশ করিয়াছেন। কেবল একখানি মাত্র পুথির প্রমাণের উপর নির্ভর করিয়া দৃঢ়তার সহিত কিছুই বলা সঙ্গত নয় সত্য—তবে গ্রন্থকার নিজ পরিচয়শ্লোকে নিরুপপদ শঙ্কর এই নাম নির্দ্দেশ করায় এই প্রমাণের যে গুরুত্ব হইয়াছে তাহা উপেক্ষা করা চলে না। বস্তুতঃ, নিজেকে শঙ্করাচার্য্যনামে পরিচিত করাই তাঁহার উদ্দেশ্য হইলে এই পরিচয়শ্লোকে তিনি শঙ্করাচার্য্য এই নামই সন্নিবেশিত করিতেন। তাহা না করিয়া পরিচয়-শ্লোকে শঙ্কর ও পুষ্পিকায় শঙ্করাচার্য্য এইরূপ নির্দ্দেশ করায় অন্য প্রমাণ না থাকিলেও কি ইহাই মনে হয় না যে শঙ্করই তাঁহার খাঁটি নাম এবং পুষ্পিকায় নির্দ্দিষ্ট মহামহোপাধ্যায়ের মত আচার্য্য বা আগমাচার্য্য উপাধিমাত্র ?

শঙ্করের সময় সম্বন্ধে নির্দ্দিষ্ট কিছুই জানা যায় না। তাঁহার রচিত 'তারারহস্যবৃত্তিকা'র নেপাল দরবার লাইব্রেরীস্থিত একখানি পুথির নকলের তারিখ লক্ষ্মণসংবৎ ৫১১ (১৬৩০ খৃষ্টাব্দ)। তারার উপাসনাবিষয়ে সুবৃহৎ প্রামাণিক গ্রন্থ গদাধরপুত্র নরসিংহ ঠক্কুর কৃত তারাভক্তিসুধার্ণবে যে তারারহস্যবৃত্তিকা উদ্ধৃত হইয়াছে তাহা ও শঙ্করকৃত গ্রন্থ অভিন্ন হওয়া অসম্ভব নহে। স্বরচিত গ্রন্থের পুষ্পিকায় শঙ্কর নিজেকে গৌড়ভূমিনিবাসী বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। ইহা হইতে বোধ হয় শঙ্করের সময় পর্য্যন্ত গৌড়ই বাংলার রাজধানী ছিল এবং গৌড়ের অবস্থা তখনও উন্নত ছিল; তাই তিনি গর্ব্বের সহিত গৌড়ভূমিনিবাসী বলিয়া নিজের পরিচয় দিয়াছেন। অতএব মনে হয়, তিনি ষোড়শ শতাব্দীর শেষভাগের পূর্ব্বেই আবির্ভূত হইয়াছিলেন। কারণ, ঐ সময়েই গৌড়ের পতন একরূপ সম্পূর্ণ হয়।

শঙ্করের রচিত গ্রন্থগুলির মধ্যে তারারহস্যবৃত্তিকা সর্ব্বপ্রধান বলিয়া মনে হয়। নামসাদৃশ্য থাকিলেও বঙ্গের সুপ্রসিদ্ধ তন্ত্রাচার্য্য ব্রহ্মানন্দগিরিকৃত তারারহস্যের সহিত এই গ্রন্থের কোনও সম্বন্ধ নাই। কিন্তু রাজেন্দ্রলাল মিত্র মহাশয় বিকানীর দরবার লাইব্রেরীর সংস্কৃত পুথীর তালিকায় এই গ্রন্থের বিবরণে বোধ হয় ইহাকে তারারহস্যের টীকা বলিয়া ভ্রম করিয়াছেন। পঞ্চদশ পটল বা অধ্যায়ে সমাপ্ত এই গ্রন্থে তারোপাসনা সম্বন্ধে বিবিধ তথ্য উপনিবদ্ধ হইয়াছে। গ্রন্থের প্রারম্ভে শিব, বিষ্ণু প্রভৃতির উপাসনা অপেক্ষা কুলাচার মতে শক্তির উপাসনার প্রাধান্য নিরূপণ করা হইয়াছে। এই প্রসঙ্গে শঙ্কর রুদ্রযামল তন্ত্র হইতে

---

* Descriptive Catalogue of Sanskrit Manuscripts in the India Office Library—৪।২৫০০

বচন উদ্ধৃত করিয়া কৌল সম্প্রদায়ানুমত মুক্তিরও বৈশিষ্ট্য প্রতিপাদন করিয়াছেন। তিনি দেখাইয়াছেন যে, বামাচার, দক্ষিণাচার, সিদ্ধান্তাগম প্রভৃতি সালোক্য নামক মুক্তি আনয়ন করিতে পারে—কুলাগমই উৎকৃষ্ট সাযুজ্য মুক্তি প্রদান করিয়া থাকে। গ্রন্থের মঙ্গলাচরণ শ্লোকে তারাদেবী সর্ব্বশ্রেষ্ঠ দেবতারূপে কল্পিত হইয়াছেন। তারাই পরমেশ্বরী 'উর্জ্জিতানন্দগহনা,' 'সর্ব্বদেবস্বরূপিণী,' 'পরাবাগ্‌রূপিণী,' 'পূর্ণাহন্তাময়ী'। এক কথায় তিনিই সচ্চিদানন্দ-ব্রহ্মরূপিণী। তারারহস্যবৃত্তিকার প্রচুর পুথি আজ পর্য্যন্ত নানা স্থানে দেখিতে পাওয়া যায়। উল্লেখযোগ্য পুথিশালার মধ্যে ইণ্ডিয়া অফিস লাইব্রেরী, এশিয়াটিক সোসাইটী, সংস্কৃত কলেজ, নেপাল ও বিকানীর দরবার লাইব্রেরী এবং বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদে এই পুথি আছে। ইহা হইতে বুঝা যায় এক যুগে এই গ্রন্থের বেশ আদর ছিল। এই আদর কেবল বাংলা দেশেই সীমাবদ্ধ ছিল না—বাংলার বাহিরেও যে এই আদর ছড়াইয়া পড়িয়াছিল তাহার প্রমাণ—মৈথিল নরসিংহ তাঁহার তারা-ভক্তিসুধার্ণবে এই গ্রন্থ হইতে প্রমাণ উদ্ধৃত করিয়াছেন; নেপাল দরবার লাইব্রেরীতে এই গ্রন্থের যে পুথি আছে তাহা মৈথিল অক্ষরে লেখা; বোম্বাই অঞ্চল ও বিকানীরের পুথি নাগরীতে লেখা।

একবীরতন্ত্র, একবীরকল্প, কালীতন্ত্র, কুমারীতন্ত্র, কুলচূড়ামণিতন্ত্র, কুলসংগ্রহ, কুলার্ণব, গণেশ্বরবিমর্ষিণী, গন্ধর্বতন্ত্র, তন্ত্রচূড়ামণি, তারার্ণব, তারাষট্‌পদী, দুর্বাসাকৃত দিব্যমহিম্নঃস্তোত্র, দেবীযামল, নীলতন্ত্র, ফেৎকারিণী, ফেরবীয়, বৃহজ্জ্ঞানার্ণব, ব্রহ্মযামল, ভাবচূড়ামণি, মৎস্যসূক্ত, মন্ত্রচূড়ামণি, মন্ত্রলীলাবতী, মহোগ্রতারাকল্প, মাতৃকার্ণব, মানসোল্লাস, মায়াতন্ত্র, রহস্যমালা, রুদ্রযামল, বারাহীতন্ত্র, বিমলাতন্ত্র, বিরূপাক্ষবিরচিত স্তোত্র, বিশুদ্ধেশ্বরতন্ত্র, বীরতন্ত্র, শঙ্করাচার্য্যকৃত তারাপঞ্চাটিকাস্তোত্র, শাম্ভবসূত্র, শাম্ভবীয়, শাম্ভবীসংহিতা, শারদাতিলক, শিবশাসনোক্ত স্তোত্র, সঙ্কেততন্ত্র, সিদ্ধসারস্বত, সোমভুজগাবলী, স্বতন্ত্রতন্ত্র, হংসপরমেশ্বর প্রভৃতি বহু তান্ত্রিকগ্রন্থ হইতে এই গ্রন্থে প্রমাণাদি উদ্ধৃত হইয়াছে। ইহাদের মধ্যে একাধিক গ্রন্থ বর্ত্তমানে অজ্ঞাত বা অল্পজ্ঞাত। ইহাদের মধ্যে কোন্‌গুলি মূলতন্ত্রগ্রন্থ ও কোন্‌গুলি নিবন্ধ তাহাও ঠিক বুঝিতে পারা যায় না। তবে লক্ষ্মণার্য্যবিরচিত শারদাতিলক তান্ত্রিক সমাজে সুপ্রসিদ্ধ। মানসোল্লাস নামে একাধিক গ্রন্থ পাওয়া যায়। এস্থলে উল্লিখিত মানসোল্লাস সুরেশ্বরাচার্য্য-কৃত দক্ষিণামূর্ত্তিস্তোত্রের বার্ত্তিক হওয়া সম্ভবপর; ঐ বার্ত্তিকের নামও মানসোল্লাস।

তারারহস্যবৃত্তিকা ব্যতীত শঙ্কর আরও কয়েকখানি তান্ত্রিক নিবন্ধ প্রভৃতি রচনা করিয়াছিলেন। ইহাদের মধ্যে সপ্তাধ্যায়ে সমাপ্ত শিবার্চ্চনমহারত্নে শৈবসাধকের আচারাদি সম্বন্ধে নানা তথ্য আলোচিত হইয়াছে। এই গ্রন্থের দুইখানি পুথির বিবরণ রাজা রাজেন্দ্রলাল মিত্র * ও মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী † কর্ত্তৃক প্রদত্ত হইয়াছে। তারারহস্যবৃত্তিকার পুথির ন্যায় এই পুথিতে তাঁহার পিতা ও পিতামহের কোনও উল্লেখ নাই। মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় তাঁহার Report of the Search of Sanskrit Manuscripts (1901-5) পুস্তকের একাদশ পৃষ্ঠায় কুলমূলাবতার ও ক্রমস্তব নামক আর দুইখানি গ্রন্থেরও উল্লেখ করিয়াছেন। তবে দুঃখের বিষয়, তারারহস্যবৃত্তিকা ছাড়া অন্য পুস্তকের পুথি সচরাচর পাওয়া যায় না এবং সেইজন্য তাহাদের সম্বন্ধে বিশেষ আলোচনাও সম্ভবপর নহে। রাজেন্দ্রলাল মিত্র মহাশয় ষট্‌চক্রভেদটিপ্পনী নামক একখানি গ্রন্থও ইহারই রচিত বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। কিন্তু তিনি এই গ্রন্থের যে পুথির বিবরণ দিয়াছেন ‡ তাহাতে শঙ্করাচার্য্য নাম থাকিলেও তিনি গৌড়দেশবাসী বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হন নাই। সুতরাং এই গ্রন্থকার ও আমাদের আলোচ্য শঙ্কর অভিন্ন কি-না সে বিষয়ে সন্দেহ আছে।

---

* Notices of Sanskrit Manuscripts—R.L. Mitra ৭।২৩৭৯

† ঐ —H. P. Shastri—১।৩৩২

‡ ঐ —R. L. Mitra—১।৩২৮

একরাত্রির যাত্রাসহচরী

শ্রীদেবেন্দ্রনাথ মিত্র

সেবারে কার্তিক মাসে পুজো। বিজয়ার পরদিন শ্যামবাবুর চায়ের দোকানে নির্দিষ্ট কোণটিতে বসেছি। মজলিস্ খালি। বন্ধুরা সবাই পুজোর ছুটিতে বাইরে গেছে। সুরেশ কাশী, নিত্যধন মধুপুর, নব আগ্রা। নৃপেন, সত্যব্রত ও শরৎ কোথায় বলা শক্ত। মণি মিত্তিরের নিমন্ত্রণে তাদের যাবার কথা কাশ্মীর। কাশ্মীরে মহারাজার প্যালেসে মণি মিত্তির ফ্রেস্কো করছে। ইণ্ডিয়ান আর্টে সে বিলেতে পাকা হয়ে এসেছে। কোজাগর পূর্ণিমায় কি যেন উৎসব। তিনজনেরই সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ আছে যোগদান করতে। কাজেকাজেই সত্য শরৎ নৃপেন রওনা হয়েছে কাশ্মীর ব'লে। নৃপেন খবরের কাগজের সম্পাদক, সত্যব্রত মোটা মাইনের চাকরি পেয়ে কবিতায় মন দিয়েছে, শরৎ জমিদারীর আয়ের আওতায় জাপানী আর্টে রিসার্চ্চ চালায়। শরতের ইচ্ছা কাশ্মীরের পথে আগ্রায় নেমে মুঘল আর্টের সঙ্গে জাপানী আর্টের সাদৃশ্য প্রমাণ করতে একটু রিসার্চ্চ করে যায়। নৃপেনের ইচ্ছা তার কাগজের জন্য দিল্লীর বিষয়ে একটা প্রবন্ধ লেখে। সত্য বলেছে ও-সব চলবে না। যেখানে ভাল লাগবে সেখানে নামা যাবে। এলাহাবাদে তার সদ্যপরিণীতা বিদুষী শ্যালিকার বাড়ি। সুতরাং এলাহাবাদ তার ভাল লেগে যাবার কথা, এবং বন্ধুর বিদুষী তরুণী শ্যালিকার আতিথ্য অতিক্রম ক'রে নৃপেন ও শরতের আর অগ্রসর হওয়া চলবে কি-না সন্দেহ।

শ্যামবাবু জিজ্ঞাসা করলেন, চা দেব? না, কোকো? নিশ্বাস ফেলে ভাবলাম,—আর চা না কোকো। সত্য, নৃপেন, শরৎ এখন কি-ই যে পান করছে।

—চা-ই দিন।

রাস্তায় লোকচলাচল রীতিমত কম। ছাত্রের দল নাই, আপিস-ফেরতদের ভিড় নাই। একটা নিরিবিলি ভাব। মনে হল,—আঃ, সুরেশ এতক্ষণ বিশ্বেশ্বরের মন্দিরে আরতি দেখে পুণ্য সঞ্চয় করছে, নিত্যধনের মধুপুরের রাস্তায় কত অনাত্মীয়ার সঙ্গে পরিচয় ঘনিষ্ঠ হয়ে উঠছে, নব একাদশীর জ্যোৎস্নায় তাজের সৌন্দর্য্যে মুগ্ধ হচ্ছে। আর গঙ্গাযমুনার সঙ্গমে বিকেলটা নৌকাবিহারে কাটিয়ে তিনটি যুবক আর একটি তরুণী সবে ঘরে ফিরে এসেছে। সত্য কবিতা আওড়াচ্ছে। শরৎ ছবির য়্যালবাম্ খুলে বক্তৃতা করছে, নৃপেন রসিকতা ক'রে হাসি ফুটিয়েছে। অতিথিপরায়ণা তরুণী নতমুখে চা বাঁটছে এবং ঈষৎ হাসির সঙ্গে রাত্রে কার কি খাওয়া অভ্যাস তার খবর নিচ্ছে।

ছোট্ট একটা নিশ্বাস ফেলে ছড়ানো ষ্টেটস্‌ম্যানটা টেনে নিয়ে ই. আই. আর টাইম টেবলের ওপর চোখ বুলোতে লাগলাম,—বড় বড় অক্ষরে বিজ্ঞাপন, পূজা কনসেসন্, পূজা কনসেসন্। প্রথম দ্বিতীয় শ্রেণী এক ভাড়ায় যাতায়াত, মধ্যম শ্রেণী—

মুখ তুলে বললাম, এবার ই. আই. আর ঘরের লোক টেনে বার ক'রে ছেড়েছে। দেখেছেন সস্তার ধুমটা।

তিনি বললেন, আপনিও ত কাশ্মীরে যাবেন বলেছিলেন। কি হল?

চায়ের বাটিতে একটা চুমুক দিয়ে বললাম,—আর বলেন কেন মশায়, ঘর শত্রু, ঘর শত্রু। সব ঠিকঠাক, গিন্নী বললেন, বাপের বাড়ি যাব। তথাস্তু। বাংলা দেশ থেকে এই বাপের বাড়ির—

বাধা দিয়ে শ্যামবাবু বললেন, তা আপনি যখন সঙ্গে গেলেন না তখন ত বেশ কাশ্মীর বেড়িয়ে আসতে পারতেন।

—দুটি সপ্তাহ কাশ্মীরে কাটিয়ে এসে দুটি বন্ধুর ধ'রে খোঁটা খেতে হত। সত্য ওরা শীগগীর ফিরছে না। কি বলেন?

—তা তেমন তাড়া নেই ত কারও। এক নৃপেন বাবুর আপিস।

—ভাল আপিস পেয়েছেন। নৃপেন এক মাসের লীভার অগ্রিম লিখে রেখে গেছে, আমি হলপ ক'রে বলতে পারি।

চায়ের শূন্য পেয়ালাটা টেবিলের ওপর অনেকটা ঠেলে দিয়ে অবসন্নভাটা যেন ঝেড়ে ফেললুম। পয়সা ক'টা টেবিলের ওপর ছড়িয়ে দিয়ে সিঁড়ির ওপর নামতেই একেবারে গায়ের ওপর গিয়ে পড়লাম,—মুখ তুলে দেখি নৃপেনের। অ্যাঁ, ব'লে এক লাফে ফিরে ঘরের মধ্যে ঢুকলাম। সে কি হে! তুমি! তুমি কেমন করে এখন এখানে এলে?

নৃপেন জবাব দিল না। আস্তে কোণটিতে গিয়ে টেবিলের ওপর কনুয়ের ভর দিয়ে দুই হাতের ভেতর মুখ রেখে চুপ করে বসল। গম্ভীর। তার এমন অকস্মাৎ অভ্যাগমের মাঝে যে অবাক হবার কিছু আছে তার ভাবে এমন আভাস মাত্র নেই। যেন রোজকার মত আজও এসেছে। যেন তা'রই প্রতীক্ষায় বসে আছি এমনি ভাবখানা।

—তুমি যাও নি?

ঘাড় নেড়ে জানালে, গিয়েছিল।

—কবে ফিরলে?

তেমনি ইঙ্গিতে জানালে, আজ।

কাছে ঘেঁষে জিজ্ঞাসা করলাম,—ব্যাপার কি? তোমার বাক্‌রোধ হয়ে গেল নাকি? ট্রেন কলিশনে শক্ লেগেছে বুঝি? ঈষৎ হেসে বলল, ট্রেন ঠিক চলেছিল। তবে শক্ বাঁচাতে পারি নি।

আরও কাছে ঘেঁষে বসলাম।

—ব্যাপার কি হে?

দশ মিনিটে তার চায়ে মাত্র দুটি চুমুক দিয়ে নৃপেন ধীরে ধীরে বলল,—সেদিন ষ্টেশনে গিয়ে দেখি সত্য শরৎ পৌঁছয় নি। যতক্ষণ সয় গেটে দাঁড়িয়ে তাদের প্রত্যাশায় চেয়ে রইলাম। আপিস থেকেই সেকেণ্ড ক্লাসের টিকিট তিনটে কিনিয়েছিলাম, কিন্তু দেরিতে ব'লে বার্থ রিজার্ভ করা চলে নি। পাঁচ মিনিটের ঘণ্টা পড়ল, তবু মাণিকযুগলের দেখা নেই। মনে হল মিনিটিকিটে ঢুকে পড়া বিচিত্র নয় বহু কষ্টে ভিতরে প্রবেশ ক'রে প্রথম দ্বিতীয় শ্রেণীর কামরাগুলো খুঁজলাম। পৃথিবীর আসতে আর কারও বাকী নেই। কেবল সত্য ও শরৎ আসে নি।

দৌড়ে গেটে গেলাম। কুলিটা চীৎকার করতে লাগল। বকশিসের দোহাই আর মানে না।—এ সাব, গাড়ী নিকালতা, গাড়ী নিকালতা। চেয়ে দেখি গাড়ী গুটি-গুটি চলেছে। দৌড়ে গিয়ে একটা কামরায় বিপুলবিক্রমে ঢুকে পড়লাম। কুলির হাত থেকে বাক্স-বিছানা টেনে নিয়ে হুড়মুড় ক'রে বাঙ্কের ওপর ছুঁড়ে ছুঁড়ে ফেললাম। পাশের থেকে একজন কে চীৎকার ক'রে আপত্তি করতে লাগল। জানালা গলিয়ে কুলিকে পাওনা এবং বকশিস ছুঁড়ে দিয়ে দেহের অর্দ্ধেক বার করে চেয়ে রইলাম—সত্য ও শরৎ উঠল কি-না চোখে পড়ল না।

পাশের সহযাত্রী তখনও সমানে ইংরেজীতে আপত্তি করে চলেছে। কটূক্তি জানাশোনা যা ছিল, বাকী রাখল না কিছুই, শেষে পুনরুক্তি করতে লাগল। এইবার বক্তার প্রতি মনোযোগ দেওয়া গেল। চেহারা দেখেই হাসি পেল। যেমন বেঁটে তেমনি কালো। প্রকাণ্ড ভুঁড়ি দেহের থেকে দেড়হাত অগ্রসর হয়ে এসেছে। চোখদুটো গোল,—রাগে রাঙা হয়ে গেছে। সোজা শক্ত গোঁফ ফিরিঙ্গী-ধরণে দুপাশ কামিয়ে নাকের নীচের শিঙের মত খাড়া হয়ে আছে।

সমানে তর্জ্জন চলেছে। নরম হয়ে বললাম, দুঃখিত।

যেন আগুনে ঘি ফেললাম। জ্বলে উঠে বলতে লাগল,—আমার এক ঝাঁকা অমন সুন্দর দামী চিমনী-ডোম ঐ দু-টাকার সুটকেস ছুঁড়ে ভেঙে দিলে। তোমার মত ননসেন্স, ইত্যাদি ইত্যাদি। বলতে বলতে দুড়ুম করে আমার সুটকেসটা মেঝেতে ফেলে দিয়ে দুই হাতে ঝুড়িটা ধরে ভুঁড়িতে ঠেকিয়ে নামিয়ে হাত নেড়ে বলতে লাগল,—দেখ ত, দেখ ত, কি কাণ্ড আহা হা—

ঝুড়িটায় নানা বর্ণের নানা ঢঙের চিমনী-ডোম ছিল। বেশীর ভাগই গুঁড়ো হয়ে গেছে।

নরম হয়ে বললাম,—তাড়াতাড়িতে দেখতে পারি নি। তাই ত। আপনার ত বড্ড ক্ষতি হ'ল।

লোকটা নরম হয় না। সমানে বিক্রম প্রকাশ করে চলল। আক্ষেপ তিরস্কার ক্রমেই মাত্রা ছাড়িয়ে চলল।

আমারও বেশভূষা রেলোপযোগী মিলিটারি অর্থাৎ শর্টের ওপর হাফশার্ট। মেজাজ গরম হয়ে গেল।—ওখানে অমন অসাবধান ভাবে রেখেছেন কেন? আহাম্মক আমি, না আপনি?

—কী-ই আমি অসাবধান, আহাম্মক! তুমি তুমি—

হাতাহাতি হবার উপক্রম। সংযত হয়ে গম্ভীর ভাবে বললাম,—মশায় মিছে কথা বাড়ানো। হয় আমার য়্যাপলজি গ্রহণ করুন, নয় দাম নিন।

হাফ প্যাণ্টের পকেটে সজোরে হাত গলিয়ে এক মুঠো টাকা সিকি দুয়ানি বার করে তার মুখের ওপর মেলে ধরলাম।

সাহেব বিভ্রান্ত হয়ে গেল। কেউ কেউ হেসে উঠল। সাহেবের পেছন থেকে একটি মেয়ে হেসে যেন ফেটে পড়ল। এতক্ষণ চোখেই পড়েনি। সম্মুখের বৃত্তাকার বিপুল দেহের আড়ালে নিজেকে যেন লুকিয়ে রেখেছিল।

আমার জোড়া প্রস্তাবের একটা যথাযথ জবাব তখনও সাহেবের জোগায় নি। রাগে পুরু ঠোঁট ঘন ঘন কাঁপছে। অপ্রস্তুত হয়ে আমিও কথা খুঁজে পাচ্ছি নে। মেয়েটি হাসতে হাসতে সামনে এসে বলল,—ওঁকে ভাবতে সময় দিয়ে এইবার বসুন। সাহেবের দিকে ফিরে বলল,—ব্যস্ত হচ্ছ কেন? দিল্লীতে ঢের চিম্‌নী পাওয়া যাবে, তুমি যেতে যেতে ফুরিয়ে যাবে না। বাঁচা গেল, একটা বড় বোঝা কমলো।

নির্ব্বাপিতপ্রায় আগ্নেয়গিরিটি আবার গর্জ্জন করে উঠল, কিন্তু অগ্নি বর্ষণ করবার আগেই তার হাত ধরে বসিয়ে দিয়ে সে বলল,—হঠাৎ ভেঙে গেলে কি আর করা যাবে?

বিসুবিয়স বসল এবং টগবগ করতে লাগল। আমার দিকে চেয়ে মেয়েটি পুনরায় বলল,—আপনি দাঁড়িয়ে রইলেন কেন? বসুন না। বিশ মাইল রাস্তা ত দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কাটল। বলেই উত্তরের অপেক্ষা না ক'রে সে নিজের জায়গাটিতে বসে জানালার বাইরে দৃষ্টি নিবদ্ধ করল।

একহারা লম্বা দেহগঠন। উজ্জ্বল রং, সুরুচিপূর্ণ মনোরম বেশ। যৌবনপ্রভায় যেন ঝকমক করছে।

পরমাশ্চর্য্য, গাড়ীটায় তেমন ভিড় নেই। দূরের বেঞ্চখানায় দুটো মাড়োয়ারী জামা খুলে ঘর্ম্মাক্ত কলেবর শীতল করছে। মাঝের বেঞ্চখানায় ছোকরা-গোছের দুটো ফিরিঙ্গী একটা যুবতী মেমসাহেবের সঙ্গে আলাপনে নিমগ্ন।

কোথায় বসি? চার দিকে বিপন্নের মত তাকাচ্ছি। মেয়েটি বলল,—এখানে বসুন না। এই ত ঢের জায়গা রয়েছে।

সাহেবের মুখের দিকে তাকালাম, অগ্রসর হব কি-না। সাহেব চুরুট ধরিয়ে চিম্‌নীর শোক ভুলচে। ভাবে মনে হল সন্ধি হয়েছে, ওধারে যাওয়া যেতে পারে। সন্ত্রস্তে সাহেবকে পার হ'য়ে মেয়েটির ওধারে, যতটা সম্ভব দূরে গিয়ে কোনও মতে বসলাম। সে আমার ভাবটা লক্ষ্য ক'রে মুচ্‌কি হেসে আবার ফিরে বসল এবং অখণ্ড মনোযোগসহকারে বাইরে চেয়ে রইল।

তার অত সহৃদয়তার উত্তরে একটা কথা পর্য্যন্ত বলবার সুযোগ হয় নি এ পর্য্যন্ত। একটু ধন্যবাদ দেওয়া, একটু কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা ত উচিত। দুই হাত জোড় ক'রে নমস্কার করলাম। মনে হ'ল চোখে পড়ল না। কিন্তু সে ঘাড়টা একটু বাঁকিয়ে মাথাটা হেঁট ক'রে নীরবে প্রতিনমস্কার করল। ভূমিকা করলাম, আমি ভারি লজ্জা বোধ করছি। বাইরের দিকে চেয়েই একটু হাসল। জিজ্ঞাসা করলাম, আপনারা বুঝি দিল্লী যাবেন?

মুখ ফিরিয়ে বলল,—হাঁ, কেমন করে জানলেন?

—আপনি যে বললেন, দিল্লীতে চিম্‌নী পাওয়া যায়।

হেসে বলল,—ও। আপনি কোথায় যাবেন?

—সত্য কথা বলতে ঠিক নেই।

—কি রকম?

বিসুবিয়স গস্‌ গস্‌ ক'রে উঠে এসে দুজনার মাঝখানে ধপ ক'রে ব'সল। মেয়েটি বিন্দুমাত্র লজ্জা পেল না। একটু হেসে তা'র ডান হাতে ছোট্ট একটা ধাক্কা দিয়ে

আবার বাইরের দিকে চেয়ে রইল। সাহেব মিটি মিটি হাসল। আমি একটা বই খুলে পাতা ওলটাতে লাগলাম।

আমি রেগে বললাম,—তুমি তাই পাতা ওল্টাতে লাগলে, আমি হ'লে মাথায় ছুঁড়ে মারতাম।

* * *

একটা ষ্টেশনে এসে গাড়ী দাঁড়াল। বোধ করি ব্যাণ্ডেল। তাড়াতাড়ি নেমে পড়লাম সত্য শরতের খোঁজ করতে। মেয়েটি একটু বিস্মিত হয়ে আমার দিকে চাইল। বোধ হয় মনে করল, তার সাহেবী মেজাজী স্বামীর তাড়াতেই আমাকে গৃহ ছাড়া হ'তে হ'ল।

এ গাড়ী, ও গাড়ী, সে গাড়ীতে উঁকি দিয়ে দিয়ে খুঁজলাম। শ্রীমানেরা চোখে পড়লেন না। মনটা খারাপ হয়ে গেল। থেকে যাব কি-না ভাবছি, গার্ড হুইসিল দিয়ে আলো নেড়ে গাড়ী ছাড়ালে। চেয়ে দেখি আমার যাত্রাসহচরী জানালা দিয়ে উদ্বিগ্ননয়নে আমার দিকে চেয়ে আছে। ট্রেন তখন চলতে সুরু করেছে। আমার গাড়ী সামনে এলে লাফিয়ে উঠলাম। একটা নামন্ত কুল্যানের সঙ্গে একটু ধাকাধাক্কি হয়ে গেল।

এসে বসলে মেয়েটি শান্ত ভাবে বলল,—এই জন্যই চলন্ত গাড়ীতে ওঠা-নামা না করাই ভাল। এক্ষুনি একটা য়্যাক্সিডেন্ট হয়ে যেতে পারত। মৃদু হেসে ধীরে জবাব দিলাম, এ আর এমন একটা কি।

বর্দ্ধমানে আবার নামলাম। আবার পাঁতি পাঁতি ক'রে প্রতি গাড়ী খুঁজলাম। এত দেরি হয়ে গেল যে, আবার চলন্ত গাড়ীতে উঠ্‌তে হ'ল এবং এবারেও একটা কুল্যানের সঙ্গে ধাকাধাক্কি, এক চুলের জন্য বেঁচে গেল। শুনলাম, পরিপূর্ণ আত্মপ্রসাদের সঙ্গে সাহেব তার সঙ্গিনীকে বলছে,—ওর নিশ্চয়ই টিকিট নেই। বিনা টিকিটে চলেছে।

মেয়েটি অবিশ্বাসের সুরে বলল,—তাহ'লে এ গাড়ীতে!

—বুঝলে না? মারি ত ঘোড়া…হা, হা, হা।

—আঃ, থাম।

রাগে আমার কপালের শিরা দপ্‌ দপ্‌ করে উঠ্‌ল। একটা ঘুষিতে বর্ব্বরের ঐ সুউচ্চ দন্তপাটি—।

চুপ ক'রে বসলাম, ওধারের বেঞ্চটার একধারে, মাড়োয়ারীর পাশে, কোনও মতে। মিসেস্ যাই-হোক ঘাড় ফিরিয়ে দেখল এবং আবার ফিরে বাইরের দিকে চেয়ে বোধ হয় প্রকৃতির সৌন্দর্য্যে ডুব দিল।

বাইরে মৃদু জ্যোৎস্না, ভিতরে পাত্‌লা অন্ধকার। কারুরই আলো জ্বালবার গরজ হয় নি। লৌহদৈত্য ভীমবেগে ছুটে চলেছে। মাড়োয়ারী দুটো মুখোমুখি ব'সে কি যেন কি খাচ্ছে, ফিরিঙ্গি দুজনের একজনের কোলের ওপর মাথা আর একজনের কোলের ওপর পা তুলে দিয়ে মেমসাহেব শুয়ে পড়েছে। শ্রীমতীর শ্রীমন্ত প্রকাণ্ড মোটা একটা চুরুট থেকে গাল গাল ধূম উদ্গীরণ ক'রে কড়া তামাকের উগ্র গন্ধে কক্ষের দম যেন বন্ধ ক'রে আনছে। শ্রীমতী জানালার উপর হাত ও মাথা রেখে তেমনি বহির্দৃশ্যে নিমগ্ন। ভেতরে যেন কেউ নেই। সবাই চুপচাপ।

সমস্ত বেখাপ্পা লাগছে। ঐ দুই মাড়োয়ারীর অফুরন্ত ভোজন, ঐ দুই ফিরিঙ্গি এবং তাদের মাঝেকার মেমসাহেব কিছুই যেন যাত্রার অঙ্গ নয়। সকলের উপর ঐ সুন্দরী সুবেশা তরুণীর তার তিনগুণ বয়সের শ্রীহীন জীবনসঙ্গী একেবারে বেমানান্। একটি যেন মূর্ত্তিমান অন্যায় আর একটি তার মূর্ত্তিমতী প্রতিবাদ।

একস্‌প্রেস্ গাড়ী চলেছে ত চলেছেই—থামে না। শুধু একটা একটানা গতিবেগ। গাড়ীর দোলনটা পর্য্যন্ত যেন একঘেয়ে, মাপা। ঐ যে সুন্দরী সহযাত্রী একই ভাবে বাইরে চেয়ে বসে আছে, ভাব দেখে মনে হয় না নেমে যাবার আগে ও নড়বে কি ফিরবে। ও যদি গল্প করতে করতে চলত গাড়ী জীবন্ত হয়ে উঠত। ও যদি গুন্ গুন্ ক'রে কোনও একটা চেনা গানের সুর ভাঁজত, গাড়ীর নিস্তব্ধতা একটা রূপ পেত।

নাঃ, এমন চুপচাপ সময় ত আর কাটে না। কি একটা করা যায়!

সাহেব চোখ বুজে বলে উঠল,—একটু জল, সরমা। সাহেবের কণ্ঠস্বর নরম। চুরুটের ধোঁয়া কাজ করেছে। সরমা বলল,—সোডা দেব?

—না। জলই দাও।

ফ্রেমে-আঁটা সোরাই থেকে কাচের গ্লাসে জল গড়িয়ে দরমা ধরল। সাহেব চোঁ চোঁ করে গিলে আঃ বলে তৃপ্তি জানালে।

স্বর নরম ক'রে ইংরেজীতে জিজ্ঞাসা করল, আমি অনেক দূর যাব কি-না?

সংক্ষেপে জবাব দিলাম—হাঁ, অনেক দূর।

সরমা ব'লে উঠল,—তবে কতদূর আর কোথায় তার ঠিক নেই।

হেসে বললাম—তাই বটে। তাই বটে। বহুদূরই যাবার কথা। তবে সঙ্গীরা ট্রেন ধরতে পারেন নি। কাজেই পথে কোথাও নেমে যাব বোধ হয়।

হঠাৎ সাহেব হাতে বাঁধা ঘড়িটার দিকে চেয়ে ব্যস্ত হয়ে বলল,—সরমা, ডিনার টাইম হয়ে গেছে।

সরমা বলল,—ওমা! এক্ষুনি? এখুনি খাবে কি! সাহেব স্মরণ করিয়ে দিলেন, সময় বয়ে গেলে তিনি খান না, সরমা তর্ক করল, এইটেই ত অসময়। এটা বয়ে গেলেই ত সময় হবে।

বলতে বলতে বেঞ্চের নীচে থেকে প্যাট্‌রা টেনে দেশী বিলাতী কত রকমের পাত্র ও খাদ্য বার করতে লাগল। ট্রেন গুড় গুড় গুড় করে ইলেকট্রিক্ আলো, প্যাসেঞ্জারের ভিড়, ফেরিওয়ালার চীৎকার, ঠেলাঠেলি দৌড়াদৌড়ির ঠিক মাঝখানে গিয়ে দাঁড়াল। আসানসোল। এক যুগ গাড়ী দাঁড়াবে। নেমে পড়লাম।

প্লাটফরমে কেনা-কাটা খাওয়া-দাওয়ার একটা ধূম লেগে গেছে। পানিপাঁড়েকে মৌমাছির মত ছেয়ে ফেলেছে। জলের কলে মারামারি কাণ্ড। মনে করছি রাতের মত খাওয়ার পাটটা এখানেই সেরে নেওয়া উচিত। কিন্তু খাবারের দোকানের দিকে এগোয় কার সাধ্য। মানুষের মুখের রুটি যে কপালের ঘাম দিয়ে সংগ্রহ করতে হয় চোখের ওপর তার প্রমাণ দেখছি আর মনে মনে রাত্রে না খাওয়ার উপকারিতা আলোচনা করছি।

আধ ঘণ্টা হয়ে গেল তবু পোড়া গাড়ী ছাড়ে না যে মস্ত ভাবনার থেকে মুক্তি পেয়ে ছুট দেব। ওদিকে ডিনারের হাঙ্গামা। যেমন নমুনা পাওয়া গেছে তাতে সেই মহাব্যাপার চট্ করে সম্পন্ন হবার কথা নয়। তার মাঝে গিয়ে রসভঙ্গ করতে প্রবৃত্তি হচ্ছে না।

একটা ফিরিওয়ালাকে ডাকলাম। যদি কিছু খাবার মত আবিষ্কার করা যায়।

—পালিয়ে এলেন যে? আমাদের খাবারের ছোঁয়াচে জাত যাবার ভয়ে নাকি?

আমার যাত্রাসহচরী সরমা। অধরের কোণে মৃদু হাসি। প্লাটফরমের উজ্জ্বল আলোয় অপরূপ দেখাচ্ছে। একটু ব্যস্ত ভাবে বলল,—একটু শীগগীর চলুন ত। মিসিনা রেলের কতকগুলা ফিরিঙ্গির সঙ্গে কি হাঙ্গাম বাধিয়ে দিয়েছেন।

—ব্যাপার কি?

—আসুন না।

গিয়ে দেখি তিনটে রেলের পোষাক-আঁটা ফিরিঙ্গি লালমুখে গরগর কচ্ছে আর মিষ্টার সিনা তাদের ড্যাম ব্লাডি ব'লে চীৎকার করছে। কোট নেই, শার্টের সম্মুখটা ভিজে, তার উপর চুরুটের ছাই পড়ে মলিন। চোখ জবা ফুলের মত রাঙা,স্বর জড়িত। অনবরত এধার ওধার দুলছে আর বলচে, দেখাব না তোদের টিকিট, গেট আউট।

বোঝা গেল ডিনারে কিছু খান বা না খান পান করেছেন প্রচুর। মাত্রা বেশী হয়ে গেছে, পুরোপুরি মাতাল।

সরমাকে বললাম—টিকিট দুটো দেখিয়ে দিলেই ত আপদ চুকে যায়।

—বেশ সোজা কথাটা বললেন ত! টিকিট কি তৈরী করব? মাতলামির ঝোঁকে বীরত্ব করে সে বাবাই জানালা দিয়ে ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছে।

রেলের কর্ম্মচারীরা হিসেব করে ভাড়া এবং জরিমানার মোটা একটা অঙ্ক দাবী করল। গলার স্বরে হুকুমের সুর ফাঁকি চলবে না, তারা সোজা লোক নয়, ভাবে ভঙ্গিতে বুঝিয়ে দিলে।

একটু এগিয়ে গম্ভীরভাবে জিজ্ঞাসা করলাম,—What's the row about?

একজন মিথ্যে,বিনয় দেখিয়ে বলল—সাহেব লেডীকে নিয়ে বিনিটিকিটে চলেছে।

মিঃ সিনা গর্জ্জে উঠল। আমি তাকে বাঁ হাতে ধরে ডান হাত দিয়ে পকেট থেকে তিনটে টিকিট বার করে সরমাকে সাহেবকে এবং নিজেকে দেখিয়ে দিলাম। সমস্ত আগুনে জল পড়ল। একজন ফিরিঙ্গি টিকিট কখানা নেড়ে চেড়ে পড়ল—ভেরি। That's all right. Thank you. মিষ্টার সিনার দিকে ফিরে 'সরি' ব'লে টুপটাপ ক'রে নেমে পড়ল।

মিষ্টার সিনা কৃতজ্ঞতায় গলে গিয়ে হঠাৎ উঠে দাঁড়িয়ে দুই বাহু বাড়িয়ে আমায় জড়িয়ে ধরে মুখ চুম্বন ক'রে বলল, You are a lovely chap. পরক্ষণেই বসতে গিয়ে বেঞ্চের ওপর গড়িয়ে পড়ল। আমি সঙের মত দাঁড়িয়ে রইলাম। সরমা লজ্জায় মাথা হেঁট করল।

সিনা গড়িয়ে বিড় বিড় করতে লাগল, সরমা মাঝের বেঞ্চের ঠ্যাসানটা ডান হাতে ধরে চুপ করে দাঁড়িয়েই রইল। রাগে অপমানে লজ্জায় আমার সমস্ত ভিতরটা যেন দীপকে চড়ে গেল। অথচ মাতালের সঙ্গে কি আর করা যায়। বিশেষতঃ তার স্ত্রীর সামনে।

সরমা তার মাথায় একটা বালিশ দিয়ে, জুতোটা খুলে দিয়ে ঠেলেঠুলে একটু সর ক'রে শুইয়ে রুদ্ধস্বরে বলল,—বকো না। চুপ করে শুয়ে থাক।

গাড়ী ছেড়ে দিয়েছে, নেমে যাব তার উপায় নেই। মাড়োয়ারী ও ফিরিঙ্গি সহযাত্রী সকলেই নেমে গেছে। ও দুটো বেঞ্চই খালি। দূরে গিয়ে বসলাম। বিশ্রী লাগতে লাগল। সত্য ও শরতের ওপর রাগটা আবার নূতন করে হ'ল। সব বেকুবের কাণ্ড। মানুষকে না হক নাকাল করা। ননসেন্স, ইরেস্‌পন্সিবল্‌।

সরমা একটু এগিয়ে দাঁড়িয়ে আমার দিকে চেয়ে বলল, যান, হাতমুখ ধুয়ে আসুন। আপনার ত কিছুই খাওয়া-দাওয়া হয় নি।

নিতান্ত সহজ কণ্ঠস্বর, কোনও রকম রং নেই। না লজ্জার, না রাগের। বললাম,—থাক, ব্যস্ত কি।

দেরী করেই বা লাভ কি? যান।

আমার পোষাকটার প্রতি চকিতে চোক বুলিয়ে বলল,—এ বোম্বা বেশটা বদলে ফেললে হয়। আর দরকার যে বলে মনে হচ্ছে না ত।

তার এই সহজ রসিকতায় হেসে ফেললাম। সেও হাসল। এতক্ষণে। বললাম,—বলা যায় না। ষ্টেশনও সব শেষ হয় নি, টিকিট দেখবার ফিরিঙ্গীও ফুরিয়ে যায় নি। সেও হাসল। আমিও হাসলাম।

স্যুটকেসটা টেনে নিয়ে বাথরুমে ঢুকে পড়লাম। নিজের অপরূপ পরিচ্ছদের কথা এই কামরাতে ঢুকে অবধি ভুলতে পারি নি। আমার যত চমৎকার কাপড় জামা আছে সরমার সামনে বসে বসে মনে মনে তার কোনটাই পরতে বাকি রাখি নি। যতবার ও আমার দিকে চেয়েছে ততবার মনে হয়েছে শুধু ভিড়ের হিসেব করে পোষাক ক'রে কি মূর্খতাই করেছি। সংযাত্রী সৌভাগ্য থাকতে পারে গণনা করি নি।

হাতমুখ ধুয়ে ঢাকাই ধুতির ওপর গরদের পাঞ্জাবী, পায়ে যোধপুরী নাগরা, মাথায় পরিপাটি সিঁথি ক'রে যখন বেরিয়ে এলাম, সরমা তখন মেঝেতে বসে খাবার সাজাতে নিমগ্ন। ঘাড় ফিরিয়ে আমার মাথা থেকে পা পর্য্যন্ত একবার ক্ষণেকের জন্ত দেখে নিয়ে আবার হাতের কাজে মন দিল।

সেই ডিনারের অবশিষ্ট অংশ হবে হয়ত। হঠাৎ বলে ফেললাম, ও-সব আমি খাব না। আমার জন্ত কষ্ট করবার দরকার নাই। ধন্তবাদ।

হাত আপনা থেকে থেমে গেল। জবাব দিল, দরকার না থাকে আলাদা কথা। কিন্তু ষ্টেশনের খোট্টা ফিরিওয়ালার খাবার থেকে আমাদের তৈরী লুচি তরকারী কিছু খারাপ হত না।

খাবারগুলো ঠেলে বেঞ্চের নীচেয় দিয়ে একটা তোয়ালেয় হাত মুছে উঠে বসল। আর কথা বলবার ফাঁক নেই। আমার কথা রীতিমত রূঢ় হয়েছিল। তার আঘাতও ব্যর্থ হয় নি। এতক্ষণের ঘনিষ্ঠতার এই পুরস্কারে অনুতপ্ত হলাম।

কোলের উপর হাতদুখানি রেখে ফিরে বসে। আঙুলের ডগায় হলুদের ঈষৎ ছাপ। মনে হল ঐ রঞ্জিত আঙুল দুটি ধরে মার্জ্জনা ভিক্ষা ক'রে নিই। তা হয় না।

সামনে ঘুরে গিয়ে বললাম,—আপনি ত ভারি রাগ

মানুষ। একটা কথার অপরাধে উপবাসী করে রাখবেন! সে মাথায় ঈষৎ ঝাঁকানি দিয়ে বলল,—না, আপনাকে এ খেতে হবে না।

—ওঃ সর্ব্বনাশ। না খেলে আমি নড়তে পারি নে। ব'লে হেঁট হয়ে বেঞ্চের নীচে থেকে খাবারের প্যাটরা টেনে বার করলাম। সে হেসে আমার হাত থেকে সেটা নিয়ে বেঞ্চের ওপর রেখে বলল,—মিথ্যে কেন এতক্ষণ ভোগালেন? রাত কমছে, না?

ঝুড়িটার দিকে একটু চেয়ে বলল,—খাবার মতন তেমন কিছু কিন্তু নেই। ওঁর পাটে অনেক কিছু ছিল।

—কিন্তু আমার ব্যবস্থা যে আপনার পাটের সঙ্গে হচ্ছে সেই আমার পরম সৌভাগ্য। খাবারের জাতকুল বিচার নাই বা করলাম। ইস্। এ ত দেখছি সেরা ব্যবস্থা। যদি শুধু ছাতু আর লঙ্কা হত, তবু কিছু আসত যেত না।

ভাগাভাগি পরস্পরকে সাধাসাধি ক'রে খাওয়া চলল। সরমা কতকটা লজ্জা সঙ্কোচে কতকটা পরিমাণ আঁচ ক'রে খাওয়া কমিয়ে কথা বাড়িয়ে দিল। বার-বার বলতে হ'ল,—আপনি কিছুই খাচ্ছেন না। এই সাধ্যসাধনা অনুরোধ অনুযোগের মাঝে স্বল্প পরিচয়ের সঙ্কোচ কেটে গিয়ে ঘনিষ্ঠতা বেড়ে উঠল।

আমাদের যাত্রার উদ্দেশ্য, সত্য শরতের কাণ্ড, আমার বিপত্তি—সমস্ত ইতিহাস শুনে বলল,—আচ্ছা কাণ্ড ত। আর্টিষ্ট কবি বন্ধুদের এটাও একটা কাব্য আর কি। কিন্তু তার ট্র্যাজিডি কেবল আপনার ওপর দিয়ে গড়াল এই যা।

হেসে বললাম,—সেজন্য আমার একটুও দুঃখ নেই। বরং বন্ধুবরদের কাছে কৃতজ্ঞ। আমার এই যাত্রার ট্র্যাজিডি অক্ষয় হোক।

প্রসঙ্গটা এড়িয়ে সরমা প্রশ্ন করল।—তা হলে পূর্ণিমার আগে আপনার আর কাশ্মীর যাওয়া হবে না? কাশীতেই দেরি করবেন?

আগে যাওয়াই ত উচিত। নতুবা মণির সঙ্গে চটাচটি হয়ে যাবে। খেয়ালী মানুষ, রেগে হয়ত কাশ্মীরটা দেখাবেই না। কাশ্মীর দেখি নি কখনও। লোভ আছে।

—আমরা যদি কাশ্মীর যাই, যদি দেখা হয়, চিনতে পারবেন ত?

মনটা ধক্ ক'রে উঠল, সরমা কাশ্মীর গেলেও যেতে পারে। জিজ্ঞেস করলাম,—আপনাদের কাশ্মীর যাবার প্রোগ্রাম আছে না কি? এই যে বল্লেন দিল্লী যাচ্ছেন?

—দিল্লী পর্য্যন্ত ওঁর সঙ্গে যাচ্ছি।

—কাশ্মীর যদি যান একলাই যাবেন? আপনার স্বামী যাবেন না?

সরমা আমার মুখের দিকে একটুক্ষণ বিস্মিত চোখে চেয়ে থেকে বলল,—ওঃ। মিষ্টার সিনা আমার দাদা-মশাই হন। আমার মা ওঁর ভাগ্নী। আপনার চমৎকার আন্দাজ ত। ওমা—! ব'লে হেসে যেন গড়িয়ে পড়ে।

লজ্জায় যেন মরে গেলাম। ভেবে দেখলাম এমন অসম্ভব সম্বন্ধ ধরে নেবার তেমন কোনও কারণ ঘটে নি।

—ওঃ! মাপ করবেন। কি ইডিয়েট আমি—ব'লে হাসবার ভাণ করলাম।

সরমা ওর পূর্ব্ব কথার সুর টেনে বলল,—দিল্লী পর্য্যন্ত ওঁর সঙ্গে যাচ্ছি। সেখানকার গবর্ণমেণ্ট হাসপাতালে উনি সিভিল সার্জ্জন খাসা মানুষ। আপনি ওঁর সখের জিনিষগুলি ভেঙেই ওঁর মেজাজ খারাপ ক'রে দিয়েছিলেন।

সরমা অবিবাহিতা। একটা মুহূর্ত্তে সে যেন বদলে গিয়ে আমার চোখে নূতন ঠেকল। তবু কেমন যেন বেসুরো বেজে গেল। আলাপের পূর্ব্বের সুরটা আর যেন লাগছে না। জোর ক'রে সেটা কাটিয়ে দিয়ে বললাম,—দিল্লী থেকে তা হলে একলাই আপনি কাশ্মীর যাবেন?

—যদি কোনও escort না-ই জোটে আপনাকে ধরে রাখা যাবে। থাকবেন না?

এমন সোজা প্রস্তাবে হঠাৎ কেমন যেন একটু অপ্রস্তুত হয়ে পড়লাম। সঙ্গে যাবার কথা হয়ত আমিই বলে ফেলতাম। মন টগবগ করছিল। ওকি তারই ইঙ্গিত করল? তখনও জবাব দিতে পারি নি, ও আবার বলল,—তবে আপনাদের এলাহাবাদ আগ্রা অনেক জায়গা হয়ে যাবার কথা।

মনে মনে বললাম,—সে বেদবাক্য ঋষিবাক্য নয়। পালন না করলে পৃথিবীর কোনও ক্ষতি হবে না।

সে আবার বললে,—তাই না ?

—সেই রকমই ত কথা।

—আপনি তা হলে কোথায় দেরি করবেন ? কাশী ? আলাপ জীবন্মৃত হয়ে উঠল। আত্মীয়তা ঘনিষ্ঠতা দ্রুতপদে চলতে চলতে হঠাৎ যেন পরস্পরের রেলযাত্রার সুবিধা অসুবিধার শুষ্ক হিসাবের চড়ায় এসে ঠেকে গেল।

নিশ্বাস ফেলে বললাম,—কাশী আগ্রা দিল্লী যেখানেই বলুন আজকে রাত্রির মত একটি পা নড়ছি নে। যাত্রা যেখানে ইচ্ছে হোকগে। আজকে রাত্রির মত আপনার সহযাত্রী। কোন এক মহাজ্ঞানী দার্শনিক কবি বলেছেন আজকের মত যা পাও তাই নাও, কালকের হিসেব ক'র না। তাঁর মতের সঙ্গে আমার মত চমৎকার মিলে যাচ্ছে।

সরমা একটু হাসল। বলল,—মহাজ্ঞানী ব্যক্তিদের মতের বিরুদ্ধে তর্ক করতে সাহস করি নে। রাত ত অনেক হল। এইবার একটু গড়িয়ে নেবার আয়োজন করা যাক।

নিজের বেঞ্চে বিলাতী কম্বলের ওপর ধবধবে সাদা চাদর বিছিয়ে, ফুলকাটা অড়ের বালিশ একটার ওপর আর একটা সাজিয়ে পরিপাটি শয্যা রচনা করে নিলে। আমি আমার বেঞ্চে পা ছড়িয়ে বেঞ্চের ঠেসানে মাথা হেলান দিয়ে যতদূর সম্ভব আরাম ক'রে বিশ্রামের ব্যবস্থা করে নিলাম। সরমা আলগা চুলের খোপাটা খুলে রাত্রির উপযোগী কেশ রচনা করতে করতে চিবুকটা তুলে বিছানাটা ইঙ্গিতে নির্দ্দেশ ক'রে বলল,—আপনি এইখানে শোন।

ব্যস্ত হয়ে উঠে বসে বললাম,···আর আপনি ? না, না, আমার এতে কোনও অসুবিধে হবে না। আপনি স্বচ্ছন্দে—

—সে হবে'খন। জায়গাও ঢের আছে, বিছানারও অভাব নেই। চুলটা ছেড়ে আবার বিছানাটা একটু পাট করে দিল।

ইতস্ততঃ করছি, সরমা ঈষৎ তাড়া দিয়ে বলল,—যান না। খাওয়া-শোওয়া বিষয়ে এমন চিন্তাশীল ব্যক্তিদের সঙ্গে পথ চলাই দায়।

উঠে ও-বেঞ্চে যেতে যেতে বললাম,—খাওয়া-শোওয়ায় ক্ষুন্নিবৃত্তি এবং নিদ্রা ছাড়া ভেবে নেবার মত কিছু এই প্রথম ব'লে চিন্তাটা একটু দীর্ঘ হয়ে পড়ছে।

—এইবার চোখ বুজে নিদ্রার চিন্তা করুন।

শুয়ে পড়ে খোলা জানালা দিয়ে আকাশের দিকে চাইলাম। চাঁদ অনেকখানি ঝুঁকে গেছে। গভীর রাত্রির নিস্তব্ধতা অনন্ত আকাশে পরিব্যাপ্ত হয়ে পড়েছে। সাঁওতাল পরগণার অসমতল ভূমি মাঝে মাঝে উঁচু হয়ে জানালা দিয়ে চকিতে উঁকি মেরে তখনই মাথা নীচু করে পালাচ্ছে। গাড়ীর দ্রুতগতির একটানা শব্দ দ্বিগুণ ধ্বনিত হচ্ছে।

খট্ করে শব্দ ক'রে আলো নিবে গেল। গভীর অন্ধকার আস্তে আস্তে ফিকে হয়ে অস্পষ্ট আলোয় কক্ষ স্নিগ্ধ এবং রমণীয় হয়ে উঠল। সরমা মিটার সিনার একটু তদ্বির ক'রে এল। আমার গায়ের ওপর একটা গরম চাদর ছুঁড়ে দিয়ে বলল,—একটু বাদেই বেশ ঠাণ্ডা পড়বে।

সর্ব্বাঙ্গে যেন একটা কোমল করস্পর্শ বুলিয়ে গেল পৃথিবীর সমস্ত স্বস্তি এবং আরাম আমাকে যেন পরম স্নেহে ধীরে ধীরে আচ্ছন্ন করে ফেলল। গাড়ী দোল দিতে দিতে চলল।

সরমার টুকটাক্ বেশবিন্যাস সারা হয়ে গেছে। চুপচাপ। শু'ল কি না বুঝতে পারছি নে। মাথাটা একটু ঘুরিয়ে চেয়ে দেখলাম ধনুকের মত বেঁকে এই কাতে চোখ বুজে শুয়ে আছে। পা-দুখানি বেঞ্চ থেকে একটু বাইরে এসে পড়েছে। ডানহাতখানি চিবুকে ঠেকানো। গালের খানিকটায় জ্যোৎস্না পড়ে চিক্ চিক্ করছে।

পাশাপাশি। দেড়হাত মাত্র তফাৎ। মাঝখানে একটুখানি মাত্র ফাঁক। ওর চুলের মৃদু সৌরভটুকু পর্য্যন্ত পাওয়া যাচ্ছে। নিঃশ্বাসের শব্দ যেন শোনা যায় যায়। এইখান থেকে ওর কপালটায় হাত বুলিয়ে ওকে দিব্যি ঘুম পাড়ানো যায়।

ওর সঙ্গে যে আমাকে কাশ্মীর যেতে বলল সে কি

নিছক একটা কথার কথা! সহযাত্রী হিসেবে আমাকে ওর ভাল লেগেছে। কাশ্মীর পর্য্যন্ত যেতে যেতে ভাল লাগা হয়ত স্নেহে পরিণত হ'ত। নিশ্চয়ই হ'ত। এখনই হয়ত ও আমাকে—। আমার সঙ্গে সত্য শরতের পরিবর্ত্তে সরমাকে দেখে মণিটে কি অবাকটাই হ'ত। ইস্! দিব্যি হত। কেন সেই দুই হতভাগার জন্য পথে নামব বললাম।

রীতিমত একটা হতাশা বোধ করলাম। সত্য শরৎ আমার সুপ্রসন্ন ভাগ্যে যেন শনির মত ঠেকতে লাগল। রোমান্স জিনিষটে শুধু কাব্যেই নয়, জীবনেও চলতে চলতে হঠাৎ একান্ত অপ্রত্যাশিত ভাবে এমনি করেই আসে। কেবল তা বিঘ্নমুক্ত নয়। এই যে চমৎকার তরুণীটি আমার ভাগ্য-গগনের কোণে দ্বিতীয়ার চাঁদের মত উদয় হয়েছে, প্রকৃতির নিয়ম অনুসারে ওর ষোলকলায় পূর্ণ হয়ে আমার সমস্ত হৃদয়াকাশ আলো করবার কথা। আমার সেটা বিধিদত্ত অধিকার। একটুখানির জন্য তাতে বিঘ্ন। ভদ্রতার গণ্ডী বাঁচিয়ে বলবার উপায় নেই —আমি তোমার সঙ্গেই যাব, আর কারো জন্য পড়ে থাকব না।

মাথা যেন গরম হয়ে উঠল। উঠে বসলাম। ও-বেঞ্চে কনুয়ের উপর ভর দিয়ে মাথা উঁচু ক'রে সরমা জিজ্ঞাসা করল,—উঠে বসলেন যে?

হঠাৎ জবাব দিতে পারলাম না, যেন আমার ভাবনা-ধারা ধরা পড়ে গেছে। কোনও মতে বললাম,—এমনি। ঘুম আসছে না।

গরম হচ্ছে? পাখাটা চালিয়ে দেব? ব'লে সে উঠে বসল।

—না, না। পাখা চালাতে হবে না। গরম হচ্ছে না ত।

—তবে কি? গাড়ীতে ঘুম হয় না?

এই সুস্পষ্ট সহৃদয়তায় আমার হৃদয়ের ঢোল তার যেন ঝম্ ঝম্ করে বেজে উঠল। ঝোঁকের মাথায় বললাম, —হয়। কিন্তু আজ ঘুমোব না। ঘুমোতে চাই নে। এই চলার প্রতিমুহূর্ত্তটি আমি সমস্ত চৈতন্য দিয়ে অনুভব করে নিতে চাই। একটি সেকেণ্ডও ফাঁক দেব না। গাড়ীটা সকাল হবার আগে আর না থামে। মোটেই আর না থামে। অনন্তকাল ধরে চলে।

সরমা মুহূর্ত্তকাল চুপ ক'রে থেকে হেসে উঠল। হাসতে হাসতে নিতান্ত সাদা গলায় বলল,—কিন্তু টিকিট ত অত দূরের নেই। আবার কি হাঙ্গামায় পড়ব?

আমার দ্রুত তালের ছন্দ পট করে কেটে গেল। সে আমার ধাবন্ত মনের লাগামটা অনায়াসে হাতে তুলে নিয়ে অত্যন্ত সহজে তার মুখ ফিরিয়ে এই দ্বিতীয় শ্রেণীর কামরায় তার সহযাত্রীর আসনটিতে বসিয়ে দিলে। ওর জন্য আমার করুণা বোধ হল। ওর মেয়েলী ইন্‌স্‌টিংট্ আমার কথায় ঝড়ের সুরে কেঁপে সঙ্কুচিত হয়ে পড়েছে। এই ঝড়ে ওকে না টানে এমন নয়, যেমন সবাইকেই এমন অবস্থায় টানে। সেই দুর্নিবার টানে আত্মসমর্পণ করতে প্রস্তুত, কিন্তু তবু দুই হাত দিয়ে প্রতিরোধ করবার চেষ্টা না করেও পারছে না।

গাড়ীর গতি মন্দ হয়ে এল। কি যেন একটা ষ্টেশন। উঠে পড়লাম। সরমা জিজ্ঞাসা করল, উঠচেন যে?

—ষ্টেসনটা দেখি। গলার স্বর ভারি।

সে মহাব্যস্ত হয়ে আমার পাঞ্জাবীর খুঁট ধ'রে বলল, —হাঁ তা বই কি! দরজায় গিয়ে দাঁড়ান আর একটা গোরা ঢুকে এসে বেঞ্চটা দখল করুক।

একান্ত নির্লিপ্তভাবে বললাম,—কেউ যদি আসেই আসবে।

—অত আতিথেয়তায় কাজ নেই। শুয়ে পড়ুন।

তেমনি ভাবেই বললাম,—আপনি শোন না।

হেসে বলল,—শিয়রে অমন খাড়া দাঁড়িয়ে থাকলে মানুষে কেমন করে শোয়?

বসে বললাম,—বসলে ত পারা যায়?

—না, তাও যায় না।

গাড়ীটা দাঁড়াল না, আস্তে আস্তে ষ্টেশনটা পার হয়ে গেল।

সরমা প্রায় ফিস্ ফিস্ করে বললে—আপনার ইচ্ছের কি জোর। সকাল হবার আগে গাড়ী থামবার লক্ষণ দেখা যাচ্ছে না।

ঐ একটুখানি কথার আঘাতে আমার মাথার যেন

ভূমিকম্পের স্থির বেজে উঠল। যেমনি মাথা নীচু ক'রে তার দিকে ঝুঁকে কি যেন বলতে যাচ্ছি, সে নিঃশব্দে শুয়ে পড়ল।

আমিও শুলাম। সেই পাশাপাশি। সরমা আর কথা বলে না, অথচ ঘুমোয় নি। হাত নাড়ছে, চুড়ীর মৃদু আওয়াজ শোনা যাচ্ছে। বাতাসে ওর আঁচলের আগাটা উড়ে আমার মুখের উপর পত পত ক'রে উড়ছে, সেটা তাড়াতাড়ি টেনে নিল। একটা মোড় ফিরতে গাড়ীটা ভয়ানক দোল খেল। ঝুল লেগে সরমা পড়ে আর কি, ব্যস্ত হয়ে হাত বাড়িয়ে আমার হাত চেপে ধ'রে সামলে নিল। অস্ফুটস্বরে বলল,—মাগো। ওর ব্রস্ত নীল শাড়ীটা কোনও মতে একটু গুছিয়ে নিল। চাঁদের আলো কখনও ওর মুখে, কখনও বুকে; কখনও ওর এদিকে ওদিকে পড়ছে।

বোধ করি ষাট মাইল বেগে গাড়ী ছুটেছে। সোঁ সোঁ সোঁ। শিরায় শিরায় আমার রক্ত যেন তাল ঠুকে ছুটেছে বোঁ বোঁ বোঁ। সারা দেহ যেন এলিয়ে পড়ছে। চোখের পাতা ভারি হয়ে আসছে। শুধু একটা গতিবেগে পায়ের আঙুল থেকে মাথার চুল পর্য্যন্ত শির্ শির্ করে বাঁশের পাতার মত কাঁপছে।

রাত্রি কত হিসাব নেই। ষ্টেশনের পর ষ্টেশন পার হয়ে যাচ্ছি। ঠাণ্ডা হাওয়া দিচ্ছে।

সরমা উঠল। ওদিকে গিয়ে মিষ্টার সিনার গায়ে একটা মোটা বেড্‌কভার দিয়ে জানালাটা বন্ধ করে এল। কি যেন জিজ্ঞাসা করল, মিষ্টার সিনা জবাব দিল না। এদিকে এসে আমার শিয়রের কাছে একটুক্ষণ দাঁড়িয়ে আমার নাম ধ'রে দুবার ডাকল। ওর অনুমান আমি ঘুমিয়েছি, যাচাই করতে ডাক দিল। সাড়া দেব দেব করছি, আমার ওপর দিয়ে ঝুঁকে আমার পাশের কাচের জানালাটা আধাআধি টেনে তুলে ছেড়ে দিল। তার জোর নিশ্বাস আমার মুখে গলায় লাগল। উঠে বসতে বাহুতে মাথা ঠেকল, চমকে উঠে বলল, ওমা! আপনি ঘুমোন নি? ঠাণ্ডা পড়ছে, জানলাটা বন্ধ ক'রে দিতে চাইছিলাম। এতদূর থেকে—

—পারেন নি। তাতে পৃথিবী রসাতলে যায় নি। দেখুন গাড়ীটা চলার জন্ত, ঘুমোবার জন্ত তৈরি হয় নি। ঘুমের জন্ত এতক্ষণ এত যে চেষ্টা আপনার সে সবই এখানকার নিয়মবিরুদ্ধ। তার চাইতে এইখানে ঠাণ্ডা হয়ে বসুন। বলে হাত দিয়ে পাশের শূন্য স্থানটা নির্দ্দেশ করে দিলাম। সরমা বসে পড়ে ন্যাকামির সুরে বলল,—হ্যাঁ, আপনার কি! সকালবেলায় টুপ ক'রে নেমে যাবেন। দিব্যি নেয়ে খেয়ে—

বাধা দিয়ে বললাম,—হয়ত সেটা দিব্যিই হবে। কিন্তু তারই আশায় আমি বেঁচে নেই। কালকের সকাল, কালকের নাওয়া-খাওয়ার আজকে আমার জীবনে এতটুকু স্থান নেই। পদ্মপাতার ওপর জলের মতন আজকের রাতের ওপর আমার সমস্ত জীবন যেন টল্‌টল্ করছে।

সরমা আমার কথার সুরে বোধ হয় ভয় পেল। নিতান্ত মিথ্যে একটা আলিস্যি ছেড়ে সহজ ভাবে উঠতে গেল। তার দিকে আরও একটু ফিরে বসে বললাম,— ঐ ত আপনাদের দোষ। সত্যি কথা আপনারা আমল দিতে চান না। আমি যদি আপনার কথায় সায় দিয়ে বলতাম,—হাঁ, তাই ত। কোথায় উঠব, নাইব খাব ঠিক নেই, আপনি মহাচিন্তা দেখিয়ে মোগলসরাই কাশীর সরাই হোটেলের গুণাগুণ আলোচনা করতেন; অথচ ঠিক জানতেন আমার উদ্বেগ আপনার আলোচনা দুইই মিথ্যে। কারও সেজন্ত সত্যি মাথা-ব্যথা নেই। আমি পাড়াগাঁয়ের আশী বছরের বৃদ্ধ প্রথম কাশী তীর্থ করতে যাচ্ছি নে। কাশীর ভয়ে হিমসিম খাচ্ছি নে। কিন্তু যেই বলব আজকের রাতটিতেই আমার জীবন জমাট বেঁধে উঠেছে, গত কালের আসছে কালের জন্ত তার মাঝে এতটুকু ফাঁক নেই, অমনি আপনি সাবধানী হয়ে উঠবেন, এই পরম সত্য কথাটা কিছুতেই বুঝতে চাইবেন না, কেবলি এড়িয়ে চলবেন।

একান্ত অসহায়ের মত বাইরের দিকে চেয়ে বলল,— এটা কোন্ ষ্টেশন! বখ্‌তিয়ারপুর বুঝি! এতক্ষণ ধ'রে মোটে বখ্‌তিয়ারপুর এল! ভাল একসপ্রেস ত!

চুপ করে রইলাম।

সরমার তাতেও ঠিক স্বস্তি বোধ হ'ল না। ও চায় না

আমি চুপ ক'রে থাকি। ও চায় আমি স্থান কাল আবহাওয়া বা অমনি ধরণের কোনও বিষয়ে কথা ক'য়ে একটা মিহি রকমের আলাপ চালাই। আমার চুপ ক'রে থাকা আমার কথা বলার চাইতে ওর কাছে কিছু কম ভয়ঙ্কর লাগছে না। কাজেই আবার বলল,—ঐ যে উঁচু পাহাড়টা দেখা যাচ্ছে, ত্রিকূট, না?

—হবে।

তাড়াতাড়ি বলল,—ত্রিকূটই। কি দেখতে যে মানুষ ওখেনে যায়। আমার ত বিশ্রী লাগে।

বললাম,—দেখুন, সেটা বেচারী পাহাড়ের দোষ না। ভাল লাগবার আপনার মন ছিল না। ওটা যদি তখন ত্রিকূট না হয়ে বিন্ধ্যাচল হত, তবু আপনার ভাল লাগত না। অথচ আমি যদি কাল সকালবেলায় আপনার সঙ্গে ঐ পাহাড় দেখতে যাই আমি দিব্যি বুঝতে পারছি হিমালয়ের চাইতে আমার ঐ ত্রিকূট ভাল লাগবে। আপনারও মত বদলাতে পারে।

নিতান্ত একটা হালকা রং দেবার জন্ম মাথা ঝেঁকে বলল,—ইস্‌স্‌! ত্রিকূট মুস্থরি পাহাড় হয়ে যাবে, না?

বললাম,—না হলেই আশ্চর্য্য হব। জানেন, স্থানের মাহাত্ম্য ব্যক্তির সংস্পর্শে। বন্ধুর নিমন্ত্রণে কাশ্মীর ছুটেছি ত। মণির জন্ম কাশ্মীর রমণীয় ঠেকেছিল। কাল পর্য্যন্ত কাশ্মীরের যা মূল্যই থাক না কেন, আজ কানা কড়িও নেই। সেই নিরর্থক যাত্রার অঙ্গ সম্পূর্ণ করতে সকাল বেলায় পথে নেমে থেকে আর দুই বন্ধুর জন্ম দেরি করব, আর আপনি এই গাড়ীতে এই কক্ষে বসেই এগিয়ে চলে যাবেন, এই মুহূর্ত্তে আমার কাছে অসম্ভব ঠেকছে।

সরমা অস্থির বোধ করছে। ও চুপ করে বসে থাকলেও ওর চঞ্চলতা আমি টের পেলাম। ত্রস্ত হরিণীর মত বলল,—আপনার যে আগ্রা দিল্লী কত জায়গা হ'য়ে যাবার কথা।

—তা ছিল। কিন্তু তখন ত আপনার সঙ্গে দেখা হয় নি। আমি দিল্লী আগ্রায় পুরাতত্ত্ব আলোচনা করতে যাচ্ছি নে। যাচ্ছিলাম সে সব স্থান সুন্দর লাগবে বলে, তাদের সৌন্দর্য্যের খ্যাতি আছে বলে। যে পর্য্যন্ত ভিতরে কোনও সৌন্দর্য্যের খোঁজ পাওয়া যায় নি সে পর্য্যন্ত বাইরের যে বস্তুতে সুন্দর ব'লে ছাপ মারা আছে তাই দেখা ছাড়া উপায় থাকে না। আপনি যদি এখন ওখেনে ঘুমিয়ে পড়তেন, আমি এইখানে ব'সে বাইরের ঐ মাটির ঢিবি, ঐ নাবালক নাবালক ন্যাড়া পাহাড় দেখে কাশ্মীরের পাহাড়, দিল্লীর কুতবমিনার দেখার চাইতে বেশী আনন্দ পেতাম। কিন্তু কাল যখন আমি নেমে থাকব আর আপনি যাবেন এগিয়ে তখন যে-চোখে আজ বিশ্বব্রহ্মাণ্ড ভাল লাগছে সে-দৃষ্টি যাবে হারিয়ে। তারপরে সত্য শরৎ ত দূরের কথা, রবীন্দ্রনাথের সঙ্গেও তাজমহল বা দেওয়ানী-ই-খাস দেখার আমার পক্ষে কোনও মানে থাকতে পারে না।

সরমা বলল,—আলোটা জ্বেলে দি, চাঁদ ত ডুবে গেল।

চাঁদ ডুবে গেছে। অন্ধকার নামলেও শরতের স্বচ্ছ আকাশের উজ্জ্বলতায় গাঢ় হতে পায় নি। সেই ফিকে অন্ধকারে সরমাকে দেখাচ্ছে অস্পষ্ট। সৌন্দর্য্যের রহস্যময় আবছায়া আভাস।

হাত তুলে বাধা দিয়ে বললাম,—না, আপনি অমন ভাবে আমাকে চুপ করিয়ে দেবেন না। দেখুন এমনিই এই সোজা কথা আপনাকে বলতে আমাকে যথেষ্ট প্রয়াস করতে হচ্ছে। পদে পদে সঙ্কোচ এবং ভয় বাধা দিচ্ছে। যদি কলকাতার বাড়িতে আপনার সঙ্গে আলাপ হত, আজকের রাত্রিকার পরিচয় পর্য্যন্ত পৌঁছিতে হয়ত এক বচ্ছর লাগত। ধীরে-সুস্থে ভেবে-চিন্তে আপনার মেজাজ বুঝে কথা কওয়ার জন্ম অপেক্ষা করবার যথেষ্ট সময় পাওয়া যেত। কিন্তু দেখা হল যে চলতে চলতে। শুভক্ষণ হু হু ক'রে গাড়ীর সঙ্গে ছুটে চলেছে যে। সুতরাং থামিয়ে দেবার আপনার অধিকার থাকলেও বলবার জন্ম অপেক্ষা করবার আমার যে সময় নেই।

সে প্রবল চেষ্টার সঙ্গে বলল,—আমার বড্ড ঘুম পাচ্ছে। আর বসতে পারছি নে। আপনি যদি মোগলসরাইতে না-ই নামেন তবে ত সারা দিনই—কথাটা শেষ করতে পারলে না। থেমে গেল। আমি বললাম,—বেশ ত! বিলক্ষণ! শোন না।

সেও বেঞ্চে উঠে গিয়েছে দুই হাতের মাঝে মুখ গুঁজে ঝুপ ক'রে শুয়ে পড়ল।

আমি দেয়ালে মাথা ঠেকিয়ে শূন্য দৃষ্টিতে বাইরের দিকে চেয়ে রইলাম। এতক্ষণ গাড়ীতে যেন একটা কড়া রাগিণী দ্রুততালে বেজে চলেছিল। তার দ্রুত কম্পনে মাথা যেন গরম হয়ে গেছে। চোখ কান দিয়ে যেন আগুনের ঝলকা বয়ে যাচ্ছে। রাত্রি শেষের ঠাণ্ডা হাওয়া চোখে মুখে তার শীতল স্পর্শ বুলিয়ে দিল। রাস্তার দুধারের গাছপালা, নিকটের দূরের ছোটবড় পাহাড় অন্ধকারের মাঝে যেন চোখ বুজে নিঃশব্দে ছুটে চলেছে। বিশ্বপ্রকৃতি যেন স্বপ্নদেশে প্রবেশ করে বিভ্রান্ত হয়ে গেছে।

সরমা তেমনি ক'রে একই ভাবে প'ড়ে রইল। আমি একই ভাবে বসে রইলাম। উভয়কে পরিব্যাপ্ত ক'রে নিশীথ রাত্রির নিস্তব্ধতা থম্ থম্ করতে লাগল। ট্রেনের গতি আর যেন টের পাওয়া যাচ্ছে না। চাকার শব্দ ক্ষীণ লাগছে, যেন বহুদূর থেকে আসছে। আমার চৈতন্য যেন মনের গভীরতম প্রদেশে ডুব দিয়ে ঝিমিয়ে পড়ে আছে।

যখন ঘুম ভাঙল, রোদ চন্ চন্ করছে। বেলা সাতটা কি আটটা। প্রথমেই নজরে পড়ল সামনের বেঞ্চে সরমা বসে—সকালবেলাকার খাবার চা নিয়ে ব্যস্ত। পরিধানে চাঁপা রঙের একটা রেশমী শাড়ী দেহের রঙের সঙ্গে মিলিয়ে গেছে। সকালবেলার সোনালি রোদে যেন ঝকমক করছে।

ওধার থেকে মিষ্টার সিনা বললেন,—গুড মর্ণিং রয়। ট্রেনে ত তোমার দিব্যি ঘুম হয়। আমাদের বুড়ো চোখ নিজের খোঁটটি না হলে আর এক হতে চায় না।

হাতমুখ ধুয়ে পোষাক পরিচ্ছদ বদলে ফিটফাট। কথায়বার্তায় আপ্যায়ন আন্তরিকতার অন্ত নেই। এই যে কালকের সেই মানুষ এমন লক্ষণটি নেই।

সরমা ঠাণ্ডা গলায় বলল,—হাতমুখ ধুয়ে নিন। মোগলসরাই ত এসে পড়ল। কতক্ষণ হল বন্ধার ছাড়িয়েছি?

দিনে রাতে তখনও মিলিয়ে নিতে পারি নি। শুধু মনে হচ্ছে রাতে যেন কত কী কাণ্ড হয়ে গেছে, যেন একটা যুগ কেটে গেছে।

সরমাকে বললাম,—এই যে নি। আপনাদের বুঝি বসিয়ে রেখেছি। ভারি দুঃখিত হলাম।

মিষ্টার সিনা বললেন,—না ভায়া। এক ঘণ্টা হল আমি সেটি শেষ করেছি। সরমা তোমার জন্য অপেক্ষা করছে। তোমাদের ইয়ং কাল, সব সয়। খাওয়া-দাওয়ার অনিয়ম হলে আমাদের বুড়ো ধাতে আর সহ্য হয় না।

হাতমুখ ধুয়ে এলাম। সরমা বিনা বাক্যব্যয়ে চা খাবার এগিয়ে দিল। নিঃশব্দে পান করছি, মিষ্টার সিনা বললেন,—শুনলুম দিল্লী কাশ্মীর তোমাদের পাড়ি ভায়া। তবে আর কেন মিছে মোগলসরাইতে নেমে থেকে পচে মরবে। চল সোজা যাওয়া যাক। এক যাত্রায় আর পৃথক ফল করে না। আমার ওখানেই চল। কি বল?

সরমা একটি কথা বলল না। এক মনে চা পানে নিবিষ্ট। আমরা যেন আর এক দেশে বসে কথা বলছি—ওর কানেও যাচ্ছে না। বললাম,—সে ত হবে না। আমাকে মোগলসরাইতে নামতেই হবে।

সরমা হঠাৎ বলল,—বেশ ত। ওঁর সঙ্গীরা এসে জুটুন। সবাই এক সঙ্গে তোমার ওখানে যাবেন। দিল্লী ত ওঁদের যেতেই হবে।

—কোথাও যেতেই হবে এমন কোনও কথা নেই ত আমাদের।

সরমা বলল,—কেন, কাশ্মীর?

—তাও না!

সিনা বললেন,—আরে যাবে বই কি। সিমলাই যাও আর কাশ্মীরই যাও, দিল্লী নামতে আর কিছু ই. বি. আর ঘুরে আসতে হবে না।

সবাই হাসলাম।

গাড়ী মোগলসরাই ষ্টেশনে এলে মিষ্টার সিনা জানালা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে কুলী ডাকলেন। সরমা উঠে দাঁড়িয়ে আমার জিনিষপত্তর একটুখানি তদারক করে দিল। আমার সঙ্গে সঙ্গে উভয়েই প্লাটফরমে নেমে এল। মিষ্টার সিনা ওদিককার একটা গাড়ী দেখিয়ে বললেন,—ঐ কাশীর গাড়ী দাঁড়িয়ে।

মিষ্টার সিনার করমর্দ্দন ক'রে, সরমাকে নমস্কার ক'রে বিদেয় নিলাম। সরমা দুই হাত তুলে নীরবে প্রতিনমস্কার করল। যাবার সময়ে বলে যাবার মত কোনও কথা জোয়াল না। শুধু মিষ্টার সিনাকে বললাম,—আসি তা হলে?

কাশীর গাড়ীতে উঠে দেওয়ালে মাথা ঠেকিয়ে চুপচাপ বসে আছি। গাড়ী চলুক না চলুক কিছুই যেন যায় আসে না। যাত্রা যেন শেষ হয়ে গেছে। এলাহাবাদ, আগ্রা দিল্লী কাশ্মীর সব যেন অনর্থক ঠেকছে। সত্য ওদের সঙ্গে দেখা হবে কি-না সেজন্ত বিন্দুমাত্র ভাবনা বোধ করছি নে।

ক্লান্তি লাগছে। এই দেওয়ালে এই ভাবে মাথা ঠেকিয়ে সামনের দিকে চেয়ে ক্লান্ত শরীর এলিয়ে দিয়ে পড়ে থাকার একটা চমৎকার আরাম লাগছে। মনের ওপর একটি রাত্রির বিচিত্র রেলযাত্রা নানা রকম রং ফলাচ্ছে। ওধারে থু, ট্রেনটা দাঁড়িয়ে। ঐ মাঝামাঝি কোথায় যেন সরমার কম্পার্টমেণ্টটা ঠিক ঠাহর হচ্ছে না। হঠাৎ দেখলাম সরমা এদিকে আসছে, এক রকম ছুটে।

কাছে এসে জানালা দিয়ে আমার হাতে একটা চিঠি গুঁজে দিয়ে হাত মুঠো করে চেপে ধরে বললে,—গাড়ী ছাড়লে পড়বেন।

খোঁপাটা খুলে ঘাড়ের পাশ দিয়ে ঝুলে এসেছে। মুখখানি আরক্ত। দম নিতে ঘন ঘন বুক উঠচে পড়ছে।

আমার বাঁ হাত তার ডান হাতের উপর রেখে বললাম,—বেশ, তাই পড়ব। জবাব দেবার ঠিকানা আছে ত।

—জবাব দেবার দরকার হবে না। বলেই সে হাত ছাড়িয়ে নিয়ে তেমনি তাড়াতাড়ি ফিরে গেল।

বাঁশী বাজিয়ে আমার গাড়ী ছেড়ে দিল।

* * *

নৃপেন সামনের দিকে চেয়ে চুপ করে বসে রইল আর কথা বলে না। রাস্তায় লোক নেই। চৌমাথায় পাহারালা লাঠি ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ঘুমোচ্ছে। কার্ত্তিকের পাতলা কুয়াশায়, দ্বাদশীর জ্যোৎস্না ম্লান হয়ে গেছে। শ্যামবাবু কখন চলে গেছেন। তাঁর ভৃত্য ওধারের দরজা জানালা বন্ধ করে দিয়ে বসে বসে ঝিমোচ্ছে।

আস্তে আস্তে জিজ্ঞাসা করলাম,—চিঠিতে কি লেখা ছিল?

তেমনি সামনের দিকে চেয়ে নৃপেন বলল,—গাড়ীতে বলি বলি করেও বলতে পারি নি, আমিই বলবার অবসর দি নি, মণির সঙ্গে তার বিয়ে পূর্ণিমায়। সময়মত আমায় কাশ্মীরে পৌছান চাই।

অবাক হলাম। একটু বাদে তার পিঠে হাত বুলিয়ে বললাম—তাই নাকি? আহাহা!! বড্ড শক্ লেগেছে, না? লাগবারই কথা। হা, হা হা—

নৃপেনের মুখের দিকে চেয়ে হাসি চেপে গেলাম।
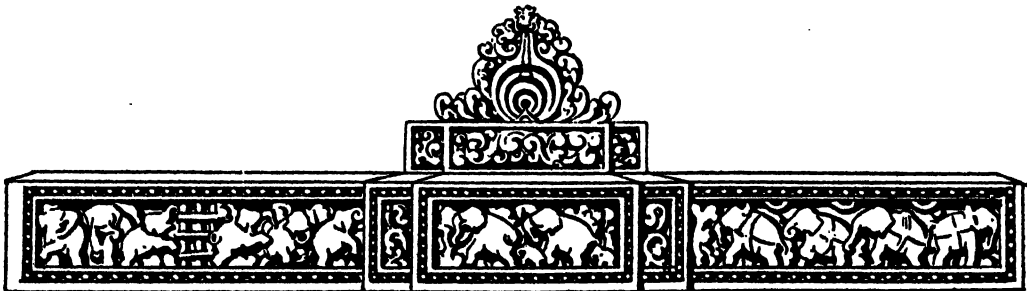
মাধ্যাকর্ষণ

শ্রীজ্যোতির্ম্ময় ঘোষ, এম-এ, পি-এইচ-ডি

সপ্তদশ শতাব্দীর শেষার্দ্ধে আইজাক্ নিউটন কর্ত্তৃক মাধ্যাকর্ষণ শক্তি আবিষ্কৃত হয়। এই শক্তির লক্ষণ এই যে, যে-কোন দুইটি পদার্থ পরস্পরের অভিমুখে আকর্ষণ অনুভব করে এবং এই আকর্ষণের পরিমাণ ঐ দুই পদার্থের পরিমাণের উপর এবং উহাদের দূরত্বের উপর নির্ভর করে। পদার্থ দুইটির অন্ততঃ একটি অতি বৃহদাকার না হইলে এই আকর্ষণ অনুভব করা সম্ভব নয়; সেই জন্যই ভূমিতে দুইটি দ্রব্য রাখিলে, পরস্পরের আকর্ষণে তাহারা একত্র গিয়া মিলিত হয় না। কিন্তু পৃথিবীর আয়তন অন্যান্য পদার্থ অপেক্ষা অনেক বড়; সেইজন্য অন্য যে-কোন পদার্থ, অন্য বাধা না থাকিলে, পৃথিবী কর্ত্তৃক আকৃষ্ট হইয়া ভূতলে পতিত হয়।

এই মাধ্যাকর্ষণ শক্তি আবিষ্কৃত হইবার পর ক্রমশঃ দেখা গেল যে, জগতের প্রায় সকল প্রকার প্রাকৃতিক গতিরই মূলে এই শক্তি। যে-শক্তির বলে বৃক্ষশাখা হইতে পক্ব ফল ভূমিতে পতিত হয়, সেই শক্তিরই প্রভাবে নদীর জল প্রবাহিত হয়, আকাশ হইতে বৃষ্টির জল ভূমিতে পতিত হয়, কর্দ্দমাক্ত পথে অসতর্ক পথিক ধরাশায়ী হয়, অশ্রুবিন্দু চক্ষু ছাড়িয়া গণ্ডদেশ প্লাবিত করে, রমণীর কেশদাম পৃষ্ঠদেশে প্রলম্বিত হয়, ঘড়ির দোলক একবার দোলাইয়া দিলে ক্রমাগত দুলিতে থাকে, সমুদ্রে জোয়ারভাটা হয়, পৃথিবী এবং অন্যান্য গ্রহ সূর্য্যের চতুর্দ্দিকে ঘোরে, চন্দ্রকলার হ্রাস-বৃদ্ধি হয় এবং সূর্য্য ও চন্দ্র রাহুগ্রস্ত হয়। চৌম্বক শক্তি, তাড়িৎ শক্তি প্রভৃতি কতকগুলি বিশিষ্ট প্রকারের শক্তি ব্যতীত জগতের সকল প্রকার প্রাকৃতিক গতিই এই শক্তির অধীন বলিয়া প্রতীয়মান হওয়ায় ক্রমশঃ এই শক্তিই জগতের একটি চরম সত্যের মধ্যে পরিগণিত হইয়া উঠিল। বিগত তিন শতাব্দীর মধ্যে এই শক্তিকে অবিশ্বাস করিবার মত বিশেষ গুরুতর কারণ উপস্থিত হয় নাই এবং সেইজন্যই এই শক্তির অস্তিত্ব আমরা চন্দ্রসূর্য্যের অস্তিত্বের মতই ধ্রুব বলিয়া বিশ্বাস করিতে অভ্যস্ত হইয়াছি।

কিন্তু মানুষের মন সদাই অতৃপ্ত। কোন প্রকার জ্ঞান লাভ করিয়াই সে তৃপ্ত হইয়া বসিয়া থাকিতে চায় না। যাহা অতি-সত্য এবং অতি-সাধারণ, তাহার মধ্যেও 'খুঁত' বাহির করিতে তাহার চেষ্টার অবধি নাই। যদিও দেখা গেল যে, পৃথিবী চন্দ্র এবং অন্যান্য সমস্ত গ্রহ ও উপগ্রহের সকল প্রকার গতিই এক মাধ্যাকর্ষণ শক্তির অধীন, তথাপি বুধগ্রহের একটি বিশেষ প্রকার গতি যেন এই শক্তির সঙ্গে কিছুতেই খাপ খায় না— কোথায় যেন একটু গরমিল থাকিয়া যায়। বহু চেষ্টাতেও যখন এই গরমিলের কোন সন্তোষজনক উত্তর পাওয়া গেল না, তখন নিউটন-আবিষ্কৃত মাধ্যাকর্ষণ শক্তির প্রতি কিঞ্চিৎ অবিশ্বাস কোন কোন গণিতজ্ঞের মনে উদিত হইতে লাগিল। তাঁহারা এই শক্তির নিয়মটিকে কিঞ্চিৎ পরিবর্ত্তিত করিয়া বুধগ্রহের গতির ব্যাখ্যা দিবার চেষ্টা করিলেন। তাহাতে বুধগ্রহের গতির গরমিলটি মিলিয়া গেল বটে, কিন্তু ঐ পরিবর্ত্তিত নিয়মে অন্যান্য গ্রহ উপগ্রহের গতিতে নানাপ্রকার নূতন গোলযোগ উপস্থিত হইল। সুতরাং ঐ সকল পরিবর্ত্তনের চেষ্টায় কোন ফল হইল না। এমন কোন নিয়ম পাওয়া গেল না যাহাতে বুধগ্রহের গতিও বুঝা যায় অথচ অন্যান্য গ্রহ উপগ্রহেরও গতিতে কোন তারতম্য না হয়।

এদিকে পদার্থবিদ্যায়ও একটি গুরুতর সমস্যা উপস্থিত হইল। ম্যাক্সওয়েল-প্রমুখ মনীষিগণের মতে আলোক-রশ্মির যেরূপ রীতি হওয়া উচিত, কার্য্যতঃ ঠিক তাহা না হওয়ায় বৈজ্ঞানিকগণের মনে নানাপ্রকার সন্দেহের উদ্রেক হইল। জার্মান বৈজ্ঞানিক লরেন্‌ত্‌স্ একটা মত প্রকাশ করিলেন, তাহাতে আপাততঃ কোন কোন সমস্যার

মীমাংসা হইলেও, সে মত বৈজ্ঞানিকদের মনে ধরিল না; কতকটা গোঁজামিলের মত মনে হইল।

জ্যোতিষশাস্ত্রে ও পদার্থবিদ্যায় যখন এই সকল সমস্যা জটিল হইয়া উঠিয়াছে, সেই সময়েই যেন বিধির বিধানেই, ইউরোপের ইংলণ্ডেতর দেশসমূহে গণিতজ্ঞগণ জ্যামিতি-শাস্ত্রের ভিত্তি লইয়া নানাপ্রকার গবেষণায় নিরত হইলেন। তাঁহারা ইতিপূর্ব্বেই দেখাইয়াছিলেন, ইউক্লিডের জ্যামিতি এবং তদুপরি প্রতিষ্ঠিত জ্যামিতিক মতামতই চরম কথা নয়; তাঁহারা দেখাইলেন যে, নিউটন-অয়লার-প্রভৃতি-প্রতিষ্ঠিত গণিত-বিধিই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ নয়। তাঁহারা দেখাইলেন যে, জগতের সর্ব্বসাধারণ নিয়মাবলীর গণনা ও বিচারের পক্ষে নূতন প্রকারের গণিত-বিধি সমধিক প্রয়োজনীয়। এই নূতন গণিত-বিধির প্রথম প্রবর্ত্তক ইতালী-দেশীয় মনস্বী রিচী।

গণিত ও বিজ্ঞানের জগতে এই প্রবল ঝঞ্ঝাবাতের মধ্যে জার্ম্মানীতে মনস্বী আইন্‌ষ্টাইন্ তাঁহার আপেক্ষিক-তত্ত্ব প্রচার করিলেন। এই তত্ত্ব এত নূতন, এত কঠিন এবং এত যুগান্তকারী যে, ইহা গণিতজ্ঞগণের এবং বৈজ্ঞানিকগণের সহসা গ্রহণযোগ্য হয় নাই। কিন্তু যখন ক্রমশঃ এই তত্ত্বকে ভিত্তি করিয়া যে জ্ঞানরাশি সঞ্চিত হইতে লাগিল তদ্দ্বারা পদার্থবিদ্যার অনেক কঠিন সমস্যার সমাধান হইল, তখন অনেকেই এই তত্ত্বের প্রতি শ্রদ্ধা প্রকাশ করিতে লাগিলেন। ক্রমশঃ এই শ্রদ্ধা অনেকের মনে বিশ্বাসে পরিণত হইল।

বিগত ১৯১৫ খৃষ্টাব্দে মনস্বী আইন্‌ষ্টাইন তাঁহার আপেক্ষিক তত্ত্ব হইতে একটি অদ্ভুত নিয়ম আবিষ্কার করিলেন। এই নিয়মটিকে আইন্‌ষ্টাইনের 'মাধ্যাকর্ষণ'-তত্ত্ব নামে অভিহিত করা যাইতে পারে। সূক্ষ্ম এবং কঠিন গণিতের সাহায্য ব্যতীত এই তত্ত্ব হৃদয়ঙ্গম করা অসম্ভব। তথাপি সাধারণ ভাষায় ইহার কিঞ্চিৎ আভাস দিবার চেষ্টা করা যাইতে পারে।

আপেক্ষিক তত্ত্ব অনুসারে জগতের যাবতীয় পদার্থের আয়তন, দৈর্ঘ্য, প্রস্থ ও বেধ ব্যতীত কালের উপরও নির্ভর করে। সুতরাং জগতের যাবতীয় ঘটনাই স্থান-কাল-সাপেক্ষ। এই মতের অনুযায়ী গণনার দ্বারা দেখা যায়, আমাদের দৃশ্যমান জগতও একটি স্থান-কাল-সমন্বিত সত্তা। এবং এইরূপ স্থান-কাল-সমন্বিত সত্তার মধ্যে কোন পদার্থ অবস্থান করিলেই, আইনষ্টাইনের নূতন মাধ্যাকর্ষণ-তত্ত্ব অনুসারে, উক্ত পদার্থের চতুর্দ্দিকে অবস্থিত দ্রব্যগুলির একটি গতি থাকিবে। এই গতির প্রকার নিউটন-নির্দ্দিষ্ট গতিরই অনুরূপ। সুতরাং যে-প্রকার গতিকে আমরা এতদিন নিউটনের মাধ্যাকর্ষণজনিত গতি বলিয়া মনে করিয়া আসিতেছি, তাহা হয়ত শুধু উক্তরূপ স্থান-কাল-সমন্বিত জগতে অবস্থানেরই ফল, কোন প্রকার আকর্ষণসম্ভূত নয়। এই তত্ত্ব হইতে যে-প্রকার গতি গণনায় পাওয়া গেল, তাহাতে বুধগ্রহের গতির সেই গরমিল অনেকটা সংশোধিত হইয়া গেল। আরও একটা আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, উক্ত তত্ত্বানুসারে তারকার আলোকরশ্মি সূর্য্যের নিকটবর্ত্তী হইলে ঋজুপথে না গিয়া ঈষৎ বক্রপথ অবলম্বন করে। একবার সূর্য্য-গ্রহণের সময়ে আলোকরশ্মির ঐরূপ বক্রতাও এডিংটন্-প্রমুখ বৈজ্ঞানিকগণ লক্ষ্য করিলেন। এতদ্ব্যতীত অন্যান্য অনেকগুলি সমস্যার সমাধান সুচারুরূপে সম্পন্ন হওয়ায় বৈজ্ঞানিকগণ আইন্‌ষ্টাইনের এই নূতন মাধ্যাকর্ষণ-তত্ত্বে ক্রমশঃ বিশ্বাসী হইয়া উঠিলেন। বর্ত্তমানে অধিকাংশ বৈজ্ঞানিকগণ এই তত্ত্বে আস্থাবান্।

তবে কি নিউটনের মাধ্যাকর্ষণ-তত্ত্ব একেবারে ভুল? এই প্রশ্ন মনে হওয়া স্বাভাবিক। ইহার উত্তর এই যে, নিউটনের তত্ত্ব আইন্‌ষ্টাইনের তত্ত্বের তুলনায় স্থূল। সুতরাং অধিকাংশ স্থূল বিষয়ে নিউটনের তত্ত্বই যথেষ্ট। কিন্তু অনেক সূক্ষ্ম বিষয় নিউটনের তত্ত্বে ব্যাখ্যাত হইবার নহে। সেখানে আমাদিগকে আইন্‌ষ্টাইনের তত্ত্বের আশ্রয় লইতে হয়।

শুধু মাধ্যাকর্ষণের নূতন ব্যাখ্যা দিয়াই আইন্‌ষ্টাইনের তত্ত্ব ক্ষান্ত হয় নাই। পূর্ব্বে পদার্থবিদ্যায় আলোকরশ্মির গতি সম্বন্ধে যে-সমস্যার উল্লেখ করা হইয়াছে, তাহারও সুষ্ঠু সমাধান হইয়াছে। আইন্‌ষ্টাইনের মাধ্যাকর্ষণ-তত্ত্ব যে গণনা-বিধির দ্বারা নিয়ন্ত্রিত, সেই গণনা-বিধি পূর্ব্বোক্ত রিচী-আবিষ্কৃত। জ্যোতিষের সমস্যা, আলোকরশ্মির সমস্যা এবং নূতন গণনা-বিধির আবির্ভাব—এই তিনটি

চিন্তার ধারা যেন একত্র সম্মিলিত হইয়া আইন্‌ষ্টাইনের প্রতিভায় আপেক্ষিক-তত্ত্বরূপে মূর্ত্ত হইয়া উঠিয়াছে। মানুষের চিন্তাজগতে এত বড় বিপর্য্যয় বুঝি ইতিপূর্ব্বে আর কখনও হয় নাই।

আইন্‌ষ্টাইনের এই নূতন তত্ত্বের ফলে ব্রহ্মাণ্ডের আকার ও আয়তন সম্বন্ধেও অভিনব ও বিস্ময়কর আলোচনার সূত্রপাত হইয়াছে। গত দুই তিন বৎসরের মধ্যে গণিতজ্ঞগণ এ-সম্বন্ধে যে-সকল সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন, সেগুলি এখনও সম্পূর্ণ নিঃসংশয়রূপে প্রতিপন্ন না হইলেও নিতান্ত উপেক্ষার বিষয় নয়।

সর্ব্বসিদ্ধি ত্রয়োদশী

শ্রীব্রহ্মানন্দ সেন

পঞ্জিকাকারগণের উপরে হরেন মজুমদারের জাতক্রোধ ছিল। ভগবানের সৃষ্ট দিনগুলিকে লইয়া যে তাহারা মড়াকাটা ডাক্তারগুলির মতই যথেচ্ছা কাটাছেঁড়া করিবে এটা হরেনের মোটেই বরদাস্ত হইত না। যাত্রানাস্তি, বার-বেলা, শনির শেষ, অগস্ত্যযাত্রা ইত্যাদির ধুয়া ধরিয়া প্রায় প্রত্যেকটি দিনেরই খানিকটা করিয়া অংশ তাহারা বকেয়ার ঘরে ফেলিয়া দিবে, আর দুনিয়ার মানুষগুলিকে কি না কুসংস্কারের বশবর্ত্তী হইয়া চলিতে ফিরিতে উঠিতে বসিতে প্রতি পদেই তাহাদের এই অন্যায় আব্দার মানিয়া লইতে হইবে! যে মানে মানুক, হরেন কিছুতেই এ কুসংস্কারের প্রশ্রয় দিতে পারে না। তাই উল্লিখিত পাঁজির নিষেধগুলিকেও যেমন সে গ্রাহ্য করিত না তেমনি আবার পাঁজি-লিখিত শুভদিনগুলিকে কাজে লাগাইতেও রাজী ছিল না। কোন একটা কাজে চলিয়াছে এমন সময়ে যদি কেহ বলিত, 'আজ দিনটা ভালই আছে তোমার কার্য্যসিদ্ধি হইবে' অমনি সে ফিরিল বাড়ির দিকে। সেদিন আর তাহার সে কাজে যাওয়া হইল না। এই বিষয়ে তাহার সাহিত্যিক বন্ধু প্রমথকে সে যে কত বিদ্রূপ করিয়াছে, কত বুঝাইয়াছে তাহার লেখাজোখা নাই। উদীয়মান লেখক হইয়াও যে প্রমথ যত রাজ্যের কুসংস্কার মানিয়া চলিবে এটা সে সহিতে পারিত না। কিন্তু হাজার চেষ্টাতেও তাহাকে দলে ভিড়াইতে পারে নাই।

হরেনও লেখে। এ-বিষয়ে সে প্রমথর নিকট হইতে যথেষ্ট উৎসাহও পায়। কিন্তু এ-যাবৎ পত্রিকার সম্পাদকদিগের কৃপালাভ তাহার ভাগ্যে ঘটে নাই। প্রায় দুই ডজন ছোটগল্প লিখিয়া সকলগুলিই সে একে একে প্রচলিত সমস্ত মাসিকের সম্পাদকদিগের নিকট পাঠাইয়াছে। কিন্তু সকলের নিকট হইতেই সেগুলি 'পত্রপাঠ' ফেরৎ আসিয়াছে। ইহাতেও হরেন দমিয়া যায় নাই। এবারে সে চিঠির উত্তর-প্রত্যুত্তরে একটি নূতন ধাতের ছোটগল্প লিখিয়া ফেলিল। গল্পটি নিজের কাছে এত ভাল লাগিল যে, তাহার দৃঢ় ধারণা হইল এবারে যে-কোন সম্পাদকের কাছেই এটিকে পাঠান হউক না কেন আর তাহা ফেরৎ আসিবে না। কিন্তু অতীতের অকৃতকার্য্যতার স্মৃতি তাহার মন হইতে একেবারে মুছিয়া যায় নাই। তাই এটিকে পাঠাইবার পূর্ব্বে সে একবার প্রমথর কাছে গেল জানিবার জন্য সে কি উপায় অবলম্বন করে যার জন্য তাহার কোন লেখাই ফেরৎ আসে না, যেটাতে পাঠায় সেটাতেই ছাপা হয়। প্রমথ নিজের সরল বিশ্বাস মতে বলিল, আমি ভাই কোন পন্থাটন্থা জানিনে। তবে এইটুকু আমি বলতে পারি যে শাস্ত্রবাক্য বিশ্বাস ক'রে সর্ব্বসিদ্ধি ত্রয়োদশীতে আমার লেখাগুলো পাঠাই।

'যত সব কুসংস্কার' বলিয়া হরেন তর্ক তুলিতে যাইতেছিল। কিন্তু যে তর্ক করিবে না তাহার সঙ্গে

জোর করিয়া তর্ক চলে না। হরেনকে বাধ্য হইয়া উঠিয়া আসিতে হইল।

বাড়ি আসিয়া হরেন ভাবিতে লাগিল, প্রমথ কি তবে ত্রয়োদশীতে লেখা পাঠায় বলিয়াই তাহার লেখা ফেরৎ আসে না? তবে কি সত্যই এ তিথির কোন গুণ আছে? সেও কি তবে দেখিবে একবার ত্রয়োদশীতে তাহার লেখা পাঠাইয়া? কিন্তু পরক্ষণেই সে আপন মনে বলিয়া উঠিল, তা হ'তে পারে না, এ-সব কুসংস্কার কুসংস্কার। কয়েক দিন ধরিয়া এই দুইটি বিরুদ্ধভাব তাহার মনের মধ্যে দোল খাইতে লাগিল। কিন্তু মাসিকে গল্প ছাপাইবার নেশা তাহাকে পাইয়া বসিয়াছিল। সে নিজের মনকে বুঝাইল, সে তো আর সত্য সত্যই তিথি-নক্ষত্র মানিতে যাইতেছে না। শুধু একবার পরীক্ষা করিয়া দেখিবে বই তো নয়। ইহাতে আর দোষ কি? তাই শেষ পর্য্যন্ত সর্ব্বসিদ্ধি ত্রয়োদশীরই জয় হইল। জ্ঞানত এই সে প্রথম পাঁজি দেখিয়া তিথি মানিয়া এক আনার ডাকটিকিট সহ রেজেষ্টারী ডাকে খ্যাতনামা এক মাসিকের সম্পাদকের কাছে তাহার নূতন ধরণে লেখা গল্পটি পাঠাইয়া দিল।

গল্প ফেরৎ আসিবার সম্ভাবিত সময় উত্তীর্ণ হইয়া যাওয়া সত্ত্বেও গল্প ফেরৎ না আসাতে হরেনের মনে আশার সঞ্চার হইল। বুঝি বা তাহার গল্প এবারে মনোনীত হইয়াছে। বুঝি বা ত্রয়োদশীর সত্যসত্যই সিদ্ধিদানের ক্ষমতা আছে। কিন্তু মনোনয়ন সংবাদ না-আসা পর্য্যন্ত একেবারে নিশ্চিন্ত হইতে পারিল না। প্রত্যহ সে ডাকপিয়নের আশায় বসিয়া থাকিত। এমনি করিয়া প্রায় দুই মাস কাটিল। এবারে সে সম্পাদককে তাগিদ দিবে ভাবিতেছিল। কিন্তু আর এক দিন অপেক্ষা করিয়া দেখি' ভাবিতে ভাবিতে আরও সাত দিন কাটিল। এমন সময়ে হঠাৎ একদিন এক পুলিস কর্ম্মচারী আসিয়া ওয়ারেণ্ট দেখাইয়া তাহাকে থানায় ধরিয়া লইয়া গেল এবং সেখান হইতে সদরে চালান করিল। সদরে গিয়া হরেন শুনিল একজন যুবক কিছুদিন পূর্ব্বে আত্মহত্যা করিয়াছিল। এ-সম্বন্ধে তদন্ত করিতে গিয়া যুবকটির বাড়িতে এ সম্পর্কে হরেনের লেখা চিঠি পাওয়া গিয়াছে। হরেনের মুখ দিয়া অতর্কিতে বাহির হইল, এ যে রীতিমত ডিটেক্‌টিভ উপন্যাস।

নির্দ্দিষ্ট তারিখে বিচার আরম্ভ হইলে হরেনকে কোর্টে লইয়া গিয়া কাঠগড়ায় দাঁড় করান হইল এবং প্রথামত শপথ করান হইল। তারপর হাকিম তাঁহার পরিচয়াদি লইবার পর জিজ্ঞাসা করিল—আপনি মণিময় রায় ব'লে কোন যুবককে জানতেন?

হরেন বলিল—আজ্ঞে না।

হাকিম। সেই যে পলাশপুরে যে যুবক আত্মহত্যা করেছিল। তাকে আপনি জানতেন না?

হরেন। আজ্ঞে না।

হাকিম তখন একখানি চিঠি দেখাইয়া হরেনকে জিজ্ঞাসা করিল—দেখুন তো এ হাতের লেখা আপনার ব'লে মনে হয় কি?

হরেন চিঠি দেখিয়া স্তম্ভিত হইয়া গেল। শেষ যে গল্পটি পাঠাইয়া নির্দ্দিষ্ট সময়ে ফেরৎ না পাওয়াতে সে আশা করিয়াছিল এবারে পত্রিকা-সম্পাদক তাহার গল্প মনোনীত করিয়াছে, এ যে সেই গল্পেরই এক পৃষ্ঠা। তাহার এক জায়গায় লেখা ছিল—

ভাই মণিময়, তোমার মনের এ অবস্থায় তোমার কর্ত্তব্য সম্বন্ধে আমার মতামত চাহিয়াছ। তোমার গভীর দুঃখে সত্যই আমি দুঃখিত। কিন্তু তোমায় কোন পরামর্শ আমি দিতে পারিলাম না। তোমার মনই তোমায় পথ দেখাইবে।...

* * * *

তোমার ধৈর্য্য অসীম বন্ধু। তোমার মত অবস্থায় পড়িলে আমার কিন্তু আত্মহত্যা ছাড়া আর কোন উপায় থাকিত না।

হরেন হাকিমকে বলিল—আমি একজন লেখক। চিঠির উত্তর-প্রত্যুত্তরে একটি গল্প লিখে এক মাসিকের সম্পাদকের নামে পাঠিয়েছিলাম। এ তারই এক অংশ।

হাকিম। আর সে সম্পাদকের সঙ্গে আপনার শত্রুতা ছিল। তাই আপনাকে বিপদে ফেলবার জন্য এই চিঠিখানি তিনি পুলিসের কাছে পাঠিয়ে দিয়েছেন। এই তো আপনি বলতে চান?

হরেন। আজ্ঞে না।

হাকিম। তবে কি বলতে চান যে পুলিসের সঙ্গে আপনার কোনরূপ শত্রুতা আছে? তাই আপনাকে জব্দ করবার জন্য সম্পাদকের আপিস থেকে সিঁদ কেটে একটা পৃষ্ঠা নিয়ে এসেছে?

হরেন। আজ্ঞে না।

হাকিম। তবে? যাক্, আপনার লেখকরূপে পরিচয় দেবার এই প্রত্যুৎপন্নমতিত্বের তারিফ করতে হয়। আমি জানি আজকালকার যুবকদের এ জিনিষটার অভাব হয় না। তারা চটপট একটা কিছু বানিয়ে বলতে পারে।

হরেন নিরুত্তর রহিল।

হাকিম। আপনি বলতে চান চিঠির এই মণিময় আপনার সৃষ্ট একটি কাল্পনিক চরিত্র মাত্র?

হরেন। নিশ্চয়।

হাকিম। আর কাল্পনিক মণিময়ের সঙ্গে আত্ম-হত্যাকারী মণিময়ের নাম মিলে যাওয়া একটা 'চান্স' মাত্র। এ রকম ঘটনা হ'তে পারে। কেমন, না?

হরেন আশান্বিত হইয়া বলিল—আজ্ঞে হ্যাঁ, এ একটা 'চান্স্' বইকি।

হাকিম। তাহলে আপনি বলতে চান, আপনার এই কাল্পনিক পত্রখানা বাস্তব মণিময়ের বাড়ি খানাতল্লাসীর সময়ে পাওয়া, এও একটা 'চান্স' এবং এও সম্ভব?

হরেন নিরুত্তর।

হাকিম মৃদু হাসিয়া বলিল—আপনার দেওয়া কাল্পনিক নামের সঙ্গে আপনার বাস্তব নাম মিলে যাওয়াও একটা চান্স্। কি বলেন?

হরেন। আপনার কথা ঠিক বুঝতে পারলাম না।

হাকিম। এই যে চিঠির শেষে হরেন্দ্র ব'লে আপনার নিজের নাম সই রয়েছে, এটাও কাল্পনিক বলতে চান?

হরেন আগে এটা লক্ষ্য করে নাই। এবারে আর একবার দেখিয়া লইয়া বলিল—আজ্ঞে এ নাম আমার বটে কিন্তু আমার লেখা নয়। আমার লেখা গল্পে চিঠির নীচে শুধু 'তোমার গুণমুগ্ধ বন্ধু' বলেই লেখা ছিল। আর কিছু ছিল না।

হাকিম। এই যে চিঠির নীচে আপনার হাতের সই দেখতে পাচ্ছি এ তাহলে আপনার হাতের লেখা নয় বলতে চান?

হরেন। আজ্ঞে না, ওখানে আমার সই থাকবার কথাই নয়। ওখানে একটা নাম থাকলেও কাল্পনিক মণিময়ের কাল্পনিক বন্ধু রাধাকান্তের নাম থাকত। কিন্তু আমি অনাবশ্যক বোধে ওখানে কোন নাম দিই নি।

হাকিম। আচ্ছা, আপনি এই কাগজের টুকরাটিতে আপনার নাম সই করুন তো।

হরেন নাম সই করিলে হাকিম চিঠির সইয়ের সঙ্গে এ সইয়ের কোন প্রভেদ আছে কি-না পরীক্ষা করিতে লাগিলেন। কিন্তু কোন প্রভেদ বুঝিতে পারিলেন না। তারপর হরেনের দিকে চাহিয়া বলিলেন—আপনি নিজেই পরীক্ষা ক'রে দেখুন এ দুটার মধ্যে কোন পার্থক্য আছে কি-না। হরেন অনেক দেখিল বটে কিন্তু কোন পার্থক্য বুঝিতে পারিল না। তবু সে জোর করিয়া বলিল এ আমার সই নয়। আপনি যদি আমার কথা বিশ্বাস না করেন তবে উপযুক্ত সময় দিলে আমি আমার কথার সত্যতা প্রমাণ করবার চেষ্টা করব।

হাকিম। কি ক'রে?

হরেন। আমার গল্পের খস্ড়া আনিয়ে আপনাকে দেখালে আপনি আমার কথা বিশ্বাস করবেন আশা করি।

হাকিম। অর্থাৎ চেষ্টা ক'রে দেখবেন যদি সময় নিয়ে এ চিঠির সঙ্গে খাপ খাইয়ে একটা গল্প লিখে দাঁড় করাতে পারেন। তাই, না?

হরেন। আপনি যদি আমার কথায় বিশ্বাস না করেন তবে আপনিই আমার বাড়ি থেকে খসড়া আনাবার ব্যবস্থা করতে পারেন।

হাকিম এ ব্যবস্থায় রাজী হইল। কারণ, আসামীকে তাহার পক্ষসমর্থনের সর্ব্বপ্রকার সুবিধা দিতে হইবে। কাজেই মোকদ্দমার তারিখ পড়িল।

চার পাঁচ দিন পরে হরেনের কাছে খবর আসিল হাকিম তাহার বাড়ি হইতে খসড়া আনাইবার ব্যবস্থা

করিয়াছিলেন কিন্তু তাহা পাওয়া যায় নাই। হরেন বাবু ইচ্ছা করিলে নিজেই সেটিকে আনাইবার ব্যবস্থা করিতে পারেন।

হরেন আনুপূর্ব্বিক ঘটনা বিবৃত করিয়া তাহার বন্ধু প্রমথকে তাহার বাড়ি হইতে খসড়াখানি খুঁজিয়া বাহির করিয়া পাঠাইয়া দিতে লিখিল। প্রমথ উত্তরে লিখিল, তাহার গল্পের খসড়াখানি পাওয়া গেল না। তাহার বাড়ি খানাতল্লাসীর সময়ে সেটি পুলিসের হস্তগত হইয়াছে কি-না তাহা সে বলিতে পারিল না।

নির্দ্দিষ্ট দিনে আবার মোকদ্দমার শুনানী হইল। কিন্তু হরেন তাহার কথামত প্রমাণ দিতে পারিল না। কাজেই হাকিমকে তাহার বিরুদ্ধেই রায় দিতে হইল। বিচারে ফৌজদারী আইনের ৩০৬ ধারা অনুসারে আত্মহত্যার প্ররোচক বলিয়া হরেনের ছয় মাস বিনাশ্রমে কারাদণ্ড এবং পঞ্চাশ টাকা অর্থদণ্ড হইল। হরেনের চিঠি মণিময়কে আত্মহত্যায় উদ্বুদ্ধ করিলেও হরেন প্রত্যক্ষভাবে ইহার প্ররোচক নহে। এই জন্যই না-কি এই লঘু দণ্ডের ব্যবস্থা হইল।

রক্ষী পুলিস হরেনকে কোর্ট হইতে থানায় এবং সেখান হইতে জেলে লইয়া গেল। জেলে যাইবার পথে এক সময়ে কিঞ্চিৎ অগ্রগামী দুই ব্যক্তির কথোপকথন হরেনের কানে গেল। একজন বলিল—এবারে আমার প্রমোশন আট্‌কায় কে? সাধে কি বলে সর্ব্বসিদ্ধি ত্রয়োদশী?

দ্বিতীয় ব্যক্তি বলিল—ব্যাপারটা কি হ'ল ভাল ক'রে বুঝিয়ে বল তো।

প্রথম ব্যক্তি। আরে ভাই শোন। মণিময় রায়ের আত্মহত্যার তদন্তের ভার পড়ল আমার ওপর। সেদিন ছিল একাদশী। তাই এটা-সেটার ছুতো ক'রে দু-দিন কাটিয়ে সর্ব্বসিদ্ধি ত্রয়োদশীতে বেরিয়ে পড়লাম মফঃস্বলে মণিময়ের গ্রাম লক্ষ্য ক'রে। আমার বরাত-গুণে সেই রাত্রেই একটা ডাক লুট হ'ল। পরদিন প্রাতে পথে একটা থানায় বসে আছি এমন সময়ে সে ডাক লুটের খবর এল। সে থানার দারোগার সঙ্গে আমিও গিয়ে হাজির হলাম। তদন্ত করতে গিয়ে একটা ছেঁড়া রেজিষ্টারি খামে পোরা হরেন বাবুর লেখা গল্পটা আমার হাতে এসে পড়ল। দুপুর-বেলা খাওয়া-দাওয়ার পর একটু গড়াগড়ি করতে করতে এই গল্পটা পড়ছিলাম। এই চিঠিটা অবধি পড়েই মাথার ভেতর এক মতলব এল। ভাবলাম যদি তদন্তে মণিময়ের আত্মহত্যার কোন কিনারা করতে না পারি তাহ'লে এই চিঠিখানি দিয়েই 'কেস' খাড়া করে দেব। করতে হ'লও তাই।

দ্বিতীয় ব্যক্তি। হরেনবাবু যে জবানবন্দী করলেন সেটা তাহ'লে সত্যি কথা?

প্রথম ব্যক্তি। নিশ্চয়।

দ্বিতীয় ব্যক্তি। কিন্তু তার দস্তখত এ চিঠিতে এল কি ক'রে?

প্রথম ব্যক্তি। বুদ্ধি থাকলেই ব্যবস্থা হয়। গল্পের শেষে লেখকেরা তাদের নাম ঠিকানা লিখে দেয় তা কি জান না? হরেনবাবু চেয়েছিলেন তাঁর গল্পের খসড়া দেখিয়ে আমার সাজান মোকদ্দমা ফাঁসিয়ে দিতে। আমি কি তেমনি কাঁচা ছেলে। খানাতল্লাসের নাম ক'রে সে যে গোড়াতেই তাঁর বাড়ি থেকে সরিয়ে ফেলেছি। ভাগ্যিস্ দু-দিন অপেক্ষা ক'রে ত্রয়োদশীতে বেরিয়েছিলাম, তাই না এমন যোগাযোগটা হ'ল।

পিছন হইতে এই ইতিহাস শুনিয়া হরেনের মুখে বড় দুঃখে হাসি ফুটিল। মনে মনে বলিল, হায় গো ত্রয়োদশী! প্রমথর নির্দ্দোষ সাহিত্যালোচনার বেলায়ও তুমি সর্ব্বসিদ্ধি, আবার এই লোকটির পাপকার্য্যের বেলায়ও তুমি সর্ব্বসিদ্ধি। কেবল আমার বেলায়ই তুমি সর্ব্বনাশী!

হরেন প্রতিজ্ঞা করিল, গল্প ছাপাইবার নেশায় তথা সর্ব্বসিদ্ধিত্ব পরীক্ষা করিতে গিয়া জীবনে এই একবারই সে ত্রয়োদশীকে মানিয়াছিল। তাহার ফলও সে হাতে হাতেই পাইল, শুধু অর্থদণ্ডই নয় একেবারে ছয় মাস জেল। সুতরাং এই প্রথম ও এই শেষ। আর সে এ জীবনে কখনও ত্রয়োদশীর কাছও ঘেঁষিবে না।

আমার তীর্থযাত্রা

শ্রীবনারসীদাস চতুর্ব্বেদী

চল্লিশ বৎসর পূর্ব্বেকার কথা।* জার্ম্মান পাদরী রেভারেণ্ড হেনরী উফম্যান সমস্ত দিনের পরিশ্রমের পর বিশ্রাম করিতেছিলেন এমন সময় ডাকহরকরা বিলাতী ডাক দিয়া গেল। সুদূর বিদেশে প্রবাসযাপনকালে নিজ মাতৃভূমি হইতে আগত সংবাদের প্রতীক্ষা লোকে যথেষ্ট উৎকণ্ঠার সহিত করিয়া থাকে। পাদরী-সাহেব বার্লিনের ডাকঘরের ছাপমারা একটি চিঠি অত্যন্ত ঔৎসুক্যসহকারে খুলিয়া দেখিলেন, চিঠির উপরে 'এলিজাবেথ হাসপাতাল, বার্লিন' লেখা। ভিতরে পাদরী-সাহেবের দশম বর্ষীয়া কন্যা মেরীর কয়েকটি বড় বড় ফটো ছিল। শিক্ষাব্যাপদেশে মেরী পুরুলিয়া-প্রবাসী পিতার নিকট হইতে দূরে জার্ম্মানীতে কৈশোরবর্ষ যাপন করিতেছিল। পত্রে লিখিত ছিল—"আপনি শুনিয়া দুঃখিত হইবেন যে, মেরী এখানে আসা অবধি পীড়িত হইয়াছে। উহার শরীরের উপর চাকা চাকা দাগ পড়িয়াছে এবং আরও কয়েকটি লক্ষণ প্রকাশ পাইয়াছে যাহা দেখিয়া অত্রস্থ চিকিৎসকেরা কিছুই নির্দ্ধারণ করিতে পারিতেছেন না। সম্ভবত ভারতবর্ষে রোগনির্ণয় হইতে পারে এই নিমিত্ত তাহার ফটো পাঠাইতেছি।"

চিঠি পড়িয়া পাদরী-সাহেব চিন্তিত হইলেন এবং কালবিলম্ব না করিয়া কলিকাতা রওয়ানা হইলেন। সেখানে তিনি চিকিৎসকদের মেরীর ফটো দেখাইলেন ও পত্রের বর্ণনা আনুপূর্ব্বিক শুনাইলেন। সমস্ত শুনিয়া চিকিৎসকেরা কহিলেন, "আপনার কন্যার কুষ্ঠরোগ হইয়াছে।" কুষ্ঠ! রেভারেণ্ড উফম্যানের চিন্তার আর অবধি রহিল না। তিনি নিজের কার্য্যস্থলে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। কিছুদিন পরে পত্রযোগে তিনি প্রিয়তমা কন্যার হৃদয়বিদারক মৃত্যুসমাচার প্রাপ্ত হইলেন। পাদরী-সাহেব চিন্তা করিলেন, যে দুঃখ আজ আমার উপর আসিয়া পড়িয়াছে লক্ষ লক্ষ পিতা মাতা তদ্দ্বারা পীড়িত। তখন হইতেই তিনি মনে মনে স্থির করিয়া লইলেন যে, ভারতের কুষ্ঠরোগীদের সেবায় তিনি জীবন ব্যয়িত করিবেন। যে সদিচ্ছা চল্লিশ বৎসর পূর্ব্বে বীজরূপে উঁহার হৃদয়ে উপ্ত হইয়াছিল, আজ তাহাই মনোরম উপবন-স্বরূপ পুরুলিয়া শহরে বিদ্যমান। ভারতবর্ষ, ভারতবর্ষ কেন, সমগ্র ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কুষ্ঠাশ্রম আজ পুরুলিয়ায় অবস্থিত। যাহার হৃদয়ে শ্রদ্ধাভক্তি তথা মানব-সমাজ-প্রেমের বিন্দুমাত্র বিকাশ হইয়াছে পুরুলিয়ার এই আশ্রম তাঁহার নিকট তীর্থস্থান বলিয়া পরিগণিত হইবে। মহাত্মা গান্ধীও এই তীর্থযাত্রা করিয়া আসিয়াছেন এবং এ বিষয়ে লিখিয়াছেন—

"To see the happy faces of the inmates was to realize what loving service rendered in the name of God can do."

অর্থাৎ "এই আশ্রমবাসীদের প্রসন্ন মুখমণ্ডল দেখিয়া স্পষ্ট প্রতীয়মান হয় যে ঈশ্বরের নামে প্রতিষ্ঠিত মানবের প্রেমপূর্ণ সেবাধর্ম্ম কি অঘটন ঘটাইতে সক্ষম।"

গত ডিসেম্বর মাসের প্রারম্ভে এই তীর্থে যাত্রা করিবার সৌভাগ্য আমার হইয়াছিল। রাত্রে হাওড়াতে পুরুলিয়া এক্সপ্রেসে উঠিয়া পরদিন প্রাতে পুরুলিয়া পৌঁছিলাম। মিশনের সেক্রেটারী মিঃ এ-ডোনাল্ড মিলার সাহেব ষ্টেশনে উপস্থিত ছিলেন। পুরুলিয়া শহর বেশ পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন বোধ হইল না। বিহার-প্রান্ত পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার জন্য প্রসিদ্ধও নয়। এই শহরের বাহিরে এক সুন্দর রমণীয় স্থানে এই আশ্রম অবস্থিত—এক বিশাল সরোবর ও নানাবিধ বৃক্ষরাজি এই স্থানের শোভা চতুর্গুণ বৃদ্ধি করিতেছে। পূর্ব্বে এই স্থান জঙ্গলসমাকীর্ণ ছিল—শুনা যায়, এই জঙ্গল বন্যপশু ও পোকামাকড়ের সাম্রাজ্য ছিল। সেই জঙ্গল আজ মানবের মঙ্গল আনিয়াছে।

পুরুলিয়া আশ্রম ৮২৯ জনকে আশ্রয় দিয়াছে—তন্মধ্যে ৭৫৮ জন কুষ্ঠরোগগ্রস্ত, ৩১ জন শিশু এখনও রোগাক্রান্ত হয় নাই। জনসংখ্যা এই প্রকার—পুরুষ ৩৪৫,

স্ত্রী ৩৪৮, শিশু ৬১—মোট ৭৫৮ জন। যিনি কলিকাতায় পথশায়িত কুষ্ঠরোগীকে দেখিয়াছেন তিনি পুরুলিয়া আশ্রম-নিবাসী রোগীকে দেখিলে বিস্মিত হইবেন—দুইয়ে আকাশ-পাতাল তফাৎ।

এইবার আমরা আশ্রম প্রদক্ষিণ করিব। প্রথমে অখিল ভারতবর্ষীয় আশ্রমের সেক্রেটারী মিঃ মিলারের সঙ্গে

একজন কুষ্ঠরোগাক্রান্ত স্ত্রীলোক তাহার শিশুসন্তানকে 'সিষ্টারে'র হাতে সমর্পণ করিতেছে

মিলিত হইতে হইবে। কারণ তাঁহার সহিত পরিচয় না হইলে এই মহান কীর্ত্তির মূলে কোন্ ভাবনা কার্য্য করিতেছে তাহা আমরা সম্যক্ বুঝিতে পারিব না। প্রায় বারো বৎসর পূর্ব্বে ইনি ভারতবর্ষে আসিয়াছিলেন। তৎপূর্ব্বে একজন ব্যবসায়ীর সহিত তাঁহার এই চুক্তি হয় যে, তিনি ব্যবসায়ে তাঁহার সহায়তা করিবেন ও মুনাফা ভাগবাটোয়ারা করিয়া লইবেন। পরে তিনি উক্ত ব্যবসায়ীর লাভের অংশীদার হওয়া অপেক্ষা ভারতের দীনহীন কুষ্ঠরোগীর দুঃখের অংশ লওয়াই অধিক শ্রেয় বলিয়া বিবেচনা করিলেন। মিষ্টার মিলার সাধু ভক্ত বিনম্র এবং সকল প্রকার প্রশংসা ও বিজ্ঞাপনের নিকট হইতে দূরে থাকেন। খাঁটি মিশনরীর যে-যে গুণ থাকা আবশ্যক তাঁহার তাহা আছে। সেই উজ্জ্বল গৌরবর্ণ সম্প্রদায়ের তিনি নন যাঁহারা নিজেদের শ্বেত চর্ম্মের গর্ব্ব করিয়া থাকেন এবং কৃষ্ণচর্ম্মদের ঘৃণার চক্ষে দেখেন। ইনি বাংলা ভাষা শিক্ষা করিয়াছেন—নিজের চাকরের সহিত একত্র বসিয়া বাংলা ভাষায় প্রার্থনা করেন। আশ্রমের অধিকাংশ অধিবাসী বাংলাভাষাভাষী, মিলার সাহেব অনায়াসে তাহাদের সহিত তর্কবিতর্ক করিতে পারেন। মিলার সাহেব বলিলেন, আমি এই কথা অন্তরের অন্তস্তল হইতে স্পষ্ট করিয়া বলিতেছি যে, প্রভু যীশুর ধর্ম্মের প্রতি শ্রদ্ধাই আমাকে এই কার্য্যে প্রণোদিত করিয়াছে। কুষ্ঠরোগী ও তাহাদের সন্তানসন্ততিদের আধ্যাত্মিক শিক্ষা দান ও সঙ্গে সঙ্গে দৈহিক আরাম সাধন আমার মুখ্য উদ্দেশ্য। We do not want to sail under false colours—এই সত্যকে গোপন করিয়া অসত্যের আশ্রয় লইতে আমি চাই না।

আমি উত্তরে বলিলাম—কুষ্ঠরোগীদের সেবা যিনি করেন তিনি হিন্দু হ'ন, মুসলমান হ'ন, খৃষ্টান হ'ন—আমার শ্রদ্ধার পাত্র। কোনও ভদ্রব্যক্তি আপনাকে আপন পদ্ধতিতে আধ্যাত্মিক শিক্ষাদান কার্য্যে বাধা দিবেন না। যে ব্যক্তি আবর্জ্জনাস্তূপ হইতে দুর্গন্ধ ন্যাকড়া উঠাইয়া পরিষ্কার করত তাহাকে সুন্দর বস্ত্রখণ্ডে পরিণত করেন ও তাহার উপর মনোহর কারুকার্য্য করিতে সক্ষম হন তিনিই যথার্থ কলাবিৎ। ভারতবর্ষ চিরকাল ধর্ম্মবিষয়ে সহিষ্ণুতার পক্ষপাতী—আর আমি ত সে সময়ের কল্পনাই করিতে পারি না যখন কোনও বুদ্ধিমান ভারতবাসী এই কথা লইয়া বিরুদ্ধতা করিবে এবং বলিবে—আপনারা ইহাদিগকে খৃষ্টধর্ম্মবিষয়ক শিক্ষা কেন দিতেছেন?

মিষ্টার মিলার স্বীয় ধর্ম্মের প্রতি অগাধ শ্রদ্ধাসম্পন্ন—ইহা সর্ব্বথা স্বাভাবিক যে, তিনি এই ধর্ম্ম প্রচারের জন্য উৎসুক রহিবেন। আমরা—যাহারা এখন পর্য্যন্ত কুষ্ঠরোগীদের নিতান্ত উপেক্ষার দৃষ্টিতে দেখিয়া আসিতেছি—মিষ্টার মিলারের মত খাঁটি মিশনরীদের কার্য্যকলাপ লইয়া বিরুদ্ধতা করিবার অধিকারী আমরা নহি।
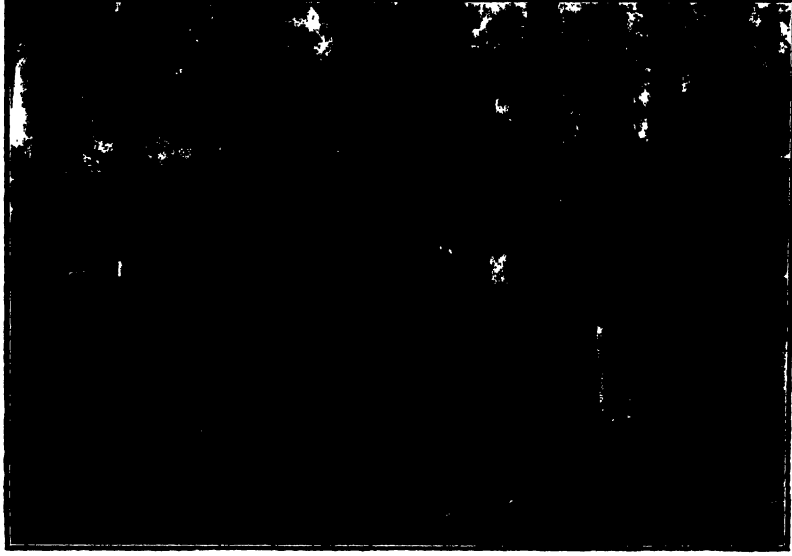
আশ্রমের অধিবাসীরা কূপ খনন করিতেছে

মিষ্টার মিলার স্বয়ং আমার সঙ্গে সঙ্গে থাকিয়া আমাকে আশ্রমের ভিন্ন ভিন্ন বিভাগ দেখাইলেন। প্রয়োগশালা অর্থাৎ হাসপাতাল দেখিলাম। স্ত্রী ও পুরুষের বাসস্থান পৃথক। নীরোগ শিশুদের স্বতন্ত্র রাখা হয়। যে-সকল শিশুর রোগ সম্বন্ধে সন্দেহ আছে তাহাদের পরীক্ষা করিয়া দেখিবার স্বতন্ত্র স্থান আছে। কুষ্ঠরোগীদের নীরোগ সন্তানদের জন্ত স্বতন্ত্র গ্রাম স্থাপন করা হইয়াছে—এখানে কুষ্ঠহীন অর্থাৎ কুষ্ঠলক্ষণ-বিমুক্তদের থাকিতে দেওয়া হয়। শিশুদের লেখাপড়া ও হাতের কাজ শিখাইবার জন্ত স্কুল আছে। মেয়েরা কাপড় বুনিতে ও অন্তান্ত গৃহকার্য্য শিখিতে থাকে। অনেকে কৃষিকার্য্য করে। কুষ্ঠরোগীদের সুস্থ সন্তানেরা নার্সের কাজ শিখিয়া আশ্রমেই সেবার কাজে আত্মনিয়োগ করে। অতি উত্তম ব্যবস্থা সহকারে সমস্ত আশ্রমটি পরিচালিত হয়। কোনও কুষ্ঠরোগী জুতা সেলাই করিয়া রোগীভাইদের সেবা করে। আশ্রমের কেন্দ্রস্থলে গির্জ্জাঘরটি অবস্থিত। সেখানে আশ্রমের অধিবাসীরা সমবেত হইয়া যীশুর ভজনা করে।

আশ্রম পরিচালকেরা আশ্রমবাসীদের হৃদয় হইতে ভিখারীপনার ভাব দূর করিতে যত্নবান, তাহাদের হৃদয়ে আত্মাভিমান জাগ্রত করিতে তাঁহারা চেষ্টা করেন। বস্তুতঃ মিশনের এই কার্য্য সর্ব্বাপেক্ষা অধিক মহত্ত্বপূর্ণ। দান করা খুব কঠিন নয়, কিন্তু যে দান দানপাত্রকে নীচে না নামাইয়া উপরে তুলিয়া লয়, উন্নত করে, সেইরূপ দান কঠিন।

পরিচালকেরা ব্যবস্থা করিয়াছেন আশ্রমের প্রত্যেক অধিবাসীকে সপ্তাহে সপ্তাহে চাউল ও কিছু পয়সা হিসাব করিয়া দেওয়া হইবে—ঐ পয়সার দ্বারা যাহার যাহা প্রয়োজন—ডাল, নুন, তেল ইত্যাদি ক্রয় করিবে। উহারা ঐ পয়সা কি ভাবে ব্যয় করিবে তাহার বজেট প্রস্তুত করিয়া লয়। যদি সম্পূর্ণ ধনসম্পত্তির অনুপাতে দানশীলতার হিসাব করা হয়, তাহা হইলে বলিতে হইবে এই আশ্রমবাসীদের অনেকে বড় বড় দানবীরদের অপেক্ষা অধিক দানী বলিয়া প্রতিপন্ন হইতে পারে। পূর্ব্ববৎসরের উৎসব-সময়ে ইহারা একত্র হইয়া ২৬২ টাকা দান করিয়াছিল। এই প্রসঙ্গে রেভারেণ্ড উফম্যান সম্বন্ধে এক ঘটনা আমার মনে জাগিতেছে। উফম্যান সাহেব একবার অসুস্থ হইয়া পড়িয়াছিলেন। আশ্রমের কুষ্ঠরোগীরা তখন যে সহৃদয়তা দেখাইয়াছিল কোনও লেখক তাহার বর্ণনা করিয়া লিখিয়াছেন—

"উকম্যানের পীড়া এত অধিক বৃদ্ধি পাইয়াছিল যে, পনর দিন পর্য্যন্ত তাঁহার জীবন সম্বন্ধে অত্যন্ত সংশয় ছিল। কখনও মনে হইতেছিল তিনি আর বাঁচিবেন না—আবার কখনও তাঁহার জীবন সম্বন্ধে আশার উদ্রেক হইতেছিল। প্রত্যহ প্রত্যেক কুষ্ঠরোগী তাঁহার স্বাস্থ্যের জন্য ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা করিত, কেহ কেহ খোঁড়াইতে খোঁড়াইতে উকম্যান সাহেবের ঘর পর্য্যন্ত আসিয়া কুশল জিজ্ঞাসা করিয়া যাইত। যেদিন তিনি সম্পূর্ণ সুস্থ হইয়া উঠিয়া নিজ পরিজনের

একজন কুষ্ঠরোগাক্রান্ত আগন্তুক

সহিত পথ্য খাইতে বসিয়াছিলেন সেদিন আশ্রমবাসীরা তাহাদের সংরক্ষকের মারফৎ তাঁহার নিকট এক পত্র পাঠাইয়াছিল—তিনি নষ্টস্বাস্থ্য ফিরিয়া পাইয়াছেন বলিয়া তাহারা আনন্দজ্ঞাপন করিয়াছিল। সংরক্ষক চিঠির সহিত কিছু কারেন্সী নোট তাঁহার হাতে দিয়া বলিলেন—'কুষ্ঠরোগীরা শ্রদ্ধাপূর্ব্বক এই টাকা আপনাকে দিয়াছে।' দেড়শত টাকার নোট ছিল—নিজেদের বরাদ্দ দু-আনা হইতে কাটিয়া কাটিয়া তাহারা এই টাকা বাঁচাইয়াছে। তাহারা লিখিয়াছিল—'আমাদের কাছে আর তো কিছু নাই—আমাদের এই ক্ষুদ্র অর্ঘ্য আপনার সেবার জন্য আমরা পাঠাইতেছি—আপনি সপ্রেমে ইহা গ্রহণ করুন এবং বায়ু পরিবর্ত্তন ও বিশ্রামের জন্য কোথাও গিয়া এই অর্থের সদগতি করুন।' ইহা শুনিয়া মিঃ উকম্যানের চক্ষু জলে ভরিয়া গেল। বহু বৎসর ধরিয়া যে শারীরিক ও মানসিক পরিশ্রম তিনি এই কুষ্ঠরোগীদের জন্য করিয়াছিলেন, যে আত্মিক কষ্ট তিনি সহিয়াছিলেন তাহার জন্য তিনি যেন মধুর পুরস্কার লাভ করিলেন। পাঁচ শত কুষ্ঠরোগীর এই সহৃদয়তাপূর্ণ দান তিনি মাথায় করিয়া স্বীকার করিলেন।"

দ্বিতীয় দিন মিঃ মিলার কহিলেন—"আজ আপনি স্বয়ং একলা আশ্রম পরিদর্শন করুন—আশ্রমবাসীদের নিকট যদি কিছু জিজ্ঞাসা করিবার থাকে জিজ্ঞাসা করুন।" কিন্তু ইহাতে বাধা ছিল। আমি বাংলা বুঝিতে পারি, কিন্তু বলিতে পারি না। অত্যন্ত লজ্জার সহিত এই কথা মিঃ মিলারের নিকট স্বীকার করিতে হইল। সাড়ে ছয় বৎসর বাংলা দেশে থাকা সত্ত্বেও সাধারণ কথাবার্ত্তা বলিবার মত বাংলা শিখি নাই—এই অপরাধের গুরুত্ব আমি তখনই বুঝিতে পারিলাম। আজ দোভাষীর কার্য্যের জন্য মিঃ মিলারকে সঙ্গে লইতে হইতেছে। আমি মিলার সাহেবের কাছে ইংরেজীতে প্রশ্ন করিতেছিলাম, তিনি বাংলাতে অনুবাদ করিয়া তাহা আশ্রমবাসীদের শুনাইতেছিলেন। ইহা অপেক্ষা অধিক লজ্জার কথা আমার পক্ষে আর কি হইতে পারে? মিলার সাহেব প্রথম দিন আমার দোভাষীর কাজ করিয়াছিলেন, এই জন্য দ্বিতীয় দিন আমি অপর কাহাকেও সঙ্গে লওয়া উচিত মনে করিলাম। শুনিয়াছিলাম মালাবারের এক কুষ্ঠী সজ্জন ভাল ইংরেজী জানেন, আমি সেই কারণে তাঁহার সন্ধান করিলাম। তিনি আমার সহিত যাইতে স্বীকৃত হইলেন; তাঁহার রোগ সম্প্রতি অত্যন্ত বাড়িয়াছিল। পথে চলিতে চলিতে আমি তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম, আপনি এখানে আসিলেন কি করিয়া? তিনি আপন দুঃখের কাহিনী আমাকে শুনাইলেন। তিনি বলিলেন, আমি মালাবারের এক শহরে সার্ভে-বিভাগে কাজ করিতাম; বেতন ৩৫৲—৪০৲ টাকা ছিল। একদিন আমার দেহে এক নূতন রোগের লক্ষণ দেখা গেল। আমি আপিসের হেড বাবুর নিকট কয়েক দিনের ছুটির প্রার্থনা জানাইলাম। উঁহার ধারণা হইয়াছিল, যে, আমি কোনও মামুলী ব্যারামে ভুগিতেছি। এই কারণে প্রথমে তিনি ছুটি দিতে অস্বীকার করিলেন। কিছুদিন পরে যখন নিশ্চিতভাবে প্রমাণ হইল যে, ইহা কুষ্ঠরোগের প্রাথমিক লক্ষণ, তখন ছুটি মিলিল। যখন এই সমাচার আমার মাতাপিতার নিকট পৌছিল, তাঁহারা অত্যন্ত দুঃখ প্রকাশ করিলেন, কিন্তু হৃদয়কে কঠিন করিয়া আমাকে ঘর হইতে বাহির করিয়া দিলেন, কারণ আমি বাড়িতে থাকিলে

আমার ভাইবোনের বিবাহে বাধা পড়িবে। আজ কয়েক বৎসর হইল আমি আমার মায়ের নিকট চিঠি পর্য্যন্ত দিই নাই, আপন ভাইভগ্নীর ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে সাবধান হইবার জন্যই ঘরের সহিত সকলপ্রকার সম্বন্ধ ছিন্ন করা উচিত, স্বয়ং ইহা বুঝিতে পারিয়াছি।"

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, আপনি কোথায় আছেন এবং কেমন আছেন এ খবরও কি আপনার মাতার নিকট পৌঁছে না? মালাবারী ভদ্রলোক উত্তর করিলেন, 'না, কোন সংবাদই তাঁরা জানেন না।' এই কথা বলিতে বলিতে তাঁহার চক্ষু অশ্রুসজল হইয়া উঠিল। তিনি কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া পুনরায় বলিতে লাগিলেন, এই রোগ প্রথম অবস্থায় হয়ত সারানো যাইতে পারে, কিন্তু প্রথমে যদি অযত্নে রোগ বাড়িয়া যায়, তাহা হইলে ইহা হইতে আরোগ্য লাভ করা প্রায় অসম্ভব। প্রথমে আয়ুর্ব্বেদীয় ঔষধের সাহায্যে আমার কিছু উপকারও হইয়াছিল, কিন্তু শেষে রোগ অত্যন্ত বাড়িয়া গেল এবং এখন আমার অবস্থা আপনি নিজেই দেখিতেছেন।"

মালাবারী ভদ্রলোকের আঙুল ও চোখের উপর রোগের প্রবল প্রভাব দৃষ্ট হইতেছিল। আমি সেই সময়ে কল্পনা করিতে লাগিলাম ইহাকে ছাড়িয়া ইহার মাতাপিতা ও ভাইভগ্নীর হয়ত দুঃখের অবধি নাই, ইহার জীবনও কি যন্ত্রণাপূর্ণ। এই মালাবারী দোভাষীকে কি বলিয়া সান্ত্বনা দিব বুঝিতে পারিলাম না, শেষে তাহাকে ইংরেজীতে বলিলাম, "You know there are a number of people who distrust others, who suffer from racial feeling, who hate people because their skin is brown, black or white. They suffer from leprosy of the soul, you are much better because you suffer from leprosy of skin only, isn't it?"—অর্থাৎ আপনি জানেন, এমন অনেক লোক আছে যাহারা অন্যকে অবিশ্বাস করে, যাহারা অন্যের প্রতি জাতিগত বিদ্বেষভাব পোষণ করে, যাহারা অন্যকে শুধু এই কারণে ঘৃণা করে যে তাহার শরীরের চামড়া তামাটে কালো কিংবা সাদা। তাহারা আত্মার কুষ্ঠরোগে আক্রান্ত, আপনি তাহাদের চাইতে অনেক ভাল, কারণ আপনি শুধু বাহিরের চামড়ার কুষ্ঠরোগে ভুগিতেছেন।—নয় কি?

আমার বন্ধু হঠাৎ যেন অবসাদগ্রস্ত হইয়া পড়িলেন, এইরূপ মনে হইল। অনেকক্ষণ ধরিয়া তিনি আমার

পূর্ব্বপৃষ্ঠার চিত্রে প্রদর্শিত আগন্তুককে পরিষ্কৃত ও বস্ত্র পরিবর্ত্তন করিয়া দিবার পর

সহিত ঘুরিতেছিলেন। ইংজেক্শন্ লইবার জন্য এই সময়ে বাহিরের পাঁচ-ছয় বৎসরের একটি শিশু তাহার অভিভাবকের সহিত উপস্থিত হইল। তাহার রোগ নিতান্ত প্রাথমিক অবস্থায় ছিল, শরীরের এক আধ স্থানে কাল চাকা চাকা দাগের মত দেখাইতেছিল। শিশু খুব কাঁদিতেছিল। আসলে ইংজেক্শন্ লইতে ততটা কষ্ট হয় না, কিন্তু ইংজেক্শনের সরঞ্জামের ভীষণতা দেখিয়া সে ভয় পাইয়াছিল। ইংরেজ নার্স অত্যন্ত স্নেহপূর্ণ স্বরে শিশুকে বাংলা ভাষায় বলিলেন, ভয় কি বাবা! কিছু হবে না। তাঁহার কথা শুনিয়া শিশু চুপ করিল। ইংজেক্শন্ লওয়া শেষ হইয়া গেলে, সে কাপড় পরিয়া অত্যন্ত আনন্দে নিজের অভিভাবকের সহিত চলিয়া গেল। ডাক্তার সাহেব প্রত্যেক রোগীর বৃত্তান্ত আলাদা শ্রবণ করিলেন। উঁহার কার্য্যের বহুর সম্বন্ধে

কুষ্ঠ ও যক্ষ্মা রোগাক্রান্ত রোগিণীদের ওয়ার্ড

ইহা শুনিলে অনুমান করা কঠিন হইবে না যে, সন ১৯৩০ সালে তিনি বিশ হাজারের অধিক ইংজেক্সন্ করিয়াছেন এবং ১৯৩১ সালে ইংজেক্সনের সংখ্যা ত্রিশ হাজারেরও অধিক হইয়াছিল। প্রত্যেক বুধবার আশ্রমের বাহির হইতে দুই শত আড়াই শত লোক ইংজেক্সন্ লইতে আসে। কখনও কখনও এমন হয় যে কোন কুষ্ঠ রোগী খোঁড়াইতে খোঁড়াইতে বিশ মাইল পায়ে হাঁটিয়া আশ্রমে আসিয়া উপস্থিত হয় এবং অতি দীন স্বরে প্রার্থনা করে আমাকে আশ্রমে ভর্ত্তি করিয়া নিন্। কিন্তু আশ্রমের পরিচালকগণ এই আবেদন অত্যন্ত দুঃখের সহিত অস্বীকার করিতে বাধ্য হন, কারণ উঁহারা এমন ধনী নহেন যে, সকল রোগীকে আশ্রমে ভর্ত্তি করিবার ব্যবস্থা করিতে পারেন। পাঠকেরা শুনিয়া বিস্মিত হইবেন, এই আশ্রমের পরিচালনা মুখ্যত বিদেশীদের অর্থেই হইয়া থাকে। গবর্ণমেণ্টও কিছু সাহায্য করেন, কিন্তু ভারত-বাসীদের দান এই কার্য্যে অতি সামান্য। ইহার কারণ এই হইতে পারে যে, এখন পর্য্যন্ত এই মহত্বপূর্ণ সেবাকার্য্যের সংবাদ এদেশের অনেকে রাখেন না। আশ্রমের পরিচালকগণ বিজ্ঞাপনী জগৎ হইতে দূরে অবস্থান করেন, ইহাও একটি কারণ। ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনায় বিশ্বাস রাখিয়া ইঁহারা সপ্রেম সেবাকার্য্যে নিযুক্ত থাকেন এবং তাঁহারই ভরসায় নিজেদের কাজ করিয়া যান। এই কার্য্য কিরূপ ভয়ঙ্কর তাহা ধারণা করা কঠিন. রোগীদের বীভৎস মূর্ত্তি দেখিয়া হৃদয় কাঁপিয়া উঠে। যদি সত্যকার ধার্ম্মিক ভক্তের জীবন্ত দৃষ্টান্ত দেখিতে ইচ্ছা হয়, তাহা হইলে এই মিশনরী সিষ্টারদিগকে গিয়া দেখিয়া আসিতে হয়। কোন কীর্ত্তি বা প্রশংসার আশা না রাখিয়া ইঁহারা নীরবে নিজের কাজ করিয়া যাইতেছেন, যীশুর মহান ধর্ম্ম সংসারকে ইঁহাদের দান করিয়াছে।

একটি চার পাঁচ মাসের শিশু একটা টুক্‌রীর ভিতর শায়িত অবস্থায় রৌদ্রে পড়িয়া ছিল। আমি মিঃ মিলারকে জিজ্ঞাসা করিলাম, এ শিশুটি কার? মিঃ মিলার কুষ্ঠরোগ-পীড়িতা মাতাকে ডাকিয়া দিলেন, সে অধোবদনে নীরবে দাঁড়াইয়া রহিল। মিঃ মিলার উঁহাকে বাংলাতে প্রশ্ন করিলেন, কয় মাসের? সে হাসিয়া ফেলিয়া বলিল, আমি জানি না। মিঃ মিলার হাসিয়া বলিলেন, তোমার ছেলে আর তুমি ওর বয়স জান না। আশ্রমবাসীরা সকলে মিঃ মিলারকে অত্যন্ত শ্রদ্ধার চক্ষে দেখিয়া থাকেন, মিঃ মিলারও তাঁহাদিগকে অত্যন্ত ভালবাসেন। এই ভালবাসায় কৃত্রিমতার লেশমাত্র নাই। ঘণ্টাখানেক

কুষ্ঠ রোগীদের দড়ি টানাটানি

মিঃ মিলারের সহিত আশ্রমে ঘুরিয়া বেড়াইলে বুঝিতে পারা যায় যে, আশ্রমবাসীদের যে-প্রেম তিনি লাভ করিয়াছেন, তাহা সত্যকার সহৃদয়তার পরিণাম।

আশ্রমের বায়ুমণ্ডল প্রসন্নতায় পরিপূর্ণ। নীচে রবার টায়ার লাগানো একটি বাক্সে বসিয়া ঘেঁসড়াইতে ঘেঁসড়াইতে এক বুড়ী পথ দিয়া যাইতেছিল, মিঃ মিলার তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, কোথায় যাচ্ছ বুড়ীমা? সে হাসিয়া জবাব দিল। দু জন স্ত্রীলোকের একটি করিয়া কৃত্রিম পা, কিন্তু তাহারা সাধারণ মানুষের মত চলাফেরা করিতেছিল। এক বুড়ী সাঁইত্রিশ বৎসর ধরিয়া আশ্রমে বাস করিতেছে। পরিচালকদের কার্য্যে সে খুবই সহায়তা করে। আশ্রমে ধর্ম্মবিষয়ে সম্পূর্ণ স্বাধীনতা আছে। প্রার্থনা বা ধর্ম্মশিক্ষার ক্লাসে যাওয়া না-যাওয়া আশ্রমবাসীদের ইচ্ছার উপর নির্ভর করে। দিগন্তবিস্তৃত মাঠ, মুক্ত আকাশ ও বৃক্ষশ্রেণী আর আশ্রমবাসীদের সমস্ত স্থানটিকে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখিবার ভরপুর চেষ্টা! সুন্দর লেপাপোছা ঘরের আঙিনায় ধানের মড়াই সজ্জিত। আশ্রমের সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট রেভাঃ ই বি শার্প বড় সহৃদয় সজ্জন। উঁহার তত্ত্বাবধানে সমস্ত কাজ অত্যন্ত সাবধানতার সহিত সম্পন্ন হয়। হাসপাতালের ডাক্তার রঘুনাথ রাও সযত্নে নিজের কাজে তৎপর আছেন। যাহারা গরিবের পয়সা তিলে তিলে শোষণ করিয়া মোটা হইতেছেন ডাক্তার রাওয়ের সহিত সেই সকল ডাক্তারের কত তফাৎ। ভারতকে যদি কিছু প্রতিষ্ঠা দিতে পারে, তবে নিঃসন্দেহ এই সকল আশ্রমই দিবে। বাঁধিবার ব্যাণ্ডেজ, পরিবার কাপড় আর পড়িবার সাত্ত্বিক সাহিত্য, ভোজনের অন্ন এবং ঔষধের জন্য পয়সা যিনি যাহা কিছু দিতে পারেন, তাঁহার তাহা দ্বারাই সাহায্য করা উচিত।* আশ্রমনিবাসী একজনের উপর সমস্ত বৎসরে ১০০৲ টাকা ব্যয় হয়, প্রত্যেক ছেলেমেয়ের জন্য ৭৫৲ টাকা। আমেরিকা ও বিলাতের প্রসিদ্ধ প্রসিদ্ধ দানশীল ব্যক্তিরা নিজেদের মাথায় এক একটি ছেলের ভরণপোষণের ভার লইয়া রাখিয়াছেন, তাঁহাদের প্রত্যেককে প্রতি মাসে সেই সব ছেলের সম্বন্ধে রিপোর্ট পাঠানো হইয়া থাকে।

ভারতবর্ষে কুষ্ঠগ্রস্তের সংখ্যা পাঁচ ছয় লক্ষের কম নয়। উহাদের অশেষ দুঃখের কল্পনা করুন। এই আশ্রম দেখিলে হৃদয়ে নানাপ্রকার ভাব আসে। 'বিশাল ভারত'-এর সুপরিচিত গল্পলেখক শ্রীজৈনেন্দ্রজী আর্টের পরিভাষা করিবার জন্য শান্তিনিকেতনে অবস্থানকালে আমাকে বলিয়াছিলেন, "আর্ট (কলা) তাহাই যাহা দুঃখিত তথা পীড়িত মানবসমাজকে হৃদয়ের সান্নিধ্যে আনয়ন করে।" এই কথা ষোল আনা সত্য। মূককে বাণী দান করিবার জন্য সত্যকার কলাবিদের মহত্ত্ব লুক্কায়িত আছে। আমার

* সাহায্য প্রেরণের ঠিকানা—এ-ডি মিলার, পুরুলিয়া, বি-এন-আর

তখন মনে হইল যদি সাধকের মত সমস্ত ভারতবর্ষের কুষ্ঠাশ্রমগুলিতে তীর্থযাত্রা করিয়া সেইগুলির বিষয়ে এক পুস্তক লিখিয়া নিজ খরচায় তাহা ছাপাইয়া এই আশ্রমের কর্তৃপক্ষকে অর্পণ করিতে পারিতাম! পুরুলিয়ার আশ্রম দেখিয়া আমার হৃদয়ে খৃষ্টধর্ম্মের প্রতি প্রভূত শ্রদ্ধার উদ্রেক হইল। যাঁহারা মনে করেন যে, পাশ্চাত্য দেশবাসীদের সত্যকার ধর্ম্ম ভাবনা নাই, তাঁহারা একবার এই আশ্রমটি দেখিয়া আসিলে তাঁহাদের ভ্রম দূর হইবে। বাঁকুড়ার কুষ্ঠাশ্রম দেখিয়া স্তর পি. সি. রায় বলিয়াছিলেন—

People often say that we of the East are a spiritual people, while the Westerners are wholly materialistic. But when I come to Bankura, I find that it is these materialistic Westerners who have built your college and other institutions for your benefit! I find it is they who have built the leper asylum, where they welcome and care for those who are our own flesh and blood, but whom whom we drive away, lest they come near us and defile us with their touch.

অর্থাৎ আমাদের অনেককে প্রায়ই বলিতে শোনা যায় যে, প্রাচ্যের লোকেরা আধ্যাত্মিক এবং পাশ্চাত্য দেশবাসীরা সম্পূর্ণ বস্তুতান্ত্রিক, কিন্তু আমি বাঁকুড়ায় আসিয়া দেখিলাম, যে, এই পাশ্চাত্য বস্তুতান্ত্রিক ব্যক্তিরাই আপনাদের মঙ্গলের জন্ম কলেজ ও অন্যান্য প্রতিষ্ঠান গড়িয়া তুলিয়াছেন। আমি দেখিতেছি তাঁহারাই এখানকার কুষ্ঠাশ্রম স্থাপন করিয়াছেন এবং সেখানে আমাদেরই রক্তমাংসের সম্পর্কিত জনকে সাগ্রহে আহ্বান করিয়া তাহাদের যত্ন লইতেছেন, কিন্তু আমরা তাহাদিগকে দূরে ঠেলিয়া রাখিয়াছি পাছে তাহারা আমাদের নিকটে আসিয়া তাহাদিগের স্পর্শের দ্বারা আমাদিগকে অপবিত্র করে।

মিঃ মিলারের সহিত আমার কয়েক ঘণ্টাব্যাপী কথাবার্ত্তা হয়। তিনি আমাকে কয়েকটি প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন। স্থানাভাববশতঃ সেই প্রশ্ন এবং তাহার উত্তর আমি এখানে উদ্ধৃত করিতে পারিলাম না। পরবর্ত্তী কোন সংখ্যায় এই মিশনের কার্য্যাবলীর বিস্তৃত বিবরণ এবং আমাদের প্রশ্নোত্তরগুলি বিশদভাবে লিখিবার ইচ্ছা রহিল। শুধু তাঁহার একটি কথা এখানে না লিখিয়া পারিতেছি না। তিনি বলিলেন,—

"It should not be treated merely as a health problem. Until, and unless we believe in our heart of hearts that leper deserves our love and service, we can not do much in this direction."

অর্থাৎ ইহাকে কেবল স্বাস্থ্য-সম্বন্ধীয় কার্য্য হিসাবে লইলে চলিবে না। যতক্ষণ পর্য্যন্ত আমরা অন্তরের সহিত বিশ্বাস করিতে পারি যে, কুষ্ঠরোগী আমাদের প্রেম ও সেবা পাইবার অধিকারী আমরা ততদিন পর্য্যন্ত কিছুই করিতে পারিব না।

মিশনরীদের দ্বারা পরিচালিত অনেক প্রতিষ্ঠান আমি দেখিয়াছি এবং অনেক মিশনরীদের সহিত মিশিবার অবকাশ আমি পাইয়াছি, কিন্তু এই আশ্রম দেখিয়া আমি যেরূপ আবিষ্ট হইয়াছি, ইতিপূর্ব্বে আর কখনও তেমন হই নাই। ধর্ম্ম পরিবর্ত্তন আমার মতে সম্পূর্ণ অনাবশ্যক এবং মিশনরীগণ নিজেদের সংখ্যাবৃদ্ধির জন্ম যে-সকল উপায় সাধারণতঃ অবলম্বন করিয়া থাকেন, তাহা নিতান্ত নিন্দনীয়, তথাপি সেবা-ভাবের দ্বারা অনুপ্রাণিত হইয়া যে-সকল কার্য্য করা হয়, তাহার প্রত্যেকটির প্রশংসা করিতে আমরা পারি। মহাত্মা গান্ধী বলিয়াছেন—

"The bloom of the rose does not require to be proclaimed to the world. Its very perfume is the witness of its own sweetness. So a Christian life that grows silently like the rose is the truest witness to Christ."

অর্থাৎ গোলাপ ফুল যখন প্রস্ফুটিত হয়, সংসারের নিকট উচ্চকণ্ঠে তাহা ঘোষণা করিবার প্রয়োজন নাই। সুগন্ধই উহার মাধুর্য্যের পর্য্যাপ্ত প্রমাণ। যে খৃষ্টধর্ম্মী জীবন গোলাপের মত নীরবে বিকশিত হয় তাহাই খৃষ্টের সৎ প্রভাবের সর্ব্বাপেক্ষা অধিক সত্য প্রমাণ।

আমি যখন মিঃ মিলারের নিকট তাঁহার এবং যে-সকল সিষ্টার ওখানে আশ্রমের সেবাকার্য্যে রত আছেন, তাঁহাদের ফটো চাহিলাম, তিনি বলিলেন, "আমার ফটো আপনি ছাপিয়া কি করিবেন? আর আমার কাছে এখন কোনও ফটো নাই। আর সিষ্টারদের ফটোর কথা? তাহারা ইহা পছন্দ করিবে না, উহারা বিজ্ঞাপন চাহে না, নীরবে কাজ করিতেই উহারা অভ্যস্ত।"

আমার বিশ্বাস প্রবাসীর কল্পনাশীল পাঠকেরা উঁহাদের চিত্র নিজেরা কল্পনা করিয়া লইবেন। ছয় হাজার মাইল দূর হইতে আগত দুই ইংরেজ ভগিনী দিবারাত্র আমাদের সমাজের এক অত্যন্ত দীনহীন, পীড়িত এবং পরিত্যক্ত অঙ্গের সেবায় নিরন্তর তনুমন সমর্পণ করিতেছেন—আর এমন একটি সেবা উপবন নির্ম্মাণ করিয়াছেন, যাহার সুগন্ধ সহৃদয় ভারতবাসীর নিকট আজ না পৌঁছিলেও কাল অবশ্য পৌঁছিবে।

বেলাশেষের দান

শ্রীলীলা নন্দী

হে রাজা আমার!
নির্ব্বাপিত দীপাবলি ঘন অন্ধকার
চারিধার ঘেরিয়াছে
তুমি তারি মাঝে
অকস্মাৎ কোথা হ'তে এলে!
ধূলিলগ্ন ছিন্ন মালা লুণ্ঠে অবহেলে
নিঃশেষ চন্দন-কণা বরণের থালে
কি পরাব অনিন্দিত ভালে?
হে বল্লভ!
বসন্তের চিকণ পল্লব
নিদারুণ গ্রীষ্মদিনে রহে যা হরিত
অবশেষে তাও হয় পীত
হেমন্তের বাণী
শিরায় শিরায় তার বিদায় রাগিণী দেয় আনি।
সেই কলস্বনে,
অশ্রুসনে,
তোমার বাঁশরীধ্বনি সকরুণ মোহ আনে মনে।

এই বিশ্বে সময়ের দান
অসাড়ে জাগায় সাড়া নিশ্চেতনে করে প্রাণবান।
অকালের অবদান
শুধু হায়, লুব্ধ করে বিক্ষোভিত প্রাণ,
শুধু পায়, শুধু দেয় ব্যথা
তাহার সর্ব্বাঙ্গ বেড়ি' বিক্ষুব্ধ ব্যর্থতা
বিরাজে অম্বর সম।
হায় মম,
রাজার দুলাল!
এতকাল
কোথা ছিলে!
হেমন্ত শেষের এই নিস্পন্দ নিখিলে
দক্ষিণা-দাক্ষিণ্যে আর কণামাত্র সাড়া নাহি মিলে!
আজ কিবা দিব আর কম করতলে
ক্রন্দন-করুণ এই ক্লান্ত আঁখিজলে,
অভিষিক্ত করি
দিনু মোর অভিশপ্ত দিবস শর্ব্বরী
আর
দিনু আনি
অন্তহীন হাহাকার
নিরাশ্বাস 'নাই' 'নাই' বাণী।

শ্রেষ্ঠ দান

নব্য জার্ম্মেনীর গল্প

কানাইলাল গাঙ্গুলী

[১]

মিউনিক্ শহর, ১৯২৩ সাল, নবেম্বর মাস, বরফ পড়তে আরম্ভ করেছে। সকাল তখন সাতটা, পাশের ঘর থেকে হের্ ডক্টর লেমান্, মিউনিক টেক্নিশে হোখ্‌শুলের একজন য়্যাসিষ্ট্যাণ্ট চেঁচিয়ে বলে উঠল, "হের্ রায় উঠুন, উঠুন! আজ নূতন জার্ম্মেনী আপনাকে অভিবাদন করছে!" রায়ের তখনও ভাল ক'রে ঘুম ভাঙে নি। বরফ পড়তে আরম্ভ ক'রে দিয়েছে, এখন কি কোন ভদ্দরলোকে ৯টার আগে বিছানা ছাড়ে? কিন্তু লেমানের চীৎকার শুনে রায় বুঝলে অদ্ভুত কিছু একটা হয়েছে। না হ'লে লেমানের এত উত্তেজনা! আজ প্রায় দুই বৎসর তারা পাশাপাশি ঘরে রয়েছে, কখনও তাকে জোরে কথা বলতে শোনেনি। রায় তার বক্তব্যটা কিন্তু ঠিক বুঝতে পারে নি, তাই তার ঘরের দিকে পাশ ফিরে জিজ্ঞাসা করলে "কি হ'ল হের্ ডক্টর?" লেমান্ বললে, "উঠুন, উঠুন! কাল রাত্রে সব ওলটপালট হ'য়ে গেছে। এখন জার্ম্মেনীর ডিক্টেটর হিট্‌লার, প্রধান সেনাপতি লুডেন্‌ডর্ফ! এক সপ্তাহের মধ্যে আমরা আঁতাতের বিরুদ্ধে লড়াই করতে চলেছি!" রায় অবাক! কী বলে এ? সেই কোমল প্রকাণ্ড লেপের আরামপ্রদ গরম আশ্রয়, শীতকালে যা থেকে লেক্‌চারের পনের মিনিট আগে পর্য্যন্ত রায় কখনও বা'র হয় নি, তা থেকে এখন নিমেষে বার হ'য়ে লাফ দিয়ে মেঝেয় পড়ে ড্রেসিং গাউনটা তাড়াতাড়ি গায়ে জড়িয়ে আর মোটা স্লিপার্সের মধ্যে পা দুটো ঢুকিয়ে বাইরে এসে জিজ্ঞাসা করলে, "কী বলছেন এ সব? এও কি সম্ভব?" "পড়ে দেখুন" বলে লেমান্ তার হাতে সেদিনকার "মুনশেনারনয়েষ্টে" নামক দৈনিক পত্রটা দিলে। তার প্রথম পাতাতেই প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড হরফে লেখা, "হিট্‌লার ডিক্টেটর! লুডেন্‌ডর্ফ প্রধান সেনাপতি! বুর্গের ব্রয় বিয়ার হল সভায় জার্ম্মেনীর ভাগ্য-পরিবর্ত্তন।" ইত্যাদি।

একনিশ্বাসে রায় সমস্ত খবরটা পড়ে গেল। কাল রাত্রে বুর্গের ব্রয় হলে এক প্রকাণ্ড সভা হয়েছিল। সেখানে প্রায় হাজার দশেক লোক জড় হয়েছিল। হলের বাইরে বহু হিটলারী ঝটিকা বাহিনী মোতায়েন ছিল। ব্যাভেরিয়ার ডিক্টেটর হের্ ফন্ কার এবং সেনাপতি ল্যসফ এবং ব্যাভেরিয়ার মন্ত্রিগণ সকলে সেখানে উপস্থিত ছিলেন। লুডেন্‌ডর্ফ আসবার আগেই হিট্‌লার কার ও ল্যসফকে পাশের ঘরে ডেকে নিয়ে গিয়ে এক রিভলভার বার ক'রে বলেন, "এই রিভলভারে তিনটে টোটা আছে। একটি হের্ ফন্ কার আপনার জন্যে, অপরটি জেনারেল ল্যসফ আপনার জন্যে, আর তৃতীয়টি আমার জন্যে। যদি আপনারা আমার প্রস্তাবে রাজি হন ভাল, না হ'লে প্রত্যেকের মাথায় এর এক একটি প্রবেশ করবে। আমার প্রস্তাব, আপনারা আমাকে এই সভায় জার্ম্মেনীর ডিক্টেটর ব'লে ঘোষণা করুন আর জেনারাল লুডেন্‌ডর্ফকে জার্ম্মেনীর প্রধান সেনাপতি বলে ঘোষণা করুন। আমি ও হের্ ফন্ কার আপনাকে আমার প্রধান মন্ত্রী বলে এবং হের্ জেনারাল আপনাকে জেনারাল লুডেন্‌ডর্ফের চীফ অব দি ষ্টাফ ব'লে ঘোষণা করবো। এতে যদি আপনারা রাজি হন উত্তম। এই খানেই আমরা জার্ম্মেনীর কেন্দ্রশাসন গঠন ক'রে বার্লিনের দিকে অভিযান করবো। বার্লিন দখল ক'রে যত শীঘ্র সম্ভব জার্ম্মেনীকে সঙ্ঘবদ্ধ ক'রে আঁতাতের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবো—ভের্সাই-এর সন্ধি আমরা মানবো না।"

কার ও ল্যসফ ভাববার একটু সময় চেয়ে অল্পক্ষণের জন্যে আড়ালে একটু পরামর্শ ক'রে হিট্‌লারের প্রস্তাবে রাজি হয়েছেন। কাল রাত্রের ঐ সভায় মহা উৎসাহের মধ্যে জার্ম্মেনীর নূতন গভর্ণমেণ্ট ঘোষিত হয়েছে। হিট্‌লার বাহিনী ও বিপুল জনতা নূতন জার্ম্মেনীর এবং হাইল্ হিট্‌লার এই জয়ধ্বনিতে আকাশ-বাতাস বিদীর্ণ করেছে।

মন্ত্রী সভার দুএকজন সভ্য সম্মত না হওয়ায় তাদের গ্রেপ্তার করা হয়েছে।

হের ডক্টর লেমান্ ততক্ষণে তার হিট্‌লারি ইউনিফর্ম্ম পরে কাঁধে কিট্‌ব্যাগটা নিয়েছে। রায় তো এসব কাণ্ড দেখে অবাক! জিজ্ঞাসা করলে, "চললেন কোথায়?"

"আমার ঝটিকা বাহিনীতে যোগ দিতে! আজই আমরা বার্লিনে মার্চ করতে আরম্ভ করবো।" "হোখশুলেতে যাবেন না?" "সেখানে গিয়ে একবার দেখুন কী মজা হ'চ্ছে!" ঘরের কোন থেকে এক রাইফেল বার ক'রে সেটা কাঁধে চড়িয়ে লেমান প্রস্থান করলে।

রাস্তায় এসে রায় দেখে, সরকারী ফৌজ সার দিয়ে মার্চ ক'রে চলেছে, মশ্, মশ্; মশ্, মশ্। প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড আর্মার্ডকার ভীষণ শব্দ করতে করতে রাস্তার দু-ধারের বাড়িঘর কাঁপিয়ে মিইনিকের প্রধান রাস্তা লুডহুইগ্ ষ্ট্রাশের দিকে ছুটেছে। শোলিঙ্গ ষ্ট্রাশেতে এসে দেখে পুলিশ সমস্ত রাস্তার মোড় কাঁটা তার দিয়ে ঘিরছে। রায় অবাক. এসব কি? হিট্‌লারের প্রস্তাবতো গবর্ণমেণ্ট মেনেই নিলে, তাহ'লে এ সব সরঞ্জাম কার বিরুদ্ধে? কমিউনিষ্টদের বিরুদ্ধে? হবেও বা! হিট্‌লার সর্ব্বেসর্ব্বা হবে সেটা তারা অত সহজে মেনে নেবে না বটে। হোগ্‌শুলেতে ঢুকে রায় অতিশয় বিস্মিত হ'ল। কোথাও কেউ কাজকর্ম্ম বা পড়শুনা করছে না। প্রত্যেক ক্লাস বা ল্যাবরেটরীতে দুই জন করে ছাত্র সৈন্য সংগ্রহে ব্যস্ত আর অন্য ছাত্রেরা নিজেদের নাম লেখাতে ব্যস্ত। রায় তার ল্যাবরেটরীতে ঢুকতেই তার সহপাঠী একজন এসে জিজ্ঞাসা করলে, "হের রায়, তুমি আমাদের ফৌজে যোগ দেবে?" রায় বললে, "দাঁড়াও, আগে ব্যাপারটা সব ভাল ক'রে বুঝি!"

কিছু পরে আবার রাস্তায় এসে রায় দেখে তখনও সরকারী সৈন্য মার্চ করছে—মশ্, মশ্; মশ্, মশ্। রাস্তায় দু-ধারের ফুটপাথে সহস্র সহস্র উৎসুক নরনারী সমবেত হয়েছে। লুডহুইগ্ ষ্ট্রাশেতে এসে দেখে সেখানে জনতা নেই, কিন্তু সমস্ত সৈন্যসমাবেশ ব্যাভেরিয়ার ওয়ার মিনিষ্ট্রির সামনে করা হয়েছে। ওটা যে দখল করবে সে-ই ব্যাভেরিয়ার মালিক হবে বটে, কারণ ঐ স্থান হ'তে সমস্ত প্রদেশের সৈন্যবাহিনী পরিচালনা করা হয়। কিন্তু কার আক্রমণ থেকে ওটাকে ওরা রক্ষা করতে চায়? হঠাৎ রায়ের নজরে পড়লো ওডেয়ন প্লাট্‌সের এক কোণ দিয়ে হিট্‌লার ও লুডেনডর্ফ স্বয়ং বার হ'লেন এবং তাঁদের পেছনে প্রকাণ্ড এক তরুণের বাহিনী। তাদের পরিধানে হিট্‌লারী ইউনিফর্ম, কাঁধে সঙ্গীন-চড়ান রাইফেল। তারা ক্রমশঃ উত্তর দিকে অগ্রসর হ'তে আরম্ভ করলে। অফুরন্ত তরুণের সংখ্যা। সামনে সরকারী সৈন্য পথ রোধ ক'রে দাঁড়িয়ে আছে দেখে একটু থামলে, এবং কুচকাওয়াজ ক'রে ওডেয়ন্ প্লাট্‌স্ ছেয়ে ফেললে। আরও কয়েকটি প্রকাণ্ড বাহিনী ওডেয়নের পেছনে মোতায়েন রইল। হিট্‌লার লুডেনডর্ফ প্রভৃতি নেতৃবৃন্দ যথাবিহিত স্থান বেছে নিয়ে নির্দ্দেশ দিতে থাকলেন।

হঠাৎ সব নিস্তব্ধ হ'য়ে গেল। সেই ভীষণ নিস্তব্ধতা যার প্রত্যেক ক্ষণ প্রলয়ের পূর্ব্ব মুহূর্ত্ত ব'লে মনে হয়। তার পরই কড় কড় কড় কড় আওয়াজ আর গুলির বৃষ্টি! নিমেষে কয়েক জন মাটিতে লুটাল। উভয় তরফ থেকে সমানে বন্দুক ছুটলো। প্রথমটা মনে হ'ল ঐ কয়েক শত সরকারী ফৌজকে সহস্র সহস্র হিট্‌লার-বাহিনী ফুৎকারে উড়িয়ে দেবে। কিন্তু অল্পক্ষণ পরেই যখন সরকারী আর্মার্ড কার হিট্‌লার বাহিনীর উপর অনর্গল অগ্নিবৃষ্টি আরম্ভ করলে—তখনই বোঝা গেল এ যন্ত্র-দৈত্যের কাছে সুকুমার তরুণরা বেশীক্ষণ দাঁড়াতে পারবে না। কয়েক মিনিটের মধ্যেই ওডেয়ন হলে হিট্‌লার উঠে শ্বেত পতাকা দেখালেন। উভয় তরফের ধ্বংস-লীলা থামলো। সরকারী ফৌজের তখন কাজ হ'ল—হিট্‌লারী তরুণদের অস্ত্র কেড়ে নিয়ে ছেড়ে দেওয়া।—তার পরই সারি সারি য়্যাম্বুলেন্স কার মোটর-গাড়ী ইত্যাদি এসে হতাহতদের তুলে নিয়ে সোয়াবিঙ্গের হাসপাতালের দিকে ছুট দিল।

এতক্ষণ রায় সমস্ত ব্যাপারটা বিবিধ মনোভাব নিয়ে দেখছিল। যখন আহতদের গাড়ী তার পাশ দিয়েই যেতে আরম্ভ করলে, তখন তার মনটা ব্যথায় ভরে গেল—আহা, কেন এ রক্ত-পাত? হঠাৎ তার নজরে পড়লো একটা

গাড়ীতে লেমান্! নিশ্চয়ই গুরুতর রকম আহত, কারণ তার সর্ব্বাঙ্গে রক্ত! তীরের মত সে গাড়ী অদৃশ্য হ'য়ে গেল। কী সর্ব্বনাশ! রায় ছুটে গিয়ে এক ট্যাক্সির সন্ধান করলে। অনেক ট্যাক্সি সেখানে রয়েছে, হয়ত শহরের সব ট্যাক্সি সেখানে জড় হ'য়েছে, কিন্তু একটাও পাওয়া শক্ত, কারণ প্রত্যেকেই আহতদের নিতে ব্যস্ত। সহস্র সহস্র নরনারী ইতিমধ্যেই সেখানে সমবেত হয়েছে। অনেকে আহতদের সেবায় ব্যস্ত, আর অধিকাংশ মাঝে মাঝে চীৎকার করছে, "কার ল্যসফ নিপাত যাউক, হিট্‌লারের জয় হউক!" দেখতে দেখতে সমস্ত লুড্‌ভুইগ্‌ ষ্ট্রাশে এক বিশাল জনতায় ভরে গেল। আর গগন-ভেদী চীৎকার, "কার ল্যসফ নিপাত যাউক, হিটলারের জয় হউক।" যেখানে জনতার উত্তেজনা একটু বাড়াবাড়ি রকমের হয়, অমনি একদল ফৌজ তেড়ে গিয়ে বন্দুক উঁচিয়ে দাঁড়ায়, নয় একটা আর্ম্মার্ড কার ফাঁকা আওয়াজ করতে করতে তার সামনে যায় আর সকলে ঊর্দ্ধশ্বাসে পলায়ন করে। রায়ের কিন্তু এসব দাঁড়িয়ে দেখবার সময় আর নেই—তার প্রতিবেশী আহত হয়ত বা নিহত, তাকে তখনই যে রকম ক'রে হ'ক হাসপাতালে গিয়ে সন্ধান নিতেই হবে। অতিকষ্টে এক ট্যাক্সি জুটলো। তাতে ক'রে তীর বেগে ছুটে এসে রায় সেই সোয়াবিঙের প্রকাণ্ড হাসপাতালের উঠানে ঢুকলো।

হাসপাতালের উঠানে ট্যাক্সি, প্রাইভেট গাড়ী আর য়্যাম্বুলেন্স গাড়ীতে ভর্ত্তি। কিন্তু দৈবাৎ এতবড় হাঙ্গামা হ'লেও এ জাতের বিশৃঙ্খলা আসে না, এরা যেন বিপ্লবটাও ডিসিপ্লিণ্ড হ'য়ে করে। একটা বিশেষ অনুসন্ধান আফিস ইতিমধ্যেই তৈরি হয়েছে। সেখানে আহত আত্মীয়স্বজনের সন্ধান নিতে সার বেঁধে নর-নারী দাঁড়িয়ে গেছে। রায় সেই সারের পেছনে দাঁড়িয়ে গেল। অল্প সময়ের মধ্যেই সন্ধান পেল কোন্ ঘরে লেমান্‌কে রাখা হয়েছে, সে কত নম্বরের রুগী ইত্যাদি। লেমান্ তখনও মরেনি—তবে সে গুরুতর রকম আহত। সেই ঘরে তাড়াতাড়ি গিয়ে দেখে একজন চিকিৎসক এবং তাঁর দুই সহকারী লেমান্‌কে ব্যাণ্ডেজ করতে ব্যস্ত। আঘাত সাংঘাতিক, তবে হৃৎযন্ত্র, ফুসফুস বা পাকস্থলী এই রকম কোন অতি প্রয়োজনীয় শারীরিক যন্ত্রে গুলি প্রবেশ করে নি। শুধু একটা কান, নাকটা আর চিবুকের নিম্নভাগ উড়ে গেছে, আর এক সার মেশিন্‌গানের গুলি তার দুই কাঁধের হাড়, আর বাহুর অগ্রভাগের গ্রন্থি ভেঙে চুরমার ক'রে দিয়েছে। গলাটা অদ্ভুত ভাবে বেঁচে গেছে—না হ'লে নাকি তৎক্ষণাৎ মৃত্যু হ'ত। মেশিন্‌গানের মুখটা সিকি ইঞ্চি উঁচুতে, নয় সিকি ইঞ্চি নিচুতে থাকলে নাকি তার মাথাটা যেত গুঁড়ো হ'য়ে নয় ফুসফুসটা যেত ঝাঁঝরা হ'য়ে। খুব বেঁচে গেছে—এতে শুধু কাঁধের হাড়টা গেছে ভেঙে। জার্ম্মান সামরিক অভিধানে নাকি এটা তত সাংঘাতিক জখম নয়। বাঁচবার সম্ভাবনা নাকি এখনও ভাল আছে, যদি অন্তর-রক্ত-স্খালন না হয়। তবে বাঁচলে হাত থাকবে না, নাক থাকবে না, একটা কানও থাকবে না—চিবুকটা জোড়া লাগলেও লাগতে পারে! কিন্তু তবু সেটা বিকৃত অবশ্যই হবে।

লেমান্ তখনও সংজ্ঞাশূন্য। রায় একটা চেয়ারে বসে অপেক্ষা করলে। ডাক্তাররা তার সংজ্ঞা ফিরিয়ে এনে চলে গেল। চোখ পাশে ফিরিয়ে লেমান্ রায়কে দেখলে। রায় উঠে তার কাছে এসে জিজ্ঞাসা করলে, "কেমন বোধ করছেন?" লেমান্ বাক্-শক্তিরহিত—তার চক্ষু দিয়ে অশ্রু নির্গত হ'ল। রায় রুমাল বার ক'রে তার অশ্রু মুছিয়ে দিয়ে বললে, "কোন ভয় নেই, শীঘ্রই ভাল হ'য়ে উঠবেন।" অল্প মাথা নেড়ে লেমান্ বোঝালে, "না"। রায় আশ্বাস দিলে, "ডাক্তার বলেছে কোন ভয় নেই। আপনি সত্বর সেরে উঠবেন।" লেমানের মুখে যেন একটু অবিশ্বাসের হাসি ফুটে উঠলো। রায় বললে, "আপনার পিতাকে কিন্তু এখুনি তার করতে হবে! শুনেছি তিনি ডুসেল্‌ডর্ফের বিখ্যাত ইঞ্জিনিয়ার গেহাইমরাট্ লেমান্, তাঁকে আসতে বলি?" রায় আশা করেছিল লেমান একথায় নিশ্চয়ই একটু উৎফুল্ল হবে। কিন্তু ফল হ'ল ঠিক উল্টা। এক ব্যথাভরা দৃষ্টি রায়ের ওপর ফেলে লেমান্ চোখ্ দুটো বুজলে। মুখের যেটুকু অংশ বেরিয়ে আছে তারই পরিবর্ত্তন দেখে মনে হ'ল তার প্রাণে এক দারুণ আঘাত লেগেছে! রায় বিস্মিত
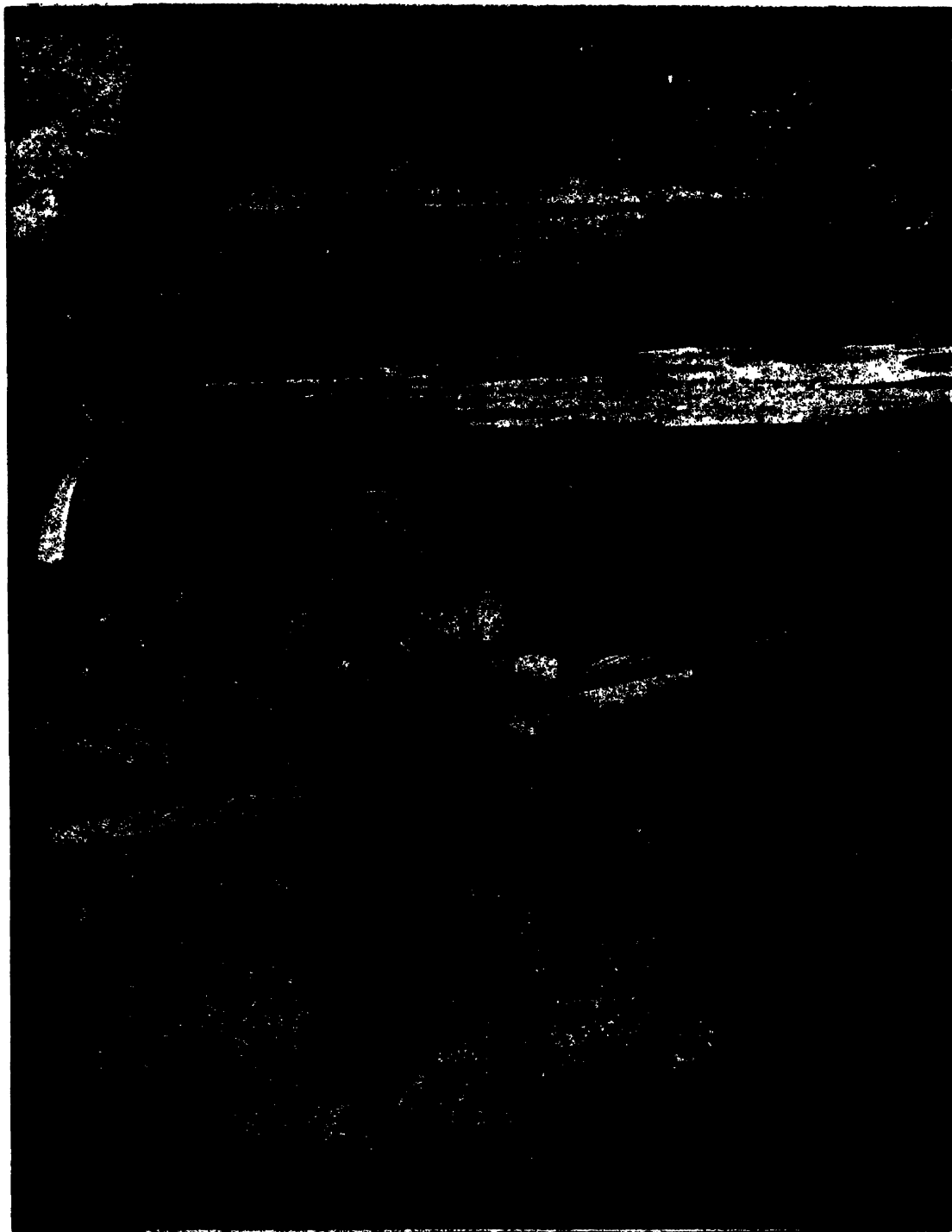
গন্ধর্ব্ব দম্পতী

শ্রীমণীন্দ্রভূষণ গুপ্ত

প্রবাসী প্রেস, কলিকাতা

হ'ল। এর কি অর্থ? লেমান্ আর চোখ খুললে না। রায় কিছুক্ষণ আরও দাঁড়িয়ে থেকে, ভেবেই পেলে না, আর সে কী করতে পারে? সে বরাবর শুনে এসেছে লেমানের পিতা একজন প্রসিদ্ধ ইঞ্জিনিয়ার। লেমানের মা নেই, বা ভাই বোন,অন্য আত্মীয়-স্বজন কেউ নেই। এক তার পিতা বর্ত্তমান। তাঁর উল্লেখ তার কাছে এত অপ্রিয়?

লেমানের মাথায় গায়ে একটু হাত বুলিয়ে দিয়ে, তাকে দুটো আশার কথা বলে—রায় চ'লে এল। রাস্তায় তখনও সেই বিশাল জনতা—আর তার উন্মত্ত চীৎকার, "কাবু, ল্যসফ্ নিপাত যাউক, হিট্লারের জয় হউক।" সমস্ত শহরে এই ব্যাপার ছড়িয়ে পড়েছে—আর সর্ব্বত্র সেই সরকারী সেনাবাহিনীর অভিযান—মশ্, মশ্; মশ্, মশ্। শহরে সামরিক আইন জারি হ'য়েছে। সন্ধ্যার পর কারও বাড়ির বার হবার হুকুম নেই। তাহ'লেই জীবন বিপন্ন।

২

আত্মীয়-স্বজনের রুগীর সঙ্গে দেখা করার সময় চারিটা হ'তে সাতটা। পরদিন প্রায় সাড়ে চারিটায় লেমানের ঘরে ঢুকে রায় দেখে, এক বর্ষীয়সী লেমানের মাথায় হাত বুলিয়ে দিচ্ছেন, আর এক তরুণী তার হাতটা আপন হাতের মধ্যে নিয়ে এক দৃষ্টিতে লেমানের দিকে চেয়ে রয়েছে। লেমানের মুখ অতিশয় পাণ্ডুর, তার দুই চক্ষু মুদ্রিত, কিন্তু মুখের ভাবে বোঝা যায় তার অন্তর প্রফুল্ল। রায় অতি সন্তর্পণে ঘরে ঢুকেছিল, তার আগমন কেউ টের পায় নি। কাজেই কেউ তার দিকে তাকালেও না। উভয় নারীর মুখে সুশিক্ষার ছাপ স্পষ্ট, কিন্তু কারও বেশ সোসাইটি মহিলার মত নয়। তরুণী যে বর্ষীয়সীর কন্যা তা পরিষ্কার বোঝা যায়। তার মাথার চুল বব্ করা বটে, কিন্তু পরিধানে সাদাসিধে নীল সার্জের ফ্রক্ ও হাতাওয়ালা কোট, পায়ে গোড়ালীহীন জুতা। মুখে বা কোথাও পমেড, লিপষ্টিক্ রুজ, পাউডার ইত্যাদির ব্যবহারের চিহ্নও নেই, বা গলায় মেকি মুক্তার মালা ঝুলছে না অথবা কানে লম্বা লম্বা দুলও দুলছে না। অথচ তার পরিচ্ছদ অতি পরিপাটী। তার বিশেষত্ব—তার মুখের আশ্চর্য্য দৃঢ়তা—দূর থেকেও তা অনুভব করা যায়। বর্ষীয়সীর বেশ বয়স্কা সাধারণ রমণীর মত। তিনি অতি স্নেহ-ভরে লেমানের মাথায় হাত বুলিয়ে দিচ্ছেন, আর অনেক কিছু বলছেন। তার দু-একটা কথায় লেমানের মুখে যেন হাসি ফুটে উঠছে—তরুণীও হাসছে। তখন তিনি তরুণীর দিকে মুখ ফিরিয়ে বলছেন, "ইয়া সিধার।" [হ্যাঁ নিশ্চয়!] তরুণী উত্তর করছে, "আবের নাট্যুর্লিশ!" [তাতো বটেই]। অপলক নেত্রে রায় এই মর্ম্মভেদী দৃশ্য কিছুক্ষণ দেখে চলে আসবার জন্যে পিছন ফিরলে। তাদের বিরক্ত করতে আর তার ইচ্ছা হ'ল না—যদিও তার ঔৎসুক্য প্রবল জানতে, এরা কে? রায় জানতো লেমান্ প্রায়ই সোয়াবিঙের দিকে আসতো—এমন কি সময় সময় রাত কাটিয়েও যেত। রায়ের চকিতে সন্দেহ হ'ল হয়ত এঁদের কাছেই আসতো—এবং ঐ তরুণী হ'চ্ছেন লেমানের—! সে যাই হউক, রায়ের আর সেখানে থাকা চলে না।

দরজার চৌকাঠ পার হবে এমন সময়ে পূর্ব্বদিনের সেই ডাক্তার আর দুই সহকারী তার সামনে এল। ডাক্তার তাকে ইঙ্গিত করলে সঙ্গে আসতে। অগত্যা রায়কে ফিরতে হ'ল। লেমানের কাছে এসে তাকে একটু পরীক্ষা করে ডাক্তার তাকে ও দুই নারীকে পাশে ডেকে নিয়ে গিয়ে বললে, "অবস্থা ভাল নয়!" বর্ষীয়সী চমকে উঠলো। ডাক্তার আশ্বাস দিয়ে বললে, "এখনও ওকে বাঁচান যায়, যদি ওর কোন নিকট আত্মীয়ের রক্ত ওকে খানিকটা দেওয়া যেত!"

বর্ষীয়সী উত্তেজিত স্বরে বললেন, তাই করুন! আমি ওর গর্ভধারিণী, আমার রক্ত ওকে দিন!" ডাক্তার বললে, "তাও হয়, কিন্তু তরুণের রক্ত হলে ভাল হ'ত! সহোদর ভাই কিম্বা সহোদরা ভগ্নীর!" তরুণী এ সমস্যার সমাধান ক'রে বললে, "আমি ওর সহোদরা ভগ্নী, আমার রক্ত দিন!" ডাক্তার সন্তুষ্ট হয়ে বললে, "এখুনি কিন্তু দিতে হবে!" তরুণী বললে, "উত্তম!"

তরুণীর হাত থেকে লেমানের হাতে রক্ত চালনা করা

হল। সে স্থির হয়ে বসে রইল। যেন কিছুই হয়নি। রক্ত দেওয়া শেষ হ'লে তার হাতে একটা ব্যাণ্ডেজ বেঁধে একটা গ্লাসে ক'রে কি একটা পানীয় তাকে দেওয়া হ'ল। সেটা পান করা শেষ হলে ডাক্তার বললে, আপনি এখন পাশের ঘরের বিছানায় একটু বিশ্রাম করুন। তরুণী বললে, "ধন্যবাদ, তার কোন প্রয়োজন নেই।" ডাক্তার একটু বিস্মিত হ'ল।

পরদিন ঠিক সেই সময়ে হাসপাতালে এসে রায় দেখে, লেমান্ শেষ নিশ্বাস টানতে আরম্ভ করছে। তার জননী তার শিয়রে অবিশ্রান্ত অশ্রুবর্ষণ করছে আর মাঝে মাঝে তার মস্তকে গণ্ডে চুম্বন দিচ্ছে, আর তার সহোদরা তার দিকে স্থির দৃষ্টিতে চেয়ে রয়েছে—দুই চক্ষু অশ্রুভরা। মাঝে মাঝে সহোদরের হাতে বিদায়-চুম্বন দিচ্ছে। রায় কাছে এল। লেমান তখন দৃষ্টিশক্তি হারিয়েছে। শেষ দেখা আর হ'ল না। সহোদরার রক্ত তার জীবনের মোয়াদ একটি দিন মাত্র বাড়িয়েছিল, তারপর সব শেষ হয়ে গেল।

কয়েক সপ্তাহ পরে এক রবিবার সকালে প্রাতঃভোজন শেষ ক'রে রায় অন্যমনস্ক হ'য়ে লেমানের শোচনীয় মৃত্যু আর তার জীবনরহস্যের কথা ভাবছে, এমন সময়ে সে বুঝতে পারলে বাড়িতে একজন আগন্তুক এল। কিছুক্ষণ পরেই লেমানের ঘর থেকে জিনিষপত্র গোছানোর শব্দ এল। রায়ের প্রবল ঔৎসুক্য হ'ল জানতে—কে এল? সম্ভবতঃ সেই তরুণী—লেমানের জিনিষপত্র নিয়ে যেতে এসেছে! কিছুক্ষণ পরেই তার দরজায় কে টোকা মারলে। রায় বললে, "হেরাইন [ভেতরে আসুন]।" দরজা খুলে গেল! দরজার ঠিক সামনে সেই তরুণী—হাতে এক কাল ব্যাজ বাঁধা—তার পিছনে গৃহকর্ত্রী। রায় তাড়াতাড়ি উঠে দাঁড়ালে—তরুণী গৃহকর্ত্রীর দিকে একবার ফিরে বললে, "বহু ধন্যবাদ!" এবং তার পরই ঘরে ঢুকে দরজা বন্ধ করলে। রায় অবাক—এ কি? অপরিচিত যুবকের ঘরে এমন অসঙ্কোচে ঢোকা? সে বিস্মিত হ'য়ে তার দিকে শুধু চেয়ে রইল, কী করবে বুঝতে পারলে না। তরুণী বললে,—"প্রাতঃপ্রণাম হের্ রায়?" রায় কথা খুঁজে পেল, "প্রাতঃপ্রণাম, মিস্ লেমান্!" অগ্রসর হ'য়ে তরুণী বললে, "আমি লেমান্ নই,—হাইম! আমার নাম হিল্ডা হাইম।" রায় আরও অপ্রস্তুত, "ও, মাপ করবেন—।"

"ব্যস্ত হবেন না, আমি জানি দাদা আপনাকে আমাদের কথা কখনও বলেননি!" "আজ্ঞে না—তা শুনিনি বটে—তা, দয়া করে কি বসবেন?" রায় একটা চেয়ার এগিয়ে দিল। তরুণী জবাবে বললে, "ধন্যবাদ, এখন আর বসবো না। দাদা আমাদের কাছে আপনার কথা অনেক বলতেন। আমার মার বড় ইচ্ছা আপনাকে একটু দেখেন। অন্য কোন কাজ না থাকলে আজ বৈকালে আমাদের বাসায় চা পান করতে যাবেন কি?" "আনন্দের সহিত! আপনাদের ঠিকানা?" তরুণী তখন তার ছোট হাতব্যাগ থেকে একটা স্লিপ প্যাড্ বার ক'রে তাতে তাদের ঠিকানা লিখে সেই স্লিপ্টা ছিঁড়ে নিয়ে রায়ের হাতে দিয়ে বললে,"তাহলে ঠিক চারটার সময় আসবেন?" রায় বললে, "নিশ্চয়!" তরুণী বললে, "বহু ধন্যবাদ!" তারপরই ডান হাত বাড়িয়ে রায়ের সঙ্গে করমর্দ্দন ক'রে বললে, "আউফ্‌ভিদারসেহেন [পুনর্দর্শনায়]" এবং পর মুহূর্ত্তে দরজা বন্ধ ক'রে প্রস্থান করলে।

৩

সোয়াবিঙে তাদের বাসা। মজুরদের ব্যারাকে। ফ্ল্যাট নম্বর খুঁজে বার করতে কষ্ট হ'ল না। সাদাসিধে কাঠের সিঁড়ি দিয়ে উঠে সেই নম্বরের ফ্ল্যাটের সামনে এসে দেখে দরজার গায়ে একটা কাঠের ফলকে ছাপার হরফে লেখা—হাইম। তখনও চারটা বাজতে পাঁচ মিনিট বাকি। পাঁচ মিনিট অপেক্ষা ক'রে রায় ঘণ্টা বাজানর বোতাম টিপলে। তরুণী দরজা খুলে বললে আসুন। রায় সেই ছোট্ট ফ্ল্যাটে ঢুকে বললে, "আমার দেরি হয় নি?" তরুণী শুধু বললে, "না।" রায় টুপিটা খুলে একটা অতি সাধারণ রকমের হ্যাটর‍্যাকে রেখে, ওভার-কোটটা খোলবার জন্যে তা থেকে একটা হাত মুক্ত করেছে, এমন সময়ে তরুণী পেছন থেকে তার ওভারকোটটা ধরলে। রায় অবাক। সে জানে পুরুষেই মহিলার ওভারকোট খুলে দিতে সাহায্য করে! একি? আপত্তি

জানিয়ে বললে, "না না, আপনি ছেড়ে দিন!" বৃথা ওভারকোটটা নিয়ে তরুণী হ্যাটর‍্যাকে টাঙিয়ে রেখে একটা ঘরের দরজা খুলে বললে, "আসুন।"

ফ্ল্যাটে ঢুকেই বোঝা যায় তার বাঁদিকে দুটি ঘর, ডান দিকে রান্নাঘর। তরুণী বাঁদিকের একটা ঘর খুলে দিয়েছে। রায় ঘরে ঢুকে দেখে একটা ছোট ঘর, তার দেওয়ালগুলো ধবধবে শাদা। বাঁ কোণে একটা ফায়ার প্লেস, তাতে সবে মাত্র কয়লা জ্বালিয়ে ঘরটাকে বেশ গরম করা হয়েছে। বাঁদিকের দেওয়ালে প্রথমেই একটা দরজা—পাশের ঘরে যাবার। তার মাথায় প্রকাণ্ড টাকওয়ালা লেনিনের প্রতিকৃতি। দরজা থেকে কিছু দূরে অপর কোণে একটা খুব সাধারণ খাট, তার বিছানা বেড কভার দিয়ে ঢাকা। সামনের দেওয়ালে রাস্তার দিকের জানালা। তার শার্শিগুলি আধভেজান, কোন পর্দা নেই। জানালার মাথায় একটা ছবি—কার তা বোঝা যায় না। খাটের সামনেই, ডানদিকের দেওয়ালের গায়ে দুটো প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড বইয়ের আলমারি, সেগুলো বইয়ে ভরা। কি বই তাও ঠিক বোঝা যায় না। ডানদিকের দেওয়ালের অপর কোণে আর একটা আলমারি, সেটা এই ক্ষুদ্র পরিবারের ভাণ্ডার, অন্ততঃ বাসনপত্রের তো বটেই। ঘরের মাঝখানে একটা টেবিল—তাতে বোধ হয় খাওয়া পড়া দুই চলে। টেবিলের ডানদিকে একটা গদি আঁটা ডবল চেয়ার, বাঁদিকে দুটো সাধারণ বেতের চেয়ার, মাথায় একটা কাঁধা উঁচু চেয়ার, সেটাতে সম্ভবতঃ গৃহকর্ত্রী আহারের সময়ে বসেন। টেবিলের উপরে একটা ধবধবে শাদা চাদর পাতা আর তার উপর চায়ের সরঞ্জাম। ঘরে আর কোন আসবাব নেই—না ওয়াশষ্ট্যাণ্ড, না ড্রেসিং টেবিল, না আয়না না অন্য কিছু। টেবিলের ওপরে একটা গ্যাসের বাতি জ্বলছে।

গদি-আঁটা ডবল চেয়ারের দিকে আঙুল দেখিয়ে তরুণী বললে, "বসুন"। রায় আপত্তি করলে, "তা কি হয়! আপনি ওখানে বসুন, আমি বেতের চেয়ারে বসছি।" তরুণী ক্ষীণ হেসে উত্তর করলে, "আমরা সোসাইটি মহিলা নই, শ্রমজীবী! আপনি অতিথি, আপনি ওখানে বসুন।" সে কথার কি উত্তর দেবে রায় ভেবে পেলে না। বাধ্য হয়ে সেই ডবল চেয়ারেই বসতে হ'ল। টেবিলের অপর দিকে বেতের চেয়ারে বসে তরুণী বললে, "নিশ্চয় চা চান, কফি নয়?"

রায়—আজ্ঞে হ্যাঁ!

হিল্ডা—আমি তা জানতুম। দাদা বলতেন আপনারা শুধু চা আর সোডা লেমনেড খান, আর কিছু পান করেন না। [উঠে রায়ের কাপে চা ঢালতে ঢালতে] খুব ভাল! আমাদের দেশের লোকগুলো জালা জালা বীয়ার গেলে আর মদ্য পান করে—বড় বিশ্রী।

রায় [পাশের কাঁধা উঁচু চেয়ারটা তখনও খালি দেখে] আপনার মাতৃদেবী এলেন না?

হিল্ডা—তিনি উঠে আসতে অসমর্থ। দাদা চলে যাওয়ার পর থেকে তিনি শয্যা-শায়ী—উত্থান-শক্তি রহিত। [এই বলে কোয়ার্টার প্লেটে ক'রে একটা আপেল টর্ট রায়ের কাপের কাছে রেখে আপন আসনে আবার বসলে] আমরা চা পান শেষ করেই তাঁর কাছে যাব।

হিল্ডা এক দীর্ঘশ্বাস ফেলে, গম্ভীর ও অন্যমনস্ক হ'য়ে গেল। মুখে ব্যথা। রায় বুঝলে। তার প্রাণেও একটা ব্যথার খোঁচা লাগল। কিছুক্ষণ চুপ ক'রে থাকার পর রায়ের নজর ঘরে ঢোকার দরজার মাথায় পড়লো। দেখে সেকানে একটা কার্ল মার্কসের প্রকাণ্ড ছবি।

রায়—আপনারা বুঝি মার্ক্সিষ্ট? [তার উদ্দেশ্য ভিন্ন প্রসঙ্গ তোলা]

হিল্ডা—নিশ্চয়! প্রত্যেক শ্রমজীবীর তাই হওয়া উচিত।

রায়—কেন, তারা তো হিটলারাইটও হ'তে পারে?

হিল্ডা—আপনার চা ঠাণ্ডা হয়ে যাচ্ছে। আরম্ভ করুন।

রায়—আপনি?

হিল্ডা—আমিও নিচ্ছি [নিজের কাপে চা ঢেলে, একটা আপেল টর্ট নিলে। উভয়ের ভক্ষণ আরম্ভ হ'ল]

রায়—আপনার দাদার হিট্‌লারিস্‌মে কী প্রচণ্ড বিশ্বাস ছিল!

হিল্ডা—হ্যাঁ! তার জন্যে প্রাণও দিলেন [দীর্ঘশ্বাস] তাঁর দৃঢ় ধারণা ছিল শ্রেণী সংগ্রামের একমাত্র ঔষধ ন্যাশানাল. সোশ্যালিস্‌ম্! এই মন্ত্রেই জার্মান জাতি একতাবদ্ধ হবে। জার্মেনীর সব গলদ দূর হবে। জার্মেনী আবার বড় হবে।

রায়—আপনার সে ধারণা নেই?

হিল্ডা—[জোরের সঙ্গে] না!! [আরও উচ্চে] তাঁর পক্ষে সে ধারণা হওয়া স্বাভাবিক, আমার পক্ষে অসম্ভব!!!

রায়—কেন?

হিল্ডা—নিশ্চয়! আমার বাপ ছিলেন কলের মজুর, কাজ করতে করতে তাঁর অপঘাত মৃত্যু হ'য়েছে! আর তাঁর বাপ হচ্চেন একজন মস্ত ধনী, ইঞ্জিনিয়ার, অভিজাত বংশীয়।

রায়—ও! [রায় স্তম্ভিত হ'য়ে গেল! এতক্ষণে লেমানের জীবন-রহস্য তার কাছে পরিষ্কার হ'ল। মনে মনে ভাবলে, "কী আশ্চর্য্য! অত বড় ধনী মানী ইঞ্জিনিয়ার-স্বামী ছেড়ে ভদ্রমহিলা শেষে এক কলের নিরক্ষর কুলিকে বিয়ে করলেন? Love is blind!"]

হিল্ডা—যা হয়ত ভাবছেন তা কিন্তু নয়! আমার মার সঙ্গে ডক্টর অফ ইঞ্জিনিয়ারং ব্যারন্ ফন্ লেমান্ গেহাইমরাটের কোন দিন বিবাহ হয় নি!

[রায় আরও বিস্মিত হ'ল। তার মনে কেমন একটা ঘৃণা এল, ছি, ছি, ছি! কিছু বলতে পারলে না।]

হিল্ডা—আমি কিন্তু ভারি খুশী, আমার মা এক অপদার্থ ব্যারনেস্ হ'য়ে জীবন নষ্ট করেন নি!

[রায় যেন আকাশ থেকে পড়লো! এ বলে কি? কাপের শেষ চাটুকু এক চুমুকে নিঃশেষ ক'রে, কাপটা নামিয়ে রেখে, বিস্ময়-বিস্ফারিত নেত্রে হিল্ডার দিকে চাইলে]।

হিল্ডা [স্মিত] আর এক কাপ চা?

[রায় নির্ব্বাক! অন্যমনস্ক হ'য়ে চায়ের কাপটা একটু এগিয়ে দিলে]।

হিল্ডা [রায়ের কাপে চা ঢালতে ঢালতে] আপনি এ বুঝবেন না, জানি। আমার মা এবং দাদাও কোনদিন বোঝেন নি। বুঝতেন শুধু আমার বাবা। [রায়ের কাপে চা ঢেলে, তার পাতে আর একটা আপেল টর্ট তুলে দিয়ে, নিজে শুধু এক কাপ চা নিয়ে] আপনি নিশ্চয়ই একটু উৎসুক হ'য়েছেন জানতে, ব্যাপারটা কি?

রায় [যেন একটু অপ্রস্তুত] আজ্ঞে, মাপ করবেন! আমি বুঝি, এ বড় অপ্রিয় প্রসঙ্গ। এ প্রসঙ্গ বরং থাক্। আপনার নিশ্চয়ই বিশ্রী লাগছে!

হিল্ডা—একটুও নয়! ফন্ লেমান্ যখন এখানকার হোখ্‌শুলেতে ছাত্র ছিলেন, তিনি যে-বাড়িতে থাকতেন সে বাড়ির দরোয়ান ছিলেন আমার দাদামশায়। আমার মা'র বয়স তখন ষোল কি সতের—মেয়ে স্কুলের ছাত্রী। যা স্বাভাবিক—তরুণ তরুণীর প্রণয় হ'ল। আমার মা বড় সরলা—ব্যারনের সব কথা বিশ্বাস করতেন—তাঁর যত আকাশ-কুসুম রচনা সব। ব্যারনের নির্দ্দেশ মত স্কুল থেকে ফেরার পথে লুকিয়ে তাঁর সঙ্গে ইংলিশ গার্ডেনে দেখা করতেন। ব্যারন বোঝাতেন, পাস করেই মাকে বিয়ে করবেন—মাও সে কথা ধ্রুব সত্য বলে মনে করতেন। একবারও এ সন্দেহ তাঁর মনে ওঠেনি, ব্যারণের সঙ্গে দরোয়ানের মেয়ের বিবাহ অসম্ভব—তা সে যত সুন্দরী, যত গুণবতী, যত বিদুষীই হউক, সন্দেহ হ'লেও হয়ত ভাবতেন তাঁর প্রণয়ী কখনও এত হৃদয়হীন হতে পারে না যে তাঁকে পথে বসাবে। এমন কি একটা অবিশ্বাসের ভাণ ক'রেও প্রণয়ীর মনে কষ্ট দিতে পারতেন না, কাজেই ব্যারনের একটা ইচ্ছাও অপূর্ণ রাখেন নি।

রায় [উৎসুক] তারপর?

হিল্ডা [নির্ব্বিকার] যা অবশ্যম্ভাবী তাই হ'ল! পাস করেই ব্যারন মশায় দিলেন চাম্পট। সেই থেকে এখন পর্য্যন্ত আর কখনও মার কোন খোঁজ নেননি—সহস্র চিঠি লেখা সত্ত্বেও নয়। এদিকে মার অবস্থা প্রকাশ পেতে দাদামশায় দিলেন তাঁকে বাড়ি থেকে তাড়িয়ে। তিনি প্রথমটা আশ্রয় নিলেন হাসপাতালে। সেখানে দাদার জন্ম হ'ল। তারপর মা হলেন কলের মজুরাণী! সেইখানে আমার বাবার সঙ্গে তাঁর প্রথম সাক্ষাৎ হয়। আমার বাবা চাইলেন মাকে বিয়ে করতে। কিন্তু আমার মার

তখনও আশা ছিল ব্যারন একদিন নিশ্চয়ই ফিরবেন—অন্ততঃ ছেলের খাতিরে। সাত আট বৎসর বৃথা অপেক্ষা করবার পর আমার বাবার সঙ্গে তাঁর বিবাহ হয়।

রায় [হিল্ডার পিতার প্রতি শ্রদ্ধায় মন ভরে গেছে] আপনার পিতার ছবি এখানে নেই?

হিল্ডা [প্রফুল্ল] নিশ্চয়, ঐ যে। [জানলার মাথায় ছবি দেখিয়ে] দেখবেন? চলুন [উভয়ে জানালার কাছে গেল। তাদের চা পান শেষ হ'য়েছে।

রায় [ছবি নিরীক্ষণ ক'রে] এ তো ঠিক মজুরের চেহারা নয়! এঁকেতো খুব শিক্ষিত বলে মনে হয়! ইনি ছিলেন কলের মজুর?

হিল্ডা—মজুর হ'লে কি হয়, বা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাপ না থাকলেই কি হয়, তিনি ছিলেন পণ্ডিত। লেনিন যখন সোয়াবিজে থাকতেন, বাবা ছিলেন তাঁর বন্ধু। [বইয়ের আলমারির দিকে হাত দেখিয়ে] এই সব যত বই দেখছেন এর অধিকাংশ ছিল তাঁর—সব পড়েছেন, ভাল ক'রে পড়েছেন!

রায় [বিস্মিত হয়ে দুই আলমারির প্রায় শ' পাঁচেক বইয়ের ওপর চোক বুলিয়ে দেখলে। সবই প্রায় সোশ্যালিষ্ট সাহিত্য—বৈজ্ঞানিক, রাজনৈতিক, বিশ্ব-সাহিত্য ও দর্শনও কিছু কিছু আছে] তাই দেখছি—আপনিও এসব পড়েছেন?

হিল্ডা—কিছু কিছু। চলুন, মার সঙ্গে দেখা করতে হবে।

রায় [অতি বিস্মিত, বই দেখতে দেখতে অন্যমনস্ক ভাবে] যাচ্ছি।

হিল্ডা [একটু হেসে—রায়ের হাত ধরে] আসুন।

হিল্ডা রায়কে পাশের ঘরে নিয়ে গেল। সে-ঘরের সজ্জা ভিন্ন রকমের। দেওয়ালে ফুলদার রঙীন কাগজ লাগান। বাহারে খাট। নানা রকমের আসবাব। জানালায় একটা দামী পর্দ্দা, দেওয়ালে অনেক ছবি। অধিকাংশ লেমানের। কয়েকটি হিট্‌লার, রোম্ প্রভৃতি নেতৃবৃন্দের! হায়রে মাতৃহৃদয়ের দুর্ব্বলতা!

হিল্ডা বললে, "মা, হের্ রায় এসেছেন।" বর্ষীয়সী বিছানায় লেপ মুড়ি দিয়ে ছিলেন। লেপ থেকে মাথা বার ক'রে বললেন, "কাছে নিয়ে আয়! তাঁকে একটু দেখবো!" রায় বর্ষীয়সীর কাছে গেল। তিনি লেপের ভেতর থেকে দুটো হাত বার ক'রে রায়ের দুটো হাত ধরে তার মুখের দিকে চেয়ে অজস্র অশ্রুবর্ষণ করতে আরম্ভ করলেন। রায়ও বেশীক্ষণ চোখের জল আটকে রাখতে পারলে না। হিল্ডা ততক্ষণে সে-ঘর থেকে চলে গেছে। সেও কি রায়ের সামনে দুর্ব্বলতা প্রকাশ না ক'রে পাশের ঘরে অশ্রুবর্ষণ করতে গেল?
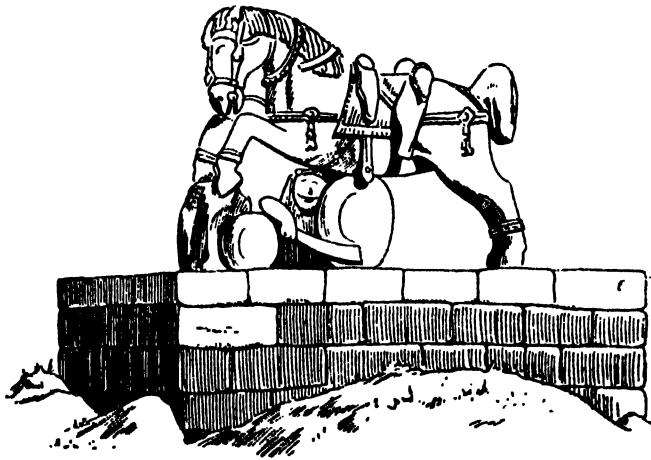
"প্রতীক্ষা"

শ্রীযুগলকিশোর সরকার, বি-এ

আলোচ্য কবিতাটি রবীন্দ্রনাথের "মহুয়া" কাব্য-গ্রন্থের মধ্যে একটি অনুপম কবিতা। সংসারের ভিতরেই এক অপরূপ স্বর্গ-সৃষ্টির পরিকল্পনা কবিতাটি মধ্যে নিহিত রহিয়াছে। কবি তাঁহার দিব্য-দৃষ্টির অকুণ্ঠিত প্রসারে আমাদের সামাজিক জীবনের মধ্যেই একটা মুক্তির ক্ষেত্র কল্পনা করিয়াছেন ;—বদ্ধ জলার ভিতরে মানস-সরোবরকে মূর্ত্ত দেখিবার জন্য আকাঙ্ক্ষিত হইয়াছেন। তাঁহার এই কল্পিত জগৎ সত্যের নির্ম্মল আলোকে আভাসিত। অন্যায় ও অসত্য সেখানে নির্ম্মমভাবে লাঞ্ছিত ও তিরস্কৃত হইবে ;—অজ্ঞতা, অবিদ্যা, অহঙ্কার নির্ব্বাসিত হইবে, মানব-সত্তা বরণীয় আদর্শে প্রতিষ্ঠিত হইবে। আমাদের দৈনন্দিন জীবন বহু তুচ্ছতায়, বহু ক্ষুদ্রতায়, বহু কুশ্রীতায় আবিল, বহু দুঃখদৈন্য-বেদনায় অসম্পূর্ণ, বহু অন্যায় অসত্যে কলুষিত। মিথ্যা এমন ওতঃপ্রোতভাবে আমাদের জীবনের সহিত জড়াইয়া গিয়াছে যে, সত্য এখানে সহজে প্রতিষ্ঠালাভ করিতে পারে না। আবার সর্ব্বাপেক্ষা বিস্ময়ের বিষয় এই যে আমরা ঐ মিথ্যাকেই সত্যভ্রমে গ্রহণ করিয়া আত্ম-প্রসাদ লাভ করিয়া থাকি। কাম্য যাহা নয় বা হওয়া উচিত নয়, তাহারই জন্য আকাঙ্ক্ষিত রহিয়াছি, অবরেণ্যকে বরমাল্য দান করিতেছি, কলহ-শক্তিকে শৌর্য্যজ্ঞানে আত্মপ্রসাদ লাভ করিতেছি, ছলাকলাকে শক্তিমত্তা আখ্যা দিতেছি। জীবনের ভিতর এইরূপে একটা মূঢ়ের স্বর্গ রচনা করিয়া অতি অবাঞ্ছিত জীবন যাপন করিতেছি ;—

"কুৎসায় বিস্তারি' দেয় পঙ্কে ক্লিন্ন গ্লানি,
কলহেরে শৌর্য্য ব'লে জানি ;
*　　*　　*
অশক্তি মজ্জায় রক্তে, শক্তি বলি' জানি ছলনাকে,
মর্ম্মগত খর্ব্বতায় সর্ব্বকালে খর্ব্ব করি' রাখে।"

অজ্ঞতায় অস্বাস্থ্যকর অন্ধকারে এতদূর অভ্যস্ত হইয়া গিয়াছি যে অন্ধকারে থাকিতেই আমরা ভালবাসি, আলোককে অস্বীকার করি, অপ্রমাণ করি। সত্যের তীব্র-উজ্জ্বল আলোক আমাদিগকে বিভ্রান্ত করে, দৃষ্টিবিভ্রম ঘটায়। দুর্ব্বল চিত্ত তাই সত্যকে দৃঢ়নিষ্ঠাভরে ধরিতে পারে না। কবির পূর্ব্ববর্ত্তী কাব্য "নৈবেদ্যে" ঠিক এই ভাবধারা অভিব্যক্ত হইয়াছে ;—

"সেই দীন প্রাণে তব সত্য হায়
দণ্ডে দণ্ডে ম্লান হ'য়ে যায়।
*　　*　　*
পুঞ্জ পুঞ্জ মিথ্যা আসি গ্রাস করে তারে
চতুর্দ্দিকে ; মিথ্যা মুখে মিথ্যা ব্যবহারে
মিথ্যা চিত্তে, মিথ্যা তা'র মস্তক মাড়ায়ে
মিথ্যারে ছাড়িয়া দেয় তব সিংহাসন।"

অন্যায় অসত্য এইরূপে মানব-সাধারণের সমগ্র সত্তা ছাইয়া ফেলিয়াছে এবং তাহার অনিবার্য্যফলে একটা অস্বাভাবিক অবস্থা চতুর্দ্দিকে বিরাজমান। তাই জীবনের যাত্রাপথে আমাদের অবিরাম গতিশীলতা আমাদিগকে গন্তব্যে উপনীত করিয়া দিতেছে না, অধিকন্তু যাহা সত্য, যাহা সুন্দর, যাহা প্রকৃত কাম্য ও বরেণ্য তাহা আমাদের প্রাপ্তির সীমা-রেখা হইতে ক্রমশঃ দূরে অপসারিত হইয়া পড়িতেছে। অভিযানের মধ্যেই ব্যর্থতার বীজ যে লুক্কায়িত রহিয়াছে ;—

"ধূসর প্রদোষে আজি অন্ত পথ জুড়ে'
নিশাচর মিথ্যা চলে উড়ে।
আলো আঁধারের পাকে না মিলে কিনারা,
দীর্ঘ যে দেখায় হ্রস্ব যারা।
যাচে দেশ মোহের দীক্ষারে,
কাঁদে দিক বিধির ধিক্কারে ;—"

মানব-সাধারণ যে-অবস্থায় উপনীত হইয়া আপনাকে সম্পন্ন ও মহীয়ান কল্পনা করে তাহা মূঢ়তাসঞ্জাত মনোবৃত্তি হইতে উদ্ভূত ভুল স্বর্গ বা "মূঢ়ের স্বর্গ"—এই ভুল স্বর্গের সৌধ অচিরাৎ ধূলিসাৎ হওয়া উচিত, এই মোহজাল ছিন্ন করা কর্ত্তব্য।

আলোচ্য ক্ষেত্রে মানব-সাধারণের এই ধিক্কৃত অবস্থা নায়কের মর্ম্ম স্পর্শ করিয়াছে। তাই 'অভ্যস্ত জীবনযাত্রার ধূলিলিপ্ত দারিদ্র্য' হইতে তিনি মানবসত্তাকে সম্পূর্ণভাবে মুক্ত করিয়া ঊর্দ্ধে প্রতিষ্ঠিত করিতে চাহেন। নায়ক সাধারণ মানব নহেন। তাঁহার আশা-আকাঙ্ক্ষা, ভাবনা বেদনা সাধারণ মানবের আশা-আকাঙ্ক্ষা ও ভাবনা-বেদনার সহিত মিলিয়া যায় না। বৃহৎ বনস্পতি যেমন ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বনজঙ্গলের পরিবেষ্টন হইতে ক্রমেই শূন্য আকাশে মস্তক তুলিয়া উঠে আলোচ্য ক্ষেত্রে নায়কও তেমনি সমাজ-সংসারের অস্বাস্থ্যকর ক্ষুদ্রতাজাল হইতে ক্রমশঃই শব্দহীন নির্জ্জনে উত্থিত হইবার জন্য আকাঙ্ক্ষিত। তিনি আড়ম্বর করিতে চাহেন না, কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিতে চাহেন ; তিনি বৃথা দম্ভ দেখাইয়া পরিতৃপ্ত থাকিতে চাহেন না, প্রকৃত যোগ্যতা লাভ করিতে চাহেন ;—তিনি অনুকরণে পরাঙ্মুখ, নবসৃষ্টির পক্ষপাতী ; তিনি স্বাবলম্বী হইবার জন্য আকাঙ্ক্ষিত, দাক্ষিণ্যের দ্বারে ভিক্ষুক হইতে অপারগ। তিনি সেই বীর্য্যের পক্ষপাতী,—

"যে-বীর্য্য বাহিরে ব্যর্থ, যে-ঐশ্বর্য্য ফিরে অবাঞ্ছিত,
চাটুলুব্ধ জনতায় যে-তপস্যা নির্ম্মম লাঞ্ছিত।"

কবির পূর্ব্ববর্ত্তী কাব্য "মানসী"র ভিতর ঠিক ঐ একই সুর ধ্বনিত হইয়াছে ;—

"পরের কাছে হইব বড়
এ-কথা গিয়ে ভুলে
বৃহৎ যেন হইতে পারি
নিজের প্রাণমূলে।"

তিনি যে অনাবিল অকৃত্রিম মনুষ্যত্ব নিজের ভিতর সর্ব্বদাই অনুভব করেন চারিদিকের জনমণ্ডলীর মধ্যে তাহার আভাস দেখিতে না পাইয়া ক্ষুব্ধ। তাঁহার চিত্তটি তপঃসম্ভারপূর্ণ ঋষিচিত্তের ন্যায়। স্তুতিবাদ-পিপাসা তাহাতে অঙ্কুরিত হয় না, পরন্তু ঐ সবের প্রতি সুগভীর ধিক্কার ও বৈরাগ্যই পরিলক্ষিত হয়। অনাসক্তভাবে তিনি সেইসব কর্ম্মেরই অনুষ্ঠান করিতে চাহেন যাহা চিত্তকে স্বতঃই ঊর্দ্ধে উৎক্ষিপ্ত

করে। তিনি সত্যাগ্রহী, সত্য-সন্ধানী। তাই তিনি বাহ্য অপেক্ষা আন্তর সৌন্দর্য্যেরই অধিক পক্ষপাতী। বাহ্যদৃষ্টিতে যাহা বৃহদায়তন তাহার নিকট অভিভূত হইয়া পড়িয়া তাহার পাদমূলে পৌরুষের বরেণ্য উষ্ণীষ স্থাপন করিতে তিনি অনিচ্ছুক।

"ভাবি দুর্য্যোগের সিন্ধু তরিব হেলায়
বঞ্চনার ভঙ্গুর ভেলায়
বাহিরে মুক্তিরে ব্যর্থ খুঁজি
অন্তরে বন্ধন করি পুঁজি—"

মানুষ নিজের স্বার্থলোভ ও লোলুপতাকে বহু সাধু উদ্দেশ্যের আবরণে ঢাকিতে চায়। অন্তরের এই দুর্ব্বলতাকে এই রিপুকে জয় করিতে না পারিলে জগতে প্রতিষ্ঠালাভ সম্ভব নয়। বঞ্চনার দ্বারা অনেক সময় সাময়িক সাফল্য লাভ করিতে পারা যায় বটে, কিন্তু তাহা অতীব ক্ষণভঙ্গুর;—শীঘ্রই তাহার কদর্য নগ্নমূর্ত্তি প্রকাশিত হইয়া পড়ে। অন্তরকে সংস্কৃত না করিয়া বাহিরে মুক্তির অন্বেষণ করা পরিপূর্ণ মূঢ়তা মাত্র। চিত্ত যাহার সংস্কারের আবর্জ্জনায় আবিল, অজ্ঞতার গুরুভারে আড়ষ্ট, হিংসায় দ্বেষে লোভে কুশ্রী, বাহিরে সে মুক্তির সন্ধান কোথা হইতে পাইবে? মুক্তি ত বাহিরের জিনিষ নয়, উহা যে মনেরই একটা পবিত্র উচ্চতর অবস্থা। এই সহজ সরল সত্যটি, জীবনের এই মূল সূত্রটি মানুষ ধরিতে পারে না বলিয়াই তাহার সাধনা সিদ্ধির সাক্ষাৎ লাভ করে না, ব্রত বরদ মূর্ত্তিতে দেখা দেয় না। জীবনের যাত্রাপথে তাই সে মাল্যচন্দন ও গন্ধবারির দ্বারা অভিনন্দিত হয় না, পরন্তু ব্যর্থতা ও বেদনার গুরুভারে আড়ষ্ট হইয়া পড়ে। বহুপূর্ব্বে লিখিত কবির একটি গানের ভিতর এই ভাবধারা আরও সহজভাবে আত্মপ্রকাশ করিয়াছে;—

"কারাগারের দ্বারী গেলে
তখনই কি মুক্তি মিলে?
আপনি তুমি ভিতর থেকে
চেপে আছ দ্বারখানা।

* * *

মনের মধ্যে নিরবধি
শিকল গড়ার কারখানা।"

আলোচ্য ক্ষেত্রে নায়ক মোহাবিষ্ট নহেন, নায়ক সংস্কারমুক্ত। তাই সাধারণ মানব যে অবস্থাকে মুক্ত অবস্থা মনে করিয়া মনে মনে শ্লাঘাবোধ করে তাহার উপর তাঁহার সুগভীর ঘৃণাই পরিলক্ষিত হয়।

"ভাগ্যের ভিক্ষুক চাহে কুটিল সিদ্ধির আশীর্ব্বাদ,
ধূলিতে খুঁটিয়া-তোলা বহুজন-উচ্ছিষ্ট প্রসাদ।"

ইহার ভিতর যে সুগভীর ধিক্কার, যে গ্লানি, যে চিত্তদৈন্য, যে ক্ষোভ মূর্ত্ত হইয়া উঠিয়াছে তাহা কবির পূর্ব্ববর্ত্তী কাব্য 'মানসা'র ভিতরও দেখিতে পাওয়া যায়;—

"দাস্যমুখে হাস্যমুখ
বিনীত জোড়কর
প্রভুর পদে সোহাগমদে
দোদুল কলেবর।
পাদুকাতলে পড়িয়া লুটি'
ঘৃণায় মাখা অন্ন খুঁটি'
ব্যগ্র হ'য়ে ভরিয়া মুঠি
যেতেছ ফিরি ঘর।"

পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে নায়ক যে অনাবিল অকৃত্রিম মনুষ্যত্ব নিজের ভিতর সর্ব্বদাই অনুভব করিতেন চারিদিকের জনমণ্ডলীর মধ্যে তাহার আভাস দেখিতে না পাইয়া ক্ষুব্ধ। মহামানবমাত্রেই ঐরূপ বেদনা নিরন্তর অনুভব করিয়া থাকেন। জনারণ্যের মধ্যে থাকিয়াও তাঁহারা একক, বন্ধুহীন। আলোচ্য ক্ষেত্রে নায়কও তাঁহার নিঃসঙ্গ, একাগ্র, একক জীবনকে তাঁহার চরম ও পরম লক্ষ্যের দিকে চালিত করিয়া লইয়া চলিয়াছেন। তাপদগ্ধ, পাদপবিরল জীবনের এই যাত্রাপথে সঙ্গিনীর জন্য তিনি আকাঙ্ক্ষিত। তবে তিনি তাঁহার "অনাগতা" "নিত্য প্রত্যাশিতা" প্রিয়ার পবিত্র মূর্ত্তিকে ভোগলিপ্সার দৃষ্টিতে লাঞ্ছিত করিয়া কল্পনা করেন নাই;—

(ক) "অয়ি অনাগতা, অয়ি নিত্য প্রত্যাশিতা,
হে সৌভাগ্যদায়িনী দয়িতা।
সেবাকক্ষে করি না আহ্বান;—"

(খ) "নাহি চাহি মধুর শুশ্রূষা,
হে কল্যাণী, তুমি নিষ্কলুষা,
তোমার প্রবল প্রেম প্রাণভরা সৃষ্টির নিঃশ্বাস,
উদ্দীপ্ত করুক চিত্তে ঊর্দ্ধশিখা বিপুল বিশ্বাস।"

জীবনের বিবিধ প্রকার কলুষ গ্লানির পঙ্ককুণ্ড হইতে যে মহীয়সী নারী তাঁহাকে উৎক্ষিপ্ত করিয়া তাঁহার বরণীয় আদর্শের আলোকময় পথে তাঁহাকে অধিরূঢ় করিয়া দিতে পারিবেন এরূপ প্রাণময়ী, কল্যাণময়ী, হ্লাদিনীশক্তিসম্পন্না প্রিয়ার জন্য তিনি প্রতীক্ষমান;—

"চিত্তের তুলুক্ ঊর্দ্ধে মহত্ত্বের পানে
উদাত্ত তোমার আত্মদানে।

হে নারী, হে আত্মার সঙ্গিনী,
অবসাদ হ'তে লহো জিনি,'—
স্পর্দ্ধিত কুশ্রীতা নিত্য যতই করুক সিংহনাদ,
হে সতী সুন্দরী আনো তাহার নিঃশঙ্ক প্রতিবাদ।"

তাঁহার 'নিত্যপ্রত্যাশিতা' প্রিয়ার 'প্রবল প্রেমের' ভিতর থাকিবে নবসৃষ্টির প্রেরণা—যাহা প্রাণ-মনকে আশায় উৎসাহে আনন্দে আন্দোলিত করিয়া অভীষ্টের পথে অগ্রগামী করিয়া দেয়, সাধনাকে, জয়যুক্ত করে, মনুষ্যত্বের পরিপূর্ণ বিকাশের পথ, অভিব্যক্তির পথ সিদ্ধির পথ উন্মুক্ত করিয়া দেয়—সংসারের ভিতরেই একটা অপরূপ স্বর্গ সৃষ্টি করিয়া ফেলে। যে মহীয়সী নারীর সার্থক সারথ্য অর্জ্জুনের ললাটে জয়টীকা অঙ্কিত করিয়া দিয়াছিল, যে মহীয়সী নারীর "প্রবল প্রেম" বনবাসে অবসন্ন মুহ্যমান পাণ্ডবকে সঞ্জীবিত করিয়া রাখিয়াছিল, যে মহীয়সী নারী উদাত্তস্বরে ঘোষণা করিয়াছিল,—'যেনাহং নামৃতাস্যাম্ তেনাহং কিমকুর্য্যাম্'—আলোচ্য ক্ষেত্রে নায়ক সেই প্রকার নারীকে "আত্মার সঙ্গিনী" রূপে পাইবার জন্য প্রতীক্ষমান। এ নারী রঘুবংশ কাব্যের "সুদক্ষিণা"—"অধ্বরস্যেবদক্ষিণা"। এই প্রকার "আত্মার সঙ্গিনী" আজও 'অনাগতা' কিন্তু 'নিত্যপ্রত্যাশিতা'। এহেন প্রাণময়ী, কল্যাণময়ী, শক্তিস্বরূপিণী নারীর জন্য জীবনব্যাপী "প্রতীক্ষা"ও বুঝি যথেষ্ট নহে।

মাতৃ-ঋণ

শ্রীসীতা দেবী

৩০

জ্ঞানদার অসুখ শীঘ্র সারিবার কোনো লক্ষণ দেখা গেল না। বিশ্রাম করা তাঁহার আর কিছুতেই ঘটিয়া ওঠে না, অথচ ডাক্তারা একবাক্যে খালি বলে পরিপূর্ণ বিশ্রামই তাঁহার একমাত্র চিকিৎসা। কিন্তু নিজের হাতের সাজান সংসারটা জ্ঞানদার অতি প্রিয় জিনিষ, চোখের সামনে ঝি-চাকরে যদি বসিয়া গলা কাটে, তাহা হইলে কি করিয়া তিনি চুপ করিয়া থাকেন ?

সুরেশ্বর আর তার ভাইকে কাল চা খাওয়ানো হইয়াছে, আজ সকালে উঠিয়াই জ্ঞানদা ছোট্টু এবং ভজুকে ধরিয়া জমাখরচ মিলাইতে বসিয়া গিয়াছেন। কাল রাত্রে হিসাব মিলাইবার ক্ষমতা থাকিলে, জ্ঞানদা দেখিয়া লইতেন, ঐ দুইটা হতভাগা কি করিয়া অতগুলা পয়সা ফাঁকি দিয়া লয়। কিন্তু তাহাদের কপাল ভাল, সারাটা রাত তাহারা সময় পাইয়াছে বাজে হিসাব তৈয়ারী করিবার জন্ম, কাজেই তাহাদের হাতে-নাতে ধরিবার কোনো উপায় নাই।

বকাবকিটা যখন বেশ জমিয়া উঠিয়াছে, তখন নৃপেন্দ্রবাবু আসিয়া হাজির হইলেন। গৃহিণীকে চাকরদের সামনেই ত আর কিছু বলা যায় না, অগত্যা শয়নকক্ষ হইতে ডাকিয়া বলিলেন,—"একবার এদিকে শুনে যাও দেখি।"

জ্ঞানদা চাকরদের বিদায় দিয়া, হাঁপাইতে হাঁপাইতে ল্যাণ্ডিং হইতে ঘরে আসিয়া ঢুকিলেন। কর্ত্তা বলিলেন, "তুমি মনে করেছ কি বল দেখি! ডাক্তার কব্‌রেজ সকলের চেয়ে তোমার বুদ্ধি বেশী, না তোমার বাঁচতে আর ভাল লাগছে না ?"

জ্ঞানদা বলিলেন,—"তোমার বক্তৃতা রাখ দেখি, দুটো লক্ষ্মীছাড়া মিলে কম হলেও তিনটে টাকা কাল বিকেলে চুরি করেছে, তাদের কিছু বল্‌তে হবে না ?"

নৃপেন্দ্রকৃষ্ণ বলিলেন,—"যদি করেই থাকে তার জন্মে কি তোমায় অসুখ শরীরে বকাবকি করে মরতে হবে ? নাঃ, তোমায় কলকাতায় রাখা আর চল্‌ল না দেখ্‌ছি। পুরীতেই তুমি ছিলে ভাল।"

জ্ঞানদা বলিলেন,—"হ্যাঁ, ভাল ত আমি কত ছিলাম। ভাল ছিলে তোমরাই, যত অকাজ ক'রে রাখতে পেরেছ। ছেলেমেয়ে সবশুদ্ধ যদি যায়, তাহলে আমি যাব, না হলে আমাকে আর কলকাতার থেকে নড়াতে পারছ না, সেটি জেনেই রেখ।"

যাঁহাকে বিশ্রাম না করার জন্ম বকিতে আসিয়াছেন, তাঁহার সঙ্গে কোমর বাঁধিয়া ঝগড়া করাটা ঠিক সুবিবেচনার কাজ নয়, অগত্যা নৃপেন্দ্রবাবু মনের রাগ মনেই রাখিয়া নীচে চলিয়া গেলেন। নানা স্থানে বাড়ির খোঁজ করিতেছিলেন, যদি যাওয়া হয়, আজ একেবারে উত্তেজনার মুখে দার্জ্জিলিঙে একখানা বাড়ি একেবারে ভাড়া লইবার জন্ম পাকাপাকি লিখিয়া দিলেন।

খাইবার সময় দেখিলেন, টেবিলে জ্ঞানদা অনুপস্থিত। যামিনীকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোমার মায়ের কি হ'ল আবার ?"

যামিনী বলিল,—"চান করে শুয়ে আছেন, বল্‌লেন—শরীর এখন ভাল নয়, পরে যদি ভাল থাকেন ত খাবেন।"

ছেলেমেয়ের কাছে পত্নীর সমালোচনা নৃপেন্দ্রবাবু প্রায়ই করিতেন না। আজ না পারিয়া বলিলেন,—"শরীরের আর অপরাধ কি ? সারাক্ষণ খালি বকাবকি। দেখ মা, রবিবারে হয়ত আমাদের দার্জ্জিলিং যেতে হবে। এখন থেকে অল্প ক'রে ক'রে গুছিয়ে নাও, নইলে শেষে ভারি হুড়োহুড়ি বেধে যাবে।"

মিহির লাফাইয়া উঠিয়া বলিল,—"আমরা সব্বাই যাব ত ?"

নৃপেন্দ্রকৃষ্ণ বলিলেন,—"হ্যাঁ।"

মিহির বলিল,—"বেশ মজা হবে, শিশিররাও যাবে বল্‌ছে।"

যামিনীর মুখটা যেন ম্লান হইয়া গেল, কিছু না বলিয়া সে নীরবে সবাইকে খাবার পরিবেশন করিতে লাগিল।

জ্ঞানদা সেদিন আর নামিতেই পারিলেন না। বিকালে খবর পাইয়া ডাক্তারসাহেব আসিয়া হাজির হইলেন। রোগিণীর ঘরে ঢুকিয়া বলিলেন,—"আপনারাও যদি শরীর বুঝে না চলবেন, তা বাজে লোককে আমরা বল্‌ব কি?"

জ্ঞানদা বলিলেন,—"সংসারে থাকতে গেলে, একটাও কথা না বলে কখনও চলে?"

ডাক্তার বলিলেন,—"দায়ে পড়লে সব-কিছুই চলে। মনে করুন না যে আপনি হাসপাতালে আছেন।"

জ্ঞানদা বলিলেন,—"ইচ্ছে করলেই সব কিছু মনে করা যায় নাকি? ওসব কথা ছাড়ুন, তার চেয়ে ওষুধপত্রের ব্যবস্থা দিন, যা সত্যি পালন করা চলে। চুপ ক'রে হাত পা গুটিয়ে বসে থাকা আমার এ জন্মে হবে না।"

ডাক্তার বলিলেন,—"সব রোগ কি আর ওষুধে সারে? যাই হোক, আপনি আর কোনো কথা যখন শুনবেনই না, তখন কলকাতাটা ছাড়ুন।"

জ্ঞানদা বলিলেন,—"কথা ত হচ্ছে, দেখা যাক। বাড়ি নেওয়া হয়েছে বলে যেন শুনলাম। না রে খুকি?"

যামিনী খাটের রেলিঙে ভর দিয়া দাঁড়াইয়া ছিল। সে বলিল,—"হ্যাঁ বাড়ি নেওয়া হয়েছে বলেই ত বাবা বললেন। সামনের রবিবারে যাওয়া হবে।"

জ্ঞানদা চটিয়া গেলেন। নৃপেন্দ্রবাবু সর্ব্বদাই যে কেন অনধিকারচর্চ্চা করেন, তাহা তিনি আজ পর্য্যন্ত ভাবিয়া পাইলেন না। যাহা হউক, বেশী বকিতে তাঁহার ভাল লাগিতেছিল না, বলিলেন,—"হ্যাঁ, তোমার বাবার আর কি, হট্ করে একটা কিছু বলে দিলেই হ'ল। যাওয়া অমনি মুখের কথা খসালেই হয় কি-না? রবিবারে যাওয়া অমনি হ'ল আর কি?"

যামিনী ডাক্তারবাবুর সঙ্গে সঙ্গে নীচে চলিয়া গেল। জ্ঞানদা কথা বলিবার আর কোনো লোক না পাইয়া অগত্যা চুপ করিয়া শুইয়া পড়িলেন। কি ছার রোগেই তাঁহাকে ধরিয়াছে। নড়িবার জো নাই, কথা বলিবার শুদ্ধ জো নাই। এমন করিয়া বাঁচিয়াই বা তাঁহার লাভ কি? সংসার এবং স্বামী পুত্র কন্যার জন্য কিছু যদি না-ই করিতে পারিলেন, তাহা হইলে তাঁহার থাকা-না-থাকা সমান। তিনি ত আর বড়লোকের দুলালী কিশোরী কন্যা নন, যে, তাকে-তোলা হইয়া থাকিয়াই সবাইকে বর্ত্তাইয়া দিবেন? যাঁহারা আজ তাঁহাকে শাসন করিতে ব্যস্ত, তাঁহারাই দুদিনের বেশী তিনদিন জ্ঞানদাকে তখন সহ্য করিতে পারিবেন না। দুনিয়াটা দেনা-পাওনার ক্ষেত্র। লোকে কবিত্ব যতই করুক, যে ভালবাসার ক্ষেত্রে মানুষ দিয়াই কৃতার্থ হয়, সে সব বাজে কথা। ভালবাসাও পাওনাগণ্ডা বেশ বুঝিয়া লইতে জানে। তিনি যদি কাহারও জন্য কিছু করিতে না পারেন, অন্যেও বেশী দিন তাঁহার জন্য কিছু করিবে না। নিতান্ত রাস্তায় টান মারিয়া ফেলিয়া দিবে না এই পর্য্যন্ত, কারণ সমাজের এবং আইনের একটা শাসন আছে। কিন্তু সিন্ধবাদ নাবিকের ঘাড়ে দ্বীপবাসী বৃদ্ধের মত চাপিয়া থাকিতে মানুষের মন কি চায়? জ্ঞানদার দ্বারা ত হইবে না। মানুষের মত হইয়া থাকিতে পারেন ত থাকিবেন, না হইলে থাকিবার প্রয়োজন নাই। তাঁহার এমন কিছু কোলে তিন মাসের শিশু নাই যে, মায়ের অভাবে শুকাইয়া মরিয়া যাইবে।

মিহিরের ঘরে অত হুড়াহুড়ি লাগাইয়াছে কাহারা? ছেলে নিজে যেমন, তেমনই সাত রাজ্যের দস্যি জোগাড় করিয়া আনিতে পারে। ছেলের ঘরখানার শ্রী কি! যেন চিড়িয়াখানার বাঁদরের খাঁচা! তাহাকে ভাল জিনিষ দিয়াই বা হইবে কি? কোনো জিনিষের যত্ন জানে? ঐ ত সেদিন সেল্ হইতে খাটের পাশে পাতিবার ছোট কার্পেটখানা কিনিয়া দিলেন, তাহার চেহারা হইয়াছে কেমন? ঠিক যেন হেঁসেলের ন্যাতা!

গোলমাল সহ্য করিতে না পারিয়া জ্ঞানদা ডাক দিলেন, "খোকা!"

পাশের ঘর হইতে নিরুৎসাহ কণ্ঠে উত্তর আসিল "কি?"

জ্ঞানদা বলিলেন, "তোমার ঘরে আর কে? ভারি যে হুটোপাটি লাগিয়েছ?"

মিহির বলিল,—"শিশির বেড়াতে এসেছে। আমরা রোদটা পড়ে গেলেই মাঠে বেরিয়ে যাব।"

জ্ঞানদা চুপ করিয়া গেলেন। শিশির যখন, তখন বাড়ীর ছাদ উড়াইয়া দিলেও তাহাকে আর কিছু বলা চলিবে না।

খানিক বাদে আবার মিহিরের ডাক পড়িল, "ও খোকা!"

"কি?"

"শিশিরকে একটু এ ঘরে আসতে বল্ না?"

মিনিট দুই কোনো সাড়া শব্দ পাওয়া গেল না। তাহার পর মিহিরের পিছন পিছন শিশির আসিয়া ঢুকিল। মুখ অতি অপ্রতিভ, বোধ হয় মনে করিয়াছে গোলমাল করার জন্য মিহিরের মা তাহাকেই বেশ করিয়া বকিয়া দিবেন। মিহিরের মা-টিকে প্রথম হইতেই শিশির অত্যন্ত ভয় করিয়া চলে।

কিন্তু জ্ঞানদা শিশিরকে বকিবার কোনো লক্ষণ দেখাইলেন না। প্রসন্নমুখে বলিলেন,—"এস বাবা এস। বুড়ো মানুষ, অসুখ হয়ে পড়ে রয়েছি তোমরা ত খোঁজ-খবরও নাও না।"

শিশির অপ্রস্তুতভাবে মাথা চুলকাইতে লাগিল। জ্ঞানদা আবার জিজ্ঞাসা করিলেন,—"তোমার মা ভাল আছেন?"

শিশির মাথা নাড়িয়া বলিল,—"না, বেশী ভাল নেই। দাদা তাঁকে আপনাদের বাড়ী আনতে চাইছিল, তিনি বল্লেন,—"শরীরটা মোটে ভাল নেই, তাঁদের বলো।" দাদা কাল আসবে।

দাদা আসিবে শুনিয়া জ্ঞানদা খুসী হইলেন। সুরেশ্বরের মায়ের ভরসা তিনি কোনো দিনই করেন নাই। তিনি বেশীরকম কিছু অনর্থ না ঘটান, তাহা হইলেই ঢের।

জ্ঞানদা আবার জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোমরা গরমের ছুটিতে কোথাও যাবে না? তোমার মায়ের অসুখ শরীর, কলকাতার গরমে আরও ত খারাপ হবে।"

শিশির বলিল,—"মা ত কাশী যাবেন বোধ হয়, আমরা দার্জ্জিলিং যেতে পারি। দাদা সেখানে বাড়ী কিনছে।"

মিহির বলিল,—"কোন্ জায়গায়? আমরা যেখানে যাব, তার যদি কাছে হয় ত ভারি মজা হয়।"

জ্ঞানদা বলিলেন,—"তুমি আছ খালি মজার ভাবনায়। দার্জ্জিলিং কত বড়ই বা জায়গা? দূর হলেই বা কত দূর হতে পারে? তবে চড়াই উৎরাই এই যা। আমি ত ওখানে গিয়ে বিপদেই পড়ে যাই। একবার নেমে গেলাম ত উঠতে আর পারি না। ও সব জায়গায় ছেলে-ছোকরাই থাকে ভাল।"

এমন সময় যামিনী উপরে আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল,—"মা, তোমার চা ওপরে দিয়ে যাবে?"

জ্ঞানদা বলিলেন,—"চা কি আমি খাই? তোমার যদি কিছু মনে থাকে? সরবৎ ক'রে পাঠিয়ে দাও গিয়ে। আয়াকে বলো নিয়ে আসতে। ও হতভাগারা আমার ঘরের ধারে কাছে যেন না আসে। ওদের দেখলে আমার হাড় শুদ্ধ জ্বলে যায়। চোরের হাট হয়েছে যেন।"

যামিনী নামিয়া যাইতেছে, এমন সময় জ্ঞানদা আবার তাহাকে ডাক দিলেন। তাহাকে একেবারে কাছে আনিয়া নীচু গলায় ফিস্ ফিস্ করিয়া বলিলেন,—"শিশির এসেছে, ওকে ভাল ক'রে চা-টা খাওয়াও। এও তোদের বলে দিতে হবে? মা বুড়ী চিরকাল থাকবে নাকি? ঘরে যদি বেশী কিছু না থাকে ত ছোট্টুকে পাঠিয়ে মোড়ের দোকান থেকে আনিয়ে নে। চার আনার আনতে বলিস, আর ক'টা কি আনে, তা দেখে নিস্। কালই ত দিনে ডাকাতি করেছে, আজ যেন আর সুবিধে না পায়।"

যামিনী আস্তে আস্তে নামিয়া চলিয়া গেল। মায়ের আদেশমত চার আনা পয়সা দিয়া ছোট্টুকে দোকানে পাঠাইয়া দিল বটে, তবে খাবার আনা হইবার পর সেগুলি গুণিয়া লইতে ভুলিয়া গেল। মিহিরকে এবং তাহার বন্ধুকে ডাকিয়া চা খাইতে বসাইয়া দিল।

জ্ঞানদা যতই রাগ করুন, এবার নৃপেন্দ্রবাবু গায়ের জোরেই একরকম বাড়ি স্থির করিয়া ফেলিলেন এবং রবিবারে যাওয়ার দিনও ঠিক রাখিলেন। যামিনী বাবার আদেশমত জিনিষপত্র অন্ন-বস্ত্র গুছাইতে লাগিল এবং

বাবার প্রতিনিধিস্বরূপ উঠিতে বসিতে মায়ের কাছে তাড়া খাইতে লাগিল।

জ্ঞানদা দেখিলেন ইহারা যাইবেই। অগত্যা স্বামীকে ডাকিয়া পাঠাইলেন। নৃপেন্দ্রবাবু ঘরে ঢুকিতেই বলিলেন,—"বলি, এখনও ত আমি মরিনি, তা এত স্বাধীনতার ঘটা কেন?"

নৃপেন্দ্রবাবু বলিলেন,—"স্বাধীনতাটা কি প্রকার?"

জ্ঞানদা বলিলেন,—"কি প্রকার আবার? যেন কচি খোকা—কিছু জান না। আমি কি বাড়ির কেউ নই নাকি? চেঞ্জে যাওয়া হবে, তা সব পরামর্শ থেকে আমাকে বাদ দেওয়া হচ্ছে কেন শুনি? না হয় টাকাই তুমি রোজগার করে আন, তা বলে ঘর-সংসারের কিছুতে আমার হাত নেই নাকি? এরকম কর ত আমি একেবারে যাবই না।"

দার্জ্জিলিং যাওয়া লইয়া গৃহিণী একটা হৈ-চৈ বাধাইবেন, তাহা নৃপেন্দ্রবাবুর জানাই ছিল। যাওয়াটা নিতান্তই দরকার, অনাবশ্যক গোলমালে পাছে সেটায় বাধা পড়ে, এই ভয়ে নৃপেন্দ্রবাবু কয়েকদিন জ্ঞানদার ঘরের দিকে আসেন নাই। কিন্তু ফল উল্টা হইয়াছে দেখা গেল।

নৃপেন্দ্রবাবু ব্যস্ত হইয়া বলিলেন,—'যা মাথায় আসে তাই বকে যাও। অসুস্থ মানুষ তুমি, অনর্থক তোমাকে হায়রান করা হবে মনে করেই নিজেরা ব্যবস্থা করছিলাম। এতে তোমার এত চটবার কি হ'ল? দার্জ্জিলিং যাবার কথা ত অনেক দিন থেকেই চলেছে, তুমি কিছু আপত্তিও করনি। খালি বলেছিলে, ছেলেপিলেদের সঙ্গে নিতে হবে, তা সেই ব্যবস্থাই ত করা হচ্ছে?"

জ্ঞানদা বলিলেন,—কোথায় বাড়ি নেওয়া হ'ল, কি রকম বাড়ি, ক'খানা ঘর, কত ভাড়া, কিছু আমার জানবার দরকার নেই? তারপর কোথায় একটা ভাঙা কাঠের খাঁচায় নিয়ে গিয়ে তুলবে, তখন যত ভোগ ভুগবে কে? যা ত তোমাদের সাংসারিক জ্ঞান। আর কাজের ভার নিয়েছেন কে,—না খুকি! আজও কোন্ শাড়ীর সঙ্গে কি জামা পরবেন, তা তাঁকে বলে দিতে হয়। তিনি গিন্নি হয়ে যাবার সব ব্যবস্থা ক'রেছেন!"

নৃপেন্দ্রবাবু চটিয়া গেলেন। পকেট হইতে একখানা চিঠি বাহির করিয়া স্ত্রীর খাটের উপর ছুঁড়িয়া দিয়া বলিলেন,—"এই নাও, এতে কোথায় বাড়ি, ক'টা ঘর, কত ভাড়া, সব খবর পাবে। আর আমি কিছু করতে যাব না। বাঁচ, মর যা নিজের খুশী কর গিয়ে,—" বলিয়া তিনি গট্ গট্ করিয়া নামিয়া চলিয়া গেলেন।

নিজের কর্ত্তৃত্ব জাহির করিতে পাইয়া জ্ঞানদা তবু একটুখানি সুস্থ বোধ করিতে লাগিলেন। মেয়েকে ডাকিয়া পাঠাইলেন এবং ঘরে ঢুকিবামাত্র আজ আর তাহাকে বকিতে বসিলেন না। উল্টা বলিলেন,—"কেন অকারণ খেটে সারা হচ্ছিস বাছা, আবার ত সব খুলে গোছাতে হবে? তার চেয়ে এ ঘরে সব বাক্স ডেস্ক নিয়ে আয়, আমি বলে দিচ্ছি কি নিতে হবে না হবে। বাড়িটা মোটে ভাল জায়গায় হ'ল না, তা তোমার বাবার যেমন কাণ্ড! হট্ করে একটা কাজ করে বস্‌লেন। ধারে কাছে চেনা-শুনো কেউ থাকবে না বোধ হয়।"

এমন সময় মিহির লাফাইতে লাফাইতে আসিয়া ঘরে হাজির হইল, চেঁচাইয়া বলিল,—"মা ভারি মজা, শিশিররাও রবিবারে যাচ্ছে দার্জ্জিলিং। বেশ মজা, এক সঙ্গে যাব।"

জ্ঞানদা জিজ্ঞাসা করিলেন,—"ওরা যে কোথায় বাড়ি কিন্‌ছিল না? তা কেনা হয়ে গেল?"

মিহির বলিল,—"কে জানে? অত আমি জানি না। আজ ত বিকেলে শিশিরের দাদা আসবেন, তাঁকে জিগগেষ করো," বলিয়া সে আবার লাফাইতে লাফাইতে চলিয়া গেল।

যামিনীকে কি একটা উপদেশ দিতে গিয়া জ্ঞানদা দেখিলেন, সে তাঁহাদের অলক্ষ্যে কখন নামিয়া চলিয়া গিয়াছে।

৩১

যতই আগে হইতে গুছাইয়া রাখা যাক, ঠিক যাইবার সময়ের জন্য কতকগুলা কাজ পড়িয়া থাকিবেই। পথের খাবার, পানীয় জল, ছাড়া কাপড়ের পোঁটলা। রোগী সঙ্গে থাকিলে, স্পিরিট ল্যাম্প, ওষুধ-বিষুদ, সব কিছুর ব্যবস্থা সেই শেষ মুহূর্ত্তেই করিতে হয়। যামিনী একেবারে দিশাহারা হইয়া পড়িয়াছে। ডাক্তারবাবু আবার কাল

সন্ধ্যায় আসিয়া বাড়ির সকলকে এবং জ্ঞানদাকে আচ্ছা করিয়া বকিয়া গিয়াছেন। এ-রকম যদি করেন তাহা হইলে তিনি চিকিৎসার ভার ত্যাগ করিবেন। রোগী একেবারে স্বাধীন হইলে চলে কখনও? নিজের শরীরের বিষয় নিজেই যদি সবচেয়ে ভাল বোঝা যায়, তাহা হইলে আর ডাক্তার কবিরাজ ডাকা কেন?

জ্ঞানদা অত্যন্ত ক্রুদ্ধ মুখে শুইয়া আছেন। বেশ, তাঁহাকে বাদ দিয়া সংসার চালান এতই যদি সহজ হয়, তা চালাক্ না সবাই? মরিয়া গেলেও তিনি আর একটাও কথা বলিবেন না। যেমন খুশী উহারা জিনিষ গুছাক্, যেমন ভাবে খুশী দার্জ্জিলিং যাক। তিনি যখন ঘাটের মড়ারই সামিল, তখন তাঁহার অত কথায় থাকার কাজ কি?

নৃপেন্দ্রবাবুরও মুখ বিরক্তিতে প্রলয়গম্ভীর হইয়া উঠিয়াছে। সত্যই জ্ঞানদাকে বাদ দিয়া সংসার চালান অত্যন্ত কঠিন বলিয়া তাঁহার রাগটা হইয়াছে আরও বেশী। এতদিন ঘর-সংসারের কাজে সমালোচনা করা ভিন্ন নৃপেন্দ্রবাবু কখনও কিছু করেন নাই। তাই জোর করিয়া সব ভার নিজের মাথায় লওয়ার উৎপাত তাঁহাকে বড়ই বিব্রত করিয়া তুলিয়াছে।

যামিনী বেচারীর আজ কোথাও আশ্রয় নাই। মা রাগ করিয়া মুখ বন্ধ করিয়া আছেন, বাবাও বিরক্তিতে নির্ব্বাক। মাঝ হইতে সব কাজ পড়িয়াছে তাহার ঘাড়ে। সে কোনও দিনও নিজের দায়িত্বে কাজ করিতে অভ্যস্ত নয়, একেবারে হতবুদ্ধি হইয়া পড়িয়াছে। আয়ার সাহায্যে তবু সে কোনও মতে কাজ শেষ করিবার চেষ্টা করিতেছে। আর সময় বেশী নাই, গাড়ী যখন রিজার্ভ করা হইয়াছে তখন যেমন করিয়া হোক, আজকের মধ্যে যাইতেই হইবে; নহিলে অতগুলি টাকা নষ্ট হওয়ার দুঃখে জ্ঞানদা কি যে কাণ্ড করিয়া বসিবেন তাহা ভাবিতেই যামিনীর ভয় করিতেছে।

একরাশ খাবার ইত্যাদি লইয়া যামিনী ডাইনিংরুমে বসিয়া টিফিন বাস্কেট সাজাইবার বৃথা চেষ্টা করিতেছে। ড্রয়িংরুমে ছোট্টু ও ভজু বিছানা বাঁধিতেছে এবং আয়ার সঙ্গে ঝগড়া করিতেছে। মিহির কোথায় গিয়াছে তাহার ঠিকানা নাই, নৃপেন্দ্রবাবু শেষ মুহূর্ত্তে নিজের কতগুলা দরকারী কাজ সারিয়া রাখিতেছেন।

এমন সময় সুরেশ্বর আর শিশির আসিয়া উপস্থিত হইল। নৃপেন্দ্রবাবু বলিলেন,—"এই যে, আসুন। আপনারাও আজ যাচ্ছেন বুঝি?"

সুরেশ্বর একবার চট করিয়া ডাইনিংরুমটা দেখিয়া লইয়া বলিল,—"হ্যাঁ, আজই যাচ্ছি। জিনিষপত্র ত ষ্টেশনে পাঠিয়ে দিয়েছি, দেখতে এলাম আপনাদের কতদূর কি হ'ল। মিহিরের মা আজ কেমন আছেন?"

নৃপেন্দ্রবাবু লিখিতে লিখিতেই বলিলেন,—"ভাল আর কই? ওখানে কোনও মতে নিয়ে গিয়ে ফেল্‌তে পারলে, তবে যদি একটু সাম্‌লান। তিনি পড়ে থাকাতে সকল দিকেই বড় গোলযোগে পড়তে হয়েছে।"

সুরেশ্বর আর তাঁহার কাছে অনাবশ্যক দেরি না করিয়া সোজা খাইবার ঘরে গিয়া উপস্থিত হইল। যামিনীকে জিজ্ঞাসা করিল, "আপনার কিছু সাহায্য করতে পারি?"

যামিনী মুখ লাল করিয়া বলিল,—"আমার কাজ প্রায় হয়ে গেছে। আপনি বসুন, আমি দেখে আসি বিছানাগুলো বাঁধা হ'ল কি না।"

খালিঘরে বসিবার সুরেশ্বরের কোনো উৎসাহ দেখা গেল না। সে যামিনীর পিছন পিছন ড্রয়িংরুমেই আসিয়া বসিল।

সুরেশ্বর নিজেও কিছু কাজের লোক নয়। তবে সে আসাতে কাজের অনেক সাহায্য হইল বটে। আয়া চাকরদের সঙ্গে ঝগড়া ছাড়িয়া উপরে মেম সাহেবকে খবর দিতে প্রস্থান করিল। চাকররাও বাহিরের একজন অভ্যাগতের সামনে ঝগড়া করা অকর্ত্তব্য বোধ করিয়া নিজেদের কাজ চটপট শেষ করিয়া ফেলিল। বাড়িতে থাকিলেই তাহাকে অবিশ্রান্ত ফরমাস খাটিতে হইবে, এই আশঙ্কায় মিহির পাশের বাড়িতে গিয়া লুকাইয়াছিল। এখন শিশির আসিয়াছে শুনিয়া সেও ছুটিয়া আসিয়া উপস্থিত হইল।

সবচেয়ে ভাল হইল এই যে, সুরেশ্বরের আগমনের সংবাদে জ্ঞানদা তাঁহার মৌনব্রত ভঙ্গ করিয়া তাহাকে

উপরে ডাকিয়া পাঠাইলেন। যামিনী তাহাকে সঙ্গে করিয়া মায়ের ঘরে লইয়া গেল। আয়া তাড়াতাড়ি বসিবার জন্য সুরেশ্বরকে একখানা ইজি চেয়ার অগ্রসর করিয়া দিল।

সুরেশ্বর বসিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "আজ কেমন আছেন? এতখানি 'জার্নি', আপনাকে খুবই 'টায়ার্ড' হতে হবে।"

জ্ঞানদা বলিলেন,—"ভাল আর কই? কোনো, মতে মানে মানে পৌঁছে যেতে পারলে বাঁচি, তারপর সেখানে গিয়ে যা হবার তা হবে। আপনাদের গোছান-গাছান সব হয়ে গেছে।"

সুরেশ্বর বলিল,—"আমাদের ত ভারি গোছান, যাচ্ছি, তো মোটে দুজন, আমি আর শিশির। চাকররাই যা করবার তা করেছে, আমরা এখান থেকে সোজা ষ্টেশনে চলে যাব আর কি।"

জ্ঞানদা বলিলেন, "এঁরা যে সব কি করছেন তা এঁরাই জানেন। ট্রেন ফেল না করেন ত চোদ্দ পুরুষের ভাগ্যি। খুকি, তুই যা, কাপড়চোপড় পরে নে। আর ঐ ক্যানভাসের ব্যাগটা বল কাউকে আলমারীর মাথার থেকে নামিয়ে নিতে। যত ছাড়া কাপড়চোপড় ওর ভিতর ঠুসে দিলেই চলবে।"

যামিনী চলিয়া গেল। জ্ঞানদা সুরেশ্বরের সঙ্গে গল্প করিতে করিতেই ঝি-চাকর খাটাইতে লাগিলেন। ব্যাপার দেখিয়া নৃপেনবাবু যথেষ্টই খুশী হইলেন বটে, তবে পাছে খুশীটা স্ত্রীর সামনে প্রকাশ হইয়া পড়ে এই ভয়ে উপরে আর উঠিলেন না।

ষ্টেশনে যাইবার সময় হইয়া আসিল, গাড়ীও আসিয়া দাঁড়াইল। অনেক বকাবকি হইত বোধ হয়, সুরেশ্বর থাকাতে জ্ঞানদা সামলাইয়া গেলেন, যদিও কতকগুলি বড় বড় ত্রুটি ক্রমাগত তাঁহার চোখে খোঁচা মারিতে লাগিল। সুরেশ্বরের গাড়ী ছিল, সুতরাং ঠিকা গাড়ী আর ডাকিতে হইল না। ভাগাভাগি করিয়া দুইখানা গাড়ীর মাথায় জিনিষপত্র তুলিয়া তাঁহারা বাহির হইয়া পড়িলেন। মিহিরও শিশিরদের গাড়ীতেই উঠিয়া পড়িল।

ষ্টেশনে পৌঁছিয়া দেখা গেল সময় আর বেশী নাই। লগেজ-টগেজ করিতে সময় যাইবে, কোনও মতে গাড়ী ধরিতে পারিলেই হয়। জ্ঞানদা বলিলেন,—"যেমন সব কাজের লোক, একেবারে দু-মিনিট থাকতে তবে ষ্টেশনে এসেছেন। নাও, থাক্ এখন জিনিষপত্র পড়ে, না হয় ট্রেন ফেল্ কর, এক কাঁড়ি টাকার শ্রাদ্ধ হোক্।"

নৃপেন্দ্রবাবু বলিলেন,—"তুমি গাড়ীতে ওঠ দেখি, তারপর জিনিষপত্রের ভাবনা আমি ভাব্‌ছি। না হয় আমি জিনিষ নিয়ে কাল যাব।"

জ্ঞানদা বলিলেন,—"তা আর নয়? ছেলেমেয়ে নিয়ে তারপর আমি দার্জ্জিলিঙে বসে এক-কাপড়ে হায় আনন্দ করি আর কি? যাও, যাও, আর এখানে দাঁড়িয়ে বাজে বকে সময় নষ্ট করো না।"

সুরেশ্বর অগ্রসর হইয়া আসিয়া বলিল,—"আপনি উঠুন গাড়ীতে, আমি যাচ্ছি লগেজ করিয়ে আনতে। গার্ডটাকে বলেছি, দু-এক মিনিট দেরি করবে এখন দরকার হলে। আর আমি একদিন পরে পৌঁছলেও কিছু এসে যাবে না, শিশির না হয় একদিন মিহিরের সঙ্গেই থেকে যাবে।" বলিয়া সে কুলিদের সঙ্গে হন্ হন্ করিয়া চলিয়া গেল। যামিনী অত্যন্ত কৃতজ্ঞ দৃষ্টিতে একবার সুরেশ্বরের দিকে চাহিয়া মায়ের সঙ্গে সঙ্গে গাড়ীতে উঠিয়া বসিল।

জ্ঞানদা উঠিয়াই চেঁচাইয়া উঠিলেন, "এই দেখ, যেদিকে আমি না দেখব সেইদিকেই অনাসৃষ্টি কাণ্ড করে বসে থাকবে। রাত্রে পাতবার বিছানাটা নিয়ে গেল কেন বলত লগেজ করাতে? ওগুলো ত ফ্রি। খাবারের বাস্কেটটাও নিয়ে গেছে নাকি? হাঁ্যা গা, হাঁ করে দাঁড়িয়ে কি দেখছ? এটুকুও দেখে শুনে দিতে পার নি? আর ভজা লক্ষ্মীছাড়ার রকম দেখ, তুই যে দশবার ট্রেনে এসেছিস্ গেছিস্, তোরও কোনো আক্কেল নেই?"

ভজা বলিল,—"এই ত খাবারের বাক্স এখানেই রয়েছে মা। আমি ওটা আগলে দাঁড়িয়ে আছি, এমন সময় কুলি বেটারা ছোট বিছানাটা নিয়ে গেছে আর কি? ছাতুখোর বেটাদের কিছু যদি বুদ্ধি আছে।"

জ্ঞানদা তাড়া দিয়া বলিলেন,—"তুই থাম, অপদার্থ কোথাকার। তোর ত ভারি বুদ্ধি। ঐ নাও, ঘণ্টা

দিচ্ছে। মা গো মা, কি কাণ্ড, এখন পরের ছেলে পড়ে না থাকলে বাঁচি। আর জিনিষপত্র সবই ত রইল পড়ে।"

যাহা হউক সুরেশ্বরকে পড়িয়া থাকিতে হইল না। দ্বিতীয় ঘণ্টা দিবার আগেই সে দ্রুতপদে আসিয়া হাজির হইল এবং কুলিরা হুড়মুড় করিয়া যেখানে-সেখানে জিনিষগুলি ঢুকাইয়া দিতে লাগিল। সুরেশ্বর গাড়ীর ভিতর উঠিয়া তাহাদের সাহায্য করিতে লাগিল। সে না থাকিলে একটা হাঁদা কুলি যামিনীর মাথার উপরেই একটা ট্রাঙ্ক বসাইয়া দিত বোধ হয়।

জিনিষ তোলা শেষ হইতে-না-হইতেই গাড়ী দুলিয়া উঠিয়া চলিতে আরম্ভ করিল। কুলিরা পয়সার জন্য হাঁউ-মাউ করিয়া চীৎকার করিতে লাগিল। নৃপেন্দ্রবাবু ব্যস্তভাবে গুটি দুই তিন টাকা প্ল্যাটফর্ম্মে ছুঁড়িয়া দিয়া তাহাদের ভাগ-বাঁটোয়ারা করিয়া লইতে উপদেশ দিতে লাগিলেন।

জ্ঞানদা বলিলেন,—"টাকাকড়ির হিসেব আর তুমি কোনো দিন শিখলে না। চারটে ত কুলি, তিনটে টাকাই অমনি দিয়ে বস্‌লে। কেন আমার কাছে কি ভাঙান পয়সা ছিল না?"

নৃপেন্দ্রবাবু বলিলেন, "হ্যাঁ, গাড়ী ছেড়ে দিয়েছে, এখন ভাঙান পয়সা নিয়ে গুণে গুণে দিতে বসি। সময় কোথায়?"

জ্ঞানদা বলিলেন,—"হ্যাঁ, সময়ের আবার অভাব। কুলিতে কখনও পয়সা না নিয়ে যায়? দমদম্ অবধি ঝুলতে ঝুলতে যেত, তবু পয়সা না নিয়ে ছাড়ত না।"

সুরেশ্বর বেঞ্চিতে বসিয়া কপালের ঘাম মুছিতে মুছিতে বলিল,—"আমি ত বেশ আপনাদের কম্পার্টমেণ্টে থেকে গেলাম। 'নেক্সট্' ষ্টেশনে নেমে যাব এখন।"

জ্ঞানদা উচ্ছ্বসিত হইয়া বলিলেন,—"ভাগ্যে আপনি ছিলেন, তাই কোনোমতে আজ শেষ রক্ষা হ'ল। যা কাণ্ড, বাবা! আমার বড়ছেলে থাকলেও এর চেয়ে বেশী করতে পারত না।"

সুরেশ্বর অতি আপ্যায়িত মুখ করিয়া বসিয়া রহিল। যামিনী একদৃষ্টে জান্‌লা দিয়া বাহিরের দিকে তাকাইয়া রহিল। জ্ঞানদা এটা পছন্দ করিলেন না। ডাকিয়া বলিলেন,—"ও খুকি, আমার সেই স্মেলিং সল্টটা কি হ'ল? একটু চাই যে?"

সুরেশ্বর ব্যস্ত হইয়া বলিল,—"আবার কি আপনার শরীর খারাপ লাগছে।"

জ্ঞানদা বলিলেন,—"একটু লাগছে বইকি? হাজার হোক তাড়াহুড়ো খানিকটা করতে ত হ'ল?"

যামিনী ছোট চামড়ার ব্যাগ খুলিয়া ঔষধের শিশি বাহির করিয়া আনিল। সেটার আবার ছিপি এমন আঁটিয়া গিয়াছে যে, কিছুতেই খোলে না। আবার সুরেশ্বরের সাহায্য গ্রহণ করিতে হইল।

নৃপেন্দ্রবাবু বসিয়া বসিয়া ভাবিতে লাগিলেন,—"ছোক্‌রা বেশ ফরওয়ার্ড আছে। গিন্নীর ঠিক মনের মত।"

জ্ঞানদা ঔষধ আঘ্রাণ করিয়া বলিলেন, "আর ত সব হ'ল, কিন্তু ছুটো দস্যি ছেলে রইল ঐ গাড়ীতে, কেউ বড় নেই। কিছু কাণ্ডকারখানা না ক'রে বসে।"

সুরেশ্বর বলিল,—"আমি ত এখনি যাব। এর মধ্যে আর কি করবে?"

জ্ঞানদা বলিলেন,—"এখন যান, কিন্তু রাত্রে খাবার সময় আপনারা দু-ভাইয়ে এখানে এসে খাবেন।"

সুরেশ্বর খুশীই হইল, তবে মুখে বলিল,—"থাক, আমরা না হয় কেল্‌নারে খেয়ে নেব এখন, আপনাদের আবার অসুবিধা হবে।"

জ্ঞানদা বলিলেন,—"অসুবিধে আবার কিসের? কিছু অসুবিধে হবে না, আপনারা নিশ্চয় আসবেন।"

গাড়ীর বেগ কমিয়া আসিল। ভাল করিয়া থামিতে-না-থামিতেই সুরেশ্বর গাড়ী হইতে লাফাইয়া নামিয়া গেল। জ্ঞানদা বলিলেন,—"ছেলে-ছোক্‌রাদের সব একরোগ।"

রাত্রে শিশির এবং সুরেশ্বর নিমন্ত্রণ রক্ষা করিতে এ গাড়ীতে আসিয়া হাজির হইল। মায়ের নির্দ্দেশমত যামিনী সবাইকে খাবার দিল, যদিও ভজু উপস্থিতই ছিল। জ্ঞানদা তাহাকে স্পিরিট ল্যাম্প জ্বালাইয়া তাঁহার জন্য হর্লিক্‌স্ মিল্ক্ তৈয়ারি করিবার কাজেই নিযুক্ত রাখিয়া দিলেন।

গাড়ী বদল, ষ্টীমারে ওঠা প্রভৃতির সময় সুরেশ্বর ও তাহার চাকর দুইজন যামিনীদের যথেষ্ট সাহায্য করিল। নৃপেন্দ্রবাবু খুব খুশী হইলেন বটে, তবে জ্ঞানদাই এত উচ্ছ্বাস করিতেছেন যে, তিনি আর কিছু বলা প্রয়োজন বোধ করিলেন না।

যামিনী বিশেষ কিছু নিজে হইতে বলিল না। তবে সুরেশ্বর তাহাকে একেবারে নিষ্কৃতি দিল না। হাজারটা প্রশ্ন করিয়া অন্ততঃ কয়েকটার উত্তর আদায় করিয়াই লইল।

মেঘাচ্ছন্ন দিনের সকালে তাহারা দার্জ্জিলিং আসিয়া পৌঁছিল। সুরেশ্বর এবং নৃপেন্দ্রবাবুদের বাড়ি কাছা-কাছিই, তবে একেবারে গায়ে গায়ে নয়।

সুরেশ্বর বলিল,—"আচ্ছা, এখন আমরা তবে আসি। বিকেলে গিয়ে আবার হাজির হব।"

জ্ঞানদা বলিলেন,—"নিশ্চয় আসবেন। শিশিরও যেন আসে।" বলিয়া রিক্‌শতে উঠিয়া বসিলেন।

(ক্রমশঃ)

মন-মর্ম্মর

শ্রীরাধারাণী দেবী

আমার জীবন-বীণা বাজুক্ তোমার করপুটে
রঙ্গে অহরহ !
সকরুণ সুররাগে ঝরিয়া পড়ুক্ টুটে টুটে
দুঃখ যা দুঃসহ !
ঝঙ্কারি উঠুক্ নিত্য চিত্ত ভরি বিচিত্র ভৈরবী
নব-আশাবরী !
ফুটুক্ মর্ম্মের গীতি, প্রীতি সুমধুর স্বপ্নচ্ছবি
—কল্পনা মঞ্জরি !

প্রভাতের পুষ্পবনে স্নেহস্নিগ্ধ শিশির-সম্পাতে
ফুটে ওঠে কলি !
অরুণ আলোক রাগে জাগে ধরা নব চেতনাতে
নিশা-সুপ্তি দলি !
অশ্রুগর্ভ সর্ব্ব গ্লানি গর্ব্বহীন ব্যর্থ ব্যথা যত
অকৃতার্থ-শোক !
হে মোর দেবতা ! তব জ্যোতিঃস্পর্শে কুহেলির মত
অন্তর্হিত হোক্ ।

জীবন-আকাশে প্রাণ ক্ষণদীপ্ত খদ্যোতেরি প্রায়
চমকি মিলায় !
অজ্ঞাত স্রোতের ফুল তীর হ'তে তীরে ভেসে যায়
লহরী-লীলায় !
তারি মাঝে নরনারী প্রেমস্বর্গ রচে ধরণীতে,
—কত অশ্রুহাসি !
মৃত্তিকার মর্ত্ত্যতলে মৃত্যুময়ী মায়া-সরণীতে
ভালবাসাবাসি !

এই স্বল্পকালে তবু ষড়ঋতু অঞ্জলি ভরিয়া
ষড়ৈশ্বর্য্য আনে !
অরণ্যে অরণ্যে পড়ে অমরার অমৃত ঝরিয়া
বিহঙ্গের গানে !
গিরিগুহা-গৃহ টুটি ছুটি চলে কল্লোলিনী নদী
নৃত্য-রসধারে !
প্রভাত-মধ্যাহ্ন-সন্ধ্যা-নিশীথিনী সাজে নিরবধি
রূপ-রত্নহারে ।

দিগন্ত-সীমন্তে যবে দিনান্ত পরায় ধীরে এসে
গোধূলি-সিন্দুর,—
সন্ধ্যার সলজ্জ ছায়া নেমে আসে নববধূ বেশে ।
—আসন্ন-ইন্দুর

অনিন্দ্য রজত আভা হাসে যেন তরঙ্গিনী বুকে
সঙ্কোচে শিহরি !
বনে বনান্তরে বায়ু, ফুলধূলি উড়ায়ে কৌতুকে
সঞ্চরে বিহরি !

আমারও সায়াহ্ন-লগ্ন কোনোদিন এই সন্ধ্যা সম
হবে কি মধুর ?
নবজনমের দূত যবে আসি বার্ত্তা দিবে মম
পরাণ-বঁধুর !
অগণ্য আরতি-দীপে দিবসের বিরহ ভুলাবে
নক্ষত্র-কিরণ !
জীবনের দাবদাহ্ নিবারিয়া চামর ঢুলাবে
মৃত্যু-সমীরণ !

যাঁর স্নেহ সুধারসে তৃপ্তি লভি অন্তরে আমার
তীব্র পিপাসায় !
জাগ্রতের জ্বালাময় দীপ্ত দুঃখ থাকি ভুলে যাঁর
না-বলা ভাষায় !
অদৃশ্য যাঁহার রূপে মানস নয়ন মুগ্ধ মোর
জন্ম জন্ম ভরি !
তাঁরি করে যেন সর্ব্ব দুঃখ সুখ ব্যথা অশ্রুলোর
সমর্পণ করি !

জনশূন্য প্রান্তরের দিশাহীন বিস্তৃতির মাঝে
সন্ধ্যার তিমিরে,—
পদচিহ্ন-আঁকা-পথ ক্ষীণ রেখা কোথায় বিরাজে
অন্বেষিয়া ফিরে
দিগ্‌ভ্রান্ত পান্থ যথা অচেনা প্রবাসে সঙ্গীহীন ;
—তেমনি জগৎ
অনাদি অনন্তকাল সন্ধানিছে চির রাত্রিদিন,—
—কোথা ধ্রুবপথ !

মেলেনি উদ্দেশ আজও, আজও যারে কেহ নাহি চিনে,
জানে শুধু নাম !
পরম রহস্যময় অপার্থিব সেই বন্ধু বিনে
বৃথা বাঁচিলাম !
সেই সে না-পাওয়া লাগি অহরহ ঝুরিছে পরাণ
শূন্যতারি মাঝে ।
জীবন-বাঁশীতে মোর উদাসীর অশ্রুসিক্ত গান
রন্ধ্রে রন্ধ্রে বাজে ।

দশভুজা

শ্রীরমাপ্রসাদ চন্দ

মহিষাসুর নাশে নিরতা দশভুজা নারীপ্রতিমা চারুশিল্পের নিদর্শন (work of art) রূপে গঠিত করা অসাধ্য সাধন বলিয়া বিবেচিত হইতে পারে। বাঙ্গালা দেশে যাহারা দশভুজার উপাসক তাহারা মহিষমর্দ্দনকে আগমনীর অঙ্গে, অর্থাৎ দশভুজার পুত্রকন্যাসহ পিতার আলয়ে আগমনের ভঙ্গীতে পরিণত করিয়া, মহিষমর্দ্দিনী গঠন শিল্পীর সাধ্যাতীত করিয়া তুলিয়াছে। পাশ্চাত্য শিল্প-ভাণ্ডারে মহিষাসুরের ন্যায় অর্দ্ধ নর অর্দ্ধ পশু আকারের দৈত্য-দানবের অভাব না থাকিলেও দশভুজা নারী মূর্ত্তি পাশ্চাত্য কল্পনার বহির্ভূত। সুতরাং পাশ্চাত্য দর্শকগণ যখন ভারতবর্ষে আসিয়া প্রাচীন মহিষমর্দ্দিনী মূর্ত্তি দেখিতে পাইয়াছেন তখন এইরূপ মূর্ত্তিকে চারুশিল্পের নিদর্শন রূপে স্বীকার করিতে পারেন নাই। পূর্ণমাত্রায় স্বভাবসঙ্গত নয় বলিয়া এদেশের প্রাচীন নর-নারী মূর্ত্তিতেও তাঁহারা অনেক দিন কোন সৌন্দর্য্য দেখিতে পায়েন নাই।

এইরূপ ঘটনার কারণ, উনবিংশ শতাব্দের শেষ পর্য্যন্ত ইউরোপের কলা-রসিকগণ চারুশিল্পের বা আর্টের লক্ষণ সম্বন্ধে যে সংস্কার পোষণ করিতেন তদনুসারে অংশতঃ অস্বাভাবিক দ্বিভুজ এবং স্বভাববহির্ভূত চতুর্ভুজ ষড়ভুজ অষ্টভুজ বা দশভুজ নর-নারী মূর্ত্তি শিল্প নিদর্শন (work of art) বলিয়া স্বীকার করা সম্ভব ছিল না। খৃষ্টীয় অষ্টাদশ শতাব্দীর আরম্ভ হইতেই ইউরোপের দার্শনিকগণ আর্টের লক্ষণ আলোচনা করিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন। অষ্টাদশ এবং উনবিংশ এই দুই শতাব্দী ব্যাপী আলোচনার ফলে সিদ্ধান্ত হইয়াছিল, আর্টের উদ্দেশ্য সৌন্দর্য্যসৃষ্টি। কিন্তু সৌন্দর্য্য কি তাহা লইয়া মতভেদ ছিল। কাহারও মতে সৌন্দর্য্য সত্য এবং শিব হইতে অভিন্ন স্বপ্রকাশ বস্তু। আবার কাহারও মতে যাহা আনন্দ উৎপাদন করে তাহা সুন্দর। ১৮৯৮ সালে প্রকাশিত 'চারুশিল্প কি'? (What is Art?) নামক পুস্তকে প্রসিদ্ধ রুষীয় ঔপন্যাসিক টলষ্টয় পূর্ব্ব মত-সকল খণ্ডন করিয়া আর্টের এই নূতন লক্ষণ স্থাপন করিয়াছিলেন—

> Art is a human activity consisting in this, that one man consciously by means of certain external signs, hands on to others feelings he has lived through and that others are infected by these feelings and also experience them.

> মানুষের এইরূপ কর্ম্মকে আর্ট বলে—একজন লোক রাগ-দ্বেষাদি যে-সকল রস স্বয়ং অনুভব করিয়াছে তাহা জ্ঞানতঃ বাহ্য সঙ্কেতের দ্বারা অন্য লোকের মধ্যে সঞ্চারিত করে, এবং (ফলে) অন্য লোকেরা ঐ রসে অভিভূত হয় এবং তাহা অনুভব করে।

সুপ্রসিদ্ধ নাট্যকার জর্জ্জ বার্ণার্ড শ টলষ্টয়ের এই গ্রন্থের সমালোচনায় লিখিয়াছিলেন—

> Tolstoy's main point, however, is the establishment of his definition of art. It is, he says, "an activity by means of which one man, having experienced a feeling, intentionally transmits it to others." This is the simple truth; the moment it is uttered, whoever is conversant with art recognizes in it the voice of the master. None-the less is Tolstoy perfectly aware that this is not the usual definition of art, which amateurs delight to hear described as that which produces beauty.*

> টলষ্টয়ের প্রধান উদ্দেশ্য হইতেছে আর্টের লক্ষণ নিরূপণ করা। তিনি বলেন, "একজন মানুষ কোনও রস স্বয়ং অনুভব করিয়া যে কাজের দ্বারা ইচ্ছা পূর্ব্বক তাহা অন্যেতে সঞ্চারিত করে সেই কাজ আর্ট।" এই কথা সহজ সত্য। যে মুহূর্ত্তে এই কথা কথিত হয়, যাহার আর্টের সহিত যথার্থ পরিচয় আছে সে তৎক্ষণাৎ উহাতে অভ্রান্ত বাণী শুনিতে পায়। তথাপি টলষ্টয় খুব ভালরূপে জানেন যে ইহা আর্টের প্রচলিত লক্ষণ নহে। যে-লক্ষণ শুনিলে সৌখীনেরা আনন্দিত হয় সেই লক্ষণ হইতেছে, "যাহা সৌন্দর্য্য উৎপাদন করে তাহা আর্ট।"

আর্টতত্ত্ব বিচারে টলষ্টয়ের এই অভিমত কি যুগান্তর উপস্থিত করিয়াছে তাহা প্রসিদ্ধ আর্ট সমালোচক রোজার ফ্রাই-এর ভাষায় বিবৃত করিব—

> আমার যৌবনকালে রসতত্ত্ব (aesthetic) বিষয়ক সমস্ত বাদানু-

---

* Bernard Shaw : *Pen Portraits and Reviews.*
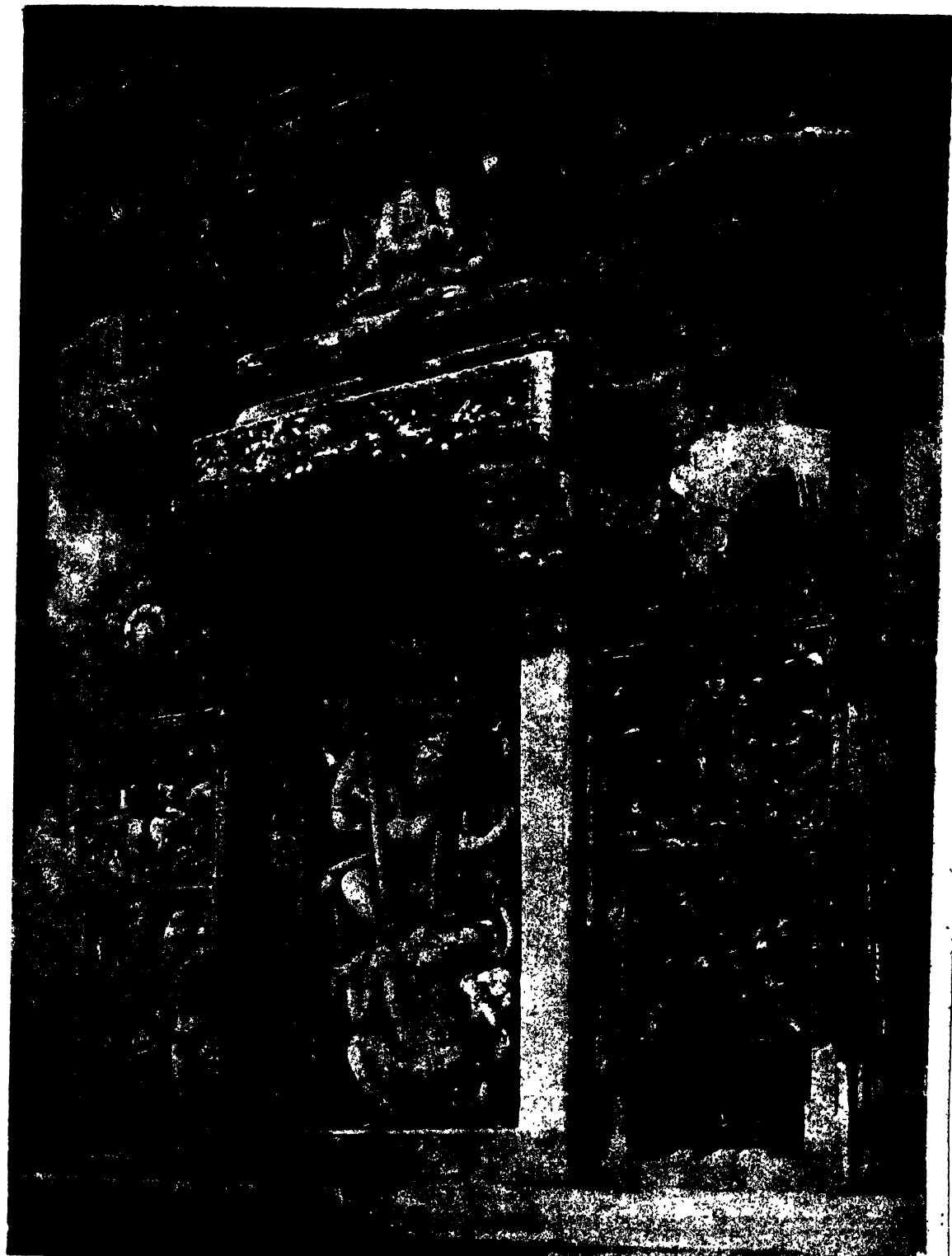
ভুবনেশ্বরের বৈতাল দেউলের মহিষমর্দিনী
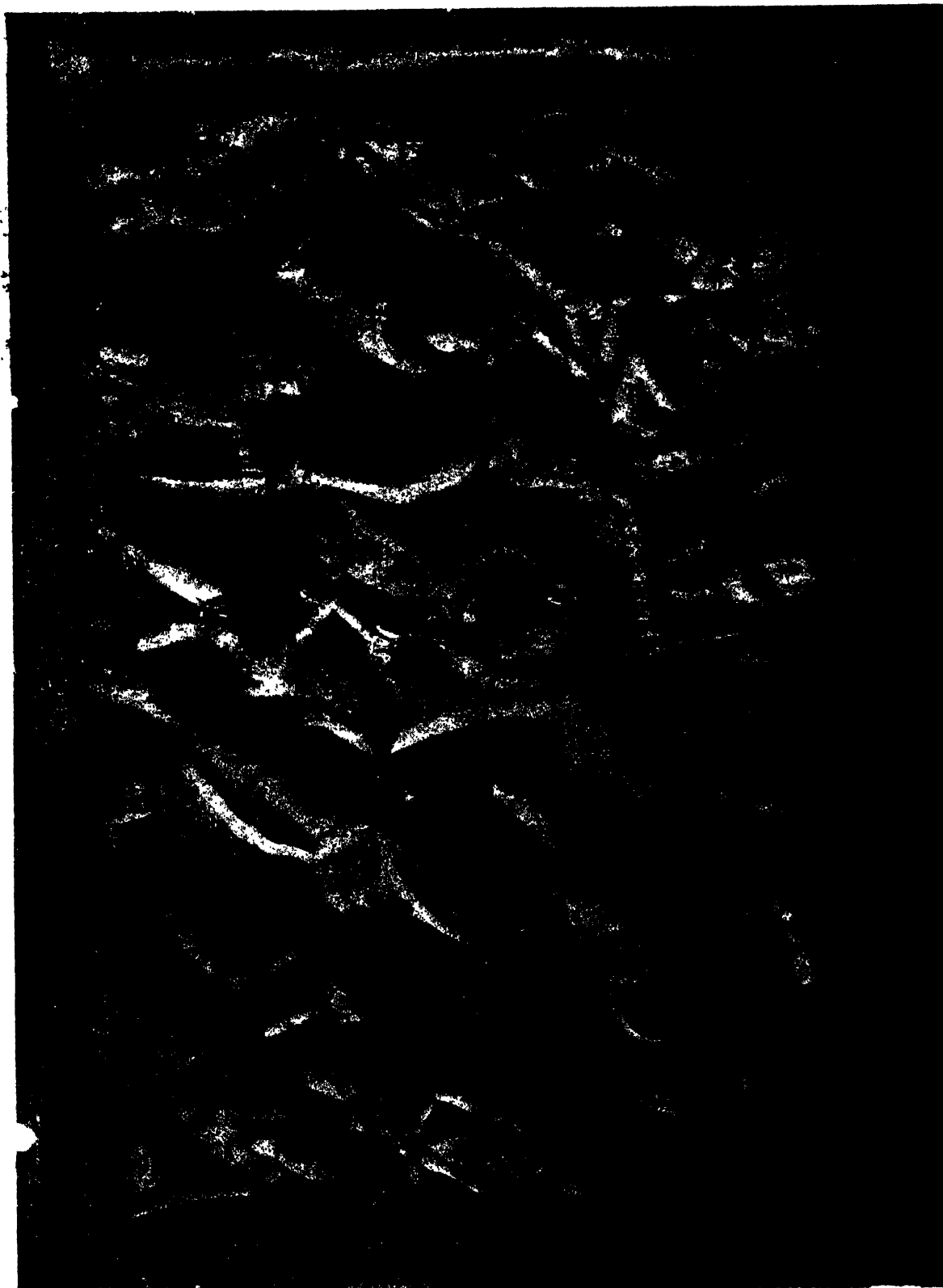
দ সৌন্দর্য্যের স্বরূপ কি এই প্রশ্নকে ঘিরিয়া অবিরত ঘূর্ণপাক ইয়াছে। আমাদের পূর্ব্ববর্ত্তীগণের মত আমরাও, কি শিল্পে, কি ভাবে, সৌন্দর্য্যের সারতত্ত্ব অনুসন্ধান করিতাম। এই অনুসন্ধান র্বদাই (আমাদিগকে) পরস্পরবিরোধী যুক্তিজালের মধ্যে ফেলিত, থবা এমন অস্পষ্ট আধ্যাত্মিকভাব উদ্রিক্ত করিত যাহার সহিত নিদর্শন বস্তুর সম্বন্ধ নিরূপণ করা অসম্ভব।

টলষ্টয়ের প্রতিভা আমাদিগকে এই বিপত্তি হইতে রক্ষা করিয়াছিল। আমার নে হয়, "আর্ট কি" (What is Art ?) নামক পুস্তকের প্রকাশের তারিখ হইতে সতত্ত্বের সার্থক আলোচনা আরম্ভ হইয়াছে। বিভিন্ন শিল্পনিদর্শনের সম্বন্ধে টলষ্টয়ের বিকট ত আমাদের মধ্যে আদর লাভ করে নাই কিন্তু টলষ্টয়ের রসতত্ত্ব সম্বন্ধে পূর্ব্ব মতবাদ মূহের সূক্ষ্ম সমালোচনা, এবং সর্ব্বোপরি স্বভাবের মধ্যে (in nature) যাহা সুন্দর তাহার সহিত আর্টের কোন বিশেষ বা কোন আবশ্যক সম্বন্ধ নাই, এবং মানবদেহের সৌন্দর্য্যের প্রতি অসঙ্গত এবং অত্যধিক অনুরাগের ফলে গ্রীক ভাস্কর্য্য অকালে অধঃপাতে গিয়াছিল, সুতরাং চিরকালের জন সেই ভুল লইয়া ভুলিয়া থাকা আমাদের পক্ষে যুক্তিযুক্ত নহে, টলষ্টয়ের এই সকল মন্তব্য আমাদিগের আদরণীয়।'

* * *

টলষ্টয় বুঝিয়াছিলেন যে আর্টের সার কথা, মানুষের মধ্যে ভাব বিনিময়ের আর্ট একটি বাহন। তিনি মনে করিয়াছিলেন আর্ট রসের বিশিষ্ট ভাষা। * * * যে সৌন্দর্য্য অন্য কোথাও পূর্ব্বাবধি আছে শিল্প নিদর্শন তাহার বিবরণ মাত্র নহে, কিন্তু শিল্পী যে রস স্বয়ং অনুভব করিয়াছেন এবং দর্শককে অনুভব করান, শিল্প সেই রসের আধার।" *

মানবদেহের স্বাভাবিক সৌন্দর্য্যের প্রকাশই শিল্পের লক্ষ্য গ্রীক শিল্পের অক্ষুণ্ণ প্রভাবের ফলে এই সংস্কার বদ্ধমূল থাকায় ইউরোপে ভারতবর্ষের প্রাচীন ভাস্কর্য্য অনেক কাল আদর লাভ করিতে পারে নাই। টলষ্টয় কর্ত্তৃক এই ভুল সংস্কার দূরীভূত হওয়ায় কেবল ভারতীয় এবং চৈনিক শিল্প নয়, আমেরিকার মর-শিল্প, নিগ্রোজাতির চিত্র এবং ভাস্কর্য্যও ইউরোপে আদর লাভ করিয়াছে, এবং অনেক ইউরোপীয় চিত্রকর এবং ভাস্কর গ্রীক আদর্শ ত্যাগ করিয়া বিদেশীয় আদর্শের অনুসরণ করিতেছেন। আমাদের
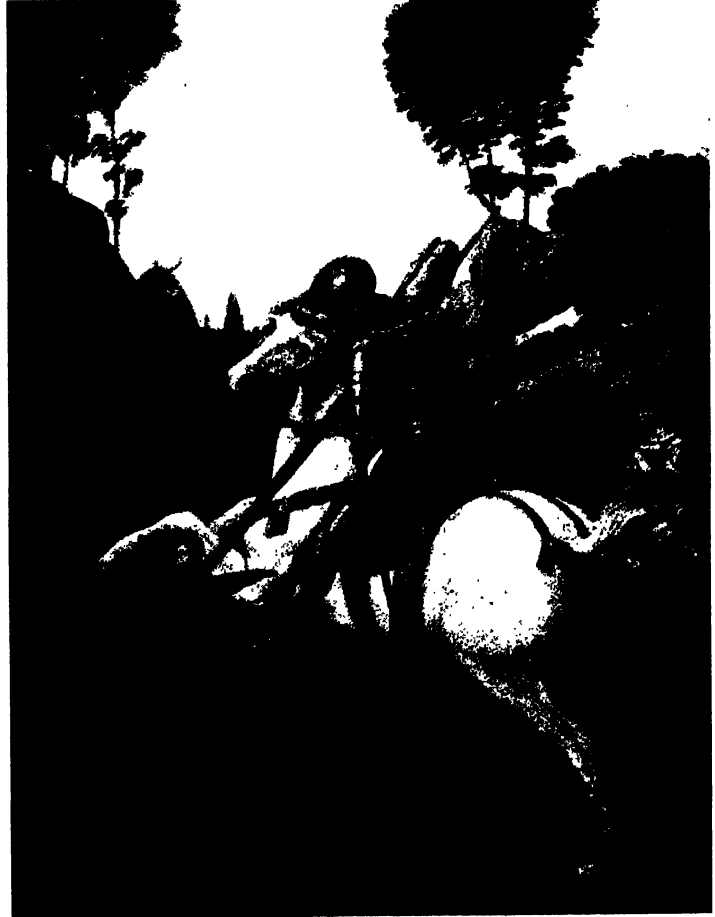
১নং চিত্র। রাফেলের অঙ্কিত ড্রেগন বিনাশে রত সেণ্ট জর্জ্জ
(*The Medici Masters in colour series No. 1* হইতে)

দেশের আলঙ্কারিকেরা কাব্যের যে লক্ষণ নির্দ্দেশ করিয়া গিয়াছেন তাহা টলষ্টয়ের কথিত আর্টের লক্ষণের অনুরূপ। সাহিত্য দর্পণকার লিখিয়াছেন—

বাক্যং রসাত্মকং কাব্যম্।

* "In my youth all speculations on æsthetics had revolved with wearisome persistence around the question of the nature of beauty. Like our predecessors we sought for the criteria of the beautiful, whether in art or nature. And always this search led to a tangle of contradictions or else to metaphysical ideas so vague as to be inapplicable to concrete cases.

রস যে বাক্যের সার বা প্রাণ বাক্য সেই কাব্য। রসহীন বাক্য কাব্য নহে।

২নং চিত্র। মেরে নির্ম্মিত বৃষাসুর বিনাশে রত মিথ্রসের মূর্ত্তি
(Stanley Casson প্রণীত *Some Modern Sculptures* হইতে)

"যাহা আস্বাদন করা যায় তাহা রস", এই বুৎপত্তি অনুসারে ভাব এবং ভাবের আভাসকে রস বলে। সংস্কৃত ভাব শব্দ ইংরেজী idea, thought-ও বুঝায়, এবং feeling, emotion-ও বুঝায়। রস শব্দ feeling অথবা emotion অর্থে ব্যবহৃত হয়। সুতরাং যে বাক্য বক্তার মনের রস (feeling, emotion) শ্রোতার নিকট বহন করে অর্থাৎ তাহার চিত্তে সঞ্চারিত করে তাহার নাম কাব্য। কাব্যের ন্যায় চিত্র ভাস্কর্য্য স্থাপত্য এবং সঙ্গীত ও ললিত কলা বা চারুশিল্পের পর্য্যায়ভুক্ত, সুতরাং এই সকল কলাও একই লক্ষণাক্রান্ত। এই হিসাবে চিত্রের এবং ভাস্কর্য্যের লক্ষণ হইতেছে, যে রূপ (form) শিল্পীর হৃদয়ে ভাব বা রস (emotion) দর্শকের চিত্তে সঞ্চারিত করে সেই চিত্র বা মূর্ত্তি চারুশিল্পের নিদর্শনরূপে গণ্য। সুতরাং 'সাহিত্য দর্পণ'-কারের কথিত কাব্যের লক্ষণের এবং টলষ্টয়ের কথিত আর্টের লক্ষণের মধ্যে কোনও প্রভেদ দেখা যায় না।

ইংরেজ সমালোচক ক্লাইব বেল (Clive Bell) চারুশিল্পের যে লক্ষণ নির্দ্দেশ করিয়াছেন তাহাতেও স্বভাবের অনুকরণকে মুখ্য স্থান দেওয়া হয় নাই। তিনি বলেন, সার্থক রূপ (significant form) চারুশিল্পের চারুতার পরিচায়ক। যেমন গোলাপ ফুলের সৌন্দর্য্য স্বয়ম্ভু,: অন্য কোন পদার্থের অনুরূপ বলিয়া গোলাপ ফুল সুন্দর নহে, তেমনি শিল্প নিদর্শনের সৌন্দর্য্যও স্বয়ম্ভু, কোন স্বাভাবিক পদার্থ হইতে ধার করা নহে। সুতরাং বহুভুজ

It was Tolstoy's genius that delivered us from this *impasse*, and I think that one may date from the appearance of *What is art?* the beginning of fruitful speculation in æsthetic. It was not indeed Tolstoy's preposterous valuation of works of art that counted for us, but his luminous criticism of past æsthetic systems, above all, his suggestions that art had no special or necessary concern with what is beautiful in nature, that the fact that Greek sculpture had run prematurely to decay through an extreme and non-æsthetic admiration of beauty in the human figure afforded no reason why we should for ever remain victims of their error.

* * * Tolostoy saw that the essence of art was that it was a means of communication between human beings. He conceived it to be *par excellence* the language of emotion.......Work of art was not the record of beauty already existent elsewhere, but the expression of an emotion felt by the artist and conveyed to the spectator."---Roger Fry, *Vision and Design*, "Retrospect."

Copyright : Archaeological Survey of India.

৩ নং চিত্র। এলুরার কৈলাসনাথ মন্দিরে দুর্গার মহিষাসুরের সহিত যুদ্ধের চিত্র।

দেব-দেবী মূর্ত্তি শিল্পের যোগ্য বিষয় নহে এমন কথা বলা যাইতে পারে না। প্রাচীন ভারতীয় ভাস্কর্য্যের যত নিদর্শন এ যাবৎ আবিষ্কৃত হইয়াছে তাহার অধিকাংশই বহুভুজ এবং বহুভুজা দেব-দেবীর মূর্ত্তি। এই সকল দেব-দেবীর অসংখ্য মূর্ত্তি এবং চিত্র ভারতবর্ষে এবং ভারতবর্ষের বাহিরে যে-সকল দেশে মহাযান বৌদ্ধমত প্রচলিত আছে সেই সকল দেশে এখনও নির্ম্মিত হইতেছে। অপরিচিত বলিয়া এই সকল মূর্ত্তি পাশ্চাত্য সমাজে আদর লাভ করিতেছে না। পূজার সামগ্রী বলিয়া এদেশের লোকের এই সকল মূর্ত্তির শিল্প-কৌশলের দিকে লক্ষ্য নাই। দুর্ভাগ্যক্রমে এদেশের লোকের মূর্ত্তি-শিল্পের রসাস্বাদের শক্তিও প্রায় লুপ্ত হইয়াছে, এবং

অনেক দিন ধরিয়া সরস মূর্ত্তিও গঠিত হইতেছে না। প্রাচীন ভাস্কর্য্যের রসের বিচার এই আস্বাদনী শক্তির পুনরুজ্জীবনের, এবং চারুশিল্প পুনরুজ্জীবনের উপায় বলিয়া

Copyright: Archaeological Survey of India.
৪নং চিত্র। ভুবনেশ্বরের বৈতাল দেউলের মহিষমর্দ্দিনী।

স্বীকৃত হয়। আমি এই প্রস্তাবে কয়েকখানি প্রাচীন দশভুজা মূর্ত্তির আলোচনা করিব। অনেক প্রাচীন দশভুজা মূর্ত্তির রসবত্তা অতি বিস্ময়কর। রসবত্তার আশ্রয় সজীবতা। যাহা নির্জীব, যাহা জড়, তাহাতে রস থাকিতে পারে না। আমাদের অনেক প্রাচীন দশভুজা মূর্ত্তি যেমনই সজীব তেমনই সরস। বর্ত্তমান যুগের শিল্পামোদীরা জিজ্ঞাসা করিতে পারেন, দেবীমূর্ত্তির এই রস কি স্বতন্ত্র, না অন্য ভাবের—ধর্ম্ম ভাবের অনুগত? মূর্ত্তির রস যদি স্বতন্ত্র না হয়, ধর্ম্ম ভাবের অনুগত হয়, তবে তাহা নিষ্কাম শিল্প (art for art's sake) বলিয়া গণ্য হইতে পারে না, তাহা সকাম শিল্প। প্রাচীনকালে যে-সকল শিল্পী মূর্ত্তি গড়িত এবং মন্দির গড়িত এবং অলঙ্কৃত করিত তাঁহারা নিষ্কাম শিল্প কি জানিত না; তাঁহারা কামনা (ulterior ends) লইয়াই গড়িত। কিন্তু তাঁহাদের অনেক সৃষ্ট নিষ্কাম শিল্পের মাপকাঠি দিয়া মাপিলেও খাট হয় না। প্রাচীন দশভুজা মূর্ত্তির মধ্যে এইরূপ নিদর্শনের অভাব নাই। অবিরত প্রাচীন গ্রীক এবং ইটালীয় রিনেসঁস্ (renaissance) শিল্প সেবনের ফলে শিল্পে নৈসর্গিক সৌন্দর্য্যের বিকাশ সম্বন্ধে যে পক্ষপাত জন্মিয়াছে তাহা বর্জ্জন করিয়া এই সকল মূর্ত্তির প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে দেখা যাইবে, যে পৌরাণিক হিন্দুধর্ম্মের ধার ধারে না, এবং পৌরাণিক আখ্যায়িকা জানে না, শিল্পে রুচি সম্পন্ন এমন দর্শকও এই সকল মূর্ত্তির রসবত্তা উপলব্ধি করিবেন।

দশভুজা মূর্ত্তির বিষয় দেবতা কর্ত্তৃক অসুর বা দৈত্য বিনাশ। সকল সভ্য জাতির মধ্যেই এই প্রকার আখ্যায়িকা প্রচলিত আছে এবং সকল শিল্পানুরাগী জাতির চিত্রকর বা ভাস্করই এই প্রকার আখ্যায়িকা চিত্রিত করিতে চেষ্টা করিয়াছে। দশভুজার মহিষাসুর বিনাশের চিত্রের রসবত্তার সহিত তুলনা করিবার জন্য আগে দুইখানি ইউরোপীয় নিদর্শনের সংক্ষিপ্ত পরিচয় দিয়া লইব।

প্রথম নিদর্শন (১নং চিত্র) র‍্যাফেলের অঙ্কিত সেণ্ট জর্জ্জ কর্ত্তৃক ড্রেগন বিনাশের চিত্র। ১৫০৬ সালে, ছাব্বিশ বৎসর বয়সের সময় র‍্যাফেল যখন ফ্লোরেন্সে অবস্থান করিতেছিলেন তখন এই চিত্র অঙ্কিত করিয়াছিলেন। এই চিত্রের পৃষ্ঠপটের (background) প্রাকৃতিক দৃশ্য অতিশয় কৌশলে অঙ্কিত হইয়াছে। দুই দিকের দুইটি

পাহাড় আকারে বিসদৃশ হইলেও সুন্দররূপে দুই দিকের ছন্দের মিল বা ওজন রাখিয়াছে। মাঝখানে সেণ্ট জর্জ্জের প্রতিকৃতি দৃশ্যটিকে প্রায় সমান দুই ভাগে বিভক্ত করিয়া গৃহপ্রাচীরের অলঙ্কারের হিসাবে (decorative value) চিত্রখানির মহিমা বৃদ্ধি করিয়াছে। সেণ্ট জর্জ্জের মূর্ত্তি বীররস প্রকাশক, কিন্তু এই রসে চঞ্চলতার চিহ্ন নাই। এই বীররস অশুভ নাশে রত সেণ্ট (saint) জনোচিত শান্তভাব মিশ্রিত। সেণ্ট জর্জ্জ অশ্বপৃষ্ঠে বসিয়া ধীরভাবে ড্রেগনকে বর্শার দ্বারা বিদ্ধ করিতেছেন এবং স্থির দৃষ্টিতে তাহার দিকে চাহিয়া আছেন। বর্শা-বিদ্ধ ড্রেগন দংশন করিবার জন্য মস্তক উত্তোলন করায় সম্মুখের পা বাঁচাইবার জন্য সেণ্টের ঘোড়া লাফাইয়া উঠিয়াছে। কিন্তু এই লম্ফও যেন সংযত।

দ্বিতীয় নিদর্শন (২ নং চিত্র) উনবিংশ শতাব্দীতে প্রাদুর্ভূত ফরাসী ভাস্কর বেরে (Barye) গঠিত বৃষাসুর (Minotaur) বিনাশে রত গ্রীক পৌরাণিক বীর থিসুস (Theseus)এর মূর্ত্তি। এই মূর্ত্তি ১৮৪৮ সালে নির্ম্মিত হইয়াছিল। প্রাণভয়ে ভীত বৃষাসুর উন্মত্তের মত আকুল ব্যাকুল হইয়া থিসুসকে জড়াইয়া ধরিয়াছে। থিসুস স্থির দৃষ্টি ধীর ভাবে লক্ষ্য করিয়া অসুরের মস্তকে ছোরা বিদ্ধ করিতেছে। কিন্তু থিসুসের প্রশান্ত গম্ভীর মুখমণ্ডলের সহিত তাহার স্ফীত ত্রস্ত মাংসপেশীগুলির ছন্দের মিল নাই। বেরের এই মূর্ত্তি গ্রীক আদর্শে গঠিত। মাংসপেশীর প্রাধান্য অনেক গ্রীক নগ্ন মূর্ত্তির প্রধান দোষ। রাফেল বর্ম্ম পরিধান করাইয়া সেণ্ট জর্জ্জের চিত্রকে এই দোষ হইতে বাঁচাইয়াছেন।

দশভুজার প্রাচীন প্রতিকৃতির মধ্যে আমরা প্রথম উল্লেখ করিব মামল্লপুরের (মহাবলিপুরের) মহিষমণ্ডপের প্রাচীরগাত্রে খোদিত দুর্গার সহিত মহিষাসুরের যুদ্ধের চিত্র (স্বতন্ত্র মুদ্রিত চিত্র ক)। এই খোদিত চিত্রের প্রথম উদ্দেশ্য মণ্ডপের প্রাচীরের শোভা সম্পাদন করা। অলঙ্কারের হিসাবে এই চিত্র চমৎকার। চিত্রের একার্দ্ধে শিবগণে পরিবৃতা সিংহবাহিনী দুর্গা, আর একার্দ্ধে অসুর সৈন্যসহ মহিষাসুর। মহিষাসুর সসৈন্য রণক্ষেত্র হইতে পলায়ন করিতেছেন; দুর্গা সগণ অগ্রসর হইতেছেন। সিংহের দংষ্ট্রাহত একটি অধঃশির অসুরের পৃষ্ঠের চিত্রের দিকে দৃষ্টি করিলে দেখা যায় শিল্পী কিরূপ সাবধানে দুই দিকের ওজন (balance) সমান রাখিয়াছেন; কিন্তু বিজয়ী দেবীর সেনা এবং পশ্চাৎপদ অসুর সেনার পার্থক্যও

Copyright : Archaeological Survey of India.

৫নং চিত্র। ময়ূরভঞ্জের প্রাচীন রাজধানী খিচিঙ্গের মহিষমর্দ্দিনী।

সুন্দর দেখান হইয়াছে। এই চিত্রের ছোট বড় সকল মূর্ত্তিই সজীব এবং স্বতন্ত্র; কোনও মূর্ত্তিই অপর কোন মূর্ত্তির ঠিক অনুরূপ নহে; অথচ সেনাশ্রেণীর চিত্রে একাকার মূর্ত্তি থাকিলে দোষ হয় না। এক একবার মুখ ফিরাইয়া দেবীর দিকে চাহিয়া পশ্চাদগামী মহিষাসুরের গমনশীলতা পরিষ্কার ফুটিয়া উঠিয়াছে।

সিংহপৃষ্ঠে আরোহণ করিয়া যুদ্ধে রতা দশভুজার মূর্ত্তি অঙ্কনে শিল্পী অসাধারণ নৈপুণ্য প্রকাশ করিয়াছেন। দেবী পুরুষের মত বাহনের দুই পার্শ্বে দুইখানি পা ঝুলাইয়া বসিয়া যুদ্ধ করিতেছেন। দশখানি হাতের আটখানি মাত্র দেখান হইয়াছে। এক এক দিকের চারিখানি হাতের ক্রিয়ার মধ্যে এমন ঐক্য রহিয়াছে, মনে হইতেছে যেন আটখানি হাত দুইখানি হাতের মত অস্ত্র সঞ্চালন করিতেছে। দেবী ধনুর্গুণ আকর্ণ টানিয়া পলায়নপর মহিষাসুরের প্রতি শর লক্ষ্য করিতেছেন। দেবীর অঙ্গভঙ্গীতে লক্ষ্য-ক্রিয়ার উপযোগী চিত্তবৃত্তি চমৎকার প্রতিফলিত হইয়াছে। এই পাষাণ-চিত্র সম্ভবতঃ খৃষ্টীয় সপ্তম শতাব্দে অঙ্কিত হইয়াছিল।

মামল্লপুরের মহিষমণ্ডপের এবং অন্যান্য মণ্ডপের মত পাহাড় কাটিয়া কাটিয়া খৃষ্টীয় অষ্টম শতাব্দে এলুরায় কৈলাসনাথের মন্দির সৃষ্টি করা হইয়াছিল। এই মন্দিরের প্রাচীরে অঙ্কিত দশভুজার সহিত মহিষাসুরের যুদ্ধ ৩ নং চিত্রে প্রদর্শিত হইল। এই চিত্রের উপরিভাগের অন্তরীক্ষচারী ইন্দ্রাদি দেবগণের এবং সিদ্ধবিদ্যাধরগণের সঙ্ঘ (group) এক রকমের অনেক মূর্ত্তি পূর্ণ এবং স্থান সংস্থানের (spatial organizationএর) হিসাবে অশোভন। নিম্নে দেবীর এবং মহিষাসুরের পার্শ্বে কোন প্রতিযোগী মূর্ত্তি না থাকায় দ্বন্দ্বযুদ্ধ ফুটিয়াছে ভাল। দেবী একদিকে দুই পা ঝুলাইয়া সিংহপৃষ্ঠে বসিয়া মহিষাসুরকে লক্ষ্য করিয়া শর সন্ধান করিতেছেন। চারিটি শরাহত অপেক্ষাকৃত হীনবল অসুরপতি গদা তুলিয়া সংহতবেগে দেবীকে আক্রমণ করিতে অগ্রসর হইতেছেন। দশভুজার এই মূর্ত্তি বীররসের সাক্ষাৎ বিগ্রহ।

দেবীযুদ্ধের এই দুইখানি চিত্র দ্রাবিড় শিল্পের উৎকৃষ্ট নিদর্শন। ক্রীয়াশীলতা বা কর্ম্মযোগ দ্রাবিড় শিল্পের প্রাণ। দ্রাবিড় মূর্ত্তি প্রচার করিতেছে, "যুদ্ধস্ব ভারত।" খৃষ্টাব্দের প্রায় আরম্ভ হইতে দেখা যায়, আর্য্যাবর্ত্তে গঠিত মূর্ত্তি সম্পূর্ণ অন্য প্রকার; তাহার প্রাণ ধ্যানযোগ। বুদ্ধের বা জিনের মত আর্য্যাবর্ত্তে দেব-দেবীর মূর্ত্তিও নাসাগ্রবদ্ধদৃষ্টি ধ্যানরত। নাসাগ্রবদ্ধ দৃষ্টি চিত্তের একাগ্রতার এবং অন্তর্মুখীনতার পরিচায়ক। আর্য্যাবর্ত্তের প্রাচীন দেবমূর্ত্তির দেবত্বের প্রধান লক্ষণ অন্তর্মুখীনতা, এবং আর্য্যমূর্ত্তি প্রচার করিতেছে "ধ্যান কর।" ধ্যানযোগ যেখানে দেবমূর্ত্তির দেবত্বের সূচনা করে সেখানে মহিষমার্দ্দিনীকেও ধ্যান রতা করিয়া সৃষ্টি করা আবশ্যক। কিন্তু মহিষাসুরের সহিত যুদ্ধে ব্যস্ত দেবী সঙ্গে সঙ্গে ধ্যানস্থা হইতে পারেন না। আর্য্যাবর্ত্তের শিল্পী তেমন মূর্ত্তি গড়িবার বৃথা চেষ্টা কখনও করে নাই। ধ্যানযোগ এবং মহিষাসুর বধ এই দুই কর্ম্ম একত্র প্রকাশ করিবার জন্য আর্য্যাবর্ত্তের শিল্পী যুদ্ধ বাদ দিয়া দেবীযুদ্ধের শেষ মুহূর্ত্তে দশভুজা যখন মহিষাসুরকে বিনাশ করিতেছেন ঠিক সেই মুহূর্ত্তের চিত্র অঙ্কিত করিয়া গিয়াছেন। দৃষ্টান্তস্বরূপ দুইখানি মূর্ত্তির পরিচয় দিব। ৪ নং চিত্র (এবং স্বতন্ত্র মুদ্রিত চিত্র খ) ভুবনেশ্বরের বৈতাল দেউলের মহিষমর্দ্দিনী। দশভুজার (প্রকাশ্য অষ্টভুজার) দক্ষিণ পদ মহিষাসুরের বক্ষ চাপিতেছে; ত্রিশূল দক্ষিণ স্কন্ধ বিদ্ধ করিয়াছে; এবং দেবীর একখানি বাম হস্ত অসুরের মুখ পশ্চাৎ দিকে চাপিয়া রাখিয়াছে। এই দেবীমূর্ত্তিতে যোদ্ধার ক্ষিপ্রকারিতা নাই। দশভুজা যেন স্বীয় দেহের ভার মাত্র চাপাইয়া অবলীলাক্রমে অসুর বিনাশ করিতেছেন। মুখমণ্ডল ক্ষত হওয়ায় মূর্ত্তির পূর্ণ ভাব লক্ষ্য করা যায় না। কিন্তু অঙ্গবিন্যাসে বীররসের সঙ্গে শান্ত রসও ফুটিয়া উঠিয়াছে। বৈতাল দেউল বোধ হয় খৃষ্টীয় নবম শতাব্দের সৃষ্টি।

অপর মূর্ত্তি, ময়ূরভঞ্জের প্রাচীন রাজধানী খিচিঙ্গের অধুনা ধ্বংসপ্রাপ্ত বৃহৎ শিবমন্দিরের গাত্রনিবদ্ধ মহিষ-মর্দ্দিনী (৫ নং চিত্র)। এখানে দেবী ছিন্নশির মহিষ হইতে নির্গত নরাকার অসুরকে ত্রিশূলে এবং অন্য একটি অস্ত্রে বিদ্ধ করিতেছেন। সমস্ত অঙ্গভঙ্গী অসুরমুখী অথচ সমস্তগুলিই শান্ত ভাবের দ্বারা অনুবিদ্ধ। মুখমণ্ডল প্রসন্ন গম্ভীর, অর্দ্ধ নিমিলিত নেত্রদ্বয় যেন মুহূর্ত্তের জন্য অন্তর্জ্জগৎ ত্যাগ করিয়া মুমূর্ষু অসুরের প্রতি সকরুণ দৃষ্টিপাত করিতেছে। যে নিষ্কাম আর্ট সেবক সে যদি দ্বিভুজ সম্পর্কীয় কুসংস্কার ত্যাগ করিয়া এই মূর্ত্তিখানি নিরীক্ষণ করে তবে তাহার চিত্তও রসার্দ্র না হইয়া পারিবে না। আর যে-দর্শক রসাস্বাদের সঙ্গে উপদেশ চায়, কেমন

করিয়া স্থির চিত্তে সংযত ভাবে অশুভ নাশ করিতে হয় সে তাহার সম্যক পরিচয় পাইবে।

এই চারিখানি মহিষমর্দ্দিনী মূর্ত্তি তুলনা করিলে দেখা যাইবে, হিন্দু শিল্পী স্বাধীনতা বিসর্জ্জন দিয়া মূর্ত্তি গড়িতে বসিতেন না। যাঁহারা প্রাচীন শিল্প পুনরুজ্জীবিত করিতে চাহেন তাঁহাদেরও স্বাধীন ভাবে রূপ গড়িবার বাধা নাই। কিন্তু পুরাতনের রসে বিভোর চিত্তে গড়িতে না বসিলে পুনরুজ্জীবন সম্ভব হইবে না। সেই রস পুরাতনে থাকিলেও চিরন্তন। সেই রস সঞ্চারিত করিতে না পারিলে রূপসৃষ্টি সার্থক হইবে না। আধুনিক কালের শিল্পিগণ মহিষমর্দ্দিনীর মূর্ত্তিতে বাৎসল্য রস সঞ্চারিত করিতে গিয়া বিড়ম্বনা করিতেছে।

আড্ডার ইতিহাস

শ্রীখগেন্দ্রনাথ মিত্র

কোন প্রত্নতাত্ত্বিক গভীর গবেষণা নহে, একটি নিশীথের ঘটনামাত্র। তখন আমি পড়াশুনা ছাড়িয়া গৃহে বেকার বসিয়া আছি।

আমাদের বাড়ির তিনখানি বাড়ি পরে রাধিকা রায়ের বাড়ি। ছোট একখানি একতলা দালান—সম্মুখে একটু মাঠ, তিন দিকে কয়েকটা বড় বড় ফলের গাছ। ঐ সঙ্গে জায়গাও খানিকটা করিয়া আছে। রাধিকাবাবু উকীল। বেশ দু-পয়সা রোজগার করিয়া থাকেন। কিন্তু দুর্ভাগ্য যে তাঁহার সন্তান একটিও নাই এবং স্নেহ বা দয়াপরবশ কোন অপোগণ্ডকে তিনি পালনও করেন না। স্বয়ং তিনি, স্ত্রী অমলা, একটি চাকর ও একটি ঝি লইয়া তাঁহার সংসার। সখের মধ্যে কেবল দাবা খেলা। সখ বলি কেন, তাহা তাঁহার একটি নেশা। তিনি দুই দিন উপবাস করিতে পারেন, কিন্তু একদিনও দাবা না খেলিয়া স্থির থাকিতে পারেন না। তাঁহার মত আরও একজন আছেন—রেল-পাড়ার দামোদর ভট্টাচার্য্য। তিনিও উকীল। তাঁহারই ক্ষুদ্র বৈঠকখানাটিতে প্রতিসন্ধ্যায় দাবার আড্ডা বসে, চার পয়সার তামাক পোড়ে এবং একটু বেশী রাত্রেই এক পক্ষ মাৎ হইয়া খেলা সাঙ্গ হয়। তারপর যে যাহার মত ঘরে ফিরিয়া চলেন। সকলের অপেক্ষা রাধিকাবাবুকেই হাঁটিতে হয় অধিক। সেই কোথায় রেল-পাড়া আর কোথায় আমলা-পাড়া—মাঝে দেড় মাইল পথ। ছোট শহর। শহর না বলিয়া একখানি প্রকাণ্ড গ্রামকে শহরের ছাঁচে ঢালিবার মূর্ত্তিমান ব্যর্থ চেষ্টা বলাই ঠিক। পথের দু-ধারে বড় বড় গাছ ও জলনিকাশের গভীর খানা। খানার দুটি পাড়ে ছোট ছোট ঝোপ ঝাড় ও কাঁটাগাছের জঙ্গল। সন্ধ্যার ছায়াপাতের সঙ্গে সঙ্গেই সেগুলি ঝিল্লীমুখর হইয়া উঠে। পথের মাঝে মাঝে কেরোসিনের আলোকস্তম্ভও আছে। কিন্তু জ্যোৎস্না-রাত্রে সেগুলি জ্বলে না এবং অন্ধকার রাত্রেও পথিকের পথ-ভ্রান্তি দূর না করিয়া পতঙ্গদলের জন্য চিতাবহ্নি জ্বালাইয়া দাঁড়াইয়া থাকে মাত্র। অবশ্য বাড়িঘরও আছে। কিন্তু রাত্রিকালে গৃহস্থ ত জাগিয়া বসিয়া থাকে না; তাই গভীর রাত্রে পথ চলিবার কালে আপনার পদশব্দে আপনি চমকিত হইতে হয়।

শীতকাল। রাধিকাবাবুর সেদিন আদালত হইতে ফিরিতে বেলা গড়াইয়া সন্ধ্যা লাগিয়া গেল। তাই ভাল করিয়া জলযোগেরও সময় হইল না। ওদিকে হয়ত এতক্ষণে চন্দরবাবু ও ভটচায ছক পাতিয়া বসিয়া গেছে; হৃদয় ঘোষ ও বিজয় দত্ত তাকিয়ার উপর উপুড় হইয়া পড়িয়া তামাক টানিতে টানিতে তাহাদের চাল দেখিতেছে, আর তারিফ করিতেছে। কথাগুলি মনে করিয়া তিনি খাদ্যগুলির কয়েকটা কোনমতে গিলিয়া ফেলিলেন। তারপর তামাক সেবনেরও সময় হইল না,

গোটা-দুই পান মুখে পুরিয়া লাঠিখানি হাতে করিয়া বাহির হইয়া পড়িলেন। যাইবার কালে কিন্তু স্ত্রীকে কিঞ্চিৎ আশ্বাসের সুরেই বলিলেন,—"আমি শীগ্‌গিরই ফিরব---"

অমলা তাঁহার কথার কোন জবাব দিল না, পানের ডিবাটি তাঁহার হাত হইতে লইয়া ফিরিয়া দাঁড়াইল। খাবারগুলি সে স্বহস্তে প্রস্তুত করিয়াছিল। তাহার মতে যেগুলি ভাল হইয়াছিল, রাধিকাবাবু তাহার একটিও স্পর্শ করেন নাই। তাঁহার সে অবসরটুকুও ছিল না, এমনি খেলার টান!

রাধিকাবাবু চলিয়া গেলে অভুক্ত খাদ্যগুলি একটি পাত্রে তুলিয়া ঢাকিয়া রাখিয়া সে শয্যায় শুইয়া পড়িল। মনে মনে প্রতিজ্ঞা করিল, সারারাত্রির মধ্যে সে একবারও উঠিবে না, লোকে ডাকিয়া মাথা কুটিয়া ভাঙিয়া ফেলিলেও না। থাক সে দামোদর ভটচায ও দাবা-বোড়ে লইয়া। কিন্তু পরক্ষণেই মনে হইল, সে না উঠিলে সকলকে অভুক্ত থাকিতে হইবে। ঝিও অধিকক্ষণ থাকে না, একটু রাত্রি হইলেই হাতের কাজ না সারিয়া চলিয়া যায়। চাকরটির সব সময় ঘরে থাকিবার কথা, কিন্তু তাহাকেও ডাকিয়া ডাকিয়া পাওয়া যায় না। ঐ পুষ্করিণীর ধারে স্যাকরার দোকানে গিয়া বসিয়া থাকে। শীঘ্র কাজ কর্ম্ম না চুকাইয়া ফেলিলে অসুবিধায় পড়িতে হইবে তাহাকেই। অগত্যা অঞ্চলে চক্ষু মুছিয়া মনে মনে অন্য প্রকার প্রতিশোধের উপায় চিন্তা করিতে করিতে সে শয্যা ছাড়িয়া পাকশালার দিকে চলিয়া গেল।

ওদিকে রাধিকাবাবু আড্ডায় পৌঁছিয়া দেখিলেন, চন্দরবাবু মাৎ হইয়া আর এক হাত খেলিবার জন্য গুটি-গুলি সাজাইতে আরম্ভ করিয়াছেন। তাঁহাকে দেখিয়া সকলে একটু মুখ টিপিয়া হাসিলেন।

চন্দরবাবু ব্যথিত কণ্ঠে বলিলেন,—"দাদার নিষ্কৃতি আর কিছুতেই নেই! রেস্ নয়, ফট্‌কা নয়, একহাত দাবা-খেলা তাতেও বৌদি আসতে দেন না—"

হুঁকাটা বিজয় দত্তর থাবার মধ্য হইতে একরূপ কাড়িয়া লইয়া হৃদয় ঘোষ বলিলেন, —"তোমাদের এখনও একপক্ষ চলছে, দ্বিতীয় পক্ষের খবরদারীতে পড়নি ত—" বলিয়াই নিজের রসিকতায় অট্টহাস্য করিয়া উঠিলেন।

ব্যাপারটা অন্যরূপ হইয়া থাকিলেও কথাগুলি রাধিকাবাবুর মন্দ লাগিতেছিল না—স্ত্রৈণ হওয়ার মধ্যেও আমোদ আছে। তিনি চন্দরবাবুকে একটা ঠেলা দিয়া সরাইয়া সেই হাতে বসিতে বসিতে বলিলেন,—"তাড়াতাড়ি একদান খেলে নি। শীগগিরই যেতে হবে—"

"সে তোমার দেরি দেখেই বুঝেছি। কিন্তু কালকের হারটা আজ শোধ না দিয়ে আমি উঠছি না—" বলিতে বলিতে দামোদর ভটচায চাল সুরু করিলেন।

রাধিকা বাবু বলিলেন,"বেশ—"

দেখিতে দেখিতে খেলা জমিয়া উঠিল। মস্তিষ্কে তাহার চিন্তা ও বাহিরে তাম্রকূট-ধূম মানুষ পাঁচটিকে কেন্দ্র করিয়া, কুণ্ডলী পাকাইয়া, দেহ এলাইয়া, ঘুরিয়া ফিরিয়া, উর্দ্ধে উঠিয়া, নিম্নে নামিয়া, আঁকিয়া বাঁকিয়া ভাসিয়া বেড়াইতে লাগিল।

তার পর খেলা যখন ভাঙিল—রাত্রি বারোটা! বাহিরে ঝুপঝাপ বৃষ্টি হইতেছে। চন্দরবাবু, বিজয় দত্ত ও হৃদয় ঘোষ নাই—তাঁহারা কখন কোন্ ফাঁকে উঠিয়া গিয়াছেন।

দামোদর ভট্টচায বলিলেন,—"এই দুপুর রাতে বৃষ্টিতে ভিজে, ঠাণ্ডায় বাড়ি গিয়ে কাজ নেই—"

রাধিকাবাবু জুতা পরিতে পরিতে বলিলেন,—"যা বলেছ- "

"ভাল কথাই বল্‌ছি, বাড়ি গিয়ে দরজা খোলা পাবে না—"

"কেন?"

"ব্যাপার দেখে আমি আগে থাকতে চাকরকে দিয়ে খবর পাঠিয়েছি, আজ তুমি এখানে থাকবে। জুতো খোল, খাবার দিতে বলি, কাল ত ছুটি—"

খেলাটা মাতের মুখে চটিয়া যাওয়ায় রাধিকাবাবুর মন প্রসন্ন ছিল না। তাহার উপর সন্ধ্যাবেলাকার ব্যাপারটা মনে পড়িয়া গেল। ফিরিবার পথে আবার এই এক বিপত্তি। তিনি ব্যস্ত হইয়া উঠিলেন।

দামোদর বলিলেন,—"যদি একান্তই যাবে, চাকরটাকে একটা আলো দিয়ে সঙ্গে পাঠাই—"

"দরকার নেই। তুমি একটা ছাতা, একটা লণ্ঠন আমাকে দাও—" বলিয়াই রাধিকাবাবু বাহিরের দরজাটা খুলিয়া ফেলিলেন। কি গাঢ় অন্ধকার! উপরে নীচে কোথাও একটু আলো দেখা যাইতেছে না। দুই চারিটা জোনাকী বৃষ্টি-বাতাস তুচ্ছ করিয়া সেই অন্ধকার-সাগরে এদিক-ওদিক ভাসিয়া বেড়াইতেছে মাত্র। সহসা পথ হইতে সজল হিম বাতাসের একটা দমকা আসিয়া তাঁহার মুখে-চোখে বিঁধিয়া ঘরময় ছড়াইয়া গেল। তিনি তাড়াতাড়ি দরজাটা বন্ধ করিয়া দিলেন।

দামোদর বলিলেন,—"তাই ত বলছি থাক—"

"না, না, না। আলো দাও—ছাতা দাও। ক্ষেপেছ?"

"ক্ষেপেছ তুমি। চাকরটাকে সঙ্গে—"

রাধিকাবাবু দামোদরের কথার কোন জবাব দিলেন না। দীর্ঘ অলেষ্টারের বোতাম আঁটিয়া, আলোয়ানখানি মাথায় গায়ে বেশ করিয়া জড়াইতে লাগিলেন। এবং তখনই ভৃত্য ছাতা আনিয়া দিলে ফরাসের উপর হইতে লণ্ঠনটি তুলিয়া দরজার বাহিরে আসিয়া ছাতাটি খুলিয়া পথে নামিয়া পড়িলেন।

জনহীন অন্ধকার পথ। চারিদিক হইতে ভেক ও ঝিল্লীর একটানা চীৎকার ও হাঁকাহাঁকিতে মুখর। বৃষ্টি ও বাতাসের বিরাম নাই। দু-পাশে গাছগুলির শাখা ও পল্লব হইতে জল ঝরিয়া নির্জ্জনতা যেন আরও বাড়াইয়া তুলিতেছে। রাধিকাবাবুর ভয় বরাবরই কম। সে জন্য এই অবস্থার মধ্যে পড়িয়া কেবল অসোয়াস্তি বোধ করিতে লাগিলেন। চলিতে চলিতে তাঁহার জুতা, জামা, কাপড় ভিজিয়া উঠিল। শীতে পাঁজরাগুলি অবধি কাঁপিতেছে। লণ্ঠনের আলোয় বেশীদূর দেখা যায় না। বাতাসের দমকায় তাহা ঘন ঘন ঝাঁপাইয়া উঠিয়া চিমনীটি মসীময় করিয়া ফেলিতেছে। পরিশেষে সে ম্লান আলোটুকুও থাকিল না—তৈলাভাবে বার দুই শ্বাস টানিয়া নিবিয়া গেল। এবার চারিধারে পরিপূর্ণ অন্ধকার! রাধিকাবাবুর মনে হইল, তিনি যেন সহসা মৃত্যুলোকের মাঝে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। কিন্তু বাড়িও আর বেশী দূর নহে। মাখন ময়রার দোকানের বন্ধ ঝাঁপের ঈষৎ ফাঁকে সোনার দাগের মত একটু আলোক দেখা গেল। পরিচিত পথ হইলেও সেই গাঢ় তমিস্রা ঠেলিয়া তিনি দ্রুত অগ্রসর হইতে পারিলেন না। অমলা হয়ত এতক্ষণে ঘুমাইয়া পড়িয়াছে। সে নিশ্চয় করিয়া জানে, তিনি আসিবেন না; দামোদরের বাড়িতেই মহাস্ফূর্ত্তিতে রাত্রি কাটাইতেছেন। ইহাতে তাহার অভিমানের সীমা নাই। কিন্তু কোথায় দামোদরের বাড়ি, আর, কোথায় এই শীতের রাত্রে জলকাদাভরা অন্ধকার পথ। তাঁহার বেশভূষার অবস্থা দেখিয়া অভিমান গলিয়া গিয়া অমলার মন কিরূপ অনুকম্পা ও শঙ্কায় ভরিয়া উঠিবে! স্ত্রীর তখনকার অবস্থা কল্পনা করিয়া রাধিকাবাবু অন্তরে অন্তরে পুলকিত হইয়া উঠিয়া সেই দুর্জ্জয় শীতেও একটু আরাম বোধ করিলেন। কিন্তু অমলা যে ভয়তরাসে! কিছুতেই একাকী ঘুমাইতে পারে না। কিন্তু না ঘুমাইয়াই বা এত রাত্রে জাগিয়া বসিয়া করিতেছে কি? তিনি ত আর আসিতেছেন না। আর, ভয়েরই বা কি আছে? বাহিরের একখানি ঘরে চাকর থাকে, চারিধারে লোকজনের বাস, পাড়ার মাঝখানে বাড়ি। একটা হাঁক দিলে দশটা লোক ছুটিয়া আসিবে। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় তবুও মানুষের ভয় করে!

অল্পক্ষণের মধ্যেই তিনি রথতলার মোড় ঘুরিয়া, পোড়া-ভিটার পাশ দিয়া চলিতে লাগিলেন। পথের দক্ষিণে খানকয়েক বাড়ি, তারপরই সান্যালদের পুষ্করিণী। তাহার খানতিনেক বাড়ি পরেই তাঁহার একতলা দালান। চোখ দুটিতে অন্ধকার সহিয়া যাওয়ায় পথটা একটু স্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে। বাড়িঘরও যেন একটু চেনা যায়। অমনি রাধিকাবাবুর হাতে-পায়ে বল ও গভীর রাত্রে নিদ্রার মাঝখানে অতর্কিতে দেখা দিয়া স্ত্রীকে কিরূপ আশ্চর্য্যান্বিত করিয়া ফেলিবেন এই চিন্তায় মনে আনন্দের সঞ্চার হইল। এবার তিনি দ্রুত চলিতে লাগিলেন। বৃষ্টিও তৎক্ষণাৎ চাপিয়া আসিল, বাতাসও দাপটে জাগিয়া

উঠিল। এ দুইয়ের মাতমাতিতে নিজের পদশব্দও আর শোনা যায় না।

যথাসাধ্য দ্রুত পায়ে বাড়ির সম্মুখের মাঠ পার হইয়া রাধিকাবাবু বারান্দায় উঠিলেন। বামদিকে ভৃত্যের ঘর, সম্মুখে বৈঠকখানা। তিনি বামদিকে সরিয়া গিয়া ভৃত্যকে বার-কয়েক ডাকিলেন। কিন্তু সাড়া পাইলেন না। শীতের রাত্রি, লোকে বিছানায় জাগিয়া থাকিলেও উঠিবার ভয়ে সাড়া দেয় না। হাতের লণ্ঠনটা মেঝেয় নামাইয়া দরজায় বারকয়েক ধাক্কা দিলেন। হঠাৎ হাতখানা দরজার কড়ার গায়ে ঠেকিল। একি? তালা? হতভাগা দরজায় তালা লাগাইয়া বাহির হইয়া গেছে! তাঁহার পৌরুষ জাগিয়া উঠিল। কিন্তু পরক্ষণেই মনে হইল, বৈঠকখানার ফরাসেও সে ঘুমাইয়া থাকিতে পারে। ঘুরিয়া বৈঠকখানার দরজায় ধাক্কা দিয়া তাহাকে ডাকিতে সুরু করিলেন। দরজা কাঁপিয়া উঠিল, তবুও কাহারও সাড়া নাই। কপাটে খানিক কান পাতিয়া থাকিলেন। কিন্তু কিছুই শুনিতে পাইলেন না। অমলাও যে তখন জাগিয়াছে, তাহাও বোঝা গেল না। বৈঠকখানার একখানা ঘর পরে, তাঁহার শয়ন-ঘর। এখান হইতে ডাকিলে সেখান হইতে শোনা যায় না। তিনি বারান্দা হইতে নামিয়া দালানের কোল দিয়া কাদা ভাঙিয়া অন্ধকারে সেইদিক পানে গেলেন।

শয়নঘরের পাশেই একটা প্রকাণ্ড জামগাছ; অজস্র ডালপালা ও অন্ধকার লইয়া দাঁড়াইয়া ভিজিতেছে। সেখান হইতে সহজে তাহার একটি ডাল ধরিয়া প্রাচীর ডিঙাইয়া বাড়ির ভিতর যাওয়া যায়। রাধিকাবাবু তাহার তলায় দাঁড়াইয়া রুদ্ধজানালায় ঘা দিয়া তাঁহার স্ত্রীকে ডাকিতে লাগিলেন। প্রথমে ধীরে ধীরে নাম ধরিয়া খুব সম্ভব "অমু" বলিয়া। কিন্তু ভিতর হইতে সে ডাকের কোন সাড়া পাইলেন না। ক্রমে স্বর ও আঘাত দ্রুত এবং প্রচণ্ড হইয়া উঠিতে লাগিল। বৃষ্টিতে তাঁহার সর্ব্বাঙ্গ সিক্ত; অলেষ্টারটা ওজনে সের কয়েক বাড়িয়া গেছে। কাদায় পা দুখানা বসিয়া গিয়া বরফের মত জমিয়া যাইতেছে। আর অধিকক্ষণ সেভাবে দাঁড়াইয়া থাকা সম্ভব নয়। সেই দরুণ ঠাণ্ডায়ও তাঁহার রক্ত গরম হইয়া উঠিল। তিনি সে জানালা ছাড়িয়া দ্বিতীয় জানালায়, সেখান হইতে তৃতীয় জানালায় গিয়া আঘাত ও ডাকাডাকি করিতে লাগিলেন। এবার মনে হইল যেন ভিতরে একটু চঞ্চলতার সাড়া পাওয়া যাইতেছে। ভাবিলেন উত্তর পাওয়া যাইবে, কিন্তু তাহার পর প্রায় পাঁচ মিনিট কাটিয়া গেল—পূর্ব্বের মতই সব চুপচাপ।

কিছুক্ষণ পূর্ব্বে তাঁহার স্ত্রীর চোখে তন্দ্রা আসিয়াছে। তাহার ঘোরে একটা দুঃস্বপ্ন মনের কোণ হইতে ধীরে ধীরে বাহির হইয়া ভয়াল দেহ বিস্তার করিয়া সারা মনকে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিতেছিল। মনে হইতেছিল, একটা দুষমন আসিয়া দরজা ঠেলিয়া তাহার ঘরে ঢুকিতেছে। কি কালো ও বিকট তাহার মুখ! এমন সময় বৃষ্টি শব্দের সঙ্গে সঙ্গে বাহির হইতে মোটা গলায় ডাক ও জানালায় সজোর আঘাত। তাহার তন্দ্রা ছুটিয়া গেল। সে ত্রস্তে কম্পিত বক্ষে শয্যার উপর উঠিয়া বসিল। হাত-পা থর্ থর্ করিয়া কাঁপিতেছে। গলার মধ্যে যেন খানিকটা ধূলা ঢুকিয়াছে। ভাবিল চীৎকার করিয়া উঠে। একবার চেষ্টাও করিল, কিন্তু পারিল না। মনে পড়িয়া গেল, বৈঠকখানার পাশেই চাকরের ঘর। স্থির করিল, ভিতরের দরজা খুলিয়া বৈঠকখানার ভিতর দিয়া তাহাকে ডাকিবে। কিন্তু ইতিমধ্যে লোকটা যদি জামগাছের ডাল ধরিয়া প্রাচীর ডিঙাইয়া ঘরের দরজার বাহিরে আসিয়া দাঁড়াইয়া থাকে? সাহসে ভর করিয়া উঠানের জানালাটা খুলিয়া প্রাচীরের দিকে তাকাইয়াই তাহার বুকের রক্ত জমিয়া যাইবার উপক্রম। ঐ যে জামগাছের ডাল হইতে একটা কালো মূর্ত্তি প্রাচীরের উপর নামিয়া পড়িল · দুষমন! সে সভয়ে সুতীক্ষ্ণ কণ্ঠে একবার চীৎকার করিয়াই জানালাটা আঁটিয়া দিল।

রাধিকাবাবুর হাঁকাহাঁকিতে পাশের বাড়ির জনকয়েক যুবক ইতিমধ্যে সজাগ হইয়া কান পাতিয়া ব্যাপারটা কি বুঝিবার চেষ্টা করিতেছিল। সে ভয়ার্ত্ত তীক্ষ্ণ শব্দে তৎক্ষণাৎ শয্যা ছাড়িয়া লাঠি ও লণ্ঠন হাতে সোরগোল করিতে করিতে বাহিরে আসিয়া তাহারা শুনিতে পাইল,

যেন প্রাচীরের উপর হইতে অভয় দিয়া সলজ্জ কণ্ঠে লতেছে—"আরে আমি—আমি—রাধিকামোহন—লা বিপদ!"

সেই নিশীথে স্বয়ং গৃহকর্ত্তাকে স্ব-গৃহের প্রাচীর হাইতে দেখিয়া যুবকগণ আর বাধাদানে অগ্রসর ল না। কিন্তু একজনের মনে তখনও একটু সন্দেহ গিয়া ছিল। সে সেখান হইতেই জিজ্ঞাসা করিল,—াচিলের ওপর কে? দাদা, নাকি?"

"হুঁ—"

"বৌদিকে ভয় দেখাচ্ছিলেন বুঝি?"

রাধিকাবাবু এ-কথার কোন জবাব না দিয়া ভিতরে মিয়া পড়িলেন।

অতঃপর সে রাত্রে আর কি হইয়াছিল জানা যায় নাই; কে কাহার মানভঞ্জন করিয়াছিলেন, তাহাও বলিতে পারি না। তবে ইহা দেখা গেল যে, পরদিন হইতেই রাধিকাবাবুর বৈঠকখানায় একটি দাবার আড্ডা বসিয়াছে। এবং পাঁচ বৎসর পরে বড় দিনের ছুটিতে বাড়ি গিয়া দেখিয়া আসিয়াছি, তাহা আজও ভাঙে নাই। পূর্ণোদ্যমে চলিয়া দমোদর ভট্চাযের আড্ডার সহিত দাবা প্রতি-যোগিতায় জয়লাভ করিয়াছে। সে বিজয়োৎসবে যোগ দিয়া আমিও রাধিকাবাবুর স্ত্রীর প্রস্তুত কড়াইশুঁটির কচুরী ও নূতন গুড়ের সন্দেশ পেট ভরিয়া খাইয়া কোরাসে বলিয়াছি,—"গৃহলক্ষ্মীর জয়!"

কলিকাতায় শীত

শ্রীসুধাংশুকুমার রায় খোদিত একটি 'উড্‌কাট্'

এ দেশে যাঁহারা কাঠ-খোদাই শিল্পের চর্চ্চা করিতেছেন, শ্রীযুক্ত সুধাংশুকুমার রায় তাঁহাদের অন্যতম। এই শিল্পে কৃতী ক্ত রমেন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তীর নিকট তিনি শিক্ষালাভ করিয়াছেন। সম্প্রতি "Wood and Lino Cuts" নামক পনরখানি চিত্র সম্বলিত তাঁহার খানি পুস্তক প্রকাশিত হইয়াছে। শ্রীযুক্ত সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় এই পুস্তকের ভূমিকা লিখিয়া দিয়াছেন ও শ্রীযুক্ত নীহাররঞ্জন রায় গুলির পরিচয় দিয়াছেন।

কবি তানসেন

শ্রীসুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়

সঙ্গীতকার তানসেনের নাম ভারতবর্ষে সকলেই জানে। কিন্তু তানসেন কেবল যে একজন যুগাবতার সঙ্গীত-রচয়িতা ও গায়ক ছিলেন তাহা নহে,—তিনি একজন উচ্চশ্রেণীর কবিও ছিলেন, ইহা তাঁহার রচিত ধ্রুপদ গানের বাণী বা কথা হইতে স্পষ্ট প্রতীয়মান হয়। বিভিন্ন রাগে তিনি যে সব গান রচিয়া গিয়াছেন, সেগুলি তাঁহার অতুলনীয় কবিত্ব-শক্তির পরিচায়ক।

ভারতের কালোয়াতী অর্থাৎ কলাবন্তগণের মধ্যে প্রচলিত সঙ্গীত-রীতিই এদেশের প্রাচীন (অর্থাৎ মুখ্যতঃ মুসলমান-পূর্ব্ব যুগের) সঙ্গীত-রীতির ধারা রক্ষা করিয়া বিদ্যমান। এই কলাবন্ত-সঙ্গীতই ভারতের classical অর্থাৎ প্রাচীন কাল হইতেই উচ্চকোটির বলিয়া গৃহীত সঙ্গীত। ভারতের কলাবন্ত-সঙ্গীত দুইটী বিভাগে বা রূপে মিলে—হিন্দুস্থানী বা উত্তর ভারতীয়, এবং কর্ণাটী বা দক্ষিণ ভারতীয়। বিগত কয় শতকের ইতিহাসে, উত্তর ভারতীয় চালের সঙ্গীতে তানসেন, এবং দক্ষিণ ভারতীয় চালের সঙ্গীতে শ্রীরামের ভক্ত তেলুগুজাতীয় গায়ক ত্যাগরায় (ইঁহার মৃত্যু খ্রীষ্টাব্দ ১৮৪৭-এ হয়)—এই দুই জনের নাম সর্ব্বপ্রধান। একজাতীয় হইলেও, হিন্দুস্থানী ও কর্ণাটী সঙ্গীতের মধ্যে কতকগুলি পার্থক্য আছে। সাধারণতঃ লোকের ধারণা যে কর্ণাটী সঙ্গীতই শুদ্ধতর, ইহাতে বাহির হইতে মুসলমানদের আনীত তুর্কী ও ইরাণী উপাদান প্রবেশ করে নাই; কিন্তু হিন্দুস্থানী সঙ্গীতে পারস্য তুরস্ক ইরাক ও আরব হইতে আহৃত উপাদান কিছু কিছু মিলিয়া ইহার প্রাচীন বা হিন্দু বিশুদ্ধিকে নষ্ট করিয়া দিয়াছে। উত্তর ভারতের ধ্রুপদ সঙ্গীতে যে বাহিরের জিনিস ততটা আসিতে পারে নাই, ইহাও একরকম সর্ব্ববাদিসম্মত। প্রাচীন হিন্দু সঙ্গীতের রূপটী ধ্রুপদেই অনেকটা অব্যাহত আছে। তানপুরা পাখোয়াজ ও বীণাযোগে গীত ধ্রুপদে আমরা সহস্র কি তদধিক বৎসর পূর্ব্বেকার কালের হিন্দুসঙ্গীতের একটু আভাস পাই। খেয়াল, টপ্পা ও ঠুম্‌রী, এগুলি পরবর্ত্তী কালে মুসলমান বাদশাহদের দরবারে ধ্রুপদের আধারের উপরেই সৃষ্ট—ভারতের নানা স্থানীয় প্রাদেশিক তথা ভারত-বহির্ভূত নানা বিদেশী জিনিস এগুলিতে আসিয়া গিয়াছে। শুদ্ধ ধ্রুপদের ঋজু, সবল ও বিরাট মহিমার তুলনা ভারতীয় সঙ্গীতে নাই,—অন্যদেশের সঙ্গীতেও এরূপ বস্তু বিরল।

আমরা আজকাল যে ধ্রুপদ শুনি, তাহার মূল হিন্দুযুগে গিয়া পঁহুছাইলেও, মুখ্যতঃ ইহা খ্রীষ্টীয় পঞ্চদশ হইতে সপ্তদশ শতকের বস্তু। ভারতে ভাষায় ও শিল্পে যে ধরণের বিকাশ বা ক্রম-বিবর্ত্তন পাই, সে ধরণের বিকাশ ভারতীয় সঙ্গীতেও অপেক্ষিত বলিয়া মনে করিলে অন্যায় করা হয় না। সংস্কৃত, তাহার বিকারে প্রাকৃত, এবং প্রাকৃতের বিকারে হিন্দী বাঙ্গালা প্রভৃতি আধুনিক আর্য্য ভাষা। মৌর্য্যযুগের ও শুঙ্গযুগের শিল্পে ভারতীয় হিন্দু-শিল্পের পত্তন; কুষাণ ও অন্ধ্র যুগের শিল্পের মধ্য দিয়া গুপ্ত যুগের ও তৎপরবর্ত্তী দুই চারি শত বৎসরের চরম উন্নতির অবস্থায় তাহার বিকাশ; তদনন্তর পরবর্ত্তী যুগের জটিলতর ধারায় হিন্দু-শিল্পের আংশিক অবনয়ন। সঙ্গীত-সম্বন্ধেও এরূপ ক্রম বা ধারা আমরা অনুমান করিতে পারি; কিন্তু এই ধারার শেষ অবস্থা, যাহা অধুনা-প্রচলিত ধ্রুপদে পাই, তদপেক্ষা প্রাচীনতর অন্য অবস্থার কোনও নিদর্শন রক্ষিত হয় নাই। ধ্রুপদকে নিম্ন-মধ্য-যুগের হিন্দু শিল্পের সহিত তুলিত করা যায়; কিন্তু ইহার পূর্ব্বরূপ উর্দ্ধ-মধ্যযুগ, বা গুপ্ত বা কুষাণ যুগের শিল্পের সঙ্গে যাহার তুলনা করা যায়, তাহা আমরা পাইতেছি না।

যাহা হউক, গোপাল নায়ক, আমীর খুসরৌ, হরিদাস স্বামী, বৈজু বাওরা, তানসেন, সদারঙ্গ, শোরী মিয়াঁ প্রভৃতির নিকট আমরা চির-কৃতজ্ঞ, কারণ প্রাচীন ভারতীয়

সঙ্গীতের সংরক্ষণে ও ইহার নবীন বিকাশে ইঁহারা অনেক কিছু করিয়া গিয়াছেন। নূতন অনেক জিনিসও ইঁহারা সৃষ্টি করিয়া গিয়াছেন। খেয়াল আমীর খুস্‌রৌয়ের সৃষ্টি বলিয়া পরিচিত; তানসেন স্বয়ং কতকগুলি প্রাচীন রাগের নূতন রূপ দিয়াছেন, যেমন মল্লার রাগের নূতন রূপ তাঁহার নাম অনুসারে 'মিয়াঁ-কী-মল্লার' নামে পরিচিত, এবং 'দরবারী কানড়া' নামে নবীন রাগও তাঁহার সৃষ্ট। কিন্তু মুখ্যতঃ ইঁহারা সংরক্ষকই ছিলেন—প্রাচীন সঙ্গীতের প্রতি ইঁহাদের অনুরাগ এবং প্রাচীন ধারাকে অবিকৃত রাখিবার প্রয়াস ইঁহাদের মধ্যে না থাকিলে আমাদের হিন্দু যুগের বা মধ্য-যুগের সঙ্গীত যতটুকু রক্ষিত হইয়াছে ততটুকুও হইত না।

প্রসঙ্গতঃ বলা যাইতে পারে যে ধ্রুপদ সঙ্গীত নিছক প্রাচীনের সংরক্ষণ বা অন্ধ অনুকরণ-মাত্র ছিল না। তাহা হইলে ধ্রুপদ এতদিন এ ভাবে টিঁকিয়া থাকিতে পারিত না। এখনও বহু বহু ব্যক্তি ধ্রুপদে যথেষ্ট আনন্দ পান, এবং ইঁহারা সকলেই পেশাদার ওস্তাদ বা শিক্ষিত কলাবন্ত নহেন—'গোলা লোক'ও ইঁহাদের মধ্যে আছেন। সাধারণের নিকট 'কলাবন্ত-সঙ্গীত' আজকাল ততটা প্রিয় নহে—কিন্তু ইহার আলোচনা ও উপযুক্ত সমাদর শিক্ষিত সমাজে এখন বাড়িতেছে বলিয়াই মনে হয়। ধ্রুপদ সঙ্গীতে এখনও যে নূতন সৃষ্টি হইতে পারে ও হইয়া থাকে, তাহার উদাহরণ-স্বরূপ, কিছুকাল পূর্ব্বে সঙ্গীতরত্নাকর শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় মহাত্মা গান্ধীর বিগত উপবাস উপলক্ষে যে 'রাগ গান্ধী' নাম দিয়া অতি মনোহর নূতন একটী রাগ বা সুর সৃষ্টি করেন, তাহার উল্লেখ করা যাইতে পারে (এই 'রাগ গান্ধী' ও তদানুষঙ্গিক ব্রজভাষা-'হিন্দী'তে রচিত বাণী গত বৎসরের অগ্রহায়ণ মাসের 'প্রবাসী'তে স্বরলিপি সমেত প্রকাশিত হইয়াছে—হিন্দী 'বিশাল ভারত' পত্রিকায়ও ১৯৩২ সালের ডিসেম্বর মাসের সংখ্যায় বাহির হইয়াছে)। এইরূপ নূতন রচনা-দ্বারা আর কিছু না হউক, ধ্রুপদ সঙ্গীত যে একেবারে মরে নাই তাহা প্রমাণিত হয়। মৃত বা অচপ্রলিত সঙ্গীত-পদ্ধতি বলিয়া ধ্রুপদের আদর বা চর্চ্চা বন্ধ করা, মৃত-ভাষা বলিয়া সংস্কৃত, পালি, প্রাকৃত বা গ্রীক লাটিন প্রভৃতির অনাদর করা বা এগুলির চর্চ্চা বন্ধ বা অনুচিত-ভাবে সীমাবদ্ধ করারই মত হইবে।

সৌভাগ্যক্রমে সম্রাট আকবরের সহিত তানসেনের সম্মিলন ঘটিয়াছিল বলিয়া তানসেনের জীবনী বা জীবনের

আকবর, তানসেন ও হরিদাস স্বামী

দুই চারিটী ঘটনা সম্বন্ধে আমরা কিছু সংবাদ পাই। আকবর ও জাহাঙ্গীরের সময়ের চিত্রশিল্পে তানসেনের প্রতিকৃতি অঙ্কিত হইয়াছিল। জাহাঙ্গীরের সময়ে অঙ্কিত দুই চারিখানি মোগল-চিত্রে তানসেনের ছবি পাওয়া যায়। এইরূপ একখানি চিত্রে তানসেনের মূর্ত্তির পাশে ফারসী অক্ষরে তাঁহার নামও লেখা আছে। তানসেন একটু খর্ব্বকায় কালো চেহারার মানুষ ছিলেন, মুখে অল্প একটু গোঁফ ছিল। একখানি ছবিতে উপবিষ্ট জাহাঙ্গীরের সামনে তানসেন দণ্ডায়মান—জাহাঙ্গীর যখন যুবরাজ, তখনকার কোনও দিনের ছবি; জাহাঙ্গীর তানসেনের গুণের প্রশংসা করিয়া লিখিয়া গিয়াছেন। আর একখানি চিত্রে জাহাঙ্গীরের দরবারে গায়ক ও বাদকের দলে তানসেনের ছবি পাওয়া যায়। আরও একখানি চিত্র

আছে—এটা আকবরের ও তানসেনের জীবনের একটা ঘটনার চিত্র। তানসেনের সঙ্গীত-গুরু ছিলেন হরিদাস স্বামী। ইনি সংসার-ত্যাগী সন্ন্যাসী ছিলেন, বৃন্দাবনে থাকিয়া সঙ্গীতের মধ্যেই সাধন-ভজন করিতেন। তাঁহার গুণপনার কথা শুনিয়া আকবর তাঁহার গান শুনিবার জন্য বিশেষ আগ্রহান্বিত হন, কিন্তু সাধু হরিদাস রাজ-দরবারে আসিতে চাহিলেন না। তখন আকবর স্বয়ং তানসেনের সঙ্গে হরিদাস স্বামীর আশ্রমে গিয়া উপস্থিত হইলেন। হরিদাস সমাগত সম্রাটের সমক্ষেও গান গাহিতে চাহিলেন না। শেষে তানসেন নিজে গুরুর সামনে গান ধরিলেন, ও ইচ্ছা করিয়া ভুল করিয়া গাহিলেন। ইহাতে হরিদাস স্বামী তানসেনকে সংশোধন করিয়া দিবার উদ্দেশ্যে স্বয়ং গান করিতে আরম্ভ করিলেন। তাঁহার গান চলিল; কথিত আছে যে সাধক হরিদাস স্বামীর গান শুনিয়া আকবর ভাবাবেশে এরূপ অভিভূত হইয়া পড়িয়াছিলেন যে তিনি কিয়ৎকাল সংজ্ঞাহীন অবস্থায় ছিলেন। জ্ঞান ফিরিয়া আসিলে পর তিনি তানসেনকে জিজ্ঞাসা করিলেন, তানসেনের গান এত ভাল হয় না কেন। তাহাতে তানসেন উত্তর দেন—'মহারাজ, আমি গান গাহি একজন পার্থিব সম্রাটের দরবারে; আর আমার গুরু গান গাহেন স্বয়ং পরমেশ্বরের দরবারে।' এই সুন্দর গল্পটি একটী মোগল-চিত্রে চিত্রিত হইয়াছে। দীর্ঘাকৃতি শীর্ণকায় হরিদাস স্বামী, কুটীর দ্বারে তানপুরা লইয়া মৃগচর্ম্মাসনে বসিয়া গান করিতেছেন—কুটীর-দ্বার-প্রান্ত কদলী ও অন্যান্য বৃক্ষের হরিদ্বর্ণ পত্রে ছায়া-শীতল; রোগা পাতলা কালো চেহারার তানসেন মাটীতে বসিয়া, ও সম্রাট আকবর দাঁড়াইয়া গান শুনিতেছেন; বহুদূরে সম্রাটের তাঁবুর কানাত ও

দরবারের গায়ক ও বাদক-মণ্ডলী মধ্যে তানসেন (মধ্যে বামদিকে)

যান-বাহন উষ্ট্রাদি দেখা যাইতেছে; এবং আরও দূরে একটী নগরের দৃশ্য।

তানসেনের ছবি পাইতেছি, তানসেন-সম্বন্ধে কতকগুলি গল্পও পাইতেছি—কিন্তু তাঁহার জীবনের সব খবর পাইতেছি না—অনেক কথা ঘোরতর রহস্যময় রহিয়া গিয়াছে। আকবরের দরবারে ঐতিহাসিক আবুল্-ফজল আঈন্-ই-আকবরী গ্রন্থে আকবরের বেতনভোগী ছত্রিশ জন দরবারী গায়ক ও বাদকের নাম দিয়াছেন—তন্মধ্যে তানসেনের নাম সর্ব্বপ্রথমে আছে, এবং তানসেন সম্বন্ধে আবুল-ফজল মন্তব্য করিয়াছেন যে তাঁহার ন্যায় গায়ক বিগত সহস্র বৎসরের মধ্যে ভারতবর্ষে হয় নাই। ১৯৩৪ সংবতে (১৮৭৭-১৮৭৮ খ্রীষ্টাব্দে) শিবসিংহ সেঙ্গর 'শিবসিংহ-সরোজ' নামে হিন্দী কবিদের জীবনীময় একখানি কবিতা-সংগ্রহ গ্রন্থ প্রকাশ করেন, তাহাতে তিনি তানসেনের জীবনের কতকগুলি ঘটনা লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। স্যর জ্যর্জ্‌ আব্‌রাহাম্‌ গ্রিয়ার্‌সন্‌ ১৮৮৯ সালে Modern Vernacular Literature of Hindustan নামে যে অতি উপাযাগী পুস্তক প্রকাশ করেন, তাহাতে তিনি 'শিবসিংহ-সরোজ' হইতে তানসেনের জীবনী-কথা উদ্ধার করিয়া দেন। শিবসিংহের মতে তানসেনের জন্মের তারিখ হইতেছে ১৫৮৮ সংবৎ (অর্থাৎ ১৫৩১-১৫৩২ খ্রীষ্টাব্দ)। শিবসিংহ কোনও প্রমাণ দেন নাই; তাঁহার প্রস্তাবিত এই তারিখ ঠিক নয়, কারণ এই তারিখে জন্ম ধরিলে তানসেনের জীবনের অনেক ঘটনার মধ্যে অসঙ্গতি দেখা যায়। বোধ হয় তানসেন ১৫২০ খ্রীষ্টাব্দের দিকে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। আকবরের দরবারে লিখিত ফারসী ইতিহাস অনুসারে তাঁহার মৃত্যুকাল ৯৯৭ হিজরী অর্থাৎ ১৫৮৯ খ্রীষ্টাব্দ। তানসেন মকরন্দ পাঁড়ে নামে এক গৌড় ব্রাহ্মণের পুত্র। তিনি বৃন্দাবনের হরিদাস স্বামীর নিকট প্রথম কবিতা রচনা ও গান শিক্ষা করেন। পরে তিনি গোয়ালিয়রের স্যুফী সাধক মোহম্মদ ঘৌসের শিষ্য হন। এই স্যুফী সাধক একজন খুব বিখ্যাত গায়ক ছিলেন। তিনি বাবর, হুমায়ুন ও আকবরের সমকালীন ছিলেন, এবং লোকে তাঁহাকে বিশেষ শ্রদ্ধা করিত। গোয়ালিয়র যখন হিন্দুদের হাতে—তোমর-বংশীয় রাজপুতদের হাতে—ছিল, তখন হইতেই মোহম্মদ ঘৌস্‌ গোয়ালিয়রে বাস করিতেন, এবং এই মুসলমান সাধুটীর সলা-পরামর্শ অনুসারে বাবরের সেনাপতি রহীম-দাদ মোগলদের হইয়া গোয়ালিয়র দখল করিতে সমর্থ হন। কথিত আছে যে মোহম্মদ ঘৌস্‌ নিজের জিভ তানসেনের জিভে ঠেকান, তাহাতেই তানসেনের অসাধারণ সঙ্গীত-শক্তির উন্মেষ হয়। ১৫৬২ খ্রীষ্টাব্দে তানসেন আকবরের দরবারে আসেন, এবং ইহার পরে তিনি মুসলমান হন। তানসেনের মুসলমান ধর্ম্ম স্বীকার করার কারণ রহস্যাবৃত। আকবরের প্ররোচনায় মুসলমান হওয়া সম্ভব ছিল না, কারণ আকবর এই ধর্ম্ম সম্বন্ধে বরাবরই উদাসীন ছিলেন, এবং শেষ জীবনে এই ধর্ম্ম একপ্রকার ত্যাগই করিয়াছিলেন। তানসেনের রচিত গানের ভাব ও ভাষা দেখিয়া মনে হয় না যে তিনি ভক্তপ্রাণ হিন্দু ছাড়া আর কিছু ছিলেন। মুসলমান ভাবে অনুপ্রাণিত তানসেনের নামে যে কয়টী গান পাওয়া যায়, সেগুলিতে এই আন্তরিকতার সুরের বিশেষ অভাব দেখা যায়। ওস্তাদ মোহম্মদ ঘৌসের প্রভাবে পড়িয়া তবে কি তানসেন মুসলমান হন? মোহম্মদ ঘৌস হিন্দুদের খুব প্রিয় হইয়া উঠিয়াছিলেন অনুমান করা যায়—অন্ততঃ যোগ্যস্থলে হিন্দুদেরও তিনি খাতির করিতেন বলিয়া গোঁড়া মুসলমানদের কেহ কেহ তাঁহার প্রতি বিরূপ হইত, ইহার প্রমাণ আছে। ভারতবর্ষে মুসলমান পীর বা ফকীরের লোক-প্রিয়তা অনেক ক্ষেত্রে হিন্দুদের মধ্যে মুসলমান-ধর্ম্মের প্রচার-কার্য্যে সহায়তা করিয়াছে, ইহা দেখা যায়। আবার ইহাও হইতে পারে যে যৌবনে তানসেন মুসলমান রাজ-দরবারে ঘনিষ্ঠভাবে মিশিতেন বলিয়া মুসলমান-সংস্পর্শ-হেতু আচারে ব্যবহারে ব্রাহ্মণত্ব বজায় রাখিতে না পারায় স্বজাতি কর্ত্তৃক পরিত্যক্ত হইয়াছিলেন। তানসেন শেরশাহের পুত্র দৌলত খাঁর বিশেষ বন্ধু হইয়া আগরায় রাজ দরবারে কিছুকাল বাস করিয়াছিলেন। ইহাও সম্ভব যে হয় তো তানসেনের স্বজাতীয় অনেকগুলি ব্যক্তিকে মোগল কর্ত্তৃক গোয়ালিয়র বিজয়ের পরে জোর করিয়া ধরিয়া মুসলমান করিয়া দেওয়া হয়—জাতিকে জাতি ধরিয়া মুসলমান করার উদাহরণ

ভারতের ইতিহাসে বিরল নহে। একটা লক্ষণীয় বিষয় —আবুল্‌-ফজল আইন্‌-ই-আকবরীতে আকবরের সভার যে ছত্রিশ জন ওস্তাদের নাম করিয়াছেন, তাহাদের মধ্যে পনের জন গোয়ালিয়রের লোক—এবং এই গোয়ালিয়রের ওস্তাদ বা কলাবন্তদের অনেকেই হিন্দুনাম-যুক্ত মুসলমান; যথা—'মিয়াঁ তানসেন' স্বয়ং, তাঁহার পুত্র 'তানতরঙ্গ খাঁ'; এবং 'শ্রীজ্ঞান খাঁ', 'মিয়াঁ চাঁদ', 'বিচিত্র খাঁ', (তদ্‌ভ্রাতা 'সুবহান খাঁ), 'বীরমণ্ডল খাঁ', 'প্রবীণ খাঁ', 'চাঁদ খাঁ।' গোয়ালিয়র-নিবাসী হিন্দু—খুব সম্ভবতঃ তানসেনের গোষ্ঠীর—অনেক ঘর ব্রাহ্মণ গায়ক ও বাদককে মুসলমান করিয়া দেওয়ায়, বা কোনও কারণে তাঁহাদের মুসলমান হইয়া যাওয়ায়, এইরূপটা ঘটিয়া থাকিবে। আরও একটা কারণ থাকিতে পারে—হয় তো তানসেন কোনও মুসলমান রমণীর প্রেমে পড়িয়া ধর্ম্মত্যাগ বা হিন্দুনাম ত্যাগ করিয়া থাকিবেন। একটা বাজে গল্প আছে যে তানসেনকে নিজ দরবারে আনিয়াও আকবর গান গাওয়াইতে পারেন নাই, শেষে নিজ কন্যাদান করিয়া তাঁহার প্রসন্নতা-সাধন পূর্ব্বক গান গাওয়াইতে পারিয়াছিলেন। এই গল্পের মূলে, প্রেমে পড়িয়া ধর্ম্মত্যাগের কথা থাকিতে পারে। যাহা হউক, মোহম্মদ ঘৌসের প্রভাব তানসেনের জীবনে বিশেষ ভাবেই কার্য্যকর হইয়াছিল বলিয়া অনুমান হয়। তানসেনের মৃত্যুর পর তাঁহার দেহ গোয়ালিয়রের বিরাট পর্ব্বত-দুর্গের পাদদেশে মোহম্মদ ঘৌসের সমাধি-মন্দিরের পার্শ্বে উন্মুক্ত প্রাঙ্গনে সমাহিত হয়। পাথরে গাঁথা তানসেনের সমাধি এখন উত্তর ভারতের গায়কগণের পক্ষে এক মহাতীর্থস্থান; এই সমাধির পার্শ্বে একটী তেঁতুল গাছ আছে, গায়কেরা শ্রদ্ধার সহিত এই গাছের পাতা চিবায়, তাহাতে নাকি সঙ্গীত-গুরু তানসেনের আশীর্ব্বাদে কণ্ঠস্বর সুমিষ্ট হয়।

তানসেনের প্রথম যৌবনের পৃষ্ঠপোষক শেরশাহ-পুত্র দৌলত খাঁর মৃত্যুর পর তিনি মধ্যভারতের রীবাঁ (রেওয়া) রাজ্যের অন্তঃপাতী বান্ধোর রাজা রামচাঁদ সিংহ বাঘেলার আশ্রয়ে বহু বৎসর যাপন করেন। তানসেন বহু ধ্রুপদ গানে 'রাজা রাম' নাম দিয়া এই রাজার যশ কীর্ত্তন করিয়া গিয়াছেন; ইনি তানসেনকে সম্মান ও অর্থ দান করিতেন যথেষ্ট। তানসেনের খ্যাতি ইতিমধ্যে চতুর্দ্দিকে পরিব্যাপ্ত হয়, এবং বাদশাহ ইব্রাহীম খাঁ আগ্রায় নিজ দরবারে তাঁহাকে আহ্বান করেন, কিন্তু তানসেন রেওয়া ত্যাগ করিয়া আসিতে চাহিলেন না। ইতিমধ্যে হুমায়ুন বাদশাহ আসিয়া পাঠান শেরশাহের বংশধরদের পরাজিত ও উৎখাত করিয়া ১৫৫৬ সালে পুনরায় মোগল রাজ-বংশের প্রতিষ্ঠা করিলেন। আকবর নিজ রাজ্যে সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়া, ১৫৬২ খ্রীষ্টাব্দে জলালুদ্দীন কুরূচী নামে এক মনসবদারকে রেওয়ায় পাঠাইয়া তানসেনকে নিজ দরবারে ডাকিয়া আনাইলেন—এবার তানসেন আপত্তি করিতে পারিলেন না। তানসেনের অবশিষ্ট জীবন আকবরের দরবারেই অতিবাহিত হয়। কোনও সময়ে নিজেকে মুসলমান-ধর্ম্মাবলম্বী বলিয়া স্বীকার করা ভিন্ন তাঁহার জীবনে অতঃপর উল্লেখযোগ্য আর কোনও ঘটনা হইয়াছিল বলিয়া মনে হয় না।

তানসেন গানে অদ্বিতীয় ছিলেন—কলাবন্ত ও সঙ্গীতকার বলিয়া তাঁহার অসীম খ্যাতি—কিন্তু কবি-হিসাবেও তিনি কম ছিলেন না। তানসেন যে যুগে জীবিত ছিলেন সে যুগ প্রাচীন হিন্দী সাহিত্যের বিশেষতঃ কাব্য সাহিত্যের পক্ষে সর্ব্বাপেক্ষা গৌরবময় যুগ। তাঁহার সমসাময়িকদের মধ্যে এক দিকে ছিলেন তুলসীদাস, এবং তাঁহা অপেক্ষা অন্ততঃ এক পুরুষ প্রাচীন ছিলেন অন্ধ কবি সুরদাস। আকবরের দরবারে যেমন একদিকে ফারসী ছিল রাজভাষা, পোষাকী ভাষা—ফারসী সাহিত্যের চর্চ্চা ও ফারসীতে ইতিহাসাদি রচনায় যেমন একদিকে আকবর ও তাঁহার অমাত্যগণের পূর্ণ উৎসাহ ছিল, তেমনি অন্যদিকে দেশ-ভাষা হিন্দীর (ব্রজভাষার) চর্চ্চা ও ইহাতে কবিতা-রচনায় সম্রাট ও তাঁহার সভাসদ্‌গণের উৎসাহের অন্ত ছিল না। আকবর নিজে হিন্দীতে কবিতা রচনা করিতেন,—'অকব্বর' বা 'অকব্বর সাহি' এই ভণিতায় আকবরের রচনা বলিয়া প্রচারিত কতকগুলি হিন্দী দোহা বা কবিতা পাওয়া যায়। তাঁহার সভাসদ্‌গণের মধ্যে রাজা বীরবল, মীরজা আব্দ্‌-র্‌-রহীম খাঁ-খানান ও বীকানেরের রাজকুমার পৃথ্বীরাজ রাঠোড়

উচ্চদরের কবি বলিয়া হিন্দী ও রাজস্থানী সাহিত্যে সম্মানের আসনে প্রতিষ্ঠিত আছেন।

গায়ক বলিয়া অতুলনীয় যশের অধিকারী হওয়ায়, কবি-হিসাবে খ্যাতি লাভ তানসেনের ভাগ্যে ততটা ঘটিয়া উঠে নাই। সঙ্গীতজ্ঞ কলাবন্ত তানসেনের আড়ালে কবি ও সাধক তানসেন যেন ঢাকা পড়িয়া গিয়াছেন। এই-রূপটা হইবার কারণ এই ছিল যে তানসেন কেবল মাত্র কবি ছিলেন না—কেবল কবিতা রচনা তাঁহার একমাত্র পেশা ছিল না; দরবারে বা সভায় সুর-সংযোগে পাঠ করিয়া তারিফ বা সাধুবাদ লইবার জন্য বড় বড় কাব্য বা ছোট-খাটো দোহা বা পদ রচনা করা তাঁহার কার্য্য ছিল না। Lyric Poet অর্থাৎ গীতি-কবিতাকার বলিলে যাহা বুঝায়, তানসেন নিছক তাহাই ছিলেন। তিনি নিজে যে গান রচিতেন তাহা তিনি স্বয়ং গাহিতেন। কাব্য-রস অপেক্ষা সঙ্গীত-রসই ছিল এই সকল গানের প্রধান আকর্ষণ। কবি বা সাহিত্যিকের মজলিস অপেক্ষা কালোয়াতের জলসায় এই সকল গানের প্রচলন বেশী ছিল; এবং এই কালোয়াতেরা বেশীর ভাগ ছিলেন সুর ও তানের বৈয়াকরণ, কাব্য-রসের দিকটা তাঁহাদের কাছে ছিল গৌণ বস্তু। সুতরাং তানসেনের কাব্য-সরস্বতী অরসিকের হাতে পড়িয়াই দুর্দ্দশাগ্রস্ত হন—তানসেনের সঙ্গীতের কাব্য-সৌন্দর্য্যে কবি-চিত্ত আকৃষ্ট হইবার তাদৃশ সুযোগ পায় নাই। তানসেনের মত একাধারে কবি ও গায়ক—অনেকেরই এই অবস্থা ঘটিয়াছে; তানসেনের সমসাময়িক কবি ও গায়ক বাবা রামদাস ও তৎপুত্র সূরদাস (ইনি অন্ধ কবি সূরদাস হইতে পৃথক্ ব্যক্তি), এবং তানসেনের বহু পূর্ব্বেকার অপর সমস্ত কবি ও গায়ক সম্বন্ধেও এই কথা বলা যায়।

মুখ্যতঃ কবি বলিয়া খ্যাতি বা স্বীকৃতি লাভ না করায়, তানসেনের গানগুলির বাহিরে যতটা প্রচার হওয়া উচিত ছিল ততটা প্রচার ঘটিতে পারে নাই। সাহিত্য-রসিকগণ ও পুস্তক-অনুলেখক বা নকলকারগণ সূরদাস বিহারীলাল তুলসীদাস ভূষণ প্রভৃতি কবিদের লইয়াই মাতিয়াছিলেন। কালোয়াৎ-সম্প্রদায়ের বাহিরে আর কেহ এ বিষয়ে ততটা আকৃষ্ট হন নাই; এবং ব্যবসায়ী কালোয়াতের দলও সঙ্গীত-বিদ্যার প্রধান গুরুস্থানীয় তানসেনের গান নিজেদের মধ্যেই নিবদ্ধ রাখিয়াছিলেন,—বাহিরের লোকেরা গায়ক হিসাবেই তাঁহার স্মৃতির সম্মাননা করিয়া ক্ষান্ত থাকিত। যতদূর সন্ধান লইয়াছি, কাব্যের দিক হইতে তানসেনের গানের কোনও সংগ্রহ-পুস্তক আমি পাই নাই। অথচ উত্তর ভারতের কলাবন্ত সঙ্গীতের যে কোনও বইয়ে তানসেনের গান দুই দশটি থাকিবেই। একটা সুখের বিষয়—ফারসী হিন্দী বাঙ্গালা মারহাট্টী প্রভৃতি ভাষার প্রাচীন রীতি অনুসারে, অন্য কবিদের ন্যায় তানসেনও স্বরচিত পদে নিজ ভণিতা দিতেন। এই ভণিতা ধরিয়া তানসেনের গানের সংগ্রহ আরম্ভ করা যাইতে পারে। হয় তো অন্য লোকের লেখা অনেক বাজে কবিতায় তানসেনের ভণিতা আসিয়া গিয়াছে; আবার হয় তো তানসেনের রচিত পদের ভণিতা পরিবর্ত্তিত হইয়া গিয়া পদটী অন্য কবির নামেই চলিতেছে। এসব বিষয় বিচার করিয়া তানসেনের গানের বাণীর একটী সংগ্রহ-পুস্তক বাহির করা হিন্দী সাহিত্যের তথা ভারতীয় সাহিত্যের একটা বড় কাজ হইবে—এই সংগ্রহের প্রধান উদ্দেশ্য থাকিবে, পদগুলির কাব্যাংশ বিচার। মুদ্রিত পদও যথেষ্ট আছে, এগুলিকে লইয়া কাজ আরম্ভ করা চলে। খ্রীষ্টীয় ১৮৪৩ সালে কলিকাতায় মুদ্রিত ও প্রকাশিত (দ্বিতীয় সংস্করণ লালগোলার রাজা বাহাদুরের ব্যয়ে ১৯১৪—১৯১৬ খ্রীষ্টাব্দে বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ হইতে প্রকাশিত) কৃষ্ণানন্দ ব্যাসদেবের বিরাট সঙ্গীত-সংগ্রহ 'সঙ্গীত-রাগ-কল্পদ্রুম' গ্রন্থে তানসেনের ভণিতা দেওয়া বহু বহু পদ আছে। খ্রীষ্টীয় ১৮৮৫ সালে কৃষ্ণধন বন্দ্যোপাধ্যায় রচিত 'গীতসূত্রসার' পুস্তক হইতে আরম্ভ করিয়া বাঙ্গালায় হিন্দীতে মারহাট্টীতে ও অন্য ভাষায় ভারতীয় সঙ্গীত বিষয়ে যত পুস্তক বাহির হইয়াছে, সেগুলিতে তানসেনের পদ আছে। আবার যাঁহারা 'খানদানী' কালোয়াৎ, অর্থাৎ বংশানুক্রমে বহু পুরুষ ধরিয়া কলাবন্তের বৃত্তি পালন করেন, তাঁহাদের কণ্ঠেও ঘরের হাতেলেখা বইয়ে কিছু কিছু রক্ষিত আছে; যেমন বাঙ্গালা দেশে বিষ্ণুপুরের

খান্‌দানী সঙ্গীতজ্ঞ, ভারতের অন্যতম অদ্বিতীয় ধ্রুপদী, সঙ্গীত-নায়ক সঙ্গীতাচার্য্য শ্রীযুক্ত গোপেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায়—তানসেনের এক বংশধর ১৭১০ খ্রীষ্টাব্দের দিকে বিষ্ণুপুরে আগত বাহাদুর সেন বা বাহাদুর আলী খাঁর শিষ্য-পরম্পরার অন্তর্ভুক্ত ইনি; ইঁহার রচিত সঙ্গীত-বিষয়ক বাঙ্গালা পুস্তকে তানসেনের পদ কিছু কিছু দেওয়া হইয়াছে। এই প্রসঙ্গে বাঙ্গালা অক্ষরে 'ধ্রুপদ ভজনাবলী' নামে কলিকাতা হইতে কয়েক বৎসর পূর্ব্বে প্রকাশিত, অধুনা দুষ্প্রাপ্য ক্ষুদ্র একখানি পুস্তকের উল্লেখ করিতে হয়। রঙ্গপুরের উকীল রামলাল মৈত্র মহাশয় নিজ সঙ্গীত-শিক্ষক শিবনারায়ণ মিশ্রের নিকট বহু ধ্রুপদ গান শিক্ষা করেন, অমৃতবাজার পত্রিকার স্বর্গীয় শিশিরকুমার ঘোষ মহাশয়ের উৎসাহে এইরূপ ৩৭১ খানি ধ্রুপদ গানের বাণী তিনি প্রকাশ করিয়াছিলেন, ইহার মধ্যে ১৮০টীর অধিক গান তানসেনের ভণিতায় পাওয়া যাইতেছে। এই 'ধ্রুপদ ভজনাবলী'তে হিন্দী শব্দগুলির যে দুর্দ্দশা হইয়াছে তাহা বর্ণনাতীত; তথাপিও এই বইখানি বিশেষ মূল্যবান্।

প্রাচীন যুগের হিন্দী কবিদের মত তানসেন ব্রজভাষায় তাঁহার পদ রচিয়া গিয়াছেন। ব্রজভাষা ব্রজমণ্ডল অর্থাৎ মথুরা-অঞ্চলের জন-ভাষা। (বাঙ্গালা বৈষ্ণব পদাবলীতে যে 'ব্রজবুলী' নামক বাঙ্গালা ও মৈথিলের মিশ্রণ-জাত এক কৃত্রিম সাহিত্যের ভাষা পাওয়া যায়, তাহা হইতে মথুরা-বৃন্দাবনের এই 'ব্রজভাষা' সম্পূর্ণরূপে পৃথক্।) ব্রজভাষায় বিরাট একটী সাহিত্য আছে; এই ভাষা বহু কবির এবং গদ্য লেখকের দ্বারা গঠিত। উত্তর ভারতের আর্য্য ভাষাগুলির মধ্যে শ্রুতি-মাধুর্য্যে ও গাম্ভীর্য্যে ব্রজভাষা অতুলনীয় সুন্দর ও শক্তিশালী,—গীতি-কবিতার পক্ষে এই ভাষা বিশেষ উপযোগী। দিল্লী ও পাঞ্জাব অঞ্চলের কথিত ভাষার আধারের উপরে প্রতিষ্ঠিত হিন্দুস্থানী (আধুনিক সাধুহিন্দী এবং উর্দ্দু) তানসেনের যুগে সাহিত্যের দরবারে তেমন প্রতিষ্ঠা লাভ করে নাই—কবিতা বা অন্য কিছু দেশভাষায় লিখিতে হইলে সাধারণতঃ একাধিক প্রাদেশিক ভাষাই ব্যবহৃত হইত—ব্রজভাষা, বা ডিঙ্গল অর্থাৎ রাজস্থানী, অথবা অবধী অর্থাৎ অযোধ্যা-অঞ্চলের ভাষা। তানসেনের ও অন্য হিন্দী কবিদের ব্রজভাষা হইতেছে মধ্য-যুগের আর্য্য-ভাষা—স্বরবর্ণ-বহুল বলিয়া বিশেষ শ্রুতিসুখকর; এই ভাষার প্রায় তাবৎ শব্দ স্বরান্ত। গানের ভাষা হইবার পক্ষে ইহা একটি বিশেষ উপযোগিতা। গানে ব্যবহৃত হইলে ব্রজভাষায় একটু উচ্চারণ-বৈশিষ্ট্য দুই এক ক্ষেত্রে আসিয়া যায়—অন্ততঃ ধ্রুপদ-গানের কোনও কোনও ধারায় এই বৈশিষ্ট্য লক্ষিত হয়—অনুনাসিক বর্ণের পরে বর্গের প্রথম দ্বিতীয় তৃতীয় চতুর্থ বর্ণ আসিলে, এই অনুনাসিক-যুক্ত সংযুক্ত বর্ণের পূর্ব্বেকার অ-কারকে ঔ-কারবৎ উচ্চারণ করা হয়—অ-কারের সাধারণ হিন্দী আ-কার-ঘেঁষা উচ্চারণ না হইয়া, কতকটা বাঙ্গালার দীর্ঘ অ-কারবৎ উচ্চারণ আসে; যেমন—'পঙ্কজ, শঙ্খ, গঙ্গ, পঙ্ক, অঞ্জন, মণ্ডল, অন্ত, পদ্ম, চন্দ, সুগন্ধ, অন্ত' ইত্যাদি শব্দ গানের সময়ে উচ্চারণে শোনায় যেন 'পৌঙ্কজ, সৌঙ্খ, গৌঙ্গ, পৌঙ্ক, ঔঞ্জন, মৌণ্ডল, ঔন্ত, পৌদ্ম, চৌন্দ, সুগৌন্ধ, ঔন্ত' ইত্যাদি। ইহাতে গীতকালে এই সানুনাসিক সংযুক্ত-বর্ণগুলির বিশেষ একটু শ্রুতিমাধুর্য্য আসিয়া যায়।

তানসেনের পদ এবং তানসেনের সমকালীন অনুরূপ অন্য হিন্দী কবিতায় একটী লক্ষণীয় বিষয় হইতেছে—পদের ভাষার সংক্ষেপ বা সঙ্কেত। ব্যাকরণ-ঘটিত শব্দ ও ধাতু-রূপ যতদূর সম্ভব বর্জ্জন করিয়া, ব্যাকরণকে যেন বাদ দেওয়া হয়—post-position বা অনুসর্গ ও প্রত্যয় এবং অন্য সহায়ক পদ বা পদাংশ যেখানে না থাকিলে চলে না, যথাসম্ভব মাত্র সেখানেই প্রযুক্ত হয়। নাম-শব্দের প্রাতি-পদিক রূপ, এবং মাত্র আকারান্ত ধাতুর দ্বারাই কাজ চালানো হয়। বাক্যে থাকে—কেবল পর পর সজ্জিত মূল শব্দ বা সমস্ত-পদ—এই সকল পৃথক্ অবস্থিত বিভক্তি-প্রত্যয়-বিরল 'নিরেট' শব্দগুলি যেন একটু বিশেষ শক্তির দ্যোতনা আনিয়া দেয়, ভাষাকে খুব জম-জমাট করিয়া তুলে। তানসেনের পদে প্রায়ই এইরূপ পাওয়া যায় যে কেবল শব্দগুলির অবস্থানেই পর পর কতকগুলি চিত্র আমাদের মানসপটে অঙ্কিত হইয়া উঠে।

তানসেনের পদ ধ্রুপদ গানের আস্থায়ী, অন্তরা, সঞ্চারী, ও আভোগ এই চারিটি অংশ অবলম্বনে চারি ভাগে

বিভক্ত। পদের ছন্দ সাধারণতঃ দীর্ঘ হয়—চারি ছত্রের বড় বড় হিন্দী ছন্দই পাওয়া যায়; আবার চারি ছত্রে বিভক্ত গদ্য রচনাও খুব মিলে।

ধ্রুপদ গানের জন্যই বিশেষ ভাবে এই সকল পদ বা গান বাঁধা হয়, ইহা তানসেনের কাব্য-সরস্বতীর স্বচ্ছন্দ স্ফূর্ত্তির পক্ষে যেন এক বিষম অন্তরায়। একদিকে বাহ্য রূপটী যেমন ধরা-বাঁধা, অন্য দিকে বিষয়-বস্তুও তেমনি সুনির্দ্দিষ্ট। ধ্রু পদ-গানের বাণীর বিষয় এই কয়টী মাত্র হইতে পারে—পরব্রহ্ম, অথবা পরব্রহ্মের ধ্যান-গ্রাহ্য স্বরূপ শিব উমা বিষ্ণু সূর্য্য গণেশ শ্রীকৃষ্ণ প্রভৃতি হিন্দুধর্ম্মের দেবতার মহিমা কীর্ত্তন, দেবতাদের রূপ ও লীলা বর্ণন; প্রকৃতি বর্ণনা, বিশেষতঃ ঋতুবর্ণনা; সঙ্গীতের মহিমা-কীর্ত্তন; রাধা-কৃষ্ণ অথবা সাধারণ নায়ক-নায়িকার প্রেম বর্ণনা; বিরহ; এবং রাজা-রাজড়াদের গৌরব-বর্ণনা। মুসলমান মতের ধ্রুপদে আল্লার মহিমাকীর্ত্তন, নবী মোহম্মদের ও মুসলমান সাধকদের গুণ-বর্ণন,—এই সব পাওয়া যায়। ধ্রুপদ গানে ব্যবহৃত শব্দ প্রায় সবগুলিই প্রাচীন হিন্দীর এবং সংস্কৃতের হইয়া থাকে—তানসেনের সময়ে ফারসী-আরবী-শব্দ-বহুল উর্দুর সৃষ্টি হয় নাই; কিন্তু মুসলমান ধর্ম্মমতের অনুকূল পদে আরবী-ফারসী নাম এবং শ এমন কি বাক্য পর্য্যন্তও মিলে।

মোটের উপর, ধ্রুপদ রীতির পদে কবির কাব্যশক্তির স্ফূর্ত্তির কতকগুলি বিশেষ অন্তরায় ছিল। তথাপি তানসেন যে একজন প্রথম শ্রেণীর প্রতিভাবান্ কবি ছিলেন, তাহা এই বন্ধনের মধ্যেও তাঁহার পদের বাণীতে বিশেষভাবে প্রকট। ধ্রুপদের পদে একটা ধীরোদাত্ত, একটা স্নিগ্ধ-গম্ভীর ভাব আছে—বিরাট্ বাস্তুশিল্পের অনুরূপ ইহার পরস্পর-সম্বদ্ধ গঠন-প্রণালী; ইহার দ্বারাই তাঁহার রচনাতে একটী মহিমা, একটী উচ্চ-ভাব আসিয়া যায়, যাহা আবার তাঁহার রচনা-শৈলীর উদারতা ও আভিজাত্য দ্বারা, তাঁহার শব্দ-চয়নের ক্ষমতার দ্বারা আরও পুষ্ট হয়, আরও সমৃদ্ধ ও উদ্ভাসিত হয়। দেবতাদের মহিমা কীর্ত্তনের সময় তাঁহার পদে যে সকল বিশেষণ বা সংজ্ঞা তিনি প্রয়োগ করিয়াছেন, সেগুলির মধ্যে যেন একটা আদিম বা মৌলিক মহত্ত্ব ও বিশালত্ব আছে। দৃষ্টান্ত-স্বরূপ পরব্রহ্ম বা শিব বা বিষ্ণু বিষয়ক কতকগুলি পদের উল্লেখ করা যাইতে পারে। পাখীর গান ও দক্ষিণ পবনের সঙ্গে বসন্ত ঋতুর আনন্দময় রূপ; পূরবী বাতাস, মেঘের ঘটা, বিদ্যুতের চমক ও মেঘগর্জ্জন এবং বৃষ্টিপাতের মনোমুগ্ধকর স্নিগ্ধ ধ্বনির সহিত বর্ষা ঋতু; রাধা ও কৃষ্ণের অনৈসর্গিক প্রেমলীলা;—ভারতীয় কাব্য-সাহিত্যে মহিমময় ও মাধুর্য্যময় যাহা কিছু আছে, সে সমস্তের দ্বারা তানসেনের পদ যেন ভরপুর, প্রাচীন ও মধ্য-যুগের হিন্দু কাব্য ও ভক্তিবাদ মথিয়া নবনীতটুকু যেন তানসেনের পদে ধরিয়া দেওয়া হইয়াছে। ধ্রুপদের বাণী, এবং অন্য কবিদের রাগরাগিণী বর্ণনার পদ—এইসব পদে যেন প্রাচীন রাজপুত ও মোগল চিত্রের কবিতাময় ব্যাখ্যা বা বর্ণনা পাওয়া যায়—এই দুইটী বস্তু ভারতের কাব্যোদ্যানে দুইটী অনিন্দ্যসুন্দর সৌরভময় পুষ্প। ঋগ্বেদের ঋষিদের সময় হইতে আরম্ভ করিয়া ভারতের প্রাচীন ও মধ্য-যুগের কবি-পরম্পরার মধ্যে তানসেনের আসন অতি গৌরবময়।

তানসেন রাজসভার কবি, জগতের ইতিহাসে শ্রেষ্ঠ রাজাদের মধ্যে যিনি অন্যতম, সেই আকবরেরই উপযুক্ত সভাসদ্ ও গায়ক তিনি। কিন্তু তাঁহার কাব্য-বস্তু দেশের জন-সাধারণের অনুভূতির বাহিরে নহে—রাজসভায় বসিয়া তিনি যাহা রচনা করিয়াছেন, তাহার সহিত পণ্ডিত ও অভিজাতজন, এবং বণিক ও যোদ্ধা, এবং ইহাদের মতই দীন পল্লীবাসী কৃষক, সকলেরই নাড়ীর টান আছে;—'আবির্ অকৃত প্রিয়াণি'—যে সব জিনিস আমাদের প্রিয়, যাহা আমরা ভালবাসি, সেই সব জিনিস তিনি সর্ব্বজন-সমক্ষে যেন নূতন করিয়া আবিষ্কার করিয়া দিয়াছেন, তাঁহার কাব্যের ও সঙ্গীত-বিদ্যার আলোক-পাত দ্বারা প্রকাশিত করিয়া দিয়াছেন। তানসেনের কবিতা ভারতের জাতীয় চিত্ত হইতেই রস পাইয়া রূপ গ্রহণ করিয়াছে।

তানসেনের নামে যে-সব পদ বা কবিতা পাওয়া যায়, সেগুলি খণ্ডাকারে বিক্ষিপ্ত ভাবে মিলিতেছে, পারম্পর্য্য বা ক্রম-বিকাশ ধরিয়া সেগুলিকে সাজানো এখন প্রায় অসম্ভব ব্যাপার। রামলাল মৈত্র মহাশয় সঙ্কলিত ইতি-পূর্ব্বে উল্লিখিত 'ধ্রুপদ ভজনাবলী' পুস্তিকার ভূমিকায় বলা হইয়াছে যে তানসেনের কবি-জীবন তিন পর্য্যায়ে পড়ে;—

প্রথম, যৌবন—এই সময়ে তিনি তাঁহার পৃষ্ঠপোষক রাজা-রাজড়াদের গৌরব গান করিয়াছেন, এবং ঋতু প্রভৃতি বর্ণনা করিয়াছেন—এই পদগুলি উল্লাস ও ঔজ্জ্বল্যে ভরপুর; দ্বিতীয়, প্রৌঢ় অবস্থা,—এই অবস্থায় তিনি দেবতাদের লীলা ও মহিমা কীর্ত্তন করেন,—এই শ্রেণীর পদগুলিতে ঐশ্বর্য্য-বোধ ও অন্তর্দৃষ্টি উভয়ই আছে, কিন্তু গভীর আত্মানুভূতি নাই; তৃতীয় পর্য্যায়ে তাঁহার পরিণত বয়সের ও বার্দ্ধক্যের কবিতাগুলিতে তিনি রাধাকৃষ্ণলীলা বর্ণনা করিয়া গিয়াছেন—ভাবগাম্ভীর্য্যে ও ভক্তির গভীরত্বে এগুলি অতুলনীয়। কিন্তু বাস্তবিক পক্ষে, তানসেনের পদের এরূপ ঐতিহাসিক ক্রম নির্দ্ধারণ করা সম্ভবপর নহে।

তানসেনের বিনয় বা প্রার্থনাত্মক পদগুলি, সরল অকপট বিশ্বাস ও প্রীতিতে অতুলনীয়। তাঁহার ধর্ম্ম-বিষয়ক পদগুলিতে আমরা একজন তাত্ত্বিক, মর্ম্মজ্ঞ ও ভক্তের প্রাণের পরিচয় পাই। নিজের জাতীয় সংস্কৃতির প্রধানতম বিষয়গুলির সহিত সুপরিচিত, এবং সেগুলির সম্বন্ধে শ্রদ্ধা ও আস্থাশীল যথার্থ ব্রাহ্মণের পরিচয়ও তানসেনের পদে পাই। শিব, বিষ্ণু, সূর্য্য, গণেশ, দেবী, সরস্বতী প্রভৃতির মহনীয় ও বিরাট্ কল্পনার অন্তর্নিহিত গভীর চিন্তা, জ্ঞান ও উপলব্ধি এবং সৌন্দর্য্যবোধ—ইহার কোনটাই তাঁহার দৃষ্টি এড়ায় নাই। বেদ, উপনিষদ হইতে রামায়ণ, মহাভারত, পুরাণ এবং তন্ত্র, ও মধ্য-যুগের সাধু ও সন্তগণের ভক্তিবাদ—এ সমস্তের মধ্যে যে জ্ঞান যে সত্যদৃষ্টি যে প্রাণ এবং যে রসসৃষ্টি আছে, তানসেন সে সমস্তেরই উত্তরাধিকারী। তানসেনের ধ্রুপদ গান-শ্রবণে শ্রোতার মনে প্রার্থনা ও আত্মনিবেদনের মত দিব্যভাব জাগরিত হয়, ইহাও দেখা গিয়াছে।

দেবমন্দিরে দেববিগ্রহের সমক্ষে, কিম্বা বন্ধু-গোষ্ঠীতে বা রসিক-সমাজে, জ্যোৎস্না-রাত্রিতে সৌধশীর্ষে বা উদ্যানে, নক্ষত্র-খচিত রজনীতে নদী বা বিরাট জলাশয়ের তীরে কোনও আশ্রমে বা কুঞ্জবনে বসিয়া ধ্রুপদ গান গীত ও শ্রুত হইবার পক্ষে সর্ব্বাপেক্ষা প্রশস্ত পারিপার্শ্বিক। বাণভট্টের কাদম্বরীতে, অচ্ছোদ-সরোবর-তীরে শিবমন্দিরে বিরহিণী কুমারী মহাশ্বেতার বীণার সঙ্গে গানের অতি মনোহর চিত্রটী বর্ণিত আছে; শিবের মহিমা মহাশ্বেতার কণ্ঠে যে সঙ্গীতে গীত হইয়াছিল, তাহা এখন হইতে এক সহস্র বৎসর পূর্ব্বেকার কালের ধ্রুপদ সঙ্গীত ভিন্ন আর কি হইতে পারে? মেঘদূতের বিরহিণী যক্ষ-পত্নী বীণা বাজাইতে বাজাইতে বেদনাতুর হৃদয়ে স্বামীর গুণবর্ণনার যে পদ গাহিতেছিলেন, এবং গানের মধ্যে নিজের রচিত যে মূর্চ্ছনা ভুলিয়া যাইতেছিলেন, তাহা কালিদাসের যুগের ধ্রুপদ ভিন্ন আর কি? ঈশ্বরের যে স্তুতি নিসর্গের সুন্দর বস্তু এবং সুশ্রাব্য ধ্বনি-নিচয় দ্বারা অহরহ ধ্বনিত হইতেছে—হিমালয়ের অরণ্য-সঙ্কুল উপত্যকায় শুষির বংশদণ্ডের মধ্য দিয়া প্রবাহিত হইয়া বায়ু যে বংশী-নিঃস্বন মুখরিত করিয়া তুলিতেছে, পর্ব্বতগুহায় প্রতিধ্বনি জাগাইয়া মেঘের গুরু-গর্জ্জনে যে মৃদঙ্গ মন্দ্রিত হইয়া উঠিতেছে, অদৃশ্য কিন্নরীকণ্ঠের সহিত সম্মিলিত প্রকৃতির সেই শিব-মহিম্ন-স্তোত্র এই ধ্রুপদেই যেন কথঞ্চিত প্রকাশিত হয়; এবং রাধিকার জন্য যুগ যুগ ধরিয়া শ্রীকৃষ্ণের বংশীধ্বনি, শ্রীকৃষ্ণের জন্য রাধার শাশ্বত অভিসারযাত্রা—ইহারও আভাস ধ্রুপদেই ধ্বনিত হইতেছে।

রোমান-কাথলিক ধর্ম্মের সব চেয়ে মনোহর ও গাম্ভীর্য্য-পূর্ণ পূজাপদ্ধতি দেখিবার সুযোগ আমার হইয়াছিল; আমাদের হিন্দুধর্ম্মের অপূর্ব্ব শ্রী ও শোভা মণ্ডিত বহু পূজা পাঠ ও যজ্ঞাদি অনুষ্ঠানও দেখিয়াছি। নানা প্রকারের পাঠ-পদ্ধতি শ্রদ্ধার সহিত শুনিয়াছি—কাশীতে, পুরীতে, দক্ষিণভারতের তামিলদেশের মন্দিরে, এবং অন্যত্র। সাধারণতঃ এই সকল পাঠের অন্তর্নিহিত সৌন্দর্য্য ও মহত্ত্ব আমাকে মুগ্ধ করিয়াছে। কিন্তু বিশেষ করিয়া আমার মনে জাগে—উদয়পুর রাজ্যে একলিঙ্গজীর মন্দিরের একটী দিনের ভোরের পূজার কথা; গৈরিক-বসন পরিহিত রুদ্রাক্ষের মালাধারী তেজঃপুঞ্জকলেবর সন্ন্যাসী পূজক, চমৎকার বিশুদ্ধ উচ্চারণে মন্ত্র পাঠ করিয়া পূজার অনুষ্ঠান পালন করিতেছেন; মাঝে মাঝে গর্ভগৃহের দ্বার রুদ্ধ হইতেছে; এদিকে অলঙ্করণ-মণ্ডিত প্রস্তরময় নাট-মন্দিরে এক ধ্রুপদ-গায়ক মৃদঙ্গী ও সারেঙ্গী-বাদকের সহিত বসিয়া, পূজার মাঝে মাঝে মহাদেবের স্তুতিময় একখানি ধ্রুপদ চৌতাল ধরিতেছে—সমস্তটা মিলিয়া পূজার যে অপূর্ব্ব আয়োজন, "কথায় তাহার বর্ণনা করা যায় না; সর্ব্বোপরি পূজারী সন্ন্যাসীর শেষ মন্ত্রগুলির মধ্যে একটীর

ঝঙ্কার আসিয়া সমগ্র অনুষ্ঠানটীর সম্বন্ধে শেষ কথা যেন বলিল—এই মন্ত্রের সম্পূর্ণ শ্লোক কয়টী মনে রাখিতে পারি নাই, কিন্তু একটী শ্লোকের একটী অংশ যেন এইরূপ ছিল—'শিবে ভক্তিঃ শিবে ভক্তি র্ভক্তি র্ভবতু মে সদা।'

তানসেনের ধ্রুপদের কবিতার একমাত্র উপযুক্ত ছবি হইতেছে রাজপুত ও মোগল শিল্পের ছবি, এই সব ছবি এবং তানসেনের কবিতা—এই দুইটী পরস্পরকে ফুটাইয়া তুলে। ধ্রুপদগানের উপযোগী পারিপার্শ্বিক বা দৃশ্যে এই প্রকারের চিত্র ভরপুর। রাগমালা বিষয়ক চিত্রগুলিকে 'দৃশ্যমান সঙ্গীত' (Visualised Music) আখ্যা দেওয়া হইয়াছে—সার্থক এই আখ্যা। রাজকুমারী উমা একাকিনী বা সখী-সহিত অরণ্য-সঙ্কুল গিরি পার্শ্বে গভীর নিশীথে শিবপূজা করিতেছেন; সঙ্গীতকার, বাদক ও যোগী মিলিয়া নদীর ধারে কোনও আশ্রমে বসিয়া সঙ্গীতচর্চ্চা করিতেছেন; শরৎকালের প্রভাতরৌদ্রে অচিরস্নাতা কুমারী পূজা-নিরতা; এই প্রকারের বহু বহু চিত্র, ধ্রুপদ গানেরই যেন রূপময় প্রকাশ।

তানসেনের কতকগুলি পদ উদ্ধৃত করিয়া এই প্রবন্ধের উপসংহার করিব। বাঙ্গালা অক্ষরে মুদ্রিত বা গায়কের কণ্ঠে রক্ষিত বিকৃত পাঠ হইতে পদগুলির ভাষা শুদ্ধ করিয়া লিখিবার যথাশক্তি প্রয়াস পাইয়াছি, ভুল-চুকগুলি বিশেষজ্ঞ পাঠকগণ সংশোধন করিয়া লইবেন।

উষা-সম্পর্কীয় পদগুলিতে বৈদিক উষা-বিষয়ক সূক্ত বা ঋকের আভাস পাওয়া যায়।

[ব—অন্তঃস্থ ব, ইংরেজীর w-এর মত; মূর্দ্ধন্য ষ-এর উচ্চারণ 'খ', এবং ক্ষ-র উচ্চারণ 'চ্ছ'।]

[১] রাগ ললিত-ভৈরব। তাল চৌতাল।

হেম-কিরীটিনী উষা দেবী কনক-বরনী সবিতা-গেহিনী উদত মধুর হাস জগ হসায়ৌ।

সিন্ধু-বারি উদত ভানু, বিমল সোহ জৈসে মানৌ দিসা-নায়রী কনক-গাগরী পানী ভরি ভরি মঙ্গল-অসনান করায়ৌ।

বিহগ মধুর ললিত তান গাবৈ, ভুবন নব জীবন, আনন্দ-মগন সব জগ-জন মঙ্গল গীত গায়ৌ।

আয়ী উষা কমল-নেত্রী, গায়ত্রী, জগ-ধাত্রী, লেকে অরুণ-কিরণ-মঞ্জন তানসেন-মানস-তামস দূর লিয়ৌ।

[উষা]

হেম-কিরীটিনী কনক-বর্ণা সবিতৃ-গৃহিণী উষা-দেবী উদিতা হইয়া মধুর হাসির দ্বারা জগৎকে হাসাইয়াছেন (উদ্ভাসিত করিয়াছেন)।

ভানু সিন্ধু-বারি হইতে উদিত হইতেছেন; কি বিমল শোভা! যেন মনে হয়, দিগ্‌বধূগণ কনক-গাগরীতে জল ভরিয়া ভরিয়া মঙ্গল-স্নান করাইয়াছে।

বিহঙ্গ মধুর ললিত তানে গায়; ভুবনময় নব জীবন; সমস্ত জগৎ আনন্দ-মগ্ন হইয়া মঙ্গল-গীত গাহিয়াছে।

কমল-নেত্রী, সঙ্গীতময়ী (গায়ত্রী), জগৎ-পালিকা উষা দেবী আসিয়াছেন—অরুণ-কিরণ-রূপ নেত্র-মঞ্জন লইয়া তিনি তানসেনের মনের অন্ধকার দূরে লইয়া গিয়াছেন।

[২] রাগ ভৈরব। তাল ধীমা তিতালা।

মহাদেব মহাকাল ধূরজটী শূলী পঞ্চ-বদন প্রসন্ন-নেত্র।

পরমেশ্বর পরাৎপর মহা-জোগী মহেশ্বর পরম-পুরুষ প্রেমময় পরা-শান্তি-দাতা।

সরিতা-গণ—(নদী-সমূহ) ভিন্ন ভিন্ন পন্থ জৈসে আবত, সিন্ধুবা পাই রহত মগন—

তানসেন কহৈ—তৈসে ভগত ভিন্ন ভিন্ন মূরতি উপাসত একহী ব্রহ্ম আবত।

[৩] রাগিনী ললিত। তাল চৌতাল।

গগন-মণ্ডল-মধ্য উদয়াচল-পর অষ্ট-বাজী কনক-রথ-মেঁ অরুণ সারথি হোত, প্রিয়া উষা সঙ্গে অরুণ-বরন রঙ্গী বসন পহিরি ভানু উদত।

গগনাঙ্গন অঁধার-ধূরিয়া কিরণ-মঞ্জন দূর লিয়া;—হুল্লাস প্রকৃতি হসত অমিয়া, বিচিত্র ভূষণ মোহন সাজত।

কানন-কুন্তল নীহার-বুঁদন জড়িত মুকুতা-মাল মানৌ, সিন্ধু নিচোল, অচল মেখলা, নিতম্ব ধরণী বিশাল।

বালার্ক সিন্দুর-বুঁদ ভাল, গ্রহ-উড়ু-সপ্তঋষি-মণ্ডল সোহত; প্রকৃতি-সোহ (=শোভা) নিহারি তানসেন প্রাণ মতাবত।

[৪] রাগিণী ভৈরবী। তাল চৌতাল।

অন্ত-কাল কৃপা করো, হিয়া-পর ঠাঢ়ো, হরি কমল-নৈন, কমলা-পতি, মুরলী অধর, ললিত-মধুর, বঙ্কিম ভই বঙ্ক-বিহারী।

বদন খীন, (=দেহ দুর্ব্বল) ইন্দ্রিয়-হীন; পাপ সুমরি সুমরি (=স্মরিয়া স্মরিয়া) অস্থির প্রাণ; নিরাশা প্রবর (=প্রবল), বিশ্ব অঁধার, গেহ ছোড়ি প্রাণ জাত, হরি।

বিষয় আপদ, সুখ সম্পদ ধন জন দারা বান্ধব সুত সব-কো ছোড়ি চলিহৌ (=আমি চলিয়া যাইব),—এক করম অব সঙ্গি (=সঙ্গে) রহিয়ৌ (=রহিয়াছে) ॥

পতিত-পাবন প্রভু জনার্দ্দন, পতিত দীন তানসেন; বিশ্ব-মোহন, পারগামী প্রাণ-আশ্রয় দীজে, গোলোক-বিহারী ॥

[৫] রাগিণী দরবারী তোড়ী। তাল চৌতাল ॥

প্রাণ মেরৌ হী রোবত হে বিরহ প্রাণ-বল্লহ নিসি-দিন; হে হরি, শরণাগত দীন-কো দরসন কাহে ন মিল ॥

ঢুঁড়ি হিদ (=হৃদয়ে) ন পাবে নিধি,—য়া বিধি তেরী বিধি; হিদ-নাথ, দীন-নাথ, কৌন গতি কীন (=করিল) মেরে অপরাধকে ফল ॥

সুন (=শূন্য) প্রাণ, সুন মন, সুন হিদ-আসন; অঁধার ভয়ৌ (=হইয়াছে) বিশ্ব-সংসার, হে নাথ ॥

তানসেন বিনতী করত: আই (=আসিয়া) হিদ জগন্নাথ মরুভূম প্রেম-বারি বরখি প্রাণ কীজে শীতল ॥

[৬] রাগিণী অলৈয়া। তাল চৌতাল ॥

জগত-জীবন হৌ (=তুমি হইতেছ) প্রভু, ভগত-বচ্ছল তুঁ হী ভগবান; ভগত-হিয়-পঙ্কজ-রাজ অচল-রাজ রাজ-রাজেশ্বর, অগণ-ভুবন-পালক ॥

তুঁ হী মাতা, তুঁ হী পাতা, তুঁ হী ধাতা বান্ধব; তুঁ হী প্রিয় প্রাণারাম, তুঁ হী শান্তি, সুখ গতি, মোক্ষ-ভক্তি-দাতা ব্রহ্ম তারক ॥

প্রাণ-বল্লহ (=বল্লভ), হৃদ-বল্লহ—তানসেন-কৌ এক বল্লহ; মায়া-মোহ-মুগধ চীত সংসার-তাপ তপত (=তপ্ত হইতেছে); শান্তি-দাতা, দীজে শান্তি দীন-কো ॥

[৭] রাগিণী হিন্দোল। তাল চৌতাল ॥

সুন্দর সরস ঋতুরাজ বসন্ত আয়ত ভাবন, কুঞ্জ কুঞ্জ ফুলি ফুলি (=ফুলে ফুলে) ভবঁর (=ভ্রমর) গুঞ্জ, কোয়িল পঞ্চম গান মতাবে নর-নারী ॥

কানন কানন ফুটত চমেলী, বকুল গন্ধরাজ বেলী, মোতিয়া গুলাব সুগন্ধ মনোহারী ॥

পবন চলত মন্দ মন্দ, বিছুড়ি গন্ধ চহুঁ দিস; গুঞ্জন রনন নাদ পঞ্চম পুরত সবহুঁ বন-ভুব ॥

রতি-পতি ভজ জুবক-জুবতী, নাচত গাবত হিন্দোল মাতি; গোবিন্দ-মঙ্গল তানসেন গায়ৌ রী ॥

[৮] রাগ মল্হার। তাল চৌতাল ॥

বাদর আয়ৌ রী বাল (=বালা) পিয়া বিন লাগই ডর পাবন ॥

এক তো অঁধেরী কারী (=কৃষ্ণবর্ণ), বিজুরী চমকত, উমড়-ঘুমড় বরখাবন ॥

জব-তেঁ (=যখন হইতে) পিয়া পরদেশ গবঁন কীনৌ (=গমন করিলেন), তব-তেঁ বিরহ ভয়ৌ মো তন-তাবন (=বিরহ আমার তনু-তাপকারী হইল) ॥

সাবন (=শ্রাবণ) আয়ৌ, অত (=এখানে) ঝর লাবত; তানসেন প্রভু ন আয়ে মন-ভাবন ॥

[৯] রাগিণী বিহাগ। তাল চৌতাল ॥

সাঈঁ, তুঁ ন আবৈ আজ, আধী রাত (আঁধী রাত), মাঝ মাঝ সিংহনী জগাবৈ সিংহ কানন পুকার ॥

চন্দন ঘসত ঘসত ঘস গয়ে নখ মেরে—বাসনা ন পুরত মাগ-কো নিহার (=তোমার মার্গ বা পথের দিকে চাহিয়া চাহিয়া) ॥

ধিক জনম মেরে, জগ-মেঁ জীবন মেরে বিমুখ লগাবৈ নাথ পকরি বেহু বার বার (=হে নাথ, বার বার বেণু ধরিয়া তুমি পৃথিবীতে আমার জীবনকে বিপথে লইতেছ) ॥

হৌ (=আমি) জন দীন অতি, নয়নহু বারি বহে; তানসেন অন্তর-বাণী ধ্রুপদ পুকার (=এই ধ্রুপদে তানসেনের অন্তর্ব্বাণী যেন চীৎকার করিয়া আপনাকে প্রকাশ করিতেছে) ॥

[১০] রাগ বিলাবলী। তাল চৌতাল ॥

তন-কী তাপ তব হী মিটৈগী মেরী, জব প্যারে-কৌ দৃষ্টি-ভর দেখোঙ্গী ॥

জব দরস পাউঁ প্রাণ-প্রীতম-কৌ, জনম জীবন সফল অপনৌ লিখাউঙ্গী ॥

অষ্ট-জাম মোহি-কৌ ধ্যান রহত বা-কৌ (=অষ্টযাম আমাতে কেবল উঁহারই ধ্যান বিদ্যমান), আলী-কৌ (=সখীকে) লে ভেটৌঙ্গী ॥

তানসেন প্রভু কোউ আন মিলাবৈ, তা-কে পাবন সীস টেকাউঙ্গী (=তানসেনের প্রভুকে যদি কেহ আনিয়া মিলায়, তার দুইটী পায়ে আমার মাথা ঠেকাইব) ॥

পুস্তক পরিচয়

অপরাজিত—শ্রীবিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত। রঞ্জন প্রকাশালয়, ৫ সি রাজেন্দ্রলাল ষ্ট্রীট, কলিকাতা। ক্রাউন ৮ ভাঁজ, দুই খণ্ডে ৬১৯ পৃষ্ঠা। মূল্য ২।০ ও ২্।

এই বহিখানি কৌতূহলাবহ মামুলী উপন্যাস নয়, নায়কের চরিতকথা। এই ধরণের গল্প বাংলা সাহিত্যে প্রথম দেখিয়াছি—শ্রীযুক্ত সুরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'চিত্রবহা'। বিভূতিভূষণ 'পথের পাঁচালী'তে বালক অপুর যে জীবনকাহিনী আরম্ভ করিয়াছেন, 'অপরাজিত' তাহারই অনুবৃত্তি। অপু এখন বড় হইয়াছে, কিন্তু তাহার স্বভাবগত বালকত্ব ঘুচিবার নয়, তাই তাহার প্রেমের চিত্রে যৌবনসুলভ আবেগ দেখিতে পাই না। তাহাতে আমাদের কোনও ক্ষোভ নাই, কারণ প্রেমই কথাসাহিত্যের একমাত্র উপকরণ নয়। গ্রন্থকার পাঠকবর্গকে যে ভোজ্য বিতরণ করিয়াছেন তাহা নিরামিষ, কিন্তু বিচিত্র ও পরম উপাদেয়। এই স্নিগ্ধ অনাবিল রচনা পাঠে মন পরিতৃপ্ত হয়। লেখকের নিসর্গ-চিত্রণ চমৎকার। মধ্যপ্রদেশের ভীমকান্ত অরণ্যের বর্ণনার তুলনা নাই।

মধু ও হুল—শ্রীসজনীকান্ত দাস প্রণীত। রঞ্জন প্রকাশালয়, ৫ সি রাজেন্দ্রলাল ষ্ট্রীট, কলিকাতা। ক্রাউন ৪ ভাঁজ, ১৫০ পৃষ্ঠা। মূল্য ২্।

লেখকের পরিচয় অনাবশ্যক। ইনি অজাতশত্রু নহেন, খ্যাতজনের প্রীতি ইঁহার কাম্য নয়, কিন্তু নিজ প্রতিভার বলে ইনি সুপ্রতিষ্ঠ। আলোচ্য পুস্তক কয়েকটি ব্যঙ্গরচনার সমষ্টি। লেখক মধু খাওয়াইবার জন্য হুলের খোঁচা দিয়াছেন। ইহা সনাতন রীতি—জনকতক খোঁচা খায়, আর সকলে রসপান করে। লেখক যদি নগণ্য বা অল্পগণ্য হইতেন তবে আমাদের কিছুই বলিবার থাকিত না। কিন্তু তিনি অসাধারণ শক্তিশালী, তাই কামনা করি—তাঁহার হুলের তূণীর অক্ষয় হোক, মধুর ভাণ্ডার বিপুল হোক, কিন্তু তিনি হুল আর মধু আলাদা রাখুন। ধর্মযুদ্ধে হুল প্রয়োগ করুন, কিন্তু মধু পরিবেশনের নিমিত্ত নয়। যদি বিনা উদ্দীপনায় মধুক্ষরণ না হয় তবে এমন হুল চালান যাহাতে সুড়সুড়ি আছে কিন্তু জ্বালা নাই।

রা. ব.

বনমর্ম্মর ও অন্যান্য গল্প—শ্রীমনোজ বসু প্রণীত। প্রকাশক, প্রবাসী কার্য্যালয়, ১২০।২ আপার সার্কুলার রোড। পৃ. সংখ্যা ২০৩। মূল্য একটাকা বারো আনা।

মনোজবাবু ছোটগল্প লিখে খ্যাতিলাভ করেছেন এবং এর একটা প্রধান কারণ এই যে, মনোজবাবু যাদের কথা লেখেন, তাদের তিনি জানেন। এই পরিচয়ের সবখানিই হয়ত ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা না'ও হ'তে পারে—কেননা সহৃদয়তার দরদ দিয়ে যে অন্তর্দৃষ্টি লাভ করা যায়—তার মূল্য ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার চেয়েও বড়—আর্টের ক্ষেত্রে। মনোজবাবু তাঁর এই অন্তর্দৃষ্টির পরিচয় দিয়েছেন তাঁর বইয়ের পাতায় পাতায়, ছত্রে ছত্রে। বাংলাদেশের পাড়াগাঁকে তিনি জানেন, ভালবাসেন—তার কথাই লিখতে তিনি আনন্দ পান। এই আনন্দই শিল্পীকে সৃষ্টিমুখী করে। আনন্দ যেখানে সত্য নয়, নিবিড় নয়—সৃষ্টি সেখানে অসার্থক, দুর্ব্বল, পাঠকের মনে তা নির্ভরতা আনে না, শিল্পীরও দৃষ্টির ক্ষেত্র সীমাবদ্ধ ক'রে রাখে—বুদ্ধি ও যুক্তির বেড়াজাল চারিপাশে নিবিড় হয়ে ওঠে, ফলে সৃষ্টি তার উদ্দামতা ও স্বাধীনতা হারিয়ে ফেলে, যুক্তিপাশবদ্ধ মনের সংকীর্ণ গণ্ডীর মধ্যে ঘুরে মরে—শিল্পীর তৃতীয় নেত্র খোলে না, অস্পষ্টতার ও সন্দেহের কুয়াসায় তুলির টান তার শক্তি হারিয়ে ফেলে।

মনোজবাবুর বই পড়লে প্রথমেই মনে হয়, শিল্পীর এই সত্যদৃষ্টি তিনি লাভ করেছেন। যে আনন্দ তাঁকে প্রেরণা দিয়েছে, পাঠকের মনেও তার ছায়াপাত হয়, তাঁর ওপর পাঠকের মনে একটা নির্ভরতার ভাব তিনি জাগিয়ে তুলতে পারেন। এই নির্ভরতার ভাব জাগিয়ে তোলা আর্টের ক্ষেত্রে বড় মূল্যবান ব্যাপার—পাঠকের মনে কোনো চরিত্র বা কোনো ঘটনা বা কোনো উক্তি সম্বন্ধে সন্দেহের অবকাশ জাগলে গল্প যে illusionটুকু সৃষ্টি করতে চায় তা নষ্ট হয়। পাঠক যদি ভাবে—'না, এ লোকটা তো এ ভাবে কথা বলতে পারে না' কিংবা 'এ ধরণের ব্যাপার তো এ চরিত্রের সঙ্গে খাপ খায় না'—তাহ'লে সে লেখা আর তাকে আনন্দ দিতে পারবে না, পদে পদে মনে হবে, এসব অবাস্তব, এ হয় না। কিন্তু নির্ভরতার ভাব একবার জাগাতে পারলে তখন পাঠকের মন যা-তা বিশ্বাস করতে প্রস্তুত হয়—এইচ, জি ওয়েল্‌স্-এর স্বর্গভ্রষ্ট দেবদূতও তখন বাস্তব হয়ে ওঠে। মনোজবাবু এই নির্ভরতার ভাব জাগাতে পারেন—আর্টিষ্ট-হিসাবে তাঁর কৃতিত্ব এখানে সব চেয়ে বেশী। সার্থক আর্টের এইটাই গোড়ার কথা।

মনোজবাবুর গল্প বলবার ভঙ্গি তাঁর নিজস্ব, টেক্‌নিকের একটা নবীন সরসতা পাঠকের মন মুগ্ধ করে। গল্পগুলির বিষয়বস্তু অনেক স্থানে খুব সামান্য, তুচ্ছ; কিন্তু সেই তুচ্ছ বিষয়বস্তুকে অবলম্বন ক'রে মনোজবাবু যে সুন্দর কল্পলোক সৃষ্টি করেছেন—তাতে তিনি পাকা হাতের পরিচয় দিয়েছেন। তাঁর এই গল্পগুলিতে বাংলা দেশের পাড়াগাঁয়ের নদী, মাঠ, বনের ছবি প্রবাসী বাঙালী পাঠককে home-sick করে তুলবে। গল্পগুলির বিষয়বস্তুর মধ্যে বৈচিত্র্যও যথেষ্ট আছে, পড়তে পড়তে কোথাও একঘেয়ে লাগে না।

আমাদের সকলের চেয়ে ভাল লেগেছে 'বনমর্ম্মর' ও 'বাঘ'। তবুও 'বনমর্ম্মর' গল্পটির ছাঁচ একেবারে আমাদের অপরিচিত নয় ব'লে রসোপলব্ধির নিবিড়তা একটু যেন ক্ষুণ্ণ হয়, কিন্তু 'বাঘ' গল্পটির বিষয়বস্তু যেমন তুচ্ছ, তেমনি অভিনব, রস তেমনি অপ্রত্যাশিত। মনোজবাবু আমাদের কৃতজ্ঞতার অধিকারী—ছোটগল্প লেখকের মধ্যে তিনি যে বিশিষ্ট স্থান অধিকার করেছেন, আশা করি তা অক্ষয় হউক।

ইহাই নিয়ম—শ্রীআশীষ গুপ্ত প্রণীত। প্রকাশক, সরস্বতী লাইব্রেরী, ৯নং রমানাথ মজুমদার ষ্ট্রীট। পৃ. সংখ্যা ১২৮। মূল্য এক টাকা।

আশীষ গুপ্তের 'ইহাই নিয়ম' বইটি কয়েকটি ছোট গল্পের সমষ্টি। এই লেখক তরুণ হ'লেও কথা-সাহিত্যের ক্ষেত্রে যশোলাভ করেচেন। আশীষবাবুর সঙ্গে পল্লীজীবনের পরিচয় তেমন ঘনিষ্ঠ নয়—তাঁর গল্পগুলি দরিদ্র মধ্যবিত্ত শহরবাসীকে আশ্রয় ক'রে। এখানে তিনি কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েচেন এ কথা অসঙ্কোচে বল্‌তে পারা যায়। শরৎচন্দ্র এই তরুণ লেখকের সম্বন্ধে বলেচেন, "এই লেখকের ভবিষ্যৎ যে সত্যই উজ্জ্বল ও আশাপ্রদ এ কথা আজকালকার দিনে অকপটে বল্‌তে পারায় মন খুশি হয়ে ওঠে।" প্রথম গল্পটির নাম 'ইহাই নিয়ম'—কর্ম্মচ্যুত কেরাণীর দারিদ্র্যের ইতিহাস। এই এক বিষয়বস্তু অবলম্বন ক'রে এ পর্য্যন্ত অনেক গল্প লেখা হয়েচে, কিন্তু এ গল্পটির টেক্‌নিক্ যেমন অভিনব, গল্পাংশটিও তেমনি সুন্দর। 'বরণ-ডালা' গল্পটির টেক্‌নিক্‌ও সম্পূর্ণ নূতন ধরণের—গল্পটি সত্যই উপভোগ্য—বৃদ্ধ পিতা উপযুক্ত পুত্রকে চিঠি লিখচেন যে, তিনি এক দরিদ্র কন্যাদায়গ্রস্ত বৃদ্ধের কন্যাকে বিবাহ ক'রে ঘরে এনেচেন, কারণ স্ত্রী অবর্ত্তমানে এতদিন তাঁর সেবাযত্নের বড়ই ত্রুটি ঘট্‌ছিল। চিঠিখানির মধ্য দিয়ে একটি সামাজিক সমস্যার রূপ বড় চমৎকার ফুটে উঠেচে। আশীষবাবুর কাছ থেকে আমরা অনেক কিছু আশা করি। তাঁর লেখনী দিনে দিনে আরও শক্তি সঞ্চয় করুক্, এই আমাদের কামনা।

আঠারো বছর—শ্রীজগৎ মিত্র প্রণীত। প্রকাশক, ডি. এম্. লাইব্রেরী। ৬১, কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট। পৃ. সংখ্যা ১২২। মূল্য পাঁচ সিকা।

বইখানিতে পাঁচটি ছোটগল্প আছে। লেখক সাহিত্য-ক্ষেত্রে নিতান্ত অপরিচিত নন, তাঁর অনেক ছোটগল্প, কবিতা ও প্রবন্ধ ইতিপূর্ব্বে নানা মাসিকপত্রে প্রকাশিত হয়েচে। গল্পগুলির মধ্যে বৈচিত্র্য আছে—তা ছাড়া জগৎবাবুর ভাষা স্বচ্ছ ও অনাড়ম্বর। 'কাশফুল' গল্পটিকে নিঃসঙ্কোচে প্রথম শ্রেণীর গল্পের মধ্যে স্থান দিতে পারা যায়। বাকী গল্পগুলির মধ্যে 'স্বপ্নের বিড়ম্বনা' ও 'বিজয়িনী' বিশেষ ক'রে উল্লেখযোগ্য। 'স্বপ্নের বিড়ম্বনা'র মত একটি অতি-প্রাকৃতিক চিত্রও তাঁর হাতে বাস্তব হয়ে উঠেচে এইটি লেখকের কৃতিত্বের পরিচায়ক। রেখা-শিল্পী শ্রীদীনেশরঞ্জন দাশের অঙ্কিত প্রচ্ছদপটটি সুন্দর হয়েচে।

কুহেলিকার পরপারে—প্রকাশক শ্রীদ্বিজেন্দ্রচন্দ্র ঘোষ। ঢাকা। মূল্য দেড় টাকা। এই বইখানি Robert James Lees-এর Through the Mists নামক পুস্তকের অনুবাদ। অনুবাদটি সুন্দর হয়েচে একথা নিঃসন্দেহে বলা যায়। রবার্ট লীসের বইখানি Spiritualistic সাহিত্যের বিখ্যাত গ্রন্থ। এতে যে সকল মতামত লিপিবদ্ধ হয়েচে, তা বিশ্বাস করা না-করা পাঠকের ওপর নির্ভর করে। এ এমন একটি জিনিষ, যা নিয়ে তর্ক করা চলে না। স্থানে স্থানে ছাপার ভুল থাকা সত্ত্বেও বইখানি উপভোগ্য। মূল্য কিছু বেশী হয়েচে বলে মনে হয়।

শ্রীবিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়

প্রবাসের কথা—শচীন সেন। আর্য্য পাবলিশিং কোং, ২৭ কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট, কলিকাতা। দাম এক টাকা চার আনা। পৃ. ৯৬।

লেখক ইউরোপে গিয়া ও-দেশের সামাজিক ও আর্থিক অবস্থা যেরূপ দেখিয়া আসিয়াছেন একখানি চিঠি ও কয়েকটি প্রবন্ধে তাহাই প্রকাশ করিতে চাহিয়াছেন। কথাগুলি নূতন নয়, কিন্তু লেখক নিজে ভাবিয়া অত্যন্ত জোরালো ভঙ্গিতে লিখিয়াছেন, ইহাই বইটার বিশেষত্ব। পড়িবার সময় ইউরোপের জীবনধারার ছবিটি চোখের সামনে ফুটিয়া ওঠে।

বাংলা বইয়ের মধ্যে ইংরেজী শব্দের বাহুল্য মনকে পীড়া দেয়। চেষ্টা করিলে উহা অনেক কমানো যাইত। ছাপা বাঁধাই সুন্দর।

শ্রীমনোজ বসু

প্রহেলী ও দীপক—শ্রীশৈলেশ্বর বসু সর্ব্বাধিকারী প্রণীত এবং বীরেন্দ্রনাথ বসু বি. এ. কর্ত্তৃক ৩৯ নং মাণিকতলা ষ্ট্রীট হইতে প্রকাশিত। মূল্য ১।০ সিকা।

লেখকের বিভিন্ন সময়ের বহুবিধ কবিতায় এই গ্রন্থখানি সজ্জিত। লেখকের কাব্যে সৌন্দর্য্যজ্ঞান থাকিলেও হাত খুব কাঁচা থাকায় বহু কবিতার ছন্দ পদে পদে বাধা পাইয়াছে। সমগ্র গ্রন্থ খুঁজিয়া যে-কয়েকটি নির্দ্দোষ কবিতার সন্ধান পাওয়া গেল তাহার সংখ্যা অতি কম। রস ও সৌন্দর্য্যই কবিতার প্রাণ। অনেক কবিতায় সেই রস ও সৌন্দর্য্য উচ্ছ্বসিত হইতে গিয়া ব্যর্থ গতিতে আহত হইয়াছে। তবে হাত কাঁচা থাকিলেও আমরা এই গ্রন্থে নবীন লেখকের কাব্যলক্ষ্মীর প্রতি একটি নিষ্ঠাসম্পন্ন হৃদয়ের পরিচয় পাইলাম এবং এই অপরিণত সৌন্দর্য্যের কাব্যগ্রন্থের মধ্য দিয়া গ্রন্থকারের ভবিষ্যৎ কাব্যজীবনের একটি উজ্জ্বল ছবি দেখতে পাইলাম।

পথধূলি—শ্রীউপেন্দ্রচন্দ্র ঘোষ প্রণীত এবং মণীন্দ্রচন্দ্র ঘোষ বি. এ. কর্ত্তৃক ২৫।৩ সি, হাজরা রোড হইতে প্রকাশিত।

এই গ্রন্থের কবিতাগুলি সঙ্গীতের রীতিতে রচিত। অধিকাংশ কবিতায় সুর বসাইয়া দিলে গান হয়। মোটের উপরে বইখানি মন্দ নহে। ছাপা ভাল, দাম এক টাকা।

শ্রীশৌরীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য

ঝড়ের রাতে—প্রণেতা শ্রীশচীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত। প্রকাশক নিরোগী নিকেতন, কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট, পৃষ্ঠা ১৫৫, দাম পাঁচ সিকা।

নাটকখানি মনস্তত্ত্বমূলক। কিন্তু দুঃখের বিষয় মানব-মনের যে দিকটা লইয়া নাড়াচাড়া করিয়া নাট্যকার তাঁহার ক্ষমতার অপব্যবহার করিয়াছেন, সেটিকে খুব প্রয়োজনীয় এবং সর্ব্বজনের শ্রবণ এবং দর্শনের উপযোগী বিষয় বলিয়া আমরা মনে করি না।

নাটকখানি মঞ্চে কিরূপ সাফল্য লাভ করিয়াছে জানি না। কিন্তু অধিকাংশ পাত্র-পাত্রীর চরিত্রের ক্রমবিকাশের গতি সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রিত হয় নাই; না হইবার কথা, যেহেতু নাটকখানি একরাত্রির ঘটনায় সম্পূর্ণ এবং যে মানসিক দ্বন্দ্বকে কেন্দ্র করিয়া নাটকখানি গড়িয়া উঠিয়াছে অধিকাংশ পাত্র-পাত্রীরই তাহার সহিত কোনই সম্পর্ক নাই, তাহারা এই নাটকরূপী গৃহের সজ্জার জড় উপকরণ মাত্র।

অত্যন্ত অসম্ভব এবং অপ্রাকৃত ঘটনার সন্নিবেশ এই বহিখানির অত্যন্ত মারাত্মক ত্রুটি। শিক্ষিতা যুবতীর 'শুধু একসঙ্গে পড়া' রূপ হেতু সঞ্জাত বন্ধুত্বের দাবিতে যুবক বন্ধুকে লইয়া রাত্রে সদর রাস্তায় গান গাহিতে গাহিতে ভাঙা মোটর ঠেলিয়া অংশে যে নিঃসঙ্কোচে জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার সম্মুখে আবির্ভাব দেখিয়া শিক্ষিত ভদ্রপরিবারের

বাঁশী

শ্রীপ্রণয়রঞ্জন রায়
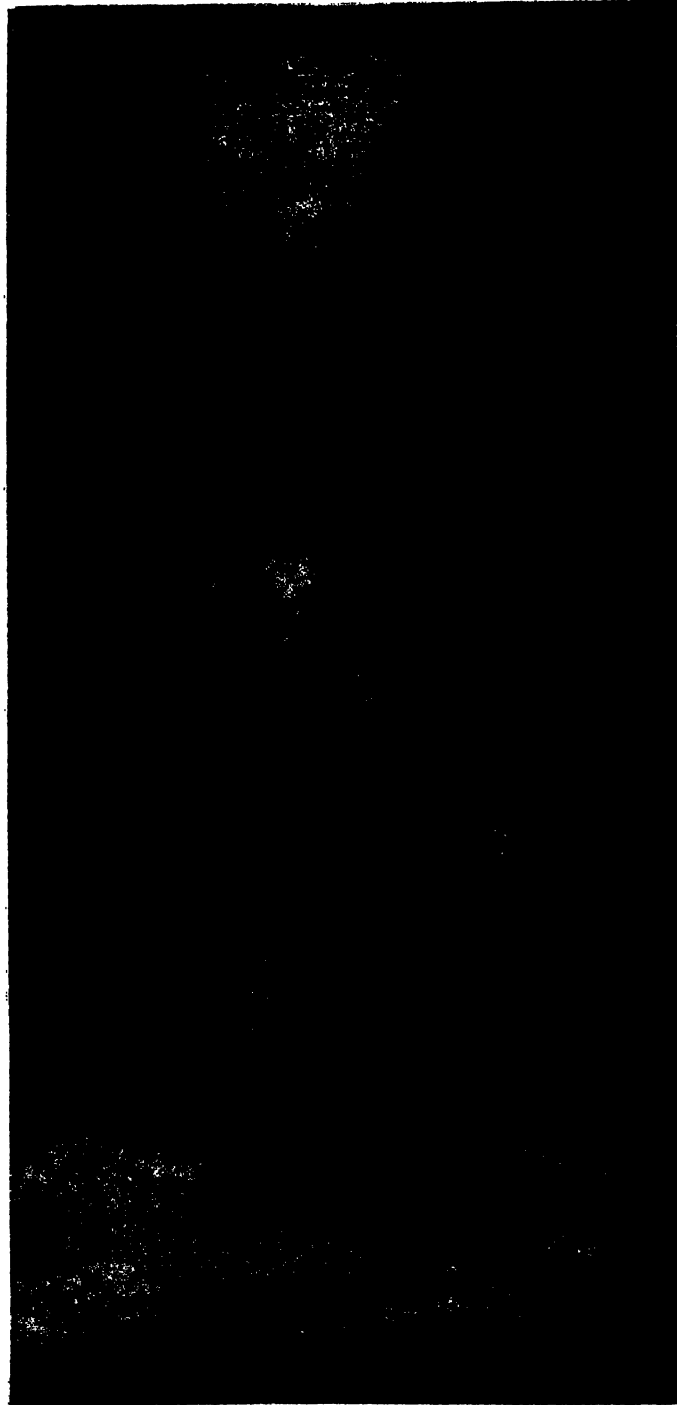
প্রবাসী প্রেস, কলিকাতা

অনাবিষ্কৃত একটি প্রথার সন্ধান পাইলাম। তাহাও বোধ হয় কোনও কালে সম্ভব হইতে পারে। কিন্তু 'ভাঙ্গা মোটর ঠেলা'-রূপ পরম আরামদায়ক কার্য্যের সহিত সুরতাল সংযুক্ত গান গাওয়ার সম্ভাবনা কল্পনা করিতে পারি না, কারণ পল্লীর কর্দ্দম-পিচ্ছিল পথে এবং মাঠে ভাঙ্গা মোটরের mud-guardএ বহুবার বাঁধ দিয়াছি, একমাত্র পিতৃনাম উচ্চারণ ব্যতীত অন্য কোনও বাক্য কণ্ঠ হইতে নির্গত করিতে পারি নাই, তবে কলিকাতা কর্পোরেশনের বাঁধা সড়কে ভাঙ্গা মোটর ঠেলিতে গিয়া যদি গান পায় সে কথা বলিতে পারি না। এত কথা বলিবার উদ্দেশ্য এই যে, যে-বাস্তবকে প্রাধান্য দান এই নাটকের লক্ষ্য, অবাস্তবের আমদানী করিয়া নাট্যকার তাঁহার সেই উদ্দেশ্যকেই ক্ষুণ্ণ করিয়াছেন।

ভূমিকায় গ্রন্থকার লিখিতেছেন—"সুস্থ ও সবল মন যাঁদের, আমার এই নাটক তাঁদেরকে আনন্দ দেবে জেনেই নাটকখানি এমন ক'রে আমি লিখেছি। আজ দেখ্‌ছি আমি ভুল করিনি।" ভুল তিনি যথেষ্টই করিয়াছেন। প্রকৃত সুস্থ ও সবল মন যাঁহাদের এ নাটক তাঁহাদিগকে আনন্দ দান করিবে বলিয়া আমরা আদৌ বিশ্বাস করি না।

'নাটকখানি এমন ক'রে' না লিখিয়া Congreve অথবা Farqu'ar-এর আদর্শে এই উপাদানে একখানি রঙ্গনাট্য লিখিলে নাট্যকার ভুল করিতেন না।

বইখানির ছাপা ও কাগজ ভাল।

রবীন্দ্রনাথ মৈত্র

মার্কিন সমাজ ও সমস্যা—শ্রীনগেন্দ্রনাথ চৌধুরী. এম্, এ। প্রকাশক শ্রীক্ষিতীন্দ্রকুমার নাগ, পি-এইচ. বি। ২৫৬ পৃঃ. প্রাপ্তিস্থান—চক্রবর্ত্তী চাটার্জ্জী এণ্ড কোং ও মডার্ণ বুক এজেন্সি, কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা। মূল্য ২৲ দুই টাকা।

গ্রন্থকার মার্কিনসমাজ ঘনিষ্ঠভাবে দেখিবার সুযোগ পাইয়া কতকগুলি সমস্যা উপস্থিত করিয়াছেন; কয়েক বৎসর হইল বাঙ্গালী পাঠক তাহাদের আভাস পাইয়া আসিতেছেন, আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্র উন্নতির পরাকাষ্ঠায় উপনীত, বড় বড় কারখানা, বিজ্ঞানের উন্নতি, স্ত্রী-স্বাধীনতা, সমাজে সর্ব্বত্র প্রসারিত শিক্ষা,—হেমচন্দ্র-বিবেকানন্দ মার্কিণের এই অভ্যুদয়ের কথাই বলিয়া গিয়াছেন। মিস্ মেয়োর Mother India প্রকাশিত হইবার পর হইতে ইহার প্রতিক্রিয়া আরম্ভ হইয়াছে। সমাজের দোষের কথা বলিতে গেলে খুব কম সমাজই বাদ পড়ে,—যৌবন-সমস্যা, পারিবারিক ও দাম্পত্য-সমস্যা, শ্বেতদেবতার অত্যাচার, বস্তুতান্ত্রিক সভ্যতার নিকট আইনের অবমাননা। বর্ণভীতির সম্মুখে সাম্যকে বলিদান,—যুক্তরাষ্ট্রের এই সকল ব্যভিচারের কথা গ্রন্থকার আলোচ্য পুস্তকে বলিয়াছেন। মিসেস [illegible]র্শিয়মের কথা, হিকম্যানের নৃশংসতা, ভারতবাসীর মনে একটা আঘাত দিবে, তাহার সযত্নপোষিত সংস্কার এই সব মানবচরিত্রের কলঙ্ক দেখিয়া শিহরিয়া উঠিবে।

যদি সমাজে এত দুর্নীতি সত্ত্বেও আমেরিকা স্বাধীনতা লাভে সুখী হইতে পারে, তবে ভারতবর্ষের আদর্শের উৎকর্ষ সত্ত্বেও সে পরাধীনতার অভিশাপ কেন ভোগ করে, এই প্রশ্ন উঠা পাঠকের মনে বিচিত্র নয়। তাহার উত্তর, সহস্র কদাচার সত্ত্বেও আমেরিকার তেজ আছে, আর আমাদের সহস্র সদ্‌গুণ সত্ত্বেও সংহতি, তেজস্বিতা প্রভৃতি গুণের অভাব। যৌন সমস্যাই জগতের একমাত্র সমস্যা নয়, শ্বেতদেবতার অত্যাচারই একমাত্র নিন্দনীয় নয়। আমাদের মধ্যে যে অশুচিতা আছে তাহা প্রায়শ্চিত্তের আগুনে জ্বলিয়া পুড়িয়া যাক্, ইহা অত্যন্ত সাধু ইচ্ছা, কিন্তু সে অশুচিতা তো একেবারে অস্বীকার করিতে পারি না। বর্ত্তমান আত্মশুদ্ধির আন্দোলনের কৈফিয়তই এই।

গ্রন্থকারের প্রকৃত অভিপ্রায় এই যে, আমাদের দৃষ্টি শুদ্ধ হউক, নিতান্ত আত্মহারা হইয়া আমরা যেন বাহিরের জগতকে দেখিতে না শিখি, জগত দেখিতে গেলে বিচারবুদ্ধির যে প্রয়োজন আছে সে কথা যেন আমরা না ভুলি। যাঁহারা পাশ্চাত্য জগতকে শুধুই প্রশংসার চক্ষে দেখেন, পাশ্চাত্যের "নিরবচ্ছিন্ন অনুচিকীর্ষু" যাঁহারা-তাঁহাদের জন্য এরূপ গ্রন্থের বহুল প্রয়োজন, এবং গ্রন্থকার তাঁহাদের জ্ঞানচক্ষু ফুটাইবার জন্য এই আয়োজন করিয়া বাঙ্গালী পাঠকসমাজের ধন্যবাদভাজন হইয়াছেন।

শ্রীপ্রিয়রঞ্জন সেন

দার্শনিক ব্রহ্মবিদ্যা—১ম, ২য় ও ৩য় খণ্ড। শ্রীস্বামী সন্তদাসজী ব্রজবিদেহী প্রণীত। প্রকাশক, চক্রবর্ত্তী, চাটার্জ্জি এণ্ড কোং লিমিটেড., কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা। মূল্য যথাক্রমে ২৲, ১।৹, ও ৪৲ টাকা।

গ্রন্থকার স্বামী সন্তদাসজী পূর্ব্ব আশ্রমে কলিকাতা হাইকোর্টের একজন প্রসিদ্ধ উকীল ছিলেন। তখন তাঁহার পাণ্ডিত্য, আস্তিকতা এবং ভক্তিমত্তার যথেষ্ট সুখ্যাতি ছিল। বর্ত্তমান গ্রন্থেও তাঁহার এই পাণ্ডিত্য এবং শাস্ত্রের প্রতি শ্রদ্ধার যথেষ্ট নিদর্শন রহিয়াছে।

গ্রন্থের প্রথম দুই খণ্ডে বৈশেষিক, ন্যায়, পূর্ব্বমীমাংসা, সাংখ্য ও যোগদর্শনের সাধারণভাবে আলোচনা করা হইয়াছে। সর্ব্বত্রই তত্তৎ দর্শনের মূল সূত্রগুলি দেওয়া হইয়াছে; এবং বাংলা ভাষায় বিশেষ বিশেষ সূত্রের ব্যাখ্যা এবং সাধারণভাবে সমস্ত প্রতিপাদ্য বিষয়ের বিচার করা হইয়াছে। তৃতীয় খণ্ডে নিম্বার্ক-মতানুযায়ী বেদান্ত-সূত্রের বিস্তৃত ব্যাখ্যা দেওয়া হইয়াছে। গ্রন্থকারের বঙ্গানুবাদ ও ব্যাখ্যা সুন্দর হইয়াছে।

প্রথম দুই খণ্ডের আলোচ্য বিষয় ঠিক ব্রহ্মবিদ্যা নহে; তথাপি যে এই দুই খণ্ডের নাম 'ব্রহ্মবিদ্যা' রাখা হইয়াছে, তার কারণ বোধ হয় এই যে, গ্রন্থকারের মতে এই সকল দার্শনিক মতবাদ ক্রমশঃ ব্রহ্মবিদ্যার দিকেই অগ্রসর হইয়াছে; এবং ইহাদের আলোচনা দ্বারা চিত্ত পরিমার্জ্জিত হইলে পরে প্রকৃত ব্রহ্মবিদ্যায় বা বেদান্ত-শাস্ত্রে অধিকার জন্মে। কিন্তু প্রকাশকের ত্রুটিতেই হউক কিংবা অন্য যে কোন কারণেই হউক, গ্রন্থের তৃতীয় খণ্ড,—যেখানে প্রকৃত ব্রহ্মবিদ্যার আলোচনা রহিয়াছে তাহা—শুধু 'বেদান্ত দর্শন' নামে আখ্যাত হইয়াছে; উহাও যে 'ব্রহ্মবিদ্যা' এবং এই একই গ্রন্থেরই শেষ খণ্ড, তাহা আপাতদৃষ্টিতে চোখে পড়ে না। অথচ, ইহার অংশ না হইলে প্রথম দুই খণ্ডকে 'ব্রহ্মবিদ্যা' বলা অসমীচীন হয়।

ছয়টি দর্শনেরই ধারাবাহিক এবং সুসম্বদ্ধ একটি বিবরণ গ্রন্থকার এই গ্রন্থে দিতে চেষ্টা করিয়াছেন। তাঁহার এই চেষ্টা সফল হইয়াছে বলিয়াই আমরা মনে করি। তবে, গ্রন্থকারের মতে বেদান্ত দর্শনই সকল দর্শনের চূড়ামণি এবং অন্যান্য দর্শন শুধু চিত্তকে বেদান্ত পাঠের উপযোগী করিবার চেষ্টা মাত্র; এবং প্রকৃতপক্ষে বিচার করিয়া দেখিলে বিভিন্ন দর্শনের ভিতর কোন তফাৎ নাই। কেন না, সকল দর্শনই শ্রুতির অনুযায়ী (১ম খণ্ড, ৫২ পৃঃ. ৩৭৫ পৃঃ. ইত্যাদি)।

কিন্তু বাস্তবিকই কি সকল দর্শনই শ্রুতির প্রতি সমান শ্রদ্ধা

দেখাইয়াছে? আর, বাস্তবিকই বিভিন্ন দর্শনের মতবাদের মধ্যে কোন গুরুতর প্রভেদ নাই? বাস্তবিকই কি বিভিন্ন দর্শনগুলিকে শিষ্যের অধিকারভেদে প্রস্থানভেদ মাত্র মনে করিবার কোন ঐতিহাসিক যুক্তি আছে? বৈশেষিকের পরমাণুবাদ এবং সাংখ্যের প্রধান-বাদ কি সত্যসত্যই শ্রুতিসম্মত? কিংবা এ সকল দর্শনকে পূর্ব্বাচার্য্যগণ যে ভাবে ব্যাখ্যা করিয়াছেন, তাহা কি ভ্রান্ত? তাই যদি হইবে, তবে বেদান্ত-সূত্রের দ্বিতীয় অধ্যায়ের দ্বিতীয় পাদের কি সার্থকতা থাকে? এবং অন্যান্য দর্শনও যে পরমত খণ্ডন করিয়াছে তাহারই বা কি অর্থ হয়? সমগ্র আস্তিক শাস্ত্র একই ভগবৎপ্রাপ্তির বিভিন্ন পথ মাত্র, এই মত মধুসূদন সরস্বতী হইতে আরম্ভ করিয়া অনেকেই প্রচার করিয়াছেন, সত্য। কিন্তু এই "প্রস্থান-ভেদ"-বাদের ঐতিহাসিক সারবত্তা কতটুকু?

বেদান্ত মোক্ষবিদ্যা; সেই হিসাবে উহা শুধু দর্শন নয়, ধর্ম্ম; এবং এইজন্য উহার আলোচনায় আমরা শাস্ত্রোচিত ভক্তি যতটা দেখাই, নিরপেক্ষ সমালোচনা—যে সমালোচনা পাশ্চাত্য দার্শনিকদের বেলায় আমরা করি, সেইরূপ সমালোচনা—ততটা করিতে সাহস হয়ত আমরা পাই না। কিন্তু এই বেদান্তই যে সমস্ত মতবাদকে বিরুদ্ধ মনে করিয়া খণ্ডন করিতে প্রয়াস পাইয়াছে, কোন্ যুক্তিতে আমরা সেই সকল বিরুদ্ধ দর্শনকে বেদান্তের মন্দিরে প্রবেশ করিবার সোপানমাত্র মনে করি? ইহাদের দীর্ঘ কলহের ইতিহাস ত আমরা মুছিয়া ফেলিতে পারি না। হইতে পারে, 'ঋজুকুটিল-নানাপথজুষাং' লোকের গম্য এক; এবং মানিয়া লওয়া যাইতে পারে, সকল দর্শনই সত্যরূপ এই একই গম্য-লাভের প্রস্থান-ভেদ মাত্র। কিন্তু তথাপি পথের পার্থক্যও ত পার্থক্য!

এইখানে গ্রন্থকারের সঙ্গে আমরা একমত হইতে পারি নাই। কিন্তু তথাপি তাঁহার গ্রন্থখানার প্রশংসা আমরা না করিয়া পারি না। স্বামীজীর ভাষা স্বচ্ছ ও সরল; এবং আলোচনা সর্ব্বত্রই সুখপাঠ্য ও সুখবোধ্য হইয়াছে। স্বামীজী শঙ্কর-মতের প্রতিও যথেষ্ট শ্রদ্ধাবান্। স্থানে স্থানে শঙ্করের মত উদ্ধৃত করিয়া তিনি যে বিচার করিয়াছেন, তাহা অত্যন্ত উপাদেয় হইয়াছে। বইখানার ছাপা কাগজও ভাল।

শ্রীউমেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য

আব্রাহাম্ লিঙ্কন্—শ্রীবিনোদবিহারী চক্রবর্ত্তী প্রণীত। শ্রীযুত বিনয়কুমার সরকার লিখিত ভূমিকা সমেত। প্রকাশক রামকৃষ্ণ পাবলিশিং ওয়ার্কস্, ১১নং কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা। দাম দেড় টাকা। পৃষ্ঠা-সংখ্যা ১৭৭।

আব্রাহাম্ লিঙ্কন্ আমাদের নিতান্ত আপনার জন। দরিদ্র জনমজুরের গৃহে তাঁহার জন্ম। তিনি শৈশব হইতে এরূপ নানাকার্য্য করিয়াছেন যাহাতে কঠোর কায়িক শ্রমের প্রয়োজন। আব্রাহাম লিঙ্কন্ কাঠুরিয়া, নৌকার মাঝি, দোকানী, আবার পাকশালার যোগানদার। প্রত্যহ এইরূপ কঠোর কাজের ভিতরেও তিনি বই পড়ার সময় করিয়া লইতেন। জ্ঞানলাভের জন্য তাঁহার অদম্য চেষ্টা ছিল। একটি দরিদ্র সন্তানের জীবনের ক্রম-পরিণতি এই পুস্তকে লক্ষ্য করি। শেষে আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রের নায়ক-পদে পর্য্যন্ত অধিষ্ঠিত হইয়াছিলেন এই আব্রাহাম লিঙ্কন্। নিগ্রো জাতিকে স্বাধীনতা প্রদান তাঁহার অক্ষয় কীর্ত্তি। শেষ জীবন পর্য্যন্ত লিঙ্কন্ সাদাসিধা গরিবই ছিলেন। জ্ঞানে, চিন্তায়, কার্য্যে তাঁহাকে অতি উচ্চ স্তরের দেখিয়া তাঁহার নিকট আমাদের মস্তক অবনত হয়—সঙ্গে সঙ্গে আশাও হয় যে, আমাদের মতই একজন যখন এত বড় হইতে পারিয়াছিলেন, তখন আমরাও অনুরূপ চেষ্টা থাকিলে অত বড় হইতে পারি। বইখানির প্রকাশ সময়োপযোগী, ইহা জাতির জীবন-বেদ তুল্য। বালক-বৃদ্ধ সকলেরই পঠনীয়।

আব্রাহাম লিঙ্কনের আত্ম-জীবনী নাই। লেখক প্রামাণ্য জীবনী হইতে বিষয়বস্তু লইয়া লিঙ্কনের মুখেই তাঁহার জীবনকথা বলাইয়াছেন। ইহাতে বইখানি আরও সুখপাঠ্য হইয়াছে। বইখানির ভাষা প্রাঞ্জল। পড়িতে আরম্ভ করিলে শেষ না করিয়া ছাড়া যায় না। এই দিক দিয়া ইহা উপন্যাসকেও ছাড়াইয়া গিয়াছে। বইখানির প্রকাশে বঙ্গসাহিত্য সমৃদ্ধ হইল।

বইখানির ছাপা, বাঁধাই উত্তম। আব্রাহাম লিঙ্কনের ও তাঁহার পল্লী-আবাস 'লগ কেবিনের চিত্রও ইহাতে আছে।

শ্রীযোগেশচন্দ্র বাগল

ইউরোপ ও আফ্রিকা মহাদেশদ্বয়ের এবং বাংলাদেশের এক একখানি করিয়া তিনখানি দেওয়ালে টাঙাইবার উপযোগী বৃহৎ রঙীন বাংলা মানচিত্র কলিকাতা ৮নং ডিক্সন লেনের শশিভূষণ চট্টোপাধ্যায় এণ্ড্ সন্সের নিকট হইতে পাইয়াছি। এই মানচিত্রগুলি উৎকৃষ্ট এবং সমুদয় বাংলা বিদ্যালয় ও পাঠশালায় ব্যবহারের উপযোগী।

উক্ত প্রকাশকদিগের নিকট হইতে আমরা দেওয়ালে টাঙাইবার উপযোগী জীবজন্তুর বাংলা নামসহ রঙীন ছবির চার্ট একটি পাইয়াছি, এবং বাংলা সচিত্র বর্ণমালার চার্টও এক গ্রন্থ পাইয়াছি। এই জিনিষগুলিও ভাল এবং বিদ্যালয় ও পাঠশালায় ব্যবহারযোগ্য। বাংলা দেশ ও আসামের অনুন্নত শ্রেণীসমূহের উন্নতিবিধায়িনী সমিতির বিদ্যালয়ে ব্যবহারের নিমিত্ত আমরা এই জিনিষগুলি সমিতিকে দিয়াছি।

শ্রীরামানন্দ চট্টোপাধ্যায়

কাঁটার মুকুট*

শ্রীস্বর্ণলতা চৌধুরী

সহরতলীর ছোট রাস্তাটা জলে কাদায় পিছল হয়ে উঠেছে। আজ কিন্তু সেখানে লোকের অভাব নেই। সব ক'টা বাড়ির দরজা জান্‌লা খোলা, জায়গায় জায়গায় পাঁচ দশজন একসঙ্গে জটলা পাকাচ্ছে। সবাইকার মুখে এক কথা, "ম্যাথিয়াস্ পালিয়ে গেছে!" মেয়েরা ফিস্‌ফিস্ করছে, চড়াইপাখীগুলো কিচ্‌মিচ্‌ করে যেন এই কথাই বল্‌ছে। লোকগুলোর কাঠের জুতোর খট্‌খট্ শব্দেও যেন এই কথাই শোনা যাচ্ছে। "বুড়ো মুচিটা পালিয়ে গেছে। ঘর দোর, তরুণী স্ত্রী, অমন সুন্দর খুকীটা, সবাইকে ফেলে পালিয়ে গেছে। কে জানে বাপু, এ কি কাণ্ড!"

এদের দেশে একটা গান আছে। "বুড়ো স্বামী একলা উনুনের ধারে বসে, তরুণী স্ত্রী বন্ধুর সঙ্গে বনে বেড়াতে গেছেন। ছেলেপিলেরা কাঁদছে তাদের মায়ের জন্যে।"

এদের ব্যাপারটা কিন্তু ঠিক এই গানের মত নয়। বুড়ো স্বামীটিই পালিয়েছে। যে টেবিলের উপর সে কাজ করত, সেটার উপরে একখানা বিদায়পত্র লিখে রেখে গেছে। তার স্ত্রী খালি সেটা পড়েছে, আর কেউ পড়েনি।

বউটি চুপ করে রান্নাঘরে বসে আছে। একজন প্রতিবেশিনী ঘরের ভিতর ঘুরে ঘুরে টেবিল ঠিক করছে, কফির পেয়ালাগুলি সাজিয়ে রাখছে। মাঝে মাঝে হাতের তোয়ালেখানা দিয়ে চোখের জল মুছে ফেল্‌ছে।

পাড়ার যত গিন্নীবান্নীর দল এসে দেওয়ালের গায়ে সাজান চেয়ারগুলোতে খাড়া হয়ে বসে আছেন। শোকাচ্ছন্ন বাড়িতে কি রকম ব্যবহার করতে হয় তা তাঁরা ভাল করেই জানেন, সুতরাং তাঁরা নীরবেই বসে দুঃখটা উপভোগ করছেন। সারাদিনের কাজ তাঁরা চুকিয়ে এসেছেন, কারণ এই ছেলেমানুষ বউটির দুঃখের দিনে তার পাশে দাঁড়ানো একান্ত তাঁদেরই কর্ত্তব্য। তাঁদের কর্ম্মকঠিন হাতগুলি এখন অলসভাবে কোলে পড়ে রয়েছে, মুখের বলিরেখাগুলি আরও যেন গভীরতর হয়ে তাঁদের শুষ্কমুখে বিরাজ করছে।

এই পাষাণ প্রতিমাদের দলে তরুণী বউটি তার সুন্দর করুণ চেহারা নিয়ে বড়ই বেমানান হয়ে বসেছিল। সে কাঁদছিল না বটে, কিন্তু তার সারা দেহ ঠক্‌ঠক্ ক'রে কাঁপছিল, মনে হচ্ছিল যেন আতঙ্কেই সে এখনই মারা যাবে। সে দাঁতে দাঁতে চেপে ছিল, পাছে তাদের ভিতর দিয়ে অস্ফুট আর্ত্তনাদ বেরিয়ে পড়ে। বাইরে কারও পায়ের শব্দ শোনা গেলে, কিম্বা দরজায় কেউ ঘা দিলে, এমন কি তার সঙ্গে কেউ কথা বললে পর্য্যন্ত, বউটি অত্যন্ত চম্‌কে উঠ্‌ছিল।

তার স্বামীর চিঠিটা তার জামার পকেটে রয়েছে। চিঠিটার লাইনগুলো একটার পর একটা তার মনের ভিতর দিয়ে বয়ে চলেছে। এক লাইনে রয়েছে "তোমাদের দুজনকে একসঙ্গে দেখা আমার পক্ষে অসম্ভব হয়ে উঠেছে।" আবার আর একটা লাইন, "আমি জানি যে তুমি এরিক্‌সনের সঙ্গে পালিয়ে যাবার ব্যবস্থা করছ।" আবার, "আমি চাই না যে তুমি এমন কাজ কর, কারণ সমাজে এতে দুর্নাম হবে, তা তুমি সইতে পারবে না। তার চেয়ে আমিই চলে যাচ্ছি। তুমি তাহলে স্বাধীন হবে, এবং এরিকসনকে বিয়ে করতে পারবে। সে খুব ভাল কারিগর, তোমাকে সুখেই রাখবে। লোকে আমার নামে যা খুশী বলুক, আমি গ্রাহ্য করি না। যতক্ষণ তোমার সুনাম অক্ষুণ্ণ থাকবে, ততদিন আমি সুখেই থাকব। লোকনিন্দা তুমি সহ্য করতে পারবে না।"

কেন যে তার বৃদ্ধ স্বামী এমন কথা লিখ্‌ল বউটি কিছু বুঝতে পারছে না। সে কোনদিনই স্বামীকে প্রতা-

* Selma Lagerlof হইতে।

ঘৃণা করবার চেষ্টা করেনি। এরিক্‌সন্ তার স্বামারই কারিগর, আনা তার সঙ্গে বসে হাসিগল্প করত বটে, কারণ দুজনেরই বয়স কাছাকাছি। কিন্তু এতে তার স্বামীর কি অনিষ্ট হয়েছে? ভালবাসা অনেকটা ব্যাধির মত, কিন্তু তা সর্ব্বদাই সংঘাতিক হয়ে দাঁড়ায় না, আনা সারাটা জীবন এই ভাবেই কাটিয়ে দিতে পারত। তার হৃদয়ের অন্তস্তলে কি কথা যে লুকানো আছে তা তার স্বামী জান্‌ল কি করে?

স্বামীর কথা মনে ক'রে যন্ত্রণায় তার বুক ফেটে যাচ্ছিল। না জানি কি রক্তাক্ত হৃদয় নিয়ে সে স্ত্রীর সব ব্যবহার এতদিন দেখেছে। নিজের বার্দ্ধক্যের জন্যে গোপনে কত চোখের জল না জানি সে ফেলেছে, এরিক্‌সনের সুস্থ সবল দেহ আর পুরুষোচিত সাহস, তাকে হিংসায় পাগল করে তুলেছে। স্ত্রীর প্রত্যেকটা কথাতে হাসিতে, এরিক্‌সনের হাত ধরাতে সে বেদনায় কেঁপে উঠেছে। বৃদ্ধের ঈর্ষ্যা আর পাগ্‌লামি মিলে সাধারণ একটা ব্যাপারকে কি দারুণ দুর্ঘটনাতেই না পরিণত করল।

আনা তার স্বামীর বার্দ্ধক্যের কথা ভাবতে লাগ্‌ল। এই অবস্থায় সে ঘর ছেড়ে চলে গেল। তার পিঠ বেঁকে গিয়েছে, কাজ করতে গেলে এখন তার হাত কাঁপে, বহু যন্ত্রণাকাতর রাত্রি জাগরণের ফলে তার স্বাস্থ্য একেবারে নষ্ট। তবু সে পালিয়েছে, এই সন্দেহ ভারাক্রান্ত জীবন তার আর সহ্য হচ্ছিল না।

চিঠিখানার অন্য লাইনগুলোও তার মনে ভেসে উঠ্‌ল, "আমি তোমাকে লোকের চোখে হেয় হতে দিতে চাই নে। আমি জানি, আমি বয়সে তোমার চেয়ে অনেকই বড়, তোমার মত তরুণীর স্বামী হবার যোগ্য আমি নই। তোমার সুনাম অম্লান থাকবে, সবাই তোমায় শ্রদ্ধা করবে। যত দোষ তা আমার ঘাড়েই পড়বে। নিজের মনের কথা নিজের মনেই রেখো।"

তরুণীর সমস্ত শরীর ভয়ে ঠক্ ঠক্ ক'রে কাঁপতে লাগল। মানুষকে ঠকান এতই কি সহজ? ভগবানকেও কি প্রতারণা করা যায়? এখানে এমন ভাবে সে বসে বসে লোকের করুণা উপভোগ করছে কেন? তারই ত আশ্রয়চ্যুত এবং ঘৃণিত হবার কথা? সত্যিই ভগবানকেও প্রতারণা করা যায়।

দেয়ালের গায়ে ঝোলান একটা ছোট তাক, তার উপর মস্ত মোটা একখানা বই। এই বইয়ে একজন নারী আর একজন পুরুষের গল্প আছে, তারা মানুষ এবং ঈশ্বর সকলকেই প্রতারণা করেছিল।

"তোমরা দুজনে মিলে ভগবানকে প্রলুব্ধ করবার চেষ্টা করছ কেন? দেখ, যারা তোমার স্বামীকে কবর দিয়েছে, তারা তোমার দ্বারে এসে উপস্থিত, তারা তোমাকে বাইরে বহন করে নিয়ে যাবে।"

তরুণী বধূটি বইখানার দিকে চেয়ে একই ভাবে বসে রইল। যে কোনো শব্দ শুন্‌লেই সে চমকে উঠছিল। দাঁড়িয়ে উঠে, সকলের সামনে সত্য যা, তা প্রকাশ ক'রে বল্‌তে সে প্রস্তুত ছিল। সেই খানে মাটিতে প'ড়ে প্রাণত্যাগ করতেও তার আপত্তি ছিল না।

কফি তৈরি করা হয়ে গেল। প্রতিবেশিনীরা ধীরে ধীরে টেবিলের চারিধারে এসে দাঁড়ালেন। কিন্তু বউটি তাঁদের দিকে তাকাল না পর্য্যন্ত। ভয়ে তার সমস্ত দেহ হিম হয়ে এসেছিল। একজন স্ত্রীলোক কথা বল্‌তে আরম্ভ করলেন। শোকের ঘরে কি যে করা উচিত তা তিনি জানেন, এখন কথা বলবারই সময়। বউটি কিন্তু এতেও চম্‌কে উঠ্‌ল। তার প্রৌঢ়া প্রতিবেশিনী কি বল্‌তে যাচ্ছে? সে কি বল্‌বে, "আনা উইক্, ম্যাথিয়াস্ উইকের স্ত্রী, তুমি সত্যি কথা খুলে বল। তুমি ঈশ্বরকে এবং জনসমাজকে যথেষ্ট দিন প্রতারণা করেছ। আমরা আজ তোমার বিচারকর্ত্তা, আমরা দণ্ডবিধান করব, তোমাকে টুকরো টুকরো ক'রে ছিঁড়ে ফেল্‌ব।"

কিন্তু না, তার প্রতিবেশিনী পুরুষের নিন্দাবাদ সুরু করল, এবং একে একে সকলেই সেই বিষয়ে কথা বল্‌তে লাগল। পুরুষে কখন কি পাপ কার্য্য করেছে, সব-কিছুর বর্ণনা হতে লাগল; তাদের ধারণা এতে তরুণী মনে সান্ত্বনা পাবে। কি পাপিষ্ঠের জাত এই পুরুষগুলি, আঘাত অপমানে একেবারে সিদ্ধহস্ত।

তরুণী বউটির মনে এই সব কথা যেন হুল ফুটতে

লাগল। সে পুরুষদের সপক্ষে দু-চার কথা বলবার চেষ্টা করল। "আমার স্বামী মানুষ বেশ ভালই ছিলেন।"

প্রতিবেশিনীরা রাগে জ্বলে উঠ্‌ল। "ভালই বটে, না হলে তোমাকে ফেলে পালায়? অন্যদের চেয়ে সে কিছুমাত্র ভাল নয়। বুড়ো বয়সে স্ত্রী-কন্যা ফেলে কেউ পালায়? সত্যিই কি তোমার বিশ্বাস যে সে অন্য পুরুষ মানুষের চেয়ে ভাল?"

আনা কাঁপতে লাগল। তার মনে হল তাকে যেন কেউ কাঁটাবনের ভিতর দিয়ে টেনে নিয়ে যাচ্ছে। তার মুখ লাল হয়ে উঠল, সে কথা বল্‌বার চেষ্টা করল, কিন্তু পারল না। ভগবান কেন এমন ব্যাপার জগতে ঘটতে দেন?

আচ্ছা, সে যদি চিঠিখানা বার ক'রে চেঁচিয়ে পড়ে, তাহলে কি হয়? তাহলে এই বিষাক্ত স্রোত এখনি তার উপর দিয়ে বয়ে যাবে ত। আবার ভয়ের হিমশীতল হাত তার হৃৎপিণ্ডকে মুঠো করে চেপে ধরল। এক একবার তার ইচ্ছে করতে লাগল, আর কেউ যেন জোর করে তার পকেট থেকে চিঠিখানা বার করে নেয়, তার নিজের ত ক্ষমতা নেই? কারখানার ঘর থেকে একটা হাতুড়ির শব্দ ক্রমাগত তার কানে আসতে লাগল। এই শব্দটার মধ্যে যেন জয়ের উল্লাস ফুটে উঠছে। আর কেউ কি তা বুঝছে না? সারাদিন এই শব্দটা তার ক্রোধের উদ্রেক করেছে, কিন্তু আর কেউ যেন এটা বুঝছে না। হে ভগবান, তোমার কি কোন সর্ব্বজ্ঞ সন্তান নেই, যে মানুষের মনের কথা পড়তে পারে? আনা দণ্ড নিতে ত প্রস্তুত, কিন্তু নিজের মুখে পাপ স্বীকার করতে সে যে পারছে না।

২

অনেক বৎসর কেটে গিয়েছে। আনা এখন তার পূর্ব্বতন স্বামীর কারিগর এরিক্‌সনের স্ত্রী। এই বিয়ে করবার তার ইচ্ছা ছিল না, কিন্তু ঘটনাচক্রে তাকে বাধ্য হতে হয়েছে। সে প্রথমে এরিক্‌সনকে বিদায় করে দিয়ে একলাই থাকবার চেষ্টা করেছিল। সে ম্যাথিয়াসের কাছে প্রমাণ করতে চেয়েছিল সে বাস্তবিকই নিষ্পাপ। কিন্তু কোথায় তার স্বামী? আনার পাপপুণ্যের সে কি কোনো খোঁজ রাখে? আনার ছোটমেয়েটি ন্যাকড়া পরে ঘুরছে, সে নিজে পেটে খেতে পায় না। কতদিন আর সে এমনি করে অপেক্ষা করে থাকতে পারবে?

এরিক্‌সনের দিন দিনই উন্নতি হচ্ছিল। সে এখন শহরে একটা দোকান খুলেছে, থাকবার জন্যে ভাল বাড়ি ভাড়া নিয়েছে, এবং বসবার ঘরের জন্য মখমলের গদি-লাগান আসবাব কিনেছে। আনার আগমনের অপেক্ষায় ঘর সাজিয়ে সে বসে আছে। অবশেষে তাকে আসতেই হ'ল। দারিদ্র্যের কঠিন পেষণে তার সব সাহস লুপ্ত হয়ে গিয়েছিল।

প্রথম প্রথম আনা মন থেকে কিছুতেই ভয় দূর করতে পারত না। কিন্তু কোনো বিপদ আপদ তার ঘটল না, বরং দিনের পর দিন তাদের অবস্থা বেশী করে স্বচ্ছল আর নিশ্চিন্ততায় পূর্ণ হতে লাগল। চারপাশের সব লোকেই তাকে বিশ্বাস এবং শ্রদ্ধা করত। আনা জানত যে, সে এ-সবের যোগ্য নয়। তার বিবেক সর্ব্বদা জাগ্রত থাকত, এবং সে খুব ভাল স্ত্রী হতে পেরেছিল।

বহুবৎসর পরে তার প্রথম স্বামী ম্যাথিয়াস্ তার শহরতলীর ভাঙা বাড়ীটাতে ফিরে এল। সে এইখানেই বাস করতে আরম্ভ করল এবং আবার মুচির কাজ সুরু করল। কিন্তু কেউ আর এখন তাকে কাজ দিতে চায় না, ভদ্রলোকে তার চৌকাঠশুদ্ধ মাড়ায় না। সবাই তাকে ঘৃণা করে। এদিকে আনার প্রতি সকলের শ্রদ্ধা ও ভালবাসা বেড়েই চলেছে। অথচ অন্যায় যা কিছু তা আনাই করেছিল, ম্যাথিয়াস্ করেনি।

ম্যাথিয়াস্ নিজের হৃদয়ের গোপন কথা নিজের মনেই রাখল, কিন্তু সেটা যেন তার কণ্ঠরোধ করবার উপক্রম করতে লাগল। ক্রমেই তার নানারকম নৈতিক অবনতি হতে লাগল। লোকে তাকে দুশ্চরিত্র মনে করে ব'লে তার চরিত্র সত্যই খারাপ হয়ে পড়ল। সে কুসঙ্গে মিশতে লাগল এবং মদ খেতে আরম্ভ করে দিল।

এমন সময় নগরে মুক্তি ফৌজের একটা দল এসে হাজির হ'ল। তারা প্রকাণ্ড একটা হল্ ভাড়া করে সভা

করতে লাগল। প্রথম দিন থেকেই শহরের যত গুণ্ডা আর বদমায়েস্ সেখানে ভিড় করে যত রকম দুষ্টামি সুরু করল, যাতে মুক্তি ফৌজের কোনো কাজ হতে না পারে। সপ্তাহখানিক পরে বুড়ো ম্যাথিয়াস্ স্থির করল যে, ওদের সঙ্গে ভিড়ে সেও একটু মজা করবে।

রাস্তাতেও তখন ধাক্কাধাক্কি চলেছে, হলের দরজার কাছে ত মহা ভিড়। সবাই সবাইকে কনুইয়ের গুঁতো মারছে, যা-তা গালাগালি করছে। রাস্তার একদল ছোক্‌রা জুটেছে, আবার সৈন্যদলও হাজির হয়েছে। গৃহস্থ বাড়ির ঝি, রাঁধুনীর থেকে খুনে গুণ্ডা, পুলিশ, সব শ্রেণীর লোকে হলটা ভর্ত্তি। মুক্তি ফৌজ জিনিষটা আধুনিক, কাজেই সবাই তাদের কাজ দেখতে চায়। এমন কি তারা আসার পর থেকে থিয়েটারে এবং মদের দোকানে পর্য্যন্ত খদ্দের কমে গেছে।

হলটার ছাদ নীচু, বেঞ্চিগুলো চটা-ওঠা, মেঝেটারও স্থান জায়গায় জায়গায় ফেটে গেছে। তেলের বাতিগুলো থেকে কড়া দুর্গন্ধ বেরচ্ছে।

প্ল্যাটফর্ম্মটা তখনও খালি, ফৌজের লোকেরা তখনও এসে পৌছয় নি। লোকগুলো হাস্‌ছে, শিষ দিচ্ছে, কেউ বা বেঞ্চি আছড়াচ্ছে। গুণ্ডার দলের মহাফুর্ত্তি লেগে গয়েছে।

হঠাৎ দলের পাশের দিকের একটা দরজা খুলে গেল, ঘরের মধ্যে একটা ঠাণ্ডা হাওয়ার স্রোত বয়ে এল। লোকগুলো গোলমাল থামিয়ে আশান্বিত ভাবে দরজার দিকে তাকিয়ে রইল। মুক্তি ফৌজের তিনটি মেয়ে হলের ভিতর এসে ঢুকল, তাদের হাতে বাদ্যযন্ত্র, বড় বড় নীল রঙের টুপিতে তাদের মুখের অর্দ্ধেক ঢাকা পড়ে গেছে। প্ল্যাটফর্ম্মে উঠেই তারা হাঁটু গেড়ে বসে পড়ল। তাদের মধ্যে একজন মাথা উঁচু ক'রে চোখ বুজে প্রার্থনা করতে লাগল। তার গলার স্বর ছুরির মত শাণিত, সেটা এই নীরবতাকে কেটে দ্বিখণ্ডিত করতে লাগল। তার প্রার্থনার সময় নীরবতা অটুট হয়ে রইল, রাস্তার ছোক্‌রারা এখনও ফুর্ত্তি আরম্ভ করেনি। পাপস্বীকার এবং গান যখন আরম্ভ হবে সেই সময় দুষ্টামি সুরু করবে বলে তারা অপেক্ষা করছিল।

মেয়েরা নিষ্ঠা সহকারে নিজেদের কাজ করে চল্‌ল। তারা প্রার্থনার পর গান ধরল, আবার গানের পর বক্তৃতা আরম্ভ করল। হাসিমুখে তারা নিজেদের আনন্দপূর্ণ জীবনের বর্ণনা করতে লাগল। তাদের সামনে এক হল ভর্ত্তি গুণ্ডা আর ছোটলোক, এরা এখন বেঞ্চিতে উঠে দাঁড়িয়ে নানারকম চীৎকার সুরু করে দিল। মেয়েগুলি যেদিকে তাকায় দেখে বীভৎস পাশবিকতাপূর্ণ মুখ। কিন্তু আশ্চর্য্য তাদের সাহস, তারা জানে যে ভগবান তাদের দিকে। তাদের ঠাট্টা বিদ্রূপ ক'রে কোনোই লাভ হল না, তারা সহজেই এই কুৎসিত বাক্য আর কাজের উপর বিজয়ী হয়ে রইল।

তারা লোকগুলোকে ডেকে বল্‌লে, "আমাদের সঙ্গে গান কর, গান করলে মন পবিত্র হয়।" তারা নিজেরা বাজনা বাজিয়ে একটি সুপরিচিত ধর্ম্মসঙ্গীত আরম্ভ করল। প্রথম কলিটা তারা বার বার করে গাইতে লাগল। প্ল্যাটফর্ম্মের ঠিক সামনেই যারা বসেছিল, তাদের ভিতর জন কয়েক মেয়ে তিনটির সঙ্গে যোগ দিল। কিন্তু দরজার কাছ থেকে একদল লোক একটা অশ্লীল গান জুড়ে দিলে। দুটি গানের স্রোত যেন পরস্পরকে ঠেলা দিয়ে দূর করে দেবার চেষ্টা করতে লাগল। মেয়ে তিনটির শিক্ষিত সুন্দর গলার স্বর যেন ঐ সব গুণ্ডা এবং রাস্তার ছোকরার ভাঙা মোটা গলার সঙ্গে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হ'ল। কিন্তু নানারকম বিকট চীৎকার বেঞ্চি ভাঙার শব্দ প্রভৃতি তাদের গানের সুরকে ছাপিয়ে উঠ্‌তে লাগল। আহত যোদ্ধার মত তাদের গান থেমে গেল। গোলমাল এত ভয়ানক হয়ে উঠল যে, আর কান পাতা যায় না। মেয়েগুলি হাঁটু গেড়ে, চোখ বুজে যন্ত্রণা-কাতর মুখে নীরব হয়ে গেল।

ক্রমে কোলাহল কমে এল, তখন তাদের দলপতি কথা বল্‌তে আরম্ভ করল, "হে প্রভু, এই-সব মানুষকে তুমি আপনার করে নেবে। আমরা তোমাকে ধন্যবাদ দিচ্ছি প্রভু, কারণ এরা সকলেই তোমার সেনানী হবে।"

ভিড়ের লোকগুলি আবার একথায় চীৎকার গালাগালি সুরু করল, তারা ভগবানের কাছে আত্মসমর্পণ করতে চায় না। তারা যে স্বেচ্ছায় এসেছে, কেউ তাদের ধরে

আনেনি তা তারা ভুলেই গিয়েছিল। মেয়েটি কথা বলে চলল। তার তীক্ষ্ণ শাণিত কণ্ঠস্বর সেই উৎকট কোলাহলকে ভেদ ক'রে সকলের কানে পৌঁছতে লাগল, এবং ক্রমে সেটাকে জয় ক'রে ফেলল।

তারপর সে নিজের একজন সঙ্গিনীকে আহ্বান করল এগিয়ে এসে কথা বলবার জন্যে। সে মেয়েটি হাস্যমুখে এগিয়ে এল, এই অভদ্র ভিড়ের সামনে দাঁড়িয়ে নির্ভীক ভাবে নিজের বিগত জীবনের পাপ এবং মুক্তি লাভের কাহিনী বলে গেল। এই মেয়েটি সাধারণ চাকরাণী, সে উপহাস বিদ্রূপকে তুচ্ছ করবার সাহস কোথা থেকে পেল? যে লোকগুলো ঠাট্টা করতে এসেছিল, তাদের মধ্যে কেউ কেউ বিবর্ণ মুখে চুপ করে গেল। এই মেয়েগুলিকে এত সাহস, এত শক্তি কে দিল? মানুষের চেয়ে মহান্ কোনো শক্তি তাদের চালিত করেছিল।

ভিড়ের একেবারে সব চেয়ে নিবিড়তম অংশে ম্যাথিয়াস্ উইক দাঁড়িয়েছিল। তার চেহারা দেখে মনে হচ্ছিল সে মাতাল, বাস্তবিক পক্ষে কিন্তু সে দিন তার মাথা বেশ পরিষ্কারই ছিল। সেখানে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে সে কেবলই এক কথা ভাবছিল, "আঃ, আমি যদি মনের সব কথা খুলে বলতে পারতাম!"

এ ধরণের মানুষ, আর এ-রকম জায়গা সে ইতিপূর্ব্বে কখনও দেখেনি। ম্যাথিয়াসের কানে কানে কে যেন বলছিল, "এই বাঁশিতে তুমি সুর দিতে পার। এই স্রোত তোমার বাণী বহুদূর বয়ে নিয়ে যেতে পারবে।"

হঠাৎ গানের দল চমকে উঠল, তাদের মনে হল তারা যেন সিংহের গর্জ্জন শুনতে পেল। ভীষণস্বরে একজন মানুষ ভয়ানক সব কথা বলতে লাগল। সে ভগবানকে উপহাস করতে লাগল। "মানুষ কেন ভগবানের দাসত্ব করবে? তিনি নিজের অনুচরদের বিপদকালে ত্যাগ করে যান। নিজের প্রিয় পুত্রকেও তিনি ত্যাগ করেছিলেন। তিনি কখনও কাহাকেও সাহায্য করেন না।"

গলার স্বরটা ক্রমেই উচ্চতর হয়ে উঠতে লাগল। সেখানে যারা উপস্থিত ছিল তাদের মধ্যে কেউ কখনও মানুষের হৃদয় বিদীর্ণ করে এমন আগুনের স্রোত বেরুতে দেখেনি। সকলে মাথা নীচু করে শুনতে লাগ[ল]। তারা যেন মরুভূমির পথিক, তাদের মাথার উপর দি[য়ে] ভীষণ ঝটিকা বয়ে যাচ্ছে।

তার কথাগুলো যেন দানবের হাতুড়ির আঘাতে[র] মত ভগবানের সিংহাসনের তলায় বাজতে লাগল। তাহাকে যিনি উৎপীড়ন করেছিলেন, বিশ্বাসীদের যি[নি] যন্ত্রণাদায়ক মৃত্যুর মুখ থেকে উদ্ধার করেন নি, সে[ই] ভগবানের বিরুদ্ধে এই মানবের কণ্ঠ বিদ্রোহ ঘোষ[ণা] করতে লাগল। কবে তিনি শয়তানকে পরাভূত করবেন? আজও সে-ই সংসারে বিজয়ী।

প্রথমে এক একজন হাসতে চেষ্টা করেছিল। তা[রা] ভেবেছিল ম্যাথিয়াস ঠাট্টা করছে, কিন্তু ক্রমে তা[রা] বুঝল এ সব কথা ঠাট্টার নয়, নিদারুণ সত্য। অনেকগু[লি] লোক উঠে প্ল্যাটফর্ম্মের উপরে গিয়ে বসল। তা[রা] মুক্তি ফৌজের কাছে আশ্রয় চায়। এ লোকটা ভীষ[ণ] সব পাপ বাক্য উচ্চারণ করছে, নিশ্চয়ই এর উপ[র] ভগবানের অভিশাপ বর্ষিত হবে।

এবার ম্যাথিয়াস্ তাদের দিকে ফিরে তীব্র ক[ণ্ঠে] প্রশ্ন করতে লাগল, তারা ভগবানের দাসত্ব করে কি পুরস্কার প্রত্যাশা করে? তারা কি মনে করে[ছে] ভগবান নিশ্চয়ই তাদের স্বর্গে নিয়ে যাবেন? তা যে[ন] না ভাবে, ভগবান স্বর্গ বিষয়ে অতি কৃপণ।

সে একজন মানুষের কথা বলতে লাগল যে চিরমুক্তি পাবার পক্ষে যথেষ্ট পুণ্য করেছিল। ভগবান যতখানি স্বার্থত্যাগ চান, সে তার চেয়েও বেশী ত্যাগ করেছিল। কিন্তু কি তার লাভ হল? দীর্ঘ জীবনের শেষে, সে এখ[ন] পাপের পঙ্কে নিমজ্জিত। তার সব সুকৃতির ফ[ল] ইহলোকেই ক্ষয় পেয়ে গেছে। নরক ছাড়া কিছু আ[র] তার জন্যে অপেক্ষা করে নেই।

এই মানুষটির কণ্ঠস্বর ঈশানের ঝড়ের মত গর্জ্জন করতে লাগল, যার প্রচণ্ড তেজে সমুদ্রের সব জাহাজ বন্দরে পালিয়ে যায়। ভিড়ের ভিতর যত স্ত্রীলোক ছিল এই দুঃসাহসিকের কথা শুনে সকলেই প্ল্যাটফর্ম্মে গিয়ে আশ্রয় নিল। তারা মুক্তি ফৌজের সেনাদের হাত ধ'রে চুম্বন করতে লাগল। সকলে তাদের দলে দীক্ষা নিতে

চায়, দলের লোকেরা কিছুতেই কাজ সামলাতে পারছিল না। এমন কি বৃদ্ধেরা এবং বালকেরাও হাঁটু গেড়ে বসে ভগবানকে ধন্যবাদ দিতে লাগল।

বক্তা কথা বলেই চল্‌ল। নিজের কথার নেশায় সে নিজেই মশগুল হয়ে উঠেছিল। ক্রমাগত সে নিজেকে বল্‌তে লাগল, "আমি কথা বলছি, এতকাল পরে অবশেষে আমি কথা বল্‌তে পারছি। আমি আমার মনের গোপন দুঃখের কথা খুলে বল্‌ছি, অথচ এমনভাবে বল্‌ছি যে, কেউ ঠিক ক'রে কিছু বুঝতে পারছে না।"

বাড়ি ছেড়ে পালাবার পর ম্যাথিয়াস্ এই প্রথম প্রাণে শান্তি অনুভব করল।

৩

শরৎকালের মধ্যাহ্ন। সমস্ত শহরটা নীরব হয়ে রয়েছে, যেন পাথরের জঙ্গল, যেন জ্যোৎস্নাপ্লাবিত প্রাকৃতিক দৃশ্য, কোথাও জনমানব নেই। সকলে শহরের প্রান্তবর্ত্তী বনটির দিকে চলেছে। কেউ-বা ঝুড়ি হাতে পায়ে হেঁটে চলেছে, কেউ সাইকেলে, স্কুলের ছেলেরা পিঠে থলি ঝুলিয়ে চলেছে, ছোটশিশুরা তাদের সঙ্গে নাচতে নাচতে চলেছে। একটা ঘোড়ার গাড়ী ছুটে গেল পদচারী পথিকদের সচকিত ক'রে। একটা সাহসী ছেলে দৌড়ে চাকার উপর উঠতে গেল, কিন্তু গাড়ীর ভিতর থেকে একটি ক্ষুদ্র সুন্দর হাত বেরিয়ে এসে তাকে ঠেলে ফেলে দিল। আসপাশের লোকেরা হেসে উঠল।

বনের মধ্যে পাখীরা গান ধরেছে, শুক্ গাছগুলি নিজেদের বিশাল কাল দেহ নিয়ে যেন শোক করছে, বীচ্ গাছগুলি সবুজ ঐশ্বর্য্যের সম্ভার স্তরে স্তরে আকাশের দিকে তুলে ধরেছে। মানুষগুলি নিজেদের খাবারের ঝুড়ি ঘাসের উপর নামিয়ে রেখে চারিদিক ঘিরে বসে গেল। তাদের চারিদিকে পোকামাকড় ঘুরতে লাগল, ঝিঁঝিঁ পোকারাও সুর তুলে তাদের আনন্দোৎসবে যোগ দিতে লাগল।

হঠাৎ বাদ্যযন্ত্রের স্বর শোনা গেল। ঝিঁঝিঁ পোকার রব ডুবে গেল বটে, তবে পাখীরা আরও গলা ছেড়ে গান ধরল। মুক্তি ফৌজের দল বনের পথ দিয়ে অগ্রসর হয়ে আসছে, বিশ্রামকারীরা নিজেদের আরাম ছেড়ে তাড়াতাড়ি উঠে পড়ল। নাচ গান, খেলা, সব থেমে গেল, সকলে দল বেঁধে মুক্তি ফৌজের তাঁবুর দিকে অগ্রসর হয়ে চল্‌ল। তাদের বেঞ্চিগুলি দেখতে দেখতে একেবারে ভরে গেল।

মুক্তি ফৌজ এখন দলে খুব ভারি হয়েছে, তাদের শক্তিও বেড়েছে। অনেক সুন্দর মুখ ঘিরেই এখন নীল টুপি শোভা পাচ্ছে। বৃদ্ধ মুচি ম্যাথিয়াস এখন তাদের পতাকা বহনকারী, সে মুক্তিফৌজের নিশানের তলায় নিজের শুভ্রমাথা নিয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে। ফৌজের সেনারা একে ভোলেনি, কারণ এরই জন্যে এই নগরে তাদের প্রথম জয় লাভ ঘটেছে। তারা তার নির্জ্জন কুটীরে গিয়ে দেখাসাক্ষাৎ করত, তার সঙ্গে মন খুলে সব বিষয়ে কথা বল্‌ত, তার ঘরদোর ঝাঁট দিয়ে দিত, ছেঁড়া কাপড় শেলাই ক'রে দিত। নিজেদের সব সভা সমিতিতে তারা ম্যাথিয়াস্‌কে বক্তৃতা দেবার জন্য ডাকত। এতকাল পরে কথা বলতে পেরে ম্যাথিয়াস্‌ও খুশী ছিল। সে এখন ভগবানের শত্রুরূপে নির্জ্জনবাস করতে আর বাধ্য নয়। তার মনে অদ্ভুত বল এসেছিল, কথায় সেটাকে প্রকাশ করতে পেলে সে বড়ই আনন্দ অনুভব করত। তার গম্ভীর কণ্ঠের স্বরে হল যখন গম্ গম্ করতে থাকত আনন্দে তার হৃদয় ভরে উঠত।

সে সর্ব্বদা নানাভাবে নিজের কাহিনীই বল্‌ত। জগতে যাদের দুঃখ কেউ বোঝে না, তাদের দুর্ভাগ্যের বিষয় বর্ণনা করত, কত ত্যাগ স্বীকার যে চিরকাল গোপন থাকে, তার মূল্য কেউ বোঝে না, পুরস্কার কেউ দেয় না, সে সবের কথাই বলত। নিজের কথাই সে বল্‌ত বটে, কিন্তু এমনভাবে ঘুরিয়ে বলত যে, লোকে আসল ব্যাপার যে কি তা ধরতে পারত না। ক্রমে কবি বলে ম্যাথিয়াসের নাম ছড়িয়ে পড়ল। সে নাকি যেমন ক'রে মানুষের মনকে নাড়া দিতে পারে, এমন আর কেউ পারে না। তার কথা শুনবার জন্যেই লোক বেশী ক'রে ভিড় করতে লাগল। তার অসুস্থ মস্তিষ্কে যত গাঢ়রঙের ছবি ফুটে উঠ্‌ত, তাকেই বাক্যে রূপ দিয়ে নিজের শ্রোতাদের সে মন্ত্রমুগ্ধ ক'রে রাখত। তার বুকফাটা আর্ত্তনাদ মানুষকে একেবারে অসম্ভব রকম বিচলিত ক'রে তুলত।

পৃথিবীর গর্ব্বিততম মানুষকে নিজের পায়ের কাছে নতজানু করাবার ক্ষমতা দরিদ্র ম্যাথিয়াস্ কোথা থেকে পেল? কথা বলতে সে যখন সুরু করত তার সারা দেহ থরথর করে কাঁপত। কিন্তু ক্রমে সে শান্ত হয়ে আস্‌ত, তার মুখ দিয়ে দুঃখের অগ্নিস্রোত একটানা বয়ে চলত।

তার বক্তৃতাগুলি কোনোদিন লেখা হয়নি বা ছাপা হয়নি। সে-কথা শিকারীর চীৎকারের মত, রণশৃঙ্গের নিনাদের মত, তা মানুষকে জাগিয়ে তোলে, উত্তেজিত করে, প্রেরণা দেয়, কিন্তু ভাষায় তাকে বন্দী করা যায় না। তা বিদ্যুতের ঝলকের মত, বজ্রের গর্জ্জনের মত, মানুষের হৃদয় তার শব্দে আতঙ্কে কেঁপে ওঠে। জলপ্রপাতের জলবিন্দু বরং গণনা করা যায়, সমুদ্রের ফেনোচ্ছ্বাসকে বরং অঙ্কিত করা যায়, কিন্তু ম্যাথিয়াসের বাণীকে লিপিবদ্ধ করা যায় না।

সেদিন বনের ভিতর ম্যাথিয়াস্ যখন বক্তৃতা আরম্ভ করল, তখন শ্রোতাদের মধ্যে তার পূর্ব্বতন পত্নী আনা এরিকসন বসেছিল। সে সকালেই স্বামীর হাত ধ'রে ধনীর গৃহলক্ষ্মীর মত বনভ্রমণ করতে এসেছিল। একজন চাকর আর আনার মেয়ে খাবারের ঝুড়ি বয়ে নিয়ে চলেছিল, আর একজন চাকর সব ছোট শিশুটিকে কোলে করে আসছিল। সবাই সুস্থ সন্তুষ্টচিত্তে চলেছিল। আনার বিবেক সুপ্ত হয়ে ছিল। কিছুদিন আগে সে ম্যাথিয়াসকে তার বাড়ির সামনে দিয়ে টল্‌তে টল্‌তে যেতে দেখেছিল, সে দৃশ্য দেখে তার মনে বড় ঘা লেগেছিল। তারপর আনা শুন্‌তে পেল যে, ম্যাথিয়াস্ মুক্তি ফৌজের খুব আদরের পাত্র হয়েছে। এ-কথা শুনে আনা মনে শান্তি পেল, তাই আজ সে ম্যাথিয়াসের বক্তৃতা শুন্‌তে এসেছে। সে বুঝল ম্যাথিয়াস্ কার কথা বল্‌ছে। বাইবেলের কাহিনী এ নয়, এ তার নিজেরই কাহিনী। নিজে যে ত্যাগস্বীকার সে করেছে, তার স্মৃতি ম্যাথিয়াস্‌কে দগ্ধ করছে। নিজের ক্ষতবিক্ষত হৃদয়কেই যেন সে শ্রোতাদের দিকে ছুঁড়ে দিচ্ছে। আনার হৃদয় এই দৃশ্য দেখে শোকে দুঃখে পূর্ণ হয়ে উঠল, সে যেন সামনে কার মুক্ত কবরের গহ্বর দেখছে।

৪

অতঃপর আনা এরিক্‌সন্ মুক্তি ফৌজের সব সভাতেই যেতে আরম্ভ করল। সে মন দিয়ে ম্যাথিয়াসের কথা শুন্‌ত। সে সর্ব্বদা নিজের কাহিনীই বল্‌ত, যত ঘুরিয়ে-ফিরিয়েই বলুক, আনা কিন্তু তার কথার মানে বুঝতে পারত।

আনার মনে হত ম্যাথিয়াসের দুঃখের যেন সীমা নেই। দুঃখের কথা বলে বলে ম্যাথিয়াস যে নিজের হৃদয়ের ক্ষতকে সারিয়ে তুল্‌ছে, তা আনা বুঝত না। নিজের কবিত্বের শক্তিতে সে নিজে কতখানি যে উল্লসিত, তাও আনা বুঝতে পারত না।

আনা নিজের বড়মেয়েকেও সভাতে নিয়ে গিয়েছিল। মেয়ে যেতে চায়নি। সে খুব ভাল মেয়ে, কর্ত্তব্য-পরায়ণও, কিন্তু তার ভিতর যৌবনের চাঞ্চল্য কোথাও ছিল না, সে যেন বুড়ো হয়েই জন্মেছে। শৈশব থেকেই সে নিজের পিতার পাপের জন্য লজ্জিত। সে সর্ব্বদা গম্ভীর মুখে মাথা সোজা করে হাঁটত, যেন সবাইকে বল্‌তে চায় "দেখ আমি পাপী পিতার সন্তান, কিন্তু আমার মধ্যে কলঙ্কের চিহ্নমাত্র নেই।"

তার মায়ের মেয়ের জন্য অহঙ্কারের সীমা ছিল না, তবু সেও মাঝে মাঝে ভাবত, "আমার মেয়ে যদি এত ভাল না হত, তাহলে তার হৃদয়ে একটু মায়া মমতা বেশী থাকত বোধ হয়। এ যেন পাথরের দেবী প্রতিমা।"

মেয়েটি সভার ঘরে বিদ্রূপের হাসি হাসতে হাসতে এসে ঢুকল! অভিনয়জাতীয় সব জিনিষকেই সে ঘৃণা করত। তার বাবা যখন বক্তৃতা দেবার জন্য প্ল্যাটফর্ম্মে উঠল, তখন সে একবার বেরিয়ে যাবার চেষ্টা করল, কিন্তু আনা শক্ত ক'রে তার হাত চেপে ধরে বসে রইল। মেয়ে তখন চুপ ক'রে বস্‌ল, তার পিতার বাক্যস্রোত তার মনের উপর দিয়ে বয়ে যেতে লাগল। কিন্তু পিতার বক্তৃতার চেয়ে মায়ের হাতের মুঠি যেন তাকে বেশী করে কিছু জানাচ্ছিল।

আনার হাত যন্ত্রণাকাতর হয় উঠেছিল। একবার সেটা ছট্‌ফট্ করে, আবার হিমশীতল হয়ে যায়, হঠাৎ

াবার মেয়ের হাত বজ্রমুষ্টিতে চেপে ধরে। আনার খ দেখে কিছু বোঝা যায় না, হাতখানা শুধু অধীর য়ে উঠে কি জানাতে চায়!

বৃদ্ধ আজকে দুঃখ মুখ বুজে সহ্য করার যে ত্যাগ তারই র্ণনা বলে গেল।

আনার হাত তার মেয়ের হাতের মধ্যে ধরা রইল। তার হাত যেন বল্‌ছিল, "এই লোকটি নীরবে অসহ্য ঃখকে সহ্য করেছে।" একটা মাত্র কথা বল্‌লেই সে ক্তি পেত। তার বিরুদ্ধে মিথ্যা অভিযোগ আনা য়েছিল।"

মেয়ে মায়ের সঙ্গে বাড়ি ফিরে গেল। তারা ীরবে চল্‌ল, তরুণীর মুখ পাথরের মত কঠিন। সে যেন শশবের সব কথা মনে করবার চেষ্টা করছিল। মা ্যাকুলভাবে মেয়ের দিকে তাকাচ্ছিল। সত্যই কি তার কছু মনে আছে?

পরদিন আনা তার কয়েকজন বন্ধুকে বিকেলে চা খতে নিমন্ত্রণ করল। এই মহিলারাই তার সেই বহুদিন মাগেকার বিপদের সময় তার কাছে এসে দাঁড়িয়েছিল। কবল একজন মাত্র নূতন মানুষ, তার নাম মারিয়া ্যাণ্ডারসন্, সে মুক্তি ফৌজের দলপতি।

প্রথমে নানা ঘরোয়া বিষয়ে গল্প হতে লাগল। বাই নিশ্চিন্তমনে তাতে যোগ দিল, কেকের প্লেটও বশ খালি হতে লাগল। আনা বসে ভাবছিল এই মানুষ-গুলিকেই সে একদিন নিদারুণ ভয় করেছে, কেন যে তা আজ সে বুঝতে পারে না।

সবাই যখন চায়ের দ্বিতীয় পেয়ালা নিয়ে বসেছে, তখন আনা নিজের বক্তব্য বলতে আরম্ভ করল। তার কথাগুলির গুরুত্ব খুবই বেশী, তবে তার গলার স্বর কাঁপল না।

আনা বল্‌তে লাগল, "অল্পবয়সে মানুষের বিবেচনা বা কাণ্ডজ্ঞান কমই থাকে। যেখানে কথা বলা উচিত, সেখানে মানুষ লজ্জায় চুপ করে থাকে। আর ঠিক সময় যে-স্ত্রীলোক কথা বলে না, তাকে চিরটা কাল অনুতাপ করে কাটাতে হয়।"

সবাই তার কথায় সায় দিল।

আনা আবার বল্‌তে লাগল, কাল সে ম্যাথিয়াসের বক্তৃতা শুন্‌তে গিয়েছিল; এর আগেও অনেকবার গিয়েছে। ম্যাথিয়াস্ আনার খাতিরে এতকাল যে কষ্ট সহ্য করেছে, তা মনে করলে আনা স্থির থাকতে পারে না। তাই আজ সে সকলের কাছে সব কথা খুলে বলতে চায়। তবুও এ-কথাও সে বলতে বাধ্য যে আনার মত তরুণীকে বৃদ্ধ ম্যাথিয়াসের বিয়ে করা ঠিক হয়নি।

"তখন আমার বয়স অল্প, তোমাদের কাছে কোনো কথা খুলে বল্‌বার আমার সাহস হয়নি। ম্যাথিয়াস্ করুণাপরবশ হয়ে আমাকে ছেড়ে চলে গিয়েছিল। তার ধারণা হয়েছিল যে, আমি এরিক্‌সনকে ভালবাসি। এ-কথা সে চিঠিতে লিখে রেখে গিয়েছিল।"

চিঠিখানা বার ক'রে সে সবাইকে পড়ে শোনাল, তার চোখ দিয়ে জল গড়িয়ে পড়তে লাগল।

"ঈর্ষ্যাতে তার জ্ঞান লোপ পেয়েছিল। এরিক্‌সনের সঙ্গে আমার কোনোই সম্পর্ক ছিল না। চার পাঁচ বছর পরে তবে আমরা বিয়ে করি। কিন্তু ম্যাথিয়াস্ সম্বন্ধে মানুষের আর ভুল ধারণা থাকা উচিত নয়। সে অতি সাধুপুরুষ। সে যে স্ত্রী-কন্যাকে ছেড়ে পালিয়েছিল, তার কারণ এই যে, সে তাদের অতিরিক্ত ভালবাস্‌ত। আমি সবাইকে এ-কথা জানাতে চাই। কাপ্তেন য়্যাণ্ডারসন্ আপনি এই চিঠি আপনাদের সভায় সকলকে পড়ে শোনাবেন। ম্যাথিয়াসের যে শ্রদ্ধা এবং সম্মান প্রাপ্য, তা যেন সে ফিরে পায়। আমি বহুদিন চুপ ক'রেছিলাম, কারণ আমার মনে হত একটা মাতালের জন্য পাপস্বীকার করতে যাবার কোনো দরকার নেই। এখন অবশ্য অবস্থা অন্যরকম দাঁড়িয়েছে।"

মহিলারা সকলে বজ্রাহতের মত বসে রইল। আনা কম্পিত কণ্ঠে বলল, "এর পর তোমরা বোধ হয় আর কেউ আমার বাড়ি আস্‌বে না?"

"তা আসব না কেন? তুমি তখন নিতান্ত ছেলেমানুষ ছিলে, তখন তোমার দোষ ধরা চলে না। আর সে বুড়ো মানুষ হয়ে এ-রকম ভুল বুঝলই বা কেন?"

আনা নিজের মনে হাসল। এই নাকি সমাজের

বজ্রকঠিন স্বর! এখানে সত্য বল্‌লেও বিপদ নেই, মিথ্যা বল্‌লেও বিপদ নেই।

কিন্তু সে কি জান্‌ত যে, সেদিন সকালেই তার বড় মেয়ে মায়ের ঘর ছেড়ে বৃদ্ধ বাপের কাছে চলে গেছে?

৫

ম্যাথিয়াসের ত্যাগের কথা সারা শহরে ছড়িয়ে পড়ল। অনেকে তার প্রশংসা করল, আবার অনেকে তার বোকামী শুনে ঠাট্টাও করল। মুক্তি ফৌজের সভায় তার সেই চিঠি পড়ে শোনানো হ'ল। শ্রোতাদের মধ্যে অনেকে চোখের জল ফেল্‌ল। লোকে রাস্তায় তার হাত স্পর্শ করবার জন্য দৌড়ে আসতে লাগল। তার মেয়ে তার সঙ্গে বাস করতে চলে এল।

পরের কয়েকদিন সভাতে সে চুপ ক'রে রইল। কথা বলবার আর কোনো প্রেরণা সে অনুভব করল না। তারপর সবাই তাকে আবার বক্তৃতা দেবার জন্য আহ্বান করতে লাগল।

সে প্ল্যাটফর্ম্মে উঠে হাতজোড় ক'রে কথা আরম্ভ করল। কিন্তু কয়েকটা কথা বলেই সে অপ্রতিভ ভাবে থেমে গেল। সে যেন নিজের গলার স্বরও চিন্‌তে পারছিল না। তার সিংহের মত শক্তি কোথায় গেল? সে বজ্রের নিনাদ কই, সে স্রোতের বেগ কই? সে বুঝতে পারলে না, তার কি হয়েছে।

সে দুই হাতে মাথা চেপে ধ'রে পিছিয়ে গেল। "আমি আর কিছু বল্‌তে পারছি না। ভগবান আমার ক্ষমতা কেড়ে নিয়েছেন।" এই ব'লে সে বেঞ্চিতে বসে পড়ল। প্রাণপণে, সমস্ত শক্তি একত্র ক'রে সে বলবার বিষয়, বলবার ভাষা খুঁজতে লাগল। এ সবের প্রয়োজন আগে তার কোনদিনও হয়নি। কিন্তু তার মাথার ভিতর খালি অসংলগ্ন চিন্তার রাশি ঘুরপাক খেতে লাগল।

সে ভাবল, যদি সে নিজের নির্দ্দিষ্ট স্থানে দাঁড়িয়ে উঠে অভ্যাসমত প্রার্থনা দিয়ে সুরু করে, তাহলে হয়ত আবার সে বলবার শক্তি ফিরে পাবে। সে চেষ্টা করল। তার মুখ পাংশুবর্ণ হয়ে গেল, কপাল বেয়ে ঘাম পড়তে লাগ্‌ল। সভার সব লোক একদৃষ্টে তার দিকে চে[য়ে] রইল।

তার মুখে একটাও কথা এল না। সে বসে প[ড়ে] ভগ্নকণ্ঠে কাঁদতে লাগল। ভগবান তার ক্ষমতা হ[রণ] ক'রে নিয়েছেন।

ভয়ানক একটা আতঙ্ক তাকে গ্রাস করতে লাগ্‌ল। সে প্রাণপণে যুদ্ধ করতে লাগ্‌ল, যা হারিয়েছে তা [সে] ফিরে চায়, তার দুঃখ তার বেদনাকে আবার সে ফি[রে] পেতে চায়, তাহলে সে কথা বলতে পারবে।

মাতালের মত টলতে টলতে সে আবার প্ল্যাটফ[র্ম্মে] গিয়ে উঠ্‌ল, যা-তা বকে যেতে লাগ্‌ল। অন্য লোকে কি ভাবে বক্তৃতা দেয় তাই মনে করবার চেষ্টা কর[তে] লাগ্‌ল, নিজে আগে আগে কি বলেছে তা মনে আনব[ার] চেষ্টা করতে লাগল। চারধারে সে উৎসুক ভা[বে] তাকাতে লাগল, কিন্তু শ্রোতাদের মুখে সে মুগ্ধ বিস্ময়ে[র] ভাব কই? ম্যাথিয়াসের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সুখ যা ছিল, তা বি[লীন] হয়ে গেছে।

সে পালিয়ে গেল অন্ধকারে মুখ লুকাতে। [সে] নিজের মন্দভাগ্যকে অভিশাপ দিতে লাগল। তা[র] কথায় আনার হৃদয়ের পরিবর্ত্তন হয়েছে, ম্যাথিয়[াস] নিজে নিজের পায়ে কুড়ল মেরেছে। তার যে মহান্ ঐশ্[বর্য্য] ছিল, তা সে হারিয়েছে। এখনও বেদনায় তার হৃ[দয়] পূর্ণ, কিন্তু এ বেদনা প্রতিভার জন্মদাতা নয়।

সে চিত্রকর, কিন্তু এখন তার হাত নেই, সে গায়[ক] কিন্তু তার কণ্ঠরুদ্ধ। আগে সে নিজের দুঃখের বর্ণ[না] করেছে, কিন্তু এখন তার আর বলবার কথা নেই।

সে প্রার্থনা করতে লাগ্‌ল, "হে ভগবান, যদি মানুষে[র] শ্রদ্ধা পেয়ে বোবা হয়ে থাকতে হয়, আর অশ্রদ্ধা পে[লে] কথা কইবার শক্তি আসে তাহলে চিরদিন আমা[য়] অশ্রদ্ধার পাত্রই হয়ে থাকতে দাও। যদি সুখ মানুষ[কে] নীরব করে, আর দুঃখ ভাষা দেয়, তাহলে দুঃখই দাও"

কিন্তু তার কাঁটার মুকুট খসে গিয়েছে। আজ [সে] সিংহাসনহীন রাজা। আজ সে দীনতমের চেয়েও [দীন,] কারণ অতিউচ্চ আসন থেকে তার পতন হয়েছে।

বাংলা দেশের মৎস্য-শিকারী মাকড়সা

শ্রী গোপালচন্দ্র ভট্টাচার্য্য

"১৯৩১ সনের মার্চ্চ মাসের প্রথম ভাগে, কলিকাতার উপকণ্ঠে, কোন বদ্ধ জলাশয়ে, ধূসর বর্ণের একটি পরিপুষ্ট মাকড়সার প্রতি হঠাৎ আমার দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়। জলাশয়টি নানা প্রকার জলজ উদ্ভিদ ও এক প্রকার ছোট ছোট 'শালুক' পাতায় পরিপূর্ণ ছিল, তাহারই একটি পাতার উপর মাকড়সাটি ভিন্ন জাতীয় আর একটি মাকড়সাকে বিষ-শল্য ফুটাইয়া অসাড় করিয়া মারিয়া ফেলিয়া আস্তে আস্তে রস চুষিয়া খাইতেছিল। এই অবস্থায় আমি উহাকে ধরার উপক্রম করিতেই ছুটিয়া পলাইয়া গেল। আমিও উহার উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখিয়া ক্রমাগত অনুসরণ করিতে লাগিলাম। অনেকক্ষণ ছুটাছুটির পর অবশেষে মাকড়সাটি পা গুটাইয়া মৃত্যুর ভাণ করিয়া জলের উপর চিৎ হইয়া ভাসিতে লাগিল। তখন সেইমাত্র আমি উহাকে কুড়াইয়া লইতে হাত বাড়াইয়াছি, অমনি আমার চোখের সম্মুখে হঠাৎ কোথায় যেন অদৃশ্য হইয়া গেল। এই হঠাৎ অদৃশ্য হওয়ার কারণ অনুসন্ধান করিয়া পরে জানিতে পারিয়াছি যে, ইহারা সুদক্ষ ডুবুরী; জলের নীচে পনেরো মিনিট হইতে আধ ঘণ্টা পর্য্যন্ত অবলীলা-ক্রমে ডুবিয়া থাকিতে পারে।

এই মাকড়সারা উভচর প্রাণী। দিনের বেলায় অধিকাংশ সময় ইহারা জলের উপর কাটায়। অনেক সময় জলজ উদ্ভিদের পাতার উপর বিশ্রাম করে, আবার কখনও কখনও জলের উপর ছুটাছুটি করিয়া বেড়ায়। দিবাবসানে সাধারণতঃ ইহারা জলাশয়ের তীরে উঠিয়া ঘাসপাতার মধ্যে আশ্রয় গ্রহণ করে। কখনও কখনও আবার পুকুরধারে পতিত ইট, কাঠ বা খোলামকুচির তলায় ছোট ছোট গর্ত্তে লুকাইয়া থাকে। দিনের আলো ইহারা খুবই ভালবাসে, কিন্তু দ্বিপ্রহরের প্রখর রৌদ্রের সময় ঝোপঝাড়ের অন্তরালে বা ছায়ার নীচে অবস্থান করে। পুষ্করিণীর পরিষ্কার জলের উপর দিয়া সময় সময় খুব দ্রুত-গতিতে লাফাইতে লাফাইতে ইহারা বহুদূর অতিক্রম করিয়া যাইতে পারে। যাইতে যাইতে জলের উপর বিশ্রাম করিলে শরীরের ভরে পায়ের নীচে জল একটু টোল খাইয়া যায় মাত্র; জলের উপরের পাতলা পর্দ্দা ছিন্ন করিয়া পা জলের ভিতর ডুবিয়া যায় না। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে, ইহাদের জলের নীচে ডুবিয়া থাকিবার অদ্ভুত ক্ষমতা আছে। কোন প্রকার ভয়ের কারণ উপস্থিত হইলে অথবা শত্রুর নিকট হইতে আত্মরক্ষার নিমিত্ত ইহারা জলের নীচে ডুব দিয়া ঘাসপাতা আঁকড়াইয়া ধরিয়া থাকে। শরীরের চতুর্দ্দিকের বাতাসের আস্তরণ ভেদ করিয়া জল ইহাদের গায়ে লাগিতে পারে না এবং এই জন্য জলের নীচে ইহাদিগকে রূপালী রঙের মত ঝক্‌ঝকে দেখায়। ধাড়ী মাকড়সাও ভয় পাইলে তাহার ডিম অথবা পৃষ্ঠে অবস্থিত বাচ্চাগুলিকে লইয়া জলের তলায় ডুব দিয়া জলজ লতাপাতার উপর দিয়া এক স্থান হইতে অন্য নিরাপদ স্থানে গিয়া লুকাইয়া থাকে।

ইহারা সাধারণতঃ নানাপ্রকার ছোট-ছোট পতঙ্গ এবং এক প্রকার জল-মক্ষিকা শিকার করিয়া বেড়ায়। এই জল-মক্ষিকাগুলিকে অনেক সময় দলবদ্ধভাবে জলের উপর ভাসিয়া বেড়াইতে দেখা যায়। এই মাকড়সারা প্রায়ই দুর্ব্বল স্বজাতীয়দিগকে খাইয়া ফেলে। স্ত্রী মাকড়সারাই এ বিষয়ে বিশেষ অগ্রণী, এমন কি সুযোগ পাইলেই তাহারা পুরুষ-মাকড়সাকে ধরিয়া উদরস্থ করে।

মাকড়সাদের মৎস্য-শিকারের কৌশল

এই মাকড়সারা সুদক্ষ শিকারী এবং ইহাদের কৌশলও অদ্ভুত। ইহারা কিরূপ ধৈর্য্যের সহিত শিকারের উপর লাফাইয়া পড়িবার সুযোগের অপেক্ষায় বসিয়া থাকে এবং কিরূপ সন্তর্পণে শিকার অনুসরণ করে তাহা বাস্তবিকই প্রণিধানযোগ্য। আরও বিস্ময়ের বিষয়

এই যে, এই ক্ষুদ্র প্রাণী কিরূপ অব্যর্থ কৌশলে নিজের শরীরের অনুপাতে বড় শিকারকে বিষশল্য প্রয়োগে অসাড় করিয়া অবলীলাক্রমে আয়ত্ত করিয়া ফেলে। নিম্নে একটি শিকারের বিবরণ দিতেছি।

একবার দমদমের নিকটবর্ত্তী একটি জলাশয়ে এই জাতীয় অনেক ডুবুরী মাকড়সা দেখিয়া তাহাদের গতিবিধি লক্ষ্য করিতেছিলাম। দেখিলাম ছোট-ছোট অনেক 'সূর্য্যপোনা' মাছও পুষ্করিণীর আশেপাশে ভাসিয়া বেড়াইতেছে। কিছু একটু ভয়ের কারণ হইলেই মাছগুলি ভাসমান 'শালুক' পাতার নীচে গিয়া লুকাইতেছিল, আবার কিছুক্ষণ পরেই বাহির হইয়া আসিতেছিল। একস্থানে দেখিলাম একটি ছোট্ট 'শালুক' পাতার চারিদিকে কয়েকটি ছোট-ছোট মাছ কি খুঁটিয়া খাইতেছে, আর পাতাটির উপরে প্রায়-মধ্যস্থলে একটা ধাড়ী মাকড়সা অনেকক্ষণ ধরিয়া চুপটি করিয়া বসিয়া উহাদিগকে লক্ষ্য করিতেছে। হঠাৎ কেহ দেখিলে মাকড়সাটির দুরভিসন্ধির কোন লক্ষণই খুঁজিয়া পাইত না, নিশ্চয়ই মনে হইত যেন মাছগুলির উপর উহার মোটেই লক্ষ্য নাই; কিন্তু প্রকৃত ব্যাপারটি সম্পূর্ণ বিপরীত, কারণ একটু অপেক্ষা করিবার পরই লক্ষ্য করিলাম—মাকড়সাটা মাঝে মাঝে থামিয়া থামিয়া খুব সন্তর্পণে পা ফেলিয়া আস্তে আস্তে পাতার ধারের দিকে অগ্রসর হইতেছে। খুব কাছে আসিয়াই হঠাৎ একটা মাছের ঘাড়ে লাফাইয়া পড়িয়া বিষ-শল্য ফুটাইয়া দিল। মাছটাও ছাড়াইবার জন্ম প্রাণপণে চেষ্টা করিয়াও কিছুতেই কৃতকার্য্য হইতে পারিল না। অবশেষে মাকড়সা মাছটাকে পাতার উপর টানিয়া তুলিয়া কামড়াইয়া ধরিয়াই রহিল। আরও কিছুক্ষণ ছটফট্ করিয়া মাছটা ক্রমশঃ অসাড় হইয়া মৃত্যুমুখে পতিত হইল। এই মাছটি প্রায় পৌনে এক ইঞ্চি লম্বা ছিল।

মৎস্য-শিকারের আলোকচিত্র

আরও বিশদভাবে পর্য্যবেক্ষণ করিবার নিমিত্ত একটা কাচপাত্রে জলজ উদ্ভিদ ও অল্প জল দিয়া কয়েকটি 'সূর্য্যপোনা' মাছ রাখিয়া কয়েকটা মাকড়সা ছাড়িয়া দিয়াছিলাম। পাত্রটির মুখ প্রায় সম্পূর্ণরূপে আবদ্ধ ছিল। তৃতীয় দিনে দেখিলাম একটি মাছ কম হইয়াছে। মাছের সংখ্যা ক্রমশঃ কমিতে কমিতে দশ দিন পর দেখা গেল
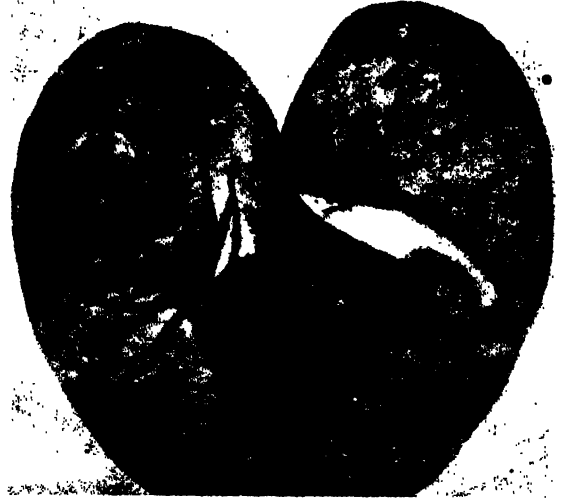
মাকড়সার মাছ ধরা

একটি মাছও অবশিষ্ট নাই। ইহাতে পরিষ্কার রূপে বুঝিতে পারা গেল যে, মাকড়সারাই মাছগুলিকে নিঃশেষ করিয়াছে।

স্বাভাবিক অবস্থায় ইহাদের মাছ ধরা ও খাওয়ার আলোকচিত্র গ্রহণ করা নানা কারণে অত্যন্ত অসুবিধাজনক এবং একরূপ অসম্ভব বলিয়াই বোধ হইল। অবশেষে

মাকড়সার মাছ শিকার ও খাওয়া

নিম্নোক্ত উপায়ে উহাদের এই অবস্থার ছবি তুলিতে কৃতকার্য্য হইয়াছি। একটি অনতিগভীর অল্প জলপূর্ণ পাত্রের মধ্যে কয়েকটা মাকড়সাকে পাঁচ দিন কিছু খাইতে না দিয়া রাখিয়া দিয়াছিলাম। কয়েক দিন কিছু খাইতে না পাইয়া ইহারা অতিমাত্রায় ক্ষুধার্ত্ত হইয়া উঠিয়াছিল। তখন ঐ পাত্রের মধ্যে কয়েকটা 'সূর্য্যপোনা' মাছ ছাড়িয়া দিবার পর অল্পক্ষণের মধ্যেই দুইটি মাকড়সা দুইটি মাছকে শল্য বিদ্ধ করিয়া পাতার উপর উঠাইয়া ফেলিল। পূর্ব্বেই ক্যামেরাটিকে নীচু দিকে মুখ করিয়া কাচ পাত্রের উপর বসাইয়া দেওয়া হইয়াছিল, কাজেই সঙ্গে সঙ্গে ছবি তুলিয়া লইতে আর কোন অসুবিধাই ঘটে নাই।

মাছটাকে ধরিয়া পাতার উপর তোলার পর আমরা ইচ্ছা করিয়া জোরে শব্দ করায়, মাকড়সাটা ভয় পাইয়া মাছটাকে ছাড়িয়া দিয়া পাশে বসিয়া রহিল। প্রথম ছবিতে ইহাই দেখান হইয়াছে। নীচের ছবিতে এরূপ কিছুই করা হয় নাই। মাকড়সা মাছটাকে পাতার উপর টানিয়া অসাড় করিয়া মারিয়া ফেলিয়া আহারে ব্যস্ত আছে।*

* বসু বিজ্ঞানমন্দিরের 'ট্র্যান্‌স্তাকসন' এ (ভলুম—৭, ১৯৩১-৩২) এই মৎস্য-শিকারী মাকড়সার বিস্তৃত বিবরণ প্রকাশিত হইয়াছে।

ভারত কোথায়?

শ্রীশরৎচন্দ্র মুখুজ্যে

ইউরোপের নানা দেশে নানা রকম দেখে নিজেকে নিজে অনেক বার জিজ্ঞাসা করেছি—"ভারত কোথায়?" আমেরিকায় এসে যেন আমার এ প্রশ্ন আরও বেশী ক'রে মনে পড়েছে। এদের স্কুলকলেজ দেখি আর ভাবি—"ভারত কোথায়?" এদের লাইব্রেরী, এদের হাসপাতাল, এদের বাড়িঘর রাস্তাঘাট সবই যেন আমাকে বার-বার মনে করিয়ে দেয় "ভারত কোথায়?" "ভারত কত পিছনে?"

কিছুদিন আগে কলম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের পাবলিক হেল্‌থ ইন্‌ষ্টিটিউটে (De Lamar Institute of Public Health—Columbia University) একটি সভাতে আমাকে ভারতবর্ষের 'পাবলিক হেল্‌থের' সম্বন্ধে কিছু বলতে হয়। এবার আমার ঐ প্রশ্নটি যেন আরও বড় রকমে আমার চোখের সামনে ভাসছিল। এ-দেশে পাবলিক হেলথের জন্য এরা এত করছে, আর আমরা তার কতখানি পিছনে, তাই ভেবে যেন আমার বলার মত বেশী কিছু খুঁজে পাচ্ছিলাম না। যা-কিছু করা দরকার তার অনেকগুলোতেই যে আমরা পিছনে তা স্বীকার করতেও যেন প্রাণে আঘাত লাগছিল। নিজেকে নিজে বহুবার জিজ্ঞাসা করেছিলাম—"ভারতবর্ষ কোথায়? কত দূরে? কত পিছনে?"

আমার এই প্রশ্নের জবাব পেলাম এদেশেরই একখানা বইয়ে। ডাঃ ডবলিন নামক একজন খুব নামকরা লোক কিছুদিন আগে এক খানা বই লিখেছেন (Health and Wealth by Louis I. Dublin of the Metropolitan Life Insurance Co.)। বইখানা পড়ে মনে হয়েছিল যেন ডাঃ ডবলিন আমার মানসিক প্রশ্নটি জেনেই তাঁর বইখানা লিখেছিলেন। তাঁর বইয়ের ১৮ পৃষ্ঠায় আছে, "India stands at the very bottom of the list of the countries of the world, with an expectation of about 23 years." অর্থাৎ ভারতবর্ষের স্থান পৃথিবীর অন্যান্য সমস্ত জাতির তালিকার সর্ব্বনিম্নে—২৩ বছরেরও কম জীবনধারণের আশা। এর তুলনায় অন্য কয়েকটি দেশের জীবনের আশা কত বছর, তা দেখলে বেশ বোঝা যাবে যে, কেন আমি বার-বার জিজ্ঞাসা করেছি "ভারতবর্ষ কোথায়?"

দেশ	বৎসর	জীবনাশা (পুরুষ)	জীবনাশা (মেয়ে)
নিউজিলাণ্ড	১৯২১-২২	৬২·৭৬	৬৫·৪৩
অষ্ট্রেলিয়া	১৯২০-২২	৫৯·১৬	৬৩·২৯
ডেন্মার্ক	১৯২১-২৫	৬০·৩০	৬১·৯০
ইংলণ্ড	১৯২০-২২	৫৫·৬২	৫৯·৫৮
নরওয়ে	১৯১১-২০	৫৫·৬২	৫৮·৭১
সুইডেন	১৯১১-২০	৫৫·৬০	৫৮·৩৮
যুক্তরাজ্য	১৯১৯-২০	৫৫·৩৩	৫৭·৫২
হলাণ্ড	১৯১০-২০	৫৫·১০	৫৭·১০
সুইজারলাণ্ড	১৯২০-২১	৫৪·৪৮	৫৭·৫০
ফ্রান্স	১৯০৮-১৩	৪৮·৫০	৫২·৪২
জার্মানি	১৯১০-১১	৪৭ ৪১	৫০·৬৮
ইটালি	১৯১০-১২	৪৬·৯৭	৪৭·৭৯
জাপান	১৯০৮-১৩	৪৪·২৫	৪৪·৭৩
ভারতবর্ষ	১৯০১-১০	২২·৫৯	২৩·৩১

আমাদের দেশের লোকের আয়ু কত কম! এত রোগ, এত অভাব, এত সহজ মৃত্যু যে শিশুর জন্মকালে সে খুব জোর গড়ে ২৩ বছর বাঁচতে আশা করে! এতে কেউ যেন মনে না করেন যে আমাদের কেউই ২৩ বছরের বেশী বাঁচি না। বাঁচি। কিন্তু যারা ২৩ বছরের বেশী বাঁচে তাদের সংখ্যা এত কম এবং যারা বাঁচে না, তাদের সংখ্যা এত বেশী যে গড়ে এসে আশাটুকু দাঁড়ায় ঐ মাত্র ২৩ বছরে! অন্য দেশে প্রায় ৬৩ বছর বাঁচতে আশা করে—আর আমাদের ঐ ২৩ বছর।

আমরা আমাদের জীবনগুলোকে যে কি ভাবে বলিদান দিচ্ছি, কেমন করে অসময়ে মেরে ফেল্ছি, তা ভাবলেও দুঃখ হয়। "বলিদান দিচ্ছি" বা "মেরে ফেল্ছি" বললে-হয়ত অনেকের পছন্দ না হ'তে পারে, কিন্তু একটু স্থির ভাবে ভেবে দেখলে বেশ স্পষ্ট মনে হবে যে, সত্যই আমরা "বলি" দিই। যখন হাজারের মধ্যে ১৮০টি বা শতকরা ১৮টি অর্থাৎ প্রায় প্রতি ৬টির মধ্যে একটি শিশুকে আমরা তার বছর না পুরতেই শ্মশানে নিয়ে যাই, তখন একে "বলিদান" বললে দোষ কি? আর ঐ বাকীগুলি যে বছর পার হ'ল ব'লে দীর্ঘায়ু পায় তা নয়। বিপদ শুধু এক বছরের মধ্যেই নয়। তাদের বাকী জীবনে অনেক রোগের সঙ্গে যুদ্ধ করতে হবে—অনেক দুঃখ-কষ্ট, অনশন-অর্দ্ধাশনের ভিতর দিয়ে যেতে হবে। কতক বাঁচবে বটে, কিন্তু অধিকাংশই ধাক্কা সামলাতে না পেরে ধ্বংস হবে।

সমস্ত ভারতবর্ষের হিসাব নিলে শতকরা ১৭ ও শুধু বাংলা দেশের হিসাবে হয় ১৮। কিন্তু এর চেয়ে ভীষণ হ'ল শহরের শিশু-মৃত্যু। কলিকাতার শিশু-মৃত্যুর হিসাব প্রতি বছর রিপোর্টে বাহির হয়; কিন্তু আমাদের কতজন মা-বাপ তা পড়েন তা আমি জানি না, তবে আমি যখন রিপোর্টখানা পড়লাম, তখন খানিকটা অবাক হলাম। কয়েক জন আমেরিকার বন্ধুকে বলাতে তারা প্রথমে বলেছিল "ওটা ছাপার ভুল নয় ত?" যখন আমি কয়েক বছরের রিপোর্ট দেখালাম তখন তারা অগত্যা বিশ্বাস না ক'রে থাকতে পারল না। এই হ'ল কলকাতার রিপোর্ট,—

বৎসর	মোট জনসংখ্যা	মোট ১ বছর বয়সের শিশুমৃত্যু সংখ্যা	শতকরা হিসাব
১৯২৫	১৭,৪০৮	৫,৩৭৭	৩০·৮
১৯২৬	১৫,৫৯০	৫,৪১৬	৩৪·৭
১৯২৭	১৪,১১৫	৪,৫৮০	৩২·৪
১৯২৮	১৮,৫২০	৫,০০১	২৭·০
১৯২৯	১৯,০৮৮	৪,৬৮৪	২৪·৫

এ কয়েক বছর তবুও খুব খারাপ নয়। এর আগে শতকরা ৪০টি পর্য্যন্ত মারা যাওয়ার রিপোর্ট আছে। একটু বিশেষ ক'রে ভাবার দরকার। শতকরা ৪০টি (বা খুব ভাল বছরের সংখ্যা শতকরা ২৫টি) শিশু এক বছর পার না হ'তেই মারা যায়। অর্থাৎ প্রতি ৪টি শিশু জন্মালে একটি যমের হাতে দিতে হবেই! এর চেয়ে "বলিদান" আর কি বেশী খারাপ!

শিশু-মৃত্যুই একমাত্র সমস্যা নয়। এক হিসাবে শিশু-মৃত্যু হয়ত বা যৌবন-মৃত্যুর চেয়ে ভাল ও বাঞ্ছনীয়। কেন-না, শিশু-মৃত্যুর দুঃখ যতই থাকুক, ক্ষতি অপেক্ষাকৃত কম। শিশুকে মানুষ করতে বাপ-মায়ের ও সমাজের খরচ আছে। তাকে খাওয়াতে হবে, পরাতে হবে, হয়ত লেখাপড়াও শেখাতে হবে। এর সবগুলোতেই খরচ আছে। এত সব খরচ ক'রে, তারপর যদি সে উপার্জ্জন করার আগেই মারা যায়, তবে অতগুলো টাকা, অত সময়, অত পরিশ্রম সব বৃথা যাবে, অথচ, শিশুর বেলায় এগুলো হ'তে পারে না। স্নেহ, মমতা কখনও ওজন ক'রে দর করা ভাল দেখায় না, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে কি

তাই নয়? একটু স্থির ভাবে বিচার ক'রে দেখলে বোঝা সহজ হবে।

অথচ শৈশবে মরা বা যৌবনে মরা, বুড়া বয়সে মরার মত স্বাভাবিক নয়। বুড়া হওয়ার আগে মরলেই তাকে অসময়ে মরা বলা যায়। আমাদের দেশের অসময় মৃত্যুর কারণ প্রায় সবগুলিই আমরা চেষ্টা করলে বন্ধ করতে পারি। আগে হয়ত এ-কথা এত জোর ক'রে বলা যেত না। কেন না, তখন আমরা অধিকাংশ রোগের কারণ জানতাম না। আধুনিক আবিষ্কারের ফলে আমরা প্রায় সবগুলি রোগেরই কারণ জানি। তা ছাড়া, জানি যে কেমন ক'রে সে রোগ বন্ধ করা যায়। সুতরাং আমরা জেনেও যদি বন্ধ না করি বা শিশুকে ও যুবককে মরতে দিই, তবে একে "বলিদান" বলাতে দোষ কি?

আমাদের রোগ হয়—আমরা "অকাতরে" ভুগি—আবার ভাবি "সময় হয়েছে" তাই মরি। মরার সময় যে "অসময়ে" অর্থাৎ শৈশবে বা যৌবনে নয় তা শেখার দরকার হয়েছে সব চেয়ে বেশী। রোগ হ'লে চিকিৎসা করতে হবে—কিন্তু তার চেয়ে দরকার বেশী হ'ল যাতে রোগ না হয়। এটি যে খুব বেশী রকম সম্ভব তার প্রমাণের অভাব নাই। আমেরিকা ও ইউরোপ তা অনেকবার প্রমাণ করেছে। ম্যালেরিয়া, টাইফয়েড, প্লেগ, কলেরা ও বসন্ত এর সব কটাই আমাদের দেশের সর্ব্বনাশ করছে, এদের দেশেও যে এগুলো ছিল না, বা এদের সর্ব্বনাশ একদিন করে নি তা আদৌ নয়, কিন্তু এরা যেমন রোগের চিকিৎসা করেছে—তেমনি রোগ যাতে আর না হ'তে পারে তার ব্যবস্থা করেছে। এই হ'ল এদের পাবলিক্ হেল্‌থ-এর বিশেষত্ব। এখন অনেক সময় মাথা খুঁড়েও এদেশে একটা বসন্ত রোগী দেখা যায় না। এই কলম্বিয়া ইউনিভার্সিটিতে দেখানর জন্য অনেক চেষ্টা করেও আমি এক সময় একটি ম্যালেরিয়া রোগীর রক্ত পাই নি। কলম্বিয়ার প্রফেসার ডাঃ এমার্সন বলেছিলেন যে তিনি যখন কলেজে পড়েন (১৯০০ সালে) তখন একদিন একটি বসন্ত রোগী তাঁদের হাসপাতালে এসেছিল। ডাক্তার ও ছাত্র সকলেই বইয়ে বসন্ত রোগের কথা পড়েছেন বটে কিন্তু জীবনে কেউ কখনও চোখে দেখেন নাই—তাই তাঁরা সবাই ঠিক করলেন যে, ওটা বসন্ত নয়। ওটা অন্য রোগ তাই ব'লে তাকে ঔষধ দিয়ে বাড়ি যেতে দেন, ফলে, সে আরও কয়েক জনকে বসন্ত দিল। তখন ডাক্তারদের খেয়াল হ'ল সে বসন্ত রোগী! বসন্ত এদেশে এখন দৈবাৎও দেখা যায় না, বললেও চলে। টাইফয়েড, এরও অনেকটা সেই অবস্থা। ম্যালেরিয়া নাই বললে চলে। (যদিও এদেশের দক্ষিণভাগে আছে) এদের চেষ্টায় একে একে সবগুলো রোগই (যা দূর করা সম্ভব অর্থাৎ নিবার্য্য) দূর হয়েছে বা হচ্ছে। আর ভারত কোথায়?

আমার পক্ষে বলা যত সহজ, রোগ বন্ধ করা যে তা আদৌ নয় তা আমি ভুলি নি। টাকা খরচ না করলে জল পরিষ্কার হয় না, এবং জল পরিষ্কার না হ'লে কলেরা টাইফয়েড্ দূর হয় না। অন্যান্য সব রোগের বিষয়েও ঠিক ঐ এক তর্ক করা চলে। টাকা না হ'লে কিছুই হয় না। কিন্তু সে টাকা কোথায়? গভর্ণমেণ্ট কত টাকা খরচ করছেন তা ভাবলে মনে হয় যে, আমরা যে এখনও তেত্রিশ কোটী বেঁচে থাকি সেটা কতকটা আশ্চর্য্যকর। ১৯২৮-২৯ সালের গভর্ণমেণ্টের রিপোর্ট যা দেখলাম তা এখানে দিচ্ছি (From "India in 1929 30," p. 272. Provincial and Central together.)

যত টাকা খরচ হয় তার প্রতি টাকার অনুপাত।
যুদ্ধবিষয়ক—০·২৬
রেলওয়ে—০·১৪
অন্যান্য দফা—০·১০
পুলিস ও জেল—০·১০
ঋণ—০·০৪
সাধারণ শাসনকার্য্য ০·০৬
অসামরিক পূর্ত্তকার্য্য—০·০৬
শিক্ষা—০·০৬
জলসেচন ০·০৩
পেন্সন্ ও ভাতা ০·০৩
জমির খাজনা—০·০২
অরণ্যানী—০·০২
চিকিৎসাবিষয়ক ০·০২
রক্ষা ও পাহারা ০·০১
সাধারণের স্বাস্থ্য ০·০১

গভর্ণমেণ্টের 'পাবলিক্ হেল্‌থের' খরচও অর্দ্ধের সব

নীচে! তবে উপায় কি? সাধারণের ক্ষমতা আছে কি? গড়-পড়তা হিসাব দেখলে সব সময় ঠিক বিচার করা যায় না। দেশে যে অবস্থাপন্ন লোক নেই তা বলা নিতান্ত অন্যায়। ঢের লোক আছেন যাঁরা অনায়াসে টাকা দিয়ে সাধারণের স্বাস্থ্যের জন্য কাজ করতে পারেন। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ আমাদের দেশের লোকের সে প্রবৃত্তি সব সময় দেখা যায় না। বরং বিদেশী গিয়ে দেশের কাজ করছে, তা দেখা যায়। সাধারণ লোকে টাকা খরচ ক'রে তার রোগের চিকিৎসা করতে পারে কি? বা রোগ বন্ধ করবার জন্য এদেশের মত কাজ করতে পারে কি? এটার বিচার করতে হ'লে আমাকে গড়পড়তা আয়ের দিকে তাকাতে হবে। আবার সেই প্রশ্ন—"ভারত কোথায়?" এবার আমার প্রশ্নের জবাব পেলাম লিগ অব নেশান্‌স্-এর রিপোর্টে—

দেশ	জনপ্রতি বাৎসরিক আয়
আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্র	৭২ পাউণ্ড
গ্রেট ব্রিটেন	৫০ "
ফ্রান্স	৩৮ "
জার্ম্মানী	৩০ "
ভারতবর্ষ	৫ পাউণ্ড ১০ শিলিং

এবারও ভারত ফর্দ্দের সব নীচে! এই সামান্য আয়ের টাকা দিয়ে আমরা ম্যালেরিয়ায় কুইনাইন কিনব, না পথ্য কিনব তা জানি নে, কাপড় প'রে লজ্জা নিবারণ ক'রব, কি স্বাস্থ্যের জন্য পয়সা খরচ ক'রব, তা বলা কঠিন। আমাদের সঙ্গে যখন আমেরিকার তুলনা করি তখন মনে হয় "তবে কেন আমরাও করি না?"

আমেরিকা তার জাতীয় আয়ের শতকরা ৪ টাকা হিসাবে ঔষধ, ডাক্তার ও স্বাস্থ্য ইত্যাদির জন্য খরচ করে। অর্থাৎ মোট ৩,৬৫৬,০০০,০০০ ডলার বার্ষিক খরচ অথবা জনপ্রতি ৩০ ডলার। এর মধ্যে ডাক্তার, নার্স, ঔষধ, হাসপাতাল সব আছে। হিসাব ক'রে দেখা হয়েছে যে, এই জনপ্রতি ৩০ ডলারের শতকরা এক অর্থাৎ ৩০ সেণ্ট যায় শুধু পাবলিক্ হেল্‌থের জন্য। এর তুলনায় আমার আবার মনে হচ্ছে—"ভারত কোথায়?"

এ যাবৎ আমি যতবার "ভারত কোথায়?" জিজ্ঞাসা করেছি ততবারই দেখেছি "ভারত সবারই নীচে"—ভারত, পৃথিবীর জনসমাজের বহু দূরে। কিন্তু এক বিষয়ে ভারতকে হয়ত কেউই পিছনে ফেল্‌তে পারবে না—(এবং কেউ চায়ও না হয়ত) সে হচ্ছে মৃত্যু-সংখ্যায়! আমার কাছে সব দেশের মৃত্যুর হার বর্ত্তমানে নেই—যেটুকু আছে তাই দিচ্ছি।

প্রতি হাজার জন সংখ্যায়—

ভারতবর্ষ	৩০·৬
ইংলণ্ড ও ওয়েল্‌স্, ফ্রান্স, বেলজিয়ম্ ও জার্ম্মানী গড়	১৪·৫

এবার ভারত সবার উপরে। আর একটা আছে, যা বোধ হয় আর কোনও দেশে আদৌ নাই। ভারতবর্ষ ১৮৯৫—১৯০০ সালে, অর্থাৎ ৫ বছরে দুর্ভিক্ষে হারায়—৫,০০০,০০০ প্রাণ, আর ১৯১৮ থেকে ১৯১৯ সালে, অর্থাৎ এক বৎসরে, একমাত্র নিবার্য্য রোগে হারায় ৮,৫০০,০০০ প্রাণ, ১৯০০ সালে শুধু কলেরায় মরে—৮০০,০০০ লোক—১৯০৭ সালে শুধু প্লেগে মরে ১,৬০০,০০০ লোক। আরও কত কি ভীষণ ফর্দ্দ দেওয়া যায়। কিন্তু লাভ কি? আমাদের এখন বোঝা-পড়া করার সময় এসেছে, এত প্রাণ বৃথা নষ্ট হবে! আর আমরা থাক্‌ব চুপ ক'রে? মায়েদের শেখাতে হবে কেমন ক'রে শিশু মানুষ করতে হয়। লোকদের শেখাতে হবে কেমন ক'রে স্বাস্থ্য ভাল রাখতে হয়। কেমন ক'রে রোগ নষ্ট করতে হয়। চিকিৎসার পদ্ধতি উল্টে দিতে হবে। নইলে এ জাতির পরিণাম বড় শোচনীয়! যদি অন্য দেশে সম্ভব হ'চ্ছে, তবে আমাদের দেশে কেন হবে না? আমরা কেন চিরদিন সব জাতির নীচে থাক্‌ব? কলেরা, বসন্ত, ম্যালেরিয়া, কালাজ্বর—এর সবগুলিই আমরা বন্ধ করতে পারি। পয়সা খরচ করলে, অনেক কিছু করা যায় সত্য, কিন্তু যতদিন পয়সা খরচ করতে না পারি, ততদিন কেন এমন কিছু করি না, যাতে পয়সা খরচ হয় না অথচ স্বাস্থ্যের উন্নতি হয়? এমন কাজ অনেক আছে। ছোট বড় সকলকেই নিজের ও সমাজের স্বাস্থ্যের জন্য কাজ করতে হবে। তা নইলে এ জাতির মঙ্গল নেই। দেশের দুর্গতির সীমা নেই।

তিনটি অপহৃতা ভুটিয়া মেয়ে

শ্রীহেমচন্দ্র চক্রবর্ত্তী

গত ২৩শে জানুয়ারী নাসির আহম্মদ নামক একজন পেশোয়ারী ফলব্যবসায়ী সিকিম রাজ্যের তিনটি সুন্দরী যুবতী ভুটিয়া মেয়েকে ভুলাইয়া রঙপো হইতে কলিকাতা লইয়া আইসে। নাসির আহম্মদ ঐ মেয়ে তিনটিকে বড়বাজারে এক বাড়ির কোন প্রকোষ্ঠে আবদ্ধ করিয়া রাখে। বঙ্গীয় প্রাদেশিক হিন্দুসভা এই খবর জানিতে পারিয়া মেয়ে তিনটিকে উদ্ধার করেন ও হিন্দু অবলা আশ্রমে আশ্রয়দান করেন। তৎপরে হিন্দুসভার সহকারী সম্পাদক শ্রীযুত অনিলকুমার রায়-চৌধুরী এই অপহৃতা মেয়েদের সম্বন্ধে সিকিম দরবারে তার ও পত্র ব্যবহার করেন। তার এবং চিঠির উত্তরে মহারাজার জেনারেল সেক্রেটারী মিঃ ড্যাড্লে জানান যে, মহারাজা ও মহারাণী হিন্দুসভার এই মহৎ কার্য্যে এবং মেয়ে তিনটি অবলা-আশ্রমে নিরাপদে আছে জানিয়া অতিশয় সন্তুষ্ট হইয়াছেন। ইহার কয়েক দিন পরে আর একখানা চিঠি পাওয়া গেল। তাহাতে মহারাজা মেয়ে তিনটিকে উপযুক্ত লোকসহ সিকিম দরবারে পাঠাইয়া দিবার অভিপ্রায় প্রকাশ করিয়াছেন। তদনুসারে মেয়েদের সিকিম দরবারে পৌঁছাইয়া দিবার ভার হিন্দুসভা আমার উপর অর্পণ করিলেন। ১লা মার্চ্চ রওনা হইবার দিন ধার্য্য হইল।

১লা মার্চ্চ সন্ধ্যার পর আটটায় মেয়ে তিনটি, আমি ও একজন দারোয়ান দার্জ্জিলিং মেলে চাপিলাম। পরদিন সকালে ট্রেন শিলিগুড়ি পৌঁছিল। শিলিগুড়ি হইতে তিস্তাভ্যালি রেলপথের শেষ ষ্টেশন গেলখোলা পর্য্যন্ত পৌঁছিয়া ওখানকার পুলিসের হাতে মেয়েদের ভার দিয়া আমাদের ফিরিবার কথা ছিল। পূর্ব্বদিন সিকিম দরবারে ও গেলখোলা পুলিসে এই মর্ম্মে তার করা হইয়াছিল। মোটর ট্রেনের অনেক আগে যায় বলিয়া মোটরে যাওয়াই যুক্তিযুক্ত মনে করিলাম। ত্রিশ মাইল পাহাড়ী পথ যাইবার জন্য মাত্র সাড়ে আট টাকায় একখানা ভাল গাড়ী রিজার্ভ করিয়া বেলা প্রায় আটটায় গেলখোলা অভিমুখে যাত্রা করা গেল।

দুই ধারে শালবন, তাহারই মাঝখান দিয়া পিচঢালা রাস্তা ধরিয়া আমাদের মোটর দ্রুতবেগে চলিতে লাগিল। ক্ষুধার্ত্ত ব্যাঘ্রের কবল হইতে মুক্ত মৃগশিশুর মতই মেয়েরা আজ বেশ উৎফুল্ল। তাহারা গুন্‌গুন্ করিয়া গান গায়, খিল্ খিল্ করিয়া হাসে, পরস্পরে কথা বলাবলি করে। তাহাদের ভাষা বুঝিলাম না। তবে ভাবে বুঝিলাম ঐ অদূরবর্ত্তী পর্ব্বতরাজির পরপারে কোন একটির গায়ে তাহাদের নির্জ্জন কুটীর, পিতামাতা আত্মীয়স্বজন, বন্ধুবান্ধবের সঙ্গে আর কয়েক ঘণ্টা পরেই মিলিতে পারিবে, শুধু এই ভাবিয়াই তাহারা আজ আনন্দে আত্মহারা। মেয়েদের মধ্যে একজন কিছু কিছু হিন্দী বলিতে পারে। সে আমাকে জিজ্ঞাসা করিল, "বাবু কেত্না দের সে যায়ে গা।" আমি বলিলাম, "দো চার ঘণ্টা দের হো গা।" "আচ্ছা জী" বলিয়া মেয়েটি বেশ আশ্বস্ত হইল। মোটর ইতিমধ্যে সিউবক্ পৌঁছিল। এখান হইতেই পার্ব্বত্যপথ আরম্ভ হইয়াছে, বহু নীচ দিয়া ভয়ানক গর্জ্জনে বনভূমি কম্পিত করিয়া তিস্তা নদী ছুটিয়া চলিয়াছে, বিরাম নাই, বিশ্রাম নাই, যুগ যুগ ধরিয়া অবিরাম গতি, অখণ্ড নিনাদ, শ্রোতা ও দর্শকের প্রাণে এক অপূর্ব্ব ভাবের সঞ্চার করে। চারিদিকে পাহাড়ের গায়ে গায়ে চড়াই উৎরাই পথ অতিক্রম করিয়া বেলা ১১টার সময় গেলখোলা আসিয়া উপস্থিত হইলাম। পূর্ব্ব ব্যবস্থামত আমার ধারণা ছিল এখানকার পুলিসের হাতে মেয়েদের ভার ছাড়িয়া দিয়া ফিরিতে পারিব। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয়, পুলিস ষ্টেশনে ও টেলিগ্রাফ আপিসে খোঁজ করিয়া জানিতে পারিলাম, যে, এ-বিষয়ে সিকিম দরবার বা কলিকাতা হইতে তাঁহারা তখনও কোন সংবাদ

পান নাই। মহা মুস্কিলে পড়িলাম। কি করা যায়? এ-বিষয়ে কিছুকাল চিন্তা করিয়া মেয়েদিগকে গ্যাংটকে পৌছাইয়া দেওয়াই কর্ত্তব্য মনে করিলাম। সিকিম দরবারে এই মর্ম্মে এক টেলিগ্রাম করিয়া আমরা মধ্যাহ্ন ভোজন সারিয়া লইলাম।

বেলা ১২টার সময় গ্যাংটকের দিকে রওয়ানা হইব। আগের মোটরওয়ালার সঙ্গেই ৩৫৲ টাকায় গ্যাংটক পৌছাইয়া দিবার বন্দোবস্ত করিলাম। তিস্তা নদীর উপর ছোট সেতুটি অধিক ভার বহন করিতে পারে না বলিয়া আমাদের খালি মোটর আগে পার হইল। বার্ড্ কোম্পানী আর একটি বৃহৎ সেতু প্রস্তুত করিতেছেন, ইহার কার্য্য শেষ হইলে যাত্রীদের এ অসুবিধা আর ভোগ করিতে হইবে না বলিয়া আশা করা যায়। তিস্তার ওপার হইতে দুইটি রাস্তা, একটি কালিম্পং অপরটি গ্যাংটকের দিকে গিয়াছে। আমাদের মোটর গ্যাংটকের পথে চলিতে লাগিল। কি ভয়ানক বিপৎসঙ্কুল পথ! কাশ্মীরে চারি শত মাইল পার্ব্বত্য পথ মোটরে ভ্রমণ করিতে আমার মোটেই ভয় হয় নাই, কিন্তু এই গ্যাংটকের পথে আমাকে অতি ভয়ে ভয়ে চলিতে হইয়াছিল। বড় বড় চড়াই-উৎরাই ত আছেই। তাহা ছাড়া অনেক স্থানে একটি মোটর কোন প্রকারে যাইতে পারে। আমরা যখন রঙ্গপো আসিয়া পৌছিলাম, তখন বেলা প্রায় আড়াইটা। এখান হইতেই সিকিম রাজ্য আরম্ভ হইয়াছে। এই স্থানটি কমলালেবু ও বড় এলাচের ব্যবসায়ের জন্য প্রসিদ্ধ। আমরা পৌছিলে পর সিকিম পুলিস আসিয়া আমাদিগকে জানাইল যে, তাহারা দরবার হইতে আমাদের আগমনবার্ত্তা সম্বলিত একখানা টেলিগ্রাম পাইয়াছে। যদি আমাদের সুবিধার জন্য লোক বা অন্য কিছু সাহায্য দরকার হয়, তবে তাহারা তাহা করিতে প্রস্তুত। আমাদের কোন কিছুরই প্রয়োজন না থাকায় তাঁহাদের সঙ্গে কিছুক্ষণ আলাপ করিয়া পুনরায় রওয়ানা হইলাম। রাস্তার ধারে ধারে পার্ব্বত্য ঝরণা, নাসপাতি, কমলালেবু ও অন্যান্য ফল-ফুলের বাগান; পাহাড়ের গায়ে গায়ে ছোট ছোট কুটীর, শস্যক্ষেত্র; পাথরের ফাঁকে ফাঁকে পাহাড়ী ফুলের গাছ; দেবশিশুর মত সৌম্য, সরল, সুন্দর, গোলাপী রঙের বালক-বালিকার গো-চারণ—সে এক অপূর্ব্ব দৃশ্য!

বেলা যখন ৪টা তখন দূর হইতে গ্যাংটক শহর দেখা যাইতে লাগিল। মেয়েদের মধ্যে আনন্দ ও লজ্জার এক অপূর্ব্ব সমাবেশ। আনন্দের আতিশয্যে গাড়ী হইতে

সিকিম বৌদ্ধমন্দিরে ভুটিয়া যাত্রীদল

গলা বাহির করিয়া দেখিতে লাগিল—আর কত দূর। কিন্তু লজ্জায় গম্ভীর। পুরুষধর্ষিতা মেয়ের লজ্জা ও কলঙ্ক সর্ব্বদেশে, সর্ব্বকালে। দেখিতে দেখিতে মোটর গ্যাংটক শহরে উপস্থিত হইল। তখন বেলা প্রায় ৫টা। জেনারেল সেক্রেটারী মিঃ ড্যাডলে সাহেবের বাংলোর নিকট গাড়ী

হইতে অবতরণ করিলাম। মিঃ ও মিসেস্ ড্যাডলে উভয়েই খবর পাইয়া বাহিরে আসিলেন। বৃদ্ধা খ্রীষ্টিয়ান মহিলা মিসেস ড্যাডলে সহর্ষে বলিয়া উঠিলেন, "ভগবান ইহাদিগকে রক্ষা করিলেন।" তাঁহাদের কি আনন্দ! উভয়েই ছুটিয়া

শ্রীযুত এলে মহোদয়ের সৌজন্যে
লেখক, মিঃ ড্যাড্‌লে, সিকিম পুলিস এবং অপহৃতা তিনটি মেয়ে

আসিয়া আমাকে করমর্দ্দনে ও সাদরসম্ভাষণে আপ্যায়িত করিলেন। মেয়েদের উপব কোন অত্যাচার করা হইয়াছে কিনা মিঃ ড্যাডলে এই প্রশ্ন করায় আমি বলিলাম, এরূপ আশঙ্কা করিবার কোনই কারণ নাই। সাহেব স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলিলেন। মিসেস্ ড্যাডলে বলিলেন, সন্ধ্যা আগতপ্রায়, ইহারা পথক্লান্ত, আর অধিকক্ষণ কথা না বলিয়া ইহাদের থাকা-খাওয়ার বন্দোবস্ত করা উচিত। মিঃ ড্যাডলে ডাক-বাংলোর কথা উত্থাপন করিয়া বলিলেন, যে, সেখানে নিঃসঙ্গ জীবন তোমার ভাল লাগিবে না, কোন বাঙালী ভদ্রলোকের বাড়িতে থাকিলে তুমি বেশ আরামে থাকিবে। গ্যাংটকে মাত্র তিন জন বাঙালী,—শ্রীযুক্ত অবনীমোহন তরফদার, বাড়ি কোন্নগর, অশ্বিনী কুমার সরকার, বাড়ি মুর্শিদাবাদ এবং রমেশচন্দ্র সেন, বাড়ি ঢাকা জেলায়। ইহারা তিনজনই গ্যাংটক এস, টি, এন হাইস্কুলের শিক্ষক। মেয়েদিগকে পুলিসের হেফাজতে ছাড়িয়া দেওয়া হইল। আর আমরা শ্রীযুত অবনীমোহন তরফদার মহাশয়ের অতিথি হইলাম। যে কয়দিন গ্যাংটকে ছিলাম শ্রীযুত অবনীবাবুর বাড়িতে খুব আরামেই কাটাইয়াছিলাম।

তারপর দিন ৩রা মার্চ্চ সকালে স্নান আহার করিয়া মিঃ ড্যাডলের সঙ্গে দেখা করিলাম। মহারাজার সঙ্গে দেখা করিবার জন্য তিনি আমাকে সঙ্গে লইয়া চলিলেন। মেয়ে তিনটিকেও দরবারে উপস্থিত করিবার জন্য পুলিসকে আদেশ করা হইল। রাজপ্রাসাদে যাইবার পথে এখানকার হাইস্কুল, চীফকোর্ট, ক্লাব, রাজকীয় বৌদ্ধমন্দির প্রভৃতি বড় বড় প্রতিষ্ঠানগুলি দেখিয়া লইলাম। রাজকীয় বৌদ্ধ-মন্দিরে রাজা এবং রাজ-পরিবারের সকলে উপাসনা করিয়া

সিউবক। তিস্তাভ্যালি রেলপথে এই ষ্টেশন হইতেই পাহাড়ী রাস্তা আরম্ভ হইয়াছে

থাকেন। বলা বাহুল্য যে, সিকিমের মহারাজ বৌদ্ধ-ধর্ম্মাবলম্বী। মন্দিরের অভ্যন্তরে প্রবেশ করিয়া দেখিলাম ধ্যানসমাহিত প্রকাণ্ড বুদ্ধমূর্ত্তি, দুই পার্শ্বে কয়েকটি দেবী-মূর্ত্তি ও শঙ্কর দেবের মূর্ত্তি। এক স্থানে একটি চতুর্ভুজ মূর্ত্তি দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, "এ কার ?" একজন লামা উত্তর দিলেন,"ইহা বিষ্ণুদেবের মূর্ত্তি" ; শুনিয়া খুব আনন্দিত হইলাম শুধু এই বলিয়া, যে, হিন্দুরা বুদ্ধদেবকে দশ অবতারের এক অবতার বলিয়া মানেন, পক্ষান্তরে বৌদ্ধরাও হিন্দুর দেবতাকে বুদ্ধদেবের সঙ্গে একাসনে বসাইয়াই অর্চ্চনা করেন। দেওয়ালের গায়ে বুদ্ধদেবের জীবনের অনেক ঘটনা চিত্রিত করা হইয়াছে। রঙীন চিত্রগুলি শিল্পীর এক অপূর্ব্ব সৃষ্টি। মিঃ ড্যাডলে বলিলেন, চিত্রাঙ্কনে যে রঙের প্রয়োজন হইয়াছে তাহা দেশীয় গাছগাছড়া হইতে উৎপন্ন, বিদেশী রং নহে। শুনিয়া আহ্লাদিত হইলাম, যে, এত বিভিন্ন রকমের রং প্রস্তুত করিতে ইহারা জানে। ইহা ছাড়া শতাধিক বৌদ্ধমন্দির সিকিম রাজ্যে আছে। সর্ব্বত্যাগী ব্রহ্মচারী লামারা নির্ব্বাণের সন্ধানে ঐগুলিতে কঠোর সাধনায় মগ্ন। এই রাজকীয় বৌদ্ধমন্দিরের উপরে একটি পাহাড়ে অবতারী লামার মন্দির। অবতারী লামা বর্ত্তমান মহারাজার ভাই। তিনি সন্ন্যাস অবলম্বন করিয়া লামা হইয়াছেন। সিকিমের রাজ-পরিবারে ও অন্যান্য অভিজাত বৌদ্ধ-পরিবারে এইরূপ নিয়ম প্রচলিত আছে, যে, পরিবারের একজনকে লামা হইতে হইবে। যিনি লামা হইবেন, তাঁহাকে শৈশব হইতেই সেইরূপ ভাবে গঠন করিয়া তোলা হয়।

আমরা মন্দির দেখা শেষ করিয়া রাজপ্রাসাদে উপস্থিত হইলাম। মিঃ ড্যাডলে আমাকে সঙ্গে লইয়া গিয়া মহারাজার নিকট আমার পরিচয় বলিলেন। আমি সসম্মানে কিছু নত হইয়া তাঁহাকে অভিবাদন করিলাম। মহারাজ উচ্চশিক্ষিত, আধুনিক রুচিসম্পন্ন, আজমেঢ় প্রিন্সেজ কলেজে অধ্যয়ন করিয়াছেন, বয়স প্রায় পঁয়ত্রিশ। মেয়ে তিনটিকে কি ভাবে উদ্ধার করা হইল এই বিষয়ে মহারাজা ইংরেজীতে প্রশ্ন করায় আমি আনুপূর্ব্বিক সমস্ত ঘটনা খুলিয়া বলি। তারপর হিন্দু মহাসভা এবং হিন্দু অবলা-আশ্রম সম্বন্ধে আমাদের মধ্যে কথাবার্ত্তা হয়। হিন্দু মহাসভা সম্বন্ধে আমি বলি, যে, ইহা সমগ্র ভারতের হিন্দুদের একটি প্রতিনিধিমূলক প্রতিষ্ঠান। হিন্দু মহাসভা হিন্দুর যে সংজ্ঞা দিয়াছেন তাহাতে বলা

লাচাম। গ্যাংটকের নিকট একটি জলপ্রপাত

হইয়াছে, যে, ভারতবর্ষে জাত ধর্ম্মে বিশ্বাসী মাত্রই হিন্দু। এই সংজ্ঞা অনুসারে সনাতনী, ব্রাহ্ম, আর্য্যসমাজী জৈন, শিখ, বৌদ্ধ—সকলেই হিন্দু বলিয়া অভিহিত ভারত ও ভারতের বাহিরে সমস্ত হিন্দু জাতির মং সামাজিক, নৈতিক, রাষ্ট্রীক ও আধ্যাত্মিক সকল প্রকা উন্নতিবিধানে হিন্দুসভা যত্নবান। যখন সিকিম রাজ্যে তিনটি বিপন্ন বৌদ্ধ বালিকার খবর হিন্দুসভায় পৌঁছি তখন তাহাদের বিপদকে নিজের বিপদ মনে করিয়া হিন্দুসভা তাহাদিগকে উদ্ধার করিতে ছুটিয়া গিয়াছিলেন

এই সকল কথা শুনিয়া মহারাজা খুব উল্লসিত হইয়া বলিলেন, "হিন্দু মহাসভা খুব মহান উদ্দেশ্য লইয়াই কর্ম্ম-ক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়াছেন।" অবলা-আশ্রম সম্বন্ধে জানিতে চাহিলে আমি বলিলাম, যে, এই আশ্রম ধর্ষিতা,

সিকিম রাজকুমারীর বিবাহে শোভাযাত্রা

প্রতারিতা, পরিত্যক্তা হিন্দু নারীর জন্য স্থাপিত হইয়াছে। বর্ত্তমানে প্রায় দেড়শত মহিলা ও ষাট-সত্তরটি শিশু এই আশ্রমে আছে। আশ্রম ইহাদের থাকা খাওয়া ও পোষাক-পরিচ্ছদের সকল ব্যয়ই বহন করেন। সাধারণ লেখাপড়া ব্যতীত নানা প্রকার শিল্পশিক্ষা দ্বারা আশ্রম-বাসিনীদিগকে স্বাবলম্বী করিয়া তুলিবার চেষ্টা করা হয়। সর্ব্বসাধারণের দানেই আশ্রম চলে। অবলা-আশ্রমের কার্য্যবিবরণী শুনিয়াও তিনি খুব সন্তোষ প্রকাশ করিলেন। তারপর বাহিরের লোক আসিয়া সিকিম ও তৎপার্শ্ববর্ত্তী অঞ্চলের পাহাড়ী মেয়েদের ভুলাইয়া লইয়া গিয়া যে পাপ ব্যবসায়ে নিযুক্ত করে এই সম্বন্ধে কিছুক্ষণ আলাপ হইল। এই বিষয়ে খুব সতর্ক দৃষ্টি রাখিবেন বলিয়া তিনি আমাকে আশ্বাস দিলেন।

আর বিশেষ কোন কথা হয় নাই। বিদায়-অভিবাদন করিয়া বাহিরে আসিলাম। তিনিও আমাদের সঙ্গে আসিলেন। মেয়েরা বাহিরে অপেক্ষা করিতেছিল; মহারাজকে দেখিয়া নতজানু হইয়া ভূমিতে তিনবার প্রণাম করিল, তারপর ভয়ে ও লজ্জায় হেঁট মাথায় দাঁড়াইয়া রহিল। মহারাজ তাহাদিগকে লক্ষ্য করিয়া মৃদু ভর্ৎসনা করিলেন বলিয়া মনে হইল। পরে উহাদিগকে উহাদের পিতামাতার নিকট পাঠাইয়া দিবার হুকুম দিলেন। ইহার পর রাজপ্রাসাদ হইতে আমরা চলিয়া আসি।

গ্যাংটকে আরও দুই-তিন দিন থাকিয়া শহর, বাজার ও অন্যান্য দ্রষ্টব্য স্থান দেখিয়া লইলাম। সিকিম দরবার আমাদের যাতায়াতের সমস্ত ব্যয় বহন করিবেন বলিয়াছিলেন। আমি একটি বিল করিয়া দরবারে পাঠাই। দরবার ষ্টেট ব্যাঙ্ককে আমার বিল পরিশোধ করিবার জন্য হুকুম দেন। ব্যাঙ্ক হইতে বিলের টাকা আদায় করিয়া ৫ই মার্চ্চ গ্যাংটক হইতে রওয়ানা হইয়া কালিম্পং ও দার্জ্জিলিং হইয়া ১১ই মার্চ্চ কলিকাতা প্রত্যাবর্ত্তন করি। এখন সিকিমের ভৌগোলিক, রাজনৈতিক ও সামাজিক বিষয়ে দুই চারিটি কথা এবং কালিম্পং ও দার্জ্জিলিং অঞ্চলে পাহাড়ী মেয়েদের লইয়া যে ভয়ানক পাপ ব্যবসা চলিতেছে এ-সম্বন্ধে কিছু লিখিয়া এই ভ্রমণকাহিনী শেষ করিব।

সিকিম একটি দেশী রাজ্য। ইহার সীমানা—উত্তর এবং উত্তর-পূর্ব্বে তিব্বত। পূর্ব্ব-দক্ষিণে ভুটান। দক্ষিণে দার্জ্জিলিং। পশ্চিমে নেপাল। পরিমাপ ২,৮১৮ বর্গ মাইল। সমস্ত সিকিমে ৩৬৭টি মৌজায় ১,০৯,৮০৮ লোক বাস করে। তন্মধ্যে মুসলমান ১০৪ জন, হিন্দু ৪৭,০৭৪ জন, বৌদ্ধ ৩৫,৪১২ জন, খ্রীষ্টিয়ান ২৭৬ জন, অন্যান্য (tribal) ২৯,৯৪০ জন, জৈন ২ জন। মোট শিক্ষিতের সংখ্যা ৩,২৭১ জন, তন্মধ্যে পুরুষ ৩,১২১ জন, নারী ১৫০ জন। ইংরেজী ভাষায় শিক্ষিত মোট ২৭৯, পুরুষ ২৬৭, নারী ১২ জন।

সিকিমে শবযাত্রা

সিকিমের বর্ত্তমান শাসনকর্ত্তার নাম মহারাজা স্যর টাসি নামগ্যাল, কে-সি-আই-ই। তিনি পলিটিক্যাল অফিসার,ষ্টেট কাউন্সিল এবং চার জন সেক্রেটারীর সাহায্যে রাজকার্য্য পরিচালনা করিয়া থাকেন। বর্ত্তমান সিকিম বেশ দ্রুত উন্নতির দিকে চলিয়াছে দেখিলাম। আরণ্য, বিচার, রাজস্ব, পূর্ত্ত প্রভৃতি সমস্ত বিভাগে বেশ উন্নতি পরিলক্ষিত হয়। শিক্ষা-বিভাগেও সিকিম পশ্চাৎপদ নয়। গ্যাংটকে ছেলেদের জন্ম একটি হাই স্কুল এবং স্কটীশ মিশন-পরিচালিত মেয়েদের জন্ম আর একটি স্কুল আছে। ইহার প্রধান শিক্ষয়িত্রী কুমারী ধনমায়া মুখীয়া। ইহা ছাড়া ডুগা, লাচেন, লাচুং, রামটেক এই চারটি গ্রামে চারটি শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান আছে। সিকিমের প্রধান ব্যবসায়ের জিনিষ কমলালেবু, বড় এলাচ ও পশমের জিনিষ। অধিকাংশ ব্যবসায় মাড়োয়ারীর হাতে। এখান হইতে ব্যবসায়ীরা তিব্বত ও চীনের সঙ্গে ব্যবসা করিয়া থাকেন। তুষারাবৃত দুর্গম পার্ব্বত্য পথে পণ্য বহন করিতে একমাত্র খচ্চরই (মিউল) সমর্থ। অন্ত কোন যান বা প্রাণী পণ্যসহ যাতায়াত করিতে পারে না। গ্যাংটক বাজারে একজন চীনদেশীয় যুবক ব্যবসায়ীর সঙ্গে আলাপ হইল। তাঁহার বাড়ি মাঞ্চুরিয়া। ইংরেজী, পাহাড়ী, হিন্দী ও চীনা ভাষায় বেশ অভিজ্ঞ। তিনি সিকিম, তিব্বত ও চীনে ব্যবসায় করিয়া থাকেন। তিনি বলিলেন, বছর বছর শত শত বৌদ্ধযাত্রী চীন হইতে তিব্বতে ও সিকিমের পথে ভারতবর্ষে তীর্থ করিতে যান। মাঞ্চুরিয়া হইতে ভারতবর্ষ পৌছিতে ছয় মাস সময় লাগে।

সিকিমের প্রাকৃতিক দৃশ্য বেশ মনোরম। কোথাও বা পার্ব্বত্য নদী ভীষণ গর্জ্জনে পর্ব্বতভূমি প্রকম্পিত করিয়া দ্রুতবেগে ছুটিয়া চলিয়াছে, কোথাও ঝরণার জলের মৃদু আস্ফালন, কল কল সুমধুর ধ্বনি, পাখীর সুমিষ্ট গান, পাহাড়ী ফুলের বাগান—বাগানের মালী নাই বটে, কিন্তু যুগ যুগ ধরিয়া বাগান তার মালিকের পূজায় ফুল সরবরাহ করিয়া আসিতেছে। অদূরে ঐ অভ্রংলিহ পর্ব্বতমালা চিরশুভ্র, তুষারময়, স্তব্ধ, গম্ভীর, যেন অনাদিকাল ধরিয়া সমাধিতে মগ্ন, নাম তাহার কাঞ্চনজঙ্ঘা।

গ্যাংটক আধুনিক শহর হিসাবেই গড়িয়া উঠিতেছে। মিউনিসিপালিটি, জলের কল, বৈদ্যুতিক আলো, হাসপাতাল, পরিষ্কার ও প্রশস্ত রাস্তাঘাট, রেডিও, ফোন—কিছুরই অভাব নাই।

আমি ফিরিবার পথে রঙপো, কালিম্পং, দার্জিলিং

প্রভৃতি স্থানে পাহাড়ী মেয়েদের পাপ ব্যবসায় সংক্রান্ত বিষয়ে অনুসন্ধান করিয়া যাহা জানিতে পারিলাম তাহা অত্যন্ত ভয়াবহ। পাহাড়ী মেয়েরা স্বভাবসরল, সুন্দরী, স্বাধীন, কর্ম্মপ্রবণা। তাহাদের মধ্যে কোন প্রকার অবগুণ্ঠন বা অবরোধপ্রথা নাই। নানা কার্য্যব্যাপদেশে তাহাদিগকে পুরুষের সঙ্গে মেলামেশা করিতে হয়। এই অবস্থার সুযোগ লইয়া বৃটিশ-ভারত এবং অন্যান্য স্থান হইতে দুষ্ট প্রকৃতির পুরুষেরা পাহাড়ী মেয়েদের সঙ্গে মেলামেশা করে ও নানা প্রলোভনে ভুলাইয়া উহাদিগকে বৃটিশ-ভারতে লইয়া আসে এবং পাপ ব্যবসায়ে নিযুক্ত করে। আমি বিশ্বস্ত সূত্রে অবগত হইয়াছি যে, কাশী ও লক্ষ্ণৌ অঞ্চল হইতে বৃদ্ধা বেশ্যারা বছর বছর পাহাড় অঞ্চলে যায় এবং অর্থ ও নানা কৌশলে শত শত বালিকার সর্ব্বনাশসাধন করিয়া থাকে। মেয়ে একটু সুন্দরী হইলেই সাহেবদের নজরে পড়ে। তাহারা উহাদিগকে আয়ারূপে গ্রহণ করিয়া গোপনে রক্ষিতার মতই ব্যবহার করে। কালিম্পঙে একটি হোমেই ৯০০ শত বালক-বালিকা আছে। তাহাদের অধিকাংশই পাহাড়ী আয়ার জারজ সন্তান। শিলিগুড়ি শহরে পঞ্চাশ-ষাটটি পাহাড়ী মেয়ে মুসলমানদের রক্ষিতারূপে বাস করে। এই রকম কত কি ঘটনা দৈনন্দিন ঘটিতেছে।

এখন আমি হিন্দু নেতা ও নারী-প্রগতির পক্ষপাতী নরনারী যাঁহারা আছেন, তাঁহাদিগকে একটা কথা স্পষ্ট করিয়া বলিতে চাই। এই যে হিন্দু নারীর জীবন লইয়া ছিনিমিনি খেলা—তাহাদের সতীত্ব ও সম্মানকে পদদলিত করিয়া পিশাচের দল কর্ত্তৃক হিন্দুত্ব ও নারীত্বের অঙ্গে কলঙ্কের মসীলেপন এই মহাপাপ, এই দুষ্কার্য্যের গতি রোধ করা যদি না যায় তবে হিন্দুত্ব ও নারী-প্রগতির গৌরব করা বৃথা। এক মিস্ এলিসের করুণ আর্ত্তনাদে সমগ্র বৃটিশ সাম্রাজ্য কাঁপিয়া উঠিয়াছিল। আজ আমাদেরই ঘরের পাশে সহস্র সহস্র মিস এলিসের ক্রন্দন-রোলে ঘুমন্ত হিন্দু কি জাগিবে না?

শৃঙ্খল

শ্রীসুধীরকুমার চৌধুরী

অভাবগুলিও অজয়ের মনের কাছে ক্রমে আব্ছায়া হইয়া আসে। অভাবও আছে, অভাবের বেদনাও আছে, কিন্তু সে-বেদনা যেন তাহার নয়। যেন আর কাহারও।

গা-সহা হইবার আগেই কোনও কিছু আর তাহার গায়ে লাগে না। দূর ভবিষ্য তাহার জন্য কোন্ ইন্দ্রের ঐশ্বর্য্য বহন করিতেছে, সেইখানে তাহার দৃষ্টি পড়িয়া থাকে, বর্ত্তমানের রিক্ত নিরাভরণ মূর্ত্তি চোখ চাহিয়াও আর দেখিতে পায় না। সুভদ্রের আশ্রয়ে দুইবেলা দুইটি খাইতে পায়, সমস্ত দিনরাত চারিটি দেওয়ালের আওতায় মাথা গুঁজিয়া পড়িয়া থাকে। পারতপক্ষে বাহির সে বড় একটা হয় না। আগে লুকাইয়া চাকুরির চেষ্টা যাও বা একটু আধটু করিত, পণ্ডশ্রম বুঝিতে পারিয়া তাহাও এখন ছাড়িয়া দিয়াছে। মনকে বুঝাইয়াছে চাকুরির সময় এ নয়। দিন ত কাটিয়া যাইতেছে, কেমন করিয়া কাটিতেছে ঐন্দ্রিলা তাহা জানিতে পাইতেছে না, আসলে ইহাই তাহার অতিবড় সান্ত্বনা।

সান্ত্বনা পাইতেছে না সুভদ্র। সর্ব্বত্র ধার জমিতেছে। কেমন করিয়া সেই ধার শোধ হইবে সে ভাবিয়া পাইতেছে না। নিজের অভাব অসুবিধা লইয়া কাহারও কাছে অভিযোগ জানান তাহার স্বভাব নহে। অজয়কে কিছুই সে বলে নাই। অভাব যখন ছিল না, বিমানকে মাঝে মাঝে তাড়া দিয়া খরচপত্র বিষয়ে সাবধান হইতে বলিত। পাছে এখনকার অবস্থায় সেই জিনিষটিকেই সুভদ্রের স্বার্থবুদ্ধি-প্রণোদিত মনে করিয়া বিমান ক্ষুব্ধ হয়, সেই ভয়ে তাহাকেও কিছু আর সে বলিতে পাইতেছে না। ভিষকবৃত্তি হইতে কোনওদিনই বিশেষ-কিছু সে পাইত না, সম্প্রতি ক্লাবের অভিনয়ের আয়োজন লইয়া এত বিব্রত হইয়াছে যে দুইবেলা পুরাতন ভৃত্য পাঁচকড়ির পাঁচনের ব্যবস্থা ছাড়া আর-কিছু করিবার বা ভাবিবার পর্য্যন্ত তাহার সময় নাই। অথচ তিন বন্ধুর সংসার-যাত্রার সমস্ত ভাবনা একলা সুভদ্রই ভাবিবে এমনই একটা নিয়ম নিজে হইতেই কি কারণে দাঁড়াইয়া গিয়াছে এবং সে-নিয়মটাকে আর-সকলের অপেক্ষা সুভদ্রই মান্য করিয়া চলে বেশী।

মধ্যবিত্ত বাঙালীর সংসার-যাত্রার বিপদ্ এইখানে যে প্রাণপাত করিয়া কৃচ্ছ্রতা করিলেও ব্যয়সঙ্কোচ যাহা হয় সেটা চট্ করিয়া চোখে পড়ে না। কিছুদিন হইতে খুবই কষাকষি করিয়া চলিতেছে, কিন্তু কোনওদিক্ দিয়াই নিরুপায় অবস্থাটার কিছু সমাধান তাহাতে হইতেছে না। সম্প্রতি তিনমাসের বাড়ীভাড়া বাকী পড়াতে বাড়ীওয়ালার দারোয়ান আসিয়া শাসাইয়া গিয়াছে, অবিলম্বে ভাড়ার টাকা জোগাড় না হইলে হয়ত অপমানের আর শেষ থাকিবে না। কথাটা অজয় এবং বিমান দুজনেরই নিকট হইতে সে লুকাইয়াছিল, কিন্তু বিমানের সঙ্গে পারিবার জো নাই। হঠাৎ সেইদিনই বৈকালিক সাজসজ্জা সমাধা করিয়া রোল্ড গোল্ড বাঁধানো ছড়িটি হাতে করিয়া আসিয়া বলিল, "তোমার কাছে পাঁচটা টাকা নিশ্চয়ই হবে না সুভদ্র?"

একটু ম্লান হাসিয়া সুভদ্র কহিল, "না।"

বিমান কহিল, "কথাটা স্বীকার করতে এত লজ্জিত হবার কিছু কারণ দেখতে পাই না। বাপের দেওয়া টাকা থাকলেই সেটা এমন আর কি গৌরবের বিষয় হত?"

সুভদ্র কহিল, "ব্যাপারটা নিয়ে academic আলোচনার উৎসাহ তোমার যখন রয়েছে, তখন টাকার দরকারটা এমন কিছু মারাত্মক নয় তোমার।"

বিমান লাঠির হাণ্ডলটাকে নিজের গলায় বাধাইয়া টানিতে টানিতে কহিল, "তা ত নয়, কিন্তু তোমার অবস্থা ভেবে দুঃখ হচ্ছে। পাঁচটা মোটে টাকা, তোমার প্রাণের বন্ধু আমি, চাইতে এলাম দিতে পারলে না। এরপর তোমার গতি কি হবে?"

সুভদ্র আবারও একটু ম্লান হাসি মুখে আনিয়া মৃদুস্বরে কহিল, "চিরকালই কি আর এই রকম করে কাটবে? গতি কিছু একটা হবেই।"

বিমান কহিল, "ছাই হবে। এদেশে গতিমাত্রেই ত অধোগতি। হয় ভিক্ষাবৃত্তি, নয় উঞ্ছবৃত্তি। কি করবে ঠিক করেছ? বাপের কাছে ইনিয়ে-বিনিয়ে চিঠি লিখবে, না গাঁটকাটার দলে ভিড়বে?"

সুভদ্র কহিল, "মাঝামাঝি পথ কিছু নেই নাকি?"

বিমান কহিল, "দেখ খুঁজে, আমি সম্প্রতি নিজের পথ দেখছি।"

ছড়িটা ঘুরাইতে ঘুরাইতে তর তর করিয়া সিঁড়ি নামিয়া পথে বাহির হইয়া আসিল। এক মুহূর্ত্ত থমকিয়া দাঁড়াইয়া মনে মনে কহিল, 'না, এই লক্ষ্মীছাড়া দেশে সাধ্য কি যে চরিত্র ঠিক রেখে পথ চলব? বাড়ীসুদ্ধ মানুষ না খেতে পেয়ে মরবে, ঠায় দাঁড়িয়ে তা ত আর দেখা যায় না? পকেটে দুটো টাকা যদি থাকত, কোথাও একপাত্র খেয়ে নিয়ে অন্ততঃ আজকের মত ভুলে থাকতে পারতাম। তারও যে জো নেই ছাই।'

শ্যামবাজারে একটা এঁদোগলির মাথায় প্রাসাদের মত বড় দুতলা বাড়ী। রাস্তার উপরেই একতলার বারান্দা, বড় বড় থাম আর ঝিলমিলি, দুতলাতেও তাহাই। দুই তলা মিলাইয়া এখনকার দিনের যে-কোনও চার-তলা বাড়ীর সমান উঁচু। ভিতর-বারান্দার মার্ব্বেলের মেজেতে লাঠিটাকে ঠুকিয়া চকমিলান উঠানের চার পাশটাকে একবার দেখিয়া লইয়া বিমান কহিল, 'কি বাড়ীই বানিয়েছিল কর্ত্তারা, ডাক ছেড়ে কাঁদতে ইচ্ছে করে। এই ত সব চেহারা, এই ত সব বীরত্ব, দেয়ালের বহর দেখলে মনে হয়, দুদিন বাদেই মানসিংহের ফৌজের সঙ্গে লড়াই বাধবে, তারই ব্যবস্থা হয়েছে। সাধে কি বাড়ী ছেড়ে পালিয়েছি?'

একতলার প্রায়ান্ধকার বৈঠকখানায় তাকিয়া হেলান দিয়া একাকী এক স্থূলকায় প্রৌঢ় আলবোলায় তামাকু সেবন করিতেছিলেন, দরজায় বিমানের ছায়া পড়িতেই একবার বড় বড় লোহিতাভ চোখ-দুইটি তুলিয়া চাহিয়া তৎক্ষণাৎ আবার আলবোলায় মনোনিবেশ করিলেন।

অপরিসর অন্ধকার একসার সিঁড়ি বাহিয়া বিমান উপরে উঠিয়া গেল। চিকঢাকা দুতলার বারান্দায় তাহার বধূঠাকুরাণী শাশুড়ীর কেশরচনায় ব্যাপৃত ছিলেন, দেবরকে দেখিয়া দাঁতে ঠোঁট চাপিয়া মৃদু হাস্য করিলেন। মা বলিলেন, "ওঘর থেকে মোড়াটা এনে দাও বৌমা।"

"না, না, বৌদি, তুমি বোসো," বলিতে বলিতে বিমান মায়ের পায়ের কাছে মাটিতে বসিয়া পড়িল। চাপাগলায় কহিল, "কর্ত্তার মেজাজ আজ আছে কেমন?"

মা কহিলেন, "তোর সে খবরে কাজ কি? বেশ ত নিজের পথ বেছে নিয়েছিস্, নিজেকেই নিয়ে থাক্ না।"

বিমান কহিল, "কর্ত্তার যেমনই হোক, তোমার মেজাজটা আজ খুব ভালো নেই, তা বুঝতেই পারছি। নিজেকে নিয়ে থাক্‌তেই যদি পারব, তাহলে আর এই ভরসন্ধ্যেয় ছুট্‌তে ছুট্‌তে এসেছি কেন তোমার কাছে?"

মা কহিলেন, "এসে ত মাথাই কিনেছ।"

বিমান কহিল, "তাহলে ফিরেই যাই, কি বল?"

মা কহিলেন, "অত ঢঙে আর কাজ নেই, দুমাসে ছমাসে একবার আস্‌বেন, তা আবার এসেই ফিরে চলেছেন ছেলে। তোর বৌদি আজ নারকেল-নাড়ু করেছে, আর পুলির পায়েস, এনে দেবে'খন, ব'সে খা। তোর দাদাও এসে পড়ল ব'লে। তারপরে একেবারে রাত্রের খাওয়া খেয়ে যাস্।"

বিমান কহিল, "ওরে বাস্‌রে, তা কি পারি। আমার বাড়ীতে সব্বাই যে উপোষ ক'রে থাক্‌বে তাহলে। আমি ফিরে গেলে তবে বাড়ীতে হাঁড়ি চড়বে।"

মা কহিলেন, "তোর আবার বাড়ী কিরে লক্ষ্মীছাড়া, রাজ্যের ভূতবাঁদর নিয়ে দিনরাত পথে পথে হৈ হৈ ক'রে বেড়াস্, তোর খবর কিছু কি আর আমার জান্‌তে বাকী আছে?"

বিমান কহিল, "সত্যি বলছি মা, ঐটুকুই জানো, ভূতবাঁদরগুলোর যে দুর্দ্দশার একশেষ হয়েছে তা জানো না। কদিন ধ'রে ভাল ক'রে খেতে পাচ্ছে না। সেই জন্যেই তো এসেছি তোমার কাছে। নিজের জন্যে হলে কখ্‌খনো আসতাম না, তা ত জানোই।"

মা বলিলেন, "নিজের জন্যে আমাদের কাছে কিছু

চাইলে তোমার যদি মান যায়, অন্যের জন্তে তোমাকেই বা আমরা দিতে যাব কেন ?"

বিমান কহিল, "বৌদি, পুলির পায়েস একবাটি তোমার ঘরে নিয়ে রাখো গে, আমি যাচ্ছি।" ভ্রাতৃজায়া নিঃশব্দে উঠিয়া চলিয়া গেলে মাকে কহিল "ভেবেছিলাম, টাকা চাইতে এসে তোমাদের কৃতার্থ করব, কিন্তু দেখতে পাচ্ছি ভুল করেছিলাম। তুমি তাহ'লে বসো, কর্ত্তাকে আমার প্রণাম জানিয়ো।—ওঘরটায় আর ঢুকতে চাইনে। বৌদি কি করছেন আর-একবার দে'খে ঘরের ছেলে ঘরে ফিরে যাই।"

মা ফুঁপাইয়া কাঁদিয়া উঠিলেন। বলিলেন, "কৃতার্থই কর্ বাপু। কত টাকা চাস্ বল্, আমি এনে দিচ্ছি। কি হবে আর তোর ওপরে রাগ ক'রে, দয়ামায়া ব'লে তোর শরীরে কিছু নেই সে আমি বেশ ভালো ক'রেই জানি।"

দুশো টাকায় রফা হইয়া গেল। ছেলের হাতে নোটের তাড়া গুঁজিয়া দিয়া মা বলিলেন, "আমার দিব্যি রইল, এর সবটাই বিলিয়ে দিবিনে। আবার দরকার হলেই এসে চাইবি।"

বৌদি বলিলেন, "ওকি, সবটা না খেয়ে উঠছ যে ?"

বিমান কহিল, "দাদা কখন্ এসে পড়বে, তার আগে তোমার ঘর থেকে বেরিয়ে পড়তে চাই, শেষটা তোমাকে নিয়েই গৃহবিরোধ সুরু হয়ে যাক্ সে আমি চাই না।"

বৌদি কহিলেন, "বুড়ো-মানুষকে নিয়ে রসিকতা করা আর কেন, ছোট একটি হ্যাঁ বললেই ত ঘর-আলো-করা বৌ আসে, গৃহবিরোধ তাকে নিয়েই কোরো।"

বিমান কহিল, "আসে নাকি, কই তা ত এতদিন কেউ বলনি।"

বৌদি উঠিয়া গিয়া আয়নার দেরাজ হইতে তিনখানি ছবি বাহির করিয়া আনিলেন। দেবরের কোলের উপর সেগুলিকে ছুঁড়িয়া দিয়া কহিলেন, "আহা, বলেছে কি আর ? তোমার বিয়ের ভাবনায় বাড়ীসুদ্ধ লোকের চোখে ঘুম নেই বলে। খান-পঁচিশেক ছবির ভেতরে এই তিনখানা আমি বেছে রেখেছি।"

বিমান ছবিগুলিকে একটির পর একটি তাড়াতাড়ি দেখিয়া লইয়া কহিল, "বৌদি, তোমার চোখ আছে তা বলতে হবে। দাদা আমার বিয়ের জন্যে খুব ব্যস্ত বুঝি ?"

"সারাক্ষণ ত ঐ ভাবনাই ভাব্‌ছে।"

"তোমাকে নিয়ে কি বিষম ভয় পেয়েছে তাহলেই দেখো। আর দেরি করা নয়, আমি উঠি।"

তাহার চাদরের প্রান্ত মুঠি করিয়া চাপিয়া ধরিয়া বৌদি কহিলেন, "হ্যাঁ, না, কিছু-একটা না ব'লে কিছুতেই তুমি উঠতে পাবে না।"

বিমান কহিল, "নাঃ, তুমি আজ একটা বিপদ্ না বাধিয়ে ছাড়বে না দেখছি। ঠিক এখখুনি দাদা এসে পড়লে কি কেলেঙ্কারীটা হবে বল দেখি ?"

"সে আমি বুঝব। তুমি বিয়ে করবে কি না বল।"

"প্রাণের দায়ে এরপর বলতে হচ্ছে, করব।"

"সত্যি ?"

"সত্যি।"

খপ করিয়া ছবিগুলিকে টানিয়া লইয়া বৌদি সহাস্তে কহিলেন, "কোন্‌টিকে পছন্দ শুনি ?"

"তিনটিকেই।"

"যে কোনো একজন হলেই চলবে ত ?"

"উঁহু, তিনজনকেই চাই।"

বৌদি রাগ করিয়া উঠিয়া পড়িলেন, বিমান হাসিতে হাসিতে ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল। দরজায় দাঁড়াইয়া কহিল, "তিনজনকে সমান ভালো লেগেছে তার আমি করব কি ; সহজে ভালো লাগাতে যাবার ঐ ত বিপদ্! ভাগ্যিস পঁচিশখানা ছবিই রাখোনি। তা তোমরা একবার ব'লে দেখই নাহয়, ওদের আপত্তি নাও হতে পারে। ছবি ত মানুষেরই প্রতীক, তারও মর্য্যাদা কিছু কম নয়, সেগুলোর পঁচিশখানা পেয়েছিলে, মানুষের বেলা তিনটিও পাবে না ?"

ততক্ষণ অন্ধকার হইয়া গিয়াছে। সুভদ্রকে এসময়ে বাড়ী পাইবে না জানিত, এস্‌প্লেনেডে নামিয়া ভবানীপুরের পথ ধরিল। দীপালোকিত একটা হোটেলের সম্মুখে কিছুক্ষণ দুমনা হইয়া দাঁড়াইয়া

মনে মনে কহিল, 'একরাশ মিষ্টি খেয়ে এরপর কোনো ভালো জিনিস আর মুখে রুচবে না, তাছাড়া টাকাটা আমার, নয় দেবার মুখে মাও চোখের জল ফেলেছেন। সুভদ্রকে আগে দিয়ে ত দিই, তারপর ওর কাছে থেকে দরকার মতো ধার নিলেই হবে।'

বেশীদূর যাইতে হইল না, সেণ্টপল্ গির্জ্জার কাছাকাছি গিয়া সুভদ্রের সঙ্গে দেখা হইল। চিন্তাকুল মুখে নতমস্তকে ভবানীপুরের দিক্ হইতে সে পদব্রজে ফিরিয়া আসিতেছে। বিমান কহিল, "কি খবর তোমার, ক্লাবে যাওনি আজ?"

সুভদ্র কহিল, "যাব ব'লেই বেরিয়েছিলাম, কিন্তু শেষ অবধি যেতে ইচ্ছে করল না।"

বিমান কহিল, "তুমি আবার ইচ্ছা-অনিচ্ছার খোঁজ রাখ্ছ কবে থেকে? অজয়ের ছোঁওয়া লেগেছে তোমাকে?"

সুভদ্র কহিল, "কথাটা literally সত্যি। যদি কাজ না থাকে ত বাড়ী এসো, বল্ছি।"

"তার চেয়ে চলো না, মাঠেই একটু ঘোরা যাক্।"

"না, আজ কিছু ভালো লাগ্ছে না। বাড়ীই যাই চল।"

পকেট হইতে নোটের তাড়া বাহির করিয়া একবার সস্নেহে সেগুলির গায়ে হাত বুলাইয়া সুভদ্রের হাতে দিয়া কহিল, "থাক্, আর এত মন খারাপ করতে হবে না। এই নাও, আশা করি এইতেই সম্প্রতিকার মতো চল্বে।"

সুভদ্র কহিল, "এত টাকা একসঙ্গে কোথায় পেলে?"

সে কহিল, "এইমাত্র একটা ছবি বিক্রী হয়ে গেল। একজন আমেরিকান টুরিষ্ট এসেচে গ্র্যাণ্ড হোটেলে যেখানে যা ছবি পাচ্ছে কিন্ছে, আমারও একটা নিলে।"

সুভদ্র কহিল, "তা বেশ, টাকাটা তুমিই রাখো। আমি একরকম ক'রে চালিয়ে নেব। এরপর আবার ত আমরা দুটি প্রাণী,—অজয় চ'লে গেছে, পাঁচকড়িকেও বিদেয় ক'রে দিয়েছি।"

"সে কি, অজয় কোথায় গেল?"

"জানি না।"

"কিছু ব'লে যায়নি?"

"না, রাগ ক'রে চ'লে গেল।"

"হঠাৎ কি, নিয়ে এত রাগ?"

"তাও জানি না। হয়ত এও একরকমের repression-এর ফল। যেখানে যার ওপর যত রাগ মনে চাপা ছিল হঠাৎ ছাড়া পেয়ে একসঙ্গে আমার ওপর এসে পড়ল, ভালো ক'রে কথা কইতেই দিলে না আমাকে। পাঁচকড়িকে এক্স্-রে ক'রে ডাক্তার টি-বি সন্দেহ করছে, জানো বোধ হয়? তাই নিয়েই ব্যাপারটার সুরু। ক'দিন থেকেই লক্ষ্য করছি, পাঁচকড়ি কাছদিয়ে হাঁটলে সে নিঃশ্বাস বন্ধ ক'রে ব'সে থাকে। পাঁচকড়িকে বাড়ীতে জায়গা দিয়েছি ব'লে দুএকদিন খুৎখুঁৎও করেছে। সবদিক্ ভেবে আজ বিকেলে লোকটাকে পথখরচ দিয়ে দেশে পাঠিয়ে দিলাম। যাবার সময় হাউ হাউ ক'রেকান্না···বল্লে, 'দেশে আমার কেউ নেই বাবু, হাস্পাতালে আমায় রাখলে না, তুমিও তাড়িয়ে দিচ্ছ, এর পর আমি না খেতে পেয়ে মরব।'··· তা না খেতে পেয়ে দেশের বারো আনা লোকই ত মরছে, আমি তার আর কি করতে পারি? কিন্তু সেই হ'ল আমার অপরাধ। রাগে কাঁপতে কাঁপতে বল্লে, 'লোকটাকে কেন অমন ক'রে তাড়ালে?' আমি বললাম, 'তোমার জন্যেই ত তাড়াতে হ'ল, তুমি এতে রাগ কেন করছ?' অন্যদিন হলে, কথাটাকে ঠিক এরকম করে বলতাম না, কিন্তু ক'দিন আমারও মনটা ভালো যাচ্ছে না, মাথাটারও সেইজন্যেই ঠিক নেই।··· বল্লে, 'আমার জন্যে তাড়াতে হ'ল কি রকম?' আমি বল্লাম, 'ওকে এখানে রাখতে পেলে আমি হয়ত সারিয়ে দিতে পারতাম, কিন্তু ক'দিন থেকেই দেখছি তুমি বেশ খানিকটা ভয় পেয়েছ—।' ভয়ের কথা হতেই সে গলা ছেড়ে চেঁচিয়ে উঠ্ল, বললে, 'তুমি মিথ্যে কথা বলছ, ওকে ভয় বলে না, অকারণ নিজেকে বিপদ্গ্রস্ত করার নামই সাহস নয়, পরের জন্যে সত্যিকারের স্বার্থত্যাগ করবার ক্ষমতা তোমার চেয়ে আমার কম নেই,ঘুঁসির বহর দিয়ে মানুষের মনুষ্যত্ব মাপ্তে যাওয়া ভুল, সেদিন পুলিশ দে'খে আমি ভয় পাইনি, নিতান্ত অবজ্ঞা ক'রেই কিছু তাদের বলিনি, এইসব—।"

সুভদ্রকে এতটা বিচলিত হইতে বিমান আজ অবধি কখনও দেখে নাই, বলিল, "কথাগুলো চাপা ছিল সেটা

সত্যি, বেরিয়ে গিয়ে ভালোই হয়েছে, কিন্তু ছোঁড়া গেল কোথায়? চলো দেখা যাক খোঁজ ক'রে।"

সুভদ্র কহিল, "না। আমি অন্ততঃ খুঁজতে বেরুব না। সাধ্য যখন নেই, সাধ ক'রে আর ভার বাড়াব না ঠিক করেছি।"

ক্লাব হইতে "বিসর্জ্জন" অভিনয় হইবে স্থির হইয়াছে। সুভদ্রের মনটা যে কিছুদিন হইতে ভাল নাই, অর্থাভাব তাহার একমাত্র কারণ নহে। অনেক আশা করিয়া ক্লাব করিয়াছিল, কিন্তু শেষ অবধি ইহা হইতে কিছু যে একটা গড়িয়া তুলিতে পারিবে সে-সম্ভাবনা দিনকার দিনই কমিয়া আসিতেছে। ভাবিয়াছিল, কাজের মধ্যে দিয়া সমষ্টি-চৈতন্য সংহতির পথে উত্তীর্ণ হইবে, কিন্তু অভিনয়ের আয়োজন হইয়া অবধি বিরোধ এবং অশান্তির শেষ নাই। প্রথমতঃ বিরোধ নেতৃত্ব লইয়া। ক্লাবের সভ্যদের মধ্যে যে-কেহ "বিসর্জ্জন" বইখানা সুর করিয়া পড়িতে পারে, তাহারই ধারণা, অভিনয়ে নেতৃত্ব করিবার যোগ্যতায় তাহার সমকক্ষ কেহ নাই। সেকার্য্যের যোগ্যতা আসলে সুভদ্রেরই একটু যা আছে। নিজে সে ভাবাবেগ-বর্জ্জিত বলিয়া অভিনয়ে যথা-পরিমিত ভাবের প্রয়োগ করিবার ক্ষমতা তাহারই সকলের অপেক্ষা বেশী। অল্পেতে সে বিচলিত হয় না, অত্যন্ত বিরুদ্ধ অবস্থায় পড়িলেও বুদ্ধি স্থির রাখিয়া সে কাজ করিতে পারে। তদুপরি সুষ্ঠমাত্র নেতৃত্ব করিবার ক্ষমতাতেও সে সকলের অগ্রণী, সে-অভিজ্ঞতাও ক্লাবের সভ্যদের মধ্যে তাহারই একমাত্র আছে। অভিনয় প্রচুর-ব্যয়-সাপেক্ষ, এবং সেদিক্‌কার দায়িত্ব কেহ ঘাড় পাতিয়া লইতে চাহিল না বলিয়া শেষ পর্য্যন্ত সুভদ্রেরই নেতৃত্ব স্বীকৃত হইল বটে, কিন্তু ব্যবস্থাটা আসলে অনেকেরই যে মনঃপূত হয় নাই, উঠিতে বসিতে এই কয়দিন সুভদ্র তাহার প্রমাণ পাইতেছে। অতঃপর বিরোধ অভিনেতা-নির্ব্বাচন লইয়া। রঘুপতির অংশ অভিনয় করিতে দেওয়া হইল না বলিয়া রমাপ্রসাদের একটি বন্ধু রাগ করিয়া ক্লাবের খাতা হইতে নাম কাটাইয়া বিদায় হইয়া গিয়াছে। জয়সিংহ এবং গোবিন্দ-মাণিক্যের অংশ অদল-বদল করিবার প্রয়োজন হওয়াতে উভয় অভিনেতাই বাঁকিয়া বসিয়াছে। রিহার্সালের সময় কাহারও অভিনয়ে কোথাও খুঁৎ ধরিলে কুরুক্ষেত্র বাধিয়া যায়, ক্লাবটা যে আসলে এক ভদ্রলোকের বাড়ীর বৈঠকখানা সেকথাও সকলে সব সময় মনে রাখে না। মেয়েদের লইয়া কোনও গোল নাই, কারণ তাহাদিগকে কোনও কারণে কিছু বলিতে সুভদ্রের মত নির্ভীক মানুষেরও বাধে। কেবল জয়সিংহ-অপর্ণা এবং গোবিন্দ-গুণবতীর অভিনয়ের রিহার্সাল একসঙ্গে হইবার জো নাই, মেয়েদের তাহাতে ঘোরতর আপত্তি।

সুতরাং রিহার্সাল যাহা হইতেছে তাহার কথা না বলিলেও চলে। একমাত্র সুভদ্র কিছুতেই দমিবার পাত্র নয় বলিয়া রোজই কিছুক্ষণ ধরিয়া হৈ চৈ চলে। বীণা পিয়ানোয় তাল দিয়া অপর্ণাকে গান শেখায়, সেদিক্‌টাই যা-একটুখানি জমে। পূজারীদের কোরাস্ একবার সুরু হইলে সেদিনকার মত আসল কাজ যাহা তাহা একেবারেই চুকিয়া যায়। মাদল বাজাইয়া, নাচিয়া, লাফাইয়া, তেতলায় সুলতার কচি ছেলেটার ঘুম ভাঙাইয়া ক্লাবের কাজ শেষ হয়। ঘর্ম্মাক্ত কলেবর হইয়া সকলে মনে করে, কাজের মত কাজ বেশ খানিকটা করা হইল।

আজও সন্ধ্যা হইতেই ক্লাবের কাজ সুরু হইয়াছে। সুভদ্র আসে নাই বলিয়া নাট্যাংশের অভিনয় আজ হয় নাই। লিখিবার টেবিলের একপাশে একটা চেয়ার লইয়া বসিয়া বীণা গভীর অভিনিবেশের সঙ্গে "বিসর্জ্জন" বইখানা আগাগোড়া আবার পড়িয়া ফেলিতে ব্যস্ত। অপর্ণার গানের রিহার্সাল দেওয়াইতে সে আজ উৎসাহ বোধ করে নাই, প্রথম হইতেই কোরাসের রিহার্সাল চলিতেছে।

হল্ হইতে সুলতা ডাকিলেন, "ঢের হয়েছে বীণা, এইবার ওঠ। দেখছিস্ একটা সুরও কেউ ঠিক ক'রে গাইতে পারছে না, আর ক'টা দিনই বা বাকী আছে, শেষটা কি লোক হাসাবি?"

ঐন্দ্রিলা কহিল, "দিদি যেন কি। আমাকে এত ক'রে টেনে নিয়ে এসে এখন দিব্যি এক কোণে ব'সে বই পড়া হচ্ছে।"

স্থলতা কহিলেন, "বইটা ত পালিয়ে যাচ্ছে না।"

রমাপ্রসাদ কহিল, "রিহার্সালে সবটাত এমনিতেই শুনতে পাবেন, পড়ার চেয়ে সে বরং আরো ভালোই লাগবে।"

তাহার কথায় কান না দিয়া ঐন্দ্রিলা কহিল, "বই না পালাক্, দিদি এই রকম কর্তে থাক্লে মানুষগুলো এরপর পালাবে।"

স্থলতা কহিলেন, "অন্ততঃ অভিনয়ের দিনে শুন্তে যারা আসবে তারা যে পালাবে, তা আমি দিব্যচক্ষে দেখতে পাচ্ছি।"

বইয়ের পাতা হইতে চোখ না তুলিয়াই বীণা কহিল, "মন্তব্য শেষ হ'ল তোমাদের? এইবার থামো। আমি ত বলেইছি, আমার আজ ভালো লাগছে না কিছু কর্তে।"

স্থলতা কহিলেন, "বেসুরো গানগুলো শুন্তে আমাদের যে আরও ভালো লাগছে না বীণা!"

বীণা কহিল, "সুভদ্রবাবু ত ব'লেই রেখেছেন, কোরাসের গানগুলো বেসুরো হলেই realistic হবে বেশী।"

স্থলতা কহিলেন, "সে তোকে সান্ত্বনা দেবার কথা, তাও বুঝতে পারিস্ নি?"

বীণা কহিল, "আস্পর্দ্ধা! আমাকে সান্ত্বনা কিসের জন্মে শুনি? গাধা পিটিয়ে ঘোড়া সত্যি সত্যি হয়ত খানিকটা করা যায়, কোকিল করা যায় না। গোড়া থেকে তোমাদের বল্‌ছি, একজন কেউ গাইয়ে ছেলে lead কর্তে সঙ্গে না থাকলে এই সব আনাড়িদের দিয়ে কোনোকালে কিছু হবে না, তা তোমরা কেউ কানেই নিলে না, এখন আমাকে দোষ দিলে কি হবে শুনি?"

স্থলতা একটি গালে রসনা-সন্নিবেশ করিয়া একটুখানি অর্থপূর্ণ হাসি হাসিলেন। বীণা আঁচল ঘুরাইয়া উঠিয়া পড়িল, কহিল, "আহা, আবার হাসি হচ্ছে। তা বেশ, যত পারো হাসো, আমি চল্‌লাম। ইলু যাচ্ছিস্?"

ঐন্দ্রিলা বলিল, "আমাকে আর জিজ্ঞেস করা কেন মিছে? ধ'রে নিয়ে এলে তুমিই, আবার তুমি যেতে বল্‌লেই যাব।"

স্থলতা এবারে একটু ক্ষুণ্ণ হইয়াই মৃদুস্বরে কহিলেন, "না-হয় নিজের ইচ্ছেতেই একদিন এলি ইলু, এটা ত ক্লাবই কেবল নয়, আমার বাড়ীও ত বটে।"

নিতান্ত কথাটাকে চাপা দিবার জন্যই ঐন্দ্রিলা কহিল, "আস্তে ইচ্ছে আমার করে স্থলতাদি, কদিনই ত এসেছি। আজকে শরীরটা ভালো ছিল না, আজকের কথাই বল্‌ছিলাম।"

সিঁড়ি নামিতে নামিতে অনুভব করিল, স্থলতাকে ফাঁকি সে দিতে পারে নাই। পাছে এ-বিষয়ে আর-কিছু বলিতে গেলে ঐন্দ্রিলা আরও বেশী করিয়া ধরা পড়ে, এই ভয়ে স্বভাব-সুলভ সৌজন্ম বশতঃই তিনি চুপ করিয়া গেলেন। কিন্তু বাড়ী ফিরিবার পথে ইহাই সে ভাবিতে ভাবিতে চলিল, যে, আসল ফাঁকি তাহার কোনটা এবং সেই ফাঁকি কাহাকে সে দিতে চেষ্টা করিতেছে। সত্যই কি কেবল বীণারই ইচ্ছাতে সে আজ ক্লাবে আসিয়াছিল? অজয়কে হয়ত দেখিতে পাইবে সেই সম্ভাবনা মনে পড়িয়া একবারও কি তাহার বুক দুরু দুরু করিয়া কাঁপে নাই? সে দুরু দুরু ভয়ের, তাহা সে জানে। অজয়কে সে ভয় করে, ভয় করে। অত্যন্ত গভীর করিয়া ভয় করে। সে এমন ভয় যাহার কথা কাহাকেও বলিতে গেলে নিজেরই কর্ণমূল আতপ্ত হইয়া উঠে। এই কিছুদিন আগে পর্য্যন্ত অজয়কে তাহার ভালও লাগিত, কিন্তু আজ তাহার জন্ম ভয় ছাড়া কিছু আর মনের মধ্যে অবশিষ্ট নাই। তবু এই ভয়াবহতারই এ কি নিদারুণ প্রলোভন? একদণ্ড কেন তাহাকে সে ভুলিয়া থাকিতে পারে না। গভীর রাত্রিতে প্রেতের মত যাহাকে দূর হইতে সে দেখিয়াছিল, চকিতে তাহার চোখে যে-দৃষ্টি সে কল্পনা করিয়াছিল, আবছায়া স্মৃতির পটে অঙ্কিত সে-মূর্ত্তি সে-দৃষ্টিকে আসল মানুষটার সঙ্গে মিলাইয়া দেখিয়া লইবার এ কি প্রচণ্ড কৌতূহল তাহার মনে! যে মানুষটা সসম্ভ্রমে কাছে আসিয়া বসে, বৌদ্ধধর্ম্ম সম্বন্ধে আলোচনা করে, ভাল করিয়া চোখের দিকে চোখ তুলিয়া চাহিয়া কথা বলে না, তাহার সঙ্গে এই নিশাচর বুভুক্ষু গোপনচারী মানুষটার সত্যই কোথাও মিল আছে কিনা জানিতে পাইলে সে

কি খুসি হয়? হয়ত খুসি হয় না, কিন্তু জানিতে তাহার আগ্রহেরও শেষ নাই।

বাড়ীর দরজায় গাড়ী থামিবার পর ঐন্দ্রিলার প্রথম মনে পড়িল সারা পথ বীণার সঙ্গে একটিও সে কথা বলে নাই, বীণাও নিঃশব্দে এতটা পথ অতিবাহিত করিয়াছে। এমন প্রায় কোনওদিনই হয় না, সে না বলিলেও বীণাই তাহাকে দিয়া কথা বলায়। বীণার নীরবতা তাহার মনকে স্পর্শ করিল, গাড়ী হইতে নামিতে নামিতে কহিল, "এসো, এসো, এইটুকুতেই এত ভাবলে নাকি চলে। সবে ত সুরু!"

বীণা কেমন একরকম করিয়া হাসিয়া উঠিল, কহিল হাঁা, তুই ত সবই জানিস। আচ্ছা তুই যা, আমি একটু ঘুরে আসছি।"

ঐন্দ্রিলা বলিল, "এত রাত্রে কোথায় আবার ঘুরতে যাবে তুমি?"

বীণা বলিল, "হারিয়ে যাব না, ভয় নেই। দে'খে আসি সুভদ্রবাবুদের কি হয়েছে। হঠাৎ এবারে যা গরম পড়েছে,বাড়ীসুদ্ধ অসুখবিসুখ ক'রে প'ড়ে আছেন হয়ত।"

ঐন্দ্রিলা কহিল, "তুমি ত আর ইচ্ছে থাক্‌লেই তাঁদের নার্স করতে লেগে যেতে পারবে না? খবরটা আন্‌তে ড্রাইভারকে পাঠালেই যথেষ্ট হত না কি?"

বীণা কহিল, "না-হয় নিজেই গেলাম। ওতে আমার কিছু এসে যাবে না"

চলমান্ মোটরটির দিকে চাহিয়া ঐন্দ্রিলা কিছুক্ষণ সেইখানে দাঁড়াইয়া রহিল। সে বেশ জানিত, বীণা তাহাকে সঙ্গে লইতে চাহিলেও সে প্রাণান্তে যাইত না। ছেলেদের মেস-বাড়ীতে হুট করিতে মেয়েরা গিয়া হাজির হয় না। তাহা বীণাও জানে বলিয়াই তাহাকে বাড়ী পৌছাইয়া দিয়া গেল। তবু অকারণেই তাহার মনে হইতে লাগিল, যেন বীণা পথের মাঝখানে জোর করিয়া তাহাকে বসাইয়া দিয়া গিয়াছে। মনের কোণে বীণার সম্বন্ধে একটু তিক্ততা জাগিয়া রহিল। বীণা যেন তাহার অস্তিত্বকে তাচ্ছিল্যভরে অস্বীকার করিতেছে। নিজে হইতেই যেখানে সে দূরে রহিয়াছে সেখান হইতেও জোর করিয়া তাহাকে দূরে ঠেলিতেছে।

উপরে আসিয়া কিছুক্ষণ বারান্দায় চুপচাপ দাঁড়াইয়া রহিল। ঐন্দ্রিলা যে কত বেশী রাত করিয়া বাড়ী ফিরিতেছে তাহাই বুঝাইবার জন্য হেমবালা আজ সাতটা না বাজিতে দরজা বন্ধ করিয়া শুইয়া পড়িয়াছেন, সিঁড়ি উঠিতে ঐন্দ্রিলা তাহা লক্ষ্য করে নাই। অজয়দের মেসে বীণার নৈশ অভিযানের পালাটিকে নানা বিচিত্রভাবে সে কল্পনা করিতে লাগিল। কল্পনা ক্রমে উদ্দাম হইয়া সম্ভাব্য-অসম্ভাব্যের সীমারেখা ছাড়াইয়া বহিয়া চলিতে লাগিল। তখন প্রায় উচ্চৈঃস্বরেই বলিয়া উঠিল, দূর ছাই আর ভাবব না। তারপর ঘরে গিয়া কাপড় ছাড়িয়া টেবিলে ঢাকা দেওয়া খাবার স্পর্শ না করিয়াই শুইয়া পড়িল। বহুক্ষণ অসাড় হইয়া পড়িয়া থাকিয়াও যখন কিছুতেই চোখে ঘুম আসিল না তখন স্থির করিল, আলো জ্বলিতেছে বলিয়া ঘুম আসিতেছে না! উঠিয়া আলোটা নিবাইয়া দিল। অন্ধকারে চিন্তারাশি রামধনুবর্ণে জ্বলিতে লাগিল।

চৌকা চেয়ারগুলির একটিতে বসিয়া-পড়িয়া বীণা কহিল, "মানুষটা থাকল কি মরল সে খোঁজ করাও একবার আপনারা দরকার মনে করেন নি? সত্যি, আপনারা যেন কি। যেমন অজয়-বাবু তেমনি আপনারা দুজন।"

সুভদ্র অপরাধীর মত একপাশে দাঁড়াইয়া রহিল, কোনও কথা কহিল না। বিমান লিখিবার ডেস্কটার উপর আধখানা শরীরের ভার রাখিয়া কাৎ হইয়া বসিল, হাসিয়া কহিল, "আসল কথা আমরা ভয় পাইনি মোটে। মনের সবচেয়ে বড় জায়গায় ওর এখন বন্ধন, যেখানেই যাক্ দুদিন পরে ঠিক ফিরে আসবে, আর সে-কথা আপনিই সব-চেয়ে ভালো বোঝেন।"

বীণা কহিল, "আপনাদের চেয়ে খানিকটা ভালো যে বুঝি তা ঠিক। কিন্তু আমি আপনাদের বলছি, ব্যাপারটাকে যত সহজ ভাবছেন তত সহজ সত্যিই সেটা নয়। ফিরতে উনি নাও পারেন, ওঁর অসাধ্য কাজ নেই।"

বিমান কহিল, "কার সাধ্য বেশী তারই এবারে পরীক্ষা চলছে।"

বীণা কহিল, "পরীক্ষাটা আপনাদের কাছে আমি অন্ততঃ দেব না। আপনারা যা কৃতিত্ব দেখিয়েছেন সে আর ব'লে কাজ নেই।"

বিমান ঠোঁট টিপিয়া একটু হাসিল। সুভদ্র ব্যথিত হইয়া কহিল, "আমাদের ওপর দোষারোপ করছেন, করুন। কিন্তু যে, মানুষ যাবে ব'লে পণ করেছে তাকে জোর ক'রে ধ'রে রেখে কিছু কি লাভ হত? কোনো জোরের সম্পর্কই বেশীদিন টেঁকে না।"

বীণা কহিল, "টেঁকে কিনা তা কোনোদিন পরখ ক'রে দেখেছেন? আমি ত দেখেছি, একমাত্র জোরের সম্পর্কটাই টেকে। আসল কথা মনের মধ্যে কোনো বন্ধনকে শেষ অবধি স্বীকার করতে আপনাদের ভালো লাগে না। জোরের সম্পর্ক ব'লে নয়, মানুষের আসল সম্পর্কটা যে কোন্‌খানে সে শিক্ষাই আপনাদের কারও হয়নি। কল্‌কাতার মেসগুলিকে একদিনে সব কেউ ভেঙে দেয় তাহলে বেশ হয়।"

কিছুক্ষণ চুপ করিয়া কাটিলে বীণা কহিল, "কোথায় কোথায় ওঁর যাবার সম্ভাবনা তা জানেন কেউ?"

সুভদ্র এবং বিমান নীরবে একবার পরস্পরের মুখ-চাওয়া-চাওয়ি করিল। বীণা অস্থির হইয়া কহিল, "জানেন না, এই ত? কলেজে যাওয়া উনি ত ছেড়েই দিয়েছেন, সেদিক থেকে কোনো খবর পাবার আশা নেই। নন্দ ব'লে আপনাদের বাড়ীতে যে-ছেলেটি থাকত, অজয়বাবু তার কথা প্রায়ই বলতেন, সে কোথায় আছে এখন?"

সুভদ্র মাথা নাড়িয়া অস্ফুটস্বরে জানাইল, তাহাও জানে না।

বীণা চৌকি ছাড়িয়া উঠিয়া পড়িল, কহিল, "তাও জানেন না। তা বেশ। সে ছেলেটি ত কলেজে পড়ে, সেখানে খোঁজ করা চলে?"

সুভদ্র একটু ভাবিয়া কহিল, "ওর টেষ্ট্ পরীক্ষা হয়ে গিয়েছে, কলেজ ত সম্প্রতি নেই।"

নিরুপায়তার দুঃখে বীণা সুভদ্রদের এবারে তিরস্কার করিতেও ভুলিয়া গেল। দাঁতে ঠোঁট চাপিয়া বদ্ধদৃষ্টিতে বাহিরের দিকে কিছুক্ষণ চাহিয়া থাকিয়া হঠাৎ মৃদুস্বরে কহিল, "জিজ্ঞেস করতেও ভয় করছে, ওঁর দেশের ঠিকানা আপনারা জানেন?"

সুভদ্র কহিল, "চেষ্টা করলে দেশের ঠিকানা পাওয়া বড় শক্ত হবে না। কলেজে তার সহপাঠীদের কেউ-না-কেউ নিশ্চয় জানে।"

বীণা কহিল, "জানে না, জানে না, কক্‌খনো জানে না, আমি আপনাদের ব'লে দিচ্ছি। মিছিমিছি কেন কষ্ট করবেন, খোঁজ ক'রে দরকার নেই।" বাহির হইয়া যাইতে যাইতে দরজার কপাট ধরিয়া ফিরিয়া দাঁড়াইল, হঠাৎ উচ্ছ্বসিত স্বরে কহিল, "সত্যি, আপনাদের কথা ভাবলে মাথা ঘুরে যায়। কি আপনারা হয়েছেন সব। কারও কোনো দায় নেই, কারও ওপরে আপনাদের কোনো দাবী নেই। আত্মীয় বন্ধু, থেকেও কেউ নেই আপনাদের। যার যখন যা খুসি করছেন, ঠিক করছেন, কি ভুল করছেন তা দেখবার মানুষ নেই। আগাগোড়া জীবনটাই আপনাদের ছেলেমানুষি, বেহিসাব। কাজ অকাজ, সবই আপনাদের খামখেয়ালিতে চলছে। কলেজে পড়ছেন, ছবি আঁকছেন, সে-সবও আপনাদের খামখেয়ালি। এরকম ক'রে মানুষের বেঁচে থাকার মানে হয় কিছু? শক্ত হাতে কেউ আপনাদের ভার নিতে পারে তাহলে হয়; যেমন ক'রে ছোট ছেলের ভার মানুষে নেয়। কিন্তু পৃথিবীতে আপনাদের ভাবনা কেউ ভাবে না, যদিও সেইটেই সব-চেয়ে বেশী দরকার।"

তাহাকে গাড়ীতে উঠাইয়া দিয়া আসিয়া দুই বন্ধুতে নীরবে মুখোমুখি বসিয়া রহিল। বৈকুণ্ঠ খাইতে ডাকিয়া গেল, উঠিল না। বেশ কিছুক্ষণ চুপ করিয়া কাটিলে সুভদ্র কহিল, "সত্যিই কারও সঙ্গে আমাদের যে বিশেষ-কিছু সম্পর্ক আছে তা নয়। আমার ত অন্ততঃ নেই। আমাদের দেশাত্মবোধ বলতে কিছু নেই, জাত আমরা মানিনে, পরিবারকে আশ্রয় ক'রে আমাদের পূর্ব্বপুরুষদের মনুষ্যত্ব বিকাশ পেত, আমাদের কালে তারও ভিত এলিয়ে গিয়েছে। পারি না, মনটা কেমন বসতে চায় না। চৌদ্দ পুরুষে জমিজমা ক'রে যজমানী ক'রে চলেছে, আরামেই চলেছে, আমারও চলত না এমন নয়। যদি সব-ছেড়ে বাড়ী গিয়ে বসতে পারতাম, প্রভাটার একটা

গতি হ'ত। কিন্তু নিজের দিক্ থেকে যেটা করা উচিত মনে করি, সেটা করতে কেমন ভালো লাগে না। বীণা দেবীকে সেকথা ত আর বোঝানো যাবে না, তাই চুপ ক'রেই রইলাম…"

হঠাৎ বাহিরে মোটরের শব্দ হইল। চকিতে বিছানা ছাড়িয়া উঠিয়া ঐন্দ্রিলা বারান্দায় আসিয়া দাঁড়াইল। দেখিল, গাড়ীবারান্দার নীচে আস্টিন হাঁপাইতেছে, দরজা খুলিয়া বীণা পা-দানে পা বাড়াইল। নিজের অসতর্কতার জন্য নিজেকে তিরস্কার করিয়া তাড়াতাড়ি ফিরিয়া বিছানায় শুইয়া পড়িল। নগরোপান্তের নিস্তব্ধ রাত্রি, মোটরের দরজা বন্ধ হইবার শব্দ শোনা গেল, সুরকি-ফেলা পথের উপর মোটরের চাকার মর্ম্মরধ্বনি। দুতলার সিঁড়িতে বীণার পায়ের শব্দ স্ফুটতর হইতে লাগিল, হেমবালা নিজেকে জানান দিবার উদ্দেশ্যে একবার কাশিলেন, কিন্তু ঐন্দ্রিলার বুকের মধ্যে রক্তস্রোতের শব্দকে ইহারা ছাপাইয়া উঠিতে পারিল না।

আলো জ্বালিয়া ঐন্দ্রিলাকে আস্তে ঠেলা দিয়া বীণা ডাকিল, "ইলু!"

ঐন্দ্রিলা সাড়া দিল না।

বীণা আবার ডাকিল, "ইলু ঘুমচ্ছিস?"

বেশ বোঝা গেল, বীণার গলার স্বর স্বাভাবিক অবস্থায় নাই। এবারে ঐন্দ্রিলা ভয় পাইল। ধড়মড় করিয়া উঠিয়া বলিল, "কে, দিদি? কি হয়েছে?"

বীণা দুই হাতে মুখ ঢাকিয়া তাহার পাশে বসিয়া পড়িল।

ঐন্দ্রিলা ঢোক গিলিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "অসুখ-বিসুখ করেছি নাকি কারও?"

বীণা মাথা নাড়িয়া জানাইল, না।

ঐন্দ্রিলা কহিল, "তবে?"

"সুভদ্রবাবুর সঙ্গে ঝগড়া ক'রে কোথায় চ'লে গিয়েছেন, কোনো খোঁজই নেই।"

"অজয়বাবু? সে কি, কবে?"

"আজ বিকেলে।"

"তুমি সুভদ্রবাবুর কাছে শুনলে?"

"হ্যাঁ।"

কিছুক্ষণ নীরবে কাটিলে ঐন্দ্রিলা কহিল, "পুরুষ-মানুষ ত? ভয় পাবার আছে কি?"

বীণা কহিল, "হ্যাঁ, পৌরুষ ত কত। একটা প্রকৃতিস্থ মানুষ, তুচ্ছ কথা নিয়ে রাগ ক'রে নিরুদ্দেশ হয়ে যায়, লজ্জা করে না,এমন কথনো শুনেছিস?"

ঐন্দ্রিলাকে স্বীকার করিতে হইল, সে শোনে নাই। কিন্তু তাহার মনের কোন্ একটা গভীর তল হইতে এই কথাটাই সমস্ত দুর্ব্বোধ্যতাকে ঠেলিয়া ভাসিয়া উঠিতে লাগিল, যে, যাহা কখনও শোনে নাই, এই মানুষটির নিকট হইতে তাহাও তাহাদের শুনিতে হইবে, যাহা কখনও দেখে নাই তাহা দেখিতে হইবে, এইজন্যই এমন অপ্রত্যাশিত ভাবে তাহাদের জীবনে সে আসিয়া পড়িয়াছে। এই মানুষটি সমস্ত অসম্ভবকে সম্ভব করিবে। ইহাকে ভয় করা যায়, কিন্তু ইহার জন্য ভয় পাইবার কিছু নাই। তাহার মনের উপর যে অন্ধকার ছায়া বিস্তার করিয়াছিল, ধীরে তাহা মিলাইয়া গেল। খোঁপা ঠিক করিতে করিতে হাসিয়া কহিল, "বেচারা সুভদ্রবাবু!"

বীণা ঝাঁঝিয়া কহিল, "হ্যাঁ, তুমি ত সুভদ্রবাবুর কথাটাই কেবল ভাববে।"

ঐন্দ্রিলা কহিল, "না গো, না, আমি কারও কথাই ভাবছি না। ঢের রাত হয়েছে, এবার খাবে এসো।"

বীণার সঙ্গে সঙ্গে সেও খাবারের ঢাকা খুলিয়া খাইতে বসিল।

(ক্রমশঃ)

প্রত্যাবর্ত্তন

শ্রীকেদারনাথ চট্টোপাধ্যায়

কোন নূতন দেশে যাবার পালায় যেমন উৎসাহ থাকে, বিদায়ের বেলায় ঠিক তেমনি খারাপ লাগে। অনেক কিছু দেখা-শোনা উপভোগ করা বাকী রয়ে গেল, সেটা আর কোন দিন হবে কি-না সন্দেহ; অনেক নূতন বন্ধুর সঙ্গে চিরবিচ্ছেদ; জীবনের একটা নূতন পরিচ্ছেদের আরম্ভের সঙ্গে সঙ্গেই সমাপ্তি, এই সব মিলে মনের মধ্যে একটা অস্বস্তির ভাব এনে দেয়। তবে প্রত্যাবর্ত্তনের একটা অঙ্গ আছে যেটা আনন্দের—যদিও স্বাধীন দেশ থেকে পরাধীন দেশে ফেরার বেলা সে আনন্দে অনেকটা অন্য ভাবও থাকে।

কাজ্‌ভিনের পথে। এলবোরুজ পর্ব্বতমালার গায়ে লারিজান গ্রাম, পিছনে দূরে দেমাবেন্দ পর্ব্বতচূড়া

*   *

টেহেরান থেকে বিদায় গ্রহণ ক'রে আমরা পশ্চিম মুখে চললাম। যে-পথে আমরা চলেছি, সেটা দিগ্বিজয়ের পথ। দারয়বহোস, মাসিদনের আলেকজাণ্ডার, অসুর শল্মানেসের, শাশানিয় শাপুর, আরবের বিজয় সেনানী, সকলেই এই পথে পূর্ব্ব হ'তে পশ্চিম বা পশ্চিম হ'তে পূর্ব্ব দিকে বিজয়দর্পে দেশ মথিত ক'রে গিয়েছেন। এখন তাঁদের চিহ্ন রয়েছে ইতিহাসের পাতায়—যেখানে তাঁদের বিজয়ের গৌরব কাহিনীই বিশেষভাবে বর্ণিত আছে—আর রয়েছে বিজিত দেশের ধ্বংসাবশেষে, যেখানে পরাজিতের দুঃখের অঙ্কেরও কিছু পরিচয় পাওয়া যায়।

আমাদের পথ কাজভিন, হামাদান, কের্ম্মানশাহ্‌, কাশরিশিরিন হয়ে ইরাকের দিকে চলে গিয়েছে। আরও এগিয়ে সুমের-আক্কাদ, অসুর, বাবিল ইত্যাদি প্রাচীন জাতির লীলাভূমি। মানবজাতির ইতিহাস এখন অনেক সুদূর অতীত পর্য্যন্ত আমাদের দৃষ্টিগোচর হয়েছে, কিন্তু এখনও উষাকালের আলো তিনটি জলস্রোতের পাশেই বেশী উজ্জ্বল ব'লে মনে

কাজ্‌ভিন। প্রধান হোটেল

হয়। প্রথম সিন্ধুনদের কূলে দ্বিতীয় ইউফ্রেটিস্ টাইগ্রিস্ যুগল নদীর মধ্যস্থ ভূমিখণ্ডে এবং তৃতীয় মিশরের নীল-নদের উপত্যকায়, সুতরাং আমাদের এই প্রত্যাবর্ত্তনের পথ ঐতিহাসিক ও প্রত্নতাত্ত্বিকের তীর্থের মুখে চলেছে।

* * *

উত্তর-পারস্যের পথটা বেশ ভাল এবং শীতকালের তুষার ও বৃষ্টির কৃপায় দু-পাশের দেশও অনেকটা উর্ব্বর। নদনদী বিশেষ কিছু নেই, তবে পার্ব্বত্য ঝর্ণার জল নালা কেটে এবং পর্ব্বতের ভিতরের সঞ্চিত জল কুয়া কেটে অনেক দূর পর্য্যন্ত মাটির নীচে সুড়ঙ্গ দিয়ে নিয়ে জল-সেচের কাজ করায় চাষবাস খুব ভালই হয়। পারস্যদেশ ফলের ভাণ্ডার, শীতপ্রধান বা অল্প গরম দেশের প্রায় সমস্ত ফলই খুব ভাল এবং অপর্য্যাপ্ত পরিমাণে এদেশে জন্মায়। আঙুর আপেল পীচ নাসপাতি কমলা খেজুর বাদাম পেস্তা আখরোট, খোবানি আলুচা আলুবোখারা ইত্যাদি একদিকে, অন্যদিকে তরমুজ খরমুজা, সরদা শশা এই-সব এদেশে যে-রকম সুস্বাদু সে-রকম অন্য কোথাও আছে কি-না সন্দেহ।

হামাদান। পর্ব্বতগাত্রে (দারয়বহোসের ?) অনুশাসন

হামাদানের পথে দু ধারে অসংখ্য ফলের বাগানে শীতের শেষে ফুল ধরেছে, কোথাও কোথাও একটু ফলও ফলতে আরম্ভ হয়েছে, গাছের কচি পাতার হরিৎ বর্ণের সঙ্গে রক্তাভ শ্বেত বর্ণের "চেরীব্লসম" এবং পীচের ফুল অতি সুন্দর, বাগানের মধ্যে উচ্চশির তরু-শ্রেণী, তার পাশে জলের স্রোত, সমস্ত মিলে যে সুন্দর দৃশ্যপটের সৃষ্টি করেছে তার যেমন রূপ, তেমনি বর্ণের ঔজ্জ্বল্য, তেমনি গন্ধের মাধুর্য্য।

হামাদান। বনভোজনের পর্ব্বে কবি, সঙ্গে শ্রীযুক্ত কৈহান ও হামাদানের সৈন্যাধ্যক্ষ

পথের ধারে কোথাও বা পাহাড়ের কাঁধে চেনার গাছের তলায় রাখাল ব'সে নিজের মনে গান গাইছে, সামনে ভেড়ার পালের মধ্যে মেষ-শাবকের দল মোটরের আওয়াজে লাফাতে লাফাতে পালের ভিতর দিকে ছুটে চলেছে, পাহাড়ের গা ধূসর সবুজের মিশ্র বর্ণ, দূরে তুষারমণ্ডিত অদ্রিমালা। ইংরেজী ভাষায় যাকে "পাষ্টোরাল" দৃশ্য বলে তার অনুপম নিদর্শন

পাওয়া যায় এই উত্তর-পারস্তের প্রাচীন আর্য্যভূমিতে। এই ধূমায়মান মেঘে আবৃত ধূসর-পীত-গৈরিক-নীল বর্ণে রঞ্জিত, প্রস্তরময় রুক্ষ পর্ব্বত-মালার পৌরুষ ভাব

কেরমানশাহের পথে। প্রাকৃতিক দৃশ্যপট

এবং তাহারই মধ্যে সুন্দর ফল-পুষ্প-বৃক্ষে শোভিত সুজলা উপত্যকার শোভাই বোধ হয় বৈদিক ঋষিদের মনে মন্ত্রসৃষ্টির ও কবিতা-রচনার উদ্দীপনা দিয়েছি

টাক্-ই-বোস্তান। গুহা ও মসজিদের দৃশ্য

কাজভিনে সন্ধ্যায় পৌছান গেল। শহরের প্রধান রাজপথ দিয়ে মহরমের বিরাট শোভাযাত্রা চলেছে। গায়ে কাল কাপড়, মাথায় মাটিমাখা, খালি পায়ে জনস্রোত চলেছে, প্রত্যেকেই শোকের চিহ্ন এবং শোকের ও ক্রোধের উচ্ছ্বাস দেখাচ্ছে, কিন্তু তারই মধ্যে একটা সংযম ও শৃঙ্খলার ভাব পূর্ণরূপে প্রকাশ পাচ্ছে—যেটা আমাদের দেশের ঐ রকম শোভাযাত্রায় একেবারেই নেই। সুসভ্য স্বাধীন মুসলমানের ধর্ম্মের বহিঃপ্রকাশ যে কিরূপ উন্নত আদর্শে চলছে সেটা এদেশের লোকের কল্পনার অতীত।

কাজভিনে রাত্রি কাটল একটি ইউরোপীয় ধরণের হোটেলে। ভোরের আগেই অভুক্ত ও ক্লান্ত দেহেই হামাদান রওয়ানা হওয়া গেল। কিছু দূর গিয়ে নাব্রিজের পথ, এই পথে কাশ্যপ সমুদ্রের কূলে গিয়ে পৌছান যায়। টেহেরান থেকে ইউরোপ-যাত্রীরা এই পথে 'পাহ্লবী' (আগে নাম ছিল "এন্‌জেলী") বন্দরে গিয়ে কাশ্যপ সমুদ্রে রুষ জাহাজ চড়ে বাকু বন্দরে যায়। সেখান থেকে রুষ রেলে মস্কো, মস্কো থেকে ইউরোপের যে-কোন শহরে কয়েক দিনে যাওয়া যায়। আমাদের পথ দেখা পর্য্যন্তই হ'ল।

হামাদানের পথের দু-ধারে ক্ষেত এবং সেইজন্য পথে প্রতি দু-তিন-শ গজ অন্তর জলনালীর উপর উঁচু সাঁকো, যার দরুণ গাড়ী জোরে চল্‌লে বেজায় ধাক্কা লাগে। বেলা দুপুর নাগাদ হামাদানে পৌছলাম, সেখানে ইংরেজী বোঝে এ-রকম কোন লোক পেলাম না। ভাঙা ফ্রেঞ্চে পথ জিজ্ঞেস ক'রে আমাদের ক-দিনের থাকবার
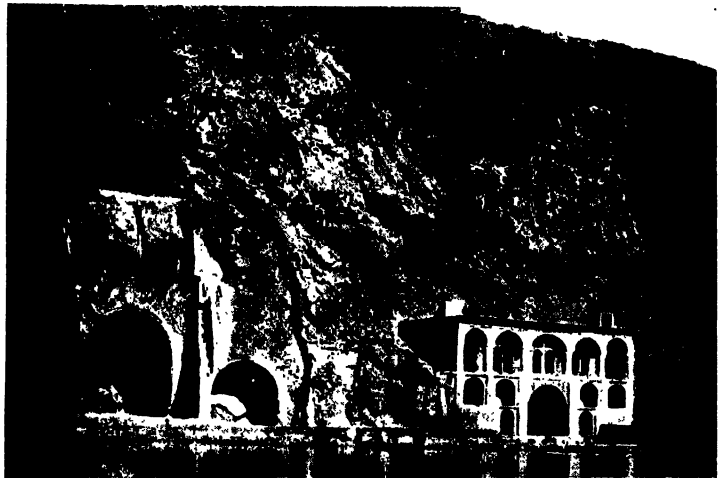
জন্যে যে উদ্যান প্রাসাদটি ঠিক হয়েছিল সেখানে পৌঁছলাম।

হামাদান সমুদ্র থেকে প্রায় ৮০০০ ফুট উঁচুতে পাহাড়ের গায়ে সুন্দর শহর। শহরের ভিতর দিয়ে একটি পার্ব্বত্য নদী গিয়েছে, তার জলস্রোত আর প্রপাতগুলিতে ঐ জায়গাটির প্রাকৃতিক দৃশ্য ভারি সুন্দর হয়েছে এবং অঞ্চলটি গাছপালা, ফুল, ফল শস্যের ক্ষেতে ভরে গিয়েছে। শহরের পিছনেই উঁচু পাহাড়, আরও দূরে অভ্রংলিহ চিরতুষারময় পর্ব্বতশ্রেণী। এ অঞ্চলটি ভূস্বর্গ বিশেষ; শীতটা প্রচণ্ড কিন্তু তাছাড়া সমস্ত বৎসরই বসন্তকালের মত সুখভোগ্য আব-হাওয়া থাকে। শহরের এখন অবস্থা খারাপ, তবে পুনর্গঠন চলেছে। এখানে কাঠের ও কুম্ভকারের কাজ খুব ভাল হয়।

হামাদান প্রাচীনতম ইরাণীয় আর্য্য-উপনিবেশের প্রাচীন নগরীর ভিত্তির উপর স্থাপিত। এইখানেই মাদ জাতির রাজধানী হগমটান (গ্রীক উচ্চারণে একবাটানা) ছিল। পরে হখামনিষ্যদের রাজত্বেও এটা গ্রীষ্মকালের রাজধানী ছিল। এখন সে অতীত গৌরবের চিহ্ন প্রায় সবই মাটির নীচে, কেবলমাত্র একটি সিংহমূর্ত্তির ধ্বংসাবশেষ মাটির উপর আছে এবং তিন মাইল আন্দাজ দূরে পাহাড়ের গায়ে কীলকলিপিতে একটি অনুশাসন (বোধ হয় দারয়বহৌসের) আছে।
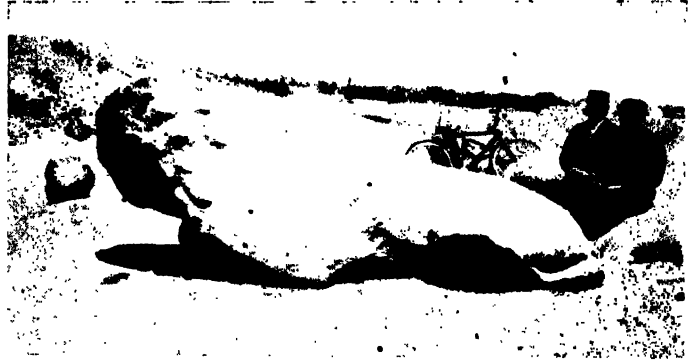
হামাদান। একবাটানার সিংহমূর্ত্তির অবশিষ্ট। পিছনে (স্থূলকায়) হামাদানের গভর্ণর শ্রীযুক্ত রোকনি

হামাদানে দিনগুলি বেশ আনন্দেই কাটল। কতকগুলো পুরাণো জিনিষ আশ্চর্য্য সস্তায় কেনা গেল, আরও অনেক জিনিষ দেখা গেল। তারপর আবার পথে বেরিয়ে পড়া গেল। এইখানে আমাদের সঙ্গী পার্শি বন্ধুদের সঙ্গে বিচ্ছেদ হ'ল, তাঁরা সোজা দক্ষিণমুখে গিয়ে মোহামেরা বন্দর থেকে জাহাজ নিয়ে বোম্বাই যাবেন, আমাদের পথ পশ্চিমে ইরাকের দিকে।
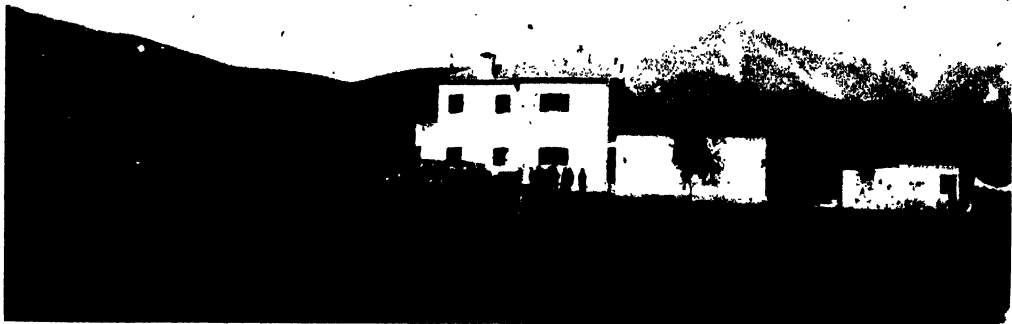
হামাদান। শহরতলী ও পর্ব্বতমালার দৃশ্য

বিসেতুন (বেহিস্টন) পর্ব্বতগাত্রে দারয়বহৌসের স্মারক চিত্রাবলী ও অনুশাসন

হামাদান থেকে কেরমানশাহ্ রওয়ানা হলাম। এবার পথের ধারে জঙ্গল, নদী, পাহাড় সবই দেখা গেল। নদীর ধারে নীচু উপত্যকাগুলিতে ধানের চাষ চলেছে, অন্যান্য গ্রীষ্মপ্রধান দেশের ফসলও এবার দেখা দিল। পারস্যের এই অঞ্চলটিই ফিরদৌসির 'শাহনামা'র প্রধান রঙ্গভূমি।

পথে বিসেতুন (বেহিস্টন) গিরিগাত্রে উৎকীর্ণ দারয়-

হামাদান। শহরের ভিতরে জলপ্রপাত

বহৌসের জগদ্বিখ্যাত শত্রুজয়ের চিত্রাবলী ও স্মারকলিপি দেখা গেল। পাছে অন্য লোকে ইহা নষ্ট করে এইজন্য এটি দুর্গম পাহাড়ের গায়ে অসম্ভব উঁচুতে আঁকা ও লেখা আছে, অনেক চেষ্টা করেও এর কাছে পৌঁছান গেল

হামাদান। একবাটানায় তিস্তিহল, দূরে হামাদান শহর

না। প্রাণ হাতে ক'রে প্রায় ছয় সাত শত ফুট পাহাড়ের খাড়া গা বেয়ে বড় বড় পাথর ডিঙিয়ে যেখানে পৌছান গেল সেখান থেকে সমস্তটা দেখা যায় বটে কিন্তু ফোটো তোলা প্রায় অসম্ভব, সুতরাং যে ক'টি ছবি তুলেছিলাম

টাক-ই-বোস্তান। নৃপতি শাপুর যুবরাজ খসরুকে অভিষিক্ত করিতেছেন, পিছনে ইষ্টদেবতা অহুর মজ্‌দা

প্রায় সবগুলিই নষ্ট হয়ে গিয়েছিল। চিত্রাবলীতে প্রধান মূর্ত্তিগুলির উপরে ইরাণীয় ও ইলামিয় ভাষায় এবং নীচে বাবিলনীয় ভাষায় মূর্ত্তিগুলির নামধাম দেওয়া আছে। প্রথমটি দারয়বহোস, দ্বিতীয় মগুস (মেজিয়ান) গৌমাত, তৃতীয় সুসীয় আথ্রীনা, চতুর্থ বাবিলনীয় নিদিন্তবেল, পঞ্চম মাদ-জাতীয় ফ্রবর্ত্তিস, ষষ্ঠ সুসীয় মর্ত্তিয়, সপ্তম অসগর্ত্তীয় চিত্রংতখ্‌ম, অষ্টম পারসীক বহজদাত, নবম বাবিলনীয় অর্থ, দশম মর্গদেশীয় ফ্রাদ, একাদশ শক-জাতীয় স্কুখ। এই মূর্ত্তিগুলি নৃপতি দারয়বহোসের বিভিন্ন শত্রুর। নৃপতি এক শত্রুর বুকের উপর পা দিয়ে দাঁড়িয়ে আছেন, অন্যদের পিঠমোড়া ক'রে হাতে ও গলায় দড়ি দেওয়া আছে।

বিসেতুন থেকে আরও পনের কুড়ি মাইল দূরে "টাক-ই বোস্তান" গুহায় শাশানিয় যুগের প্রস্তর চিত্রাবলী
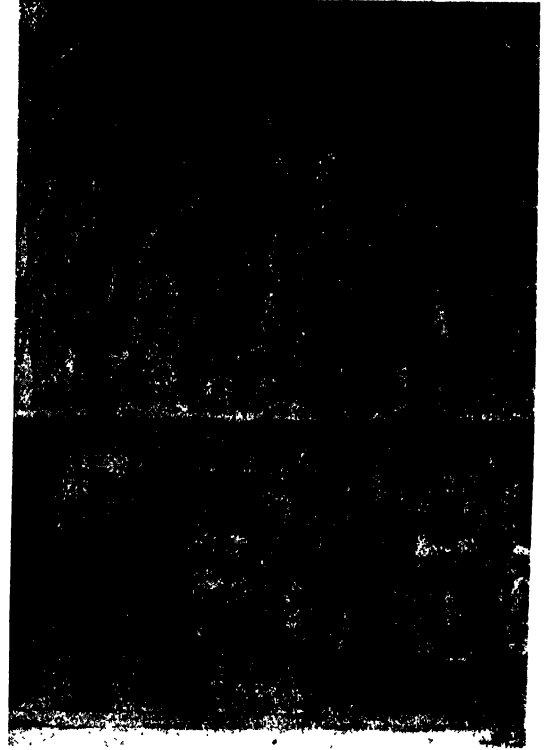
টাক-ই-বোস্তান। নীচে যুদ্ধসজ্জায় নৃপতি শাপুর। উপরে মধ্যে শাপুর, দুই পাশে খসরু ও শিরিন

আছে। নৃপতি খসরু ও তাঁহার মহিষী শিরিন (রোমক রাজ-দুহিতা), নৃপতি খসরুর মৃগয়া, নৃপতি শাপুরের যুদ্ধবেশ—এই সকল সেখানে রয়েছে। এই প্রস্তর-খোদিত চিত্রাবলীতে ভারতীয় শিল্পীর কলাকৌশলের নিদর্শন এতই স্পষ্ট—বিশেষ হাতীগুলির পরিকল্পনা এরূপ ভারতীয় ছাঁদের—যে পাশ্চাত্য দেশেও এখন অনেকে স্বীকার করতে বাধ্য হয়েছেন যে এগুলির অঙ্কনকার্য্যে ভারতীয় শিল্পীও বোধ হয় নিযুক্ত করা হয়েছিল।

* * *

কেরমানশাহে পৌছান গেল, শহরটি বেশ বড় এবং

কাস্‌রিশিরিনের পথে

টাক-ই-রোস্তান। খসরুর মৃগয়া। ভারতীয় যুদ্ধহস্তী দ্রষ্টব্য

কতকটা আমাদের পশ্চিম অঞ্চলের শহরগুলির নূতন অংশের মত দেখতে। গভর্ণর মহাশয় বেশ ভাল ইংরেজী জানেন। এখানকার হোটেলগুলি ক্রমেই ইউরোপীয় ছাঁচের হয়ে আসছে, কেননা কেরমানশাহ কাজভিন টাব্রিজ এই নগরগুলি ইউরোপের পথের ঘাঁটি।

কেরমানশাহের পর আমাদের আর এক জায়গায় মাত্র

পাহাড়ী

শ্রী আনন্দমোহন শাস্ত্রী

প্রবাসী প্রেস, কলিকাতা

থামতে হবে, তার পরই ইরাকে পৌঁছাব। তবে পথের এই শেষ অংশটুকু বেশ দুরূহ, যদিও হামাদান থেকে এখানে আসার পথে এবং শিরাজের আগে যে রকম দুর্গম গিরিশঙ্কট দিয়ে অতিশয় উঁচু পাহাড় টপ্‌কাতে হয়েছিল সে রকম আর করতে হবে না। হামাদান থেকে আসবার পথে—এবং কাজভিন থেকে হামাদান যেতেও একবার—আমরা পথের পাশে তুষার-স্তূপ পেয়েছিলাম। যদিও শীতের মরসুম অনেক দিন হ'ল কেটে গিয়েছে তা সত্বেও তুষার, এর থেকেই বোঝা যায় যে আমাদের কতটা উঁচুতে (আন্দাজ ১০০০০ ফুট) উঠে পাহাড় পার হ'তে হয়েছিল।

দিন-দুই পরে একদিন ভোরে কেরমানশাহ থেকে রওয়ানা হয়ে বেলা দশটা নাগাদ আমরা শাহাবাদ নামে একটি ছোট গ্রামে উপস্থিত হলাম। এ জায়গাটা প্রায় সমস্তই শাহের খাস জমীদারির মধ্যে। নূতন চাষের এবং আবাদের পত্তন অনেক জায়গায় হচ্ছে, নূতন ক'রে গাছ লাগিয়ে বনজঙ্গলও সৃষ্টি করা হচ্ছে। এই জেলার হাকিম একজন অল্পবয়স্ক সামরিক কর্ম্মচারী (কর্ণেল)। সীমান্তের কাছে ব'লে এখানে চুরি ডাকাতি খুবই বেশী হয় এবং সেই কারণে লোকেও চাষবাস বা বসতি করতে চায় না। শাহের জমীদারি করার মানে নূতন ক'রে লোকালয় সৃষ্টি করা, সেইজন্যে এখানে সামরিক শাসন-কর্ত্তা দিয়ে শান্তিস্থাপনের চেষ্টা চলেছে। এদিকের যাযাবরগুলি খুব দুর্দ্দান্ত, তা ছাড়া ইরাকের দুর্দ্ধর্ষ আরব যাযাবরের উৎপাতও আছে, সুতরাং অনেক কর্ম্মচারীই এখানে কাজ করতে এসে বিফল চেষ্টা ক'রে সুনাম খুইয়ে চলে গেছেন। উপস্থিত শাসনকর্ত্তাটি এপর্য্যন্ত খুব সাহস ও তৎপরতার সঙ্গে কাজ ক'রে বড় বড় দস্যুদল প্রায় সব নিকেশ করেছেন। ফলে অল্পবয়সেই খুব পদোন্নতি হয়েছে।

শাহাবাদে চা খেয়ে আমরা কেরেন্ট নামে ছোট পার্ব্বত্য শহরে চললাম। সেখানে পৌঁছে আমাদের মধ্যাহ্নভোজনের পালা শেষ হ'ল এবং কবি খানিকক্ষণ জিরিয়ে নিলেন। কেরেন্ট পাহাড়ের কোলে অতি সুন্দর একটি ছোট শহর। এখানকার অধিবাসীরা বোধ হয় আমাদের দেশের "ইরাণী" বেদে ও নটদের জাতভাই। চেহারা ও পোষাক এদের পারস্য দেশের অন্যান্য অঞ্চলের মত নয়, বিশেষ মেয়ে পুরুষে এরা এক রকম কাল পাগড়ী ব্যবহার করে যেটা সম্পূর্ণ বিদেশী ছাঁদের।

কেরেণ্টে কিছুক্ষণ থাকবার পর আবার পথে নামা গেল। সন্ধ্যার কাছাকাছি আমরা খসরু ও শিরিনের নামে প্রসিদ্ধ কাশরিশিরিন নগরে পৌঁছলাম। এই পথটুকুর প্রাকৃতিক দৃশ্যপট খুবই সুন্দর। গিরিপথ এঁকে বেঁকে চলেছে, কোথাও দু-ধারের পাহাড় ছোট ছোট গাছে ভরা, কোথাও বা দূরে নীচের উপত্যকায় হরিণ চরে বেড়াচ্ছে, আবার কোথাও বা গমের ক্ষেত সুপক্ক শস্যে ভরে গিয়েছে, চাষীর দল গম কেটে গাড়ীতে বোঝাই করছে। কাসরিশিরিন পৌঁছবার ঠিক আগেই খসরুর প্রাসাদের ধ্বংসাবশেষ দেখা গেল। অতীত গৌরবের স্মারক হিসাবে ছাড়া এর আর কিছুই বিশেষত্ব নেই, ধ্বংসের কাজ এতটাই এগিয়ে গিয়েছে।

কাসরিশিরিনে গিয়ে দেখলাম বালির আঁধি (স্যাণ্ডষ্টর্ম) চলেছে, আকাশ-বাতাস সবই বালিতে ভরা। ইরাকের মরুভূমি এগিয়ে এসেছে বোঝা গেল, গরমও বেশ টের পাওয়া গেল। এতদিনে বুঝলাম পারস্য-অধিত্যকার বেহেস্ত থেকে সমতল ধরাতলে প্রত্যাবর্ত্তন আরম্ভ হয়েছে।

আমেরিকায় ব্যাঙ্কিং সঙ্কট

শ্রীযোগেশচন্দ্র সেন, বি-এ (হারভার্ড)

গত ৪ঠা মার্চ্চ আমেরিকার নবনির্ব্বাচিত প্রেসিডেণ্ট রুজ্‌ভেণ্ট স্বীয় পদে অভিষিক্ত হইতে-না-হইতেই তথায় 'দারুণ ব্যাঙ্কিং এবং আর্থিক সঙ্কট উপস্থিত হইয়াছে। পৃথিবীর এক-তৃতীয়াংশ স্বর্ণ যে-দেশের কোষাগারে আবদ্ধ, যে-দেশ শিল্প-বাণিজ্যে অসাধারণ উৎকর্ষ লাভ করিয়াছে, যাহার শিল্প-কৌশল সকলের অনুকরণীয়, ব্যবহারিক জ্ঞানে এবং ধনে যে-দেশ অদ্বিতীয় বলিয়া খ্যাত —এহেন দেশের যে এরূপ অবস্থা হইবে তাহা কল্পনারও অতীত। তাহার ইতিহাসে এরূপ কঠিন ব্যাঙ্কিং সঙ্কট পূর্ব্বে কখনও উপস্থিত হয় নাই। যুক্তরাজ্যের অন্তর্গত আটচল্লিশটি ষ্টেটই এবং ডিষ্ট্রিক্ট অফ কলম্বিয়ার সমস্ত ব্যাঙ্ক লেন-দেন বন্ধ করিয়াছিল। প্রেসিডেণ্ট রুজ্‌ভেণ্ট ঘোষণা করিয়াছিলেন যে, আমেরিকা হইতে স্বর্ণ এবং রৌপ্য রপ্তানি হইতে পারিবে না, তদুপরি আরও নিয়ম করা হইয়াছিল যে, ব্যাঙ্ক পরস্পরের দেনা-পাওনা মুদ্রার দ্বারা নয়, পরন্তু ক্লিয়ারিং হাউস লোন্ সার্টিফিকেট দ্বারা পরিশোধ করিবে। কেহ স্বগৃহে মুদ্রা অথবা নোট সংগ্রহ করিয়া রাখিতে পারিবে না এবং বিদেশীয়দের প্রাপ্য স্বর্ণ ব্যাঙ্ক ভিন্ন তহবিলে পৃথক করিয়া রাখিতে পারিবে না।

ক্লিয়ারিং হাউস সার্টিফিকেট আমেরিকার একটি নিজস্ব আবিষ্কার। ফেডারেল রিজার্ভ ব্যাঙ্কের যোজনা হওয়ার পূর্ব্বেও প্রায় প্রত্যেক ব্যাঙ্কই ক্লিয়ারিং হাউসের মেম্বর হইত। ইহার উদ্দেশ্য এই যে, ব্যাঙ্কগুলি পরস্পরের দেনা-পাওনা যেন সহজে এবং মুদ্রার আদান-প্রদান না করিয়া মিটাইতে পারে। পূর্ব্বে প্রত্যেক মেম্বর-ব্যাঙ্ককেই ক্লিয়ারিং হাউসে স্বর্ণ মজুত রাখিতে হইত এবং তৎপরিবর্ত্তে স্বর্ণের পরিমাণ অনুসারে ৫,০০০ কিম্বা ১০,০০০ ডলারের ক্লিয়ারিং হাউস সার্টিফিকেট পাইত। প্রত্যেক মেম্বর-ব্যাঙ্ক অন্য ব্যাঙ্কের উপর যে-সব চেক্ জমা পায় সেগুলি লইয়া ক্লিয়ারিং হাউসে উপস্থিত হয়। চেকের আদান-প্রদান করিয়া যদি দেয় বেশী হয় তাহা হইলে ক্লিয়ারিং হাউস সার্টিফিকেট অথবা নগদ টাকা দ্বারা পরস্পরের দেনা চুকাইয়া দেয়। এরূপ করাতে এক-পয়সারও বিনিময় ব্যতীত লক্ষ লক্ষ টাকার জমা খরচ হইয়া যায়। ইহাই হইল ক্লিয়ারিং হাউস সার্টিফিকেটের মুখ্য উদ্দেশ্য। ফেডারেল্ রিজার্ভ ব্যাঙ্ক স্থাপনার পর হইতে ক্লিয়ারিঙের কাজ উহাদের মারফতেই হইয়া থাকে। প্রত্যেক মেম্বর-ব্যাঙ্ক তথায় চলতি খাতা রাখে এবং যাহাদের প্রাপ্য অপেক্ষা দেয় অধিক হয় তাহারা রিজার্ভ ব্যাঙ্কের উপর চেক্ দ্বারা দেনা মিটাইয়া দেয়।

আমেরিকায় যখনই ব্যাঙ্কিং সঙ্কট উপস্থিত হইয়াছে, তখনই প্রাপ্য টাকা না দিতে পারিয়া যাহাতে ব্যাঙ্ক ফেল্ না পড়ে সেজন্য ক্লিয়ারিং হাউস লোন্ সার্টিফিকেট দ্বারা ব্যাঙ্কসকল পরস্পরের দেনা-পাওনা শোধ করিয়াছে। সকলেই জানেন, ব্যাঙ্ক যে আমানত গ্রহণ করে উহার অধিকাংশ ভাগই লগ্নি করা হয়। যদি একই সময়ে সকলে টাকা উঠাইতে চায় তাহা হইলে ব্যাঙ্কের পক্ষে দেওয়া অসম্ভব। অথচ ব্যাঙ্কের মূল্যবান সম্পত্তি থাকে। এই অবস্থায় সঙ্কটের সময় আমেরিকার ব্যাঙ্ক শেয়ার, বণ্ড এবং কমার্শিয়াল্ পেপার অর্থাৎ দস্তাবেজী বিল ক্লিয়ারিং হাউসে জমা রাখে এবং সেগুলির মূল্যের তিন-চতুর্থাংশ পরিমাণ তাহাদিগকে ক্লিয়ারিং হাউস লোন্ সার্টিফিকেট্ দেওয়া হয়। লোন্ সার্টিফিকেট ব্যাঙ্কের পরস্পর দেনা-পাওনা মিটান ছাড়া অন্য কাজে ব্যবহৃত হয় না। সার্টিফিকেট দ্বারা যে ঋণ গ্রহণ করা হয়, উহার সুদের হার অত্যন্ত উচ্চ হওয়াতে প্রয়োজনাতিরিক্ত বেশী দিন কেহ তাহা অনাদায় রাখে না।

যখনই আমেরিকার আর্থিক এবং ব্যাঙ্কিং সঙ্কট উপস্থিত হইয়াছে তখনই সেখানে ক্লিয়ারিং হাউস লোন্ সার্টিফিকেটের প্রচলন হইয়াছে। প্রথম ইহার প্রচলন হইয়াছিল ১৮৬০ সালে। তৎপর ১৮৬১, ১৮৭৩, ১৮৮৪, ১৮৯০, ১৯০৭, ১৯১৪ এবং বর্ত্তমানে ইহার প্রচলন হইয়াছে। সঙ্কটের সময় যাহাতে মুদ্রার আদান প্রদান কম হয় সেই উদ্দেশ্যেই এই সার্টিফিকেট্ ব্যবহৃত হয়।

১৯৩১ সালের অক্টোবর মাসে যখন ব্রিটেন স্বর্ণমান স্থগিত করে তখন ভারতবর্ষে তিন দিন সমস্ত ব্যাঙ্ক বন্ধ রাখা হইয়াছিল। আমেরিকায়ও প্রথম ৬ই মার্চ্চ হইতে ৯ই মার্চ্চ পর্য্যন্ত এবং পরে ১৫ই মার্চ্চ পর্য্যন্ত, মোট দশ দিন সমস্ত ব্যাঙ্ক বন্ধ রাখা হইয়াছিল। দশ দিন পরেও সমস্ত ব্যাঙ্ক খোলা হয় নাই, শুধু যেগুলি সুদৃঢ় বলিয়া বিবেচিত উহারাই কার্য্য করিবার অনুমতি পাইয়াছে। স্বর্ণ রপ্তানি বন্ধ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ডলারের সহিত অন্যান্য মুদ্রার বিনিময়ের হার নির্ণয় করাও বন্ধ করা হইয়াছিল। কতকগুলি ব্যাঙ্ক কারবার আরম্ভ করাতে পুনরায় মুদ্রা বিনিময়ের পূর্ব্বের হারই বজায় রহিয়াছে। ইহা হইতে ইহাই প্রতিপন্ন হয় যে, আমেরিকা স্বর্ণমান পরিত্যাগ করিবে না। কেন-না, স্বর্ণ রপ্তানি একেবারে বন্ধ করিলে স্বর্ণমান স্থগিত হইবেই। তবে পূর্ব্বের ন্যায় অবাধে আমেরিকা হইতে স্বর্ণ রপ্তানি হইতে পারিবে না,

কিন্তু প্রয়োজন হইলে গভর্ণমেণ্টের তত্ত্বাবধানে স্বর্ণ রপ্তানি করা যাইবে।

কি কারণে আমেরিকায় হঠাৎ কঠিন ব্যাঙ্কিং সঙ্কট উপস্থিত হইল তাহা বিবেচনা করিলে মনে হয় সে-দেশের ব্যাঙ্কিং পদ্ধতির গোড়ায় যে গলদ আছে তাহাই মুখ্যতঃ ইহার জন্য দায়ী। ১৯২৯ সাল হইতে আমেরিকার ব্যবসায় ও বাণিজ্য দিন দিন মন্দা হইতে চলিয়াছিল। প্রেসিডেণ্ট নির্ব্বাচনের সময়ে ভূতপূর্ব্ব প্রেসিডেণ্ট হুভার বলিয়াছিলেন, আমেরিকার আর্থিক অবস্থা এমন হইয়াছিল যে সে প্রায় স্বর্ণমান পরিত্যাগ করিতে আয়োজন করিয়াছিল। অনেকে এই উক্তি নির্ব্বাচন প্রসঙ্গে একটি ধাপ্পাবাজী বলিয়া উড়াইয়া দিতে চাহিয়াছিলেন। কিন্তু যাঁহারা আমেরিকার আর্থিক অবস্থার খোঁজ রাখেন তাঁহারা মনে করেন প্রেসিডেণ্ট হুভার সত্যই বলিয়াছিলেন। প্রথমতঃ, আমেরিকার বজেটে আয়-ব্যয়ের সামঞ্জস্য সাধিত হয় নাই। দ্বিতীয়তঃ, নূতন করের যে সব প্রস্তাব করা হইয়াছিল। কংগ্রেস সেগুলি অনুমোদন করে নাই, তৃতীয়তঃ ব্যয়সঙ্কোচেরও বিশেষ কোন চেষ্টা করা হয় নাই। এই-সব কারণে আয় অপেক্ষা ব্যয় উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাওয়াতে অন্যান্য দেশে এবং আমেরিকায়ও এই ধারণা বলবতী হইয়াছিল যে আমেরিকার আর্থিক অবস্থা আরও হীন হইবে। এই জন্যই ব্যাঙ্ক হইতে টাকা তুলিবার ব্যগ্রতা আরম্ভ হইয়াছিল। প্রথম মিশিগ্যান ষ্টেটে ইহা আরম্ভ হয়। ফলে সেখানকার গভর্ণর ব্যাঙ্ক-ছুটি ঘোষণা করেন। মিশিগ্যানের দেখাদেখি অন্যান্য ষ্টেটে আতঙ্ক ছড়াইয়া পড়িল এবং সমস্ত দেশ-ব্যাপী এরূপ একটি অবস্থার সৃষ্টি হইল যাহাতে যুক্তরাজ্যের প্রেসিডেণ্ট সমস্ত দেশব্যাপী ব্যাঙ্ক-ছুটি দিতে বাধ্য হইলেন।

একদিকে আয় অপেক্ষা ব্যয়-বৃদ্ধি, অন্য দিকে পশ্চিম ভাগের ষ্টেটের কৃষকদের অনবরত মাগ্‌নি যে সরকার তাহাদের অতিরিক্ত কাঁচা মাল ক্রয় করুন, যেহেতু অন্যান্য দেশের মত মালের মূল্য হ্রাস হইলে তাহাদের সর্ব্বনাশ হইবে। নির্ব্বাচনক্ষেত্রে তাহাদের ভোটের মূল্য অধিক এবং যদি তাহাদের আবেদন গ্রাহ্য না করা হয় তাহা হইলে সঙ্ঘবদ্ধ কৃষকেরা নির্ব্বাচনে অন্য পক্ষকে ভোট দিবে ইহাও নিশ্চিত। এই সমস্যায় পড়িয়া ভূতপূর্ব্ব প্রেসিডেণ্টদের আমলে ফেডারেল ফার্ম্ম বোর্ড নামে একটি সংস্থা গঠন করা হয়; ইহার উদ্দেশ্য ছিল গম, তুলা, প্রভৃতি সরকারের তরফে ক্রয় করা, যাহাতে ইহাদের মূল্য হ্রাস না হয়। এইরূপ করিতে গিয়া সরকার যে অপর্য্যাপ্ত অর্থ খরচ করেন, তাহা সত্ত্বেও পৃথিবীব্যাপী মন্দার দরুণ কাঁচা মালের মূল্য অসম্ভব হ্রাস হওয়াতে, আমেরিকায় ইহাদের মূল্য উচ্চ রাখা অসম্ভব হইয়া পড়িল। অনেকে বলেন, ফেডারেল্ ফার্ম্ম বোর্ড কাঁচা মাল কিনিতে যে টাকা ব্যয় করিয়াছেন তাহা প্রায় সমস্তই লোকসান হইয়াছে, সুতরাং বাধ্য হইয়া আর কাঁচা মাল খরিদ করিতে পারিতেছে না। প্রেসিডেণ্ট রুজভেণ্ট তাই প্রস্তাব করিয়াছেন আইন দ্বারা নির্দ্দিষ্ট জমির অতিরিক্ত কেহ চাষ করিতে পারিবে না এবং কৃষকদিগের লোকসান 'রিকনষ্ট্রাকসন ফাইন্যান্স করপোরেশন' হইতে পূরণ করা হউক। আমাদের মনে হয়, সে-দেশের বর্ত্তমান ব্যাঙ্কিং সঙ্কট অনেক পরিমাণে গভর্ণমেণ্টের এই নীতির ফলে উপস্থিত হইয়াছে। ১৯২৯ সালের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত আমেরিকায় ব্যবসায়-বাণিজ্যের দ্রুত উন্নতি হইয়াছিল, ব্যবসায়ের পরিমাণ বৃদ্ধি হইয়া ব্যাঙ্কের আমানত বৃদ্ধি পাইয়াছিল। পশ্চিম এবং দক্ষিণ ভাগের ছোট ছোট ব্যাঙ্কগুলি অধিকাংশ টাকাই জমি বন্ধক রাখিয়া ধার দিয়াছিল। গম এবং তুলার মূল্য সেই সময় অধিক হওয়ায় জমির মূল্যও অত্যন্ত বৃদ্ধি পাইয়াছল। কিন্তু যখন গম তুলা এবং অন্যান্য কাঁচা মালের দাম কমিতে লাগিল তখন জমির দরও কমিল। ১৯২৯ সালের সহিত তুলনা করিলে দেখা যায় যে বর্ত্তমানে জমির মূল্য পূর্ব্বের অপেক্ষা প্রায় এক-তৃতীয়াংশ। কাজেই ব্যাঙ্ক যে টাকা ধার দিয়াছিল তাহা সম্পূর্ণ আদায় করিবার কোন উপায় ছিল না। যদি প্রথম হইতেই তাহারা জমি বিক্রয় করিয়া টাকা আদায়ের চেষ্টা করিত তাহা হইলে হয়ত তাহাদিগকে এতটা লোকসান দিতে এবং অবশেষে কার্য্য বন্ধ করিতে হইত না। কিন্তু ফার্ম্ম বোর্ড অতিরিক্ত গম কিনিবে, গমের বাজার চড়িবে এবং সেই সময় জমির দরও বাড়িবে, এই আশায় ছোট ব্যাঙ্কগুলি জমি বিক্রয় করিয়া টাকা আদায়ের চেষ্টা করিল না। অতএব দিন দিন ব্যাঙ্কের অবস্থা আরও কাহিল হইতে লাগিল এবং আমানতী টাকা প্রত্যর্পণ করিতে না পারায় অবশেষে তাহারা কার্য্য বন্ধ করিতে বাধ্য হইল। ঠিক অনেকটা এই কারণেই সে দেশের লোন্ আপিসগুলি দুর্দ্দশাগ্রস্ত হইয়াছে। স্বল্প সময়ের আমানত গ্রহণ করিয়া বন্ধকী কারবার করিলে এই পরিণাম অবশ্যম্ভাবী। ফার্ম্ম বোর্ডের কার্য্যপ্রণালী পর্য্যালোচনা করিলে ইহাই মনে হয় যে, শুধু আইন-কানুন দ্বারা কোন দেশ নিজের অবস্থা উন্নত করিতে পারে না। অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে আমাদের পরস্পরের সহিত এত ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ যে, পৃথিবীব্যাপী সর্ব্বত্র কাঁচা এবং যন্ত্রপাতি দ্বারা নির্ম্মিত মালের মূল্য হ্রাস হইলে কোন বিশেষ দেশে তাহার অপেক্ষা অধিক উচ্চ মূল্য বজায় রাখা যায় না।

আমেরিকা কাঁচা মালের মূল্য উচ্চ করিবার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়াছে, কিন্তু সফল হইতে পারে নাই। এরূপ করিতে গিয়া ব্যাঙ্কের উপর একটা অবিশ্বাস উৎপন্ন হইয়াছে। ১৯৩০ সালে ১,৩৪৫ ব্যাঙ্ক—যাহাদের পুরা আমানত ৮৬৫ মিলিয়ন ডলার; ১৯৩১ সালে ২,২৯৮টি ব্যাঙ্ক—যাহাদের পুরা আমানত ১৬৯২ মিলিয়ন ডলার এবং ১৯৩২ সালে ১৪৫৪ ব্যাঙ্ক—যাহাদের পুরা আমানত ৭৩০ মিলিয়ন ডলার, এতগুলি ব্যাঙ্ক ফেল পড়িয়াছে। ব্যাঙ্ক এবং অন্যান্য ব্যবসায়ের এইরূপ শোচনীয় পরিণাম দেখিয়া গত বৎসর রিকনষ্ট্রাকশন ফাইন্যান্স করপোরেশন নামীয় আর একটি সংস্থা গঠন করা হইয়াছে। ইহার মুখ্য উদ্দেশ্য সঙ্কটাপন্ন ব্যবসায়ের সাহায্য করা এবং মৃতপ্রায়, অথচ যাহাদের স্পন্দনক্রিয়া একেবারে লোপ পায় নাই এরূপ ব্যবসায়কে পুনর্জীবিত করা। ১৯৩২ সালের ২রা ফেব্রুয়ারি হইতে ৩১শে ডিসেম্বর পর্য্যন্ত রিকনষ্ট্রাকশন ফাইনান্স করপোরেশন ব্যাঙ্ক, এবং ট্রাষ্ট কোম্পানীগুলিকে ৫৭৫ মিলিয়ন ডলার,রেল কোম্পানীগুলিকে ২৭২ মিলিয়ন ডলার এবং অন্যান্য কোম্পানীকে ২৬১ মিলিয়ন ডলার ধার দিয়াছে। ইহা অবশ্যই স্বীকার্য্য যে, এই সংস্থা হইতে উপযুক্ত সাহায্য পাওয়াতে ব্যাঙ্ক এবং অন্যান্য অনেক ব্যবসায় টিকিয়া থাকিতে সমর্থ হইয়াছে।

আমেরিকায় অনেকেরই বিশ্বাস হইয়াছিল যে তাহারা ফাঁড়া কাটাইয়া উঠিয়াছে, মন্দা শেষ সীমায় পৌঁছিয়াছে, এখন হইতে ধীরে ধীরে ব্যবসায়-বাণিজ্যের উন্নতি হইবে। যদিও ১৯৩১ সালের তুলনায় ১৯৩২ সালে ব্যবসায়-বাণিজ্যের বিশেষ উন্নতি হয় নাই, তথাপি অবনতিও কিছু হয় নাই। অতএব তাহারা আশা করিয়াছিল ১৯৩৩ সালে অবস্থার পরিবর্ত্তন ঘটিবে। কিন্তু আন্তর্জাতিক অবস্থার কোন উন্নতি দেখা যাইতেছিল না। একের পর আর এক দেশ স্বর্ণমান পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হইয়াছিল। গত ডিসেম্বর মাসে ফ্রান্স আমেরিকাকে দেয় ঋণের কিস্তি দিতে অস্বীকার করিল, ব্রিটেন যদিও তাহার ঋণের কিস্তি প্রদান করিল তথাপি সে বলিয়া রাখিল ইতিমধ্যে যদি কোন রফা না হয় তাহা হইলে সে জুন মাসের কিস্তি দিতে পারিবে না। তাহার বক্তব্য এই যে, ঋণ শোধ করিবার একমাত্র উপায় মালের আদান প্রদান। আমেরিকা শুল্কের হার অসম্ভব বাড়াইয়া দেওয়াতে, ব্রিটিশ মাল তথায় প্রবেশ করিতে পারিতেছে না, সুতরাং দেনা শোধ করিবার উপায় রহিল স্বর্ণরপ্তানি দ্বারা। কিন্তু তাহার তহবিলে স্বর্ণ বেশী নাই, যাহা আছে তদ্দ্বারা সমস্ত দেনা শোধ হইবে না, অধিকন্তু নিঃশেষ করিয়া সব স্বর্ণ দিলে ব্রিটিশ ব্যবসা-বাণিজ্যের অশেষ ক্ষতি হইবে। ব্রিটেনের যুক্তিপূর্ণ প্রতিবাদ আমেরিকা একেবারে অগ্রাহ্য করে নাই, এবং ভবিষ্যতে পন্থা নির্ণয় করিবার জন্য ব্রিটিশ প্রতিনিধির সহিত প্রেসিডেণ্ট রুজ্‌ভেল্টের আলোচনা চলিতেছিল। স্বর্ণ তহবিল কোন্ দেশে কত ছিল, তাহা নিম্নের হিসাব হইতে জানা যাইবে।

স্বর্ণ-তহবিল

মিলিয়ন ডলার-এ বিদেশী মুদ্রা পার অফ এক্সচেঞ্জে পরিবর্ত্তিত করা হইয়াছে—

	১৯৩১	১৯৩২			১৯৩৩
	সপ্তাহশেষ—সেপ্টেম্বর ১৯	জানুয়ারি ৯	ফেব্রুয়ারি ২৫	জুলাই ৭	জানুয়ারি ৭
ব্যাঙ্ক অফ ইংলণ্ড	৬৬০	৫৮৮	৫৮৮	৬৬২	৫৮৩
আমেরিকার রিজার্ভ ব্যাঙ্ক সমূহ	৩৪৮৬	২৯৪৬	২৯৩৮	২৫৭৮	৩১৭৩
ব্যাঙ্ক দ্য ফ্রান্স	২২৯৬	২৭১৪	২৯৪১	৩২৩১	৩২৪৩
রাইশ্‌ ব্যাঙ্ক	৩২১	২৩৪	২২২	১৯২	২৩৩
নেদারল্যাণ্ডস্ ব্যাঙ্ক	৩৬৭	৩৫৪	৩৪৯	৪০৫	৪১৫
ন্যাশন্যাল ব্যাঙ্ক অফ বেলজিয়াম	২২৪	৩৫৪	৩৫১	৩৫৭	৩৬১
সুইস্ ন্যাশন্যাল ব্যাঙ্ক	২৩৪	৪৬৪	৪৮২	৫০৩	৪৭৭
ব্যাঙ্ক অফ সুইডেন	৬১	৫৫	৫৫	৫৫	৫৫
ব্যাঙ্ক অফ নরওয়ে	৩৯	৩২	৩২	৪০	৩৯
ব্যাঙ্ক অফ ইটালি	২৮৫	২৯৬	২৯৬	২৯৯	৩০৮
ব্যাঙ্ক অফ জাপান	৪০৭	২৩৪	২১৫	২১৪	২১২
মোট	৮২৮০	৮৩১১	৮৪৬৯	৮৫৩৬	৯০৯৯

মোটের উপর দেখিতে গেলে সব দিক হইতেই অবস্থা পূর্ব্বাপেক্ষা অনেকটা আশাপ্রদ বলিয়া মনে হইতেছিল। তথাপি এমনি সময়ে হঠাৎ এরূপ ব্যাঙ্কিং সঙ্কট উপস্থিত হইল যাহাতে প্রথমে চারি দিন, অতঃপর আর ছয় দিন, মোট দশ দিন, আমেরিকার সমস্ত ব্যাঙ্ক কার্য্য বন্ধ করিতে বাধ্য হইল। একটি লক্ষ্য করিবার বিষয় এই যে, বর্ত্তমান সময়ে ব্যাঙ্কের নগদ মজুত যে পরিমাণে আছে ইতিপূর্ব্বে কখনও সেরূপ ছিল না। ব্যবসা-বাণিজ্যে মন্দার দরুণ, ব্যাঙ্কের আমানত এত বৃদ্ধি পাইয়াছে যে সব দেশেই ব্যাঙ্ক সুদের হার কমাইয়াছে। এখন টাকা লগ্নি করাই ব্যাঙ্কের পক্ষে একটি সমস্যা হইয়া দাঁড়াইয়াছে। নিউইয়র্ক ন্যাশন্যাল সিটি ব্যাঙ্কের ১৯৩৩ সালের ফেব্রুয়ারি মাসের রিপোর্ট হইতে জানা যায় যে আমেরিকার প্রধান প্রধান টাকার বাজারে জানুয়ারি মাসেও পূর্ব্বের মাসের ন্যায় টাকার অধিক আমদানী হইয়া ব্যাঙ্কের রিজার্ভ অত্যন্ত বৃদ্ধি হইয়াছিল। স্বর্ণ আমদানী হওয়াতে স্বর্ণের পরিমাণ ৫১ মিলিয়ন ডলার বাড়িয়াছে। খৃষ্টমাসের পর ব্যাঙ্কে ৭৬ মিলিয়ন ডলার পুনরায় জমা হইয়াছে। জমা বৃদ্ধির সঙ্গে ব্যবসা-বাণিজ্যের জন্য টাকার মাগনি না হওয়াতে, আইন অনুসারে যত রিজার্ভ রাখা প্রয়োজন তদপেক্ষা ৫০০ মিলিয়ন ডলার বাড়িয়াছে। একদিকে অত্যধিক জমা এবং অন্যদিকে টাকার মাগনি কম, কাজেই সুদের হার অত্যন্ত কমিয়াছে। নব্বই দিনের দস্তাবেজী বিলের সুদের হার দাঁড়াইয়াছে শতকরা একটাকা চারি আনা, ষ্টক এক্সচেঞ্জের ধারের সুদ আট আনা হইতে বারো আনা, এক বৎসরের গভর্ণমেণ্ট সিকিউরিটির সুদ শতকরা আট আনা। টাকার বাজার এরূপ ঢিলা হওয়াতে আমেরিকার প্রত্যেক সুদৃঢ় ব্যাঙ্কের নগদ মজুত তাহাদের দেনার প্রায় পঞ্চাশ হইতে পঁচাত্তর টাকা পর্য্যন্ত ছিল।

ইহা সত্ত্বেও হঠাৎ এরূপ ব্যাঙ্কিং সঙ্কট কেন উপস্থিত হইল, তাহা বিবেচনা করিলে মনে হয় আমেরিকানদের সাময়িক স্নায়বিক উত্তেজনার ফলেই এরূপ ঘটিয়াছিল। যদি সে-দেশের ব্যাঙ্কের অবস্থা এতই সঙ্কটাপন্ন হইত তাহা হইলে দশ দিন পরেই অধিকাংশ ব্যাঙ্ক কার্য্য আরম্ভ করিতে পারিত না। আরও মনে হয়, আমেরিকার ব্যাঙ্কিং আইনের গলদের জন্যই সে-দেশে ক্রমাগত ব্যাঙ্কিং সঙ্কট উপস্থিত হয়। প্রথমতঃ, ফেডারেল আইন, যাহা ন্যাশানল ব্যাঙ্ক য়্যাক্ট নামে খ্যাত, সেই আইন অনুসারে যে সব ব্যাঙ্ক স্থাপিত হয় তাহাদের মূলধন এবং অন্যান্য বিষয়ে বেশ কড়া নিয়ম আছে। তাহা ছাড়া প্রত্যেক ষ্টেটেই স্বতন্ত্র ব্যাঙ্কিং আইন আছে; সে-গুলির নিয়মাবলী অপেক্ষাকৃত শিথিল। মোটামুটি বলা যাইতে পারে, পশ্চিম এবং দক্ষিণ ভাগের ষ্টেটগুলির ব্যাঙ্কিং আইন পূর্ব্ব ভাগের ষ্টেট অপেক্ষা অধিক শিথিল। ইহার ফলে প্রথমোক্ত বিভাগে সহস্র সহস্র ছোট ব্যাঙ্ক স্থাপিত হইয়াছে, যাহাদের মূলধন কম, পরিচালনে দক্ষতার অভাব এবং আমানতী টাকার বেশীর ভাগ জমিজমায় দাদন দেওয়া হইয়াছে। আমানতি টাকা চাহিবামাত্র প্রত্যর্পণ করিতে ইহারা বাধ্য, অথচ জমিজমার মূল্য পূর্ব্বের তুলনায় প্রায় এক-তৃতীয়াংশ হওয়ায় বিক্রয় করিয়া টাকা দেওয়ার কোন উপায় ছিল না। এরূপ অবস্থায় অধিকাংশ ছোট ব্যাঙ্কই দরজা বন্ধ করিতে বাধ্য হইয়াছিল। ১৯২৯ সন হইতে আমেরিকায় যে পাঁচ হাজারের অধিক ব্যাঙ্ক ফেল পড়িয়াছে উহাদের অধিকাংশই এই শ্রেণীর ব্যাঙ্ক। আমেরিকার ব্যাঙ্ক আইন এইরূপ যে যে-ষ্টেটের আইন অনুসারে ব্যাঙ্ক স্থাপিত হয় সে ষ্টেট ছাড়া অন্য ষ্টেটে প্রায়ই উহারা শাখা স্থাপন করিতে পারে না। এই নিয়মের ফলে আমেরিকায় প্রায় ২৬,০০০ ব্যাঙ্ক ছিল। উহাদের বর্ত্তমান সংখ্যা এখন ১৮,০০০ হাজারে দাঁড়াইয়াছে।

ছোট ব্যাঙ্কগুলির নগদ মজুত সম্পত্তি খুব কম। তাহা ছাড়া ইহার অধিকাংশ ভাগই নিউইয়র্কে অন্য ব্যাঙ্কে জমা রাখা হয়। যখনই কোন কারণে টাকার চাহিদা বাড়ে তখনই ইহারা নিউইয়র্ক হইতে টাকা তুলিবার জন্য ব্যস্ত হইয়া পড়ে। ইহার ফলে নিউইয়র্ক ব্যাঙ্ক-গুলির উপর টাকার মাগনি অত্যন্ত বৃদ্ধি পায় এবং যদি তাহারা তৎক্ষণাৎ দাবি না মিটাইতে পারে তাহা হইলে দেশব্যাপী ব্যাঙ্কিং সঙ্কট উপস্থিত হয়। পূর্ব্বে যখনই ব্যাঙ্কিং সঙ্কট উপস্থিত হইয়াছে তখনই দেখা গিয়াছে যে, হঠাৎ দেশব্যাপী টাকার মাগনি হওয়ায় নিউইয়র্কের ব্যাঙ্কগুলি সময়মত টাকা দিতে না পারায় সর্ব্বত্র আতঙ্ক ছড়াইয়া পড়িয়াছে।

সহস্র সহস্র ব্যাঙ্ক থাকার দরুণ বিপদকালে ইহারা একজোট হইয়া কাজ করিতে পারে না। তাই মনে হয়, আমেরিকার ব্যাঙ্কিং আইনের আমূল পরিবর্ত্তন প্রয়োজন। ভিন্ন ভিন্ন ষ্টেটের স্বতন্ত্র ব্যাঙ্কিং আইনের বদলে একই ফেডারল আইন অনুসারে সমস্ত ব্যাঙ্ক বিধিবদ্ধ হওয়া উচিত। তাহা ছাড়া শাখা স্থাপনা করিবার অঙ্কুশ উঠাইয়া দেওয়া উচিত। আমেরিকান ব্যাঙ্ক দক্ষিণ আমেরিকায়, চীনে, জাপানে, ভারতবর্ষে এবং পৃথিবীর সর্ব্বত্র নিজেদের শাখা খুলিতে পারে—অথচ নিজের দেশে তাহাদের সেই অধিকার নাই! যুক্তরাজ্য স্থাপনার প্রথম হইতেই ষ্টেট এবং ফেডারেল গবর্ণমেণ্টের অধিকার সম্বন্ধে তীব্র

মতভেদ চলিয়াছে। ষ্টেটগুলি ফেডারেল গভর্ণমেণ্টের অধিকার সন্দেহের চক্ষে দেখে এবং সর্ব্ববিষয়েই নিজেদের ক্ষমতা অক্ষুণ্ণ রাখিতে চেষ্টা করে। যদিও অবস্থায় পড়িয়া তাহাদের ক্ষমতা কতকটা খর্ব্ব হইয়াছে, তথাপি অনেক বিষয়েই ফেডারেল এবং ষ্টেট গভর্ণমেণ্টের ভিন্ন ভিন্ন বিধি-নিয়ম আছে। যতদিন অন্যান্য দেশের সহিত যুক্তরাজ্যের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ ছিল না ততদিন ইহার অপকারিতা তাহারা তত অনুভব করে নাই। কিন্তু বিগত মহাযুদ্ধের পর হইতে অন্যান্য দেশের সহিত আমেরিকার নিকট সম্বন্ধ হইয়াছে। যুদ্ধের দ্রব্যসম্ভার খরিদ করিয়া ইউরোপের অনেক দেশই তাহার নিকট ঋণী হইয়াছে। তাহা ছাড়া যুদ্ধাবসানে জার্ম্মানী, অষ্ট্রীয়া প্রভৃতি দেশকে আমেরিকা অপর্য্যাপ্ত ধার দিয়াছে। ইউরোপের প্রত্যেক দেশই আমেরিকার নিকট ঋণী, সুতরাং লগ্নি টাকার জন্যও ইচ্ছায় হউক অনিচ্ছায় হউক তাহাদিগকে ইউরোপের সহিত সম্বন্ধ রাখিতে হইবেই। যদি ইউরোপের কোন প্রকার আর্থিক দুর্দ্দশা উপস্থিত হয়, তাহা হইলে আমেরিকাকেও ইহার ফল ভোগ করিতে হয়। কাজেই আনুষঙ্গিক অবস্থার প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে মনে হয়, আমেরিকা পূর্ব্বে যেরূপে স্বতন্ত্র ভাবে চলিতেছিল এখন তাহার পক্ষে আর সেরূপে চলা সম্ভব নয়। কাজেই তাহার ব্যাঙ্কিং আইন পরিবর্ত্তন করার প্রয়োজন হইয়াছে। একই ফেডারেল আইন অনুসারে যদি সব ব্যাঙ্ক বিধিবদ্ধ হয় এবং যদি শাখা স্থাপন করিতে কোন অঙ্কুশ না থাকে, তাহা হইলে কয়েক বৎসরের মধ্যেই আমেরিকায় কয়েকটি সুদৃঢ় বড় ব্যাঙ্ক স্থাপিত হইবে। তখন ছোট এবং দুর্ব্বল ব্যাঙ্কগুলি বাধ্য হইয়া উঠিয়া যাইবে, এবং ব্যাঙ্ক সংখ্যায় কম হইলে বিপদের সময়ে ইহারা পরস্পরের সহায়তা করিয়া সাময়িক আতঙ্ক নিবারণ করিতে সমর্থ হইবে।

স্বর্ণ এবং রৌপ্য রপ্তানির বিরুদ্ধে ঘোষণার পশ্চাতে আরও কিছু গুরুতর মতলব আছে বলিয়া অনেকে মনে করেন। আমেরিকা স্বর্ণমানে প্রতিষ্ঠিত থাকায় ডলারের মূল্য অন্যান্য মুদ্রার, যেমন ষ্টারলিং, ইয়েন ইত্যাদির তুলনায় অত্যন্ত বৃদ্ধি পাইয়াছে। পূর্ব্বে এক ষ্টারলি-এর মূল্য ছিল ৪ ডলার ৮৬৷ সেণ্ট, এখন হইয়াছে ৩ ডলার ৪৪ সেণ্ট। কাজেই যেখানে ষ্টারলিং মুদ্রা প্রচলিত আছে, সেখানে আমেরিকার মালের মূল্য সেই অনুপাতে বৃদ্ধি পাইয়াছে। ডলারের মূল্য অন্য মুদ্রার তুলনায় বৃদ্ধি হওয়াতে আমেরিকার রপ্তানি বাণিজ্য প্রায় বন্ধ হইয়া গিয়াছে। যখন ব্রিটেন স্বর্ণমান পরিত্যাগ করিয়াছিল তখন সে-দেশের অনেক সুপণ্ডিত বলিয়াছিলেন ইহার ফলে ব্রিটেনের রপ্তানি বাড়িবে এবং আমদানী কমিবে। অনেকে মনে করেন, জাপানও এই সুবিধার জন্যই স্বর্ণমান পরিত্যাগ করিয়াছে। এই ঘটনার পর হইতেই জাপানী পণ্য সব দেশেই অত্যধিক ছড়াইয়া পড়িয়াছে এবং ভারতের বাজারে তাহারা এ-প্রকার প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিতেছে যে বোম্বাই এবং আমেদাবাদের অনেক কাপড়ের কল বন্ধ হইয়াছে। শুধু তুলাজাত দ্রব্য নয়, অন্যান্য অনেক প্রকার মালও তাহারা এদেশে আমদানী করিয়া আমাদের অনেক শিল্পকে ধ্বংসমুখে আনিয়াছে।

এই সব বিচার করিয়া আমেরিকায় অনেকে বলিতেছেন স্বর্ণমান পরিত্যাগ না করিলে তাহাদের রপ্তানি বাণিজ্য মাথা তুলিয়া দাঁড়াইতে পারিবে না এবং বেকারের সংখ্যা দিন দিন বাড়িবে।। আবার কেহ কেহ বলেন, চলতি মুদ্রার ন্যূনতার জন্যই এই সঙ্কট উপস্থিত হইয়াছে। যদি মুদ্রার সংখ্যা বৃদ্ধি করা হয়, তাহা হইলে মালের মূল্য বৃদ্ধি পাইবে এবং তৎসঙ্গে দেশের আর্থিক অবস্থা উন্নত হইবে। কিন্তু দেখা যাইতেছে, ব্যাঙ্কে যে পরিমাণে আমানত বৃদ্ধি হইতেছে তাহাতে মুদ্রার অসচ্ছলতা প্রমাণ হয় না। বর্ত্তমান সমস্যা চলতি মুদ্রার স্বল্পতা নয়, পরন্তু ব্যবসা-বাণিজ্যের মন্দা। যদি ব্যবসাতে টাকা খাটাইতে পারা যাইত, তাহা হইলে ব্যাঙ্ক শতকরা চার আনা আট আনা হিসাবে কেন লগ্নি করিবে? শুধু চলতি মুদ্রার বৃদ্ধিতে মালের মূল্য হ্রাসবৃদ্ধি হইতে পারে না, কেন-না যে পর্য্যন্ত মালের মাগনি না বাড়ে ততদিন মুদ্রার মাগনি বৃদ্ধি পাইবে কি প্রকারে?

আবার কেহ কেহ বলিতেছেন, স্বর্ণ ডলারের স্বর্ণাংশ কম করিয়া দেওয়া হউক, তাহা হইলেই অন্য দেশের মুদ্রার বিনিময়ে ডলারের মূল্য কমিয়া যাইবে এবং তৎসঙ্গে আমেরিকার রপ্তানি বাণিজ্য আবার পূর্ব্বাবস্থায় ফিরিয়া আসিবে। মোট কথা এই, আমেরিকান ব্যাঙ্কের বর্ত্তমান অবস্থা পর্য্যালোচনা করিলে এই বিশ্বাস দৃঢ় হয় যে ইহাদের আর্থিক অবস্থা এমন কিছু মন্দ ছিল না যাহার জন্য দেশব্যাপী সমস্ত ব্যাঙ্কেই বন্ধ করিবার প্রয়োজন ছিল। অনেক ক্ষুদ্র ব্যাঙ্ক ফেল পড়ায় এবং আমেরিকার ভবিষ্যত আর্থিক অবস্থার প্রতি সন্দেহ হইতেই একটা সাময়িক আতঙ্কের সৃষ্টি হইয়া এই কাণ্ডটা ঘটিয়াছিল। তাহা না হইলে দশ দিন পরেই কি প্রকারে অধিকাংশ ব্যাঙ্কেই পুনরায় কার্য্য আরম্ভ করিতে সক্ষম হইল? যদিও সাময়িক আতঙ্ক ব্যাঙ্ক বন্ধ করিবার একটি প্রধান কারণ, তথাপি ইহার মূলে যে অন্য কোন উদ্দেশ্য ছিল না তাহাও বলা যায় না। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, আমেরিকার রপ্তানি বাণিজ্য প্রায় বন্ধ হইয়া গিয়াছে, ইহাকে পুনর্জীবিত করিতে না

পারিলে কঠিন বেকার সমস্যার সমাধান সম্ভবপর নয়। যতদিন আমেরিকা স্বর্ণমান পরিত্যাগ না করিবে ততদিন অন্য দেশের মুদ্রার তুলনায় ডলারের মূল্য কমিবে না, অতএব আমেরিকার মাল অন্য দেশের মালের সহিত প্রতিযোগিতা করিতে পারিবে না। গত কয়েক মাস যাবতই সে-দেশে এই বিষয়ে অনেক বাদানুবাদ চলিতেছে। রক্ষণশীলগণ বলেন, অন্য দেশের পন্থা অনুসরণ করিতে গিয়া আমেরিকার কোন লাভ হইবে না বরং লোকসানের আশঙ্কাই অধিক, কেন-না ইউরোপের দেনদারগণ আমেরিকাকে স্বর্ণ দ্বারা দেনা শোধ করিতে বাধ্য, যদি ডলারের মূল্য কমিয়া যায় তাহা হইলে প্রাপ্য ঋণের পরিমাণও অনেক কমিয়া যাইবে। তাহা ছাড়া আমেরিকার বিশ্বাস, ব্রিটেন স্বর্ণমান পরিত্যাগ করাতে লণ্ডনের আর্থিক প্রতিপত্তি কমিয়া যাইবে এবং কালে নিউইয়র্ক লণ্ডনের স্থান অধিকার করিবে। লণ্ডন ছিল পৃথিবীর ব্যাঙ্কার। সমস্ত সভ্য দেশই লণ্ডনে মোটারকম টাকা আমানত রাখিত এবং এই টাকা খাটাইয়া ব্রিটেনের বেশ দু-পয়সা লাভ হইত। ইহার ফলে ব্রিটিশ ব্যাঙ্ক, ব্রিটিশ ইন্‌সিউরেন্স কোম্পানী, ব্রিটিশ জাহাজ কোম্পানী সকলেই লাভবান হইত। ব্রিটেনের অদৃশ্য রপ্তানির ইহাই ছিল মূল ভিত্তি। যদি আমেরিকা স্বর্ণমানে প্রতিষ্ঠিত থাকে তাহা হইলে আজ হউক কিম্বা কাল হউক এই সব সুখসুবিধা নিউইয়র্কের করায়ত্ত হইবে।

স্বর্ণমান বজায় রাখিতে হইবে অথচ সেই সঙ্গে রপ্তানি বাণিজ্যও বৃদ্ধি করিতে হইবে এই জন্য অনেকে বলিতেছেন, কেবল স্বর্ণের উপর আন্তর্জাতিক বাণিজ্য প্রতিষ্ঠিত হওয়াতে বর্ত্তমান সঙ্কট উপস্থিত হইয়াছে। ১৮৯৩ সালের পূর্ব্বে স্বর্ণ এবং রৌপ্য দুইই যেমন চলতি মুদ্রা ছিল এখনও যদি আবার তাহাই করা যায় তাহা হইলে প্রাচ্যদেশবাসী, যেমন চীন এবং ভারতবর্ষ, যাহাদের মুখ্য মুদ্রা রৌপ্য, তাহাদের ক্রয়শক্তি বৃদ্ধি পাইবে। এই দুই দেশে সত্তর কোটার অধিক লোকের বাস, কাজেই কোন প্রকারে যদি ইহাদের ক্রয়শক্তি বৃদ্ধি করা যায় তাহা হইলে ইউরোপ এবং আমেরিকা এইসব দেশে মাল বিক্রয়ের অপূর্ব্ব সুযোগ পাইবে এবং তৎসঙ্গে তাহাদের আর্থিক অবস্থারও শীঘ্র উন্নতি হইবে। দেখা যাইতেছে যে, কাঁচা মালের মূল্য যে পরিমাণে হ্রাস হইয়াছে, তৈয়ারি মালের মূল্য সেই পরিমাণে হ্রাস হয় নাই। পূর্ব্বে যতটা কাঁচা মালের বিনিময়ে তৈয়ারি মাল পাওয়া যাইত এখন তাহার দ্বিগুণ কাঁচা মাল না দিলে সেই পরিমাণ তৈয়ারি মাল পাওয়া যায় না। ইহার প্রধান কারণ এই যে, ইউরোপে এবং আমেরিকায় মজুরের মজুরীর দর কমে নাই। বিগত মহাযুদ্ধের সময় হইতে মজুরের মজুরী যে প্রকার অসম্ভব বাড়িয়াছিল এখনও প্রায় তেমনি রহিয়াছে। জীবনধারণের খরচ যদিও পূর্ব্বাপেক্ষা অর্দ্ধেক কমিয়া গিয়াছে তথাপি সঙ্ঘবদ্ধ হওয়ায় মজুরের মজুরী কমান যাইতেছে না। এই জন্যই তৈয়ারী মালের মূল্য কাঁচা মালের তুলনায় বিশেষ কমে নাই। যুদ্ধের পরবর্ত্তী সময়ে মালের যে মূল্য ছিল তাহা পুনর্ব্বার হইবে এরূপ আশা করা দুরাশা মাত্র। সেই চেষ্টা করিতে গিয়াই আজ আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে বিপ্লব উপস্থিত হইয়াছে। জাপানের কৃতকার্য্যতার মুখ্য কারণ সে-দেশের মজুরের মজুরী অনেক কম, কাজেই ইউরোপ এবং আমেরিকার তুলনায় সে অনেক সস্তায় মাল প্রস্তুত করিতে পারে।

ইউরোপ এবং আমেরিকায় চেষ্টা চলিতেছে কিরূপে মালের মূল্য বৃদ্ধি করা যায়। কিন্তু ক্রেতার ক্রয়শক্তি না থাকিলে অধিক মূল্য দিবে কে? মজুরী কমিলে তাহাদের জীবনাদর্শ (standard of living) হীন হইবে, তাহারা তাহা চায় না। তাই প্রাণপণ চেষ্টা চলিতেছে কিরূপে মজুরীর হার উচ্চ রাখিয়াও মালের মূল্য বৃদ্ধি করা যায় এবং তৎসঙ্গে রপ্তানি বাণিজ্যের উৎকর্ষ সাধন করা যায়। ইহা যে সম্ভব তাহা মনে হয় না। ব্যবসায়-বাণিজ্যের মন্দার দরুণ ইউরোপে যে আর্থিক সঙ্কট উপস্থিত হইয়াছিল এখন আমেরিকায়ও সে সঙ্কট উপস্থিত হইয়াছে। প্রাচ্য দেশে, বিশেষতঃ জাপানে, শিল্পের দ্রুত উন্নতি হওয়াতে তৈয়ারী মালের জন্য প্রাচ্য আর প্রতীচ্যের মুখাপেক্ষী নহে। পূর্ব্বে ব্যবসা-বাণিজ্যের এরূপ ভাগ-বাঁটোয়ারা করা হইয়াছিল যে, প্রাচ্য চিরকাল কাঁচা মাল উৎপন্ন করিবে এবং প্রতীচ্য ইহার বিনিময়ে আমাদিগকে তৈয়ারী মাল সরবরাহ করিবে। এ যুক্তি এখন কেহ মানিতেছে না। শিল্প-কুশলতা কোন জাতিবিশেষের একচেটিয়া নহে, সুযোগ পাইলে প্রাচ্য যে প্রতীচ্যকে পশ্চাতে ফেলিয়া যাইতে পারে জাপান তাহা দেখাইয়াছে। অতএব ব্যবসায়-বাণিজ্য পূর্ব্বে যে-ধারায় বহিত ভবিষ্যতেও যে সেই ধারায় বহিবে তাহা সম্ভবপর নয়। এই সত্যটি প্রতীচ্য এখনও গ্রহণ করিতে পারে নাই। তাই তাহার সমস্ত চেষ্টা নিয়োগ করা হইতেছে পূর্ব্বাবস্থা ফিরাইয়া আনিবার জন্য। আমরা দেখিয়াছি, ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের ভিতর ব্রিটিশ বাণিজ্য অক্ষুন্ন রাখিবার জন্য অটোয়া চুক্তি হইয়াছিল। ভারতের ন্যায় সাম্রাজ্যের অধীন দেশসমূহে ইহাতে ব্রিটিশ পণ্য বিক্রয়ের সুবিধা হইবে, কিন্তু ক্যানাডা প্রভৃতি স্বাধীন দেশসমূহ যেদিন বৃটিশ মাল তাহাদের উৎপন্ন মালের সহিত প্রতিযোগিতা করিবে সেইদিনই চুক্তি ভঙ্গ করিয়া দিবে। অতএব সাম্রাজ্যের ভিতর

অবাধ বাণিজ্য (Empire free trade) অথবা অর্থনৈতিক মজলিস (Economic conference) দ্বারা বর্ত্তমান দ্বন্দ্বের অবসান হইবে না।

সকল দেশের ভাগ্যই এখন সকল দেশের সহিত গ্রথিত হইয়া পড়িয়াছে। আমেরিকা এখন বুঝিতে পারিয়াছে, পৃথিবীর প্রায় এক-তৃতীয়াংশ স্বর্ণ তাহার কোষাগারে আবদ্ধ রাখিয়া সে অন্য দেশের ক্রয়শক্তি হ্রাস করিয়াছে। ইউরোপের ঋণের বোঝা না কমাইলে তাহার বাণিজ্যের উন্নতিরও আশা নাই। অনেকে মনে করেন, স্বর্ণমান পরিত্যাগ, চল্‌তি মুদ্রার সংখ্যা বৃদ্ধি এবং ডলারের স্বর্ণাংশ কমান এই-সব প্রস্তাবের মূলে একটি পরোক্ষ হেতু আছে, যাহা মজুরের মজুরী কমান। যদিও নামে পূর্ব্ব মজুরীই বজায় থাকিবে, তথাপি মুদ্রার ক্রয়শক্তি কমিয়া যাওয়াতে পরোক্ষভাবে মজুরের মজুরী কমিয়া যাইবে। এই চালবাজী মজুরেরা যে বোঝে না তাহা নহে। তাহারা কোন দিক দিয়াই মজুরী কমাইতে রাজী নয়। ইহার স্বপক্ষে এই বলা হয় যে, মজুরের মজুরী কমিলে তাহাদের ক্রয়শক্তি কমিয়া যাইবে। যেহেতু প্রত্যেক দেশই শুল্কের হার চড়াইয়া মাল আমদানী বন্ধ করিতে চেষ্টা করিতেছে, সেহেতু এখন বাধ্য হইয়া নিজ দেশেই মালের কাট্‌তি বাড়াইতে হইবে। যদি ক্রেতাদের আয় কমিয়া যায় তাহা হইলে স্বদেশী শিল্পবাণিজ্যের অবস্থা আরও মন্দ হইবে।

এই-সব যুক্তির সপক্ষে-বিপক্ষে যাহাই বলা হউক না কেন, মালের দাম কমাইতে না পারিলে বিক্রয় বৃদ্ধি হইবে না। বিক্রয় বৃদ্ধি করিতে হইলে মজুরের মজুরী কমাইতে হইবেই। আমেরিকার আর্থিক অবস্থার পর্য্যালোচনা করিলে মনে হয়, তাহার ব্যাঙ্কিং সঙ্কট একটা সাময়িক উত্তেজনার ফলেই ঘটিয়াছে। ইহার অন্তর্নিহিত যে সব কারণের উল্লেখ করা হইয়াছে যতদিন সেগুলির সমাধান না হয় ততদিন প্রতীচ্য যে রোগমুক্ত হইতে সমর্থ হইবে তাহা মনে হয় না। আন্তর্জাতিক বিদ্বেষ যেন দিন দিন আরও বাড়িতেছে। ইহার ফলে সমরসম্ভারের খরচ আরও বাড়িয়া চলিয়াছে। 'ডিজার্ম্মামেণ্ট কন্‌ফারেন্স' প্রায় বিফল হইয়াছে। হিট্‌লার্‌-সূর্য্য উদয়ে জার্ম্মানীতে নবজাগরণের সাড়া পড়িয়া গিয়াছে। ফ্রান্স এবং তাহার মিত্রবর্গ তাহাতে আশঙ্কান্বিত হইতেছে। চীনের বিরুদ্ধে জাপানের অভিযান আমেরিকা রুষ্টদৃষ্টিতে নিরীক্ষণ করিতেছে। একে ত ব্যবসা-বাণিজ্যের অসম্ভব মন্দা, তদুপরি যদি সমরব্যয় সঙ্কোচ না করিয়া উত্তরোত্তর বৃদ্ধিই করা হয়, তাহা হইলে ব্যবসার-বাণিজ্যের উপর যে অসম্ভব করভার চাপান হইয়াছে তাহাই বা কমিবে কিরূপে? গত মহাসমর হইতে যে আন্তর্জ্জাতিক বিদ্বেষ-বহ্নি প্রজ্বলিত হইয়াচে এবং যাহা 'রেপারেশন' এবং যুদ্ধঋণ দ্বারা তাজা রাখা হইয়াছে, সেগুলির অবসান না হওয়া পর্য্যন্ত আমাদের আর্থিক অবস্থার উন্নতি হওয়া অসম্ভব। অন্যকে মারিলে আমরাও বাঁচিব না, এই সত্য যখন আমাদিগের নিকট প্রতিভাত হইবে তখনই বর্ত্তমান দ্বন্দ্ব-বিদ্বেষ দূর হইয়া পৃথিবীতে শান্তি স্থাপিত হইবে।

মহিলা-সংবাদ

শ্রীমতী কপিলা খন্দওয়ালা—বোম্বাই বিশ্ববিদ্যালয় হইতে বি-এ ও বি-টি পরীক্ষা পাশ করিয়া ১৯৩০ সনে লেডি বার্‌বার বৃত্তি লইয়া শিক্ষার্থ আমেরিকায় গমন করেন। সেখানে তিনি মিশিগান বিশ্ববিদ্যালয়ের এম-এ পরীক্ষা পাশ করেন ও নানা সমাজহিতকর প্রতিষ্ঠানের সহিত সংশ্লিষ্ট থাকিয়া সামাজিক সেবা শিক্ষা করেন। প্রত্যাগমনের সময়ে তিনি জার্ম্মেনী, ইটালী, চেকোস্লোভাকিয়া প্রভৃতি দেশ পরিভ্রমণ করিয়া শিক্ষা-বিষয়ক নানারূপ তথ্য সংগ্রহ করিয়াছেন।

শ্রীমতী কমলা রায়—ইনি ফিলিপাইন দ্বীপপুঞ্জে একমাত্র ভারতীয় মহিলা; এখন ফিলিপাইন বিশ্ববিদ্যালয়ে পাঠে নিযুক্ত আছেন। ইনি এই বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ডাক্তার শ্রীধীরেন্দ্রনাথ রায় মহাশয়ের পত্নী।

—

শ্রীযুক্তা জ্যোতির্ম্ময়ী গাঙ্গুলী ও শ্রীযুক্তা কুমুদিনী বসু এ-বৎসর কলিকাতা কর্পোরেশ্যনের কমিশ্যনর বা সদস্য নির্ব্বাচিত হইয়াছেন। ইহাদের বিবরণ বিবিধপ্রসঙ্গে দ্রষ্টব্য।

শ্রীমতী কমলা রায়

শ্রীমতী কপিলা খন্দওয়ালা

শ্রীযুক্তা কুমুদিনী বসু

শ্রীযুক্তা জ্যোতির্ময়ী গাঙ্গুলী

বাংলা
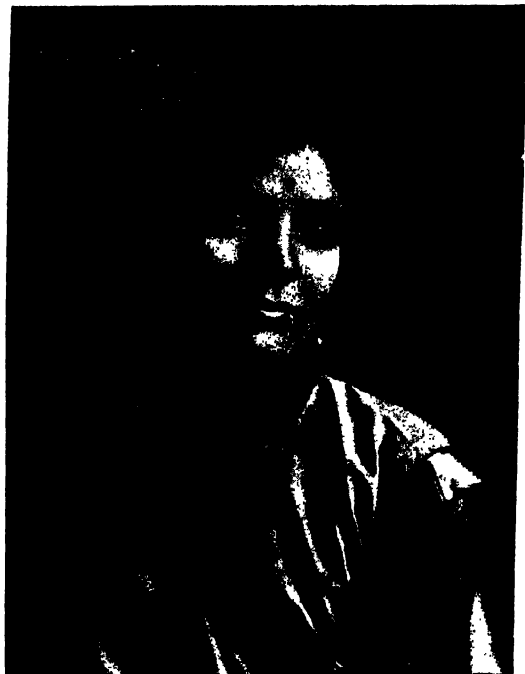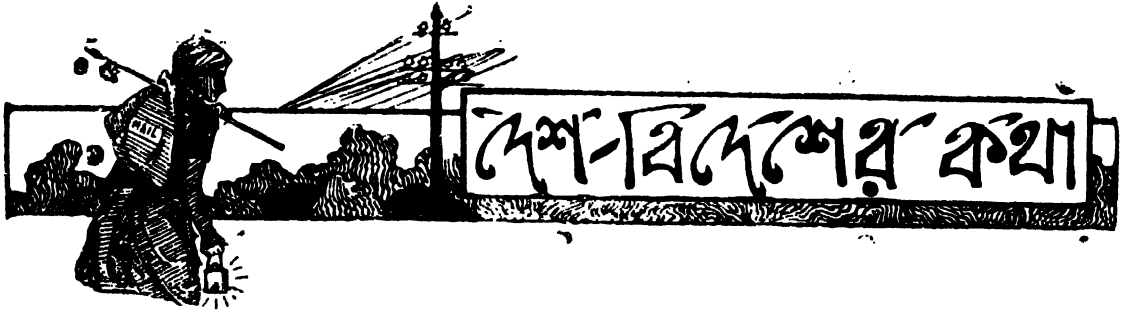
বোধনা-নিকেতন—

জড়বুদ্ধি ছেলেমেয়েদের জন্ত ঝাড়গ্রামে বোধনা-নিকেতন নির্ম্মিত

বোধন নিকেতনের একটি অসম্পূর্ণ গৃহ।

বোধনা মৌজার সাধারণ দৃশ্য।

বোধনা মৌজার ক্ষুদ্র নদী।

হইতেছে। এই সদনুষ্ঠানটির শীঘ্র আরম্ভ হওয়া আবশ্যক বলিয়া কয়েকটি গৃহের নির্ম্মাণ যথাসম্ভব সত্বর শেষ করা দরকার। বোধনা-সমিতি ঝাড়গ্রামের রাজাবাহাদুরের নিকট হইতে যে ২৫০ বিঘা জমী পাইয়াছেন, তাহার সাধারণ দৃশ্য দেখাইবার জন্য একটি ছবি দিলাম। সেখানে ঝরণা হইতে উৎপন্ন যে ছোট নদীটি আছে, তাহারও চিত্র দেওয়া হইল। এই নদীটিতে সম্বৎসর জল থাকে।

বোধনা-নিকেতনের জন্ত অর্থ সাহায্য একান্ত আবশ্যক। পাঠাইবার ঠিকানা—রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়, ২।১ টাউনসেণ্ড রোড, ভবানীপুর, কলিকাতা।

কৃতী ছাত্র—

কাশী হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ের ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগের ছাত্র শ্রীযুত সঞ্জীবচন্দ্র ভট্টাচার্য্য ১৯৩০ সালে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে

শ্রীসঞ্জীব চন্দ্র ভট্টাচার্য্য

রাধিকামোহন এডুকেশনাল স্কলারসিপ প্রাপ্ত হইয়া 'চাদর' শিল্প (sheet metal industry) সম্বন্ধে বিশেষ পারদর্শিতা লাভ করিবার জন্ত ইংলণ্ডে গমন করেন। লণ্ডনে তিনি উক্ত বিষয়ে বিশেষ খ্যাতনামা কারখানায় হাতেকলমে কাজ করেন। তৎপর তিনি লণ্ঠন, ল্যাম্প, খেলনা প্রভৃতি নিত্য ব্যবহার্য্য জিনিষের প্রস্তুত প্রণালী শিক্ষালাভ করিবার জন্য জার্ম্মানীতে গমন করেন। সেখান হইতে তিনি উক্ত বিষয়ে বিশেষ পারদর্শিতা লাভ করিয়া

সম্প্রতি কলিকাতা প্রত্যাবর্ত্তন করিয়াছেন। দেশে ফিরিয়া তিনি "দি বেঙ্গল সিট মেটেল ওয়ার্কস্' নামে একটি কোম্পানী স্থাপন করিয়াছেন।

পরলোকে দেবেন্দ্রনাথ মিত্র—

গত ১৮ই চৈত্র দেবেন্দ্রনাথ মিত্র, ব্যারিষ্টার-এট্-ল, হঠাৎ হৃৎপিণ্ডের ক্রিয়া বন্ধ হইয়া মৃত্যুমুখে পতিত হন। তিনি হুগলির সুপ্রসিদ্ধ উকিল ৺অম্বিকাচরণ মিত্র মহাশয়ের দ্বিতীয় পুত্র। মৃত্যুকালে তাঁহার বয়স মাত্র ৪৪ বৎসর হইয়াছিল। ১৯১০ সনে তিনি ইংলণ্ডে গমন করেন। তথায় তিনি ব্যারিষ্টারী পরীক্ষা দেন ও লণ্ডন য়ুনিভার্সিটীর বি-এস-সি ও এল-এল-বি পরীক্ষা সসম্মানে উত্তীর্ণ হইয়া ১৯১৪ সনে কলিকাতা হাইকোর্টে আইন ব্যবসা আরম্ভ করেন। ইহার অল্পকাল পরেই তিনি য়ুনিভার্সিটী ল-কলেজে অধ্যাপক নিযুক্ত হয়েন।

তিনি তাঁহার সারল্য ও সদাশয়তায় তাঁহার ছাত্রবৃন্দকে ও সমব্যবসায়ীদিগকে মুগ্ধ করেন। তাঁহার জীবদ্দশায় তিনি অক্লান্তভাবে ছাত্রগণের উন্নতিসাধনকল্পে চেষ্টিত ছিলেন। মৃত্যুকালে তিনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ফ্যাকালটী-অফ-ল এবং বোর্ড-অফ-ষ্টাডিস্-ইন্-লয়ের সদস্য ছিলেন। এতদ্ভিন্ন ল-কলেজ ইউনিয়নের প্রেসিডেন্ট, এবং হাইকোর্ট ক্লাবের সম্পাদক ও অন্যান্য শিক্ষাবিষয়ক ও সামাজিক অনুষ্ঠানে অগ্রণী ছিলেন।

—

বিদেশ

ড্রেসডেনে ভারতীয় ছাত্র-সভা—

জার্ম্মানীর অন্তর্গত ড্রেসডেনে ভারতীয় ছাত্রগণ গত শীতকালে একটি সমিতি স্থাপন করিয়াছেন। বিদেশীয়দের সঙ্গে ভারতবর্ষের কৃষ্টিগত যোগসাধন এবং ভারতীয় ছাত্রবৃন্দের মধ্যে মেলামেশা ও ভাবের আদান প্রদান এই সমিতির উদ্দেশ্যের মধ্যে গণ্য। বস্তুতঃ এই দুইটি বিষয়েই এই সমিতি ইতিমধ্যে কথঞ্চিৎ কৃতিত্ব অর্জ্জন করিয়াছেন।

ড্রেসডেনে বিদেশী ছাত্রেরা মিলিয়া একটি নৃত্য-উৎসব অনুষ্ঠান করেন। সেখানকার প্রদর্শনীগৃহে এই উৎসবটি হইয়া থাকে। জার্ম্মানী ও বিদেশী দুঃস্থ ছাত্রদের সাহায্যের জন্যই এই উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। বিভিন্ন দেশের ছাত্রগণ স্ব স্ব জাতীয় রুচি অনুসারে নিজেদের তাঁবু সাজাইয়া থাকেন। ভারতীয় ছাত্রেরাও এবার এইরূপ একটি তাঁবু খাটাইয়াছিলেন। ভারতবর্ষীয় রীতিতে রান্নাকরা খাদ্যাদি এখানে পরিবেশন করা হইয়াছিল। ভারতীয়দের কেহ কেহ দেশী পোষাকে উপস্থিত ছিলেন।

ভারতীয় ছাত্রদের একটি প্রীতি-সম্মিলনীও ইতিমধ্যে হইয়া গিয়াছে। এই সম্মিলনীতে ড্রেসডেন পলিটেক্নিক্ বিশ্ববিদ্যালয়ের রেক্টর অধ্যাপক রুথার যোগদান করিয়াছিলেন। ড্রেসডেনের ভারতীয় ছাত্রসভার অধ্যক্ষ শ্রীমতী জোরা মমতাজ উপস্থিত আগন্তুকগণকে অভিনন্দিত করিয়া জার্ম্মান ভাষায় একটি নাতিদীর্ঘ বক্তৃতা করেন। তৎপর অধ্যাপক রুথার ও অধ্যাপক কির্শমার

ড্রেসডেনে ভারতীয় প্রীতি-সম্মিলন

ছাত্রগণকে কিছু উপদেশ দেন। এই সম্মিলনীতে ভারতীয় নৃত্যগীতের আয়োজন করা হইয়াছিল। আহারের পর অন্যান্য নৃত্যগীতের মধ্যে শ্রীমতী জোরা মমতাজের নৃত্যে সকলেই মুগ্ধ হইয়াছিলেন।

জার্ম্মানীতে নাৎসি শাসন—

বিধ্বস্ত জার্ম্মানীর আত্ম-প্রতিষ্ঠা লাভের চেষ্টায় নিরপেক্ষ ব্যক্তি-মাত্রেরই সহানুভূতি আছে। নাৎসি দল যখন জার্ম্মানীকে সংহত ও সবল করিবার জন্য আসরে নামিলেন তখন সকলেরই মনে আশার সঞ্চার হইয়াছিল। কিন্তু উদ্দেশ্য সাধনের জন্য এই দল সম্প্রতি যে-পন্থা অবলম্বন করিয়াছেন তাহাতে সকলেই বিস্ময়াভিভূত হইয়াছেন। জার্ম্মানীর আত্ম-প্রতিষ্ঠা লাভ প্রচেষ্টায় ইহুদিগণ কিরূপে অন্তরায় হইতে পারে তাহা সাধারণ বুদ্ধির অগম্য। হেয়ার হিট্‌লেরারের অধীনে নাৎসি দল জার্ম্মান গবর্ণমেণ্টের কর্ণধার হইয়া তথাকার সমগ্র ইহুদিদের উপর খড়্গহস্ত হইয়াছেন। জার্ম্মান গবর্ণমেণ্ট সরকারীভাবে এক দিনের জন্য ইহুদি-বর্জ্জন নীতি অবলম্বন করিয়াছিলেন। এখন যদিও সরকারী নীতি বলবৎ নাই তথাপি সাধারণ লোকেরা ইহুদি-বর্জ্জন নীতি অনুসরণ করিয়া চলিতেছে। যাহাতে ইহুদিদের সঙ্গে লোকেরা ব্যবসা-বাণিজ্য না করে, তাহাদের দোকান হইতে জিনিষপত্র না ক্রয় করে, সেইজন্য নাৎসিগণ দোকানের সম্মুখে ধর্ণা দিতেছে। ইতি-মধ্যেই অনেক ইহুদির চাকুরি গিয়াছে, বড় বড় ব্যবসা হইতে ইহুদিগণকে ছাড়াইয়া দেওয়া হইতেছে, সর্ব্বোপরি আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, বিশ্ব-বিশ্রুত বৈজ্ঞানিক আইনষ্টাইন্‌কে পর্য্যন্ত ভিটা-ছাড়া হইতে হইয়াছে। জার্ম্মানীর ব্যাঙ্কে তাঁহার যে টাকা মজুত ছিল তাহাও বাজেয়াপ্ত হইয়াছে। আইনষ্টাইন এখন ব্রাসেল্‌স নগরে অবস্থান করিতেছেন। অতঃপর তিনি মার্কিণে নিউইয়র্কে বসবাস করিবেন এই তাঁহার সঙ্কল্প। তিনি জার্ম্মানীর বৈজ্ঞানিক সমিতি হইতে নিজের নাম কাটাইয়াছেন।

ইহুদিদের উপর অত্যাচার আরম্ভ হইলে তাহারা দলে দলে জার্ম্মানী ছাড়িয়া যাইতেছিল। এখন আর কোন ইহুদিকে ছাড়-পত্রও দেওয়া হইতেছে না। জার্ম্মানীতে ইহুদিদের ব্যবসা-বাণিজ্য বন্ধ, চাকুরী নাই, অথচ তাহাদিগকে বিদেশেও যাইতে দেওয়া হইবে না।

—

ভারতবর্ষ

পরলোকে প্রবাসী বাঙালী—

খগেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় গোয়ালিয়রের সর্ব্বপ্রথম প্রবাসী বাঙালী রমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের কনিষ্ঠ পুত্র। তিনি গোয়ালিয়র হাইস্কুলে এণ্ট্রান্স পাস করিয়া আগরা সেণ্ট জন কলেজে এফ্-এ ও বি-এ পাস করেন। গোয়ালিয়র সেক্রেটরিয়েট আপিসে কেরানীর কার্য্যে প্রবেশ করেন এবং ক্রমে উন্নতি করিয়া মহারাজার সৈন্ত বিভাগের স্কুলে প্রিন্সিপালের পদ পাইয়াছিলেন। ভূতপূর্ব্ব মহারাজার মৃত্যুর পর কর্ত্তৃপক্ষ ঐ বিভাগ উঠাইয়া দেন এবং শত্রুতা করিয়া তাঁহাকে অকালে পেন্সন লইতে বাধ্য করেন।

খগেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

তিনি মিউনিসিপ্যালিটির অনারারি ম্যাজিষ্ট্রেটের পদে কিছুকাল কার্য্য করিয়াছিলেন। তিনি গত আষাঢ় মাসে দেহত্যাগ করিয়াছেন।

এভারেষ্ট-পরিক্রম—

বিমানপোতে এভারেষ্ট অভিযানের উদ্যোগ-আয়োজন গত কয়েক মাস হইতে চলিতেছিল। এবারকার অভিযানের নেতা লর্ড ক্লাইড্‌সডেল। তাঁহার নেতৃত্বে সম্প্রতি এভারেষ্ট অভিযান সম্পন্ন হইয়াছে। এভারেষ্ট ২৯,০০২ ফুট উচ্চ, এই দল বিমানপোতে ৩৫,০০০ ফুট উচ্চে উঠিয়াছেন। বিমানপোত হইতে এভারেষ্টের নানা চিত্রও তোলা হইয়াছে।

ইহার পূর্ব্বে পায়ে হাঁটিয়া তিন বার এভারেষ্ট আরোহণের চেষ্টা হইয়াছিল। কিন্তু তিন বারই চেষ্টা বিফল হয়। রাটলেজ্ নামে একজন ইংরেজের নেতৃত্বে এইরূপ আরোহণের চেষ্টা পুনরায় আরম্ভ হইয়াছে।

আগ্নেয়গিরিতে নামা—

আগ্নেয়গিরিতে অগ্ন্যুৎপাতের সময়ে নিকটে থাকিয়া কি ঘটিতেছে তাহা নির্ণয় করিবার চেষ্টা দু-চারিজন বৈজ্ঞানিক ইতিপূর্ব্বে করিয়াছেন। কিন্তু এ পর্য্যন্ত আগ্নেয়গিরির মধ্যে নামিয়া তথ্য সংগ্রহের চেষ্টা কেহ করিয়াছেন বলিয়া শোনা যায় নাই। এই দুঃসাহসিক কাজ সম্প্রতি একজন ফরাসী বৈজ্ঞানিক ও ভ্রমণকারী করিয়াছেন। ইঁহার নাম আর্ণ্য কিরনার।

সিসিলি দ্বীপ ও ইটালীর নিম্নাংশের মধ্যভাগে বিখ্যাত ষ্ট্রম্বোলি আগ্নেয়গিরি অবস্থিত। শ্রীযুক্ত কিরনার এই আগ্নেয়-গিরির জ্বলন্ত গহ্বরের মধ্যে নামিয়াছিলেন। অনেকদিন ধরিয়া ইনি এই সঙ্কল্প পোষণ করিতেছিলেন, কিন্তু আয়োজন-উদ্যোগ কষ্টসাধ্য বলিয়া এতদিন পর্য্যন্ত উহা কার্য্যে পরিণত করিতে পারেন নাই। সম্প্রতি তাঁহার চেষ্টা সার্থক হইয়াছে।
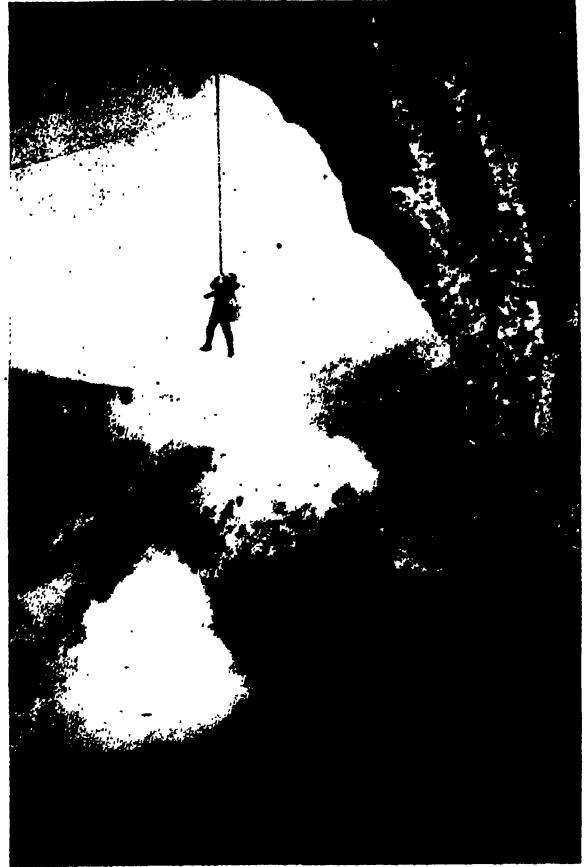
শ্রীযুক্ত কিরনার। তাঁহাকে আগ্নেয়গিরির গহ্বরে নামাইয়া দেওয়া হইতেছে।

শ্রীযুক্ত কিরনার অ্যাস্‌বেষ্টসের পোষাক পরিয়া, নিঃশ্বাস-প্রশ্বাসের জন্য পিঠে অক্সিজেনের টিন ঝুলাইয়া, একটি অ্যাস্‌বেষ্টসের দড়ি ধরিয়া ষ্ট্রম্বোলির অভ্যন্তরে নামিয়াছিলেন। জাহাজে মাল তুলিবার জন্য যেরূপ কপিকল ও ক্রেন ব্যবহৃত হয়, সেইরূপ একটি যন্ত্রের সাহায্যে তাঁহার বন্ধুরা তাঁহাকে আটশত ফিট নীচে জ্বলন্ত আগ্নেয়গিরির গহ্বরে নামাইয়া দেন। দড়ি ধরিয়া নামিবার সময়ে শ্রীযুক্ত কিরনারের প্রতি মুহূর্ত্তে মনে হইতেছিল এই বুঝি দড়ি ছিঁড়িয়া তিনি অতল আগুনের গহ্বরে অদৃশ্য হইয়া যান। কিন্তু সৌভাগ্যক্রমে দড়ি ছিঁড়ে নাই। আটশত ফিট নামিবার পর তিনি কঠিন পাথরের উপর গিয়া ঠেকিলেন। থার্ম্মোমিটার দিয়া দেখিলেন এই পাথরের উত্তাপ ২১২° ডিগ্রী ফারেনহাইট্। সেইখানে বায়ুর উত্তাপ ১৫০° ডিগ্রী ছিল। নিকটেই তিনি গভীর কূপের মত প্রায় ত্রিশফুট ব্যাসের কয়েকটি গর্ত্ত দেখিতে পাইলেন। উহাদের ভিতর দিয়া মুহূর্ত্তে মুহূর্ত্তে বিষাক্ত বাষ্প, গলিত ও কঠিন উত্তপ্ত প্রস্তর রাশি উৎক্ষিপ্ত হইতেছিল। এই অগ্নিনিঃসরণ একটু ক্ষান্ত হইবার অবকাশে শ্রীযুক্ত কিরনার দুই তিনবার দৌড়িয়া একটি গর্ত্তের একেবারে ধারে গিয়া উঁকি মারিয়া দেখিলেন, নীচে আলোড়িত সংক্ষুব্ধ তরল আগুনের সমুদ্র গর্জ্জন করিতেছে। তাঁহার সঙ্গে ক্যামেরা ছিল। তিনি উহার সাহায্যে কোন প্রকারে অভ্যন্তরের

ম্বর কয়েকটি ফটো তুলিয়া লইলেন। কিন্তু অক্সিজেন ঃশেষিত হইয়া যাইবার আশঙ্কায় তাঁহাকে শীঘ্রই উঠিয়া সিতে হইল। তাহা সত্ত্বেও অর্দ্ধেক পথ উঠিবার পূর্ব্বেই ক্সিজেন ফুরাইয়া গেল ও তিনি বিষাক্ত বাষ্পে অজ্ঞান য়া পড়িলেন। তাঁহার নাক দিয়া রক্ত পড়িতে লাগিল। ন্তু তাঁহার-বন্ধুরা তাঁহাকে উপরে তুলিয়া শীঘ্রই সংজ্ঞা রাইয়া আনিলেন।

শ্রীযুক্ত কিরনার ইহাতেও ক্ষান্ত না হইয়া আর একদিন নালির একটি ধার বাহিয়া আবার উপরে উঠিলেন। : দিক দিয়া গলিত 'লাভা' গড়াইয়া সমুদ্রে পড়ে বলিয়া হ উহার নিকটেও যাইত না, এমন কি জাহাজও উপকূলের ছে না ঘেঁষিয়া দূর দিয়া চলিয়া যাইত। শ্রীযুক্ত কিরনার জন বন্ধুসহ এই দিক দিয়া উঠিয়া নিজের জীবন বিপন্ন রিয়াছিলেন।

শ্রীযুক্ত কিরনার ও তাঁহার এক বন্ধু লৌহের বর্ম্ম পরিয়া ষ্ট্রম্বোলির পাশ বাহিয়া উঠিতেছেন

—

ত্রিম উপায়ে ঘাস জন্মানো—

ডাক্তার পল স্প্যাঙ্গেনবের্গ নামে একজন জার্ম্মান কৃষিবিদ্ ড়টি গৃহপালিত পশুর উপযুক্ত ঘাস জন্মান যায়, এইরূপ কটি আলমারী আবিষ্কার করিয়াছেন। এই আলমারীতে দুই রিতে দশটি দেরাজ আছে। এই দেরাজগুলিতে কৃত্রিম পায়ে ভুট্টা গাছ জন্মান হয়। আলমারীর সম্মুখে যে নল দেখা ইতেছে উহার ভিতর দিয়া দিনে তিন- বার করিয়া ছগুলিতে সার ও ঔষধ দেওয়া হয়। ইহাতে গাছগুলি খুব ড়াতাড়ি বাড়ে। এই গাছগুলি দশদিনে কাটিবার উপযুক্ত তখন আবার দেরাজে নূতন বীজ রোপন করা হয়। দেখা যাছে, এই আলমারীতে দিনে ৫৫০ পাউণ্ড পরিমিত ঘাস জন্মান য়। ডাঃ স্প্যাঙ্গেনবের্গ বলেন, এই পরিমাণ ঘাস স্বাভাবিক ভাবে াইতে হইলে ২০ হইতে ৫০ একর জমির প্রয়োজন। এইরূপে খাদ্য জন্মান হয় তাহা পশুদের পক্ষে খুব পুষ্টিকর খাদ্য, কারণ াতে খাদ্যের অন্যান্য উপাদান এবং প্রচুর পরিমাণে ভাইটামিন ক।
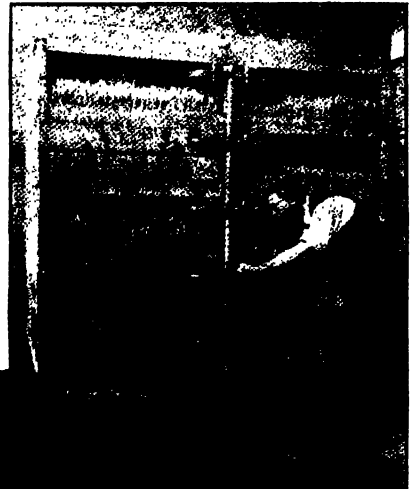
কৃত্রিম উপায়ে ঘাস জন্মাইবার আলমারী ও ঘাস দিনে কতটুকু করিয়া বড় হয়, তাহার মাপ
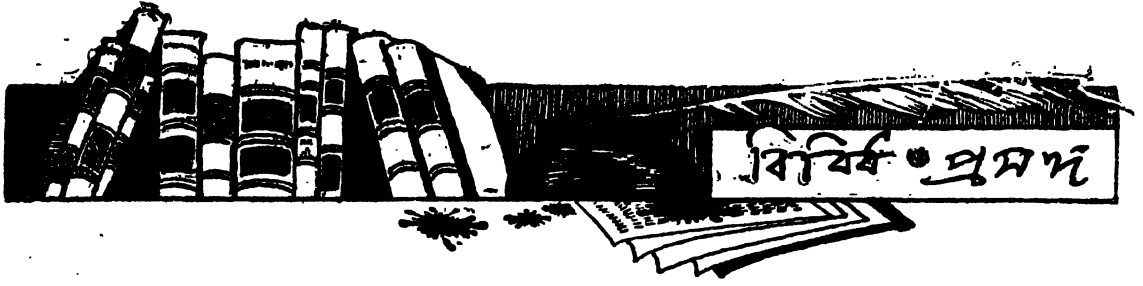
কংগ্রেস ও গবন্মেণ্ট

রতীয় ব্যবস্থাপক সভায় এরূপ অনুরোধ কয়েক বার া হইয়াছে, যে, মহাত্মা গান্ধী ও বিনা বিচারে বন্দীকৃত ান্য কংগ্রেস নেতাদিগকে মুক্তি দেওয়া হউক ; কেন না, হা হইলে দেশের লোক শান্ত ভাবে প্রস্তাবিত ভবিষ্যৎ সনবিধির আলোচনা করিতে পারিবে। সরকার- ৎ হইতে উত্তরে বলা হইয়াছে, যে, কংগ্রেস নিরুপদ্রব ইনলঙ্ঘন প্রচেষ্টা যত দিন ছাড়িয়া না দিতেছেন, তদিন নেতাদিগকে ছাড়িয়া দেওয়া হইবে না। ংগ্রেস ঐ প্রচেষ্টা ছাড়িয়া দিবেন কি-না, তাহা স্থির রিতে হইলে নেতৃবর্গের পরস্পরের সহিত পরামর্শ করা বশ্যক। সর্ব্বপ্রধান নেতা মহাত্মা গান্ধীও অন্য সকল তার সহিত পরামর্শ না করিয়া কোন একটা আদেশ ত পারেন না। এই জন্য, "আগে কংগ্রেসের নায়করা ন তাঁহারা আর আইনের অবাধ্যতা করিবেন না, তবে মরা নেতৃবর্গকে ছাড়িয়া দিব," ইহা সুসঙ্গত মানসিক া নহে। গবন্মেণ্ট যদি বলিতেন, যে, পরামর্শ িবার জন্য কয়েক দিনের নিমিত্ত নেতৃবর্গকে মুক্তি দিব, াহার পর তাঁহাদিগকে আবার জেলে যাইতে হইবে, বা যদি বলিতেন, ঐ উদ্দেশ্যে কয়েক দিনের জন্য াদিগকে কোন একটি জেলে আনিব, তাহা হইলে া অধিকতর সঙ্গত হইত। সর্ত্তানুযায়ী এরূপ অল্প- য়িক মুক্তিতে কিংবা এক জেলে একত্র সমাবেশে ৃবর্গ সম্মত হইতেন কি না, জানি না। গবন্মেণ্ট আগে ত কিছু না বলিয়া তাঁহাদিগকে সুধাইয়া পরে তাঁহাদের ্-বিষয়ক প্রশ্নের প্রকাশ্য উত্তর দিলে চলিত।

আরও একটি কথা বলিবার আছে। ভারত-সচিব াতে এই মর্ম্মের কথা বার-বার বলিয়াছেন, যে, গ্রেসের শক্তি বিনষ্ট করা হইয়াছে। এরূপ কথার ধ্বনি ভারতবর্ষের উচ্চপদস্থ রাজপুরুষদের মুখ হইতেও শুনা গিয়াছে। তাহাই যদি হইয়া থাকে, তাহা হইলে, কংগ্রেস-নেতারা আর আইনলঙ্ঘন প্রচেষ্টা চালাইবেন না, এরূপ প্রতিশ্রুতির দাবি গবন্মেণ্ট করেন কেন? যাহা আপনা হইতে মরিয়াছে বা আধমরা হইয়াছে, কিংবা গবন্মেণ্ট যাহার প্রাণবধ করিয়াছেন বা যাহাকে পঙ্গু করিয়াছেন, "ওগো, তোমার বিরুদ্ধে আর কখনও কিছু করিব না" এরূপ প্রতিজ্ঞা তাহার মুখ দিয়া বাহির করাইবার বিশেষ প্রয়োজন আছে কি? অবশ্য, যাঁহারা গবন্মেণ্টকে কংগ্রেস-নেতাদিগকে ছাড়িয়া দিতে অনুরোধ করিতেছেন, আমরা তাঁহাদের প্রার্থনাপরায়ণতার সমর্থন করি না। কংগ্রেস-নেতাদিগকে গবন্মেণ্ট যদি নিজের প্রয়োজনে ছাড়িয়া দেন, ভাল। দেশবাসীদের শক্তির বলে যদি তাঁহারা মুক্তি পান, তাহা ত খুবই ভাল, এবং আমাদের বিবেচনায় কেবলমাত্র তাহাই বাঞ্ছনীয়। গবন্মেণ্টের নিকট দেশের লোকদের এ-বিষয়ে কোন প্রার্থনা থাকা উচিত নয়।

দেশের বহুসংখ্যক লোকের যে অভিপ্রায় ও ইচ্ছা কংগ্রেসের কার্য্যাবলীর পশ্চাতে ও মধ্যে প্রেরণা-রূপে বিদ্যমান, তাহা মরে নাই, কখনও মরিতে পারে না। সেই প্রেরণার বশে মানুষ কংগ্রেসদলভুক্ত হইয়া কাজ করিবে, বা আর কোন নাম লইয়া কাজ করিবে, তাহা গৌণ; প্রধান বিবেচ্য এই, যে, সেই প্রেরণা নষ্ট হইতে পারে কি-না, নষ্ট হইয়াছে কি-না।

গবন্মেণ্টও সম্ভবতঃ জানেন, যে, আইনলঙ্ঘন প্রচেষ্টা অনেকটা মন্দীভূত হইয়া থাকিলেও কংগ্রেসের প্রাণ ও প্রেরণা মরে নাই। সরকারী উচ্চতম কর্ম্মচারীরা সেই কারণেই আশঙ্কা করেন, যে, কংগ্রেস-নেতাদিগকে ছাড়িয়া দিলে ঐ প্রচেষ্টা হয়ত আবার প্রবল হইবে। অবশ্য, তাঁহাদিগকে ছাড়িয়া দিলে তাহা ঘটিবে কি-না বলা কঠিন।

কিন্তু একটি কথা দেশের লোকদের কাছে স্পষ্ট হইয়াছে বা হওয়া উচিত। কংগ্রেস গবর্মেণ্টের কাজ অচল করিতে পারেন নাই এবং স্বরাজ আদায় করিতে পারেন নাই। দেশের আপামরসাধারণ আবালবৃদ্ধবনিতা সকলে আরও খুব বেশী সংখ্যায়, শুধু মনোভাবে নহে কাজেও, কংগ্রেসের অনুবর্ত্তী হইলে হয়ত তাহা ঘটিত। কিন্তু আরও বেশী লোক যে কংগ্রেসে কার্য্যতঃ যোগ দেয় নাই তাহা কংগ্রেসের দোষে, না দেশের লোকদের দোষে, তাহার বিচার করিতে আমরা অসমর্থ।

কংগ্রেস আর একটি কাজ করিতে পারেন নাই। কংগ্রেসের অনুবর্ত্তী বহুসংখ্যক পুরুষ নারী বালক ও বালিকাকে দুঃসহ দুঃখ ক্ষতি অপমান লাঞ্ছনা সহ্য করিতে হইয়াছে, এইরূপ অভিযোগ পুনঃ পুনঃ হইয়াছে। তাহা ঘটিয়া থাকিলে, কংগ্রেস তাহা হইতে তাহাদিগকে রক্ষা করিতে পারেন নাই, তাহা নিবারণ করিতে বা তাহার প্রতিকার করিতে পারেন নাই। সাধারণ আইন বা বিশেষ আইন ও অর্ডিন্যান্স লঙ্ঘন করিলে তৎসমুদয়ে যে-সব দুঃখভোগের ব্যবস্থা আছে, আমরা সে-রকম দুঃখের কথা বলিতেছি না। সেরূপ দুঃখ ত কংগ্রেস-ওয়ালারা বরণ করিয়াছেন। কোন প্রকার আইন বা অর্ডিন্যান্সে যাহার ব্যবস্থা নাই, আমরা সেই রূপ দুঃখ ও অপমানের কথা বলিতেছি। আজকাল এই সমস্ত অভিযোগের মর্ম্মন্তুদ সংবাদ খবরের কাগজে বাহির হয় না, যে-কাগজ বাঁচিয়া থাকিতে চায় তাহাতে বাহির হইতে পারে না;—লোকমুখে রটিত হয়, সরকারের ইচ্ছার বিরুদ্ধে প্রচারিত সংবাদপত্রে লিপিবদ্ধ হয়। কিন্তু আমরা সরকারের নিজ ব্যয়ে প্রকাশিত রিপোর্টে যেরূপ অভিযোগ লিপিবদ্ধ আছে, তাহার উপর নির্ভর করিয়া এই সব কথা লিখিতেছি।

গত বৎসর ডিসেম্বর মাসে গবর্মেণ্ট যে ফৌজদারী আইন সংশোধন বিল ("Criminal Law Amendment Bill") আইনে পরিণত করেন, ভারতীয় ব্যবস্থাপক সভায় তদ্বিষয়ক তর্কবিতর্কের সময় ৩রা ডিসেম্বর শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্রচন্দ্র মিত্র যে বক্তৃতা করেন, তাহাতে তমলুক মহকুমার দুটি থানার এলাকাভুক্ত কোন কোন গ্রামে কতকগুলি অত্যাচারের অভিযোগ করেন, তদ্বিষয়ক ফোটোগ্রাফ ব্যবস্থাপক সভার লাইব্রেরীতে রাখেন। ভারতীয় ব্যবস্থাপক সভার কার্য্যবিবরণ ভারত-গবর্মেণ্ট মুদ্রিত করিয়া প্রকাশ করেন। তাহা যে-কেহ ইচ্ছা কিনিতে পারেন। ১৯৩২ সালের ৩রা ডিসেম্বরের রিপোর্টের ২৮৫১ হইতে ২৮৫৪ পৃষ্ঠায় আমরা মিত্র মহাশয়ের অভিযোগগুলি পাঠ করিয়াছি। এইগুলির সম্বন্ধে প্রকাশ্য অনুসন্ধান হইয়াছে বা প্রকাশ্য তদন্তের ফলে তৎসমুদয় মিথ্যা প্রমাণিত হইয়াছে বলিয়া আমরা অবগত নহি। যদি হইয়া থাকে, কেহ আমাদিগকে জানাইলে বাধিত হইব।

অত্যাচার হইবে না, কিংবা অত্যাচারের সত্য বা মিথ্যা অভিযোগও হইবে না, কংগ্রেস অবশ্য এরূপ কোন প্রতিশ্রুতি দেন নাই, দিতে পারেন না। সত্যেন্দ্রচন্দ্র মিত্র মহাশয়ের এবং অন্য অনেকের দ্বারা ব্যক্ত অভিযোগের প্রতিকার কংগ্রেস করিবেন বা করিতে পারেন, তাহাও আমরা মনে করি না। আমাদের বক্তব্য কেবল এই, যে, যদি দেশ স্বরাজ পাইত বা পায়, তাহা হইলে দুঃখ সহ্য করা কতকটা সার্থক মনে হইতে পারিত। বাধাদানসমর্থ শক্তিমান্ লোকেরা সাত্ত্বিকভাবে দুঃখ সহ্য করিলে দেশের ইতিহাসে তাহার ভবিষ্যৎ পরোক্ষ সুফল আমরা অস্বীকার করিতেছি না; কিন্তু সেই সুফল যে স্বরাজের আকার ধারণ করিবেই, সেরূপ দিব্যদৃষ্টি আমাদের এখন, লিখিবার সময়, নাই। ইংরেজদের সহিত স্বরাজবিষয়ে তর্কবিতর্কের সময় যেমন আমরা বলি, "আমরা মরিয়া যাইবার পর যে স্বরাজ আসিবে, তাহার কল্পনায় আমরা আশ্বস্ত হইতে পারি না, বাঁচিয়া থাকিতে থাকিতেই স্বাধিকার পাইতে ইচ্ছা করি"; তেমনই দেশের নেতৃবর্গের নিকটও আমাদের বক্তব্য এই, যে, তাঁহারা এমন কিছু কর্ম্মপন্থা উদ্ভাবন করুন যাহার ফলে দুঃখবরণ দ্বারাও প্রৌঢ় ও যুবকগণ মরিবার আগে স্বাধিকার পাইবার কতকটা আশা করিতে পারেন—আমাদের মত বৃদ্ধদের কথা ছাড়িয়া দিলাম। আমরা ইতিহাসে অনেক জাতির এক বা বহুশতাব্দীব্যাপী স্বাধিকারলাভ-চেষ্টার বিবয় পড়িয়াছি। ইতিহাসবর্ণিত

ভিন্ন ভিন্ন পন্থার বিষয়ও পড়িয়াছি। ব্যর্থপন্থানুসরণের বিষয়ও পড়িয়াছি। অতীত ইতিহাসে যে-পথের নির্দ্দেশ নাই, তাহা বর্ত্তমানে উদ্ভাবিত ও অনুসৃত হইতে পারে না, মনে করি না। অন্য দেশে যে-অবস্থায় যে-উপায়ে ফললাভ হইয়াছে, তাহা আমাদের দেশে ও অবস্থায় ফলদায়ক না-হইতে পারে। আবার অন্যত্র অন্য অবস্থায় যাহা ব্যর্থ হইয়াছে, তাহা আমাদের দেশে ও অবস্থায় সুফলপ্রদ হইতে পারে।

সেই জন্য পথ-নির্দ্দেশের পূর্ব্বে চিন্তা ও বিচার আবশ্যক—বিশেষ করিয়া যদি সেই পথের কোন উল্লেখ দৃষ্টান্ত সফলতা ব্যর্থতা ইতিহাসে লিপিবদ্ধ না থাকে।

—

কংগ্রেসের ৪৭তম অধিবেশন

বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভায় ও অন্যত্র প্রশ্নের উত্তরে সরকারী জবাব হইতে জানা যায়, যে, কংগ্রেস বে-আইনী বলিয়া ঘোষিত হয় নাই, এবং উহার সপ্তচত্বারিংশত্তম অধিবেশনও বে-আইনী বলিয়া নিষিদ্ধ হয় নাই। অথচ ভারত-গবর্ন্মেণ্ট ও সমুদয় প্রাদেশিক গবর্ন্মেণ্ট, যাহাতে এই অধিবেশন না হয়, তাহার জন্য প্রভূত চেষ্টা করিয়াছিলেন। যেখানে যে-কোন ব্যক্তিকে কংগ্রেসে যোগদানেচ্ছু প্রতিনিধি বলিয়া পুলিসের সন্দেহ হইয়াছে, তাহাকেই গ্রেপ্তার করা হইয়াছে। পণ্ডিত মদনমোহন মালবীয় (“মালব্য” নহে) ৪৭তম অধিবেশনের সভাপতি হইবেন স্থির ছিল। তাঁহাকেও আসানসোলে গ্রেপ্তার করিয়া কয়েক দিন জেলে রাখা হয়। অনেক জায়গায় লাঠিপ্রয়োগও হইয়াছিল। অধিবেশনের স্থান কলিকাতা নির্দ্দিষ্ট ছিল বলিয়া ইহার সব পার্কে পুলিস মোড়ে পুলিস গিজগিজ করিতেছিল। তাহা সত্ত্বেও, গবর্ন্মেণ্টের বুদ্ধি ও পুলিসের বুদ্ধিকে পরাস্ত করিয়া কলিকাতার প্রসিদ্ধতম স্থান চৌরঙ্গীর মোড়ে ট্রামওয়ের যাত্রীবিশ্রাম-মণ্ডপে কংগ্রেসের প্রতিনিধিরা উহার ৪৭তম অধিবেশন কয়েক মিনিটে সমাপ্ত করেন। শ্রীযুক্তা নেলী সেন গুপ্তা মহাশয়া সভানেত্রীর কাজ করেন ও ধৃত হন। প্রতিনিধি গ্রেপ্তার কেহ বলেন ৩০০, কেহ বলেন ২০০ হইয়াছিল। ২০।২৫ হইয়া থাকিলেই বা কি আসিয়া যায়? আসল কথা এই, যে, গবর্ন্মেণ্টের প্রদত্ত সর্ব্ববিধ বাধা সত্ত্বেও ভারতবর্ষের নানাস্থানের অন্যূন দুই হাজারেরও উপর লোক কংগ্রেসে যোগ দিতে উদ্যত হইয়াছিল। ইহার দ্বারা কংগ্রেসের প্রতি দেশের লোকদের অনুরাগ, এবং কংগ্রেসের শক্তি প্রমাণিত হইয়াছে। ইহাতে কংগ্রেস-ওয়ালারা নিশ্চয়ই সন্তুষ্ট হইবার অধিকারী। তবে, তাঁহারা ইহাও অবশ্য মনে রাখিবেন, যে, কংগ্রেসের প্রধান উদ্দেশ্য স্বরাজলাভ এখনও সিদ্ধ হয় নাই। গবর্ন্মেণ্টও বুঝুন, যে, কংগ্রেসকে তাঁহারা যেরূপ দুর্ব্বল এবং উপায়-উদ্ভাবনে অসমর্থ মনে করিয়াছিলেন, কংগ্রেস তাহা নহে—কংগ্রেসে রিসোর্স্‌ফুল্ অর্থাৎ কৌশলউদ্ভাবনসমর্থ লোক আছে।

কলিকাতায় কংগ্রেসের ৪৭তম অধিবেশনে গত ১লা এপ্রিল নিম্নমুদ্রিত প্রস্তাবগুলি গৃহীত হইয়াছিল বলিয়া দৈনিক কাগজে সংবাদ বাহির হইয়াছে।

(১) ১৯২৯ সালে লাহোরে ৪৪তম কংগ্রেসের অধিবেশনে পূর্ণ স্বাধীনতাই কংগ্রেসের লক্ষ্য বলিয়া যে প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছিল, এই কংগ্রেস দৃঢ়তার সহিত পুনরায় উহা সমর্থন করিতেছেন।

(২) জনসাধারণের অধিকার রক্ষা করিবার, জাতির আত্মসম্মান অক্ষুণ্ণ রাখিবার এবং জাতীয় লক্ষ্যে পৌঁছিবার জন্য এই কংগ্রেস আইন-অমান্য আন্দোলনকেই সম্পূর্ণরূপে আইনসম্মত পন্থা বলিয়া গ্রহণ করিতেছেন।

(৩) ১৯৩২ সালের ১লা জানুয়ারী তারিখে ওয়ার্কিং কমিটি যে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়াছিলেন, এই কংগ্রেস পুনরায় উহার সমর্থন করিতেছেন। গত ১৫ মাসে যাহা ঘটিয়াছে, তৎসমুদয় সম্বন্ধে পরীক্ষা করিয়া এই কংগ্রেস দৃঢ়তার সহিত এরূপ অভিমত প্রকাশ করিতেছেন, যে, দেশ বর্ত্তমানে যে অবস্থায় পতিত হইয়াছে, তাহাতে আইন-অমান্য আন্দোলনের শক্তিবৃদ্ধি এবং প্রচার করা উচিত; সুতরাং ওয়ার্কিং কমিটির নির্দ্দেশিত পন্থা অনুসারে কংগ্রেস জনসাধারণকে অধিকতর উৎসাহের সহিত আন্দোলন চালাইতে আহ্বান করিতেছেন।

(৪) এই কংগ্রেস দেশের সমস্ত দলের ও সম্প্রদায়ের লোককে সম্পূর্ণরূপে বিদেশী বস্ত্র পরিহার করিতে, খদ্দর ব্যবহার করিতে এবং বৃটিশ দ্রব্য বর্জ্জন করিতে আহ্বান করিতেছেন।

(৫) এই কংগ্রেসের অভিমত এই যে, যতক্ষণ পর্য্যন্ত বৃটিশ গবর্ন্মেণ্ট নির্ম্মম নিপীড়নমূলক অভিযান চালাইবেন—জাতির অতীব বিশ্বস্ত নেতৃবৃন্দ ও তাঁহাদের হাজার হাজার অনুসরণকারীদিগকে কারাদণ্ডিত ও বিনা বিচারে আটক করিয়া রাখিবেন, স্বাধীনভাবে কথা বলিবার ও মেলামেশা করিবার মৌলিক অধিকার লোপ করিবেন, সংবাদপত্রের স্বাধীনতার উপর কঠোর বাধানিষেধের ব্যবস্থা করিয়া রাখিবেন এবং ইংলণ্ড হইতে মহাত্মা গান্ধীর প্রত্যাবর্ত্তনের প্রাক্কালে সাধারণ অসামরিক আইনের স্থানে ইচ্ছাপূর্ব্বক প্রবর্ত্তিত কার্য্যতঃ সামরিক আইন প্রচলিত

থাকিবে, ততক্ষণ পর্য্যন্ত বৃটিশ গবর্মেণ্ট কর্ত্তৃক রচিত কোন রাষ্ট্রতন্ত্রই ভারতের জনসাধারণের বিবেচনা বা গ্রহণের যোগ্য হইবে না।

(৬) ১৯৩২ সালের সেপ্টেম্বর মাসে মহাত্মা গান্ধী যে অনশন করিয়াছিলেন, তাহা সাফল্যমণ্ডিত হওয়ায় এই কংগ্রেস দেশকে অভিনন্দিত করিতেছেন এবং আশা করিতেছেন যে, অনতিবিলম্বে অস্পৃশ্যতা অতীতের ব্যাপার রূপে পরিণত হইবে।

(৭) কংগ্রেসের অভিমত এই যে, "স্বরাজ" বলিতে কংগ্রেস কি ধারণা করেন, জনসাধারণ যাহাতে তাহা উপলব্ধি করিতে সক্ষম হন, সেই হেতু কংগ্রেসের বক্তব্য সহজবোধ্যভাবে বর্ণনা করা বাঞ্ছনীয়। এই জন্য এই কংগ্রেস ১৯৩১ সালে কংগ্রেসের করাচী অধিবেশনে গৃহীত ১৪নং প্রস্তাবের পুনরাবৃত্তি করিতেছেন।

—

কংগ্রেস-অভ্যর্থনাসমিতিকে বেআইনী ঘোষণ

কংগ্রেস বে-আইনী নহে, উহার ৪৭তম অধিবেশনও বেআইনী নহে, ইহা সরকারী মত। অথচ যে অভ্যর্থনা-সমিতি ঐ অধিবেশনের আয়োজন করিতেছিলেন, সরকার বাহাদুর তাহাকে বে-আইনী বলিয়া ঘোষণা করিয়াছিলেন এবং তৎসম্পৃক্ত যাঁহাকে যেখানে পাইয়াছেন তাঁহাকেই গ্রেপ্তার করিয়া জেলে পাঠাইয়াছেন! ইহা এক হেঁয়ালী।

যাহা হউক, সঙ্গত বা অসঙ্গত ভাবে যে-কোন সমিতি সরকারকর্ত্তৃক বেআইনী অভিহিত হইলেই তাহা বেআইনী হয়, তাহা না-হয় মানিয়া লইলাম। কিন্তু অভ্যর্থনা-সমিতির সভাপতি বা সভ্য হওয়া ত ডাকাতী নরহত্যা বদমায়েসী নহে এবং তাহার সভ্যেরা পলায়নপরও হন নাই। সুতরাং তাঁহাদের হাতকড়ি দেওয়ার প্রয়োজন বা ন্যায্যতা কোথায়? অথচ কাগজে দেখিলাম, উহার অন্যতম সভাপতি শ্রীযুক্ত ডক্টর নলিনাক্ষ সান্যাল, পি এইচ-ডি (লণ্ডন), ধৃত হইবার পর তাঁহার হাতে হাতকড়ি লাগাইয়া তাঁহাকে লালবাজারের গারদে লইয়া যাওয়া হইয়াছিল। ইহাতে তাঁহার কোনই অপমান বা লাঘব হয় নাই, হইয়াছে অন্য পক্ষের।

—

হোয়াইট পেপারের সমালোচনা

কোন বিষয়ে সর্ব্বসাধারণকে সকল সংবাদ বৃত্তান্ত তথ্য বা সমাচার জানাইবার জন্য ব্রিটিশ গবর্মেণ্ট যে-সব রিপোর্ট বাহির করেন, তাহার সাধারণ নাম হোয়াইট পেপার। এই সব রিপোর্টের মলাট শাদা বলিয়া নাম এই রূপ দেওয়া হইয়াছে, যেমন বিলাতী পার্লেমেণ্টের রিপোর্ট-সমূহের মলাট নীল কাগজের দেওয়া হয় বলিয়া তৎসমুদয়কে ব্লু বুক বা নীল পুস্তক বলা হয়।

কিন্তু হোয়াইট পেপারের নামের উৎপত্তি ও মানে যাহাই হউক, 'শাদা' বিশেষণটিকে স্বভাবতই সমালোচকদের বিদ্রূপবাণ সহ্য করিতে হইয়াছে। ভারতীয় অনেক সমালোচক ইহাকে কাল কাগজ বলিয়াছেন। ইহার কালিমা সহজেই চোখে পড়ে বটে। কিন্তু ইহার সপক্ষে এই একটা কথা বলা চলে, যে, ইহা হইতে ভারতবর্ষ সম্বন্ধে ব্রিটিশ জাতির বর্ত্তমান মনের ভাব বেশ স্পষ্ট বুঝা যায়। ভ্রমে পড়িয়া থাকা, প্রতারিত হওয়া, কখনই ভাল নয়। তার চেয়ে সকল অবস্থাতেই সত্য জানিতে পারা ভাল। প্রকৃত অবস্থা জানিলে প্রতিকারের চেষ্টা অপেক্ষাকৃত সহজ হয়। অবশ্য, ভারতবর্ষে এমন লোকের একান্ত অভাব ছিল না যাঁহারা মনে করিতেন ব্রিটিশ জাতি কখনই ভারতবর্ষকে সহজে স্বশাসক হইতে দিবে না, স্বশাসনের অধিকার আদায় করিয়া লইবার ক্ষমতা ভারতীয়দের জন্মিলে ইংরেজদের সম্মতি পাওয়া যাইতেও পারে এবং সেরূপ অবস্থায় সম্মতি না পাইলেও ক্ষতি হইবে না। এই রূপ লোকের সংখ্যা বাড়িয়াছে।

হোয়াইট পেপারটির এই প্রশংসাও করা চলে, যে, ইহা হইতে অনুমান হয়, ব্রিটিশ গবর্মেণ্ট বুঝিয়াছেন ভারতীয়দের রাজনৈতিক সচেতনতা ও শক্তি বাড়িয়া চলিতেছে; নতুবা তাঁহারা ভারতবর্ষকে দাবাইয়া রাখিবার জন্য হোয়াইট পেপারে প্রস্তাবিত কঠোর উপায়সমূহ অবলম্বন করিতে চাহিতেন না।

যাহারা, ভারতবর্ষ স্বশাসন-ক্ষমতা পাক বা না পাক, নিজেরা চাকরি বেশী করিয়া পাইলে এবং নিজেদের শ্রেণীর বা ধর্ম্মসম্প্রদায়ের কতকগুলি লোক কোনও বিষয়ে চূড়ান্তক্ষমতাহীন ব্যবস্থাপক সভাগুলার কয়েকটা বেশী আসন পাইলেই সন্তুষ্ট, তাহারা ছাড়া হোয়াইট পেপারটা আর কাহারও সমর্থন পাইবে না, পায় নাই। কিন্তু তাহাতে ব্রিটিশ গবর্মেণ্টের কিছু আসিয়া যাইবে না। ব্যবস্থাপক সভার সদস্য হইবার, মন্ত্রী হইবার, ও অন্যান্য চাকরি করিবার—বিশেষতঃ সৈনিক ও পুলিস বিভাগের চাকরি করিবার—ভারতীয় লোক যত দিন

সহজে জুটিবে, ততদিন ব্রিটিশ জাতির 'কুচ পরোয়া নহি' ভাব কায়েম থাকিবে।

—

হোয়াইট পেপার সম্বন্ধে ভারত-সচিব

হোয়াইট পেপারটা যে ব্রিটিশ জাতির হাত হইতে ভারতীয়দের হাতে ক্ষমতা একটুও হস্তান্তর করিতেছে না, উহা পড়িলেই তাহা বুঝা যায়। কিন্তু কেহ যদি উহা না পড়িয়া থাকেন, বিলাতী হাউস অব কমন্সে ঐ রিপোর্ট সম্বন্ধীয় তর্কবিতর্কের সময় কেবল মাত্র ভারত-সচিবের বক্তৃতার নিম্নোদ্ধৃত বাক্যগুলি পড়িয়া থাকেন, তাহা হইতেই বুঝিতে পারিবেন,চূড়ান্ত সব ক্ষমতা ব্রিটিশ জাতির হাতেই রাখা হইতেছে। স্যর স্যামুয়েল হোর ঐ বক্তৃতায় বলেন—

The Irish Treaty bore no analogy to the Indian situation. The Irish Treaty broke down because there were no safe-guards. In India the Governor-General, the Provincial Governors and other high officials would still be appointed by the Crown. The Security Services and the executive officers of the Federal and Provincial Governments would still be recruited and protected by Parliament, and the Army would remain under the undivided control of Parliament. Those were no paper safe-guards. The heads of Government were endowed with great powers and were given the means of giving effect to those powers.

তাৎপর্য্য।

আইরিশ সন্ধির সহিত ভারতীয় অবস্থার কোন সমতুল্যতা নাই। আইরিশ সন্ধি (ব্রিটিশ জাতির উদ্দেশ্যসিদ্ধির দিক্ দিয়া) অকেজো হইয়াছে এই কারণে যে উহাতে (ব্রিটিশ জাতির স্বার্থ ও ক্ষমতা রক্ষা করিবার নিমিত্ত আইরিশদের ক্ষমতা সীমাবদ্ধ করিবার ব্যবস্থা রূপ) সেফগার্ড বা রক্ষাকবচ ছিল না। ভারতবর্ষে গবর্ণর-জেনার্যাল, প্রাদেশিক গবর্ণরগণ এবং অন্যান্য উচ্চ কর্ম্মচারীরা অতঃপরও ব্রিটিশ-নৃপতির দ্বারা নিযুক্ত হইবেন। ভারতবর্ষকে নিরাপদ রাখিবার জন্য আবশ্যক চাকর্যোরা ("সিকিউরিটি-সার্বিসেজ্") এবং সংঘবদ্ধ ভারত-গবর্মেণ্ট ও প্রাদেশিক গবর্মেণ্টসমূহের শাসন-বিভাগের কর্ম্মচারীরা অতঃপরও ব্রিটিশ পার্লেমেণ্টের দ্বারা সংগৃহীত নিযুক্ত ও রক্ষিত হইবে, এবং সৈন্যদল পার্লেমেণ্টের একার অখণ্ড আয়ত্তে থাকিবে। এগুলি শুধু কাগজে লেখা রক্ষাকবচ নহে, (পরন্তু প্রকৃত রক্ষাকবচ)। সমগ্র ভারতবর্ষের এবং প্রদেশসমূহের গবর্মেণ্টের সর্ব্বপ্রধান ব্যক্তিদিগকে খুব বেশী ক্ষমতা দেওয়া হইয়াছে, এবং সেই ক্ষমতাগুলিকে কার্য্যকর করিবার উপায়ও তাঁহাদের হাতে দেওয়া হইয়াছে।

ভারতবর্ষকে 'নিরাপদ' রাখা যে-যে শ্রেণীর চাকর্যোদের কাজ, যেমন সিবিল সার্বিস ও পুলিস সার্বিস্, তাহাদের নাম সিকিউরিটি সার্বিসেজ। নিরাপদ রাখার প্রকৃত অর্থ, ভারতবর্ষকে ব্রিটেনের জমীদারী রূপে কায়েম রাখা।

—

মণ্টেগুর ঘোষণা ও হোয়াইট পেপার

১৯১৭ খৃষ্টাব্দে ভারত-সচিব মণ্টেগু সাহেব পার্লেমেণ্টের সম্মতিক্রমে ঘোষণা করেন, যে, ভারতশাসনে ব্রিটেনের নীতি হইতেছে দায়িত্বপূর্ণ গবর্মেণ্ট ক্রমশঃ প্রগতিশীলরূপে কার্য্যত স্থাপন করা (the progressive realization of responsible government)। কয়েক বৎসর হইল বর্ত্তমান প্রধান মন্ত্রী বলিয়াছিলেন,কয়েক মাসের মধ্যে না হউক, কয়েক বৎসরের মধ্যে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যে স্বশাসক ডোমীনিয়নের সংখ্যা একটি বাড়িবে, অর্থাৎ ভারতবর্ষ স্বশাসক ডোমীনিয়ন হইবে। ভূতপূর্ব্ব বড়লাটও ভারতবর্ষকে স্বশাসক ডোমীনিয়নে পরিণত করা ভারতবর্ষে ব্রিটিশ রাজনীতির লক্ষ্য বলিয়াছিলেন। হোয়াইট পেপারটি ভারতবর্ষকে এই তিন জন রাজপুরুষের উক্তির যাহা লক্ষ্যস্থল তাহার দিকে এক চুলও লইয়া যাইবে এমন মনে হয় না। শেষোক্ত দু-জন পার্লেমেণ্টকে জানাইয়া ও তাহার অনুমোদনক্রমে কথা বলেন নাই, এরূপ আপত্তি উঠিতে পারে। কিন্তু মণ্টেগু সাহেবের ঘোষণা সম্বন্ধে তাহা বলা চলে না। অতএব তাঁহার কথা অনুসারে হোয়াইট পেপারটার বিচারে কোন আপত্তি হইতে পারে না।

মণ্টেগু যেমন রেস্পন্সিব্ল্ গবর্মেণ্ট বা দায়িত্বপূর্ণ গবর্মেণ্টের কথা বলিয়াছিলেন, হোয়াইট পেপারেও তেমনি আছে, যে, ভারতবর্ষকে দেশী রাজ্য ও ব্রিটিশ-শাসিত প্রদেশগুলির দায়িত্বপূর্ণ ভাবে শাসিত ("রেস্পন্সিব্লি গভর্ণড্") একটি ফেডারেশুন বা সংঘবদ্ধ রাষ্ট্রে পরিণত করা ইহার উদ্দেশ্য। কিন্তু প্রকৃত প্রশ্ন এই, শাসনকর্ত্তারা বা গবর্মেণ্ট দায়ী থাকিবেন কাহার নিকট? মণ্টেগুর উক্তির সোজা ও স্বাভাবিক মানে সভ্য জগৎ ও ভারতবর্ষ এই বুঝিয়াছিল, যে, ভারত-গবর্মেণ্টকে ক্রমে ক্রমে ধাপে ধাপে দেশের

লোকদের কাছে দায়ী করার দিকে লইয়া যাওয়া হইবে। হোয়াইট পেপারে সেরূপ প্রগতি অগ্রগতি উর্দ্ধদিকে গতির কোন চিহ্ন নাই, বরং উল্টা দিকে গতির ব্যবস্থা ও প্রমাণ যথেষ্ট আছে। ভারতবর্ষের গবন্মেণ্ট দায়িত্বপূর্ণ হইবে বটে, কিন্তু তাহা দায়ী হইবে ব্রিটিশ জাতি ও তাহাদের প্রতিনিধি পার্লেমেণ্টের নিকট, ভারতবাসী এবং তাহাদের প্রতিনিধি কোন ব্যবস্থাপক সভার নিকট নহে। তদ্ভিন্ন, বর্ত্তমানে বড়লাট ও অন্যান্য লাটদের হাতে যত ক্ষমতা আছে, হোয়াইট পেপারে তাঁহাদিগকে তার চেয়ে অনেক বেশী ক্ষমতা দেওয়া হইয়াছে। এই সব ক্ষমতা অনুসারে তাঁহারা যাহা কিছু করিবেন, তাহার জন্য তাঁহাদিগকে ভারতবর্ষের কোন অধিবাসীর বা অধিবাসীসমষ্টির নিকট কৈফিয়ৎ দিতে হইবে না। ইহা অতি অদ্ভুত ও অপূর্ব্ব দায়িত্বপূর্ণ গবন্মেণ্ট বটে!

—

অবস্থান্তর ঘটিবার কালের ব্যবস্থা

হোয়াইট পেপারের প্রথম অনুচ্ছেদটিতে আছে,বর্ত্তমান শাসনবিধি পরিবর্ত্তিত হইয়া সংঘবদ্ধ বা ফেডারেটেড ভারতের ভবিষ্যৎ শাসনবিধিতে পরিণত হইবে। এই পরিবর্ত্তন বা অবস্থান্তর প্রাপ্তির জন্য সময়ের আবশ্যক। অবস্থান্তর প্রাপ্তির জন্য আবশ্যক এই যে সময়, সেই সময়ে কতকগুলি দিকে দেশের লোকদের ও তাহাদের প্রতিনিধিদের ক্ষমতা সীমাবদ্ধ করা হইবে। এই সীমা-নির্দ্দেশকে সাধারণতঃ সেফগার্ড বা রক্ষাকবচ বলা হয়। তাহা বুঝা গেল; কিন্তু কত মাসে, বৎসরে, যুগে, বা শতাব্দীতে এই অবস্থান্তর ঘটিবে, তাহা কোথাও বলা হয় নাই। সুতরাং ব্যাপারটা দাঁড়াইতেছে এই, যে, অনির্দ্দিষ্ট কাল, চিরকাল, যতদিন ব্রিটিশ রাজত্ব টিকিবে ততদিন, এই অবস্থান্তর ঘটিবার কালের রক্ষাকবচগুলি বর্ত্তমান থাকিয়া, ভারতীয়েরা এখন যেমন স্বশাসন ক্ষমতা হইতে বঞ্চিত, সেইরূপ বঞ্চিত থাকিবে। যে অঙ্গীকার পালনের কোন সময় নির্দ্দিষ্ট করা হয় না, তাহার কোন মূল্য নাই। "ভদ্রলোকের এক কথা" সম্বন্ধে যে প্রচলিত পরিহাস আছে, এরূপ অঙ্গীকার তাহারই মত। এক জন ঋণী ব্যক্তি তাহার মহাজনকে বলিয়াছিল, "কাল টাকা দিব।" মহাজন যেদিন তাগিদ দেয়, সেই দিনই উত্তর পায়, "বলিয়াছি ত কাল দিব—ভদ্রলোকের এক কথা।" ব্রিটিশ ভদ্রলোকেরাও সেইরূপ, আমরা যতই কেন তাগিদ দি না, চিরকাল আমাদিগকে বলিতে পারে ও বলিতেছে, "শাসনবিধির অবস্থান্তর প্রাপ্তির সময় উত্তীর্ণ হইলেই তোমরা স্বরাজ পাইবে—ভদ্রলোকের এক কথা।"

—

রক্ষাকবচগুলি কাহার হিত ও স্বার্থরক্ষার জন্য?

কংগ্রেস যাহাতে তথাকথিত গোলটেবিল বৈঠকে যোগ দিতে পারে, তাহার জন্য লর্ড আরুইনের সহিত মহাত্মা গান্ধীর একটি চুক্তি অনুসারে নিরুপদ্রব আইন-লঙ্ঘন প্রচেষ্টা বন্ধ করা হয়। এই চুক্তির দ্বিতীয় সর্ত্তের দ্বিতীয় অনুচ্ছেদে আছে—

"Of the scheme there outlined, Federation is an essential part, so also are Indian responsibility and reservation or safe-guards in the interests of India for such matters, as for instance, defence, external affairs, the position of minorities, the financial credit of India and the discharge of obligations."

ইহাতে বলা হইয়াছে, যে, ভারতবর্ষের হিত ও স্বার্থরক্ষার জন্য আবশ্যক কতকগুলি বিষয় শাসনকর্ত্তাদের হাতে রক্ষিত থাকিবে। এই রক্ষিত রাখিবার ব্যবস্থাগুলিরই নাম রক্ষাকবচ। এইরূপ যে-সব সর্ত্ত করা হইয়াছিল তাহা মহামহিম ব্রিটিশ নৃপতির গবর্মেণ্টের সম্মতিক্রমে ("with the assent of His Majesty's Goverenment") করা হইয়াছিল বলিয়া চুক্তিনামায় লিখিত আছে।

হোয়াইট পেপারে কিন্তু চুক্তির এই সর্ত্তের ব্যতিক্রম দেখা যাইতেছে। তাহাতে রক্ষাকবচগুলি সম্বন্ধে লিখিত আছে—

These limitations, commonly described by the compendious term "safe-guards," have been framed in the common interests of India and the United Kingdom.

তাৎপর্য্য।

"সংক্ষেপে রক্ষাকবচ নামে অভিহিত এই সংকোচক ব্যবস্থাগুলি ভারতবর্ষ এবং গ্রেট ব্রিটেন ও উত্তর আয়ারল্যাণ্ডের যুক্ত রাজ্যের সাধারণ স্বার্থরক্ষার্থ প্রণীত হইয়াছে।"

এগুলি বস্তুতঃ ব্রিটিশ জাতিরই প্রভুত্ব ও স্বার্থরক্ষার জন্য প্রণীত হইয়াছে। হোয়াইট পেপারে যাহা লেখা ও করা হইয়াছে, তাহার দ্বারা গান্ধী-আরুইন চুক্তির সর্ত্ত ভঙ্গ করা হইয়াছে। অঙ্গীকারভঙ্গ আগে আগেও হইয়াছিল বলিয়া বঙ্গের ভূতপূর্ব্ব গবর্ণর লর্ড লিটনের পিতা বড়লাট লিখিয়াছিলেন, ব্রিটিশ জাতি অঙ্গীকারভঙ্গের অভিযোগ মিথ্যা বলিতে পারেন না।

রক্ষাকবচ সম্বন্ধে গান্ধী-আরুইন চুক্তিতে যাহা লিখিত হইয়াছিল এবং হোয়াইট পেপারে যাহা লিখিত হইয়াছে, তাহার মধ্যে সত্যকথনের দিক দিয়া হোয়াইট পেপারটাকে কিছু ভাল বলিতে হইবে। কারণ, গান্ধী-আরুইন চুক্তিতে যাহা লিখিত হইয়াছিল, ভারতবাসীরা সাধারণতঃ মনে করিয়াছিল, যে, কার্য্যতঃ তাহা করা হইবে না, কথার আবরণের সুযোগে ব্রিটিশ স্বার্থরক্ষার উহা একটা কৌশল মাত্র। হোয়াইট পেপারে যে সেই আবরণ কিয়ৎ পরিমাণেও অপসৃত হইয়াছে, তাহা ভাল। সম্পূর্ণ অপসৃত হইলে আরও ভাল হইত; যদি পরিষ্কার করিয়া বলা হইত, যে, রক্ষাকবচগুলি কেবল মাত্র ব্রিটিশ জাতির স্বার্থরক্ষার্থ, কিংবা অন্ততঃ প্রধানত ব্রিটিশ জাতির স্বার্থরক্ষার্থ রচিত হইয়াছে, তাহা হইলে আরও ভাল হইত। যাহা হউক, সেগুলি যে অংশতও ব্রিটিশ জাতির স্বার্থরক্ষার জন্য প্রণীত হইয়াছে, এতটুকু স্বীকারোক্তিও মন্দের ভাল।

—

ফেডারেশ্যন কখন হইবে?

হোয়াইট পেপারে লোভজনক দুটি কথা আছে। একটি কেন্দ্রীয় দায়িত্ব, অন্যটি প্রাদেশিক আত্মকর্ত্তৃত্ব। যেরূপ শাসনবিধি রচিত হইবার স্পষ্ট প্রস্তাব ইহাতে আছে, তাহাতে বুঝা যায়, কথা দুটি কেবল কথার কথা মাত্র, ভিতরে যে বস্তুটি থাকিলে কথা দুটি সার্থক হয়, তাহা নাই। সে কথা পরে বুঝাইব।

বর্ত্তমানে প্রদেশগুলিতে যে দ্বৈরাজ্য আছে, তাহাতে শিক্ষা কৃষি প্রভৃতি কোন কোন হস্তান্তরিত বিষয়ের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রীরা নিজ নিজ বিষয়ের কার্য্যনির্ব্বাহের জন্য প্রাদেশিক ব্যবস্থাপক সভার নিকট দায়ী। কেন্দ্রীয় দায়িত্ব বলিতে এই বুঝায়, যে, কেন্দ্রীয় যে ভারত-গবর্মেণ্ট তাহাতেও মন্ত্রী থাকিবেন, এবং মন্ত্রীরা নিজ নিজ বিষয়ের কার্য্যনির্ব্বাহের নিমিত্ত ভারতীয় ব্যবস্থাপক সভার নিকট দায়ী থাকিবেন। সমস্ত রাষ্ট্রীয় ব্যাপারগুলি মন্ত্রীদের হাতে গেলে এবং মন্ত্রীরা তাঁহাদের সব কাজের জন্য ব্যবস্থাপক সভার নিকট দায়ী হইলে, সে ত খুব ভাল বন্দোবস্তই হয়। কিন্তু পরে দেখা যাইবে, যে, সব বিষয় মন্ত্রীদের হাতে যাইবে না এবং যাহা যাইবে মন্ত্রীরা বস্তুতঃ তাহার কর্ত্তা হইবে না। সে-কথা এখন ছাড়িয়া দিয়া দেখা যাক্, কেন্দ্রীয় দায়িত্ব নামক জিনিষটির প্রবর্ত্তন কখন হইবে।

বলা হইয়াছে, যখন দেশী রাজ্যগুলি এবং ব্রিটিশ-শাসিত প্রদেশগুলি একটি সম্মিলিত সংঘবদ্ধ রাষ্ট্রে (Federationএ) পরিণত হইবে, তখন কেন্দ্রীয় দায়িত্ব প্রবর্ত্তিত হইবে। তাহা হইলে দেখিতে হইবে, ফেডারেশ্যন কখন হইবে; কারণ তাহা হওয়ার উপরই কেন্দ্রীয় দায়িত্ব নির্ভর করিতেছে।

ফেডারেশ্যন হওয়া অনেকগুলি জিনিষের উপর নির্ভর করিতেছে। আগে কন্স্‌টিটিউশ্যন য়্যাক্ট্‌ অর্থাৎ শাসন-বিধি বিষয়ক আইনটি পার্লেমেণ্টে পাস হওয়া চাই। তাহাতে অনেক সময় লাগিবে। এই আইন পাস হইয়া গেলে দেশী রাজ্যের নৃপতিরা বিচার করিয়া দেখিবেন, তাঁহারা ফেডারেশ্যনে যোগ দিবেন কি না। তাহাতে সময় লাগিবে। দেশী রাজ্যগুলির মোট লোকসংখ্যা ৮ কোটি ১২ লক্ষের উপর। অন্ততঃ ৪ কোটি ৬ লক্ষ লোকের রাজারা ফেডারেশ্যনে যোগ দিতে রাজী হইলে তবে ফেডারেশ্যন প্রতিষ্ঠিত হইবে। ইহা কত সময় সাপেক্ষ এখন বলা যায় না। আর একটি সর্ত্ত এই, যে, একটি রিজার্ভ ব্যাঙ্ক স্থাপিত হওয়া চাই, এবং তাহা সম্পূর্ণ রূপে রাজনৈতিক প্রভাব হইতে মুক্ত হওয়া চাই। তাহার মানে এই, যে, এই ব্যাঙ্ক পরিচালনের কাজে এমন কোন ভারতীয় ব্যক্তির হাত থাকিবে না যিনি রাজনৈতিক দিক্ দিয়া ব্যাঙ্কটির দ্বারা ভারতবর্ষের উপকার করিতে পারেন। সব দেশের রাষ্ট্রীয় ব্যাঙ্ক স্বদেশের জন্য এইরূপ উপকার স্বভাবতই করিয়া থাকে; কিন্তু ভারতবর্ষের সব

প্রতিষ্ঠান এরূপ হওয়া চাই যদ্দ্বারা ইংলণ্ডের স্বার্থরক্ষা নিশ্চয়ই হয় এবং ইংলণ্ড ও ভারতবর্ষের স্বার্থসংঘর্ষ ঘটিলে ইংলণ্ডের যেন কোন ক্ষতি না হয়। এই রিজার্ভ ব্যাঙ্ক স্থাপন পৃথিবীর অর্থনৈতিক অবস্থার উপর নির্ভর করিবে, বলা হইয়াছে। সুতরাং ইহাতেও সময় লাগিবে।

ফেডারেশ্যন প্রতিষ্ঠিত হইবার আর একটি সর্ত্ত এই, যে, প্রারম্ভিক উক্ত সব আয়োজন সম্পূর্ণ হইয়া গেলে রাজকীয় ঘোষণা দ্বারা উহার জন্মদান হইবে ("the Federation shall be brought into being by Royal Proclamation")। পাঠকেরা যেন না ভাবেন, ইংলণ্ডেশ্বর এই ঘোষণা করিবার জন্য 'মুখিয়ে' আছেন। তাঁহার এরূপ উদ্‌গ্রীব হইয়া থাকিবার কোনই কারণ নাই। তিনি উদ্‌গ্রীব হইয়া থাকিলেও স্বয়ং কিছু করিতে পারিবেন না। কারণ, হোয়াইট পেপারে লিখিত হইয়াছে, যে,

"The Proclamation shall not be issued until both Houses of Parliament have presented an Address to the Crown with a prayer for its promulgation."

তাৎপর্য্য।

পার্লেমেণ্টের দুই কক্ষ হাউস্ অব্ লর্ড্‌স্ ও হাউস্ অব্ কমন্স্ রাজার সমীপে একটি আবেদন পেশ্ করিবেন, তাহাতে এই প্রার্থনা থাকিবে, যে, তিনি উক্ত ঘোষণাপত্র প্রকাশ করুন। এইরূপ আবেদন রাজার হুজুরে পেশ হইবার পূর্ব্বে তিনি ঘোষণা করিবেন না।

পার্লেমেণ্টের উভয় অংশের সভ্যেরা এইরূপ একটি আবেদন করিবার নিমিত্ত উন্মুখ হইয়া নাই। উভয় অংশেই চার্চিলের মত সভ্য আছে, যাহারা প্রতি ধাপে ভারতবর্ষে ফেডারেশ্যন প্রবর্ত্তনে বাধা দিতে প্রস্তুত। তাহাদের প্রভাবে অধিকাংশ পার্লেমেণ্টের সভ্য রাজার কাছে উক্ত প্রার্থনা করিতে রাজী না হইতেও পারে। রাজার উদ্দেশে উপস্থাপিত আবেদনের সংশোধনাদিরও নিয়ম আছে। বিরোধী সভ্যেরা সেই নিয়মের সুযোগ গ্রহণ করিয়া বাধা উপস্থিত করিতে পারে।

দেখা গেল, ফেডারেশ্যন সহজে ও শীঘ্র হইবে না— একেবারেই না হইতেও পারে। প্রস্তাবিত রকমের ফেডারেশ্যন না হইলে আমরা দুঃখিত হইব না।

—

দেশী রাজ্যের অর্দ্ধেক কেন ফেডারেশ্যনভুক্ত হওয়া চাই

যে-যে উপায়ে ভারতবর্ষের ন্যাশন্যালিজ্‌মকে অর্থাৎ ভারতীয় স্বাজাতিকতা ও স্বরাজলাভচেষ্টাকে ব্যাহত করা যাইতে পারে, ফেডারেশ্যনের মধ্যে দেশী রাজ্যগুলিকে আনিয়া তাহাদের নৃপতিদিগকে ফেডারেশ্যনের ব্যবস্থাপক সভায় খুব বেশী সভ্য নিযুক্ত করিবার অধিকার দেওয়া তাহার অন্যতম। ইহার ব্যাখ্যা পরে করিব। এই উদ্দেশ্যে ফেডারেটেড্ বা সংঘবদ্ধ ভারতবর্ষের ব্যবস্থাপক সভার নিম্ন হাউস্ বা কক্ষের মোট যে সভ্যসংখ্যা ৩৭৫, তাহার এক-তৃতীয়াংশ অর্থাৎ ১২৫ জন দেশী রাজারা মনোনীত করিবেন। সমুদয় দেশী রাজ্য ফেডারেশ্যনের মধ্যে আসিলে এই ১২৫ জন সভ্য দেশী রাজারা নিযুক্ত করিবেন। অর্দ্ধেকগুলি রাজ্য যদি ফেডারেশ্যনভুক্ত হয়, তাহা হইলে তাহাদের রাজাদের নিযুক্ত ৬৩ জন সভ্যের দ্বারাও ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদীদের উদ্দেশ্য অনেকটা সিদ্ধ হইতে পারে; কিন্তু তাহার কমে সে উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইবে না। এই জন্য হোয়াইট পেপারে বলা হইয়াছে, যে, অন্ততঃ দেশী রাজ্যসমূহের মোট প্রজা আট কোটি বার লক্ষের অর্দ্ধেকের রাজারা ফেডারেশ্যনভুক্ত হইতে রাজী হইলে তবে ফেডারেশ্যন প্রবর্ত্তিত হইবে।

—

ফেডারেশ্যন ও য়ুনিটারী গবর্মেণ্ট

ফেডারেশ্যনের মানে এই, যে, সাধারণ কতকগুলি বিষয়ে ফেডারেটেড বা সংঘবদ্ধ রাষ্ট্রের সর্ব্বত্র ঠিক্ এক রকম আইন, ও রাষ্ট্রীয় কার্য্য পরিচালনের এক রকম রীতি চলিবে এবং কতকগুলি ট্যাক্স সর্ব্বত্র এক রকম হইবে; কিন্তু অন্য সব বিষয়ে সংঘবদ্ধ রাষ্ট্রের সভ্য ভিন্ন ভিন্ন দেশী রাজ্য ও ব্রিটিশ-শাসিত প্রদেশগুলিতে তাহাদের নিজের নিজের আইন, নিজের নিজের রীতি, ও নিজের নিজের ট্যাক্স থাকিতে পারিবে। ইহাতে অংশগুলির নিজের নিজের কিছু স্বাতন্ত্র্য, স্বাধীনতা ও বৈচিত্র্য থাকায় কিছু সুবিধা আছে বটে। কিন্তু অন্যদিকে এই অসুবিধাও আছে, যে, এইরূপ স্বাতন্ত্র্য ও বৈচিত্র্য সমগ্র মহাজাতির মধ্যে একতা ও সংহতি জন্মিবার একটা বাধাও উৎপাদন

করে ; এবং সেই বাধা বশতঃ সমগ্র দেশ ও মহাজাতি আত্মরক্ষার জন্য যত শক্তিমান্ হওয়া দরকার তত শক্তিশালী হইতে পারে না ; এমন কি সংঘবদ্ধ রাষ্ট্রের অংশীভূত দেশী রাজ্য ও প্রদেশগুলির মধ্যে রেষারেষি ও ঝগড়া-বিবাদ হওয়ারও সম্ভাবনা থাকে। ভারতবর্ষে যে-প্রকারের ফেডারেশ্যন স্থাপনের চেষ্টা হইতেছে, তাহাতে ত ভারতবর্ষ কখনই শক্তিশালী একটি রাষ্ট্র হইতে পারিবে না, এবং অন্যবিধ কুফলও ফলিবে।

ভারতবর্ষে কি ঘটিবে, তাহার অনুমান ও আলোচনা ছাড়িয়া দিলে, সাধারণতঃ ফেডারেশ্যন ভাল না য়ুনিটারী গবর্মেণ্ট ভাল, তাহার আলোচনা হইতে পারে। য়ুনিটারী গবর্মেণ্ট, মোটামুটি, তাহাকে বলে যাহার অধীন সমগ্র ভূখণ্ডে অভিন্ন আইনসমষ্টি, অভিন্ন রাষ্ট্রীয় কার্য্যপরিচালন-পদ্ধতিসমূহ এবং অভিন্ন নানা ট্যাক্স প্রচলিত।

আমেরিকায় অনেক বৎসর ধরিয়া ফেডার‍্যাল শাসন-প্রণালী চলিয়া আসিতেছে। সেখানকার চিন্তাশীল রাষ্ট্রবিজ্ঞানবিদেরা ফেডার‍্যাল প্রণালীর অনেক অসুবিধা বুঝিতে পারিতেছেন। ইহাঁদের মধ্যে এক জন, মিঃ ডবলিউ এফ উইলোবি, মূলরাষ্ট্রবিধিসম্বন্ধীয় ("Constitutional") বিষয়সমূহে বিশেষজ্ঞ বলিয়া সুপরিচিত। তিনি গত ফেব্রুয়ারী মাসের আমেরিকান্ পোলিটিক্যাল সায়েন্স রিভিউতে লিখিয়াছেন :—

It is a significant fact that practically all countries which in recent years have adopted new constitutional systems have after a careful study of the relative advantages and disadvantages of the unitary and federal types of government, decided in favour of the former. The difficulties that our country (U. S. A.) has had, as the result of its having a federal form of government, in the handling of such matters as the detection and prosecution of crime, the control of transportation, the securing of uniform legislation in respect to many matters in regard to which uniformity is desirable and the co-ordination of the activities of the national government and the governments of the states, when their operations are in the same field, are well known.

তাৎপর্য্য।

ইহা একটা অর্থপূর্ণ তথ্য, যে আধুনিক কালে যে-সব দেশ নূতন শাসনপ্রণালী অবলম্বন করিয়াছে, কার্য্যতঃ তাহাদের সবগুলিই, ফেডার‍্যাল ও য়ুনিটারী প্রণালীর আপেক্ষিক সুবিধা অসুবিধা যত্নপূর্ব্বক বিবেচনা করিয়া য়ুনিটারীর পক্ষে সিদ্ধান্ত করিয়াছে। আমেরিকার ইউনাটেড ষ্টেট্‌সে ফেডার‍্যাল শাসনপ্রণালী থাকায়, অপরাধ (crime) ধরা ও অপরাধীর বিরুদ্ধে মোকদ্দমা চালানতে, মাল ও যাত্রী বহন করায়, যে-সব বিষয়ে একবিধ আইনপ্রণয়ন বাঞ্ছনীয় সেই সেই বিষয়ে একবিধ আইন প্রণয়নে, এবং যে-সব বিষয়ে সমগ্রদেশের এবং তাহার অংশ এক একটি রাষ্ট্রের কার্য্যক্ষেত্র এক, সেই সেই বিষয়ে ফেডারেশ্যনের ও ভিন্ন ভিন্ন রাষ্ট্রগুলির কার্য্যাবলীর পরস্পরের সহিত সঙ্গতি ও সমন্বয় বিধানে, যে-সকল দুষ্করতা আছে তাহা সুবিদিত।

এই জন্য মিঃ উইলোবি বলেন, যে, ফেডার‍্যাল প্রণালীর যে-সব দুষ্করতা অনিবার্য্য, তাহার অসুবিধাগুলি কি প্রকারে যথাসম্ভব কমান যায়, তদ্বিষয়ে অনুসন্ধান হওয়া উচিত। তিনি বলেন :—

It may well be that the American people are not prepared to abandon their federal form of government. It is desirable, however, that they should have a clear knowledge of the disadvantages that this form of government presents. A dispassionate study is needed of the manner in which this form of government operates at the present time and of the means that have been resorted to to overcome its disadvantages. Such a study would be especially valuable in considering proposals constantly being made to amend the federal constitution with a view to enlarging the powers of the national government and in the further development of means for securing uniformity in legislation and co-ordination in the administrative work of the different governments where such uniformity and co-ordination are desirable.

তাৎপর্য্য।

হইতে পারে, যে, আমেরিকার লোকেরা তাহাদের ফেডার‍্যাল প্রণালী ত্যাগ করিতে প্রস্তুত নয়। তাহা হইলেও, এইরূপ শাসন-প্রণালীর অসুবিধাগুলি সম্বন্ধে তাহাদের স্পষ্ট ধারণা থাকা উচিত। এই প্রণালীর কাজ বর্ত্তমানে কি ভাবে হয় তদ্বিষয়ে এবং ইহার অসুবিধাগুলি অতিক্রম করিবার জন্য যে-সব উপায় অবলম্বিত হইয়াছে, তৎসম্বন্ধে অপক্ষপাত অনুশীলন আবশ্যক। সমগ্রজাতীয় ফেডার‍্যাল গবর্মেণ্টের ক্ষমতা বাড়াইবার নিমিত্ত, ফেডারেশ্যনভুক্ত রাষ্ট্রগুলির আইনপ্রণয়নে ঐক্যসম্পাদনার্থ আরও উপায় উদ্ভাবনের জন্য এবং বিভিন্ন রাষ্ট্রের যে-সব কার্য্যবিভাগে সমন্বয় ও সঙ্গতিসাধন আবশ্যক তাহা করিবার জন্য, যে-সব প্রস্তাব ক্রমাগত হইয়া আসিতেছে, তৎসমুদয় বিবেচনা করিবার নিমিত্ত এই প্রকার অনুশীলন বিশেষরূপে মূল্যবান হইবে।

যে-সকল দেশে ফেডার‍্যাল শাসনপ্রণালী প্রচলিত, তাহাদের মধ্যে, আমেরিকার ইউনাইটেড ষ্টেট্‌স্ বৃহত্তম

এবং সর্ব্বাপেক্ষা ধনী ও শক্তিশালী। এই দেশের চিন্তাশীল রাষ্ট্রবিজ্ঞানবিদেরা অনেকে ফেডার্যাল শাসন-প্রণালীর অনেক দোষ বুঝিতে পারিতেছেন। যে-সকল দেশে অপেক্ষাকৃত অল্পকাল পূর্ব্বে নূতন শাসনপ্রণালী প্রবর্ত্তিত হইয়াছে, তাহাদের মধ্যে অনেক দেশ য়ুনিটারী প্রণালী অবলম্বন করিয়াছে। এই সব দেশ স্বাধীন। তাহাদের একতা সংহতি ও শক্তি অর্জ্জন স্বাধীন হইবার জন্ত আবশ্যক নহে, যদিও স্বাধীনতা রক্ষার জন্ত তাহা আবশ্যক। ভারতবর্ষের পক্ষে স্বাধীনতা লাভ, এবং পরে স্বাধীনতা রক্ষা, উভয় উদ্দেশ্য সাধনের জন্তই একতা, সংহতি ও শক্তি অর্জ্জন একান্ত আবশ্যক।

য়ুনিটারী শাসনপ্রণালী অবলম্বন এই উভয় উদ্দেশ্য সাধনের সমধিক উপযোগী। কিন্তু ভারতবর্ষকে দেওয়া হইতেছে ফেডার্যাল প্রণালী, এবং তাহাও এমন খিচুড়ীর মত, যে, তাহা হইতে ভারতবর্ষে ঐক্য ও সংহতির উদ্ভব অসম্ভব। দেশী রাজ্যগুলি এবং ব্রিটিশ-শাসিত প্রদেশগুলিকে একটি অখণ্ড য়ুনিটারী প্রণালীতে শাসিত রাষ্ট্রে পরিণত করিতে হইলে দেশী রাজ্যগুলির স্বাতন্ত্র্য বিলোপ এবং উহার নৃপতিদের প্রভুত্ব বিনাশ করিতে হয়। তাহা এখন সম্ভব হইবে না। কিন্তু ব্রিটিশ-শাসিত প্রদেশগুলিকে একটি অখণ্ড য়ুনিটারী রাষ্ট্রে পরিণত করা অসাধ্য বা দুঃসাধ্য নহে। তাহা করা চলিত। কিন্তু গবর্মেণ্ট তাহা করিবেন না। এবং আমাদের রাজনৈতিক নেতাদেরও সেই দূরদৃষ্টি, রাষ্ট্রবিজ্ঞানে সেই গভীর পারদর্শিতা এবং সেই সমগ্রভারত-প্রেম নাই, যাহা থাকিলে তাঁহারা ভারতবর্ষকে অখণ্ড য়ুনিটারী রাষ্ট্রে পরিণত করিবার চেষ্টাই করিতে থাকিতেন। তাঁহারা প্রাদেশিক আত্মকর্ত্তৃত্বের (প্রভিন্সিয়্যাল অটনমির) মোহে পথভ্রান্ত হইয়া আছেন। ব্রিটিশ-ভারত অখণ্ড য়ুনিটারী রাষ্ট্র রূপে গণতান্ত্রিক শাসনবিধি অনুসারে শাসিত হইলে কালক্রমে শক্তিশালী হইয়া উঠিতে পারিত। তখন উহা আপনার ও সমগ্রভারতের পক্ষে কল্যাণকর সর্ত্ত-সমূহে দেশী রাজ্যগুলিকে নিজের সহিত যুক্ত হইতে আহ্বান করিতে পারিত, এবং সেই আহ্বান আদেশের চেয়ে কম ফলদায়ক হইত না।

আমরা যাহা বলিলাম, এখন সেরূপ কিছু ঘটিবে না। কিন্তু তথাপি যাহা ভাল বলিয়া বুঝিয়াছি, তাহা বলা উচিত মনে করিলাম।

—

ফেডারেশ্যনের খিচুড়ী

ভারতবর্ষে ফেডারেশ্যনের যে কাঠামো আমাদের সম্মুখে ধরা হইয়াছে, তাহাকে আমরা খিচুড়ী বলিয়াছি। ঠিক্ বলা হয় নাই; খিচুড়ীর প্রতি অবিচার করা হইয়াছে। কারণ, খিচুড়ীতে চাল ডাল ঘি মশলা মিশিয়া একটা সুখাদ্য পুষ্টিকর জিনিষ উৎপন্ন হয়। কিন্তু ভারতীয় ফেডারেশ্যনের ব্যবস্থাপক সভার এক দিকে থাকিবে একনায়ক দেশী রাজ্যসমূহের রাজাদের নিযুক্ত লোকেরা এবং অন্ত দিকে থাকিবে নানা ধর্ম্মসম্প্রদায়ের, শ্রেণীর, জাতির ও "স্বার্থের" (interest এর) লোকদের দ্বারা নির্ব্বাচিত সভ্যেরা। কিন্তু ক্ষমতা কাহারও বিশেষ কিছু থাকিবে না—বড়লাটই হইবেন সর্ব্বেসর্ব্বা। এহেন চমৎকার ফেডারেশ্যন জগতে আর কোথাও নাই। অন্ত সব ফেডারেশ্যনের অঙ্গীভূত প্রত্যেক রাষ্ট্রের গণতান্ত্রিক হওয়া এবং থাকা একটি অবশ্যপালনীয় সর্ত্ত।* কিন্তু ভারতবর্ষের দেশী রাজ্যগুলির প্রজারা ফেডার্যাল ব্যবস্থাপক সভায় কোন সদস্য নির্ব্বাচন করিয়া পাঠাইতে পারিবেন না, তাঁহাদের নৃপতিরা আপনাদের নিযুক্ত লোক পাঠাইবেন। অন্ত দিকে ব্রিটিশ-ভারতের নানা লোকসমষ্টি নিজেদের প্রতিনিধি-নির্ব্বাচন করিয়া পাঠাইবে। এই ব্যাপারটার বাহ্য চেহারা গণতান্ত্রিক হইলেও, গণতান্ত্রিকতার সার বস্তু রাজনৈতিক ক্ষমতা এই নির্ব্বাচিত সভ্যদের থাকিবে না।

* এ-বিষয়ে ভিজাগাপাটমে প্রবাসী-সম্পাদকের প্রদত্ত বক্তৃতার একটি অংশ মাদ্রাজের "হিন্দু" ও পুনার "সার্ভেণ্ট অব ইণ্ডিয়া" হইতে নীচে উদ্ধৃত হইল।

"If most of the States were governed as at present according to the will of the rulers and if, as was hoped for, the provinces had a somewhat democratic constitution with elected legislatures, then federated India would present the strange spectacle of an assemblage of parts dissimilar and opposite in structure. That was not the case with

"প্রাদেশিক আত্মকর্ত্তৃত্ব" আগে হইবে

স্বাজাতিক (ন্যাশন্যালিষ্ট) ভারতীয়েরা কেন্দ্রীয় দায়িত্ব এবং প্রাদেশিক আত্মকর্ত্তৃত্ব এক সঙ্গে প্রবর্ত্তিত হওয়া চান। কিন্তু আমাদের মত যাঁহারা হোয়াইট পেপারটা আদ্যোপান্ত পড়িবার দুঃখ ভোগ করিতে বাধ্য হইয়াছেন, তাঁহারা বুঝিয়াছেন, যে, "প্রাদেশিক আত্মকর্ত্তৃত্ব" নামক চিজটিই আমাদিগকে আগে দেওয়া হইবে। এই কথাটি প্রচ্ছন্ন রাখিবার যথেষ্ট চেষ্টা হোয়াইট পেপারে আছে, কিন্তু তাহা যে চাপা পড়ে নাই তাহা 'মডার্ণ রিভিউ'তে বিশদরূপে দেখাইয়াছি। "প্রাদেশিক আত্মকর্ত্তৃত্ব" প্রদত্ত হইবার কত পরে কেন্দ্রীয় দায়িত্ব প্রবর্ত্তিত হইবে, তাহা কোথাও লেখা নাই। প্রকৃত কেন্দ্রীয় দায়িত্ব ব্রিটিশ জাতির আন্তরিক সম্মতি ক্রমে স্বেচ্ছায় কখনও প্রদত্ত হইবে বলিয়া আমরা বিশ্বাস করি না।

—

ফেডার‍্যাল ব্যবস্থাপক সভায় কে কত সদস্য পাঠাইবে

ফেডার‍্যাল অর্থাৎ সংঘবদ্ধ সমগ্রভারতের ব্যবস্থাপক সভায় গণশক্তি বা প্রজাশক্তিকে দাবাইয়া রাখিবার কিরূপ ব্যবস্থা হোয়াইট পেপারে আছে, তাহা উহার গঠনোপাদান হইতে বুঝা যাইবে। ফেডার‍্যাল ব্যবস্থাপক সভা দুই কক্ষে বিভক্ত হইবে। উচ্চ কক্ষটির নাম কৌন্সিল অব ষ্টেট এবং নিম্ন কক্ষটির নাম ফেডার‍্যাল য়্যাসেম্ব্লী। উচ্চ কক্ষের সদস্য-সংখ্যা হইবে ২৬০, তাহার মধ্যে দশ জনকে বড়লাট নিযুক্ত করিবেন; বাকী ২৫০ জন কাহারা হইবেন পরে লিখিতেছি। নিম্ন কক্ষের মোট সদস্য-সংখ্যা ৩৭৫ হইবে। তাহার বিবরণও পরে লিখিতেছি। কর্ত্তৃপক্ষ ধরিয়াই লইয়াছেন, ব্রহ্মদেশকে ভারতবর্ষ হইতে পৃথক করিতে হইবে—যদিও উহার অধিকংশ লোক পূর্ণস্বরাজ পাইবার পূর্ব্বে ভারতবর্ষ হইতে পৃথক হইতে চায় না। এই জন্য সদস্যের ফর্দ্দের মধ্যে ব্রহ্মদেশের উল্লেখ নাই।

দেশী রাজ্যসকলে মোটের উপর শিক্ষার বিস্তার এবং রাজনৈতিক চর্চ্চা কম হওয়ায় এবং তথায় নৃপতিদের একনায়কত্ব প্রতিষ্ঠিত থাকায়, প্রজাশক্তির বিকাশ ব্রিটিশ-ভারত অপেক্ষা কম হইয়াছে। তথাপি যদি দেশী রাজ্যের প্রজাদিগকে তাহাদের প্রতিনিধি নির্ব্বাচন করিতে দেওয়া হইত, তাহা হইলে স্বাজাতিকরাই দেশী রাজ্যের জন্য নির্দ্দিষ্ট অধিকাংশ আসন দখল করিতে পারিতেন। কিন্তু ব্যবস্থা হইয়াছে, যে, উচ্চ কক্ষের ২৫০ জন সদস্যের মধ্যে ১০০ জন এবং নিম্ন কক্ষের ৩৭৫ এর মধ্যে ১২৫ জন দেশী রাজ্যের সদস্য হইবেন এবং তাঁহারা নৃপতিদের দ্বারা নিযুক্ত হইবেন—প্রজাদের দ্বারা নির্ব্বাচিত হইবেন না। দেশী রাজ্যের রাজাদিগকে ফেডার‍্যাল ব্যবস্থাপক সভায় কি প্রকার অসঙ্গত রকম বেশী সদস্য দেওয়া হইয়াছে, তাহা তাহাদের মোট লোকসংখ্যা ও ব্রিটিশ-ভারতের লোকসংখ্যা হইতে বুঝা যায়।

(ব্রহ্মদেশ বাদে) সমগ্রভারতের লোকসংখ্য ৩৩,৮৩,২১,২৫৮, এবং দেশী রাজ্যগুলির লোকসংখ্যা ৮,১২,৩৭,৫৬৪। অর্থাৎ দেশী রাজ্যগুলিতে সমগ্রভারতের সিকির কম, শতকরা ২৪এরও কম, লোক বাস করে। কিন্তু তাহাদের রাজাদিগকে উচ্চ কক্ষের শতকরা ৪০ জন এবং নিম্ন কক্ষের শতকরা ৩৩⅓ জন সদস্য নিযুক্ত করিবার অধিকার দেওয়া হইয়াছে। রাজারা স্ব-ইচ্ছায় চলেন।

---

any other federation at the present day. A notable feature of some of the important existing federal constitutions was a declaration laying down in general terms the form of government to be adopted by the States forming part of the Federation. For example, the constitution of the United States of America contained a provision guaranteeing to every State of the Union a republican form of government. Similarly, according to the terms of the Swiss Federal Constitution the cantons are required to demand from the Federated State its guarantee of their constitution. This guarantee must be given provided, among other things, they ensure the exercise of political rights according to republican forms, representative or democratic. Likewise, the new German constitution provides that each state constituting the republic must have a republican constitution. In a Federated India the provinces are to have a more or less advanced form of representative government. Such should also be the from of government in the States. Similarity of forms of government in the States and the provinces was not demanded for the sake of artistic symmetry. The States' people should have free representative institutions in their own interests. It was necessary in the interests of the provinces also that the States' people should have citizens' rights."

তাঁহারা স্বাজাতিকতা কিংবা গণতান্ত্রিকতার ধার ধারেন না। আবার তাঁহারা নিজে গবর্ণর-জেনার‍্যালের মুঠার ভিতর। সুতরাং ব্যবস্থাপক সভার উচ্চ ও নিম্ন কক্ষে যথাক্রমে ১০০ ও ১২৫ জন (শতকরা ৪০ ও ৩৩⅓ জন) সদস্য কার্য্যতঃ গবর্ণর-জেনার‍্যালের মুঠার ভিতর থাকিবে।

ব্রিটিশ-শাসিত প্রদেশগুলির মধ্যে সদস্য বণ্টন

ব্রিটিশ-শাসিত কোন্ প্রদেশ উচ্চ ও নিম্ন কক্ষে কতজন করিয়া সদস্য পাইবে, তাহা নীচের তালিকায় দেওয়া হইল। লোকসংখ্যা হোয়াইট পেপার অনুসারে লিখিত।

প্রদেশ।	লোকসংখ্যা।	উচ্চ কক্ষ।	নিম্ন কক্ষ।
মাদ্রাজ	৪৫৬ লক্ষ	১৮	৩৭
বোম্বাই	১৮০	১৮	৩০
বাংলা	৫০১	১৮	৩৭
আগ্রা-অযোধ্যা	৪৮৪	১৮	৩৭
পঞ্জাব	২৩৬	১৮	৩০
বিহার	৩২৪	১৮	৩০
মধ্যপ্রদেশ-বেরার	১৫৫	৮	১৫
আসাম	৮৬	৫	১০
উ-প সীমান্ত প্রঃ	২৪	৫	৫
সিন্ধু	৩৯	৫	৫
উড়িষ্যা	৬৭	৫	৫
দিল্লী	৬	১	২
আজমীর	৬	১	১
কূর্গ	২	১	১
বালুচিস্থান	৫	১	১

লোক-সংখ্যার অনুপাতে সদস্য-সংখ্যা নির্দ্দিষ্ট হয় নাই। তাহাতে সর্ব্বাপেক্ষা জনবহুল প্রদেশগুলির প্রতি অবিচার করা হইয়াছে। ব্রিটিশ জাতির কোন কোন স্বার্থের সিদ্ধির জন্য এরূপ করা হইয়াছে। প্রদেশে প্রদেশে ঈর্ষ্যা জাগরূক রাখিয়া সম্পূর্ণ ঐক্য ও মৈত্রীর উদ্ভবে বাধা দেওয়া ব্রিটিশ জাতির অভিপ্রায় কি না, তাহা ভগবান জানেন। কিন্তু সেরূপ অভিপ্রায় না থাকিলেও ফল ঐ রূপ হইবে।

সকলের চেয়ে বেশী অবিচার বঙ্গের প্রতি হইয়াছে।

এই প্রকার অবিচার বর্ত্তমান ভারতীয় ব্যবস্থাপক সভার সদস্য-পদ বণ্টনেও আছে এবং দীর্ঘকাল চলিয়া আসিতেছে। তাহা আমরা প্রবাসীতে পূর্ব্বে পূর্ব্বে দেখাইয়াছি। কিন্তু অন্যায়ের বয়স যতই হউক, তাহা অন্যায়ই থাকে, দীর্ঘব্যবহারে ন্যায্যত্ব প্রাপ্ত হয় না।

এই প্রকার অন্তঃপ্রাদেশিক অবিচারের প্রতিবাদ অনুগৃহীত প্রদেশগুলির লোকদেরই আগে করা উচিত। কিন্তু ভারতীয় রাজনৈতিক ব্যক্তিদের ন্যায়বুদ্ধি এবং সমগ্রভারতপ্রেম এখনও তত প্রবল হয় নাই, যে, তাঁহারা এরূপ প্রতিবাদ করিবেন। যাহা হউক, এরূপ অবিচার সত্ত্বেও সমগ্রভারতের পূর্ণস্বরাজলাভের জন্য সম্মিলিত চেষ্টা করা কর্ত্তব্য। আসল জিনিষটা পাওয়া গেলে ভাগবখরার মীমাংসা পরে হইতে পারিবে। কিন্তু অবিচার যে হইয়া আসিতেছে এবং তাহাকে স্থায়িত্ব দিবার প্রস্তাব যে হইয়াছে, তাহা চাপা থাকা উচিত নয়।

সংখ্যাভূয়িষ্ঠেরা সংখ্যান্যূনে পরিণত

দেশী রাজ্যসমূহ ও ব্রিটিশ-ভারতের মধ্যে এবং ব্রিটিশ-ভারতের প্রদেশগুলির মধ্যে সদস্য বণ্টনের তালিকা দুটি হইতে দেখা যাইতেছে, যে, ভারতবর্ষের অধিকাংশ লোককে সংখ্যান্যূন সমষ্টিতে পরিণত করা হইয়াছে। মাদ্রাজ, বাংলা, আগ্রা-অযোধ্যা এবং বিহার এই চারিটি প্রদেশের লোকসংখ্যা ১৭ কোটি ৬৫ লক্ষের উপর। অর্থাৎ সমগ্রভারতের অর্দ্ধেকের উপর লোক এই চারিটি প্রদেশে বাস করে। এই কয়টি প্রদেশকে ফেডার‍্যাল ব্যবস্থাপক সভার উচ্চকক্ষে ৭২টি এবং নিম্ন কক্ষে ১৪১টি আসন দেওয়া হইয়াছে। সমগ্রভারতের বাকী অংশে অর্দ্ধেকের কম লোক বাস করে। সেই অংশকে কিন্তু ব্যবস্থাপক সভার উচ্চ কক্ষে ১৭৮টি এবং নিম্ন কক্ষে ২৩৪টি আসন দেওয়া হইয়াছে।

ব্রিটিশ-ভারতের সংখ্যাভূয়িষ্ঠ "বর্ণ" হিন্দুরা সংখ্যান্যূনে পরিণত

১৯৩১ সালের সেন্সস অনুসারে (ব্রহ্মদেশ বাদে) ব্রিটিশ ভারতবর্ষের লোকসংখ্যা ২৫,৬৬,২৭,১৩৮। ইহার মধ্যে ১৭,৬৩,৫৯,৭৩৮ জন হিন্দু। সেন্সসে "অনুন্নত" শ্রেণীর হিন্দুদের সংখ্যা দেওয়া হইয়াছে ৪,০২,৫৪,৫৭৬। আমাদের মতে তাহাদের সংখ্যা এত বেশী নয়। বাকী সব হিন্দুকে সরকারী ও বেসরকারী ইংরেজরা "কাষ্ট হিন্দু" বা বর্ণহিন্দু বলেন। ইহাদের সংখ্যা ১৩,৬১,০৫,১৬২।

ব্রিটিশ-ভারতে ইহারা সকলের চেয়ে সংখ্যাবহুল লোক-সমষ্টি। ইহাদিগকে ভারতীয় ব্যবস্থাপক সভায় "জেনার‍্যাল" বা সাধারণ আসনগুলিতে নির্ব্বাচিত হইবার অধিকার দেওয়া হইয়াছে। কিন্তু এই আসনগুলির দাবিদার একমাত্র তাহারাই নহে। বৌদ্ধ, জৈন, পারসী, ইহুদী এবং আদিম জাতিদেরও এগুলিতে দাবি আছে। বর্ণহিন্দুদের ও ইহাদের সকলের মোট সংখ্যা চৌদ্দ কোটির উপর। ইহারা ব্রিটিশ-ভারতের মোট লোকসংখ্যার অর্দ্ধেকের চেয়ে অনেক বেশী। কেবলমাত্র বর্ণহিন্দুদের সংখ্যা ধরিলেও তাহারাও ব্রিটিশ-ভারতের মোট লোকসংখ্যার অর্দ্ধেকের উপর হয়। এই জন্য ব্রিটিশ-ভারতের নিমিত্ত ফেডার‍্যাল ব্যবস্থাপক সভায় যতগুলি আসন রাখা হইয়াছে, তাহার অর্দ্ধেকের বেশী তাঁহাদের পাওয়া উচিত। কিন্তু ফেডার‍্যাল য়্যাসেম্বলীতে ব্রিটিশ-ভারতের জন্য নির্দ্দিষ্ট আড়াই শত আসনের মধ্যে কেবল এক শত পাঁচটি ইহাদিগকে দেওয়া হইয়াছে। অর্থাৎ যাহারা সংখ্যাভূয়িষ্ঠ তাহাদিগকে সংখ্যান্যূনে পরিণত করা হইয়াছে।

ইঁহারা যে সংখ্যাতেই বেশী, দলেই পুরু, তাহা নহে। ভারতবর্ষের যাঁহারা যোগ্যতম রাজনীতিজ্ঞ, যাঁহারা স্বরাজের জন্য সর্ব্বাপেক্ষা অধিক পরিশ্রম, স্বার্থত্যাগ, ও দুঃখবরণ করিয়াছেন, তাঁহাদের অধিকাংশ এই লোকসমষ্টির অন্তর্ভূত। যোগ্যতায়, স্বার্থত্যাগে ও দুঃখবরণে শ্রেষ্ঠ হওয়ার পুরস্কার ঠিক্ মিলিয়াছে!

—

বিভিন্ন ধর্ম্মসম্প্রদায়াদির মধ্যে আসন বণ্টন

ব্রিটিশ-ভারতের (অস্থায়ী) অধিবাসী ইউরোপীয়দের সংখ্যা ১,৬৮,১৩৪ জন। ইহাদিগকে উচ্চ কক্ষে ৭টি ও নিম্ন কক্ষে ১৪টি আসন দেওয়া হইয়াছে। কিন্তু ব্রিটিশ-ভারতের দেশী অধিবাসীরা প্রায় প্রতি ১৭ লক্ষ জনে উচ্চ কক্ষের এক একটি আসন পাইবে, এবং নিম্ন কক্ষের এক একটি আসন তাহাদের প্রতি দশ লক্ষের ভাগ্যে জুটিবে। ইহা হইতে বুঝুন ইউরোপীয়েরা কীদৃশ অতিমানব।

ব্রিটিশ-ভারতে মুসলমানেরা মোট লোকসংখ্যার এক-তৃতীয়াংশের চেয়ে অনেক কম, কিন্তু উভয় কক্ষেই তাহাদিগকে এক-তৃতীয়াংশ আসন দেওয়া হইয়াছে।

ব্রিটিশ-ভারতের (ব্রহ্মদেশ বাদে) মুসলমানদের সংখ্যা ৬,৬৩,৭৮,৬৬৯, অনুন্নত শ্রেণীর হিন্দুদের সংখ্যা ৪,০২,৫৪,৫৭৬। কিন্তু নিম্ন কক্ষে মুসলমানরা পাইবে ৮২টি আসন, অনুন্নত হিন্দুরা পাইবে মাত্র ১৯টি। মুসলমানদের প্রাপ্ত সংখ্যার অনুপাতে অনুন্নত হিন্দুদের পাওয়া উচিত ছিল ৪৯টি। অনুন্নত হিন্দুদের তথাকথিত নেতারা যে লণ্ডনে মুসলমানদের সঙ্গে "মাইনরিটি প্যাক্ট" করিয়াছিলেন, ইহা সম্ভবতঃ তাহারই পুরস্কার। উচ্চ কক্ষে অনুন্নত হিন্দুদের জন্য নির্দ্দিষ্ট আসনের যে উল্লেখ পর্য্যন্ত নাই, তাহাও বোধ হয় "মাইনরিটি প্যাক্টে"র বখশীশের ফাউ! নিগ্রহ ও অনুগ্রহের আর বেশী দৃষ্টান্ত দিবার প্রয়োজন নাই। আমরা কাহারও জন্য নির্দ্দিষ্টসংখ্যক কতকগুলি আসন রাখিবার পক্ষপাতী নহি। কিন্তু গবর্ন্মেণ্ট যখন আসন ভাগ করিয়াইছেন, তখন সকলের প্রতি ন্যায়বিচার করা উচিত ছিল। সেই জন্য বলি, মহিলাদের জন্য নির্দ্দিষ্ট কেবল ৯টি এবং শ্রমিকদের জন্য কেবল ১০টি আসন অত্যন্ত কম।

—

স্বাজাতিকতা দাবাইয়া রাখিবার আয়োজন

আগে আগে যাহা লিখিয়াছি, তাহা হইতে পাঠকেরা আভাস পাইয়াছেন, যে, ভারতীয় ব্যবস্থাপক সভায় স্বাজাতিকতার প্রভাব খর্ব্ব করিবার যথেষ্ট আয়োজন হইয়াছে। উচ্চ কক্ষের ২৬০ জন সদস্যের মধ্যে ১০০ জন দেশী রাজারা নিযুক্ত করিবেন, ১০ জন বড়লাট সাহেব নিজে নিযুক্ত করিবেন, ৫০ জন হইবেন মুসলমান, ৭ জন ইউরোপীয়, ২ জন দেশী খ্রীষ্টিয়ান, ১ জন ফিরিঙ্গী, এবং এক জনকে বড়লাট বালুচিস্থানের জন্য নিযুক্ত করিবেন। বাকী কেবলমাত্র ৮৯ জনকে নির্ব্বাচন করিবে ব্রিটিশ-ভারতের সংখ্যাভূয়িষ্ঠ বর্ণহিন্দু ও অন্যেরা, যাহাদের সংখ্যা, যোগ্যতা, পরিশ্রম, স্বার্থত্যাগ ও দুঃখবরণের উল্লেখ আগে করিয়াছি। মুসলমানদের মধ্যেও অবশ্য স্বাজাতিক আছেন, কিন্তু কম।

নিম্ন কক্ষের ৩৭৫ জন সদস্যের মধ্যে ১২৫ জনকে দেশী রাজারা নিযুক্ত করিবেন, ৮২ জন হইবেন মুসলমান, ১৯

জন অনুন্নত হিন্দু, ১৪ জন ইউরোপীয়, ৪ জন ফিরিঙ্গী; ইত্যাদি। বর্ণহিন্দু ও অন্য "সাধারণ"রা (যাঁহারা সংখ্যায় অর্দ্ধেকের বেশী, এবং যাঁহাদের যোগ্যতাদির উল্লেখ আগে করিয়াছি, তাঁহারা) পাইবেন মোটে ১০৫টি আসন।

আমরা অনুন্নত হিন্দুদিগকে অন্য হিন্দুগণ হইতে পৃথক ও ভিন্নসমাজভুক্ত মনে করি না। যদি তাঁহাদের জন্য নির্দ্দিষ্ট ১৯টি আসন অন্য হিন্দু ও সাধারণদের ১০৫টি আসনে যোগ করা যায়, তাহা হইলেও দেখা যাইবে, যে, ব্রিটিশ-ভারতের ২৫০ আসনের মধ্যে (১০৫+১৯) ১২৪টি আসন পাইবে ১৮,৪২,২১,৮৩৪ জন হিন্দু এবং অন্য "সাধারণ" মানুষ। ইহারা ব্রিটিশ-ভারতের মোট লোকসংখ্যা ২৫,৬৬,২৭,১৩৮-এর অর্দ্ধেকের অনেক বেশী, দুই-তৃতীয়াংশেরও বেশী, অথচ পাইবে অর্দ্ধেকের কম আসন!

—

দেশী রাজ্যসমূহ ও ইংলণ্ডেশ্বরের প্রতিনিধি

বর্ত্তমান সময়ে ভারতবর্ষীয় ব্যবস্থাপক সভায় দেশী রাজ্যসমূহ সম্বন্ধে কোন আলোচনা হইতে পারে না। ঐ রাজ্যগুলির সহিত ইংলণ্ডেশ্বরের যে সম্পর্ক সেই সম্পর্ক সম্বন্ধীয় সকল কাজ বর্ত্তমানে সকৌন্সিল গবর্ণর-জেনার্য্যাল নির্ব্বাহ করিয়া থাকেন। গবর্ণর-জেনার্য্যালের কৌন্সিলে ভারতীয় লোকও কয়েক জন থাকেন। দেশী রাজ্যসমূহ সম্বন্ধে ব্রিটিশ রাজনীতির উপর ইঁহাদের প্রভাব হয়ত সামান্যই আছে। কিন্তু ইঁহারা অন্ততঃ অনেক কথা জানিতে ও তাহার আলোচনা করিতে পারেন। দেশে প্রজাশক্তির ক্রমিক বৃদ্ধি সহকারে, কৌন্সিলরূপ ভারত-গবর্মেণ্টের অন্তরঙ্গ মহলেও সংখ্যা ও প্রভাবের দিক দিয়া ভারতীয়তা হয়ত কালক্রমে বাড়িবে। এই প্রকারে ক্রমবর্দ্ধমান উন্নতিশীল ভারতীয় প্রভাব ব্রিটিশ-ভারতে যেমন সেই রূপ দেশী রাজ্যসমূহেও অনুভূত হইত। তাহার দ্বারা সমুদয় ভারতবর্ষ বাহিরে ও ভিতরে এক এবং সংহত হইয়া উঠিত পারিত। কিন্তু হোয়াইট পেপারের একটি প্রস্তাবে সে পথ রুদ্ধ করা হইয়াছে; বলা হইয়াছে, যে, নূতন শাসনবিধি প্রবর্ত্তিত হইবার পর দেশী রাজসমূহের সহিত ব্রিটিশ-নৃপতির সম্পর্ক সম্বন্ধীয় সব কাজ তাঁহার প্রতিনিধি ভাইসরয় স্বয়ং করিবেন,—সকৌন্সিল করিবেন না। এই সব কাজের কোন খবর বড়লাটের কৌন্সিলের সদস্যেরা জানিতে বা আলোচনা করিতে পারিবে না। ভারতবর্ষের একটা বৃহৎ অংশের উপর একচ্ছত্র প্রভুত্ব ব্রিটিশ-নৃপতির প্রতিনিধি নিজের হাতে রাখায় পরোক্ষ ভাবে অন্য অংশের উপর প্রভুত্বও নিজের হাতে রাখা হইল। ফলে, সমগ্র ভারতবর্ষে প্রজাশক্তিকে নতমস্তক থাকিতে হইবে।

—

গবর্ণর-জেনার্য্যালের ক্ষমতা

হোয়াইট পেপারটির পুঙ্খানুপুঙ্খ সমালোচনা করিতে হইলে প্রবাসীর তিনটি সংখ্যার সব পাতাগুলি দরকার। তাহা দিতে পারা যাইবে না। এই জন্য কতকগুলি কথামাত্র সংক্ষেপে বলিতেছি। বড়লাটের কিছু ক্ষমতার উল্লেখ আগে আগে করিয়াছি। সংক্ষেপে আরও কিছু বলিতেছি।

দেশরক্ষা (অর্থাৎ জলে স্থলে আকাশে যুদ্ধ করিবার সমুদয় বন্দোবস্ত), বিদেশসমূহ সম্পৃক্ত সমুদয় ব্যাপার, এবং খ্রীষ্টীয় ধর্ম্মযাজন সম্পৃক্ত সব বিষয়ের ভার গবর্ণর-জেনার্য্যাল নিজের হাতে রাখিবেন। নিজের দেশের সামরিক সব বন্দোবস্ত করিবার এবং সামরিক সকল পদে নিযুক্ত হইবার অধিকার স্বাধীনতার একটি অপরি-হার্য্য অঙ্গ। ভারতবর্ষের লোকদের তাহা থাকিবে না। সৈন্যদল যে ক্রমে ক্রমেও, দীর্ঘকাল পরেও, কখন সম্পূর্ণ ভারতীয় লোকদের দ্বারা গঠিত হইবে, তাহার আভাস মাত্রও ঘুণাক্ষরেও হোয়াইট পেপারের কোথাও নাই।

পূর্ণ স্বাধীনতা না থাকিলে কোন দেশ অন্য কোন দেশের সহিত যুদ্ধঘোষণা বা শান্তিস্থাপন করিতে পারে না। ভারতবর্ষ কোন দেশের সহিত যুদ্ধ করিতে চায় না, সুতরাং শান্তিস্থাপনের কথাও উঠে না। কিন্তু কোন দেশের সহিত ব্রিটেনের যুদ্ধ আরম্ভ হইলে ভারতবর্ষকেও তাহার সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইতে হইবে, ইহা ভারতবর্ষের পক্ষে সাতিশয় অসুবিধাজনক। ভারতবর্ষ ইচ্ছা করিলে

যুদ্ধে যোগ দিবে, কিংবা নিরপেক্ষ থাকিবে, এইরূপ হওয়াই উচিত; যেমন অধিকার কিছুকাল হইতে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের ডোমীনিয়নগুলির জন্মিয়াছে।

তদ্ভিন্ন, বিদেশের সহিত বাণিজ্য সম্বন্ধীয় নানাবিধ ব্যবস্থা করিবার অধিকার ভারতবর্ষের থাকা উচিত। ভারতবর্ষের লোকদিগকে কোন দেশে যাইতে ও তথায় অবাধে বসবাস সম্পত্তিক্রয় কৃষিবাণিজ্যাদি করিতে না দিলে ভারতবর্ষেরও সেই দেশের লোকদের সম্বন্ধে ঐরূপ ব্যবস্থা করিবার অধিকার থাকা উচিত। কিন্তু এই সমস্ত ক্ষমতাই বড় লাটের নিজের হাতে থাকিবে। তিনি প্রধানতঃ নিজের দেশের সুবিধা অসুবিধা অনুসারে এই ক্ষমতা পরিচালন করিবেন, এই রূপ অনুমান ভারতীয়েরা করিবে।

অতএব, সমুদয় বৈদেশিক ব্যাপারের ভার বড় লাটের হাতে থাকায় ভারতবর্ষের ন্যায্য অধিকার খর্ব্ব হইবে এবং তাহাতে ভারতের ক্ষতি ও অসুবিধা হইবে।

ভারতবর্ষের খুব কম লোক খ্রীষ্টিয়ান। ইহার প্রভু ইংরেজরা ও ভারতপ্রবাসী ইংরেজরা আপনাদিগকে খ্রীষ্টিয়ান বলেন বটে। কিন্তু তাহার জন্য ভারতবর্ষের অধিকাংশ (অখ্রীষ্টিয়ান) অধিবাসীদের প্রদত্ত অর্থে খ্রীষ্টীয় কোন সম্প্রদায়ের ধর্ম্মযাজকদের বেতনাদি দেওয়া উচিত নহে। দ্বিতীয়তঃ, যদি তাহা দেওয়াই হয়, তাহা হইলেও ভারতীয় খ্রীষ্টিয়ানদের মত অনুসারে ধর্ম্মযাজক-বিভাগ-সম্পর্কীয় সব কাজ হওয়া উচিত।

এই তিনটি রক্ষিত (reserved) বিভাগ ছাড়া বড় লাটের কতকগুলি বিশেষ দায়িত্ব থাকিবে। যথা—ভারতের বা তাহার কোন অংশের শান্তিভঙ্গের আশঙ্কা ঘটিলে, তাহা নিবারণ; সংঘবদ্ধ ভারতের আর্থিক বাজার-সম্ভ্রমাদি রক্ষা; সংখ্যান্যূনদের বৈধ স্বার্থ রক্ষা; সরকারী চাকরেদের অধিকার ও স্বার্থ রক্ষা; বাণিজ্যাদি বিষয়ে ব্রিটিশদের চেয়ে দেশী লোকেরা যাহাতে বেশী সুবিধা না পায় সে-দিকে দৃষ্টি রাখা; দেশী কোনও রাজ্যের অধিকার রক্ষা; এবং বড় লাটের হস্তে রক্ষিত বিভাগের কার্য্য পরিচালনে যাহাতে অসুবিধা বা বাধা জন্মে সেরূপ কোন ব্যাপার। এই সকল বিশেষ দায়িত্ব পালনের জন্য বড় লাট মন্ত্রীদের পরামর্শ না লইয়া এবং পরামর্শের বিরুদ্ধেও যাহা কিছু দরকার মনে করেন করিতে পারিবেন।

সরকারী রাজস্ব যাহা আদায় হইবে, তাহা হইতে বড় লাট রক্ষিত বিভাগগুলির জন্য যত আবশ্যক টাকা লইবেন, বিশেষ দায়িত্বগুলির জন্যও লইবেন। ইহাতে কেহ বাধা দিতে পারিবে না। সুতরাং স্বাধীন দেশ-সকলে প্রজাদের প্রতিনিধিদের রাজস্ব হইতে খরচের টাকা মঞ্জুর করা না-করার যে অধিকার আছে, ভারতীয় ব্যবস্থাপক সভার কার্য্যতঃ সে অধিকার থাকিবে না।

সিবিলিয়ান, পুলিসের বড় চাকরো প্রভৃতিদের বেতনাদি ভারতবাসীরা দিবে, কিন্তু তাহাদের উপর ব্যবস্থাপক সভার বা মন্ত্রীদের প্রায় কোন ক্ষমতা থাকিবে না। চমৎকার স্বরাজ!

সকল স্বাধীন দেশেই তথাকার স্থায়ী ও দেশী বাসিন্দাদের বাণিজ্যাদির সুবিধা আগে দেখা হয়; বিদেশীদিগকে তাহাদের সহিত সমান অধিকার দিতেই হইবে এমন আজগুবি নিয়ম কোথাও নাই; বিদেশীদের অধিকার সর্ব্বত্র সীমাবদ্ধ। কিন্তু ভারতবর্ষ ইংরেজদের জমিদারী রূপে ব্যবহৃত হয় বলিয়া এদেশে তাহারা কল কারখানা বাণিজ্য খনির কাজ জাহাজ চালান প্রভৃতি নানা বিষয়ে দেশী লোকদের চেয়ে বেশী সুবিধা দখল করিয়াছে। ভবিষ্যতেও যাহাতে এদিকে কোন ব্যাঘাত না ঘটে তাহারই বন্দোবস্ত এখন হইতে করা হইতেছে। এরূপ বন্দোবস্তের সমর্থনে বলা হইতেছে, বিলাতে এসব বিষয়ে ভারতবর্ষের লোকদের অধিকার ইংরেজদের সমান, অতএব ভারতবর্ষেও এসব বিষয়ে ইংরেজদের অধিকার ভারতীয়দের সমান হওয়া উচিত। ইহা সম্পূর্ণ সত্য নহে। ১৯২০ সালে বিলাতে এলিয়েন্স অর্ডার (বিদেশীদের সম্বন্ধে হুকুম) অনুসারে শ্রমিক মন্ত্রীর বিভাগকে উপার্জ্জনার্থ ইংলণ্ডপ্রবেশেচ্ছু বিদেশীদের আগমন বন্ধ করিবার অবিসংবাদিত ক্ষমতা দেওয়া হইয়াছে। যাহা হউক, যদি ধরিয়াই লওয়া যায়, যে, ব্রিটেনে ভারতবাসীদের অধিকার ইংরেজদের সমান, তাহা হইলেও কার্য্যতঃ ঐ অধিকারসাম্য একটা

কথার কথা মাত্র। কারণ, ব্রিটেনে কৃষি, পণ্যশিল্পের কারখানা, বাণিজ্য, রেল জাহাজ এরোপ্লেন চালনা, খনিজ উত্তোলন, অরণ্য ও জলজ সম্পদ কাজে লাগান, প্রভৃতি সব কর্ম্মক্ষেত্র ইংরেজরা অধিকার করিয়া আছে। ফাঁক কোথায় আছে, যে, সেখানে ভারতবাসী ঢুকিবে? অন্য দিকে এদেশে এই সকল কর্ম্মক্ষেত্রের অনেক অংশ এখনও অনধিকৃত, এবং যাহা অধিকৃত ও যাহা হইতে প্রচুর লাভ হয় তাহা অধিকাংশ স্থলে ইংরেজদের হাতে। সুতরাং ইংরেজরা যে, বলিতেছেন, "তোমরা আমাদের দেশে আসিয়া সব রকম সম্পত্তির মালিক হও ও সব রকম রোজগারের কাজ কর, এবং আমাদিগকেও তোমাদের দেশে সব রকম সম্পত্তির মালিক হইতে দাও এবং সব রকম রোজগারের কাজ করিতে দাও," এটা একটা বিরাট বিদ্রূপ। ইংরেজদের দেশে তাহাদের দ্বারা অনধিকৃত উপার্জ্জনক্ষেত্র কত টুকু আছে? তা ছাড়া, ইংলণ্ডে ইংরেজরা মালিক। যখনই তাহারা দেখিবে, যে, বিদেশীরা একটু বেশী সংখ্যায় তথায় গিয়া রোজগার করিতেছে তখনই তাহা তাহারা বন্ধ করিতে পারিবে ও বন্ধ করিবে। ভারতবর্ষে আমরা "নিজবাসভূমে পরবাসী।"

—

সংখ্যাভূয়িষ্ঠদের বৈধ স্বার্থরক্ষা

সংখ্যান্যূনদের বৈধ স্বার্থরক্ষা বড় লাটের অন্যতম বিশেষ দায়িত্ব। কিন্তু আমরা দেখাইয়াছি, হোয়াইট পেপারের প্রস্তাব অনুসারে সংখ্যাভূয়িষ্ঠদিগকে সংখ্যান্যূনের দশায় অবনমিত করা হইয়াছে। অতএব আমাদের বিবেচনায় তাঁহার এই বিশেষ দায়িত্বটির বর্ণনা ও বিষয় হওয়া উচিত ছিল, "সংখ্যাভূয়িষ্ঠদের বৈধ স্বার্থরক্ষা।" কারণ, তাহাদেরই স্বার্থ বলি দেওয়া হইতে যাইতেছে।

—

হোয়াইট পেপারটা চূড়ান্ত নহে

হোয়াইট পেপার চূড়ান্ত নহে। জয়েণ্ট পার্লেমেণ্টারী কমিটি এগুলি আলোচনা করিয়া রিপোর্ট করিবেন। তাহার পর, ব্রিটিশ মন্ত্রীমণ্ডল ভারতের ভবিষ্যৎ শাসন-বিধির অর্থাৎ কন্সটিটিউশন য়্যাক্টের পাণ্ডুলিপি প্রস্তুত করিবেন। পার্লেমেণ্টের দুই কক্ষে তর্কবিতর্কের পর প্রয়োজনানুরূপ সংশোধনের পর উহা পাস হইবে—না হইতেও পারে। হোয়াইট পেপারে যদি এমন কোন ছিদ্র থাকে, যাহার সুযোগে ভারতীয়রা কিছু সুবিধা করিয়া লইতে পারে, জয়েণ্ট পার্লেমেণ্টারী কমিটি সে ছিদ্র বন্ধ করিতে পারিবেন। তার পরও কোন ছিদ্র থাকিয়া গেলে মন্ত্রীমণ্ডল কন্সটিটিউশন বিলের খসড়ায় তাহা বন্ধ করিতে পারিবেন। সর্ব্বশেষে পার্লেমেণ্টে বিলটার আলোচনার সময়, তখনও কোন ছিদ্র থাকিয়া গেলে, চার্চিল-জাতীয় কোন সভ্য তাহা বন্ধ করিতে পারিবেন।

অতএব হোয়াইট পেপারের কোন পাঠক যেন এই ভাবিয়া স্বস্তির নিঃশ্বাস না ফেলেন, যে, মন্দের চূড়ান্ত দেখা গেল, এখন ভাগ্য-চক্রের আবর্ত্তনে ভাল কিছু আসে কি না দেখা যাক্।

—

অনিয়ন্ত্রিতক্ষমতাবিশিষ্ট বড় লাট

বর্ত্তমানে বড় লাটের এমন কতকগুলি ক্ষমতা আছে যাহার পরিচালনে ভারতীয় ব্যবস্থাপক সভার নিকট তাঁহার কোন জবাবদিহি নাই। হোয়াইট পেপারে তাঁহার এইরূপ ক্ষমতা খুব বাড়াইয়া দেওয়া হইয়াছে। এখন তিনি কেবল ছয় মাস স্থায়ী অর্ডিন্যান্স জারি করিতে এবং পুনর্ব্বার আরও ছয়মাস তাহা বলবৎ করিতে পারেন। তাঁহার এই ক্ষমতা বজায় রাখা হইয়াছে। তাহার উপর আর এক রকম অর্ডিন্যান্স তিনি জারি করিতে পারিবেন, যাহা ছয় সপ্তাহ বলবৎ থাকিতে পারিবে। অধিকন্তু তিনি, ব্যবস্থাপক সভার দ্বারা প্রণীত আইনের সমান বলবৎ ও সমান স্থায়ী আইন, নিজের খুশীতে পাস করিতে পারিবেন। ব্যবস্থাপক সভায় পাস কোন আইনে সম্মতি দেওয়া না-দেওয়া বা তাহা ইংলণ্ডেশ্বরের মতামতের জন্য রিজার্ভ রাখার ক্ষমতা তো তাঁহার থাকিবেই; অধিকন্তু যদি তাঁহার বিবেচনায় মনে হয়, যে, এমন অবস্থা ঘটিয়াছে যে গবর্মেণ্ট অচল হইতে বসিয়াছে, তখন তিনি সব আইনাদি স্থগিত করিয়া সব ক্ষমতা নিজের হাতে লইয়া সব কিছু করিতে পারিবেন।

এ-রকম অসীম ক্ষমতা পরিচালনের যোগ্য মানুষ এ-পর্য্যন্ত পৃথিবীতে কেহ জন্মগ্রহণ করিয়াছেন কি-না, জানি না। ভারতবর্ষে এপর্য্যন্ত যত বড় লাট আসিয়াছেন তাঁহাদের মধ্যে এবং ব্রিটেনে এ-পর্য্যন্ত যাঁহারা প্রধান ও অন্য মন্ত্রী হইয়াছেন, তাঁহাদের মধ্যে ত এমন লোক দেখিতে পাই না।

হোয়াইট পেপারের মুসাবিদাকারীদের মনেও বোধ করি বড় লাটদের অতিমানবতা সম্বন্ধে একটু সন্দেহ আসিয়া থাকিবে। কারণ, এক জায়গায় বলা হইয়াছে, যে, বড় লাট যে আইনে সম্মতি দিয়াছেন, এরূপ যে-কোন আইন সকৌন্সিল ইংলণ্ডেশ্বর এক বৎসরের মধ্যে নাকচ করিতে পারিবেন।

—

ভিত্তীভূত বা মৌলিক অধিকার

স্বাধীন দেশসমূহের স্বাধীন মানুষদের কতকগুলি অধিকারকে ফাণ্ডামেণ্ট্যাল রাইট্‌স্ বা ভিত্তীভূত বা মৌলিক অধিকার বলা হয়। কংগ্রেস গত করাচী অধিবেশনে এইরূপ কতকগুলি অধিকারের তালিকা ধার্য্য করিয়াছিলেন। হোয়াইট পেপারে বলা হইতেছে, যে, ব্রিটিশ গবন্মেণ্ট কন্সটিটিউশ্যান য়্যাক্টে এরূপ কোন অধিকারতালিকা নিবদ্ধ করায় গুরুতর আপত্তি দেখিতেছেন—কিম্বিধ আপত্তি তাহা খুলিয়া বলেন নাই। তবে তাঁহারা, দৃষ্টান্ত স্বরূপ, ব্যক্তিগত স্বাধীনতা ও ব্যক্তিগত সম্পত্তিতে অধিকার এবং জাতি-ধর্ম্মাদিনির্বিশেষে সব সরকারী কাজে সকলের অধিকার, এইরূপ অধিকার আইনে থাকা সঙ্গত মনে করেন। এখন যেমন রেগুলেশ্যান এবং অর্ডিন্যান্স ও অর্ডিন্যান্সবৎ আইন দ্বারা লোকের ব্যক্তিগত স্বাধীনতা লুপ্ত ও সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত হইতে পারে, ভবিষ্যতেও যদি তাহা হইতে পারে, তাহা হইলে কন্‌ষ্টিটিউশ্যন আইনের পাতায় এতদ্বিষয়ক অধিকার মুদ্রিত থাকা না-থাকা সমান হইবে।

হোয়াইট পেপারের ভূমিকায় বলা হইয়াছে, যে, মৌলিক অধিকার সম্বন্ধীয় যে-সব প্রস্তাব আইনে নিবদ্ধ হইবার উপযোগী নহে, সেগুলি নূতন শাসনবিধি প্রচারিত করিবার সময় মহামহিম ইংলণ্ডেশ্বরের একটি ঘোষণায় (Pronouncementএ) নিবদ্ধ করা যাইতে পারে: তাহা হইতে পারে বটে। কিন্তু মহারাণী ভিক্টোরিয়ার ঘোষণা পত্র যেরূপ সম্মান ব্রিটিশ-জাতীয় রাজপুরুষদের হাতে পাইয়াছে, প্রস্তাবিত ঘোষণাপত্রটি সেই ভাবে সম্মানিত হইলে ব্রিটিশ-নৃপতি দ্বারা সেরূপ ঘোষণা না-করাইলেই তাঁহার সম্মানের পক্ষে ভাল।

নৃপতির ঘোষণায় যাহা থাকিবে তদনুসারে কাজ হওয়া যদি ব্রিটিশ গবর্ন্মেণ্টের অভিপ্রেত হয়, তবে তাহা কন্স্‌টিটিউশ্যন য়্যাক্টে রাখিতে কেন আপত্তি করা হইতেছে?

—

হোয়াইট পেপার ও ভারতের ভবিষ্যৎ

হোয়াইট পেপারে ভারতবর্ষের ভবিষ্যৎ শাসনবিধির সম্বন্ধে যাহা লেখা হইয়াছে, তাহার মধ্যে এমন কিছু নাই যাহাতে বুঝা যায়, যে, ভারতবর্ষ ক্রমশঃ কতকগুলি ক্ষমতা পরিচালন করিতে করিতে আপনা-আপনি স্বরাজের যোগ্য হইয়া স্বরাজ পাইবে। ক্রমবিকাশ, বিবর্ত্তন বা ইভল্যুশ্যন দ্বারা ভারতবর্ষের স্বরাজলাভের কোন উল্লেখ বা সম্ভাবনা হোয়াইট পেপারে নাই। ব্রিটিশ জাতি ও ব্রিটিশ পার্লেমেণ্ট কখনও দয়া করিয়া ভারতবর্ষকে স্বরাজ দিবে বা দিতে পারে, এমন কোন আভাসও উহাতে নাই। বস্তুতঃ, কোনও প্রকারে ভারতবর্ষে ইংরেজপ্রভুত্বের বদলে ভারতীয় প্রভুত্ব কখনও হইতে পারে, এ কল্পনা হোয়াইট পেপারের মুসাবিদাকারীদের মনে চকিতেও উদিত হইয়াছে বলিয়া কেহ মনে করে না।

তাহা হইলে ব্রিটিশ জাতি, ব্রিটিশ পার্লেমেণ্ট, ব্রিটিশ গবর্ন্মেণ্ট ভারতবর্ষের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে কি ভাবেন? কিছু ভাবেন কি? হোয়াইট পেপার পড়িলে মনে হয়, উহার মুসাবিদাকারীরা এই দেশের কখনও স্বাধীন হইবার পথ যথাসাধ্য রুদ্ধ করিবার চেষ্টা করিয়াছেন। অবশ্য, পৃথিবীতে অনেক বড় বড় ঘটনা অকস্মাৎ ঘটে,—মানুষ যাহা ভাবে নাই, কল্পনা করে নাই, এই প্রকারে ঘটে। কিন্তু অভাবনীয় এইরূপ কিছু ভারতে ঘটুক, মুসাবিদাকারীরা ইহাই চাহেন, এমন কথা কেহ বলিতে পারে না।

ফ্রান্সের অষ্টাদশ শতাব্দীর অন্যতম রাজা পঞ্চদশ লুইসের রক্ষিতা ম্যাড্যাম দ্য পংপাডোরের মুখ দিয়া একদা বাহির হইয়াছিল, "*Après moi le déluge*" ("After me, the deluge" অর্থাৎ "I care not what happens when I am dead and gone") "আমি যখন মৃত ও গত হইব তখন কি ঘটিবে তাহা আমি গ্রাহ্য করি না।" হোয়াইট পেপারের কোন মুসাবিদাকারী কি এইরূপ কিছু ভাবিয়াছেন?

—

প্রাদেশিক গবর্ন্মেণ্ট ও ব্যবস্থাপক সভা

দেশ কোন রাষ্ট্রীয় অধিকার পাইতেছে কি না, সমগ্র ভারতীয় গবর্ন্মেণ্ট ও ব্যবস্থাপক সভা সম্বন্ধীয়' বিধানগুলি হইতে প্রধানতঃ তাহা বুঝা যায়। আমরা সংক্ষেপে এ-পর্য্যন্ত যাহা লিখিয়াছি, তাহা হইতে বুঝা যাইবে, হোয়াইট পেপারের তত্তদ্বিষয়ক প্রস্তাবগুলির দ্বারা জনগণের অধিকার ও ক্ষমতা না বাড়িয়া কমিয়াছে এবং গবর্ণর-জেনার‍্যালকে নিরঙ্কুশ প্রভুত্ব দেওয়া হইয়াছে। তাঁহাকে ভারতবর্ষে কেহ বাগ মানাইতে বা কৈফিয়ৎ দেওয়াইতে পারিবে না; বিলাতে কেহ পারিলে তাহাতে ভারতবর্ষের অধীনতা ও শক্তিহীনতা কমিবে না।

প্রাদেশিক ব্যাপারসমূহেও জনসাধারণ এবং তাহাদের প্রতিনিধিরা বর্ত্তমান সময়ের চেয়ে বেশী কিছু অধিকার ও ক্ষমতা পাইবেন না, অন্য দিকে গবর্ণরের প্রভুত্ব বর্ত্তমান সময় অপেক্ষা বহু পরিমাণে বৃদ্ধি পাইবে।

সমগ্রভারতে গবর্ণর-জেনার‍্যালকে যতটা নিরঙ্কুশ ক্ষমতা দেওয়া হইয়াছে, গবর্ণরদিগকে তাঁহাদের প্রত্যেকের প্রদেশে সেইরূপ ক্ষমতা দেওয়া হইয়াছে। গবর্ণর নিজের প্রদেশের জন্য দু রকম অর্ডিন্যান্স জারি করিতে পারিবেন, এবং ব্যবস্থাপক সভায় যে-সব আইন পাস হয়, তাহারই মত বলবৎ ও স্থায়ী আইন কেবল নিজের খুশীতে ও ক্ষমতায় জারি করিতে পারিবেন। মন্ত্রী তাঁহার কয়েক জন থাকিবেন, কিন্তু তাঁহাকে তাঁহাদের পরামর্শের বিরুদ্ধে কাজ করিবার ও তাঁহাদের পরামর্শ না-লইয়া কাজ করিবার ক্ষমতা দেওয়া হইয়াছে। মন্ত্রীদের ও ব্যবস্থাপক সভার মতনির্ব্বিশেষে, মতনিরপেক্ষভাবে এবং তাঁহাদের মতের বিরুদ্ধেও তিনি নিজের বিবেচনা অনুসারে রাজস্বের টাকা সরকারী যে কোন কাজে খরচ করিতে পারিবেন।

যদি কখনও এমন অবস্থা ঘটে, যে, তিনি মনে করেন গবর্ন্মেণ্ট অচল হইতে বসিয়াছে, তাহা হইলে তিনি প্রাদেশিক যে-কোন কর্ত্তৃপক্ষকে যে-কোন ক্ষমতা দেওয়া হইয়াছে সমস্তই দরকার-মত প্রাদেশিক গবর্ন্মেণ্ট ভাল করিয়া চালাইবার জন্য স্বহস্তে গ্রহণ করিবেন। বড় লাটের মত প্রাদেশিক গবর্ণরদের কতকগুলি বিশেষ দায়িত্ব থাকিবে, এবং সেই দায়িত্ব পালনের জন্য যাহা দরকার তাহা তাঁহারা নিজে করিতে পারিবেন। তা ছাড়া, তাঁহাদিগকে বড় লাটের ও ভারত-সচিবের হুকুম তামিল করিতে হইবে। এরূপ আদেশ পালনে কেহ বাধা দিতে পারিবে না।

—

প্রাদেশিক মন্ত্রীর বেতন

প্রাদেশিক কোন মন্ত্রীর বেতন তাঁহার কার্য্যকালের মধ্যে কমাইতে বাড়াইতে পারা যাইবে না। দেশের লোকের ট্যাক্সে তিনি মোটা বেতন পাইবেন, কিন্তু তিনি অকর্ম্মণ্য হইলে বা কাজে অবহেলা করিলে কিংবা বে-আইনী বা দেশের অহিতকর কাজ করিলেও তাঁহার বেতন কমাইবার প্রস্তাব কেহ করিতে পারিবে না।

—

প্রদেশসমূহে আইন ও শৃঙ্খলা রক্ষা

বর্ত্তমানে "ল এণ্ড অর্ডার" অর্থাৎ আইনানুগত্য ও শৃঙ্খলা রক্ষা মন্ত্রীদের হাতে হস্তান্তরিত একটি বিষয় নহে। হোয়াইট পেপারের প্রস্তাব অনুসারে ভবিষ্যতে সব বিষয়ই মন্ত্রীদের হাতে যাইবে। কিন্তু কেহ মনে করিবেন না, পুলিসের ও ম্যাজিষ্ট্রেটদের উপর মন্ত্রীদের প্রকৃত কোন ক্ষমতা থাকিবে। পুলিস সাহেব ও ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেবদের নিয়োগ, বেতন নির্দ্ধারণ, পদের উন্নতি অবনতি, ভাতা পেনশুন ইত্যাদি সম্বন্ধে মন্ত্রীদের কোন ক্ষমতা থাকিবে না। শুধু তাই নয়। গবর্ণরকে ব্রিটিশ গবর্ন্মেণ্ট তাঁহার নিয়োগের সময় যে উপদেশাবলীর দলিল (Instrument of Instructions) দিবেন, তাহাতে এই আদেশ

থাকিবে, যে, তিনি যেন মনে রাখেন, যে, দেশের নিরুপদ্রব অবস্থা ও শান্তির জন্য তাঁহার যে বিশেষ দায়িত্ব থাকিবে তাহার সহিত পুলিসের আভ্যন্তরীণ শাসনকার্য্য ও নিয়মানুগত্যের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ আছে। ইহার সোজা মানে এই, যে, মন্ত্রী বেচারা সাক্ষীগোপাল থাকিবেন এবং পুলিস সব বিষয়ে গবর্ণরের হুকুম তামিল করিবে।

—

কথা বলিবার স্বাধীনতা

ভারতীয় এবং প্রাদেশিক ব্যবস্থাপক সভাসমূহে সদস্যদের এখনকারই মত সভাগৃহে কথা বলিবার স্বাধীনতা থাকিবে। কিন্তু তাঁহাদের বক্তৃতাদি খবরের কাগজে যথাযথ ছাপিবার অধিকার সম্পাদক ও মুদ্রাকরদের আছে কি না সন্দেহ। জামিন দিবার ও তৎপরে যথাকালে বাজেয়াপ্ত হইবার ভয়ে কোন কাগজ ও প্রেস সব সদস্যের ব্যবস্থাপক সভায় উক্ত সব কথা ছাপে না। ভবিষ্যতেও এই ভয় থাকিবে। সুতরাং কথা বলিবার স্বাধীনতা দিবার তামাশা হোয়াইট পেপারে না করিলেও চলিত।

—

বাংলার ব্যবস্থাপক সভা

বিহার, আগ্রা-অযোধ্যা, ও বাংলা এই তিনটি প্রদেশের ব্যবস্থাপক সভাগুলি উচ্চ ও নিম্ন কক্ষে বিভক্ত হইবে; অন্য সব প্রদেশের ব্যবস্থাপক সভা এককাক্ষিক হইবে। এইরূপ প্রভেদ করিবার কারণ জানি না। ১২ বৎসর পরে নির্দ্দিষ্ট প্রক্রিয়া অনুসারে দ্বিকাক্ষিকগুলি এককাক্ষিক এবং এককাক্ষিকগুলি দ্বিকাক্ষিক হইতে পারিবে। এই নিগ্রহানুগ্রহের কারণও জানি না।

বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার উচ্চ কক্ষে ৬৫ জন সদস্য থাকিবে লেখা আছে, কিন্তু ভিন্ন ভিন্ন রকমের সদস্যের সংখ্যা যোগ করিলে ৬৭ হয়। যদি ৬৫ই ঠিক্ সংখ্যা হয়, তাহা হইলে "জেনার‍্যাল" বা সাধারণ (অর্থাৎ কিনা প্রধানতঃ হিন্দু) আসন ১২টি হইতেই সম্ভবতঃ ২টি বাদ যাইবে। ছাগশিশু ব্রহ্মার কাছে নালিশ করে, "আমাকে সবাই বলি দিতে চায়।" তাহাতে ব্রহ্মা উত্তর দেন, "দেখ বাপু, তুমি এমন নিরীহ, যে, আমারও ঐরূপ ইচ্ছা হয়।"

৬৫ জনের মধ্যে দশ জন গবর্ণর মনোনীত করিবেন। বাকী ৫৫ জনের মধ্যে ২৭ জন নিম্ন কক্ষের সব সভ্যেরা নির্ব্বাচন করিবেন। তাহাতে মুসলমান সভ্যের সংখ্যাই বেশী হইবে। তা ছাড়া ১৭ জনকে কেবল মুসলমান নির্ব্বাচকমণ্ডলীসমূহ নির্ব্বাচন করিবে। এক জন ইউরোপীয় হইবে। ১২ (বা ১০) জন "সাধারণ" নির্ব্বাচকমণ্ডলীসমূহ হইতে নির্ব্বাচিত হইবে। ইহা হইতে স্পষ্ট বুঝা যাইতেছে, যে, এই উচ্চ কক্ষে গবন্মে‍ণ্ট সাধারণতঃ নিজের মত বলবৎ রাখিতে পারিবেন।

বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার নিম্ন কক্ষে ২৫০ জন সদস্য থাকিবে। তাহাদের মধ্যে, নিশ্চয়, ১১৯ জন মুসলমান, ২ জন দেশী খ্রীষ্টিয়ান, ৪ জন ফিরিঙ্গী এবং ১১ জন ইউরোপীয় হইবে। তদ্ভিন্ন, হোয়াইট পেপারই আশা করে, আরও ১৪ জন ইউরোপীয় বাণিজ্যাদির প্রতিনিধি হিসাবে নির্ব্বাচিত হইবে, এবং ৫ জন ভারতীয় হইবে (কোন্ ধর্ম্মের বলা যায় না)। ৫ জন জমিদারের মধ্যে কোন্ ধর্ম্মের কয় জন হইবে বলা যায় না। বিশ্ববিদ্যালয়ের ২ জন প্রতিনিধি কোন্ কোন্ ধর্ম্মের হইবে, তাহা অনিশ্চিত। শ্রমিক ৮ জন সম্বন্ধেও ঐ মন্তব্য প্রযোজ্য। বঙ্গের "সাধারণ" ৮০টি আসন হিন্দু বৌদ্ধ জৈন শিখ পারসী আদিমনিবাসী ইহুদী প্রভৃতির জন্য। ৮০টির মধ্যে ৩০টি "অবনত" শ্রেণীসমূহের জন্য। বাকী ৫০টি যদি হিন্দুরাই পায়, "অবনত" ৩০ জন সদস্য যদি সাধারণতঃ হিন্দু সদস্যদের দলে থাকে (যাহা বিশেষ সন্দেহস্থল), এবং বাণিজ্যের ৫টি ভারতীয় আসন, জমিদারদের ৫টি আসন, বিশ্ববিদ্যালয়ের ২টি আসন ও শ্রমিকদের ৮টি আসন **সমস্তই** যদি হিন্দুরা পায় (যাহা নিশ্চয়ই পাইবে না), তাহা হইলেও বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার নিম্ন কক্ষে হিন্দুপ্রতিনিধির সংখ্যা হইবে মোট ১০০। ইহা ২৫০এর অর্দ্ধেকের চেয়ে কম। সুতরাং বঙ্গের হিন্দুরা নিজেদের শক্তিতে নিম্ন কক্ষে কখনও নিজেদের মত বজায় রাখিতে পারিবে না। তাহা যে পারিবে না, তাহার আরও কারণ আছে। বর্ত্তমানে "অবনত"

শ্রেণীর সদস্যদের ভোটদান-রীতি হইতে মনে হয়, ভবিষ্যতে ঐ শ্রেণীর সদস্যেরা—অন্ততঃ অনেকে—অন্য হিন্দুদের সঙ্গে ভোট দিবেন না। তদ্ভিন্ন মুসলমানরা ১টি বাণিজ্য আসন, ১টি-দুটি জমিদারী আসন, ১টি বিশ্ববিদ্যালয়ের আসন এবং ৪টি শ্রমিক আসন পাইতে পারেন।

এই সম্ভাবনা হইতে ইহাও বুঝা যায়, যে, মুসলমানদের মোট ১২৬টি কি ১২৭টি আসন পাইবার বিশেষ সম্ভাবনা আছে। তাহা হইলে তাঁহারা নিজের জোরেই নিম্ন কক্ষে সংখ্যাভূয়িষ্ঠ হইবেন।

বিদ্যাবুদ্ধি, শিক্ষার উন্নতি, কৃষ্টি বা সংস্কৃতি, পণ্যশিল্প ও বাণিজ্য, ধনশালিতা, দানশীলতা, দেশের জন্য পরিশ্রম স্বার্থত্যাগ ও দুঃখবরণ প্রভৃতি বিষয়ে বাংলা দেশের সামান্য যাহা খ্যাতি আছে, তাহার অধিকাংশ প্রাপ্য হিন্দুদের। সেই হিন্দুদিগকে ব্যবস্থাপক সভায় বলহীন করা হইতেছে। ইহাতে দেশের ক্ষতি এবং হিন্দুদের ক্ষতি হইবে। মুসলমান বাঙালীরা ক্ষমতা পাইতে যাইতেছেন। দেশহিত সাধনের ক্ষমতা ব্যবস্থাপক সভার সামান্যই থাকিবে। যাহা থাকিবে, তাহা যদি মুসলমান সদস্যেরা প্রকৃত দেশভক্তের মত সমুদয় অধিবাসীদের মঙ্গলের জন্য প্রয়োগ করেন, তাহা হইলে তাহাতে সামান্য কিছু সুফল ফলিতে পারে।

—

হিন্দুদের প্রতি অবিচার

সমগ্রভারতীয় ব্যবস্থাপক সভায় সংখ্যাগরিষ্ঠ হিন্দুদিগকে সংখ্যান্যূনের দশায় ফেলিয়া তাহাদের প্রতি যে অবিচার করা হইয়াছে, তাহা পূর্ব্বে দেখাইয়াছি। প্রদেশগুলিতেও হিন্দুদের প্রতি সেইরূপ অবিচার করা হইয়াছে। বড় প্রদেশগুলির মধ্যে বাংলা ও পঞ্জাবে হিন্দুরা সংখ্যান্যূন। মুসলমানরা যেখানেই সংখ্যান্যূন, সেইখানেই তাহারা সংখ্যার অনুপাতে প্রাপ্য আসনের চেয়ে বেশী আসন পাইয়াছে। বঙ্গে ও পঞ্জাবে হিন্দুরা এই ভাবে বেশী আসন পাওয়া দূরে থাক, সংখ্যার অনুপাতে যাহা প্রাপ্য তাহাও পায় নাই। উভয় প্রদেশেই হিন্দুরা শিক্ষা ও বাণিজ্যাদিতে অগ্রসর। সিন্ধু এবং উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ, কেবল এই দুটি ছো[ট] প্রদেশে হিন্দুরা তাহাদের সংখ্যার অনুপাতে যাহা প্রাপ[্য] তাহা হইতে অতি অল্প কয়েকটি আসন বেশী পাইয়াছে কিন্তু ঐ দুই প্রদেশে হিন্দুরা শিক্ষায় এবং বাণিজ্যাদি দ্বার উপার্জ্জনে মুসলমানদের চেয়ে অনেক বেশী অগ্রসর এই দুই বিষয়ে শ্রেষ্ঠতার জন্য কেহ বেশী আসন পায় তাহা আমরা ইচ্ছা করি না। কিন্তু কেবল সংখ্যান্যূন বলিয়াই যদি মুসলমানরা বেশী আসন পাইতে পারে তাহা হইলে হিন্দুরা সংখ্যায় ন্যূন এবং অগ্রসর উভয়ই হইলে নিশ্চয়ই তাহাদের বেশী আসন পাইবার দাবি বাড়ে বই কমে না।

ভারতবর্ষের প্রাদেশিক ব্যবস্থাপক সভাসমূহে হিন্দুদের প্রতি কিরূপ অবিচার হইয়াছে, তাহা আর এক দিক দিয়া দেখাইতেছি। সমুদয় প্রাদেশিক ব্যবস্থাপক য়্যাসেম্বলীর মোট সভ্যসংখ্যা ১৫৮৫। যদি সমুদয় "সাধারণ" আসনগুলি হিন্দুরা পায় (যাহা তাহারা সম্ভবতঃ পাইবে না), তাহা হইলে তাহারা ৮৩৯টি আসন পাইবে, মুসলমানরা পাইবে ৪৯২টি। প্রদেশগুলির মোট লোক-সংখ্যা ২৫,৬৬,২৭,১৩৮; হিন্দু ১৭,৬৩,৫৯,৭৩৮, মুসলমান ৬,৬৪,৭৮,৬৬৯। মুসলমানদের সংখ্যা হিন্দুদের সংখ্যার অর্দ্ধেকের চেয়ে ঢের কম; তথাপি তাহারা হিন্দুদের আসনের অর্দ্ধেকের চেয়ে অনেক বেশী আসন পাইয়াছে। সংখ্যার অনুপাতে হিন্দুদের মোট ১৫৮৫টি আসনের মধ্যে পাওয়া উচিত ছিল ১০৮৮টি, কিন্তু তাহারা সব "সাধারণ" আসনগুলি পাইলেও (যদিও তাহা পাইবে না) পাইবে কেবল ৮৩৯টি; অর্থাৎ পাওনার চেয়ে ২৪৯টি কম!

অতএব, অনুমান দ্বারা নহে, অঙ্ক কষিয়া প্রমাণ করা গেল, যে, সমগ্রভারতীয় ব্যবস্থাপক সভায় এবং প্রাদেশিক ব্যবস্থাপক সভাসমূহে উভয়ত্র হিন্দুদের প্রতি ঘোরতর অবিচার করা হইয়াছে।

—

রেলওয়ে বোর্ড

ভবিষ্যৎ ভারতশাসন আইন ("Constitution Act") অনুসারে একটি রেলওয়ে বোর্ড গঠিত হইবে। ভারতবর্ষের ফেডার‍্যাল গবন্মেণ্ট ও ব্যবস্থাপক সভার ইহার কর্ম-

নীতির (পলিসির) উপর সাধারণ তত্ত্বাবধান-ক্ষমতা থাকিবে বলা হইয়াছে, কিন্তু তাহার পর যাহা লিখিত হইয়াছে, তাহাতেই বুঝা যায়, যে, ইহাকে ভারতবর্ষীয় কোন কর্ত্তৃপক্ষের নিকট জবাবদিহির অতীত করা হইবে। কথাগুলি এই :—

"While the Federal Government and Legislature will necessarily exercise a general control over railway policy, the actual control of the administration of the State Railways in India (including those worked by Companies) should be placed by the Constitution Act in the hands of a Statutory Body so composed and with such powers as will ensure that it is in a position to perform its duties upon business principles and without being subject to political interference. With such a Statutory Body in existence, it would be necessary to preserve such existing rights as the Indian Railway Companies possess under the terms of their contracts to have access to the Secretary of State in regard to disputed points and, if they desire, to proceed to arbitration."

সরকারী রেলওয়েগুলিরই নিট আয় ১৯৩১-৩২ সালে ৩৯,৫৪,০২,০০০৲ টাকা হইয়াছিল। রেলের অনেক হাজার ও অনেক শত টাকা মাসিক বেতনের চাকর্য়ো বিস্তর আছে; তাহাদের অধিকাংশ ইংরেজ ও ফিরিঙ্গী। সর্ব্বোচ্চ চাকরিগুলি ভারতীয় কেহই এ-পর্য্যন্ত পায় নাই। রেলের মাল চালানের রেট এবং নিয়মাবলী এরূপ যে ভারতবর্ষ হইতে বিলাতে ও অন্য বিদেশে কাঁচা মাল রপ্তানী এবং বিলাত ও অন্য বিদেশ হইতে কারখানায় তৈরি মাল আমদানী করা অপেক্ষাকৃত কম খরচে হয়। কিন্তু যে-সব ব্যবসায়ে ভারতবর্ষের নিজের স্বার্থ, তাহার মাল দেশের মধ্যেই চলাচল করা অপেক্ষাকৃত ব্যয়সাধ্য। যেমন দক্ষিণ-আফ্রিকা হইতে বোম্বাইয়ে কয়লা আনিবার খরচের চেয়ে বাংলা ও বিহার হইতে কয়লা আনিবার খরচ বেশী! এই রকম নানা উপায়ে রেলওয়েগুলির কাজ চালান হয় ইংরেজদের (এবং ফিরিঙ্গীদের) সুবিধার জন্য। ব্যবস্থাপক সভায় তাহার সমালোচনা করিলে ও তাহাতে বাধা দিবার চেষ্টা করিলে তখন তাহার নাম হয় পোলিটিক্যাল ইণ্টারফেরেন্স বা রাজনৈতিক হস্তক্ষেপ। কিন্তু একটা দেশের (অর্থাৎ ভারতবর্ষের) রেলগুলাকে রাজনৈতিক ক্ষমতার অপব্যবহার দ্বারা সেই দেশজাত স্থায়ী অধিবাসীদের কল্যাণের জন্য না চালাইয়া অন্যদের স্বার্থসিদ্ধির জন্য চালান রাজনৈতিক হস্তক্ষেপ নহে!

—

প্রবাসী বঙ্গসাহিত্য সম্মেলনের মহিলাবিভাগ

গত বৎসর মাঘের প্রবাসীতে আমরা যখন প্রবাসী বঙ্গসাহিত্য সম্মেলনের কোন কোন অভিভাষণ হইতে অল্প অল্প অংশ উদ্ধৃত করিয়া দিয়াছিলাম, তখন মহিলা-বিভাগের সভানেত্রী শ্রীযুক্তা অনুরূপা দেবীর অভিভাষণটি পাই নাই। পরে উহা পাইয়াছি। এই পাণ্ডিত্যপূর্ণ অভিভাষণটির প্রধান ও শেষ বক্তব্য সাহিত্যে শুচিতা বিষয়ক। বাগ্‌দেবীর পূজার উল্লেখ করিয়া তিনি বলেন :—

ইঁহার পূজায় বাক্‌সংযততার প্রয়োজন আছে। চিত্তশুদ্ধি ব্যতীত বাক্‌শুদ্ধি কখনই সম্ভবে না। অন্তরের শুচিতা ও অশুচিতা প্রকাশ করে বাক্য। সৌভাগ্য বশতঃ যাঁরা দেবীপূজার অধিকার পাইয়াছেন, সেই অধিকারের গৌরবকে রক্ষিত এবং বর্দ্ধিত করুন, মহামন্ত্র জপে পুরশ্চরণপূর্ব্বক সিদ্ধিলাভ প্রচেষ্টায় অবহিত হোন। "শিবো ভূত্বা শিবমর্চ্চয়েৎ"—এই সনাতন পূজাবিধি স্মরণে রাখিয়া উপাস্যের সহিত একাত্মতা প্রাপ্ত হইয়া দেবীপূজায় দেবীত্ব লাভ করুন, নতুবা ঋদ্ধি লাভ করিলেও সিদ্ধিলাভ ঘটিবে না। বিশেষতঃ এই বাণীপূজার মন্ত্রগুলি আপনাদের বিশেষ ভাবে স্মরণে রাখিতে হইবে। এই দেবী রক্তাম্বরা বা হরিদকলা নহেন; নৃমুণ্ডমালিনী অথবা দিক্‌-অম্বরা ইনি নন। ইনি শ্বেতপদ্মাসনা, শ্বেতপুষ্পবিশোভিতা শ্বেতাম্বরধরা; শ্বেতগন্ধানুলিপ্তা, শ্বেতাঙ্গী শুভ্রহস্তা, শ্বেতবীণাধরা, শুভ্রা এবং কুন্দেন্দুতুষারহারধবলা। এই সিতশুভ্র পবিত্রতার বিশ্বব্যাপক প্রতীক যিনি, তাঁর পূজার মণ্ডপে শুভ্রতার সুপবিত্র উপচার আহরণ করা ব্যতীত প্রবেশ করা সম্ভবে না; করিলে তাহা অনাচার হয়। তান্ত্রিক পূজার পঞ্চমকার এ পূজায় যাঁরা সমাহৃত করিতেছেন, করুন; তাঁদের পূজার উৎসব হয়ত খুবই চমকপ্রদ হইয়া উঠিবে; উৎসবের কোলাহল, বলিদানের উচ্চ জয়নাদ ও বাদ্যধ্বনি হয়ত গগন-পবনকেও কম্পিত করিয়া তুলিতে পারে; জনতার দাপে পথিক রুদ্ধশ্বাস হওয়াও বিচিত্র নয়। তা হোক্‌ কুণ্ঠিত হইবার প্রয়োজন নাই। সমারোহ যতই সেখানে থাকে থাক, পূজামন্ত্রে বিভ্রম ঘটিয়াছে এ কথা স্থির নিশ্চিত। জ্ঞানময়ী বাণীর আরাধনায় নিষ্ঠার অভাবে অকল্যাণ দেখা দিয়া পূততোয়া কল্যাণস্বরূপিণী জাহ্নবীকে পঙ্কিল করিয়া তুলিবেই।

যাহা অপবিত্র, যাহা পুতিগন্ধময়, যাহা জীবনীশক্তির পরিপন্থী, জ্ঞানস্বরূপিণী সরস্বতীর পুণ্যধারা তাহাকে প্রণষ্ট করিয়া দিয়া, যাহা পবিত্র যাহা পুণ্য মানবজীবনের পক্ষে যাহা উন্নতিকর মঙ্গলপূর্ণ ও মহিমময়, তাহাকেই সুপ্রতিষ্ঠিত করুক, এই ত্রিবেণীতীর্থের উপকূলের এবারকার বঙ্গের বাহিরের এই বঙ্গসাহিত্যের সম্মিলন।

—

শারদা আইনের সমর্থন, ও সংশোধনের দাবি

বাল্যবিবাহ-নিরোধক শারদা আইন সমর্থন করিয়া এবং তাহাকে আরও কার্য্যকর করিবার নিমিত্ত সংশোধনের দাবি করিয়া গত ২৩শে চৈত্র কলিকাতার আলবার্ট হলে ভদ্রমহিলা ও ভদ্রলোকদের এক বৃহৎ সভার অধিবেশন হয়। নিখিল ভারত নারীসম্মেলনের কলিকাতা শাখা উহা আহ্বান করেন। শ্রীযুক্তা সরলা দেবী চৌধুরাণী সভানেত্রীর কাজ করেন। সভায় নিম্নমুদ্রিত প্রস্তাবগুলি গৃহীত হয়।

(১) কলিকাতার নাগরিকগণের অভিমত এই যে, হিন্দুসমাজের কল্যাণকল্পে শারদা আইনের বিধানগুলি সর্ব্বসাধারণের বর্ণে বর্ণে পালন করিয়া চলা উচিত এবং ঐগুলিকে পূর্ণমাত্রায় কার্য্যকর করা উচিত। তদুদ্দেশ্যে এই সভা—

(ক) জনসাধারণকে শারদা আইনের কোন বিধান লঙ্ঘন না করিতে অনুরোধ করিতেছে ;

(খ) দেশের সর্ব্বত্র জনসাধারণকে কমিটী গঠন করিয়া ঐ আইনভঙ্গকারীমাত্রকে উপযুক্ত দণ্ডে দণ্ডিতকরণ বিষয়ে অবহিত হইতে অনুরোধ করিতেছে ;

(গ) এবং অভিজ্ঞতার ফলে আইনটিকে যথাযথরূপ কার্য্যকর করিবার জন্ম অর্থাৎ বর্ত্তমান আইনের মধ্যে যে সন্দেহের সুযোগ রহিয়া গিয়াছে উহা দূরীভূত করিবার জন্ম সংশোধন-প্রস্তাব আনিয়া স্পষ্টরূপে ইহা নির্দ্দেশিত করিয়া দিতে অনুরোধ করিতেছে, যে, বৃটিশ ভারতের বাহিরে যাইয়া যাহারা এই আইনানুযায়ী অপরাধ করিয়া আসিবে, তাহাদিগকে তাহারা বৃটিশ ভারতে সাধারণতঃ যে স্থানে বাস করে ঐ স্থানে অভিযুক্ত ও দণ্ডিত করা যাইতে পারিবে।

(২) এই আইনকে সাফল্যমণ্ডিত করিবার জন্ম এবং যাহারা এই আইনের দণ্ড এড়াইবার জন্য সুদূর পল্লীগ্রামে যাইয়া শারদা আইন লঙ্ঘন করিয়া বাল্যবিবাহ নিষ্পন্ন করিয়া আসিবার মতলব অন্তরে পোষণ করে, উহাদের হীন চেষ্টা ব্যর্থ করিবার জন্য এবং জাতীয় বহুবিধ অকল্যাণের কারণ বলিয়া নিশ্চিতরূপে প্রমাণিত বাল্যবিবাহের উচ্ছেদ সাধনের জন্য এই সভা প্রস্তাব করিতেছে যে শারদা আইনের ৮ম ধারার মারফৎ প্রেসিডেন্সী ম্যাজিষ্ট্রেট ও জেলা ম্যাজিষ্ট্রেটদের হাতে যে ক্ষমতা দেওয়া হইয়াছে, দেশের অভ্যন্তরবর্ত্তী সুদূর মফঃস্বলবাসিগণকেও এই আইনের কল্যাণপ্রসূ বিধানাবলী দ্বারা উপকৃত হইবার সুযোগদানের জন্য উক্ত ক্ষমতা মহকুমা হাকিমদের হাতেও অর্পিত হউক।

—

কলিকাতা মিউনিসিপালিটির মহিলা কৌন্সিলর

শহরগুলির এমন অনেক পৌর কর্ত্তব্য আছে, যাহা মহিলাদের দ্বারা উত্তমরূপে নির্ব্বাহিত হইতে পারে। এই জন্ম মিউনিসিপালিটিসমূহে মহিলা সদস্য থাকা আবশ্যক। বাংলা দেশ এ-বিষয়ে পশ্চাতে পড়িয়া আছে। এ-বৎসর এই প্রথম কলিকাতায় শ্রীযুক্তা জ্যোতির্ম্ময়ী গঙ্গোপাধ্যায়, এম-এ ও শ্রীযুক্তা কুমুদিনী বসু, বি-এ কলিকাতার কৌন্সিলর নির্ব্বাচিত হইবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। সুখের বিষয় তাঁহারা উভয়েই তাঁহাদের ওয়ার্ড দুটিতে সর্ব্বোচ্চ ভোট পাইয়া নির্ব্বাচিত হইয়াছেন। তাঁহারা উভয়েই নানা লোকহিতকর প্রতিষ্ঠান ও অনুষ্ঠানের সংস্রবে কাজ করিতে অভ্যস্ত এবং তাহার দ্বারা অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করিয়াছেন।

—

নারীশিক্ষার জন্য দান

চন্দননগরের শ্রীযুক্ত হরিহর শেঠ সৎকর্ম্মে দানশীলতার জন্ম সুবিদিত। তিনি সম্প্রতি তাঁহার প্রতিষ্ঠিত কৃষ্ণভাবিনী নারীশিক্ষা-মন্দিরে এক লক্ষ টাকার শতকরা ৩।০ টাকা সুদের কোম্পানীর কাগজ দান করিয়াছেন।

—

কলেজে ছাত্রবেতন বৃদ্ধির প্রস্তাব

বঙ্গীয় সরকারী ব্যয়সঙ্কোচ কমিটি কলেজের ছাত্রদের বেতন বৃদ্ধির যে প্রস্তাব করিয়াছেন, তদ্বিষয়ে কলিকাতা ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়দ্বয়ের মত জিজ্ঞাসা করা হইয়াছে। সর্ব্বসাধারণের—বিশেষতঃ মধ্যবিত্ত শ্রেণীর—এই আর্থিক অনটনের দিনে ছাত্রদের বেতন বাড়ান উচিত হইবে না। ব্যয়সঙ্কোচ কমিটিকে সরকারী ব্যয় কমাইবার উপায় নির্দ্দেশ করিতে বলা হইয়াছিল। তাহার মানে কি এই, যে, ছাত্রদের অভিভাবকগণের ব্যয় বাড়াইয়া অর্থাৎ তাহাদের উপর ও শিক্ষার উপর ট্যাক্স বসাইয়া সরকার শিক্ষাক্ষেত্র হইতে কতকটা হাত গুটাইবেন?

—

বঙ্গে চিনির ব্যবসায়ে সরকারী অবহেলা

বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভায় শ্রীযুক্ত সুধাংশুমোহন বসুর প্রশ্নের উত্তরে মন্ত্রী ফরোকী সাহেব বলিয়াছেন, যে, বাংলা গবর্ন্মেণ্ট চিনির ব্যবসায়ের জন্ম বিশেষ কিছু করেন নাই। কেন, মন্ত্রীর বেতন ও সফর-ব্যয় ইত্যাদি ত ঠিক্ ঠিক্ দিয়াছেন? ইহা কি বিশেষ কিছু নয়?

বিদেশী চিনির উপর শুল্ক বসানতে দেশী চিনি বেশী দামে বিক্রী হইতেছে। এই সুযোগে বঙ্গে চিনির কারখানা বাঙালীদের দ্বারা স্থাপিত হইলে বঙ্গে বিক্রীত চিনির এই অতিরিক্ত দামের কিয়দংশ লাভ-বাবদে বাঙালীর হাতে থাকিবে। নতুবা বাঙালী চিনির জন্ম কেবল বেশী দামই দিবে, লাভটা পাইবে অবাঙালীরা।

—

ঝাড়গ্রামে চিনির কারখানা

বঙ্গের জমিদারদের মধ্যে যাঁহারা ঋণে হাবুডুবু খাইতেছেন না, তাঁহারা কৃষকদিগকে আকের চাষে উৎসাহিত করিয়া আক ও গুড় কিনিয়া লইয়া কারখানায় চিনি প্রস্তুত করাইলে চাষীদের ও দেশের উপকার হইবে, এবং তাঁহাদের নিজেরও কিছু আয় বাড়িতে পারে। ঝাড়গ্রামের জমিদার রাজা নরসিংহ মল্ল দেব একটি ছোট চিনির কারখানা স্থাপন করিয়াছেন। ইহাতে এখন সাধারণ ভাল চিনি হইতেছে। আমরা ব্যবহার করিয়া দেখিয়াছি। দানাদার শাদা চিনি এই কারখানা এখন প্রস্তুত করে না। খাদ্য হিসাবে সাধারণ বাদামী রঙের চিনি দানাদার শাদা চিনির চেয়ে সারবান্। এই কারখানার চিনির চাহিদা বাড়িলে মালিক ইহা আরও বড় করিতে পারিবেন, দানাদার চিনিও প্রস্তুত করাইতে পারিবেন। ইহার বিশেষত্ব এই, যে, ইহার মূলধন

াঙালীর, আক ও গুড় বাঙালী চাষীর, এবং কার্য্যাধ্যক্ষ ও ্রমিকগণ বাঙালী।

—

পাপ-ব্যবসা দমন বিল পাস

শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ বসু পতিতা নারীদের দ্বারা পাপ-্যবসা চালান বন্ধ করিবার জন্য বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভায় একটি বিল পেশ করিয়াছিলেন। তাহা পাস্ হইয়াছে। আইনের দ্বারা বেশ্যাবৃত্তি বন্ধ করা ইহার উদ্দেশ্য নহে, কেবল আইনের দ্বারা তাহা করা যায় না। অসৎ উদ্দেশ্যে বালিকা ও নারী আমদানী করা, বা তাহাদিগকে পাপে লিপ্ত করিয়া তাহার ব্যবসা করা যাহাতে না-চলে, তাহাই এই আইনের উদ্দেশ্য। সর্ব্বসাধারণ এই দিকে লক্ষ্য রাখিলে আইনের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইবে। সঙ্গে সঙ্গে, পতিতাবৃত্তি হইতে যাহাদিগকে উদ্ধার করা হইবে, তাহাদের সৎশিক্ষা ও সাধুভাবে জীবিকা অর্জ্জনের উপায় করিয়া দিবার নিমিত্ত অনেক প্রতিষ্ঠান স্থাপিত করিতে ও চালাইতে হইবে।

—

কেশবচন্দ্র ঘোষ

শ্রীযুক্ত কেশবচন্দ্র ঘোষের মৃত্যুতে হিন্দু-মুসলমান-নির্বিশেষে বঙ্গের কৃষকেরা একজন প্রকৃত বন্ধু হারাইল। তিনি সামান্য অবস্থার লোক ছিলেন। প্রসিদ্ধ অনেক লোকদের সহযোগিতায় চাষীদের হিতসাধনে একাগ্রতার সহিত পরিশ্রম করিতেন। তিনি বর্দ্ধমান জেলার লোক ছিলেন, সরকারী টেলিগ্রাফ আপিসে কম বেতনের চাকরি করিতেন।

—

বঙ্গে লবণশিল্প

বাহির হইতে আমদানী লবণের উপর শুল্ক থাকায় গবর্মেণ্টের অনেক লক্ষ টাকা আয় হয়, কিন্তু বঙ্গের লোকদিগকে বেশী দামে নূন কিনিতে হয়। শুল্কের আয়ের কয়েক লক্ষ টাকা বাংলা গবর্মেণ্ট পাইয়াছেন। উহা বঙ্গে লবণশিল্পে উৎসাহ দিবার জন্য ব্যয় করিবার কথা ছিল। গবর্মেণ্ট তাহা করেন নাই, কেবল ছয়টি কোম্পানীকে বঙ্গে নূন তৈরি করিবার অনুমতি দিয়াছেন। একটি কাজ আরম্ভ করিয়াছে। বাংলা দেশে কাট্তি নূন যদি বাঙালীরা তৈরি করিতে পারে, তাহা হইলে বাঙালীদিগকে অতিরিক্ত দামে নূন কিনিয়া ক্ষতিগ্রস্ত হইতে হয় না। কিন্তু গবর্মেণ্ট কোন সরকারী সাহায্য দিতে আপাততঃ রাজী নহেন। কখনও রাজী হইবেন কি? কোম্পানীগুলি কি বাঙালীর?

হোয়াইট পেপার সম্বন্ধে ভারতীয় ও বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার মত

ভারতীয় ব্যবস্থাপক সভায় গবর্মেণ্টের পক্ষ হইতে স্যর ব্রজেন্দ্রলাল মিত্র প্রস্তাব করেন, "ভারতের ভাবী শাসন-সংস্কারের প্রস্তাব সম্বলিত হোয়াইট পেপারের আলোচনা করা হউক" এবং বলেন যে গবর্মেণ্ট আলোচনায় যোগ দিবেন না। স্যর আবদার রহিম বেসরকারী সদস্যদিগের পক্ষ হইতে নিম্নমুদ্রিত মর্ম্মে এক সংশোধন প্রস্তাব উপস্থিত করেন :—

মূল প্রস্তাবটি পরিবর্ত্তন করিয়া এইরূপ করা হউক :—"ভারতীয় ব্যবস্থাপক সভার পক্ষ হইতে সপারিষদ বড়লাটকে অনুরোধ করা যাইতেছে,—শাসন-সংস্কারের প্রস্তাবগুলির বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্ত্তন করিয়া জনসাধারণের নির্ব্বাচিত প্রতিনিধিদের হাতে কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক গবর্মেণ্টের অধিকতর কার্য্যক্ষমতা এবং স্বাধীনতা প্রদান করা আবশ্যক ; তাহা না হইলে এই শাসনতন্ত্র দ্বারা দেশে শান্তি প্রতিষ্ঠিত হইবে না, ভারতবাসীরা সন্তুষ্ট হইবে না এবং উন্নতির পথ অক্ষুণ্ণ থাকিবে না ; সপারিষদ বড়লাট যেন এই অভিমত ব্রিটিশ গবর্মেণ্টকে জানাইয়া দেন।"

বেসরকারী তীব্র অনেক বক্তৃতার পর এই সংশোধন-প্রস্তাব বিনা ভোটগণনায় গৃহীত হয়।

বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভাতেও এই রকম কোন প্রস্তাব গৃহীত হওয়া উচিত ছিল। তাহা না হইয়া হোমমেম্বর মিঃ প্রেণ্টিসের নিম্নলিখিত প্রস্তাবটি গৃহীত হইয়াছে।

হোয়াইট পেপারে সন্নিবিষ্ট ব্রিটিশ গবর্মেণ্টের প্রস্তাবগুলি বিবেচনা করিয়া এই সভা বাংলা গবর্মেণ্টকে এই অনুরোধ করিতেছেন যে, সভার আলোচনার বিবরণ ব্রিটিশ গবর্মেণ্টের জ্ঞাতার্থে এবং জয়েণ্ট সিলেক্ট কমিটির বিবেচনার্থে ভারত-গবর্মেণ্টের নিকট পাঠাইবার বন্দোবস্ত করা হউক।

—

প্রাদেশিক ফৌজদারী আইনসমূহের প্রপূর্ত্তি

ফৌজদারী আইনসমূহ কঠোর হইতে কঠোরতর করা হইতেছে, কঠোরতম যে কখন হইবে তাহা দেবা ন জানন্তি কুতো মানবাঃ। কয়েক দিন পূর্ব্বে ভারতীয় ব্যবস্থাপক সভায় প্রভিন্সিয়্যাল ক্রিমিন্যাল লজ সপ্লেমেণ্টিং বিল পাস হইয়া গিয়াছে। ইহার দ্বারা হাইকোর্টের ক্ষমতার প্রভূত হ্রাস হইবে। স্যর আবদার রহিম হাইকোর্টের প্রধান জজিয়তী করিয়াছিলেন, বাংলা গবর্মেণ্টের শাসন-পরিষদেরও সভ্য ছিলেন। এহেন লোকের মতে, "আইনের রাজত্ব (rule of law) ব্রিটিশ গবর্মেণ্টের প্রধান যশের বিষয় ছিল, কিন্তু তাহা প্রায় নষ্ট হইয়াছে।"

বোম্বাই ও বাংলা

বোম্বাই গবন্মেণ্ট ব্যয়-সংক্ষেপের জন্ত কয়েক জন মন্ত্রী ও শাসন-পরিষদের সভ্য ছাঁটিয়া দিয়াছেন, গ্রীষ্মকালে মহাবলেশ্বরে যাওয়া বন্ধ করিয়াছেন। কিন্তু চিরঋণী বাংলা সরকার এরূপ কিছু করেন নাই।

—

কলিকাতা মিউনিসিপালিটির দেশী সদস্য

কংগ্রেসের দলাদলি সত্ত্বেও এবারকার নির্ব্বাচনে নির্ব্বাচিত অধিকাংশ দেশী সভ্য, নামতঃ না হইলেও কার্য্যতঃ, কংগ্রেস দলের। তাঁহারা ঘরোয়া বিবাদ ও স্বার্থ ভুলিয়া জনহিতে মন দিলে আগামী তিন বৎসর দেশহিত-বিরোধী সরকারী বেসরকারী সাক্ষাৎ ও পরোক্ষ ইউরোপীয় প্রভাব ঠেকাইয়া রাখিতে পারিবেন। বর্ত্তমান মেয়র ডাক্তার বিধানচন্দ্র রায় কাগজে চিঠি লিখিয়া জানাইয়াছেন, যে, তিনি কার্য্যক্ষেত্র হইতে সরিয়া দাঁড়াইলে যদি ঘরোয়া বিবাদ মিটে এই আশায় তিনি সরিয়া দাঁড়াইতেছেন। তাঁহার এই উদ্দেশ্য সফল হউক।

—

জাপান ও ভারতবর্ষ

জাপান দ্রুত গতিতে ভারতবর্ষে কারখানায় তৈরি পণ্যের বাজার দখল করিতেছে, এমন কি চালের বাজারেও আতঙ্ক জন্মাইতেছে। বাণিজ্যিক প্রভুত্বের পর রাজনৈতিক প্রভুত্বও যে জাপান চাহিবে, এ অনুমান আমরা অনেক বৎসর পূর্ব্বেও করিয়াছিলাম, সম্প্রতিও মডার্ণ রিভিউতে জাপানের নাম না করিয়া তাহার আভাস দিয়াছিলাম। এখন কাগজে দেখিতেছি, চীনের ভূতপূর্ব্ব পররাষ্ট্রসচিব ইউগেন চেন এইরূপ কথা বলিয়াছেন। তাঁহার মতে,

> চীনের বাজারে জাপানী পণ্য বয়কট করা হইয়াছে। ইহাতে জাপানের যে ক্ষতি হইয়াছে, জাপানীরা তাহা ভারতের বাজার হইতে পূরণ করিতেছে। অদূর ভবিষ্যতে ভারতে জাপানের পণ্যের আমদানী অত্যন্ত বৃদ্ধি পাইবে। ইহার ফলে জাপান ভারতবর্ষেও নিজের মাঞ্চুরিয়ার অনুরূপ নীতি অবলম্বন করিবে। ভারতবর্ষ হইতে বৃটিশ জাতির প্রস্থান করিবার দিন খুব বেশী দূরবর্ত্তী নহে। ইহার পর ভারতবর্ষ জাপানী নৌবহরের অনুগ্রহের উপর নির্ভর করিতে বাধ্য হইবে।

—

স্যর দীনশা পেটিট

বোম্বাইয়ের অন্যতম বিখ্যাত ধনী স্যর দীনশা পেটিটের সম্প্রতি মৃত্যু হইয়াছে। তিনি উইলে দুই লক্ষ কুড়ি হাজার টাকা দানের ব্যবস্থা করিয়া গিয়াছেন।

—

বাঁকুড়ায় কুষ্ঠরোগ

বাংলাদেশের মধ্যে বাঁকুড়া জেলায় কুষ্ঠরোগের প্রাদুর্ভাব সর্ব্বাপেক্ষা বেশী। এই জন্য বাঁকুড়া জেলার ইউনিয়ন বোর্ড কন্‌ফারেন্সে গৃহীত নিম্নলিখিত প্রস্তাবটি খুব সমীচীন ও সময়োচিত হইয়াছে।

> কুষ্ঠরোগ "notifiable disease" বলিয়া ঘোষণা করা হউক এবং আইন এ ভাবে সংশোধন করা হউক যাহাতে প্রত্যেক কুষ্ঠরোগী তাহার রোগ চিকিৎসা করিতে বাধ্য হয়েন। (বাঁকুড়া দর্পণ।)

—

বঙ্গে ডাকাতী

বঙ্গে ১৯২৯ সালে ৬৯০টা, ১৯৩০এ ১১০৩টা এবং ১৯৩১এ ১২২৯টা ডাকাতী হইয়াছিল। রোজ রোজ ও সপ্তাহে সপ্তাহে যেরূপ ডাকাতীর খবর কাগজে বাহির হয়, তাহাতে মনে হয় ১৯৩২এ সংখ্যা আরও বেশী হইয়াছিল, এবং ১৯৩৩এ তার চেয়েও বাড়িবে। কিন্তু রাজপুরুষেরা বলেন, শক্ত শাসন দ্বারা তাঁহারা বাংলা দেশটাকে নিরাপদ করিয়াছেন! মাজিষ্ট্রেট, পুলিস ও জেল-কর্ম্মচারীরা নিরাপদ হইলেই কি দেশটা নিরুপদ্রব ও নিরাপদ হইয়াছে মনে করিতে হইবে?

—

কলিকাতা মিউনিসিপাল আইন সংশোধন

১৯২৩ সনের কলিকাতা মিউনিসিপাল আইন সংশোধন করিবার জন্য যে আইন করিবার প্রস্তাব হইয়াছে, উহার খসড়া ৩০এ মার্চ্চ তারিখের একটি বিশেষ সংখ্যা "কলিকাতা গেজেটে" প্রকাশিত হইয়াছে। এই বিলটির উদ্দেশ্য দুইটি,—(১) কলিকাতা করপোরেশনের বেতনভোগী কর্ম্মচারীদের মধ্য হইতে রাজনৈতিক অপরাধে দণ্ডিত ব্যক্তিদিগকে দূরীভূত করা; (২) কলিকাতার করপোরেশনের আর্থিক ব্যবস্থার উপর গবন্মেণ্টের কর্তৃত্ব সুদৃঢ় ও সুপ্রতিষ্ঠিত করা।

এই আইনের ভূমিকায় গবন্মেণ্টের তরফ হইতে যাহা বলা হইয়াছে, তাহার তৎপর্য্য এইরূপ,—

> করপোরেশনের প্রাইমারী বিদ্যালয় সমূহের শিক্ষকগণ আইন অমান্য আন্দোলনে যোগদান করিয়াছে কিনা বা রাজনৈতিক কারণে দণ্ডিত হইয়াছে কিনা এবং তজ্জন্য করপোরেশন নিয়মানুবর্ত্তিতা রক্ষার জন্য কি ব্যবস্থা করিয়াছেন বা করিতে মনস্থ করিয়াছেন—ইত্যাদি প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিয়া বাংলা সরকার গত জুলাই মাসের প্রথম ভাগে করপোরেশনকে একখানি পত্র দিয়াছিলেন। ইহার উত্তরে করপোরেশন জানাইয়াছিলেন যে, তাঁহাদের কর্ম্মচারিগণ আপিসের নির্দ্দিষ্ট সময় ব্যতীত অন্য সময়ে ব্যক্তিগতভাবে যে-সকল কাজ করিয়া থাকেন তাহার জন্য তাঁহারা দায়ী নহেন। এই যুক্তি গবর্ণমেণ্ট স্বীকার করিয়া লইতে পারেন না। তদনুসারে ডিসেম্বর মাসে ব্যবস্থাপক সভাকে জানান হইয়াছিল যে, এতৎ সম্পর্কে এই

সেসনেই একটি আইনের পাণ্ডুলিপি তাহাদের নিকট উপস্থিত করা হইবে।

কিছুকাল যাবৎ বাংলা সরকার দেখিয়া আসিতেছেন যে, কোন কোন বিষয়ে কর্পোরেশন এমন সব কাজ করিতেছেন যাহা গবর্ণমেণ্ট অনুমোদন করিতে পারিতেছেন না। কিন্তু কলিকাতার মিউনিসিপাল আইনের অস্পষ্টতা হেতু, ইচ্ছা থাকিলেও ঐ সমস্ত বিষয়ে গবর্মেণ্ট কোন প্রতিকার করিয়া উঠিতে পারিতেছেন না। ইহাতে করপোরেশন ক্রমশঃই গবর্মেণ্টের ইচ্ছার বিরুদ্ধে কার্য্য করিয়া গবর্ণমেণ্টকে বিব্রত করিতেছেন এবং করদাতাদের স্বার্থ ক্ষুণ্ণ করিতেছেন।

শুধু ইহাই নহে। এই বিল উপস্থাপিত করিবার সময়ে ব্যবস্থাপক সভার বর্ত্তমান নিয়মানুযায়ী স্বায়ত্তশাসন বিভাগের মন্ত্রীকে বক্তৃতা করিবার অবকাশ দেওয়া হইবে না বলিয়া এই আইনের সাফাই গাহিবার জন্য বাংলা গবর্মেণ্টের পক্ষ হইতে একটি ইস্তাহারও প্রকাশিত হইয়াছে। এই ইস্তাহারে রাজনৈতিক অপরাধ সম্বন্ধে নূতন কোন কথা নাই, কিন্তু আর্থিক ব্যাপারে গবর্মেণ্ট যে সকল নূতন ক্ষমতা দাবী করিয়াছেন, তাহার আরও একটু বিশদ ব্যাখ্যা আছে। উহার সারমর্ম্ম নিম্নে দেওয়া গেল।—

বিলটির দ্বিতীয় অধ্যায়ে এরূপ ব্যবস্থা করা হইয়াছে যে, অডিটর কোন ব্যয় বে-আইনী সাব্যস্ত করিলে অথবা কাহারও শৈথিল্য বা কর্ত্তব্যের ত্রুটির জন্য করপোরেশনের ক্ষতি হইয়াছে মনে করিলে, সেই ব্যয় নামঞ্জুর করিতে পারিবেন এবং করপোরেশনের সদস্য ও কর্ম্মচারীদিগকে ব্যক্তিগতভাবে ক্ষতিপূরণের জন্য দায়ী করিতে পারিবেন। ইহা দ্বারা মিউনিসিপ্যাল আইন এড়াইবার চেষ্টা ও আর্থিক বিশৃঙ্খলা দূরীভূত হইবে।

গত ১৬ই ডিসেম্বর তারিখের বিবৃতিতে স্বায়ত্তশাসন বিভাগের মন্ত্রী ব্যবস্থাপক সভাকে জানাইয়াছেন যে, বিভিন্ন ইলেকট্রিক স্কিম সম্পর্কে করপোরেশন কলিকাতা মিউনিসিপাল আইনের ১৪॥ ধারা লঙ্ঘন করিয়াছেন কিনা সরকার শীঘ্রই এ-বিষয়ে একটা সিদ্ধান্তে পৌছিবেন। ঐ বিষয়ে তদন্তাদি হইয়া গিয়াছে, এবং শীঘ্রই সরকার করপোরেশনকে এ বিষয়ে পত্র দিবেন।

সরকার এই সিদ্ধান্তে পৌছিয়াছেন যে, করপোরেশন ঐ সকল স্কিম সম্পর্কে আইনের ঐ ধারা লঙ্ঘন করিয়াছেন। এতদ্ব্যতীত ঋণের টাকা ব্যবহার সম্পর্কে মিউনিসিপ্যাল আইনের ৯৭ ধারার বিধানও করপোরেশন লঙ্ঘন করিয়াছেন। এইভাবে আইনের অমর্য্যাদা রোধ করিবার এক উপায় গবর্মেণ্ট কর্ত্তৃক করপোরেশনের আভ্যন্তরিক ব্যাপারে হস্তক্ষেপ। কিন্তু করপোরেশন যথাযথ আইনের বিধানানুযায়ী নিজ কর্ত্তব্য মানিয়া চলেন, সরকার ইহাই দেখিতে চান বলিয়া এবং করপোরেশনের আইনানুগত কার্য্য পরিচালনা ব্যবস্থার উপর সরকারের হস্তক্ষেপের অভিলাষ নাই বলিয়া সরকার বর্ত্তমানে গ্রেট বৃটেনে মিউনিসিপ্যালিটি ও করপোরেশন প্রভৃতির দোষ ত্রুটি বা অন্যায় আচরণ সংশোধন করিবার জন্য যে ব্যবস্থা অবলম্বিত হইয়া থাকে—এবং ভারতের বিভিন্ন প্রদেশেও যে ধরণের ব্যবস্থা অবলম্বিত হইতেছে, ঐরূপ ব্যবস্থার আশ্রয়-গ্রহণই সঙ্গত বলিয়া বিবেচনা করিয়াছেন।

এই বিল আইনে পরিণত হইলে করপোরেশনের সদস্যগণ কোন কর্ত্তব্যের ত্রুটী বা আইনের অমর্য্যাদার জন্য করপোরেশনের কোন ক্ষতি হইলে সেই ক্ষতি পূরণ করিতে বাধ্য থাকিবেন।

এই প্রস্তাবিত আইন সম্বন্ধে বাংলা ও ইংরেজী প্রায় সমস্ত দেশী পত্রিকাতেই তীব্র প্রতিবাদ প্রকাশিত হইয়াছে, আমাদেরও অনেকগুলি আপত্তি আছে। কিন্তু এই বিষয়ে যথাযথ আলোচনা করিতে হইলে অনেক কথা বলিতে হয়। বর্ত্তমানে আমাদের এইরূপ আলোচনা করিবার সময় এবং স্থান নাই বলিয়া সংক্ষেপে আমাদের বক্তব্য লিপিবদ্ধ করিব। ভবিষ্যতে এই বিষয়ের উপযুক্ত আলোচনা করা হইবে।

প্রথমে রাজনৈতিক অপরাধের কথাই ধরা যাক্। প্রস্তাবিত আইন কার্য্যে পরিণত হইলে শুধু যে এই আইন পাশ হইবার পরে যাহারা রাজনৈতিক অপরাধে দণ্ডিত হইবে তাহারাই কলিকাতা করপোরেশনের কর্ম্ম হইতে চ্যুত হইবে তাহাই নহে, ১৯৩০ সনের ১লা এপ্রিলের পর যাহারা আইন অমান্য আন্দোলন সম্পর্কে বা অন্য কোন রাজনৈতিক অপরাধে কারারুদ্ধ হইয়াছে, তাহারাও গবর্মেণ্টের অভিরুচি অনুযায়ী কার্য্য হইতে চ্যুত হইতে পারিবে এবং কর্ম্মে বহাল হইবে না। বলা বাহুল্য এক রাজনৈতিক অপরাধী ভিন্ন অন্য কোন অপরাধীর নিয়োগ সম্বন্ধীয় কোন ব্যবস্থা এই আইনের খসড়ায় নাই। আইন অমান্য আন্দোলন সম্পর্কে দণ্ডিত ব্যক্তিরা কোনও নৈতিক অপরাধ করিয়াছে কিনা এ-প্রশ্নের বিস্তারিত আলোচনা না করিয়া শুধু এই কথা বলিলেই যথেষ্ট হইবে, যে, তথাকথিত রাজনৈতিক অপরাধ একটা কৃত্রিম বা টেকনিক্যাল অপরাধ মাত্র হইতে পারে। অল্পকালের মধ্যে এইরূপ অপরাধের সংজ্ঞা ও সংখ্যার পরিবর্ত্তন হইতেছে। দৃষ্টান্ত স্বরূপ 'পিকেটিং'-এর উল্লেখ করা যাইতে পারে। লর্ড আরউইনের আমলে শান্তিপূর্ণ পিকেটিং অপরাধ ছিল না, বর্ত্তমানে উহা অপরাধ। এ দেশে এমন সব কার্য্যকলাপ রাজনৈতিক অপরাধ বলিয়া গণ্য হইয়া থাকে যাহা ইংলণ্ডে বা অন্য কোন স্বাধীনদেশে প্রশংসার্হ কাজ বলিয়াই বিবেচিত হইয়া থাকে। এইরূপ অপরাধের জন্য কাহারও জীবিকা উপার্জ্জনের পথ বন্ধ হইবে ইহা ন্যায়সঙ্গত নহে।

কিন্তু নৈতিক অপরাধের প্রশ্ন না তুলিলেও শুধু কারাদণ্ডে দণ্ডিত হইয়াছে বলিয়াই কাহাকেও কর্ম্মচ্যুত করিবার বিপক্ষে অন্ততঃ একটি যুক্তিযুক্ত আপত্তি আছে। আইন অমান্য আন্দোলন সম্পর্কে যাঁহারা শাস্তি পাইয়াছেন তাঁহাদের প্রায় কেহই আদালতের বিচারে যোগদান করেন নাই। ইহাদের শাস্তি সম্পূর্ণ একতরফা অভিযোগের ফলে হইয়াছে। ইচ্ছা এবং চেষ্টা করিলে ইহাদের

অনেকেই নিজেদিগকে নির্দ্দোষ প্রমাণ করিতে পারিতেন। এই অবস্থায় আইন অমান্ত আন্দোলনের জন্ত দণ্ডিত হইয়াছে বলিয়া কাহাকেও জীবিকা হইতে বঞ্চিত করিলে সুবিচার হইবে না। ইহা ছাড়া আর একটি কথাও আছে। এই আইনে বলা হইয়াছে, যে ব্যক্তি ছয় মাস বা অধিক কালের জন্ত বিনাশ্রমে কারাদণ্ডে দণ্ডিত হইয়াছে বা যে-কোন কালের জন্ত সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত হইয়াছে, সে-ই চাকরী হইতে বরখাস্ত হইবে। সশ্রম ও বিনাশ্রমে কারাদণ্ডে দণ্ডিত ব্যক্তিদের জন্ত ব্যবস্থার এইরূপ তারতম্য করিবার ফলে সুবিচার হইবে বলিয়া আমাদের মনে হয় না। আইন অমান্ত আন্দোলনে যোগদানের জন্ত যাহারা শাস্তি পাইয়াছে, তাহাদের শাস্তি সর্ব্বত্র সমান হয় নাই। বিচারকের অভিরুচি মত একই অপরাধে বিভিন্ন ব্যক্তির বিভিন্নরূপ শাস্তি হইয়াছে। সুতরাং একই অপরাধে অপরাধী দুই ব্যক্তির মধ্যে একজন কর্ম্মচ্যুত হইবে, আর একজন কর্ম্মে বহাল থাকিবে, নূতন মিউনিসিপ্যাল আইন অনুযায়ী এরূপ ঘটনা ঘটা একেবারে অসম্ভব নহে।

অবশ্ত গবর্ন্মেণ্ট ইচ্ছা করিলে যে-কোন ব্যক্তিকে এই নূতন আইনের ফলভোগ করা হইতে অব্যাহতি দিতে পারিবেন। কিন্তু ইহার দ্বারা কর্ম্মচারী নিয়োগ ব্যাপারে করপোরেশনকে যে-ভাবে পূর্ণক্ষমতা হইতে বঞ্চিত করা হইবে, এবং গবর্ন্মেণ্টকে করপোরেশনের আভ্যন্তরিক ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করিবার যে সুযোগ দেওয়া হইবে, তাহা সম্মানজনক ও সমীচীন নহে।

এখন আর্থিক ব্যবস্থার কথা বলিব। এই আইনের দ্বারা করপোরেশনের আর্থিক ব্যবস্থায় গবর্ন্মেণ্ট নিযুক্ত অডিটরকে প্রায় সর্ব্বেসর্ব্বা ক্ষমতা দেওয়া হইয়াছে, এবং আর্থিক ব্যাপারে এই ক্ষমতা প্রদানের ফলে তাঁহাকেই প্রকৃত প্রস্তাবে করপোরেশনের প্রভু করিয়া দেওয়া হইয়াছে। এই আইন পাশ হইয়া গেলে, গবর্ন্মেণ্ট নিযুক্ত অডিটর যে কোন ব্যয়কে বে-আইনী বলিয়া নামঞ্জুর করিতে পারিবেন, এবং এরূপ বে-আইনী ব্যয়ের দ্বারা কোন লোকসান হইয়াছে মনে করিলে করপোরেশনের যে-কোন বা সকল কর্ম্মচারী ও কৌন্সিলরকে দায়ী করিয়া তাঁহাদের নিকট হইতে ব্যক্তিগতভাবে ক্ষতিপূরণ আদায় করিতে পারিবেন।

এই আইন পাশ হইয়া গেলে করপোরেশনের কোন কর্ম্মচারী বা করপোরেশনের সহিত সংশ্লিষ্ট কোন ব্যক্তি ক্ষতিপূরণ দিবার ভয়ে অডিটরের অনুমতি না লইয়া কোন কার্য্যে অগ্রসর হইবে না তাহা বলাই বাহুল্য। ইহাতে করপোরেশনের আর কোন স্বাধীনতা থাকিবে না। ইহার পরও যে গবর্ন্মেণ্ট বলিয়াছেন, করপোরেশনের আভ্যন্তরিক ব্যাপারে ও স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ করিবার উদ্দেশ্ত তাঁহাদের নাই, ইহা তাঁহাদের দয়া বলিতে হইবে।

পরিশেষে গবর্ন্মেণ্টের সাধু উদ্দেশ্ত সম্বন্ধে দুচারিটি কথা বলিয়া আমাদের বক্তব্যের উপসংহার করিব। এই আইনের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে গবর্ন্মেণ্ট যাহা বলিয়াছেন তাহার মধ্যে এই দুইটি কথা আছে,—(১) এই আইনে করপোরেশনের কর্ম্মচারী ও কৌন্সিলরদিগকে ক্ষতিপূরণের জন্য যে ভাবে দায়ী করা হইয়াছে ইংলণ্ডেও এইরূপ ব্যবস্থা আছে; (২) গবর্ন্মেণ্ট এই আইন কলিকাতার করদাতাদের স্বার্থরক্ষা ও করপোরেশনের আর্থিক সুব্যবস্থার জন্যই করিতেছেন।

এ-দুয়ের মধ্যে প্রথম কথাটি যে সর্ব্বৈব অমূলক তাহা ৩রা এপ্রিল তারিখের 'লিবার্টি' পত্রিকার সম্পাদকীয় স্তম্ভে প্রদর্শিত হইয়াছে। 'লিবার্টি' পত্রিকা লিখিয়াছেন,

"We challenge the Government to find 'any machinery for charges and surcharges' in the Municipal Corporation Act, 1882." [of the U. K.]

গবর্ন্মেণ্ট ইহার কি উত্তর দেন তাহা দেখিবার জন্য আমরা ব্যগ্র রহিলাম।

দ্বিতীয় উক্তিটির সম্বন্ধে অনেক কথা বলিবার আছে, কিন্তু আপাততঃ এইটুকু বলিলেই বোধ করি যথেষ্ট হইবে যে, কলিকাতার করদাতাদের স্বার্থরক্ষার চিন্তা বৎসর কুড়ি পূর্ব্বে যখন পানীয় জল সরবরাহের নামে লক্ষ লক্ষ টাকার অপব্যয় হয় তখন উঠে নাই, ইহার পর আবার যখন এই ভুলের উপর আর একটি ভুল করিয়া 'মুর-বেটম্যান স্কিমে'র উপর লক্ষ লক্ষ টাকা অপব্যয় করা হয় তখন উঠে নাই, ওয়াটগঞ্জ ও মল্লিকঘাটের জন্ত ইলেকট্রিসিটি উৎপাদনের নিমিত্ত যখন বহুলক্ষ টাকা ব্যয়ে কল বসান হয় তখন উঠে নাই, বিদ্যাধরী খনন করিবার নামে যখন লক্ষ লক্ষ টাকা জলে ফেলিয়া দেওয়া হয় তখনও উঠে নাই, উঠিয়াছে শুধু তখন—যখন দেশীয় করপোরেশন কলিকাতার উন্নতি ও করপোরেশনের ব্যয়সঙ্কোচের জন্ত চেষ্টা আরম্ভ করিয়াছে।

এই সকল কারণে মনে হয় নূতন আইনটিকে কলিকাতা মিউনিসিপাল আইন সংশোধক আইন নাম না দিয়া দেশীয় করপোরেশন দমন আইন নাম দিলেই সঙ্গত হইত।

১২০।২ আপার সার্কুলার রোড, কলিকাতা, প্রবাসী প্রেস হইতে শ্রীমাণিকচন্দ্র দাস কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

দিবা-স্বপ্ন
শ্রীকনু দেশাই

প্রবাসী প্রেস, কলিকাতা

"সত্যম্ শিবম্ সুন্দরম্"

"নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ"

৩৩শ ভাগ ১ম খণ্ড | জ্যৈষ্ঠ, ১৩৪০ | ২য় সংখ্যা

অতীত ও ভবিষ্যৎ

শ্রীরমাপ্রসাদ চন্দ

প্রাচীন কাল হইতে ইতিহাস অর্থাৎ হিষ্টরি সাহিত্যের একটি শাখা বলিয়া গণ্য হইয়া আসিতেছিল। উনবিংশ শতাব্দে ইতিহাসকে বিজ্ঞানের শাখায় পরিণত করিবার সূত্রপাত হয়; অর্থাৎ ঐতিহাসিক ঘটনা-প্রবাহের মধ্যে অলঙ্ঘনীয় নীতির ক্রিয়া আবিষ্কার করিবার চেষ্টা আরম্ভ হয়। বর্ত্তমান বিংশ শতাব্দে ইতিহাস কার্য্যকরী বিজ্ঞানে (applied science) পরিণত হইতে চলিয়াছে। ইতিহাসকে এই মর্য্যাদা দান করিয়াছে কম্যুনিজম্ (communism) বা সমাজগত ধনাধিকার-বিধির প্রধান প্রবর্ত্তক কার্ল মার্কস্ (Karl Marx) এবং তাঁহার শিষ্যগণ।

জর্ম্মণ দার্শনিক হেগেল পুরাবৃত্তবিজ্ঞান (Philosophy of History) নামক গ্রন্থে প্রচার করিয়াছিলেন, মানব-ইতিহাসের ধারা এবোলিউশন্ (evolution) বা পরিণাম-নীতির দ্বারা শাসিত হইতেছে। হেগেলের মতে মানবের ইতিহাসে ধীরে ধীরে স্বাধীনতার ভাবের ক্রম-বিকাশ চলিতেছে; নিত্যনিয়ত প্রবর্দ্ধমান স্বাধীনতার ভাব মানব-সমাজের ইতিহাসকে নিয়মিত করিতেছে। হেগেলের শিষ্য কার্ল মার্কস্ গুরুর পদানুসরণ করিয়া ইতিহাসে এবোলিউশন্ নীতির কার্য্য স্বীকার করিয়াছিলেন, কিন্তু তিনি ইতিহাসের ঘটনা-ধারার অন্তর্নিহিত কোনও ভাবধারার প্রভাব স্বীকার করিতে প্রস্তুত ছিলেন না। মার্কস্ প্রচার করিয়া গিয়াছেন, পরিবর্ত্তনশীল ধনোৎপাদনের এবং ধনবিভাগের বিধি মানবের ইতিহাসের ক্ষেত্রে এবোলিউশন নীতির আশ্রয়। কালের গতির সঙ্গে ধনোৎপাদন এবং ধনবিভাগ-বিধি ক্রমশঃ উৎকর্ষ লাভ করিতেছে। ইউরোপের বিভিন্ন রাজ্যে এক সময় ভৌমিকতন্ত্র শাসন (feudalism) প্রচলিত ছিল। বড় বড় ভৌমিক বা জমিদারগণ ধনবিভাগ নিয়মিত করিতেন, এবং রায়তকে কৃষিলব্ধ ধনের সামান্য অংশ রাখিতে দিয়া, বেশি অংশ আত্মসাৎ করিতেন। তারপর বাণিজ্যের এবং কলকারখানার সহিত সম্পর্কিত শিল্পের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে বুর্জ্জোয়া (bourgeois) বা ধনিশ্রেণীর অভ্যুদয় হইল, এবং বুর্জ্জোয়াগণ ক্রমে ভৌমিকগণের হস্ত হইতে প্রভুত্ব কাড়িয়া লইল। ইউরোপের ভৌমিকগণকে বলা যায় পাশ্চাত্য ক্ষত্রিয়, বুর্জ্জোয়াগণ পাশ্চাত্য বৈশ্য, এবং যে-সকল শ্রমিক (proletariat) দৈনিক মজুরীর দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করে সেই মজুরগণ পাশ্চাত্য শূদ্র। পাশ্চাত্য বৈশ্য বা বুর্জ্জোয়াগণ মূলধনে ধনী (capitalist) হইয়া সাম্রাজ্য-প্রিয় হইয়া উঠিয়াছে। এইবার পাশ্চাত্য শূদ্র বা মজুর-গণের পাশ্চাত্য বৈশ্যগণের হস্ত হইতে শাসনদণ্ড কাড়িয়া

লইবার সময় আসিয়াছে। শ্রমিকগণ এখন নিজেদের প্রভুত্ব প্রতিষ্ঠিত করিয়া (dictatorship of the proletariat) দেশমাত্রেরই ধনসম্পত্তি সমাজের হস্তে অর্পণ করিয়া আর্থিক বিষয়ে সম্পূর্ণ সাম্য স্থাপন করিতে সচেষ্ট হইবেন। কার্ল মার্কসের মতে মানব সমাজের ভাগ্য-চক্রনিয়ামক অনতিক্রমণীয় নীতির শাসনে শাসনদণ্ড মজুর-গণের হস্তগত হওয়া এবং ধনসম্পত্তি সমাজের হস্তগত হওয়া অবশ্যম্ভাবী। এই অবশ্যম্ভাবী পরিবর্ত্তন যত শীঘ্র সাধিত হয় ততই ভাল। বুর্জ্জোয়াগণ নিশ্চয়ই স্বেচ্ছায় আত্মসমর্পণ করিবেন না। সুতরাং বুর্জ্জোয়া এবং মজুর এই দুই শ্রেণীর মধ্যে যুদ্ধ আরম্ভ হইবে, বিপ্লব ঘটিবে, রক্তারক্তি চলিবে। ১৮৪৮ সালে কার্ল মার্কস্ যে কম্যুনিষ্ট ঘোষণাপত্র (Communist manifesto) প্রচার করিয়াছিলেন। তাহাতে তিনি তাঁহার ধনবিভাগানুগত ইতিহাসের ব্যাখ্যা (materialistic interpretation of history) নিবদ্ধ করিয়াছিলেন, এবং উপসংহারে লিখিয়াছিলেন—

"The Communists disdain to conceal their views and aims. They openly declare that their ends can be attained only by the forcible overthrow of existing social conditions. Let ruling classes tremble at a communist revolution. The proletarians have nothing to lose but their chains. They have a world to win. Workers of all lands unite."

"কম্যুনিষ্টগণ তাঁহাদের মতামত এবং উদ্দেশ্য গোপন করা ঘৃণাজনক মনে করে। তাহারা প্রকাশ্যভাবে ঘোষণা করে, বর্ত্তমান সামাজিক ব্যবস্থা বলপূর্ব্বক ধ্বংস না করিলে তাহাদের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইবে না। কম্যুনিষ্ট-বিপ্লবের ভয়ে প্রভুত্বসম্পন্ন জনগণ কম্পিত হউক। মজুরগণকে দাসত্ব-শৃঙ্খল ভিন্ন আর কিছুই হারাইতে হইবে না। তাহাদিগকে পৃথিবী জয় করিতে হইবে। সমস্ত পৃথিবীর মজুরগণ একত্র হও।"

এই ঘোষণাপত্র প্রচারের পর কার্ল মার্কস্ লণ্ডনে আশ্রয় লইয়া বহু দুঃখকষ্ট সহ্য করিয়া, ইতিহাস এবং ধন-বিজ্ঞান সম্বন্ধে বহু গবেষণা করিয়া, অনেক গ্রন্থ প্রচার করিয়াছিলেন, এবং তাঁহার উপদেশ কার্য্যে পরিণত করিবার জন্য বিশ্ব-শ্রমিক-সঙ্ঘও প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন। কার্ল মার্ক্স এবং তাঁহার শিষ্যগণ ধর্ম্মপ্রচারকের একাগ্রতা এবং উৎসাহ সহকারে কম্যুনিজমের প্রচার আরম্ভ করিয়া-ছিলেন, এবং এক সময় খ্রীষ্টধর্ম্ম এবং ইস্লাম যেরূপ দ্রুত বিস্তৃত হইয়া পড়িয়াছিল, কম্যুনিজমের বিস্তারও তেমনি দ্রুতবেগে ঘটিতেছিল। সুতরাং দেখা যাইবে, কার্ল মার্কস্ ধনী এবং নির্ধনের মধ্যে যে যুদ্ধ ঘোষণা করিয়া-ছিলেন সেই যুদ্ধের সমর্থনে তিনি ওকালতি করেন নাই, ইতিহাসের ভিত্তির উপর ভর করিয়া তিনি বলিতেছিলেন, ধনী এবং নির্ধন শ্রমিকের মধ্যে যুদ্ধ এখন অনিবার্য্য, এবং এই যুদ্ধে নির্ধনের জয়লাভ এবং রাজ্যলাভ অবশ্যম্ভাবী। কার্ল মার্কস্ এবং তাঁহার শিষ্যগণের চেষ্টার ফলে সর্ব্বত্রই কম্যুনিষ্ট দল অভ্যুদিত হইয়াছিল। কিন্তু ব্রিটেন, ফ্রান্স এবং জর্ম্মানির অধিকাংশ কম্যুনিষ্ট রক্তপাত না করিয়া বা বিপ্লব না বাধাইয়া আইনসঙ্গত উপায়ে ক্রমশঃ শ্রমিকের প্রভুত্ব স্থাপন করিতে চেষ্টা করা কর্ত্তব্য বোধ করিয়াছিলেন। এই সকল শান্তিকামী কম্যুনিষ্ট সোশিয়ালিষ্ট নামে পরিচিত।

১৯১৪ সালে মহাযুদ্ধ আরম্ভ হইবার পর শান্তিকামী সোশিয়ালিষ্টগণ অত্যন্ত ভীত হইয়াছিলেন, এবং স্বদেশ-প্রেমের বশে স্বদেশের বুর্জ্জোয়া গবর্ণমেণ্টের পক্ষে যুদ্ধে যোগদান করিয়াছিলেন। কিন্তু গোঁড়া কম্যুনিষ্টগণ তখন প্রচার করিতে আরম্ভ করিলেন, "এইবার মূলধনী সম্প্রদায়ের নিকট হইতে শ্রমিকগণের প্রভুত্ব কাড়িয়া লইবার সুযোগ উপস্থিত হইয়াছে।" তারপর, ১৯১৭ সালের নবেম্বর মাসে, লেনিন্ এবং ট্রট্স্কির নেতৃত্বাধীনে রুষের কম্যুনিষ্টগণ যখন বিশাল রুষ-সাম্রাজ্যের শাসনদণ্ড হস্তগত করিলেন, তখন তাঁহারা ঘোষণা করিলেন, এইবার কার্ল মার্কসের ভবিষ্যদ্বাণী ফলিয়াছে। মহাযুদ্ধের নিবৃত্তির পর সর্ব্বত্রই সোশিয়ালিষ্টগণ প্রভুত্বলাভের চেষ্টা করিতে লাগিলেন। ইটালীর সোশিয়ালিষ্টগণ বলপ্রয়োগ আরম্ভ করিয়াছিলেন; মূলধনীর পক্ষবর্ত্তী ফাসেষ্টগণ মুসোলিনীর নেতৃত্বাধীনে সেই চেষ্টা ব্যর্থ করিয়া ধনীর প্রাধান্য পুনঃ প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন। ইটালীতে, এবং সম্ভবত জর্ম্মণীতে বাধাপ্রাপ্ত হইলেও বর্ত্তমান যুগের যুগধর্ম্ম যে সোশিয়ালিজ্‌ম্ একথা কেহ অস্বীকার করিতে পারে না। সোশিয়ালিজমের প্রবর্ত্তক মহাপুরুষগণ ইতিহাসের ইঙ্গিত অনুসরণ করিয়া এই পন্থা নির্দ্দিষ্ট করিয়া গিয়াছিলেন। সুপ্রসিদ্ধ রুষীয় কম্যুনিষ্ট নায়ক ট্রট্স্কিও ইতিহাসভক্ত এবং ইতিহাস-সেবক। ১৯০৫ সালের পূর্ব্বেই ট্রট্স্কি তাঁহার সুপ্রসিদ্ধ অবিশ্রান্ত বিপ্লববাদ (theory of permanent

revolution) প্রচার করিয়াছিলেন, এবং ভবিষৎ সম্বন্ধে বলিয়াছিলেন, রুষে প্রথমতঃ বুর্জ্জোয়াগণের অনুষ্ঠিত বিপ্লব হইবে, এবং তারপর সোশিয়ালিষ্ট বিপ্লব হইবে। ইতিহাসের স্বরূপ সম্বন্ধে ট্রট্‌স্কি তাঁহার রচিত রুষিয়ার বিপ্লবের ইতিহাসের (The History of the Russian Revolution) মুখবন্ধে লিখিয়াছেন—

"The history of a revolution, like every other history, ought first of all to tell what happened and how. That, however, is little enough. From the very telling it ought to become clear why it happened thus and not otherwise. Events can neither be regarded as a series of adventures, nor strung on the thread of some preconceived moral. They must obey their own laws. The discovery of these laws is the author's task."

"অন্য সকল প্রকার ইতিহাসের মত বিপ্লবের ইতিহাসেও কি ঘটনা ঘটিয়াছিল এবং কেমন করিয়া ঘটিয়াছিল, তাহা প্রথমতঃ বিবৃত করা কর্ত্তব্য। কিন্তু এইরূপ বিবরণের মূল্য খুব কম। বর্ণনার ভঙ্গী হইতেই প্রকাশ পাওয়া উচিত—কেন ঘটনা-বিশেষ ঘটিয়াছিল এবং অন্যরূপ ঘটনা ঘটে নাই। ঐতিহাসিক ঘটনামালা কৌতূহল-উদ্দীপক আখ্যানমালা নহে, অথবা কোনও প্রচলিত সদুপদেশের দৃষ্টান্ত মাত্র নহে। ঐতিহাসিক ঘটনামালা নিয়তির বা নির্দ্দিষ্ট নীতির অনুসরণ করে। এই সকল নীতি আবিষ্কার করা ঐতিহাসিকের কর্ত্তব্য।"

কার্ল মার্কস এবং তাঁহার শিষ্যগণ যে-প্রণালীতে অতীতের ইতিহাসের অনুশীলন করিয়াছেন সমাজ-সংস্কারক মাত্রেরই তাহা অনুকরণীয় এবং সেই রীতিতে ইতিবৃত্ত অনুশীলন করিয়া অতীতের অভিজ্ঞতার সহায়তায় ভবিষ্যতের পন্থা নিরূপণ করা কর্ত্তব্য। কিন্তু তাঁহাদের ইতিবৃত্ত অনুশীলন প্রণালী অসম্পূর্ণ। কম্যুনিষ্টগণের ইতিবৃত্ত-আলোচনা-রীতিকে ধনবিভাগানুগত ইতিহাসের ব্যাখ্যা (the materialistic interpretation of history) বলে ; কিন্তু পেটের ক্ষুধা, ভোগলিপ্সা, এবং তজ্জনিত ধনতৃষ্ণা এবং প্রভুত্বের আকাঙ্ক্ষাই পৃথক মনুষ্যের এবং মনুষ্য-সমাজের সকল কর্ম্ম প্রবর্ত্তিত করে না। পরি-দৃশ্যমান জগৎ ছাড়া চিন্তাশীল মনুষ্যেরা অতীন্দ্রিয় জগতের অস্তিত্বের অনুমান করে, এবং ভূত, ভবিষ্যৎ, বর্ত্তমান এই ত্রিকাল ছাড়া পরকালের আশঙ্কা করে। অতীন্দ্রিয় জগতে এবং পরকালে বিশ্বাস ধর্ম্মের ভিত্তি। ধর্ম্মের ইতিহাসকে বা ধর্ম্মজীবনকে সম্পূর্ণরূপে টাকা-পয়সার জমাখরচে পরিণত করা যায় না। কার্ল মার্কসের অবলম্বিত এবো-লিউশনবাদ অসম্পূর্ণতা দোষেও দুষ্ট। কার্ল মার্কস সামাজিক পরিবর্ত্তনে বাহ্য আর্থিক অবস্থার প্রভাব স্বীকার করিয়াছেন। কিন্তু তাঁহার ইতিবৃত্ত বিজ্ঞানে বংশানুগতির কোন স্থান নাই। শিক্ষাদীক্ষার এবং ধনোপার্জ্জনের সমান সুযোগ থাকিলেও বংশানুগত শক্তির অভাবে সকলে সমান ভাবে শিক্ষিত হইতে এবং সমান অর্থ উপার্জ্জন করিতে পারে না ; এবং সমান ধনের অধিকারী হইয়াও বংশানুগত স্বভাবদোষে অনেকে সেই ধন রাখিয়া খাইতে পারে না। সুতরাং ধর্ম্মবিশ্বাস এবং বংশানুগতি উপেক্ষা করিয়া কেবল ধনোৎপাদন এবং ধনবিভাগের হিসাবে সমাজের ভবিষ্যতের পথ নির্দ্দিষ্ট করিতে গেলে, ভ্রমে পতিত হইবার বিশেষ সম্ভাবনা থাকে। ইউরোপীয় ইতিবৃত্ত বা ইউরোপীয় সমাজসংস্কার আমাদের আলোচ্য বিষয় নহে। যাঁহারা ভারতবর্ষের হিন্দু সমাজের ভবিষ্যৎ নিয়ন্ত্রিত করিতে চাহেন, তাঁহাদের পক্ষে কার্ল মার্কসের ইতিবৃত্ত বিজ্ঞানের অসম্পূর্ণতা স্মরণ রাখিয়া কার্য্যক্ষেত্রে অগ্রসর হওয়া উচিত। মহাযুদ্ধের পর হইতে ভারতবর্ষেও সোশিয়ালিজমের প্রভাব দিন-দিন বৃদ্ধি পাইতেছে। আমার যেন মনে হয়, এ-দেশের নব্যতন্ত্রের সমাজ-সংস্কারকগণ প্রচ্ছন্ন সোশিয়ালিষ্ট। অবশ্য এ-দেশে সোশিয়া-লিজমের অনেক উপকরণ নাই। এ-দেশের মধ্যবিত্তগণ পাশ্চাত্য বুর্জ্জোয়াগণের মত ধনী বা প্রভুত্বশালী নহে ; এবং এ-দেশের শতকরা নিরানব্বই জন শ্রমিকই পরস্পর হইতে বিচ্ছিন্ন। এ-দেশে অবশ্য জমিদার এবং রায়ৎ এই দুই শ্রেণী আছে, কিন্তু এ-দেশের জমিদারগণ ধনে, মানে এবং প্রভাব-প্রতিপত্তিতে পাশ্চাত্য জমিদার-গণের সহিত তুলনীয় নহে। কিন্তু এ-দেশের সর্ব্বাপেক্ষা উৎকট সমস্যা হিন্দুর জাতিভেদ। জাতিভেদ, সোশিয়ালিষ্ট এবং ন্যাশনালিষ্ট উভয়েরই চক্ষুশূল। ন্যাশনালিষ্ট মনে করেন, জাতিভেদ রাষ্ট্রীয় ঐক্যের অন্তরায় ; সোশিয়ালিষ্ট মনে করিতে পারেন, এত প্রকার সামাজিক বৈষম্য থাকিতে শ্রমিকগণের ঐক্যসাধন এবং ধন-বিভাগের সাম্য স্থাপন দুঃসাধ্য। সুতরাং এখন নানা দিক হইতে হিন্দু সমাজ সংস্কারের নানারূপ চেষ্টা চলিতেছে। এই সম্বন্ধে বাংলার বিগত সেন্‌সাসের বা জনগণনার বিবরণে লিখিত হইয়াছে—

'The Hindu Sabha circularized its members calling upon them to withhold details of their caste when asked for it by the census staff; and the professed policy of the Hindu Mission is the same, though the propaganda issued by them suggested that the return should comprise only the three twice-bern *varna* names, any further details of caste being withheld and no person being return-d as Sudra or under a Sudra caste. There is also an association known as Jat Pat Torak Mandal whose professed object is the abolition of caste system altogether." (Pp. 423-24).

যাঁহারা জাতিভেদ-প্রথা ভাঙিতে বা হিন্দুসমাজকে বৈদিক যুগের চতুর্ব্বর্ণের আদর্শে ঢালিয়া সাজিতে চাহেন তাঁহাদের প্রথমত কার্ল মার্কস প্রমুখ পাশ্চাত্য মহারথগণের দৃষ্টান্ত অনুসরণ করিয়া এবং বৈজ্ঞানিক বিচারপ্রণালী অবলম্বন করিয়া জাতিভেদের ইতিহাস অনুশীলন করিতে প্রবৃত্ত হওয়া কর্ত্তব্য। জাতিভেদের ইতিহাসের ধারা অনুসরণ করিতে পারিলে তাঁহারা জানিতে পারিবেন, নিয়তি এই ধারাকে কোন্ দিকে চালাইতেছে; এই গতির কতটা পরিবর্ত্তন সম্ভব; এবং সম্ভাবিত পরিবর্ত্তন সাধন করিতে হইলে কি উপায় অবলম্বন করা কর্ত্তব্য। দৃষ্টান্তস্বরূপ জাতিভেদের গোড়ার ইতিহাসের দুই একটি কথা এই প্রস্তাবে সংক্ষেপে আলোচনা করিব।

চতুর্বর্ণের প্রথম পরিচয় পাওয়া যায় ঋগ্বেদের দশম মণ্ডলের একটি সূক্তে বা কবিতায়। বৈদিক যুগে আর্য্যাবর্ত্তের উত্তর-পশ্চিম ভাগে জাতিভেদের উৎপত্তি-সম্বন্ধে একটি ভ্রান্তমত ইদানীং বিশেষ প্রচারলাভ করিয়াছে। এই মতবাদীরা বলেন, বৈদিক সংস্কৃত-ভাষাভাষী একদল আর্য্য ভারতবর্ষে প্রবেশ করিয়া, আদিম অনার্য্য অধিবাসিগণকে পরাজিত করিয়া, এ-দেশে বাস করিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন। এই আর্য্যবিজেতা-গণের পদানত পদাশ্রিত অনার্য্যগণ শূদ্রবর্ণরূপে সমাজে স্থানলাভ করিয়াছিল; এবং তারপর কর্ম্মবিভাগ-অনুসারে আর্য্যসমাজে ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য এই তিনটি দ্বিজবর্ণের উৎপত্তি হইয়াছিল। এই মত স্কুলপাঠ্য ইতিহাসে স্থানলাভ করায় শিক্ষিত সমাজে স্বতঃসিদ্ধ সিদ্ধান্তের মত গণ্য হইয়া আসিতেছে। এই মতের মূলে বিশেষ ঐতিহাসিক প্রমাণ নাই; ইহা একটি দুর্ব্বল অনুমান মাত্র।

বিজেতা এবং বিজিতগণের মধ্যে আর্য্য এবং শূদ্র, অথবা প্রভু এবং দাস, এই প্রকার জাতিভেদের অভ্যুদয় পৃথিবীর সর্ব্বত্রই দেখা যায়। ভারতবর্ষ ছাড়া আরও অনেক দেশে আর্য্যগণ যাইয়া অনার্য্য অধিবাসীদিগকে পদাশ্রিত করিয়া বাস করিয়াছে। কিন্তু আর কোথাও ত আর্য্য ঔপনিবেশিকদিগের মধ্যে ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয়-বৈশ্য এইরূপ চিরস্থায়ী ত্রিবর্ণভেদ দেখা যায় না। ইরাণ ভিন্ন আর কোনও আর্য্যদেশে কোনও কালে ব্রাহ্মণবর্ণের মত স্বতন্ত্র পুরোহিত জাতিও দেখা যায় না। সুতরাং ত্রিবর্ণভেদের উৎপত্তি সম্বন্ধে প্রচলিত মত উপমারহিত, সুতরাং ভিত্তিহীন বলিতে হইবে। আর্য্য-শূদ্র বা প্রভু-দাস ভেদ অন্য দেশে উৎপন্ন হইয়া থাকিলেও, তাহাও আর কোথাও চিরস্থায়ী হয় নাই, রাষ্ট্রবিপ্লবের ফলে নষ্ট হইয়া গিয়াছে। ভারতবর্ষে অনেক দিন শূদ্র বর্ণের দাসত্ব ঘুচিয়াছে; নন্দ মহাপদ্মের আমল হইতে (খৃষ্টপূর্ব্ব চতুর্থ শতাব্দের আরম্ভ হইতে) নরপতিরা প্রায়ই শূদ্র-জাতীয় এই কথাও পুরাণে আছে; তথাপি এ-দেশে দ্বিজ-শূদ্রভেদ ঘোচে নাই। সুতরাং জাতিভেদের উৎপত্তি সম্বন্ধে প্রচলিত মত ভ্রমশূন্য মনে করা যাইতে পারে না।

আমার অনুমান হয়, বর্ণভেদের মূল আর্য্য-শূদ্র ভেদ নহে, ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয় ভেদ। ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয় ভেদের এক কারণ বোধ হয় আকৃতিগত ভেদ (racial difference)। আদিম ব্রাহ্মণ ছিল গৌরবর্ণ এবং কপিল-পিঙ্গল কেশ-সম্পন্ন; এবং আদিম ক্ষত্রিয় ছিল বোধ হয় শ্যামবর্ণ। আদিম ব্রাহ্মণের এবং ক্ষত্রিয়ের আকারগত ভেদ সম্বন্ধে প্রমাণ বেশি নাই। কিন্তু আদৌ ব্রাহ্মণের এবং ক্ষত্রিয়ের কৃষ্টি (culture) ধর্ম্ম এবং আচার যে স্বতন্ত্র ছিল তাহার যথেষ্ট প্রমাণ আছে। বৃহদারণ্যক উপনিষদে কথিত হইয়াছে (২।১।১৫) যখন গার্গ্য-বালাকি কাশীরাজ অজাতশত্রুর নিকট ব্রহ্ম কি জানিতে চাহিলেন, তখন অজাতশত্রু প্রথম বলিলেন, "ব্রাহ্মণের পক্ষে ক্ষত্রিয়ের নিকট উপদেশের জন্য আসা রীতিবিরুদ্ধ"; এবং তারপর ব্রহ্মতত্ত্ব বলিতে লাগিলেন। কৌষিতকী উপনিষদেও (৪। ১।১৯) অজাতশত্রু-বালাকি-সংবাদ আছে। পঞ্চালরাজ প্রবাহণ জৈবলি, আরুণির

পুত্র শ্বেতকেতু, এবং গৌতম আরুণি এই তিন জনের প্রসিদ্ধ সংবাদ শুক্লযজুর্বেদের বাজসনেয় শাখার অন্তর্গত বৃহদারণ্যক-উপনিষদে (৬।২), এবং সামবেদের অন্তর্গত ছান্দোগ্য উপনিষদে (৫।৩-.০) পাওয়া যায়। রাজা প্রবাহণ শ্বেতকেতুকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন—"তুমি কি দেবযান এবং পিতৃযান জান? কোন্ কর্ম্ম করিলে লোকে দেবযানে যাইতে পারে এবং কোন্ কর্ম্ম করিলে পিতৃযানে যাইতে পারে তাহা কি তুমি জান।"

শ্বেতকেতু উত্তর করিল, "আমি এই দুই পথের এক পথও জানি না।"

রাজা তখন শ্বেতকেতুকে তাহার কাছে থাকিতে অনুরোধ করিলেন। বালক সেই অনুরোধ অবহেলা করিয়া পিতা আরুণির নিকট গিয়া সকল কথা বলিলেন।

আরুণি বলিলেন, "আমি এ-সকল তত্ত্ব জানি না। চল আমরা দুইজনে গিয়া পঞ্চাল রাজের শিষ্য হই।"

•শ্বেতকেতু রাজার প্রশ্নগুলি বেয়াদবি মনে করিয়াছিলেন, এবং পিতার নিকট রাজাকে "রাজন্যবন্ধু" অর্থাৎ ছোট ক্ষত্রিয় বলিয়া গালি দিয়াছিলেন। সুতরাং উদ্ধত ব্রাহ্মণ-বালক আর রাজার নিকট গেলেন না; কিন্তু পিতা আরুণি গিয়া পঞ্চালরাজের নিকট যে পদার্থ ভূমা, অনন্ত এবং অসীম (অর্থাৎ ব্রহ্ম বা পরমাত্মা) তাহার সম্বন্ধে উপদেশ চাহিলেন। রাজা বলিলেন—"এই তত্ত্ব এতদিন কোন ব্রাহ্মণের জানা ছিল না এ-কথা যেমন সত্য, তুমি এবং তোমার পূর্ব্বপুরুষগণ আমাদিগের কোন অনিষ্ট না কর এ-কথাও তেমনি সত্য হউক। কিন্তু আমি তোমাকে এই তত্ত্ব বলিব, কারণ তুমি যখন এইরূপ অনুরোধ কর তখন কে তোমার অনুরোধ রক্ষা না করিয়া পারে।"

ছান্দোগ্য উপনিষদ (৫।৩ ৬-৭) অনুসারে পঞ্চাল-রাজ আরুণিকে এই কথা বলিয়াছিলেন—"হে গৌতম, তুমি আমাকে যে তত্ত্ব জিজ্ঞাসা করিয়াছ, তোমার পূর্ব্বে আর কোন ব্রাহ্মণ এই তত্ত্বজ্ঞান লাভ করে নাই; এবং এই নিমিত্তই সকল দেশে ক্ষত্রিয়ের আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে।"

ছান্দোগ্য উপনিষদের আর একটি উপাখ্যানে (৫।১১) কথিত হইয়াছে, প্রাচীনশাল উপমন্যব, সত্যযজ্ঞ পৌলুষি, ইন্দ্রদ্যুম্ন ভাল্লবেয় জন, শার্করাক্ষ্য এবং বুড়িল আশ্বতরাশি এই পাঁচ জন শ্রোত্রিয় ব্রাহ্মণ আত্মা এবং ব্রহ্ম কি জানিবার জন্য উদ্দালক আরুণির নিকট গিয়াছিলেন। উদ্দালক আরুণি স্বয়ং কোন উপদেশ না দিয়া এই পাঁচ জন জিজ্ঞাসুকে লইয়া কেকয়গণের রাজা অশ্বপতির শরণাগত হইয়াছিলেন, এবং তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, "পরমাত্মা কি তাহা আপনি আমাদিগকে বলুন।"

এখন বিচার্য্য, উপনিষদের এই সকল সংবাদ ইতিহাস বা হিষ্টরি বলিয়া গণ্য হইতে পারে কি-না। উপনিষদের এই সকল সংবাদে সূচিত ঘটনা যে প্রকৃতপ্রস্তাবে ঘটিয়াছিল তাহার অনুকূলে স্বতন্ত্র সমসময়ে লিখিত প্রমাণ না পাওয়া পর্য্যন্ত এই সকল সংবাদের ঐতিহাসিকতা সম্পূর্ণরূপে স্বীকার করা যায় না। কিন্তু বেদের বিভিন্ন শাখায় যখন এক জাতীয় এতগুলি সংবাদ পাওয়া যায় তখন স্বীকার করিতে হইবে, উপনিষদ-রচনার সময় ঠিক এই সকল ঘটনা না ঘটিয়া থাকিলেও, এই জাতীয় ঘটনা, অর্থাৎ ব্রহ্মতত্ত্ব-জিজ্ঞাসু হইয়া ব্রাহ্মণগণের ক্ষত্রিয় রাজাদিগের শিষ্যত্ব গ্রহণ করা, সচরাচর ঘটিত। প্রাচীন তিনখানি উপনিষদের অন্তর্গত এই সকল সংবাদ পাঠ করিয়া অনেক আধুনিক পণ্ডিত অনুমান করিয়াছেন, ব্রহ্মবিদ্যা আদৌ ক্ষত্রিয়গণের মধ্যে উৎপন্ন হইয়া ব্রাহ্মণ-সমাজে প্রচারলাভ করিয়াছিল। সকল পণ্ডিত এই মত স্বীকার করেন না, এবং কেহ কেহ বলেন, ঋগ্বেদ সংহিতায়ও যখন ব্রহ্মজ্ঞানের আভাস পাওয়া যায় তখন ব্রহ্মবিদ্যাকে ক্ষত্রিয়ের আবিষ্কার বলা যাইতে পারে না। এই কথার উত্তরে বলা যাইতে পারে, কোন কোন ঋঙমন্ত্রে যে ব্রহ্মবিদ্যার পূর্ব্বাভাস আছে তাহাও ক্ষত্রিয় প্রভাবের ফল হইতে পারে। বৃহদারণ্যক এবং ছান্দোগ্য উপনিষদের পঞ্চালরাজ এবং আরুণি সংবাদে, যেখানে স্পষ্টাক্ষরে বলা হইয়াছে ব্রহ্মবিদ্যা আদৌ ব্রাহ্মণের অজ্ঞাত এবং ক্ষত্রিয়ের সম্পত্তি ছিল, সেইখানে দেবযান এবং পিতৃযান প্রসঙ্গে জন্মান্তরবাদ ও বৈদিক সাহিত্যে সর্ব্বপ্রথম পরিষ্কার ভাষায় ব্যাখ্যাত হইয়াছে। যদি

উপনিষদের সংবাদের কিছুমাত্র ঐতিহাসিকতা স্বীকার করিতে হয়, তবে এ-কথা স্বীকার করিতে হইবে জন্মান্তরবাদও ক্ষত্রিয়ের সৃষ্টি। বেদের কর্ম্মকাণ্ডের লক্ষ্য যজ্ঞানুষ্ঠান করিয়া স্বর্গে অমরত্বলাভ। তারপর ক্রমশঃ পুণ্যক্ষয়ে স্বর্গে পুনর্মৃত্যু, এবং পুনর্মৃত্যুর পর মর্ত্ত্যে পুনর্জ্জন্মের বিশ্বাসের অভ্যুদয় দেখা যায়। সেমিটিক জাতির ধর্ম্মে স্বর্গলাভের বিশ্বাস প্রবল; কিন্তু সেই বিশ্বাস হইতে পুনর্মৃত্যুতে এবং পুনর্জ্জন্মে বিশ্বাসের উৎপত্তি দেখা যায় না। সুতরাং স্বর্গলোকে বিশ্বাসের সহিত জন্মান্তরে বিশ্বাসের যে আবশ্যক কোন সম্বন্ধ আছে তাহা স্বীকার করা যায় না; এবং উপনিষদের প্রমাণে ভর করিয়া বলা যাইতে পারে, স্বর্গ যাহার লক্ষ্য সেই কর্ম্মকাণ্ড, এবং পুনর্জ্জন্ম হইতে মুক্তি যাহার লক্ষ্য সেই জ্ঞানকাণ্ড যথাক্রমে ব্রাহ্মণ এবং ক্ষত্রিয় সমাজে স্বতন্ত্রভাবে উৎপন্ন হইয়াছিল। আমি অন্যত্র দেখাইয়াছি, আদৌ ক্ষত্রিয়ের এবং ব্রাহ্মণের আচার-ব্যবহারে আরও অনেক প্রভেদ ছিল।* ব্রাহ্মণের এবং ক্ষত্রিয়ের আদিম ধর্ম্মভেদ এবং আচারভেদ হিসাব করিলে অনুমান হয়, দুইটি সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র উন্নত সভ্যতার উত্তরাধিকারী দুইটি মানব সঙ্ঘ ঘটনাক্রমে পরস্পরের সম্মুখীন হইবার পর, একদল যাজনের অধিকার এবং আর এক দল শাসনের অধিকার লইয়া নির্ব্বিবাদে একত্র বাস করিতে সম্মত হওয়ায় ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয় ভেদ স্থাপিত হইয়াছিল। উভয় শ্রেণীর মধ্যে নিজস্ব মৌলিক সভ্যতার অভিমান থাকায় উভয় শ্রেণী আপন স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করিতে উৎসুক ছিলেন। এইরূপে সমাজের উচ্চ স্তরে বৃত্তিভেদে জাতিভেদ প্রতিষ্ঠিত হইলে এই ভেদ-প্রথা নিম্নস্তরে বিস্তারলাভ করিয়া বৈশ্য এবং শূদ্র বর্ণের সৃষ্টি করিয়াছিল।

আর্য্যাবর্ত্তে বৈশ্য এবং শূদ্র ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয়ের স্পর্শযোগ্য বা আচরণীয়। তার পর জিজ্ঞাস্য, অস্পৃশ্য বা অনাচরণীয় জাতির মূল কি? ঋগ্বেদের একটি মন্ত্রে (১০।৫৩।৫) অগ্নি বলিতেছেন—

পঞ্চজনা মম হোত্রং জুষন্তাম্

"পঞ্চজন আমাকে যজ্ঞের হোতারূপে লাভ করিয়া প্রীত হউক।"

যাস্কের 'নিরুক্তে' এবং শৌনকের 'বৃহদ্দেবতা'য় "পঞ্চজন" পদের নানারূপ অর্থ দেওয়া হইয়াছে। শৌনক লিখিয়াছেন (৭।৬৯)—

নিষাদ পঞ্চমান বর্ণান্ মন্যতে শাকটায়নঃ।

"শাকটায়ন মনে করেন 'পঞ্চজন' অর্থ চতুর্বর্ণ (ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য শূদ্র) এবং পঞ্চম বর্ণ নিষাদ।"

যাস্ক (৩.৮) লিখিয়াছেন এই মত ঔপমন্যবের। কিন্তু নিরুক্তের অপর অংশে (১০। ৩।৫-৭) যাস্ক ঋগ্বেদের 'পঞ্চকৃষ্টি' শব্দের ব্যাখ্যা করিয়াছেন, "পঞ্চমনুষ্য জাতি" অর্থাৎ চতুর্বর্ণ এবং পঞ্চম নিষদ। মনুসংহিতায় বা অন্য কোন ধর্ম্মশাস্ত্রে পঞ্চম বর্ণের অস্তিত্ব স্বীকৃত হয় নাই, নিষাদকে ব্রাহ্মণের ঔরসে শূদ্রা স্ত্রীর গর্ভে জাত বর্ণসঙ্কর বলা হইয়াছে। সুতরাং 'পঞ্চজন' শব্দের অর্থ যাহাই হউক, এই শব্দের ঔপমন্যবের এবং শাকটায়নের ব্যাখ্যায় এবং যাস্কের 'পঞ্চকৃষ্টি'র ব্যাখ্যায় হিন্দুর এমন একটা সময়ের সামাজিক ইতিহাসের সন্ধান পাওয়া যায়, যখন বর্ণসঙ্করের অভ্যুদয় হয় নাই, এবং নিষাদ পঞ্চমবর্ণরূপে গণ্য হইত। বৈদিক সাহিত্যে নিষাদগণের নাম প্রথম পাওয়া যায় তৈত্তিরীয় সংহিতার রুদ্রাধ্যায়ে (৪।৫।৪)। সামবেদের পঞ্চবিংশ ব্রাহ্মণে বিহিত হইয়াছে, যে-যজমান বিশ্বজিৎ যজ্ঞ করিবেন তাহাকে নিষাদগণের মধ্যে (অর্থাৎ নিষাদ গ্রামে) তিন দিন বাস করিতে হইবে (১৬।৬।৭; লাট্যায়ন শ্রৌতসূত্র, ৮।২।৮-৯)। সম্ভবতঃ এই বৈদিক যুগে নিষাদগণ পঞ্চমবর্ণ বলিয়া গণ্য হইত। নিষাদগণ যে কাহারা এবং কোথায় যে তাহাদের জ্ঞাতিরা বাস করিত তাহার সন্ধান পাওয়া যায় মহাভারত, হরিবংশ এবং বিবিধ পুরাণ-বর্ণিত বেণ-রাজার উপাখ্যানে। পুরাকালে বেণ নামক একজন ব্রাহ্মণবিদ্বেষী রাজা ছিলেন। মহাভারতের শান্তিপর্ব্বে কথিত হইয়াছে (৫৯। ২২১৫-২২১৮)—

ততঃ প্রজাস্থ বিধর্ম্মাণং রাগদ্বেষবশানুগং।
মন্ত্রপূতৈঃ কুশৈর্জঘ্নুঋর্ষয়ো ব্রহ্মবাদিনঃ।
মমন্থুর্দক্ষিণোরুমৃষয়স্তস্য মন্ত্রতঃ।
ততোঽস্য বিকৃতো জজ্ঞে হ্রস্বাঙ্গঃ পুরুষো ভুবি।
দগ্ধস্থাণুপ্রতীকাশো রক্তাক্ষঃ কৃষ্ণমূর্দ্ধজঃ।
নিষীদেত্যেবমূচুস্তমৃষয়ো ব্রহ্মবাদিনঃ।

* *Survival of the Prehistoric Civilization of the Indus Valley (Memoirs of the Archaeological Survey of India, No. 40).*

তস্মান্নিষাদাঃ সম্ভূতাঃ ক্রূরাঃ শৈলবনাশ্রয়াঃ।
যে চান্যে বিন্ধ্যনিলয়া ম্লেচ্ছাঃ শতসহস্রশঃ।

—জীবজন্তুর প্রতি অধর্ম্ম আচরণকারী রাগদ্বেষের বশীভূত সেই বেণকে ব্রহ্মবাদী ঋষিগণ মন্ত্রপূত কুশের দ্বারা হত্যা করিয়াছিলেন। মন্ত্র উচ্চারণ করিয়া ঋষিগণ তাঁহার দক্ষিণ উরু মন্থন করিয়াছিলেন। সেই উরু হইতে বিকৃত আকার, হ্রস্বঅঙ্গ, দগ্ধকাষ্ঠের মত কৃষ্ণবর্ণ, রক্তলোচন, কৃষ্ণকেশসম্পন্ন পুরুষ উৎপন্ন হইয়াছিল। ব্রহ্মবাদী ঋষিগণ সেই পুরুষকে বলিলেন, "নিষীদ," উপবেশন কর। এই নিমিত্ত ক্রূর পর্ব্বত এবং বনবাসী, এবং বিন্ধ্যপর্ব্বতবাসী অন্যান্য শত সহস্র ম্লেচ্ছ নিষাদ নামে পরিচিত হইল।

ভাগবৎ পুরাণের (৪।১৪।৪৪) বেণ-উপাখ্যানে নিষাদের আকৃতি এইভাবে বর্ণিত হইয়াছে—

কাককৃষ্ণোঽতিহ্রস্বাঙ্গো হ্রস্ববাহুর্ম্মহাহনুঃ।
হ্রস্বপান্নিম্ননাসাগ্রো রক্তাক্ষস্তাম্রমূর্দ্ধজঃ।

—কাকের মত কৃষ্ণবর্ণ, অতিহ্রস্বাঙ্গ (খুব খাটো), হ্রস্ববাহু, মহাহনু, হ্রস্বপাদ, নতনাসাগ্র, রক্তলোচন এবং তাম্রবর্ণ চুল।

পদ্মপুরাণে (২।২৭।৪২-৪৩) কথিত হইয়াছে, পর্ব্বত এবং বনবাসী নিষাদগণ, ভীল্লগণ, নাহলকগণ, ভ্রমরগণ, পুলিন্দগণ এবং অন্যান্য পাপাচারী ম্লেচ্ছজাতি-নিচয় বেণরাজার উরু হইতে উৎপন্ন নিষাদের বংশধর। সুতরাং দেখা যাইবে কোল, ভীল, সাঁওতাল, ওঁড়াও, গোণ্ড, খন্দ, শবর প্রভৃতি বর্ত্তমান কালের বর্ব্বর জাতিনিচয়ের পূর্ব্বপুরুষেরা নিষাদ নামে পরিচিত ছিল। জাতিভেদের গোড়ায় এই নিষাদগণ পঞ্চম বর্ণ বলিয়া গণ্য হইত। ধর্ম্মভেদ এবং আচারভেদ যেমন যাজকে শাসকে বা ব্রাহ্মণে ক্ষত্রিয়ে জাতিভেদের কারণ হইয়াছিল, গুরুতর আকারভেদ এবং আচারভেদ চতুর্বর্ণে এবং পঞ্চমবর্ণে গুরুতর ভেদের কারণ হইয়াছিল। চতুর্বর্ণে এবং পঞ্চমবর্ণে গুরুতর আকারভেদ এবং আচারভেদ অনাচরণীয়তার বা অস্পৃশ্যতার মূল।

বিভিন্ন আকার, বিভিন্ন আচারী, বিভিন্নবৃত্তি জনশ্রেণী জাতিভেদের উপকরণ যোগাইয়াছিল। কিন্তু জাতিভেদ জমাট বাঁধিল কি প্রকারে? বিভিন্ন জাতির বিভাগকারী প্রাচীর অর্থাৎ অসবর্ণ বিবাহের নিষেধ এবং পান, আহার এবং স্পর্শ সম্বন্ধে অনাচরণীয়তা অলঙ্ঘনীয় হইয়া উঠিল কেমন করিয়া? সভ্যজগতের আর কোথাও জাতিভেদের বিভাগকারী প্রাচীরগুলি এমন দুর্ভেদ্য হইয়া উঠিবার অবকাশ পায় নাই। হিন্দুর মধ্যে জাতিভেদ দুর্ভেদ্য হইবার কারণ দুইটি—

(১) বংশানুগতি বা heredityতে বিশ্বাস। ভগবদ্‌গীতায় বাসুদেব বলিতেছেন (৪।১৩)—

চাতুর্ব্বর্ণ্যং ময়া সৃষ্টং গুণকর্ম্মবিভাগশঃ।

"আমি সত্ত্ব, রজঃ এবং তম এই তিন গুণের এবং কর্ম্মের বা বৃত্তির বিভাগ অনুসারে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য এবং শূদ্র এই চারি বর্ণের সৃষ্টি করিয়াছি।"

ভগবদ্গীতায় এবং মনুসংহিতায় এইরূপ আরও অনেক-বচন প্রমাণ আছে। সাংখ্যদর্শন অনুসারে সত্ত্ব রজঃ এবং তমঃ এই তিন গুণ সৃষ্টির পূর্ব্বে অব্যক্ত মূল প্রকৃতি বা প্রধানে সাম্যাবস্থায় থাকে, এবং প্রকৃতির যখন পরিণতি বা সৃষ্টিকার্য্য আরম্ভ হয় তখন সমস্ত সৃষ্টিতে এই গুণত্রয় সঞ্চারিত হয়। মনুষ্যের মধ্যে যে ত্রিগুণ বর্ত্তমান তাহা মূল প্রকৃতিলব্ধ। প্রাণিবিজ্ঞানের ভাষায় এই গুণত্রয় হইতেছে বংশানুগত লক্ষণের বাহন (hereditary factors)। আধুনিক কালের প্রাণিবিজ্ঞান অনুসারে যে পদার্থ বংশানুগত লক্ষণ বহন করে তাহার নাম (genes) গেনে। জীবের দেহ বহু সেল্‌স্ (cells) বা জীবাণুপুঞ্জের সমষ্টি। একটি মাত্র জীবাণু (cell) লইয়া অধিকাংশ জীবের জীবনযাত্রা আরম্ভ হয়। প্রত্যেকটি জীবাণু প্রোটোপ্লাজ্‌ম্ (protoplasm) নামক পদার্থপূর্ণ। প্রত্যেকটি জীবাণুর কেন্দ্র (nucleus) অপেক্ষাকৃত ঘন। এই জীবাণুকেন্দ্র দুই ভাগে বিভক্ত হইলে তাহাতে রঞ্জনকারী ক্রোমোসোমস্ (chromosomes) দেখা দেয়। এই ক্রোমোসোমস্ বংশানুগত লক্ষণের বাহন গেনে সকল (genes) বহন করে। আধুনিক প্রাণিবিজ্ঞানবিদ্‌গণ অনুবীক্ষণের সাহায্যে জীবাণুর অন্তর্গত গেনে আবিষ্কার করিয়াছেন এবং তাহাদের কার্য্যও পরীক্ষা করিয়াছেন। হিন্দুর ত্রিগুণবাদ অনুমান মাত্র। কিন্তু এই অনুমান অভিজ্ঞতার দৃঢ়ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত এবং ইহার ফলে বংশানুগতিতে দৃঢ়বিশ্বাস জাতিভেদের বন্ধন অচ্ছেদ্য করিয়া রাখিয়াছে।

(২) কর্ম্ম-জন্মান্তরবাদে বিশ্বাস। সকল ধর্ম্মেই পুণ্যের পুরস্কার এবং পাপের শাস্তি বিহিত হইয়াছে; কিন্তু জন্মান্তরের সহিত জড়িত হওয়ায় হিন্দুর কর্ম্ম-

বাদ সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র আকার ধারণ করিয়াছে। লোকে পাপের ফলে নীচ বা দরিদ্র বংশে দুঃখভাগী হইতে জন্মগ্রহণ করে; এবং পুণ্যের ফলে ধনী মানী বংশে জন্মগ্রহণ করে। কিন্তু জন্মান্তরবাদ শিক্ষা দেয়, এই দুঃখে উদ্বিগ্ন হওয়া উচিত নয়, এবং এই সুখ স্পৃহণীয় নহে। সুখ দুঃখ দুই বন্ধনের হেতু। জীবনের দুঃখ আনন্দে ভোগ করা উচিত; কেন-না তাহাতে সঞ্চিত পাপকর্ম্মের ফলের ক্ষয় হয়, মুক্তির পথ প্রশস্ত হয়। এই কর্ম্ম-জন্মান্তরবাদে যাহাদের বিশ্বাস তাহারা জাতিগত হীনতা, দীনতাকে অপ্রীতির চক্ষে দেখিতে পারে না; তাহারা মুক্ত জীবের অনন্তজীবনের অনন্ত সুখের দিকে লক্ষ্য রাখিয়া বর্ত্তমান অল্পকালস্থায়ী জীবনের দুঃখদৈন্যকে উপেক্ষা করিতে পারে; অথবা কর্ম্মফল ভোগের পালা মিটিয়া যাইতেছে এই কথা মনে করিয়া শান্তি অনুভব করিতে পারে। হিন্দুসমাজে যাহারা অল্পবুদ্ধি কর্ম্ম-জন্মান্তরের তাৎপর্য্য ভাল করিয়া বুঝিতে পারে না, মুক্তি কামনা করে না, তাহারাও সংসর্গ-গুণে বিনা-অভিযোগে দুঃখদৈন্য ভোগ করিতে পারে। হিন্দুস্থানে মানুষ পলিটিক্যাল animal বা রাষ্ট্রীয়ভাবসর্ব্বস্ব জন্তু নহে; তাহারা ৮৪ লক্ষ যোনি ভ্রমণকারী শ্রান্ত পথিক, অল্প সময়ের জন্য মনুষ্যলোকে আসিয়াছে। যে-জাতির লোকের সংস্কার এই প্রকার তাহারা জাতিভেদকে অসুবিধাজনক এবং অনাচরণীয়তাকে অপমানজনক মনে করিতে পারে না। সুতরাং ভারতবর্ষে জাতিভেদের সংখ্যা এবং বর্ণাশ্রমের কঠোরতা দিন-দিন বাড়িয়া চলিয়াছে। জাতিভেদ উৎপন্ন হইয়াছিল ব্রহ্মাবর্ত্তে এবং ব্রহ্মর্ষিদেশে, অর্থাৎ বর্ত্তমান আম্বালা, দিল্লী, কর্ণাল, মথুরা প্রভৃতি জেলায় এবং রোহিলখণ্ডে ও রাজপুতানার জয়পুর অঞ্চলে। কিন্তু এই পবিত্র দেশ হইতে পূর্ব্ব বা দক্ষিণ দিকে যত দূরে যাওয়া যায় জাতিভেদের বিধিব্যবস্থা ততই কঠোর, ততই নির্ম্মম দেখা যায়।

আমরা জাতিভেদের গোড়ার যে ইতিহাসটুকু দিলাম তাহার যদি materialistic interpretation অথবা ধনবিভাগানুগত ব্যাখ্যা সম্ভব হয় তবেই তাহার সংস্কারের জন্য সোশিয়ালিষ্টগণের অবলম্বিত নীতি প্রয়োগ করা যাইতে পারে। বৈদিক যুগের জাতিভেদের উৎপত্তি সম্বন্ধে যে পাশ্চাত্য মত এখন বিশেষ প্রচলিত এবং স্কুলপাঠ্য ইতিহাস পুস্তকেও বিনিবদ্ধ তাহার অবশ্য materialistic interpretation সহজ। আক্রমণকারী আর্য্য এবং আক্রান্ত অনার্য্য এই দুইয়ের বিরোধ বর্ত্তমান বুর্জ্জোয়া এবং মজুরগণের বিরোধের আদিম সংস্করণ মাত্র। এই মতের ভ্রম আমি পূর্ব্বেই দেখাইয়াছি, এবং দেখাইতে চেষ্টা করিয়াছি যে, জাতিভেদের মূলে স্বতন্ত্র আচারী যাজক এবং শাসকভেদ। কোন সময়ে যাজক এবং শাসক শ্রেণী যদি পরস্পরের মধ্যে বিবাহ সম্বন্ধ স্থাপনে অস্বীকৃত হইয়া থাকেন তবে তাহা ধনী-দরিদ্রের বিবাদের মত বিবাদমূলক মনে করা যাইতে পারে না; তাহার মূলে বর্ণসঙ্কর ভীতি অর্থাৎ বংশানুগতির সম্বন্ধে সংস্কার। চতুর্ব্বর্ণের এবং পঞ্চমবর্ণ নিষাদের মধ্যে যে ব্যবধান তাহার অবশ্য materialistic interpretation সম্ভব। কিন্তু এখানেও দেখা যায় বৈদিক যুগে নিষাদের নিকট হইতে ব্রাহ্মণ পুরোহিতের অর্থাগমের ব্যবস্থা ছিল। কাত্যায়নের শ্রৌতসূত্রে (১।১২) এবং জৈমিনির মীমাংসা-সূত্রে (৬।১।৫১-৫২) এমন বেদের বচনের উল্লেখ আছে যাহাতে নিষাদগণের নিষাদ-জাতীয় স্থপতি বা রাজাকে রৌদ্রযাগ করাইবার ব্যবস্থা ছিল। রামায়ণের অযোধ্যা-কাণ্ডে (৫০।৩৩) কথিত হইয়াছে গঙ্গাতীরবর্ত্তী শৃঙ্গবেরপুরের অধিপতি রামের সখা গুহ নিষাদস্থপতি ছিলেন। যথা—

> তত্র রাজা গুহো নাম রামস্যাত্মসমঃ সখা।
> নিষাদজাত্যো বলবান্ স্থপতিশ্চেতি বিশ্রুতঃ।

—সেই নগরে রামের অভিন্নহৃদয় সখা স্থপতি বলিয়া খ্যাত নিষাদ-জাতীয় বলবান্ রাজা গুহ বাস করিতেন।

তারপর রামের সহিত যখন গুহের মিলন হইল, তখন রাম—

> ভুজাভ্যাং সাধু বৃত্তাভ্যাং পীড়য়ন্ বাক্যমব্রবীৎ।
> দিষ্ট্যা ত্বাং গুহ! পশ্যামি হ্যরোগং সহ বান্ধবৈঃ।

—সুন্দর, সুগোল বাহুদ্বয় দ্বারা আলিঙ্গন করিয়া (রাম) জিজ্ঞাসা করিলেন, "গুহ, আজ ভাগ্যক্রমে তোমার দর্শন লাভ করিলাম; তুমি সবান্ধবে নিরোগ আছ ত?"

এইখানে দেখা যাইবে যে,বর্ণাশ্রমী হিন্দুর এবং নিষাদের,

যে গুরুতর ভেদ তাহার মূলে বিজেতা আর্য্য এবং বিজিত, বিতাড়িত অনার্য্যের সম্বন্ধ নহে। তখন ক্ষত্রিয় রাজারা এবং নিষাদনৃপতিগণ পাশাপাশি বন্ধুভাবে বাস করিতেছিলেন। এ বন্ধুত্বের অবশ্য materialistic interpretation সম্ভব। কিন্তু বর্ণাশ্রম বিধির কঠোরতার এইরূপ ব্যাখ্যা সম্ভব বলিয়া মনে হয় না। বর্ণসঙ্কর-ভীতি এবং আচারসঙ্কর-ভীতি জাতিভেদের বন্ধন কঠিন হইতে কঠিনতর করিয়াছে এবং এই ভীতিকে অমূলক বলা যাইতে পারে না; কঠোর নিয়ম সত্ত্বেও বর্ণসঙ্করের সৃষ্টি চলিয়াছিল এবং আচার-মিশ্রণ ঘটিতেছিল। আমি আচারমিশ্রণের একটা দৃষ্টান্ত দিতেছি, সতীদাহ। সতীদাহ-প্রথা প্রাচীন শাস্ত্রে বিহিত হয় নাই। কাদম্বরী কাব্যে বাণভট্ট মুক্তকণ্ঠে অনুমরণের বা সতীদাহের নিন্দা করিয়াছেন। মনুভাষ্যকার ঋষিকল্প মেধাতিথি শ্রুতির দোহাই দিয়া অনুমরণ নিষেধ করিয়া গিয়াছিলেন। কিন্তু মেধাতিথির প্রতিবাদ করিয়াছেন দাক্ষিণাত্যবাসী মিতাক্ষরাকার বিজ্ঞানেশ্বর। আর যে দুইজন প্রাচীন নিবন্ধকার, অপরার্ক এবং মাধব, সতীদাহের বিধি দিয়াছেন, তাঁহারাও দাক্ষিণাত্যবাসী ছিলেন; সুতরাং আমি অনুমান করি আর্য্যাবর্ত্তবাসী দাক্ষিণাত্যের দ্রবিড়গণের নিকট হইতে সতীদাহপ্রথা গ্রহণ করিয়াছিল। বর্ণাশ্রমী হিন্দুরা হাজার হাজার বৎসর উন্নতির উচ্চ সীমায় আরূঢ় ছিলেন। কিন্তু এখন তাঁহাদের গুরুতর অধঃপতন ঘটিয়াছে। বর্ণসঙ্করত্ব এবং আচারসঙ্করত্ব খুব সম্ভব এই অধঃপতনের প্রধান কারণ। সুতরাং বর্ণসঙ্কর-ভীতি অমূলক বলা যায় না।

জাতিভেদের অপর অবলম্বন, জন্মান্তরবাদেরও ধনবিভাগানুগত ব্যাখ্যা সহজ নহে। উপনিষদে যিনি প্রথম জন্মান্তরবাদ ব্যাখ্যা করিয়াছেন, সেই পঞ্চালরাজ অবশ্য ধনী (capitalist) ছিলেন। কিন্তু বিদেহরাজ জনকের গুরু ব্রহ্মজ্ঞানপ্রচারক যাজ্ঞবল্ক্য স্বীয় ধনসম্পত্তি বণ্টন করিয়া দিয়া সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়াছিলেন। জন্মান্তরবাদের প্রধান পৃষ্ঠপোষক গৌতম বুদ্ধ এবং জিন মহাবীর স্বামী ধনী বংশে জন্মগ্রহণ করিয়া থাকিলেও জন্মান্তরবাদে বিশ্বাসের প্রেরণায় মোক্ষের আকাঙ্ক্ষায় সংসার ত্যাগ করিয়াছিলেন।

অবশ্যই আমাদের এ-দেশে আমাদের সামাজিক ইতিহাসের ধনবিভাগানুগত ব্যাখ্যা কেহ এখনও আরম্ভ করেন নাই। কিন্তু সমাজ-সংস্কারকগণ যে-ভাষায় হিন্দুর আচার-ব্যবহারের নিন্দা করেন সেই ভাষায় পাশ্চাত্য সামাজিক ইতিহাসের সোশিয়ালিষ্টগণের ব্যাখ্যার প্রতিধ্বনি শুনা যায়। এক্ষেত্রে যদি তাঁহারা নিজেরা হিন্দুর সামাজিক ইতিহাসের ব্যাখ্যা করিয়া লইতেন তবে ভাল হইত। দুঃখের বিষয় এ-দেশের সংস্কারকেরা এ-দেশের ইতিহাসের অস্তিত্বই যেন স্বীকার করেন না। কাজেই তাঁহাদের বিধিব্যবস্থা দেশের অবস্থার সহিত সুসঙ্গত, সুতরাং সুফলপ্রদ হইতেছে না। অতীত, বর্ত্তমান এবং ভবিষ্যৎ এই ত্রিকালের বিধি-বিধানের সমন্বয় করিয়া লইতে না পারিলে অগ্রগতি অসম্ভব।*

---

* তালতলা সাধারণ পুস্তকালয়ের অনুষ্ঠিত সাহিত্য-সম্মিলনের ইতিহাস শাখার সভাপতির অভিভাষণ (২রা বৈশাখ, ১৩৪০)।

সেকালের কথা

(পুরাতন সংবাদপত্র হইতে সঙ্কলিত)

শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

বিদ্বজ্জনগণ সমাগম সভা

ঠিক কোন্ সময়ে জোড়াসাঁকো ঠাকুর-বাড়িতে এই সভার সূচনা হয় তাহা এতদিন আমাদের জানা ছিল না। শ্রীযুত মন্মথনাথ ঘোষের 'জ্যোতিরিন্দ্রনাথ' পুস্তকে এবং শ্রীযুত বসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়ের 'জ্যোতিরিন্দ্রনাথের জীবনস্মৃতি' পুস্তকে এই সভার যৎকিঞ্চিৎ পরিচয় পাওয়া যায় বটে, কিন্তু তাহাতে কৌতূহল নিবৃত্তি হয় না। সমসাময়িক সংবাদপত্রে এই সভার প্রথম অধিবেশনের যে বিস্তৃত বিবরণ পাওয়া যায় তাহা নিম্নে উদ্ধৃত হইল,—

(ভারত-সংস্কারক, ২৪ এপ্রিল ১৮৭৪—
১২ বৈশাখ ১২৮১, শুক্রবার)

যোড়াসাঁকো বিদ্বজ্জনগণ সমাগম সভা।—ইংলণ্ড প্রভৃতি সভ্য দেশে বিদ্বান্ লোকেরা ইতর লোকদিকের ন্যায় সামান্য আমোদ প্রমোদ করিয়াই সন্তুষ্ট হন না। জ্ঞানজনিত বিশুদ্ধ সুখ সম্ভোগের জন্য তাঁহারা সময় সময় একত্র হন এবং কাব্য, দর্শন, বিজ্ঞান প্রভৃতির আলোচনা করিয়া চিত্তের স্বাস্থ্য ও প্রসন্নতা বৃদ্ধি করেন। এ প্রকার সম্মিলন পূর্ব্বেকালে ভারতবর্ষের অজ্ঞাত ছিল না। প্রত্যেক রাজসভা, চতুষ্পাঠী বা আশ্রমপদ নানাবিধ জ্ঞানালোচনা ও সদালাপজনিত সুখের আবাসস্থান ছিল। দুর্ভাগ্যক্রমে এদেশে জাতীয় স্বাধীনতা বিলোপের সঙ্গে সঙ্গে বিদ্যোৎসাহ ও কাব্যামোদেরও বিলোপ হইয়াছে। মুসলমান রাজাদিগের মধ্যে সদাশয় ব্যক্তিগণের রাজত্ব সময়ে তথাপি এ শুভ ব্যাপার সময় সময় দেখা যাইত, কিন্তু ইংরেজ রাজত্বে তাহার চিহ্ন পর্য্যন্ত বিলুপ্ত হইয়াছে। ইংরাজেরা আমাদিগের অনেক বিষয়ে উন্নতি ও সুখ সাধন করিয়াছেন, তজ্জন্য আমরা কৃতজ্ঞ, কিন্তু তাঁহারা যে আমাদিগের জাতীয় কাব্য-শাস্ত্রালোচনা সুখ হইতে বঞ্চিত বা নিরুৎসাহিত করিয়াছেন, এতদপেক্ষা আর মর্ম্মান্তিক দুঃখ আমাদিগের কিছুই নাই। ইহাতে তাঁহাদিগের দোষই বা কি? আমাদিগের ভাগ্যেরই দোষ। যাঁহারা আমাদিগের জাতীয় সঙ্গীত সাহিত্য রসানভিজ্ঞ, তাঁহাদিগের নিকট সে বিষয়ের উৎসাহ লাভের প্রত্যাশা করা বৃথা। সে বিষয়ের সহিত তাঁহাদিগের সংস্পর্শ হিতের না হইয়া বরং অহিতেরই হেতু হইয়া উঠে। ইহা না হইলে ক্যাম্বেল সাহেব বাঙ্গালা ভাষার শ্রীবৃদ্ধি করিতে আসিয়া কেন বলিবেন "যদিও বাঙ্গালা ভাষায় আমি সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ, তথাপি আমার বিবেচনায় ইহা সংস্কৃতাদির সহিত মিশ্রিত হইয়া বিজাতীকৃত হইয়া গিয়াছে।" তিনি আদালতী বিশুদ্ধ বাঙ্গালালঙ্কারে পাঠ্য পুস্তক সকল সুসজ্জিত দেখিতেই বা কেন অনুরাগী হইবেন? এ দেশীয় রাজা হইলে এ দেশীয় সাহিত্য রসে এরূপ বিকৃতরুচি হইতে পারেন না। যাহাহউক যখন ঈশ্বরেচ্ছায় বিদেশীয় রাজাদিগের অধীনস্থ হইয়াই আমাদিগকে থাকিতে হইতেছে, তখন দেশের যে সকল কল্যাণকর কার্য্য তাহাদিগের দ্বারা সম্পন্ন না হইবে, আপনাদিগকেই তাহার পূরণ করিয়া লইতে হইবে। স্বজাতীয় সাহিত্যের উৎসাহদান এ৭টি এ দেশের মহৎ অভাব। আমরা অনেকদিন অবধি সে অভাব অনুভব করিয়াছি, কিন্তু কিসে তাহার মোচন হইবে বুঝিতে পারিতেছি না। স্বজাতীয় রাজা থাকিলে হইত তাহা নাই, স্বজাতীয়দিগের মধ্যে ঐক্য সদ্ভাব থাকিলে হইত তাহা নাই, বিজাতীয় রাজা এ দেশীয় ভাষায় শিক্ষিত হইয়া ইহার গুণগ্রাহী হইলে হইত, তাহারও উপায় দেখিতে পাই না। এ সময় এ শুভকার্য্যে যিনি উদ্যোগী হইবেন, তিনি আমাদিগের পরমবন্ধু সন্দেহ নাই।

আমরা গত সপ্তাহে প্রস্তাবিত বিষয়ের যে একটী বিজ্ঞাপন দিয়াছিলাম, গত শনিবার রাত্রে [৬ বৈশাখ] তাহা কার্য্যে পরিণত দেখিয়া আনন্দিত হইয়াছি। বাবু দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর ও সিবিলিয়ান বাবু সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুরের আহ্বানে বাঙ্গলা গ্রন্থকার ও সংবাদ পত্রের সম্পাদকদিগের অনেকে তাঁহাদিগের যোড়াসাঁকোর ভবনে সমবেত হন। অন্যান্য প্রসিদ্ধ ব্যক্তির মধ্যে আমরা এই কয় ব্যক্তিকে দর্শন করিলাম—রেবরণ্ড কৃষ্ণমোহন বন্দ্যো, বাবু রাজেন্দ্রলাল মিত্র, বাবু রাজনারায়ণ বসু, বাবু প্যারীচরণ সরকার, বাবু রাজকৃষ্ণ বন্দ্যো। সর্ব্বশুদ্ধ ন্যূনাধিক ১০০ ব্যক্তি উপস্থিত ছিলেন। নিমন্ত্রয়িতা মহাত্মারা ভদ্রোচিত অভ্যর্থনার ত্রুটি করেন নাই। সভাস্থলে একটী যুবা প্রথমে বাবু হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের উদ্দীপনী কবিতামালা উচ্চ গম্ভীর স্বরে ও উপযুক্ত ভাবভঙ্গীর সহিত অনর্গল আবৃত্তি করিলেন, তাহাতে আসর বেশ গরম হইয়া উঠিল। আমরা বহুদিন বিস্মৃত একটী জাতীয় ভাব অনুভব করিলাম, এবং ইংরাজাধীনে বা স্বাধীন রাজ্যে বাস করিতেছি বোধগম্য করিতে পারিলাম না। পরে কবিবর [প্যারীমোহন] মৃত অনরেবল দ্বারকানাথ মিত্রের গুণব্যাখ্যা পূর্ব্বক একটী সঙ্গীত করিয়া, শ্রোতৃবর্গকে বিমোহিত করিলেন। তিনি তৎপরে স্বকৃত আর একটী শ্রুতিমধুর গান করিলেন, তাহাতে বিলাতী দ্রব্যের সহিত এদেশীয় দ্রব্যের বিনিময়ে ভারতের সর্ব্বনাশ হইল বলিয়া ইংলণ্ডেশ্বরীর নিকট ক্রন্দন করা হইতেছে। অতঃপর ঠাকুর পরিবারের ছোট ছোট কয়েকটী বালক বালিকা চৌতাল প্রভৃতি তালে তানলয় বিশুদ্ধ সঙ্গীত করিয়া সভাস্থবর্গকে চমৎকৃত করিল। তৎপরে আমন্ত্রকগণ উপস্থিত ভদ্রলোকদিগের মধ্যে কোন কোন ব্যক্তিকে কিছু কিছু বলিতে বিশেষ অনুরোধ করিলেন, কিন্তু কেহ কিছু বলিলেন না। ইহাতে কবিবর পুনরায় গাত্রোত্থান করিয়া তাঁহার কবিত্ব শক্তির পরিচয় দিতে গেলেন, কিন্তু তিনি এবার এরূপ একটী ইতর গান ধরিলেন, যে সভা এককালে মাটী হইয়া গেল এবং তাঁহাকে বসাইয়া দিতে হইল। পরে জ্যোতিরিন্দ্র বাবু এক অঙ্ক নাটক পাঠ করিলেন,

তাহাতে পুররাজা যখন শত্রু নিপাত করিবার জন্য সৈন্য দলকে উত্তেজিত করিতেছেন এবং সৈন্যদল তাঁহার বাক্যের প্রতিধ্বনি করিয়া বীরমদে মাতিতেছে। তদনন্তর দ্বিজেন্দ্র বাবু স্ব রচিত 'সপ্ন' বিষয়ক একটী সুন্দর কবিতা পাঠ করিলে শিশুরা সঙ্গীত করিতে লাগিল এবং পান, গোলাপের তোড়া, পুষ্পমালা প্রভৃতি দ্বারা নিমন্ত্রিতগণের প্রতি সমাদর প্রদর্শন পূর্ব্বক সভাকার্য্য শেষ হইল।

বিদ্বন্মণ্ডলীর এই প্রথম অধিবেশন দর্শনে আমরা আহ্লাদিত হইয়াছি, কিন্তু দুঃখের সহিত বলিতে হইতেছে, যে আশা করিয়া গিয়াছিলাম, তাহা সফল করিতে পারি নাই। সভাটী অনেকটা প্রদর্শনের মত হইয়াছে এবং জাতীয় মেলা প্রভৃতিতে যাহা হয় এখানে যেন তাহার পুনরাবৃত্তি হইল, বোধ হইয়াছে। নানা স্থান হইতে বিদ্বান্ জনগণ একত্র হইয়া মূকের ন্যায় বসিয়া রহিলেন এবং পান চিবাইতে ও আলবোলা টানিতে টানিতে দুইটা পুরাতন কবিতা কি সঙ্গীত শুনিলেন ইহাতে আর কি হইল? বিশেষতঃ কার্য্যপ্রণালী বিশেষ বিবেচনাপূর্ব্বক পূর্ব্বে স্থিরীকৃত না হওয়াতে কতকগুলি বিষয় নিতান্ত কষ্টের কারণ হইয়াছে। সভ্যগণ এখানে যদি মন খুলিয়া পরস্পরের সহিত কথোপকথন করিতে পারিতেন, অথবা কোন সাহিত্য বিষয় লইয়া আলোচনা করিতে পারিতেন, তাহা হইলে সভার উদ্দেশ্য অনেকটা সিদ্ধ হইত। এইটী সম্ভব না হইলে বিদ্বান্‌দিগের সমাগম ও অপগমে বিশেষ কি? আমরা আর একটী বিষয় দেখিয়া বিশেষ দুঃখিত হইলাম, কোন কোন কলিকাতায় বাঙ্গালা সম্পাদক ও গ্রন্থকার আহূত হন নাই, দলাদলির ভাব যদি ইহার কারণ হয় যে উদার উদ্দেশ্যে বর্ত্তমান অনুষ্ঠানটীর সূত্রপাত হইয়াছে, তাহা সফল হইবার পক্ষে বিলক্ষণ সন্দেহ রহিল।

আমরা এখন আর অধিক বলিতে চাহি না, এ সভা যদি স্থায়ী হয়, মনের সকল ভাব প্রকাশ করিব। আমরা ইহার বিরুদ্ধে যে কয়েকটী কথা বলিলাম, ইহার মঙ্গলাকাঙ্ক্ষা আমাদিগকে তাহা বলিতে বাধ্য করিল। ইহার উদ্যোগ কর্ত্তারা যে বঙ্গসাহিত্য ক্ষেত্রচারী উপেক্ষিত লোকদিগকে আহ্বান করিয়া এত সমাদর করিয়াছেন এবং এক স্থানে এতগুলি লোককে সমবেত করিয়াছেন এজন্য সম্পূর্ণ হৃদয়ের সহিত পুনরায় আমরা তাঁহাদিগকে ধন্যবাদ করিতেছি। কিন্তু তাঁহাদিগের প্রতি আমাদিগের একান্ত অনুরোধ, তাঁহারা এ অনুষ্ঠান করিয়া আমাদিগের মনে যে আশার সঞ্চার করিয়াছেন, তাহা সম্পূর্ণ না করিয়া যেন উদ্যোগ ভঙ্গ না করেন। এ বিষয়ে দেশীয় সাহিত্যানুরাগী সকল ব্যক্তিরও সহকারিতা অবশ্য কর্ত্তব্য।

আচার্য্য কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য্য

আচার্য্য কৃষ্ণকমল তাঁহার স্মৃতিকথায় বলিয়াছেন—"১৮৫৭ খৃষ্টাব্দে য়ুনিভার্সিটি স্থাপিত হইলে, ঐ বৎসরই আমি এন্‌ট্রান্স পরীক্ষা দিয়া সংস্কৃত কলেজ ত্যাগ করিলাম।... প্রেসিডেন্সি কলেজে ভর্ত্তি হইলাম।... এক বৎসর পরে কাহাকেও কিছু না বলিয়া পশ্চিমে যাইলাম।" ('পুরাতন প্রসঙ্গ', ১ম পর্য্যায়, পৃ. ৪১) তাঁহার এই নিরুদ্দেশের কথা সমসাময়িক সংবাদপত্রে প্রকাশিত একটি বিজ্ঞাপনে পাওয়া যায়। বিজ্ঞাপনটি এইরূপ,—

(সংবাদ প্রভাকর ২০ এপ্রিল ১৮৫৮। ৮ বৈশাখ ১২৬৫)

বিজ্ঞাপন।—আমার ভ্রাতা শ্রীমান কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য্য গত ৫ বৈশাখ শনিবার দিবস নিরুদ্দেশ হইয়াছে। তাহার বয়স ১৬।১৭ বৎসর কিন্তু খর্ব্বাকৃতি জন্য অল্প বোধ হয়, গৌরাঙ্গ, কৃশ, সংস্কৃত কালেজ হইতে প্রেসিডেন্সি কালেজে অধ্যয়নে প্রবৃত্ত হইয়াছিল যে কেহ তাহার অনুসন্ধান করত ধৃত করিতে পারেন, প্রভাকর যন্ত্রালয় অথবা নরমেল স্কুলে আমার নিকট সংবাদ দিলে তাঁহার নিকট যথোচিত বাধিত ও উপকৃত হইব।

শ্রীরামকমল ভট্টাচার্য্য।
নরমেল স্কুলের প্রধান শিক্ষক।

আচার্য্য কৃষ্ণকমল কয়েক বৎসর প্রেসিডেন্সি কলেজে সংস্কৃতের অধ্যাপকতা করিয়াছিলেন। কিন্তু তিনি এই পদত্যাগের কারণটি স্মৃতিকথায় উল্লেখ করেন নাই। তিনি শুধু বলিয়াছেন,—"কেহ কেহ মনে করেন যে, আমি প্রেসিডেন্সি কলেজের পদত্যাগ করিয়াছিলাম কারণ তৎকালে Principal Sutcliffe সাহেবের সহিত সম্পূর্ণ বনিবনাও হয় নাই। লোকের এই ধারণাটি কিন্তু নিতান্ত অমূলক।"

আচার্য্য কৃষ্ণকমলের পদত্যাগের আসল কারণটি সমসাময়িক সংবাদপত্রে পাওয়া যায়।

(এডুকেশন গেজেট, ৩ জানুয়ারি ১৮৭৩—
২১ পৌষ ১২৭৯)

সাপ্তাহিক সংবাদ।—প্রেসিডেন্সি কলেজের সংস্কৃত অধ্যাপক বাবু কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য্য কর্ম্মে জবাব দিয়াছেন। তিনি হাইকোর্টে ওকালতী করিবেন। প্রেসিডেন্সির ন্যায় সর্ব্বপ্রধান কলেজের সংস্কৃত অধ্যাপকের পদ শিক্ষা বিভাগের গ্রেডভুক্ত না হওয়া উক্ত বাবুর পদত্যাগের কারণ। তাঁহার পদে সংস্কৃতের সহকারী অধ্যাপক বাবু রাজকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায় উন্নীত হইয়াছেন। বাবু নীলমণি মুখোপাধ্যায় এম, এ সহকারী অধ্যাপকের পদ পাইলেন।

দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুরের বিবাহ

(সংবাদ প্রভাকর ৩ ফেব্রুয়ারি ১৮৫৮—
৩ ফাল্গুন ১২৬৪, শনিবার)

মহামান্য বাবু দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় সিমুলা হইতে লাহোরে আসিয়াছেন। আমরা আহ্লাদ পূর্ব্বক প্রকাশ করিতেছি, তিনি তথা হইতে অবিলম্বে এতন্নগরে প্রত্যাগমন করিবেন।

গত শনিবার রাত্রিতে তাঁহার জ্যেষ্ঠপুত্রের এবং রবিবার রাত্রিতে ভ্রাতৃপুত্রের শুভোদ্বাহকার্য্য সর্ব্বাঙ্গ সুন্দররূপে সুনির্ব্বাহ হইয়াছে। সুবিখ্যাত সর্ব্বগুণজ্ঞ ধার্ম্মিকবর শ্রীযুত বাবু রমানাথ ঠাকুর মহাশয় তৎ বাবু নগেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় এই মাঙ্গলিক কর্ম্মে সর্ব্বতো-

ভাবে প্রশংসা লাভ করিয়াছেন। দেবেন্দ্রনাথ বাবু এতৎকর্ম্মে স্বয়ং উপস্থিত থাকিলে আরো অধিক সুখের বিষয় হইত।

সিপাহী-বিদ্রোহকালে মুদ্রাযন্ত্রের স্বাধীনতা হরণ

(সংবাদ প্রভাকর, ১৫ জুন ১৮৫৮। ২ আষাঢ় ১২৬৫)

আমারদিগের বর্ত্তমান গবর্ণর জেনরল বাহাদুর বিগত ইংরাজি ১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দের ১৩ জুন দিবসাবধি ১৮৫৮ খ্রীষ্টাব্দের ১৩ জুন তারিখ পর্য্যন্ত ভারতবর্ষীয় ছাপাযন্ত্রের স্বাধীনতা বন্ধ করেন, আমরা সেই অবধি যে প্রকার সাবধান এবং বিহিত বিবেচনাসহকারে মানে২ সম্পাদকীয় কার্য্য নির্ব্বাহ করিয়া আসিতেছি, তাহা গুণগ্রাহক পাঠক মহাশয়েরা বিশেষরূপে অবগত আছেন, এক্ষণে ছাপাখানার স্বাধীনতা পুনঃপ্রাপ্ত হওয়া গেল।

মদনমোহন তর্কালঙ্কারের মৃত্যু

(সংবাদ প্রভাকর, ১ এপ্রিল ১৮৫৮। ২০ চৈত্র ১২৬৪)

অবগতি হইল, জিলা মুরশিদাবাদে ওলাউঠা রোগের এতাধিক আতিশয্য হইয়াছে, যে, দিন দিন ২০ জন করিয়া কালের ভীষণ গ্রাসে পতিত হইতেছে, আমরা শ্রবণ করত বড়ই কাতর হইলাম, কিন্তের ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট এবং ডেপুটী কালেক্টর পণ্ডিত মদনমোহন তর্কালঙ্কার এই নির্দ্দয় পীড়ায় পীড়িত হইয়া এ অনিত্যদেহ পরিত্যাগ পূর্ব্বক যোগধামে গমন করিয়াছেন, এই মহাশয় যুবাগণের নীতিশিক্ষার্থ যে কয়েকখানি পুস্তক রচনা করিয়াছিলেন, তাহার লেখা সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর হইয়াছে, এবং তাহা সকলের প্রতিষ্ঠাভাজন হইয়া এতন্নগর এবং মফঃসলের প্রায় সকল বিদ্যালয়ের বালকবৃন্দের পাঠোপযোগি হইয়াছে।

রাণী রাসমণির কন্যার সৎকীর্ত্তি

(সাধারণী, ২৫ এপ্রিল ১৮৭৫। ১৩ই বৈশাখ ১২৮২)

সংবাদ।......গত ৩০ চৈত্র সোমবার জানবাজার নিবাসিনী মৃতা রাণী রাসমণীর কন্যা শ্রীমতী জগদম্বা দাসী অতি সমারোহের সহিত বারাকপুরস্থ ভাগীরথীতটে অন্নপূর্ণা ও শিব প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। ইহাতে অন্যূন দুইলক্ষ টাকা ব্যয় হইয়াছে।

উলায় মহামারী

উলা বা বীরনগর এক সময়ে সমৃদ্ধিশালী জনপদ ছিল ; তথায় ৪০-৫০ হাজার লোক বাস করিত। কিন্তু ১৮৫৬ সনে এখানে যে ভীষণ মহামারী দেখা দেয় তাহাতেই উলার সর্ব্বনাশ হইয়া গিয়াছে। এই মহামারীর বিবরণ সমসাময়িক সংবাদপত্র হইতে সঙ্কলন করিয়া দেওয়া হইল।

(সমাচার চন্দ্রিকা, ২৭ অক্টোবর ১৮৫৬।১২ কার্ত্তিক ১২৬৩)

উলায় কি মারিভয়।—আমরা শুনিয়া সশঙ্কিত হইলাম উলা, শান্তিপুর, নবলা, ফুলিয়া বেলগড়ে অঞ্চলে জ্বর বিকারে কি মারিভয় হইয়াছে, বিশেষতঃ উলা গ্রাম একেবারে উবাড় করিলেক ঐ গ্রামে প্রতিদিন ১৫০।২০০ লোক মরিতেছে যাহার বাটীতে ১০।১৬ জন পরিবার তাহার বাটীতে ৩।৪ জন এইক্ষণে জীবিত আছেন, উক্ত গ্রামে অধিকাংশ বিশিষ্ট বর্দ্ধিষ্ট ব্রাহ্মণের বসতি কায়স্থাদি জাতিও আছে নবশাখ ইতর লোকের বসতি তত নহে, দিবা রাত্রি কেবল ক্রন্দনের ধ্বনিতে লোকে সশঙ্কিত কে কখন আছে, শান্তিপুরাদি প্রাগুক্ত গ্রামে মারিভয় হইয়াছে, কিন্তু উলার মত শ্মশানভূমি হয় নাই, উলার সকল শবের সৎকার্য্য হইতেছে না এমত ভয়ঙ্কর ব্যাপার কখন শুনা যায় নাই আমরা অনুমান সিদ্ধ করিতেছি গত অসম্ভব বর্ষাতে সর্ব্বত্রেই এবারে মারিভয় হইবেক অত্র মহানগরী কলিকাতাতে আরম্ভ হইয়াছে প্রতিদিন ৫০।৬০ জন মরিতেছে।

(সংবাদ প্রভাকর, ১১ নবেম্বর ১৮৫৬। ২৭ কার্ত্তিক ১২৬৩)

উলা গ্রামের মারীভয় অদ্যাপি নিবৃত্তি হয় নাই, দুই দিনের জ্বরেই বিকার হইয়া লোকে পঞ্চত্ব পাইতেছে, ঔষধ খাটে না, ৺শারদীয়া পুজার অব্যবহিত পূর্ব্বে এই মহামারী আরম্ভ হয়, এক মাসের মধ্যে প্রায় দুই সহস্র লোক পঞ্চত্ব পাইয়াছে, গ্রামে আর লোক নাই, যাহারা জীবিত আছে তাহারা সর্ব্বস্ব ছাড়িয়া প্রাণ লইয়া গ্রামান্তরে পলাইয়া যাইতেছে, কৃষ্ণনগরের সিবিল সরজন সাহেব উলা গ্রামে আসিয়া কহিয়া গিয়াছেন, ঐ স্থানের মৃত্তিকা হইতে এক প্রকার কদর্য্য মারাত্মক বাষ্প নির্গত হইয়া থাকে, এবং বায়ুও নষ্ট হইয়াছে, এই দুই কারণে এপ্রকার মহামারী উপস্থিত হইয়াছে। কতিপয় পুরাতন গৃহ দাহ করিয়া মহা অগ্নি করিলে তদ্বারা বায়ু বাষ্প শোধন হইতে পারে। শান্তিপুরের সব আসিষ্টাণ্ট সরজন গবর্ণমেণ্টের আজ্ঞাক্রমে উক্ত গ্রামে যাইয়া বিনা বেতনে রোগিদিগের চিকিৎসা এবং অবৈতনিক ঔষধ বিতরণ করিতেছেন।

(সমাচার চন্দ্রিকা, ১ ডিসেম্বর ১৮৫৬। ১৭ অগ্রহায়ণ ১২৬৩)

উলা গ্রামে মহামারি।—উলা গ্রামের মহামারির বিবরণ আমরা পূর্ব্ব২ পত্রে প্রকাশ করিয়াছি জ্বর বিকারে কতলোক স্ত্রী বালক প্রাণত্যাগ করিয়াছে তাহার সংখ্যা নাই, কতলোক হত পরিবার শোকে আত্ম রক্ষার্থে বাটীঘর পরিত্যাগ পূর্ব্বক স্থানান্তর গ্রামান্তর হইয়াছেন, সম্রান্তবর শ্রীযুত বাবু শম্ভুনাথ মুখোপাধ্যায় মহাশয় সপরিবারে গ্রামত্যাগ পূর্ব্বক খড়দহে আসিয়া আপাতত রহিয়াছেন অতুল অস্পদ অচলা জ্ঞানে শ্রীযুত বাবু বামনদাস মুখোপাধ্যায় মহাশয় রুগ্নাবস্থায় বাটীতে আছেন তাঁহার বহুপরিবার তন্মধ্যে ২৯ জন পরলোক গমন করিয়াছেন এমন বিলোপনীয় বিষয় লিখিতে হৃদি বিদীর্ণ হয়।

(সংবাদ প্রভাকর,১২ ডিসেম্বর ১৮৫৬। ২৮ অগ্রহায়ণ ১২৬৩)

উলা গ্রামে অতিশয় মারীভয় উপস্থিত হওয়াতে ২৫ নবেম্বর পর্য্যন্ত ১০ দিনের নিমিত্ত তথাকার মুন্সেফী কাছারী বন্ধ হইয়াছে, অদ্যাপিও ওলাউঠা রোগ নিবারণ হয় নাই।

মূলাজোড়ে প্রসন্নকুমার ঠাকুরের দাতব্য চিকিৎসালয়

(সংবাদ পূর্ণচন্দ্রোদয়, ৩ জুন ১৮৫৯। ২১ জ্যৈষ্ঠ ১২৬৬)

আমরা পরম্পরায় শুনিতেছি শ্রীযুত বাবু প্রসন্নকুমার ঠাকুর মহোদয় মূলাজোড় গ্রামে একটী দাতব্য চিকিৎসালয় স্থাপনের উদ্যোগ করিতেছেন অবিলম্বেই তাহার শিলারোপণ হইবেক। মূলাজোড় গ্রামে স্বর্গবাসি গোপীমোহন ঠাকুর মহোদয়ের বিবিধ কীর্ত্তি দেদীপ্যমান রহিয়াছে উক্ত শ্রীযুক্ত প্রসন্নকুমার বাবু যেসকল উত্তরোত্তর উন্নত

করিতেছেন অর্থাৎ বেবালয় মেরামত ও দেবসেবা পূর্ব্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট এবং অতিথিসালায় আতিথ্য কর্ম্ম বর্দ্ধিত হইয়াছে শ্রুত আছে। ঐ সকল কার্য্য দ্বারা ঐ অঞ্চলের অনেক দীন দরিদ্র লোক নিরন্তর উপকার প্রাপ্ত হয় সন্দেহ নাই। পরন্তু ঐ সকল কার্য্য দ্বারা মহোদয় বাবুর যে যশঃ বিস্তীর্ণ হইতেছিল আমরা নিশ্চয় বলিতে পারি দাতব্য চিকিৎসালয় স্থাপিত হইলে তাহারা ঐ মহাত্মার ধর্ম্ম ও সুখ্যাতি যৎপরোনাস্তি বৃদ্ধিশীল হইবেক। এদেশে দেশীয় চিকিৎসা বিদ্যা অন্তর্হিতা হওয়াতে মফঃসল অঞ্চলের লোকদিগের শারীরিক পীড়ার সময় কোন প্রকার সাহায্য লাভ সম্ভাবনা নাই। ইংরাজী চিকিৎসকের মফঃসলে অধিক লভ্য হয় না বলিয়া চিকিৎসা করিতে নিয়ত নিযুক্ত থাকে না দেশীয় বৈদ্যও পাওয়া যায় না সুতরাং পীড়ার সময় বর্ণজ্ঞান বিহীন চিকিৎসক ব্যতীত অন্য কাহাকেও পাওয়া যায় না তাহাদের হইতে রোগির রোগ শান্তি কি হইবেক বরং যাতনা বৃদ্ধি হইয়া অচিরে প্রাণ নাশ হয়। মফঃসলবাসি লোকদের মধ্যে অনেক প্রচুর সম্পত্তিহীন, তাহার রাজধানী অথবা অন্য স্থান হইতে যে সুচিকিৎসক লইয়া যাইবেক এমত ক্ষমতা নাই। গবর্ণমেণ্ট মফঃসলের স্থানেং একং চিকিৎসক রাখিয়াছেন সত্য তাহা হইতে সর্ব্ব সাধারণ লোকের চিকিৎসা হওয়া সুকঠিন। সর্ব্ব সাধারণ লোকের শারীরিক পীড়ায় সময় কোন প্রকার উপকার করিতে হইলে দেশীয় ধনি মহোদয়দিগের স্বং অধিকার মধ্যে একংটা চিকিৎসালয় করা কর্ত্তব্য শ্রীযুক্ত বাবু প্রসন্নকুমার ঠাকুর মহোদয় ঐ বিষয়ে পথ প্রদর্শক হইলেন এক্ষণে অনুরোধ করি অন্যান্য ধনিগণ তাঁহার দৃষ্টান্তানুগামী হউন।*

* ১৮৫৮ সনের 'সংবাদ প্রভাকর' ও ১৮৫৯ সনের 'সংবাদ পূর্ণ-চন্দ্রোদয়' পত্রের সংখ্যা কয়খানি রায়-সাহেব শ্রীযুক্ত বিপিনবিহারী সেন দেখিবার সুযোগ দিয়া আমাকে অনুগৃহীত করিয়াছেন।

হোটেলওয়ালা

শ্রীমণীন্দ্রলাল বসু

সে বছর গ্রীষ্মকালে আমরা জার্ম্মানীতে বেড়াতে গেলুম—সতীশ ঘোষ, সিতাংশু সেন ও আমি। কোলনের অপূর্ব্ব গির্জ্জা; রাইন-নদীতে ষ্টীমারে ভ্রমণ, বন্-এ বিটোফেনের বাড়ি; বার্লিনে—কাইজারের দম্ভ, জার্ম্মান-জাতির সভ্যতার রূপ, বিজ্ঞানের সাধনা, ভোগলালসার লীলাক্ষেত্র বার্লিনে; লাইপজিগে Messe; ড্রেসডেনে চিত্রশালা, অপেরা; মুনসেনে এসে ঘোষ আর নড়তে চাইলে না; আমাদের প্ল্যান ছিল ভিয়েনা পর্য্যন্ত যাওয়া যাবে।

ঘোষ বললে, বাকী ছুটিটা সে মুনসেনে কাটাবে, সিতাংশুর সঙ্গে গির্জ্জার পর গির্জ্জা ও আমার সঙ্গে চিত্রশালার পর চিত্রশালা ঘুরতে আর সে রাজী নয়, সে জার্ম্মানীতে এসেছে কতকগুলি প্রাচীন কালো পাথরের গির্জ্জা বা মেরী ও যিশুখৃষ্টের রংচঙে ছবি দেখবার জন্য নয়, সে এসেছে 'লাইফ' দেখতে, মুনসেনের বীয়ার ও অপেরা ছেড়ে সে আর কোথাও যাচ্ছে না।

সিতাংশু বললে, আচ্ছা, ভিয়েনাতে নেই যাওয়া হ'ল, কিন্তু রোথেনবুর্গে যেতে হবে; দেখ, বেডডেকারে লিখছে, রোথেনবুর্গ ইয়োরোপের অতি পুরাতন শহর, মধ্যযুগের এক পরমসুন্দর রূপ কালের শাসন এড়িয়ে স্বপ্নের মত জেগে আছে, যেন সময়ের চলা থেমে গেছে এখানে,—চতুর্দ্দশ পঞ্চদশ শতাব্দীর পরিখা-দেওয়াল-ঘেরা নগর, তোরণদ্বার, গির্জ্জা, দুর্গের ধ্বংসাবশেষ—

ঘোষকে মুনসেনে রেখে আমরা দু-জন রোথেনবুর্গের দিকে যাত্রা করলুম। ঢেউ-খেলান ছোট পাহাড়ের সারি, বার্চ বন, পাইন বনের ঘন রহস্য, তরঙ্গায়িত সবুজ প্রান্তরে গির্জ্জার চূড়া ঘিরে লাল-টালি ছাওয়া ছোট ছোট কুঁড়েগুলি, ছোটনাগপুরের পার্ব্বত্য সৌন্দর্য্যের সঙ্গে বাংলার স্নিগ্ধতা শ্যামলতা মেশান প্রাকৃতিক দৃশ্যপট। ছোট ট্রেন যখন রোথেনবুর্গে এসে থামল তখন সন্ধ্যা হয়-হয়, সবুজ পাহাড়ের গায়ে থাকে থাকে সাজান লাল রঙের ত্রিকোণ ছাদের বাড়ির সারি, গির্জ্জার চূড়া, তোরণ, অস্ত সন্ধ্যারাগে ঝলমল আকাশের মায়াপটে আগুনের শিখার মত, যেন সবুজরঙের পেয়ালাতে রাঙা মদ গলিত স্বর্ণের মত টলমল।

সিতাংশু বেডডেকার দেখে ঠিক ক'রে রেখেছিল যে, রাটহাউসের কাছে 'রাটস্-কেলার' হোটেলে গিয়ে থাকা হবে, কিন্তু হোটেলে গিয়ে জানা গেল, ঘর খালি নেই, আমেরিকান ভ্রমণকারীর দল সমস্ত হোটেল দখল ক'রে বসে আছে। স্যুটকেস-বাহক কুলিটি

বললে, বুর্গটোরের কাছে একটি ভাল হোটেল আছে, তবে সে শহরের আর প্রান্তে—'হোটেল সোহো'। এই মধ্যযুগের প্রাচীন শহরে হোটেল সোহো! সেই দিকেই যাওয়া গেল।

'হোটেল সোহোর' ম্যানেজার জানালেন, সেখানেও স্থানাভাব, সেখানেও আর একদল মার্কিনদেশীয় ভ্রমণকারী; আর যা দু-খানা খালি ঘর আছে তা আগামী কল্যের জন্য রিজার্ভ করা রয়েছে। সিতাংশু ম্যানেজারের সঙ্গে রীতিমত চেঁচামেচি সুরু ক'রে দিলে,—দেখুন, আমরা আসছি ভারতবর্ষ থেকে, আপনাদের এই পুরাতন শহর দেখতে, আর আপনি বলছেন, থাকবার জায়গা নেই—অতিথিদের প্রতি জার্ম্মানীর—

এমন সময় ক্রমান্ধকারময় নির্জ্জন পথ কার হাস্যে কেঁপে উঠল, হাস্য নয় অট্টহাস্য। ম্যানেজার বললেন, ওই হোটেলের মালিক আসছেন, ওঁকে বলুন।

ছাই-রঙের সুট পরা একটি মোটা লোক আমাদের দিকে এগিয়ে এলেন পথের বাঁক থেকে, যেন চারিদিকের ছায়া মূর্ত্তিমান্ সরব হয়ে উঠল। লোকটি যেমন স্থূল তাঁর কণ্ঠস্বর তেমনি বাজখাঁই, গাল দুটি ফোলা ফোলা, বড় বড় চোখ দুটি ভাসা ভাসা, ষ্টেজের ভাঁড় বা সার্কাসের ক্লাউনের মত অঙ্গভঙ্গী,—অর্থাৎ জীবনটা একটা পরিহাস, ফুর্ত্তি ক'রে নাও।

অত্যধিক বীয়ার পানে স্ফীত উদর দুলিয়ে লোকটি অট্টহাস্যের সুরে বললেন,—কি ব্যাপার, এত হৈ-চৈ কিসের—হা, হা, শুভসন্ধ্যা বিদেশী অতিথিগণ, রবার্ট নয়মান, হোটেল সোহোর মালিক, আপনাদের ভৃত্য—ব্রেজিল? পর্ত্তুগাল? সিনা—হা হা—

সিতাংশু রুক্ষস্বরে ব'লে উঠল,—ভারতবর্ষ, ভারতবর্ষ। আমরা আসছি—

সিতাংশুর বাক্যগুলি তাঁর কণ্ঠস্বরে ডুবিয়ে নয়মান বলে উঠলেন—ইণ্ডার—ইণ্ডার—কালকুটা, গুট্—

আমি ধীরে বললুম,—এখন আমরা লণ্ডন থেকে এসেছি, জার্ম্মানী বেড়াতে, আপনার হোটেলে দুই-বিছানা-ওয়ালা একখানা ঘর পাওয়া যাবে কি?

— লণ্ডন? ও লণ্ডন!

লণ্ডন কথাটা শুনে নয়মানের পরিহাস-উজ্জ্ব মুখ যেমন গম্ভীর হয়ে গেল, থিয়েটারের ভাঁড়ের মু গেল বদলে। ম্যানেজারের দিকে চেয়ে তিনি বললেন সোয়ারৎসেনবেয়ার্গ, কোন্ ঘর খালি আছে?

—কোনো ঘর ত খালি নেই।

—কেন, ১৮ নম্বর?

—ও ঘর ত কালকের জন্যে রিজার্ভ, এক সুইস্ দম্পতী কাল সকালেই আসছেন।

—আচ্ছা, কাল তাঁদের একটা ব্যবস্থা ক'রে দেওয়া যাবে, আপনি এঁদের ১৮ নম্বরে বন্দোবস্ত ক'রে দিন—আমার লণ্ডনের প্রিয় অতিথিদ্বয়, আপনারা যতদিন খুশী এ হোটেলে থাকুন, এ পুরাতন শহরে 'লাইফ এন্জয়' করবার কিছু নেই, এ লণ্ডন নয়, তবে আমাদের যথাসাধ্য আপনাদের মনোরঞ্জন করবার ব্যবস্থা করব। আসুন, আপনাদের ঘর দেখিয়ে দিচ্ছি।

ডিনার খেয়ে শহরটা একটু ঘুরতে বার হওয়া গেল। আমাদের দেশে সন্ধ্যার রক্তরাগ বড় ক্ষণিক, দিনের আলো হঠাৎ নিবে যায়, রাত্রির অন্ধকারের কালো পর্দ্দা চারিদিক ঘিরে ফেলে। কিন্তু ইয়োরোপে, বিশেষতঃ উত্তর-ইয়োরোপে, সূর্য্যাস্তের পর গোধূলির আলো অনেকক্ষণ থাকে, রাত দশটা-এগারটা পর্য্যন্ত। সেই গোধূলির আলোয় প্রাচীন শহরটি বড় সুন্দর লাগল। সিতাংশুর ইচ্ছা ছিল, দ্বাদশ শতাব্দীর যে এক গির্জ্জার ধ্বংসাবশেষ কাছে কোথায় আছে, তার সন্ধান করবে আমি বললুম—না, শহরে কোথায় ভাল কাফে আছে দেখ, সেখানে বসা যাবে।

রাত্রে যখন ফিরলুম তখন হোটেল সোহো সরগরম হয়ে উঠেছে; একতলার সব ঘর আলোয় ঝলমল, বড় খাবার ঘরের মাঝের সব টেবিল সরিয়ে নৃত্যশালা হয়েছে, কাঠের দেওয়াল ও জানালার পাশে মদের পাত্র রাখার ছোট গোল টেবিল ও চেয়ারের সারি সাজান, এক কোণে নৃত্যের বাদ্য বাজছে, আর আমেরিকান ভ্রমণকারীদের দল হাস্যগীত-গল্পগুঞ্জরণের সঙ্গে সঙ্গে নানা প্রকার মদ্য-পানের অবসরে নৃত্যচটুল পদের আঘাতে কাচের মত

মসৃণ কাঠের মেঝে সঙ্গীতমুখর ক'রে তুলছে, গ্লাসে গ্লাসে বীয়ারের ফেনা উপ্‌চে পড়ছে, মুখে মুখে হাসি ও গানের উচ্ছ্বাস।

বাদ্যযন্ত্র বেশী নয়,—একটি পিয়ানো, দু'টি বেহালা, একটি হার্প ও দু'টি চেলো। আমাদের হোটেল-স্বামী নৃত্যের তালে দুলে দুলে একটি বেহালা বাজাচ্ছেন, চোখ দু'টি জল্‌-জল্‌ করছে, সান্ধ্য-সজ্জার কালো কোটের লেজের মত পেছনটা বিজয়-পতাকার মত উড়ছে, উচ্ছ্বাসের সঙ্গে বেহালার ছড়ি টেনে তিনি মাঝে মাঝে চেঁচিয়ে উঠছেন,—Enjoy ladies and gentlemen, enjoy,—Valencia, la-la-la-la; তাঁর সঙ্গে নৃত্য-উল্লসিত নরনারীগণ উজ্জ্বল হাস্যে গেয়ে উঠছেন—Valencia la-la-la-la-la—

সিতাংশু ও আমি বাইরে বাগানে বসলুম। একটু পরে নৃত্যের বাজনা থামল; যাঁরা নাচছিলেন, সবাই যে-যার চেয়ারে গিয়ে বসলেন, টেবিল থেকে মদের গেলাস তুলে পান করতে লাগলেন, নৃত্যের শ্রম দূর ক'রে আবার নূতন নাচের জন্য বল সঞ্চয় করতে।

হোটেল-স্বামী ঘরের মাঝখানে খালি জায়গাতে তাঁর বেহালা হাতে ক'রে এলেন, সবার প্রতি নত হয়ে অভিবাদন ক'রে ধীরে বললেন, প্রিয় আমেরিকান অতিথিগণ, ব্যাভেরিয়ার একটি অতি পুরাতন গান আপনাদের বাজিয়ে শোনাচ্ছি, খাঁটি বাভেরিয়ার খাঁটি গ্রাম্য সুর—

বেহালা বাজান সুরু হল, বড় করুণ ক্লান্ত সুর, একটু কর্ষেয়ে, অনেকটা আমাদের ভাটিয়াল সুরের মত, এ গ্রাম্যগীত শতাব্দীর পর শতাব্দী কত কৃষক-কৃষাণীর মুখে মুখে গীত হয়ে এসেছে। হোটেল-স্বামী উদাস চোখে করুণ ভঙ্গীতে বেহালা বাজিয়ে গেলেন, লোকটার মূর্তি একেবারে বদলে গেল, কালো কোটের পেছনটা আর নাচে না, মাঝে মাঝে কেঁপে উঠতে লাগল।

বেহালা বাজান শেষ হতেই সবাই করতালি দিয়ে উঠলেন। তারপর এক মধ্যবয়স্কা আমেরিকান মহিলা পিয়ানোতে গিয়ে দু-বৎসর ধরে তৎকালিক লণ্ডনে অভিনীত অপেরেটার জনপ্রিয় এক গানের কন্সার্ট-নৃত্যোপযোগী সুর বাজাতে আরম্ভ করলেন, তাঁর বব্‌ড্‌ চুল দুলিয়ে,—

আবার নৃত্য সুরু হল।

আমরা যে বাইরে বাগানে বসে আছি, তা হোটেল-স্বামীর চোখ এড়ায়নি। তিনি তাঁর বেহালাটি বগলে নিয়ে আমাদের কাছে ছুটে এলেন,—শুভ সন্ধ্যা, ভারতীয় প্রিয় অতিথিদ্বয়, আপনারা বাহিরে বসে কেন? সম্মুখে এমন নৃত্যগীতের আনন্দ-নদী প্রবাহিত হয়ে যাচ্ছে, আর আপনারা তীরে বসে শুধু সুখলহরীর লীলা দেখবেন! ভাসিয়ে দিন্‌ তরী এ স্রোতে—

সিতাংশু হেসে বললে,—আমরা বড় শ্রান্ত।

—শ্রান্ত! সব শ্রান্তি দূর হয়ে যাবে, আসুন নৃত্য-শালাতে, কি পান করবেন?—বীয়ার, ম্যুনসেন বীয়ার, শাম্পেন্‌, লিকয়র্‌, ক্লারেট, সেণ্ট জুলিয়ন—

নৃত্যগৃহে প্রবেশ করতে এক জার্ম্মান মহিলা আমাদের দিকে এগিয়ে এলেন অভ্যর্থনা করতে,—লম্বা ছিপছিপে, কালো সাটিনের গাউনের রেখা তীরভূমিতে ভেঙে-পড়া ক্লান্ত তরঙ্গের মত; টানা চোখ দু-টির তারা ঘননীল, যেন ব্লুবেল ফুল; মুখখানি ফ্যাকাসে, শরত-শেষের পতনোন্মুখ বৃক্ষপত্রের মত সোনালী। হোটেল-স্বামী পরিচয় করিয়ে দিলেন, ফ্রাউ (মিসেস্‌ আমেলিয়া মাগ্‌ডালেন) নয়মান, আমার স্ত্রী; এঁরা প্রিয় ভারতীয় বন্ধু, লণ্ডন থেকে এসেছেন, হের্‌ সেন, হের্‌ চৌতুরী (চৌধুরী)।

সিতাংশু সহজেই আমেরিকান দলের সঙ্গে মিশে গেল। ফ্রাউ নয়মানের সঙ্গে এক পালা কন্সার্ট নেচে আমি বললুম—চলুন, বাগানে বসা যাক্‌, ঘরটা বড় গরম।

ঘরে স্থানাভাবও ছিল। দু-জনে বাগানে এসে বসলুম। নৃত্যের উত্তেজনায় ফ্রাউ নয়মানের পীতপত্রবর্ণের মুখখানি একটু দীপ্ত রুক্ষ হয়ে উঠেছিল, বাহিরে এসে শীতল কোমল হয়ে এল।

ধীরে তিনি বললেন,—আজকের আমেরিকানগুলি বড় বেশী হৈ-চৈ করছে। এত গোলমাল আমার ভাল লাগে না।

আমি বললুম, এরকম এক প্রাচীন শহরে এসে লণ্ডন প্যারীর মিউজিক-হলের নতুন গান শুনতে বা চার্লষ্টোন্‌

নাচ দেখতে ইচ্ছে করে না, তার চেয়ে আপনার স্বামী যে প্রাচীন জার্ম্মান গ্রাম্য গীত বাজালেন, বড় ভাল লাগল।

—দেখুন, আজকালকার দিনে পবিত্র বলে কিছু নেই, এই শহরটা যে একটা মিউজিয়মের মত ক'রে রাখা হয়েছে, তা শুধু নানা দেশের ভ্রমণকারীদের কাছ থেকে টাকা লুটবার জন্তে, এ আমার ভাল লাগে না।

—আপনার স্বামী কিন্তু আমোদে খুব মাততে পারেন।

—ওঁর ঐ হৈ-চৈ করাটা অত্যধিক মদ খাওয়ার জন্তে, তা ছাড়া উনি ব্যাভেরিয়ান্—

—আপনাকে দেখে উত্তর-জার্ম্মানীর মনে হয়।

—ঠিক বলেছেন, আমার বাড়ি ল্যুবেকে।

—কিছু মনে করবেন না, অনেক জার্ম্মান উপন্যাসে পড়েছি, উত্তর-জার্ম্মানদের সঙ্গে ব্যাভেরিয়ানদের মানসিক প্রকৃতির বড় প্রভেদ, সেজন্ত তাঁদের মধ্যে বিবাহ প্রায় সুখের হয় না।

—অমন কথা সব ক্ষেত্রে বলা যায় না। তবে কথাটা খুবই সত্য।

আমার মন্তব্য এত ব্যক্তিগত হওয়া উচিত ছিল না ভেবে লজ্জিত হয়ে একটু চুপ করলুম। সিগারেট কেসটা খুলে ফ্রাউ নয়মানের সম্মুখে ধরে বললুম—সিগ্রেট!

—ধন্তবাদ, আমি ধূমপান করি নে, আপনি স্বচ্ছন্দে খেতে পারেন।

একটি সিগারেট ধরালুম। ফ্রাউ নয়মান্ ক্লান্তস্বরে বলতে লাগলেন,—আপনি হয়ত ভাবছেন, আমি কেন এ-রকম বিবাহ করেছি, বিবাহ আমি স্বচ্ছন্দচিত্তেই করেছি, আমাদের বিবাহের একটা ইতিহাস আছে, আমার স্বামী গত মহাযুদ্ধের সময় আমার দাদার সঙ্গে একসঙ্গে বন্দী ছিলেন—

—বন্দী; কোথায়?

—আমি হচ্ছি আমার স্বামীর দ্বিতীয় পক্ষের স্ত্রী: যুদ্ধের আগে আমার স্বামী লণ্ডনে থাকতেন। সেখানে সোহোতে তাঁর এক রেস্তোরাঁ ছিল—

—সোহোতে! সেজন্তেই বুঝি এ হোটেলের নাম হোটেল সোহো।

—ঠিক বলেছেন। লণ্ডনে সোহোতে তাঁর রেস্তোরাঁ ছিল, তিনি এক ইংরেজ মেয়েকে বিবাহ করে সেখানে ঘর-সংসার পেতে বেশ সুখেই ছিলেন—তারপর যুদ্ধ বাধল, ইংরেজ গভর্ণমেণ্ট তাঁকে বন্দী করলে, জার্ম্মান বলে, আইল- অফ্-ম্যানেতে রাখলে বন্দী ক'রে, তাঁর দোকান বাজেয়াপ্ত হ'ল, আর তাঁর স্ত্রী কোর্টে ডিভোর্সের জন্তে দরখাস্ত করলেন, তাঁদের বিবাহবিচ্ছেদ হয়ে গেল।

একটু থেমে ফ্রাউ নয়মান বলে যেতে লাগলেন,—যুদ্ধের পর উনি মুক্তি পেলেন, কিন্তু তখন তিনি ভাঙা মানুষ, মস্তিষ্কেরও একটু বিকৃতি হয়ে গেছল, সব সময়ে বিমর্ষ। আমার দাদাও ওঁর সঙ্গে আইল-অফ্-ম্যানেতে বন্দী ছিলেন; তিনি ওঁকে আমাদের বাড়ি নিয়ে এলেন; স্বদেশের আবহাওয়াতে আমাদের বাড়ির প্রীতিতে সেবায় রবার্ট ধীরে ধীরে সেরে উঠল, আমাদের নূতন প্রেমের জীবন আরম্ভ হল। কিন্তু তখন কোন কাজকর্ম্ম পাওয়া শক্ত, আমার বাবার যা টাকা ছিল, সব দিয়ে তিনি যুদ্ধের ঋণ কিনেছিলেন, যুদ্ধের পর আমরা কপর্দ্দকহীন। এমন সময় আমার এক দূরসম্পর্কীয় দাদামশাই মারা গেলেন, তাঁর দুই ছেলে যুদ্ধে মরেছে, সেই শোকে বৃদ্ধ মারা গেলেন; উইলে তিনি আমাকে এই হোটেল-বাড়িখানা দিয়ে গেলেন, আমরা নূতন বিবাহ ক'রে একটা আশ্রয় পেলুম, কাজ পেলুম। তারপর এই পাঁচ-ছ বছরে আমার স্বামীর তত্ত্বাবধানে হোটেলের নাম প্রসিদ্ধ হয়ে গেছে; আমাদের চলে যাচ্ছে; অতিথিদের মনোরঞ্জন করতে উনি ওস্তাদ—তবে আমার মাঝে মাঝে এত হৈ-চৈ ভাল লাগে না। কিন্তু জীবনটা ত নিছক সুখের জন্ত নয়, দেখুন—

ফ্রাউ নয়মান শ্রান্ত হয়ে চুপ করলেন। আমি বললুম,—আপনার জন্তে কোন পানীয় অর্ডার দিতে পারি?

—না, ধন্তবাদ, কিছু না, আপনি কিছু পান করুন।

—আমি একটা কফি নেব।

—আচ্ছা, আমার জন্তও একটা কফি বলে দিন।

ঘরের মধ্যে বাদ্যযন্ত্র সব নৃত্যের সুরের ঝঙ্কনায় মেতে উঠেছে, হের্ নয়মান্ সবাইকে মনোরঞ্জন করবার জন্তে একটি জার্ম্মান্ গান গাইছেন—Ich habe mein Herz

in Heidelberg verloren (আমি আমার হৃদয় হারিয়েছি হাইডেলবেয়ার্গে); মাঝে মাঝে রসিক টিপ্পনীর সঙ্গে গানের পর ইংরেজীতে অনুবাদ ক'রে দিচ্ছেন বাউলের মত হেলেদুলে নেচে, তাঁর মাথার টাকটা চকচক্ করছে; নৃত্যপাগল নরনারীদলে হাসির রোল উঠছে।

বাহিরে আমরা দু-জন চুপ ক'রে বসে কফিপান করতে লাগলুম, পিছনে পঞ্চদশ শতাব্দীর বুরুজমণ্ডিত নগরতোরণ দ্বার সঙ্গীনধারী নিশীথ প্রহরীর কালো ছায়ার মত, নির্মল আকাশে তারাগুলো দপ দপ্ করতে লাগল, বহুশতাব্দী-মলিন কালো নগরপ্রাচীরে জ্যোৎস্নার মৃদু আলো।

নৃত্যশালায় হের্ নয়মানের আনন্দ নৃত্য বড় করুণ মনে হল, তাঁর এ নাচগান কেবল মাত্র অতিথিদের মনোরঞ্জনের জন্য নয়, কোন নিগূঢ় ব্যথাকে হাসির উচ্ছ্বাসে ভোলবার চেষ্টা।

নাচঘর থেকে সিতাংশুকে টেনে নিয়ে যখন শুতে গেলুম তখন রাত একটা। নয়মান্ বললেন, এতক্ষণে ত কিছু জমেছে, এর মধ্যে শুতে যাবেন! কিন্তু দেখলুম, সিতাংশু এ প্রাচীন নগরের পুরাতত্ত্ব আলোচনা ছেড়ে তার নৃত্যসঙ্গিনীর সঙ্গে ককটেলের মিশ্রণ-তত্ত্ব সম্বন্ধে যেরূপ ব্যবহারিক অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করতে সুরু করেছে, তাতে আর অধিক জ্ঞানলাভে বিপদ হতে পারে।

পরদিন সারাদিন ঘুরে রোথেনবুর্গ দেখা গেল। বিকেলে চা খাবার পর সিতাংশু বললে,—আমার ভাই দেশে চিঠি লিখতে হবে, আমি আর বেরুবো না।

আমি নয়মানের সঙ্গে একটু বেড়াতে বের হলুম।

—আজ সকালে আপনাদের দেখাশোনা করতে পারিনি, ক্ষমা করবেন, কাল রাত আড়াইটে পর্য্যন্ত নৃত্যগীত চলেছিল—

—আজ দুপুরে ত আমেরিকান দলটি চলে গেলেন।

—হাঁ, আজ রাতটা তেমন জমবে না, তবে কাল আর একদল আসছেন। আমাদের পুরাতন কবরস্থান দেখেছেন? বড় সুন্দর জায়গা, অমন ফুলের শোভা কোথাও দেখতে পাবেন না।

নগরের পরিখার অপর ধারে দিগন্তমেশা চেউখেলান মাঠের মধ্যে গোরস্থান, যেমন নির্জ্জন তেমনি নানা রঙের ফুলের শোভায় অপরূপ; সবুজ মাঠে যেন রঙের হোলিখেলা চলেছে, কত রঙের কত রকমের অপূর্ব্ব ফুল সব চারিদিকে ফুটে—শুভ্র লিলি অফ্ দি ভ্যালি, রূপকথার পরীদের ঘণ্টার মত; নানাজাতীয় বন্য গোলাপ, ডগ্ রোজ, এগ্‌লেনটাইন; লাল ক্লোভার, সাদা ক্লোভার; ভ্যালেরাইন, চুনীর মত লাল; ফক্সগ্লাভ, তার রাঙা পাপড়িতে সাদা-হলদে রঙের ফুট্‌কি।

নয়মান এক ভাঙা পাথরের ওপর বসলেন, চারিদিকের ফুলের রঙের মেলার দিকে চেয়ে বললেন,—এখানে বসে সূর্য্যাস্ত দেখতে বড় ভাল লাগে।

অবাক হয়ে তাঁর দিকে চাইলুম। ছাই রঙের সুট-পরা শান্তমূর্ত্তি, করুণ মুখ, ক্লান্ত কণ্ঠস্বর, লোকটা একেবারে বদলে গেছে, অনেক বুড়ো দেখাচ্ছে, এই উদাস রূপ দেখে কে ভাবতে পারে এই লোকটা কাল রাত আড়াইটে পর্য্যন্ত নেচে গেয়ে ভাঁড়ামি করেছে। চুপ ক'রে তাঁর পাশে বসলুম।

যেন আমাকে নয়, অপরাহ্নের ম্লান আলো ভরা আকাশ-প্রান্তরের প্রতি লক্ষ্য ক'রে তিনি বলে যেতে লাগলেন,—আমার মেয়ে ফুল ভালবাসত, বড্ড ভালবাসত। হাঁ, আমার একটি মেয়ে আছে, আমি লণ্ডনে যে ইংরেজ ললনা এলিজাবেথকে বিবাহ করেছিলুম, সেই তার মা—সে মা মেয়ে যে কোথায় আমি তা কিছুই জানি নে—হের্ চৌধুরী, গ্রেট্‌সেন এই ফক্সগ্লাভ বড় ভালবাসত, আর ব্লুবেল আর—

ধীরে তিনি পকেট থেকে একটি ফটো অ্যালবাম বার ক'রে নিজে একবার সব পাতা উল্টে দেখে আমার হাতে দিলেন। দেখলুম গ্রেট্‌সেন নাম্নী একটি ছোট মেয়ের নানা বয়সের ফটোতে ভরা; ছ'মাসের, এক বছরের, দু-বছরের, প্রতি জন্মদিনে তার ফটো নেওয়া হয়েছে, বছরের পর বছর, এগারো বছরের পর আর ফটো নেই; শেষের অনেকগুলি ধূসর রঙের পাতা খালি।

হের্ নয়মান্ বলে যেতে লাগলেন,—যখন যুদ্ধ আরম্ভ হ'ল তখন গ্রেট্‌সন্ বারোয় পড়েছে, নভেম্বরে তার জন্মদিন ছিল, তার আগেই আমি বন্দী হলুম। বিবাহ-বিচ্ছেদের পর তার মা তার অভিভাবিকা হলেন, আমার

আর কোন সম্পর্ক, কোন দাবী রইল না। যুদ্ধের শেষে যখন জার্ম্মানীতে আসার অনুমতি পেলুম, আমি একবার আমার মেয়েকে দেখতে চেয়েছিলুম; আধ ঘণ্টার জন্য; পনেরো মিনিটের জন্য ভিক্টোরিয়া ষ্টেশনে আমাদের দেখা হয়েছিল, তখন তার মা আবার বিবাহ করেছেন; তার স্বাস্থ্য বেশভূষা দেখেই বুঝলুম তার আর তেমন যত্ন আদর হয় না। বড় আদরের মেয়ে ছিল। আমি কেঁদে ফেললুম; সে নতমুখে নীরবে দাঁড়িয়েছিল, আমার কান্না দেখে বললে, বাবা, তুমি কেঁদো না, আমি ভালই আছি, তুমি জার্ম্মানীতে ফিরে যাও, সেখানে নূতন জীবন আরম্ভ কর, আমি যখন সাবালিকা হব তখন নিশ্চয়ই তোমার সঙ্গে জার্ম্মানীতে গিয়ে দেখা করব, এরা এখন ত আমায় যেতে দেবে না—

নয়মানের কণ্ঠ চোখের জলে ভিজে স্তব্ধ হয়ে গেল; চারিদিকে নিস্তব্ধ গোধূলির আলো। চুপ ক'রে বসে রইলুম।

দূরে গির্জ্জার ঘণ্টা বেজে উঠল সন্ধ্যারতির মত। নয়মান চমকে উঠলেন,—চলুন, আর দেরী নয়—আজ সন্ধ্যার ট্রেনে কয়েকজন সুইস্ আস্‌ছেন।

পথে যেতে যেতে হঠাৎ আমার হাতটা জড়িয়ে ধ'রে কাতরস্বরে তিনি বলে উঠলেন,—দেখুন হের্ চৌতুরী, আপনি যদি আমার একটি কাজ করতে পারেন চিরজীবন আমরা আপনার কাছে কৃতজ্ঞ থাকব। দেখুন, লণ্ডনে গিয়ে আমার মেয়ের সন্ধান করতে হবে আপনাকে, এ নভেম্বরে সে সাবালিকা হবে, সে যদি আমার ঠিকানা জানতে পারে, নিশ্চয় সে আসবে আমার কাছে ছুটে। লণ্ডন থেকে এখানে বড় কেউ আসে না, আর আমার লণ্ডনের পুরাতন বন্ধুদের সঙ্গে কোন যোগ নেই, আমার মেয়েকে খুঁজে বার করতে হবে—জানি, বার করা খুব শক্ত। সেই জন্যেই ত আপনাকে বলছি, আমার জন্য সে প্রতীক্ষা করছে—

ধীরে বললুম,—আমি আমার যথাসাধ্য চেষ্টা করব, কিন্তু অত বড় শহরে এক অজানা মেয়েকে বিনা ঠিকানায় খুঁজে বার করা—

—খুব সম্ভবপর হবে! আমার মেয়ের নাম,—মার্গারেট এথেলমান, লণ্ডনে আমি শুধু 'মান্' লিখতুম। কিন্তু বিবাহ-বিচ্ছেদের পর তার মা তার পিতার নাম নেন, ওয়েব; এখন তিনি বিবাহ করেছেন একজন ব্রাউনকে। খুব সম্ভব আমার মেয়ের নাম বদল হয়েছে, মার্গারেট ওয়েব—এই ফটোখানি রাখুন আপনার কাছে, ব্লণ্ড, সুগভীর নীল চোখ—

—আমি যথাসাধ্য চেষ্টা করব। তার বেশী আর কি বলতে পারি?

—ধন্যবাদ, হের্ চৌতুরী, ঈশ্বর আপনার মঙ্গল করুন।

পরদিন সকালে বিদায় নেবার সময় ফ্রাউ নয়মান্ স্যাণ্ডউইচ কেক ইত্যাদিভরা প্যাকেটটি আমাদের হাতে দিয়ে বললেন,—হের্ চৌতুরী, মার্গারেটের সন্ধান করবেন নিশ্চয়। আমার একটি ছেলে হয়েছিল, সে দেড় বছরে মারা গেছে, আর আমার ছেলেমেয়ে হবার সম্ভাবনা নেই। মার্গারেটকে যদি পাই, নিজের মেয়ের মত ক'রে তাকে রাখব।

লণ্ডনে ফিরে এসে একমাত্র কাজ হ'ল মার্গারেটকে খুঁজে বার করা। কিন্তু সে লণ্ডনে, না কানাডায়, না অষ্ট্রেলিয়াতে; সে জীবিতা কি মৃতা, তা কে জানে? বৃথা এ সন্ধান। তবু রীতিমত খুঁজতে সুরু করলুম।

টাইম্‌স্ পত্রিকা, ডেলি টেলিগ্রাফ, ডেলি এক্সপ্রেস, লণ্ডনের প্রধান প্রধান দৈনিক সংবাদপত্রের ব্যক্তিগত কলমে ছাপালুম,—মিস্ মার্গারেট এথেলমান্ ওরফে ওয়েব, তোমার পিতা তোমার সহিত দেখা করবার জন্যে বিশেষ অধীর, তুমি শীঘ্র—নম্বর পোষ্ট বক্সে চিঠি লিখবে।

একমাস কেটে গেল, কোন চিঠি এল না।

ইংরেজ ও ভারতীয় সকল বন্ধু পরিচিত-পরিচিতাদের ব'লে দিলুম, দেখ, মার্গারেট ওয়েব ওরফে মান নাম্নী কোন একুশ বছরের মেয়ের সঙ্গে যদি পরিচয় হয় বা তার খবর পাও, তৎক্ষণাৎ আমাকে জানাবে। সবাই সিদ্ধান্ত ক'রে নিলে, নিশ্চয়ই কোন প্রেম-ঘটিত ব্যাপার। মুচকে হেসে বললে, নিশ্চয়ই মার্গারেট ওয়েবের দেখা পেলেই ধরে নিয়ে আসব তোমার কাছে, কেউ বুঝি তাকে নিয়ে পালিয়েছে!

আমার অনুসন্ধান ব্যাপারটা এত জানাজানি হয়ে

গেল যে, পথে কোন বন্ধুর সঙ্গে দেখা হলেই এখন প্রশ্ন, কি হে, মার্গারেট ওয়েব ওরফে মানের দেখা পেলে? একদিন স্কটল্যাণ্ড ইয়ার্ড থেকে এক লোক এসে হাজির, তাঁকে সব কথা খুলে বললুম, দু-তিন দিন ইয়ার্ডের ডিটেকটিভ আপিসে হাঁটাহাঁটি করলুম, তারা কোন সন্ধান দিতে পারলে না।

প্রতি সপ্তাহে হের্ নয়মানকে চিঠি লিখতুম, সন্ধান চলছে, শীঘ্রই খোঁজ পাওয়া যাবে। কিন্তু তিন মাস কেটে গেল, কোথাও কোন খোঁজ পাওয়া গেল না।

শরৎকাল শেষ হয়ে শীতকাল এল। সকালে ব্রেকফাষ্ট খেয়ে ড্রয়িংরুমে আগুনের পাশে ব'সে কলেজপাঠ্য একখানি পুস্তক পড়বার চেষ্টা করছি, মেড এসে একখানি চিঠি দিয়ে গেল। খুলে দেখি ফ্রাউ নয়মানের চিঠি, লিখেছেন,—মার্গারেটের সন্ধান ত এতদিনেও পাওয়া গেল না, এদিকে মার্গারেটের কথা ভেবে ভেবে আমার স্বামীর স্বাস্থ্য ভেঙ্গে গেছে; তিনি কিছুই খেতে চান না, বলেন, মার্গারেট হয় ত কোথাও না খেতে পেয়ে পথে ঘুরে বেড়াচ্ছে, তার বি-পিতা তাকে বাড়ি থেকে তাড়িয়ে দিয়েছে, হয়ত লণ্ডনের কোন গ্রামে সে অসহায়া। তাঁর সকল আমোদপ্রমোদ বন্ধ চলে গেছে, তা ছাড়া এখন ভ্রমণকারীদের দলও বড় আসে না। আমার স্বামী সারাক্ষণ বিমর্ষভাবে বসে ভাবেন ও মদ খান, এরকম ক'রে কিছুদিন গেলে, মার্গারেটের দেখা না পেলে, তাঁর মস্তিষ্কের বিকৃতি হবে। এদিকে কিছু দেখেন শোনেন না বলে হোটেল চালান দায়।

চিঠিটা পড়ে মন বড় খারাপ হ'ল; নভেম্বরের লণ্ডনের কালো আকাশ আরও কালো বিষণ্ণতাময় মনে হ'ল, যেন রাতে ও প্রভাতে কোন তফাৎ নেই। কি করা যায় ভাবছি, দ্বারে সজোরে করাঘাত হল।

—কাম-ইন্।

—হ্যালো চৌ, গুডমর্ণিং!

—হ্যালো মেরী! সকালে যে, মভ-রঙের ফ্রকটিতে তোমায় বেশ সুন্দর দেখাচ্ছে, এ সবুজ ফেল্টের টুপি কবে কেনা হল? তার সঙ্গে কালো ভেলভেটের রিবন, বেশ মানিয়েছে।

—আমায় কন্‌গ্রাচুলেট কর, অবশেষে আমরা এন্‌গেজ্‌ড্ হয়েছি।

—সত্যি!

মেরী মেকলে ছিল সতীশ ঘোষের প্রেমিকা। মেরী বলত সতীশ তার ফিয়াঁসে, আর সতীশ বলত মেরী তার বান্ধবী মাত্র। তাদের মান-অভিমানের অনেক ঝগড়া আমাকে মিটমাট ক'রে দিতে হয়েছে।

—শোন, আজ পার্ক রেস্তোরাঁতে আমাদের এন্‌গেজমেন্ট-উৎসব উপলক্ষ্যে একটা ডিনারেট করতে হবে, তার সব ব্যবস্থা করা তোমার ওপর, সতীশকে দিয়ে ওসব হবে না—কিন্তু তোমায় কেমন বিমর্ষ দেখাচ্ছে, তুমি তোমার সেই এটার্নাল মার্গারেটের কথাই ভাবছ নিশ্চয়—ভুলে যাও তাকে, তোমার মত ছেলেকে যে এমন ক'রে ফেলে যেতে পারে!

—মেরী, ব্যাপারটা তোমরা জান না, শোন।

মেরীকে সব কথা খুলে বললুম, ফ্রাউ নয়মানের চিঠিখানাও দেখালুম। সে বিষণ্ণ হয়ে উঠল, চিঠি পড়ে তার চোখে জল এল। শৈশবে সে মাতৃহারা, পিতার আদুরে আবদারে মেয়ে ছিল, এক বৎসর হ'ল তার পিতা মারা গেছেন।

মেরী বললে, আচ্ছা, মার্গারেটের ফটো তোমার কাছে আছে?

নয়মান্ যে ফটোখানি দিয়েছিলেন, সর্ব্বদা সেটি পকেটেই থাকত, মেরীকে দিলুম।

ফটোটি কিছুক্ষণ চুপ করে দেখে মেরী বল্লে, দেখ, আশ্চর্য্য আমার মুখ চোখের সঙ্গে মার্গারেটের অনেক মিল, নয়? মনে হয়, আমার ছেলেবেলার ফটো।

—হাঁ, আশ্চর্য্য।

—তুমি এক কাজ কর, তুমি লিখে দাও, তুমি মার্গারেটের সন্ধান পেয়েছ, সে ভালই আছে, আমার একখানা ফটোও পাঠিয়ে দাও, আমি মার্গারেটের নাম ক'রে একখানা চিঠিও লিখে দিতে রাজী আছি।

—প্রস্তাবটা লোভজনক, কিন্তু—

—কিন্তু কি? তোমরা সব ধর্ম্মপুত্র? জীবনে কখনও মিথ্যা কথা লেখনি, না লোক ঠকাওনি! তোমরা যে কত

মিথ্যা ভালবাসার ভাণ করে কত সরলা তরুণীদের প্রতারণা করেছ তার হিসাব যদি করা যায়—

—কাকে প্রতারণা করেছি আমি!

—ক্ষমা কর, আমি ব্যক্তিগতভাবে কিছু বলছি নে; কিন্তু এখন হের্ নয়মানকে বাঁচান বিশেষ দরকার; বিশেষতঃ একবার তাঁর মস্তিষ্কবিকৃতি ঘটেছিল, আবার ঘটবার খুবই সম্ভাবনা। তুমি এখুনি চিঠি লিখে দাও, এ চিঠি না লিখলে আজ আমার উৎসবে আমি কোন আনন্দ পাব না।

হের্ নয়মানকে চিঠি লিখলুম, মার্গারেটের সন্ধান পেয়েছি সে লণ্ডনে আছে, ভালই আছে। তবে তার সঙ্গে দেখা করা বা পত্র বিনিময় করা এখন যুক্তিযুক্ত নয়। তার এক বন্ধুর কাছে সব খবর পাওয়া গেছে, সে বন্ধুটি তার এখনকার একটি ফটোও দিয়েছেন, কিন্তু তার ঠিকানা বলতে রাজী নন।

পর সপ্তাহে ফ্রাউ নয়মান্ ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন ক'রে চিঠি দিলেন। তাঁর স্বামী অনেকটা সুস্থ, কিন্তু তাঁর মনে কেমন ধারণা হয়েছে মার্গারেটের বড় অসুখ এ আইডিয়া তাঁর মন হতে কিছুতেই দূর হচ্ছে না।

মার্গারেটের কুশলসংবাদ দিয়ে আবার চিঠি দিলুম।

ডিসেম্বরে লণ্ডনে শীত দারুণ হয়ে উঠল। খৃষ্টমাসটা ফ্রান্সে কাটাবার জন্যে এক বন্ধুর নিমন্ত্রণ পাওয়াতে লণ্ডন ছেড়ে পারিতে গেলুম। জানুয়ারীর মাঝামাঝি সেদিন সকালে লণ্ডন ফিরলুম, পথঘাট ফগে ভরা। বাড়িতে পৌঁছাতেই মেড এসে এক টেলিগ্রাম দিলে, বললে, টেলিগ্রাফ দু-দিন হল এসেছে, আমার ঠিক ঠিকানা জানা ছিল না বলে পাঠান হয় নি। টেলিগ্রাম খুলে দেখি নয়মানের টেলিগ্রাম, লিখেছেন—মার্গারেট কেমন আছে? বড় চিন্তিত। শীঘ্র জানাবেন তার আরোগ্যলাভ সম্বন্ধে ডাক্তারদের মত কি?

টেলিগ্রাম পড়ে হতভম্ব হয়ে গেলুম। নয়মান কি সত্যিকার মার্গারেটের সন্ধান পেয়েছেন? সে কি সত্যই অসুস্থা? তাড়াতাড়ি মেরী মেকলেকে টেলিফোন করলুম, কেমন আছ তুমি?

—আমি খুব ভাল আছি। আজ গেইটিতে আসছ ত?

—ইচ্ছে আছে; শোন হের্ নয়মান—

টেলিগ্রামের কথা তাকে বললুম।

সে উত্তর দিল, আচ্ছা আমি যাচ্ছি শীগগীর, তুমি ততক্ষণ বিশ্রাম করে নাও।

দাড়ি কামিয়ে হাত মুখ ধুয়ে বেশ বদল ক'রে ঘরেতেই ব্রেকফাষ্ট আনতে বললুম। মেড এসে বললে, মিস মেকলে নীচে আপনার জন্যে প্রতীক্ষা করছেন।

—তাঁকে অনুগ্রহ ক'রে ড্রয়িংরুমে একটু বসতে বল।

ডিম ও মাংসের ডিসটা অর্দ্ধেক শেষ করেছি, মেড ভীত মুখে ঝড়ের মত ঘরে প্রবেশ ক'রে উদ্বেগের সঙ্গে বললে,—মিষ্টার চৌধুরী, প্লিজ শীগগীর নীচে যান।

—কি হয়েছে?

—আপনার সঙ্গে এক ভদ্রলোক দেখা করতে চান।

—তাঁকে বসাও ড্রয়িংরুমে।

—তাঁকে ড্রয়িংরুমে বসিয়েছিলাম—তিনি অদ্ভুত রকমের। মিস্ মেকলেকে কি বলেছেন, তাঁর গায়ে হাত দিতে গেছেন, ভয়ে মিস্ মেকলে খাবার ঘরে পালিয়ে দরজা বন্ধ ক'রে আছেন আর ভদ্রলোকটি ড্রয়িংরুমে বসে অদ্ভুত শব্দ করছেন—বিদেশী—এই তার কার্ড—

কার্ডে লেখা—রিচার্ড নয়মান্!

ব্যাপারটা বিদ্যুতের মত মনে চমকে উঠল। টেলিগ্রামের উত্তর না পেয়ে নয়মান লণ্ডনে ছুটে এসেছেন—ড্রয়িংরুমে মেরীকে তাঁর মেয়ে মনে করে আদর করে ধরতে গেছেন।

মেডকে বললুম,—মিস্ মেকলেকে বল, তিনি অনুগ্রহ করে তাড়াতাড়ি তাঁর বাড়িতে চলে যান, টেলিফোনে আমি সব জানাব।

ড্রয়িংরুমে ছুটে গেলুম। দেখি পিয়ানো-টুলের ওপর বসে হের্ নয়মান্ শিশুর মত ফুঁপিয়ে কাঁদছেন, ধুলো-ভরা কালো এক ফার ওভারকোটে সমস্ত দেহ আবৃত, মাথায় পুরাতন এক ধূসরবর্ণের টুপি, হাতে ভিজে ছাতা, মলিন শুষ্ক মুখ দাড়িভরা, শুধু চোখ দু-টো আর নাকের ডগা রাঙা টকটক করছে।

ধীরে বললুম,—হের্ নয়মান্। আজ সকালে পারী থেকে এসে আপনার টেলিগ্রাম পেলুম। আপনার মেয়ের

কোন অসুখের সংবাদ আমিও পাইনি; কে আপনাকে এ খবর দিলে? আপনি কাঁদছেন কেন? ভাঙাগলায় নয়মান্ বলে উঠলেন,—আমার মেয়ে, আমার মেয়ে আমাকে চিনতে পারল না। আমাকে পিতা বলে অস্বীকার করলে বুঝতুম, কিন্তু বললে,—আমি তোমায় চিনি না!

—আপনি ভুল করেছেন, আপনি এখানে যাকে দেখেছেন, সে আপনার মেয়ে নয়।

—আমার মেয়ে নয়! আমার মেয়েকে আপনার কাছ থেকে চিনতে হবে? সেই চোখ, সেই কথা বলার ধরণ, সেই ঘাড় নাড়বার ভঙ্গী—আমার মেয়ে নয়। বললে—আমি তোমায় চিনি না।

—আমি সত্যি বলছি, আপনি ভুল করেছেন।

—ভুল করেছি? তাহলে আমার মেয়ে কোথায়?

—আমি এইমাত্র লণ্ডনে আসছি, আপনার মেয়ে যে কোথায় তা ঠিক বলতে পারছি নে, বোধ হয় লণ্ডনে নেই।

—আমি কিছুই বুঝে উঠ্‌তে পারছি নে, আমি বেশ অনুভব করছি, তার অসুখ করেছে, সে হাসপাতালে, ভারি অসুখ, মাঝে মাঝে আমায় ডাকছে, বাবা বাবা! অথচ এই ড্রয়িংরুমে যাঁকে দেখলুম আমার মেয়ে বলেই মনে হল।

—আপনি শান্ত হয়ে বিশ্রাম করুন, সব বুঝতে পারবেন।

ধীরে নয়মানের টুপি ওভারকোট খুলিয়ে রাখলুম। সোফায় বসালুম। মেডকে কিছু খাবার ও কফি আনতে বললুম। ইংলিশ ব্রেকফাষ্ট খেয়ে নয়মান কিছু প্রকৃতিস্থ হলেন। ভাগ্যক্রমে বাড়িতে একটা শোবার ঘর খালি ছিল; সে-ঘরে বিশ্রামের ব্যবস্থা ক'রে দিলুম। বিছানাতে শুয়েই তিনি ঘুমিয়ে পড়লেন। সারাদিন অকাতরে ঘুমোলেন। চার দিন চার রাত তাঁর ঘুম হয় নি।

দাড়ি কামিয়ে স্নান ক'রে সান্ধ্য-বেশ প'রে নয়মান্ যখন সন্ধ্যাবেলায় আমার ঘরে এলেন, একেবারে নূতন মানুষ, যেন কোন তরুণ জার্মান লণ্ডন-জীবন উপভোগ করতে এসেছে।

—হের্ চৌতুরী, রাতটা একটু 'এন্‌জয়' করতে বার হওয়া যাক, আসুন, সোহোতে আমার কয়েকটি মদের দোকান জানা আছে, চমৎকার মদ!

সোহোতে এক ইতালীয়ান রেস্তোরাঁতে বেশ ভাল ক'রে খাওয়া গেল। নয়মানের ইচ্ছা ছিল, তারপর কোন মিউজিক-হল ও নৃত্যশালাতে যাওয়া, অথবা সোহোর মদ্যশালাগুলি পরিদর্শন করা। আমি তাঁকে টেনে কভেন্টগার্ডেন অপেরাতে নিয়ে গেলুম। এক ইতালীয়ান দল সে রাতে ভের্দির রিগোলেত্তো করছিল।

অপেরা দেখার পর থিয়েটার-পাড়ার এক কাফে-রেস্তোরাঁতে এসে বসা গেল। খাওয়াটা নয়মানের উপলক্ষ্য মাত্র, মদ্য পানটাই উদ্দেশ্য; একটা লোক যে কত রকমের মদ কত পরিমাণে পান করতে পারে তা দেখে অবাক হলুম। গুট্, সেয়ার গুট্ হের্ চৌতুরী!

—ভাল লাগছে মদটা।

—ইয়া! লণ্ডনেও ভাল মদ মাঝে মাঝে পাওয়া যায়। বেশ, খুব ভাল, I am happy with life—খুব ভাল—আপনি বলছেন ওই মেয়েটি আমার মেয়ে নয়, গ্রেট্‌সেন নয়, বেশ, মেনে নিলুম আপনার কথা—ও আমার মেয়ে নয়—তাহলে আমার মেয়ে কোথায়—আপনি বলছেন, জানি নে, বোধ হয় লণ্ডনের বাইরে—আপনি জানেন না, কারণ আজ সকালে আপনি পারী থেকে লণ্ডনে এসেছেন, বেশ, মেনে নিলুম—আপনি তার কোন অসুখের খবর পান নি, খুব ভাল—ও মেয়েটি আমাকে বাবা বলে চিনতে চাইল না, তা যখন সে আমার মেয়ে নয় তখন কি ক'রে আমাকে পিতা বলে চিনবে—ভাল খুব ভাল হের্ চৌতুরী—আপনি শুধু কফি খাবেন? একটা লিকয়র—বেনিডিক্টিন্?

—না, ধন্যবাদ।

—বেশ, আচ্ছা, একটা সিগার? হের্ ওবার—

—ধন্যবাদ।

—মেয়েটি গ্রেট্‌সেন্ নয়, কিন্তু তার মত ঠিক দেখতে। আচ্ছা, আমার মেয়ে মার্গারেট তা হলে কোথায়—'ইয়োর হেল্‌থ' হের্ চৌতুরী—কোথায়, আমরা জানি না, বেশ, একবার তার খবর পাওয়া গিয়েছিল, আবার সে হারিয়ে

গেছে, বৃহৎ পৃথিবীর হাজার হাজার মেয়েদের মধ্যে হারিয়ে গেছে—কোনদিন আর তাকে দেখব না—আমি তার পক্ষে মৃত, সে আমার পক্ষে মৃতা—মৃত, হাঁ, আমাদের দু-জনের মধ্যে যুদ্ধে মৃত হাজার হাজার শবদেহের স্তূপের বিরাট ব্যবধান—তা আমি ভুলে গেছলুম—গুট সেয়ার গুট্ হের্ চৌতুরী।

সহসা নয়মান্ মদের গেলাস হাতে দাঁড়িয়ে উঠলেন—হে আমার অজ্ঞাতবাসিনী কন্যা, তোমাকে আমি হয়ত কখনও দেখব না—তুমি—তুমি সুস্থা হও—তুমি সুখী হও—

এক চুমুকে গেলাসের সব মদ খেয়ে চেয়ারে ব'সে তিনি হাঁপাতে লাগলেন। কিছুক্ষণ পরে ট্যাক্সি ক'রে তাঁকে বাড়িতে নিয়ে যেতে হ'ল।

পরদিন সকালে নয়মান্ চলে গেলেন। ষ্টেশনে বিদায় নেবার সময় মেয়ের কথা কিছুই বললেন না। ট্রেন ছাড়লে চেঁচিয়ে উঠলেন, গুড বাই লণ্ডন, গুডবাই ইংলণ্ড, আশা করি আর তোমার সঙ্গে দেখা হবে না।

সাতদিন পরে। লণ্ডনের শীতের সকাল যেমন কালো তেমনি ঠাণ্ডা, তেমনি বিমর্ষ; টিপ টিপ বৃষ্টি পড়ছে। ব্রেকফাষ্ট খাওয়া তখনও শেষ হয় নি, সহসা মেরী মেকলে এসে হাজির, কালো গাউন পরা, মুখ মলিন, হাতে একখানা ভিজে সংবাদপত্র। তার বিষণ্ণ রূপ দেখে মন দমে গেল।

—কি খবর মেরী? কোন দুঃসংবাদ?

—তোমার মার্গারেটের খোঁজ পেয়েছি।

আর সে কিছু বলতে পারল না। সেদিনকার টাইম্স্ সংবাদপত্র খুলে প্রথম পৃষ্ঠায় মৃত্যু-সংবাদ স্তম্ভটিতে একটি নাম দেখিয়ে হাতের কাগজটি এগিয়ে দিলে। লেখা রয়েছে—

চেরিংক্রস হাসপাতালে এক অস্ত্রোপচারের পর, সহসা কিন্তু অতি শান্তভাবে, দুই সপ্তাহের রোগভোগে একুশ বৎসর বয়সে মার্গারেট এথেলমান, আমাদের অতি প্রিয় কন্যা—

তারপর কোন্ চার্চ্চে কখন অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার ধর্ম্মানুষ্ঠান হবে, কোন্ কবরস্থানে গোর দেওয়া হবে, তা লেখা আছে।

লেখাটা তিনবার পড়লুম, অক্ষরগুলি চোখের ওপর নাচতে লাগল, কাগজটা হাত থেকে কার্পেটের ওপর পড়ে গেল; কাঠের পুতুলের মত বসে রইলুম চেয়ারে।

মেরী বললে,—ওঠ, ড্রেস ক'রে নাও, সতীশ আর দু-চারজন বন্ধুকে এখানে আসবার জন্যে টেলিফোন করছি, সময় বেশী নেই; ক্রাইষ্ট চার্চ্চ অনেক দূর, বারোটায় সার্ভিস, কিছু ফুল কিনে নিতে হবে।

—হাঁ, ফুল, অনেক ফুল, সে খুব ফুল ভালবাসত যস্মিনাভ পাওয়া যাবে, বুঝলে—

—না, ও-সব ফুল এখন পাওয়া যাবে না, গোলাপ ক্রিসেনথেমামে ভরে দেব।

গোরস্থান থেকে ফিরে এসে সমাধিক্রিয়ার সব বিবরণ দিয়ে ফ্রাউ নয়মানকে চিঠি লিখলুম, টাইম্স্ পত্রের পাতাটিও কেটে পাঠালুম।

পর সপ্তাহে তাঁর চিঠি এল। স্বামীকে তাঁর কন্যার মৃত্যুসংবাদ জানিয়েছেন, তাতে তিনি বিশেষ বিচলিত হন নি। বস্তুতঃ লণ্ডন থেকে ফিরে এসে পর্য্যন্ত তিনি বলেছেন, তাঁর কন্যা মৃতা, তাঁর পক্ষে মৃতা; তার সম্বন্ধে তিনি আর কোন খবর জানতে চান না। এখন সারাক্ষণ তিনি মদে চুর হয়ে থাকেন।

মাসের পর মাস কেটে গেল। আবার সুন্দর গ্রীষ্মকাল। এবার কন্টিনেণ্টে লম্বা পাড়ি দিলুম, বল্কান্স পর্য্যন্ত। ফেরবার পথে নয়মান্-পরিবারের সঙ্গে দেখা ক'রে আসতে বড় ইচ্ছে হল; বহুদিন তাদের খবর পাইনি।

নুরেনবের্গ থেকে মোটরকারে রোথেনবুর্গে পৌছালুম দুপুরবেলা। হের্ নয়মান্ আমাকে দেখে আনন্দে লাফিয়ে প্রায় বুকে জড়িয়ে ধরেন—ওয়েলকাম্ ব্রাদার চৌতুরী, কি সৌভাগ্য!

সেই প্রাচীন শহর, সেই পুরান হোটেল সোহো, কিন্তু সব কেমন অদ্ভুত অস্বাভাবিক অপরিচিত মনে হল।

খাবারের ঘরে খেতে বসে দেখি, দু-দিকের দুই দেওয়ালে দু'খানি মস্ত ফটো এনলার্জমেণ্ট, সোনার জলের ফ্রেমে বাঁধান,—একটি মৃতাকন্যা মার্গারেটের ছবি, বারো বছরের গ্রেটসেন; আর একটি ফ্রাউ আমেলিয়া মাগডালেন নয়মানের।

—হের্ চৌতুরী, আপনাকে জানান হয়নি, আমার দ্বিতীয় স্ত্রী গত মে মাসে মারা গেছেন; এখানকার আবহাওয়া তাঁর সহ্য হচ্ছিল না। আর এক গেলাস বীয়ার হের্ চৌতুরী, হাম্বারগের বেশ—আনা! আনা—এক গেলাস হাম্বারগের—আচ্ছা আর এক গেলাসও নিয়ে এসো—

ডগডগে লাল ফ্রকের ওপর ছাপান নীল ফুলের সাদা য়্যাপ্রন প'রে এক অতি স্থূলকায়া বেঁটে মধ্যবয়স্কা স্ত্রীলোক পাঁচ আঙলে দুইটি বীয়ারের গ্লাস নিয়ে আমাদের সামনে এলেন।

— —ইনি আমার নতুন স্ত্রী, আনা, হের্ চৌতুরী আমাদের প্রিয় ভারতীয় বন্ধু, লণ্ডন থেকে আসছেন। একটু বোসো আনা।

আনা কিন্তু বসলেন না। তাঁর অনেক কাজ।

—বুঝলেন কি-না হের্ চৌতুরী, হোটেল চালাতে একজন কর্ত্রী থাকা বিশেষ দরকার, না হলে অতিথিদের ঠিক মত সমাদর করা যায় না।

সন্ধ্যার সময় নয়মানের সঙ্গে বেড়াতে বার হলুম। নগর-পরিখা পার হয়ে সেই কবরস্থান। তেম্নি লিলি ক্লোভার ফক্সগ্লাভ, নানা রংএর ফুলের মেলা, তেম্নি সুন্দর নীলাকাশ, গোধূলির রাঙা আলো; বড় করুণ লাগল সব।

দুইটি কবর পাশাপাশি; একটি দ্বিতীয় ফ্রাউ নয়মানের, তার পাশে একটি নকল গোর মার্গারেটের।

নয়মান্ কতকগুলি ফুল তুলে দুই সমান ভাগ ক'রে দুই কবরের ওপর ছড়িয়ে দিলেন, তারপর ঘাসের ওপর বসে পড়লেন।

—এখানে বসে সূর্য্যাস্ত দেখতে বড় ভাল লাগে। রোজ সন্ধ্যাবেলায় এখানে এসে বসি।

আমি চুপ করে এক ভাঙা পাথরের ওপর বসলুম।

—আচ্ছা হের্ চৌতুরী, আপনার কি মনে হয়, সে রাতে রেস্তোরাঁ আর অপেরাতে না গিয়ে আমরা যদি লণ্ডনের সব হাসপাতাল ঘুরে ঘুরে গ্রেটসেনের সন্ধান করতুম, তাহলে হয়ত তার দেখা পেতুম। সে বাঁচত না জানি, তবু তাকে একবার দেখতে পেতুম।

অশ্রুজলে নয়মানের কণ্ঠ রুদ্ধ হয়ে গেল। চারিদিকে সন্ধ্যার ছায়া ঘনিয়ে এল। দূরে গির্জ্জার ঘণ্টা বেজে উঠল সন্ধ্যারতির শঙ্খের মত।

—চলুন, দেরী হয়ে যাচ্ছে, টমাস কুকের এক দল ভ্রমণকারী সন্ধ্যার ট্রেনে আসছে।

রাতে ডিনারের পর শহর ঘুরে আবার বাগানে এসে বসলুম। ভেতরে নৃত্যশালা সরগরম। কুক-কোম্পানীর ভ্রমণকারী নরনারীদল জীবনের আনন্দ উপভোগ করে নিতে তৃষিত চঞ্চল—ট্যাঙ্গো ফক্সট্রট্ চার্লস্টন-নৃত্যের পর নৃত্য সুরা পানের পর সুরা পান। মাঝে মাঝে নয়মান্ তাঁর কালো কোটের লেজটা দুলিয়ে বার্লিন বা প্যারীর কোন নূতন অপেরেটের হাস্যকর আদিরসাত্মক গান গেয়ে সটীক অনুবাদ ক'রে সবার মনোরঞ্জন করছেন। আর তাঁর তৃতীয়া স্ত্রী স্থূলকায়া আনা কালো ভেলভেটের এক গাউন প'রে পিয়ানো বাজাচ্ছেন অতি প্রাণহীনভাবে।

—এই যে আমার ভারতীয় ব্রাদার, বাইরে ব'সে কেন! আসুন নৃত্যশালাতে, সম্মুখে এমন নৃত্যগীতের আনন্দ-নদী প্রবাহিত, আর আপনি চুপ ক'রে তীরে ব'সে থাকবেন, ঝাঁপিয়ে পড়ুন এ-স্রোতে—

—ধন্যবাদ হের্ নয়মান্, আমি এখানে বেশ আছি।

—বেশ, খুব ভাল, যেমন আপনার খুশী—বীয়ার শাম্পেন্—শুধু কাফি! ভাল, খুব ভাল! এ গানটা শুনেছেন—

I want to be happy but I can't be happy—
ha ! ha ! la la ! ha ! ha !

তাঁর সে অট্টহাস্য কান্নার চেয়েও করুণ হতাশাময়।

পরদিন প্রভাতে যখন হোটেল সোহো ছেড়ে এলুম হের্ নয়মানের সঙ্গে দেখা হল না, রাত দুটো পর্য্যন্ত নৃত্যগীত চলেছিল, তিনি সকালে শ্রান্ত হয়ে নিদ্রা যাচ্ছেন।

বৈষ্ণব কাব্য

শ্রীনগেন্দ্রনাথ গুপ্ত

সাহিত্য-পরিষদের সঙ্কলন চণ্ডীদাস

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ হইতে প্রকাশিত চণ্ডীদাসের পদাবলীর ভূমিকায় সম্পাদক লিখিয়াছেন, নান্নুর (চণ্ডীদাসের বাসস্থান) গ্রামের নিকটবর্ত্তী কীর্ণাহার নামক স্থানে বাসকালে তিনি দুইখানি পুঁথি প্রাপ্ত হন। একটিতে চণ্ডীদাসের রচিত রাসলীলার পদ, আর একটিতে ঐ কবির ৬০০র অধিক পদ। তাহার মধ্যে ৫০০ নূতন। কোন পুঁথিরই আর কোন পরিচয় নাই। প্রাচীন হস্তলিখিত পুঁথির শেষে প্রায়ই লেখকের নাম ধাম ও লিখনসমাপ্তির তারিখ লেখা থাকে। এ-দুইটি পুঁথিতে সেরূপ কিছু লেখা আছে কি-না তাহার কোন উল্লেখ নাই। সম্পাদকের প্রধান কথা তিনি ৮৩০টি পদ সংগ্রহ করিয়াছেন এবং ইতিপূর্ব্বে এতগুলি পদ কখনও প্রকাশিত হয় নাই। সকল পদ প্রামাণ্য কি-না, সমস্তগুলিই কবি চণ্ডীদাসের লিখিত কি না সে-কথার মীমাংসা তিনি করেন নাই। তিনি সরলভাবে স্বীকার করিয়াছেন তাঁহার সে যোগ্যতা নাই। তিনি লিখিয়াছেন, "চণ্ডীদাসের নামাঙ্কিত যত পদ পাইয়াছেন বিনা বিচারে তাহা গ্রহণ করিয়াছেন। কোন্‌টা মণি আর কোন্‌টা কাঁচ" সে পরীক্ষার ভার পাঠক ও জনসাধারণকে অর্পণ করিয়াছেন। কিন্তু তাঁহার আর একটি কথা অনুমোদন করিতে পারা যায় না। তাঁহার মতে "বর্ত্তমান সময়ে অতি সূক্ষ্ম নিক্তি লইয়া চণ্ডীদাসের পদের ওজন করা উচিত নহে।" কেন? নিক্তির ওজন সময়োচিত হইবে কবে? যে-কবি বাংলা ভাষার আদি কবি, যাঁহার রচনার ভাবুকতা ও মধুরতা সকলে একবাক্যে স্বীকার করে, তাঁহার ভণিতাযুক্ত ৫০০ নূতন ও অপ্রকাশিত পদ কোনরূপ বিচার না করিয়া গ্রহণ করিতে হইবে? শুধু পাঠকের বা সাধারণের কথা হইতেছে না, মুখ্য কথা কবির যশরক্ষা। যে-কোন পুঁথিতে চণ্ডীদাসের নাম-সম্বলিত বহু অথবা অল্পসংখ্যক পদ পাইলেই বিনা বিচারে তাঁহার রচনা বলিয়া সিদ্ধান্ত করিতে হইবে? তাহা হইলে কবির প্রতিই শ্রদ্ধার অভাব প্রকাশ পায়। যে-সকল পুঁথিতে এই সকল পদ পাওয়া গিয়াছে সেগুলির সম্বন্ধে আমরা কিছু জানি না, কত কালের পুঁথি, পুঁথির কোন ইতিহাস আছে কি-না, কিছু জানি না, অথচ পদের শেষে চণ্ডীদাসের নাম আছে কেবল এই একমাত্র কারণে অন্য কোন বিচার অথবা অনুসন্ধান না করিয়া মানিয়া লইতে হইবে যে, এ সকল কবিতাই চণ্ডীদাসের রচনা? এরূপ করিলে প্রাচীন কবি ও কাব্যের সম্মান রক্ষা কঠিন হইয়া উঠে। আক্ষেপের বিষয়, বৈষ্ণব কাব্যের প্রশংসাবাদী অনেকে থাকিলেও প্রকৃত সমালোচক ও যথার্থ বোদ্ধা অতি অল্পসংখ্যক। যে-কবিতায় যে-কবির ভণিতা আছে তাহা তাঁহারই রচনা সকলেই নিঃসংশয়ে ইহা মানিয়া লইয়া প্রত্যেক কবির ভাষা ও ভাবের স্বতন্ত্রতার প্রতি লক্ষ্য রাখেন না।

চণ্ডীদাসের এই ৮৩০ পদের সংগ্রাহক ও সম্পাদক কবি ও সাহিত্যের প্রতি অনুরাগী হইয়াই এই গ্রন্থ সঙ্কলন করেন। তিনি ইহলোকে নাই। দ্বিতীয় সংস্করণ তাঁহার তত্ত্বাবধানে প্রকাশিত হইবে না। প্রথম সংস্করণের বিস্তারিত সমালোচনা কোথাও প্রকাশিত হইয়াছিল কি-না জানি না। সঙ্কলন ও সম্পাদনের কার্য্য কিরূপে নির্ব্বাহিত হইয়াছে তাহার আলোচনা করা কর্ত্তব্য। তিনি স্বীকার করিয়াছেন যে তিনি বৈষ্ণববংশোদ্ভব, বাল্যাবস্থা হইতে মনোহরসাহী কীর্ত্তন শুনিতেন কিন্তু ব্রজভাষায় (ব্রজবুলি) রচিত পদগুলি ভাল বুঝিতেন না। পূর্ব্বে চণ্ডীদাসের পদাবলীও তিনি ভাল করিয়া পড়েন নাই, তাহার প্রমাণ চণ্ডীদাসের স্বরচিত পদে নান্নুরের উল্লেখ আছে—

নান্নুরের মাঠে গ্রামের হাটে
বাশুলী আছয়ে যথা।
তাহার আদেশে কহে চণ্ডীদাসে
সুখ যে পাইব কোথা।

ইহা সত্ত্বেও চণ্ডীদাসের পদাবলী সংগ্রহ ও সম্পাদন করিবার কয়েক বৎসর পূর্ব্বে কোন মাসিক পত্রিকায় ইনি লিখিয়াছিলেন চণ্ডীদাস মজঃফরপুর জেলার উচৈট্ গ্রামে জন্মিয়াছিলেন অর্থাৎ বিদ্যাপতির ন্যায় চণ্ডীদাসও মিথিলাবাসী এবং মিথিলাবাসীর পক্ষে এরূপ বাংলা গীত রচনা করা বিস্ময়কর নহে। এই কথা ইনি কাহারও মুখে শুনিয়াছিলেন। মিথিলাবাসীর পক্ষে এরূপ বিশুদ্ধ বাংলা লেখা সম্ভব কি-না সে কথা বিবেচনা করেন নাই।

সম্পাদক মহাশয় চণ্ডীদাসের রচিত অপ্রকাশিত পদাবলী অন্বেষণ করিবার কারণ নির্দ্দেশ করিয়াছেন। ইনি লিখিয়াছেন পদকল্পতরু ও পদামৃতসমুদ্রে চণ্ডীদাসের পদাবলী পাঠ করিয়া ইঁহার তৃপ্তি হয় নাই। বৈষ্ণব ভক্ত ও কবিগণ, স্বয়ং শ্রীচৈতন্যের ন্যায় পণ্ডিত ও মহাপুরুষ চণ্ডীদাসের পূর্ব্বপরিচিত পদাবলী হইতে পূর্ণ তৃপ্তি লাভ করিয়াছিলেন, কিন্তু ইঁহার অতৃপ্তির কারণ পদাবলী অসংলগ্ন, তাহাতে 'ধারাবাহিক কৃষ্ণচরিত্র বর্ণনা' নাই। কোন্ বৈষ্ণব কাব্যে ধারাবাহিক কৃষ্ণচরিত্র বর্ণনা আছে? সকল কবির অপেক্ষা বিদ্যাপতির পদাবলী সর্ব্বাপেক্ষা সম্পূর্ণ। কৈশোর, পূর্ব্ব অনুরাগ, অভিসার, মান, মাথুর, ও ভাবোল্লাসের পদ তাঁহার রচনায় সকলের অপেক্ষা সংখ্যায় অধিক, কিন্তু তাঁহার পদাবলীও ধারাবাহিক কৃষ্ণচরিত্র বর্ণনা বলা যায় না। ধারাবাহিক কৃষ্ণচরিত্র বলিতে শ্রীকৃষ্ণের জন্ম হইতে মৃত্যু পর্য্যন্ত সমগ্র ইতিহাস বুঝায়। এক শ্রীমদ্ভাগবত ব্যতীত অন্য কোন গ্রন্থে তাহা পাওয়া যায় না। তাহাতেও কুরুপাণ্ডবের বিরোধে এবং কুরুক্ষেত্রের মহাসমরে শ্রীকৃষ্ণ যাহা করিয়াছিলেন তাহার কোন উল্লেখ নাই। মহাভারত মহাকাব্য ও বৃহৎ ইতিহাস, কিন্তু উহাতে দ্বারকাপতি কৃষ্ণের বাল্যাবস্থার কোন কথা নাই, অথচ মহাভারতের বিপুল আখ্যায়িকায় তিনি যে প্রধান অধিনায়ক সে-বিষয়ে কিছুমাত্র সংশয় নাই। খিল হরিবংশ মহাভারতের পরিশিষ্ট বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে কিন্তু এই গ্রন্থ অপেক্ষাকৃত আধুনিক, ভাগবতের পরে লিখিত। ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণ আরও আধুনিক এবং উহার রচনাও উৎকৃষ্ট নয়, কিন্তু রাধার কথা ঐ গ্রন্থে প্রথম বর্ণিত হইয়াছে, ভাগবতে রাধার নাম পর্য্যন্ত নাই। চণ্ডীদাসের পদাবলীতে রাধাচরিত্র বর্ণিত হইয়াছে, কৃষ্ণচরিত্র অবলম্বন মাত্র।

বৈষ্ণব কাব্যের আকার হইতেই স্পষ্ট বুঝিতে পারা যায়, যে চরিত্র-বর্ণনা উহার উদ্দেশ্য নয়। মহাকাব্যে, নাটকে, ইতিহাসে চরিত্র বর্ণনা করা যায়। মৌখিক চরিত্র বর্ণনা যাত্রার পালায় হইতে পারে। বৈষ্ণব কাব্য সাহিত্যে নূতন সামগ্রী। গীতরচনা চিরকালই চলিয়া আসিতেছে। যে গীত শুধু গাহিবার সময় মিষ্ট শুনায় না, ছন্দের মাধুরীতে ও ভাবের নবীনতা ও গাঢ়তায় আবৃত্তি করিলেও শ্রুতি-মনোহর তাহাই গীতিকবিতা। সকল বৈষ্ণব কবিতায় সুর দেওয়া আছে, কিন্তু ঐ সকল কবিতার এরূপ শব্দ-পারিপাট্য ও মর্ম্মস্পর্শী ভাব যে বিনা সুরেও শ্রবণকুহরে ও হৃদয়ে ছন্দিত হয়, দোলায়মান সঙ্গীত-তরঙ্গের ন্যায় চিত্তকে চঞ্চল করে। রাধাশ্যামের ব্রজলীলা বৈষ্ণব কাব্যের উপাদান, বৈষ্ণব কবিরা দ্বারকায় শ্রীকৃষ্ণের রাজত্ব অথবা কুরুক্ষেত্রে অর্জ্জুনের সারথ্যের বিবরণ লিখিতে বসেন নাই। কৃষ্ণচরিত্রের যে অংশটুকু ব্রজধামে বিকশিত হইয়াছিল কল্পনায় ধ্যানধারণায় তাঁহারা তাহাতেই নিবিষ্টচিত্ত ও তন্ময় হইয়া থাকিতেন। তাঁহাদের গীতরচনা উপাসনার রূপান্তর, প্রেমের চক্রবর্ত্তী রাজত্বের জয়ধ্বনি। সমস্ত বৈষ্ণব কবিতার প্রতিপাদিত বিষয় গোপালতাপনী উপনিষদের দুইটি শ্লোকে নিহিত আছে,—

> বেণুবাদনশীলায় গোপালায়ঘমর্দ্দিনে।
> কালিন্দীকূললোলায় লোলকুণ্ডলধারিণে॥
> বল্লবী বদনাম্ভোজমালিনে নৃত্যশালিনে।
> নমঃ প্রণতপালায় শ্রীকৃষ্ণায় নমো নমঃ॥

—যিনি বেণুবাদনে তৎপর, যিনি গো-পালনকারী, যিনি অঘাসুরের মর্দ্দনকারী, যমুনাকূলে গমন করিতে যিনি চঞ্চল, যিনি চপল কুণ্ডল ধারণ করেন, গোপললনাগণের বদনপদ্ম যাঁহার মালাস্বরূপ, যিনি নৃত্যপরায়ণ, তাঁহাকে নমস্কার; যিনি প্রণতজনের পালনকর্ত্তা, সেই শ্রীকৃষ্ণকে পুনঃ পুনঃ নমস্কার করি।

ইহার পরে বাল্যলীলার আরও ঘটনা উল্লিখিত হইয়াছে, কিন্তু এস্থলে উদ্ধার করিবার প্রয়োজন নাই।

চণ্ডীদাসের বহুসংখ্যক নূতন পদাবলীর সংগ্রহকর্ত্তা যদি বিবেচনা করিয়া থাকেন এই ৮৩০ পদে ধারাবাহিক কৃষ্ণচরিত্র কীর্ত্তিত হইয়াছে তাহা হইলে শৈশবলীলার বর্ণনা কোথায়? বাল্যলীলা অর্থে কেবল গোষ্ঠলীলা নয়, শিশুর চরিত্র বর্ণনও বুঝায়। ঘনরাম দাস, শিবরাম দাস, উদ্ধব দাস, চৈতন্য দাস, বলরাম দাস প্রভৃতি পদকর্ত্তাগণ এই শ্রেণীর অতি মধুর পদ রচনা করিয়াছিলেন। পদকল্পতরু সংগ্রহ গ্রন্থ না থাকিলে ইহার একটিও পাওয়া যাইত না। একটি পদ উদ্ধৃত করিতেছি, ইহাতে পদকর্ত্তার ভণিতা নাই—

দেখসি রামের মাগো দেখসি নয়ন ভরি
গোপাল নাচিছে তুড়ি দিয়া।
কোথা গেও নন্দরাজ দেখহ আনন্দ আজ
দেখহ কি উঠে উছলিয়া।
চিত্র বিচিত্র নাট চরণে চাঁদের হাট
চলে যেন খঞ্জনীয়া পাখী।
সাধ করিয়া মায় নূপুর দিল রাঙা পায়
নাচিয়া নাচিয়া আইল দেখি।
প্রতি পদ চিহ্ন তায় পৃথক পড়িয়া যায়
ধ্বজবজ্রাঙ্কুশ তাহে সাজে।
অবাক রামের মায় বিস্মিত হইয়ে চায়
একি চরণে বিরাজে।

দেখসি—আসিয়া দেখ। রামের মা—বলরামের মাতা রোহিণী। গেও—হিন্দী শব্দ, গেল।

বালক কানাই যখন গোচারণে প্রথমে নিযুক্ত হইয়াছেন জ্ঞানদাস রচিত সে সময়কার বর্ণনা অতুলনীয়,—

ধেনু সঙ্গে আওত নন্দদুলাল।
গোধূলি ধূসর শ্যাম কলেবর
আজানুলম্বিত বনমাল।
ঘন ঘন শিঙ্গা বেণুরব শুনাইতে
ব্রজবাসিগণ ধায়।
মঙ্গল থারি দীপকরে বধূগণ
মন্দির দ্বারে দাঁড়ায়।
পীতাম্বর ধর মুখ জিনি বিধুবর
নব মঞ্জরী অবতংস।
চূড়া ময়ূর শিখণ্ডক মণ্ডিত
বাইয়ি মোহন বংশ।
ব্রজবাসিগণ বালবৃদ্ধ জন
অনিমেখে মুখ শশী হেরি।
তৃষিত চকোর চাঁদ জনু পাওল
মন্দিরে নাচয়ে ফেরি।
গোগণ নবহু গোঠে পলায়ল
মন্দিরে চলু নন্দলাল।
আকুল পদে যশোমতি অন্তে
জ্ঞান ভণিত রসাল।

এ প্রকার বালচরিত্রের বর্ণনা চণ্ডীদাস, বিদ্যাপতি অথবা কবিরাজ গোবিন্দদাস ঝা কেহই করেন নাই। রাধামাধবের অপূর্ব্ব প্রেমলীলাই ইঁহাদের একমাত্র বর্ণিত বিষয়। এ-সম্বন্ধে পরলোকগত সুলেখক ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় চণ্ডীদাসের এই বহুসংখ্যক পদাবলীর সম্পাদককে যাহা বলিয়াছিলেন তাহা সম্পূর্ণ যথার্থ কথা। সম্পাদক বলেন, তাঁহার বিশ্বাস চণ্ডীদাস কৃষ্ণচরিত্র অবলম্বন করিয়া কোন কাব্য প্রণয়ন করিয়াছিলেন। উত্তরে ইন্দ্রনাথ বলেন, "ও কথা আমি মানিব না, প্রাচীন পদ-কর্ত্তারা যখন ইচ্ছা তখনই অসংলগ্নভাবে পদ রচনা করিয়া গিয়াছেন, কখনও কাব্য লিখিবার চেষ্টা করেন নাই।" ইহাই প্রকৃত কথা। পদকর্ত্তারা গান রচনা করিতেন, কাব্য লিখিতেন না, যখন যে ভাব মনে উদয় হইত সেই ভাবের গান বাঁধিতেন, এবং সেই সকল গান গীত হইত। এই রকম ছোট ছোট গান ধারাবাহিক চরিত্র বর্ণনার অনুকূল নয়। কবির যশ গানের গুণে, সংখ্যায় নয়।

বিদ্যাপতির পদাবলী

বিদ্যাপতি ও চণ্ডীদাস শ্রীচৈতন্যের পূর্ব্বে, কিন্তু বাংলার আদি কবি বলিয়া এই দুই কবির নাম সর্ব্বদা একসঙ্গে করা হয়। যথার্থপক্ষে ইঁহাদের দুই জনের মধ্যে কোনরূপ প্রতিদ্বন্দ্বিতা নাই। মিথিলায় ও বাংলায় গুরুশিষ্য সম্বন্ধ না থাকিলে, বাঙালী অধ্যয়নের জন্য মিথিলায় না যাইলে বিদ্যাপতির পদাবলী কখনও এ-দেশে আসিত না। বিদ্যাপতির পরেই গোবিন্দদাস ঝা যাঁহাকে আমরা কবিরাজ গোবিন্দদাস বলিয়া জানি। ইঁহার কবিতাও এ-দেশে আনীত হয়। এই সময় মিথিলায় ও বাংলায় সম্বন্ধ রহিত হইয়া যায়, কোন বিদ্যার্থী আর বাংলা হইতে মিথিলায় বিদ্যা অর্জ্জন করিতে যাইত না। এই কারণে বিদ্যাপতি ঠাকুর ও গোবিন্দদাস ঝার পর মৈথিল ভাষায় অন্য উত্তম কবি হইলেও তাঁহাদের রচিত গীতাবলী বঙ্গ-দেশে আনীত হয় নাই। বিদ্যাপতি ও চণ্ডীদাস দুই জনে ভিন্ন, ভিন্ন দেশবাসী, এক জন মৈথিল, আর এক জন

বাঙালী, এক জন মৈথিল, অবহট্ট ও সংস্কৃত ভাষায় গ্রন্থ রচনা করিতেন, অপর জন বাংলা ছাড়া আর কিছু লিখিতেন না। বিদ্যাপতি বাংলা ভাষার একটি কথাও জানিতেন না, চণ্ডীদাস মৈথিল ও হিন্দী জানিতেন এবং বিদ্যাপতির পদাবলী পাঠ করিয়াছিলেন, ইহার যথেষ্ট প্রমাণ তাঁহার রচিত পদাবলীতেই পাওয়া যায়। চণ্ডীদাসের নাম কস্মিন্‌কালে মিথিলায় কেহ শোনে নাই।

যে-সময় বিদ্যাপতির পদাবলী সম্পাদন ভার আমি গ্রহণ করি সে-সময় বিদ্যাপতির রচনা সম্বন্ধে আমাদের দেশে বিশেষ কিছু জানা ছিল না। 'বঙ্গদর্শন' মাসিক-পত্রে রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় প্রমাণ করিয়াছিলেন যে, বিদ্যাপতি মিথিলাবাসী, বঙ্গবাসী নহেন। গ্রিয়ারসন মিথিলা হইতে অল্পসংখ্যক পদ সংগ্রহ করিয়া প্রকাশ করিয়াছিলেন, কিন্তু সে-সংবাদ এ-দেশে বড়-একটা কেহ রাখিত না। যে-কয়েকটি পদ বিদ্যাপতির বলিয়া পরিচিত তাহাতে অসংখ্য ভ্রম, ভাষা অজানিত বলিয়া সর্ব্বত্র পাঠের বিকৃতি। এদিকে পদাবলীর স্বতন্ত্র সটীক সংস্করণ প্রকাশিত হইত। যাঁহারা টীকা করিতেন তাঁহারা প্রাচীন মৈথিল ও হিন্দী ভাষার একটা কথাও জানিতেন না, কিন্তু তাহাতে তাঁহারা কিছুমাত্র নিরুৎসাহিত হইতেন না। বিদ্যাপতি বাংলার, বাঙালীর কবি, বাঙালী তাঁহার রচিত ভাষার অর্থ করিতে পারিবে না কেন? টীকাকারেরা কোনরূপ সাহায্যের অপেক্ষা করিতেন না, যে-শব্দের, যে-শ্লোকের যেমন ইচ্ছা অর্থ করিতেন। প্রায় সকল অর্থই আটকালে বা আন্দাজে করা। এরূপ টীকা বা অর্থ করা যে অত্যন্ত গর্হিত কর্ম্ম এ-কথা তাঁহারা একবারও ভাবিতেন না। চণ্ডীদাসের পদাবলীর যে-সংস্করণের আলোচনা করিতেছি তাহাতেও ঠিক এই-রূপ। যাহা হউক একটা কিছু অর্থ করিয়া দিলেই টীকা-কারেরা মনে করেন তাঁহাদের কর্ত্তব্যপালন করা হইল। এক কালে এই ভাবেতে টীকাকারেরা অর্থ ও ব্যাখ্যা লিখিয়াই অমর হইতেন, তাঁহাদের যশ মধ্যাহ্ন-সূর্য্যের ন্যায় আজ পর্য্যন্ত দীপ্তিমান রহিয়াছে। সায়ন, শ্রীধর, শঙ্কর, রামানুজ, মাধব, মহীধর, আনন্দগিরি, কত নাম করিব? কালি-দাসের টীকাকার মল্লিনাথ কবির তুল্য যশস্বী হইয়া রহিয়াছেন। বৈষ্ণব কাব্যের টীকাকারেরা সে-কথা কখন স্মরণ করেন?

মৈথিল ভাষার ব্যাকরণ কিংবা অভিধান নাই, মিথিলা হইতে ঐ ভাষায় কোন পদ্য অথবা গদ্য গ্রন্থ প্রকাশিত হয় নাই। মৈথিল ভাষা না জানিয়া, না শিখিয়া, পদাবলীর অর্থ ও টীকা করা হইত। একমাত্র ভণিতা দেখিয়াই বিদ্যাপতির পদাবলী সঙ্কলিত হইত। ভণিতায় যে ভুল হইতে পারে, এক কবির রচিত পদে অপর কোন কবির নাম সংযুক্ত হইতে পারে, এ সম্ভাবনা কাহারও মনে স্থান পাইত না। বিশুদ্ধ বাংলা ভাষায় রচিত পদের ভণিতায় বিদ্যাপতির নাম থাকিলে তাহা নিঃসংশয়ে বিদ্যাপতির রচিত বলিয়া গৃহীত হইত। পূর্ব্বে যে-সকল সঙ্কলন প্রকাশিত হইত তাহাতে মোট পদসংখ্যা দুই শতেরও অল্প। রাধাকৃষ্ণলীলা ছাড়া যে কবি আর কোন পদ রচনা করিয়াছিলেন, অথবা তাঁহার বিরচিত আর কোন গ্রন্থ আছে এ কথা কেহ জানিত না। আমার সঙ্কলনে পদের সংখ্যা অনেক অধিক। কিছু মিথিলা হইতে আনীত, কিছু নেপাল হইতে প্রাপ্ত পুঁথি হইতে সংগৃহীত, হরগৌরী সম্বন্ধীয় পদাবলী প্রথম প্রকাশিত। কিন্তু পদকল্পতরুতেই যে বিদ্যাপতির আরও অনেক পদ আছে এ সন্ধান কেহ রাখিত না। মিথিলায় অনুসন্ধান করিবার সময় আমি জানিতে পাই যে, বিদ্যাপতির নাম ছাড়া কয়েকটি উপাধি ছিল, সকল পদের ভণিতায় নিজের নাম না দিয়া এই উপাধিগুলিও ব্যবহার করিতেন। তদ্ব্যতীত কতকগুলি পদে তিনি ভূপতি, ভূপতি নাথ, সিংহ ভূপতি, চম্পতি পতি, প্রভৃতি নাম ভণিতায় দিতেন। এ সমস্ত পদই বিদ্যাপতির রচনা। এ-কথা বলার আবশ্যক যে, বিদ্যাপতির যতগুলি নূতন পদ পাওয়া গিয়াছে সকলগুলিই উৎকৃষ্ট, প্রত্যেক পদ তাঁহার প্রতিভা দ্বারা মুদ্রাঙ্কিত। কোন কবির সমস্ত রচনা সমান হয় না, উৎকর্ষতা ও অপকর্ষতা লক্ষিত হইবেই। বিদ্যাপতিতে যে এরূপ নাই তাহা নহে, কিন্তু তাঁহার রচিত সমস্ত পদেই এক প্রকার বিশিষ্টতা আছে যাহাতে তাঁহার রচনা আর কাহারও বলিয়া ভ্রম হয় না। তাঁহার কোন কবিতাই নিকৃষ্ট বলিতে পারা

যায় না। বৈষ্ণব কাব্যের আলোচনায় এমন পণ্ডিতও আছেন যাঁহারা বিদ্যাপতির সম্বন্ধে কিছু না-জানিয়াই তাঁহার রচনা প্রাচীন ইংরেজ কবি চসরের সহিত তুলনা করিয়াছেন, অর্থাৎ চসরের ভাষা যেরূপ প্রাচীন ইংরেজী বিদ্যাপতির ভাষাও সেইরূপ প্রাচীন বাংলা। বিদ্যাপতির ভাষায় মিথিলায় আরও কয়েক জন কবি কবিতা রচনা করিয়াছেন, তাঁহাদের লেখা বঙ্গদেশে আসে নাই কেন? বাংলা ও মৈথিল যে দুই স্বতন্ত্র ভাষা এই সহজ কথা ইঁহাদিগকে বুঝান অসম্ভব। কেহ কেহ আমার সংস্করণ হইতে বিদ্যাপতির পদাবলী ও আমার কৃত টীকা অম্লানবদনে তাঁহাদের নিজের পরিশ্রমের ফল বলিয়া প্রকাশ করিয়াছেন, কোথাও আমার নামোল্লেখ পর্য্যন্ত করেন নাই। বাংলা সাহিত্যে এই এক প্রকার সততা, অপরের সামগ্রী নিজের বলিয়া প্রচার করিতে কিছুমাত্র দ্বিধা হয় না। ওদিকে বিদ্যাপতির সম্বন্ধে অজ্ঞতা যেমন ছিল প্রায় সেই রূপই আছে। এখনও টীকাকারেরা নিজের ইচ্ছামত অর্থ করেন, মিথিলার শুদ্ধ পাঠ ও অর্থ ভ্রমাত্মক বলিয়া নির্দ্দেশ করেন। অথচ মৈথিল ভাষায় তাঁহারা কিছুই জানেন না।

চণ্ডীদাসের নূতন পদসমূহ

বিদ্যাপতির সম্বন্ধে যে-সকল কথা খাটে, চণ্ডীদাসের সম্বন্ধে তাহা বলা যায় না। বিদ্যাপতি বিদেশী, তাঁহার ভাষা বিদেশী; তাঁহার নিজের দেশে তাঁহার পদাবলী তালপাতার পুঁথিতে পাওয়া যাইত, সেই সকল পুঁথি হইতে কিছু কিছু পদ অনেকে নকল করিয়া রাখিত। চণ্ডীদাসও যে বিদেশী এরূপ ধারণা যে কাহারও ছিল তাহা বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের প্রকাশিত গ্রন্থ হইতেই প্রথমে অবগত হওয়া যায়। চণ্ডীদাসের পদাবলী পাঁচ শত বৎসরের অধিক হইল রচিত হয়। তালপাতার পুঁথি নাই, কাগজে লেখা পুঁথি যাহা পাওয়া গিয়াছে তাহা কতকালের তাহা জানা নাই। যদি এ রকম পুঁথি এখন পাওয়া যায় তাহা হইলে বৈষ্ণবদাসের কালে পাওয়া যাইত না কেন? যদি যাইত তাহা হইলে তিনি সংগ্রহ করিলেন না কেন? তিনি ত স্পষ্ট লিখিয়াছেন, "প্রাচীন প্রাচীন পদ যতেক পাইল" সংগ্রহ করিয়া "গীতকল্পতরু নাম কৈলুঁ সার।" তিনি যে চণ্ডীদাসের অনেক পদ পাইয়া কিছু বাছিয়া লইয়াছিলেন, কিছু পরিত্যাগ করিয়াছিলেন এরূপ বিবেচনা করিবার কোন কারণ নাই। চণ্ডীদাস যে শ্রেষ্ঠ কবি, আদি কবি তাহা তিনি উত্তমরূপে জানিতেন। পদকল্পতরুতেই তিন জন পদকর্ত্তা মহাজনের বন্দনা দেখিতে পাওয়া যায়, জয়দেব, বিদ্যাপতি ও চণ্ডীদাস। বিদ্যাপতির প্রশংসাবাদ সকলের অপেক্ষা অধিক হইলেও চণ্ডীদাসের স্তুতি কিছু কম নয়। নরহরি দাস লিখিয়াছেন,—

জয় জয় চণ্ডীদাস দয়াময়
মণ্ডিত সকল গুণে।
অনুপম যার যশ রসায়ন
গাওত জগত জনে।
* * *
শ্রীরাধাগোবিন্দ কেলিবিলাস যে
বর্ণিলা বিবিধ মতে।
কবিবর চারু নিরুপম মহী
ব্যাপিল যাহার গীতে।
শ্রীনন্দনন্দন নবদ্বীপ পতি
শ্রীগৌর আনন্দ হৈয়া।
যার গীতামৃত আস্বাদে স্বরূপ
রায় রামানন্দ লৈয়া।
* * *
চণ্ডীদাস পদে যার রতি সেই
পিরিতি মরম জানে।
পিরিতি বিহীন জনে ধিক রহু
দাস নরহরি ভণে।

এরূপ যশস্বী ও প্রতিষ্ঠাশালী কবির সমগ্র পদাবলী পাইয়া বৈষ্ণব দাস যে তাহা হইতে বাছাই করিয়া কতকগুলি পদ গ্রহণ করিয়াছিলেন, এরূপ সিদ্ধান্তে উপনীত হইবার কোন কারণ দেখিতে পাওয়া যায় না। সকল বৈষ্ণব কবির যত পদ পাওয়া যায় সমুদায় সংগ্রহ করিবার উদ্দেশ্যেই তিনি নানা স্থানে পর্য্যটন করিয়াছিলেন। বঙ্গদেশে প্রচলিত বিদ্যাপতির সকল পদ যদি তিনি পাইয়া থাকেন তাহা হইলে চণ্ডীদাসের বিরচিত সমস্ত পদই বা তিনি না পাইবেন কেন? তিনি স্বয়ং কবি, বৈষ্ণবপ্রধান, সকল বৈষ্ণবেরাই আগ্রহের সহিত প্রতিলিপি গ্রহণ করিবার জন্য তাঁহাকে যত্নরক্ষিত পুঁথি সকল দিয়া থাকিবেন। সঙ্কলন গ্রন্থের কলেবর বৃহৎ হইবে এ আশঙ্কায়

যে বৈষ্ণবদাস কতক পদ বর্জ্জন করিয়া থাকিবেন এরূপ অনুমানও সঙ্গত মনে হয় না। তিন সহস্র পদ তিনি সংগ্রহ করিয়াছিলেন, আর এক সহস্র পাইলেও তিনি সঙ্কলন করিতেন। বিশেষ, বৈষ্ণবসমাজে বিদ্যাপতি ও চণ্ডীদাসের পদাবলীর সমাদর সর্ব্বাপেক্ষা অধিক। কীর্ত্তনের সময় শ্রীচৈতন্য এই দুই কবির রচিত পদাবলী শুনিতে ভালবাসিতেন। বৈষ্ণবদাস চণ্ডীদাসের অনেক পদ পাইয়া যে তাহার অধিকাংশ পরিত্যাগ করিয়াছিলেন এ-কথা বিশ্বাসযোগ্য নয়। সাহিত্য-পরিষদের সংস্করণে প্রকাশিত চণ্ডীদাসের নূতন পদাবলী হয় তিনি দেখেন নাই, নতুবা এই সকল পদ যথার্থই চণ্ডীদাসের রচিত কি-না তাহাতে সংশয় আছে।

অশরীরী

শ্রীশরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়

পুরাতন উই-ধরা ডায়েরিখানি সাবধানে খুলিয়া বরদা বলিল—'অদ্ভুত জিনিষ, কিন্তু আগে থাকতে কিছু বলব না। আমাদের আবদুল্লা কুঁজড়াকে জান ত? সাহেবদের কুঠি থেকে পুরোনো বই সের-দরে কিনে বিক্রি করতে আসে? তারি কাছ থেকে এটা কিনেছি, ঝাঁকায় ক'রে এক গাদা বই নিয়ে এসেছিল, বইগুলো ঘাঁটতে ঘাঁটতে দেখি একটা বাংলায় লেখা ডায়েরি। নগদ ছ-পয়সা খরচ ক'রে তৎক্ষণাৎ কিনে ফেললুম।'

অমূল্য দৈবক্রমে আজ ক্লাবে আসে নাই, তাই বাক-বিতণ্ডায় বেশী সময় নষ্ট হইল না। বরদা বলিল,—'পড়ি শোনো। বেশী নয়, শেষের কয়েকটা পাতা খানিক পড়ে শোনাব। আর যা আছে তা না শুনলেও কোন ক্ষতি নেই। একটা কথা, এ ডায়েরির লেখক কে তা ডায়েরি পড়ে জানা যায় না। তবে তিনি যে কলকাতা হাইকোর্টের একজন ম্যাড্‌ভোকেট ছিলেন তাতে সন্দেহ নেই।'

ল্যাম্পটা উস্কাইয়া দিয়া বরদা পড়িতে আরম্ভ করিল,—৭ ফেব্রুয়ারি। আজ মুঙ্গেরে আসিয়া পৌঁছিলাম। ষ্টেশন হইতে পীর-পাহাড় প্রায় মাইল-তিনেক দূরে—শহরের বাহিরে। মুঙ্গের শহরের যতটুকু দেখিলাম, কেবল ধূলা আর পুরাতন সেকেলে ধরণের বাড়ি। যা হোক, আমাকে শহরের মধ্যে থাকিতে হইবে না। ইহাই রক্ষা। ষ্টেশন হইতে আসিতে পথে কেল্লার ভিতর দিয়া আসিলাম। কেল্লাটা মন্দ নয়। পুরাতন মীরকাশিমের আমলের কেল্লা,—গড়খাই দিয়া ঘেরা। প্রাকারের ইটপাথর অনেক স্থানে খসিয়া গিয়াছে। বড় বড় গাছ উচ্চ প্রাচীরের উপর জন্মিয়া শুষ্ক গড়খাইয়ের দিকে ঝুঁকিয়া পড়িয়াছে। একদিন এই গড়ের প্রাচীরে সতর্ক সান্ত্রী পাহারা দিত, প্রহরে প্রহরে দুর্গদ্বারে নাকাড়া বাজিত, সন্ধ্যার সময় লোহার তোরণ-দ্বার ঝনৎকার করিয়া বন্ধ হইয়া যাইত,—কল্পনা করিতে মন্দ লাগে না।

পীর-পাহাড়ের বাড়িখানি চমৎকার। এমন বাড়ি যাহার, সে চিরদিন এখানে থাকে না কেন এই আশ্চর্য্য। যা হোক, পাহাড়ের উপর নির্জ্জন প্রকাণ্ড বাড়িখানিতে একাকী একমাস থাকিতে পারিব জানিয়া ভারি আনন্দ হইতেছে। বন্ধু কলিকাতায় থাকুন, আমি এই অবসরে তাঁহার বাড়িটা ভোগ করিয়া লই।

কলিকাতা হাইকোর্টে প্রায় দেড়মাস ধরিয়া প্রকাণ্ড দায়রা মোকদ্দমা চালাইবার পর সত্য সত্যই বিশ্রাম করিতে হইলে এমন শান্তিপূর্ণ স্থান আর নাই। আমার শরীর যে ভাঙিয়া পড়িয়াছে তাহার কারণ শুধু অত্যধিক পরিশ্রম নয়— মানুষের সহিত অবিশ্রাম সংঘর্ষ। যে-লোক মিথ্যা কথা বলিবে বলিয়া দৃঢ়সঙ্কল্প করিয়া আসিয়াছে তাহার

পেট হইতে সত্য কথা টানিয়া বাহির করা এবং যে-হাকিম বুঝিবে না তাহাকে বুঝাইবার চেষ্টা যে, কিরূপ বুকভাঙা ব্যাপার তাহা যিনি এ পেশায় ঢুকিয়াছেন তিনিই জানেন। মানুষ দেখিলে এখন ভয় হয়, কেহ কথা কহিবার উপক্রম করিলেই পলাইতে ইচ্ছা করে। তাই একেবারে নিঃসঙ্গ ভাবে চলিয়া আসিয়াছি, বামুন-চাকর পর্য্যন্ত সঙ্গে লই নাই। ইক্‌মিক্ কুকার সঙ্গে আছে, তাহাতেই নিজে রাঁধিয়া খাইব।

কি সুন্দর স্থান! পাহাড়ের ঠিক মাথায় উপর বাড়িটি চারিদিকের সমতলভূমি হইতে প্রায় তিন-চার শ' ফুট উঁচে। ছাদের উপর দাঁড়াইলে দেখা যায়, একদিকে দিগন্ত রেখা পর্য্যন্ত বিস্তৃত গঙ্গার চর, তাহার উপর এখন সরিষা জন্মিয়াছে—সবুজ জমির উপর হলুদ বর্ণ ফুলের ফুলিজ, চাহিয়া চাহিয়া চক্ষু স্নিগ্ধ হইয়া যায়। অন্তদিকে যতদূর দৃষ্টি যায় অগণ্য অসংখ্য তালগাছের মাথা জাগিয়া আছে, আরও কত প্রকারের ঝোপ-ঝাড় জঙ্গল; তাহার ভিতর দিয়া গেরিমাটি-ঢাকা পথটি বহু নিয়ে গোলাপী ফিতার মত পড়িয়া আছে। এ যেন কোন্ স্বর্গলোকে আসিয়া পৌঁছিয়াছি। বাড়িতে একটা মালী ছাড়া আর কেহ নাই, সে-ই বাড়ির তত্ত্বাবধান করে এবং দু-চারটা মৃতপ্রায় গোলাপ গাছে জল দেয়। জল পাহাড়ের উপর পাওয়া যায় না, পাহাড়ের পাদমূলে রাস্তার ধারে একটি কুয়া আছে সেখান হইতে আনিতে হয়। মালিটার সহিত কথা হইয়াছে আমার জন্ত দু-ঘড়া জল রোজ আনিয়া দিবে, তাহাতেই আমার স্নান ও পান দুই কাজই চলিয়া যাইবে।

মালীটাকে বলিয়া দিয়াছি, পারতপক্ষে যেন আমার সম্মুখে না আসে। আমি একলা থাকিতে চাই।

৮ ফেব্রুয়ারি। কাল রাত্রে এত ঘুমাইয়াছি যে, জীবনে বোধ হয় এমন ঘুমাই নাই। রাত্রি নয়টার সময় শুইতে গিয়াছিলাম, যখন ঘুম ভাঙিল তখন বেলা সাতটা —ভোরের রৌদ্র খোলা জানালা দিয়া বিছানায় আসিয়া পড়িয়াছে।

গোছগাছ করিয়া সংসার পাতিয়া ফেলিয়াছি। সঙ্গে কিছু চাল ডাল আলু ইত্যাদি আনিয়াছিলাম, তাহাতে আরও তিন-চার দিন চলিবে। ফুরাইয়া গেলে মালীকে দিয়া শহরের বাজার হইতে আনাইয়া লইব। ট্রাঙ্ক-গুলা খুলিয়া দেখিলাম প্রয়োজনীয় দ্রব্য সবই আছে। দাড়ি কামাইবার সরঞ্জাম সাবান তেল আয়না চিরুণী কিছুই ভুল হয় নাই। এক বাণ্ডিল ধূপের কাটিও রহিয়াছে দেখিলাম, ভালই হইল। এখনও অবশ্য একটু শীত আছে, কিন্তু গরম পড়িতে আরম্ভ করিলে মশার উপদ্রব বাড়িতে পারে। চাকরটার বুদ্ধি আছে দেখিতেছি, কতকগুলা বই ও কাগজ পেনসিল ট্রাঙ্কের মধ্যে পুরিয়া দিয়াছে। যদিও এই একমাসের মধ্যে বই স্পর্শ করিব না প্রতিজ্ঞা করিয়াছি তবু হাতের কাছে দু-এক-খানা থাকা ভাল।

বইগুলা কিন্তু একেবারেই বাজে। পরলোক ও ভূতদর্শন, উন্মাদ ও প্রতিভা—এ-সব বই আমি পড়ি না। চাকরটা বোধ হয় ভাবিয়াছে আইন ছাড়া অন্ত যে-কোনো বই পড়িলেই আমি ভাল থাকিব। সে একটু-আধটু লেখাপড়া জানে—সাধে কি বলে, স্বল্পা বিদ্যা ভয়ঙ্করী।

বন্ধুর এখানেও একটা ছোটখাট লাইব্রেরী আছে দেখিতেছি। একটা ক্ষুদ্র আলমারীতে গোটাকয়েক পুরাতন উপন্যাস, অধিকাংশই সম্মুখের ও পশ্চাতের পাতা ছেঁড়া। যা হোক পড়িবার যদি কখনও ইচ্ছা হয়—বইয়ের অভাব হইবে না।

দুপুর বেলাটা ভারি আনন্দে কাটিল। শূন্ত বাড়িময় একাকী ঘুরিয়া বেড়াইলাম। পাহাড়ের উপর এই বৃহৎ বাড়ি কে তৈয়ার করিয়াছিল—ইহার কোনো ইতিহাস আছে কি? কলিকাতায় ফিরিয়া বন্ধুকে জিজ্ঞাসা করিব।

বাড়ি যে-ই তৈয়ার করুক তাহার রুচির প্রশংসা করিতে হয়। যে-পাহাড়ের উপর বাড়িটি প্রতিষ্ঠিত তাহা দেখিতে একটি উল্টানো বাটির মত,—কবি হইলে আরও রসাল উপমা দিতে পারিতাম,—হয়ত সাদৃশ্যটাও আরও বেশী হইত,—কিন্তু আমার পক্ষে উল্টানো বাটিই যথেষ্ট। শাদা বাড়িখানা তাহার উপর মাথা তুলিয়া আছে। বাড়িখানা যেমন বৃহৎ তেমনি মজবুত—মোটা মোটা দেওয়ালের মাঝখানে বিশাল এক একটা ঘর, নিজের বিশালতার গৌরবে শূন্ত আসবাবহীন অবস্থাতেও সর্ব্বদা

গম্‌গম্‌ করিতেছে। বাড়ির সম্মুখে খানিকটা সমতল স্থান আছে, তাহাতে গোলাপ বাগান। গোলাপ বাগানের শেষে ফটক, ফটকের বাহিরেই নীচে যাইবার ঢালু পাথরভাঙা পথ বাঁকিয়া বাড়ির নীচে দিয়া নামিয়া গিয়াছে। ফটকের সম্মুখে কিছুদূরে একটা প্রকাণ্ড কূপ, গভীর হইয়া কোথায় চলিয়া গিয়াছে, তাহার তল পর্য্যন্ত দৃষ্টি যায় না। কূপের চারিপাশে আগাছা জন্মিয়াছে, একটা শিমুলগাছ তাহার মুখের বিরাট গর্ত্তটার উপর ঝুঁকিয়া পড়িয়াছে। কূপের ভিতর এক খণ্ড পাথর ফেলিয়া দেখিলাম, অনেকক্ষণ পরে একটা কাঁপা আওয়াজ আসিল। কূপটা নিশ্চয় শুষ্ক।

সন্ধ্যার সময় কূপের কাছে গিয়া দাঁড়াইলাম। নীচে বেশ অন্ধকার হইয়া গিয়াছে, দূরে দূরে দু-একটা প্রদীপ মিট্‌মিট্‌ করিয়া জ্বলিতে আরম্ভ করিয়াছে, কিন্তু উপরে এখনও বেশ আলো আছে। পশ্চিম দিকটা গৈরিক ধূলায় ভরিয়া গিয়াছে। দেখিতে ভারি চমৎকার। এই বাড়িতে আমার দুই দিন কাটিল।

হঠাৎ কাঁধের উপর একটা স্পর্শ অনুভব করিয়া দেখি, এক ঝলক রক্ত সেখানে পড়িয়াছে। কিন্তু তখনই বুঝিতে পারিলাম, রক্ত নয়—ফুল। শিমুল গাছটায় দু-চারটা ফুল ধরিয়াছিল, ইতিপূর্ব্বে লক্ষ্য করি নাই।

ফুলটি হাতে লইয়া ফিরিয়া আসিলাম। মনে হইল, এই স্থানের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা ফুল দিয়া আমাকে স্বাগত সম্ভাষণ করিলেন।

৯ ফেব্রুয়ারি। আজ শরীরটা ভাল ঠেকিতেছে না; বোধ হয় একটু জ্বরভাব হইয়াছে। মাথার মধ্যে কেমন একটা উত্তাপ অনুভব করিতেছি। মোকদ্দমা লইয়া যে অতিরিক্ত মানসিক পরিশ্রম করিয়াছি তাহার কুফল এখনও শরীরে লাগিয়া আছে; অকারণে স্নায়ুমণ্ডল উত্তেজিত হইয়া উঠে। আজ উপবাস করিয়াছি, আশা করি কাল শরীর বেশ ঝরঝরে হইয়া যাইবে।

১০ ফেব্রুয়ারি। প্রাচীন গ্রীসে সংস্কার ছিল, প্রত্যেক গাছ লতা নদী পাহাড়ের একটি করিয়া অধিষ্ঠাত্রী দেবতা আছে। আধুনিক বিজ্ঞানশাসিত যুগে কথাটা হাস্যকর হইলেও উপদেবতা অধিষ্ঠিত গাছপালার কথা কল্পনা করিতে মন্দ লাগে না। সাঁওতালদের মধ্যেও এইরূপ সংস্কার আছে শুনিয়াছি। যাহারা বনে জঙ্গলে বাস করে তাহাদের মধ্যে এই প্রকার বিশ্বাস হয়ত স্বাভাবিক। মানুষ যেখানেই থাকুক, দেবতা সৃষ্টি না করিয়া থাকিতে পারে না। আমরা সভ্য হইয়া ইট-পাথরের মন্দিরের মধ্যে দেবতার প্রতিষ্ঠা করিয়াছি, যাহারা বনের মানুষ তাহারা গাছপালা নদী-নালাতেই দেবতার আরোপ করিয়া সন্তুষ্ট থাকে। আত্মবিশ্বাসের যেখানে অভাব সেইখানেই দেবতার জন্ম। মানুষ সহজ অবস্থায় ভূত প্রেত উপদেবতা, এমন কি দেবতা পর্য্যন্ত বিশ্বাস করিতে পারে না; ও-সব বিশ্বাস করিতে হইলে রীতিমত মস্তিষ্কের ব্যাধি থাকা চাই। কিন্তু সে যাহাই হোক, উপদেবতার কথা কল্পনা করিতে বেশ লাগে। আমার ঐ শিমুল গাছটার যদি একটা দেবতা থাকিত তাহাকে দেখিতে কেমন হইত? কিংবা অতদূর যাইবার প্রয়োজন কি, এই পাহাড়টারও ত একটা দেবতা থাকা উচিত—তিনিই বা কিরূপ দেখিতে শুনিতে? তিনি যদি হঠাৎ একদিন আমাকে দেখা দেন তবে কেমন হয়?

১১ ফেব্রুয়ারি। দিনের বেলাটা পাহাড়ের উপরেই এধার-ওধার ঘুরিয়া এবং রান্নাবান্নার কাজে বেশ একরকম কাটিয়া যায়। কিন্তু সন্ধ্যার পর হইতে শয়নের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত এই তিন-চার ঘণ্টা সময় যেন কিছুতেই কাটিতে চায় না। এখন কৃষ্ণপক্ষ যাইতেছে, সূর্য্যাস্তের পরই চারিদিক ঘুটঘুটে অন্ধকার হইয়া যায়। তখন পৃথিবী-পৃষ্ঠে সমস্ত দৃশ্য লেপিয়া মুছিয়া একাকার হইয়া যায়, কেবল আকাশের তারাগুলা যেন অত্যন্ত নিকটে আসিয়া চক্ষু মেলিয়া চাহিয়া থাকে। আমি ইক্‌মিক কুকারে রান্না চড়াইয়া দিয়া লণ্ঠন জ্বালিয়া ঘরের মধ্যে নীরবে বসিয়া থাকি। লণ্ঠনের ক্ষীণ আলোয় ঘরটা সম্পূর্ণ আলোকিত হয় না—আনাচে-কানাচে অন্ধকার থাকিয়া যায়।

প্রকাণ্ড বাড়িতে আমি একা।

১২ ফেব্রুয়ারি। মনটা অকারণে বড় অস্থির হইয়াছে। সন্ধ্যার পর হইতে কেবলি মনে হইতেছে যেন কাহার অদৃশ্য চক্ষু আমাকে অনুসরণ করিতেছে, বার-বার ঘাড় ফিরাইয়া পিছনে দেখিতেছি। অথচ বাড়িতে আমি ছাড়া কেহ নাই। স্নায়বিক উত্তেজনা—তাহাতে সন্দেহ

নাই, কিন্তু বড় অস্বস্তি বোধ হইতেছে,—নার্ভের কোনো ঔষধ সঙ্গে থাকিলে ভাল হইত।

১৩ ফেব্রুয়ারি। কাল রাত্রে এক অদ্ভুত ব্যাপার ঘটিয়াছে। আমার স্নায়ুগুলা এখনও ধাতস্থ হয় নাই—কিংবা—

না, না, ও সব আমি বিশ্বাস করি না।

ঘুমাইয়া পড়িয়াছিলাম, অনেক রাত্রে ঘুম ভাঙিয়া গেল। কে যেন আমার সর্ব্বাঙ্গে অতি লঘুস্পর্শে হাত বুলাইয়া দিতেছে! কি অপূর্ব্ব রোমাঞ্চকর সে স্পর্শ তাহা বলিতে পারি না। মুখের উপর হইতে আঙুল চালাইয়া পায়ের পাতা পর্য্যন্ত লইয়া যাইতেছে, আবার ফিরিয়া আসিতেছে। ঘর অন্ধকার ছিল, এই শারীরিক সুখস্পর্শের মোহে কিছুক্ষণ আচ্ছন্ন থাকিয়া ধড়মড় করিয়া বিছানায় উঠিয়া বসিলাম। মনে হইল, কে যেন নিঃশব্দে শয্যার পাশ হইতে সরিয়া গেল।

এতক্ষণে ঘুমের আবেশ একেবারে ছুটিয়া গিয়াছিল, ভাবিলাম—চোর নয় ত? কিন্তু চোর গায়ে হাত বুলাইয়া দিবে কেন? তাহা ছাড়া ঘরের দরজা বন্ধ করিয়া শুইয়াছি। আমি উচ্চকণ্ঠে ডাকিলাম—কে? কোনো সাড়া নাই। গা ছম্‌ছম্ করিতে লাগিল। বালিশের পাশে দেশলাই ছিল, আলো জ্বালিলাম। ঘরে কেহ নাই, দরজা পূর্ব্ববৎ বন্ধ। ভাবিলাম, ঘুমাইয়া নিশ্চয় স্বপ্ন দেখিয়াছি। এমন অনেক সময় হয়, ঘুম ভাঙিয়াছে মনে হইলেও ঘুম সত্যই ভাঙে না—নিদ্রা ও জাগরণের সন্ধিস্থলে মনটা অর্দ্ধচেতন অবস্থায় থাকে।

দ্বার খুলিয়া বাহিরে আসিলাম, খোলা বারান্দায় আসিয়া দেখিলাম এক আকাশ নক্ষত্র জ্বল্‌জ্বল্ করিতেছে। ঘরের বদ্ধ বায়ু হইতে বাহিরে আসিয়া বেশ আরাম বোধ হইল। একটা ঠাণ্ডা হাওয়া বাড়ির চারিদিকে যেন নিঃশ্বাস ফেলিয়া বেড়াইতেছে। কিছুক্ষণ এদিক-ওদিক পায়চারি করিবার পর একটু গা শীত শীত করিতে লাগিল, আবার ঘরে ফিরিয়া দরজা বন্ধ করিয়া শুইলাম। আলোটা নিবাইলাম না, কমাইয়া দিয়া মাথার শিয়রে রাখিয়া দিলাম।

এটা কি সত্যই স্বপ্ন?—রাত্রে আর ভাল ঘুম হইল না।

১৪ ফেব্রুয়ারি। কাল আর কোন স্বপ্ন দেখি নাই। আধ-আশা আধ-আশঙ্কা লইয়া শুইতে গিয়াছিলাম—হয়ত আজ আবার স্বপ্ন দেখিব; কিন্তু কিছুই দেখি নাই। আজ শরীর বেশ ভাল বোধ হইতেছে।

চাল ডাল কেরাসিন তেল ইত্যাদি ফুরাইয়া গিয়াছিল, মালীকে দিয়া বাজার হইতে আনাইয়া লইয়াছি। মালীটা জাতে গোয়ালা হইলেও বেশ বুদ্ধিমান লোক, সেই যে তাহাকে আমার সম্মুখে আসিতে মানা করিয়া দিয়াছিলাম তারপর হইতে নিতান্ত প্রয়োজন না হইলে আমার কাছে আসে না। কখন জল দিয়া যায় আমি জানিতেও পারি না। আমিও আসিয়া অবধি পাহাড় হইতে নীচে নামি নাই, সুতরাং মানুষের সঙ্গে মুখোমুখি সাক্ষাৎ এ-কয়দিন হয় নাই বলিলেই চলে। নীচে রাস্তা দিয়া মানুষ চলাচল করিতে দেখিয়াছি বটে, কিন্তু এতদূর হইতে তাহাদের মুখ দেখিতে পাই নাই।

আজ বাড়িতে চিঠি দিয়াছি, লিখিয়াছি বেশ ভাল আছি। কিন্তু তাহাদের চিঠিপত্র দিতে বারণ করিয়া দিয়াছি। আমার এই বিজন বাসের মাধুর্য্য চিঠিপত্রের দ্বারাও খণ্ডিত হয় ইহা আমার ইচ্ছা নয়। বাহিরের পৃথিবীতে কোথায় কি ঘটিতেছে-না-ঘটিতেছে তাহার খোঁজ রাখিতে চাই না।

১৫ ফেব্রুয়ারি। আজ আবার মনটা অস্থির হইয়াছে। কি যেন হইয়াছে, অথচ ঠিক বুঝিতে পারিতেছি না। শরীর ত বেশ ভালই আছে। তবে এমন হইতেছে কেন?

কাল ভাবিতেছি একবার শহরটা দেখিয়া আসিব। শুনিয়াছি নবাবী আমলের অনেক দ্রষ্টব্য স্থান আছে।

কাছেই কোথায় নাকি সীতাকুণ্ড নামে গরম জলের একটা প্রস্রবণ আছে, বন্ধু বলিয়া দিয়াছিলেন সেটা দেখা চাই। অতএব সেটাও দেখিতে হইবে।

১৬ ফেব্রুয়ারি। কাল রাত্রে আবার সেইরূপ ঘটিয়াছে। স্বপ্ন নয়—এ স্বপ্ন নয়! স্পষ্ট অনুভব করিলাম, কে আমার

পাশে বসিয়া অতি কোমল হস্তে ধীরে ধীরে আমার গায়ে হাত বুলাইয়া দিতেছে। অনেকক্ষণ চোখ বুজিয়া নিস্পন্দ বক্ষে শুইয়া রহিলাম। বালিশের তলায় ঘড়িটা টিক্ টিক্ করিতেছে শুনিতে পাইলাম, সুতরাং এ ঘুমের ঘোরে স্বপ্ন দেখা হইতেই পারে না।

অদৃশ্য হাতটা কতবার আমার আপাদমস্তক বুলাইয়া গেল তাহা বলিতে পারি না। একবার হাতখানা যখন আমার বুকের কাছে আসিয়াছে তখন হাত বাড়াইয়া আমি সেটা ধরিতে গেলাম। মনে হইল আমার মুঠির মধ্যে হাতটা গলিয়া মিলাইয়া গেল। হাত-বুলানোও বন্ধ হইল। অনুভবে বুঝিলাম, সে শয্যার পাশে দাঁড়াইয়া আছে, এখনও যায় নাই। আমি চোখ চাহিয়া শুইয়া রহিলাম—সেও দাঁড়াইয়া রহিল। ঘর অন্ধকার, কিছুই দেখিতে পাইতেছি না,—চোখ খুলিয়া থাকা বা বুজিয়া থাকার কোন প্রভেদ নাই। উৎকর্ণ হইয়া শুনিবার চেষ্টা করিলাম, কোনো শব্দ হয় কি-না। দরজায় কোথাও ঘুণ ধরিয়াছে—তাহারই শব্দ শুনিতেছি। আর কোনো শব্দ নাই।

অতীন্দ্রিয় অনুভূতি দ্বারা বুঝিলাম, সে আস্তে আস্তে চলিয়া গেল; আজ আর আসিবে না। ঘুমাইয়া পড়িলে হয়ত থাকিত। আমি যখনই ঘুমাই, তখনই কি সে আমার সুস্থ শরীরের উপর পাহারা দেয়?

কিন্তু আশ্চর্য্য! আজ আমার একটুও ভয় করিল না কেন?

১৭ ফেব্রুয়ারি। আমার শিমুল গাছ রক্তরাঙা ফুলে ফুলে ভরিয়া উঠিয়াছে। গাছে পাতা নাই, কেবলই ফুল।

সেদিন যে আমার কাঁধের উপর এক ঝলক রক্তের মত ফুল পড়িয়াছিল—সে কি স্বাভাবিক? এত স্থান থাকিতে আমার কাঁধের উপরই বা পড়িল কেন? তবে কি কোনো অদৃশ্য হস্ত গাছ হইতে ফুল ছিঁড়িয়া আমার গায়ে ফেলিয়াছিল? কে সে? বৃক্ষদেবতা? না, আমারই মত কোন মানুষের দেহবিমুক্ত আত্মা? তাই কি? একটা দেহহীন আত্মা! সে আমাকে পাইয়া খুশী হইয়াছে তাহাই কি আকারে ইঙ্গিতে জানাইতে চায়? সে আমার সহিত বন্ধুত্ব স্থাপন করিতে চায় তাই কি সে-দিন ফুল দিয়া আমার সম্বর্দ্ধনা করিয়াছিল?

তবে কি সত্যই প্রেতযোনি আছে? দেহমুক্ত অশরীরী আত্মা! বিশ্বাস করা কঠিন, কিন্তু there are more things in heaven and earth.

একটা বিষয়ে ভারি আশ্চর্য্য লাগিতেছে,—ভয় করে না কেন? এই নির্জ্জন স্থানে একলা আছি, এ অবস্থায় ভয় হওয়াই ত স্বাভাবিক!

১৮ ফেব্রুয়ারি। আনমনে দিন কাটিয়া গেল। শূন্য বাড়িময় কেবল ঘুরিয়া বেড়াইলাম।

পছিয়াঁ হাওয়া দিতেছে—খুব ধূলা উড়িতেছে। গঙ্গার চরের দিকটা বালুতে অন্ধকার, কিছু দেখা যায় না।

আজ কিছু ঘটে নাই। মনটা উদাস বোধ হইতেছে।

১৯ ফেব্রুয়ারি। দিনটা যেন রাত্রির প্রতীক্ষাতেই কাটিয়া গেল। দিনের বেলা কিছু অনুভব করি না কেন?

সন্ধ্যার সময় দেখিলাম, পশ্চিম আকাশে সরু একটি চাঁদ দেখা দিয়াছে—যেন অসীম শূন্যে অপার্থিব একটু হাসি! অল্পক্ষণ পরেই চাঁদ অস্ত গেল, তখন আবার নীরন্ধ্র অন্ধকার জগৎ গ্রাস করিয়া লইল।

ইকমিক্ কুকারে রান্না চড়াইয়া অন্যমনে বসিয়া ছিলাম। আলোটা সম্মুখের ভাঙা টেবিলে বসানো ছিল। অদূরে কতকগুলা ধূপ জ্বালিয়া দিয়াছিলাম, তাহারই সুগন্ধ ধূমে ঘরটি পূর্ণ হইয়া উঠিয়াছিল।

বসিয়া বসিয়া সহসা স্মরণ হইল, বাক্স হইতে সেই প্রেততত্ত্ব সম্বন্ধে বইখানা বাহির করিয়া পড়িতে আরম্ভ করিলাম। গল্প—নেহাৎ গল্প! সত্য অনুভূতির ছায়া মাত্র এ সব কাহিনীতে নাই। আমি যেমন করিয়া তাহাকে অনুভব করিয়াছি, চোখে না দেখিয়াও সর্ব্বাঙ্গ দিয়া তাহার সামীপ্য উপলব্ধি করিয়াছি—সেরূপ ভাবে আর কে প্রত্যক্ষ করিয়াছে?

ইহারা লিখিতেছে, চোখে দেখিয়াছে। চোখে দেখা কি যায়? যে আমার কাছে আসে সে কেমন দেখিতে? আমারই মত কি তার হস্ত পদ অবয়ব আছে? মানুষের চেহারা না অন্য কিছু!

বই হইতে চোখ তুলিয়া ভাবিতেছি এমন সময়

আমার দৃষ্টির সম্মুখে এক আশ্চর্য্য ইন্দ্রজাল ঘটিল। ধূপের কাঠিগুলি হইতে যে ক্ষীণ ধূমরেখা উঠিতেছিল তাহা শূন্যে কুণ্ডলী পাকাইতে পাকাইতে যেন একটা বিশিষ্ট আকার ধারণ করিতে লাগিল। অদৃশ্য কাচের শিশিতে রঙীন জল ঢালিলে যেমন তাহা শিশির আকারটি প্রকাশ করিয়া দেয়, আমার মনে হইল ঐ ধোঁয়া যেন তেমনি কোনো অদৃশ্য আধারে প্রবেশ করিয়া ধীরে ধীরে তদাকারত্ব প্রাপ্ত হইতেছে। আমি রুদ্ধনিঃশ্বাসে দেখিতে লাগিলাম। ক্রমে ধূসর রঙের একটি বস্ত্রের আভাস দেখা দিল। বস্ত্রের ভিতর মানুষের দেহ ঢাকা রহিয়াছে, বস্ত্রের ভাঁজে ভাঁজে তাহার পরিচয় পাইতে লাগিলাম।...ধূমকুণ্ডলী মূর্ত্তি গড়িয়া চলিল, আবছায়া মূর্ত্তির ভিতর দিয়া ওপারের দেয়াল দেখিতে পাইতেছি, কিন্তু তবু তাহার ডৌল হইতে বেশ বুঝা যায় যে, একটা বিশেষ কিছু! ধূম পাকাইয়া পাকাইয়া উর্দ্ধে উঠিতে উঠিতে ক্রমে মূর্ত্তির গলা পর্য্যন্ত পৌঁছিল। এইবার তাহার মুখ দেখিতে পাইব!...কি রকম সে মুখ? বিকট, না ভয়ানক? কিন্তু ঠিক এই সময় সহসা সব ছত্রাকার হইয়া গেল। জানালা দিয়া একটা দমকা হাওয়া আসিয়া ঐ ধূমমূর্ত্তিকে ছিন্নভিন্ন করিয়া দিল। মুখ দেখা হইল না।

প্রতীক্ষা করিয়া রহিলাম যদি আবার দেখিতে পাই। কিন্তু আর সে মূর্ত্তি গড়িয়া উঠিল না।

২০ ফেব্রুয়ারি। সে আছে, তাহাতে তিলমাত্র সন্দেহ নাই। ইহা আমার উষ্ণ মস্তিষ্কের কল্পনা নয়। দিনের বেলা সে কোথায় থাকে জানি না, কিন্তু সন্ধ্যা হইলেই আমার পাশে আসিয়া দাঁড়ায়, আমার মুখের দিকে চোখ মেলিয়া চাহিয়া থাকে। আমি তাহাকে দেখিতে পাই বটে, কিন্তু যাহা দেখিতে পাওয়া যায় না তাহাই কি মিথ্যা? বাতাস দেখিতে পাই না, বাতাস কি মিথ্যা? শুনিয়াছি একপ্রকার গ্যাস আছে যাহা গন্ধহীন ও অদৃশ্য অথচ তাহা আঘ্রাণ করিলে মানুষ মরিয়া যায়। সে গ্যাস কি মিথ্যা?

না সে আছে। আমার মন জানিয়াছে সে আছে।

২১ ফেব্রুয়ারি। কে সে? তাহার স্পর্শ আমি অনুভব করিয়াছি, কিন্তু তাহাকে স্পর্শ করিতে পারি না কেন? ছুঁইতে গেলেই সে মিলাইয়া যায় কেন, সে দেখা দিতে চেষ্টা করে জানি, কিন্তু দেখা দিতে পারে না কেন? রক্তমাংসের চক্ষু দিয়া কি ইহাদের দেখা যায় না?

আমি এখন শয়নের পূর্ব্বে ডায়েরি লিখিতেছি, আর সে ঠিক আমার পিছনে দাঁড়াইয়া আমার লেখা পড়িতেছে। আমি জানি। আমার শরীর রোমাঞ্চিত হইয়া উঠিতেছে। কিন্তু মুখ ফিরাইলে তাহাকে দেখিতে পাইব না—সে মিলাইয়া যাইবে।

কেন এমন হয়? তাহাকে কি দেখিতে পাইব না? দেখিবার কী দুর্দ্দম আগ্রহ যে প্রাণে জাগিয়াছে তাহা কি বলিব। তাহার এই দেহহীন অদৃশ্যতাকে যদি কোনো রকমে মূর্ত্ত করিয়া তুলিতে পারিতাম!

কোনো উপায় কি নাই?

২২ ফেব্রুয়ারি। কাল রাত্রে সে আসে নাই। সমস্ত রাত্রি তার প্রতীক্ষা করিলাম, কিন্তু তবু সে আসিল না। কেন আসিল না? তবে কি আর আসিবে না?

নিজেকে অত্যন্ত নিঃসঙ্গ মনে হইতেছে। আমার প্রতি রজনীর সহচর সহসা আমাকে ফেলিয়া চলিয়া গিয়াছে! আর যদি না আসে?

২৩ ফেব্রুয়ারি। জানিয়াছি—জানিয়াছি! সে নারী।

এ কি অভাবনীয় ব্যাপার, যেন ধারণা করিতে পারিতেছি না। আজ সকালে স্নান করিয়া চুল আঁচড়াইতে গিয়া দেখি, একগাছি দীর্ঘ কাল চুল চিরুণীতে জড়ানো রহিয়াছে। এ চুল আমার চিরুণীতে কোথা হইতে আসিল! বুঝিয়াছি—বুঝিয়াছি। এ তাহার চুল। সে নারী! সে নারী!

কখন তুমি আমার চিরুণীতে কেশ প্রসাধন করিয়া এই অভিজ্ঞানখানি রাখিয়া গিয়াছ? কি সুন্দর তোমার চুল! তুমি আমায় ভালবাস তাই বুঝি আমার চিরুণীতে কেশ প্রসাধন করিয়াছিলে? আমার আরসীতে মুখ দেখিয়াছিলে কি? কেমন সে মুখ? তাহার প্রতিবিম্ব কেন আরসীতে রাখিয়া যাও নাই? তাহা হইলে ত আমি তোমাকে দেখিতে পাইতাম।

ওগো রহস্যময়ি, দেখা দাও! এই সুন্দর সুকোমল চুলগাছি যে-তরুণ তনুর শোভাবর্দ্ধন করিয়াছিল সেই দেহখানি আমাকে একবার দেখাও। আমি যে তোমায়

ভালবাসি। তুমি নারী তাহা জানিবার পূর্ব্ব হইতেই যে তোমায় ভালবাসি।

কেমন তোমার রূপ, যে-শিমুল ফুল দিয়া প্রথম আমায় সম্ভাষণ করিয়াছিলে তাহারই মত দিক-আলো-করা রূপ কি তোমার? তাই কি নিজের রূপের প্রতিচ্ছবিটি সেদিন আমার কাছে পাইয়াছিলে? অধর কি তোমার অমনই রক্তিম বর্ণ, পায়ের আলতা কি উহারই রঙে রাঙা।

কেমন করিয়া কোন্ ভঙ্গীতে বসিয়া তুমি আমার চিরুণী দিয়া চুল বাঁধিয়াছিলে? কেমন সে কবরীবন্ধ! একটি রক্তরাঙা শিমুল ফুল কি সেই কবরীতে পরিয়াছিলে?

আমার এই ছত্রিশ বৎসর বয়স পর্য্যন্ত কখনও আমি নারীর মুখের দিকে চোখ তুলিয়া দেখি নাই। আজ তোমাকে না দেখিয়াই তোমার প্রেমে আমি পাগল হইয়াছি। ওগো অশরীরিণি, একবার রূপ ধরিয়া আমার সম্মুখে দাঁড়াও।

২৪ ফেব্রুয়ারি। তাহার প্রেমের মোহে আমি ডুবিয়া আছি। আহারনিদ্রায় আমার প্রয়োজন কি? আমার মনে হইতেছে এই অপরূপ ভালবাসা আমাকে জর্জ্জরিত করিয়া ফেলিতেছে, আমার অস্থি-মাংস-মেদ-মজ্জা জীর্ণ করিয়া জঠরস্থ অন্নরসের মত আমাকে পরিপাক করিয়া ফেলিতেছ। এমন না হইলে ভালবাসা?

২৫ ফেব্রুয়ারি। আজ সকালে হঠাৎ মালীটার সঙ্গে দেখা হইয়া গেল, তাহাকে গালাগালি দিয়া তাড়াইয়া দিয়াছি। মানুষের মুখ আমি দেখিতে চাই না।

সমস্ত দিন কিছু আহার করি নাই। ভাল লাগে না—আহারে রুচি নাই। তা ছাড়া রান্নার হাঙ্গামা অসহ্য।

গরম পড়িয়া গিয়াছে। মাথার ভিতরটা ঝাঁ-ঝাঁ করিতেছে। কাল সারারাত্রি জাগিয়া ছিলাম।

কিন্তু তাহাকে দেখিতে পাইলাম না। সে কাল আমার পাশে আসিয়া শুইয়াছিল। স্পষ্ট অনুভব করিয়াছি, তাহার অস্পষ্ট মধুর দেহ-সৌরভ আঘ্রাণ করিয়াছি। কিন্তু তাহাকে ধরিতে গিয়া দেখিলাম শূন্য—কিছু নাই। জানি, সে আমার চোখে দেখা দিবার জন্য, আমার বাহুতে ধরা দিবার জন্য আকুল হইয়াছে। কিন্তু পারিতেছে না। তাহার এই ব্যর্থ আকুলতা আমি মর্ম্মে মর্ম্মে উপলব্ধি করিতেছি।

মধ্যরাত্রি হইতে প্রভাত পর্য্যন্ত খোলা আকাশের তলায় পায়চারি করিয়াছি, সেও আমার পাশে পাশে বেড়াইয়াছে। তাহাকে বার-বার জিজ্ঞাসা করিয়াছি, কি করিলে তাহার দেখা পাইব? সে উত্তর দেয় নাই—কিংবা তাহার উত্তর আমার কানে পৌঁছায় নাই।

সকাল হইতেই সে চলিয়া গেল। মনে হইল, ঐ রক্তরাঙা শিমুল গাছটার দিকে অদৃশ্য হইয়া গেল।

চর্ম্মচক্ষে তাহাকে দেখিতে পাওয়া কি সম্ভব নয়?

২৬ ফেব্রুয়ারি। না, রক্তমাংসের শরীরে তাহাকে দেখিতে পাইব না। সে সূক্ষ্মলোকের অধিবাসিনী; স্থুল মর্ত্ত্যলোক হইতে আমি তাহার নাগাল পাইব না। আমার এই জড়দেহটাই ব্যবধান হইয়া আছে।

২৭ ফেব্রুয়ারি। আহার নাই, নিদ্রা নাই। মাথার মধ্যে আগুন জ্বলিতেছে। আয়নায় নিজের মুখ দেখিলাম। একি,সত্যই আমি—না আর কেহ?

আমি তাহাকে চাই, যেমন করিয়া হোক চাই। স্থূল শরীরে যদি না পাই—তবে—?

২৮ ফেব্রুয়ারি। হাঁ, সেই ভাল। আর পারি না।

শিমুল গাছের যে-ডালটা কূপের মুখে ঝুঁকিয়া আছে তাহাতে একটা দড়ি টাঙাইয়াছি। আজ সন্ধ্যায় যখন তাহার আসিবার সময় হইবে—তখন—

সখি আর দেরি নাই, আজ ফাগুনের সন্ধ্যায় যখন চাঁদ উঠিবে, তুমি কবরী বাঁধিয়া প্রস্তুত হইয়া থাকিও। তোমার রক্তরাঙা ফুলের থালা সাজাইয়া রাখিও। আমি আসিব। তোমাকে চক্ষু ভরিয়া দেখিব। আজ আমাদের পরিপূর্ণ মিলনরাত্রি···

* * *

বরদা আস্তে আস্তে ডায়েরি বন্ধ করিয়া বলিল,—এইখানেই লেখা শেষ।

দুর্ব্বোধ্য শিশু ও তাহার শিক্ষা

শ্রীমন্মথনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

আলোচ্য বিষয়টি অতি দুরূহ হইলেও প্রত্যেক গৃহস্থ, মাতাপিতা ও শিক্ষক-শিক্ষয়িত্রীর বিশেষ প্রণিধানযোগ্য। শিশুর শিক্ষা লইয়া মনোবিদ্‌গণ ও শিক্ষকেরা বিব্রত হইয়া পড়িয়াছেন। স্বাভাবিক কারণে মস্তিষ্ক ও স্নায়বিক অপূর্ণতার জন্ম কয়েক প্রকার উনমানসিকতা বা বুদ্ধিবৃত্তির অপূর্ণ বিকাশ দেখা যায়। অসম্পূর্ণ মনোবৃত্তিবিশিষ্টগণের মধ্যে, (ক) প্রথমতঃ কতকগুলিকে 'ইডিয়ট' বা 'জড়' বলা হয়। ইহারা এতই হীনবুদ্ধি যে সাধারণ বিপদ হইতে নিজেদের প্রাণরক্ষা করিতে পারে না। (খ) দ্বিতীয় শ্রেণীকে 'ইম্বেসিল' বা 'জড়কল্প' বলা যাইতে পারে। ইহাদের বুদ্ধিবৃত্তির কিছু উন্মেষ থাকিলেও অন্যের সাহায্য ব্যতীত ইহাদের চলিবার উপায় নাই। (গ) পরিশেষে তৃতীয় শ্রেণীকে 'ফীব্‌ল-মাইণ্ডেড' বা প্রকৃত উনমনস্ক বলা যাইতে পারে। ইহাদের বুদ্ধি কিঞ্চিৎ থাকায় পরের সাহায্য পাইলে কোন প্রকারে কাজ চালাইয়া লইতে পারে এবং সময় সময় নিজেদের জীবিকাও অর্জ্জন করিতে পারে। ইহারা সকলেই, অর্থাৎ এই তিন শ্রেণীর শিশু, সাধারণ বিদ্যালয়ে কোনক্রমেই শিক্ষালাভ করিতে পারে না। বলা বাহুল্য, উনমনস্ক শিশুরা সাধারণতঃ চক্ষুকর্ণ প্রভৃতি জ্ঞানেন্দ্রিয়ের বিকলতা ব্যতিরিক্ত প্রধানতঃ মস্তিষ্কের দোষেই এই অবস্থা প্রাপ্ত হইয়া থাকে। পুরুষানুক্রমিক বুদ্ধিযন্ত্রের দৌর্ব্বল্য, মানসিক রোগ এবং আগন্তুক ভীষণ ব্যাধির প্রভাব এবং 'ডাক্টলেস্ গ্লাণ্ডসের' অর্থাৎ নলবিহীন গ্রন্থিসমূহের ক্রিয়াবৈষম্যহেতু এই মানসিক বিকলতাগুলি উৎপন্ন হয়।

বুদ্ধি মান এবং চরিত্র মান

পণ্ডিতেরা কিন্তু আরও লক্ষ্য করিয়াছেন, যে, কেবল বুদ্ধি-মাপের উপর চলিলে সকল শিশুর শিক্ষার সামঞ্জস্য করিতে পারা যায় না। এমন অনেক শিশু দেখিতে পাওয়া যায় যাহাদের বুদ্ধি বয়সের অনুপাতে উন বা অল্প নহে। আবার দুর্ব্বোধ্য শিশুর কোন্‌খানে গোল ঠেকে, তাহার আলোচনা করিতে করিতে গেসেল ও ওয়াটসন প্রভৃতি মনোবিদ্‌গণ শিশুর জন্মের পর হইতে বিদ্যালয়-প্রবেশের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত কাল কিরূপে তাহার বুদ্ধি ও সহজ প্রেরণাগুলির (instinct) বিকাশ হয় সে-সম্বন্ধে মৌলিক আলোচনা করিয়াছেন। মনোবিদ্‌গণ বুঝিতে পারিয়াছেন, অতি শৈশবকাল হইতে বিদ্যালয়ে শিক্ষক-শিক্ষয়িত্রীর নিকট আসিবার পূর্ব্বেই উনমানসিকতার সূত্রপাত হয়।

আজকাল আর বুদ্ধি-মাপপ্রণালীর উপর সম্পূর্ণ নির্ভর নাই। ব্যক্তিত্ব ও চরিত্রের গতির অনুসন্ধানের উপর বিলক্ষণ দৃষ্টি পড়িয়াছে। উহাতে প্রায় অন্যূন পঞ্চাশটি বিষয়ে শিশুর চরিত্র পরীক্ষা করা হয়। নিম্নে ঐ প্রকারের একটি তালিকা কোন পুস্তক হইতে অনূদিত হইল।

সামাজিক—

১। শিশু একা একা খেলা করে, না অন্যের সহিত খেলা করে?
২। সে অন্য শিশুদের ছাড়িয়া থাকে, না তাহাদের মধ্যে অগ্রসর হয়?
৩। অন্য লোকের সহিত কিরূপ ব্যবহার করে—ভদ্র না কর্কশ?
৪ আবশ্যক হইলে অন্য শিশুকে সাহায্য করে কি-না?
৫ শান্ত থাকে, না গোলযোগ উৎপন্ন করে?
৬ অন্যের ব্যবহার লক্ষ্য করে, কি অগ্রাহ্য করে?
৭ বয়স্ক শিশুদের চালনা করিতে চায়, না অনুসরণ করে?
৮ নিজ অধিকার রক্ষা করিতে চায় কি না?
৯ অন্য শিশুরা তাহাকে পছন্দ করে কি-না?
অন্যের উপর আধিপত্য করিতে চায় কি-না?
স্বার্থপর কি-না?
অন্যের প্রতি সহানুভূতি আছে কি-না?
১৩ অনুরাগ বা স্নেহ প্রবৃত্ত শিশুর আছে কি-না?
১৪ ধরাবাঁধা পদ্ধতি অনুযায়ী কাজ করিতে চায় কি-না?
১৫ খুব বেশী কথা বলে কি না?
১৬ খুব বেশী চুপ করিয়া থাকে কি?

১৭। অনাহূতভাবে শিশু পরের ব্যাপারে প্রবেশ চায়, না অনধিকার বিষয়ে নিজের মতানুযায়ী কাজ করিয়া যায়?
১৮। অপরের মনোযোগ আকর্ষণ করে, কি করে না?
১৯ কর্ত্তৃপক্ষের নিয়ম মানিয়া চলে, না বিরুদ্ধাচরণ করে?
২০ কথার বাধ্য কি-না?
২১ সমালোচনায় বেশী বিচলিত হয়, না গ্রাহ্যই করে না?
বয়স্ক লোকের অনুপস্থিতিতে শিশু বিশ্বাসযোগ্য কিনা?

ব্যক্তিগত—

২৩। স্বাধীন, না অন্যের উপর নির্ভর করে?
২৪। নিজের উপর শিশুর বিশ্বাস আছে কি-না?
২৫। কর্ম্মশীল, না অলস?
২৬। শান্ত, না গোলমাল করে?
২৭। কোন কাজ শীঘ্র করিতে পারে, না বিলম্ব করে?
২৮। অধ্যবসায় আছে, না শীঘ্রই আশা ছাড়িয়া দেয়?
২৯। সাবধানী, না অসাবধান?
৩০। উদ্দেশ্যবিহীন, না উদ্দেশ্য লইয়া কাজ করে?
৩১। একাগ্রতা আছে, না সহজেই অন্যমনস্ক হয়?
৩২। অনুসন্ধিৎসু কি-না?
৩৩। জিনিষপত্র (তছ্‌নছ্‌) নষ্ট করে কি?
৩৪। খেলাধূলার মধ্যে শিশুর মৌলিকতা আছে কি-না?
৩৫। শিশুর কল্পনাশক্তি আছে, না কল্পনার ধার ধারে না?

ভাবনা-বিষয়ক—

৩৬। প্রফুল্ল, না গম্ভীর প্রকৃতি?
৩৭। মেজাজ সহজেই পরিবর্ত্তিত হয় কি-না?
৩৮। শিশুর কার্য্যপ্রবৃত্তি স্বতঃই ফুটে, না নিজের ভিতর সংযত থাকে?
৩৯ নিজের সম্বন্ধে কোন ধারণা আছে কি-না?
৪০ অল্প কারণে শিশুর মন খারাপ হয়, না সে দৃঢ় থাকে?
৪১ প্রতারণা করে কি না?
৪২ সহজেই উত্তেজিত হয় কি না?
৪৩ অল্পেই কাঁদিয়া উঠে, না চক্ষের জল সংবরণ করিতে পারে?
সাহসী, না ভীরু?
শিশুকে কেহ লক্ষ্য করিলে সে অত্যধিক বিচলিত হইয়া পড়ে কি?
(৪৬) শিশু ভাবিয়া চিন্তা করিয়া কোন কাজ করে, না ঝোঁকের মাথায় করে?
(৪৭) হঠাৎ ক্রোধশীল কি-না?
(৪৮) মনে মনে অপ্রসন্ন হইয়া গোঁ ধরিয়া থাকে কি?
(৪৯) ধীর না অস্থির?
(৫০) ক্ষমাশীল না প্রতিশোধপরায়ণ?

মোটা কথায় বলিতে হইলে এখানেও মনোবিদ্‌দিগের মতভেদ। মনোসমীক্ষিগণের গবেষণার ফলে সমস্যা সমাধানের দিকে আসিতেছে। এই ব্যাপারটি আমি কয়েকটি উদাহরণ দিয়া বুঝাইতে চাহি।

দুর্ব্বোধ্য শিশুর লক্ষণ

গত ছয় মাসের মধ্যে আমি কয়েকটি বালককে পড়াশুনায় গোলযোগের কারণ নির্দ্ধারণের জন্য বিজ্ঞান কলেজে পরীক্ষা করিয়াছি। ঐ বালকদের বয়স আট হইতে পনর বৎসরের ভিতর। উহাদের কাহারই উনমানসিকতা নাই অর্থাৎ বুদ্ধি-মাপের দ্বারা কিছু বৈলক্ষণ্য দেখা যায় না অথচ তাহাদিগকে লইয়া মাতাপিতা ও শিক্ষকগণ বিব্রত হইয়া পড়িয়াছেন—তাহারা সকলেই দুর্ব্বোধ্য বালক। কেহ বা সব ভুলিয়া যায়, কেহ বা অন্যমনস্ক পড়িতে বসিলেই অন্য জিনিষ ভাবে, কেহ বা রচনা পারে না, কেহ বা অঙ্কশাস্ত্রে বিতৃষ্ণ, কেহ বা একগুঁয়ে, কেহ বা ঝগড়াটে, কেহ বা চুরি করে, কেহ পড়িতে চায় না, কেহ বা স্কুল পালায়, কেহ বা 'কুনো,' কেহ বা ভীরু, অল্প কারণে কাঁদিয়া উঠে, চোখে জল আসে, কাহারও বা পড়া ভাল লাগে না, কেহ বা শাসন মানে না, কেহ বা উদ্ধত, কেহ বা লাজুক; কেহ বা নির্লজ্জ, কেহ বা যাহা বলা যায় তাহার বিপরীত করে, কেহ বা স্বার্থপর, কেহ বা অশ্লীল ভাষা ও ব্যবহারে পটু, কেহ বা দুষ্ট, কেহ বা রাত্রিতে বিছানায় প্রস্রাব করে, কেহ বা হাতের বুড়ো আঙুল চোষে, কেহ বা ঘুমাইতে ঘুমাইতে ভয় পাইয়া কাঁদিয়া উঠে, কেহ বা ত্রুটি দেখাইলে অত্যন্ত চটিয়া যায়, কেহ বা মিথ্যাবাদী, কেহ বা হিংস্র, কেহ বা নির্দ্দয়, কেহ বা জিনিষপত্র চূর্ণবিচূর্ণ করে, কেহ বা নিজেদের পারিবারিক অবস্থায় অত্যন্ত অসন্তুষ্ট, কাহারও বা কোন কিছু করিবার প্রবৃত্তি প্রবল, নিজেকে মোটেই সংযত করিতে পারে না। তাহা হইলে কথা দাঁড়াইতেছে, যে, বুদ্ধি আছে অথচ পড়াশুনা হইতেছে না। তাহা হইলে গলদ কোথায়? এই গলদের হেতু পিতামাতা, অভিভাবক ও শিক্ষকগণের অজ্ঞাত। ইহার একটি উত্তর আছে। গলদের মূলসূত্র শিশুর ভাবরাজ্যে, জ্ঞানরাজ্যে নহে। শিশুর সকল জ্ঞানই তাহার ভবিষ্যৎ জীবনে কিরূপ কাজে আসিবে তাহার দিক দিয়া মনে 'ভাল' বা 'মন্দ' এই প্রকার বেদনা (feeling) সংশ্লিষ্ট হইয়া স্মৃতিপথে গ্রথিত হয়। ভবিষ্যতে সে উহা চায় বা প্রত্যাখ্যান করে।

প্রায় অর্দ্ধ শতাব্দী ধরিয়া পাশ্চাত্য জগতে প্রাচীন ও নব্য মনোবিদ্‌গণের মধ্যে খুব বিবাদ চলিতেছিল। প্রাচীনপন্থীরা মানুষের জ্ঞানকাণ্ডের উপর জোর দিতেন এবং সেই ধারায় মনোবিজ্ঞান চলিয়া আসিতেছিল। কিন্তু নব্য মনোবিৎ মনোসমীক্ষিগণ বলিতেছিলেন কেবল জ্ঞানের উপর জোর দিলে চলিবে না। আমাদের জ্ঞানধারা মনের সম্পূর্ণ বস্তু নহে। উহা প্রবমান হিমশিলার ন্যায় জ্ঞানালোকে প্রায় দশমাংশ পরিমাণ পরিদৃশ্যমান। মনের অধিকাংশই আমাদের নিজ্ঞানের বা বিস্মৃতির অন্ধকারে নিমজ্জিত। আর জ্ঞাত ও অজ্ঞাত ভাবপরম্পরা (feelings and emotions) অজ্ঞাতসারে আমাদের জ্ঞানবিষয়ীভূত চিন্তাধারা নিয়ন্ত্রিত করিতেছে।

জ্ঞান এবং ভাবনার মধ্যে কে বুদ্ধিবৃত্তি বা চিন্তাধারাকে প্রণোদিত করে এই লইয়া বহু তর্কবিতর্কের ফলে ক্রমশঃ প্রাচীন ও নব্য মনোবিদ্‌দিগের মধ্যে একটা সামঞ্জস্য আসিতেছে। মনোসমীক্ষিগণ প্রমাণ করিয়াছেন যে, আমাদের কোন চিন্তাই স্বাধীন নহে এবং নির্জ্ঞানের দ্রব্যগুলিই ভূগর্ভস্থ শক্তির ন্যায় মনের জ্ঞানস্তরে পরিবর্ত্তন সাধন করিতেছে। এই মূলসূত্র অনুধাবন করিলে মানসিক যাবতীয় ব্যাপার—চিন্তাধারা, কার্য্যকলাপ, কি সুস্থাবস্থার কি বিকারে, কি অপরাধ প্রবৃত্তিতে, কি শিশুর চরিত্র-বৈচিত্র্যে—সব বস্তুর সমাধান হয়। বর্দ্ধমান শিশুর অশিষ্ট ব্যবহারের অনুধাবন করিয়া মনোবিদ্‌গণ কয়েকটি সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন।

(ক) প্রত্যেক দুর্ব্বোধ্য শিশুর অশিষ্ট ব্যবহারের সংশোধনের জন্য ব্যক্তিগতভাবে চেষ্টা করিতে হইবে।

(খ) শিশুর প্রাথমিক আবেগজনিত মনোভাব (sentiment) প্রথমে অতীব স্বার্থপরতার উপর প্রতিষ্ঠিত। শিশু স্বভাবতঃ হিংস্র ও প্রতিহিংসাপরায়ণ। অন্যের উপর প্রথমতঃ কোন সমবেদনা থাকে না। ক্রমে ক্রমে তাহার স্বার্থপরতা শ্লথ হয়। সকলের সহিত সামাজিকভাবে মিশিতে গেলে যে-সকল প্রবৃত্তির উন্মেষ হওয়া আবশ্যক সেগুলি কারণবিশেষের জন্য যথোপযুক্ত-ভাবে পরিস্ফুট হয় না।

(গ) শিশুর কল্পনা-রাজ্যে ও বাস্তব জগতে প্রভেদ জ্ঞান অতি অল্প এবং ইহা ক্রমে ক্রমে বর্দ্ধিত হইয়া থাকে। এই জন্য না জানিয়া সে মিথ্যা ব্যবহার করে।

(ঘ) শিশুর দৈহিক কার্য্যকলাপে বাধা দিলে তাহার মানসিক উন্নতির বিশেষ ক্ষতি হয়। অনেক পিতামাতা খেলাতে যে-সময় নষ্ট হইবে সেই সময় পড়াতে দিলে কাজ হইবে, ভাবিয়া শিশুর খেলা বন্ধ করিয়া শিশুর বিদ্যায় সুফলের কথা দূরে থাকুক শিশুর মানসিক অবনতি উৎপাদন করেন।

(ঙ) শিশুর সর্ব্বাঙ্গীন ব্যক্তিগত উন্নতির জন্য মাতাপিতার স্নেহ সমধিক পরিমাণে আবশ্যক করে। যাহারা পিতামাতার মৃত্যু বা অন্য কারণে পরের নিকট প্রতিপালিত হয় তাহাদের লালনে অনেক ত্রুটি ঘটিয়া থাকে। প্রাকৃতিক নিয়মে আবার মাতাপিতার স্নেহাতিশয্যবশতঃ একমাত্র সন্তান ও প্রথম বা কনিষ্ঠ সন্তানের মানসিক অবনতি হয় ও নিজের উপর নির্ভর কমিয়া যায়। আবার দেখা যায়, জারজ শিশুর মনোবৃত্তি পরিস্ফুটনে অনেক বাধা ঘটে। নিজেকে অপরের অপেক্ষা হীন, এই বোধ মনোন্নতির পরিপন্থী।

(চ) শিশুর অশিষ্ট ব্যবহারের মূল কারণ তাহার ভ্রাতাভগিনীর উপর, নিজের উপর, মাতাপিতার উপর অত্যধিক ভালবাসা অর্থাৎ বালকের মাতার উপর ও বালিকার পিতার উপর; অপিচ বালকের পিতৃবিদ্বেষ, বালিকার মাতৃবিদ্বেষ, তাঁহাদিগের উপর বহু অভিযোগ, তীব্র ঈর্ষা, বিদ্বেষ, হিংসা ও তাহাতে সময়ে সময়ে নিজ ব্যর্থতা, এবং মাতাপিতা বা অন্য কোন লোক, যিনি শিশুকে ভালবাসেন, তাঁহাকে এবং শিশুর নিজেকে কষ্ট দিবার অজ্ঞাত প্রবৃত্তি।

(ছ) পারিগার্ভিক হইলে, অর্থাৎ অল্প বয়সে শিশুর "এঁড়ে" লাগিলে, শিশু মাতার উপর অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হয়, তাঁহার মৃত্যু কামনা করে। পরে অনুজ শিশুর উপর অত্যন্ত হিংসা করে। সে পিতামাতার নিকট হইতে পূর্ব্বের ন্যায় স্নেহ পায় না। মাতৃপিতৃস্নেহের অংশীদার অনুজের উপর তীব্র বিদ্বেষ বা হিংসা প্রবৃত্তি কতকটা রুদ্ধ হইয়া বিনা কারণে অপরের অনিষ্ট চিন্তা, অপরের প্রতি বাক্‌পারুষ্য, সংসারের দ্রব্যাদি ও জিনিষপত্রাদি নষ্ট বা 'তছনছ'

করিবার প্রবৃত্তি, অশান্ততা, হিংস্রতা, ক্রোধ প্রভৃতিতে প্রকাশ পায়। শিশু অত্যন্ত প্রতিহিংসাপরায়ণ। তাহার হিংসা বা প্রতিক্রিয়া প্রবৃত্তি অনেক সময়ে স্থানভ্রষ্ট হওয়াতে সাধারণ ব্যক্তির দৃষ্টি এড়াইয়া যায়। মূর্খ পিতামাতার অতিরিক্ত ও মুহুর্মুহু তাড়নে শিশু "মারকুটে বা মার-ঘেচড়া" হইয়া যায়। তাহার শাসনের সুফল হয় না বরং পিতামাতার প্রহারের প্রত্যুত্তর শিশু অন্তের উপর এবং অন্য প্রণালীতে দিয়া থাকে।

(জ) শিশু যাহাদের ভালবাসে তাহাদিগকেই আদর্শ করিয়া লয়, তাহার অনুকরণ করিয়া কথা বলিতে শিখে, কার্য্যেরও অনুকরণ করে। পুনঃপুনঃ শুনিয়া পরিদৃশ্যমান বস্তু ও ব্যাপারসমূহের নাম আয়ত্ত করে, কোন্ অবস্থায় কি করা হয় তাহা জানে। তাঁহাদিগের সঙ্গে মিশিয়া কোন্‌টি সামাজিক ও নৈতিক হিসাবে 'ভাল' বা 'মন্দ' বলিয়া বিবেচিত হয় তাহা বুঝিতে পারে। জীবনের মধ্যে শৈশবেই জ্ঞানার্জ্জন ও বুদ্ধিবিকাশের গতি অতি ক্ষিপ্র। সুতরাং শিশুর শিক্ষাদীক্ষা সমস্তই তাহার মাতাপিতা ভ্রাতাভগিনী পরিচারিকা ও বাটির অভিভাবকবর্গের আচরণের উপর নির্ভর করে। শিশুরা স্বতঃই কে তাহাকে ভালবাসে, কে বিরূপ, বুঝিতে পারে। শিশু যে শিক্ষক বা শিক্ষয়িত্রীর নিকট আদর-যত্ন পায় তাঁহার বাধ্য হয় এবং তাঁহার শিক্ষণীয় বিষয় সহজেই আয়ত্ত করে।

(ঝ) অনেক মাতাপিতা মনোবিদ্যার সম্পূর্ণ অজ্ঞতায় মনে করেন শিশুকে শিক্ষা দিতে হইলে কায়িক শাসন ও ভয়প্রদর্শনই প্রধান উপায়। তাঁহারা জানেন না যে, ভয়প্রদর্শনের কি বিষময় ফল হয়। ভীতু শিশু অত্যন্ত অন্তর্মুখীন হইয়া পড়ে। নির্জীব শান্ত শিশুই তাঁহারা তৈয়ারী করিতে চান কিন্তু জানা উচিত যে, দুর্দ্দান্ত শিশুই ভবিষ্যতে সমধিক উন্নতিলাভ করে।

(ঞ) শিশুরা অতিশয় অনুসন্ধিৎসু, পরিবারের ভিতর মাতাপিতার কলহ ও পরস্পরের প্রতি দুর্ব্যবহার এবং পরস্পরের প্রতি শিশুর সমক্ষে অসংযত ও অশিষ্ট ব্যবহার শিশুর অশেষ মানসিক অবনতির কারণ হইয়া থাকে।

(ট) এই সকল কারণ বর্ত্তমান থাকিলে শিশুর ভাবরাজ্যের সরলগতি (emotional life) নষ্ট হইয়া যায় এবং তাহার ফলে শিশু মানসিক বিকারগ্রস্ত অথবা অপরাধপ্রবণ হইয়া পড়ে। যদি এই দুইটির কোনটি না ঘটে তবে শিশুর বুদ্ধিবৃত্তির উন্মেষের প্রাখর্য্য নষ্ট হইয়া যায়, শিশু পাঠ্য-বিষয়ে ও ভবিষ্যৎ উন্নতিতে অনাবিষ্ট হইয়া পড়ে। শিশু বয়সের বৃদ্ধির সহিত কিশোর-কিশোরী, যুবক-যুবতীতে পরিণত হয় বটে, কিন্তু প্রতিযোগিতাসঙ্কুল জগদ্‌ব্যাপারের ব্যবহার করিবার সামর্থ্য তাহার জন্মে না। সে মানসিক ব্যাপারে শৈশব মনোবৃত্তি পোষণ করিয়া থাকে।

অভিভাবক ও শিক্ষক-শিক্ষয়িত্রীর দায়িত্ব

মাতাপিতা ও অভিভাবকবর্গ স্ব-স্ব অজ্ঞতায় গৃহে দুর্ব্বোধ্য শিশু প্রস্তুত করিয়া বিদ্যালয়ে প্রেরণ করেন এবং মনে করেন বিদ্যালয়ের শাসনে তাহার সর্ব্বাঙ্গীন কুশল হইবে। অনেক বিদ্যালয়ে আবার শিশুর ব্যক্তিগতভাবে যত্ন করিবার প্রথা নাই। শিক্ষক-শিক্ষয়িত্রীগণও অনেকেই তাঁহাদের মামুলী প্রথায় চলিয়া শিক্ষাকার্য্যে ব্রতী হন। মনোবিদ্যার সহিত তাঁহাদের পরিচয় না থাকাতে, রীতিমত শাসন ও নিয়মের দ্বারা শিশুর দুর্ব্বোধ্যতা যাহা-কিছু বাকী থাকে তাহা সম্পূর্ণ করিয়া দেন।

শ্রেণীতে প্রবেশের সময়ে, শিক্ষার সময়ে, পরীক্ষা গ্রহণের সময়ে ও উচ্চতর শ্রেণীতে উন্নয়নের সময়ে তাঁহারা নিয়মানুযায়ী কাজ করেন। এক ঘণ্টা বা দুই ঘণ্টা পরীক্ষা করিয়া শিশুর শিক্ষার দৌড় শীঘ্র নির্দ্ধারণ করা অতি কঠিন ব্যাপার। উহা মনোবিদ্যার জ্ঞান অপেক্ষা করে। আবার যাঁহারা পরীক্ষা করেন, তাঁহারা সাধ্যমত আয়াস স্বীকার করেন না। অথচ এই পরীক্ষার উপর অতিরিক্ত গুরুত্ব আরোপ করা হয়। বিষয় অতি গুরু বটে, কিন্তু অকিঞ্চিৎকর পরীক্ষার উপর শিশুর আয়ুষ্কালের বর্ষপরিমাণ নির্ভর করে। অনেক সময়ে আবার ভূয়োদর্শনের অভাব অথবা পরীক্ষকের ব্যক্তিগত কঠিন প্রকৃতি জন্য পরীক্ষার উদ্দেশ্য একেবারেই ব্যর্থ হইয়া যায়। যাহার পাঠে যত্ন ও চেষ্টা আছে, পরীক্ষায় তাহার কোন ন্যূনতা দৃষ্ট হইলেও তাহাকে আটকাইয়া রাখা কতদূর সমীচীন তাহাতে

মতভেদ থাকিতে পারে, কিন্তু বিফলতাজনিত আঘাত শিশুর মনে কতটা হয় এবং তাহার পরিণাম কি হইতে পারে তাহা কর্ত্তৃপক্ষের ভাবিবার বিষয়। মনের কথা বাদ দিয়া কেবল নিয়ম মানিয়া চলিলে নিয়মের মূল উদ্দেশ্যের ব্যর্থতা ঘটে। পরীক্ষা প্রতিযোগী ব্যতীত ব্যক্তিগতও হওয়া উচিত।

অনেক শিক্ষক-শিক্ষয়িত্রী গীতার "কর্ম্মণ্যেবাধিকারস্তে মা ফলেষু কদাচন" এই উপদেশ অনুযায়ী কার্য্য করেন। তাঁহাদের কর্ম্মের ফল শিশুর উপর কি হইবে তাহা বুঝিবার শক্তি অনেক ক্ষেত্রে তাঁহাদের থাকে না। সমবেদনার অত্যন্ত অভাব এবং 'দিনগত পাপক্ষয়' করিয়া তাঁহারা কর্ত্তব্য কর্ম্ম সম্পাদন করেন। অনেকেরই স্ব-স্ব কর্ম্মে আস্থা নাই। তাঁহাদের মনে পড়ে না যে, বিদ্যালয়ে শিশুর শিক্ষা ও পরিচালন সন্তানপালনের অনুকল্পস্বরূপ, এবং হয়ত বা নিজ নিজ ক্ষমতা দুর্ব্বল অসহায় শিশুদের উপর চরিতার্থ করিবার অজ্ঞাত প্রবৃত্তিই শিক্ষক-শিক্ষয়িত্রীর কার্য্যে তাঁহাদিগকে প্রযুক্ত করিয়া থাকিতে পারে। তাঁহারা মনে করেন যে যদি কোন দুর্ব্বোধ্য শিশুকে তাঁহারা করায়ত্ত করিতে না পারেন সে দোষ তাঁহাদেরই। যতক্ষণ না শিক্ষক-শিক্ষয়িত্রী শিশুকে ব্যক্তিগতভাবে বুঝিয়া তাহার উন্নতির জন্য যত্নবান বা যত্নবতী না হইবেন, দুর্ব্বোধ্য শিশুর সংখ্যা হ্রাস হইবে না।

যে-সমস্ত শিশু সাধারণ অপেক্ষা বিশেষ পারদর্শী (super-normal) তাহাদিগকে নিয়মানুযায়ী শ্রেণীতে আটকাইয়া রাখা উচিত নহে। আর যে-সব শিশু সাধারণ অপেক্ষা নিকৃষ্ট (sub-normal) তাহাদিগকে বর্ষের পর বর্ষ ধরিয়া এক শ্রেণীতে নিয়মানুযায়ী উন্নয়ন বন্ধ করিয়া ভাল করিয়া পুরাণ পড়া পড়াইলে বিশেষ ফল দর্শিবে না। যদি তাহাদের উনমানসিকতা না থাকে তাহা হইলে বুঝিতে হইবে শিক্ষক-শিক্ষয়িত্রীর শিক্ষাপ্রণালীতেই ত্রুটি আছে। ঐ ত্রুটির মধ্যে যেটি সাধারণ ও সর্ব্বাপেক্ষা অনিষ্টকারী তাহার বিলোপ করিতেই হইবে। তাহা আর কিছুই নহে, 'না বুঝাইয়া মুখস্থ করান' এবং না পারিলে তাহাকে সহপাঠীর চক্ষে হেয় ও হীন করিয়া শাসন। দিন কতটুকু পড়া শিশু আয়ত্ত করিতে পারে তাহা অনেকেরই বোধ নাই। কিছুদিন ধরিয়া এইরূপ করিতে করিতে অনেক শিক্ষক-শিক্ষয়িত্রী শিশুর মনে ঐ বিষয়ের কাঠিন্য অতীব গুরুতর করিয়া ফেলেন। তাঁহারা ভুলিয়া যান, যে কোন শিক্ষণীয় বিষয়ে শিশুর চিত্তে আকর্ষণ উৎপাদন করাই বিদ্যালয়ে তাঁহাদের সর্ব্বপ্রথম কর্ত্তব্য ও উদ্দেশ্য হওয়া উচিত। তাঁহাদের এ-বিষয়ে ত্রুটির জন্য তাঁহারা শিশুর নিকট যাবজ্জীবন অকৃতজ্ঞতা ও গালির পাত্র হইয়া থাকেন।

দুর্ব্বোধ্য শিশুকে সরল করিতে হইলে প্রথমে মাতা-পিতার ও পরিবারের ব্যবহারের পরিবর্ত্তন ও সামঞ্জস্য আনয়ন এবং আবশ্যক হইলে পারিপার্শ্বিক অবস্থার পরিবর্ত্তন করিতে হইবে। এগুলি অধিকাংশ স্থলেই সহজ-সাধ্য নহে। যতদিন পর্য্যন্ত সাধারণের মধ্যে, মাতা-পিতা ও শিক্ষক-শিক্ষয়িত্রীর মধ্যে মনোবিদ্যার মূল সূত্রগুলি প্রচারিত ও গৃহীত হইবে, ততদিন দুর্ব্বোধ্য শিশু থাকিবেই, এবং দুর্ব্বোধ্য শিশুকে যথেচ্ছ পরিমাণে সরল করিবার চেষ্টা ফলবতী হইবে না। এইজন্য আমার মতে প্রত্যেকেরই Cyril Burt প্রণীত *How the Mind Works* (British Broadcasting Corporation), Fitz Wittels প্রণীত *Set the Children free* (George Allen), Anna Freud প্রণীত *Psycho-analysis for Teachers*, Grace W. Pailthorpe প্রণীত *Psychology of Delinquency* এবং Melanie Klein প্রণীত *Child Analysis* গ্রন্থ পাঠ করা উচিত।

এক্ষণে পিতামাতা ও শিক্ষক-শিক্ষয়িত্রীগণের সাহায্যের জন্য কয়েকটি নিয়ম সংগ্রহ করিয়া দিতেছি।

১। অসীম ধৈর্য্য, শিশুর প্রতি সমবেদনা এবং শিক্ষাকার্য্যের প্রতি প্রীতি—এইগুলি শিক্ষক-শিক্ষয়িত্রীর অত্যাবশ্যক গুণ বলিয়া বুঝিতে হইবে।

২। যে-বিষয় শিক্ষা দিতেছেন, শিশুর মনে সেই বিষয়ের প্রতি আকর্ষণ ও কৌতূহল উৎপাদন বা উদ্বোধন করাই শিক্ষক-শিক্ষয়িত্রীর প্রথম কর্ত্তব্য। এইরূপে শিশুর মনে শিক্ষণীয় বিষয়ের প্রতি অনুরাগ জাগাইয়া দিয়াই শিক্ষক-শিক্ষয়িত্রী শিশুর যথেষ্ট উপকার সাধন করিতে পারেন এবং এই পন্থা অবলম্বন করিলে শিশুর কোন বিষয়ে অপারদর্শিতা বা হীনতা দূর করিতে পারিবেন।

৩। ছাত্র বা ছাত্রী যখন ক্লান্ত, অনিচ্ছুক বা নিদ্রালু হইয়া থাকে সেই সময়ে তাহাকে জোর করিয়া কিছু পড়ান কোন কাজেই আসে না।

৪। শিক্ষক-শিক্ষয়িত্রী যদি কোন বিষয় ধরিয়া ক্রমাগত অনেকক্ষণ বুঝাইবার চেষ্টা করেন তাহাতে পাঠক-পাঠিকার মনে একঘেয়ে ভাব আসে, মনোযোগ দিবার পরিবর্ত্তে অনাবিষ্ট হইয়া ক্রমে তাহারা নিদ্রালু হইয়া পড়ে; সুতরাং ক্রমাগত এক বিষয় লইয়া চাপাচাপি করিলে কোন কাজই হয় না। কোন বিষয় অনেকক্ষণ ধরিয়া পাঠনা করা আদৌ ভাল নহে। কোন বিষয়ের পাঠনার কাল ঘণ্টায় ত্রিচতুর্থাংশের অধিক হওয়া উচিত নহে।

৫। এক একটি বিষয়ের পাঠাভ্যাসের মধ্যে পাঁচ-সাত মিনিটের বিশ্রাম কার্য্যের সহায়তা করে।

৬। যিনি ছাত্রী-ছাত্রীর হিতকামী তিনি কখনই তাহাদিগের বুদ্ধি অমুকের তুলনায় হীন এইরূপ ভাবের সূচক কোনপ্রকার তিরস্কার পাঠের ত্রুটির জন্ম করিবেন না। উৎসাহ-দিলেই সর্ব্বদা ভাল ফল পাওয়া যায় এবং যে-বিষয়ে কেহ অপেক্ষাকৃত দুর্ব্বল তাহাতে ক্রমে তাহার অনুরাগ জন্মাইতে পারা যায়। পড়াইবার সময় "খিঁচানো" একেবারেই খারাপ।

(৭) বিদ্যাভ্যাসকালে শিক্ষক-শিক্ষয়িত্রী প্রথমে কোন বিষয় অল্প অল্প বলিয়া ধরাইয়া দিয়া সাহায্য করিবেন এবং ক্রমে ক্রমে ছাত্রছাত্রীকে স্বীয় শক্তির উপর নির্ভর করিতে শিখাইবেন।

(৮) শিক্ষণীয় যে বিষয়ের আলোচনা হইতেছে ছাত্রছাত্রী যদি তাহা বুঝিতে না পারে সেজন্ম তাহাদের বুদ্ধিশক্তির অল্পতা উপলক্ষ্য করিয়া সমালোচনা করা একেবারেই উচিত নহে। ছাত্র-ছাত্রী যদি বুঝিতে না পারে, সে তাহাদের দোষ না হইতে পারে, শিক্ষক-শিক্ষয়িত্রীর বুঝাইবার শক্তির ন্যূনতাতেও ইহা ঘটিতে পারে। কারণ অনুসন্ধান করিলে দেখা যায় পশ্চাল্লিখিত একটি না একটি জিনিষের দরুণ ছাত্র বা ছাত্রী বুঝিতে পারিতেছে না; যথা—তাৎকালিক অমনোযোগ বা অনিচ্ছা, ঐ শিক্ষণীয় বিষয়টির প্রতি একপ্রকার ভীতি, দৃষ্টি ও শ্রবণ শক্তির কোনরূপ বিকলতা, adenoids, endocrine গ্রন্থিসমূহের কার্য্যের অনুরোধ বা হ্রাস।

(৯) অল্পবয়স্ক ছাত্রছাত্রীর কোন বিষয়ের প্রতি অনেকক্ষণ ধরিয়া মনোযোগ দেওয়া বা তাহাতে লাগিয়া থাকার ক্ষমতা অল্প। শিক্ষক-শিক্ষয়িত্রীর তুলনায় তাহাদের একাগ্রতা বা মনোযোগ খুবই কম। অভ্যাস ও অনুরাগ উৎপাদনের দ্বারাই একাগ্রতা শক্তি পরিবর্দ্ধন করিতে হয়।

(১০) বুঝিতে পারিতেছে না বা অনেকক্ষণ ধরিয়া কোন বিষয়ে মনোনিবেশ করিতে পারিতেছে না বলিয়া কখনই ছাত্র-ছাত্রীকে শাস্তি দিতে নাই। গুরুতর নৈতিক অশিষ্টতা ও অসদ্ব্যবহারের জন্মই, কেবলমাত্র শাস্তির বিধান করা যাইতে পারে।

(১১) অনাবিষ্টতা, অমনোযোগ এবং বুদ্ধির অভাবের কারণ অনুসন্ধান করিতে হইবে। অনেক সময়ে শারীরিক অপুষ্টি, স্বাস্থ্যোন্নতির অন্তরায়, বা কুঅভ্যাসের জন্মই ঐগুলি জন্মিয়া থাকে।

১২। কোন জিনিষ যদি ছাত্রছাত্রীর মাথায় না ঢুকিয়া থাকে, কখনও সেই জিনিষ না বুঝাইয়া দিয়া মুখস্থ করিতে দিবেন না। না বুঝিয়া ক্রমাগত অভ্যাস স্মৃতিশক্তিকে অকারণ ভারাক্রান্ত করে। উহা ভবিষ্যতে সুফলদায়ক হয় না, অনিষ্টই করিয়া থাকে। যাহার মুখস্থ করিতে ভয় হয়, তাহাকে মন দিয়া বুঝিয়া বার-কয়েক পড়িতে বলিলে ফল হইবে।

১৩। পড়াইবার সময় এমনভাবে ছাত্রছাত্রীকে চালাইতে হইবে যে, সে যেন কিছুতেই মনে না করে যে তাহাকে বাধ্য করিয়া বা জোর করিয়া শেখান হইতেছে। শিক্ষণীয় বিষয়ে তাহাদের অনুরাগ উৎপন্ন করিয়া পাঠের অনিচ্ছাকে জয় করিতে হইবে।

১৪। ঘড়ি ঘণ্টা ধরিয়া ছাত্রছাত্রীকে পড়াইতে হইবে এমন নহে; পরন্তু যত শীঘ্রই হউক না কেন সে যদি তাহার পাঠ্য-বিষয় প্রস্তুত করিয়া ফেলে, তখনই তাহাকে ছাড়িয়া দেওয়া উচিত। ইহা একটি প্রকৃষ্ট পন্থা।

১৫। যে পড়িতে ইচ্ছা করিতেছে না তাহাকে অনেকক্ষণ ধরিয়া পড়িতে বাধ্য করিলে কিছুই হয় না।

মোটের মাথায় শিশুর বাড়িতে পড়ার কাল তিন-চার ঘণ্টার অধিক মোটেই হইবে না। *

* গত ২রা ফেব্রুয়ারি তারিখে কলিকাতায় অনুষ্ঠিত বঙ্গীয় নারী-শিক্ষা-সম্মিলনের অধিবেশনে পঠিত।

বাণ্টিক-রাণী গথ্‌ল্যাণ্ড ও তাহার প্রাচীন রাজধানী ভিজ্‌বী

শ্রীলক্ষ্মীশ্বর সিংহ

যে-সকল দেশের প্রাকৃতিক গঠন ও পারিপার্শ্বিক অবস্থা আমাদের কাছে অপরিচিত, সেই সকল দেশের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য ও দেশবাসীদের জাতীয় জীবনের ধারা বুঝাইতে যাওয়া সহজ নহে। সুইডেন সম্বন্ধে পূর্ব্বে কিছু বলিয়াছি। আজ বাণ্টিক সাগরবক্ষে সুইডেন হইতে বিচ্ছিন্ন গথ্‌ল্যাণ্ড ও সেখানকার পৌরাণিক শহর ভিজ্‌বী সম্বন্ধে কিছু বলিতেছি।

ভিজ্‌বীর বিশাল প্রাচীরের এক অংশ। এই দিক দিয়া ডেনিশ্‌-রাজা ভাল্‌ডেমার্‌ শহর আক্রমণ করিয়াছিলেন

১৯৩০ সনের শেষ ভাগে সুইডেন হইতে বাণ্টিক দেশে যাওয়া স্থির হয়। গথ্‌ জাতি এই দ্বীপের অধিবাসী ছিল এবং তাহা হইতেই গথ্‌ল্যাণ্ড নামের উৎপত্তি। প্রত্নতত্ত্ববিদ্‌গণের গবেষণার ফলে এই দ্বীপভূমিতে যে-সকল আবিষ্কার সম্ভাবিত হইয়াছে, তাহাতে ইউরোপের অনেক ঐতিহাসিক তত্ত্ব নূতন আলোতে প্রকাশ পাইয়াছে এবং আরও হইবে বলিয়া অনুমান করিবার যথেষ্ট যুক্তিসঙ্গত কারণ আছে। যে মাসের মধ্যভাগে সুইডিশ 'এস্‌পারেণ্টো' সমিতির পরিচালক আমার পুরাতন বন্ধু শ্রীযুত মাল্‌ম্‌গ্রেন্‌ ও তাহাদের বিদ্যালয়ের বালকদের সঙ্গে গথ্‌ল্যাণ্ড পরিভ্রমণ করিবার উদ্দেশ্য লইয়া রওয়ানা হই।

গথ্‌ল্যাণ্ড দ্বীপটিকে সাধারণতঃ বাণ্টিক-রাণী ও তাহার রাজধানী ভিজ্‌বীকে ধ্বংসাবশেষ ও গোলাপ ফুলের রাজ্য বলা হয়। স্থানটি সত্যই এই বিশেষণ পাইবার অধিকারী। উত্তর দক্ষিণে দ্বীপটি প্রায় আশী মাইল দীর্ঘ ও প্রস্থে মোটামুটি ত্রিশ মাইল। দ্বীপের উপর সর্ব্বসমেত ষাট হাজার লোকের বাস। তন্মধ্যে দশ হাজার ভিজ্‌বী শহরের অধিবাসী। সেখানকার জলবায়ু উত্তর দেশের অন্যান্য স্থানের ন্যায় এত শীতকঠোর নয়। সেইজন্য দক্ষিণ দেশের অনেক গাছপালা গথ্‌ল্যাণ্ডের ভূমিতে শিকড় গাড়িয়াছে। ইহার ইতিহাস রোমাঞ্চকর ঘটনায় পরিপূর্ণ। বহু বিধ্বস্ত প্রাসাদ, প্রাচীর ও অট্টালিকা প্রথম দৃষ্টিতেই দর্শকের মনে কৌতূহল ও বিস্ময় জাগাইয়া তোলে। ষ্টক্‌হল্‌ম্‌ হইতে জাহাজে করিয়া উক্ত দ্বীপের প্রধান শহর ভিজ্‌বীতে পৌছিতে প্রায় চৌদ্দ ঘণ্টা লাগে। সেখানে রওয়ানা হইবার পূর্ব্বেই ভিজ্‌বী শহরের 'এস্‌পারেণ্টিস্‌' বন্ধুদিগকে আমাদের পৌছিবার দিন জানান হইয়াছিল। ঘাটে অভ্যর্থনা করিবার জন্য অনেকে উপস্থিত ছিলেন। যাওয়ার সময় সমুদ্রের অবস্থা ভাল ছিল না। কাজেই জাহাজ হইতে সোজাসুজি নির্দ্দিষ্ট বাসস্থানে পৌছিয়াই একটু বিশ্রাম করিয়া

শরীর শক্ত করিয়া লইবার জন্য বন্ধুদিগকে বিদায় দিলাম। কথা রহিল, নির্দ্দিষ্ট সময়ে বিশেষ কোন স্থানে সকলে একত্র হইয়া শহর ঘুরিতে হইবে। জাহাজ হইতে ভিজবী শহরের বিশাল প্রাচীরের কতক অংশ দৃষ্ট হয়। আমরা সর্ব্বপ্রথম প্রাচীরের পাশ দিয়া পুরাতন শহরের অদ্ভুত রাস্তাঘাট, ঘরবাড়ি ও অন্যান্য দ্রষ্টব্য স্থান দেখিতে গিয়াছিলাম। ভিজ্‌বী শব্দের অর্থ বলিদানের জায়গা। কবে কোন্‌ যুগে শহরটি স্থাপিত হইয়াছিল, সত্যই সেখানে মানুষ বলি দেওয়া হইত কি-না, এবং হইলেই বা কে কাহাকে বলি দিত, সে-সম্বন্ধে নিশ্চিত কিছুই জানা যায় না। উত্তর দেশসমূহে খ্রীষ্টধর্ম্ম প্রচারিত হইবার পূর্ব্ব পর্য্যন্ত যখন সেই দেশবাসীরা 'থোর, ওডিন, ও ফ্রেই' দেবতাদের উপাসক ছিল, তখন স্থানে স্থানে শত্রুসৈন্যদিগকে ধরিয়া মন্দিরে দেবতাদের প্রীত্যর্থে বলি দেওয়া হইত। সুইডেনের প্রসিদ্ধ বিশ্ববিদ্যালয় শহর 'উপ্‌-শালার' নিকটবর্ত্তী স্থানে সেইরূপ মন্দিরের চিহ্ন এখনও রহিয়াছে। ভিজ্‌বী শহরেও এইরূপ বলিদান হইত বলিয়া অনুমান করা যায়, এবং তাহা হইতেই হয়ত বা 'ভিজ্‌বী' শব্দের উৎপত্তি। ভিজ্‌বী শহর মধ্যযুগ হইতে এই দ্বীপের রাজধানী। এখন শহরটি প্রাচীন গৌরব ও সম্পদের অবশেষ বক্ষে ধরিয়া বাল্টিক সাগরের মধ্যে মাথা উত্তোলন করিয়া নীরবে দাঁড়াইয়া আছে। এই কথা নিশ্চিত যে, উত্তর ইউরোপীয় সভ্যতায় ভিজবী প্রাচীন ব্যবসা-কেন্দ্ররূপে এক সময়ে ভারতবর্ষ, পারস্য ও মধ্য-এশিয়ার সহিত আপনার যোগ স্থাপন করিয়াছিল। দ্বীপটি ষষ্ঠ হইতে অষ্টম শতাব্দী পর্য্যন্ত ভিকিংদের অধীনে ছিল। ভিকিংরা ভিজ্‌বী শহর হইতে যাত্রা করিয়া ভল্‌গা ও নীপার নদীর ভিতর দিয়া মধ্য-এশিয়ার আরবদের ও বাইজেণ্টাইন গ্রীকদের সঙ্গে ব্যবসা-সম্বন্ধ স্থাপন করিয়াছিল।

প্রত্নতত্ত্ববিদ্‌গণের গবেষণার ফলে 'বুর' নামক গ্রামের পার্শ্বে এই স্থানে একটি প্রকাণ্ড বাড়ি আবিষ্কৃত হইয়াছে। তাহাতে পাঁচটি ঘর, মধ্যের প্রধান ঘরটি ৬০ মিটার লম্বা এবং দেখিতে একটি হলের মত। স্থানটির প্রাচীন নাম 'Stavers Farm'। আইস্‌ল্যাণ্ড-দেশীয় পৌরাণিক গল্পে এই জাতীয় প্রাসাদের উল্লেখ আছে

'বুর' গ্রামে আবিষ্কৃত বহুমূল্য দ্রব্যাদির মধ্যে একটি রোমান Fajan

ভিকিংদের প্রতাপে তখন সমস্ত ইউরোপীয়দের ত্রাস লাগিত। ছোট ছোট নৌকায় চড়িয়া কম পক্ষে ৪০,০০০ ভিকিং নির্ভয়ে সমুদ্রের উপর দিয়া ধনসম্পদ লুঠপাটের আশায় নানা দেশ আক্রমণ করিত এবং লুণ্ঠিত সম্পদ সঙ্গে লইয়া আপনাদের দেশে ফিরিয়া আসিত। শোনা যায়, সুন্দরী রমণী তাহাদের খুব প্রলোভনের বস্তু ছিল এবং পারিলে বিদেশী মেয়েদিগকে নৌকা

বোঝাই করিয়া আনিতে ছাড়িত না। এই ঐতিহাসিক ঘটনা প্রসঙ্গে আমার মনে হইত, যে, উত্তর দেশের লোকেদের মধ্যে যথেষ্ট মিশ্রণ ঘটিয়াছে। কিন্তু জিজ্ঞাসা করিয়া যতদূর জানা গিয়াছে, তাহাতে মনে হয় যে, ভিকিংদের দেশে পৌঁছিবার পূর্ব্বেই সমুদ্রের প্রকোপ সহ্য করিতে না পারিয়া সুন্দরী রমণীগণ জলসমাধি লাভ করিতেন। দশম শতাব্দীর মধ্যভাগেও ভিকিংরা কাস্পিয়ান হ্রদের তীরবর্ত্তী দেশসমূহ লুঠপাট করিয়া লইয়া গিয়াছিল।

গত শতাব্দী হইতে যখন প্রত্নতত্ত্ববিদ্‌গণ গবর্ণমেণ্ট ও জনসাধারণের অর্থসাহায্যে এই দ্বীপের স্থানে স্থানে খনন-কার্য্য আরম্ভ করেন, তখন হইতে সর্ব্বদাই মূল্যবান
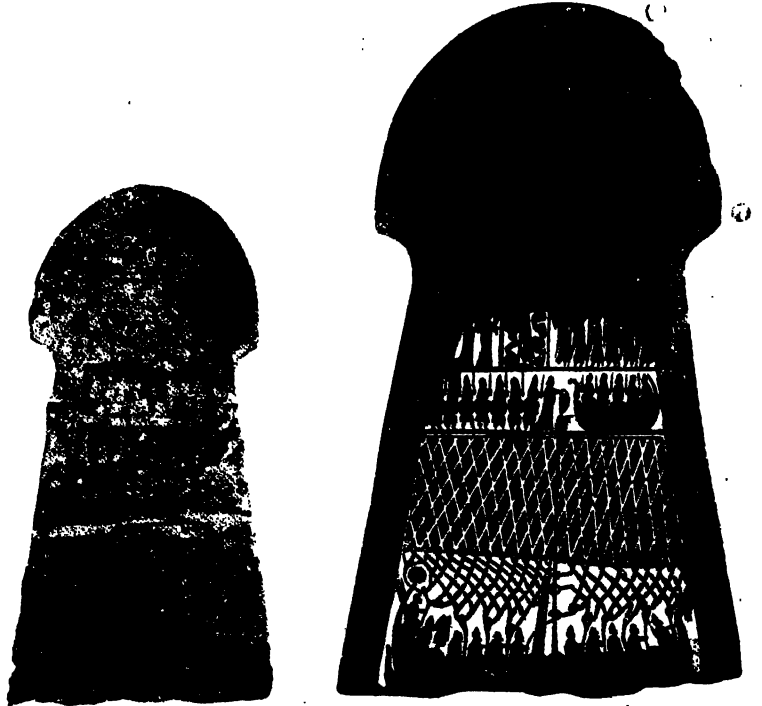
'বুঙ্গে' মিউজিয়মে রক্ষিত ভিকিংদের সময়ের দুইটি প্রস্তরখণ্ডের প্রতিচ্ছবি। ইহাদের গায়ে ভিকিং জীবনযাত্রা-প্রণালী খোদিত আছে। এই জাতীয় পাথরকে রূণে বলে

গথ্‌ল্যাণ্ডের '(Inisvard' নামক ধীবর গ্রামের পাশে মেগালিথিক্ (বৃহৎ প্রস্তরনির্ম্মিত) মনুমেণ্ট। ইহা লম্বায় ৪৫ মিটার এবং তাহাতে শতাধিক বিভিন্ন রকমের পাথর আছে

ডেনিশ্‌ রাজার ভিজ্‌বী লুণ্ঠন। শিল্পী হেলকুইস্ত এর আঁকা ষ্টক্‌হল্‌মের মিউজিয়মে রক্ষিত চিত্র

রত্ন, কাচ, অস্ত্রশস্ত্র ইত্যাদি বহু জিনিষ আবিষ্কৃত হইতে থাকে। এক সময়ে এই স্থান যে কতবড় ব্যবসা-কেন্দ্র ছিল, তাহা সেখানকার ভূমিতে আবিষ্কৃত মুদ্রা ও তাহাদের সংখ্যাধিক্য স্পষ্টভাবে প্রমাণ করে।

১৮৭০ খৃষ্টাব্দে ভিজ্‌বী ও ইহার চতুষ্পার্শ্ববর্ত্তী স্থানে যে খনন-কার্য্য হয় তাহার ফলে এক হাজার চার-শ একাত্তরটি বাইজেণ্টাইন মুদ্রা ও বহুমূল্য স্বর্ণালঙ্কার আবিষ্কৃত হইয়াছে। সমস্ত স্কাণ্ডেনেভিয়ান্ দেশে প্রথম শতাব্দী হইতে ইহার পরবর্ত্তী যুগের যত রোমান রৌপ্যমুদ্রা আজ পর্য্যন্ত আবিষ্কৃত হইয়াছে, তাহার মোট সংখ্যা প্রায় ছয় হাজার হইবে। তন্মধ্যে অল্পাধিক সাড়ে চার হাজার এক গথ্‌ল্যাণ্ডের ভূমিতেই আবিষ্কৃত হয়। সমগ্র সুইডেনে সর্ব্বশুদ্ধ ত্রিশ হাজার আরবীয় মুদ্রা পাওয়া গিয়াছে এবং তাহারও অধিকাংশ গথ্‌ল্যাণ্ডের ভূমিতে প্রাপ্ত। আরবীয় মুদ্রার বেশীর ভাগ বাগ্‌দাদের নিকটবর্ত্তী 'কুফা' নামক স্থানে তৈরি হইয়াছিল; সেইজন্য এই সকল মুদ্রা 'কুফিক' নামে পরিচিত। ঐতিহাসিকগণ আরও অনুমান করেন, নির্ভীক ভিকিংরা আপনাদের ছোট ছোট নৌকায় চড়িয়া টাইগ্রীস্ নদীর পথ বাহিয়া 'লাড্‌গা' হ্রদের ভিতর দিয়া ঐ সকল সম্পদ গথ্‌ল্যাণ্ডে লইয়া আসিয়াছিল। আবার কতকগুলি মুদ্রা সমরখন্দ্‌, ডামস্কাস্ প্রভৃতি স্থানে তৈয়ারী হইয়াছিল। সেই সকল মুদ্রাকে 'ডিরহেরনার' (Dirherner) বলা হইয়া থাকে; ইহাদের উপর মহম্মদের তথা ইস্‌লামের বাণী মুদ্রিত আছে। আমি ভিজ্‌বীর ও ষ্টক্‌হল্‌মের মিউজিয়মে এই সকল আবিষ্কৃত দ্রব্যের বৃহৎ সংগ্রহ সময় পাইলেই দেখিতে যাইতাম। তাহাদের মধ্যে সোনা ও রূপার অলঙ্কার ও কয়েকটি পাত্রের উপরের কারুকার্য্য বড় বিস্ময়কর। ঐ সকল ছাড়াও গথ্‌ল্যাণ্ডের ভূমিতে বিদেশীয় অন্য অনেক জিনিষ পাওয়া গিয়াছে। তাহার কারণ হয়ত বা এই যে, ঐতিহাসিক ঘটনাবহুল দ্বীপটি ভিন্ন ভিন্ন ডেনিস্, সুইডিস্, নরওয়ে, প্রবলপরাক্রান্ত 'হান্‌সিয়াটিক্' লীগ ও 'ল্যুবেকে'র দ্বারা শাসিত হইয়াছিল। এমন কি, একসময়ে অল্প কিছুদিনের জন্য দ্বীপটি রুশিয়ার অধীনও

ছিল। অল্লাধিক শত বৎসর পূর্ব্বে রাশিয়ানদের প্রভুত্বের অবসান হয়। গথ্ল্যাণ্ডের অধিবাসীরা বাল্টিক সাগরের উপর ঝড় ও তুফানে পীড়িত রুশিয়ার যুদ্ধ জাহাজ আক্রমণ করিয়া অধিকার করায় এই রাষ্ট্রীয় পরিবর্ত্তন ঘটে।

আধুনিক ভিজ্‌বী শহরের হোটেলের বৈঠকখানা। হোটেলের একদিকে সমুদ্র

দ্বীপটির মধ্যযুগের ইতিহাস বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। তখন দেশটি প্রবলপরাক্রান্ত হানসিয়াটিক লীগের অধীন। সমৃদ্ধিতে গথল্যাণ্ড বাসীরা তখন উন্নতির চরমসীমায়। ভিজ্‌বীর বণিকদের পণ্যদ্রব্যসম্ভারে পূর্ণ জাহাজ বাল্টিক সাগরের উপর দিয়া অনবরত আনাগোনা করিত। ভিজ্‌বীর বন্দর তখন জাহাজের নাবিকদের দ্বারা কলমুখরিত। ভিজ্‌বীর বণিকদের নিজেদের সামুদ্রিক আইনকানুন ছিল এবং ইউরোপীয় প্রায় সকল রাজধানীর সহিত তাহারা বিশেষ ব্যবসায়-সম্বন্ধ ও অধিকার স্থাপন করিয়াছিল। স্থানটি তখন নানা দেশের ধনী বণিকদের মিলন-কেন্দ্র।

ভিজ্‌বীর মেয়রের বাসস্থান। ১৭শ শতাব্দীতে নির্ম্মিত এই গৃহটি এখনও অটুট অবস্থায় আছে

মধ্যযুগে এই স্থানের শ্রীবৃদ্ধি সম্বন্ধে বহু আজগুবি গল্প চলিত আছে। কিন্তু এখানে শুধু কয়েকটি ঐতিহাসিক ঘটনার উল্লেখ করা যাইতেছে। ১২০০ খৃষ্টাব্দে সেখানকার বণিকগণ সম্রাট লুথিয়ার,—তাহারও পূর্ব্বে ১১২৫ খৃঃ ইংলণ্ডের রাজা তৃতীয় হেন্‌রী ও অন্যান্য ইউরোপীয়দের সহিত নিজেদের ব্যবসায়-সংক্রান্ত নানা অধিকার আদায় করিয়া লয়। সেই সময়ে ভিজ্‌বীর বিশাল প্রাচীর ও পনেরটি বৃহৎ খ্রীষ্টিয় মন্দির নির্ম্মিত হয়। কিন্তু ক্ষমতাগর্ব্বী বিত্তশালী বণিকদের প্রভুত্ব বেশী দিন টিকে নাই।

১৩৬১ খৃষ্টাব্দে ডেনমার্কের রাজা ভালডেমার আত্তেরডাগ ভিজ্‌বী শহর আক্রমণ করিয়া ধ্বংস করেন। সেই সঙ্গে সেখানকার বণিকদের প্রভাব ও প্রভুত্ব লোপ পাইতে থাকে। তাহার পর কখনও শহর পূর্ব্বগৌরব ও পূর্ব্বশ্রী ফিরাইয়া আনিতে পারে নাই। ডেনমার্কের রাজা ভিজ্‌বীর বণিকদের অক্ষুন্ন প্রতাপ সহ্য করিতে পারেন নাই। গুজব আছে, রাজা বণিকবেশে ভিজ্‌বী শহর আক্রমণ করিয়া সেখানকার জনৈক মহিলার সহিত

প্রেমসম্বন্ধ স্থাপন করেন। ছদ্মবেশে তাঁহার আগমনের উদ্দেশ্য ছিল, সেখানকার সমস্ত গুপ্তপথগুলি জানিয়া লওয়া। উক্ত মহিলাটিও ছদ্মবেশী রাজাকে ভালবাসিয়াছিলেন। কিন্তু রাজা ভিজ্‌বী শহর ছাড়িয়া যাওয়ার পূর্ব্ব পর্য্যন্ত মহিলার কাছে আত্মপরিচয় গোপন রাখিয়াছিলেন যাইবার প্রাক্কালে তিনি তাঁহার অভিসন্ধি প্রেমিকার নিকট ব্যক্ত করেন এবং বলিয়া যান যে, পরবর্ত্তী বৎসরের বিশেষ কোন দিনে ভিজ্‌বী শহর অধিকার করিয়া তাঁহাকে আপনার রাণী করিবেন। ভালবাসায় পীড়িতা কিন্তু ভয়ে ভীতা মহিলা নিতান্ত বিহ্বলচিত্তে দিন কাটাইতেছিলেন। আপন জন্মভূমির দুর্দ্দিন আগতপ্রায় ভাবিয়া তাঁহার শরীর কণ্টকিত হইল। রাজা ভালডেমারের আক্রমণের পূর্ব্বদিনে তিনি শহরের মেয়রের নিকট সমস্ত প্রকাশ করিয়া দিলেন। ব্যক্তিগত ভালবাসার দাবি স্বদেশপ্রীতির নিকট পরাস্ত হইল। ঐরূপ যে ঘটিতে পারে, রাজা ভালডেমার তাহা পূর্ব্বেই অনুমান করিয়াছিলেন। তিনি যেভাবে এবং যেদিকে শহর আক্রমণ করিবেন বলিয়া জানাইয়াছিলেন তাহা না করিয়া গোপনে অন্য পথ দিয়া সহসা শহর আক্রমণ করিয়া তাহা অধিকার করেন।

ভিজ্‌বী শহরের ভাগ্যে সে বড় দুর্দ্দিন। ডেনিস্‌ সৈন্য গথ্‌দের তৈরি বিশাল প্রাচীরের স্থান-বিশেষ ভাঙিয়া শহরে ঢুকিয়া বড় বড় প্রাসাদ ও গির্জ্জায় আগুন ধরাইয়া দিল। আত্মরক্ষার্থে তিন সহস্র ভিজ্‌বীর বীরসৈন্য প্রাণ হারাইল। শহরটি একেবারে ছারখার করিয়াও রাজা ভালডেমারের দুঃখ মিটিল না। তিনি ভীতা কিন্তু বিশ্বাসঘাতিনী প্রেমিকাকে খুঁজিয়া বাহির করিয়া ভিজ্‌বীর প্রাচীর গাত্রে জীবন্ত সমাধি দিলেন। সে বড় দুঃখের কাহিনী। সেই মহিলার সমাধিস্থানে এখন বড় একটি টাওয়ার (Jungfru Tornet) গত যুগের দুঃখময় কাহিনী দর্শকের নিকট জানাইয়া দেয়।

তৃণলতায় আচ্ছন্ন সেণ্ট্‌ ওলফ্‌ গির্জ্জার ভগ্নাবশেষের একটি দৃশ্য

যে-স্থানে তিন সহস্র ভিজ্‌বীর অধিবাসী যুদ্ধে প্রাণপাত করিয়াছিল, সে-স্থানে একটি পাথর-নির্ম্মিত ক্রস্‌ দাঁড়াইয়া তাহাদের মৃত আত্মার শান্তি কামনা করিতেছে। স্থানটি ভিজ্‌বী শহরের বাহিরে প্রায় আধ মাইল দূরে অবস্থিত এবং ভাল্‌ডেমার ক্রস্‌

বলিয়া খ্যাত। প্রায় ৬০০ বৎসর কাটিয়া গিয়াছে। এখন সেখানে প্রত্নতাত্ত্বিক কাজ চলিতেছে। আমি যখন সেখানে যাই তাহার কিছুদিন পূর্ব্বে ভালডেমার ক্রসের নিকটবর্ত্তী স্থানে খনন-কার্য্যের ফলে সহস্রাধিক

'বুক্সে' গির্জ্জার আবিষ্কৃত মধ্যযুগের একটি কাষ্ঠনির্ম্মিত মূর্ত্তি

নরকঙ্কাল পাওয়া গিয়াছিল। কতকগুলি কঙ্কালের গায়ে শিরস্ত্রাণ ও বর্ম্মগুলি অটুট অবস্থায় ছিল। একই স্থানে একথলিপূর্ণ ৪০০ মধ্যযুগের সুইডিশ্ ও ডেনিশ মুদ্রাও আবিষ্কৃত হইয়াছে। কঙ্কালগুলি পরীক্ষা করিয়া জানা গিয়াছে যে, তীক্ষ্ণ ধারাল তরবারি ও কুঠারের দ্বারা দেহগুলি ক্ষতবিক্ষত করা হইয়াছিল।

রাজা ভালডেমার দেশে ফিরিয়া যাইবার পূর্ব্বে দুই বৃহৎ থলি রাখিয়া ভিজ্‌বীবাসীদিগকে তাহা সোনা ও রূপায় পূর্ণ করিয়া দিতে আদেশ করিলেন। রাজার সৈন্যেরা থলি দুইটি পূর্ণ করিতে দেশবাসীকে বাধ্য করিল। রাজা কিন্তু দুই থলি পাইয়াও সন্তুষ্ট হইলেন না। তৃতীয় থলি পূর্ণ করিবার আদেশ করা হইল। গল্পে আছে, তৃতীয় থলিটি তাঁহার দুর্ভাগ্যের

ক্যাথারিন্ গির্জ্জার অন্তর্দৃশ্য

সূচনা করিয়াছিল। লুণ্ঠিত ধনদৌলৎ সহ ডেনমার্কে ফিরিবার পথে তাঁহার জাহাজগুলি ঝড় তুফানের মধ্যে পড়ায় কার্ল নামক দ্বীপের কাছে স্বর্ণ রোপ্য বোঝাই জাহাজটি তলাইয়া যায়। রাজা অতিকষ্টে প্রাণ লইয়া ডেনমার্কে ফিরিয়া আসেন। গল্প চলিত আছে, সেই ধন এখনও বাল্টিক সাগরের নীচেই পড়িয়া আছে; এবং সামুদ্রিক যক্ষরা তাহা পাহারা দিতেছে।

ভিজ্‌বীর প্রাচীর দশ হাজার ফিট লম্বা। তাহার গায় সাঁইত্রিশটি বুরুজ মাথা উঁচু করিয়া স্থানে স্থানে যেন বাল্টিক সাগরের নীল-জল-মুকুরে আপনার প্রতিবিম্ব

সেণ্ট্ ওলফ্ গির্জ্জার নিকটবর্ত্তী সমুদ্রতীরে প্রকৃতির খেয়ালে পাথরের অদ্ভুত রূপ

খুঁজিতেছে। প্রাচীরের ভিতর পুরাতন শহরের রাস্তাঘাট, ঘরবাড়ি, প্রাচীন প্রাসাদসম অট্টালিকা ও বিপুলকায় গির্জ্জার ধ্বংসাবশেষগুলি দর্শকের মনকে খুব আকর্ষণ করে। চাঁদের আলোতে পাশাপাশি এগারটি গির্জ্জার কাছে দাঁড়াইয়া চারিদিকে দৃষ্টিনিক্ষেপ করিলে মনে হয় শহরটি কোন্ এককালের রাজার পরিত্যক্ত রাজ ধানী। হানসিয়াটিক যুগে ল্যুবেকের সময়ে শহরের স্থাপত্য উন্নতির চরম শিখরে পৌঁছিয়াছিল। বিশাল প্রাচীরের নির্ম্মাণকার্য্য সেই সময়কার স্থাপত্যের বড় নিদর্শন। বড় বড় সুরম্য অট্টালিকা সেই যুগেই নির্ম্মিত হইয়াছিল। ভিজ্‌বীর বিত্তশালী অধিবাসীরা শুধু ঘরবাড়ি তৈরি করিয়াই ক্ষান্ত হয় নাই। ফলে ভিজ্‌বী ও দ্বীপের সর্ব্বত্রই বহু পরিশ্রম ও অর্থব্যয় করিয়া গির্জ্জা-নির্ম্মাণের ঝোঁক হয়। ভিজ্‌বীর নিকটবর্ত্তী রোমা নামক স্থানে কুমারী সন্ন্যাসিনীদের জন্য সুরম্য বাসনিকেতন বা য়্যাবি তখনই নির্ম্মিত হইয়াছিল। মঠের বৃহৎ আঙিনা ও ধ্বংসাবশেষ দেখিলে বুঝিতে কষ্ট হয় না,—এখন এই জনমানবশূন্য স্থানটি একদা কত-না সন্ন্যাসিনীদের স্তোত্র-

গথ্‌ল্যাণ্ডের পার্শ্বস্থ পাথরের দ্বীপ কার্ল। ইহা পাখীদের রাজ্য

গানে মুখরিত হইত। এই ধর্ম্মকর্ম্মেও ধনবানদের মধ্যে প্রতিযোগিতা ঘটিয়াছিল। শুনা যায়, কোন ধনী বণিকের দুইটি কন্যা একই মন্দিরের ছাদের তলায় বসিয়া উপাসনা করিতে রাজী হইত না; ফলে তাহাদের জন্য পৃথক পৃথক গির্জ্জা তৈরি করিতে হইয়াছিল।

ভিজ্‌বী শহরের প্রাচীন গৃহগুলির মধ্যে মেয়রের বাসভবনটিই এখন পর্য্যন্ত অক্ষত অবস্থায় আছে। ১৭০০ শতাব্দীর একটি কাষ্ঠনির্ম্মিত গৃহকে সযত্নে রক্ষা করা হইয়াছে। ইহা মেহগিনিগৃহ বলিয়া পরিচিত। হয়ত বা ঘরটি মেহগিনি কাঠ দিয়াই তৈরি হইয়াছিল, কিন্তু সময়ে সময়ে ঘরখানিকে মেরামত করিবার ফলে মেহগিনি কাঠ ইহার গায়ে এখন কোথাও নাই।

এই দ্বীপটির পূর্ব্বগৌরব ও ব্যবসা-সমৃদ্ধি এখন নাই বটে, কিন্তু ইউরোপীয় ইতিহাসে ইহা চিরকালই

কর্ম্মে রত ডাঃ থর্ডেমান ও তাঁহার সঙ্গীগণ। এখানে প্রত্নতাত্ত্বিক খনন-কার্য্য চলিতেছে

বিশেষ স্থান অধিকার করিয়া থাকিবে। তাহার কারণ লৌহ পাথর ইত্যাদি মানবেতিহাসে সকল যুগের স্মৃতিচিহ্নই এই দ্বীপটি বহন করিতেছে। ফলে, স্থানটি ইতিহাস-আমোদী ব্যক্তিদের বড় প্রিয়।

প্রত্নতত্ত্ববিৎ ডাক্তার ওয়েটারষ্টেণ্ড ভিজ্‌বী বাজারের একস্থান খনন করিয়া একটি প্রাচীন বাড়ি আবিষ্কার করিয়াছেন এবং তাহা ৬০০০ বৎসরের বলিয়া অনুমান করা হইয়াছে। ডাঃ ওয়েটারষ্টেণ্ড একই স্থানে পাথরের কুড়াল ও ব্রঞ্জের অনেক জিনিষ কুড়াইয়া পাইয়াছেন।

আমি ভিজ্‌বী হইতে উত্তরে গাড়ী চড়িয়া লেরবো পর্য্যন্ত এবং সেখান হইতে মোটরকার করিয়া একেবারে উত্তর সীমান্ত শহর বোজে গিয়াছিলাম। সেখানে আমাকে জনসভায় বক্তৃতা দিতে হইয়াছিল। বোজে স্থানটিকে শহর বলা চলে না। সেখানে অতি প্রাচীন মধ্যযুগের একটি গ্রাম্য মিউজিয়াম আছে। ঠিক ঐ ধরণের মিউজিয়ম্ উত্তর দেশের কোথাও আমার চোখে পড়ে নাই।

গথ্‌ল্যাণ্ড দ্বীপের পশ্চিম-দক্ষিণ পার্শ্বে উল্লেখযোগ্য একটি দ্বীপ আছে। দ্বীপটির নাম কার্ল—যেন একটি পাথরের পাহাড় সমুদ্রের জল ঠেলিয়া উপরে মাথা তুলিয়া দাঁড়াইয়া আছে। তাহারই কাছাকাছি আর একটি দ্বীপ যাহার নাম ছোট কার্ল। উভয় দ্বীপই উত্তর-দেশীয় সকল প্রকার পাখীর একচেটিয়া রাজ্য। পাথরের গায়ে অসংখ্য কোঠর আছে, তাহাতে এই পাখীরা বাস করিয়া থাকে। পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, এই দ্বীপের পার্শ্বেই রাজা ভালডেমারের লুণ্ঠিত দ্রব্যপূর্ণ জাহাজ ঝড়ে তলাইয়া গিয়াছিল।

ভিজ্‌বী শহরে ফিরিয়া আসিলে সেখানকার বন্ধুরা স্থানীয় নাট্যশালায় সচিত্র বক্তৃতা দিবার ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। ভিজ্‌বীবাসীদের নিকট বেশ পরিচিত হইয়া উঠিয়াছিলাম। সংবাদপত্রের প্রতিনিধিরা ভিজ্‌বী ও গথ্‌ল্যাণ্ডে আমি কি দেখিলাম এবং সেই সম্বন্ধে আমার কি বলিবার আছে, ভারতবাসীরা তাহাদের সম্বন্ধে কিছু জানে কি-না, ভারতীয় কোন ভাষায় এই ইতিহাসপ্রসিদ্ধ দ্বীপ সম্বন্ধে কিছু লিখিত আছে কি-না, ইত্যাদি নানা প্রশ্ন লইয়া আমার বাসস্থানে ভিড় করিত। সে যাহা হউক, বেশী লোকসমাগম আমার পক্ষে প্রীতিদায়ক হইলেও তাহা আমার দেখাশোনা ও উপভোগের যথেষ্ট ব্যাঘাত ঘটাইত। কিন্তু ব্যক্তিগতভাবে তাহাদের নিকট যে আতিথ্য ও প্রীতি পাইয়াছি তাহা জীবনে কোনদিনও ভুলিবার নহে।

তখন মে মাস,—প্রকৃতি ও গাছপালা সবেমাত্র শীতের জড়তা হইতে মুক্ত হইয়া কচি সবুজ পাতার ভূষণে সজ্জিত ও আলোর প্রখরতায় উজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছে। দিন ক্রমশঃ দীর্ঘ হইয়া চলিতেছে। চারিদিকে এখানে-সেখানে প্রাচীন ধ্বংসাবশেষের গায়ে নানা তৃণলতা ও ফুলের গাছ। ইহাদের মধ্যে অধিকাংশই বন্য গোলাপফুল। সে কি এক অভাবনীয় দৃশ্য। স্থানীয় কোন এক বন্ধুর সঙ্গে

কখন বা প্রাচীরের উপর আবার কখনও বা বিপুলকায় গির্জ্জার দেওয়ালের উপর বসিতাম। ভিজ্‌বী সম্বন্ধে তখন কত গল্পই শুনিয়াছি। সেণ্ট মাইকেল নামক গির্জ্জার ধ্বংসাবশেষের দিকে দৃষ্টিপাত করিলে মনে পড়িত যে, এক সময় ইহার জানালায় কাচের বদলে কারুকার্য্য-মণ্ডিত বহুমূল্য রত্ন বাণ্টিক সাগরস্থ জাহাজের নাবিক-দিগকে নিজের আলোর উজ্জ্বলতায় পথ দেখাইত। শুনিয়াছি, ভিজ্‌বী শহরের অধিবাসীদের ঐশ্বর্য্য এত বেশী ছিল যে, বাড়ির দরজা-জানালার চৌকাঠ পর্য্যন্ত রূপার দ্বারা তৈরি হইত।

বিশাল প্রাচীরের বাহিরে এখনও মধ্যযুগের ফাঁসী-মঞ্চটি নগ্ন অবস্থায় পড়িয়া আছে। ইহার দিকে চাহিলে শরীর কণ্টকিত হয়। কতনা হতভাগ্যকে অতি-জাঁকজমকে ধুমধাম করিয়া তখনকার প্রথানুযায়ী এই ফাঁসীকাষ্ঠে ঝুলান হইয়াছে। এই ধরণের দ্বিতীয় মঞ্চ উত্তর ইউরোপের কোথাও নাই। ভিজ্‌বী শহর এখন ধ্বংসাবশেষ ও বন্য গোলাপফুলের রাজ্য হইয়া উঠিয়াছে। প্রতি বৎসর গ্রীষ্মকালে অনেকে সেখানে বেড়াইতে যায়। বিশেষ করিয়া ভিজ্‌বীর উপকূলে গ্রীষ্মস্নান উপলক্ষ্যে।

সিণ্টেংদের দেশে

শ্রীনলিনীকুমার ভদ্র

জৈন্তা পাহাড়ে সিণ্টেং নামক পার্ব্বত্য জাতির মধ্যে প্রচারকার্য্য ব্যপদেশে ১৯২৯ সনের এপ্রিল মাসের মাঝামাঝি 'হালামদের দেশ' হইতে যাত্রা করিলাম। শ্রীহট্টে আসিয়া খবর পাইলাম, রামকৃষ্ণ মিশনের সুপ্রসিদ্ধ কর্ম্মী স্বামী প্রভানন্দ দিন-কয়েকের মধ্যেই খাসিয়া পাহাড়ের দিকে রওনা হইবেন। স্বামিজীর সঙ্গে এপ্রিলের শেষ ভাগে শেলা নামক স্থানে আসিয়া পৌঁছিলাম। দিনকতক শেলাতে কাটাইয়া স্থির হইল শিলং হইতে আমাকে জৈন্তা পাহাড়ের প্রধান শহর জোয়াইয়ে পাঠাইবার ব্যবস্থা স্বামিজী করিবেন।

শেলা গ্রামটি ছাড়াইয়া কিছুদূর অগ্রসর হইবার পরই আন্দাজ আড়াই হাজার ফিট উঁচু এক খাড়া চড়াই সুরু হইল। চড়াইটি পার হইয়া মুস্ত গ্রামে উপস্থিত হইয়া আমরা চারিদিকে পাথরের দেওয়ালে ঘেরা এক তক্‌তকে-ঝক্‌ঝকে প্রশস্ত স্থানে একটি গাছের ছায়ায় বসিয়া বিশ্রাম করিতে লাগিলাম। অনতিদূরে জনকতক খাসিয়া জটলা করিয়া বসিয়া ছিল। আমি তাহাদিগকে নিকটে আসিবার জন্য ইসারা করিলাম। তাহারা আসিয়া এক-এক জন করিয়া 'খু-ব্লেই' এই দুইটি শব্দ উচ্চারণপূর্ব্বক আমাদের সঙ্গে করমর্দ্দন করিতে লাগিল, ইহাই খাসিয়াদের অভিবাদন-প্রণালী। কথা-প্রসঙ্গে স্বামিজী বলিলেন, এই অঞ্চলের বহুগ্রামেই এই ধরণের এক একটি প্রাচীরবেষ্টিত স্থান দেখিতে পাওয়া যায়। কোনো সামাজিক সমস্যার সমাধান করিতে হইলে গ্রামের মাতব্বররা না কি এই জায়গাগুলাতে আসিয়া জমায়েৎ হন। নানা উৎসব উপলক্ষ্যে এগুলাতে না কি খাসিয়াদের নৃত্যাদিও হইয়া থাকে।

বেলা পাঁচটা নাগাদ 'নংওয়ারে' রামকৃষ্ণ মিশন স্কুলের শিক্ষক বন্ধুবর শচীন্দ্র সোমের বাসায় আসিয়া আশ্রয় লইলাম।

সূর্য্যাস্তের প্রাক্কালে একান্তে এক অত্যুচ্চ স্থানে একখানা সমতল শিলাখণ্ডে আসিয়া বসিলাম। সম্মুখে গভীর খাদ। খাদের ও-পারে নিবিড় জঙ্গলে ঢাকা সুদূরবিস্তৃত পাহাড়শ্রেণী। ঐ পাহাড়শ্রেণীর পিছনে বহুদূরে অবস্থিত একটি নীল পাহাড়ের গা বাহিয়া রজত-রেখার মত দুইটি ঝরণাধারা নিম্নে গড়াইয়া পড়িতেছে। তন্ময় হইয়া এই পার্ব্বত্য সৌন্দর্য্য উপভোগ করিতে-

ছিলাম, কিন্তু সূর্য্য অস্তমিত হইবার সঙ্গে সঙ্গেই নিবিড় অন্ধকারে দিঙ্‌মণ্ডল আচ্ছন্ন হইয়া গেল। আমি তখন অগত্যা সে জায়গা হইতে উঠিয়া বিজন বনপথ দিয়া বাসায় ফিরিয়া আসিলাম।

পরদিন দ্বিপ্রহরে আমরা চেরাপুঞ্জীর উদ্দেশে রওনা হইলাম। রাস্তার দু-ধারের দৃশ্য পরম রমণীয়। পাহাড়ের উচ্চ চূড়ায় অবস্থিত খৃষ্টান মিশনরীদের

জৈন্তা পাহাড়ের একটি দৃশ্য

প্রতিষ্ঠিত গির্জ্জাগুলি মাঝে মাঝে নজরে পড়িতে লাগিল। কয়েকটি চড়াই-উৎরাই পার হইয়া আমরা টার্ণা গ্রামের কাছে আসিয়া পৌঁছিলাম। টার্ণার নিকট চেরাপুঞ্জীর রাস্তাটি ডানদিকে বাঁকিয়া খাড়া পাহাড়ের উপর দিয়া উঠিয়াছে, এই চড়াইটির মাথায় পৌঁছিবার পর চারিদিকের প্রাকৃতিক দৃশ্য দেখিয়া পথের শ্রান্তি যেন একনিমেষে বিদূরিত হইয়া গেল। বামে ঢেউ-খেলানো সুনীল পাহাড়শ্রেণী নীল আকাশের গায় হেলান দিয়া দাঁড়াইয়া আছে। শিখরদেশ হইতে শিবজটা-নিঃসৃত জাহ্নবীধারার মত কত রজতশুভ্র জলধারা গিরি-পাদমূলে গড়াইয়া পড়িয়া উপলখণ্ডসমূহের বাধা অতিক্রম করিয়া সগর্জ্জনে বহিয়া যাইতেছে। দক্ষিণ দিকে দূরে বহুনিম্নে শ্রীহট্ট জেলার সুবিস্তীর্ণ সমতলভূমি দিগন্তে গিয়া মিশিয়াছে।

চড়াইটি পার হইয়াই আমরা যে-গ্রামে পৌঁছিলাম সেইটির নাম মাউ-মু। মাউ-মুতে দেখিলাম, এক বিস্তীর্ণ প্রান্তরে খাসিয়াদের তীর-খেলা সুরু হইয়াছে। এক-এক জন করিয়া একটা নির্দ্দিষ্ট লক্ষ্যে তীর ছুঁড়িতেছে, খেলোয়াড়দের মধ্যে কেহ লক্ষ্যভেদ করিবা-মাত্র সমবেত দর্শকমণ্ডলী উচ্চকণ্ঠে হর্ষধ্বনি করিতেছে। শুনিতে পাইলাম, ভিন্ন ভিন্ন গ্রামের দুইটি দলের মধ্যে প্রতিযোগিতা চলিতেছে।

তীরখেলা খাসিয়াদের সর্ব্বপ্রধান জাতীয় ক্রীড়া। ক্রীড়াশেষে বিজয়ী দল নৃত্য এবং ঘন ঘন আনন্দধ্বনি করিতে করিতে ঘরে ফিরিয়া যায়, তখন যুবতী রমণীরা সমবেত হইয়া তাহাদের চিত্তরঞ্জনের জন্য সাধ্যমত প্রয়াস পায় এবং একান্ত আগ্রহসহকারে আদ্যোপান্ত প্রতি-যোগিতার বিবরণ শ্রবণ করে।

মাউ-মু হইতে সবুজ ঘাসে ঢাকা পাহাড়ের উপর দিয়া সমান রাস্তা আরম্ভ হইল। প্রায় মাইল-দেড়েক চলিবার পর চেরাপুঞ্জীতে পৌঁছিয়া আমরা খাসিয়া পাহাড়ে ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচারক, আচার্য্য শ্রীযুক্ত নীলমণি চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের শৈলনিবাস নামক ভবনে আতিথ্য গ্রহণ করিলাম। পরদিন বেলা প্রায় পাঁচটার সময় মোটরে শিলঙে পৌঁছিলাম।

শিলঙে পৌঁছিয়া খবর পাইলাম যে, দিন-কয়েকের মধ্যেই 'স্মিট' নামক স্থানে 'নংক্রেমের পূজা' এবং খাসিয়া মেয়েদের নাচ হইবে। নির্দ্দিষ্ট দিনে ভোরবেলা হইতেই দলে দলে খাসিয়া, নেপালী, বাঙালী প্রভৃতি বিভিন্ন জাতীয় নরনারী পূজা ও নাচ দেখিবার জন্য শিলং হইতে রওনা হইল। আমিও পণ্ডিত লক্ষ্মীনারায়ণজী কর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত হিন্দু অনাথ আশ্রমের এক পণ্ডিতজীর সঙ্গে স্মিটে পৌঁছিয়া সিম পুরোহিত্রীর * বাটীর সম্মুখস্থিত বেড়া-ঘেরা এক প্রশস্ত প্রাঙ্গণের ভিতরে ঢুকিয়া পড়িলাম। সেখানে প্রকাণ্ড জনতা। প্রাঙ্গণের একদিকে পুরুষ এবং অন্য দিকে স্ত্রীলোকেরা বসিয়াছে। মাঝখানে প্রায় পঞ্চাশটি যুবতী নৃত্য করিবার জন্য সার বাঁধিয়া দাঁড়াইয়া আছে। সেখানে বাস্তবিকই যেন সৌন্দর্য্যের হাট খুলিয়া গিয়াছে। মেয়েরা প্রায় সকলেই বেশ সুন্দরী, তাহাদের পরণে দামী সিল্কের শাড়ী, গায়ে রঙীন জ্যাকেট, গলায় সোনা এবং প্রবালে তৈরি কণ্ঠহার, কানে সোনার মাকড়ি, হাতে

---

* খাসিয়া রাজাকে 'সিম' বলা হয়।

রূপার চুড়ি, বক্ষে সোনা অথবা রূপার দীর্ঘ চেন বিলম্বিত, সকলেরই মাথায় একই ধরণের সোনা অথবা রূপার মুকুট এবং এক এক গাছি দীর্ঘ বেণী প্রত্যেকেরই পৃষ্ঠে দোলায়িত। আপাদমস্তক তাহাদের বস্ত্রালঙ্কারে ভূষিত। বাহু দুটি তাদের দুই পার্শ্বে ঝুলানো। দৃষ্টি মাটিতে নিবদ্ধ।

একটু পরে খুব আস্তে আস্তে পা টিপিয়া তাহারা অগ্রসর হইতে লাগিল। ইহারই নাম না-কি 'কা সাড্ কম্বেই' বা মেয়েদের নৃত্য। রাজ-পরিবারের কয়েকটি মেয়েও এই নৃত্যে যোগদান করিয়াছিলেন। তাঁহাদের মাথার উপর ছাতা ধরিয়া কয়েক জন লোক সঙ্গে সঙ্গে চলিতেছিল। অদূরস্থিত এক উঁচু মঞ্চের উপর হইতে সানাই, ঢাক, 'করতাল ইত্যাদি বিবিধ বাদ্যযন্ত্রের আওয়াজ কানে ভাসিয়া আসিতেছিল। এক সময় একটি স্ত্রীলোক আসিয়া মেয়েদের বেশভূষার একটু পারিপাট্য সাধন করিয়া দিয়া চলিয়া গেল।

প্রায় ঘণ্টাখানেক পরে আসিল বীরবেশে সজ্জিত আট-দশ জন খাসিয়া, মাথায় তাহাদের গেরুয়া রঙের পাগড়ীর উপর সাদা এবং কালো রঙের মুরগীর পালকের তৈরি মুকুট, গায়ে জরির কাজ করা রঙীন জামা, পরণে রঙীন বস্ত্র। পিঠে, অস্ত্র এবং পাখীর পালকে পূর্ণ তূণ। পায়ে এক-এক জোড়া প্রকাণ্ড বুট জুতা। সকলকারই এক হাতে চামর ও অন্য হাতে তলোয়ার। বীরবেশধারীরা প্রথমে কিছুক্ষণ চামর দোলাইয়া বীরত্বব্যঞ্জক অঙ্গভঙ্গীসহকারে নৃত্য করিতে করিতে প্রাঙ্গণের চারিদিকে ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিল, অবশেষে দুই-দুই জন করিয়া অসি-যুদ্ধের অভিনয়পূর্ব্বক অঙ্গন প্রদক্ষিণ করিতে লাগিল।

ঘণ্টা-তিনেক আমরা নৃত্যাদি দেখিয়া কাটাইলাম। প্রথমে মন্দ লাগে নাই, কিন্তু অবশেষে বিরক্তি ধরিয়া গেল, কেন-না, নৃত্য, বাদ্য এবং যুদ্ধাভিনয়, সমস্তই একঘেয়ে, মেয়েদের ধৈর্য্যের প্রশংসা না করিয়া থাকিতে পারিলাম না। রৌদ্রের তাপে সুন্দরীদের সুগৌর মুখগুলি রাঙা হইয়া উঠিয়াছে, কপালে মুক্তাসদৃশ বিন্দু বিন্দু ঘাম দেখা দিয়াছে। কিন্তু তাহাতে তাহাদের ভ্রূক্ষেপ নাই। সেই যে ঘণ্টা-তিনেক আগে কনে-বৌদের মত পা টিপিয়া টিপিয়া তাহারা নৃত্য (?) সুরু করিয়াছে, থামিবার ত কোনো লক্ষণই দেখিতেছি না, আমরা কিন্তু সেখানে আর দেরি না করিয়া শিলঙের পথ ধরিলাম।

প্রতি বৎসর মে মাসে 'স্মিটে' খাসিয়াদের 'পম-ব্লাং' উৎসব এবং তদুপলক্ষে খাসিয়া কুমারীদের নৃত্য হয়।

জৈন্তা পাহাড়ের পথে সারি নদীর উপর সেতু

নংক্রেমের 'সিম' এই উৎসবের প্রধান উদ্যোক্তা বলিয়া ইহা 'নংক্রেমের পূজা' নামে পরিচিত। শস্যাদির উন্নতি এবং রাজ্যে শ্রীবৃদ্ধির জন্য 'কা-ব্লেই-সংসার' অর্থাৎ জগতের অধিষ্ঠাত্রী দেবীর নিকট ছাগবলি দেওয়া হয়, সময়মত পৌঁছিতে না পারায় আমরা 'পম-ব্লাং' উৎসব দেখিতে পারি নাই।

জোয়াই শিলং হইতে তেত্রিশ মাইল দূরে অবস্থিত। পায়ে হাঁটিয়া যাওয়া ছাড়া সেখানে পৌঁছিবার আর অন্য উপায় নাই। আমি এক দিন সকাল বেলা, স্বামিজীর ব্যবস্থামত দুই জন ডাকওয়ালার সঙ্গে জোয়াই রওনা হইলাম। প্রায় সতেরো মাইল রাস্তা অতিক্রম করিয়া আমরা 'মউ রং-থে্নং'-এর ডাকবাংলাতে আসিয়া পৌঁছিলাম। এখানে শিলঙের ডাকওয়ালারা বিদায় হইল, আমি দুই জন সিণ্টেং ডাকওয়ালার সঙ্গে চলিলাম। ডাক ঘাড়ে করিয়াই ইহারা প্রাণপণে ছুটিতে আরম্ভ করিল। পাছে জঙ্গলের মধ্যে পথ হারাইয়া ফেলি তাই তাহাদের পিছনে পিছনে ছুটিতে লাগিলাম। পথের দৃশ্য বিচিত্র, কোথাও বা দীর্ঘপত্রসমন্বিত পাইন-শ্রেণী, কোথাও বা দিগন্তবিসর্পী বন্ধুর পার্ব্বত্য প্রান্তর, কোথাও বা প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড ওক গাছ এবং অন্যান্য বিরাট বনস্পতি-

সমূহে পরিপূর্ণ সুদূর-প্রসারিত নিবিড় অরণ্যানী। এই আরণ্য শোভা উপভোগ করিবার মত অবস্থা কিন্তু তখন আমার নয়। প্রকাণ্ড এক বোঁচকা ঘাড়ে করিয়া এক রকম মরীয়া হইয়াই ছুটিতেছি। মনে হইতেছে, যেন আমাদের তিন জনের মধ্যে দৌড়ের প্রতিযোগিতা সুরু হইয়াছে। কিছুক্ষণ পরে কালো পোষাক-পরা এক দল সিণ্টেং রমণীর একেবারে সাম্‌না-সাম্‌নি আসিয়া পড়িলাম। অম্‌নি একসঙ্গে প্রায় দশ জোড়া (কালো নয়) কটা চোখের কৌতুহলপূর্ণ দৃষ্টি আমার উপরে নিক্ষিপ্ত হইল এবং পরক্ষণেই সম্মিলিত নারীকণ্ঠের অট্টহাস্যে নিস্তব্ধ বনভূমি মুখরিত হইয়া উঠিল। আমার ধারণা ছিল যে, আমার তৎকালীন অবস্থাটা স্নেহ-সুকোমল নারীহৃদয়ে যদি কোনো রসের উদ্রেক করিতে পারে ত তাহা করুণ রস। কিন্তু সিণ্টেঙ্গিনীরা আমার সে-ধারণা বদলাইয়া দিল। যাই হোক পুরুষ-বাচ্চার ইহাতে ঘাবড়াইলে চলে না। আমিও বিড়ালাক্ষীদের বিদ্রূপ-হাস্যে ভ্রূক্ষেপ না করিয়া মরি-বাঁচি করিয়া দৌড়াইতে লাগিলাম এবং সন্ধ্যার একটু পরে আধমরা অবস্থায় সিণ্টেংদের দেশ জোয়াইয়ে আসিয়া পৌছিলাম।

পরদিন বিকালে শহরে বেড়াইতে বাহির হইলাম। দৃশ্য-সৌন্দর্য্যে জোয়াই অতুলনীয়। এখানকার মত অমন সুন্দর পাইন-কুঞ্জ খাসিয়া পাহাড়ের কোথাও নাই। শিলঙের চেয়ে এ-জায়গা ঢের নির্জ্জন ও নিরালা। যাঁহারা শিলঙে বেড়াইতে যান, তাঁহারা একটু কষ্ট স্বীকার করিয়া (অবশ্য সিণ্টেং ডাকওয়ালার সঙ্গে নয়) জোয়াইয়ে গেলে প্রচুর আনন্দ উপভোগ করিতে পারিবেন।

শহরের চারিদিক প্রদক্ষিণ করিয়া বাজারে আসিয়া উপস্থিত হইলাম। বেশীর ভাগ স্ত্রীলোকেরাই জিনিষপত্র বিকিকিনি করিতেছে, চায়ের দোকান অনেকগুলি। সিণ্টেং-দ্রৌপদীরা বাজারেই রন্ধন করিয়া উৎকট দুর্গন্ধযুক্ত এক প্রকার ব্যঞ্জন বিক্রী করিতেছে। বাজারে শুকনো মাছ, কুক্কুট, শূকর-মাংস ইত্যাদির আমদানীই বেশী। বেঙের ছাতা, বোল্‌তার চাক ইত্যাদিও দেখিলাম। ওগুলা নাকি সিণ্টেংদের প্রিয় খাদ্য।

আমি জোয়াইয়ে আসিবার কিছুদিন পরেই সেখানে বে-ডিং-খ্লাম উৎসব পড়িয়া গেল, ইহা সিণ্টেংদের সর্ব্বপ্রধান উৎসব। প্রতি বৎসর জুন মাসে জোয়াইয়ে এবং জৈন্তা পাহাড়ের আরও নানা স্থানে উক্ত উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। 'বে-ডিং-খ্লাম' কথাটার মানে লাঠিদ্বারা মহামারী তাড়ানো।

জোয়াই শহরের প্রত্যেক পল্লীতে এক একটি কা-ইং-পূজা অর্থাৎ পূজাঘর আছে। জুন মাসের ষোল-সতেরো তারিখ হইতে শহর এবং পার্শ্ববর্ত্তী গ্রামসমূহের ছেলেবুড়ো সকলে ভিন্ন ভিন্ন 'কা-ইং-পূজা'তে সমবেত হইয়া আমোদ-উৎসবে মত্ত হইল। প্রথম কয়দিন তাদের কাজ রংবেরঙের কাগজ দিয়া রথ তৈরি করা। তারপর একদিন সকালে সকলে প্রচুর পরিমাণে মদ্য পান করিয়া 'হয়' 'হয়' শব্দ উচ্চারণপূর্ব্বক হাততালি দিয়া বিবিধ অঙ্গভঙ্গীসহকারে উদ্দাম নৃত্য করিতে করিতে গোটা শহরখানা প্রদক্ষিণ করিল। সেদিন জঙ্গলের ভিতর হইতে কতকগুলি গাছ কাটিয়া আনা হইল এবং লোকেরা নিজেদের বাড়ির উঠানের মধ্যে এক একটি গাছ পুঁতিয়া রাখিল। সিণ্টেংদের বাড়িতে গিয়া দেখিতে পাইলাম যে, পুরুষেরা এক একটি লাঠিদ্বারা ঘরের চালে আঘাত করিতেছে এবং মহামারীর ভূতকে ঘর ছাড়িয়া চলিয়া যাইবার জন্য অনুনয়বিনয় করিতেছে।

বিকালবেলা সকলে কাগজের তৈরি সং, বেলুন ইত্যাদি সহ এক খোলা ময়দানে জমায়েৎ হইয়া আবার নৃত্য আরম্ভ করিল। মেয়েরা উত্তম বস্ত্রালঙ্কারে সজ্জিত হইয়া নাচ দেখিবার জন্য সেখানে আসিয়া উপস্থিত হইল। নৃত্য শেষ হইলে কাগজের তৈরি রথগুলাকে 'কা-ইং-পূজা'-সমূহ হইতে বাহির করিয়া আনিয়া শহর হইতে কিছুদূরে একটি জলার নিকটে লইয়া যাওয়া হইল, সেখানে একহাঁটু জলের মধ্যে সকলে আবার নৃত্য সুরু করিল। জলের কাছে স্ত্রী-পুরুষের যেন মেলা জমিয়া গেল। জননীরা দুগ্ধপোষ্য শিশুদিগকে কাপড় দিয়া পিঠে বাঁধিয়া সেখানে হাজির হইল।

জলমধ্যে কিছুক্ষণ নৃত্য হইবার পর একদল লোক সদ্যকর্ত্তিত একটি প্রকাণ্ড বৃক্ষকে বহন করিয়া লইয়া আসিল। ঐ বৃক্ষটি উ-ব্লেই অর্থাৎ সৃষ্টি কর্ত্তার প্রতীক।

বৃক্ষটিকে জলে স্থাপিত করিবার পর দলে দলে লোকেরা তাহাতে চড়িয়া বসিল, তারপর এই গাছটি দখল করিবার জন্ম বিভিন্ন দলের মধ্যে লড়াই আরম্ভ হইল। সিণ্টেংদের বিশ্বাস, যে-দল গাছটি দখল করিতে পারিবে, সেই দলের লোকেরা আগামী বৎসর স্বাস্থ্য এবং সমৃদ্ধিলাভ করিবে।

সন্ধ্যার প্রাক্কালে কাগজের তৈরি রথসমূহ এবং বৃক্ষটিকে জলাভূমিতে বিসর্জ্জন দিয়া যে-যার ঘরে ফিরিয়া আসিল।

'বে-ডিং-খ্লাম' উৎসবের দিন-কতক পরে একদিন বিকালে রাস্তায় বেড়াইতে বাহির হইয়া দেখি, বাঁশের চাটাই দিয়া ঢাকা একটি শবদেহকে বহু সিণ্টেং স্ত্রীপুরুষ দাহ করিবার নিমিত্ত লইয়া চলিয়াছে। কেহ কেহ পান সুপারি, অন্নব্যঞ্জন ইত্যাদি সহ শবের অনুগমন করিতেছে। আমি তাহাদের পিছনে পিছনে সৎকার-ভূমিতে আসিয়া উপস্থিত হইলাম। ছোট একটি টিলার উপর চিতা রচনা করা হইল। স্ত্রীপুরুষ সকলে চিতার উপর পান-সুপারি সিকি-দুয়ানি ইত্যাদি রাখিল। চিতায় আগুন দিবামাত্র মৃতব্যক্তির মাতুল একটি কুক্কুটের গলা কাটিয়া অগ্নিতে কিছু রক্ত নিক্ষেপ করিল। তার পর, কুক্কুটটিকে আগুনে সেঁকিয়া টুক্‌রা টুকরা করিয়া কাটিয়া একটা বংশখণ্ডে গাঁথিয়া রাখা হইল। মৃতদেহ ভস্মীভূত হইবার পর আগুন নিবাইয়া অস্থিগুলি এবং সিকি-দুয়ানি ইত্যাদি কুড়াইয়া লওয়া হইল।

এক বৃদ্ধা অস্থিগুলি হাতে লইয়া বিড়বিড় করিয়া মন্ত্র আওড়াইলে সকলে আবার ও-গুলার উপরে পান-সুপারি রাখিল। অতঃপর সকলে একটি প্রস্তরস্তম্ভের নিকটে গমন করিল। একটি গাছের পাতা মাটিতে বিছাইয়া তাহাতে কদলী, আম্র, পিষ্টক ইত্যাদি রাখা হইল এবং পূর্ব্বোক্ত বৃদ্ধাটি মন্ত্র আওড়াইয়া মাটিতে কিয়ৎ-পরিমাণ মদ ঢালিয়া দিল। সৎকার-সংক্রান্ত এই সমস্ত অনুষ্ঠান সম্পন্ন হইলে পর, মৃতের মাতুল অস্থিগুলি ভূমিতে পতিত একখানা সমতল শিলাখণ্ডের নীচে রাখিল। দিনকতক পরে উক্ত প্রস্তরখণ্ডের নীচে হইতে মৃতের অস্থি স্থানান্তরিত করিয়া তদুপরি একটি খাড়া প্রস্তরস্তম্ভ প্রতিষ্ঠিত করা হইল। এগুলিকে বলে 'কা-জিং-কন-মাউ'। জোয়াই শহরে রাস্তার ধারে এখানে-সেখানে বহু 'কা-জিং-কন-মাউ' দেখিতে পাওয়া যায়।

জোয়াই শহরস্থ সিণ্টেংদের বাড়িগুলা বিলাতী ফ্যাসানের তৈরি। প্রত্যেক বাড়িতেই ছাদের উপর

সিণ্টেং নারী।

সিণ্টেং নারীরা আজকাল নিজেদের জাতীয় পরিচ্ছদ আংশিক ভাবে বর্জ্জন সুরু করিয়াছে। এই চিত্রে কেবলমাত্র একজন ছাড়া আর কাহারও মস্তকাবরণ নাই। মধ্যস্থলে দণ্ডায়মান মেয়েটি বাঙালী নারীদের অনুকরণে 'ব্লাউজ' পরিয়াছে।

একটি করিয়া চিম্‌নী আছে। সিণ্টেংদের মধ্যে অনেক ওস্তাদ মিস্ত্রী আছে। তাহারাই এ সমস্ত বাড়ি তৈয়ার করিয়া থাকে। গ্রামবাসীদের বাড়িগুলি কিন্তু আলাদা ধরণের, সেগুলির ছাদ ডিম্বাকৃতি। ঘরে জানালা থাকে না। সিণ্টেংরা তাহাদের ঘরের সাম্‌নের খানিকটা জায়গা লাল মাটি কিংবা গোবর দিয়া লেপিয়া রাখে। এই প্রথা আসামের আর কোনো পার্ব্বত্য জাতির মধ্যে প্রচলিত নাই।

খ্রীষ্টান সিন্টেংরা কোট-প্যাণ্ট, ওয়েষ্টকোট ইত্যাদি পরিধান করে। শ্রীহট্ট জেলার অধিবাসীদের সঙ্গে যাহারা কাজকারবার করে তাহারা ধুতি ও জামা পরে। পাগড়ী প্রায় সকলেই মাথায় বাঁধিয়া থাকে। কাহারও

সিন্টেং পুরুষ (ইহারা খৃষ্টান)

কাহারও মাথায় কালো রঙের কাপড়ে তৈরি একরকম টুপী দেখিতে পাওয়া যায়। গ্রাম্য সিন্টেংরা একরকম হাতা ছাড়া কোর্ত্তা ব্যবহার করে। স্ত্রীলোকেরা আপাদলম্বিত সেমিজের উপর ছোট একটি জামা গায়ে দেয় এবং একটি চার-পাঁচ হাত লম্বা কাপড় কোমরে গেরো দিয়া পরে ও একটি চাদর দিয়া সমস্ত শরীর ঢাকিয়া রাখে। মস্তকে আলাদা একটি বস্ত্রখণ্ড অবগুণ্ঠনরূপে ব্যবহার করে। এরূপভাবে সর্ব্বাঙ্গ আচ্ছাদিত করিয়া পরিচ্ছদ পরিধান করিতে আসামের অন্যান্য পাহাড়ী রমণীদের দেখি নাই। মস্তক এবং বক্ষদেশের উপরিভাগ অনাবৃত রাখাই অন্যান্য পার্ব্বত্য স্ত্রীলোকদের রেওয়াজ। কেবলমাত্র লুশাই নারীরা সেমিজ গায়ে দেয়। সিন্টেং রমণীদের পোষাক সাধারণতঃ কালো রঙের, তাহাদের বস্ত্রাভ্যন্তরে সকল সময়েই পান-সুপারিতে ভরা ছোট একটি কাপড়ের থলি থাকে।

প্রবাল এবং সোনায় তৈরি ফাঁপা কণ্ঠহার সিন্টেং নারীদের প্রিয় অলঙ্কার। ইহারা কানে মাকড়ি, হাতে চুড়ি, গলায় রূপার চেন পরে, চেনগুলি গলা হইতে কোমর পর্য্যন্ত ঝুলিয়া পড়ে।

ভাত, শুকনো মাছ এবং শূকর ও কুক্কুট-মাংস সিন্টেংদের প্রধান খাদ্য। একমাত্র গোমাংস ছাড়া আর সকল প্রকার মাংসেই ইহাদের অত্যন্ত আসক্তি আছে। ইহারা অতি প্রত্যূষে এবং বিকালে—দিবসের মধ্যে দুইবার খাদ্য গ্রহণ করিয়া থাকে। প্রত্যূষে জোয়াইয়ের রাস্তায় বেড়াইতে বাহির হইলে দগ্ধ শূকরের দুর্গন্ধে নাড়ীভুঁড়ি উল্টিয়া আসিতে চায়। ইঁদুর ব্যাঙাচি প্রভৃতিও ইহাদের বিশেষ প্রিয় খাদ্য। ইহারা পচা ভাত হইতে প্রস্তুত মদ্য পান করে। সিন্টেংদের প্রধান প্রধান পূজা এবং উৎসবাদিতে মদ্য একটি অত্যাবশ্যক জিনিষ।

ইহাদের মধ্যে পুরুষ অপেক্ষা স্ত্রীলোকের সংখ্যা ঢের বেশী। সেজন্য পাত্র জুটাইতে মেয়ের বাপকে যথেষ্ট বেগ পাইতে হয়। তাই অধিক বয়সে মেয়েদের বিবাহ হয়। আমি নিমন্ত্রিত হইয়া সিন্টেংদের একটি বিবাহ-উৎসবে যোগদান করিয়াছিলাম। পাত্রীটির বয়স ছিল কম পক্ষে ছাব্বিশের কাছাকাছি। বিবাহ ক'নের বাপের বাড়িতেই হয়। বিবাহের পর ক'নে স্বামীর ঘরে যায় না, বাপের বাড়িতেই থাকে। দিবাভাগে স্বামি-স্ত্রীর দেখা হওয়া নিষিদ্ধ। সন্ধ্যার পর স্বামী মহাশয়েরা শ্বশুর-বাড়িতে গিয়া নিজ নিজ পত্নীর সহিত রাত্রিযাপন করেন এবং রাত্রি প্রভাত হইবার আগেই নিজেদের বাটীতে ফিরিয়া আসেন। শ্বশুরালয়ের খাদ্যপানীয় গ্রহণ করিবার অধিকার তাহাদের নাই। আজকাল খৃষ্টান সিন্টেংরা অনেকেই কিন্তু এই প্রথা মানিয়া চলে না। ইহাদের মধ্যে বিধবা-বিবাহ প্রচলিত আছে। কিন্তু কোনো নারী স্বামীর মৃত্যুর পর যদি আর বিবাহ করিবে না বলিয়া প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হয় তাহা হইলে সে মৃত স্বামীর অস্থি নিজের কাছে রাখিতে পারে।

ইহারা আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা খুব বেশী পান খায়। কেহ বাড়িতে বেড়াইতে আসিলে সিন্টেং-গৃহিণী প্রথমেই পান-সুপারি দিয়া অভ্যর্থনা করে। ইহারা ঘরে-বাহিরে যেখানেই থাকুক না কেন, পান-সুপারি সঙ্গে থাকিবেই। ইহাদের বিশ্বাস, মৃত্যুর পর মানুষ সুপারি গাছে পরিপূর্ণ স্বর্গোদ্যানে বাস করিয়া অবাধে পান-সুপারি খাইতে থাকে। মৃত ব্যক্তির সম্বন্ধে তাহারা সময় সময় নিম্নলিখিত কথাগুলি বলিয়া থাকে—উবা বাম কোয়াই হা ইং উ-ব্লেই।*

ইহারা অত্যন্ত অপরিচ্ছন্ন, নোংরা। সপ্তাহে একদিনও স্নান করে কি-না সন্দেহ। কাছে আসিলে গায়ের দুর্গন্ধে তিষ্ঠানো দায় হইয়া উঠে। ইহারা মলত্যাগ করিয়া জলশৌচ করে না।

সিন্টেংদের প্রধানকে বলে দলৈ। জনসাধারণ দলৈ নির্ব্বাচিত করে। ছোটখাটো কতকগুলি সামাজিক অপরাধের বিচারের ভার দলৈয়ের হাতে ন্যস্ত আছে। তাহার সহকারিগণ পাত্র, বাসন, সাঙ্গত প্রভৃতি নামে পরিচিত।

স্থাবর এবং অস্থাবর সম্পত্তির উত্তরাধিকারিণী হয়, পিতামাতার সর্ব্বকনিষ্ঠা কন্যা। অন্য মেয়েরাও কিছু কিছু অংশ পাইয়া থাকে। কিন্তু ছেলেদের ভাগ্যে কাণা কড়িটিও জোটে না, ইহাদের অভাব-বোধ তেমন প্রবল নহে। জীবিকার জন্য দরিদ্রতম সিন্টেংও ভিক্ষাবৃত্তি অবলম্বন করে না। এই পার্ব্বত্য জাতির নিকট আমাদের যতগুলি শিক্ষণীয় বিষয় আছে, তন্মধ্যে ইহা একটি।

সিন্টেং রমণীদের দেখিলে বাস্তবিকই চিত্ত প্রসন্ন হয়। ইহারা সদা প্রফুল্লচিত্ত, হাসিখুশী ছাড়া এক মুহূর্ত্তও থাকিতে পারে না। প্রায় সকলেরই গায়ের রং খুব ফরসা, দেহের গড়ন নিটোল এবং সুডৌল, কেহ কেহ অনবদ্য রূপলাবণ্যসম্পন্না। ইহারা কঠোর পরিশ্রম করিতে পারে। একমণ-দেড়মণ বোঝা পিঠে করিয়া এক দিনে তেত্রিশ-চৌত্রিশ মাইল রাস্তা অতিক্রম করা ইহাদের পক্ষে মোটেই কষ্টসাধ্য কাজ নহে। ভাত রাঁধা, কাপড়-কাচা, জঙ্গল হইতে কাঠ কুড়াইয়া আনা, বাজারে জিনিষ-পত্র সওদা করা, দোকান-পাট চালান ইত্যাদি যাবতীয় কাজ স্ত্রীলোকেরাই করিয়া থাকে।

সিন্টেংরা অত্যন্ত সরল ও বিশ্বাসী। ইহারা প্রকৃতির সন্তান। সারাদিন পাহাড়জঙ্গলের ভিতরে প্রকৃতির স্নেহ-ক্রোড়ে থাকিতেই ভালবাসে। প্রাচীনকালে ইহারা শ্রীহট্টের স্বাধীন হিন্দু রাজাদের অধীনে ছিল। শ্রীহট্টের অন্তর্গত জৈন্তার রাজারাই সিন্টেংদের অধ্যুষিত পাহাড়টিকে জৈন্তা পাহাড় নামে আখ্যায়িত করেন। তখনকার দিনে ইহারা হিন্দুধর্ম্মের প্রভাব হইতে সম্পূর্ণরূপে মুক্ত থাকিতে পারে নাই। গেট সাহেব তাঁহার আসামের ইতিহাসে সিন্টেং-রাজাদের সম্বন্ধে লিখিয়াছেন—'রাজ-পরিবার ও বিশিষ্ট অভিজাত বংশীয়েরাই অংশত হিন্দু ধর্ম্মের আশ্রয়ে আসেন। রাজারা শাক্ত ছিলেন।'*

এই সমস্ত রাজারা এবং তাঁহাদের অমাত্যবর্গ বহু হিন্দু আচার-পদ্ধতি সিন্টেংদের মধ্যে প্রবর্ত্তন করিয়া-ছিলেন। আজও পর্য্যন্ত সিন্টেংদের আচার-ব্যবহার এবং রীতিনীতিতে হিন্দু প্রভাবের বহু ছাপ রহিয়া গিয়াছে; যেমন গোবর দিয়া গৃহপ্রাঙ্গণ লেপিয়া রাখা, গোমাংস ভক্ষণে বিরতি, নরটিয়াঙের সিন্টেংগণ কর্ত্তৃক বিশ্বকর্ম্মার পূজানুষ্ঠান প্রভৃতি। কিন্তু এক দিন যাহারা আংশিকভাবে আমাদের বৃহত্তর হিন্দু সমাজের অন্তর্ভুক্ত হইয়াছিল, খৃষ্টান মিশনরীদের দীর্ঘ-কালব্যাপী প্রচেষ্টার ফলে আজ তাহারা আমাদের নিকট হইতে একেবারেই বিচ্ছিন্ন হইয়া গিয়াছে, আমাদের পরস্পরের ভিতরকার যোগসূত্র আজ ছিন্ন হইয়া গিয়াছে।

জোয়াই, জৈন্তা পাহাড়ে মিশনরীদের সর্ব্বপ্রধান কেন্দ্র। ওয়েল্‌শ মিশন, চার্চ্চ অব ইংল্যাণ্ড, রোমান ক্যাথলিক চার্চ্চ, ইউনিটেরিয়ান চার্চ্চ, ইত্যাদি সব কয়টাই এখানে আড্ডা গাড়িয়াছে। প্রত্যেক রবিবারে গির্জ্জাগুলি সমবেত সিন্টেং নরনারীর কণ্ঠনিঃসৃত খৃষ্টবন্দনা গানে মুখরিত হইয়া উঠে। আর শুধু জোয়াই কেন, জৈন্তা

* সেই ব্যক্তি যিনি ভগবানের গৃহে পান-সুপারি খাইতেছেন।

* *History of Assam* by E. A. Gait, p. 262,

পাহাড়ের সর্ব্বত্রই দেখিয়াছি, অপ্রতিহত প্রভাবে আধিপত্য করিতেছে খৃষ্টান মিশনরীরা। বলিতে গেলে গোটা সিণ্টেং জাতিটাই স্বধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া পর-ধর্ম্মের আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছে। স্বীকার করি, মিশনরীরা কিয়ৎপরিমাণে ইহাদের কল্যাণসাধন করিয়াছে। কিন্তু আজ যে ইহারা পরানুকরণকেই জীবনের একমাত্র লক্ষ্য বলিয়া বরণ করিয়া লইয়া বিলাসিতা এবং দুর্নীতির স্রোতে গা ভাসাইয়া দিয়াছে, মেয়েদের মধ্যে সতীত্বের আদর্শটা পর্য্যন্ত যে লোপ পাইয়াছে, জিজ্ঞাসা করি, সেজন্য দায়ী কে?

জোয়াই হইতে প্রকাশিত *Woh* নামক খাসিয়া সংবাদ-পত্রের সিণ্টেং সম্পাদক Mr. B. T. Pugh তাঁর পত্রিকার কোনো এক সংখ্যায় তাঁর স্বজাতির নৈতিক অবনতির মূল কারণ যে মিশনরীরাই সে-সম্বন্ধে আলোচনা করিয়া-ছিলেন। বিজাতীয় আদর্শের অনুসরণকারী কুকিজাতির শোচনীয় দুরবস্থার মর্ম্মন্তুদ কাহিনী কুকি-সমাজের শিরোমণি শ্রদ্ধেয় লালতুদাই রায় মহাশয় ইতিপূর্ব্বে 'প্রবাসী'তে বিস্তারিতভাবে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। কিন্তু শুধু সিণ্টেং বা কুকি জাতিরই ত এ অবস্থা নয়। খাসিয়া, লুসাই, নাগা, গারো ইত্যাদি আসামের সমস্ত পার্ব্বত্য জাতির ভিতরকার খবর যিনি রাখেন, তিনিই জানেন সকলকার একই দশা।

এই সমস্ত পার্ব্বত্য জাতিকে হিন্দু সমাজের অঙ্গীভূত করিবার জন্য এখনও কি আমরা উদ্যোগী হইব না? সিণ্টেংদের সহিত প্রায় ছয়টি মাস ঘনিষ্ঠভাবে মেলামেশা করিয়া ইহা বিশেষরূপেই উপলব্ধি করিতে পারিয়াছি যে, সম্প্রতি প্রতিক্রিয়া সুরু হইয়াছে। জাতির দুর্গতিমোচন করিতে হইলে যে, সর্ব্বাগ্রে দেশবাসীকে খৃষ্টান মিশনরীদের প্রভাব হইতে মুক্ত করিতে হইবে, জোয়াইয়ের দলৈ প্রভৃতি জনকতক শিক্ষিত সিণ্টেং আজ তাহা মর্ম্মে মর্ম্মে অনুভব করিতেছেন। তাঁহাদের হৃদয়ে একটা তীব্র অসন্তোষ আজ প্রধূমিত হইয়া উঠিয়াছে। সুতরাং এই পার্ব্বত্য জাতিটার মধ্যে প্রচারকার্য্য করিবার অনুকূল অবস্থা এখন সৃষ্টি হইয়াছে। কেন-না, প্রচারকগণ জাতির সত্যকারের কল্যাণকামী এই সমস্ত সিণ্টেঙের উৎসাহ সহানুভূতি এবং সাহায্য লাভ করিতে সক্ষম হইবেন। সিণ্টেংদের চিত্ত জয় করিবার দুইটি উপায় আছে। প্রথমতঃ তাহাদিগকে বাংলা ভাষা শিক্ষা দেওয়া, দ্বিতীয়তঃ তাহাদের মধ্যে বাংলা সঙ্গীত প্রচার করা, কেন-না, জীবিকার জন্য শ্রীহট্টের বাঙালীদের সঙ্গে ব্যবসা-বাণিজ্য না করিয়া ইহাদের গত্যন্তর নাই। ইহাদের নিজেদের মাতৃভাষাতেই প্রায় ছয় সাত শত বাংলা শব্দ ঢুকিয়াছে, যথা সংসার, পূজা, খবর, মহাজন, হুকুম ইত্যাদি। বাংলা সঙ্গীতও ইহারা অত্যন্ত ভালবাসে। বাংলা গান শুনিয়া সিণ্টেংরা নৃত্য করিতে আরম্ভ করে, ইহা স্বচক্ষে দেখিয়াছি। সুতরাং বাংলা ভাষা ও সঙ্গীত প্রচার দ্বারা কাজের সূচনা করিলে ভবিষ্যতে অন্যান্য কাজ সহজ ও সুসাধ্য হইয়া উঠিবে। মিশনরীরা বিরোধিতা করিয়া, আমাদের কাজ পণ্ড করিয়া দিতে চাহিলেও, সফলকাম হইবে না।*

---

* এই প্রবন্ধ-রচনায় Major Gurdon-এর *The Khassis* নামক পুস্তক হইতে কিছু সাহায্য পাইয়াছি।

দ্রাক্ষাফল

শ্রীরামপদ মুখোপাধ্যায়

বহুদিন পরে অতুলের সঙ্গে হঠাৎ দেখা হইয়া গেল। আপিস-ফেরৎ বাসে গাদাগাদি করিয়া লোক চলিয়াছে, অঙ্গপ্রত্যঙ্গ অক্ষত রাখিয়া ঠিকানায় পৌছানো কম কৃতিত্বের কথা নহে। প্রথমে চাই একটি নির্ব্বিঘ্ন কোণ। দ্বিতীয়তঃ, হাত দুখানি বুকের উপর আড়াআড়ি রাখিয়া অন্যের চাপ হইতে নিজেকে রক্ষা করা। তৃতীয়তঃ, বাস থামিবার কালে টাল সামলাইবার জন্য পা দুখানিকে অতি সন্তর্পণে ছড়াইয়া সর্ব্বদেহের সমতা রক্ষা করা। সর্ব্বোপরি চক্ষু চরকীর মত সর্ব্বক্ষণ ঘুরিতে থাকিবে,—মাথা বুঝি এই ঠুকিয়া গেল, পা বুঝি ছেঁচিয়া গেল, হাতের উপর বুঝি-বা চাপ পড়িল, বুকের ও-পাশের পকেটে অজানা আগন্তুকের নিঃশব্দ হাতখানি বুঝি যৎসামান্য পুঁজির মাথায় হাত বুলাইল ইত্যাদি।

এত সতর্কতা সত্ত্বেও বাস থামিবার কালে একজন লোক উঠিয়া আমার সামনে আসিয়া দাঁড়াইল। তাহার পানে চাহিবার পূর্ব্বেই বাস নড়িয়া উঠিল ও লোকটি টলিয়া আমার উপরেই হুমড়ি খাইয়া পড়িল।

বক্ষোবদ্ধ হাত দিয়া তাহাকে একটা ঠেলা দিয়া কহিলাম,—আঃ—কাণা না কি?

লোকটি সামলাইয়া আমার পানে চাহিয়াই সহর্ষে চীৎকার করিয়া উঠিল,—বাই জোভ্! ফণী যে! চিন্তে পারলি নে?

মুহূর্ত্ত পূর্ব্বের দৃষ্টিশক্তির বড়াই আমার ঘুচিয়া গেল। সে অতুল। একসঙ্গে কলেজে চার বছর পড়িয়াছি,—একসঙ্গে পাস করিয়াছি, একই ঘরে পাশাপাশি খাটে শুইয়া দেশ-বিদেশের কত না গল্প করিয়া গ্রীষ্মের রাত্রি ভোর করিয়া দিয়াছি—তবু তাহাকে চিনিতে পারিলাম না! মাত্র চারটি বৎসরের ব্যবধান। কিন্তু শপথ করিয়া বলিতে পারি—না চিনিবার দোষ আমার নহে। সম্পূর্ণ চারিটি বৎসরে সে অসম্ভব রকমের রোগা হইয়া গিয়াছে; ফুলন্ত গালে হাড় উঠিয়াছে। দাড়ি গজাইয়াছে এত ঘন ও বিশৃঙ্খল যে, লোকালয়ের সঙ্গে তার সম্পর্ক কতটুকু সে-বিষয়ে যে-কেহ যথেষ্ট সন্দেহ করিতে পারে। হোষ্টেলের সেই ফিট-দুরস্ত বাবুর গায়ে এমন জামা-কাপড় কেই-বা কোন দিন ভাবিতে পারে? অভাবের তাড়নায় মানুষ যদি মরিয়া হইয়া তপস্যা সুরু করে ত, সে-তপস্যার শেষ পরিণতি এমনই লজ্জাহীন দারিদ্র্য। এবং অতুলকে দেখিয়া আমার মনে হইল, এই সম্পদকে পাইবার জন্য তাকে যেন বিশেষ রকমের ক্লেশ স্বীকার করিতে হইয়াছে।

অতঃপর চিনিলাম এবং লজ্জিতও হইলাম।

অতুল বোধ হয় আমার লজ্জা বুঝিল না। প্রশ্ন করিল,—ভাল ত?

উত্তর দেওয়া বাহুল্যবোধে নিজ দেহের পানে চাহিলাম। অতুল আমার দৃষ্টির অনুসরণ করিয়া বুঝুক, চার বৎসর পূর্ব্বেকার আমির সঙ্গে আজিকার আমির কত তফাৎ। রং! হাঁ আগের চেয়ে ফরসা হইয়াছে বইকি। ছিপ্‌ছিপে চেহারায় নেওয়াপাতি-গোছ ভুঁড়ি গজাইয়াছে। বাটারফ্লাই গোঁপ ঘুচিয়া কাইজারী ফ্যাশনের যুগ আসিয়াছে—ঊর্দ্ধ ওষ্ঠরাজ্যে। চোখের চশমা, হাতের রিষ্ট-ওয়াচ্ ও বুকের ফাউণ্টেন—কোনটাই ত কুশল প্রশ্ন জিজ্ঞাসার বিনিময়ে প্রতিকূল উত্তর দিবার মত নহে। অবশ্য মাথায় আমেরিকান ফ্যাশান ঘুচিয়া সাদাসিধা এক টেরির আবির্ভাব হইয়াছে, যাহা দেখিলে নিরীহ গৃহস্থের সাংসারিক অটুট শান্তির পরিচয়ই মিলে। পায়ের জুতা ভিড়ের চাপে অদৃশ্য না হইলে অতুল দেখিত সেখানেও আভিজাত্যের চিহ্ন সুপরিস্ফুট। সুতরাং ভালই আছি।

উত্তর দেওয়া বাহুল্যবোধে ঈষৎ হাসিলাম, এবং প্রতি-প্রশ্ন করিবার পূর্ব্বে বন্ধুত্বের খাতিরে বলিলাম,—ব’স।

তিলধারণের স্থান কোথাও নাই। অতুল বিপন্ন চোখে আমার পানে চাহিয়া বলিল,—থাক।

যথাসম্ভব সঙ্কুচিত হইয়া কহিলাম,—এই যে হবে’খন। ব’স না। কথায় ব’লে, যদি হয় সুজন—তেঁতুল পাতায়—উ—হু—হু—

—কি হ’ল?—বলিয়া অতুল চারি আঙল পরিমিত কাষ্ঠাসন স্পর্শ করিতে-না-করিতেই উঠিয়া দাঁড়াইল। পাশের ভদ্রলোক বোধ হয় আমাদের প্রগাঢ় বন্ধুত্বের মর্য্যাদা রাখিবার জন্যই অল্প একটু নড়িয়া বসিলেন। আরও আঙল-দুই ফাঁক হইল। ‘আহা’ ‘উহু’র দিকে দৃকপাত না করিয়া বন্ধুকে ধরিয়া বসাইলাম।

—তারপর, ভাল ত?

অতুল হাসিয়া বলিল,—বলা বাহুল্য।

—কিন্তু এমন বেশ কেন?

অতুল তেমনই হাসিয়া বলিল,—সনাতনী। পাঁচটার পর চেয়ার থেকে ছাড়া পেয়ে চলেচি। কি—বোকা বুঝলি নে? ভাল কথা, কি করচিস বল ত?

—হাইকোর্টে বেরুচ্চি।

অতুল বলিল,—পসারের কথা আর জিজ্ঞেস ক’রবো না—চেহারায় কিছু কিছু মালুম হচ্চে’ তা সুপারিশ ধরলি কাকে?

বলিলাম,—যাঁরা এ-সব বিষয়ে চিরদিন অগ্রণী।

—ওঃ, অর্দ্ধাঙ্গিনীর পিতা, সাবাস।

বলিলাম,—তোর কল্পনাশক্তি আগের মতই প্রখর দেখচি। তবে এত—

বাধা দিয়া অতুল বলিল,—সে এক মস্ত কাহিনী।

—নিশ্চয়ই কিছু থ্রিলিং আছে; কিছু বা রোমান্স।

দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া সে কহিল,—দুই-ই ছিল। জানিস ত, কবিতায় আমার হাত কি রকম খেলতো। গদ্যটাও আয়ত্ত ক’রে নিয়েছিলাম। কথাসাহিত্যে স্থায়ী কিছু দেবার দুরাশাও করতুম এক সময়ে।

—তার পর—?

—তারপর অকস্মাৎ নিকট আশা আরও দূরে গেল স’রে। অর্থাৎ সে হ’ল সত্যসত্যই দুরাশা।

—কিন্তু আমি জানতে চাই সেই অকস্মাৎ-এর ইতিহাস।

সে কথার উত্তর না দিয়া অতুল সহসা প্রশ্ন করিল,—আচ্ছা ফণি, নারী ভিন্ন কি কাব্য লেখা চলে না? প্রেম ভিন্ন কি উপন্যাস অচল?

অতুল হয়ত জানে না, রোমান্স ঘটিবার পূর্ব্বেই আমি বিবাহ করিয়াছি। কাহিনী হিসাবে কাব্য বা উপন্যাস আমার কৌতূহল পরিতৃপ্ত করে, কিন্তু প্রেমকে কষ্টিপাথরে যাচাই করিবার বিন্দুমাত্র সময় আমার কোথায়? মক্কেলের মুঠার ভিতর দিয়া সর্ব্বসমস্যা-সমাধিকা রমা সবেমাত্র স্মিতহাস্যে আমায় অভয়বাণী শোনাইতেছেন।

কিছুক্ষণ আমার উত্তর প্রত্যাশায় কাটাইয়া অতুল কহিল,—নাঃ, তুই আগের মতই আছিস। কিছু বুঝিস না। শোন তবে। নারী ভিন্ন সংসার চলে, কাব্য উপন্যাসও চলে।

—চলে ত চলে! এ-কথা এত ঘটা করিয়া এই এক-বাস লোকের সামনে বলিয়া লাভ কি?

অতুল অল্প একটু উত্তেজিত হইয়া বলিল,—বুঝলি? ওরা মনে করে,—ওরা না থাকলে সৃষ্টি রসাতলে যেত। ভুল সে কথা। ওরা সৃষ্টিটাকে শুধু জটিল ক’রে তোলে, সরল ত করেই না।

খানিক থামিয়া,—ওরা যেমন ভাবপ্রবণ তেমনি হাল্‌কা। দু-দণ্ড কোন মেয়েকে তুমি মুখ ভার ক’রে থাকতে দেখবে না। আবার হাসিখুশীর মধ্যে ছোট্ট একটু কথা ফোটাও দেখবে, চোখে জল গড়াচ্ছে। এই হাসি এই কান্না শরতের মেঘের মতই অন্তঃসারশূন্য।

বলিলাম,—আজকাল নারীতত্ত্ব আলোচনা ক’রছ নাকি?

—তা বাড়ির তিনি কোন—

বিস্মিত হইয়া অতুল কহিল,—বাড়ির? কে তিনি? তিনি ব’লে কেউ নেই। আমি—শুধু আমি। জানিস, ওদের প্যানপেনে স্বভাবের জ্বালায় কবিতা লেখাই

ছেড়েছি। উপন্যাস আমার দু-চোখের বিষ। ফেনিয়ে ফেনিয়ে দুঃখের কাহিনীকে এত করুণ করবার কি দরকার! আরে মর, যেখানে নায়ক-নায়িকা নিয়ে তোর কারবার সেখানে ও-সব ত ঘটবেই।

হাসি চাপিয়া বলিলাম,—তা বটে! কিন্তু বিয়ে করলে ও-কথা বলতে না, বন্ধু। দেখচ, ওদের নিয়েও, ব'লতে নেই, চেহারার জলুষ কিছু কমেনি! বরং—

ফুঃ; অতুল উপেক্ষার হাসি হাসিয়া কহিল,—চেহারা! ও-ত ভোজবাজি। সালসা শরীরকে ফাঁপায়, শক্তিকে করে হরণ।

কহিলাম,—কি জানি, ডাক্তারেরা সালসার এতবড় গুণের সার্টিফিকেট ত দেন নি। যাক, ও-সব কথা। সত্যিই কি বিয়ে করবি নে?

বিয়ে?—পরম আশ্চর্য্যভরে প্রশ্ন করিয়া সেই ঘৃণাভরে উত্তর দিল,—এ জীবনে ত নয়ই, পরজীবনেও—

তাড়াতাড়ি কহিলাম,—পরজীবন আপাতত মুলতবী থাক। বিয়ে না করার কারণ?

—কারণ?—হাঁ সত্য কথাই ব'লবো। আমি, আমি ওদের ঘৃণা করি।

—সর্ব্বনাশ! কিন্তু—কেন?

বন্ধুর প্রদীপ্ত চক্ষুর পানে চাহিয়া কহিলাম,—থাক, থাক, এই এক-বাস লোকের সামনে—

স্বর চড়াইয়া অতুল কহিল,—তাতে কি? স্পষ্ট সত্য সবার সামনেই বলা যায়। বিয়ে করবো না, কারণ, ওরা অসার অপদার্থ জাত। এক কথায় সৃষ্টির আবর্জ্জনা।

ভাগ্যে ভিড় ছিল। তবু নিকটবর্ত্তী লোকগুলার হাসি দেখিয়া আশঙ্কা হইল। চৈত্রের গরম না হউক, বাক্যের উষ্ণতায় যদি অতুলের বক্তৃতার গ্রাম চড়িয়া যায় ত অবিলম্বে দুর্ঘটনা ঘটিতে বিলম্ব হইবে না।

তাড়াতাড়ি বাসের বেল বাজাইয়া অতুলের হাত ধরিয়া নামিয়া পড়িলাম।

* * *

ঘরের মধ্যে ইজিচেয়ারটায় বসিয়াই অতুল স্বস্তির নিঃশ্বাস ত্যাগ করিল,—বাঃ ঘরখানি বেশ সাজিয়েচিস ত!

—তুই বোস, আমি কাপড় ছেড়ে আসি।

ফিরিয়া দেখি, অতুল দেওয়ালে টাঙানো ছবিগুলি খুঁটিয়া খুঁটিয়া দেখিতেছে।

আমায় দেখিয়া উষ্ণস্বরে কহিল,—ম্যাডোনার ছবি রাখ ক্ষতি নেই, কিন্তু ওর পাশে য়্যাষ্টির ওই ছবিখানা কেন? ভালবাসার অভিব্যক্তি! স্রেফ ন্যাকামী। আবার মজুমদারের পঙ্কে পদ্ম—ব্রজের ঢেউ,—ছুত্তোরী, যত সব রাবিশ!

বলিলাম,—ম্যাডোনাও নারী, পঙ্কে পদ্মও নারী। একজন জননী. অপরা প্রিয়া।

বন্ধু মুখ বিকৃত করিয়া কহিল,—মাঝগঙ্গার জলও জল, কিনারার জলও জল। তবে কাদা-গোলা জল না খেয়ে লোকে জলের মধ্যে দাঁড়িয়ে জল আনে কেন? নারী! মাথা খেলে ঐ নারী! নারীর শেষ দিকটা বরং সহ্য করা যায়, কিন্তু, প্রথমটা ওই পেঁকো জলের মতই অপেয়।

বলিলাম,—তোমার কথায় যুক্তি কম। যদি তুমি প্রমাণ করতে পার—

—করবো, আলবৎ করবো। নারী—

—থাক, আপাতত চায়ের সদ্ব্যবহার করা যাক। আপত্তি নেই ত?

—কিছু না—বলিয়া অতুল খাবারের ডিশখানি টানিয়া লইল। ফল এবং খাবার কিছুই সে ফেলিয়া রাখিল না। বেশ তৃপ্তিসহকারেই খাইল।

খাওয়া শেষ হইলে চায়ে চুমুক দিয়া একটা তৃপ্তিসূচক ধ্বনি করিয়া সে কহিল,—আঃ, চমৎকার চা। যেমন রং তেমনি টেষ্ট। খাবারগুলোও ঘরের বুঝি? ফল-ছাড়ানোতেও রুচির পরিচয় আছে। ঠাকুরটি পেয়েচিস ভাল। কত মাইনে রে?

রহস্য করিয়া কহিলাম,—বিনামূল্যে।

—কি রকম? কি রকম?

—ব'লচি। আর এক কাপ চা চলবে?

—মন্দ কি। মেসের ঠাকুরটার যা হাত দিন-দিন পাকচে। কোন্ দিন না হাত কেটে রস বার হয়!

হাসিয়া কহিলাম,—বেশ হয় তাহ'লে। ঠাকুরের বদলে আসবে ঠাকুরাণী।

অতুল রাগ করিয়া কহিল,—ফের ঐ কথা! উঠলাম তাহ'লে।

ধরিয়া বসাইলাম।

—কিন্তু একটা কথা অতুল, তোর কাহিনীটা আমায় বলতে হবে।

বহুক্ষণ ধরিয়া গুম হইয়া বসিয়া সে কি ভাবিল। অবশেষে দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া কহিল,—শুনবি তাহ'লে? কিন্তু শুনলে পরে ও-জাতের ওপর তোর চিত্তির চ'টে যাবে হয়ত, তখন ভাববি কেন ঝকমারি ক'রে এ কাজ করেছিলাম।

—না, তা ভাববো না। ঝকমারির মাশুল একবারই দিতে হয়, বার-বার নয়। ওদের বোঝা না ভেবেও কিছু কিছু বুঝতে পারি কি-না।

—তবে শোন্।

চার বছর আগেকার কথা। মনে কর সেই তেতলা হোষ্টেল। কোণের দিকের ঘর। ছোট্ট ঘরে মাত্র দুখানি সিট। পূব জানালার ধারে আমার বিছানা, দক্ষিণ জানালায় তোর। আমি ভালবাসতাম পূবের তরুণ সূর্য্যকে লাল থালাটির মত আকাশের গায়ে প্রথম রূপায়িত হ'তে দেখতে, তুই ভালবাসতিস দক্ষিণের হাওয়া। এমনি ক'রেই দুটি বছর কাটলো। তারপর পূব আকাশের ও-দিকটা ঢেকে প্রকাণ্ড একটা চারতলা বাড়ি রূঢ়ভাবে আত্মপ্রকাশ করলে। প্রভাতসূর্য্যকে আর দেখতে পেতাম না, সামনের বাঁশ-বাঁধা বাড়ির কাঠামোটা দিন-দিন বেড়ে উঠতে লাগলো। তারপর, একদিন বাঁশের কারাগার থেকে মুক্তি পেল ঐ ভবন। ভবনের প্রাণপ্রতিষ্ঠা হ'ল। মোটর জুড়ি লোকলস্কর নিয়ে অতিথিরা ঢুকলেন তার জঠরে। এদিকে বাড়ির মাথায় প্রতিদিনকার চড়া বেলার সূর্য্যকে দেখে অতীত স্মরণ করি, আর কবিতা লিখি। হঠাৎ একদিন দেখি, ওরই পর্দ্দা-ঘেরা জানালা দিয়ে বহুদিনকার তরুণ রবি আমার পানে চাইচে। রবি তরুণ—রূপে, বর্ণে এবং নূতনতর প্রাণ সম্পদেও। মনে হ'ল বাড়িটার রূঢ় আত্মপ্রকাশকে ক্ষমা করবার মহত্ত্ব আমার থাকা উচিত। বৃথাই এত দিন ওর পানে ভ্রূকুটি ভরে চেয়েচি। লজ্জিত হ'য়ে ক্ষমা-প্রার্থনার দৃষ্টিতে আবার চাইলাম। মনে হ'ল, অপরূপ।

বিছানায় ব'সে খাতা কলম তুলে নিলাম। কবিতার সঙ্কীর্ণ গিরিনদী অকস্মাৎ যেন সমতলভূমি লাভ ক'রে সুবিস্তীর্ণ ও বেগ-ব্যাকুল হ'য়ে উঠলো।

খাতার সঙ্গে মনও ভ'রে উঠলো। মাসিকের পাতায় দু-এক কণা তার পৌঁচেছিল। মনে পড়ে?—

কহিলাম, পড়ে। তোর আকস্মিক কবি-খ্যাতিতে হোষ্টেল হ'য়ে উঠলো চঞ্চল। একটা অভ্যর্থনার আয়োজনও যেন আমরা করেছিলাম না?

—হাঁ। প্রভাতসূর্য্যকে রূপ দিলেন যিনি, তিনি একটি তরুণী। বেথুনে পড়েন—দু-বেলা ঘরের গাড়ী ক'রে যাতায়াত করেন।

—তারপর?

তারপর সচরাচর যা ঘটে থাকে। আরম্ভ হ'ল মোহের ক্রিয়া। দূরবর্ত্তিনীকে উদ্দেশ ক'রে পদ্যে ও গদ্যে স্তুতি-স্তব। মনে হ'ল, বইয়ের ভালবাসা চোখের পথ দিয়ে আমায় হাতছানি দিচ্ছে। তার কমনীয় কর-প্রকোষ্ঠে দু-গাছি স্পর্শকুণ্ঠ সোনার চুড়িকে মনোরম ফুলহার ভাবলাম; একদা এই অতিকর্কশ কণ্ঠে সংলগ্ন হ'য়ে সেই দু-খানি হাত আত্মদানের মাল্য রচনা ক'রবে, এ স্বপ্নও দেখতে লাগলাম।

—তারপর।

—তারপর এক দিন বাড়ির মোটরখানা গেল বিগড়ে। মেয়েটি হেঁটেই কলেজে চললো। চুম্বক যেমন লোহাকে টানে—আমিও তেমনি একটা আকর্ষণ অনুভব করলাম। চলতে চলতে সুযোগও এল।—বেশ বুঝতে পাচ্ছিলাম, ভিড় বাঁচিয়ে চলতে মেয়েটি একটু আড়ষ্ট হ'য়ে গিছলো। বই সামলাবে, না নিজেকে সামলাবে—! শেষে নিজেকে সামলাতে গিয়ে একখানা বই হাত-ফসকে ফুটপাতে প'ড়ে গেল।…এ সুযোগ নষ্ট হ'তে দিলাম না। তাড়াতাড়ি এগিয়ে এসে বইখানা তার হাতে তুলে দিতেই সে…ঘাড় দুলিয়ে একটি মৃদু

অভিবাদন ক'রে হাসলো। কথার চেয়ে এই হাসির মিষ্টতা আমার মনকে স্নিগ্ধ করলো।

—বাঃ—বেশ ত জমিয়ে তুলেছিস।—

—শেষ পর্য্যন্ত শোনই আগে। চলতে চলতে মেয়েটি বললে, আপনার কলেজও কি এই পথে? মিথ্যা কথাটা বলতে পারলাম না। মুখখানা লাল ক'রে উত্তর দিলাম,—না। ভাগ্যে মেয়েটি আর কোনো প্রশ্ন করল না। তাহ'লে বিশেষ রকমেই লজ্জিত হ'তে হ'ত। বেথুনের গেট পর্য্যন্ত কলেজ প্রোফেসার ও পড়ানোর রীতি নিয়ে অনেক তর্কই হ'ল,··প্রথম আলাপের সঙ্কোচটুকুও হয়ত কেটে গেল, কিন্তু সাহস ক'রে কেউ কারও নাম জিজ্ঞাসা করতে পারলাম না।···ভদ্রতাকে ঈষৎ ঢিলে ক'রে পুরুষের নাম পরিচয় জানা হয়ত যায়, কিন্তু এ-সম্বন্ধে কোনো মহিলাকে জিজ্ঞাসাবাদ, মানে রীতিমত বর্ব্বরতা। গেটের মধ্যে ঢুকবার আগে সে আবার মিষ্ট হাসি হাসলে। আগ্রহভরে বললাম,—চারটের পর আসব।

সে ব'ললে,—মিছি মিছি কষ্ট ক'রে—

বললাম,—কষ্ট আর কি।

মনে মনে বললাম, এত কষ্ট কি কপালে সইবে। বড়লোক তোমরা—কালই হয়ত মোটরটা ঠিক হ'য়ে যাবে, কিংবা নতুন একখানা আসবে। তারপর—তোমার মোটরের পাশ দিয়ে চলতে গেলেই ধুলো ও কাদা আমার ভদ্রবেশের ওপর কি কম দস্যুতাই করবে! তখন আমার বিব্রত ভাব দেখে তোমার এই হাসিই হয়ত তখন প্রবল হ'য়ে উঠবে যে চোখের জল লুকুতে আমায় মুখ ফিরিয়ে পালাতে হবে। কিন্তু ভয় আমার মিছে। আকাশে পুরো চাঁদ উঠলে সমুদ্র ওঠে কেঁপে। আকাশে আর জলে বন্ধনরেখা। আমার মনের টানে ওর মোটরের টায়ারটা ফেঁসেই রইলো।—হেঁটেই কলেজে যেতে লাগলো।

—তারপর? নামটা জানতে পারলি নে?

—নাম? হাঁ, জানলাম বইকি। নীলিমা।

—মেয়েটি কেমন দেখতে তা ত বললি নে!

—সে বলার কোনো মানে নেই। যেহেতু, তোমার চোখ ও আমার চোখ এক নয়। আমার চোখে তখন প্রথম বসন্ত দেখা দিয়েচে। আকাশের ফিকে নীল রং থেকে ধূসর ধুলো পর্য্যন্ত অর্থবস্তু। ও সব থাক,—সপ্তাহের আলাপে আমরা যা লাভ করলাম একদিনে দিগ্বিজয়ী তা পায় না। নীলিমা আমায় বললে, তাদের বাড়ির বাঁধন নাকি খুব শক্ত। সাগরপারের ছাপ না-থাকলে ও-বাড়িতে পাণি-প্রার্থনার দুঃসাহস কারও হয়ই না। আমি যদি রাজি হই এবং সত্যকার বীর হই ত গোপনে—

আহত পৌরুষগর্ব্বে উত্তর দিলাম,—এ ত আমার গৌরব!

উত্তরের পরক্ষণেই মুখটা ঈষৎ ম্লান হ'য়ে উঠল। পৌরুষ আমার যথেষ্ট থাকলেও স্বাধীনতা কতটুকু! উপার্জ্জনক্ষম ত নই; কলেজের মাইনে, বই, খাতা বা বাবুয়ানি, বায়স্কোপের খরচ যেখান থেকে আসে, সেখানে এত বড় আত্মত্যাগের কিই বা মূল্য! নীলিমা আমার ভাবান্তর লক্ষ্য ক'রে ব'ললে, দু-দিন পরে যখন আমরা একই হব, তখন কোন বিষয়ে দ্বিধা মনে পুষে রাখা ঠিক নয়। তোমার ভাব আমি বুঝেছি। কিন্তু সে ভয় কোরো না। গোপনে ধর্ম্মসঙ্গত অধিকার নিয়ে আমরা এমন দিনে এ-কথা প্রচার করবো, যেদিন অর্থসমস্যার ভ্রূকুটি আমাদেরকে শাসন করতে পারবে না। কেমন?—

এ-কথায় ওর ওপর শ্রদ্ধা আমার বেড়ে গেল। মুখে বিদ্যাভ্যাসের কঠোরতর দীপ্তিকে মনে হ'ল শ্রী। কে বলে বিবাহ বোঝা! জীবনযাত্রাকে সহজ ও গতিবান করবার জন্যই এই অপূর্ব্ব অনুষ্ঠান। সেইদিনই বীডন বাগানে ব'সে সব ঠিক ক'রে ফেললাম। ভবানীপুরে নীলিমার জানা একখানা ছোট বাড়ি আছে। সে-ই ঠিক করবে ব'ললে। আমায় ভার নিতে হ'ল নাপিত পুরুত ও অন্যান্য আয়োজনের। একলা পাছে সব জোগাড় করতে না পারি এই ভেবে একজন বন্ধুর সাহায্য নেব তাকে জানালাম। নীলিমা হেসে বললে, বেশী লোক-জানাজানি ভাল নয়। আচ্ছা, একজনকেই নিয়ো।

তারপর, নোট বইয়ের ভেতর থেকে খানকয়েক নোট বার ক'রে আমার হাতে গুঁজে দিয়ে সে ব'ললে,—এ-সব বিষয়ে একটুও যদি কিন্তু কর ত আমি মাথা খুঁড়ে মরব। কোন বিষয়ে ঋণ আমরা স্বীকার ক'রবো না।

পৌরুষে আঘাত লাগল, কিন্তু উপায় কি!

সে আরও একটু স'রে এসে ব'ললো,—কাল তোমায় বাড়ি দেখিয়ে আনবো। যাবে ত?

সম্মতি দিলাম।

—চমৎকার! তারপর?—

—তারপর বিয়ের দিন। রাত্রি দুর্য্যোগময়ী। যেমন জল তেমনি ঝড়। ছোট বাড়িখানি—লোকালয় হ'তে একটু দূরে। এমন বিয়ের উপযুক্তই বুঝি। বন্ধু অসীমের কৃতিত্বের খ্যাতি ছিল। কুলো-ডালা, শ্রী, শালগ্রাম শিলা, নাপিত, পুরোহিত পর্য্যন্ত প্রস্তুত। লগ্নের আধঘণ্টা আগে নীলিমা এল। বর্ষাতিটা খুলতেই দেখি, চেলি চন্দন প'রে সে তৈরি হ'য়েই এসেচে। আমিও চেলি প'রে পিঁড়িতে গিয়ে ব'সলাম। বন্ধু অসীম শাঁক হাতে ক'রে যেমন ফুঁ দিয়েচে, অমনি যেন ভোজবাজি আরম্ভ হ'ল। লাল পাগড়ী নিয়ে জন-কুড়ি লোক হুড়মুড় ক'রে বাড়ির মধ্যে ঢুকে প'ড়লো, এবং ঢুকেই কোন কথা না ব'লে আমাদের চার জনকেই তারা বেঁধে ফেললে।

—কি সর্ব্বনাশ! তারপর?

এক সুবেশ সুন্দর যুবক এগিয়ে এসে এক সৌম্য-দর্শন বৃদ্ধকে ব'ললে,—ভাগ্যে এই পথ দিয়ে আমি যাচ্ছিলাম! তাই নীলার চীৎকার শুনে এ বাড়িতে ঢুকে পড়ি। ওকে দেখেই আমার সন্দেহ হয়।—কিন্তু ওদের মত গুণ্ডার গলাধাক্কা খেয়ে আমায় বাড়ি ছাড়তেই হ'ল। ছুটে চ'লে গেলাম থানায়। ইনস্পেক্টরকে সব জানিয়ে আপনাকে ফোন ক'রলাম।

বৃদ্ধ তার দু-হাত চেপে ধ'রে কৃতজ্ঞ-উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে বললেন,—বাবা, তুমি আমার মান বাঁচিয়েছ আজ। ভুল করেছিলাম তোমার হাতে নীলাকে দিতে অস্বীকার ক'রে। তুমি মহৎ। বল, আমায় ক্ষমা ক'রলে? আর নীলার মান শেষ অবধি তোমাকেই রাখতে হবে। বল, বাবা, বল।

যুবক মাথা নামিয়ে স্বীকার করলে।

তারপর নীলাকে জিজ্ঞাসাবাদ আরম্ভ হ'ল।

নির্লজ্জা মেয়েটা অম্লানবদনে ব'ললে,—এ বিয়ের সে কিছুই জানতো না। আমার সঙ্গে তার না-কি পথের সামান্য পরিচয় ছিল। আজ বিকেলে আমি তাকে জানাই যে আমার স্ত্রী এখানে এসে বড়ই পীড়িত হ'য়ে পড়েছে। যদি নীলা দয়া ক'রে গিয়ে তাকে একবার সান্ত্বনা দিয়ে আসে। বাড়িতে কোনো স্ত্রীলোক নেই ব'লে ভারি অসুবিধে হচ্ছে। প্রথমটা নীলা যেতে স্বীকার পায় না। শেষে আমার কান্না দেখে সে থাকতে পারে নি। কিন্তু এখানে এসে ব্যাপার দেখে তার আত্মাপুরুষ উঠল শুকিয়ে। আমরা না-কি তাকে জোর ক'রে চেলি-চন্দন পরালাম। ছোরা দেখিয়ে পিঁড়িতেও বসালাম। ভয়ে সে চীৎকার ক'রে উঠেছিল। সেই সময়ে ভাগ্যে উনি এসে পড়েছিলেন!...ব'লে নীলা কাঁদতে লাগল।—

সেই মুহূর্ত্তে মনে হ'ল, প্রভাতের সূর্য্য অকস্মাৎ আকাশের মাঝখানে গিয়ে উঠেচে এবং সেটা গ্রীষ্মকালের আকাশ! যেমন দাহ তেমনি যন্ত্রণা। মাটি দু-ফাঁক হ'লে আমি অনায়াসে তার মধ্যে চ'লে যেতে পারতাম।

—তা তো পারতে। কিন্তু তারপর—?

—তারপর অনেক ব্যাপার ঘটলো। আসল নামটা লুকিয়ে মাটির মধ্যে আর গেলাম না, গেলাম জেলে। একেবারে আড়াই বছর।

বলিতে বলিতে অতুলের মুখ ঘৃণা ও বেদনায় রেখাসঙ্কুল হইয়া উঠিল। সেই অসহ্য বেদনাকে বিলীন করিবার মানসে ক্ষণপরে সে সশব্দে হাসিয়া উঠিল। বলিল,—এখন বল দেখি, নারীকে ঘৃণা করা কি এতই শক্ত! বঞ্চনাকারিণীর জাতকে, যদি ক্ষমতা থাকত, পৃথিবী থেকে আমি নিশ্চিহ্ন ক'রে দিতাম।

দাঁতে দাঁত চাপিয়া সে ঠাণ্ডা চায়ের পেয়ালাটা তুলিয়া লইল।

ক্ষণিক নিস্তব্ধতার পর কহিলাম,—না ভাই, তোমার ভুল।

চক্ষু বিস্ফারিত করিয়া অতুল কহিল—ভুল! বেশ ভুলই তা'হ'লে। একটু আগে তোমায় জিজ্ঞাসা করেছিলাম, নারী ভিন্ন কি কাব্য লেখা চলে না? তুমি উত্তর দাও নি।—তার মানে তোমার মনেও সন্দেহ আছে। আমি আবার কলম ধ'রে প্রমাণ করব!

কহিলাম,—তা ক'রো। কিন্তু মনে রেখো শেয়ালের গল্পটা। আঙুর ফল—

অতুল হাসিবার চেষ্টা করিয়া কহিল, আছে মনে। আঙুর যতই মিষ্টি হোক—অপক্ক অবস্থায় সে মোটেই মুখরোচক নয়।—বলিয়া উঠিল।

আমি বসিবার অনুরোধ করিতেই সে হাত তুলিয়া বারান্দা পার হইয়া ফুটপাথে গিয়া নামিল।

মণিমালা ঘরে ঢুকিয়া কহিল,—উনি থাকলেন না? বিস্মিত ভাব কাটাইবার চেষ্টা করিয়া হাসিলাম,—মণি, তুমি যদি বেচারীর কাহিনী শুনতে ত হেসে অস্থির হ'তে। এমন নিরেট—

মণিমালা শান্তস্বরে কহিল,—ও-ঘর থেকে সব শুনেচি। শুনে চোখের জল সামলাতে পারি নি। আহা!

সবিস্ময়ে তাহার পানে চাহিলাম।

চোখের কোল দুটি জলভারে টলটলো। ব্যথার তাপে সারা মুখখানিতে মেদুর সন্ধ্যাছায়া নামিয়াছে। নিস্তব্ধ বিষণ্ণতার অন্তরালে এক মহিমময়ী নারীর জ্যোতি-আভাস।

ইচ্ছা হইল, চীৎকার করিয়া অতুলকে একবার ডাকি। শিশির-ভেজা প্রভাত-পদ্মের পেলবতা দেখিয়া সে পুকুরের পাঁকের কথা ভুলিয়া যাক।

কিন্তু অতুল চলিয়া গিয়াছিল।

কি লিখিব?

শ্রীজিতেন্দ্রচন্দ্র মুখোপাধ্যায়

বাংলায় বিজ্ঞান আলোচনা করিতে গেলেই সর্ব্বপ্রথম ও সর্ব্বপ্রধান অসুবিধা মনে হয় বৈদেশিক বৈজ্ঞানিক সংজ্ঞার যথোপযুক্ত ও সর্ব্বজনানুমোদিত পরিভাষার অভাব।

'পজিটিভ্' (positive) ও 'নেগেটিভ্' (negative) 'ইলেকট্রিসিটি' (electricity)-র বিভিন্ন প্রকার পরিভাষা সৃষ্টি হইয়াছে। প্রকৃতপ্রস্তাবে কোনটিই সর্ব্বজনগৃহীত হইতেছে না। 'ধনাত্মক-ঋণাত্মক' যথার্থ, কি 'সংযোগ-বিয়োগ' সুন্দর অথবা 'ইতিবাচক-নেতিবাচক' শ্রুতিমধুর, এখন তাহার বিচার করিবার সময় আসিয়াছে। বাংলায় বিজ্ঞানানুশীলন করিবার পূর্ব্বে এবম্বিধ প্রশ্নের মীমাংসা প্রয়োজন। পরিভাষা সমস্যা নিরাকরণ আশু কর্ত্তব্য।

একটি বিশিষ্ট বৈজ্ঞানিক সংজ্ঞার যথাসম্ভব একটি নির্দ্দিষ্ট পরিভাষা থাকা আবশ্যক—যেটি বিশেষ করিয়া ঐটিই বুঝাইবে। 'ইলেকট্রিসিটি'র পরিভাষা-হিসাবে বিদ্যুৎ বা তড়িৎ উভয়ই ব্যবহৃত হয়। কিন্তু সৌকর্য্যার্থ ইহার একটি পরিত্যাজ্য; কারণ 'লাইটনিং' (lightning)-এর পরিভাষা-হিসাবেও বিদ্যুৎ বা তড়িৎ উভয়ই ব্যবহৃত হয়। সুতরাং 'লাইট্নিং' ও 'ইলেকট্রিসিটি'কে এককালে পৃথক করিয়া বুঝাইতে গেলেই মুস্কিল। এই বিষয়ে একটি সিদ্ধান্ত থাকা দরকার; নতুবা 'তড়িৎ (electricity)' বা 'বিদ্যুৎ (lightning)' কতকাল চলিবে?

'প্রিজ্ম্' (prism)-এর বাংলা ত্রিকোণ বা ত্রিশির কাচ। কিন্তু কাচ ভিন্ন কি 'প্রিজম' হইবে না? 'প্রিজম্' একটি সাধারণ সংজ্ঞা সুতরাং তাহার তদনুরূপ একটি পরিভাষাই থাকা উচিত, নতুবা বিভিন্ন দ্রব্য নির্ম্মিত 'প্রিজম্'কে বিভিন্ন নাম দিতে হইবে। তাহাতে অসুবিধা কম হইবে না। তারপর 'প্রিজম্' মাত্রই কি

ত্রিশির হইবে? Nicol's Prism প্রভৃতির বেলায় ত্রিকোণ বা ত্রিশির লেখা চলিবে না নিশ্চয়ই। সুতরাং 'প্রিজম্'-এর এমন একটি পরিভাষা থাকা দরকার (যদি একান্তই পরিভাষা সৃষ্টি কর্ত্তব্য হয়) যাহার অর্থ ব্যাপক—ত্রিশির, ত্রিকোণ বা কাচের সহিত কোন সম্পর্ক নাই।

সর্ব্বোপরি চিন্তনীয়, সকল ক্ষেত্রেই বাংলা শব্দ সৃষ্টি করিয়া বৈজ্ঞানিক সংজ্ঞার পরিভাষা নির্ম্মাণ সুবিধা ও সঙ্গত হইবে কি-না। 'ইলেকট্রন (electron)এর বাংলা কেহ লিখিলেন 'তড়িদণু', কেহ বা 'তাড়িৎকণা,'—কাহারও বা পছন্দ 'বিদ্যুতিন'। সর্ব্বাঙ্গসুন্দর পরিভাষা ইহার ভিতর কোন্‌টি তাহা বিবেচনা করিবার এবম্প্রকার পরিভাষা ব্যবহার করাই যুক্তিযুক্ত কি-না তাহাই বিচার্য্য। 'ইলেকট্রন' একটি বস্তুবিশেষের নাম—যে ভাষাভাষীর প্রদত্তই হোক না কেন। ইহার বাংলা প্রতিশব্দ ছিল না; সৃষ্টি করা যাইতে পারে, কিন্তু একান্ত প্রয়োজন কি? 'ইলেকট্রন' যিনি প্রথম আবিষ্কার করিয়া ইহার নামকরণ করিয়াছেন তাহার একটা দাবি থাকিতেই পারে। অন্ততঃ সেই দাবি হিসাবেই 'ইলেকট্রন' শব্দটির রূপান্তর না করাই বোধ হয় উচিত। ইহাকে 'বিদ্যুতিন' বা 'তড়িদণু' বলিলে, ইহার সত্য সংজ্ঞা লোপ করিয়া নব নামকরণ করা হয়। 'ইলেকট্রন'কে বৈজ্ঞানিকগণ বলেন, 'atom of electricity', সেই হিসাবে আমরাও বলিতে পারি 'ইলেকট্রন' 'তাড়িৎকণা' বা তড়িদণু'। কিন্তু সত্য নাম লোপ করিয়া 'তড়িদণু' বা এবম্প্রকার বাংলা নামকরণ শুধু নিষ্প্রয়োজন ও বৃথা নয়, হয়ত অনধিকারও, সুতরাং অসমীচীন হইতে পারে। 'ইথার' (ether), 'এক্স-রশ্মি' (X-Ray) প্রভৃতিকে যে জন্য বাংলা করি না, সেই একই কারণে 'ইলেকট্রন'-এর পরিভাষা নির্ম্মাণ নিরর্থক।

'স্পেক্‌ট্রাম' (spectrum)এর অর্থ 'বর্ণচ্ছত্র' বটে, কিন্তু ইহাকেও পরিভাষা রূপে ব্যবহারে পূর্ব্বানুরূপ আপত্তি হইতে পারে। 'স্পেক্‌ট্রাম'—'বর্ণচ্ছত্র' লিখিলে spectral lines-এর বেলায় কি লিখিব?

'থার্ম্মোমিটার' (thermometer)-এর বাংলা 'তাপমানযন্ত্র' লেখা হইয়া থাকে, যদিও লোকে 'থার্ম্মোমিটার'ই ভাল চেনে। 'পাইরোমিটার' (pyrometer), 'কেলোরিমিটার' (calorimeter), 'বলোমিটার' (bolometer)—এগুলিও তাপমানযন্ত্র। প্রভেদ বুঝাইবার কোন উপায় নাই—'ব্র্যাকেটে' ইংরেজীটা লিখিয়া দেওয়া ছাড়া। অবশ্য এগুলির জন্য অন্য পরিভাষাও সৃষ্টি করা যাইতে পারে; কিন্তু লাভ কি? থার্ম (therm), কেলোরী (calorie), মিটার (metre) এগুলির উপায় কি হইবে? শব্দগুলি বৈদেশিক, কিন্তু উহারা মাত্রা বা 'ইউনিট' (unit); সুতরাং উহাদিগকে পরিবর্ত্তিত করিয়া দেশীয় পরিভাষা সৃষ্টি করা চলিবে না—যেমন, ইঞ্চি, পাউণ্ড, শিলিং প্রভৃতিকে বাংলা করা হয় না বা করা যায় না। যদি 'থার্ম' (therm) কেলোরী (calorie), মিটার (metre) চলিতে পারে তবে 'থার্ম্মোমাত্রা' বা 'থার্ম্মোমিটার' 'কেলোরীমাত্রা' বা 'কেলোরীমিটার' চলিতে আপত্তি হইতে পারে না। metre চলিলে meter-ও চালাইলে দোষ কি? এইরূপ 'এম্‌মিটার (ammeter), 'ভোল্টমিটার' (voltmeter), 'গেলভ্যানোমিটার' (galvanometer) প্রভৃতি সম্বন্ধে ঐ একই কথা বলা চলে।

'লেন্স' (lens) কে মণিমুকুর, স্বচ্ছমণি বা আতসীকাচ বলিলেই 'লেন্স'-এর অর্থ, ক্রিয়া বা ধর্ম্ম নিশ্চয়ই কিছু বুঝান যায় না। তবে উহার পরিভাষা নির্ম্মাণের সার্থকতা কোথায়, অত্যাবশ্যকতা কি? 'লেন্স' কে ঐ নামেই বলিব না কেন? আপত্তি হইতে পারে 'লেন্স' বৈদেশিক শব্দ, কিন্তু বৈদেশিক শব্দ নাই কোন্ ভাষায়?

যথাসম্ভব কয়েকটি নূতন শব্দ সৃষ্টি করিয়া অল্পসংখ্যক শব্দের পরিভাষা নির্ম্মাণ অসম্ভব নয়, কিন্তু অগণিত বৈজ্ঞানিক শব্দের প্রতিশব্দ সৃষ্টি করা সম্ভব হইবে কি-না তাহাও বিবেচ্য।

'হাইড্রোজেন' (hydrogen)এর বাংলা 'উদজান' (জান?) 'অক্সিজেন' (oxygen)কে 'অম্লজান' 'নাইট্রোজেন' (nitrogen)কে 'যবক্ষারজান' বলিতে পারি; কিন্তু আরও শত শত রাসায়নিক পদার্থের পরিভাষা সৃষ্টি করা চলিবে কি-না তাহা চিন্তনীয়। উল্লেখ করা বাহুল্য, আশী-নব্বইটি মৌলিক পদার্থের এতগুলি পরিভাষা নির্ম্মাণ ও তাহাদের অগণিত যৌগিক পদার্থের

প্রত্যেকটির নব নামকরণ খুব সহজ হয়ত নয় এবং তাহাতে অসুবিধাও হইবে যথেষ্ট। এইরূপে দেখা যাইবে পরিভাষা সৃষ্টি করাই কর্ত্তব্য স্থির করিলে বিপদ বড় কম হইবে না; অসম্ভব হয়ত নয়, কিন্তু তাহার একান্ত প্রয়োজন কি?

চেয়ার, টেবিল, হোটেল, রেস্তোরাঁ, পিনিশ (পান্সী) প্রভৃতির মত 'ফোকাস', 'পাম্প', 'গ্যাস', 'এসিড' কথা-গুলিও বাংলায় প্রচলিত হইয়া গিয়াছে; উহাদিগকে তর্জ্জমা করিয়া কেন্দ্রীভবন, বায়ুনিষ্কাশক, বায়বীয় পদার্থ, অম্ল লিখিবার সুযোগ কি জানি না।

পদার্থবিদ্যার (physics) বা রসায়নীর (chemistry) গোটাকতক পরিভাষা নির্ম্মাণ সম্ভব হইলেও বিজ্ঞানের অন্যান্য শাখা যেমন উদ্ভিদবিদ্যা (botany), ভূবিদ্যা (geology), প্রাণিবিদ্যা (zoology), চিকিৎসা-শাস্ত্রাদি (medicine, anatomy, physiology, etc.), গণিত প্রভৃতি বিষয়ান্তর্ভুক্ত অগণিত শব্দাবলীর পরিভাষা নির্ম্মাণ সঙ্গত ও সুবিধা হইবে কিনা তাহাও বিবেচ্য।

রসায়নীর ফরমূলা (formula) ও সাঙ্কেতিক নাম (symbol) কোন্ বর্ণমালায় লিখিব? প্রয়োজনানুযায়ী গ্রীক বর্ণমালাগুলি সমস্তই ইংরেজী বা জার্ম্মান বৈজ্ঞানিক গ্রন্থে সংক্ষিপ্ত নাম লিখনার্থ ব্যবহৃত হইতেছে। সুতরাং আমরাও ঐক্যরক্ষার্থ 'ফরমূলা' ও সংক্ষিপ্ত নামগুলি রোমান বর্ণমালায় লিখিতে পারি না কি?

যে-শাস্ত্র বা বিদ্যার পাঠালোচনা ইতিপূর্ব্বে বঙ্গভাষার সাহায্যে সম্যক সম্ভব ছিল না তদন্তর্গত নূতন ও বিশিষ্ট শব্দাবলী যাহারা বঙ্গভাষায় সম্পূর্ণ নূতন বিধায় বঙ্গভাষায় তাহাদের কোন প্রচলিত প্রতিশব্দ নাই, সেইগুলি বৈদেশিক ভাষাতেই গ্রহণ করিলে অন্য যে ক্ষতিই হোক না কেন, ঐ সব শাস্ত্রাধ্যয়নে বিশেষ সুবিধা হইবে এটুকুও কম লাভ নয়।

sulphur কে গন্ধক, mercury-কে পারদ, gold-কে স্বর্ণ বলিব, heat-কে উত্তাপ, retort-কে বকযন্ত্র বলিবার কারণ থাকিতে পারে, wave-কে 'ওয়েভ' বা force-কে 'ফোর্স' না বলিবার যুক্তি আছে, কিন্তু 'ফস্‌ফরাস্' 'প্ল্যাটিনাম্' 'ফরমূলা', 'ক্যামেরা', 'বেরোমিটার,' 'ভালভ,' 'গ্রীড্' প্রভৃতিকে অপরিবর্ত্তিত নামেই অভিহিত করা বোধ হয় অসঙ্গত নহে। Detector-কে সন্ধানী বলিতে পারি, কিন্তু crystal কে ক্রীষ্টাল বলাই বোধ হয় সহজ। Root-কে মূল বলা অযৌক্তিক নহে, কিন্তু logarithm-কে লগারিথম্ বা log-কে লগ বলাই সুবিধাজনক মনে হয়। যে-সকল স্থলে বহুকল্পিত দুরূহ নূতন শব্দ সৃষ্টি করিয়া পরিভাষা গঠন করিতে হইয়েছে, সেখানে যদি বৈদেশিক শব্দটি গ্রহণ সহজ হয় তবে বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে (সাহিত্যের কথা নয়) তাহা করিবার প্রয়োজন আছে। সর্ব্বাগ্রে চেষ্টা করিতে হইবে বৈদেশিক ভাষার অনুরূপ বা সদৃশোচ্চারণের শব্দ দ্বারা পরিভাষা-সৃষ্টি সম্ভব কি-না—যেমন geometry—জ্যামিতি; trigonometry—ত্রিকোণমিতি; আবার Intern—অন্তরীণ, romance—রোমাঞ্চন বা রমন্যাস, ruminate—রোমন্থন; সেইরূপ লিখিতে পারি diode—দ্ব্যায়ুধ, triode—ত্র্যায়ুধ, diffraction—দিগর্ত্তন ইত্যাদি।

এখানে তর্ক উঠিতে পারে, অন্য সকল স্থানে যদি ইংরেজীর প্রতিশব্দ ব্যবহার করা চলে man-কে মানুষ, water-কে জল বলিলে বুঝিতে অসুবিধা না হয় তবে lens-কে মণিমুকুর বা electron কে বিদ্যুতিন বলিলে আপত্তি কেন?

এখানে বলিয়া রাখা ভাল, পূর্ব্বে যে বৈদেশিক শব্দ গ্রহণ বিষয়ে উল্লেখ করা হইয়াছে তাহা বিজ্ঞানান্তর্গত, কেবলমাত্র বৈজ্ঞানিক বিষয়ে ব্যবহৃত বৈজ্ঞানিক শব্দ ও সংজ্ঞাগুলি সম্বন্ধেই।

সাহিত্য যাহার যাহার নিজস্ব। বিভিন্ন ভাষার সাহিত্যে বিভিন্ন ভাষার চিন্তাধারায় যথেষ্ট প্রভেদ বিদ্যমান, উহা বিভিন্ন ভাষার স্ব-স্ব গণ্ডীভুক্ত। প্রয়োজন বোধ করিলে অন্য ভাষাবিৎ নিজ ভাষায় অন্যভাষার সাহিত্যকে অনুবাদ করিয়া লইতে পারে, না লইলেও ক্ষতি নাই; কিন্তু বিজ্ঞান শাশ্বত ও সার্ব্বজনীন সত্য, ইহাতে প্রাদেশিকতা বা বৈদেশিকতার প্রভেদ নাই। ইহার মৌলিকত্ব, চিন্তাধারা, গবেষণার বিষয় এক এবং বিভিন্ন ভাষাবিদের নিকট বিভিন্ন অভিব্যক্তিতে পরিস্ফুট

নহে। একের চিন্তাধারার সহিত অপরের নিয়ত যোগ থাকা প্রয়োজন, একের আবিষ্কৃত সত্যের সহিত অন্যের পরিচয় অবশ্যম্ভাবী। সুতরাং বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে যথাসম্ভব ঐক্য রাখিবার প্রয়োজনীয়তা বিদ্যমান। যে বাঙালীর ছেলে ইংরেজী শিখিবে অর্থাৎ ইংরেজী ভাষা ও সাহিত্য শিখিবে তাহাকে মনুষ্য—man, জল—water প্রভৃতি শিক্ষার ভিতর দিয়াই আরম্ভ করিতে হইবে, পরন্তু তৎসঙ্গে তাহাকে lens, electron, ion বা quantum-এর প্রতিশব্দ শেখান হইবে না বা শেখান সম্ভব হইবে না। তাহাই যদি করিতে হয় তবে বৈজ্ঞানিক পরিভাষা শিখিতেই ভাষা শিক্ষা হইতে বেশী সময় প্রয়োজন হইবে, কারণ বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখায় বিভিন্ন প্রকার অসংখ্য শব্দ আছে। অন্যভাষা শিখিতে গিয়া যদি তদন্তর্ভুক্ত বৈজ্ঞানিক শব্দগুলিও শিখিতে হয় তবে ভাষা শিক্ষার বিপদ বড় কম হইবে না। পক্ষান্তরে যদি বৈজ্ঞানিক সংজ্ঞাগুলি সকল ভাষাতেই অনুরূপ থাকে তবে বিজ্ঞানালোচনার গণ্ডী সহজেই অনেক প্রসারিত করা যাইবে। যে-কোন ভাষায় সাধারণ জ্ঞান হইলেই সেই ভাষায় বিজ্ঞানালোচনা সম্ভব হইবে ও অনেক বৃথাশ্রমের দায় এড়ান যাইবে। মাতৃভাষাকে শিক্ষার বাহন করিলে শিক্ষা অনেক সহজ হয়, এই যুক্তিকে এতদূর টানিয়া না আনিলেও চলে। কারণ গোটাকতক সংজ্ঞা—মাতৃভাষায় যাহাদের কোন প্রচলিত প্রতিশব্দ ছিল না, দুর্ব্বোধ্য পরিভাষা হয়ত চেষ্টা করিলে নির্ম্মাণ করা যাইতে পারে, সেগুলি যদি বৈদেশিক ভাষাতেই গ্রহণ করি তবে বিশেষ কোন অসুবিধা বোধ হয় না। বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার এ প্রান্তে আসিয়া হয়ত বুঝা যায় lens কে 'মণিমুকুর,' electron-কে 'বিদ্যুতিন' বলা চলে, কিন্তু যখন বিজ্ঞানে প্রাথমিক শিক্ষা পাইয়াছিলাম তখন অর্থ না জানিয়াও বুঝিতে অসুবিধা হয় নাই lens, spectrum, prism কাহাকে বলে। প্রত্যক্ষভাবে না চিনাইয়া দিলে electron, spectrum, atom প্রভৃতিকে বিদ্যুতিন বা তাড়িৎকণা, বর্ণচ্ছত্র, অণু বা পরমাণু যাহাই বলি না কেন, চেনাটা মোটেই সহজসাধ্য হইবে না। প্রথম শিক্ষার্থীর নিকট 'ব্যাটারী' বা 'তড়িতোৎপাদক' 'আয়ন্', বা 'বিদ্যুতিকা' 'ভিটামিন' বা 'খাদ্যপ্রাণ' সবই সমান; কিন্তু অণু, বর্ণচ্ছত্র প্রভৃতি শিখাইয়া ফল হইবে যে, যে ছাত্র আণবিক গঠন-প্রণালীতে বিদ্যুতিনের বিভিন্ন প্রকার অবস্থান ও ঘূর্ণন ফলে কি প্রকারে বিভিন্ন বর্ণচ্ছত্রের উৎপত্তি এতাদৃশ গভীর তত্ত্ব অবগত আছে, সে ইংরেজী ভাষা শিখিয়া শেক্স্‌পীয়ারের কাব্য পড়িতে শিখিল, বার্ণার্ড শ-র উপন্যাস পড়িয়া রসগ্রহণ করিতে অথবা জার্ম্মান ভাষায় সুপণ্ডিত হইয়া জার্ম্মান সাহিত্য পড়িতে জানিল তাহাকে, 'atoms are composed of electrons'—বলিলে সে কিছুই বুঝিবে না অথবা electron theory of matter, atomic structure and spectral lines, atomes et electrons, Atomban spectrallinien বা La Theorie des Quanta প্রভৃতি বই পড়িতে দেওয়া হইলে বা নিজ প্রয়োজনে পড়িতে হইলে ঐ পুস্তক পদার্থবিদ্যার অথবা চিকিৎসা শাস্ত্রান্তর্গত তাহা স্থির করা সহজ হইবে না, যদিও Theory of matter, structure, lines, theorie, des, প্রভৃতির অর্থ তাহার অজ্ঞাত নহে শুধু তাহার জানা নাই, অণুর ইংরেজী বা জার্ম্মান 'এটম,' spectra অর্থ বর্ণচ্ছত্র ইত্যাদি। সুতরাং বঙ্গভাষায় যে-ব্যক্তি বিজ্ঞানে সুপণ্ডিত তাহাকে অন্য ভাষায় লিখিত বৈজ্ঞানিক পুস্তক পাঠ করিতে হইলে বিজ্ঞানের প্রাথমিক পুস্তক হইতে আরম্ভ করিতে হইবে। এমতাবস্থায় বিভিন্ন ভাষার বৈজ্ঞানিক 'ওয়াডবুক' তৈয়ারী করিতে হইবে। কেহ হয়ত বলিবেন কেন ঐ কয়েকটি অর্থ জানিয়া লইলেই হইতে পারে? হয়ত পারে; কিন্তু ঐ জাতীয় অজ্ঞাত শব্দ ঐ সকল পুস্তকে একটি দুইটি নয়, শত শত এবং বিভিন্ন ভাষায় বারংবার শেখার অর্থ শক্তির অপব্যবহার এবং যাহা না করিলেও চলে যদি আণবিক গঠন-প্রণালীর পরিবর্ত্তে 'এটমিক' গঠন-প্রণালী শেখান হয় বিদ্যুতিনবাদ না বলিয়া 'ইলেকট্রনবাদ,' বলা হয়। বঙ্গভাষার প্রতি একপ্রকারে চরম নিষ্ঠা রাখিতে গিয়া আমরা জিতিব কি ঠকিব তাহা ভাষাকুশলীগণ বিচার করিবেন।

নব্যবিজ্ঞানালোচনা বা গবেষণার কেন্দ্র প্রতীচ্য জগতেই

মূলতঃ বা সর্ব্বথাই বলা চলে। ইউরোপের বিভিন্ন দেশের ভাষা পরস্পর-সম্বন্ধ-সম্পন্ন এবং বর্ণমালাও প্রায়শই এক, সুতরাং ঐ সমস্ত দেশে বৈজ্ঞানিক নাম ও সংজ্ঞাগুলি সকল ভাষাতেই অধিকাংশ স্থলে অনুরূপ রাখিতে বেশী অসুবিধা হয় নাই বা অন্য প্রকারে পরিবর্ত্তিত করিবার প্রশ্নও খুব জটিল হইয়া উঠে নাই। কিন্তু আমাদের দেশে ভাষা, বর্ণমালা সম্পূর্ণ ভিন্ন হওয়াতেই বৈদেশিক শব্দগুলি নিজভাষায় গ্রহণ করিতে কেমন বিসদৃশ মনে হইতে পারে। কিন্তু অসুবিধা কি হইবে তাহা দেখাইতে বেশী দূরে যাইতে হইবে না। যদি ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রদেশের বিভিন্ন ভাষাভাষীগণ স্ব-স্ব ভাষায় বিভিন্ন প্রতিশব্দ গড়িয়া লয় তবে এক প্রদেশের বৈজ্ঞানিককে অন্য প্রদেশে গিয়া বিজ্ঞানালোচনা করিতে হইলে বৈজ্ঞানিক দোভাষীর প্রয়োজন হইবে। বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে এতটুকু উদারপন্থী হওয়ার প্রয়োজন আছে মনে হয়। জার্ম্মান, আমেরিকান, রুষীয় বা ভারতীয় বৈজ্ঞানিক যাহা আবিষ্কার করিতেছেন ইংরেজ বৈজ্ঞানিক তাহা অস্বীকার করিতেছেন না। ইংরেজ বৈজ্ঞানিক 'প্রটন' আবিষ্কার করিয়া তাহার যে নামকরণ করিয়াছেন জার্ম্মান বৈজ্ঞানিক তাহার জার্ম্মান নামকরণ করেন নাই; কিন্তু বাঙালী লেখক 'কেন্দ্রীন' লিখিবার প্রলোভন ত্যাগ করিতে পারেন নাই। বাংলার বৈজ্ঞানিক যদি কোন বিষয় আবিষ্কার করিয়া তাহার বাংলা নাম প্রদান করেন তবে ঐ বাংলা নামই সর্ব্বত্র গৃহীত হইবে এবম্প্রকার আশা করিতে পারি। 'টুরমালীন' (Tourmaline) কথাটি সিংহলীয়, কিন্তু সকল ভাষাতেই ঐ অপরিবর্ত্তিত অবস্থাতেই গৃহীত হইয়াছে। প্রয়োজনানুসারে বাংলা যত শব্দ ইংরেজী হইয়া গিয়াছে তাহার সংখ্যাও কম নয়। বৈজ্ঞানিক শব্দের মূল খুঁজিতে গেলে ইংরেজী ভাষার শব্দের চেয়ে অন্যভাষান্তর্ভুক্ত শব্দই বেশী পাওয়া যাইবে; অথচ ঐগুলি ঈষৎ পরিবর্ত্তিত বা অপরিবর্ত্তিত অবস্থাতেই ইংরেজীতে গৃহীত হইয়াছে। Algebra শব্দটির মূল আরবী, Thermos, Spectrum, Atom, quantum, Infra, lens শব্দগুলি গ্রীক ও ল্যাটিন হইতে গৃহীত। এবম্প্রকার দৃষ্টান্ত মোটেই বিরল নহে। বৈদেশিক ভাষান্তর্গত বহু শব্দ প্রয়োজনানুযায়ী ইংরেজী ভাষান্তর্ভুক্ত করিয়া লওয়ার জন্যই ইংরেজী ভাষা এত সমৃদ্ধ ও বর্ত্তমানে পৃথিবীর সাধারণ ভাষা।

বৈজ্ঞানিক শাস্ত্রের যতটুকু বিদেশী হইতে গ্রহণ করিব প্রয়োজন হইলে তদন্তর্গত বিশিষ্ট শব্দগুলি (Technical terms)—যাহাদের প্রচলিত বাংলায় ভাল কোন প্রতিশব্দ নাই—তাহা গ্রহণ করিতে আপত্তি হওয়ার কোন্ কারণ থাকিতে পারে? যে-সমস্ত বৈজ্ঞানিক সংজ্ঞার নূতন করিয়া পরিভাষা নির্ম্মাণ করিতে নূতনতর শব্দ সৃষ্টি করিতে হইতেছে সে-সব স্থলে সদৃশোচ্চারণের শব্দ নির্ম্মাণ করিতে পারিলে এই ব্যবস্থাই সর্ব্বোৎকৃষ্ট হয়, কিন্তু যদি তাহা একান্তই সম্ভব না হয় তবে ঐ বৈদেশিক শব্দটিই যথাসম্ভব বাংলা করিয়া লওয়াই বোধ হয় সুবিধাজনক।

এই বিষয়ে সুধীগণের দৃষ্টি আকর্ষণ করাই এই প্রবন্ধের মূল উদ্দেশ্য। স্বমত প্রতিষ্ঠিত হোক বা না-হোক—সেগুলি যুক্তিযুক্ত বিবেচিত হোক বা না-হোক তাহাতে কিছু ক্ষতিবৃদ্ধি নাই, কিন্তু বৈজ্ঞানিক পরিভাষা সম্বন্ধে একটা স্থায়ী বিধি স্থিরীকৃত হউক ইহাই লেখকের আন্তরিক ইচ্ছা।

মাতৃ-ঋণ

শ্রীসীতা দেবী

৩২

কার্ট রোড হইতে ঢালু গড়ানে রাস্তা বাহিয়া খানিকটা নামিয়া যাইতে হয় তাহার পর এক সঙ্গে তিনটি বাড়ি। ইহারই মাঝেরটি নৃপেন্দ্রবাবু ভাড়া লইয়াছেন। লোকের মুখে শুনিয়া কাজ করিলে যাহা হয়, এ-ক্ষেত্রেও তাহাই ঘটিয়াছে। চিঠিতে বর্ণনা পড়িয়া যাহা অতিশয় সুন্দর ও সুবিধাজনক বলিয়া বোধ হইয়াছিল, এখন দেখা যাইতেছে তাহার প্রতি পদে ত্রুটি, এবং সুবিধা অপেক্ষা অসুবিধা দশ-বিশ গুণ বেশী।

কাঠের খাঁচার মত বাড়িখানি দেখিয়াই ত নৃপেন্দ্রবাবুর প্রাণ উড়িয়া গিয়াছিল, জ্ঞানদার বাক্যস্রোত তিনি যেন কল্পনাতেই দুই কান ভরিয়া শুনিতে লাগিলেন। কিন্তু গৃহিণী আসিয়াই এত অসুস্থ হইয়া পড়িলেন যে, তাঁহার আর কিছুর খুঁৎ ধরিবার ক্ষমতাই রহিল না। উহারই মধ্যে যে ঘরখানি ভাল, তাহা বাছিয়া যামিনী মায়ের জন্ত বিছানা পাতিয়া তাঁহাকে শোয়াইয়া দিল, তাহার পর আয়ার সাহায্যে জিনিষপত্র গুছাইয়া রাখিতে লাগিল। পাচক ভৃত্য রান্নাঘর ঝাঁট দিয়া, রান্নাবান্নার জোগাড় করিতে লাগিল।

বেলা বারোটা অবধি পরিশ্রম করিয়া যামিনী স্নান করিতে গেল। বাড়িখানা এখন খানিকটা মানুষের বাসযোগ্য বলিয়া বোধ হইতেছে, যদিও তাহাদের প্রয়োজনের পক্ষে স্থানের অভাব অত্যন্তই। চারিখানি মাত্র ঘর, দুটি শয়নকক্ষ, একটি বসিবার ঘর, একটি খাইবার ঘর। বিজ্ঞাপনে যদিও বাড়িটি well-furnished বলিয়া লেখা ছিল, কিন্তু আসবাবের অবস্থা দেখিয়া যামিনীর ত কান্না পাইতে লাগিল। নিতান্ত না হইলে নয়, এমনই দু-চারটা জিনিষ আছে, সেগুলিও ভাঙাচোরা, রঙচটা। কি আর করা যায়, ইহাতেই কাজ চালাইতে হইবে। কলিকাতায় বাড়িসুদ্ধ ত আর এখানে উঠাইয়া আনা যায় না?

পাহাড়ে হাওয়ায় এবং অনেক পরিশ্রম করিয়া যামিনীর অত্যন্ত ক্ষুধা বোধ হইতেছিল, সে তাড়াতাড়ি স্নান সারিয়া আসিয়া খাইতে বসিল। আয়া আসিয়া জ্ঞানদা সামান্ত যাহা খাইবেন, তাহা উঠাইয়া লইয়া গেল।

নৃপেন্দ্রবাবু বলিলেন, "তাই ত এসেই তোমার মাকে শুতে হ'ল, ভারি মুস্কিল। এখানে আবার ডাক্তার-টাক্তার কোথায় কি পাওয়া যায়, ঠিক মত জানা নেই।"

যামিনী বলিল, "স্যানিটোরিয়মে খোঁজ করলেই জানা যাবে বোধ হয়।"

মিহির বলিল, "আমি বিকেলে শিশিরদের সঙ্গে বেড়াতে গিয়ে সব জেনে আসব।"

বাড়িটার গুণের মধ্যে পাশেই একটুকরা জমিতে একটি গোলাপ-বাগান। ফুলগুলি চমৎকার যেন চারিদিক আলো করিয়া রহিয়াছে। যামিনী ভাবিল, কলিকাতা হইলে এই ফুলের না জানি কত দাম হইত, এখানে কখন ফুটিতেছে, কখন ঝরিয়া পড়িতেছে, কেহ খোঁজই রাখে না। রৌদ্রের উত্তাপ নাই, কুয়াসায় ম্লান দিন। খাওয়া শেষ করিয়া দেখিল, মা ঘুমাইয়া পড়িয়াছেন, একখানা চেয়ার টানিয়া লইয়া গিয়া বাগানের ভিতর বসিয়া পড়িল।

মিহির বাহিরে আসিয়া বলিল, "ষ্টেশনে নেমে ভেবেই পাচ্ছিলাম না যে, এখানে সবাই এত শীত বলে কেন। এইবারে টের পেয়েছি। বাব্বা, হাড়গুলো সুদ্ধু যেন ঠক্ ঠক্ ক'রে শব্দ করছে।"

যামিনী বলিল, "ওভারকোটটা গায়ে দে না, আনা ত হ'ল সব বয়ে।"

মিহির বলিল, "হ্যাঁ, এখনি ওভারকোট গায়ে দিচ্ছে, তারপর সন্ধ্যার সময় কি করব? লেপ গায়ে দিয়ে বেড়াব?"

যামিনী বলিল, "দরকার হ'লে তাই কোরো। আর যাই কর, ঠাণ্ডা লাগিয়ে তুমিও অসুখ বাধিও না। এক মা শুয়েই আমাদের যথেষ্ট হয়েছে।"

মিহির বলিল, "অসুখ বাধাবার ছেলে আমি নই। একটু হাঁটাহাঁটি করলেই এ শীত আমার কেটে যাবে। দেখে আসি শিশিরদের বাড়িটা কোন্‌খানে," বলিয়া কাহারও অনুমতির অপেক্ষা না রাখিয়া, ঢালু রাস্তা বাহিয়া উপরে উঠিয়া গেল। যামিনী ঘরের ভিতর হইতে একখানা শাল বাহির করিয়া আনিয়া আবার বাগানেই বসিল।

মেঘাচ্ছন্ন দিন, রৌদ্রের তেজ নাই, বেলা কি ভাবে গড়াইয়া চলিয়াছে, বুঝিবার উপায় নাই। দুপুরও হইতে পারে, সন্ধ্যাও হইতে পারে। তাহার বিষণ্ণ মন আরও যেন ভারাক্রান্ত হইয়া উঠিতে লাগিল। দুর্ভাগ্য যেন প্রতি পদক্ষেপে যামিনীর জন্য বসিয়া আছে। একমাত্র অবলম্বন তাহার ছিলেন মা, তাঁহাকেও কি হারাইতে হইবে? কোনও দিন যাঁহাকে কাতর বা অক্ষম সে দেখে নাই, তিনি এখন শিশুর মত অসহায়, যামিনীর অপটু হস্তের সেবার কাঙাল! যামিনীর বুকের ভিতরটা কেমন যেন ব্যথা করিতে লাগিল।

বাস্তবিক এ-সংসারে আসিয়া অবধি জ্ঞানদা নিজের দেহ-মনকে কোনদিন বিশ্রাম দেন নাই। নৃপেন্দ্রবাবুর আয় যখন কম ছিল, ছেলেমেয়ে ছোট ছিল, তখন বিশ্রামের অবসরই হয় নাই। তাহার পর ছেলে-মেয়ে বড় হইয়াছে, আয় বাড়িয়াছে, নিজের বাড়ি, নিজের গাড়ী হইয়াছে, কিন্তু জ্ঞানদার অবস্থা একই রকম। কাজ না থাকিলে, কাজ তিনি সৃষ্টি করিয়া লইয়াছেন। একবার গোছান আল্‌মারী দেরাজ খুলিয়া আবার গুছাইয়াছেন। ঘর-দোর পঞ্চাশবার ঝাড়িয়াছেন, শেলাইয়ের কল লইয়া অবিশ্রাম শেলাই করিয়াছেন। যাহা নিজেদের প্রয়োজনে লাগে নাই, তাহা মহিলা সমিতির মেলাতে দিবার জন্য তুলিয়া রাখিয়াছেন। চাকর-ঝি কাহারও হাত-পা'কে একটুও রেহাই তিনি কখনও দেন নাই, তাই না ঘর-বাড়ি অমন আয়নার মত ঝকঝকে। এক যামিনী ছাড়া কাহারও বসিয়া থাকা তিনি দেখিতে পারিতেন না। কন্যার পুষ্পকোমল সৌন্দর্য্য পাছে অতিশ্রমে একটুও ম্লান হইয়া যায়, এই ছিল তাঁহার ভাবনা। যামিনীকে কাজকর্ম্ম শিখাইবার চেষ্টা তিনি মাঝে মাঝে করিতেন বটে, কিন্তু তাহাও এত সন্তর্পণে যে কাজ শেখা তাহার বিশেষ কিছু হইত না। খোকা জোর করিয়াই কুঁড়েমী করিত এবং মায়ের কাছে সারাক্ষণ বকুনি খাইত। নৃপেন্দ্রবাবুর নিজের কাজ যথেষ্টই ছিল, সুতরাং তাঁহার জন্য কাজ খুঁজিবার কোনো প্রয়োজন হয় নাই। জ্ঞানদার মনেরও কোন বিশ্রাম ছিল না, সংসারিক উন্নতির একটা সোপানে পা দিয়াই আর একটাতে কোন্ উপায়ে উঠিতে পারা যায়, তাহাই তিনি ভাবিতে বসিয়া যাইতেন।

সেই মা আজ সকল দিকেই অক্ষম হইতে চলিয়াছেন। সংসারটা যেন কর্ণধারহীন নৌকার মত হাবুডুবু খাইতেছে। সামান্য একবেলা ইহাকে চালাইবার চেষ্টা করিয়াই যামিনী পরিশ্রান্ত হইয়া পড়িয়াছে। আবার বিকালের চায়ের ফরমাস করা, রাত্রে কি রান্না হইবে তাহার ব্যবস্থা দেওয়া; যামিনীর যেন কান্না পাইতেছিল। পাচক ভজা রান্না ভালই করিতে জানে, ছয় বৎসর সে জ্ঞানদার কাছে কাজ করিতেছে, ভাল রান্না না করিয়া তাহার উপায় নাই। কিন্তু একটা দিনও সে নিজের ইচ্ছামত কিছু করে নাই। কি ডাল চড়ান হইবে, তাহা সুদ্ধ দুই বেলা গৃহিণীকে জিজ্ঞাসা করিয়া লইয়াছে, সুতরাং প্রতি পদক্ষেপে হুকুমের প্রত্যাশা করা তাহার একটা স্বভাব হইয়া দাঁড়াইয়াছে।

রাত্রে কি রান্না করিতে দিবে, তাহা যখন যামিনী মনে মনে স্থির করিবার চেষ্টা করিতেছে, তখন দেখা গেল মিহির এবং শিশির হাতধরাধরি করিয়া দৌড়িয়া নামিয়া আসিতেছে, এবং তাহাদের খানিকটা পিছন

পিছন আসিতেছে সুরেশ্বর। যামিনী তাড়াতাড়ি উঠিয়া পড়িল। চেয়ারখানা ভিতরে লইয়া যাইবার জন্ম আমাকে ডাকিতে লাগিল।

মিহির ততক্ষণ বন্ধুর সঙ্গে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে। যামিনীকে চীৎকার করিয়া খবর দিল, "জ্ঞান দিদি, শিশিরদের বাড়ি কিছু দূর নয়। পাহাড়ে জায়গা তাই, না হ'লে এ-বাড়ি বসে ও-বাড়ির সঙ্গে গল্প করা যেত। কার্ট রোডে উঠে কয়েক পা গিয়েই, একটা উপরে উঠবার রাস্তা, ব্যস্ সেইখানেই ওদের বাড়ি।

সুরেশ্বরও আসিয়া দাঁড়াইল। যামিনী বলিল, "চলুন ভিতরে।"

সুরেশ্বর বলিল, "এইখানেও ত বসা যায়, ভারি চমৎকার 'ভিউ'টা।"

যামিনী বলিল, "বৃষ্টি এসে পড়বে, বোধ হয়। তার ওপর মায়ের হয়ত ঘুম ভাঙলেই আমাকে ডাকবেন, এখান থেকে শোনা যাবে না।"

সুরেশ্বরকে অগত্যা যামিনীর সঙ্গে ভিতরেই ঢুকিতে হইল। বসিবার ঘরের শ্রী দেখিয়া বলিল, "আপনাদের বোধ হয় খুবই অসুবিধা হচ্ছে?"

যামিনী বলিল, "অসুবিধা একটু হচ্ছে বইকি। মায়ের অসুখ হওয়াতে আরও বিপদ হয়েছে।"

সুরেশ্বর ব্যস্তভাবে বলিল, "এসেই আবার তাঁর অসুখ করেছে বুঝি? ভারি মুস্কিল ত। এখানে তাঁকে দেখবে কে? চেনাশোনা ডাক্তার আছেন?"

যামিনী বলিল, "না তেমন চেনা আর কে আছে? তবে বাবা বেরিয়েছেন, কাউকে নিয়ে আসবেন বোধ হয়।"

সুরেশ্বর বলিল, "আমরা যে বাড়িটা নিয়েছি, তার উপরের একটা কটেজে একজন বেশ ভাল ডাক্তার আছেন। বাঙালী, তবে থাকেন পঞ্জাবে। আমার সঙ্গে এরই মধ্যে আলাপ হয়ে গেছে, বলেন ত তাঁকে গিয়ে নিয়ে আসি।"

যামিনী বলিল, "দেখি বাবা আগে আসুন।"

এমন সময় আয়া আসিয়া যামিনীকে ডাক দিল। জ্ঞানদা উঠিয়াছেন, তিনি কন্যার খোঁজ করিতেছেন যামিনী উঠিয়া গেল, সুরেশ্বর উঠিয়া ছোট ঘরখানার ভিতরে পায়চারী করিতে লাগিল। জ্ঞানদা অসুখ বাধাইয়া তাহারও কম বিপদ করেন নাই। নৃপেন্দ্রবাবুর যে সুরেশ্বরকে জামাইরূপে পাইবার বিশেষ কিছু উৎসাহ নাই, তাহা সে বুঝিতেই পারিয়াছিল। যামিনীর মন বোঝা যায় না, সে যেন রহস্যের কুহেলিকায় আবৃত একমাত্র জ্ঞানদাই সুরেশ্বরকে অতি আগ্রহসহকারে বরণ করিয়া লইতে প্রস্তুত, তাঁহার সাহায্যে কাজ হয়ত উদ্ধার হইতেও পারে। সেই তিনিই কি-না আসিয়া শয্যা নিলেন। দুর্দ্দৈব আর কাহাকে বলে।

যামিনী ঘরে ঢুকিতেই, লেপের ভিতর হইতে মাথা তুলিয়া জ্ঞানদা জিজ্ঞাসা করিলেন, "ও ঘরে কে এসেছে রে?"

যামিনী বলিল, "সুরেশ্বরবাবু আর শিশির।"

জ্ঞানদা বলিলেন, "দেখ বাছা, আমি অসুখে পড়ে আছি ব'লে মানুষ-জন ঘরে এলে যেন আদর-যত্নের ত্রুটি না হয়। ও-সব আমি দেখতে পারি না। ভাল ক'রে চা-টা খাইও। টিফিন বাস্কেটে মিষ্টি এখনও অনেক আছে। খানকতক নিমকি ভেজে দিক। আর টোমাটো দিয়ে—আচ্ছা তুই ভজাকে ডাক দিকি, আমি বুঝিয়ে তাকে বলে দিচ্ছি।"

এমন কিছু দুরূহ তথ্য নয়, যাহা যামিনী ভজাকে বুঝাইয়া না দিতে পারিত, কিন্তু এটুকুও নিজে না বলিলে জ্ঞানদার শান্তি নাই। সংসারটা যে তাঁহাকে বাদ দিয়া একদিনও চলিতে পারে, ভাবিতেই তাঁহার অত্যন্ত খারাপ লাগিত।

যামিনী ভজাকে সঙ্গে করিয়াই ফিরিয়া আসিল। জ্ঞানদা বলিলেন, "তুই যা ও-ঘরে বোস্ গিয়ে, আমি ওকে ব'লে দিচ্ছি কি করতে হবে না-হবে। তোর বাবা এসে আবার গেলেন কোথায়?"

যামিনী বলিল, "ডাক্তারের খোঁজে গিয়েছেন বোধ হয়।"

জ্ঞানদা বলিলেন, "একেবারে বিশ্রাম ক'রে চা খেয়ে গেলেই হ'ত। তা না সব তাতে তাড়াতাড়ি। যেন আমি আজই মরছি।"

আসলে স্বামীর ব্যস্ততায় তিনি খুশী বই অখুশী হন নাই, কিন্তু স্বামীর সব কিছুর প্রতিকূল সমালোচনা করিয়া করিয়া এমন তাঁহার অভ্যাস হইয়া গিয়াছিল যে একটা কিছু আপত্তির কারণ তিনি বাহির না করিয়া ছাড়িতেন না।

যামিনী অগত্যা ফিরিয়াই গেল। সুরেশ্বর আবার চেয়ার টানিয়া বসিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "এখানে সব বাড়িই কি তিন মাসের জন্যে নিতে হয় নাকি?"

এ-বিষয়ে যামিনীর জ্ঞান অতি সীমাবদ্ধ, তবু একটা কিছু উত্তর না দিলেই নয়, কাজেই সে বলিল, "তাই বোধ হয় নিয়ম।"

সুরেশ্বর বলিল, "তাহলে ত মুস্কিল। না হ'লে এ বাড়িটা ছেড়েও দিতে পারতেন। বড় ছোট, আমাদের ওদিকে একটা বেশ ভাল বাড়ি এখনও খালি পড়ে রয়েছে।"

মিহির এবং শিশির ঘরে আসিয়া ঢুকিল। নিমকি-ভাজার গন্ধ নাকে গিয়াছে বোধ হয়। পাহাড়ের হাওয়াতে ক্ষুধাটাও তাহাদের কলিকাতা অপেক্ষা দ্বিগুণ হইয়া দাঁড়াইয়াছে।

সুরেশ্বর বলিল, "আর যারই যত অসুবিধা হোক, মিহির আর শিশিরের কিছু অসুবিধা হয়নি। ওরা বেশ আছে।"

শিশির খবর দিল, "মিহির বলছে আমাকে অব্-সার্ভেটরি হিল দেখিয়ে আনতে পারে। যাব ওর সঙ্গে?

সুরেশ্বর বলিল, "আচ্ছা, বাড়ির থেকে রামদীনকে নিয়ে যেতে পার। দু-জনে মিলে তা না হ'লে কি যে কীর্ত্তি করবে তার ঠিক নেই।"

নৃপেন্দ্রবাবু এমন সময় ফিরিয়া আসিলেন। যামিনীকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, "ডাক্তার ত একজন ঠিক ক'রে এলাম। বিকেলে আসবেন। তোমার মা এখন কেমন আছেন?"

যামিনী বলিল, "এতক্ষণ ত ঘুমিয়ে ছিলেন, এখন উঠেছেন।"

নৃপেন্দ্রবাবু বলিলেন, "এ বাড়িটা নিয়ে সকল দিকেই ঠকা হ'ল। স্যানিটোরিয়মের কাছেই বেশ একটা কটেজ দেখলাম, সেই রকম হ'লে বেশ হ'ত। লোকজন সব হাতের কাছে, সাহায্যের কোনো অভাব হ'ত না।"

সুরেশ্বর বলিল, "আমাদেরও পাশেই বেশ একটা ভাল বাড়ি খালি রয়েছে। একেবারে নূতন, আর এর চেয়ে বড়ও।"

নৃপেন্দ্রবাবু গম্ভীরভাবে বলিলেন, "হুঁ।"

ইতিমধ্যে পাশের ঘরে চা-সাজানোর শব্দ পাওয়া গেল। শিশিরকে টানিতে টানিতে মিহিরই সর্ব্বাগ্রে সেখানে গিয়া জুটিল। সুরেশ্বর বসিয়া আছে, সুতরাং তাহাকে না বলিলে চলে না। যামিনী অনুরোধটা করিলেই সে খুশী হইত. বেশী, কিন্তু বাবা থাকিতে এ-কাজটা যে তাহাকেই করিতে হইবে, তাহা যামিনী মনেই করিল না। অগত্যা নৃপেন্দ্রবাবুর আহ্বানেই সুরেশ্বর চা খাইতে চলিল।

যামিনী চা ঢালিতে এবং খাবার গোছাইতে ব্যস্ত হইয়া রহিল। নৃপেন্দ্রবাবুই অতিথির সঙ্গে দুই একটা করিয়া কথা বলিতে লাগিলেন। আয়া আসিয়া বলিল, "মেমসাহেব বল্‌ছেন, তিনি এখন ভাল আছেন, এ-ঘরে আসবেন।"

নৃপেন্দ্রবাবু ব্যস্ত হইয়া বলিলেন, "না, না, এ-ঘরে আস্‌তে হবে না। চা খাওয়া হলেই আমি যাচ্ছি। তিনি কি খাবেন জিগ্‌গেষ কর।"

আয়া চলিয়া গেল, এবং অল্প পরে ফিরিয়া আসিয়া খবর দিল যে জ্ঞানদা কিছুই খাইবেন না।

নৃপেন্দ্রবাবু চা খাওয়াটা অনাবশ্যক তাড়াতাড়ি শেষ করিয়া উঠিয়া গেলেন। ইহাতে অবশ্য তাঁহার বা অপর কাহারও কিছুই লাভ হইল না। কাঠের দেওয়াল, এক ঘরে জোরে কথা বলিলে আর এক ঘরে শোনা যায়। জ্ঞানদা যে বিরক্তভাবে কি সব বলিতেছেন, তাহা বেশ বোঝা গেল, যদিও কথাগুলি কি তাহা শোনা গেল না। নৃপেন্দ্রবাবু অল্পক্ষণ পরেই পত্নীর শয়নকক্ষ হইতে বাহির হইয়া আসিলেন, তবে ড্রয়িং-রুমে পুনঃপ্রবেশ না করিয়া সোজা বাগানে চলিয়া গেলেন।

সুরেশ্বর যামিনীর সঙ্গে আলাপ জমাইবার বৃথা চেষ্টা করিতে লাগিল। এক ত সে নিজে নিঃসম্পর্কীয়া মেয়েদের সঙ্গে কথা বলিতে অভ্যস্ত নয়, সর্ব্বদাই ভুল করিবার ভয়ে ত্রস্ত হইয়া থাকে, তাহার পর কায়ক্লেশে যেটুকুও বা গুছাইয়া বলে, যামিনী তাহার অধিকাংশ কথারই উত্তর দেয় না। ক্ষুণ্ণ এবং অপ্রতিভ হইয়া সে যখন উঠিবার জোগাড় করিতেছে, তখন আয়া আসিয়া জানাইল যে মেমসাহেব তাহাকে একবার ডাকিতেছেন।

সুরেশ্বর উঠিয়া পড়িয়া আয়ার সঙ্গে চলিল। যামিনীও তাহাদের অনুসরণ করিল।

জ্ঞানদা খাটের উপর উঠিয়া বসিয়া আছেন, লেপ-কম্বলগুলিকে পায়ের দিকে ঠেলিয়া দিয়াছেন। সুরেশ্বরকে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোমার চা খাওয়া হয়েছে ত বাবা?"

সুরেশ্বর অবাক হইয়া গেল। এতখানি আত্মীয়তা জ্ঞানদা ইতিপূর্ব্বে করেন নাই, তাহাকে এত দিন 'আপনি' বলিয়াই সম্বোধন করিয়া আসিতেছিলেন। যাহা হউক, বিস্ময় এবং আনন্দটা কোনোমতে সাম্‌লাইয়া লইয়া সে বলিল, "হ্যাঁ হয়েছে বইকি। কিন্তু আপনি যে এসেই আবার অসুখে পড়লেন, এতে ভারি মুস্কিল হ'ল।"

জ্ঞানদা বলিলেন, "কি আর করা যায় বল? অসুখের উপর ত হাত নেই? তা এখন বেড়াতে যাচ্ছ বুঝি?"

সুরেশ্বরকে অগত্যা বলিতে হইল, "হ্যাঁ, একটু পরেই বেরব।"

জ্ঞানদা বলিলেন, "খুকি তুইও যা আয়াকে নিয়ে। ঘরের কোণে বসে শরীর খারাপ করার জন্যে এখানে ত আসা হয়নি।"

যামিনী অবাক হইয়া গেল। মা তাহাকে কি-না শেষে সুরেশ্বরের সঙ্গে বেড়াইতে পাঠাইতে চান? বলিল, "আজ থাক না মা। তোমার অসুখ।"

জ্ঞানদা তাড়া দিয়া বলিলেন, "আমার আবার কি অসুখ? তুই যা ও-ঘরে, কাপড় প'রগে যা।"

যামিনী আস্তে আস্তে চলিয়া গেল। জ্ঞানদা তখন মৃদু হাসিয়া বলিলেন, "এখনও ও সেই কচি মেয়েটির মতই আছে। মায়ের কোন কথার অবাধ্য হয় না। আজকালকার মেয়েদের মত না।"

সুরেশ্বর চুপ করিয়া রহিল। জ্ঞানদা বলিলেন, "কাল দুপুরে তোমরা এখানে খেও। পড়ে আছি ত কি হয়েছে? মরা হাতী সওয়া লাখ। তোমার মা আসেন নি ব'লে যে এখানে অযত্ন হবে, তা আমার সইবে না।"

আয়া আসিয়া খবর দিল যে, খুকি বাবা প্রস্তুত হইয়া বাহিরে দাঁড়াইয়া আছেন।

৩৩

নৃপেন্দ্রবাবুতে আর জ্ঞানদাতে ঝগড়া চলিতেছিল। স্ত্রীর অসুখ বলিয়া কর্ত্তা আরও বেকাদায় পড়িয়া গিয়াছেন, বেশী কিছু বলিতে ভরসা পান না, অথচ গৃহিণীর আচরণে এত আপত্তি অনুভব করেন যে, একেবারে চুপ করিয়া থাকিতেও পারেন না।

জ্ঞানদা বলিতেছেন, "আমার শরীরের ভালমন্দ আমি বুঝব বাপু, তোমাদের অত আদিখ্যেতা করতে হবে না। সব কাজে বাগ্‌ড়া দেওয়া তোমার এক স্বভাব হয়ে দাঁড়িয়েছে।"

নৃপেন্দ্রবাবু বলিলেন, "না ব'লে পারি না, যদিও জানি তোমাকে যুক্তিতর্ক দিয়ে কিছু বোঝাবার চেষ্টা পণ্ডশ্রমমাত্র। ছোক্‌রাকে নিয়ে তুমি অতি বাড়াবাড়ি আরম্ভ করেছ, এর পর লোকের কাছে হাস্যাস্পদ হ'তে হবে।"

জ্ঞানদা ঠোঁট উল্টাইয়া বলিলেন, "ইস্, ভারি লোকের ক্ষমতা! কেন, হাস্যাস্পদ হব কেন শুনি? জমিদার জামাই নিয়ে যখন কলকাতায় ফিরব, তখন সব থোঁতা মুখ ভোঁতা হয়ে যাবে না?"

নৃপেন্দ্রবাবু বলিলেন, "জমিদারটি কি তোমার জামাই হ'তে চেয়েছে? আর কারো মতামতের না হয় কোনো দরকার নেই ধরেই নিলাম।"

জ্ঞানদা বলিলেন, "স্পষ্ট ক'রে না চা'ক, তার যে সম্পূর্ণ মত আছে, তা আমি বেশ জানি।"

নৃপেন্দ্রবাবু বলিলেন, "কি ক'রে জানলে? ও যে দু-দিন মেলামেশা ক'রে তারপর সরে পড়বে না, তার কোনো গ্যারান্টী আছে? সাতজন্মে ত ওদের কারো সঙ্গে চেনা নেই।"

জ্ঞানদা বলিলেন, "একটু মেলামেশা করবার জন্যে কেউ এত সাতরাজ্যি বয়ে আসে না। আর চেনা-শোনা আগেই না-হয় ছিল না, এখন ত হয়েছে? অজ্ঞাতকুলশীল নয় কিছু। সুধারা ওদের সবাইকে ভাল ক'রে চেনে। রাতারাতি উবে যাবার মানুষ ওরা নয়। আজই যদি প্রস্তাব তুলি, সুরেশ্বর লুফে নেবে এ তোমায় লিখে দিতে পারি।"

নৃপেন্দ্রবাবু বলিলেন, "টাকা আছে অনেকগুলো আর রংটা ফরশা, এ ছাড়া এমন কি গুণ তার দেখলে যার জন্যে মেয়ে দেবার জন্যে একেবারে ঝুলে পড়েছ?"

জ্ঞানদা বলিলেন, "কেন? ভদ্রঘরের ছেলে, লেখা-পড়া শিখেছে, স্বভাব-চরিত্র ভাল। তার উপর টাকা আর রং যদি থাকে, তা আর কি বেশী চাইবার থাকে? তোমার মেয়েকে কিছু প্রিন্স্ অব্ ওয়েল্‌স্ আসবে না বিয়ে করতে। এখন ত দেখি খুব দোষগুণ বিচার করতে লেগে গিয়েছ। আগে ত এ-সবের কোনো বালাই দেখিনি। যা ত পছন্দ সব!"

নৃপেন্দ্রবাবু খোঁচা খাইয়া আরও চটিয়া গেলেন, বলিলেন, "আমার পছন্দ কি রকম? আমি কাউকে পছন্দ-টছন্দ করিনি।"

জ্ঞানদা বলিলেন, "তুমি বললেই আমি শুনব? তুমি যদি আস্কারা না দাও ত মেয়ের সাধ্যি কি যে কোথাকার কোনো হাঘরের সঙ্গে 'এন্‌গেজড' হয়ে বসে। তেমন মেয়ে আমি মানুষ করিনি।"

পাশের ঘরে যামিনীর সাড়া পাওয়া গেল, অগত্যা নৃপেন্দ্রবাবু তর্ক থামাইয়া উঠিয়া চলিয়া গেলেন। তর্ক করিবার ফলে লাভ এইমাত্র হইল যে, জ্ঞানদা যদি বা দুই একদিন সবুর করিতে প্রস্তুত ছিলেন, এখন একেবারে মরিয়া হইয়া উঠিলেন।

সুরেশ্বর প্রতিদিনই এখানে সকাল বিকাল হাজিরা দিত। যেদিন খাইবার নিমন্ত্রণ থাকিত সেদিন ত সারাটা দিন এইখানেই কাটিয়া যাইত। যামিনীকে লইয়া ইহার ভিতর বার-দুই বেড়াইতেও গিয়াছে। তবে সঙ্গে আয়া, মিহির, শিশির, সুতরাং অতিশয় সাধারণ কথা ভিন্ন আর কিছু বলিবার বিন্দুমাত্রও সুবিধা হয় নাই। তবে সুরেশ্বর তাহাতে কিছু দমে নাই। যামিনীকে পাইতে হইলে জ্ঞানদাকে জয় করাই যে আসল প্রয়োজন তাহা সে বেশ বুঝিতে পারিয়াছে।

বিকালে সেদিন যামিনী তাহার বাবার সঙ্গেই বাহির হইয়া গিয়াছে। জ্ঞানদার শরীর ভাল নাই, ডাক্তার তাঁহাকে বেশী নড়াচড়া করিতে দিতে নারাজ। শয়নকক্ষে পড়িয়া থাকিয়া থাকিয়া তাঁহার হাড় পাঁজরে ব্যথা ধরিয়া গিয়াছে, কাজেই আয়ার সাহায্যে উঠিয়া আসিয়া ড্রয়িং-রুমে বসিয়া আছেন। আয়া নীচে মেঝেতে বসিয়া অনর্গল বক্‌বক্ করিয়া চলিয়াছে।

সুরেশ্বর কোনদিনই না-খাইয়া বাহির হয় না, কিন্তু এখানে আসিলে তাহার আর একবার যে খাইতে হইবে তাহা জানা কথা। ইতিমধ্যেই জামাই-আদর সুরু হইয়া গিয়াছে। আয়া চাকর কাহারও আর জানিতে বাকি নাই যে, এই ছেলেটিকে গৃহিণী জামাতারূপে বরণ করিয়াছেন।

সুরেশ্বর ঘরে ঢুকিবামাত্র আয়া তাড়াতাড়ি উঠিয়া রান্নাঘরে চলিল। জ্ঞানদা বলিলেন, "বোসো বাবা, শিশির কোথা?"

সুরেশ্বর বলিল, "কোথায় হৈ হৈ ক'রে বেড়াচ্ছে কে জানে? পাশের বাড়িতে কতকগুলো ফিরিঙ্গী এসে জুটেছে, তাদের কয়েকটা ছেলের সঙ্গে বেজায় ভাব জমিয়ে তুলেছে। সারাক্ষণ আছে তাদের সঙ্গে। ভাগ্যে মা এখানে নেই, তাহলে আর রক্ষে থাকত না।"

জ্ঞানদা একটু নিরুৎসাহভাবে বলিলেন, "তোমার মা বুঝি ভয়ানক গোঁড়া?"

সুরেশ্বর বলিল, "তা খানিকটা আছেন বইকি। চিরকাল পাড়াগাঁয়েই কাটিয়েছেন কি-না?"

জ্ঞানদা বলিলেন, "তুমি ত বাবা খুব আমাদের

মাজে মেশামেশা কর, এ নিয়ে গোলমাল হয় না ত কিছু ?"

গোলমাল একেবারেই যে কিছু হয় না তাহা নয়, তবে সে-কথা এ-ক্ষেত্রে বলিবার ইচ্ছা সুরেশ্বরের ছিল না। সে বলিল, "বাবা মারা যাবার পর সংসারের বড়-একটা খোঁজ তিনি রাখেন না, তা ছাড়া এখন ত কাশীই চলে গেলেন।"

জ্ঞানদা বলিলেন, "কত দিন থাকবেন সেখানে ?"

সুরেশ্বর বলিল, "বরাবরই থাকবেন ব'লে ত গিয়েছেন, তবে যদি কখনও-সখনও বেড়াতে আসেন।"

জ্ঞানদা খানিক চুপ করিয়া থাকিয়া বলিলেন, "দেখ বাবা, একটা কথা বলি কিছু মনে ক'রো না। এত তাড়াহুড়ো করবার কোনো দরকার ছিল না, তবে যা শরীর আমার কিছুরই স্থিরতা নেই। হুট ক'রে কবে যে চলে যাব তার ঠিক নেই; আর কর্ত্তাকে ত দেখছ সংসারের কিছু বোঝেনও না, কোনো কাজও তাঁকে দিয়ে হয় না।"

এতখানি দীর্ঘ ভূমিকা যে কিসের তাহা সুরেশ্বর ঠিক বুঝিল না, তবে একটু আশান্বিত ভাবেই নড়িয়া-চড়িয়া বসিল।

জ্ঞানদা আবার সুরু করিলেন, "মেয়েকে আমি মানুষ করেছি অতি যত্নে। কেমন যে মেয়ে তা ত দেখছই, আমাকে আর বল্‌তে হবে না। ঘরে ঘরে যে এমনটা নেই, এ বল্‌লে অন্যায্য জাঁক করা হয় কি ?"

সুরেশ্বর গলাটা পরিষ্কার করিয়া বলিল, "নিশ্চয়ই না, ওকে যত দেখছি, তত অবাক হয়ে যাচ্ছি যে, বাঙালীর ঘরে এমন মেয়ে কি ক'রে সম্ভব হ'ল।"

জ্ঞানদা খুশী হইয়া বলিলেন, "তবে বাবা, একটা কথাবার্ত্তা পাকাপাকি হয়ে যাওয়া ভাল নয় ? তোমার মন যে আমি বুঝি না তা নয়, তারই ভরসায় যামিনীর সঙ্গে এতটা মিশতেও দিচ্ছি। কিন্তু পাঁচ জনে পাঁচ কথা বলতে কতক্ষণ ? একটা বোঝাপড়া হয়ে গেলে সে ভয় আর থাকে না।"

সুরেশ্বর বলিল, "আমি ত ওকে স্ত্রীরূপে পেলে ধন্য মনে করব নিজেকে। আপনি কথা তুলবার আগে আমারই বলা উচিত ছিল, খালি আপনার অসুস্থতার জন্যে এ-সব কথা তুলতে সাহস করিনি।"

জ্ঞানদা কতখানি যে খুশী হইয়াছেন, তাহা মুখ দেখিয়া অবশ্য তাঁহার বোঝা গেল না, তবে কথা বলিবার সময় উত্তেজনায় তাঁহারও গলাটা কাঁপিয়া গেল। সুরেশ্বরের মাথায় হাত বুলাইয়া তিনি বলিলেন, "বেঁচে থাক বাবা, আমাকে বড় সুখী, বড় নিশ্চিন্ত তুমি আজ করলে। তাহ'লে কখন কাজটা হয় ব'লে তোমার ইচ্ছে ?

সুরেশ্বর বলিল, "যখন আপনারা চান তাই হবে।" যামিনীকে কথাটা কি ভাবে জানান হইবে, সে নিজে বলিবে, না জ্ঞানদাই বলিবেন ইহা ভাবিয়া সে ব্যস্ত হইয়া উঠিয়াছিল। ব্যাপারটার সমাধান যে ঠিক এই ভাবে হইবে, তাহা সে ভাবে নাই। এ ত ঠিক হিন্দুঘরের ব্যবস্থার মতই হইল। মা-বাবায় বিবাহ স্থির করিয়া দিলেন, বরকন্যা অতি সুবোধ সন্তানের মত বিবাহ করিয়া বসিল। যামিনীর সঙ্গে সে অবশ্য কথা বলিয়াছে, বেড়াইতেও গিয়াছে দুই চার দিন, কিন্তু তাহার আশানুরূপ কিছুই হয় নাই। কোর্টশিপ করা হইল কই ? প্রণয়িনীর নিকট নিজেকে নিবেদন করা হইল কই ? যাহা হউক, যামিনীকে তাহার ভাল লাগিয়াছিল, এতটা বেশী যে, এ-সকল ত্রুটি সত্ত্বেও সে অত্যন্ত খুশী না হইয়া পারিল না।

জ্ঞানদা খুশী হইলেন বটে, তবে তাঁহার সম্মুখে তখনও বাধা বিস্তর, তাহাও বুঝিলেন। স্বামীকে বুঝাইয়া এবং বকিয়া নিজের মতে আনিতে হইবে, কন্যাকে সুবুদ্ধি দিতে হইবে, সে আবার না এক গোলোযোগ বাধায়। প্রতাপ লক্ষ্মীছাড়ার চিন্তা এখনও তাহার কতখানি মন জুড়িয়া আছে কে জানে ? সাধে মেয়েকে এত করিয়া তিনি আগলাইয়া বেড়াইতেন ? চোখের আড়াল করিলেই একটা-না-একটা বিভ্রাট ঘটাইয়া বসে। সর্ব্বোপরি সুরেশ্বরের মা রহিয়াছেন। হাজারই কাশীবাস করুন, ছেলে ব্রাহ্ম-মেয়ে বিবাহ করিতেছে শুনিয়া তিনি কি আর স্থির হইয়া থাকিবেন ?

বাহিরে পায়ের শব্দ যেন কাহার শোনা গেল।

সুরেশ্বর তাড়াতাড়ি উঠিয়া পড়িয়া বলিল, "আমি যাই তবে, কাল সকালে আবার আসব।"

জ্ঞানদা বলিলেন, "সে কি? চা-টা খেয়ে যাও। শুধু-মুখে আমি যেতে দেব কেন? ভগবান মেরে রেখেছেন তাই, নইলে আজকের দিনটা কি আর আমি অমনি যেতে দিতাম?"

পায়ের শব্দটা নিতান্তই মিহিরের, কাজেই সুরেশ্বর আবার বসিল। আয়া ট্রে সাজাইয়া চা এবং জলখাবার লইয়া আসিল। জ্ঞানদা বলিলেন, "কাল রাত্রে সকলে এখানেই খাবে, তারপর এন্‌গেজমেণ্টের একটা দিন ঠিক ক'রে সবাইকে বলা যাবে।"

সুরেশ্বর খাইতে খাইতে নতমস্তকে জিজ্ঞাসা করিল, "নৃপেন্দ্রবাবুর কাছে আমাকে কিছু বল্‌তে হবে কি?"

জ্ঞানদা বলিলেন, "তুমি আবার কি বল্‌তে যাবে? যা বলবার আমিই বল্‌ব। তোমার বাবা থাকতেন যদি ত স্বতন্ত্র কথা হ'ত।"

সুরেশ্বর চা খাইয়া প্রস্থান করিল। যাইবার সময় ঘটা করিয়া জ্ঞানদাকে একটা প্রণাম করিয়া গেল। প্রণামটা আগেই করা উচিত ছিল, তবে লজ্জায় পড়িয়া করিতে পারে নাই।

জ্ঞানদা আবার শয়নকক্ষে ফিরিয়া গেলেন। স্বামীকে কি ভাবে কি বলিবেন, তাহাই মনে মনে গুছাইয়া রাখিতে লাগিলেন। যা অবুঝ মানুষ, কতক্ষণ যে তাঁহার সঙ্গে বকাবকি করিতে হইবে তাহা কে জানে? তাহার পর যামিনীও এখনও বাকি। কিন্তু সে সম্ভবতঃ জোর করিয়া অবাধ্যতা করিবে না।

খানিক বাদেই নৃপেন্দ্রকৃষ্ণের ফিরিবার শব্দ শোনা গেল। নিজের শয়নকক্ষে ঢুকিয়া তিনি ওভারকোট ও জুতা ত্যাগ করিয়া চটি পায়ে এবং শাল গায়ে দিয়া বাহির হইয়া আসিলেন। জ্ঞানদা ডাকিয়া বলিলেন, "শুনে যাও একবার।"

নৃপেন্দ্রবাবু আসিয়া ঢুকিলেন। স্ত্রীর খাটে বসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি বল্‌ছ?"

জ্ঞানদা বলিলেন, "সুরেশ্বর ত আজ প্রস্তাব ক'রে গেল," বলিয়া আশান্বিত ভাবে স্বামীর মুখের দিকে চাহিয়া রহিলেন।

নৃপেন্দ্রকৃষ্ণ বলিলেন, "তাই নাকি?" বলিয়াই অত্যন্ত গম্ভীর হইয়া গেলেন।

স্বামীর উত্তরের জন্য মিনিট-দুই অপেক্ষা করিয়া নিরাশ হইয়া জ্ঞানদা আবার বলিলেন, "তাকে একটা উত্তর ত দিতে হবে? কি বলব?"

পত্নীর এহেন নম্রতায় নৃপেন্দ্রবাবু চটিয়া উঠিলেন, বলিলেন, "তা আমি কি জানি?" আমার কাছে ত আর প্রস্তাব করেনি যে আমি উত্তর দিতে যাব? তোমার যা মর্জ্জি হয় ব'লো।"

জ্ঞানদার মুখ রাগে লাল হইয়া উঠিল। খাটের উপর উঠিয়া বসিয়া চোখ পাকাইয়া তিনি গর্জ্জিয়া উঠিলেন, "কেন আমাকে বলেছে ত এমন কি অপরাধটা হয়েছে? আমি কি কেউ নই নাকি? মেয়ে তোমারও যতটা আমারও ততটা। ছেলেমানুষ, তোমায় বল্‌তে ভরসা না পেয়ে যদি বলেই আমাকে তা কি চণ্ডী অশুদ্ধ হয়ে গেল?"

নৃপেন্দ্রবাবু বলিলেন, "অত রাগারাগি ক'রে কি দরকার? বেশ ত, তোমার কাছে বলেছে ভালই। তুমিই যা বলবার তা বলে দিও, তাতেও কিছু চণ্ডী অশুদ্ধ হবে না।"

জ্ঞানদা বলিলেন, "হ্যাঁ, তোমাকে ত আর আমি চিনি না? একটা কথা দিয়ে বসি তারপর তুমি একটা গোলমাল সুরু কর। তখন আমার মুখ থাকবে কোথায়?"

নৃপেন্দ্রবাবু বলিলেন, "আমার গোলমাল ক'রে লাভ কি? তোমার মেয়ে যদি ওকে বিয়ে করতে রাজী হয় করুক না? তবে তার অমতে জোর ক'রে বিয়ে দেওয়ায় অবশ্য আমি মত দেব না," বলিয়া ঘর ছাড়িয়া চলিয়া গেলেন।

জ্ঞানদা রাগে ফুলিতে লাগিলেন। এ-সব চাল কি আর তিনি বুঝেন না। আচ্ছা, মেয়েকে রাজী করাইবার ভার তাঁহার উপর, তিনি দেখিয়া লইবেন। অত সহজে জ্ঞানদাকে দমান যায় না, তাহা যেন সবাই জানিয়া রাখে।

আয়াকে ডাকিয়া বলিলেন, "খুকি ফিরেছে রে?"

আয়া বলিল, "হাঁ, বাগানে রয়েছেন।"

জ্ঞানদা বলিলেন, "ডেকে দে তাকে।"

যামিনী আসিয়া ঘরে ঢুকিল। তখনও গায়ে কোট, গলায় গরম শালের স্কার্ফ জড়ান। জিজ্ঞাসা করিল, "কেন ডাকছ মা?"

জ্ঞানদা তাহাকে নিজের কাছে টানিয়া বসাইয়া পিঠে হাত বুলাইতে বুলাইতে বলিলেন, "আজ সুরেশ্বর তোমাকে বিয়ে করবার প্রস্তাব তুলেছে, তুমি কি বল? আমাদের ত খুবই মত আছে।"

যামিনী খাট ছাড়িয়া উঠিয়া পড়িল। তাহার পর দুই হাতে মুখ ঢাকিয়া ঘর ছাড়িয়া পলায়ন করিল।

ক্রমশঃ

দেশের অর্থ যায় কোথায়?

শ্রীসুরেন্দ্রকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

যখনই দেশের লোককে ব্যবসা করিবার পরামর্শ দিতে শুনি, যখনই বাঙালীদের ব্যবসাবুদ্ধিহীনতা ও কার্য্য-কুশলতার অভাব শুনিতে পাই, যখনই শিক্ষিত যুবক-দিগকে ফেরীওয়ালার কাজ করিতে প্রবুদ্ধ করিবার চেষ্টা দেখি, তখনই ঐ সকল পরামর্শদাতাদের অভিজ্ঞতা ও দূরদৃষ্টির অভাবের জন্য দুঃখ হয়। অন্ধ অন্ধকে পথ দেখাইতে চায়!

পূর্ব্বে যে বাঙালী জাতি ভারতে ও ভারতের বাহিরে ব্যবসা-বাণিজ্য করিত তাহার প্রমাণের অভাব নাই। প্রাথমিক ইংরেজ ও তৎপূর্ব্ববর্ত্তী ঐতিহাসিক মুসলমানের আমলে বাংলায় যে 'ব্যাঙ্কিং' বা মহাজনী প্রথা ছিল সেরূপ স্বল্পব্যয়ে এখন কোনও জাতির ব্যাঙ্ক কি কাজ চালাইতে পারেন? বাণিজ্যের প্রসার ভিতর ও বাহিরে বিস্তৃত না হইলে মহাজনী কারবারের আবশ্যকতা হয় না; ভারতে আগমনের পূর্ব্বে ইংরেজের সেরূপ ব্যবসা-বিস্তৃতি ছিল কি? যখন তাহারা ভারতে আসে তখন তাহারা সোনা, রূপা ও বহুমূল্য প্রস্তরাদি লইয়া আসিত এবং তাহার বদলে এ-দেশের নানাবিধ উৎপন্ন-দ্রব্য লইয়া স্বদেশে বিক্রয় করিত। তাহাদের সে সময়ে লেন-দেন কারবার ছিল না, থাকিবার কোনও সঙ্গত ও আবশ্যক কারণ ছিল না।

বাংলায় শেঠ, বসাক, সুবর্ণবণিক ও ক্ষেত্রী মহাজন-গণ ইংরেজকে লেন-দেন কারবার শিক্ষা দেন; এই মহাজনী কার্য্য শিক্ষা করিয়া, যখন পরে ইংরেজ এ-দেশের একচ্ছত্র রাজা হইল তখন মহাজন ছাড়িয়া তাহারা দেশের প্রজার নিকট টাকা ঋণ করিতে এবং সাধারণ প্রজার টাকা গচ্ছিত রাখিবার কারবার আরম্ভ করিল। ফলে এ-দেশের মহাজনদিগের কারবারে হাত পড়ায় দেশী মহাজনদের টাকার সরবরাহ হ্রাস পাইতে লাগিল। দেশে চোর-ডাকাতের উপদ্রব হওয়ায় এবং তদুপরি তাহাদের সহিত অনেক জমিদার সংশ্লিষ্ট থাকায় দেশের উচ্চতর শ্রেণীর উপর সাধারণ লোকের বিশ্বাস হ্রাস পাইতে লাগিল এবং দুর্দ্দান্ত ইজারাদারদের উৎপীড়নে লোক গৃহের টাকা হয় মাটির মধ্যে পুঁতিয়া রাখিতে সুরু করিল, না-হয়, মহাজনদের নিকট গচ্ছিত রাখিল। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র স্থানীয় দোকানদার ও ব্যবসায়িগণের নিকট টাকা গচ্ছিত রাখা সে-সময়ে খুব ব্যাপকভাবে প্রচলিত ছিল। চল্লিশ-পঞ্চাশ বৎসর পূর্ব্বেও এ-প্রথা শহর ও মফঃস্বলে যথেষ্ট ব্যাপ্ত ছিল, কিন্তু দেশের ব্যবসা-বাণিজ্য ক্রমশঃ এ-দেশের লোকের হাত হইতে বিদেশীর হাতে চলিয়া যাইতে থাকায় মহাজনদের টাকা আর সেরূপ খাটিত না। এ-দিকে গবর্ণমেণ্ট যুদ্ধকার্য্য এবং দেশে রেল, পোষ্টাপিস,

টেলিগ্রাফ, রাস্তা, খাল সেতু ইত্যাদি কার্য্যে অর্থব্যয়ের জন্ম ক্রমশঃ ঋণ গ্রহণ করিতে লাগিলেন। ফলে যে ইংরেজকে পূর্ব্বে এ-দেশের রাজা-রাজড়া অবধি অধিক সুদ ও ছুট্‌বাদে টাকা ধার দিয়া বিশ্বাস করিত না, সেই ইংরেজ ক্রমশঃ দেশের প্রজার নিকট হইতে ঋণস্বরূপ অর্থ গ্রহণ করিতে লাগিল। সে-সময়ে দেশে বহু অর্থ জমিয়া থাকায় ঐ সকল অর্থ গবর্ণমেণ্টের ঋণ-ভাণ্ডারে যাইতে আরম্ভ করিল; বাংলারই বহু টাকা গবর্ণমেণ্টের ঋণে প্রথম প্রথম ন্যস্ত হয়। ফলে বাঙালী ঘরের গচ্ছিত সম্পদ বাহির করিয়া দিয়া কাগজের মালিক হইয়া এখন বসিয়া আছে। এ-দেশের ধনীরা এই ভাবে গবর্ণমেণ্টের 'কেনা গোলাম' হইয়া পড়ে।

ইহার পর গবর্ণমেণ্ট যখন পোষ্টাপিসের মারফৎ নিভৃততম গ্রামসমূহে অবধি সেভিংস্ ব্যাঙ্কের কার্য্য আরম্ভ করিল, তখন গরিবের গচ্ছিত ও উদ্বৃত্ত অর্থ ক্রমশঃ গবর্ণমেণ্টের ভাণ্ডারজাত হইল এবং নামমাত্র সুদে তাহাদের ঐ টাকা খাটিতে লাগিল। এই টাকা পূর্ব্বে দেশীয় মহাজন ও ব্যবসাদারদের দোকানে রাখিয়া তাহারা যেখানে শতকরা মাসে আট আনা হইতে বার আনা সুদ পাইত, পরে সেই স্থলে তাহারা মাত্র বার্ষিক তিন টাকা বার আনা সুদে টাকা রাখিয়া স্বস্তির নিঃশ্বাস ছাড়িয়া বাঁচিল! এই হারে সুদ ১৮৯০-৯১ সাল অবধি প্রচলিত ছিল; তাহার পর ১৮৯৪ সালে ১লা এপ্রেল হইতে ইহা হ্রাস করিয়া ৩৷৴০ করা হয়। এখন বার্ষিক শতকরা ৩ টাকা মাত্র সুদ দেওয়া হয়। দেশের ছোটখাট ব্যবসাদারের অর্থাগমের পথ এইরূপে রুদ্ধ হওয়ায় ব্যবসা করিবার টাকা আসিবে কোথা হইতে? সেভিংস্ ব্যাঙ্কের মারফৎ কত কোটী কোটী টাকা গবর্ণমেণ্ট, এবং তাহাদের মারফৎ বিদেশী ব্যাঙ্কও গ্রহণ করিতেছে! এই সব উপায়ে বিদেশী সওদাগরগণ যে কি অজস্র টাকার লেন-দেন করিতে সমর্থ হইয়াছে তাহা এক বিরাট আধুনিক অর্থনৈতিক ইতিহাসের কথা! সেভিংস্ ব্যাঙ্কের সমস্ত টাকাটাই গরিব লোকের উদ্বৃত্ত অর্থ, সেই অর্থ অধিকাংশ স্থলেই স্থানীয় কারবারিগণের হাতে থাকিত এবং তাহারই সাহায্যে তাহাদের ব্যবসা-বিস্তৃতির সুযোগ হইত। এই-সব কারবারিগণ খুব বিশ্বাসী ছিল এবং সেজন্ম তাহাদের হিসাবপত্র রাখা, রসিদাদি দেওয়া লওয়ার এত ব্যয়বহুল 'হাঙ্গামা' ছিল না; কাজেই তাহাদের কার্য্যপ্রণালী অতি সরল ও ব্যয়হীন ছিল। এ-রকম ব্যাঙ্কের কাজের জন্ম তাহাদের মোটা মোটা মাহিনা দিয়া হিসাব-পরীক্ষকাদি রাখিতে হইত না এবং চেকবহি, পাসবহি ছাপিয়া মুদ্রাকরের উদর পূরণ করিতে হইত না। বিশ্বাস, ধর্ম্মবিশ্বাসই তাহাদের ব্যয়স্বল্পতার কারণ ছিল। প্রকৃতপক্ষে এ-দেশে সেভিংস্ ব্যাঙ্ক সৃষ্টি ও তাহার কার্য্যবিস্তৃতি হওয়ায় দেশের ছোট ছোট ব্যবসায়িগণ মারা পড়িয়াছে। এই সেভিংস্ ব্যাঙ্কে কত টাকা খাটে এবং কত টাকা সুদ গবর্ণমেণ্টকে দিতে হয় তাহার হিসাব-আলোচনা করিলেই বুঝা যাইবে যে যদি এই টাকা দেশের কারবারিগণের নিকট পূর্ব্বের ন্যায় জমা থাকিত তাহা হইলে দেশের বাণিজ্যের কত শ্রীবৃদ্ধি হইত। কিন্তু সে কথা বুঝিবে কে? আর কি সে ধর্ম্মবিশ্বাস, আত্মবিশ্বাস, প্রতিবাসীর প্রতি বিশ্বাস আছে? সে বিশ্বাস নষ্ট হইল কেন? কে সেই বিশ্বাস নষ্ট করিল, সে-কথা কি কেহ একবার ভাবিয়া দেখিবেন? যে-দেশে চন্দ্র সূর্য্যকে সাক্ষী রাখিয়া লোকে লেন-দেন করিত, যে-দেশে লোকে দেবতা প্রতিষ্ঠা করিয়া ধর্ম্মগোলায় এবং পর্ব্বতগহ্বরে ধান্যাদি ফসল গচ্ছিত রাখিত এবং দেবতা সাক্ষী করিয়া আবশ্যক-মত সেই শস্যাদি লেন-দেন করিত, আজ সেই দেশের লোক খৎ, তমসুক, বন্ধকী জিনিষও জমি না রাখিয়া ত' টাকা পায়ই না এবং তাহা দিয়াও অনেক সময় লোকে টাকা ধার পায় না! এ অবস্থা হইল কেন? ইহা করিল কে এবং কি প্রকারে, তাহা কি ভাবিবার সময় এখনও আসে নাই? দেশের অর্থ কোথায় এবং কেন এ-দেশে ব্যবসায়ে প্রতিষ্ঠা লাভ করা দুরূহ হইয়াছে তাহা কি ভাবিবার বিষয় নহে?

সেজন্ম একবার সেভিংস্ ব্যাঙ্কের হিসাব আলোচনা করিয়া দেখা যাক। ১৯৩১ সনের মার্চ মাসে সমগ্র ভারতে ২৪,৭৭,৬১৩ জন লোকের টাকা সেভিংস্ ব্যাঙ্কে জমা ছিল এবং ঐ টাকার পরিমাণ ছিল ৩৭,১২,৬৬,০০০ টাকার কিছু উপর এবং মাথাপিছু প্রত্যেকের গড়পড়তা

হিসাবের পরিমাণ ১৪৯৲ টাকা কয়েক আনা মাত্র। ১৯২৯-৩০ সনে গড়পড়তা জনপ্রতি জমার পরিমাণ ছিল ১৬১৲ টাকা কয়েক আনা; সুতরাং ১৯২৯-৩০ সন অপেক্ষা ১৯৩০-৩১ সনে লোকের গড়ে উদ্বৃত্ত অর্থ কমিয়া গিয়াছিল। সেভিংস্ ব্যাঙ্কে গচ্ছিত অর্থ দরিদ্রের উদ্বৃত্ত গচ্ছিত অর্থ মাত্র। এদেশে ১৮৮২-৮৩ সালে সর্ব্বপ্রথম পোষ্ট্যাল সেভিংস ব্যাঙ্কের সৃষ্টি হয় এবং প্রথম বৎসরে লেন-দেন করিয়া বৎসরের শেষে উদ্বৃত্ত জমা থাকে ২৭,৯৬,৭৯৬৲ টাকা; ১৯৩৩ সালের ৩১শে মার্চ পঞ্চাশ বৎসর পূর্ণ হইয়াছে; ইহার হিসাব এখনও পাওয়া যায় নাই, তবে ১৯৩০-৩১ সালের ৩১শে মার্চ তারিখে গচ্ছিতকারীদের হিসাবে জমার পরিমাণ ছিল ৩৭,০২,৫৯,৮৭৪৲ টাকা কিছু কম. পঞ্চাশ বৎসরের হিসাবটা শিক্ষাপ্রদ ও ভাবিবার জিনিষ। সম্প্রতি প্রতি পাঁচ বৎসরের শেষে চারি পাঁচ কোটী টাকা বাকী জমা বৃদ্ধি পাইতেছে তাহাতে সন্দেহ নাই। গবর্ণমেণ্টের হিসাব হইতেই এ তথ্য অবগত হওয়া যায়।

১৯২০-২১ সনে মোট গচ্ছিত টাকার পরিমাণ ছিল ২২,৮৬,২১,৭১৬৲ টাকা, ১৯৩০-৩১ সনে উহার পরিমাণ দাঁড়ায় ৩৭,০২,৫৯,৮৭৪৲ টাকা; সুতরাং লোকের গচ্ছিত অর্থ যে বৃদ্ধি পাইয়াছিল তাহার সন্দেহ নাই।

বাংলা ও বোম্বাই এই উভয় প্রদেশের সেভিংস্ ব্যাঙ্কের হিসাব হইতে দেখিতে পাই, সমগ্র বঙ্গদেশে মোট সেভিংস্ ব্যাঙ্কের সংখ্যা ৩,১৪১টি, তন্মধ্যে ৩৯টি বড় আপিস এবং ৩,১০২টি সাব অর্থাৎ শাখা আপিস বিশেষ। এই সকল ব্যাঙ্কে মোট ৬,১৫,৭৮৫ জন লোকের অর্থ গচ্ছিত ছিল। ১৯২৯-৩০ সনের জের টাকা জমা ছিল ৯,৩২,০৯,৮৮৯৲ টাকা, ১৯৩০-৩১ সনের মোট জমা হয় ৬,২১,১৪,৫৪০৲ টাকা, ১৯৩০-৩১ সনে সুদবাবদ জমা মাত্র ২৫,৬৭,২৯৭৲ টাকা। মোট জমা টাকা (বাংলায়) ১৫,৭৮,৯১,৭২৭৲ টাকা এবং বোম্বাই প্রদেশে ৯,৬৪,১৩,৩৮৩৲ টাকা, অথচ বোম্বাই প্রদেশের লোক বাংলা অপেক্ষা অধিক রোজগার করে এবং ধনী বলিয়া উক্ত প্রদেশের সবিশেষ খ্যাতি আছে।

বাংলায় গড়পড়তা প্রতি ব্যাঙ্কের গচ্ছিতকারীর সংখ্যা ১৯৬ আর বোম্বাইয়ে ১৮৩ জন; প্রতি ব্যাঙ্কে গড়পড়তা বাংলায় ২৮,৬৪৮৲ টাকা জমা আছে আর বোম্বাইয়ে আছে ৩১,০৮৩৲ টাকার কিছু উপর। প্রত্যেক বাঙালীর জনপ্রতি জমা ১৪৬৲ টাকা আর বোম্বাইয়ে জনপ্রতি ১৬৯৲ টাকার কিছু উপর। এই হিসাবে বিভিন্ন প্রদেশের জনপ্রতি গচ্ছিতের পরিমাণ গড়পড়তা দাঁড়াইয়াছে:—

পঞ্জাব	১৮৮.৭৬
সিন্ধু	১৮৫.০৫
বোম্বাই	১৬৯.৭৭
উত্তর-পশ্চিম যুক্তপ্রদেশ	১৬৯.৭৭
মধ্যপ্রদেশ	১৬২.৮৬
বিহার ও উড়িষ্যা	১৬০.৮৮
বাংলা ও আসাম	১৪৬.১৩
ব্রহ্মদেশ	১৪৪.৭১
মাদ্রাজ	৬৭.৩৩

উপরিউক্ত হিসাব হইতে বিভিন্ন প্রদেশের দরিদ্রতর লোকদের উদ্বৃত্ত অর্থের পরিমাণের আন্দাজ করা যায়।

বাংলার শিক্ষিত যুবক অন্নাভাবে, চাকরি অভাবে আত্মহত্যা অবধি করিতেছে অথচ বাংলা বিহার ও আসামের দরিদ্রতর লোকের প্রায় ১২ কোটী টাকা গবর্ণমেণ্টের নিকট মাত্র তিন টাকা সুদে খাটিতেছে। ইহা অপেক্ষা অদৃষ্টের পরিহাস আর কি হইতে পারে? পূর্ব্বে, অর্থাৎ সেভিংস্ ব্যাঙ্ক সৃষ্টির পূর্ব্বে, লোকের কি উদ্বৃত্ত অর্থ থাকিত না? আর, মাত্র তিন টাকা সুদে সেই উদ্বৃত্ত অর্থ খাটাইয়া কত অর্থ-বৃদ্ধি সম্ভবপর হয়? এই অর্থ দেশের লোক পরস্পরকে বিশ্বাস করিয়া যদি ধনী মহাজন ও কারবারী দোকানদারগণের নিকট পূর্ব্বের ন্যায় গচ্ছিত রাখিতে আরম্ভ করে তাহা হইলে দেশের বেকার-সমস্যা কি দূর হয় না? দেশের ব্যবসা-বাণিজ্যের ও দোকানদারদের শ্রীবৃদ্ধি হয় না? ইহা মাত্র পোষ্টাপিস সেভিংস ব্যাঙ্কের হিসাব এখন প্রাইভেট ব্যাঙ্ক সমূহও এইরূপ ব্যাঙ্ক খুলিয়াছে, তাহাতে কত টাকা লেন-দেন হইতেছে তাহাতে জমা কত তাহা নির্ণয় করা দুরূহ।

সেভিংস্ ব্যাঙ্কের টাকা যখনই গচ্ছিতকারী চাহিবে তখনই দিতে হইবে বলিয়া গবর্ণমেণ্ট এ-টাকাটা নিশ্চয়ই

ঘরে বসাইয়া নিজের অর্থ-ভাণ্ডার হইতে সুদ গুণিয়া দিতেছেন না; এই টাকাটা তাঁহারা খাটাইয়া থাকেন এবং তাহারই আয় হইতে গচ্ছিতকারীকে বার্ষিক সুদ দিয়া থাকেন, অথচ গচ্ছিতকারীরা জানে না তাহাদের টাকা কিসে খাটান হয়; যেহেতু গবর্ণমেণ্টের হস্তে টাকা আছে সেই হেতু তাহারা টাকার ফেরৎ সম্বন্ধে নিশ্চিন্ত; অন্য বে-সরকারী ব্যাঙ্কে টাকা রাখিলে তাহাদের এরূপ নিশ্চিন্ত ভাবে থাকা সম্ভব হইত না; গবর্ণমেণ্টের নিকট টাকা গচ্ছিত রাখা সম্পূর্ণ বিশ্বাসের উপর; ইহার জামীন-জমা নাই; অন্য কেহ এমন বেপরোয়া ভাবে টাকা লইতে বা খাটাইতে পারে না, অন্য বে-সরকারী ব্যাঙ্ক বা মহাজনগণ ইহার জন্য দস্তরমত কৈফিয়ৎ দিতে বাধ্য, কিন্তু গবর্ণমেণ্টের সে সব বালাই নাই।

আজ বাংলার যখন এরূপ দুরবস্থা উপস্থিত তখন বাংলার টাকা আমানতকারিগণ কি বলিতে পারেন না যে, বাংলা বিহার ও আসামের হিসাবে যে-টাকা সেভিংস্ ব্যাঙ্কে গচ্ছিত আছে তাহা লইয়া একটি যৌথ কারবার প্রতিষ্ঠিত হউক এবং ঐ টাকা গবর্ণমেণ্ট ও গচ্ছিতকারিগণের প্রতিনিধি কর্ত্তৃক বিভিন্ন স্বদেশী ব্যবসায়ের প্রতিষ্ঠা ও উন্নতির জন্য ন্যস্ত হউক? এরূপ প্রস্তাবের অন্যায্যতা কোথায়? পোষ্টাপিসের মারফৎ লেন-দেন হয় বলিয়া ডাক বিভাগ তজ্জন্য শতকরা দুই চারি টাকা খরচ ধরিয়া লউক। যখন এ-দেশের মহাজন ব্যবসাদার ও দোকানদারগণের নিকট গ্রামস্থ লোকেরা নিজেদের উদ্বৃত্ত অর্থ গচ্ছিত রাখিত তখন দেশের নানাবিধ কৃষি, শিল্প, ব্যবসা-বাণিজ্য এই গচ্ছিত অর্থের দ্বারা উপকৃত হইত, এই টাকাটা গবর্ণমেণ্ট টানিয়া লওয়ায় দেশের ক্ষুদ্র ব্যবসায়িগণের দুরবস্থা হইয়াছে এবং গচ্ছিতকারিগণের সুদ হইতে আয়ের পরিমাণ হ্রাস পাইয়াছে।

এই সেভিংস্ ব্যাঙ্কের মারফৎ গবর্ণমেণ্ট যখন পাঁচ-দশ টাকা মূল্যের ক্যাশ সার্টিফিকেট বিক্রয় করিতে আরম্ভ করিল তখন আরও বহু অর্থ প্রজার ঘর হইতে সরকারের ঘরে প্রবেশলাভ করিল। সরকার এইরূপে সমস্ত দরিদ্র ও মধ্যবিত্ত দেশবাসীর ব্যাঙ্কার অর্থাৎ মহাজনের কাজ করিতেছে, কিন্তু দেশীয় মহাজনগণের দ্বারা দেশের লোক যেরূপ উপকৃত হইত, দেশের শিল্প-বাণিজ্যাদি যেরূপ উপকৃত হইত গবর্ণমেণ্ট মহাজন হওয়ায় সে-সকল সুবিধা হইতে দেশবাসী বঞ্চিত হওয়ায় এবং ঘরে মজুত টাকা না থাকায় লোকে কেবল মাত্র বিদ্যা বুদ্ধি ও স্বাস্থ্যবান শরীর লইয়া কি রোজগারের পথ অবলম্বন করিয়া থাকিবে? কাজেই অর্থাভাবে বিদেশী অর্থী ও গবর্ণমেণ্টের দ্বারে চাকুরিবৃত্তি গ্রহণ ভিন্ন তাহাদের উপায় কি? গবর্ণমেণ্টের টাকা ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্কে জমা থাকে, এই ব্যাঙ্ক অন্য ক্ষুদ্রতর ব্যাঙ্ক এবং ইউরোপীয় বণিকগণকে যেরূপ সাহায্য করেন তাহা এ দেশীয়গণের ভাগ্যে জোটে না; নিয়মকানুন সকলের পক্ষে একই হইলেও ব্যবহার-প্রয়োগের সময় দেশী ও ইউরোপীয় জাতি হিসাবে উক্ত আইন বিভিন্নরূপে ব্যবহৃত হয়; ইহা কে না জানে? এ দেশের জমিদারগণ যত টাকার কোম্পানীর কাগজের মালিক হউন না কেন, সামান্য ইউরোপীয় বণিক বা দোকানদার যেরূপ সহজে ব্যাঙ্কের নিকট শুধু-হাতে নামমাত্র কাগজের জামীনে টাকা ধার পাইবে একজন এ-দেশীয় ধনী জমিদার তাহা পাইবেন না, যেহেতু এই সকল ব্যাঙ্ক জমি জামীন রাখিয়া টাকা ধার দেন না; একেবারেই যে দেন না এ কথা বলি কেমন করিয়া? মিঃ গলষ্টনকে বহু লক্ষ টাকা তাঁহার কলিকাতার ভূসম্পত্তি এমন কি ঘোড়দৌড়ের ঘোড়ার জামীনে দেওয়া হইয়াছিল, এ-কথা কাহারও অবিদিত নাই। যত গোল এ-দেশীয়দের জামীন লইয়া। যাঁহারা চন্দ্র সূর্য্য সাক্ষী না করিয়াও দোকানদার ও মহাজনগণের সুনামের উপর নির্ভর করিয়াই এক সময়ে নিজের উদ্বৃত্ত অর্থ বিনা রসিদে গচ্ছিত রাখিত, সহসা এমন কারণ কি উপস্থিত হইল যাহার জন্য এই বিশ্বাস, ধর্ম্মভয় ইত্যাদি লোকের মন হইতে অন্তর্হিত হইল? ইহা কি কৃষ্টি পরিবর্ত্তনের ফল নহে? আজ দেশের লোক ধর্ম্ম অপেক্ষা আইনের গণ্ডীকে অধিক মান্য করে কেন? আইন কি ধর্ম্মের উপরই সংস্থাপিত নহে? তাহা যদি না হইবে তাহা হইলে আদালতে শপথ-গ্রহণের সময় এখনও তামা তুলসী স্পর্শ করিয়া, ঈশ্বরকে সাক্ষ্য করিয়া, ধর্ম্মপুস্তক স্পর্শ করিয়া হলপ-গ্রহণের পর তবে তাহার কথা গ্রাহ্য হয় কেন? সুতরাং ধর্ম্মবিশ্বাসকে বাদ

দিয়া আইনের কার্য্য চলিতে পারে না; অথচ সেই মূল ধর্ম্মবিশ্বাস হারানোর ফলেই আজ আমরা ধর্ম্ম অপেক্ষা আইনের বাঁধাবাঁধিকে অধিকতর মান্য করি এবং গুরু-পুরোহিত পোষণ অপেক্ষা উকীল-টুর্ণীর খাতির অধিক করি। ইহা আমাদের কৃষ্টি ও ধর্ম্মবিশ্বাস পরিবর্ত্তনের ফল নহে কি? আদালতকে যখন ধর্ম্মাধিকরণ বলা হয় তখন ইংরেজের আইনও কি ধর্ম্মবিশ্বাসকে মূল করিয়া সৃষ্টি হয় নাই? আমাদের ধর্ম্মবিশ্বাসকে পুনরায় উজ্জীবিত করিলে সেভিংস ব্যাঙ্কের বদলে দোকানীর নিকট টাকা রাখিতে বিশ্বাস হইবে না কি? তাহাতে আমাদের লাভ না লোকসান? ১৯৩০-৩১ সনে দশ টাকা মূল্যের ক্যাশ সার্টিফিকেট কোন্ প্রদেশে কত বিক্রয় হইয়াছে তাহার হিসাবটা দেখুন,—

বাংলা ও আসাম	১,৬৯,৪২,২৪২
পঞ্জাব	২,৬৩,৮৩,৭৩৬
যুক্তপ্রদেশ	১,৫৩,৬০,৬৯৯
সিন্ধু	৯৭,২৪,৭৪৭
বিহার ও উড়িষ্যা	৩৯,৫৯,৭৩৬
বোম্বাই	২,৭৯,৮১,৬৫৩
মাদ্রাজ	৬৯,৩৭,৮৮৯
ব্রহ্ম	২৪,৫৬,২৯১
মধ্যপ্রদেশ	৮৪০,৮০,৩৭০

১৯২০-২১ সনে সমস্ত ভারতে ৫১,৮৭,২৬২ এবং ১৯৩০-৩১ সনে ১১,৭৮,২৭,৪১৬ টাকার ক্যাশ সার্টিফিকেট বিক্রয় হয়।

ইহা ব্যতীত পোষ্টাপিস মারফৎ জীবনবীমা ইত্যাদি অন্য প্রকার অর্থ লেন-দেনের কার্য্য আছে, তাহারও পরিচয় গ্রহণ করুন। পোষ্টাপিস বীমাবিভাগে ১৯৩০-৩১ সনে ১,৫০,৩৮,২৩১ টাকার জীবনবীমা হইয়াছিল আর ১৯২৯-৩০ সনে হইয়াছিল ১,৪৯,৫৬,০৭০ টাকা। ইহার জন্য প্রিমিয়ম আদায় হইয়াছিল (১৯৩০-৩১ সনে) ৬১,৫১,৭৭২৲ টাকা এবং ১৯২৯-৩০ সনে আদায় হইয়াছিল ৫৬,২৩,২৩৯৲ টাকা। দশ বৎসরের হিসাব দেখিলে ব্যাপারটা আরও ভাল করিয়া বুঝা যাইবে।

	১৯২০-২১	১৯৩০-৩১
ইন্সিওরের (সংখ্যা)	৪৭,২৮০	১,০৮,৩২৯
প্রিমিয়ম আদায় (টাকা)	২,৪০,৭৭,৭৪৭৲	৬,৪২,৯৯,০৬০৲
ইন্সিওরের পরিমাণ (টাকা)	৬,৬৩,৮৯,৫৪৯৲	১৮,৮৭,০৩,০৮৪৲
ক্লেম (claim) দান (টাকা)	১,৩০,৯৩,৭৫৩৲	৩,৫০,৫২,৫৫৩৲

গবর্ণমেণ্ট যে-দেশে ব্যাঙ্ক ও ইনস্সিওরের কার্য্য করেন এবং দরিদ্র লোকের উদ্বৃত্ত অর্থ স্বল্পতম সুদে গ্রহণ করেন, সে-দেশের লোককে অক্ষম অব্যবসায়ী ইত্যাদি বলিলে চলিবে কেন? বাঙালীর যে-টাকাটা সেভিংস্ ব্যাঙ্কে আছে তাহা দেশের ব্যবসায়ে খাটিলে আজ বাঙালীর এ দুর্দ্দশা হইত কি? আজ বাংলা গবর্ণমেণ্ট এ প্রদেশের শিল্পোন্নতির জন্য এক লক্ষ টাকা ব্যয় বরাদ্দ করিয়াছেন, শুনিতে বেশ ভাল। কিন্তু যদি ইহার পরিবর্ত্তে ভারতগবর্ণমেণ্টের অনুমতিক্রমে এবং উপযুক্ত ব্যক্তি ও কমিটির হস্তে সেভিংস ব্যাঙ্কের দরুণ টাকা হইতে অর্দ্ধেক বা সিকি পরিমাণ টাকা মূলধন স্বরূপ প্রাদেশিক উটজ বা কারখানা-শিল্পে ন্যস্ত করিতেন তাহা হইলে কি দেশের বহু দিকে উন্নতি হইত না? ইহার উপর কোম্পানী কাগজ বাবদ অর্থ ধরিলে আমাদের অর্থহীনতার কারণ এবং তজ্জন্য ব্যবসায়ের শ্রীহীনতার কারণ কি বুঝিতে কষ্ট হয়? বাংলায় আনুমানিক ১৫০ কোটী টাকা কোম্পানী-কাগজে ন্যস্ত আছে; বোম্বায়েও তাহাই। তবে বোম্বাই-বাসী বাঙালীর ন্যায় মাত্র সুদেই সন্তুষ্ট নহে; তাহারা কোম্পানী-কাগজকে জামীনস্বরূপ ব্যবহার করিয়া ব্যাঙ্কের নিকট হইতে ব্যবসার জন্য অর্থ সংগ্রহ করে এবং উহাতে কারবার করে; বাংলা কেবলমাত্র সুদ লাভেই সন্তুষ্ট। সুদের পয়সায় যাহাদের সংসার চালাইতে হয় না, তাহারা ঐ সুদের অর্থে কোম্পানী-কাগজের পরিমাণ বৃদ্ধি করিয়া চলিয়াছে, সুতরাং দেশে ব্যবসা, বা শিল্প বাড়িবে কি প্রকারে?

কচ দেবযানী—শ্রীসুরেন্দ্রনাথ রায়-চৌধুরী। মূল্য এক টাকা।

তিন অঙ্কে সমাপ্ত পৌরাণিক নাটক। বিজ্ঞাপন দৃষ্টে জানিলাম, গ্রন্থকার আরও আটখানি নাটক বাংলা ভাষায় লিখিয়াছেন, এই পুস্তক তাহা হইলে তাঁহার কল্পনার নবম ফল। কিন্তু আলোচ্য নাটকে না আছে নূতন ভঙ্গী, না আছে নূতন ভাব; পদ্য চলিয়াছে, কিন্তু ছন্দে নহে। ছন্দোহীন গতি পাঠকের প্রীতির উদ্রেক করে না। শেষ অঙ্কের একাদশ দৃশ্যে রবীন্দ্রনাথের 'বিদায়-অভিশাপে'র অতি ক্ষীণ প্রতিধ্বনির সৃষ্টি করা হইয়াছে। পৌরাণিক ও রবীন্দ্রনাথের স্বতন্ত্রধারাকে মিলাইবার এই চেষ্টা নিতান্তই ব্যর্থ হইয়াছে।

সর্ব্বধর্ম্ম-সমন্বয়—শ্রীদ্বিজদাস দত্ত। ১৯৩৩। কুমিল্লা। মূল্য ১৲ এক টাকা।

পুস্তকখানি চারি অধ্যায়ে সম্পূর্ণ। প্রথম অধ্যায়ে মানবমাত্রেরই মহিমাকীর্ত্তন করা হইয়াছে। অস্পৃশ্যতাদোষ এই মহিমাকে অস্বীকার করিতে চায়; কিন্তু সকল মানুষই যে শ্রীভগবানের সন্তান তাহা অস্বীকার করিবার উপায় কি? দ্বিতীয় অধ্যায়ে, সর্ব্বধর্ম্ম-সমন্বয় করিবার একটা উদার চেষ্টা জগতের ইতিহাসের প্রথম অধ্যায়ে যে দেখা গিয়াছিল তাহার প্রমাণ দেওয়া হইয়াছে। তৃতীয় অধ্যায়ে সমন্বয়ের বীজ সকল ধর্ম্মের ভিতরে (বিশেষতঃ ইস্‌লামে) অঙ্কুরিত হইতেছিল, তাহা দেখান হইয়াছে। নববিধানাচার্য্য ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র ধর্ম্মসমন্বয় করিবার জন্য বিরাট কর্ম্ম প্রতিষ্ঠানের সূচনা করিয়াছিলেন; তাঁহার সমসাময়িক কালীকচ্ছের শ্রীমদাচার্য্য আনন্দস্বামী শারদীয় উৎসবে সার্ব্বজনীন প্রীতিভোজন ও অন্যান্য উপায়ে সমন্বয়ের ভাবকে রূপ দিতে চাহিয়াছিলেন। নানা শাস্ত্র হইতে সযত্নে উদ্ধৃত শ্লোকসংগ্রহের দ্বারা সম্প্রদায়-নিরপেক্ষ সার্ব্বজনীন মিলিত ঈশ্বরোপাসনার উদ্বোধন, উপদেশ ও প্রার্থনার পথ নির্দ্দেশ করিয়া গ্রন্থকার তাঁহার পুস্তক শেষ করিয়াছেন।

পুস্তকখানিতে গ্রন্থকারের উদার দৃষ্টি ও নানা শাস্ত্রে জ্ঞানের পরিচয় পাওয়া যায়। আশা করি ইহার উদ্দেশ্য অন্ততঃ অল্প পরিমাণেও সিদ্ধ হইবে।

শ্রীপ্রিয়রঞ্জন সেন

দুঃখের দেওয়ালী—শ্রীকেদারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়। গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স্। ২০৩।১।১, কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট্। পৃ. ২০৩। মূল্য দেড় টাকা।

লেখক বঙ্গসাহিত্যে খ্যাতনামা। জীবনকে যে নতুন ভঙ্গিতে তিনি দেখেন এবং যে ভাষায় তা ব্যক্ত করেন, দুই-ই তাঁর সম্পূর্ণ নিজস্ব। এই বর্ণনাগুলি যেমন সরস, তেমনি অননুকরণীয়। 'কালী ঘরামী' গল্পটি পড়তে পড়তে মনে হয় এ এমন বাংলা দেশের কথা পড়ছি, যে-দেশ অতীতে লুপ্ত হয়ে গিয়েছে। ছবিগুলি অতি স্পষ্ট—কোথাও ঝাপসা আবছায়া নেই। 'রেল দুর্ঘটনা' গল্পের হিসাবরত গুরুপ্রারিলাল ও তার কলেজে-পড়া ছেলে, 'নিষ্কৃতি' গল্পের গাঙ্গুলী মশাই—এঁদের একেবারে চোখের সাম্‌নে দেখতে পাই। 'নন্দোৎসব' গল্পটি এই বইয়ে না ছাপলেই ভাল হ'ত—দশাশ্বমেধ ঘাটের ঘটনাটি পাঠককে বিশ্বাস করানো বড় শক্ত। বইখানির ছাপা, বাঁধাই ও কাগজ সুন্দর।

দিক্‌শূল—শ্রীউপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়। আর. এইচ. শ্রীমানী এণ্ড সন্স্। ২০৪, কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট্। পৃঃ ৩৫৫। দাম আড়াই টাকা।

লেখকের পরিচয় দান অনাবশ্যক। 'দিক্‌শূল' উপন্যাসখানিতে তিনি কিন্তু নতুন ধরণের কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছেন। একটি বেগবতী নদীর মত আমাদের যে জীবনধারা, তার দু-পাশে কোথাও শ্যামল মাঠ, কোথাও বা অরণ্যানী শ্বাপদসঙ্কুল, কোথাও উষর মরু—এদের বিচিত্রতার মধ্য দিয়ে মানবাত্মার সুখদুঃখময় অপরূপ অভিযানের কাহিনী লেখক ধ্যানদৃষ্টিতে ফুটিয়ে তুলেছেন। এখানি গতানুগতিক ধরণের উপন্যাস নয়, বসবার ও রান্না ঘরের দেওয়ালের চতুঃসীমা ছাড়িয়ে এর ঘটনাস্থল বহুদূরে বিস্তৃত—কল্পনার এই ব্যাপকতা পাঠকের মন মুগ্ধ করে। পুস্তকের ছাপা ও কাগজ সুন্দর।

শ্রীবিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়

কৃষ্ণরাও—শ্রীচারুচন্দ্র দত্ত। দত্ত মহাশয় যে গল্প লিখিয়া থাকেন তাহা আগে জানিতাম না। অল্পদিন আগে তাঁহার একটিমাত্র গল্প কি একটা কাগজে দেখিয়াছিলাম। হঠাৎ কৃষ্ণরাও বইখানি চোখে পড়িল। সখ করিয়া পড়িব বলিয়া আনিলাম। প্রথম হইতে শেষ পর্য্যন্ত সব কয়টি গল্প শেষ করিয়া দুঃখ হইল কেন এত শীঘ্র ফুরাইয়া গেল। ছেলেবেলায় যে কৌতূহল লইয়া মানুষ গল্প পড়ে এই গল্পগুলি অনেকটা সেইরূপ কৌতূহলই জাগাইয়া তুলিয়াছিল। বাল্যকালে গল্প পড়া মানে নিত্য নূতন আবিষ্কার। বয়স্ক মানুষ সচরাচর যে সকল গল্প পড়ে তাহাতে আবিষ্কারের বিষয় থাকে না এবং তাহা মানুষের ওই প্রবৃত্তিকে উদ্বুদ্ধও করে না। পাঠক আপন মতামতের সঙ্গে লেখকের মতামত মিলিল কি-না এই চিন্তাতেই ব্যস্ত থাকেন এবং লেখক হয় তাঁহার মতবাদ, নয় তাঁহার সাহিত্যিক কারিগরী বাহাদুরি দেখাইতে পারিলেই খুশী হন।

দত্ত মহাশয়ের গল্পে আমরা মহারাষ্ট্রীয় ব্রাহ্মণ, বেলুচ জমিদার, গুজরাটি ও সিন্ধী শেঠ প্রভৃতির সদর অন্দরের সহিত যেন ঘনিষ্ঠ পরিচয়ে পরিচিত হইলাম। তিনি যে বাঙালী হইয়া তাহাদের কাহিনী অন্য বাঙালীদের শুনাইতেছেন তাহা মনেই হয় না। যেন তাহাদেরই এক একজন আসরে উৎকর্ণ শ্রোতাদের নিজ নিজ দেশের কাহিনী শুনাইতেছে।

আধুনিক বাংলা গল্প-সাহিত্যে একই কাহিনীকে নূতন নূতন পোষাক পরাইয়া ছাড়িয়া দেওয়া একটা রীতি হইয়াছে। পাঠকের মনে ইহা ক্লান্তি ছাড়া আর কিছু আনে না। দত্ত মহাশয়

আমাদের ক্লান্ত মনকে শুধু যে নানা দেশের চিত্র ও গল্পের লোভে সজাগ করিয়া তুলিয়াছেন তাহা নয়, প্রত্যেকটি গল্পের বিষয়বস্তুও নূতনতর করিয়া তাহার সরসতা আরও বাড়াইয়াছেন।

বইখানির সামান্য একটু নিন্দা করিতেছি, যদিও এই সুন্দর গল্পগুলির নিন্দা করিতে মন চায় না। গল্পের দিকে লেখক মহাশয় মন যতখানি ঢালিয়া দিয়াছেন, ভাষার দিকে তাহা দেন নাই। আশা করি, দ্বিতীয় সংস্করণে এই খুঁৎটুকু থাকিবে না।

শ্রীশান্তা দেবী

ডন্‌কুস্তি—শ্রীযামিনীকান্ত সোম প্রণীত। প্রকাশক গুপ্ত ফ্রেণ্ডস্ এণ্ড কোং ১১নং কলেজ স্কোয়ার। কলিকাতা। দাম এক টাকা।

ব্যায়াম-সম্বন্ধীয় পুস্তক নয়। 'ডন্ কুইক্সোট' নামক সুবিখ্যাত প্রকাণ্ড গ্রন্থখানিকে শিশু পাঠোপযোগী করিয়া লেখক সহজ ও সুমিষ্ট ভাষায় ইহা রচনা করিয়াছেন। সেজন্য পুস্তকখানিকে আয়তনে ক্ষুদ্র করিতে হইয়াছে এবং নামও দিতে হইয়াছে কৌতুককর—'ডনকুস্তি'। ইহা পাঠে শিশুরা যে আমোদ পাইবে, এ বিষয়ে সন্দেহ নাই। পুস্তকখানির মোটা মলাটের উপরে ও ভিতরের ছবিগুলিও বেশ মজার। ছাপা, কাগজ ভাল।

শ্রীখগেন্দ্রনাথ মিত্র

খেয়াল—শ্রীকণীন্দ্রচন্দ্র দাস প্রণীত। প্রকাশক কোটাচাঁদ লাইব্রেরী, শ্রীহট্ট।

এখানি গানের বই। গ্রন্থকার ভূমিকায় লিখিয়াছেন—"গানগুলি কবিতা হিসাবে পাঠ করিতে যাইয়া পাঠকপাঠিকারা হয় তো নিরাশই হইবেন।" এই কথাটি গ্রন্থকারের বিনয়নম্র সৌজন্যমাত্র সন্দেহ নাই; কারণ এই গ্রন্থের অধিকাংশ সঙ্গীতই গীতিকবিতার মূর্ত্তি লাভ করিয়াছে, আর যেগুলির দেহ খাঁটি সঙ্গীতের পোষাকে মণ্ডিত সেগুলির মধ্যেও কাব্যের সম্পদ আছে। গানগুলির রচনাভঙ্গী সুন্দর, পাঠকচিত্তে স্পর্শ রাখিয়া যায়। সঙ্গীতানুরাগী ব্যক্তি মাত্রেরই এই বইখানি উপভোগ্য হইবে আশা করি।

ফুলকলি—(ক্ষুদ্রকাব্য গ্রন্থ) শ্রীনিবারচন্দ্র চক্রবর্ত্তী প্রণীত। প্রকাশক শ্রীহেমচন্দ্র চক্রবর্ত্তী, কামালকাচনা, নবাবগঞ্জ, রংপুর। মূল্য চারি আনা। ছোটদের কবিতা হিসাবে এই বইয়ের কবিতাগুলি মন্দ নহে।

শ্রীশৌরীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য

'এষা'র কবি—শ্রীপ্রিয়লাল দাস, এম্ এ, বি-এল্ প্রণীত, মূল্য পাঁচ সিকা।

স্বর্গীয় কবি অক্ষয়কুমার বড়ালের কাব্য গ্রন্থের সমালোচনা 'এষা'র কবি নামে গ্রন্থকার প্রকাশিত করিয়াছেন। অক্ষয়কুমার বর্ত্তমান যুগের একজন শ্রেষ্ঠ কবি। বঙ্গভাষায় কাব্য-সাহিত্যের ইতিহাসে বড়াল-কবির নাম সুপরিচিত। আলোচ্য পুস্তকের প্রথম অধ্যায়ে 'এষা'-কাব্যের" সমালোচনা লিপিবদ্ধ হইয়াছে। এই অধ্যায়টি অধুনালুপ্ত 'সাহিত্য' নামক মাসিক পত্রিকায় ইতিপূর্ব্বে গ্রন্থকার কর্তৃক প্রকাশিত হইয়াছিল। 'এষা'-কাব্যে অক্ষয়কুমারের বিপত্নীক জীবনের কাহিনী শোকোচ্ছ্বাসময় কবিতার আকারে লিপিবদ্ধ। গ্রন্থকার কবির রচনাবলী বিশ্লেষণ করিয়া শুধু যে অক্ষয় কবির মনস্তত্ত্বের বিচার করিয়াছেন তাহা নহে, সেই সঙ্গে তিনি কবির সু-উচ্চ আদর্শ সম্বন্ধেও গভীরভাবে আলোচনা করিয়াছেন। অক্ষয়কুমারের কাব্য-গ্রন্থগুলি সম্বন্ধে যাহা কিছু বলা যাইতে পারে গ্রন্থকার তাহার একটিও বাদ দেন নাই। কবির সৌন্দর্য্য-দৃষ্টি হইতে আরম্ভ করিয়া আত্মানুসন্ধানের ভিতর দিয়া কিরূপে অক্ষয়কুমারের প্রতিভার বিকাশ দেখা যায় তাহা 'এষা'র কবির পাঠক সহজেই বুঝিতে পারিবেন। কবির রচিত কাব্যের উদ্দেশ্য পাঠককে বুঝাইবার জন্য সমালোচক অক্ষয়কুমারের কবিত্বময় রচনা হইতে যে সকল শ্লোক উদ্ধৃত করিয়াছেন তাহার সাহায্যে কবির চিন্তাধারার চিত্র পরিস্ফুট হইয়াছে। প্রিয়বাবু যে ভাবে বড়াল-কবির কাব্য-গ্রন্থের সমালোচনা করিয়াছেন তাহাতে কাব্যামোদী পাঠক ও উচ্চ শ্রেণীর কাব্যানুশীলনকারী উভয়েই যে কবির ভিতরকার মানুষটিকে উত্তমরূপে বুঝিতে পারিবেন তাহাতে সন্দেহমাত্র নাই। আমরা এই উপাদেয় তথ্যে পূর্ণ গ্রন্থের বহুল প্রচারে সুখী হইব।

শ্রীসুরেন্দ্রনাথ কুমার

বিলাতে ভারতের দাবী—(রাউণ্ড টেবিল কনফারেন্সে গান্ধীজীর বক্তৃতা) অনুবাদক শ্রীহেমেন্দ্রলাল রায়। মূল্য আট আনা।

শিক্ষা ও সেবা—শ্রীমোহনদাস করমচাঁদ গান্ধী, অনুবাদক শ্রীসতীশচন্দ্র দাসগুপ্ত, মূল্য বাঁধাই আট আনা, সাধারণ পাঁচ আনা।

খাদি প্রতিষ্ঠান হইতে সতীশ বাবুর যত্নে গান্ধীজীর যে সকল বই বাহির হইতেছে, এ দুখানি বই তাহারই অন্তর্গত। বাংলা দেশে গান্ধীজীর বাণী প্রচার করিবার বিষয়ে খাদি প্রতিষ্ঠান যাহা করিয়াছেন তাহার তুলনা হয় না। বিলাতে গান্ধীজী যে সকল বক্তৃতা দিয়াছিলেন তাহাতে তাঁহার রাজনৈতিক আদর্শ কি ও ভবিষ্যৎ ভারতবর্ষ কেমনভাবে তিনি গড়িতে চান তাহা যেমন ফুটিয়াছে, অন্য কোনও জায়গায় তেমনভাবে ফোটে নাই। গান্ধীজীর ইংরেজী ভাষার উপর দখল অসাধারণ এবং তাঁহার লেখার অনুবাদ করিতে গিয়া ভাব ঠিকমত বজায় রাখা অতিশয় কঠিন। তথাপি হেমেন্দ্রবাবু যতদূর কৃতকার্য্য হইয়াছেন তাহা প্রশংসা না করিয়া থাকা যায় না।

দ্বিতীয় বইখানিতে শিক্ষা ও গ্রাম সংস্কার সম্বন্ধে আমরা গান্ধীজীর বহু উপদেশ একত্র পাই। যে সকল কর্ম্মী দেশ সেবার কার্য্যে নিযুক্ত আছেন তাঁহারা বইখানিতে অনেক শিক্ষণীয় বিষয় পাইবেন ও তাহারও বেশী, অন্তরে উৎসাহ পাইবেন বলিয়া আশা করা যায়।

শ্রীনির্ম্মলকুমার বসু

বাঙালীর জাতি-বিশ্লেষণ

শ্রীবিরজাশঙ্কর গুহ

মানবজাতিকে নানাভাবে ভাগ করা যায়। ভাষা, কৃষ্টি, দেশ ও ধর্ম্ম প্রভৃতি নানাবিষয়ে মানুষ পরস্পরের মধ্যে বিভক্ত হইয়া আছে। দুঃখের বিষয়, ঐ লক্ষণগুলার কোনটিই স্থায়ী ও অপরিবর্ত্তনীয় নয়। অবস্থাবিশেষে লোকে ভাষা, ধর্ম্ম ও কৃষ্টির আমূল পরিবর্ত্তন করিতে পারে—দেশ ত্যাগ করিয়া চলিয়া যাওয়াও সম্ভব। আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রের নিগ্রোরা ইহার দৃষ্টান্ত। এইজন্য মানুষের স্থায়ী শ্রেণী-বিভাগের জন্য এমন কতকগুলি বিশেষত্ব নির্দ্ধারণ করা আবশ্যক, যাহা লোকে ইচ্ছামত পরিবর্ত্তন করিতে পারে না। নৃ-তত্ত্ব বিজ্ঞানে মানবের দৈহিক গঠনের বিশ্লেষণ করিয়া এমন কতকগুলি বিশেষত্বের সন্ধান পাওয়া গিয়াছে যাহা কালের প্রভাবে লুপ্ত হয় না, বংশানুক্রমে টিকিয়া থাকে। মানুষের দেহগত ঐ সকল মৌলিক পার্থক্য বিচার করিয়া নৃতাত্ত্বিকেরা মানুষকে কতকগুলি সুনির্দ্দিষ্ট জাতিতে (race) বিভক্ত করিয়া থাকেন। অবশ্য কোন একটি মাত্র বৈশিষ্ট্যের উপর নির্ভর করিয়া এইরূপ জাতি-বিভাগ করা চলে না, অনেকগুলি বিশেষত্ব একসঙ্গে তুলনা করিয়া এক জাতি হইতে অপরের প্রভেদ নিরূপিত হয়. আবার দৈহিক বৈশিষ্ট্যগুলি যে-নিয়মে বংশানুক্রমে সঞ্চারিত হয় ও প্রাকৃতিক আবেষ্টনের প্রভাবে মানবদেহে যে-সকল পরিবর্ত্তন ঘটে, তাহার সবগুলিই সমান ভাবে স্থায়ী ও অপরিবর্ত্তনীয় নহে। বংশানুক্রমের নিয়মে দেখিতে পাওয়া যায়, কতকগুলি বিশেষত্ব অপর কতকগুলি বিশেষত্ব হইতে প্রবলতর হইয়া আত্মপ্রকাশ করে; কতকগুলি আবার আবেষ্টনের প্রভাবে বদলাইয়া যায়। মানুষের শরীরের রং ঐরূপ পরিবর্ত্তনের একটি দৃষ্টান্ত। আমাদের চামড়ার নীচে কতকগুলি বর্ণ-কণিকা (pigments) বিদ্যমান থাকে—ইহার পার্থক্যবশতই শরীরের রঙের প্রভেদ দেখা যায়। পৃথিবীর উষ্ণদেশগুলিতে বাস করিয়া বাঁচিয়া থাকিতে হইলে মানবদেহের সূর্য্যের উত্তাপ সহ্য করিবার ক্ষমতা থাকা প্রয়োজন। এইজন্যই আমাদের চামড়ার নীচে ঐরূপ বর্ণ-কণিকার আবির্ভাব হয়। ফলে নানা জাতির মানুষের মধ্যে এতটা বর্ণভেদ লক্ষিত হয়।

Dolicho-cephalic
(লম্বা) মাথার খুলি

Brachy-cephalic
(গোল) মাথার খুলি

নৃ-তত্ত্বে যে যে লক্ষণে মানুষের জাতি বিভাগ করা হয় তাহার মধ্যে মাথা, নাক ও মুখের গঠনবিষয়ক বৈশিষ্ট্যগুলিই বিশেষ উল্লেখযোগ্য। শুধু চোখে দেখিয়া কতকটা স্থূল ধারণা হইতে ইহাদের পার্থক্য নির্দ্ধারণ করা যায় না। বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতির সাহায্যে দেহের ঐ সকল অঙ্গের

সূক্ষ্মভাবে মাপ লওয়া হয়; পরে ঐ মাপগুলিকে রাশিগত ভাবে তুলনা করা হইয়া থাকে। উপর হইতে মাথার খুলির দিকে চাহিয়া দেখিলে তাহার প্রস্থের সহিত দৈর্ঘ্যের যে অনুপাত (ratio) দেখা যায়, সেই অনুযায়ী মাথাকে যথাক্রমে Dolicho-cephalic (লম্বা মাথা), Meso-cephalic (মধ্যমাকৃতি মাথা) অথবা Brachy-cephalic (গোল মাথা) বলা হয়। Calipers নামক যন্ত্রের সাহায্যে মাথার দৈর্ঘ্য ও প্রস্থের মাপ লইয়া অনুপাত কষিয়া দেখিতে হয়। ভ্রূ দুইটির মধ্যবর্ত্তী কল্পিত বিন্দু (glabella) হইতে মাথার পিছন দিকের অস্থির (occipital bone) শেষ সীমা পর্য্যন্ত একটি সরল রেখা কল্পনা করা হইলে তাহার দৈর্ঘ্যকেই মাথার দৈর্ঘ্য বলা যায়। এই সরল রেখার সহিত সমকোণ করিয়া আড়া-আড়িভাবে মাথার যে বৃহত্তম মাপটি লওয়া হয়, তাহাই মাথার প্রস্থ। এই দুই মাপ হইতে মাথার অনুপাত বা cephalic index এই ভাবে বাহির করা হয়:—

$$\frac{\text{প্রস্থের মাপ} \times ১০০}{\text{দৈর্ঘ্যের মাপ}}$$

এইরূপে cephalic index-এর যে অনুপাত পাওয়া যায়, নিম্নের তালিকায় তাহার বিভিন্ন পর্য্যায়গুলি দেওয়া গেল:—

মুণ্ডের শ্রেণী	ক্রমের পর্য্যায়।
Dolicho cephalic (লম্বামাথা)—	৭৫·৯ পর্য্যন্ত
Meso-cephalic (মধ্যমাকৃতি মাথা)—	৭৬ হইতে ৮০·৯
Brachy-cephalic (গোল মাথা)—	৮১ হইতে উর্দ্ধে

শুধু চোখে মানুষের নাকের বিচার করিলে দেখা যায়, এক শ্রেণীর নাক দৈর্ঘ্যে, প্রস্থে ও উচ্চতায় বেশ সুগঠিত; কতগুলি আবার দৈর্ঘ্যে কম, প্রস্থে বা বিস্তারে অধিক, কোনটি বা উচ্চতায় কম। এইগুলিকে যথাক্রমে দীর্ঘনাসা (leptorrhine), মধ্যমাকৃতি-নাসা (mesorrhine) এবং নিম্ন-নাসা (platyrrhine) বলা হয়। নাসাস্থির মূল (nasion) হইতে নাকের রন্ধ্র দুইটির মধ্যবর্ত্তী স্থান পর্য্যন্ত যে মাপ, তাহাই নাকের দৈর্ঘ্য। নাসারন্ধ্রের বাহিরের দুই দিক লইয়া যে মাপ তাহা নাকের প্রস্থ। ঐ রন্ধ্র দুইটির মাঝখানের প্রাচীরের নীচে হইতে নাসাগ্র পর্য্যন্ত নাকের উচ্চতা। এই মাপগুলি হইতে নাসিকার কয়েকটি index কষিয়া দেখা হয়। প্রধান indexটি এইরূপ:—

$$\frac{\text{নাসা প্রস্থ} \times ১০০}{\text{নাকের দৈর্ঘ্য}}$$

নীচের তালিকায় এই index-এর পর্য্যায়গুলি দেওয়া হইল:—

নাকের শ্রেণী	ক্রমের পর্য্যায়
Leptorrhine (দীর্ঘনাসা)—	৬৯·৯
Mesorrhine (মধ্যমাকৃতি-নাসা) -	৭০ হইতে ৮৪·৫
Platyrrhine (নিম্ন-নাসা)—	৮৫ হইতে উর্দ্ধে।

এইরূপে মাথা ও মুখের অনেকগুলি মাপ লইয়া তাহা হইতে নানাপ্রকার index কষিয়া দেখা হয়।

বর্ত্তমান প্রবন্ধে আমরা উপরোক্ত বৈজ্ঞানিক প্রণালী অনুসারে বাঙালীদের জাতিবিভাগ করিতে চেষ্টা করিব। এ-সম্বন্ধে প্রচলিত ধারণাগুলির মধ্যে কতটা সত্য আছে, তাহাও বিচার করা যাইবে।

২

বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে বাঙালীর জাতি-বিশ্লেষণের প্রথম চেষ্টা করেন স্যর হারবার্ট রিজলে। ১৮৯১ খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত তাঁহার *Tribes and Castes of Bengal* নামক গ্রন্থে এই প্রচেষ্টার ফলাফল লেখা হয়। এই গ্রন্থেই রিজলে ভারতবাসীদের জাতিগত উৎপত্তি সম্বন্ধে তাঁহার প্রসিদ্ধ মতগুলি প্রথম প্রচার করেন। তাঁহার সিদ্ধান্তে বাঙালীরা মঙ্গোলীয় ও দ্রাবিড় জাতিদ্বয়ের মিশ্রণে উৎপন্ন—অবশ্য উচ্চতর বর্ণগুলির মধ্যে সামান্য আর্য্য (Indo-Aryan) রক্ত দেখা যায়। রিজলে এই মিশ্রিত জনতার নাম দেন—মঙ্গোলো-দ্রাবিড়। উত্তরে হিমালয়, পূর্ব্বে আসাম, পশ্চিমে ছোটনাগপুরের পার্ব্বত্য প্রদেশ—এই সীমানার মধ্যে বিস্তৃত সমগ্র বাংলা দেশ ও উড়িষ্যা এই জাতির বাসভূমি বলিয়া নির্দ্ধারিত হয়। ব্রাহ্মণ, কায়স্থ ও চট্টগ্রামের রাজবংশী মগ, বাঁকুড়া ও মেদিনীপুরের মাল, রঙ্গপুর ও জলপাইগুড়ির কোচ প্রভৃতি লোকদের এই জাতির নিদর্শন বলিয়া রিজলে উল্লেখ করেন।

রিজলের সিদ্ধান্তের যাথার্থ্য নিরূপণ করিতে হইলে নিম্নের প্রশ্নগুলির মীমাংসা করা আবশ্যক।

(১) উপরোক্ত লোকেরা কি পরিমাণে প্রকৃত বাঙালী জাতির নিদর্শনভূত ?

(২) ব্রাহ্মণ ও কায়স্থেরা অবশ্য বাঙালী সমাজেরই উচ্চ শ্রেণীর লোক, কিন্তু রিজলের নির্দ্দিষ্ট অন্যান্য লোকদের সম্বন্ধেও কি ঐ কথা খাটে ?

প্রথমে পার্ব্বত্য চট্টগ্রামের রাজবংশী মগদের কথাই ধরা যাক। মগজাতির যে তিনটি শাখা আরাকান হইতে আসিয়া ঐ অঞ্চলে প্রবেশ করে, ইহারা তাহাদেরই অন্যতম। প্রকৃত প্রস্তাবে ইহারা চীনা জাতির লোক ; ইহাদের সমাজসংস্থান, গোষ্ঠীর নাম প্রভৃতিতে ইহাদের প্রকৃত উৎপত্তির যথার্থ প্রমাণ আছে। পার্ব্বত্য চট্টগ্রামের শাসনকেন্দ্র রাঙ্গামাটিতে রিজলের আদেশে ইহাদের মাপ লওয়া হয়। যাহাদের মাপ লওয়া হয় তাহাদের কতকগুলি লোকের নাম ছিল—আহং, সেপ্টেটং, পংডুং, ঠাপাস্থ, ঠৈঙ্গা। এই মঙ্গোলীয় নামগুলি হইতে বোঝা যায় যে, এই মগরা ঐ অঞ্চলে বহু দিনের বাসিন্দা হইলেও আজও আপনাদের জাতীয় স্বাতন্ত্র্য বজায় রাখিয়াছে এবং বাঙালীর সামাজিক রীতি ও নাম এখনও গ্রহণ করে নাই।

বাঁকুড়া, বীরভূম প্রভৃতি জেলার মালদের দৃষ্টান্তও লওয়া যাক। রিজলে নিজেই স্বীকার করেন যে, ইহারা রাজমহল পাহাড় হইতে এদিকে আসিয়াছে এবং সাঁওতাল পরগণার মালপাহাড়ীয়া, মালে প্রভৃতির মত একই জাতির লোক।

অতঃপর উত্তর-বঙ্গের রাজবংশী কোচদের কথা উঠে। যে প্রসিদ্ধ কোচ জাতি এক সময় উত্তর-বঙ্গ আক্রমণ করে, ইহারা তাহাদেরই বংশধর। রিজলে ইহাদের যে, সব লোকের মাপ লন, তাহাদের—পাইয়া, লেথ্‌, লোবু, আলিঙ্গা, ইউরিয়া, তাণ্ডু, লোবাই প্রভৃতি—নাম মোটেই বাঙালীর নহে। কর্ণেল ওয়াডেল এই শ্রেণীর বহু লোকের মাপ লইয়া স্থির করেন যে, ইহারা স্পষ্টতঃ মঙ্গোলয়েড জাতীয় লোক।

ফলে দেখা যাইতেছে, ঐ সকল উপজাতিরা বাহির হইতে এদেশে আসিয়া বাংলার সীমান্তস্থিত জেলাগুলিতে কিছুকাল যাবৎ বাস করিতেছে। খাঁটি বাঙালীর নিদর্শন বলিয়া তাহাদের ধরা যায় না ; এবং দৈহিক মাপ হইতে তাহাদের জাতিগত উৎপত্তি বিষয়ে যে-সকল সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায়, তাহা প্রকৃত বাঙালীর সম্বন্ধে প্রযোজ্য নহে।

দৈহিক বৈশিষ্ট্যের তুলনা করিলে দেখা যায়, সাঁওতাল পরগণার মালে, মালপাহাড়ীয়া প্রভৃতির ন্যায় বাঁকুড়া ও মেদিনীপুরের 'মাল'রা একই আদিম জাতির লোক। এই জাতিটা সাধারণতঃ 'প্রটো-অষ্ট্রেলয়েড' বলিয়া কথিত হয়। ইহাদের দেহাকৃতি খর্ব্ব, মাথা লম্বা,

মালর পুরুষ
Cephalic Index 74.23
Nasal Index 81.65

লেপ্‌চা স্ত্রী
C. I. 86.23
N. I. 63.25

বাঙালী ব্রাহ্মণ
C. I. 80.65
N. I. 64.91

বাঙালী ব্রাহ্মণ
C. I. 97.52
N. I. 60.38

নাক খাঁদা ও চৌড়া। অপর পক্ষে রাজবংশী মগদের মাথা গোলাকৃতি, নাক চ্যাপটা, ও গণ্ডাস্থি অত্যধিক পরিণত। তাহাদের মুখ ও দেহে কেশরোমাদি বিশেষ নাই। তাহাদের চক্ষু বঙ্কিম ও অর্দ্ধোন্মীলিত; নাকের পাশে চোখের কোণ দুটি একটি বিশেষ চামড়ার ভাঁজে (epicanthic fold) আবৃত থাকে।

উত্তর-বঙ্গের কোচদের মাথা ঠিক গোলাকৃতি না হইলেও তাহাদের মুখের গঠন পূর্ব্বোক্ত মগদের মতই মঙ্গোলীয় শ্রেণীর।

ঐ সকল উপজাতির সহিত তুলনা করিলে বাঙালী সমাজের ব্রাহ্মণ-কায়স্থদের নিম্নরূপ বিশেষত্ব দেখা যায়:—

ইহাদের মাথা গোলাকৃতি, নাসিকা দীর্ঘ এবং উন্নত। মালদের নাকের ক্রম হইল ৮৪.৭ (Platyrrhine)।* আর ইহাদের মাত্র ৭০.৩৫ (Leptorrhine)। ইহাদের মাথার দৈর্ঘ্যের তুলনায় ব্যাস মগদের অপেক্ষা কম হইলেও ইহারা মগদের মত নিম্ননাসা (অনুপাত=৮২.৭) লোক নহে; মুখও ইহাদের মঙ্গোলীয় জাতির মত থ্যাবড়া নহে। মগ ও কোচদের গণ্ডাস্থির বিস্তার যথাক্রমে ১৩৭.৮ মিলিমিটার এবং ১৩২ মিলিমিটার—ইহাদের মাত্র ১২৮ মিলিমিটার। মানুষের বংশানুক্রম সম্বন্ধে এমন কোন প্রাকৃতিক নিয়ম আজও আবিষ্কৃত হয় নাই, যাহাতে চ্যাপটা নিম্ন-নাসা ও থ্যাবড়া মুখবিশিষ্ট

* এখানে যে মাপগুলি দেওয়া হইল তাহা রিজলের anthropometric data হইতে লওয়া।
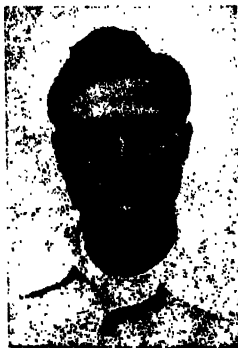
বাঙালী কায়স্থ
C. I. 83.61
N. I. 60.71

বাঙালী বৈদ্য
C. I. 82.46
N. I. 60.34
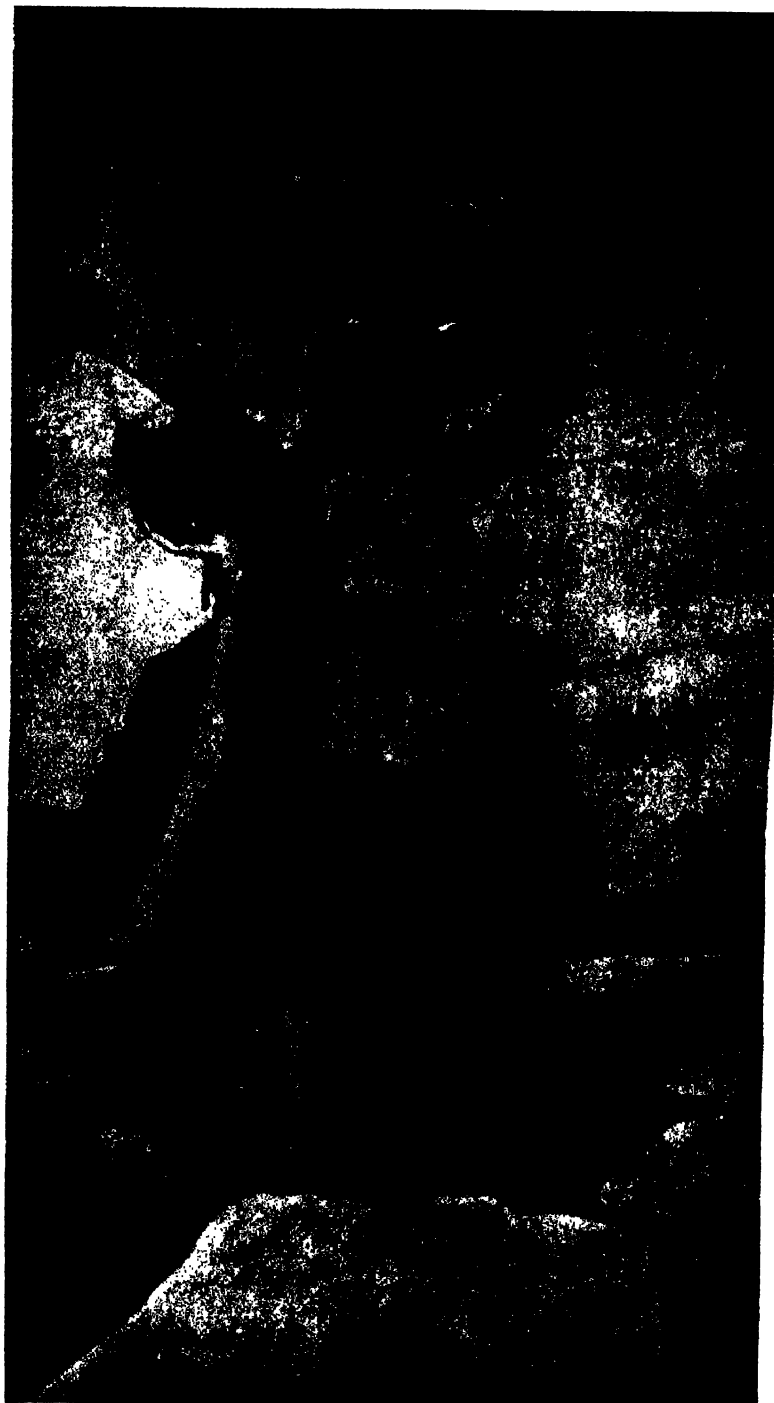
গোয়ালিনী

শ্রীরামগোপাল বিজয়বর্গীয়

প্রবাসী প্রেস, কলিকাতা

বাঙালী ব্রাহ্মণ
C. I. 83.33
N. I. 66.07

বাঙালী ব্রাহ্মণ
C. I. 83.62
N. I. 60.00

বাঙালী ব্রাহ্মণ
C. I. 82.35
N. I. 61.67

বাঙালী ব্রাহ্ম (ব্রাহ্মণ × বৈদ্য)
C. I. 87.15
N. I. 53.7

ঐ দুইটি জাতির সংমিশ্রণে ব্রাহ্মণ-কায়স্থদের মত দীর্ঘ ও উন্নত-নাসা লোকের উৎপত্তি কল্পিত হইতে পারে। মঙ্গোলীয় জাতির যাহা প্রধান বিশেষত্ব—মুখ ও শরীরে কেশরোমাদির অপ্রাচুর্য্য এবং চর্ম্মাবৃত অক্ষিকোণ (epicanthic fold) তাহাও এই ব্রাহ্মণ কায়স্থদের মধ্যে দেখিতে পাওয়া যায় না। বাস্তবিকই, বাঙালী ব্রাহ্মণ-কায়স্থাদির যে প্রকার শরীরের গঠন, সেইরূপ আকৃতি ও দৈহিক বিশেষত্ব রিজলের কথিত উপজাতিদের মিশ্রণে সম্ভূত হইতে পারে না। ইহাদের আদি ইতিহাস, ইহাদের কুটুম্বিতার সূত্রগুলি অন্যত্র খুঁজিতে হইবে।

ভারতবাসীদের দৈহিক বৈশিষ্ট্যগুলি বিশ্লেষণ করিলে দেখা যায় যে, গুজরাট হইতে কূর্গ পর্য্যন্ত পশ্চিম-ভারতের সমুদ্রতট একটি গোল মাথা ও দীর্ঘোন্নত নাকবিশিষ্ট জাতি কর্তৃক অধ্যুষিত। নৃতাত্ত্বিকেরা ইহাদের আল্‌পাইন বলিয়া অভিহিত করেন। ইহারা অবশ্য আল্‌প্‌স্ পর্ব্বত হইতে আসিয়া ভারতে বসবাস করে নাই। ইউরোপের জাতি-বিশ্লেষণের ফলে আল্‌প্‌স্ অঞ্চলে এই জাতীয় লোকের প্রথম সন্ধান পাওয়া যায় বলিয়া ইহাদের ঐরূপ নাম দেওয়া হইয়াছে—পৃথিবীর সর্ব্বত্রই এই জাতির লোক আল্‌পাইন বলিয়া কথিত হয়। গুজরাট, মহারাষ্ট্র, কানাড়া ও কূর্গের অধিবাসীদের মধ্যে এই আল্‌পাইন জাতিটির প্রাবল্য দেখা যায়। যতদূর জানা গিয়াছে, এই গোল্ মাথাবিশিষ্ট জাতি দক্ষিণাত্যের মালভূমির ভিতর

বাঙালী ব্রাহ্মণ
C. I. 80.65
N. I. 73.47
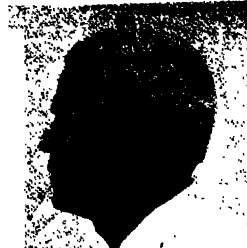
বাঙালী পোদ
C. I. 87.71
N. I. 79.17

মারাঠী 'দেশস্থ' ব্রাহ্মণ
C. I. 86.05
N. I. 64.58

কানারীজ অব্রাহ্মণ
C. I. 85.06
N. I. 67.31

মলয়ালী নায়ার
C. I. 70.00
N. I. 67.92
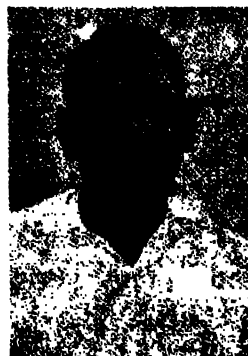
যুক্তপ্রদেশের ব্রাহ্মণ
C. I. 72.41
N. I. 60.71

গুজরাটী নাগর ব্রাহ্মণ
C. I. 77.60
N. I 75.47

গুজরাটী নাগর ব্রাহ্মণ
C. I. 46.23
N. I. 66.67

দিয়া দক্ষিণাভিমুখী হইয়া চলিলেও মালাবারে পৌছে নাই, পূর্ব্বদিকে একটু ঘুরিয়া গিয়া তামিল নাড়ুতে চলিয়া গিয়াছে। সম্ভবতঃ দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলেই ইহাদের অভিযান শেষ হইয়াছিল—পূর্ব্বোত্তর দিকের সমুদ্রতটে তেলুগুদের মধ্যে ইহাদের প্রভাব বিশেষ অনুভূত হয় না।

উত্তরাপথে, পঞ্জাবে এবং বারাণসী পর্য্যন্ত গঙ্গা-বিধৌত প্রদেশে এই জাতির অস্তিত্ব তেমন দেখা যায় না। অপর পক্ষে বিহার প্রদেশ হইতে দক্ষিণ-বাংলার দিকে যতই নামিয়া আসা যায়, ততই এই গোল মাথাবিশিষ্ট জাতির লোক সংখ্যায় প্রবল হইয়া উঠে।

পূর্ব্ব ও পশ্চিম ভারতে এই গোল মাথা জাতির অস্তিত্বের ব্যাখ্যা করিতে গিয়া রিজলে সিদ্ধান্ত করেন যে, পশ্চিমে শক এবং পূর্ব্বে মঙ্গোলীয় রক্তে ইহাদের উৎপত্তি। কিন্তু দাক্ষিণাত্যে শক-অভিযানের কোন ঐতিহাসিক প্রমাণ নাই। বাংলা দেশে মঙ্গোলীয় রক্তের সংমিশ্রণে এই জাতীয় মানবের উৎপত্তি যে প্রমাণ করা যায় না তাহা পূর্ব্বেই দেখান গিয়াছে।

কয়েক বৎসর পূর্ব্বে 'ইণ্ডিয়ান য়্যাণ্টিকোয়ারী' পত্রিকায় প্রকাশিত একটি প্রবন্ধে ডাঃ ভাণ্ডারকর এই সম্বন্ধে একটি নূতন যুক্তির অবতারণা করিয়াছেন। তিনি দেখাইয়াছেন যে, গুজরাটের নাগর ব্রাহ্মণ ও বাংলার কায়স্থ সমাজের কতকগুলি পদবী এক; যেমন—মিত্র, ঘোষ, দত্ত, নাগ, পাল ইত্যাদি। এ অবস্থায় উভয় সম্প্রদায়ের মিল শুধু নামের পদবীতে, না দৈহিক গঠনেও, তাহা বিচার করা প্রয়োজন। রিজলের তত্ত্বাবধানে ৺বি. এ. গুপ্তে যে মাপ লন, তাহাতে দেখা যায়, ঐ নাগর ব্রাহ্মণদের গড়ে দৈর্ঘ্য ১৬৪৩ মিলিমিটার এবং বাঙালী কায়স্থদের ১৬৩৬ মিলিমিটার—অর্থাৎ প্রভেদ মাত্র ৭ মিলিমিটার বা ¼ ইঞ্চি। নাগর ব্রাহ্মণদের মাথা ও নাকের অনুপাত যথাক্রমে ৭৯.৭ ও ৭৩.১—বাঙালী কায়স্থদের ৭৮.২ এবং ৭০.৩। সুতরাং এই দুই শ্রেণীর লোকের প্রভেদটা বিশেষ উল্লেখযোগ্য নহে। আরও দেখা যায় যে, সংগৃহীত তথ্যে নাগর ব্রাহ্মণদের শতকরা ৬৩ জনের মাথা গোলাকৃতি, শতকরা ৫৩ জনের নাক দীর্ঘ ও উন্নত। বাঙালী কায়স্থদের মধ্যে শতকরা ৬০ জনের মাথা গোলাকৃতি এবং শতকরা ৭১ জনের নাসিকা দীর্ঘ ও উন্নত।

গুজরাট, বোম্বাই ও বাংলার এইরূপ লোকের মধ্যে দৈহিক ও কৃষ্টিগত সাদৃশ্যের অর্থ তাহাদের জাতিগত ঐক্য। রিজলে যদি বাংলার সীমান্তবাসী মঙ্গোলীয় লোকদের সহিত ইহাদের তুলনামূলক আলোচনা করিতেন এবং মধ্যপ্রদেশের ভিতর দিয়া প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য ভারতের গোল-মাথা অধিবাসীদের মধ্যে একটি যোগসূত্র কল্পনা করিতেন, তিনিও এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইতেন। কথাটার একটু বিস্তৃত আলোচনা প্রয়োজন।

(১) মঙ্গোলীয় উপজাতি ও বাঙালী সমাজ

বাংলার সীমান্তবাসী মঙ্গোলীয়দের দৈহিক বৈশিষ্ট্যের বিচার করিলে দেখা যায় যে, ব্রহ্মপুত্র উপত্যকার কোচ, কাছাড়ী, কলিতা, গারো, লুসাই ও নাগা পর্ব্বতের অধিবাসীরা স্পষ্টতঃ লম্বা-মাথা লোক। গোল-মাথা মঙ্গোলীয়েরা নেপাল, সিকিম এবং পার্ব্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলে বাস করে। বাঙালী সমাজের উচ্চস্তরে যে গোল-মাথা জাতির প্রাধান্য, তাহারা কিন্তু বাংলা দেশের মাঝামাঝি অর্থাৎ গঙ্গার 'ব'-দ্বীপ অঞ্চলে সংখ্যায় প্রবল হইয়া আছে। বাংলার উত্তর ও পূর্ব্ব সীমান্তের দিকে যতই অগ্রসর হওয়া যায় ইহাদের সংখ্যা ততই কমিয়া যাইতে দেখা যায়। নেপাল, সিকিম ও পার্ব্বত্য চট্টগ্রামের গোল-মাথা মঙ্গোলীয় জাতি হইতে যদি এই শ্রেণীর বাঙালীর উদ্ভব হইত, তবে তৎসন্নিহিত ভূভাগেই ইহাদের সংখ্যাধিক্য দেখা যাইত। উত্তর-পূর্ব্বের লম্বা-মাথা মঙ্গোলীয়েরা আদৌ ইহাদের পূর্ব্বপুরুষ বলিয়া বিবেচিত হইতে পারে না।

( ) মধ্যভারতের ভিতর দিয়া প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য আলপাইনগণের যোগসূত্র

রিজলের সময়ে মধ্যভারতের বাসিন্দাদের দৈহিক বৈশিষ্ট্যের সম্বন্ধে বিশেষ কিছু জানা ছিল না। প্রচলিত ধারণামতে, রিজলে যাহাদের দ্রাবিড় বলিয়াছেন, অর্থাৎ মানভূম ও সিংহভূমের মাল, মালপাহাড়িয়া প্রভৃতি প্রটো-অষ্ট্রোলয়েড জাতীয় লোকেই ঐ দেশভাগ অধিকার করিয়া আছে।

পূর্ব্বাঞ্চলে এই গোল-মাথা জাতির অভিযান কোন্ পথে হইয়াছিল তাহা নির্দ্ধারণ করিবার জন্য বর্ত্তমান লেখক ১৯৩১ খৃষ্টাব্দের আদমসুমারীর সহযোগিতায় মধ্য ও দক্ষিণ ভারতের জনতাকে ব্যাপকভাবে পরীক্ষা করেন। এই উপলক্ষ্যে মালবের মালভূমি, পশ্চিম-ভারতের উপকূল, এবং দাক্ষিণাত্যের নিম্নাঞ্চলও পর্য্যবেক্ষিত হয়। এই অনুসন্ধানের ফলাফল অন্যত্র বিশদরূপে আলোচিত হইবে। এখানে ইহা বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে, রেওয়া (অর্থাৎ ৮৩° পূর্ব্ব দ্রাঘিমা রেখা) পর্য্যন্ত সমগ্র মালবের মালভূমিতে পূর্ব্বোক্ত গোলাকৃতি মাথাবিশিষ্ট জাতির লোক এখনও টিকিয়া থাকিয়া প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য আল্‌পাইনগণের প্রাচীন যোগসূত্রের সাক্ষ্যস্বরূপ হইয়া আছে। আমার ছাত্রদ্বয় শ্রীমান্ বজ্রকুমার চট্টোপাধ্যায় ও অচ্যুতকুমার মিত্রের অনুসন্ধানে আরও প্রমাণ হইয়াছে যে, বর্ত্তমান বিহার প্রদেশের উচ্চশ্রেণীর হিন্দুগণের মধ্যে এই গোল-মাথা জাতির অস্তিত্ব বিদ্যমান। বিশেষ করিয়া এই গোল-মাথা জাতির প্রভাবেই যে বাংলা দেশের জাতীয় ছাঁদটি (racial type) উদ্ভূত হইয়াছে, এ বিষয়ে সন্দেহ নাই। পূর্ব্বাঞ্চলে এই গোল-মাথা জাতির অভিযানের পরবর্ত্তী যুগে অন্য জাতির জনস্রোত আসিয়া ইহাদের পূর্ব্ব ও
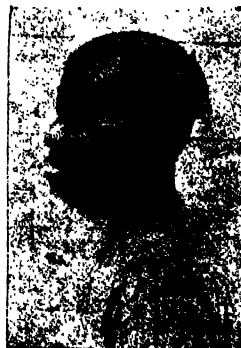
বাঘেল রাজপুত
C. I. 81.42
N. I. 72.00

মৈথিল ব্রাহ্মণ
C. I. 86.34
N. I. 67.27

পশ্চিম শাখার যোগসূত্রটি নিরবচ্ছিন্ন থাকিতে দেয় নাই। কিন্তু এককালে যে ইহা বিশেষ বলবৎ ছিল, আমাদের সংগৃহীত তথ্য তাহা নিঃসংশয়ে প্রমাণ করিয়াছে।

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে, পশ্চিম-ভারতের গোল-মাথা এবং দীর্ঘোন্নত নাসাবিশিষ্ট জাতির জনস্রোত প্রধানতঃ দক্ষিণ-পূর্ব্বে তামিল দেশের দিকে প্রবাহিত হইয়া যায়। তামিল দেশের উত্তরে অন্ধ্রদের মধ্যে ইহাদের প্রভাব বিশেষ অনুভূত হয় নাই। সুতরাং অন্ধ্র ও উড়িষ্যার ভিতর দিয়া ইহাদের বঙ্গাভিযান কল্পিত হইতে পারে না। পশ্চিম-ভারত ও বাংলার জাতিগত ইতিহাসের (racial history) এই প্রকার যোগসূত্র স্বীকৃত হইলে বাঙালী সমাজের উচ্চস্তরের গোল-মাথা ও দীর্ঘোন্নত নাসা বিশিষ্ট জাতির উৎপত্তির জন্য কোন মঙ্গোলীয় জাতির সংমিশ্রণ কল্পনা করিতে হয় না।

মায়ের আশীর্ব্বাদ

শ্রীপারুল দেবী

কানপুর থেকে পূজার ছুটিতে অনু স্বামীর সঙ্গে কলকাতায় এল।

শ্বশুর-শাশুড়ী নেই, দেবর-ননদ নেই, কেবল একটি মাত্র ভাশুর। অনুর স্বামী ললিত কেবলই বলেন, "কতদিন যে দাদাকে দেখিনি; এবার পূজার ছুটিতে আমি কলকাতায় যাবই। দু-চার দিনের ছুটি সেই সঙ্গে বাড়িয়ে নিলেই হবে।"

অনু এক-একবার ভাবে—রাঁচি ত কলকাতা থেকে তেমন দূর নয়, মা বাবাকে আমিও ত কতদিন দেখিনি, একবার অমনি রাঁচিটা ঘুরে এলেও বেশ হ'ত। কিন্তু ছুটি মাত্র কটাই বা দিন। মাঝে অনুর ভাশুরের বড় অসুখ গিয়েছিল, তিনি সেরে ওঠবার পরে আর তাঁর কাছে যাওয়া হয়ে ওঠে নি। অনু জানে তার স্বামীর ঐ একটিমাত্র ভাইয়ের উপর টানের অন্ত নাই—অনেক দিন থেকে ললিত ভেবে আছে, পূজার কটা দিন দাদার কাছে গিয়ে থাকবে; অনু কি ক'রে বলে "ওগো অতদিন দাদার কাছে না-ই বা থাকলে, দু-দিন রাঁচি যাই চল।" ভাবে এক সময়ে বলবে কিন্তু বলা হয়ে ওঠেনি।

কানপুরে যেমন ধুলো তেমনি শুকনো কাঠফাটা দেশ। দু-বছর সমানে অনু ঐ দেশ দেখছে; আর হিন্দুস্থানী দাই চাকরদের সঙ্গে বকাবকি ক'রে ক'রে ত অনুর প্রাণ একেবারে অস্থির। সকালে ট্রেনের জানলা খুলে দিয়ে যখন সে দেখলে সামনে সবুজ শ্যাওলা-ভরা পুকুর, তার ঘাটে ডুরে শাড়ী পরা, মাথায় ঘোমটা দেওয়া ছোট বউটি বসে বাসন মাজছে, পুকুরের একটু ও-ধারে দু-তিনটি কুঁড়েঘর, তারই একটিতে একজন বর্ষীয়সী বিধবা উঠান ঝাঁট দিতে দিতে ঝাঁটা-হাতে থমকে দাঁড়িয়েছেন ট্রেন দেখতে এবং তার আশেপাশে পাঁচ-সাতটি শিশু—কেউ নগ্ন, কেউ অর্দ্ধনগ্ন দেহ, হাততালি দিয়ে চীৎকার করছে, "ও ভাই রেলগাড়ী যাচ্ছে—ঐ দেখ্—ঐ যাচ্ছে"—তখন অনুর চোখ-কান দু-ই যেন জুড়িয়ে গেল। অর্দ্ধসুপ্ত স্বামীকে ঠেলে জাগিয়ে দিয়ে বললে, "ওগো দেখ দেখ কেমন বৌটি বাসন মাজছে। ছোট ছোট ঐ ছেলেগুলি সব বাংলা বলছে—জান? যাঃ, ছাড়িয়ে এলাম। তোমার উঠতেই এক ঘণ্টা তা আর দেখবে কি? কেবল ঘুমোবে—যাও চাইনে তোমাকে দেখাতে কিছু। কিছু দেখো না, কিছু শুনো না—কেবল ঘুমোও শুয়ে শুয়ে—এদিকে ইষ্টিশন এসে যাক।" অনু স্বামীর উপর রাগ ক'রে নিজের ঘুমন্ত তিন বছরের মেয়েটিকে জাগিয়ে কোলে নিয়ে বললে, "ও খুকু, দেখবি কেমন তোর মত সব ছোট ছোট ছেলেমেয়ে? দেখবি এখন, থাম না, গাড়ী আসুক ইষ্টিশনে, দেখাব।"

খুকু দুই হাতে চোখ রগড়ে ডান হাতের দেড় ইঞ্চি তর্জ্জনীটি গাড়ীর জানলার দিকে বাড়িয়ে বললে "জানলা।"

অনু মেয়ে নিয়ে জানলার কাছে বসতে-না-বসতে একটা ষ্টেশনে এসে গাড়ী থামল। ললিত মুখ বাড়িয়ে ষ্টেশনের নাম দেখে লাফিয়ে উঠল, "এ কি, এ যে একেবারে বদ্যিবাটী এসে পড়ল। ও অনু, আর যে সময় নেই—এসে পড়ল ব'লে—কাপড় পর, কাপড় পর। বিছানা-টিছানা এখনও কিছু বাঁধা হয় নি—কি মুস্কিল।"

অনু উঠে তাড়াতাড়ি ক'রে সুটকেস খুলে খুকীর ফরসা জামা বের ক'রে মেয়েকে পরাতে বসল: নিজে মুখ ধোবে, চুল বাঁধবে, একটা ভাল কাপড়ও সঙ্গে নিয়েছে, প'রে নামবে ব'লে—সেটা পরার সময় চাই। গাড়ি না এসে পড়ে আগেই। আবার স্বামীর উপর রাগ হ'ল, "ঘুমোও না খুব ঘুমোও। ক'টা বাজল, কি ইষ্টিশন এল—কিছু খেয়াল নেই। তবু ত ভাগ্যিস আমি জাগিয়ে দিলুম—না হ'লে বেশ হ'ত, দাদা ইষ্টিশনে নিতে এসে দেখতেন গুণের ভাই তখনও পড়ে পড়ে ঘুমোচ্ছেন, সেই বেশ হ'ত, না জাগালেই হ'ত।"

যা হোক তাড়াহুড়ো ক'রে বিছানাপত্র বাঁধা, সাজ-গোজ করা সব শেষ হয়ে যাবার পরেও দেখা গেল তখনও প্রায় দশ মিনিট সময় আছে। অনু শুনে বললে, "বাপরে, বাপরে, যা তাড়া তোমার, আমি ভাবলাম বাড়ির দরজায় এসে গিছি বুঝি, এত মিছে হাঙ্গাম করতে পার তুমি। না হ'ল ভাল ক'রে চুলটা বাঁধা, না ভাল ক'রে মুখ ধোওয়া; মেয়েটাকে ত একটা মোজা অবধি পরাতে পারলাম না। তোমার একটা কথা যদি কখনও আর আমি বিশ্বাস করি।"

ললিতের এইরকম বকুনি খাওয়া অভ্যাস আছে; তাই সে নির্ব্বিকার মুখে বসে বসে জানলার বাইরে চোখ রেখে একমনে কি দেখতে লাগল সে-ই জানে—বাংলা দেশের সুজলা সুফলা শস্যশ্যামলা চেহারাখানিই হবে বোধ হয়।

খানিক পরে শব্দ শুনে মুখ ফিরিয়ে দেখে অনু একটা সুটকেস ধ'রে টানাটানি করছে, খুলতে পারছে না। ললিত উঠে সেটা টেনে অনুর সামনে দিয়ে বললে, "আবার সুটকেস কি হবে?" অনু সে কথার উত্তর দেওয়া আবশ্যক ব'লে মনে করলে না।

সুটকেস খুলে পাঁচ মিনিট সেটা হাতড়ে, জিনিষ-পত্র সব উলটে-পালটে আঃ উঃ ক'রে অনু রেগে বললে, "মোজাটা কি উড়ে গেল না কি? মেয়েটা খালি পায়ে জুতা পরেই থাক তাহ'লে?"

ললিত নিজের পকেট থেকে ছোট্ট এক জোড়া মোজা বার ক'রে অনুকে দেখিয়ে বললে, "এইটে না কি?"

অনু জ্বলে উঠল। "ভারী মজা দেখা হচ্ছে। মরছি এদিকে ছিষ্টি খুঁজে আমি, মোজাটা পকেটে পুরে দিব্যি চুপ ক'রে আছ। রইল এই সুটকেস, পারব না সব আবার তুলতে আমি। ইচ্ছে হয় গুছিয়ে তোল গে, না হয় থাক্ পড়ে।"

ললিত বললে, "বা রে, সব বার ক'রে ছড়ালে তুমি, আর তোলবার বেলায় বুঝি আমার ঘাড়ে? বেশ তো।"

অনু জোরে স্বামীর হাত থেকে মোজা-জোড়া টেনে নিয়ে ধপ্ ক'রে খুকীর পাশে বসে প'ড়ে তার ছোট্ট পায়ে মোজা-জোড়া পরাতে পরাতে বললে, "ছড়ালাম কি সাধ ক'রে? মোজা লুকোলে কেন, বললেই হ'ত আছে তোমার কাছে। তোমারই ত দোষ। যার দোষ সে তুলুক, আমার কিসের দায়?"

ললিত মিনিট-কয়েক চুপ ক'রে বসে রইল, অনুও মেয়েকে মোজা-পরান শেষ ক'রে তাকে কোলের কাছে টেনে নিয়ে জানলার পাশে গুছিয়ে বসল, ওঠবার কোনও লক্ষণ দেখাল না। শেষে ললিত আস্তে আস্তে উঠে ছড়ান জিনিষপত্র আবার সুটকেসে ভ'রে বন্ধ করলে।

হাবড়া এসে গেল—দাদা, নবু ও বারীণকে নিয়ে বাড়ির গাড়ী ক'রে নিতে এসেচেন। তা ছাড়া অনুর মামাতো ভাই, এক কাকা, তার এক ছেলে, অনুর বড় ভগ্নীপতি—কত লোক। অনেক দিনের পর তারা ক'দিনের জন্যে কলকাতায় এসেছে শুনে সকলেই আনন্দ ক'রে দেখতে এসেছেন।

বড়-জায়ের আটটি ছেলে-মেয়ে। বড়-জা অনুকে

মাঝে মাঝে বলতেন, "যে-গাছটিতে যত ফল, সে-গাছটি তত সুন্দর—দেখিস্ তো? এ-ও তাই। মেয়েমানুষের অনেকগুলি ছেলেমেয়ে না হ'লে কি মানায়?"

অনুদের বাড়ির দরজায় গাড়ী থামতেই একপাল ছোট-বড়-মাঝারি ছেলেমেয়ে কোলাহল ক'রে ছুটে এল, "ওরে কাকা এসেছে, কাকীমা এসেছে।" অনু প্রায় বছর-তিনেক আসেনি, এর মধ্যে বাড়িতে দুটি নূতন শিশুর আবির্ভাব হয়েছে। অনু যে-ছেলেমেয়েগুলিকে আগে দেখেছে, তাদের কাউকে আদর ক'রে, কারও সঙ্গে দুটো কথা কয়ে, কারও হাত ধরে, ভিতরে এসে বড়-জাকে প্রণাম করলে। কোলের ছ-মাসের মেয়েকে কোলে নিয়ে বললে, "কি ফরসা হয়েছে দিদি—তোমার রং এ-ই পাবে। আর ত কেউ তোমার ধার দিয়েও গেল না। এ মেয়ে মার মান রাখবে কিন্তু।"

মোটাসোটা মস্ত মেয়ে; কে বলবে ছ-মাসের মেয়ে, মনে হয় যেন এক বছরের। তবু জা বললেন, "এখন মেয়ের কি আছে? শুধু হাড় ক'খানা। আঁতুড়ে যখন হ'ল, ফরসা ধব-ধব করছে, মোটাসোটা এতখানি মেয়ে—তখন দেখতিস্ ত বলতিস্ হ্যাঁ মেয়ে বটে। এখন ত দাঁত উঠেছে, পেটের অসুখ—মেয়ে কালি হয়ে যাচ্ছে দিন দিন।...তা কই, তোর মেয়ে ত তোরই মত রোগা তৈরি করছিস দেখছি। ও মা পশ্চিমে থাকিস জল-হাওয়া ভাল, অমন দুধ ওদিককার, তা মেয়ে অমন কেন? হ্যাঁ রে ও-খুকী, মা বুঝি তোকে খেতে দেয় না? আয় ত দেখি কত বড়টি হয়েছিস। ওমা, ওকি, আমি যে জ্যাঠাইমা হই—ছিঃ, অমন করে না, জ্যাঠাইমার কাছে আসতে হয়।"

সারাদিন হৈ হৈ। এ আসে দেখা করতে, ও আসে নিমন্ত্রণ করতে। এদিকে বাড়ির ছেলেমেয়ের দল অনুর খুকীকে নিয়ে মহা গণ্ডগোল বাধিয়েছে; সকলেই তার সঙ্গে বেশী ক'রে ভাব করতে ব্যস্ত; ভাল জিনিষটি যার যা সম্পত্তি আছে খেলাঘরে, কে এনে আগে খুকীর হাতে দিতে পারে এই নিয়ে খুব কাড়াকাড়ি চলেছে। খুকী কখনও এত গোলমালের ভেতর থাকেনি—সে হকচকিয়ে গিয়ে বোকার মত তাকিয়ে রইল। জ্যাঠাইমা আদর ক'রে অন্য সব ছেলেমেয়েদের সঙ্গে তাকে নিয়ে ভাত খাওয়াতে বসে যেই ভাতের গ্রাস মুখে তুলে দিয়েছেন, অমনি খুকী সব বমি ক'রে দিলে। অনু তাড়াতাড়ি মেয়ে তুলে নিয়ে গেল, বললে, "ও বড় গরম, মুখে দিতে পারে না দিদি। মেয়ের যেন গলায় ফুটো নেই—একটু তাতেই বমি একটু তাতেই ওয়াক—জ্বালাতন।"

বড়-জা অপ্রস্তুত হয়ে বললে, "জানিনে বাপু, তিন বছরের মেয়ে হ'ল, এখন কোথায় থাবা থাবা ক'রে ডাল-ভাত খাবে তবে ত গায়ে মাংস লাগবে। অমন পাখীর আহার, তাই তো অমন চেহারা। নে নে, মণি হাঁ কর্, বড় ক'রে—হাতের ভাত আমার খবরদার যেন ফিরে না আসে। খুকীর দেখাদেখি তোদেরও সব মুখ ছোট হয়ে গেল না কি? দেখে আর বাঁচিনে।"

কানপুরে তাদের ছোট সংসারে দু-এক রকমের বেশী তরকারী একসঙ্গে কোনদিন রান্না হ'ত না। এখানে কম ক'রে সাত-আট রকমের তরকারী তিন রকম মাছ দিয়ে বেলা তিনটের সময় ভাত খেয়ে উঠে অনুরও যেন মনে হ'তে লাগল খুকীর মত অবস্থা হব-হব হয়েছে। খেয়ে উঠতেই বড়-জা বললেন, "হ্যাঁ রে, ঠাকুরপো তো এখন দিব্যি মোটা মাইনে পায়; তুই গয়না-গাঁটি কি কি গড়ালি দেখা না সব।...আমাদের কথা আর বলিস নে। ছেলে-মেয়েগুলোর মোটা জামা কাপড়ই কুলিয়ে উঠতে পারি নে, তা আবার গয়না। একটার জামা করি তো আর একটার কোট ছেঁড়ে, আবার তার কোট করাই তো অন্যটার কামিজ ছেঁড়ে। যেমন ধোপার কষ্ট, তেমনি ছেলেমেয়ে-গুলো কাপড়ও ছেঁড়ে। বাবা, পেরে উঠা যায় না আর। স্বর্ণটার তো বারো পুরল, আবার মেয়ের বিয়ের ঠেলা আসছে এর পর। ভাগ্যে নবুটা ছেলে, না হ'লে প্রথম মেয়ে হলেই হয়েছিল আর কি—এতদিনে বিয়ে চুকিয়ে দিতে হ'ত তাহলে...নে নে, দেখা কি গড়ালি।"

অনু বাক্স খুলে দেখালে একটি মস্ত বড় লকেট-দেওয়া সরু হার, আর এক জোড়া কঙ্কণ। দিল্লী থেকে কে স্যাকরা কানপুরে একবার এসেছিল, তার কাছে ঐ দুটি জিনিষ গড়ান ছিল, ললিত পছন্দ ক'রে কিনে দেয়। বড়-

জায়ের পছন্দ হ'ল না—"যেমন নিজে সরু কাটি, তেমনি সবই বাপু তোর সরু সরু পছন্দ। ও কি ফিন্‌ফিনে গয়না! ও কি টিকবে? আর গলায় পরলেও তো ও হার মিলিয়েই থাকবে। দশ-বার ভরি দিয়ে বেশ চ্যাটালো ক'রে পাথর-মুক্তো-বসান একটা নেকলেস্ করলি নে কেন? বেশ জম জম্ করত গলাটা।"

অনু ক্ষুণ্ণ হয়ে ভাবলে, দিদির যে কি পছন্দ তার ঠিক নেই।

রাত্রে খাওয়া-দাওয়ার পর বড়জায়ের অনেক রকম বন্দোবস্ত করতে হয়। মণি শেষরাত্রে উঠে বিস্কুট খায়, তার জন্যে দু-খানি ক'রে লিলি বিস্কুট তার বালিশের তলায় রাখতে হয়। কিন্তু কোনও দিন সন্ধ্যাবেলা খায় না, সে অন্ধকার হ'তে-না-হতেই রোজ ঘুমিয়ে পড়ে আর রাত বারটায় ঠিক জেগে ওঠে, তখন তাকে কিছু খেতে না দিলে আর রক্ষা থাকে না। কাজেই ছোট একটি রেকাবীতে দু'খানি লুচি, একটু তরকারী, আর হয় একটি রসগোল্লা নয় একটু গুড় প্রতিরাত্রে তার জন্যে শোবার ঘরের কোণে ঢাকা থাকে, সে বারটা রাত্রে উঠে নিজেই ঢাকাটি খুলে খায়। ঠাকুরই অবশ্য খাবারটা ঠিক ক'রে রেখে যায় কিন্তু তবু কিঙ্করর মাকে প্রতিদিন শোবার আগে সব দেখে শুতে হয় যে সকলের বন্দোবস্ত ঠিক আছে কি-না। তারপর খুকী তো রাত তিনটেয় উঠে ম্যালেন-বেরি ফুড খাবে, তার জন্যে জল গরম করবার স্পিরিট ষ্টোভ, ছোট একটি বাটি, দেশলাই, ফুডের বোতল ইত্যাদি সব মাথার কাছে গুছিয়ে শুতে হয়, না হ'লে সেই রাত্রে কোথায় দেশলাই, কোথায় কি নিজেই তো খুঁজে মরতে হবে। অনু এ সব কিছুই জানত না; রাত্রে খাবার পর বড়-জায়ের সঙ্গে ঘুরে ঘুরে যেটুকু পারলে সাহায্য করলে।

কাজকর্ম্ম শেষ ক'রে শুতে এগারটা বেজে গেল। রাত কত হবে অনু জানে না, হঠাৎ কি একটা শব্দে ললিত অনু দু-জনেরই ঘুম ভেঙে গেল। পাশেই দাদার ঘর, সেখান থেকে দাদার গলা এল "বড়বৌ, ও বড়বৌ, ওগো শুনছ?"

অনু ভাবলে হয়ত জেগে উঠে কেউ মাকে ডাকছে—দিদি ঘুমোচ্ছেন, তাই দাদা তাঁকে ডেকে দিচ্ছেন।

অনু ভাশুরকে দাদাই বলে—প্রথামত বড়ঠাকুর বলতে পারে না। ভাশুরকে সে দাদার মত, নয় বাপের মতই শ্রদ্ধা করে। ভাশুরকে দাদা বলা নিয়ে পাড়ার কেউ কিছু বললে সে প্রথম প্রথম রাগ করত, বলত, "বেশ করি দাদা বলি। ওঁর দাদা আমারও দাদা—কি হয় বললে?"

ললিত উঠে বসে বললে, "দাদা কেন অমন ক'রে কেবল কেবল ডাকছেন অনু! কি হ'ল বৌদির?" অজানা কি আশঙ্কায় অনুর বুক কেঁপে উঠল—বললে, "ওঠ না গো, দেখ না" ব'লে নিজেও স্বামীর সঙ্গে সঙ্গে খাট ছেড়ে নেমে দাঁড়াল। দু-জনেই একসঙ্গে দাদার ঘরের সামনে যেতেই দেখে, দাদা দরজা খুলে ছুটে বেরুচ্ছেন। ললিত বললে, "কি হয়েছে দাদা?" দাদা হাঁপাতে হাঁপাতে বললেন, "জানি নে ভাই, বুঝতে পারছি নে। সাড়া দিচ্ছে না, এত ডাকছি, সাড়া দিচ্ছে না। দেখবি আয়।"

অনু ললিত ছুটে ঘরে ঢুকল। অনু জোর ক'রে মশারির দড়ি ছিঁড়ে খাটখানা উন্মুক্ত ক'রে দিলে। প্রকাণ্ড বিছানা—তিনখানা চৌকী একসঙ্গে পাশাপাশি ক'রে লাগিয়ে বিছানা করা হয়েছে; তার মধ্যে লম্বালম্বি আড়াআড়ি পাশাপাশি কত রকম ভাবে আটটি ছেলেমেয়ে শুয়ে, তারই একপাশে তাদের মা। মুখের পাশ দিয়ে রক্তের মত কি একটা গড়িয়ে পড়ছে, চোখ আধখোলা, একটি হাত অসহায় ভাবে বালিশের উপর এলিয়ে পড়েছে।

অনু কোনদিন মৃত্যুকে সাম্‌না-সাম্‌নি দেখে নি। এই প্রায় অচেনা জায়গায় এই স্তিমিত আলোকে গভীর রাত্রে অকস্মাৎ নিজের এত কাছে এই ভীষণ মৃত্যুমূর্ত্তি সে সহ্য করতে পারলে না, 'মা গো' ব'লে প্রথমে সে দুই হাতে নিজের মুখ ঢাকলে, তারপর মাটিতে পড়ে গেল।

তারপরে যে গোলমালে গোলমালে কোথা দিয়ে কি হয়ে গেল, অনু আর পরে ভাল ক'রে কিছুই স্মরণ করতে পারে না। ডাক্তার এল, আত্মীয়স্বজন এল, পাড়ার লোকে বাড়ি ভরে গেল, খুকী উঠে পড়ে তারস্বরে চীৎকার করতে লাগল। তবু স্বর্ণ বাসন্তী রবি সকলেই সমস্বরে

কাঁদতে লাগল। খাট এল, ফুল এল, সিঁদুর এল—কে বন্দোবস্ত করলে. কি ক'রে কি হ'ল, অনু কিছুই জানে না। মৃতদেহ বহন ক'রে নিয়ে কারা-কারা চ'লে গেল—ছেলেপিলে-ভরা বাড়িটা যেন শেষরাত্রে থম থম করতে লাগল।

পাড়াপ্রতিবাসী বোঝালে, তোমার একটি ছিল, ন'টি হ'ল। তুমি ছাড়া এদের আর কেউ নেই, তুমিই এখন এদের মা।

একটির মা ছিল—একরাত্রে একেবারে নয়টি ছেলের মা। বারীণ কোন্ স্কুলে পড়ে, সে কি প'রে স্কুলে যায়, মণির কি খাওয়া অভ্যাস, খুকীকে ক'বার দুধ আর ক'বার ম্যালেনবেরি ফুড খাওয়াতে হয়, কিন্তু ক-দিন অন্তর স্নান করে—বড়জায়ের মুখে কাল দিনের বেলা একবার শুনেছিল বটে, কিন্তু অনু তো জানত না যে, বড়-জা তাকে শেষ হিসাব বুঝিয়ে দিয়ে যাচ্ছেন, তাই সে মন দিয়ে ও-সব কিছুই শোনে নি।

শ্মশান থেকে ললিতের দাদা দলবল নিয়ে তখনও ফেরেন নি। সকালবেলাবার আলো হ'তেই অনু চেয়ে দেখলে বারান্দায় শুয়ে কিরু ঘুমোচ্ছে। বিছানা বালিশ ছেঁড়া মশারিতে বড়জায়ের ঘর নিতান্তই এলোমেলো, তারই মাঝে ভিজা বিছানার উপর জায়ের ছোটখুকী ঘুম থেকে উঠে আপন মনে নিজের পায়ের বুড়ো আঙুলটা মুখের মধ্যে পোরবার চেষ্টায় ব্যস্ত আছে। বারীণ চৌকাঠের উপর বসে হাঁটুর মধ্যে মাথা রেখে তখনও ফোঁপাচ্ছে, স্বর্ণ ভাইটির পাশে শোকাহত মূর্ত্তিতে নীরবে দাঁড়িয়ে। অনু চারদিক চেয়ে দেখলে, এ সংসারের সে কিছুই জানে না। ছেলেমেয়েদের মুখ কার কোন্ রকম তাও একটু ভাল ক'রে চেয়ে দেখে তবে বুঝতে হয়। কনেবৌ হয়ে সে বছর-দুই এ সংসারে ঘর করেছিল, তারপর থেকে প্রায়ই বিদেশে-বিদেশে ঘোরে, সবই তার অজানা, সবই তার নূতন। খুকীকে ভিজা বিছানা থেকে কোলে তুলে নিয়ে সে দিশেহারা হয়ে ভাবলে, এ কি হ'ল।

যদিও সে-ই এদের মাতৃস্থানীয়া তবু সে বুঝলে স্বর্ণ এ-বাড়ির বড় মেয়ে, তার চেয়ে সে এ সংসারে জানে বেশী। খুকীকে কোলে নিয়ে স্বর্ণর কাছে দাঁড়িয়ে সে অত্যন্ত অসহায় ভাবে বললে, "স্বর্ণ এ কি হ'ল মা।" স্বর্ণ ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠল, "আমি তো জানিনে কাকীমা।"

২

বছর আড়াই পরে বৈশাখের ২রা তারিখে স্বর্ণর বিয়ের দিন ঠিক হয়েছে। এ কয় বৎসর ধ'রে অনু ভাশুরের সংসারে পাকা গিন্নীর মত চালিয়ে এসেছে। খুকীকে তিন বছরেরটি ক'রে তুলেছে, নবু কলেজে পড়ে, স্বর্ণর বিয়ের ঠিক। তাদের মা থাকলে যা করতেন অনু প্রাণপণে সে-সবই করেছে। ভাশুর আদর ক'রে বলেন, "মা আমার লক্ষ্মী। এমন ক'রে এদের যত্ন করতে আর কেউ পারত না।"

ললিত অনেক চেষ্টা ক'রে কলকাতায় বদলি নিয়ে আজ বছর-দেড়েক দাদার কাছেই আছে। বাড়ির বড়মেয়েটি সকলেরই বেশী আদরের, তার বিয়েতে সকলেরই, বিশেষ ক'রে তার কাকার, উৎসাহ খুবই বেশী। মাছ-কোটার তদারক থেকে বাড়ি বাড়ি নিমন্ত্রণ ক'রে বেড়ান অবধি অত্যন্ত আনাড়ি ভাবে উৎসাহের সঙ্গে ললিত ক'রে চলেছে। দাদাকে কেউ কিছু জিজ্ঞাসা করতে এলে তিনি বলছেন, "কি জানি তা তো জানিনে। আমায় আর কেন ভাই? আমি তো ও-সব কোনও খবরই রাখি নে—যা করছে ললিত, ঐ ওকেই তোমরা বলগে, বলে পাঁচজনে যা ভাল বোঝ তাই করগে। বাইরে ললিত আছে—ভেতরে বৌমা আছেন, আমি তো কিছুই পেরে উঠিনে ভাই।"

ভিতরে স্বর্ণকে ঘিরে মাসী পিসী খুড়ি জ্যেঠি দিদিদের দল। দরজীপাড়ার পিসীমা বললেন, "যত সব ছেলেমানুষের কাণ্ড। ব্যবস্থা-পত্তর যে-রকম দেখছি তা'তে দেখো রাত একটার আগে কথ্খনো বরযাত্তর খাওয়ান চুকবে না। স্বর্ণর মা হাজার হোক গিন্নিবান্নি ভারিক্কে মানুষ ছিল, ললিতের বৌ তো ছেলেমানুষ, ও জানে কি? তাই আমরা সব মাথার উপর রয়েছি, দু-দিন আগে যদি আমাদের নিয়ে আসে তো হয়। সাত-সাতটা মেয়ের বিয়ে একা হাতে দিয়েছি, ধরুক দেখি কেউ একটা খুঁৎ।"

পিসীমার মেয়ে বললে, "কেন মা, বৌদি কি কম খাটুনি খাটছে? স্বর্ণই বলছিল তিন রাত বৌদি নাকি মোটে শোয়নি, সারা রাত একা হাতেই তো সব গুছিয়েছে বাপু। স্বর্ণর ফুলশয্যাতে দেবার জামা-টামা সব নিজে হাতে সেলাই করেছে—দেখেছ কি চমৎকার হাতের কাজ?"

বামুন-পিসী এগিয়ে এসে বললেন, "খুব গুণের মেয়ে বাছা ঐ আমাদের ললিতের বৌ। আর মায়া-মমতা দয়াদাক্ষিণ্যি সকলের ওপর সমান। আহা কাল রাতে মেয়ের বাক্স গোছাতে গোছাতে কেঁদে ভাসিয়ে দিলে গা! আমায় বললে, 'পিসীমা, দিদি যখন হঠাৎ এক রাত্তিরে সব ভার আমার ওপর ছেড়ে দিয়ে চলে গেলেন তখন আর ভাবি নি যে এ সংসার আবার গুছিয়ে তুলতে পারব। আজ তাঁর স্বর্ণর বিয়ে, তিনি থাকলে কত আনন্দের দিনই আজ হ'ত।'" ব'লে বামুন-পিসী আঁচল তুলে নিজের চোখ মুছলেন। সকলেই চুপ ক'রে রইল—মায়ের কথায় স্বর্ণর চোখ দুটি জলে ভরে এল। সাঁকারিটোলার জ্যাঠাই মা বললেন, "আহা যার নামে মেয়ে কেঁদে খুন হ'ল গো। ও স্বর্ণ, কাঁদিস নে মা, আজকের দিনে চোখের জল ফেলতে নেই। তারই আশীর্ব্বাদে এমন বিয়ের যোগাযোগটি হয়েছে, না হ'লে ভাল পাত্তর আজকালকার দিনে কি সহজে মেলে? এখন ভালয়-ভালয় সব শুভ কাজগুলো চুকে গেলে আমরাও নিশ্চিন্দি হই—স্বর্গ থেকে দেখে সে-ও সুখী হোক্। আর মা'র এমন মায়া যে মলেও ঘোচে না রে, সন্তানের সুখ সর্ব্বদাই খোঁজে। আহা মায়ের মত জিনিষ কি পৃথিবীতে আর আছে? কথায় বলে মা, গর্ভধারিণী, জননী। একা মায়ের কতগুলো নামই ছিষ্টি হয়েছে দেখ না।"

এমন সময়ে ছুটে ললিত এসে ঘরে ঢুকেই বলল, "স্পিরিট আছে, স্পিরিট? কই, অনু কোথায়? স্বর্ণ, কাকীমা কোথায় রে? এক বোতল স্পিরিট যে আনান ছিল, গেল কোথায়?"

সাঁকারিটোলার জ্যাঠাইমার মাতৃ-মহিমা কীর্ত্তনে বাধা পড়াতে তিনি বোধ করি একটু বিরক্ত হয়েছিলেন; বললেন, "তুই বাছা যেন সর্ব্বদাই ঘোড়ায় চেপে আছিস। কি চাস একটু স্থির হয়ে বল না, দিচ্ছি এনে। কি হবে কি স্পিরিট?"

"একজন বামুন ঘিয়ের কড়া নামাতে সব ঘি-টা পায়ের উপর ফেলে বড্ড পুড়ে গেছে—" বলতে বলতে ললিত অন্য দরজা দিয়ে যেমন ছুটে এসেছিল তেমনি ছুটে বেরিয়ে গেল।

স্পিরিট পাওয়া গেল না, কিন্তু সোরগোল চলল অনেকক্ষণ ধরে।

সন্ধ্যাবেলা দেখা গেল বরের আসন সাজাবার ভার যার উপর দেওয়া হয়েছিল, সে আসে নি। ললিত বললে কালই ললিত তাকে নিজে গিয়ে ব'লে এসেছে, ফুল, রঙীন কাচের আলো, জরির ঢাকা ইত্যাদি নিয়ে বিকালের আগেই আসতে, কিন্তু আজ সকলের মনে পড়ল যে এ বাড়ির ঠিকানাটা কাল তাকে তাড়াতাড়িতে দিয়ে আসা হয় নি। সকালেই আবার যাবে ভেবেছিল কিন্তু গোলমালে ভুলে গেছে।

মোটর নিয়ে ললিত ছুটে গেল তাকে আনতে, কিন্তু সে আসবার আগেই বর এসে পড়ল। যা হোক একটু পরেই বরাসন সাজাবার লোক এসে পড়াতে বরকে কাঠের হাতল-দেওয়া একটা চেয়ারে বসিয়ে রেখে ফুল-লতাপাতা দিয়ে বরাসন সাজান চলতে লাগল।

বিয়ের লগ্ন ছিল প্রথম রাত্রেই, কিন্তু বরযাত্রী খাওয়ান চুকতে বারটা বেজে গেল। তারপরে বাড়ির লোকজনদের খাইয়ে বরকনের বাসরে বেশী রাত অবধি গোলমাল যেন না করা হয় সকলকে এই অনুরোধ ক'রে অনু যখন শুতে গেল তখন রাত আড়াইটা বাজে। সব ভাল ঘরগুলিই নিমন্ত্রিতদের জন্য ছেড়ে দেওয়া হয়েছে, অনুর নিজের ঘরে বাসরশয্যা পাতা। ও-পাশের একটি ছোট কুঠুরীতে তেতলার ঘরে মাটির বিছানায় দুই মেয়ে ঘুমোচ্ছিল, তাদের পাশে উপবাসক্লান্ত দেহে অনু শুয়ে পড়ল। ক'দিনের অবিশ্রান্ত খাটুনির পর আজ বিয়েটা চুকে যাবার নিশ্চিন্ততায় তার ক্লান্ত চোখে ঘুম আসতে দেরি হ'ল না।

রাত কত অনু ঠিক জানে না। ঘরের ওদিকে

যে পাশের সরু বারান্দায় বেরোবার দরজা বন্ধ ছিল সেটা হঠাৎ খুলে গেল। এক ঝলক ঠাণ্ডা হাওয়ার সঙ্গে একটা কি যেন মাথার তেলের গন্ধ ভেসে এল। কি গন্ধ এটা? অমুর মনে হ'ল এ গন্ধ যেন তার পরিচিত। অমু মনে করতে চেষ্টা করতে লাগল। হঠাৎ তার মনে পড়ে গেল, তার বড়-জা যে-রাত্রে মারা যান সেই ভোরে খুকীকে বিছানা থেকে তুলতে গিয়ে যখন অমু বড়জায়ের বিছানার পাশে দাঁড়িয়েছিল, তখন সে এই গন্ধটা পেয়েছিল। সদ্যমৃত্যুর বিভীষিকাপূর্ণ ঘরে হঠাৎ এই মৃদু মিষ্টি একটা গন্ধ তার যেন তখন কেমন খাপছাড়া মনে হয়েছিল, তাই আজও সেই গন্ধটা অমু ভোলে নি। কিন্তু এত যে স্পষ্ট মনে আছে তাও অমু যেন জানত না। তাকিয়ে দেখলে দরজা খুলে বড়দি ঘরে ঢুকেছেন—রাস্তা থেকে গ্যাসের আলো এসে তাঁর মুখের উপর পড়েছে। চুল-বাঁধা—সিঁথিতে সিঁদুর—ফরসা রঙে বাঁ গালের উপর কালো যে আঁচিলটি তাঁর ছিল এই অস্পষ্ট আলোয় সেটা যেন আরও কালো দেখাচ্ছে। দিদি বেশ সহজ গলায় জিজ্ঞাসা করলেন, "বরকনে কোন্ ঘরে রে?"

অমুর মনে পড়ল দিদি তো বেঁচে নেই। তার সমস্ত শরীর ভয়ে অসাড় হয়ে হাত-পা যেন ঝিমঝিম ক'রে এল। মুখ দিয়ে কথা ফুটছে না, কিন্তু উত্তর না দেবারও সাহস নেই। প্রাণপণ চেষ্টায় স্বর ফুটিয়ে অমু উত্তর দিলে, "দক্ষিণ দিকের বড় ঘরে।"

নিজের বিকৃত কণ্ঠস্বরে অমুর ঘুম ভেঙে গেল। ধড়মড়িয়ে উঠে ব'সে দেখলে বারান্দার দরজা খুলে গেছে, টবের বেল ফুলের মিষ্ট গন্ধে ঘর ভরা, নিজে এক গা ঘেমে উঠেছে। ভয়ে বুকের মধ্যে এমন জোরে ধড়াস ধড়াস শব্দ হচ্ছে যে, অমুর মনে হ'তে লাগল শব্দটা কানে শুনতে পাচ্ছে সে। গ্যাসের আলো সত্যই ঘরে এসে পড়েছিল, সেই আলোয় অমু ঘরের চারদিকটা একবার ভাল ক'রে দেখে নিলে। এইমাত্র ঘরে কে ছিল, অমুর ঘুম ভাঙতেই সে যেন চলে গেল এই রকম একটা অনুভূতি অমুর মনে তখনও স্পষ্ট।

নীচে একটা হৈ-চৈ গোলমাল শব্দ শুনে অমু নিজের ভয় সামলে নিয়ে কোনও রকমে উঠে বারান্দার দরজাটা বন্ধ ক'রে নীচে নেমে গেল। গিয়ে দেখে ক'নে ভয় পেয়ে চীৎকার ক'রে উঠেছে; বাসরে অন্ত যে মেয়েরা রাত জাগবার সঙ্কল্প ক'রে ঢুকে শেষটা শুয়ে ঘুমিয়ে পড়েছিল তারা সকলেই উঠে পড়ে এ ওকে জিজ্ঞাসা করছে, কি হয়েছে, ও একে জিজ্ঞাসা করছে, কি হয়েছে, কেউ কিছু বলতে পারছে না। অমু ঘরে ঢুকতেই স্বর্ণ লজ্জাচ্ছলে বাসরশয্যা ছেড়ে ঘোমটা ফেলে ছুটে এসে তাকে জড়িয়ে ধরলে। ভয়ে তার সর্ব্বশরীর কাঁপছে—অস্ফুট স্বরে বললে, "কাকীমা, মা এসেছিলেন।"

অমুর নিজের স্বপ্নের স্পষ্ট অনুভূতি তখনও মন থেকে যায় নি। সে জিজ্ঞাসা করলে, "কি ক'রে জানলি? স্বপন দেখলি বুঝি?"

স্বর্ণ বললে, "স্বপন তো দেখিনি কাকীমা; আমি তো ঘুমিয়ে পড়েছিলাম। মা এসে আমার মাথায় হাত দিয়ে আমাকে জাগিয়ে দিয়ে বললেন, "সুখী হও।"

স্বর্ণ কাঁদতে লাগল। সকলে এসে ঘরে জড়ো হ'ল—সকলেই শুনলে কথাটা, কত লোকে কত রকম বলতে লাগল। অমু নিজের স্বপ্নের কথা কাউকে বললে না। অভয় দিয়ে স্বর্ণকে বললে, "বেশ তো তাতে আর ভয় কি? মা এসে আশীর্ব্বাদ ক'রে গেছেন, এ তো ভাগ্যের কথা মা। কার এমন ভাগ্য হয়? কোনও ভয় নেই, মাকে আবার মেয়ের ভয় কিসের?"

তার মনে হ'তে লাগল তৃষিত মাতৃহৃদয় ছায়ামূর্ত্তি ধ'রে সত্যই কি এতদিন পরে মৃত্যুপার থেকে নববিবাহিতা কন্যার মুখখানি দেখবার লোভে ক্ষণিকের জন্ম পৃথিবীতে এসেছিল? হবেও বা!

মানব সত্য

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

৩

বর্ষার সময় খালটা থাকত জলে পূর্ণ। শুকনো সময়ে লোক চলত তার উপর দিয়ে। এ পারে ছিল একটা হাট, সেখানে বিচিত্র জনতা। দোতলার ঘর থেকে লোকালয়ের লীলা দেখতে ভাল লাগত। পদ্মায় আমার জীবনযাত্রা ছিল জনতা থেকে দূরে। নদীর চর—ধূ-ধূ বালি, স্থানে স্থানে জলকুণ্ড ঘিরে জলচর পাখী। সেখানে যে-সব ছোট গল্প লিখেচি তার মধ্যে আছে পদ্মাতীরের আভাস। সাজাদপুরে যখন আসতুম চোখে পড়ত গ্রাম্য জীবনের চিত্র, পল্লীর বিচিত্র কর্ম্মোদ্যম। তারই প্রকাশ 'পোষ্টমাষ্টার' 'সমাপ্তি' 'ছুটি' প্রভৃতি গল্পে। তাতে লোকালয়ের খণ্ড খণ্ড চলতি দৃশ্যগুলি কল্পনার দ্বারা ভরাট করা হয়েচে।

সেই সময়কার একদিনের কথা মনে আছে। ছোট শুকনো পুরান খালে জল এসেচে। পাঁকের মধ্যে ডিঙ্গিগুলো ছিল অর্দ্ধেক ডোবানো, জল আসতে তাদের ভাসিয়ে তোলা হ'ল। ছেলেগুলো নতুন জলধারার ডাক শুনে মেতে উঠেচে। তারা দিনের মধ্যে দশবার ক'রে ঝাঁপিয়ে পড়চে জলে।

দোতলার জানলায় দাঁড়িয়ে সেদিন দেখছিলুম, সামনের আকাশে নববর্ষার জলভারনত মেঘ, নীচে ছেলেদের মধ্যে দিয়ে প্রাণের তরঙ্গিত কল্লোল। আমার মন সহসা আপন খোলা দুয়ার দিয়ে বেরিয়ে গেল বাইরে সুদূরে। অত্যন্ত নিবিড়ভাবে আমার অন্তরে একটা অনুভূতি এল, সামনে দেখতে পেলুম নিত্যকালব্যাপী একটি সর্ব্বানুভূতির অনবচ্ছিন্ন ধারা, নানা প্রাণের বিচিত্র লীলাকে মিলিয়ে নিয়ে একটি অখণ্ড লীলা। নিজের জীবনে যা বোধ করচি, যা ভোগ করচি, চার দিকে ঘরে ঘরে জনে জনে মুহূর্ত্তে মুহূর্ত্তে যা-কিছু উপলব্ধি চলেচে, সমস্ত এক হয়েচে একটি বিরাট অভিজ্ঞতার মধ্যে। অভিনয় চলেচে নানা নটকে নিয়ে, সুখদুঃখের নানা খণ্ড-প্রকাশ চলচে তাদের প্রত্যেকের স্বতন্ত্র জীবযাত্রায়, কিন্তু সমস্তটার ভিতর দিয়ে একটা নাট্যরস প্রকাশ পাচ্চে এক পরম দ্রষ্টার মধ্যে যিনি সর্ব্বানুভূঃ। এত কাল নিজের জীবনে সুখদুঃখের যে-সব অনুভূতি একান্ত-ভাবে আমাকে বিচলিত করেচে, তাকে দেখতে পেলুম দ্রষ্টারূপে এক নিত্য সাক্ষীর পাশে দাঁড়িয়ে।

এমনি ক'রে আপনা থেকে বিবিক্ত হয়ে সমগ্রের মধ্যে খণ্ডকে স্থাপন করবামাত্র নিজের অস্তিত্বের ভার লাঘব হয়ে গেল। তখন জীবনলীলাকে রসরূপে দেখা গেল কোনো রসিকের সঙ্গে এক হয়ে। আমার সেদিনকার এই বোধটি নিজের কাছে গভীরভাবে আশ্চর্য্য হয়ে ঠেকল।

একটা মুক্তির আনন্দ পেলুম। স্নানের ঘরে যাবার পথে একবার জানলার কাছে দাঁড়িয়েছিলুম ক্ষণকাল অবসর-যাপনের কৌতুকে। সেই ক্ষণকাল এক মুহূর্ত্তে আমার সামনে বৃহৎ হয়ে উঠল। চোখ দিয়ে জল পড়চে তখন, ইচ্ছে করচে সম্পূর্ণ আত্মনিবেদন ক'রে ভূমিষ্ঠ হয়ে প্রণাম করি কাউকে। কে সেই আমার পরম অন্তরঙ্গ সঙ্গী যিনি আমার সমস্ত ক্ষণিককে গ্রহণ করচেন তাঁর নিত্যে। তখনি মনে হ'ল আমার একদিক থেকে বেরিয়ে এসে আর একদিকের পরিচয় পাওয়া গেল। এষাস্য পরম আনন্দঃ, আমার মধ্যে এ এবং সে.—এই এ যখন সেই সে-র দিকে এসে দাঁড়ায় তখন তার আনন্দ।

সেদিন হঠাৎ অত্যন্ত নিকটে জেনেছিলুম আপন সত্তার মধ্যে দুটি উপলব্ধির দিক আছে। এক, যাকে বলি আমি, আর তারি সঙ্গে জড়িয়ে মিশিয়ে যা-কিছু, যেমন আমার সংসার, আমার দেশ, আমার ধন জন মান, এই যা-কিছু নিয়ে মারামারি কাটাকাটি ভাবনা-চিন্তা।

কিন্তু পরমপুরুষ আছেন সেই সমস্তকে অধিকার ক'রে এবং অতিক্রম ক'রে,—নাটকের স্রষ্টা ও দ্রষ্টা যেমন আছে নাটকের সমস্তটাকে নিয়ে এবং তাকে পেরিয়ে। সত্তার এই দুই দিককে সব সময়ে মিলিয়ে অনুভব করতে পারিনে। একলা আপনাকে বিরাট থেকে বিচ্ছিন্ন ক'রে সুখে-দুঃখে আন্দোলিত হই। তার মাত্রা থাকে না, তার বৃহৎ সামঞ্জস্য দেখিনে। কোনো এক সময়ে সহসা দৃষ্টি ফেরে তার দিকে, মুক্তির স্বাদ পাই তখন। যখন অহং আপন ঐকান্তিকতা ভোলে তখন দেখে সত্যকে। আমার এই অনুভূতি কবিতাতে প্রকাশ পেয়েচে জীবনদেবতা শ্রেণীর কাব্যে।

"ওগো অন্তরতম
মিটেছে কি তব সকল তিয়াষ
আসি অন্তরে মম।"

আমি যে-পরিমাণে পূর্ণ অর্থাৎ বিশ্বভূমিন, সেই পরিমাণে আপন করেচি তাঁকে, ঐক্য হয়েচে তাঁর সঙ্গে। সেই কথা মনে ক'রে বলেছিলেম, তুমি কি খুসি হয়েচ আমার মধ্যে তোমার লীলার প্রকাশ দেখে?

বিশ্বদেবতা আছেন, তাঁর আসন লোকে লোকে, গ্রহচন্দ্রতারায়। জীবনদেবতা বিশেষভাবে জীবনের আসনে হৃদয়ে হৃদয়ে যাঁর পীঠস্থান, সকল অনুভূতি সকল অভিজ্ঞতার কেন্দ্রে। বাউল তাঁকেই বলেচে মনের মানুষ। এই মনের মানুষ, এই সর্ব্বমানুষের জীবন-দেবতার কথা বলবার চেষ্টা করেচি Religion of Man বক্তৃতাগুলিতে। সেগুলিকে দর্শনের কোঠায় ফেল্‌লে ভুল হবে। তাকে মতবাদের একটা আকার দিতে হয়েচে, কিন্তু বস্তুত সে কবিচিত্তের একটা অভিজ্ঞতা। এই আন্তরিক অভিজ্ঞতা অনেক কাল থেকে ভিতরে ভিতরে আমার মধ্যে প্রবাহিত—তাকে আমার ব্যক্তিগত চিত্তপ্রকৃতির একটা বিশেষত্ব বললে তাই আমাকে মেনে নিতে হবে।

যিনি সর্ব্বজগদ্‌গত ভূমা তাঁকে উপলব্ধি করবার সাধনায় এমন উপদেশ পাওয়া যায় যে, লোকালয় ত্যাগ করো, গুহাগহ্বরে যাও, নিজের সত্তাসীমাকে বিলুপ্ত ক'রে অসীমে অন্তর্হিত হও। এই সাধনা সম্বন্ধে কোনো কথা বলবার অধিকার আমার নেই। অন্তত আমার মন যে-সাধনাকে স্বীকার করে তার কথাটা হচ্চে এই যে, আপনাকে ত্যাগ না ক'রে আপনার মধ্যেই সেই মহান পুরুষকে উপলব্ধি করবার ক্ষেত্র আছে,—তিনি নিখিল মানবের আত্মা। তাঁকে সম্পূর্ণ উত্তীর্ণ হয়ে কোনো অমানব বা অতিমানব সত্যে উপনীত হওয়ার কথা যদি কেউ বলেন তবে সে-কথা বোঝবার শক্তি আমার নেই। কেন-না, আমার বুদ্ধি মানববুদ্ধি, আমার হৃদয় মানবহৃদয়, আমার কল্পনা মানবকল্পনা। তাকে যতই মার্জ্জনা করি, শোধন করি, তা মানবচিত্ত কখনোই ছাড়াতে পারে না। আমরা যাকে বিজ্ঞান বলি তা মানববুদ্ধিতে প্রমাণিত বিজ্ঞান, আমরা যাকে ব্রহ্মানন্দ বলি তাও মানবের চৈতন্যে প্রকাশিত আনন্দ। এই বুদ্ধিতে এই আনন্দে যাঁকে উপলব্ধি করি তিনি ভূমা কিন্তু মানবিক ভূমা। তার বাইরে অন্য কিছু থাকা-না-থাকা মানুষের পক্ষে সমান। মানুষকে বিলুপ্ত ক'রে তবেই যদি মানুষের মুক্তি, তবে মানুষ হলুম কেন?

এক সময় বসে বসে প্রাচীন মন্ত্রগুলিকে নিয়ে ঐ আত্মবিলয়ের ভাবেই ধ্যান করেছিলেম। পালাবার ইচ্ছে করেছি। শান্তি পাই নি তা নয়। বিক্ষোভের মধ্যে সহজেই নিষ্কৃতি পাওয়া যেত। এভাবে দুঃখের সময় সান্ত্বনা পেয়েচি। প্রলোভনের হাত থেকে এমনি ভাবে উদ্ধার পেয়েছি। আবার এমন একদিন এল যেদিন সমস্তকে স্বীকার করলেম, সবকে গ্রহণ করলেম। দেখলেম—মানব-নাট্যমঞ্চের মাঝখানে যে-লীলা তার অংশের অংশ আমি। সব জড়িয়ে দেখলেম সকলকে। এই যে দেখা একে ছোট বলব না। এও সত্য। জীবনদেবতার সঙ্গে জীবনকে পৃথক ক'রে দেখলেই দুঃখ, মিলিয়ে দেখলেই মুক্তি।

শান্তিনিকেতনে প্রদত্ত কবির বক্তৃতা।

১লা বৈশাখ

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

বৎসরের পর বৎসর চলেচে। মহাকালের স্বাক্ষর চিহ্নিত হচ্ছে তার পাতায় পাতায়। তাঁর লিখন বিচিত্র, অখণ্ড তার তাৎপর্য্য। আমরা তাকে অখণ্ড ভাবে গ্রহণ করতে পারি নে, খণ্ড খণ্ড ক'রে ফেলি। সমগ্রকে দেখতে পাই নে ব'লে ক্ষুব্ধ হই। এই যে দেখি কিছু দিন পূর্ব্বে প্রখর রৌদ্র আবার পরে এই মেঘমেদুর আকাশ, ব্যক্তিগতভাবে এর কোনোটা দুঃখ দেয় আর কোনোটা হয় আরামের কারণ। কিন্তু এই মেঘ রৌদ্র সুভিক্ষ দুর্ভিক্ষ সব নিয়ে সমগ্র বৎসরের মধ্যে ঋতু-পর্য্যায়ের একটা সমন্বয় চলেচে। সেই সমন্বয়ের ভিতর দিয়ে ধরণীর জীবলোকের অভিব্যক্তি, কোটি কোটি বৎসর ধরে। সেই মহাঅভিপ্রায়ের ধারা কোনো খণ্ড ঘটনার দ্বারা খণ্ডিত হয় না।

সংস্কৃতে একটি প্রবচন আছে,—

যদুপতেঃ ক্ব গতা মথুরাপুরী,
রঘুপতেঃ ক্ব গতোত্তর কোশলা।
ইতি বিচিন্ত্য কুরুস্বমনঃস্থিরং,
ন সদিদং জগদিত্যবধারয়॥

"কোথায় গেল যদুপতির মথুরাপুরী, কোথায় গেল রঘুপতির উত্তরকোশলা, এই কথাটাই চিন্তা ক'রে মনে স্থির জেনো এই জগৎ সৎ নয়।"

আমি বলি এর উল্টো কথাটাই মনে স্থির করতে হবে। মথুরাও থাকে না, কোশলও থাকে না, কিন্তু সেই উত্থান-পতনের মধ্যে দিয়ে মানবের ইতিহাস নিয়ে জগৎ চলতে থাকে। ঢেউ ওঠে, ঢেউ পড়ে, কিন্তু জগতের ধারা চলেচে, তার অন্ত নেই। নিজের ব্যক্তিগত সুখ-দুঃখের সংসারযাত্রাকে চিরন্তন ব'লে দেখব না, কিন্তু সেই সমস্ত অনিত্যকে গেঁথে চলেছেন যিনি তিনি নিত্য। আমার আত্মাতেও আছেন সেই নিত্য, আমার চিন্তায়, আমার কর্ম্মে, আমার সমগ্র জীবনে তাঁর জয় হোক, তাঁর সঙ্গে আমার সচেতন যোগ থাকুক, আজ বৎসরের প্রথম দিনে তাঁকে আমার প্রথম প্রণাম নিবেদন করি॥

জড়বস্তু একটানা চলেচে। নূতন হওয়ার তত্ত্ব নেই তার মধ্যে। বাহিরের নানা সংঘাতে ক্রমে পরিবর্ত্তন ও বিলাপের দিকে তার গতি। কিন্তু প্রাণ চলেচে চক্রপথে। সে ফিরে ফিরে মৃত্যুর মধ্যে দিয়ে নতুন হয়ে ওঠে। প্রাণের প্রক্রিয়ার সঙ্গে সঙ্গে বিনাশ কাজ করে। সেই বিনাশে প্রতিমুহূর্ত্তে জীবনে জীর্ণতার আবর্জ্জনা পুঞ্জীভূত হয়ে ওঠে। তখন ভুলে যাই জীবনের ধর্ম্ম তার নূতনত্ব, যা তার অপ্রাণের প্রাচীন আবরণ, তাকেই মনে করি চিরকালের। সেই বোঝার ভারে আনে ক্লান্তি, আনে নিশ্চেষ্টতা। তাই মাঝে মাঝে স্মরণ করতে হবে সেই প্রাণের নির্ম্মল নবীন রূপ, যে প্রাণ বারে বারে পুরাতনের মলিনতা বর্জ্জন করে নব জন্মে আপন কক্ষপথ প্রদক্ষিণের নূতন প্রারম্ভে প্রবৃত্ত হয়।

জড় বস্তুর কোনো লক্ষ্য নেই। কিন্তু জীবনযাত্রা মানবজীবনের একটা ব্রত,—নিজেকে সম্পূর্ণ করার ব্রত। বাহির থেকে যে সব শক্তি তাকে চালনা করে তার মধ্যে তার আপন প্রবৃত্তিকেও গণ্য করতে হবে। প্রবৃত্তির কাছে মানুষের চিত্ত অধীন, অভিভূত। জীবনকে ব্রত ব'লে যদি স্বীকার করি তবে আপনাকে স্বাধীন ব'লে জানতে হবে। সেই স্বাধীনতার শক্তি অন্তরে নিয়ে তবেই পূর্ণতার পথে চলা সম্ভব। নইলে জড়ের পথে পশুর পথে চালিত হ'তে হয়। তখন আর শান্তি নেই, তখন দুঃখ থেকে দুঃখ, দুর্ভিক্ষ থেকে দুর্ভিক্ষ। মনুষ্যত্বের ব্রত যদি আমরা গ্রহণ ক'রে থাকি, তবে দিনে দিনে তার উপরে পড়ে ধূলির ছাপ, ম্লান হয়ে আসে তার তেজ, আত্মবিস্মৃতির আশঙ্কা প্রবল হ'তে থাকে। তখন আবার আনতে হবে মনে জীবনের নবপ্রারম্ভতা।

সেই নবপ্রারম্ভতার বেগ যদি দুর্ব্বল হয় তাহলেই জয় হয় মৃত্যুর। চিত্ত যখন আপনাকে নূতন ক'রে উপলব্ধি করবার শক্তি হারায় তখনই জরা তাকে অধিকার করে।

জীবনের প্রত্যেক দিনই আরম্ভদিন,—প্রতিদিনই নূতন তার মধ্যে জন্ম নিচ্ছে, পুরাতন যাচ্ছে মরে। তবু মন একটা বিশেষ দিনের প্রয়োজন অনুভব করে যেদিন সে প্রথম দিনকে আপনার মধ্যে বন্ধনমুক্তভাবে উপলব্ধি করতে পারে। যদি স্পষ্ট ক'রে জানতে চাই আমি মানুষ তবে জ্ঞাত ও অজ্ঞাতসারে নিজের উপরে যে জড়ত্বের গ্লানি জমেচে তাকে মেজে ফেলে নবজীবনের মূর্তিটি দেখে নিতে হবে। যেন নূতন মানুষ আজ আমার মধ্যে নূতন আরম্ভে আনন্দিত, এই বোধকে জাগাতে হবে। যেন না বলি, আমি দুর্ব্বল অক্ষম। সে-ই বীর সে-ই নির্ভীক সে-ই পথিক যে চলেচে সব বাধা-বিপদ জয় ক'রে। তার স্বরূপ স্পষ্ট দেখতে পাইনে। অবসাদের আবরণ ভেদ ক'রে দুর্ব্বলতার আবরণ মুক্ত ক'রে দেখতে হবে তাকে। নির্ভীক নির্ম্মম মৃত্যুঞ্জয় যে-পথিক মৃত্যুর ভিতর দিয়ে সে-ই নিয়ে যাবে আমাদের অমৃতলোকে। আজ সব মলিনতা মার্জ্জনা ক'রে অন্তরকে নির্ম্মল ক'রে সকলকে ক্ষমা ক'রে যেন বলতে পারি, যদ্ ভদ্রং তন্ন আসুব। যাহা কল্যাণ তাই দাও। কঠিন সেই প্রার্থনা, দুঃখের তপস্যায় তার পরিণতি, মৃত্যুকে জয় ক'রে তার প্রকাশ।

তারা

শ্রীযোগানন্দ দাস

ও গো তারা, ও গো তারা!
গগনের বুকে রয়েছ মগন
কোন্ স্বপনেতে হারা?
ও গো তারা, ও গো তারা!

আমার মত কি তারো আঁখি দু'টি
তোমা পানে আছে চাহি?
একই স্মৃতিছায়া উঠিছে কি ফুটি
সে চিত্তে অবগাহি?

কিম্বা প্রবাসে একেলা শয়নে
যে কাটায় রাতি স্বপন বয়নে,
তুমি কি আমার সে-প্রিয়া-নয়নে
জমাট অশ্রু-ধারা?
ও গো তারা, ও গো তারা!

সেদিন ছিল না তারকার রাশি,
ছিনু শুধু প্রিয়া-আমি,
সে মধু-অধরে ছিল মৃদু হাসি—
কোথা দিয়ে যায় যামী।

দিনের কর্ম্মে পাসরি যখন
হারানো-নিশীথ-কথা,
তুমি কি আপনা আবরি' তখন
লুকাও মরম-ব্যথা?

তব জ্যোতিরেখা পশিতে কি পারে
তিলে তিলে যেথা ওপারে-এপারে
গাঁথিয়া তুলেছে অমা-আঁধিয়ারে
বিরাট্ অন্ধ কারা?
ও গো তারা, ও গো তারা!

কণায় কণায় ভুলে থাকা যত
কালের কঠিন হাতে
জমিয়া জমিয়া গড়িছে নিয়ত
নীল নভ ইস্পাতে।

নীরন্ধ্র সেই গগন গভীরে
বাহিরিতে মন পথ খুঁজে ফিরে,
সে নীল পাতের বুক চিরে চিরে
তুমি কি স্মৃতির ধারা?
ও গো তারা, ও গো তারা!

শৃঙ্খল

শ্রীসুধীরকুমার চৌধুরী

১৪

প্রভাতে ঐন্দ্রিলার ঘুম না ভাঙিতেই বীণা বিছানা ছাড়িয়া উঠিয়া পড়িল।

দুতলায় হেমবালা তখনও দ্বার খোলেন নাই, রুদ্ধদ্বারের বাহিরে স্তিমিত আলোকে দেয়াল ঘেঁসিয়া বসিয়া ক্ষ্যান্ত নিঃশব্দে অপেক্ষা করিতেছে। বাড়ীর অন্য ঝিচাকরদের সঙ্গে শেষ অবধি কিছুতেই আর তাহার বনিবনাও হইয়া উঠিল না, প্রায় সমস্ত জীবন একটা বৃহৎ পরিবারে যে মর্য্যাদা পাইয়া সে অভ্যস্ত এখানে কেহ তাহাকে তাহা দিবে না, সুতরাং পারতপক্ষে নীচেকার মহলে সে বড় একটা যায় না, সুযোগ পাইলেই হেমবালাকে আসিয়া আশ্রয় করে।

বীণা বলিল, "চুপ ক'রে ব'সে কেন আছ, পিসীমাকে দরকার?"

ক্ষ্যান্ত বলিল, "না দিদিমণি, দরকার আর কি? ঘুম ভাঙতেই ত ডাক পড়বে, আগে থেকে তৈরী হয়ে ব'সে আছি। আমরা রাজবাড়ীর ঝি-চাকর, কাজ পালিয়ে বেড়ানো, সাতডাকে সাড়া না দেওয়া, ও-সব ত আর আমাদের ধাতে নেই।"

বীণা বলিল, "তা কাজ করতে চাও, নীচে ত ঢের কাজ রয়েছে, স্বচ্ছন্দে করতে পার।"

ক্ষ্যান্ত বলিল, "কোথা আর পারি দিদিমণি, আমরা পাড়াগেঁয়ে মানুষ, আমাদের কাজ কি আর তোমাদের মনে ধরবে? কিছুতে হাত লাগাতে গেলে বাড়ীসুদ্ধ একসঙ্গে হাঁ হাঁ করে আসে, আবার ব'সে খাই ব'লে সেই সঙ্গে খোঁটাও উঠতে বসতে শুনতে হয়।"

বীণা বলিল, "খোঁটা আবার তোমাকে কে দেয়?"

ক্ষ্যান্ত বলিল, "কে আবার দেবে, দেয় আমার কপাল।"

বীণা বলিল, "খোঁটা যারা দেয় তাদের ত তুমি খাচ্ছ না, তাহলেই হ'ল।"

হৃষীকেশের মহলে পৌঁছিয়া বীণা দেখিল, তিনি স্নানের ঘরে ঢুকিয়াছেন। বেহারাকে ডাকিয়া তাঁহার ঘর ঝাড়িতে বলিয়া বাগান হইতে কয়েকগুচ্ছ ফুল সংগ্রহ করিয়া আনিল। লিখিবার টেবিল স্বহস্তে ঝাড়িয়া একটি রেকাবীতে কতকগুলিকে সযত্নে সাজাইয়া দিল। স্নানান্তে একসঙ্গে কন্যাকে এবং ফুলগুলিকে দেখিতে পাইয়া হৃষীকেশের চিন্তাভারাচ্ছন্ন মুখ প্রসন্নতার হাসিতে উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল। কহিলেন, "আজ খুব ভোরে উঠেছ মা?"

বীণা বলিল, "রোজই খুব যে দেরি ক'রে উঠি তা নয়, কিন্তু রাহু-মন্দিরার পাল্লায় কোনোরকমে একবার পড়লে ছাড়া পেয়ে বেরুতে সেদিন নটা বেজে যায়। ততক্ষণ চাকরবাকরগুলো তোমার কি হাল ক'রে রাখে জানতেও পাই না।"

রাহু-মন্দিরার নাম হইতেই চকিতের মত হৃষীকেশের মুখে আবার একটু স্নেহপ্রসন্নতার হাসি খেলিয়া গেল। কহিলেন, "আমার অসুবিধা কিছু হয় না। তাছাড়া হেমও ভোরেই রোজ আসে। অপর্ণা কেমন আছেন এখন?"

বীণা কহিল, "ভালো।"

পিতাপুত্রীতে ইহার পর অনেকক্ষণ আর কোনও কথা হইল না। হৃষীকেশ চশমা বাহির করিয়া বই লইয়া বসিলেন। হৃষীকেশের মুখে কোনও হাসি মুহূর্ত্তেকের বেশী স্থান পায় না, তবু তাঁহার শুদ্ধ বিষণ্ণতারও কেমন একটি শ্রী আছে, তাঁহার দিক্ হইতে চোখ ফিরাইয়া লওয়া কঠিন হয়। বীণা বসিয়া বসিয়া সম্পূর্ণ পরিতৃপ্ত চিত্তে একদৃষ্টে তাঁহাকে দেখিতে লাগিল। বেহারা নিঃশব্দে ঘরদোর গুছাইয়া চলিয়া গেলে ক্ষিপ্রহস্তে তাহার ত্রুটিগুলি সারিয়া লইল, তারপর পিতার খুব কাছে একটা চৌকি টানিয়া বসিয়া কহিল, "তোমাকে আজ একটু বিরক্ত করব, কিছু মনে করবে না ত বাবা?"

হৃষীকেশ চশমা খুলিয়া রাখিয়া কন্যার দিকে ঘুরিয়া বসিলেন, কহিলেন, "বল, কি বলবে ?"

বীণা বলিল, "আচ্ছা বাবা, দেশের জমিজমা থেকে আয় ত দিন দিন কমে যাচ্ছে, এখানেও তোমার কাজ-কর্ম্মের অবস্থা কিছু ভালো নয়, নিজে কিছুই আর তুমি দেখতে শুনতে পার না। রাস্তসর্দ্দার মানুষ হয়ে উঠতেও ঢের দেরী। তুমি নিজে কতদিন বলেছ, যদি ভালো লোক পাও নিজের হাতে শিখিয়ে পড়িয়ে নিতে রাজি আছ।······অজয়বাবুর মতো বিশ্বস্ত লোক খুব ত বেশী পাওয়া যাবে না, ওঁকে একটা chance দিয়ে দেখবে ?"

হৃষীকেশ কিছুক্ষণ স্তব্ধ হইয়া রহিলেন, তারপর কহিলেন, "Chance অন্যকে যতটা দেব তার চেয়ে ঢের বেশী নিজেকেই দেওয়া হবে, কাজের কথা নিয়ে আমাকে কিছু বলতে তুমি সঙ্কোচ কোরো না মা। কিন্তু অজয়বাবুকে আমি ত তেমন জানি না, যে ধরণের কাজের কথা তোমাদের আমি বলেছি সে কি ওঁর ভালো লাগবে ?"

বীণা বলিল, "ভালো লাগাটা বড় কথা নয়, অন্ততঃ সব অবস্থায় নয়,—মানুষকে খেতে-পরতে হবে ত আগে ?"

হৃষীকেশ কহিলেন, "সে ত খুব ঠিক কথা। কাজটা অসাধু না হয় এইটুকু দেখাই দেশের এখনকার অবস্থায় যথেষ্ট। তা বেশ, তুমি ব'লে দেখতে পার।" বলিয়া আবার চশমটা কানে বাধাইয়া বইয়ের উপর ঝুঁকিয়া বসিলেন।

পিতার মহল হইতে ত্রস্তপদে বাহির হইয়াই বীণা গাড়ী তলব করিল। কাহাকেও কিছু না বলিয়া একেবারে ভবানীপুরে সুলতাদের বাড়ী আসিয়া হাজির হইল। সুলতা নীচে চায়ের তদারক করিতেছেন, প্রিয়গোপাল তখনও নামেন নাই, কহিলেন, "কিরে বীণি, তুই এমন সময়ে অকস্মাৎ ?"

বীণা কহিল, "তোমার কর্ত্তা কোথায় ?"

সুলতা কহিলেন, "আমার কর্ত্তা আছেন যেখানে খুসি, সে-খবরে তোর কাজ কি ?"

"ঠাট্টা নয় সুলতাদি—"

"আমিই কি বলছি ঠাট্টা ? তারি একটা খোস-খবর এনেছিস মনে হচ্ছে, আমরাও না-হয় তার ভাগ পেলাম।"

"ভাগ তোমাকে দিচ্ছি, কিন্তু তুমি ওপরে চাটুয্যে সাহেবকে আগে খবর পাঠিয়ে দাও।"

"খবর আর পাঠাতে হবে না, নিজে থেকেই মাথার টনক নড়েছে, ঐ আসছেন বীরপুরুষ।"

"তা বীর আর কম কি, তোমাকে সাম্‌লে ঘর করছেন ত ?"

"হ্যাঁ, ঘর ত কতই করছেন, দিনের বেলায় হাইকোর্ট আর সারা রাত ব্রিজের আড্ডা।"

বীণা কহিল, "ব্রিজের আড্ডা এখনো চলছে ? নাঃ, তুমি কিছু কাজের নও সুলতাদি। তোমার হয়ে আমাকেই দেখছি সব ব্যবস্থা ক'রে দিতে হবে।"

"তা বেশ ত, তুইই দে-না সব ব্যবস্থা ক'রে। সেজন্যে তোর হাতে কিছুদিনের মতো সমর্পণ ক'রে দিতে হয় যদি, খুসি হয়ে দেব।"

"থাক্ এতটা খুসি তোমাকে আমি আর করব না, ব্যবস্থা এমনিতেই হবে।—"

কথা শেষ হইতে না হইতে প্রিয়গোপাল আসিয়া পড়িলেন, বীণাকে অভিবাদন করিয়া তাহার পাশে একটা চৌকি লইয়া বসিয়া কহিলেন, "আজ অদৃষ্ট সুপ্রসন্ন। আপনি খুব ভালো চা করতে পারেন, সে-পরিচয় বহুবার পেয়েছি। আসুন, পেয়ালাগুলো ভর্ত্তি করুন আগে, তারপর সব খবর শোনা যাবে।"

"তোমার লোভকে এত বেশী প্রশ্রয় দেওয়া হবে না," বলিয়া সুলতাই চা ঢালিয়া দিলেন। একটু মুখ-বিকৃতি-সহকারে এক চুমুক খাইয়া প্রিয়গোপাল বলিলেন, "তা হোক, আপনি কাছে থাক্‌লেই ঢের হবে। এবারে কি খবর বলুন।"

অজয়ের নিরুদ্দিষ্ট হওয়ার বৃত্তান্ত যতটা জানিত বীণা সমস্তই বিবৃত করিল।

সুলতা কহিলেন, "ও হরি, এইজন্যে তোকে আজ এত খুসি দেখাচ্ছিল ? তুই ত আচ্ছা মেয়ে।"

প্রিয়গোপাল কহিলেন, "খুসি কেন দেখাবে না;

বাঙালীর ছেলে, ঘরবাড়ী ছেড়ে পথে যে বেরিয়েছে সেইটেই ত আশার কথা।"

বীণা কহিল, "আশার কথা হত, পথে বেরনোটা একাধিক অর্থে যদি সত্যি না হত। বাপের ওপর রাগ ক'রে খরচ নেওয়া বন্ধ করেছেন, এদিকে পকেটে একবেলা খাবার মতো পয়সা আছে কিনা সন্দেহ; আমার ত মনে হয়, বাড়ী ছেড়ে চ'লে যাবার আসল কারণটা সুভদ্রবাবু যা ভেবেছেন তা মোটে নয়ই। কলহটা উপলক্ষ্য, সুভদ্রাবাবুর ওপর ভার হয়ে থাকতে চাননি, সেইটেই আসল কথা। ওঁর স্বভাব জানতে আমার ত বাকী নেই।"

সুলতা কহিলেন, "কিন্তু স্বভাব জেনেই বা তুই এখন করবি কি?"

বীণা কহিল, "সেইজন্তেই ত এসেছি তোমাদের কাছে। কাজের চেষ্টা করছিলেন, অবিশ্যি সুবিধে কিছু হয়নি। সেদিক্‌কার সমস্যাটা মিটলে এসব পাগলামি নিশ্চয় কতকটা সেরে যায়। বাবা অনেক দিন থেকে তাঁর কাজকর্ম্ম বুঝে নেবার জন্তে একজন বিশ্বাসী লোক খুঁজছিলেন। আমি এইমাত্র তাঁর কাছ থেকে আসছি, অজয়বাবুকে নিতে তিনি রাজি হয়েছেন।"

সুলতার দুই চোখ উজ্জ্বল হইয়া উঠিল, কহিলেন, "যাক্, এতক্ষণে ব্যাপারটা বোঝা গেল।"

প্রিয়গোপাল কহিলেন, "খুব ভালো সম্বাদ। আপনার বাবার কাজকর্ম্ম বলতে নিতান্ত চারটিখানি বোঝায় না ত, অজয়বাবুর জোর কপাল বলতে হবে। শুনে খুসি হওয়া গেল।"

বীণা কহিল, "আপনি খুসি হয়ে ত আমার সব হবে। খুসি যার হওয়া দরকার তার কাছে খবরটা পাঠাই কেমন ক'রে বলুন ত?"

প্রিয়গোপাল কহিলেন, "কিছু ভাবতে হবে না, বিংশ শতাব্দীর পৃথিবী এমন জায়গাই নয় যে বেশীদিন অজ্ঞাত-বাস চলবে। তার ওপর আবার যে পৃথিবীতে আপনি রয়েছেন। ধৈর্য্য ধ'রে থাকুন কিছুদিন, নিজে থেকেই খোঁজ পেয়ে যাবেন।"

সুলতা কহিলেন, "বীণা ধৈর্য্য ধ'রে থাকবেন, তাহলেই হয়েছে আর কি।"

বীণা কহিল, "তোমরা ওকে কেউ জানো না সুলতাদি, তাই ওরকম বলছ। আমি সত্যিই একদিনও দেরি করতে চাই না। ডাক্তার চ্যাটার্জ্জী একটু কষ্ট করলে হয়ত উপায় হয়।"

প্রিয়গোপাল বলিলেন, "কি করতে হবে বলুন, খুব খুসি হয়েই করব।"

বীণা বলিল, "পুলিশের সঙ্গে আপনাদের ত নিত্য কারবার। তারাই একমাত্র ওর খোঁজ নিয়ে দিতে পারে। তাদের ব'লে একটু চেষ্টা ক'রে দেখবেন?"

প্রিয়গোপাল স্তব্ধ হইয়া গেলেন।

সুলতা কহিলেন, "হ্যাঁ না কিছু একটা বলো।"

প্রিয়গোপাল আরও একটু ভাবিয়া কহিলেন, "পুলিশ চেষ্টা করলে ওর খোঁজ পায় তা ঠিক, চটপট খোঁজ পাবার উপায়ও ঐ একটাই কেবল আছে। কিন্তু ঐকাজটি আপনাকে আমি করতে দেব না। পুলিশে খবর দেওয়া চলবে না কিছুতেই।—অকারণে ছেলেটাকে সন্দেহের তলায় ফেলে ওর সমস্ত জীবনটাকেই হয়ত মাটি করা হবে। বাংলাদেশের উঠতি বয়সের ছেলে, পুলিশের সংস্পর্শে যত কম আসে ততই ভালো।"

কিন্তু এমনই অদৃষ্ট, ঠিক সেই মুহূর্তে লালবাজার হাজতের দরজায় দাঁড়াইয়া পুলিশের একজন দারোগা ডাকিতেছে, "অজয়কুমার রায়।...অজয়কুমার রায় কার নাম?"

কম্বলের বিছানা ছাড়িয়া অজয় ধীরে ধীরে অগ্রসর হইয়া আসিল, কহিল, "আমার নাম।"

দারোগা কহিল, "আসুন আমার সঙ্গে।"

অজয় মন্ত্রচালিতের মত তাহার অনুসরণ করিল।

সুভদ্রের বাড়ী ছাড়িয়া বাহির হইবার পর হইতে সুরু করিয়া ষোল-সতেরো ঘণ্টায় যে-অধ্যায়ের শেষ, বিকালেই তাহার অনেক কথা অজয়ের স্মৃতির পাতা হইতে মুছিয়া গিয়াছে। অন্ততঃ কোনও কথাকেই মনে রাখিবার মত করিয়া সে মনে রাখে নাই। যেন আর কাহারও জীবনের

ঘটনা, তাহাকে জোর করিয়া শোনাইয়া গিয়াছে। শুনিতে সে চাহে নাই।

হাওড়ায় রাত্রিবাস করিতে গিয়াছিল, এটা বেশ পরিষ্কার মনে আছে। অন্যত্র স্থানাভাব ঘটিলে ষ্টেশনে কিছুকালের মত আশ্রয় পাওয়া সম্ভব, এ শিক্ষা তাহার নন্দের নিকট হইতে পাওয়া। প্রথমে শিয়ালদহের কথাই মনে পড়িয়াছিল, কিন্তু কি ভাবিয়া সেদিকে সে গেল না। সম্ভবতঃ শিয়ালদহের সঙ্গে নন্দের নির্য্যাতনের স্মৃতি এক সঙ্গে হইয়া জড়াইয়া গিয়াছিল। হাওড়া ষ্টেশনের জনাকীর্ণ ধূলিময় এককোণে সুটকেস আর বিছানা নামাইয়া সে কুলি বিদায় করিল। কিন্তু কে কি মনে করিবে ভাবিয়া বিছানাটাকে ভাল করিয়া পাতিয়া গুছাইয়া বসিতে তাহার ভয় করিতেছে।

ভয়, ভয়, ভয়! অজয় ভীরু! হ্যাঁ, ভীরুই ত। মনে মনে নিজের সঙ্গে সুভদ্রের সে তুলনা করিতে আরম্ভ করিল। এবারে কলিকাতায় আসিবার পথে জাহাজে আততায়ীর হাতে সুভদ্রকে একাকী ফেলিয়া পলায়ন মনে পড়িল। আরও ছোটখাট কত ঘটনা।...ঠিক এমনি ধরণের একটা কবিতা রবিবাবু না ডি-এল রায় কার একটা বইয়ে পড়েছি না?...অজয় হঠাৎ বিমনের ধরণে মুখ টিপিয়া হাসিতেছে।...সুভদ্র সাহসী, অজয় ভীরু। কিন্তু এ কি ভয়? ইহার লজ্জা তাহাকে অভিভূত করে, কিন্তু কেন তাহার স্বভাবের কোনও হীনতার মধ্যে ইহার মূল সে খুঁজিয়া পায় না? পাঁচকড়ির জন্য এখনও তাহার বুকের মধ্যেটা কেমন করিয়া উঠিতেছে। যদি তাহার অর্থ থাকিত, এই অসহায় লোকটির সুচিকিৎসার জন্য তাহার যথাসর্ব্বস্ব বিলাইয়া দিতেও সে কুণ্ঠিত হইত না। নিজের জীবনের শ্রেষ্ঠ সুখকামনাকেও প্রয়োজন হইলে হয়ত ভুলিয়া যাইতে পারিত। কিন্তু শৈশব হইতে তাহার জীবনকে এমন অসীম মূল্যে মূল্যবান্ করিতে সে শিক্ষা পাইয়াছে, ইহাকে এমন বিচিত্র অর্থপূর্ণ করিয়া সে দেখিয়াছে, নানাদিকে ইহার সম্ভাবনাকে কল্পনায় এমন বিরাট, এমন লোভনীয় করিয়া সে সাজাইয়াছে যে সহসা নিজেকে বিপন্ন করিয়া সে-সমস্তকেই চিরকালের মত করিয়া হারাইতে তাহার মন উঠে না।

অথচ তাহার রক্তের মধ্যে ভারতবর্ষের নির্লিপ্ততার সাধনা।...তাহার বৈরাগ্য অপরিসীম। নিজের মধ্যেও নিজেকে অন্তরতম করিয়া সে অনুভব করে না!...

না, এই ভয়কে সে অতিক্রম করিবে। যাহা তাহাকে লজ্জা দেয় তাহা নিশ্চয় কোনও না-কোনওরূপে মনুষ্যত্বের পরিপন্থী। ভয়কে মানুষের সব-চেয়ে বড় পাপ বলিয়া চিরকাল সে বিশ্বাস করে। এ পাপের যথাযোগ্য প্রায়শ্চিত্ত সে করিবে। অবিলম্বে করিবে।

তবু নিজের সুটকেস এবং বিছানা আগলাইয়া দাঁড়াইয়া থাকিতে তাহার ভাল লাগিল না। হয়ত কেহ জানিতে চাহিবে, মশাই কদ্দূর যাবেন? তখন সে কি উত্তর দিবে? যদি বলে আগ্রা, কি দিল্লী, কি এলাহাবাদ, হয়ত প্রশ্ন হইবে, সেখানে কি করা হয়? যদি বলে, এমনি যাচ্ছি বেড়াতে, হয়ত শুনিতে হইবে, ভালই হল আপনাকে সঙ্গে পাওয়া গেল, বেশ যাওয়া যাবে গল্প করতে করতে। কিম্বা, আগ্রার ট্রেনের ত আর দেরী নেই মশায়, টিকিট করা হয়েছে আপনার? অবস্থাটা কল্পনা করিয়াই অজয় ঘামিয়া উঠিল। জিনিষগুলা যেন তাহার নয় এমনই ভাবে দূরে দূরে পায়চারি করিয়া বেড়াইতে লাগিল।

তাহার পর হঠাৎ এক সময় কোথা দিয়া যে কি ঘটিল, সত্যই তাহার ভাল করিয়া মনে নাই। অন্যদের সঙ্গে সেও পলাইতে পারিত, কিন্তু জীবনে সেই প্রথম কি এক গভীর উন্মাদনা তাহাকে পাইয়া বসিল, সে পলাইল না। ঠায় দাঁড়াইয়া মার খাইল এবং আরও কয়েকটি যুবকের সঙ্গে ধরা পড়িল।

অতঃপর বহুলোকের ভিড়ের মধ্য দিয়া পথ। মুহুর্মুহু জয়ধ্বনি। দুপাশের বাড়ীর বারান্দার চিকের আড়াল হইতে মাড়োয়ারী সুন্দরীদের কঙ্কন-সমাবৃত হস্তের লাজবৃষ্টি।...অজয় মাথা নত করিয়া চলিয়াছে। গর্ব্বে তাহার বুক ফুলিয়া উঠিতেছে না ত!

জোড়াসাঁকোর থানা। সেইখানে প্রথমে সে নন্দকে দেখিল। নন্দও হাওড়ায় গিয়াছিল, অন্যদের সঙ্গে ধরা পড়িয়াছে। পলাইতে চেষ্টা সে করিয়াছিল, অসুস্থ শরীরে ছুটিতে পারে নাই। অজয়ের পায়ের ধূলা লইয়া নন্দ

প্রণাম করিল।...ধীরে অজয়ের আত্মস্মৃতা ফিরিয়া আসিতেছে।...কিন্তু কি একটা তুচ্ছ কারণে পুলিশের একজন লোক অজয়কে কঠোর কটূক্তি করিয়া উঠিল, চকিতে অজয় নন্দের মুখের দিকে একবার তাকাইল,—না, তাহার পর জোড়াসাঁকোর কথা সত্যই অজয়ের মনে নাই।

তারপর রাত নটা সাড়ে-নটায় লালবাজার। এবারে কালো কয়েদী গাড়ীতে চড়িয়া তাহাদের যাত্রা। লালবাজার হাজতে গভীর রাত্রিতে মুড়ি খাইয়াছিল মনে আছে। হাজতে সেদিন বেশীর ভাগ হিন্দুস্থানী যুবকের ভিড়, তাহাদের প্রায় সকলেরই মাথায় গান্ধীটুপি। চীৎকার করিয়া তাহারা ঘর ফাটাইতেছে। যথারীতি সভাপতি নির্ব্বাচন করিয়া একপালা কংগ্রেসের বৈঠক হইল। দরজার তারের জালে মুড়ি গুঁজিয়া গুঁজিয়া কে একজন নাগরী হরপে গান্ধীকি জয় লিখিয়া দিল। অতঃপর বহুকণ্ঠের মিলিত জয়ধ্বনি, "মহাত্মা গান্ধীকি জয়, মহাত্মা গান্ধীকি জয়—" অজয় এই জয়ধ্বনির সঙ্গে প্রাণপণে নিজের মনের কণ্ঠ মিলাইতেছে, কিন্তু মুখ খুলিতে তাহার ভারি লজ্জা। দুই জানুর মাঝখানে মাথা গুঁজিয়া স্তব্ধ নিঃস্পন্দ হইয়া সে বসিয়াছে। তাহাকে লইয়া ক্রমে আশেপাশে নানাপ্রকার মন্তব্যের গুঞ্জন। কে একজন তাহার সঙ্গীকে বুঝাইতেছে, লোকটা বাঙালী, গান্ধীর নাম মুখে আনিবে না, দেশবন্ধুর জয় বলিলে এখনই গলা ছাড়িয়া চেঁচাইয়া উঠিবে।

দুতলার হাজতঘর হইতে নামিয়া দারোগার পশ্চাৎ পশ্চাৎ অজয় একতলার একটা ঘরে আসিয়া ঢুকিল। ছোট একটি টেবিল সম্মুখে করিয়া বসিয়া বিশালকায় একজন সাহেব কর্ম্মচারী। দুইজন সার্জ্জেণ্ট ত্রস্ত-পদে এধার-ওধার টহলাইয়া বেড়াইতেছে। দৈত্য-পুরীতে প্রহ্লাদের মত, সজের বাঙালী দারোগাটিকে অজয়ের মনে হইল যেন তাহার কতকালের বন্ধু, পরমাত্মীয়। লোকটিকে সহসা সে ভালবাসিল। অজয়কে যেমনভাবে যাহা সে করিতে বলিল, পরম নির্ভরের সঙ্গে নির্ব্বিচারে সে তাহা করিয়া গেল। কি একটা কাগজে সহি দিল, এইটুকু তাহার মনে আছে। তারপর মুক্তি!

দারোগার নিকট হইতে বিদায় লইয়া বাহিরে আসিয়া ইহার পর কি তাহার করা কর্ত্তব্য ভাবিতেছে, অকস্মাৎ পাশ হইতে কে মৃদুকণ্ঠে ডাকিল, "অজয়দা—।" দেখিল, নন্দও আসিয়া জুটিয়াছে।

নন্দ কহিল, "কোথায় যাবেন এখন, বাড়ী?"

অজয় কহিল, "না, সে-বাড়ী ছেড়ে দিয়ে এসেছি।"

নন্দ কহিল, "সে কি, কেন?"

অজয় সত্য বলিতেছে মনে করিয়াই বলিল, "সেখানে খরচ বড্ড বেশী।"

অত্যন্ত অবাক্ হইয়া নন্দ কিছুক্ষণ একদৃষ্টে তাহার মুখের দিকে চাহিয়া রহিল। অজয়কে তাহার অন্তরের যে স্বর্গলোকে সে স্থাপন করিয়া রাখিয়াছিল, তাহার সঙ্গে কোনও পার্থিবতার কিছুমাত্র সংস্পর্শ ছিল না। অজয়কেও যে টাকাকড়ির ভাবনা ভাবিতে হয় এই আকস্মিক উদ্ভাবনা তাহাকে অভিভূত করিয়া দিল।

হঠাৎ কি ভাবিয়া তাহার বিষাদ-করুণ চোখ দুইটি উজ্জ্বল হইয়া উঠিল। বলিল, "কোথায় যাবেন কিছু ঠিক করেননি?"

অজয় বলিল, "বিছানাটা আর একটা সুটকেস হাওড়া ষ্টেশনে প'ড়ে আছে। সম্প্রতি সেগুলির পুনরুদ্ধার সম্ভব কিনা দেখতে যাব। ফিরে এসে বাড়ীর খোঁজ করব।"

নন্দ কহিল, "সেগুলো কি আর আছে এতক্ষণ? চলুন তাড়াতাড়ি পা চালিয়ে।"

দেখা গেল, বিছানা সুটকেস অজয় যেখানে রাখিয়া গিয়াছিল সেখানে সেগুলি নাই বটে, কিন্তু দূরে আর-একটা কোণে ধূলিধূসরিত অবস্থায় সেগুলি পড়িয়া আছে। টানাটানি করিয়া বিছানাটাকে নন্দ কাঁধে তুলিয়া লইল, অজয় মুটে ডাকিতে চাহিল, কিছুতেই শুনিল না। সুটকেসটাও হাতে লইতে চাহিয়াছিল, অজয় দেয় নাই। দুইজনে বাহির হইয়া আসিয়া একটা বাসে উঠিল। অজয় কহিল, "কোথায় যাচ্ছি ঠিক না ক'রে আগে-ভাগেই ত বাসে চ'ড়ে বসা গেল।"

নন্দ বলিল, "আপনার যদি কিছু আপত্তি না থাকে, জিনিষপত্র আমার ওখানে রেখে চলুন। শেয়ালদার খুব কাছেই একটা গলিতে আমি থাকি।"

তাহার এই অপ্রত্যাশিত প্রস্তাবে অজয় অত্যন্ত আরাম অনুভব করিল। এতক্ষণ মন্ত্রচালিতের মত চলিতেছিল, সে চলা এখনই অন্ততঃ ব্যাহত হইবে না। তাহার হইয়া সমস্ত ভাবনা আর-কেহ ভাবিয়া দিতেছে এই অবস্থাটাই আসলে তাহার ভাল লাগে। বলিল, "তাই চল যাচ্ছি। এগুলোকে কাঁধে ক'রে আর কাহাতক ঘুরে বেড়ানো যাবে?"

অত্যন্ত অপরিসর একটা গলি, বৌবাজার হইতে বাহির হইয়া এধার ওধার শীর্ণতর দুইএকটা শাখা-প্রশাখা বিস্তার করিয়া বহু-পুরাতন ও জীর্ণ একটা বড় বাড়ীর ফটকের কাছে আসিয়া শেষ হইয়াছে। দেখিলে হঠাৎ মনে হয় না যে সেখানে মানুষ বাস করে। আশে-পাশের সমস্ত বাড়ীগুলি যেন বিরাগবশতঃই ইহার দিকে পিছন ফিরিয়া দাঁড়াইয়াছে। দেয়ালে বহু বৎসর আগে সখ করিয়া কেহ লাল রঙ ধরাইয়াছিল, এখন সে রঙ প্রায় মিশি-দেওয়া দাঁতের মত কাল হইয়া আসিয়াছে। দুতলা বাড়ী, লোহার গরাদে দেওয়া খিলান-করা সরু সরু দরজা-জানালা। চার কোণে চারিটি ছোট গম্বুজ, সব-ক'টাকেই আগাছার ঝাড় বেড়িয়া ধরিয়াছে। সম্মুখের দিকে খানিকটা ফাঁকা জায়গা দেয়াল দিয়া ঘেরা, সেখানেও মনের আনন্দে আগাছা জন্মাইয়াছে। আগাছার বন অতিক্রম করিয়াই একতলার লম্বা সরু বারান্দা। সারি সারি সব-ক'টা দরজাতেই তালা দেওয়া, কেবল একটি দরজা খোলা। তালা-বন্ধ করিয়া রাখিবার মত ধনসম্পদ্ নন্দের কিছু ত নাই, তাহার ঘরের দরজা বেশীর ভাগ সময় তাই খোলাই পড়িয়া থাকে।

ছোট ঘরটির সেই একটি দরজা ছাড়া আর সব-ক'টা দরজা জানালাই মোটা লোহার গরাদে দিয়া বন্ধ করা, হঠাৎ ঢুকিয়াই মনে হয় কয়েদখানায় ঢুকিলাম। এক পাশে ছোট একটি তক্তপোষের উপর ময়লা একটা বিছানা পাতা, শিয়রের দিকে একটা মস্ত কেরাসিন কাঠের বাক্সকে কাৎ করিয়া ফেলিয়া নন্দ টেবিল তৈয়ারী করিয়াছে। টেবিলের একপাশে মাটির সরায় মাটির পিলসুজে রেড়ীর তেলের প্রদীপ। আর-একপাশে খান-পাঁচ-সাত কলেজপাঠ্য কেতাব। বিছানার উল্টা দিকে চুণ-বালির ছোপ লাগান একটি ছোট চৌকির উপর জলের কুঁজা, একটা উপুড়-করা গেলাসে তাহার মুখ ঢাকা দেওয়া রহিয়াছে।

অজয়ের জিনিষপত্র গুছাইয়া রাখিয়া নন্দ স্মিতমুখে তাহার কাছে আসিয়া দাঁড়াইল, কহিল, "স্নান ক'রে বেরুবেন?"

অজয় কহিল, "হ্যাঁ, স্নান সেরেও বেরুতে পারি।" লালবাজারে হাঁপাইয়া উঠিয়াছিল, এখন ভাবিতে লাগিল, সেইখানে থাকিয়া যাইতে পারিলেই ভাল ছিল, কোনও গোল থাকিত না। ইহার পর কি সে করিবে, কোথায় যাইবে, নিঃসম্বল মানুষকে কে কোথায় আশ্রয় দিবে? ভাবিতেই তাহার ক্লান্তি বোধ হইতেছে।

নন্দ তাহার স্নানের জোগাড়ে মহা ব্যস্ত হইয়া উঠিতেই তাহাকে থামাইয়া দিয়া কহিল, "সেজন্যে এত ব্যস্ত হবার এখনই কিছু দরকার নেই, ঢের সময় আছে। বোসো, তোমার সব খবর আগে শুনি।"

ঘরে বসিবার আসবাব কিছু ছিল না, অজয় বিছানায় বসিয়াছিল, নন্দ তাহার পাশে বসিতে অত্যন্ত ইতস্ততঃ করিতে লাগিল। অগত্যা তাহাকে বিছানায় বসাইয়া অজয় কেরাসিন কাঠের বাক্সটার উপর চড়িয়া বসিল। কহিল, "কেমন আছ?"

"মন্দ আর কি?"

"কাশিটা আর হয় না ত?"

"বিশেষ না।"

অজয় সত্যই খুসি হইল, কহিল, "খুব ভালো খবর। আমি কতদিন তোমার কথা ভেবেছি, কিন্তু তোমার ঠিকানা চেষ্টা করলেও যে জানতে পারা যেত না।"

"এক জায়গায় খোঁজ করলে খুব সহজে জানতে পারতেন।"

"কোথায়?"

"পুলিশে।"

"তারা এখনো তোমায় জ্বালায়?"

"আলোনো আর কি ?"

"সে যাক—এখানো পড়ছ ?"

"আর চোদ্দদিন পর পরীক্ষা।"

"পড়াশোনা কেমন করেছ ?"

"ভালোই ত করেছি মোটের ওপর। অসুখের ভয়ে শী মেহনৎ করতে ভয় করে, নয়ত আরো ভালো ত।"

"চলছে কি ক'রে ?"

"টুইশানিটা ত আছে।"

"তাইতেই চলে ? দশটা ত মোটে টাকা।"

"বাড়ী ভাড়া লাগে না, কলেজের মাইনে দিতে হয় না, ওয়া-দাওয়া করতে যা লাগে আর বই খাতা পেন্সিলের রচ।"

"তোমার ঐ শরীরে একটু ভালো খাওয়া-দাওয়া ওয়া দরকার।"

নন্দ মৃদু হাসিল। পেট ভরিয়া আহার করিতে রিবার উপর কাহারও যে আবার কোনও দাবী কিতে পারে ইহা যেন নিতান্তই অবান্তর প্রসঙ্গ।

অজয় বলিল, "বাড়ীভাড়া লাগে না বলছ, সে কিরকম 'রে হয় ?"

নন্দ বলিল, "বাড়ীটা প'ড়েই ছিল, পুরনো বলেও বটে ার ভূতের বাড়ী ব'লেও বটে, কেউ এটা ভাড়া নিতে য় না। বাড়ীওয়ালারা মস্ত লোক, পরোয়া করে না, টাকে তাদের গুদাম ক'রে রেখে দিয়েছে। আমি 'লে কয়ে এই ঘরটা নিয়েছি।"

স্নান সমাধা হইতেই নন্দ বলিয়া বসিল, "খেতে যাবেন নু।" অজয়কে হঠাৎ এই অবস্থায় এতটা কাছে পাইয়া যে তাহার সাহস বাড়িতেছিল। অন্য সময় এই কথাটুকু লিতে অনেক কাঁচুমাচু করিত।

অজয় কি বলিবে ভাবিয়া পাইল না। তাহাকে রব দেখিয়া নন্দের সাহস একেবারেই উবিয়া গেল। লিল, "আপনার ভালো না লাগে ত দরকার নেই ... মি পাশেই একটা হোটেলে খাই। বেশ ভালো টেল, তাই ভেবেছিলাম হয়ত আপনার অসুবিধা ও হতে পারে।"

অজয় বলিল, "নন্দ, কাছে এসো।...হোটেলে কত ক'রে দিতে হয় ?"

নন্দ বলিল, "তিনরকম আছে, দু আনা, তিন আনা আর পাঁচ আনা।"

"দু আনাতে কি-কি দেয় ?"

"ভাত, ডাল আর মাছের কাঁটার চচ্চড়ি। ভাত-ডাল খুব অনেকখানি ক'রে দেয়।"

তাহার কাঁধে হাত রাখিয়া অজয় বলিল, "তুমি দু আনাতেই খাও ?"

"হ্যাঁ।"

"তাও অধিকাংশ দিন একবেলা মাত্র ?"

নন্দ মাথা নীচু করিয়া রহিল।

অজয় আবারও কহিল, "একবেলাও রোজ খেতে পাও না ? বালিগঞ্জে ছেলে পড়াতে যেতে হয়, এতটা পথ অসুস্থ শরীরে রোজ হাঁটা সম্ভব হয় না, খাবারের পয়সা বাস্ ভাড়া দিতে খরচ হয়ে যায়, এই ত ?"

নন্দের হঠাৎ আজ কি হইল, মাথাটাকে আরও নীচু করিতে করিতে কোঁচার খুঁটে মুখ ঢাকিল।

অজয় বলিল, "না নন্দ, ওইটি চলবে না। কাঁদতে সুরু কর যদি তাহলে এখনই আবার মুটে ডেকে বিছানা-পত্র নিয়ে চ'লে যাব।"

যেমন অকস্মাৎ কাঁদিতে আরম্ভ করিয়াছিল, তেমনই অকস্মাৎ নন্দ চুপ করিয়া গেল। চোখ মুছিয়া যখন তাকাইল, অজয় দেখিল, তাহার মুখের স্বাভাবিক বিষণ্ণতারও অনেকখানিকে সেইসঙ্গে সে মুছিয়া ফেলিয়াছে।

তাহাকে জোর করিয়া পাশে বসাইয়া অজয় বলিল, "শোনো নন্দ। আমার অবস্থাটা তোমার চেয়ে কিছু বিশেষ ভালো নয়, অন্ততঃ এমন নয় যে আমার দ্বারা তোমার কোনও সাহায্য হতে পারে। কিন্তু তোমার একটি সাহায্য আমি নেব। আমি তোমার সঙ্গে এই খানেই থাকব যদি তাতে তোমার কিছু আপত্তি না থাকে।"

নন্দ প্রায় চীৎকার করিয়া বলিয়া উঠিল, "আমার আপত্তি থাকবে ? কি বলছেন আপনি, বা রে !"

অজয় বলিল, "কিন্তু তার আগে আমাদের দুজনকেই প্রতিজ্ঞা করতে হবে, নিজে থেকে আমরা পরস্পরকে সাহায্য করবার কোনও চেষ্টাই কখনো করব না। চেষ্টা করলেও পারব না, সেটাও একটা কারণ বটে, কিন্তু একমাত্র কারণ সেটা নয়। তুমি একবেলা খাচ্ছ কি দুবেলা খাচ্ছ কিম্বা একেবারেই খাচ্ছ না, আমি আর তা জানতে চাইব না। তুমিও চাইবে না।"

নন্দ কতকটা বুঝিতে পারিল, কতকটা পারিল না, কহিল, "যদি একজন কারও অসুখবিসুখ করে?"

অজয় কহিল, "তাহলে তাকে দেখা না দেখা সম্পূর্ণ অপরের ইচ্ছাসাপেক্ষ। কারও ওপর কোনো দায় থাকবে না। রাজি?"

নন্দ মাথা নাড়িয়া জানাইল রাজি। কিন্তু তাহার মুখটি আবার অন্ধকারে ছাইয়া গেল।

অজয় বলিল, "আর আমি যে এখানে রয়েছি সে-খবর কাউকে তুমি দেবে না, তার আভাস মাত্র বাইরে কোথাও তোমার কোনো কথায় প্রকাশ পাবে না।"

পকেটে হাত দিয়া দেখিল, তিনটাকা এগারো আনা রহিয়াছে। কহিল, "তুমি খেতে যাও, আমি সুবিধামত পরে যাব।"

বিকালে কলেজের কাপড় না ছাড়িয়াই ঐন্দ্রিলা বীণাকে আসিয়া বলিল, "দিদি, চল একবার সুলতাদির কাছ থেকে ঘুরে আসি। নিজের ইচ্ছেয় একদিনও যাই না ব'লে উঠতে বসতে তিনি আমায় কথা শোনান্, আজ তোমাকেই আমি ধ'রে নিয়ে যাচ্ছি।"

বীণা কহিল, "মোটে ত পাঁচটা, এত আগে গিয়ে কি করব? সাতটার আগে কেউ আসবে না।"

ঐন্দ্রিলা কহিল, "কারুর আসা ত চাই না, সুলতাদি থাকলেই হ'ল।"

সমস্তটা দিন কেন তাহার এত ছট্‌ফট্ করিয়া কাটিয়াছে সে জানে না। কোনও উপায়ে মনের এই অস্থিরতা সে ঝাড়িয়া ফেলিতে চায়। কি জানি কেন তাহার মনে হইতেছে, সুলতার কাছে কিছুক্ষণ কাটাইয়া আসিতে পারিলে অনেকখানি শান্তি ফিরিয়া পাইবে। কলেজে বসিয়া বারবার সুলতাকে সে আজ ভাবিয়াছে।

সাজগোজ করিয়া বাহির হইতে ছয়টা বাজিয়া গেল। কিন্তু সুলতাদের বাড়ী পৌঁছিয়া দেখিল তখন অবধি ক্লাবের মেম্বাররা কেহ আসে নাই। সুলতা হলের এককোণে একটা সেলাই লইয়া বসিয়াছেন, পাখাটার কিছু-একটা দোষ হইয়াছে, একটা টিপয়ের উপর সাবধানে নিজের ভার রাখিয়া দাঁড়াইয়া রমাপ্রসাদ সেটা সারিবার চেষ্টা করিতেছে। বীণাদের আসিতে দেখিয়াই সুলতা সেলাই তুলিয়া রাখিয়া আসিলেন। রমাপ্রসাদ উচ্চাসন ছাড়িয়া নামিয়া পড়িল। কহিল, "বীণা দেবী এসে পড়েছেন ভালোই হয়েছে।—আমাদের বইটা শেষ অবধি বোধহয় বদ্‌লাতেই হবে, সব পার্টের জন্যে লোক পাওয়া যাচ্ছে না। অপর্ণা যিনি করছিলেন, আজ সুলতা দেবীকে চিঠি লিখেছেন, তাঁর বাড়ীর লোকদের ভয়ানক আপত্তি, তিনি আর আসতে পারবেন না।"

বীণা কহিল, "একেবারেই কোনো লোকের দরকার হয় না এমন একখানা বই এবারে আপনি লিখে ফেলুন, ট্রেন্ ক'রে দেবার সব ভার আমি নেব।"

বীণা ও সুলতার সেদিন পরস্পরকে অনেক কথা বলিবার এবং পরস্পরের নিকট হইতে অনেক কথা শুনিবার আছে। নিভৃতে ছাড়া তাহা হইবার নহে। রমাপ্রসাদকে ডাকিয়া সুলতা কহিলেন, "বইয়ের ব্যবস্থা ঠিক হবে, আপনি ভাববেন না, সম্প্রতি পাখাটার একটা গতি করুন। আগে যাও বা খট্‌খট্ করে ঘুরছিল, আপনি হাত লাগানোতে তাও ত আর ঘুরছে না। একটা মিস্ত্রি কোথাও থেকে ধ'রে আনুন।"

অত্যন্ত কাতর মুখ করিয়া রমাপ্রসাদ চলিয়া গেলে সুলতা হাসিয়া উঠিলেন, বীণা-ঐন্দ্রিলা সেই হাসিতে যোগ দিল। সুলতা কহিলেন, "সত্যি বলছি ভাই, চল্ শুধু মেয়েদের নিয়ে একটা ক্লাব করা যাক্। এ আর ভালো লাগে না।"

ঐন্দ্রিলা কহিল, "চ্যাটার্জ্জি-সাহেবের ওপর শোধ তোলবার জন্যে বুঝি?"

সুলতা কহিলেন, "তা বেশ ত, শোধ কেন নেব না ?"

বীণা কহিল, "কোথায় গেলেন বীরপুরুষ ?"

সুলতা কহিলেন, "কোথায় আবার, ব্রিজের আড্ডায়।"

বীণা কহিল, "ভালো কথা মনে পড়েছে, তোমার হয়ে এবিষয়ের সব ব্যবস্থা ত আমার ক'রে দেবার কথা। রাজি আছ আমার পরামর্শ মতো চল্‌তে ?"

সুলতা কহিলেন, "তোকে বাপু কথা দিতে ভয় করে। কি কর্‌তে হবে শুনি ? রমাপ্রসাদের সঙ্গে প্রেম ক'রে jealous ক'রে তুলতে হবে ?"

বীণা কহিল, "পাগল, ওধরণের কাজ তোমাকে দিয়ে হবে না, তা আমি জানি।"

ঐন্দ্রিলা হাসিতে হাসিতে কহিল, "তা আবার রমাপ্রসাদ। বেচারা!"

বীণা কহিল, "ঠাট্টা নয়, সত্যিই বল্‌ছি। ভদ্রলোক ভয়ানক ব্রিজ ভালোবাসেন ?"

"সেইরকম ত মনে হয়।"

"তা এর ত খুব সহজ উপায় রয়েছে। নিজে খেলাটা শিখে নাও না ? তারপর তোমাদের দুজনেরই ভালো লাগে এমনতর বন্ধুবান্ধব দুএকজনকে ডেকো। কর্ত্তাও বাড়ী থাক্‌বেন, তোমারও সময় কাট্‌বে ভালো।"

সুলতা হাসিয়া উঠিলেন। কহিলেন, "কথাটা ভালো বলেছিস্‌। তুই জানিস খেল্‌তে ? দিবি শিখিয়ে ?"

বীণা কহিল, "দেব না শুধু, ভদ্রলোক পাকাপাকি রকম ঘরমুখো না হওয়া পর্য্যন্ত তোমাদের সঙ্গে রোজ এসে খেল্‌ব।"

ইহার পর সুলতা অজয়ের প্রসঙ্গ তুলিবেন ভাবিতেছেন, এমন সময় মিস্ত্রি লইয়া রমাপ্রসাদ ফিরিয়া আসিল, তাহাদের পিছনে মস্ত একটা মই কাঁধে করিয়া কুলি আসিল। সেদিনকার মত গল্প জমিবার কোনও সম্ভাবনা আর রহিল না।

সাড়ে-সাতটায় সুভদ্র আসিল। আজ সে একাকী বীণার সম্মুখীন হইতে ভরসা পায় নাই, বিমানকে সঙ্গে করিয়া আনিয়াছে। সমস্তদিন দুই বন্ধুতে শহরের সর্ব্বত্র তন্নতন্ন করিয়া খোঁজ করিয়াছে কিন্তু অজয়ের ঠিকানা মিলে নাই। দূর হইতে বীণাকে দেখিয়াই সুভদ্র বুঝিতে পারিল, তাহার কমনীয় মনটির উপর দিয়া কি নিদারুণ ঝড় বহিয়া যাইতেছে, ভয়ে অগ্রসর হইয়া গিয়া অন্যদিনের মত কুশল জিজ্ঞাসাও করিল না। কয়েকটি নূতন মেম্বার জুটাইয়া আনিয়াছিল, তাহাদের লইয়াই ব্যস্ত রহিল। অভিনয়ের অক্ষম আয়োজন চলিতে লাগিল, এক রমাপ্রসাদ ভিন্ন অপর কাহারও কিছুমাত্র উৎসাহ প্রকাশ পাইল না।

কিছুক্ষণ অধীর আগ্রহে প্রতীক্ষা করিয়া বীণা উঠিয়া পড়িল। সুভদ্রের পাশ ঘেঁসিয়া গাড়ীবারান্দার ছাতে যাইতে যাইতে মৃদুকণ্ঠে তাহাকে বলিয়া গেল, "এক শুনুন।"

সুভদ্র বাহির হইয়া আসিলে কহিল, "কিছু খবর পেলেন ?"

"না।"

"খবর পাবার আর আশা আছে কিছু ?"

"যথাসাধ্য ত চেষ্টা ক'রে দেখেছি।"

কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া বীণা একটু হাসিয়া বলিল, "বেশ!"

আরও কিছুক্ষণ চুপ করিয়া কাটিলে বীণার সান্ত্বনার্থ কিছু একটা বলিবে ভাবিতেছে এমন সময় রমাপ্রসাদ ছুটিয়া আসিয়া সুভদ্রকে সংবাদ দিল, "বিমানবাবু কি চমৎকার রাজার পার্ট করছেন দেখ্‌বেন আসুন। উনি এত ভালো কর্‌তে পারেন, আমরা কেউ জানতাম না ত!"

সুভদ্র জানিত, কিন্তু বিমানের কিছুমাত্র সুনাম নাই বলিয়া পাছে তাহার সঙ্গে অভিনয়ে নামিতে মেয়েদের আপত্তি হয়, এই ভয়ে প্রথম হইতেই তাহাকে বাদ দিয়া রাখিয়াছিল। অর্পণা খসিয়া পড়ার সংবাদ ক্লাবে আসিয়াই পাইয়াছিল, ভাবিল, 'এত সাবধান হয়েও যখন কিছু লাভ হ'ল না তখন ওকে আর বাধা দেব না।'

বীণা দুটি হাতকে কপালে ঠেকাইয়া কহিল, "আমি বাড়ী যাচ্ছি, ঐন্দ্রিলাকে দয়া ক'রে ব'লে দেবেন।"

তাহাকে বাধা দেয়, বহু চেষ্টাতেও এতটা কঠিন

সুভদ্র নিজেকে করিতে পারিল না। বীণা যে সিঁড়ি বাহিয়া নীচে নামিল, তাহা কেহই প্রায় লক্ষ্য করিল না, যাহারা করিল তাহারাও বুঝিতে পরিল না যে সে চলিয়া যাইতেছে।

সেদিনকার মত রিহার্সাল চালাইয়া দিবার জন্ত বিমান রাজার পার্টে নামিয়াছিল, কিন্তু তাহার অভিনয়ে সকলে বিস্মিত, মুগ্ধ। সমস্বরে দাবী করিতে লাগিল, "আপনাকে আমরা চাইই, 'না' বললে কিছুতেই শুনব না।"

ঐন্দ্রিলা কহিল, "নামুন না, বিমানবাবু। সকলে এত ক'রে বল্‌ছে। সত্যিই ত আপনি বেশ ভালো অভিনয় করেন।"

সুলতা কহিলেন, "অপর্ণার পার্ট নিয়ে তুই নাম্‌বি?"

সকলে আবার সমস্বরে চীৎকার করিয়া উঠিল, "তাহলে ত বেশ হয়, খুব ভালো হয়।"

বীণার কাহাকেও কিছু না বলিয়া-কহিয়া হঠাৎ বাড়ী চলিয়া যাওয়া ঐন্দ্রিলা লক্ষ্য করিয়াছিল, সেই হইতে তাহার মনে অনেকখানি উত্তাপ সঞ্চিত হইয়া আছে। এই-সব প্রেমে-পড়া-পড়ি ব্যাপারগুলি এমনিতেই সে সহিতে পারে না, তাহার উপর সেগুলি কি হাটের মধ্যে ঢাক পিটাইয়া লোক-জানাজানি করিয়া না করিলেই নয়? তাহা ছাড়া অন্তদের কথাও ত একটু ভাবিতে হয়? সকলে মিলিয়া আনন্দ করিতেছে, উহার মধ্যে নিজের দুঃখটাকেই বড় করিয়া এমন সৃষ্টি-ছাড়া ব্যবহার করাটা নিছক স্বার্থপরতা।

রমাপ্রসাদ কহিল, "কি বলেন রাজি?"

মুহূর্ত্তে মনকে প্রস্তুত করিয়া সে কহিল, "দেখতে পারি, চেষ্টা ক'রে।"

রিহার্সাল সত্যই ইহার পর সেদিন জমিল ভাল। চতুর্দ্দিক্ হইতে সকলের অজস্র প্রশংসা কুড়াইয়া ঐন্দ্রিলা যখন বাড়ী ফিরিবার জন্ত বাহিরে আসিল, তাহার দুই চোখ উজ্জ্বল। মনের অস্থিরতাটা সত্যই আজ অপ্রত্যাশিত উপায়ে কাটিয়া গিয়াছে। সুভদ্র সুখী হইয়াছে, তাহার বক্তৃতা আজ থামিতে চাহিতেছে না। সকলের উৎসাহগুঞ্জনের মধ্যে দাঁড়াইয়া অজয়ের আজিকার অনুপস্থিতিকেও ঐন্দ্রিলা অতিবড় স্বার্থপরতার রূপে দেখিল। ভাবিল, অজয় সেই ধরণের মানুষ যাহারা অপরকে আনন্দ করিতে দেখিলে কাতর হয়, পাছে সেই আনন্দের ভাণ্ডারে নিজেকেও কিছু দান করিয়া ফেলিতে হয়, এই ভয়ে সর্ব্বদা সতর্ক হইয়া দূরে থাকে। এমন মানুষকেও ভাল লাগিয়াছিল ভাবিয়া সে আশ্চর্য্য হইয়া গেল।

বিমান ভাবিতেছিল, সমস্তটা দিন ত হৈ হৈ ক'রে কাটল। যার জন্তে সব করলাম তাকে ত একবার দেখতেও পেলাম না ভালো ক'রে। যাই, অন্ততঃ শ্রীমুখের বকুনি একটু শুনে কানদুটোকে জুড়িয়ে আসি। ঐন্দ্রিলাকে কহিল, "আপনাকে পৌঁছে দিয়ে আসব?"

ঐন্দ্রিলা কহিল, "চলুন।"

বাহিরে মেঘ করিয়া আসিতেছে, আসন্ন দুর্য্যোগের রাত্রি। সুলতা নীচে আসিয়াছিলেন, তাড়াতাড়ি বলিলেন, "বিমানবাবু যাচ্ছেন? ভালোই হ'ল, আমিও একটু ঘুরে আসি। বীণাটা হঠাৎ মাঝখানে উঠে চ'লে গেল, কিছু ব'লে সুদ্ধ গেল না। একটু খবর নেওয়া উচিত।"

সুলতার অভিপ্রায় বুঝিতে বিমানের দেরি হইল না। ঠোঁট টিপিয়া একটু হাসিল। ড্রাইভারের পাশে বসিয়া সারাপথ গুণগুণ করিয়া গাহিতে গাহিতে চলিল, My car will meet her, but her mother comes too ; It's a two seater, but her mother comes too....

বালিগঞ্জের মাঠের পথ ধরিতে-না-ধরিতে মহা আড়ম্বরে বৃষ্টি। দম্‌কা হাওয়ার দাপটে পথের পাশের দেবদারু গাছের সারি অস্থির বিপর্য্যস্ত। আর্ম্মিন সেডান্‌কে যেন সাবধানে পা টিপিয়া পথ চলিতে হইতেছে। পথের মোড় ফিরিয়া যেখান হইতে তাহাদের বাড়ী প্রথম চোখে পড়ে, সেইখানে আসিয়া নিজের অজ্ঞাতেই ঐন্দ্রিলা দূরে মাঠের মাঝখানে, যেখানে ঘনতরুসন্নিবেশের নীচে আজও হয়ত রাশি রাশি চাঁপাফুল ঝরিয়া পড়িতেছে, সেইদিকে চাহিয়া দেখিল। চোখ ফিরাইতেই চকিত বিদ্যুতের আলোয় মনে হইল, অজয়। যেন পলকের মত পথপার্শ্বের একটা দেবদারু গাছের আড়ালে তাহাকে

দেখিল, সিক্ত পরিচ্ছদ শীর্ণ দেহে লিপ্ত হইয়া আছে, চুলগুলি জলধারার সঙ্গে মুখচোখের উপর গড়াইতেছে। ভয়-বেদনাতুর মুখ, আগ্রহ-ব্যাকুল দৃষ্টি, কিছুই তাহার চোখ এড়াইল না। গাড়ী পলক ফেলিতে সরিয়া আসিল, ঐন্দ্রিলা পশ্চাতের পর্দ্দা তুলিয়া একদৃষ্টিতে চাহিয়া রহিল। আজ ভয় হইল না, আজ তাহার দয়া হইল। দুর্যোগ-ঘনরাত্রি, জনহীন পথ, পথচারী নিরাশ্রয় হতভাগ্যের জন্য তাহার নারীহৃদয় গভীর বেদনায় মোচড় দিয়া দিয়া উঠিতে লাগিল। ভাবিল, গাড়ী থামাইতে বলে, নামিয়া গিয়া খোঁজ লয়, কিন্তু পাশে সুলতা রহিয়াছেন, সম্মুখে বিমান, কোথা হইতে দুস্তর লজ্জা আসিয়া বাধা দিল। এ লজ্জা নিজের জন্য তত নহে, অন্য মানুষটির জন্য যত। যে নিজেকে এত করিয়া লুকাইতেছে, তাহাকে প্রাণ ধরিয়া সে সকলের কাছে ধরাইয়া দিতে পারিল না।

সুলতা কহিলেন "কি রে, ইলু?"

উত্তর দিল, "কই, কিছু না।"

বাড়ীর দরজায় গাড়ী পৌঁছিলে সুলতা-বিমানের জন্য বসিবার ঘর খুলিয়া দিয়া সে বীণাকে খবর দিতে উপরে গেল, আর নামিল না। তিনতলার বারান্দার এককোণে প্রস্তরমূর্ত্তির মত অনিমেষ দৃষ্টিতে সুদূরে চাহিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। বৃষ্টির ছাটে সর্ব্বাঙ্গ ভিজিয়া ভাসিয়া যাইতে লাগিল, ভ্রূক্ষেপমাত্র করিল না। যাহার সন্ধান এত করিয়া কেহ পাইতেছে না, সে হয়ত এখনও ঐ তরুবীথির নীচেকার পথ ছাড়াইয়া যায় নাই। এখনও হয়ত প্রাণপণ জোরে চীৎকার করিয়া ডাকিলে সে শুনিতে পায়, তবু সে কত দূরে! শুভমুহূর্ত্ত আসিয়া বহিয়া গিয়াছে, কতকালে ফিরিবে কে জানে? কখনও ফিরিবে কি না তাহাই বা কে বলিতে পারে? ও যা মানুষ, হয়ত চিরকালের মত শেষ দেখা দিয়া এবং শেষ দেখা দেখিয়া গেল, দৃপ্ত-ঐন্দ্রিলার, অকুতোভয় ঐন্দ্রিলার মনে এই চিন্তাও আজ জাগিল।

সমস্ত রাত্রি ধরিয়া অবিশ্রাম বৃষ্টি…হায় পথবাসী, হায় গতিহীন, হায় গৃহহারা…বাহিরের এবং ভিতরের সমস্ত বিশ্ব জুড়িয়া এ কি ক্রন্দনের সুর!…প্রাসাদের মত এই বাড়ীতে কত ঘরের দরজা বৎসরে একবার খোলা হয় না, আর একটা মানুষ ঝড়ের মুখে জীর্ণপত্রের মত হয়ত আজ পথে পথে ছিট্‌কাইয়া ফিরিতেছে, পৃথিবীতে কোথাও তাহার মাথা গুঁজিবার স্থান নাই।… নিষ্ঠুর, নিষ্ঠুর পৃথিবী!

(ক্রমশঃ)

বাংলা

ভিক্ষুকের সৎকার্য্য—
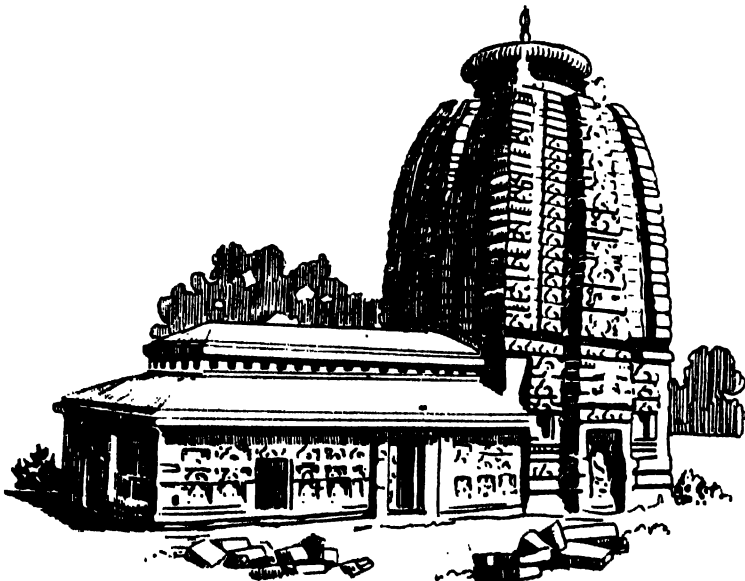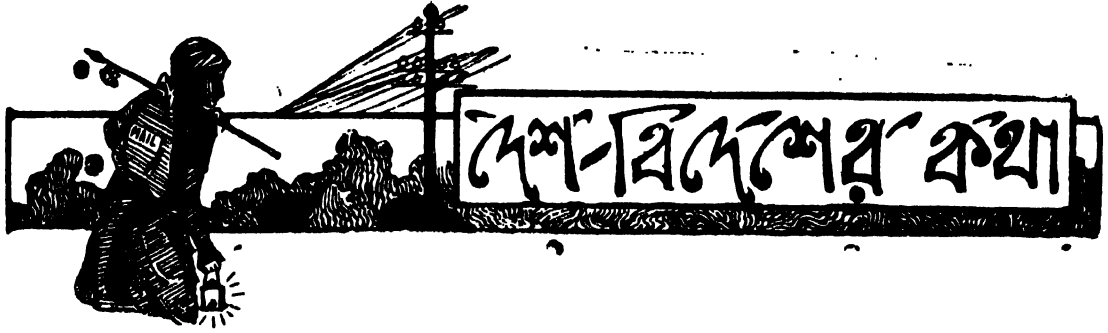
ভিখনরাম একটি দরিদ্র ভিক্ষুক। তাহার পদদ্বয় মুলো ও ভগ্ন। এই ভগ্ন ও মুলো পদদ্বয়ের উপর ভর করিয়া সে রংপুরের সর্ব্বত্র ভিক্ষা করিয়া দুই শতাধিক টাকা সংগ্রহ করিয়াছিল। তাহার কষ্ট-সঞ্চিত অর্থ সে রংপুরের ডাক্তার শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র লাহিড়ী এল্-এম্-এস্ মহাশয়ের হস্তে অর্পণ করে এবং এইরূপ ইচ্ছা প্রকাশ করে যে রংপুরের যে সকল স্থানে পানীয় জলের বিশেষ অভাব, তাহার যে কোন স্থানে তিনি এই অর্থসাহায্যে যেন একটি ইঁদারা খনন করিয়া দেন। পূর্ব্বোক্ত অর্থানুকূল্যে, ও রংপুর মিউনিসিপালিটির আংশিক সাহায্যে যোগেশবাবু রংপুরের চাউলের 'আমোদের' (হাটের) দক্ষিণভাগে একটি ইঁদারা খনন করিয়া দেন। ভিখনরাম এই চাউলের আমোদের একখানি বেড়াশূন্য গৃহে রাত্রে শয়ন করিত, সারাদিন এখানে-সেখানে ভিক্ষায় কাটাইয়া দিত।

ভিখনরাম

কারুশিল্প প্রদর্শনী—

আমরা গৃহস্থালীর কর্ম্মে যে-সব জিনিষ ব্যবহার করি তাহার কতকাংশ না কতকাংশ নষ্ট বা পরিত্যক্ত হয়। এই সকল পরিত্যক্ত সামগ্রী হইতেও প্রয়োজনীয় সুন্দর সুন্দর জিনিষ প্রস্তুত হইতে পারে। কলিকাতার শ্রীযুক্তা স্বর্ণলতা বসু কয়েক বৎসর যাবৎ এইরূপ সুন্দর সুন্দর জিনিষ স্বহস্তে প্রস্তুত করিতেছেন। গত চারি বৎসরে এই সকল জিনিষের চারিটি প্রদর্শনী হয়। সকলেই শ্রীযুক্তা স্বর্ণলতার শিল্পনৈপুণ্য দেখিয়া মুগ্ধ হন। পুরস্ত্রীগণ গৃহে বসিয়া এই শিল্পের চর্চ্চা করিলে, নিজেদের উন্নতি করিতে পারিবেন—ভারতীয় শিল্পেরও উন্নতি সাধনে সাহায্য করিবেন। গত ১৭ই ফাল্গুন শ্রীযুক্ত রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় চতুর্থ বারের প্রদর্শনীর দ্বার উন্মোচন করেন।

তারকদাসী নারী-কল্যাণ সদন—

বিগত ২৬এ ফেব্রুয়ারি পুরমহিলাদের শিক্ষার সুবিধার্থ এবং ছাত্রীনিবাসের জন্য চন্দননগরে কৃষ্ণভাবিনী নারী-শিক্ষা মন্দিরের
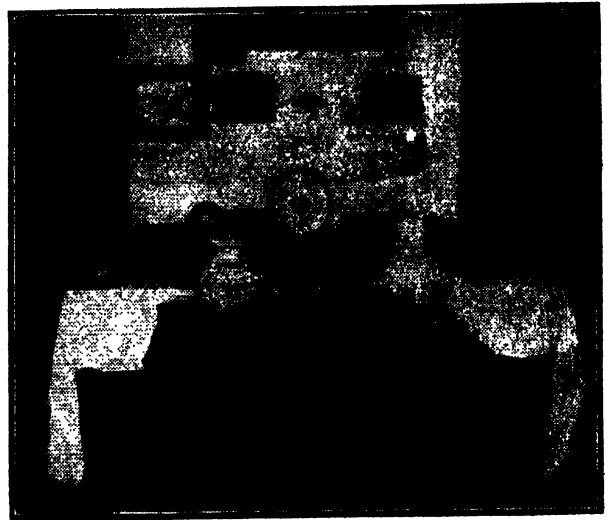
শ্রীযুক্তা স্বর্ণলতা বসুর প্রস্তুত—ঝিনুকের হাঁড়ি, বেতের ও র‍্যাফিয়ার বাস্কেট, কাঠের ও মাটির পাত্র কারুকার্য্য ও চিত্রিত করার কয়েকটি নমুনা।

শ্রীস্বর্ণলতা বসু

শ্রীযুক্তা বসুর প্রস্তুত ঝিনুকের উপহার বাক্স, ভাঙা গ্লাস ও ছোট পরিত্যক্ত শিশির দ্বারা দোয়াত দান ইত্যাদি ও নানা প্রকার কাগজ চাপা ও ভাঙা পাথর হইতে ছাঁচ প্রস্তুত ইত্যাদির কয়েকটি নমুনা।

কৃষ্ণভাবিনী নারী শিক্ষা-মন্দির ও তারকদাসী নারী-কল্যাণ সদন, চন্দননগর

বিস্তৃতিরূপে 'তারকদাসী নারী-কল্যাণ সদন' নামক নবনির্ম্মিত ভবনটির উদ্বোধন কার্য্য ফরাসী ভারতের গভর্ণর মহোদয়ের পত্নী মাদাম জুতার্ঁ দ্বারা সম্পাদিত হইয়াছে। নারীশিল্প, মাতৃমঙ্গল ও শিশু-কল্যাণ বিষয় শিক্ষা দানই ইহার প্রধান উদ্দেশ্য। তারকদাসী নারী-কল্যাণ সদনের কার্য্য আরম্ভ হইলে পুরস্ত্রীদের শিক্ষাবিষয়ে দেশে যে অভাব আছে তাহা কতক অংশে বিদূরিত হইবে। নারীশিক্ষা-মন্দিরের তত্ত্বাবধানে এই সদনের কার্য্য পরিচালিত হইবে। ছাত্রী নিবাসে অনেকগুলি নূতন ছাত্রীর থাকিবার স্থান হইবে।

বোধনা-নিকেতনের জন্য সাহায্য প্রার্থনা—

জড়বুদ্ধি ছেলেমেয়েদের জন্য ঝাড়গ্রামে বোধনা-নিকেতন নাম দিয়া যে আশ্রম স্থাপিত হইতেছে, তাহার গৃহনির্ম্মাণ কার্য্য অনেকদূর অগ্রসর হইয়াছে। উহা সমাপ্ত করিবার জন্য টাকার প্রয়োজন। যিনি যাহা দিবেন, দয়া করিয়া তাহা সত্বর বোধনা-সমিতির সভাপতি ও কোষাধ্যক্ষ শ্রীরামানন্দ চট্টোপাধ্যায়ের নিকট ২-১ টাউনসেণ্ড রোড, ভবানীপুর, কলিকাতা, ঠিকানায় পাঠাইয়া দিলে কৃতজ্ঞচিত্তে গৃহীত হইবে। গত চৈত্রের প্রবাসীতে যে দানগুলির প্রাপ্তি স্বীকৃত হইয়াছিল, তাহার পর নিম্নলিখিত টাকা পাওয়া গিয়াছে :—

শ্রীযুক্ত শিউকিষেণ ভট্টার	২৫০	টাকা	
" হরিদাস মজুমদার মারফৎ অমৃত সমাজ	১০০	"	
" সুধীরচন্দ্র নান	১০০	"	
" প্রফুল্লনাথ ঠাকুর	১০০	"	(১ম কিস্তি)
" ব্রজেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়	৫০	"	"
" নগেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় রায় বাহাদুর	৫০	"	"
" সত্যেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় রায় বাহাদুর	৫০	"	"
শ্রীমতী সীতা দেবী	৫০	"	"
" প্রিয়বালা গুপ্তা	২০	"	"
শ্রীযুক্ত অমূল্যকুমার ভাদুড়ী	১২	"	
" " মাসিক	১	"	
ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দান	৮	"	

বি, এন, দাস

ভারতবর্ষ

ব্রহ্ম-প্রবাসী বাঙালী—

ঢাকা-নিবাসী শ্রীযুক্ত বি. এন. দাস ব্রহ্মদেশের অন্তর্গত বেসিনে নানা ভাবে দেশসেবা করিতেছেন। তিনি ছয় বৎসর যাবৎ বেসিন করপোরেশনের সভ্য ছিলেন। ১৯২৪ সনে এই করপোরেশনের পক্ষ হইতে রেঙ্গুন বিশ্ববিদ্যালয়ের ফেলো মনোনীত হইয়াছিলেন। স্থানীয় ভারতীয় সমিতির সভাপতি পদেও বৃত হইয়াছিলেন। তিনি "Fair Play" নামক পত্রিকার অবৈতনিক সম্পাদক ছিলেন।

দাস-মহাশয় ব্রহ্ম ব্যবস্থাপক সভায় দুই বার সভ্য নির্ব্বাচিত হইয়াছেন। প্রথম বারে তাঁহার কোনও প্রতিদ্বন্দ্বী ছিলেন না। তখন তিনি ব্যবস্থাপক সভায় সাইমন কমিশনের বিরুদ্ধে ভোট দেন। তিনি ব্রহ্মসরকার কর্ত্তৃক প্রস্তাবিত ভরোৎপাদক নিপীড়ন আইনেরও প্রতিবাদ করেন। দাস-মহাশয় মিলনপন্থী। যাহাতে ব্রহ্মদেশ ও ভারতবর্ষ নিরবচ্ছিন্ন থাকে তাহার জন্য তিনি বিশেষ সচেষ্ট। এইবার সভ্য নির্ব্বাচিত হইয়া ব্যবস্থাপক সভায় ভারতবর্ষ ও ব্রহ্মদেশের মিলন প্রস্তাবে সহায়তা করিতেছেন।

—

বিদেশ

লণ্ডন বাংলা সাহিত্য সম্মিলন—

গত ১২ই চৈত্র (১৩৩৯) লণ্ডন বাংলা সাহিত্য সম্মিলনের পঞ্চম বার্ষিক অধিবেশন হইয়া গিয়াছে। ব্যারিষ্টার শ্রীযুক্ত বিজয়চন্দ্র চট্টোপাধ্যায় এবারকার সম্মিলনে সভাপতির কার্য্য করিয়াছেন। সম্মিলনে সাহিত্য বিষয়ক আলোচনা ছাড়া পরশুরামের 'কচিসংসদ'ও অভিনীত হইয়াছিল। অধিবেশনে জলযোগেরও ব্যবস্থা ছিল। লণ্ডন-প্রবাসী বাঙালী মহিলারা স্বহস্তে রসগোল্লা, সন্দেশ, নিমকি, সিঙ্গাড়া প্রভৃতি খাবার প্রস্তুত করিয়াছিলেন। সম্মিলন-উৎসবে ২০১ জন বাঙালী ও বাঙালী-হিতৈষী উপস্থিত ছিলেন।

সম্মিলনীর পূর্ব্ব বৎসরের রিপোর্টে জানা যায়, ঐ বৎসর ইহার মোট ১৮টি অধিবেশন হয়,—৫টি আনন্দ-উৎসব ও ১৩টি সাহিত্য-সম্মিলন। এই বৎসর সম্মিলন রবীন্দ্র-জয়ন্তী উৎসবের অনুষ্ঠান করেন। এই সনের বৈশাখ মাসে সমিতির পুস্তকাগার প্রতিষ্ঠিত হয়।

গ্লাসগো ভারতীয় সমিতি—

গ্লাসগো শহরে "Glasgow Indian Union" নামে একটি ভারতীয় সমিতি আছে। এই সমিতি গ্লাসগো বিশ্ববিদ্যালয়ে পাঠে বহু ভারতীয়কে নানারূপ প্রয়োজনীয় সংবাদাদি দিয়া থাকেন। ইহাতে ভারতীয় ছাত্রেরা বিশেষ উপকৃত হন। সমিতির সম্পাদক G. C. Roy, c/o The University, Glasgow এই ঠিকানায় পত্র লিখিলে আবশ্যক সংবাদ পাওয়া যাইবে।

আকাশে ছবি ফেলা—

এইচ্ গ্রীণডেল-ম্যাথিউজ নামে একজন ইংরেজ আবিষ্কারক কামানের মত দেখিতে একটি যন্ত্র নির্ম্মাণ করিয়াছেন। উঁহার সাহায্যে মেঘের উপরে ছবি ফেলা যায়। এই প্রোজেক্টরটির ভিতর একটি ঘড়ির ডায়েল ঢুকাইয়া দিয়া কটা বাজিয়াছে তাহা আকাশ হইতে বহু লোককে এক সঙ্গে জানান যায়। এই যন্ত্রটি সামরিক অন্যান্য কার্য্যেও ব্যবহৃত হইতে পারে।
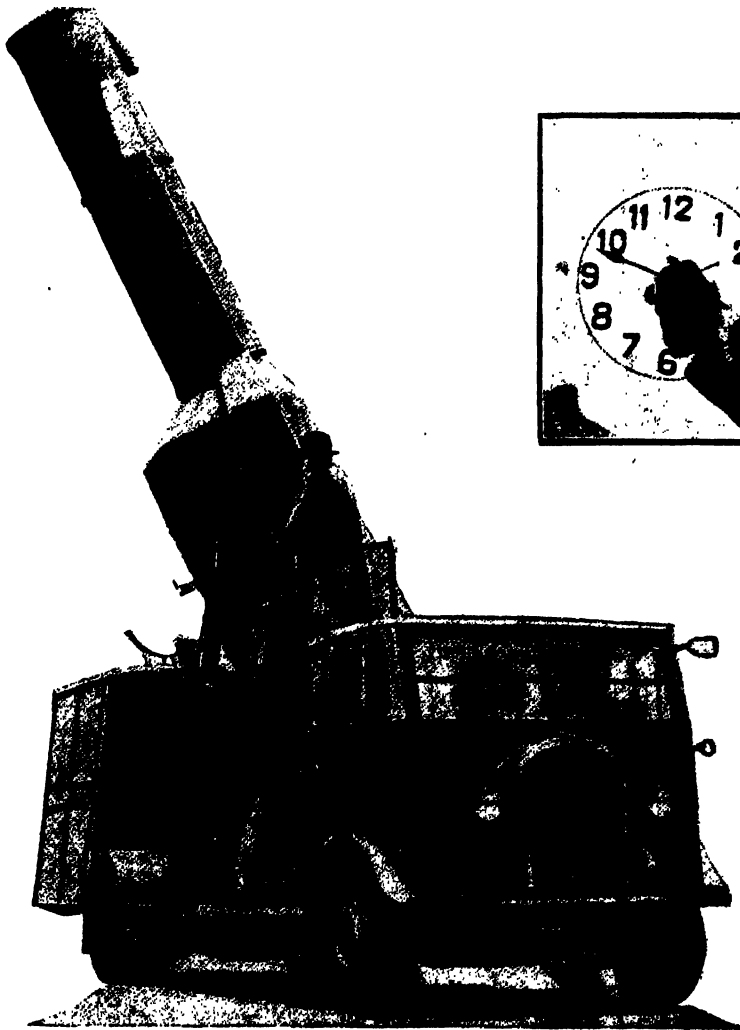
প্রজেক্টরের জন্য ঘড়ির ডায়েল।

আকাশে ছবি ফেলিবার নূতন প্রোজেক্টর।

রেডিওর সাহায্যে অপরাধী গ্রেপ্তার—

রেডিও ফটোগ্রাফীর সাহায্যে আসামী ধরিবার এক নূতন উপায় আবিষ্কৃত হইয়াছে। যে-লোকটিকে ধরিতে হইবে রেডিওর দ্বারা তাহার ফটো, স্বাক্ষর ও টিপসহি পাঠান হয়।

রেডিওর দ্বারা প্রেরিত ফটো, স্বাক্ষর ও টিপসহি

ডাইনোসরের বংশধর—

লণ্ডনের চিড়িয়াখানায় দুইটি সরীসৃপ আছে যাহাকে প্রাণিতত্ত্ব-বিদরা ডাইনোসরের বংশধর বলিয়া বিবেচনা করেন।

বৃহত্তম এরোপ্লেন—

জার্ম্মেনীতে সম্প্রতি পৃথিবীর বৃহত্তম এরোপ্লেন নির্ম্মিত হইয়াছে। উহার কয়েকটি চিত্র এই সঙ্গে দেওয়া হইল।

এই সঙ্গে ইংলণ্ডের রণপোত বিভাগের একটি সামুদ্রিক এরোপ্লেনের চিত্রও প্রকাশিত হইল।
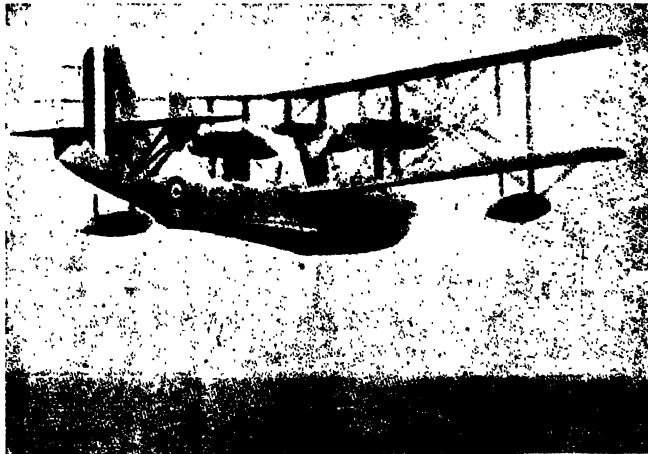
ইংলণ্ডের সামুদ্রিক এরোপ্লেন
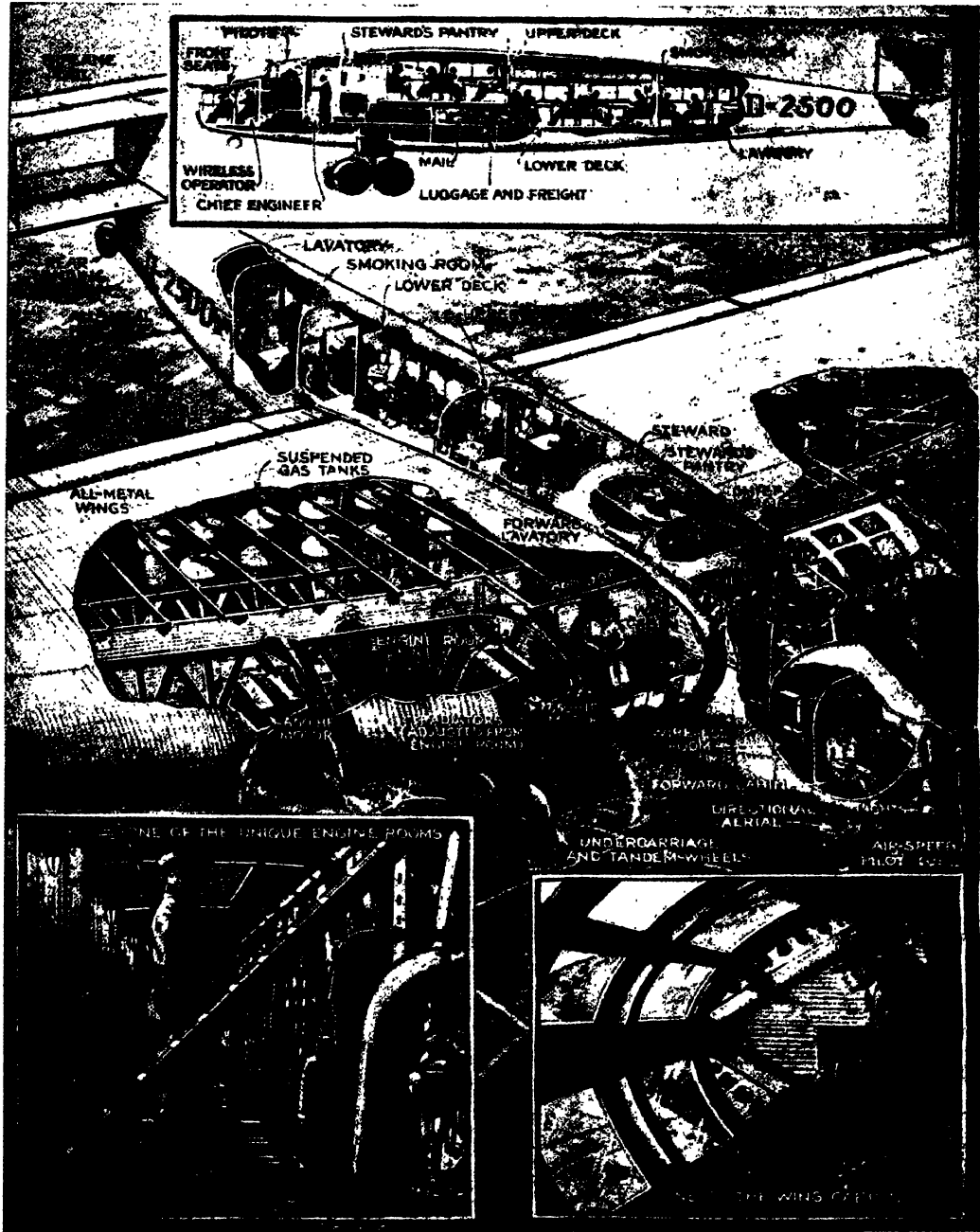
বৃহত্তম এরোপ্লেনের গঠন ও অভ্যন্তরের দৃশ্য

প্রত্যাবর্ত্তন

শ্রীকেদারনাথ চট্টোপাধ্যায়

আর্য্যভূমি ছেড়ে এবার আমরা অনার্য্য সেমিটিকের লীলাভূমিতে চলেছি। ইরাক—মেসোপটামিয়া (নদী-মধ্যদেশ)—সুদীর্ঘ চল্লিশ শতাব্দী ধরে একের পর এক সভ্যতার জন্মদান করেছে। সুমেরীয় আক্কাদীয়

পারস্ত সীমানার কাছে। ইরাকরাজের পারস্তভ্রমণের দৃশ্য

ব্যাবিলীয়, অসুর, আরব, কত সভ্যতারই জন্ম ও উৎকর্ষ এই প্রাচীন জনপদে হয়ে গিয়েছে এবং কত দেশেই না সেই সভ্যতার বীজ ছড়িয়ে পড়েছে! মানবের সভ্যতা ও কৃষ্টির অঙ্কুর কোন্ দেশে প্রথম উষার আলো দেখেছিল সেই নিয়ে নানা বিদগ্ধ-চূড়ামণি নানা মত প্রকাশ করেছেন, (এবং এখনও কর্‌ছেন) সে সকল মতামতের মীমাংসা করার ক্ষমতা লেখকের নাই। তবে সভ্যতা ও কৃষ্টির ভিত্তি যে-সকল মূল উপাদানে নির্ম্মিত সে-সকলের অনেকগুলিরই প্রাচীনতম ইতিহাস আমরা এ-পর্য্যন্ত পেয়েছি এই ভুবনবিখ্যাত নদীমধ্যদেশে।

সত্যসত্যই ইরাকের মাটির গুণ আছে। অতি প্রাচীন যুগের কথা ছেড়ে দিয়ে আধুনিক যুগের প্রথম-ভাগের অর্থাৎ বারো-তেরো শতাব্দী আগেকার কথাই দেখা যাক। ঐ সময়টা পাশ্চাত্য ইতিহাসের মতে মধ্য-যুগের প্রথম অংশ; কিন্তু যে-দেশের ইতিহাসের বয়স পাঁচ হাজার বা ততোধিক বৎসর, সে-দেশের হিসাবে বারো শত বৎসর আধুনিক যুগের মধ্যে ফেলাই উচিত। সে-সময় দুর্দ্ধর্ষ আরব জাতি এক মহাপুরুষের প্রভাবে সংঘবদ্ধ হয়ে ভুবনবিজয়ে প্রবৃত্ত হয়েছে, কিন্তু শিক্ষায়, সভ্যতায় তাদের স্থান তখন অন্য অনেক জাতির তুলনায় অনেক নীচে। নিজের ধর্ম্মে ও নিজের শক্তিতে অদম্য বিশ্বাস, যুদ্ধক্ষেত্রে অসীম শৌর্য্য এবং অসাধারণ কষ্ট-সহিষ্ণুতা, এই কয়টি অস্ত্রে এই মুষ্টিমেয় জাতি দিগ্বিজয়ে সমর্থ হয়। শাশানিয় পারসীক সাম্রাজ্য ধ্বংস করে, যখন আরব সাম্রাজ্যের স্থাপনা হ'ল তখন ইরাণী, ভারতীয় বা মিশরীদের তুলনায়

ইরাক-সীমান্তে কবি-সম্বর্দ্ধনা

তাহারা প্রায় অসভ্য বর্ব্বর। কিন্তু নদীমধ্যদেশে দুই শত বৎসর খিলাফতের পরে সেই জাতির কৃষ্টির অবস্থা দেখুন —প্রভাত সূর্য্যকিরণের মত আরব সভ্যতার প্রভা সভ্য জগত আলোকিত করেছে। এই আরব-সভ্যতাই পাশ্চাত্য ইয়োরোপীয় সভ্যতার জন্মদাতা, কেন-না, আরব-স্পেনের

গ্রানাডা, সেভিল, কর্দ্দোভা ইত্যাদি প্রসিদ্ধ বিশ্ববিদ্যালয়-গুলিই ঐ সভ্যতার আকর।

* * *

কাশর-ই-শিরিনে গোলমালে রাত কেটে গেল। ছোট শহর, গবর্ণরের বাড়িও সেই রকমই ছোট। আমাদের লোকজন, লটবহর অনেক, তার উপর গরম এবং বালির আঁধিতে অশেষ অসুবিধা। জায়গার অভাবও ছিল এবং তাই নিয়ে কিছু অশান্তি হবারও উপক্রম হয়েছিল। যা হোক শেষ পর্য্যন্ত সব মিটে গেল।

খানিকিন ষ্টেশনে সম্বর্দ্ধনা। কবির পার্শ্বে ইরাকের বৃদ্ধ কবি

ভোরের বেলায় সীমান্তের দিকে রওয়ানা হওয়া গেল। কবির শরীর আর বইছে না, প্রায় দু-হাজার মাইলের শফর, পথে রাস্তার কষ্ট, থাকার কষ্ট, শান্তির অভাব এবং চিরাভ্যস্ত অনেক দৈনন্দিন ব্যাপারের একান্তই বেবন্দোবস্ত—এই-সব জড়িয়ে তাঁর শরীর-মন দুইই পীড়িত। শেষ পথটুকু আবার শুল্ক-বিভাগের টানা-হেঁচড়াতে কষ্টকর না হয়, সেই জন্যে আগে গবর্ণর ও শুল্ক বিভাগের প্রধান কর্ম্মচারীর সঙ্গে আমরা চললাম, যাতে কবির গাড়ী নির্ব্বিবাদে পার হয়ে যেতে পারে। পথ এবার পাহাড়ের গা বেয়ে সর সর করে নেমে চলেছে, চারিধারে উঁচুনীচু ঢিবি, মাঝে মাঝে গমের ক্ষেত, দূরে সমতল জমি দেখা যাচ্ছে। এদিকে সীমান্ত রক্ষার জন্য ছোট ছোট কেল্লা রয়েছে, তাতে রক্ষীদল দিনরাত পাহারা দিচ্ছে।
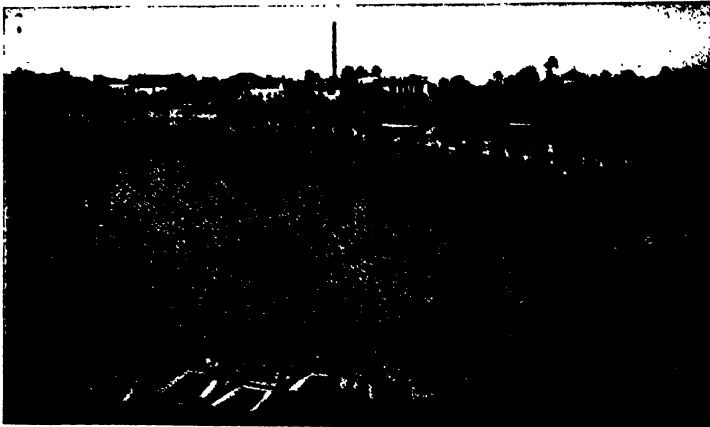
বাগদাদ। মহম্মীজ

খাচাল-কাচাল নামে ফাঁড়িতে পৌছান গেল। রাস্তার উপর প্রকাণ্ড ফাটক, তার আশেপাশে কাঁটা-তারের বেড়া, সঙ্গীন চড়িয়ে সৈন্য প্রহরী রোঁদ দিচ্ছে। কিছু দূরে আর একটা ঐ রকম ফাটক, তার পাশে অন্য রকম উর্দ্দি পরে ইরাকী প্রহরী চৌকী দিচ্ছে, সেটা হ'ল ইরাকের সীমানা। এ দিকের ফাটকের পাশে শুল্কের ঘাঁটি, সেখানে

বাগদাদ। তোব্ আবু খাহান

একদিক অবশ হওয়া সত্ত্বেও এতদূর এসে সারারাত ষ্টেশনে কাটিয়ে কবি ভ্রাতাকে অভ্যর্থনা করতে এসেছিলেন। ইনি স্পষ্টবক্তা, নির্ভীক এবং কবি ব'লে সমস্ত দেশের শ্রদ্ধা ও সমাদর পান। এঁর দীর্ঘজীবনে কারাগার থেকে রাজসভা পর্য্যন্ত হেরফের অনেকবারই হয়েছে, অবস্থার পরিবর্ত্তনও বারবার হয়েছে, কিন্তু প্রাচীনকালের কবি দার্শনিকদের মতই সে-সব কিছুই তিনি তুচ্ছজ্ঞান ক'রে এসেছেন। তিনি দোভাষীর মারফৎ আমাকে জিগেস করলেন কবির বয়স কত, উত্তর শুনে খুব
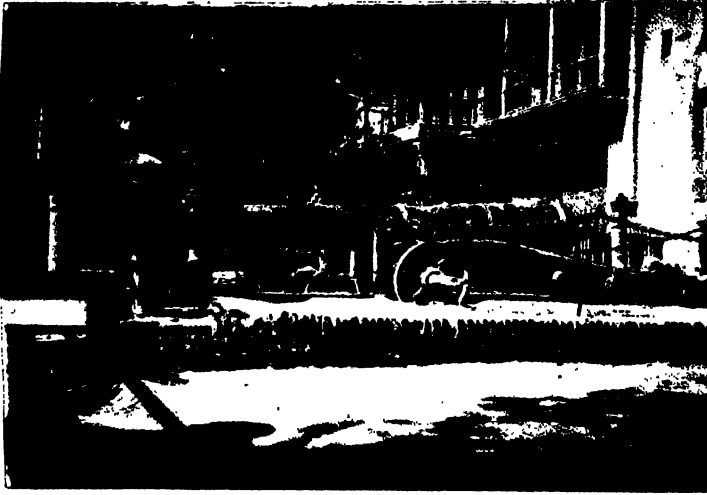
ঢুকে পড়া গেল। পাসপোর্ট দেখা, নানারকমের কাগজপত্র দস্তখত করা, চা খাওয়া, টেহেরানের খবর দেওয়া, (এখানে কর্ম্মচারীর দল উৎসুক হয়ে সে সব শুনল) আমাদের ভ্রমণ বৃত্তান্ত বলা এই সবে প্রায় ঘণ্টাখানিক কেটে গেল। সঙ্গের জিনিষপত্র তারা দেখলেও না, আমিও দেখাতে চাইলাম না। খানিক পরে একটা সাড়া পড়ে গেল, লোক জন ছুটোছুটি করতে লাগল, শুনলাম কবির গাড়ী প্রায় এসে পড়েছে। রাস্তা গাড়ী, লরী, লোকজনে ভরা। সেপাই-শান্ত্রী তাদের স'রিয়ে পথ ক'রে দিল। কবি এসে পৌঁছালেন, তাঁর গাড়ীর সামনে এ-অঞ্চলের গবর্ণর সৈন্যাধ্যক্ষ ইত্যাদি যত উচ্চপদের রাজকর্ম্মচারী সবাই অভিবাদন করলেন। দুইদিকে অনেক কথাবার্ত্তা সম্ভাষণ ইত্যাদি হ'ল। শেষে সকলে একসঙ্গে সৈনিক রীতিতে নমস্কার (স্যালুট) করলেন।

পারস্যদেশের শেষ অভ্যর্থনা এবং বিদায় এক সঙ্গেই হয়ে গেল।

* * *

ও-পারে ইরাকের দল অভ্যর্থনা করার জন্য উপস্থিত ছিলেন। সে দলে রাজনীতি, সাহিত্য, শিক্ষা, সমর, সংবাদপত্র সব দিকেরই প্রতিনিধি ছিলেন। ইরাকের প্রাচীনতম কবি পক্ষাঘাতে শরীরের

বাগদাদ। মিতান মসজিদ

বাগদাদ নর্থ ষ্টেশনে কবিকে দেখিবার জন্য জনসমাগম

আকাশ হইতে বাগদাদের দৃশ্য

ইরাকের গোল নৌকা

টাইগ্রিস নদীর তীরে বাগদাদ শহর

খুশী হয়ে বললেন, "আমার চেয়ে বয়সেও এক বছরের বড়, জ্ঞান ও গৌরবের তো কথাই নেই, আমি নির্ব্বিবাদে ওঁকে 'ওস্তাদ' (গুরু) বলতে পারব।" এঁর সঙ্গে পরে অনেক আদান প্রদান হয়েছিল, কবিও এঁকে পেয়ে খুব খুসী হয়েছিলেন। বাগদাদের নবীন-প্রবীণ সকলের প্রিয় এই সরল অথচ জ্ঞানী কবি সত্যসত্যই আমাদের শ্রদ্ধার পাত্র ছিলেন।

সীমান্ত থেকে ইরাক রেলের খানিকন ষ্টেশন তেরো মাইল মাত্র। সুন্দর টারম্যাকাডাম রাস্তা দিয়ে মোটরের বিরাট বাহিনী চলল। নারায়ণ চন্দ্ বলে এক ভারতীয় ভদ্রলোক আমাদের সম্বর্দ্ধনা করতে এসেছিলেন। তিনিও গাড়ীতে আমার সঙ্গে চললেন। খানিকিনে এসে প্রথমে অভ্যাগত এবং অভ্যর্থনাকারীদের ফোটো তোলা হ'ল তারপর প্রাতরাশের ব্যাপার। ষ্টেশনে লোকে লোকারণ্য, মধ্যে মধ্যে দু-দশ জন ক'রে মরুভূমির আরবও এসে কবিকে দেখে যেতে লাগল। খানিক পরে ট্রেন ছাড়বার সময়ে সকলে উঠে পড়া গেল।

* * *

দুধারে মরুভূমি, পিছনে দূর পারস্যের নীল পর্ব্বতমালা ক্রমেই আব্ছায়া হয়ে আসছে। আশপাশে মাঝে মাঝে জলসেচের নালীর ভগ্নাবশেষ দেখা যাচ্ছে, এককালে এইগুলি দিয়ে ইউফ্রেটিস্-টাইগ্রিস যুগ্মনদীর জল এসে এই ভূমিখণ্ডকে শস্যপূর্ণ জনপদে পরিণত করেছিল। বিদেশী শত্রু এসে এগুলি নষ্ট ক'রে দেশকে দেশই উজাড় ক'রে দিয়ে গেছে।

কিছুদূর গিয়ে নীচু পাহাড়ের সারিও দেখা গেল, তার ভিতর দিয়ে এঁকেবেঁকে একটি নদীও চলেছে, তার দু-পাশে ঘন খেজুরের বাগান। একটি নির্জ্জন জায়গায় নদীর ধারে এক বিদেশী স্মৃতিস্তম্ভ দেখা গেল, গড়নে চৌকোণ, মাথাটা পিরামিডের মত ছুঁচালো, আয়তনেও খুবই দীর্ঘ। শুনলাম সেটি বাইশ সালের বিদ্রোহে নিহত ইংরেজ রাজপুরুষের কবর।

মধ্যাহ্নের পরে ক্রমেই ষ্টেশনগুলির আশেপাশে ছোটখাট শহর দেখা গেল। ঐ রকম একটি শহরের ষ্টেশনে কবিকে দেখতে বিষম ভিড় এসে উপস্থিত হ'ল, তারা সমস্ত প্লাটফর্ম ছাপিয়ে রাস্তার ধারের গাছ পর্য্যন্ত ছেয়ে ফেলেছিল।

বিকালের দিকে আকাশ কেমন ঘোরালো দেখাতে লাগল। সূর্য্যের মুখও কেমন আচ্ছন্ন, গাছপালা দেখে মনে হয় বাতাস বিশেষ নেই, কিন্তু গাড়ী থামলেও ঝুরঝুর ক'রে বালি প'ড়ে সব জিনিষ ছেয়ে ফেল্‌ছে। শুনলাম আজ ক'দিন ধ'রে এই রকম বালির আঁধি চলেছে। গরমও বেশ লাগতে লাগল, সোডা লেমনেডে বেশ একটা স্পৃহা হ'ল।

সন্ধ্যার মুখে দূরে মিনারগম্বুজশোভিত বিরাট শহর দেখা দিল। কাছে এসে প্রথমে অসংখ্য কবরস্থান এবং

বাগদাদ। শেখ আবদুল কাদির মসজিদ

কুম্ভকারের চুল্লী দেখা গেল। তারপর শহরের আবছায়া রূপও দেখলাম, বুঝলাম এই সেই প্রসিদ্ধ শহর বাগ্‌দাদ।

* * *

ষ্টেশনে লোকে লোকারণ্য, তারমধ্যে কয়েকজন ভারতীয় মহিলাও ছিলেন (দুজন বাঙালী)। ষ্টেশনে নেমে মোটরে ওঠা গেল, প্রায় পোয়া মাইল লম্বা মোটরের শোভাযাত্রা শহরের ভিতর দিয়ে ঘুরে বাগদাদের প্রধান হোটেল 'টাইগ্রিস প্যালেস'-এ এসে থামল। আমাদের সেখানেই থাকার ব্যবস্থা হয়েছিল। হোটেলটিতে আধুনিক ইয়োরোপীয় ধরণের সব রকম ব্যবস্থাই আছে। হোটেলের পাশ দিয়েই টাইগ্রিস নদী চলেছে, তার বুকে পিল্‌পে ও খুঁটি পুঁতে নদীর উপর দোতালা বিশাল বারান্দা করা হয়েছে, সেখান থেকে মনে হয় যেন জাহাজের ডেকে রয়েছি। নদীর দুধার দিয়ে শহর তৈরী, এ-পারে তার প্রধান অংশ, বাজার হাট, আদালত ইত্যাদি, ওপারে সুন্দর সুন্দর বসতবাড়ি এবং অন্যান্য শহরতলির ব্যাপার, তবে এখন ওদিকেও শহর বিস্তার করা হচ্ছে। নদীপারের উপায় দুটি নৌকার সেতু—হাওড়া ব্রীজের সংক্ষিপ্ত সংস্করণ—তার প্রধানটির নাম ইরাক-বিজেতা ইংরেজ জেনারেল মডের নামে 'মডব্রীজ'।

শহরের পথঘাট নূতন ক'রে করা হচ্ছে, কাফিখানা, নৈশ প্রমোদালয়, সিনেমা ইত্যাদিও অনেক। দেখলে ইউরোপ এবং ঈজিপ্ট দুয়েরই কথা মনে হয়।

ভ্রম-সংশোধন ২৫১ পৃঃ ছবির নীচে "C. I. 46.23" স্থলে "C. I. 86.23" হইবে।
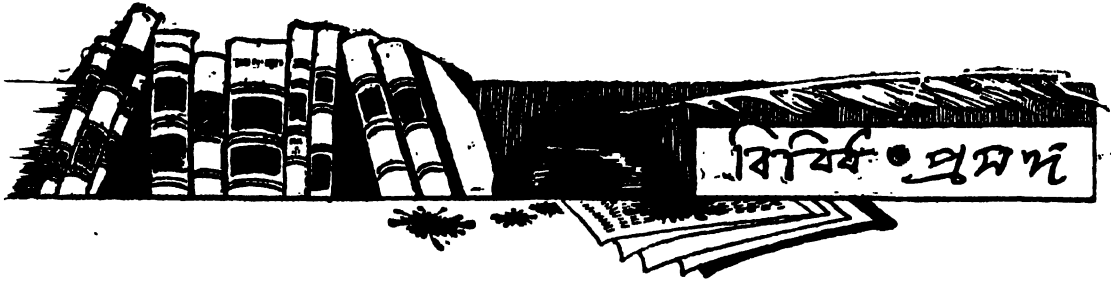
মহাত্মা গান্ধীর উপবাস

৮ই বৈশাখ হইতে মহাত্মা গান্ধী একুশ দিনের উপবাস আরম্ভ করিয়াছেন। ইহা দেশব্যাপী উদ্বেগের কারণ হইয়াছে। পরম মানবপ্রেমিক ত্যাগী তাঁহার মত মহাপুরুষের প্রাণসংশয়ে উদ্বিগ্ন হওয়া স্বাভাবিক। ঠিক কি কারণে তিনি এবার উপবাস করিতেছেন, তাহা তিনি খুলিয়া বলেন নাই। বিশেষ করিয়া তাঁহার নিজের প্রায়শ্চিত্ত রূপে এবং নিজের চিত্তশুদ্ধির জন্য তিনি এই কঠোর ব্রত গ্রহণ করিয়াছেন, ইহা তিনি বলিয়াছেন। "হরিজন"-সেবার সহিত ইহার সম্পর্ক আছে। তিনি ইহাও বলিয়াছেন, যে, "হরিজন"দিগের সেবার সহিত সংপৃক্ত লোকদের মধ্যে কতকগুলি সাতিশয় বিক্ষোভকর দুর্নীতির দৃষ্টান্ত তাঁহার জ্ঞানগোচর হইয়াছে। যাহাদের আচরণ তাঁহাকে মর্ম্মান্তিক ব্যথা দিয়াছে, তাহাদের চেতনা হইলে এবং তাহারা অনুতপ্ত হৃদয়ে আত্মশুদ্ধিতে প্রবৃত্ত হইলে তাহাদের সম্বন্ধে তাঁহার তপস্যার উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইবে। তাঁহার নিজের যে কল্যাণের উদ্দেশ্যে তিনি উপবাস করিয়াছেন, সে কল্যাণ ত হইবেই।

মোটের উপর বুঝা যাইতেছে, "হরিজন"দিগের প্রতি গর্হিত ব্যবহারের প্রতিকার এবং তাহাদের উন্নতির জন্য যথেষ্ট চেষ্টা না হওয়ায় মহাত্মা গান্ধী উপবাস আরম্ভ করিয়াছেন।

উপবাসের দ্বারা চিত্তশুদ্ধি হইতে পারে, ইহা স্বীকার্য্য। অনুতাপ এবং প্রায়শ্চিত্তের ইহা একটি প্রণালী, তাহাও স্বীকার্য্য। একুশ দিনের কম দীর্ঘকাল উপবাস করিলেও মহাত্মা গান্ধীর উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইত কি-না, সে-বিষয়ে কোন তর্ক করা চলে না। তিনি বলিয়াছেন, তাঁহার উপবাস করিবার প্রতিজ্ঞা টলিবে না। সুতরাং তাঁহার মত দৃঢ়চিত্ত মানুষকে তাঁহারও এবং তাঁহার প্রেমাস্পদ "হরিজন"দিগেরও মঙ্গলের জন্য একুশ দিনের আগে উপবাস ভঙ্গ করিতে অনুরোধ করিলে তাহা নিষ্ফল হইবে।

এ অবস্থায় আমরা কেবল এই আশা করিতে পারি, যে, একুশ দিনের উপবাসের পরও তিনি ভগবৎকৃপায় বাঁচিয়া থাকিবেন, কিংবা যাঁহার প্রেরণায় তিনি উপবাসে প্রবৃত্ত হইয়াছেন বলিয়াছেন সেই পরমপুরুষ একুশ দিনের আগেই তাঁহাকে উপবাস ভঙ্গ করিবার প্রেরণা দিবেন।

—

অহিংস আইনলঙ্ঘন প্রচেষ্টা স্থগিত রাখিবার আদেশ

মহাত্মা গান্ধী জেল হইতে খালাস পাইবার পর ৬ সপ্তাহ বা এক মাসের জন্য অহিংস আইনলঙ্ঘন প্রচেষ্টা স্থগিত রাখিবার আদেশ প্রচার করিয়াছেন। তাহার সঙ্গে সঙ্গে গবর্ন্মেণ্টকে অহিংস আইনলঙ্ঘক রাজনৈতিক বন্দীদিগের মুক্তি দিতে এবং অর্ডিন্যান্স-সমূহ রদ করিতে অনুরোধ করিয়াছেন। মহাত্মা গান্ধী সন্ধিপ্রবণতার প্রমাণ দিয়াছেন। এখন গবর্ন্মেণ্ট কি করেন, দেখা যাক্।

—

উপবাসান্তে গান্ধীজী কি করিবেন

মহাত্মা গান্ধী বলিয়াছেন, একুশ দিন উপবাসের পর তিনি বাঁচিয়া থাকিলে বিলাত হইতে ফিরিয়া আসিবার পর এবং কারাগারে প্রেরিত হইবার পূর্ব্বে ভারত-গবর্ন্মেণ্টের সহিত তাঁহার কথাবার্ত্তা যেখানে থামিয়াছিল, সেইখান হইতে আবার সন্ধিস্থাপনসংক্রান্ত আলোচনা আরম্ভ করিবেন।

মহাত্মা গান্ধী উপবাসান্তে আবার ধৃত ও বন্দীকৃত হইতে প্রস্তুত থাকিবেন।

—

উপবাস ও সমাজসংস্কার

মহাত্মা গান্ধী পুণা-চুক্তির আগে যে উপবাস করিয়াছিলেন, তাহাতে যে কোন সুফল হয় নাই এমন নয়। কিছু সুফল হইয়াছে। কিন্তু মানুষ দীর্ঘকাল যে-সব ধারণা পোষণ করিয়া আসিয়াছে, তাহা অতি সত্বর পরিত্যক্ত হয় না; যে-সব সামাজিক রীতি বহু শতাব্দী চলিয়া আসিতেছে, তাহা হঠাৎ পরিবর্তিত বা বিনষ্ট হয় না। তাঁহার উপবাসে ভীত হইয়া তাঁহার প্রাণ রক্ষা করিবার জন্য মানুষ কোন কোন কু-সংস্কার ত্যাগ করিবার, কোন কোন সামাজিক প্রথা সংশোধন বা বিনাশ করিবার অকপট মনোভাব কথায় ও কাজে প্রকাশ করিলেও, যখনই তাঁহার প্রাণসংশয়ের ভয় চলিয়া যায়, তখনই কু-সংস্কার ও কু-প্রথাগুলা আবার নিজের প্রভাব স্থাপন করিবার উপক্রম করে, তাঁহার প্রাণসংশয়ে যাহারা ভীত হইয়াছিল তাহারা আত্মশুদ্ধি ও সমাজসংস্কারে শিথিলপ্রযত্ন ও উদাসীন হইতে আরম্ভ করে।

অতএব, উপবাস-প্রবণতা যাঁহার বা যাঁহাদের মধ্যে আছে তাঁহাদিগকে উপবাস হইতে নিবৃত্ত করিবার ব্যর্থ চেষ্টা না করিলেও আমাদিগকে বলিতে হইতেছে, যে, আত্মশুদ্ধি ও সমাজসংস্কার বিষয়ে স্থায়ী ফললাভের জন্য মানুষের জ্ঞানবৃদ্ধির প্রয়োজন, ধর্ম্মবুদ্ধিকে জাগান আবশ্যক, এবং ফললাভের জন্য কিছু ধৈর্য্য অবলম্বনও আবশ্যক। পৃথিবীতে হিন্দু সমাজে এবং অন্যান্য সমাজে মানুষের হৃদয়ের পরিবর্ত্তন এবং সমাজের সংশোধন প্রাচীন কাল হইতে আগে আগেও অনেক মহাপুরুষ এবং তাঁহাদের সহকর্ম্মী ও অনুচরদের চেষ্টায় হইয়াছে। তাঁহারা উপবাস দ্বারা সেই সকল মহা পরিবর্ত্তন ঘটান নাই বলিয়া এখনও কাহারও উপবাস করা অনাবশ্যক এমন কথা যেমন বলা যায় না, তেমনি ইহাও বলা যায় না, যে, আগেকার সমাজ-হিতৈষীদের কার্য্যপ্রণালী পরিত্যাজ্য। মানবসমাজে নব নব পন্থার উদ্ভাবন ও আবির্ভাব আবশ্যক, কিন্তু প্রাচীন পন্থা প্রাচীন বলিয়াই বর্জ্জনীয় হইতে পারে না। নবীন বা প্রাচীন, কার্য্যকর যাহা, তাহাই অবলম্বনীয়।

প্রাচীন পন্থার মধ্যে যাহা কার্য্যকর, মহাত্মা গান্ধী তাহা একেবারে ত্যাগ করিয়াছেন, এমন কথা বলিলে মিথ্যা কথা বলা হইবে। তিনি তাহা করেন নাই। কিন্তু তিনি নিজের কার্য্যপ্রণালীতে, উপবাসের উপর খুব বেশী গুরুত্ব আরোপ করিয়াছেন বলিতে হইবে। উপবাসের রীতি প্রাচীন, মহাত্মাজী কর্ত্তৃক উহার প্রয়োগ অনেকটা নূতন এবং সম্পূর্ণ অনন্যসাধারণ ও অনতিক্রান্ত।

মানবসমাজের ভ্রান্ত ধারণা, কুসংস্কার, কুরীতি ও দুর্নীতি দূর করিবার জন্য কেবল জ্ঞানবৃদ্ধি ও তর্কযুক্তি সব সময়ে যথেষ্ট ফলপ্রদ হয় না, ইহা স্বীকার্য্য। মানুষের হৃদয়মনকে সচেতন ও সচল করিবার জন্য অলোক-সামান্য কোনও দুঃখবরণ, কোনও ত্যাগের প্রবল আঘাত কখন কখন আবশ্যক হয়। কিন্তু সেই উপায় পুনঃপুনঃ অবলম্বিত হইলে প্রথমে যত কার্য্যকর হয়, পরে তত না হইবার সম্ভাবনা। কারণ, মানুষের মন উহাতে অভ্যস্ত হইয়া পড়িতে পারে।

বঙ্গে নারীর সংখ্যা কম কেন?

কোন কোন সময়ে, কোন কোন দেশে, কোন কোন শ্রেণীতে বা ধর্ম্মসম্প্রদায়ের মধ্যে ছেলে বা মেয়ে বেশী জন্মগ্রহণ কেন করে, তাহার বৈজ্ঞানিক কারণ আবিষ্কৃত হয় নাই। কোন দেশে হয়ত এক সময়ে পুরুষের চেয়ে নারীর বা নারীর চেয়ে পুরুষের সংখ্যা বেশী থাকে; অন্য সময়ে হয়ত তাহার বিপরীত অবস্থা ঘটে। এরূপ অবস্থান্তর ঘটিবার সমুদয় কারণ নির্দ্ধারিত হয় নাই। কিন্তু নারীর চেয়ে পুরুষের সংখ্যাধিক্যের কারণ কোন কোন স্থলে সুস্পষ্ট। বঙ্গে তাহা হইবার কারণের বিষয় কিছু আলোচনা করিব।

সরকারী হিসাবে এখন যাহা বাংলা দেশ, ১৯৩১ সালের সেন্সস অনুসারে তাহার লোকসংখ্যা ৫,১০,৮৭,৩৩৮। তাহাদের মধ্যে ২,৬৫,৫৭,৮৬০ জন পুরুষ, ২,৪৫,২৯,৪৭৮ জন নারী। পুরুষের চেয়ে নারীর সংখ্যা ২০,২৮,৩৮২ কম। কোন কোন দেশে ও প্রদেশে প্রতি হাজার পুরুষে নারীর সংখ্যা কত, তাহা নীচের তালিকায় দেখান হইল।

দেশ বা প্রদেশ	প্রতি হাজার পুরুষে নারীর সংখ্যা
ভারতবর্ষ	৯৪১
ইংলণ্ড ও ওয়েল্‌স্	১০৮৭
মাদ্রাজ	১০২২
বিহার-উড়িষ্যা	১০০৮
মধ্যপ্রদেশ-বেরার	১০০০
ব্রহ্মদেশ	৯৫৮
বঙ্গ	৯২৪
আসাম	৯০৯
বোম্বাই	৯০৯
আগ্রা-অযোধ্যা	৯০৪
পঞ্জাব	৮৩১

বাংলা দেশে প্রতি হাজার পুরুষে বর্দ্ধমান ডিবিজনে স্ত্রীলোকের সংখ্যা ৯৪২, প্রেসিডেন্সী ডিবিজনে ৮৪৬, রাজসাহী ডিবিজনে ৯২২, ঢাকা ডিবিজনে ৯৪৭, এবং চট্টগ্রাম ডিবিজনে ৯৮৩। জেলার মধ্যে স্ত্রীলোকের আনুপাতিক সংখ্যা সকলের চেয়ে বেশী চট্টগ্রামে, ১০৫৯, তাহার পর মুর্শিদাবাদে ১০০৬, এবং তাহার পর বীরভূমে ১০০৫। জেলার মধ্যে সকলের চেয়ে কম হাবড়ায়, ৮৩৪। কলিকাতায় খুব কম, ৪৬৮।

বাংলা দেশে স্ত্রীলোকের চেয়ে পুরুষের সংখ্যা বেশী হওয়ার একটি কারণ এই, যে, অন্যান্য প্রদেশ হইতে যত লোক বাংলা দেশে আসে, বাংলা দেশ হইতে তত লোক অন্যান্য প্রদেশে যায় না; এবং যাহারা বঙ্গে আসে তাহাদের অধিকাংশ পুরুষ। আমরা 'প্রবাসী'র আগেকার এক সংখ্যায় বঙ্গে হিন্দীভাষী প্রভৃতি অবাঙালীদের সংখ্যার যে তালিকা দিয়াছিলাম, তাহা হইতেই বুঝা যায়, উপার্জ্জনের জন্য কত লোক অন্যান্য প্রদেশ হইতে বাংলায় আসিয়া থাকে।

১৮৮১ সাল হইতে প্রত্যেক দশবার্ষিক সেন্সসে বঙ্গে স্ত্রীলোকদের আনুপাতিক সংখ্যা কমিয়া আসিতেছে, ১৮৮১ সালে প্রতি হাজার পুরুষে স্ত্রীলোকদের সংখ্যা ছিল ৯৯৪; তাহার পর ১৮৯১ সালে উহা হয় ৯৭৩, তাহার পর ক্রমশঃ কমিয়া ১৯৩১ সালে ৯২৪ হইয়াছে।

এই ক্রমহ্রাসের একটা কারণ এই হইতে পারে, যে, বাংলা দেশে (প্রধানতঃ অবাঙালীদের) কলকারখানা ও ব্যবসা বাড়িতেছে এবং তাহাদের জন্য বাংলা দেশ যথেষ্ট শ্রমিক ও অন্য কর্ম্মী জোগাইতে না পারায় অন্যান্য প্রদেশ হইতে শ্রমিকেরা ও অন্যান্য কর্ম্মীরা ক্রমশঃ অধিক সংখ্যায় আসিতেছে।

কিন্তু বঙ্গে স্ত্রীলোকদের আনুপাতিক সংখ্যা ক্রমাগত কমিয়া আসিবার উহাই এক মাত্র কারণ নহে। ১৮৮১ সাল হইতে আরম্ভ করিয়া ১৯৩১ সাল পর্য্যন্ত প্রত্যেক দশবার্ষিক লোকসংখ্যাগণনায় দেখা যাইতেছে, যে, প্রতি হাজার পুরুষজাতীয় শিশুর জন্মে যত স্ত্রীজাতীয় শিশু জন্মগ্রহণ করে, তাহাদের সংখ্যা ক্রমাগত কমিয়া আসিতেছে। ১৮৮১ সালের সেন্সসে দেখা যায়, বঙ্গে জাত প্রতি হাজার পুরুষ শিশুতে বঙ্গে জাত স্ত্রীশিশুর সংখ্যা ছিল ১০১৩; ১৮৯১, ১৯০১, ১৯১১, ১৯২১ এবং ১৯৩১ সালের সেন্সসে ছিল যথাক্রমে ৯৯৫, ৯৮২, ৯৭০, ৯৫৪ এবং ৯৪২। বঙ্গে এই যে ক্রমাগত কম স্ত্রীজাতীয় শিশু জন্মিতেছে, ইহার কারণ কি? বঙ্গে নারীনিগ্রহ, নারীর অনাদর ও নারীর উপর অত্যাচারের ব্যাপকতা ও মাত্রায় যাহারা ব্যথিত, তাহাদের মনে স্বভাবতঃ এই চিন্তার উদয় হইতে পারে, যে, এমন দেশে বিধাতা স্ত্রীজাতীয় শিশু পাঠাইতে কার্পণ্য করিতেছেন। কিন্তু এরূপ কল্পনা বা অনুমানকে বৈজ্ঞানিক কারণ বলা যায় না। বৈজ্ঞানিক কারণের অনুসন্ধান কেহ করিয়াছেন কি-না, জানি না।

কারণ যাহাই হউক, ইহা মনে রাখা দরকার, যে, যে-দেশে বা যে-সব সমাজে ও শ্রেণীতে স্ত্রীলোকের সংখ্যা অনেক কম, তথায় জননী কম হওয়ায় লোকসংখ্যা যথেষ্ট বৃদ্ধি পায় না।

বঙ্গে কলকারখানা বৃদ্ধি এবং পুরুষের সংখ্যাধিক্য

উপরে বলিয়াছি, বঙ্গে (প্রধানতঃ অবাঙালী ধনিক-দের দ্বারা স্থাপিত) কলকারখানা ও ব্যবসা বাড়িতেছে এবং তাহাদের জন্য আবশ্যক শ্রমিক ও অন্য কর্ম্মী বঙ্গের বাহির হইতে আসিতেছে বলিয়া স্ত্রীলোক অপেক্ষা পুরুষের সংখ্যা বাড়িয়া চলিতেছে। তাহার একটি প্রমাণ ১৯৩১ সালে বঙ্গের ছোট বড় শহরে পুরুষ ও স্ত্রীলোকদের সংখ্যা হইতে পাওয়া যায়।

এই সংখ্যাগুলি নীরস সংখ্যা মাত্র। এগুলি কবিতা ও গল্পের মত আনন্দদায়ক নহে। কিন্তু এগুলি হইতে তালিকাভুক্ত প্রত্যেক শহরের লোকেরা সন্ধান লইতে পারিবেন, যে, সেখানে পুরুষনারীর সংখ্যার তারতম্যের কারণ কলকারখানা, না আর কিছু। এই দিক্ দিয়া সংখ্যাগুলি কারণজিজ্ঞাসু লোকদের কাজে লাগিতে পারে।

শহর	পুরুষ	স্ত্রীলোক
কলিকাতা	৮,১৪,৯৪৮	৩,৮১,৭৮৬
হাবড়া	১,৪৫,১২০	৭৯,৭৫৩
ঢাকা	৭৯,৩৬৫	৫৯,১৫৩
ভাটপাড়া	৬০,১৪৩	২৪,৮৪১
খড়্গপুর	৩৩,৪৪৩	২৪,৬৯১
চট্টগ্রাম	৩৫,০৪৯	১৮,১০৭
টিটাগড়	৩৪,২৫২	১৫,৩৩২
বর্দ্ধমান	২৩,৪৮৫	১৬,১৩৩
সাউথ সুবার্ব্যান	২২,১৮৩	১৭,৩১৬
শ্রীরামপুর	২৩,৯৮৫	১৫,০৭১
বরানগর	২৩,১১৬	১৩,৯৩৪
বরিশাল	২৩,৫৮৮	১২,১২৮
নারায়ণগঞ্জ	২১,৫২৬	১২,৬৬৩
হুগলী-চুঁচুড়া	১৮,৭৯৯	১৩,৮৩৫
সিরাজগঞ্জ	১৭,৯৮১	১৪,৪৮৬
মেদিনীপুর	১৭,৮০৭	১৪,২১৪
বাঁকুড়া	১৭,২৮০	১৪,৪২৩
কুমিল্লা	১৮,৫৩০	১২,৮৩৫
আসানসোল	১৮,৭১০	১২,৫৭৬
নৈহাটী	২০,১২৩	১০,৭৮৫
মৈমনসিং	১৯,৭৩৩	১০,৭৪৭
বালী	২০,৯৪৪	৯,৪০৩
কামারহাটী	২০,০৮৭	১০,২৪৭
বহরমপুর	১৫,১৬৬	১২,২৩৭
রাজশাহী	১৫,১৭৮	১১,৮৮৬
মাদারীপুর	১৫,২০৪	১১,৬৯০
রিষড়া-কোন্নগর	১৭,৫২৮	৯,৩৪০
ব্রাহ্মণবাড়িয়া	১৩,৯৭৩	১২,৬৮৯
চাঁপদানী	১৭,৪৯৭	৭,৮৬৮
শান্তিপুর	১২,০১৬	১২,৯৭৬
টালিগঞ্জ	১৪,৮০০	৯,৬৭৬
কৃষ্ণনগর	১২,৮০৭	১১,৪৭৭
বজবজ	১৫,৫১৪	৮,৬৬৯
জামালপুর	১২,৬২৯	১০,৪৪৮
ভদ্রেশ্বর	১৪,৯৩৮	৮,০৫৪
পাবনা	১১,৯৭০	৯,৯৩৪
বসিরহাট	১১,১০৬	১০,১৮১
রংপুর	১২,৮০৮	৭,৯৪১

শহর	পুরুষ	স্ত্রীলো
দার্জিলিঙ্	১১,৩২৮	৮,৫৭৫
বিষ্ণুপুর	৯,৭৬৭	৯,৯২৯
শেরপুর	১০,৫৪৫	৯,০০২
দিনাজপুর	১১,৭৬৩	৭,৩৯৩
খুলনা	১১,৯৬৮	৭,১৫২
জলপাইগুড়ী	১১,৯৯৫	৬,৯৬৭
নবদ্বীপ	৮,৯১২	৯,৯৪৯
বৈদ্যবাটী	১০,৩৬৯	৮,১১৭
দক্ষিণ দমদমা	১১,৯৮৩	৬,৪৮৮
ইংলিশ বাজার	৯,৩৮৭	৭,৫২০
চাঁদপুর	১১,৪৪৩	৫,৩৯৫
হালিশহর	১২,১৭৮	৪,৫৮২
সৈদপুর	৯.৭২০	৬,৭৯৯
রাণীগঞ্জ	৯,১৬২	৭,২১১
উত্তর বারাকপুর	৯,৭৫১	৬,৫০৭
টাঙ্গাইল	৮,৭৩৯	৭,৩৪৩
নবাবগঞ্জ	৭,৪৯৭	৮,৩২৯
ফরিদপুর	৯,৪২৭	৬,০৮৯
কিশোরগঞ্জ	৮,৬২৪	৬,১৮৩
কাঁচড়াপাড়া	১০,১১৩	৪,৮৯২
বগুড়া	৮,৬৭৮	৬,১৪১
বারাকপুর	৯,৩১৮	৫,০৯৫
বাঁশবেড়িয়া	৯,৭৯৭	৪,৪২৪
গারুলিয়া	৯,২৮২	৪,৭৫১
বাদুড়িয়া	৭,১৬৯	৬,৫০৮
নোয়াখালি	৭,৮০৮	৫,২৫৫
জঙ্গীপুর	৬,২৮৩	৬,৫১৩
কান্দী	৬,৪০৩	৬,২১৩
ঘাটাল	৬,৪২২	৫,৯৭৮
কুচবেহার	৭,১৪৪	৪,৬৯৩
পানিহাটী	৬,৭৩৮	৪,৯৬১
বাজিতপুর	৫,৬৩২	৬,০১৮
কুলটী	৭,১৮০	৪,৩৯৪
রাজপুর	৫,৭৮৮	৫,৬৪৫
রাণাঘাট	৬,৩৩৪	৫,০৬১
যশোর	৭,০৮৪	৪ ২৭২
সাতক্ষীরা	৬,০৭১	৫,১৭০
জিয়াগঞ্জ-আজিমগঞ্জ	৫,৭৭৪	৫,২২৪
সোনামুখী	৫,৩৩৭	৫,৬৫২
বারাকপুর ক্যাণ্টনমেণ্ট	৭,০০২	৩,৯৮০
নেত্রকোণা	৬,৮৪৮	৪,১৩২
পিরোজপুর	৬,০৬২	৪,৮৯৭
সিউড়ী	৬,০৮৯	৪,৮১৯
ফেণী	৬,৩৮৯	৪,৪৮৬
রামপুরহাট	৫,৫২৫	৪,৪৪৪
ধুলিয়ান	৪,৭০৩	৫,০৬৪
জয়নগর	৫,১৩৯	৪,৬১৬
আগরতলা	৫,৫৪৭	৪,০৩৩

শহর	পুরুষ	স্ত্রীলোক
কালনা	৫,১৫৯	৪,৩৯৮
মুর্শিদাবাদ	৪,৯০৪	৪,৫৭৯
কুষ্টিয়া	৫,৬৮৮	৩,৭১৭
উত্তরপাড়া	৫,৪৮০	৩,৮৭০
তমলুক	৪,৯৯৮	৪,০৯৭
কালিমপং	৪,৮৭০	৩ ৯০৬
বেলডাঙ্গা	৪,৪৪৩	৪,৩০২
বারাসত	৪,৭৩০	৩,৯৪২
গাইবাঁধা	৫,১৪৩	৩,৩৩৬
কুড়িগ্রাম	৪,৯৩৬	৩,৫১৬
নাটোর	৪,৬৩৭	৩,৬৮১
টাকী	৪,২৬৩	৩,৯৭১
কাটোয়া	৩,৯২৮	৩,৮৪৪
আরামবাগ	৩,৯১৩	৩,৫৪৮
কার্সিয়ং	৪,০১৪	৩,৪৩৭
কোটরং	৪,১৫৮	৩,০০২
রাজবাড়ী	৪,১৯৪	২,৯১০
ঝালকাটি	৪,৮৮২	১,৬১৪
বারুইপুর	৩,৭০৯	২,৭৭৪
পটুয়াখালি	৪,০৩৯	২,৩৯৫
গৌরীপুর	৩,৬৬৫	২,৬৫৪
রামজীবনপুর	৩,২১৬	৩,০১৪
মেহেরপুর	৩,২৪১	২,৯৬৪
মুক্তাগাছা	৩,৪৪১	২,৬৯০
কোটচাঁদপুর	৩,৩০৯	২,৮০৬
শিলিগুড়ি	৪,১৮২	১,৮৮৫
খড়দহ	৩,৩৩৪	২,৬৮৪
চন্দ্রকোণা	৩,১২৭	২,৮৮৯
বার্ণপুর	৪,৫২৬	১,২১৪
খড়ার	২,৯৬৩	২,৭৭৩
ভোলা	৩,৭০৯	১,৮৪৯
দমদমা	৪,০৩৬	১,৩১৪
কাঁথি	৩,০২১	২,২৩৮
কক্সবাজার	২,৬৪২	২,৩৭৬
দেবহাটা	২,৪৫৪	২,৫০০
পাত্রশায়ের	২,৫১২	২,৩৪২
দাঁইহাট	২,৪৩৭	২,৪০৮
লালমণিরহাট	৩,২২৮	১,৪৬৩
উত্তর দমদমা	২,৫৪৪	১,৯৯১
গোবরডাঙ্গা	২,২৯৮	২,২২৭
নীলকামারী	২,৭৭৮	১,৬২৭
শেরপুর	২,৩৩৯	১,৯৪০
চাকদহ	২,০১৬	১,৯৭০
ক্ষীরপাই	১,৮৫১	১,৮৪২
কুমারখালি	১,৭৫১	১,৬১১
মহেশপুর	১,৭১৪	১,৬০৭
অণ্ডাল	২,০৫৫	১,০৫৫
নওগাঁও	১,৯৮৬	১,১১৮
পুরাতন মালদহ	১,৪৬৮	১,৩১১
দিনহাটা	১,৬২৯	৮৮৭
ডোমার	১,৪৩৯	১,০৩২
মাথাভাঙা	১,৫২১	৯১০
বীরনগর	১,২৬৫	১,০৭৬
নলচিটি	১,২৬১	৬৮৫
হলদিবাড়ী	৮৩১	৪১৫
জলাপাহাড়	৪২১	২৯৭
লেবং	৩৫২	২১২

যে-সব জায়গায় স্ত্রীলোকের সংখ্যা অত্যন্ত কম, তথাকার ও তাহার নিকটবর্ত্তী স্থানসমূহের স্থায়ী বাসিন্দা পুরুষদের বুঝা উচিত—বিশেষ করিয়া তন্মধ্যে বেকার পুরুষদের বুঝা উচিত—যে, তাঁহারা তথাকার সব রকম কাজ করিতে না পারায় বাহির হইতে পুরুষ কর্ম্মীরা আসিয়াছেন।

—

বঙ্গে বেকার বেশী, অথচ আগন্তুকও বেশী

বঙ্গে কলকারখানা ও ব্যবসা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে বাহির হইতে (প্রধানতঃ পুরুষজাতীয়) শ্রমিক ও অন্য কর্ম্মী আসায় এখানে পুরুষের সংখ্যা বেশী হইয়াছে। ইহা হইতে প্রশ্ন উঠে, তবে কি বঙ্গের প্রাপ্তবয়স্ক বাঙালী পুরুষেরা বা তাহাদের অধিকাংশ বরাবর রোজগারের কাজে লাগিয়া আছে, এবং কাজ বাড়ায় সেই জন্য বাহির হইতে মানুষের আমদানী হইয়াছে? দুঃখের বিষয় অবস্থাটা সেরূপ নয়। অবস্থা সেরূপ হইলে ত বাঙালীদের দুর্ভাবনার কোন কারণ থাকিত না।

বাঙালীর দুর্ভাবনার কারণ এই, যে, বঙ্গে শতকরা বেকারের সংখ্যা ভারতবর্ষের অন্য সব প্রদেশের চেয়ে বেশী, আমার বঙ্গে আগন্তুকের সংখ্যাও অন্য সব প্রদেশের চেয়ে বেশী। তাহার কারণ নানাবিধ। একটা কারণ এই হইতে পারে, যে, আগন্তুক অবাঙালীরা যে-যে রকমের দৈহিক শ্রম, কারিগরী ও ব্যবসার কাজ করে, বাঙালী শ্রমিক, কারিগর ও ব্যবসাদার শ্রেণীর লোকেরা তাহা করিতে চায় না বা করিতে পারে না। আর একটা কারণ এই হইতে পারে, যে, ঐ রকম কাজে বাঙালী শ্রমিক, কারিগর ও ব্যবসাদার

শ্রেণীর লোকেরা অবাঙালী সেই সেই শ্রেণীর লোকদের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় আঁটিয়া উঠে না। হয়ত দুই রকম কারণেই বর্ত্তমান অবস্থা ঘটিয়াছে। এই দুটি কারণের মূলে বঙ্গের বহুবর্ষব্যাপী রোগজীর্ণতা নিশ্চয়ই আছে। আর একটি কারণ এই, যে, বঙ্গের অধিকাংশ লোক দীর্ঘকাল হইতে কৃষক বা কৃষিজীবী; কলকারখানা ও ব্যবসা-বাণিজ্যের জন্য যেরূপ মনের ভাব এবং অভ্যাসাদির প্রয়োজন, তাহাদের তাহা জন্মিতে বিলম্ব হইতেছে এবং ইত্যবসরে অবাঙালীরা আসিয়া কার্য্যক্ষেত্র দখল করিতেছে। বঙ্গের দেশী কুটীরপণ্যশিল্পে যাহাদের অন্ন হইত, তাহারা দেশী ও বিদেশী কলকারখানার প্রতিযোগিতায় ক্রমশঃ অধিক সংখ্যায় বেকার ও নিরন্ন হইতেছে, নূতন রকমের পণ্যশিল্প বা অন্য কোন রোজগারের কাজে প্রবৃত্ত ও অভ্যস্ত হইবার সুযোগ পাইতেছে না বা করিয়া লইতে পারিতেছে না।

বাঙালীদের মধ্যে যাঁহাদিগকে শিক্ষিত শ্রেণীর লোক বলা হয়, তাঁহারা সরকারী ও বেসরকারী চাকরি এবং ব্যারিষ্টরী, ওকালতী, মোক্তারী, ডাক্তারী প্রভৃতি করিতে অভ্যস্ত বা ইচ্ছুক। ব্যবসা-বাণিজ্যের দিকে তাঁহাদের ঝোঁক ছিল না বা কম ছিল। এখন কিছু বাড়িয়াছে, কিন্তু যথেষ্ট বাড়ে নাই। আবার, যাঁহাদের এই ঝোঁক জন্মিয়াছে, তাঁহারা অনেকে মূলধনের অভাব, অভিজ্ঞতার অভাব, বা ব্যবসার প্রারম্ভিক অনিশ্চিত আয়ের উপর নির্ভর করিবার সাহসের অভাব বশতঃ ব্যবসা-বাণিজ্যে প্রবৃত্ত হইতে পারেন না।

বঙ্গে বিস্তর অবাঙালীর অন্নসংস্থান হয়, অথচ বাঙালী বেকারের সংখ্যা কেন অনেক বেশী, তাহার কিছু কারণের আভাস দিলাম। এই সমুদয় কারণের উচ্ছেদ সাধন করিতে হইবে। নতুবা বাঙালীর ভবিষ্যৎ অন্ধকারময় থাকিবে। হিন্দু বাঙালী মুসলমান বাঙালী উভয়ের পক্ষেই একথা প্রযোজ্য।

এখন বাংলা দেশে যে অকর্ম্মা বা বেকারদের শতকরা সংখ্যা অন্যান্য প্রদেশের চেয়ে বেশী, তাহা দেখাইতেছি।

১৯৩১ সালের সেন্সস অনুসারে বঙ্গের রোজগারী লোকদিগকে এবং তাহাদের কর্ম্মিষ্ঠ পোষ্যদিগকে (earners and working dependants) এক শ্রেণীতে ফেলিয়া, অ-কর্ম্মী পোষ্যদিগকে যদি আর এক শ্রেণীতে ফেলা যায়, তাহা হইলে দেখা যাইবে, যে, প্রথম শ্রেণীতে পড়ে শতকরা ২৯ জন এবং দ্বিতীয় শ্রেণীতে পড়ে শতকরা ৭১ জন। অর্থাৎ বঙ্গের শতকরা ৭১ জন নিজের ভরণপোষণের জন্য পরিশ্রম করে না, করিবার মত বয়স হয় নাই, সামর্থ্য নাই, উদ্যোগ ও ইচ্ছা নাই বা সুযোগ নাই। ১৯৩১ সালের সেন্সস অনুসারে সমগ্র ভারতবর্ষের ও বাংলা ছাড়া অন্যান্য প্রদেশের কর্ম্মী ও বেকারদের শতকরা সংখ্যা কত তাহা জানি না। কারণ সব সেন্সস রিপোর্ট প্রকাশিত বা আমাদের হস্তগত হয় নাই। কিন্তু ১৯২১ সালের সেন্সস অনুসারে কর্ম্মহীনতার তালিকায় বঙ্গের স্থান সকলের নীচে ছিল দেখা যায়। এখন সে অবস্থার পরিবর্ত্তন হইয়াছে মনে হয় না। ১৯২১ সালের সেন্সস অনুযায়ী তালিকা নীচে দিতেছি।

প্রদেশ	শতকরা কর্ম্মী	শতকরা অ-কর্ম্মী
আসাম	৪৬	৫৪
বাংলা	৩৫	৬৫
বিহার-উড়িষ্যা	৪৯	৫১
বোম্বাই	৪৪	৫৬
মধ্যপ্রদেশ ও বেরার	৫৮	৪২
মান্দ্রাজ	৪৮	৫২
উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত	৩৭	৬৩
পঞ্জাব	৩৬	৬৪
আগ্রা-অযোধ্যা	৫৩	৪৭
ভারতবর্ষ	৪৬	৫৪

বাংলা দেশ অন্য সব প্রদেশের চেয়ে মোট লোকসংখ্যায় জনবহুল, আবার প্রতি বর্গমাইলে বঙ্গে যত লোক বাস করে অন্য কোন প্রদেশে তত লোক বাস করে না। এত বেশী লোক প্রতি বর্গমাইলে যে দেশে থাকে, পণ্যশিল্পের কলকারখানা কিংবা কুটীরপণ্যশিল্পের খুব প্রাচুর্য্য ভিন্ন সে দেশ ত দরিদ্র হইবেই, এবং সেখানে বেকারের সংখ্যাও বেশী হইবে। ইহা স্বাভাবিক। কিন্তু বঙ্গে এত বেশী মানুষ থাকা সত্ত্বে এখানকার মাটিতে স্থাপিত কলকারখানা প্রভৃতি চালাইবার জন্য যে বাহির হইতে লোক আসে, এই অবস্থাটা অস্বাভাবিক। ইহা হইতে বুঝিতে হইবে, কতক রকমের কাজের জন্য বাঙালীদের

অযোগ্যতা কিংবা তৎসম্বন্ধে অনিচ্ছা ও ঔদাসীন্য আছে। এই অযোগ্যতা অনিচ্ছা বা ঔদাসীন্য অনিবার্য্য বা অপ্রতিবিধেয় নহে। ইহার প্রতিকার প্রত্যেক বাঙালী পরিবারের কর্ত্তা-কর্ত্রীকে করিতে হইবে, প্রত্যেক প্রাপ্ত-বয়স্ক বাঙালী পুরুষ ও নারীকে করিতে হইবে।

কতকগুলি দেশের প্রতি বর্গমাইলে কত মানুষ বাস করে, তাহার একটি তালিকা দিতেছি। ১৯৩৩ সালের হুইটেকারের পঞ্জিকা হইতে সংখ্যাগুলি গৃহীত।

দেশ	প্রতি বর্গমাইলে লোকসংখ্যা
ভারতবর্ষ	১৯৫
বেলজিয়ম	৭০২
হল্যাণ্ড	৬২৭
ইংলণ্ড	৭৩৪
জার্ম্যানী	৩৪৮
ফ্রান্স	১৯২
আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্র (U. S. A.)	৩৬
জাপান	৩২১

১৯২১ সালের সেন্সস হইতে ভারতবর্ষের কয়েকটি প্রদেশের বসতির ঘনতা নীচের তালিকায় প্রদর্শিত হইল।

প্রদেশ	প্রতি বর্গমাইলে লোকসংখ্যা
বাংলা	৬০৮
বিহার	৫৫২
উড়িষ্যা	৩৬২
আসাম	১৪৩
ছোটনাগপুর	২০৯
বোম্বাই	২০৮
ব্রহ্মদেশ	৫৭
মধ্যপ্রদেশ	১৩২
বেরার	১৭৩
মান্দ্রাজ	২৯৭
উ-প সীমান্ত	১৬৮
পঞ্জাব	২০৭
আগ্রা	৪০৪
অযোধ্যা	৫০৪

এ পর্য্যন্ত জানা গিয়াছে, যে, ১৯৩১ সালের সেন্সস অনুসারে প্রতি বর্গমাইলে বঙ্গে ৬১৬, আগ্রা-অযোধ্যায় ৪৪২, মান্দ্রাজে ৩২৮, বিহার-উড়িষ্যায় ৩৭৯, পঞ্জাবে ১৩৩, বোম্বাইয়ে ১৭৩, মধ্যপ্রদেশে ও বেরারে ১৩৭, উত্তর-পশ্চিম সীমান্তে ১২৯, এবং আসামে ১৩৭ জন মানুষ বাস করে। বাংলা দেশ ভারতবর্ষে সকলের চেয়ে ঘনবসতি; সুতরাং এখানে জমীর উর্ব্বরতাসত্ত্বেও জীবিকানির্ব্বাহ করা অপেক্ষাকৃত কঠিন। অথচ এখানে বাঙালী অনেকে বেকার থাকিলেও অবাঙালীরা আসিয়া রোজগার করিয়া থাকে এবং অনেকে লক্ষপতি ক্রোড়পতিও হয়। ইহা কেমন করিয়া সম্ভব হয়, তাহা ঐ অবাঙালীদের কাজকর্ম্ম ও স্বভাবচরিত্র দেখিয়া শিখিতে হইবে। তাহারা এখানে আসিয়া রোজগার করে ইহা আমাদের অভিযোগের বিষয় নহে—বাংলা দেশ যে কিরূপ রোজগারের জায়গা তাহা দেখাইয়া দিবার জন্য তাহাদের প্রতি আমাদের কৃতজ্ঞ হওয়াই উচিত। আমাদের দুঃখ এই, যে, বাঙালীরা রোজগার করিতে পারে না।

বঙ্গের অবস্থা যে নৈরাশ্যজনক নয় তাহার প্রমাণ, ইউরোপের কোন কোন দেশ বাংলা দেশের চেয়েও ঘন-বসতি হওয়া সত্ত্বেও তথাকার লোকেরা সুপুষ্ট, দারিদ্র্য-পীড়িত নয়। বাঙালীরা পণ্যশিল্পে, ব্যবসা-বাণিজ্যে এবং উৎপাদনবৃদ্ধিকর বৈজ্ঞানিক কৃষিপ্রণালীতে মনোযোগী হইলে তাহারাও সুপুষ্ট হইবে, দারিদ্র্যপীড়িত থাকিবে না।

সরকারী বাংলা প্রদেশ যত ঘনবসতি, ভৌগোলিক বাংলা দেশ তত ঘনবসতি নহে। যে ভূখণ্ডের অধিকাংশ অধিবাসীর ভাষা বাংলা, আমরা তাহাকেই ভৌগোলিক বাংলা দেশ বলিতেছি। সরকারী আসাম, বিহার ও ছোট-নাগপুরের অনেক অংশ এই ভৌগোলিক ও স্বাভাবিক বঙ্গের অন্তর্গত। আসাম ও ছোটনাগপুর বিরলবসতি। সুতরাং বাংলা দেশের অঙ্গচ্ছেদ না করিয়া যদি উহাকে স্বাভাবিক ও ভৌগোলিক থাকিতে দেওয়া হইত, তাহা হইলে বঙ্গদেশ এত বেশী ঘনবসতি মনে হইত না, বাঙালীরা একটু হাত-পা ছড়াইবার জায়গা পাইত এবং অপেক্ষাকৃত সঙ্গতিপন্নও হইতে পারিত। সঙ্গতির কথায় মনে পড়িতেছে, যে, স্বাভাবিক বঙ্গের অন্তর্গত ও ছোটনাগপুর উপ-প্রদেশভুক্ত অনেক স্থান খনিজ ঐশ্বর্য্যের জন্য বিখ্যাত। সরকারী ব্যবস্থা দ্বারা সেগুলিকে বঙ্গের বাহিরে ফেলা হইয়াছে।

বিরলবসতি নানা অঞ্চলে গিয়া বসবাস করা বাঙালীদের কর্ত্তব্য।

—

নারীসংখ্যার ন্যূনতার নৈতিক কুফল

যাঁহারা ধর্ম্মভাবের প্রেরণায় সন্ন্যাস অবলম্বন করেন এবং সেই ধর্ম্মভাব অটুট রাখিতে পারেন, তাঁহারা পরিবারী হইয়া বাস না করিলেও তাঁহাদের চারিত্রিক অবনতি হয় না। কিন্তু ধর্ম্মভাব বজায় রাখা অনেকের পক্ষে কঠিন। সেই জন্য সন্ন্যাসপ্রধান ধর্ম্মসম্প্রদায়ের মধ্যে কতকগুলি লোকের অধঃপতন হইয়াছিল বলিয়া ইতিহাসে দেখা যায়।

যাহারা সন্ন্যাসী নহে, বিষয়কর্ম্ম উপলক্ষ্যে পারিবারিক প্রভাব হইতে দূরে জীবন যাপন করে অথচ অন্য সব সাধারণ মানুষের মত উপার্জ্জন ও ব্যয় করে, আমোদ-প্রমোদ চায়, তাহাদের চারিত্রিক অবনতি ঘটিবার বিশেষ সম্ভাবনা ঘটে। এই জন্য, যে সব বড় বড় শহরে এবং কলকারখানার নিকটস্থ যে-সকল শ্রমিক-উপনিবেশে বিস্তর লোক অপরিবারী হইয়া বাস করে, সেই সকল স্থানে সামাজিক অপবিত্রতা অধিক দেখা যায়। কলকারখানা ও ব্যবসা চালাইবার জন্য বঙ্গে অপরিবারী বিস্তর লোকের আগমন দ্বারা এই দিকে আমাদের বিশেষ ক্ষতি হইয়াছে। বাংলা দেশে কলকারখানা ও ব্যবসা বাড়িবার পূর্ব্বে অপবিত্রতা ছিল না বলিতেছি না। কিন্তু তাহার আগে বঙ্গের নৈতিক অবস্থা যাহা ছিল, কলকারখানার সন্নিহিত স্থানগুলিতে এখন তাহা পূর্ব্বাপেক্ষা নিকৃষ্ট হইয়াছে। এই জন্য যাঁহারা নূতন কারখানা স্থাপন করিতেছেন, তাঁহাদিগের দেখা কর্ত্তব্য আশপাশের পরিবারী লোকদের দ্বারা কাজ চালান যায় কি-না। তাহা একেবারে অসাধ্য হইলে শ্রমিকদের বাসগৃহের ব্যবস্থা এমন করা উচিত যাহাতে তাহারা সপরিবারে থাকিতে পারে।

—

বঙ্গের দারিদ্র্য ও পরাধীনতা

ভারতবর্ষ ইংরেজদের অধীন। এ-বিষয়ে সব প্রদেশ সমান। অন্য কোন কোন বিষয়ে কোন কোন প্রদেশের পরাধীনতা বেশী। বাংলা দেশের কথা ধরা যাক। ভারতবর্ষের যে-সব অঞ্চলের লোক সৈন্যদলে সিপাহী হইতে পারে, তাহারা স্বদেশের স্বাধীনতা রক্ষা করে না বটে, তথাপি স্বরাজ আসিলে তাহারা দেশরক্ষার কাজ করিতে পারিবে বলিয়া তাহাদের মর্য্যাদা সেই সব প্রদেশের লোকদের চেয়ে পরোক্ষ ভাবে কিছু বেশী যথাকার লোকেরা সিপাহী হইতে পারে না—যেমন বাংলা দেশ। তারপর বাংলা দেশকে সায়েস্তা রাখিবার জন্য কনষ্টেবল পাহারাওয়ালা আসে বিহার হইতে, দমনাত্মক কাজ করিবার জন্য মানুষ আসে নেপাল পঞ্জাব উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ গঢ়োয়াল প্রভৃতি অঞ্চল হইতে।

ইংরেজের অধীনতার নীচে ইহা আর এক রকমের অধীনতা।

কিন্তু এ-সব ছাড়া, বাঙালীদের দারিদ্র্যজনিত আরও কোন কোন রকমের অধীনতা বাঙালীকে শৃঙ্খলিত করিতেছে। সমাজসেবা, স্বাধীনতালাভ-প্রচেষ্টা, সংবাদপত্র পরিচালন প্রভৃতি কাজও কোন কোন স্থলে এখন বাঙালী স্বাধীনচিত্ততার সহিত করিতে পারিতেছে না। বাঙালীর কাহারও টাকা নাই এমন নয়; কিন্তু যাহাদের টাকা আছে তাহারা অনেকে জনহিতকর কাজে টাকা দিতে চায় না। নগদ টাকা আছে প্রধানতঃ অবাঙালীদের হাতে। তাহারাও কেহ কেহ টাকা দেয়, অনেকে দেয় না। যাহারা কোন কাজে টাকা দেয় তাহারা স্বভাবতঃ সেই কাজ নিজেদের নির্দ্দেশ অনুসারে করাইতে চায়। তাহাতে সব সময়ে বাংলা দেশের এবং বাঙালীদের মঙ্গল প্রধান লক্ষ্যীভূত হইতে পারে না।

এই কথাগুলি আমরা সেই সব বাঙালীর উদ্দেশে লিখিতেছি যাহারা ধনী হইবার জন্য পরিশ্রম করিতে চান না, দেশহিতের জন্য পরিশ্রম করিতে চান। তাঁহারা যদি স্বাধীনচিত্ততার সহিত, আত্মসম্মান বজায় রাখিয়া, বঙ্গে জনসেবা স্বাধীনতালাভপ্রচেষ্টা প্রভৃতি চালাইতে চান, তাহা হইলে তাঁহাদিগকে স্বয়ং বাণিজ্য পণ্যশিল্প প্রভৃতি দ্বারা অর্থ উপার্জ্জনে কতক সময় ও শক্তি দিতে হইবে এবং বাঙালীরা যাহাতে জনহিতৈষী ও স্বাধীনতালিপ্সু থাকিয়া সঙ্গতিপন্ন হইতে পারে, সে চেষ্টাও দেখিতে হইবে।

বোধনা-সমিতির প্রথম বার্ষিক রিপোর্ট

বোধনা-সমিতির প্রথম বার্ষিক রিপোর্ট প্রকাশিত হইয়াছে। ইহা ৬-৫ বিজয় মুখুজ্যের গলি, ভবানীপুর, কলিকাতা, ঠিকানায় সম্পাদক শ্রীযুক্ত গিরিজাভূষণ মুখোপাধ্যায়, এম্-এ, বি-এল, মহাশয়ের নিকট পাওয়া যায়। ইহাতে পাঠক দেখিতে পাইবেন, সমিতি বোধনা-নিকেতনের গৃহনির্ম্মাণ কার্য্যে অনেকটা অগ্রসর হইয়াছেন এবং ইংলণ্ডে শিক্ষিতা একটি বাঙালী মহিলাকে প্রিন্সিপ্যাল ও তত্ত্বাবধায়িকা, স্বর্ণপদকপ্রাপ্ত এম্-বি ও ডি টি-এম্ পাস একজন ডাক্তারকে রেসিডেণ্ট মেডিক্যাল সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট, ও শুশ্রূষা ও গৃহস্থালীর কার্য্যে অভিজ্ঞা একটি মহিলাকে মেট্রন নিযুক্ত করিয়াছেন। তদ্ভিন্ন বড় বড় চিকিৎসক ও মনস্তত্ত্বজ্ঞ নানা প্রকারে সাহায্য করিতে স্বীকৃত হইয়াছেন। এখন টাকার একান্ত প্রয়োজন হইয়াছে। প্রবাসীর পাঠকেরা যদি প্রত্যেকে অল্পস্বল্প কিছুও দেন, তাহা হইলে এই প্রতিষ্ঠানটির প্রারম্ভিক আয়োজন সম্পূর্ণ করিয়া কাজ আরম্ভ অনায়াসে করা যায়। ভারতবর্ষে ভারতীয় জড়-বুদ্ধি ছেলেমেয়েদের জন্য ইহাই একমাত্র প্রতিষ্ঠান।

—

শান্তিনিকেতন কলেজ

ম্যাট্রিকুলেশন ও ইণ্টারমীডিয়েট পরীক্ষার ফল বাহির হইতে বেশী দেরি নাই। যাঁহারা তাহার পর কলেজে আরও উচ্চতর শিক্ষা লাভ করিতে চান, তাঁহাদিগকে অতঃপর কলেজ বাছিতে হইবে। যাঁহারা বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষার জন্য শিক্ষণীয় বিষয় ছাড়া কালচার বা কৃষ্টির জন্য আবশ্যক অন্য কতকগুলি বিষয়ও শিখিতে চান, প্রকৃতির সংস্পর্শে থাকিতে চান, বঙ্গের গ্রাম্য-জীবন পুনর্গঠন-প্রণালী শিখিতে চান, সংস্কৃত, পালি, হিন্দী, চৈনিক ও তিব্বতীয় সাহিত্যের ভিতর দিয়া ভারতবর্ষীয় প্রাচীন সভ্যতার সহিত ঘনিষ্ঠ পরিচয় চান, তাঁহাদের পক্ষে শান্তিনিকেতন কলেজ উৎকৃষ্ট শিক্ষাক্ষেত্র। নানা দিক দিয়া এখানকার গ্রন্থাগারের বৈশিষ্ট্য আছে। সংগীত চিত্রাঙ্কনাদি শিখাইবার উৎকৃষ্ট ব্যবস্থা থাকায় এবং এখানে নির্ভয়ে স্বচ্ছন্দে মুক্ত আকাশের তলে দীর্ঘ ভ্রমণ ও নির্ম্মল বায়ু-সেবনের সুবিধা থাকায় এই কলেজ ছাত্রীদের পক্ষে বিশেষ উপযোগী। কলেজে মোট এক শতের বেশী ছাত্র-ছাত্রী লওয়া হয় না বলিয়া অধ্যাপকেরা প্রত্যেক ছাত্র ও ছাত্রীর অভাবের প্রতি মনোযোগ দিতে সমর্থ। গ্রীষ্মের ছুটির পর মোটে ষাটটি ছাত্র-ছাত্রী লওয়া হইবে। প্রবাসীর বর্ত্তমান সংখ্যার বিজ্ঞাপনসমূহের মধ্যে শান্তিনিকেতন কলেজের ইংরেজী বিজ্ঞাপনে অন্য নানা জ্ঞাতব্য বিষয় লিখিত হইয়াছে।

—

অধ্যাপক যদুনাথ সিংহ ও অধ্যাপক রাধাকৃষ্ণনের মোকদ্দমা

অধ্যাপক যদুনাথ সিংহ ও অধ্যাপক রাধাকৃষ্ণনের মোকদ্দমা উভয় পক্ষের সম্মতিক্রমে কলিকাতা হাইকোর্ট হইতে তুলিয়া লওয়া হইয়াছে। ইহার মিটমাটের সংবাদ ইংরেজী ও বাংলা কোন কোন খবরের কাগজে অসম্পূর্ণ আকারে বাহির না হইলে এ-বিষয়ে আমার কিছু লিখিবার কারণ ঘটিত না। এখন সংক্ষেপে মোকদ্দমা দুটি সম্বন্ধে কিছু বলিতে হইতেছে।

১৯২৯ সালের জানুয়ারী মাসের 'মডার্ণ রিভিউ'তে অধ্যাপক যদুনাথ সিংহের একটি চিঠি বাহির হয়। তাহা অধ্যাপক রাধাকৃষ্ণনের একখানি বহির প্রতিকূল সমালোচনা। অধ্যাপক রাধাকৃষ্ণন এই চিঠির উত্তর দেন ও আমি তাহা প্রকাশ করি। অধ্যাপক যদুনাথ সিংহের প্রত্যুত্তর এবং অধ্যাপক রাধাকৃষ্ণনের প্রত্যুত্তরও আমি প্রকাশিত করি। ইহার পর অধ্যাপক যদুনাথ সিংহ যাহা লেখেন, তাহার উত্তরও আমি ছাপিতে প্রস্তুত, অধ্যাপক রাধাকৃষ্ণনকে তাহা জানান হয়। কিন্তু তিনি আর উত্তর দেন নাই। এই তর্কবিতর্ক উত্তর-প্রত্যুত্তর ১৯২৯ সালের 'মডার্ন্ রিভিউ'য়ের জানুয়ারী হইতে এপ্রিল এই চারি সংখ্যায় চলিয়াছিল। তাহার পর ঐ বৎসর জুলাই মাসে অধ্যাপক যদুনাথ সিংহ কলিকাতা হাইকোর্টে অধ্যাপক রাধাকৃষ্ণনের নামে কপিরাইট ভঙ্গের নালিশ করেন এবং ক্ষতিপূরণ দাবি করেন। তদনন্তর অধ্যাপক

রাধাকৃষ্ণন্ কলিকাতা হাইকোর্টে আমার ও অধ্যাপক যদুনাথ সিংহের নামে একলক্ষ টাকা দাবি করিয়া এক সম্মিলিত মোকদ্দমা করেন। আমাকে জড়াইবার কারণ, আমার ইংরেজী মাসিকে উভয় অধ্যাপকের তর্কবিতর্ক ছাপা হইয়াছিল। যাহা হউক, এতদিন গড়াইয়া গড়াইয়া এখন মোকদ্দমা মিটিয়া গিয়াছে। অধ্যাপক রাধাকৃষ্ণন ও অধ্যাপক যদুনাথ সিংহের পরস্পরের সহিত মিটমাট এবং তাঁহাদের মীমাংসার সর্ত্ত-পত্র ("terms of settlement") উভয়ের স্বাক্ষরযুক্ত হইয়া যাইবার পর অধ্যাপক যদুনাথ সিংহ স্বয়ং এবং অধ্যাপক রাধাকৃষ্ণনের এজেন্ট আমাকে টেলিফোনে সংবাদটি জানান, তাহার পূর্ব্বে আমাকে কিছু জানান তাঁহারা আবশ্যক মনে করেন নাই—যদিও অধ্যাপক রাধাকৃষ্ণন মোকদ্দমায় আমাকেও জড়াইয়াছিলেন। তাঁহাদের এই কার্য্যপ্রণালী হইতেই প্রমাণ হয়, কোন মোকদ্দমার সহিত আমার মুখ্য সম্বন্ধ ছিল না। যাহা হউক, ইহাতে আমার আপত্তির কারণ ছিল না; কারণ উভয় অধ্যাপকের কাহারও নামে আমি নালিশ করি নাই, এবং আমাকে 'মডার্ন রিভিউ'য়ে আমার লিখিত কিছু প্রত্যাহার করিতে বলা হয় নাই, তাহা করিতে বলিবার কোন কারণও ছিল না। সুতরাং মিটমাটে আমি স্বচ্ছন্দে সম্মতি দিয়াছি। মিটমাটের সর্ত্তগুলি নীচে উদ্ধৃত হইল।

1. The suits against the respective defendants are withdrawn.

2. The allegations made against the aforesaid parties in the respective plaints, written statements and the correspondence relating to the subject matter of the above-mentioned suits in the *Modern Review* are withdrawn.

3. There shall be no order as to costs.

আমি কোন নালিশ করি নাই, সুতরাং প্রত্যাহার করিবার "প্লেন্ট" অর্থাৎ অভিযোগপত্র আমার ছিল না; উভয় অধ্যাপক তাঁহাদের নিজ নিজ "প্লেন্ট" বা অভিযোগ-পত্র প্রত্যাহার করিয়াছেন। "লিখিত বর্ণনাপত্র" আমারও একটা ছিল, কিন্তু তাহাতে কাহারও নামে কোন অভিযোগ ছিল না, কেবল অধ্যাপক রাধাকৃষ্ণনের "প্লেন্ট" বা অভিযোগপত্রের উত্তর ছিল। তিনি আগে হইতেই নিজের "প্লেন্ট" বা অভিযোগপত্র প্রত্যাহার করায় আমার বর্ণনাপত্রও অনাবশ্যক এবং স্বতঃপ্রত্যাহৃত হইয়াছিল। বাকী থাকে 'মডার্ণ রিভিউ'তে মুদ্রিত এতদ্বিষয়ক জিনিষগুলি। সেগুলি দুই শ্রেণীর। প্রথম, উভয় অধ্যাপকের মোকদ্দমার বিষয়ীভূত উত্তর-প্রত্যুত্তর-পত্রাবলী ("the correspondence relating to the subject matter of the above-mentioned suits in the *Modern Review*")। এই করেস্পণ্ডেন্সের (পত্রাবলীর) এক বর্ণও আমার নহে। দ্বিতীয়, এই বিষয় সম্পর্কে সম্পাদকীয় মন্তব্যগুলি অর্থাৎ আমি যাহা লিখিয়াছিলাম। মীমাংসার সর্ত্ত-পত্রে ("terms of settlement"এ) সম্পাদকীয় মন্তব্যসমূহ উল্লিখিত ও প্রত্যাহৃত হয় নাই, হইবার কারণও ছিল না। কেন না, তাহাতে আমি উভয় অধ্যাপকের কাহারও পত্রলিখিত বিষয়ের সপক্ষে বা বিপক্ষে কিছু লিখি নাই।

অধ্যাপক যদুনাথ সিংহের যদি মোকদ্দমা করিবারই ইচ্ছা ছিল, তাহা হইলে মডার্ণ রিভিউয়ের চারি সংখ্যার এতগুলি পাতা নষ্ট করিয়া আমাকে না জড়াইলেই ভাল হইত। তাহা হইলে মোকদ্দমাঘটিত উদ্বেগ ও অর্থনাশ হইতে আমি রক্ষা পাইতাম। তিনি মোকদ্দমা না করিলে খুব সম্ভব অধ্যাপক রাধাকৃষ্ণনও তাঁহার ও আমার নামে মোকদ্দমা করিতেন না—অধ্যাপক রাধাকৃষ্ণনের মোকদ্দমাটা পাল্টা মোকদ্দমা। অধ্যাপক রাধাকৃষ্ণনকে আমি মোকদ্দমা করার জন্য তেমন দোষ দি না যেমন দি অধ্যাপক যদুনাথ সিংহকে। কিন্তু অধ্যাপক রাধাকৃষ্ণনের সম্বন্ধেও প্রশ্ন উঠে এই, যে, তিনি যখন মোকদ্দমা পরে করিলেনই তখন অধ্যাপক যদুনাথ সিংহের প্রথম চিঠি মডার্ণ রিভিউয়ে বাহির হইবার পরই তাহার জবাব না দিয়া সোজাসুজি লেখকের ও সম্পাদকের নামে নালিশ কেন করিলেন না।

আমার সন্তোষের বিষয় এই, যে, আমাকে কোন প্রকার ত্রুটি স্বীকার করিতে কিংবা মডার্ণ রিভিউয়ে আমার লেখা কোন জিনিষ প্রত্যাহার করিতে বলা হয় নাই। আমার বরাবরই এই বিশ্বাস ছিল, যে, আমি এই মোকদ্দমার বিষয়ীভূত কোন জিনিষ সম্বন্ধে অন্যায় কিছু লিখি নাই। এখন পরোক্ষভাবে প্রমাণও হইয়া গেল, যে, আমি অন্যায় কিছু লিখি নাই।

আমার অসন্তোষের বিষয় এই, যে, আমার এতগুলি টাকা ন দেবায় ন ধর্ম্মায় গেল।

—

চন্দননগরের কৃষ্ণভাবিনী নারীশিক্ষা-মন্দির

এই শিক্ষামন্দিরের ১৩৩১-৩২ সালের কার্য্যবিবরণ হইতে জানা যায়, যে, আলোচ্য বর্ষে ইহার পরিচালন-ব্যাপারে প্রথম পরিবর্ত্তন যাহা সাধিত হইয়াছে তাহা শিক্ষামন্দিরের একটি পরিচালন-সমিতি গঠন।

শিক্ষামন্দিরের দ্বিতীয় উল্লেখযোগ্য উন্নতির কথা বলিতে হইলে ইহার একটি স্থায়ী ধনভাণ্ডার প্রতিষ্ঠার কথা বলিতে হয়। আমরা অতীব আনন্দের সহিত জানাইতেছি, মন্দির-পরিচালনার সুব্যবস্থার জন্য মন্দিরের প্রতিষ্ঠাতা শ্রীযুক্ত হরিহর শেঠ মহাশয় একলক্ষ টাকার

(face value) শতকরা ৩।০ টাকা সুদের গবর্ণমেণ্ট পেপার দ্বারা একটি স্থায়ী ভাণ্ডারের সৃষ্টি করিয়া দিয়াছেন।

বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষার জন্ত প্রস্তুত করাই মন্দিরের মুখ্য উদ্দেশ্য না হইলেও ছাত্রী ও অভিভাবকদের আগ্রহ ও শিক্ষামন্দির পরিচালনার সুবিধার জন্ত বিশ্ববিদ্যালয়কে আবেদন করায় ১৯৩১ হইতে শিক্ষামন্দির কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্তর্ভুক্ত হইয়া উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয়ে পরিণত হইয়াছে। এক্ষণে ইহাই বর্দ্ধমান বিভাগের মধ্যে বালিকাদের জন্ত একমাত্র ম্যাট্রিক স্কুল।

কৃষ্ণভাবিনী নারীশিক্ষা-মন্দিরটি ফরাসী চন্দননগরের একজন জনহিতৈষী ভদ্রলোকের কীর্ত্তি। সুতরাং ব্রিটিশ বঙ্গের বর্দ্ধমান বিভাগের মালিক ইংরেজ গবন্মেণ্ট কিংবা তথাকার অধিবাসী বাঙালীরা ইহার জন্ত প্রাপ্য প্রশংসার আংশিক দাবিও করিতে পারেন না। বর্দ্ধমান বিভাগে ছেলেদের জন্য কয়েকটি গবন্মেণ্ট, গবন্মেণ্ট সাহায্যপ্রাপ্ত ও বেসরকারী কলেজ ও উচ্চ বিদ্যালয় আছে, অথচ বালিকাদের জন্ত একটিও উচ্চ বিদ্যালয় নাই, ইহা গবন্মেণ্টের ও বর্দ্ধমান বিভাগের লোকদের সাতিশয় লজ্জার বিষয়। বর্দ্ধমান বিভাগ হিন্দুপ্রধান। হিন্দু বাঙালীরা আপনাদিগকে শিক্ষা-বিষয়ে বিষম অগ্রসর মনে করেন। অথচ বালিকাদিগকে অশিক্ষিত রাখা তাঁহারা অনেকে অসঙ্গত মনে করেন না। পশ্চিম-বঙ্গের লোকেরা পূর্ব্ববঙ্গের লোকদিগকে বাঙাল বলিয়া উপহাস করিতেন। অথচ প্রধানতঃ পূর্ব্ববঙ্গের সংখ্যান্যূন হিন্দুদের চেষ্টায় সেই অঞ্চলে বালিকাদের জন্ত অনেক উচ্চ বিদ্যালয় স্থাপিত হইয়াছে।

পশ্চিম-বঙ্গের অল্পাধিক চেতনা হইতেছে। সেদিন শ্রীরামপুরের একটি বালিকা-বিদ্যালয়ের পুরস্কার-বিতরণ করিতে গিয়া তাহার রিপোর্ট হইতে অবগত হইলাম, তাহার সভাপতি শ্রীযুক্ত বলাইচন্দ্র গোস্বামী বিদ্যালয়টির নিজস্ব গৃহ নির্ম্মাণের জন্ত জমি দিয়াছেন এবং গৃহও নির্ম্মিত হইয়াছে। শুনিলাম, গৃহটি এরূপ করা হইয়াছে, যে, তাহা কালক্রমে উচ্চ বিদ্যালয়ে পরিণত হইতে পারিবে। শ্রীরামপুরে সঙ্গতিপন্ন লোকের অভাব নাই, শিক্ষালাভে ইচ্ছুক বালিকাও সেখানে যথেষ্ট আছে। সুতরাং ইহা আশা করা অসঙ্গত হইবে না, যে, রমেশচন্দ্র বালিকা বিদ্যালয়টি যথাসম্ভব সত্বর উচ্চ বিদ্যালয়ে পরিণত হইবে। বাঁকুড়া শহরেও একটি উচ্চ বালিক-বিদ্যালয়ের শিক্ষণ-কার্য্য আরম্ভ হইয়াছে।

—

বালিকাদের শিক্ষার বিস্তারে একটি অন্তরায়

কৃষ্ণভাবিনী নারীশিক্ষা-মন্দিরের মত সুপরিচালিত একটি বালিকা-বিদ্যালয়ের কথা বলিতে গিয়া বালিকাদের শিক্ষার বিস্তারের একটি বাধার কথা মনে পড়িল। বাল্যবিবাহ একটি অন্তরায়; তাহা ক্রমশঃ তিরোহিত হইতেছে। অবরোধপ্রথা আর একটি অন্তরায়; তাহাও দূর হইতেছে। অন্ত একটি অন্তরায় আছে। কোন কোন স্থানে বালিকা-বিদ্যালয়ের কমিটির সম্পাদক এবং কোনো কোনো সভ্য ভদ্রমহিলাদিগের সহিত শিষ্ট ব্যবহারে অনভ্যস্ত ও অনভিজ্ঞ থাকায় শিক্ষয়িত্রীদের সহিত যথাযোগ্য ব্যবহার করিতে পারেন না। কোথাও কোথাও তাঁহারা শিক্ষয়িত্রীদের সহিত এইরূপ রূঢ় ভাবে কথা বলেন, যেন তাঁহারা তাঁহাদের গৃহভৃত্য। অবশ্য ঝি-চাকরদের সঙ্গেও রূঢ় ব্যবহার করা উচিত বলিতেছি না, তাহাও অনুচিত। অশিষ্ট ব্যবহারের উপর কোথাও কোথাও সম্পাদক প্রভৃতি আবার শিক্ষয়িত্রীদের বিরুদ্ধে চক্রান্ত করেন, অনুরোধ উপরোধ দ্বারা শিক্ষয়িত্রী-বিশেষের বিরুদ্ধে অভিভাবক-বিশেষের নিকট হইতে অভিযোগ করাইয়া লয়েন। আমরা অবগত হইলাম, রাণীগঞ্জের অদূরবর্ত্তী কোন এক বালিকা-বিদ্যালয়ে এইরূপ অশিষ্ট ও অশোভন ব্যবহারের ফলে প্রধান শিক্ষয়িত্রী ও অন্ত এক শিক্ষয়িত্রী কাজে ইস্তফা দিয়াছেন। ঐ বিদ্যালয় হইতে আগেও দু-জন প্রধান শিক্ষয়িত্রী কাজ ছাড়িয়া চলিয়া যান। শহরটির ও বিদ্যালয়ের নাম করিলাম না। বিদ্যালয়ের কমিটি ও সম্পাদককে সাবধান করাই আমাদের উদ্দেশ্য।

—

কৈলাসচন্দ্র সরকার

স্বর্গীয় কৈলাসচন্দ্র সরকার মহাশয়ের নাম বেশী লোকে জানেন না। তিনি একজন সুদক্ষ সংক্ষিপ্ত রেখাক্ষর-

কৈলাসচন্দ্র সরকার

লেখক (shorthand writer) এবং কাশিমবাজারের মহা-

রাজার কলিকাতাস্থ কমার্শ্যাল ইন্‌ষ্টিটিউটের প্রধান শিক্ষক ছিলেন। তিনি দেশী লোকদের ও ইংরেজদের কলিকাতার প্রধান প্রধান দৈনিক কাগজের ও কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের রিপোর্টারের কাজ করিয়াছিলেন। তাঁহার অনেক ছাত্র কৃতী রিপোর্টার হইয়া উপার্জ্জন ও জনহিতসাধন করিতে পারিতেছেন। কথায় কথায় বলা হয়, আমরা এখন গণতন্ত্রের যুগে বাস করি। মানুষকে এখন বক্তৃতার দ্বারা অভীষ্ট মত অবলম্বন ও অনুসরণ করাইতে হয়, অভীষ্ট পথে চালিত করিতে হয়। এই জন্য বক্তৃতা-সমূহের অনুলিখন (রিপোর্ট) যথাযথ হওয়া আবশ্যক। এই কারণে কমার্শ্যাল ইন্‌সটিটিউটটির স্থায়িত্ব ও উন্নতি বাঞ্ছনীয়। ইহার দ্বারা কৈলাসচন্দ্র সরকার মহাশয়ের স্মৃতিও যথাযোগ্য রূপে রক্ষিত ও সম্মানিত হইবে। তিনি যে সংক্ষিপ্তলেখক রূপেই প্রশংসনীয় ছিলেন তাহা নহে। তিনি মানুষ হিসাবেও তাঁহার স্বাবলম্বন, নম্রতা, অনাড়ম্বরতা, সকল ধর্ম্মের প্রতি শ্রদ্ধা ও ঔদার্য্য এবং পরোপকারিতার জন্য শ্রদ্ধেয় ছিলেন। আলবার্ট-হলে তাঁহার স্মৃতিসভায় অনেক মান্যগণ্য ব্যক্তি তাঁহার এই সকল গুণের বর্ণনা করিয়া তাঁহার প্রতি শ্রদ্ধা প্রকাশ করেন।

—

ভিক্ষু ধর্ম্মপাল

দেবমিত্ত ধর্ম্মপাল বর্ত্তমান সময়ের একজন খ্যাতনামা ব্যক্তি ছিলেন। সিংহলে এক সম্ভ্রান্ত পরিবারে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। বৌদ্ধধর্ম্মের উৎপত্তি ভারতবর্ষে। তাহার জন্মদেশে এই ধর্ম্মকে সুপ্রতিষ্ঠিত করা তাঁহার জীবনের মহাব্রত ও উচ্চ আকাঙ্ক্ষা ছিল। তিনি কৃতী পুরুষ। ভারতবর্ষের মহাবোধি সভা, সারনাথে বৌদ্ধবিহার, কলিকাতায় ধর্ম্মরাজিক চৈত্য বিহার, প্রভৃতি প্রধানতঃ তাঁহার চেষ্টায় স্থাপিত হয়। বিদেশে বৌদ্ধধর্ম্মের প্রচারেও তিনি পরম উৎসাহী ছিলেন। ইংলণ্ডের মহাবোধি সভার তিনি প্রতিষ্ঠাতা। ১৮৯৩ সালে শিকাগোর ধর্ম্ম-পার্লেমেণ্টে তিনি বক্তৃতা করিয়া খ্যাতিলাভ করেন। তাঁহার উপদেশে তৃপ্ত হইয়া ও শান্তি পাইয়া হনোলুলুর মিসেস্ মেরী ফষ্টার বহু লক্ষ টাকা দান করেন। প্রধানতঃ ঐ অর্থ হইতে একাধিক বিহার নির্ম্মিত হইয়াছে এবং বহুসংখ্যক বিদ্যালয় পরিচালিত হইতেছে। ধর্ম্মপাল মহাশয়ের নিজের সম্পত্তিও কম ছিল না। তাহার সমস্তই তিনি নানাবিধ বৌদ্ধ প্রতিষ্ঠানের জন্য ব্যয় ও দান করিয়াছেন।

—

বেঙ্গল ন্যাশন্যাল চেম্বার অব কমার্সের বার্ষিক রিপোর্ট

বেঙ্গল ন্যাশন্যাল চেম্বার অব কমার্সের অর্থাৎ বঙ্গীয় জাতীয় বাণিজ্য-সমিতির ১৯৩২ সালের রিপোর্টটি সুমুদ্রিত ও প্রায় ৫০০ পৃষ্ঠাব্যাপী। এই রিপোর্টে আলোচ্য বৎসরে সমিতির সমুদয় কাজের বৃত্তান্ত আছে। তদ্ভিন্ন, সাক্ষাৎ ও পরোক্ষ ভাবে বঙ্গের আর্থিক উন্নতি-অবনতি-সম্বন্ধীয় নানা বিষয়ের আলোচনাপূর্ণ মন্তব্য ও প্রবন্ধাদি আছে। এইগুলি সংবাদপত্রের সম্পাদক ও লেখকদের, ব্যবস্থাপক সভার সভ্যদের, সার্ব্বজনিক হিতকর কার্য্যে ব্যাপৃত কর্ম্মীদের এবং শিক্ষিত জনসাধারণের কাজে লাগিবে। এই রূপ এত বিষয়ের আলোচনা এই রিপোর্টটিতে আছে, যে, কেবলমাত্র তাহাদের নাম করিবার মত স্থানও আমাদের নাই। কেবল একটির উল্লেখ করিতেছি।

রাজনৈতিক ও ভারতশাসনবিষয়ক প্রয়োজনে ইংরেজ গবন্মেণ্ট ভৌগোলিক ও স্বাভাবিক বাংলা দেশের অঙ্গচ্ছেদ করিয়া তাহার এক টুকরা আসামের, এক টুকরা ছোট নাগপুরের ও এক টুকরা বিহারের সঙ্গে জুড়িয়া দিয়াছেন। বঙ্গের এই অঙ্গচ্ছেদে বাংলা দেশের বাঙালীদের নানা রকম ক্ষতি হইয়াছে। সাক্ষাৎ ও পরোক্ষ ভাবে আর্থিক ক্ষতি যাহা হইয়াছে, তাহার বিশদ বর্ণনা এই রিপোর্টের ৩৯-৪০ পৃষ্ঠায় ও ৯১-৯৭ পৃষ্ঠায় আছে।

বাংলা দেশকে টুকরা টুকরা করায় যে অনিষ্ট ও ক্ষতি হইয়াছে, বাঙালী ভিন্ন অন্য ভারতীয়েরা তাহা বুঝিতে চান না। এ-বিষয়ে তাঁহাদের সহানুভূতি এবং প্রতিকার-চেষ্টায় তাঁহাদের সাহায্য পাইবার আশা দুরাশা বলিলেও চলে। কোন কোন প্রদেশ ত আমাদের ক্ষতিতে লাভবানই হইয়াছে। প্রতিকারের চেষ্টা আমাদিগকেই করিতে হইবে। প্রতিকারের কোন সম্ভাবনা নাই, কোন সময়ে কোন অবস্থাতেই এরূপ মনে করা উচিত হইবে না।

বাঙালীদের মধ্যে যাঁহারা ব্যবসা-বাণিজ্য, পণ্যশিল্প, মহাজনী প্রভৃতি আর্থিক যে-কোন ব্যাপারে লিপ্ত আছেন, কোন-না-কোন প্রকারে এই বাণিজ্য-সমিতির সহায় হওয়া তাঁহাদের কর্ত্তব্য।

—

আইন-লঙ্ঘন কেন স্থগিত করা হইল

কারামুক্তির পর মহাত্মা গান্ধী পুনাতেই লেডী প্রেমলতা ঠাকরসীর "পর্ণকুটী" নামক বাংলাতে বাস করিতেছেন। লেডী প্রেমলতা স্বর্গীয় স্যর বিঠলদাস দামোদর ঠাকরসীর বিধবা পত্নী। আইন-লঙ্ঘন কেন ছয়

সপ্তাহের জন্য স্থগিত করা হইল, তদ্বিষয়ে এবং তৎসম্পর্কীয় অন্যান্য বিষয়ে গান্ধীজীর বিবৃতির কিয়দংশের অনুবাদ নীচে দেওয়া হইল।

আইন অমান্য করা সম্পর্কে আমার মতামতের কোনও পরিবর্ত্তন হয় নাই। বহুসংখ্যক আইন-অমান্যকারীর অপূর্ব্ব সৎসাহস এবং আত্মত্যাগের প্রশংসা না করিয়া আমি থাকিতে পারি না। এই সঙ্গে আমি ইহাও না বলিয়া থাকিতে পারি না, যে, এই আন্দোলনের মধ্যে গুপ্তভাবে কাজ করিবার যে মনোভাব প্রবেশ করিয়াছে, তাহাই ইহার সাফল্যের পক্ষে সাংঘাতিক প্রতিবন্ধক। সুতরাং এই আন্দোলন যদি আরও চালাইতে হয়, তাহা হইলে দেশের নানাস্থানে যাঁহারা এই আন্দোলন-নিয়ন্ত্রণে নিযুক্ত আছেন, তাঁহাদিগকে আমি বলিব, সর্ব্বপ্রকারে এই গোপনীয়তা বর্জ্জন করিতে হইবে। এরূপ ব্যবস্থা করিলে একজন আইন-অমান্যকারী পাওয়াও যদি দুষ্কর হয়, তাহা হইলেও আমি ভয় করি না।

এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই যে, সাধারণ লোকের মনে ভয় হইয়াছে। অর্ডিন্যান্স তাহাদিগকে ভীরু করিয়া দিয়াছে। আমার এরূপ মনে হইতেছে, যে, সৎসাহসের অভাবেই গোপন কার্য্যপ্রণালী অবলম্বিত হইয়াছে। যে-সমস্ত নরনারী আইন অমান্য করায় যোগদান করিবে, তাহাদের সংখ্যার উপর ইহার সাফল্য তেমন নির্ভর করে না, তাহাদের গুণাবলীর উপরই উহার সাফল্য সম্পূর্ণরূপে নির্ভর করে। আমার উপর যদি এই আন্দোলন-পরিচালনার ভার থাকিত, তাহা হইলে আমি আইন-অমান্যকারীদের সংখ্যার উপর তেমন জোর না দিয়া তাহাদের গুণাবলীর উপর খুব বেশী জোর দিতাম। ইহা করিতে পারিলেই এই আন্দোলনের নৈতিক মর্য্যাদা অনেকখানি বাড়িয়া যাইত। আমার অভিপ্রেত হউক, আর নাই হউক, আগামী তিন সপ্তাহকাল সমস্ত আইন-অমান্যকারিগণ দারুণ উদ্বেগে কাটাইবেন। এই অবস্থায় কংগ্রেসের সভাপতি বাপুজী মাধবরাও আনে যদি কংগ্রেসের পক্ষ হইতে এক মাস অথবা ছয় সপ্তাহ কাল এই প্রচেষ্টা স্থগিত রাখা হইল, এরূপ একটা ঘোষণা করেন, তাহা হইলে ভাল হয়।

এ-সময়ে আমি গবর্ণমেণ্টের নিকটও একটি আবেদন করিতেছি। দেশের মধ্যে যদি তাঁহারা সত্যকার শান্তি প্রতিষ্ঠা করিতে ইচ্ছা করেন, যদি তাঁহারা মনে করেন যে, দেশে এখন প্রকৃত শান্তির অভাব, যদি তাঁহারা অনুভব করেন যে, অর্ডিন্যান্স দ্বারা সুশাসন চলে না, তাহা হইলে আইনলঙ্ঘন প্রচেষ্টা স্থগিত রাখার এই সুযোগ গ্রহণ করা তাঁহাদের কর্ত্তব্য এবং এই সুযোগে সমস্ত আইন-অমান্যকারী-দিগকে মুক্তি দেওয়া তাঁহাদের কর্ত্তব্য। যদি আমি এই অনশনের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইতে পারি, তাহা হইলে আমি সমস্ত অবস্থা সম্পর্কে বিবেচনা করিবার সময় পাইব এবং কংগ্রেস নেতৃবৃন্দ ও গবর্ণমেণ্ট (যদি আমি সাহস করিয়া এ-কার্য্য করিতে পারি) এই উভয়কেই উপদেশ প্রদান করিতে পারিব। ইংলণ্ড হইতে প্রত্যাবর্ত্তনের পর যেখানে আমি বাধাপ্রাপ্ত হইয়াছিলাম, ঠিক সেই স্থল হইতে আমি কার্য্যারম্ভ করিতে ইচ্ছা করি। আমার চেষ্টার ফলে গবর্ণমেণ্ট ও কংগ্রেসের মধ্যে যদি কোন মীমাংসা না হয় এবং আইন-লঙ্ঘন-আন্দোলন পুনরায় আরম্ভ হয়, তাহা হইলে গবর্ণমেণ্ট ইচ্ছা করিলেই আবার অর্ডিন্যান্স প্রবর্ত্তন করিতে পারিবেন। এ-বিষয়ে আমার কোন সন্দেহ নাই যে, গবর্ণমেণ্টের ইচ্ছা থাকিলে কোন-না-কোন প্রকার কার্য্যক্রম আবিষ্কৃত হইতে পারিবে। আমার দিক হইতে আমি এই পর্য্যন্ত বলিতে পারি যে, কার্য্যক্রম আবিষ্কার সম্পর্কে আমি সম্পূর্ণ নিঃসন্দেহ।

যতদিন পর্য্যন্ত এই সমস্ত আইন-অমান্যকারিগণ কারারুদ্ধ থাকিবেন, ততদিন পর্য্যন্ত আইনলঙ্ঘন-আন্দোলন প্রত্যাহার করা যায় না এবং সর্দ্দার বল্লভভাই পটেল, খাঁ আবদুল গফ্‌ফার খাঁ, পণ্ডিত জওআহরলাল নেহ্‌রু এবং অন্যান্যকে যতদিন জীবন্তে সমাধিস্থ করিয়া রাখা হইবে, ততদিন কোনও প্রকার মীমাংসাই সম্ভবপর নহে। প্রকৃত কথা এই যে, বর্ত্তমানে যাঁহারা জেলের বাহিরে আছেন, আইনলঙ্ঘন আন্দোলন প্রত্যাহার করিবার অধিকার তাঁহাদের নাই, কেবল কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটিই ইহা করিতে পারে। আমি সেই ওয়ার্কিং কমিটির কথাই বলিতেছি, যে-কমিটি আমার গ্রেপ্তারের সময় কাজ করিতেছিল।

আমি গবর্ন্মেণ্টকে বলিতেছি, মুক্তিতে আমার যে সুযোগ হইয়াছে, আমি তাহার অপব্যবহার করিব না। আমি যদি নিরাপদে এই অগ্নিপরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইতে পারি এবং ২১ দিন পরেও রাজনীতিক্ষেত্রে আজিকার ন্যায় বিশৃঙ্খল অবস্থাই দেখিতে পাই, তাহা হইলে প্রকাশ্যে অথবা গোপনে আইনলঙ্ঘনের সাহায্যকল্পে একটি মাত্র কাজ না করিয়াই আমি গবর্ন্মেণ্টকে অনুরোধ করিব, তাঁহারা যেন আবার আমাকে যারবেদা জেলে আমার সহকর্ম্মীবৃন্দের নিকট লইয়া যান। আজ আমার মনে হইতেছে, আমি যেন তাঁহাদিগকে পরিত্যাগ করিয়াই আসিয়াছি।

এই বিষয়ে কংগ্রেসের অস্থায়ী সভাপতি শ্রীযুক্ত মাধব শ্রীহরি আনে বলিয়াছেন :—

ইহা খুবই সত্য যে, গান্ধীজীর অনশনকালে প্রত্যেক সত্যাগ্রহী গভীর উৎকণ্ঠায় উৎকণ্ঠিত থাকিবেন, সুতরাং তিনি আমাকে একমাস এমন কি ছয় সপ্তাহ কালের নিমিত্ত আইনলঙ্ঘন-আন্দোলন স্থগিত রাখিতে উপদেশ দান করিয়াছেন। গত চারি মাসের মধ্যে আমি বহুবার বলিয়াছি, 'যতদিন পর্য্যন্ত সহস্র সহস্র সত্যাগ্রহী কারারুদ্ধ থাকিবেন—যতদিন সর্দ্দার বল্লভভাই পটেল, পণ্ডিত জওআহরলাল নেহ্‌রু, খাঁ আবদুল গফ্‌ফার খাঁ প্রভৃতি জীবন্তে সমাহিত থাকিবেন, ততদিন আইনলঙ্ঘন-আন্দোলন প্রত্যাহৃত হইতে পারে না। বস্তুতঃ যাঁহারা কারাগারের বাহিরে আছেন, আইনলঙ্ঘন-আন্দোলন প্রত্যাহার করিবার ক্ষমতা তাঁহাদের নাই। কেবলমাত্র মূল ওয়ার্কিং কমিটিরই তাহা করিবার ক্ষমতা আছে'—মহাত্মা গান্ধীও তাঁহার বিবৃতিতে দৃঢ়ভাবে এই উক্তি করিয়াছেন।

আমি পুনরায় বলিতেছি, আইনলঙ্ঘন-আন্দোলন সম্পর্কে মহাত্মাজীর যে সুস্পষ্ট ও দ্বিধাবিহীন উক্তি উপরে বর্ণিত হইল কংগ্রেসের নিয়মতন্ত্র অনুসারে এবং যুক্তিসঙ্গত পন্থানুসারে তাহাই প্রত্যেক কংগ্রেস-কর্ম্মীর পক্ষে একমাত্র সমীচীন নীতি।

কিন্তু কোনও একটি বিশেষ উদ্দেশ্য সাধনার্থ সীমাবদ্ধ কালের নিমিত্ত আইনলঙ্ঘন-আন্দোলন স্থগিত রাখা সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র কথা। আমরা যাহাতে রাজনৈতিক আবহাওয়ায় বিশুদ্ধ শান্তিপূর্ণ বায়ু গ্রহণ করিয়া সভক্তি হৃদয়ে তাঁহার মহান্‌ উদ্দেশ্যের সাফল্যকল্পে প্রার্থনা করিতে পারি এবং এই ভীষণ পরীক্ষায় তাঁহার যে আধ্যাত্মিক খাদ্য প্রয়োজন তাহা যাহাতে তাঁহাকে প্রচুর পরিমাণে দিতে পারি, তজ্জন্য রাজনৈতিক আবহাওয়া হইতে সমস্ত বিষাক্ত উত্তেজনা দূরীকরণার্থ আমি ঘোষণা করিতেছি যে, ৯ই মে হইতে ছয় সপ্তাহের নিমিত্ত আইন-লঙ্ঘন-আন্দোলন স্থগিত রাখা হইল।

—

আইনলঙ্ঘন স্থগিত করা সম্বন্ধে মতামত

অধিক বা অল্প বিখ্যাত যে-সব ভারতীয় ব্যক্তি আইন-লঙ্ঘন প্রচেষ্টা ছয় সপ্তাহ স্থগিত রাখা সম্বন্ধে মত প্রকাশ করিয়াছেন, দুই জন ব্যতীত তাঁহারা কেহই ইহার প্রতিকূল সমালোচনা করেন নাই। বিরুদ্ধ ভাব দেখাইয়াছেন কেবল ভারতীয় ব্যবস্থাপক সভার ভূত-পূর্ব্ব সভাপতি শ্রীযুক্ত বিঠলভাই পটেল এবং শ্রীযুক্ত সুভাষচন্দ্র বসু। উভয়েই এখন অষ্ট্রিয়ার রাজধানী ভিয়েনায় চিকিৎসাধীন। ছয় সপ্তাহের জন্য আইনলঙ্ঘন প্রচেষ্টা বন্ধ রাখা সম্বন্ধে ফ্রী প্রেসের প্রতিনিধিকে সুভাষবাবু বলেন :—

এই কাজটি কম্প্রোমাইসিং (রফার সদৃশ কিংবা জাতীয় স্বাধীনতা-লাভ চেষ্টার পক্ষে আশঙ্কাজনক, সুতরাং দুর্ব্বলতার পরিচায়ক)।

অতঃপর তাঁহাকে প্রশ্ন করা হয় :—

কিন্তু মহাত্মা গান্ধীই কি আপনাদের আন্দোলনের প্রতীক ও মূর্ত্তিমান বিগ্রহ নহেন?

উত্তর :—হাঁ, এ-কথা সত্য। তবে আমার আশঙ্কা এই যে, মহাত্মা গান্ধী প্রকৃত অবস্থার ডাক শুনিয়া তদুপযুক্ত সাড়া দেন নাই। এ-সময়ে ইংলণ্ডের সহিত কোন প্রকার রফা করিলে কংগ্রেসের মধ্যে অনৈক্য ও দলের সৃষ্টি হইবে। ভারতবাসীদিগকে তাহাদের চির-দিনের স্বপ্ন সফল করিতেই হইবে। সুতরাং কংগ্রেস-সেবকগণ নিজেদের মধ্যে ভিন্ন ভিন্ন দলে বিভক্ত হইতে পারেন না।

ভিয়েনা হইতে প্রেরিত আর একটি তার এইরূপ :—

শ্রীযুত পটেল ও শ্রীযুক্ত সুভাষচন্দ্র বসু একযোগে 'রয়টারে'র নিকট এক বিবৃতিতে জানাইয়াছেন, "আইনলঙ্ঘন-আন্দোলন স্থগিত রাখা কার্য্যটির দ্বারা মিঃ গান্ধীর বিফলতার স্বীকারোক্তি সূচিত হইতেছে।"

উক্ত বিবৃতিতে আরও বলা হইয়াছে,—

"আমরা পরিষ্কাররূপে জানাইতেছি যে, রাষ্ট্রনৈতিক নেতা-হিসাবে মিঃ গান্ধী বিফলপ্রযত্ন হইয়াছেন। অতএব নূতন নীতি ও পদ্ধতির উপর ভিত্তি করিয়া কংগ্রেসকে পুনর্গঠনের সময় আসিয়াছে, এবং যেহেতু মিঃ গান্ধীর আজীবন অনুসৃত নীতির বিরোধী কোনও প্রণালী অনুসারে তিনি কাজ করিবেন আশা করা অন্যায়—এইজন্য এই কার্য্যে একজন নূতন নেতার বিশেষ আবশ্যক।"

উক্ত বিবৃতিতে আরও প্রকাশ :—

"যদি সমগ্র কংগ্রেস সম্বন্ধে এইরূপ পরিবর্ত্তনের ব্যবস্থা হয়, তাহা হইলে খুব ভালই হয়। আর যদি এইরূপ করা সম্ভবপর না হয়, তবে কংগ্রেসের মধ্যেই চরমপন্থীগণকে লইয়া একটি দল গঠন করিতে হইবে।"

শ্রীযুক্ত বিঠলভাই পটেল ও সুভাষচন্দ্র বসু মহাত্মা গান্ধী ও শ্রীযুক্ত মাধবরাও আনের বিবৃতি পড়িবার পূর্ব্বে ঐরূপ মত প্রকাশ করিয়াছেন। সেগুলি পড়িবার পর তাঁহাদের মত পরিবর্ত্তিত হইতে পারে, না-হইতেও পারে। আমরা কংগ্রেসভুক্ত নহি বলিয়া কংগ্রেসের কর্ত্তব্য সম্বন্ধে কিছু বলিতে চাই না। কিন্তু সুভাষবাবু কংগ্রেসে যে দলাদলির আশঙ্কা করিয়াছেন, তাহা ত এখনও আছে। পটেল মহাশয় ও তিনি নূতন দল গঠনের প্রয়োজন অনুভব করিয়াছেন। ইহা সুবিদিত বটে, যে, কংগ্রেসের ভিতরে ও বাহিরে অনেকে মহাত্মা গান্ধীর প্রধান প্রধান মত ও কার্য্যপ্রণালীর অনুমোদন করেন না; কিন্তু তাঁহার মত বা তাঁহা অপেক্ষা বিচক্ষণ, নির্ভীক ও সর্ব্বত্যাগী নেতা আর এক জনও ত দেখিতেছি না।

এখানে বলা আবশ্যক, আমাদের বিবেচনায় আপাততঃ আন্দোলন বন্ধ রাখা ঠিক্ হইয়াছে। ইহাতে দুর্ব্বলতা প্রকাশ পায় নাই।

—

মহাত্মা গান্ধীর অনুরোধ ও তাহার সরকারী উত্তর

শ্রীযুক্ত বিঠলভাই পটেল ও সুভাষচন্দ্র বসু আইন-লঙ্ঘন প্রচেষ্টা কিছু দিনের নিমিত্ত বন্ধ করায় তাহার মধ্যে গান্ধীজীর নেতৃত্বের নিষ্ফলতার ও তাঁহার দুর্ব্বলতার পরিচয় রহিয়াছে মনে করিয়াছেন। সরকারী মহলেও সম্ভবতঃ ঐরূপ একটা ধারণা জন্মিয়াছে। সেই জন্য আইন-লঙ্ঘন প্রচেষ্টা আপাততঃ বন্ধ করিয়া গান্ধীজী গবর্ন্মেণ্টকে রাজনৈতিক বন্দীদিগকে মুক্তি দিবার যে অনুরোধ পরোক্ষ ভাবে জানাইয়াছেন, তৎসম্পর্কে প্রচারিত নিম্নে অনুবাদিত সরকারী বিজ্ঞপ্তি-পত্রে বল-গর্ব্বিত দর্পের আভাস পাওয়া যায়। রাজপুরুষেরা যেন বলিতেছেন, "অতটুকু নামিলে চলিবে না, একেবারে নাকে খৎ দিতে হইবে।"

মিঃ গান্ধী যে কারণে প্রায়োপবেশন আরম্ভ করিয়াছেন, তাহার সহিত গবর্ণমেণ্টের কোনও কার্য্য বা নীতির কোনও সম্পর্ক নাই—হরিজন-সেবার আন্দোলনের সহিতই তাহার সম্পর্ক। সুতরাং তাঁহাকে মুক্তি দান করায় আইনলঙ্ঘন-আন্দোলনে দণ্ডিতগণকে মুক্তিদান সম্পর্কে অথবা যাহারা প্রকাশ্যভাবে এবং সর্ত্তাধীনভাবে আইনভঙ্গ আন্দোলন করেন—তাঁহাদের সম্পর্কে গবর্ণমেণ্টের নীতির কোনও পরিবর্ত্তন সূচিত হয় নাই। আইনভঙ্গ-আন্দোলনে দণ্ডিত ব্যক্তিদিগের সম্বন্ধে গবর্ণমেণ্টের নীতি গত এপ্রিল মাসে ব্যবস্থা-পরিষদে স্বরাষ্ট্রসচিব স্পষ্ট ভাষায় ব্যক্ত করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন,—"যদি কংগ্রেস বস্তুতঃই আইনভঙ্গ-আন্দোলন পুনরুজ্জীবিত করিতে ইচ্ছুক না হয়, তবে এই অনিচ্ছা সুস্পষ্টরূপে ব্যক্ত করিতে হইবে। যদি কংগ্রেস-নেতৃবর্গের এইরূপ অভিপ্রায় থাকে, যে, সরকারী নীতি তাঁহাদের মনঃপূত না হইলে তাঁহারা পুনরায় আইনভঙ্গ আন্দোলনের ভয় প্রদর্শন করিবেন, তাহা হইলে সহযোগিতা হইতে পারে না। প্রয়োজনের অতিরিক্ত কালের নিমিত্ত কাহাকেও কারারুদ্ধ করিয়া রাখিবার অভিপ্রায় আমাদের নাই; আবার কারারুদ্ধ ব্যক্তিদিগকে মুক্তিদান করিলে যতদিন আইন ভঙ্গ-আন্দোলন পুনরারম্ভের সম্ভাবনা থাকিবে ততদিন তাহাদিগকে মুক্তিদানের কোনও অভিপ্রায়ও আমাদের নাই। হঠাৎ কোনও কাজ করিয়া আমরা বিপদ ডাকিয়া আনিবার সম্ভাবনার সম্মুখীন হইতে পারি না। পার্লেমেণ্টে

ভারতসচিব গবর্মেণ্টের নীতি সংক্ষেপে সুস্পষ্টরূপে প্রকাশ করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন যে, বন্দীদিগকে মুক্তিদান করিলে আইনলঙ্ঘন-আন্দোলন পুনরায় আরম্ভ করা হইবে না—এইরূপ বিশ্বাসযোগ্য প্রমাণ আমরা চাই।"

কংগ্রেস নেতৃবর্গের মধ্যে আলোচনার সুবিধার নিমিত্ত নির্দ্দিষ্ট অল্পকালের জন্ম আইনলঙ্ঘন স্থগিত রাখা হইলেই বলা যায় না, যে, আন্দোলন পরিত্যক্ত হইয়াছে। সুতরাং অবৈধ আন্দোলন সম্পর্কে কংগ্রেস-নেতৃবর্গের সহিত কোনও আপোষ নিষ্পত্তি করিবার বা কারারুদ্ধদিগকে মুক্তিদান করিবার কোনও অভিপ্রায়ই গবর্মেণ্টের নাই।"

গবর্ন্মেণ্টকে উপদেশ বা পরামর্শ দিবার অভিপ্রায় আমাদের নাই। কেন-না, শক্তিশালী গবর্ন্মেণ্ট বা জাতি কেবল তাহাদের কথাতেই কান দিয়া থাকে যাহাদের কথায় কান না দিলে বিশেষ অসুবিধা ঘটিতে পারে। সেরূপ অসুবিধা ঘটাইবার ক্ষমতা আমাদের নাই। গবর্ন্মেণ্টকে ভয় দেখাইবার ইচ্ছা ত নাই-ই। কারণ, যে-ব্যক্তি প্রয়োজন হইলে ধমকানিকে কার্য্যে পরিণত করিতে পারে না, তাহার পক্ষে ধমক দেওয়াটা উপহাসাস্পদ ও অবজ্ঞার পাত্র হওয়ারই নামান্তর।

গবর্ন্মেণ্ট কি ভাবিবেন না-ভাবিবেন, করিবেন না-করিবেন, তাহার বিচার না করিয়াও কংগ্রেসের সম্পূর্ণ পিষ্ট, অপদস্থ ও নির্বীর্য্য হওয়ার ফলাফল আলোচনা করা যাইতে পারে।

—

কংগ্রেসের বিনাশ হইলে তাহার ফলাফল

মোটের উপর ইহা সত্য, যে, পৃথিবীর অতীত ইতিহাসে যত জাতি আপনাদিগকে অধীনতাপাশ হইতে মুক্ত করিয়াছে, যুদ্ধ তাহাদের মুক্তির জন্ম অবলম্বিত প্রধান উপায় ছিল; যুদ্ধ মোটেই না করিয়া স্বাধীন হইবার চেষ্টা প্রথম ভারতবর্ষে হইয়াছে। মহাত্মা গান্ধীর উপদেশ ও নেতৃত্বে কংগ্রেস এই চেষ্টা করিয়াছে। সুতরাং ভারতবর্ষেও যে যুদ্ধ দ্বারা স্বাধীনতালাভের চেষ্টা বর্ত্তমান সময়ে ব্যাপকভাবে হয় নাই, কংগ্রেসই তাহার কারণ। কংগ্রেস দেশকে হননের পথ হইতে নিবৃত্ত রাখিয়াছে। কংগ্রেসের অহিংস স্বাধীনতালাভপ্রচেষ্টা ব্যর্থ হইলে কংগ্রেস রাজনৈতিক কার্য্যক্ষেত্র হইতে তিরোহিত হইলে, হননের পন্থা অবলম্বনের সম্ভাবনা ঘটিবেই না, এমন বলা যায় না। ঘটিতে যে পারে, তাহা চরমপন্থী নহেন এমন এক জন বিদেশী ভারতবর্ষে আসিয়া বুঝিয়া গিয়াছেন। ইনি মিঃ পোলাক।

তিনি এই বৎসর ভারত-ভ্রমণের পর বিলাতে ফিরিয়া গিয়া গত ২১শে এপ্রিল লণ্ডনে একটি বক্তৃতা করেন।

অহিংস আইনলঙ্ঘন প্রচেষ্টার দিন ফুরাইয়াছে, প্রচলিত এইরূপ একটি মতের সম্পর্কে তিনি বলেন,—"অপেক্ষাকৃত অল্পবয়স্ক অনেকে আপনাদিগকে জিজ্ঞাসা করিতে আরম্ভ করিয়াছে গান্ধীজীর অ-বলপ্রয়োগ নীতি ঠিক্ কি-না। এই জিজ্ঞাসা যদি বৃহৎ আকারে বিস্তারলাভ করে, তাহা হইলে একটি ভয়প্রদ পরিণতি হইবে। বয়োজ্যেষ্ঠেরা কনিষ্ঠদিগকে সংযত করিতে অনিচ্ছুক, কারণ তাঁহারা মনে করেন বর্ত্তমান পরিস্থিতিতে তাহাদের সরোষ অসন্তোষ ঠিক্।"

মিঃ পোলাক বলেন:—"যদি তরুণদিগকে সুধাও, তাহারা বলিবে, 'আমরা আমাদের সময়ের অপেক্ষায় আছি; আমরা জানি আমরা কি চাই, এবং কোন্ প্রণালী অবলম্বিত হইবে তাহা এক্সপীডিয়েন্সির (অর্থাৎ উদ্দেশ্যসাধনোপযোগিতার) ব্যাপার।'"

মিঃ পোলাক এ বৎসর বাংলা দেশে আসিয়াছিলেন কি-না, আমরা অবগত নহি। সম্ভবতঃ তিনি বঙ্গের বাহিরে বৃদ্ধ ও প্রৌঢ় এবং তরুণদের নিকট হইতে তাঁহার ধারণাগুলির উপকরণ পাইয়াছিলেন।

হিংসা-অহিংসার মধ্যে ধর্ম্ম ও ধর্ম্মনীতি হিসাবে কোন্‌টি অবলম্বনীয় তাহার বিচার না করিয়া অধিকাংশ লোক আমাদের মত অহিংস প্রযত্ন দ্বারা স্বাধীনতা লাভের পক্ষপাতী, মনে করি। কংগ্রেসের প্রণালী বা তৎসম কিংবা তার চেয়ে ফলদায়ক কোন অহিংসপ্রণালী অবলম্বন দ্বারা স্বাধীনতা লব্ধ হইলে তাঁহাদের মত আমরাও প্রীত হইব। তবে, যাহারা ভারতবর্ষের স্বাধীনতার বিরোধী, তাহারা চায় না, যে, অহিংস বা হননাত্মক কোন নিশ্চিত ফলদায়ক পন্থাই ভারতীয়েরা অবলম্বন করে। কিন্তু এই দু-রকম পন্থার মধ্যে কোন্‌টা দমন করা সহজতর, তাহা ভারতস্বরাজবিরোধীরা বিবেচনার যোগ্য মনে করিতে পারে এবং তাহাদের বিবেচনায় যাহা অপেক্ষাকৃত সহজে দমনীয় ভারতীয়দের দ্বারা সেই পন্থার অবলম্বন মনে মনে অধিক বাঞ্ছনীয় ভাবিতে পারে। মনে মনে তাহারা যাহাই ভাবুক, বাহিরে তাহারা অবশ্য শেষোক্ত পন্থাকে অন্য পন্থার চেয়ে প্রশ্রয় দিতে পারে না।

—

বাঙালীদের দ্বিবিধ সংগ্রাম

সমগ্র ভারতবর্ষ স্বরাজ না পাইলে বাংলা দেশ স্বরাজ পাইতে পারে না। সুতরাং নিখিলভারতীয় স্বরাজ-সংগ্রামে বাংলা দেশ যেমন যোগ দিয়াছে তাহা অপেক্ষা বেশী বই কম যোগ ভবিষ্যতে দিলে চলিবে না। অন্য দিকে ভারতীয় স্বরাজ লব্ধ হইবার সময়ে ও পরে যদি বাংলার প্রতি নানাবিধ রাজস্বিক অবিচার থাকিয়া যায়, যদি সমগ্রভারতীয় ব্যবস্থাপক সভায় বঙ্গের প্রতিনিধি-সংখ্যা অন্যায় রকম কম থাকে, যদি বঙ্গ অখণ্ড না হইয়া ব্যবচ্ছিন্নই থাকে, যদি বঙ্গের বাণিজ্যিক ও পণ্যশৈল্পিক নিকৃষ্টতা ও পরাধীনতা বর্ত্তমান সময়ের মত থাকে, যদি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে ও মহেন্দ্রলাল সরকারের

ভারতীয় বিজ্ঞান সভায় বাঙালীদের বৈজ্ঞানিক শক্তি বিকাশের বাধাগুলা থাকিয়া যায়......, তাহা হইলে ভারতীয় স্বরাজ হইতে বাংলা দেশের সেই সকল সুবিধা ও কল্যাণ হইবে না, যাহা অন্যান্য প্রদেশের হইবে।

অতএব, বাঙালীদিগকে ভারতীয় স্বরাজ এবং তাহার অন্তর্গত বঙ্গীয় স্বরাজ, এই উভয় প্রকার স্বরাজের জন্য একসঙ্গেই সংগ্রাম চালাইয়া যাইতে হইবে। ইহা কঠিন কাজ। কিন্তু ইহা খুব উৎসাহ ও দৃঢ়তার সহিত না চালাইলে, পূর্ণস্বরাজের পর বাঙালীর কেবল ইংরেজাধীনতাটা ঘুচিবে বটে, কিন্তু 'প্রবাসী'তে বার-বার বর্ণিত অন্যান্য রকমের বঙ্গীয় পরাধীনতা ঘুচিবে না।

—

মহেন্দ্রলাল সরকারের বিজ্ঞান-সভায় মান্দ্রাজী সেক্রেটরী ?

'আনন্দ বাজার পত্রিকা' অধ্যাপক স্যর চন্দ্রশেখর বেঙ্কট রামনের কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজ্ঞান কলেজে কৃত ও অকৃত কার্য্য সম্বন্ধে এবং ডাক্তার মহেন্দ্রলাল সরকারের বিজ্ঞান-সভায় কৃত ও অকৃত কার্য্য সম্বন্ধে পূর্ব্বে অনেক প্রবন্ধ ছাপিয়াছিলেন। সম্প্রতি লিখিয়াছেন,—

> অধ্যাপক সি. ভি. রামন্ কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে থাকিবার সময়ে 'ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশন অব্ সায়েন্স' বা ভারতীয় বিজ্ঞান-পরিষদের সেক্রেটারী ছিলেন। তাঁহার পরিচালনাধীনে উক্ত সায়েন্স এসোসিয়েশনের কিরূপ শোচনীয় অবস্থা হইয়াছে, বাঙ্গালী শিক্ষার্থীরা উহার সুযোগ হইতে কি ভাবে কার্য্যতঃ বঞ্চিত হইয়াছে, তাহার পরিচয় ইতিপূর্ব্বে আমরা দিয়াছি। অধ্যাপক রামন কিছুকাল হইল বাঙ্গালোরে সায়েন্স ইনষ্টিটিউটের ডিরেক্টর হইয়া গিয়াছেন। আমরা আশা করিয়াছিলাম, এইবার কোন যোগ্য বাঙ্গালী বৈজ্ঞানিককে সায়েন্স এসোসিয়েশনের সেক্রেটারী নিযুক্ত করা হইবে; কিন্তু আমরা শুনিয়া বিস্মিত হইলাম, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের মান্দ্রাজী অধ্যাপক শ্রীযুক্ত কৃষ্ণন্ সায়েন্স এসোসিয়েশনের সেক্রেটারী নিযুক্ত হইয়া আসিতেছেন। ইনি অধ্যাপক রামনের অন্তরঙ্গ লোক। দেশপূজ্য ডাক্তার মহেন্দ্রলাল সরকার কর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত বাঙ্গালীর এই বৈজ্ঞানিক প্রতিষ্ঠানটির সেক্রেটারীর কাজের জন্য কোন বাঙ্গালী অধ্যাপকই কি মিলিল না? বাঙ্গালী নিজের দেশে, নিজের প্রতিষ্ঠান হইতেও যে এইভাবে বহিষ্কৃত হইল, এর চেয়ে পরিতাপের বিষয় আর কি হইতে পারে? সায়েন্স এসোসিয়েশনের গবর্ণিং বডি বা পরিচালক-সমিতিতে বহু বাঙালী-প্রধান আছেন। তাঁহারা চোখকান বুজিয়া নির্ব্বিকার চিত্তে এই সব বিসদৃশ ব্যাপার কিরূপে সমর্থন করিতেছেন?

'আনন্দবাজার পত্রিকা'য় যাহা লিখিত হইয়াছে, তাহা সত্য হইলে দুঃখের বিষয়, কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় নহে। বঙ্গে অনেক দেশপূজ্য ব্যক্তি আছেন ও ছিলেন। আমাদের বাঙালীদের একটা দোষ এই, যে, আমরা অনেকে দেশপূজ্যদের সব কাজ, অ-কাজ, অবহেলা ইত্যাদিকেও কার্য্যতঃ দেশপূজ্যবৎ মানিয়া লই বা মনে করি। যখন আমরা দেশপূজ্যদের সম্মুখেও মাথা ও শিরদাঁড়া খাড়া করিয়া সত্য কথা স্পষ্ট করিয়া বলিতে পারিব, তখন বাঙালীদের কল্যাণ হইতে পারিবে। দেশপূজ্য ও সাধারণ অনেক বাঙালীর চক্ষুলজ্জা এবং উদারতা অত্যধিক। সাম্প্রদায়িকতার মিথ্যা অপবাদের ভয়ে অনেক হিন্দু বাঙালী হিন্দুর ন্যায্য অধিকার সমর্থন করেন না, প্রাদেশিক সংকীর্ণতার মিথ্যা অপবাদের ভয়ে বাঙালীর ন্যায্য অধিকারের সমর্থন করেন না। এরূপ চক্ষুলজ্জা ও অত্যুদারতা দুর্ব্বলতার ও দেশদ্রোহিতার নামান্তর মাত্র।

—

ভ্রম-সংশোধন

আমরা বৈশাখের 'প্রবাসী'তে লিখিয়াছিলাম, যে, শ্রীযুক্তা কুমুদিনী বসু ও শ্রীযুক্তা জ্যোতির্ম্ময়ী গাঙ্গুলী কলিকাতা মিউনিসিপ্যালিটির কৌন্সিলর নির্ব্বাচিত হইবার চেষ্টা প্রথম করিয়াছেন। ইহা ভুল। ১৯২৭ সালে ও ১৯৩০ সালে শ্রীযুক্তা মায়া দেবী ও শ্রীযুক্তা উর্ম্মিলা দেবী নির্ব্বাচিত হইবার চেষ্টা করিয়াছিলেন।

—

মহাত্মাজীর ওজন হ্রাস ও দুর্ব্বলতাবৃদ্ধি

আজ ২৯শে বৈশাখ ১২ই মে প্রবাসীর শেষ পাতাগুলি ছাপা হইবে। অদ্যকার দৈনিক কাগজে মহাত্মাজীর ক্রমিক দ্রুত ওজন হ্রাস ও দুর্ব্বলতাবৃদ্ধির সংবাদ পড়িয়া মনে দারুণ উদ্বেগের সঞ্চার হইয়াছে। ভগবান্ ভরসা।

—

ভবিষ্যৎ বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভায় উচ্চ কক্ষ

হোয়াইট পেপার বা শ্বেত কাগজের প্রস্তাব অনুসারে ভবিষ্যৎ বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভা দ্বিকাক্ষিক হইবে। হোয়াইট পেপার বাহির হইবার আগে বর্ত্তমান বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভায় ভবিষ্যতে একটি "উচ্চ" কক্ষের সৃষ্টি সমর্থিত হইয়াছিল। কিন্তু সমর্থকেরা যে রকমের "উচ্চ" কক্ষ মনে রাখিয়া তাহার সমর্থন করিয়াছিলেন, হোয়াইট পেপারে প্রস্তাবিত "উচ্চ" কক্ষ সেরূপ হইবে না। সমর্থকেরা ভাবিয়াছিলেন, নিম্ন কক্ষে ত মুসলমান ও ইউরোপীয়দের প্রাধান্য হইবেই, উচ্চ কক্ষ বিলাতী হাউস অব লর্ডসের মত অভিজাতদের দ্বারা বোঝাই হইলে তাহাতে জমিদারের দল পুরু হইবে এবং বঙ্গে জমিদারদের মধ্যে হিন্দুর সংখ্যা বেশী বলিয়া বঙ্গীয়

উচ্চ কক্ষ হিন্দুপ্রধান ও জমিদারপ্রধান হইবে। কিন্তু সে আশা পূর্ণ হইবে না। উচ্চ কক্ষে মুসলমানরা নির্ব্বাচন করিবেন ১৭ জন মুসলমান মেম্বর। নিম্ন কক্ষের দ্বারা নির্ব্বাচিত উচ্চ কক্ষের ২৭ জন মেম্বরের মধ্যে অন্যূন ১৩ জন মুসলমান হইবেন, কারণ নিম্ন কক্ষের শতকরা ৪৮ জন সভ্য মুসলমান। গবর্ণর উচ্চ কক্ষের যে দশজন মেম্বর নির্ব্বাচন করিবেন, তাহার মধ্যে অন্ততঃ পাঁচ জন হইবেন মুসলমান। এক জন ইউরোপীয় মেম্বর ইউরোপীয় ভোটারদের দ্বারা নির্ব্বাচিত হইবেন। অতএব উচ্চ কক্ষের ৬৭ (বা ৬৫) জন মেম্বরের মধ্যে ৩৫ জন হইবেন মুসলমান ও একজন ইউরোপীয়। অনুগ্রহভাজনেরা অনুগ্রাহকের দলেই সাধারণতঃ থাকে। অতএব "উচ্চ" কক্ষের অ-হিন্দু সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের দ্বারা গবন্মেণ্ট সাধারণতঃ জনমতকে প্রতিহত করিতে সমর্থ হইবেন।

—

পুণা-চুক্তির অযৌক্তিকতা

পুণা-চুক্তির দ্বারা বঙ্গের অনুন্নত শ্রেণীসমূহকে বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভায় "সাধারণ" ৮০টি আসনের ৩০টি দেওয়া হইয়াছে। কিন্তু "অনুন্নত" শব্দটির কোন সরকারী সংজ্ঞা, কোন সর্ব্বজনসম্মত সংজ্ঞা, না থাকায়, কাহাদের জন্য, কতগুলি মানুষের জন্য, ৩০টি আসন রাখা হইয়াছে, বুঝা কঠিন। অনুন্নত জাতিদের সরকারী, পরীক্ষাধীন, তালিকায় যে-সব জা'তের নাম আছে, তাহাদের মোট লোকসংখ্যা ৯৩,৩৬,৬২৪। বাগদী, ভুঁইমালী, ধোবা, জালিয়া কৈবর্ত্ত, ঝালো-মালো, কপালী, নাগর, নাথ, পোদ, পুণ্ড্রী, রাজবংশী, রাজু, শুঁড়ী ও শুঁড়ীরা অস্পৃশ্য অনাচরণীয় অবনত ইত্যাদি নামে পরিচিত হইতে তাঁহাদের অনিচ্ছা কিছু দিন হইল গবন্মেণ্টকে জানাইয়াছেন। আরও কোন কোন জাতি পরে এইরূপ অনিচ্ছা জানাইয়া থাকিবেন। যাঁহাদের নাম উপরে দিয়াছি, তাঁহাদের মোট লোকসংখ্যা ৫০,১৯,৫৩৬। ৯৩,৩৬,৬২৪ হইতে এই সংখ্যা বাদ দিলে ৪৩,১৭,০৮৮ থাকে। ইহা হইতে ২০,৮৬,১৯২ জন নমশূদ্রেকও বাদ দিতে হইবে। কারণ তাঁহারা সামাজিক হিসাবে ব্রাহ্মণত্ব ক্ষত্রিয়ত্ব, মোটের উপর দ্বিজত্বের, দাবি অনেক বৎসর ধরিয়া করিয়া আসিতেছেন, ব্যারিষ্টার উকীল মোক্তার ডাক্তার গ্রাজুয়েট তাঁহাদের মধ্যে অনেকে আছেন, অন্য জা'তদের সঙ্গে প্রতিযোগিতা দ্বারা নির্ব্বাচন-যুদ্ধে জয়লাভ করিয়া কয়েক জন বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভায় ঢুকিয়াছেন, এবং মোটের উপর তাঁহারা স্বাবলম্বী ও প্রগতিশীল। অতএব অবনতদের সংখ্যা বঙ্গে জোর ২২,৩০,৮৯৬ দাঁড়ায়। সংখ্যার অনুপাতে ইহাঁরা আটটির বেশী আসন পাইতে পারেন না, কিন্তু ইহাঁদিগকে দেওয়া হইয়াছে ৩০টি।

যে-কোন জা'তের লোক ব্যবস্থাপক সভার যত আসন দখল করুন, তাহাতে আমাদের আপত্তি নাই। আমরা চাই, যে, তাঁহারা অস্পৃশ্যতাদির ছাপ কপালে লাগাইয়া সেখানে না-যান, এবং চাই, যে, তাঁহারা স্বরাজসৈনিক হইয়া ব্যবস্থাপক সভায় প্রবেশ করুন এবং সেখানে কাজ করুন স্বরাজসৈনিকের মত।

—

পুণা-চুক্তি সমর্থনের আনুষঙ্গিক দোষ

যখন পুণা-চুক্তিতে মহাত্মা গান্ধী মত দেন, তখন বলিয়াছিলেন, যে, তাঁহার সম্মতির মানে এ নয়, যে, তিনি প্রধান মন্ত্রীর সাম্প্রদায়িক নির্দ্ধারণেও মত দিতেছেন। কিন্তু গান্ধীজীর দলভুক্ত লোকেরা চুক্তিটি তাঁহার অনুমোদিত বলিয়া এমন করিয়া উহার সমর্থন করিতেছেন, যে, প্রধান মন্ত্রীর সাম্প্রদায়িক নির্দ্ধারণ (communal award) যে কংগ্রেসের ও গান্ধীজীর অনুমোদিত নহে, তাহা ভুলিয়া যাইতেছেন এবং প্রধান মন্ত্রীর নির্দ্ধারণের পুনঃ পুনঃ প্রতিবাদ করিতেছেন না। তাঁহাদের ভয় হয় ত এই, যে, তাহা হইলে পুণা-চুক্তিরও ত সাক্ষাৎ বা পরোক্ষ প্রতিবাদ করিতে হয়।

পুণা-চুক্তির দ্বারা আর একটি অনভিপ্রেত কুফল ফলিতেছে। গান্ধীজীর, কংগ্রেসের, সমাজসংস্কারকদের মুখ্য উদ্দেশ্য "অবনত" জনগণ আর যাহাতে অবনত না-থাকে, যাহাতে তাহারা সামাজিক ও অন্যান্য দিক দিয়া উন্নত হয় ও উন্নত বলিয়া পরিগণিত হয়। কিন্তু ত্রিশটি আসনের লোভ এরূপ হইয়াছে, যে, যাহারা আগে দ্বিজত্বের দাবি করিয়া আসিতেছিল তাহারাও কেহ কেহ অস্পৃশ্যত্ব অনাচরণীয়ত্ব ইত্যাদি আবার মানিয়া লইতেছে! অর্থাৎ এখন পুণা-চুক্তি রক্ষা এবং আসনের অধিকারী হওয়াটাই পরমার্থ হইয়া দাঁড়াইয়াছে, অনাচরণীয়ত্ব-মোচন পশ্চাতে পড়িয়া যাইতেছে।

পুণা-চুক্তির মোহ এরূপ হইয়াছে, যে, সরকারী ফর্দ্দে যাহাদিগকে অবনত বলিয়া ধরা হইয়াছে, তাহাদের অনেকের প্রতিবাদ সত্ত্বেও চুক্তির সমর্থক কংগ্রেসওয়ালারা সরকারী ফর্দ্দের চেয়েও বেশীসংখ্যক লোক যে বাংলা দেশে অবনত অনাচরণীয় ইত্যাদি, তাহা প্রমাণ করিতে যেন বদ্ধপরিকর হইয়াছেন!

ইহা কি সত্যের প্রতি আগ্রহ?

১২০।২, আপার সার্কুলার রোড, কলিকাতা, প্রবাসী প্রেস হইতে শ্রীমাণিকচন্দ্র দাস কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

সন্ধ্যার জ্যোতি

"সত্যম্ শিবম্ সুন্দরম্"
"নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ"

৩৩শ ভাগ
১ম খণ্ড

আষাঢ়, ১৩৪০

৩য় সংখ্যা

আষাঢ়

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

নব বরষার দিন,
বিশ্বলক্ষ্মী তুমি আজ নবীন গৌরবে সমাসীন।
রিক্ত তপ্ত দিবসের নীরস প্রহরে
ধরণীর দৈন্য 'পরে
ছিলে তপস্যায় রত
রুদ্রের চরণতলে নত।
উপবাসশীর্ণ তনু, পিঙ্গল জটিল কেশপাশ,
উত্তপ্ত নিঃশ্বাস।
দুঃখেরে করিলে দগ্ধ দুঃখেরি দহনে
অহনে অহনে :
শুষ্কেরে জ্বালায়ে তীব্র অগ্নিশিখারূপে
ভস্ম করি দিলে তারে তোমার পূজার পুণ্যধূপে।
কালোরে করিলে আলো,
নিস্তেজেরে করিলে তেজালো;
নির্ম্মম ত্যাগের হোমানলে
সম্ভোগের আবর্জ্জনা লুপ্ত হয়ে গেল পলে পলে।
অবশেষে দেখা দিল রুদ্রের উদার প্রসন্নতা,
বিপুল দাক্ষিণ্যে অবনতা
উৎকণ্ঠিতা ধরণীর পানে।

নির্ম্মল নবীন প্রাণে
অরণ্যানী
লভিল আপন বাণী।
দেবতার বর
মুহূর্ত্তে আকাশ ঘিরি রচিল সজল মেঘস্তর।
মরুবক্ষে তৃণরাজি
পেতে দিল আজি
শ্যাম আস্তরণ,
নেমে এল তার 'পরে সুন্দরের করুণ চরণ।
সফল তপস্যা তব
জীর্ণতারে সমর্পিল রূপ অভিনব ;
মলিন দৈন্যের লজ্জা ঘুচাইয়া
নব ধারাজলে তারে স্নাত করি দিলে মুছাইয়া
কলঙ্কের গ্লানি ;
দীপ্ত তেজে নৈরাশ্যেরে হানি
উদ্বেল উৎসাহে
রিক্ত যত নদীপথ ভরি দিলে অমৃত-প্রবাহে।
জয় তব জয়
গুরু গুরু মেঘগর্জ্জে ভরিয়া উঠিল বিশ্বময়॥
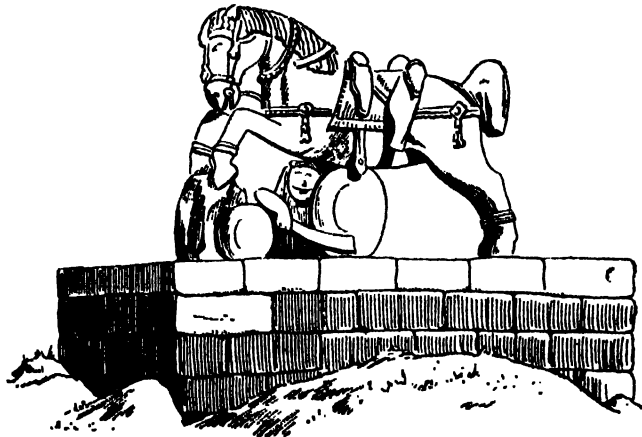
স্বর্ণমান

শ্রীঅনাথগোপাল সেন

বর্ত্তমান সময়ে আমরা সকলেই অর্থসঙ্কটের ফল কম-বেশী ভোগ করিতেছি এমন কি ঐশ্বর্য্যশালী ইউরোপ ও আমেরিকার অবস্থাও কাহিল। সুখ ও সম্পদের একটানা উর্দ্ধগতির পথে হঠাৎ শনির দৃষ্টি উহাদের উপরও পড়িয়াছে। উর্দ্ধরেখা নীচের দিকে নামিতে সুরু করিয়াছে। "বাণিজ্যে বসতে লক্ষ্মী" এই ছিল তাহাদের মূলমন্ত্র। এদিকে পণ্যদ্রব্যের চাহিদা কমিতেছে, বিশ্বের হাটে মূল্য যাহা মিলে তাহাতে খরচ পোষায় না। আবার সকল দেশই নিজের পণ্য অন্য দেশে পাঠাইয়া নিজের কোলে সমস্ত ঝোল টানিতে চান। কেহই পরের দ্রব্য পারতপক্ষে ক্রয় করিবেন না; তাহার জন্য ফন্দিফিকিরের অন্ত নাই। ফলে বাণিজ্য হইয়াছে অচল—কলকারখানার মজুর, কারিকর ও কৃষক বসিয়াছে পথে। প্রাসাদ ও ঐশ্বর্য্যের মাঝেও বেকারসমস্যা তাহার বিরাট ও ও বিকট মূর্ত্তি লইয়া মাথা তুলিয়া দাঁড়াইয়াছে। অর্থনীতি-বিশারদ না হইয়াও আমরা এই সহজ সত্যটুকু চোখে দেখিতেছি ও বুঝিতেছি যে, সকল দেশের কাঁচা ও তৈয়ারী মালের চাহিদা ও দর কমিয়া যাওয়াতেই এই সঙ্গীন অবস্থার সৃষ্টি হইয়াছে। দেশের সম্পদ যাহারা হাতে-নাতে সৃষ্টি করে (producers of wealth) তাহাদের হাত যখন শূন্য হইতে সুরু হইল, সঙ্গে সঙ্গে আর সকল শ্রেণীর অবস্থাও হইল কাহিল; কারণ আর সকলে তাহাদের ধনে পোদ্দারী করেন মাত্র। এই পর্য্যন্ত আমরা সাধারণ বুদ্ধিতে বুঝিতে পারি। কিন্তু জিনিষের চাহিদা ও দরের হঠাৎ এরূপ নিম্নগতি হইল কেন; আবার কি করিলে পণ্যদ্রব্যের চাহিদা ও মূল্য বৃদ্ধি পাইবে; আন্তর্জ্জাতিক অর্থনীতির সহিত এ সমস্যার সম্বন্ধ কোথায়; স্বর্ণমান পরিত্যাগ করিলেই দেশ-বিদেশের বাণিজ্যের উন্নতি কি পরিমাণ হইতে পারে; বিভিন্ন দেশের অর্থের বিনিময়ের হার অ-স্থির ও অনির্দ্দিষ্ট হওয়ায় কি প্রকারে ব্যবসার ক্ষতি হয়, উনবিংশ শতাব্দীর অব্যাহত বাণিজ্যনীতির পরিবর্ত্তে বর্ত্তমান কালের রক্ষণশীল নীতি কি ভাবে আন্তর্জ্জাতিক ব্যবসা-বাণিজ্যের টুঁটি চাপিয়া ধরিয়াছে; পৃথিবীব্যাপী ঋণের গুরুভার, বিশেষতঃ সমর-ঋণের নিষ্ঠুর চাপ, পৃথিবীর কতখানি শ্বাসরোধ করিতেছে—এ সব জটিল প্রশ্ন যখন ওঠে তখন তৎসম্বন্ধে আমাদের শিক্ষিত বাঙালীদের ভাবিবার বা বলিবার কিছু থাকে না। কিন্তু বর্ত্তমান জগতে আমরা যদি টিকিতে চাই তাহা হইলে এই-সব ব্যাপারে আমাদের জ্ঞানের প্রয়োজন অপরিহার্য্য। চারিদিকে মুক্তিপথের সন্ধান চলিয়াছে। বৈঠক ও পরামর্শের শেষ নাই। আমাদের অনেকের মনেও এক্ষণে এ-সব বিষয়ে কিছু জানিবার আগ্রহ হইয়াছে। তাই আজ অর্থনীতির গোড়ার কথা 'স্বর্ণমান' সম্বন্ধে কিছু আলোচনা করিব।

কর্ম্মবিভাগ, বিভিন্ন পণ্যদ্রব্যের সহজ বিনিময়ের উপায় ও স্বোপার্জ্জিত ধনে মানুষের ব্যক্তিগত অধিকার—এই কয়টিকে মূল ভিত্তি করিয়া আমাদের বর্ত্তমান আর্থিক জগৎ প্রতিষ্ঠিত। কোন সমাজ যখন আত্মসর্ব্বস্ব হইয়া নিজের ক্ষুদ্র গণ্ডীর মধ্যে স্বল্প অভাব লইয়া বসবাস করে কেবল তখনই 'বার্টার' অর্থাৎ দ্রব্যবিনিময়ে বেচাকেনার কাজ চলিতে পারে। আমাদের প্রয়োজনীয় দ্রব্যের পরিমাণ যখন নগণ্য ছিল এবং নিজের দেশেই ভিন্ন জনপদের সহিত আমাদের বেচাকেনার সম্পর্ক অতি সামান্য ছিল, তখনই আমরা ধানের পরিবর্ত্তে দেশী জোলার গামছা, কামারের দা বা লাঙলের ফাল কিনিতে পারিতাম। কিন্তু বর্ত্তমানকালে ধান-চাল দিয়া আমরা বিলাতী মোটর গাড়ী, এমন কি কাশ্মীরী শাল কিনিতে পারি কি? কাজেই যখন একই দেশের বিভিন্ন গ্রাম বা শহরে নহে, একেবারে বিভিন্ন দেশে অসংখ্য রকম পণ্য তৈরি হইতে আরম্ভ হইল এবং তাহাদের মধ্যে অবারিত বিনিময় চলিতে লাগিল তখন আদিম যুগের 'বার্টার' পন্থায় আর কাজ চলিতে পারিল না। এইরূপ অসংখ্য পণ্য-বিনিময়ের হিসাব ঠিক রাখিবার জন্য একটা মধ্যস্থ মাপকাঠি স্থির করিয়া লইতে হইল। আমরা যদি আজও সেই 'বার্টার'-এর যুগেই থাকিতাম তাহা হইলে আন্তর্জ্জাতিক ব্যবসা-বাণিজ্যের এরূপ বিরাট ও দ্রুত প্রসার

হইতে পারিত না। যে মধ্যস্থ মাপকাঠির কথা এইমাত্র উল্লেখ করিলাম তাহারই নাম অর্থ (money)। অর্থশাস্ত্রে অর্থকে ধন বা সম্পদের প্রতিভূ মাত্র বিবেচনা করা হয়। দেশের ধন বা সম্পদ বলিতে সেই দেশের অর্থকে বুঝায় না, সেই দেশের কাঁচা বা তৈরি মাল বিশ্বের হাটে যাহার চাহিদা আছে—তাহাকেই বোঝায়। অর্থ বা টাকা কাগজের তৈরি নোটও হইতে পারে, তাহার ত নিজের কোন মূল্যই নাই। রৌপ্য বা স্বর্ণমুদ্রা হইলে তাহাদের মধ্যস্থিত ধাতুর যাহা বাজার দর ঐটুকুই দেশের সম্পদ হিসাবে তাহার কদর। পণ্যবিনিময়ের সুবিধার জন্য এই যে প্রতিনিধিত্বের সৃষ্টি হইয়াছে, ভিন্ন দেশে ইহার ভিন্ন নাম ও ভিন্ন মূল্য। ইংলণ্ডের মুদ্রা পাউণ্ড ষ্টার্লিং নামে পরিচিত, আমেরিকার মুদ্রার নাম ডলার, ফ্রান্সের মুদ্রাকে ফ্রাঁ বলা হয়। তিনটি মুদ্রারই স্বর্ণের পরিমাণ জানা থাকায় তাহাদের বিনিময়ের হার নির্দ্ধারণ করা কঠিন হয় না। অবশ্য কোন দেশের মুদ্রা বলিতে আমরা এক্ষণে শুধু সেই দেশের স্বর্ণমুদ্রাকেই বুঝিব না—ব্যাঙ্ক নোট, চেক ইত্যাদিকেও বুঝিব। আন্তর্জ্জাতিক বাণিজ্যে ধাতব মুদ্রা ব্যবহারের প্রয়োজনীয়তা ক্রমে ক্রমে অত্যন্ত হ্রাস পাইয়া গিয়াছে। বর্ত্তমান যুগে বাণিজ্যের অধিকাংশ লেন-দেন ব্যাঙ্ক নোট ও ব্যাঙ্ক চেক দ্বারাই চলিয়াছে; ধাতব মুদ্রার সহিত বাহ্যতঃ তাহার সম্পর্ক খুবই কম। কিন্তু ভিতরের ব্যাপার অন্যরূপ। আমরা তামা, নিকেল, রৌপ্য, কাগজের নোট বা চেক—যাহারই সাহায্যে পণ্য ক্রয় করি না কেন, এই সকলের পশ্চাতে পাউণ্ড, ডলার, ফ্রাঁঙ্ক প্রভৃতি মুদ্রা যে ধাতুতে গঠিত সেই ধাতু সমপরিমাণে থাকা চাই। একটি দৃষ্টান্ত দ্বারা বিষয়টি আরও পরিষ্কার করিবার চেষ্টা করা যাক। এক পাউণ্ড ছাপের নোট গ্রহণ করিয়া আমি আমার পণ্য বিক্রয় করিলেও তৎপরিবর্ত্তে আমি গবর্ণমেণ্টের নিকট হইতে এক পাউণ্ডের জন্য নির্দ্দিষ্ট পরিমাণ স্বর্ণ বা রৌপ্য পাইতে অধিকারী। ১৯৩১ সালে স্বর্ণমান পরিত্যাগ করার পূর্ব্ব পর্য্যন্ত এক পাউণ্ড নোটের পরিবর্ত্তে, ব্যাঙ্ক অব ইংলণ্ড হইতে ১২৩¼ গ্রেণ ওজনের সোনা পাওয়া যাইতে পারিত। ঊনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগ পর্য্যন্ত অধিকাংশ দেশের মুদ্রা রৌপ্যনির্ম্মিত ছিল। ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষার্দ্ধে অষ্ট্রেলিয়া ও ক্যালিফর্ণিয়ার সোনার খনি আবিষ্কারের সঙ্গে মুদ্রা ব্যাপারে রৌপ্যের স্থান স্বর্ণ অধিকার করিতে আরম্ভ করে। লড়াইয়ের সময় অর্থাৎ ১৯১৪ সাল ও ১৯১৯ সালের মধ্যে অর্থনৈতিক ব্যাপারে একটা মস্ত ওলটপালট হইয়া যায় এবং অধিকাংশ দেশই স্বর্ণমান পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হয়। কিন্তু ১৯১৯ ও ১৯২৫ সালের মধ্যে প্রধান প্রধান দেশগুলির সমবেত চেষ্টায় আন্তর্জ্জাতিক স্বর্ণমান পুনরায় সুদৃঢ় ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত হয়।

কোন দেশের মুদ্রা স্বর্ণমানের উপর প্রতিষ্ঠিত বলিলে আমরা কি বুঝিব? আমরা বুঝিব, (১) স্বর্ণ সেই দেশের 'লিগেল টেণ্ডার' অর্থাৎ সেই দেশে স্বর্ণের বিনিময়ে বেচাকেনা চলে; (২) আমরা সেই দেশের রাজকোষে সোনার থান দাখিল করিয়া তদ্বিনিময়ে তুল্যমূল্যের স্বর্ণমুদ্রা পাইতে অধিকারী; (৩) জনসাধারণের অবাধ স্বর্ণ আমদানী ও রপ্তানীর অধিকার আছে।

এই স্বর্ণমান হইতে কি উদ্দেশ্য সাধিত হয় এক্ষণে তাহা বুঝিবার চেষ্টা করা যাক। প্রত্যেক দেশের মুদ্রা যদি একটা নির্দ্দিষ্ট ওজনের স্বর্ণ দ্বারা গঠিত হয়, তাহা হইলে বিভিন্ন দেশের মুদ্রার বিনিময়ের হারও (rate of exchange) নির্দ্দিষ্ট হইয়া যায়। যদি এক ষ্টার্লিঙে ১২৩¼ গ্রেণ, এক ডলারে ২৫ গ্রেণ, এবং এক ফ্রাঁতে প্রায় ৫ গ্রেণ খাঁটি সোনা থাকে তাহা হইলে এক পাউণ্ড ষ্টার্লিং, ৪·৮৬ ডলার ও ২৫ ফ্রাঁর সমান হইবে (কাছাকাছি হিসাব ধরা হইল)। আন্তর্জ্জাতিক বাণিজ্য অতিমাত্রায় বৃদ্ধি পাওয়ায় এই বিনিময়ের হার যথাসম্ভব ঠিক রাখা অত্যন্ত প্রয়োজন। বিশেষতঃ বর্ত্তমান কালে অধিকাংশ কেনাবেচার কাজ ধারে হওয়ায় ইহার প্রয়োজন আরও বেশী এবং স্বর্ণমান দ্বারা সেই প্রয়োজনই সাধিত হইয়া আসিতেছিল। একটা দৃষ্টান্ত দেওয়া যাক। আমেরিকা হইতে ইংরেজ ব্যবসায়ী তুলা খরিদ করিলে তাহাকে তাহার মূল্য ডলারে হিসাব করিয়া দিতে হইবে। যদি ডলার ও ষ্টার্লিঙের মধ্যে বিনিময়ের হার নির্দ্দিষ্ট থাকে তবেই কত ষ্টার্লিং হইলে তাহার চলিবে তাহা বুঝিয়া লাভালাভ হিসাব করিয়া সে ব্যবসা করিতে পারে। এক ষ্টার্লিং = ৪·৮৬ ডলার হইলে (উভয় দেশ স্বর্ণমানে থাকাকালীন বিনিময়ের হার এইরূপ ছিল)

ইংরেজ ব্যবসায়ীকে হাজার ডলার মূল্যের তুলার জন্য কত ষ্টার্লিং দিতে হইবে তাহার হিসাব সে সহজেই করিতে পারে. কিন্তু যে-মুহূর্ত্তে পাউণ্ড ষ্টার্লিঙের সহিত স্বর্ণের অভেদ্য সম্পর্ক ঘুচিয়া গেল, প্রত্যেক পাউণ্ড ষ্টার্লিঙের বিনিময়ে স্বর্ণ পাওয়া বন্ধ হইল, অমনি ষ্টার্লিঙের মূল্য হ্রাস হইতে সুরু করিল। স্বর্ণ বা ডলারের সহিত তাহার বিনিময়ের হার কমিতে লাগিল ও অনির্দ্দিষ্ট হইল। যেখানে এক পাউণ্ড ষ্টার্লিং=৪·৮৬ ডলার ছিল সেখানে বিনিময়ের হার অনির্দ্দিষ্ট হইয়া এক পাউণ্ড ষ্টার্লিঙের মূল্য ৩·৩০০ ডলার হইতে প্রায় ৪ ডলার পর্য্যন্ত অনবরত ওঠা-নামা করিতে লাগিল। ফলে ইংরেজ ব্যবসায়ীকে হাজার ডলারের বিনিময়ে কেবলমাত্র যে অধিক ষ্টার্লিং দিতে হইল তাহা নহে, উপরন্তু কতটা অধিক দিতে হইবে তাহাও সে বিনিময়ের অনিশ্চয়তার দরুণ বুঝিতে পারিল না। সুতরাং আমরা দেখিতে পাইতেছি বিভিন্ন দেশের মুদ্রার বিনিময়ের হার ঠিক না থাকিলে আন্তর্জ্জাতিক বাণিজ্যের মূল্য নিরূপণ করা কঠিন হইয়া পড়ে এবং বাণিজ্য জুয়াখেলা ও ভাগ্যপরীক্ষায় পরিণত হয়।

স্বর্ণমান আর একটি বড় উদ্দেশ্য সাধন করে। প্রত্যেক নোটের বিনিময়ে স্বর্ণ দিবার সর্ত্ত থাকায় কোন গবর্ণমেণ্ট অত্যধিক নোট ছাপাইয়া চালাইতে পারেন না। কারণ নোটের বিনিময়ে স্বর্ণ দিবার জন্য তাঁহাদিগকে সর্ব্বদাই প্রস্তুত থাকিতে হয়। তদ্দরুণ অতিরিক্ত কাগজের মুদ্রা প্রচলিত হইয়া জিনিষের দর অত্যধিক বৃদ্ধি পাইতে পারে না। কেনাবেচার জন্য যে পরিমাণ মাল দেশে আছে তদনুপাতে যদি মুদ্রার পরিমাণ বেশী হয় (inflation of currency) তাহা হইলে যোগান ও চাহিদার সাধারণ নিয়মানুসারে জিনিষের মূল্য অপেক্ষাকৃত বাড়িয়া যাইবে। তদ্দরুণ সেই দেশের জিনিষ বিদেশে কম রপ্তানী হইবে এবং বিদেশী জিনিষের আমদানী বাড়িবে। অথচ বিদেশীকে জিনিষের মূল্য কাগজে দেওয়া চলিবে না। ফলে দেশের সোনা বিদেশে চলিয়া যাইতে সুরু করিবে। স্বর্ণমান অতিরিক্ত মুদ্রা প্রচলনের প্রতিবন্ধকতা করিয়া এইরূপে তাহার কুফল নিবারণ করে। এই ত গেল সুবিধার দিক।

একটা অসুবিধার দিকও ইহার আছে। ইহার সাহায্যে ভিন্ন দেশের মধ্যে বিনিময়ের হার ঠিক থাকে সত্য, কিন্তু কোন জিনিষের দর দেশ-বিশেষের যোগান ও চাহিদা, তৈরি খরচ, মুদ্রার পরিমাণ ইত্যাদি অবস্থার উপর ততটা নির্ভর করে না—পৃথিবীময় মোট স্বর্ণের পরিমাণ ও অন্যান্য অবস্থার উপর যতটা নির্ভর করে। বিভিন্ন দেশের মধ্যে সর্ব্বপ্রকার ব্যবধান ঘুচিয়া যাওয়ায় কোন দেশের পণ্য আর এখন কেবল সেই দেশের পণ্য হিসাবেই গণ্য হইতে পারে না; বিশ্বের সকল হাটই তাহার খোঁজ রাখে এবং সেই কারণেই তাহার কদর দুনিয়ার হাটের অবস্থার উপর নির্ভর করে। আমরা দেখিয়াছি বিশ্বের হাটে কেনাবেচার মূল্য দেওয়া হয় স্বর্ণে। পণ্য-বিনিময়ে যদি আমরা স্বর্ণ লইতে চাই তাহা হইলে পৃথিবীর পণ্যের দর পৃথিবীর স্বর্ণের পরিমাণের উপর নির্ভর করিবে। তাই বিশ্বের হাটের দর তাহার নিজ নিয়মে যেমন নিয়ত ওঠা-নামা করিতে থাকে, বিভিন্ন দেশের দরকেও তাহার সহিত তাল রাখিয়া চলিতে হয়। ব্যাপার দাঁড়াইয়াছে এই যে, স্বর্ণমানের সাহায্যে সমগ্র পৃথিবীর সহিত ব্যবসাক্ষেত্রে আমাদের সংযোগ যেমন সহজ হইয়াছে, তেমনি আমাদের দেশের জিনিষের দর অর্থের সংকোচন ও প্রসারণ সাহায্যে (deflation and inflation) নিয়ন্ত্রিত করিবার শক্তি আমাদের হাতের বাহিরে চলিয়া গিয়াছে। আজকাল একদল লোক, যাহাদের একটা নির্দ্দিষ্ট আয়ের উপর জীবিকা নির্ভর করে, দরের এই নিয়ত পরিবর্ত্তন কিছুতেই পছন্দ করিতে পারেন না -ভাগ্যান্বেষী দলের নিকট ইহা যতই লোভনীয় হউক না কেন।

পৃথিবীর বাজার-দরের ওঠা-নামা প্রধানতঃ কি কারণে হয় এখানে তাহার একটু আলোচনা করা আবশ্যক। আমরা দেখিয়াছি বিশ্বের হাটে কেনাবেচা বাহ্যত যে-ভাবেই হউক না কেন, কার্য্যতঃ ও প্রকৃতপ্রস্তাবে সোনার সাহায্যেই ইহা সম্পন্ন হইয়া থাকে। তাহা হইলে অর্থনীতির মূলসূত্র যোগান ও চাহিদার নিয়মানুসারে বিশ্বের স্বর্ণতহবিলের কম-বেশীর সহিত জিনিষের দর নামিবে ও চড়িবে। সোনার পরিমাণ কমিয়া গেলে জিনিষ ক্রয়কালীন আমাদিগকে বাধ্য হইয়া সোনা কম দিতে হইবে, অর্থাৎ জিনিষের দর কমিবে। পক্ষান্তরে পৃথিবীর স্বর্ণতহবিল বৃদ্ধি পাইলে জিনিষ কিনিতে অধিক সোনা দেওয়া সহজ হয় এবং জিনিষের দর বাড়িতে থাকে। সেই জন্যই দক্ষিণ-আফ্রিকা, অষ্ট্রেলিয়া ও ক্যালি-

ক্যালিফোর্নিয়ার স্বর্ণখনি আবিষ্কারের সঙ্গে পৃথিবীর বাজার-দর চড়িয়াছিল। কিন্তু বর্ত্তমান সময়ে যে-পরিমাণ পণ্যদ্রব্য হাটে আসিতেছে সেই পরিমাণে স্বর্ণ বৃদ্ধি পাইতেছে না। তদুপরি আমেরিকা ও ফ্রান্সে প্রভূত স্বর্ণ অব্যবহৃত অবস্থায় আবদ্ধ আছে। চলতি সোনার এই ঘাটতি বাজার-দর পড়িয়া যাওয়ার অন্যতম প্রধান কারণ।

ইংলণ্ড ১৯৩১ সালে স্বর্ণমান পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হইল কেন এবং এই পন্থা অবলম্বন করিয়া তাহার লাভ ক্ষতি কি হইয়াছে এক্ষণে তাহা আলোচনা করা যাক। অর্থের (currency) বা দ্রব্যের বিনিময়ে স্বর্ণ দিতে না পারিলেই স্বর্ণমান পরিহার করা ভিন্ন উপায় থাকে না, মোটামুটি ইহা বুঝিতে পারা যায়। কিন্তু স্বর্ণের প্রধান হাট ইংলণ্ডে স্বর্ণাভাব ঘটিল কি করিয়া তাহাই আমাদিগকে বুঝিতে হইবে। এই আলোচনা প্রসঙ্গে কি করিয়া প্রভূত স্বর্ণ আমেরিকা ও ফ্রান্সে আসিয়া জমা হইল তাহাও আমরা বুঝিতে পারিব। ইংরেজ জাতিকে তাহাদের খাদ্যদ্রব্য, কাঁচা মাল ইত্যাদি বিদেশ হইতে অনেক পরিমাণে কিনিতে হয় বলিয়া তাহাদের রপ্তানী অপেক্ষা আমদানী অধিক এবং বাণিজ্যের গতি (balance of trade) তাহার প্রতিকূল। ইহার অর্থ এই যে, বাণিজ্য করিয়া ইংলণ্ড বিদেশ হইতে যত টাকা পায় তদপেক্ষা বেশী টাকা তাহার বিদেশকে দিতে হয়। এই অতিরিক্ত টাকার স্বর্ণ প্রতি বৎসর তাহার দেশ হইতে বাহিরে চলিয়া যাইবার কথা। কিন্তু এই সঙ্কটকাল উপস্থিত হইবার পূর্ব্ব পর্য্যন্ত, বিদেশে ইংরেজের যে বিপুল মূলধন ব্যবসায়ে খাটিত তাহার সুদ ও লাভ এবং পণ্যবাহী নৌবহর (mercantile marine) হইতে তাহার আয় এত অধিক ছিল যে তদ্দরুণ বিদেশকে অতিরিক্ত আমদানীর জন্য কোন টাকা দেওয়ার প্রয়োজন হওয়া দূরের কথা, উপরন্তু প্রতি বৎসর ইংরেজই বিদেশ হইতে বহু টাকা পাইবার হকদার ছিল। কিন্তু বিশ্বব্যাপী ব্যবসা মন্দার সঙ্গে সঙ্গে ইংলণ্ডের এই সব আয় অত্যন্ত হ্রাসপ্রাপ্ত হইতে আরম্ভ করে এবং আয়ব্যয়ের হিসাব নিকাশ অন্তে তাহাকে দেনদার হইতে হয়। ইংলণ্ডের স্বর্ণাভাবের ইহা অন্যতম কারণ, যদিও প্রধান কারণ নহে।

প্রধান কারণ খুঁজিতে হইলে আমাদিগকে ইউরোপের তৎকালীন কতকগুলি অবস্থার প্রতি দৃষ্টিপাত করিতে হইবে। লড়াইয়ের পর হৃতসর্ব্বস্ব জার্ম্মানীর উপর পর্ব্বত-প্রমাণ ঋণভার চাপাইয়া দেওয়া হইল।। ব্যবসা-বাণিজ্য, পণ্যবাহী নৌবাহিনী যাহার সমূলে ধ্বংসপ্রাপ্ত হইয়াছে, যাহার বিদেশ হইতে আনীত মুখের অন্নের মূল্যটুকু পর্য্যন্ত দিবার শক্তি ছিল না, সে কোথা হইতে এত টাকা দিবে? কিন্তু ইহারা বিষম জেদী জাত, তাই মরণ পণ করিয়া বৈদেশিক বাণিজ্য নূতন করিয়া গড়িয়া তুলিবার জন্য উঠিয়া পড়িয়া লাগিল। কিন্তু বিপুল মূলধনের দরকার, মূলধন পাইবে কোথায়? আমেরিকা ও ইংলণ্ড তাহাকে টাকা ধার দিতে রাজী হইল। ফলে জার্ম্মানী অতি অল্প সময়ের ভিতর নিজের ব্যবসা-বাণিজ্যের আশ্চর্য্যজনক উন্নতিসাধন করিয়া ফেলিল। কিন্তু ধার-করা টাকার সুদ আছে এবং সুযোগ বুঝিয়া ইহারা সুদও খুব উচ্চ হারে ধরিয়া লইয়াছিলেন। কাজেই বিরাট ঋণের বোঝা মাথায় করিয়া এত চেষ্টাতেও জার্ম্মানী তাহার অবস্থার পরিবর্ত্তন বিশেষ করিতে পারিল না। ইতিমধ্যে ১৯২৮-২৯ সালে আমেরিকা নিজের আভ্যন্তরীণ কতকগুলি কারণে জার্ম্মানীকে আর টাকা ধার দিতে রাজী হইল না। ফলে জার্ম্মানীর অবস্থা হইল সঙ্গীন। জার্ম্মানীর ধ্বংসে ফ্রান্সের প্রভাব ইউরোপে অপ্রতিহত হইয়া পড়িবে এবং হয়ত ইউরোপে একটা বিপ্লবের সৃষ্টিও হইতে পারে, এই আশঙ্কা করিয়া ইংলণ্ড নিশ্চেষ্ট থাকিতে পারিল না এবং জার্ম্মানীকে ঋণদান-ব্যাপারে আমেরিকার শূন্য স্থান অধিকার করিল। অবশ্য ইহার পিছনে রাজনৈতিক কারণ ব্যতীত লাভের প্রত্যাশাও ছিল। ব্যবসায় মন্দা হেতু ইংরেজ ব্যাঙ্কারদের হাতে বহু টাকা জমিয়া যায়। আমেরিকা ও ফ্রান্সের ধনী সম্প্রদায়ের অনেক টাকাও এই-সব ব্যাঙ্কের সুদে খাটিত। ইংরেজ ব্যাঙ্কাররা তিন টাকা সুদে ইহাদের টাকা গচ্ছিত রাখিয়া আট টাকা সুদে ঐ টাকা জার্ম্মানীকে ধার দিতে লাগিলেন। কিন্তু পৃথিবীর ব্যবসার অবস্থা নিম্নগামী হওয়ায় জার্ম্মানী কিছুতেই আর তাল সামলাইতে পারিল না। তাহার অবস্থা যত বেশী সঙ্গীন হইতে লাগিল, নিজেদের পূর্ব্ব প্রদত্ত অর্থ বাঁচাইবার জন্য তাহাকে রক্ষা করা ইংরেজের তত বেশী আবশ্যক হইয়া পড়িল। ফলে বাধ্য হইয়া আরও বেশী করিয়া টাকা ইংরেজ জার্ম্মানীকে ধার দিতে লাগিল। এইরূপ ঋণদানের জন্য ইংরেজদের ভাবী অবস্থা সম্বন্ধে কতকটা

আস্থাহীনতার দরুণও বটে, আবার নিজেদের দেশের অর্থসঙ্কট তখন গুরুতর হওয়ার দরুণও বটে, আমেরিকা ইংরেজদের ব্যাঙ্কে স্বল্প মেয়াদে গচ্ছিত টাকা ফেরত চাহিয়া বসিল। কিন্তু ইংরেজদের দেনদার জার্ম্মানী অষ্ট্রেলিয়া দক্ষিণ-আফ্রিকা প্রভৃতি দেশ কেহই তাহাকে টাকা দিতে পারিল না। বাধ্য হইয়া ইংরেজকে তাহার নিজ রিজার্ভ তহবিল হইতে আমেরিকায় স্বর্ণ পাঠাইতে হইল। এইরূপে এত স্বর্ণ বাহির হইয়া যাইতে লাগিল যে, সত্বর এই স্বর্ণ-রপ্তানী বন্ধ করিতে না পারিলে ইংরেজের স্বর্ণ-তহবিল শূন্য হওয়ার সম্ভাবনা হইয়া পড়িল। তখন আমেরিকা হইতে ঋণ গ্রহণ করিয়া এই স্বর্ণ-রপ্তানী বন্ধ করিবার চেষ্টা করা হইল। কিন্তু তাহা সত্ত্বেও আমেরিকার মহাজনেরা ইংলণ্ড হইতে টাকা তুলিয়া লইতে ক্ষান্ত হইলেন না। ফলে আমেরিকা হইতে যে-টাকা ধার লওয়া হইল তাহাও শীঘ্রই নিঃশেষ হইয়া গেল। পুনরায় ঋণগ্রহণের চেষ্টা করিলে আমেরিকা এমন কতকগুলি অপমানসূচক সর্ত্ত করিয়া লইলেন যাহার ফলে ইংরেজ মন্ত্রীবর্গের মধ্যে মতভেদ উপস্থিত হইয়া 'লেবার' গবর্ণমেণ্ট পদত্যাগ করিতে বাধ্য হন এবং রক্ষণশীল ও শ্রমিক দলের সংমিশ্রণে বর্ত্তমান ন্যাশানাল গবর্ণমেণ্টের প্রতিষ্ঠা হয়। এই-সব গোলমালে ইংরেজদের প্রতি আমেরিকা ও ফ্রান্সের আস্থা আরও কমিয়া যায়। মাহিনা কমানো লইয়া ইংরেজ নৌ-সেনানীর মধ্যে একটা ক্ষুদ্র বিদ্রোহের সংবাদ ইতিমধ্যে প্রচারিত হইয়া পড়ে এবং ফ্রান্স ও আমেরিকা উভয় দেশ তাহাদের প্রাপ্য টাকার জন্য অধিকতর ব্যস্ত হইয়া পড়ে। তখন উপায়ান্তরহীন হইয়া ইংলণ্ডকে স্বর্ণমান পরিহার করিতে হয়। এই সময়ে আমেরিকা ফ্রান্স ও ইংলণ্ডের স্বর্ণ-তহবিলের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে ইংলণ্ডের অবস্থা কি পর্য্যন্ত কাহিল হইয়াছিল তাহা বুঝিতে পারিব। ১৯৩১ সালে আমেরিকার স্বর্ণ-তহবিলের পরিমাণ. হইল ৪৬০০ মিলিয়ন ডলার; ফ্রান্সে ২৩০০ মিলিয়ন ডলার; ইংলণ্ডে ৬৫০ মিলিয়ন ডলার মাত্র।

স্বর্ণমান পরিহার করার ফলে বিদেশী মহাজনদের দেনা পরিশোধ করা ভিন্ন আর কাহাকেও সোনা দেওয়ার দায় হইতে ইংলণ্ড রক্ষা পাইল এবং সঙ্গে সঙ্গে বিদেশে স্বর্ণ রপ্তানী করিবার অধিকারও আইনদ্বারা রহিত করা হইল। স্বর্ণহীন হইয়া এক পাউণ্ড কাগজের নোটের মূল্য কমিয়া গেল এবং যেখানে এক পাউণ্ড ষ্টার্লিং ৪·৮৬ ডলারের সমান ছিল সেখানে তাহার মূল্য ন্যূনকল্পে ৩·৩০০ ও উর্দ্ধকল্পে ৪ ডলার মাত্র দাঁড়াইল। এই ব্যাপারে জগৎ সমক্ষে ইংলণ্ডের সম্মানের খুবই লাঘব হইল বটে, কিন্তু স্বর্ণমান পরিহার করার ফল তাহার পক্ষে শাপে বর হইয়া দাঁড়াইল। ষ্টার্লিঙের মূল্য হ্রাস পাওয়ায় বিলাতি মালের চাহিদা সঙ্গে সঙ্গে বাড়িয়া গেল। কারণ ষ্টার্লিঙের বিনিময়ে ফ্রান্স, আমেরিকা বা অন্যান্য দেশকে কম স্বর্ণমুদ্রা দিবার প্রয়োজন হইল। আমেরিকা ও অন্যান্য দেশ উচ্চহারে আমদানী শুল্ক বসাইয়া বিদেশী জিনিষের আমদানী বন্ধ করিবার যে চেষ্টা করিতেছিল ইংরেজ তাহা এইভাবে আংশিক ব্যর্থ করিয়া দিল। তাই ইংলণ্ড যখন সমরঋণের দায় হইতে মুক্তি পাইবার জন্য আমেরিকার নিকট অনুরোধ জানাইল তখন মহাজন পক্ষ হইতে এমন একটা সর্ত্তের কথা উঠিয়াছিল যে ইংলণ্ড যদি স্বর্ণমান পুনঃ গ্রহণ করে তবেই তাহাদের অনুরোধ সম্বন্ধে আমেরিকা বিবেচনা করিতে পারে। ইংলণ্ড এইরূপ সর্ত্তে অত্যন্ত আপত্তি করে। ফলে ওয়াশিংটন আলোচনায় মিঃ ম্যাকডোনাল্ড ও মিঃ রুজভেল্টের মধ্যে কোনরূপ সিদ্ধান্ত হইতে পারে নাই; অধিকন্তু মিঃ ম্যাকডোনাল্ডকে নিজগৃহে আদর-আপ্যায়নে পরিতোষ করার সঙ্গে সঙ্গেই আমেরিকা স্বর্ণমান পরিহার ঘোষণা করিয়া ইংলণ্ডকে পাল্টা জবাব দিয়াছে। ইহা অস্বীকার করা যায় না যে, ১৯৩১ সালে স্বর্ণমান পরিত্যাগ করিয়া বিনিময় হারের অনিশ্চয়তা সত্ত্বেও মন্দার বাজারে জিনিষের দর কমাইতে পারিয়া ইংলণ্ড কিছুমাত্র সামলাইয়া লইতে পারিয়াছে। অবশ্য এ সুবিধা বেশীদিন থাকিবে না যদি আমেরিকার ন্যায় ফ্রান্স এবং অন্যান্য দেশও স্বর্ণমান পরিত্যাগ করে।

এক্ষণে পৃথিবীর বর্ত্তমান আর্থিক সমস্যা সম্বন্ধে আমরা এইরূপ একটা ধারণা মোটামুটি করিতে পারি—পৃথিবীতে কাঁচা ও তৈরি মাল অতিরিক্ত পরিমাণে সৃষ্টি হইতেছে; অর্থের বা স্বর্ণের পরিমাণ ঐ মালের অনুপাতে বৃদ্ধি পায় নাই; আন্তর্জ্জাতিক ঋণের চাপে ও অন্যান্য কারণে স্বর্ণের ভাগ প্রত্যেক দেশের প্রয়োজন অনুযায়ী না হওয়ায়

পৃথিবীর অর্থের বা সোনার বাজারে একটা অসামঞ্জস্য ঘটিয়াছে। রপ্তানী অপেক্ষা আমদানী বেশী হইয়া দেশের অর্থ যাহাতে বিদেশে চলিয়া না যায় তজ্জন্য বিদেশী মালের উপর অতিরিক্ত শুল্ক বসাইয়া আন্তর্জ্জাতিক বাণিজ্যে বাধার সৃষ্টি করা হইতেছে; অবস্থার চাপে পড়িয়া কতগুলি দেশ স্বর্ণমান পরিহার করিতে বাধ্য হওয়ায় এবং তাহার ফলে তাহাদের মাল বিদেশে স্বল্পমূল্যে বিক্রয়ের সুবিধা হওয়ায় পরস্পরের মধ্যে রেষারেষি ও বিরোধ বৃদ্ধি পাইতেছে।

স্বর্ণমান পরিহারের অন্তর্নিহিত কারণ বিদূরিত করিয়া, বিনিময়ের হার স্থির রাখিয়া, general price level-এর উন্নতি সাধন করিতে পারিলেই সমস্যার সমাধান হইতে পারে ইহা আমরা বুঝিতে পারিতেছি। কিন্তু কি করিয়া তাহা সম্ভব এক্ষণে ইহাই প্রশ্ন বা সমস্যা। সকলেই ব্যক্তিগত স্বার্থ দেখিলে যেমন কোন জাতির সমষ্টিগত স্বার্থ রক্ষা হইতে পারে না, সেইরূপ প্রত্যেক জাতিই যদি নিজ নিজ 'পাউণ্ড অব্ ফ্লেশ' দাবি করে, তাহা হইলে পরস্পরসংশ্লিষ্ট এই আন্তর্জ্জাতিক সমস্যার মীমাংসা হওয়া সুদূরপরাহত। দেশসমূহের মনোবৃত্তি যদি বিশ্বাস ও সাহসের সহিত জাতীয়তার ও বিশ্বমানবতার সমন্বয় করিতে না পারে তাহা হইলে মীমাংসা অসম্ভব এবং সম্মুখে বিপ্লব ও নূতন সৃষ্টি এক প্রকার অবশ্যম্ভাবী।

স্বর্ণমান যতদিন থাকিবে ততদিন নোটের পরিবর্ত্তে স্বর্ণ দিবার সর্ত্তও থাকিবে এবং আইন করিয়া স্বর্ণের অতিরিক্ত নোটের পরিমাণ সীমাবদ্ধ করিতে হইবে। দুনিয়ার পণ্য বাড়িয়া চলিলেও দর চড়া রাখিবার জন্য ইচ্ছামত নোট প্রচলন করা যাইবে না। সেইজন্য প্রশ্ন উঠিয়াছে, দুনিয়ার স্বর্ণ-তহবিল অনুযায়ী অর্থের প্রয়োজন নির্দ্ধারিত না করিয়া দুনিয়ার পণ্যের পরিমাণ অনুসারে অর্থ প্রচলন করা সম্ভব কি-না। তাহা হইলে অর্থের পরিমাণ বাড়িবে, সঙ্গে সঙ্গে জিনিষের মূল্যও চড়িয়া যাইবে এবং সেই মূল্যের এত ঘন ঘন পরিবর্ত্তন হইবে না। কিন্তু তাহা করিতে হইলে দেশ-বিশেষের চেষ্টায় উহা সম্ভব হইতে পারে না। সকল জাতি মিলিয়া যদি একটি কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠা করিতে পারে এবং সেই ব্যাঙ্ক যদি সকল জাতির সম্মতি অনুসারে পৃথিবীর পণ্যের পরিমাণ বুঝিয়া মুদ্রার পরিমাণ নিয়ন্ত্রিত করিতে পারে, তবেই ইহা সম্ভব। ইহাতে স্বর্ণমান একেবারে পরিত্যাগ করিবার প্রয়োজন হইবে না। কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের নির্দ্দেশ অনুযায়ী স্বর্ণের অনুপাতে প্রত্যেক দেশের নোট প্রচলন করিবার ক্ষমতা আরও কিছু বাড়াইয়া দিলেই চলিবে এবং বিভিন্ন দেশের মধ্যে হিসাব-নিকাশ হইয়া যে দেনা দাঁড়াইবে শুধু তাহা স্বর্ণদ্বারা পরিশোধ করিলেই চলিবে। এমনও কেহ কেহ বলেন, দেনা স্বর্ণ-দ্বারা পরিশোধ না করিয়া জিনিষের দ্বারা পরিশোধ করিবার অধিকার দিতে হইবে। আবার এরূপ মতও কেহ কেহ পোষণ করেন যে, পৃথিবীর সকল দেশের স্বর্ণ-তহবিল আন্তর্জ্জাতিক সঙ্ঘের (League of Nations) কিংবা কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের জিম্মায় থাকিবে এবং সেখানে প্রত্যেক দেশের প্রয়োজন অনুযায়ী লেন-দেন হইয়া হিসাবে জমা-খরচ হইবে। কিন্তু এই পন্থা কার্য্যকরী করিতে হইলে প্রত্যেক দেশের স্বাতন্ত্র্য ও স্বেচ্ছানুবর্ত্তিতাকে অনেকখানি লোপ করিয়া দিতে হইবে। বৃহত্তর মঙ্গলের জন্য তাহার একান্ত আবশ্যকতা থাকিলেও সেই মনোভাবের নিতান্তই অভাব দেখা যাইতেছে। অথচ এত আলোচনা ও চিন্তার পরও অন্য কোন পন্থা নির্দ্দেশ আজ পর্য্যন্তও হইল না।

পুনর্জীবন

শ্রীনগেন্দ্রনাথ গুপ্ত

১

—মরা মানুষ কি আবার বেঁচে ওঠে ?

এক পল্লীগ্রামে একটি গৃহস্থের ঘরে যোগেশের মাতা এই প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিলেন। ঘরের মধ্যে বসিয়া যোগেশের বিধবা মাতা, পাড়ার দুই জন বর্ষীয়সী স্ত্রীলোক আর যোগেশ।

প্রাচীন কালের কথা হইতেছিল। এক জন স্ত্রীলোক বলিলেন,—না বাঁচলে শাস্তরে লিখবে কেন ? শাস্তর কি কখনও মিথ্যা হ'তে পারে ? মন্তরের জোরে মরা মানুষ বেঁচে উঠত, রামায়ণ মহাভারতেই এমন কত আছে ?

যোগেশ বলিল,—রামায়ণ-মহাভারতের সব কথা কি সত্যি ?

—সত্যি না হ'লে এতকাল দেশসুদ্ধ লোক বিশ্বাস ক'রে আসচে কেন ? তোমাদের সব ইংরিজী বিদ্যে হয়েচে. শাস্তর-টাস্তর কিছুই মান না।

যোগেশের মাতা বলিলেন. —সে কথা হচ্চে না। যোগেশ ডাক্তারী পড়চে, ওদের বইয়ে কি লেখে ?

যোগেশ বলিল, মানুষ ম'রে গেলে আর বাঁচে না. কিন্তু অনেক সময় দেখলে মনে হয় মরে গিয়েচে কিন্তু সত্যি মরে নি। তাই নিয়ে মরা মানুষ বাঁচবার কথা ওঠে।

তখন মেডিক্যাল কলেজ সম্প্রতি প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। কলেজে অধিকসংখ্যক ছাত্র হয় না, মড়া কাটায় আপত্তি। যে বার প্রথম ব্রাহ্মণ ছাত্র কলেজে প্রবেশ করে তখন অত্যন্ত গোলযোগ হয়, কিন্তু ক্রমে আপত্তি কমিয়া আসিতেছিল। যোগেশও ব্রাহ্মণ। সে যখন স্কুলে পড়ে সেই সময় তাহার পিতৃবিয়োগ হয়। বাড়িতে অভিভাবক তাহার জ্যেষ্ঠতাত. তিনি কিছু করিতেন না, তাঁহার এক মাত্র পুত্র কলিকাতায় একটা আপিসে চাকরি করিত। বৎসর-দুই পূর্ব্বে তিনি বিপত্নীক হইয়াছিলেন। বাড়িতে যোগেশের মাতা, এক বৃদ্ধা বিধবা পিসি, যোগেশ ও তাহার জেঠতুতো ভাই নরেশের স্ত্রী ও যোগেশের স্ত্রী। যোগেশ ইংরেজী প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া মেডিক্যাল কলেজে ভর্ত্তি হইয়াছিল। কলেজে এক বৎসর পরেই জলপানি পাইল। সঙ্গীদের মধ্যে সে সর্ব্বোৎকৃষ্ট ছাত্র। এইবার কলেজের শেষ পরীক্ষা। পরীক্ষার পূর্ব্বে কয়দিনের ছুটী পাইয়া যোগেশ বাড়ি আসিয়াছিল।

যোগেশ উঠিয়া আর একটা ঘরে গেল। সে ঘরে যোগেশের সপ্তদশ-বর্ষীয়া স্ত্রী সরোজিনী আর নরেশের একবিংশ-বর্ষীয়া স্ত্রী সরলা। যোগেশকে দেখিয়া সরোজিনী মাথায় ঘোমটা টানিয়া দিল। যোগেশ বলিল,—এখানে কে আছে যাকে দেখে ঘোমটা দিচ্চ ?

সরলা বলিল, — দেখতে পাচ্চ না আমি রয়েচি। আমার সাক্ষাতেও ওঁর লজ্জা। ও ছিল চিরকাল ক'নে বউ. এখন কলা বউ হয়েচে।

সরোজিনী কাপড়ের ভিতর হইতে হাত বাড়াইয়া সরলাকে একটা চিমটি কাটিল। সরলা বলিল,— দেখেচ, ঠাকুরপো, তোমার বউয়ের কত গুণ! ঘোমটার ভিতর থেকে আমাকে চিমটি কাটচে।

যোগেশ সরোজিনীর ঘোমটা টানিয়া খুলিয়া দিল, বলিল,—বড় বউ কি একটা ভারি মাতব্বর লোক যে ওর সামনে ঘোমটা দিচ্চ ?

সরলা কপট অভিমান করিয়া বলিল,— বটে ? আমি বাড়ির বড় বউ, জান না ? তুমি আমার পায়ে হাত দিয়ে নমস্কার কর না ?

— তাই ব'লে কি ছোট বউ তোমায় দেখে ঘোমটা দেবে ?

সরোজিনীর মুখ আরক্ত বর্ণ হইয়া উঠিল। সে মুখ হেঁট করিয়া রহিল।

যোগেশ বলিল,— তোমরা দু-জনের কেউ আমাকে চিঠি লেখ না. আমি বাড়ির কোন খবর পাইনে। জ্যাঠা-মশায় ত কালেভদ্রে কখন চিঠি দেন, আমি তিনখানা লিখলে হয়ত একখানা লেখেন।

সেকালে স্ত্রীলোকে স্বামীকে পত্র লিখিবার পদ্ধতি ছিল

না। সরলা ও সরোজিনী দু-জনেই অল্প-স্বল্প লেখা-পড়া শিখিয়াছিল, কিন্তু স্বামীকে কেহ পত্র লিখিত না। পত্রের শিরোনামায় কি স্বামীর নাম লেখা যায় —ছি! আর পত্র লিখিয়া ডাকে কেমন করিয়া দিবে, তাহা হইলে যে সকলে দেখিতে পাইবে।

সরলা বলিল,– তুমি আমাদের কি বলচ, তুমি আমাদের কখন চিঠি লেখ?

এই অভিযোগ সত্য। বধূদের স্বামীকে পত্র লিখিতে যেমন সঙ্কোচ, স্বামীরাও স্ত্রীকে পত্র লিখিতে সেইরূপ লজ্জা অনুভব করিত। যোগেশ একটু ভাবিয়া বলিল, -আচ্ছা, বড় বউ, এবার থেকে আমি তোমাকে চিঠি লিখব, তোমার চিঠির ভিতর ছোট বউকে চিঠি দেব। আর কতকগুলা খামে আমার ঠিকানা লিখে দিয়ে যাব, তোমরা তাইতে চিঠি পুরে দিও।

সরোজিনী মাথা নাড়িয়া মৃদুস্বরে বলিল,— আমি চিঠি লিখতে পারব না, কে কি বলবে! দিদি লিখলেই হবে।

—কে আবার কি বলবে? চিঠি লেখা কি একটা দুষ্কর্ম্ম না কি? বড় বউর সঙ্গে তুমি চিঠি লিখবে তাতে আর দোষ কি?

সরলা বলিল, –এতকাল পরে বুঝি তোমার চিঠি লেখা মনে পড়ল? এইবার কলকেতায় ফিরে গিয়েই তুমি ত একজামিন দেবে, তারপর পাস হয়ে বাড়ি আসবে।

—বাড়িতে কদিন থাকব? আমাকে একটা কিছু করতে হবে ত।

— বেশ ত, যখন কিছু করবে তোমার বউকে নিয়ে যেও।

–তা হ'লে দাদা তোমাকে নিয়ে যায় না কেন?

—তিনি অল্প মাইনে পান, শহরে অনেক খরচ, তাই আমাকে নিয়ে যান না।

কথাটার কোন নিষ্পত্তি হইল না। এক সপ্তাহ পরে পরীক্ষা হইবে বলিয়া দিন-দুই পরে যোগেশ কলিকাতায় চলিয়া গেল।

২

গ্রামে যেমন দিন কাটিত সেইরূপ কাটিতে লাগিল। যোগেশের জ্যাঠা মহাশয় উমেশ ঘরের দাওয়ায় বসিয়া ধূম পান করেন, গ্রামের চণ্ডীমণ্ডপে বসিয়া গল্পগুজব করেন, অপর গ্রামবৃদ্ধদিগের সহিত পাশা খেলেন। যোগেশের পিসিমা চরকায় সুতা কাটেন, মস্তকের স্খলিত কেশ সংগ্রহ করিয়া বধূদ্বয়ের চুলের দড়ি বিননী করেন। যোগেশের মাতা নিরামিষ পাক করেন, বধূরা আমিষ পাক করে। পুষ্করিণীতে পোনা, চেলা, মৌরলা, পুঁটি মাছ বিস্তর, জেলেরা ধরিয়া দিয়া যাইত। চালে লাউ-কুমড়া হইত, বাড়ির পিছনের জমিতে নটে শাক, বেগুন, ঢেঁড়স, সিম, ঝিঙে উৎপন্ন হইত। বাগানে কয়েকটা নারিকেল গাছ, একটা তেঁতুল ও একটা চালতে গাছ ছিল। কলাগাছে চাঁপা ও মর্ত্তমান কলা ফলিত। গ্রামে সপ্তাহে দুই দিন করিয়া হাট বসিত, হাটে আলু, পটল, পলতা, উচ্ছে, রাঙা আলু পাওয়া যাইত। বাড়িতে গরু ছিল। বধূরা পুষ্করিণীতে স্নান করিত, কাপড় কাচিত, বাসন মাজিত। মাসকাবারের সামগ্রী উমেশ বেণের দোকান হইতে লইয়া আসিতেন।

কলিকাতায় পঁহুছিয়া যোগেশ উমেশকে দুই ছত্রের একখানি চিঠি দিয়াছিল। তাহার পর পরীক্ষার হাঙ্গামায় পড়িয়া আর কাহাকেও কিছু লিখিতে পারে নাই। পরীক্ষা কিছু দিন ধরিয়া নাগাড়ে চলিতে লাগিল—কতক লিখিয়া, কতক মুখে মুখে, কতক শবদেহ কাটাকাটি করিয়া। যোগেশের নিঃশ্বাস ফেলিবার অবসর রহিল না।

কথায় কথায় সরলা এক দিন সরোজিনীকে বলিল,- কই, ঠাকুরপো আমাদের চিঠি দেবেন বলেছিলেন, চিঠি ত এল না।

সরোজিনী কুণ্ঠিতভাবে কহিল,—তাঁর পরীক্ষা হচ্চে কি না, তাই বোধ হয় সময় পান নি।

—তাই হবে।

যোগেশের পরীক্ষা প্রায় সমাপ্ত হইয়া আসিয়াছে এমন সময় এক দিন বৈকাল বেলা সরোজিনী সরলাকে বলিল,—দিদি আমার মাথা কেমন করচে?

–মাথা ধরেচে, না ঘুরচে?

সরোজিনী কোন উত্তর দিল না, মাটিতে শুইয়া মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িল। সরলা চীৎকার করিয়া উঠিল,—ছোট বউয়ের কি হল, দেখ!

যোগেশের মা ও পিসিমা ছুটিয়া আসিলেন। যোগেশের মা বলিলেন,—কি হয়েছে?

সরলা বলিল,—এই মাত্র ছোট বউ আমাকে বললে ওর মাথা কেমন করচে। ব'লেই অজ্ঞান হয়ে গেল।

পিসিমা বলিলেন,—কেন কিছুর দিষ্টি লাগে নি ত?

যোগেশের মা সরোজিনীর পাশে বসিয়া, তাহার গায়ে হাত দিয়া, তাহাকে নাড়াচাড়া দিয়া বলিলেন,—কি হয়েচে, বউ-মা? অমন ক'রে রয়েচ কেন?

সরোজিনীর মুখে কথা নাই। সর্ব্বাঙ্গ স্থির, চক্ষু নিমীলিত, নিঃশ্বাস-প্রশ্বাস বহিতেছে না।

উমেশ বাহিরের রোয়াকে বসিয়া তামাক খাইতেছিলেন। গোলমাল শুনিয়া, হুঁকা রাখিয়া, খড়ম-পায়ে তিনিও আসিলেন। জিজ্ঞাসা করিলেন,—এত চেঁচামেচি কিসের? কি হয়েচে?

তাঁহার ভগিনী বলিলেন,—ছোট বউ হঠাৎ অজ্ঞান হয়েচে, ডাকলে সাড়া দিচ্চে না। কি জানি কি হয়েচে! রোজা ডেকে পাঠাও।

উমেশ তাচ্ছিল্য ভাবে বলিলেন,- হ্যাঁ, তোমাদের সব তাতেই রোজা ডাক। রোজা কি করবে? দাঁতকপাটি লেগেচে, মুখে জলের ঝাপটা দাও, সেরে যাবে।

সরলা তাড়াতাড়ি এক ঘটি জল লইয়া আসিল। যোগেশের মা সরোজিনীর মুখে কয়েক বার জলের ঝাপটা দিলেন। সরোজিনীর মুখের ভিতর আঙুল দিয়া চুপি চুপি ননদকে বলিলেন,—ঠাকুরঝি, কই, দাঁতে ত দাঁত লাগে নি, মুখ খোলা রয়েচে।

ভাসুরের সাক্ষাতে যোগেশের মা জোরে কথা কহিতে পারিলেন না।

জলের ঝাপটায় কোন ফল হইল না। আলুলায়িত-কেশা, নিমীলিতনয়না সুন্দরী নিস্পন্দ রহিল। উমেশ বলিলেন,—তোমরা গোল ক'রো না, আমি কবিরাজ-মশায়কে ডেকে আনচি।

উমেশ কবিরাজ ডাকিতে গেলেন। যোগেশের মা অঞ্চল দিয়া মূর্চ্ছিতা পুত্রবধূর কেশ মুখ মুছাইয়া দিলেন, তাহার পর তিন জনে ধরাধরি করিয়া তাহাকে শয্যায় শয়ন করাইলেন।

গ্রামে চিকিৎসকের মধ্যে এক প্রাচীন হাতুড়িয়া বৈদ্য। পড়াশুনা কিছুই নাই, পুরুষানুক্রমে চিকিৎসা ব্যবসা। কয়েকটা ঔষধ ও পাঁচন সংগ্রহ, বায়ু পিত্ত কফের প্রকোপ আবৃত্তি করা অভ্যস্ত ছিল।

উমেশের সঙ্গে কবিরাজকে আসিতে দেখিয়া পাড়ার কয়েকজন স্ত্রী-পুরুষ আসিয়া জুটিল। পুরুষেরা বাড়ির বাহিরে দাঁড়াইয়া রহিল, স্ত্রীলোকেরা বাড়ির ভিতর প্রবেশ করিল।

কবিরাজ উমেশের সঙ্গে ঘরের ভিতর গিয়া সরোজিনীকে দেখিলেন। সরোজিনীর নাড়ী দেখিয়া কহিলেন,—আমি আর কি করব? হয়ে গিয়েচে। নাড়ী নেই।

ঘরের বাহিরে আসিয়া কবিরাজ আর দাঁড়াইলেন না, বাড়ি চলিয়া গেলেন। উমেশ ঘরের মধ্যে স্তম্ভিত হইয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন। তাহার পর বাহিরে আসিয়া শুষ্কমুখে কহিলেন,—কবিরাজ আর কি করবে? হয়ে গিয়েচে।

গৃহে ক্রন্দনের রোল উঠিল। ওগো আমাদের কি হ'ল গো! বলিয়া পিসিমা চীৎকার করিয়া কাঁদিয়া উঠিলেন। যোগেশের মা মাটিতে পড়িয়া রোদন করিতে লাগিলেন। সরলা ফুঁপাইয়া ফুঁপাইয়া কাঁদিতে লাগিল।

সরোজিনীর শয্যার পাশে দাঁড়াইয়া এক বৃদ্ধা তাহার স্থির মূর্ত্তি দেখিতেছিলেন। চক্ষের জল মুছিয়া বলিলেন,—যেন দুর্গা-ঠাকুরুণের প্রতিমা! মুখের ভাব একটুও বদলায় নি, ঠিক যেন ঘুমিয়ে রয়েচে। দেখলে কে বলবে মরে গিয়েচে।

নিদ্রা না মহানিদ্রা?

পাড়ার আরও লোক জড় হইল। গ্রামবৃদ্ধেরা উমেশকে বলিলেন,—যা হবার তা হয়ে গিয়েচে, ভবিতব্য কে খণ্ডন করতে পারে? তুমি আর ভেবে কি করবে, এখন সৎকারের ব্যবস্থা কর।

উমেশ বলিলেন,—আমার ত বুদ্ধিসুদ্ধি লোপ পেয়েচে, য করবার তোমরাই কর।

—বেশ ত, তুমি স্থির হও, আমরাই সব আয়োজন করচি।

তাঁহাদের আদেশে কয়েক জন ব্রাহ্মণ যুবক সকল ভার গ্রহণ করিল। বাড়ির ভিতর সরোজিনীর মৃতদেহ ভূতলে স্থাপিত হইল। তাহাকে চওড়া লালপেড়ে কোরা শাড়ী পরিধান করানো হইল। সরলা কাঁদিতে কাঁদিতে তাহার পায় আলতা, মাথায় সিন্দুর পরাইয়া দিল। যুবকেরা শবের জন্য একখানি ছোট খাট আনিয়াছিল। শব বাহির করিয়া লইয়া যাইবার সময় গৃহে রোদনের উচ্ছ্বাস উঠিল।

গ্রাম হইতে অল্প দূরে ক্ষুদ্র নদী। নদীর তীরে শ্মশান। চিতা সজ্জিত হইলে সরোজিনীর মৃতদেহ তাহার উপর রক্ষিত হইল। একখানা চেলাকাঠের অগ্রভাগ তাহার পৃষ্ঠে বিদ্ধ হইল তাহা কেহ লক্ষ্য করিল না। সরোজিনী জীবিতা থাকিলে বেদনা অনুভব করিত।

উমেশ নুড়া জ্বালিয়া শবের মুখাগ্নি করিবেন এমন সময় দেখেন শব চক্ষু উন্মীলন করিয়া বিস্ময় বিস্ফারিত দৃষ্টিতে তাঁহার মুখের দিকে চাহিয়া আছে!

অ্যাঁ-অ্যাঁ-অ্যাঁ শব্দ করিয়া উমেশ পিছাইয়া পড়িলেন। তাঁহার হাতের প্রজ্বলিত তৃণগুচ্ছ মাটিতে পড়িয়া গেল। তাঁহার সর্ব্বাঙ্গ ঠক-ঠক করিয়া কাঁপিতে লাগিল।

যাহারা পাশে দাঁড়াইয়া ছিল তাহারা কিছু বুঝিতে পারিল না, বিস্মিত হইয়া উমেশকে জিজ্ঞাসা করিল—কি হয়েচে? আপনি এমন ভয় পেয়েচেন কেন?

উমেশকে উত্তর দিতে হইল না। সরোজিনী চিতার উপর উঠিয়া বসিয়া পৃষ্ঠদেশে হাত বুলাইতে লাগিল। যাহারা চিতার কাছে দাঁড়াইয়া ছিল তাহারা চীৎকার করিয়া সরিয়া গেল।

সরোজিনীর সম্পূর্ণরূপে চৈতন্যোৎপাদন হয় নাই। মাথায় কাপড় টানিয়া দিতে তাহার প্রথমে মনে পড়িল না। অঙ্গে আঘাত লাগিতেছে বলিয়া সে চারিদিকে চাহিয়া দেখিল। পরে চিতা হইতে নামিয়া দাঁড়াইল।

সরোজিনীর চক্ষের জড়িমা অপসৃত হইল। সে কহিল—আমাকে চিলুর উপর শুইয়েছিল কেন? আমি কি মরে গিয়েচি?

তাহার পর অনেক লোক দাঁড়াইয়া আছে দেখিয়া সরোজিনী মস্তক ও মুখ অবগুণ্ঠিত করিল।

যাহারা দাঁড়াইয়া দেখিতেছিল তাহাদের মধ্যে এ-পর্য্যন্ত কাহারও বাকস্ফূর্ত্তি হয় নাই। সহসা একজন চীৎকার করিয়া উঠিল,—ওকে দানোয় পেয়েচে। ওকে চিলুতে ফেলে আগুন ধরিয়ে দাও।

অমনি অপর লোকেরা সমস্বরে বলিয়া উঠিল,—দানোয় পেয়েচে! দানোয় পেয়েচে!

কয়েক জন যুবক সাহস করিয়া সরোজিনীকে বলপূর্ব্বক চিতায় নিক্ষেপ করিবার জন্য অগ্রসর হইল।

গ্রামের চৌকিদার লাঠি হাতে করিয়া দাঁড়াইয়া দেখিতেছিল। সে হাঁকিয়া বলিল,—দানোয় পাক আর যাই হোক, তোমরা কি জ্যান্ত মানুষকে পুড়িয়ে মারবে? তোমাদের সবাইকে ধ'রে থানায় নিয়ে যাব, জান না?

থানার নাম শুনিয়াই সকলে পিছাইল। আর কোন কথা না বলিয়া সকলে গ্রামের অভিমুখে ফিরিয়া চলিল।

সরোজিনীও তাহাদের পশ্চাতে যাইবার উপক্রম করিতেছিল, এমন সময় উমেশ সভয়ে চীৎকার করিয়া বলিলেন,—আরে কি সর্ব্বনাশ! দানোয় পেয়ে কি আবার বাড়িতে ঢুকবে না কি? চল, চল, সব বাড়ির দরজা বন্ধ ক'রে দেবে। আজ রাত্রে কেউ দোর খুলো না, কি জানি কার বাড়িতে ঢুকে পড়বে।

উমেশের কথা শুনিয়া সরোজিনীর পা আর চলিল না। সে পাষাণ মূর্ত্তির ন্যায় স্থির হইয়া রহিল। দেখিতে দেখিতে শ্মশান জনশূন্য হইল। সরোজিনী ব্যতীত জন-মনুষ্য রহিল না।

৩

সায়াহ্নের সূর্য্য অস্তমিত হইতেছে। আকাশ গোধূলি রাগে রঞ্জিত হইয়াছে। বায়ুর বেগ মন্দীভূত হইয়া আসিতেছে। নদীস্রোতের স্নিগ্ধ কল কল ছল ছল শব্দ, চারিদিকে নীড় গমনোন্মুখ পক্ষীর কূজন। সেই সান্ধ্য শান্তির মধ্যে নিস্পন্দ হইয়া দাঁড়াইয়া একাকিনী রমণী! সে নিস্পন্দতা শান্তির স্থিরতা নহে, বজ্রাঘাতের ভস্মীভূত জড়তা। অনেকক্ষণ সরোজিনী কিছু বুঝিতে পারিল না, কিছু ভাবিতে পারিল না। ক্রমে চিত্তবৃত্তি ফিরিয়া আসিল। তাহার কি হইয়াছে? সে গৃহস্থের বধূ, সন্ধ্যার সময় সে একাকিনী শ্মশানে দাঁড়াইয়া কেন? উমেশের কথায় সে বুঝিয়াছিল যে শ্বশুর-বাড়িতে তাহার আর স্থান নাই। তবে সে কোথায় যাইবে? বাপের বাড়ি? সেখানে কি সে আশ্রয় পাইবে, না তাহাকে দেখিয়া বাপের বাড়িরও দ্বার রুদ্ধ হইবে? সে কি মরিয়া গিয়াছিল যে তাহাকে শ্মশানে আনিয়া, চিতায় শয়ন করাইয়া তাহার মুখাগ্নি করিবার উদ্যোগ হইতেছিল? সেই যে সরলাকে বলিয়াছিল তাহার মাথা কেমন করিতেছে তাহার পর আর কিছু স্মরণ নাই। যখন তাহার চৈতন্য হইল তখন তাহার পৃষ্ঠে বেদনা, কে যেন

তাহার মুখে আগুন দিতে আসিতেছে। পরে বুঝিল সে উমেশ। সরোজিনীকে কি সত্য সত্যই দানোয় পাইয়াছে? সে ত পূর্ব্বে যেমন ছিল এখনও সেইরূপ আছে, তবে সকলে এমন কথা কেন বলিল? তাহার শরীরের কি মনের কোন বিকার হয় নাই, কোন পরিবর্ত্তন হয় নাই। তবে তাহাকে কেন গৃহবহিষ্কৃত করিয়া তাহার ভয়ে সকলে বাড়ির দরজা বন্ধ করিবে?

শ্মশানে জনপ্রাণী নাই, সরোজিনী একা দাঁড়াইয়া ভাবিতে লাগিল। তাহার কি অপরাধ? সে কি করিয়াছে যে কারণে তাহাকে শ্মশানে রাখিয়া সকলে চলিয়া গেল? সরোজিনী বুঝিতে পারিল তাহার অপরাধ সে মরিয়াও মরে নাই। যে একবার মরে সে আবার বাঁচিয়া উঠিলেও গৃহসংসারে তাহার আর ঠাঁই নাই। যদি চৌকিদার না থাকিত তাহা হইলে গ্রামের লোক তাহাকে জোর করিয়া পুড়াইয়া মারিত। ঘরে যদি তাহার আর স্থান না রহিল তাহা হইলে সে কোথায় থাকিবে? শ্মশানবাসিনী হইবে? সরোজিনী স্থির করিল, মরণ ছাড়া তাহার অন্য উপায় নাই। সম্মুখে নদী। নদীতে ডুবিয়া মরিবে।

ঘোর-ঘোর হইয়া আসিয়াছে। আকাশে তারা উঠিয়াছে, মাথার উপর দিয়া বাদুড় উড়িয়া যাইতেছে। সরোজিনী ধীরে ধীরে নদীর অভিমুখে চলিল। তাহার পিছনে আর এক জন আসিতেছে তাহা লক্ষ্য করে নাই। সে জলে নামিবার উপক্রম করিতেছে এমন সময় পশ্চাৎ হইতে নারীকণ্ঠে কে বলিল,—হ্যাঁগা, বাছা, ভর সন্ধ্যেবেলা কি জলে নামতে আছে?

সরোজিনী অপরাধীর ন্যায় থমকিয়া দাঁড়াইল। যে কথা কহিয়াছিল সে সরোজিনীর পাশে আসিয়া দাঁড়াইল। তাহাকে দেখিয়া সরোজিনী চিনিল—বামা। বামা জাতিতে কৈবর্ত্ত, বিধবা, আধাবয়সী। সময়ে সময়ে সরোজিনীর শ্বশুর-বাড়িতে তরি-তরকারী দিয়া যাইত। সে ভূত-প্রেতের ভয় করে না, গ্রামের লোকের চেঁচামেচি শুনিয়া শ্মশানে সরোজিনীর অন্বেষণে আসিয়াছিল। সরোজিনীকে নদীর দিকে যাইতে দেখিয়াই তাহার অভিপ্রায় বুঝিতে পারিয়াছিল। কাছে আসিয়া বলিল,—বউদিদি, কি করচ? তুমি এখানে কেন?

শুষ্ক মুখে শুষ্ক চক্ষে সরোজিনী বলিল,—আর কোথায় যাব? আমার ত আর কোথাও ঠাঁই নেই, ডুবে মলেই সব যন্ত্রণা ফুরোবে।

—বালাই, বউদি, অমন কথা মুখে আনতে নেই। কোথাকার এক হাতুড়ে কবিরাজ, তার কথায় এমন কাজ করতে হয়? দানো-টানো কিছু নয়, তুমি অজ্ঞান হয়ে গিয়ে থাকবে, তাই নিয়ে এত কাণ্ড! তুমি আমার সঙ্গে বাড়ি চল।

তখন সরোজিনী কাঁদিয়া ফেলিল। তাহার দুই চক্ষু বহিয়া অজস্র অশ্রুধারা বহিতে লাগিল। কাঁদিতে কাঁদিতে বলিল,—কোথায় যাব বামা? আমার কি বাড়িঘর আছে, না আমাকে কেউ ঘরে ঢুকতে দেবে? আমায় যে দানোয় পেয়েচে!

—ওদের যেমন কথা! তুমি আমার বাড়ি চল, তোমার সব আলাদা ক'রে দেব। দু-দিন পরে ত দাদাবাবু আসবে, তখন আর কোন গোল থাকবে না।

সরোজিনী নীরবে রোদন করিতে করিতে বামার সঙ্গে তাহার বাড়ি গেল। দিব্য খট-খটে ঘর, ঘরে তক্তপোষ পাতা ছিল। বামা বলিল,—বাইরে ইঁট দিয়ে উনান পেতে দিচ্চি, কোরা হাঁড়ি কুমোরঘর থেকে এনে দিচ্চি, তুমি রেঁধে খাও।

সে রাত্রে সরোজিনী কিছুতেই পাক করিতে স্বীকার করিল না। বামা গয়লা-বাড়ি হইতে দুধ লইয়া আসিল, অনেক পীড়াপীড়িতে সরোজিনী সেই দুধটুকু পান করিয়া শয়ন করিল। বামা মাটিতে মাদুর পাতিয়া শুইয়া পড়িল।

৪

উমেশ বাড়ি ফিরিবার পূর্ব্বেই সরোজিনীর অদ্ভুত বৃত্তান্ত গ্রামময় রাষ্ট্র হইয়া গিয়াছিল। তিনি বাড়িতে ফিরিয়া দেখেন কান্নাকাটি থামিয়া গিয়াছে, স্ত্রীলোকেরা ভয়ে জড়সড় হইয়া রহিয়াছে। সরলার মাথায় ঘোমটা, যোগেশের মা মাথায় অল্প কাপড় টানিয়া দিয়াছেন। উমেশের ভগিনী ভয়ে আড়ষ্ট, চক্ষু কপালে উঠিয়াছে। তিনি বয়সে উমেশের অপেক্ষা বড়। তিনি বলিলেন,—কি হয়েচে? লোকে কত কি বলচে।

উমেশ বলিলেন,—আশ্চর্য্য ব্যাপার! ছোট বউমাকে চিলুতে শুইয়ে মুখাগ্নি করতে যাচ্ছি, দেখি সে কটমট ক'রে

চেয়ে রয়েচে। তখনই ধড়মড়িয়ে উঠে বসল, তার পর নীচে নেমে দাঁড়াল।

যোগেশের মা মৃদুস্বরে ননদকে বলিলেন,—ঠাকুরঝি, বউ-মা মূর্চ্ছা যায় নি ত?

কথাটা উমেশের কানে গেল। তি'ন বিরক্ত ভাবে কহিলেন,—কবিরাজ নাড়ী দেখে বললে মরে গিয়েচে, সে কি মুখ্খু না কি? মরে গেলে পর ছোট বউমাকে দানোয় পেয়েচে। এ রকম আগে কত হ'ত, আমরা কত শুনেচি, সেকালে দানোয় পেলে তাকে বাঁশের খোঁচা দিয়ে চিলুতে ফেলে পুড়িয়ে দিত, এখন ত তা হবার জো নেই, চৌকিদার শাসালে আমাদের ধরে থানায় নিয়ে যাবে। এখন সে দানোয় পেয়ে ঘুরে বেড়াবে, কবে কার ঘাড় মটকাবে। আমাদের পিছনে পিছনে আসছিল, আমি চেঁচিয়ে উঠলাম তখন দাঁড়িয়ে রইল। আজ রাত্রে কেউ আর বাড়ির দরজা খুলবে না।

উমেশ কথা কহিতেছেন এমন সময় জন-কয়েক যুবকের সঙ্গে একজন রোজা আসিয়া উপস্থিত। উমেশ বাহিরে আসিলে রোজা বলিল,—দানোয় পেলে কি তাকে ছেড়ে দিতে আছে, তা হ'লে গ্রামের লোকের বিপদ হবে। আমি ঝাড়ান করলে দানো ছেড়ে যাবে, তার পর সহজ মরা মানুষের মতন সংকার করলেই হবে। আমি শুনেই তাড়াতাড়ি এসেচি।

উমেশ বলিলেন,—সে যে মশানে আছে, সেখানে রাত্রে কে যাবে?

রোজা দম্ভ করিয়া বলিল.—তাতে আর কি হয়েচে? আমি একাই যেতে পারি, কিন্তু চিনিয়ে দেবার জন্য ত কাউকে চাই।

যুবকেরা বলিল,—বেশ ত, আমরা তোমার সঙ্গে যাচ্চি।

কয়েকটা মশাল জোগাড় করিয়া তাহারা মশানে গেল, চারিদিকে খুঁজিয়া কোথাও কাহাকে দেখিতে পাইল না। সরোজিনীকে বামার সহিত তাহার বাড়িতে যাইতে কেহ দেখে নাই।

রোজা আর যুবকেরা ফিরিয়া আসিলে উমেশ বলিলেন,—আমি যা ভেবেছিলাম তাই হয়েচে! দানোয় পেলে কোথায় চলে যায়, কোথায় মিলিয়ে যায়, কে জানে! এখন আমাদের আর কারুর কোন বিপদ না হ'লে বাঁচি।

সে রাত্রে ঘরের বাহিরের সকল দরজায় খিল আঁটিয়া উমেশ শয়ন করিলেন।

পর দিবস প্রভাত হইলে পর উমেশের মনে নানারূপ দুর্ভাবনা উপস্থিত হইল। যোগেশকে কি সংবাদ দিবেন, সরোজিনীর পিত্রালয়ে কি লিখিবেন? তাহার মৃত্যু হইয়াছে লিখিলেই কি চলিবে? উমেশের মনে দারুণ সংশয় উপস্থিত হইল। যদি সরোজিনী না মরিয়া থাকে, যদি সে কোথাও চলিয়া গিয়া থাকে? সে লেখাপড়া জানে, যদি সে যোগেশকে কিংবা তাহার পিতামাতাকে পত্র লেখে তাহা হইলে ত তাহার মৃত্যুসংবাদ মিথ্যা প্রমাণিত হইবে। উমেশ বিষম ভাবনায় পড়িলেন। কিছু একটা উপায় স্থির করিবার জন্য তিনি কবিরাজের বাড়ি গমন করিলেন। কবিরাজ মহাশয় একটা খলের সম্মুখে বসিয়া বড়ি প্রস্তুত করিতেছিলেন। উমেশ বলিলেন,—ব্যাপার শুনেচেন ত?

কবিরাজ বড়ি পাকান স্থগিত করিয়া বলিলেন,—এ ত স্পষ্ট ভৌতিক ব্যাপার। মরা মানুষ কি চিলুর উপর উঠে বসে, না তার পর হেঁটে বেড়ায়? আমি দেখলুম নাড়ী নেই, নিঃশ্বাস বইচে না, মানুষ আর কি রকম ক'রে মরে? দানোয় পাওয়া ভৌতিক ব্যাপার নয় ত কি?

—শুধু তাই নয়, তার পর যখন রোজাকে সঙ্গে ক'রে তাকে মশানে খুঁজতে গেল. তখন তাকে আর দেখতে পেলে না।

—তা হলেই হ'ল, মরে ভূত হয়েচে। ভূতপেত্নী কি আর সব সময় দেখা যায়?

উমেশের সন্দেহ ঘুচিল না। বলিলেন,—তার দেহ কি হ'ল? তাকে ত আর দাহ করা হয় নি। দানোয় পেয়েচে ব'লে তাকে ধরে পোড়াতে যাচ্ছিল, কিন্তু চৌকিদার যখন ভয় দেখালে যে সবাইকে থানায় নিয়ে যাবে তখন আর কেউ এগুলো না।

কবিরাজ এ কথার কোন উত্তর করিতে পারিলেন না, তিনি ইংরেজের আইনের নিন্দা করিতে লাগিলেন। বলিলেন,—দানোয় পেলে মনে হয় বেঁচে আছে কিন্তু সত্যি ত আর বাঁচে না। দানোয় পেলেও পোড়াতে দেবে না।

উমেশ মাথা চুলকাইয়া বলিলেন, আমি ত বিষম সমস্যায় পড়েচি।

কবিরাজ বিজ্ঞভাবে উত্তর করিলেন, -তা ত বুঝতেই পারচি।

—যোগেশকে কি লিখব ? বাড়ির বউ মরে গেলে অশৌচ হয়, যোগেশকে ত জানাতে হবে। বউমার বাপের বাড়িও খবর দিতে হবে। আমার কি ভয় হচ্চে, জানেন ? যদি বউমা না মরে থাকে, আর কোথাও গিয়ে যদি যোগেশকে আর তার বাপের বাড়ি খবর দেয় তা হ'লে তারা আমাদের কি বলবে ?

—আপনিও যেমন, ও ভাবনা ভাবচেন কেন ? আমি সাত-পুরুষে কবিরাজ, রোগী বেঁচে আছে কি মরে গিয়েচে বুঝতে পারি নে ! নাড়ী ছেড়ে গিয়ে কে আবার কবে বাঁচে ?

উমেশ আরও কয়েকজন বিজ্ঞ ব্যক্তির সহিত কথাবার্ত্তা করিলেন, কিন্তু তাঁহার মনের খটকা মিটিল না।

মধ্যাহ্নের পর বামা কৈবর্ত্তানী উমেশের বাড়ি আসিয়া উপস্থিত হইল। উমেশ বাড়ি ছিলেন না, আহার করিয়াই পাড়ায় কোথায় গিয়াছিলেন। বামা আসিয়া দেখিল বাড়িতে স্ত্রীলোকেরা চুপ করিয়া বসিয়া আছে, কাহারও মুখে কোন কথা নাই। বামা যোগেশের মাতাকে বলিল,—মা ঠাকরুণ, ছোটবউদি আমার ওখানে আছে তাই তোমাদের বলতে এসেচি। তোমরা হয়ত ভাবচ কোথায় চলে গিয়েচে।

সকলে অবাক। পিসিমা বলিলেন,—এই কাল রাত্রে সকলে বললে তাকে দানোয় পেয়েচে, সে কোথায় মিলিয়ে গিয়েচে, মশানে গিয়ে রোজা তাকে খুঁজে পায় নি। আর তুই বলচিস সে তোর বাড়িতে রয়েচে। কার কথা আমরা বিশ্বাস করব ?

- এতে আবার বিশ্বাস অবিশ্বাসের কি কথা আছে ? কেউ গিয়ে দেখে এলেই হবে। সকলে তাকে মশানে ছেড়ে চলে এল, ছোট বউদি নদীতে ডুবতে যায়, আমি কত ক'রে বুঝিয়ে বাড়ি নিয়ে গেলুম। কাল রাত্রে কিছু খায় নি, অনেক বলা-কওয়াতে একটু দুধ খেয়ে শুয়েছিল। আজ নতুন হাঁড়ী এনে নিজে রেঁধে খেয়েচে। আমি এখানে আসবার কথা বললুম তা বললে এ বাড়িতে তার ঠাই নেই, আর এ-মুখো হবে না, গ্রামে কারুর বাড়ি যাবে না। তাকে যদি দানোয় পেয়ে থাকে তবে আমাদের সবাইকে পেয়েচে। বোধ হয় ভির্মি গিয়েছিল, কবিরাজ যেমন আকাট মুখ্খু, বললে কি-না মরে গিয়েচে। তোমরা কি একবার তাকে দেখতে যাবে না ? দাদাবাবু শুনে এর পর কি বলবে ?

যোগেশের মা নীরবে অশ্রুমোচন করিতেছিলেন চক্ষু মুছিয়া বলিলেন,—আমরা কি বলব, কি করব ? বঠ্ঠাকু যা ভাল বুঝবেন তাই করবেন।

বামা বলিল, তোমাদের যেমন বিবেচনা হয় তাই করো কিন্তু বউদি এক-কাপড়ে রয়েচে, এড়া কাপড় ছাড়বার জ একখানা দেবে না ?

যোগেশের মা সরোজিনীর চারিখানা শাড়ী আনি দিলেন। সরলা বলিল,—আমি ছোট বউকে দেখতে যাব।

পিসিমা বলিলেন,—আমরা সকলেই যাব। উমেশ বা আসুক, দেখি সে কি বলে।

বামা বলিল,—বউদিকে একলা ফেলে এসেচি, তার মনে ঠিক নেই, কখন কি ক'রে বসবে। আমি যাই।

শাড়ী হাতে করিয়া বামা চলিয়া গেল।

সরোজিনী আত্মহত্যার কল্পনা পরিত্যাগ করিয়াছিল সে কোন গর্হিত কর্ম্ম করে নাই, তাহার কোন অপরাধ নাই। তাহাকে জীবিত অবস্থায় চিতাশায়িনী করি দাহ করিবার উদ্যোগ করিতেছিল, পৃষ্ঠে আঘাত লাগি তাহার মূর্চ্ছাভঙ্গ না হইলে তাহাকে পুড়াইয়া মারিত। এ তাহার অপরাধ। শ্বশুরবাড়িতে তাহার স্থান না হয় বাপের বাড়ি চলিয়া যাইবে। বাপ-মা ত তাহাকে আ ফেলিয়া দিতে পারেন না। কিন্তু পিত্রালয়ে সংবাদ দিবা সম্বন্ধে সে একটু ইতস্ততঃ করিতেছিল। যাহাকে লই শ্বশুরবাড়ির সঙ্গে সম্বন্ধ তাহার সহিতও কি সম্বন্ধ ঘুচিয়াছে যোগেশ কিছু জানে না, তাহাকে না জানাইয়াই কি সরোজি পিত্রালয়ে চলিয়া যাইবে ? যোগেশের পরীক্ষা সমাপ্ত হইবে তাহার বাড়ি আসিবার কথা। সে আসিয়া কি বলে, করে, সেজন্য অপেক্ষা করিতে হইবে। তাহার পর য হয় হইবে।

বামা আসিয়া তক্তপোষের উপর কাপড় রাখিল, বলিল,—তোমার শাশুড়ীর কাছ থেকে তোমার ক'খানা শাড়ী নি এসেচি।

সরোজিনী কেবল বলিল,—তুমি কি সেখানে গিয়েছিলে কি ?—আর কোন কথা জিজ্ঞাসা করিল না।

উমেশ বাড়ি ফিরিয়া আসিয়া দেখেন স্ত্রীলোকেরা অত্যন্ত চঞ্চলভাবে কি বলাবলি করিতেছে। তিনি ভগিনীকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—কি হয়েচে? তোমরা কি বলাবলি করচ?

তাঁহার ভগিনী বলিলেন, ছোটবউমা কোথায় আছে, জান?

—কোথায় আবার থাকবে? সে কি আর আছে?

- এইমাত্র বামা কৈবর্ত্তানী এসেছিল। বউমা তার বাড়িতে আছে। বামা বউমার পরবার কাপড় নিয়ে গেল। বউমা না কি বলেচে এ বাড়িতে আর ঢুকবে না।

উমেশ মাথায় হাত দিয়া বসিয়া পড়িলেন। বলিলেন,—এত দেশ থাকতে শেষে কি-না কৈবর্ত্তের ঘরে? লোকে শুনলে বলবে কি? যদি কৈবর্ত্তর ভাত খেয়ে থাকে তা হ'লে ত তার জাত গিয়েচে।

পিসিমা বলিলেন,—সে কারুর ভাত খায় নি। নতুন হাঁড়ীতে নিজে রেঁধে খেয়েচে। বামা বললে,—বউমা দিব্য সহজ মানুষের মতন রয়েচে, তার কিছুই হয় নি, বোধ হয় অজ্ঞান হয়ে গিয়েছিল। বামা কবিরাজকে মুখ খু বললে। বউমা যে বাড়িতে এল না, তুমি বুঝি তাকে কিছু বলেছিলে?

— সকলে বললে দানোয় পেয়েচে তাই আমি বলেছিলাম যেন কারুর বাড়ি না যায়। তাতে আমার কি দোষ হ'ল?

—যোগেশ এলে পর তাকে কি বলবে? ছোটবউ-মার বাপের বাড়ি কি লিখবে?

উমেশ এ-কথার কোন উত্তর দিতে পারিলেন না। উঠিয়া নিজের ঘরে প্রবেশ করিলেন।

সরোজিনী বামার বাড়িতে বাস করিতেছে এ সংবাদ প্রকাশ হইতে বিলম্ব হইল না। দানোয় পাওয়ার কথা চাপা পড়িয়া গেল। গ্রামের লোকেরা উমেশের নামে নানা কথা বলিতে আরম্ভ করিল। গৃহস্থ-ঘরের বউ, ব্রাহ্মণ-কন্যা, তাহাকে নিরপরাধে কি এমন করিয়া বাড়ি হইতে তাড়াইয়া দিতে আছে? তাহার বাপের বাড়ি শুনিলে কি বলিবে? যোগেশ জানিতে পারিয়া কি করিবে?

উমেশ এই সকল কথা শুনিয়া রাগিয়া বলিলেন,—যত নষ্টের গোড়া ঐ কবিরাজ। তা যে যাই বলুক ও-বউকে ত আমরা আর ঘরে নিতে পারব না।

উমেশের ভগিনী, যোগেশের মা আর সরলা এক দিন সন্ধ্যার পর অন্ধকার হইলে সরোজিনীকে দেখিতে গেলেন। সরোজিনী শাশুড়ী, পিস্‌শাশুড়ী ও বড় জাকে দূর হইতে প্রণাম করিল, পায়ে হাত দিল না। যোগেশের মাতা কাঁদিতে লাগিলেন, বলিলেন,—আমার ভাঙা কপাল, তা নইলে এমন হবে কেন?

পিসিমা বলিলেন,—যোগেশ বাড়ি এসে কি কাণ্ড করবে কে জানে!

সরলা বলিল,—হাঁ্যা ভাই ছোটবউ, তোমার ত কোন দোষ নেই, তোমার এ রকম কেন হ'ল?

সরোজিনী ম্লান হাসি হাসিয়া বলিল,—এ জন্মের না হয় আর জন্মের দোষ। আমার কপালে যা আছে তাই হবে, তোমরা মিছে দুঃখ ক'রো না।

তিন জন কিছুক্ষণ সরোজিনীর কাছে বসিয়া রহিলেন, কিন্তু প্রকৃত সান্ত্বনা-বাক্য কেহই বলিতে পারিলেন না। উমেশ স্পষ্ট বলিয়াছিলেন তিনি বধূকে বাড়িতে লইয়া যাইবেন না। তাঁহার কথার উপর কে কথা কহিবে? যোগেশ বাড়ি আসিয়া কি করিবে তাহাই বা কে বলিতে পারে? সে স্ত্রীকে গ্রহণ করিবে কি ত্যাগ করিবে কে জানে? আর সে ইচ্ছা করিলেও জ্যেষ্ঠতাতের অমতে স্ত্রীকে বাড়িতে লইয়া আসিতে পারিবে না।

তাঁহারা বিষণ্ণ চিত্তে গৃহে ফিরিয়া গেলেন।

৫

পরীক্ষা শেষ হইলে যোগেশ বুঝিতে পারিল যে, তাহার পাস হইবার সম্বন্ধে কোন সংশয় নাই। সে প্রায় সকল প্রশ্নের যথাযথ উত্তর দিয়াছিল। যে-দিন পরীক্ষা সমাপ্ত হইল সেই দিনই বৈকাল বেলার রেলগাড়ীতে সে দেশে চলিয়া গেল। চিঠি লিখিয়া সংবাদ দিবার সাবকাশ হয় নাই। বাড়ি যাইবে তাহার আবার সংবাদ দিবার প্রয়োজন কি?

ষ্টেশনে গাড়ী পঁহুছিতে সন্ধ্যা হইয়া আসিল। সেখান হইতে গ্রাম অর্দ্ধ ক্রোশ দূরে, সেটুকু পথ হাঁটিয়া যাইতে হয়। বাড়ি পঁহুছিতে অল্প অন্ধকার হইল।

উমেশ বাড়ি ছিলেন না। যোগেশের হাতে একটা ব্যাগ ছিল, সেটা মাটিতে রাখিয়া মাতাকে, পিসিমাকে ও

বড় বউকে প্রণাম করিল। বলিল,—মা, একজামিন আজ শেষ হ'ল, আমি বোধ হয় পাস হব।

যোগেশের মাতা মৃদু স্বরে কহিলেন,—ঠাকুর তাই করুন, তুই পাস হ'লে সকলের কত আহ্লাদ হবে।

কথা কহিতে তাঁহার স্বর ভঙ্গ হইল। যোগেশ বিস্মিত হইয়া তাঁহার মুখে দিকে চাহিল, পিসিমার, বড় বউর মুখ চাহিয়া দেখিল। সকলের মুখ ম্লান, কাহারও মুখে কোন কথা নাই। অজানিত আশঙ্কায় যোগেশের বুক কাঁপিয়া উঠিল। উদ্বিগ্ন হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, তোমরা সব অমন ক'রে চুপ ক'রে রয়েচ কেন? কি হয়েচে?

তাহার স্মরণ হইল সে যখন ঘরে প্রবেশ করে সে-সময় সরোজিনীকে উঠিয়া অন্য ঘরে যাইতে দেখে নাই। সরোজিনী কোথায়?

সরলা সঙ্কেত করিয়া যোগেশকে ডাকিল। যোগেশের মাতার দুই চক্ষু বাহিয়া অশ্রু প্রবাহিত হইতেছিল।

যোগেশ ও সরলা যোগেশের ঘরে প্রবেশ করিল। সে ঘরেও সরোজিনী নাই। যোগেশ অধীর ভাবে বলিল,—কি হয়েচে বড়বউ? ছোটবউকে দেখতে পাচ্চি নে।

অশ্রুরুদ্ধ কণ্ঠে, ধীরে ধীরে, থামিয়া থামিয়া সরলা সকল কথা বলিল। সরোজিনী চিতায় উঠিয়া বসিয়াছিল শুনিয়া যোগেশ শিহরিয়া উঠিল, বলিল,—কি সর্ব্বনাশ! জ্যান্ত মানুষকে পোড়াতে নিয়ে গিয়েছিল। যখন আবার জ্ঞান হ'ল ছোট-বউ বাড়ি ফিরে এল না কেন?

—সকলে বললে দানোয় পেয়েচে। ছোটবউ বামা কৈবর্ত্তানীর বাড়িতে রয়েচে। কর্ত্তা বলচেন, তাকে আর এ বাড়িতে আনা হবে না। আমরা সব ছোটবউকে দেখতে গিয়েছিলাম। সেও কোনমতে আসবে না।

যোগেশ ঘরের বাহিরে আসিয়া মাতাকে বলিল,—মা, একটা আনাড়ী বৈদ্যের কথায় জ্যান্ত মানুষকে সকলে পোড়াতে গিয়েছিল। যদি জ্ঞান না হ'ত তা হ'লে ত তাকে পুড়িয়েই মারত। তোমার মনে পড়ে তুমি যখন জিজ্ঞাসা করেছিলে মরা মানুষ কি বাঁচে তখন আমি বলেছিলাম একটা মূর্চ্ছা ব্যারাম আছে যাতে মানুষ বেঁচে থাকলেও মনে হয় মরে গিয়েচে। এই অপরাধে জ্যাঠামশায় ছোটবউকে আর বাড়ি ঢুকতে দেবেন না?

যোগেশের মাতা কাঁদিয়া বলিলেন,—বাবা, আমরা কি বলব, আমাদের কি কোন হাত আছে?

—তা জানি। কিন্তু আর কারুর কথায় যদি বিনা অপরাধে আমি আমার স্ত্রীকে ত্যাগ করি তা হ'লে আমার নরকেও ঠাঁই হবে না। ছোটবউ এখানে না এলে আমাকেও বাড়ি থেকে বেরুতে হবে সে কথা ভাবা উচিত ছিল।

যোগেশ ব্যাগ হাতে করিয়া বেগে বাড়ির বাহির হইয়া গেল। ছেলে বাড়ি আসিলে কোথায় সকলে আহ্লাদ করিবে, না সকলে কাঁদিতে আরম্ভ করিল।

বাড়ি ফিরিয়া উমেশ দেখিলেন স্ত্রীলোকেরা অধোমুখে অশ্রু বিসর্জ্জন করিতেছে। তিনি বিস্মিত ও বিরক্ত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, কিসের কান্নাকাটি? আবার কি হ'ল?

উমেশের ভগিনী বলিলেন, বউটা ত বাড়ি থেকে গিয়েইচে, এখন ছেলেটাও বাড়ি থেকে বেরিয়ে গেল।

কথাটা উমেশ প্রথমে বুঝিতে পারিলেন না, জিজ্ঞাসা করিলেন, কার কথা বলচ?

—আবার কার, যোগেশের। সে এই মাত্র কলকেতা থেকে এল, তার পর যেই শুনলে ছোটবউমা এখানে নেই, বামা কৈবর্ত্তানীর বাড়িতে আছে অমনি ব্যাগ হাতে ক'রে ছুটে বেরিয়ে গেল।

উমেশ স্তব্ধ হইয়া রহিলেন। এরূপ সম্ভাবনা তাঁহার মনে কখনও উদয় হয় নাই। তিনি জানিতেন, যোগেশ তাঁহার বিনা অনুমতিতে কিছুই করিতে পারে না। যোগেশের স্ত্রী যখন কৈবর্ত্তর ঘরে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছে তখন তাহাকে ত্যাগ করা ব্যতীত আর কি উপায় আছে? নিতান্তপক্ষে আর কিছুদিন পরে যোগেশের আবার বিবাহ দিলেই গোল ফুরাইবে। যোগেশ যে এমন বাঁকিয়া দাঁড়াইবে তাহা তিনি স্বপ্নেও কল্পনা করিতে পারেন নাই।

কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া উমেশ বলিলেন,—আজ-কালকার ছেলেদের কাণ্ডজ্ঞান নেই। যোগেশ কি ব'লে আমার সঙ্গে দেখা না ক'রে আমাকে কিছু না ব'লে বাড়ি থেকে চলে গেল? যাক, এখন হয়ত তার মাথার ঠিক নেই, কাল সকালে তাকে ডেকে নিয়ে আসব।

যোগেশ হন-হন করিয়া দ্রুতপদে একেবারে বামার বাড়িতে

উপস্থিত। তাহার পদশব্দ শুনিয়া বামা ঘরের বাহিরে আসিল। বলিল,—এই যে দাদাবাবু! তুমি কখন এলে?

—আমি এই সন্ধ্যেবেলার গাড়ীতে এসেচি। ছোটবউ কোথায়?

—ঐ ঘরে আছে, বলিয়া বামা বাড়ির বাহিরে চলিয়া গেল।

যোগেশের কণ্ঠ শুনিয়া সরোজিনী উঠিয়া দাঁড়াইল। তাহার বক্ষঃস্থল, তাহার সর্ব্বাঙ্গ থর থর করিয়া কাঁপিতে লাগিল, তাহার নিঃশ্বাস প্রায় রুদ্ধ হইল। যোগেশ ঘরে প্রবেশ করিয়া, দরজা ভেজাইয়া দিয়া, তক্তপোষের উপর ব্যাগ নিক্ষেপ করিয়া, সরোজিনীর নিকটে গেল।

সরোজিনী পিছনে সরিয়া গিয়া বলিল,—আমাকে ছুঁয়ো না, ছুঁয়ো না, আমার জাত গিয়েচে!

যোগেশ হাসিয়া বলিল,—তা হ'লে আমারও জাত গিয়েচে। তোমার যে জাত আমারও সেই জাত।

যোগেশ বাহু প্রসারিত করিয়া সরোজিনীকে বক্ষে ধারণ করিল। তাহার সিক্ত চক্ষু, কম্পিত অধরপল্লব চুম্বন করিল। সরোজিনী যোগেশের কণ্ঠলগ্ন হইয়া অশ্রুজলে তাহার বক্ষ ভাসাইয়া দিল।

সরোজিনীর শোকোচ্ছ্বাস কিঞ্চিৎ শমিত হইলে যোগেশ তাহার হাত ধরিয়া তাহাকে তক্তপোষে নিজের পাশে বসাইল। পকেট হইতে রুমাল বাহির করিয়া সরোজিনীর চোখ মুখ মুছাইয়া দিল। কোমল স্বরে কহিল,—আমি সব জানি। বড়বউর মুখে সব শুনেচি।

সরোজিনীর চক্ষু ছল ছল করিতেছিল, কিন্তু তাহার অধরপ্রান্তে অল্প হাসি দেখা দিল। সলজ্জভাবে কহিল,—আমার ভয় হয়েছিল তুমি বুঝি আর আমাকে নেবে না।

—কেন? তুমি এখানে রয়েচ ব'লে? আমাদের বাড়ি জায়গা না হ'লে তুমি কি করবে?

—আমার কি হয়েছিল? আমার কিছু মনে নেই। পিঠে কাঠ ফুটে গিয়ে যখন আমার জ্ঞান হ'ল দেখি আমায় চিলুতে শুইয়ে রেখেচে। আর একটু হলেই আমার মুখে আগুন দিত।

যোগেশ সরোজিনীকে বক্ষে চাপিয়া ধরিল। বলিল,—ওসব কথা তুমি ভেব না। তোমার কিছুই হয় নি। তোমার যা হয়েছিল ও-রকম ব্যারাম আমরা বইয়ে পড়েচি। ভয়ের কিছু নেই।

সরোজিনী বিমনা হইল। একটু ভাবিয়া বলিল,—এখন আমরা কোথায় যাব, কোথায় থাকব?

—সে ভাবনা তোমাকে ভাবতে হবে না। আমি ত কিছু দিন পরে তোমাকে কলকেতায় নিয়েই যেতুম, না হয় দু-দিন আগে যাবে।

দুই জনে বসিয়া কথা কহিতেছে এমন সময় বামা আসিয়া ঘরের বাহির হইতে ডাকিল,—বউদি!

সরোজিনী মাথায় কাপড় দিয়া তাড়াতাড়ি দরজা খুলিয়া দিল। বামা ঘটীতে দুধ আর ঠোঙায় চারিটা সন্দেশ সরোজিনীর হাতে দিল। বলিল,—দাদাবাবুর জন্যে একটু দুধ আর মিষ্টি এনেচি। আমি ত উনুনে আগুন দেব না, বউদি নিজেই দেবে!

যোগেশ বলিল, বামা, তোমার উপকার আমি কখন ভুলব না।

বামা বলিল, দাদাবাবুর যেমন কথা! ভারি ত উপকার! গাঁয়ের লোক পাগল হয়েচে ব'লে আমি ত আর পাগল হই নি! সে রাত্রে আমি এখানে না নিয়ে এলে বউ মানুষ কোথায় যেত!

কথাটা ঘুরাইবার জন্য যোগেশ বলিল,—তাই ত, আমার যে বড় খিদে পাচ্চে। রেলে এসেচি কি-না।

বামা বলিল,—একটা সন্দেশ মুখে দিয়ে একটু জল খাও। রান্না এখনি হয়ে যাবে।

যোগেশ বলিল,—এখন আর কিছু খাব না, রান্না হোক, তখন খাব।

সরোজিনী তাড়াতাড়ি উঠিয়া রাঁধিতে গেল। ভাত, কই মাছের ঝোল, পটল ভাজা। দুধ জ্বাল দিয়া বাটিতে রাখিল। রন্ধন সমাপ্ত হইলে, থালা সাজাইয়া যোগেশকে খাইতে দিল। যোগেশের আহার হইলে সরোজিনী তাহার হাতে পান দিয়া তাহার পাতে বসিয়া আহার করিল।

বামার বাড়িতে আর একটি ছোট ঘর ছিল, সে সেখানে শয়ন করিতে গেল। যোগেশ ও সরোজিনী তক্তপোষে শয়ন করিল।

ভোরবেলা উমেশ আসিয়া বামার বাড়ির বাহির হইতে

যোগেশ, যোগেশ, বলিয়া ডাকিতে লাগিলেন। বামা বাড়ির বাহির হইয়া আসিল। বলিল,—দাদাবাবু ত এখানে নেই। খুব ভোরে উঠে বউদিকে নিয়ে কলকেতায় চলে গিয়েচে।

উমেশ হতভম্ব হইয়া বাড়ি ফিরিয়া গেলেন। ভগিনীকে বলিলেন,—দেখেচ যোগেশের আক্কেল! তার বউকে নিয়ে কলকেতায় চলে গিয়েচে। কলকেতার খরচ যোগাবে কে?

৬

কলিকাতায় যোগেশ যেখানে বাসা করিয়া থাকিত তাহার পাশেই একটি ছোট দোতলা বাড়ি খালি ছিল। বাড়িওয়ালা যোগেশের পরিচিত, তাহারও বাড়ি সেইখানে। যোগেশ সরোজিনীকে গাড়ীতে বসাইয়া, গৃহস্বামীকে গিয়া বলিল,—আমি দেশ থেকে আমার বউকে নিয়ে এসেচি। আপনার খালি বাড়ী ভাড়া নেব। কত ভাড়া?

—কুড়ি টাকা। তুমি একটু দাঁড়াও, বাড়ির চাবি এনে দিচ্চি।

বাড়িওয়ালা চাবি আনিয়া যোগেশের হাতে দিল। বলিল,—বাড়ি বন্ধ আছে, অপরিষ্কার হয়ে থাকবে। আমাদের বাড়ির ঝি এখনি গিয়ে ঝাঁট দিয়ে আসবে, তারপর তোমাদের লোক আবশ্যক হয় সে একজন ঝি এনে দেবে।

যোগেশ কৃতজ্ঞতা জানাইয়া, বাড়ির দরজা খুলিয়া, সরোজিনীকে গাড়ী হইতে নামাইয়া আনিল। বাড়িখানি ছোট কিন্তু দিব্য খটখটে। দোতালায় দুইটি ঘর, নীচে খাবার ঘর, ভাঁড়ার, রান্নাঘর। রান্নাঘরে নূতন উনান পাতা। সরোজিনী সমস্ত দেখিয়া বলিল, কি সুন্দর বাড়ি!

বাড়িওয়ালার বাড়ির ঝি এক হাতে ঝাঁটা, অপর হাতে একটা কলসী লইয়া আসিল। সরোজিনীকে দেখিয়া বলিল,—বউ যেন লক্ষ্মীঠাকরুণ!

উপর নীচে সমস্ত ঝাঁট দিয়া, ধুইয়া, উনান নিকাইয়া দাসী জিজ্ঞাসা করিল,—বউদি, আর কিছু কাজ আছে?

যোগেশ বলিল,—ঝি, আমাদের একটি লোক দিতে পারবে?

—কেন পারব না? আমার বোনঝি বসে আছে, কাজ-কর্ম্ম সব জানে, বাজার থেকে ফিরে আসবার সময় তাকে নিয়ে আসব।

—বাজারে আমাকেও যেতে হবে, ঘরসংসারের সব জিনিষ ত চাই।

– তরিতরকারী মাছের বাজার আমি সব ক'রে দেব। হাঁড়ি, কলসী, কলাপাতা আমি নিয়ে আসব। আর যা চাই তুমি এন। বউদি নিজে রাঁধবে?

- তা নয় ত কি বামুন রাখতে হবে? দুটি লোকের ত রান্না।

ঝিকে যোগেশ চার আনা পয়সা পুরস্কার দিল, বাজারের জন্য একটা টাকা দিল। ঝি চলিয়া গেলে যোগেশ সরোজিনীকে বলিল,—তোমাকে খানিকক্ষণ একলা থাকতে হবে। ঘরে ত কিছু নেই, বসবার শোবার জন্য ত কিছু চাই। তুমি দরজায় খিল দিয়ে থেকো। ঝি যদি বাজার ক'রে আগে আসে তাকে দরজা খুলে দিও।

যোগেশ বেশ হিসাবী। জলপানির টাকা হইতে ৭৫৲ টাকা জমা করিয়াছিল, সে টাকা তাহার কাছে ছিল। সুতরাং কলিকাতায় পা দিয়াই তাহাকে টাকার ভাবনা ভাবিতে হইল না। সে বাজারে গিয়া আবশ্যক সামগ্রী ক্রয় করিল। দুই চারিখানা বাসন, গাড়ু, ঘটি, বঁটি, দু-খানা মাদুর, দুইটা তক্তপোষ, গদি, বালিশ ক্রয় করিল। দুই জন মুটের মাথায় জিনিষপত্র চাপাইয়া দিয়া যোগেশ গরম কচুরি, পানতুয়া, রসগোল্লা কিনিল। বাড়ি ফিরিয়া দেখে বাড়িওয়ালার গৃহ হইতে আনীত বঁটিতে সরোজিনী তরকারী কুটিতেছে, উঠানে নূতন ঝি আঁশবটিতে মাছ কুটিতেছে। যোগেশ মুটেদের সাহায্যে জিনিষপত্র সমস্ত গুছাইয়া রাখিল। তাহার পর খাবার ঘরে গিয়া সরোজিনীকে ডাকিল। সে আসিলে তাহাকে বলিল,—এখনও রান্নার দেরি আছে, কিছু খাবার খাও। আমিও খাচ্চি।

যোগেশের পীড়াপীড়িতে সরোজিনী একটা রসগোল্লা আর একখানা কচুরি খাইল।

এক সপ্তাহ অতীত হইল। সংসার পাতিতে যোগেশের যথেষ্ট ব্যয় হইয়াছিল, হাতে বেশী টাকা ছিল না। টাকা ফুরাইলে কি হইবে? পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইলে তখনই ত আর অর্থাগম হইবে না। যোগেশ কলেজের অধ্যক্ষের সহিত সাক্ষাৎ করিতে গেল। তিনি বলিলেন, যোগেশ, তোমাদের পরীক্ষার ফল এক সপ্তাহের পর প্রকাশ হবে।

তুমি পরীক্ষায় প্রথম হয়েচ, তিনটে প্রাইজ পেয়েচ তাতে নগদ তিন শো টাকা পাবে। এ মাসের আর দশ দিন আছে। আসচে মাস থেকে কলেজে তোমার মাসিক এক-শো টাকা বেতনের কর্ম্ম হবে।

যোগেশ নিশ্চিন্ত হইয়া বাড়ি ফিরিল। সরোজিনী সকল কথা শুনিয়া বলিল,—আমাদের যে জাতে ঠেলবে তার কি হবে?

—তার সহজ উপায় আছে।

পারিতোষিকের টাকা আনিয়া যোগেশ সরোজিনীর হাতে দিল। তাহাকে একটা বাক্স কিনিয়া দিয়াছিল।

যোগেশ হাতিবাগানের টোলে গিয়া পণ্ডিতদিগের নিকট হইতে প্রায়শ্চিত্তের ব্যবস্থা লইল। প্রায়শ্চিত্ত করিয়া দুইজনে শুদ্ধ হইল।

এ পর্য্যন্ত যোগেশ বাড়িতে চিঠিপত্র লেখে নাই। এখন লিখিল। উমেশকে প্রায়শ্চিত্তের কথা উল্লেখ করিয়া লিখিল, সমাজে ঠেলিবার আর কোন আশঙ্কা নাই। যে বেতন পাইবে তাহাতে কলিকাতায় খরচের অকুলান হইবে না। বেতন ছাড়া কলেজের অধ্যক্ষ তাহাকে বাহিরের রোগী দেখিতে অনুমতি দিয়াছেন। মাতাকে এবং সরলাকেও পত্র লিখিল। সরোজিনীও লিখিল।

উমেশ চিঠি পড়িয়া বলিলেন,—প্রায়শ্চিত্ত করেচে, বেশ হয়েচে। আর কেউ কিছু বলতে পারবে না। আর যোগেশের চাকরিও বেশ ভাল হয়েচে।

আহ্লাদে যোগেশের মায়ের চক্ষে জল আসিল। সরলার মুখে হাসি ধরে না। সে তাড়াতাড়ি চিঠির উত্তর লিখিতে বসিল। পিসিমা বলিলেন,—যোগেশ সোনার চাঁদ ছেলে। তার ভাবনা কিসের?

দেখিতে দেখিতে বামা মুঠার ভিতর টাকা বাজাইতে বাজাইতে আসিল। বলিল,—দেখ, মা-ঠাকরুণ, দাদাবাবু আমাকে দশটা টাকা পাঠিয়ে দিয়েচে।

যোগেশের মা বলিলেন,—বেশ করেচে, তুই তার কত উপকার করেচিস্।

রমেশ কলিকাতায় অল্প মাহিনার চাকরি করিত, একটা মেসে থাকিত। যোগেশের মুখে সকল কথা শুনিয়া সে রাগিয়া অস্থির। বাপকে কড়া করিয়া চিঠি লিখিতে যায়, যোগেশ তাহাকে বুঝাইয়া থামাইল। কহিল,—এতে রাগের কোন কথা নেই। আমাদের এখনও অনেক কুসংস্কার আছে, এ তারই ফল। জ্যাঠামশায়ের কোন দোষ নেই। আমি এখানে একটু গুছিয়ে নি, তার পর তুমি আমার বাড়িতে এসে থেকো, দেশ থেকেও সবাইকে নিয়ে আসব।

যোগেশ কলেজে কর্ম্ম পাইতেই বাহিরের রোগী যোগেশের বাড়ি আসিতে আরম্ভ করিল। সে যেমন অস্ত্রচিকিৎসায় দক্ষ, রোগনির্ণয় করিয়া ঔষধের ব্যবস্থা করিতেও সেইরূপ পটু। কলেজের অধ্যক্ষ ও অপর শিক্ষকেরা তাহার কর্ম্মের বিশেষ প্রশংসা করিতেন। কয়েক মাসের মধ্যেই তাহার পসার এত বাড়িয়া গেল যে, কলেজের কর্ম্ম করা তাহার পক্ষে অসম্ভব হইয়া উঠিল। ছয় মাস পরে সে কর্ম্ম ত্যাগ করিল।

যোগেশ বড় রাস্তার উপরে বড় বাড়ি ভাড়া করিল। নিজের গাড়ী করিল। সকাল বেলা বাড়িতে ঘণ্টা-দুই রোগী দেখিত, তাহার পর সমস্ত দিন ও খানিক রাত্রি পর্য্যন্ত গাড়িতে ঘুরিয়া বেড়াইত। দুপুর বেলা আহার বিশ্রামের জন্য দুই-তিন ঘণ্টার অধিক সময় পাইত না। বাড়ীতে ফিরিয়া দুই পকেট হইতে মুঠা মুঠা টাকা বাহির করিয়া সরোজিনীর হাতে দিত। সরোজিনী লোহার সিন্দুকে টাকা তুলিয়া রাখিত। সরোজিনীর অঙ্গে নূতন অলঙ্কার উঠিল। বাড়িতে পাচক, দাস, দাসী নিযুক্ত হইল। মাস-কয়েকের মধ্যেই সরোজিনী একটা মস্ত সংসারের গৃহিণী হইয়া উঠিল।

নূতন বাড়িতে গিয়াই যোগেশ রমেশকে নিজের বাড়িতে লইয়া আসিয়াছিল। কিছু দিন পরে উমেশকে টাকা পাঠাইয়া দিয়া বাড়ির সকলকে কলিকাতায় আসিতে লিখিল। তাঁহারা আসিলে ষ্টেশনে গিয়া তাঁহাদিগকে বাড়ি লইয়া আসিল। বাড়ির গাড়ী দেখিয়া উমেশ বলিলেন,—এ তোমার নিজের গাড়ী?

যোগেশ কহিল,—আজ্ঞা হাঁ। আমাকে সারা দিন ঘুরে বেড়াতে হয়।

বাড়িতে উমেশের আলাদা বৈঠকখানা। তিনি আসিয়া বসিলে চাকর রূপাবাঁধানো হুঁকায় তামাক আনিয়া দিল।

সরোজিনী খাশুড়ীর পায়ে হাত দিয়া নমস্কার করিলে

তিনি তাহাকে বক্ষে ধারণ করিয়া আনন্দাশ্রু মোচন করিলেন। পিসিমা ঘুরিয়া ঘুরিয়া উপর নীচে সমস্ত ঘর দেখিতে লাগিলেন। সরোজিনী সরলাকে একা পাইয়া বলিল,—দিদি, তোমার নিজের ঘর দেখবে এস।

সরোজিনী আর সরলার ঘর দেখিতে ঠিক এক রকম, একই রকম সজ্জিত। সরলা বলিল,—কি লা, ছোটবউ, তুই যে মস্ত বাড়ির গিন্নী হয়েচিস!

সরোজিনী হাসিয়া বলিল,—তা হব না কেন? আমি যে যমের বাড়ি থেকে ফিরে এসেচি।

সরলা বলিল,—ভাগ্যিস তোকে দানোয় পেয়েছিল!

আবেগ

মৈত্রেয়ী দেবী

গগনে গগনে বাজে গুরু গুরু রোল
পূবে বাতাসের কোলে লেগেছে কি দোল
মেঘে মেঘে বিরহিণী ছড়ায়েছে কেশ
শাল তাল তমালের মহানৃত্য বেশ
অরণ্যেরে মত্ত করে। পল্লবের কোলে
সে দুঃসহ নৃত্যছায়া মুগ্ধ হয়ে দোলে
পাংশু রাশি উড়ে চলে পথপ্রান্ত ঘিরে
পল্লবের দীর্ঘশ্বাসে হৃদয়-মন্দিরে
ওঠে মর্ম্মরিত রোল, অবসন্ন দিন
যে উতল ধ্বনি তোলে তুলনাবিহীন-
তরঙ্গিত চিত্ততলে ছায়া মেলে মেঘ
অন্তরে অধীর হয় ছোটার আবেগ;
উথলিত হৃদয়ের নাহি মেলে তল,
জানো কি সম্মুখে আছে কঠিন অর্গল?
অতি তুচ্ছ লাভ ক্ষতি ক্ষুদ্র নিন্দা ভুল
তোমার এ আবেগের সেও সমতুল?
চিত্ত যবে উছলিত বিভোল আকুলা
নৃত্যশীল পদ 'পরে লাগে কত ধূলা
সে ধূলা সহিতে যদি মনে থাকে বল
বর্ষণমুখর রাতে ভাঙো এ অর্গল
আপনারে ছিন্ন করি সর্ব্ববন্ধ হ'তে
না মেলে তুলনা আজ ছুটেছি যে পথে
ঘন তরু ছায়া নাই সে বিস্তীর্ণ পথ
অরণ্য ঢাকে না তারে রোধে না পর্ব্বত
নহে কুসুমিত বন নহে দিশাহারা
নহে মরুতপ্ত বালু সে নহে সাহারা
জনহীন প্রান্তে যথা নিস্তব্ধ ধরণী
বহুদূর সিন্ধুতটে চলেছে সরণী--
বাতাসে বাতাসে পথে লাগে মহা দোল
জলে জলে কল কল ধ্বনি উতরোল
উচ্ছল ফেনিলময় উথলিত নীর
একি লক্ষ মানবের চিত্ত সিন্ধুতীর?
উতল জোয়ার আসে জাগে ধ্বনি তারি
হেথা মোর তরীখানি ভাসাতে না পারি
এ আকুল বর্ষারাতে শুনেছি যে ডাক্
তারে স্মরি দিনু ঝাঁপ তরী পড়ে থাক্।
এ রাত কি হবে ভোর এই ক্লান্তিহীন
তরঙ্গের ওঠা-নামা বিরামবিহীন
অবরুদ্ধ জীবনের ভাঙি ক্ষুদ্র কারা
ফেনিলোচ্ছল জল মেলে শতধারা
গুণ্ঠিত অম্বরখানি অন্ধকারময়
শতলক্ষতারাজ্যোতি অবরুদ্ধ রয়
আঁধার শ্রাবণ রাতে হে রাজাধিরাজ
চক্ষু মুদি যে সমুদ্রে ঝাঁপায়েছি আজ
ঘনঘোর বর্ষাপাতে যা লভেছি বল
ভেবেছি করিনু মুক্ত কঠিন অর্গল
এ রাত প্রভাত হ'লে সে আলোতে তবে
এ উচ্ছল জলধারা এমনি কি রবে?
চক্ষে ঢালি দিবে আলো তরুণ তপন
হবে না ত এ তপস্যা শ্রাবণ স্বপন—?
নির্ম্মল অম্বরে যবে কেটে যাবে মেঘ
এরে কি কহিব স্বপ্ন নিশার আবেগ?

শ্রমের মর্য্যাদা—বাঙালীর পরাজয়

শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র রায়

পূর্ব্বেকার প্রবন্ধে কতকগুলি শ্রেষ্ঠ কৃতী পুরুষের জীবন-কাহিনী বিবৃত করা হইয়াছে। ইঁহারা প্রত্যেকেই দারিদ্র্যের সহিত কঠোর সংগ্রাম করিয়া কেবল আত্মচেষ্টার দ্বারা আজ মনুষ্য-সমাজের শীর্ষস্থান অধিকার করিয়াছেন। আমাদের দেশের যুবকগণ এই ভীষণ জীবন-সংগ্রামের দিনে কি কারণে ব্যর্থকাম হয় তাহার কারণ ক্রমশঃ নির্ণয় করিতেছি।

ষাট-সত্তর বৎসর পূর্ব্বে বড় বড় জেলায় ও মহকুমায় উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়ের ছাত্রেরা প্রায়ই তথাকার উকিল এবং মোক্তারদের বাসায় আশ্রয় গ্রহণ করিত। ইহারা পালা করিয়া হাটবাজার, এমন কি রন্ধন করা ও থালাবাসন মাজিতেও কুণ্ঠিত হইত না। বিদ্যালাভের জন্য এ-সকলকেই তাহারা তুচ্ছ জ্ঞান করিত। পরলোকগত শিবনাথ শাস্ত্রী মহাশয়ের আত্মজীবনী হইতে জানা যায়, তিনি কলিকাতা সুকিয়া ষ্ট্রীটে এক সামান্য বেতনভুক্ ছাপাখানার কম্পোজিটরের বাড়িতে থাকিয়া অধ্যয়ন করিতেন। দৈনিক বাজার ও পাকশালার সমস্ত কার্য্য তাঁহাকেই নির্ব্বাহ করিতে হইত। তিনি বলিয়াছেন যে দিনের পর দিন মশলা হলুদ ইত্যাদি বাটিতে তাঁহার অঙ্গুলির নখগুলি হলুদ বর্ণ হইয়া গিয়াছিল।

বাষট্টি বৎসর পূর্ব্বে আমি যখন প্রথম কলিকাতায় আসি তখন দেখিতাম, কলেজের প্রবাসী ছাত্রগণ এক-একটি মেসে থাকিত এবং মাসের পর মাস পালা করিয়া এক-এক জন ম্যানেজার নিযুক্ত হইত, এবং ছাত্রগণ পর্য্যায়ক্রমে প্রত্যেকেই ভৃত্যসহ প্রত্যহ বাজার করিত। ইহাতে যে কেবল চাকরের চুরি বন্ধ হইত তাহা নহে, ভাল টাটকা জিনিষপত্রও আনা হইত। এস্থলে ইহা বলা অপ্রাসঙ্গিক হইবে না যে, আমার সঙ্গে বরাবর আট-দশ জন ছাত্র বাস করে এবং ইহাদের ভিতর নিয়মিত ভাবে একজন-না-একজন প্রত্যহ বাজার করে।

আজকাল এই সকল সুনিয়ম একে একে অন্তর্হিত হইতেছে। কুক্ষণে লর্ড হার্ডিং বিশ্ববিদ্যালয়ের হস্তে দশ-বার লক্ষ টাকা এই সর্ত্তে অর্পণ করেন যে, সিটি, বিদ্যাসাগর, বঙ্গবাসী, রিপন ইত্যাদি কলেজ-সংসৃষ্ট একটি করিয়া রাজ-প্রাসাদ তুল্য ছাত্রাবাস নির্ম্মিত হইবে। তখন চারিদিকে বাহবা পড়িয়া গেল। অবশ্য লর্ড হার্ডিঞ্জের উদ্দেশ্য ভালই ছিল। ছাত্রদের স্বাস্থ্যের জন্য সুন্দরভাবে আলোবাতাস-যুক্ত ছাত্রাবাসগুলি সত্যই প্রয়োজনীয়। কিন্তু আমাদের এমনই দুরদৃষ্ট যে শিব গড়িতে গেলেই বাঁদর হইয়া পড়ে। এই ছাত্রাবাসগুলিতে বর্ত্তমান সভ্যতার সমস্ত সরঞ্জামই বিদ্যমান, কল টিপিলেই বৈদ্যুতিক আলো, দ্বিতল ও ত্রিতল কক্ষে পাম্প-করা জলের ব্যবস্থা, তারপর ঘণ্টা বাজিলেই তৈয়ারী ভাত, প্রয়োজনীয় যা-কিছুই হাতের কাছে। সত্য বটে এখনও এই সব ছাত্রাবাসের অনেক স্থানে মেসেরও ব্যবস্থা আছে। কিন্তু সেগুলিও কি রকম বিশৃঙ্খল ভাবে চালিত হয় তাহার নিদর্শন দিতেছি। ছেলেরা এমন বাবু হইয়া উঠিয়াছে যে, যদিও পনর-বিশ জন ছাত্র লইয়া এক-একটি মেস্ হয়, তবু প্রত্যহ ভৃত্যদের সহিত বাজার করা তাহাদের ঘটিয়া উঠে না। কয়েক দিন হইল আমি সায়াহ্ন কলেজের একটি মেস দেখিতে গিয়াছিলাম। বিশ-একুশ জন ছাত্র সেই মেসে বাস করে। বাজার সেস্থান হইতে মাত্র তিন-চার মিনিটের পথ। জিজ্ঞাসা করিলাম, তোমরা পালা করিয়া বাজারে যাও কি-না। সলজ্জ ভাবে উত্তর আসিল, না। আমি বলিলাম, বাপু, ৩×৭=২১ তাহা হইলে তিন সপ্তাহে একজনের মাত্র একদিন পালা পড়ে, ইহাও কি তোমাদের ক্লেশসাধ্য মনে হয়? ইহার উপর আবার একটি কুপ্রথার হাওয়া বহিতেছে। এমন অনেক মেস আছে যেখানে শ্রীমানেরা ঠাকুর ও ভৃত্যদের সহিত কনট্রাক্ট করিয়া থাকেন অর্থাৎ "মাসে এত দিব, দুবেলা দু-মুঠা খাইতে দিবে।" বলা বাহুল্য যত রকম শুষ্ক ও বাসি তরকারী মাছ তাহাদের আহার্য্য হইয়া থাকে। আমার বক্তব্য এই যে, ছেলেরা এখন কুড়ের বাদশা হইয়া উঠিতেছে। যদি বুঝিতাম, শ্রীমানদের

নিকট সময়ের মূল্য এত বেশী যে তাঁহারা সর্ব্বদাই পাঠে নিরত থাকেন এবং এ-সব তুচ্ছ ব্যাপারে মনঃসংযোগ করা তাঁহাদের প্রায়ই ঘটিয়া উঠে না তাহা হইলে তেমন ক্ষোভের কারণ হইত না, কিন্তু প্রায়ই যখন দেখা যায় তাঁহাদের রবিবার ও ছুটির দিন অধিকাংশ সময়ই দিবানিদ্রা, গল্পগুজব, তাস, ক্যারাম ও পিংপং ইত্যাদিতে অতিবাহিত হয় তখন এ-সব ওজর-আপত্তি আর খাটে না। আর অধিক বলিবার প্রয়োজন নাই। এ প্রসঙ্গের অবতারণা করার উদ্দেশ্য এই যে, আজকাল ছেলেরা নিজের দোষেই অকেজো, উপায়হীন অলস পুতুল হইয়া যাইতেছে। সুতরাং তাহারা যখন পৃথিবীতে জীবনসংগ্রামে প্রবেশ করে তখন একেবারে হতবুদ্ধি হইয়া পড়ে।

ইদানীং কয়েক বৎসর ধরিয়া আমাকে সমগ্র ভারতবর্ষে পরিভ্রমণ করিতে হইয়াছে। দেখিতে পাই যে, পঞ্জাবের ছাত্রগণের মধ্যে বিলাসিতার স্রোত সর্ব্বাপেক্ষা বেশী প্রবাহিত। আঠার বৎসর পূর্ব্বে আমি যখন প্রথম লাহোরে যাই তখন দেখি গবর্ণমেণ্ট কলেজ-সংস্পৃষ্ট বিলাতী ধরণের হোষ্টেলগুলি সাহেবীয়ানা শিখিবার উৎকৃষ্ট ফাঁদ। এক শত টাকার কমে একজন ছাত্রের খরচ কুলায় না। ক্রিকেট খেলিবার জন্য 'ফ্লানেল স্যুট' ও টেনিস খেলিবার জন্য জর্দ্দা রঙের পোষাক ইত্যাদিতেই অধিকাংশ টাকা ব্যয় হইয়া যায়। সম্প্রতি আরও দুইবার লাহোরে যাইবার প্রয়োজন হইয়াছিল। এই সময়ের মধ্যে বেশভূষা ও অন্যান্য সরঞ্জামের খরচ আরও বাড়িয়াছে। একজন পঞ্জাবী অভিভাবক আমাকে বলিলেন, "অধিক কি বলিব, ছেলেদের খরচ জোগাইতেই সর্ব্বস্বান্ত, তাহারা আমাদের জীবন্ত চামড়া পর্য্যন্ত তুলিয়া লয়।" আমেরিকান ও ইউরোপীয় মিশনরীগণ পরিচালিত কলেজের হোষ্টেলগুলিতেও এই পাপ সংক্রামিত হইয়াছে, এমন কি অনেক ছাত্র মাসে দেড়-শ দু-শ টাকা ব্যয় করিতে কুণ্ঠিত হয় না।

সেদিন এলাহাবাদে অনেকগুলি হোষ্টেল পরিদর্শন করিবার সুযোগ হইয়াছিল। অবশ্য এই শহরে কলিকাতা ও বোম্বাইয়ের ন্যায় অল্প পরিসর স্থানের মধ্যে হোষ্টেল তৈয়ারী করিবার প্রয়োজন হয় নাই। সবগুলিরই বৃহৎ আয়তন এবং চারিদিকে বিস্তৃত ফাঁকা জায়গা। স্বাস্থ্যের দিক দিয়া দেখিতে গেলে এ হোষ্টেলগুলি আদর্শস্থানীয়। আমি অনেক ছাত্রকে জিজ্ঞাসা করিলাম যে, মাসিক গড়ে সর্ব্বসমেত কত ব্যয় পড়ে? তাহারা বলিল পঁয়তাল্লিশ টাকা। এখন এইটুকু বোঝা দরকার যে, এক বাপের একটি পুত্র বা একটি কন্যা নহে। প্রায়ই দেখা যায়, যেখানে যত আয়সঙ্কীর্ণতা সেখানে মা-ষষ্ঠীর কৃপা তত বেশী। আমি বাংলার কথাই বলিতেছি। একজন ছেলের জন্য যদি মাসে চল্লিশ-পঁয়তাল্লিশ-পঞ্চাশ টাকা ব্যয় করিতে হয়, তাহা হইলে প্রত্যেক পিতা-মাতার পক্ষে তাহাদের সমস্ত পুত্রকন্যার বিদ্যাশিক্ষার ব্যয়ভার বহন করা যে কত দুর্ব্বহ তাহা বর্ণনাতীত। এর উপর অরক্ষণীয়া কন্যাকে পাত্রস্থ করিতে হইলে অনেকের ভিটামাটি পর্য্যন্ত বাঁধা দিয়া সর্ব্বস্বান্ত হইতে হয়। সুতরাং অর্থনীতিঘটিত এই ভীষণ দুর্দ্দিনে এই প্রকার ব্যয়বাহুল্য সত্যই ভাবিবার বিষয়।

অতএব কত ত্যাগস্বীকার ও কৃচ্ছ্র সাধন করিয়া মা-বাপ ও অভিভাবকগণ তাঁহাদের ছেলেদের কলিকাতায় পাঠান তাহা বলা নিষ্প্রয়োজন। কিন্তু মাসিক মনি-অর্ডারের টাকা পাইয়া শ্রীমানেরা যে কি প্রকারে ইহার সদ্ব্যবহার করেন তাহার আভাস দিতেছি। আগে ধোপারা কাপড় কাচিত এখন তাহাতে তাঁহাদের আর মন উঠে না, সেজন্য 'ডাইং-ক্লিনিং' চারিদিকে গজাইয়া উঠিতেছে। সাধারণ নাপিতে চুল ছাঁটিলে মনোমত হয় না, কাজেই হেয়ার কাটিং সেলুনের সৃষ্টি হইতেছে। আবার সন্ধ্যার পূর্ব্বে এক কিস্তী রেস্তোরাঁতে গিয়া চপ কাটলেট্ ইত্যাদি উদরস্থ না করিলে রসনার তৃপ্তি হয় না। এই ত গেল কয়েক দফা বাজে খরচের তালিকা, ইহার উপর সপ্তাহে অন্যূন দুই দিন সিনেমা দেখা চাই, কেহ কেহ তিন দিন না দেখিলে অতৃপ্ত থাকেন। তাহার পর আর এক সংক্রামক ব্যাধি কেবল কলিকাতায় নহে, সমগ্র বাংলা দেশে দেখা দিয়াছে। এইটি জাঁকজমক ও ধুমধাম করিয়া সরস্বতী পূজা করা। কলিকাতার ইডেন হোষ্টেল ইহার উচ্চ আদর্শ প্রদর্শন করে। কার্ডের বাহার ও মিষ্টান্নের ফর্দ্দ দেখিলে বিস্মিত হইতে হয়। এমন অনেক ছেলে আছে যাহারা চাঁদা দিতে অপারগ, কিন্তু 'দশচক্রে ভগবান ভূত'—যে-কোন প্রকারে হউক তাহাদিগকে চাঁদা দিতে বাধ্য করা হয়। এখন কথা হইতেছে এই, শ্রীমানেরা ভুলিয়া যান চিরদিনই বুঝি এই রকম মজাদার ভাবে কাটিবে। যেদিন তাঁহারা

বিশ্ববিদ্যালয়ের দ্বারমোচন করিয়া জীবনসংগ্রামে প্রবেশ করেন তখন অন্ধকার দেখিতে থাকেন ও একটু একটু করিয়া মোহ ঘুচিতে থাকে। কত বিধবা মা হৃতসর্ব্বস্ব হইয়া শেষ গহনাখানি পর্য্যন্ত বিক্রয় করিয়া এবং কত দরিদ্র পিতা নিজের পৈতৃক ভিটামাটি বন্ধক দিয়া যে কি প্রকারে ব্যয়সঙ্কুলান করেন তাহা ভাবিতেও কষ্ট হয়, এবং তাঁহাদের আশা-ভরসাস্থল বিশ্ববিদ্যালয়ের তকমাযুক্ত পুত্রগণের দিকে তাকাইয়া তাঁহারা যে ভবিষ্যতের সুখস্বপ্নের কল্পনা করিয়াছিলেন তাহা ক্রমে ক্রমে বিলয়প্রাপ্ত হয়।

কয়েক বৎসর হইল আমাকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কোর্ট মেম্বার স্বরূপ বছরে একবার করিয়া তথায় গমন করিতে হয়। ঢাকা শহরেও সিনেমা একটি দুইটি করিয়া গড়িয়া উঠিতেছে এবং তাহারই নিকটবর্ত্তী নারায়ণগঞ্জেও এই পাপ ঢুকিয়াছে। তথাকার একজন উকিলের মুখে শুনা গেল, "আমি একটি সিনেমার পরিচালক (ডিরেক্টর)। দু-পয়সা রোজগার হয় বটে, কিন্তু যখন টাকা গুণিবার সময় দেখি অনেকগুলিতে সিঁদুরের ছাপ আছে (মা-বোনদের বলিয়া দিতে হইবে না যে এগুলি লক্ষ্মীর কৌটা হইতে অপহৃত) তখন হৃদয় শুষ্ক হয় এবং ভাবি যে কি পাপের প্রশ্রয় দিতেছি।"

ছাত্রদিগের মধ্যে শহরে আসিয়া বিদ্যাশিক্ষা করার একটি প্রবল আকর্ষণ আছে, কারণ শহরের ন্যায় আর কোন স্থানে বিলাসপ্রিয় ও অনায়াসলব্ধ জীবন যাপন করা চলে না।

এ-স্থলে বাগেরহাট কলেজের বিষয় কিছু না-বলিয়া থাকিতে পারিতেছি না। আজ প্রায় চোদ্দ-পনর বৎসর হইল একদিন তত্রস্থ কয়েক জন নেতা ও কর্ম্মী কলেজ অফ্ সায়ান্সে আমার নিকট আসিয়া উপস্থিত হইলেন এবং বলিলেন, তাঁহারা বাগেরহাটে একটি কলেজ সংস্থাপনের জন্য স্থিরসঙ্কল্প হইয়াছেন, তাহাতে আমার সাহায্য ও সহানুভূতি প্রার্থনা করেন; আরও বলিলেন কলিকাতায় ছেলেপিলে পড়ান বহু ব্যয়সাধ্য, বিশেষত শহরের ছাত্রগণ নানাবিধ প্রলোভনের মধ্যে পতিত হয়। আমিও মাঝে মাঝে ভাবিতেছিলাম ম্যালেরিয়ামুক্ত কোন পল্লীগ্রামে, যেখানে বিস্তৃত ভূমিখণ্ড সহজলভ্য ও রেলওয়ে ষ্টীমার সাহায্যে যাতায়াতের সুবিধা আছে, এইরূপ স্থানে একটি কলেজ করিতে পারিলে বোধ হয় বর্ত্তমান শিক্ষাপ্রণালী ও পূর্ব্বেকার টোলের ছাত্রাবাস উভয়েরই সামঞ্জস্য রক্ষা করা হইবে। প্রথম অবস্থায় ছাত্রাবাসের জন্য নদীতটে তৃণাচ্ছাদিত ভূমিখণ্ডের উপর ঘর তৈয়ারী করা হইল, চারিদিকে উন্মুক্ত প্রান্তর এবং হুহু করিয়া বাতাস প্রবাহিত হয়। সেই স্থানে কলিকাতার অলিগলির ভিতরের একতালা ঘরের স্যাঁতসেঁতে ভাব একেবারেই নাই, এক একটি ঘর আবার কতকগুলি প্রকোষ্ঠে বিভক্ত এবং তাহার ভাড়া মাত্র এক টাকা ধার্য্য হইল; প্রকাণ্ড মাঠ, ফুটবল ক্রিকেট খেলিবারও যথেষ্ট স্থান এবং নদীর উপর নৌকা-সঞ্চালন দ্বারা ব্যায়াম করিবারও সুবন্দোবস্ত।

কিন্তু ইহার বিপরীত ফল ফলিল। এই সকল সর্ব্ববিধ সুবিধা থাকা সত্ত্বেও ছাত্রসংখ্যা দিনের পর দিন হ্রাস পাইতে লাগিল। প্রথম দুই এক বৎসর কলেজে প্রায় তিন চারি শত ছাত্র অধ্যয়ন করিত, কিন্তু গত বৎসরে তাহা একশত চল্লিশ জনে আসিয়া দাঁড়াইয়াছিল এবং এ-বৎসর টানাটানি করিয়া বোধ হয় দুইশত পঞ্চাশ জন হইবে। এই বাগেরহাট কলেজের অধ্যক্ষ অতি অমায়িক অভিজ্ঞতাসম্পন্ন ব্যক্তি এবং ছাত্রবৎসল ও সহজঅধিগম্য। ইনি এবং আর কয়েক জন অধ্যাপক এই কলেজের আশেপাশের বাসিন্দা, সেজন্য সকল সময়ই তাঁহারা ছাত্রদিগের লেখাপড়ার দিকে সুদৃষ্টি রাখিতে পারেন। বাছিয়া বাছিয়া এমন সব অধ্যাপক নিযুক্ত করা হইল যে, তাঁহারা কোন অংশেই কলিকাতার কলেজের অধ্যাপকদের তুলনায় নিকৃষ্ট নহেন। যখন ছাত্রসংখ্যা কমিতে লাগিল তখন ছেলেদের পক্ষ হইতে এই অভিযোগ আসিল যে, তাহারা কাঁচা ঘরে থাকিতে নারাজ, কাজেই গ্রীষ্মাবকাশের সময় আমিও সেইস্থানের কর্ত্তৃপক্ষদের সহিত ভিক্ষার ঝুলি কাঁধে লইয়া নানাস্থানে ঘুরিতে লাগিলাম এবং এই প্রকারে কতকগুলি পাকা বাড়িও হইল। কিন্তু তাহাতেও বিশেষ ফল ফলিল না। তখন বাগেরহাটের কেহ কেহ আমাকে বলিলেন, "মহাশয় আপনি বুঝিলেন না যে, এ পাড়াগাঁয়ে ছেলেরা থাকিতে আদৌ রাজী নয়। আজব শহর কলিকাতায় বহুবিধ আকর্ষণের বস্তু আছে, সেখানে বিজলী বাতিসংযুক্ত বড় বড় হোটেল এবং রেস্তোরাঁ। সিনেমা প্রভৃতি বিদ্যমান। বিশেষতঃ বাগেরহাটে থাকিলে

মা-বাপ ও অভিভাবকগণের নজরবন্দী হইয়া থাকিতে হয়, আর কলিকাতায় থাকিলে মাসের পর মাস মনি-অর্ডারে চল্লিশ পয়তাল্লিশ টাকা করিয়া নির্ব্বিবাদে আদায় হয় ও ইচ্ছানুরূপ খরচ করা যায়।"

এই সম্পর্কে ঢাকার মোসলেম হোষ্টেলের কথা বলি। যখন লর্ড হার্ডিং বঙ্গের অঙ্গচ্ছেদ রহিত করিলেন তখন মুসলমান নেতাদিগকে এই বলিয়া প্রবোধ দিলেন যে, তাঁহাদের সুবিধার জন্য একটি স্বতন্ত্র বিশ্ববিদ্যালয়ের সৃষ্টি হইবে, সেখানে মুসলমান ছাত্রদের জন্য বিশেষ সুবিধাও করা হইবে। আমি চিরকাল এই মতই পোষণ করিয়া আসিতেছি এবং ইহা ব্যক্ত করিতে কখনও কুণ্ঠিত হইব না যে, অনুন্নত সম্প্রদায়গুলির ভিতর যতদিন না শিক্ষার আলোক প্রবেশ করিবে এবং যতদিন না তাঁহারা বিদ্যাশিক্ষা করিয়া তথাকথিত উচ্চশ্রেণীদের সহিত সমভাবে মেলামেশা ও সমান অধিকার ও সুবিধা লাভ করিবে ততদিন আমাদের প্রকৃত উন্নতি হইবে না। সেখানকার প্রকাণ্ড সেক্রেটারিয়েট বাড়ি মোসলেম হোষ্টেলে পরিণত হইয়াছে। কিন্তু কর্ত্তৃপক্ষেরা ইহাও যথেষ্ট মনে করেন নাই। আবার দশ লক্ষ টাকা ব্যয় করিয়া রাজ-প্রাসাদতুল্য একটি স্বতন্ত্র 'মোসলেম হল' নির্ম্মিত হইয়াছে। এখানে থাকিতে গেলে কিছু উচ্চ হারে ভাড়া দিতে হয়। একে ত মুসলমান ছাত্রেরা অধিকাংশই দরিদ্র, তাহার উপর এই দুর্দ্দিনে এইরূপ উচ্চ হারে ভাড়া দেওয়া ক্লেশসাধ্য। কাজেই অধিকাংশ ঘরই খালি পড়িয়া আছে। যাঁহারা একটু তলাইয়া বুঝিতে পারেন তাঁহারা বলেন ছেলেদের ভবিষ্যৎ নষ্ট করিবার ইহা অপেক্ষা প্রকৃষ্ট উপায় আর উদ্ভাবিত হইতে পারে না। আসল কথা এই যে, যদি দশ লক্ষ টাকা মূলধন-স্বরূপ অব্যাহত রাখিয়া তাহার বাৎসরিক সুদ আনুমানিক চল্লিশ হাজার টাকা দরিদ্র মুসলমান ছাত্রদের উন্নতিকল্পে বৃত্তিস্বরূপ ব্যয়িত হইত তাহা হইলে প্রকৃতপক্ষে তাহাদের উন্নতির বিধান করা হইত। কিন্তু বৃটিশ রাজনীতি ভাগ্যবিধাতার পরিকল্পনার ন্যায়ই দুজ্ঞের্য়।

বর্ত্তমান শিক্ষাপ্রণালী যে কত রকমে শাপ ও পাপ গ্রস্ত তাহার একটুমাত্র আভাস দিলাম। অবশ্য ছাত্রগণ বিদ্যাশিক্ষার জন্য অভিভাবকদের নিকট হইতে মাসে মাসে টাকা পাইবেন। ইহার বিরুদ্ধে আমি কিছুই বলিতেছি না। কিন্তু এখানে বিবেচ্য এই যে যাহারা কলেজে পড়ে তাহাদের এইটুকু বোঝা উচিত, তাহারা যে টাকার শ্রাদ্ধ করে তাহা কত কষ্টের। প্রয়োজনাতীত ব্যয় করা কেবল নীচাশয়তার পরিচায়ক নহে, ভাবী জীবনের উন্নতির মূলেও কুঠারাঘাত করা।

আজকালকার তুলনায় একশত বৎসর পূর্ব্বে স্কটল্যাণ্ড এক প্রকার নির্ধন ছিল, তখনও সেখানে নব্যসভ্যতা ও বিলাসিতা জাল বিস্তার করে নাই। মনীষী কার্লাইলের জীবনচরিত হইতে ইহার একটি সুন্দর বিবরণ দিতেছি।

বর্ত্তমানে বিশ্ববিদ্যালয়ে পাঠ্যাবস্থায় ছাত্রবৃন্দ সুরম্য অট্টালিকায় বিলাসসম্ভারপরিপূর্ণ প্রকোষ্ঠে ও বিপুল অর্থব্যয়ে তাহাদের ছাত্রজীবন অতিবাহিত করে। এই সকল ছাত্রেরা যাহা ব্যয় করে কার্লাইল বোধ হয় তাঁহার জীবনের কোন বৎসরেও তাহা উপার্জ্জন করিতে সক্ষম হন নাই। তাঁহার সময়ে স্কটল্যাণ্ডের বিশ্ববিদ্যালয়ে এখনকার মত পারিতোষিক ও বৃত্তির ব্যবস্থা ছিল না। ছাত্রগণ অধিকাংশই দরিদ্র ছিল। কার্লাইলও এইরূপ একজন দরিদ্র কৃষকের সন্তান। বিদ্যাশিক্ষার ব্যয়নির্ব্বাহের জন্য তাহাদের পিতামাতা ও অভিভাবকগণ যে কিরূপ কায়ক্লেশে অর্থ সংগ্রহ করিতেন তাহা প্রত্যেক বিদ্যার্থীই হৃদয়ঙ্গম করিত এবং সময়ের সদ্ব্যবহারের জন্য সতত সচেষ্ট থাকিত। বৎসরে মাত্র পাঁচ মাস বিদ্যালয়ে অধ্যয়ন করিয়া অবশিষ্ট সময় তাহারা কৃষিকার্য্য ও শিক্ষকতা করিয়া তাহাদের ব্যয়-সঙ্কুলানের জন্য অর্থ সংগ্রহ করিত।

চৌদ্দ-পনর বৎসর বয়সেই তাহাদিগকে এডিনবরা গ্লাসগো প্রভৃতি স্থানের বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রেরণ করা হইত, এবং সুদীর্ঘ পথ পদব্রজে গমন ভিন্ন তাহাদের আর কোন উপায় ছিল না। সেখানে অভিভাবকহীন হইয়া তাহাদের আহার ও বাসস্থান নিজেদেরই খুঁজিয়া লইতে হইত। সময়ে সময়ে তাহাদের পিতামাতা গৃহ হইতে ক্ষেত্রজ আলু, ডিম, মাখন ইত্যাদি খাদ্যদ্রব্য লোক মারফৎ পাঠাইতেন এবং তাহারাও তাহাদের মলিন বস্ত্র ধৌত করিবার নিমিত্ত সেই সকল লোক দ্বারা গৃহে প্রেরণ করিত। তাহাদের স্বল্পতুষ্ট স্বভাবের

পক্ষে এই সবই যথেষ্ট ছিল। দারিদ্র্যই তাহাদিগকে কলুষিত আমোদপ্রমোদ হইতে সতত রক্ষা করিত।

এই এক শত বৎসরের মধ্যে স্কটল্যাণ্ড দেশ প্রভূত ধনশালী হইয়াছে। কলিকাতার সন্নিকটে ও হুগলী নদীর উভয় পার্শ্বে বজবজ হইতে আরম্ভ করিয়া ত্রিবেণীরেও ঊর্দ্ধে যে সত্তর-আশীটি পাটকল আছে তাহার কর্তৃত্ব স্কটল্যাণ্ডবাসীর একচেটিয়া বলিলেও চলে। এই কারণে প্রতি বৎসর অজস্র অর্থ স্কটল্যাণ্ড দেশে চলিয়া যাইতেছে। এতদ্ভিন্ন গ্লাসগো, ডান্‌ডি 'গ্রীণক' ইত্যাদি মহানগরেও অর্ণবপোত-চালন এবং ব্যবসা-বাণিজ্য-সূত্রেও প্রভূত ধনসমাগম হইয়াছে। এই সকল কারণে সেই সব স্থান হইতে এখন পূর্ব্বেকার মত সাদাসিদা চালচলনও অন্তর্হিত হইয়াছে। স্কটল্যাণ্ডের বিখ্যাত কবি রবার্ট বারন্‌স্ অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগে খেদোক্তি করিয়া ভবিষ্যদ্বাণী করিয়াছিলেন যে, দেশের মধ্যে বিলাসিতার স্রোত প্রবাহিত হওয়া সর্ব্বনাশের মূল। ঐশ্বর্য্যমদগর্ব্বীরা এখন তাহা ক্রমে ক্রমে বিস্মৃত হইতেছেন।

বিলাসিতার হাওয়া প্রবাহিত হইলে দেশে যে কত রকম দুর্নীতির প্রশ্রয় পায় তাহা এস্থলে আলোচ্য নয়। শুধু এই কথা বলিতে পারি যে, অন্তত এক শতাব্দীর ভিতর স্কটল্যাণ্ড পূর্ব্বাপেক্ষা দশগুণ ধনী হইয়াছে, সুতরাং সে-দেশে যদি কার্লাইলের ছাত্রজীবনের তুলনায় এখনকার ছাত্রজীবনের ব্যয়ভার অনেক বাড়িয়া থাকে তাহা হইলে তত আপত্তিজনক হইবে না। কিন্তু আমাদের দেশে যুবকগণ ছাত্রাবস্থায় অভিভাবকগণের নিকট অর্থ শোষণ করিয়া বিলাসিতার স্রোতে গা ঢালিয়া দিতেছে. ইহাতে তাহারা নিজেরাই তাহাদের ভাবী জীবনের মূলে কুঠারাঘাত করিতেছে। আমাদের দরিদ্র দেশ। আমরা ক্রমশঃ দীন হইয়া যাইতেছি। যে-দেশের জনপ্রতি গড় আয় দৈনিক দুই আনা এবং বাৎসরিক পঞ্চাশ টাকা হইবে কি-না সন্দেহ, সে-দেশের লোকের পক্ষে বিলাতি ভাবে অনুপ্রাণিত হইয়া বিলাতি রকম চালচলন অনুকরণ করা সর্ব্বনাশের কারণ।

বর্ত্তমান জগতে যে-সকল মহাপ্রাণ ব্যক্তি নিজের চেষ্টা ও পুরুষকার বলে কৃতিত্ব লাভ করিয়াছেন তাঁহাদের মধ্যে এনড্রু কারনেগি অন্যতম। ইনি স্কটল্যাণ্ড দেশের ডানফারমলাইন নগরে জন্মগ্রহণ করেন। ইঁহার পিতা একজন তন্তুবায় ছিলেন। দারিদ্র্যনিপীড়িত হইয়া স্ত্রী ও অপরিণতবয়স্ক দুই বালক সমভিব্যাহারে কোন প্রতিবেশীর নিকট জাহাজ ভাড়ার নিমিত্ত কিছু টাকা ধার করিয়া ভাগ্যান্বেষণের জন্য আমেরিকায় গমন করেন। বালক কারনেগীর বয়স তখন তের-চৌদ্দ বৎসর হইবে এবং এই বয়সে তিনি একটি ক্ষুদ্র কারখানায় প্রবেশলাভ করেন। অতি প্রত্যূষেই শয্যাত্যাগ করিয়া সামান্য কিছু আহারের পর তিনি কর্ম্মক্ষেত্রে গমন করিতেন এবং সমস্ত দিন হাড়ভাঙা পরিশ্রমের পর গৃহে প্রত্যাগমন করিতেন। যখন তিনি তাঁহার প্রথম সপ্তাহের সামান্য রোজগার তিন-চারি টাকা তাঁহার পিতামাতার হস্তে সমর্পণ করিলেন তখন তাঁহার মনের ভাব তাঁহার নিজের কথায় ব্যক্ত করিতেছি, "আমি আমার পরবর্ত্তী জীবনে প্রচুর অর্থ উপার্জ্জন করিয়াছি, কিন্তু যখন আমি আমার সর্ব্বপ্রথম রোজগার পিতামাতার হস্তে অর্পণ করিলাম তখন মনে একটি গর্ব্ব অনুভব করিলাম এবং মনে করিলাম যে আজ হইতে আমি স্বাবলম্বী।" এই এনড্রু কারনেগী হীন অবস্থা হইতে পুরুষকার-বলে পৃথিবীর একটি শ্রেষ্ঠ লৌহ কারখানার মালিক হইয়াছিলেন, এবং বিদ্যাশিক্ষার জন্য ও নানাবিধ হিতকার্য্যে প্রায় একশত কোটী টাকা দান করিয়াছিলেন। কারনেগীর উপরি লিখিত উক্তি হইতে বোঝা যায় যে পিতামাতা ও অভিভাবকের উপর জুলুম করিয়া বাবুয়ানা ও বিলাসিতা করা কত গর্হিত। কিন্তু কলেজের ছাত্রগণ "লাগে টাকা দেবে গৌরীসেন" এই মতের বশবর্ত্তী হইয়া অযথা ব্যয় করিতে শিক্ষা করিয়া ভাবী জীবনের পথ কণ্টকাকীর্ণ করে।

ছায়া

শ্রীসুশীলকুমার দে

হৃদয়-বীণাতারের যেন স্পন্দ
জীবন-শতদলের যেন গন্ধ
মূরতি লভি' উঠিল কবে ফুটি',
মুগ্ধ করি' আমার আঁখি দু'টি ;
প্রাণের মাঝে অজানা কোন্ গানের যেন ছন্দ।

ঘেরিয়া রহে মধুর তা'র মিনতি,
মৌনে-ঢাকা প্রাণের যেন প্রণতি ;
পক্ষ্মনত চক্ষে রহে লিখা
অতল কালো আলোর যেন শিখা,
তিমিরে-হারা ভাদরে ভরা-মেঘের যেন আনতি।

পাদপ-পাদে দেখেছি ছায়া লগ্ন,
তড়াগ-বুকে জড়ায়ে আছে মগ্ন ;
কায়া ত নাই, তেমনি যেন ছায়া ;
জায়া সে নয়, মমতাময় মায়া ;
ভাঙিতে নারে, ভাঙন-সুখে নিজেরে করে ভগ্ন।

একেলা কবে পথের পাশে চাহিয়া
নিজেরে শুধু আতপতাপে দাহিয়া,
বিছাল তা'র শীতল স্নেহখানি
তিমিরঘন ঘোম্‌টাটুকু টানি',
অতিথি কোন্ পথিক যেন আসিবে পথ বাহিয়া।

রচিয়া বুকে গভীর সুখে স্বর্গ,
ধরিয়াছিল ক্ষুদ্র তা'র অর্ঘ্য ;
মেলিয়া বাহু মুদিয়া দু'টি আঁখি,
জীবন-পথে কখন নিল ডাকি' ;
আনেনি ব্যথা, হানেনি প্রাণে আঁখির খর খড়্গ।

বনের বাণী মনের মাঝে বিহরে,
তিমিরতলে সুখের ছলে শিহরে ;
চঞ্চলিয়া আঁখির দু'টি তারা,
সঞ্চরিয়া ধরার রসধারা,
স্নিগ্ধ স্নেহ বহিয়া যায় মুগ্ধ প্রাণ-কুহরে।

ক্ষুদ্র তা'র দুঃখ-সুখ-ক্লান্তি,
আয়াসহীন-জীবন-ভরা শ্রান্তি
ক্ষুদ্র তা'র ধরণীটিরে ঢাকে,
আকাশটিরে ক্ষুদ্র ক'রে রাখে ;
স্বপনছায়া-চয়নে শুধু নয়নে ভাসে ভ্রান্তি।

সঙ্গীহীন রাত্রি দিন বসিয়া
চাহে সে দূরে আলোর পারে খসিয়া ;
নিবিড় যেন দীঘির কালো জলে
অতল-তল শীতল প্রাণতলে
সুদূর কোন্ মধুর রাগ পড়িবে ধীরে খসিয়া।

সুপ্তিময়ে তৃপ্ত প্রাণ-পূর্তি
লভিল কবে গভীরতর স্ফূর্তি ;
দেখিল মোরে স্বপ্ন-দেখা চোখে,
ডাকিল কবে মানস-ছায়া-লোকে,
হেরিনু তা'র প্রশ্নময়ী অরূপ রূপমূর্তি।

সুখের লাজে বুকের মাঝে ধরিয়া
আমার সব ক্লান্তি নিল হরিয়া ;
শিহরি' সুখে সরেনি মুখে বাণী,
মনের মাঝে কি ছিল নাহি জানি,
মোহের শুধু মন্ত্র যেন পড়িল প্রাণে ঝরিয়া।

ভোরের ঘোরে স্বপনসুখদাত্রী
কাটিয়াছিল কবে সে মোর রাত্রি ;
ফুটিয়াছিল নয়ন ঝলসিয়া
দিনের দাহ হৃদয়ে বিলসিয়া
বাড়ায়ে তৃষা,—হারায়ে দিশা একেলা ছিনু যাত্রী।

একেলা চলি নিশাথে আর দিবসে,
ক্লান্ত দেহ শ্রান্ত মন বিবশে ;
ভাবিনি পথে ভুলাতে মোর মন
আড়ালে এত শ্যামল আয়োজন
চলিত মোর তৃষাতাপ-হরণতরে নিবসে।

নয়নে নহে দৃষ্টি তা'র দৃপ্ত,
গোপন কোন্ স্বপন-সুখে তৃপ্ত ;
ঝরে না, তবু ব্যথার ইসারায়
থমকি' কাঁপে আঁখির কিনারায়
হাসির সাথী অশ্রুপাতি মমতা-ভাতি-লিপ্ত।

পথের যত পাথর 'পরে মিলায়ে,
আলোর কোলে ছায়ার মত বিলায়ে,
কঠোর যাহা, নিঠুর যাহা ছিল,
তাহার সাথে মাধুরী মিলাইল ;
স্বপন-সাঁঝে শিহরি' লাজে সোহাগ-সুখ-লীলা এ।

জানে না ছলা বিলাস-কলা-ভঙ্গী,
করেনি মোরে রাগের রসে রঙ্গী ;
দহনহীন গহন আঁখি দু'টি
তিমিরে-ভাসা তারার মত ফুটি'
করিল মোরে ক্ষণেক তরে নিভৃত-পথ-সঙ্গী।

ভাবিনি মোরে এমন ক'রে ভুলাবে,
চোখের 'পরে চোখের মায়া বুলাবে ;
রাখিয়া করে কোমল দু'টি কর,
পরশে করি' সরস কলেবর,
ভাবিনি প্রাণ-দোলায় কভু সে মোর প্রাণ দুলাবে।

পূর্ণ হ'ল যা' ছিল মোর রিক্ত,
মধুর হ'ল যা' ছিল মোর তিক্ত ;
তটের বুকে জলের ঢেউ লেগে
শুনিনু শুধু যে-গান ওঠে জেগে ;
হেরিনু শুধু নয়ন দু'টি অশ্রুসুখসিক্ত।

চলিতে গিয়ে চরণ তা'র চলেনি,
বলিতে গিয়ে যা' ছিল মনে বলেনি ;
লইনু যবে নিভৃতে বুকে টানি'
দু'হাতে শুধু ঢাকিল মুখখানি,
শয্যাতলে লজ্জাহীন প্রদীপ কভু জলেনি।

আদরমাখা অধর সুধা-সদ্ম,
আঁচলে-ঢাকা বুকের দু'টি পদ্ম ;
কেশের রাশি ঘেরিয়া রহে মোরে
সকল দুখ হরিয়া সুখঘোরে,
মুরছি' পড়ে সকল সুখ ধরিয়া দুখ-ছদ্ম।

আধেক ঘুমে আধেক যেন জাগরে
ডুবাল মোরে ছায়ার মায়া-সাগরে ;
নিজের কথা কখনো সে ত ভাবি'
বিজয় ক'রে করেনি কোনো দাবী
চাহিনি মোরে যেমন ক'রে নাগরী চাহে নাগরে।

শিশির-নীরে শেফালি-সম শীর্ণ
তিমির-তীরে যেন সে অবতীর্ণ ;
আলোর তাপে স্নিগ্ধ আঁখি কাঁপে,
সুরভি-ভার বক্ষে যেন চাপে,
বৃন্তে তবু রক্তরাগ, হাসিটি নহে জীর্ণ।

অন্তহীন শান্তিলীন বিজনে
কাটিল দিন অলস-সুখে দু'জনে ;
চাঁদের আলো ফুলের রেণু মাখা
গন্ধঘন অন্ধকারে ঢাকা,
বিবশ অনুদিবস মন ছায়ার ছবি-সৃজনে।

চলার পথে চপল মোর চিত্ত
আরামহীন বিরাম-সুখে নিত্য
মিলনমাঝে বিরহ-গীত গাহে,
বিধুর হ'য়ে সুদূর পানে চাহে,
দেখে না চেয়ে হৃদয় গেহে কি তা'র রহে বিত্ত।

আঁখির পানে ছিল সে আঁখি মেলিয়া,
তবুও তা'রে হেলার ভরে ফেলিয়া,
চলিয়া পথে ছলিয়া দূরে সরি'
ভেবেছি কত আছে সে পিছে পড়ি',—
দিবস-রাতি সাথের সাথী রহে সে পাশে হেলিয়া।

নীরব তা'র নয়ন নিস্পন্দ
মরমে আনে মধুর মহানন্দ;
চপল মনে মায়াবী অঙ্গুলি
বুলাল স্নেহে স্বপ্ন-আঁকা তুলি.
মুছিল সব তৃষার গ্লানি, ঘুচিল সব দ্বন্দ্ব।

আঁখির মাঝে আঁখিটি তা'র আঁকিয়া
ঠোঁটের হাসি লইনু ঠোঁটে মাখিয়া:
ব্যাকুল বুকে তবুও সদা ভয়
কায়াটি যদি মিলায় ছায়াময়;
নিশীথ হ'তে নীলিমাটুকু কেমনে ল'ব ছাঁকিয়া?

দেবতা যথা লুকায় অহোরাত্র
মন্থশেষ-সুখের সুধাপাত্র,
তেমনি আমি আগলি' ভয়ে সুখে
মেলিয়া বাহু জড়ানু তা'রে বুকে,
বাঁধিনু বুঝি বায়ুর থর ছায়ার মায়া মাত্র।

পূর্ণতার তৃপ্তি ল'য়ে হৃদয়ে
ছায়াটি মোর মিলালো আলো-উদয়ে;
অসহ সুখ সহিতে যেন নারে.
ভাঙনে তাই ভাঙিল আপনারে—
এখনো তা'র বিদায়-ব্যথা বাজিছে বুকে নিদয়ে।

জীবন-পথে মিলিল খেলা-ভঙ্গে
মরণ-পথে নিল না মোরে সঙ্গে;
চোখের 'পরে দিনের পর দিন
তনুটি ক্ষীণ হ'ল যে আরো ক্ষীণ.
সুরের রেশ মিলায় যেন দূরের উৎসঙ্গে।

শেষের দেখা আজো সে আছে স্মরণে
মুখটি তার মৌনমূক মরণে;
দাঁড়ানু তা'র শয্যাপাশে আসি'.
ক্ষণেক তরে চাহিল শুধু হাসি',
অস্তশেষ পাংশু আলো মেঘের কালো সরণে।

চাইল হাসি পাণ্ডু মুখপ্রান্ত
সুদূরতর-অশ্রুভর-ক্লান্ত.
নীরবে মোরে প্রণমে আঁখি দু'টি,
রহিবে ইহ-জনমে তাহা ফুটি',—
বাঁধিল কেন মায়ায় তা'রে যে ছিল পথে পান্থ?

কেন সে আসি' ক্ষণেক তরে ছলিল,
আমার পথে চলার পথে চলিল?
ছায়ায় ছাওয়া করুণ জলধনু
ঝরিল কেন তরুণ তা'র তনু?
নিভিবে যদি প্রদীপ তবে মিথ্যা কেন জলিল?

কখন আঁখি মুদিল মুদিতাক্ষী,
পথের পাশে রহিনু শুধু সাক্ষী;
রহিল শুধু শ্যামলছায়াময়
আঁখরে লেখা পথের পরিচয়,
প্রাণের নিকেতনের মাঝে কারুণ্য-কটাক্ষী।

ভবিতব্যতা

শ্রীইলা দেবী

বিয়ে-বাড়ির আলোর মালার সঙ্গে পাল্লা দিয়ে আকাশে মেঘের মেলা সে দিনে। শ্বেতপদ্মের আলপনা-আঁকা চন্দন-কাঠের আসনে রক্তবসনা বধূ একা বসে ভাবছে,—বাইরের কোলাহলে তার মন নেই,—উদ্বিগ্ন নয়নে আকাশভরা আঁধারের পানে চেয়ে কি সে ভাবছিল।

দেশের পরিচিত নীড় থেকে অনভ্যস্ত নগরীর বদ্ধ বক্ষপুটে বিবাহোপলক্ষে প্রবেশ ক'রে অবধি সুহিতার অস্বস্তির শেষ ছিল না। চারিদিকের অপরিচিতের মাঝে একমাত্র পরিচিত শুধু তার পিতা -- সে তাঁর কাছেই ঘেঁষে থাকত। মাকে সুহিতার মনে পড়ে না. কোন্ শিশুকালে তিনি তাকে ছেড়ে গেছেন। পিতার কাছেই পালিতা সে। চন্দ্রনাথের বয়সের সঙ্গে শরীর ভেঙে আসায় তিনি বিষয়-কর্ম্ম দেখা ছেড়ে দিয়েছিলেন। তাঁর পুত্র উমানাথ এখন জমিদারীর পরিচালনা করেন। উমানাথ অধিকাংশ সময় থাকেন কলকাতায়, তা থাকলেও মহাল পরিদর্শন থেকে মোকদ্দমার তদ্বির করা প্রভৃতি সমস্ত ভারই ছিল তাঁর ওপর। চন্দ্রনাথ দেশকে ছাড়তে পারেন নি। মায়াপুরে বনেদী ধরণের বৃহৎ অট্টালিকা. পূর্ব্বের জলুস নেই, পূর্ব্বের আয়তন এখনও বজায় আছে। কয়েক জন আশ্রিত ও দাসী-পরিচারক নিয়ে পিতাপুত্রীর এই গ্রামের বিজনে দিন কাটে।

বিবাহের দু-দিন আগে সুহিতাকে নিয়ে চন্দ্রনাথ কলকাতায় এলেন। উমানাথই সব আয়োজন করেছিলেন, তিনিই কর্ম্মকর্ত্তা। কিন্তু চন্দ্রনাথের আসার পরদিনই উমানাথকে কলকাতা পরিত্যাগ করতে হ'ল.--- পূর্ব্বসীমার মহালে পার্শ্ববর্ত্তী জমিদারের সঙ্গে কি নিয়ে দাঙ্গা বেধেছে খবর পেয়ে তিনি তদারক করতে ছুটলেন।

চন্দ্রনাথের ওপর এতবড় আয়োজনের ভার পড়ায় তিনি বিব্রত হয়ে উঠলেন। অপরিচিত লোকজন নিয়ে এ-সমস্ত সামলান তাঁর পক্ষে এক দুরূহ ব্যাপার। বহুদিন থেকে নির্লিপ্ত শান্তির মাঝে বাস ক'রে এ-সব সাংসারিক ঝঞ্ঝাটে তিনি এখন অনভ্যস্ত হয়ে পড়েছেন। বিয়ের দিন সকাল হ'তে চন্দ্রনাথ অসুস্থ বোধ করছিলেন, তবু কোন মতে যথাকর্ত্তব্য ক'রে গেলেন। সারাদিনের উপবাসে পরিশ্রম সহ্য হ'ল না। সন্ধ্যাবেলা তিনি মাথা ঘুরে অজ্ঞান হয়ে পড়লেন। খবর শুনে সুহিতা উৎকণ্ঠায় দিশেহারা হয়ে গেল। এ-সব উৎসব-সজ্জা টেনে ফেলে দিয়ে চেতনাহীন চন্দ্রনাথের শয্যাপার্শ্বে মন তার ছুটে যেতে চাইল,—বাধা পেয়ে সে বিবাহটার উপরই ক্ষুব্ধ হয়ে উঠল. বিবাহের আয়োজনগুলো তার কাছে একান্ত বিরক্তিকর এবং সমস্ত অনুষ্ঠান অর্থহীন লাগতে লাগল।

চন্দ্রনাথের অসুস্থতায় কাজকর্ম্ম সব বিশৃঙ্খল হয়ে পড়ল। আত্মীয় অনাত্মীয়ের সংখ্যা অগণ্য. কিন্তু সকলেই বিবাহ উপলক্ষে দু-দিনের জন্যে এসেছেন নানা জায়গা থেকে। মায়াপুরের নিঃসঙ্গ জীবনে অধিকাংশকে সুহিতা দেখেই নি কখন, যাদের বা দেখেছে তাদের সাথেও স্বল্পপরিচয়। গোলযোগের সীমা রইল না,- কিন্তু বিবাহ স্থগিত থাকতে পারে না। কর্ত্তাহীন কর্ম্ম কোন মতে এগিয়ে চলল।

একলা ঘরে বসে বসে বাইরের কোলাহল শুনে সুহিতার মায়াপুরের সে শান্ত নীরবতা মনে পড়ছিল। নিত্য ভোরে যখন জলের মত স্বচ্ছ টল্‌টলে আকাশে গোলাপী আভা ছড়িয়ে যায়, সুহিতা উঠে দেখত মন্দিরের ত্রিশূলে আলো পড়েছে, বেণুবনের মাথায় মাথায় আলো এসে লেগেছে, দীঘির আঁধার জলে রঙের কাঁপন জেগেছে.—সুহিতার কাজে অকাজের সারাদিনের ছন্দটি যেন নীরবে বেজে উঠল এদের মাঝে। তার আঠারটি বছরের স্মৃতির লিপিকায় সে দীঘি, দেবালয়, মুকুলিত আম্রশাখা, মর্ম্মরিত বেণুবন প্রতিদিনে কত মধুবিন্দু জমিয়ে গেছে !...

বিদ্যুৎকে চমকে দিয়ে মেঘ ডেকে উঠল, মেঘান্ধকার আকাশকে দেখে সুহিতার মনে জাগল,—সেই পল্লীজ্যোৎস্না,—উত্তপ্ত গ্রীষ্ম-দিন-শেষে অলিন্দে শীতলপাটি বিছিয়ে চন্দ্রনাথ

তাকে নিয়ে বসতেন। আমের মুকুলের গন্ধে বাতাস মাতাল, বকুল বটের মসৃণ পত্রপুঞ্জে জ্যোৎস্নার বর্ষণ, 'চোখ-গেল'র জ্যোৎস্নাসিক্ত সুর থেকে থেকে জেগে উঠত। পিতাপুত্রীর আলোচনার মৃদুগম্ভীর গুঞ্জন জ্যোৎস্নাধ্যানী রাতের সাথে মিশে যেত। চন্দ্রনাথ চাইতেন সুহিতার স্বাতন্ত্র্য কোথাও যেন ব্যাহত না হয়, দিনের আলোর মত সহজ তার প্রকাশ হোক। উমানাথের এ-সবে বিশ্বাস ছিল না, তিনি ছিলেন অন্য প্রকৃতির। সুহিতাকে এতদিন অবিবাহিতা রাখায় তাঁর ছিল ঘোরতর আপত্তি। তিনি বহুবার তার বিবাহের সম্বন্ধ এনেছেন, কিন্তু চন্দ্রনাথ প্রতিবারই ফিরিয়ে দিয়েছেন। এবার উমানাথ সম্বন্ধ আনলেন কোন্ রাজবাড়ি থেকে; ভারি বনিয়াদী বংশ নাকি, হাতীশালে এখনও হাতী বাঁধা। পাত্র অত্যধিক বিদ্বান্-শিক্ষিত নাই বা হ'ল, তাকে ত আর চাকরি ক'রে খেতে হবে না। বাপের অবর্ত্তমানে অতবড় জমিদারির সে-ই এখন মালিক। এমন ঘরে কুটুম্বিতা করা বড় সোজা কথা নয়। এতেও চন্দ্রনাথ সম্মত না হ'লে উমানাথ যে ভগ্নীর আর কোন বিষয়ে কখনও থাকবেন না এ-কথাটা পুনঃ পুনঃ ব'লে দিলেন।

চন্দ্রনাথ অমত করতে পারলেন না। মেয়েকে এবার যখন পরের ঘরে পাঠাতেই হবে তখন অনর্থক দেরি ক'রে এমন সুপাত্র হাতছাড়া ক'রে কি লাভ? উমানাথ সোৎসাহে কলকাতায় ফিরলেন, কথাবার্ত্তা পাকা করতে। কয়েক দিন পরেই জানালেন সুহিতার বিয়ের সমস্ত স্থির ক'রে ফেলেছেন। বরের এক মামা সুহিতাকে আশীর্ব্বাদ করতে শীঘ্রই মায়াপুরে যাবেন; সেই সঙ্গে আর এক দলও যাবে মালতীকে আশীর্ব্বাদ করতে। তাঁদের আশ্রিতা বিধবা খুল্লতাত পত্নীর কন্যা মালতী, উমানাথ তার কথাও ভোলেন নি, এ-সম্বন্ধটি তিনিই কোথা হ'তে যুটিয়েছেন; কিছু তাদের বরপণ দিতে হবে না, পাত্র পশ্চিমে কর্ম্ম করে। উমানাথ হিসেবী লোক, বুদ্ধি ক'রে ঠিক করেছেন মালতীর বিয়েটাও সুহিতার সঙ্গে একরাত্রে সেরে ফেলা যাবে, খরচপত্র ইত্যাদি নানা দিক্ দিয়ে এতে মস্ত একটা সুবিধা। এখন কোনমতে দুদিনের ছুটি করিয়ে পাত্রকে নিয়ে এসে বিয়েটি সেরে ফেলতে পারলেই বাঁচা যায়।

কক্ষের এক প্রান্তে আর একটি ক'নেকে কখন বসিয়ে দিয়ে গেছে। সঙ্কুচিতা শ্যামা মেয়েটি চন্দ্রের আকর্ষণে উচ্ছ্বসিত সমুদ্রের মত নানা রকম ফিতে-জড়ান চক্রাকার খোঁপাটির আকর্ষণে চুলগুলি সব নিঃশেষে সামনে থেকে সরে পিছনে জমেছে এসে। কপালে কাঁচপোকার টিপ, নাকে একটি নোলক। এত গোলমালে মালতা বেচারা আরও আড়ষ্ট জড়সড় হয়ে বসে আছে। বরের কথা শিশুকাল হ'তে সে কত না শুনেছে, তার বরটি কেমন হবে কে জানে! গঙ্গাজলের বরের মত তাকে সেই পাখী-আঁকা লাল কাগজে চিঠি দেবে কি? ভাবতে ভাবতে এক-একবার তার ঢুলুনি আসছে।

ঘন ঘন শঙ্খরোলে বরের আগমন প্রচারিত হ'ল। বারিধারার প্রবল বর্ষণে উলুধ্বনি ক্ষীণ হয়ে গেল। শঙ্খ শুনে সুহিতার মন বর্ত্তমানে ফিরে এল বিবাহ, চন্দ্রনাথের অসুস্থতা সব ভিড় ক'রে জেগে উঠে তাকে পুনর্ব্বার অশান্তিতে ভরিয়ে দিল।

দূরসম্পর্কের কে এক বৃদ্ধ সুহিতাকে রাজকুমারের হাতে সম্প্রদান করলেন। সভায় এসে চারিদিকের বিশৃঙ্খলা, সুহিতাকে আরও বিমূঢ় ক'রে দিলে। অবগুণ্ঠন আবৃতা হয়ে সে নিস্তব্ধভাবে বসে রইল, বিবাহের কোন মন্ত্র তার মনকে ছুঁতে পারল না। শুভদৃষ্টির সময় স্বল্পপরিচিতা ও অপরিচিতা পুরনারীদের চেয়ে দেখার নানারকম অনুরোধ তাকে শুধু ক্ষিপ্ত ক'রে তুলল। পানপাত্রের আড়ালে বিনত নয়ন তার চন্দ্রনাথের রোগকাতর মূর্ত্তিস্মরণে বার-বার জলে ভরে উঠছিল কেবল। স্ত্রীআচার শেষে বাসর-ঘরে প্রবেশ ক'রে সুহিতা আর অপেক্ষা করতে পারলে না। গাঁঠছড়া-বাঁধা ওড়না খসিয়ে রেখে চন্দ্রনাথের কক্ষে চলে গেল পশ্চাতে অসন্তোষ বিরক্তির যে ঝঙ্কার উঠল তা শোনার ধৈর্য্য তার ছিল না।

পরদিন প্রাতে বর-ক'নে বিদায়ের সময় পর্য্যন্ত অসময়ের অনাকাঙ্ক্ষিত বৃষ্টি বিদায় নেয় নি। ভুক্তপত্রের রাশিতে কাকের চীৎকার, দাসী-পরিচারিকাদের ক্লান্ত কোলাহল, আত্মীয়-অভ্যাগতদের অকারণ কলরব, ডাক্তারদের আনাগোনা, চারিদিকে অগোছাল জিনিষপত্রের অপরিচ্ছন্ন ভাব ও মহামান্য বরপক্ষীয়দের কল্পিত অবমাননার আন্দোলনের মাঝে বর-ক'নে বিদায়ের ব্যাপার উৎকট গোলযোগ সৃষ্টি করলে। অবগুণ্ঠিতা সুহিতা চন্দ্রনাথের শয্যাপার্শ্ব হ'তে উঠে এল, অপরিচিত আত্মীয়ের দল ঠেলাঠেলি ক'রে

তাকে একটা মোটরে উঠিয়ে দিল, সে কোনমতে মোটরে উঠে বসল। কান্নাভরা চিত্তকে তার উদ্বেল ক'রে কত প্রশ্ন যে জাগছিল,—আজন্মের স্নেহনীড় ছেড়ে কোথায় সে চলল?—এক অজানার হাতে ভাগ্য সমর্পণ করা, সে কি মনের তারে সঠিক সুরে আঘাত দিতে জানবে? এমনি ক'রে কতদিনে কত মেয়ে সুখসংশয় শঙ্কিত মনে পিতৃগৃহদ্বারে অশ্রুরেখা রচনা ক'রে রেখে গেছে, সুহিতার বাঁধনহারা অশ্রুধারা সে চিরন্তন চিহ্নতে মিশে গিয়ে তাকে আর একটু স্পষ্ট ক'রে দিয়ে গেল।

অমিতাভের মা শুভ্রবেশ পরা, সৌম্য তাঁর চেহারা, উদ্বিগ্ন হয়েছিলেন না-জানি ছেলে কেমন বধূ আনে। জ্ঞাতিকুটুম্ব দিয়ে তাঁর সব আয়োজন করান, তাদের মুখে বধূর যা বর্ণনা শুনেছিলেন তাতে তিনি তৃপ্ত হ'তে পারেন নি। সুহিতাকে দেখে মুগ্ধবিস্ময়ে কেবলই বলেন, 'আমার অমিতের ভাগ্য ভাল, ওমা এমন সুন্দর বউ হয়েছে!' কন্যাপক্ষে আচম্বিত অসুস্থতার সব বিশৃঙ্খল হয়ে গেছে শুনে তিনি দুঃখিত হলেন, কিন্তু তখনই গিয়ে খোঁজ-খবর নেবার সময় কারও ছিল না। অমিতাভকে কর্ম্মোপলক্ষ্যে মধ্যপ্রদেশের যেখানে থাকতে হয় সেই দিনই তাকে সেখানে ফিরতে হবে। ট্রেনের সময় বয়ে যায়, বরবধূকে যাত্রা করতে হবে, সকলের ব্যস্ততার অন্ত নেই, দ্রুত কাজ সেরে ফেলার চঞ্চলতা চারিদিকে।

সুহিতাকে অমিতাভের সঙ্গে আজই দূরে যেতে হবে একথা সে পূর্ব্বে শোনে নি,—কোন্ কথাই বা সে শুনেছে? আর যা গোলযোগ পর-পর ঘটেছে সবই বোধ হয় তাতে ওলট্‌পালট্ হয়ে গেছে। রাজবাড়ির আড়ম্বরের সম্ভাবনায় সে সচকিত হয়েছিল, এখানের সাধারণ ধরণ দেখে সে কিছু বিস্মিত হলেও হাঁপ ছেড়ে বাঁচল! অমিতাভের মায়ের সহজ সস্নেহ ব্যবহার, অনাড়ম্বর অভিব্যক্তি সুহিতার সংক্ষুব্ধ মনে অনেকখানি শান্তি ঢেলে দিলে; বিক্ষিপ্ত উদ্বিগ্ন মনে বেশী কিছু তলিয়ে দেখবার শক্তিও ছিল না।

অনুষ্ঠান আচারে, বধূ দেখার তাড়াহুড়ায় সময় কোথা দিয়ে কেটে গেল। পুনর্ব্বার বরবধূ বিদায়ের পালা, আবার সেই যাত্রা করা। অবশেষে কোনমতে ট্রেনে উঠে তবে যেন সুহিতা নিঃশ্বাস ফেলার সময় পেলে; প্রচুর গোলমালের মাঝে তীক্ষ্ণ বাঁশী বাজিয়ে গাড়ী ছাড়ল। এতক্ষণে এবার একটু সুহিতা হাত পা ছড়াবার সময় পেলে।

এতক্ষণ ধরে বার-বার অমিতাভের আহ্বানটা শুনে কি একটা চেনা সুর সুহিতার মনে পড়ছিল যেন।...শীতের অলস মধ্যাহ্নে মায়াপুরের আলোছায়ার আল্‌পনা-আঁকা দীঘির ঘাটে বসে সে কতদিন দেখেছে ঘন নীল আকাশের আভা জলে ঠিকরে পড়েছে, নারিকেল সুপারি পাতা আলোয় ঝিলমিল করছে, এক টুকরো রূপোর মত মাছ লাফিয়ে উঠল, একটা মাছরাঙা প্রজাপতির মত ডানা কাঁপিয়ে জলের ঠিক উপরে ক্ষণেক উড়ে সজ্‌নের শাখে স্থির হয়ে বসল, তার গ্রীবার রক্তিম পালক আলোয় মাণিকের মত জ্বলে উঠল, একমুঠো মুক্তার মত সজ্‌নে ফুল জলে ঝরে পড়ল। দীঘির যে প্রান্ত মজে এসেছে সেখানে শেওলার মাঝে শারদলক্ষ্মীর চরণচিহ্ন দু-একটি শালুক এখনও ফোটে,—তাদের ঘিরে সেই যে কয়েকটি মৌমাছির গুঞ্জন কোন্ যেন ঘুমপুরী হ'তে ভেসে আসা কি যেন না বোঝা সুর,—অমিতাভ নামটা সেই সুরেই মনকে টানে না? বিবাহের পূর্ব্বে এ নামটা ত তাকে কেউ বলে নি! মনে হ'তে সুহিতার ওষ্ঠপুটে একটু হাসি জাগল,—কোন্ কথাটাই বা তাকে বলা হয়েছিল!..

জানালার কাছে মুখ রেখে বাহিরের অপসৃয়মান্ দৃশ্যপটের দিকে শান্তভাবে সুহিতা তাকিয়ে ছিল,—আরও কতদূর,—কোথায় গিয়ে যাত্রা তাদের শেষ হবে! চন্দ্রনাথ কেমন আছেন কে জানে! চন্দ্রনাথের কথা মনে হতেই তার চোখ ভিজে এল, জানালা থেকে মুখ ফিরিয়ে নিল। কক্ষে আরও দু-জন যাত্রী ছিল, তাদের সামনে অমিতাভ তার দিকে চেয়ে আছে দেখে অনভ্যাসে সুহিতা বিব্রত হয়ে উঠল। অমিতাভ বলল, 'দেশ ছেড়ে যেতে ভারি খারাপ লাগে, না? আমারও প্রতিবার মন খারাপ হয়ে যায়।' হেসে বলল, 'এবারে ছাড়া অবশ্য।'

অমিতাভের মনে একটা বিস্ময় থেকে থেকে জেগে উঠছিল, সে একদৃষ্টে সুহিতার পানে চেয়ে আত্মবিস্মৃত

হয়ে কি ভাবছিল। সুহিতাকে চাইতে দেখে বললে, 'উপবাসে আর গোলমালে মানুষের চোখও মানুষকে ঠকায়। কাল রাতের অন্ধকারে তোমার যা মুখ দেখেছি, আজ মনে হচ্ছে তার চেয়ে কত সুন্দর তুমি!' মানুষের চারি পাশের আবেষ্টন এমন ধাঁধা সৃষ্টি করে! নইলে কালকের নিশীথে দেখা সেই আড়ষ্ট বস্ত্রের পুঁটুলির মাঝে এই অগ্নিশিখার দৃপ্ত রূপ লুকিয়ে ছিল!...

সুহিতাকে নিদ্রাতুর দেখে অমিতাভ শয্যার বন্ধন মুক্ত ক'রে চর্ম্মাসনের উপর বিছিয়ে দিলে। সুহিতাকে বললে, 'একটু শুলে ভাল হ'ত, যা হৈ হৈ গেছে।'

এমন ভাবে অপরিচিত আবাসে নিদ্রা যেতে সুহিতা সম্পূর্ণ অনভ্যস্ত, অমিতাভ বললেও সে শুধু খানিকটা হেলান দিয়ে বসল।

গাড়ীর গতির দোলায় কখন সুহিতা গভীর নিদ্রায় মগ্ন হয়ে গেছল জানতেও পারে নি। পরদিন প্রভাতে ভোরের আলোর রঙীন অঙ্গুলি সারা দেহে ছড়িয়ে গিয়ে জাগিয়ে দিলে তাকে। তখনও অন্য সকলে ঘুমিয়ে। অমিতাভের শালটা নিজের গায়ে জড়ান দেখে সুহিতার কুণ্ঠা লাগল।—অমিতাভের উপাধানটাও তার পিঠের দিকে ঠেসিয়ে দেওয়া। পাশের চর্ম্মাসনে অমিতাভ বাহুর ওপর ললাট রেখে ঘুমিয়ে পড়েছে। একটি আলোর রেখা তির্য্যক্ ভঙ্গীতে তার মুখে এসে পড়েছে, বাতাসে কয়েক গুচ্ছ চুল উড়ছে। উদিতসূর্য্যের দীপ্ত আলোর মাঝ দিয়ে সুহিতা তাকিয়ে দেখল, কি সম্ভ্রম-ভরা সুন্দর মুখ এ!—এ মুখের দেখা কি সে পেয়েছে আগে? স্নানান্তে সিক্ত কেশে শুচিবস্ত্রে সে যখন শুভ্র শিবসুন্দরের পূজা করেছে তখনই কি এ মুখের ছবি তার অন্তরে অঙ্কিত হয়েছে? তাই কি অতি আপনার ব'লে মনে হয় এ মুখ? গোধূলির গেরুয়া আকাশ দিয়ে যখন বকের দল নীড়ে উড়ে গেছে, আমলকি বনের আড়াল দিয়ে চাঁদ দেখা দিয়েছে, তুলসীতলায় প্রদীপ-শিখাটি কেঁপে কেঁপে উঠেছে, তখন তার আপন-ভোলা মন কি এরই স্বপ্ন দেখেছে! গৃহপ্রত্যাগামী গো-দল সাথে রাখালের পুরবীর বাঁশী, দেবালয়ের বিলীয়মান ঘণ্টাধ্বনি, পল্লীবালার সন্ধ্যা-শঙ্খের মিলিয়ে যাওয়া স্বর তার মনে ত এরই আগমনী বাজিয়েছে! কতদিনের রঙ-বুলানো মনের আকাশে অমিতাভ কি আজ আলোর রূপে এল? এত দিনের ছন্দে বাঁধা চিত্তবীণায় এবার কি সে সুর জাগাল?...

অমিতাভ চোখ মেলে সুহিতা তার দিকে আছে দেখে হেসে উঠে বসল।

গৃহে পৌঁছলে দেশীয় দাসী ভৃত্যের হাসিমুখে সুহিতাকে অভ্যর্থনা ক'রে নামালে। তাদের ভাষা, তাদের দেশ সবই সুহিতার রহস্য-সুন্দর লাগছিল।

অমিতাভের ব্যস্ততার সীমা ছিল না, সুহিতাকে কোথায় বসাবে, কি করবে সে যেন ভেবেই পাচ্ছিল না। বেশীক্ষণ কাছে বসবার অবসরও নাই, অথচ কাছে পাওয়ার আগ্রহ অসীম। তার অতিরিক্ত ব্যগ্রতায় কুণ্ঠিত হলেও সুহিতা মনে মনে পুলক পাচ্ছিল। সারা দ্বিপ্রহরটা সে আপন মনে ঘুরে বেড়াল! আকাশের সীমাছোঁয়া তৃণবিরল মাঠ, কত দূরে নীলাভ একটা পাহাড়, তালীবনের মাঝ দিয়ে বিশীর্ণ নদীর বালুবক্ষে জলের রূপালি রেখা। এক দিকে ফুলের আগুন লাগা সরষে ক্ষেত, কপি ক্ষেতে গরু দিয়ে জল টেনে দেওয়া। সামনের উদাসী পথ আপন মনে কোথায় চলে গেছে, রঙীন শাড়ীপরা ঋজু-দেহা মেয়েদের সে পথে আনাগোনা, চলার তালে তাদের কোঁচার ফুল ফেঁপে উঠছে—সুহিতা বিস্ময়োজ্জ্বল নয়নে তাকিয়ে দেখছিল। তারই মাঝে এই অল্পকালের মধ্যে পাওয়া অমিতাভের অসীম অনুরাগের পরিচয়গুলি তার দেহ-মনকে পুলকিত ক'রে তুলছিল।

অমিতাভ সমস্ত দিন বাদে সেই মাত্র গৃহে ফিরেছে। সুহিতা তখন মৃদু সঙ্কোচ ও আগ্রহে তার কাছে ঘেঁষে দাঁড়িয়ে তার হাতে হাত দিয়ে পথ দেখছিল। হঠাৎ বলে উঠল, 'একি দাদা আসছেন যে!' উমানাথ উদ্যান-পথে জোরে হেঁটে আসছেন। অমিতাভ তাঁর পরিচয় পেয়ে বিস্মিত হয়ে তাঁকে এগিয়ে আনতে নেমে গেল।

সুহিতা শঙ্কায় পাংশু হয়ে গেল, চন্দ্রনাথ কেমন আছেন ভাবতেও তার সাহস হচ্ছিল না। উমানাথ প্রবেশ করতেই ভয়কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করল, 'বাবা কেমন আছেন?'

তার বিকৃত স্বরে উমানাথও একটু চমকে উঠেছিলেন, তারপর বলে উঠলেন, 'বাবা, ও বাবা, কতকটা সামলেছেন। ও অসুখ কি আর সারবে, কিন্তু তোমায় এখনই আমার সঙ্গে

লে আসতে হবে।' শেষের দিকে স্বরটা তাঁর ভয়ানক গম্ভীর মাদেশমূলক শোনাল।

অমিতাভ জিজ্ঞাসা করল, 'কেন?'

খেঁকিয়ে উঠে উমানাথ বললেন, 'কেন! এতক্ষণে জিগ্‌গেষ করার ফুরসৎ হ'ল, কেন! তোমার বিয়ে হয়েছে আমার াকার মেয়ে মালতীর সঙ্গে, তা কি জান না! ন্যাকা! আর ই স্থহিতা, আমার বোন, তার বিয়ে হয়েছে জগৎপুরের ুমারের সঙ্গে, এও কি তোমায় ব'লে দিতে হবে? বরক'নে বদায়ের সময় স্থহিতাকে ওরা ভুল ক'রে তোমার গাড়ীতে ুলে দিয়েছে আর মালতীকে দিয়েছে জমিদার-বাড়ির গাড়ীতে। তামার কলকাতার বাসায় তোমায় না পেয়ে বরাবর এখানে লে আসছি, আর কেন! এর উপর আর কিছু বলবার রকার আছে?'

স্থহিতা ও অমিতাভ দু-জনে বজ্রাহতের মত বিমূঢ় হয়ে াড়িয়ে রইল।

বিবাহ সম্বন্ধে অমিতাভ কতকগুলো নিজস্ব মতামত াড়েছিল। বন্ধুদের সঙ্গে মেয়ে দেখতে গিয়ে তাকে প্রশ্ন করার থা তার মনে অত্যন্ত বিরাগ জাগাত। এ-সম্বন্ধে কিছু বললে ন্ধুরা উত্তর দিত, 'বাঃ, যাকে বিয়ে করব তাকে দেখে শুনে নতে হবে না!' অমিতাভ বলত, মেয়েদের কি দেখে-শুনে নবার স্থযোগটা দিয়েছ? আগে ত মেয়েরাই হ'ত স্বয়ম্বরা, ঢুট ধনু ভাঙিয়ে, অসম্ভব লক্ষ্য বিঁধিয়ে শৌর্য্যবীর্য্য পরীক্ষা রিয়ে নিত,—বন অরণ্য সন্ধান ক'রে রণরথ পরিচালনা 'রে আপন ভাগ্য আপনি চিনে নিত। আর আজ!' ন্ধুরা বলত, 'আচ্ছা, দেখা যাবে নিজের বেলা কি কর।'

পণ নেব না বলেও প্রাণপণে শোষণ করা দেখে দেখে মিতাভ ভাবত, সে যদি বিয়ে করে, এমন ঘরে করবে াদের শোষণোপযোগী অবস্থাও নেই।

মালতীর সঙ্গে বিবাহের যখন সম্বন্ধ আসে, মাতার নিচ্ছাতেও সে রাজী হয়। মেয়ে দেখতে যাওয়া ইত্যাদি ম্বন্ধে প্রথম হতেই সে অসম্মতি জানিয়ে দিয়েছিল। এ কম না দেখেশুনে বিয়ে ক'রেও এমন বধূ হয়েছে দেখে মিতাভের মাতার আনন্দের শেষ ছিল না।

উমানাথ পুনরায় আরম্ভ করিলেন, 'যেখানে আমি না াকব সেখানেই অঘটন ঘটবে। নইলে এমন ভুলও হয়! এমন একটা লোক ছিল না যে, বর-কনেকে দেখে-শুনে বিদায় করে। বরপক্ষদের দোষ দেওয়া যায় না, তারা ত কনেদের চেনে না, তাছাড়া কনেরা ছিল ঘোমটায় ঢাকা, কিন্তু আমাদের বাড়ির লোকগুলা কি! যত সব অপদার্থ বাঁদরের দল!'

অমিতাভ স্থহিতার কাছে একটা আসন এগিয়ে দিয়ে জানালার ধারে সরে দাঁড়াল।

উমানাথ বললেন, 'আর সঙের মত দাঁড়িয়ে থেকে দেরি ক'রো না বলছি, চল। ওদিকে কত কাজ পড়ে রয়েছে। ওদের বুঝিয়ে হাতে কিছু বড় রকমের নগদ ধরে দিয়ে দেখি কি বলে। আমাদের সাধ্যমত চেষ্টা ত করতে হবে।'

এতক্ষণে স্থহিতা কথা বললে,—'আর মালতী?'

ওঃ, তাকে তারা সেই দিনই ফিরিয়ে দিয়ে গেছে। তখন থেকেই ত হৈ-চৈ স্থরু হয়েছে। মালতীকে অবিশ্যি আমরা এখানে পাঠাতে পারি যদি ওই অমরেশ না কি ওর নাম, তাকে নিতে রাজী হয়, আর না নেয় ত সে যেমন ছিল আমাদের কাছে তেমনি থাকবে আর কি। মেয়ে মানুষ,—খেতে পরতে পাবে, তার আবার দুঃখুটা কিসের। দরকার হ'লে একটা প্রায়শ্চিত্তটিত্ত করান যাবে না হয়।

পরাশ্রিতা মালতীর কুমারী নামটা ত ঘুচে গেছে, তাহলেই হ'ল। কিন্তু স্থহিতা, জমিদার-ঘরের একমাত্র মেয়ে, তার কথা স্বতন্ত্র। কত সন্ধানে এতবড় ঘরে বিয়ে দেওয়া গেল, তাকে সেখানে না পাঠাতে পারলে সবই বৃথা। সমাজপতিদের মস্তক যথেষ্ট পরিমাণে তৈলসিক্ত করলেই ব্যাপারটা অনেক মসৃণ হয়ে যাবে, বৈষয়িক উমানাথের সে কথা বুঝতে বিলম্ব হয় নি। তিনি বললেন, 'চল বেরই। যার হাতে তোমায় সম্প্রদান করা হয়েছে সে-ই তোমার স্বামী। এ-বাড়িতে থাকার তোমার ত অধিকার নেই।'

অমিতাভ দাঁড়িয়ে ভাবছিল লক্ষ্মীছাড়ার ভাগ্যে এমন লক্ষ্মীকে লাভ করা সম্ভব কি। তার এ দীন গৃহে লক্ষ্মীর স্বর্ণাসন কি প্রতিষ্ঠিত হয় কখনও! উমানাথের কথায় বিচলিত হয়ে বলে উঠল, 'তা বলবেন না, ওঁর উপযুক্ত ঘর আমার নেই, কিন্তু আমার এ সামান্যকে উনি নিজের ব'লে ভাবলে ভাগ্য ব'লে মানব।'

উমানাথ ধমকে উঠে বললেন, 'রাখো রাখো,—তোমার ও-সব নাকে-কাঁদা শিভালরি আমার ঢের শোনা আছে।'

তিনজনে নীরব। সব মিথ্যা, সুহিতার সব মিথ্যা। আবহমানকালের শুনে-আসা রীতি এমন ক'রে তার মিথ্যা হল! অতি-অপরিচিত অজানা একব্যক্তি এক সন্ধ্যার মন্ত্রবলে জন্মজন্মান্তরের নিকটতম হয়ে উঠবে এই চিরন্তন প্রথাকেই ত সে মেনে নিয়েছিল। তাই ত জীবনের এ নব-অধ্যায়ের অতিথিকে যখন সে চোখ মেলে দেখলে তখন এমন সহজে তাকে গ্রহণ করতে পারলে। তার কুমারী জীবনে যে পথিকের আগমন আশায় প্রদীপ জ্বলেছে, বিবাহের শুভলগ্নেই তাকে সে পাবে,—বিবাহের বরসজ্জায় যার আগমন সে-ই তার জন্মতোরণে হারিয়ে-যাওয়া জন অরণ্য হ'তে খুঁজে পাওয়া জন্মান্তরের পরিচিত,—এর মাঝে ত সংশয় জাগে নি! অমিতাভকে এই যে তার ভাল লাগা,—সে জেনেছে এটা হ'ল বিবাহের মন্ত্রশক্তির প্রভাবে। সে ধারণা এত ভ্রান্ত এত মিথ্যা হ'ল আজ! এমন ক'রে তাকে প্রতারিত করলে!—আচ্ছা—দশনে সে অধর দংশন করলে। প্রতারণাকে প্রতারিত করবে সে। তার হৃদয়ের নিভৃত কন্দরশায়ী দেবতা তাকে দিয়ে যার গলায় বরমাল্য পরিয়েছেন, তাকেই সে বরণ ক'রে নেবে,—আজন্মের সংস্কার, বিবাহের বাহ্য অনুষ্ঠান তার পক্ষে ব্যর্থ হোক্ গ্রাহ্য করবে না।...

উমানাথ ডাক দিলেন, 'চল না সুহিতা!'

—'আমি যাব না।'

বজ্র পড়লেও উমানাথ এত চমকে উঠতেন না। তড়াক্ ক'রে তিন হাত লাফিয়ে উঠে বললেন, 'কি!'

অমিতাভ বাইরের দিকে তাকিয়ে ছিল। বিদ্যুৎস্পৃষ্টের মত চমকে ফিরে সুহিতার মুখের দিকে চাইলে।

সুহিতা বললে, 'আমি যাব না।'

এতদিন সে সকল সংস্কারকে নির্ব্বিচারে মেনে এসেছে। আজ দেখেছে প্রতারণার রূঢ় আঘাত বুকে এসে বাজল। আজও কি তার নিজে পথ দেখে চলার সময় হ'ল না! এ নবজীবনের পথ তার জ্যোৎস্না-সরস হবে না নিশ্চয়,—রুদ্রের ললাটনেত্রের বহ্নির আলোয় যাত্রা তাদের সুরু,—আকাশে তার রঙের লীলা নাই বা রইল, মহাসন্ন্যাসীর বাঁধন-খসা জটার জটিলতা সেখানে দেখে সে ত ফিরবে না!—সে এরই মাঝে সত্যের সন্ধান পেয়েছে, সংস্কার কি আর তাকে বাঁধতে পারে!

বাক্‌শক্তি ফিরে পেয়ে উমানাথ গর্জ্জন ক'রে উঠলেন,—'কি বললে, আসবে না! জান ওর সঙ্গে তোমার বিয়ে হয় নি!'

সুহিতা মাথা হেলাল।

'কত বড় রাজবাড়িতে তোমার বিয়ে হয়েছে জান তুমি? তাদের নামে বাঘে-গরুতে এক ঘাটে জল খায়, জান?'

'দরকার নেই জানবার।'

'নাঃ, তা কেন দরকার থাকবে! শুধু ভুল ক'রে এই যে তোমার এখানে চলে আসা এতেই আমাদের কত মাথা হেঁট হয়েছে, কত গুণোগার লাগবে এ শোধরাতে, জান! আমাদেরই ত গরজ, ওদের আর কি! একটা ছেড়ে দশটা বিয়ে করতে পারে। এখনই চলে এস বলছি!'

'না।'

ওদের গরজ যদি এত সহজেই শেষ হয়ে থাকে, তার গরজও তবে শেষ হয়েছে। দুর্য্যোগনিশায় অন্ধকারের অপরিচয়ে একজনের সঙ্গে সুহিতা মন্ত্রের বন্ধনে আবদ্ধ হয়েছিল, তার পরদিন প্রাতে যার সাথে পরিচয়—তাকে নয়ন মেলে দেখে গ্রহণ ক'রে নিলে। এখন শোনে ভুল হয়েছে,—রাত্রের অন্ধকারে মন্ত্রের সম্বন্ধে সম্বন্ধ হ'ল যার সঙ্গে এ সে নয়! নাই হোক,—আজ অকুণ্ঠ আলোর আভায় যার সঙ্গে পরিচয়, তারই আবির্ভাব একান্ত সত্য সুহিতার জীবনে। রাত্রের অন্ধকারে মন্ত্রের পরিচয় দুঃস্বপ্নের মত মিথ্যা হয়ে গেছে এখন।...তাদের এই মিলনে সাহানার সুকোমল সুর বাজবে না, নিন্দা-অপবাদের রক্তিম ভৈরোঁ রাগে হবে তাদের পরিচয়। সমাজ তাকে এড়িয়ে যাবে। জন-অরণ্যে এই স্বেচ্ছাকৃত নির্ব্বাসন তাকে কাঁটার মত বিঁধবে। বিঁধুক তা।...

ক্রোধে কম্পিত হয়ে উমানাথ বললেন, 'না! বটে! তুমি রাজবধূ হ'তে চাও না, তুমি আমাদের ত্যাগ ক'রে, সমাজ ত্যাগ ক'রে এখানে এই স্বেচ্ছাচারে থাকতে চাও!'

অমিতাভের ললাট লাল হয়ে উঠল। সে নিজেকে সামলে রাখলে।

সুহিতা অতি সংক্ষেপে জবাব দিলে, 'আমি এইখানেই থাকব। আর কোথাও যাবার আমার উপায় নেই।'

কয়েক মুহূর্ত্ত বিমূঢ় থেকে উমানাথ চেঁচিয়ে উঠলেন, 'হবে না! মেয়েকে ধেড়েকেষ্ট ক'রে রাখবার ফল ফলবে না! তখনই আমি পই-পই ক'রে বাবাকে বলেছি,—এবার এই স্বাধীনা স্বেচ্ছাচারিণী মেয়েকে বাবা সামলান! ছিঃ ছিঃ, কি কেলেঙ্কারি! আমি কিচ্ছু জানি না!' তারপর সহসা স্বর কোমল ক'রে বললেন, 'লক্ষ্মী বোন সুহিতা, এখনও বলছি, চলে এস দিদি।'

'না দাদা।'

উমানাথ আবার জ্বলে উঠে বললেন, 'তোমার মুখদর্শনও পাপ! আমাদের কাছে আজ থেকে তুমি মরে গেলে। কখনও যেন তোমার মুখ দেখতে না হয়।'

ছোটখাট একটা ঘূর্ণীর মত ক্ষিপ্রভাবে উমানাথ বেরিয়ে গেলেন।

কক্ষ নিস্তব্ধ।

অমিতাভ এতক্ষণ নীরব হয়ে ছিল। তাহার ক্রোধের কোনো প্রকাশ শুধু সুহিতা থাকায় করতে পারে নি।

এগিয়ে এসে ধীরে বললে, 'সুহিতা, কিসের জন্যে সব ছাড়লে? সারাজীবন ঝড়ঝাপটে যুঝে চলতে পারবে কি?'

সুহিতা হীরের মত দীপ্ত দুটি চোখ অমিতাভের মুখের ওপর রাখলে। প্রলয় ঝঞ্ঝাকে সে ভয় করবে না, যিনি প্রলয়ঙ্কর তিনি যে তাকে পথ দেখালেন, রিক্ত হয়ে সে যাত্রী হ'ল,—এ যাত্রা কি ধ্রুব হবে না? আস্তে থেমে বলল, 'তুমি আমায় সাহায্য করবে? আমায় যে তুমি নিজের ক'রে নিয়েছ!'

অমিতাভ নত হয়ে বললে, 'এত বাধাকে জিতে তুমি আসবে, একি কখনও স্বপ্নেও ভাবতে পারতাম! তুমিই আমায় সাহায্যে হাত বাড়ালে সুহিতা,—কত দিনের কর্ম্মশুদ্ধির পর আমি পৌঁছাব তোমার কাছে সে কি বলতে পার?' সে তার বিস্ময়সম্ভ্রম-ভরা দুটি চোখ সুহিতার অনিন্দ্যসুন্দর মুখের ওপর রেখে স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে রইল।

তালীবনের ফাঁক দিয়ে অস্তসূর্য্যের শেষ রশ্মি তাদের ললাটে স্বর্ণচন্দন এঁকে দিয়ে চলে গেল।

কয়েক দিন পরে চন্দ্রনাথের একখানা চিঠি এল। তিনি সুহিতাকে লিখেছেন, '...আমরা গড়েছিলাম এক, বিধাতা তাকে এই ভুল দিয়ে ভেঙে গড়লেন অন্য; তুমি তাঁর এই নূতন গঠনকেই গ্রহণ ক'রে নিলে, লোকাচারের নিয়ম তুমি মানলে না, নিজের জীবন-পথ নিজে নির্ব্বাচন ক'রে নিলে। আমার কিছু বলবার মুখ নেই মা। তবে মানুষের আশীর্ব্বাদের যদি কোন অর্থ থাকে তাহলে আমার আশীর্ব্বাদ, যে-সত্যকে গ্রহণ করলে তাকে পালন করবার শক্তি যেন তোমাদের অটুট থাকে চিরদিন...।'

অসাংসারিক চন্দ্রনাথ কন্যাকে আশীর্ব্বাদ ক'রেই ক্ষান্ত হলেন। সাংসারিক উমানাথও ভগিনীর হিতৈষী ছিলেন। সুহিতাকে চিঠি লিখে তিনি জানিয়ে দিলেন কেমন ক'রে অমিতাভের সহিত তার মিলন আইনসঙ্গত বিবাহ হ'তে পারে।

কিন্তু মালতীর কি হবে?

ভারতীয় সাহিত্যে ভারতীয় সমাজের ছায়া

শ্রীঅনুরূপা দেবী

এই ভারতবর্ষে অতি প্রাচীন কাল হইতে বিদ্যা এবং জ্ঞানের চর্চ্চা ছিল। কি বৈদিক যুগে, কি বৌদ্ধযুগে, কি পৌরাণিক যুগে, এমন কি বৈদেশিক আক্রমণের যুগেও সে চর্চ্চা কোনদিনই একেবারে বন্ধ হইয়া যায় নাই।

বৈদিক যুগে এবং তৎপরবর্ত্তী যুগ-সকলে বেদ সঙ্কলিত, উপনিষদসমূহ প্রচারিত, এবং অষ্টাদশপুরাণ, রামায়ণ, মহাভারত, ষড়দর্শন অর্থাৎ ন্যায়, বৈশেষিক, মীমাংসা, সাংখ্য, যোগ ও বেদান্ত, বৌদ্ধদর্শনসকল, ব্যাকরণ, জ্যোতিষ, গণিত এবং শ্রীমদভগবদ গীতা ও ধর্ম্মশাস্ত্র, নীতিশাস্ত্র, তন্ত্রশাস্ত্র, ও বহু কাব্য মহাকাব্য নাটক ও নাটিকার উৎপত্তি।

বৈদিক পুরোহিত যখন "স্বর্গকাম যজেত:" এই উপদেশ প্রদানে সংসারীর মায়ামোহ পাশবদ্ধ অলস চিত্তকে অহরহঃ ইহলৌকিক আনন্দবিলাস হইতে কথঞ্চিৎ সংযত, সাগ্রহ এবং উর্দ্ধলোকাশ্রয়ী করিতে সচেষ্ট ছিলেন, তখন আর একদিকে কাণ্ডত্রয়াত্মক বেদের কর্ম্মকাণ্ডের বৈপরীত্যে জ্ঞানকাণ্ডের প্রচার অধিকারীভেদে যোগ্যপাত্রে প্রচলিত হইয়া গিয়াছিল। কোথাও যাগযজ্ঞ ক্রিয়াবহুল কর্ম্মকাণ্ডের, কোথাও ধ্যান-যোগাশ্রিত এবং সমাধিজ্ঞানগম্যবিজ্ঞানবহুল জ্ঞানকাণ্ডের প্রচলন একই সঙ্গে জাহ্নবী-যমুনা ধারার মতই ভারতের পুণ্যবক্ষে প্রবাহিত হইতেছিল। ভারতের নবীন সাহিত্য তপোবনের তরুচ্ছায়ায় প্রবর্দ্ধিত হইয়া উঠিতেছিল। হিংসাদ্বেষবিবর্জ্জিত শান্তরসাস্পদ বনভূমিতে সহস্র সহস্র শিষ্য-পরিবৃত তপঃস্বাধ্যায়নিরত জীবন্মুক্ত মহামুনি তাঁহার নিগূঢ় সাধনালব্ধ নির্ব্যূঢ় আত্মানন্দে বিভোরচিত্তে বলিয়া উঠিতেছিলেন,—

"বেদাহমেতম্ পুরুষং মহান্তম্ আদিত্যবর্ণম্ তমসপরস্তাৎ।"

যে মহত্তত্ত্বকে মহাজনেরা গুহানিহিত বলিয়াছেন, সেই গহনগুহার যাত্রাপথকে দুর্গমপথস্তৎ বলিয়া সাবধান করিতে পরাঙ্মুখ হন নাই,—সে এই তত্ত্ব। আর সেই গভীর গুহানিহিত নিগূঢ় তত্ত্ববার্ত্তাকে প্রাচীন ভারতের ঋষিগণ তাঁহাদের সুগভীর ধ্যানযোগে এবং সুকঠিন জ্ঞানযোগে আয়ত্ত করিয়া শুধু আত্মগত করেন নাই, তাঁহাদের গভীরতর মানব-প্রেমের সুমহৎ নিদর্শনস্বরূপে তাহা মানবজীবনের চরমোৎকর্ষ সাধনোদ্দেশ্যে ভারতীয় সাহিত্যে প্রদান করিয়া বলিয়াছেন,—"যস্তদবেদ সবেদসর্ব্বম্"। সেই তত্ত্ব এমনই যে, যে তাহা জানিয়াছে সে সব কিছুই পরিজ্ঞাত হইয়া গিয়াছে। সেই অচিন্ত্যকে অব্যক্তকে অপরিজ্ঞাতকে জ্ঞানগম্য করিয়া লইয়া সর্ব্বজনকল্যাণকামী ভারতীয় ঋষি গভীরচ্ছন্দে বলিয়াছেন—"বেদাহমেতম্!" আমি জানিয়াছি! কাহাকে? "পুরুষং মহান্তম।" তিনি কিরূপ? "আদিত্যবর্ণং তমসঃ পরস্তাৎ"। এই পুরুষ অবিদ্যাতিমিরের পরপারস্থ ব্রহ্মধামে জ্যোতির্ম্ময় ব্রহ্মরূপে অবস্থিত *ইহা আমি জানি।* তাঁহাকে জানিলে কি হয়?

"তমেব বিদিত্বাতিমৃত্যুমেতি
নান্যঃপন্থাঃ বিদ্যতে হয়নায়।"

তাঁহাকে জানিলে জীব মহামৃত্যু হইতে মুক্তিলাভ করিতে পারে। ইহা ব্যতীত পরম পদলাভ করার আর দ্বিতীয় উপায় নাই।

এই স্নিগ্ধ স্থির জ্যোতি আমাদের প্রাচীন সাহিত্যকে আলোকিত করিতে থাকিয়া জগতের তমোহন্তারূপে তাহাকে বিশ্বসাহিত্যে গৌরবাসন প্রদান করিয়া রাখিয়াছে। শুধু তত্ত্বের দিক দিয়া নহে, ভাষা ও ছন্দের দিক দিয়াও সর্ব্বাঙ্গীন-ভাবেই এক একটি উপনিষদ যেন এক একটি অমূল্য রত্নমঞ্জুষা।

তারপর দেখা দিল পুরাণের যুগ। সাল তারিখ লইয়া বিচার করিতে গেলে ইহাদের রচনাকাল সম্বন্ধে বিস্তর মতভেদ দেখা দিবে। সমস্ত উপনিষদ একই সময়ে লিখিত হয় নাই। পুরাণসমূহও একই সময়ে অথবা ধারাবাহিকভাবে লিখিত বা সংগৃহীত হয় নাই। আমরা সাধারণভাবে শুধু একটা কালের বিভাগ করিয়া লইয়া সাহিত্যের কথাই

বলিব। বাংলায় একটি প্রচলিত কথা আছে—"যাহা নাই ভারতে (মহাভারতে), তাহা নাই ভারতে।" আমাদের মহাভারতখানি জ্ঞানের একটি মূর্ত্ত প্রতীক। বস্তুতঃ, যদি অবহিতচিত্তে সমগ্র মহাভারতখানি পাঠ করিতে পারা যায় তবে দেখা যাইবে যে ভীষ্মনীতি, শ্রীমদ্‌ভগবদ্‌গীতা, যুধিষ্ঠির ও বকরূপী ধর্ম্মসংবাদসমেত সমস্ত মহাভারতে যাহা আছে তাহা অতুলনীয়। গীতার মধ্যে সমস্ত বেদ বেদান্ত এবং যড়দর্শনের সার সংগৃহীত।

ভারতীয় ঋষিগণের রচনার অনন্যসাধারণ বৈশিষ্ট্য যেমন পুলকিত করে তেমনি বিস্মিত করে। এত বড় বড় কঠিন বিষয়সমূহকে এমন সুললিত শ্রুতিসুখকর সহজউচ্চার্য্য শব্দমালায় বিভূষিত এবং শ্লোকচ্ছন্দে গ্রন্থন করা যেন ভগবতী ভারতীর সাক্ষাৎ বরপুত্র ব্যতীত অন্যের দ্বারা সম্ভবপর মনে হয় না। অথবা স্বয়ং বাণীর হাতের বীণারই যেন এ সব কলঝঙ্কার!

যে মহত্তম চিত্রাবলী রামায়ণ মহাকাব্যে প্রদর্শিত হইয়াছে, মনে হয় যে-কোন দেশে এমন একখানি মাত্র মহাকাব্যের উদ্ভব হইলে সে-দেশের সাহিত্যসাধনা সফল বিবেচিত হইতে পারে। ইহা যুগযুগান্তরেও অমরত্বলাভের অধিকারী। ইহা একখানি চরিত্রপঞ্জিকা। সতীর আদর্শ, সতী পতির আদর্শ, সৌভ্রাত্রের আদর্শ, শক্তিমত্তার আদর্শ এবং সর্ব্বোপরি রাজার আদর্শ ইহাতে সহস্রদল পদ্মের মতই প্রস্ফুটিত হইয়া উঠিয়াছে। ইহার প্রত্যেক দলটিই যেন আর একটির মতই নেত্রশোভাকর, সুগন্ধে ভরপুর।

বস্তুতঃ, সত্যানুসন্ধান করিয়া দেখিলে স্বীকার করা অনিবার্য্য যে, আমাদের দেশে কি জীবনে, কি সাহিত্যে রামায়ণকে এখনও পর্য্যন্ত কেহই সম্পূর্ণরূপে অতিক্রম করিয়া যাইতে সমর্থ হয় নাই। আজও বাংলা-সাহিত্যের তেজস্বিনী সতীচিত্রে সতীকুলরাণী সীতাদেবীর ছায়াপাত অলক্ষ্যেই হইয়া থাকে; সৌভ্রাত্রের তুলনা আজিও সেই লক্ষ্মণে, কুমন্ত্রণায় কুঁজি এবং বিমাতার বিসদৃশ ব্যবহারে কৈকেয়ী আজিও দৃষ্টান্তস্থল হইয়া আছেন। আজ শুধু নাই সেই সকল আদর্শের প্রধান আদর্শ রাজাধিরাজ শ্রীরামচন্দ্র।

কেহ কেহ বলিয়া থাকেন, রামায়ণ ইতিহাস নহে, উহা একটি মহাকাব্য মাত্র; রামায়ণের বর্ণিত চরিত্রসমূহ বাস্তব-জগতের প্রাণী নহেন, কবির কল্পনার মধ্যেই উঁহাদের জন্মকর্ম্ম। কিন্তু এত বড় উচ্চ আদর্শ, এমন পরিপূর্ণ সমাজের চিত্র, কবি পান কোথায়? কল্পনা করেন কেমন করিয়া? কল্পনা কি কখন সম্পূর্ণ মিথ্যার উপর প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে? "ইহৈব নরকস্বর্গঃ," ইহাই সাহিত্যে পরম সত্য।

তখনকার আর্য্যসমাজে সত্যসন্ধ দশরথ যিনি প্রাণ দিয়াও স্বমুখোচ্চারিত একটি বাণী রক্ষা করেন, সত্যবাদী যুধিষ্ঠির যিনি জীবনের সর্ব্বাপেক্ষা কঠিন সমস্যার মধ্যে নিপতিত হইয়াও সত্য পরিহার করেন নাই, সতীশ্রেষ্ঠা সাবিত্রী যিনি অত্যল্পমাত্রজীবী জানিয়াও পতিভাবে দৃষ্ট অরণ্যবাসী দরিদ্রকে বরণ করিতে কুণ্ঠিতা নহেন, এমনই সব উচ্চ আদর্শের সহিত ঘনিষ্ঠ পরিচয়ে পরিচিত না হইলে কবি কি কখনও তাঁর কাব্যগ্রন্থে অমন সুনিপুণভাবে তাঁহাদের চিত্রগুলি আঁকিয়া তুলিতে পারিতেন?—যে চিত্রাবলী সহস্র সহস্র বর্ষের ঝঞ্ঝাময় সমাজধর্ম্ম রাষ্ট্রপরিবর্ত্তনের মধ্যেও আজ পর্য্যন্ত ম্লানায়মান হয় নাই, হইতে জানে না, হইতে পারে না। যদি রামায়ণের মূলে ঐতিহাসিক সত্য না-ই থাকে, তবে সে কবি আরও কত বড়; আরও কতখানি ভূয়োদর্শন এবং সূক্ষ্মদৃষ্টিযুক্ত, কি অপূর্ব্ব ঐন্দ্রজালিক শক্তিসম্পন্নই না তাঁহার লেখনী!

শিল্প ও সাহিত্য সকল দেশেরই জাতীয় ইতিহাস। ইতিহাসের মধ্য দিয়া যে ঐতিহাসিক বৃত্তান্ত পাওয়া যায়, শিল্প এবং সাহিত্যের মধ্য দিয়া তাহার সর্ব্বাঙ্গীন পূর্ণ রূপটি নিখুঁতভাবে ফুটিয়া উঠে। এদেশের ধারাবাহিক লিখিত ইতিহাস না মিলিলেও শিল্প এবং সাহিত্যের ভিতর দিয়া তাহার উত্থান ও পতনের উন্নতি অবনতির, বেশ একটি সামঞ্জস্যপূর্ণ ধারাবাহিকতা খুঁজিয়া পাওয়া যায়। যখন বহির্দৃষ্টি অপেক্ষা অন্তর্দৃষ্টি ভারতে প্রবল ছিল তখন ভাস্কর্য্যের মধ্য দিয়া তাহার ধ্যানের প্রতিমায় ধ্যানীযোগীর নাসাগ্রবদ্ধ দৃষ্টি সৌম্যশান্ত সমাধিমগ্নভাবটি অতি সুন্দররূপে ফুটিয়া উঠিয়াছিল। যখন হইতে ভারত যোগভ্রষ্ট হইল, তাহার সেই দুর্দ্দশার পরিচয় সুস্পষ্ট হইয়া উঠিতে লাগিল তাহার শিল্পে, তাহার সাহিত্যে। ক্রমশঃই বাহ্যাড়ম্বর বাড়িতে লাগিল, ধ্যানদৃষ্টি ফুরাইয়া গেল। বৌদ্ধযুগ ভারতেতিহাসে উন্নতির মহাযুগ। বস্তুতঃ, এ সময়ে ভারতে শিল্পোন্নতির যে চরমোৎকর্ষ সাধিত হইয়াছিল তাহা ইতিহাসজ্ঞ পাঠকমাত্রেই অবগত আছেন। অজন্টা, বোধগয়া, সাঁচি এবং সারনাথের ধ্বংসাবশেষ

আজিও তাহার সাক্ষ্যপ্রদান করিতেছে। এই সময়ে সাহিত্যেও প্রভূত উন্নতিসাধন ঘটিয়াছিল। বন্যা আসিলে যেমন গ্রীষ্মের শীর্ণা নদী পরম বেগবতী হইয়া দুই কূলকে বহুদূর অবধি প্লাবিত করে, এই নবধর্ম্মের বন্যাতেও ভারতীয় জীবনধারা যেন নূতন শক্তিবলে সঞ্জীবিত হইয়া ভারতে এবং ভারতের বাহিরে বহু দূরদূরান্তরাবধি ধর্ম্মে, নীতিতে, সাহিত্যে ও শিল্পে একেবারে ইন্দ্রজালের মতই কার্য্য করিল। দর্শনবিজ্ঞানে প্রভূত উন্নতির সহিত সাধারণ সাহিত্যে, অর্থাৎ কাব্য নাট্যাদিতে যে অভূতপূর্ব্ব উন্নতি হইয়াছিল, সত্যই তাহার তুলনা নাই। বৌদ্ধধর্ম্ম সাধারণের ধর্ম্ম, সঙ্ঘের ধর্ম্ম তাই এ সময়ের অনেক গ্রন্থই তৎকাল প্রচলিত কথ্যভাষায় বিরচিত; বৌদ্ধ শাস্ত্রগ্রন্থের মধ্যে বিনয়পিটক, সূত্র পিটক এবং অভিধর্ম্ম পালিভাষায় লিখিত; কিন্তু কণিষ্কের সময় হইতে মহাযানী বৌদ্ধগণের গ্রন্থসমূহ সংস্কৃত ভাষায় বিরিচিত হইতে আরম্ভ হয়। মহাকবি কালিদাসের অমর গ্রন্থাবলী এই যুগেই লিখিত। ভাস, শূদ্রক, শ্রীহর্ষ, বাণভট্ট, ভবভূতি প্রমুখ কবির অতুলনীয় কাব্যনাট্যাদির উদ্ভব এই স্মরণীয় যুগেই। তদ্ভিন্ন ব্রহ্মগুপ্ত, বরাহমিহির, আর্য্যভট্ট, ভট্টোৎপল প্রমুখ বহু মনীষী এই সময়ে ফলিতজ্যোতিষ, গণিত ইত্যাদির প্রভূত উন্নতি বিধান করেন।

ফলতঃ, বৌদ্ধযুগ ভারতীয় শিল্প-সাহিত্যের গৌরবোজ্জ্বলতম যুগ। এই যুগটিকে ভারতেতিহাসের সুবর্ণময় যুগ বলিলেও অত্যুক্তি করা হয় না। এই সময় জনসাধারণের জ্ঞানচর্চ্চার অধিকার স্বীকৃত হওয়ায় অসংখ্য বিদ্বান্-বিদুষীর অভ্যুদয় ঘটিয়াছিল। এই সময়ে বিরচিত বিখ্যাত গ্রন্থসমূহ আমরা তৎকালীন সমাজের রাষ্ট্রের কৃষ্টির নানা তথ্য সংগ্রহ করিতে সমর্থ হই। আমরা দেখিতে পাই যে ভাসের নাটকগুলিতে চরিত্রসৃষ্টির অদ্ভুত বৈচিত্র্য, ভাষাসৌকর্য্য এবং রচনার কৃতিত্ব উচ্চদরের হইলেও কালিদাসের চরিত্রগুলি যেন অধিকতর প্রাণবন্ত। আর্য্য-ভারতীয় সমাজ কালিদাসের সময়ে যে তার চরম পরিণতিতে উন্নীত হইয়াছিল তাহা উক্ত মহাকবির কাব্য নাট্য হইতে জানা যায়। তাঁহার দুষ্মন্ত কালের রীতিতে বহুপত্নীক হইলেও পত্নীদিগকে অসম্মান করেন না; আশ্রমবাসীদিগের প্রতি তিনি শ্রদ্ধাপূর্ণ; বীরত্বে বাসববিজয়ী দৈত্যদিগের তিনি নিহন্তা। অন্যায়রূপে পরিত্যক্তা তেজস্বিনী সতী সর্ব্বসমক্ষে পতিকে কঠোর তিরস্কারে বিদ্ধ করিতে দ্বিধাহীনা হইলেও একবেণীধরা ব্রহ্মচারিণীরূপে তাঁহারই চিন্তায় জীবনাতিপাত করিয়া নশ্বর জীবনের ভঙ্গুর সুখবিলাসকে তুচ্ছাদপি তুচ্ছ এবং পবিত্রতা ও সংযমই যে জীবনের শ্রেষ্ঠ সম্পদ তাহা প্রমাণ করিতেন। কুমারসম্ভবের কিশোরী উমা তাঁহার পিতৃগৃহের সুখসম্পদ ঠেলিয়া ফেলিয়া যে নির্ম্মম পুরুষ তাঁহাকে প্রত্যাখ্যান করিতে দ্বিধা বোধ করেন নাই, তাঁহারই লাভাশায় কঠোর কৃচ্ছ সাধ্য তপশ্চরণ করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন, অনাদরের প্রতিশোধ লওয়ার সহজসাধ্য কোন পথই খুঁজিয়া দেখেন নাই। এই কালিদাসে অশ্লীলতার আরোপ করিয়া আধুনিক তরুণ সাহিত্যের সমর্থকগণ আত্মপ্রবঞ্চনা করিতে কুণ্ঠিত হন না। তাঁহারা ভুলিয়া যান, ভাবের অশ্লীলতা ভাষার অশ্লীলতা হইতে সহস্রগুণে দোষাবহ এবং ভয়াবহ। ভাষা নিয়ত পরিবর্ত্তনশীল, কিন্তু মানবসভ্যতার মূল নীতিগুলি সনাতন। যেখানে তাহার ব্যতিক্রম ঘটিতেছে, সেগুলি সযত্নে সংশোধিত হওয়া প্রয়োজন; সমূলে উচ্ছেদ তাহার প্রতিষেধক নহে। একনিষ্ঠ প্রেমের সমুজ্জ্বল দৃষ্টান্ত ভারত-সতীদের জীবনাদর্শ হইতে কবি ও নাট্যকারেরা পুনঃ পুনঃই প্রদর্শন করিয়া থাকেন। সাহিত্য সমাজেরই দর্পণ।

আবার ধর্ম্মের বাণ ডাকিল। কুমারিল শঙ্করের আবির্ভাবে ভারতের ধর্ম্মক্ষেত্রে আবার যুগান্তর দেখা দিল। ঘটনাবহুল ঘাতপ্রতিঘাতময় একটি নবীন যুগের অভ্যুদয় ঘটিল। বৌদ্ধধর্ম্মের খাঁটি সোনায় সে দিনে খাদের মাত্রাধিক্য হইয়াছিল। ধর্ম্মের গ্লানি যিনি সহিতে পারেন না তাঁহার ইচ্ছা পরিপূর্ণ হইয়াছিল। অনাচারী, কদাচারী বৌদ্ধ তান্ত্রিক-গণকে নিরসনপূর্ব্বক পুনরায় ত্যাগ সংযমপূত যতি ব্রহ্মচারী সন্ন্যাসীর দল মোহমুদ্গরের ভাবগভীর শ্লোকচ্ছন্দে ভারতের গগনপবন প্রতিধ্বনিত করিয়া আসমুদ্র হিমাচলে শঙ্করের বেদান্তবাদ সুপ্রতিষ্ঠিত করিলেন। ভারতের চারিপ্রান্তে চারিটি বিখ্যাত ধর্ম্মমঠ সংস্থাপিত হইল। সংযতচরিত্র সন্ন্যাসধর্ম্মী সুপণ্ডিত বৈদান্তিকগণ ভ্রষ্টাচারী বৌদ্ধসঙ্ঘের পরাভব ও সনাতন ধর্ম্মসঙ্ঘের প্রতিষ্ঠার সহায়তা করিতে লাগিলেন। বৈদিক ধর্ম্মের প্রাচীন ভিত্তির উপর বৌদ্ধ ধর্ম্মের কাঠামো এবারের এই নবধর্ম্ম নূতন তেজে প্রতিষ্ঠিত হইল। নূতন ধর্ম্মের অর্জ্জিত সত্য এবং সারাংশ পুরাতনে মিলিয়া একীভূত হইল। এমনই করিয়া সমস্ত

নদ নদী আসিয়া মহাসাগরে মিলিত হয়। যাগযজ্ঞবহুল বৈদিকধর্ম্ম সাধারণের সহজগম্য ছিল না। ভারতীয় সাহিত্যের পুষ্টিসাধনোদ্দেশ্যে জনকয়েক বৈদিক দেবতা স্থলে ক্রমে ক্রমে তেত্রিশ কোটির আবির্ভাব হইতে লাগিল। আর একদিকে স্বল্পপ্রচার উপনিষদকে সুপরিচিত করিয়া তুলিল শঙ্করের বেদান্ত। এইরূপে এ যুগে ধর্ম্মশাস্ত্রের বিশেষ রূপেই সংস্কার এবং সংযোজনা হইল। মাহিষ্মতী নগরীর নব নালন্দায় দশসহস্র শিষ্যসহ প্রথম বৌদ্ধ নিরসনকারী ভট্টপাদ কুমারিল বেদাধ্যয়নে ও ভাষ্যবার্ত্তিক রচনায় ব্যাপৃত। সারা ভারতেই তর্কবিতর্কের খরতর স্রোত প্রবাহিত। ফলে নবনবোন্মেষণী শক্তির বিকাশ পূর্ণতর হইয়া উঠিতেছে। কোথাও 'সোহম' কোথাও 'শিবোহম্' এই ভাবধারায় মানুষ নিজের তুচ্ছতা এবং ক্ষুদ্রতা ভুলিয়া গেল; অনেক নরদেবতার আবির্ভাব ঘটিল। শঙ্কর এবং শঙ্কর-শিষ্যগণের হস্তে বহু অতুলনীয় গ্রন্থমালা বিরচিত হইয়া ভারতসাহিত্য রত্নভাণ্ডারের গৌরববর্দ্ধন করিতে লাগিল।

তারপর কত যুগ আসিল, যুগান্তর গত হইল। কালচক্র ঘুরিয়া গেল। ভারতের সর্ব্বনাশের দিন সমীপবর্ত্তী হইতে লাগিল। যে শক্তিমত্তার বলে দুর্দ্ধর্ষ শক হূণ বিতাড়িত হইয়াছিল, সে শক্তি আর নাই। গেল কিসে?—অনৈক্যে। যে আভ্যন্তরিক তেজে বর্ব্বর শক হূণ জাতি ভারতীয় সভ্যতায় অনুপ্রাণিত হইয়া বিশাল হিন্দুসমাজ-শরীরে অনুপ্রবিষ্ট হইয়া তাহার বল বৃদ্ধি করিয়াছিল, সে তেজ সমাজের আজ কোথায়? ব্রাহ্মণের ব্রহ্মতেজ, ক্ষত্রিয়ের ক্ষাত্রশক্তি, বৈশ্যের সেই পৃথিবী প্রতিযোগিতা, শূদ্রের সেই নব নব শক্তি ও উদ্যম ক্ষীণ হইতে আরম্ভ করিয়াছে।

বৈদেশিক শাসন আরম্ভ হইল। জাতীয় অধীনতার এই প্রারম্ভের যুগে উল্লেখযোগ্য এমন কোন সাহিত্য সৃষ্টির দেখা পাওয়া যায় না, যাহা লইয়া মন স্বতঃই গর্ব্বানুভব করিতে পারে। বহুধাবিভক্ত ভারতীয় সমাজ অন্তর্বিদ্রোহে তখন জর্জ্জর; বৈদেশিক আক্রমণে বিপন্ন, বিব্রত; অনৈক্যে উদাসীন; আদর্শ খর্ব্বাকৃত; আশয় হীনতাগ্রস্ত। উন্নত সাহিত্যসৃষ্টির এ-সকল পারিপার্শ্বিক অবস্থা নয়। এমন দুর্দ্দিনের অন্ধকার মাথায় বহিয়া বড় জিনিষ উঠিতে পারে না, ছোটখাট অনেক কিছু জন্মিতে পারে, বনস্পতির পাদমূলে লতাগুল্মের মত দু-দিন দশ দিন অবস্থিতি করে, কোনটায় ফুলও ফোটে, কচিৎ একটায় ফলও ফলে; দু-একটা স্থায়ী হয়, বাকীগুলি শুকাইয়া শেষ হইয়া যায়। কালের সহিত আপোশ করিয়া বাঁচিয়া থাকার মত প্রাণশক্তি তাহাদের বড় বেশী থাকে না। তথাপি উর্ব্বরক্ষেত্রের গুণে অযত্নসিঞ্চিত বীজ হইতে দু-একটি কখন কখন হয়ত বা ফলদানকারী মহীরুহ রূপ ধারণ করিয়া বসে!

পাঠান-যুগে এবং মোগল-যুগে সাহিত্যের ধারা পরিবর্ত্তিত হইয়া গিয়াছিল দেখা যায়। মৌলিক রচনার শক্তি ক্ষয়প্রাপ্ত হইয়াছে অথবা হ্রাস পাইয়াছে; তথাপি নিত্যপ্রয়োজনীয় সাহিত্যসৃষ্টির বিরাম নাই, যদিও উহা টীকাটিপ্পনী-নিবন্ধাদিতেই পর্য্যবসিত হইতেছিল। কালিদাস আর জন্মেন না, কিন্তু মল্লিনাথের উদ্ভব ঘটে। বিদ্বানের অভ্যুদয় এদেশে স্বতঃসিদ্ধ, স্থানকাল সামান্য অনুকূল হইলেই সরস্বতীর বরপুত্রগণের আবির্ভাব হয়। বাচস্পতি মিশ্রের ষড়দর্শনের টীকা, বিজ্ঞানভিক্ষুর সাংখ্যদর্শনের টীকা, মাধবাচার্য্যের (সায়ণমাধবের) বেদ ও পূর্ব্বমীমাংসা ব্যাখ্যা, আবার বিদ্যারণ্যস্বামীরূপে তাঁহারই বিখ্যাত বেদান্তগ্রহ পঞ্চদশী, মেধাতিথি ও কুল্লুক-ভট্টের মনুটীকা, বিজ্ঞানেশ্বর এবং জীমূতবাহনকৃত বর্ত্তমান হিন্দুআইনের মূলভিত্তি মিতাক্ষরা এবং দায়ভাগ এই সকল সময়েই বিরচিত হইয়া ভারতীয় সমাজ ও সাহিত্যের বহু কল্যাণ সাধন করিতেছে। বিজাতীয় অধীনতার ঘোর দুর্দ্দিনে জাতীয় অবনতির ভয়াবহ অবস্থা হইতে আত্মরক্ষার্থ তখন বিশেষভাবে ধর্ম্মব্যাখ্যার এবং চারিদিক দিয়া বাঁধন কষিবার প্রয়োজন ছিল, নতুবা জাতিভেদহীন বৌদ্ধাদির মতই কোটি কোটি নরনারী বিধর্ম্ম অবলম্বন করিয়া আজ হয়ত তাহাদের সভ্যতা ও সাহিত্যকে প্রত্নতাত্ত্বিকের গবেষণার উপাদানমাত্র করিয়া রাখিত। কিন্তু যে আভ্যন্তরিক আনন্দে ও উৎসাহে মানুষের স্বাধীনচিত্ত বিস্তৃত-পক্ষ উর্দ্ধাকাশের পাখীর মত কল্পনার অত্যুন্নত কল্পলোকে ছুটিয়া যায়, জীবনের পরিপূর্ণ রসলোক হইতে অজস্র অমৃত রস আহরণ করে, উদারতার উচ্চস্বরে মনের বীণা বাঁধিয়া লইয়া নিত্যনূতন আনন্দের তান আপনি শোনে, পরকে শুনায়, নূতন সৃষ্টির নব নব উপাদান যোগান দেয়,

বর্ষামঙ্গল

শ্রীঅমর দাসগুপ্ত

প্রবাসী প্রেস, কলিকাতা

সে রকম আনন্দের এবং উৎসাহের সে দিনে অবকাশ কোথায়? বিহারে ও বিদ্যালয়ে, মঠে ও মন্দিরে সেদিনে শুধু সতর্ক সাধনায় আত্মরক্ষার উপায় সন্ধান ও বিধান চলিতেছিল। ভারতীয় সাহিত্য সেদিনেও কিছু কম লাভ করে নাই। মানুষের জীবনে যেমন সমাজের জীবনেও তেমনই হাসির সহিত অশ্রুর পরিচয়েরও আবশ্যক থাকে। নিছক আনন্দবিলাসের মধ্যে কোন মানুষ অথবা কোন জাতি গড়িয়া উঠিতে পারে না। তাহাকে সম্পদের ধর্ম্ম, আপদ্ধর্ম্ম দুই-ই শিক্ষা করিতে হয়। চরম দুঃখই তাহাকে একমাত্র পরম পরিণতি প্রদান করিতে পারে। তখনও সেদিন আসে নাই, আজও তার সেই দুঃখের সাধনাই চলিতেছে।

সাহিত্য বলিতে আমরা আজিকার দিনে সাধারণতঃ যাহা বুঝি তাহাতে, অর্থাৎ কাব্যনাট্যাদিতে তখন প্রাদেশিকতা দেখা দিয়াছে। প্রাচীন বাংলা সাহিত্যে আমরা প্রথমেই ডাকের বচন, মাণিকচাদের ও গোপীচাঁদের গীত, শূন্যপুরাণ, ধর্ম্মপুরাণ ও ধর্ম্মমঙ্গল প্রভৃতি বৌদ্ধপ্রভাবান্বিত এবং প্রসিদ্ধ পাল-বংশের সংশ্লিষ্ট রচনাবলীর দেখা পাই। চৈতন্য-চরিতামৃত হইতে জানা যায়, মহাপ্রভুর আবির্ভাবের পূর্ব্বে বাংলার জনসাধারণ পাল-রাজগণের কীর্ত্তিগাথাই গান করিত। ইহা হইতে বুঝা যায় যে বঙ্গদেশে সে সময়ে ব্রাহ্মণ্য প্রভাব স্থাপিত হইলেও তথায় ধর্ম্মসম্প্রদায়ভুক্ত মহাযানী বৌদ্ধাচার্য্যদিগের প্রভাব বহুকাল যাবৎ প্রবল রহিয়া গিয়াছিল। জনসাধারণের মতিগতি ফিরাইবার জন্য, অথবা জীবনযাত্রার সুবিধার্থ, কি জন্য বলা যায় না, অনেক ব্রাহ্মণ ক্রমশঃ বৌদ্ধের 'ধর্ম্ম'কে হিন্দুসমাজের উপযোগীভাবে ধর্ম্মঠাকুরে পরিবর্ত্তিত করিয়া লইয়াছিলেন। ইঁহারা ধর্ম্মের গান রচিয়া ধর্ম্মের পালা গাহিতে আরম্ভ করিয়া দেন, ধর্ম্মের গাজনও চলিতে থাকে। ঘনশ্যাম, সহদেব প্রমুখ ধর্ম্মমঙ্গল-রচয়িতৃগণ তাহার নিদর্শন। ব্রাহ্মণ কাব্যকারদিগের হস্তে ধর্ম্মঠাকুরের চেহারাটি বদলাইয়া গেলেও ভিতরকার বৌদ্ধ প্রভাবটুকু চিনিতে বাধে না। রামাই পণ্ডিতের শূন্যপুরাণের আরম্ভের একটু নমুনা দিই,—

> "নাহি রেক নাহি রূপ নাহি ছিল বন্নচিন্,
> রবি সসি নাহি ছিল নাহি রাতি দিন।
> বন্তাবিন্দু নাহি ছিল না ছিল আধার"—ইত্যাদি।

এইখানে একটি টিপ্পনী না করিয়া থাকিতে পারিলাম না। এই বর্ণনাটির সহিত "নাসদাসীন্নোসদাসীত্তদানীম্" ইত্যাদি সৃষ্টিতত্ত্বের কি প্রকার সাদৃশ্য রহিয়াছে।

ব্রাহ্মণ কবির হস্তে এই শূন্য মূর্ত্তি সাকার রূপ পরিগ্রহ করিয়াছেন। এঁদের ধর্ম্মের,—

> "ধবল আসন ধবল ভূষণ
> ধবল চন্দন গায়।
> ধবল চামর, ধবল অম্বর
> ধবল পাদুকা পায়।"

অর্থাৎ তিনি শুদ্ধ সত্ত্ব গুণের প্রতীক, রজোগুণের লেশ তখনও তাঁহাকে স্পর্শ করে নাই।

প্রাচীন বঙ্গসাহিত্যের সম্যক অনুশীলনের দ্বারা বাংলার তৎকালীন সাহিত্য এবং সমাজের ইতিবৃত্তটি বেশ সুস্পষ্ট হইয়া উঠে। বৌদ্ধধর্ম্মের পতনের কালে বঙ্গদেশে বুদ্ধ এবং সঙ্ঘকে ছাড়িয়া ধর্ম্মপূজক মহাযানী বৌদ্ধদিগের বহু দিন অবধি প্রাবল্য ছিল। সনাতন হিন্দুধর্ম্মের পুনরুত্থানে ব্রাহ্মণ্য শক্তির পুনরুদ্দীপনে ধর্ম্মকে তাঁহারা জা'তে তুলিয়া লইলেন; কিন্তু তাঁহার উপাসকবৃন্দ জাতিচ্যুত রহিয়া গেল। এই একটি বিশেষ কারণে এবং হয়ত আরও বিভিন্ন কারণে দলে দলে বৌদ্ধধর্ম্মাবলম্বী বাংলার আদিম অধিবাসী এবং অন্যান্য দেশজ সদ্ধর্ম্মীরাও মুসলমানাধিকারে ইসলাম ধর্ম্ম অবলম্বন করিয়াছিল। আমরা দেখি যে ইহার পর হইতে ক্রমশই বাংলা ভাষা সমৃদ্ধির পথে অগ্রসর হইতেছে। খনার বচন, মৃগলুব্ধ বা শিবরাত্রির ব্রতকথা, শিবায়ন, মনসামঙ্গল, শীতলামঙ্গল, চণ্ডীমঙ্গল, কালিকামঙ্গল, লক্ষ্মী ও সারদা মঙ্গল ইত্যাদি বহু দেবদবীর ব্রত-পূজার প্রচারবার্ত্তা;—কৃত্তিবাস, কাশীরাম দাস, রামপ্রসাদ, ভারতচন্দ্র এ সকল শক্তিশালী লেখকবৃন্দকে আমরা একে একে সাহিত্যিক রঙ্গভূমে প্রবেশ করিতে দেখিতে পাই। বঙ্গসাহিত্যাকাশে ইঁহারা উজ্জ্বল জ্যোতিষ্করূপে সমুদিত হইয়াছিলেন। বাংলার পাঠানরাজগণ বঙ্গসাহিত্যের উন্নতির জন্য যথাসাধ্য আয়াস পাইতেন। তাঁহাদের আনুকূল্যেই হিন্দুর অষ্টাদশ পুরাণ, রামায়ণ মহাভারতাদির বঙ্গানুবাদ হইয়াছিল। রামায়ণ এবং মহাভারতের বহুসংখ অনুবাদ হইয়াছিল। তন্মধ্যে কাশীরাম এবং কৃত্তিবাসের রচনাই এক্ষণে লোক বিখ্যাত। পরাগল খাঁর পুত্র ছুটী খাঁর আদেশে শ্রীকরনন্দী

মহাভারতের যে অনুবাদ করিয়াছিলেন তাহা "পরাগলী মহাভারত" নামে আজিও কোথাও কোথাও প্রচলিত আছে। হিন্দু মুসলমানের মধ্যে তখনকার দিনে এখনকার অপেক্ষা যে অনেক বেশী সদ্ভাব ছিল, তাহা প্রাচীন বঙ্গসাহিত্য হইতে বেশ ভালরূপেই জানা যায়। মুসলমান কবিগণও নানাবিধ সদ্‌-গ্রন্থাদি রচনা করিয়া বঙ্গসাহিত্যের পুষ্টিবর্দ্ধন করিতে পশ্চাৎপদ হন নাই। ঐ গ্রন্থগুলির কিছু কিছু আমি পাঠ করিবার সুযোগ লাভ করিয়াছি। দেখিয়া বিস্মিত হইতে হয় যে, অনেক সুপণ্ডিত মুসলমান বাস্তবিকই হিন্দুশাস্ত্রকে কতই ভক্তির চক্ষে দেখিতেন। তখনকার দিনে যখন তাঁহাদের সঙ্গে বৈরী সম্বন্ধ থাকাই হয়ত স্বাভাবিক ছিল, তখন তাহার পরিবর্ত্তে উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে কতখানি মধুর মৈত্রীভাব ও সম্প্রীতির উদ্রেক হইয়াছিল! আর কি সেদিন আসিবে না? অতীত যাহা ছিল চেষ্টা করিলে হয়ত তাহা আবার আসিতে পারে।

মুসলমান লেখকগণের ধর্ম্মতত্ত্ব, নীতি, ইতিহাস, সঙ্গীত, বিরহবর্ণন, কাহিনী ইত্যাদি নানাবিষয়ক রচনাই দেখিতে পাওয়া যায়। তাঁহাদের মধ্যে সুলেখকের অভাব ছিল না। সৈয়দ সুলতান প্রণীত যোগতত্ত্ব-সম্বন্ধীয় দুখানি গ্রন্থে হঠযোগের নিগূঢ় সাধনতত্ত্ব প্রকাশ পাইয়াছে। সংস্কৃত, ফারসীর অনুবাদ এবং মৌলিক রচনা দ্বারা যথেষ্ট পরিমাণেই ইঁহারা বঙ্গসাহিত্যের শ্রীবৃদ্ধি সাধন করিয়াছিলেন। প্রাচীন মুসলমান লেখকগণের ভাষা এতই বিশুদ্ধ ও মধুর যে লেখকের নাম জানা না থাকিলে তাহা কাহার রচনা বুঝিবার উপায় নাই। "রাগনামা" হইতে একটুখানি নমুনা দেওয়া যাইতেছে, -

> "চলহ সখি নাগরি, মান তুহি পরিহরি,
> দেখ আসি নন্দ কি রায়।
> যত ব্রজকুলনারী অঞ্জলি ভরি ভরি
> আবীর দেপন্ত শ্যাম গায়।
> * * কহে তাহির মহম্মদে, ভজ রাধাশ্যামপদে;
> বিলম্ব করিতে না জুয়ায়।"

আর দুইটি ছোট পদ অন্য একটি পুস্তক হইতে তুলিয়া দিব, দেখুন ব্রজবুলীর সেই চিরপরিচিত সুরটিই শুনিতে পাইবেন; শুধু যাঁর নলিননয়ন দুটি বারিপূর্ণ হইয়া বর্ষাবারির সহিত বর্ষণমুখর হইয়া রহিয়াছে, তিনি শ্রীমতী রাধিকা নহেন, বিরহিণী লয়লা।

> "বরখিত বারিদ জগমণ্ডরি
> যুগল নয়ানে বহে বারি।"

শ্রীচৈতন্যদেবের সময় হইতে বঙ্গভাষা ও সাহিত্যে একটি নবযুগের উদয় হইল। বঙ্গদেশ প্লাবিত করিয়া প্রেমের বন্যা ছুটিল, ভাবের ভাগীরথী প্রবাহিতা হইলেন। বঙ্গসাহিত্যের এ এক স্মরণীয় এবং বরণীয় দিন। শ্রীকৃষ্ণমঙ্গল, গোবিন্দমঙ্গল, কৃষ্ণপ্রেমতরঙ্গিণী, শ্রীমদভাগবতের বঙ্গানুবাদ; তারপর শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতাদি বহু ধর্ম্মগ্রন্থ, জীবগোস্বামী রূপসনাতনাদি ভক্তবৃন্দের ও গুণরাজ খাঁ, কবিকর্ণপুর, ভাগবতাচার্য্য প্রভৃতি বহু খ্যাতনামা কৃতী লেখকবৃন্দের অভ্যুদয়;—এবং তন্মধ্যে সর্ব্বপ্রধান স্থানটি অধিকার করিয়া থাকিয়া আজিও স্বর্ণমুকুটের মধ্যমণির মতই দীপ্তি পাইতেছে বৈষ্ণবপদাবলী। পদাবলী-সাহিত্যের মত ভাবমধুর অমৃতনিঃস্রাবী আর কিছু এই মরজগতে আছে কি-না আমি জানি না।

বিদ্যাপতি বা চণ্ডীদাসের কতকগুলি পদ আমাদের যেন বড় পরিচিত, একান্তই আপনার জনের মত মনের সঙ্গে যেন গাঁথা হইয়া গিয়াছে। এই যে পদটি

> "সুখের লাগিয়া এ ঘর বাঁধিনু অনলে পুড়িয়া গেল", অথবা
> "জনম অবধি হম্‌ রূপ নেহারিনু নয়ন না তিরপিত ভেল,"

এমন প্রগাঢ় ভক্তিপ্রেমের চিত্র, এমন সরল সুললিত শব্দঝঙ্কার, এমন মর্ম্মস্পর্শী বিরহবিষাদের, এমন মর্ম্মন্তুদ বেদনা আক্ষেপের কত অসংখ্য পদই আছে, তাহার ইয়ত্তা নাই।

আমার এই যুগযুগান্তের সংক্ষিপ্ত সাহিত্য পরিচয়ের মধ্যে আমি কোন মহিলা-লেখিকার নামোল্লেখমাত্র করি নাই। তবে কি সাহিত্যে তাঁহাদের স্থান ছিল না; অথবা দান কি তাঁহারা সাহিত্যে কিছুই করেন নাই? তা নয়; তাঁদের সম্বন্ধে অনেক কথা বলার ছিল বলিয়াই বলার অবসর পাই নাই। কি বৈদিক যুগে, কি পৌরাণিক যুগে, কি বৌদ্ধযুগে, কি শঙ্করাদি যুগে, কি মুসলমান যুগে, কি ইংরেজ-শাসিত ভারতবর্ষে, নারী-লেখিকার অভ্যুদয়ে কেহ কোনদিনই বাধা দিতে পারে নাই। প্রশান্ত তপোবনের সুশীতল তরুচ্ছায়ায় তাঁহারা অসংখ্য বেদমন্ত্র রচনা করিয়াছেন; রাজসভামধ্যে মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিতের সহিত উপনিষদ-তত্ত্বের তর্ক করিতে তাঁহারা দ্বিধাবোধ করেন নাই; অমিততেজা সর্ব্বশাস্ত্রবিৎ

দার্শনিকপ্রবরকে তর্কযুদ্ধে আহ্বান করিতে পশ্চাৎপদ হন নাই ; বিত্তপ্রদানেচ্ছুক পতিকে অবলীলায় প্রশ্ন করিয়া বসেন : —

"যেনাহং নামৃতাস্যাং কিমহং তেন কুর্য্যাং। যদেব ভগবান বেদ তদেব কে ব্রূবীহি।"

আবার আর একদিকে রাজপুতানার মিবার-রাজ্যের রাজ-রাজেন্দ্রানী ভক্তিমতী মীরার ভজনগানে বোধ করি পাষণ্ডেরও চিত্ত বিগলিত করে. পাষাণ হইতেও বুঝি তা জল ঝরায়।

"মেরে জনম মরণকে সাথী
তানে নাহি বিসরু দিনরাতি" ইত্যাদি

ভক্তিরসামৃতসিক্ত সঙ্গীতলহরী চিরযুগযুগান্তরাবধি যেন প্রাণের অমৃতরস নিঙড়াইয়া মর্ত্ত্যমানবার অমরত্ব ঘোষণা করিতেছে. চিরযুগযুগান্তরাবধি ঘোষণা করিবে।

মেরে চাকর রাখোজী"—

এই যে আরজি, এ বড় সোজা দাবি নয়। এই অধিকার স্থাপনার জোরেই শুধু সাধক-সেবক অদ্বৈতবাদীর অতি কঠিনসাধ্য 'সোহম্'কে অতি সহজসাধ্য. একমাত্র গভীর প্রেমসাধ্য 'দাসোহম্' করিয়া লইতে পারে। ইহা অতি মধুর দ্বৈতাদ্বৈতবাদ। ভগবৎচরণ উপাসিকা মীরাদাসী এ পথের বার্ত্তা তাঁর মধুর সঙ্গীতের দ্বারা আত্মাভিমানী মানুষকে ইঙ্গিত করিয়া গিয়াছেন।

নামের তালিকা লিখিব না, নামের শেষ নাই। খনা লীলাবতীর উপমা ত আমরা কথায় কথায় দিয়া থাকি। কিন্তু দিই না যাঁদের তাঁদের মধ্যেও অসংখ্য শক্তিমতীর আবির্ভাব এ-জাতিকে ধন্য করিয়াছিল। শুধু লেখাপড়ার মধ্য দিয়াই নয় ; কত জ্ঞানহীনা নারীও কত কবিতা ছড়া গান রচনা করিয়াছেন তাহার পরিচয় পাওয়া যায়।

মুসলমান যুগেও শক্তিমতী নারী লেখিকার অভাব হয় নাই। বৈষ্ণব যুগের মাধবী দাসীর নাম সুপরিচিত। জেব-উন্নিসা, গুলবদন বেগম ইতিহাসপ্রসিদ্ধ, বিদুষী নারী। বর্ত্তমান যুগের কথা আমার আলোচ্য নহে। তবে এ যুগেও যে নারী-সাহিত্যিকের অভাব অনুভূত হইতেছে না তাহা বলাই বাহুল্য। সুযোগ এবং সহানুভূতি বৃদ্ধির সহিত মহিলা-লেখিকাদের সংখ্যাও দিন দিন বর্দ্ধিত হইবে. এ আশা করা যায়। প্রাচীন যুগের মত বর্ত্তমান এবং ভবিষ্যৎ যুগের লেখিকারা বেদমন্ত্রের মতই কঠিন বিষয়ে মনোযোগিনী হইবেন, ইহাও আশা করি।

মহিলা-লেখিকাগণ যে যুগেই প্রাদুর্ভূতা হউন না কেন, সেই সুদূর অতীত হইতে আজিকার এই বস্তুতন্ত্রতার দিন অবধি তাঁরা কোনভাবেই অসৎ সাহিত্যের প্রচার চেষ্টা করেন নাই। এইটুকুই আমাদের মহিলাসমাজের সবিশেষ গৌরবের বিষয় ছিল।*

* চন্দননগর নৃত্যগোপাল স্মৃতিমন্দিরে জনসভায় পঠিত।

প্রার্থনা

শ্রীবিশ্বনাথ নাথ

আমারে বঞ্চিত কর সর্ব্ব সুখ হ'তে
হে স্বামিন্! জীবনের ঘাত-প্রতিঘাতে
যে ব্যথা ফেনায়ে উঠে, যেই অশ্রু ঝরে
উছলিয়া ; তাই দাও পানপাত্র ভ'রে।
ব্যর্থতায় শূন্য ক'রে দাও সব আশা,
রিক্ততায় পূর্ণ ক'রে দাও ভালবাসা,
প্রেম, প্রীতি, হৃদয়ের সব লহ হ'রে.
নিঃসঙ্গ, নিষ্ঠুর কর, বন্ধুহীন ক'রে
দাও মোরে. গৃহহীন, পরিজনহীন,
কর মোরে সর্ব্বহারা দীন, অতিদীন.
নির্যাতিত, নিঃসহায়, একা নিদারুণ,
ক'রো না'ক কোন দয়া ওগো অকরুণ!
ক'রো না'ক আশীর্ব্বাদ দিও না আশ্বাস,
তবে যদি তোমা পরে রহে গো বিশ্বাস।

সিংহলের চিত্র

শ্রীমণীন্দ্রভূষণ গুপ্ত

'একদা যাহার বিজয় সেনানী হেলায় লঙ্কা করিল জয়,' এই গানের জন্য বাঙালী সিংহলকে স্মরণ ক'রে থাকে, আর আমাদের রামায়ণের সঙ্গেও সিংহলের স্মৃতি জড়িত। রাবণের স্বর্ণলঙ্কা ছিল এই সিংহলেই, অবশ্য তার কোনো চিহ্ন নেই।

সিংহলী পুরুষ
সাধারণ বেশ মাথায় 'পানাব'

বিজয়সিংহের লঙ্কাদ্বীপ জয়ের পর থেকেই সিংহলের ইতিহাস আরম্ভ। লঙ্কাদ্বীপে বিজয়সিংহের রাজত্ব হ'ল ব'লে এর নাম হয়ে গেল সিংহল।

আমাদের সঙ্গে বর্ত্তমান সিংহলের কোনো পরিচয় নেই। ভারতের ধর্ম্ম, ভাষা, সাহিত্য, শিল্প নিয়েই সিংহলের সভ্যতা গড়ে উঠেছে। সিংহলীদের আচার-ব্যবহারের সঙ্গে আমাদের অনেক মিল আছে। সমুদ্রের দ্বারা বিচ্ছিন্ন ব'লে ভারতের সঙ্গে যোগধারা নিরবচ্ছিন্ন চলে নি। সিংহলের সঙ্গে বিভিন্ন জাতির সঙ্ঘর্ষ হয়েছে বিভিন্ন সময়ে। সেজন্য তারা বিজেতাদের দ্বারা অনেক বিষয়ে প্রভাবিত হয়ে পড়েছে, জাতীয় শক্তি ক্ষুণ্ন হয়েছে।

প্রাচীন ইতিহাসে দেখতে পাই, ভারতের দাক্ষিণাত্য থেকে তামিলদের আক্রমণ লেগেই আছে। আরব এসেছে, চীন এসেছে, জাভা এসেছে, তারপর ধ্বংস এবং তাণ্ডবলীলা নিয়ে এসেছে পর্ত্তুগীজ এবং ডাচ্। একটা ছোট দেশের পক্ষে এতগুলি আক্রমণ সাম্‌লে নেওয়া সোজা কথা নয়। ১৮১৪ খৃষ্টাব্দে সিংহল ইংরেজদের হাতে এসেছে, যদিও সমুদ্রতটবর্ত্তী প্রদেশে এবং এখানে-সেখানে মাঝে মাঝে বিদেশী রাজত্ব করেছে। ১৮১৪ খৃষ্টাব্দের পর থেকেই সিংহলের স্বাধীনতা সম্পূর্ণ ভাবে লুপ্ত হয়েছে।

এদের ইতিহাস, এদের শিল্পপ্রচেষ্টা, বিভিন্ন সময়ে স্বাধীনতার জন্য সংগ্রাম নিশ্চয়ই খুব কৌতূহলোদ্দীপক। বৌদ্ধযুগে স্থাপত্য, ভাস্কর্য্য, চিত্র ইত্যাদি শিল্পের বিরাট কর্ম্মোদ্যম দেখা যায়। ধ্বংসস্তূপ দেখে স্তম্ভিত হ'তে হয়, এত ক্ষুদ্র দেশ কি ক'রে এ শিল্পসম্ভার সৃষ্টি করেছে।

প্রাচীন কীর্ত্তির ন্যায় সিংহলের দৃশ্যও খুব মনোমুগ্ধকর। প্রকৃতির লীলানিকেতন পার্ব্বত্য প্রদেশ, মধ্যপ্রদেশের বনানীর শ্যামল দীপ্তি, চতুর্দ্দিকের নীল সমুদ্র সিংহলকে যেন ফ্রেমে বাঁধান ছবি করেছে। এখানে যে-কোনো লোকই ভ্রমণ করতে আসুক না কেন, নয়নে যে তৃপ্তি পাবে তার সীমা-পরিসীমা নেই।

সিংহল ইউরোপীয় ভ্রমণকারীদের মুগ্ধ করেছে। তার প্রাচীন শিল্পগরিমা প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যকে সকল ভ্রমণকারীই উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করেছে। সেটা মিথ্যা স্তব নয়। আমিও নিজে তিন বৎসর সিংহলে অবস্থান ক'রে সেটা অনুভব করেছি। তার বনানীর শ্যামসুষমা, সমুদ্রের নীলিমা, পার্ব্বত্য প্রদেশের বর্ণ-ব্যঞ্জনা আমার চোখে যেন লেগে রয়েছে।

সিংহলের আবহাওয়া নাতিশীতোষ্ণ। সেজন্য লোকদের

ভিতর তেমন কর্ম্মোদ্যম দেখা যায় না, একটু যেন আয়েসী, নিতান্ত যতটুকু প্রয়োজন তার অতিরিক্ত চেষ্টা করা যেন হয়ে ওঠে না। সিংহল উর্ব্বর, অল্প পরিশ্রমেই আহার্য্য মেলে। যার সামান্য কিছু জমি আছে, নারিকেল বা রবারের ফসলে অতি সহজেই অর্থ উপার্জ্জন হয়—অবশ্য বছর কয়েক হ'ল রবারের ব্যবসায়ে মন্দা পড়ে গেছে। গড়পড়তা লোকের অবস্থা ভারতবর্ষের লোক অপেক্ষা অনেক ভাল। যে-ভাবে দিন কেটে যাচ্ছে তাই ভাল, পরিবর্ত্তনের হাঙ্গামা কেন? এই চেষ্টার অভাব কেবল যে কর্ম্মজগতে তা নয়, মানসিক ব্যাপারেও যেন তাদের একটা গতিহীনতা লক্ষ্য করা যায়; "বেশ আছি" এই ভাব। এই যে একটা মানসিক সন্তুষ্টি, এর জন্য জ্ঞান, বিজ্ঞান, সাহিত্য, ব্যবসা-

কাণ্ডি প্রদেশের মাথার টুপী

বাণিজ্য, রাজনীতি প্রভৃতির ক্ষেত্রে উন্নতির জন্য তেমন একটা আন্দোলন দেখা যায় না।

সকল বিদ্যালয়ে, দেশের শিক্ষার ভিতরে এমন একটা স্থিতিশীলতার ভাব আছে, যে, তার দেওয়াল ভেদ ক'রে কোন নতুন চিন্তার ধারা প্রবেশ করতে পারে না। শিক্ষায়তন-গুলি সব বিলাতের মডেলে তৈরি—দেশের সাহিত্য, ইতিহাস, সভ্যতা শিক্ষায় তেমন স্থান পায় না যেমন পায় ল্যাটিন গ্রামার এবং বিলাতের ইতিহাস। কলম্বো একটি বড় বন্দর ব'লে সদাসর্ব্বদাই নানা ইউ-রোপীয় জাতির আনাগোনা। যুবকদের মনের উপর তাদের প্রভাব কম নয়। শহরের ছাত্রদের ফ্যাশানের দিকে ঝোঁক বড় বেশী, সব বিষয়ে বিদেশীয়দের অনুকরণের চেষ্টা। দেশীয় সব-কিছু প্রতিষ্ঠান থেকে ইউরোপের সব-কিছু ভাল এরূপ একটি মনোভাব লক্ষ্য করা যায়।

সিংহলী যুবক—জাতীয় পোষাকে

কোন একটা কিছু নতুন আন্দোলন দেশে এলে সভা-সমিতিতে কিছু বক্তৃতা, কিছু রেজোলুশ্যন, কাগজে কিছু লেখালেখি, কিছু বাদপ্রতিবাদ—বাস্, তারপরে সব ঠাণ্ডা।

সিংহলীদের নামকরণ

ব্যক্তি-বিশেষের নাম থেকে তার দেশ বোঝা যায়। কিন্তু সিংহলীদের নাম থেকে দেশের পরিচয় হবে না, কারণ পর্ত্তুগীজ ডচদের আমল থেকে বহুকাল যাবৎ খৃষ্টানদের অধীনে বাস ক'রে নিজেদের নাম গোত্র বদলাতে হয়েছিল। খৃষ্টান শাসনকর্ত্তা সিংহলীদের জোর ক'রে খৃষ্টান ধর্ম্মে দীক্ষিত করেছে এবং খৃষ্টানী নাম রাখতেও বাধ্য করেছে। যারা খৃষ্টধর্ম্ম গ্রহণ করেনি তাদের হাজার হাজার লোকের প্রাণদণ্ড হয়েছে। অবশ্য এসব ঘটেছে 'লোকান্ট্রি সিংহলীস' বা সমুদ্রতটবর্ত্তী সিংহলীদের মধ্যে। 'আপকান্ট্রি সিংহলীস' বা পার্ব্বত্য অঞ্চলের সিংহলীদের এসব পরিবর্ত্তন ঘটেনি, কারণ সুরক্ষিত পার্ব্বত্য প্রদেশে তাদের স্বাধীনতা অটুট ছিল।

সিংহলীদের নামের নমুনা--টমাস পেরারা, জন ফার্ণাণ্ডো, হেনরি ডি'সিল্‌ভা ইত্যাদি পর্ত্তুগীজ নাম। আমাদের বোম্বাই অঞ্চলের গোয়ানীজদের মত। এসব বিদেশী নাম দেখে কেউ মনে না করেন এরা খৃষ্টান। এরা খৃষ্টান নয়, অধিকাংশই বৌদ্ধ। ধর্ম্ম বৌদ্ধ হলেও নামটা খৃষ্টানী ধরণেই চলেছে। রেভারেণ্ড ধম্মপাল সিংহলীদের দেশী নাম রাখবার জন্য অনেক বলেছেন।

দেশী নামের রেওয়াজ যে নেই তা নয়। নমুনা জয়সেন, জয়তিলক, জয়সিংহ, বিজয়তিলক, বিজয়তুঙ্গ, গুণসিংহ, গুণতিলক, গুণশেখর ইত্যাদি। কাণ্ডি প্রদেশে প্রচলিত নাম পুঞ্চি বান্ডা, রণরাজ, বান্ডার নায়ক ইত্যাদি।

অনেকে ইউরোপীয় নাম বদলে দেশী নাম রাখছে-খবরের কাগজে এরূপ নোটিস চোখে পড়তে পারে,- 'আমার নাম টমাস ফার্ণাণ্ডো ছিল, অদ্য হইতে আমার নাম সিরিসেন (শ্রীসেন) জয়সিংহ; এতদ্দ্বারা সর্ব্বসাধারণকে জানান যাইতেছে যে, অতঃপর আমি এই নামেই অভিহিত হইব।'

সিংহলী মেয়ে—সাধারণ পোষাকে

পরিচ্ছদ

শহরে যারা ইংরেজী শিক্ষিত তারা তো পুরাদস্তুর সাহেব। দেশী ধরণের সাধারণ পোষাক লুঙি (সিংহলী ভাষায় বলে সারঙ) গায়ে শার্ট বা কোট। পুরাদস্তুর মত হ'লে শার্ট কোট দুই-ই চাই। কোমরে বেল্ট আছে, অনেকেই রূপার শিকল ব্যবহার ক'রে থাকে, একে সিংহলী ভাষায় বলে হাবাডি। পূর্ণিমার দিনে বৌদ্ধরা মন্দিরে পূজা দিতে যায় তখন তাদের বিশেষ বেশ আছে- সব একদম শাদা হওয়া চাই। শাদা কাপড় (রেন্দা) জড়িয়ে পরা, কাছা নেই, গায়ে বেনিয়ান (খাট পাঞ্জাবী) ও চাদর (উত্তুরু সালুয়া, সংস্কৃত উত্তরীয়)।

আজকাল ন্যাশনাল ড্রেস ব'লে এক বেশ ইংরেজী-শিক্ষিতদের ভিতর চলিত হয়েছে। এটার প্রবর্ত্তন করেছেন আনন্দ কলেজের অধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত কুলরত্ন মহাশয়। তিনি বিলাত ফেরৎ হয়েও দেশী পোষাক গ্রহণ ক'রে সৎসাহসের পরিচয় দিয়েছেন। তাঁর বেশ হ'ল শাদা কাপড় (রেন্দা), বেনিয়ান ও চাদর। তাঁর পূর্ব্বে রেন্দার সঙ্গে কোট পরা অবশ্যকর্ত্তব্য ব'লে বিবেচিত হ'ত। কিন্তু কোট ছেড়ে বেনিয়ান পরে সভ্য সমাজে চলাফেরা করলে যে ভব্যতার সীমালঙ্ঘন করা হয় না তিনি প্রথম সৎসাহসের সঙ্গে দেখালেন। অবশ্য এজন্য খবরের কাগজের মারফতে তাঁকে এই undignified dressএর জন্য অনেক গালাগালি শুনতে হয়েছিল, এখনও যে শুনতে হয় না এমন নয়। তাঁর রেন্দা হয় ছ-হাত লম্বা। সিংহলীদের যে রেন্দা চলতি তা আরও ছোট। সিংহলের রেন্দা এক টুক্‌রা শাদা কাপড়, লংক্লথের কাপড় চওড়া ক'রে মুড়ি শেলাই ক'রে নিলেও চলে। শ্রীযুক্ত কুলরত্ন চালিয়েছেন পাড়ওয়ালা ধুতি। সারঙের যে উল্লেখ করেছি তা লুঙির কাপড়ও হয়, বা কোটের বা শার্টের ছিটের কাপড় থেকেও করা হয়। বাঙালীর মত এরা চাদর জড়িয়ে পরে না, কাঁধের দু-পাশ দিয়ে লম্বালম্বি ভাবে ঝুলিয়ে দেয়।

সিংহলী মেয়ে—পরণে 'ওসারী'

আভিজাত্যের নিদর্শন এক পোষাক আছে। এই পোষাক হ'ল সাধারণ স্যুটের ওপর একটি বেশী কাপড়ের সংযোগ। প্যাণ্টলুনের ওপর একটি বেশী কাপড়ের সংযোগ। প্যাণ্টলুনের ওপর একটা কাপড় জড়িয়ে পরতে হয়, কোমর থেকে হাঁটুর কিছু নীচে এ কাপড় নাবে। আমাদের দেশের রায়-সাহেব বা রায়-বাহাদুররা যেমন চোগা চাপকান্ পিরিলি পাগড়ি প'রে থাকেন সেকেলে অভিজাত সম্প্রদায়ের

সিংহলীরাও তেমনি এ বিশিষ্ট পোষাক প'রে থাকেন। মুহান্দিরাম মুদলিয়াররা এরূপ পোষাক পরেন। মুদলিয়ার হ'ল আমাদের দেশের রায়-সাহেবের মত। মুহান্দিরাম মুদলিয়ারের চেয়ে ছোট উপাধি।

অবশ্য যাঁদের রুচি আধুনিক সভ্যতা অনুযায়ী. তাঁরা সাহেবী স্যুটের সঙ্গে এরূপ আর একটি নতুন কাপড়ের সংযোগ করেন না।

মলয়দ্বীপ থেকে একটি অদ্ভুত জিনিষের আমদানি হয়েছে, পুরুষের মাথায় কচ্ছপের খোলার চিরুনী (পানাব)। পুরুষদের মেয়েদের মত লম্বা চুলের খোঁপা, তাতে চিরুণী গোঁজা। অনেক সাবেকী ধরণের সিংহলী আছেন, যাঁরা পূরাদস্তুর সাহেবী পোযাক পরলেও মাথায় খোঁপা রাখেন ও চিরুণী গোঁজেন। খোঁপা ও চিরুণী টপ হ্যাট বা সেকেলে উঁচু টুপীতে ঢাকা থাকে। 'পানাব' শুধু নিম্ন সিংহলীদের ভিতর চলতি, কাণ্ডি অঞ্চলে এর চলন নেই।

মেয়েরাও প'রে সারঙ্_ পুরুষদের থেকে কোনো তফাৎ নেই হয়ত একটু রংচং বেশী। গায়ে আঁটা জ্যাকেট (সিংহলী হেট্টে, সংস্কৃত কঞ্চুক)। কাণ্ডি অঞ্চলে এক প্রকার শাড়ীর চলন আছে, তাদের ভাষায় বলা হয় 'ওসারী'। কোমরের চারদিকে শাড়ীর কতকটা অংশ ঝালরের মত ঝুলে থাকে. এবং খাটো আঁচলের এক দিক কাঁধের ওপর পর্য্যন্ত থাকে। মাথায় ঘোমটা দেওয়ার রীতি নেই। গহনার প্রাচুর্য্য আছে। আমরা যাকে বলি ইঙ্গ-বঙ্গ সেরূপ যদি ইঙ্গ-সিংহলীস শব্দ করা যায়, তারা 'ওসারী'র 'ইম্প্রুভড' সংস্করণ প'রে থাকে—'ওসারী' এবং স্কার্টের মধ্যে যেন কতকটা কম্প্রমাইজ। গহনার অভাবে হাতে স্লেভ ব্যাঙ্গল, তাতে রুমাল গোঁজা। পায়ে হাই-হিল শু।

নিম্নসিংহলী অথবা কলম্বোর তীরবর্ত্তী শিক্ষিতা মেয়েরা আজকাল কেউ কেউ একেবারে খাঁটি বাঙালী মেয়েদের আধুনিক ধরণের শাড়ী পরার রীতি অনুকরণ ক'রে থাকেন, এবং বাঙালী মেয়েদের মতই মাথায় কাপড় দিয়ে থাকেন। এই প্রথা প্রবর্ত্তন করেছেন শ্রীযুক্ত (অধুনা স্যর) ডি.বি.

'ধাতু মন্দির'

বিশেষ কোন পর্ব্ব উপলক্ষে বৌদ্ধমন্দিরের প্রাঙ্গণে, নারিকেল পাতায় ছাওয়া কুটীর নারিকেল পাতা ও রঙীন নিশানে সুসজ্জিত করা হয়

জয়তিলকের পত্নী। তিনি কলকাতায় বেড়াতে এসে-ছিলেন, দেশে ফিরে গিয়ে বাংলার শাড়ী পরার রীতি নিজেদের পরিবারে এবং বন্ধুবান্ধবদের ভিতর প্রচার করেন।

বহু প্রাচীন কালে অবশ্য পোষাক এমন ছিল না। মেয়েদের গায়ে থাকত 'তন পট' (স্তন পট) এবং উত্তুরু সাল্যুয়া।

রাজাদের পরিচ্ছদর বর্ণনায় পাওয়া যায়, তাদের ছিল 'সিউ সাট্ বরণ' (চতুঃষষ্ঠী আভরণ)। চৌষট্টি রকমের অলঙ্কার ছিল, তাতেই গা ঢাকা থাকত। উত্তুরু সাল্যুয়া থাকত। সাধারণ লোকদের খালি চাদর গায়ে, জামা থাকত না।

সিংহলী মেয়ে পরণে ওসারী'
(আধুনিক সংস্করণ)
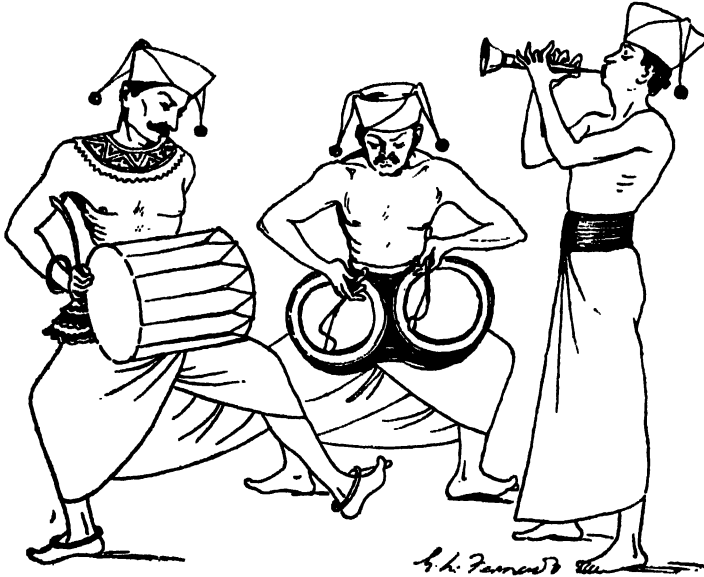
বিবাহ

ভিন্ন জাতির ভিতর বিবাহ হ'তে পারে না। যদিই বা ভিন্ন জাতির ভিতর হয়ে যায়, তবে জানতে হবে সেটা পিতামাতার বিনা অনুমতিতেই হয়েছে। বৌদ্ধ সিংহলে জাতিভেদ আছে—ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় বৈশ্য এরূপ নয়— গয়িগান, করাভ, শালগান ইত্যাদি জাতির নাম। 'লভ ম্যারেজ' পিতামাতা পছন্দ করেন না। আর সিংহলে ভীষণ রকম পণ-প্রথা থাকায় 'লভ ম্যারেজ' হ'তে পারে না, কারণ তাতে পণ না পাওয়ারই সম্ভাবনা। আমাদের দেশের মতই 'কাপুরাল' (ঘটক) বিবাহের প্রস্তাব আনে এবং দেনা-পাওনা ঠিক করে। বিবাহের প্রস্তাব উঠলেই সবচেয়ে দরকারী বিষয় হ'ল পণ। অর্থের পরিমাণ কাপুরালের সাহায্যে দুই দলের ভিতর ঠিক হয়ে গেলে তারপরে অন্য কথা। পণের পরিমাণ ভীষণ। একজন এডভোকেট হয়ত পঞ্চাশ হাজার টাকা দাবি করতে পারে। বরের আর্থিক অবস্থা, সামাজিক স্থান, শিক্ষা অনুসারে পণের পরিমাণ স্থির হয়ে থাকে। আমাদের দেশের মত সেখানে গণ্ডায় গণ্ডায় গ্র্যাজুয়েট নেই ব'লে এ-রকম পণ দাবি করা সম্ভব। পণ ঠিক হ'লে কোষ্ঠী দেখা হবে। সিংহলীদের কোষ্ঠীর উপর খুব বিশ্বাস। কোষ্ঠীতে যদি বর-কনের মিল না পাওয়া যায়, তবে হয়ত বিবাহ ভেঙে যেতে পারে। বিবাহের সময় স্থির হয় 'পঞ্চাঙ্গ-লিথ' বা পাঁজি দেখে— দিন ঘণ্টা মিনিট সমেত সময় নির্দ্দিষ্ট হবে। সিংহলীদের পাঁজি দেখার চলন আছে—দূর দেশে যখন কেউ যায় (যেমন গ্রাম থেকে কলম্বো শহরে) পাঁজির দিন ক্ষণ দেখে বেরুতে হবে।

বিবাহের সব ঠিকঠাক হয়ে গেলে বর-কনের ভিতর একটু দেখাসাক্ষাৎ হ'তে পারে—ঐ যা একটু পূর্ব্বরাগ। পাকাপাকি বন্দোবস্ত হয়ে যায়, বর-কনের বাড়িতে গিয়ে আত্মীয়স্বজনের সম্মুখে যখন আংটি বদল ক'রে আসে।

সিংহলী নৃত্য ও বাদ্য
জি.এল কারনাডো কর্ত্তৃক অঙ্কিত চিত্র হইতে

পেরহেরা

আংটি বদলের তিন মাসের মধ্যে বিবাহ হয়। বিবাহের দুই অনুষ্ঠান রেজিষ্টারী করা এবং দেশী প্রথায় কতকগুলি অনুষ্ঠান। সিংহলে বিধবা-বিবাহের চলন আছে।

অন্ত্যেষ্টি ক্রিয়া, শ্রাদ্ধ, অন্নপ্রাশন

সিংহলে সাধারণত দেহ মাটিতে সমাহিত করা হয়। সেটা আর্থিক কারণেই। যারা সঙ্গতিপন্ন তারা খুব ঘটা ক'রে দাহ করে, মিছিল ক'রে ব্যাণ্ড বাজিয়ে শ্মশানে নিয়ে যায়। পুরোহিত অর্থাৎ বৌদ্ধ ভিক্ষু শ্মশানে মন্ত্র উচ্চারণ করে।

সিংহলে আমাদের মত অন্নপ্রাশনের চলন আছে, বিশেষ দিনে 'ভাত খাওয়ান' হয়।

সঙ্গীত

দেশীয় সম্পদ্ যা-কিছু তা কাণ্ডিতে রক্ষিত আছে। সিংহলের কারুশিল্প, নৃত্যগীত কাণ্ডিতেই জীবন্ত আছে। পূজাপার্ব্বণ উপলক্ষ্যে এসব দেখার ও শোনার সুযোগ হয়। বৌদ্ধবিহারকেই কেন্দ্র ক'রে শিল্প নৃত্যগীত ইত্যাদি গড়ে উঠেছে।

পূজাপার্ব্বণ উৎসব ছাড়া গৃহে সঙ্গীতের বিশেষ স্থান আছে ব'লে মনে হয় না। নিম্ন-সিংহলে গানের তো নির্ব্বাসন। ইংরেজী শিক্ষিতদের ভিতর ইংরেজী গানের চলন আছে। স্কুলে ছোট ছেলেমেয়েরা পিয়ানো যোগে ইংরেজী গান শেখে। রাস্তাঘাটে চলতে খুব কমই এক-আধটা গানের টান শোনা যায়। যদিই বা শোনা যায়—সে হয়ত রাস্তার তামিল রিক্সা কুলির গান। সিংহলীদের ভিতর গান বিশেষ শোনা যায় না। পৃথিবীতে এমন সঙ্গীত-বর্জ্জিত দেশ আর কোথাও আছে কি-না জানি না। কলম্বোতে সিংহলী থিয়েটার আছে। প্রথম যিনি এই থিয়েটার খোলেন, শুনেছি একজন বাঙালীকে না-কি তিনি এনেছিলেন সিংহলী গানের সুর সংযোগ করতে। সুর খুব উচ্চশ্রেণীর নয়—থিয়েটারী ঢঙের হালকা গান। থিয়েটারে যারা যায়, তারা নিতান্তই সাধারণ লোক—কুলী, ভৃত্য, গাড়োয়ান, দোকানদার প্রভৃতিই বেশী। যাঁরা উচ্চশিক্ষিত তাঁরা থিয়েটারে যান না—তাঁরা যেন থিয়েটারে যাওয়াটা 'ডিগনিটি'র বাইরে মনে করেন, তাঁরা যান সিনেমায়। এজন্য থিয়েটারের চাহিদা সাধারণ শ্রেণীর ভিতর আবদ্ধ থাকায় বেশী উন্নতি হ'তে পারে

পেরহরো

না। সিংহলীদের মধ্যে সঙ্গীতের চর্চ্চা একটু-আধটু যা আছে তা ভদ্রশ্রেণীর মধ্যে নয়। দেশী সঙ্গীত শিক্ষা করতে যারা ইচ্ছুক তারা ভদ্রশ্রেণীর ভিতর নয়, তারা আপিসের কেরাণী, স্কুলের ছোটখাট মাষ্টার। পেটার অঞ্চলের দোকানদার প্রভৃতি অবসর সময়ে একটু-আধটু সঙ্গীত চর্চ্চা ক'রে থাকে। কলম্বোতে একজন সঙ্গীত-শিক্ষক আছেন, তাঁর নামটা আমার স্মরণ নেই। তিনি পেটা অঞ্চলে থাকেন, তার বাড়িতে সিংহলী সঙ্গীত এবং বাজনা শিক্ষা দিয়ে থাকেন, হারমোনিয়াম তবলা, সেতার বেহালা ইত্যাদি শেখাব ব্যবস্থা আছে। তিনিই না-কি সিংহলীদের ভিতর দেশী সঙ্গীতে বিশেষ অভিজ্ঞ। একবার নিমন্ত্রিত হয়ে তাঁর বাড়িতে গিয়েছিলাম; তাঁর ছাত্রেরা গান বাজনা করল, একটু হালকা রকমের।

আধুনিক রুচি যাঁদের, যাঁরা সমাজের উচ্চস্তরে আছেন, তাঁদের বাড়িতে দেশী সঙ্গীত আশা করা যায় না। কোনো সিংহলী সিভিলিয়ান, বা উচ্চ রাজকর্ম্মচারী, বা ইংরেজী-শিক্ষিত ধনীর বাড়িতে ছেলেমেয়েরা দেশী সঙ্গীতের চর্চ্চা করবে এরূপ আশা করা যায় না। তারা পিয়ানো বাজিয়ে ইংরেজী গান করে।

এই যে সঙ্গীতের অভাব এর কারণ কি হীনযান বৌদ্ধধর্ম্ম? শুনেছি গোঁড়া বৌদ্ধ পরিবারে বাপমায়েরা না-কি ছেলে-মেয়েদের গানের চর্চ্চা পছন্দ করেন না। মহাযান বৌদ্ধ চীন, জাপানে সঙ্গীত আছে। তাদের দেশীয় প্রথামত উচ্চাঙ্গের থিয়েটার আছে। হীনযান বৌদ্ধ বর্ম্মিদের গানের খবর জানি না, কিন্তু তাদের পোয়ে নাচ ত বিখ্যাত।

বর্ত্তমানে সিংহল এই সঙ্গীতের অভাবের কথা ভাবছে না, তা নয়। দেশের শিল্প, সঙ্গীত ইত্যাদির পুনরুজ্জীবন এবং নতুন ক'রে সৃষ্টি করতে কেউ কেউ সচেষ্ট। সিংহল কাউন্সিলের ভাইস্-প্রেসিডেণ্ট স্বর্গীয় স্যর জেম্‌স্ পিরিসের পুত্র শ্রীযুক্ত দেবর সূর্য্য সেন, বি এ, এল-এল-বি মহাশয় ইউরোপীয় সঙ্গীতে অভিজ্ঞ। কাণ্ডি অঞ্চলে ঘুরে গ্রাম্য সঙ্গীত সংগ্রহ করেছেন অনেক। শান্তিনিকেতনে কিছুকাল ছিলেন বাংলা গান শেখার জন্য। অমরসিংহ নামে একজন সিংহলী ছাত্র শান্তিনিকেতনে ছিলেন বাংলা গান শেখার জন্য। ভাল ক'রে ভারতীয় সঙ্গীতের চর্চ্চা করতে লক্ষ্ণৌ মিউজিক স্কুলে গেছেন। সেখানকার শিক্ষা শেষ হ'লে কলম্বোতে গিয়ে ভারতীয় সঙ্গীতের ক্লাস খুলবেন।
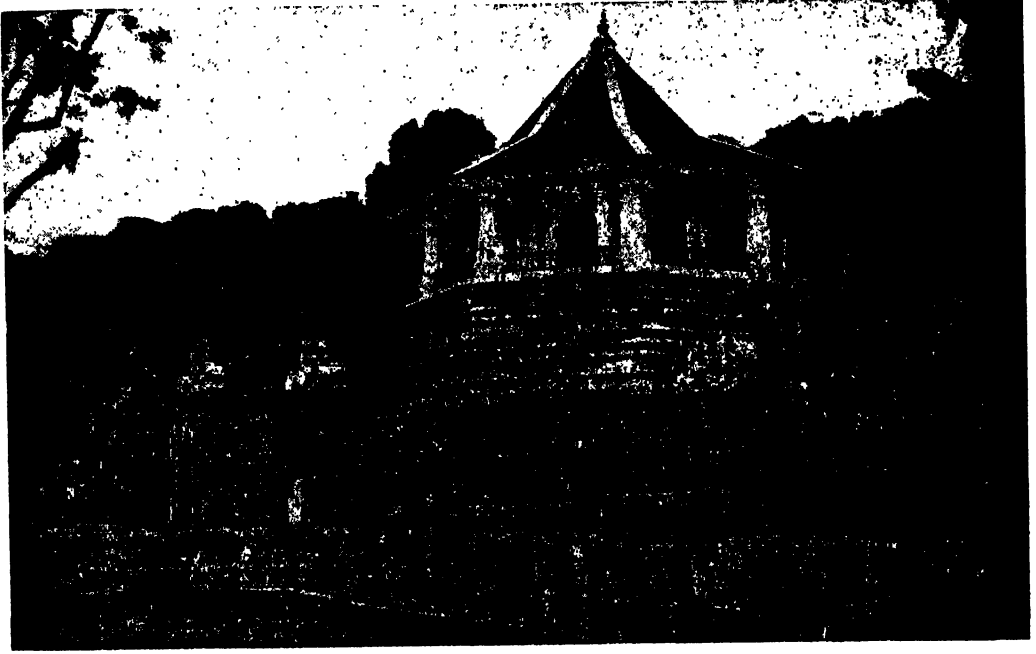
কাণ্ডির দালদা মালিগাওয়ার এক অংশ সামনের ৮ কোণওয়ালা ঘরটি হল মন্দির সংলগ্ন লাইব্রেরী। এখানে অনেক বৌদ্ধশাস্ত্রের প্রাচীন পুঁথি আছে

লোকনৃত্য

কাণ্ডিতে তিন প্রকারের নৃত্য চল্‌তি—(১) কান্তারু; (২) উডেক্কি; (৩) কাঙ্কেরি। কান্তারু নৃত্যই হ'ল সিংহলের শ্রেষ্ঠ নৃত্য। হাতে রিং রয়েছে, পায়ে আছে ঘুঙুর (গিরিরি বললু), নাচের সময় হাতের রিং এবং পায়ের ঘুঙুর থেকে শব্দ হয়। গায়ে কোনো কাপড় নেই, গহনার প্রাচুর্য্য। কান্তারু নৃত্যের সঙ্গে গান গাওয়ার জন্য অনেক গান আছে। সব গানই প্রাচীন কাল থেকে চলে আসছে। বেশী গানই কাণ্ডির রাজা রাজাধিরাজসিংহের সময় রচিত। তিনিও নিজে অনেক গান রচনা করেছেন। গানের উদ্দেশ্য ত্রিরত্ন অর্থাৎ বুদ্ধ, ধর্ম, সঙ্ঘকে নমস্কার এবং রাজার গুণগান করা। রাজাদের 'নৃত্যমণ্ডপ' থাকত, সেখানে নাচগান হ'ত। নর্ত্তকরা রাজার অনুগ্রহ পেত, জমি ভোগ করত।

উডেক্কি নৃত্য নাচের সময় হাতে ডমরু থাকে। কাঙ্কেরি নৃত্যে হাতে কিছু থাকে না।

কাণ্ডির সব নৃত্যই বীররসোচিত। কাণ্ডির 'পেরহেরা'র সময় যখন একদল নৃত্য ক'রে চলে রাজপথ দিয়ে, ঢোল দামামা প্রভৃতি নানা বাদ্য নিয়ে, বীররসটাই মনে আছে, যেন যুদ্ধ জয়ের উৎসব। প্রাচীন যুগের একটি চিত্র মনে ভেসে উঠে। বিজয়সিংহ যখন দেশ জয় ক'রে তার সৈন্য-বাহিনী নিয়ে চলেছিল এমন নৃত্য হয়েছিল কি?

পেরহেরা ও অন্যান্য ধর্ম্মানুষ্ঠানের সঙ্গে নৃত্যের সম্বন্ধ। এমনি শুধু আমোদপ্রমোদের জন্য বোধ হয় নৃত্যের রীতি নেই। মেয়েদের নৃত্যের যে চলন নেই তা বলাই বাহুল্য। আমাদের দেশে দেবদাসী বা নাচওয়ালী মেয়ে আছে, সেরূপ কিছু সিংহলে নেই।

পেরহেরা

আগষ্ট মাসে কাণ্ডিতে 'পেরহেরা' বা মিছিল পনর দিন ধ'রে চলতে থাকে। 'দন্তধাতু' বুদ্ধের দন্তচিহ্ন হাতীর পিঠে চড়িয়ে, বিরাট শোভাযাত্রা প্রতিদিন রাত্রে বার করা হয়। চারিটি মন্দির থেকে নাথ দেবল (দেবালয়), বিষ্ণু দেবল, কাতর গান দেবল, সমন দেবল থেকে শোভাযাত্রা বেরয় এবং আদাহন মালুয়া বিহারে গিয়ে সমবেত হয়।

পেরহেরার সময় কাণ্ডির রাজপথে লোকারণ্য। সমস্ত

সিংহল থেকে লোক এসে জড়ো হয়েছে। পানশালা, পান্থশালা, হোটেল সব ভর্ত্তি। রাস্তার দু-পাশে লোক ভিড় ক'রে রয়েছে, সারি বেঁধে, উদ্‌গ্রীব হয়ে—কখন মিছিল বেরয়। রাত্রির অন্ধকারে মশালালোক অনতিদূরে দেখা গেল।

কাণ্ডির শেষ রাজা শ্রীবিক্রমরাজ সিংহ (১৭৯৮—১৮১৫)
কলার প্রভৃতি পোষাকে ডাচদের প্রভাব আছে।
মাথায় সোনার মুকুট

সকলে হাতজোড় ক'রে সেদিকে মুখ ক'রে মাথায় ঠেকাল, বলল 'সাধু, সাধু'। বৌদ্ধরা তীর্থযাত্রায় বিহারে 'সাধু' উচ্চারণ করে। বিরাটকায় হাতী 'দন্তধাতু' বহন ক'রে ধীরমন্থর গতিতে চলেছে। নানা কারুকার্য্যময় অলঙ্কার ও কাপড়ে সাজান অনেক হাতীর সারি শোভাযাত্রায় প্রাচ্য-সুলভ গাম্ভীর্য্য দান করেছে। কোন শোভাযাত্রা হাতী ছাড়া যেন হ'তে পারে না। এই প্রসঙ্গে ঢাকার জন্মাষ্টমী মিছিলের কথা স্মরণ হ'তে পারে। কিন্তু ঢাকার মিছিল যেন এর তুলনায় হীনপ্রভ, ঢাকার শিল্পের কিছু পরিচয় পেলেও যেন প্রাচীন থেকে আধুনিক খেলো নভেলে নেমে এলাম। প্রাচীনের ভিতর যে একটা আভিজাত্য আছে তা ঢাকার মিছিলে নেই, কাণ্ডির তুলনায় যেন তা 'ইতর শ্রেণীর'।

কাণ্ডির পেরহেরা বৌদ্ধ সিংহলের জাতীয় এবং ধর্ম্ম জীবনের সহিত সংশ্লিষ্ট। শিল্পী এর জন্য কারুকার্য্যময় অলঙ্কার, কাপড় প্রভৃতি নির্ম্মাণ করেছে, সঙ্গীতকার দিয়েছে সঙ্গীত, নৃত্যকার দিয়েছে সকল দেহে ছন্দ। পেরহেরা যেন জাতীয় সকল শিল্পপ্রচেষ্টার বিরাট প্রদর্শনী। যে কাণ্ডির পেরহেরা দেখেনি সে সিংহলের কিছুই দেখে-নি বললেই হয়।

মশালালোকে চতুর্দ্দিক ঝলসিত। মুসলমানেরা মশাল বহন ক'রে চলেছে। ঘন ঘন 'সাধু সাধু' ধ্বনি। নৃত্য গীত এবং নানা প্রকার সঙের সমাবেশ। মাঝে মাঝে দু-একটি লোক বিচিত্র বেশে সজ্জিত হয়ে দীর্ঘ রজ্জু নিয়ে বিচিত্র ভঙ্গীতে চারদিকে ঘুরিয়ে মাটিতে বার-বার আঘাত ক'রে রাস্তা ফাঁক ক'রে নিচ্ছে— যখন দুই দিকের ভিড়ের চাপ ভিতরে এসে পড়ছে।

আমাদের বিখ্যাত রাইবেঁশে নৃত্যে গতি আছে, কিন্তু বড়ই শাদামাঠা কাণ্ডির নৃত্যে গতি সাজসজ্জা দুই-ই আছে। শ্রীযুক্ত গুরুসদয় দত্ত মহোদয় রাইবেঁশে নৃত্য আবিষ্কার করেছেন, তাঁর কাণ্ডির নৃত্য দেখা উচিত, সেখানে তিনি নিশ্চয়ই এক নতুন রূপলোকের সন্ধান পাবেন। কাণ্ডির নৃত্যে হাতপায়ের বিপুল আন্দোলন এলোরা গুহার মহাদেবের তাণ্ডব নৃত্যেরই মত। সঙ্গীত যখন সকলের ঐকতানে মাঝে মাঝে চীৎকারে পর্য্যবসিত হয়— ঢক্কানিনাদ তার সঙ্গে মিলে, প্রজ্জ্বলিত মশালের তীব্র আলো, অন্ধকার, ছায়া, সকলের সমাবেশে নৃত্যটিকে ভীষণ মধুর ক'রে তোলে।

'দন্তধাতু' ও দালদা মালিগাওয়া

বুদ্ধের দন্তচিহ্ন যে-মন্দিরে রাখা আছে, তার নাম দালদা মালিগাওয়া বিহার। ইংরেজীতে এই মন্দিরকে বলে Tooth-relic Temple। এই বিহারের কর্ত্তৃত্ব যাঁর উপরে আছে, তাঁকে বলা হয় 'দিয় বডন নিলাম'। পূর্ব্বে কাণ্ডির রাজা কোনো প্রদেশের অধিপতিকে এ-কার্য্যে নিযুক্ত করতেন। এটি খুব সম্মানজনক পদ। এখন নিযুক্ত ক'রে থাকে গবর্ণমেণ্ট। বর্ত্তমানে মুগ বেল প্রদেশের জমিদার এ-কাজে নিযুক্ত আছেন। তিনি আবার

পেরহেরা বা মিছিলের কর্ত্তা— মিছিলের সঙ্গে সঙ্গে তাঁরও হেঁটে চলতে হয়, মিছিলকে চালনা ক'রে। চারটি মন্দির থেকে যে চারটি মিছিল বেরয়, তার ভার থাকে কাণ্ডির চার জন জমিদারের উপর। সকলের উপরে থাকেন ন্নুগ বেল।

দালদা মালিগাওয়াতে 'দন্তচিহ্ন' যে পেটিকাতে থাকে তা চাবি দিয়ে বন্ধ ক'রে রাখা হয়, তীর্থযাত্রীদের দর্শনের জন্য বছরের ভিতর একবার খোলা হয়। তিনটি চাবি আছে, একটি থাকে ন্নুগ বেলের কাছে, একটি মন্দিরের প্রধান যাজকের কাছে, অপরটি গবর্মেণ্টের জিম্মায়।

এই 'দন্তধাতুর' অনেক কাহিনী আছে। সিংহলের প্রাচীন ইতিহাসে প্রকাশ—কলিঙ্গের রাজা ছিল গুহাসিংহ, সেখান থেকে সিংহলে 'দন্তধাতু' আনা হয়। বিদেশী শত্রু কলিঙ্গ-রাজ্য আক্রমণ করে; 'দন্তধাতু' যাতে শত্রুর কবলে না পড়ে, সেজন্য গুহাসিংহের ভ্রাতুষ্পুত্র দণ্ডকুমার ও কন্যা হেমবালির সঙ্গে 'দন্তধাতু' সিংহলে পাঠিয়ে দেন। সিংহলের রাজা মহাসেন ছিলেন গুহাসিংহের বন্ধু; কিন্তু দণ্ডকুমার ও হেমবালির সিংহলে পৌঁছাবার পূর্ব্বেই মহাসেন গত হন। তাঁর পুত্র শীল মেঘবর্ণ সিংহাসনে আরোহণ করেন। তিনি অনুরাধাপুরে বিহার নির্ম্মাণ ক'রে 'দন্তধাতু' স্থাপিত করেন।

অনুরাধাপুরের পর রাজধানী পোলানারুয়া, দেল গামুয়া, সীতাবাক্ প্রভৃতি স্থানে স্থানান্তরিত হয়। শেষে আসে কাণ্ডিতে। 'দন্তধাতু' সঙ্গে সঙ্গে বিভিন্ন স্থানে ঘোরে। বর্ত্তমানে কাণ্ডির দালদা মালিগাওয়া বিহারে আছে। কাণ্ডির শেষ রাজা এই মন্দিরের অংশ-বিশেষ এবং প্রবেশদ্বার নির্ম্মাণ

কাণ্ডির শেষ রাজ্ঞী

করেন। ভিতরের চত্বরে কারুকার্য্যখচিত সুদৃশ্য স্তম্ভ, এবং মন্দিরের দেওয়ালে চিত্র আছে। এ-সব চিত্র অবশ্য ফোক আর্ট— আমাদের পটের চিত্রের মত।

মাতৃ-ঋণ

শ্রীসীতা দেবী

৩৭
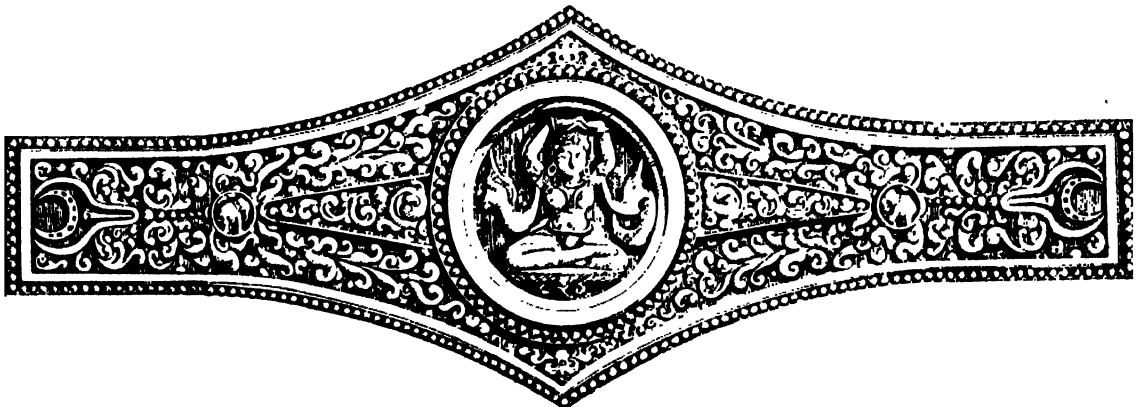
দার্জ্জিলিঙের অমন যে ঠাণ্ডা রাত্রি তাহাতেও সুরেশ্বরের ঘুম হইল না। সারাটা রাত এপাশ-ওপাশ করিয়াই তাহার কাটিয়া গেল। তাহার মস্তিষ্কে যেন আগুন লাগিয়া গিয়াছে, স্নায়ুমণ্ডলীতেও প্রলয় কাণ্ড ঘটিতে বসিয়াছে, ঘুমাইবে সে কোথা হইতে? তাহার ছটফটানি শেষে এতটাই বাড়িয়া উঠিল যে, শিশিরেরও ঘুম ছুটিয়া গেল। সে জিজ্ঞাসা করিল, "দাদা, তোমার অসুখ করেছে না কি?"

সুরেশ্বর বলিল, "নাঃ, অসুখ করতে যাবে কেন? পিশু না ছারপোকা কিসে কাম্ড়ে অস্থির করছে।"

দাদার স্বাস্থ্য সম্বন্ধে নিশ্চিন্ত হইয়া শিশির আবার নাক ডাকাইয়া ঘুমাইতে আরম্ভ করিল।

ভোরের আলো ফুটিয়া উঠিবামাত্র সুরেশ্বর চট্‌ করিয়া উঠিয়া পড়িল। চাকর দুইজন সবে উঠিয়া তখন হাতমুখ ধুইতে সুরু করিয়াছে, বেশ নিশ্চিন্ত আছে যে এখনও অন্ততঃ ঘণ্টা-তিন তাহারা স্বাধীনভাবে চলিতে ফিরিতে পারিবে। কিন্তু গরম ড্রেসিং গাউন-পরা সুরেশ্বরকে সামনে দেখিয়া তাহারা হতবুদ্ধি হইয়া গেল। যে-মানুষ জ্যৈষ্ঠ মাসে কলিকাতায়ও আটটার আগে উঠে না তাহার আজ হইল কি?

সুরেশ্বর তাহাদের কল্পনাশক্তির অপব্যবহার হইতে নিষ্কৃতি দিয়া বলিল, "শীগ্‌গির আমায় এক পেয়ালা চা করে দে, আমি বেড়াতে বেরব।"

ভৃত্যদ্বয় প্রস্থান করিল রান্নাঘরের অভিমুখে। সুরেশ্বর বসিবার ঘরটার মধ্যে অস্থির ভাবে পায়চারি করিতে লাগিল। যামিনী এতক্ষণ কি করিতেছে কে জানে? ঘুমাইয়া আছে না জাগিয়া? জ্ঞানদা নিশ্চয়ই তাহাকে খবরটা শুনাইয়াছেন। শুভকর্ম্মে অযথা কালবিলম্ব করিবার মানুষ তিনি নন। যামিনী শুনিয়া কি ভাবিল? খুশী হইয়াছে কি? হওয়াই ত সম্ভব। সুরেশ্বর অযোগ্য কিসে? রূপ আছে, ধন আছে, বংশ-মর্য্যাদা আছে, বিদ্যাও চলনসই রকম আছে। টাকার যখন অভাব নাই, তখন বিলাত গিয়া একটা ছাপ মারিয়া আসিতেই বা কতক্ষণ? এমন বর যদি যাচিয়াই একরকম হাজির হয়, তাহা হইলে খুশী হইবে না এমন মেয়ে এই বাংলা দেশে আছে না কি? তবে যামিনী মেয়েটির মন কেমন যেন রহস্যের অবগুণ্ঠনে আবৃত, কিছুই তাহার ভাল করিয়া বুঝা যায় না। সুরেশ্বরের সঙ্গে আলাপ ত তাহার বেশ কিছুদিন হইল হইয়াছে, কিন্তু তাহার মনের কোনো একটা তুচ্ছ কথাও সুরেশ্বর জানে কি? একেবারে কিছুই জানে না। যামিনী নিজে হইতে কখনও একটা কথাও হয়ত সুরেশ্বরের সঙ্গে বলে নাই, কেবল সুরেশ্বরের প্রশ্নের উত্তর দিয়াছে মাত্র। সাধারণ মেয়ে যে-জিনিষকে সৌভাগ্য মানিয়া বরণ করিয়া লইবে, যামিনী যে সেটাকে কি ভাবে গ্রহণ করিবে, তাহা ঠিক বুঝা যায় না। সেইজন্যই ত সুরেশ্বরের এত আগ্রহ, এত অস্থিরতা। সে একবার এই মেয়েটিকে কাছে পাইতে চায়, তাহার-মনের উপরের অবগুণ্ঠন টানিয়া সরাইয়া দেখিতে চায়, তাহার অন্তরলোকে কি আছে, কে আছে। তাহার হরিণ-নয়নে প্রেমবিহ্বল দৃষ্টি দেখিতে চায়, তাহার পাষাণপ্রতিমার মত অনিন্দনীয় সুন্দর, অথচ ভাবহীন মুখে হৃদয়াবেগের রক্তোচ্ছ্বাস দেখিতে চায়। সে সৌভাগ্য এখনও কি বহু দূরে? না আজই তাহার কাল্পনিক সুখস্বর্গের দ্বার তাহার জন্য উন্মুক্ত হইবে?

চাকর ডাকিয়া বলিল, "বাবু, চা দেওয়া হয়েছে।"

সুরেশ্বর খাবার ঘরে ঢুকিয়া চা পান করিতে বসিল। তাহার পর চেয়ার ঠেলিয়া দিয়া উঠিয়া পড়িয়া বলিল, "দেখ, আমি বেড়াতে বেরচ্ছি। যদি আমার নামে কেউ চিঠিপত্র নিয়ে আসে, তাহ'লে তাকে একটু বস্‌তে বল্‌বি।" বলিয়া বেড়াইবার পরিচ্ছদ পরিবার জন্য শুইবার ঘরে ঢুকিয়া গেল। আবার এক মিনিট পরেই বাহিরে আসিয়া বলিল, "না, লোক বসিয়ে রাখবার দরকার নেই। বলিব

বাবু কার্ট রোড ধরে ঘুমের দিকে গেছেন, পা চালিয়ে গেলেই তাঁকে ধরতে পারবে। পাঠিয়ে দিবি অমনি, বুঝলি?"

চাকর বলিল, "যে আজ্ঞে।" সুরেশ্বর আবার ঘরে ঢুকিয়া গেল। দার্জ্জিলিং আসিবার নাম করিয়া, গরম কাপড় দুই ভাইয়ে মিলিয়া একরাশ তৈয়ারি করাইয়াছে, সবক'টা এ যাত্রা পরিয়া উঠিতে পারিলে হয়। সুরেশ্বর অবশ্য চেষ্টার ত্রুটি করিতেছে না। শিশিরের এদিকে তত উৎসাহ নাই। আসিয়া অবধি একটা হাফপ্যাণ্ট এবং কোট ছাড়া আর কিছু বাহিরই করে নাই।

পোষাক পরা শেষ করিয়া একটা ছড়ি হাতে করিয়া সুরেশ্বর বাহির হইয়া পড়িল। বাড়ি হইতে খানিকটা পথ নামিয়া গিয়া তবে কার্ট রোড। সে পথটা খুব তাড়াতাড়িই সে নামিয়া আসিল। কিন্তু কার্ট রোডে পড়িয়াই ধীরে ধীরে চলিতে সুরু করিল। বেশী জোরে হাঁটিলে যদি আবার পিছনের লোক তাহার সন্ধান না পায়? পিছনে যে লোক পত্র বহন করিয়া নিশ্চয়ই আসিতেছে এ-বিষয়ে সুরেশ্বরের বিন্দুমাত্রও সন্দেহ ছিল না। যামিনীকে সে না চিনিয়া থাক, জ্ঞানদাকে একরকম ভাল করিয়াই চিনিয়াছিল।

ধীরে ধীরে হাঁটিতে হাঁটিতেও সুরেশ্বর বেশ খানিক দূর চলিয়া আসিল। কতবার পিছন ফিরিয়া যে দেখিল তাহার ঠিকানা নাই। লোক অবশ্য অনেক দেখা গেল, কিন্তু তাহাদের ভিতর কেহই সুরেশ্বরের জন্য পত্র বহন করিয়া আসিতেছে না। সে ক্ষুণ্ণও হইল, বিস্মিতও হইল। তবে কি নৃপেন্দ্রবাবু তাহার প্রস্তাবে সম্মত হন নাই? না যামিনীই আপত্তি করিয়াছে? সুরেশ্বরের একটু একটু রাগও হইতে লাগিল। সে কি এমনই পাত্র, যাহাকে যে-কেহ হেলায় প্রত্যাখ্যান করিতে পারে? নৃপেন্দ্রবাবুর না-হয় কলিকাতায় একখানা বাড়িই আছে, আর তাঁহার কি সম্পত্তি আছে? অমন বাড়ি সুরেশ্বর ইচ্ছা করিলে দশখানা করিতে পারে, এক বৎসরের মধ্যেই। আর যামিনী? সেও কি সুরেশ্বরকে প্রত্যাখ্যান করিতে পারে? না-হয় সে সুন্দরী, খুবই সুন্দরী এবং লেখাপড়া, গানবাজনা, ছবি-আঁকা সবই জানে, তাই বলিয়া এমন একটা কিছু নয় যাহা বাংলা দেশে আর মেলে না। লেখাপড়া শিখিতেছে ত আজকাল কত মেয়েই? আর সুন্দরের কথা যদি বল, সুরেশ্বরের আত্মীয়াদের ভিতর এখনও এমন রূপবতী আছেন, যাঁহাদের দেখিলে লোকের দুর্গাপ্রতিমা বলিয়া ভ্রম হয়।

অনেক দূর সে আসিয়া পড়িয়াছিল, আর তাহার অগ্রসর হইতে ইচ্ছা করিল না। ফিরিয়াই চলিল। পথেও জ্ঞানদার চিঠির সন্ধান পাইল না।

বাড়ি আসিয়াই যে-চাকরটাকে সামনে পাইল তাহাকে এক তাড়া দিয়া বলিল, "তোদের দিয়ে যদি কোনো কাজ হবার জো আছে। লোকটাকে পাঠাস্ নি কেন?"

চাকরটা থতমত খাইয়া বলিল, "আজ্ঞে লোক ত কেউ আসেনি?"

সুরেশ্বর গট্ গট্ করিয়া শুইবার ঘরে ঢুকিয়া গেল। শিশির তখনও মহানন্দে ঘুমাইতেছে। টুপিটা খুলিয়া আলনার দিকে ছুঁড়িয়া দিয়া সুরেশ্বর উঁচু গলায় বলিল, "খালি পড়ে পড়ে ঘুমোবার জন্যে এখানে এসেছিস্ না কি? আটটা বাজে, এখনও নবাবের ঘুম ভাঙল না।"

শিশিরের ঘুম ছুটিয়া গেল। তবু লেপের মায়া অত সহজে ত্যাগ করা যায় না। খানিকটা এপাশ-ওপাশ করিয়া তাহার পর সে উঠিয়া বসিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "কি হয়েছে?"

সুরেশ্বর চটিয়া বলিল, "হবে আবার কি? সকাল হয়েছে। উঠে বেড়াতে যাও। এই রকম করলে শরীর যা সারবে, তা বোঝাই যাচ্ছে।"

শিশির উঠিয়া গেল, তবে খাওয়ার সন্ধানেই গেল, বেড়ানোর সন্ধানে নয়। এত ঠাণ্ডায় বাহির হওয়াতে তাহার মারাত্মক রকম আপত্তি ছিল। নিতান্ত মিহির আসিয়া টানাটানি না করিলে সে কোনদিনই রোদ ভাল করিয়া উঠিবার আগে বাহির হইত না।

সুরেশ্বর বাহিরের জুতা ছাড়িয়া একজোড়া কাজ-করা কার্পেটের জুতা পরিয়া ছোট বাগানটার মধ্যে বাহির হইয়া আসিল। এখন যাওয়া যায় কোথায়? এখানে তাহারা আগে কখনও আসে নাই, সুতরাং পথঘাটের সঙ্গে পাকাপাকি পরিচয় এখনও হয় নাই। তাহার চেনাশোনা লোকও এখানে কেহ নাই, ঐ এক বাড়ি ছাড়া। কি করিয়া দিনটা কাটান যায়?

বাগানেই দু-চার পাক ঘুরিয়া সে আবার ঘরে গিয়া

ঢুকিল। শিশির তখনও বসিয়া খাইতেছে দেখিয়া তাহার চটা মেজাজ আরও খানিকটা চটিয়া গেল। তাহাকে ধমক-ধামক করিয়া বাড়ি হইতে বাহির করিয়া তবে ছাড়িল। শিশির যে দাদার খুব বেশী বাধ্য তাহা নয়, তবে বিদেশে-বিভুঁয়ে নিতান্তই এখন সে দাদার হাতের মুঠিতে আসিয়া পড়িয়াছে, কাজেই তাহাকে বেশী ঘাঁটাইতে ভরসা করিল না। কলিকাতার বাড়ি হইত, আর মা কাছে থাকিতেন, তাহা হইলে সে দেখিয়া লইত। সম্প্রতি ক্রুদ্ধ দৃষ্টিতে দাদার দিকে তাকাইতে তাকাইতে সে বাহির হইয়া গেল।

সুরেশ্বর আর ধৈর্য্য ধরিতে পারিল না। চিঠির কাগজের প্যাড এবং কলম লইয়া টেবিলের কাছে আসিয়া বসিল। একটা খবর না পাইলে আর ত চলে না, কিন্তু কাহার কাছে চিঠিখানা লিখিবে। যামিনীকে লিখিতে পারিলেই হইত ভাল, কিন্তু তাহার কাছে আসল খবর কিছুই পাওয়া যাইবে না। এমন কি একেবারে কোনো উত্তর না পাওয়াও বিচিত্র নয়। নৃপেন্দ্রবাবুকে লিখিতে তাহার সাহস হইল না, তিনি সম্প্রতি সুরেশ্বরের সম্বন্ধে কিরূপ মনোভাব পোষণ করিতেছেন, তাহা জানা ত নাই। মিহিরকে লিখিয়া কোনই কাজ হইবে না, সুতরাং বাকি থাকেন জ্ঞানদা। তাঁহাকেই লিখিতে বসিল। দুই-তিনবার চিঠি আরম্ভ করিয়া কাগজ ছিঁড়িয়া ফেলিয়া দিল। অবশেষে সংক্ষেপে দুই চার লাইন লিখিয়াই লেখা শেষ করিয়া, চিঠি খামে পূরিয়া বন্ধ করিয়া ফেলিল। লিখিল যে গতকাল তাঁহার শরীর কিঞ্চিৎ অসুস্থ দেখিয়া আসিয়াছে, আজ কেমন আছেন, জানাইয়া সুরেশ্বরকে নিশ্চিন্ত করিবেন।

চিঠিতে নাম লিখিয়া চাকরের হাতে পাঠাইয়া দিয়া সুরেশ্বর বসিয়া বসিয়া ভাবিতে লাগিল, এই চিঠিতেই কাজ হইবে। জ্ঞানদা অতিশয় বুদ্ধিমতী, বুঝিতেই পারিবেন যে কেবলমাত্র তাঁহার শরীরিক কুশল-জিজ্ঞাসার জন্যই চিঠিখানা লেখা হয় নাই। কি খবর জানিবার জন্য যে সুরেশ্বর উদ্‌গ্রীব হইয়া আছে, তাহা তাঁহার জানাই আছে। কোনও কারণে এতক্ষণ খবর দিতে পারেন নাই, এখন নিশ্চয়ই দিবেন। সুরেশ্বরের চাকরের সঙ্গে সঙ্গে নিশ্চয়ই তাঁহারও চাকর নিমন্ত্রণের চিঠি বহন করিয়া আসিয়া উপস্থিত হইবে।

কলিকাতা হইতে আসিবার সময় সাহেবী দোকান হইতে সে কয়েকখানা ইংরেজী উপন্যাস কিনিয়া আনিয়াছিল। এতদিন সে-সব নাড়িয়া-চাড়িয়া দেখিবার সময় হয় নাই। আজ আর কিছু করিবার যখন খুঁজিয়া পাইল না, তখন বইয়ের প্যাকেটটা টানিয়া আনিয়া খুলিয়া বসিল। সব ক'খনা উল্টাইয়া-পাল্টাইয়া দেখিল, কোনটাই বিশেষ লোভনীয় বোধ হইল না। কিন্তু চাকর ফিরিয়া আসা পর্য্যন্ত সময়টা কোনমতে ত তাহাকে কাটাইতে হইবে? সে পূরা এক ঘণ্টার ব্যাপার। একে ত পাহাড়ে রাস্তায় হাঁটিতেই গজাননের অত্যধিক সময় খরচ হইয়া যায়। তাহার পর সেখানে পৌছিয়া খানিকটা তাহাকে বসিতেও হইবে। এ ত আর যে-সে চিঠি নয় যে পাইবামাত্র যেমন হয় দু-লাইন জবাব লিখিয়া চাকরকে বিদায় করিয়া দিলেই চলিবে? কর্ত্তাগিন্নীর পরামর্শ হইবে, হয়ত বা যামিনীরও ডাক পড়িবে। তাহার পর চিঠি লেখা হইবে, চাকরকে দেওয়া হইবে। গজাননচন্দ্র যে এই সুযোগে ও-বাড়ির চাকরদের সঙ্গে এক পালা গল্পও করিয়া লইবে না, তাহাও বলা যায় না। জমিদারবাবুর বিবাহ, অতি খোশ খবর। তাহারা এতদিন ভাল করিয়া কিছুই জানিতে পারে নাই বলিয়াই তাহাদের আগ্রহটা হইবে বেশী।

বই উল্টাইতে উল্টাইতে এবং নানা ভাবনা ভাবিতে ভাবিতে খানিকটা সময় কাটিয়া গেল। দূরে রাস্তায় গজাননের মূর্ত্তি দেখা গেল। একলাই আসিতেছে সে, সঙ্গে কোনো চাকর নাই। লক্ষ্মীছাড়ার হাঁটিবার রকম দেখ না, যেন সদ্য আজ হাঁটিতে শিখিয়াছে। সুরেশ্বরের ইচ্ছা করিতে লাগিল যে ছুটিয়া গিয়া হতভাগার ঘাড় ধরিয়া টানিয়া লইয়া আসে। কিন্তু জমিদারী গাম্ভীর্য্য বজায় রাখিয়া তাহাকে যথাস্থানে বসিয়া থাকিতে হইল।

গজানন আসিয়া একখানা চিঠি প্রভুর হাতে দিয়া সরিয়া গেল। সুরেশ্বর অধীরভাবে খামখানা নির্ম্মভাবে ছিঁড়িয়া ফেলিয়া চিঠিটা টানিয়া বাহির করিল।

নিমন্ত্রণ-পত্র একেবারেই নয়। জ্ঞানদা লিখিয়াছেন তাঁহার শরীর অত্যন্ত অসুস্থ। ডাক্তার নড়াচড়া, এমন কি কথা বলা পর্য্যন্ত বারণ করিয়া দিয়াছেন। একটু সুস্থ হইলেই তিনি সুরেশ্বরকে খবর দিবেন।

আর কোনো সংবাদই নাই। সুরেশ্বর চিঠিখানা দলা

পাকাইয়া ছুঁড়িয়া ফেলিয়া দিল, তাহার মুখ ভীষণ ভ্রুকুটিকুটিল হইয়া উঠিল। আচ্ছা সেও দেখিয়া লইবে।

৩৫

সকাল হইতেই বাড়িটা কেমন যেন স্তব্ধ হইয়া আছে। জ্ঞানদা সারারাত ঘুমান নাই, অনেক রাত পর্য্যন্ত ত নৃপেন্দ্রবাবুর সঙ্গে তর্কাতর্কি ঝগড়া করিয়াছেন। যামিনী অপরিণামদর্শী এবং অতি নির্ব্বোধ, তাহার নিজের জীবন যেদিকে খুশী চালিত করিবার কোনো অধিকার জন্মে নাই, তাহাকে এখনও সব বিষয়েই পিতামাতার নির্দ্দেশ মানিয়া চলিতে হইবে, এই ছিল জ্ঞানদার বলিবার বিষয়। কিন্তু নৃপেন্দ্রকৃষ্ণের বয়স হইয়াছে বটে, তবু বুদ্ধি প্রায় যামিনীরই মত, তিনি একথা বুঝিয়াও বুঝিতে চান না। যামিনী যখন সুরেশ্বরের সহিত বিবাহে অমত করিতেছে, তখন কিছুতেই এ বিবাহ দেওয়া চলে না। যামিনী সেই যে মায়ের ঘর হইতে পলাইয়াছে, আর সেখানে ঢোকে নাই। অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত অভিভূতের মত খাবার-ঘরে বসিয়াছিল, তাহার পর না খাইয়া-দাইয়াই মিহিরের বিছানায় গিয়া শুইয়া পড়িয়াছে। মিহিরকে অগত্যা বাধ্য হইয়া মায়ের ঘরে যামিনীর খাটে গিয়া শুইতে হইয়াছে। তাহাতে তাহার অবশ্য ঘুমের ব্যাঘাত কিছু ঘটে নাই। বেলা নয়টা অবধি সে নিরুপদ্রবে ঘুমাইয়া গিয়াছে।

রাতজাগা এবং অস্বাভাবিক উত্তেজনার ফলে জ্ঞানদার অসুখ আবার বাড়িয়াছে। কাহাকেও কাছে আসিতে দিতেছেন না, একলাই শুইয়া আছেন। নৃপেন্দ্রবাবু ডাক্তার ডাকিতে চাওয়াতে বলিয়াছেন, "তোমাদের আর দরদ দেখাতে হবে না। ডাক্তার আনলে আমি ঘরে খিল দিয়ে থাকব।"

বেলা ন'টা বাজে, এখন পর্য্যন্ত জ্ঞানদাকে কিছুই খাওয়ানো যায় নাই। আয়া দুই-চারিবার খাওয়াইবার চেষ্টা করিয়া তাড়া খাইয়া ফিরিয়া আসিয়াছে। নৃপেন্দ্রবাবু গেলে কোনো কাজ হইবে না জানা কথাই, তাই তিনি আর যান নাই। যামিনীরও যাইবার ভরসা নাই। বাড়িসুদ্ধ কি যে করিবে কিছু ভাবিয়া পাইতেছে না।

এমন সময় সুরেশ্বরের চিঠি বহন করিয়া গজানন আসিয়া হাজির হইল। চিঠিখানা জ্ঞানদার নামে এবং খামখানা বন্ধ। অন্য সময় হইলে কর্ত্তাই চিঠিখানা খুলিয়া দেখিতেন কিন্তু আজ আর ভরসা করিলেন না, আয়ার হাত দিয়া গৃহিণীর কাছে পাঠাইয়া দিলেন।

চিঠি পড়িয়া জ্ঞানদার মুখ প্রলয়গম্ভীর হইয়া উঠিল। সুরেশ্বর যে অত্যন্তই অধীর হইয়া উঠিয়াছে তাহা বুঝিতেই পারিলেন। অধীর হইবারই ত কথা? এমন অদ্ভুত অবস্থায় কেহ চুপ করিয়া থাকিতে পারে? কি যে সে তাঁহাদের মনে করিতেছে, তাহা ভগবানই জানেন। জ্ঞানদার মত অবস্থায় যেন পরম শত্রুকেও না পড়িতে হয়। এত যে তাঁহার প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব, তিনিও এখন হতবুদ্ধি হইয়া গেলেন। কি লিখিবেন তিনি সুরেশ্বরকে? আয়াকে হুকুম করিলেন, "সাহেবকে ডেকে আন্।"

নৃপেন্দ্রকৃষ্ণ আসিয়া উপস্থিত হইলেন। চিঠিখানা তাঁহার দিকে ছুঁড়িয়া দিয়া জ্ঞানদা বলিলেন, "পড়ে দেখ। এখন আমি করব কি মাথা আর মুণ্ডু?"

নৃপেন্দ্রবাবু চিঠিখানা পড়িয়া, আবার ভাঁজ করিয়া খামে ঢুকাইয়া রাখিলেন। তাহার পর বলিলেন, "তা আর কি করা যাবে বল? লিখে দাও সত্যি অবস্থাটা, যে মেয়েকে জানান হয়েছিল, তার মত নেই। আমরা অত্যন্ত দুঃখিত—"

বাধা দিয়া জ্ঞানদা চীৎকার করিয়া উঠিলেন, "তোমাকে কি আমি রসিকতা করবার জন্যে ডেকেছি? আর কোনো বিবেচনা না থাক, আমি যে মরতে বসেছি অন্ততঃ সে বিবেচনাটুকু ত থাকা উচিত?"

নৃপেন্দ্রবাবু উঠিয়া পড়িয়া বলিলেন, "আমি যা বলব, তা-ই তোমার খারাপ লাগবে। আমাকে না ডাকলেই হয়, অনর্থক একটা রাগারাগি।" বলিয়া তিনি ঘর হইতে বাহির হইয়া গেলেন।

জ্ঞানদা খানিকক্ষণ গুম্ হইয়া বসিয়া রহিলেন। তাঁহার মাথাটা এত ঘুরিতেছিল যে পরিষ্কার করিয়া ভাবিতেও পারিতেছিলেন না কিছু। তাঁহার দিন ত ঘনাইয়া আসিতেছে, অথচ জীবনের সকল কাজই অসমাপ্ত থাকিয়া গেল। আর একটু বাড়াবাড়ি হইলেই তিনি ত বিদায় হইয়া যাইবেন। তখন যে-সংসারের জন্য, যে-ছেলেমেয়ের জন্য তিনি সারাটা জীবন প্রাণপাত করিয়া খাটিয়া গেলেন, সে-সংসার হইতে ভূতের বাথান, সে ছেলেমেয়ের দশা হইবে লক্ষ্মীছাড়ার মত। তাহারা না পাইবে সুশিক্ষা, না পাইবে আরাম বা মর্য্যাদা।

স্বামীটি এতবড় মূর্খ যে তাহার হাতে মানুষে ভরসা করিয়া একটা কুকুর বেড়াল ছাড়িয়া যাইতে পারে না ত ছেলেমেয়ে। আর অমন মেয়েটা! তাহার রাজরাণী হইবার যোগ্যতা ছিল, হইতও সে তাহা, কেবল স্বামীর অন্যায় প্রশ্রয়ে সকল দিক দিয়া মাটি হইয়া গেল। জ্ঞানদা আর বসিতে পারিলেন না, বিছানায় শুইয়া পড়িলেন।

আয়া বাহির হইতে খবর দিল যে চিঠি লইয়া যে-লোকটা আসিয়াছে, সে জবাবের জন্য অপেক্ষা করিতেছে।

জ্ঞানদা আবার উঠিয়া বসিলেন। আয়াকে দিয়া খাম, চিঠির কাগজ, দোয়াত কলম সব আনাইয়া লইলেন। তাহার পর অতি সাবধানে চিঠির জবাব লিখিয়া পাঠাইয়া দিলেন। যাক্ ঘণ্টা-কয়েক অন্ততঃ ভাবিবার সময় পাওয়া গেল।

কিন্তু একলা ভাবিয়াই বা তিনি করিবেন কি? তাঁহার বাস শত্রুপুরীতে, একটা কেহ তাঁহার সহায় নাই। যে-মেয়ের জন্য এত করিতেছেন, সে-ই তাঁহাকে শত্রু মনে করিয়া প্রাণপণে বিরুদ্ধাচরণ করিতেছে।

শরীরে তাঁহার অত্যন্ত অসোয়াস্তি, কিন্তু মনের যন্ত্রণা তাহার চেয়েও অধিক। কিছুতেই যেন তিনি শান্তি পাইতেছেন না। আয়া আর একবার খাইবার জন্য বলিতে আসিল, তাহাকে পাঠাইয়া দিলেন যামিনীকে ডাকিবার জন্য। আর একবার তাহাকে বুঝাইয়া দেখিবেন। সে কি নিজে নিজের ভবিষ্যৎ একেবারে নষ্ট করিবার জন্য উঠিয়া-পড়িয়া লাগিয়াছে?

যামিনী ধীরে ধীরে আসিয়া ঢুকিল। তাহারও মুখ মলিন শুষ্ক, চোখ দুইটা ফুলিয়া উঠিয়াছে। কোন কথা না বলিয়া মায়ের খাটের পাশে আসিয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

জ্ঞানদা বলিলেন. "বোস্ দেখি। তুই কি করতে বসেছিস্ বুঝতে পারছিস্? আমাকেও মারবি আর নিজেও চিরদিনের জন্যে মাটি হবি? আমি যা করতে চাই, তা যে তোর মঙ্গলের জন্যে তা বুঝিস্ না? এটুকু বিশ্বাস তোর নেই মায়ের উপরে?"

যামিনী কোন কথা বলিল না, খালি তাহার দুই চোখ দিয়া বড় বড় অশ্রুবিন্দু গড়াইয়া পড়িতে লাগিল।

জ্ঞানদার মন কিন্তু ইহাতে আরও কঠিন এবং বিরক্ত হইয়া উঠিল। মেয়ে যেন ন্যাকা। সংসারটা ভারি সহজ জায়গা কি-না, এখানে কাঁদিলেই অমনি জিতিয়া যাওয়া যায়। একটু ধমক দিবার সুরে বলিলেন, "কি একটা উত্তর দিতে পারিস্ না? আমিই খালি তোর অহিত করছি, আর গুষ্টিসুদ্ধ খালি তোর হিত করছে?"

যামিনী বলিল, "আমি পারব না মা," বলিয়া খাটের পাশের একটা চেয়ারে বসিয়া পড়িয়া, চেয়ারের হাতলে মুখ গুঁজিয়া কাঁদিতে লাগিল।

নৃপেন্দ্রবাবু দরজার বাহিরে ঘুরিয়া বেড়াইতেছিলেন। স্ত্রীর সামনাসামনি হইবার আর তাঁহার ইচ্ছা ছিল না। তবু মেয়ের কান্না দেখিয়া আর না পারিয়া ঘরে ঢুকিয়া পড়িলেন। যামিনীর পিঠে হাত রাখিয়া স্ত্রীকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, "ওকে অন্ততঃ একটু ভাববার সময় দাও? এত বড় একটা গুরুতর বিষয়ের মীমাংসা কখনও এক মিনিটে হয়ে যেতে পারে?"

জ্ঞানদা চীৎকার করিয়া বলিলেন, "হ্যাঁ গো হ্যাঁ, সব বুঝেছি আমি। আমি পাগল না, সবই আমি বুঝি। সবাই মিলে কি যুক্তি হচ্ছে তা কি আর আমি না জানি? কর কর, আমার সঙ্গেই শত্রুতা কর। কিন্তু আমার ছেলে-মেয়েকে আমার বিরুদ্ধে প্ররোচনা দিচ্ছ, তোমারও ভাল হবে না, এ আমি ব'লে দিলাম।"

নৃপেন্দ্রবাবু হতবুদ্ধির মত স্ত্রীর দিকে চাহিয়া রহিলেন, তাহার পর যামিনীকে টানিয়া তুলিয়া তাড়াতাড়ি ঘর হইতে বাহির হইয়া গেলেন।

যামিনী মিহিরের খাটে আবার মুখ গুঁজিয়া শুইয়া পড়িল। নৃপেন্দ্রবাবু খানিকক্ষণ খোলা জানালার পথে বাহিরের কুয়াসাচ্ছন্ন দৃশ্যের দিকে চাহিয়া রহিলেন। তাহার পর মেয়ের কাছে অগ্রসর হইয়া তাহার মাথায় হাত রাখিয়া বলিলেন, "চল মা, আমরা একটু বেড়িয়ে আসি। তোমার মাকে একটু একলা থাকতে দাও, আমরা সারাক্ষণ সামনে থাকলে ওঁর উত্তেজনা কমবে না।"

যামিনী উঠিয়া বসিল। বেশ পরিবর্ত্তন করিতে গেলে আবার মায়ের ঘরে যাইতে হয়। সে চেষ্টা না করিয়া, যাহা পরিয়া ছিল তাহারই উপরে ওভারকোট পরিয়া সে যাইবার জন্য প্রস্তুত হইল। চুলটা মিহিরের চিরুণী দিয়া আঁচড়াইয়া লইল।

পিতা ও কন্যাতে বেড়াইতে বেড়াইতে অনেক দূর চলিয়া গেলেন। বাড়ি ফিরিবার অনিচ্ছা ক্রমেই যেন তাঁহাদের প্রবল হইয়া উঠিতে লাগিল। জ্ঞানদার সম্মুখীন হইবার মত সাহস দু-জনের এক জনেরও ছিল না।

কিন্তু ঘুম ষ্টেশন পর্য্যন্ত আসিয়া পড়িয়া তাঁহারা নিতান্তই থামিতে বাধ্য হইলেন। সত্যই ত আর হাঁটিয়া কলিকাতা চলিয়া যাইতে পারিবেন না? ফিরিতে তাঁহাদের হইবেই, ইচ্ছা থাক বা নাই থাক। যামিনী নিজের হাতঘড়ি দেখিয়া বলিল, "অনেক দেরি হয়ে গেল বাবা, বাড়ি ফিরতে একেবারে বেলা দুটো বেজে যাবে।"

নৃপেন্দ্রবাবু বলিলেন, "তা হোক। ওঁকে ঠাণ্ডা হবার জন্যে একটু বেশী সময়ই দেওয়া দরকার ছিল," বলিয়া তিনি ধীর মন্থর গতিতে আবার ফিরিয়া চলিলেন।

কুয়াসা ভাল করিয়া কাটে নাই। একবার রোদ উঠিতেছে, আবার শুভ্র মেঘপুঞ্জে প্রকৃতিদেবীর মুখশোভা ঢাকিয়া যাইতেছে। যামিনী একরকম কোনোদিকে না তাকাইয়াই পিতার পিছন পিছন চলিতেছিল। তাহার হৃদয়ের ভিতর দারুণ অন্ধকার, বাহিরের আলোর দিকে তাকাইবার কোনো প্রবৃত্তি তাহার ছিল না।

নৃপেন্দ্রবাবু হঠাৎ আচমকা দাঁড়াইয়া গেলেন, যামিনী তাহার গায়ের উপর হুঁচোট্ খাইয়া পড়িতে পড়িতে সাম্‌লাইয়া গেল। নৃপেন্দ্রবাবু বলিলেন, "দেখ ত মা, আমাদের ভজু না? ঘোড়ায় চড়ে অমন ক'রে ছুটে আস্‌ছে কেন?"

যামিনী মুখ তুলিয়া চাহিয়া দেখিল। ঘোড়াটাকে চার হাতপায়ে আঁকড়াইয়া ধরিয়া একটি মানুষ এক রকম ঝুলিতে ঝুলিতে আসিতেছে। তাহাদের ভৃত্য বলিয়াই ত বোধ হয়, কিন্তু এমন ভাবে আসিতেছে কেন? কোন বিপদ-আপদ হইল না কি?

দুই জনেরই চলার গতি বাড়িয়া গেল, ঘোড়াটাও ক্রমে কাছে আসিয়া পড়িল। নৃপেন্দ্রবাবুকে দেখিয়া ভজু ঘোড়ার পিঠ হইতে একরকম গড়াইয়া নামিয়া পড়িল। নৃপেন্দ্রবাবু ব্যস্ত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি হয়েছে?"

ভজু হাঁপাইতে হাঁপাইতে বলিল, "আজ্ঞে মেমসাহেব পড়ে গিয়ে বেহুঁস হয়ে গেছেন?"

যামিনী কাঁদিয়া ফেলিল। নৃপেন্দ্রবাবু এদিক-ওদিক তাকাইয়া একটা রিক্‌শ দেখিতে পাইয়া, তাহাতেই চড়িয়া বসিলেন। বাহকদের প্রচুর বখ্‌সিস্ কবুল করাতে তাহারা দু-জনকেই রিক্‌শতে বসাইয়া প্রাণপণে দৌড়িয়া চলিল। ভজু আর ঘোড়ায় চড়িতে ভরসা পাইল না, সেটার লাগাম ধরিয়া টানিয়া লইয়া চলিল।

বাড়িতে পৌঁছিয়াই যামিনী ছুটিয়া গিয়া মায়ের ঘরে ঢুকিল। একমাত্র আয়া সেখানে বসিয়া কাঁদিতেছে, বাড়িতে আর কেহ নাই।

মিহির ডাক্তার ডাকিতে গিয়াছে। জ্ঞানদা খাটের উপর শুইয়া আছেন, জ্ঞান হইয়াছে কি-না ঠিক নাই, চোখ বন্ধ।

নৃপেন্দ্রবাবুও যামিনীর পিছন পিছন ঘরে ঢুকিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি ক'রে পড়ে গেলেন?"

আয়া কাঁদিতে কাঁদিতে যাহা বলিল, তাহার মর্ম্ম এই যে, মেমসাহেবকে কিছুতেই খাওয়াইতে না পারিয়া সে নিজে স্নান করিতে চলিয়া গিয়াছিল। খোকাবাবুও খাইয়া শুইয়াছিলেন, চাকররা রান্নাঘরে কাজ করিতেছিল। ইতিমধ্যে কি ঘটিয়াছে সে কিছুই জানে না। হঠাৎ কোলাহল শুনিয়া ভিজা কাপড়ে বাহিরে আসিয়া দেখে যে উপরে উঠিবার রাস্তায় মেমসাহেব অজ্ঞান হইয়া পড়িয়া আছেন, আর একটা পাহাড়ী কুলি তাঁহার স্যুটকেশটা পিঠে বাঁধিয়া হাঁদার মত দাঁড়াইয়া আছে। তাহাকে জিজ্ঞাসা করায় বলিল যে, মেমসাহেব ষ্টেশনে যাইবার জন্য তাহাকে রাস্তা হইতে ডাকিয়াছিলেন। কখন যে মেমসাহেব রাস্তায় গেলেন আর কুলি ডাকিলেন, তাহা সে জানে না। যাহা হউক, পয়সা দিয়া তাহারা কুলি বিদায় করিয়া দিয়াছে, আর মেমসাহেবকে ধরাধরি করিয়া বিছানায় আনিয়া শোয়াইয়াছে। খোকাবাবু ডাক্তার ডাকিতে গিয়াছেন।

নৃপেন্দ্রবাবু দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন, "এমন ক'রে নিজের প্রাণ নিজে নষ্ট করলে কি আর কে করতে পারে?"

যামিনী আকুল হইয়া কাঁদিতে লাগিল। মা যে তাহারই অবাধ্যতায় অভিমান করিয়া চলিয়া যাইতেছেন, এ দুঃখ সে ভুলিবে কি করিয়া? তাহার নিজের কথা ভাবিবার কি অধিকার ছিল? সে কেন নিজেকে বলিদান দিতে সম্মত হয় নাই?

আর কোনো দিন কি এই অপরাধ সে নিজে ভুলিতে পারিবে, না অন্য মানুষে ভুলিতে পারিবে? মাতৃহত্যার পাতক তাহার সারাটা জীবন কি কালিমাময় করিয়া রাখিবে না?

ডাক্তারও দেখিতে দেখিতে আসিয়া পড়িলেন, যামিনীকে সরাইয়া রোগিণীকে পরীক্ষা করিয়া দেখিলেন। তাহার পর বাহির হইয়া বলিলেন, "জ্ঞান একবার হ'তে পারে, কিন্তু অবস্থা অত্যন্তই সীরিয়াস্।"

যামিনী আবার মায়ের খাটের উপর পড়িয়া কাঁদিতে লাগিল। মিহির খাইবার ঘরে হতবুদ্ধির মত বসিয়া রহিল। ডাক্তার, আয়া এবং নৃপেন্দ্রবাবু মিলিয়া জ্ঞানদার পরিচর্য্যা করিতে লাগিলেন।

এমন সময় হন্ হন্ করিয়া সুরেশ্বর আসিয়া হাজির হইল। বেশভূষার বিশেষ পরিপাট্য নাই, মুখে ক্রোধের ছাপ সুস্পষ্ট। মিহিরকে সামনে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "তোমার মা কোথায়? কেমন আছেন?"

মিহির বলিল, "ঐ ঘরে। ডাক্তার বল্‌ছে তিনি আর বাঁচবেন্ না।"

সুরেশ্বর অবাক হইয়া দাঁড়াইয়া গেল। সে আসিয়াছিল জ্ঞানদার সঙ্গে একটা বোঝাপড়া করিতে, তিনি যে এমন ভাবে তাহাকে ফাঁকি দিয়া যাইবেন, তাহা সে ভাবে নাই।

ঘরের ভিতর হইতে নৃপেন্দ্রবাবু ডাকিয়া বলিলেন, "খোকা, এদিকে এস, তোমার মা তোমায় খুঁজছেন।"

মিহির ছুটিয়া জ্ঞানদার ঘরে ঢুকিয়া গেল। সুরেশ্বর ধীরে ধীরে আসিয়া দরজার সামনে দাঁড়াইল।

জ্ঞানদা চোখ খুলিয়া চাহিয়াছেন। কিন্তু কথা বলিবার শক্তি আর নাই। যামিনী তাঁহার একটা হাত ধরিয়া কাঁদিতেছে। মিহির গিয়া দিদির পাশে বসিয়া পড়িল।

যামিনী দরজার দিকে চাহিয়া সুরেশ্বরকে দেখিতে পাইল। হঠাৎ চোখ মুছিয়া মায়ের কানের কাছে ঝুঁকিয়া পড়িয়া বলিল, "মা, আমি তোমার কথা শুনব, আর অবাধ্য হব না।"

জ্ঞানদা হাত নাড়িতে চেষ্টা করিলেন, পারিলেন না। তাঁহার দুই চোখ দিয়া জল পড়িতে লাগিল।

নৃপেন্দ্রবাবু ইসারা করিয়া সুরেশ্বরকে কাছে আসিতে বলিলেন। সে আস্তে আস্তে আসিয়া দাঁড়াইল। যামিনী উঠিয়া গিয়া তাহার পাশে দাঁড়াইল। চোখের জলে তাহার মুখ ভাসিয়া যাইতেছে। কম্পিত কণ্ঠে সে বলিল, "মায়ের কাছে আপনি যে প্রস্তাব করেছিলেন, আমি তাতে সম্মতি জানাচ্ছি।"

সুরেশ্বর ধীরে ধীরে যামিনীর একখানি হাত নিজের হাতের মধ্যে তুলিয়া লইল। বলিবার কোনো কথা খুঁজিয়া পাইল না।

জ্ঞানদার মুখে যেন ক্ষীণ একটু হাসির রেখা দেখা দিল। তাহার পর চোখের দৃষ্টি দেখিতে দেখিতে স্থির হইয়া গেল।

সমাপ্ত
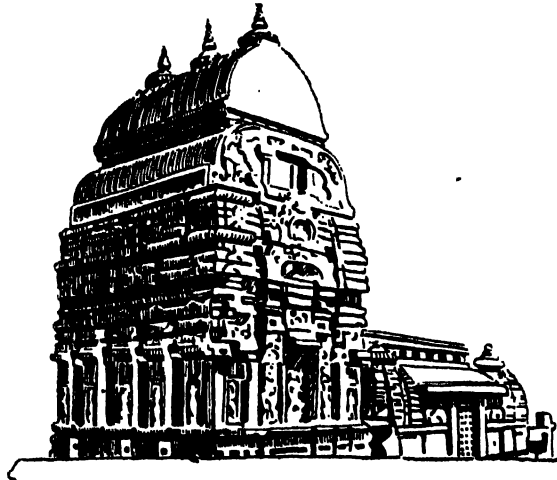
ক্রমবিকাশের সমস্যা*

শ্রীশশাঙ্কশেখর সরকার

ক্রমবিকাশের সমস্যা অধুনা বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখা-প্রশাখার মনীষিগণের গবেষণার লক্ষ্যস্থল হইয়া উঠিয়াছে। কি রাসায়নিক, কি পদার্থবিৎ, কি প্রাণিতত্ত্ববিৎ, কি উদ্ভিদতত্ত্ববিৎ, এমন কি মনস্তত্ত্ববিৎ পর্য্যন্ত সকলেই এই সমস্যার অন্তর্গত; আর এই প্রকারের গণপ্রচেষ্টা ব্যতীত এই সমস্যার মীমাংসা হওয়া দুরূহ।

প্রাণের উৎপত্তি কোথায়? জীবে প্রাণ আছে বা নাই, একথা বলা কিছুমাত্র কষ্টসাধ্য নহে, কিন্তু জীবিতের মধ্যে এরূপ কতকগুলি বিবিধ জটিল পন্থা আছে যাহার বা যাহাদের সহিত প্রাণের নিকট সম্পর্ক অস্বীকার করা চলে না। এই বিরাট জীবজগতে যত বড়ই জটিল কোন জীব বা উদ্ভিদ থাকুক না কেন, সকলেরই উৎপত্তি হইয়াছে একটি ক্ষুদ্র জীবকোষ হইতে। প্রত্যেক জীবদেহে নিম্নলিখিত পরিবর্ত্তনগুলি হইয়াই থাকে,—

(১) খাদ্য আহার করা;

(২) আহার্য্যবস্তুর পরিপাক করিয়া

(৩) জীবদেহের সূত্র (tissue) গঠনোপযোগী উপাদান প্রস্তুত করা;

(৪) নিঃশ্বাসপ্রশ্বাসকালে অম্লজান (oxygen) ও অঙ্গারাম্লজানের (carbon dioxide) আদান-প্রদান;

(৫) প্রবৃত্তি ও ইন্দ্রিয়বৃত্তির আকর্ষণ বিকর্ষণ;

(৬) জীবের অথবা জীবদেহের অঙ্গবিশেষের গতিবিধি;

(৭) দেহের অব্যবহার্য্য পদার্থসকল দেহমুক্ত করা, এবং সর্ব্বশেষে

(৮) জীবের জাতি বংশপরম্পরায় রক্ষা করা।

এই সকল দৈহিক ক্রিয়া জীবপঙ্ক (protoplasm) এবং তন্মধ্যবর্ত্তী একটি ক্ষুদ্র কোষস্থলীর (nucleus) দ্বারা পরিচালিত হয়। এই জীবপঙ্ক একটি জটিল রাসায়নিক পদার্থবিশেষ এবং কতকগুলি অণুর সমষ্টি; এই অণুগুলি আবার কতকগুলি পরমাণুর সমষ্টিতে গঠিত। পদার্থবিদ্‌দের মতে প্রত্যেক পরমাণু, কতকগুলি নিত্য গতিশীল পরমাণু-কণার দ্বারা গঠিত এবং এই পরমাণুকণাগুলির একটি দ্বৈতনিয়মেই প্রথম প্রাণের উৎপত্তি হইয়াছে। পদার্থবিদের এই সিদ্ধান্ত এবং প্রাণিতত্ত্ববিদ্‌দের মধ্যে যাঁহারা বিবেচনা করেন যে, অধিকাংশ প্রাণীজাতি ক্রমবিকাশের চরমসীমায় পৌঁছিয়াছে, তাঁহাদের গবেষণার প্রত্যক্ষ প্রমাণগুলি এইস্থলে আলোচনা করিব।

জীবের প্রথম বিকাশ হইতে আজ পর্য্যন্ত এই পৃথিবীতে
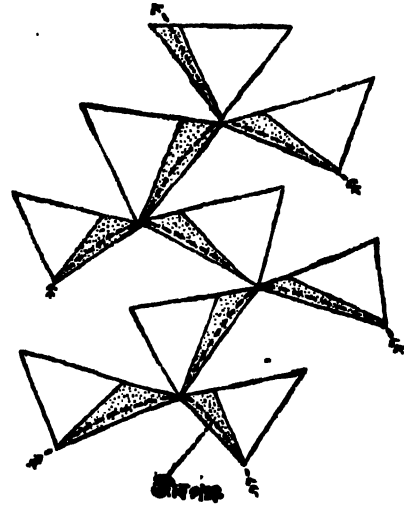
চিত্র নং ১

জীবপঙ্কের অপ্রতিহত গতি এইভাবে চলিয়া থাকে।

ক্রমবিকাশের ধারা অপ্রতিহতভাবে চলিয়া আসিয়াছে জীবজাতি প্রাণের কোন বিচ্ছিন্ন বিভাগ নহে, পরন্তু তাহাদে স্রোতের গতি কত যুগান্তকাল হইতে চলিয়া আসিয়াছে এবং ভবিষ্যতে আর কতকাল চলিবে তাহার ইয়ত্তা নাই মধ্যে মধ্যে এই গতি বিভিন্নমুখী হইয়া স্বতন্ত্র জীবের সৃষ্টি করিয়াছে। কিন্তু নিরবচ্ছিন্নতার গতিরোধ কখন হ নাই (১নং চিত্র)।

* এই প্রবন্ধ ভারতীয় বিজ্ঞান কংগ্রেসের (১৯৩১) প্রাণিতত্ত্ব শাখার সভাপতি [illegible] অভিভাষণের সারাংশ।

ক্রমবিকাশের প্রথম ছন্দ হইল জীবের কোষহীন on-cellular) অবস্থা হইতে বহুকোষবিশিষ্ট অবস্থার nulti-cellular) পরিবর্ত্তন। কোষগঠনের বহু পূর্ব্বে র্য্যকারী কোষের বৈশিষ্ট্য দেখা গিয়াছে; তাহার প্রমাণ
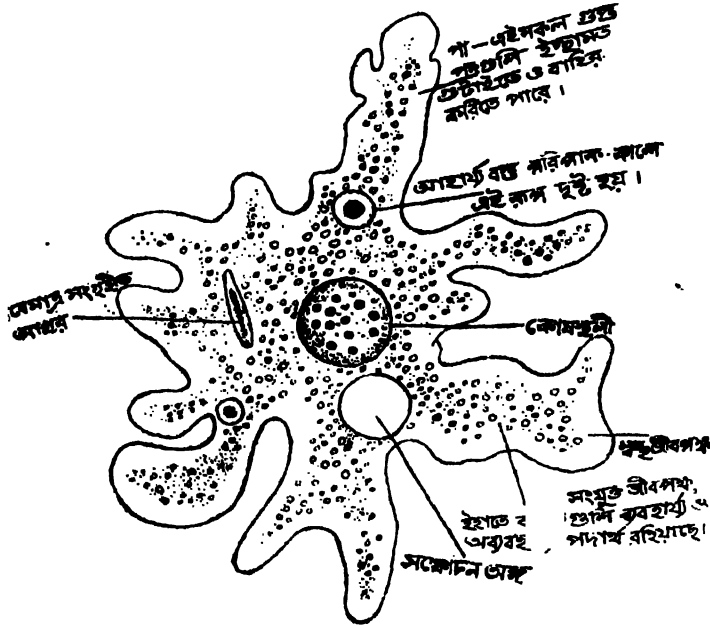
চিত্র নং ২

একটি এক কোষবিশিষ্ট জীব (Amoeba)

া দেখিতে পাই কোষহীন জীবসমূহের মুখ ও ক্রিয়াশীল সকলের মধ্যে (শুঁড়, কশা, নিঃসারক ইন্দ্রিয় ও কোষস্থলী)। এই সকল কোষহীন জীবেরা (২নং চিত্র) াণভাবে আপনাদের দেহপুষ্টি করিয়া থাকে এবং পরে বভক্ত হইয়া (fission) নিজেদের বংশ বৃদ্ধি করে; কেহ বিবেচনা করেন যে, প্রাণীর অথবা তাহার ার্শ্বিক কোন অবস্থার পরিবর্ত্তনে পূর্ব্বোক্ত কোষগুলির বিভক্ত হইবার ক্ষমতা থাকে না এবং এই ভাবে দর স্বাধীনতা হারাইয়া একত্রে কয়েকটি মিলিয়া বহুকোষস্থলীবিশিষ্ট জীবপঙ্কের পিণ্ড (syncytium) ৩নং চিত্র)। ইহা হইতেই কতকগুলি কোষের সৃষ্টি হয় ীবের দেহ-গঠনে ইহাই প্রথম সোপান। সমস্ত জীবেই লী কোষের সমস্ত কার্য্য নিয়মিত করে; কোষস্থলীর বিভাগ জীবের ক্রমরক্ষার সহায়ক হইয়া থাকে। কোষস্থলীর অসম্পূর্ণ বিভাগের ফলে নানা প্রকার বিকটাকার অবয়বের (৪নং চিত্র) জন্ম হয়; ইহাতে জীবপঙ্ক ও তৎসহ কোষস্থলীর সংখ্যা অধিক থাকে। কোষস্থলীর অসম্পূর্ণ বিভাগ ব্যতীত কোন একটি কোষে দুই বা ততোধিক কোষস্থলীর সংখ্যায় ও দেহের আকার বিকটাকার হইয়া থাকে। নিম্নতর জীবে বিষক্রিয়া, রঞ্জন রশ্মি, প্রভৃতির দ্বারা পূর্ব্বোক্তরূপ অনিয়মিত অবস্থা আনিতে পারা যায়। এইজন্য মনে হয়, ক্রমবিকাশের প্রথম স্তরে জীবকোষের কোষস্থলীর বিভাগ হয় কিন্তু জীব-পঙ্কের কোন বিভিন্ন কোষসমষ্টি হইবার ক্ষমতা থাকে না। পক্ষীদের ডিম্বের সর্ব্বপ্রথম গঠনে পূর্ব্ববৎ পিণ্ডাকার অবস্থা দৃষ্ট হয়।

এই পিণ্ডাকার অবস্থা হইতে কৌষিক অবস্থায় আসিতে জীবের অবস্থার কতকগুলি বিশেষ পরিবর্ত্তন হয়। দেহ-গঠনের প্রথম প্রয়োজন হইল একটি নির্দ্দিষ্ট আকার। বহুকোষবিশিষ্ট নিম্নতর জীবের (metazoa) ক্ষেত্রে ইহা সাধারণতঃ গোলাকার হইয়া থাকে। প্রথম স্তরে সম্ভবতঃ একটি গোলাকার পিণ্ডের চারিধারে কোষসকল থাকিত এবং এই গোলকের মধ্যস্থলটি শূন্য ছিল। যখন এই পিণ্ডটি পূর্ণ হইয়া আসিল তখন প্রত্যেক কোষসমষ্টির পৃথক পৃথক কার্য্যের প্রয়োজন হয়। জীবদেহের জটিল কার্য্যপ্রণালী বৃদ্ধি হওয়ার সহিত কতকগুলি অংশ নির্দ্দিষ্ট কার্য্য গ্রহণ করে এবং নিয়মিত ভাবে কার্য্য করিবার জন্য জীবদেহও সমভাবে এক-একটি নির্দ্দিষ্ট স্থান অধিকার করিয়া বসে। বস্তুতঃ, যে-সকল কোষ দেহের বহির্ভাগে থাকে তাহারা আশপাশ হইতে উত্তেজনা পায়, খাদ্যকণা সংগ্রহ করে, কিংবা দেহের জন্য বাষ্প গ্রহণ প্রভৃতি করে, কিন্তু পিণ্ডের মধ্যবর্ত্তী কোষগুলি এই সকল কার্য্য হইতে একেবারে বিচ্ছিন্ন হইয়া থাকে। এই অবস্থার পরিবর্ত্তন অনুসারে আমরা

দেহের গঠিত অংশগুলির কার্য্যের বৈচিত্র্য দেখিতে পাই ; একটি কোষসমষ্টি বহির্দ্দেশে থাকিয়া উত্তেজনার আকর্ষণ-বিকর্ষণের কার্য্য করে ; অপর সমষ্টি সর্ব্বদা চলাফেরা করিয়া বেড়ায় (ইহারা মাংসপেশী কোষ বলিয়া পরিচিত) ; কতকগুলি দেহের ভার ধারণ করে ; কতকগুলি পরিপাক-শক্তির কার্য্য করে আর কতকগুলি অব্যবহার্য্য পদার্থ দেহ মুক্ত করে। পরিশেষে, আমরা এমন এক কোষসমষ্টি পাই যাহাদের একমাত্র কার্য্য হইল বংশরক্ষা করা ও জাতির বংশপরম্পরা বজায় রাখা। জীবদেহের এইরূপ গঠনের সহিত কতকগুলি স্বতন্ত্র কোষের প্রয়োজন হয় ; ইহাদের প্রত্যেকের এক-একটি নির্দ্দিষ্ট বহির্ভাগ আছে। জীবকোষের এই সকল কার্য্য জীবপঙ্কে সন্নিবেশিত থাকে। কোষের বহির্ভাগ দ্বারা আহার, বিহার, নিঃশ্বাস, প্রশ্বাস প্রভৃতি সমস্ত কার্য্যই হইয়া থাকে। এই জন্য প্রতি নির্দ্দিষ্ট বহির্ভাগস্থলের জন্য নির্দ্দিষ্ট কোষাংশের বিশেষ প্রয়োজন।

নানা প্রকার কোষসমষ্টির সহিত আদিম কোষহীন জীব-সকলের তুলনা করিয়া দেখিতে গেলে দেখা যায়, যে, কার্য্যের বৈশিষ্ট্যের সহিত কেবলই যে স্বাতন্ত্র্যের ক্ষতি হইয়াছে তাহা নহে, কয়েকটি ক্ষমতারও ক্রমিক ক্ষতি হইয়াছে। প্রথম ক্ষমতা, যাহা কোষসমষ্টির মধ্যে প্রায় সকলেই হারাইয়াছে হইল পরিপাক শক্তি ; কোষহীন অথবা নিম্নতর জীবে খাদ্যকণা প্রথমে দেহমধ্যে লইয়া পরে পরিপাক করিত কিন্তু বহুকোষবিশিষ্ট উচ্চ শ্রেণীর প্রাণীর মধ্যে এমন কি পাকস্থলী কিংবা লালানিঃসারক গ্রন্থি (salisvary glands) প্রভৃতি যাহারা এই পরিপাকক্রিয়ার সহিত অত্যন্ত ঘনিষ্ঠভাবে সংশ্লিষ্ট তাহারাও পরিপাকক্রিয়ার কিছুই করিতে পারে না ; ইহারা কেবলমাত্র পরিপাকের খামি (digestive ferment) প্রস্তুত করে, আসল পরিপাকক্রিয়া কোষসমষ্টির বাহিরে পাকস্থলীর গহ্বরে ও অন্ত্রের (cavity of the stomach and intestine) মধ্যে হইয়া থাকে। সেইরূপ যৌনকোষ ব্যতীত অন্যান্য কোষের মধ্যে সকলেই বংশজননের ক্ষমতা হারাইয়াছে, কারণ ইহা প্রকৃতপক্ষে অন্যস্থলের ঐরূপ একটি কোষের সাময়িক যুগ্মমিলনের উপর এবং উচ্চতর জীবে পুংকোষের (spermatozoon) ডিম্বকোষে (ovum) প্রবেশের উপর নির্ভর করে। এই কার্য্যকারী ক্ষমতা হারাইবার কারণ আরও এই যে, এই বিশিষ্ট কোষগুলি একটি নির্দ্দিষ্টকাল আপনার জাতিবৈশিষ্ট্য রক্ষা করিতে পারে। অধুনা যেরূপ পরীক্ষাগারে নানাপ্রকারে জন্মান যায় সেইরূপ দেহ সঞ্জীবিত করিয়া রাখা যায় এবং ইহাও দেখা গিয়াছে এই ভাবে থাকিতে থাকিতে কোষসকল একটি অনিয়মিত
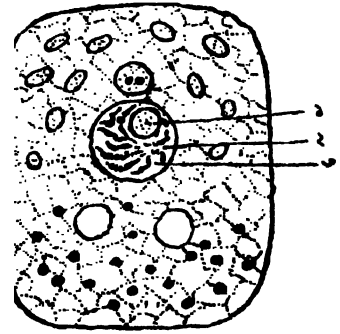
চিত্র নং ৩

বহু কোষবিশিষ্ট জীবের একটি কোষ।
১—কোষস্থলীর মধ্যস্থিত কেন্দ্র Nucleolus)
২ ৩—ক্রমোসোম (Chromosomes)

(amitotic method) আপনার বংশরক্ষা করিয়া থাকে অনেক সময় ইহারা প্রাণীর সাধারণ জীবিতকাল হ অধিক দিন বাঁচিয়া থাকে।

বংশজননের সারবত্তা হইল মাতৃপিতৃকোষের (parent অবিরত বিভাগ হইতে উদ্ভূত কন্যাকোষের (daughter মধ্যে এই ক্ষমতা প্রয়োগ করা ও পরে এই দুই কোষে মধ্যে পার্থক্য আনিয়া দেওয়া। জীবজগতের উচ্চ মধ্যে এই পন্থা একমাত্র যৌনকোষেই আবদ্ধ—অ কোষের এ ক্ষমতা আর নাই। এ ক্ষমতা আকস্মিক লুপ্ত হয় নাই, কারণ এখন পর্য্যন্ত নিম্নতর জীবে (চিংড়ি জাতীয় crustacea) একটি ক্ষুদ্র দেহাংশ হইতে সমস্ত জী উৎপত্তি হইয়া থাকে। উদ্ভিদ-জগতে ইহা বহুল প দৃষ্ট হয়।

উচ্চতর জীবে ডিম্বকোষে পুংকোষের (৫ নং চিত্র) প্র পর ক্রমাগত বিভাগের ফলে (৬ নং চিত্র) একটি স্থি অবস্থায় আসিয়া পড়ে। এই অবস্থাকে blastula Blastula-র কোষসমষ্টি হইতে ক্রমশঃ তিনটি মূল

উৎপত্তি হয়—সর্ব্বোপরি হইয়া থাকে epiblast ; ইহা হইতে দেহের আবরণ ও ইন্দ্রিয়াদির উৎপত্তি হয় ; মধ্যস্থলে হয় mesoblast ; ইহা হইতে দেহের মাংশপেশী ও কঙ্কালের উৎপত্তি হয় এবং সর্ব্বনিম্নে hypoblast হইতে

চিত্র নং ৪

দুইটি যমজ জীব একত্র হইলে এইরূপ বিকটাকার জীবের উৎপত্তি (Oxytricha) হয়।

পরিপাকযন্ত্রের উদ্ভব হয়। ডিম্বকোষের একটি নির্দ্দিষ্ট মেরুদেশ হইতে দেহের অঙ্গপ্রত্যঙ্গের উৎপত্তি হয় ; এই মেরুদেশ ডিম্বের অবস্থা এবং কতকগুলি শক্তি, বিশেষতঃ মাধ্যাকর্ষণ প্রভৃতির উপর নির্ভর করে। ডিম্বের মেরুদেশ ডিম্বমধ্যেই নির্দ্দিষ্ট নহে—ক্রমবিকাশের পথে কিছুদূর অগ্রসর না হওয়া পর্য্যন্ত দেহের আকার মেরুপ্রদেশে নির্দ্দিষ্ট হয় না। মানুষের মধ্যেও এই নিয়ম চলিয়া থাকে। আবার ডিম্বকোষের বিভাগের ফলে যখন মাত্র চারিটি কোষ হয় তখন তাহাদের মধ্যে দুইটি নষ্ট করিয়া দিলেও একটি সম্পূর্ণ জীবের উৎপত্তি হইবে।

নিম্নতর জীবের বর্দ্ধিষ্ণু দেহের পারিপার্শ্বিক অবস্থাসকল যে বিশেষরূপ প্রভাবান্বিত করে সে-বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই এবং সুদূর অতীতে উচ্চতর জীব অপেক্ষা নিম্নতর জীবের কোমল দেহে ইহা অপেক্ষা অধিক কর্ত্তৃত্ব করিত। Loeb-এর গবেষণার যাঁহারা বিশেষরূপ আলোচনা করিয়াছেন তাঁহারা কখনই অস্বীকার করিবেন না যে, জীবদেহের সাধারণ আকার কতকগুলি আকস্মিক বর্ণবিকারের (mutation) ফলে না ঘটিয়া কতকগুলি নির্দ্দিষ্ট প্রভাব ও শক্তির ফলে হইয়াছে। কতকগুলি নিম্নতম জীবের (protozoa) দেহ দ্বিধাবিভক্ত হইয়া বংশজননের ফলে জীবপঙ্কে নানারূপ ইন্দ্রিয়ের পৃথকীকরণ হয় ; জীবের ইন্দ্রিয়গুলির ন্যায় প্রত্যেক কন্যাকোষেই সমস্ত ইন্দ্রিয়গুলির আবির্ভাব হইয়া থাকে। জীবপঙ্কের এইরূপ পৃথকীকরণের সহিত যুগ্মমিলন (conjugation) ও কোষাবরণ (encystment) হইবার পূর্ব্বে চ্যুত-পৃথকীকরণ (de-differentiation) উপায়ে গলনালী (gullet), স্পন্দনশীল ঝিল্লি (vibratile membranelles) ও অন্যান্য ইন্দ্রিয়সকল লুপ্ত হয়। এই চ্যুত-পৃথকীকরণের পরেই আবার স্বতঃপ্রবৃত্ত পূর্ণ-পৃথকীকরণের (re-differentiation) ফলে ঐ লুপ্ত ইন্দ্রিয়াদির পূর্ণবিকাশ হয়। এই সকল উপায় সমস্তই পরীক্ষামূলক—পরীক্ষকের নিজ ইচ্ছায় নিম্নতর জীবদেহে নানাপ্রকার পরিবর্ত্তন আনা যাইতে পারে। Blastula অথবা জীবপঙ্কের পিণ্ডের মত (syncytium) কোন রূপান্তর নহে—ইহা একটি সম্পূর্ণ নূতন উপায়। এই প্রকারের জীবের কোন দেহাংশ হইতে একটি পূর্ণ জীবের জন্ম হইতে পারে। নানাপ্রকার রাসায়নিক ক্রিয়ার দ্বারা এই সকল নিম্নতর জীবে একদিকে দুইটি মুখ, অথবা দেহাংশের মধ্যস্থলে মুখ প্রভৃতি নানাপ্রকারে স্থানান্তরিত করিতে পারা

চিত্র নং ৫

বিভিন্ন জীবের শুক্রকীট। ক ও খ,—শামুক ; গ—পক্ষী ; ঘ—মানুষ ; চ—সালামাণ্ডার মৎস্য ; ছ—চিংড়ি।

যায়। কীটজাতীয় (insecta) জীবে চ্যুত-পৃথকীকরণ এবং পূর্ণপৃথকীকরণ এই দুইটি অবস্থা এরূপ সুচারুসম্পন্ন যে গুটির অবস্থায় (pupal stage) প্রায় সকল অঙ্গেরই এই দুই প্রকার পরিবর্ত্তন হইয়া থাকে। এইজন্য কীটের শেষ অবস্থা ও পূর্ব্বাবস্থায় এত প্রভেদ দেখিতে পাওয়া

যায় (৭নং চিত্র)। স্পঞ্জের* কোষগুলি যদি ভাঙিয়া চূর্ণবিচূর্ণ করা যায় তাহা হইলেও তাহা হইতে দুই-একটি কোষ কোনরূপে একত্র হইতে পারিলে পুনরায় একটি সম্পূর্ণ স্পঞ্জ গড়িয়া উঠিবে। প্রথমে এক-একটি কোষ একত্র হইয়া একটি অনির্দ্দিষ্ট পিণ্ড প্রস্তুত করে এবং পরে এই পিণ্ড হইতে একটি সম্পূর্ণ জীবের জন্ম হয়। কোষের যতই বৈশিষ্ট্য থাকুক না কেন, তাহা হইতে জীবের পুনর্জন্ম হইতে পারে,—তবে প্রত্যেক জীববিশেষে কোষের সামঞ্জস্য থাকা চাই।

জীবজগতের যতই উচ্চস্তরে আসা যায় ততই দেখা যায় যে পৃথকীকরণের এই দুইটি অবস্থা এবং তাহার সহিত দেহাংশের পূর্ণগঠনের ক্ষমতা ক্রমশঃই লোপ পাইতেছে। ভেক (amphibia) ও সর্প (reptilia) জাতীয় জীবের মধ্যে লেজ প্রভৃতি নষ্ট হইয়া গেলে পুনর্গঠনের ক্ষমতা কিছু পরিমাণে আছে, কিন্তু উচ্চস্তরের জীবে কেবলমাত্র ক্ষতস্থান ক্ষতাঙ্ক স্থত্র (scar tissue) দ্বারা পূর্ণ করিয়া আরাম করা ব্যতীত আর কোন ক্ষমতাই নাই। আবার এই সকল জীবের ভ্রূণাবস্থায় নানাপ্রকার ইন্দ্রিয় অথবা দেহাংশ গঠনের ক্ষমতা থাকে। চক্ষু কিংবা কর্ণ মস্তিষ্কের এক একটি-অতিবৃদ্ধি (outgrowth)। সকল জীবে কর্ণ একটি কোষের (otic vesicle) মত মস্তিষ্ক হইতে কুঁড়ির মত নির্গত হয় এবং চক্ষু একটি ক্ষুদ্র পাত্রের মত (optic cup) মস্তিষ্কের একটি অতিবৃদ্ধি হইয়া জন্মে (৮নং চিত্র)। যদি এই কর্ণকোষের কিংবা চক্ষুপাত্রের মধ্যে কোনটি তাহার নির্দ্দিষ্ট স্থান হইতে দেহের অন্য কোনস্থানে স্থানান্তরিত করা হয় তাহা হইলে সেই স্থানেই অপেক্ষাকৃত অল্পরূপ পরিপুষ্ট হইয়া কর্ণের অনুরূপ হইয়া উঠিবে। চক্ষুপাত্রেরও স্থানান্তরে ঐরূপ হইবে; যেস্থলে বসান হইবে সেইস্থলের চর্ম্ম কাচে (lens) পরিণত হইয়া চক্ষুর বৈশিষ্ট্য বজায় রাখিবে। দেহের নানা অংশের মধ্যে এইরূপ একটি পরস্পর প্রতিক্রিয়া আছে। প্রত্যেকেরই কোষোৎপাদনের বৈশিষ্ট্য ইন্দ্রিয়বিশেষের গঠনের প্রভাবান্বিত করে। এই বিশিষ্ট প্রথার নাম বৈজ্ঞানিকেরা দিয়াছেন (correlative differentiation) বা 'পারস্পরিক পৃথকীকরণ'।

ক্রমবিকাশের পথে যতই অগ্রসর হওয়া যায় ততই দে[খা] যায়, ভ্রূণের অবস্থা এমন সুগঠিত যে তাহার মাধ্যাক[র্ষণ] কিংবা অন্যান্য কোন শক্তির প্রভাবের ভয় নাই। এই জন্য সম[স্ত] ইন্দ্রিয়ের ও দেহাংশের একটি নির্দ্দিষ্ট পদ্ধতি দেখা যায়
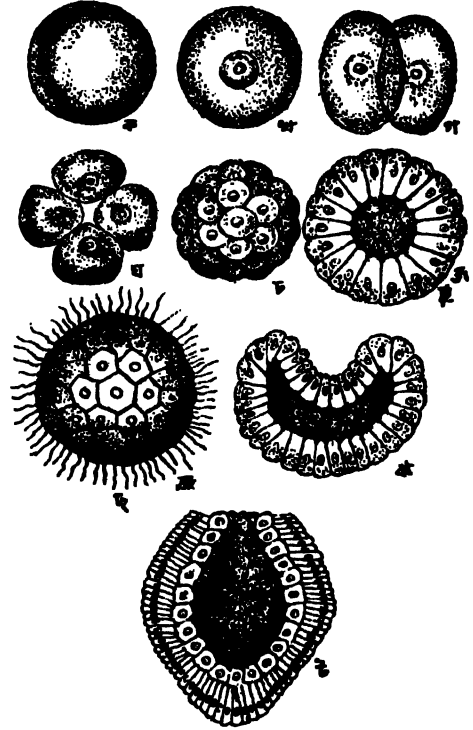
চিত্র নং ৬

প্রবালের (Coral) ডিম্বকোষের বিভাগের বিভিন্ন অবস্থা
চ, ছ—Blastula ; ঝ—Blastula
দুই ভাগে বিভক্ত করিবার পর এইরূপ দৃষ্ট হয়।

জাতিবিশেষে বৈশিষ্ট্যের কোন বৈচিত্র্য নাই ; ইন্দ্রিয়ের ম[ধ্যে] একে অন্যের উপর আসিয়া পড়ে না। এই সকল বি[শি]... দেহাংশের গঠনকৌশল hormone নামক একটি রাসায়নি[ক] পদার্থের উপর নির্ভর করে। ইহারা দেহের রক্তের ম[ধ্যে] চলাফেরা করিয়া থাকে। জীববিশেষের দেহের বিভি[ন্ন] অংশের বৃদ্ধির (development) তারতম্য আছে ; কো[ন] কোন অংশ অন্যান্য অংশ হইতে দ্রুত প্রসার লাভ করে এ[বং] ইহাও স্ত্রী পুরুষ উভয়ের মধ্যে এক নহে। চিংড়ি মাছজাতীয় জীবের দেহের বৃদ্ধির একটি বিশিষ্ট অনুপা[ত] আছে এবং প্রত্যেক বিভাগের এই অনুপাত গণিত দ্বা[রা]

* Coelenterata.

সিদ্ধান্ত করা যায়। স্ত্রী. পুরুষ উভয় লিঙ্গেই দেহের আকার বৃদ্ধিরও পার্থক্য আছে এবং ইহা উপযৌন লক্ষণগুলির (seconda-y sexual characters) উপর নির্ভর করে। সাধারণ hormone উভয় লিঙ্গেরই বৃদ্ধি শাসন
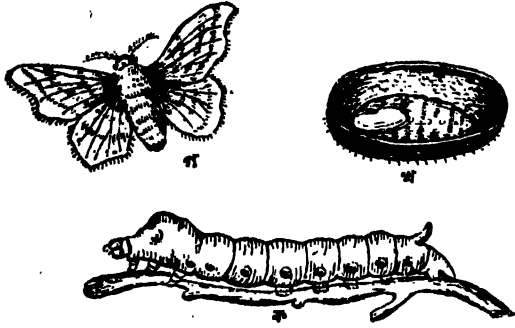
চিত্র নং ৭
রেশমের গুটিপোকার বিভিন্ন অবস্থা।

করে এবং এক প্রকার যৌনরস (sexual secretion) দেহবৃদ্ধির অনুপাত (degree) নিয়ন্ত্রিত করে।

পূর্ব্বোক্ত প্রমাণগুলি হইতে বুঝা যায় যে জীবের বৃদ্ধি আংশিকরূপে বাহ্যপ্রভাব ও অন্তরস্থ অবস্থা, উভয়েরই উপর নির্ভর করে। নিম্নতর জীবের বাহ্যিক অবস্থার প্রভাব সর্ব্বাপেক্ষা অধিক কিন্তু উচ্চস্তরে অবস্থাভেদের প্রভাব ক্রমশঃই হ্রাস হইয়া থাকে। আভ্যন্তরীণ যন্ত্রকৌশল আধুনিক জীবসমূহের অবস্থাভেদের স্থান পূর্ণ করিয়া থাকে। এইজন্য উচ্চস্তরের জীবাপেক্ষা নিম্নস্তরের জীবে বাহ্যিক অবস্থাভেদে নানারূপ পরিবর্ত্তন আনা যায়। অণুপরমাণু উপাদানের পরিবর্ত্তন ভেদে জীবপঙ্কের বিবিধ কার্য্য সমাধা হইয়া থাকে। কোন জীবচরিত্র তাহার সন্তান-সন্ততিতে নিয়োজিত হয় gene নামক কতকগুলি ক্ষুদ্র কণার দ্বারা। এই সকল gene কোষস্থলীর chromosome * গুলির সহিত সংশ্লিষ্ট থাকে। কেহ কেহ বলেন যে, gene-রাই এক-একটি স্বতন্ত্র অনুকণা। এই জীবপঙ্কের অণুগুলির কোনরূপ পরিবর্ত্তনে জীবের পরিবর্ত্তনও অবশ্যম্ভাবী। জীবপঙ্কের তৎপরতায় জটিল রাসায়নিক পদার্থসকল সরল পদার্থে পরিণত হয় এবং ইহাই শক্তির উৎপাদক হইয়া থাকে। ইহাকে katabolism বলে। শক্তির বিরাম অথবা প্রগতিকালে সরল পদার্থসকল আবার জটিল পদার্থে পরিণত হয়। ইহাকে anabolism বলে। এই পদার্থের মধ্যে যাহারা দেহের পক্ষে অব্যবহার্য্য তাহাদের দেহমুক্ত করা হয় (excretion) ; পৃথিবীতে যেদিন প্রথম প্রাণের বিকাশ হইয়াছে, তাহা বৃদ্ধি :(development) অথবা ক্রমবিকাশের (evolution) যে-কোন স্তরেই হউক না কেন, এই ঐক্যসম্পন্ন পরিবর্ত্তনগুলি জীবাণুজীব নির্ব্বিচারে চলিয়া আসিতেছে। উত্তাপের হ্রাস ও বৃদ্ধি, নানাপ্রকার লবণ প্রয়োগ করিয়া জীবপঙ্কের তারল্যের (viscosity)—বিবিধ পরিবর্ত্তন প্রভৃতি রাসায়নিক উপায়ে এই সকল পরিবর্ত্তন আনা সম্ভব। উত্তাপের আতিশয্যে বা অত্যল্পে জীবদেহের নানাপ্রকার পরিবর্ত্তন করা যায়। কোথাও উত্তাপের স্বল্পতায় অন্তঃকরণের তাল (beat) কমিয়া যায়। কাহারও বা দেহাংশের গতিবিধির পরিবর্ত্তন হয়, কাহারও বা দ্বিধা-বিভক্ত হইয়া বংশবৃদ্ধিক্রিয়ার প্রতিবন্ধক হইয়া পড়ে, আর কীটজাতির ডিম্ব উত্তাপের অনুপাতে বৃদ্ধি পায়। ইহারা উত্তাপের উপর এত নির্ভরশীল যে, যদি ডিম্বের কোন অংশ-বিশেষ উত্তাপিত হয় তাহা হইলে মাত্র সেই পার্শ্বের বৃদ্ধিই দ্রুত হইবে এবং ভ্রূণের অবস্থা দ্বিধা অসমান (asymmetrical হইয়া যায়। উত্তাপের পরিবর্ত্তনে জীবচরিত্রের আমূল ব্যবধান আনা যায় ; নানাপ্রকার বিকটাকার (monstrous) জীবের উদ্ভব করা যায় ; লিঙ্গেরও পরিবর্ত্তন সম্ভব হইয়া থাকে। ব্যাঙাচিদের কিছুকাল যাবৎ যদি ৩২°সি উত্তাপের মধ্যে রাখা যায় তাহা হইলে স্ত্রী-ব্যাঙাচির জন্ম একেবারেই হয় না। জলমক্ষিকার (water flea, *daphnia pulex*) গ্রীষ্মকালের ডিম্ব পুরুষসংসর্গ ব্যতীত (parthenogentic) স্ত্রী-মক্ষিকায় পরিবর্ত্তিত হয় কিন্তু শরৎকালের ডিম্বের আবরণ (shell) অত্যন্ত পুরু হইয়া থাকে এবং তাহা হইতে কেবলমাত্র পুংমক্ষিকার জন্ম হয়। উত্তাপ ব্যতীত সাধারণ আলোক ও অন্ধকারের ব্যতিক্রমে জীবদেহের বহু বদ্ধমূল পরিবর্ত্তন আনা যায়। কীটজাতীয় (aphidae) জীবদের কিছুকাল যাবৎ আলোকে রাখিলে একেবারে পক্ষবিহীন সন্তান প্রসব করে। অনাহারে রাখিলেও জীবদেহের অনেক পরিবর্ত্তন আনা যায়। নানাপ্রকার রাসায়নিক ক্রিয়ার দ্বারা জীবের লিঙ্গ পরিবর্ত্তন

* Chromosome—কোষস্থলীর (nucleus মধ্যে দড়ির মত এক প্রকার পদার্থ। বিভাগকালে ইহারা কতকগুলি নির্দ্দিষ্ট সংখ্যার কাঠি, গ্রন্থি বা গুঁড়ার (r ds, loops, granules) মত হয়।

করাও সম্ভব। পুরুষ-ইন্দুরের দেহে সুরাসার (alcohol) প্রদান করিলে সন্তান-সন্ততির মধ্যে পুরুষ-ইন্দুরের সংখ্যাধিক্য হইয়া থাকে। আহারের অত্যল্পে জোঁক-জাতীয় জীবের (rotifers) দ্বিতীয় বংশে কেবল মাত্র স্ত্রী-কীটের জন্ম হয় এবং আহারের অত্যাধিক্যে প্রায় শতকরা ৯৫টি পুং-কীটের জন্ম হয়। রঞ্জনরশ্মির দ্বারাও পূর্ব্বোক্তরূপ পরিবর্ত্তন আনা যায়। কোষবিহীন জীবের মধ্যে (Protozoa, Chilodon uncinatus, Family chlamydodontidae) দুই-এক দিন অন্তর অথবা প্রতিদিন দুই সেকেণ্ড হইতে দুই মিনিট পর্য্যন্ত রঞ্জনরশ্মি প্রদান করিলে দুই প্রকার বিচিত্র পরিবর্ত্তন হইতে দেখা যায়,—

(১) Chilodon Cucullus-এর মত একটি বিভিন্ন জাতীয় জীবের জন্ম হয়; ইহারা কয়েক মাস যাবৎ বংশবৃদ্ধি করিয়াও এই বিভিন্ন বৈশিষ্ট্য বজায় রাখিতে সক্ষম হয়। কোষাবরণের (encystment) পরও এই বৈশিষ্ট্য থাকিতে দেখা গিয়াছে।

(২) একটি লেজবিশিষ্ট জীবেরও উৎপত্তি হয় এবং ইহারাও ৪৮ পর্য্যায় পর্য্যন্ত আপনার বংশবৈশিষ্ট্য বজায় রাখিয়াছিল। এই দুই বিশিষ্ট বৈচিত্র্য ব্যতীত যমজ, বিকটাকার প্রভৃতি জীবের উৎপত্তি হইতে দেখা গিয়াছিল।

এই সকল পরিবর্ত্তনগুলি নিম্নলিখিত ভাবে বিধিবদ্ধ করা যায়,—

(১) কোষাবরণ ও যুগ্মমিলনের পরও বর্ণবিকার (mutation) চলিতে থাকে।

(২) পরিবর্ত্তনগুলি কিছুকালস্থায়ী হইয়া থাকে এবং বৈশিষ্ট্য বজায় রাখিয়া উৎপন্ন করে (bred true)। কিন্তু যুগ্মমিলনের প্রারম্ভেই মরিয়া যায়।

(৩) ক্ষণস্থায়ী বৈচিত্র্য তিন পর্য্যায়ের পরে লুপ্ত হয়।

(৪) অসাধারণ (abnormality) কিছুরই সংস্পর্শে মৃত্যু ঘটে।

উচ্চস্তরের জীবে এই সকল পরিবর্ত্তন আনা দুরূহ। ইহারাও কোন সামঞ্জস্য রাখিয়া চলিতে পারে না—কোন অঙ্গবিশেষে নিবদ্ধ হইয়া থাকে। দেহেরও সকল অঙ্গ সমভাবে কর্ম্মঠ নহে; দেহের অগ্রভাগ (head end) সর্ব্বাপেক্ষা metabolism কার্য্যে অগ্রণী। যে অঙ্গের গঠন যত জটিল সেই অঙ্গের metabolism* শক্তিও তত অধিক এবং এই সকল অঙ্গেই বিষক্রিয়া প্রভৃতি বহিঃপ্রভাবের আশঙ্কা অধিক হইয়া থাকে।

উচ্চস্তরের জীবের মধ্যে বয়স্কদের (adult) উপর কোন প্রভাব আনা দুরূহ। রুগ্ন অথবা শিশু অবস্থায় ইহার কোন
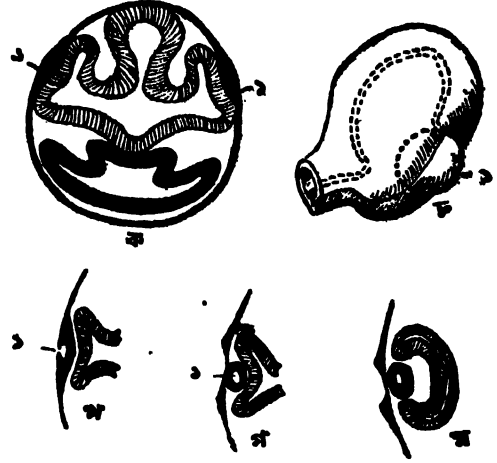
চিত্র নং ৮
চক্ষুর উৎপত্তির বিভিন্ন অবস্থা। ১—চক্ষুর কাচ (lens)

পরিবর্ত্তন সুফলদায়ক বটে কিন্তু সাধারণতঃ ইহা ব্যাধিমূলক (pathological) বলিয়া বিবেচিত হয়। বয়স্কদের প্রভাব কখন কখন সন্তান-সন্ততিদের উপর আসিয়া পড়ে। পরিবর্ত্তিত অবস্থাভেদে যদি ডিম্বকোষের প্রকৃত আকার বা গঠনের কোন বৈশিষ্ট্যের ফলে কোষস্থলীর chromosome-গুলির অণুকণার প্রভেদ হয় এবং যদি ইহা জীবের মৃত্যু বা বংশজনন শক্তির ক্ষতি ব্যতীত বংশপরম্পরায় আনাইয়া দেওয়া যায় তাহা হইলে জীবজগতে নূতন জীবের উৎপত্তি হইয়া থাকে।

জীবজগতের ক্রমবিকাশের সকল স্তরেই দেখা যায় যে প্রত্যেক উচ্চস্তরের আদর্শ লাভে কোন-না-কোন ক্ষমতা বা কার্য্যকরী শক্তি হারাইয়াছে। কোষবিহীন অবস্থা হইতে বহু কোষবিশিষ্ট অবস্থার পরিবর্ত্তনে অন্ততঃ একটি কার্য্যকরী শক্তি লোপ পাইয়া থাকে; যৌনকোষ ব্যতীত সকল কোষেরই অবিরত বংশজননের ক্ষমতা হারাইয়াছে। পরে, জীবের

* Metabolism—এই ক্রিয়ার দ্বারা দেহের সজীব মূল পদার্থসকল রক্ত হইতে আপন আপন পুষ্টিসাধনের দ্রব্য গ্রহণ করে।

পলাইয়া এই লোকটির কাছে আসিয়া হাজির হইত। শুধু তাই নয়, তাকে মাঝে মাঝে খাবারের জন্য যে পয়সা দিতাম, সে সেই পয়সা দিয়া খাবার না খাইয়া গোপনে গিয়া লোকটিকে দিয়া আসিত। আমি মাঝে মাঝে ধমকাইতাম, স্ত্রী বলিতেন—"ধমকাও কেন, পয়সাই ত দিয়েছে। অন্যায় কাজ ত কিছু করে নি।" স্ত্রী পূর্ব্বে দুইটি সন্তান হারাইয়া মর্ম্মাহত হইয়াছিলেন। সেইজন্য পুত্রকে শাসন করিয়া আর তার মনোবেদনা বাড়াইতে ইচ্ছা হইত না। আর বস্তুতঃ সে ত তেমন অন্যায় কিছু করিত না।

একদিন স্ত্রীপুত্রকে লইয়া রামনগরে ব্যাসদেবের মেলা দেখিতে গিয়াছিলাম। ফিরিতে সন্ধ্যা হইল। ঘাটে নৌকা লাগাইয়া অবতরণ করিব এমন সময় একটা গোলমাল শুনিয়া চাহিয়া দেখিলাম পূর্ব্বোক্ত ঘরটার সামনে একটা ছোট জনতা সাধুজীকে ঘিরিয়া ক্রুদ্ধভাবে তর্জ্জনী প্রদর্শন করিতেছে আর নানারূপ বাক্য উচ্চারণ করিতেছে। ব্যাপার কি দেখিবার জন্য মাঝিকে তাড়াতাড়ি করিয়া নৌকা লাগাইতে বলিলাম। কিন্তু নামিবার পূর্ব্বেই জনতার মুষ্টি, কিল, প্রহার ও লাঠির আঘাত সাধুজীর উপর বৃষ্টিধারার মত পড়িতে লাগিল। লোকটা ধরাশায়ী হইয়া চুপ করিয়া সমস্ত সহ্য করিতে লাগিল। কয়েকজন লোক শুধু আঘাত করিয়াই ক্ষান্ত হইল না—ঘরের ভিতর ঢুকিয়া লোকটির বহুদিনের তৈয়ারী বেদী ও আসনগুলি ভাঙ্গিয়া গুঁড়া করিয়া ফেলিল, তার নোংরা গেরুয়া কাপড়গুলি ও শালগ্রাম শিলা তুলিয়া নীচে ফেলিয়া দিল।

আমি নামিয়া আসিতে আসিতে জনতা সরিয়া পড়িল। ব্যাপার কি বুঝিতে পারিলাম না। একটা কিছু কারণ নিশ্চয়ই আছে, কিন্তু লোকটিকে জিজ্ঞাসা করিয়া কিছুই জানিতে পারিলাম না। প্রহারের আঘাতে তার শরীরে নীল দাগ পড়িয়া গিয়াছিল,—সেদিকে সে বেশীমনোযোগী ছিল না। সে একদৃষ্টে চাহিয়া ছিল তার লুণ্ঠিত ঘরটার দিকে—সেই দিকে চাহিয়া তার চোখ জলে ভরিয়া উঠিয়াছিল।

জলে ভরিয়া উঠিয়াছিল আরেক জনের চোখ—খোকার। সে সাশ্রুনেত্রে একবার আমার দিকে, একবার তার মার দিকে, একবার সেই লোকটির দিকে দেখিতেছিল। তার মনের মধ্যে অনেক কথা উঠিতেছিল বুঝা গেল—কিন্তু সে কিছু বলিতে পারিতেছিল না। আমরাই বা সেখানে দাঁড়াইয়া লোকটির কি করিতে পারিতাম. বিশেষতঃ যখন প্রকৃত কথা কিছুই জানিতাম না, জিজ্ঞাসা করিয়াও জানিতে পারি নাই। যদি সে অন্যায় রূপেই প্রহৃত হইয়া থাকে, তাহা হইলেই বা এর আর প্রতিকার কি?

চলিয়া আসিতে আসিতে স্ত্রী বলিলেন—"অমন নিরীহ লোকটাকে অমন ভাবে মারলে কেন?"

"নিরীহ তুমি কি ক'রে জানলে? হঠাৎ এতগুলি লোক এসে তাকে অমনিই মেরে গেল? কি করেছে কে জানে?"

"অমন কি আর করতে পারে যার জন্য তাকে মারতে পারে? আর তার জিনিষপত্র অমন ভাবে নষ্ট করবার কি দরকার ছিল? বেচারী!"

বাড়ি ফিরিয়া আসিয়া গৃহিণী নিজ কাজে চলিয়া গেলেন। আমি আবার কাজ লইয়া টেবিলে বসিলাম। খোকা এই সময় পাশের ঘরে ছোট মাদুরটার উপর বসিয়া খড়ি দিয়া শ্লেটের উপর ছবি আঁকে, না হয় এক, দুই লেখে। খাবারের সময় ছাড়া আর তিনজনের বড় দেখা হয় না। কিন্তু সে রাত্রে খাওয়ার সময় ছেলেকে ডাকিতে গিয়া গৃহিণী দেখেন সে ঘরে নাই। অস্থির হইয়া ছুটিয়া আসিয়া আমাকে বলিলেন—"ছেলে কোথায় গেল? ছেলেকে দেখছিনে যে?"

"দেখছ না কি রকম?"—তাড়াতাড়ি করিয়া উঠিয়া তাহাকে খুঁজিতে গেলাম। সমস্ত বাড়ি খুঁজিলাম, বাহিরে আসিয়া ডাকাডাকি করিলাম, প্রতিবেশীদের জিজ্ঞাসা করিলাম, সন্ধান মিলিল না। তখন মনে হইল হয় ত সে ঘাটে সাধুর কাছে গিয়া হাজির হইয়াছে। ঘাটের দিকে চলিলাম।

ঠিক তাই। সাধুবাবা তার লুণ্ঠিত ঘর আবার মেরামত করিবার চেষ্টা করিতেছিল, জল আনিয়া কাদা গুলিয়া আবার ভাঙা আসনগুলি নূতন করিয়া গড়িতেছিল। দেখি শ্রীমানও তার এই মেরামতের কাজে সাহায্য করিতে লাগিয়া গিয়াছে। অন্ধকারে আমাকে সে দেখিতে পায় নাই, কিন্তু আমি তাকে ডাকিবা মাত্র সে চমকিয়া উঠিয়া চীৎকার করিয়া কাঁদিয়া উঠিল, বলিল—"একে না নিয়ে গেলে আমি যাব না, আমি যাব না।" এই বলিয়া সে তার কাদামাখা হাতে আমাকে আক্রমণ করিল, আর পা দুইটা দিয়া জোরে ঘন ঘন মাটির উপর আঘাত করিতে লাগিল। আমি তাকে বুঝাইতে চেষ্টা

করিলাম, কিন্তু যতই বুঝাই ততই তার কান্না বাড়িয়া যায়। বিপদে পড়িলাম। ফিরিয়া আসিয়াই স্ত্রীকে সমস্ত কথা বলিলাম। শুনিয়া তিনিও ঘাটে চলিলেন, কিন্তু তাঁকে দেখিয়া তার রাগ আরও বাড়িয়া যায়, তার কান্না সপ্তমে চড়ে, তার আব্দার আরও প্রবল হইয়া উঠে। যখন কিছুতেই তাকে শান্ত করা গেল না, তখন নিরাশ হইয়া স্ত্রী বলিলেন— "না হয় লোকটাকে আজ রাত্রের মত ঘরেই নিয়ে চল।"

সে রাত্রের মত লোকটাকে বাড়িতে লইয়া আসিলাম। নীচে একটা ঘর খালি পড়িয়া থাকিত। তিনটি প্রাণীর জন্য উপরের ঘরগুলিই যথেষ্ট ছিল—নীচেরটা ব্যবহারে আসিত না। সেই ঘরটায় তাকে থাকিবার বন্দোবস্ত করিয়া দিলাম।

ভাবিয়াছিলাম পরদিন প্রাতে সে স্বেচ্ছায়ই চলিয়া যাইবে। কিন্তু চলিয়া যাইবার বিন্দুমাত্র ইচ্ছা তার মধ্যে দেখিলাম না। বেলা যখন দ্বিপ্রহরের কাছাকাছি তখন পর্য্যন্ত যখন তাহার স্বেচ্ছায় চলিয়া যাওয়ার কোন চিহ্ন দেখিলাম না, তখন ভাবিলাম দুপুর বেলা খাওয়াইয়া-দাওয়াইয়া বিকালবেলা তাহাকে বিদায় করিয়া দিব।

স্ত্রীকে বলিলাম "লোকটির যে যাবার নামগন্ধ নেই।"

স্ত্রী বলিলেন "তাই ত, এ যে সাধ ক'রে আপদ ডেকে আনলাম।"

আমি বলিলাম—"বিকেলবেলা তাকে মুখ ফুটে বলতে হবে।"

খোকা নিকটে দাঁড়াইয়া আমাদের কথাবার্ত্তা শুনিতেছিল। সে বলিয়া উঠিল—'না, বাবা, সে হবে না। ও আমাদের এখানেই থাকবে। সেখানে গেলে আবার ওকে মারবে।"

আমি তাকে বুঝাইতে চেষ্টা করিলাম। কিন্তু সে আমার কোন কথা না শুনিয়া আঙ্গুল ধরিয়া শুধু বলিতে লাগিল— "বল তাকে যেতে দেবে না, বল তাকে যেতে দেবে না।"

কি করি, বলিলাম—না, তাকে যেতে দেব না। সে আমাদের এখানেই থাকবে, তোমার সঙ্গে খেলা করবে, তোমাকে নিয়ে বেড়াতে যাবে।

স্ত্রী বলিলেন—"থাকুকই; ভগবান যখন এনে জুটিয়েছেন তখন আর তাড়িয়ে দিয়ে দরকার নেই।"

লোকটি আমাদের সঙ্গে বাস করিতে সুরু করিল। প্রথম প্রথম বোধ হয় তার একটু বাধ-বাধ ঠেকিত, সেইজন্য নীচের ঘরেই সে নিজের শালগ্রাম শিলা আর তার পূজাঅর্চ্চনা, সেবা-যত্ন লইয়া থাকিত। মাটি কুড়াইয়া আনিয়া ঘরের মধ্যে আবার একটি বেদী করিয়াছিল। খোকাও তাহাকে সে বিষয়ে সাহায্য করিয়াছিল। সকাল হইলেই কোথা হইতে গিয়া ফুল তুলিয়া আনিত, তারপর অনেকক্ষণ ধরিয়া স্নান করিয়া ঘরে ঢুকিয়া নৈবেদ্য সাজাইয়া পূজা করিত, আর পূজা শেষ হইলে খোকাকে ডাকিয়া প্রসাদ দিত। দুইবেলার আহার সে চাহিয়া খাইত না।

কিন্তু ক্রমে সে পরিবারেরই একজন হইয়া উঠিল। খোকার সঙ্গে মিলটাই বেশী করিয়া জমিয়া উঠিল, কিন্তু আমাদের সঙ্গেও আর পূর্ব্বের বাধ বাধ ভাব ছিল না,—সকল বিষয়ই সে নিঃসঙ্কোচে আলোচনা করিত। সে তার গত জীবনের ইতিহাস আমাদিগকে বলিত—তার শৈশবের ঘটনা, যৌবনে সে কি কি কাজ করিয়াছে সে সব কথা, কেন সে সংসারবিরাগী হইয়া গেরুয়া ধরিয়াছে তার কৈফিয়ৎ। সংসারে তার বাবা মা আত্মীয়স্বজন বলিতে গেলে কেহই ছিল না—স্ত্রী একজন ছিল, কিন্তু সেও বহুদিন পূর্ব্বে স্বামি-গৃহ ছাড়িয়া গিয়াছে, তার কারণ, সে বলিত তার স্ত্রীর মনটা ছিল একটু বিলাসী, কিন্তু সে তার বিলাসবাসনা চরিতার্থ করিতে পারিত না। আমি তাকে জিজ্ঞাসা করিতাম, সে আবার সংসার করিতে চায় কি-না। সে বলিত, সে প্রবৃত্তি তার আর নাই। কোনদিনই সে কর্ম্মঠ প্রকৃতির ছিল না। কিন্তু এখন তার কাজ করিবার বয়স চলিয়া না গেলেও সে আর সংসারের ঝঞ্ঝাটের মধ্যে ফিরিয়া যাইতে চায় না। যে অবস্থায় আছে সেই অবস্থায়ই সে বেশ সুখী।

এই অবস্থায় সে যে সুখী ছিল তাহাতে সন্দেহ ছিল না। একে ত কাশীর মত অমন অলস শহর বোধ হয় আর দ্বিতীয় নাই। অকর্ম্মার সংখ্যা এখানে গণনা করা যায় না। যারা কাজ করে তারাও বেশী পরিশ্রম করিতে প্রস্তুত নয়। তার উপর যদি অমন অনায়াসে খাওয়া-পরা জুটিয়া যায়, তাহা হইলে সুখে না থাকিবার কোন কারণ নাই। বস্তুতঃ যতই দিন যাইতে লাগিল, লোকটি খাইয়া-দাইয়া বাবা বিশ্বনাথের ষাঁড়ের মত মোটা হইতে লাগিল।

আরাম পাইয়া তার চালচলনেও একটু একটু করিয়া পরিবর্ত্তন আসিল। কৌপীন ঘন ঘন পরিষ্কার হইতে লাগিল,

পূজার আগ্রহ পূর্ব্বের চেয়ে কমিয়া আসিল, গলায় তুলসী কাঠের মালা সর্ব্বদা থাকিত না, স্তোত্র পাঠ কচিৎ কখনও শোনা যাইত। পূর্ব্বে তার যে সকল অদ্ভুত ধারণা ছিল সে-সব দূর হইয়া গেল। এককথায় লোকটি আবার স্বাভাবিক সাধারণ মনুষ্যত্ব ফিরিয়া পাইল। তার ভিতরকার যে সকল জন্মগত প্রবৃত্তি এতদিন চাপা পড়িয়াছিল, সেগুলি আবার অল্পে অল্পে মাথা তুলিতে লাগিল। যে পঞ্চেন্দ্রিয়ের সুখ সে ত্যাগ করিতে গিয়াছিল, দেখিলাম সে সবগুলিরই সে একজন সমজদার। আহারে রুচি জ্ঞান তার টনটনে, শয়নে আরামটুকু তার পুরামাত্রায় চাই, সুন্দর জিনিষের প্রতি লোভ তার কম নয়। তবু যদি তাকে জিজ্ঞাসা করা যাইত আবার ঘরসংসার করিতে সাধ যায় কি না, সে 'না' বলিয়া উঠিত। সব-কিছুই সে পাইতে চায়, কিন্তু কোন প্রকার আবল্যের মধ্যে না গিয়া।

এইরূপে দিন যায়। সে আমার বাজার করে, ছেলেটাকে লইয়া বেড়াইতে যায়, ফরমায়েস খাটে। আমারও এখন তাকে দুবেলা দুমুঠো খাইতে দিতে মনে কোন খুঁৎখুঁৎ নাই।

একদিন বড় গরম পড়িয়াছিল। বিছানায় শুইয়া অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত অস্থির ভাবে ঘুমের জন্য বৃথা চেষ্টা করিয়া উঠিয়া ছাতে গেলাম। তখন রাস্তায় লোক চলাচল সম্পূর্ণ বন্ধ হইয়া গিয়াছে, শুধু ইলেকট্রিকের আলোগুলি রাত্রির বিনিদ্র চোখের মত জ্বলিতেছে। আকাশে জ্যোৎস্না ছিল—জ্যোৎস্নায় অদূরে গঙ্গার স্থির জলরাশি দেখা যাইতেছিল। আমার বাড়িটার ঠিক পাশেই একটি বিস্তৃত লেবুবাগান আছে—তার অপর পাশে কয়েকজন সাধু সন্ন্যাসীর আড্ডা, জনকতক গরীব লোকের বাস। ঈষৎ গতিশীল বাতাসে লেবুর গন্ধ ভাসিয়া আসিতেছিল। আমি আপন মনে পায়চারি করিতেছিলাম, এমন সময় হঠাৎ মনে হইল যেন দেখিতে পাইলাম একটি মনুষ্যমূর্ত্তি লেবুগাছের আড়ালে আড়ালে আমাদের বাড়ির দিকে অগ্রসর হইয়া আসিতেছে। আমি একটু আড়ালে সরিয়া গিয়া তাহাকে দেখিতে লাগিলাম। লোকটি নিকটে আসিলে আমি হঠাৎ ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম—"কে ?"

সে চমকাইয়া উঠিল। বলিল—"আমি বাবু।" দেখিলাম আমারই পোষা লোকটি। মনের ভিতর দিয়া একটি সন্দেহ বিদ্যুৎরেখার মত চলিয়া গেল। প্রশ্ন করিলাম—"এত রাত্রে কোথায় গিয়েছিলে ?" সে আমৃতা আমৃতা করিয়া উত্তর দিল—"সন্ন্যাসীদের আখড়ায়।" তারপর সে ভিতরে ঢুকিয়া গেল।

নীচে নামিয়া আসিয়া স্ত্রীকে ঘটনাটা বলিলাম। তিনি বলিলেন—"হয়ত সন্ন্যাসীদের আখড়াতেই গিয়েছিল।"

যাহা হউক ঘটনাটা লইয়া আমি বেশী উচ্চবাচ্য করিলাম না। পরদিন সকাল বেলা নীচে গিয়া দেখি সে চুপ করিয়া বসিয়া গুন গুন করিয়া গাহিতেছে—

"চঞ্চল মন্‌কো বশ কর্‌না
বড় ভাবনা, বড় ভাবনা।"

ভাবিলাম ব্যাপার কি ? যে লোকটা আগে গান গাহিলে হয় রাম, না হয় বিষ্ণু, না হয় শিবের গান গাহিত, তার মুখে হঠাৎ "চঞ্চল মন্‌কো বশ কর্ না, বড় ভাবনা, বড় ভাবনা" এর মানে কি ?

প্রশ্ন করিলাম—"কি রে, চঞ্চল মনকে বশ করবার জন্য এত ব্যস্ত হলি কেন ?" সে যেন একটা কৈফিয়ৎ তৈয়ার করিয়া ঠোঁটের ডগায় রাখিয়া দিয়াছিল। প্রশ্ন করিতে-না-করিতেই বলিতে লাগিল যে, কাল রাত্রে সন্ন্যাসীদের সঙ্গে তত্ত্বকথা আলোচনা করিয়া অবধি বড়ই বিবেকদংশন অনুভব করিতেছে। ভাবিতেছে যে গৃহীলোকের সংস্পর্শ সে ছাড়িয়া যাইতে চেষ্টা করিতেছিল, মনের দুর্ব্বলতা বশতঃ আবার কি করিয়া তারই মোহে আচ্ছন্ন হইয়া যাইতেছে ইত্যাদি। কিন্তু যখন বলিলাম সে যদি গৃহী লোকের সংসর্গ ছাড়িতে চায়, ইচ্ছা করিলেই ছাড়িয়া যাইতে পারে,—সে চুপ করিয়া গেল।

আরও দিন যায়। এখন তার মুখে প্রায় সর্ব্বদাই লাগিয়া থাকে—"চঞ্চল মন্‌কো বশ করনা, বড় ভাবনা, বড় ভাবনা।" আমার ছেলেটিও শুনিয়া শুনিয়া গানের পদটা শিখিয়া লইয়াছে। সেও সময়ে অসময়ে গাহিয়া উঠে—"চঞ্চল মন্‌কো বশ করনা, বড় ভাবনা, বড় ভাবনা।" আর প্রশ্ন করে, চঞ্চল কি, মন কি, বশ করা কি, সেজন্য তার সাধুদাদার অত ভাবনা কিসের।

কিন্তু এখন হইতে আমার বাড়িতে একটা বড় মজার ঘটনা ঘটিতে লাগিল। এতদিন আমার বাড়িতে যেখানে যে জিনিষটি থাকিত, সেটির আর নড়চড় হইত না। কিন্তু এখন গোলমাল হইতে লাগিল, যেখানে যে জিনিষ থাকিত,

সেখানে সেটি থাকে না, খুঁজিয়া বাহির করিতে হয়। ক্রমে একটি-দুইটি করিয়া জিনিষ অদৃশ্য হইতে লাগিল। আজ সাবানটা নাই, কাল তেলটা নাই, একদিন দেখা গেল চিরুণীটা সরিয়া গিয়াছে, একদিন একটা কাপড় উধাও হইয়া গেল, একদিন নূতন কেনা স্নোর শিশিটা নাই।

ইতিমধ্যে একটা নূতন ঝি নিযুক্ত করা হইয়াছিল। তাহার আসার পর হইতেই এইরূপ কাণ্ড ঘটিতেছে, সেইজন্য সন্দেহটা তাহার উপরেই পড়িল। স্ত্রীও তাই মনে করিলেন, সাধুজীও সায় দিয়া বলিল "তাই হবে। নইলে এতদিন উৎপাত ছিল না, এখন আজ এটা কাল সেটা থাকে না কেন?"

ঝিকে ডাকিয়া ধমক দিলাম। বেচারী কাঁদিয়া ফেলিল। বলিল "বাবু, গরীব হ'তে পারি, কিন্তু অমন বেইজ্জত আর হইনি।"

তার ভাব দেখিয়া মনে হইল হয়ত সত্যই তার দোষ নাই। কিন্তু তাহা হইলে এই কাণ্ড করিতেছে কে? যে-জীবটিকে ঘরে পুষিতেছি সেই কি? কিন্তু সে এখানে বেশ আরামে আছে, খাওয়া-পরা কিছুরই অভাব নাই, আমি তাকে সমস্তই দিই, তাছাড়া সে এ কাণ্ড করিতে যাইবে কার জন্য? সংসারেও সে সম্পূর্ণ একা। এই-সব কথা মনে করিয়া তাকে কিছু বলিতে পারিলাম না। ঝিকে সাবধান করিয়া দিলাম, আর স্ত্রীকে সতর্ক থাকিতে বলিলাম।

কয়েকদিন ভাল ভাবেই গেল। একদিন স্ত্রীর জন্য দুইখানা নূতন সাড়ী কিনিয়া আনিয়াছি, কিন্তু আনিবার দুইদিন পরেই আর সেগুলি পাওয়া গেল না। ইহার পরদিনই স্ত্রীর এক জোড়া চুড়িও চুরি গেল।

এবার মনে হইল আর শুধু সতর্ক থাকিলে চলিবে না। এর প্রতিকার করিতে হইবে। থানায় সংবাদ দিলাম। থানার লোকের প্রথম সন্দেহ হইল বেচারী ঝির উপর। তাহাকে জেরা করা হইল তার বাড়ি খানাতল্লাসী করা হইল, কিছুই পাওয়া গেল না। তখন তাহাদের সন্দেহ হইল সাধুজীর উপর। তাহার অস্ত্রীজ্ঞা খুঁজিয়া দেখা হইল, তাহাকে ধরিয়া থানায় লইয়া যাওয়া হইল, কিন্তু কোন সন্ধানই পাওয়া গেল না। সন্ধ্যাবেলায় সে থানা হইতে ফিরিয়া আসিয়া বলিল—"বাবু দয়া ক'রে স্থান দিয়েছিলেন সেজন্য আপনার নিকট কৃতজ্ঞ, কিন্তু অমন বেইজ্জত হবার পর আর আমার এখানে থাকা শোভা পায় না। আমি আমার পূর্ব্বস্থানে চলে যাচ্ছি।" বলিতে বলিতে তার চোখ দিয়া ঝরঝর করিয়া জল পড়িতে লাগিল।

মনে দুঃখ হইল। সত্যিই ত যে রকম জিনিষ চুরি যাইতেছিল, সে-সব লইয়া সে কি করিবে? টাকা পয়সা হইলে কথা ছিল। বলিলাম "পুলিশে সংবাদ দিয়েছি, তুমি আমার বাড়িতে আছ, কাজেই তোমার উপর তাদের সন্দেহ হওয়া স্বাভাবিক। কি করব বল। জিনিষ যা যাবার তা ত গিয়েইছে। তুমি এতকাল আছ, চলে গিয়ে আর কি করবে।"

লোকটি চুপ করিয়া বসিয়া আরও কিছুক্ষণ কাঁদিল। তারপর ধীরে ধীরে নীচে নামিয়া গেল।

বিষয়টা আমার কাছে একটা রহস্য হইয়াই ছিল। কোনদিন যে আবার চুরি যাওয়া জিনিষ ফিরিয়া পাইব এমন আশা পোষণই করি নাই, কিন্তু বড় আশ্চর্য্য উপায়ে সেগুলি ফিরিয়া পাইলাম।

সেদিন শহরে কি একটা উৎসব ছিল। কাশীতে উৎসবের অভাব নাই। বিশেষ তিথি থাকলেই লোকের মনে উৎসবের আনন্দ দেখা দেয়, মেলা বসে, ভিড় জমিয়া যায়। সেদিনও দশাশ্বমেধ ঘাটে মেলা বসিয়াছিল। দলে দলে লোক পর্ব্ব উপলক্ষে যার যা সাধ্যমত ভাল পোষাক পরিয়া যাওয়া-আসা করিতেছিল। আমি এক্কা করিয়া মেলা দেখিয়া ফিরিয়া আসিতেছিলাম, এমন সময় ভিড়ের মধ্যে দেখিলাম একটি নিম্নজাতীয়া যুবতী স্ত্রীলোক আমার সম্মুখ দিয়া কয়েকজন সঙ্গিনীর সহিত যাইতেছে, আশ্চর্য্যের বিষয়, তার হাতে আমার স্ত্রীর চুরি-যাওয়া চুড়িগুলির মতন একজোড়া চুড়ি আর পরণে সেই রকমের একখানা শাড়ী। আমার মনটা কেমন করিয়া উঠিল। এই শ্রেণীর স্ত্রীলোকের পক্ষে অমন বিলাস সম্ভব নয়। সে এরূপ শাড়ী ও চুড়ি পাইল কোথায়? কিন্তু তৎক্ষণাৎ কিছু করিতে পারি না। সেইজন্য এক্কা হইতে নামিয়া তার অনুসরণ করিতে লাগিলাম। সে আমাদের মহল্লার দিকেই অগ্রসর হইতেছিল। অবশেষে সে আমার বাড়ির পার্শ্ববর্ত্তী বাগানের অপর দিকের একটি বাড়িতে ঢুকিল।

আমি তৎক্ষণাৎ বাড়ি ফিরিয়া আসিলাম ও স্ত্রীকে সমস্ত

কথা বলিলাম। পরক্ষণেই মহল্লার সর্দ্দার আমার বাড়িওয়ালা-পাড়ায় মামাজী বলিয়া খ্যাত প্রতাপশালী লোকটির কাছে গিয়া হাজির হইয়া ব্যাপারটা জানাইলাম। তিনি শুনিবা-মাত্র তড়াক্ করিয়া লাফাইয়া উঠিলেন ও কালক্ষেপ না করিয়া আমাকে সঙ্গে লইয়া স্ত্রীলোকটির বাড়ির দুয়ারে আসিয়া হাজির হইলেন।

ডাকিলেন—বুড়িয়া ?

ডাক শুনিয়া স্ত্রীলোকটি পরিবর্ত্তিতবেশে দরজায় আসিয়া দাঁড়াইল। মামাজীর চোখ মুখের ভাব দেখিয়া সে থতমত খাইয়া গিয়াছিল। ভয়ে ভয়ে বলিল—"কি মামাজী ?"

মামাজী কঠিন স্বরে জিজ্ঞাসা করিলেন "বুড়িয়া তুই আজ যে-শাড়ী পরে মেলাতে গিয়েছিলি, সে-শাড়ী তুই কোথায় পেয়েছিস ?"

বুড়িয়ার মুখ শুকাইয়া গেল। সে আম্‌তা-আম্‌তা করিয়া উত্তর দিল—সে যে-বাঙালীবাবুর বাড়িতে কাজ করিত তাহারা চলিয়া যাইবার সময় সেটা দিয়া গিয়াছে।

মামাজী রাগিয়া এক ধমক দিয়া বসিলেন "তারা চলে যাবার সময় দিয়ে গেছে! বললেই আমি বিশ্বাস করলাম। যদি পাড়ায় থাকতে চাস্ তবে সত্যি কথা বল। নইলে তোর নিস্তার নেই।"

মামাজীর ধমকের ফল ফলিল। স্ত্রীলোকটি একেবারে ঘাবড়াইয়া গিয়া সমস্ত কথা স্বীকার করিল। যা বলিল তাতে আমি আশ্চর্য্য হইয়া গেলাম। বলিল, সে ইহা সাধুজীর নিকট হইতে পাইয়াছে। মামাজী চোখ বিস্ফারিত করিয়া আমার দিকে চাহিলেন। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম "আর কি কি জিনিষ দিয়েছে ?" একে একে সমস্ত জিনিষ সে বাহির করিয়া দিল। দেখিলাম যতগুলি জিনিষ আমার বাড়ি হইতে চুরি গিয়াছিল সমস্তই এর ঘরে আসিয়া জমা হইয়াছে।"

জিনিষগুলি লইয়া মামাজী বলিলেন—"চলুন শীগগীর, সাধুশালাকে দেখা যাক্।"

তাড়াতাড়ি করিয়া ফিরিয়া আসিলাম। কিন্তু আসিয়া দেখি যে-ঘরে সে থাকিত সে ঘর খালি। সাধুবাবা চম্পট দিয়াছে। স্ত্রীকে জিজ্ঞাসা করিলাম। স্ত্রী বলিলেন, আমি বাহির হইয়া যাইবার পর তিনি সাধুজীকে বলেন যে হারানো জিনিষের সন্ধান পাওয়া গিয়াছে। শুনিয়া সাধুজী কিছু না বলিয়া নীচে চলিয়া যায়। তার পর তিনি আর কিছু জানেন না।

মামাজীকে লইয়া চারিদিকে খোঁজ করিতে গেলাম, কিন্তু কোথাও তার সন্ধান পাওয়া গেল না। ক্লান্ত হইয়া ফিরিয়া আসিয়া বিছানায় শুইয়া ভাবিতে লাগিলাম, মানুষের মন কি বিচিত্র, আর নারী কি বিস্ময়ের বস্তু! ব্যাপারটা এখন আমার কাছে পরিষ্কার হইয়া আসিল। মনে পড়িল একদিন রাত্রে আমার পোষা জীবটিকে বাগানটা পার হইয়া আসিতে দেখিয়াছিলাম এবং তার পর হইতেই তার মুখে প্রায়ই শুনিতাম—'চঞ্চল মন্‌কো বশ করনা, বড় ভাবনা, বড় ভাবনা।" তখন সে যে কৈফিয়ৎ দিয়াছিল, আর যা আমি বিশ্বাস করিয়া লইয়াছিলাম দেখিলাম সমস্তই মিথ্যা। তার মন চঞ্চল করিয়া দিয়াছিল এই স্ত্রীলোকটি, আর তাকে সন্তুষ্ট করিবার জন্যই বিলাসের সামগ্রী অপহরণ করিয়া সে প্রণয়ের উপহার দিতেছিল। অথচ কি চতুর ভাবেই সে তাহা গোপন করিয়া আসিতে পারিয়াছে।

অনেকদিন চলিয়া গিয়াছে। সাধুজীর কথা আমরা এক রকম ভুলিয়াই গিয়াছি। সে চলিয়া গেলে খোকার মনে অত্যন্তই দুঃখ হইয়াছিল, সে প্রায়ই তার কথা জিজ্ঞাসা করিত। এখনও মাঝে মাঝে সে গানের পদটা আপন মনে গাহিয়া উঠে আর জিজ্ঞাসা করে, সাধুদাদার কি হইয়াছিল, সে চলিয়া গেল কেন? তখনই আবার তার কথা নূতন করিয়া মনে হয় আর ভাবি—এতদিনে কি সে তার চঞ্চল মনকে বশ করিতে পারিয়াছে?

সংবাদপত্রে সেকালের কথা*

শ্রীসুশীলকুমার দে, এম এ, ডি লিট্

ইতিপূর্ব্বে গত বৎসরের 'মডার্ণ রিভিউ' পত্রিকায় (নভেম্বর ১৯৩২) এই পুস্তকের প্রথম খণ্ডের সমালোচনায় আমরা লিখিয়াছিলাম যে ইহার দ্বিতীয় খণ্ডের জন্য জিজ্ঞাসু পাঠকসমাজ উৎসুক থাকিবে। এক্ষণে অতি অল্প সময়ের মধ্যে বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের গুণগ্রাহিতায় দ্বিতীয় খণ্ড প্রকাশিত হইল। এই বহুশ্রমসাধ্য ও বহুমূল্য সঙ্কলনের প্রয়োজন উপকারিতা ও সম্পাদন রীতি সম্বন্ধে আমরা পূর্ব্ব সমালোচনায় যাহা বলিয়াছিলাম সুখের বিষয় যে দ্বিতীয় খণ্ডের সমালোচনায় সে সমস্ত কথাই বিশেষরূপে প্রযোজ্য।

পুস্তকের নামকরণ হইতে ইহার প্রতিপাদ্য বিষয়ের আভাস পাওয়া যাইবে। 'সে কালের কথা' অর্থে বেশী কালের কথা নহে, বিগত উনবিংশ শতাব্দীর কথা মাত্র শত বৎসর পূর্ব্বেকার কথা। কিন্তু বেশী দিনের কথা না হইলেও এই সদ্যোবিগত উনবিংশ শতাব্দীর ইতিবৃত্ত আমরা প্রায় ভুলিতে বসিয়াছি। মৃত পিতামহ প্রপিতামহদের কথা কে মনে করিয়া রাখে? ব্রজেন্দ্রবাবু আমাদের বিস্মৃতপ্রায় পূর্ব্বপুরুষদের কথা নূতন করিয়া শুনাইয়া আমাদের কৃতজ্ঞতাভাজন হইয়াছেন।

প্রাচীনতর যুগ সম্বন্ধে আমরা অনেক সংবাদ রাখি কিন্তু যে যুগ আমাদের এত নিকটবর্ত্তী এবং যে যুগের জের এখনও আমাদের জাতীয় জীবনকে চালিত করিতেছে তাহার সম্বন্ধে আমাদের জ্ঞান যে খুব বেশী তাহা বলা যায় না। যাহা সুদূর তাহার প্রতি মোহ থাকা স্বাভাবিক, কিন্তু যাহা নিকটতর এবং যাহা আমাদের সহিত ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধসূত্রে আবদ্ধ তাহার বিচিত্র কাহিনীও কিছু কম চিত্তাকর্ষক নহে। এ কথা সম্পূর্ণ সত্য নহে যে আমরা পুরাবৃত্তের অধিকতর পক্ষপাতী কারণ যাহা ঘরের কথা এবং আমাদেরই পিতামহদের বিস্মৃত বৃত্তান্ত তাহাও শুনিতে কৌতূহলের অভাব নাই। গত শতাব্দী সম্বন্ধে আমাদের অজ্ঞতার একটি কারণ এই হইতে পারে যে, স্কুল-কলেজে পাঠ্য বা প্রচলিত ঐতিহাসিক গ্রন্থাদিতে আমরা পুরাকালের কথাই বেশী পাইয়া থাকি, গত যুগের বাঙ্গালা দেশের কথা এত সহজলভ্য নহে। যে কয়েকটি জীবনী বা প্রবন্ধাদিতে কিছু কিছু বিবরণ পাওয়া যায় তাহাও সব সময়ে সকলের নজরে পড়ে না এবং অনেক সময় এই অসম্পূর্ণ বৃত্তান্তগুলি এত ভুলভ্রান্তি কল্পিত তথ্য বা বিকৃত সত্যে ওতপ্রোত থাকে যে সেগুলিকে নির্ভরযোগ্য ঐতিহাসিক বা ধারাবাহিক বিবরণ বলিয়া গ্রহণ করা যায় না। এই যুগের একটি সুসংযত ও পূর্ণাঙ্গ ইতিহাস এখনও লিখিত হয় নাই।

ব্রজেন্দ্রবাবু এই যুগের ধারাবাহিক ইতিহাস লিখিতে চেষ্টা করেন নাই। তাহা লিখিবার সময় বোধ হয় এখনও আসে নাই। এরূপ ইতিহাস সর্ব্বাঙ্গসুন্দর করিয়া লিখিতে হইলে যে-সকল তথ্যের উপাদান প্রয়োজন তাহা এখনও সম্পূর্ণরূপে সংগৃহীত হয় নাই। ব্রজেন্দ্রবাবু এই তথ্য সংগ্রহের কার্য্যে মনোনিবেশ করিয়াছেন কারণ তিনি বুঝিয়াছেন যে এরূপ উপকরণ-সংগ্রহ সম্পূর্ণ না করিয়া ইতিহাস লিখিতে যাওয়া বাতুলতা বা সৌখীনতা মাত্র। আপাতদৃষ্টিতে এই কার্য্য সামান্য হইলেও বর্ত্তমান সময়ে ইহার উপকারিতা ও প্রয়োজনীয়তা অস্বীকার করা যায় না। বড় বড় সৌখীন বই লিখিয়া গৌরব অর্জ্জন করিবার সহজ উপায় অনেকেই খুঁজিয়া থাকেন কিন্তু এরূপ সামান্য অথচ নিতান্ত প্রয়োজনীয় ও শ্রমসাধ্য ব্যাপারে আত্মনিবেশ করিবার উৎসাহ ও একাগ্রতা সুলভ নহে। উনবিংশ শতাব্দীর 'সমাচার দর্পণ' নামক সুপ্রসিদ্ধ পত্রিকার পুরাতন ফাইলে যে প্রচুর ও বিচিত্র সাময়িক ঐতিহাসিক উপাদান বিক্ষিপ্ত ও দুষ্প্রাপ্য অবস্থায় পড়িয়া ছিল বর্ত্তমান গ্রন্থে ব্রজেন্দ্রনাথবাবু সেগুলি অদম্য উৎসাহ ও অক্লান্ত পরিশ্রমের দ্বারা শৃঙ্খলাবদ্ধ ভাবে, শুধু ঐতিহাসিকের নহে সাধারণ পাঠকেরও সুগম্য ও সুপাঠ্য করিয়াছেন। এরূপ অন্যান্য সমসাময়িক সংবাদপত্র হইতে আরও তথ্য সংগ্রহ করা প্রয়োজন এবং এই ক্ষেত্রে আরও উৎসাহী কর্ম্মীর শুভাগমন হইলে সুখের বিষয় হইবে। কিন্তু ব্রজেন্দ্রবাবু একাই যাহা সংগ্রহ করিয়াছেন তাহা দেখিলে তাঁহার একনিষ্ঠ সাধনার প্রশংসা না করিয়া থাকা যায় না। তাঁহার সুদীর্ঘ ও সুসম্পাদিত সঙ্কলনকে উনবিংশ শতাব্দীর পূর্ণাঙ্গ ইতিহাস বলিয়া ধরা না যাইতে পারিলেও ইহার মধ্যে যে প্রচুর ও প্রামাণ্য উপকরণ রহিয়াছে তাহা ইহার ভবিষ্যৎ সত্য ইতিহাস রচনার ভিত্তি-স্বরূপ হইবে।

সাধারণ পাঠকের পক্ষেও এরূপ সংগ্রহের মূল্য কিছু কম নহে। তৎকালীন সমাজ, রাষ্ট্র শিক্ষা, সাহিত্য ভাষা ধর্ম্ম, চিন্তার ধারা ও আচার-ব্যবহারের যে অপূর্ব্ব চিত্রপট, তৎকালীন সাময়িক পত্রিকাদি হইতে সঙ্কলিত সুনিপুণ সংগ্রহের মধ্যে উন্মীলিত হইয়াছে তাহা শুধু মনোজ্ঞ নহে শিক্ষিত ব্যক্তিমাত্রেরই অবশ্য জ্ঞাতব্য ও শিক্ষাপ্রদ। কারণ, উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে নূতন শিক্ষা ও আদর্শের প্রচারের সঙ্গে সঙ্গে যে দেশব্যাপী নবজাগরণের সূত্রপাত হইয়াছিল, সেই সামাজিক ও আধ্যাত্মিক বিপ্লবের এখনও শেষ হয় নাই এখনও আমরা সেই যুগ-পরিবর্ত্তনের ফলভাগী। বিংশ শতাব্দীর বাঙ্গালা দেশ উনবিংশ শতাব্দীর বাঙালা দেশের উপরই প্রতিষ্ঠিত; বর্ত্তমান যুগকে বুঝিতে হইলে গত যুগকে না বুঝিলে চলিবে না।

নিতান্ত সহজপ্রাপ্য সাধারণ কয়েকটি তথ্য বা ঘটনা লইয়া ও বাকীটুকু সুলভ কল্পনা দ্বারা পরিপূরণ করিয়া, এই যুগের একটি চমকপ্রদ বিবরণ রচনা করা কঠিন নহে; কিন্তু এরূপ রচনার কোনও চিরস্থায়ী মূল্য নাই। নিরপেক্ষ ইতিবৃত্ত রচনা করিতে হইলে যে-তথ্যানুসন্ধানের প্রয়োজন তাহা অশেষ পরিশ্রম ও যত্নসাপেক্ষ। সেইজন্য ঐতিহাসিক সাধনার এই কঠিন পথ অবলম্বন করিবার ধৈর্য্য, অধ্যবসায় ও অনুরাগ সকলের নাই। থাকিলেও সহজ পথ অবলম্বন করা বোধ হয় মানুষের স্বভাবসিদ্ধ এবং সহজ পথ অনেক সময় ক্ষিপ্র ও আপাত-ফলদায়ী। ঐতিহাসিকের কঠোর তথ্যনিষ্ঠার দ্বারা প্রণোদিত হইয়া, ব্রজেন্দ্রবাবু এই সহজ পথ ও সুলভ নাম যশের প্রত্যাশা পরিত্যাগ

---

* সংবাদপত্রে সেকালের কথা—দ্বিতীয় খণ্ড। শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় সঙ্কলিত ও সম্পাদিত। বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদ গ্রন্থাবলী ৮২। কলিকাতা ১৩৪০। পৃ. ১৸০+৫১৫।

করিয়াছেন। উল্লিখিত চমকপ্রদ, কিন্তু পরিণাম-নিষ্ফল, বৃত্তান্ত লিপিবার প্রলোভন সংবরণ করিয়া তিনি একটি সোজাসুজি সংযত ও নিখুঁত ইতিবৃত্তের আভাস দিয়াছেন যে-আভাস পরিস্ফুট করিবার জন্ত তাঁহাকে যথেষ্ট শ্রমস্বীকার অর্থব্যয় ও এমন কি স্বাস্থ্যনাশ পর্য্যন্তও করিতে হইয়াছে। সেই বিস্মৃতপ্রায় শতাব্দীর অধুনা-দুষ্প্রাপ্য, কীটদষ্ট, গলিতপ্রায় সংবাদপত্রাদি যেখানে যাহা পাওয়া যায় তাহা তন্ন তন্ন করিয়া অনুসন্ধান করিয়া অনন্তসাধারণ পরিশ্রম ও একাগ্রতার সহিত তাহা মিলাইয়া নকল করিয়া তাহা হইতে যে বহু অজ্ঞাত ও মূল্যবান্ তথ্য সংগ্রহ করিয়াছেন তাহার দ্বারা বর্ত্তমান গ্রন্থে তিনি সেই যুগের সুখ দুঃখ গৌরব ও অগৌরবের একটি নির্ব্বিকার প্রামাণ্য চিত্র অঙ্কিত করিতে সমর্থ হইয়াছেন। এই চিত্র তাঁহার নিজের মতবাদ বা কল্পনার দ্বারা অতিরঞ্জিত নহে সেই যুগের কাগজপত্রের ভাণ্ডার দ্বারাই তাহাকে ফুটাইয়া তুলিয়াছেন।

পুস্তকের নাতিদীর্ঘ ভূমিকায় প্রতিপাদ্য প্রধান প্রধান বিষয়গুলির একটি সংক্ষিপ্ত ও সংযত বিবরণ দেওয়া হইয়াছে। প্রথম খণ্ডে ১৮১৮ হইতে ১৮৩০ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত তের বৎসরের তথ্য সঙ্কলিত হইয়াছিল; দ্বিতীয় খণ্ডে ১৮৩০ হইতে ১৮৪০ পর্য্যন্ত এগার বৎসরের তথ্য সঙ্কলিত হইয়াছে; কিন্তু দ্বিতীয় খণ্ড বিষয় প্রাচুর্য্যের জন্য আয়তনে বৃহত্তর। প্রথম খণ্ডের মত, ইহাতেও শিক্ষা, সাহিত্য সমাজ, ধর্ম্ম ও বিবিধ বৃত্তান্ত— এই কয়টি বিভাগ ইহার পাঁচশত পৃষ্ঠা পরিপূর্ণ করিয়াছে। পুস্তকান্তর্গত ব্যক্তি ও বিষয়ের একটি ত্রিশপৃষ্ঠাব্যাপী বিস্তৃত সূচীপত্র দেওয়া হইয়াছে। তৎকালীন চিত্রকর দ্বারা অঙ্কিত শত বৎসর পূর্ব্বেকার দৈনন্দিন বাঙ্গালী জীবনের বারটি দুষ্প্রাপ্য চিত্র পুনর্মুদ্রিত হইয়াছে এগুলিও ঐতিহাসিক উপাদান হিসাবে মূল্যবান।

বর্ত্তমান ইংরাজী শিক্ষার ভিত্তিস্থাপন ও বহুল প্রচার এই যুগের একটি প্রধান স্মরণীয় ঘটনা। পুরাতন হিন্দুকলেজ, সংস্কৃত কলেজ, মেডিকেল কলেজ, কলিকাতা ও মফঃস্বলে বিবিধ বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা, স্ত্রীশিক্ষা শিক্ষাবিষয়ক সভাসমিতি ও তৎসঙ্গে সংস্কৃত চতুষ্পাঠী প্রভৃতির নানা সংবাদ এই গ্রন্থের শিক্ষা বিভাগে সঙ্কলিত হইয়াছে। সাহিত্য-বিভাগে—সে-যুগের মুদ্রিত পুস্তক, সংবাদপত্র, সাহিত্য ও ভাষা-সংক্রান্ত অনেক তথ্য সংগৃহীত হইয়াছে। সামাজিক তথ্যের মধ্যে দেশের নৈতিক অবস্থা আমোদ-প্রমোদ, জনহিতকর অনুষ্ঠান, আর্থিক অবস্থা, শাসন প্রভৃতি বহু সরস ও প্রয়োজনীয় সংবাদ পাওয়া যাইবে। ধর্ম্মসম্বন্ধীয় সংবাদের মধ্যে পূজা-পার্ব্বণ, বিবাহ শ্রাদ্ধ, ধর্ম্মকৃত্য, ধর্ম্মসভা, তীর্থাদি বিষয়ে নানা তথ্য লিপিবদ্ধ হইয়াছে। বিবিধ বিভাগে কলিকাতা ও মফঃস্বলের রাস্তাঘাট বাড়ীঘর, বিভিন্ন স্থানের ইতিবৃত্ত প্রভৃতি নানা কথা সঙ্কলিত হইয়াছে। এই সমস্তই 'সমাচার-দর্পণ' হইতে উদ্ধৃত হইয়াছে, কিন্তু পরিশিষ্টে ১২৩৮ সালের 'সমাচার চন্দ্রিকা' হইতেও কতকগুলি সংবাদ দেওয়া হইয়াছে।

এই সমস্ত সংবাদ অন্য কোথাও এত সহজে পাইবার উপায় নাই, এবং সমসাময়িক বলিয়া তথ্য-হিসাবে ও বিষয় বৈচিত্র্যে ইহাদের মূল্য কেহই অস্বীকার করিতে পারিবে না। শুধু এইটুকু বলিলে এরূপ সংগ্রহের প্রয়োজনীয়তা ও উপকারিতা আরও পরিস্ফুট হইবে যে, এই সকল পুরাতন সংবাদপত্রের অধিকাংশ আমাদের দেশের জলহাওয়ার প্রভাবে লুপ্তপ্রায়, অথবা চেষ্টা ও অনুরাগের অভাবে সযত্নে রক্ষিত হয় নাই। এগুলির অনুসন্ধান ও সংগ্রহ যে কত কষ্টসাধ্য, এবং এগুলি পরীক্ষা করিয়া অভ্রান্তরূপে নকল করিয়া লওয়া যে কত যত্নসাপেক্ষ তাহা যাঁহারা এই বিষয়ে মনোনিবেশ করিয়াছেন তাঁহারা বুঝিতে পারিবেন। এ-সম্বন্ধে প্রথম খণ্ডের ভূমিকায় গ্রন্থকার যাহা লিখিয়াছেন, তাহা সকল অনুরাগী পাঠকেরই অনুধাবনযোগ্য—

"বহু পুরাতন সংবাদপত্র ক্রমে দুষ্প্রাপ্য হইয়া উঠিতেছে। যেগুলি পাওয়া যায় সেগুলিও অনেক সময় সম্পূর্ণ নহে। এই অবস্থায় অবিলম্বে অবহিত না হইলে, যে উপাদানগুলি এখনও আছে সেগুলিও বিনষ্ট হইয়া যাইবে উনবিংশ শতাব্দীতে বাঙালী-জীবন কিরূপ ছিল তাহা আর তেমন করিয়া জানা যাইবে না। অষ্টাদশ শতাব্দী পর্য্যন্ত খাঁটি বাঙালী-জীবন যেমন অনুমানসাপেক্ষ হইয়া দাঁড়াইয়াছে, উনবিংশ শতাব্দীর বাঙালীর ইতিহাসও তেমন হইয়া দাঁড়াইবে।"

ইহা সত্যই দুঃখের বিষয় যে প্রতিদিন এই সকল প্রাচীন উপকরণ নষ্ট হইয়া যাইতেছে, অথচ তাহাদের সংরক্ষণ বা অনুসন্ধানের চেষ্টা যেরূপ হওয়া উচিত সেরূপ হইতেছে না। কিন্তু ব্রজেন্দ্রবাবুর মত পরিশ্রমী ও অনুরাগী ব্যক্তি বাঙ্গালা দেশে সুলভ নহে এবং এ বিষয়ে উৎসাহ দিবার জন্য গুণগ্রাহী বদান্যতারও অভাব রহিয়াছে। সুতরাং যাহা কিছু প্রাচীন মূল্যবান্ উপকরণ এখনও পাওয়া যায়, তাহা এরূপভাবে সঙ্কলন করিয়া লিপিবদ্ধ করিবার সঙ্কল্প শুধু সময়োপযোগী নহে, একান্ত প্রয়োজনীয়। এই সৎকার্য্যের কিয়দংশ ভার সৎপাত্রে ন্যস্ত ও সুসম্পন্ন করিয়া, বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ সজ্জনয় বাঙ্গালী পাঠক মাত্রেরই ধন্যবাদের পাত্র হইয়াছেন।

ভ্রম-সংশোধন

প্রবাসী (জ্যৈষ্ঠ, ১৩৪০) ২০০ পৃষ্ঠা——"সমুদ্রে" চিত্রটির শিল্পীর নাম শ্রীমণিমোহন রায়-চৌধুরী,—শ্রীবদ্রীপ্রনারায়ণ রায় নহে।

শৃঙ্খল

শ্রীসুধীরকুমার চৌধুরী

১৫

অজয়কে বিমান বার বার বলিয়াছে, সমস্যাটা তোমার একলার নয়, মানুষের জীবনের, বিশেষ করিয়া এযুগের সভ্য মানুষের জীবনের অধিকাংশ সমস্যাই কোনও-না-কোনও রূপে সমষ্টিগত সমস্যা। কিন্তু বিমানের কথা অজয় শুনিত মাত্রই, শ্রদ্ধা করিয়া শুনিত না। তদুপরি নিজের পুরুষকারে তাহার অপরিসীম নির্ভর। নিজের বাহিরে আর যাহা-কিছু, তাহারই ত অপর নাম দৈব। সমষ্টিগত কর্ম্মফলকেও সে দৈবেরই নামান্তর বলিয়া জানে। সুতরাং একলার মনে করিয়াই তাহার জীবনের সমস্ত সংশয়-সমস্যার সঙ্গে সে সংগ্রাম করিতে নামিয়াছে।

প্রথমেই তাহার দৈহিক অসম্পূর্ণতা। এই ক'দিনেই শরীর যেন আরও ভাঙিয়া পড়িয়াছে। শ্রম না করিয়াই শ্রান্তি. আহার নাই অপরিপাক আছে। নন্দ তাহার পরিচিত এক হোমিওপ্যাথ ডাক্তারের কাছে লইয়া যাইবার প্রস্তাব করিয়াছিল, অজয় ডাক্তারের কাছে যাইতে অপমান বোধ করে। তাহার অস্বাস্থ্য তাহার লজ্জা, ইহাকে প্রচার করিয়া বেড়াইতে তাহার আপত্তি। সুভদ্র বন্ধু মানুষ, নিজে হইতে অজয়ের চিকিৎসার ভার হাতে লইয়াছিল, তাহার পাঁচনে তিক্ততা ছিল, অগৌরব ছিল না। নন্দকে এত কথা সে বলে নাই, বলিয়াছে সমস্ত অস্বাস্থ্যের প্রতিকার অনায়াসে এবং বিনা চিকিৎসাতে করিতে পারে, প্রতি মানুষ সেই গভীর শক্তিতে শক্তিমান্। নিজের মধ্যে সেই শক্তির উৎসমূল আমি খুঁজিয়া বাহির করিব, ইহাই আমার সাধনা। নতুবা মনুষ্যত্বের দুরূহতর পরীক্ষাগুলিতে আমি উত্তীর্ণ হইব কেমন করিয়া?

বিমান কাছে থাকিলে বলিত, 'তুমি ভারতবর্ষের মানুষ, তোমার এধরণের সব spiritualityর মূলে আছে তোমার মজ্জাগত আলস্য। সবকিছুকে তুমি সহজ করিতে চাও।' বিমানের কথা এখন না ভাবিলেও চলে। অজয়ের জগতে এখন একমাত্র মানুষ নন্দ, তাহাকে লইয়া কোনও গোল নাই। অহেতুক শ্রদ্ধা জিনিসটা নন্দ তাহার পূর্ব্বপুরুষদের নিকট হইতে উত্তরাধিকার সূত্রে পাইয়াছে। অজয় শ্রদ্ধেয়, অজয় প্রণম্য, ইহা স্থির করিয়াই সে সুরু করিয়াছিল, সুতরাং অতঃপর তাহার মধ্যে যাহা-কিছু অপরিস্ফুট. যাহা-কিছু দুর্ব্বোধ্য দেখিত তাহাকেই অনন্যসাধারণ জ্ঞান করিয়া ভক্তিতে আনন্দে আপ্লুত হইয়া যাইত। অজয়ের সঙ্গে কোনওদিন কোনও কিছু লইয়া সে তর্ক করিত না. তর্কটা অজয়ের হইয়া মনে মনে নিজের সঙ্গে করিত।

স্বভাবের ভয়-প্রবণতা লইয়াও অজয়ের লজ্জার অবধি ছিল না, নন্দের সঙ্গে থাকিয়া যাওয়াও কতকটা সেই পাপেরই প্রায়শ্চিত্ত-বিধানের অঙ্গ। যখন নন্দের খোঁজ করা তাহারই সর্ব্বাগ্রে কর্ত্তব্য ছিল তখন বিপদের ভয়ে সে তাহাকে এড়াইয়া চলিয়াছে. আজ যাচিয়া বিপদের সম্মুখীন হইয়া সেই অপরাধ সে ক্ষালন করিতে চায়।

দেশের অতীত ঐতিহ্যের তমসাচ্ছন্ন অন্ধকারে কল্পনার দীপবর্ত্তিকা হাতে করিয়া মাঝে মাঝে অভিযান করে। নানা রকম করিয়া দেশের বহুমুখী সমস্যাকে ভাবে, মনে মনে তাহাদের নানা ঐতিহাসিক সমাধান স্থির করে, কিন্তু তাহার মন খুসি হয় না। সমস্ত সমস্যার একটি যে সমাধানকে গহনতম অন্ধকারের অতল তলা হইতে অন্তরের আলোয় প্রদীপ্ত কহিয়া সে বাহিরে আনিতে চায়, তাহার পথ কোথায় কতদূরে?

অন্ধকারের পথে, সংগ্রামের পথে বেশীদূর অগ্রসর হইবার মত জোর অজয় কিছুতেই মনের মধ্যে সঞ্চয় করিয়া উঠিতে পারে না। শরীরের সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত চিত্তবৃত্তি কেমন দুর্ব্বল নিস্তেজ হইয়া পড়িয়াছে। কোনও কিছুতেই সাড়া জাগে না। যুগাবতার গান্ধি, ভারতবর্ষের বহুযুগব্যাপী সমাহিত তপস্যা তাঁহার দৃষ্টিতে নূতন যুগের আলোয় চোখ মেলিয়াছে, বিংশ শতাব্দীর ভাষায় যুগযুগান্তের ভারতবর্ষের বাণী তাঁহার

উদাত্তকণ্ঠে ধ্বনিত হইয়া উঠিয়াছে, ধনী-নির্ধন, জ্ঞানী-অজ্ঞান, সমর্থ-অসমর্থ, সকলকে তাঁহার আহ্বান, এ-আহ্বান অজয়ের জন্যই কেবল নহে। অজয় কি করিবে, কি সে করিতে পারে? সত্য এবং অসত্য ব্যবহার এই উভয়েরই সঙ্গে তাহার স্বাভাবিক অসহযোগ, সে কর্ম্মহীন অসামাজিক মানুষ। নন্দ বাহির হইতে চাহিয়া চিন্তিয়া মাঝে মাঝে দু-একটা পুরান খবরের কাগজ সংগ্রহ করিয়া আনে, পড়িয়া অজয়ের দুর্ব্বল দেহ গভীর আবেগে কণ্টকিত হয়। দ্বিপ্রহরের খররৌদ্রে ছাতের উপর দ্রুত পায়চারি করিতে করিতে চতুর্দ্দিক্কার নিশ্চিন্ত নিরুদ্বেগ জীবনযাত্রা লক্ষ্য করিয়া সে ক্ষিপ্ত হইয়া উঠে।

দেশের এই পক্ষাঘাতগ্রস্ত মন, নিজেকে দিয়া অজয় বুঝিতেছে। এ দেশে কতিপয়ের স্বার্থত্যাগ, কতিপয়ের প্রাণদান চিরকালই ব্যর্থ হইবে। এদেশের মানুষ দেখে, শোনে, আলোচনা করে, টেবিল চাপড়ায়, তারপর সব ভুলিয়া যায়। চোখের সম্মুখে সর্ব্বনাশ ঘটিয়া গেলেও পাশ কাটাইয়া ইহারা বাড়ী আসে এবং বৈঠকখানার বাতাসকে কণ্ঠস্বরের উদ্দীপনায় ভরিয়া তুলিতে পারিলেই খুসি হয়।

সুভদ্রের সঙ্গে ইহা লইয়া বহুদিন সে আলোচনা করিয়াছে। এই পক্ষাঘাতের কি চিকিৎসা? সুভদ্রের উক্তি চিকিৎসকের উপযুক্ত,-- sex repression হইতে দেশের এই অধোগতি।

অজয়ের উত্তর কেরাণীর ঘরে দুইগণ্ডা ছেলেমেয়ে দেখে ত তা মনে হয় না?

সুভদ্রের প্রত্যুত্তর- sexকে মনের পর্য্যায় থেকে শরীরে নামিয়ে ফেলা হয়েছে, এই অবস্থাটার প্রতিকার চাই। দুদিক্কার মিলন না ঘটিয়ে দিতে পারলে দুদিক্‌টাই starved হতে থাকবে। তার ফলে দেশব্যাপী শরীর-মনের অস্বাস্থ্য।

সুভদ্রের কথা অজয়ের মনঃপূত হয় নাই, কিন্তু সুভদ্রের বুদ্ধির সেই স্থৈর্য্য আছে, সুনির্দ্দিষ্ট আদর্শের দ্বারা অনুপ্রাণিত অন্তরে সে অধ্যবসায় তাহার আছে যাহার সহায়তায় ফলাফল বিচার না করিয়াও সে কাজ করিয়া যাইতে পারে। অজয় তাহা পারে না। অগত্যা অজয় ভাবে, দেশের এই যে নির্লিপ্ততার সাধনা ইহা এত বড় জিনিষ যে আমার ক্ষুদ্র বুদ্ধি লইয়া তাহা বুঝিবার সামর্থ্যই আমার নাই। এই সাধনার শেষ স্তরে বিগতমোহ হইয়া দুঃখসুখের দেনা-পাওনার হাটে ফিরিয়া আসিবার অধিকার ত সাধকের জন্য আছেই। যায়, সেই সাধনা সকলের জন্য নহে, অন্ততঃ তাহার জন্য নহে।

তাহার অস্তিত্বের একেবারে গোড়ার স্থানটিতে ঐন্দ্রিলাকে লাভ করিবার তপস্যা। পাছে সে-তপস্যায় কোথাও বিঘ্ন ঘটে এই ভয়ে বীণার স্মৃতিকে প্রাণপণে এই ক'দিন সে এড়াইয়া চলিতেছে।

তবু এমনই দুর্দ্দৈব, ঐন্দ্রিলাকে মনে করিতে গেলেই সর্ব্বাগ্রে বীণার স্নিগ্ধ মাধুর্য্য-মণ্ডিত মুখখানি তাহার স্মৃতির পটে ভাসিয়া উঠে। সে-মুখটি যে সুন্দর অজয়কে বারম্বার তাহা স্বীকার করিতে হয়। কি জানি কেন, ঐন্দ্রিলার মুখ তত সহজে সে মনে আনিতে পারে না।

নন্দের পরীক্ষার আর তিন দিন মাত্র বাকী। সমস্ত দিনরাতই প্রায় সে পড়িতেছে। সকালে ভাল করিয়া অন্ধকার না কাটিতেই বালিশটাকে কোলে করিয়া সে উঠিয়া বসে। স্নানের সময় না-হওয়া পর্য্যন্ত নড়ে না। স্নানের পর ঘণ্টাখানেকের জন্য বাড়ী ছাড়িয়া বাহির হয়, কিন্তু সে ফিরিয়া আসিলে তাহার ক্লান্ত শুষ্ক মুখ দেখিয়া অজয় বুঝিতে পারে, বাহির হওয়াটা বেশীর ভাগই অজয়কে ভুলাইবার জন্য। রাত্রিতে সম্ভবতঃ কোনওদিন দুপয়সার ছোলাভাজা, কোনওদিন বা একমুঠা যবের ছাতু আহার করিয়া সে ক্ষুন্নিবৃত্তি করে। গলির ধারের একটা গ্যাসের আলোর খানিকটা একতলার বারান্দার এককোণে আসিয়া পড়ে, সেইখানে একটা খবরের কাগজ পাতিয়া বসিয়া নন্দ পড়া করে, ঝড়বৃষ্টি না হইলে রেড়ীর তেল পোড়ায় না। প্রায় সমস্ত রাত জাগিয়াই সে পড়ে, অজয় বারণ করিলেও শোনে না, অত্যন্ত অপরাধীর মত মুখ করিয়া বলে, "এই ক'টা ত দিন, স্কলারশিপ না পেলে আর যে আমার পড়া হবে না!"

অজয়ের বলিতে ইচ্ছা করে, নিজের প্রাণের মূল্যের বিনিময়ে এমন করিয়া যে-অভীষ্ট তুমি লাভ করিতে চাহিতেছ, তোমার ঐহিক বা পারত্রিক কোন্ কাজে তাহা লাগিবে কখনও ভাবিয়া দেখিয়াছ কি? কিন্তু তরুণ-হৃদয়ের এই সাগ্রহ স্বপ্ন-সাধনাকে নির্ম্মম হইয়া ভাঙিতে পারে না। বলিতে চায়, প্রাণেই যদি না বাঁচিয়া থাকো, স্কলারশিপটা শেষ অবধি ভোগ করিবে কে? উহার ক্ষুৎপীড়িত আশাহীন রোগবিশীর্ণ মুখের দিকে চাহিয়া সেকথাটাও বলিতে তাহার আটকায়।

দিনের পর দিন এই প্রাণান্তকর সাধনা চোখে দেখিয়া অজয়েরও মনে নিজেরই অজ্ঞাতে কাজের উৎসাহ জাগিয়া উঠিতেছিল বহুদিন হইতে একটি ঐতিহাসিক নাটক রচনার জন্য সে প্রস্তুত হইতেছিল, সম্প্রতি একদিন রাত্রির অন্ধকারে গা-ঢাকা দিয়া বাহির হইয়া স্বল্পাবশিষ্ট অর্থ হইতে কিছু কাগজ, দোয়াত, কলম, প্রভৃতি আবশ্যকীয় জিনিস সে কিনিয়া আনিয়াছে। অনেক কাটাকুটি করিয়া দুই অঙ্ক অবধি লেখা হইয়াছে, আরও দিন দশবারো খাটিতে পারিলে হয়ত বইটা শেষ হয়, কিন্তু সেই অবধি কেমন করিয়া তাহার চলিবে তাহা সে জানে না। তিনটাকা এগারো আনা লইয়া সুরু করিয়াছিল, যাহা বাকী আছে তাহাতে দুইদিন, কি বড় জোর আর তিনদিন অর্দ্ধাশনে তাহার চলিতে পারে। তাহার পর কি উপায় হইবে? তখনকার অবস্থাটাকে কিছুতেই সে কল্পনা করিতে পারিল না। ভাবিল, অদৃষ্ট এত নির্ম্মম হইতে পারে না। আমি কাহারও সাহায্য-প্রার্থী হইব না তাহা নিশ্চয়, কিন্তু অনাহারেও শুকাইয়া মরিব না। কোনও অলক্ষ্য উপায়ে আমার সম্মুখের এই অন্ধকার পাষাণ প্রাচীর সরিয়া গিয়া আমার পথ খুলিয়া যাইবে। পৃথিবীর আলোয় যেদিন চোখ মেলিয়াছিলাম, জানি না কোথা হইতে এই আশ্বাস আমার মনে জাগিয়াছিল, আমি জয়লাভ করিব। তারপর জীবনের প্রতি পদক্ষেপে সেই আশ্বাস আমার কানে বাজিয়াছে, সমস্ত বাধাবিপত্তি কোন্ অদৃশ্য শক্তির নির্দ্দেশে বারম্বার আমার পথ হইতে দূরে সরিয়া গিয়াছে। কাম্যবস্তু আমার পথে ভিড় করিয়া আসিয়াছে, আমি তাচ্ছিল্যভরে তাহার অধিকাংশকে হাত বাড়াইয়া লই নাই। আমার সেই-সমস্ত ত্যাগ-করা সম্পদ্ নিশ্চয় কোথাও কোনও হিসাবের খাতায় জমা করা আছে। আজ নিঃস্বতার দিনে, রিক্ততার দিনে আমি বঞ্চিত হইব না।

দুপুরে নন্দকে লজিক্ পড়াইতে বসিয়া বারবার সেদিন সে ভুল করিতে লাগিল। কিছুতেই বইয়ের পাতায় তাহার মন বসিল না। নন্দ হঠাৎ পড়ার মাঝখানে উঠিয়া পড়িল, কহিল, "আজ আর থাক্, একটা দিন একটু বিশ্রাম করব।"

তাহার অমনোযোগ বশতঃই যে নন্দ উঠিয়া-পড়িল তাহা বুঝিতে পারিয়া অজয় জোর করিয়াই তাহাকে আবার পড়িতে বসাইল। নিজের মনকে ইহার পর একবারও আর সে হাত-ছাড়া করিল না। ভারি ত ব্যাপার, দুমুঠা খাইতে পাইবে কিম্বা পাইবে না, তাহাই লইয়া আবার এত ভাবনা! কিন্তু এবার নন্দের দিক্ হইতে মনঃসংযোগের অভাব ঘটিতে লাগিল। সে কিছুই শুনিতেছে না, অজয়ের প্রায় সমস্ত প্রশ্নেরই অদ্ভুত অদ্ভুত উত্তর দিতেছে। অগত্যা বই বন্ধ করিয়া অজয় কহিল, "কি হয়েছে আজ তোমার? এমন অমনোযোগ ত আগে আর কখনো দেখিনি।"

নন্দ মাথা নীচু করিয়া একটু হাসিল মাত্র।

ইহার পর সমস্তটা দিন অজয় তাহার নাটক লইয়া ব্যস্ত রহিল। এই নাটকে আলমগীর চরিত্রকে সে নূতন ছাঁচে ঢালিয়া গড়িতেছে। বাদ্শাহ শাহজহান্ জরাভারগ্রস্ত স্থবির, শিশুর মত কাণ্ডজ্ঞানবর্জ্জিত, তাঁহাকে লইয়া রাজপরিবার অতিষ্ঠ। এদিকে সাম্রাজ্যের চতুঃসীমান্তে বহিঃশত্রু প্রবল। পূর্ব্বসীমান্তে দুর্দ্দান্ত মগ, পশ্চিমে পারস্য, সমুদ্র-উপকূল জুড়িয়া পর্ত্তুগীজ, ইংরেজ, ফরাসী, ওলন্দাজ। বৃদ্ধ বাদ্শাহের বুদ্ধিভ্রংশজনিত নানাপ্রকার অকর্ম্মের ফলে রাজশক্তির অবস্থা দিনে দিনে শোচনীয়তর হইতেছে, অথচ রাজমন্ত্রীদের মধ্যে, শাহজাদাদের মধ্যে, রাজার আত্মীয় অনাত্মীয় পার্শ্বদবর্গের মধ্যে এমন কেহ নাই যে সাহস করিয়া তাঁহার কোনও রাষ্ট্রব্যবস্থা বা অব্যবস্থার প্রতিবাদ করিতে পারে। হিন্দুস্থান চিরকাল বস্তু অপেক্ষা বস্তুর প্রতীকের প্রতি অধিকতর শ্রদ্ধাবান্। ইহা বুঝিবার মত বুদ্ধি ছিল বলিয়াই আউরংজীব সাম্রাজ্যের সঙ্কট সময়ে পিতাকে সিংহাসনচ্যুত করিয়া পিতৃসিংহাসন রক্ষা করিবার ব্যবস্থা করিলেন। সে-ব্যবস্থার বিরুদ্ধে বিকৃতবুদ্ধি অক্ষম বৃদ্ধের নিরুপায় বিদ্রোহ তাঁহাকে ব্যথিত করিল, কিন্তু কর্ত্তব্যভ্রষ্ট করিতে পারিল না। হিন্দুস্থানকে রাষ্ট্রীয় সংহতি দান করিয়া অমিতশক্তিশালী করিয়া তুলিবার স্বপ্ন আশৈশব তাঁহার চক্ষে; অজয় বলিতে চাহে, বাদ্শাহ আলমগীর রূপে ভারতকে একটিমাত্র ভেদ-বুদ্ধিহীন ধর্ম্মে দীক্ষিত করিবার দুশ্চেষ্টার মূলে তাঁহার আশৈশবের সেই স্বপ্ন। তৃতীয় অঙ্কে এই অবধি গল্পকে টানিয়া আনিয়া সে যখন বাহিরে আসিয়া দাঁড়াইল, তখন অস্তোন্মুখ সূর্য্যের রক্তিম আভায় কলিকাতার ধূমাচ্ছন্ন আকাশও শ্যামলী নববধূর মত সাজিয়াছে।

নন্দ শুইয়া ছিল, তাহাকে নাড়া দিয়া কহিল, "এসময়টা শুয়ে প'ড়ে না থেকে ঘুরে এসো না একটু?"

নন্দ বলিল, 'আজ শরীরটা কেমন ভাল লাগছে না।"

অজয় সে-রাতে খাইতে গেল না। বাকী পয়সা-ক'টাকে যথাসাধ্য সে বাঁচাইয়া চলিতে চায়। তিনদিন উপবাস করিয়া একবেলা খাইলে আরও তিনদিন উপবাস করিবার শক্তি সে লাভ করিবে, হয়ত ছয়দিনের দিন তাহার কিছু-একটা উপায় হইবে। আকণ্ঠ কলের জল পান করিয়া আসিয়া সে আবার নাটক লইয়া বসিল। নন্দ সচরাচর যেসময় খাইতে যায় সেই সময়ে একবার বাহিরে বারান্দায় নিঃশ্বাস লইতে আসিয়া দেখিল, এককোণে অন্ধকারে গোঁজ হইয়া সে বসিয়া আছে। ডাকিল, "নন্দ।" নন্দ সাড়া দিল না। কাছে গিয়া তাহার হাত ধরিয়া অজয় তাহাকে টানিয়া তুলিল, কহিল, "এখানে ব'সে কি করছ?"

নন্দ কহিল, "কিছু না।"

তাহার কণ্ঠস্বরে কি ছিল, "ঘরে এসো," বলিয়া অজয় তাহার হাত ধরিয়া টানিয়া ঘরে লইয়া আসিল। বাতির আলোয় তাহার মুখ ভাল করিয়া দেখিয়া বলিল, "সেদিন তোমাকে বলেছিলাম মনে আছে, যে, এ-সমস্ত চলবে না, তুমি এ রকম করলে আমি চ'লে যাব?"

ভয়ে নন্দের শুষ্ক মুখ আরও শুকাইয়া একেবারে এতটুকু হইয়া গেল। জড়িত কণ্ঠে অর্দ্ধস্ফুট স্বরে কহিল, "কথা দিচ্ছি আর কখনও করব না।"

অজয় বলিল, "পুরুষ মানুষকে দুঃখভোগ করতে হয়, দুঃখভোগ করতে দিতে হয়। বিশেষতঃ এই দুর্ভাগা দেশে দুঃখের তপস্যাই ত আমাদের একমাত্র তপস্যা, আর কি আমাদের করবার আছে?"

নন্দ নীরবে মাথা নত করিয়া রহিল। অজয় বলিল, "শোনো নন্দ। দুঃখ তুমি আমার থেকে কম করছ না, আমি তা সারাক্ষণই দেখছি, যতটা চোখে দেখা যায়। তার বেশী যেটা সেটারও অনেকখানিকে অনুভব করছি। একএকবার মনে হয়, নিজের জন্যে না হোক, তোমারই মুখ চেয়ে আমার ব্রতভঙ্গ করি। যেমন ক'রে হোক, যে-কোনো কাজ নিয়ে হোক, দুজনে দুবেলা পেট ভ'রে খাবার ব্যবস্থা করি। কিন্তু বিধান কি বলত তোমার মনে আছে ত? যে কাজ আমার নয় তা যদি আমি করতে যাই ত সে কাজ সত্যিই যার এমন একজন মানুষকে আমি বঞ্চিত করব। দেশের অন্নসমস্যা আজ এমনি।—যে-কাজের শক্তি এবং যোগ্যতা পৃথিবীতে আমারই একমাত্র আছে, তা যে কি তা আমি আজও জানি না। দেশের শিক্ষাব্যবস্থার কর্ত্তব্য ছিল অন্ততঃ সেইটে আমাকে জানিয়ে দেওয়া, তা সে দেয়নি। নিজের চেষ্টায় তা আমাকে এখন জানতে হবে। যদি তা করতে গিয়ে আমাকে অনাহারে মরতে হয়, তবু জানব মরা ছাড়া আমার উপায় ছিল না। দেশের লোক জানবে, আমার সমস্ত নিয়ে নিজের প্রতি আমি খাঁটি ছিলাম, সেই অপরাধে আমার জন্যে তারা মৃত্যুদণ্ড ব্যবস্থা করেছে। অবস্থাটাকে তারা অন্ততঃ উপলব্ধি করবে। ক্রমাগত নিজেদের ফাঁকি দিতে গিয়ে আমরা সকলে মিলে দেশ-বিধাতাকে ফাঁকি দিচ্ছি, সত্যকে আড়াল ক'রেই প্রতিকারের সম্ভাবনাকে বেশী ক'রে দূরে সরিয়ে দিচ্ছি। আমরা ম'রেও যদি সত্যকে সকলের চোখে ধরিয়ে দিয়ে যেতে পারি ত সেই মৃত্যুই কি আমাদের জীবনধারণকে সার্থক করবে না?"

অজয়ের মুখে মৃত্যুর কথা এরূপ ভাবে নন্দ পূর্ব্বে আর কখনও শোনে নাই। ভয়ের উত্তেজনায় তাহার মুখ বিবর্ণ হইয়া গেল। বেচারার অবস্থা দেখিয়া অজয় সত্যই অনুতপ্ত হইল। মৃত্যুকে একেবারে সম্মুখে করিয়াই ত বেচারা বসিয়া আছে, অনাহার ও অস্বাস্থ্য মিলিয়া তাহার জীবনের সব-কয়টি গ্রন্থিই শিথিল করিয়া দিয়াছে, পৃথিবীতে এমন আপনার জন তাহার কেহ নাই যে একমাত্র হৃদয়ের আবেগ দিয়া, স্নেহের আবেষ্টন দিয়া মৃত্যুর সেই করাল রূপকে তাহার ভয়াকুল দৃষ্টি হইতে আড়াল করিয়া রাখিতে পারে।—ইহাকে মৃত্যুমন্ত্র শোনাইয়া আর কি হইবে? তাহাকে প্রবোধ দিবার জন্য নিজের সম্মুখে টানিয়া আনিয়া বলিল, "খেতে যাওনি এখনো?"

নন্দ মাথা নাড়িয়া জানাইল, না।

অজয় বলিল, "আজকের মতো আমাদের প্রতিজ্ঞা থাকুক। আর তিনদিন পরে তোমার পরীক্ষা, এখন উপোস দিলে চলে?"

নন্দ এই প্রথম অজয়ের কথার অবাধ্যতা করিয়া বলিল, "আজ আমি কিছুতেই খেতে যেতে পারব না।"

অজয় পকেট হাতড়াইয়া তিনআনার পয়সা বাহির করিল, বলিল, "আজ প্রতিজ্ঞা যখন ভেঙেছি, ভালো ক'রেই ভাঙব। এই তিন আনা আছে, নাও। ইচ্ছে না করলেও দুটিখানি মুখে দিয়ে এসো। পরীক্ষাটা হয়ে যাক্, তারপর যতখুসি উপোস কোরো।"

নন্দ বলিল, "পয়সা ত আমার কাছেই আছে।"

অজয় বলিল, "ঠিক বল্‌ছ ?"

নন্দ বলিল, "আপনি ত জানেন, আমি মিথ্যে কখনো বলি না।"

অজয় বলিল, "তা জানি। তবে আব খেতে যাওনি কেন ? যাও, খেয়ে এসো।"

নন্দ কিছুক্ষণ স্তব্ধ হইয়া রহিল। অজয়ের মনে হইল, সে দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া টলিতেছে। হঠাৎ অজয়ের পায়ের কাছে মাটিতে সে বসিয়া পড়িল, অস্ফুট-কণ্ঠে কহিল, "আপনিও ত আজ তিন দিন রাত্রে খেতে যাননি—" বাকী যাহা বলিবার ছিল তাহার গলায় বাধিয়া গেল, অজয়ের পাশে বিছানায় মুখ গুঁজিয়া উচ্ছ্বসিত আবেগে ফুলিয়া ফুলিয়া সে কাঁদিতে লাগিল। অজয় বাধা দিতে চেষ্টা করিল না, বাধা দিবার শক্তি আজ নিজের ক্লান্ত দেহমনের মধ্যে খুঁজিয়া পাইল না।

বাহিরে বর্ষা নামিয়াছে। নীরবে নন্দের পাশে মাটিতে নামিয়া বসিয়া তাহার মাথাটিকে সে কোলে টানিয়া লইল, তারপর নীরবেই তাহার চুলের মধ্যে অঙ্গুলি চালনা করিতে লাগিল। রাত্রি বহিয়া চলিল। ধূলি-সমাচ্ছন্ন আর্দ্র ভূমিতল ছাড়িয়া উঠিবার কথা দুজনের কাহারও মনে হইল না।

ভোরের দিকে অকস্মাৎ ঘুম ভাঙিয়া অজয় দেখিল, নন্দ মাটিতেই পড়িয়া ঘুমাইতেছে। অত্যন্ত নিদ্রাতুর চোখে তাহাকে একবার উঠিতে বলিয়া নিজে কখন্ বিছানায় গিয়া শুইয়াছিল মনে নাই। ধীরে তাহার গায়ে হাত দিয়া ডাকিল, "নন্দ!" হঠাৎ গরম জলের কাৎলিতে হাত ঠেকিলে যেমন হয় তেমনই ভাবে চমকিয়া সে হাত সরাইয়া লইল, আবার সন্তর্পণে কপালে হাত রাখিয়া দেখিল, জ্বরে নন্দের গা পুড়িয়া যাইতেছে। সভয়ে তাহাকে ঠেলা দিতে দিতে ডাকিল, "নন্দ, নন্দ, ও নন্দ!"

ঘুম এবং জ্বরের মোহ একসঙ্গে কাটাইবার চেষ্টা করিতে করিতে নন্দ বলিল, "কি ?"

"বিছানায় উঠে শোও। শীগ্‌গির ওঠ। জ্বরে গা পুড়ে যাচ্ছে যে একেবারে!"

নন্দ বিছানার প্রান্তে উঠিয়া বসিল। তারপর কিছুক্ষণ বাম হস্তে দক্ষিণ হস্তের কব্জির কাছে নাড়ীর স্পন্দন অনুভব করিয়া ঘুম-জড়ান চোখ ভাল করিয়া না মেলিয়াই একটু মৃদু হাসিল মাত্র। যেন ঠিক এইরূপ হওয়ারই কথা ছিল। আরও আগেই হয় নাই যে, সে কেবল অদৃষ্ট-দেবতাকে সে এতদিন গুছাইয়া ফাঁকি দিতে পারিয়াছে বলিয়া।

অজয় বলিল, "আমারই জন্যে এই বিপদ্ ঘট্‌ল। আমার উচিত ছিল তোমাকে বিছানায় তুলে শোওয়ানো।"

নন্দ বলিল, "আপনার কি দোষ. বা রে! বিছানায় শুয়ে কি আর মানুষের জ্বর আসে না ? অসুখটা ত আমার আছেই, যখন হয় এম্‌নি হঠাৎই হয়।"

অজয় বলিল, "ক'দিন থাকে ?"

নন্দ বলিল, "তার ঠিক নেই কিছু. একদিনেও সেরে যায় আবার একুশ দিনও থাকতে পারে।" এমন ভাবে বলিল, যেন এক্ষেত্রে একে আর একুশে তফাৎ কিছু নাই। বাস্তবিক ছিলও না। পীড়িত, দুর্ব্বল, অনাহারক্লিষ্ট দেহে যে সুখের জীবন তাহাকে দিনের পর দিন অতিবাহিত করিতে হইতেছে, তাহার উপর সামান্য একটু জ্বরতপ্ততাকে এমন কিছু অসাধারণ বিপৎপাত বলিয়া তাহার মনে হইবার কথা নয়। আরও ছেলেবেলায় জ্বর আসিলে এইজন্য সেটাকে তাহার দুর্ভাগ্য মনে হইত, যে, যতদিন জ্বর থাকিবে, পেট ভরিয়া সে খাইতে পাইবে না। এখন ত এমনিতেই অধিকাংশ দিন খাইতে পায় না, সুতরাং জ্বর একটু আছে বা নাই তাহাতে আর এমন আসিয়া যাইবে কি ?

বলিল, "পরীক্ষার জন্য ভাববেন না, পরীক্ষা আমি ঠিক দেব।"

অজয় বলিল, "আচ্ছা, সে হবে এখন। সম্প্রতি তুমি শুয়ে পড় দেখি। দাঁড়াও, বালিশটা ঠিক ক'রে দিচ্ছি।... এই দুটো চাদর এক সঙ্গে ক'রে দিচ্ছি, গায়ে দাও।...মাথায় যন্ত্রণা হচ্ছে, টিপে দেব ?"

নন্দ ব্যাকুল ভাবে বলিলে, "না, না, মাথায় তেমন কিছু কষ্ট হচ্ছে না।"

অজয় বলিল, "মাথা টিপে দিতে আমার বেশ লাগে, দাওনা, টিপে দিচ্ছি।"

নন্দ কিছুতেই রাজি হইল না, কিন্তু ক্রমাগত বিছানায় এপাশ ওপাশ করিতে লাগিল।

অজয় বলিল, "কাল রাত্রে খাওনি, নিশ্চয় খুব খিদে পেয়েছে তোমার। দুপয়সার বার্লি এনে জ্বাল দিয়ে দিই, কি বল ?"

নন্দ বলিল, "জ্বরের প্রথম দিনটা লঙ্ঘন দেওয়াই ত ভালো। আজকে থাক্ !"

"কিন্তু মুখটা শুকিয়ে উঠেছে যে।"

"আচ্ছা, একটু জল দিন্।"

পিপাসায় তাহার তালু, গলা এবং বুক তখন শুকাইয়া উঠিয়াছিল।

অজয় বলিল, "দাঁড়াও, কাগজ জেলে জলটা একটু গরম ক'রে দিচ্ছি ; ওতে পিপাসাও সহজে মিটবে, ঘাম হ'লে ভালোও লাগবে একটু।"

উঠিয়া পুরান খবরের কাগজ সংগ্রহ করিয়া আগুন ধরাইল, তারপর একটা এলুমিনিয়মের গেলাসে জল লইয়া আগুনের আঁচে ধরিতে যাইবে এমন সময় দরজার কড়াটা সজোরে নড়িয়া উঠিল।

অজয় উঠিয়া-পড়িয়া বলিল, "আমাদের বাড়ীতে visitor, এমন সময়ে ? কি ব্যাপার ?"

কাহারও অসুখ দেখিলে অজয় যত ভড়কাইত এত আর কিছুতে নহে। বিশেষতঃ নন্দকে লইয়া সে এখন একেবারে একাকী। মাথা টিপিয়া দিতে চাহিয়াছিল, বাস্তবিক ঐটুকু অবধিই সে পারিত. তাহার বেশী আরও কিছু তাহাকে করিতে হইবে বলিলে তাহার মাথায় আকাশ ভাঙিয়া পড়িত। দিনের পর দিন, রাতের পর রাত একাকী এক রোগীর পরিচর্য্যা, মরণপথের যাত্রীর সঙ্গে মুহূর্ত্ত হইতে মুহূর্ত্তে গুরুভার দুর্ভাবনা বহিয়া চলা, তদুপরি নন্দের রোগটা যে বাস্তবিক কি তাহাও সে জানে না, টি-বি হইতে পারে, টাইফয়েড, কিম্বা বসন্ত...চেষ্টা করিয়াও কণ্ঠস্বরে আনন্দের উদ্দীপনা অজয় লুকাইতে পারিল না। হয়ত তাহার অজ্ঞাতবাসের পালা ফুরাইয়াছে। সে ইচ্ছা করে না সুভদ্র আসুক, কিন্তু হয়ত খবর পাইয়া সুভদ্রই তাহাকে ফিরিয়া লইতে আসিয়াছে। আর কিছু না হউক, অন্ততঃ নন্দের সমস্ত ভার তাহার হাতে তুলিয়া দিয়া তাহা হইলে সে নিশ্চিন্ত হইতে পারে।

নন্দ দুই কনুয়ের উপর ভর দিয়া উঠিয়া বসিতে গেল, তাহাকে জোর করিয়া শোয়াইয়া অজয় দ্বার খুলিয়া দিল। টুপী হাতে করিয়া যিনি প্রবেশ করিলেন, তিনি অজয়ের পূর্ব্বপরিচিত সেই বাঙালী দারোগা, লালবাজার হাজতে কয়েক মুহূর্ত্তের জন্য অজয় যাঁহাকে ভালবাসিয়াছিল। আজও মানুষটিকে দেখিয়া সে খুসিই হইল। এতটা খুসি না হইলেও ক্ষতি ছিল না, কিন্তু যে-অবস্থায় সে পড়িয়াছে, একটা মানুষের মুখ দেখিতে পাওয়াই কতকটা সান্ত্বনা, তারপর এই মানুষটিকে কি কারণে জানে না, প্রথম দিন দেখিয়াই তাহার ভাল লাগিয়াছিল। স্মিতহাস্যে আগন্তুককে সে অভিবাদন করিল। দারোগা প্রত্যভিবাদন করিয়া বলিলেন, "আপনিও এখানেই রয়েছেন বুঝি ? বেশ, বেশ। কেমন আছেন ?"

অজয় তাঁহাকে সমাদর করিয়া ভিতরে লইয়া গেল। সঙ্গের পুলিশ দুইজন ইতস্ততঃ করিয়া দ্বারপ্রান্তেই রহিয়া গেল। অজয় তাহাদের দেখিতে পাইয়াছে মনে হইল না। দারোগা বলিলেন, "কি নন্দবাবু, চিন্‌তে পারেন ?"

নন্দ মুখে হাসি আনিয়া বলিল, "চিন্‌তে কেন পার্‌ব না ? কেমন আছেন ? বসুন।"

নন্দের বিছানার এক পাশে চাদরটাকে একটু টানিয়া বসিয়া দারোগা বলিলেন, "শরীর ভালো নেই বুঝি, কি হয়েছে ?" নন্দের উত্তরের অপেক্ষা না করিয়াই তিনি তাহার কপালে হাত রাখিয়া জ্বর পরীক্ষা করিলেন, নাড়ী দেখিলেন। এলুমিনিয়মের গেলাসটা হাতে করিয়া আসিয়া অজয় বলিল, "নন্দ, জলটুকু খেয়ে নাও।"

কনুয়ে ভর দিয়া উঁচু হইয়া নন্দ জলপান করিল।

দারোগা বলিলেন, "আপনি একটু বসুন, আপনার সঙ্গে একটা পরামর্শ কর্‌বার আছে।"

অজয় নিজের বিছানার এক প্রান্তে বসিয়া সম্মুখের দিকে ঝুঁকিয়া কহিল, "বলুন, কি বিষয়ের পরামর্শ।"

দারোগা কহিলেন, "আপনাদের যা অবস্থা দেখছি, তাতে আমি এসে প'ড়ে ভালোই হয়েছে। এঁর সব ভার আপাততঃ

আমি নিতে পারব। অবশ্যি আমি নিজের ইচ্ছেয় আসিনি তা বলাই বাহুল্য..."

অজয় কহিল. "ঘরে থার্ম্মমিটার নেই, কিন্তু আমি নিশ্চয় বলতে পারি ওর জর একশোতিনের কম হবে না। পরশু রাত থেকে কিছু না খেয়ে আছে, আজ এইমাত্র একটু জল পেটে পড়ল। এ অবস্থায় ওকে কোথাও নিয়ে যাওয়া কি ঠিক হবে?"

দারোগা কহিলেন, "হাস্‌পাতালে যাচ্ছেন মনে করুন না, ব্যাপারটা আসলে ত তা-ই। এই ত আধ-কোশ রাস্তা, মোড় থেকে ট্রামে চ'লে যাব।...আমার পরামর্শ যদি শোনেন, ত, এঁকে এখুনি এখান থেকে সরাবার ব্যবস্থা না করলেই ওঁর মারা যাবার সম্ভাবনা বেশী। আপনাদের অবস্থা জান্‌তে ত আমার বাকী নেই?"

অজয় তবু দৃঢ়ভাবে মাথা নাড়িয়া কহিল. "ও যেতে পারবে না।

দারোগা কহিলেন, "ইচ্ছে থাকৃলেই যে ফে'লে রেখে যেতে পার্‌ব সে সাধ্যি কি আর আছে? জানেনই ত, আমরা হুকুমের চাকর।... তা বেশ, নন্দবাবুর ওপরেই ভার দেওয়া যাক। কি করা উচিত তিনিই বলুন।"

নন্দ উঠিয়া বসিয়াছিল, লাল ক্যানভাসের জুতাজোড়াটাতে পা ঢুকাইতে ঢুকাইতে কহিল, "আমি যাচ্ছি, চলুন।"

অত্যন্ত কাতর মিনতির স্বরে অজয় কেবল কহিল, "নন্দ..."

নন্দ আসিয়া তাহাকে প্রণাম করিল, কহিল, 'অজয়দা, অনুমতি করুন ঘুরে আসি। এ-সব আমার গা-সওয়া হয়ে গিয়েছে, জানেনই ত, কিছু কষ্ট হবে না। তাছাড়া হয়ত বেশীক্ষণ রাখ্‌বেই না, এমনি কতকগুলি প্রশ্ন করবে, জবাব দিয়ে চ'লে আসব।"

অজয় তাহার মুখের দিকে চাহিল না।

দারোগা অজয়ের অবস্থাটা বুঝিতে পারিলেন, কাছে আসিয়া বলিলেন, "অজয়বাবু. মনটাকে একটু ঠিক করুন। আমরা মানুষ ত? নাহয় পুলিশে কাজ করি, আমাদেরও ভাইবোন্ আছে, ছেলেমেয়ে আছে। ওঁর কিছু কষ্ট হবে না, আপনি একজন ছিলেন, আমরা সবাই মিলে ওঁকে দেখব। সরকারের যত দোষই দিন, অসুখে বিসুখে সি-ক্লাশ প্রিজনাররাও বা টি ট্রিমেণ্ট পায় তা আমার আপনার সাধ্যের বাইরে, সমালোচনার বাইরে ত বটেই। এমন হতে পারে যে এখান থেকে চ'লে যাবার ফলেই উনি বেঁচে যাবেন।"

অজয় কিছু না বলিয়া বিমানের ধরণে একটু হাসিল মাত্র। তাহার দিকে চাহিয়া নন্দের দুইচোখ অশ্রুসিক্ত হইয়া উঠিল, কিন্তু সেও নিজের মুখ হইতে একটুখানি হাসিকে কিছুতেই মিলাইয়া যাইতে দিল না।

নন্দকে লইয়া দারোগা চলিয়া গেলে সেইখানেই দুইহাতে মাটিতে ভর দিয়া অজয় বসিয়া পড়িল। মুখের হাসি ক্রমে বেদনায় রূপান্তরিত হইয়া যাইতেছে। দুই হাত কানের উপর চাপিয়া সে রক্তস্রোতের শব্দ বন্ধ করিতে প্রয়াস পাইতেছে, কিন্তু শব্দ দ্বিগুণতর হইতেছে। অনাহারে শরীর দুর্ব্বল ছিল, মনে হইল, হৃৎপিণ্ডের সমস্ত রক্ত মাথায় উঠিয়া পড়িয়াছে, এখনই হৃৎযন্ত্রের ক্রিয়া বন্ধ হইয়া যাইবে। দুই হাতে বুকটা চাপিয়া ধরিয়া মাটিতেই সে উপুড় হইয়া শুইয়া পড়িল। তারপর কাল রাত্রিতে নন্দ কাঁদিতে কাঁদিতে যেখানে লুটাইয়া পড়িয়াছিল, সেখান অবধি গড়াইয়া গিয়া নিজেকে ধূলিধূসরিত করিতে করিতে নির্ম্মম হাতে নিজের গলা টিপিয়া ধরিয়া রহিল। সহসা সমস্ত অস্তিত্ব-ভরা হিংস্র কঠোরতা লইয়া সে বলিয়া উঠিল, "আমি চাই না, এই ক্লিষ্ট, ধূলিমলিন, অবমানিত জীবনকে আমি চাই না। এই নিরুপায়, নিরানন্দ, আশাহীন, উদ্দীপনাহীন জীবনে আমার কোনো প্রয়োজন নাই। হে দেবতা, তুমি ইহাকে ফিরিয়া লইতে পার, এই মুহূর্ত্তে ফিরিয়া লইতে পার। তুমি বাছিয়া বাছিয়া আর দেশ পাও নাই, আমাকে ভারতবর্ষে জন্মগ্রহণ করিতে পাঠাইয়াছিলে। তুমি বাছিয়া বাছিয়া আর-কোনও মানুষ করিতে পার নাই, আমাকে আমি করিয়া সৃষ্টি করিয়াছিলে! জীবনে বহুবার তোমার বহু অনুগ্রহের দানকে প্রত্যাখ্যান করিয়াছি, তুমি জানো। আজ তোমার দেওয়া সর্ব্বোত্তম দান এই জীবনকেই আমি প্রত্যাখ্যান করিতেছি, ইহাকে ফিরিয়া লও, ফিরিয়া লও।"

দেবতা সে-প্রার্থনায় কর্ণপাত করিলেন কিনা বোঝা গেল না, কিন্তু অজয়ের চোখের সম্মুখে দিনের আলো রক্তবর্ণ হইয়া ক্রমে কালো হইয়া আসিল। এই পৃথিবী, পৃথিবীর মানুষ, তাহাদের সমস্ত স্মৃতি, নিজের জীবনের

সহস্র সুখদুঃখ, আশা-নিরাশা, আনন্দ-বেদনার সঞ্চয় সেই অন্ধকার মহাসমুদ্রে নিশ্চিহ্ন হইয়া ডুবিয়া গেল। কলিকাতার পথের সদা-প্রবহমান্ কোলাহলের স্রোত, সমস্ত হাসি-কান্না-সঙ্গীত-হাহাকারের প্রবাহ এক অবিচ্ছিন্ন মহা-স্তব্ধতার মধ্যে পড়িয়া হারাইয়া গেল। কানের কাছে রক্তস্রোত উদ্দাম নৃত্যে ঝম্‌ঝম্ করিয়া বাজিতেছিল, সে-নৃত্য থামিল। হৃৎপিণ্ডের স্পন্দন মৃদুতর হইতে হইতে ক্রমে আর শোনা গেল না। বহুক্ষণ ধরিয়া সে অনুভব করিল, যেন সেই স্তব্ধ অন্ধকারের একেবারে মর্ম্মস্থানটিতে তাহার সমস্ত অতীত, বর্ত্তমান এবং ভবিষ্যৎ একসঙ্গে হইয়া একটি ক্ষীণ দীপশিখার মত জ্বলিতেছে, সে-দীপশিখা কাঁপিতেছে না। ক্রমে সেই আলোটুকুও আর রহিল না। তখন ভিতরের এবং বাহিরের সেই নিরবচ্ছিন্ন স্তব্ধ অন্ধকার ভরিয়া অদৃশ্য আলোর স্পন্দনের মত বিচিত্র নীরবতার স্বরে প্রশ্ন হইল, "তোমাকে যদি ফিরিয়া লই এবং আবার পৃথিবীতে তোমাকে আসিতে হয়, কোন্ দেশে জন্মগ্রহণ করিতে চাহ?"

অজয়ের সমস্ত অস্তিত্ব, তাহার হইয়া উত্তর দিল, "ভারতবর্ষে।"

আবার প্রশ্ন হইল, "ফিরিয়া আসিয়া যদি কাহারও অপেক্ষা করিতে হয়, কাহার জন্য অপেক্ষা করিবে?"

এবারেও অজয়ের অস্তিত্ব ভরিয়া ছাপাইয়া উত্তর হইল, "নন্দের জন্য।"

অন্ধকার গলিয়া যাইতে লাগিল। চেতনা কোলাহল-মুখর হইয়া উঠিল। একটুকরা তীব্র রোদ অজয়ের চোখের উপর পড়িয়া তাহার চোখকে পীড়া দিল। নন্দকে কেবলই মনে পড়িতে লাগিল। মনে পড়িতে লাগিল, আর দুইদিন পরে তাহার পরীক্ষা। জীবন-পণ করিয়া, দুঃসহ দুঃখকে অনাহারকে অনিদ্রাকে হাসিমুখে সহ্য করিয়া, রোগযন্ত্রণাকে উপেক্ষা করিয়া, অক্লান্ত আগ্রহে এই পরীক্ষার জন্য সে প্রস্তুত হইয়াছে। হয়ত কলিকাতার সহস্র সহস্র পরীক্ষার্থীর মধ্যে এই পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়ার প্রয়োজন এবং অধিকার আর কাহারও এত ছিল না, তাহার যত ছিল। এত কঠিন সাধনার পথশেষে সাফল্যের দ্বারপ্রান্ত হইতে তাহাকে ফিরিয়া যাইতে হইল। হাসিমুখে সে চলিয়া গেল, যেন এ-সাফল্যে লোভ করিয়া কাহাকেও সে ফাঁকি দিতে চাহিতেছিল, রগড় হইতেছিল, রগড়টা ধরা পড়িয়া গিয়াছে। তাহার সেই হাসি মনে করিয়া অজয়ের বুক ফাটিয়া যাইতে লাগিল। উঠিয়া বসিয়াছিল, দুই জানুর মধ্যে মুখ লুকাইয়া ক্রন্দন-জড়িত স্বরে ডাকিতে লাগিল, "নন্দ রে, নন্দ", আর অবিরল-ধারে অশ্রুবর্ষণ করিতে লাগিল। (ক্রমশঃ)

মন্দির-বাহিরে

শ্রীরাধাচরণ চক্রবর্ত্তী

আরাধনা ব্যর্থ নয়,—ব্যর্থ নাহি হয়;
সাধনার তাপে আঁখি তপ্ত অশ্রুময়।
পবিত্র পাবক বহি', পাষাণ-মন্দিরে
প্রদক্ষিণ করে' ফিরি পূজা-বেদীটিরে।
সত্যের সে পরিক্রমা—নিত্যের আরতি!
নহেক ব্যক্তির স্তুতি বা বস্তু-ভারতী;
সে যে অব্যক্তের ধ্যান, আত্মার সন্ধান,
অমৃতের শুদ্ধ স্তব—বহ্নিমান প্রাণ!

এই মোর আরাধনা।—মন্দির-চত্বরে
বস্তু আর ব্যক্তি মিলে' হোথা ভিড় করে।
ব্যক্তি চাহে স্বাধিকার, বস্তু চাহে স্থান;
ভাবের বিগ্রহ—তাঁরে করে অপমান।

পবিত্র পাবক বহি', মন্দির-বাহিরে
আজি প্রদক্ষিণে চলি আকাশ-বেদীরে!

মেয়েদের ভোটের অধিকার

শ্রীস্বর্ণলতা বসু*

ভোট্ কথাটা আমরা অনেকে শুনি, এবং মনে করি ভোট্ দেওয়াটা কেবল পুরুষেরই অধিকার।

কাউন্সিল, স্কুল, কলেজ, খেলার মাঠ—সব জায়গাতেই আজকাল ভোটের সাহায্যে সভ্য নির্ব্বাচন করা হয়। আমি শুধু মেয়েদের বাংলা কাউন্সিলে ভোট দেওয়ার ব্যবস্থা সম্বন্ধে কয়েকটি কথা বলিতে চাই। যে-মেয়েরা আজকাল বাংলা কাউন্সিলে ভোট দিবার অধিকার পাইয়াছেন তাঁহাদের সংখ্যা খুবই কম। কেন-না, যাঁহাদের একটা নির্দ্দিষ্ট আয়ের সম্পত্তি নাই, তাঁহারা পুরুষই হউন, কিংবা মেয়েই হউন. ভোট দিতে পারেন না; আর ঐরূপ সম্পত্তির মালিক মেয়েদের সংখ্যা এদেশে বেশী নহে। শীঘ্রই ভারতে নূতন শাসন-ব্যবস্থার প্রচলন হইবে। এ সময় মেয়ে-ভোটারদের সংখ্যা বাড়াইয়া লওয়া দরকার; কেন-না পুরুষদের মত আমাদেরও যে দেশের উপর একটা দাবি আছে, এবং দেশের প্রতি কর্ত্তব্য আছে, সে-কথাটা আমরা এতদিন ভাবি নাই। এখন শিক্ষাবিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে আমরা গৃহস্থালী, শিক্ষা, ও সমাজ-সংস্কারের কাজে ক্রমশঃ অগ্রসর হইতেছি। এ-সব কাজ করিতে গিয়া বুঝিতে পারিতেছি যে, আমাদের ও ভোট দেওয়ার অধিকার থাকা দরকার। এই অধিকার থাকিলে ভোটপ্রার্থিগণ মেয়ে-ভোটারদের একেবারে তুচ্ছ করিতে পারিবেন না। কাউন্সিলে সভ্যরূপে নির্ব্বাচিত হইবার ইচ্ছা থাকিলে, আমাদের মতামতের বিরুদ্ধে সহজে তাঁহারা যাইতে পারিবেন না। প্রায় সমুদয় সভ্যদেশেই নির্ব্বাচনপ্রার্থীদিগকে ভোটারদের মুখাপেক্ষী হইতে হয়, ভোটারদের অভাব-অভিযোগ সম্বন্ধে সজাগ থাকিতে হয়, আর ভোটারদের অধিকাংশের মতের প্রভাবে নিজেদের মত গঠন করিয়া লইতে হয়। যাঁহারা ভোটপ্রার্থী হন, তাঁহাদিগকে একটা ঘোষণাপত্র প্রচার করিতে হয়, এবং এ-পত্রে তাঁহারা দেশের কি কি কাজ করিয়াছেন, এবং কাউন্সিলে ঢুকিয়া কি কি কাজ করিতে প্রস্তুত আছেন, তাহার একটা বর্ণনা দিয়া থাকেন। ঐ ঐ কাজগুলি করিয়া উঠিতে না পারিলে, তাঁহারা পরের বারে নির্ব্বাচিত হইবার আশা করিতে পারেন না।

আমাদের দেশেও ভোটপ্রার্থীরা পুরুষ-ভোটারদের মুখাপেক্ষী হইতে আরম্ভ করিয়াছেন, কিন্তু আমাদের মেয়ে-ভোটারদের সংখ্যা এত কম. যে, তাঁহারা আমাদের ভোটের উপর মোটেই নির্ভর করেন না; সুতরাং আমাদের নিকট তাঁহাদের দায়িত্বের কোনও বালাই নাই। মেয়েদের উন্নতির জন্য কাজ করার কোনও অঙ্গীকারপত্র তাঁহাদের দিতে হয় না, এবং কেহ তাঁহাদিগকে ঐরূপ কাজে বাধ্য করিতেও পারেন না।

এই অবস্থার প্রতিকার শুধু আমাদের মেয়ে-ভোটারদের সংখ্যা বাড়াইলেই সম্ভব হইতে পারে। এ বিষয়টি এখন অনেকেই ভাবিতেছেন, এবং যাঁহারা মেয়েদের হিতকর অনুষ্ঠানগুলির সহিত লিপ্ত আছেন, তাঁহারা মেয়ে-ভোটারদের সংখ্যা বাড়াইবার উদ্দেশ্যে গবর্ণমেণ্টের নিকট আবেদনও করিয়াছেন। এ-বিষয়ে রাজপুরুষগণের দৃষ্টিও যে আকৃষ্ট হয় নাই তাহা নহে। সাইমন কমিশন, বিলাতের প্রধান মন্ত্রী ম্যাক্‌ডোনাল্ড্ সাহেব এবং লোথিয়ান কমিটি—প্রত্যেকে মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন যে, মেয়ে-ভোটারদের সংখ্যা বাড়ানো দরকার। এ-বিষয়ে আমাদের দেশেও অনেক আন্দোলন হইতেছে। পুরুষেরাও এখন আমাদের পক্ষপাতী হইয়া বলিতেছেন যে, মেয়ে-ভোটারদের সংখ্যা বাড়ানো উচিত। আমরাও এখন বুঝিতেছি যে, আমাদের ভোটারের সংখ্যা বাড়ানোর কতখানি প্রয়োজন।

আমরা এ-বিষয়ে অনেকে চিন্তা করিয়াছি, এবং ঠিক করিয়াছি যে, মেয়েদের কাউন্সিলে ভোট্ দেওয়ার যোগ্যতা শুধু সম্পত্তিগত করিলে চলিবে না। যোগ্যতার অনুরূপ মাপকাটিও ঠিক করা প্রয়োজন হইবে। তাহা না হইলে নূতন শাসনপ্রণালী প্রবর্ত্তিত হইবার পর কাউন্সিলে মেয়েদের নির্ব্বাচিত হইবার কোনও সম্ভাবনাই থাকিবে না বলিয়া আমাদের বিশ্বাস। এতদ্ভিন্ন, আমাদের মধ্যে নিজেদের ভাল-মন্দ বিবেচনা করিবার প্রবৃত্তিও জন্মিবে না,

---

* শ্রীযুক্তা স্বর্ণলতা বসু (মিসেস পি. কে. বসু) বেঙ্গল প্রভিন্সিয়াল ফ্র্যানচিজ কমিটির সভ্য ছিলেন।—প্রবাসীর সম্পাদক।

এবং ভোট্-প্রার্থীরাও আমাদের মতকে মোটেই আমল দিবে না।

সম্পত্তির মালিক হওয়া ভিন্ন মেয়েদের ভোটার করার আরও দুইটি উপায় হইতে পারে:—প্রথমতঃ, সাধারণ লেখাপড়া জানা; দ্বিতীয়তঃ, যে-সকল পুরুষ সম্পত্তির মালিক বলিয়া ভোটার, তাঁহাদের স্ত্রীদেরও ভোট্ দেওয়ার অধিকার দেওয়া।

গণনা করিয়া দেখা যায় যে, সম্পত্তির মালিক হিসাবে বাংলা দেশে যে-মেয়েরা ভোট্ দেন, তাঁহাদের সংখ্যা পাঁচ লক্ষ, বর্ত্তমানে লেখাপড়া-জানা বয়স্ক মেয়েদের সংখ্যা প্রায় ৩,৭৫,০০০, আর যে-সকল পুরুষ সম্পত্তির মালিক বলিয়া ভোটার, তাঁহাদের স্ত্রীদের সংখ্যা ৮ লক্ষ—একুনে ১৬,৭৫,০০০ হয়। কিন্তু ইঁহাদের কোনো কোনো মেয়ের একাধিক যোগ্যতা আছে, তথাপি তাঁহারা শুধু একটি ভোটই দিতে পারিবেন। সুতরাং, উক্ত সংখ্যা কমিয়া যাইবে, এবং বাংলা দেশে এ-হিসাবে মেয়ে-ভোটারদের সংখ্যা অনুমান পনের লক্ষের বেশী হইবে না।

এই সংখ্যা অল্প হইলেও ইহার বেশী আমরা এখন দাবি করিতে পারি না, তবে ক্রমশঃ বাড়িবে বলিয়া আশা করা যায়। কেন-না, লেখাপড়া-জানা মেয়েদের সংখ্যা মেয়েদের শিক্ষাবিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে ক্রমশ বাড়িবেই।

এই ব্যবস্থার ফলে মেয়েদের কোনও বিশেষ শ্রেণী ভোট হইতে একেবারে বঞ্চিত হইবেন না। যাঁহারা বিবাহিতা তাঁহারা হয় লেখাপড়া জানার দরুণ ভোটার হইবেন, নয় সম্পত্তির মালিক বলিয়া, অথবা সম্পত্তির মালিক পুরুষ-ভোটারের স্ত্রী বলিয়া ভোটার হইতে পারিবেন। আর যাঁহারা সাধারণ লেখাপড়া জানেন তাঁহারা কুমারী হউন, সধবা হউন, বিধবা হউন ভোট দিতে পারিবেন। বিদ্যালয়ে শিক্ষালাভ অথবা পরীক্ষায় পাস করার উপর ভোট দেওয়ার যোগ্যতা নির্ভর করিবে না। যে-সকল মহিলা অন্তঃপুরে থাকিয়াই সামান্য লেখাপড়া শিখিতে পারিবেন তাঁহারাও ভোটার বলিয়া গণ্য হইবেন। অধিকন্তু বিধবাদের সম্বন্ধে লোথিয়ান কমিটি এই নির্দ্দেশ করিয়াছেন যে, সধবা অবস্থায় তাঁহারা যদি সম্পত্তির মালিক পুরুষ-ভোটারের স্ত্রী বলিয়া ভোটাররূপে পরিগণিত হইয়া থাকেন, তবে বিধবা হইবার পরও ভোটারের তালিকায় তাঁহাদের নাম থাকিবে। ইহাতে বিধবাদের মর্য্যাদাও কিছু বাড়িবে।

যাঁহারা পুরুষ-ভোটারের স্ত্রী বলিয়া ভোটার হইবেন, তাঁহাদের মত নিজ নিজ স্বামীদের মতের দ্বারা প্রভাবিত হইবে বলিয়া একটা কথা উঠিয়াছে। তবে, এ-কথাও বলা যায়, স্বামীরাও তো নিজ নিজ স্ত্রীদের মতের দ্বারা প্রভাবিত হইতে পারেন? সুতরাং ও-কথার বিশেষ কোন গুরুত্ব নাই। মেয়েরা শিক্ষা ও সমাজের অনেকগুলি সংস্কারের কাজে নিজেদের স্বাধীন মতের পরিচয় দিয়াছেন, ভোটের ব্যাপারেও কেন পারিবেন না তাহার কোনো যুক্তি খুঁজিয়া পাওয়া যায় না।

আমরা যে-দুইটি উপায়ে আমাদের ভোটের সংখ্যা বাড়াইয়া লইতে চাহিয়াছি, লোথিয়ান কমিটিও তাহা সমর্থন করিয়াছেন।

পার্লামেণ্ট হইতে যে সিলেক্ট্ কমিটি গঠিত হইয়াছে, ঐ কমিটি লোথিয়ান কমিটির মত ও অন্যান্য মত আলোচনা করিয়া একটা সিদ্ধান্ত করিবেন, এবং খুব সম্ভবতঃ ঐ সিদ্ধান্তই পার্লামেণ্ট কর্ত্তৃক গৃহীত হইবে। লোথিয়ান কমিটির মতের কোন অংশ সঙ্কোচ করিতে গেলে, উহা সমগ্র নারীসমাজের পক্ষে বড়ই বিপদের কথা হইবে। ঐ কমিটির নির্দ্ধারণ মতে পুরুষ-ভোটারের স্ত্রী বলিয়া যাঁহারা ভোটার হইতে পারিবেন, বাংলা দেশে তাঁহাদের সংখ্যা দাঁড়াইবে ৮ লক্ষ। যদি এই নির্দ্ধারণের বিরুদ্ধে সিলেক্ট কমিটিতে কোন আপত্তি উঠে, তবে ১৫ লক্ষ মেয়ে-ভোটারের মধ্যে ৮ লক্ষই কমিয়া যাইবে, অথচ ঐ আপত্তি যে ভিত্তিহীন তাহা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। সুতরাং লোথিয়ান কমিটির মত যাহাতে সিলেক্ট্ কমিটিতে বজায় থাকে, তাহার জন্য নারীসমাজকে আন্দোলন এখন হইতেই আরম্ভ করিতে হইবে। এই সংখ্যা কমাইতে গেলে, নির্ব্বাচন-প্রার্থীদের উপর নারী-ভোটারদের প্রভাব খুবই কমিয়া যাইবে।

কিছুদিন আগে বাংলা প্রেসিডেন্সির মহিলা-সম্মিলনের সভ্যগণ মিলিয়া প্রধান মন্ত্রীর নিকট তারযোগে জানাইয়াছেন যে পূর্ণবয়স্কা রমণীমাত্রই যদি ভোটার না হইতে পারেন, তাহা হইলে লোথিয়ান কমিটি নারীগণের জন্য যে সংখ্যা নির্দ্দেশ করিয়া দিয়াছেন, তাহার কম আমরা কিছুতেই গ্রহণ করিতে সম্মত হইব না।

পোষ্টাপিসের পিয়ন ও তার মেয়ে

শ্রীমাণিক বন্দ্যোপাধ্যায়

সিদ্ধির নেশায় কৈলাসের চোখ দুটি স্তিমিত হইয়া আসিয়াছে। রামগতি নিজের মনে খুব হাসিতেছিল। কাঁচা-পাকা খোঁচা-খোঁচা দাড়ির নীচে চিবুক চুলকাইয়া সে রামগতির হাসিতে যোগ দিবার চেষ্টা করিল। কিন্তু আজ নেশাটা বড় ধরিয়াছে। রামগতির রসিকতাতেও হাসি আসে না।

দুধের সাধ ঘোলে মেটানোর মত করিয়াই সিদ্ধি খাওয়া, নহিলে সিদ্ধির নেশায় কৈলাসের কোনদিন ঝোঁক ছিল না। তাড়ির কাছে কি সিদ্ধি! কিন্তু তাড়ি সে আজকাল আর খায় না। একদিন নেশার ঝোঁকে মেয়ে কালীতারার কানের মাকড়ি টানিয়া ছিঁড়িয়া ফেলার পর হইতে ছাড়িয়া দিয়াছে। পোষ্টাপিসের ছুটি থাকিলে বদনের দোকানে যাওয়ার জন্য বিকালের দিকে এখন তার পা সুর সুর করে, এক ভাঁড় তালের রস আর বদনের বউয়ের কড়া করিয়া ভাজা পেঁয়াজবড়ার অভাবে দিনটা তার বৃথাই গেল মনে হয়। কিন্তু বদনের দোকানে যাওয়া আর তার হইয়া উঠে না। কানের খানিকটা উঁচুতে আর একটা ছেঁদা করিয়া কালী অবশ্য আবার মাকড়ি পরিয়াছে, কিন্তু কানের কাটা অংশটুকু বেশ দেখিতে পাওয়া যায়। কৈলাস চাহিয়া দেখে আর অনুতাপ করে। মাকড়ি-ছেঁড়ার রাত্রে কৈলাসের নেশার জগতে জগতের তিলটি তাল হইয়াই ছিল, কালী বিশেষ না চেঁচাইলেও তার মনে হইয়াছিল মেয়েটা বুঝি আর্ত্তনাদ করিয়াই মারা যায়, এবং সেই ফেণানো উপলব্ধিটাই তার স্মরণ আছে।

কাটা কানের জন্য কালী বিশেষ দুঃখ করে না। বলে 'হোকগে' বাবা, কান নে' ধুয়ে ধুয়ে জল খাব কি! তোমার একটো কুস্বভাব তো শুধরোলো।'

শুনিয়া কৈলাস খুশী হয়। সে যে আর তাড়ি খায় না মেয়ের জন্য সে একটা বড়রকম ত্যাগ ছাড়া আর কিছুই নয়। মেয়ে ত্যাগটা বোঝে জানিলে নেশা না করার আপশোষে সে অনেকখানি সান্ত্বনা পায়।

রামগতির জামাই মাখম একটা কালিপড়া লন্ঠন রাখিয়া গিয়াছে। তারই মৃদু আলোকে পরিমাণ ঠিক করিয়া কৈলাস আরও খানিকটা সিদ্ধি গিলিয়া ফেলিল। তারপর একটা অত্যন্ত দুঃখের হাসির সঙ্গে নিজের মনে তার মাথা নাড়ার কারণটা রামগতি কিছুই বুঝিতে পারিল না।

বলিল 'আর খেও না দাদা।'

কৈলাস বলিল, 'না।' খাইলে ছাই হয়। না আছে তাড়ির গন্ধ না আছে স্বাদ।

তবু সে প্রায়ই রামগতির কাছে সিদ্ধি খাইতে আসে, সর্পী হইতে বাদাম পেস্তা আর সাদা চিনি আনিয়া দিয়া সবুজ সরবৎকে বিলাসিতায় দাঁড় করানোর ব্যবস্থা করে। সিদ্ধি যোগায় রামগতি। তার জামাই মাখমের বাড়ি ময়মনসিংএর একটা মহকুমা শহরে,—যেখানে-মাঠে ঘাটে বিনা চাষেই সিদ্ধি গাছে জঙ্গল হইয়া থাকে। টিনের তোরঙ্গে কাপড়ের নীচে লুকাইয়া সে শ্বশুরের জন্য সিদ্ধিপাতা লইয়া আসে। নিজে না আসিলে লোক মারফৎ পাঠাইয়া দেয়। আবগারী বিভাগের লোকেরা মদ আপিং প্রভৃতি বড় বড় মাদক সামলাইতে ব্যস্ত থাকে, সুতরাং কাজটা মাখম আইন বাঁচাইয়াই করে। মাখম নিজে কিন্তু কোন নেশাই করে না। কেবল তামাক খায়। সে ভারি শান্ত ও সংসারী মানুষ,—একা সে সাতাশী বিঘা জমির চাষ আবাদ দেখে আর বছরে দেড় হাজার টাকার গুড়ের কারবার সামলায়। শ্বশুরকে সে বিশেষ ভক্তি করে এবং শ্বশুরের বন্ধু বলিয়া প্রতিবার আসা ও যাওয়ার সময় কৈলাসের পায়ে হাত দিয়া প্রণাম করিতে ভোলে না।

কৈলাস 'থাক, থাক, বলিয়া তার প্রণাম নেয় ও চিরজীবী হওয়ার জন্য আশীর্ব্বাদ জানায়। তারপর রামগতির কাছে প্রাণ খুলিয়া মাখমের সঙ্গে নিজের গোঁয়ারগোবিন্দ জামাই সুবলের তুলনামূলক সমালোচনা আরম্ভ করিয়া দেয়। সুবলকে সে চাষা বলে, গুণ্ডা বলে, গেঁজেল বলে এবং আরও অনেক-কিছু বলে। সুবলের নাই এমন অনেক দোষও সে তার ঘাড়ে

চাপাইয়া দেয়। বারকয়েক বলিবার পর সুবলের সেই কাল্পনিক দোষগুলিতে তার বিশ্বাস জন্মিয়া যায়।

মেয়ের মত মেয়ের সেই অপদার্থ জামাইটাও বেচারীর সজ্ঞান মুহূর্ত্তগুলিতে অধিকার করিয়া থাকে। আজও সমস্ত সময়টা সে মাখমের সঙ্গে সুবলকে মিলাইয়া দেখিতেছিল। সুবলের সঙ্গে সম্পর্ক একপ্রকার রহিত করিয়া এবং কালীকে পাঠাইতে রাজী না হইয়া সে যে ভালই করিয়াছে এর সপক্ষে সমস্ত যুক্তিগুলি তার কাজে ক্রমেই পরিষ্কার ও অকাট্য হইয়া উঠিতেছিল।

'ভয় দেখিয়ে পত্র লিখিছে দাদা, এবার মেয়ে না পাঠালে ফের বিয়ে করবে। আমি বলি, কর! কর গিয়ে তুই যʼটা পারিস বিয়ে। ওতে ভয় পাবার পাত্র কৈলেস ধর নয়। একটা মেয়েকে সে রাজার হালে পুষ্যতে পারবে।' হঠাৎ ভয়ানক রাগিয়া, 'আরে আগে তুই গাঁজা গুণ্ডামি ছাড়, মানুষ হʼ তবে তো পাঠাব মেয়ে। নিজের গর্ভধারিণী মার গায়ে তুই হাত তুলিস, তোকে বিশ্বাস কি!'

এটুকু কল্পনা। রামগতি বলিল, 'মার গায়ে হাত তোলে না কি?'

'তোলেনা? ওর অসাধ্য কর্ম্ম আছে জগতে? মেয়ে কি আমি সাধে পাঠাই না দাদা.-- মেরে ফেলবে যে!'

প্রকৃতপক্ষে মেয়েকে স্বামীর ঘর করিতে না পাঠানোর কৈফিয়তই সে আগাগোড়া রামগতিকে দিয়া যায়। সুবলের মেজাজটা বিশ্রী, অন্য দোষও তার কমবেশী আছে, কিন্তু মেয়ে পাঠানো চলে না এমন অজুহাত সেটা নয়। কিন্তু নিজে রাজা না হইলেও রাজকন্যার সঙ্গে কালীর বিশেষ পার্থক্য আছে বলিয়া কৈলাস মনে করে না এবং মাখমের মত রাজপুত্রগুলির একটাকে ও সে যে কালীর জন্য সংগ্রহ করিতে পারিত না এ কথাটাও সে ভুলিয়া থাকে। সে ভালবাসে বলিয়াই সুবলের চেয়ে ভাল স্বামীর ভাগ্য কালীর অর্জ্জিত হইয়া গিয়াছে এই রকম একটা ঝাপসা ধারণাই বরং তার আছে।

তবু মাঝে মাঝে সুবলের দোষগুলি তার কাছে সংসারের রোগশোকের মতই অপরিহার্য্য ও মার্জ্জনীয় মনে হয়। কালীকে না পাঠানোর অনেকগুলি সমর্থনই কমজোরী হইয়া যায়। তখন সে আশ্রয় করে জামাইয়ের সঙ্গে তার মনান্তরকে। কালীকে নিতে আসিলে বিনাপ্ররোচনায় সুবলকে সে এমন অপমানই করে, যে, সুবলও তাকে অপমান না করিয়া পারে না। কৈলাস তখন পাড়াপ্রতিবেশীকে ডাকিয়া জামাইয়ের মেজাজ দেখায়, তার গালাগালির সাক্ষী করে, এবং সকলের সামনে জোর গলায় ঘোষণা করিয়া দেয় যে জামাই যতদিন জামাইয়ের মত না আসিবে মেয়ে সে কোনমতেই পাঠাইবে না। সর্পী পোষ্টাপিসের সে হেডপিয়ন তার একটা সম্মান আছে, মেয়ে তার ফেলনা নয়।

কালী ঘরের ভিতর থʼ হইয়া থাকে। ভাবে এত গোলমালে কাজ কি বাবু, দিলেই হয় পাঠিয়ে! মারে যদি না হয় খাবই একটু মার।

দাঁতে দাঁত ঘষিয়া সুবল সকলের কাছে তার একটা নালিশ জানায়।

শুনিয়া, কৈলাস যায় ক্ষেপিয়া। কালীকে ঘরের ভিতর হইতে হাত ধরিয়া টানিয়া আনিয়া চড়া গলায় জিজ্ঞাসা করে, 'চাস্? চাস তুই যেতে? বল, চেঁচিয়ে বল, সবাই শুনুক।' কালী সুস্পষ্ট মাথা নাড়ে।

সুবল সহসা কেমন ঝিমাইয়া পড়ে, আর তেমনভাবে কৈলাসের সঙ্গে কলহ চালাইতে পারে না। সকলকে শুনাইয়া একটা অশ্রদ্ধেয় কথা বলিয়া ঘাড় উঁচু করিয়া সে চলিয়া যায়।

সুবল যতক্ষণ উপস্থিত থাকে প্রতিবেশীরা তাকে এত বেশী ছিছি করে যে, তার প্রতি কালীর পর্য্যন্ত একটা সাময়িক অশ্রদ্ধা জন্মিয়া যায়। সুবল চলিয়া গেলে তারা একটু সুর বদলায়। বলে যে জামাই যাই হোক মেয়ে না পাঠাইয়া উপায় কি? আরও বলে যে কালীর যখন বয়সের গাছপাথর নাই তাকে আর এভাবে রাখা উচিত নয়। কারণ, গ্রামটা খারাপ ছেলেতে ভর্ত্তি, কালীর খারাপ হইতে কতক্ষণ?

কৈলাস কটমট করিয়া ইহাদের দিকে তাকায়, কিন্তু কিছু বলে না। নিজেই এক ছিলিম তামাক সাজিয়া টানিতে থাকে।

একজন বয়স্কা বিধবা কথাটা আরও স্পষ্ট করিয়া দেয়।

'হ্যাঁ লো কালী, সেদিন দুপুরবেলা বংশী কি করতে এসেছিল রে? তোর কাছে তার কি দরকার?'

কালী মুখ লাল করিয়া বলে, 'কবে মাসী?'

কৈলাস লাফাইয়া ওঠে। বলে 'খুন কʼরে ফেলব কাতুর মা। যতনের পিসি রোজ দুপুরে এসে বসে থাকে জানিস নে তুই?'

কাতুর মা বলে, 'বসে থাকে না। ঘুমোয় তুই দেখতে আসিস্? আমি তো দুপুরে না ঘুমিয়ে থাকতে পারি না।'

খানিক রাত্রে কৈলাস রামগতির কাছে বিদায় নিল। রামগতি হাঁকিয়া বলিয়া দিল, 'একটু তেঁতুল গুলে খেয়ো দাদা। রকম ভাল নয়।'

গ্রামে সন্ধ্যার পরেই রাত্রি। কানাইমুদী ইতিমধ্যেই ঝাঁপ বন্ধ করিয়াছে। দোকানের সামনে বাঁশের বেঞ্চিতে কে চিৎ হইয়া শুইয়া আছে, মুখে তার বিড়ির আগুন। কানাইয়ের ভাই বংশী ছোড়া রোজ এমনি সময় ওখানে এমনিভাবে শুইয়া থাকে আর থাকিয়া থাকিয়া বাঁশী বাজায়। সুবলের মতই অপদার্থ। কয়েকবার মুখ ফিরাইয়া কৈলাস জোনাকির মত তার বিড়ির আগুনের জলা-নেবা চাহিয়া দেখিল। ছেলেদের এ-রকম ভাসিয়া বেড়ানো সে পছন্দ করে না। কানাইয়ের একেবারে দায়িত্ববোধ নাই। ভাইয়ের একটা বিবাহ সে এবার দিলেই পারে।

মেয়ের বদলে বংশীর মত ছেলেও যদি তার একটা থাকিত তবে কোন ভাব না ছিল না, এও কিন্তু কৈলাসের মনে হয়। পরের বাড়ি পরের সংসার মানুষের ছেলেকে ধরিয়া টানাটানি করে না. মমতার সঙ্গে থাকে অধিকার। ছেলের বউ আনিয়া মেয়ের সাধও মেটানো চলে। নিজের সন্তানকে নিজের কাছে রাখিয়া সকলের কাছে অপরাধী হইয়া থাকিতে হয় না।

অন্ধকার পথে চলিতে চলিতে কৈলাসের ভয়ানক রাগ হইতে লাগিল। সংসারে একি অবিচার! সে তার মেয়েকে কোথাও পাঠাইতে চায় না. মেয়ে তার কোথাও যাওয়ার নামে ভয়ে অস্থির হয়,—তাদের দু-জনকে পৃথক করিয়া দেওয়ার জন্য লোকের এত মাথাব্যথা কেন? সে কারও ভালমন্দে থাকে না, তার শান্তি নষ্ট করিতে লোকের এত উৎসাহ কি জন্য? প্রতিবেশী নিন্দা করে, সুবল আসিয়া দাবী জানায়। কিসের নিন্দা. কিসের দাবী? দেশে ঢের মেয়ে আছে. সুবল যাকে খুশী ঘরে আনিয়া কষ্ট দিক, প্রতিবেশীদের ঘরে ছেলেমেয়ে আছে তাদের ভাল মন্দ লইয়া তারা মাথা ঘামাক্। সে কথাটি কহিবে না। কিন্তু সে আর তার মেয়ে দু-জনেই যখন সুবলকে অস্বীকার করিয়াছে, লোকের বলাবলিকে তারা যখন গ্রাহ্য করে না, তাদের আর বিরক্ত করা কেন? গায়ের জোরেই সকলে মিলিয়া তাদের দিয়া যা-খুশী করাইয়া লইবে না কি? রাগ আর তার কমিতে চায় না। নির্জ্জন রাস্তায় নিজের মনে কৈলাস গজ্‌গজ্‌ করিতে লাগিল। নেশায় তার মাথার মধ্যে ঝিম ঝিম করিতেছে, রাস্তাটা ঝুলানো দোলনার মত দুলিয়া উঠিতে চায়। গ্রামের সমতল পথে সে পাহাড়ী দেশের চড়াই উৎরাই ভাঙিতেছে। তবু, এমন জমজমাট নেশার মধ্যেও তাড়ির তৃষ্ণায় সে আহত। মেয়ের জন্য কত দুর্দ্দশাই তার কপালে আছে কে জানে। এতেও লোকে মেয়ের উপর তার অধিকারকে স্বীকার করিবে না। তাড়ি তো বড় কথা, কালার জন্য সুবল একটা ছোটখাট ত্যাগও স্বীকার করুক দেখি। সেবেলা তার পাত্তা মিলবে না। অধিকার জাহির করিতেই সে মজবুত।

এমনি মানসিক অবস্থায় বাড়ির উঠানে পা দিয়া কৈলাস দেখিল, দাওয়ায় মাদুরে কাত হইয়া তারই হুঁকায় সুবল পরম আরামে তামাক টানিতেছে। চিনিতে পারিয়াও সেখান হইতেই কৈলাস হাঁকিয়া বলিল, 'কে?'

হুঁকা রাখিয়া সুবল নামিয়া আসিল। বলিল, 'আজ্ঞে আমি।'

'বলা নেই, কওয়া নেই তুমি বাড়ির মধ্যে ঢুকেছ কেন?'

সুবল ঠিক করিয়া আসিয়াছিল এবার স্বর নরম করিবে, সহজে রাগিবে না।

মাটির দিকে চাহিয়া সে বলিল, 'বাড়ির মধ্যে ঢুকব না তো কোথায় যাব?'

শ্বশুরকে একটা প্রণাম ঠুকিবে কি-না সুবল তাহাও ভাবিয়া দেখিতেছিল। অভ্যর্থনার রকম দেখিয়া সেটা আর পারিয়া উঠিল না।

কৈলাস বলিল, 'কোথায় যাবি তা আমি কি জানি? চুলোয় যাবি।'

সুবল বলিল, 'এত রাগবার কারণটা কি হ'ল? মা নিতে পাঠাল বলে এসেছি বই ত নয়।'

কৈলাস বলিল, 'মা নিতে পাঠাল! তোর মা কে রে যে আমার মেয়েকে নিতে পাঠায়? যা তুই, বেরো আমার বাড়ি থেকে।'

সুবল অল্প রাগ করিয়া বলিল, 'বার ক'রে দিচ্ছ যে, তোমার বাড়ি থাকতে এসেছে কে? গাছতলা ঢের ভাল।'

"যা তবে গাছতলাতে যা। ফের আমার বাড়ি ঢুকলে তোর ঠ্যাং খোঁড়া ক'রে দেব।'

'ঠ্যাং অমনি সবাই সবাকার খোঁড়া করছে। আমারও দুটো হাত আছে!'

প্রতিবার যেমন হয়, এবারও তেমনি ভাবে দুজনের সুর চড়িতে লাগিল; ভাষা রূঢ় হইতে অভদ্র এবং অভদ্র হইতে অশ্রাব্যে দাঁড়াইয়া গেল। মাত্রা কৈলাসেরই বেশী। সে বুঝিতে পারিয়াছিল আজ একটা হেস্তনেস্ত হইয়া যাইবে, সুবল শেষ মীমাংসা করিতে আসিয়াছে, আজ ওকে ফিরাইয়া দিতে পারিলে ও আর আসিবে না। শুধু আসিবে না নয়, কালীকে কোনদিন পাঠানও অসম্ভব করিয়া দিবে। বিধবা মেয়ের মত তার কাছে থাকা ছাড়া কালীর আর কোন উপায় থাকিবে না। মেয়েটা বাঁচিবে।

খানিক পরে তাই কলহের পরিসমাপ্তির জন্য কৈলাস পা হইতে ছেঁড়া চটি খুলিয়া সুবলকে পটাপট কয়েক ঘা বসাইয়া দিল। উঠানে একটা বাঁশের বাতা পড়িয়া ছিল, সেটা কুড়াইয়া লইয়া কৈলাসের মুখের উপর নির্ম্মম ভাবে কয়েকবার আঘাত করিয়া সুবলও করিল প্রস্থান। রান্নাঘরের দরজায় দাঁড়াইয়া উলুখড় কালী তার জীবনের দুই রাজার যুদ্ধ আগাগোড়া সবটাই চাহিয়া দেখিল।

কৈলাসের আঘাত কম লাগে নাই। মুখে চার-পাচটা কালো দাগ পড়িয়াছে, নাক দিয়া রক্তপাত হইয়াছে এবং খোঁচা লাগিয়া একটা চোখ বুজিয়া গিয়াছে। অনেক রাত অবধি তাহার নাক দিয়া রক্ত ও চোখ দিয়া জল পড়িতে লাগিল। থাকিয়া থাকিয়া সে বলিতে লাগিল, 'দেখলি কালী, দেখলি? আর একটু হ'লে খুন ক'রে ফেলত রে!'

মনে মনে সে কিন্তু নিশ্চিন্ত হইয়াছিল। সুবল আর আসিবে না। তাকে ক্ষমা করার কামনা কালীর মনে যদি কখনও জাগিয়া থাকে এ ঘটনার পর আর জাগিবে না। বাপকে যে এমন করিয়া মারিয়া যায় মেয়ে কি তাকে ক্ষমা করিতে পারে? এবার আর বুঝিতে পারা নয়, কালী নিঃসন্দেহ প্রমাণ পাইয়াছে যে, সুবল মানুষ নয়-- খুনে, ডাকাত। ওকে এবার কালী ভয়ঙ্কর ঘৃণা করিবে। আত্মরক্ষার প্রবৃত্তিই এবার তাকে কোনমতে ভুলিতে দিবে না যে বাপের কাছে থাকাই তার পক্ষে সবচেয়ে নিরাপদ ও মঙ্গলজনক ব্যবস্থা।

অথচ কালী ভয়ানক গম্ভীর হইয়া গিয়াছে। ভাল করিয়া কথার জবাব দেয় না। সুবলের বিরুদ্ধে সত্যমিথ্যা অভিযোগে সায় দিতে তার যেন আর তেমন উৎসাহ নাই।

প্রথমটা কৈলাস অত খেয়াল করে নাই। শেষে মেয়ের ভাব লক্ষ্য করিয়া সে অস্বস্তি বোধ করিতে লাগিল।

'কথা কইছিস না যে কালী?'

'কি বলব বল না?'

'বাঁচলি, কি বলিস?'

'ঝগড়াঝাঁটি ভাল লাগে না বাবু।'

'দেখলি তো? কি রকম কাণ্ডটা ক'রে গেল?'

কৈলাস নিশ্চিন্ত হইয়া ঘুমাইল। একটা বিরক্তিকর ব্যাপার ঘটিয়াছে শুধু এই জন্যই কালীর মন খারাপ হইয়াছে, সুবলের সঙ্গে সম্পর্ক চুকিয়া গেল বলিয়া নয়। কাল ওর মুখের মেঘ কাটিয়া যাইবে। যেমন হাসিয়া খেলিয়া এতদিন এতকাল তার দিন কাটিয়াছে কাল আবার গোড়া হইতে তার সুরু। এবার আর বাধা পড়িবে না। কাল সে ওকে সতীশের হার্ম্মোনিয়মটা আনিয়া দিবে। পাড়ার লোকে নিন্দা করিবে, তা করুক। নিন্দা করা যাদের স্বভাব নিন্দা তারা করিবেই। কালী আনন্দে শুধু নাচিতে বাকী রাখিবে। তার মত অবস্থার লোক কে কবে মেয়েকে বাইশ টাকা দিয়া হার্ম্মোনিয়াম কিনিয়া দিয়াছিল? তার এক মাসের মাহিনা!

পরদিন সোমবার। সোমবার উখারায় মস্ত হাট বসে। অনেক দূর দূর গ্রামের লোক হাটে চিঠিপত্র সংগ্রহ করিতে আসে, সেখানে বড় বড় মহাজনদের নামে মোটা টাকার মনিঅর্ডার ও ইনসিওর থাকে। চিঠির তাড়া হাতে চামড়ার ব্যাগ কাঁধে ঝুলাইয়া বেলা দশটার মধ্যে কৈলাসকে হাটে হাজির হইতে হয়। একটা পর্য্যন্ত সেখানে সে চিঠি ও টাকা বিলি করে।

সর্পীর পোষ্টাপিস কাছে নয়, পাচমাইল পথ। পোষ্টাপিসে চিঠি ও টাকা হিসাব করিয়া গুছাইয়া লইয়া আরও তিন মাইল হাঁটিলে তবে উখারার হাট। কৈলাসের সকালে ওঠা দরকার ছিল, কিন্তু কালী তাকে কোন মতেই ডাকিয়া তুলিতে পারিল না। উঠিতে সে বেলা করিয়া ফেলিল।

সকালে তুলে দিলি না যে কালী ? আজ হাট বার খেয়াল নেই ? দিনকে দিন তোর কি হচ্ছে !

'তুমি উঠলে ? রাঁধতে রাঁধতে ক'বার যে ডেকেছি তার ঠিক নেই।'

কৈলাসের রাগ হইয়াছিল। সে আরও কিছু বলিতে যাইতেছিল, কিন্তু হঠাৎ গত সন্ধ্যার কথা মনে পড়ায় এক নিমেষে গলিয়া জল হইয়া গেল।

'রাঁধতে তোর যদি কষ্ট হয় তো বল তোর মাসীকে এনে রাখি।'

'রাঁধতে আবার কষ্ট কিসের ? মাসীর ধাক্কা পোয়াতে পারব না বাবু।'

কৈলাস খুশী হইয়া মনে মনে হাসিল। ভাবিল, বাপের সেবার ভারটা মাসীর উপরেও ছাড়িয়া দিতে কালীর বাধে।

সে স্নান করিয়া আসিল। পিঁড়িতে বসিয়া বলিল, 'আন রে কালী, চটপট আন্। দেখেছ শালার রোদ্দুর ! প্রাণটা যাবে।'

কালী বলিল, 'হুটোপুটি করলে চলবে না বাবা, বসে খেতে হবে।'

'বসে খাওয়ার সময় গড়াচ্ছে !'

কিন্তু কালী যে কাণ্ড করিয়া রাখিয়াছে তাহাতে বসিয়া না খাইয়া তার উপায় রহিল না। ডাল আর আলুভাতে খাইয়াই নিত্য সে পোষ্টাপিসে যায়, আজ কালী নিমন্ত্রণ রাঁধিয়াছে। কখন সে এত সব করিল কে জানে। কৈলাস যা খাইতে ভালবাসে তার কোনটাই একরকম সে বাদ দেয় নাই। কলাপাতার বদলে আজ খাওয়ার ব্যবস্থা থালাতে, থালায় তরকারী সাজাইয়া কালী কুলাইয়া উঠিতে পারে নাই।

'এ কি করেছিস রে ! তুই কি ক্ষেপেছিস কালী ?'

'একদিন কি ভাল খেতে নেই ?'

'এত কেউ খেতে পারে ?'

'না খাও তো আমার মাথা খাও।'

কৈলাস প্রাণপণে খাইল। মেয়ের এতটুকু সখের জন্য সে প্রাণ দিতে পারে, মেয়ে সাধ করিয়া রাঁধিয়াছে, সে খাইবে না ? উঠান রোদে ভরিয়া গিয়াছে, সেখানে ছায়া ফেলিয়া ফেলিয়া কালী তাহাকে পরিবেশন করিল, মাছের কালিয়া দিয়া জিজ্ঞাসা করিল, 'কেমন হয়েছে বাবা।'

'বেশ হয়েছে। চমৎকার রেধেছিস কালী।'

কালীর পায়ের মলের আওয়াজ বাড়িটাকে যেন জীবন্ত করিয়া রাখিয়াছে। সে একাকিনীই ঘরভরা। এ বাড়িতে তার অতগুলি ছেলেমেয়ে যে পট-পট করিয়া মরিয়াছিল, কৈলাসের কাছে আর তাহা শোকাবহ স্মৃতি নয়। এমনি ভাবে ভাত বাড়িয়া দিয়া, এমনি ভাবে মল বাজাইয়া হাঁটিয়া কালী তার জীবনে শোকের চিহ্ন রাখে নাই, তার গৃহের আবহাওয়া হইতে মৃত্যুর স্তব্ধতা মুছিয়া লইয়াছে। ক'টা ছেলে-মেয়ে আর তার মরিয়াছে ? দু'টা তাও পাঁচ-সাত বছর বয়সে—একযুগ আগে। তবু, কালী না থাকিলে তাদের জন্যই কৈলাস শোকাতুর হইয়া থাকিত বই কি !

খাওয়ার পর বসিয়া বসিয়া কৈলাস খানিক তামাক টানিল। বেলার দিকে তার নজর ছিল না, ধীরেসুস্থে খাকী কোট কাঁধে ফেলিয়া সে যাওয়ার জন্য প্রস্তুত হইল।

কালী ছল ছল চোখে বলিল, 'এই রদ্দুরে কি ক'রে অদ্দুর যাবে বাবা ?'

মেয়ের মমতায় মুগ্ধ হইয়া কৈলাস বলিল, 'জানিস কালী, তোর মা ঠিক অমনি করে বলত।' তারপর সান্ত্বনা দিয়া বলিল, 'বিশ বছরের অভ্যেস, আর কি কষ্ট হয় ? বলে, রোদে ঘুরে ঘুরে মাথার চুলে ছাই এর রঙ ধ'রে গেল।'

ধূসর মাথায় হাত বুলাইতে বুলাইতে কৈলাস বাহির হইয়া গেল। কালী বলিয়া দিল, 'গাছের ছায়ায় জিরিয়ে জিরিয়ে যেও বাবা।'

মানুষের ছায়ায় যে জিরাইয়া জুড়াইয়া গেল, গাছের ছায়া দিয়া সে করিবে কি ? বিশ বছরের দুবেলা চেনা পথ কাঠফাটা রোদে বোঝাই পেটে পথ চলিতে কৈলাসের মুখের হাসি কোন মতেই মুছিয়া গেল না। চেনা মানুষকে দাঁড় করাইয়া সে কুশল জিজ্ঞাসা করিল, যে ডাকিল দুদণ্ড বসিয়া তার তামাক খাইল, মেয়ে আজ তাকে কি রকম গুরুভোজন করাইয়াছে অনেক বাড়াইয়া তার বর্ণনা করিল। পোষ্টাপিসে পৌঁছানোর আগেই তার পেটে কেমন করিয়া মাংস সন্দেশ আর নাম না-জানা একটা ক্ষীরের খাবার হাজির হইয়া গেল।

নিশ্বাস ফেলিয়া ফেলিয়া, 'কহিল আমার অমন মেয়ে, তার কাই বা আমি করলাম। চোখ কান বুজে একটা জানোয়ারের হাতে সঁপে দিলাম মেয়েকে। এমন ঝকমারি কাজ মানুষ করে!'

পোষ্টাপিসে পৌঁছিতে তার দেরী হইয়া গেল।

পোষ্টমাষ্টার বলিলেন, 'দিন কে দিন বড় যে নবাব হয়ে উঠছ হে কৈলাস!'

'আজ্ঞে, মেয়েটার বড় অসুখ বাবু।'

পোষ্টমাষ্টার তার দুর্ব্বলতা জানিতেন, একটু নরম সুরে বলিলেন, 'মেয়ের তো তোমার অসুখ লেগেই আছে।'

কৈলাস উৎসাহিত হইয়া বলিল, 'সাধে অসুখ লেগে থাকে বাবু? মনের কষ্টে। জামাই যে মানুষ নয়, ডেকে জিজ্ঞেস করে না। একদিন-দুদিনের জন্য যদি বা আসে তো মেরে গাল দিয়ে ভূত ছাড়িয়ে দিয়ে যায়। মেয়ে আমার খায় না দায় না, দিবারাত্তির কাঁদছে, অসুখ হবে না?'

দ্রুত পটু হস্তে সে চিঠির তাড়া গুছাইয়া নিতে লাগিল। গলা নামাইয়া বলিল, 'আপনার জামাইটি ভাল। আমায় সেদিন ডেকে বললেন, কৈলেস, অমন খাসা শাড়ী নিয়ে যাচ্ছ কার জন্যে? আমি বললাম, মেয়ে পরবে জামাইবাবু, গরীবের মেয়ে হ'লে কি হয় মেয়ের আমার সখটি আছে পুরো-মাত্রায়। জামাইবাবু হেসে কাপড়ের দাম জিজ্ঞেস করলেন, তারপর আমার হাতে টাকা গুঁজে দিয়ে বললেন, 'আমায় এক জোড়া এনে দিও তো কৈলাস। লুকিয়ে এনো।' পোষ্ট-মাষ্টারের মুখের দিকে চাহিয়া চোখ মিটমিট করিয়া কৈলাস রহস্যটা তাকে বুঝাইয়া দিল, 'দিদিমণির জন্যে আর কি, তাই লুকিয়ে আনতে বলা।'

'তোমার মুখে দাগ কিসের কৈলাস?'

কৈলাসের বকুনি থামিয়া গেল। সে সংক্ষেপে জবাব দিল পড়ে গিয়েছিলাম।'

পোষ্টমাষ্টার সিন্দুক খুলিয়া টাকা বাহির করিয়া দিলেন। আজ ইনসিওর নাই, মনিঅর্ডারও কম। সই করিয়া টাকা লইয়া কৈলাস বলিল, 'আমায় গোটা কুড়িক টাকা দিন।'

'এবার হবে না কৈলাস।' বলিয়া পোষ্টমাষ্টার মাথা নাড়িলেন।

কৈলাস কোমরের কাপড়ের ভিতর হইতে একটা টাকা বাহির করিয়া পোষ্টমাষ্টারের সামনে টেবিলের উপর রাখিল। বলিল, 'আগাম সুদ দিচ্ছি বাবু, দিন। মাইনে থেকে পাঁচটাকা ক'রে কাটবেন, চার মাসেই শোধ হয়ে যাবে। নতুন তো নয়!'

'সুদের জন্য নয় হে!' পোষ্টমাষ্টার টাকাটা দুই আঙ্গুলে তুলিয়া লইলেন, কিন্তু পকেটে ভরিলেন না. 'কি জান, সাহস হচ্ছে না। কোন্‌দিন ইন্‌স্‌পেক্টর হুট ক'রে এসে পড়বে, বলবে সিন্দুক খোলো। একেবারে ডুবে যাব তাহ'লে। তোমার কি বল, গায়ে তোমার আঁচড়টি লাগবে না, টানাটানি করবে আমাকে নিয়েই।' মাথা নাড়িলেন 'একটা টাকার জন্য অতবড় ভয়ানক দায়িত্ব নিতে পারি না কৈলাস।'

'একটা টাকা কি কম হ'ল বাবু!' কৈলাস অনিচ্ছার সঙ্গে একটা সিকি বাহির করিয়া দিল।

টাকা আর সিকিটা পকেটে ভরিয়া পোষ্টমাষ্টার আবার সিন্দুক খুলিলেন। কুড়িটি টাকা বাহির করিয়া কৈলাসকে দিলেন। কথা আর তিনি বলিলেন না, নীরবে কাজ করিতে লাগিলেন।

একটু লজ্জা বোধ হয়। যৎসামান্য।

হাটে পৌঁছানো মাত্র কৈলাসকে ঘিরিয়া ভিড় জমিয়া গেল। তার মধ্যে এমন নরনারীর সংখ্যা অল্প নয়, একটি পোষ্টকার্ড পাওয়া যাদের জীবনে বিশেষ ঘটনা। তাদের আগ্রহ ও উত্তেজনা কৈলাসকে চিরদিনই বিশেষভাবে বিচলিত করে। চিঠি বিলানো সকলের প্রতি তারই যেন অনুগ্রহ। ধনীর দারোয়ানের কাঙালী বিদায় করার মতই গর্ব্ব সে বোধ করে!

ছেলেবেলা কালী মাঝে মাঝে তার সঙ্গে হাটে আসিত। কৈলাসের ইচ্ছা হয় কালীকে এখন একবার সঙ্গে লইয়া আসে, সে দেখিয়া যায় হাট-ভরা লোক কি ভাবে তার বাপের পথ চাহিয়া থাকে, তাকে কত খাতির করে। কত লোককে সে হাঁসায়-কাঁদায়। অধর চিঠি পড়িয়া বলে, 'সুখবর এনেছ কৈলেসদা, যাওয়ার সময় ফুটিটুটি একটা কিছু তুলে নিয়ে যেও।' বসন্ত চিঠি হাতে ধূলার উপর বসিয়া পড়ে। তার দেওয়া চিঠির খবরে হরিদাসী হাটের কলরব ছাপাইয়া আর্ত্তনাদ করিতে থাকে।

এসব দেখিলে কালী কি রকম আশ্চর্য্য হইয়া যায়।

শেষ দুপুরে প্রাপ্য তরিতরকারী সংগ্রহ করিয়া গামছায়

বাঁধিয়া কৈলাস পোষ্টাপিসে ফিরিয়া গেল। গুমোট হইয়া দারুণ গরম পড়িয়াছে। বিকালে ঝড়-বৃষ্টি হওয়া আশ্চর্য নয়। হার্মোনিয়মটা আজ তাহা হইলে আর কেনা হয় না। কিন্তু কালী পাঁচ মিনিটের নোটিশে কাল তার মান রাখিয়াছে. পুরস্কারটাও তাকে অবিলম্বে দেওয়া দরকার। কাল পর্য্যন্ত ধৈর্য্য কৈলাস ধরিতে পারিবে না। অথচ দেরী করিয়া আসিয়া পাঁচটার আগে আজ ছুটি পাওয়াও মুস্কিল।

সে শ্রান্তি বোধ করিতেছিল। তবু বেঞ্চিতে চিং হইয়া খানিক ঝিমানোর ইচ্ছা ত্যাগ করিয়া সে পোষ্টমাষ্টারের বাড়ির মধ্যে গেল।

পোষ্টমাষ্টারের মেয়ে দাওয়ায় ছেলে কোলে লইয়া বসিয়াছিল, বলিল, 'কি, কৈলাস ?'

''সেই যে মাদুলির কথা বলছিলে দিদিমণি. আজ গেলে সেটা পাওয়া যায়।'

পোষ্টমাষ্টারের মেয়ে সাগ্রহে বলিল, 'তবে তুমি আজকেই যাও কৈলাস।'

বাবু যদি রাগ করেন ?'

'আমি বলে রাখব।'

মাদুলি লইয়া পোষ্টমাষ্টারের মেয়েকে কৈলাস অনেক দিন ঠকাইতেছে। ঝিকণ ফকিরের মাদুলি আনা সহজ কথা নয়. একবেলা নৌকায় গিয়া সাত ক্রোশ হাঁটিলে তবে ঝিকণ ফকিরের আস্তানা। আজকাল করিয়া কৈলাস মাদুলির দাম বাড়াইয়াছে, এবার একদিন আধ পয়সা দিয়া একটা মাদুলি কিনিয়া তার গ্রামেরই জাগ্রত দেবতার পূজার ফুলের একটি শুকনো পাপড়ি ভরিয়া আনিয়া দিবে। বলিবে, 'দিতে কি চায় দিদিমণি, কত হাতে পায়ে ধরে আনলাম। পাঁচসিকে লাগল।· না না. ও আর তোমাকে দিতে হবে না দিদিমণি। নিতে নেই গো, নইলে নিই না ? মাদুলির খরচ বলে নয়, আমার মেয়েকে সন্দেশ খাবার জন্য যদি দাও তবে বরং নিতে পারি।'

পোষ্টমাষ্টার যে পাঁচসিকে গালে চড় মারিয়া লইয়াছে সেটা ফেরৎ আসিবে।

এই মিথ্যাচারের বিরুদ্ধে কৈলাসের বিবেকের কোন প্রতিবাদ নাই। কালী ভিন্ন সংসারের আর সমস্ত মেয়ে তাদের কর্ম্মফল ভোগ করিবেই, ঝিকণ ফকিরের মাদুলিতে তাদের কোন উপকার হওয়া সম্ভব নয়। এটুকু ছলনায় তবে ক্ষতি কিসের ? মাদুলিতে দেবতার ফুল তো থাকিবেই।

সকলের মত কৈলাসের আত্মপ্রবঞ্চনাতেও এমনি একটি সুন্দর শৃঙ্খলা থাকে। কালীর সম্বন্ধেও তার আত্মপ্রবঞ্চনা এমনি মনোহর। পোষ্টমাষ্টারের মেয়ের কাছে ঝিকণ ফকিরের মাদুলির মত কালীর জীবনে সুবল অনর্থক, মঙ্গল দূরে থাক এ দু'টি মেয়ের দুঃখ মোচনও মাদুলি আর সুবলকে দিয়া হইবে না। একজনের জন্য সে তাই অকারণে সাতক্রোশ পথ হাঁটিতে যেমন রাজী নয়. আর একজনকে পরের বাড়ি পাঠাইয়া শূন্য ঘরে বুক চাপড়াইতেও তার তেমন ইচ্ছা নাই।

সতীশের বাড়ি পথে পড়ে না, একটু ঘুরিয়া যাইতে হয়। হার্মোনিয়ম কিনিয়া বাহির হইতে অপরাহ্ণ হইয়া গেল। রোদের তেজ কমিয়াছে, কিন্তু হার্মোনিয়ম ঘাড়ে করিয়া পথ চলিতে কৈলাস শ্রান্ত হইয়া পড়িল। মনে হয় এতক্ষণে তার নেশা টুটিয়া গিয়াছে। কিন্তু নেশার সঙ্গে স্নেহকে সে ঝিমাইয়া পড়িতে দিবে কেন ? সে জোরে জোরে পা ফেলিয়া চলিতে লাগিল।

আধ মাইল গিয়াই সে হাঁপাইয়া পড়িল। বাদাযন্ত্রের ভারে ঘাড়টা ইতিমধ্যে ব্যথা হইয়া গিয়াছে। পথের ধারে সেটা সে নামাইয়া রাখিল। পা দু'টা বেজায় টন টন করিতেছে।

বয়স যে পঞ্চাশ পার হইয়াছে সেটা আর অস্বীকার করা যায় না। এই ধরণের প্রমাণ আজকাল প্রায়ই পাওয়া যায়। বয়সটা কৈলাসের গুরুতর বিপদ। কালীর জীবনের অৰ্দ্ধেকটা কাটিতে-না-কাটিতে তাকে মরিতে হইবে ভাবিতে কৈলাসের ভাল লাগে না। কালীর কি উপায় হইবে ? কালীর ভার কে লইবে ?

সুবল লইতে পারিত। তার মৃত্যুর পরেও সুবল বাঁচিয়া থাকিবে।

মৃত্যুর সঙ্কেত মানিয়া মেয়েকে তার নিশ্চিত দুঃখ-দুর্দ্দশার মধ্যে বিসর্জ্জন দিতে হইবে না কি ? তার এত স্নেহ এত কল্যাণকামনা, এত ত্যাগ কোন কাজে লাগানো যাইবে না ? মাঝে মাঝে নেশার অবসাদের সময় কথাটা ভাবিয়া অসহায় আপশোষে কৈলাসের মাথা ঝিম ঝিম করে। মরণে

তার এমন নিশ্চিহ্ন নিশ্চিন্ত অবলুপ্তি যে কালীর ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে কিছু পরিমাণে হওয়া যায় এমন একটা জোড়াতালি দেওয়া যুক্তিও সহজে আবিষ্কার করা যায় না।

তবু বসিয়া বসিয়া সে জোড়াতালি দেয়। ভাবে, সে তো আজই মরিতেছে না। দুচার বছর গেলে সুবলের হয়ত পরিবর্ত্তন হইতে পারে, সে মানুষ হইতে পারে। তখন কালীকে পাঠান চলিবে। সে আরও ভাবে যে কালীকে লইয়া যাইবার জন্য সুবলের যেরকম আগ্রহ তাতে এ আশা করা যায় তার মৃত্যুর পর মেয়েটাকে সে ফেলিবে না। তার সুবিধার জন্য কালীর প্রতি প্রেমকে সুবল দশ-বিশ বছর বাঁচাইয়া রাখিবে এটা কৈলাসের আশ্চর্য্য মনে হয় না। এই বিশ্বাস বজায় রাখার জন্য সে একটা যুক্তিও ব্যবহার করে। সুবলের সঙ্গে কলহ তার; কালী কোনও অপরাধ করে নাই। কালী ছেলেমানুষ, বাপের ব্যবস্থা না মানিয়া তার উপায় কি? বাপের অপরাধে সুবল নিশ্চয় মেয়েকে শাস্তি দিবে না।

তাছাড়া, তার সম্পত্তি আর জমানো টাকা এবং কালীর মত রূপে গুণে দুর্লভ বউয়ের লোভ সুবল কি সহজে ত্যাগ করিবে?

আধঘণ্টাখানেক বিশ্রাম করিয়া কৈলাস উঠিল। একটা লোক ধরিয়া তার মাথায় হার্ম্মোনিয়ম চাপাইয়া গ্রামের দিকে চলিতে আরম্ভ করিল।

গ্রামের বাহিরে দেখা হইল বংশীর সঙ্গে।

বংশী বলিল, 'কালীকে তাহ'লে পাঠিয়েই দিলে কৈলেস কাকা?'

'হুঁ', বলিয়া কৈলাস শঙ্কিত হইয়া রহিল।

বংশী বলিল, 'সুবল গাড়ী খুঁজে হয়রাণ। সব গাড়ী গেছে হাটে, কোথায় পাবে গাড়ী? আমি বাড়ির সামনে দিয়ে যাচ্ছিলাম, কালী আমায় ডেকে বললে, বংশীদা, একটা গাড়ী যোগাড় ক'রে দাও না? আমি শেষে রামগতি কাকার গাড়ীটা জুতিয়ে আনি তবে ওরা রওনা হয়।'

কৈলাস বলিল, 'দেখ দিকি কাণ্ড! আগে থাকতে গাড়ী ঠিক ক'রে রাখবে, তা নয়,—সুবলটার একেবারে বুদ্ধি নেই।'

'তোমার সঙ্গে দেখা হল না ব'লে কালী কেঁদেই অস্থির।'

'কেন, কাঁদল কেন? জষ্ঠি মাসেই তো ওকে আমি নিয়ে আসব।'

বংশী জ্ঞানীর মত বলিল, 'তাতে কি শানায় কৈলাস কাকা, শ্বশুরবাড়ি যেতে মেয়েরা কাঁদবেই। হার্ম্মোনিয়মটা তোমার না কি? কার জন্যে কিনলে?'

'কার জন্যে আবার, নিজের জন্যে। খালি বাড়িতে কি ক'রে সময় কাটাব; ওটা বাজিয়ে প্যাঁ পোঁ করা যাবে। তুই কোথায় যাচ্ছিস রে বংশী? সন্ধ্যের সময় এসে দুটো গানটান শুনিয়ে যাস তো।'

বাড়ি গিয়া জামা খুলিয়া কৈলাস তামাক সাজিয়া লইল। কালী পাড়ায় কোথায় বেড়াতে গিয়াছে; তামাক খাইয়া সে স্নান করিল। চিনি খুঁজিয়া লেবু দিয়া সরবৎ করিয়া পান করিয়া রামগতির ওখানে গেল।

রামগতি বলিল, 'কালীকে তা হ'লে পাঠাতে হ'ল কৈলাস দা?'

কৈলাস বলিল, 'হাঁ, দিলাম পাঠিয়ে। কালী সতেরয় পড়েছে, আর কি রাখা যায়? তবে এবার বেশী দিন রাখব না, জষ্টির মাঝামাঝি নিয়ে আসব। পাঠাব একেবারে সেই পূজোর পর।'

রামগতি বলিল, 'ভালই করেছ। মানুষের মন, কি জান দাদা, একেবারে আশ্চর্য্য। কালীকে পাঠাওনি বলেই হয়ত সুবল ওরকম হয়ে যাচ্ছিল, এবার বদলে যাবে। এতদিন কালীকে আটকে রাখা উচিত হয় নি।'

কৈলাস বলিল, 'অতটা বুঝতে পারি নি।'

'সুবল আর একটা বিয়ে ক'রে বসলে কি বিপদ হ'ত বল ত।'

কথাটা কৈলাস নিজেও অনেকবার ভাবিয়াছে, আজ রামগতির মুখে শুনিয়া সে শিহরিয়া উঠিল। ভাগ্যে কালী তার পাগলামীতে সায় দিয়া নিজের সর্ব্বনাশ করে নাই, গোপনে স্নেহ দিয়া সম্মান দিয়া বাপের অপমান ও অবিবেচনার বন্যাতেও নোঙর হইয়া স্বামীকে বাঁধিয়া রাখিয়াছে!

রামগতি বলিল, 'একটু সিদ্ধি করব না কি?'

কৈলাস বলিল, 'বদনার ওখানে গেলে হয় না? থাক্, কাজ নেই। সিদ্ধিই কর।'

গ্রামে সন্ধ্যার পরই রাত্রি। ঝাঁপ বন্ধ করা দোকানের

সামনে বাঁশের বেঞ্চিতে কাৎ হইয়া এমনি সময় বংশী বিড়ি টানে আর থাকিয়া থাকিয়া বাঁশী বাজায়, রামগতির বৈঠকখানায় মাখম একটা কালি-পড়া লণ্ঠন রাখিয়া যায়. সিদ্ধির নেশায় কৈলাসের দু-চোখ স্তিমিত হইয়া আসে, খানিক পরে বাড়ি ফিরিয়া কালীকে দেখার চেয়ে একমাস পরে পাথুরেঘাটায় গিয়া কালীকে বাড়ি ফিরাইয়া আনার কল্পনা কৈলাসের বেশী মনোরম মনে হয়, আর ওদিকে গরুর গাড়ীর মধ্যে কালী সুবলের সঙ্গে বক্ বক্ করে।

বলে, 'তোমার জন্য বাবার কাছে মুখ দেখাবার উপায় রইল না।'

কিন্তু একমাস পরে তাকে আনিতে গেলে কালী অনায়াসে আসিয়া কৈলাসকে প্রণাম করে. বলে, 'রাস্তায় কষ্ট হয়নি তো বাবা? যে গরম!'

কারও লজ্জা নাই। নিয়ম পালনে লজ্জা কি? পদে পদে নিয়মলঙ্ঘন করিয়াই তো সংসারে লজ্জা ও দুঃখের সীমা নাই।

মহিলা-সংবাদ

শ্রীমতী মৃণাল দাসগুপ্তা ১৩৩৬ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে সংস্কৃত ও বাংলায় প্রথম বিভাগে প্রথম স্থান অধিকার করিয়া এম্-এ উপাধি লাভ করিয়াছিলেন, এ সংবাদ আমরা পূর্ব্বেই ঐ সালের কার্ত্তিক সংখ্যা প্রবাসীতে প্রকাশ করিয়াছি। তৎপরে তিনি ঐ বিশ্ববিদ্যালয়ে দুই বৎসরের জন্য গবেষণা বৃত্তি লাভ করিয়া, বৈদিক ও সংস্কৃত সাহিত্যে ভক্তির ধারণা ও ভক্তিশাস্ত্র সম্বন্ধে তাঁহার গবেষণার কিয়দংশ ফল অবলম্বন করিয়া একটি পাণ্ডিত্যপূর্ণ প্রবন্ধ লিখিয়া কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রিফিথ মেমোরিয়ল পুরস্কার লাভ করিয়াছেন।

যাঁহারা কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে এরূপ পুরস্কার এ-যাবৎ পাইয়াছেন তাঁহাদের মধ্যে ইনিই সর্ব্বপ্রথম মহিলা।

শ্রী মৃণাল দাসগুপ্তা

ডাক্তার কুমারী মৈত্রেয়ী বসু, এম্-বি (কলিকাতা) কলিকাতায় চিত্তরঞ্জন সেবাসদনের হাউস্ সার্জ্জন ছিলেন। তিনি জার্ম্মেনীতে একটি বৃত্তি পাইয়া মিউনিক্ বিশ্ববিদ্যালয়ে উচ্চতর শিক্ষা লাভ করিতে যান। সেখানে পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া এম্-ডি উপাধি পাইয়াছেন। শিশুদের রোগের চিকিৎসা তাঁহার বিশেষ শিক্ষণীয় বিষয় ছিল।

গত ১৯৩০ হইতে ১৯৩২ সন পর্য্যন্ত নয়টি বাঙালী ছাত্রী ব্রহ্মদেশের হাইস্কুল ফাইন্যাল্ (ম্যাট্রিকুলেশন) পরীক্ষা পাস করিয়া রেঙ্গুন বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবেশের অনুমতি পাইয়াছেন। ইঁহাদের মধ্যে পাঁচজন প্রশংসার সহিত পাস করিয়াছেন।

১৯৩২ সনে তিনটি বাঙালী ছাত্রী রেঙ্গুন বিশ্ববিদ্যালয় হইতে আই-এ পরীক্ষা পাস করিয়াছেন।

এই বৎসর চারিটি বাঙালী ছাত্রী হাইস্কুলের ফাইন্যাল্ পরীক্ষা পাশ করিয়া রেঙ্গুন বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবেশের অনুমতি পাইয়াছেন।

ব্রহ্মদেশের হাইস্কুল ফাইন্যাল্ পরীক্ষা পাশ করিলেই সকলকে

শ্রীমতী স্নেহশোভনা দেবী

রেঙ্গুন বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবেশের অনুমতি দেওয়া হয় না। কিন্তু সুখের বিষয়, এযাবৎ সকল বাঙালী ছাত্রীই প্রবেশের অনুমতি পাইয়াছেন।

কুমারী সুরভি সিংহের সাফল্যের কথা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে। তিনি এ-বৎসর ব্রহ্মভাষা-পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছেন।

শ্রীমতী স্নেহশোভনা দেবী, বি-এ, বি-টি মান্দ্রাজের অন্তর্গত কোকনদস্থিত পিঠাপুরম্ মহারাজের কলেজে ইংরেজী সাহিত্যের টিউটর নিযুক্ত হইয়াছেন। ইনি ঐ কলেজের ইংরেজী সাহিত্যের অধ্যাপক শ্রীযুক্ত বিনয়ভূষণ রক্ষিতের পত্নী। অন্ধ্র বিশ্ববিদ্যালয়ের মিশ্র-কলেজের অধ্যাপক-মণ্ডলীতে মহিলার নিয়োগ এই প্রথম। সম্প্রতি ইনি পূর্ব্বগোদাবরী জেলার বোর্ড অফ সেকণ্ডারি এডুকেশ্যনের সভ্য মনোনীত হইয়াছেন। মান্দ্রাজ প্রদেশে বাঙালী মহিলার এইরূপ সম্মান এই প্রথম। পূর্ব্বে ইনি বাংলা গবর্ণমেণ্টের অধীনে স্কুল সমূহের এসিষ্টাণ্ট ইনস্পেক্ট্রেস ছিলেন।

গহনে

শ্রীনরেন্দ্রনাথ ঠাকুর

প্রবাসী প্রেস, কলিকাতা

জাতিগঠনে গ্রন্থালয়ের স্থান

শ্রীমুণীন্দ্র দেব রায় মহাশয়

ঋষিগণ মুখে মুখে কিরূপ চলন্ত লাইব্রেরীর কার্য্য করিয়া বেড়াইতেন মহাভারতের যুগে আধুনিক ক্লাবের মত প্রতিষ্ঠানের মধ্য দিয়া কিরূপ সাহিত্যালোচনা হইত বা বৌদ্ধযুগে নালন্দা, বিক্রমশীলা ও ওদণ্ডপুরীর বিরাট লাইব্রেরীর কথা অথবা অধ্যাপকদের আশ্রমে বা চতুষ্পাঠিগুলিতে জ্ঞানের অফুরন্ত ভাণ্ডার অগাধ পাণ্ডিত্যের আধার অমূল্য শাস্ত্রগ্রন্থ সংগৃহীত ও সঞ্চিত থাকিত সে-সকল বিষয়ে আজ আমি আলোচনা করিব না। তখনকার দিনে জগতের সর্ব্বত্র গ্রন্থ-সংরক্ষণ ছিল গ্রন্থাগারের প্রধান লক্ষ্য, আমাদের দেশে পুঁথিগুলি কাষ্ঠখণ্ডে আবদ্ধ করিয়া বস্ত্রাবৃত করিয়া রাখা হইত। এত যত্নে রক্ষিত ছিল বলিয়া আজও বহু অমূল্য গ্রন্থ জগত হইতে বিলুপ্ত হইতে পারে নাই। একখানি সম্পূর্ণ মহাভারত বা শ্রীমদ্ভাগবত নকল করিতে বৎসরের পর বৎসর অতিবাহিত হইত—এত পরিশ্রমলব্ধ দ্রব্যের আদর ও যত্ন অস্বাভাবিক নহে। খৃষ্টীয় ষোড়শ শতাব্দীতেও বিলাতে ও ইউরোপের নানা স্থানে আলমারীতে পুস্তক শৃঙ্খলাবস্থায় রাখিবার ব্যবস্থা ছিল। প্রথমতঃ, পিতলের ফ্রেমে পুস্তক আবদ্ধ রাখা হইতে। ফ্রেমের সহিত আঙটা থাকিত, তাহার ভিতর দিয়া লৌহের শিকল লইয়া গিয়া তাকের দুই দিকে আটকান হইত। শিকল যতটা লম্বা তাহার অতিরিক্ত দূরে পুস্তক লইয়া যাওয়া চলিত না। তখন ব্যবহার অপেক্ষা পুস্তক সংরক্ষণ ছিল মুখ্য উদ্দেশ্য। মুদ্রাযন্ত্র আবিষ্কারের পরও বহুদিন পর্য্যন্ত পুস্তক শৃঙ্খলমুক্ত হয় নাই। সেটা একটা অভ্যাসের মধ্যে দাঁড়াইয়া গিয়াছিল। মুদ্রাযন্ত্রের দ্রুত উন্নতি ক্রমশঃ পুস্তকের শৃঙ্খল মোচনের সহায়ক হয়। স্বাধীনতালাভ সত্ত্বেও পুস্তক সাধারণের ব্যবহারে আসিতে আরও এক শতাব্দী কাটিয়া যায়। "পুস্তক-সংরক্ষণ" নীতি অপসারিত হইয়া "ব্যবহারের জন্যই পুস্তক"-নীতি ক্রমে অবলম্বিত হয়। কিন্তু তাহা আবদ্ধ রাখা হয় ক্ষুদ্র গণ্ডীর মধ্যে। যাহারা অর্থসাহায্য বা চাঁদা দিতে পারিত কেবল তাহারাই গ্রন্থালয়ে বসিয়া পুস্তকপাঠের অধিকার পাইত ক্রমে মূল্য জমা দিয়া নির্দ্দিষ্ট সময়ের জন্য পুস্তক গৃহে লইয়া যাইবার নিয়ম প্রবর্ত্তিত হয়। পুস্তকের অবাধ ব্যবহার-নীতি প্রবর্ত্তিত হইয়াছে—নিতান্ত আধুনিক যুগে। কিছুকাল পূর্ব্বে হারভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়-সংশ্লিষ্ট গ্রন্থাগারের অধ্যক্ষ পূর্ব্ব তালিকার সহিত পুস্তক মিল করিয়া নূতন তালিকা প্রস্তুত করিতেছিলেন, কার্য্যশেষে তিনি দেখেন, কেবলমাত্র দুইখানি পুস্তক জনৈক পাঠকের নিকট হইতে ফেরৎ আসে নাই আর সকলই যথাযথভাবে আলমারীতে বদ্ধ আছে দেখিয়া তিনি উৎফুল্ল হন। এখনকার দিনে সে মনোবৃত্তি পাল্টাইতে হইবে। এখন পাঠকদের মধ্যে পুস্তক বিলি করিয়া আলমারী খালি করিতে পারিলে গ্রন্থাধ্যক্ষ তাঁহার কর্ত্তব্যপালনে কৃতকার্য্য হইয়াছেন বলিয়া আত্মপ্রসাদ লাভ করেন। এখন ইউরোপ ও আমেরিকার সুদূর পল্লীতে লোকের দ্বারে দ্বারে চলন্ত পুস্তকের বাক্স পল্লীবাসীকে পুস্তকপাঠে আকৃষ্ট করিবার চেষ্টা করে—পাঠস্পৃহা বর্দ্ধিত করিবার সহায়ক হয়।

স্ত্রী-শিক্ষা সম্বন্ধেও আধুনিক সুসভ্য দেশসমূহ অর্দ্ধ শতাব্দী পূর্ব্বেও অধিক দূর অগ্রসর হয় নাই। আমাদের দেশে বহু পূর্ব্বকালেও স্ত্রীলোকের জ্ঞানচর্চ্চার কোনও বাধা ছিল না। ইউরোপ ও আমেরিকায় পঞ্চাশ বৎসরের মধ্যে নারীশিক্ষা বিষয়ে সামাজিক মতের পরিবর্ত্তন হইয়া গিয়াছে। এখন সকল বিষয়ে পুরুষের সহিত নারীর সমানাধিকারের যুগ আসিয়াছে। আমাদের দেশেও এখন সেই হাওয়া বহিতেছে। জ্ঞানলাভে স্ত্রী-পুরুষনির্ব্বিশেষে আপামর-সাধারণের সমান অধিকার আবহমান কাল হইতে আমাদের দেশে স্বীকৃত হইয়া আসিতেছে। নিরক্ষরতা এখানে জ্ঞানলাভের অন্তরায় হয় নাই। নিরক্ষর থাকিয়াও সকলে জ্ঞানার্জ্জনের কিছু সুযোগ ও সুবিধা পাইত; কথকতা, পুরাণ, ভাগবত, মহাভারত, রামায়ণ প্রভৃতি সদ্‌গ্রন্থ পাঠের পূর্ব্বে বহুল প্রচলন ছিল, নিরক্ষর লোক পাঠ শুনিয়া শুনিয়া

অনেক জ্ঞান লাভ করিত। যাত্রা প্রভৃতি আমোদানুষ্ঠানের ভিতর দিয়াও নানা বিষয়ে শিক্ষালাভ করিতে পারিত। নিরক্ষর থাকিয়াও হিতাহিত বিচারশক্তি স্ফুরিত হইত, লোক স্বধর্ম্মপরায়ণ থাকিয়া সমাজের অশেষ কল্যাণসাধন করিতে পারিত। এখন কালধর্ম্মে সব ওলট-পালট হইয়া যাইতেছে। এখন আর নিরক্ষর থাকিলে চলিবে না। এদেশে প্রাথমিক বিদ্যাশিক্ষার আইন বিধিবদ্ধ হইয়াছে--- ইহাতে নিরক্ষরতা বিদূরণের পথ উন্মুক্ত হইবে। প্রাথমিক-বিদ্যা শিক্ষালাভের প্রথম সোপান; দ্বিতীয় সোপান হইতেছে উচ্চ বিদ্যালয়, ও তৃতীয় সোপান কালেজী বিদ্যা। আমাদের এ গরিব দেশে দ্বিতীয় সোপানে উঠিতে পারিবে কয় জন? আর গরিবের পক্ষে বহুব্যয়সাধ্য তৃতীয়ের কথা ছাড়িয়া দিলাম। এখন প্রাথমিক শিক্ষা পর্য্যন্ত যাহারা শিক্ষালাভ করিবে, তাহাদের উত্তরোত্তর জ্ঞান বর্দ্ধনের ব্যবস্থা না করিলে এখন তাহারা যাহা শিখিবে তাহাও ক্রমে বিস্মৃত হইবে, তাহাদের জন্য যে বিপুল ব্যয় হইবে সবই ব্যর্থ হইয়া যাইবে। সেজন্য গ্রামে গ্রামে চলন্ত লাইব্রেরী প্রেরণের ব্যবস্থা করা একান্ত প্রয়োজন হইবে। জ্ঞানস্পৃহা বর্দ্ধন ও পুস্তকপাঠের আগ্রহ জাগাইয়া রাখিতে হইলে দেশের ভবিষ্যতের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া একটা কিছু ব্যবস্থা করিতেই হইবে। আপামর সাধারণের মধ্যে জ্ঞানপ্রচার এবং জ্ঞানান্ধকার বিদূরণ মহা পুণ্য-কর্ম্ম। বিদ্যালয়ের শিক্ষা নির্দ্দিষ্ট কালের জন্য, আর গ্রন্থালয়ের শিক্ষা জীবনব্যাপী। প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলিতে ছেলেদের লাইব্রেরীর ভালরূপ বন্দোবস্ত করিবার জন্য আমি গবর্ণমেণ্টকে বিশেষভাবে অনুরোধ করিব। জনৈক বিভাগীয় স্কুল-পরিদর্শকের সহিত সম্প্রতি এ-বিষয়ে আমি আলোচনা করিতেছিলাম। তিনি স্বীকার করেন যে, এ দেশে স্কুল-সংলগ্ন লাইব্রেরীগুলি অকিঞ্চিৎকর, ছেলেদের পক্ষে আদৌ চিত্তাকর্ষক নহে এবং পাঠেচ্ছাবর্দ্ধনে কিছুমাত্র সহায়তা করে না। জগতে সর্ব্বত্র শিশু-পাঠাগারের শ্রীবৃদ্ধিকল্পে বিপুল প্রচেষ্টা চলিতেছে। দেশের ভবিষ্যৎ তো এই ছেলেদেরই হাতে। পোল্যাণ্ড দেশে শিশু-লাইব্রেরী পরিচালনের ভার তাহাদে্‌ই হাতে ন্যস্ত থাকে। এই দায়িত্বপূর্ণ স্বায়ত্তশাসন-কার্য্যে এইখানেই তাহাদের হাতেখড়ি হয়। শিশুপ্রতিভা স্ফুরণের কি অপূর্ব্ব উপায়! নরওয়ের শিশু-লাইব্রেরীগুলিতে গল্পের ক্লাস আছে, গল্পের সঙ্গে সঙ্গে নানা বিষয়ে শিক্ষা দেওয়া হয়, জ্ঞানস্পৃহা ও পাঠেচ্ছা বর্দ্ধনের উদ্দেশেই গল্পের অবতারণা করা হয়। নির্দ্দোষ আমোদ-প্রমোদের সঙ্গে জ্ঞানবৃদ্ধিকল্পে তাহাদের লইয়া নাটকাদি অভিনয়েরও ব্যবস্থা করা হইয়া থাকে। খেলার ছলে যুদ্ধকৌশলও শিক্ষা দেওয়া হয়।

আমাদের দেশে সন্তান-শাসনের ব্যবস্থাই চলিয়া আসিতেছে। তাহাদের প্রকৃত মানুষ করিবার চেষ্টা দেখি না। ভারতবর্ষের বড়োদা রাজ্যে ছেলেদের লাইব্রেরীর সুন্দর ব্যবস্থা আছে। এখন গ্রামে গ্রামে ছেলেদের উপযোগী চিত্তাকর্ষক লাইব্রেরী-প্রতিষ্ঠার প্রচেষ্টা অত্যাবশ্যক হইয়াছে। নরওয়ে দেশে একজন সামান্য ধীবরের পুত্র একমাত্র লাইব্রেরীর সাহায্যে জ্ঞানলাভ করিয়া এখন আমেরিকায় সেণ্টওলাফ কলেজে অধ্যাপকতা করিতেছেন। তাঁহার নাম Prof. Rolvaag. বালকের পিতা চৌদ্দ বৎসর বয়সে তাহাকে স্কুল হইতে ছাড়াইয়া লইয়া নরওয়ের উত্তরোপকূলে এক নির্জ্জন স্থানে ধীবরের কার্য্যে নিযুক্ত করেন। বালক মৎস্য ধরিয়া জীবিকার্জ্জন করিত এবং অবকাশ পাইলে সমুদ্রতীরস্থ একটি লাইব্রেরী হইতে পুস্তক লইয়া পড়িত। আটাশ বৎসর বয়সে সে আমেরিকার ডিগ্রী পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া ক্রমে অধ্যাপকের পদ লাভ করে।

বিগত ইউরোপীয় মহাযুদ্ধের পর হইতে জগতের সর্ব্বত্র লাইব্রেরী-আন্দোলনের একটা সাড়া পড়িয়া গিয়াছে। বর্ত্তমান যুগে লাইব্রেরীগুলি জ্ঞানার্জ্জনের প্রকৃষ্ট স্থান বলিয়া স্বীকৃত হইয়াছে। লাইব্রেরীর কার্য্য সুচারুরূপে পরিচালন জন্য ইউরোপের প্রত্যেক রাজ্যে ও আমেরিকার প্রত্যেক ষ্টেটে ও ব্রিটিশাধিকৃত প্রায় সমস্ত উপনিবেশে লাইব্রেরী আইন বিধিবদ্ধ হইয়াছে। বিলাতে এবং নানাস্থানে অন্যান্য ট্যাক্সের মত পৃথক লাইবেরী 'রেট' ধার্য্য হইয়াছে। কোথাও কোথাও গবর্ণমেণ্ট সাধারণ রাজস্ব হইতে লাইব্রেরীর ব্যয়ভার বহন করিতেছেন। অনেক রাজ্যে লাইব্রেরীর উন্নতিকল্পে শিক্ষামন্ত্রীর অধীনে পৃথক লাইব্রেরী বিভাগ সৃষ্ট হইয়াছে। জগতের মধ্যে আমেরিকার যুক্তরাজ্য লাইব্রেরী আন্দোলনে শ্রেষ্ঠ স্থান অধিকার করিয়াছে। তাহার মূলীভূত কারণ হইতেছে নিউ ইয়র্ক শহরের দানবীর এন্‌ড্রু কার্ণেগীর অতুলীয় বদান্যতা। তিনি মানবের কল্যাণের জন্য এক শত কোটী টাকা দান

করিয়াছেন—লাইব্রেরীর জন্য দানই তাঁহাকে চিরস্মরণীয় করিয়া রাখিবে। আমেরিকা, কানাডা ও ইংলণ্ডের প্রাসাদতুল্য সহস্র সহস্র লাইব্রেরীগৃহ তাঁহার অক্ষয় কীর্ত্তি ঘোষণা করিতেছে। দানবীর কার্ণেগীর আদি নিবাস স্কটল্যাণ্ডে। তাঁহার পিতা তন্তুবায়ের কার্য্যে জীবিকার্জ্জন করিতেন। কার্ণেগী তের বৎসর বয়সে যুক্তরাজ্যে একটি সুতার কারখানায় মাসিক তের টাকা বেতনে প্রথম কর্ম্ম গ্রহণ করেন। ক্রমে স্বীয় অধ্যবসায় ও কর্ম্মপটুতার গুণে তিনি জগতের মধ্যে একজন শ্রেষ্ঠ ধনী বলিয়া পরিগণিত হন। মিঃ এ. জি. গার্ডনার তাঁহার "Pillars of Society" (সমাজের স্তম্ভরাজি) নামক পুস্তকে লিখিয়াছেন :—

একই দেহ এবং আত্মায় দুই জন এণ্ড্রু কার্ণেগী বাস করিতেন—এক জন কোটী কোটী টাকা উপার্জ্জন করিতেন আর এক জন সেই অর্থ অকাতরে সদ্ব্যয় করিতেন—দুই জনের মধ্যে কখনও বিরোধ হইত না—প্রত্যেকেই নিজ নিজ কর্ত্তব্য পালন করিয়া অবশ্য হইতেন। একজন ক্ষুরের ন্যায় তীক্ষ্ণধার কঠোর ব্যবসায়ী, অপর জন মূর্ত্ত করুণা পরার্থে উৎসৃষ্ট প্রাণ।"

১৮৯৯ খ্রীষ্টাব্দে জুন সংখ্যা "নর্থ য়্যাটলাণ্টিক রিভিউ" পত্রে এন্‌ড্রু কার্ণেগী "Gospel of Wealth" শীর্ষক একটি প্রবন্ধ লিখেন। তাহাতে অর্থশালী ব্যক্তির কর্ত্তব্য সম্বন্ধে তাঁহার মনোভাব সুন্দররূপে অভিব্যক্ত হইয়াছে। তাহার মর্ম্মার্থ হইতেছে যে ধনশালী ব্যক্তি আদর্শ মিতব্যয়ীর জীবন যাপন ও তাঁহার পোষ্যগণের ন্যায্য অভাব পূরণ করিয়া যে অর্থ উদ্বৃত্ত থাকিবে তাহা স্বীয় বিবেচনামত জনহিত-কল্পে ট্রাষ্টীস্বরূপ ব্যয় করিবেন। জ্ঞানবিস্তারে তাঁহার অগাধ অর্থ ব্যয়িত হইয়া আসিতেছে। তাঁহার বদান্যতায় নির্ম্মিত প্রত্যেক লাইব্রেরী-গৃহে "Let there be light" এই মন্ত্র অঙ্কিত আছে। একমাত্র জ্ঞানালোক-বিতরণ ছিল তাঁহার জীবনের প্রধান ব্রত। এখন নিউ ইয়র্কে কার্ণেগী করপোরে-শনের কার্য্য আরম্ভ হইয়াছে—দক্ষিণ-আফ্রিকার লাইব্রেরীর কার্য্যবিস্তারে। সেখানকার অভাব পূরণ হইলে, কোথায় কার্য্য আরব্ধ হইবে তাহার স্থিরতা নাই। ভারতের দিকে কার্ণেগী করপোরেশনের দৃষ্টি আকর্ষণের আমরা ক্রমাগত চেষ্টা করিতেছি। ভারতবর্ষ উল্লঙ্ঘন করিয়া তাহা অষ্ট্রেলিয়ায় গিয়া পড়িবে কি-না কে জানে ব্রিটিশাধিকৃত উপনিবেশের দাবি হয়ত সর্ব্বাগ্রগণ্য হইবে। আমাদের দেশে কার্ণেগীর ন্যায় দানবীর নাই আর যদি বা থাকেন লাইব্রেরীর ন্যায় অনুষ্ঠানের জন্য কয়জন মুক্তহস্ত হইবেন? যে-কোনও কার্য্যে সাফল্য লাভ করিতে হইলে অর্থের আবশ্যক। গবর্ণমেণ্টের নিকট অর্থের আশা করা বিড়ম্বনামাত্র। অর্থের অনটনের অজুহাত তো বরাবরই ছিল, এবার তো দেউলিয়া পড়িবার অবস্থা। বিগত মহাযুদ্ধে ইউরোপীয় যে-সব রাজ্য যুদ্ধে সংশ্লিষ্ট ছিল তাহাদের সকলেরই অর্থের অনটন যথেষ্ট হইয়াছিল। যুদ্ধের অবসানে কিন্তু তাহারা "knowledge is power" (জ্ঞানই শক্তি) উক্তির মর্ম্ম সাগ্রহে গ্রহণ করিয়া জ্ঞানবিস্তারের জন্য অতিশয় ব্যগ্র হইয়া পড়েন এবং রাজ্যের সর্ব্বত্র লাইব্রেরী-প্রতিষ্ঠায় অবহিত হন। তন্মধ্যে দাসত্বশৃঙ্খলমুক্ত নবজাগ্রত জাতিদের উৎসাহ সর্ব্বাপেক্ষা বেশী দেখা যায়। ভার্সাইয়ের সন্ধির পর লাইব্রেরী-জগতের এক নবযুগ আরম্ভ হইয়াছে। বুলগেরিয়ার প্রাচীন সামাজিক প্রতিষ্ঠান "চিতানিষ্ঠা"গুলিকে উপলক্ষ্য করিয়া রাজ্যের সর্ব্বত্র লাইব্রেরী-প্রতিষ্ঠার ব্যবস্থা হইয়াছে। সেখানকার শিক্ষামন্ত্রীর উদ্যোগে ১৯২৮ খৃষ্টাব্দে লাইব্রেরী আইন বিধিবদ্ধ হয়, তাহার ফলে তিন বৎসরের মধ্যে ১৯৮৪টি "চিতানিষ্ঠা" প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। রুমানিয়াতে প্রাচীন "আস্ত্রা" এবং "এথিনিয়াম্"গুলিকে উপলক্ষ্য করিয়া ৩০০০ লাইব্রেরী স্থাপিত হইয়াছে। যুগোশ্লাভিয়ার শিক্ষামন্ত্রীর অধীনে একটি লাইব্রেরী বিভাগ গঠিত করিয়া এক সহস্র পল্লী লাইব্রেরী প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। হাঙ্গেরী যুদ্ধের আঘাত এতদিনেও সামলাইতে না পারিলেও সম্প্রতি সেখানে বয়স্কদের শিক্ষার আইন (Adult Education Bill) পাসের ব্যবস্থা হইতেছে। তাহার তৃতীয় পরিচ্ছেদে লাইব্রেরী-আন্দোলনের পরিপুষ্টির প্রচুর আয়োজন আছে। চেকোশ্লোভাকিয়া অষ্ট্রিয়ার কবল হইতে মুক্তিলাভ করিয়াই জ্ঞানে দিগ্বিজয়ী হইতে কৃতসঙ্কল্প হইয়াছে। পরপদানত জাতি সর্ব্ববিষয়ে অবনতির চরমসীমায় গিয়া পৌঁছিতেছিল।

এখন চেকোশ্লোভাকিয়ায় লাইব্রেরীর সংখ্যা দাঁড়াইয়াছে ১৬,২০০ অর্থাৎ প্রতি ৮৯৪ জন অধিবাসীর জন্য একটি লাইব্রেরী ও প্রতি একশত লোকের জন্য ৪৪খানি পুস্তকের ব্যবস্থা হইয়াছে। এই ক্ষুদ্র সাধারণতন্ত্রের রাজস্ব হইতে লাইব্রেরীর জন্য বার্ষিক পনের লক্ষ টাকা ব্যয়িত হইয়া থাকে। তা ছাড়া প্রথম প্রেসিডেণ্ট মাসারিক ভাল পুস্তক প্রকাশ জন্য মাসারিক ইনষ্টিটিউট নামক সভার হস্তে চারি লক্ষ টাকা

ন্যস্ত করিয়াছেন। ১৯১৮ খৃষ্টাব্দে পোল্যাণ্ড স্বাধীনত লাভ করিয়া ১৮০০ লাইব্রেরী স্থাপিত করিয়াছে এবং নূতন লাইব্রেরী-আইন বিধিবদ্ধ হইলে পোল্যাণ্ডে লাইব্রেরীর সংখ্যা দাঁড়াইবে ১৫,০০০। সোভিয়েট রাশিয়া পাঁচ বৎসরের মধ্যে রাশিয়াকে নিরক্ষতা হইতে মুক্ত করিতে কৃতসঙ্কল্প হইয়া যে বিরাট আয়োজন করিয়াছে তাহা বস্তুতঃই বিস্ময়কর। লাইব্রেরীর ব্যবস্থাও তদুপযোগী করা হইতেছে। সে বিশাল দেশে এমন পল্লী নাই যেখানে কুটীর লইব্রেরী বা People's House প্রতিষ্ঠিত হয় নাই। সেখানে লাইব্রেরীর সংখ্যা ৪৬,৭৫৯ এবং চলন্ত লাইব্রেরীর সংখ্যা ৫০,০০০। ১৯১৭ খৃষ্টাব্দে ফিনল্যাণ্ড স্বাধীনতা লাভ করিয়া জ্ঞান-বিস্তারকল্পে বদ্ধপরিকর হয়। বিদেশী ভাষা রাজভাষা হওয়ায় ফিনিস্ ভাষা বিলুপ্ত হইতে বসিয়াছিল, স্বাধীনতার অনুকূল বায়ুতে ফিনিস্ ভাষা নবগৌরবে গরীয়ান হইয়া উঠিতেছে। ১৯২৮ খৃষ্টাব্দে লাইব্রেরী-আইনের বলে সেই তুষারাবৃত জন-বিরল দেশে এক সহস্রাধিক পল্লী লাইব্রেরী গড়িয়া উঠিয়াছে। সেখানে আটত্রিশটি নগর এবং আঠারটি বরোতে শতকরা আশীটি সাধারণ পাঠাগার স্থাপিত হইয়াছে। সুইডেনে ৮৫০০ লাইব্রেরী প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, তন্মধ্যে ১২৯৭টি ছেলেদের লাইব্রেরী। এই-সব লাইব্রেরীতে গবর্ণমেণ্ট ও মিউনিসিপ্যাল সাহায্যের পরিমাণ ১৮,৭৫,০০০৲। ১৯২০ খৃষ্টাব্দে লাইব্রেরী-আইন বিধিবদ্ধ হওয়ার পর হইতে ডেনমার্কের লাইব্রেরীর দ্রুত উন্নতি হইতেছে। কোপেনহেগেন শহরের রাষ্ট্রীয় লাইব্রেরী এবং বিশ্ববিদ্যালয় লাইব্রেরী ছাড়া শহরের লাইব্রেরীর সংখ্যা আশীটি এবং পল্লী লাইব্রেরী আটশত। সরকারী ও নাগরিক সভার সাহায্যের পরিমাণ বার্ষিক উনিশ লক্ষ টাকা। ছেলেদের লাইব্রেরীর শ্রীবৃদ্ধিকল্পে রাষ্ট্রীয় লাইব্রেরীর পরিচালক সর্ব্বদা সচেষ্ট আছেন। বেলজিয়ামের লাইব্রেরী-সংখ্যা ১২০০। হল্যাণ্ডে প্রাচীন সাহিত্যিক প্রতিষ্ঠান Nut-এর মধ্য দিয়া লাইব্রেরী-আন্দোলন ক্রমশঃ সাফল্য লাভ করিতেছে। জার্ম্মানী, ইটালী, ইংলণ্ড প্রভৃতি বড় বড় রাজ্যে তো লাইব্রেরীর বিরাট আয়োজন থাকিবেই। তাহার কথা ছাড়িয়া দিয়া এশিয়াখণ্ডে প্যালেষ্টাইন, ফিলিপাইন দ্বীপপুঞ্জ, শ্যামরাজ্য, চীন, জাপান, অষ্ট্রেলিয়া প্রভৃতি স্থানে লাইব্রেরীর দ্রুত বিস্তার ও উন্নতি দেখা যাইতেছে। হাওয়াই দ্বীপের লাইব্রেরীর সাফল্যে মুগ্ধ হইয়া যাইতে হয়। প্রশান্ত মহাসাগরে এই দ্বীপপুঞ্জ আটটি বড় খণ্ডে ও অনেকগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র খণ্ডে বিভক্ত। অধিবাসীও বিভিন্ন জাতীয়-চীনা জাপানী, পর্ত্তুগীজ, ফিলিপিন, স্প্যানিস, জার্ম্মান, রাশিয়ান, ইংরেজ ও আমেরিকান প্রভৃতি নানা জাতি লইয়া এই দ্বীপ-পুঞ্জের অধিবাসী। এত স্বাভাবিক অসুবিধা সত্ত্বেও এখানে লাইব্রেরীর কার্য্য অতি সুচারুরূপে পরিচালিত হইয়া থাকে। এখানে চারিটি উচ্চ শ্রেণীর লাইব্রেরী আছে ও ২৪৬টি পুস্তকবিলির কেন্দ্র আছে। গ্রন্থাধ্যক্ষেরা দ্বীপের সর্ব্বত্র পরিভ্রমণ করিয়া পাঠকদের অভাব অভিযোগ শুনিয়া তাহাদের উপযোগী শিক্ষণীয় পুতক বিলির ব্যবস্থা করিয়া থাকেন। এই দ্বীপপুঞ্জের অধিবাসীর সংখ্যা ২৫০,০০০; তাহাদের মধ্যে সাত লক্ষ পুস্তক প্রতি বর্ষে বিলি করা হইয়া থাকে। গবর্ণমেণ্টের বার্ষিক সাহায্য তিন লক্ষ টাকা এই দ্বীপ-পুঞ্জের মধ্যে একটি ক্ষুদ্র দ্বীপে কেবলমাত্র পনর জন লোকবাস করে! তাহাদের জন্য নিয়মিত ভাবে পুস্তকাদি প্রেরিত হয়। এতক্ষণ বিদেশের কথাই শুনাইতেছিলাম। এখন ভারতবর্ষের কথা বলি। দেশীয় রাজ্য মধ্যে বড়োদা রাজ্যের ব্যবস্থা ব্রিটিশ ভারতের আদর্শস্থানীয় ও অনুকরণীয়। ব্রিটিশ ভারতের মধ্যে পঞ্জাব গবর্ণমেণ্ট লাইব্রেরীর বিস্তারকল্পে খুব সচেষ্ট আছেন। তাঁহারা ১৬০০ স্কুল লাইব্রেরীকে পল্লী-লাইব্রেরীতে পরিণত করিয়াছেন এবং লাইব্রেরীর দ্বার সাধারণের জন্য উন্মুক্ত রাখিয়াছেন। জেলা বোর্ড সহযোগে গবর্ণমেণ্ট এই-সব লাইব্রেরীর ব্যয়-ভার বহন করিতেছেন। সাধারণের উপযোগী পুস্তক; সাময়িক পত্রাদির প্রচুর ব্যবস্থা করা হইতেছে। উপযুক্ত গ্রন্থাধ্যক্ষ নিযুক্ত করিয়া সাধারণকে লাইব্রেরীতে আকর্ষণ ও তাহাদের পাঠস্পৃহা বর্দ্ধনের চেষ্টা চলিতেছে। যুক্ত-প্রদেশে কয়েকটি জেলা লইয়া চলন্ত লাইব্রেরী প্রেরণের ব্যবস্থা হইয়াছে। মান্দ্রাজের গবর্ণমেণ্ট লাইব্রেরীতে অর্দ্ধেক সাহায্য দান প্রবর্ত্তিত করিয়াছেন। লাইব্রেরী যত টাকা ব্যয় করিবে গবর্ণমেণ্ট তাহার অর্দ্ধেক ব্যয়ের সাহায্য করিয়া থাকেন। আর আমাদের বাংলা গবর্ণমেণ্ট লাইব্রেরী-সংক্রান্ত বিষয়ে কিরূপ উদাসীন।

বাংলা গবর্ণমেণ্ট কলিকাতার তিনটি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান—

বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ, সংস্কৃত সাহিত্য পরিষদ এবং ইউনিভার্সিটি ইনিষ্টিটিউটে কিছু কিছু সাহায্য করিয়া থাকেন। আর কলিকাতার বাহিরে সমগ্র বাংলা দেশে গবর্ণমেণ্টের দানের বহর মাসিক পঁচিশ টাকা মাত্র, তাহা পান কেবল মাত্র একটি লাইব্রেরী নবদ্বীপের আইডিয়াল লাইব্রেরী। আর কোনও লাইব্রেরী এক কপর্দ্দকও সাহায্য পান না। কাউন্সিলে এ-বিষয়ে আমি বহু আলোচনা করিয়াছি। মান্যবর শিক্ষামন্ত্রীর নিকট একটিও আশার বাণী পাই নাই। জেলা বোর্ড বা ইউনিয়ন বোর্ড আইনের বাধায় এতদিন লাইব্রেরীতে সাহায্য দিতে পারিতেন না - আমি Bengal Local Self-Government (Amendment) Bill 1931 এবং Bengal Village Self-Government (Amendment) Bill, 1931 বেঙ্গল কাউন্সিলে পেশ করিয়াছিলাম। শেষোক্ত বিলটি পাস হইয়াছে। প্রথমোক্ত বিলটি গবর্ণমেণ্টের সংশোধনী বিলের সামিল করা হইয়াছে। আগামী নবেম্বর সেসনে বিল-সংক্রান্ত সিলেক্ট কমিটির রিপোর্ট বিবেচিত হইবে। আমি আর একটি পাব্লিক লাইব্রেরী বিল আগামী সেসনে পেশ করিব। সেটি এখন গবর্ণরের মতসাপেক্ষ আছে। অতীব পরিতাপের বিষয়, বাংলা দেশে বিশ্ববিদ্যালয় বা কলেজ লাইব্রেরী বা সাধারণ লাইব্রেরীতে বিশেষজ্ঞ নাই। পঞ্জাব ও মান্দ্রাজ বিশ্ববিদ্যালয়ে ও বড়োদাতে লাইব্রেরীয়ান কার্য্য শিক্ষা দিবার ব্যবস্থা আছে। বাংলার শিক্ষামন্ত্রীকে এখানে একটা ব্যবস্থা করিবার কথা বলিয়াছিলাম তিনি স্বীকৃত হন নাই। বিশেষজ্ঞ লাইব্রেরীয়ানের আবশ্যকতাও তিনি অনুভব করেন না। জগতের সর্ব্বত্র লাইব্রেরীয়ান কার্য্য শিক্ষার ব্যবস্থা আছে, ডিগ্রী পর্য্যন্ত দেওয়া হয়, আর বাংলা কত পশ্চাতে পড়িয়া রহিয়াছে। আমরা ইম্পিরিয়াল লাইব্রেরীতে একটি লাইব্রেরী ক্লাস খুলিবার চেষ্টা করিতেছি। ইতিমধ্যে আমাদের অনুরোধে কলিকাতার ইম্পিরিয়াল লাইব্রেরীয়ান মিঃ আসাদুল্লা লিলুয়া ইণ্ডিয়ান ইনষ্টিটিউটের লাইব্রেরীয়ানকে আধুনিক বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে লাইব্রেরীয়ানের কার্য্য শিক্ষা দিতেছেন। সেজন্য আমরা তাঁহার নিকট কৃতজ্ঞ।

সেদিন এই লাইব্রেরীর কর্ত্তৃপক্ষের নিকট শুনিয়া বিস্মিত হইলাম এখানকার কলের কর্ত্তারা নৈহাটীতে লাইব্রেরী গৃহ নির্ম্মাণ জন্য পঁচিশ হাজার টাকা দিতে চাহিয়াছিলেন, কিন্তু স্থান নির্ণয়ে মতদ্বৈধ হওয়ায় প্রস্তাবটি কার্য্যে পরিণত হইতে পারে নাই। পরিতাপের বিষয় হইলেও গত কার্য্যে অনুশোচনায় ফল নাই। আধুনিক যুগের প্রচলিত নিয়মানুযায়ী যে-স্থানে লোক প্রত্যহই কোনও-না-কোনও কার্য্য উপলক্ষে গিয়া থাকেন এরূপ সাধারণ স্থানে লাইব্রেরী গৃহ নির্ম্মাণ করা কর্ত্তব্য জগতের সর্ব্বত্র এই নিয়ম অনুষ্ঠিত হইয়া আসিতেছে য়ুরোপ ও আমেরিকায় নগরের কেন্দ্রস্থলে সাধারণ স্থানে প্রধান লাইব্রেরী গৃহ নির্ম্মিত হয় আর তাহার শাখা প্রশাখা সাধারণের সুবিধার দিকে দৃষ্টি রাখিয়া স্থাপিত হয় দূরত্ব পুস্তক ব্যবহারের প্রতিবন্ধক না হয় ইহাই থাকে প্রধান লক্ষ্য। দৃষ্টান্তস্বরূপ কয়েকটি শহরের উল্লেখ করিতেছি। ডাবলিন শহরে ৩,২৪,০০০ অধিবাসীর জন্য পাঁচটি শাখা, মিতব্যয়ী এডিনবরা শহরে ৪,২০,০০০ অধিবাসীর জন্য সাতটি শাখা ম্যাঞ্চেষ্টারের ৭.৪৪,০০০ লোকের জন্য ত্রিশটি শাখা, বার্মিং হামের ৯,১৯,০০০ লোকের জন্য চব্বিশটি শাখা, টরণ্টো শহরের ৫,৫০,০০০ লোকের জন্য পনেরটি শাখা, ক্লেভল্যাণ্ডের ৮,০০,০০০ লোকের জন্য পঁচিশটি শাখা ও ১০৮টি পুস্তক বিলি করিবার কেন্দ্র আর শিকাগোর ৩০,০০০,০০০ অধিবাসীর জন্য ৪৬টি শাখা লাইব্রেরী এবং ২৭৫টি পুস্তক বিলির কেন্দ্র আছে। লিসবন শহরের উদ্যান-লাইব্রেরী জগতের মধ্যে অতুলনীয়, শহরটি সাতটি পর্ব্বতের উপর স্থাপিত। এই পর্ব্বতশ্রেণীর পুরোভাগে টেগাস নদীর সন্নিকটে একটি সাধারণ পুষ্পোদ্যান আছে। উদ্যানের এক প্রান্তে ঘন-পল্লব-বিশিষ্ট বহু শাখাপ্রশাখাযুক্ত একটি বিরাট বৃক্ষ আছে। বৃক্ষটি প্রকাণ্ড ছাতার ন্যায় এক বিস্তৃত ভূখণ্ড জুড়িয়া আছে। বৃক্ষতলে রৌদ্র বা বৃষ্টির প্রবেশাধিকার নাই। এই ছায়া-বিশিষ্ট নির্জ্জন স্থানে চক্রাকারে কাষ্ঠাসন সজ্জিত আছে, আর মধ্যস্থলে চিত্তাকর্ষক পুস্তকের আলমারী। পুস্তক নির্ব্বাচন অভিনব। সকল শ্রেণীর লোকের উপযোগী পুস্তক সেখানে পাইবেন। পাঠক কেবল স্কুল কলেজের ছাত্র নহে, ধূলায় ধূসর শ্রমিক, চাষা ভূষা, দোকানের কর্ম্মচারী, সৈনিক, ছাপাখানার প্রিণ্টার, ইলেকট্রিক মিস্ত্রী, নাবিক, ডকের কুলী, শর্টহাণ্ড টাইপিষ্ট, রাসায়নিক, বৈজ্ঞানিক এই-সব শ্রেণীর লোক

এই লাইব্রেরীর নিত্য পাঠক। পুস্তকের নিকট তাহাদের অবাধ গতি। জনৈক বিদুষী লাইব্রেরীয়ান সহাস্যমুখে পুস্তকাগারের এ-ধার ও-ধার গিয়া পাঠকদের সাহায্য করিতেছেন। পুস্তকের সংখ্যা এক সহস্রের বেশী নহে, তবে সেগুলি পাল্টাইয়া ঘন ঘন নূতন নূতন পুস্তক রাখা হয়। পুস্তকনির্ব্বাচন-গুণে সকল শ্রেণীর লোকে সেখানে আকৃষ্ট হইয়া থাকে। প্রাতে ১০টা হইতে সন্ধ্যা ৬টা পর্য্যন্ত এই লাইব্রেরী খোলা থাকে। যে-বৎসর এই লাইব্রেরী প্রথম প্রতিষ্ঠিত হয় সে বৎসরের পাঠকসংখ্যা ছিল পঁচিশ হাজার। এখন ক্রমেই পাঠকসংখ্যা বাড়িয়া চলিয়াছে। লিসবন অবৈতনিক বিশ্ববিদ্যালয় নামে একটি সভা আছে। তাহার সভ্যগণ এই উদ্যান-লাইব্রেরীর কল্পনা করেন। তাঁহাদের নির্দ্দেশে মত এই অভিনব লাইব্রেরী পরিচালিত হইতেছে। নাগরিক সভা কেবল লাইব্রেরীয়ানের বেতনের ব্যয় বহন করেন। এরূপ বৃহদাকার মহীরুহ সকল স্থানে দুর্ল্লভ। মান্দ্রাজ আদিয়ার লাইব্রেরীর সন্নিকটে একটি বিরাট বৃক্ষ দেখিয়া ছিলাম, তবে তাহা রৌদ্রবৃষ্টি উপেক্ষা করিতে পারে এরূপ ঘনপল্লবিত নহে। তাহার তলে থিয়সফিক্যাল কন্‌ভেন্স্যান হইয়াছিল। দুই সহস্র লোক এই বৃক্ষতলে বসিয়াছিলেন। আমাদের দেশে বহু প্রাচীন কালে বৃক্ষতলে বসিয়া অধ্যাপনা চলিত। বোলপুর শান্তিনিকেতন বিশ্বভারতীর অধ্যাপকগণকে বৃক্ষতলে বসিয়া অধ্যাপনা করিতে দেখিয়াছি।

বাংলার অবনত ও অনুন্নত জাতি

শ্রীরামানুজ কর

বাংলা গবর্ণমেণ্ট কি নীতি ধরিয়া এই জাতিগুলিকে অবনত পর্য্যায়ভুক্ত করিয়াছেন? বাংলার বাহিরে অন্যান্য প্রদেশের অবনত জাতির সহিত বাংলার অবনতপর্য্যায়ভুক্ত এই সকল জাতির সহিত তুলনাই হইতে পারে না। বাংলার অবনত পর্য্যায়ভুক্ত জাতিগুলি শিক্ষা আচার ব্যবহার ও সামাজিক পদমর্য্যাদায় অন্যান্য প্রদেশের অবনত জাতির তুলনায় অনেক উচ্চে স্থান পাইবে। যাহারা অস্পৃশ্য অথবা যাহাদের জল আচরণীয় নহে, তাহাদিগকে যদি অবনত পর্য্যায়ভুক্ত করিতে হয় তাহা হইলে বাংলার কোন জাতিই অবনত পর্য্যায়ভুক্ত হয় না। বাংলায় বাউরী, মাল, হাড়ী প্রভৃতি জাতীয় স্ত্রীলোকেরা ধাত্রীর কাজ করিয়া থাকে। ব্রাহ্মণ প্রভৃতি উচ্চজাতীয় প্রসূতি যতদিন সূতিকাগারে থাকে ততদিন বাড়ির কোন স্ত্রীলোক সূতিকাগারে প্রবেশ করে না। প্রসূতি এই সময়ে এই সকল নিম্নজাতীয় স্ত্রীলোকের আনীত জল পান করে ইহাদের স্পৃষ্ট অন্ন ভোজন করে। ধাত্রীও সূতিকাগারে শয়ন করে। এদেশে একটি প্রবাদ আছে, "আসতে বাউরী, যেতে বাউরী বাউরী ব্যতীত গতি নাই।" অর্থাৎ জন্ম ও মরণ উভয় সময়েই বাউরীর সাহায্য আবশ্যক। বাউরীরা পাল্কী বহন করে, বরকন্যা বাউরীর বাহিত পাল্কীতে থাকিতেই জলপান করে। উচ্চ জাতির কুটুম্ব বাড়িতে তত্ত্ব পাঠাইতে হইলে বাগ্দী লোহার প্রভৃতি জাতি দধির ভার লইয়া যায়। তালিকাভুক্ত কয়েকটি জাতি বাংলার সর্ব্বত্র জল আচরণীয়, কয়েকটি জাতি স্থানবিশেষে জল আচরণীয়। মেদিনীপুর ও হাওড়া জেলার মাহিষ্য জাতি জল আচরণীয়, বাঁকুড়া ও হুগলী জেলায় জল আচরণীয় নহে। কুড়মী জাতি পশ্চিমবঙ্গে জল আচরণীয় নহে কিন্তু উত্তরবঙ্গে জল আচরণীয়। কতকগুলি জাতির ব্রাহ্মণে পৌরোহিত্য করেন। বাংলায় মাটির প্রতিমা পূজা হয়। বাংলার বাহিরে ইহার প্রচলন কম। দুর্গা প্রতিমা বিসর্জ্জনের সময় বাউরী প্রভৃতি জাতি ইহা বহন করিয়া লইয়া যায়। প্রতিবৎসর দুর্গা ও কালী মন্দিরে পচরা দিবার সময় এই সকল নিম্নজাতীয় লোকই নিযুক্ত হইয়া থাকে। দেবালয়েও তাহাদের অবাধ প্রবেশ। যাত্রাগান ও কীর্ত্তনের সময় এই সকল নিম্নজাতীয় লোক ব্রাহ্মণাদি উচ্চজাতীয়ের মধ্যে আসরে নামিয়া অভিনয় করে। বর্ত্তমানে বাঁকুড়া জেলার প্রধান কীর্ত্তন গায়ক লোহার জাতীয়। কবির লড়াইয়ের সময়ও এই সকল নিম্ন জাতীয় কয়েক ব্যক্তি বেশ খ্যাতি লাভ করিয়াছিলেন। ডোম প্রভৃতি জাতি ধর্ম্মরাজ ঠাকুরের পূজক। ব্রাহ্মণাদি জাতীয় স্ত্রীলোকেরা পর্য্যন্ত ধর্ম্মরাজ ঠাকুরের মানত ও ব্রত করিয়া ইহাদের বাড়িতে গিয়া ঠাকুরের পূজা দিয়া আসেন, পূজকেরাই পূজা করিয়া থাকে, ব্রাহ্মণে করেন না; অর্থাৎ ব্রাহ্মণেরাও এই সকল জাতির পৌরোহিত্য মানিয়া লন।

উচ্চ ইংরেজি বিদ্যালয়ে হেড পণ্ডিতের পদটি ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের একচেটিয়া। বর্ত্তমানে কলু জাতীয় জনৈক শিক্ষক সরকারী উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়ে হেড পণ্ডিতের কার্য্য করিতেছেন। বাংলা দেশে ব্রাহ্মণের সংখ্যা ১৪,৪৭,৬৯১ ইহার মধ্যে ৪,৬৯,৬৮৮ জন ছাপ্পান্নটি থাকে বিভক্ত। এই শ্রেণীর মধ্যে এমন কয়েকটি শ্রেণী আছে যাহাদের জল সৎ শূদ্রেরা পান করে না। তাহা হইলে ইঁহারাও কি অবনত পর্য্যায়ভুক্ত হইবেন? বৈদিক শ্রেণীর ব্রাহ্মণেরা অন্য ব্রাহ্মণের অন্ন ভোজন করেন না। আবার উচ্চ-শ্রেণীর ব্রাহ্মণের সহিত বর্ণ ব্রাহ্মণের বৈবাহিক আদান প্রদান চলিতেছে। কয়েক বৎসর পূর্ব্বে ব্রাহ্মণেরা সৎশূদ্রের বাটীতে বিবাহ শ্রাদ্ধাদি উপলক্ষে লুচি সন্দেশ গুড় ভোজন করিতেন: অন্ন কি লবণ মিশ্রিত তরকারী পাইতেন না। বর্ত্তমানে ব্রাহ্মণেরা সৎশূদ্রের বাটীতে কার্য্যোপলক্ষে অবাধে অন্নাদি আহার্য্য ভোজন করিতেছেন। আবার উচ্চশ্রেণীর ব্রাহ্মণেরাও এই সকল অবনত পর্য্যায়ভুক্ত কোন জাতির বাটীতে গিয়া নিজে পাক করিয়া অন্নাদি ভোজন করিয়া থাকেন। বাংলায় অবনত জাতির তালিকা প্রস্তুত করিতে হইলে হয় সকল জাতিকেই বাদ দিতে হইবে নতুবা ব্রাহ্মণ হইতে সকল জাতিকেই এই তালিকাভুক্ত করিতে হইবে।

আলোচনা

দশভুজা

বৈশাখ সংখ্যা 'প্রবাসী'তে প্রকাশিত শ্রীযুক্ত রমাপ্রসাদ চন্দ মহাশয়ের "দশভুজা" শীর্ষক প্রবন্ধে মূল বিষয়ের ভূমিকা প্রসঙ্গে যে মতবাদের বিস্তৃত বিবৃতি প্রদত্ত হইয়াছে সাধারণ পাঠকরূপে আমার সে-সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ নিবেদন আছে।

চন্দ মহাশয় লিখিয়াছেন:—"মানবদেহের স্বাভাবিক সৌন্দর্য্যের প্রকাশই শিল্পের লক্ষ্য, গ্রীক শিল্পের অক্ষুণ্ণ প্রভাবের ফলে এই সংস্কার বদ্ধমূল থাকায় ইউরোপে ভারতবর্ষের প্রাচীন ভাস্কর্য্য অনেক কাল আদরলাভ করিতে পারে নাই।" "লক্ষ্য" শব্দের অর্থ যদি "আদর্শ" হয় তাহা হইলে বলিতে হইতেছে যে স্বভাবানুকৃতি গ্রীক-শিল্পের লক্ষ্য বলিয়া কোনদিন বিবেচিত হয় নাই। গ্রীক শিল্প-বিচারের সংজ্ঞাতে "imitation" শব্দের অর্থ "অনুকরণ" মাত্র নহে "কল্পনা" বা imaginationও তাহার অন্তর্গত। ইহার প্রমাণ Philostratus প্রণীত Apollonius of Tyanaর জীবনীর II. XXII এবং VI. XIX এবং Cicero প্রণীত "The Orator" নামক রচনার II. 9.

"মডেল" সম্মুখে রাখিয়া চিত্রাঙ্কন বা মূর্ত্তি নির্ম্মাণ Cimabue হইতে বহুল প্রচারিত হইয়াছে। প্রাচীন গ্রীসে উহা একরূপ অজ্ঞাত ছিল। Apellesএর মডেল হইয়াছিলেন, Phryne কি Lais কি Campaspe. ইহা লইয়া মতদ্বৈধ থাকায়, কিছুই নিশ্চিত করিয়া বলা যায় না। Lafcadio Hearn লিখিয়াছেন, "The Greek conventional face cannot be found in real life, no living head presenting so large a facial angle....... The face of Greek art represents an impossible perfection, a superhuman evolution." Proceedings of the Hellenic Traveller's Club হইতে সংগ্রহ করিয়া *Ægean Civilizations* নামক যে গ্রন্থ প্রকাশিত হইয়াছে তাহাতে অধ্যাপক নাইট (Knight)ও এই কথাই লিখিয়াছেন।

চন্দ মহাশয় তাহার পর লিখিয়াছেন যে টলষ্টয়ের "What is Art ?" গ্রন্থ প্রকাশের পূর্ব্বে, শিল্প সম্বন্ধে যে মতবাদ ইউরোপে প্রচলিত ছিল তাহার প্রভাবে পাশ্চাত্য কলা-রসিকগণ ইউরোপেতর শিল্পের সমাদর করিতে পারেন নাই এবং ঐ গ্রন্থে তাঁহাদের ভুল সংস্কার দূরীভূত হওয়ায় তাঁহারা ইউরোপেতর শিল্পের সমাদর করিতে শিখিয়াছেন। এই মত যে অতিরঞ্জিত নিম্নলিখিত তথ্যগুলিই তাহার প্রমাণ।

১। সপ্তদশ শতাব্দীর পাশ্চাত্য চিত্রকর Rembrandt মোগল চিত্র-শিল্পের প্রতি বিশেষ অনুরক্ত ছিলেন। হ্যাভেলের "Indian Sculpture and Painting" (Pages 202, 203).

২। Vincent Van Gogh জাপানী শিল্পের প্রতি সমধিক আকৃষ্ট হইয়াছিলেন। ইনি দেহত্যাগ করেন, ১৮৯০ খৃষ্টাব্দে, অর্থাৎ টলষ্টয়ের গ্রন্থ-প্রকাশের পূর্ব্বে।

৩। Post-Impressionistic চিত্রকর, Goghএর সতীর্থ, Gauguin, পলিনেশীয় কারিকরদিগের বর্ণবাহুল্যময় শিল্প-নিদর্শনের দ্বারা অনুপ্রাণিত হইয়াছিলেন।

৪। টলষ্টয়ের গ্রন্থ-প্রকাশের অনেক দিন পূর্ব্বে, ১৮৭৮ খৃষ্টাব্দে, E. F. Fenollosa তোকিও বিশ্ববিদ্যালয়ে দর্শনের অধ্যাপক নিযুক্ত হন। তিনিই সর্ব্বপ্রথম চীন এবং জাপানের প্রাচীন শিল্পের প্রতি ইউরোপের সারস্বত মণ্ডলীর প্রশংসমান দৃষ্টি আকৃষ্ট করেন।

৫। জাপানের শিল্প-সম্বন্ধে আলোচনা করিবার জন্য ইংলণ্ডে "জাপান সোসাইটি" প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল ১৮৯২ খৃষ্টাব্দে, অর্থাৎ টলষ্টয়ের গ্রন্থ-প্রকাশের পূর্ব্বে।

৬। Lafcadio Hearn এবং Edward Strange জাপানী শিল্পের সমাদর করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন টলষ্টয়ের গ্রন্থ প্রকাশের পূর্ব্বেই।

চন্দ-মহাশয় Clive Bellএর Significant form নামক শিল্প মতবাদ উদ্ধৃত করিয়াছেন টলষ্টয়ের সমর্থক এবং অভিনব বলিয়া। এ-সম্বন্ধে বক্তব্য এই যে Clive Bellএর উক্ত মতবাদ Hegelএর Æsthetics নামক গ্রন্থ (১৮৩৫ খৃষ্টাব্দে, অর্থাৎ টলষ্টয়ের গ্রন্থ-প্রকাশের প্রায় সত্তর বৎসর পূর্ব্বে প্রকাশিত) হইতে গৃহীত। Hegel লিখিয়াছিলেন, "Wahre Gestalt", তাহারই অনুবাদ, "Significant form"। ইহাতে প্রমাণ হয় যে টলষ্টয়ের পূর্ব্বেও ইউরোপে শিল্প সম্বন্ধে যে ধারণা প্রচলিত ছিল তাহাতেও ইউরোপেতর শিল্প বোধগম্য হওয়া উচিত ছিল।

ইউরোপেতর শিল্প কি কারণে ইউরোপ কর্ত্তৃক সমাদৃত হয় নাই, তাহা সাধারণ ব্যক্তির মনে হয়, দ্বিবিধ। (১) বিজিত এশিয়া এবং আফ্রিকার সঙ্গে বিজেতা ইউরোপের ভক্ষ্য-ভক্ষক সম্বন্ধ এবং ভারতবর্ষের পরাধীনতা ও জাতি-সমাজে অন্ত্যজ অবস্থা। (২) ইউরোপেরতর শিল্পের সহিত ইউরোপের অপরিচয় বা অল্পপরিচয়।

শ্রীনির্ম্মলচন্দ্র মৈত্র

উত্তর

শিল্পের রসতত্ত্ব সম্বন্ধে আমার পুঁজি অতি অল্প। "দশভুজা" প্রবন্ধের গোড়ায় তাহা আমি স-মূল দাখিল করিয়াছি। রোজার ফ্রাই যে মূল কথায় ভুল করিয়াছেন তাহা আমার মনে হয় না। আমার অনুবাদে ভুল থাকিতে পারে।

ক্লাইব বেল (Clive Bell) তাঁহার "আর্ট" নামক পুস্তকে "আর্ট যে সার্থক রূপ" (significant form) এই মত নিজস্ব বলিয়াই প্রচার করিয়াছেন এবং রোজার ফ্রাই তাঁহার এই দাবি স্বীকার করিয়া লইয়াছেন (Retrospect প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য)। হেগেলের লেখার মূলের বা অনুবাদের সহিত আমার পরিচয় নাই। এস্থেটিক্সের প্রসঙ্গে হেগেলকে বোধ হয় কেহ সার্থকরূপবাদী বলে না, সৌন্দর্য্যবাদীই বলে। টলষ্টয় হেগেলের মতের যে সার উদ্ধার করিয়াছেন তাহার কতক অংশ উদ্ধৃত করিব—

"According to Hegel (1770-1831), God manifests himself in nature and in art in the form of beauty...... Beauty is the shining of the Idea through matter......

Art is thus the production of this appearance of the Idea, and is a means, together with religion and philosophy, of bringing to consciousness, and expressing, the deepest problems of humanity and the highest truths of the spirit.

"Truth and beauty according to Hegel are one and the same thing, the difference being only that truth is the Idea itself as it exists in itself and is thinkable. The Idea, manifested externally, becomes to the apprehension not only true but beautiful. The beautiful is the manifestation of the Idea."

নির্ম্মলবাবুর একটি কথার আমি প্রতিবাদ না করিয়া পারি না। তিনি বলেন, য়ুরোপ কর্ত্তৃক এসিয়ার এবং আফ্রিকার আর্টের অনাদরের কারণ ভক্ষ্য-ভক্ষ্যক সম্বন্ধ "এবং ভারতবর্ষের পরাধীনতা এবং জাতি-সমাজে অন্ত্যজ অবস্থা।" সেজান (Cezanne) ভ্যান গোঘ (Van Gogh), গোগেঁন (Gauguin) ভারতবাসী বা আফ্রিকাবাসী ছিলেন না। এই তিন জন চিত্রকরের মধ্যে একজনও ছবি বেচিয়া জীবিকানির্ব্বাহের উপযোগী অর্থ উপার্জ্জন করিতে পারেন নাই। শিল্পের প্রকৃত রস আস্বাদন করা সহজ কাজ নহে। এই শক্তির অভাবেই য়ুরোপের সাধারণ দর্শকগণ এতকাল ভারতবর্ষের প্রাচীন শিল্পের মহিমা বুঝিতে পারে নাই। এখন সেই রস আস্বাদনের প্রণালী বলিয়া দিবার যোগ্য সমালোচকের অভ্যুদয় হওয়ায় দিন-দিনই য়ুরোপে সমজদারের সংখ্যা বাড়িয়া যাইতেছে।

"দশভুজা"র ভূমিকা রূপদ্রষ্টার হিসাবে লিখিত। উপসংহারে রূপস্রষ্টার হিসাবে পাশ্চাত্য জগতের রুচি-পরিবর্ত্তনের সংক্ষিপ্ত বিবরণ দিব। স্যর উইলিয়ম অর্পেন লিখিয়াছেন (*The Outline of Art* XXIII)—

"The reader of this outline will have observed that, from the days of Giotto down to the close of the nineteenth century, the development of the main stream of European painting was in the direction of a more perfect representation of the appearances of natural forms."

অর্থাৎ খৃষ্টীয় ত্রয়োদশ শতাব্দী হইতে উনবিংশ শতাব্দীর শেষ পর্য্যন্ত য়ুরোপীয় চিত্রকরেরা ক্রমশঃ অধিকতর শুদ্ধরূপে স্বাভাবিক আকারের অনুকরণের চেষ্টায় রত ছিল। উনবিংশ শতাব্দে দুই কারণে এই ধারার পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছিল। প্রথম কারণ, ফটোগ্রাফীর আবিষ্কার দ্বিতীয় কারণ ইম্প্রেসনিষ্ট (Impressionist) শাখার চিত্রকরগণ কর্ত্তৃক স্বাভাবিক আকারের অনুকরণের চরম উৎকর্ষসাধন। এই অনুকরণের পথে আর বেশী কিছু করিবার উপায় ছিল না। অর্পেন লিখিয়াছেন—

"Ambitious painters sighed, like Alexander, for new worlds to conquer."

তারপর নূতন একদল চিত্রকর অভ্যুদিত হইল। এই দলের অভিমত সম্বন্ধে অর্পেন লিখিয়াছেন—

"A new generation began to argue that, after all, painting was not a science but an art, and that its primary function was not the accurate representation of nature but the expression of an emotion."

অর্থাৎ নূতন যুগের চিত্রকরেরা বলিতে আরম্ভ করিলেন চিত্র বিজ্ঞান নহে, চারুশিল্প এবং চিত্রের মুখ্য উদ্দেশ্য স্বভাবের বিশুদ্ধ অনুকরণ নহে ভাব-প্রকাশ।

শ্রীরমাপ্রসাদ চন্দ

চিঠিপত্র

রামমোহন শতবার্ষিক উৎসব

মাননীয় প্রবাসী-সম্পাদক মহাশয় সমীপে

মহাশয়,

রামমোহনের পুণ্য মহাতিথি সমাগতপ্রায়। তাঁহার স্মৃতিরক্ষার জন্য নানাজনে নিশ্চয়ই নানা যোগ্য প্রস্তাব উপস্থিত করিতেছেন। সকলই অর্থ ও সামর্থ্য সাপেক্ষ। আমারও একটু বলিবার ইচ্ছা আছে। জানি না ইহা পূর্ণ হওয়া সম্ভবপর কি-না তবু বলা ভাল আজ না হয় ভবিষ্যতে সেই আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ হইতে পারে।

পৃথিবীর সকল ধর্ম্মের মধ্যে যোগদৃষ্টির মহর্ষি রামমোহন। তাঁহার স্মরণার্থ হয়ত, খুবই উৎকৃষ্ট পুস্তক এবার বাহির হইবে। তবু কি তাঁহার সম্বন্ধে সকলের সব কথা চিরকালের জন্য নিঃশেষে বলা হইয়া যাইবে?

আমার মনে হয় তাঁহার নামে এমন একটি মহাগ্রন্থালয় কোনখানে প্রতিষ্ঠিত করা একান্ত প্রয়োজন যেখানে জগতের সকল ধর্ম্মের যথার্থ পরিচয় মিলিতে পারে। অন্ততঃ পক্ষে ভারতের পূর্ব্বপূর্ব্ববর্ত্তী সকল ধর্ম্মের ও সম্প্রদায়ের সকল মুদ্রিত গ্রন্থ ও অমুদ্রিত পুঁথি সেখানে যেন ক্রমে সংগৃহীত হইতে থাকে। ভারতের পূর্ব্বপূর্ব্ববর্ত্তী যত সম্প্রদায় ও সম্প্রদায়ের গুরুগণের পরিচয় যাহা কিছু মিলা সম্ভব সেখানে যেন ক্রমে সংগৃহীত হইয়া চলে। তাহা হইলে ভবিষ্যতে যাঁহারা কাজ করিবেন তাঁহারা হয়ত রামমোহনের মধ্যে এমন কিছু বিরাট মহত্ত্ব দেখিতে পাইবেন যাহা আজও আমাদের সঙ্কীর্ণ চিন্তার অগোচর। ইতি

বিনীত

শ্রীক্ষিতিমোহন সেন

শ্রীসরোজরঞ্জন চৌধুরী" স্বাক্ষরিত একখানি দীর্ঘ চিঠি আসিয়াছে। লেখকের ঠিকানা জানিতে পারিলে উত্তর দিব। সম্পাদক।

প্রত্যাবর্ত্তন

শ্রীকেদারনাথ চট্টোপাধ্যায়

বাগদাদে আমাদের প্রথম কাজ হ'ল জিরোনো। পারস্থ ভ্রমণের ঔৎসুক্য এবং উত্তেজনা যতদিন ছিল ততদিন শ্রান্তি-ক্লান্তি মনে বিশেষ স্থান পায়নি। ক্রমাগত একের পর এক নূতন দৃশ্য, প্রাচীন কথাকাহিনীর রঙ্গভূমির প্রত্যক্ষ দর্শনের রূপ, অন্য নানাপ্রকারের নূতন অভিজ্ঞতা এই সকলের প্রতিক্রিয়ায় অনেককিছু নিত্যনৈমিত্তিক ব্যাপার ক্রমাগতই বাদ পড়ে যাওয়া সত্ত্বেও কোন রকম শারীরিক বা মানসিক বিকার হয়নি। হঠাৎ সে সব দিনকয়েকের মত বন্ধ হয়ে যাওয়ায় সমস্ত শ্রান্তিক্লান্তি যেন পুঞ্জীভূত হয়ে এসে উপস্থিত হ'ল। কাজেই প্রথম দিনের সন্ধ্যা এবং পরের দিনের বিকাল পর্য্যন্ত একরকম গড়িয়ে-বসেই কাটিয়ে দেওয়া গেল। মাঝে মাঝে কেবল সোডা, লেমনেড, চা ইত্যাদি খেয়ে মরুভূমির গ্রীষ্মের কিছু প্রতিকার করার চেষ্টা করা গেল।

কিন্তু এদেশও নূতন, তা ছাড়া এ শুধু ঐতিহাসিক দেশ নয়, এ হ'ল আরব্য উপন্যাসের দেশ। হারুণ-অল-রসীদ অনেক দিন হ'ল তাঁর মর্ত্ত্যজগতের লীলাখেলা শেষ ক'রে গিয়েছেন, শাহ্‌রিয়র ও শাহারজাদির এক হাজার এক রাত্রির পর আরও অনেক শত সহস্র রাত্রি কেটে গেছে, কিন্তু দেশও সেই আছে, দেশের লোকও প্রায় সেই রকমই আছে। এখনও পুরানো শহরের আঁকাবাঁকা গলি, নীচু অলিন্দ, রুদ্ধ বাতায়ন দেখলে, জীর্ণ কুটীরের পাশেই বিরাট প্রাসাদের অদ্ভুত সমাবেশ দেখলে মনে হয় এই বুঝি সিন্ধবাদের প্রাসাদ, ঐ বুঝি আবু হোসেনের ঘর।

বড় রাস্তায় যারা হেঁটে চ'লে বেড়াচ্ছে তাদের দেখলে বিংশ শতাব্দীটা বড়ই স্পষ্ট হয়ে ওঠে, কিন্তু সঙ্কীর্ণ গলির ভিতরে বা পুরাণো বাজারে যারা ঘুরে ফিরে যাচ্ছে তাদের

জাফর পাশা কবি নৃপতি ফৈজল রাজভ্রাতা
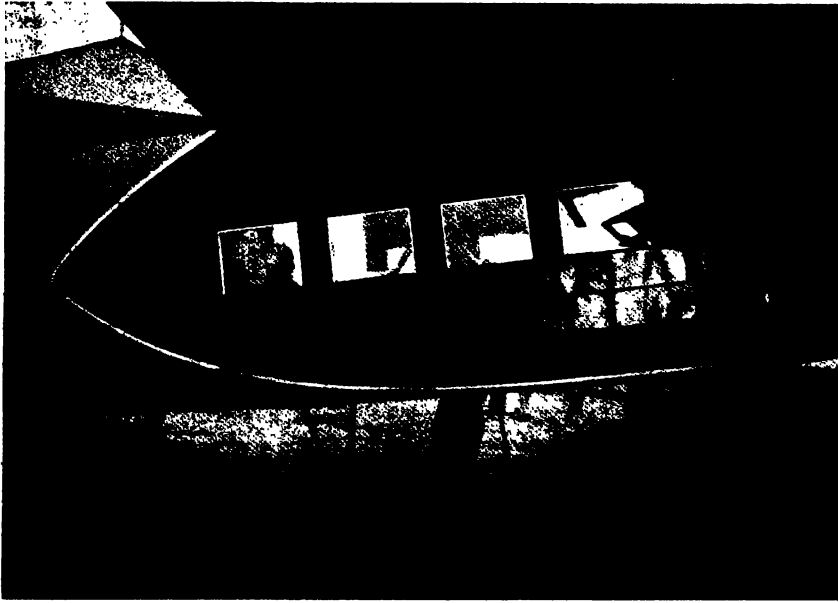
বাগদাদ। এরোপ্লেনে কবির স্বদেশ যাত্রা

গম্ভীর মুখ, মাথায় উটের পশমের দড়ি দিয়ে বাঁধা আপাদ-মস্তক ঢাকা 'আবা' এবং ধীর পদক্ষেপ দেখলে ঠিক বোঝা যায় না যে, এটা দশম শতক না বিংশতি শতক। মোটের উপর বাগদাদ শহর এবং এখানকার লোকজন দেখলে এটা মনে হয় এর যে-অংশটা—সজীব বা নির্জীব—এগিয়েছে, সেটা বিলক্ষণ এগিয়েছে, আবার যেটা এগোয়নি সেটা বড় বিষম পেছিয়ে আছে। সমস্ত দেশটা দেখলে ধারণা হয় যে সমস্ত দেশ বা জাতিকে অদম্য উৎসাহে এগিয়ে নেবার চেষ্টা বিশেষ কিছু নেই—যেটা পারস্যে খুব বেশী আছে অথচ আংশিকভাবে অল্পখানিকটা খুব বেশী দূর এগিয়ে গেছে, পারস্যকে ছাড়িয়ে, এমন কি আমাদেরও ছাড়িয়ে। এর কারণ আর কিছু নয়, যে-অংশটা যতটা এগোলে বিদেশীর সুবিধা হয় তারা সেটাকে ঠিক ততটাই এগিয়ে নিয়েছে ঠিক আমাদের দেশের যা অবস্থা জাতীয় আন্দোলনের আগে ছিল।

তবে এখন অল্প কিছু দিন যাবৎ দেশটা যে-নৃপতির করায়ত্ত হয়েছে তাঁর এবং তাঁর সভাসদ্‌দের হাতে দেশে একটা নূতন জীবনের ধারা বইবে সেটা সুনিশ্চিত।

আরব জাতির অভিনব অভ্যুদয় এবং তুর্ক সাম্রাজ্যের আরব অংশের ধ্বংসের বিবরণ যখন সম্পূর্ণভাবে প্রকাশিত হবে, তাতে এমির ফৈজল, জাফ্‌ফর পাশা এবং কর্ণেল লরেন্সের নাম উজ্জ্বল অক্ষরে প্রধান ভূমিকায় মুদ্রিত থাকবে। সামান্য আরব উপজাতির সর্দ্দারের পুত্র, অসাধারণ শৌর্য্য, নিজের জাতির শক্তিতে অচল বিশ্বাস এবং অদ্ভুত নেতৃত্বের ক্ষমতার গুণে কি ক'রে দুর্দ্ধর্ষ তুর্কী এবং জার্ম্মাণ সৈন্যের বিরুদ্ধে সামান্য অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে যুদ্ধে সফলকাম হয়েছিলেন তার ইতিহাস প্রায় আরব্যোপন্যাসেরই মত আশ্চর্য্য। জাফ্‌ফর পাশা প্রথমে তুর্কী সেনানায়ক ছিলেন এবং মহাযুদ্ধের প্রথম পর্ব্বে সাব্‌মেরিনের সাহায্যে ভূমধ্যসাগর পার হয়ে সাহারা মরুভূমির অধিবাসী সেন্যুসি আরবদের সঙ্গে মিলিত হ'ন। এঁর যুদ্ধকৌশলে সেন্যুসিরা ইংরেজ সৈন্যকে প্রথমে নাস্তানাবুদ ক'রে তুলেছিল। পরে অস্ত্রশস্ত্রের অভাবে এবং ইংরেজের লোকবলে তারা ছত্রভঙ্গ হয়ে যায়, জাফ্‌ফর বন্দী হ'ন।

সেই সময় ফৈজল আরব-উপজাতিগুলিকে একত্র ক'রে সেনাবাহিনী গঠন করছিলেন। জাফ্‌ফর স্বজাতির সাহায্যে অবতীর্ণ হয়ে মহাযুদ্ধের দ্বিতীয় অংশে তুর্কের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ ক'রে সমান শক্তিতেই যুদ্ধ করেন। শেষের অংশে এঁদের অনেক ভাগ্যবিপর্য্যয় হয়, সেকথা এখনও প্রকাশ করা

বেদুঈন যুদ্ধের নাচ। প্রথম অংশ

বেদুঈন যুদ্ধের নাচ। পূর্ণোদ্যম

সম্ভব নয়। কিন্তু ১৯৩২ সালের মে মাস থেকে এঁদের অবস্থা অন্য রকম হয়েছে। এতদিনে বোধ হয় আরব জাতির পূর্ণ অভ্যুদয়ের অঙ্ক আরম্ভ হ'ল।

* * * *

বাগদাদে আমাদের কর্ণধার ছিলেন ইব্রাহিম বেগ তিলমি, এবং তাঁর প্রধান সহায়ক ছিলেন ডক্টর মোহাম্মদ ফাথেল
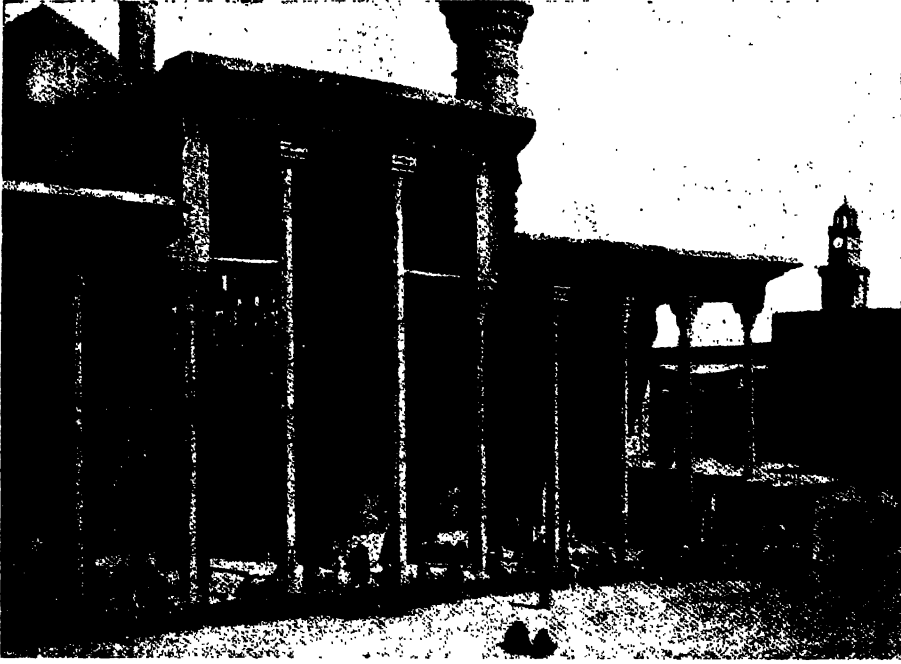
বাগদাদ। কাধিমেন মসজিদের দ্বারপথ

জেমালি, এম-এ, পি-এইচ্-ডি। প্রথম জন আভ্যন্তরীন বিভাগের মন্ত্রীর সহকারী, দ্বিতীয় জন শিক্ষাবিভাগের উচ্চ-পদস্থ কর্ম্মচারী। এঁদের উৎসাহে এবং ইব্রাহিম বেগের বিশেষ চেষ্টায় কবির নিমন্ত্রণের ব্যাপার ঘটে। এই নিমন্ত্রণের বিশেষ আয়োজনের মধ্যে বাগদাদ সাহিত্যিকদিগের তরফ থেকে কবিকে অভিনন্দন, ইরাকের শিক্ষক-সমিতি কর্ত্তৃক বিরাট সান্ধ্যভোজন, অভিনন্দন ইত্যাদি, নৃপতি ফৈজলের উদ্যান-প্রাসাদে রাজার সহিত চা পান, রাজপ্রাসাদে সান্ধ্য-ভোজন, কাধিমেনের বেদুঈন সর্দ্দার শেখ মুহাইল (বেনিটামানি) কর্ত্তৃক বেদুঈন ধরণের অভ্যর্থন-মধ্যাহ্ন-ভোজন ইত্যাদি, এই সকল অনুষ্ঠান হয়। কবি অসুস্থ হয়ে পড়ায় অন্য অনেক ব্যবস্থা শেষ পর্য্যন্ত কার্য্যে পরিণত হয়নি। বাগদাদের ভারতীয় সভা কবিকে অভিনন্দন দেন এবং শাবেন্দার নামে এক সম্ভ্রান্ত আরব একদিন টাইগ্রীস কূলে বাগানে নৃত্যগীতের ব্যবস্থা করেছিলেন।

সাহিত্য-সম্মিলন শহরের এক সুন্দর উদ্যানে করা হয়। এখানে দেখলাম মেয়ে-পুরুষ দুই-ই উপস্থিত যা পারস্যে কোনও প্রকাশ্য সাধারণ ব্যাপারে দেখিনি--তবে, আমাদের দেশেরই মত, দু-দলের বসবার জায়গা আলাদা। মেয়েদের অধিকাংশই ইয়োরোপীয় বেশে, কেবল একটি প্রৌঢ়া এবং একটি তরুণী দেশের পোষাকে (জুতা বাদে), সেই কালো পারসীক চাদরে মাথা থেকে কোমর পর্য্যন্ত ঢেকে এসে বস্‌লেন। কালো চাদরটায় পারসীক ঝাঁপ লাগান ছিল না ব'লে অনেকটা ভাল দেখতে হয়েছিল। বসবার পর প্রৌঢ়া চাদর খুলে রেখে বস্‌লেন, তরুণীও মুখ খুললেন কিন্তু চাদরটা রয়ে গেল, কেউ তাঁর দিকে তাকাচ্ছে দেখলেই তিনি তাই দিয়ে অর্দ্ধেক মুখ ঢাকতে লাগলেন। দুজনেরই মুখ নাক চোখ চিবুক নিখুঁত রেখায় গঠিত, বিশেষত বৃদ্ধার প্রশান্ত সুদৃঢ় গৌরমুখকান্তিতে আভিজাত্যের সকল চিহ্নই ছিল, তরুণীর মুখ অনেক কোমল, কালো চোখের দৃষ্টিও তরল।

অনেক বক্তৃতা, দুটি কবিতা (ইরাকের দুই শ্রেষ্ঠ কবি নিজেরাই পড়লেন) হ'ল, কবি 'দুঃসময়' আবৃত্তি

বাগদাদ। কাধিমেন মসজিদ

করলেন। দুজন ভারতীয় মুসলমান ভদ্রলোক আমার পাশে বসেছিলেন, একজন সিপাহীবিদ্রোহে পলাতক এক নবাবের পুত্র এই দেশেই জন্ম ও বসতি তাঁরা অনুবাদ ক'রে সব শোনালেন এবং বললেন, "দেখছেন খাঁটি মুসলমান আরব কেমন গুণের কদর করে, আমাদের দেশের মুসলমান ভাইদের সবই উল্টা, কাণ্ডজ্ঞান এখনও হয়নি।"

ইরাকের শিক্ষক-সমিতি টাইগ্রীস প্যালেস্ হোটেলেই ভোজনের আয়োজন করেছিলেন। প্রায় তিন শত নিমন্ত্রিত একসঙ্গে বসেন। নিমন্ত্রিতদের মধ্যে শিক্ষাবিভাগের উচ্চতম কর্ম্মচারী, বিশিষ্ট সাহিত্যিক ও সাংবাদিক এবং প্রধান প্রধান কলেজ ও স্কুলের উচ্চতম শিক্ষক প্রায় সকলেই ছিলেন। দু-দশজন ধর্ম্মশিক্ষক ছাড়া মেয়ে-পুরুষ প্রায় সবই বিদেশী পোষাক প'রে এসেছিলেন। এখানে কবির বক্তৃতায় শ্রোতারা খুবই সন্তুষ্ট এবং মুগ্ধ হয়। ব্যাপারটি রাত্রি আটটা থেকে প্রায় সাড়ে এগারটা পর্য্যন্ত চলে।

ঐদিন বিকালে নৃপতি ফৈজল কবিকে সদলে চায়ে নিমন্ত্রণ করেন। উদ্যান-প্রাসাদে পৌঁছবার পর রাজদোভাষী সকলের পরিচয় দেন এবং রাজাও প্রথমে কবিকে, পরে অন্য সকলকে সহাস্যমুখে "হ্যাণ্ডশেক" ক'রে অভ্যর্থনা করেন। সমস্ত মন্ত্রী ও সদস্যবর্গ এবং মন্ত্রীসভার সভাপতি (ইনি দেশীয় পরিচ্ছদে ছিলেন) সেখানে উপস্থিত ছিলেন। বর্ত্তমান পাশ্চাত্য সভ্যতার গতি, এসিয়ার আদর্শ, ভারতের ধর্ম্মসম্প্রদায়ের অন্তর্বিবাদ- এই সব নিয়ে অনেক আলোচনা হয়। কিছুক্ষণ পরে রাজার ভাই হেজাজের ভূতপূর্ব্ব নৃপতি এসে উপস্থিত হন। অনেক সমাদর ইত্যাদির পর নিমন্ত্রণের পর্ব্ব শেষ হয়। রাজপ্রাসাদের ভোজে ইরাকের দেশী-বিদেশী সকল রাজকর্ম্মচারী, দূত, বণিক এবং অন্য বিশিষ্ট ব্যক্তি উপস্থিত ছিলেন, সেখানেও অনেক কথাবার্ত্তা হয় এবং কবি নৃপতি ফৈজলকে কবিতায় অভিনন্দন করেন।

বেদুইন-সর্দ্দারের নিমন্ত্রণব্যাপার এ-যাত্রার নানা অভিনব ঘটনার মধ্যেও বিচিত্র ব'লে ঠেকেছিল। সেদিন সকালে আমরা প্রথমে এখানকার শিক্ষক ট্রেনিং কলেজে গিয়েছিলাম।

সেখানকার বিদ্যার্থীরা অধিকাংশই প্রায় অল্পবয়স্ক শিক্ষানবিশ—সবল দেহ, উৎসুক তরুণ মুখ। দৈহিক স্বাস্থ্যের কারণ কতকটা দেশের আবহাওয়া, কতকটা পৈতৃক রক্তের জোর, কিন্তু বাকীটা সম্পূর্ণই শিক্ষার গুণে, কেন-না ঐ

বাগদাদ। শেখ আব্দুল কাদের এল কয়লানি মসজিদের ভিতরের দৃশ্য

বিদ্যালয়ের সকল ছাত্রই ব্যায়াম, ক্রীড়া ইত্যাদি দৈহিক উৎকর্ষের সাধনা করতে বাধ্য। সেখানে কবিকে অভিনন্দন এবং উচ্চকণ্ঠে সমস্বরে "রৈস, রৈস, রৈস," নিনাদে বন্দিত করার পর আমরা পুরানো বাজার পার হয়ে কাধিমেন শহরে চল্লাম। কাধিমেন মুসলমানদের তীর্থ। এখানে তাঁহাদের এক ইমামের সমাধি আছে। এখানে বাহির থেকে যতটা দেখা যায় দেখে আমরা শহর ছাড়িয়ে মরুভূমির দিকে চললাম। শহরের উপকণ্ঠে দুটি সুন্দর মোটর দাঁড়িয়ে ছিল, তার একটি থেকে তিন জন সম্ভ্রান্ত আরব নেমে কবির গাড়ীর দিকে এগোলেন। তিন জনের মধ্যে দু-জন পূর্ণ-বয়স্ক, (প্রৌঢ় বলা চলে না, তাঁদের শরীর এতই দৃঢ় ও সবল, যদিও এক জনের বয়স পঞ্চাশের উপর) এক জন যুবক। শুনলাম এক জন কাধিমেনের নিকটস্থ মরুভূমির বেনি টামানি বেদুইনদের সর্দ্দার শেখ সুহাইল, অন্য দুই জনের একজন তাঁর ছোট ভাই, অন্যটি বড় ছেলে।

কবিকে অভিবাদনের পর তাঁরা মোটরে উঠলেন। মরুভূমির দিকে যাত্রা করা গেল। আট-দশ মাইল পর্য্যন্ত খেজুরের বাগান, শস্যের ক্ষেত দেখা গেল, সবই টাইগ্রীসের খালের জলে সেচ করা। আরও এগিয়ে মরুভূমির রুক্ষমূর্ত্তি দেখা গেল, দূরে দূরে দ্বীপের মত দু-চারটে ওয়েসিস রয়েছে। শুনলাম এ সবই এবং আরও অনেক দূর পর্য্যন্ত সমস্ত জমিই শেখ সুহাইলের অধিকারে আছে। কিছুক্ষণ পরে তাঁর বাড়িতে উপস্থিত হওয়া গেল।

বাগদাদ। পুরাণো শহরের পথ

বাড়িটি দু-অংশে বিভক্ত, একটি পুরুষদের, অন্যটি মেয়েদের। মেয়েদের অন্তঃপুর কি রকম বল্‌তে পারি না, কেন-না, সেটা কড়া পর্দ্দার ভিতরে। পুরুষদের বাড়ি একটি

শেখ মুহাইলের তাঁবুতে

বাগদাদ। ভারতীয় সমিতির কার্য্যনির্ব্বাহক সভা

বাগদাদ। পুরাণো শহর ভাঙ্গিয়া নূতন রাস্তা নির্ম্মাণ

প্রকাণ্ড মাটির ঘর, তার দেওয়াল যেমন মোটা তেমনি পুরু তার মাটি ও কাঠখড় খেজুরপাতার তৈরী ছাদ। ঘরের প্রধান অংশ একটি প্রশস্ত বৈঠকখানা, তার চারি ধারের দেওয়ালে চওড়া বেঞ্চির মত কাঠের শয্যাসন আঁটা। ঐ বেঞ্চির উপর পুরুগদী, তাতে বসা শোওয়া সবই চলে। মাঝ-খানের অংশ খালি, কেবল খেজুরপাতার চাটাইয়ের উপর গালিচা পাতা। শুনলাম এই হ'ল বেদুইনদের গ্রীষ্মাবাস, শীতকালে তাঁবুতেই থাকা নিয়ম।

বৈঠকখানার সামনে প্রকাণ্ড তাঁবু খাটান রয়েছে, সেটার কাপড়টা উটের পশমে তৈরী। তাঁবুর এক জায়গায় আগুনের ধুনী জলছে, তার উপর কফির পাত্র বসান; কফি দিনরাত ঢালা ও খাওয়া চলে। তাঁবুর ভিতরে প্রায় শ'দেড়েক লোক বসে আছে, গল্পগুজব হাসিঠাট্টা এবং ক্রমাগত কফি পান চলছে। তাঁবুর পাশে দুটি আরব ঘোড়া বাঁধা রয়েছে, সেগুলি দেখলেও আনন্দ হয়।

কবিকে ঘরের ভিতরে সমাদর ক'রে নিয়ে বসান হ'ল। শেখ সুহাইল তারপর কবিকে অভিনন্দন করলেন, তাঁর পিছনে তাঁর লোকজন দাঁড়িয়ে তাঁকে সমর্থন করলে। বক্তৃতা ইরাকের সমরবিভাগের এক কর্ম্মচারী অনুবাদ করলেন।

তিনি বললেন, "আমি একজন মরুভূমির আরব, আপনাকে অভ্যর্থনা করার উপযুক্ত শিক্ষা, জ্ঞান বা আদবকায়দা কোনটাই

বাগদাদ। সাহিত্যিকদিগের উদ্যানসম্মিলন

আমার নাই। এমন কি, আমি যা বল্‌ছি এ-ও হয় ত ব্যাকরণ হিসাবে অশুদ্ধ। সুতরাং আপনার অভ্যর্থনায় যদি কিছু ত্রুটি হয় সেটা আপনি জানবেন আমাদের অজ্ঞান বশতঃ।"

"আপনাকে আমি তিনবার স্বাগত বলছি। প্রথমতঃ এই কারণে, যেহেতু আপনি অতিথি, এবং বেদুইন

বাগদাদ। হোটেল হইতে নদীর দৃশ্য

আরবের কাছে অতিথি অতি শ্রদ্ধার ও আদরের পাত্র। দ্বিতীয়তঃ, আপনি আমাদের প্রাচীনকাল হ'তে পরিচিত হিন্দুস্তান থেকে এসেছেন। তৃতীয়তঃ, আপনি যাঁহার বিশিষ্ট অতিথি তিনি আমাদের রাজা, তাঁহার জন্য আমাদের সমস্ত উপজাতি প্রাণপাত করতে প্রতিমুহূর্ত্তে প্রস্তুত।"

টেসিফোন। প্রাচীন পার্শ্যিয় প্রাসাদের ভগ্নাবশেষ

কিছুক্ষণ কথাবার্ত্তা, নাচগান চল্‌ল। তারপর প্রকাণ্ড এক থালায় মন দুই চালের পোলাও এবং তার উপর তিনটে আস্ত দুম্বা ভেড়ার রোষ্ট এনে আমাদের সামনে রাখা হ'ল এবং ঐ রকম আর একটি থালা অন্য অভ্যাগতদের সামনে ধরা হ'ল। এর আগে ছোট ছোট পেয়ালায় বারে বারে কয়েক ফোঁটা করে ঘন কফি দেওয়া হয়েছিল। পোলাওয়ের সঙ্গে ছোট ছোট রেকাবে ঢেঁড়শ সিদ্ধ, কাঁচা মূলো ইত্যাদি দেওয়া হয়েছিল, পানীয় সেই ঘোল, তবে এখানে সেটা পাতলা এবং "লিবান" নামে পরিচিত। আমাদের খাওয়ার পরে শেখ মহাশয় সপারিষদ্ খেতে বস্‌লেন, তারপর "ওজন" অনুসারে অন্যেরা, এই রকমে ভোজের পালা সাঙ্গ হ'ল।

নাচগান এর আগে যা হচ্ছিল তার বিশেষত্ব কিছুই নেই। একজন একটা ছোট কাটা বাঁশী বাজাচ্ছিল, আর একজন সুর করে একঘেয়ে গান গাইছিল এবং একদল বেদুইন হাতধরাধরি করে তালে তালে পা ফেলে নেচে সমের মুখে একত্রে লাফাচ্ছিল। এর মধ্যে শেখ মহাশয়কে জিগ গেস করা

বাগদাদ। শিক্ষকসমিতির সান্ধ্যভোজের এক অংশ

হ'ল যে, এই নাচগান সম্বন্ধে কোনও নিষেধ বিধি আছে কিনা বা মোল্লারা বারণ করেন কিনা। তিনি, "আমাদের বারণ করবে—" এই বলে হাস্‌তে লাগলেন।

কবি বল্‌তে লাগলেন, "আমার বয়স যখন কম তখন তোমাদের এই স্বাধীন উত্তেজনাপূর্ণ জীবন, এই মুক্ত আকাশের নীচে প্রান্তহীন বাধাহীন মরুভূমিতে বাস এ-সকল আমার মনে অনেক উদ্দীপনা আন্‌ত। আমি তখন তোমাদের ঐ সুন্দর ঘোড়ায় চড়ে তলোয়ার হাতে তীরবেগে শত্রুর পেছনে অনুধাবন এইসব স্বপ্ন দেখতাম।" এই বল্‌তে বল্‌তে তিনি তাঁর আরব বেদুঈন সম্বন্ধে কবিতা দু-চার লাইন আবৃত্তি কর্‌লেন।

এতক্ষণ শেখ সুহাইল এবং তাঁর অনুচরবর্গ সকলেই সহাস্যমুখে "শহুরে" ভদ্রপ্রথা মত অতি ধীর স্থির ভাবে বসেছিলেন, শুধু অনুচরদের মধ্যে দু-দশজনের মুখে অস্ত্রক্ষতের দাগ থেকে বুঝা যাচ্ছিল যে ইঁহারা শান্তিপ্রিয় শহরবাসী ন'ন। কবির কথা যেমন দোভাষী অনুবাদ করতে লাগলেন অম্‌নি যেন সভা মধ্যে একটা সাড়া পড়ে গেল। শেখ মহাশয় বল্‌লেন "হাঁ? এই সব আপনার যৌবনের কামনা ছিল? কি আশ্চর্য্য, এইসব আমাদের সাধারণ ব্যাপার হয়ত আপনার কাছে অভদ্র ঠেক্‌বে বলে আমি কোন আয়োজন করিনি। কিছু আগে যদি জানতাম এ-সব আপনার পছন্দ—দেখি কি ব্যবস্থা হতে পারে।" বলে তিনি কয়েকজন অনুচরকে মৃদুস্বরে কি বল্‌লেন, তারা তৎক্ষণাৎ বেরিয়ে গেল। পরেই জানলা দিয়ে দেখলাম তারা তীরবেগে ঘোড়া ছুটিয়ে দূরের ওয়েসিসগুলির দিকে যাচ্ছে।

দেখ্‌তে দেখ্‌তে চারদিক থেকে লোকজন এসে পড়ল, বন্দুক, রাইফ্‌ল্‌, পিস্তল, তলোয়ারও বেরোলো অনেক। সকলে সশস্ত্র হয়ে তাঁবুর বাইরে ফাঁকা জায়গায়

একত্র হবার পর একজন একটু দূরে দাঁড়িয়ে মাথার উপর একটা লোহার শিক ধরে মৃদু গলায় সুর করে কি গাইল। সঙ্গে সঙ্গে বিপরীত দিক থেকে সুর করে সমস্বরে উত্তর এল। প্রথম লোকটি এবং তার সঙ্গে দুচারজন তারপর সুরের সঙ্গে তালে তালে পা ফেলে ধীরে ধীরে নেচে অগ্রসর হতে লাগল, এদিকের দলও অস্ত্র আস্ফালন করে সমস্বরে ক্রমেই জোরে উত্তর দিতে থাকল।

প্রথম দিকে সকলেই হাসিমুখে আমাদের দিকে মাঝে মাঝে তাকিয়ে এসব করছিল। ক্রমে তাল দ্রুততর হয়ে তাণ্ডবে পরিণত হল। তারপর নর্ত্তকদের মুখে উত্তেজনা দেখা দিল, কণ্ঠস্বরও গম্ভীর ও কর্কশ হয়ে এল। তার পর দুইদল একত্র হবার পর যুদ্ধের নাচ আরম্ভ হল, সে একেবারে রৌদ্ররসের ব্যাপার। দীর্ঘ বলিষ্ঠ দেহ, সশস্ত্র যোদ্ধার প্রচণ্ড নৃত্য, অস্ত্র আস্ফালন ও ক্রৌঞ্চনিনাদ সঙ্গে সঙ্গে আগ্নেয়াস্ত্রের বিস্ফোরণ, মুখের ভাবে বিষম উত্তেজনার পরিচয়, শ্যেনচক্ষুর তীব্র দৃষ্টি সে এক অপূর্ব্ব দৃশ্য। এদিকে অন্তঃপুর থেকে মেয়েদের সমস্বরে উলুধ্বনি আরম্ভ হল—এতদিনে বুঝলাম উলুধ্বনির অর্থ কি। উলুধ্বনির সঙ্গে সঙ্গে দলের মধ্যে কয়েকজন এতই উত্তেজিত হয়ে উঠল যে শেখ ও তাঁর ভাই মাঝে পড়ে তাদের টেনে এনে রক্তপাতের সম্ভাবনা বন্ধ করলেন। কিছুক্ষণ পরে যখন সকলে অসম্ভব উত্তেজিত হয়ে উঠল তখন এ ব্যাপার বন্ধ করে দেওয়া হ'ল।

আর একদিন নদীর ধারে শ্রীযুক্ত শাবেন্দারের সৌজন্যে বাগদাদের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ নর্ত্তকীর নাচগান দেখা ও শোনা গেল। গানের সঙ্গে তালে তালে নাচ; নাচের গতি, দেহের চালন ইত্যাদি সমস্তই আমাদের বাইনাচ অপেক্ষা অনেক সতেজ, তবে সংযত মোটেই নয়। গানেও সেই উদ্দাম ভাব, কিন্তু দুইয়ে সামঞ্জস্যের অভাব ছিল না।

এদিকে কবি অসুস্থ হয়ে পড়লেন সুতরাং তাঁর সোজা দেশে ফিরে যাওয়াই ঠিক হ'ল। একদিন অতি ভোরে তিনি ও তাঁর পুত্রবধূ হিনায়দি এয়রোড্রোম থেকে বায়ুযানে কলিকাতার মুখে রওয়ানা হলেন। আমি এবং বন্ধুবর অমিয় চক্রবর্ত্তী রয়ে গেলাম এদেশের আতিথ্যের শেষ অংশ সম্ভোগ করার জন্য।

পুরাণো চিঠি

শ্রীপ্রমোদরঞ্জন সেন

ভট্টাচার্য্য-গৃহিণী হাতমুখ ঘুরাইয়া সক্রোধে গর্জ্জন করিয়া উঠিলেন, "বয়েস তো তিন কুড়ি পার হয়ে গেল, বুদ্ধি তোমার কবে গজাবে শুনি? সকাল বেলা আমি কি তোমার কাছে মিথ্যে লাগাতে এসেচি? জিজ্ঞেস ক'রেই দেখ না তোমার গুণধর ছেলের বৌকে।"

সুবৃহৎ মাংসল বপুখানি যখন দুলিতে দুলিতে ঘরের বাহির হইয়া গেল তখন ভট্টাচার্য্যের মুখ খুলিল। গৃহিণী সম্মুখে থাকিলে তাঁহার বীরত্ব বড় দেখা যায় না, কিন্তু এখন তিনিও সপ্তমে গলা চড়াইয়া বলিলেন, "ছেলের বৌকে জিজ্ঞেস করা-করি কি? ছেলে যদি তাকে কলেজের খরচ থেকে লুকিয়ে দুল গড়িয়ে পাঠিয়েই থাকে তো বৌ কি করবে? আর ওকালতিতে সে হতভাগা যে তিন-তিনবার ফেল করল সে-ও কি বৌমারই দোষ নাকি?...হুঃ, বুদ্ধি শুধু আমারই নেই, বুড়ো শুধু আমিই হয়েছি, আর কারও পান ছেঁচে খেতে হয় না, আর কারও চুল দিয়ে শোনের দড়ি"

হঠাৎ উচ্ছ্বাসে বাধা পড়িয়া গেল। গৃহিণী চিরকালের অভ্যাস মত ঘর হইতে বাহির হইয়া গিয়া থাকিলেও দরজার আড়ালেই অবস্থান করিতেছিলেন, অকস্মাৎ রুদ্রমূর্ত্তিতে দেখা দিলেন।

"কিসের জন্য তুমি আমায় এত অপমান করতে সাহস কর শুনি? আমি কি বাড়ির ঝি, না চাকর? তার চেয়ে আমাকে দাদার কাছে পাঠিয়ে দাও, ল্যাঠা চুকে যাক্।"

ভট্টাচার্য্য চিম্‌টি কাটিয়া উত্তর করিলেন, "ও, তাও যদি মাসে মাসে টাকা ক'টা না পাঠাতে হ'ত।"

কথাটা যাঁহার উদ্দেশ্যে বলা হইল এবার আর তাঁহার কানে গেল না। ঘরে ঢুকিয়াই তিনি সগর্ব্বে প্রস্থান করিয়াছিলেন। বারান্দায় তাঁহার কলকণ্ঠ বাড়িখানা তোলপাড় করিয়া তুলিতেছিল-

"কিসের সংসার, কিসের কি, চিরদিন পরের ঘরদুয়ার আগ্‌লেই মলুম। নিজের ছেলে-বৌকেও যদি অন্যায় করলে কিছু বলতে না পারি তো সে সংসারে আমার দরকার? ঢের ঢের ছেলে দেখেছি, অমন বৌ-ঘেঁষা ছেলেও আর দেখিনি বাপু! আর বৌটিও কি আমার লক্ষ্মীমন্ত রে, আসা নাগাদ ছেলেটা ফেল ক'রে ক'রে হয়রাণ হয়ে গেল।"

ভট্টাচার্য্য বিলক্ষণ জানেন যে, লক্ষ্মী বৌমাটি মুখ ফুটিয়া একটি কথাও কহিবে না, সুতরাং তিনি নিজে যদি ইন্ধন না জোগান তাহা হইলে যুদ্ধটাও আর বেশী দূর গড়াইবে না। ধীরে ধীরে বিছানা হইতে উঠিয়া হুঁকাটি কুয়াতলায় ঠেস্ দিয়া রাখিয়া তিনি প্রাতঃকৃত্য সমাপন করিতে গেলেন। এটি তাহার সন্ধির প্রস্তাব। গৃহিণীর চোখের অসুখ; তাই অন্যান্য পতিসেবাকার্য্যের ন্যায় প্রত্যহ প্রাতে পরম ভক্তিসহকারে হুঁকার বাসি জলটুকুর সদ্ব্যবহারও তিনিই করিয়া থাকেন।

হাতমুখ ধুইয়া আসিয়াও যখন ভট্টাচার্য্য দেখিলেন যে, হুঁকা সেইখানেই পড়িয়া আছে তখন ঘরে গিয়া কিছুক্ষণ চুপ করিয়া বসিয়া রহিলেন।...কিন্তু পাঁচ মিনিট যায়, পনের মিনিট যায়, আধ ঘণ্টা যায়, হুঁকা আর আসিবার নাম করে না। সকাল বেলার তামাক খাওয়াটা আর হয় না দেখিয়া ভট্টাচার্য্য অবশেষে রাগে গস্ গস্ করিতে করিতে বারান্দায় আসিয়া উচ্চকণ্ঠে বলিলেন, "যার চোখ খসে যায় যাবে, আমার কি? এই আমি চল্লুম বাড়ি থেকে, আর কখনও আসি তো—"

বাহিরে আসিয়া দাঁড়াতেই পরাণ ঘোষ দুই পা জড়াইয়া ধরিল। আজ তাহার বালা জোড়া রাখিয়া দশটা টাকা না দিলেই হইবে না, কুটুম্ববাড়ি বেহানের দাবিতত্ত্ব পাঠানো চাই-ই। সকাল বেলা এমন শিকারটা পাইয়া বুড়ার মনটা হাল্‌কা হইয়া গেল। অনেক দর কষাকষির পর ঘোষের পো সাতটাকা লইয়াই সন্তুষ্ট থাকিতে রাজি হইল।

আধঘণ্টাও যায় নাই,— বুড়া আবার বাড়ি ঢুকিলেন।

ঘোষের পো-কে হঠাৎ সাত টাকার জায়গায় আট টাকা দিয়া চমক লাগাইয়া দিয়া বুড়া আবার তাড়াতাড়ি বাড়ি ঢুকিলেন। আবার যেন বুড়া ইচ্ছা করিয়াই একটু বেশী কাশিয়া খড়মটাতে একটু বেশী জোরে শব্দ করিতে করিতে বারান্দা দিয়া ঘরের দিকে গেল, কিন্তু তবু বারান্দার আর-এক কোণে যিনি হাঁড়িমুখ করিয়া বসিয়াছিলেন তিনি ভ্রূক্ষেপই করিলেন না।

তাহা না হউক বুড়া যেন দমিলেন না। কেহ চাহিয়া দেখিলেই দেখিতে পাইত বুড়ার ঠোঁট দুইটা ঈষৎ ফাঁক হইয়া গিয়াছে। দাঁত থাকিলে তাহাও দেখা যাইত নিশ্চয়।

ঘরে ঢুকিয়াই বুড়া গম্ভীরভাবে কুয়াতলায় বাসন মাজিতে প্রবৃত্ত ক্ষিমি ঝিকে ডাকিয়া বলিল, আজ রাত্রেই তিনি কাশী চলিয়া যাইবেন। কাহারও যদি দরকার থাকে সে যেন আসিয়া তাহার জিনিষপত্র বুঝিয়া লয়।

বুড়া অনেকবার এমন কাশীতে গিয়াছেন। কেহ আসিল না।

বুড়া আবার চেঁচাইয়া বলিলেন, কাহারও যদি দরকার থাকে সে আসিয়া তাহার দাদার চিঠি দেখিয়া যাইতে পারে। কাল হইতে চিঠি আসিয়া পড়িয়া আছে। ইহার পর বাক্স-টাক্স বাঁধা ছাঁদা হইয়া গেলে কিন্তু আর আমার দোষ নাই!

ধীরে ধীরে গদাই লস্করি চালে গম্ভীর মূর্ত্তি ঘরের দরজার কাছে দেখা দিল। বুড়া তক্তপোষের উপর গাঁট হইয়া বসিয়া থাকিয়া নির্লিপ্তভাবে পত্রখানা দরজার দিকে ছুঁড়িয়া ফেলিলেন। আর শুক্‌না ডাঁটার মত আঙ্গুল কয়খানি দিয়া একেবারে পালিশকরা মাথাটার বর্ত্তমান সম্পত্তি কয়টাতে হাত বুলাইতে লাগিলেন!

পত্র পড়িতে গিয়াই হাঁড়ি মুখখানা মুহূর্ত্তে জালার মত হইয়াই ছোট হইয়া যায়। চিঠিখানা খানিকটা পড়িয়াই বুড়ী খাটের দিকে ছুঁড়িয়া ফেলিয়া চলিয়া যাইতে চাহেন—, এমন সময় আর একখানা চিঠি পায়ের কাছে আসিয়া পড়ে। বাঁকা বাঁকা অক্ষরে বড় বড় করিয়া লেখা— দেখিয়া পড়িতে ইচ্ছাও করে আবার— এবার বুড়ী পত্রের সবটা

পড়ে। মুখের কোণটা একটু কেমন যেন হইয়া উঠে। আগের খানা মেজে হইতে কুড়াইয়া লইয়া দুইখান পত্রই বাক্সের উপর রাখিয়া দিয়া আবার চলিয়া গেলেন।

বুড়া ঝনাৎ করিয়া একটা চিঠির ঝাঁপি চৌকির তল হইতে টানিয়া বাহির করিয়া চৌকির উপরে তুলিয়া লইলেন। একটানে ডালাটা খুলিয়া ফেলিয়া একখানা চিঠি বাহির করিয়া একটু জোরে পড়িলেন "পাদপদ্মে অসংখ্য প্রণিপাত-পূর্ব্বক নিবেদন. নাথ. আপনি যে দিন এখান হইতে গিয়াছেন সেইদিন হইতে আমার প্রাণ—"

বুড়ীর অতবড় মুখখানায় অনেকদিন আগেকার অভ্যাস ফিরিয়া আসিল বলেন —"আঃ. বাইরে যে বৌমা—

বুড়ী খাটের কাছে সরিয়া আসে। বুড়া চশমাটা নাকের উপর নাড়িয়া চাড়িয়া বসাইয়া পত্র পড়িয়া শেষ করিয়া আর একখানা পত্র টানিয়া বাহির করিলেন।

বুড়ী আরও সরিয়া আসে।

বুড়া পড়িতে পড়িতে হাসে. বুড়ী শুনিতে শুনিতে হাসে। বুড়ী সরিয়া বসিয়া বসিয়া জায়গা দেয়. বুড়ী সরিয়া আসিয়া চৌকিতে বসে।

চিঠির পরে চিঠি শেষ হইতে থাকে. হঠাৎ বুড়ী বলিল, পত্র পড়ে চোখের জ্বালাটা বেড়েছে. থামো চোখটা ধুয়ে আসি।

চোখ না ধুইয়াই বুড়ী তাড়াতাড়ি হুঁকার জল বদলাইয়া তামাক সাজিয়া আনিল। বুড়া বাঁ হাতে হুঁকাটা লইয়া আবার পত্র পড়িতে থাকে।

বুড়ী সরিয়া আসিয়া বসিল, বুড়া সরিয়া যাইয়া বসিতে দিল; তামাক আপন মনে পুড়িতে থাকিল।

বাইরে ক্ষেমি ঝি ঝঙ্কার তুলিয়া বলিল, এতখানি বেলা হইল বাজারের পয়সা সে পাইল না। বারান্দায় বৌমা আসিয়া ফিরিয়া যায়,—দাদার চিঠি পড়াই শেষ হয় না।

পত্র পড়া শেষ হইয়া গেল! বুড়া আবার তামাক চায়, বুড়ী আবার তামাক দেয়, ক্ষেমি ঝি আবার ঝঙ্কার তোলে - বুড়ী তাড়াতাড়ি বাহির হইয়া গেল. বুড়া প্রকাণ্ড তাকিয়া-টায় ঠেস দিয়া বসিয়া থাকে। আজ আর বাহিরে যাওয়া হইল না। বৈঠকখানা ঘরের বারান্দাটা বহুবৎসরের মধ্যে আজ খালি পড়িয়া আছে। বুড়া চোখ বুজিয়া কি যেন ভাবিতেছে।

আধ ঘণ্টা যায়। পায়ে কিসের ছোঁওয়া লাগিয়া বুড়া চম্‌কিয়া উঠে। বুড়ী বলে, "আহা ঘুমুচ্ছিলে বুঝি? বুড়া বলে. না. কিন্তু আজ স্নানের পরে যে বড়—।"

বুড়ী তাড়াতাড়ি বাহির হইয়া যায়। বুড়া মুখ টিপিয়া হাসে; আবার চোখ বুজিয়া কি ভাবিতে থাকে।

এক ঘণ্টা যায়.- বুড়ার নাক ডাকিতে থাকে। বুড়ী আসিয়া ডাকে. "ওগো- ও গো।"চোখ মেলিয়া বুড়া বলে. "কি।"

বুড়ী বলে. "বেলা যে দশটা বাজে, এখন চানটা করে নাও না।"

বুড়া বলিলেন, "কিন্তু আমি তো এগারোটার সময় ":

বুড়ী বলিলেন. "ওই করেই তো অম্বলের ব্যামোটা হয়েছে। বেশ. আমার কি,- আমি ভাল ব'লে বল্‌তে এলাম "

বুড়া বলে. "আচ্ছা, আচ্ছা তেল দাও আর তামাক দাও।"

বুড়া খাইতে বসিলেন, বুড়ী পাখা লইয়া বসিলেন, বুড়ী দেখাইয়া দিল, বুড়া খান।

বাজার আসিতে দেরি হইয়া গিয়াছে. এত সকালে রান্না কিছুই হয় নাই। বৌমা লজ্জায় কিছু বলিতে পারে না। তাড়াতাড়ি 'সিদ্ধ' মাখিয়া দেয়, তাড়াতাড়ি মাছ ভাজিয়া দেয়, তাড়াতাড়ি 'কাজকর্ম্মের দিনের জন্য জমাইয়া-রাখা ঘিয়ের বোতল হইতে একটু ঘি আনিয়া দিল বুড়ী খুসী হইয়া উঠিলেন।

বুড়ার খাওয়া শেষ হইয়া গেল। বৌমা তাড়াতাড়ি খোকার জন্য কেনা দুধটুকু গরম করিয়া আনিয়া বলিল "খোকার তো অসুখ, খোকা তো বার্লি খাবে ।"

বুড়ী বলিলেন, "আহা-হা বৌমা তোমার আর কাপড় নেই বুঝি বাছা। মাগো মা, এমনি মেয়ে, নিজের হাজার কষ্ট হ'লেও কিছু বল্‌বে না। অমন সেলাই করা কাপড় প'রে, কেমন করে থাক মা!"

বৌমা তাড়াতাড়ি চলিয়া গেল। বুড়ী আস্তে আস্তে বলে, "হাজার বকি আর ছকি মেয়েটা ঘরের লক্ষ্মী।"

বুড়া দুধের বাটিতে চুমুক দিলেন। বুড়ী বলিলেন, "বৌমার জন্য একজোড়া কাপড় এনো গো।"

বুড়া খাইয়া ঘরে আসিলেন। বৌমা পান ছেঁচিয়া দিয়া গেল। বুড়ী বলিলেন, "নবীন স্যাক্‌রা এখানে আছে নাকি গো?"

"কেন?"

"বৌমার হাতে তারের বালা বেশ মানায় কিন্তু!"

বুড়া তামাক টানিতে থাকে। বুড়ী বাহিরে যাইয়া বলিলেন, "এখন ওসব কাপড় কাচা রেখে চান করে চাট্টি খেয়ে নাও বৌমা! তোমার ও তো শরীর।"

দুপুরে শুইয়া বুড়ার রোজ রোজ ঘুম হয় আজ আর ঘুম আসে না। বুড়ী কাছে বসিয়া হাওয়া করিতেছে। বুড়া বলে, "তুমি একটু শোও না গো।" বুড়ী বলে, "নাঃ।"

চুপ করিয়া থাকিয়া থাকিয়া বুড়ী বলে, "খোকাকে একটা চিঠি লিখে দাও না গো বৌটা বড় একা একা থাকে। কাজ নাই তার উকীল হয়ে, আমাদের যা আছে এই ঢের।"

বুড়া কি ভাবিয়া হাসিলেন। বুড়ী বলে, "কি?" বুড়া বলে, "কিছু না," বুড়ী বলে, "তবু শুনি!"

বুড়া বলে, "সেবারকার কথা মনে ক'রে হাসি এল। পুরুতগিরি ক'রে প্রথম টাকা পেয়েই তোমার নথ গড়িয়ে নিয়ে এলুম লুকিয়ে! বাবা মা টের পেয়ে সে কি বকুনি!"

বুড়ী বলিলেন, "ছি, ছি, আমায় কিন্তু ভারি লজ্জা দিয়েছিলে। সকলে ভাবলে আমি বুঝি তোমার কাছে চেয়েছি। তার ওপর আবার পরতে ইচ্ছেও হয় অথচ পরতেও পারিনে।"

আবার দুইজনেই চুপ!

আবার বুড়া হাসে, "তোমার দাদার চিঠি দেখলে না?" বুড়ী মুখ ঘুরাইয়া বলে, "আহা!"

এবার বুড়া সত্যসত্যই দাদার চিঠি বাহির করিলেন। দাদা কিছু বেশী টাকা চান, কাশী যাইবেন।

বুড়া বলিলেন, "আমরা কি-ই বা পাঠাই তাঁকে! দিই গোটা পঞ্চাশেক পাঠিয়ে, কি বল?"

বুড়ী চুপ করিয়া থাকে। তারপর বলে, "আচ্ছা চিঠির ঝাঁপিটা কোথায় পেয়েছিলে গা তুমি?"

"কেন, ঘোষের পো-কে টাকা দেবার সময় সিন্দুকে।"

টাকা পাঠাইয়া আসিবার পথে বুড়া বালাজোড়া ঘোষের পো-কে ফেরত দিয়া বলিলেন, "বালা আর রেখে কি করব ঘোষের পো, টাকা ক'টা যখন পার দিয়ে দিও।"

পঞ্চশস্য

প্রাণিজগতে মৈত্রী —

আমাদের দেশে বাঘে গরুতে একত্রে জল খাওয়ার প্রবাদ আছে। কিন্তু সে কোন প্রবল প্রতাপ শাসকের ভয়ে। শাসন ও ভয় ছাড়াও যে প্রাণিজগতে সামাজিকতা আছে তাহার সংবাদ প্রাণিতত্ত্ববিদদের অজানা না হইলেও সাধারণ লোকের হয়ত জানা নাই। কিন্তু দলবদ্ধ হইয়া বাস ও পরস্পরের সাহায্য ভিন্ন অন্য রকমের মৈত্রীও পশুপক্ষীদের মধ্যে মাঝে মাঝে দেখা যায়। খাদ্যখাদক সম্পর্ক থাকায় এবং অন্য কারণে জীবজগতে কতকগুলি জন্তুর সহিত অন্য কতকগুলি জন্তুর জন্মগত শত্রুতা থাকে। কিন্তু অবস্থাবিশেষে এই সকল জন্তুরাও পরস্পরের প্রতি বিদ্বেষ ভুলিয়া যাইতে পারে। জাপানের 'আসাহিগ্রাফ' নামক পত্রিকায় প্রকাশিত কয়েকটি চিত্রে এই বিষয়টির সাতিশয় কৌতূহলাবহ কতকগুলি দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়। এই চিত্রগুলির কয়েকটি এই সঙ্গে প্রকাশিত হইল।

এক বাসায় সাপ ও ইঁদুর। সাপ ইঁদুরের ভক্ষক ও মহাশত্রু, অথচ এই ইঁদুরগুলি একটি প্রকাণ্ড সাপের বাসায় আনাগোনা করিতে কিছুমাত্র ভীত হইতেছে না

একটি খাঁচায় আবদ্ধ শূকর ও বাঁদর। বাঁদরগুলিকে পিঠে চড়িতে দিতে শূকরের কিছুমাত্র আপত্তি নাই
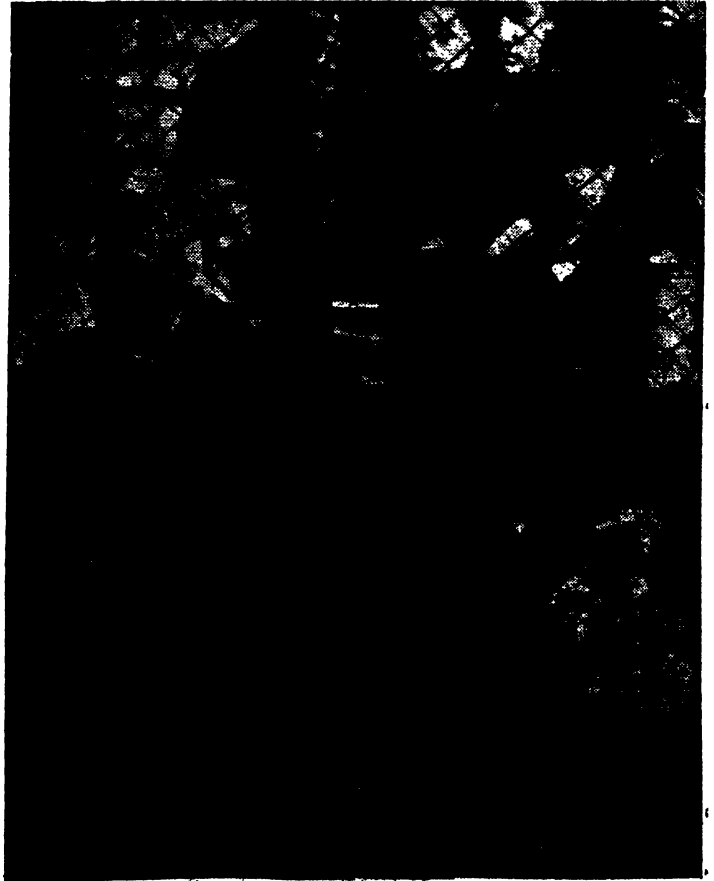
কুকুরের কোলে বাঁদর

একটি 'হবাচী' বা আগুন রাখিবার পাত্রের পাশে একটি বিড়াল ও বকের ছানা বাসা লইয়াছে। সম্মুখে পাখী থাকা সত্ত্বেও বিড়াল একেবারে উদাসীন
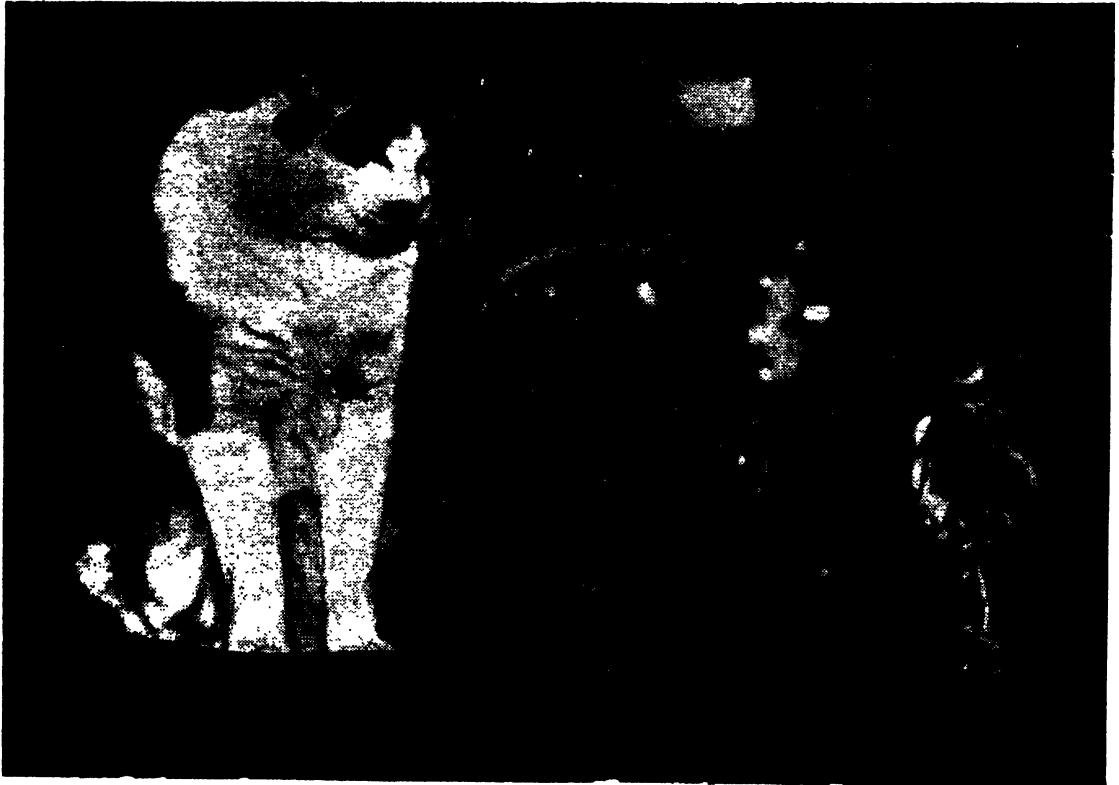
বাংলা

দেশবন্ধু সপ্তাহ—

এ বৎসর ১০ই জুন হইতে ১৬ই জুন পর্য্যন্ত দেশবন্ধু স্মৃতি উৎসব অনুষ্ঠিত হইবে। এই সপ্তাহে প্রধান কার্য্য হইবে দেশবন্ধুর স্মৃতি রক্ষাকল্পে কেওড়াতলা শ্মশান ঘাটে—যেখানে চিত্তরঞ্জনের শবদাহ হইয়াছিল—একটি মন্দির প্রতিষ্ঠার জন্য চাঁদা সংগ্রহ। স্মৃতিরক্ষা কমিটির সভাপতি কলিকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি শ্রীযুত মন্মথনাথ মুখোপাধ্যায় এবং সম্পাদক কলিকাতার মেয়র শ্রীযুত সন্তোষকুমার বসু। বাংলা দেশের গণ্যমান্য ব্যক্তিগণ এই কমিটির সভ্য। আমাদের জাতীয় জীবনে দেশবন্ধুর স্থান অতি উচ্চে। প্রত্যেকেই যথাসাধ্য সাহায্য করিলে দেশবন্ধু স্মৃতি রক্ষা কমিটির উদ্দেশ্য সফল হইতে পারিবে।

পাবনার "সৎসঙ্গ" আশ্রম—

শ্রীমতী অনুরূপা দেবী লিখিয়াছেন—"বিগত মার্চ্চ মাসে পাবনা শহরের নিকটবর্ত্তী হিমায়েৎপুর গ্রামের সৎসঙ্গ আশ্রম আমাদের দেখিবার সুযোগ ঘটিয়াছিল। মাননীয়া শ্রীযুক্তা কামিনী রায়ের সহিত পাবনা যাত্রা করিলাম। পদ্মার তীরে ঘন জঙ্গল ও বালুরাশির মধ্যে একটি সুন্দর নূতন শহরের পত্তন আরম্ভ হইয়াছে। ইহারই মধ্যে প্রায় আট শতেরও অধিক লোক এখানে বাস করিতেছে; তন্মধ্যে উচ্চশিক্ষিত বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধিধারীর সংখ্যা নিতান্ত অল্প নহে। দেখিলাম সকল বিষয়ে প্রতিষ্ঠানটিকে আত্মনির্ভরশীল করিয়া তুলিবার চেষ্টা চলিতেছে। তজ্জন্য ছেলে ও মেয়েদের স্কুলকলেজ, গবেষণার জন্য বিজ্ঞানমন্দির ছাপাখানা বৈদ্যুতিকশক্তি সরবরাহের 'পাওয়ার হাউস' বিদেশী উদ্ভিজ্জ হইতে ঔষধাদি প্রস্তুতের কারখানা নলকূপ কলাভবন সকলই একে একে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। স্কুলকলেজের ব্যবস্থা ভাল লাগিল। বড় বড় ইমারতাদিতে অর্থ নষ্ট না করিয়া প্রাচীন ভারতীয় আদর্শানুযায়ী (এবং বিশ্বভারতীতে যেমন আছে) উন্মুক্ত প্রান্তরে এবং বৃক্ষতলে বসিয়া শিক্ষক ও ছাত্রগণ অধ্যয়ন ও অধ্যাপনা করিয়া থাকেন। বিজ্ঞানের বিশ্ববিদ্যালয়নির্দ্দিষ্ট প্রাকটিক্যাল কোর্স শিখিবার জন্য সপ্তাহে কয়েকদিন করিয়া এখান হইতে ছাত্রগণ পাবনা শহরে এডওয়ার্ড কলেজে পড়িতে যান। তজ্জন্য কর্ত্তৃপক্ষের সহিত আবশ্যকমত ব্যবস্থাদি করিতে হইয়াছে। আগামী বৎসর কয়েকটি বালিকা বি-এসসি পরীক্ষা দিবেন শুনিলাম।

"কলাভবনে সূক্ষ্ম সূচীশিল্পের কয়েকটি নিদর্শন দেখিলাম। সেগুলি একটি স্থানীয় মহিলার হস্তনির্ম্মিত—বাস্তবিকই সুন্দর ও প্রশংসার্হ জিনিষ। সূচীদ্বারা প্রস্তুত দেশবন্ধুর চিত্রাদি অতি চমৎকার এরূপ আর কোথাও দেখি নাই।

"এখানকার 'পাওয়ার হাউসে' আশ্রমের প্রয়োজনের অতিরিক্ত তাড়িৎ শক্তি উৎপন্ন হইতে পারে। তাহা কার্য্যে লাগান এবং সম্পূর্ণরূপে আত্মনির্ভরশীল হওয়া এই উভয়বিধ কারণে আশ্রমের কর্ত্তৃপক্ষগণ সম্প্রতি এখানে কয়েকটি কলকারখানা প্রতিষ্ঠা করিতে মনস্থ করিয়াছেন।"

ঋগ্বেদের নূতন সংস্করণ

ইণ্ডিয়ান রিসার্চ্চ ইনষ্টিটিউট্ কর্ত্তৃক বর্ত্তমানে হিন্দুদের আদিধর্ম্মগ্রন্থ ঋগ্বেদের একটি প্রামাণিক সংস্করণ প্রকাশিত হইতেছে। ইহা ৪ খণ্ডে বিভক্ত। প্রথম খণ্ডে সংস্কৃত মূল পদপাঠ স্বরচিহ্ন, সায়ন ভাষ্য, প্রাচীন ভারতীয় বিভিন্ন টীকাকারগণের মতবাদ প্রভৃতি আছে। ২য় খণ্ডে ইংরেজী অনুবাদ পাশ্চাত্য বৈদিক পণ্ডিতদের মতবাদ ও বহুগবেষণাপূর্ণ তথ্য আছে। ৩য় ও ৪র্থ খণ্ডে জনসাধারণের অবগতির জন্য বিস্তৃত ব্যাখ্যাসহ বাংলা ও হিন্দী অনুবাদ আছে। মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত সীতারাম শাস্ত্রী ও প্রমথনাথ তর্কভূষণ, পণ্ডিত বিধুশেখর শাস্ত্রী ডাঃ সুরেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত, ও সীতানাথ প্রধান, অধ্যাপক বনমালী বেদান্ততীর্থ ও দুর্গামোহন ভট্টাচার্য্য, স্বামী দেবানন্দ বসু, পণ্ডিত অযোধ্যাপ্রসাদ ও দেবানন্দ ঝা প্রমুখ বিশিষ্ট বেদজ্ঞ পণ্ডিতবর্গকে লইয়া সম্পাদকীয় কমিটি গঠিত হইয়াছে। ইহা প্রতিমাসে খণ্ডাকারে প্রকাশিত হইতেছে ও প্রতিখণ্ডে প্রায় ১২৮ পৃষ্ঠা করিয়া থাকিবে। ইহার বার্ষিক মূল্য ১২ টাকা ও ষাণ্মাসিক মূল্য ৬ টাকা ধার্য্য হইয়াছে। বিস্তারিত বিবরণের জন্য কলিকাতা, ৫৫নং আপার চিৎপুর রোডস্থ ইনষ্টিটিউট্ আপিসে আবেদন করা যাইতে পারে। আশা করি, ইঁহাদের এই চেষ্টা সাফল্যমণ্ডিত হইবে এবং ঋগ্বেদের এই সংস্করণের যথেষ্ট গ্রাহক হইবে।

বোধনা-নিকেতনের জন্য দানপ্রাপ্তিস্বীকার—

ঝাড়গ্রামে জড়বুদ্ধি ছেলেমেয়েদের জন্য বোধনা-নিকেতন নামে যে আশ্রম প্রতিষ্ঠিত হইতেছে তাহার সাহায্যার্থে প্রাপ্ত নিম্নলিখিত দানগুলি কৃতজ্ঞতার সহিত স্বীকৃত হইতেছে। আরও যিনি যাহা দিবেন কৃতজ্ঞতার সহিত গৃহীত ও স্বীকৃত হইবে। শ্রীরামানন্দ চট্টোপাধ্যায় কোষাধ্যক্ষ, ২।১ টাউনসেণ্ড রোড, ভবানীপুর কলিকাতা।

সুরেশচন্দ্র রায় ২ কমরুদ্দিন ১, পাঁচু মিঞা ৩, মোলকাৎ ১, পাঁচুগোপাল দত্ত ২ কালাচাঁদ ১ সেন ব্রাদার্স এণ্ড কোং ১ গোষ্ঠবিহারী সাও ২ এল সি চৌধুরী এণ্ড কোং ১, টুইন এণ্ড কোং ১ টোপসী এণ্ড কোং ২ আর জে সিং ১ ডি এন সাহা ১ জনৈক পার্সী মহিলা ৫ জনৈক স্কাউট ৫ এ মুখুজ্যে ৫ কেদারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ২১ বিষ্ণুচরণ চাটুজ্যে ॥০ আনা, বি ডি বসু ১, অমরকুমার দত্ত ॥০ আনা, মিসেস এইচ এন বোস ৩, মিসেস চ্যাটার্জ্জি ১, এন এন বোস ৫, ডাঃ এ রক্ষিত ১০, মিঃ শচীন ও দুই বন্ধু ১, পি ব্যানার্জ্জি ৫, জে টি নিয়োগী ।০ আনা, মোল্লাপা এণ্ড কোং ৷৵০ আনা, রায় বাহাদুর নগেন্দ্রনাথ গাঙ্গুলী ৪০, অধরচন্দ্র চক্রবর্ত্তী ২, অরুণচন্দ্র সেন ১০, দীনেশচন্দ্র সেন ১০, মোহিনীমোহন মুখোপাধ্যায় ১০, শশীভূষণ দে ১০০, শিখরনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ৫০, সুরেন্দ্রনাথ মল্লিক ১০০, হরিহর শেঠ ২০, স্যর বিপিনবিহারী ঘোষ ১০০।

বাঙালী যুবকের কৃতিত্ব—

পুরী নিবাসী শ্রীযুত শিশিরকুমার লাহিড়ী বিহার ইঞ্জিনীয়ারিং কলেজের শেষ পরীক্ষায় সর্ব্বপ্রথম হন এবং প্রিন্স অব ওয়েল্‌স্ বৃত্তি লইয়া এ-বিষয়ে অধিকতর জ্ঞান লাভের জন্য বিলাতে গমন করেন। তিনি সেখানকার ডাগেনহাম কাউন্টি কাউন্সিলের চীফ ইঞ্জিনীয়ার মিঃ টি-পি ফ্রান্সিসের নিকট ইঞ্জিনীয়ারীং শিক্ষা করেন। এই বিষয় বিশেষ আয়ত্ত করিয়া এ-এম্-আই-এস-ই ও এম্-আর-এস-আই উপাধি লাভ করিয়াছেন। বিদেশের বিভিন্ন ইঞ্জিনিয়ারীং বিষয়ক পত্রিকায় মৌলিক প্রবন্ধাদি লিখিয়াও তিনি প্রশংসা লাভ করিয়াছেন।

ভারতীয় নৌবিভাগে প্রবেশার্থীদের পরীক্ষা

দিল্লীতে ভারতীয় নৌবিভাগে প্রবেশার্থীদের যে পরীক্ষা গৃহীত হইয়াছে অবসরপ্রাপ্ত ইঞ্জিনিয়ার বরিশাল শঙ্করবাসী রায়সাহেব মধুসূদন চাটুয্যের পুত্র শ্রীমান অধরচন্দ্র চাটুয্যে তাহাতে প্রথম স্থান অধিকার করিয়াছেন। বর্ত্তমানে তিনি বোম্বাই-এ শিক্ষাধীন আছেন এবং বোধ হয় আগামী সেপ্টেম্বর মাসে বিলাত গমন করিবেন।

বাঙালী নারীর দুর্দ্দশা

পাবনার স্বরাজ পত্রিকা লিখিয়াছেন, "মফঃস্বলে বহু হিন্দুনারী নানা কারণে নিরাশ্রয়া হইয়া এখানে-ওখানে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। অবস্থাপন্ন ঘরের মেয়েও একমুষ্টি অন্ন ও পরণের একখানি বস্ত্রের জন্য নিতান্ত দীনা কাঙালিনীবেশে দ্বারে দ্বারে আশ্রয়ভিক্ষা করিতেছে; কিন্তু কোন স্থানেই আশ্রয় না পাইয়া তাহাদের কতক নারী ধর্ম্ম বিসর্জ্জন দিয়া অন্যের বাড়িতে দাসীবৃত্তি করিয়া হীন জীবন যাপন করিতেছে।" "কতক নবদ্বীপ কলিকাতা প্রভৃতি স্থানে মাতৃমন্দির ও নানা প্রকার আশ্রম ইত্যাদিতে আশ্রয় লইয়াছে।" "ঘটনা বিপর্য্যয়ের মধ্যে পড়িয়া আবার কতক নারী পঞ্জাব সিন্ধু প্রভৃতি সীমান্ত প্রদেশে ব্যবসায়িগণ কর্ত্তৃক প্রেরিত হইয়া বিধর্ম্মীকে বিবাহ করিতে বাধ্য হইতেছে। বর্ত্তমানে পাবনায় এই প্রকার অসহায় হিন্দুনারীর সংখ্যা ক্রমশঃ বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইতেছে। এই সম্পর্কে আরও একটি বিষয় প্রণিধানযোগ্য যে এই সব নারীর মধ্যে ব্রাহ্মণ সমাজের নারীর সংখ্যাই সমধিক। বর্ত্তমান সময়েও একাধিক ব্রাহ্মণ মহিলা এই পাবনা শহরেই অসহায় অবস্থায় আমাদের চোখের সামনে এখানে-ওখানে একটু আশ্রয়ের জন্য ঘুরিয়া বেড়াইতেছে; কিন্তু কোনও স্থানেই আশ্রয় পাইতেছে না।"

ভারতবর্ষ

প্রবাসী বঙ্গ সাহিত্য সম্মেলন

কানপুর হইতে শ্রীযুত শচীন্দ্রনাথ ঘোষ জানাইতেছেন—প্রবাসী বঙ্গ সাহিত্য সম্মেলনের একাদশ অধিবেশন আগামী বড়দিনের ছুটিতে ১৩ই, ১৪ই ও ১৫ই পৌষ ১৩৪০ (ইং ২৮, ২৯ ও ৩০এ ডিসেম্বর) গোরক্ষপুরে হইবে।

প্রবাসী বাঙালীর সাহিত্য-চর্চ্চা

বঙ্গের বাহিরে যেখানেই দু-দশ জন বাঙালী থাকেন সেখানে প্রায়ই ছাত্র ও অধিক বয়স্ক বাঙালীদের মধ্যে বাংলা সাহিত্যের অনুশীলনের কিছু চেষ্টা দেখিতে পাওয়া যায়। ইহা সন্তোষের বিষয়। মজঃফরপুরে বাঙালীর সংখ্যা কম নহে। স্থানীয় "গ্রীয়ার ভূমিহার ব্রাহ্মণ কলেজ" নামক সরকারী কলেজে বাঙালী ছাত্রের সংখ্যা চল্লিশের বেশী হইবে না কিছু কমও হইতে পারে। সংখ্যায় এত কম হইলেও ইঁহারা বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের চর্চ্চার জন্য একটি বাংলা সমিতি স্থাপন করিয়াছেন। তাহার প্রথম সাম্বৎসরিক অনুষ্ঠান উপলক্ষ্যে তাঁহারা প্রবাসীর সম্পাদককে নিমন্ত্রণ করিয়াছিলেন এবং তাঁহার দ্বারা একটি বক্তৃতা দেওয়াইয়াছিলেন। বক্তৃতার বিষয় ছিল, প্রধানতঃ কি প্রকারে ও কি কি উপায়ে মানুষ সভ্যতার পথে অগ্রসর হইয়াছে। শ্রীমতী অনুরূপা দেবী সভানেত্রী মনোনীত হন। কলেজের অধ্যক্ষ আমীর সাহেব বক্তাকে স্বাগত সম্ভাষণ করেন। পরদিন তিনি ও কয়েক জন অধ্যাপক সৌজন্য সহকারে 'প্রবাসী'র সম্পাদককে কলেজ ও ছাত্রাবাস দেখান। উভয়ই দেখিতে সুন্দর এবং উভয়ের বন্দোবস্ত ভাল।

মজঃফরপুরে বাঙালীদের ক্লাব

মজঃফরপুরে বাঙালীদের একটি ক্লাব আছে। ক্লাবের পাকা বাড়িটি

মজঃফরপুর জি-বি-বি কলেজের বাংলা সমিতির সদস্যবৃন্দ এবং প্রবাসীর সম্পাদক

মজঃফরপুর বাঙালী ক্লাবের সদস্যবৃন্দ ও প্রবাসীর সম্পাদক

সুদৃশ্য এবং বিস্তৃত হাতার মধ্যে অবস্থিত। জমি ও বাড়ি উভয়ই ক্লাবের নিজস্ব সম্পত্তি। এই ক্লাবে সকলের মেলামেশার, আলাপ-পরিচয়ের, খেলা ও অন্যবিধ চিত্তবিনোদনের এবং পুস্তক পত্রিকাদি পড়িবার সুযোগ আছে। ক্লাবের সভ্যবৃন্দ একদিন সভা করিয়া প্রবাসীর সম্পাদককে প্রীতিজ্ঞাপন করেন। এই সভায় স্থানীয় প্রায় সমুদয় বাঙালী ভদ্রলোক ও ভদ্রমহিলা উপস্থিত ছিলেন। প্রবাসীর সম্পাদককে বক্তৃতা করিতে হইয়াছিল। মজঃফরপুর কলেজের বাঙালী ছাত্রদের উদ্যোগিতায় মজঃফরপুরে অনেকের সহিত পরিচিত হইবার সুযোগ প্রবাসীর সম্পাদক পাইয়াছিলেন।

পি-ই-এন্ সভার ভারতীয় শাখা—

কোন কোন বাংলা দৈনিক ও সাপ্তাহিকে নিম্নমুদ্রিত সংবাদটি বাহির হইয়াছে,—

"ভিয়েনা, ২৭শে মে—শ্রীযুক্ত সুভাষচন্দ্র বসু ক্রমেই আরোগ্যের দিকে অগ্রসর হইতেছেন। তাঁহার চিঠিপত্র লেখালেখির ফলে শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর শ্রীযুক্ত রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ও স্যর সর্ব্বপল্লী রাধাকৃষ্ণনের উদ্যোগে ভারতে পি-ই-এন্ ক্লাবের একটি শাখা প্রতিষ্ঠিত হইতেছে।"

পি-ই-এন্ নামক লেখক-সভার ভারতীয় শাখা প্রতিষ্ঠার সংবাদটিতে প্রবাসীর সম্পাদকের নাম থাকায় তাঁহাকে লিখিতে হইতেছে, যে তিনি এ-বিষয়ে কোন "উদ্যোগ" করেন নাই এবং উদ্যোগিতার কোন প্রশংসা তিনি পাইতে পারেন না। অন্য কোন বাঙালী "লেখালেখি" ও "উদ্যোগ" করিয়াছিলেন কি না জানি না। গত বৎসর (১৯৩৩ সালে) ডিসেম্বর মাসে উক্ত সভার ভারতীয় শাখার সম্পাদিকা ম্যাডেম সোফিয়া ওয়াডিয়া প্রবাসীর সম্পাদককে জানান যে তাঁহাকে এই সভার ভারতীয় শাখার অন্যতম সহকারী সভাপতি করিবার কথা সভাপতি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় তুলিয়াছেন। তদনুসারে ঐ ১৯৩৩ সালের ১৬ই ডিসেম্বর প্রবাসীর সম্পাদক অন্যতম সহকারী সভাপতি হইতে রাজী হন। রবীন্দ্রনাথ আগে হইতেই সভাটির লণ্ডন কেন্দ্রের সম্মানিত সভ্য ছিলেন, এবং পরে ভারতীয় শাখার সভাপতি হইতে সম্মত হন। তখন শ্রীযুক্ত সুভাষচন্দ্র বসু মহাশয় রাজবন্দী ছিলেন তের মাস বন্দী থাকার পর বর্ত্তমান বৎসরের ২৩শে ফেব্রুয়ারী কারামুক্ত হইয়া মার্চ্চ মাসে তিনি ইউরোপে পদার্পণ করেন। ভারতীয় শাখার সম্পাদিকা ম্যাডেম সোফিয়া ওয়াডিয়া এই বৎসর মে মাসের গোড়ায় এসোসিয়েটেড প্রেসের মারফৎ পি-ই-এন্ সভার ভারতীয় শাখার যে বর্ণনা প্রচার করেন তাহাতে রবীন্দ্রনাথ ইহার সভাপতি এবং শ্রীমতী সরোজিনী নাইডু স্যর এস্ রাধাকৃষ্ণন্ ও শ্রীযুক্ত রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় ইহার সহকারী সভাপতি হইতে রাজী হইয়াছেন, লেখা ছিল। মূল সভা ১৯২১ সালে লণ্ডনে প্রতিষ্ঠিত হয়। বিখ্যাত ঔপন্যাসিক গল্স্‌ওয়ার্দি ইহার সভাপতি ছিলেন। তাঁহার মৃত্যুর পর মিঃ এইচ-জি ওয়েল্‌স্ সভাপতি হইয়াছেন। পৃথিবীতে ৩৫টি দেশে এই সভার ৫০টি শাখা আছে। ইহা লেখকদের অরাজনৈতিক সভা। ইহার নয়টি আন্তর্জ্জাতিক সম্মেলন হইয়া গিয়াছে দশম সম্মেলন যুগোস্লাভিয়াতে এই বৎসর হইবে।

ভক্ত নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়ের জীবনবৃত্তান্ত।—শ্রীবঙ্কবিহারী কর। ঢাকা পূর্ব্ববাঙ্গালা ব্রাহ্মসমাজ। আশ্বিন ১৩৩৯। মূল্য এক টাকা। ২৫৫ পৃঃ

আমাদের দেশে জীবনী সাহিত্যের এখনও যথেষ্ট অভাব আছে। সে অভাব দূর করিবার জন্য বঙ্কবাবু বহুদিন হইতেই পরিশ্রম করিতেছেন এবং তাঁহার লেখনীপ্রসূত জীবনীগুলি সর্ব্বদাই তথ্যপূর্ণ। নগেন্দ্রনাথ কৃতী পুরুষ ছিলেন সাধনার ভাবে ভরপুর ছিলেন, সম্প্রদায়ের গণ্ডী তাঁহাকে কোনও মতে আবদ্ধ রাখিতে পারে নাই। তাই তাঁহার কোনও কোনও আচরণে বন্ধু ও সহকর্ম্মিগণ বিরক্ত হইলেও আমরা তাহাদের মধ্যে তাঁহার সত্য ও ধর্ম্মের প্রতি নিষ্ঠারই পরিচয় পাই। নগেন্দ্রনাথের জীবনের বিবিধ চিন্তা ও ঘটনার বিবরণ বিশেষ উপভোগ্য। ব্রাহ্মসমাজের ইতিহাস যাঁহারা আলোচনা করিতেছেন ও করিবেন আলোচ্য গ্রন্থ তাঁহাদের বিস্তর উপাদান যোগাইবে। পুস্তকে মুদ্রাকরপ্রমাদ আছে পরবর্ত্তী সংস্করণে শুদ্ধি আবশ্যক।

রাজার সাজা—শ্রীঅসিতকুমার হালদার। প্রকাশক পপুলার এজেন্সী, ১৬৩ মুক্তারাম বাবু ষ্ট্রীট কলিকাতা। মূল্য আট আনা। ১৯৩২

একাঙ্ক নাটক: বিশেষ করিয়া বালকবালিকাদের জন্য লেখা: কল্পলোকের উপকথা লইয়া কাহিনী রচিত সরল অথচ ভাবময় গীতগুলি মনোরম প্রচ্ছদপট সুন্দর। শেষে যে স্বরলিপি দেওয়া হইয়াছে তাহাতে অভিনয়ের সাহায্য হইবে। শিশুসাহিত্যের দিক দিয়া পুস্তকখানি প্রশংসনীয়, বয়স্ক লোকেরও মনোরঞ্জন হইবে।

শ্রীপ্রিয়রঞ্জন সেন

কাশ্যপবংশ ভাস্কর—ভারতবর্ষ, বঙ্গের হিন্দুরাজগণ বৈদিক সমাজ ও ৺মধুসূদন সরস্বতীর ইতিবৃত্ত সম্বলিত। কলিকাতা আর্য্যবিদ্যালয়ের অন্যতর অধ্যাপক এবং সংস্কৃত পরিষদাচার্য্য শ্রীযুক্ত সীতানাথ সিদ্ধান্তবাগীশ ভট্টাচার্য্য কর্ত্তৃক সঙ্কলিত। ৮১ নং রাজা নবকৃষ্ণ ষ্ট্রীটস্থ আর্য্যবিদ্যালয় হইতে শ্রীযুক্ত কৃষ্ণানন্দ ভট্টাচার্য্য, এম্-এ কর্ত্তৃক প্রকাশিত। প্রথম সংস্করণ। শক ১৮৫৪। সন ১৩৩৯। মূল্য ২৷৷০ টাকা মাত্র।

এই গ্রন্থে পাশ্চাত্য বৈদিকসমাজের অন্তর্ভুক্ত যজুর্ব্বেদীয় কাশ্যপগোত্রীয়-দিগের বংশ-বিবরণ সঙ্কলিত হইয়াছে। সিদ্ধান্তবাগীশ মহাশয় বিবিধ কুলগ্রন্থ এবং নানাস্থানে প্রচলিত জনপ্রবাদ অবলম্বন ও আলোচনা করিয়া এই গ্রন্থখানি প্রণয়ন করিয়াছেন। শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু মহাশয়ের বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস—ব্রাহ্মণকাণ্ডে'ও এই বিষয়টি আলোচিত হইয়াছিল সত্য, কিন্তু সিদ্ধান্তবাগীশ মহাশয় এই বংশেরই লোক বলিয়া বংশধরগণের নিকট রক্ষিত ও বসুজ মহাশয়ের অ-দৃষ্ট এবং অনালোচিত অনেক নূতন উপকরণের সাহায্য পাইয়াছেন। ফলে এই পুস্তকের বিবরণ অনেকাংশে বিস্তৃততর। একখানি প্রাচীন অপ্রকাশিতপূর্ব্ব কুলপঞ্জী প্রকাশিত হইয়াছে এবং অনেক অজ্ঞাতপূর্ব্ব বৃদ্ধপরম্পরা-প্রচলিত কাহিনী এই গ্রন্থে প্রকাশিত হইয়া বিস্মৃতির কবল হইতে রক্ষিত হইয়াছে। পণ্ডিতগণের মতে কুলপঞ্জী প্রভৃতির ঐতিহাসিক মূল্য অল্প হইলেও ইতিহাস-সঙ্কলনের সময় এইগুলি হইতে কিছু কিছু মালমসলা যে সংগৃহীত হইতে পারে তাহা কেহ অস্বীকার করেন না। তাই সিদ্ধান্তবাগীশ মহাশয়ের এ সঙ্কলনের মূল্য আছে। আর শুধু এই বংশের লোক এবং ঐতিহাসিক সমাজেই যে এই গ্রন্থ আদৃত হইবে তাহা নহে- এই বংশের অলঙ্কার ভারতের গৌরব প্রসিদ্ধ বৈদান্তিক মধুসূদন সরস্বতী সম্বন্ধে প্রচলিত বহু কাহিনী এই পুস্তকে একত্র সংগৃহীত হওয়ায় সাধারণ পাঠকও এই গ্রন্থ পাঠ করিয়া তৃপ্তি পাইবেন এবং অনেক নূতন কথা জানিতে পারিবেন। গ্রন্থের প্রারম্ভে ভারতবর্ষের ঐতিহাসিক ও ভৌগোলিক বিবরণ সম্বন্ধে যে-সকল কথা গ্রন্থকার বলিয়াছেন তাহা এই গ্রন্থে কতটা প্রাসঙ্গিক তাহা বিবেচ্য।

শ্রীচিন্তাহরণ চক্রবর্ত্তী

ঘূর্ণী- শ্রীপ্রফুল্লকুমার মণ্ডল; প্রকাশক- গৌরগোপাল মণ্ডল ৬৬নং কৈলাস বোস ষ্ট্রীট, কলিকাতা। মূল্য এক টাকা।

একখানি গার্হস্থ্য উপন্যাস। কিন্তু পল্লী বা শহরে ইহাতে অঙ্কিত চিত্রগুলি পাওয়া দুষ্কর। যে প্লটটিকে ভিত্তি করিয়া গ্রন্থখানি রচিত তাহা ঘোরাল এবং গ্রন্থখানির নামকরণের সহায়ক হইলেও গতিহীন। চরিত্রগুলি এক একটি টাইপ। তাহাদের কার্য্যকলাপ ও কথাবার্ত্তা সহজেই অনুমান করা যায়। চরিত্রহীন নায়ক সমর ও নায়িকার আশ্রয়দাতার গৃহে পরিচারিকা কুলটা দ্রৌপদী শেষের দিকে কিছু উজ্জ্বল হইয়া উঠিলেও সমরকে দেখিয়া, এবং তাহার কথাবার্ত্তা ও কার্য্যকলাপে মনে হয় উপন্যাস-জগতে অসাধারণ নৈপুণ্যে যে চরিত্রটি বহুকালপূর্ব্বে সৃষ্ট হইয়াছে, সমর তাহারই ছায়া—কিন্তু ক্ষীণ। আখ্যানভাগের কোথাও রস তেমন জমে নাই। তবে গ্রন্থকারের চেষ্টা সাধু। নারীর প্রতি নিদারুণ অত্যাচারের বিরুদ্ধে লেখনী ধারণ করিয়া বেশ ঝরঝরে ভাষায় তিনি গ্রন্থখানি রচনা করিয়াছেন।

আরও একটি কথা। "কাঁসি" "রেকাবী" ও "থালায়" যে পার্থক্য আছে তাহা জানিয়াও তিনি কয়েকবার বিপুল বিত্তশালী সমরকে তাহারই গৃহে কেন যে "কাঁসিতে" গরম লুচি খাওয়াইলেন বুঝা গেল না।

পুস্তকখানির ছাপা ও কাগজ ভাল মলাটখানিও সুদৃশ্য।

শ্রীখগেন্দ্রনাথ মিত্র

"জননী জন্মভূমিশ্চ"—শ্রীঅচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত। গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স, ২০৩।১।১, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট কলিকাতা। মূল্য ১৲

একদিকে বধূবিদ্বেষিণী মা অপরদিকে শিক্ষাভিমানিনী আধুনিকা স্ত্রী, এই দু-জনার সংঘর্ষের মধ্যে ন্যায়দর্শী পুত্রের কর্ত্তব্য কোন্ পথে?—বাঙালী পরিবারের এই নিগূঢ় সমস্যাটিকে কেন্দ্র করিয়া এই ছোট উপন্যাসটি রচিত। ১৫৩ পৃষ্ঠায় শেষ হইয়াছে। এই সংঘর্ষের পরিণামে বধূ আভা স্বামী-গৃহ ছাড়িয়া পিত্রালয়ে চলিয়া গেল। কিছুদিন মনের সঙ্গে অনেক রকম দ্বন্দ্বাদ্বন্দ্বির পর নায়ক রঙ্গলাল একটা ছলনা করিয়া মাকে তাঁহার দিদির আশ্রয়ে পাঠাইবার আয়োজন করিয়া স্বয়ং গিয়া স্ত্রীকে ফিরাইয়া আনিল।

লেখকের রচনাভঙ্গী বেশ সতেজ; বিশেষ করিয়া একটা তীব্র অনুভূতি ফুটাইয়া তুলিতে কিংবা উৎকট ঘটনা-সংস্থানের বেলায় তাঁহার কলম

একেবারে মাতিয়া উঠে। মাঝে মাঝে রিফ্লেকশনগুলিও উপাদেয় যদিও হয়ত জায়গায় জায়গায় একটু খাট হইলে আরও ভাল হইত।

এই-সব বাদ দিয়া কিন্তু বইখানিতে নিরাশ হইতে হইল। মাতৃভক্তি বনাম পল্লীপ্রেম—এই দ্বন্দ্বযুদ্ধে লেখক কাহাকে জয়মাল্য দিলেন পরিষ্কার হইল না যদিও বইয়ের নামকরণের দিক দিয়া মনে হয় মাতার দাবিই প্রবলতর বলিয়া স্বীকৃত হইয়াছে। হয়ত বা লেখক ওদিক দিয়াই যান নাই—কর্ত্তব্যের নামে দুইয়ের মধ্যে একটা সামঞ্জস্য রচনা করাই তাঁহার উদ্দেশ্য। যদি তাহাই হয় তো সে উদ্দেশ্যও তাঁহার ব্যর্থ হইয়াছে—শেষের দিকে মায়ের সঙ্গে রঙ্গলালের কদর্য্য প্রবঞ্চনায়। যে দিক দিয়াই দেখা যাক মা-রাজলক্ষ্মীকে শেষের দিকে স্থানে স্থানে অত উৎকটভাবে নীচ করিয়া চিত্রিত করিবার কোন সার্থকতাই নাই। এককথায় বলিতে গেলে গল্পাংশের দিক দিয়া বইখানি যেন হইয়াছে· মা তুমি মাথায় থাক· কিন্তু তফাৎ থেকে।

বইয়ের ছাপা, বাঁধাই ভাল।

শ্রীবিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়

ভারতের সভ্যতা।—শ্রীসতীশচন্দ্র দাসগুপ্ত মূল্য· বাঁধাই বারোআনা সাধারণ আট আনা।

'রাষ্ট্রবাণী'তে নানা সময়ে সতীশবাবুর কতকগুলি প্রবন্ধ বাহির হইয়াছিল। বর্ত্তমান বইখানি সেইগুলির সমষ্টি। খুব গভীর তত্ত্বকথা না থাকিলেও সহজ সরল ভাষায় সাধারণ পাঠকের জন্য অনেক কথাই বলা হইয়াছে এবং আমাদের মনে হয় ইহা পড়িলে তাঁহারা যথেষ্ট লাভবান হইবেন। কেবল দু-একটি প্রবন্ধে ইউরোপীয় সভ্যতার প্রতি ঠিক সুবিচার করা হইয়াছে বলিয়া মনে হয় না। ভারতের সহিত সংঘাতে আমরা ইউরোপের যে রূপ দেখি তাহা শাশ্বত রূপ নহে ইউরোপেরও একটি শাশ্বত রূপ আছে। অস্পৃশ্যতা দেখিয়া যেমন হিন্দুধর্ম্মের বিচার চলে না ইউরোপের একটা দিক মাত্র দেখিলে তেমনি ভুল হইবার সম্ভাবনা থাকিয়া যায়। পাঠকের মনে ইউরোপ সম্বন্ধে ভুল ধারণা থাকিয়া যাইতে পারে বলিয়াই একথা বলা দরকার বইখানির ত্রুটি দেখাইবার জন্য নহে।

শ্রীনির্ম্মলকুমার বসু

পরলোকের কথা—শ্রীযুক্ত মৃণালকান্তি ঘোষ ভক্তিভূষণ প্রণীত। প্রকাশক শ্রীসুচারুকান্তি ঘোষ ২নং আনন্দ চাটুয্যের গলি, বাগবাজার, কলিকাতা। ১৮/০+২৭৪ পৃঃ। মূল্য ২৲ দুই টাকা মাত্র।

এই গ্রন্থে লেখক কয়েকটি আধ্যাত্মিক ঘটনার বিবরণ দিয়াছেন এবং নিজেদের অধ্যাত্ম-চর্চ্চার ইতিহাসও সংক্ষেপে বর্ণনা করিয়াছেন। মিডিয়মের সাহায্যে প্রেতাত্মার আনয়ন এবং তাহার সহিত নানা প্রকার কথোপকথন প্রভৃতি কয়েকটি রোমাঞ্চকর আশ্চর্য্যজনক ব্যাপার এই বইয়ের মূল উপাদান। বাংলা ভাষায় একেবারে নূতন না হইলেও এই প্রকার বই খুব বেশী নাই।

পরলোকের কথা যে-পরিমাণে মনোরম সেই পরিমাণেই প্রমাণ-সাপেক্ষ। এখনও পৃথিবীতে এমন লোক অনেক আছেন যাঁহারা "অয়ং লোকো নাস্তি পর ইতি মানী"। এই বই পড়িয়াও তাঁহাদের সকল সন্দেহ যে ভঞ্জন হইবে না তাহা অনুমান করা কঠিন নহে।

যাঁহারা বিশ্বাসী, তাঁহারা শুধু পরলোক আছে ইহা জানিয়াই সন্তুষ্ট নহেন সেখানে প্রেতাত্মারা কি ভাবে বাস করে তাহাও জানিতে চাহেন। আলোচ্য গ্রন্থের লেখক এবং তাঁহার সহকর্ম্মীরাও আবিষ্ট ব্যক্তির দেহে আবির্ভূত প্রেতাত্মাদের সঙ্গে কথাবার্ত্তা কহিয়া এ-বিষয়ে সত্য-নির্দ্ধারণের চেষ্টা করিয়াছেন। বৈজ্ঞানিকের নিক্তিতে এ সব আবিষ্কার ওজন করিলে হয়ত একেবারে সন্দেহের অতীত বলিয়া প্রতীয়মান না-ও হইতে পারে। তথাপি অবিশ্বাসীও এ-সব পড়িয়া আনন্দ পাইবেন আর যিনি বিশ্বাসী তাঁর ত কথাই নাই।

গ্রন্থকার একজন লব্ধপ্রতিষ্ঠ প্রবীণ ব্যক্তি। তাঁহার কাছে যে-সব ঘটনার বিবরণ পাওয়া যাইতেছে সেগুলি একেবারে ফুৎকারে উড়াইয়া দেওয়ার উপায় নাই। তবে, স্যর অলিভার লজের মত বৈজ্ঞানিকদের সাক্ষ্য সত্ত্বেও পরলোকে অনাস্থা অনেকের মন হইতে দূর হয় নাই; সুতরাং মৃণালবাবুর সাক্ষ্যও যে সকলের মনের সন্দেহ অপনোদিত করিতে সমর্থ হইবে না ইহা ধরিয়া লওয়া যাইতে পারে।

শ্রীউমেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য

পারিজাত—শ্রীনারদমোহিনী বসু প্রণীত এবং ৮২ সাউথ রোড ইণ্টালি হইতে অনিলকুমার বসুকর্ত্তৃক প্রকাশিত।

এই গ্রন্থের কবি স্বর্গগতা এক বিদুষী নারী। বাল্যকাল হইতেই এই নারী কাব্যলক্ষ্মীর কৃপা লাভ করেন। গ্রন্থকর্ত্রীর বাল্য কৈশোর এবং সমগ্র জীবনেরই বহু কবিতা এই গ্রন্থে আছে। প্রাচীন ছন্দে কবিতাগুলি লিখিত হইলেও ইহা পাঠে এক পবিত্র আনন্দ পাওয়া যায় ইহাই এই গ্রন্থের বৈশিষ্ট্য। ছাপা ও বাঁধাই সুন্দর।

শ্রীশৌরীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য

বিশ্ব-রাষ্ট্র-সঙ্ঘ·· (বিশ্বরাষ্ট্রের দপ্তরখানা হইতে প্রকাশিত) প্রাপ্তিস্থান :--দি বুক কোম্পানী লিমিটেড কলিকাতা। মূল্য ছয় আনা।

কিছু দিন পূর্ব্বে বিশ্বরাষ্ট্র-সঙ্ঘ স্থির করেন যে নানা ভাষায় সঙ্ঘের উদ্দেশ্য গঠনপদ্ধতি ও কার্য্যপ্রণালী সম্বন্ধে একখানি পুস্তক রচনা করা হইবে। তদনুসারে ইংরেজীতে একখানি Hand-book লিখিত হয়। "বিশ্ব-রাষ্ট্র-সঙ্ঘ" এই ইংরেজী পুস্তিকার বঙ্গানুবাদ। অনুবাদ যতদূর সম্ভব সরস ও প্রাঞ্জল হইয়াছে। অনুবাদকের কৃতিত্ব আরও বেশী প্রকাশ পাইয়াছে তাঁহার নানা ইংরেজী শব্দের বাংলা প্রতিশব্দ বাছাই করাতে। প্রতিশব্দগুলি যেমন শুনিতে ভাল হইয়াছে অর্থপ্রকাশেও তেমনি নিখুঁত হইয়াছে বলিয়া মনে হয়। প্রতি স্কুলের শিক্ষক শিক্ষয়িত্রী এই বইখানি পাঠ করিয়া বিশ্বরাষ্ট্র-সঙ্ঘ সম্বন্ধে অনেক জ্ঞাতব্য বিষয় ছাত্র-ছাত্রীদের বলিতে পারিবেন। আমরা পুস্তিকাখানির বহুল প্রচার কামনা করি।

শ্রীনরেশচন্দ্র রায়

মায়াবাদ—সাধু শান্তিনাথ বিরচিত। বাঙালী সাধু শান্তিনাথ "নাথজী" বলিয়া উত্তর-ভারতের বহুস্থানে সুপরিচিত। তিনি বেদান্ত-মতের অর্থাৎ অদ্বৈতভাবের সাধক। প্রাচীন শাস্ত্রসমূহ হইতে মায়াবাদের মূল বিষয় উদ্ধার করিয়া বাঙালী পাঠকের জন্য বাংলা ভাষায় তাহা মুদ্রিত করিয়াছেন। কিন্তু গ্রন্থখানি এত সংস্কৃত-পরিভাষা-বহুল যে, সাধারণ পাঠকগণের নিকট ইহা দুর্ব্বোধ্য। নাথজী এই পুস্তক বিনামূল্যে ও বিনামাশুলে দিবার ব্যবস্থা করিয়াছেন। উদ্দেশ্য---বাংলা দেশে বেদান্ত-প্রচার। কিন্তু উপরোক্ত কারণে তাঁহার উদ্দেশ্য কতদূর সফল হইবে তাহা অনিশ্চিত। বেদান্ত শাস্ত্রে যাঁহারা অনেকটা ব্যুৎপত্তি লাভ করিয়াছেন "মায়াবাদ" তাঁহাদের উপকারে আসিবে।

স্বামী চন্দ্রেশ্বরানন্দ
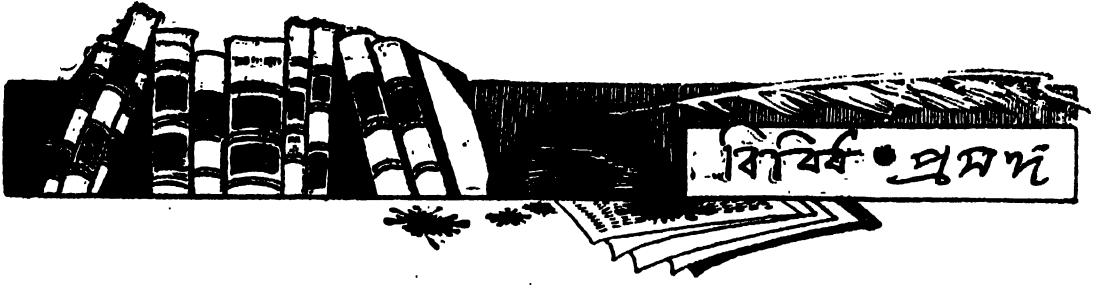
মহাত্মা গান্ধীর উপবাসভঙ্গ

একুশ দিন অনাহারে থাকিয়া মহাত্মা গান্ধী যে নির্বিঘ্নে উপবাস ভঙ্গ করিতে পারিয়াছেন, তাহা তাঁহার ভারতবর্ষীয় স্বদেশবাসীদের আনন্দের কারণ হইয়াছে। বিদেশী অনেকেও তাহাতে আহ্লাদিত হইয়াছেন। এখন তিনি দীর্ঘজীবী হইয়া সুস্থ শরীরে মানবের কল্যাণসাধনে ব্যাপৃত থাকিতে পারিলে আরও আনন্দের কারণ হইবে।

উপবাসভঙ্গের পর প্রথম প্রথম কয়েক দিন তাঁহার যেরূপ দৈহিক উন্নতি হইতেছিল, সম্প্রতি তাহা না হওয়ায় কিছু উদ্বেগের কারণ ঘটিয়াছে। তিনি যদি কিছুদিন খবরের কাগজ না পড়েন, অন্য প্রকারেও তাঁহার নিকট বাহিরের খবর না পৌঁছে, এবং তিনি সম্পূর্ণ বিশ্রাম করিতে পারেন, তাহা হইলে তাঁহার বললাভে ব্যাঘাত ঘটিবে না আশা করা যায়। (২৬শে জ্যৈষ্ঠ, ৯ই জুন।) তাঁহার স্বাস্থ্যের পরবর্তী সংবাদ অপেক্ষাকৃত ভাল।

মহাত্মা গান্ধীর অসাধারণত্ব কোথায় ?

মহাত্মা গান্ধী একুশ দিন উপবাসের পরেও জীবিত থাকায় সেই ঘটনাটিকে 'অলৌকিক' বলিয়া এবং তাঁহার অসাধারণত্বের প্রমাণ বলিয়া তাঁহার অনেক ভক্ত বর্ণনা করিতেছেন। ইহাতে তাঁহাকে খাট করা হইতেছে। বর্ত্তমান বৎসরের আগে এবং বর্ত্তমান বৎসরে মহাত্মাজীর সঙ্গে সঙ্গেও অনেকে একুশ বা তার চেয়ে বেশী দিন অনাহারে থাকিয়া জীবিত ছিলেন ও আছেন। মহাত্মাজী উপবাসের সময় যে-প্রকার সুবন্দোবস্তে ও পরিচর্য্যায় দক্ষ লোকদের শুশ্রূষাধীন এবং প্রসিদ্ধ ডাক্তারদের পর্য্যবেক্ষণাধীন ছিলেন, ঐ সব উপবাসকারীরা তাহা ছিলেন না। সুতরাং উপবাসের দৈর্ঘ্যই যদি অসাধারণত্বের কারণ ও প্রমাণ হইত, তাহা হইলে ঐ সকল ব্যক্তি মহাত্মাজীর সমান, কেহ কেহ বা তাঁর চেয়েও অধিক অসাধারণ বলিয়া পরিগণিত হইতেন।

মহাত্মাজীর উপবাস ও তাহার দৈর্ঘ্য তাঁহার অসাধারণত্বের কারণ ও প্রমাণ নহে। তিনি যে অসাধারণ মানুষ তাহা নিঃসন্দেহ। তিনি অসাধারণ পুরুষ বলিয়াই উপবাস করিয়াছেন এরূপ কারণে ও উদ্দেশ্যে, যেরূপ কারণে ও উদ্দেশ্যে সচরাচর লোকেরা উপবাস করে না। উপবাসের প্রথা আগে হইতেই ছিল। সেই প্রথার অনুসরণ ও প্রয়োগ তিনি অসাধারণ রকমে করিয়াছেন।

মহাত্মাজীর অসাধারণত্ব তাঁহার সাধনা ও চরিত্রে। তিনি, "জগদ্ধিতায়" জগতের হিতার্থ জীবন ধারণ করিতেছেন, কোন দুঃখকেই দুঃখ মনে করেন না, এবং নিজের জীবনের ব্রত পালনের জন্য মৃত্যু ও জীবন উভয়কেই আলিঙ্গন করিতে সমভাবে প্রস্তুত আছেন।

রাজনৈতিক এবং অন্য অনেক বিষয়ে তাঁহার বুদ্ধিমত্তা ও বিচক্ষণতাও কম নহে। অল্প লোকেরই তাহা আছে। কিন্তু এইরূপ বিষয়-সকলের প্রত্যেকটিতেই তিনি অসাধারণ কি-না, সে-বিষয়ে মতদ্বৈধ আছে।

বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষায় এবং অন্য কোন কোন পরীক্ষায় পারদর্শিতা অনুসারে কাহার স্থান কিরূপ হইল, তাহা জানিবার কৌতূহল অনেকেরই থাকে। পৃথিবীর মধ্যে বড় মনীষী, বড় লেখক, ইত্যাদি কোন্ দশ বিশ বা পচিশজন এবং তাঁহারা কে কার উপরে বা নীচে, এবম্বিধ প্রশ্নাবলীর উত্তরে তালিকা প্রস্তুতও অনেক বার হইয়াছে। আমরা এই রকম সব ব্যাপারের ভিত্তীভূত কোন প্রকার মনোভাব লইয়া "মহাত্মাজীর অসাধারণত্ব কোথায় ?" এ প্রশ্ন করি নাই। আমাদের উত্তরের যে আভাস দিয়াছি, তাহা ঠিক না হইতে পারে। কিন্তু ইহা আমরা ধ্রুব সত্য বলিয়া মনে করি, যে, তাঁহার অসাধারণত্ব বুজরুকি-জাতীয় কোন কিছুতে নহে, তিনি বুজরুক নহেন। প্রকৃত মহাপুরুষরা নিজেদের অসাধারণত্ব প্রমাণ করিবার জন্য "অলৌকিক" শক্তির পরিচয় দিতে রাজী হন না। বর্ত্তমান সময়েও অনেক বুজরুক ও

হঠযোগী অনেক "অলৌকিক" শক্তির পরিচয় দেন। কিন্তু তাঁহারা মহাপুরুষ নহেন।

আবার কি আইন অমান্য করা হইবে ?

গান্ধীজী উপবাস আরম্ভ করিবার সময় ঘোষিত হইয়াছিল, যে, ছয় সপ্তাহের জন্য আইন অমান্য করিবার প্রচেষ্টা স্থগিত থাকিবে। ৪ঠা আষাঢ় ১৮ই জুন এই ছয় সপ্তাহ শেষ হইবে। ৫ই আষাঢ় হইতে কংগ্রেসের লোকেরা আবার আইন অমান্য করিতে আরম্ভ করিবেন কি-না, অনেকে আলোচনা করিতেছেন। ঠিক কি করা হইবে, কংগ্রেসদলভুক্ত কেহও এখন বলিতে পারেন না—অন্যেরা ত পারেনই না।

মহাত্মাজী যখন উপবাস আরম্ভ করায় কারামুক্ত হন, তাহার আগে হইতেই দেশের প্রায় সর্ব্বত্র নিরুপদ্রব আইন-লঙ্ঘন-প্রচেষ্টা মন্দীভূত বা বন্ধ হইয়া গিয়াছিল—তা যে কারণেই হউক। সুতরাং উহা ছয় সপ্তাহ স্থগিত রাখিবার কাল উত্তীর্ণ হইয়া গেলেই আপনা আপনি উহা নবীভূত হইবে মনে হয় না। তবে, কংগ্রেসনেতারা একত্র মিলিত হইয়া যদি বলেন, যে, উহা আবার চালান হউক, তাহা হইলে সে চেষ্টা হইতে পারে বটে। কিন্তু অনেক নেতা এখনও জেলে আছেন। যাঁহারা বিচারান্তে নির্দ্দিষ্ট কালের জন্য কারারুদ্ধ হইয়াছেন, তাঁহাদের মুক্তির দিন জানা আছে; যাঁহারা বিনা বিচারে বন্দী হইয়াছেন, তাঁহারা কবে খালাস পাইবেন জানা নাই। অতএব সকল কংগ্রেসনেতা একত্র বসিয়া পরামর্শ করিবার সুযোগ কখন পাইবেন, কেহ বলিতে পারে না। তদ্ভিন্ন, মহাত্মা গান্ধী সুস্থ হইয়া না উঠিলে তাঁহার সঙ্গে আলোচনা চলিতে পারে না, এবং তাঁহার পরামর্শ ব্যতিরেকে কর্ত্তব্যনির্দ্ধারণ হইতে পারে না।

৫ই আষাঢ় নাগাদ যদি গান্ধীজী বেশ সুস্থ হইয়া না উঠেন, তাহা হইলে আরও কিছু দিনের জন্য আইন-লঙ্ঘন-প্রচেষ্টা স্থগিত রাখা বোধ করি সমীচীন বিবেচিত হইবে।

ব্রিটিশ গবর্ন্মেণ্টকে রবীন্দ্রনাথ প্রভৃতির অনুরোধ

রবীন্দ্রনাথপ্রমুখ ৭৩ জন ভারতবর্ষের অধিবাসী ব্রিটিশ প্রধান মন্ত্রী ও ভারত-সচিবকে একটি টেলিগ্রাম পাঠাইয়াছেন। তাহাতে অন্যান্য কথার মধ্যে এই অনুরোধ আছে, যে, বিনা বিচারে যাঁহারা বন্দী আছেন তাঁহাদিগকে এবং ভায়োলেন্স বা বলপ্রয়োগের সহিত সম্পর্কশূন্য রাজনৈতিক "অপরাধে"র জন্য কারারুদ্ধ ব্যক্তিগণকে মুক্তি দেওয়া হউক এবং ভারতবর্ষের ভবিষ্যৎ রাষ্ট্রবিধি ও শাসনপ্রণালী রচনার যে চেষ্টা হইতেছে, কংগ্রেসকে তাহাতে সহযোগিতা করিবার সুযোগ দেওয়া হউক। কংগ্রেস ছয় সপ্তাহ কাল দলস্থ লোকদিগকে আইন অমান্য করা হইতে নিবৃত্ত থাকিতে বলিয়া যে মনোভাবের আভাস দিয়াছেন, রবীন্দ্রনাথপ্রমুখ ব্যক্তিরা গবর্ন্মেণ্টকে তাহারই সাড়া দিতে বলিয়াছেন।

এই টেলিগ্রাম প্রেরণের উপর সংবাদপত্রে টিপ্পনী নানাবিধ হইয়াছে এবং হওয়া স্বাভাবিক ও উচিত। সম্পূর্ণ বা আংশিক সম্মতিসূচক মন্তব্যগুলি সম্বন্ধে কিছু লেখা অনাবশ্যক। বিরুদ্ধ সমালোচনার কিছু উল্লেখ এবং তৎসম্বন্ধে কিছু মন্তব্য প্রকাশ করিতে হইবে। আমি স্বাক্ষরকারীদের মধ্যে এক জন বলিয়া কিছু সঙ্কোচের সহিত তাহা করিতেছি।

কেহ কেহ লিখিয়াছেন, গবর্ন্মেণ্ট এরূপ অনুরোধে কর্ণপাত করিবেন না, ইহাকে হয়ত স্বাক্ষরকারীদের অনধিকারচর্চ্চা মনে করিবেন, সুতরাং ইহা নিষ্ফল ও না-করাই উচিত ছিল। খুব সম্ভব, ফল এইরূপই হইবে—গবর্ন্মেণ্ট স্বাক্ষরকারীদের কথায় কান দিবেন না। অযাচিত পরামর্শদানের ঐরূপ সম্মান মোটেই বিরল নহে। তবে, এখানে বিবেচ্য এই যে, সংবাদপত্রের সম্পাদকেরা খুব চরমপন্থী সম্পাদকেরাও গবর্ন্মেণ্টকে অযাচিত পরামর্শ নিজেদের কাগজে লিখিয়া দিয়া থাকেন। গবর্ন্মেণ্টের কি করা উচিত, কাগজে তাহা লেখার মানেই গবর্ন্মেণ্টকে পরামর্শ দেওয়া ও অনুরোধ করা। সম্পাদকেরা কাগজে যাহা লিখিয়া ক্ষান্ত থাকেন, কংগ্রেস আইন-লঙ্ঘন-প্রচেষ্টা স্থগিত রাখায় ভারতীয় সম্পাদকেরা যাহা গবর্ন্মেণ্টের কর্ত্তব্য বলিয়া নিজের নিজের কাগজে লিখিয়াছিলেন, কিন্তু কোন রাজপুরুষকে টেলিগ্রাফযোগে জানান নাই, রবীন্দ্রনাথ-প্রমুখ ব্যক্তিরা সেইরূপ কিছু কথাই বিলাতে রাজপুরুষদিগকে টেলিগ্রাফ করিয়াছেন—প্রভেদ এই মাত্র। আমাদের বোধ হয়, রাজপুরুষদিগকে অনুরোধ উপরোধ করা ও পরামর্শ দেওয়ার বাস্তবিক বা সম্ভাবিত ব্যর্থতা সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ প্রভৃতি প্রত্যেক স্বাক্ষরকারী সম্পূর্ণ অজ্ঞ নহেন। আগামানে

কতকগুলি বন্দীর প্রায়োপবেশন উপলক্ষ্যে আলবার্ট হলে প্রথম যে সভা হয়, তাহাতে গবন্মেণ্টকে কিছু অনুরোধ করা হয়। সেই সভায় আমি বলিয়াছিলাম, "অরণ্যে-রোদন" দুই প্রকার। বৃক্ষপূর্ণ জনমানবশূন্য অরণ্যে রোদন একবিধ অরণ্যে-রোদন, এবং রাষ্ট্রীয়শক্তিহীনলোকারণ্যে রোদন অন্যবিধ অরণ্যে-রোদন; কারণ উভয়ই নিষ্ফল। গবন্মেণ্টকে আমাদের অনুরোধ অরণ্যে-রোদন, কিন্তু স্বভাবের দোষে বা মনের কষ্টে বা কাহারও হিতার্থে তাহা আমরা করিয়া থাকি।" বোধ করি, ভারতীয় সব সম্পাদকই কখন-না-কখন ইহা করিয়া থাকেন। সুতরাং তদ্রূপ কাজের জন্য রবীন্দ্রনাথ প্রভৃতির স্বভাবে বিশেষ কোন অসাধারণত্ব আরোপ করা যায় না।

অনুরোধের ফল যাহাই হউক, গবন্মেণ্টকে যে অনুরোধ করা হইয়াছে, তাহা আমাদের বিবেচনায় ঠিক, এবং স্বদেশের কল্যাণকামনায় তাহা করা অনুচিত হয় নাই।

টেলিগ্রামটিকে লিবার্যাল ম্যানিফেষ্টো (মতজ্ঞাপক পত্র) বা মূভ (চা'ল) বলা হইয়াছে। তাহা হইতে পারে। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ এবং আরও কোন কোন স্বাক্ষরকারী লিবার্যাল বা অন্য কোন রাজনৈতিক দলের লোক নহেন।

আর একটি মন্তব্য এই, যে, গবন্মেণ্ট কংগ্রেসের প্রচেষ্টা স্থগিত রাখিবার ঘোষণায় সাড়া দিতে যেরূপ অবজ্ঞার সহিত অস্বীকার করিয়াছেন এবং অন্যান্য প্রকারেও জনমতে উপেক্ষা প্রদর্শন করিয়াছেন, তাহাতে গবন্মেণ্টকে আবার কোন অনুরোধ-উপরোধ করা অপমানকর। এইরূপ মনোভাব অসঙ্গত বা অস্বাভাবিক নহে। পরাধীনতা সাতিশয় অপমানকর। এই অপমানকর অবস্থা হইতে উদ্ধারলাভ করিবার জন্য কেহ অস্ত্র ধারণ করে, কেহ-বা নিরুপদ্রব অহিংস প্রতিরোধের পন্থা অবলম্বন করে। এরূপ কোন উপায়ই যাহারা, যে-কোন কারণেই হউক, অবলম্বন করে নাই অথচ যাহারা পদলেহন করিতেও রাজী নয়, তাহাদের পক্ষে গবন্মেণ্টের কর্ত্তব্য পুনঃ পুনঃ নির্দ্দেশ করিয়া দেওয়াটা অনুচিত মনে করি না। কারণ ইহাতে গবন্মেণ্টের এবং ভারতীয় লোকদের উভয়েরই কল্যাণের সম্ভাবনা। দুর্নীতির কাজ, নীচাশয়তার কাজ করা সর্ব্বদা অনুচিত। কিন্তু অপমানকর পরাধীন অবস্থা হইতে মুক্তিলাভের জন্য সশস্ত্র বা নিরস্ত্র বিদ্রোহ ছাড়া আর কোন অপমানহীন পন্থাই নাই, মনে করি না। অবশ্য ইহা ইতিহাস-সমর্থিত সত্য, যে, পরাধীন জাতিদের স্বাবলম্বী হইয়া কেবলমাত্র নিজেদের শক্তির দ্বারা স্বাধিকার অর্জ্জনের চেষ্টা অপেক্ষা অধিকতর সম্মানকর ও স্ফূর্ত্তিজনক কোন পন্থা নাই। কিন্তু যদি কোন কারণে তাহা ব্যর্থ হয় বা সেইরূপ পথ অবলম্বন করা না-চলে, তাহা হইলে নিশ্চেষ্ট ভাবে পরাধীনতা মানিয়া লওয়া, অভিমান করিয়া ঘরে বসিয়া থাকা, কিংবা আত্মহত্যা করা ছাড়া অন্য কর্ত্তব্যও থাকিতে পারে। (২৬ শে জ্যৈষ্ঠ।)

এরূপও লিখিত হইয়াছে, যে, গবন্মেণ্ট বরাবর তাঁহাদের দমননীতি ও তদ্বিধ অন্যান্য নীতি এবং কার্য্যপ্রণালী অভ্রান্ত, এবং তাহা ক্রমশঃ অধিক হইতে অধিকতর ভারতীয়দের সমর্থন পাইতেছে বলিয়া দাবি করেন, এবং ইহাও দাবি করেন, যে, অধিকাংশ ভারতীয় কংগ্রেসের উপর বিরক্ত এবং কংগ্রেসের সহিত গবন্মেণ্টের সংগ্রামে গবন্মেণ্টের পোষকতা করে: কিন্তু স্বাক্ষরকারীরা প্রধান মন্ত্রী ও ভারত-সচিবকে যে টেলিগ্রাম পাঠাইয়াছেন, তাহাতে এই সরকারী দাবির সত্যতা কার্য্যতঃ অস্বীকৃত হইয়াছে, এবং ইহাই প্রমাণিত হইয়াছে, যে, প্রভাবশালী ও জ্ঞানালোকপ্রাপ্ত বহু ব্যক্তির মত গবন্মেণ্টের সমর্থক নহে। আমরাও মনে করি, টেলিগ্রামটি হইতে পরোক্ষভাবে এইরূপ অনুমান করা যুক্তিসঙ্গত।

কিন্তু স্বাক্ষরকারীদের টেলিগ্রামের উল্লিখিতরূপ প্রশংসার সঙ্গে সঙ্গে ইহাও বলা হইয়াছে, যে, আবেদন-নিবেদন-অনুরোধে গবন্মেণ্টের কার্য্যপ্রণালীর সংশোধন ও ব্যবহারের উন্নতি হইবে না: তার চেয়ে বেশী ফলপ্রদ কিছু চাই--তাহা স্বশাসক ব্রিটিশ ডোমীনিয়নগুলি বহু পূর্ব্বে প্রমাণ করিয়া দিয়াছে; অবস্থার উন্নতির জন্য জনগণ এখন আর কর্ত্তৃপক্ষের মুখাপেক্ষা করে না, তাহারা তাহাদের নেতৃবর্গ ও বিশ্বাসভাজন মুখপাত্রদের উপর নির্ভর করে, এবং তাঁহাদের নিকট হইতে 'কাজ' চায়, কথা নহে।

কথাগুলিতে শৌর্য্যের ভঙ্গী আছে, এবং এই ইঙ্গিতও আছে, যে, স্বাক্ষরকারীরা নেতা নহেন ও জনগণের বিশ্বাস-ভাজন মুখপাত্র নহেন। আমাদের মন্তব্য এই, যে, কথাগুলির মধ্যে যতটুকু সত্য আছে, তাহা সম্ভবতঃ স্বাক্ষরকারীরা অনবগত নহেন; মহাত্মা গান্ধীর চেয়ে বড় নেতা কেহ

নাই এবং তাঁর চেয়ে অধিকতর লোকের বিশ্বাসভাজন মুখপাত্রও অন্য কেহ নাই; এবং মহাত্মাজীর উপবাস আরম্ভের সময়কার মতজ্ঞাপক পত্রের মধ্যে নিহিত ও ছয় সপ্তাহের জন্য আইন-লঙ্ঘন আন্দোলন স্থগিত রাখার মধ্যে নিহিত ইঙ্গিতের এবং স্বাক্ষরকারীদের টেলিগ্রামের মধ্যে অসামঞ্জস্য নাই। মহাত্মাজীর ইঙ্গিতটিকে যদি 'কাজ' বলা চলে, তাহা হইলে স্বাক্ষরকারীদের টেলিগ্রামটিকেও 'কাজ' বলা যাইতে পারে। কিন্তু যদি ইঙ্গিতটি কেবল শব্দসমষ্টি, তাহা হইলে টেলিগ্রামটিও শব্দসমষ্টি মাত্র।

একটি প্রভেদ অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে। মহাত্মাজীর ইঙ্গিতের মর্য্যাদা গবর্মেণ্ট রক্ষা না-করিলে তিনি ও তাঁহার অন্তরঙ্গ বন্ধু ও সহচর অনুচরেরা ব্যক্তিগত-স্বাধীনতা ও জীবন পণ করিয়া অহিংস্র রকমের কিছু করিতে পারেন— ইহা অসম্ভব নহে। কিন্তু স্বাক্ষরকারীদের টেলিগ্রাফিক অনুরোধ রক্ষিত না হইলে তাঁহারা কেহ সেরূপ কিছু করিবেন কি-না, তাহা অনিশ্চিত।

এ পর্য্যন্ত আমরা বাংলা দেশের কোন কোন মতের উল্লেখ ও আলোচনা করিয়াছি। পঞ্জাবের প্রাচীনতম ও শ্রেষ্ঠ দৈনিক ট্রিবিউনের মত নীচে উদ্ধৃত হইল।

It is impossible to think of a weightier or more authoritative representation than what has just been cabled to the Prime Minister, the Secretary of State for India and the Lord President of the Council by a large number of distinguished Indians urging the release of political prisoners and the immediate ending of the present disastrous conflict between the Government and the Congress. The signatories to the cable not only include the large majority of the best known public men in all provinces, not directly asssociated with the Congress, but are in the highest and truest sense representative of all that is good and true in our public life. There are among them men of letters and science of world-wide fame, men who have held the highest offices open to Indians, both in British India and in the Indian States, an ex-Governor and several ex-Ministers, men whom the British Government itself has delighted to honour and to decorate with titles and distinctions, representatives of all ranks of society, of all communities, of both sexes, of all learned and honourable professions, eminent lawyers, eminent journalists, eminent business men, eminent doctors, eminent legislators, eminent educationists, men who have made their mark in the sphere of social reform. Even the landed aristocracy is represented on the list by several of its leading members. In point of fact we do not remember any previous occasion when an appeal of this kind was addressed to the British Government by so highly influential and so thoroughly representative a body of Indians. No Government with the slightest pretension to statesmanship or political sanity can lightly treat an appeal addressed to it by so eminently representative a body of citizens.

Add to this the fact that the appeal is as irresistible on its merits as it is influentially signed.

—

ভারতীয়শাসন-সংস্কারের জন্য পার্লেমেণ্টের কমিটি

ভারতবর্ষের বর্ত্তমান রাষ্ট্রবিধি ও শাসনপ্রণালীর পরিবর্ত্তে অন্য প্রকার বিধি ও প্রণালী রচনার নিমিত্ত তথাকথিত গোলটেবিল বৈঠক তিনবার হইয়া গিয়াছে। তাহাতে গবর্মেণ্ট কোন-না-কোন অধিবেশনে যে-সকল ভারতীয়কে "প্রতিনিধি" মনোনীত করিয়াছিলেন, তাঁহাদের মর্য্যাদা ও ক্ষমতা—অন্ততঃ নামে ও কথায় ব্রিটিশ প্রতিনিধিদের সমান ছিল। গোলটেবিল বৈঠকের তিন অধিবেশনের পর "সাদা কাগজ" বা হোয়াইট পেপার বাহির হইয়াছে। তাহাতে যে-সব প্রস্তাব আছে, তাহার বিচার ও বিবেচনা করিবার নিমিত্ত পার্লেমেণ্টের দুই কক্ষ হাউস অব লর্ডস ও হাউস অব কমন্সের কয়েক জন সভ্যকে লইয়া একটি কমিটি হইয়াছে। এবার যে-সব ভারতীয়কে এই কমিটির কাজে সহযোগিতা করিবার জন্য লওয়া হইয়াছে, তাঁহাদের মর্য্যাদা ও ক্ষমতা নামতও ব্রিটিশ সভ্যদের সমান নহে; তাঁহারা "পরামর্শদাতা" মাত্র—প্রায় সাক্ষীরই সামিল। তবে, তাঁহারা ব্রিটিশ ও ভারতীয় সাক্ষীদিগকে প্রশ্ন ও জেরা করিতে পারিবেন বটে।

তিন তিন বার গোলটেবিল বৈঠকের অধিবেশনের পর, ভারতীয়দের পক্ষে অনিষ্টকর ও সম্পূর্ণ অসন্তোষজনক হোয়াইট পেপারের প্রস্তাবগুলি রচিত হইয়াছে। গোলটেবিল বৈঠকে যে-সব ভারতীয় গিয়াছিলেন, এবারকার ভারতীয় "পরামর্শদাতা" ও সাক্ষীরা তাঁদের চেয়ে শক্তিমান্ লোক নহেন, তাঁদের মর্য্যাদা, অধিকার এবং ক্ষমতাও আগেকার ভারতীয় "প্রতিনিধি"দের চেয়ে কম। সুতরাং এবারকার লণ্ডনযাত্রী ভারতীয়দের সফরের ফলে হোয়াইট পেপারের উন্নতি হইবে আশা করা যায় না, অবনতির সম্ভাবনাই অধিক— বিশেষতঃ চার্চিল কোম্পানী যেরূপ আন্দোলন ও ন্যাকামি আরম্ভ করিয়াছে তজ্জন্য। তাহাদের সোরগোলে অবশ্য আমরা এরূপ ভ্রমে পতিত হই নাই, যে, হোয়াইট পেপারের দ্বারা বাস্তবিকই ভারতীয়দিগকে কোন রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা দেওয়া হইতেছে।

এবারকার লণ্ডনযাত্রী ভারতীয়দের বিদেশ ভ্রমণ ভারতবর্ষকে স্বরাজের পথে একটুও অগ্রসর করিয়া দিবে না বলিয়াছি। কিন্তু কোন-না-কোন দল, শ্রেণী বা সম্প্রদায়ের স্বার্থ বেশী করিয়া সিদ্ধ হইতেও পারে। এরূপ স্বার্থ-সিদ্ধির মানে স্বরাজের বিঘ্ন উৎপাদন। হোয়াইট পেপারে, হিন্দুদের—বিশেষতঃ বঙ্গের হিন্দুদের, প্রতি ঘোর অবিচার হইয়াছে। ভারতবর্ষকে স্বরাজ না দিয়াও তাহার প্রতিকার করা যায়। কিন্তু সে প্রতিকারেরই বা আশা কতটুকু?

আবার ঐক্য-কন্‌ফারেন্সের প্রস্তাব

মৌলানা শৌকৎ আলী প্রস্তাব করিয়াছেন, যে. হিন্দু মুসলমান শিখ খ্রীষ্টিয়ান প্রভৃতির মধ্যে একতা স্থাপনের চেষ্টা পুনর্ব্বার করা হউক। একতা স্থাপন যদি প্রকৃত ও একমাত্র উদ্দেশ্য হয়, তাহা হইলে পুনর্ব্বার চেষ্টা করায় আমাদের কোন আপত্তি নাই। কিন্তু গত বারের অভিজ্ঞতা হইতে যাহা জানা গিয়াছে, তাহা মনে রাখা দরকার। বাংলা দেশের সকল প্রকার রাজনৈতিক মতের হিন্দু প্রতিনিধিদের যে কন্‌ফারেন্স বিড়লা-পার্কে হয়, তাহাতে তাঁহারা এই সর্ত্তে কতকগুলি প্রস্তাবে সম্মতি দিয়াছিলেন, যে, স্বরাজ-সংগ্রামে মুসলমান ও হিন্দু পরস্পরের সহায় ও সহকর্ম্মী হইবেন, মুসলমান ও হিন্দুদিগকে ব্যবস্থাপক সভায় আরও যে-কয়টি আসন দিতে হইবে, তাহা দিতে হইবে ইউরোপীয়দিগের আসন কমাইয়া, এবং ইউরোপীয়দের আসন কমাইবার চেষ্টা মুসলমান ও হিন্দুকে একযোগে করিতে হইবে। কিন্তু এলাহাবাদের মিলন-বৈঠকে এই সর্ত্তটি সম্পূর্ণ চাপা পড়িয়া গিয়াছিল।

এলাহাবাদ মিলন-বৈঠকে হিন্দুরা মুসলমানদের পক্ষে সুবিধাজনক কোন কোন প্রস্তাবে কোন কোন সর্ত্তে রাজী হইয়াছিলেন—যেমন সিন্ধুদেশকে বোম্বাই প্রেসিডেন্সী হইতে পৃথক করিবার প্রস্তাব। তাহার ফলে ভারত-সচিব স্যর সামুয়েল হোর রাজনৈতিক নিলামের ডাক হাঁকিলেন—তিনি মুসলমানদিগকে উক্ত প্রস্তাবগুলি অপেক্ষা অধিক সুবিধা বিনা-সর্ত্তে দিলেন এবং তাহার দ্বারা বহুসংখ্যক মুসলমানের সমর্থন ও আনুগত্য বেশী করিয়া পাইলেন। এইরূপ রাজনৈতিক নিলামের সুযোগ দেওয়া অবশ্য মিলন-কন্‌ফারেন্সের সকল পক্ষের উদ্দেশ্য ছিল না। কিন্তু কার্য্যতঃ যদি প্রস্তাবিত ভবিষ্যৎ কন্‌ফারেন্সে পুনর্ব্বার ভারত-সচিবকে ঐরূপ সুযোগ দেওয়া হয়, তাহা কি বাঞ্ছনীয় হইবে? এরূপ সুযোগ না-দিয়া মিলন-কন্‌ফারেন্স হইতে পারে কি-না, তাহাই বিবেচ্য।

ভারতীয় রাষ্ট্রনীতি-ক্ষেত্রে সাম্প্রদায়িকতা

পঞ্জাবের ডক্টর মোহাম্মদ আলম রাষ্ট্রনীতিক্ষেত্র হইতে সাম্প্রদায়িকতার বিষ দূর করিবার চেষ্টা করিতেছেন। সাম্প্রদায়িকতা দূর করিবার অকপট চেষ্টার সহিত আমাদের সম্পূর্ণ সহানুভূতি আছে।

ডক্টর আলম তাঁহার একটি মতজ্ঞাপক পত্রে একটি তথ্যের ভুল করিয়াছেন বলিয়া আমাদের মনে হয়। তিনি বলিয়াছেন, ষোল-সতর বৎসর পূর্ব্বে হিন্দু-মুসলমানে মিলিয়া লক্ষ্ণৌতে যে প্যাক্ট বা চুক্তি করেন, তাহাই রাষ্ট্রনীতিক্ষেত্রে সাম্প্রদায়িকতার সূত্রপাত। ইহা ভুল। সূত্রপাত উহা নহে। যাহা মর্লী-মিণ্টো রিফর্মর্স্ (সংস্কার) বলিয়া পরিচিত, তাহার প্রাক্কালে বড়লাট লর্ড মিণ্টো কোন কোন মুসলমান নেতাকে এই সঙ্কেত করেন, যে. তাঁহারা ব্যবস্থাপক সভায় স্বতন্ত্র প্রতিনিধিত্ব ও আসনের দাবি করুন। তদনুসারে আগা খানের নেতৃত্বে মুসলমান প্রতিনিধিবর্গ লর্ড মিণ্টোর নিকট উপস্থিত হইয়া ঐরূপ দাবি জানান। পরলোকগত মৌলানা মোহাম্মদ আলী কংগ্রেসের কোকনদ অধিবেশনের সভাপতি রূপে নিজের অভিভাষণে এই ব্যাপারটিকে কম্যাণ্ড্ পার্ফর্ম্যান্স বা অনুজ্ঞাকৃত অভিনয় বলিয়াছিলেন; অর্থাৎ আগা খান্ প্রমুখ নেতৃবর্গ বড়লাটের হুকুমে তাঁহার কাছে দরবার করিয়াছিলেন। বহরমপুরে বঙ্গীয় প্রাদেশিক কন্‌ফারেন্সের গত অধিবেশনে অভ্যর্থনা-সমিতির সভাপতি মৌলবী আবদুস সমদও আগা খানের ডেপুটেশ্যনের উৎপত্তির বর্ণনা ঐরূপ করিয়াছিলেন। ইহার মুদ্রিত অন্য প্রমাণও আছে। অন্যতম ভূতপূর্ব্ব ভারত-সচিব লর্ড মর্লী একজন প্রসিদ্ধ লেখক। তাঁহার আমলেই এই ব্যাপারটি ঘটে। তিনি এই ঘটনাটিকে লক্ষ্য করিয়া ১৯০৯ সালের ৬ই ডিসেম্বর বড়লাট লর্ড মিণ্টোকে লেখেন :—

"*December* 6.—I won't follow you again into our Mahometan dispute. Only I respectfully remind you

once more that it was *your* early speech about their extra claims that first started the M. (*i. e.*, the Mahometan) hare."—Morley's *Recollections*, vol. ii, p. 325.

নূতন রকমের ট্যাক্স

গত মহাযুদ্ধের পর ইউরোপে যে-কয়টি নূতন রাষ্ট্র গঠিত হয়, চেকোস্লোভাকিয়া তাহার মধ্যে অন্যতম। এই রাষ্ট্র নানাদিকে খুব প্রগতিশীল। ইহার গবন্মেণ্ট বিবাহের যৌতুকের উপর ট্যাক্স বসাইয়াছেন।

আফ্রিকার কঙ্গো দেশের উরুণ্ডি ও রুয়াণ্ডা প্রদেশদ্বয়ে বেল্‌জিয়ান গবন্মেণ্ট কাহারও একটির বেশী স্ত্রী থাকিলে অতিরিক্ত প্রত্যেক স্ত্রীর জন্য স্বামীর উপর ট্যাক্স বসান।

ভারতবর্ষে যৌতুকের (অর্থাৎ কার্য্যতঃ বরপণ ও কন্যাপণের) উপর এবং বহুপত্নীক স্বামীদের উপর ট্যাক্স বসাইলে মন্দ হয় না। কিন্তু তাহা হইলে অনেক হিন্দু ও মুসলমান বলিবে, "ধর্ম্ম গেল," "আমাদের ধর্ম্মের উপর হস্তক্ষেপ করা হইতেছে"!

কিন্তু পৃথিবীর প্রধান মুসলমান দেশ তুরস্ক আইন দ্বারা বহুবিবাহ বন্ধ করিয়া দিয়াছে, এবং হিন্দু সমাজের কোন কোন জাতি নিজেদের বেরাদরির মধ্যে সর্ব্বসম্মতিক্রমে অতি সামান্য যৌতুকের ব্যবস্থা করিয়াছে। তুরস্কের মুসলমানদের ধর্ম্ম যায় নাই, এবং এই সকল হিন্দুরও ধর্ম্ম যায় নাই।

হিন্দুদের অনৈক্যের একটি কারণ

হিন্দুদের—বিশেষতঃ বাঙালী হিন্দুদের—অনৈক্যের একটি কারণ তাহাদের অসাধারণ বুদ্ধিমত্তা। সংস্কৃতে একটি বচনের শেষে বলা হইয়াছে, "নাসৌ মুনির্যস্য মতং ন ভিন্নম্," "তিনি মুনি নহেন যাঁহার মত ভিন্ন নহে।" আমরা হিন্দুরা মনে করি, যাঁহার মত ভিন্ন নহে, তিনি ত মুনি নহেনই, এমন কি বুদ্ধিমানও নহেন।

বিশ্বভারতীর ভারতীয়তা

বিশ্বভারতীর নবপ্রকাশিত ইংরেজী অনুষ্ঠানপত্রে দেখিলাম, এখন ইহাতে ভারতবর্ষের নিম্নলিখিত প্রদেশ ও দেশী রাজ্যগুলি হইতে আগত ছাত্র-ছাত্রী শিক্ষালাভ করিতেছে :—

আসাম, বাংলা, বিহার, আগ্রা-অযোধ্যা, বোম্বাই (সিন্ধু, গুজরাট), মালাবার, মান্দ্রাজ, অন্ধ্রদেশ, মহীশূর, হায়দরাবাদ, ত্রিবাঙ্কুর, পঞ্জাব, এবং উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ। তদ্ভিন্ন সিংহলের ছাত্রও আছে।

বিশ্বভারতীর বিদ্যালয় বিভাগে শিক্ষার বাহন বাংলা। অবাঙালী ছাত্রছাত্রীরা তাহা সহজেই শিখিয়া ফেলে। যাহাদের মাতৃভাষা উর্দ্দু, হিন্দী বা গুজরাটী, তাহাদের ঐ ঐ ভাষা শিখিবার বন্দোবস্তও আছে।

সম্প্রদায়-বিশেষের দ্বারা স্বরাজ অর্জ্জন

মহাত্মা গান্ধী এক সময় বলিয়াছিলেন—হয়ত অনেক বার বলিয়াছেন, যে, একা গুজরাটই ভারতবর্ষে স্বরাজ স্থাপন করিতে পারে। তাঁহার কথাটির তাৎপর্য্য এ নয়, যে, অন্য কোন প্রদেশের লোকদের স্বরাজ-সংগ্রামে যোগ দেওয়া অনাবশ্যক, কিংবা তাহারা এই সংগ্রামের যোগ্য নহে। তিনি ইহাই বলিতে চাহিয়াছিলেন, যে, শুধু গুজরাটে যত লোক আছে, কেবল ততগুলি পুরুষনারীর সম্মিলিত চেষ্টাতেই স্বরাজ অর্জ্জিত হইতে পারে। গুজরাটী যাহাদের মাতৃভাষা তাহাদের সংখ্যা মোটামুটি এক কোটি। এক কোটি লোক স্বরাজের চেষ্টা করিলে তাহা লাভ করা অসাধ্য নয়, ৩৫ কোটি চেষ্টা করিলে ত সুসাধ্যই হয়। ইহার মধ্যে একটা কথা উহ্য আছে। এক কোটি যদি চেষ্টা করে, বাকী ৩৪ কোটি যদি উদাসীন ও নিশ্চেষ্ট থাকে, তাহা হইলেও স্বরাজ লব্ধ হইতে পারে। কিন্তু যদি কেবল মাত্র ষাট-সত্তর হাজার লোক চেষ্টা করে, বহু কোটি লোক উদাসীন থাকে, এবং কয়েক লক্ষ লোকও স্বরাজ-বিরোধীদের দলে গিয়া স্বরাজলাভে বাধা দেয়, তাহা হইলে স্বরাজ পাওয়া খুব কঠিন হইয়া উঠে।

আমরা ইহা ধরিয়া লইয়া উপরের মতগুলি প্রকাশ করিতেছি, যে, স্বরাজ-সংগ্রামটি হইবে অহিংস ও বলপ্রয়োগশূন্য, কিন্তু স্বরাজপ্রতিষ্ঠায় বাধা-দান অহিংস ও সহিংস এবং বলপ্রয়োগশূন্য ও বলপ্রয়োগসাপেক্ষ উভয়বিধ উপায়েই হইতে পারে।

আরও একটা কথা উহ্য আছে। অপেক্ষাকৃত অল্পসংখ্যক লোক যদি স্বরাজলাভের চেষ্টা করে, তাহা হইলে বাকী লোকদের উদাসীন বা শত্রুভাবাপন্ন হইবার সম্ভাবনা কম হইবে,

যদি তাহারা বুঝিতে পারে, যে, ঐ অল্পসংখ্যক স্বরাজলিপ্সুরা কেবল নিজেদের সুবিধার জন্য স্বরাজ চাহিতেছে না, কিন্তু সকলের কল্যাণ ও সুবিধার জন্য চাহিতেছে। সম্প্রতি দুই জন হিন্দুনেতা স্বরাজলাভ সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছেন, তাহা পড়িয়া পূর্ব্বোক্ত চিন্তাগুলি আমাদের মনে উদিত হইয়াছে।

পঞ্জাবের ভাই পরমানন্দ এবং মহারাষ্ট্রের ডাক্তার মুঞ্জে এই মর্ম্মের কথা বলিয়াছেন, যে, হিন্দু-মুসলমান একযোগে কাজ না করিলে স্বরাজ লব্ধ হইতেই পারে না, এরূপ মত প্রচার দ্বারা অনিষ্ট হইয়াছে। আমরাও ইহা সত্য মনে করি -যদিও আমরা হিন্দু-মুসলমানের মিলন খুবই চাই। ভারতবর্ষের সকল ধর্ম্মসম্প্রদায়ের, বিশেষতঃ হিন্দু ও মুসলমানের, সম্মিলিত চেষ্টায় স্বরাজ যত শীঘ্র ও সহজে লব্ধ হইতে পারে, আলাদা আলাদা চেষ্টায় তাহা হইতে পারে না, ইহা সত্য কথা। কিন্তু স্বতন্ত্র চেষ্টায় কিছুই হইতে পারে না, ইহা সত্য নহে। আমাদের মনে হয়, হিন্দু মুসলমান শিখ খ্রীষ্টিয়ান প্রভৃতি ধর্ম্মসম্প্রদায়ের লোকেরা যদি সকল সম্প্রদায়ের লোকদের কল্যাণ ও সুবিধার জন্য স্বরাজলাভের চেষ্টা করেন এবং ভাবেন ও বলেন, "আমরা স্বরাজলাভের চেষ্টা করিতেছি, অন্যেরা যদি আমাদের সঙ্গে যোগ দেন ভালই, তাহা আমরা খুবই চাই, কিন্তু তাহারা যোগ না-দিলেও আমরা স্বরাজসংগ্রাম চালাইতে থাকিব এবং আমরা সফলকাম হইলে তাহার ফলভোগ সকলেই করিবেন," তাহা হইলে তাহার ফল ভাল হইবে। অন্য সম্প্রদায়ের লোকেরা এই ভাবে কাজ করুন বা না-করুন, হিন্দুরা ইহা করিয়া আসিতেছেন।

দুঃখের বিষয়, সকল ভাল চেষ্টা ও কাজে বিঘ্ন অনেক।

ভারতবর্ষে হিন্দুদের সংখ্যা বেশী এবং ইংরেজ-রাজত্বকালে তাহারাই আগে শিক্ষার সুযোগ গ্রহণ করে। রাজনৈতিক জাগরণও তাহাদের মধ্যে আগে হয়। এই সব কারণে স্বরাজসংগ্রামের গোড়া হইতেই স্বরাজসৈনিকদের মধ্যে হিন্দুর সংখ্যা বরাবরই বেশী। কিন্তু এই আধিক্য স্বরাজবিরোধী-দিগকে হিন্দুদের স্বরাজপ্রিয়তার বিকৃত ব্যাখ্যা করিবার সুযোগ ও সুবিধা দিয়াছে। তাহারা অহিন্দুদিগকে বরাবর বুঝাইতে চেষ্টা করিয়া আসিতেছে, "দেখ, হিন্দুরা যে এত স্বরাজপ্রিয়, স্বরাজের জন্য এত চেষ্টা, এত স্বার্থত্যাগ, এত দুঃখবরণ করে, ইহার মধ্যে নিশ্চয়ই কোন দুরভিসন্ধি আছে—তাহারা নিজেদের জন্যই স্বরাজ চায়।" অথচ, সাবেক আমলের কংগ্রেসে ও আধুনিক কংগ্রেসে হিন্দুদের সংখ্যা খুব বেশী হইলেও কংগ্রেস যাহা কিছু চাহিয়াছে, সকল সম্প্রদায়ের জন্য চাহিয়াছে, কেবল হিন্দুদের জন্য কিছু চায় নাই; অহিন্দুদের অনিষ্টকর কিছু ত চাই-ই নাই। ভারতীয় জাতীয় উদারনৈতিক সংঘ আর একটি অসাম্প্রদায়িক রাজনৈতিক সভা। ইহাতেও হিন্দুদের সংখ্যা বেশী। কিন্তু ইহাও যাহা কিছু চাহিয়াছে, সকল সম্প্রদায়ের জন্যই চাহিয়াছে, কেবল হিন্দুদের জন্য নহে, এবং অহিন্দুদের পক্ষে অনিষ্টকর কিছু চায় নাই। হিন্দু মহাসভা কেবল মাত্র হিন্দুদের সভা, কিন্তু ইহাও রাজনীতিক্ষেত্রে কেবলমাত্র হিন্দুদের পক্ষে সুবিধাজনক এবং অন্যদের পক্ষে অনিষ্টকর কিছু চায় নাই, ইহা বরাবরই এরূপ রাষ্ট্রবিধি ও শাসনপ্রণালী চাহিয়াছে যাহা সম্পূর্ণ গণতান্ত্রিক (ডিমোক্র্যাটিক) ও স্বাজাতিক (ন্যাশন্যালিষ্টিক); অন্যেরা সাক্ষাৎ বা পরোক্ষ ভাবে হিন্দুদের প্রতি অবিচার ও অন্যায় ব্যবহার চাওয়ায় ও করায় হিন্দু মহাসভা আত্মরক্ষার্থ প্রতিবাদ করিতে বাধ্য হইয়াছে। ডাঃ মুঞ্জের নিন্দা অনেকে করেন। তিনি নিখুঁত মানুষ নন। কিন্তু তিনিও অহিন্দু কোন সম্প্রদায়ের অহিতকর কিছু চান নাই। তাঁহার বাঞ্ছিত রাষ্ট্রবিধি ও শাসনপ্রণালী সম্পূর্ণ স্বাজাতিক (ন্যাশন্যালিষ্টিক)।

হিন্দুদের মধ্যে "উচ্চ" বর্ণের হিন্দুরাই আগে শিক্ষার সুযোগ গ্রহণ করায়, প্রধানতঃ তাহারাই স্কুল-কলেজ স্থাপন করায়, সেটাও যেন একটা দোষ এইরূপ কুব্যাখ্যা করা হইয়াছে। স্বরাজসংগ্রামে অগ্রণী "উচ্চ" শ্রেণীর হিন্দুরা, সুতরাং ইহার মধ্যে তাহাদের কোন কুমতলব আছে, এইরূপ সন্দেহ "নিম্ন" শ্রেণীর হিন্দুদের মনে জন্মাইবার চেষ্টা করা হইয়াছে। অথচ অসাম্প্রদায়িক কংগ্রেস ও অসাম্প্রদায়িক উদারনৈতিক সংঘ শুধু "উচ্চ" শ্রেণীর হিন্দুদের জন্য কিছু চায় নাই, "নিম্ন" শ্রেণীর হিন্দুদের অনিষ্ট চায় নাই। পক্ষান্তরে, "নিম্ন" শ্রেণীর হিন্দুদের শিক্ষাবিষয়ক ও সামাজিক উন্নতির চেষ্টা "উচ্চ" শ্রেণীর হিন্দুরা গবর্ন্মেণ্টের আগে আরম্ভ করিয়াছেন। প্রধানতঃ "উচ্চ" শ্রেণীর হিন্দুরা স্বরাজসংগ্রাম আরম্ভ করিবার পরে তবে গবর্ন্মেণ্ট নিজের বন্ধুত্ব ও হিতৈষিতা প্রমাণ করিবার নিমিত্ত প্রধানতঃ মুসলমানদিগকে এবং সামান্য পরিমাণে "নিম্ন" শ্রেণীর হিন্দুদিগকে শিক্ষা ও

চাকরি পাইবার বিশেষ সুযোগ দিতে আরম্ভ করিয়াছেন। তাহারও একটা উদ্দেশ্য এই, যে, যাহাতে মুসলমানরা ও "নিম্ন" শ্রেণীর হিন্দুরা স্বরাজ সংগ্রামে "উচ্চ" শ্রেণীর হিন্দুদের সঙ্গে যোগ না-দেয়। এই উদ্দেশ্য কতকটা সিদ্ধও হইয়াছে।

তথাপি "উচ্চ" শ্রেণীর হিন্দুদের মধ্যে যাঁহারা স্বরাজ-সৈনিক, "নিম্ন" শ্রেণীর হিন্দুদের মধ্যে যাঁহারা স্বরাজসৈনিক এবং মুসলমান ও অন্যান্য অহিন্দুদের মধ্যে যাঁহারা স্বরাজ-সৈনিক, তাঁহারা একযোগে বা আলাদা আলাদা স্বরাজসংগ্রাম চালাইবেন, আশা করিতে দোষ নাই। সম্মিলিত সংগ্রামে শীঘ্র সাফল্যের সম্ভাবনা অধিকতর, কিন্তু স্বতন্ত্র সংগ্রামও ব্যর্থ হইবে না। শীঘ্র বা বিলম্বে সফলতা যখন আসিবে, তখন স্বরাজ সম্বন্ধে উদাসীন ও স্বরাজলাভে বিঘ্ন-উৎপাদকেরা ও তাহাদের বংশধররাও উহার সুফল ভোগ করিবে- হয়ত অনুতাপ ও লজ্জার সহিত ভোগ করিবে।

—

সকল দলের সম্মিলিত দাবি ও মিলনের উপর অতিরিক্ত গুরুত্ব আরোপ

ব্রিটিশ গবন্মে´ণ্ট বলিয়া আসিতেছেন, ভারতীয়েরা সর্ব্বদলসম্মত, সর্ব্ববাদিসম্মত একটা কিছু রাষ্ট্রবিধি শাসন-বিধি চাহিলে তাহা দেওয়া হইবে- অন্ততঃ বিবেচিত হইবে। কিন্তু ছোট ছোট দেশের অল্পসংখ্যক লোকেরাও সম্পূর্ণ একমত হইতে কচিৎ পারিয়াছে। ভারতবর্ষের মত বৃহৎ দেশের বহু কোটি লোকের ঐকমত্য আরও কঠিন। স্বাভাবিক বাধা ছাড়া কৃত্রিম বাধাও উৎপাদিত হইয়া আসিতেছে। স্বরাজ সম্বন্ধে উদাসীন কিংবা স্বরাজের বিরোধী নগণ্য লোক ও নগণ্য দলকেও গবন্মে´ণ্ট স্বরাজলিপ্সু যোগ্যতম লোক ও অতিপ্রভাবশালী ও সংখ্যাবহুল দলের সমান বা তদপেক্ষাও মান্যগণ্য বলিয়া বাহ্যতঃ স্বীকার করিয়া আসিতেছেন; তাহাদের সরকারী সম্মান এবং চাকরিলাভ ইত্যাদি ত হইতেছেই। লর্ড মিণ্টোর আমল হইতে স্বতন্ত্র আসন, সংখ্যানুপাত অপেক্ষা অধিকতর আসন ইত্যাদির ব্যবস্থা কোন কোন সম্প্রদায়ের জন্য হইয়া আসিতেছে। এই সব মিলন-পরিপন্থী ব্যবস্থা যাঁহারা করেন, তাঁহাদের মুখ দিয়াই আবার সম্পূর্ণ ঐকমত্যের দাবিও বাহির হয়। উভয়ের মধ্যে সঙ্গতি ও সামঞ্জস্য নাই।

অতীতকালে সম্পূর্ণ অহিংস উপায়ে কোন পরাধীন ভূখণ্ড স্বাধীন হয় নাই, অথচ আমাদের অবলম্বিত উপায় অহিংস। এই জন্য যুদ্ধ দ্বারা বা কতকটা সহিংস উপায় দ্বারা যাহারা স্বাধীন হইয়াছিল, তাহাদের দৃষ্টান্ত ভিন্ন অন্য এমন কোন দৃষ্টান্ত নাই যাহার দ্বারা আমাদের মত সমর্থন করা যায়। আমরা এই কারণেই আমেরিকা ও আয়ার্ল্যাণ্ডের দৃষ্টান্ত দিতেছি, নতুবা দেশকালপাত্রভেদ থাকায় তাহাদের অবলম্বিত উপায় যে ভারতবর্ষের অবলম্বনীয় উপায় নহে তাহা আমরা বুঝি। এখন, যাহা বলিতে চাই, তাহা বলি।

ব্রিটেনের অধীন আমেরিকার কতকগুলি উপনিবেশ যখন স্বতন্ত্র ও স্বাধীন হইবার চেষ্টা করে, তখন সকল উপনিবেশ এই চেষ্টায় যোগ দেয় নাই, কয়েকটি উপনিবেশ ব্রিটেনভুক্ত ও স্বাধীনতার বিরোধী ছিল। ইহারা এখন কানাডা নামে উল্লিখিত হয় এবং ব্রিটেনের সহিত ইহারা এক সাম্রাজ্যভুক্ত। কিন্তু অন্য উপনিবেশগুলির স্বাধীনতা-প্রিয়তা অজেয় ছিল বলিয়া তাহারা সফলকাম হয়। তাহাদের নাম হইয়াছে আমেরিকার ইউনাইটেড্ ষ্টেট্স্। আমেরিকার উপনিবেশগুলির সম্পূর্ণ ঐকমত্য না থাকা সত্ত্বেও ব্রিটেন ইউনাইটেড্ ষ্টেট্সের স্বাতন্ত্র্য স্বীকার করিতে বাধ্য হইয়াছে। আয়ার্ল্যাণ্ডের স্বরাজসংগ্রামেও বরাবর দলাদলি হইয়া আসিতেছে। আধুনিক নেতাদের নাম করিলে একটিকে ডি ভ্যালেরার অন্যটিকে কস্‌গ্রেভের দল বলিতে হয়। সম্পূর্ণ ঐকমত্য সেখানে আগেও ছিল না, এখনও নাই। কিন্তু তাহা সত্ত্বেও একটি দলের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইতেছে এবং তাহার দাবি ও কাজ ব্রিটেন অগত্যা মানিয়া লইতেছে।

ধর্ম্মসাম্প্রদায়িক অমিলন ও ঝগড়া আমেরিকা ও আয়ার্ল্যাণ্ড উভয়ত্রই রাজনৈতিক দলাদলি ও বিবাদের সঙ্গে জড়িত হইয়া আসিয়াছে ও আসিতেছে; ফলে সাতিশয় অবাঞ্ছনীয় ভীষণ রক্তারক্তিও হইয়াছে।

পূর্ব্বেই আভাস দিয়াছি, বিদেশী সহিংস স্বাধীনতা-সংগ্রামের সহিত ভারতীয় অহিংস স্বরাজলাভ-চেষ্টার সাদৃশ্য নাই। কিন্তু ভবিষ্যৎ চরম ফলে এই সাদৃশ্য জন্মিবার সম্ভাবনা আছে বলিয়া আমরা মনে করি, যে, সকল দলের সম্মিলিত চেষ্টা না-থাকিলেও সকলের চেয়ে উদ্যোগী, স্বার্থত্যাগী,

আত্মোৎসর্গপরায়ণ ও ন্যায়নিষ্ঠ দলের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইতে পারে।

ভারতীয় স্বদেশপ্রেমিক লোকেরা সকল ধর্ম্মসম্প্রদায় ও সকল দলের মধ্যে একতা স্থাপনের চেষ্টা অবশ্যই করিতে থাকুন। সম্পূর্ণ একতা স্থাপিত না হইলেও, যে-পরিমাণে একতা স্থাপিত হইবে, সেই পরিমাণে স্বরাজলাভ সহজ হইবে এবং শীঘ্র সম্পাদ্য হইবে। কিন্তু একতার অপেক্ষায় স্বরাজলাভ-চেষ্টা স্থগিত রাখা অনুচিত। একতার খাতিরে কোন সম্প্রদায়ের বা দলের স্বাজাতিকতা ও গণতান্ত্রিকতার বিরোধী কোন দাবি বা আবদার মানিয়া লওয়াও অনুচিত। মানিয়া লইলে দাবি ও আবদার বাড়িয়াই চলিবে, একতা হইবে না, স্বরাজও পাওয়া যাইবে না।

সুভাষচন্দ্র বসু ও বিঠলভাই পটেলে স্বাস্থ্য ও কর্ম্মিষ্ঠতা

শ্রীযুক্ত বিঠলভাই পটেল ও সুভাষচন্দ্র বসু এখনও আরোগ্য লাভ করিতে না-পারিলেও এতটা যে সুস্থ হইয়াছেন, যে, ভারতবর্ষসম্বন্ধীয় ও আন্তর্জাতিক সভাসমিতির জন্য লিখিতে ও সুযোগ পাইলে তৎসমুদয়ের অধিবেশনে বক্তৃতা করিতে পারিতেছেন, ইহা আনন্দের বিষয়। তাঁহারা সম্পূর্ণ সুস্থ হইয়া উঠিলে তাঁহাদের কর্ম্মিষ্ঠতা নিশ্চয়ই আরও বৃদ্ধি পাইবে। সুভাষ বাবু ভিয়েনা মিউনিসিপালিটির অভিজ্ঞতা হইতে কলিকাতার উন্নতির উপায় চিন্তা ও নির্দ্দেশ করিতেছেন।

বাঙালীদের মানসিক ও অন্যবিধ শক্তি

বাঙালীরা স্বভাবতঃ ভারতবর্ষের অন্যান্য জাতির চেয়ে বুদ্ধিমান ও প্রতিভাশালী ইহা যেমন বলা চলে না, তাহাদের বুদ্ধি ও প্রতিভা কমিয়া গিয়াছে, ইহাও তেমনি বলা চলে না।

বাঙালী ও অন্য ভারতীয়েরা যে-সব প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষা দেয় তাহাতে আজকাল বাঙালী ছাত্রেরা উচ্চ স্থান অধিকার করে না, নির্ব্বাচিত ছাত্রদের মধ্যে কখন কখন এক জন বাঙালীরও নাম থাকে না। ইহা হইতে অনেকেই মনে করেন, বাঙালী ছেলেদের বুদ্ধি ও শ্রমশক্তি কমিয়া গিয়াছে। কিন্তু ইহা বাঙালী জাতির বুদ্ধি কমিয়া যাইবার একটা প্রমাণ মোটেই নহে।

সকলেই জানেন, আজকাল অনেক ছেলে বড় চাকরি পাওয়াটাকেই একটা বড় উদ্দেশ্য মনে করে না। এই কারণে ইহা সম্ভব, যে, আগে যত খুব বুদ্ধিমান্ বাঙালী ছেলে চাকরির জন্য প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষা দিত, এখন তত দেয় না। তারপর, আর একটা কথা বিবেচ্য। আগে আগে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে কোন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়া যত কঠিন ছিল, অনেক বৎসর হইতে তত কঠিন নাই। তার মানে, এখন আগেকার চেয়ে কম পরিশ্রমে প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হওয়া যায়। ইহাতে ছাত্রদের শ্রমের অভ্যাস কমিয়া থাকিবে, এবং শ্রমের অভ্যাস কম হওয়ায় অপেক্ষাকৃত ভাল ছেলেরাও অন্যান্য প্রদেশের পরিশ্রমী ভাল ছেলেদের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় পারিয়া উঠে না। কিন্তু ইহাতে প্রমাণ হয় না, যে, বাঙালীর বুদ্ধি কমিয়া গিয়াছে।

বাংলা দেশে সংগৃহীত রাজস্ব গবন্মেণ্ট ভারতবর্ষের নানা প্রদেশে খরচ করেন। বাংলা ছাড়া আর সব বড় প্রদেশেই শিক্ষাপ্রণালীর উন্নতির চেষ্টা ও তজ্জন্য অর্থব্যয় বেশী হয়। এই কারণে বাংলা দেশে ছাত্রদের শিক্ষা আজকাল সম্ভবতঃ অন্য কোন কোন প্রদেশের চেয়ে নিকৃষ্ট রকমের হয়।

কোন কোন প্রদেশে প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষা পাস করাইবার জন্য বিশেষ রকম শিক্ষা দেওয়া হয়। বাংলা দেশে সেরূপ কোন বন্দোবস্ত নাই।

তাহার পর প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষার প্রণালীর মধ্যেই দোষ থাকিতে পারে। ইংরেজরা ভারতীয়দের মধ্যে বাঙালী-দিগকে যতটা কম ভাল বাসে, অন্য কাহাকেও ততটা নহে। এই জন্য, যে-সব পরীক্ষায় ইংরেজদের কর্ত্তৃত্ব আছে, তাহাতে—বিশেষ করিয়া মৌখিক (oral বা *viva voce* অংশে)—অজ্ঞাতসারে বাঙালী পরীক্ষার্থীদের প্রতি অবিচার হইতে পারে;—জ্ঞাতসারে অবিচারও হইতে পারে, কিন্তু তাহা হয়, তাহার কোন প্রমাণ আমাদের নিকট নাই। ইংরেজ ছাড়া অন্য অবাঙালী পরীক্ষকেরা সকলেই যে বাঙালীদের প্রতি ন্যায়বিচার করিতে সর্ব্বদা সমুৎসুক, এরূপ মনে করিবার কারণ নাই।

এইরূপ নানাবিধ কারণে বাঙালী ছাত্রেরা প্রতিযোগিতা-

মূলক পরীক্ষায় আগেকার মত কৃতকার্য্য না হইতে পারে। বাঙালী জাতির বুদ্ধি কমিয়া যায় নাই।

তাহার একরকম প্রমাণ আগে একাধিকবার দিয়াছিলাম, আধুনিক অন্য প্রমাণ একটা দিতেছি।

জার্ম্যানদের কাছে বাঙালীও যা, অন্য ভারতীয়েরাও তাই। বাঙালীদের প্রতি পক্ষপাতিত্ব করিবার তাহাদের কোন কারণ নাই।

ডয়েশ (জার্ম্যান) একাডেমির ইণ্ডিয়া ইন্সটিটিউটে ভারতীয় গ্র্যাজুয়েট বিদ্যার্থীদিগকে ভিন্ন ভিন্ন জার্ম্যান বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়িবার জন্য ছয়টি বৃত্তি দিবেন বলিয়া আবেদন চাহিয়াছিলেন। আবেদকদিগের মধ্যে যে ছয় জনকে বৃত্তি দেওয়া হইয়াছে, তাঁহাদের মধ্যে তিন জন বাঙালী। আবেদন করিয়াছিলেন সকল প্রদেশের গ্র্যাজুয়েট বিদ্যার্থীরা। ভারতবর্ষীয় গ্রাজুয়েট বিদ্যার্থীদিগকে এইরূপ বৃত্তি আগে আগেও দেওয়া হইয়াছিল। তাঁহাদের মধ্যে যাঁহাদের কাজে ভিন্ন ভিন্ন জার্ম্যান বিদ্যাপীঠের অধ্যক্ষেরা অধিক সন্তুষ্ট হইয়াছেন, এইরূপ দশ জনকে ডক্টর উপাধি পাইবার নিমিত্ত অধ্যয়নে সমর্থ করিবার জন্য আরও কিছু কাল সাহায্য দেওয়া হইবে। এই দশ জনের মধ্যে পাঁচ জন বাঙালী।

ডয়েশ (জার্ম্যান) একাডেমির ইণ্ডিয়া ইন্সটিটিউটের বৃত্তিপ্রাপ্ত যে তিন জন ভারতীয় গ্র্যাজুয়েট গত সেমেষ্টারে (বর্ষার্দ্ধে) ডক্টর উপাধি পাইয়াছেন, তাঁহারা তিন জনেই বাঙালী।

এই সকল তথ্য হইতে ইহা মনে হয় না, যে, বাঙালী ছাত্র-ছাত্রীদের বুদ্ধি কমিয়া গিয়াছে। মানসিকশক্তিসাপেক্ষ যে-কোন কাজ করিবার শক্তি অন্য জাতিদের মত বাঙালীর আগেও ছিল, এখনও আছে। কিন্তু বুদ্ধির সুপ্রয়োগ চাই এবং পরিশ্রম করা চাই। পরিশ্রম না করিলে শুধু বুদ্ধি ও প্রতিভার জোরে বড় কিছু করা যায় না।

বাঙালীদের অন্য দিকেও শক্তি আছে। কোন কোন খেলায় বাঙালীরা আগে খুব নাম করিয়াছিল। এখনও স্বাস্থ্যের সর্ব্ববিধ নিয়ম মানিয়া চলিয়া পরিশ্রম ও অভ্যাস করিলে, অন্যেরা যাহা করিতে পারে, বাঙালীরাও তাহা করিতে পারে। সে-দিকে মন না দিয়া আজকাল শুনিতেছি কোন কোন বাঙালী খেলার দল জিতিবার লোভে অন্য প্রদেশ হইতে পেশাদার খেলোয়াড় আনিয়া নিজেদের দলভুক্ত করিতেছে। ইহা ঠিক নয়। সকল প্রদেশের লোকেরা খেলায় এবং অন্য সব বিষয়ে উন্নতি করেন, ইহা খুবই বাঞ্ছনীয়। কিন্তু যাহা বাঙালীর দল বলিয়া পরিচিত, তাহাকে বাঙালীর দল রাখিয়াই তাহার উন্নতি করা উচিত। যদি পটলডাঙার একটা দল থাকে, কিন্তু তাহাতে ক্রমে ক্রমে পাটনা বা পেশাওয়ারের খেলোয়াড় জোটান হয়, তাহা হইলে তাহার পটলডাঙা নামটাও বদলান উচিত।

—

ব্যবসা-বাণিজ্যে বাঙালী

বর্ত্তমান সময়ে, অন্য প্রদেশের কথা দূরে থাক্, বাংলা দেশেরই ব্যবসা-বাণিজ্যে বাঙালীর স্থান অতি সামান্য। বড় বড় কারখানা ও সওদাগরীতে ত বাঙালীর স্থান সামান্য বটেই, ছোট ছোট ব্যবসাও বঙ্গের বাহিরের লোকেরা আসিয়া অনেক পরিমাণে দখল করিয়া বসিয়াছে এবং ক্রমশঃ আরও দখল করিতেছে। ইহা হইতে অনেকে মনে করে, ব্যবসা-বাণিজ্যে বাঙালীর বুদ্ধিই কম। কিন্তু বর্ত্তমান সময়ে বঙ্গে ব্যবসা-বাণিজ্যে বাঙালীর অপ্রাধান্য ব্যবসা-বুদ্ধির অভাব জন্য নহে, ইহার অন্য কারণ আছে। মানুষের মস্তিষ্কটা ব্যবসা-বুদ্ধির একটা খোপ, পরীক্ষা পাস করিবার একটা খোপ, রাষ্ট্রনীতি বুঝিবার একটা খোপ, ধর্ম্ম ও সমাজ-সংস্কারের উপায় আবিষ্কারের একটা খোপ—এই রকম আলাদা আলাদা নানা খোপে বিভক্ত নয়। বুদ্ধিশক্তিটা একই, তাহার অনুশীলন ও প্রয়োগ নানা দিকে হইতে পারে। অবশ্য ইহা ঠিক বটে, যে, এক এক জন মানুষের শিক্ষা সাহচর্য্য বংশানুক্রম প্রভৃতি কারণে বুদ্ধিটা যে-দিকে সহজে যায় ও খেলে, অন্য এক জন মানুষের বুদ্ধি সেই দিকে সহজে তত না-যাইতে না-খেলিতে পারে। কিন্তু একটা দেশের সমগ্র অধিবাসীদের বুদ্ধি একটা বিশেষ দিকে খেলিতেই পারে না—এমন হয় না। গত শতাব্দীর যাটের কোটায় জাপানের নূতন যুগ আরম্ভ হইবার পূর্ব্বে সেখানে বৈশ্যবৃত্তি অর্থাৎ ব্যবসাবাণিজ্য অবজ্ঞাত ছিল, জাপানী অভিজাতদের মধ্যে ব্যারন শিবুশাওয়া প্রথমে বৈশ্যবৃত্তির দিকে ঝোঁকেন। তাহার পর এখন এক শতাব্দী যাইতে না-যাইতেই জাপানের বাণিজ্যিক প্রতিযোগিতায় নেপোলিয়ন যে-জাতিকে

দোকানদারের জা'ত বলিয়াছিলেন সেই ইংরেজ জাতি পর্য্যন্ত অতিষ্ঠ হইয়া উঠিয়াছে।

বাঙালীদের মধ্যে আগে বড় বড় সওদাগর ছিল, ইংরেজ-রাজত্বেরও গোড়ার দিকে বড় বাঙালী বণিক ছিল, এখনও অল্পসংখ্যক এরূপ লোক আছে। তাহাতেই প্রমাণ হয়, যে, বাঙালীর বুদ্ধি ব্যবসা-বাণিজ্যের ক্ষেত্রেও তাহার কৃতিত্বের কারণ হইতে পারে।

যে-যে অবস্থা ও কারণের জন্যই হউক, বাঙালীরা একটু আগে ইংরেজী শিখিয়াছিল। কেরানী ও অন্য নিম্নপদস্থ কর্ম্মচারীর দরকার হওয়ায় ইংরেজ রাজপুরুষেরা প্রথমটা বাঙালীদিগকে ঐ সব চাকরি দিত এবং অনুগ্রহ করিত। ডাক্তারী ওকালতী ব্যারিষ্টারীতেও প্রথম প্রথম বাঙালীদের বিশেষ সুবিধা হইয়াছিল তাহাদের ইংরেজী শেখার গুণে। এই হেতু বাঙালীরা ধনাগমের প্রধান উপায় ব্যবসা-বাণিজ্যে মন দেয় নাই। ইত্যবসরে অন্যেরা সেই ক্ষেত্র দখল করিয়াছে। তা ছাড়া, আরও একটা কারণে বাঙালীদের ব্যবসা-বাণিজ্যে অবনতি হইয়াছে। *হিন্দু বাঙালীদের মধ্যে যে-সব জাতির* লোকে বৈশ্যবৃত্তি করে, তাহাদের সামাজিক মর্য্যাদা ও সম্মান যথেষ্ট নহে। ইংলণ্ডের বড় বড় ব্যবসাদার লর্ড-শ্রেণীতে উন্নীত হইয়া অভিজাতদের মধ্যে পরিগণিত হয়। আমাদের সমাজে তাহা হইবার জো নাই। এখানে এক জন সরকারী কেরানী বাবুর যে সামাজিক মর্য্যাদা আছে, তাহার শতগুণ আয়ের শতগুণ দানশীল ব্যবসাদারের সে সম্মান না-থাকিতে পারে। এইরূপ অবজ্ঞাত বৃত্তি অবলম্বন করার চেয়ে পনের কুড়ি টাকার কেরানীগিরি পছন্দ করার ইহা একটা কারণ।

বাঙালী যদি ব্যবসা-বাণিজ্যে মন দেয়, তাহা হইলে নিশ্চয়ই তাহাতেও সফলতা লাভ করিতে পারে। অবশ্য ব্যবসায়ী হইতে ইচ্ছা করিলেই হওয়া যায় না। ইহারও শিক্ষা এবং শিক্ষানবিশী চাই। এই শিক্ষা কেহ যাচিয়া দিবে না, পাইবার বিধিমত নানা চেষ্টা করিতে হইবে। তাহার পর মূলধনের কথা। কিছু টাকা না-থাকিলে ব্যবসা করা চলে না। আগেকার কালের অনেক বাঙালী ব্যবসাদার অতি সামান্য অবস্থা হইতে ধনী সওদাগর হইয়াছিলেন। বর্ত্তমানে যে-সব মাড়োয়ারী ও অন্য ব্যবসাদারেরা কলিকাতার প্রধান বণিক, তাঁহারা প্রত্যেকেই উত্তরাধিকার-সূত্রে প্রভূত মূলধন পাইয়া তাহার সাহায্যে ব্যবসা আরম্ভ করেন নাই। অনেককে সামান্য মজুরীর কাজ করিয়া তাহা হইতে টাকা জমাইয়া ক্রমশঃ বৃহৎ হইতে বৃহত্তর কারবার করিতে হইয়াছিল। দরিদ্র বাঙালীদিগকেও তাহা করিতে হইবে।

ব্যবসাতে বুদ্ধি খাটাইতে হইবে, হিসাবী অবিলাসী স্বল্পব্যয়ী সঞ্চয়ী পরিশ্রমী হইতে হইবে, বার-বার অকৃতকার্য্য হইলেও অদম্য উৎসাহে নূতন চেষ্টা করিতে হইবে। তবে ব্যবসা-বাণিজ্যে বাঙালী কৃতী হইতে পারিবে।

বঙ্গের বাহির হইতে আগত ব্যবসাদারদের বুদ্ধি ব্যবসাতে বাঙালীর চেয়ে বেশী মনে হইবার কারণ আছে। "যাদৃশী ভাবনা যস্য সিদ্ধির্ভবতি তাদৃশী," "যাহার ভাবনা যেরূপ সিদ্ধিও সেইরূপ হয়"। যাহারা বাহির হইতে বঙ্গে ব্যবসা করিতে আসে তাহাদের প্রত্যেকের প্রধান চিন্তার বিষয় অর্থ-উপার্জ্জন, অধিকাংশের একমাত্র চিন্তার বিষয় টাকা রোজগার। বঙ্গনিবাসী বাঙালীদের সম্বন্ধে ঠিক্ এ-কথা বলা চলে না। *ব্যবসা ছাড়া আরও অনেক ভাল মন্দ* জিনিষ বঙ্গীয় অবাঙালী রোজগারীদের চেয়ে বাঙালীদের হৃদয়-মনের উপর আধিপত্য করে। এক কথায়, বঙ্গের ব্যবসাদার অবাঙালীরা ব্যবসাতে যেমন একাগ্র, বাঙালীরা ব্যবসাতে ততটা একাগ্র নহে। যে-সব কারণে বাঙালীদের ব্যবসাবুদ্ধি কম মনে হয়, ইহা তাহার মধ্যে একটি।

অনেক বাঙালী ছেলে বিদেশে ও স্বদেশে নানাবিধ পণ্যশিল্প শিখিয়াছে। তাহাদের অনেকে মূলধন ও মূলধনীর অভাবে কারখানা খুলিয়া আপন আপন বিদ্যার পরিচয় দিতে ও ধন বাড়াইতে পারে না। ধনী বাঙালী বেশী নাই বটে; কিন্তু যাঁহাদের বেশী বা অল্প সঞ্চয় আছে, তাঁহারা যৌথ-কারবার হিসাবে কারখানা খুলিয়া পণ্যশিল্পবিৎ বাঙালী যুবকদের অর্জ্জিত বিদ্যার সদ্ব্যবহারের সুযোগ দিলে উভয় পক্ষেরই সুবিধা হয় এবং বঙ্গেরও ধন বাড়ে। অবশ্য, যে-কেহ বলিবে, সে একটা পণ্যশিল্পের ওস্তাদ, তাহাকেই ওস্তাদ ধরিয়া লইলে চলিবে না; পরখ করিতে পারা চাই। আবার, কোন কোন বাঙালী পণ্যশিল্পবিদের চেষ্টা ব্যর্থ হইয়াছে বলিয়া সকল বাঙালী পণ্যশিল্পবিৎকে অকেজো মনে করা যায় না। ভারতবর্ষে ইংরেজজাতীয় কোন কোন "বিশেষজ্ঞের"

অজ্ঞতায় ও দোষেও ত লক্ষ লক্ষ টাকার কারখানা ও কারবার ডুবিয়াছে।

—

বাংলা দেশে চিনির কারখানা ও অন্যবিধ কারখানা

চিনির কারখানার সরকারী ও বেসরকারী কোন কোন বিশেষজ্ঞ বলিতেছেন, যে, ভারতবর্ষে (প্রধানতঃ আগ্রা-অযোধ্যায় ও বিহারে) ইতিমধ্যেই যত চিনির কারখানা হইয়াছে, আগামী ১৯৩৩-৩৪ সালেই তাহাতে ভারতবর্ষের বর্ত্তমান চাহিদার চেয়ে বেশী চিনি উৎপন্ন হইবে, অতএব ভারতবর্ষে আর নূতন চিনির কারখানা স্থাপন করা উচিত নয়। আমাদের মত সেরূপ নয়।

বিদেশী চিনির উপর শুল্ক স্থাপিত হওয়ায় এখন দেশী চিনি তাহার সহিত প্রতিযোগিতা করিতে পারিতেছে, চিনি বেশী দামে বিক্রী হইতেছে। চিনি-ভক্ষকেরা যে বেশী দাম দিতেছে, তাহার কতক অংশ লাভের আকারে দেশী চিনির কারখানার মালিক ও অংশীদারদের সিন্ধুকে যাইতেছে। যদি প্রত্যেক প্রদেশেই যেমন চিনিভক্ষক আছে, তেমনি চিনির কারখানার মালিক ও অংশীদারও থাকে, তাহা হইলে সব প্রদেশেরই অল্পাধিক স্থবিধা হয়। অবশ্য আগ্রা-অযোধ্যা ও বিহারে ইক্ষুক্ষেত্রের ও চিনির কারখানার যতটা স্থবিধা আছে, সব প্রদেশে ততটা নাই; স্থতরাং সব প্রদেশ সমভাবে চিনির ভক্ষক ও উৎপাদক হইতে পারিবে না। কিন্তু ইহাও ঠিক্ নয়, যে, যেহেতু বিশেষ স্থবিধা থাকায় আগ্রা-অযোধ্যা ও বিহারে আগেই অনেক চিনির কারখানা হইয়াছে, অতএব অন্য কোথাও তাহা আর হইয়া কাজ নাই—অন্য প্রদেশের লোকেরা কেবল বেশী দাম দিয়া দেশী চিনি খাইতে থাকুক, বেশী দামের লাভটা তাহাদের কিছুই পাইয়া কাজ নাই।

লোকসংখ্যা বৃদ্ধির দরুণ এবং বর্ত্তমানে যাহারা চিনি খায় ভবিষ্যতে তাহাদের আরও বেশী চিনি খাইবার সম্ভাবনা থাকার দরুণ চিনির চাহিদা বাড়িতে পারে। স্থতরাং আরও বেশী চিনির কারখানা স্থাপন অনাবশ্যক না হইতে পারে। আর একটা কথাও মনে রাখিতে হইবে। আগ্রা-অযোধ্যায় দেশী স্থপরিচালিত চিনির কারখানার লাভ এখন খুব বেশী। একটি কারখানার এক বৎসরেই লাভ মূলধনের শতকরা ৪০ টাকা হইয়াছে, তিন বৎসরেই মূলধনের সব টাকা উশুল হইয়া যাইবে। কারখানার সংখ্যা বাড়িলে চিনির দাম কমিবে, উৎপাদন কিছু পরিমিত করিতে হইবে, লাভও কিছু কমিবে বটে, কিন্তু যথেষ্ট থাকিবে। ব্যবসা-বাণিজ্যে কেবল কতকগুলি লোক খুব লাভ করিতে থাকিবে, আর কেহ কোন লাভ করিতে পাইবে না, ইহা সমীচীন ও ন্যায্য বাণিজ্যনীতি নহে। লাভ যথেষ্ট থাকিবে, তাহা বহুসংখ্যক লোকের মধ্যে বিতরিত হইবে, এবং ক্রেতারা যথাসম্ভব স্থলভ মূল্যে পণ্যদ্রব্য পাইবে— এইরূপ হইলে তাহাই ভাল।

অবশ্য, কোন একটি পণ্যদ্রব্য একটা বড় দেশের সব অংশেই প্রস্তুত হইবার স্বাভাবিক স্থবিধা থাকিবেই এমন নয়— যে-সকল অংশে উহা প্রস্তুত হইতে পারে তাহার কথাই বলিতেছি। চিনির কথা হইতেছে। তাহা বাংলা দেশে লাভ রাখিয়া উৎপাদন করা যায় কি না বিবেচ্য। এক সময় চিনির উৎপাদনে বাংলা দেশ প্রদেশগুলির মধ্যে দ্বিতীয়স্থানীয় ছিল। এখনও বোধ করি চতুর্থস্থানীয় আছে। আকের চাষ গুড় ও চিনি উৎপাদন এখানে স্মরণাতীত কাল হইতে হই আসিতেছে। স্থতরাং, যেহেতু অন্যত্র বিস্তর কারখানা হই গিয়াছে, অতএব বঙ্গে একটিও হইয়া কাজ নাই, এই যুক্তি অনুসরণ না করিয়া এখানে যথেষ্ট লাভ রাখিয়া চিনি উৎ করা যায় কি-না বিবেচনা করাই যুক্তিসঙ্গত। সরকার তদন্ত হইতেছেও। বঙ্গের অনেক অংশে বৃহৎ লাগা ইক্ষুক্ষেত্র, যানবাহন প্রভৃতির অস্থবিধা আছে; কিন্তু কোথাও কোথাও স্থবিধাও আছে। সেখানে বড় কারখানা হইতে পারে। অন্যত্র এক-একটি জেলা বা সবডিবিজনের জোগান দিবার জন্য ছোট ছোট কারখানা লাভ রাখিয়া চালান যায় কি-না দেখা কর্ত্তব্য। সকল প্রদেশের মধ্যে বাংলার লোকসংখ্যা বেশী। এত বড় প্রদেশের লোকেরা বেশী দাম দিয়া চিনি কিনিয়াই খাইতে থাকিবে এবং এই প্রকারে পরোক্ষভাবে চিনি-শুল্কের বড় একটা অংশ দিতে থাকিবে অথচ সেই শুল্ক স্থাপিত হওয়ার স্থযোগে চিনির কারখানা স্থাপন করিয়া লাভেরও কতকটা অংশ পাইতে পারিবে না ইহা অলঙ্ঘ্য বিধিলিপি মনে করিতে পারি না। বাঙালীদের হাতে মূলধন কম আছে বটে, কিন্তু কোন কারখানাই হইতে পারে না, এত কম নয়।

এই প্রসঙ্গে বলা আবশ্যক মনে করিতেছি, যে, প্রবাসী-সম্পাদকের তত্ত্বাবধানে চিনির কারখানা প্রতিষ্ঠিত হইতেছে বলিয়া যে বিজ্ঞাপন খবরের কাগজে বাহির হইতেছে, তাহা মিথ্যা। প্রবাসী-সম্পাদক কোন চিনির কারখানার পৃষ্ঠপোষক, তত্ত্বাবধায়ক, মালিক বা অংশীদার নহেন।

বাংলা দেশের লোকসংখ্যা প্রদেশগুলির মধ্যে অধিকতম বলিয়া এখানে সুতি কাপড়ের কাটতিও খুব বেশী। ইংলণ্ডে কার্পাস হয় না, জাপানে কার্পাস হয় না। অথচ কার্পাসের সুতা ও সুতি কাপড় প্রস্তুত করিয়া ইংলণ্ড ধনী হইয়াছে, এখন ঐ ব্যবসায়ে জাপান ইংলণ্ডকেও পরাস্ত করিতেছে। বাংলা দেশে আগে ভাল কার্পাস হইত, এখন যাহা হয় তাহা নিকৃষ্ট রকমের ও পরিমাণে অল্প। কিন্তু ভাল কার্পাস এখনও হইতে পারে, পরিমাণেও বেশী হইতে পারে। বাংলা গবর্মেণ্ট ও বাঙালীরা এ-বিষয়ে যথেষ্ট মন দিতেছেন না। বিশ্বভারতীয় শ্রীনিকেতন ভাল কার্পাসের চাষের পরীক্ষা করিতেছেন। বাংলা দেশে যত কাপড়ের কল হইয়াছে, তার চেয়ে আরও অনেক বেশী হওয়া উচিত।

এখানে একটা কথা উঠিতে পারে, যে, কাপড়ের কল বাড়াইলে তাহার মজুর ত বেশীর ভাগ বঙ্গের বাহির হইতে আসিবে, সুতরাং তাহাতে বঙ্গের সাধারণ লোকদের—অধিকাংশ লোকদের—কি লাভ? ইহার উত্তরে বলা যাইতে পারে, যে, কলের মজুর স্থানীয় লোকদের মধ্য হইতে সংগ্রহ করিবার বিশেষ চেষ্টা করিতে হইবে। সে-চেষ্টা যদি সফল না হয়, তাহা হইলে বাঙালী জনসাধারণ কাপড়ের কল স্থাপন দ্বারা লাভবান না হইলেও মূলধনী বাঙালীরা ত লাভবান্ হইবে। এখন যে বাঙালী জনসাধারণ ও বাঙালী মূলধনী কেহই কাপড়-উৎপাদন কার্য্য হইতে বিশেষ লাভ পাইতেছে না।

কাপড়ের কলের শ্রমিক কেবল যে অশিক্ষিত জনগণের মধ্য হইতে সংগ্রহ করা যায়, এমন নয়। ইংলণ্ডের, জাপানের, এবং অন্যান্য সভ্য দেশের কারখানার শ্রমিকরা লেখাপড়া-জানা লোক। আমাদের দেশের লেখাপড়া-জানা লোকদেরও এই কাজে যাওয়া উচিত এবং কলের মালিকদেরও তাহাদিগকে লওয়া উচিত। সাধারণ কেরানীর আয় অপেক্ষা কলের শ্রমিকের রোজগার সব স্থলে কম নয়। কলকারখানার পরিচালকরা শ্রমিকদের সহিত ভদ্র ব্যবহার করিলে শিক্ষিত বেকার ভদ্রলোকদের শ্রমিক হইবার অনিচ্ছা ক্রমশঃ কমিবে। ভদ্রব্যবহার এখন কোথাও হয় না, এমন নয়।

সম্মিলিত স্বরাজসংগ্রামের সর্ত্ত

আগের একটি নিবন্ধিকায় বলিয়াছি, হিন্দু-মুসলমান প্রভৃতি সব সম্প্রদায় একমত হইয়া একত্র স্বরাজলাভ-চেষ্টা না করিলে স্বরাজ লব্ধ হইতেই পারে না, এইরূপ মত-প্রচারে অনিষ্ট হইয়াছে। কি অনিষ্ট, তাহা সুবিদিত। বিস্তর মুসলমান ভাবিয়াছেন, হিন্দুদের যখন স্বরাজলাভের গরজ এত বেশী, তখন তাদের কাছ থেকে যত বেশী সম্ভব সুবিধা আদায় করিয়া লইয়া তবে স্বরাজসংগ্রামে সম্মতি দেওয়া যাইবে; স্বরাজলাভের চেষ্টাটা প্রধানতঃ হিন্দুরা করিবে, সুবিধাটা যথাসম্ভব বেশী আদায় করিবে মুসলমানেরা। এইরূপ মনোভাবের দৃষ্টান্ত পুনশ্চ কয়েক দিন আগেও পাওয়া গিয়াছে। খান বাহাদুর হাফিজ হিদায়ৎ হুসেন একজন নামজাদা ব্যক্তি। তিনি বিলাতী জয়েণ্ট পার্লেমেণ্টারী কমিটিতে সাক্ষ্য দিবেন। তিনি কানপুর হইতে হিন্দুদিগকে জানাইয়াছেন, যে, ব্রিটিশ প্রধান মন্ত্রীর সাম্প্রদায়িক ভাগবাটোয়ারা পত্রে মুসলমানদের যে-সব দাবি মঞ্জুর হয় নাই, হিন্দুরা যদি সেগুলিতে রাজী হয়, তাহা হইলে তিনি ও অন্যান্য মুসলমান সাক্ষীরা জয়েণ্ট পার্লেমেণ্টারী কমিটিতে হিন্দুদের সঙ্গে একযোগে "জাতীয় দাবিসমূহ" (ন্যাশ্যন্যাল ডিমাণ্ডস্) পেশ করিবেন।

হিন্দুদের প্রতি কি অনুগ্রহ!

চট্টগ্রামের হিন্দুদের নূতন দুঃখ

চট্টগ্রামের হিন্দুদের কয়েক বৎসর ধরিয়া যে লাঞ্ছনা ও দুঃখ ভোগের অধ্যায় আরম্ভ হইয়াছে তাহা এখনও শেষ হয় নাই। বিপ্লবী বলিয়া অভিযুক্ত কয়েক ব্যক্তি নিরুদ্দেশ থাকায় চট্টগ্রামের হিন্দুদের অনেক হাজার টাকা পাইকারী জরিমানা হয়। তাহার পর উহাদের কয়েক জন ধৃত হইয়াছে বটে, কিন্তু তাহা পুলিস ও সৈনিকদের দ্বারা, বেসরকারী হিন্দুদের সাহায্যে নহে। এখনও কয়েক জন ধৃত হইতে বাকী আছে। গবর্মেণ্ট নিয়ম করিয়াছেন, ১২ হইতে ২৫ বৎসর বয়স্ক প্রত্যেক হিন্দুকে লাল নীল সাদা এই তিন রকম রঙের কোন এক রকম তাস সর্ব্বদা সঙ্গে রাখিতে

হইবে এবং পুলিস বা সৈনিক কেহ চাহিলে দেখাইতে হইবে। যাহারা নজরবন্দী বা "অন্তরীন" তাহাদিগকে লাল, যাহারা পুলিসের সন্দেহভাজন তাহারা নীল, যাহারা পুলিসের মতে নিরপরাধ তাহারা সাদা তাস রাখিতে বাধ্য হইবে। তাসে তাসধারীব নামধামাদি পরিচয় লেখা থাকিবে। উহা কেহ হারাইয়া ফেলিলে বা দেখাইতে না পারিলে তাহার শাস্তি হইবে। ইত্যাদি, বিস্তারিত বর্ণনা খবরের কাগজে বাহির হইয়াছে। সমালোচনাও অনেক হইয়াছে। আমরাও আমাদের ইংরেজী কাগজে কিছু লিখিয়াছি। এখন ইংরেজ-সম্পাদিত এলাহাবাদের "পাইয়োনীয়ার" কাগজের মন্তব্য কিছু উদ্ধৃত করি। ইহার সম্পাদক গোড়াতেই বলিতেছেন, "against those who resort to the vile weapon of political assassination no measures can be too ruthless," "যাহারা রাজনৈতিক হত্যা রূপ জঘন্য উপায় অবলম্বন করে, তাহাদের বিরুদ্ধে প্রবুক্ত কোন কার্য্য-প্রণালীই অত্যধিক নিষ্করুণ হইতে পারে না।" সুতরাং এই ইংরেজ-লেখক বিপ্লবীদের প্রতি সহানুভূতি বশতঃ চট্টগ্রামের নূতন হুকুমটার সমালোচনা করেন নাই। তাঁহার সমালোচনার কারণ অন্যবিধ। অন্যান্য কথার মধ্যে তিনি বলেন :—

Apart from the rather obvious criticism that, if terrorists can be paraded and served out with red cards, there seems no reason why they should ever be out of hand. Our first comment is that control of a community by means of identification cards has already been tried on a large scale under the Native Pass Laws of South Africa and has proved a complete failure....

This is not mere theorizing ; it has been so borne out by years of experience that the police admit that the Pass Laws are virtually a dead letter. In the same way, passport regulations in all countries have failed to stop the entry of undesirable immigrants, whose passports are invariably in order, while causing a maximum of annoyance and inconvenience to innocent travellers. Does anyone suppose that a terrorist, setting out on a desperate crime, will meekly submit a red card for inspection? If terrorists were as simple and unresourceful as that, there would be no problem.

পাইয়োনীয়ার-সম্পাদক মিঃ ডেস্‌মণ্ড ইয়াং ইহার পর আরও বলেন :—

White cards, we are told, will be "a protection to law-abiding persons." But will they ? Suppose the terrorists direct their attention for a time to known holders of white cards. Is it not possible that they will either make their lives unendurable or secretly terrify the weaker among them until they have perverted them to their own ends ? When bandits were in strength in Corsica, would it have been "protection for a law-abiding person" to have a certificate from the police that he was wholeheartedly opposed to them ? A white card may, indeed, be a protection from the police, but from the police no innocent citizen should have anything to fear. Again if the 'bhadralogs' of Chittagong are so inclined to terrorism, what sort of an effect will these regulations have upon them ? Apart from the minor annoyance of having to carry a white card, what young man values a purely negative certificate of harmlessness ? And these are young men "intensely sensitive and emotional, endowed with generous impulses, easily led, quick to fancy insults and slights and quick to respond to anything that ministers to their personal vanity. In the terrorist movement their emotions find vent in misdirected patriotism" (Sir Charles Tegart). Is there not a real danger that the red card, so far from being a disgrace, may come to be regarded as the red badge of courage ?

On general grounds the dragooning of a whole community, many of whom, on the evidence of the greatest expert on the subject, cannot be expected to know of the secret activities even of their own children, needs a great deal of justification. It is on a level with indiscriminate bombing of villages and indiscriminate levying of fines on innocent and guilty alike. That is to say that, if it has indeed to be adopted because other methods are ineffective, the necessity is in itself an admission of failure by the Administration.

—

আণ্ডামানে রাজনৈতিক বন্দীদের উপবাস ও মৃত্যু

আণ্ডামানে ৪১ জন রাজনৈতিক বন্দী, তাহাদের ন্যায্য বা অসঙ্গত দাবি মঞ্জুর না করায়, উপবাস আরম্ভ করিয়াছে, তাহাদের মধ্যে প্রথমে দু-জন ও পরে এক জনের মৃত্যু হইয়াছে, ইত্যাদি সরকারকর্তৃক বিলম্বে প্রদত্ত সংবাদ পাঠকেরা জানেন। দশ বৎসরের উপর হইল, গবন্মেণ্ট অঙ্গীকার করেন. যে, আণ্ডামানে আর বন্দী রাখা হইবে না, উহা আর বন্দীশালা রূপে ব্যবহৃত হইবে না। অস্বাস্থ্যকরতা, স্বাধীন জনমতের অভাব প্রভৃতি কারণে সরকারী কার্ডিউ কমিটির দ্বারা উহা বন্দী রাখিবার অনুপযুক্ত স্থান বলিয়া নির্দ্ধারিত হয়। সুতরাং ওখানে পুনর্ব্বার রাজনৈতিক বন্দী পাঠান অনুচিত হইয়াছে ও তদ্দ্বারা সরকারের অঙ্গীকারভঙ্গ-দোষ হইয়াছে। সাধারণ সশ্রম কারাদণ্ড অপেক্ষা দ্বীপচালান কঠোরতর দণ্ড। বিচারে যাহাদের দ্বীপচালান হয় নাই, তাহাদিগকে আণ্ডামানে পাঠান বেআইনী বলিয়া আমাদের ধারণা। যাহারা প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত হয় নাই, তাহাদের সুস্থ শরীরে বাঁচিয়া থাকিবার অধিকার আছে। তাহারা যাহাতে বাঁচিয়া থাকিতে পারে, এরূপ অবস্থায় থাকিবার দাবি

তাহারা করিতে পারে। ঠিক্ কি কারণে ৪১ জন বন্দী উপবাস করিতেছে, সরকারী বিজ্ঞপ্তিপত্র হইতে তাহা জানা যাইতেছে না। লোকে সখ করিয়া বা ফ্যাশনের অনুরোধে প্রায়োপবেশন করে না। ৪১ জন তাহা করায় এবং তাহাদের মধ্যে তিন জনের মৃত্যু হওয়ায় এরূপ সন্দেহ হওয়া স্বাভাবিক, যে, তাহারা ন্যায়সঙ্গত ব্যবহার পায় নাই। পাইয়াছে কি না, তাহার প্রকাশ্য তদন্ত হওয়া উচিত। সরকারী বিজ্ঞপ্তি অনুসারে যে-যে দাবি প্রায়োপবেশনের কারণ, স্বামী জ্ঞানানন্দ দেখাইয়াছেন, যে, সেই দাবিগুলি জেল-বিধি অনুসারে ন্যায্য। তিনি প্রায়োপবেশনের অনেক আগেই খবরের কাগজে বন্দীদের নানা অভাব অভিযোগের কথা লিখিয়া জানাইয়াছিলেন, যে, সেগুলি দূরীভূত না হইলে তাহারা সম্ভবতঃ উপবাস করিবে। সম্ভবতঃ গবন্মে´ণ্ট এই সব খবরের প্রতি দৃকপাত না করায় প্রায়োপবেশন আরম্ভ হয়। অদক্ষ লোকে জোর করিয়া কাহাকেও খাওয়াইতে গেলে খাদ্য তাহার পেটে না গিয়া ফুসফুসে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকে ও তাহাতে নিউমোনিয়া হইতে পারে। মৃত তিন জনের মধ্যে দু-জনের, জোর করিয়া খাওয়াইবার চেষ্টার পর, নিউমোনিয়াতে মৃত্যু হয়। মৃত তিন জনের মৃত্যুসংবাদ গবন্মে´ণ্ট তাহাদের আত্মীয়দিগকে দেন নাই। অপর আটত্রিশ জনের নাম প্রকাশ করিতে গবন্মে´ণ্ট রাজী নহেন।

এই অতিশোচনীয় সমস্ত ব্যাপারটির প্রকাশ্য তদন্ত হওয়া উচিত, সমুদয় বন্দীকে আণ্ডামান হইতে ভারতবর্ষের জেলে আনা উচিত, এবং অতঃপর আণ্ডামানে আর কোন বন্দীকে পাঠান উচিত নহে।

কংগ্রেসওয়ালাদিগকে প্রহারের অভিযোগ

পণ্ডিত মদনমোহন মালবীয় ("মালব্য" নহেন) একটি বর্ণনাপত্রে কংগ্রেসের প্রতিনিধিদের প্রতি পুলিস কর্ত্তৃক অত্যাচারের কতকগুলি দৃষ্টান্ত দেন। গবন্মে´ণ্ট বলিতেছেন, সেগুলি সর্ব্বৈব মিথ্যা। যে-পুলিসের বিরুদ্ধে অভিযোগ, তাহাদের কথার উপর বিশ্বাস করিয়াই ইহা বলা হইতেছে। অভিযুক্তরাই জজ, জুরী, সাক্ষী ইত্যাদি সব! সরকারী কম্যুনিকেতেই দেখা যাইতেছে, যে, পুলিস বলপ্রয়োগ করিয়াছিল, কিন্তু তাহা তাহাদের কর্ত্তব্যপালনার্থ ন্যূনতম বলপ্রয়োগ। তাহা কি রকম ন্যূনতম বলপ্রয়োগ যাহাতে মানুষের দাঁত ভাঙিয়া যায় ও স্কন্ধের হাড় স্থানচ্যুত হয়? আহত দু-জনের এইরূপ হইয়াছিল বলিয়া সরকারী বিজ্ঞপ্তিতে আছে। কংগ্রেস কোন কালে বেআইনী সভা বলিয়া ঘোষিত হয় নাই, সুতরাং তাহার ডেলিগেটদিগকে গ্রেপ্তার করা, বা কংগ্রেসের অধিবেশন ভাঙিয়া দেওয়া পুলিসের আইনসঙ্গত কর্ত্তব্যপালনের মধ্যে পড়ে না।

পুলিস যে মারপিট করিয়াছিল, সে-কথা কয়েক জন ভারতীয় এবং একজন আমেরিকান নিজ নিজ অভিজ্ঞতা হইতে খবরের কাগজে লিখিয়াছেন; মালবীয়জী ত আগেই লিখিয়াছেন। তিনি বলেন, "প্রকাশ্য তদন্ত হউক, আমি প্রমাণ উপস্থিত করাইব; কিংবা আমার নামে মোকদ্দমা করা হউক।" সে সাহস ভারত-সচিবের হইতেছে না কেন?

গবন্মে´ণ্ট বলেন, খবরের কাগজে পুলিসের তথাকথিত অত্যাচারের সব বর্ণনা বাহির হয় নাই, অতএব ওগুলা মিথ্যা। গবন্মে´ণ্ট কি জানেন না, যে, প্রেস-আইনের কঠোরতা এবং প্রেস-অফিসারের কঠোর কর্ত্তব্যপরায়ণতার গুণে মালবীয়জী-বর্ণিত ঘটনা অপেক্ষাও শোচনীয় ঘটনা খবরের কাগজে বাহির হইতে পারে না? যাহা হউক, ইহা একটা ভাল খবর, যে, গবন্মে´ণ্ট দেশী সংবাদপত্রগুলিকে (দায়ে পড়িয়া?) সত্যসাক্ষী মনে করেন!

বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার অধিবেশন বসিয়াছিল ৪ঠা এপ্রিল পর্য্যন্ত, অথচ ৩০শে মার্চ ও ১লা এপ্রিলের বর্ণিত অত্যাচারের কথা কোন সদস্য তথায় তুলেন নাই, অতএব তাহা মিথ্যা—গবন্মে´ণ্ট এইরূপ তর্ক করিয়াছেন। কিন্তু কোন বা অধিকাংশ ধৃত কংগ্রেস-ডেলিগেট ৪ঠার আগে হাজত হইতে খালাস পান নাই, অনেকে ৭ই খালাস পাইয়াছেন। সুতরাং ব্যবস্থাপক সভায় প্রশ্ন করানর উপর তাঁহাদের আস্থা যদি থাকিত, তাহা হইলেও তাহা করাইবার সময় ছিল না।

লালবাজার থানায় কয়েদী-গাড়ী থামিবার পর আঁধারে পা-দানে ঠিক পা দিতে না পারিয়া পড়িয়া গিয়া দু-জন ডেলিগেট আভ্যন্তরীণ বেদনার অভিযোগ করেন, এবং এইজন্য তাঁহাদিগকে তৎক্ষণাৎ হাসপাতালে পাঠান হয়; ইহা পুলিসের

কৈফিয়ৎ। কিন্তু লালবাজারে ডাক্তার থাকিতেও তাহাদিগকে তাড়াতাড়ি হাসপাতালে পাঠান হইল এবং কয়েক দিন সেখানে রাখিতে হইল কেন? সামান্য একটু পা-ফস্কানতে এত গুরুতর আভ্যন্তরীণ আঘাত, এবং তাহাও দুই জনেরই, হয় কি? মালবীয়জীর বর্ণনায় ছিল, যে, আহত লোক দুটির পেটে সার্জেণ্টরা গুঁতা মারিয়াছিল। কোন্ কথাটা সত্য, প্রকাশ্য তদন্ত হইলে কিংবা মালবীয়জীকে ফৌজদারী সোপর্দ্দ করিলে স্থির হইতেও পারে।

—

কংগ্রেস-প্রেসিডেণ্টের অভিযোগ

কংগ্রেসের অস্থায়ী প্রেসিডেণ্ট শ্রীযুক্ত আণে মহাশয়ের মেদিনীপুর জেলে থাকা কালে তাঁহার উপর দুর্ব্যবহার হইয়াছিল, এইরূপ অভিযোগ কাগজে বাহির হয়। গবন্মেণ্ট বলিতেছেন—ইহা মিথ্যা। আণে মহাশয় বলিতেছেন, সমস্তই সত্য, তদন্ত করা হউক। গবন্মেণ্ট যাঁহাদের কথার উপর নির্ভর করিয়া কিছু বলেন, তাঁহারা আণে মহাশয়ের চেয়ে অধিক বিশ্বাসযোগ্য নহেন, এবং সাক্ষাৎ বা পরোক্ষ ভাবে তাঁহারাই অভিযুক্ত। অতএব সত্যনির্ণয়ের জন্য প্রকাশ্য তদন্ত কিংবা আণে মহাশয়কে ফৌজদারী সোপর্দ্দ করা আবশ্যক। গবন্মেণ্ট দুইয়ের মধ্যে কোনটা করিবেন কি?

—

কলিকাতা মিউনিসিপালিটির মেথর ধাঙড়

কলিকাতা মিউনিসিপালিটির মেথর ধাঙড়দের দুঃখ আছে, তাহা মিউনিসিপালিটিও স্বীকার করিবেন। মিউনিসিপালিটি-কর্ত্তৃক নিযুক্ত বিশেষ কমিটি তাহাদের অনেক দুঃখের কথা বলিয়াছেন। তাহাদের বাসগৃহগুলা অতি অপকৃষ্ট ও অস্বাস্থ্যকর, তাহারা আমরণ কাজ করিলেও দিন-মজুর বলিয়া গণ্য, কাজ পাইতে হইলে তাহারা ঘুষ দিতে বাধ্য হয়, তাহাদের সন্তানদের শিক্ষার ব্যবস্থা নাই, রোগে তাহাদের চিকিৎসা সেবাশুশ্রূষার যথোচিত বন্দোবস্ত নাই, ইত্যাদি।

তাহাদের অনেকে নোটিস না-দিয়া ধর্ম্মঘট করিয়াছিল। তাহারা ইহা ঠিক করে নাই। কিন্তু তাহাদিগকে অশিক্ষিত ও অসভ্যজনোচিত অবস্থায় রাখার জন্য ভারতীয় সভ্যসমাজ দায়ী। এই সভ্যসমাজের লোকদের পক্ষে তাহাদের বিরুদ্ধে অবিমৃষ্যকারিতার অভিযোগ না-আনাই ভাল। যাহা হউক, তাহারা অনুচিত কাজ করিয়াছিল সন্দেহ নাই। তাহাদের ধর্ম্মঘটের খবর মিউনিসিপালিটির ষ্ট্যাণ্ডিং কমিটিকে প্রধান কর্ম্মকর্ত্তা (চীফ এক্সিকিউটিভ অফিসার) জানাইলে পর কমিটি তাঁহারই উপর, দরকার হইলে পুলিসের সাহায্যে, যাহা আবশ্যক করিবার ভার দেন। তিনি পুলিসের সাহায্য লইয়াছিলেন। কাগজের রিপোর্টে প্রকাশ, ধর্ম্মঘটীরা ইটপাটকেল ছুঁড়িয়াছিল (ভাল করে নাই।—সম্পাদক), এবং পুলিস লাঠি ও বন্দুক চালাইয়াছিল (ভাল করে নাই।—সম্পাদক।) তাহাতে অনেক ধর্ম্মঘটী আহত হয়। সৌভাগ্য, যে, কেহ মরে নাই।

আমাদের বিবেচনায় ষ্ট্যাণ্ডিং কমিটির সভ্যদের নিজে ঘটনা-স্থলে গিয়া ধর্ম্মঘটীদিগকে বুঝাইয়া-পড়াইয়া মিটমাট করা উচিত ছিল, পুলিসের সাহায্য লইতে বলা ও লওয়া উচিত হয় নাই। সাধারণ অবস্থাতে সাধারণভাবেই আমাদিগকে ইহা বলিতে হইত। কিন্তু বলিবার বিশেষ কারণও আছে। ঘটনার দিন হরিজনদের জন্য প্রাণউৎসর্গকারী মহাত্মা গান্ধী উপবাসভঙ্গ করিয়াছিলেন। সেই দিন উপবাসের এইরূপ পারায়ণ কলিকাতায় হওয়া উচিত হয় নাই। যে-কোন প্রকারে গঠিত মিউনিসিপালিটির উচিত, তাহার প্রধান কর্ম্মী ধাঙড়-মেথরদের সহিত ন্যায্য, সহৃদয় ও ক্ষমাপূর্ণ ব্যবহার করা। কলিকাতা মিউনিসিপালিটির তাহা করা আরও উচিত, কারণ তাহার অধিকাংশ সভ্য কংগ্রেসওয়ালা। আক্রমণকারীর উপরও বলপ্রয়োগ কংগ্রেসনীতির বিরুদ্ধ; কংগ্রেস দুঃখ সহিবেন, কিন্তু দুঃখ দিবেন না। ধাঙড়মেথরদের সহিত ব্যবহারে এই নীতি পালিত হয় নাই। যদি কমিটির সভ্যেরা তাহাদিগকে বুঝাইতে গিয়া অপমানিত ও প্রহৃত হইতেন, তাহা হইলেও তাঁহাদের সহিষ্ণুতা অবলম্বন করা উচিত হইত। কিন্তু তাঁহারা স্বয়ং ত সাক্ষাৎভাবে কিছু করিলেনই না, অধিকন্তু আবশ্যক হইলে পুলিসের সাহায্য লইবার আজ্ঞা দিলেন। তাঁহারা জানিতেন, পুলিস নিজেদের জ্ঞানবুদ্ধি অনুসারে নিজ কর্ত্তব্য পালন করিতে গিয়া লালা লাজপৎ রায়কে রেহাই দেয় নাই, সুভাষচন্দ্র বসুকে রেহাই দেয় নাই, এই সেদিনও কংগ্রেস-ডেলিগেটদিগকে রেহাই দেয় নাই। আমরা বেসরকারী লোকেরাও মেথরধাঙড়দিগকে তুচ্ছতাচ্ছিল্যই করিয়া থাকি, ইহাও মনে রাখা দরকার।

সুতরাং ষ্ট্যাণ্ডিং কমিটি অনুমান করিতে সমর্থ ছিলেন, যে, পুলিসের উপর ধর্ম্মঘট ভাঙিবার ভার দিলে কিরূপ ঘটনা ঘটিতে পারে। তদ্রূপ অনুমান করিবার শক্তি তাঁহাদের থাক্ বা না-থাক্, ধর্ম্মঘটীদিগকে সংযত ভাষায় বুঝাইবার ভার তাঁহাদের লওয়া উচিত ছিল—বিশেষতঃ যখন তাঁহারা প্রধানতঃ কংগ্রেসওয়ালা এবং তাঁহাদের মহত্তম নেতা মহাত্মা গান্ধী হরিজনদের সেবা ভাল করিয়া করিবার সামর্থ্য লাভের জন্য দীর্ঘ উপবাস করিয়া ঘটনার দিনে উপবাস ভঙ্গ করিতেছিলেন।

—

মেথর-ধাঙ্গড়দের অবস্থার উন্নতি

মেথর-ধাঙ্গড়দের অবস্থার উন্নতির উপায়াদি সম্বন্ধে অনুসন্ধান পূর্ব্বক রিপোর্ট দিতে নিযুক্ত বিশেষ কমিটি আপাততঃ দুইটি রিপোর্ট দিয়াছেন—চূড়ান্ত রিপোর্ট পরে দিতে পারেন। যে রিপোর্ট তাঁহারা দিয়াছেন, মিউনিসিপালিটি তাহা নথীভুক্ত করিয়াই আশা করি ক্ষান্ত হইবেন না।

অন্যতম কৌন্সিলর মিঃ সি. ডব্লিউ. গার্ণার এই ভাবিয়া ও বলিয়া ভয় খান ও ভয় দেখান, যে, মেথর-ধাঙ্গড়দের নানারকম কাজের জন্য মিউনিসিপালিটিকে তের লক্ষ টাকা খরচ করিতে হয়; তাহার উপর অবস্থোন্নতির জন্য আরও কিছু করিবার প্রতিজ্ঞা হঠাৎ করিয়া বসিলে ফল গুরুতর হইয়া উঠিতে পারে! কিন্তু মনে রাখিতে হইবে, যে, সামাজিক কুব্যবস্থা ও কুপ্রথার ফলে মেথর-ধাঙ্গড়রা সমাজের হেয়স্তরভুক্ত বলিয়া গণিত হইলেও, তাহারা শহরের জন্য একান্ত আবশ্যক এমন কতকগুলি কাজ করে, যাহা ভিন্ন শহর টিকিতে পারে না। অতএব যে-মিউনিসিপালিটির বার্ষিক আয় আড়াই কোটি তিন কোটি টাকা, তাহার পক্ষে শহর পরিষ্কার ও শুচি রাখিবার কর্ম্মীদের নিমিত্ত প্রয়োজন হইলে তেরর জায়গায় ছাব্বিশ লক্ষ টাকা খরচ করাও অনুচিত হইবে না। যদি তাহা করিবার জন্য অন্যান্য যে-সব দিকে, শহরের স্বাস্থ্যহানি না করিয়া, ব্যয়সংক্ষেপ করা চলে তাহা করিতে হয়, তাহাই শ্রেয়ঃ। মনে রাখিতে হইবে, কলিকাতা মিউনিসিপালিটির আয় বোধ হয় কয়েকটি [illegible] ভারতবর্ষের প্রায় প্রত্যেক দেশী রাজ্যের আয়ের চেয়ে বেশী। প্রধান দেশী রাজ্যগুলির আয় ইণ্ডিয়ান ষ্টেট্‌স্ ইনকোয়ারী কমিটির রিপোর্ট হইতে দিতেছি।

বড়োদা ২,৪৯,০০,০০০, ইন্দোর ১,৩৬,০০,০০০, গোয়ালিয়র ২,১০,০০,০০০, হায়দরাবাদ ৭,৯৮,৫৭,০০০, ত্রিবাঙ্কুড় ২,৪৮,০৮,০০০, মহীশূর ৩,৪৬,৪৬,০০০, জয়পুর ১,৩০,০০,০০০, যোধপুর ১,৫২,২৪,০০০, ভাবনগর ১,০৪,৬৫,০০০, নবনগর ১,১২,৫৯,০০০, কোল্‌হাপুর ১,৩৯,২৯,০০০। কাশ্মীরের নাম পাইলাম না। উহার আয় ২ কোটি ৩৯ লক্ষ হইতে প্রায় আড়াই কোটি হইয়া থাকে।

—

বঙ্গের সংগৃহীত রাজস্বের অপব্যবহার

আমরা পুনরুক্তি করিতেছি, যে, ১৯২১-২২ সালে ভারত-গবর্মেণ্টের মোট আয় ছিল ৬৪,৫২,৬৬,০০০ টাকা; তাহার মধ্যে বাংলা দেশ হইতেই লওয়া হয় ২৩,১১,৯৮,০০০ টাকা! অঙ্কগুলি সরকারী বঙ্গীয় ব্যয়সংক্ষেপ কমিটির রিপোর্ট হইতে গৃহীত। বাংলা দেশের লোকসংখ্যা অন্য সব প্রদেশের চেয়ে বেশী, কিন্তু বঙ্গে সংগৃহীত রাজস্ব ভারত-গবর্মেণ্ট খুব বেশী করিয়া লওয়ায় বড় প্রদেশগুলির মধ্যে বাংলা সকলের চেয়ে কম টাকা খরচ করিতে পায়।

সম্প্রতি বাংলা গবর্মেণ্ট দুটি পুস্তিকা বাহির করিয়াছেন তাহা হইতে অন্য কতকগুলি অঙ্ক উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি।

১৯২৮-২৯ সালে ভারত-গবর্মেণ্ট কোন্ প্রদেশ হইতে কত রাজস্ব আদায় করেন এবং তথাকার প্রাদেশিক গবর্মেণ্টের হাতে কত থাকে—

প্রদেশ	প্রাদেশিক গবর্মেণ্ট	ভারত-গবর্মেণ্ট	লোক-সংখ্যা
মান্দ্রাজ	১,৭৫৩ লক্ষ	৭৬৭ লক্ষ	৪২৩ লক্ষ
বোম্বাই	১,৫২২ "	২,৪৮৪ "	১৯৩ "
আগ্রা-অযোধ্যা	১,১৪৫ "	৪২২ "	৪৫৫ "
পঞ্জাব	১,১১৫ "	১০১ "	২০৬ "
বাংলা	১,০৯৭ "	২,৬৭৭ "	৪৬৬ "

বঙ্গের প্রতি ঐরূপ অবিচার হইতে থাকায় সরকারী সব বিভাগে এখানে মাথাপিছু খরচ কম হইয়াছে। ১৯২৯-৩০ সালে শিক্ষা এবং চিকিৎসা ও স্বাস্থ্য বিভাগের মাথাপিছু খরচ দেখুন।

প্রদেশ	শিক্ষা	চিকিৎসা ও লোক-স্বাস্থ্য
মাদ্রাজ	'৬০৮ টাকা	·৩৯৩ টাকা
বোম্বাই	১'০৫৭ "	'৪৭২ "
আগ্রা-অযোধ্যা	'৪২১ "	·১৪৫ "
পঞ্জাব	'৮০৬ "	·৩৯১ "
বাংলা	'২৮৫ "	·২১০ "

লণ্ডনে পঠিত সুভাষ বাবুর বক্তৃতা

লণ্ডনে ভারতীয় রাজনৈতিক সম্মেলনে শ্রীযুক্ত সুভাষচন্দ্র বসু ছাড়পত্রের অভাবে সভাপতিত্ব করিতে পারেন নাই। তাঁহার অভিভাষণ অন্যের দ্বারা পঠিত হয়। উহার তাৎপর্য্য আজ ৩০শে জ্যৈষ্ঠের কাগজে দেখিলাম। উহার সমালোচনা করিবার সময় ও স্থান নাই। কিন্তু সংক্ষেপে ইহা বলা যায়, যে, ব্রিটেন ও ভারতের রফা এবং প্রস্তাবিত ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রে রাজন্যদিগের স্থান সম্বন্ধে তিনি যাহা বলিয়াছেন তাহাতে সত্য আছে।

কলিকাতা করপোরেশন ও গবর্ন্মেণ্ট

গবর্ন্মেণ্ট কর্ত্তৃক কলিকাতা মিউনিসিপাল আইন সংশোধনের যে-প্রস্তাব উপস্থাপিত হইয়াছে উহার ফলে কলিকাতা করপোরেশনে কংগ্রেস-পন্থী দুই দলের মধ্যে ঐক্য স্থাপিত হইয়াছে, ইহা সন্তোষের বিষয়। কিন্তু তাহা সত্ত্বেও প্রস্তাবিত আইন পাস হইবে না এ-কথা বলা চলে না। গবর্ন্মেণ্ট ও করপোরেশনের মধ্যে বহুদিন ধরিয়া নানা বিষয়ে মতান্তর চলিয়া আসিতেছে। গবর্ন্মেণ্ট অন্য কোন উপায়ে করপোরেশনকে বশে আনিতে না পারিয়া এই নূতন আইনের প্রস্তাব করিয়াছেন। এই আইনটি যাহাতে পাস হইয়া যায় গবর্ন্মেণ্টের পক্ষ হইতে তাহার জন্য চেষ্টার ত্রুটি হইবে না, এবং বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভায় এখন গবর্ন্মেণ্টের যেরূপ ক্ষমতা তাহাতে এই আইন পাস হইয়া যাওয়া খুবই সম্ভব। সুতরাং এই প্রস্তাবিত আইনটিকে নামঞ্জুর করিতে হইলে দেশীয় সদস্য-দিগকে ও কলিকাতার অধিবাসীদিগকে বিশেষ সতর্ক ও উদ্যোগী হইতে হইবে।

এই উদ্দেশ্য সাধনের জন্য নূতন আইনটির প্রকৃত উদ্দেশ্য কি, সে-সম্বন্ধে দেশের লোককে সচেতন করা প্রয়োজন। সরকার-পক্ষ হইতে গবর্ন্মেণ্টের সাধু উদ্দেশ্য সম্বন্ধে অনেক কথা বলা হইয়াছে। কিন্তু একটু তলাইয়া দেখিলেই মনে হয়, আইনের প্রকৃত উদ্দেশ্য কলিকাতাবাসীদের হিতসাধন নয়, গবর্ন্মেণ্টের জেদ এবং কতকগুলি বিদেশী ব্যক্তি ও বিদেশী কোম্পানীর স্বার্থরক্ষা।

কলিকাতা করপোরেশনের বর্ত্তমান আর্থিক ব্যবস্থা সম্বন্ধে স্বায়ত্তশাসন-বিভাগের মন্ত্রীর বিবৃতিতে ও নূতন আইনের ভূমিকায় যাহা বলা হইয়াছে তাহাতে লোকের ধারণা হইতে পারে, যে, করদাতাদের চক্ষে ধুলা দিয়া করপোরেশনে একটা বিরাট অপব্যয়, এমন কি প্রতারণা পর্য্যন্ত চলিতেছে; গবর্ন্মেণ্ট এ-সকলই দেখিতেছেন, বুঝিতেছেন, কিন্তু ক্ষমতার অভাবে কিছুই করিতে পারিতেছেন না। কিন্তু সত্যই কি তাই? গবর্ন্মেণ্টের পক্ষ হইতে যে-সকল "বে-আইনী" খরচ ও আইনকে "ফাঁকি" দেওয়ার কথা বলা হইয়াছে সেগুলি কি? যে-সকল কুব্যবস্থার জন্য এইরূপ একটি আইনের প্রয়োজন হইল, সেগুলি একমাত্র গবর্ন্মেণ্টেরই চক্ষে পড়িল, কলিকাতা করপোরেশনের কমিশনার, কলিকাতার করদাতা বা দেশের অন্য কাহারও চক্ষে পড়িল না, ইহা কি করিয়া সম্ভব হইতে পারে? না বুঝিতে হইবে, কলিকাতা ও মফস্বলের সমস্ত লোক পরামর্শ করিয়া কলিকাতা করপোরেশনকে ঠকাইতেছে! গবর্ন্মেণ্ট কোনও তথ্য প্রমাণ না দিয়া যেরূপ ভাবে একতরফা নিষ্পত্তি করিয়াছেন তাহাতে এইরূপই মনে হয়।

প্রকৃত প্রস্তাবে এখানেও দেশের লোক ও গবর্ন্মেণ্ট পক্ষের স্বার্থের এরূপ গুরুতর বিরোধ রহিয়াছে যে, গবর্ন্মেণ্টের পক্ষে এই আইনের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে সব কথা খুলিয়া বলা সম্ভব নয়। এত দিন পর্য্যন্ত কলিকাতা করপোরেশনের ভিতর দিয়া বহু বিলাতী কোম্পানীর প্রভূত আয় হইতেছিল। কলিকাতা করপোরেশন কংগ্রেস দলের আয়ত্তাধীন হওয়া এবং একজন বাঙালী করপোরেশনের প্রধান ইঞ্জিনিয়ার হওয়ার পর হইতে যে-সকল নূতন বিধি-ব্যবস্থা হইতেছে, তাহার ফলে এই সকল বিদেশী কোম্পানীর স্বার্থ ক্ষুণ্ণ হইবার সম্ভাবনা হইয়াছে। যে ইলেকট্রিসিটি 'স্কিম' নূতন আইনের একটি মুখ্য কারণ, উহার দ্বারা কলিকাতা ইলেকট্রিক সাপ্লাই করপোরেশনের

বিশেষ ক্ষতি হইবার সম্ভাবনা। সেজন্য গবর্মেণ্ট এই সকল বিধিব্যবস্থা মঞ্জুর করিতে নানা ওজরে বিলম্ব করিতেছিলেন। কলিকাতা করপোরেশন গবর্মেণ্টের বিলম্ব দেখিয়া নিজেদের ক্ষমতায় যাহা করা যায়, এইরূপ কয়েকটি কাজ আরম্ভ করিয়াছিলেন, উহাই গবর্মেণ্টের বিরক্তির অন্যতম কারণ।

কলিকাতা করপোরেশন কর্ত্তৃক বিদ্যুৎ-উৎপাদন ও কলিকাতার ক্লেদনিষ্কাশনের নূতন ব্যবস্থা, এই দুইটি বিষয় লইয়াই করপোরেশন ও গবর্মেণ্টের মধ্যে মনান্তর উপস্থিত হইয়াছে। গবর্মেণ্টের পক্ষ হইতে বলা হইতেছে যে, এই সকল ব্যাপারে করপোরেশন অযথা ব্যয় ও আইনানুযায়ী ক্ষমতার অপব্যয় করিয়াছেন। অথচ এই ক্লেদনিষ্কাশনের ব্যাপারেই সাহেব-পরিচালিত করপোরেশনের কত অপব্যয়ের অনুমোদন গত পঞ্চাশ বৎসরের মধ্যে গবর্মেণ্ট কর্ত্তৃক করা হইয়াছে, তাহার হিসাব লইলে বিস্মিত হইতে হয়।

১৮৭১ সনে কলিকাতার ক্লেদনিষ্কাশন-প্রণালীগুলির প্রসারণের কাজ আরম্ভ হয়। যে প্ল্যান অনুযায়ী এই কাজ আরম্ভ হইয়াছিল, তাহা অনেক বিচারবিতর্কের পর নামঞ্জুর হয়। উহার জন্য কুড়ি বৎসরে একশত দশ লক্ষ টাকা ব্যয় হয়।

১৮৯১ সনে এই বিষয়ে বল্ড্উইন ল্যাথাম নামে একজন ইঞ্জিনিয়ারকে পরামর্শ দিবার জন্য আশী হাজার টাকা দেওয়া হয়। ইঁহার পরামর্শ অনুমোদিত হয় নাই।

১৮৯৯ সনে করপোরেশন বে-আইনীভাবে অনেক টাকা ব্যয় করেন। যে-কাজে এই ব্যয় হয় তাহা বন্ধ করিয়া দেওয়া হয়। উহার জন্য করপোরেশনের কত ক্ষতি হইয়াছিল তাহা জানা যায় নাই।

১৯০০-১৯০১ সনে আবার বল্ড্উইন ল্যাথামের পরামর্শ লওয়া হয়। এবারে তাহার ব্যবস্থা অনুমোদিত হয় নাই।

১৯২৩ সনে বিদ্যাধরী নদী খনন করিবার জন্য তিন লক্ষ টাকা ব্যয় হয়। অথচ এই খননের দ্বারা কোন ফল হইবে না, ইহা ইঞ্জিনিয়ারদের দ্বারা সুনিশ্চিত বলিয়া স্থির হইয়াছিল। প্রকৃত প্রস্তাবেও বিদ্যাধরী-খননের দ্বারা কোন উপকার হয় নাই।

এই সময়েই আবার তিন লক্ষ টাকা ব্যয়ে আর একটি স্থান খনন করা হয়। ইহার দ্বারাও কোন ফল হয় নাই।

এই সকল ব্যবস্থা অনুমোদন করার পর গবর্মেণ্ট পক্ষ হইতে আবার প্রায় দুই কোটি টাকা ব্যয়ের একটি প্ল্যান মঞ্জুর করা হয়। সৌভাগ্যক্রমে এই প্ল্যান অনুযায়ী কোন কাজ হয় নাই।

এই সকল অপব্যয়ের পরও যে গবর্মেণ্ট বর্ত্তমান করপোরেশনকে অযথা ও বেআইনী ব্যয়ের জন্য দায়ী করিতেছেন, তাহাই আশ্চর্য্যের বিষয়।

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের কর্ম্মাধ্যক্ষ নির্ব্বাচন

বর্ত্তমান বর্ষের জন্য বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের কর্ম্মাধ্যক্ষ নির্ব্বাচন হইয়া গিয়াছে। এই নির্ব্বাচনে শ্রীযুক্ত রাজশেখর বসু পরিষদের সম্পাদক; শ্রীযুক্ত প্রিয়রঞ্জন সেন, শ্রীযুক্ত সুকুমাররঞ্জন দাশ, শ্রীযুক্ত চিন্তাহরণ চক্রবর্ত্তী ও শ্রীযুক্ত অনাথনাথ ঘোষ, এই চারিজন সহকারী সম্পাদক; শ্রীযুক্ত সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় পত্রিকাধ্যক্ষ; শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় গ্রন্থাধ্যক্ষ; শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রনাথ লাহা কোষাধ্যক্ষ; শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রনাথ ঘোষাল চিত্রশালাধ্যক্ষ; ও শ্রীযুক্ত বিনয়কুমার সরকার ছাত্রাধ্যক্ষ নিযুক্ত হইয়াছেন।

শ্রীযুক্ত রাজশেখর বসু মহাশয়ের নির্ব্বাচনে আমরা সুখী হইয়াছি। গল্পলেখক ও অভিধানকার হিসাবে বাংলা সাহিত্যে তাঁহার যথেষ্ট প্রতিষ্ঠা আছে, তদুপরি তিনি ব্যবসায় ও কর্ম্মপরিচালনে সুদক্ষ। বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ বর্ত্তমানে একটা আর্থিক সঙ্কটের মধ্য দিয়া যাইতেছে এরূপ আমরা শুনিয়াছি। শ্রীযুক্ত রাজশেখর বসুর নিয়োগে এই বিষয়ে সুশৃঙ্খলা হইবে আমরা এরূপ আশা করি।

অন্যান্য পদসমূহেও যথাযোগ্য ব্যক্তি নির্ব্বাচিত হইয়াছেন।

ভ্রম-সংশোধন—জ্যৈষ্ঠের 'প্রবাসী'র বিবিধ প্রসঙ্গে লেখা হইয়াছিল, বর্দ্ধমান-বিভাগে বিশ্ববিদ্যালয়ের ম্যাট্রিকুলেশন পর্য্যন্ত পড়াইবার ও পরীক্ষা দিবার অনুমতিপ্রাপ্ত বালিকা-বিদ্যালয় একটিও নাই, কেবল ফরাসী চন্দননগরে একটি আছে। আমরা কয়েকখানি চিঠি পাইয়াছি, যে, হাবড়া মেদিনীপুর, কাঁথি প্রভৃতিতেও এরূপ বালিকা-বিদ্যালয় আছে।

১২০।২, আপার সার্কুলার রোড, কলিকাতা, প্রবাসী প্রেস হইতে শ্রীমাণিকচন্দ্র দাস কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

সীতান্বেষণ

শ্রীচিন্তামণি কর

প্রবাসী প্রেস, কলিকাতা

"সত্যম্ শিবম্ সুন্দরম্"
"নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ"

Amiya

৩৩শ ভাগ, ১ম খণ্ড | শ্রাবণ, ১৩৪০ | ৪র্থ সংখ্যা

সাধু ও চলিত ভাষা

শ্রীরাজশেখর বসু

কয়েক মাস পূর্ব্বে প্রবাসীতে শ্রীযুক্ত অক্ষয়চন্দ্র সরকার এবং শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধি বাংলা অক্ষর সংস্কার সম্বন্ধে যে প্রবন্ধ লিখেছেন তার ফলে সাহিত্যানুরাগীদের ভিতর একটা চাঞ্চল্য দেখা দিয়েছে। এই চাঞ্চল্য স্বাস্থ্যের লক্ষণ। আর একটি সুসমাচার— স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ সংস্কার-কার্য্যে উৎসাহী হয়েছেন। যোগেশচন্দ্র অক্ষর ও বানান সংস্কারের বহু চেষ্টা এ যাবৎ করেছেন, কিন্তু তিনি অসহায়, তাই তাঁর নির্দ্দেশ উপেক্ষিত হয়েছে। কিন্তু এখন আশা করা যায় রবীন্দ্রনাথের নেতৃত্বে ও বিশ্ববিদ্যালয়ের আনুকূল্যে যদি ছাপার হরফের সংখ্যালাঘব ও কিছু কিছু রূপান্তর ধার্য্য হয় এবং যদি বানান নিরূপিত হয়, তবে অক্ষরকার মুদ্রাকর গ্রন্থকার সকলেই বেশী বিতণ্ডা না ক'রে তা মেনে নেবেন। শুনেছি কোনো এক বড় ছাপাখানার কর্ত্তা ইতিমধ্যেই কিছু কিছু নূতন রকম টাইপ ফরমাশ দিয়েছেন। গতানুগত্যের প্রতি অন্ধ অনুরাগ আমাদের এখন কিছু কমেছে, অনুকূল লক্ষণও দেখা যাচ্ছে, সুতরাং কিছু-না-কিছু পরিবর্ত্তন ঘটবেই। সংস্কারের এই সন্ধিক্ষণে একটা পুরাতন প্রসঙ্গ তুলতে চাই—সাধু ও চলিত ভাষা।

কিছুকাল পূর্ব্বে সাধু ও চলিত ভাষা নিয়ে যে বিতর্ক চলছিল এখন তা বড় একটা শোনা যায় না। যাঁরা সাধু অথবা চলিত ভাষার গোঁড়া, তাঁরা নিজ নিজ নিষ্ঠা বজায় রেখেছেন, কেউ কেউ অপক্ষপাতে দুই রীতিই চালাচ্ছেন। পাঠক-মণ্ডলী বিনা দ্বিধায় মেনে নিয়েছেন—বাংলা সাহিত্যের ভাষা পূর্ব্বে এক রকম ছিল, এখন দু রকম হয়েছে।

আমরা শিশুকাল থেকে বিদ্যালয়ে যে বাংলা শিখি তা সাধু বাংলা, সেজন্য তার রীতি সহজেই আমাদের আয়ত্ত হয়। খবরের কাগজে মাসিক পত্রিকায় অধিকাংশ পুস্তকে প্রধানতঃ এই ভাষাই দেখতে পাই। বহুকাল বহুপ্রচারের ফলে সাধুভাষা এদেশের সকল অঞ্চলে শিক্ষিতজনের অধিগম্য হয়েছে। কিন্তু চলিত ভাষা শেখবার সুযোগ অতি অল্প। এর জন্য বিদ্যালয়ে কোনও সাহায্য পাওয়া যায় না, বহুপ্রচলিত সংবাদপত্রাদিতেও এর প্রয়োগ বিরল। এই তথাকথিত চলিত ভাষা সমগ্র বঙ্গের প্রচলিত ভাষা নয়, এ ভাষা ভাগীরথী-তীরবর্ত্তী কয়েকটি জেলার কথিত ভাষার মার্জ্জিত রূপ। এই কারণে কোনো কোনো অঞ্চলের লোক চলিত ভাষা সহজে আয়ত্ত করতে পারে কিন্তু অন্য অঞ্চলের লোকের পক্ষে তা দুরূহ।

যোগেশচন্দ্র-প্রবর্ত্তিত দুটি পরিভাষা এই প্রবন্ধে প্রয়োগ করছি—মৌখিক ও লৈখিক। আমার একটা অযত্নলব্ধ মৌখিক ভাষা আছে, তা রাঢ়ের বা পূর্ব্ববঙ্গের বা অন্য অঞ্চলের। চেষ্টা করলে এই ভাষাকে অল্পাধিক বদলে কলকাতার মৌখিক ভাষার অনুরূপ ক'রে নিতে পারি—

না পারলেও বিশেষ অসুবিধা হয় না। কিন্তু আমার মুখের ভাষা যেমনই হোক, আমাকে একটা লৈখিক অর্থাৎ লেখবার ভাষা শিখতেই হবে—যা সর্ব্বসম্মত, সর্ব্বাঞ্চলবাসীর বোধ্য, অর্থাৎ সাহিত্যের উপযুক্ত। এই লৈখিক ভাষা 'সাধু' হ'তে পারে কিংবা 'চলিত' হ'তে পারে। কিন্তু যদি দুটিই কষ্ট ক'রে শিখতে হয় তবে আমার উপর অনর্থক জুলুম হবে। যদি চলিত ভাষাই যোগ্যতর হয় তবে সাধু ভাষার লোপ হ'লে হানি কি? সাধু ভাষায় রচিত যে-সব সদ্‌গ্রন্থ আছে তা না-হয় যত্ন ক'রে তুলে রাখব। কিন্তু যে ভাষা অচল হওয়াই বাঞ্ছনীয়, এখন আর তার বৃদ্ধির প্রয়োজন কি? পক্ষান্তরে, যদি সাধুভাষাতেই সকল উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয় তবে এই সুপ্রতিষ্ঠিত বহুবিদিত ভাষার পাশে আবার একটা অনভ্যস্ত ভাষা খাড়া করবার চেষ্টা কেন?

যাঁরা সাধু ও চলিত উভয় ভাষারই ভক্ত, তাঁরা বলবেন, কোনোটাই ছাড়তে পারি না। সাধুভাষার প্রকাশশক্তি একপ্রকার, চলিত ভাষার অন্যপ্রকার। দুই ভাষাই আমাদের চাই, নতুবা সাহিত্য অঙ্গহীন হবে। ভাষার দুই ধারা স্বতঃস্ফূর্ত হয়েছে, সুবিধা-অসুবিধার হিসাব ক'রে তার একটিকে রুদ্ধ করা অসম্ভব।

কোনো ব্যক্তি বা বিদ্বৎসঙ্ঘের ফরমাশে ভাষার সৃষ্টি স্থিতি লয় হ'তে পারে না। শক্তিশালী লেখকদের প্রভাবে ও সাধারণের রুচি অনুসারে ভাষার পরিবর্ত্তন কালক্রমে ধীরে ধীরে ঘটে। কিন্তু প্রকৃতির উপরেও মানুষের হাত চলে। সাধারণের উপেক্ষার ফলে যদি একটা বিষয় কালোপযোগী হয়ে গড়ে না ওঠে, তথাপি প্রতিষ্ঠাশালী কয়েকজনের চেষ্টায় অল্পকালেই তার প্রতিকার হ'তে পারে। অতএব সাধু ও চলিত ভাষার সমস্যায় হতাশ হবার কারণ নেই।

'ভাষা' শব্দটি আমরা নানা অর্থে প্রয়োগ করি। জাতি-বিশেষের কথা ও লেখার সামান্য লক্ষণসমূহের নাম 'ভাষা', যথা 'বাংলা ভাষা'। আবার, শব্দাবলীর প্রকার (form)—অর্থাৎ কোন্ শব্দ বা শব্দের কোন্ রূপ প্রয়োজ্য বা বর্জ্জনীয় তার রীতিও 'ভাষা', যথা 'সাধুভাষা'। আবার, প্রকার এক হ'লেও ভঙ্গী (style)র ভেদও 'ভাষা', যথা 'বিদ্যা-সাগরী, বঙ্কিমী ভাষা'।

বিদ্যাসাগরী ও বঙ্কিমী ভাষা যতই ভিন্ন হোক, দুটিই যে সাধুভাষা তাতে সন্দেহ নেই। ভেদ যা আছে তা প্রকারের নয়, ভঙ্গীর। হুতোমী ও বীরবলী ভাষায় বিস্তর ব্যবধান, কিন্তু দুটিই চলিত ভাষা, প্রকার এক, ভঙ্গী ভিন্ন। আজ-কাল সাধু ও চলিত ভাষায় যে সাহিত্য রচনা হচ্ছে তার লক্ষণাবলী তুলনা করলে এই সকল ভেদাভেদ দেখা যায়—

(১) দুই ভাষার প্রকারভেদ প্রধানতঃ সর্ব্বনাম ও ক্রিয়ার রূপের জন্য। 'তাঁহারা বলিলেন, তাঁরা বললেন'।

(২) সাধুভাষার কয়েকটি সর্ব্বনাম মৌখিকভাষার অনুকরণ করেছে। রামমোহন রায় লিখতেন 'তাঁহারদিগের', তা থেকে ক্রমে 'তাহাদিগের, তাহাদের' হয়েছে। আর একটু অগ্রসর হ'লেই হবে 'তাদের'। ক্রিয়াপদেও মৌখিকের প্রভাব দেখা যাচ্ছে। 'লিখা, শিখা, শুনা, ঘুরা' স্থানে অনেকে সাধুভাষাতেও 'লেখা, শেখা, শোনা, ঘোরা' লিখছেন।

(৩) সর্ব্বনাম ও ক্রিয়াপদ ছাড়াও কতকগুলি অ-সংস্কৃত ও সংস্কৃতজ শব্দে পার্থক্য দেখা যায়। সাধুতে 'উঠান, উনান, মিছা, কুয়া, সুতা', চলিতে 'উঠন, উনন, মিছে, কুয়ো, সুতো'। কিন্তু এই রকম বহু শব্দের চলিত রূপই এখন সাধুভাষায় স্থান পেয়েছে। 'আজিকালি, চাউল, চাকুরি, একচেটিয়া, লতানিয়া' স্থানে 'আজকাল, চাল, চাকরি, একচেটে, লতানে' সাধুভাষাতেও চলছে।

(৪) সংস্কৃত শব্দের প্রয়োগ উভয় ভাষাতেই অবাধ। কিন্তু সাধারণতঃ চলিত ভাষায় অধিকতর সংযম দেখা যায়। এই প্রভেদ উভয় ভাষার প্রকারগত নয়, লেখকের ভঙ্গীগত, অথবা বিষয়ের লঘুগুরুত্বগত।

(৫) আরবী ফার্সী প্রভৃতি বিদেশাগত শব্দের প্রয়োগ উভয় ভাষাতেই অবাধ, কিন্তু চলিত ভাষাতে কিছু বেশী। এই ভেদও ভঙ্গীগত, প্রকারগত নয়।

(৬) অনেক লেখক কতকগুলি সংস্কৃত শব্দের মৌখিক রূপ চলিতভাষায় চালাতে ভালবাসেন, যদিও সে সকল শব্দের মূল রূপ চলিতভাষার প্রকৃতিবিরুদ্ধ নয়। যথা 'সত্য, মিথ্যা, নূতন, অবশ্য' না লিখে 'সত্যি, মিথ্যে, নতুন, অবিশ্যি'। এও ভঙ্গী মাত্র।

উল্লিখিত লক্ষণগুলি বিচার করলে বোঝা যাবে যে, সাধুভাষা অতি ধীরে ধীরে মৌখিক শব্দ গ্রহণ করছে, কিন্তু চলিতভাষা কিঞ্চিৎ ব্যগ্রভাবে তা আত্মসাৎ করতে চায়। সাধুভাষার এই মন্থর প্রগতির কারণ, তার বহুদিনের নিরূপিত

শৃঙ্খল। চলিতভাষার স্বচ্ছন্দ বিস্তারের কারণ, শৃঙ্খলের একান্ত অভাব। একের শৃঙ্খলার ভার এবং অন্যের বিশৃঙ্খলা উভয়ের মিলনের অন্তরায় হয়ে আছে। যদি লৈখিকভাষাকে কালোপযোগী লঘু শৃঙ্খলায় নিরূপিত করতে পারা যায় তবে সাধু ও চলিতের প্রকারভেদ দূর হবে, একই লৈখিকভাষায় দর্শন বিজ্ঞান পুরাণ ইতিহাস অবধি লঘুতম সাহিত্য পর্যন্ত স্বচ্ছন্দে রচিত হতে পারবে, বিষয়ের গুরুত্ব বা লঘুত্ব অনুসারে ভাষার ভঙ্গীর অদল-বদল হবে মাত্র।

লৈখিক ও মৌখিক ভাষার ভঙ্গীগত ভেদ অনিবার্য, কারণ, লেখবার সময় লোকে যতটা সাবধান হয়, কথাবার্ত্তায় ততটা হতে পারে না। কিন্তু দুই ভাষার প্রকারগত ভেদ অস্বাভাবিক। কোনও এক অঞ্চলের মৌখিকভাষার প্রকার আশ্রয় করেই লৈখিকভাষা গড়তে হবে। এ বিষয়ে ভাগীরথ-মৌখিকভাষারই যোগ্যতা বেশী, কারণ, এ ভাষার পীঠস্থান কলকাতা সকল সাহিত্যিকের মিলনক্ষেত্র, রাজধানীও বটে।

কিন্তু যদি ভাগীরথ-মৌখিকভাষার উচ্চারণের উপর অতিমাত্র পক্ষপাত করা হয় তবে উদ্যম পণ্ড হবে। শতচেষ্টা সত্ত্বেও বানান ও উচ্চারণের সঙ্গতি সর্ব্বত্র বজায় রাখা সম্ভবপর নয়। 'মতো, ছিলো, কাল, করো' ইত্যাদি কয়েকটি রূপ না-হয় উচ্চারণসূচক (?) করা গেল, কিন্তু আরও শত-শত শব্দের গতি কি হবে? বিভিন্ন টাইপের ভারে আমাদের ছাপাখানা নিপীড়িত, তার উপর যদি ও-কারের বাহুল্য আর নূতন নূতন চিহ্ন আসে তবে লেখার ও ছাপার শ্রম বাড়বে মাত্র। 'কাল' অর্থে কল্য বা সময় বা কৃষ্ণ, 'করে' অর্থে does কি having done, তার নির্দ্ধারণ পাঠকের সহজবুদ্ধির উপর ছেড়ে দেওয়াই ভাল, অর্থবোধ থেকেই উচ্চারণ আসবে অবশ্য, নিতান্ত আবশ্যক স্থলে বিশেষ ব্যবস্থা করা যেতে পারে। উচ্চারণের উপর বেশী ঝোঁক দেওয়া অনাবশ্যক। কলকাতার লোক যদি পড়ে 'রমণীর মোন' আর বরিশাল-বাসী যদি পড়ে 'রোমোণীর মওন', তাতে সর্ব্বনাশ হবে না, পাঠকের অর্থবোধ হলেই যথেষ্ট। লৈখিকভাষাকে স্থানবিশেষের উচ্চারণের অনুলেখ করা অসম্ভব। লৈখিক বা সাহিত্যের ভাষার প্রকার সংযত নিরূপিত ও সহজে অধিগম্য হওয়া আবশ্যক, নতুবা তা সর্ব্বজনীন হয় না, শিক্ষারও বাধা হয়। সুতরাং একটু রফা ও কৃত্রিমতা অর্থাৎ সকল মৌখিকভাষা হতে অল্পাধিক প্রভেদ—অনিবার্য।

মোট কথা, চলিতভাষাই একমাত্র লৈখিকভাষা হবার যোগ্য, যদি তাতে নিয়মের বন্ধন পড়ে এবং সাধুভাষার সঙ্গে রফা করা হয়। বহু লেখক যে আধুনিক চলিতভাষাকে দূর থেকে নমস্কার করেন তার কারণ কেবল অনভ্যাসের কুণ্ঠা নয়, তাঁরা এ ভাষার নমুনা দেখে পথহারা হয়ে যান। বিভিন্ন লেখকের মর্জ্জি অনুসারে একই শব্দের বানান বদলায়, একই রূপের বিভক্তি বদলায়, কভু বা অকারণে ক্রিয়াপদ বিশেষ্য সর্ব্বনামের আগে এসে বসে, বাংলা শব্দাবলীর অদ্ভুত সমাস কানে পীড়া দেয়, ইংরেজী ইডিয়মের সজ্জায় মাতৃভাষা চেনা যায় না। সাধুভাষার প্রাচীন গণ্ডি ছেড়ে চলিতভাষায় এলেই অনেক লেখক একটু অস্থির হয়ে পড়েন। এই অস্থিরতা মুক্তি-জনিত, এতে উদ্বেগের কারণ নেই। বাঙালী কুলবধূ আবাসের গণ্ডিতে আড়ষ্ট হয়ে থাকে, প্রবাসে এলেই কিঞ্চিৎ ছুটোপাটি করে। নূতনের ভিত্তি দৃঢ় হলেই স্বচ্ছন্দতার সঙ্গে সংযম আসবে।

এমন লৈখিকভাষা চাই যাতে প্রচলিত সাধুভাষা আর মার্জ্জিতজনের মৌখিকভাষা উভয়েরই সদ্‌গুণ বজায় থাকে। সংস্কৃত সমাসবদ্ধ পদের দ্বারা যে বাক্যসংকোচ লাভ হয় তা আমরা চাই, আবার মৌখিকভাষার যে বাগ্‌ভঙ্গী তার সহজ প্রকাশ-শক্তিও হারাতে চাই না। চলিতভাষার লেখকরা একটু অবহিত হলেই সর্ব্বগ্রাহ্য সর্ব্বপ্রকাশক লৈখিকভাষা প্রতিষ্ঠালাভ করবে। বলা বাহুল্য, গল্পাদি লঘুসাহিত্যে পাত্র-পাত্রীর মুখে সব ভাষারই স্থান আছে, মায় তোৎলামি পর্য্যন্ত।

এখন আমার প্রস্তাব সংক্ষেপে নিবেদন করি।—

(১) প্রচলিত সাধুভাষার কাঠামো অর্থাৎ অন্বয়-পদ্ধতি বা syntax বজায় থাকুক। ইংরেজী ভঙ্গীর বেশী অনুকরণ সাধারণে বরদাস্ত করবে না।

(২) ক্রিয়াপদ ও সর্ব্বনামের সাধুরূপের বদলে চলিত-রূপ গৃহীত হোক। বানান 'দেখছে, দেখলাম, দেখান' হবে কি 'দেখচে, দেখলুম, দেখানো' হবে, তার মীমাংসা সহজেই হতে পারবে।

(৩) অন্যান্য অ-সংস্কৃত ও সংস্কৃতজ শব্দের চলিতরূপ গৃহীত হোক। যদি অনভ্যাসের জন্য বাধা হয়, তবে

কতকগুলির সাধুরূপ কতকগুলির চলিতরূপ নেওয়া হোক। বোধ হয় যে শব্দের সাধু ও চলিত রূপের প্রভেদ শেষ অক্ষরে, তার চলিতরূপ গ্রহণযোগ্য, যথা 'সুতা, মিছা, কুয়া' স্থানে 'সুতো, মিছে, কুয়ো'। যার প্রভেদ আদ্য বা মধ্য অক্ষরে, তার সাধুরূপই রাখা যেতে পারে, যথা 'ওপর, ভেতর, পুরনো, উনন' না লিখে 'উপর, ভিতর, পুরানো উনান'।

(৪) যে সংস্কৃত শব্দ চলিতভাষায় অচল নয়, তা যেন বিকৃত করা না হয়। 'সত্য, মিথ্যা, নূতন, অবশ্য' বজায় থাকুক।

(৫) এ ভাষায় অনুবাদ করলে রামায়ণাদি সংস্কৃত রচনার ওজোগুণ নষ্ট হবে, অথবা এ ভাষায় দর্শন বিজ্ঞান লেখা যাবে না- এমন আশঙ্কা ভিত্তিহীন। দুরূহ শব্দ আর সমাসে সাধুভাষার একচেটে অধিকার নেই। 'বাত্যাবিক্ষোভিত মহোদধি উদ্বেল হইয়া উঠিল' না লিখে '...হয়ে উঠল' লিখলে গুরুচণ্ডাল দোষ হবে না। দু-দিনে অভ্যাস হয়ে যাবে। শুনতে পাই ধুতির সঙ্গে কোট পরতে নেই, পাঞ্জাবী পরতে হয়। এই রকম একটা ফ্যাশনের অনুশাসন চলিতভাষাকে অভিভূত করেছে। ধারণা দাঁড়িয়েছে-- চলিতভাষা একটা তরল পদার্থ, এতে হাত-পা ছড়িয়ে সাঁতার কাটা যায়, কিন্তু ভারী জিনিষ নিয়ে নয়। ভার বইতে হলে শক্ত জমি চাই, অর্থাৎ সাধুভাষা। এই ধারণার উচ্ছেদ দরকার। চলিতভাষাকে বিষয় অনুসারে তরল বা কঠিন করতে কোনও বাধা নেই।

বিশ্ববিদ্যালয়ের আদেশে নবরচিত পাঠ্যপুস্তকে যদি এই ভাষা চলে তবে তা কয়েক বৎসরের মধ্যেই সাধারণের আয়ত্ত হবে। ব্যাকরণ আর অভিধানে এই ভাষার শব্দাবলীর বিবৃতি দিতে হবে, অবশ্য সাধুভাষাকেও কিছুমাত্র উপেক্ষা করা চলবে না, কারণ, সে ভাষার বহু পুস্তক বিদ্যালয়ে পাঠ্য থাকবে। কালক্রমে যখন সাধুভাষা প্রত্ন হয়ে পড়বে তখনও তা স্পেনসার শেক্সপিয়ারের ভাষার তুল্য সমাদরে অধীত হবে। নূতন লৈখিকভাষাও চিরকাল এক রকম থাকবে না নিয়মের বন্ধন যেমনই হোক। শক্তিশালী লেখকগণের প্রভাবে পরিবর্তন আসবেই, এবং কালে কালে যেমন পঞ্জিকা-সংস্কার আবশ্যক হয়, তেমনি যোগ্যজনের চেষ্টায় লৈখিকভাষারও নিয়মসংস্কার আবশ্যক হবে।

বসুন্ধরা

শ্রীঅমরেন্দ্রনাথ বসু

নিখিল কাব্যে চিনিনু তোমারে,
বসুন্ধরা !
জীবন-তন্ত্রে সে বাণী কি মোর
স্বতন্তরা ?

পরমানন্দ প্রভাতের সম
রূপে রসে তুমি চিন্ময়ী মম ;
আঁধার শিয়রে জ্বলে যে দীপালি
চিরন্তনী,
তারি মত তুমি অন্তরলোকে
নিরঞ্জনী !

হেরিনু তোমারে প্রথম চাহনি
উন্মেষিয়া ;
সেদিন উঠিল জীবন প্রথম
নিশ্বসিয়া।

নিত্য স্রোতের নানা নিগ্রহে,
কত আনন্দে শত বিদ্রোহে,
কার পানে চাহি জীবনোৎসবে
অমর-রুচি ?
কাহার উদার অঙ্কে নিবিড়
পরশ শুচি ?

জীবন-উৎসে যে রসের ধারা
উৎসারিছে ;
যে-মন্ত্র প্রেম জীবন-দেউলে
উচ্চারিছে ;
তব রহস্যে নানা সন্ধানে,
ধেয়ে চলে তারা কি গভীর টানে !
তোমার রূপের অসীমে হৃদয়
নিদ্রাহারা,
তিমির-স্বপ্ন-প্রয়াণে যেমন
সন্ধ্যাতারা !

অসামান্য

শ্রীপ্রবোধকুমার সান্যাল

দুই দিকের প্রান্তরের পরে বসন্তকালের মধ্যাহ্ন-রৌদ্র প্রখর হইয়া উঠিয়াছিল। ট্রেন চলিতেছে।

দক্ষিণ দেশের গাড়ী, হাওড়া ষ্টেশন হইতে সকালে ছাড়িয়া আসিয়াছে। প্রথম শ্রেণীর ক্ষুদ্র কাম্‌রাখানিতে এতক্ষণ তিনজন যাত্রী ছিল। ইউরোপীয় ভদ্রলোকটি একটু আগে নামিয়া যাইবার পর এখন কেবল দুইজন পোষ্টাল্ সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট্ মিষ্টার মুখার্জ্জি ও তাঁহার স্ত্রী। মিষ্টার মুখার্জ্জি কয়েক দিন ধরিয়া ডাকঘরগুলি পরিদর্শন করিয়া বেড়াইতেছেন, আরও দিন-দুই তাঁহার ডিউটি, তারপর স্বস্থানে ফিরিয়া যাইবেন।

'তোমার এবার কষ্ট হচ্চে নীলা, রোদে তোমার মুখ রাঙা হয়ে উঠেচে!'

নীলা হাসিয়া কহিল, 'তাই ত, উপায়?'

'সত্যি ঠাট্টা নয়, মুখ রাঙা হয়েচে!'

'আমার মুখ রাঙা হ'লে তুমি ত খুশী হও!'

'ধারালো তোমার বিদ্রূপ। কিন্তু রাগ করো না, আর মাত্র দু-দিন। তুমি সঙ্গে না থাকলে আমি কাজ করতে পারিনে নীলা।'

'কেন?'

মিষ্টার মুখার্জ্জি উঠিয়া একবার আলস্য ভাঙিয়া লইলেন, তারপর হাসিয়া কহিলেন, 'Woman's beauty is the energy of a man.'

'থাক্, পুরুষমানুষের কাঙালপনা আমার সহ্য হয় না!' বলিয়া নীলা তাহার জুতাপরা পা দুইখানি সুমুখের দিকে ছড়াইয়া বসিল।

'আঃ, এবার বাঁচলাম'— মুখার্জ্জি কহিলেন, 'এত ছোট কাম্‌রায় বেশী লোক থাকা...বাস্তবিক, লোকটা এতক্ষণ হাঁ ক'রে তাকাচ্ছিল তোমার দিকে।'

'কোন্ লোকটা?'

'এই যে গো বসেছিল এখানে, সেই ফিরিঙ্গিটা...অসভ্য!'

নীলা কহিল, 'কই আমি ত লক্ষ্য করিনি! আর তাকালেই বা, ক্ষয়ে ত যাইনি!'

মিষ্টার মুখার্জ্জি বলিলেন, 'সে তুমি বুঝবে না কি রাগ হয়!'

নীলা হাসিল। বলিল, 'ওটা রাগ নয়, অন্য কিছু।'

'কি? বিদ্বেষ?'

'জানিনে।' বলিয়া নীলা চুপ করিয়া রহিল।

আবার কিয়ৎক্ষণ পরে কি একটা ষ্টেশনে আসিয়া গাড়ী দাঁড়াইল। অনেকক্ষণ এক জায়গায় বসিয়া বসিয়া নীলা ক্লান্ত হইয়া গেছে, এইবার সে গাড়ী হইতে নামিয়া একটুখানি হাঁটিয়া বেড়াইতে লাগিল। আরদালি আসিয়া কিছু বরফ ও ফলমূল গাড়ীর ভিতরে ডিসের উপরে সাজাইয়া দিয়া গেল, পরে বাহিরে দাঁড়াইয়া সেলাম করিয়া জানিতে চাহিল, আর কিছু চাই কি না!

'নেহি।'

আরদালি চলিয়া যাইতেই বাঁশী বাজিল, নীলা আসিয়া উঠিল গাড়ীতে। দরজাটা বন্ধ করিয়া মুখার্জ্জি কহিলেন, 'ফুটবোর্ডে পা দিয়ে তুমি ওঠা-নামা করলেই আমার ভয় করে, কখন্ হয়ত যাবে পা ফস্‌কে.. এসব ত তোমার অভ্যেস নেই! তা ছাড়া শরীরও কাহিল, বড় ভাবনা হয় তোমার জন্য নীলা।'

'মাথাটা ধরেচে একটু।' নীলা চোখ বুজিয়া কহিল।

'তা ত ধরবেই—' বলিয়া মুখার্জ্জি ব্যস্ত হইয়া বরফ ও ফলের প্লেট্‌টা আনিলেন। বলিলেন,—'তোমার শরীরের যত্ন হচ্চে না...এত ট্রাভেল্ করা, চল ওখানে নেমেই ডাক্তারকে ডাকতে পাঠাব। কিছু নেবে এর থেকে?'

নীলা কেবল মাত্র এক টুক্‌রা বরফ তুলিয়া লইল।

'তিন বছর হ'ল তোমাকে বিয়ে করেচি, কিন্তু আমি দেখচি তোমার শরীর তোমার মনের মতই ডেলিকেট, সেন্‌সিটিভ্। কত যে ভাবি তোমার জন্যে! অথচ একটুখানি

সেবাও তুমি করতে দাও না...কাছে এলেই তুমি দূরে সরে যাও...কতখানি আমার দুঃখ !'

নীলা কহিল, 'আমি কি কিছু বলেচি তোমাকে ?'

'বলনি কিন্তু ভঙ্গীতে জানিয়েচ। তোমার সেবার অধিকার যে পেল না সে নিতান্ত দুর্ভাগ্য !' মিষ্টার মুখার্জ্জি একটু থামিলেন, প্লেটটা সুমুখের টেবলের উপর নামাইয়া রাখিলেন, তারপর পুনরায় কহিলেন, 'এ বেলা এই শাড়ীটা পরেচ ? কিন্তু গাড়ী থেকে নামবার সময় সেই ম্যাডরাসি পারপল্ শাড়ীটা পরে নিও, কেমন ? সেখানা পরলে মনে হয় তুমি যেন এন্‌জেল্, নেমে এসেচ স্বর্গ থেকে। বাস্তবিক, তোমার দিকে যখন লোকেরা তাকায় তখন আমার রাগ হয় বটে, কিন্তু খুশীও হই। সকলের ঈর্ষার উপর দিয়ে সৌভাগ্যের রথ ছুটিয়ে দিতে আমার খুব ভাল লাগে।'

গম্ গম্ করিয়া ট্রেন ছুটিতেছে। মিষ্টার মুখার্জ্জি একটু থামিলেন, তারপর পুনরায় সুরু করিলেন সেই চিরন্তন বিষয়বস্তুটির পুনরাবৃত্তি। স্ত্রীর জন্য তাঁহার উদ্বেগ-আকুলতার সীমা নাই, কোথায় কোথায় প্রসাধন-সামগ্রীর জন্য অর্ডার পাঠাইয়াছেন, কতগুলি ডাক্তারের সহিত তিনি স্ত্রীর স্বাস্থ্য-রক্ষা সম্বন্ধে আলোচনা করিয়াছেন, এবারের গ্রীষ্মে দার্জ্জিলিং কিংবা মুসৌরী কোনটা নীলার বর্ত্তমান স্বাস্থ্যের পক্ষে অনুকূল, ইত্যাদি। নীলা চুপ করিয়া শুনিয়া যাইতেছিল, তিন বৎসরকাল এমনি নীরবেই সে শুনিয়া আসিতেছে। ইহার ঠিক পরেই সুরু হইবে তাহার রূপ সম্বন্ধে স্তুতিবাক্য। সে দেখিতে সুন্দর, সে এন্‌জেল্, তাহার কণ্ঠে সঙ্গীত, তাহার সর্ব্বাঙ্গে বসন্তকালের ঐশ্বর্য্যসম্ভার। প্রতিদিন সে না-কি তাহার মোহগ্রস্ত স্বামীর চক্ষে নব নব রূপে মূর্ত্তিমতী হইয়া উঠে, নব নব রসে,—নব নব অনুপ্রেরণায়। বারে বারে পরিচ্ছদ পরিবর্ত্তন করিলে স্বামী আনন্দিত হন নিত্যনূতন সাজসজ্জায় প্রকৃতি যেমন আপন বৈচিত্র্যকে প্রকাশ করে, যেমন বর্ষার পরে শরৎ, শীতের পর বসন্ত।

নিরন্তর প্রশংসা ও খ্যাতি মানুষকে অবসাদগ্রস্ত করিয়া তুলে, ক্লান্তি আনিয়া দেয়। নীলার চক্ষে তন্দ্রা নামিয়া আসিল। মিষ্টার মুখার্জ্জি তাহার মাথার কাছে বসিয়া তাহার চুলের ভিতরে ধীরে ধীরে আঙুল চালাইতে লাগিলেন।

মেদিনীপুরের একটা সাবডিভিশনের ষ্টেশনে গাড়ী আসিয়া দাঁড়াইতেই নীলার তন্দ্রা ভাঙিল। প্লাটফরমে কয়েক জন ভদ্রলোক তাঁহাদের অভ্যর্থনা করিয়া নামাইতে আসিয়া দাঁড়াইয়াছেন। সাবপোষ্টমাষ্টার ও ইন্‌স্‌পেক্টর বাবু হাসিয়া মিষ্টার মুখার্জ্জিকে নমস্কার করিলেন। দুই একজন কেরানী উভয়কে নমস্কার করিয়া সরিয়া দাঁড়াইল। গাড়ী বেশীক্ষণ থাকিবে না, আরদালি আসিয়া জিনিষপত্র নামাইয়া লইল। ষ্টেশনে গাড়ীর ব্যবস্থার প্রয়োজন হয় নাই, নিকটেই সরকারি বাংলো।

মাষ্টারবাবু কহিলেন, 'সব ব্যবস্থা আছে, থাকার কোনো কষ্ট হবে না, আমরা রান্নাবান্নার ব্যবস্থা ক'রে রেখেচি।'

ইনস্‌পেক্টর কহিলেন, 'যদি অসুবিধে না হয় তবে দিন-দুই থেকে যাবেন।'

মিষ্টার মুখার্জ্জি কহিলেন, 'থাকা আর চল্‌বে না, এঁর শরীর ভাল নেই। আপনাদের রেকর্ডগুলো আজকেই আমাকে দেখে শুনে নিতে হবে, কাল সকালের গাড়ীতেই ফিরে যাব। বেলা দেখছি আর বাকি নেই। হরিপদ যে, কি খবর ?'

একটি লোক অদূরে তাঁহাদের সঙ্গে সঙ্গে চলিতেছিল, এইবার সবিনয়ে হেঁট হইয়া নমস্কার করিল। বলিল, 'আমাদের সৌভাগ্য যে আপনারা এলেন !'

'কাজকর্ম্ম কেমন করচ ?'

মাষ্টারবাবু বলিলেন, 'কাজকর্ম্ম ত ভালই করে, তবে স্ত্রীকে নিয়েই ওর বিপদ...ছুটোছুটি ক'রে হায়রাণ হয়।'

মুখার্জ্জি কহিলেন, 'স্ত্রী এখন কেমন ?'

হরিপদ কহিল, 'সেই একই রকম।'

'তুমি ছুটি চেয়েছিলে, কিন্তু মঞ্জুর করতে পারিনি। ছুটি আর তোমার পাওনা নেই হরিপদ।'

হরিপদ মাথা হেঁট করিয়া চলিতে লাগিল।

বাংলোর বারান্দার কাছে আসিয়া সকলে বিদায় লইল। মাষ্টারবাবু প্রভৃতি সবাই রেকর্ড গুছাইতে তাড়াতাড়ি ডাকঘরের দিকে চলিয়া গেলেন। স্বামি-স্ত্রী বাংলোর ভিতরে প্রবেশ করিল।

সম্মুখে বিস্তৃত ঘাসের জমি; তাহাকেই বেষ্টন করিয়া রাঙামাটির চক্রাকার পথ ঘুরিয়া ষ্টেশনের দিকে চলিয়া গেছে। উত্তর দিকে কয়েকটি সরকারী দপ্তর, পাশেই পুলিসের থানা, আদালত, মহকুমা হাকিমের বাসা—তাহারই

সংলগ্ন উদ্যানে কয়েকটি সুস্থ ও বলিষ্ঠ বালক-বালিকা খেলা করিতেছে। পূর্ব্বদিক হইতে দক্ষিণ ও পশ্চিমে ঘন শালের জঙ্গল,—বসন্ত-বাতাসে থাকিয়া থাকিয়া সেই জঙ্গলের ভিতর মর্ম্মর শব্দ হইতেছিল।

অপরাহ্ণ হইয়া আসিয়াছে, কিয়ৎক্ষণ বিশ্রাম করিয়া ও জলযোগ সারিয়া মিষ্টার মুখার্জ্জি বাহির হইলেন। বলিয়া গেলেন, 'বেশীক্ষণ আমার লাগবে না, ঘণ্টাখানেক মাত্র, তুমি ততক্ষণ ওদের একটু দেখিয়ে শুনিয়ে দাও নীলা।'

নীলা কহিল, 'চমৎকার জায়গা, আমার বেশ লাগচে।'

আরদালি ও বেয়ারা মিলিয়া রান্নার আয়োজন করিল, খাটে বিছানা পাতিল, ডিনারের টেবিল সাজাইল, আলোর ব্যবস্থা করিল। বাহিরের বারান্দায় একটা ইজি-চেয়ারে নীলা নীরবে বসিয়াই রহিল, তাহাকে কিছুই নির্দ্দেশ করিয়া দিতে হইল না। আরদালি আসিয়া তাহার হাতের কাছে চা ও জলখাবার রাখিয়া দিয়া গেল।

'কি রান্না করবি রে ভর্ত্তু ?'

ভর্ত্তু কহিল, 'আলু-পটলের দম, ভাজা, আর ডিমের--'

'না না', ডিম নয় বাবা।'

'তবে মাংস করব, মা ?'

'তাই কর্, তবে আমাকে বাদ দিয়ে করিস। তোর বাবুর ত মাংস নইলে খাওয়াই হয় না। আমার ওসব কিছু দরকার নেই।'

'যে আজ্ঞে।' বলিয়া ভর্ত্তু মাংসের ব্যবস্থা করিতে গেল।

ঘণ্টাখানেকের মধ্যেই মিষ্টার মুখার্জ্জি আসিয়া পৌঁছিলেন। বলিলেন, 'শরীর একটু সুস্থ হয়েচে নীলা? মাথাধরাটা ছেড়েচে ? খবর পাঠিয়েছি ডাক্তারকে, রাতে আসবেন।'

নীলা কহিল, 'ডাক্তারের আর কি দরকার ?'

'তুমি বোঝ না নীলা, তুমি বুঝতে পার না তোমার শরীর। এখন প্রত্যেক দিন তোমাকে একজন ডাক্তারের য়্যাটেণ্ড্ করা উচিত, মাথাধরা জিনিষটা ভয়ানক খারাপ।'

'এখন মাথা ভাল হয়ে গেছে।'

'আবার ধরতে পারে, এখন থেকে যদি সাবধান হওয়া যায়—' বলিয়া মুখার্জ্জি ভিতরে ঢুকিয়া তাঁহার টুপি, জামা ও ট্রাউজার ছাড়িতে লাগিলেন।

নিকটে শালবনের ধারে ধারে একটু বেড়াইয়া আসিবার কথা হইল। নীলা পরিল একখানি জরির পাড়-দেওয়া নীলাম্বরী; মিষ্টার মুখার্জ্জি কোট-প্যাণ্ট ছাড়া চলিতে পারেন না, অনেক অনুরোধে ও উপরোধে তিনি কোঁচানো ধুতি, পাঞ্জাবী ও চাদর চড়াইয়া বাহির হইয়া আসিলেন। সূর্য্যের আলো তখনও একেবারে নিষ্প্রভ হয় নাই, ইহারই মধ্যে শালবনের পারে চাঁদ উঠিয়াছে; বোধ করি পূর্ণিমার কাছাকাছি একটা কোনো তিথি হইবে। মাঠ পার হইয়া তাহারা রাঙামাটির পথের উপর উঠিয়া আসিল। গাছপালার ফাঁক দিয়া রেলপথের টেলিগ্রাফের তারগুলি দেখা যাইতেছে। আশপাশে অরণ্যপুষ্পের একরূপ সংমিশ্রিত বিচিত্র গন্ধে পথের এলোমেলো বাতাস ভারাক্রান্ত হইয়া উঠিয়াছিল।

'এই বুঝি এদেশের বেড়াবার জায়গা, এইটুকু ?'

মুখার্জ্জি কহিলেন, 'না, ভাল জায়গা আছে, ষ্টেশনের ওপারে, ওপারেই বেশী লোকজনের বাস।'

নীলা কহিল, 'চল না ওইদিকেই যাওয়া যাক্।'

মুখার্জ্জি একবার হাতঘড়ির দিকে তাকাইলেন, পরে তাকাইলেন আকাশের দিকে। তারপর বলিলেন, 'যেতে আপত্তি নেই, তবে এখন সাড়ে-ছ'টা, একটু দেরি হয়ে গেছে,--তাড়াতাড়ি ফিরে আসা দরকার।'

'চল ঘুরেই আসি, এলাম ত সব দেখেই যাই। চাঁদের আলো হবে, পথে অসুবিধে হবে না।'

দুই জনে ষ্টেশনে আসিয়া প্লাটফর্ম হইতে নামিয়া ট্রেনের লাইন অতি সাবধানে অতিক্রম করিল। সাড়ে-ছয়টা বাজিলেও প্রান্তরের পরে দিনান্তকালের দীপ্তিহীন আলো তখনও ঝিকিমিকি করিতেছে। পথে আসিয়া নামিতেই এক পাশ হইতে দুই তিনটি লোক তাহাদের নমস্কার জানাইয়া সরিয়া গেল। পথ সুন্দর ও মসৃণ, দুইধারের বন কাটিয়া এক একখানি পাকা ঘর তৈরি হইতেছে। দূরে বা নিকটে গ্রাম নাই, কেবল এখানে-ওখানে দুই চারখানি পাকা বাংলায় গৃহস্থবাসের চিহ্ন দেখা যাইতেছিল। পথের কোলেই একটি শীর্ণ জলধারা নিঃশব্দে বহিয়া চলিয়াছে, কেউ বলে খাল, কেউ বলে নদী, তাহারই পুলের উপর দিয়া স্বামি-স্ত্রী পার হইয়া গেল।

দেখিতে দেখিতে অন্ধকার হইয়া আসিল, চন্দ্রালোক উজ্জ্বল হইয়া উঠিল। পথে আলো কোথাও নাই, মাঠের জঙ্গলে

থাকিয়া থাকিয়া জোনাকি পোকা জলিতেছিল। মুখার্জ্জি কহিলেন, 'চল নীলা এবার ফেরা যাক্‌।'

'চল।'

ফিরিবার পথে কিছুদূর আসিয়া একজন পথিকের সহিত মুখোমুখি হইল। লোকটি পথের একপাশে দাঁড়াইয়া বিনীত কণ্ঠে কহিল, 'আলো এনে ধরব আপনাদের? —অন্ধকার হয়ে গেছে।'

'কে তুমি?'

'আজ্ঞে আমি হরিপদ।'

'ও, তোমার বাসা বুঝি এইদিকে হরিপদ? বেশ বেশ—থাক্‌, আলো আর ধরতে হবে না, এমনিই চলে যেতে পারব।'

হরিপদ কহিল, 'বাসা আমার এই খুব কাছেই। আমার অনেক দিনের সাধ...এসেছেন যখন আপনারা, একবার আমার ঘরে পায়ের ধুলো দিয়ে যান্‌।' বলিতে বলিতেই সে যেন কৃতার্থ হইয়া গেল।

'আচ্ছা আচ্ছা হবে, এদিকে আবার এলে আসা যাবে এক সময়, আজ একটু রাত হয়ে গেছে কি-না!'

নীলা কহিল, 'তা হোক গে, এতদূর এসেচি, উনি বলচেন, চল দেখেই যাই।'

মুখার্জ্জি আম্‌তা-আম্‌তা করিয়া রাজি হইতেই হরিপদ ছুটিয়া আলো আনিতে গেল। নীলা কহিল, 'এরই স্ত্রীর তখন অসুখের কথা শুনছিলাম না?'

মুখার্জ্জি কহিলেন, 'হ্যাঁ, এই সে। আমিই এর চাকরি ক'রে দিয়েছিলাম, তাই এ আমার খুব অনুগত।'

তাঁহার গলার আওয়াজটা নীলার কানে ভাল শুনাইল না, অহঙ্কারী মনের একটি গোপন দম্ভ যেন তাহার কানের ভিতর দিয়া অন্তরে আঘাত করিল। আর কোনও কথা সে বলিতে পারিল না।

আলো আনিয়া হরিপদ কহিল, 'আসুন, আজ আমার সৌভাগ্য।'

পথ হইতে নামিয়া হরিপদর অনুসরণ করিয়া তাহারা উভয়ে একখানি পাতার ঘরের দাওয়ার পরে উঠিয়া আসিল। পাশাপাশি দুইখানি ঘর, একখানিতে টিম্‌ টিম্‌ করিয়া তেলের আলো জলিতেছে। ভিতরে দারিদ্র্যের একটি করুণ ছায়া। হরিপদ কহিল, 'আসুন এই ঘরে।'

দরজার ভিতরে একবারটি ঢুকিয়াই মিষ্টার মুখার্জ্জি কহিলেন, 'আমি বাইরেই আছি, বুঝলে হরিপদ? তোমার এই উঠোনটি বেশ, চমৎকার বাতাস।' বলিতে বলিতে তিনি পুনরায় বাহির হইয়া আসিলেন। কাহারও বুঝিতে বাকি রহিল না যে, তিনি এই আতিথেয়তাকে এড়াইবার চেষ্টা করিতেছেন।

কিন্তু নীলা আসিল না। হরিপদর রুগ্ন স্ত্রী যেখানে শুইয়া আছে তাহারই কাছে গিয়া সে মেঝের উপরেই বসিয়া পড়িল। হরিপদ তাড়াতাড়ি আসন দিতে গেল, কিন্তু সে লইল না। শীর্ণ অস্থিচর্ম্মসার দেহ,—মেয়েটির বয়স বাইশ-তেইশের বেশী হইবে না। রূপ নাই, এবং সে যে কতখানি রূপহীনা তাহা এই স্তিমিত দীপালোকে এই পর্ণকুটীরের বুকচাপা দারিদ্র্যের ভিতরে বসিয়া না দেখিলে বুঝা যায় না। সমস্ত মুখখানিতে ক্ষতের দাগ, বোধ করি কোনোদিন বসন্ত হইয়াছিল। সর্ব্বাঙ্গে কোথাও আভরণের চিহ্নমাত্র নাই, কেবল দুই হাতে দুইগাছি মাটির রাঙা রুলি। নিতান্ত জীর্ণ শয্যায় পড়িয়া মেয়েটি চোখ চাহিয়াই ছিল বটে, কিন্তু নবাগতাকে পাশে আসিয়া বসিতে দেখিয়া কোনরূপ সাড়াও দিল না, অভ্যর্থনাও করিল না।

'উনি কি আর জান্‌তে পেরেচেন, চোখে যে দেখতে পান্‌ না।' বলিয়া হরিপদ স্নিগ্ধ হাসিয়া স্ত্রীর কানের কাছে মুখ লইয়া গেল এবং উচ্চ কণ্ঠে কহিল, 'শুন্‌চ, মা এসেচেন, আলাপ করবে না মা'র সঙ্গে?'

মেয়েটি ব্যাকুল হইয়া এদিক-ওদিক মুখ ফিরাইল, বলিল, 'কই?'

'এই যে।' বলিয়া নীলা ঝুঁকিয়া পড়িয়া একখানি হাত তাহার গায়ের উপর রাখিল, বলিল, 'মা নয়, আমি বোন,—কেমন আছেন?'

মেয়েটি ক্লান্ত হাসি হাসিল। অকর্ম্মণ্য জীবনের সহিত যাহার এতটুকুও পরিচয় আছে সে-ই জানে এ হাসির অর্থ কি!

নীলা জিজ্ঞাসা করিল, 'কি অসুখ হরিপদবাবু?'

হরিপদ কহিল, 'কি-যেন একটা ইংরেজী নাম আছে, তার বাংলা নেই। এই ত আজ আট বছর হ'ল।'

'আট বছর!'—দুইটি শঙ্কাকুল চক্ষু বিস্ফারিত করিয়া নীলা তাহার দিকে তাকাইল।

'হ্যাঁ, এই আষাঢ়ে ন' বছর হবে। খুব কষ্ট পাচ্ছেন,

চোখ আর কান গিয়ে ভারি বিপদ হয়েচে। প্রত্যেক বছরেই আশা করি এবার উনি ভাল হবেন, সংসারের ভার নেবেন—কিন্তু তা আর হন্ না। আত্মীয়রা আসেন, দেখে চলে যান্... উনি আবার একটু খিটখিটে মানুষ কি-না!'

'আপনাকেই সব করতে হয় ত?'

'করি কোনো রকমে, আর কাজ ত এমন কিছু নয়! সকাল বেলায় ওঁকে সুস্থ ক'রে রেখে ট্রেনে বেরিয়ে যাই, সন্ধ্যের আগেই ফিরে আসি।—দাঁড়ান, ভয় পাবেন না, ওর অমন হয় মাঝে মাঝে।' বলিতে বলিতে হরিপদ তাড়াতাড়ি আসিয়া স্ত্রীর অর্দ্ধেক দেহটা কোলের উপর তুলিয়া লইল। হাত-মুখ কিম্ভূতকিমাকার বাঁকাইয়া মেয়েটি তখন গোঁ গোঁ করিতেছে। সযত্নে তাহার গায়ে হাত বুলাইয়া শান্ত হাসি হাসিয়া হরিপদ কহিল, 'আপনাকে কাছে পেয়ে আনন্দ হয়েচে কি-না...ডাক্তার বলে এর নাম মৃগী।'

ভয়ে আড়ষ্ট হইয়া নীলা বসিয়া রহিল। হরিপদ কহিল, 'বিয়ের এক বছর না যেতেই এই অসুখ। পরের চাকরি করি, চাকরিই ত ভরসা, তাই সেবাযত্ন করার তেমন সময় পাইনে। একদিন অজ্ঞান অবস্থায় আমার হাতটা কামড়ে দিয়েছিলেন... এই দেখুন না হাসপাতালে গিয়ে এই আঙুলটা বাদ দিতে হয়েচে।' বলিয়া সে আবার হাসিল।

এই পরিচ্ছন্ন হাসিটুকুর মধ্যে কোথাও ক্লান্তি নাই, অবসাদ নাই, বিরক্তি নাই। এই চিররুগ্ন কুরূপা স্ত্রী, এই দারিদ্র্য ও স্বজন-সহায়হীন দুঃস্থ জীবন—ইহাদেরই আসনের 'পরে বসিয়া এই শান্ত নিরীহ মানুষটি যেন কঠিন তপস্যা করিয়া চলিয়াছে। ইহা সংগ্রাম নয়, সাধনা। একটি অপরিসীম সৌন্দর্য্যোপলব্ধিতে নীলার সর্ব্বশরীর রোমাঞ্চ হইয়া উঠিল। আকাশের ধ্রুবতারার অচঞ্চলতাকে তাহার মনে পড়িল, তাহার মনে পড়িল প্রভাত-সূর্য্যের প্রথম রশ্মিটির পবিত্রতাকে!

চুপ করিয়া সে বসিয়া রহিল, বাহিরে রাত্রি গভীর হইতে লাগিল, স্বামী অপেক্ষা করিতেছেন, কিন্তু তাহার উঠিতে ইচ্ছা হইল না। দেবতার মন্দিরে সে যেন এক সামান্য পূজারিণী, তাহার ইচ্ছা হইল ধূপ-ধূনা দিয়া এই প্রদীপটি লইয়া এই অর্দ্ধশয়ান হরপার্ব্বতীর আরতি করিয়া যায়। চক্ষু তাহার বাষ্পাকুল হইয়া আসিল।

একটু পরে রোগিণী আবার সুস্থ হইল। সুস্থ হইয়া সে হাসিল, সে হাসি দেখিলে মানুষ ভয় পায়। হাতটা বাড়াইয়া আন্দাজে সে নীলার একখানি হাত ধরিল, তারপর সেখানি লইয়া নিজের মাথার পরে রাখিয়া কহিল, 'আশীর্ব্বাদ কর দিদি!'

নীলা তাহার মুখের কাছে মুখ লইয়া কহিল, 'আশীর্ব্বাদ যে চাইতে এলাম!'

এমন সময় বাহিরে মিষ্টার মুখার্জ্জির গলার আওয়াজ শোনা গেল। নীলা আর বসিতে পারিল না, উঠিয়া দাঁড়াইয়া কহিল, 'এখানে থাকলে কাল আবার আসতুম, কিন্তু ওঁর থাকার উপায় নেই ত!'

হরিপদ উঠিয়া আসিয়া প্রণাম করিতে চাহিল, নীলা সরিয়া দাঁড়াইয়া কহিল, 'অমন কাজ করবেন না, প্রণামের যোগ্য আমি নয়, আপনি।'

হরিপদ অবাক হইয়া তাহার দিকে তাকাইল। নীলা তাড়াতাড়ি রোগিণীর মুখখানি নাড়িয়া আর একটু আদর করিয়া বাহির হইয়া আসিল। হরিপদ আলো ধরিতে গেল, কিন্তু সে বাধা দিয়া কহিল, 'কিছু দরকার নেই, বেশ যাব আমরা, আপনি গিয়ে বসুন ওঁর কাছে।'

উঠানে নামিয়া স্বামীর সহিত গিয়া সে মিলিত হইল। জ্যোৎস্নায় চারিদিক ভাসিয়া যাইতেছে, পথ দেখিয়া লইবার কিছুই অসুবিধা হইল না। মিষ্টার মুখার্জ্জি একটু উত্যক্ত হইয়াছিলেন, একজন নগণ্য স্টোরের বাড়ির উঠানে সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট হইয়া এতক্ষণ অপেক্ষা করাটা তাঁহার সম্মানে আঘাত করিয়াছে।

'গল্প জমেছিল না-কি?'

চলিতে চলিতে নীলা কহিল, 'না।'

'তবে বুঝি হরিপদ জলখাবার খাওয়াচ্ছিল? ওর স্ত্রীর সঙ্গে 'গঙ্গাজল' পাতিয়ে এলে না কেন?'

নীলা বিদ্রূপ শুনিয়াও চুপ করিয়া রহিল। মিষ্টার মুখার্জ্জি পুনরায় কহিলেন, 'সামান্য লোককে প্রাধান্য দেওয়া তোমার স্বভাব।'

নীলা একবার তাহার মুখের দিকে তাকাইল, তারপর মুখ নীচু করিয়া চলিতে চলিতে কহিল, 'সামান্য নয়!'

এইবার তাহার চক্ষে জল নামিয়া আসিল।

বিংশ শতাব্দীর রাষ্ট্রীয় চিন্তাধারা

শ্রীবিমানবিহারী মজুমদার, এম-এ

বিংশ শতাব্দীর ইতিহাসের বৈশিষ্ট্য

আমাদের দেশে যে পরিমাণে রাষ্ট্রীয় আন্দোলন হইতেছে তাহার তুলনায় রাষ্ট্রীয় দর্শনের আলোচনা বিশেষ কিছুই হইতেছে না। কর্ম্মের প্রেরণা আসে চিন্তা হইতে, আবার চিন্তাশক্তি উদ্বুদ্ধ হয় কর্ম্মের দ্বারা। চিন্তা ও কর্ম্ম 'বীজাঙ্কুর ন্যায়ের' মত পরস্পরের সহিত ঘনিষ্টভাবে সংশ্লিষ্ট। রাষ্ট্রীয় আন্দোলন ব্যাপক হইয়া পড়িয়াছে, অথচ আধুনিক রাষ্ট্র যে-সকল ভিত্তি ও স্তম্ভের উপর প্রতিষ্ঠিত তাহার সম্বন্ধে সুস্পষ্ট ধারণা জনগণের মনে জাগরূক করিবার চেষ্টা হইতেছে না। ইহার ফলে এই আন্দোলনে অনেক ত্রুটি ও অসামঞ্জস্য পরিলক্ষিত হইতেছে। আধুনিক রাষ্ট্রচিন্তার অন্যতম নায়ক জি-ডি-এইচ্ কোল তাঁহার "Social Theory" নামক গ্রন্থে বলিয়াছেন, পরাধীন জাতির বিভিন্নপ্রকার সঙ্ঘ জ্ঞাত বা অজ্ঞাতসারে স্বাধীনতা অর্জ্জনের জন্য চেষ্টিত হয়। কোল-এর এই উক্তি মূলতঃ সত্য বটে, কিন্তু স্বাধীনতার স্বরূপ কি, রাষ্ট্রের ক্ষমতার সীমা কতদূর, ব্যক্তির সহিত তাহার সম্বন্ধ কি, জাতীয় রাষ্ট্রের সহিত বিশ্বমানবতার সামঞ্জস্য করা যায় কিরূপে, শ্রমিক ধনিক ও ভূস্বামীর পরস্পরের অধিকার ও কর্ত্তব্য কিরূপে নিরূপিত হইবে—এই সমস্ত সমস্যা প্রত্যেক স্বাতন্ত্র্যকামী জাতিকেই নিজ নিজ অবস্থানুসারে সমাধান করিতে হইবে। উল্লিখিত সমস্যাগুলি সম্বন্ধে বিংশ শতাব্দীর রাষ্ট্রীয় চিন্তানায়কগণের কি মত তাহাই এই প্রবন্ধে নিরপেক্ষ ভাবে আলোচনার চেষ্টা করিব।

সাধারণতঃ রাষ্ট্রীয় দর্শনের উপাদান আসে রাষ্ট্রীয় ইতিহাস, অর্থাৎ জাতীয় ও আন্তর্জ্জাতিক জীবনের অভিজ্ঞতা হইতে। উনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগের ইতিহাসের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে কয়েকটি বৈশিষ্ট্যদ্যোতক ধারা পরিলক্ষিত হয়। ঐ সকল বিশিষ্ট ঘটনা রাষ্ট্রীয় চিন্তাকে নূতন পথে পরিচালিত করিয়াছে। উনবিংশ শতাব্দীর চতুর্থপাদ হইতে কলকারখানার প্রসার আরও বাড়িয়া গিয়াছে। ইহার এক শত বৎসর পূর্ব্বে ইংলণ্ডে কলকারখানার যুগের সূত্রপাত হয় বটে, কিন্তু ইউরোপের অন্যান্য রাষ্ট্রে ও আমেরিকা এবং এশিয়ায় উহার প্রতিপত্তি বাড়ে গত পঞ্চাশ-ষাট বৎসরের মধ্যে। পাশ্চাত্য জগতের সর্ব্বত্রই ছোট ছোট কারবারগুলি ক্রমে বিশাল আকার ধারণ করিতে থাকে, যৌথ ব্যবসায়ের প্রসার হইতে আরম্ভ হয়, শ্রমিকদিগের নিয়োগ ও নিয়ন্ত্রণ-ব্যাপারে বৈজ্ঞানিক প্রণালী (scientific management) অনুসৃত হইতে থাকে, এবং এক-একটি কারবার এক-একটি মালের উপর জাতীয় বা আন্তর্জ্জাতিক একচেটিয়া অধিকার স্থাপন করিতে প্রয়াসী হয়। কল-কারখানার যেমন বৃদ্ধি হইতে লাগিল, শহরের সংখ্যাও তেমনই বাড়িয়া যাইতে লাগিল। পুরাতন শহরগুলিতেও লোকসংখ্যা অসম্ভব রকম বাড়িয়া গেল। ইহার ফলে একদিকে যেমন শ্রমিকদিগের মধ্যে সঙ্ঘবদ্ধ হইবার সুযোগ জুটিল, অন্যদিকে তেমনি এতগুলি বিত্তহীনের একত্র সম্মিলন হওয়ায় তাহাদের বাসগৃহ, স্বাস্থ্য, শিক্ষা, শিশুপালন ও আকস্মিক বিপদের প্রতিকার উপায় প্রভৃতি কঠিন সামাজিক সমস্যার উদ্ভব হইল। শ্রমিকগণ ট্রেড ইউনিয়নে সঙ্ঘবদ্ধ হইয়া নিজেদের অবস্থার উন্নতির চেষ্টা করিতে লাগিল। আবার দার্শনিকগণও ধন-উৎপাদন-প্রণালীর নিয়ন্ত্রণ ও উৎপন্ন ধনের ন্যায্য বিভাগ সম্বন্ধে নানা প্রকার মতবাদ উপস্থিত করিতে লাগিলেন। এই দুই প্রকারের চেষ্টার ফলে সমাজের শ্রমিক কর্ত্তৃত্ব স্থাপনের জন্য সমূহতন্ত্রবাদ (Collectivism), অরাষ্ট্রতন্ত্রবাদ (Anarchism), উৎপাদক-সঙ্ঘতন্ত্রবাদ (Syndicalism), নৈগম সমাজতন্ত্রবাদ (Guild-Socialism), সমবায় (Co-operation) ও বলশেভিক তন্ত্রের উৎপত্তি হয়।

উনবিংশ শতাব্দীর শেষপাদে ইংরেজের দেখাদেখি অন্যান্য পাশ্চাত্য জাতির মনে সাম্রাজ্য লাভের ইচ্ছা প্রবল হয়। ভৌগোলিক আবিষ্কার, যানবাহনের সুবিধা, মিশনরিদের ধর্ম্মপ্রচারের ইচ্ছা, লোকসংখ্যার বৃদ্ধি, এই সকল কারণে নূতন আবাসস্থলের প্রয়োজন ও সঞ্চিত ধন খাটাইবার বাসনা

পাশ্চাত্য জাতিগুলিকে আফ্রিকার ও এশিয়ার দেশবাসীদের সংস্পর্শে লইয়া আসে। প্রধানতঃ উৎপন্ন সামগ্রীর কাটতি ও কাঁচা মালের আমদানি করিবার জন্য আধুনিক সাম্রাজ্যবাদের উৎপত্তি। কিন্তু পাশ্চাত্য জাতির, বিশেষতঃ ইংরেজগণের, শাসন বিস্তারের ফলে অধীন জাতিদের মনে রাষ্ট্রীয় অধিকার লাভের ইচ্ছাও জাগরিত হয়। মহাযুদ্ধের পর পোল্যাণ্ড, ফিনল্যাণ্ড, ল্যাটভিয়া, এস্টোনিয়া, চেকোস্লো-ভাকিয়া, যুগোশ্লাভিয়া প্রভৃতি বহু পরাজিত জাতির স্বাধীনতা লাভ দেখিয়া আফ্রিকা ও এশিয়ার অধীন জাতির মনেও স্বরাষ্ট্রনিয়ন্ত্রণের (self-determination) ইচ্ছা প্রবল হইয়া উঠে। ইহাতে সাম্রাজ্যবাদের সহিত জাতীয়তাবাদের সংঘর্ষ উপস্থিত হইয়াছে। কিন্তু জাতীয়তাবাদের শক্তি আন্তর্জ্জাতিক কয়েকটি আন্দোলনের ফলে হ্রাস হইবার সম্ভাবনা আছে। শেষোক্ত আন্দোলনের দুইটি রূপ,—এক হইতেছে জাতিসঙ্ঘের (League of Nations) কর্ম্মপদ্ধতি, আর বিভিন্ন দেশের শ্রমিকগণের স্বার্থের একত্ব অনুভব।

এই দুইটি ঘটনা ছাড়া বিংশ শতাব্দীতে আর একটি ব্যাপারও লক্ষ্য করিবার বিষয়। সেটি নারীজাগরণ আন্দোলন। রাষ্ট্র-ব্যাপারে নরনারীর সমান অধিকার ফ্রান্স ব্যতীত সকল প্রধান রাষ্ট্রেই স্বীকৃত হইয়াছে। পুরুষের ন্যায় নারীও প্রতিনিধি নির্ব্বাচন করিবার ও প্রতিনিধি হইবার ক্ষমতা লাভ করিয়াছে।

বিত্তহীনের রাষ্ট্রীয় অধিকার

কলকারখানার প্রসার, প্রাচ্য জাতির উপর পাশ্চাত্য জাতির অধিকার বিস্তার ও নারীর রাষ্ট্রীয় অধিকার—এই তিনটি ঐতিহাসিক ঘটনা আধুনিক রাষ্ট্রচিন্তাকে কি ভাবে প্রভাবান্বিত করিয়াছে এক্ষণে তাহারই আলোচনা করিব। কলকারখানার প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে শ্রমিক আন্দোলন প্রবল আকারে দেখা দিয়াছে। মহাযুদ্ধের সময় ইউরোপীয় জাতি-সমূহ সঞ্চিত বিত্ত ব্যয় করিতে থাকে ও ধন আহরণে বিরত হইতে বাধ্য হয়। যুদ্ধের জন্য প্রয়োজনীয় গোলাবারুদ, জাহাজ, ডুবোজাহাজ, এরোপ্লেন, পোষাক প্রভৃতির উৎপাদন সে সময়ে চলিয়াছিল বটে, কিন্তু তাহাতে জাতীয় ধনসম্ভার সমৃদ্ধ হয় নাই। যুদ্ধের পরে প্রত্যেক ইউরোপীয় রাষ্ট্রেরই জাতীয় ধনভাণ্ডার শূন্য হইয়া পড়ে। ফলে সব দেশেই বেকারের সংখ্যা অসম্ভব রকম বাড়িয়া যায়। যে-ধন উৎপন্ন হইতে লাগিল তাহার অংশ-বিভাগ লইয়া শ্রমিক ও ধনিকের মধ্যে ভীষণ দ্বন্দ্ব দেখা গেল। যুদ্ধে যোগ দেওয়ার জন্য শ্রমিকদের রাষ্ট্রীয় অধিকারবোধ জন্মিল। তাহারা বুঝিল, যুদ্ধের দ্বারা তাহারাই সর্ব্বাপেক্ষা ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে। এক জাতির সহিত অন্য জাতির বিরোধের অর্থ এক রাষ্ট্রের ধনিক-সম্প্রদায়ের সহিত অন্য রাষ্ট্রের ধনিকদিগের স্বার্থের সংঘর্ষ। যুদ্ধের সময় অনেক ধনিক ধন অর্জ্জন করিবার অন্যায্য সুযোগ পাইয়াছিল। সুতরাং শ্রমিকগণ রাষ্ট্রে এমন অধিকার দাবি করিতে লাগিল যাহাতে ভবিষ্যতে আর ধনিকগণ যুদ্ধ বাধাইয়া তাহাদের সর্ব্বনাশ সাধন করিতে না পারে। এই আন্দোলনের দাবি মিটাইবার জন্য বিভিন্ন মতবাদী মনীষী বিভিন্ন প্রকার সমাধান উপস্থিত করিয়াছেন।

সমূহতন্ত্রবাদ

শ্রমিকগণের দাবি ও তাহাদের অধিকার লাভের উপায় সম্বন্ধে পূর্ব্বে Louis Blanc, J. K. Rodbertus, F. Lass-alle প্রভৃতি মনীষী গবেষণা করিলেও উহার ঋষি কার্ল মার্কস্। মার্কস্ ইতিহাসের মধ্যে ধনিক ও শ্রমিকের আবহমানকালের দ্বন্দ্ব, ধনিকের দ্বারা শ্রমিকের নিষ্পেষণ ও বিত্তহীন সম্প্রদায়ের ক্রমশঃ সংখ্যাবৃদ্ধি দেখিতে পান। তিনি বলেন, শ্রমিকেরাই ধন উৎপাদন করিয়া থাকে, সুতরাং উৎপন্ন ধন তাহাদেরই ন্যায্য প্রাপ্য। ধন ক্রমশঃ কতিপয় মুষ্টিমেয় ধনীর হাতে পুঞ্জীভূত হইতেছে। ইহার ফলে সংখ্যাগরিষ্ঠ বিত্তহীনের সহিত সংখ্যালঘিষ্ঠ বিত্তবানের সংঘর্ষ উপস্থিত হইবে, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক বিপ্লব আসিবে। তাহার পর শ্রমিকগণ রাষ্ট্রীয় ও বার্ত্তাসম্পর্কীয় সমস্ত ক্ষমতা নিজের হাতে লইবে। তখন ধন ব্যক্তিবিশেষের হাতে না থাকিয়া রাষ্ট্রের হাতে আসিবে, শিক্ষা অবৈতনিক হইবে, শ্রম করিতে প্রত্যেকেই বাধ্য হইবে ও সমাজ হইতে শ্রেণী-বিভাগ অন্তর্হিত হইবে। এই সকল উদ্দেশ্য সিদ্ধ করিবার জন্য সকল দেশের শ্রমিকগণ মিলিত হইয়া আন্তর্জাতিক সঙ্ঘ স্থাপন করিবে ও কার্য্যে অগ্রসর হইবে।

মার্কস্‌কে গুরু মানিয়া বিত্তহীনের রাষ্ট্রীয় অধিকার লইয়া বিভিন্ন মতবাদ সৃষ্ট হইয়াছে। ইহার মধ্যে Collectivism

বা সমূহতন্ত্রবাদ সর্ব্বপ্রথমে প্রচারিত হয়। ইহার মূল উদ্দেশ্য ধন-উৎপাদনের উপায়গুলি অর্থাৎ কলকারখানা, রেল ষ্টীমার, জমি প্রভৃতি রাষ্ট্রের হাতে আনা ও রাষ্ট্রকর্ত্তৃক সর্ব্বসাধারণের উপকারার্থ নিয়ন্ত্রিত ও পরিচালিত করা। ইংলণ্ডে ১৮৮৪ খৃষ্টাব্দে সিডনী ওয়েব্ ও তাঁহার ভাবী পত্নী, বার্ণার্ড শ, মিসেস্ বেসাণ্ট প্রভৃতি মহামনীষাসম্পন্ন নরনারী ফেবিয়ান সোসাইটি নামে একটি সঙ্ঘ স্থাপন করিয়া সমূহতন্ত্রবাদ প্রচার করিতে আরম্ভ করেন। তাঁহারা কেহই সাধারণ শ্রমজীবী নহেন. তাঁহাদের লেখাও মুটে মজুরের জন্য নহে। তাঁহারা শ্রমজীবীদিগকে সংক্ষুব্ধ করিয়া রাষ্ট্রীয় বিপ্লবের সাহায্যে অর্থনৈতিক সংস্কার করিবার পক্ষপাতী নহেন। তাঁহারা সমাজতন্ত্রবাদের উপযোগী মনোভাব আনিবার জন্য কতকগুলি প্রবন্ধ প্রকাশ করেন। তাহাতে তাঁহারা ধন ও ভূমির উপর গণতন্ত্রমূলক রাষ্ট্রের একচেটিয়া অধিকার স্থাপনের ব্যবস্থা দেন। রাষ্ট্রের পরিচালনার ভার রাজনীতি উপজীবী ব্যক্তিদের হাতে না রাখিয়া বিশেষজ্ঞদিগের উপর ন্যস্ত করা হউক, এই মতের দ্বারা প্রভাবান্বিত হইয়া জার্ম্মানী, ইংলণ্ড ও আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রে সমাজতন্ত্রবাদী রাজনৈতিক দলের উদ্ভব হয়। ঐ সকল দেশে কারবার ও কারখানা এত বিশালকায় হইয়া উঠিয়াছে যে. রাষ্ট্র তাহার কর্ত্তৃত্ব গ্রহণ করিতে পারে। জার্ম্মানীতে সমূহ-তন্ত্রবাদের কতকগুলি নীতি অনুসৃতও হইয়াছিল। কিন্তু আধুনিক চিন্তানায়কগণ সমূহতন্ত্রবাদের অনেক দোষের উল্লেখ করিয়া থাকেন। তাহার মধ্যে প্রধান এই, যে, রাষ্ট্রের কর্ম্মচারিবৃন্দ বা বুরোক্রেসী জাতির অর্থনৈতিক স্বার্থপরিচালনার উপযুক্ত নহে। তাহাদের হাতে অতিকায় কারখানা ও কারবার আসিলে ঘুষ ও পক্ষপাতিত্ব, অক্ষমতা ও অত্যাচার বৃদ্ধি পাইবার সম্ভাবনা।

অরাষ্ট্রতন্ত্রবাদ

উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে অরাষ্ট্রতন্ত্রের (Anarchism) প্রভাব দেখা দেয়। এই মতবাদী ব্যক্তিগণ ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যে এতদূর বিশ্বাসশীল যে, ইঁহারা মনে করেন, রাষ্ট্রপরিবার ও সমাজবন্ধনের দ্বারা ব্যক্তিত্বের বিকাশের বিঘ্ন হয়। বিংশ শতাব্দীতে এই মতের প্রধান পোষক ছিলেন রুষিয়ার প্রিন্স ক্রপট্‌কিন। তিনি প্রাণিতত্ত্ববিদ্যার অনুসরণ করিয়া স্থির করেন যে, শাসন ও আইনের দ্বারা ব্যক্তিকে বদ্ধ না রাখিয়া পরস্পরের সাহায্য করিবার সংস্কারের প্রতি শ্রদ্ধাবান হওয়া প্রয়োজন। তাহার দ্বারাই সমাজ সংগঠন রক্ষা পাইবে। তাঁহার মতে আইন ও শাসন কেবলমাত্র আধুনিক শ্রেণী-বৈষম্যকেই চিরস্থায়ী করে। সুতরাং বাধ্যতামূলক রাষ্ট্রের উচ্ছেদসাধন করিয়া স্বাধীন ব্যক্তিগণের স্বাধীন সঙ্ঘসমূহ গঠন করা উচিত। ব্যক্তিগত সম্পত্তির বিলোপসাধন করিলে জেল, পুলিস, আইন, আদালত, হাকিম ও হুকুম কিছুরই প্রয়োজন থাকিবে না। অরাষ্ট্রবাদিগণ রাষ্ট্রের প্রয়োজনীয়তা একেবারেই স্বীকার করেন না। কিন্তু সমাজের বর্ত্তমান অবস্থায় রাষ্ট্রশক্তি না থাকিলে ব্যক্তির সহিত ব্যক্তির, সঙ্ঘের সহিত সঙ্ঘের ও সঙ্ঘের সহিত ব্যক্তির সম্বন্ধ নিরূপণ ও নির্দ্ধারণ করিবার কোন উপায় থাকিবে না। নিট্‌শের অতিমানববাদ এই অরাষ্ট্রতন্ত্রেরই অন্য রূপ। তিনি পরাক্রমশীল ব্যক্তির উপাসক। তাঁহার মতে দুর্ব্বলের উচ্ছেদসাধন করিয়া পরাক্রান্ত ব্যক্তিরা যদি ভোগ্যবস্তুর উপর কর্ত্তৃত্ব স্থাপন করে তবে সমাজের কল্যাণ সাধিত হয়।

উৎপাদক-সঙ্ঘ-তন্ত্রবাদ

অরাষ্ট্রতন্ত্রবাদের ন্যায় উৎপাদক-সঙ্ঘ-তন্ত্রবাদও (Syndicalism) রাষ্ট্রের প্রতি শ্রদ্ধাহীন। এই মতবাদ প্রাগম্যাটিক দর্শনবাদ, মার্কস্-এর সমূহতন্ত্রবাদ ও ক্রপট্‌কিন্ এবং নিট্‌শের অরাষ্ট্রতন্ত্রবাদের সম্মিলনে উদ্ভূত। এই মতবাদীরা বুদ্ধিবৃত্তির উপর তত জোর দেওয়া অপেক্ষা ভাবকামনা ও সংস্কারের প্রভাবে জীবনকে পরিচালিত করা শ্রেয় মনে করেন। সংগঠন ও শাসনের দ্বারা মানবের ব্যক্তিত্ব বিকাশের বিঘ্ন হয় বলিয়া ইঁহারা মনে করেন। এক এক শ্রেণীর বস্তুর উৎপাদকগণ সঙ্ঘ গঠন করিবে ও নিজেরা নিজেদের কাজ নিয়ন্ত্রিত করিবে। ধন এই সকল সঙ্ঘের সাধারণ অধিকারে থাকিবে। সকল সঙ্ঘ অবশেষে যুক্ত হইয়া এক মহাসঙ্ঘে পরিণত হইবে। ধনিকের কবল হইতে প্রধান প্রধান দ্রব্য উৎপাদনের যন্ত্রগুলি উদ্ধার করিবার জন্য ইঁহারা দেশব্যাপী সাধারণ ধর্ম্মঘট করিবার পক্ষপাতী।

যতদিন পর্য্যন্ত এইরূপ সকল শ্রেণীর শ্রমিকের সমবেত ধর্ম্মঘট উপস্থিত না করা যায় ততদিন পর্য্যন্ত শ্রমিকেরা যেন মন না দিয়া ধনিকের অধীনে কলের কাজ করিয়া যায়। তাহারা যেন সকল প্রকারে নিয়োগকারীকে ফাঁকি দিতে চেষ্টা করে, কল বিগড়াইয়া দিতে যত্নবান হয়, উৎপন্ন দ্রব্য যাহাতে খরিদ্দারের পছন্দসই না হয় তাহার দিকে সতর্ক দৃষ্টি রাখে। এইরূপে ধনিকের ক্ষতি করিতে থাকিলে তাহারা বাধ্য হইয়া উৎপাদনের উপায়সমূহের উপর কর্ত্তৃত্ব পরিত্যাগ করিবে। কিন্তু উৎপাদক-সঙ্ঘ-তন্ত্রবাদিগণ সাধারণ ধর্ম্মঘটের দ্বারা কেমন করিয়া যে ধনসম্পত্তির কর্ত্তৃত্ব শ্রমিকদের হাতে আসিবে সে-সম্বন্ধে সুস্পষ্ট ধারণা পোষণ করেন না। উৎপাদক-সঙ্ঘের হাতে যদি সকল ক্ষমতা ন্যস্ত হয় তবে খরিদ্দারদের উপর যে অত্যাচার হইবে না তাহা কে বলিতে পারে?

উৎপাদক-সঙ্ঘ-তন্ত্রবাদ ফরাসী দেশেই সমধিক প্রভাবশীল হইয়া উঠিয়াছে। ফরাসী চিন্তাবীর Georges Sorel, Edmund Berth ও Paul Louis এই মতের পোষক।

নৈগম-সমাজতন্ত্রবাদ

সমূহতন্ত্রবাদ ও উৎপাদক-সঙ্ঘ-তন্ত্রবাদের বিরোধের সামঞ্জস্য ও সমন্বয়ের উপর নৈগম-সমাজতন্ত্রবাদ বা Guild-Socialism-এর প্রতিষ্ঠা। এই মতের প্রধান পরিপোষক ইংলণ্ডবাসী এস্-জি-হব্‌সন্ ও জি-ডি-এইচ্ কোল্। ইঁহারা কেবলমাত্র উৎপাদকের স্বার্থ দেখেন না, খরিদ্দারের স্বার্থের প্রতিও মনোযোগ দিয়াছেন। শ্রমিকগণ নিজ নিজ শিল্প অনুসারে নিগমে সঙ্ঘবদ্ধ হইয়া উৎপাদনের নিয়ন্ত্রণ করিবে ও রাষ্ট্র খরিদ্দারদের প্রতিভূস্বরূপ উৎপাদনের যন্ত্র, ধন ও ভূমির উপর স্বামিত্ব স্থাপন ও রক্ষা করিবে। শিক্ষার, ধর্ম্মের, ধন-উৎপাদনের, খেলাধূলার ও মেলামেশার প্রতিষ্ঠানগুলি নিজ নিজ ব্যাপারে সম্পূর্ণ কর্ত্তৃত্ব করিবে। রাষ্ট্র এই সকল প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধিদের দ্বারা গঠিত হইবে ও একান্ত প্রয়োজন ব্যতিরেকে অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের উপর হস্তক্ষেপ করিবে না। ইঁহাদের মতে রাষ্ট্র ট্রেড-ইউনিয়ন, হরিসভা, বিদ্যালয়, ফুটবল ক্লাব প্রভৃতির ন্যায় সমাজের একটি প্রতিষ্ঠান মাত্র—কিন্তু একমাত্র সামাজিক প্রতিষ্ঠান নহে। সুতরাং রাষ্ট্র সর্ব্বশক্তিমানত্ব দাবি করিতে পারে না ও অন্যান্য সামাজিক প্রতিষ্ঠানের উপর কর্ত্তৃত্ব করিতে পারে না। কোন কোন নৈগম-সমাজতন্ত্রবাদী রাষ্ট্রের হাতে খরিদ্দারদের স্বার্থরক্ষার ভারও দিতে চাহেন না। তাঁহারা উৎপাদকদের সঙ্ঘের ন্যায় খরিদ্দারদের সঙ্ঘ হওয়া প্রয়োজন মনে করেন। রাষ্ট্রের হাতে কেবলমাত্র কর্ম্মচারীদের কার্য্য পর্য্যবেক্ষণ, আন্তর্জ্জাতিক সম্বন্ধ পরিচালনা, শিল্পকলা ও শিক্ষার উন্নতিবিধান কার্য্য ন্যস্ত থাকিবে। শ্রমজীবী ও মস্তিষ্কজীবী ব্যক্তিদিগের শ্রমবিভাগ অনুসারে যে-সকল নিগম থাকিবে তাহারাই বেতন, কার্য্য করিবার সময়, প্রণালী ও উৎপন্ন দ্রব্য বা বিষয়ের মূল্য নিরূপণ করিয়া দিবে। বর্ত্তমান রাষ্ট্র একদিকে যেমন সমস্ত ধনসম্পত্তির স্বামিত্ব অর্জ্জন করিয়া শক্তিশালী হইবে, অন্যদিকে তেমনি অর্থনৈতিক ধর্ম্ম ও শিক্ষা সম্বন্ধীয় বিষয়ের কর্ত্তৃত্ব পরিহার করিয়া দুর্ব্বল হইয়া পড়িবে। এক সর্ব্বশক্তিমান্ গণতন্ত্রের পরিবর্ত্তে দুইটি গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হইবে—এক রাষ্ট্রীয়, অপর অর্থনৈতিক। এইরূপ ব্যবস্থার ফলে সমাজ-জীবনের বিরোধ ও অসামঞ্জস্য, দৈন্য ও দুর্দ্দশা, কুসংস্কার ও বর্ব্বরতা তিরোহিত হইবে বলিয়া আধুনিক অনেক চিন্তানায়ক বিশ্বাস করিয়া থাকেন। শ্রমিকগণ প্রভুর বেতনভুক্ ক্রীতদাস মাত্র না হইয়া, নিজ নিজ কার্য্যে বিচারবুদ্ধির ব্যবহার করিতে পারিবে ও কারুশিল্পের সৌন্দর্য্যসাধনে যত্নবান্ হইবে। মার্ক্‌স্ যে ধনিকনির্যাতন-প্রসূত রাষ্ট্রের দ্বারা শ্রমিকের সর্ব্বনাশসাধনের কথা বলিয়াছেন তাহা অন্তর্হিত হইবে, তাহার স্থলে ব্যক্তিত্বের পূর্ণ বিকাশের উপর প্রতিষ্ঠিত, পরস্পরের সেবা ও সাহায্যের দ্বারা সংবদ্ধ জনমতনিয়ন্ত্রিত রাষ্ট্রের সৃষ্টি হইবে।

এই মতের বিরোধীগণ বলিয়া থাকেন যে, রাষ্ট্রের একাধিপত্য নষ্ট হইয়া গেলে সমাজের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের মধ্যে যোগ-সম্বন্ধ স্থাপিত হইবে কিরূপে এবং পরস্পরের মধ্যে বিরোধ মিটাইবে কে? বিভিন্ন প্রকারের প্রতিষ্ঠানের গুরুত্ব অনুসারে রাষ্ট্রে তাহাদের প্রতিনিধি লইবার কথা নৈগম-সমাজতন্ত্রবাদীরা বলিয়া থাকেন; কিন্তু বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের গুরুত্ব লইয়া যে-বিবাদ উপস্থিত হইবে তাহা মিটাইবে কে? আমার মনে হয়, এই-সব ছোটখাট বাধা সামাজিক সদিচ্ছাদ্বারা দূর করা অসম্ভব নহে। পরে দেখাইব যে, আধুনিক রাষ্ট্র কিয়ৎপরিমাণে

নৈগম-সমাজতন্ত্রের পথে অগ্রসর হইয়াছে ও কালক্রমে আধুনিক চিন্তানায়কগণের এই মতবাদ সমাজে গৃহীত হইতে পারে। জাতি ও কর্ম্মভেদের উপর প্রতিষ্ঠিত হিন্দুসমাজে আহেলা বিলাতী গণতন্ত্রের অনুকরণ অপেক্ষা নৈগম-সমাজতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা সহজতর কার্য্য বলিয়া আমার মনে হয়। ভারতীয় রাষ্ট্র, রেল প্রভৃতি যানবাহন ও সংবাদ আদান-প্রদানের উপায়গুলি, বনসমূহ ও ভূমির স্বামিত্ব অর্জ্জন করিয়াছে। কে বলিতে পারে যে, যদি কোন দিন বলশেভিক-বাদ সত্যসত্যই ভারতে প্রবেশ করিতে চেষ্টা পায় তবে তাহার সহিত নৈগম-সমাজতন্ত্রের আপোস হইয়া আমাদের দেশের জনসাধারণের মনস্তত্ত্ব ও প্রথানুযায়ী এক নববিধ রাষ্ট্রের উদ্ভব হইবে না? ভারতবর্ষে নিগমসভা এককালে খুবই প্রভাববিস্তার করিয়াছিল; ভারতের অন্তর-পুরুষ যেদিন অনুকরণের মোহনিদ্রা ত্যাগ করিয়া জাগ্রত ও আত্মস্থ হইবেন, সেদিন আবার যে নৈগম-সমাজতন্ত্রের উপর রাষ্ট্রব্যবস্থা স্থাপিত হইবে ইহা অসম্ভব কল্পনা না-ও হইতে পারে।

লেনিনবাদ

লেনিনের মতবাদ বিংশ শতাব্দীর রাষ্ট্র ও সমাজকে প্রবলভাবে আন্দোলিত করিয়াছে। একদল লোক লেনিনের মতবাদকে বাস্তবক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠা করিবার জন্য যথাসর্ব্বস্ব পণ করিয়াছে। তাহাদের দৃঢ়বিশ্বাস, বিশ্বমানবের মুক্তিসাধনার জন্য লেনিনবাদের প্রচার ও প্রতিষ্ঠা করা একান্ত প্রয়োজন। অপর একদল লোকও অন্তরের সহিত বিশ্বাস করে যে, সমাজে উচ্ছৃঙ্খলতা ও নৈতিক উন্মার্গগামিতা আনয়ন করিবার জন্যই লেনিনবাদের উৎপত্তি। লেনিনের মতবাদ লইয়া সপক্ষে ও বিপক্ষে যেরূপ আন্দোলন ও মতদ্বৈধ দেখা গিয়াছে, সেরূপ বিতর্ক ও বিতণ্ডা অন্য কোন মতবাদ লইয়া কোন যুগে উপস্থিত হয় নাই। তাহার উপকারিতা বা অপকারিতা সম্বন্ধে মতভেদ যথেষ্ট থাকিলেও বিংশ শতাব্দীর চিন্তাজগতে লেনিনের যে একটি বিশিষ্ট স্থান আছে সে-কথা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। আমরা প্রথমে লেনিনের মতবাদের মূলসূত্র-গুলি বিবৃত করিয়া পরে রুষিয়ার রাজনীতির মধ্যে তাহা কিরূপে প্রযুক্ত হইয়াছে ও কিরূপ ফল উৎপাদন করিয়াছে তাহার বিচার করিব।

বিংশ শতাব্দীর বিশিষ্ট রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক আবহাওয়ার মধ্যে লেনিনের মতবাদের জন্ম হইয়াছে। বিংশ শতাব্দীর অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে ধন ও ধনিকের যে প্রাধান্য দৃষ্ট হয় তাহাকে ক্যাপিটালিজম্ বলে। ধনিক-প্রাধান্যই রাষ্ট্রক্ষেত্রে নব সাম্রাজ্যবাদকে জন্ম দিয়াছে। লেনিন সাম্রাজ্যবাদকে 'ধনিক-প্রাধান্যের মুমূর্ষু অবস্থা' বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। তাঁহার মতে ধনিক-প্রাধান্যের মধ্যে অনেকগুলি বিরোধ দেখা যায়—সেই বিরোধের সংঘাতে বিপ্লব অবশ্যম্ভাবী হইয়া উঠে।

সাম্রাজ্যবাদ ধনিক ও শ্রমিকের মধ্যে দূরত্ব ও ব্যবধান আরও ব্যাপক করিয়া তুলিয়াছে। ধনিকরা উৎপাদনের উপায়গুলি ট্রাষ্ট, সিণ্ডিকেট প্রভৃতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সঙ্ঘের দ্বারা নিজেদের একচেটিয়া অধিকারে রাখিয়াছে। শ্রমিকেরা ট্রেড-ইউনিয়ন্, সমবায় রাজনৈতিক দল প্রভৃতির দ্বারা তাহাদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করিয়া বিশেষ কোন সুবিধা আদায় করিতে পারিতেছে না। লেনিন বলেন, এরূপ অবস্থায় শ্রমিকেরা হয় ধনীদের নিকট আত্মসমর্পণ করিয়া কায়ক্লেশে জীবনধারণ করিবে, না-হয় অত্যাচারে সংক্ষুব্ধ হইয়া বিপ্লব করিবে। ধনিক-শ্রমিকের বিরোধ সম্বন্ধে লেনিনের এই মত কতটা যুক্তিসহ আমরা পরে তাহার বিচার করিব।

দ্বিতীয়তঃ, সাম্রাজ্যবাদী বিভিন্ন রাষ্ট্রীয় শক্তির মধ্যে ভীষণ বিরোধ দেখা দিয়াছে। প্রত্যেক রাষ্ট্রই কলে তৈরি জিনিষের জন্য কাঁচা মাল পাইতে আগ্রহান্বিত। কাঁচা মাল যে-সকল দেশে উৎপন্ন হয়, সেই সব দেশে একচেটিয়া অধিকার স্থাপনপূর্ব্বক টাকা খাটাইয়া লাভবান্ হইবার ইচ্ছা সকল শক্তির মনেই প্রবল। সেই জন্যই এক শক্তির স্বার্থের সহিত অপর শক্তির বিরোধ বাধিয়া উঠে। পরস্পরের মধ্যে সংঘর্ষের ফলে ধনিক-প্রাধান্যের ভিত্তি শিথিল হইয়া যায় ও শ্রমিক বিদ্রোহের পথ পরিষ্কৃত হয়।

ধনিক-প্রাধান্য তথা সাম্রাজ্যবাদের তৃতীয় বিরোধ বাধে কতিপয় তথাকথিত সুসভ্য জাতির সহিত জগতের লক্ষ লক্ষ অধীন দেশবাসীর সংঘর্ষে। বিজেতাগণ বিজিত দেশের ধন আহরণ করিবার জন্য রেলপথ স্থাপন, কলকারখানা

প্রতিষ্ঠা ও শিল্পবাণিজ্যের কেন্দ্রস্থান নির্ম্মাণ করিয়া থাকে। তাহার ফলে বিজিত দেশে একদল বিত্তহীন শ্রমিকের ও বুদ্ধিজীবী নেতার উদ্ভব হয়। তাহারা অবহেলিত ও অবমানিত হইয়া জাতীয়ভাবে প্রণোদিত হয় ও দেশের মুক্তিসাধনে আত্মনিয়োগ করে। লেনিনের মতে এই আন্দোলনে অধীন দেশগুলি শ্রমিক-বিদ্রোহের জন্য প্রস্তুত হইয়া উঠে।

ধনিক-প্রাধান্যের এই তিন মূল বিরোধ যখন প্রবলরূপে দেখা দিয়াছিল, তখনই লেনিনের মতবাদ প্রচারের সুযোগ উপস্থিত হইল। রুষিয়ার জারের অনুন্নত নীতির ফলে এই তিন প্রকার বিরোধই প্রবলতম আকারে দেখা দিয়াছিল বলিয়া তথায় পাশ্চাত্য জগতের মধ্যে সর্ব্বপ্রথমে লেনিনবাদের প্রতিষ্ঠা হইল।

লেনিনের মতবাদ একদিনে গঠিত হয় নাই। অনেকে মনে করেন, ১৯১৬ সালে মহাযুদ্ধের সময়ে রুষিয়ার দুরবস্থা দেখিয়া লেনিন শ্রমিক-বিদ্রোহের বাণী ঘোষণা করেন। কিন্তু লেনিন ১৯১৬ খৃষ্টাব্দের অনেক পূর্ব্ব হইতেই শ্রমিক-বিদ্রোহের কথা ঘোষণা করিয়া আসিতেছিলেন। রুষ-জাপান যুদ্ধের সময় রুষিয়ায় প্রথম বিদ্রোহের সূত্রপাত হয়। সেই সময় লেনিন The Provisional Government নামক প্রবন্ধে বলেন—আমাদের দলের এমন ভাবে কাজ করা উচিত যে, রুষিয়ার বিপ্লব যেন কয়েক মাস মাত্র স্থায়ী না হয়—ইহা যেন বহুবর্ষব্যাপী ব্যাপারে পরিণত হয়। ইহার উদ্দেশ্য যেন কেবলমাত্র কর্ত্তৃপক্ষের নিকট হইতে কয়েকটি সুবিধা আদায় করা না হয়; কিন্তু একেবারে সমস্ত কর্ত্তৃত্বের ধ্বংসসাধন করাই লক্ষ্য হয়। আমরা যদি সফলকাম হই তবে বিপ্লবের আগুন ইউরোপের সর্ব্বত্র ছড়াইয়া পড়িবে। পশ্চিম-ইউরোপের শ্রমিকগণ মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের অত্যাচারে জর্জ্জরিত হইয়া বিদ্রোহ ঘোষণা করিবে। তাহাদের বিদ্রোহে রুষিয়ার বিপ্লব আরও শক্তিশালী হইবে ও কয়েক বৎসরের বিপ্লব বহুযুগব্যাপী হইবে (গ্রন্থাবলী ৬ষ্ঠ খণ্ড)।

বিপ্লব সর্ব্বপ্রথমে কোথায় আবির্ভূত হইবে? এই সম্বন্ধে লেনিন বলেন, যে-দেশে কলকারখানার খুব প্রসার হইয়াছে, সেই দেশেই যে বিপ্লবের প্রথম আবির্ভাব হইবে এরূপ কোন কথা নাই। বরং যেখানে কলকারখানার শক্তি প্রবল হইয়া উঠে নাই, সেখানেই বিপ্লবের সূচনা হওয়া বেশী সম্ভব।

"The capitalist front will be broken where the chain of Imperialism is weakest, and it is there that the proletarian revolution (which follows upon the defeat of imperialism) must begin." (*Leninism* by Stalin)

রুষিয়ায় উনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগে কলকারখানার প্রবর্ত্তন হয় ও বলশেভিক বিপ্লবের পূর্ব্বে তাহার প্রসার কেবল কয়েকটি নগরে সীমাবদ্ধ ছিল। কিন্তু জারের বর্দ্ধমান সাম্রাজ্যনীতির ফলে শ্রমিকশ্রেণীর মধ্যে অসন্তোষের মাত্রা অত্যধিক বৃদ্ধি পায়। ধনিক-প্রাধান্য বা capitalism রুষিয়ার সমাজে অনুপ্রবিষ্ট হয় নাই বলিয়াই সেখানে বিপ্লব উপস্থিত করা সম্ভবপর হইয়াছিল। লেনিনবাদিগণ বিশ্বাস করেন, রুষিয়ার পর ভারতবর্ষে বিপ্লব উপস্থিত হইবে। এ সম্বন্ধে ষ্টালিন লিখিয়াছেন -

"Where is the front likely to be broken next? Again at the weakest point, obviously. Perhaps that will be in British India, where there is young and combative revolutionary proletariat allied to the champions of the movement for national liberation—a movement which is certainly very powerful. In India, moreover, the anti-revolutionary forces are incorporated in a foreign imperialism which has completely forfeited moral credit and has incurred the general hatred of the oppressed and exploited masses."

অর্থাৎ,—রুষিয়ার পর কোন্ দিকে বিপ্লব বাধিবে? নিশ্চয়ই যেখানে কলকারখানার প্রভাব এখনও দুর্ব্বল। সম্ভবতঃ ব্রিটিশ-ভারতে ইহা অনুষ্ঠিত হইবে। সেখানে তরুণ ও বর্দ্ধমান বিপ্লবী বিত্তহীনদের সহিত জাতীয় স্বাধীনতা আন্দোলনের নেতাদের মিলনে যে আন্দোলন উপস্থিত হইয়াছে তাহা নিশ্চয়ই খুব প্রবল ও শক্তিশালী। অধিকন্তু ভারতে বিপ্লববিরোধী শক্তি ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের সহিত মিলিত হইয়াছে, আর সেই সাম্রাজ্যবাদ সম্পূর্ণরূপে নৈতিক শ্রদ্ধা হারাইয়াছে ও নির্যাতিত ও অপহৃত জনসাধারণের বিদ্বেষভাজন হইয়াছে।

ভারতবর্ষের জনগণের মনোবৃত্তি বুঝিতে যে লেনিনবাদিগণ কতদূর অক্ষম তাহার পরিচয় ষ্টালিনের এই উক্তি হইতে পাওয়া যায়। ভারতবর্ষের নবজাগ্রত শ্রমিকশক্তির পিছনে জাতীয় আন্দোলনের নেতারা আছেন এ-কথা নিঃসন্দেহে বলা যায়, দেশের জনসাধারণ শোষণনীতির বিষময় প্রক্রিয়ার রহস্য কিছু কিছু বুঝিতে পারিতেছে এ-কথাও ঠিক; কিন্তু ভারতবাসী বিত্তহীন সম্প্রদায় যে বলশেভিক বিপ্লববাদের আশ্রয় গ্রহণ করিয়া ধনিক-প্রাধান্যের উচ্ছেদসাধনার্থ দণ্ডায়মান হইবে ইহা কিছুতেই বলা যায় না। ভারতবর্ষ রুসিয়ার ন্যায় নূতন সভ্য দেশ নহে, ভারতবর্ষের পিছনে আছে তাহার অতীত

সাধনা। সে সাধনার মূর্ত্তিমান বিগ্রহ সত্যাগ্রহী গান্ধী, বিপ্লববাদী লেনিন নহে। হিংসা ও রক্তপাতের পথকে ভারতবর্ষ বরণীয় বলিয়া গ্রহণ করিবে এ-কথা আমরা কিছুতেই বিশ্বাস করিতে পারি না।

কি অবস্থায় উপস্থিত হইলে দেশবিশেষ বিপ্লবের আশ্রয় গ্রহণ করিতে বাধ্য হইবে সে-সম্বন্ধে লেনিন তাঁহার "Left Wing Communism --an Infantile Disorder" নামক গ্রন্থে বিচার করিয়াছেন। তিনি বলেন,—

"নির্যাতিত জনসাধারণ যদি বুঝিতে পারে, তাহারা যেভাবে জীবন যাপন করিতেছে সেরূপভাবে জীবন ধারণ করা অসম্ভব ও যদি তাহারা পরিবর্ত্তনের দাবি করে তাহা হইলেই যে বিপ্লব আসিবে তাহা নহে। শোষণকারিগণের পক্ষে পুরাতন উপায়ে শাসন করাকে অসম্ভব করিয়া তুলিতে হইবে। যতক্ষণ পর্য্যন্ত না নিম্নশ্রেণীর লোকের নিকট প্রচলিত ব্যবস্থা অসহনীয় হইয়া উঠে ও উচ্চশ্রেণীর লোকেরা সেই ব্যবস্থা চালাইতে অপারগ হয় ততক্ষণ পর্য্যন্ত বিপ্লব জয়ী হইতে পারিবে না। তাহা হইলে দেখা যাইতেছে, বিপ্লবের জন্য দুইটি ঘটনার প্রয়োজন। প্রথমতঃ শ্রমিকগণের মধ্যে অধিকাংশ ব্যক্তির—অন্ততঃ নিজেদের স্বার্থসম্বন্ধে সজাগ লোকের—স্পষ্টতঃ উপলব্ধি করা চাই যে বিপ্লব অবশ্য প্রয়োজন এবং তাহার জন্য উহারা মৃত্যুপণ পর্য্যন্ত করিতে প্রস্তুত। দ্বিতীয়তঃ শাসকশ্রেণীর এমন বিপন্ন অবস্থায় পতিত হওয়া চাই যেন নিতান্ত অজ্ঞজনেরাও রাজনীতির ক্ষেত্রে আসিয়া পড়ে। ইহার ফলে গবর্ণমেণ্ট এত দুর্ব্বল হইয়া পড়িবে যে, বিপ্লবীগণ অনায়াসেই তাহার ধ্বংসসাধন করিতে পারিবে।

কিন্তু এক দেশে বিপ্লব করিয়াই বিত্তহীন শ্রমিকগণ নিশ্চিন্ত থাকিলে চলিবে না··

"In any country, the victorious revolution must do its utmost to develop, support and awaken the revolution in all other countries."

লেনিনের মতে বিপ্লবের আশু উদ্দেশ্য Dictatorship of the Proletariat এবং মুখ্য উদ্দেশ্য Socialism-এর পূর্ণ প্রতিষ্ঠা। Dictatorship of the Proletariat বা বিত্তহীনের যথেচ্ছশাসন বলিতে লেনিন 'লেবার' দলভুক্ত ব্যক্তিদের শাসন বুঝেন না। ইংলণ্ডে 'লেবার পার্টির হাতে এক সময়ে শাসনভার ছিল—কিন্তু লেনিনের মতে ঐ ঘটনার সহিত Dictatorship of the Proletariat-এর কোন সম্বন্ধ নাই। কেন-না, এরূপ দল প্রচলিত অর্থনৈতিক ব্যবস্থার সহিত আপোষ করিবার প্রয়াসী। লেনিন Dictatorship of the Proletariat-এর সংজ্ঞা এইরূপে নির্দ্দেশ করিয়াছেন, "বিত্তহীনের যথেচ্ছশাসন অর্থে মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের উপর বিত্তহীনগণের আইনের দ্বারা অনাবদ্ধ, জোরের উপর প্রতিষ্ঠিত, নির্যাতিত শ্রমিকশ্রেণীর সহানুভূতি ও সমর্থনের উপর স্থাপিত শাসন বুঝায়। (Lenin, *The State and Revolution*)

মধ্যবিত্ত সম্প্রদায় যে জাতীয় ধন-উৎপাদনের সহায়তা করে না ইহা মার্কসের একটি ভ্রান্তধারণা এবং এই ভ্রান্তির উপর লেনিনের মতবাদের প্রতিষ্ঠা। ধন-উৎপাদনের পক্ষে শ্রমিকদের শ্রম যেমন প্রয়োজন, মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ভুক্ত ইঞ্জিনীয়ার, ম্যানেজার ও পরিচালকের কার্য্যও সেইরূপ প্রয়োজনীয়। লেনিনবাদিগণ ছোট ছোট কলকারখানা রাষ্ট্রের দ্বারা বাজেয়াপ্ত করাইয়া লইয়া ও নিয়োগকারী সম্প্রদায়ের ভোটের অধিকার না দেওয়ায় রুষিয়ার অর্থনৈতিক উন্নতির মূলে কুঠারাঘাত করা হইয়াছিল। ১৯২১ সালে Nep বা New Economic Policy—নব অর্থনৈতিক পন্থা—লেনিন অবলম্বন করেন। তাহাতে ছোট ছোট কারখানা প্রভৃতি আবার মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের হাতে প্রদান করা হইয়াছে। ভূস্বামিত্বও রাষ্ট্রের প্রকৃত অধিকারের মধ্যে না রাখিয়া ছোটখাট কৃষিজীবীদের হাতে দেওয়া হইয়াছিল। অর্থাৎ "নেপ" ধনিকবাদের সহিত কিছুকালের জন্য আপোষ স্থাপন করে। কিন্তু ভূস্বামিত্ব বহুসংখ্যক ব্যক্তির মধ্যে বিভাগ করিয়া দেওয়ায় রুষিয়ার লোকের জীবননির্ব্বাহোপযোগী শস্য উৎপন্ন হইতেছিল না। সুতরাং ১৯৩০ সালে ছোট ছোট সম্পত্তি যোগ করিয়া বড় বড় সম্পত্তি গঠনের ও রাষ্ট্রের দ্বারা তাহা চাষ করাইবার চেষ্টা চলিতেছে। ইহাতে কারখানার শ্রমিক প্রভৃতির সুবিধা হইবে বটে, কিন্তু কৃষকদের মধ্যে অসন্তোষের মাত্রা আরও বৃদ্ধি পাইতেছে।

বলশেভিক রাষ্ট্রের গঠন পর্য্যবেক্ষণ করিলে দেখা যায়, The All-Russian Congress of Soviets-এ কৃষক ও পল্লীবাসীদের অপেক্ষা কারখানার শ্রমিকদের প্রায় পাঁচগুণ বেশী প্রতিনিধি রহিয়াছে। ইহা গণতন্ত্রের প্রচলিত ধারণার বিরোধী। কম্যুনিষ্ট পার্টির মাত্র ষাট লক্ষ লোকের রাষ্ট্রীয় অধিকার ও ক্ষমতা আছে, অবশিষ্ট কোটী কোটী লোক রাষ্ট্রীয় ক্ষমতাশূন্য। আমেরিকায় শ্রমিকের সহিত ধনিকের স্বার্থসমন্বয় বিনাদ্বন্দ্বে উপস্থিত হইতেছে। সুতরাং বলশেভিকবাদীদের যে বিপ্লবপন্থা তাহার আশ্রয় না লইলেও ভবিষ্যতের সমাজ শান্তির উপর প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে।

আর ব্যক্তিগত সম্পত্তি নাশ করা কেবলমাত্র রাষ্ট্রের দ্বারা সম্ভবপর নহে। জনসাধারণের মন হইতে স্বার্থবাসনা দূরীভূত হইয়া যখন আধ্যাত্মিক বোধের বিকাশ হইবে তখনই বলশেভিক নীতির সাফল্য আসিবে। সে কার্য্য মূলতঃ ধর্ম্মবোধের উপর স্থাপিত। রাষ্ট্রীয় আইন কেবলমাত্র মানসিক অবস্থার ও ভাবের বহির্বিকাশ, এই সত্য বলশেভিকবাদীদের উপলব্ধি করা প্রয়োজন।

আধুনিক রাষ্ট্র ও সমূহতন্ত্রবাদ

ইউরোপের আধুনিক রাষ্ট্রে শ্রমিক রাষ্ট্রনীতির মূলসূত্রগুলি স্বীকৃত হইয়াছে। মহাযুদ্ধের পর জার্ম্মানী, পোল্যাণ্ড, চেকোস্লোভাকিয়া, যুগোস্লাভিয়া, এষ্টোনিয়া, ফিনল্যাণ্ড, ল্যাটভিয়া প্রভৃতি রাষ্ট্রের উদ্ভব হইয়াছে। উনবিংশ শতাব্দীর লিবার্যাল-গণের রাষ্ট্রীয় দর্শন যাহা কেবলমাত্র ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যের উপর প্রতিষ্ঠিত ও যাহাতে রাষ্ট্র কেবলমাত্র পুলিসের কাজ করিবার জন্য বর্ত্তমান তাহা সম্পূর্ণরূপে পরিত্যক্ত হইয়াছে। অর্থনৈতিক সমস্যা যে রাষ্ট্রীয় সমস্যা হইতে বিভিন্ন সমাজজীবন-বিকাশের পক্ষে শ্রমজীবীদের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের প্রয়োজন সর্ব্বাপেক্ষা অধিক, তাহা স্বীকৃত হইয়াছে। জার্ম্মানীর নূতন কনষ্টিটিউশ্যনের ১৫১ ধারায় আছে, "জাতির অর্থনৈতিক জীবনের সংগঠন সুবিচারের উপর প্রতিষ্ঠিত হইবে ও যাহাতে সকলে ভালভাবে জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিতে পারে তাহার ব্যবস্থা হইবে।" এষ্টোনিয়ার কনষ্টিটিউশ্যনের ২৫ ধারায় আছে, "অর্থনৈতিক ব্যবস্থা এরূপভাবে নিয়ন্ত্রিত হইবে যে, মনুষ্যের উপযোগী জীবনযাত্রা নির্ব্বাহের উপায় সকলের হস্তগত হইবে।" পোল্যাণ্ডের কনষ্টিটিউশ্যনে আছে যে শ্রমজীবীদের সুখ-সুবিধা দেখা রাষ্ট্রের অন্যতম প্রধান কর্ত্তব্য। অনুরূপ ব্যবস্থা ফিনল্যাণ্ডের ও যুগোস্লাভিয়ার কনষ্টিটিউশ্যনেও গৃহীত হইয়াছে। উনবিংশ শতাব্দীর লিবার্যাল মতের সম্পূর্ণ বিরোধিতা করিয়া যুগোস্লাভিয়ার কনষ্টিটিউশ্যনে (২৬ ধারা) স্পষ্টই লিখিত হইয়াছে—

"The Government has in the interest of the whole and based upon the spirit of the law, the right and duty to intervene in the economic affairs of its citizens in the spirit of justice and for the prevention of social adversity."

ধনসম্পত্তির উপর ব্যক্তিগত অধিকার এই সকল নবরাষ্ট্রে স্বীকৃত হইলেও, রাষ্ট্র সাধারণের স্বার্থের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া ব্যক্তিগত সম্পত্তির অধিকাংশ বা সর্ব্বাংশ প্রয়োজনমত অধিকার করিয়া লইতে পারিবে এই মত গৃহীত হইয়াছে। জার্ম্মানীর নবরাষ্ট্রে অর্থনৈতিক সমস্যা সমাধানের জন্য ইকনমিক্ কাউন্সিল স্থাপিত হইয়াছে তাহাতে শ্রমজীবীদের কর্ত্তৃত্ব স্বীকৃত হইয়াছে।

ব্যক্তি, জাতি ও বিশ্ব

উল্লিখিত মতবাদ ও রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা পর্য্যালোচনা করিলে দেখা যায়, সমাজ-জীবনে সদিচ্ছা ও সদ্ভাবপ্রণোদিত ব্যাপক সহানুভূতি ও একত্ববোধের বিকাশ হইতেছে। এই নবভাবের উদ্দেশ্য ব্যক্তিত্বের পূর্ণবিকাশ সাধন করা। ব্যক্তি নিজেকে একক বিচ্ছিন্ন ও স্বতন্ত্র ভাবে না দেখিয়া বিরাট সমাজ-জীবনের অংশমাত্র ও সমষ্টির স্বার্থেই ব্যষ্টির স্বার্থ এই ভাবে উদ্বুদ্ধ হইবে।

জাতিবিশেষের মধ্যে যেমন বিভিন্ন শ্রেণীর স্বার্থ বিরোধের সমন্বয় ধীরে ধীরে সাধিত হইতেছে, তেমনি বিভিন্ন জাতীয় রাষ্ট্রের মধ্যেও স্বার্থের একত্ব উপলব্ধি হইতেছে ও বিরাট আন্তর্জ্জাতিক জীবনযাত্রার পথ পরিষ্কৃত হইতেছে। ভূমার প্রতি লক্ষ্য অল্পের অনাদর আধুনিক চিন্তাধারার প্রধান বৈশিষ্ট্য। একদিকে যেমন স্বরাষ্ট্রনিয়ন্ত্রণ নীতি পরাধীন জাতিদিগকে স্বাধীনতা-অর্জ্জনের দিকে উন্মুখ করিয়া তুলিয়াছে ও তুলিতেছে, অন্য দিকে তেমনি বিশ্বজাতি সঙ্ঘ (League of Nations), বিশ্বযুবক সঙ্ঘ (League of the Youth of the World), সাম্রাজ্যবিরোধী সঙ্ঘ (Anti-Imperialist League), আন্তর্জ্জাতিক শ্রমিক সঙ্ঘ (International Labour Conference) ও আন্তর্জ্জাতিক অর্থনৈতিক সঙ্ঘ এক রাষ্ট্রের সহিত অপর রাষ্ট্রের মিলন সাধন করিতেছে। ন্যাশনালিজম্ বা জাতীয়তাবাদের মধ্যে যে হিংসার বিষ রহিয়াছে তাহা দূর করিবার জন্য পৃথিবীর বহু শ্রেষ্ঠ মনীষী আজ বিশেষভাবে চেষ্টিত হইতেছেন।

পরিশেষে বলিতে চাই, আধুনিক রাষ্ট্রচিন্তার ধারা সমাজতত্ত্ব, মনস্তত্ত্ব, প্রাণবিদ্যা প্রভৃতি নব নব বিজ্ঞানের দ্বারা প্রভাবান্বিত হইয়া পরিপুষ্ট হইতেছে ও মানব-সমাজে সংঘাত ও স্বার্থবিরোধের অবসান করিয়া বিশ্বশান্তি আনয়নের প্রয়াস পাইতেছে।

ব্যথা-সঙ্গম

শ্রীরাধিকারঞ্জন গঙ্গোপাধ্যায়

বনমালী সুপুরুষ কিন্তু বংশমর্য্যাদায় কিছু খাটো বলিয়া অতি অল্প বয়সেই একটা মর্ম্মান্তিক ঘা পাইল।

তাহার পূর্ব্বপুরুষের মধ্যে কে একজন না-কি জন খাটিত।

বনমালীর অপেক্ষাও আঘাতটা যাহার বেশী লাগিয়াছিল সে বনমালীর পিতা ঋষিবর। ঋষিবরের অবস্থা মাঝারি রকমের বনমালী গ্রামের ইংরেজী স্কুলে দ্বিতীয় শ্রেণী পর্য্যন্ত পড়িয়াছে তাহার উপর সে সুন্দর সুপুরুষ বলিয়া খ্যাত এই এতগুলি সুযোগের উপর নির্ভর করিয়া ঋষিবর একেবারে বড় গাছে নৌকা বাঁধিতে উঠিয়া-পড়িয়া লাগিল। দাঁও সে প্রায় বসাইয়াছিল, কিন্তু একান্ত অতর্কিতভাবে বংশমর্য্যাদার কথাটা ঝড়ের মত উঠিয়া পড়িয়া তাহার দৃষ্টির সম্মুখ হইতে সমস্ত ভাসাইয়া লইয়া গেল।

গ্রামের সকলে ঋষিবরের শোকে হাহাকার করিল,— আবার খুশীও হইল।

- যেমন ছোট হয়ে বড় আশা, ঠিক উপযুক্তই হয়েছে।

ঋষিবর ইহারই কিছুদিন পরে মৃত্যুর শীতল ক্রোড়ে আশ্রয় লইল, কিন্তু বড় হঠাৎ।

ডাক্তার বলিল, সন্ন্যাস রোগ।...

লোকে বলিল, কি দাঁওটাই না বসাচ্ছিল। পাঁচ-পাঁচটি হাজার টাকা। এত বড় আঘাতটা সামলানো কি বড় সোজা?

বনমালী সংসারধর্ম্ম গ্রহণের পূর্ব্বেই সংসারের প্রতি বীতস্পৃহ হইয়া একদিন সকলের অলক্ষ্যে গ্রাম ছাড়িল। পিতার মৃত্যুর পরে তাহার আপনার বলিতে কেহ রহিল না, সংসারের প্রতি তাই টান থাকা কিছু স্বাভাবিকও না, কিন্তু অপযশ মাথায় করিয়া ফিরিতে সে আরও অসমর্থ; চেষ্টাও তাই করিল না।

গ্রামের লোক প্রাণ ভরিয়া হাসিল।

গণ্ডকীর তীরে ছোট একটি আশ্রমের মত।

যোগাচার্য্যের তেজোদ্দীপ্ত সৌম্য শান্ত চেহারা বনমালীর মনে বড় ধরিল। এমনই একটি লোকের সন্ধানে সে যেন এতদিন ঘুরিয়া বেড়াইয়াছে। যোগাচার্য্যের আশ্রমে চারিটি ছাত্র ছিল তাহারা যোগাচার্য্যের নিকট বেদ অধ্যয়ন করিত। বনমালী ছাত্রশ্রেণীভুক্ত হওয়ার জন্য আবেদন জানাইল, আবেদন গ্রাহ্যও হইল।

যোগাচার্য্য তাহার নাম জিজ্ঞাসা করায় সে বলিল,— এই অধমের নাম শ্রীবনমালী ভট্টাচার্য্য।

যোগাচার্য্যের হয়ত বনমালী জানিলেই চলিত, ভট্টাচার্য্যটুকু না থাকিলেও ক্ষতি ছিল না, কিন্তু বনমালীর ক্ষতি আছে মনে করিয়া বনমালী কায়স্থের সন্তান হইয়াও নিজেকে ভট্টাচার্য্যে পরিণত না করিয়া পারিল না।

বনমালীর বেদাধ্যয়ন সুরু হইল।

বনমালী যতই যোগাচার্য্যের ঘনিষ্ঠ হইয়া উঠিতে লাগিল ততই তাহার প্রথম পরিচয়ের মধ্যে যে মিথ্যাটুকু ছিল তাহা বড় হইয়া তাহাকে অত্যন্ত ব্যথা দিতে লাগিল।

একদিন যোগাচার্য্য গণ্ডকী হইতে স্নান করিয়া ফিরিতেছিলেন বনমালী আশ্রমোপান্তের একটি আনত তরুশাখে দেহের ভার ন্যস্ত করিয়া কি যেন ভাবিতেছিল। বনমালী যোগাচার্য্যের আগমন লক্ষ্য করে নাই, কিন্তু যোগাচার্য্য বনমালীর চিন্তাক্লিষ্ট ললাটের সবখানি পরিচয় যেন একবার সেদিকে দৃষ্টি পড়িতেই পাইলেন। যোগাচার্য্য অতি সহজ শান্ত হাসিয়া বলিলেন, বন, তুমি আমার আশ্রমের নিয়মভঙ্গ করচ।'

বনমালী সহসা চমকাইয়া উঠিয়া কি যেন বলিতে চেষ্টা করিল, যোগাচার্য্য বাধা দিয়া বলিলেন,- আনন্দ আমাদের আশ্রমের রীতি, দুঃখকে আমরা আশ্রমের বাইরে বিসর্জ্জন দিয়ে আসি। তোমাকে আজ এত ক্লান্ত দেখচি কেন বন? তোমার তো শুনেচি সংসারে কেউ নেই।

বনমালী অতিকষ্টে উচ্ছ্বসিত ক্রন্দন রোধ করিয়া বলিল,—

আমি আপনার কাছে অপরাধ করেচি, তারই অনুতাপে অহর্নিশ দগ্ধ হচ্ছি।

যোগাচার্য্য অতি সন্তর্পণে বনমালীর স্কন্ধের উপর একটা হাত রাখিয়া মৃদু একটু হাসিলেন মাত্র।

বনমালী তাঁহার স্নেহস্পর্শে মুগ্ধ হইয়া তাহার জীবনের প্রথম আঘাত হইতে সুরু করিয়া একে একে প্রত্যেকটি ঘটনা বিবৃত করিয়া শেষে বলিল,- আমার নাম শ্রীবনমালী দাস. আমি ভট্টাচার্য্য নই। আজ যে নূতন ছাত্রটি এসেচে তাকে যখন আপনি দ্বিধাবিহীনভাবে গ্রহণ করলেন তখন বুঝলেম যে. আপনার কাছে জাতিবিচার নেই। কাজেই আমার প্রথম দিনের অপরাধ আজ আমাকে এমন ক'রে দগ্ধ করচে।

যোগাচার্য্য মৃদু হাসিয়া বলিলেন. মিথ্যায় কোন অপরাধ নেই বন. কিন্তু নিজের কাছে নিজেকে যখনই ছোট হয়ে থাকতে হয় তখনই অপরাধ করা হয়।

যোগাচার্য্যের সর্ব্বাপেক্ষা মেধাবী ছাত্রের পরিষ্কার মস্তিষ্কে কিছুতেই এ-কথা আজ প্রবেশ করিল না। ইহার মধ্যে কোন যুক্তি আছে বলিয়াও সে ভাবিতে পারিল না। কিন্তু শান্তি পাইল।

বনমালী সেদিন ভিক্ষায় বাহির হইয়াছে।

ছাত্রদের পালা করিয়া এমন ভিক্ষায় বাহির হইতে হয়, কিন্তু এ আশ্রমের ছাত্রদের ভেক পরিবার কোন রীতি নাই বলিয়া গ্রামবাসীর চোখে ইহারা আদর পায় না, ভিক্ষালব্ধ তণ্ডুলের পরিমাণও তাই যথেষ্ট হয় না। এদিকে আবার দ্বাদশ গৃহস্থের অধিক দ্বারস্থ হওয়া ইহাদের নিয়ম-বিরুদ্ধ। আজ পর্য্যন্ত কেহ জ্ঞাতসারে এ নিয়ম ভঙ্গ করে নাই।

বনমালী দ্বাদশ গৃহস্থের শেষ গৃহস্থের দ্বারস্থ হইয়া হাঁকিল, - কই মা, যোগাচার্য্যের আশ্রমের চাল দিয়ে যাও।

দরজার অনতিদূরেই একটি অল্পবয়স্কা বধূ একটি সুন্দর শিশুকে লইয়া ক্রীড়ারতা ছিল। ত্রস্তে নিজের বসন সংযত করিয়া লইয়া ব্রীড়ানত মুখ তুলিয়া জানাইল, আমাদের অন্নে তো সন্ন্যিসীর পূজো হয় না।

বনমালী তাহার কথার মর্ম্ম বুঝিতে না পারিয়া বলিল,— সে কি মা?

- আমরা জাতিচ্যুত। গ্রামের কেউ আমাদের অন্নজল স্পর্শ করে না।

অপরিচিতা বধূটি এ-কথা বলিবার ঠিক পূর্ব্বমুহূর্ত্তে সে একবার নিজের দুইটি ঠোঁট চাপিয়া ধরিয়াছিল, তাহা বনমালী লক্ষ্য করিয়াছে; বধূটির কণ্ঠ যে মাঝে হঠাৎ একবার কাঁপিয়া উঠিয়াছে তাহাও তাহার কাছে গোপন নাই।

বনমালী বলিল, আমাদের কাছে তো জাতিবিচার নেই মা।

বধূটি আর একবার মুখ তুলিয়া বলিল, আপনি হয়ত এ-গ্রামে আজই প্রথম এসেচেন তাই অমন কথা বলচেন. কিন্তু আমি জেনে-শুনে তো আপনাকে বঞ্চনা করতে পারি না।

- সে তো ঠিক কথা মা, কিন্তু কারণটা কি শুনতে পাই না? বারো বাড়ির অধিক আমাদের দ্বারস্থ হওয়ার নিয়ম নেই, দু-বাড়ি বিমুখ হয়েচি. এখানে বিমুখ হ'লে আশ্রমে ফিরে যেতে হবে, কিন্তু যে তণ্ডুল আজ সংগ্রহ করেচি তাতে আমাদের সাতজনের কোনমতেই কুলোয় না। বলিয়া বনমালী তণ্ডুলের ঝুলিটি তুলিয়া ধরিল।

— ও মা, এই কি আপনাদের দু-বেলার সংস্থান?— বলিয়া বধূটি একটি ঘরের মধ্যে গিয়া প্রবেশ করিল। অল্প পরেই একটি থালায় তণ্ডুল, আলু ও কাঁচকলা সাজাইয়া আনিয়া বলিল,- আগে আমার কথা শুনুন, তারপরে গ্রহণ করতে হয় করবেন। আমার স্বামীর উৰ্দ্ধতন তিনপুরুষে কে একজন তীর্থ করতে বেরিয়েছিলেন। তাঁর হঠাৎ পথে মৃত্যু হয় এবং যোগ্য লোকাভাবে সে জায়গার একদল ছোট জাতে মিলে তাঁর সৎকার করে। সে-কথা গ্রামের লোক কেমন ক'রে জানলে জানি না. কিন্তু আমাদের জাতিচ্যুত করলে তারা। আমাদের অন্ন কেউ স্পর্শ করে না।... আপনার যদি কোন আপত্তি না থাকে, তবেই দিতে পারি।

বনমালী লক্ষ্য করিয়া দেখিল, বধূটির চোখের কোণ সজল হইয়া উঠিয়াছে। বলিল,- দুনিয়ার লোকের যদি আপত্তি থাকে মা তবু আমার থাকবে না।

বধূটি বনমালীর ঝুলিতে থালাটি উজাড় করিয়া ঢালিয়া দিয়া ত্রস্তে মুখ ফিরাইল। বনমালীও আর সেখানে দাঁড়াইতে পারিল না। খানিকটা পথ অগ্রসর হইয়া বনমালী পশ্চাতে

মুখ ফিরাইব। অপরিচিতা বধূটি তখন সুন্দর শিশুটিকে কোলে তুলিয়া লইয়া নিবিড় সুখে তাহার সর্ব্বাঙ্গ যেন চুম্বনে চুম্বনে ছাইয়া দিতেছিল। বনমালীর কণ্ঠ ঠেলিয়া একটি বেদনাজড়িত দীর্ঘশ্বাস বাহির হইল।

মধ্যাহ্ন-সূর্য্য তখন মাথায় উঠিয়া পড়িয়াছে।

বহুকাল সাহচর্য্যের ফলে যোগাচার্য্যের আশ্রমের প্রতি শাখা-পল্লব বৃক্ষ নদীতীর আশ্রমকুটীর অতি তুচ্ছ হইলেও বনমালীর ভাবপ্রবণ হৃদয়টিকে একটি অদৃশ্য মায়ারজ্জুতে বাঁধিয়া ফেলিয়াছিল।

বনমালীকে আজ এই সব অতি পরিচিত জিনিসগুলি ছাড়িয়া যাইতে হইবে। যোগাচার্য্যের নিকট তাহার পাঠ সমাপ্ত হইয়াছে।

বিদায়ের মুহূর্ত্তে যোগাচার্য্য গণ্ডকীর তীরে দাঁড়াইয়া বনমালীর স্কন্ধে হাত রাখিয়া বলিলেন, তোমার মত মেধাবী ছাত্র পেয়ে আমি নিজেকে ধন্য মনে করেছি। আমার কাছে তোমার শিক্ষা যেন ব্যর্থ না হয়। স্বচ্ছতোয়া গণ্ডকীকে আজ প্রণাম জানাও বন। ওরই মত স্বচ্ছন্দ সরল গতিতে যেন তোমার জীবনের প্রতি মুহূর্ত্ত অতিবাহিত হয়।

বনমালী গণ্ডকীর কাছে প্রণাম জানাইয়া যোগাচার্য্যের পাদযুগল স্পর্শ করিয়া সেখানে কপালের শিরোভাগ স্পর্শ করাইল। যোগাচার্য্য স্বস্তিবচন উচ্চারণ করিয়া শেষে বলিলেন, বন, তোমার উদ্দেশ্য সফল হউক।

বনমালী সহপাঠীদের নিকট হৃদয়ের কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিয়া বিদায় লইয়া আশ্রমের বাহিরের বনান্তরালে অদৃশ্য হইয়া গেল।

বনপথ তখনও আলোকের স্পর্শে ভাল করিয়া জাগে নাই।

নির্জীব নিস্তেজ গ্রাম হঠাৎ প্রাণ পাইল।

মাধবাচার্য্যের বিদ্যাবত্তা খুব অল্পকাল মধ্যেই গ্রামময় রাষ্ট্র হইয়া পড়িল। দলে দলে লোক তাহার পাতার কুটীরে আসিয়া ভিড় করিল, শাস্ত্র-সম্বন্ধে আলোচনা করিল, মাধবাচার্য্যের গুণমুগ্ধ হইয়া যে যাহার গৃহে ফিরিল।

মাধবাচার্য্য গ্রামের সীমান্তে যে-স্থানটুকু নিজের আশ্রম গড়িবার জন্য বাছিয়া লইল তাহা গ্রামের সকলের মনোমত না হওয়ায় তাহারা সকলে মিলিয়া তাহাকে ঋষিবরের ছাড়া ভিটাটা ছাড়িয়া দিতে রাজী হইল।

মাধবাচার্য্য গ্রামবাসীর এ প্রস্তাবে মত দিল, কিন্তু মনে মনে হাসিল।

ছাত্র আসিল। অধ্যাপনাও সুরু হইল। দেশ-বিদেশে খ্যাতিও রটিল।

মাধবাচার্য্য এত লোকসমাগমে নিজের সহজ আনন্দ ও শান্তিটুকু হারাইয়া ফেলিল।

গ্রামের সকলেই তাহার সুপরিচিত। এই সব সুপরিচিত লোকগুলির সঙ্গে অপরিচিতের মত আলাপ আলোচনা করার মধ্যে যে প্রতারণা আছে তাহাই তাহাকে দিবারাত্র পীড়ন করিতে লাগিল।

কিন্তু নিজের পরিচয় দিবার কোন পথ সে রাখে নাই। এই বা মন্দ কি ? কেন, এই তো বেশ !

বনমালী যে গ্রাম ছাড়িয়া অন্যত্র গিয়া নিশ্চয় মরিয়াছে সে বিষয়ে গ্রামবাসী যখন নিঃসন্দেহ তখন তাহাকে জোর করিয়া বাঁচাইয়া আর কোন লাভ নাই। চেষ্টাও তাই করিল না।

কসবা গ্রাম হইতে নূতন ছাত্রটি আসিয়াছে।

মাধবাচার্য্য বিনা-প্রশ্নে নির্ব্বিচারে ছাত্র গ্রহণ করিত, কিন্তু নবাগতের সুগৌর সুডোল সুন্দর দেহবল্লী তাহাকে কুতূহলী করিয়া তুলিল।

কসবার আগন্তুক তাহার অতীতের কপাটে ঘা মারিয়া কোন্ বিস্মৃতপ্রায় কল্পলোকের কাহিনীর নূতন করিয়া প্রাণ সঞ্চার করিল। হয়ত না করিলেই ছিল ভাল।

নবাগত কিশোর ছাত্রটির নাম পুরন্দর।

বেদের ভাষা তাহার কাছে সজীব না, কিন্তু ফুলের প্রত্যেকটি পাপড়ি তাহার কাছে সৃষ্টির অপূর্ব্ব রহস্য মেলিয়া ধরে। পাখীদের কলতান সে বোঝে—তাহারা তাহার অন্তরঙ্গ।

পিপাসার যদি কোন শরীরী রূপ দেওয়া সম্ভব হয় তবে সে তাই।

জ্যোৎস্না-পুলকিত রজনীতে তাহাকে ফুলের বাগানে খুঁজিয়া পাওয়া যায়। মধ্যাহ্নের তীব্র কটাক্ষ যখন বন-বনান্ত ঝল্‌সাইয়া দিতে চায় তখন ছায়া-সুনিবিড় আম্রপল্লবের নীচে তাহার ক্লান্ত বিধুর অকারণ উপস্থিতি অবশ্যম্ভাবী... পাখীদের কলতানে কান পাতিয়া বসিয়া থাকে; কিন্তু ছাত্রাবাসে লেখাপড়া যখন সুরু হয় তখন তাহার অনুপস্থিতি তেমনই আবার অনিবার্য্য।

মাধবাচার্য্য সকলই লক্ষ্য করিয়াছে।

চাঁপাফুলের কচি গাছটা পূর্ব্বরাত্রের ঝড়ের তাণ্ডব নৃত্য হইতে নিজেকে যেন অতিকষ্টে বাঁচাইয়াছে।

পুরন্দর ভোরের প্রথম আলোয় তাহারই খোঁজ লইতে আসিয়া যাহা দেখে তাহাতে তাহার কিশোর প্রাণটিতে পূর্ব্বরাত্রের ঝড়ের দোলা লাগিয়া যায়। দলিত ছিন্ন গাছটার দিকে বেশীক্ষণ চাহিয়া থাকিতে তাহার ব্যথা লাগে। ফিরিয়া চলিয়া যাইতে চায়।

মাধবাচার্য্য তাহাকে ডাকিয়া ফিরাইয়া বলে,—পুরন্দর, গাছের ব্যথাটাই শুধু তোমার প্রাণকে স্পর্শ করে, কিন্তু মানুষের ব্যথা তো কই কোনদিন তোমাকে স্পর্শ করে না।

বলিয়া ফেলিয়াই মাধবাচার্য্য বিস্মিত হয়। কথাটা যে পুরন্দরকে বলা হইয়াছে তাহা সে যেন নিজেই আর বিশ্বাস করিতে পারে না।

তাড়াতাড়ি পুরন্দরের কাছে আসিয়া তাহাকে সস্নেহে অতি কাছে টানিয়া লইয়া বলে,—পুরন্দর, কস্‌বায় তোমার কে আছে?

এতদিন পুরন্দর সম্বন্ধে কোন প্রশ্নই মাধবাচার্য্য করে নাই, পুরন্দর তাই এ প্রশ্নে বিস্মিত হয়। মুখ তুলিয়া অতি আস্তে বলে,—কেন, আমার তো কেউ নেই।

মাধবাচার্য্য পুরন্দরের পৃষ্ঠে অতি নিবিড়ভাবে স্নেহস্পর্শ বুলাইয়া বলে,—একদিন তো ছিল।

—হুঁ, ছিল। পুরন্দর ক্ষণিকের জন্য নিবিড় আঘাতের সঘন ব্যথা বুকে জড়াইয়া নীরব হইয়া থাকে। মাধবাচার্য্যও তাহার নীরব ম্লান মুখের দিকে চাহিয়া নীরব রহে।

পুরন্দর হঠাৎ এক সময় চম্‌কাইয়া উঠিয়া বলিয়া যাইতে থাকে,—মা'কে আমি কোনদিনই দেখিনি, তবে তাঁকে আমি কল্পনা করতে পারি। সে না-কি আমার দিদির মতই ছিল। দিদির বিয়ের পরেই ঠিক বাবা মারা গেলেন, তখন আমি খুব ছোট। বাবার মৃত্যুটাও মনে পড়ে, কিন্তু তার জীবন্ত মূর্ত্তি আর আমি কল্পনাও করতে পারি না। তার পরে দিদির কথা...

পুরন্দর ক্লান্ত হইয়া হঠাৎ থামে। চোখের কোণ তাহার সজল বাধায় আচ্ছন্ন হইয়া আসে।

পুরন্দর হঠাৎ মাধবাচার্য্যের একটা হাত চাপিয়া ধরিয়া খিল খিল করিয়া হাসিয়া উঠিয়া বলে—তাকেও আমি ভুলে গেছি।

বলিয়া ছুটিয়া অদৃশ্য হইয়া যাইতে চায়, মাধবাচার্য্য তাহার একটা হাত ধরিয়া ফেলিয়া তাহার গতিতে বাধা দিয়া বলে,—পুরন্দর!

আর কিছু যেন তাহার বলিবার নাই।

পুরন্দর মাধবাচার্য্যের শান্ত চোখের মমতাময় চাহনিতে সংযত শান্ত হইয়া দাঁড়াইয়া আবার বলিয়া চলে, দিদির বিয়ে হয় ময়নাগড়ে। দিদির মুখেই শুনেছি, তার স্বামীর ঘর না-কি বংশমর্য্যাদায় সকলেরই ঈর্ষার বস্তু। বাবার মৃত্যুর পরে আমার দূরসম্পর্কের এক পিসিমাকে ডেকে এনে তার ওপরে আমাকে দেখার ভার দিয়ে দিদি ময়নাগড়ে চলে গেল। তারপরে দিদির কতদিন কোন খবর পাইনি: তাকে দেখার জন্যে কত না আবেদন জানিয়েছি, কিন্তু পিসিমা বলতেন, পাগল ছেলে! সে এখন কত বড় সংসারের ভার নিয়েছে—সে কি পারে সে-সব ফেলে এখানে এসে একদিনের তরেও থাকতে? হয়ত পারতই না, নইলে সে কি না এসে পারে কখনও? বছরের পর বছর কেটে গেল, কিন্তু দিদির কোন খবর পাওয়া গেল না। হঠাৎ গভীর রাত্রে একদিন ঘুম ভেঙে যেতে দেখি, কে একজন অন্ধকারে পাগলের মত আমাকে চুমায় চুমায় ছেয়ে দিচ্ছে। আমি ভয় পেয়ে চীৎকার করতে যাব এমন সময় সে বললে, পুরন্দর দিদিকে তোর মনেই নেই? তারপরে দু-জনের মধ্যে আর কোন কথা হয়নি। আমি দিদির নিবিড় আবেষ্টনের মধ্যে মূর্চ্ছিতের মত পড়ে ছিলাম। ভোরের আলোয় যখন ঘুম ভাঙলো তখনও দিদি আমাকে তেমনি জড়িয়ে শুয়ে আছে, কিন্তু চোখে তার পলক নেই। বললেম,—দিদি, তুমি

কেমন ক'রে এখানে এলে?...কোন উত্তর পেলাম না, দিদির রক্তজবার মত লাল চোখ দুটো দিয়ে আমাদের কস্‌বার ঝরণার মত অবিশ্রাম জল ঝরে পড়তে লাগল। চোখের জল নিঃশেষ না হ'তেই দিদি আমাকে আরও তার বুকের কাছে টেনে নিয়ে ব'লে যেতে লাগল, পুরন্দর, তারা না-কি বংশমর্য্যাদায় সকলের ঈর্ষার বস্তু, কিন্তু মানুষ তাদের মধ্যে একজনও নেই ভাই। আমাকে শুধু তারা জীয়ন্তে চিতায় তুলে দেয় নি, নইলে আমার মধ্যে যে নারীত্ব আছে তা তারা ভুলে গিয়ে অহোরাত্র তার অশেষ অবমাননা করেছে। আমার প্রতি-অঙ্গে আমার শ্বশুরবাড়ির হাতের লাঞ্ছনার দাগ আজও আঁকা আছে। তারপরে স্বামীর কথা। হিন্দু স্ত্রীর যিনি জীবন্ত দেবতা-- পুরন্দর, সৌন্দর্য্যের সে কি ভীষণ অপরাধ! আমার এই অপার্থিব সৌন্দর্য্য নিয়ে আমি সতীত্বের কঠোর শুভ্রতা কিছুতেই নাকি অটুট রাখতে পারি না- এই তার ধারণা। আমার সৌন্দর্য্য আমার অপরাধ।...আজ তাই সকলকে মুক্তি দিয়ে রাত্রির অন্ধকারের জড়োয়ায় নিজের সৌন্দর্য্যকে জড়িয়ে এখানে চলে এসেছি। পুরন্দর, আমার বুকের এই গভীর বেদনা তোর বুকে খানিকটা মিশিয়ে দিই আয়।...আমি একা বইতে অক্ষম, তোকে তাই এর ভাগ নিতে হবে। তারপরে আরও নিবিড়, আরও গভীর ভাবে সে আমাকে তার ব্যথার স্থানে জড়িয়ে ধরল।...দিন-কয়েক পরে ময়নাগড় থেকে লোক এল দিদির সন্ধানে। কিন্তু দিদির খোঁজ নিতে আমি ঘরে ঢুকে দেখি, ঘরের আড়ার সঙ্গে বাঁধা একটা দড়ির ফাঁসে তার বিকৃত সৌন্দর্য্য ঝুলচে। এমনি ক'রে তার সৌন্দর্য্যের বীভৎস অবসান হ'ল, কিন্তু তার স্মৃতির অবসান হয়ত আমার কোন কালেই হবে না। সে তার ব্যথার ভাগী আমাকে ক'রে নিতে এসেছিল, আমি চিরদিন তাই হয়েই থাকব।

বলিয়া পুরন্দর মাধবাচার্য্যের শিথিল বন্ধন হইতে নিজেকে মুক্ত করিয়া লইয়া অদৃশ্য হইয়া গেল।

মাধবাচার্য্যও আর বাধা দিল না।

চাঁপাগাছের সিক্ত সবুজ পত্রের উপর সূর্য্যের কিরণ পড়িয়া ঝিলমিল্ করিতেছিল। যেন জগতের পুঞ্জীভূত অশ্রু সেখানে আসিয়া জমা হইয়াছে।

ছাত্রাবাসের সহজ সরল তালটুকু সহসা কাটিয়া গিয়াছে।

পুরন্দর কাহারও অনুরোধের পূর্ব্বেই মাধবাচার্য্যের পাতা আসনটির পাশে আসিয়া বই খুলিয়া নিত্য নিয়মিত সময়ে বসে। মাধবাচার্য্য ছাত্রদের নিকট বেদের নিগূঢ় ব্যাখ্যা অতি প্রাঞ্জল সরল করিয়া প্রকাশ করিতে গিয়া হয়ত মাঝপথেই অকারণে থামিয়া যায়। আবার তাহার আত্মস্থ ভাবটুকু কাটিয়া গেলেই ছিন্নসূত্র ধরিয়া নূতন করিয়া আরম্ভ করিতে যায়, কিন্তু সমস্তই গরমিল হইয়া যায়। কেমন হতাশভাবে পুরন্দরের দ্যুতিহীন মুখের পানে চাহিয়া থাকে।

পুরন্দর সর্ব্বাগ্রে তাহা লক্ষ্য করিয়া বলে,-- আজ আপনার শরীরটা হয়ত ভাল নেই। আজ না-হয় থাক।

বলিয়া পুরন্দর মাধবাচার্য্যের অনুমতির অপেক্ষা না রাখিয়াই উঠিয়া পড়ে। মাধবাচার্য্য আরও নীরব হইয়া যায়। একে একে অন্যান্য ছাত্রেরাও উঠিয়া যায়। এমন করিয়া মাঝপথেই হয়ত বেদাধ্যয়ন শেষ হয়।

নিশুতি রাতের নিবিড় তন্দ্রাচ্ছন্নতা ছাত্রাবাসটিকে তখন ছাইয়া ফেলিয়াছে।

মাধবাচার্য্যের কাছে অনিদ্র রজনীর প্রত্যেকটি সুদীর্ঘ মুহূর্ত্ত যেন অসহ্য হইয়া উঠিয়াছে। ধীরে ধীরে শয্যা ত্যাগ করিয়া বাহিরে আসিয়া দেখিল, সমস্তই অন্ধকারের গভীরতার মধ্যে তলাইয়া গিয়াছে। হয়ত পুরন্দরও আর সকলের মতই নিদ্রাজনিত বিস্মৃতির মধ্যে শান্তি পাইয়াছে। কিন্তু পুরন্দরকেই মাধবাচার্য্যের আজ বড় প্রয়োজন।

প্রথম ডাকেই তাহার সাড়া মিলিল। পুরন্দরও হয়ত তাহারই মত অনিদ্র রজনী কাটাইতেছিল।

পুরন্দর কাছে আসিয়া বলিল, এত রাত্রে যে আপনি?

--রাত্রের অন্ধকারেই তুমি আমার সঙ্গী, আমার আত্মীয়, বন্ধু। তোমাকে যে-ব্যথা বইবার ভার তোমার দিদি দিয়ে গেছে তাতে আমিও কিছু ভাগ নিতে চাই, তোমার সে দুঃখের সাথী হ'তে চাই পুরন্দর। কিন্তু জগতের চোখের আড়ালেই তা চিরদিন থাকে যেন।

মাধবাচার্য্য পুরন্দরকে বুকের কাছে টানিয়া লইয়া তাহার উন্নত বিশাল ললাটের উপর গাঢ় চুম্বন আঁকিয়া দিয়া বলিল,---

পুরন্দর, আমি এ গ্রামে এসেই মায়ার ভীষণ আত্মহত্যার কাহিনী লোকমুখে শুনেছিলাম। মায়াকে কখনও দেখিনি, তার মূর্ত্তি আমি যেন বেশ কল্পনা করতে পারি।

পুরন্দর মাধবাচার্য্যের মুখে তাহার দিদির নাম শুনিয়া চম্‌কাইয়া উঠিল। মাধবাচার্য্য তাহা বুঝিয়া বলিল, মায়াকে আমি কেমন ক'রে চিনলাম এই তো তোমার বিস্ময়, পুরন্দর? আজ আমি মাধবাচার্য্য বলেই পরিচিত, কিন্তু একদিন আমি এই গ্রামেরই বনমালী ছিলাম। আজ কিন্তু কেউ আমাকে বনমালী ব'লে আর চিনতেই পারে না।

তারপরে মাধবাচার্য্য নিজের জীবনের যতদূর মনে পড়ে সকলই পুরন্দরের কাছে প্রকাশ করিয়া বলিল। এমন কি যোগাচার্য্যের আশ্রমে থাকিতে যেদিন ভিক্ষায় বাহির হইয়া একটি অপরিচিতা বধূর নিকট তাহাদের জাতিচ্যুতির কাহিনী শুনিয়াছিল সেদিন যে কোন্ কথা সর্ব্বাগ্রে তাহার স্মরণ হইয়াছিল তাহাও বলিতে ভুলিল না।

মাধবাচার্য্য যখন থামিল তখন ভোরের প্রথম আলো আসিয়া তাহাদের মুখে পড়িয়াছে।

ছাত্রেরা শুনিল, মাধবাচার্য্য গুরু-সন্দর্শনে ও তীর্থ-পর্য্যটনে বাহির হইবে। দেখিতে দেখিতে গ্রামময় সে-কথা রাষ্ট্র হইয়া গেল।

সকলে আসিয়া ঘটা করিয়া তাহার কাছে বিদায় লইল এবং অচির শুভ-প্রত্যাবর্ত্তন কামনা করিয়া গেল। মাধবাচার্য্য কবে ফিরিবে, কি আদৌ ফিরিবে না—কিছুই বলিয়া তাহাদের ঔৎসুক্য বাড়াইতে বা কমাইতে পারিল না। শুধু যাহা না-বলিলেই নয় তাহাই বলিয়া সকলকে বিদায় দিল।

বিদায়ের দিন যেদিন আসিয়া পড়িল সেদিন মাধবাচার্য্য পুরন্দরকে একান্তে ডাকিয়া লইয়া বলিল, তুমি আমার পথের সাথী হবে কিন্তু ভাই। আমরা দু-জনে পথ চলব, ভাগ ক'রে দুঃখ বইব, আর দিন গুণব কেমন, পারবে তো পুরন্দর?

পুরন্দর জানিত, এ ডাক তাহার পড়িবেই এবং একপ্রকার প্রস্তুত হইয়াই ছিল। শুধু মাথা নাড়িয়া বলিল,—খুব।

উভয়ে বিদায় লইয়া চলিয়া গেল।

বনমালীও একদিন এ গ্রাম হইতে বিদায় লইয়াছিল, আবার ফিরিয়াও আসিয়াছিল, কিন্তু কেহ তাহাকে চিনিতে পারে নাই। মাধবাচার্য্যও বিদায় লইল, কিন্তু আর কখনও ফিরিয়া আসে নাই। এইটুকুই তফাৎ...

ব্যর্থ

শ্রীসুধীন্দ্রনারায়ণ নিয়োগী

তোমার ত এত বুদ্ধি! চোখ দেখে তাই মনে হয়;
তুমিও নিজের মনে সেই গর্ব্বে আছ ভরপুর।
তোমার ত এত রূপ! যত হেরি ততই বিস্ময়
দিনে দিনে বেড়ে যায়, কানে বাজে মরণের সুর।
কত তুমি রঙ্গ জান, মন নিয়ে খেল ছিনিমিনি,
দলিত করিবে জেনে প্রাণখানি সঁপে দিই পায়,
তোমার হাতের বিষ অমৃতের মূল্য দিয়ে কিনি—
মরণের বিভীষিকা ঢাক তুমি হাসির আভায়।

তোমার ত এত বুদ্ধি—একথাটি তবু বুঝিলে না,
স্নেহ যদি নাহি দাও, কার স্নেহ কর তুমি আশা?
রূপ দিয়ে, রঙ্গ দিয়ে কারু প্রেম নাহি যায় কেনা;
অভিনয়ে, বুদ্ধিমতি! জানিও পাবে না ভালবাসা।
মমতাবিহীন রূপ—তার মত আছে কি বালাই?
সবারে করিতে দগ্ধ তুমিও কি দগ্ধ হও নাই?

শিশুর শিক্ষায় খেলার স্থান

শ্রীউষা বিশ্বাস, এম-এ, বি-টি

To spare the rod and spoil the child—যে-কালের ধারণা ছিল সে-কাল আর নাই। শিশুকে শিক্ষা দিবার জন্য যে বেত্রের প্রয়োজন নাই—এ-সত্য শিক্ষকগণ ক্রমেই উপলব্ধি করিতেছেন। ফ্রোএবেল প্রভৃতি শিক্ষা-গুরুগণ বর্ত্তমান শিক্ষা-পদ্ধতিতে যে-বিপ্লব আনিয়াছেন তাহাতে শিশুকে শাসন করার পরিবর্ত্তে আনন্দ দেওয়ারই ব্যবস্থা করা হইয়াছে। পাঠ্যবিষয়কে মনোরম ও চিত্তাকর্ষক করিবার প্রয়োজন আজকাল সকল শিক্ষকই অনুভব করিতেছেন। পাঠে শিশুর স্বাভাবিক অনুরাগ জন্মাইতে পারিলে শিক্ষকের কাজ কঠিন না হইয়া বরং যে সহজই হইয়া যায় এ-কথা সর্ব্ববাদিসম্মত। শিক্ষা অর্থে আমরা আজকাল কেবল কতকগুলি পাঠ্যবিষয় মুখস্থ করানোই বুঝি না। প্রকৃত শিক্ষায় শিশুর দৈহিক ও মানসিক শক্তিগুলির স্বাভাবিক ক্রমবিকাশ সহজ ও সুনিয়মিত হয়। তাই রুশো-প্রমুখ আধুনিক শিক্ষা-প্রবর্ত্তকগণ শিশুর ইন্দ্রিয়পরিচালনার উপরই তাহার ভবিষ্যতের সমস্ত শিক্ষার ভিত্তি স্থাপন করিতে প্রয়াস পাইয়াছেন। এই কারণেই শিক্ষকের শিশু-মনস্তত্ত্ব সম্বন্ধে জ্ঞান থাকা বিশেষ প্রয়োজন।

আমরা শিশুকে অপরিণত মানবমাত্র জ্ঞান করিয়া বড়ই ভুল করি। তাহার মন যে প্রাপ্তবয়স্ক মানুষের মন হইতে সম্পূর্ণ বিভিন্ন, সে-কথা শিশুর কার্য্য বিচার করিবার সময় আমাদের সর্ব্বদা মনে রাখা উচিত। শিশুকে শিক্ষা দিবার সময় তাহার দৈহিক ও মানসিক শক্তিগুলি সম্বন্ধে সচেতন থাকা শিক্ষকের একান্ত কর্ত্তব্য। শিশুর যাবতীয় দৈহিক প্রয়োজনকে, তাহার মানসিক বৃত্তি ও সহজাত সংস্কারগুলিকে উপেক্ষা করিলে চলিবে না। বরং এইগুলিকে উপযুক্তভাবে পরিচালিত করিয়া শিক্ষাকার্য্যে প্রয়োগ করিতে পারিলে অধিক ফল পাওয়া যাইবে। কোন্ কোন্ বিষয় ও কার্য্যে শিশুর স্বাভাবিক আগ্রহ ও অনুরাগ লক্ষিত হয়—ইহার প্রতিও শিক্ষকের সজাগ ও সুতীক্ষ্ণ দৃষ্টি থাকা প্রয়োজন। শিশুকে স্বতঃই খেলায় প্রবৃত্ত হইতে দেখা যায়। কিন্তু তাহার এই ক্রীড়াশক্তি অনেক সময় পাঠ্যবিষয় হইতে তাহার মনোযোগ বিক্ষিপ্ত করিয়া দেয় এবং পাঠের বিঘ্ন জন্মায়। এই কারণে অনেক সময় শিক্ষক শিশুর এই স্বাভাবিক ক্রীড়া-স্পৃহাকে দমন করিতে প্রয়াস পান। কিন্তু তাঁহার এই কার্য্য কতদূর যুক্তিসঙ্গত সে-বিষয়ে বিবেচনা করিয়া দেখা আবশ্যক। এই সহজ-বৃত্তিটিকে বিনষ্ট না করিয়া উহাকে শিক্ষাকার্য্যে উপযুক্তরূপে নিয়োগ করিতে পারিলে যে অধিক সুফল দর্শিত হয় তাহা ফ্রোএবেল প্রভৃতি শিক্ষাতত্ত্ববিশারদগণ সপ্রমাণ করিয়া গিয়াছেন।

খেলা-সম্বন্ধে নানাপ্রকার মত আছে। এ-সম্বন্ধে কয়েকটি বিশিষ্ট লোকের মত উল্লেখযোগ্য। শিলার ও স্পেনসার-এর মতে শক্তির আধিক্যবশতই (surplus energy) শিশুরা ক্রীড়ায় প্রবৃত্ত হয়। ইহারা বলেন, খেলার দ্বারা আমাদের অতিরিক্ত ও অত্যধিক শক্তি ব্যয়িত হইয়া যায়। এই মত আংশিকভাবে সত্য হইলেও সম্পূর্ণ সত্য বলিয়া মনে হয় না। শিশু যখন প্রথম খেলিতে শিখে তখন তাহার সেই খেলায় অঙ্গপ্রত্যঙ্গচালনা দ্বারা তাহার অপরিমিত শক্তির ব্যয় ছাড়া আর কোন উদ্দেশ্যই লক্ষিত হয় না। কিন্তু তাহার পরবর্ত্তী জীবনের খেলায় যে প্রকারভেদ দেখা যায় তাহাতে এই মত অভ্রান্ত বলিয়া মনে হয় না। বয়োবৃদ্ধিক্রমে শিশুর দৈহিক ও মানসিক শক্তির ক্রমোন্মেষের সঙ্গে সঙ্গে তাহার খেলারও পরিবর্ত্তন হইতে দেখা যায়। বিভিন্ন জাতীয় ইতর জন্তু-শিশুদিগের ও বিভিন্নবয়স্ক মানবশিশুদিগের বিভিন্ন প্রকারের খেলায় অনুরাগ দৃষ্ট হয়। যদি শক্তির প্রাচুর্য্যই শিশুদিগের খেলার একমাত্র কারণ হয়, তাহা হইলে এইরূপ হইবার কথা নয় এবং শিশুরা ক্লান্ত ও অসুস্থ হইয়া পড়িলেই তাহাদের আর ক্রীড়াস্পৃহা না থাকিবার কথা। কিন্তু অত্যধিক শক্তি না থাকিলেও শিশুকে সময়ে সময়ে খেলা করিতে দেখা যায়। ক্লান্ত ও অসুস্থ শিশুকেও এমন কতকগুলি খেলায় প্রবৃত্ত

হইতে দেখা যায় যাহাতে কেবল তাহার স্বাভাবিক ছন্দবোধই পরিতৃপ্ত হয়। সুতরাং শিশুগণ সব সময় শক্তির আধিক্যের জন্যই খেলা করে না। শক্তির আধিক্য শিশুদের ক্রীড়াপ্রবৃত্তি জাগাইতে সাহায্য করিলেও উহাকে ঠিক খেলার কারণ বলা যায় না।

জার্ম্মান দার্শনিক লাজারস্-এর মতে আমাদের অবসন্ন মানসিক ও দৈহিক শক্তিগুলিকে বিশ্রাম ও আরাম দিবার জন্যই আমরা খেলা করি। এ-বিষয়ে কোনও সন্দেহ নাই যে, খেলা আমাদের অবসাদগ্রস্ত দেহ ও মনকে স্ফূর্ত্তি ও আনন্দ দান করে। কিন্তু সেই আনন্দ ও স্ফূর্ত্তি লাভের জন্যই খেলার আবশ্যকতা নাই।

কার্ল গ্রস ও বল্ডউইন-এর মতে শিশুর সহজাত সংস্কার হইতেই তাহার ক্রীড়াস্পৃহা জন্মে। ইহা ইতর প্রাণীদিগের মধ্যেও লক্ষিত হয়। বল্ডউইন ও গ্রস-এর মতে শিশুর ক্রীড়ার মধ্য দিয়াই তাহার ভবিষ্যৎ জীবনের কর্ম্ম করিবার শক্তি অর্জ্জিত ও নিয়ন্ত্রিত হয়—ইহার দ্বারাই শিশুর দৈহিক ও মানসিক শক্তিগুলির উৎকর্ষ সাধিত হয়। কার্ল গ্রস-এর মতে খেলার সাহায্যে শিশুর অনিয়ন্ত্রিত শক্তি সুনিয়ন্ত্রিত, ও জীবনের কার্য্যের উপযোগী হইয়া উঠে।

শিশুরা ভবিষ্যৎ জীবনে যে-সকল কার্য্যে ব্রতী হইবে শৈশবে খেলার ছলে তাহাই নানাভাবে অভ্যাস করে।

এই মত অন্ততঃ অনেকাংশেই সত্য বলিয়া মনে হয়। যত্নপূর্ব্বক লক্ষ্য করিলে দেখা যায় যে, শিশুর ক্রীড়ায় তাহার ভবিষ্যৎ জীবনের কর্ম্মের আভাস সূচিত হয়। অনেকস্থলেই বালক ও বালিকাদিগের বিভিন্ন প্রকারের খেলায় অনুরাগ লক্ষিত হয়। বালকেরা সাধারণতঃ বল মার্ব্বেল ইত্যাদি লইয়া ছুটাছুটি করিয়া খেলিতে ভালবাসে। খেলাঘরের গৃহস্থালীর কাজকর্ম্মে, পুতুলখেলায়, বালিকাদিগের অধিক আনন্দ ও আসক্তি দেখা যায়। এখানে রবীন্দ্রনাথের একটি কবিতার লাইন মনে পড়ে। জননী শিশুকে বলিতেছেন :—

> ছিলি আমার পুতুল খেলায়, প্রভাতে শিবপূজার বেলায়
> তোরে আমি ভেঙেছি আর গড়েছি।

পুতুল খেলার সময় বালিকার মধ্যে ভাবী জননীর রূপটিই প্রকাশ পায়।

এইরূপে শিশুজীবনের প্রথম শিক্ষা খেলার মধ্য দিয়াই হইয়া থাকে। এইজন্য খেলাকে প্রকৃতির ধাত্রী (Nature's jolly old nurse) বলা হইয়াছে। ইহার মধ্য দিয়াই শিশু তাহার দৈহিক ও মানসিক শক্তিগুলির পরিচালনা ও উৎকর্ষসাধন করিতে শিক্ষা করে। খেলার মধ্যে শিশুর মন যে-আনন্দ সংগ্রহ করে তাহা তাহার কার্য্যশিক্ষার সমস্ত কষ্টকে ভুলাইয়া দেয়। এইজন্যই প্রকৃতির বিধান যে শিশুর প্রথম জীবনের সমস্ত কাজই খেলার মত। তাহার কাজের ও খেলার মধ্যে বিশেষ কোন পার্থক্যই দেখা যায় না। তাহার পর বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে শিশুর প্রয়োজনবোধ সজাগ হইয়া উঠে। ক্রমে সে প্রয়োজনের বশবর্ত্তী হইয়া কাজ করিতে শিখে। শিশুর দৈহিক ও মানসিক শক্তিগুলির যেরূপ ক্রমবিকাশ হয় তদনুযায়ী তাহার খেলারও প্রকারভেদ হইতে দেখা যায়। এইরূপেই প্রকৃতি খেলার মধ্য দিয়া শিশুর সহজ শিক্ষার বিধান করিয়াছেন। শিক্ষকের কাজ তাহাকেই ঠিক ভাবে নিয়মিত করা—শিক্ষার দ্বারা শিশুমনের স্বাভাবিক ক্রমবিকাশকে বাধা না দিয়া সহজ করিয়া দেওয়া এবং তদনুরূপ আবেষ্টনী সৃষ্টি করিতে চেষ্টা করা।

শিক্ষাক্ষেত্রে খেলার প্রয়োজনীয়তা যাঁহারা প্রথম প্রচার করিয়াছিলেন তাঁহাদের মধ্যে কিণ্ডারগার্টেন প্রণালীর প্রবর্ত্তক ফ্রোএবেলের নামই বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। খেলা যে শিশুর আত্মপ্রকাশের একটি প্রকৃষ্ট উপায় এ সত্য তিনিই প্রথম আবিষ্কার করেন। আনন্দই যেন শিশুর সকল কাজের প্রেরণা হয় ইহাই তাঁহার অভিপ্রেত ছিল। তাঁহার মতে আনন্দ ব্যতীত শিশুর সহজ ও স্বাভাবিক আত্মবিকাশ সম্ভব নয়। ঐ বয়সে আনন্দই সকল কাজের প্রাণ। খেলার সাহায্যে শিশু আনন্দে কুঁড়ি হইতে ফুলের মত বিকশিত হইয়া উঠে।

ফ্রোএবেলই প্রথম শিশুর শিক্ষাপদ্ধতিতে খেলাকে এইরূপ উচ্চস্থান দেন।

> আনন্দে ফুটিয়া ওঠ
> শুভ্র সূর্য্যোদয়ে প্রভাতের কুসুমের মত।

তিনি শিশুজীবনকে এই সহজ আনন্দেই ও স্বাভাবিক ভাবেই বিকশিত করিয়া তুলিতে চাহিয়াছিলেন। শিশুর স্বেচ্ছাকৃত মনোযোগ (voluntary attention) কম থাকে। যে-বিষয়ে তাহার স্বাভাবিক অনুরাগ থাকে না তাহাতে

অধিকক্ষণ মনোনিবেশ করা তাহার পক্ষে কঠিন। খেলার মধ্যে শিশু যে স্বাভাবিক আনন্দ পায় তাহাই তাহাকে পাঠে আসক্তি আনিয়া দেয়। তাই কিণ্ডারগার্টেন প্রণালীতে খেলার ছলে তাহাকে শিক্ষা দিবার প্রচেষ্টা। খেলার উদ্দেশ্যই আনন্দ দেওয়া। কিন্তু আমরা কাজ করি বিশেষ কোন উদ্দেশ্যসিদ্ধির জন্যই। কাজের মধ্যে এই যে প্রয়োজনবোধ ও বাধ্যবাধকতার ভাবটি থাকে তাহাই আমাদের আনন্দকে নষ্ট করিয়া দেয় ও আমাদের শরীর-মনও শীঘ্রই সেজন্য ক্লান্ত হইয়া পড়ে। অনেক সময়েই কাজ ও খেলায় একই প্রকারের দৈহিক ও মানসিক শক্তি নিয়োগ করিতে হয়। সময়ে সময়ে খেলার জন্যও যথেষ্ট যত্ন ও উদ্যমের প্রয়োজন হয়। অথচ তাহাতে শিশুমনের স্বাভাবিক আনন্দ ও স্ফূর্ত্তি নষ্ট হয় না এবং সে শীঘ্র অবসন্নও হইয়া পড়ে না। তাই আধুনিক শিক্ষাতত্ত্ব-বিদ্‌গণের মতে খেলাই কার্য্যশিক্ষা করিবার প্রকৃষ্ট উপায়। ইহার দ্বারা শিশুর সহজ ও স্বাভাবিক প্রবৃত্তিকেও বাধা দেওয়া হয় না এবং তাহার স্বাভাবিক কাজের মধ্য দিয়াই তাহাকে আত্মবিকাশের সুযোগ দেওয়া হয়। কিণ্ডারগার্টেন প্রণালীতে যে-খেলার পদ্ধতি বিহিত হইয়াছে তাহার দ্বারা শিক্ষক শিশুর স্বভাবিক বৃত্তিগুলিকে উপযুক্ত ভাবে নিয়মিত ও পরিচালিত করিতে প্রয়াস পান। ইহাতে কতকগুলি কৃত্রিম ও নিয়মবদ্ধ খেলার ব্যবস্থা করা হইয়াছে বলিয়া অনেকে বলেন যে, ইহার দ্বারা খেলার প্রকৃত উদ্দেশ্য সাধিত হয় না। সে যাহাই হউক, শিশুকে খেলার সাহায্যে শিক্ষা দিবার প্রয়াসই এই প্রণালীর বিশেষত্ব। ইহার আর একটি সুফল এই হয় যে, ইহার দ্বারা কতকগুলি সমবয়স্ক শিশুকে একত্র খেলা ও কাজ করিবার সুযোগ দেওয়া হয়। এইরূপে শিশুদের মধ্যে সমাজের জ্ঞান জাগাইয়া দেওয়া হয়। তাহারা বুঝিতে শিখে যে, তাহারা ব্যক্তিবিশেষ হইলেও আপন আপন শ্রেণীরও একজন। এই প্রকারে খেলার মধ্য দিয়া তাহারা নিঃস্বার্থপরতা ও সামাজিকতার প্রয়োজন অনুভব করিতে শিখে।

সাধারণতঃ শিশু পাঁচ-ছয় মাস বয়স হইতেই খেলিতে আরম্ভ করে। কিন্তু ঐ সময়ে তাহার খেলার কোন নিয়ম বা উদ্দেশ্যই থাকে না। সে আপন খেয়ালের বশে স্বাধীন ভাবে হাত-পা নাড়িয়া খেলিয়াই আনন্দ পায় বলিয়া মনে হয়। এই সময়ে তাহাকে দর্শন ও শ্রবণেন্দ্রিয় পরিচালনা করিয়াও খেলিতে দেখা যায়। ঝুমঝুমি, রঙীন কাগজের ফুল ইত্যাদি খেলনার দ্বারা এই বয়সের শিশুদের খেলা দেওয়া হয়। ইহার পর ক্রমে শিশু তাহার প্রত্যেক অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ চালনা করিয়া খেলিতে শিখে। ক্রমশঃ সে খেলায় তাহার মানসিক শক্তি নিয়োগ করিতে আরম্ভ করে। প্রথমে সে কোন জিনিষের সাদৃশ্য, বৈসাদৃশ্য লক্ষ্য করিতে শিখে, ক্রমে তাহার স্থান ও দূরত্ব জ্ঞানও অল্প অল্প জন্মিতে থাকে। এই সময়ে সে দ্রব্যাদি আপন হাতে সাজাইয়া গুছাইয়া দেখিতে ভালবাসে। তিন-চার বৎসর বয়স হইতেই শিশু অপরের অনুকরণ করিতে শিখে। এই সময়ে শিশু বয়োজ্যেষ্ঠদের যাহা করিতে দেখে খেলায় তাহারই নকল করিতে চেষ্টা করে। সাধারণতঃ তৃতীয় বৎসরেই শিশুর পর্য্যবেক্ষণ শক্তির সূচনা দেখা যায়। এই সময় হইতেই সে অপরকে যাহা বলিতে শোনে তাহাই বলিতে চেষ্টা করে, যাহা করিতে দেখে তাহাই করিতে চায়। ইহাতেই তখন তাহাকে বিশেষ আমোদ পাইতে দেখা যায়। ইহার পর শিশুর কল্পনা-শক্তি উন্মেষিত হইতে থাকে। পাঁচ-ছয় বৎসর বয়সেও শিশু অত্যন্ত কল্পনাপ্রবণ হইয়া পড়ে। তাহাকে এই সময়ে কল্পনাশক্তির সাহায্যে নানা অদ্ভুত গল্প বানাইতে দেখা যায়। পরীর গল্প, রাক্ষসের গল্প, আরব্যোপন্যাসের গল্পাদি এই বয়সের শিশুদের অত্যন্ত প্রিয়। কারণ এই সব গল্পে তাহারা তাহাদের কল্পনাশক্তিকে যথেচ্ছ খেলাইতে পারে। এই শক্তির সাহায্যেই পরে ইতিহাস ও ভূগোলের পাঠগুলি তাহাদের কাছে জীবন্ত করিয়া তোলা যাইতে পারে। সাধারণতঃ পাঁচ বৎসর বয়স পর্য্যন্ত শিশু তাহার কোনও কাজে বা খেলায় নিয়ম মানিয়া চলে না। এই সময়ে সে আপন খেয়ালের বশবর্ত্তী হইয়াই সব কাজ করে। তাহার সকল কাজই যেন খেলা। পাঁচ হইতে দশ বৎসর বয়সের মধ্যেই ক্রমে তাহার বিশেষ বিশেষ নিয়মবদ্ধ খেলায় আসক্তি ও আগ্রহ জন্মে। এই সময়েই সে খেলার মধ্য দিয়া নিয়মানুবর্ত্তিতা শিক্ষা করিবার সুযোগ পায়। শিশু একটু বড় হইলেই আর সে শুধু দৈহিক শক্তির পরিচালনা করিয়াই খেলিতে ভালবাসে না। ক্রমে তাহার খেলার বাধাহীন স্বাধীন ভাবটিও কমিয়া যাইতে থাকে। সাত-আট বৎসর বয়স হইতেই শিশুকে

খেলায় চিন্তাশক্তি প্রয়োগ করিতে দেখা যায়। এই সময়ে সে ধাঁধাঁর উত্তর করিতে, খেলাসংক্রান্ত কোন বিষয় চিন্তা করিয়া অনুমান করিতে অত্যন্ত আমোদ বোধ করে। এই সময় হইতে কৈশোর পর্য্যন্ত শিশুরা আপন আপন দৈহিক ও মানসিক শক্তির পরিচালনা করিতেই শুধু ভালবাসে না, তাহারা ঐ শক্তিগুলির পরীক্ষা দিয়া নিজ নিজ শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করিতেও অতিশয় আনন্দ পায়। ইহার পর ক্রমে শিশু খেলায় যুক্তি ও বিচার শক্তি নিয়োগ করিতে শিখে। কোন কাল্পনিক বিবরণ দিতে গিয়া শিশু যুক্তি দ্বারা বিচার করিতে চাহে যে, বাস্তবে তাহা সম্ভবপর কি-না। শিশুরা আর একটু বড় হইলে, তাস ইত্যাদি খেলায়, যাহাতে তাহাদের বুদ্ধি-শক্তির পরিচালনা হয় তাহাতে তাহাদের বিশেষ অনুরাগ লক্ষিত হয়। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে, শিশুর দৈহিক ও মানসিক শক্তিগুলি যেরূপভাবে ক্রমবিকাশ প্রাপ্ত হয় তদনুযায়ী তাহার খেলারও প্রকারভেদ হয়।

শিশুর খেলা-প্রবৃত্তির মূল তাহার কতকগুলি সহজাত সংস্কারের (instincts) মধ্যে নিহিত আছে বলিয়া বিবেচিত হয়। অনুসন্ধিৎসা বা কৌতূহল ইহাদের মধ্যে একটি। এই কৌতূহলই শিশুর ক্রীড়াস্পৃহা জাগাইয়া তুলিতে সহায়তা করে। যে-খেলার মধ্যে কোন বৈচিত্র্য বা নূতনত্ব নাই শিশুরা তাহা পছন্দ করে না, যেহেতু তাহাতে তাহাদের স্বাভাবিক কৌতূহল উদ্দীপিত হয় না। তাহাদের কাছে সে খেলা খেলাই না, এবং তাহাদের মনও তাহাতে স্বতই ক্লান্ত হইয়া পড়ে। তিন বৎসর বয়স হইতেই শিশুর খেলার মধ্যে তাহার আত্ম-প্রকাশের স্বাভাবিক স্পৃহা ও চেষ্টা লক্ষিত হয়। এই সময়ে সে বিভিন্ন শব্দ দ্বারা ও নানা অঙ্গভঙ্গীর সাহায্যে তাহার মনোভাব ব্যক্ত করিতে চাহে। এই আত্মপ্রকাশের ইচ্ছা শিশুর একটি সহজাত সংস্কার। ইহা তাহার পরবর্ত্তী জীবনেও থাকিয়া যায়। ক্রমে যখন শিশুর আত্মশক্তিবোধ জন্মিতে থাকে সে তখন তাহার নিজশক্তিতে বিশ্বাস করিতে শিখে। এই সময়ে সে নিজের হাতে সব জিনিষ নাড়িয়া-চাড়িয়া খেলা করিয়া আনন্দ পায়। শিশুর এই স্বাভাবিক বৃত্তিটি তাহার ক্রীড়াস্পৃহা জাগাইতে বিশেষ আনুকূল্য করে। মানুষের মন গতিশীলতায় একটি স্বাভাবিক আনন্দ পায়। তাই শিশু যখন প্রথম চলিতে বা হামাগুড়ি দিতে শিখে সে গতিতে স্বভাবতই আনন্দ অনুভব করিয়া থাকে। তাহাকে কেহ ধরিতে গেলে অনেক সময় সে তাহাকে এড়াইয়া চলিবার চেষ্টা করিয়া বড়ই আমোদ উপভোগ করে। এই সময় ইহাই তাহার একটি অত্যন্ত প্রিয় খেলা। ইহার পর শিশু একটু বড় হইলে তাহার মনে অনুকরণ-স্পৃহা জাগে। এই সময়ে সে অপরের কার্য্যকলাপ বাক্যাদি নকল করিয়া অভিনয় করিতে ভালবাসে। এইরূপ অভিনয়ই তাহার খেলাবিশেষ। সাত হইতে বার বৎসর বয়সের মধ্যে শিশুর প্রতিদ্বন্দ্বিতার স্পৃহা প্রবল থাকে। এই সময়ে সে কি খেলায়, কি পাঠে তাহার সঙ্গীদের পরাস্ত করিতে চায়। এই প্রবৃত্তি বয়ঃপ্রাপ্ত মানুষের খেলার মধ্যেও অল্পাধিক পরিমাণে থাকে। কিন্তু তাহার সামাজিকতার স্পৃহা ইহাকে কতক পরিমাণে দমন করিয়া রাখে। বয়োবৃদ্ধির সহিত শিশু তাহার ব্যক্তিগত স্বাতন্ত্র্যকে তাহার সামাজিক বৃহত্তর সত্তার অধীন করিয়া রাখিতে শিখে। সে দলের ও শ্রেণীর অপরাপর সঙ্গীদের সহিত সহযোগে খেলা ও কাজ করিয়া আনন্দ পায়। এইরূপে সে তাহার নিজ ব্যক্তিত্বকে দলের ও ক্রমে সমাজের বৃহত্তর সত্তায় ডুবাইয়া দিতে শিখে। বালকদিগের ফুটবল ক্রিকেট ইত্যাদি খেলায় এই সঙ্ঘবোধের উৎকর্ষ সাধিত হয়। শিশুর খেলায় আরও কতকগুলি সহজাত সংস্কারের আভাস পাওয়া যায়---যথা, সংগ্রহ-স্পৃহা (collective instinct), সৃজন-স্পৃহা (creative instinct), নির্ম্মাণ-স্পৃহা (constructive instinct), সৌন্দর্য্যবোধ (aesthetic instinct) ইত্যাদি।

বিদ্যালয়ে সুদক্ষ শিক্ষক শিশুর স্বাভাবিক বৃত্তিগুলিকে খেলার সাহায্যে পরিচালিত করিয়া শিক্ষা দিতে পারেন। খেলার মধ্য দিয়া মানসিক, নৈতিক এবং দৈহিক সর্ব্ববিধ শিক্ষাই দেওয়া যাইতে পারে। শিক্ষক বিদ্যালয়ে অনেক পাঠ্যবিষয়ই খেলার মত করিয়া শিশুর নিকট উপস্থিত করিতে পারেন। পাঠে যদি খেলার ন্যায় আনন্দ ও বৈচিত্র্য দেওয়া যায় তাহা হইলে শিশু ক্লান্ত না হইয়া অধিকক্ষণ উহাতে মনঃসংযোগ করিতে পারে। তাহাতে শিক্ষক শিশুর স্বাভাবিক কৌতূহলকেও অধিকক্ষণ জাগাইয়া রাখিতে পারিবেন। এইরূপে খেলাচ্ছলে অভিনয়, চিত্রাঙ্কণ, মডেল প্রভৃতি হস্তসম্পাদ্য কার্য্যের দ্বারা ইতিহাস ভূগোলাদি পাঠ দেওয়া যায়। নানা প্রকার খেলার সাহায্যে বানান পঠন অঙ্কনাদি শিক্ষা

দিতে পারা যায়। খেলার মধ্য দিয়া বস্তুসাহায্যে শিশুকে গণিতের জ্ঞান দেওয়া যায়। তাহাকে তাহার পুতুলের বস্ত্রাদি সেলাই করিতে দিয়া সেলাই শিক্ষা দেওয়া যায়। শিক্ষক শিশুকে পুতুল খেলার মধ্য দিয়া গৃহ-কর্ম্মের ধারণা দিতে পারেন। শিশুকে তাহার খেলাঘর তৈয়ারী করিতে দিয়া তাহাকে স্বাস্থ্যতত্ত্ব-বিষয়ে জ্ঞান দেওয়া যায়। এইরূপে নানা উপায়ে শিক্ষক শিশুর স্বাভাবিক ক্রীড়া-শীলতাকে বিদ্যালয়ের শিক্ষাকার্য্যে প্রয়োগ করিতে পারেন। পাঠের খেলাগুলি উদ্ভাবন করিবার সময় শিক্ষকের লক্ষ্য রাখা উচিত যেন শিশুদের বয়সানুসারে তাহাদের কল্পনা, স্মৃতি, যুক্তি, বিচার প্রভৃতি বিভিন্ন মানসিক শক্তিগুলির যথেষ্ট পরিচালনা ও প্রয়োগ হয়। শিশুদের মধ্যে একটি স্বাভাবিক ছন্দবোধ আছে। তাহাদের মধ্যে অনুকরণ ও অভিনয়ের যথেষ্ট স্পৃহা দেখা যায়। এই মনোবৃত্তি বা সহজাত সংস্কারগুলিও যাহাতে উপযুক্তরূপে বিকাশপ্রাপ্ত হয় শিক্ষকের তদনুরূপ বিধান করা উচিত। এইরূপে শিশুর স্বাভাবিক মনোবৃত্তিগুলি বাধাপ্রাপ্ত না হইয়া সহজ ভাবে স্ফূর্ত্তি লাভ করিতে পারিবে ও শিক্ষার প্রকৃত উদ্দেশ্য সাধিত হইবে। শিক্ষক যেন খেলাগুলিকে শিশুর পক্ষে অতিশয় সহজ না করিয়া দেন। কোনও বিষয় অতি সহজ হইলে তাহাতে শিশুর আগ্রহ ও আনন্দ স্বতই কমিয়া যায়। কারণ কোন বাধাকে জয় করার যে স্বাভাবিক আনন্দ আছে তাহা আর সে পায় না। কোনও খেলা শিশুর পক্ষে অত্যধিক কঠিন হইলেও সে অকৃতকার্য্য হইয়া শীঘ্রই ক্লান্ত ও বিরক্ত হইয়া পড়ে। শিশুর খেলাগুলি যেন বৈচিত্র্যহীন না হয় সে বিষয়েও শিক্ষকের দৃষ্টি রাখা উচিত। বৈচিত্র্যের অভাবে শিশুর কৌতূহল স্বতঃই নষ্ট হইয়া যায়। সাত হইতে বার বৎসর বয়সের শিশুদের মধ্যে প্রতিদ্বন্দ্বিতার স্পৃহা জাগে। এই সময়ে শিক্ষক খেলার মধ্য দিয়া শিশুর এই সহজ বৃত্তিটিকে যথোপযুক্তভাবে নিয়মিত করিতে পারেন। এই প্রতিদ্বন্দ্বিতার স্পৃহা শিশুকে জ্ঞানার্জ্জনেও যথেষ্ট সহায়তা করে। এই বৃত্তিটিকে সম্পূর্ণ বিনষ্ট করা নীতির দিক দিয়াও সঙ্গত নয়। কখনও কখনও ইহার কুফল দেখিতে পাওয়া গেলেও এই প্রতিদ্বন্দ্বিতার স্পৃহাই শিশুর ভবিষ্যৎ জীবনের প্রায় সমস্ত কর্ম্মের প্রেরণা জোগায়। দশ বৎসর বয়স হইতে শিক্ষক শিশুকে খেলার সাহায্যে সহযোগিতা শিক্ষা দিতে পারেন। খেলার মধ্য দিয়া এই প্রকারে শিশুকে নৈতিক শিক্ষাও দেওয়া যায়। ফুটবল, ক্রিকেট ইত্যাদি নিয়মবদ্ধ খেলায় শিশু কার্য্যতৎপরতা, পরার্থপরতা, একতা, বাধ্যতা, নিয়মনিষ্ঠা, সময় ও কর্ম্মনিষ্ঠা ইত্যাদি সদ্‌গুণ অর্জ্জন করিবার সুযোগ পায়। খেলার মধ্য দিয়া শিশুর দৈহিক শক্তিগুলিও পূর্ণবিকাশ প্রাপ্ত হয়। শিক্ষা শব্দটিকে যদি ব্যাপক অর্থে ব্যবহার করি তাহা হইলে শিশুর দৈহিক শক্তিগুলির উৎকর্ষ সাধনের জন্য খেলার প্রয়োজনীয়তা যে কত অধিক সে-সম্বন্ধে আলোচনাই বাহুল্য মাত্র। শরীরকে বাদ দিয়া যে শিক্ষা তাহা একবারেই অসম্পূর্ণ।

শিলার বলিয়াছেন—A man is fully human when he plays, অর্থাৎ আমরা খেলা করিয়াই পূর্ণমানবত্ব প্রাপ্ত হই। কিন্তু আমাদের জীবনের পরিণতির জন্য খেলার এত প্রয়োজন থাকিলেও আমরা ছেলেখেলা করিয়াই সমস্ত জীবনকে কাটাইয়া দিতে পারি না। আমাদের অনেকেরই জীবনে নিরবচ্ছিন্ন সুখ ও আনন্দ ঘটে না। তাই বিরুদ্ধমতাবলম্বীরা শিশুর জীবন-প্রভাতে এই খেলার আনন্দের মধ্য দিয়া শিক্ষা দিবার বিধানকে সমীচীন মনে করেন না। তাঁহাদের মতে বিদ্যালয়ের কঠোরতার মধ্য দিয়াই শিশুকে জীবন-সংগ্রামের জন্য প্রস্তুত করা দরকার। শিশুর ভবিষ্যৎ জীবনের পথ কুসুমাস্তীর্ণ না হইয়া কণ্টকাকীর্ণ হইবারও সম্ভাবনা আছে। সে যদি খেলাকেই জীবনের চরম লক্ষ্য বলিয়া জানে তবে সে দুঃখ বহনের অনুপযোগী হইয়া যাইতে পারে এবং তাহার জীবনের গাম্ভীর্য্যও নষ্ট হইয়া যাইবার আশঙ্কা আছে। তাই ইহাও বাঞ্ছনীয় যে, শিশু বিদ্যালয়ে অপ্রিয় কার্য্যও করিতে শিখিবে এবং তাহা করিতে সর্ব্বদা প্রস্তুতও থাকিবে। শিক্ষক যখন শিশুকে ক্রীড়াচ্ছলে শিক্ষা দিবেন তখন তিনি যেন তাহাকে বলিয়া না-দেন যে, তিনি খেলার মধ্য দিয়াই তাহাকে শিক্ষা দিতেছেন। তাহা হইলে শিশু জীবনের কঠোরতাকে বরণ করিতে শিখিবে না। শিক্ষক পাঠগুলিকেই এত আনন্দদায়ক করিবেন যে, শিশু স্বতঃই তাহাতে অনুরক্ত হইবে। কাজের মধ্যে শিশু যেন খেলার আনন্দ পায় ইহাই শিক্ষকের লক্ষ্য হওয়া উচিত।

ভক্তের ভগবান

শ্রীআশীষ গুপ্ত

ঘড়ির দিকে চাহিয়া পার্থ চেয়ার ছাড়িয়া উঠিয়া দাঁড়াইল,—আজ দশটার মধ্যে কলেজে গিয়া ল্যাবরেটারীর কাজ আরম্ভ করিবে ভাবিয়াছিল, আর আজই সর্ব্বাপেক্ষা অধিক বিলম্ব হইয়া গেল!

এগারটা বাজিতে মাত্র দশ মিনিট বাকী আছে, অথচ প্রবন্ধটা লিখিতে অত্যন্ত ভাল লাগিতেছে, কিন্তু আর দেরি করা যায় না। খাতার উপর চোখ বুলাইয়া পার্থ গাত্রোত্থান করিল. যাহা লিখিয়াছে তাহাতে সন্তুষ্ট হওয়া চলে, অর্থাৎ নিজের রচনা পাঠ করিয়া নিজেরই তাহার পুলকের সীমা নাই!

বিজ্ঞানে পার্থের আনন্দ, রসায়নে তাহার মস্তিষ্কের মূল্য অধ্যাপকদের মতে লাখ টাকা। গঙ্গার ধারে তাহাদের বাড়ি। শহরের প্রান্তসীমায় বড় রাস্তার গা ঘেঁসিয়া যেখান দিয়া অতি-নিরীহগোছের একটা রেল লাইন চলিয়া গিয়াছে, তাহারই পাশে পার্থদের পৈতৃক বাসভবন। সম্মুখের গঙ্গা বিস্তৃত নদীই বটে, কালীঘাটের কলুষনাশিনী পতিতোদ্ধারিণী পচা ডোবা নহেন। শান্ত শ্রীতে মহিমময়ী, তরঙ্গের হাঙ্গামা অল্প।

গঙ্গার দিকের বারান্দায় বসিয়া নদীর দিকে চাহিলে পৃথিবী ছাড়িয়া যাইতে ইচ্ছা করে না। মনে হয় দিনের পর দিন বাঁচিয়া থাকি,—জীবনবীমার টাকা যে-সকল পরমাত্মীয়দের নামে লিখিয়া দিয়াছি তাহারা প্রতি মুহূর্ত্তে আমার সুস্থ দেহের প্রতি তাকাইয়া সুনিবিড় আনন্দে রুষ্ট হইতে থাকুক।

পার্থ চেয়ার ছাড়িয়া উঠিয়া দাঁড়াইল। স্নান করা, খাওয়া পূর্ব্বেই সমাধা হইয়াছিল,—একখানা রসায়নের বই, খাতা এবং ব্লো-পাইপ হাতে করিয়া বাহির হইয়া গেল।

নিশীথ পার্থের বাল্যবন্ধু—বরাবরই তাহার স্বাধীন ব্যবসার দিকে ঝোঁক। "বাণিজ্যে বসতে লক্ষ্মী" কথাটা দিনের মধ্যে যে সে কতবার কত লোকের সম্মুখে ব্যবহার করে, তাহার সংখ্যা নির্দ্দেশ করা কঠিন। ষ্টেশনারী-বাণিজ্যে যাহাতে লক্ষ্মী বাস করিতে পারেন, কলেজ ছাড়িয়া দিয়া সে এখন সেই চেষ্টায় প্রবৃত্ত হইয়াছে।

বেলা দ্বিপ্রহরকালে নিশীথ তাহার দোকানে বসিয়া এক পয়সার নিব, দু-পয়সার কালির বড়ি বিক্রী করিয়া চঞ্চলা লক্ষ্মীকে তাহার পাচ হাত দীর্ঘ, চার হাত প্রস্থ দোকানখানিতে অচঞ্চলা করিবার চেষ্টা করিতেছে, এমন সময়ে পার্থদের বাড়ির একটি ছেলে আসিয়া সংবাদ দিয়া গেল, পার্থ ট্রেন চাপা পড়িয়া মারা গিয়াছে!—তাহার মৃতদেহ মর্গে লইয়া যাওয়া হইয়াছে, নিশীথ যদি তাহার বন্ধুকে শেষ দেখা দেখিতে চায় তাহা হইলে যেন আর বিলম্ব না করে!

সংবাদ শুনিয়া নিশীথ শুধু বোকার মত ফ্যালফ্যাল করিয়া ছেলেটির মুখের দিকে চাহিয়া থাকে, চেষ্টা করিয়াও গলা দিয়া কোন শব্দ বাহির করিতে পারে না।

নিশীথ যখন মর্গে পৌছিল তাহার পূর্ব্বেই মৃতদেহ যথারীতি পরীক্ষার পর আত্মীয়স্বজনদের হস্তে সমর্পিত হইয়াছে। সে সংবাদ পাইল, পার্থের শব প্রথমে তাহাদের গৃহে লইয়া যাওয়া হইবে। শুনিয়া নিশীথ ছুটিল বন্ধুগৃহে।

পার্থদের বাড়িতে উপস্থিত হইয়া শুনিতে পাইল, বন্ধু না-কি শ্মশানেই গিয়াছে, গৃহে আর ফেরে নাই। পার্থের পড়িবার ঘরে দাঁড়াইয়া চারিদিকে চাহিয়া কত কথাই যে নিশীথের মনে পড়ে! টেবিলের উপরকার বুখারিনের 'হিষ্টোরিক্যাল মেটেরিয়্যালিজম্' বইখানা সবেমাত্র গতকল্য অপরাহ্ণে দুই বন্ধুতে দোকান হইতে কিনিয়া আনিয়াছিল।

পার্থের অঙ্কের খাতার একখানা উন্মুক্ত পৃষ্ঠার প্রতি নির্নিমেষ দৃষ্টিতে নিশীথ চাহিয়া রহিল। সকালে লেখা প্রবন্ধ, এই রচনাটা শেষ করিয়াই পার্থের আর আনন্দের পরিসীমা ছিল না!

দুর্নিবার আগ্রহের সহিত নিশীথ সেই প্রবন্ধ পাঠ করিতে

আরম্ভ করিল। পড়া শেষ করিয়া খাতার ভিতর হইতে সযত্নে পাতাখানা কাটিয়া লইয়া সেখানা বুকপকেটে ভাঁজ করিয়া রাখিতে রাখিতে বাহির হইয়া গেল।

একটা নিষ্ফল আক্রোশ নিষ্ফলতর সুতীব্র বিরক্তি যেন নিমেষের জন্য মনের মধ্যে উদিত হয়। নিশীথ ভাবে, সেও এইবার লিখিতে পারিবে, দিনের পর দিন এই রক্তমাংসের দেহটা লইয়া পৃথিবীতে বাঁচিয়া থাকিব। দুঃখ হয় পার্থের মস্তিষ্ক, পার্থের বিজ্ঞানের সাধনা, পার্থের মুমূর্ষু-পন্থী বলিষ্ঠ মন যদি তাহার থাকিত!

পার্থদের গৃহ হইতে শ্মশান মিনিট দশেকের পথ। ওই পল্লীর মধ্যে গঙ্গাতীরের এই জায়গাটি সর্ব্বাপেক্ষা প্রয়োজনীয় এবং বিখ্যাত স্থান! নিশীথ দ্রুতপদে সেইদিকে অগ্রসর হইল। পথে আরও তিন-চার জন বন্ধুর সহিত সাক্ষাৎ... পাড়ার বহু ছেলেবুড়ো দল বাঁধিয়া পার্থের প্রতি সম্মান প্রদর্শনের উদ্দেশ্যে শ্মশানঘাটের অভিমুখে চলিয়াছে।

প্রমথ কহিল, 'ট্রেনটা তখনও দাঁড়িয়ে, চট ক'রে যে নড়বে এমন ভরসা ছিল না। পার্থের তখন কলেজের বেলা হয়ে গিয়েছে কে আবার অতটা ঘুরতে যায়? আর কোনও কাজ দেরি ক'রে করবার ছেলেও পার্থ নয়। সে ট্রেনের নীচে দিয়েই রাস্তা পার হ'তে গেল, ইঞ্জিনটা এসে লাগল ঠিক এমনি সময়! কেমন ক'রে কি হ'ল কেউ বলতে পারে না। পার্থ বোধ হয় একেবারেই প্রস্তুত ছিল না, বুকের উপর দিয়ে চলে গেল একটা চাকার খানিকটা, সব নয়, এই খানিকটা—"

শ্মশানে পৌঁছিয়া নিশীথরা সংবাদ পাইল পার্থকে সেখানে আনা হয় নাই, মর্গের নিকটবর্ত্তী ঘাটে লইয়া যাওয়া হইয়াছে।

খবরটা দিলেন শ্মশানঘাটের কাঠের ঠিকেদার। ডিনামাইটের মত ফাটিয়া পড়িয়া তিনি নিশীথের মুখের কাছে হাত বাড়াইতেই, তাড়াতাড়ি নাক সরাইয়া লইয়া নিশীথ আত্মরক্ষা এবং নাসিকা রক্ষা করিল।

গোলদার বলিল, "মশাই, আপনি পাথবাবুর বন্ধু, আপনিই বলুন তার এ কি রকম ব্যাভার!— আমার ঝুড়িরডিকশানের লোক তিনি, মরলেনও আমার ঝুড়িরডিক্‌শানে—কিন্তুন্ দাহ হ'তে গেলেন সেই বেপাড়ার ঘাটে!— আর আমি পাথবাবুকে ভদ্দরলোক ব'লে জানতুম! এইটে হ'ল ভদ্দরলোকের কাজ!"

বন্ধুবর্গসহ নিশীথ আহাম্মকের মত চাহিয়া রহিল।—লোকটা পুনরায় কহিল,—"এমন করলে ব্যবসা চলে কখনও! শালা সব-রেজেষ্টার আছে, শাল কাঠের দাম ন-আনার জায়গায় স' ন-আনা কর দিগিনি একবার, আসবে দাঁত ব'ার ক'রে ক্যাপা কুকুরের মত তেড়ে।—গামছাটি, কলসীটি সব একেবারে ফিক্‌স্ রেট। তার ওপর এই মন্দার বাজার, একে খদ্দের-পত্তর নেই আবার জোটে আমার বরাতে আপনাদের মত ভদ্দরলোক! তেরোস্পর্শ আর কি!" বলিতে বলিতে ক্রোধাতিশয্যে তাহার বাকরোধ হইয়া গেল। মুহূর্ত্ত পরে কহিল, "বলব কি মশাই আপনাদের ব্যাভারে—" বলিয়া সে হাত মুঠা করিয়া ক্ষিপ্তভাবে নিশীথের দিকে অগ্রসর হইয়া আসিয়া কহিল, "দুত্তোর তোর ভদ্দরলোকের নিকুচি করেছে—"

নিশীথ পুনরায় তাড়াতাড়ি মুখ সরাইয়া লইয়া নাসিকার মহিমা বজায় রাখিল।

গলার স্বর অপেক্ষাকৃত মোলায়েম করিয়া গোলদার কহিল, 'আপনাদের হ'লে আপনারা বুঝতেন, যে রকম বাজার পড়েছে—"

নিশীথকে একপাশে ডাকিয়া লইয়া গিয়া কণ্ঠস্বর আরও মিহি করিয়া বলিল, "পাথবাবুকে বেশ ঘটা ক'রেই দাহ করা হবে,— ওদের অবস্থা ভাল আর অমন ছেলে বাপ-মার কত আদরের! চন্দনকাঠের দর আমি সুবিধে ক'রে দেব, বিশ্বেস না হয় আপনারা যাচাই ক'রে নেবেন। আপনি তাড়াতাড়ি ক'রে গিয়ে এখানে ওদের ফিরিয়ে নিয়ে আসতে পারেন না? আপনার কথা ওরা শুনবে, কতদিনের বন্ধু!— বলিয়া মৃদু হাসিয়া কহিল, "বলাটা ভাল দেখায় না, কিন্তুন না বললেও নয়, আপনাকেও না-হয় কিছু দেব'খন।"

নিশীথের বেদনার্ত্ত দৃষ্টি অসহ্য ক্রোধে রক্তবর্ণ হইয়া উঠিল। লোকটা কিন্তু নিজের মনেই বলিতে লাগিল, "শ্মশান-কালীর পূজোয় কতকগুনো টাকা খরচ ক'রে ফেললুম অথচ এখন পর্য্যন্ত তার কোনও ফলই দেখতে পাচ্ছিনে,—ব্যবসার বাজার যে মন্দা সে মন্দা! কদ্দিনে যে টাকা উঠবে ভগমান জানেন!"

ঘৃণায় নিশীথের সর্ব্বশরীর কুঞ্চিত হইয়া গেল, বন্ধুবর্গের সহিত স্থানত্যাগ করার উদ্যোগ করিতেই তাহার হাত দুইটা

জড়াইয়া ধরিয়া পরম কাতরতার সহিত গোলদার কহিল, "যা বলন্থ, দেখবেন একবার চেষ্টা করে ?"

তীব্রদৃষ্টিতে নিশীথ লোকটার মুখের দিকে নিমেষমাত্র চাহিয়া দেখিল, তাহার পর কি ভাবিয়া পকেট হইতে একখানা দশ টাকার নোট বাহির করিয়া বাঁ-হাতে সেখানা মাটিতে ছুঁড়িয়া ফেলিয়া দিল, সঙ্গে সঙ্গে ডান হাতে বিরাশী শিক্কা ওজনের এক থাপ্পড় কসাইল লোকটার গালে !

গালে হাত বুলাইতে বুলাইতে গোলদার নোটখানা কুড়াইয়া লইল, রাগ করিল না একটুও, বরং প্রসন্ন হাস্যে কৃতজ্ঞতার ভঙ্গীতে নিশীথের দিকে চাহিয়া বলিল, "আপনারা মহাশয় বেক্তি, আপনাদের দয়াতেই ত বেঁচে আছি--- নইলে য্যাদ্দিনে কোতায় যে যেতুন্ !—"

শ্মশানঘাটের ঠিকেদারের নাম মৃত্যুঞ্জয়।

মৃত্যুঞ্জয়ের "যালানি কাষ্ঠের" গোলাতে সে নিজে ছাড়া আরও দু-জন কর্ম্মচারী থাকে। পালা করিয়া কাঠ ঘি কলসী গামছা পাটকাঠি ইত্যাদি বিক্রয় করাই তাহাদের কাজ।

সেদিন সন্ধ্যাবেলা মৃত্যুঞ্জয় তাড়াতাড়ি করিয়া বাড়ি ফিরিল, দোকানে রহিল বনমালী।

মৃত্যুঞ্জয়ের ছোট ছেলেটার বয়স পাঁচ বৎসর। সে আজ সাত আট দিন যাবৎ গণ্ডা-দেড়েক ফোড়াতে কষ্ট পাইতেছে---- মৃত্যুঞ্জয়ের আর দুশ্চিন্তার অবধি নাই! বহু আয়াসেও ফোড়াগুলা কিছুতেই ফাটে না।

মৃত্যুঞ্জয় চারবার হোমিওপ্যাথিক ডাক্তার ডাকিয়াছে, য়্যালোপ্যাথকে দেখাইয়াছে দুইবার, কবিরাজকে একবার দর্শনী দিয়াছে, কিন্তু স্ফোটকগোষ্ঠি বিন্দুমাত্র বিচলিত হয় নাই।

গোলা হইতে বাহির হইয়া "হোমিওপ্যাথিক ডাক্তারখানা" হইতে মৃত্যুঞ্জয় একখানা 'সরল হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসা" কিনিল, পরে সেখান হইতে প্রস্থান করিয়া এক সুবৃহৎ পুস্তকালয়ে প্রবেশ করিয়া বলিল, "আমায় একখানা য়্যালোপাতি চিকিচ্ছের সোজা বই দিতে পারেন, ইংরিজীতে নয়, বাংলায়,— এই সোজা সোজা কয়েকটা অসুখের নাম থাকে তাহ'লেই হয়, ধরুন যেমন ফোড়া-টোড়া—" বলিয়া সে নির্ব্বোধের ন্যায় খানিকটা হাসিল।

"পারিবারিক চিকিৎসা" এবং একখানা "গাছ-গাছড়ার গুণ" কিনিয়া লইয়া মৃত্যুঞ্জয় সে দোকান হইতে বাহির হইল।

রাত্রি আটটার সময় সে যখন বাড়ি ফিরিল তখন দেখা গেল হাঁটুর উপর কাপড় গুটাইয়া লইয়া সে মালকোঁচা মারিয়াছে---কাপড়টা যেমন অপরিচ্ছন্ন তেমনই তাহার দুর্গন্ধ! গায়ের ছেঁড়া ময়লা জামা ঘামে ভিজিয়া পচা ডোবায় চুবানো কম্বল হইয়া উঠিয়াছে! কাঁধের উপরে এক প্রকাণ্ড গাঁটরি, তিনখানা বই, নানাপ্রকার ফল, কতকগুলা ওষুধ এবং তুলা ইত্যাদিতে সেটা তখন গন্ধমাদনের রূপ ধারণ করিয়াছে !

পা টিপিয়া টিপিয়া অতিশয় সন্তর্পণে মৃত্যুঞ্জয় গৃহপ্রবেশ করিল। বারান্দায় গাঁটরি নামাইয়া রাখিয়া ফিস্‌ফিস্ করিয়া স্ত্রীকে জিজ্ঞাসা করিল, "হাবলা কেমন আছে ?"

"ভালোই—"

বিনোদিনীকে সাবধান করিয়া দিয়া মৃত্যুঞ্জয় কহিল, "আস্তে কথা কও, কতবার তোমাদের বারণ করতে হবে ?" গলা নামাইয়া অত্যন্ত মৃদুস্বরে বলিল, - "ফোড়াগুলো ফেটেছে ?"

"না—"

মৃত্যুঞ্জয় আবার ধমক দিয়া উঠিল, "আস্তে কথা কও না ছাই!—আজকে রাত্তিরে ফাট্‌বে কি ? তোমার কি রকম মনে হচ্ছে ?"

বিনোদিনী উত্তর দিল, "ঠিক বুঝতে পারছিনে।"

একটু চুপ করিয়া থাকিয়া মৃত্যুঞ্জয় পুনরায় জিজ্ঞাসা করিল, "হাব্‌লা আমার জন্যে খুব কেঁদেছিল না ?"

"কই না ত—"

নিমেষে মৃত্যুঞ্জয়ের মুখ গাঢ় বেদনায় কালো হইয়া গেল--- ইতস্ততঃ করিয়া সে কহিল, "মন পোড়ে বইকি,—ছেলেমানুষ তাই চুপ ক'রে থাকে, নইলে দিনরাত মন পোড়ে বই কি!"

একটু থামিয়া বলিল, "হেরিকেনটায় একটু বেশী ক'রে তেল ভরে দিও, বই-টইগুলো রাত্তিরে পড়ে দেখব। ও শালার ডাক্তারদের বিশ্বেস নেই, নিজে হাতেই করব এবার সব।" বলিয়া গায়ের জামা ছাড়িয়া বারান্দার দড়িতে ঝুলাইয়া রাখিল, গামছাটা লইয়া কলতলায় চলিয়া যাইতে যাইতে ফিরিয়া আসিয়া কহিল, "শোন—"

বিনোদিনী রান্নাঘরের দিকে যাইতেছিল, দাঁড়াইয়া পড়িয়া কহিল, "কি ?"

"ফোড়াগুলো আজকে ফাটবে, কি বল ?"

"কালও ত ফাটবে ভেবেছিলুম, পরশুও ত তাই, কিন্তু কই আর তা হ'ল,—আজই যে হবে তার আর ভরসা কি ?"

মৃত্যুঞ্জয় চটিয়া উঠিল, চীৎকার করিয়া কহিল, "একটা ভাল কথাও কি ও পোড়ামুখ দিয়ে বেরোতে নেই।" মুখ ভেঙচাইয়া বলিল, "ভরসা কি !—ভরসা নেই ত আমি বলছি কি ক'রে ?" বলিয়া সে অতিশয় ক্রুদ্ধ হইয়া কলতলায় গিয়া বালতি বালতি জল ঢালিতে লাগিল।

সদর দরজায় কড়া-নাড়ার শব্দ শোনা গেল, বাড়ির ভিতর হইতে ভৃত্য সদানন্দ সাড়া দিল, 'যাই —"

মুহূর্ত্তের মধ্যে ঠিক যে কি ঘটিল বুঝা গেল না। মৃত্যুঞ্জয় একেবারে পাগলের মত ছুটিয়া আসিয়া সদানন্দের দেহে কিল চড় বর্ষণ করিয়া চেঁচাইতে লাগিল, "হারামজাদা, কতবার তোদের বলব, আস্তে আস্তে কথা বল্‌বি ? মেরে ফেলবি ছেলেটাকে সবাই মিলে ? একটুও বাছাকে ঘুমোতে দিবিনে ?" বলিয়া সে একেবারে উন্মাদের ন্যায় কলরব করিতে লাগিল, "তোকে আজ খুন ক'রে ছাড়ব—"

বাড়িসুদ্ধ লোক সেখানে জড়ো হইল, সকলে মিলিয়া মৃত্যুঞ্জয়কে ধরিয়া জোর করিয়া ঘরের মধ্যে লইয়া গেল। কর্ত্তার কবল হইতে পরিত্রাণ লাভ করিয়া সদর দরজা দিয়া জ্যা-মুক্ত তীরের ন্যায় দ্রুতগতিতে সদানন্দ অন্তর্হিত হইল। এই কর্ণবিদারী কোলাহলে জাগিয়া উঠিয়া হাবলা তাহার বহুপূর্ব্ব হইতেই পরিত্রাহি চীৎকার সুরু করিয়াছে।

সকাল বেলা ঘুম হইতে উঠিয়া স্ত্রীকে গম্ভীর মুখে বারান্দায় বসিয়া থাকিতে দেখিয়া মৃত্যুঞ্জয় একটু রসিকতা করিবার চেষ্টা করিয়া কহিল, "পারের ভাবনা ভাব্‌ছ না কি গো ?"

মুখ তুলিয়া বিনোদিনী বলিল, "মাথাটা বড্ড ধরেছে।"

[উত্তর শুনিয়া মৃত্যুঞ্জয় একেবারে এতটুকু হইয়া গেল। ঘাড় নাড়িয়া নাড়িয়া নিজের মনেই বার-বার কহিতে লাগিল, "ও সেরে যাবে, ও কিছু নয়—শ্মশানকালীর পুজো দেব আজকে আবার আমি—দিলেই সব দিক দিয়ে ভাল হবে আমার"—বলিয়া চোখ তুলিয়া বিনোদিনীর দিকে চাহিয়া কহিল, "ও সেরে যাবে, তুমি দেখে নিয়ো—"

দিন-চারেক পরে একদিন সন্ধ্যাবেলা মৃত্যুঞ্জয় শ্মশান হইতে মুখে দুই গাল হাসি লইয়া বাড়ি ফিরিল,—দুঃখ হয়, হাসিবার জন্য বেচারার মাত্র একখানা মুখ ছিল !

তরিতরকারী, মাছ, মাংস এবং ওষুধ ও ফলে বোঝাই দুইটা প্রকাণ্ড থলে বারান্দার উপর ফেলিয়া দিয়া, বিশাল ঘনকৃষ্ণ রোমশ ভুঁড়ি দ্রুতভাবে নাচাইয়া মৃত্যুঞ্জয় হাসিতে লাগিল। তাহার ভুঁড়িনৃত্য নটরাজের জটার বাঁধন-খোলা প্রলয় নাচনকে হার মানায় যেন, এমনি গভীর মৃত্যুঞ্জয়ের উল্লাস !

"আজ মড়া এসেছিল শ্মশানে একুশটা ! শ্মশানকালী কত জাগ্রত ঠাকুর দেখ্‌লে বড় বউ—এই রকমটি আরও কিছুদিন চলে ! বেটি কত খেলাই যে খেল্‌ছে !" বলিয়া সে গভীর শ্রদ্ধাভাবে শ্মশানকালীর উদ্দেশে করজোড়ে প্রণাম করিল।

অকস্মাৎ কি একটা কথা মনে পড়ায় পকেট হইতে একখানা কাগজ বাহির করিয়া কহিল, "সেদিন পাথবাবুর বন্ধু নিশীথের পকেট থেকে কাগজটা পড়ে গিস্‌ল, শ্মশানে,—বনমালী রেখেছিল কুড়িয়ে।" সে বল্‌লে হাতের লেখাটা পাথবাবুর, বনমালী ও-লেখা চেনে, ওদের কেলাবের সেক্রেটারী ছিল কি-না পাথবাবু, তাই !—পড়ে দেখ বড়বউ, ঠাকুর-দেবতা নিয়ে চালাকি নয়, পাথবাবু লিখেছে সে চিরকাল বাঁচবে, আরও সব কত কি লিখেছে ! এয়ার্কী নয় বাবা, হাঁ, হাতে হাতে টিট হয়ে গেলি ত—বলিয়া সে কাগজটা বিনোদিনীর হাতে দিল।

পার্থের খুশীমনে লেখা প্রবন্ধ—জীবনের বন্ধুর পথে আমি মৃত্যুকে জয় করিব। দুই লাইন কাব্য লিখিয়া, থিয়েটারে আড়াই দিন 'য়্যাক্টো' করিয়া, অথবা প্রহসনে সাড়ে তিন দিবস ভাঁড়ামি করিয়া কিংবা পাঁচটা সস্তা বাজে কথা বেঞ্চের 'পরে দাঁড়াইয়া চীৎকার করিয়া বলিয়া আমি মরণ বিজয়ী হইব না !—একদিন মরিয়া ঢোল হইয়া যাইব, আগুনে পুড়িয়া ক্যালশিয়াম ফস্‌ফেট বনিয়া যাইব,—চোখ হইয়া যাইবে স্থির, হাত-পা হইয়া যাইবে হিমশীতল, ইহা জানিয়াও সন্দিগ্ধ খ্যাতির প্রত্যাশায় বলিব না, মৃত্যুর পরে যদি দেড় জন লোক সিকি মিনিট ধরিয়া আমার নামের অক্ষর দুইটা উচ্চারণ করে তাহা হইলেই ত আমি অমর হইলাম !

"আমি যখন এই রক্তমাংসের দেহটা লইয়া দিনের 'পর দিন পৃথিবীর পথে পায়চারি করিয়া বেড়াইব, আমার সম্পত্তির উত্তরাধিকারীরা যখন বছরের পর বছর আমার 'পরে রুষ্ট হইতে রুষ্টতর হইতে থাকিবে, তখনই বুঝিব আমি অমর হইয়াছি। সন্দেহ থাকিবে না যে যমদূতদের প্রকৃতই বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ দেখাইলাম!

"আমার বিজ্ঞান আমাকে সেই অমরতা দান করিবে, আমার সাহায্যে পৃথিবীর ইতিহাস আবার নূতন করিয়া লিখিত হইবে,—ভবিষ্যতের সেই দিবসটি আগতপ্রায় হউক।—

মৃত্যুঞ্জয় কহিল, "দেবতা আছে স্বর্গে, বড়বউ,—ভক্তের জন্যে তারা হাতে হাতে ফল দেখায়, আর পাখর মত লোকেদের দেয় শাস্তি!—ঠাকুর-দেবতাকে গেরাহ্যি না ক'রে কত বড় দেমাকের কথা ওতে লেখা আছে দেখ বড় বউ! এ কি ছেলেখেলা! এ কি চালাকী!—সেইজন্যেই আমি অত পূজো দিই। ওটা বাজে খরচ নয়, ব্যবসার দরকারী মূলধন সুদসুদ্ধ ও টাকা পরে উঠে আসে।—ভক্তের জন্যে ভগমান, ধম্মাত্মাদের জন্যে দেবদেবী আছে বইকি বড় বউ, নিশ্চয় আছে, এ তুমি ঠিক জেনো।" বলিয়া অত্যন্ত ভক্তির সহিত সে বার-বার হাত দুইটা লইয়া কপালে ঠুকিতে আরম্ভ করিল। একটু পরে পকেট হইতে একমুঠা টাকা বাহির করিয়া বিনোদিনীর পানে চাহিয়া গভীর আনন্দে মৃত্যুঞ্জয় ফিক্ ফিক হাসিতে থাকে।

নিশীথে

শ্রীপ্রফুল্ল সরকার

সীমাহীন অশান্ত আকাশ—তারার অস্ফুট রেখা
কাঁপে প্রাণ-স্পন্দনের মত; লুপ্ত মেঘ অন্তরালে
কৃষ্ণপক্ষ শশী, যেন পার্ব্বতীর মুক্ত কেশজালে
লীলা-মত্ত ধূর্জ্জটির সমাচ্ছন্ন শশীকলা-লেখা!

অতরল অন্ধকার—নির্ম্মম নিশ্চল যবনিকা
মৃত্যু-ঘন নিবিড় কালিমা, কোনো দিকে নাহি পার—
অকূল স্তব্ধতা যেন নিস্তরঙ্গ সমুদ্রের মত
ব্যাপিয়াছে দিক্-দিগন্তর, বিশ্ব ম্লান মূর্চ্ছাহত!

বিহঙ্গের পক্ষ-ঘায়ে ক্ষণে ক্ষণে বিচ্ছিন্ন আঁধার—
কোথা কোন্ মণি-হর্ম্ম্যে চমকিয়া ওঠে সাগরিকা!

কা'রা যেন চলিয়াছে রুদ্ধশ্বাসে সম্মুখের পানে,
অশরীরী আত্মার ক্রন্দন পিছে মরিছে গুমরি
তীব্র শব্দ-শলাকায় নিশীথের বক্ষ ভিন্ন করি!
চন্দন-শৈলের পথে কারা ওরা চলে কোন্খানে!
দীর্ঘ ক্ষীণ ছায়া-মূর্ত্তি, সম্মুখের চক্রবাল ঘুরে
বাক্যহীন রহস্য-সঙ্কেত—ওরা চলে দূরে—আরও দূরে!

উত্তর-ইউরোপের সুরলোক

ষ্টক্‌হল্‌ম ও তাহার পার্শ্ববর্ত্তী দ্বীপোদ্যান

শ্রীলক্ষ্মীশ্বর সিংহ

[লেখক পুনর্ব্বার সুইডেন গিয়াছেন]

আমার সুইডেন অবস্থানের অধিকাংশ সময়ই ষ্টক্‌হল্‌মে অতিবাহিত হইয়াছিল। সুইডেনের এই প্রধান নগর ও

ষ্টক্‌হল্‌মে অপেরা মন্দিরে দর্শকদের বসিবার ঘর

ইহার পার্শ্ববর্ত্তী দ্বীপোদ্যান সম্বন্ধে অনেক বড় বড় লেখক ও কবি উচ্ছ্বসিত ভাষায় বর্ণনা লিখিয়া গিয়াছেন। বিদেশী-দের মনের উপর এই শহরটি ও ইহার পার্শ্ববর্ত্তী দ্বীপোদ্যান সমগ্রভাবে আপন বিশিষ্টতার এমন একটা চিত্র আঁকিয়া দেয় যে, উহার সহিত অন্য কোনো স্থানের তুলনা করিতে যাওয়া বিড়ম্বনা বলিয়া মনে হয়। প্রকৃতির কৃপায় স্থানটি যে রূপ পাইয়াছে, তাহার উপর মানুষের সুনিপুণ হস্তের তৈরি এই শহরটি প্রকৃতিকে এমন মনোরম করিয়া তুলিয়াছে যে, আজ যখন নিজের অবস্থান ও ভ্রমণের কথা ভাবি তখন ষ্টকহল্‌ম ও ইহার পার্শ্ববর্ত্তী দ্বীপোদ্যানকে যেন কল্পনালোকের বাস্তব সুরলোক বলিয়া মনে হয়।

সুইডিসরা তাহাদের এই প্রধান শহরকে মেলারেনের রাণী বলিয়া থাকে। যেখানে মেলারেন হ্রদ দ্বীপোদ্যান বক্ষে করিয়া বাল্টিক সাগরে পড়িয়াছে, শহরটি তাহার তীরে অবস্থিত। এই মেলারেনের জলধারা যেখানে বাল্টিক সাগরের জলের সহিত মিশিয়াছে ঠিক তাহারই পাশে রাজপ্রাসাদটি অবস্থিত। আবার অন্যদিকে একধারে ইউরোপের সুবিখ্যাত ষ্টক্‌হল্‌মের অধুনানির্ম্মিত টাউন হলটি। শুধু এই হলের স্থাপত্য দেখিবার জন্য দেশ-বিদেশ হইতে অনেক লোক সেখানে
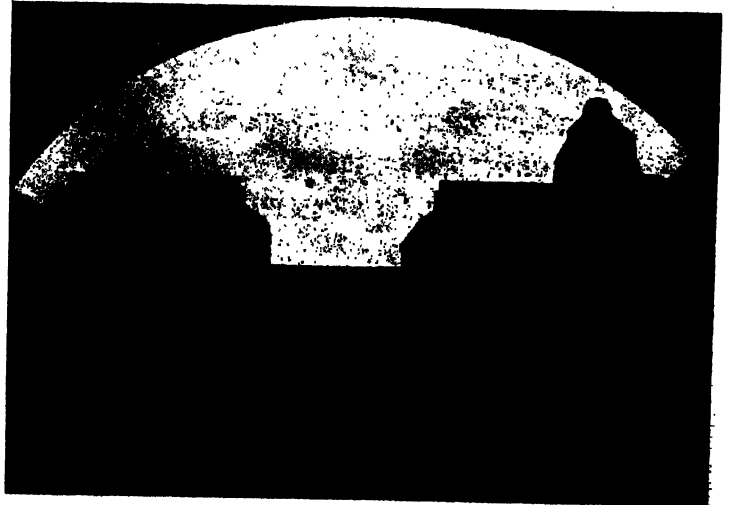
টেকনিকেল কলেজের প্রধান গৃহ

আগমন করে। শহরটি পাথুরে ও বিচ্ছিন্ন পাহাড়খণ্ডের উপর অবস্থিত। এখানে-সেখানে চারিদিকেই জলাশয়। এই বৃহৎ জলাশয়ের মধ্যে পাথুরে ভূমিখণ্ডগুলি যেন মাথা তুলিয়া উঁকি দিয়া আছে। ইহাদেরই উপর আবার ঘরবাড়িগুলি। বিদেশীদের চোখে যাহা বিশেষ করিয়া পড়ে তাহা সেখানকার রাস্তা-ঘাট ঘরবাড়ির অসাধারণ পরিচ্ছন্নতা—সমস্তই যেন চিরনূতন। বলিয়া রাখা ভাল, এই পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা সুইডিসদের মজ্জাগত গুণ। ষ্টকহল্‌মের অধিবাসীরা আপন শহরটিকে প্রাণ দিয়া ভালবাসে। এই জাতি যে সুখী এবং সেই দেশের ধন-সম্পদ কম-বেশী সকলেই যে সমানভাবে ভোগ করিয়া আসিতেছে, তাহা গরিব ও ধনী লোকদের আবাসস্থল, পোষাক-পরিচ্ছদ ও ঘর বাড়ির প্রভেদের অভাবই স্পষ্টভাবে বুঝাইয়া দেয়। প্রতি পরিবারে—প্রতি তিন জন পিছু একটি করিয়া টেলিফোন আছে। শৌখীন ও দামী মোটরকারের বাহুল্য এবং অধিকাংশ অধিবাসীদের একটি করিয়া মোটর ডিঙ্গি—এ সমস্তই কর্মনিষ্ঠ অধিবাসীদের আরামপ্রিয়তার পরিচয় দেয়। প্রয়োজনমত ঘরে বসিয়া টেলিফোন করিলে কয়েক মিনিট পরেই মোটর আসিয়া দরজায় হাজির হয়। টেলিফোন করিয়া প্রয়োজনীয় যে-কোন জিনিষ দোকানে চাহিলে দোকানের লোক মোটরে করিয়া ঘরে আনিয়া দিয়া যায়। ষ্টকহল্‌মের ঘরে বসিয়া অতি অল্প খরচে টেলিফোন হাতে লইয়া যখন খুশী সুইডেনের যে-কোনো জায়গার বন্ধুবান্ধব বা আত্মীয়স্বজনের সঙ্গে কথা বল চলে। রান্নাঘর বা কোটরটি স্থানে স্থানে ছোট হইলেও আধুনিক সাজ-সরঞ্জামে উনুন, বাসন ধোয়া ও রাখার স্থান এমন ভাবে সাজানো যে, অতি অল্পায়াসে এবং অল্প সময়ের ভিতর সুচারুরূপে রান্নাবাড়া ও খাওয়া-দাওয়ার কার্য্য সম্পন্ন করা যায়। হয়ত বা প্রয়োজনের চাপেই গৃহস্থালীর এই সমস্ত ব্যবস্থার এত উন্নতি হইয়াছে। কারণ, ষ্টকহল্‌মের মত শহরে অধিকাংশ স্থলেই সাধারণ বা মধ্যবিত্ত অবস্থার লোকের পক্ষে ঘরে নিজের জন্য আলাদা চাকর রাখা সম্ভব

সুইডেনের জীবন্ত প্রতিচ্ছবি 'স্কানশেনে' :—সেখানকার মুক্তপ্রকৃতির নাট্যমঞ্চে অভিনয়

ইতিহাস সম্বন্ধীয় প্রাকৃতিক বস্তুর যাদুঘর

নহে। অন্যদিকে স্ত্রী-পুরুষ উভয়েই অনেক ক্ষেত্রে ঘরের বাহিরে কাজ লইয়া জীবিকার্জ্জন করিয়া থাকে। শুনিয়াছি, ষ্টকহল্‌মের এই সাম্যের ব্যবস্থা যাহা সর্ব্বসাধারণ কম-বেশী সকলেই ভোগ করিতে পারে, ইউরোপ আমেরিকার বড় বড় আন্দোলনের প্রধান কেন্দ্র। সেইজন্য শহরটি প্রাচীন অট্টালিকা, ঐতিহাসিক মনুমেণ্ট, মিউজিয়ম প্রভৃতিতে পরিপূর্ণ।

শহরের ঠিক মাঝখানে রাজপ্রাসাদটি; সর্ব্বসাধারণের জন্য সকল সময়েই খোলা। ১৭০০ শতাব্দীর শেষ ভাগে ইহা নির্ম্মিত হয়। ভিতরের কারুকার্য্যমণ্ডিত প্রকোষ্ঠ-গুলির আসবাবপত্র, বিশেষ করিয়া নানা-প্রকারের গালিচা, এ সমস্ত মিলিয়া প্রাসাদটিকে যেন মিউজিয়মের আকার দান করিয়াছে। পূর্ব্বে প্রাসাদটি একটি দ্বীপখণ্ডের উপর অবস্থিত ছিল। উত্তর ভাগে পুরাতন ষ্টকহল্‌ম্ এবং দক্ষিণ দিকে মাত্র কয়েকখানা ঘরবাড়ি ছিল; কিন্তু এখন তাহার অনেক পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে। পুরাতন শহর ও রাজপ্রাসাদের মধ্যস্থানে পার্লেমেণ্ট গৃহটি তৈরি হইয়াছে। দুই দিকেই জলপথ খোলা এবং খোলা জল-পথের উপর সেতু। পার্লেমেণ্ট গৃহের সম্মুখস্থ প্রাঙ্গনের পূর্ব্বমুখে ঠিক তীরভাগের উপর বিখ্যাত শিল্পীর ভাস্কর মূর্ত্তি বাহু উত্তোলন করিয়া সাগ্রহে সূর্য্যাভিনন্দন করিতেছে।
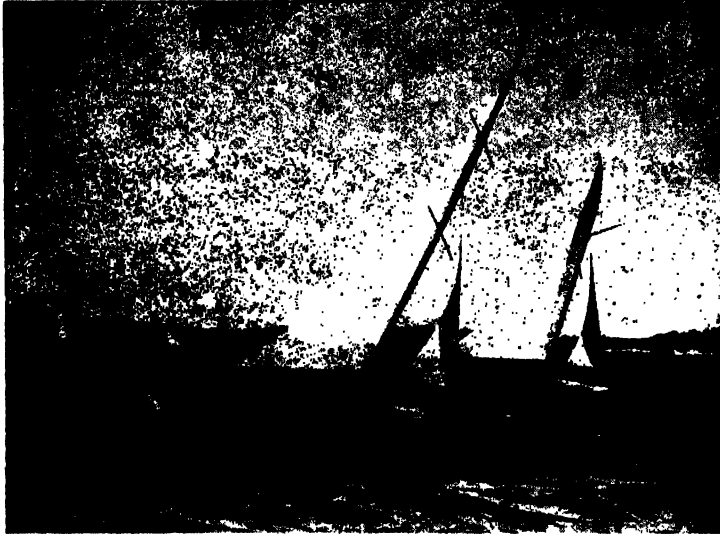
বায়ুর গতিতে নৌকাদৌড় প্রতিযোগিতা

শহরের বাসিন্দাদিগকেও তাক লাগাইয়া দেয়। ষ্টকহল্‌মে কোনো দিন কোনো ভিখারী দেখা যায় না; অবশ্য এই কথা সাধারণভাবে সমস্ত সুইডেন সম্বন্ধেই প্রযোজ্য। মোটের উপর এই বলা চলে, যে, সুইডিস্ গবর্ণমেণ্ট প্রতি ব্যক্তির সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য ও শিক্ষাদীক্ষার সম্বন্ধে বিধিমত যত্ন করিয়া থাকেন। এই প্রসঙ্গে একটি ব্যাপার বিশেষ উল্লেখ্য। যে-সকল শিশুসন্তানের পিতামাতা তাহাদের পড়াশুনার খরচ জোগাইতে অসমর্থ, সেই সকল বালক-বালিকার জন্য গবর্ণমেণ্ট নিজে যে তত্ত্বাবধান করেন তাহা খুব আশ্চর্য্যজনক। বলা হয়ত বা বাহুল্য যে, গবর্ণমেণ্ট দেশের অধিবাসীদের নিকট হইতে সেজন্য যথেষ্ট স্বেচ্ছাকৃত দান পাইয়া থাকেন। ষ্টকহল্‌মের পার্শ্ববর্ত্তী দ্বীপের উপর দুর্ব্বল শিশুদের স্বতন্ত্র স্বাস্থ্যভবন আছে।

পঞ্চাশ মিটারের উপর হইতে শি লম্ফ

ষ্টকহল্‌ম্ শহরটি গত সাত শত বৎসর ধরিয়া সুইডেনের প্রধান নগর এবং সেই দেশেরও সামাজিক ও রাজনৈতিক

শহরটির উপর ছোট-বড় অনেক গির্জ্জা। অবশ্য

ইউরোপের বড় বড় প্রায় সকল শহরেই গির্জ্জার সংখ্যা বেশী। ষ্টক্‌হল্‌মের এই গির্জ্জাগুলি কিন্তু বিশেষ করিয়া আপন দেশের ভাস্কর্য্যশিল্পের বৈশিষ্ট্যের চিহ্নকে বহন করিয়া রহিয়াছে। শহরটিতে আধুনিক ও প্রাচীন ঐতিহাসিক অট্টালিকা ও প্রাসাদ কয়েকটিই রহিয়াছে। কিন্তু ইহাদের মধ্যে টাউন-হলটি অদ্বিতীয়। ১৯২৩ খৃষ্টাব্দে ইহার নির্ম্মাণকার্য্য শেষ হয়। ইহা প্রস্তুত করিতে প্রায় দেড় কোটী রৌপ্য মুদ্রা খরচ হইয়াছিল। শহরটির উপর কয়েকটি মিউজিয়ম আছে। তাহাদের মধ্যে 'নরডিস্কা' মিউজিয়মে প্রাগৈতিহাসিক যুগের ও উত্তর দেশীয় ভূতত্ত্ব সম্বন্ধীয় জিনিষের নানা সংগ্রহ আছে। যাদুঘর সকলের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ও পৃথিবীতে বিখ্যাত 'মিউজিয়ম্ স্কানসেন' (Skansen) মুক্ত আকাশের তলে দ্বীপাকারে পাহাড়ে ভূমির উপর অবস্থিত। এইস্থান উত্তর-দেশীয় সকল প্রকার জীবন-যাপন-প্রণালীর জীবন্ত প্রদর্শনী। এখানে উত্তর-দেশীয় সকল প্রদেশের বেশভূষা-পরিহিত লোকজন রাখা হইয়াছে—যাহারা চিরাচরিতভাবে জীবন নির্ব্বাহ করে। তাহা ছাড়া তাহাদের বাসের জন্য ঘরবাড়িগুলিও ঠিক প্রাচীন পদ্ধতিতে তৈরি। কয়েকটি ল্যাপ-পরিবারও এই মিউজিয়মের এক অংশে পাহাড়ের উপর 'কোট্টা' (ল্যাপ-কুটির) তৈরি করিয়া ঠিক ল্যাপল্যাণ্ডের মতই বসবাস করে। এক কথায় বলিতে গেলে এই মিউজিয়মটি সমস্ত সুইডেনের ছোট একটি জীবন্ত প্রতিকৃতি। এই মিউজিয়মে অভিনয় গান ও অন্যান্য উৎসবাদি সম্পন্ন হইয়া থাকে। বাৎসরিক উৎসবাদি উপলক্ষ্যে 'স্কান্‌সেনে' খুব ভিড় হয়, বিশেষ করিয়া যখন বসন্ত উৎসবের দিন আসে। সুদীর্ঘ শীতকালের পর যখন নব বসন্ত সূর্য্যালোক ও পত্রবিহীন গাছপালায় সতেজ সবুজ ও রঙীন পত্রপুষ্প লইয়া হাজির হয় তখন সুইডেনবাসীরা মাঙ্গলিক উৎসব দ্বারা ইহাকে অভিনন্দিত করে এবং ইহার আগমনকে ঘোষণা করে।

গ্রীষ্মকালে স্নান উপলক্ষে সমুদ্রতীরে জনতার একটি দৃশ্য

শূন্যপথ হইতে তোলা ষ্টক্‌হলমের ষ্টেডিয়মের একটি দৃশ্য

এই স্কানসেনের পাশেই এক বৃহৎ পার্কের মধ্যে

চিড়িয়াখানা। এই চিড়িয়াখানায় দেখিবার মত জীব-জন্তুদের মধ্যে উত্তর-দেশীয় মেরুপ্রদেশস্থিত ভালুক, পাখী, সিন্ধুঘোটক ইত্যাদি বিশেষ উল্লেখযোগ্য। গ্রীষ্মপ্রধান দেশীয় জীবজন্তুদের মধ্যে সাপ ও নানা প্রকার বানর ছাড়া ব্যাঘ্র সিংহ প্রভৃতি

সুইডেনের প্রসিদ্ধ স্কেটিং খেলোয়াড় শ্রীমতী ভিভিআন্ হুলটেন্

হিংস্র জন্তু একেবারেই নাই। এর কারণ, সেইখানকার আবহাওয়ায় ঐ সকল জন্তু বেশী দিন বাঁচিতে পারে না।

অন্য সকল দ্রষ্টব্য বস্তুর মধ্যে ষ্টকহলমের জনসাধারণের পুস্তকাগার ও পাঠাগারটি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এই পাঠাগারের একটি অংশ ছোট শিশুদের জন্য; ইহাতে নানা প্রকারের বই শিশুদের খেলার উপযোগী নানা যন্ত্রপাতি রহিয়াছে। দুই শত বা ততোধিক শিশুকে একসঙ্গে এই লাইব্রেরী বই ধার দেওয়া, বসিয়া পড়িবার বই বা খেলার সাজ-সরঞ্জাম যোগাইতে পারে। সাধারণতঃ শিশুদের সঙ্গে তাহাদের মায়েরাও সেখানে গিয়া এদের সঙ্গে থাকেন। এই সব ব্যবস্থা একেবারে আধুনিক। একটা জাতির সমস্ত দিক গড়িয়া তুলিতে শিশুদের জাতীয়ভাবে সর্ব্বাঙ্গীন যত্ন করা যে কত প্রয়োজন, তাহা এই-সব ব্যবস্থা দেখিলে অনায়াসেই হৃদয়ঙ্গম করা যায়।
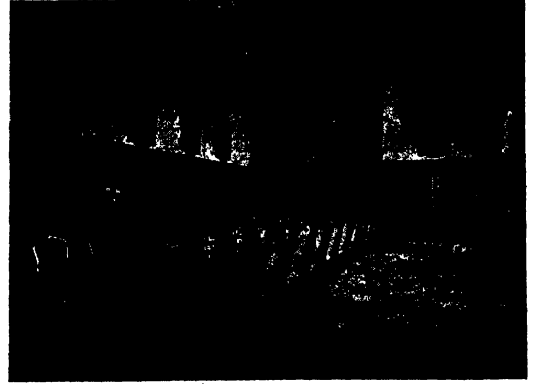
ষ্টকহলমের নোবেল প্রাসাদ ও কন্‌সার্ট হলটিও উল্লেখ-

ষ্টকহল্‌মে বিজ্ঞান-মন্দিরে বৈজ্ঞানিকদের মন্ত্রণাকক্ষ (একাডেমি অফ সায়েন্স)

যোগ্য। নোবেল প্রাসাদটি উক্ত একাডেমীর জন্য তৈরি হইয়াছে। কনসার্ট হলটি খুব আধুনিক ও বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে এমনভাবে তৈরি যে, পাঁচ-ছয় হাজার লোক অনায়াসে তাহাতে বসিতে পারে, এবং বক্তার বক্তব্য সকলেই স্পষ্ট

ষ্টকহল্‌মের প্রসিদ্ধ কনসার্ট হল, এখানে প্রতিবৎসর নোবেল প্রাইজ বিতরণী সভা হয়

শুনিতে পারে। এই কন্‌সার্ট হলেই প্রতি বৎসর নোবেল প্রাইজ বিতরণ-সভা বসে। ১৯২৯ সনে যখন নরওইজেন্ লেখিকা শ্রীযুক্তা সিগ্রিড উন্‌সেট নোবেল প্রাইজ পান, সেই বৎসরে আমিও ঘটনাক্রমে সেখানে উপস্থিত ছিলাম। সেই সময় প্রথম কার্ল ফেল্‌ৎহু মহাশয়ের সঙ্গে পরিচয় ঘটে। পর বৎসর শ্রীযুক্ত রমন্ যখন নোবেল প্রাইজ গ্রহণ

মেলারেণ হ্রদে পালের নৌকাদৌড়ের প্রতিযোগিতা। একপাশে বিখ্যাত টাউন-হল

করিবার জন্য ষ্টকহল্‌মে যান, তখন ষ্টকহলমে ছিলাম না বটে, কিন্তু সেখানকার দৈনিক কাগজগুলিতে কলিকাতা ইউনি-ভার্সিটির প্রফেসার ও ভারতীয় বৈজ্ঞানিকের নোবেল প্রাইজ পাওয়া সম্বন্ধে অনেক কিছু পড়িয়াছি। সুইডিস সকল

ষ্টক্‌হল্‌মে মিউনিসিপ্যালিটি গৃহে বিবাহ রেজিষ্ট্রী করিবার সুরম্য কক্ষ

কাগজই এই সম্বন্ধে বিশেষ করিয়া মন্তব্য লিখিয়াছিল। তাহাদের বিশেষ বক্তব্য এই ছিল যে, আধ্যাত্মিক ও সাহিত্য জগতে ভারত প্রাচীনকাল হইতেই সভ্য জগতে আপনার প্রাধান্য স্থাপন করিয়াছে। কিন্তু এইবার ভারতীয় বৈজ্ঞানিকের নোবেল প্রাইজ প্রাপ্তির ও বিশ্ব-প্রতিষ্ঠা দ্বারা কোন্ দিকে তরুণ ভারতের আবহাওয়া আজকাল বহিতে আরম্ভ করিয়াছে এবং তাহা যে সমগ্রভাবে মানব সভ্যতায় এক বিশিষ্ট পরিবর্ত্তন আনিতে পারে তাহারই পূর্ব্বাভাস দিতেছে।

নোবেলের জন্মগৃহ

ষ্টকহল্‌মে লোকসংখ্যার তুলনায় নাট্যশালার আধিক্য খুব বেশী। বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য রাজকীয় অপেরা মন্দির ও নাট্যশালা—এই দুইটাই সুইডেনের বিখ্যাত নাট্যকার ও গায়কগণ দ্বারা পরিচালিত।

সুইডেনের জীবন্ত প্রতিচ্ছবি 'স্কানশেনে' মুক্তপ্রকৃতির নাট্যমঞ্চে অভিনয়

বিদেশীদের পক্ষে কিন্তু দেখিবার মত জিনিষ সে দেশের খেলাধূলা—বিশেষ করিয়া সেই খেলা, যেগুলি শীতকালে হইয়া থাকে। ষ্টকহলম্ খেলাধূলার বড় কেন্দ্র। সেখানকার বিখ্যাত ষ্ট্যাডিয়ামে প্রতি বৎসরই সুইডিস্ ড্রিল ও খেলাধূলার বিশেষ প্রদর্শন ও প্রতিযোগিতা হয়। ষ্টকহলমে দ্বীপোদ্যানের চারিদিকে জলাশয়ের উপর নৌকাদৌড় ও পালের নৌকা-খেলা হইয়া থাকে। এই বিষয়ে সকলেরই খুব উৎসাহ এবং সুইডিস্‌রা এই বিষয়ে এত দক্ষ যে, আন্তর্জ্জাতিক ঐ জাতীয় খেলায় প্রায় প্রতি বৎসরেই প্রথম স্থান অধিকার করিয়া থাকে। বলা বাহুল্য, শীতকালের খেলাধূলা প্রাচীনকাল হইতে চলিয়া আসিতেছে। ইহাদের মধ্যে 'শি' দৌড় এবং 'শি' লম্ফ বিশেষ উল্লেখযোগ্য। 'শি' ইহাদের জাতীয় খেলা। ষ্টকহলমের পাশেই এই খেলার প্রদর্শনী হয়, তখন শি-তে কৃতী খেলোওয়াড়গণের খেলা দেখানো হয়। শির সাহায্যে কৃতী খেলোয়াড় ১০০-১৪০ ফুট পাহাড়ের উপর হইতে লম্ফ দিয়া পড়িতে পারে। ঘোড়ার সাহায্যেও স্কি খেলা হইয়া থাকে। অন্য দেখিবার মত খেলা স্কেটিং। বুট জুতার তলায় লোহার 'রড' থাকে। সেই জুতা পায়ে দিয়া শীতে জমাট জলাশয়ের উপর এই খেলা হয়। এই খেলা নানা প্রকারের এবং বড় কৌশলপূর্ণ। যাহারা ওস্তাদ তাহারা শুধু এক পায়ের সাহায্যে বিভিন্ন প্রকারের আঁকা-বাঁকা সুন্দর ডিজাইন্ কাটিয়া বরফের উপর নাচিতে পারে। আবার অনেক সময় পা'ল পিঠের উপর রাখিয়া বায়ুর গতিতে বরফের উপর স্কেট করা হয়।

সুইডিস্‌রা সাধারণতঃ বড় খেলাধূলাপ্রিয়। সুইডিস্ জিম্‌ন্যাসটিক পৃথিবীর সর্ব্বত্রই সুবিদিত। জাতীয় ভাবে এই জিম্‌ন্যাসটিক ও খেলাধূলা সেখানকার শিক্ষার এক বড় অঙ্গ। এই কার্য্যে সর্ব্বসাধারণকে উৎসাহিত করিবার

জন্য বড় সমিতি রহিয়াছে। ইহাদের মধ্যে একটির নাম সেণ্ট্রাল এসোসিয়েশন ফর দি প্রমোশন অব য়্যাথ্লেটিক্স— ১৮৯৭ খৃষ্টাব্দে প্রথম প্রতিষ্ঠিত হয়; দ্বিতীয়টি ন্যাশন্যাল য়্যাসোসিয়েশন অব্ সুইডিস্ জিম্ন্যাষ্টিক এবং য়্যাথলেটিক ক্লাব:

বালটিক্ সাগর ও মেলারেণ হ্রদের সঙ্গমস্থানে ষ্টকহল্মের রাজপ্রাসাদ

১৯০৩ খৃষ্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত। ইহার সভ্যসংখ্যা আজ দেড় লক্ষ। ষ্টক্হলমেই ইহাদের প্রধান কেন্দ্র। সাধারণতঃ ষ্টক্হলম্ ষ্ট্যাডিয়ামটিতেই এই সকল খেলাধূলার বাৎসরিক প্রদর্শনী হইয়া থাকে। ফুটবল টেনিস্ প্রভৃতি খেলার বিস্তারও খুব বেশী; কিন্তু সেদেশে ক্রিকেট খেলা নাই বলিলেও চলে।

পুস্তকাগারে শিশুবিভাগের একটি কোঠা, এখানে ছোট শিশুরা গল্প শুনিতে আসে

খেলাধূলার বাহিরে বৎসরে কয়েকটি বড় উৎসব ঘটিয়া থাকে। এই উৎসবগুলির মধ্যে তিনটি খুব জাঁকজমকের সহিত সম্পাদিত হয়। ৬ই জুন সুইডেনের জাতীয় দিবস। ২৩শে জুন তারিখে 'মধ্যরাত্রির সূর্য্যাভিনন্দন' উৎসব। তখন গ্রামে গ্রামে পাড়ায় পাড়ায় ফুলে-ফলে সুসজ্জিত 'মে-পোল' তৈরি করা হয় এবং আপনপর-নির্ব্বিশেষে স্ত্রীপুরুষ সকলেই স্থানীয় রঙীন জাতীয় পোষাকে সজ্জিত হইয়া সাময়িক নৃত্য খেলা খেলিয়া থাকে। এই উৎসবটি দেখিবার মত জিনিষ। ২৬শে জুলাই তারিখে সুইডেনের জাতীয় রাজকবি ও সঙ্গীতজ্ঞ স্বর্গগত বেলমানকে মাঙ্গলিক
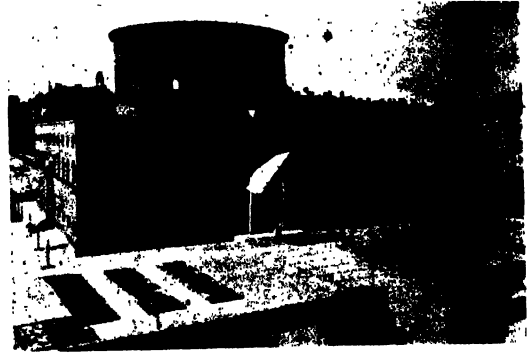
জনসাধারণের আধুনিক পুস্তক ও পাঠাগার

উৎসব দ্বারা সম্মানিত করা হয়। বেলমানের গান সর্ব্বত্রই হইয়া থাকে এবং ছোটবড় সকলেই আজও যেন এই বেলমান্কে অন্তর দিয়া চিনে— তাই তিনি মরিয়াও অমর।

এই ষ্টক্হলম্ শহরটি আমদানি ব্যবসার সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ

সাহিত্যামোদী ও ছাত্রদের চির-প্রিয় ভেনারবের্গের প্রতিমূর্ত্তি

কেন্দ্র। রপ্তানী ব্যবসার দিক দিয়া কিন্তু দ্বিতীয় শহর গথেন্বার্গ একই স্থান অধিকার করিয়াছে। ডেন্মার্ক, সুইডেন প্রভৃতি দেশ সমবায় (co-opreative) আন্দোলন ও

ইহার প্রসারের দ্বারা জনসাধারণের অর্থনৈতিক জীবনে যে কত বড় সুবিধা আনয়ন করিয়াছে তাহা ঐ বিষয়ে যাঁহাদের অভিজ্ঞতা আছে বা এই সম্বন্ধে যাঁহারা খোঁজ রাখেন তাঁহারা নিশ্চয়ই জানেন বা শুনিয়া থাকিবেন। ষ্টক্‌হলমে সুইডেনের সকল রকম কো-অপারেটিভের কেন্দ্রগুলি স্থাপিত; সুতরাং এ-সম্বন্ধে সামান্য কিছু বলা হয়ত বাহুল্য হইবে না। এই সমবায় কো-অপারেটিভ আন্দোলন সমিতির সভ্যদিগকে নানা সুযোগ-সুবিধা দিয়া থাকে। সাধারণতঃ শ্রমিক শ্রেণীর লোকেরাই এই সকল সমবায় সমিতির সভ্যসংখ্যা বেশী বলিয়া সেই অনুপাতে পরিচালক-সমিতির সভ্যদের মধ্য একই শ্রেণীর লোক বেশী। এক সময় এই প্রচেষ্টা কতকটা জনসাধারণকে সাহায্য করিবার জন্য সামাজিক বা অর্থনৈতিক জীবনে পদস্থ ব্যক্তিদের দ্বারা চালিত হইত। কিন্তু আজ তাহা নিশ্চিত ও জাতীয় ব্যবসা হইয়া দাঁড়াইয়াছে এবং সকল শ্রেণীর লোকেই কম-বেশী সভ্যতালিকায় আপনাদিগকে ভুক্ত করিয়াছে। ষ্টকহল্‌মে বড় বড় আদর্শ কো-অপারেটিভ দোকান, রেস্তরাঁ এবং তাহা ছাড়া কৃষিজাত দ্রব্যের ও কো-অপারেটিভ ইউনিয়ন মিলের কারখানা রহিয়াছে। আজকাল গৃহনির্ম্মাণ সমিতি প্রচেষ্টা এবং বিদ্যুৎ সরবরাহ সমিতিও সেখানে সমবায় আদর্শে গড়িয়া উঠিয়াছে। সমবায় সমিতির গৃহনির্ম্মাণ-কার্য্যের প্রধান উদ্দেশ্য অল্প খরচে অল্প স্থানে সকল রকম সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের ব্যবস্থা রাখিয়া জনসাধারণকে সাহায্য করা।

ষ্টক্‌হলম ও ইহার পার্শ্ববর্ত্তী দ্বীপোদ্যান গত সাত শত বৎসর ধরিয়া তুলনাবিহীন প্রকৃতির অতুল সৌন্দর্য্যের মধ্যে উত্তর-দেশীয় সভ্যতার কেন্দ্র হইয়া সুনিপুণ হস্তের স্পর্শে এমনভাবে গড়িয়া উঠিয়াছে যে, ইহার সঙ্গে অন্য কোনো স্থানের বা দেশের তুলনা হয় না। আর এই স্থানের বাসিন্দা!—জাতিদেশনির্ব্বিশেষে পরদেশীয়দের প্রতি ইহাদের আদর-যত্ন, আন্তরিক আতিথেয়তা, চরিত্রের গভীরতা—মনে হয় যেন তাহারা মর্ত্ত্যভূমিতে কোনো সুরলোকের অধিবাসী।

বাসন্তীপঞ্চমী

শ্রীনির্ম্মলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

সঙ্কোচ-মন্থর নবফাল্গুনের বায়
প্রথম প্রেমের মৃদু গুঞ্জরের মত
সঞ্চরি ফিরিছে ধীরে আজি অবিরত;
জানে না কেমনে মুক্তি দিবে আপনায়।
কবোষ্ণ নিঃশ্বাস তার ছুঁয়ে ছুঁয়ে যায়
শিহরণ তুলি, কিশলয় ভারনত
দূর বনবীথি দেহে; বাণী তার যত
মরে দহি কিংশুকের কুসুমশিখায়।

দীর্ঘনিদ্রা অবসানে ধরণীর বুকে
নয়ন মাজিয়া জাগে নিখিলশোভিকা;
স্ফুটন-উন্মুখ ফুলকলিকার মুখে
তারি অনুরাগরক্ত চুম্বনের লিখা।
কুসুমকাননপথে আনমনে ভ্রমি
উতলা হয়েছে আজি বাসন্তীপঞ্চমী।

সন্ধি

শ্রীযতীন্দ্রমোহন সিংহ

প্রথম খণ্ড

কিশোরের কথা

১

আমরা পাঁচটি ছেলে কৃষ্ণনগরের এক হাই স্কুলের দ্বিতীয় শ্রেণীতে পড়িতাম—শঙ্কর, বিনয়, বিভূতি, কান্তি ও আমি। আমাদের এই কয় জনের মধ্যে খুব মেলামেশা চলিত। শঙ্কর বয়সে সকলের বড় ছিল। সে দেখিতে সুপুরুষ, লেখাপড়ায় ক্লাসে সর্ব্বপ্রথম এবং ব্যবহারে খুব তেজস্বী ছিল। ক্লাসের অনেক ছেলে সহজেই তাহার প্রতি আকৃষ্ট হইত, এবং তাহার সঙ্গে বন্ধুত্ব করিবার জন্য লালায়িত হইত। বিভূতি ও কান্তি প্রায়ই তাহার সঙ্গে সঙ্গে থাকিত—তাহারা ক্লাসে এক জায়গায় বসিত, ছুটির পর একসঙ্গে বেড়াইত, অন্য সময়েও পরস্পর মিলিত হইত। আমি বয়সে তাহাদের সকলের ছোট ছিলাম। আমিও তাহাদের সঙ্গে মিশিতে চেষ্টা করিতাম, কিন্তু তাহারা আমাকে কাছে ঘেঁসিতে দিত না। আমি দূর হইতে শঙ্করের একজন নীরব উপাসক ছিলাম। ভাল ছেলে বলিয়া শঙ্করের বিলক্ষণ গর্ব্ব ছিল। সে সময়-সময় ঔদ্ধত্য প্রকাশ করিত, কিন্তু তাহার দলের ছেলেরা তাহা সাদরে সহ্য করিত।

তাহাদের "অপোজিশন বেঞ্চের' (বিরুদ্ধ দলের) নেতা ছিল বিনয়। সে পড়াশুনায় তত দূর মনোযোগী ছিল না। কিন্তু ক্রিকেট, ফুটবল প্রভৃতি খেলাধূলায় সে খুব পটু ছিল। বিনয় শঙ্করের ঔদ্ধত্য সহ্য করিতে পারিত না। সে জন্য তাহাদের মধ্যে সময়-সময় ঝগড়া হইত। আমি মনে মনে শঙ্করের প্রতি অনুরক্ত হইলেও প্রকাশ্যে তাহার সঙ্গে মিশিতে পারিতাম না, বিনয়ের ঠাট্টার ভয়ে। পড়াশুনায় আমি মন্দ ছিলাম না, পরীক্ষায় প্রায়ই আমার স্থান হইত শঙ্করের অব্যবহিত পরে। সে জন্য বিনয় আমাকে শঙ্করের প্রতি-দ্বন্দ্বিরূপে খাড়া করিয়া শঙ্করকে জব্দ করিতে চেষ্টা করিত, এবং আমি তাহাতে নিতান্ত লজ্জা বোধ করিতাম। বিনয় অঙ্কে বড় কাঁচা ছিল, সে অনেক সময় আমার নিকট অঙ্ক বুঝিয়া লইত, ক্লাসের অন্য কোন কোন ছেলেও আমার নিকট অঙ্ক কষিতে আসিত, ইহাতে আবার শঙ্কর আমার প্রতি ঈর্ষান্বিত ছিল। তাহার আর একটি কারণ, শিক্ষকেরা বোধ হয় আমার বিনয়-নম্র ব্যবহারে আমাকেই বেশী ভালবাসিতেন।

এই প্রকার বিরুদ্ধ ভাবের মধ্য দিয়া শঙ্কর ও আমি কিরূপে বাল্য প্রণয়ের বন্ধনে দৃঢ় বদ্ধ হইয়াছিলাম, তাহার ইতিহাস এখানে কিছু বলিতেছি। কারণ, পরবর্ত্তী জীবনেও আমাদের এই প্রণয়ের গ্রন্থি আর একটি সূত্রের সহিত মিলিত হইয়া একটা কঠিন জটিলতার সৃষ্টি করিয়াছিল।

একদিন সন্ধ্যার প্রাক্কালে আমি নদীতীরে বেড়াইতে গিয়া একটি বটগাছের তলে বসিয়া সূর্য্যাস্তের শোভা দেখিতেছিলাম। সূর্য্য উজ্জ্বল রক্তবর্ণ ধারণ করিয়া পাটে বসিতেছিলেন। সেই রক্তবর্ণ আদিগন্তবিস্তৃত শস্যক্ষেত্রে পতিত হওয়ায় তাহার শ্যামলতা স্নিগ্ধ হইয়াছিল। এই সময়ে আমার পশ্চাৎ হইতে কে গাহিয়া উঠিল—

"যমুনা পুলিনে বসি কাঁদে রাধা বিনোদিনী।"

আমি দৃষ্টি ফিরাইয়া দেখিলাম শঙ্কর আসিতেছে—তাহার সঙ্গে কান্তি, বিভূতি ও অমিয়। কান্তি আমার সম্মুখে আসিয়া তাহার দুই হাত ঘুরাইতে ঘুরাইতে আবার ঐ গানের পদটি গাহিল। আমি তাহার কাণ্ড দেখিয়া একটু হাসিলাম। তখন কান্তি আমাকে সম্বোধন করিয়া বলিল—

'ওগো রাধাবিনোদিনী—ওগো রাই কিশোরী, এখানে একলাটি বসে কি ভাবছ?'

বিভূতি বলিল, 'রাইকিশোরী আর কি ভাববে,—শ্যামের ভাবনা।'

এই বলিয়া সে ও আর সকলে সেখানে বসিল। আমি বলিলাম, 'বাঃ, দেখ সূর্য্য কেমন লাল হয়ে অস্ত যাচ্ছে!'

কান্তি বলিল, 'অর্থাৎ এর পূর্ব্বে প্রতি সন্ধ্যায় সূর্য্য গাঢ় কৃষ্ণবর্ণ ধারণ ক'রে অস্ত যেত, আজ রক্তবর্ণ ধারণ করেছে। এটা শ্রীমতী রাইকিশোরীর একটা মস্ত আবিষ্কার !'

কান্তির এই রসিকতায় শঙ্কর হাসিল না। সে সূর্য্যের দিকে তাকাইয়া সেই অতুলনীয় শোভা দেখিতেছিল। আমার দিকে দৃষ্টি ফিরাইয়া বলিল, 'বাস্তবিকই সুন্দর।'

তাহার এই প্রশংসমান দৃষ্টিতে আমার শরীর রোমাঞ্চিত হইল, এবং তাহার সহিত আমার যে দূরত্ব ছিল তাহা যেন একটু কমিয়া গেল।

কান্তি ছাড়িবার পাত্র নহে, সে বলিল, 'কিশোরের দেখা-দেখি তোমরা সবাই যে কবি হয়ে উঠলে—আমরা যাই কোথায় ?'

শঙ্কর এবার তাহাকে ধমক দিয়া বলিল—'যাও ঐ চুলোয়। একটা সুন্দর জিনিষ দেখে উপভোগ করবার কাল্‌চার তোদের নেই, এই ত তোদের শিক্ষা !'

কান্তি ধমক খাইয়া দৃষ্টি নত করিল। শঙ্করের মেজাজের ঠিক ছিল না, সে হাসিতে হাসিতে হঠাৎ রাগিয়া উঠিত। কান্তি জব্দ হওয়ায় বিভূতি যেন একটু খুশী হইল। সে তাহার মনের ভাব গোপন করিবার জন্য বলিল, 'আচ্ছা বল তো, সূর্য্য অস্ত গেলে কার মনে দুঃখ হয় ?'

শঙ্কর কান্তিকে প্রসন্ন করিবার জন্য তাহার দিকে চাহিয়া বলিল 'বল না তুই ?'

কান্তি মুখ ভার করিয়া বলিল—'জানিনে, কিশোর গুড্‌বয়; তাকে জিজ্ঞেস কর।'

আমি বলিলাম, 'কেন, আজ পণ্ডিতমশায় ক্লাসে যে সংস্কৃত শ্লোকটি লিখিয়ে দিয়েছেন, তাতেই ত আছে সূর্য্যের বন্ধু পদ্ম, আর চন্দ্রের বন্ধু কুমুদ—'

শঙ্কর বলিল—'শ্লোকটি বড় সুন্দর—

"গিরৌ কলাপী গগনে পয়োদঃ
লক্ষান্তরেঽর্কশ্চ জলেষু পদ্মঃ।
ইন্দোর্দ্বিলক্ষং কুমুদস্য বন্ধুঃ
যো যস্য মিত্রং নহি তস্য দূরং ॥"

বিভূতি বলিল, 'তোমার শ্লোক শুনলাম, এবার একটা গান হোক।'

শঙ্কর কান্তিকে বলিল, 'তুই একটা গা না।'

কান্তি বলিল, 'না, ভাই, আমার গলা ভাঙা, আমি পারব না।'

শঙ্কর বলিল, 'রাগ হয়েছে। অমিয়, তুই তোর সেই 'সোনার গগনে' গানটা গা।'

তখন অমিয় সেই গানটি গাহিল। গান শেষ হইলে আমরা একসঙ্গে বাড়ির দিকে রওনা হইলাম।

২

পরদিন যথাসময়ে স্কুলে গেলাম। প্রথম ঘণ্টায় এসিষ্টাণ্ট হেড্‌মাষ্টার জনার্দ্দনবাবু ইংরেজী পড়াইতে আসিলেন। তিনি বড় কড়া লোক ছিলেন, ছেলেরা তাঁহাকে বাঘের মত ভয় করিত। তাঁহার ঘণ্টায় কেহ টুঁ শব্দটি করিতে পারিত না। তিনি ক্লাসে বসিয়াই আমাদিগকে একটি রচনা লিখিতে দিলেন। আমরা রচনা লিখিয়া তাঁহার সম্মুখস্থ টেবিলে খাতা রাখিলাম, তিনি একখানা খাতা হাতে করিয়া তাহা দেখিতে আরম্ভ করিয়াছেন, ঠিক এই সময়ে আমি যে-বেঞ্চে বসিয়াছিলাম তাহার সম্মুখের দিক হইতে একটা কাগজের মোড়ক আসিয়া আমার উপর পড়িল। এই কার্য্যটি অতি সন্তর্পণে অনুষ্ঠিত হইলেও তাহা জনার্দ্দনবাবুর দৃষ্টি এড়াইল না। তিনি অমনি 'ও কি হচ্ছে' বলিয়া হুঙ্কার দিয়া উঠিলেন, এবং সেই কাগজের মোড়কটি আমার হাত হইতে কাড়িয়া লইলেন। আমি উহা খুলিয়াছিলাম—উহাতে পেন্‌সিল দিয়া একটি পুরুষের ও একটি নারীর আকৃতি নিতান্ত অপটু হস্তে আঁকা ছিল, সেই নারীর পাশে লেখা ছিল 'রাইকিশোরী,' আর ছবি দুটির নীচে লেখা ছিল 'যো যস্য মিত্রং নহি তস্য দূরং'। শিক্ষক মহাশয় উহা দেখিয়া চীৎকার করিয়া উঠিলেন, 'কী! ক্লাসে ব'সে ইয়ারকি দেওয়া হচ্ছে? এ কাজ কে করেছে ?'

তাঁহার গর্জ্জন শুনিয়া ক্লাসের বালকবৃন্দ নিস্পন্দ হইল। কাহারও কোন উত্তর না পাইয়া তিনি আমাকে কাছে ডাকিলেন। আমি বলিদানের ছাগশিশুর মত কাঁপিতে কাঁপিতে তাঁহার সম্মুখে গিয়া দাঁড়াইলাম।

তিনি আমাকে জেরা করিতে আরম্ভ করিলেন—'এ কাগজটা তোমার দিকে ছুঁড়ে মেরেছিল ?'

উত্তর।—আজ্ঞে হাঁ।

'কে মেরেছিল ?'

উত্তর।—আজ্ঞে আমি দেখি নাই।

'তুমি জান কে মেরেছিল ?'

উত্তর।—আজ্ঞে আমি জানি না।

'কাগজটা কোন দিক্ থেকে এসেছিল ?'

উত্তর।-- আজ্ঞে আমার সম্মুখ থেকে।

শিক্ষক মহাশয় তখন আমার সম্মুখের বেঞ্চের ছেলেদিগকে একে একে কাছে ডাকিয়া ঐ লেখা দেখাইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন। কেহই দোষ স্বীকার করিল না। তখন তিনি ক্রোধে অধীর হইয়া তাহাদিগকে দাঁড় করাইয়া দিলেন এবং ঐ কাগজখানি হাতে হেড্‌মাষ্টারের খাস কামরায় গেলেন। ঐ সকল সন্দিগ্ধ ছেলেদের মধ্যে শঙ্কর, বিভূতি, কান্তি, আরও তিন জন ছিল। তাহারা রোষকষায়িত লোচনে আমার পানে তাকাইতে লাগিল। আমি একজন ঘোর অপরাধীর ন্যায় জড়সড় হইয়া আমার জায়গাটিতে বসিয়া রহিলাম। তখন বিনয়ের স্ফূর্তি দেখে কে ? সে, 'কী ! ক্লাসে ব'সে ইয়ারকি দেওয়া হচ্ছে ?' এই কথাগুলি বিভিন্ন ভঙ্গীতে উচ্চারণ করিয়া তাহার দলের ছেলেদের কৌতুক উৎপাদন করিতে লাগিল। কিছুক্ষণ পরে হেড্‌মাষ্টারের বসিবার ঘরে আমার ডাক পড়িল। আমি ভয়ে কাঁপিতে কাঁপিতে তাঁহার সম্মুখে উপস্থিত হইলাম। হেড্‌মাষ্টার মহাশয় ছিলেন কঠোর নীতিবাদী, হাস্যকেও তিনি অধর্ম্মের কাজ মনে করিতেন। তবে তিনি খুব ধীরপ্রকৃতি, হঠাৎ কাহারও প্রতি রুষ্ট হইতেন না, এবং যত দূর সম্ভব ন্যায়বিচার করিতে চেষ্টা করিতেন। জনার্দ্দনবাবু তাঁহার পাশে বসিয়া ছিলেন। তাঁহারা আমাকে প্রশ্নের পর প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিয়া পূর্ব্ব দিনের ঘটনা বাহির করিয়া লইলেন। তখন শঙ্কর, বিভূতি ও কান্তি এই তিন জনের তলব হইল। হেড্‌মাষ্টার তাহাদিগকে 'যো যস্য মিত্রং নহি তস্য দূরং' এই লাইনটি কাগজে পেনসিল দিয়া লিখিতে বলিলেন। সেই কাগজখানির সহিত তাহাদের লেখা মিলাইয়া দেখিয়া হেড্‌মাষ্টার কান্তিকে পুনর্ব্বার বিশেষ করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন,—'তুমি ঠিক করিয়া বল, এটা তোমার হাতের লেখা কি-না ?' কান্তি অবিচলিত ভাবে উত্তর দিল—'না।'

কিন্তু হেড্‌মাষ্টার তাহার কথা বিশ্বাস করিলেন না। কারণ সেই কাগজখানিতে 'দূরং' শব্দটিতে 'দ'য়ে হ্রস্ব উকার দেওয়া হইয়াছিল, এখন কান্তির লেখাতেও সেই ভুল দেখা গেল। এইরূপে হেড্‌মাষ্টার কান্তির দোষ সম্বন্ধে নিঃসন্দেহ হইয়া তিনি তাহাকে মিথ্যা কথা বলার অপরাধে ১৲ টাকা জরিমানা করিলেন, এবং ভবিষ্যতে সে এরূপ গর্হিত কাজ না করে সেজন্য সতর্ক করিয়া দিলেন। আমরা সকলে ক্লাসে ফিরিয়া আসিলাম, কিন্তু জনার্দ্দনবাবু যেন এই লঘু দণ্ডে সন্তুষ্ট হইলেন না। তিনি ক্লাসে ফিরিয়া আসিয়া কান্তির অপরাধ নিতান্ত গুরুতর, সে বখাটে ছেলে, আমার ন্যায় সুশীল বালকদের কান্তির সহিত মেলামেশা করিলে আমাদের পরকাল মাটি হইবে, এইরূপ একটি লেকচার দিলেন। এই রূপে ঘণ্টা বাজিয়া গেল। জনার্দ্দনবাবু উঠিয়া গেলে বিনয় তাঁহার স্বর অনুকরণ করিয়া বলিল, 'অতএব হে বালকগণ ! সাবধান, তোমরা আর ক্লাসে বসিয়া ইয়ারকি দিও না।' বিনয়ের কথা শুনিয়া সকলে হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিল, কিন্তু শঙ্কর ও তাহার সঙ্গীরা সে হাসিতে যোগ দিল না, তাহারা মুখ চুণ করিয়া বসিয়া রহিল।

ইহার পর হইতে শঙ্কর ও তাহার দলের ছেলেরা আমার সঙ্গে বাক্যালাপ বন্ধ করিল। আমিও তাহাদের সঙ্গে আর মিশিবার চেষ্টা করিতাম না। আমি নদীর ধারে বেড়াইতে না গিয়া অন্য দিকে বেড়াইতাম। কিন্তু একলা একলা বেড়ান ভাল লাগিল না। আমার মন আবার শঙ্করের সহিত মিলিত হইবার জন্য ব্যাকুল হইয়া উঠিল। তাই আমি এক দিন সাহস করিয়া নদীর ধারে বেড়াইতে আসিলাম। দেখিলাম শঙ্কর, কান্তি ও বিভূতি সেই বটগাছের তলে বসিয়া উচ্চহাস্য সহকারে গল্প করিতেছে। আমাকে আসিতে দেখিয়া তাহারা আমাকে শুনাইয়া শুনাইয়া এইরূপ কথোপকথন আরম্ভ করিল,—

কান্তি বলিল, 'A good boy always minds his lessons' (সুবোধ বালক সর্ব্বদা লেখাপড়া করে)।

বিভূতি।—'He does not play with bad boys' (সে দুষ্ট বালকদের সঙ্গে খেলা করে না)।

কান্তি।—'Two sides of a triangle are greater than the fourth side' (একটি ত্রিভুজের দুইটি বাহু চতুর্থ বাহু অপেক্ষা বড়)।

এই কথাতে শঙ্কর হাসিয়া উঠিল। বিভূতি বলিল,

'Chandragupta was the grand-daughter of Ashoke,' (চন্দ্রগুপ্ত অশোকের নাতনী)।

কান্তি।—'Aurangzeb imprisoned Chandragupta and ascended the throne of Delhi' (ঔরঙ্গজেব চন্দ্রগুপ্তকে কারারুদ্ধ করিয়া দিল্লীর সিংহাসন দখল করিয়াছিলেন)।

শঙ্কর বলিল, 'বেশ, বেশ, আরও কিছু!'

বিভূতি।—'Akbar defeated Aurangzeb at the battle of Plassey in the year of our Lord 1957' (আকবর ১৯৫৭ খৃষ্টাব্দে ঔরঙ্গজেবকে পলাশীর যুদ্ধে পরাজয় করিয়াছিলেন)।

এই কথায় তাহারা হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিল। আমিও দূর হইতে তাহাদের হাসিতে যোগ না দিয়া থাকিতে পারিলাম না। তাহাদের এই প্রকার পরিহাস শুনিয়া আমি মনে করিয়াছিলাম, আমার উপর তাহাদের রাগটা বোধ হয় পড়িয়াছে। কিন্তু শঙ্কর আমাকে ডাকিল না বা আমার সঙ্গে কথা কহিতে চেষ্টা করিল না, দেখিয়া আমি অন্য দিকে চলিয়া গেলাম।

পর দিন স্কুলের সময় বুকপোষ্টে আমার নামে একখানা বই আসিল। সেখানা উপন্যাস, সবে নূতন বাহির হইয়াছে, আমার ভগ্নীপতি আমার ভগিনীর জন্য পাঠাইয়াছেন। আমি বইখানা পাইয়াই তাহার প্যাকেট খুলিয়া ফেলিলাম। আমার পার্শ্ববর্ত্তী ছেলেদের হাতে হাতে বইখানা ঘুরিতে লাগিল। শঙ্করও সেই বইখানার দিকে সতৃষ্ণ নয়নে তাকাইয়া রহিল দেখিলাম, কিন্তু সে মুখ ফুটিয়া তাহা দেখিতে চাহিল না।

ইহার অল্প ক্ষণ পরে স্কুলের ছুটি হইল এবং আমি সেই বইখানা লইয়া বাটি গেলাম। বাড়ি গিয়া আমি সে বইখানা দিদিকে না দিয়া, উহা আমার কাপড়ের মধ্যে লুকাইয়া লইয়া বেড়াইতে বাহির হইলাম। সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইলে আমি শঙ্করদের বাড়ির পথে ফিরিলাম। তখন শঙ্করের বাড়ি ফিরিবার সময় হইয়াছিল। অল্প দূর আসিয়াছি, এমন সময় দেখিলাম শঙ্কর আসিতেছে। তাহাকে জ্যোৎস্নালোকে চিনিলাম। তখন আমি আমার গন্তব্য পথে যেন আপন মনে যাইতেছি, এই ভাব দেখাইয়া তাহার সম্মুখে আসিলাম। আমাকে দেখিয়া শঙ্কর বলিল, 'কে ও কিশোর না কি?' আমি বলিলাম। 'হাঁ।' সে দাঁড়াইল না, আর কোন কথাও বলিল না, চলিতে লাগিল। আমি পশ্চাৎ ফিরিয়া তাহাকে বলিলাম, 'এই বইখানা আজ ডাকে এসেছিল, তুমি যদি পড়তে চাও তবে নিতে পার।' সে এই কথা শুনিয়া থমকিয়া দাঁড়াইল, এবং বিদ্রূপের হাসি হাসিয়া বলিল, 'আজ যে বড় ভাব করতে এসেছ?'

আমি নিতান্ত অপ্রস্তুত হইয়া ছল ছল নেত্রে বলিলাম, 'কেন, আমি তোমার কি করেছি?'

সে বলিল— 'কর নাই? সে দিন হেড্‌মাষ্টারের কাছে আমাদিগকে অপমানিত করেছিল কে?'

আমি কাতর ভাবে বলিলাম, 'ভাই, আমার কোন দোষ নাই। আমি তোমার বিরুদ্ধে তো কোন কথাই বলি নাই। তুমি অনর্থক আমার উপর রাগ ক'রো না।'

শঙ্কর আর কিছু না বলিয়া চলিয়া গেল। আমি অনেক কষ্টে অশ্রুসম্বরণ করিয়া বাড়ি ফিরিলাম।

কিন্তু যেখানে বাঘের ভয় সেখানেই সন্ধ্যা হয়। আমি কতক দূর অগ্রসর হইয়া দেখিলাম, বিনয় তাহার দল-বল সহ খেলার মাঠ হইতে ফিরিতেছে। আমি তাহাদের পাশ কাটাইয়া যাইতে চেষ্টা করিলাম, কিন্তু বিনয় আমাকে দেখিয়া ফেলিল এবং হাতছানি দিয়া কাছে ডাকিল। আমি সভয়ে তাহার দিকে অগ্রসর হইলাম। সে বলিল, 'কি রে কিশোর, তুই যে আজকাল বড় 'বড় 'গুড্‌ বয়' হয়েছিস? মাঠে খেলতে যাস্ না, আবার বই হাতে ক'রে বেড়াতে যাস।'

আমি কোন উত্তর না দিয়া চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিলাম। কিন্তু বিনয় ছাড়িবার পাত্র নহে। 'ওখানা কি বই দেখি', বলিয়া আমার হাত হইতে বইখানা টানিয়া লইল।

তাহার সঙ্গী বিমল বলিল—'এই বইটাইত আজ স্কুলে কিশোরের নামে ডাকে এসেছিল, কেমন না রে?'

আমি 'হুঁ' বলিয়া দাঁড়াইয়া রহিলাম—বেশী কথা বলিলে পাছে ধরা পড়ি। বিনয় বইখানা নাড়িয়া-চাড়িয়া বলিল, 'কিন্তু এই বই নিয়ে তুই আজ শঙ্করদের বাড়ির দিকে কেন গিয়েছিলি বল ত?—ওহো! বুঝেছি, শঙ্করকে ঘুস দিয়ে খুশী করতে?' তাহার এই কথায় তাহার সঙ্গীরা উচ্চ হাস্য করিয়া উঠিল। আমি যেন লজ্জায় মরিয়া গেলাম।

আমাকে চুপ করিয়া থাকিতে দেখিয়া বিনয়ের বোধ হয় একটু দয়া হইল। সে বইখানা আমার হাতে ফিরাইয়া দিয়া বলিল, 'যা এখন বাড়ি যা;—খুব পড়বি, এই হাফ ইয়ার্লি পরীক্ষায় ফার্ষ্ট হওয়া চাই। তুই শঙ্করের চেয়ে কম কিসে? তিনি কেবল মুখস্থর জোরে দু-চার নম্বর বেশী পেয়ে ধরাকে সরা জ্ঞান করেন।' আমি আর সেখানে না দাঁড়াইয়া বাড়ি ফিরিলাম। বাড়ি ফিরিতে ফিরিতে ভাবিতে লাগিলাম,—শঙ্কর আমার কে? আমি তাহার নিকট এরূপ লাঞ্ছনা সহ্য করিলাম কেন? আবার তাহার জন্য বিনয়ের নিকটই বা এরূপ বিদ্রূপ সহ্য করিলাম কেন? আমি তাহাকে ভালবাসি, কিন্তু সে ত আমাকে দেখিতে পারে না। আমি মনে মনে প্রতিজ্ঞা করিলাম, আমি আর শঙ্করের সঙ্গে মিশিতে যাইব না। কিন্তু ইহার পরে যে ঘটনা ঘটিল তাহাতে আমার সে প্রতিজ্ঞা কোথায় উড়িয়া গেল।

৩

গোয়াড়ী বাজারের দোকানদারদিগের প্রতিবৎসর একটা বারোয়ারী পূজা হয়, এবং তদুপলক্ষ্যে কলিকাতা হইতে ভাল যাত্রার দল আনা হয়। সেই যাত্রা-গানের আসরে লোকের অত্যন্ত ভিড় হয়, বিশেষতঃ স্কুল-কলেজের ছাত্রদের। সেবার যাত্রা-গানের প্রথম দিন আসরে সামনে বসা লইয়া কতকগুলি ছেলে অত্যন্ত গোলমাল করিল। সেজন্য বারোয়ারীর কর্ত্তৃপক্ষ শান্তিরক্ষার জন্য কয়েক জন বড় বড় ছাত্রকে ভলান্টিয়ার নিযুক্ত করিলেন। কিন্তু তাহাতে ফল হইল বিপরীত। আমাদের ক্লাসের বিনয় একজন ভলান্টিয়ার হইল। সে শঙ্করের দলের উপর চটা ছিল। শঙ্করের দল তাহাকে ভলান্টিয়ার হইতে দেখিয়া তাহাকে জব্দ করিবার অভিপ্রায়ে তাহার নিষেধ না শুনিয়া যখন সামনের জায়গা দখল করিতে চেষ্টা করিল তখন একটা মারামারির উপক্রম হইল। বারোয়ারীর সেক্রেটারী হাজারী বাবু অনেক অনুনয়-বিনয় করিয়াও তাহাদিগকে থামাইতে পারিলেন না। তখন তিনি পুলিসে খবর দিলেন। খবর পাইয়া থানা হইতে কয়েক জন কনেষ্টবল আসিল। পুলিসের ভয়ে শঙ্কর, কান্তি প্রভৃতি কয়েক জন ছাত্র বাহির হইয়া গেল, কিন্তু তাহারা একেবারে নিরস্ত হইল না। এক ঘণ্টা পরে গান যখন জমিয়া উঠিয়াছে, সেনাপতি ইন্দ্রদমন যখন হংসকেতু রাজাকে বনে পাঠাইবার জন্য ছোটরাণী চন্দ্রাবতীর সঙ্গে মন্ত্রণা করিতেছেন,—ঠিক এই সময়ে টুপ করিয়া একটা ঢিল আসিয়া একটা বেলোয়ারি ঝাড়ের উপর পড়িল। দেখিতে দেখিতে আরও দুই তিনটি ঢিল আসিয়া পড়ায় একটা গোলমালের সৃষ্টি হইল। তখন কনেষ্টবলেরা সেই অনিষ্টকারীদিগকে ধরিবার চেষ্টা করিল। প্রকৃত দোষী যাহারা তাহারা চম্পট দিল—ধরা পড়িল শঙ্কর, সত্যচরণ, অমিয়। অবশ্য তাহারাও সেই অনিষ্টকারীদের দলভুক্ত ছিল, কিন্তু বাস্তবিক পক্ষে তাহারা ঢিল ছোড়ে নাই। হাজারী বাবু তখন কনেষ্টবলদিগের সাহায্যে তাহাদিগকে থানায় লইয়া চলিলেন, কারণ ঢিল লাগিয়া কয়েকটা মূল্যবান ঝাড় ভাঙিয়া গিয়াছিল এবং এই গুরুতর ক্ষতি অম্লান বদনে সহ্য করা সম্ভবপর ছিল না। আমি একটু দূরে দাঁড়াইয়া এই সকল ঘটনা দেখিতেছিলাম।

হাজারী বাবুর বাড়ি আমাদের বাড়ির পাশে, তিনি আমার দাদার সহপাঠী ছিলেন, সর্ব্বদা আমাদের বাড়ি আসিতেন এবং আমি তাঁহাকে দাদা বলিয়া ডাকিতাম। তিনি যখন থানায় যাইতেছিলেন, আমি অগ্রসর হইয়া চুপে চুপে তাঁহাকে বলিলাম—'দাদা, আমার একটা কথা শুনুন।'

হাজারী বাবু বলিলেন -'কি বল্‌বি বল, তুইও এ-দলে আছিস না কি?'

আমি বলিলাম—'আপনি কি মনে করেন?'

তিনি হাসিয়া বলিলেন,—'তোকে ত আমি বরাবরই ভাল ব'লে জানি, কি বলতে চাস্ বল।'

আমি শঙ্করকে দেখাইয়া বলিলাম,—'আপনি ঐ ছেলেটিকে চেনেন?' তিনি বলিলেন—'না—ওকে চিনি না, তবে ওকে এই দলের নেতা বলেই মনে হয়।'

আমি বলিলাম—'ওর চেহারাটা সেই রকমই বটে, কিন্তু ওর স্বভাব অতি চমৎকার। ওর নাম শঙ্কর, মুনসেফ্ বাবুর ছেলে। আমি নিশ্চয় জানি শঙ্কর এইরূপ দুষ্কার্য্য কখনই করিতে পারে না। ওকে কনেষ্টবল ভুল ক'রে ধরেছে। দাদা, আপনি ওকে ছেড়ে দিন।'

হাজারী বাবু নরম হইয়া বলিলেন—'মুনসেফ্ বাবুর ছেলে

—তোর বন্ধু—তুই বলছিস ও নির্দ্দোষ—আচ্ছা, আমি ওকে ছেড়ে দিলাম।'

এই বলিয়া তিনি কনেষ্টবলদিগকে কি বলিলেন, তাহারা শঙ্করকে ছাড়িয়া দিল।

শঙ্কর এইরূপে ছাড় পাইয়া আমার কাছে আসিল এবং আমাকে দুই বাহু দিয়া জড়াইয়া ধরিয়া বলিল, কিশোর! আমি এত দিনে জানলুম, তোর মত হিতৈষী বন্ধু আমার আর কেউ নেই।'

আমি হাসিয়া বলিলাম,—'অর্থাৎ রাজদ্বারে শ্মশানে চ য তিষ্ঠতি স বান্ধবঃ—কিন্তু ভাই, হেডমাষ্টারের দ্বারে ত আমাকে শত্রু বলেই মনে করেছিলে।'

শঙ্কর আমার হাত তাহার হাতের মধ্যে চাপিয়া ধরিয়া বলিল,—'সে জন্য তুই কিছু মনে করিস্‌নে ভাই। আমি ভুল বুঝেছিলুম। ভুল বুঝে তোর প্রতি অন্যায় ব্যবহার করেছিলুম। আজ থেকে আমি আর ও-সব ছেলেদের সঙ্গে মিশব না। দেখিস ভাই, আজকার এ কথা যেন বেশী জানাজানি না হয়। আমার বাবা শুন্‌লে নিশ্চয়ই আমাকে আর ঘরের বাইরে যেতে দেবেন না।'

আমি বলিলাম,—'কুচ পরোয়া নেই, তুমি নিশ্চিন্ত থাক। চল তবে আমরা এখন বাড়ি ফিরে যাই, আজ আর যাত্রা শুনে কাজ নেই।'

এই বলিয়া আমি শঙ্করের সঙ্গে বাড়ি রওনা হইলাম। হাজারী বাবু অমিয় ও সত্যচরণকে লইয়া থানায় গেলেন। পরদিন শুনিলাম, দারোগা তাহাদের নিকট মুচলিকা লইয়া ছাড়িয়া দিয়াছিলেন। কিন্তু তদন্তে তাহাদের বিরুদ্ধে কোন সন্তোষজনক প্রমাণ না পাওয়ায় তাহাদিগকে আর তলব করিলেন না।

এইরূপে শঙ্করের সহিত আমার বন্ধুত্ব স্থাপিত হইল। আমি তাহাকে অত্যন্ত ভালবাসিতাম, সেও আমাকে ভালবাসিতে লাগিল। ক্লাসে আমরা প্রায় এক জায়গায় বসিতাম। অন্য সময়ে আমি তাহাদের বাসায় যাইতাম, সেও আমাদের বাড়িতে আসিত। শঙ্কর আমার প্রতি সুপ্রসন্ন হওয়ায় কান্তি, বিভূতি ইহারা আর আমাকে জ্বালাতন করিত না। শঙ্কর তাহাদের সঙ্গে মেলামেশা পরিত্যাগ করিল। বিনয় সময়-সময় আমাকে টিট্‌কারি দিতে ছাড়িত না, কিন্তু আমি যথাসম্ভব তাহারও মন রাখিয়া চলিতাম। শঙ্করের একটি ভগিনী ছিল, তাহার নাম প্রমীলা। সে গোয়াড়ী বালিকা-বিদ্যালয়ে পড়িত। তাহার স্কুল আমাদের বাড়ির খুব নিকটে, সে মধ্যে-মধ্যে আমার বোন কমলার সহিত আমাদের বাড়িতে আসিত ও আমাকে দাদা বলিয়া ডাকিত। আমি তাহাদের বাড়িতে গেলে সে আমাকে যেন পাইয়া বসিত। তাহার মাও আমাকে খুব আদর করিতেন।

সেবারে বাৎসরিক পরীক্ষায় শঙ্কর পূর্ব্বের ন্যায় প্রথম স্থান অধিকার করিল, কিন্তু অঙ্কে আমিই প্রথম হইলাম, মোটের উপর আমি দ্বিতীয় হইলাম। আমাদের হেড পণ্ডিত মহাশয় আমাদের দুই জনের অত্যন্ত ভাব দেখিয়া আমাদের নাম দিয়াছিলেন "মাণিকজোড়"—কিন্তু অল্প দিন পরেই আমাদের 'জোড়' ভাঙিয়া গেল। আমাদের বাৎসরিক পরীক্ষার পরেই শঙ্করের পিতা অমরেন্দ্র বাবু বরিশাল বদলী হইয়া গেলেন, আমি কৃষ্ণনগরেই রহিলাম।

বরিশালে গিয়া শঙ্কর মধ্যে মধ্যে চিঠি লিখিত, আমিও তাহাকে পত্র দিতাম। তাহার চিঠি না পাইলে মন বড় ব্যাকুল হইত। কিন্তু ক্রমে যত দিন যাইতে লাগিল, ততই আমাদের চিঠি লেখালেখি কমিতে লাগিল এবং অবশেষে একেবারে বন্ধ হইয়া গেল। যাহাকে একদিনও না দেখিয়া থাকিতে পারিতাম না,—যেদিন তাহার সঙ্গে দেখা না হইত সে দিনটাই ব্যর্থ মনে করিতাম, কালক্রমে তাহাকে ভুলিয়া গেলাম, কদাচিৎ কখনও তাহাকে স্বপ্নে দেখিতাম। বোধ হয় শঙ্করও আমাকে সেইরূপ ভুলিয়া গিয়াছিল। ইহাই বুঝি বাল্য-প্রণয়ের প্রতি বিধাতার অভিশাপ। কিন্তু ইহার পর শঙ্করের সহিত যখন পুনর্ম্মিলিত হইলাম, তখন বিধাতা আমাদের দ্বারা অন্য খেলা খেলিবেন বলিয়াই যেন আমাদের পূর্ব্বপ্রণয়ের স্মৃতি জাগরূক রাখিয়াছিলেন।

সে ছ-সাত বৎসর পরের কথা। আমি কৃষ্ণনগর কলেজ হইতে আই-এস্‌সি পাস করিয়া কলিকাতা মেডিক্যাল কলেজে আসিয়া ভর্ত্তি হইলাম। আমি এনাটমি, ফিজিওলজী চর্চ্চার সঙ্গে সঙ্গে কিছু কিছু সাহিত্যচর্চ্চা আরম্ভ করিলাম। হাঁসপাতালে ডিউটি করিতে গিয়া

যযাতি ও পুরু
শ্রী অসিতকুমার হালদার

আমি যে সময় পাইতাম তাহা বৃথা নষ্ট না করিয়া ইংরেজী বাংলা অনেক কাব্য উপন্যাস পড়িতে আরম্ভ করিলাম। কেবল পড়িয়া তৃপ্তি হইল না—কিছু কিছু লিখিতেও আরম্ভ করিলাম। প্রথমে দুই তিনটি ছোট গল্প লিখিলাম। তাহার একটি অতি সঙ্কোচের সহিত 'বৈজয়ন্তী' পত্রিকার সম্পাদকের নিকট পাঠাইয়া দিলাম। কিছুদিন পরে সম্পাদক মহাশয় উহা ধন্যবাদের সহিত ফেরত না পাঠাইয়া তাহা পাঠানর জন্য আমাকে ধন্যবাদ দিয়া চিঠি লিখিলেন এবং সেরূপ আরও লেখা পাঠাইবার জন্য আমাকে অনুরোধ করিলেন। আমার সে-গল্পটি যেদিন 'বৈজয়ন্তী' পত্রিকায় বাহির হইল সেদিন আমার আহ্লাদ দেখে কে! আমি উৎসাহ পাইয়া আরও কয়েকটি গল্প লিখিলাম এবং তাহা ছাপা হইল। ইহার পর 'ভারতপ্রভা' পত্রিকায় নারী-প্রগতি সম্বন্ধে একটি প্রবন্ধ দেখিয়া আমিও সেই সম্বন্ধে আলোচনা আরম্ভ করিলাম। আমি ডাক্তারী পুস্তকে স্ত্রী ও পুরুষের শারীর তত্ত্ব সম্বন্ধে অনেক অধ্যয়ন করিয়াছিলাম। আমার সেই বিদ্যা খাটাইবার এই উপযুক্ত অবসর বুঝিয়া আমি নারী-প্রগতি সম্বন্ধে দুই একটি প্রবন্ধ লিখিয়া পাঠাইলাম। এইরূপে আমি একজন ক্ষুদ্র সাহিত্যিক হইয়া উঠিলাম।

পটলডাঙ্গা রামজয় বসু লেনের মেসে আমি যেদিন উঠিয়া আসিলাম তাহার পরদিন সকালে বেলা প্রায় দশটার সময় বেথুন কলেজের মেয়েদের গাড়ী আমাদের গলিতে আসিল এবং একটি পরমাসুন্দরী তরুণী পাশের এক গলি হইতে হাঁটিয়া আসিয়া সেই গাড়ীতে উঠিল। আমি আমার দোতলার ঘরে বসিয়া এই রমণীয় দৃশ্য যখন দেখিলাম তখন এক ঝলক বিজলীশিখা যেন আমার অন্তস্তলে প্রবেশ করিয়া একটি আলোকের রেখা আঁকিয়া দিয়া গেল। তাহার পরদিন ঠিক এই সময়ে, আবার তাহার পরদিনও ঠিক এই সময়ে—এইরূপে প্রত্যহ সেই বিদ্যুৎ-শিখার দীপ্তি আমার চিত্ত আলোকিত করিতে লাগিল। আমি প্রত্যহ উহা দেখিবার লোভে আমার ঘরে বসিয়া থাকিতাম—অবশ্য যেদিন স্কুলের ছুটি থাকিত সেদিন ঐ গাড়ী আসিত না, আমি সেদিনটা আমার পক্ষে নিতান্ত বৃথা গেল মনে করিতাম। এইরূপে ছয় মাস কাটিল।

একদিন প্রভাতে আমি কাহার মুখ দেখিয়া উঠিয়াছিলাম বলিতে পারি না। সেদিন আমার ভাগ্যে এত আহ্লাদ, এত সুখ সঞ্চিত ছিল। আমি বৈকালে ৩টার সময় কলেজ হইতে ফিরিতেছি, আমার বাসার সম্মুখে আসিলে 'কে কিশোর না কি রে' বলিতে বলিতে একটি যুবক পেছন হইতে আসিয়া আমার হাত ধরিল। আমি মুখ ফিরাইয়া দেখি—এ যে আমার বহুদিনের হারানো প্রিয়তম বন্ধু শঙ্কর। আমি এত কাল পরে হঠাৎ তাহাকে দেখিয়া হর্ষভরে জড়াইয়া ধরিলাম। সে আমাকে গাঢ় আলিঙ্গনে আবদ্ধ করিয়া বলিল,— 'তুই এখানে? কই আগে ত তোকে কোন দিন কলকাতায় দেখিনি?'

আমি বলিলাম— 'আমি ত অনেকদিন কলকাতায় আছি, মেডিক্যাল কলেজে পড়ছি। এই মেসে থাকি। তুমি কোথায় থাক, কি কর শঙ্কর-দা?'

শঙ্কর বলিল—'আমি ত আমাদের নিজ বাড়িতেই থাকি, ভবানীপুরে; সব ভুলে গিয়েছিস দেখছি। আমার বাবা সবজজ হয়েছিলেন, রিটায়ার ক'রে এখন বাড়িতেই আছেন। আমি 'ল' পড়ছি। আমার বোন প্রমীলাকে মনে পড়ে?'

আমি বলিলাম—'হ্যাঁ, পড়ে বইকি। তাকে ছোট দেখেছিলাম, এখন কত বড় হয়েছে।'

'তাকে যদি দেখবি তবে আমার সঙ্গে আয়। তোদের গলির পাশের ঐ গলিতে সম্প্রতি তার বিয়ে হয়েছে। আমি সেখানেই যাচ্ছি—আর দেরি করিস নে।'

'একটু দাঁড়াও শঙ্কর-দা, আমার এই কাপড়টা বদলে আসি। রাস্তায় দাঁড়াবে কেন, এস আমার ঘরে এক মিনিট বসে যাবে।' এই বলিয়া শঙ্করকে হাত ধরিয়া টানিতে টানিতে আমার ঘরে লইয়া আসিলাম। আমি আমার বাক্স হইতে ধোয়া ধুতি পাঞ্জাবী বাহির করিয়া তাহা পরিতে পরিতে বলিলাম—'এক কাপ চা খাবে শঙ্কর-দা?'

শঙ্কর বলিল—'নারে না। আমি চা খেয়ে বেরিয়েছি, আবার সেখানে গিয়েও ত কিছু খেতে হবে।' এই বলিয়া উঠিয়া পড়িল।

আমরা হাত ধরাধরি করিয়া চলিলাম। অল্প দূর গিয়াই একটা বাড়ির মধ্যে ঢুকিয়া শঙ্কর হাঁকিল—'সুকুমার।' তখন একটি সুদর্শন যুবক বাহির হইয়া আসিয়া আমাদিগকে দেখিয়া বলিল—'ইনি কে?'

শঙ্কর বলিল—'এটি আমার হারাণো মাণিক।'

যুবকটি কিছু বুঝিতে না পারিয়া আমাদিগকে লইয়া যেই একটি ঘরে ঢুকিবে, অমনি চকিতা হরিণীর ন্যায় একটি তরুণী সে-ঘর হইতে বাহির হইয়া গেলেন। আমি দেখিয়া আশ্চর্য্য হইলাম, ইনি আমার সেই চিরপরিচিতা বেথুনের ছাত্রী বিদ্যুৎশিখা। সুকুমার শঙ্করের ভগিনীপতি, ইনি সুকুমারের ভগিনী, নাম নীহারিকা।

দ্বিতীয় খণ্ড

নীহারিকার কথা

১

আমি আই-এ পাস করিয়া বেথুন কলেজে বি-এ পড়িতেছি, এবার আমার থার্ড ইয়ার। বাড়িতে থাকিয়াই পড়ি। বাড়িতে আমার মা আর বড় ভাই থাকেন। আমার বাবা কলেজের একজন খ্যাতনামা অধ্যাপক ছিলেন, দুই বৎসর হইল স্বর্গে গমন করিয়াছেন। তাঁহার উদ্যোগে আমি লেখাপড়ায় এতদূর অগ্রসর হইয়াছি। দাদা সুকুমার আমার দুই বৎসরের বড়, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে এম-এ ক্লাসে পড়ে। আমি তাহাকে মান্য করিয়া কোনদিন ডাকিতে পারিলাম না, 'তুমি' বলিয়াই সম্বোধন করি। সেও আমাকে নানাপ্রকার মিষ্ট সম্বোধন করে। আমি হিন্দুর মেয়ে, সুতরাং মা আমাকে যত শীঘ্র পারেন বাড়ি হইতে বিদায় করিয়া দেওয়ার জন্য চেষ্টা করিতেছেন। বাবা বাঁচিয়া থাকিতে তাঁহার জন্য পারেন নাই। এখন দাদাও বলিতে আরম্ভ করিয়াছে—'পোড়ার মুখী, তুই দূর হ—তুই যে বি-এ পাস ক'রে আমার সমান হয়ে দাঁড়াবি, আমি তা সহ্য করতে পারব না।' কিন্তু আমার প্রতিজ্ঞা, আমি কিছুতেই বিবাহ করিব না। বিবাহ মানে ত একজন পুরুষের পায় দাসখত লিখিয়া দেওয়া। সে কি সোজা দাসখত -চিরজীবনের জন্য স্লেভারি (দাসত্ব)। আমার এই জীবনের সামান্য অভিজ্ঞতা হইতেই তাহা হাড়ে হাড়ে বুঝিয়াছি।

আমাদের বাড়ি কলিকাতা পটলডাঙার একটা অপেক্ষাকৃত নির্জ্জন পল্লীতে অবস্থিত, গাড়ী-ঘোড়ার গোলমাল বড় নাই। কিন্তু গভীর নিশীথে প্রায়ই আমার নিদ্রাভঙ্গ হয়, দুইটি কারণে। আমাদের বাড়ির একপাশে এক ঘর ধোপা আছে, সেই ধোপার একটা গাধা রাত্রির প্রহরে প্রহরে বিকট চীৎকার করে। আর আমাদের বাড়ির প্রায় সম্মুখের দিকে পরাণবাবু নামক এক বৃদ্ধ বাস করেন, তিনি পঞ্চাশ বৎসর বয়স অতিক্রম করার পরে শাস্ত্রানুসারে বনগমন না করিয়া পুত্রহীনতার অছিলায় এক পঞ্চদশী বালিকাকে সেই শাস্ত্রের দোহাই দিয়া তথাকথিত বিবাহরূপ শৃঙ্খলে আবদ্ধ করিয়া গৃহে আনিয়া রাখিয়াছেন। প্রায় প্রতিদিনই রাত্রে ঐ বৃদ্ধ নেশা করিয়া সেই মেয়েটিকে নির্দ্দয়রূপে প্রহার করেন, এবং তাহার রোদন-শব্দে আমার ঘুম ভাঙিয়া যায়। আমি প্রায়ই শুইয়া শুইয়া এই হতভাগিনীর দুরদৃষ্টের বিষয় চিন্তা করি। তাহার নাম মালিনী, দেখিতে বেশ সুন্দরী, এখন আমার প্রায় সমান বয়সী, ছাদের উপর হইতে আমার সঙ্গে কথা কয়। কিন্তু বড়ই আশ্চর্য্য, সে তাহার স্বামীর বিরুদ্ধে কোন দিনই একটা কথা বলে নাই—যে রাত্রে এত কাঁদে, দিনের বেলায় তাহার কথাবার্ত্তায় বোধ হয় সে যেন কত সুখী। আমি তাহার এই স্লেভ মেণ্টালিটি (দাসীর ন্যায় মনোভাব) দেখিয়া অবাক হই। ইহাই ত হিন্দুর বিবাহ—ইহাতে মানুষের মনুষ্যত্ব থাকে না, মানুষের স্বাধীনতা লোপ করিয়া তাহাকে পিঞ্জরাবদ্ধ পাখী অথবা লৌহকারাগারে আবদ্ধ পশুর ন্যায় করিয়া রাখে। অন্য জাতির মধ্যে এই দাসত্বশৃঙ্খল ছেদনের উপায় আছে, কিন্তু পোড়া হিন্দুসমাজে যে এক দিনের জন্য বন্দী, সে চিরজীবনের জন্য বন্দী হয়। স্ত্রীজাতির উপর সমাজের এই ঘোর অত্যাচারের কথা আমি যখনই চিন্তা করি, তখনই আমার মন বিদ্রোহী হইয়া উঠে। ইহা লইয়া দাদার সঙ্গে আমার কত তর্ক, কত ঝগড়া হয়। সেজন্য দাদা আমার নাম দিয়াছে ম্যামেজন অর্থাৎ রণরঙ্গিণী।

আমাদের ভাগ্যনিয়ন্তা পুরুষজাতির প্রতি আমার বিদ্বেষের আরও অনেক কারণ আছে। স্ত্রী ও পুরুষের মধ্যে কি খাদ্যখাদক সম্বন্ধ? বিধাতা বনের বাঘকে যেমন নরমাংস-লোলুপ করিয়া সৃষ্টি করিয়াছেন, স্ত্রীজাতি কি সেইরূপ পুরুষ-জাতির ভোগ্য হইবার অভিপ্রায়ে সৃষ্ট হইয়াছে? আমাদের তথাকথিত শিক্ষিত যুবকদিগের ভাবভঙ্গী দেখিয়া যেন তাহাই বোধ হয়। আমাদের কলেজের গাড়ী কলেজের গেটের সম্মুখে ফুটপাথের কাছে আসে আর আমরা গাড়ী হইতে বাহির হইয়া পড়ি। তখন সেই ফুটপাথের উপর আমাদিগকে দেখিবার জন্য কত তৃষিত চক্ষু একদৃষ্টে তাকাইয়া থাকে। বলিতে লজ্জা হয়,

এই দর্শকদিগের মধ্যে ভদ্রবেশধারী যুবকের সংখ্যাই বেশী। এ-দেশে স্ত্রীলোকেরা প্রায়ই অন্তঃপুরের বাহিরে যায় না, পর্দ্দার আড়ালে থাকে তাই রক্ষা, নতুবা তাহাদিগকে সর্ব্বদা বাহিরে দেখিতে পাইলে এই সকল নারীমাংসলোলুপ ব্যাঘ্রগণ যে কি করিত তাহা আমি ভাবিয়া পাই না। সে দিন এই বিষয় লইয়া দাদার সঙ্গে আমার তর্ক হইতেছিল। দাদা বলে, আমাদের দেশের পর্দ্দাপ্রথাই এই জন্য দায়ী। পুরুষগণ নারীদিগকে গৃহের বাহিরে দেখিতে অভ্যস্ত নয় বলিয়া ফাঁকতালে কৌতূহল চরিতার্থ করিবার প্রবৃত্তি তাহাদের মধ্যে সর্ব্বদা জাগরূক থাকে। আর যেখানে স্ত্রীপুরুষের মধ্যে মেলামেশার সুযোগ আছে সেখানে পুরুষের এরূপ অযথা কৌতূহল থাকে না। কথাটা সত্য হইলেও সম্পূর্ণ সত্য নহে। কত ইংরেজী উপন্যাসে পড়িয়াছি, একটি তরুণী রমণী (বিশেষ সে যদি সুন্দরী হয়) পথঘাটে রেলষ্টীমারে কত লোকের দৃষ্টি আকর্ষণ করে, যদিও এই বর্ব্বরোচিত লোলুপতার জন্য তাহারা আবার ধমকও খায়।

সেদিন একটা বেশ মজা হইয়াছিল। লতিকা নামে আমার কলেজের একটি সঙ্গী আছে। সে বিলাত-ফেরৎ মিঃ সি. বোসের মেয়ে, খুব সুন্দরী, উত্তম বেশভূষা করিতে ভালবাসে, ইঙ্গ-বঙ্গ সমাজে চলাফেরায় অভ্যস্ত। আমরা একসঙ্গে বায়স্কোপ দেখিতে গিয়াছিলাম। আমরা যখন বাহিরে আসিতেছিলাম, তখন দুই-তিনটি যুবক একটু দূরে দাঁড়াইয়া আড়চোখে আমাদের দিকে তাকাইয়া কি বলা-বলি করিতেছিল। লতি অমনি সপ্রতিভ ভাবে তাহাদের নিকট গিয়া বলিল, 'এই আমি আপনাদের সামনে এসে দাঁড়ালুম. কি বলতে চান সামনা-সামনি বলুন।' তাহার সেই রণোন্মুখী মূর্ত্তি দেখিয়া তাহারা হতভম্ব হইয়া পরস্পরের মুখ চাওয়া-চাওয়ি করিতে লাগিল। লতি বলিল, 'ছিঃ, আপনারা না ভদ্রলোক. আপনারা না লেখাপড়া শিখেছেন?' তখন একটি ছোকরা হাতজোড় করিয়া বলিল, 'আমরা কোন দোষ মনে করি নাই, আমাদের মাপ করুন।' আমি তখন লতির হাত ধরিয়া টানিয়া আনিয়া গাড়ীতে আসিয়া উঠিলাম।

দাদা বলে, পুরুষেরা যে মেয়েদের দিকে আকৃষ্ট হয়, ইহাতে সে বেচারাদের দোষ কি? ঈশ্বরই তাঁহার গূঢ় উদ্দেশ্য সাধনের জন্য স্ত্রীজাতিকে পুরুষের চোখে রমণীয় করিয়া সৃষ্টি করিয়াছেন। তার পর নারীরা আবার তাঁহাদের স্বাভাবিক সৌন্দর্য্য নানা কৃত্রিম উপায়ে অর্থাৎ মনোহর বেশভূষা দ্বারা বাড়াইয়া থাকেন। ইহাতে পুরুষ-বেচারাবা সেই রূপের মোহে মুগ্ধ না হইয়া যাবে কোথায়? কিন্তু আমি দাদার এই যুক্তি মানি না। ঈশ্বর নারীজাতিকে এরূপ কোন হীন উদ্দেশ্যে সৃষ্টি করিয়াছেন আমি তাহা বিশ্বাস করি না। পুরুষের ন্যায় নারীরও একটা স্বাধীন সত্তা আছে, পুরুষের ন্যায় নারীও স্বতন্ত্রভাবে তাহার জীবনের সার্থকতা সম্পাদন করিতে পারে। পুরুষ আপন স্বার্থসিদ্ধির জন্য নারীকে আপন পদতলে দলিত করিয়া রাখিয়াছে। এখন নারীর উপযুক্ত শিক্ষা দীক্ষা লাভ করিয়া নিজের স্বাতন্ত্র্য সংস্থাপন করিবার সময় আসিয়াছে। যাহা হউক, আমি এই সকল বিষয় চিন্তা করিয়া আমাদের হিন্দুসমাজের প্রচলিত প্রথা অনুসারে বিবাহের ফাঁদে ধরা দিয়া নিজের স্বাতন্ত্র্য বিসর্জ্জন দিতে সম্মত হই নাই, এ-কথা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। আমি এই সকল বিষয় লইয়া কেবল দাদার সঙ্গে তর্ক করিয়া ক্ষান্ত হই নাই। আমি এ-সম্বন্ধে একটা প্রবন্ধ লিখিয়া 'ভারতপ্রভা' নামক মাসিক পত্রিকায় পাঠাইয়াছিলাম। তাহাতে নিজের নাম না দিয়া একটা ছদ্মনাম দিয়াছিলাম। ঐ প্রবন্ধ ছাপা হইয়াছিল।

ক্রমশঃ

বিদ্যাসুন্দর-উপাখ্যানের মুসলমানী রূপ

শ্রীচিন্তাহরণ চক্রবর্ত্তী, এম-এ

সম্প্রতি পল্লীসাহিত্যপ্রচারনিষ্ঠ অধ্যাপক মুহম্মদ মনসুর উদ্দীন সাহেব 'শিরণী' এই নাম দিয়া পাবনা অঞ্চলে প্রচলিত একটি মুসলমানী রূপকথা স্বতন্ত্র পুস্তিকাকারে প্রকাশিত করিয়াছেন।* গল্পটির গ্রাম্য নাম বোধ হয় 'দরজীর শাস্তর'। সংক্ষেপে গল্পটি এইরূপ :—

এক দরজী এক বাদশাহের নিকট হইতে পাঁচশত টাকা মজুরী লইয়া একটি সূতার ময়ূর তৈয়ার করিল। 'সতী মার সতী ব্যাটা' পৃষ্ঠে আরোহণ করিলে ময়ূর উড়িতে পারিবে—দরজী এইরূপ বলিলে বাদশাহ সতীর পুত্রের সন্ধানে লোক পাঠাইলেন। কিন্তু সতীপুত্র পাওয়া গেল না। তখন বাদশাহের সদ্যোবিবাহিত পত্নী সোনালু বিবির গর্ভজাত সাত দিন মাত্র বয়সের রহিমকেই অগত্যা সেই ময়ূরের পিঠে চড়ান হইল। দরজীর অলৌকিক ক্ষমতার বলে ময়ূর উড়িতে উড়িতে বহু উর্দ্ধে উঠিয়া গেল। দরজীর নিষেধসত্ত্বেও বাদশাহ তাহাকে আরও উপরে উঠাইতে বলিলেন। ক্রমে ময়ূর চক্ষুর অগোচর হইয়া গেল। এখন তাহাকে নীচে নামান দরজীর ক্ষমতার বাহিরে। তাই দরজী আর তাহাকে নামাইতে পারিল না।

সাত দিন পরে সমুদ্রের ওপারে ময়ূর নামিল। তখন সন্ধ্যা হইয়াছে তাই রহিম পার্শ্ববর্ত্তী গ্রামের এক ফুল বাগানে শুইয়া রাত্রি কাটাইল। পরদিন দেখা গেল—অনেকদিনের মরা বাগানে ফুল ফুটিয়াছে। মালিনী সকালে ফুল তুলিতে গিয়া রহিমকে দেখিয়া অবাক হইয়া গেল। রহিম তাহাকে 'মাসী' বলিয়া ডাকিল—নিজেকে তাহার বোনপো বলিয়া পরিচয় দিল এবং তাহারই কুটীরে আশ্রয় লইল। মালিনী বাদশাহের বাড়ি ফুল জোগাইত।

গ্রাম্য কৃষক যে ভাষায় এই রূপকথার আবৃত্তি করিয়াছে, সংগ্রাহক মহাশয় তাঁহার পুস্তকে সেই ভাষার পরিবর্ত্তন না করিয়া ভাষাতত্ত্বের আলোচনাকারীদিগের ধন্যবাদভাজন হইয়াছেন। সাধারণ পাঠকও ভূমিকায় নির্দ্দিষ্ট কতিপয় প্রাদেশিক শব্দের সাহায্যে ইহা পড়িয়া আমোদ পাইবেন সন্দেহ নাই। পুস্তকখানির মুদ্রণভঙ্গীর একটি বৈচিত্র্য লক্ষ্য করিবার বিষয়। আরবী ফারসী উর্দ্দুর ধরণে বইখানি পড়িতে হয় ডান দিক হইতে বাম দিকে। এরূপভাবে বাংলা বই ছাপান অবশ্য এই প্রথম নহে—মুসলমানী বাংলায় লেখা বহু গ্রন্থ এইরূপ ভাবে মুদ্রিত হইয়া মুসলমান সমাজে প্রচারিত হইয়াছে। তবে সে সব বই কেবল মুসলমান সমাজের মধ্যেই চলে—সাধারণ বাঙালীর নিকট তাহা আদৌ পরিচিত নহে। অধ্যাপক মনসুর উদ্দীন সাহেব বাংলা সাহিত্যে সাধারণ ভাবে এই রীতি প্রবর্ত্তন করিবার উদ্দেশ্যেই এইরূপ ভাবে পুস্তকখানি ছাপিয়াছেন কি-না তাহা বুঝিবার কোনও উপায় নাই। ভূমিকায় তিনি এই মুদ্রণরীতি সম্বন্ধে কোন কথাই বলেন নাই এবং মনসুর উদ্দীন সাহেবের মত লব্ধ-প্রতিষ্ঠ যে সকল আধুনিক মুসলমান সাহিত্যিকের লেখসম্ভারে বাংলা সাহিত্য সমৃদ্ধ হইয়া উঠিতেছে তাঁহাদের মধ্যে অন্য কেহ তাঁহাদের প্রকাশিত গ্রন্থে এরূপ রীতি অনুবর্ত্তন করিয়াছেন বলিয়া আমাদের জানা নাই।

বাদশাহ তাঁহার স্ত্রী উজীর এবং 'তোলাপতি' কন্যা—এই চারজনকে সে মালা দিত। এক দিন মাসীকে অনুরোধ করিয়া রহিম মালা গাঁথিবার ভার লইল এবং তোলাপতি কন্যার মালা বিনাসূতায় গাঁথিয়া উহার উপর নিজের নাম লিখিয়া দিল। কন্যা মালা দেখিয়া মুগ্ধ হইল এবং তাহাকে ধামা ভরিয়া 'জিলাপী, মণ্ডা, সন্দেশ ইত্যাদি অনেক দিল।' মালিনীর বাড়ীতে নূতন কেহ আসিয়াছে কি না জানিবার জন্য অনেক পীড়াপীড়ি করায় অগত্যা মালিনী বলিল যে তাহার একটি বোনঝি আসিয়াছে। কন্যার অনুরোধে মালিনী তাহাকে বোনঝিটি দেখাইতে স্বীকৃত হইল। ইতিমধ্যে একদিন রহিম ময়ূরে আরোহণ করিয়া বাদশাহের বাড়ি ঘুরিয়া ফিরিয়া দেখিয়া আসিল।

নির্দ্দিষ্ট দিনে মনোহর স্ত্রীবেশে সজ্জিত হইয়া রহিম মালিনীর সহিত তোলাপতির অন্দরমহলে প্রবেশ করিল এবং তাহার খাটের নীচে বসিয়া রহিল। যথাসময়ে উভয়ের সাক্ষাৎ হইল। তোলাপতির বহু অনুরোধেও কিন্তু মালিনী তাহার বোনঝিকে বাদশাহের বাড়িতে রাখিয়া যাইতে রাজী হইল না।

এদিকে রহিম ময়ূরে চড়িয়া তোলাপতির অন্দরে যাওয়া-আসা করিতে লাগিল। ক্রমে তোলাপতির গর্ভসঞ্চার হইল। তাহাকে প্রতিদিন ওজন করা হইত—তোলাদারের কাছে তাহার ওজনবৃদ্ধির সংবাদ পাইয়া বাদশাহ চোর ধরিবার জন্য কড়া পাহারার বন্দোবস্ত করিলেন। তোলা-পতি ওজনবৃদ্ধি বিষয়ে বলিল—খাওয়া বেশী হওয়ায় এবং টক খাওয়ায় শ্লেষ্মার জন্য তাহার শরীর ভার হইয়াছে।

পাহারাদার চোর ধরিবার জন্য নূতন রকম মতলব আঁটিয়া বাদশাহের দ্বারা হুকুম দেওয়াইল—রাত্রিতে কোন ধোপা কাপড় কাচিতে পারিবে না। তারপর সে এক মণ তেল ও এক মণ সিন্দুর লইয়া তোলাপতি কন্যার মহলের থাম, বরগা এবং অন্যান্য সমস্ত জায়গায় মাখাইয়া দিল।

রহিম রাত্রিতে যখন থাম বাহিয়া তোলাপতির মহলে নামিল তখন তাহার সমস্ত কাপড়-চোপড় সিন্দুরে রঞ্জিত হইয়া গিয়াছে। সে তৎক্ষণাৎ ধোপাবাড়ি গিয়া ধোপা এবং তাহার স্ত্রীকে সেই রাত্রেই তাহার কাপড় কাচিয়া দিবার জন্য অনেক কাকুতি মিনতি করিল এবং পাঁচশত টাকা বক্‌শিস্ দিতেও রাজী হইল। অনেক কথা কাটাকাটির পর অর্থলোলুপ স্ত্রীর বিশেষ অনুরোধে অগত্যা ধোপা কাপড় কাচিতে লাগিল। কাপড় কাচার শব্দ শুনিয়া কোতোয়াল আসিয়া তখনই তাহাকে ধরিল। রহিম কাছেই বসিয়াছিল। তাহাকেও গ্রেপ্তার করা হইল।

বাদশাহের হুকুমে জল্লাদ রহিমকে দৃঢ়বন্ধনে বদ্ধ করিয়া বধ্যস্থানে লইয়া গেল। তোলাপতি তেতলার ছাদে ছুরি হাতে দাঁড়াইয়া রহিল এবং রহিমের মৃত্যুসংবাদ পাইলেই সে আত্মহত্যা করিবে এইরূপ সঙ্কল্প করিল।

এদিকে জল্লাদেরা রহিমের অদ্ভুত ময়ূরের কথা শুনিয়া তাহার উপর চড়িয়া দেখিল এবং রহিমকে একবার চড়িতে অনুরোধ করিল। এই অবসরে রহিম ময়ূরে চড়িয়া উপরে উঠিয়া গেল এবং ময়ূরের পাখার আঘাতে বাদশাহের বাড়ি ভাঙ্গিয়া ফেলিতে লাগিল। তখন বাদসাহ কন্যার উপদেশানুসারে গলবস্ত্র হইয়া যুক্তকরে উর্দ্ধদৃষ্টি হইয়া প্রার্থনা করিতে

---

* শিরণী। দরজীর শাস্তর।—অধ্যাপক মুহম্মদ মনসুর উদ্দীন, এম-এ সংগৃহীত। কলিকাতা, এম, সি, সরকার এণ্ড সন্স; পনের কলেজ স্কোয়ার। দাম বারো আনা। রয়াল—/০—'৶০+১—৪২।

লাগিলেন—'তুমি যে দেবতা হও, আমার দোষ ক্ষমা কর। আমি তোমার নিকট কন্যার বিবাহ দিব।'

এই কথা শুনিয়া রহিম তখনই ময়ূর লইয়া নামিয়া আসিল। বাদশাহ ভাল দিন দেখিয়া তাহার সহিত নিজ কন্যার বিবাহ দিলেন। পরে যখন জানিতে পারিলেন যে রহিমও বাদশাহের ছেলে তখন তিনি খুবই সন্তুষ্ট হইলেন।

এইখানেই গল্পের প্রথম অংশ শেষ। তোলাপতির সহিত বিবাহের পর কিছু দিন সুখে কাটাইয়া এবং কয়েকটি পুত্র লাভ করিয়া দেশে ফিরিয়া যাইবার পথে রহিম ও তাহার স্ত্রীপুত্রদিগকে নানাস্থানে কিরূপে নানা দুঃখকষ্ট ভোগ করিতে হইয়াছিল পরবর্ত্তী অংশে তাহার বিবরণ দেওয়া হইয়াছে।

আমরা এই প্রবন্ধে গল্পের পূর্ব্বাংশ লইয়াই আলোচনা করিব। এই অংশের সহিত বাংলা দেশে সুপরিচিত বিদ্যাসুন্দর-উপাখ্যানের অনেকাংশে যে সাদৃশ্য রহিয়াছে তাহা বিশেষ লক্ষ্য করিবার বিষয়। বিদ্যাসুন্দরের উপাখ্যান নানাস্থানে নানা আকারে দেখিতে পাওয়া যায়। এই উপাখ্যানের এবং এজাতীয় অন্যান্য উপাখ্যানের বিভিন্নরূপের পরিচয় আমি অন্যত্র দিয়াছি।* আলোচ্য গল্পে আমরা এই উপাখ্যানের আর একটি রূপ পাইতেছি বলিয়া মনে হয়। বিদ্যাসুন্দর উপাখ্যানের আদিরূপ কি, ইহার মূল উৎস কোথায় এবং এজাতীয় অন্যান্য উপাখ্যানের সহিত ইহার সম্বন্ধ কি, এই সব বিষয়ে যথেষ্ট আলোচনার অবকাশ আছে। তাই এই গল্পটির দিকে সাহিত্যিকবর্গের দৃষ্টি আকর্ষণ করা কর্ত্তব্য। এই গল্পে বিদ্যা অথবা সুন্দরের নাম নাই সত্য, তবে ইহা যে বিদ্যাসুন্দর উপাখ্যানের অন্যরূপ তাহা অস্বীকার করা চলে না।† সুন্দর যেরূপ বিনাসূতায় মালা গাঁথিয়া এবং সেই মালার মধ্যে নিজ পরিচয়-শ্লোক লিখিয়া মালিনী মাসীর মারফত রাজবাড়িতে বিদ্যার নিকট প্রেরণ করিয়াছিল এখানে রহিমের তোলাপতির নিকট মালা প্রেরণ তাহার অনুরূপ। বিদ্যাসুন্দর উপাখ্যানে সুন্দর শুকপক্ষীর সাহায্যে বিদ্যার বাড়ির অনেক খবর সংগ্রহ করিয়াছিল—এই গল্পে রহিম ময়ূরের সাহায্যে নিজেই তোলাপতির বাড়ির সমস্ত প্রত্যক্ষ করিয়া আসিয়াছে। বিদ্যা ও সুন্দরের প্রথম সাক্ষাৎকার হয় স্নানের ঘাটে—এখানে রহিম ও তোলাপতির প্রথম সাক্ষাৎ তোলাপতির বাড়িতেই হয়। দুই গল্পের পার্থক্য এই যে, সাক্ষাৎকারের সময় রূপকথার নায়ক স্ত্রীবেশ ধারণ করিয়াছিল এবং এই সাক্ষাৎকারের সময় পরস্পরের কোনও আলাপ হওয়ার ইঙ্গিত রূপকথাকার দেন নাই। বিদ্যাসুন্দরের মিলন কতকগুলি উপাখ্যানের মতে সুরঙ্গপথে হইত, রূপকথার নায়ক নায়িকার মিলন হইত আকাশপথে। রূপকথার ন্যায় বিদ্যাসুন্দরের কোন কোন উপাখ্যানে সিন্দুরের সাহায্যে চোরকে ধরিবার কথা পাওয়া যায়। তবে বিদ্যাসুন্দরের উপাখ্যানে দেখিতে পাই যে, চোর বিদ্যার ঘরেই ধরা পড়িয়াছিল—রূপকথায় কিন্তু দেখি চোর ধরা পড়িল ধোপার বাড়িতে। রূপকথার বাদশাহ নায়কের অত্যাচার সহ্য করিতে না পারিয়া আত্মরক্ষার জন্য একরূপ বাধ্য হইয়াই নিজ কন্যার সহিত নায়কের বিবাহ দিয়াছিলেন। বিদ্যাসুন্দরের উপাখ্যানে কিন্তু এরূপ বাধ্যতার কোন উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায় না; বরং সুন্দরের প্রেমের গভীরতা ও গুণবত্তায় রাজা মুগ্ধ হইয়া গিয়াছিলেন এরূপ ইঙ্গিতই বিদ্যাসুন্দরের কোন কোন উপাখ্যানে পাওয়া যায়।

সর্ব্বাপেক্ষা লক্ষ্য করিবার বিষয় হইতেছে এই যে বাংলায় বিদ্যাসুন্দরের উপাখ্যানগুলিতে ধর্ম্মপ্রচারের যে ভাব স্পষ্ট অভিব্যক্ত হইয়াছে রূপকথায় তাহার কোনও উল্লেখ নাই। ধর্ম্মপ্রসঙ্গবর্জ্জিত এই রূপকথা বিদ্যাসুন্দরের উপাখ্যানগুলির মূল ভিত্তি, কি বিদ্যাসুন্দরের প্রচলিত উপাখ্যান অবলম্বনে এই রূপকথা পরিকল্পিত তাহা নির্ণয় করিবার উপায় নাই। তবে এমন হওয়া আশ্চর্য্য নয় যে, প্রথমে বিদ্যাসুন্দরের উপাখ্যান ধর্ম্মপ্রসঙ্গবর্জ্জিত বিশুদ্ধ প্রেমের কথামাত্র ছিল। কালক্রমে এই কথার মধ্য দিয়াই নানা দেবতার মাহাত্ম্য প্রচার করিবার চেষ্টা করা হইতে লাগিল।

এই গল্প বিদ্যাসুন্দর উপাখ্যানের মূল হউক বা না হউক কাশীনাথের বিদ্যাবিলাপ প্রভৃতি প্রাচীন গ্রন্থের মত ইহাতে সুড়ঙ্গের উল্লেখ না থাকায় ইহাকে প্রাচীন বলিয়া মনে করা যাইতে পারে। তবে, ইহা কতদিনের পুরাতন তাহা নিশ্চিতভাবে বলিবার উপযোগী কোনও প্রমাণ এখন পর্য্যন্ত পাওয়া যায় নাই। শ্রীযুক্ত দীনেশচন্দ্র সেন মহাশয় লিখিয়াছেন* 'বহু প্রাচীন ফার্সীতে রচিত একখানি প্রাচীন বিদ্যাসুন্দর আমরা দেখিয়াছি।' এই ফার্সী গ্রন্থ ঠিক কোন্ সময়ে রচিত হইয়াছিল এবং তাহার সহিত বর্ত্তমান রূপকথার কোনও সম্পর্ক আছে কি-না তাহা অনুসন্ধান করা দরকার। মোটের উপর বিদ্যাসুন্দরের উপাখ্যানমূলক বিস্তৃত সাহিত্য-রাজ্যে এই রূপকথা কোন্ স্থান অধিকার করিবার যোগ্য তাহা নির্ণয় করিবার চেষ্টা করা উচিত। এই রূপকথা এবং দীনেশবাবুর উল্লিখিত ফার্সী বিদ্যাসুন্দরের সময় নিরূপণের উপযোগী উপকরণ সংগ্রহ করিবার জন্য আমরা সাহিত্যিকগণকে—বিশেষতঃ মুসলমান সাহিত্যিকবর্গকে—অনুরোধ করি। বিদ্যাসুন্দরের ফার্সী গল্পটি প্রকাশ করাও দরকার।

বিদ্যাসুন্দর উপাখ্যানের প্রথম পরিকল্পনা ভারতচন্দ্র করেন নাই, তাঁহার পূর্ব্বে কঙ্ক কৃষ্ণরাম, কবিশেখর প্রভৃতি একাধিক কবি এই উপাখ্যান অবলম্বনে গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন। ভারতচন্দ্র এই উপাখ্যানকে সাধারণের নিকট বিশেষ ভাবে প্রচারিত ও আদৃত করিয়াছিলেন মাত্র। এই সর্ব্বজনসমাদৃত উপাখ্যানের মূল উৎস এখন পর্য্যন্ত আবিষ্কৃত হয় নাই। বর্ত্তমান প্রবন্ধে আলোচিত রূপকথার মত কোন সর্ব্বজনপ্রচলিত রূপকথার মধ্যেই হয় ত একদিন উহা আবিষ্কৃত হইবে। সকল দেশের রূপকথাই কালক্রমে সাহিত্যের ভিত্তিবন্ধন করিয়াছে। কিন্তু দুঃখের বিষয়, আমাদের দেশের রূপকথা এখনও শৃঙ্খলাবদ্ধভাবে আগ্রহের সহিত আলোচিত হয় নাই।

* সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা ১৩৩৬, পৃঃ ৫১ প্রভৃতি। কালিকামঙ্গল (সাহিত্য-পরিষদ্ গ্রন্থাবলী সং ৭৯)—ভূমিকা (পৃ. ./০—৸০)

† আশ্চর্য্যের বিষয় অধ্যাপক মনসুর উদ্দীন সাহেবের চোখে এই সাদৃশ্য আদৌ ধরা পড়ে নাই। তিনি 'শিরণী'র ভূমিকায় এই গল্পের সহিত Enchanted Horse নামক আরবীয় গল্পের যে কিছু কিছু সাদৃশ্য আছে কেবল তাহারই উল্লেখ করিয়াছেন।

* বঙ্গভাষা ও সাহিত্য (পঞ্চম সংস্করণ)—পৃঃ ৪৭৭।

স্মৃতি-পাথেয়

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

একদিন কোন্ তুচ্ছ আলাপের ছিন্ন অবকাশে
সে কোন্ অভাবনীয় স্মিত হাসে
অন্যমনা আত্মভোলা
যৌবনেরে দিয়ে ঘন দোলা
মুখে তব অকস্মাৎ প্রকাশিল কী অমৃতরেখা,
কভু যার পাই নাই দেখা,
দুর্ল্লভ সে প্রিয়
অনির্ব্বচনীয়।

হে মহা অপরিচিত
এক পলকের লাগি হয় সচকিত
গভীর অন্তরতর প্রাণে
কোনো দূর বনান্তের পথিকের গানে ;
যে অপূর্ব্ব আসে ঘরে
পথহারা মুহূর্ত্তের তরে
বৃষ্টিধারামুখরিত নির্জ্জন প্রবাসে
সন্ধ্যাবেলা যূথিকার সকরুণ স্নিগ্ধ গন্ধশ্বাসে,
চিত্তে রেখে দিয়ে গেল চিরস্পর্শ স্বীয়
তাহারি স্খলিত উত্তরীয়।

সে বিস্মিত ক্ষণিকেরে পড়ে মনে
কোনোদিন অকারণে ক্ষণে ক্ষণে
শীতের মধ্যাহ্নকালে গোরুচরা শস্যরিক্ত মাঠে
চেয়ে চেয়ে বেলা যবে কাটে।
সঙ্গহারা সায়াহ্নের অন্ধকারে সে স্মৃতির ছবি
সূর্য্যাস্তের পার হ'তে বাজায় পূরবী।

পেয়েছি যে-সব ধন যার মূল্য আছে
ফেলে যাই পাছে।
সেই যার মূল্য নাই, জানবে না কেও,
সঙ্গে থাকে অখ্যাত পাথেয় ॥

পল্লী-সংস্কার ও শিল্প-প্রতিষ্ঠা

শ্রীহেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ

দীর্ঘ সাতাশ বৎসর পূর্ব্বে ১৯০৭ খৃষ্টাব্দে আমি 'কলিকাতা রিভিউ' পত্রে বাংলার পল্লীর অবনতি সম্বন্ধে একটি প্রবন্ধ লিখিয়াছিলাম। তাহা 'প্রবাসী'র শ্রদ্ধেয় সম্পাদক মহাশয়ের দৃষ্টি আকৃষ্ট করিয়াছিল এবং তিনি নবেম্বর মাসের 'মডার্ণ রিভিউ' পত্রে তাহার উল্লেখ করিয়া বলিয়াছিলেন—বাংলার পল্লীগ্রামের উন্নতিসাধন দুঃসাধ্য হইলেও অসাধ্য নহে। জাতিহিসাবে বাঙালীর অস্তিত্ব এই সমস্যার সমাধানের উপর নির্ভর করিতেছে; কারণ, বাংলার শত করা ৯৫ জন লোক পল্লীগ্রামবাসী। তিনি দেশের শিক্ষিত লোকদিগের নিকট ঐ মূল প্রবন্ধের ও তাহার অনুবাদ প্রচার করিতে বলেন এবং আমাকে উপদেশ দেন —আমি যেন কিছুকাল এ-বিষয়ে লোকমত গঠনকার্য্যে আত্মনিয়োগ করি।

তাঁহার সেই উপদেশ আমি বিস্মৃত হই নাই এবং তদবধি সাংবাদিকরূপে এ-বিষয়ে বাংলার শিক্ষিত-সম্প্রদায়ের মনোযোগ আকৃষ্ট করিতে চেষ্টা করিয়াছি। কিন্তু দুঃসাধ্য কার্য্য দিন দিন যেন অসাধ্য হইয়া আসিয়াছে। কার্য্যের বিরাটত্ব স্বায়ত্ত-শাসনবঞ্চিত দেশের লোককে নিরাশ করিয়াছে এবং ইংরেজের আমলাতন্ত্র এদিকে মনোযোগ দেন নাই। ফলে দাঁড়াইয়াছে, নগরে নগরে 'পরদীপমালা' আরও উজ্জ্বল হইয়াছে এবং পল্লীগ্রাম 'যে তিমিরে সে তিমিরে'ই থাকে নাই পরন্তু তাহার দুর্দ্দশার অন্ধকার নিবিড়তর হইয়াছে। যত দিন গিয়াছে, পল্লী তত জনহীন ও শ্রীহীন হইয়াছে; তথায় পানীয় জলের অভাব অনুভূত হইয়াছে, জলনিকাশের ব্যবস্থা উপেক্ষিত হইয়াছে, স্বাস্থ্য ক্ষুণ্ণ হইয়াছে, দেবায়তন ধূলিসাৎ হইয়াছে, অযত্নে যে-সব লতাগুল্ম বর্দ্ধিত হয় সে-সকল স্বচ্ছন্দে পরিত্যক্ত বাসস্থান অধিকার করিয়াছে। পল্লীগ্রামের লোকের দারিদ্র্য বৃদ্ধির নানা কারণের মধ্যে শিল্পধ্বংস যে অন্যতম তাহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। কিন্তু এ-দেশের যে-সব শিল্প সকল সভ্য দেশে প্রসিদ্ধ ছিল এবং যে-সকল শিল্পের উৎপন্ন পণ্যের বিনিময়ে দেশের লোক বিদেশ হইতে অর্থ আহরণ করিত সে-সকল শিল্পই পল্লীগ্রামে পরিচালিত হইত। তিন হাজার বৎসর পূর্ব্বে যে-সব পণ্য বিক্রয় করিয়া ভারতবর্ষ ধনশালী হইয়াছিল, সে-সবই পল্লীগ্রামে উৎপন্ন হইত।

সার জর্জ্জ বার্ডউড তাঁহার ভারতীয় শিল্পবিষয়ক পুস্তকে লিখিয়াছেন :—

"গ্রামের প্রবেশ-পথের বাহিরে উচ্চ ভূমিতে বসিয়া কুম্ভকার তাহার চক্রে করসঞ্চালন দ্বারা নানা দ্রব্য প্রস্তুত করিতেছে। গৃহগুলির পশ্চাতে গমনাগমন পথে কয়খানি তাঁত চলিতেছে, সেগুলির সানা বৃক্ষে ঝুলান আছে এবং নীল, লোহিত ও স্বর্ণসূত্রে যখন বস্ত্র বয়ন করা হইতেছে তখন সূত্রের উপর বৃক্ষ হইতে ফুল ঝরিয়া পড়িতেছে। পথে পিত্তলের ও তাম্রের পাত্রাদি প্রস্তুতকারীরা সশব্দে কাজ করিতেছে। ধনীর গৃহে অলিন্দে বসিয়া স্বর্ণকার ও মণিকার চারিদিকের ফল ও ফুল এবং বিকশিত শতদল পুষ্করিণীর কূলে আম্রকুঞ্জ মধ্যে অবস্থিত দেবায়তনের প্রাচীরে অঙ্কিত চিত্র হইতে আদর্শ লইয়া নানারূপ অলঙ্কার প্রস্তুত করিতেছে।"

অর্দ্ধ শতাব্দী পূর্ব্বেও সার জর্জ্জ ভারতের পল্লীগ্রামে এই দৃশ্য প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন। অর্দ্ধ শতাব্দীর মধ্যে সে অবস্থা সম্পূর্ণ পরিবর্ত্তন হইয়াছে। ধনীরা গ্রাম ত্যাগ করিয়া আসিয়াছেন; গ্রামে আর শিল্প নাই বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। এখন গ্রামের লোক অন্য স্থান—বিশেষ বিদেশ হইতে আমদানী দ্রব্য ব্যবহার করিতেছে। কৃষির আয় হ্রাস হইলে তাহারা আর কিছুতেই পরিবার পালন করিতে পারে না। পল্লীগ্রামে বেকারের সংখ্যা বাড়িতেছে এবং যে মধ্যবিত্ত 'ভদ্র' সম্প্রদায় সমাজের মেরুদণ্ড ছিলেন, তাঁহারা গ্রাম ত্যাগ করিয়া আসিতেছেন।

এই অবস্থায় পৃথিবীব্যাপী আর্থিক দুর্দ্দশার উদ্ভব হইয়াছে। জার্ম্মান যুদ্ধের পরই এই অবস্থা ঘটিয়াছে। ইউরোপে নেপোলিয়নিক যুদ্ধ শেষ হইলে একবার কতকটা এইরূপ দুর্দ্দশা ঘটিয়াছিল। সে যুদ্ধের অবসানে কৃষক তাহার পণ্য বিক্রয়ের বাজার হারাইয়াছিল, সৈনিকরা কর্ম্মচ্যুত হইয়াছিল, সমর-সরঞ্জামপ্রস্তুতকারীরা আর কোন কাজ পায় নাই। কিন্তু জার্ম্মান যুদ্ধের বিরাটত্ব অধিক এবং যান্ত্রিক যুগের উন্নতিকালে তাহা সংঘটিত হয়। কাজেই এবার আর্থিক দুর্দ্দশা অধিক

হইয়াছে। এই দুর্দ্দিনে লোক আবার পল্লীগ্রামের কথা মনে করিতেছে; লোক বুঝিতেছে, পল্লীগ্রামে যাইয়া আবার সরল জীবন-যাত্রার পদ্ধতি অবলম্বন না করিলে আর উপায় নাই। কিন্তু বাংলার পল্লীগ্রামের যে অবস্থা হইয়াছে, তাহাতে তথায় যাইয়া 'ভদ্র'-সম্প্রদায়ের লোক কিরূপে অন্নসংস্থান করিবে? সরকার এতকাল পল্লীগ্রামের দিকে দৃষ্টিপাত করেন নাই। ফলে পল্লীগ্রাম শ্রীভ্রষ্ট হইয়াছে।

আর কোন দেশে সরকারের পক্ষে এরূপ ভাবে প্রদেশের শতকরা ৯৫ জন লোকের বাসস্থান উপেক্ষা ও অবজ্ঞা করা সম্ভব কিনা সন্দেহ; কারণ, আর কোন দেশে শাসনের ব্যয়বাহুল্যে দেশের কল্যাণকর কার্য্য সম্পন্ন করিবার উপযোগী অর্থের অভাব হইলে শাসকদিগের পরিবর্ত্তন অবশ্যম্ভাবী হয়—মন্ত্রিমণ্ডল কার্য্য ত্যাগ করিতে বাধ্য হইয়া থাকেন। বাংলার ব্যবস্থাপক সভা থানায় থানায় একটি করিয়া দাতব্য চিকিৎসালয় প্রতিষ্ঠা করিবার প্রস্তাব গ্রহণ করেন। সরকার অর্থাভাবে সেই ক্ষুদ্র প্রস্তাবটিও কার্য্যে পরিণত করেন নাই। সংপ্রতি বাংলা সরকার ম্যালেরিয়া-নাশের নূতন উপায় পরীক্ষার জন্য বার্ষিক বিশ হাজার টাকা মঞ্জুর করিয়াছেন। কিন্তু বড়লাটের কলিকাতায় সফরে আগমনে যে ইহা অপেক্ষা অনেক অধিক অর্থব্যয় হইয়াছে, তাহা বলাই বাহুল্য। মন্ত্রীর পর মন্ত্রী আশা দিয়াছেন, পল্লীগ্রামে পানীয় জল সরবরাহের সুব্যবস্থা শীঘ্রই হইবে; কার্য্যকালে দেখা গিয়াছে বিশেষ কিছু হয় নাই।

চিত্তরঞ্জন দাশ মহাশয় যখন বাংলার রাজনীতি ক্ষেত্রে আবির্ভূত হন, তখন তিনি পল্লী-সংস্কারের প্রয়োজন উপলব্ধি করিয়া দেশবাসীর নিকট হইতে সংগৃহীত অর্থে একটি ধনভাণ্ডার স্থাপিত করিয়া তাহার আয় পল্লী-সংস্কারকার্য্যে ব্যয়ের ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। কিন্তু তাহার কি হইয়াছে, তাহা সেই ভাণ্ডারের ভারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা দেশের লোকের গোচর করা প্রয়োজন বা কর্ত্তব্য বলিয়া বিবেচনা করেন নাই।

বলা বাহুল্য, পল্লী-সংস্কারের কতকগুলি কাজ সরকার ব্যতীত দেশের লোক সঙ্ঘবদ্ধ হইয়াও করিতে পারেন না। দৃষ্টান্তস্বরূপ বাংলার হাজা-মজা নদীসমূহের সংস্কারের উল্লেখ করা যাইতে পারে। এইরূপ বিরাট কার্য্য সরকারকেই করিতে হয়। বাংলার নদীগুলির দুর্দ্দশা যে বাংলার স্বাস্থ্য ও সম্পদ নষ্ট করিয়াছে, তাহা সকলেই জানেন। যিনি মিশরে নীল নদের প্রবাহ নিয়ন্ত্রিত করিয়া অসাধ্য সাধন করিয়াছিলেন সেই বিশ্ব-বিখ্যাত পূর্ত্তবিদ্যাবিৎ স্যর উইলিয়ম্ উইলকক্স স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া পরিণত বয়সে এ-দেশে আসিয়া বাংলার নদীগুলির উন্নতি সাধনোপায় নির্দ্দেশ করিয়াছিলেন। বাংলা সরকার সে-কথায় কর্ণপাত করেন নাই।

এইরূপে সরকারের কর্ত্তব্যে উপেক্ষায় ও দেশের লোকের অসহায় ভাবজনিত উদ্যমাভাবে বাংলার পল্লীগ্রাম রোগের আকর ও দারিদ্র্যের কেন্দ্র হইয়াছে। অথচ আজ সকলেই উপলব্ধি করিতেছেন, গ্রামে ফিরিয়া যাওয়া প্রয়োজন।

শিক্ষিত লোকেরা গ্রামে থাকিলে তবে গ্রামের স্বাস্থ্যোন্নতির উপায় হইতে পারে। তাঁহাদিগের আন্দোলনে সরকার, জেলা বোর্ড প্রভৃতি কর্ত্তব্যে অবহিত হইতে পারেন। কিন্তু তাঁহাদিগের গ্রামে থাকিবার সর্ব্বপ্রধান অন্তরায়—গ্রামে অর্থোপার্জ্জনের উপায়ের অভাব। সকল দেশ যখন স্ব-স্ব শিল্পের উন্নতিসাধন করিয়া অর্থোপার্জ্জনের উপায় করিতেছে, তখন এ-দেশে সে-বিষয়ে কোন প্রয়াসই লক্ষিত হয় নাই। কোন কোন শহরে প্রতীচ্য প্রথায় বড় বড় কলকারখানা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে বটে, কিন্তু পল্লীগ্রামে যে-সব শিল্প স্বল্পব্যয়ে প্রতিষ্ঠিত ও পরিচালিত হইতে পারে, যে-সব শিল্পের দ্বারা গ্রামের লোকের নিত্যব্যবহার্য্য পণ্য উৎপন্ন করা যায়, সে-সব শিল্পের দিকে এতদিন কেহ দৃষ্টিপাত করেন নাই।

আয়ার্লণ্ডে স্যর হোরেস প্লাঙ্কেট প্রমুখ উৎসাহী কর্ম্মীরা সরকারের সাহায্য গ্রাহ্য না করিয়া সমবায় নীতিতে দেশের শিল্পের উন্নতিসাধনের চেষ্টা করিয়াছিলেন, সফলকামও হইয়াছিলেন। তাহার পর বিলাতের পার্লেমেণ্ট আয়ার্লণ্ডে শিল্পের উন্নতিসাধনের উপায় নির্দ্ধারণের জন্য কমিটি গঠিত করিয়াছিলেন। আমাদিগের দুর্ভাগ্যক্রমে এ-দেশে সেরূপ কোন লোকনায়কের আবির্ভাব হয় নাই।

কিন্তু দেশের দারিদ্র্য দিন-দিন বর্দ্ধিত হইয়াছে, দেশে বেকারের সংখ্যাও বাড়িয়াছে। দেশে সন্ত্রাসবাদ বা বিভীষিকাবাদের বিস্তারে সরকার বিব্রত হইয়াছেন—তাঁহারা সর্ব্বরোগহর মনে করিয়া দমননীতি অবাধে প্রয়োগ করিয়া বুঝিয়াছেন তাহা উপযুক্ত ভেষজ নহে। সঙ্গে সঙ্গে তাঁহারা বুঝিতে পারিয়াছেন, যতক্ষণ লোককে অন্নার্জ্জনের উপায়

দেখাইয়া দিতে পারা না যাইবে, ততক্ষণ তাহাদিগের মন হইতে অসন্তোষ দূর করা যাইবে না। বাংলার গবর্ণর স্যর জন এণ্ডারসনই স্বীকার করিয়াছেন :—

(১) যেরূপ মনোভাব লোককে সন্ত্রাসবাদী করে, শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মধ্যে কাজের অভাব সেইরূপ মনোভাবের সৃষ্টি করে, এবং

(২) স্বল্পব্যয়সাধ্য শিল্প প্রতিষ্ঠার দ্বারা লোকের অন্নার্জ্জনের উপায় করিয়া দিলে লোক তাহাতেই ব্যাপৃত থাকিতে পারে।

সেই জন্য অর্থাৎ বাংলার ভদ্র সম্প্রদায়ের বেকাররা যাহাতে সন্ত্রাস-বা বিভীষিকাবাদে বিরত হয় সেই চেষ্টায় বাংলা সরকার সম্প্রতি কতকগুলি শিল্প লোককে শিক্ষা দিবার ব্যবস্থা করিয়াছেন। দেশের আর্থিক উন্নতিসাধন যদি এই ব্যবস্থার পরোক্ষ উদ্দেশ্য না হইয়া প্রত্যক্ষ উদ্দেশ্য হইত, তবে আমরা বিশেষ আনন্দিত হইতাম। কারণ তাহা হইলে সরকার এই ব্যবস্থার জন্য অধিক অর্থব্যয় করিতে প্রস্তুত হইতেন। বর্ত্তমানে ইহার জন্য যে অর্থব্যয় করা হইবে স্থির হইয়াছে তাহা কার্য্যের গুরুত্ব ও ব্যাপকতার তুলনায় যথেষ্ট বলিয়া কখনই বিবেচিত হইতে পারে না। তবে আশা করা যাইতে পারে, এই কাজ দেশের লোকে আরম্ভ করিতে পারেন।

কতকগুলি শিল্পে উন্নত পদ্ধতির প্রবর্ত্তন যে সরকারের কারখানায় উদ্ভাবিত ও পরীক্ষিত হইতেছিল, তাহা এখন জানা গিয়াছে। শিল্প-বিভাগের বাঙালী ইঞ্জিনিয়ার শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র মিত্র এজন্য প্রশংসাভাজন। তাহার সর্ব্বপ্রধান কারণ তিনি যখন বাংলার বিবিধ উটজ শিল্পে উন্নত পদ্ধতি প্রবর্ত্তন করিয়া উৎপন্ন পণ্যের মূল্য হ্রাসের চেষ্টায় পরীক্ষা করিতেছিলেন, তখন বাংলা সরকার বেকার সমস্যার সহিত বিভীষিকাবাদের সম্বন্ধ সন্দেহ করেন নাই এবং অদূর ভবিষ্যতে যে সরকার লোককে শিল্পশিক্ষা প্রদানের ব্যবস্থা করিবেন ইহাও মনে করিবার কোন কারণ ছিল না। পরন্তু অন্যান্য প্রদেশের তুলনায়ও বঙ্গদেশে শিল্প সম্বন্ধে সরকারের চেষ্টা অযথারূপ অল্প ছিল। দেখা গিয়াছে বাংলা সরকার ইণ্ডাষ্ট্রিয়াল ইঞ্জিনিয়ার নিযুক্ত করিলেও কয় বৎসর তাঁহার পরীক্ষার জন্য কারখানার কোন ব্যবস্থা করেন নাই! অর্থাৎ তাঁহারা চাবুক চিনিয়াছিলেন বটে, কিন্তু ঘোড়া চিনিবার প্রয়োজন অনুভব করেন নাই। এমন কি, অন্যান্য প্রদেশে শিল্পে সরকারের সাহায্য প্রদানের জন্য আইন প্রণীত হইলেও বঙ্গদেশে বহুদিন তাহা হয় নাই। এখনও সে আইনের বিধান অনুসারে কোন কাজ হইতেছে না। অথচ মাদ্রাজে সরকারের শিল্প-বিভাগ কতকগুলি শিল্প প্রতিষ্ঠিত করিয়া সেগুলির পরিচালন জন্য যে-সব কলকারখানা স্থাপিত হইয়াছিল সে-সব লোকের নিকট বিক্রয় করিয়া প্রজাসাধারণের সহিত প্রতিযোগিতায় বিরত হইয়াছেন।

আমরা পূর্ব্বে আয়ার্লণ্ডে স্যর হোরেস প্ল্যাংকেট প্রমুখ ব্যক্তিদিগের কৃতকার্য্যের উল্লেখ করিয়াছি। তাঁহাদিগের কার্য্যের সাফল্যের যে কারণ ছিল এ-দেশেও সেই কারণ বিদ্যমান। এ-দেশও তৎকালীন আয়ার্লণ্ডের মত ইংরেজের অধীন—এদেশেও সেদেশের মত সরকারের অনুসৃত নীতির ফলে বহু শিল্প নষ্ট হইয়াছে—এ-দেশেও সে-দেশের মত সরকার দেশের শিল্পের উন্নতির জন্য কোন উল্লেখযোগ্য চেষ্টা করেন নাই। কিন্তু এ-দেশে স্যর হোরেসের মত নেতার আবির্ভাব হয় নাই—জাতির জন্মগত অধিকার লাভপ্রচেষ্ট নেতারা রাজনীতিক আন্দোলনে মন দিয়াছেন, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে অর্থনীতিক উন্নতির প্রতি সক্রিয় মনোযোগ প্রদান করেন নাই। সত্য বটে কোন কোন রাজনীতিক নেতা নিত্যব্যবহার্য্য দ্রব্য সম্বন্ধে জাতির পরবশ্যতার বিপদের উল্লেখ করিয়াছিলেন, পরলোকগত গোপালকৃষ্ণ গোখলে কংগ্রেসের সভাপতির অভিভাষণে ইহার উল্লেখ করিয়াছিলেন এবং স্থানে স্থানে কংগ্রেসের সহিত স্বদেশী শিল্পপ্রদর্শনী প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল, কিন্তু ধারাবাহিক ভাবে কার্য্য পরিচালিত হয় নাই।

সেরূপ কাজ সরকার কখনই করেন নাই। স্যর জর্জ্জ বার্ড-উড, ডাক্তার ওয়াট প্রভৃতি কোন কোন ইংরেজ রাজকর্ম্মচারী ভারতীয় শিল্পের গুণে আকৃষ্ট ছিলেন বটে, কিন্তু লর্ড কার্জ্জনের মত বড়লাটও ভারতীয় শিল্পের উন্নতির কোন স্থায়ী ব্যবস্থা করিতে পারেন নাই। লর্ড কার্জ্জন ১৯০২ খৃষ্টাব্দে দিল্লীতে দরবারের অঙ্গ হিসাবে যে শিল্পপ্রদর্শনী প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন তাহা উপলক্ষ্য করিয়া তিনি বলিয়াছিলেন বিদেশী ক্রেতাদিগের অনুগ্রহে কোন দেশের উটজ শিল্প স্থায়িত্ব লাভ করিতে পারে না—তাহা যদি দেশের লোকের ভাবের সহিত সামঞ্জস্য রক্ষা করিয়া দেশের লোকের প্রয়োজন সিদ্ধ

করিতে পারে, তবেই তাহা প্রতিযোগিতায় আত্মরক্ষা করিতে পারে, নহিলে নহে। তাহা স্মরণ রাখিয়া—এখনও ভারতের নানা স্থানে—নগরে ও গ্রামে বহু শিল্পী ভারতীয় শিল্পের বৈশিষ্ট্য রক্ষা করিয়া দেশের লোকের প্রয়োজনীয় সুন্দর সুন্দর পণ্য উৎপাদন করিতে পারে, তাহাই দেখাইবার জন্য তিনি প্রদর্শনীর কল্পনা করিয়াছিলেন।

লর্ড কার্জ্জন এ-দেশে যে-সব উটজ শিল্পের উন্নতির জন্য বিশেষ আগ্রহ প্রকাশ করিয়াছিলেন, সেই সকলই দেশের রাজনীতিক নেতৃগণের মনোযোগ আকৃষ্ট করে নাই। তাঁহারা ইউরোপের অনুকরণে এদেশে বড় বড় কলকারখানার প্রতিষ্ঠা কল্পনা করিয়াছিলেন, সেজন্য সরকারকে শিল্পসংরক্ষণনীতি অবলম্বন করিতে বলিয়াছিলেন, কিন্তু দেশের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শিল্প তাঁহাদিগের নিকট উপেক্ষিত হইয়াছিল। তাঁহারা এদেশে কাপড়ের কল প্রতিষ্ঠার দ্বারা বিদেশী কাপড়ের আমদানি বন্ধ করিবার জন্য আন্দোলন করিয়াছিলেন, কিন্তু কিসে এদেশের সর্ব্বপ্রধান উটজ শিল্প—বয়নশিল্প—উন্নতি লাভ করে সে-বিষয়ে অবহিত হন নাই। তাঁহারা গঠনকার্য্য তাঁহাদিগের কার্য্য-পদ্ধতির অন্তর্ভুক্ত করেন নাই। বহুব্যয়সাধ্য বড় বড় কলকারখানার প্রয়োজনে ও উপযোগিতায় কোনরূপ সন্দেহ প্রকাশ না করিয়াও বলা যায়, জাপানের মত এ-দেশেও চেষ্টা করিলে বহু উটজ শিল্প এই যান্ত্রিক যুগেও আত্মরক্ষা করিতে ও বহু লোকের অন্নসংস্থানের উপায় করিতে পারে। সেই সকল শিল্পের সহিত এ-দেশের পল্লীগ্রামের উন্নতি অচ্ছেদ্যভাবে সম্বদ্ধ। বঙ্গের অঙ্গচ্ছেদের বিরুদ্ধে যখন আন্দোলন হয়, তখন হাতের তাঁত চালাইবার চেষ্টা হইয়াছিল, খদ্দর সরবরাহের জন্য এখনও তাহা হয়। কিন্তু কোন চেষ্টাই যথেষ্ট ব্যাপক হয় নাই। সরকার যদি দেশে ছোট ছোট শিল্প প্রতিষ্ঠার পথপ্রদর্শন করেন, তবে দেশের লোকের পক্ষে সে সুযোগ সাগ্রহে গ্রাহ্য করা কর্ত্তব্য। আমাদিগের অর্থে সরকারের পরীক্ষাগারে—কারখানায় যে-সব পরীক্ষা সম্পন্ন হয় সে-সকলের ফল দেখিয়া দেশের লোক যদি সমবায় নীতি গ্রাহ্য করিয়া শিল্পপ্রতিষ্ঠায় তৎপর হইতে পারেন তবে বাংলার প্রত্যেক পল্লীগ্রামকে শ্রীসম্পন্ন করিবার কার্য্য বহু দূর অগ্রসর হয়।

আমরা যে লোককে সমবায় নীতিতে এই কার্য্যভার গ্রহণ করিতে বলিতেছি, তাহার বিশেষ কারণ এই যে, যত দিন এ-দেশে প্রকৃত স্বায়ত্তশাসন প্রবর্ত্তিত না হইবে অর্থাৎ যত দিন দেশের লোক আপনাদিগের সরকারের নীতি নিয়ন্ত্রিত করিবার অধিকার লাভ না করিবে, তত দিন সরকারের অবলম্বিত এই নীতি অক্ষুণ্ণ থাকিবে কি-না, সে-বিষয়েও সন্দেহের যথেষ্ট অবকাশ থাকিবে। বিশেষ বর্ত্তমান ক্ষেত্রে সরকার সন্ত্রাস-বাদের প্রতিকারকল্পেই শিল্পশিক্ষা প্রদানের উপায় অবলম্বন করিয়াছেন। সুতরাং কোন কারণে এই সন্ত্রাসবাদের অবসান ঘটিলে যে এই কার্য্য ত্যক্ত হইবে না, তাহাই বা কে বলিতে পারে? জার্ম্মান-যুদ্ধের সময় যখন ভারতবর্ষের অসহায় অবস্থা তাহার বিদেশ হইতে নিত্যব্যবহার্য্য দ্রব্যের আমদানি বন্ধে বিশেষভাবে উপলব্ধ হইয়াছিল, তখন বাংলা সরকার স্বদেশী শিল্পজ পণ্যের এক স্থায়ী প্রদর্শনী কলিকাতায় প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন। সে প্রদর্শনীর উপযোগিতা কেহই অস্বীকার করেন নাই। কিন্তু জার্ম্মান যুদ্ধের অবসানের পরই সরকার সে প্রদর্শনী বন্ধ করিয়া দিয়াছিলেন। সেই সময় বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভায় সরকারের স্বদেশী শিল্পের উন্নতিসাধনের আগ্রহ সম্বন্ধে অনেক কথা শুনা গিয়াছিল বটে, কিন্তু সে আগ্রহে দেশের লোক উপকৃত হয় নাই। বাংলার উটজ শিল্প এক সময়ে বিশেষ উন্নতিলাভ করিয়াছিল। ঢাকা, শান্তিপুর, ফরাসডাঙ্গা, সিমুলিয়া, কুষ্টিয়া প্রভৃতি স্থানের বয়ন-শিল্প সমগ্র ভারতের প্রশংসা অর্জ্জন করিয়াছিল। মেদিনী-পুরের মাদুর দিল্লীর বাদশাহরাও সাদরে ব্যবহার করিতেন। মুর্শিদাবাদের গজদন্তের দ্রব্যাদি দিল্লীর ঐরূপ দ্রব্যাদির সহিত প্রতিযোগিতা করিত। খাগড়ার (মুর্শিদাবাদ) কাঁসার বাসন অতুলনীয় ছিল বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। রংপুরে উৎকৃষ্ট সতরঞ্চি প্রস্তুত হইত। বরিশাল ও যশোহর জেলাদ্বয়ের নানাস্থানে উৎকৃষ্ট ছুরি, দা প্রভৃতি প্রস্তুত হইত। মুর্শিদাবাদ, মালদহ, বীরভূম, বাঁকুড়া প্রভৃতি জেলা রেশমী কাপড়ের জন্য বিশেষ প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিল। চেষ্টা করিলে—পণ্য উৎপাদনের উপায়ে উৎকর্ষ সাধিত হইলে, শিল্পীদিগকে অপেক্ষাকৃত অল্পমূল্যে উপকরণ কিনিবার সুযোগ দিলে ও তাহাদিগের উৎপন্ন পণ্য বিক্রয়ের সুব্যবস্থা করিলে—এই সকল শিল্প পুনরায় উন্নতিলাভ করিতে পারে এবং কালে বহু লোকের অন্নার্জ্জনের উপায় হয়।

এত দিন বাংলা সরকার এ-বিষয়ে উল্লেখযোগ্য কোন কাজ করেন নাই বলিলেও বলা যায়। এই সরকার বার-বার বাংলার শিল্প সম্বন্ধে অনুসন্ধান করাইয়াছেন বটে, কিন্তু অনুসন্ধানের ফল অনুযায়ী কাজ করা হয় নাই। ১৮৮৮ খৃষ্টাব্দে ভারত-সরকার যে আদেশ প্রচার করেন, তদনুসারে মিষ্টার কলিন বাংলার শিল্প-সম্বন্ধে অনুসন্ধান করিয়া ১৮৯০ খৃষ্টাব্দে তাঁহার বিবরণ দাখিল করেন। দশ বৎসর পরে মিষ্টার কামিং আবার ঐরূপ রিপোর্ট রচনা করেন। তিনিই লিখিয়াছেন—

"দুঃখের বিষয় মিষ্টার কলিনের রিপোর্ট কখনও বাহিরে প্রকাশ করা হয় নাই। কেবল রাজকর্ম্মচারীরাই ইহা দেখিয়াছিলেন। সেই রিপোর্টে তিনি যে-সব কাজ করিতে বলিয়াছিলেন, সে-সব আজও করণীয় হইলেও লোক তাহার অস্তিত্বই বিস্মৃত হইয়াছে। পাঁচ বৎসর পরে আমি এই রিপোর্ট চাহিলে আমাকে বলা হয়—ইহা প্রকাশ্য নহে।"

যখন সরকারের একজন কর্ম্মচারী শিল্প-সম্বন্ধে অনুসন্ধান-কার্য্যের জন্য নিযুক্ত হইলেও রিপোর্ট দেখিতে চাহিলে এইরূপ উত্তর লাভ করেন, তখন সেই রিপোর্ট অনুসারে কিরূপ কাজ হইয়াছিল, তাহা সহজেই অনুমান করিতে পারা যায়। ইহার পর মিষ্টার সোয়ান আবার এইরূপ অনুসন্ধান করেন। কিন্তু এই-সব অনুসন্ধানের ফলে বাংলার কোন শিল্প কোনরূপ উপকার লাভ করে নাই।

কাজেই দেশের লোককে দেশের লোকের আর্থিক অবস্থার উন্নতি সাধনের জন্য এই কার্য্যের ভার গ্রহণ করিতে হইবে। যদি সন্ত্রাসবাদ-ব্যাপ্তি সরকারকে বিব্রত না করিত তবে এবার যে সামান্য আয়োজন হইয়াছে, তাহাও হইত কি-না সন্দেহ। কারণ সন্ত্রাসবাদের সহিত বেকার-সমস্যার সম্বন্ধের বিষয় বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার এক জন বেসরকারী সদস্য মন্ত্রীকে জানাইবার পূর্ব্বে দেশের লোকও জানিত না—নিম্ন-লিখিত শিল্পগুলি অল্পব্যয়ে উন্নত পদ্ধতিতে পরিচালিত করিবার উপায় সম্বন্ধে বাংলা সরকারের শিল্প-বিভাগ পরীক্ষা করিয়া সুফল লাভ করিয়াছেন :—(১) পিতল-কাঁসার বাসন, (২) কাপড়-কাচা সাবান, (৩) ছুরি কাঁচি প্রভৃতি, (৪) মাটির বাসন প্রভৃতি, (৫) ধান ছাঁটাই, (৬) ছাতা (৭) মোজা ও গেঞ্জী, (৮) শাঁখা। প্রত্যেক শিল্পপ্রতিষ্ঠার জন্য পাঁচ শত হইতে সাত শত টাকা মূলধন প্রয়োজন। সুতরাং যে-স্থানে এক জনের পক্ষে ইহার কোন একটি শিল্প প্রতিষ্ঠিত করা সাধ্যাতীত, সে-স্থানে দুই বা তিন জন একসঙ্গে তাহা করিতে পারে। বাংলার সর্ব্বত্র পিতল ও কাঁসার বাসন, কাপড়-কাচা সাবান, ছুরি, কাঁচি প্রভৃতি, ছাতা, মোজা ও গেঞ্জী, শাঁখা সর্ব্বদা ব্যবহৃত। পিতল ও কাঁসার বাসন অপেক্ষা মূল্যে সুলভ বলিয়াই আজকাল এল্যুমিনিয়মের বাসনের ব্যবহার বাড়িতেছে, এবং সেই কারণেই বিদেশী আমদানী ছুরি, কাঁচি প্রভৃতির বহুল প্রচার হইতেছে। যদি মফঃস্বলে কেন্দ্রে কেন্দ্রে লোক আপনার গৃহে থাকিয়া—পরিবারের, পুণ্য পরিবেষ্টনে এই-সব শিল্প পরিচালিত করিতে পারে, তবে আর তাহাদিগকে গ্রাম ত্যাগ করিয়া যাইতে হয় না। পল্লীবাসীর অন্নসমস্যার সমাধান হইলে তাহাদিগের উদ্যোগে গ্রামের স্বাস্থ্যোন্নতি কার্য্য অনেকটা অগ্রসর হইতে পারে, গ্রামের লোককে বিদ্যাদানের ব্যবস্থাও হইতে পারে। গ্রাম যদি শিক্ষিত অধিবাসীশূন্য না হয়, তবে কৃষির উন্নত পদ্ধতির প্রবর্ত্তনও সহজসাধ্য হয়। গ্রামের উন্নতি নানা অংশে বিভক্ত এবং সে-সবই পরস্পরের সহিত সম্বদ্ধ ও পরস্পরের উপর নির্ভর করে। কেবল পল্লীগ্রামে শিল্পপ্রতিষ্ঠাই যে গ্রামের শ্রী ফিরাইতে পারে, ইহা মনে করা সঙ্গত নহে। কিন্তু পরস্পরসাপেক্ষ যে-সব উপায়ে গ্রামের শ্রী ফিরান সম্ভব, শিল্পপ্রতিষ্ঠা যে সে-সকলের অন্যতম, তাহা অবশ্য-স্বীকার্য্য।

সুপ্রতিষ্ঠিত উটজ শিল্প কিরূপে লোকের অন্নের উপায় করিতে পারে সম্প্রতি বিলাতে বিহারের পর্দ্দার আদরে তাহা দেখিতে পাওয়া গিয়াছে। বিহার ও উড়িষ্যার সরকার এই পর্দ্দা, সতরঞ্জি, প্রভৃতি বিক্রয়ের জন্য বিলাতে একজন লোক নিযুক্ত করিয়াছেন। এখন বিলাতের ও ইউরোপের অন্যান্য দেশের বড় বড় দোকানদার বিহারের পর্দ্দা প্রভৃতি কিনিতেছেন এবং পাটনার উটজ শিল্প-প্রতিষ্ঠান সে-সব যোগাইতেছে। বর্ত্তমান ব্যবসা-মন্দার বাজারেও বিদেশে বিহারের পর্দ্দার আদর কমে নাই। বিচিত্র বর্ণের সমাবেশই এই-সব পর্দ্দার বৈশিষ্ট্য। বিহার ও উড়িষ্যার সরকার ইহা বিদেশে পরিচিত করাইতেই তথায় ইহার আদরলাভ সম্ভব হইতেছে।

বিহারের পর্দ্দা সম্বন্ধে যাহা বলা যায়, বাংলার ছাপা রেশমী কাপড় সম্বন্ধেও তাহাই বলা যায়। কিন্তু বিদেশে বাংলার উদ্ভিজ্জ বর্ণে রঞ্জিত এই-সব কাপড় বিক্রয়ের সুব্যবস্থা এখনও হয় নাই।

আমরা বাংলা-সরকারের শিল্পশিক্ষা প্রদানের যে ব্যবস্থার উল্লেখ করিয়াছি, তাহা প্রয়োজনের অনুরূপ নহে। যে-কয়টি শিল্পে উন্নত পদ্ধতি প্রবর্ত্তনের সংবাদ পাওয়া গিয়াছে বর্ত্তমানে যে সেই কয়টি শিল্পই শিক্ষা দেওয়া হইবে বা সকল জেলায় শিক্ষা দেওয়া হইবে, তাহাও নহে। আপাততঃ মাত্র চারিটি জিলায় ইহার মধ্যে কয়টি শিল্প শিক্ষা দিবার জন্য যাযাবর শিক্ষকদল প্রেরণ করা হইতেছে। ইহার ব্যয়-নির্ব্বাহ করিবার জন্যও কয়জন বেসরকারী বাঙালী অর্থ সাহায্য দিয়াছেন। সাহায্যকারীদিগের মধ্যে শিল্প-বিভাগের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রীর ও ইণ্ডাষ্ট্রিয়াল ইঞ্জিনিয়ারের নাম দেখিয়া মনে হয়, ইঁহারা এইরূপ শিল্পশিক্ষাদানের প্রয়োজন ও উপযোগিতা বিশেষভাবে উপলব্ধি করিয়াছেন বলিয়াই নিশ্চেষ্ট সরকারের ঔদাস্য দূর করিবার চেষ্টায় প্রবৃত্ত হইয়াছেন।

এইজন্যই আমরা বাংলার লোককে এ-বিষয় সরকারের উপরই নির্ভর না করিয়া সরকারের কার্য্যের সুযোগ গ্রহণ করিয়া স্বাবলম্বী হইতে বলিতেছি। আমরা তাঁহাদিগকে আয়ার্লণ্ডের আদর্শ গ্রহণ করিতে অনুরোধ করিতেছি। যে-দেশে সরকার বেকারদিগের সংখ্যানির্ণয়ের চেষ্টাও করেন না—তাহাদিগের প্রাণধারণের উপায় করা ত পরের কথা—যে-দেশের সরকার লোকমতের উপর আত্মপ্রতিষ্ঠার প্রয়োজন অনুভব করেন না, সে-দেশের সরকারের স্বরূপ উপলব্ধি করিলেই দেশের অধিবাসিগণ স্বাবলম্বনের প্রয়োজন বিশেষভাবে অনুভব করিবেন। সুতরাং সরকারী সাহায্যের স্বল্পতায় বিস্মিত না হইয়া দেশের লোককে গঠনকার্য্যের ভার আপনাদিগকে গ্রহণ করিতে হইবে। দেশের শিক্ষিত লোকরা এই কাজ করিলে কেবল যে দেশের আর্থিক দুর্গতির প্রতিকার করিতে পারিবেন তাহাই নহে; পরন্তু সঙ্গে সঙ্গে জনগণের নেতৃত্বের অধিকারও অর্জ্জন করিবেন, এবং দেশের ভিন্ন ভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে তাহাতে যে ঘনিষ্ঠতার সৃষ্টি ও পুষ্টি হইবে, তাহা জাতীয়তার জন্য বিশেষ প্রয়োজন। পল্লীগ্রামে গঠনকার্য্যের প্রয়োজন বাংলার শিক্ষিত লোকদিগকে উপলব্ধি করিয়া কার্য্যে প্রবৃত্ত হইতে হইবে।
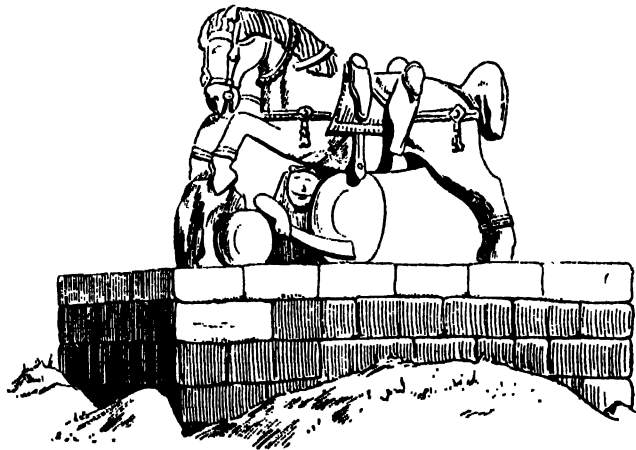
পুত্র

শ্রীপ্রভাতমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়

ভাল আমি বাসিয়াছি এই বসুধারে ;
রাত্রি দিবসের পাত্রে আলোকে আঁধারে
অবিরাম পান করি এর স্তন্যসুধা
আজও তৃষ্ণা মিটে নাই ; আজও স্নেহক্ষুধা
বক্ষে মোর জেগে আছে। যত দেখি' চেয়ে
নিত্য মা'র মুখপানে, চিত্তে উঠে ছেয়ে
আরতির ধূপগন্ধ ; ভাষাহীন স্তবে
কণ্ঠ মৌন হয়ে রয়। কে আমারে কবে—
কারো যা পড়ে না চোখে মোর চোখে কেন
তারা পড়ি প্রতিপদে—স্বপ্ন রচে হেন ?
গ্রামান্তে প্রান্তর মাঝে কেন দ্বিপ্রহরে
শুচিস্মিতা মাতৃমূর্ত্তি মোর চোখে পড়ে
হেমন্তের শস্যক্ষেত্রে ? প্রদোষ বেলায়
সুনিবিড় মহারণ্যে বিটপিমেলায়
তপস্বিনী জননীরে প্রশান্ত নয়নে
চাহিয়া থাকিতে দেখি কেন অন্যমনে ?
কেন মহাম্বুধি-বক্ষে চলোর্ম্মিনিকরে
লক্ষ কোটি তরঙ্গের শিখরে শিখরে
ভৈরবী মায়েরে দেখি ? মাতা বসুমতী
বারে বারে লভিয়াছে আমার প্রণতি
নিত্য নবরূপে তা'র ; পুষ্পে পর্ণে তৃণে
নিত্য নব উপহারে নিত্য নব ঋণে
বাঁধিছে নিবিড় ক'রে মোরে প্রতিদিন।
আমি তার মুগ্ধ ভক্ত চির স্নেহাধীন।
পুত্রের আসনখানি দাবি করিবারে
স্থাবর জঙ্গম জড় মা'র পরিবারে
আমি করিয়াছি পণ যেই দিন হ'তে,
সেই দিন অকস্মাৎ দুর্নিবার স্রোতে
বাঁধ মোর ভেঙে গেছে আচারে বিচারে,—
সমাজে সংসারে ঘরে। মাতা বলি যারে

আনন্দে নিয়েছি ভাগ, তার বেদনার
বিষপাত্র হ'তে যদি একটি কণার
ভাগ লয়ে যেতে পারি, ধন্য হ'ব তবে—
নীলকণ্ঠ দেবতার পূজা পূর্ণ হ'বে।

আজি মোর চক্ষে পড়ে বিপুলা বিশালা
ধরিত্রীর বক্ষ-জুড়ি কোটি বন্দীশালা
কতরূপে কত দিকে তুলিয়াছে মাথা
লোভ দিয়া হিংসা দিয়া দম্ভ দিয়া গাঁথা
কত না ভেদের গণ্ডী ! কুৎসিত কামনা
কি সৌম্য সুন্দর বেশে কহিছে, "থামো না।
আর আগে যেতে নাই।" কেন এই ভেদ ?
সে-কথা জানিতে মানা, ভাবিতে নিষেধ !
ভাষা দিয়া শাস্ত্র দিয়া রুচি দিয়া গড়া
অর্থহীন নিষেধের উদ্যত প্রহরা
চারিদিকে জেগে আছে ; দুর্ব্বলের 'পরে
সবলের অত্যাচার দৃপ্ত দম্ভভরে
আপনার ন্যায্য স্বত্ব করিছে প্রমাণ
পশুবলে নখদন্তে। পশুর সমান
মানুষে অবজ্ঞা করি রাখি দুর্দ্দশায়
মানুষ সভ্যতা গড়ে, নগর বসায় ;
অমানুষ ভোগপুরী রচি তুলে নিতি
আত্মীয়ের তপ্তরক্তে ভিজাইয়া ক্ষিতি ;
আমি ধরিত্রীর পুত্র, এরে বিধাতার
বিধি ব'লে নতশিরে করিতে স্বীকার
লজ্জা পাই ; অবিচারে পারিনে মানিতে,
আপনার প্রাপ্য বলি ; ধিক্কারে গ্লানিতে
চিত্ত মোর ভরি উঠে অপমানে যবে
লাঞ্ছিত ভুলিতে চায় বিলাসে উৎসবে।

জলে স্থলে বনে শৈলে গ্রামে ও নগরে
ছলে বলে প্রতি নীড়ে, বিবরে কোটরে
গুহা-গর্ভে পর্ণশালে প্রাসাদের মাঝে
যেথা যত অত্যাচার নিত্যকাল রাজে,—
যেথা যত শতাব্দীর পুঞ্জিত অন্যায়
বার্দ্ধক্যের দাবি করে,—জীবন-বন্যায়
তাদের ভাষায়ে দেব যে ক'টিরে পারি।
রাষ্ট্রে প্রজা মুক্তি পাবে, সংসারেতে নারী ;
জগতের পশুপাখী মানব-শাসনে
ভোগ্য হয়ে আছে যারা জড়বস্ত্র সনে—
তাহাদের মুক্তি দেব। এই বসুধার
সন্তান যে যেথা আছে সবারে উদার
উন্মুক্ত আকাশতলে পথ ছাড়ি দিয়া
মানুষ যেদিন তার শুভ বুদ্ধি নিয়া
নিখিলে রহিবে জাগি ; স্নেহস্পর্শে তার
শান্ত হবে সর্ব্বপ্রাণী, সকল ব্যথার
যেদিন সমাপ্তি হবে ধরিত্রীর বুকে,—
সে-দিনের পথ চাহি মোরা হাসিমুখে
আজিকার এ দুর্দ্দিনে দীন কামনায়
উদ্বেল সাগরবক্ষে ক্ষুদ্র জীর্ণ নায়
দুঃসাহসে দিছি পাড়ি ; কোথা এর শেষ ;
কোথায় নিশ্চিহ্ন হবে কে দিবে উদ্দেশ ?

আমি ধরিত্রীর পুত্র, মোরে দেছে ধরা
আপন স্বরূপে তার মাতা বসুন্ধরা
সুদূর অতীতে ; হায় সেদিন কে জানে,—
এত বড় সৌভাগ্যের দুরূহ সম্মানে
সহ্য করা কি কঠোর ! কত বড় দাবি
স্নেহের পশ্চাতে রহে ! আজ তাই ভাবি,
সেদিন পড়ে নি কেন এ-কথাটি মনে ?
আজ শ্রান্ত জীর্ণ তনু শিথিল যৌবনে ;
বক্ষে আশা আছে কিন্তু দেহে নাই বল ;
মধ্য দিনে মধ্য পথে বিকল বিহ্বল ;
লক্ষকোটি লাঞ্ছিতের তপ্ত দীর্ঘশ্বাসে
অতীতের সুখ-স্বপ্ন ম্লান হয়ে আসে ;
ক্ষুদ্র স্বার্থ সসঙ্কোচে পাতালে লুকায়।
আজিকে শীতের বনে যে ফুল শুকায়
আমি তার সহযাত্রী, সহোদর ভ্রাতা ;
তার তরে যেই শয্যা পাতিয়াছে মাতা
তারি প্রান্তে তারি মত মোর ঠাঁই হবে।
যাহারা নিষ্ফল হ'ল যুগে যুগে ভবে,—
পরম প্রয়াসে গেল দুটি দণ্ড দিয়া
অস্ফুট সুরভি, লোকে মুহূর্ত্তে শুধিয়া
তাদের দানের ঋণ ক্ষণিক প্রীতিতে
যেমন ফেলিয়া দেছে চির বিস্মৃতিতে—
তেমনি আমার ভাগ্যে আছে তাহা জানি
সংসারের বিস্মরণে ধরণী কল্যাণী
শুধু মোরে ভুলিবে না, এই গর্ব্ব মম।
সংসারে যে যত তুচ্ছ তত প্রিয়তম
সেই যে মায়ের কাছে,—যে যত আহত
মা তাহারে করপদ্ম বুলাইয়া তত
মধুর সান্ত্বনা দেয় ; যে যত নিষ্ফল
মা তত মুছায়ে দেয় তার আঁখিজল
যে নেছে আপন করি মার অপমান
মা তারে আপন হাতে দানিবে সম্মান ;
শ্রান্ত দেহে সন্ধ্যাবেলা ঘুমে যদি ঢুলে
মা তাহারে ভালবেসে বক্ষে লবে তুলে।
এই মোর অহঙ্কার আমি যদি মরি
রব তবে জননীর সর্ব্ব চিত্ত ভরি।—
রাত্রির আঁধারে তার দিনের আলোকে।
মনুষ্য যদ্যপি কেহ ভালবেসে ওকে
পূজা দেয়, কানে কানে দিব তারে কহি
"মা'র চোখে অশ্রুবিন্দু আজও গেছে রহি,
এখন উৎসব মিথ্যা প্রণয় দুরাশা।"
এই মোর শেষ কাজ, এই মোর আশা॥

শ্রমের মর্য্যাদা ও বাঙালীর বিমুখতা

শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র রায়

লেখাপড়া ও চাকরি

কেহ কেহ আমার প্রতি এই অভিযোগ করিয়া থাকেন যে, আমি বাঙালী ছেলেদের কেবল মাড়োয়ারী হইতে বলি,—যেন আমি আমার জীবনে সরস্বতীর উপাসনা বর্জ্জন করিয়া কেবল ধনোপার্জ্জনেই মত্ত আছি। এই অভিযোগটি নিশ্চেষ্টতা ও শ্রমবিমুখতার অজুহাত মাত্র।

স্কুল ও কলেজে বৎসরে প্রায় চার-পাঁচ মাস ছুটি এবং পোষ্ট-গ্রাজুয়েটে সাত মাস, স্থতরাং বিদ্যাশিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে ভবিষ্যৎ জীবনে কি পন্থা অবলম্বন কা... ...বে তাহার উপায় নির্দ্ধারণ ও সেই পথ অনুসরণ করিতে পারিলে বঙালী যুবকের হয়ত এইরূপ দুর্দ্দশাগ্রস্ত হইতে হইত না। কিন্তু গোড়ায়ই গলদ, আজ যে দুর্দ্দিন আসিয়াছে ইহার জন্য ছাত্রগণ অপেক্ষা অভিভাবকগণই বেশী দায়ী। বাস্তবিক তাঁহারা ভাবিয়া দেখেন না যে, বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধিধারীদের কি ভীষণ পরিণাম। আমি বলিয়া বলিয়া হয়রান হইয়াছি যে, দশ হাজার আইনের উপাধিধারীর মধ্যে (বি-এল্; এম্-এ বি-এল্; এম্-এল্; ডি-এল্) হয়ত মাত্র একজন হাইকোর্টের জজ বা এডভোকেট-জেনারেল হইবে এবং এই শ্রেণীর এক হাজার উপাধিধারীর মধ্যে হয়ত একজন মুনসেফ, সবজজ বা পশারী উকিল হইবে। আমি জিজ্ঞাসা করি, আর আর সকলের কি উপায় হইবে? আলিপুর কোর্টে সহস্রাধিক উকিল এবং মফঃস্বল জেলা ও মহকুমায়ও নিতান্ত কম হইবে না। আমার ক্ষুদ্র খুলনা জেলার সদরেই দেড়-শ জন উকিল, এবং সাতক্ষীরা বাগেরহাট প্রত্যেক মহকুমাতেও একশ জনের কম হইবে না।

খোঁজখবর করিয়া জানিয়াছি যে, ইহাদের মধ্যে শতকরা পাঁচ জনের এক প্রকার আয় আছে এবং শতকরা দশ জনের কোন রকমে চলে, আর বাকী যাঁহারা আছেন তাঁহাদের যে কি প্রকারে দিন গুজরান হয় তাহা জিজ্ঞাসা করিলে কোন উত্তর পাই না। তাঁহারা কি বাতাস খাইয়া থাকেন? ছোট আদালতে ও পুলিস কোর্টে গেলে দেখা যায়, উকিলবর্গ একেবারে মৌমাছির মত ঘিরিয়া ফেলে, অনেকের হয়ত ট্রামের ও বাসের ভাড়া জোটে কি-না সন্দেহ। আমি বক্তৃতাপ্রসঙ্গে অনেকবার বলিয়াছি যে, স্যর রাসবিহারী ঘোষ একজন এম্-এ, বি-এল, স্যর আশুতোষ একজন এম্-এ, বি-এল্, শ্রীমান্‌রাও এম্-এ, বি-এল হইবার জন্য ব্যস্ত, কারণ ইউক্লিডের স্বতঃসিদ্ধের মত "যে বস্তুগুলি একই বস্তুর সমান তাহারা পরস্পর সমান হয়।" হায়! কত উজ্জ্বল প্রতিভা 'বহ্নিমুখং পতঙ্গমিব' হুতাশনে ভস্মীভূত হইয়া বিনষ্ট হইয়া যায়, কত আশা-ভরসা, কত উচ্চাকাঙ্ক্ষা মাত্র ত্রিশ-পঁয়ত্রিশ টাকার কেরাণীগিরিতে পর্য্যবসিত হয়; তাহাও আজকাল দুষ্প্রাপ্য। আদালতের একটি নকলনবিশের জন্য বিজ্ঞাপন প্রদত্ত হইলে বোধ হয় কয়েক শত প্রার্থীর আবেদনপত্র আসিয়া দাখিল হয় এবং তাহার মধ্যে এম্-এ, বি-এলও পাওয়া যায়। পঁচিশ বৎসর পূর্ব্বে পরলোকগত ভূপেন্দ্রনাথ বসু মহাশয় একবার বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভায় বলিয়াছিলেন, "The law has been the grave of many brilliant careers" এখন জিজ্ঞাসা করি, এই হৃদয়বিদারক অবস্থার জন্য প্রকৃতপক্ষে দায়ী কে?

পূর্ব্বেই বলিয়াছি 'গোড়ায়ই গলদ'। আসল কথা এই যে আমাদের মা-বাপ ও অভিভাবকগণ বংশপরম্পরায় প্রচলিত এক ভ্রমাত্মক সংস্কার হৃদয়ে পোষণ করিয়া আসিতেছেন যে, যেন-তেন-প্রকারেন বিশ্ববিদ্যালয়ের তকমা না মিলিলে বুঝি জীবন ব্যর্থ হইয়া যাইবে। প্রায় পঁচিশ বৎসর পূর্ব্বে "বাঙালীর মস্তিষ্ক ও তাহার অপব্যবহার" শীর্ষক প্রবন্ধে ইহার কতকটা অবতারণা ও আলোচনা করিয়াছি। রাজনারায়ণ বসুর 'সেকাল ও একাল' পুস্তক পাঠে অবগত হওয়া যায় যে সেই সময় যে-ব্যক্তি কতকগুলি ইংরেজী কথা বা ছড়া বলিত তাহারই জয়জয়কার। ইংরেজ সওদাগরের আপিসে চাকরিরও খুব সুবিধা ছিল।

তাহার পর হিন্দু কলেজ স্থাপিত হইল। হিন্দু কলেজ হইতে সিনিয়র ডিপ্লোমা এমন কি জুনিয়র ডিপ্লোমা পাইলেও অমনি তৈয়ারী চাকরি। তারপর ১৮৫৭ সালে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সৃষ্টি হইল, এমন কি সঙ্গে সঙ্গে আইন বিভাগও খোলা হইল। কিছুকাল 'পাস করা' ছেলেদের চাহিদা বাড়িয়া গেল, কারণ কোম্পানীর রাজত্বের প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে নানা বিভাগও খুলিতে আরম্ভ হইল। সরকারী দপ্তরখানার কলেবর বৃদ্ধি ও কৃষি, পুলিস, অরণ্য ইত্যাদি বিভাগেরও সৃষ্টি হইয়া এই সমস্ত পাসকরা ছেলেদের দ্বারা পরিপূর্ণ হইতে লাগিল। আদালতে আবার পার্শীভাষা স্থলে ইংরেজী ভাষা প্রবর্ত্তিত হইল। বাংলা দেশে সর্ব্বাপেক্ষা ইংরেজী ভাষার বহুল প্রচার। এই সময় বিহার উত্তর-পশ্চিম অঞ্চল পশ্চাৎপদ ছিল। কাজেই যখন বাংলা দেশ এইসব মসীজীবী দ্বারা ছাইয়া গেল, তখন ঐ সব প্রদেশ হইতে ইহাদের ডাক পড়িল। ঝুড়ি ঝুড়ি উপাধিধারী বাঙালী আবার সেইদিকে ঊর্দ্ধশ্বাসে ছুটিল।

লর্ড ডালহৌসীর সময়ে অযোধ্যা, ঝাঁসী, পঞ্জাব প্রভৃতি অধিকৃত হইলে শিক্ষিত বাঙালী পঙ্গপালের ন্যায় সেই দিকে ধাবিত হইল, এবং এ সমস্ত যখন কানায় কানায় পূরিয়া গেল তখন ১৮৮৫ খৃষ্টাব্দে ব্রহ্মদেশ জয় করা হইলে শিক্ষিত বাঙালীরা আবার সেইদিকেও গমন করিল। এই নূতন অধিকৃত ব্রহ্মদেশেও বাংলা দেশের ন্যায় নূতন দপ্তরখানা, আইন আদালত ইত্যাদির সৃষ্টি হইল। এই সময় ব্রহ্মদেশবাসিগণ ইংরেজী লেখাপড়ার ধার ধারিত না, কাজেই অপর প্রদেশের লোকেরা প্রায় সমস্ত চাকরি একচেটিয়া করিয়া বসিল। বাঙালী তখন বুঝিল না, এর পরিণাম কি ভীষণ। এখন এক উত্তর-পশ্চিম অঞ্চলে পাঁচ-ছয়টা বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হইয়াছে। তাহা ছাড়া দিল্লী, পঞ্জাব ও ব্রহ্মদেশেও বিশ্ববিদ্যালয় এবং তাহার অন্তর্ভুক্ত অনেক স্কুল ও কলেজের সৃষ্টি হইয়াছে। এই সব বিশ্ববিদ্যালয় এখন বাংলার সহিত পাল্লা দিয়া গ্রাজুয়েট উদ্গীরণ করিতেছে, কাজেই বাঙালীর প্রতি বিদ্বেষবহ্নিও প্রজ্জ্বলিত হইয়াছে। তাহারা তারস্বরে বলে বিহার প্রদেশ বিহারীদের জন্য, পঞ্জাব পঞ্জাবীদের জন্য, ব্রহ্মদেশ ব্রহ্মীদের জন্য, ইত্যাদি।

১৯১১ সালে যখন বঙ্গের অঙ্গচ্ছেদ রহি হইল তখন রাজধানী কলিকাতা হইতে দিল্লী স্থানান্তরিত হইল। কাজেই ভারত-সরকারের দপ্তরখানা বড় বড় কর্ম্মচারিগণ দিল্লী ও সিমলায় আসি হাজির হইলেন। এখন আর দুর্দ্দশার সীমা নাই। সম্প্রা আমার নয়াদিল্লীতে যাইবার প্রয়োজন হইয়াছিল। সেখা কার প্রবাসী বাঙালীগণ (যাহার মধ্যে শতকরা ৯৯ জ কেরাণী শ্রেণীভুক্ত) বাঙালী স্কুলের প্রাঙ্গণে আমাকে এক অভিনন্দন-পত্র প্রদান করিয়াছিলেন। আবাল-বৃদ্ধ-বনি সংখ্যায় প্রায় আড়াই হাজার তিন হাজার সেখানে সমবে হইয়াছিল। আমি বক্তৃতাপ্রসঙ্গে বলিলাম যে, এই সকল ন যুবকের উপায় কি হইবে?

এখন বুঝা যায় যে, যাঁহারা একবার কলে পড়িয়াছেন তাহাদের দফা রফা। প্রায়ই দেখা যা তাঁহারা আঠার-কুড়ি পঁচিশ টাকায় শহরে থাকিয়া সামা কেরাণীগিরি দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করেন। কিন্তু কিছুতে পাড়াগাঁয়ে যাইতে চাহেন না। আমি জিজ্ঞাসা করি যে-স কলেজের ছাত্রেরা এই প্রকার রাজপুরীর মত হোষ্টে বাস করে তাহাদের মধ্যে কয়জনের দেশে ঐরূপ বাসভব আছে? পাড়াগাঁয়ে যাইতে চাহে না তাহার কারণ এ যে, অধিকাংশ স্থলে তাহাদের বাপ-খুড়োরা এখনও বে সাদাসিধা ভাবে নিজ নিজ ব্যবসা চালাইয়া বেশ দু-পয়স রোজগার করিয়া থাকেন। যশোহর এবং খুলনার দৌলত পুর ও বাগেরহাট অঞ্চলে এখন অনেক বারুজীব আছেন যাঁহারা পানের ব্যবসা করিয়া বেশ সঙ্গতিপ হইয়াছেন। এমন কি, এই শ্রেণীর দশ-বার জন পৈতৃ ব্যবসা অবলম্বন করিয়া নিজ বুদ্ধিবলে জমিদারীও করিয় গিয়াছেন। কিন্তু এখন দেখা যায়, কলেজের ধা মাড়ান কেন, উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়ের দ্বিতীয় অথব তৃতীয় শ্রেণী পর্য্যন্ত পড়িলে তাহাদের মাথা বিগড়াইয়া যায় এবং তাহারা ষাঁড়ের গোবরে পরিণত হয়। কেহ কেহ আমাকে বলিয়া থাকেন, আপনি কলেজের ছেলেদের উপর এত দোষারোপ করেন কেন? কলেজে মাত্র না-হয় পঁচিশ-ত্রিশ হাজার ছাত্র অধ্যয়ন করে, কিন্তু বাংলা দেশে আরও যে লক্ষ লক্ষ ছেলে আছে তাহারা ত ব্যবসা-বাণিজ্য

করিয়া ধনোপার্জ্জনের পথ সুগম করিতে পারে। কিন্তু আমি তাহার উত্তরে বলি, বর্ত্তমান শিক্ষা-প্রণালী যেখানে প্রচলিত সেইখানেই এই বিষ অনুপ্রবিষ্ট। মৌলবী আবদুল করিম শিক্ষাবিভাগের একজন বিচক্ষণ অভিজ্ঞ উচ্চশ্রেণীর স্কুলপরিদর্শক ছিলেন। তিনি অবসরপ্রাপ্ত হইয়াও অনেক সুচিন্তাপূর্ণ বক্তৃতা ও প্রবন্ধ রচনা করিয়াছেন, তাহা হইতে সামান্য অনুবাদ করিয়া দিতেছি।

"এক সময় বাখরগঞ্জ জেলা পরিভ্রমণ কালে আমি দেখিলাম যে, একটি প্রাইমারী স্কুল অর্থাভাবে শোচনীয় অবস্থায় পতিত হইয়াছে. বিদ্যালয়টির পরিদর্শন হইয়া গেলে আমি সেখানকার কতকগুলি লোককে বলিলাম যে, বিদ্যালয়টি যাহাতে বেশ ভাল ভাবে চলে তাহার ব্যবস্থা তোমাদের করা উচিত। আমার কথা শুনিয়া তাহাদের মধ্যে একজন আস্তে আস্তে বলিল, 'যেদিন স্কুল উঠিয়া যাইবে সেইদিন হরির লুট্ দিব'। পরিশেষে যখন আমি সেখানকার পুলিস ইন্‌স্পেক্টরকে ইহার কারণ জিজ্ঞাসা করিলাম, তখন জানিতে পারিলাম যে. ছেলেপিলে সামান্য কিছু লেখাপড়া শিখিয়াই তাহাদের পৈতৃক ব্যবসাকে ঘৃণার চক্ষে দেখে। তাহারা নিজেদের দোকানে বসিয়া বেচা-কেনা করিতে লজ্জা বোধ করে।"

১৩৩৯ সালের মাঘ মাসের 'বসুমতী'তে আমার যে প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছে এবং যাহা চৈত্র মাসের 'প্রবাসী'তে উদ্ধৃত হইয়াছে তাহার এক স্থলে আছে যে, এখন আর হিন্দু ছুতার প্রায়ই দেখা যায় না, ইহার কারণ কি? মিষ্টার কমিং বহু পূর্ব্বে সূক্ষ্ম দৃষ্টির সাহায্যে যাহা দেখিয়াছিলেন তাহা এখন সকলেই বুঝিতে পারিতেছেন। পঞ্চাশ-ষাট বৎসর পূর্ব্বে কলিকাতায় এমন সব হিন্দু রজক ছিল যাহারা মাসে একশ-দেড়শ টাকা রোজগার করিত। বড় বড় জাহাজ গঙ্গার ঘাটে পৌছিলে রাশি রাশি মলিন বস্ত্র এই-সব রজকের নিকট ধৌত. করিবার জন্য বিলি হইত। কিন্তু যখন এই-সব রজকের সন্তানগণ একবার মাত্র ইংরেজী স্কুলে প্রবেশ লাভ করিয়া কোন রকমে দ্বিতীয়, তৃতীয় শ্রেণী পর্য্যন্ত পড়িল অমনি তাহাদের মাথা বিগড়াইয়া গেল। বাঙালী দিন দিন যে শুধু কঠোর প্রতিযোগিতায় পরাজিত হইতেছে তাহা নহে, এই রকম মিথ্যা মর্য্যাদাও তাহাদের সর্ব্বনাশের কারণ হইয়া দাঁড়াইয়াছে।

জালিয়াৎ

শ্রীবিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়

১

হায়, পল্লীর দুলারী,—সে আজ কলিকাতার বধূ। বোধ হয় ভাবে—

হায় রে রাজধানী পাষাণ কায়া!
বিরাট মুঠিতলে চাপিতে দৃঢ় বলে,
ব্যাকুল বালিকারে, নাহিকো মায়া!

প্রাণ তাহার কাঁদে—

কোথা সে খোলা মাঠ উদার পথঘাট,
পাখীর গান কই, বনের ছায়া!

কিন্তু ঐ পর্য্যন্ত; ইহার বেশী আর কবিবরের মানসী প্রতিমার সঙ্গে এই মেয়েটির কিছু মেলে না। তাহার কারণ বোধ হয় এই যে, প্রত্যেক ব্যাপারেই ইহার নিজস্ব মতামত খুব দৃঢ় এবং সুস্পষ্ট। যাহা ভাল লাগে তাহা চাই-ই, যাহা লাগে না ভাল তাহা চাই না। সিঁদুরে আমের লোভে যেদিন গাছের মগডালে উঠিয়া জীবন সঙ্কটাপন্ন করিয়াছিল সেদিনও ছিল এই কথা আর আজ. ভাল না লাগার দরুণ, কলিকাতা ছাড়া চাই বলিয়া যে-সব ফন্দি-ফিকির মনে মনে আঁটিতেছে, তাহারও মূলে সেই একই কথা।

মেয়েটির নাম চপলা। যখন রাখা হইয়াছিল সে-সময় সকলের দৃষ্টি ছিল ওর মা'র কাঁচা সোনার মত রংটির দিকে, এবং কাহারও আর সন্দেহ ছিল না যে এমন মা'র মেয়ের দেহ-লতাটির মধ্যে একদিন বিদ্যুতের চপলদীপ্তি শান্তশ্রীতে

ফুটিয়া উঠিবে। মেয়েটি যেন তাহার স্বভাবসিদ্ধ অবাধ্যতার বশেই সবাইকে এই দিক দিয়া নিরাশ করিয়া দিল। কিন্তু তবুও নামটা রহিল সার্থক।—আকাশের বিদ্যুৎ কেমন করিয়া সত্যই যেন ওর শ্যাম দেহটুকুর মধ্যে আটক পড়িয়া গিয়াছে; তাই ওর মিহি ভ্রূ দুটি কথায় কথায় অত কুঞ্চিত হইয়া ওঠে, কালো চোখের তারা অত চঞ্চল, ঠোঁটের কোণে আচমকা হাসি ফুটিয়া একটু রেশ না রাখিয়াই অমন হঠাৎ মিলাইয়া যায়।

ক'নে দেখানোর সময় বাপ পরিচয় দিয়াছিলেন—বড় শান্ত লক্ষ্মীমেয়ে আমার, এ কিছু বড়াই ক'রে ব'লচি না। বাড়ির বাইরে পা দেয় না—কলকাতায় বিয়ে হবার জন্যে যেন তোয়ের হ'য়ে জন্মেচে..."

আগাগোড়া বানানো কথা। ওর বাড়ি ছিল সদর রাস্তা, বনবাদাড়, দীঘির ধার। এখন সেখান থেকে তাহারা সর্ব্বদাই ওকে যেন কান্নার সুরে ডাকিতে থাকে।

আদুরে দুষ্টু মেয়ের যত অত্যাচারের দাগ স্নেহের পরতে পরতে আঁকা, আসন্ন বিচ্ছেদের সময় সেগুলো রাঙাইয়া ওঠে। তবু মেয়ের বাপ, তাহাকে বলিতেই হয়—"বুঝেচেন। কি-না,—আমার মা'র মতন শান্ত মেয়ে দুটি পাবেন না; এ কিছু নিজের মেয়ে বলেই যে বলচি তা' নয়..."

প্রবঞ্চনা ধরা পড়িতে অবশ্য দেরি লাগে নাই। শ্বশুর আপিস হইতে ফিরিয়া বাড়ির চৌকাঠ ডিঙাইবার সঙ্গে সঙ্গেই ডাকেন—"কই গো, আমার শান্ত, শিষ্ট মা-টি কোথায় গেলে?"

চপলা যেমন ভাবে যেখানেই থাকুক, লঘুগতিতে আসিয়া হাজির হয়।. লঘুগতি কথাটা মোলায়েম ভাবেই বলা গেল, আসলে শ্বশুরের এই ডাকটিতে কলিকাতার এই অষ্টাবক্র বাড়িখানি হঠাৎ চপলার পক্ষে ঋজু, সরল হইয়া যায়, কঠিন বিলিতি মাটির মেঝে বেলপুকুরের দেশী মাটির মত পায়ের নীচে নরম, স্নিগ্ধ, মিঠে হইয়া ওঠে; সে এক রকম গোটাকতক লাফেই শ্বশুরের নিকট আসিয়া পৌঁছায়, আব্দারের ভর্ৎসনায় চক্ষের তারকা নাচিতে থাকে, চাবির গোছাসুদ্ধ আঁচলটা মাটি হইতে তুলিতে তুলিতে বলে—"না বাবা; আজ আপনি বড্ড দেরি করেচেন, তা ব'লে দিচ্ছি, হ্যাঁ..."

দেরি যে রোজ হয়ই এমন নয়; তবে এই মিলনটুকুর মূল্য অনেক; তাই, উৎকণ্ঠার বশে পুত্রবধূর রোজই মনে হয় বড় দেরি হইয়া গেছে। তারই রোজ অনুযোগ।

শ্বশুর রোয়াকে নির্দ্দিষ্ট ইজিচেয়ারটিতে দেহখানা এলাইয়া দেন। বধূ পাখা আনিয়া হাওয়া করে, পায়ের কাছে বসিয়া জুতার ফিতা খুলিয়া পা দুখানি খড়মের উপর বসাইয়া দেয়, চাদর খুলিয়া, জামা নামাইয়া ঝাড়িয়া-ঝুড়িয়া রাখে।

ধীরে ধীরে এই সব চলে, আর গল্প হয়—"ঠিক হ'ল বাবা? বড্ড যেন দেরি হ'য়ে যাচ্চে; আমার আর মোটেই ভাল লাগচে না তোমার এই কলকাতা, হ্যাঁ।"

"আর কিছু দেরি নেই মা, একটা বাড়ি খালি হ'লেই আমরা উঠে যাব।"

শ্বশুর-বৌয়ের পরামর্শ পাকা হইয়া গেছে—কলিকাতায় আর থাকা হইবে না। কলিকাতার বাহিরে, বেশ পাড়াগাঁ দেখিয়া বাড়ি দেখা হইতেছে, ঠিক হইলেই সব উঠিয়া যাইবে।

বধূকে শ্বশুর কোলের কাছে টানিয়া লন, মাথায় ধীরে ধীরে হাত বুলান, করতল হইতে স্নিগ্ধ আশীর্ব্বাদ ক্ষরিতে থাকে। বাৎসল্যের প্রবঞ্চনায় মুখে শান্ত হাসি ফোটে, ভাবেন এই দীর্ঘীকৃত আশার মধ্য দিয়া পাড়াগাঁয়ের স্বপ্ন কাটিবে, ক্রমে এই বাড়িরই ইটকাঠের সঙ্গে মনটা মায়ায় মায়ায় গাঁথিয়া যাইবে।

স্বপ্ন কাটে না, বরং মনটা এদিকে বিরূপ হইয়া সেই স্বপ্নকেই মায়ার পাকে পাকে জড়াইয়া ধরে—

অনামধেয় একটা জায়গা; কিন্তু কেমন করিয়া যেন মনের পটে তাহার একটা স্পষ্ট ছবি আঁকিয়া গিয়াছে।—বেলপুকুরের সঙ্গে অনেকটা মেলে, ভিজে ভিজে কালচে মাটি, এখানে-ওখানে গাছপালার ঘন সবুজ দিয়া ঢাকা, ওপরে আকাশের নীল আস্তরণখানি উবুড় হইয়া পড়িয়াছে... পাশাপাশি দুটি কোঠাঘর, সামনে পাকা রোয়াক—বিকালের পড়ন্ত রোদটি সেখানে জ্বল জ্বল করিতে থাকে।...ওদিকপানে রান্নাঘর, সকাল সন্ধ্যায় তাহার গোলপাতার ছাউনি ফুঁড়িয়া ধোঁয়ার কুণ্ডলী ওঠে।...পাকা ঘরের পাশ দিয়া রাস্তা। সেটা সদর দুয়ারের চৌকাঠ ডিঙাইয়া বাহির হইয়া গিয়াছে—ডাহিনে জামরুল গাছের নীচু দিয়া, বাঁয়ে কাহাদের পুকুর, তাহার পুরাণ ঘাটের শেষ ধাপায় কাহাদের ঘোমটা-টানা বৌ বাসন মাজে—তাহার শাড়ীর রাঙাপাড় আর ছোট রাঙা ঠোঁটের মাঝখানে নোলকটি দুল্ দুল্ করে—কে সমবয়সী আসিল—বৌ হাতের উলটা দিক দিয়া ঘোমটা উঁচু করিয়া

হাসিয়া কথা কয়।...আর একটু দূরে লতা-জড়ান পুরাণ আমগাছের দু-পাশ দিয়া রাস্তাটা ফিরিয়া দু-দিক দিয়া বাহির হইয়া গিয়াছে...আমগাছের শিকড়ের কাছে ইট, নুড়ি, খোলামকুচি, রাংচিত্রের পাতার ছড়াছড়ি, তাহার সঙ্গে সঙ্গে ছোট ছোট পায়ের মেলা দাগ।.. মনটি এইখানে আটকাইয়া যায়--যেন নিজেকেই দেখা যায়---গাছের তলায় লুব্ধদৃষ্টিতে চাহিয়া আছে।

অন্যমনস্কতা থেকে হঠাৎ সজাগ হইয়া বধূ হাসিয়া বলে, 'তা ব'লে আপনি যেন ভাববেন না বাবা যে আমি সেখানে কচি মেয়েদের মত পাড়ায় পাড়ায় খেলাঘর রচে কাটাব · সে ভয় আপনার একটুও নেই ব'লে দিচ্চি। কিন্তু দেরি করলে হবে না, হ্যাঁ।"

মন ভুলাইবার দিকে স্বামীর চেষ্টারও ত্রুটি নাই। ছোট বোন ক্ষান্তমণির ওপর হঠাৎ অত্যধিক স্নেহপ্রবণ হইয়া পড়িয়াছে। বলে "ক্ষেন্তী চিড়িয়াখানায় একটা নতুন জন্তু এসেচে, যাবি না কি দেখতে?"

ক্ষান্তমণি উৎসাহের সহিত বলে "হ্যাঁ যাব।" তাহার পর হঠাৎ একটু সঙ্কুচিত হইয়া মিনতি করে - "একটি কথা রাখবে দাদা?"

'কি কথা আবার?"

"বৌদি'কেও..." আর শেষ করিতে সাহস করে না।

"হ্যাঃ, অত লোকের ঝক্কি বওয়া,-- সে আমার কুষ্ঠীতে লেখেনি।"

এই করিয়া চিড়িয়াখানা, মিউজিয়াম, ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল হইয়া গিয়াছে। রাত্রে স্বামী উৎসাহভরে বলে -- "এইবার কি দেখবে বল,— ডালহৌসী স্কোয়ার, হাওড়া ষ্টেশন..."

বধূ নাসিকা কুঞ্চিত করিয়া বলে—"কিচ্ছু না।"-- বলিয়া ফিরিয়া শোয়।

অনেক সাধাসাধি চলে। "কলকাতায় এত দেখবার জিনিষ রয়েচে, দেশবিদেশ থেকে লোক আসচে দেখতে— গড়ের মাঠ, গঙ্গার জাহাজ, কত বড় বড় বাড়ি— ওপরে চাইতে গেলে ঘাড় উলটে পড়ে..."

"পড়ুক গিয়ে ঘাড় উলটে যার সাধ আছে, আমার কলকাতার কিচ্ছু ভাল লাগে না; আমায় বাড়ি দিয়ে এসো।"

"কলকাতার কিচ্ছুই ভাল লাগে না?—আমরাও তো কলকাতার— আমিও তো..."

ঝাঁঝিয়া উত্তর হয়--"তোমাদের কাউকেও ভাল লাগে না; যারা কলকাতা ভালবাসে তাদের দু-চক্ষে দেখতে পারি না।"

দারুণ নিরাশার কথা।

পরের দিন ভগ্নীস্নেহে আবার জোয়ার আসে। প্রশ্ন হয় "কই রে ক্ষেন্তী, শিবপুরে রামরাজাতলার মেলা ফুরিয়ে এল, একদিনও তো গেলিনি? দিব্যি পাড়াগেঁয়ে পাড়াগেঁয়ে জায়গাটি-- আমার তো বড্ড ভাল লাগে।"

আজ তিন বৎসর দাদার খোসামোদ করিয়া ফল হয় নাই; বলিলেই---"অজ পাড়াগাঁ, এঁদো ডোবা"--বলিয়া নাক সিঁটকাইয়াছে। আজ বিধি এত অনুকূল!

ক্ষান্তমণি হাতের কাজ ফেলিয়া ছুটিয়া হাজির হয়। "হ্যাঁ দাদা, যাব।...আর একটি কথা দাদা শুনবে?—বৌদিদিকেও নিয়ে চল দাদা, আমার দিব্যি। আহা, বেচারী গো. পাড়াগাঁয়ের কথা বলতে বলতে আত্মহারা হয়ে ওঠে..."

দাদা রাগিয়া বলে---"ওঃ-ই, আপনি পায় না আবার শঙ্করাকে ডাকে...ওই জন্যে কোথাও তোকে নিয়ে যেতে ইচ্ছে হয় না।"

২

রামরাজা কি বাতাইচণ্ডী তলা হইতে ফিরিয়া ফল হয় উল্টা। পিঁজরার পাখী একবার ছাড়া পাইয়া আবার পিঁজরায় বদ্ধ হইলে যেমন অতিষ্ঠ হইয়া ওঠে, মেয়েটির অবস্থা হয় সেই রকম। প্রাণটা আইঢাই করে। প্রতি মুহূর্ত্তে বেলপুকুরের কোন-না-কোন একটা ছিন্ন দৃশ্য চোখের সামনে ভাসিয়া ওঠে; কথায় কথায় ভুল হয় ঝিকে ডাকিতে বাপের বাড়ির দাসী "পদীপিসীর" নাম মুখে আসিয়া পড়ে, ননদকে ডাকিতে বাহির হইয়া পড়ে---"সই!"

ননদ দু-একবার ভুলটা ভুলের হিসাবেই ধরে, শেষে— "এই যে আসি সই"—বলিয়া হাসিতে হাসিতে সামনে আসিয়া দাঁড়ায়। বলে---'মরণ!—বলি, তোমার হয়েচে কি আজ? দাদা এলেই বলব-- তোমার বুনো হরিণকে বনে ছেড়ে দিয়ে এসো।"

বধূ স্বগ নিজেই সে ব্যবস্থায় তৎপর হইয়া ওঠে। কলিকাতায় থাকা চলিবে না, কোনমতেই নয়।

শ্বশুরকে বলে—"আমি বলছিলাম বাবা..."

"হ্যাঁ মা, বল।"

"এই বলছিলাম - মাস তিনেক পরেই তো আপনি কাজ নিয়ে ক'মাসের জন্যে ঢাকা চলে যাবেন? এর মধ্যে আমাদের আর নতুন বাসা ক'রে কাজ নেই। আপনারও অসুবিধে বাবা, আর বাসা-বদলির একটা হিড়িকও তো কম নয়—খরচও এতগুলি, এই মাগ্গি গণ্ডার দিন..."

শ্বশুর নিজের চিকিৎসার এক রকম আশু সাফল্যে উল্লসিত হইয়া ওঠেন,—শুধু পাড়াগাঁয়ের নেশা কাটিয়া যাওয়া নয়, সঙ্গে সঙ্গে গৃহিণীপনার গাম্ভীর্য্য আসিয়া পড়া। বধূর মাথাটি নিজের বুকে চাপিয়া বলেন—"ঠিকই তো মা। দেখ ত, কথাটা আমার মাথায়ই ঢোকেনি!...আর বুড়ো হ'তে চললাম, এইবার মা-ই আমাদের বুদ্ধি দেবে কি-না। আমি তা'হলে ওদের খোঁজাখুঁজি করতে বারণ ক'রে দোব। ঢাকা থেকে ফিরে আসি, তখন বরং একটা পাকা রকম ব্যবস্থা করা যাবে, কি বল?"

"হ্যাঁ।"—বলিয়া শ্বশুরের বুকে মাথাটি আরও গুঁজিয়া দেয়। ক্ষণেকের জন্য বোধ হয় একটু দ্বিধা আসে, সেটুকু কাটাইয়া ধীরে ধীরে আরম্ভ করে—"তাই বলছিলাম বাবা.."

"হ্যাঁ মা, বল, বল,—"

"এই বলছিলাম ততদিন পর্য্যন্ত না-হয় আমাকে একেবারে বেলপুকুরেই রেখে আসুন না.."

রোগটা মজ্জাগত; এমনভাবে নিরাশ হইয়া চিকিৎসক হাসিবেন কি কাঁদিবেন স্থির করিতে পারেন না। চিকিৎসার নূতন নূতন প্রণালী আবিষ্কার করিতে হয়। এই করিয়া দিন চলে। শ্বশুরের পাঠানর যে সে-রকম গা নাই একথাটা ক্রমেই স্পষ্ট থেকে স্পষ্টতর হইয়া উঠে।

শাশুড়ীর কাছে চালাকি করিতে সাহস করে না; কারণ শাশুড়ী বেটাছেলে নয়, এবং সেই জন্য তাহার মতে, বোকা নয়। সোজাই কথাটা পাড়ে—বাপ, মা, ভাই, ছোট বোনটি এদের অনেক দিন দেখে নাই, তাই...

শাশুড়ী চোখ কপালে তুলিয়া বলেন—"ওমা, অমন কথা বলো না, বৌমা! এই তো।মোটে ক'টা মাস এসেচ...আমি সেই মোটে ন' বছরের মেয়েটি শ্বশুরঘর করতে এলাম—আর ঝাড়া তিনটি বছর কাটিয়ে..."

চপলারও আশ্চর্য্যের সীমা থাকে না। বলে,—"এই কলকাতায় মা?"

"পোড়া কপাল!—কলকাতা কোথায়?—তা'হলে তো বাঁচতাম। শ্বশুর থাকতেন ডাহা পাড়াগাঁ, মাঝের পাড়া—নাইবে—সেই আধক্রোশ ভেঙে ইচ্ছেমতী, খাবার জল চাই—সেই আধ ক্রোশ ভেঙে ইচ্ছেমতী, গা ধোবে—সেই আধক্রোশ .."

"ঐঃ, বেরালটা বুঝি কি ফেললে গো।"—বলিয়া হয়ত হঠাৎ সে স্থান ত্যাগ করে।

স্বামীর উপর উপদ্রব হয়। সে বেচারী জর্জ্জরিত হইয়া অভিমান করিয়া বলে—"বেশ তো বাবাকে মাকে রাজী করাও; আমার রেখে আসতে কি?.. আমায় যখন ভালই বাস না, মিছিমিছি এখানে থেকে কষ্ট পাও কেন?"

অবাধে মিথ্যা চলে, একেবারে নির্জ্জলা মিথ্যা "বাবা মা তো খুবই রাজী। বাবা বলেন—'আমার তো ছুটি নেই অজিতকে বললেই বলবে পড়ার ক্ষতি হবে; না-হয় আসুক না রেখে'...মা বলেন 'আমার আর কি অমত মা - আহা এতদিন এসেচ—তবে আজকালকার ছেলের মত আগে। তা তুমি ঠিক এই রকম ক'রে মাকে বলো তো, বলো—'মা অত ঘ্যান্ ঘ্যান্ করচে যখন, রেখেই আসি নয়, দিনকতকের জন্যে; বাবাকে ব'লে দিও আমার কলেজের ক্ষতি হবে না..."

স্বামী অতটা বোকা নয়, এ-ফন্দি খাটে না।

কয়েক দিন আবার মুখ অন্ধকার হইয়া থাকে; কথাবার্ত্তা বন্ধ...। যত সব বেয়াড়া আব্দার ভাবিয়া স্বামীও কয়েক দিন বেপরোয়া ভাবটা জাগাইয়া রাখে, তাহার পর তাহাকেই মাথা নোয়াইতে হয়। বলে—"যা হবার নয় তাই ধরে ব'সে থাকলে চলবে কেন। বরং চল দক্ষিণেশ্বর দেখিয়ে নিয়ে আসি—পাড়াগাঁকে পাড়াগাঁ-ও, কলকাতা থেকে অনেক দূরও; বাড়ি হয়ে গেলে বরং নৌকোও চড়া হবে। রাজী?" পরামর্শ আঁটা হয়;—দুপুরে কান্ত যখন স্কুলে থাকিবে, চপলা গিয়া শাশুড়ীর আদেশ চাহিয়া লইবে—মিউজিয়াম দেখিবার নাম করিয়া।

বধূ জিজ্ঞাসা করে—"তোমারও তো কলেজ আছে?"

"আমার ঘণ্টাখানেক মাথা ধরবে তারপর কেষ্টি চলে গেলে ভাল হয়ে যাবে।"

কথাটা বুঝিতে একটু দেরি হয়, চপলা স্বামীর মুখের দিকে একদৃষ্টে চাহিয়া থাকে, শুধু ভ্রূ-জোড়াটি অল্প অল্প স্ফুরিত হইতে থাকে। তাহার পর হঠাৎ খিল খিল করিয়া হাসিয়া ওঠে, বলে,—"ও, বুঝেচি, বাব্বাঃ, তোমার দুষ্টুবুদ্ধি কম নয় তো!"

প্রশস্ত, শান্ত গঙ্গায় নৌকা চড়িয়াই চপলার মনটা প্রসারিত হইয়া পড়ে। ও-পারে, প্রকাণ্ড ঘাটের নীচে গিয়া নৌকা লাগে। নামিয়াই একহাঁটু করিয়া কাদা, এত বড় বিলাসিতা অনেকদিন তাহার ভাগ্যে জোটে নাই। পা টানিয়া টানিয়া চলিতে চলিতে স্বামীর হাতটা চাপিয়া ধরে; বলে—"উঃ, বড্ড মজা না?"

সিঁড়ি বাহিয়া সুবিস্তীর্ণ চত্বর, যেদিকটা ইচ্ছা হন্ হন্ করিয়া অনেকটা চলিয়া যায়,—পায় পায় কত দিনের শৃঙ্খল যেন খসিয়া পড়িতেছে।...মন্দিরে ওঠে—সুগঠিত সৌম্য মূর্ত্তির আসনে মাথা নোয়াইয়া পড়িয়া থাকে—অনেকক্ষণ; কিছুই প্রার্থনা করে না—পড়িয়া থাকার মুক্ত অবসর তাই পড়িয়া থাকে।...গঙ্গার ধারে ধারে পরিষ্কার চওড়া রাস্তা, ঘন আমগাছের মস্ত বাগান—পাতার গাঢ় সবুজে সবুজে যেন অন্ধকার হইয়া গিয়াছে...পিছনে আয়ত পুষ্করিণী—বেলপুকুরের দীঘির মত—একটু ছোট এই যা...ক্রমাগত ঘোরে—একটি মুক্ত বেগ-চঞ্চল প্রাণ প্রতি মুহূর্ত্তে দেহতটে আসিয়া উচ্ছলিত হইয়া পড়ে,—চপল অঙ্গবিক্ষেপে, প্রগলভ হাসিতে, কথার অসংযত স্বরে,—মাঝে মাঝে পিছন ফিরিয়া চাহিয়া বলিয়া উঠে—"কই গো!...ওমা, এখনও ওখানে!—পুরুষের পা না?..."

পুকুরের ঘাটে আসিয়া বসিল। পা দুলাইতে দুলাইতে পাশের লতাগুল্মের সঙ্গে স্বামীকে পরিচিত করিয়া দিতে লাগিল—"ওটা ঘেঁটু—যে টুকুল মহাদেব খুব ভালবাসেন—সত্যিকারের মহাদেব নয় খেলাঘরের মহাদেব। আচ্ছা, এর মধ্যে অমূল-লতার গাছ কোথায় দেখাও দিকিন, কত বুদ্ধিমান দেখি... পারলে না তো?—ঐ দেখ, কলকে ফুলের গাছটার মাথার ওপর ওই হলদে হলদে—ভয়ঙ্কর বিষ মশাই! একটু যদি গেল পেটে তো বাড়তে-বাড়তে-বাড়তে...ওগো! কুঁচকন্দলের চারা! নিশ্চয়ই একেবারে, নিয়ে আসি তুলে।"

উৎসাহের সঙ্গে নামিয়া ক্ষিপ্রগতিতে পুকুরপাড়ের জঙ্গলের দিকে চলিল। ঝিরঝিরে পাতা ছোট চারাগাছটি, হাওয়ায় নধর ডগাটি একটু একটু দুলিতেছে। কাছে গেল তুলিবার জন্য, ঝুঁকিয়া কি ভাবিয়া থামিয়া গেল, তাহার পর ধীরে ধীরে ফিরিয়া আসিয়া আবার শানের বেঞ্চিটার উপর বসিয়া পড়িল।

স্বামী হাসিয়া বলিল,—"কি হ'ল আবার?—খেয়ালী মেয়ে!..."

"নাঃ, থাক; কলকাতার সেই টবে তো?—আমার মতন দুর্দ্দশা হবে বেচারীর।"

দু-জনেই খানিকক্ষণ চুপ করিয়া রহিল।

একটু পরে চপলা স্বামীর হাতটা নিজের কোলে লইয়া বলিল—"এক কাজ করলে হয় না? বলছিলাম...বলছিলাম—আমায় এই দিক থেকেই বেলপুকুরে রেখে আসবে?"

অজিত হাসিয়া দুষ্টামীর সহিত বলিল—"বেশ তো...টাকা?"

"আমার দু-হাতের দু-গাছা চুড়ি দিচ্চি।"

স্বামী কি ভাবিয়া আবার একটু চুপ করিয়া রহিল; তাহার পর বলিল—"সে মন্দ কথা নয়; মাকে কিন্তু কি বলব?"

"সে আমি ভেবে রেখেচি, বলবে—নাইতে গিয়ে ডুবে গিয়েছে।"

আবার একটু চুপচাপ। চপলা তাগাদা দিল—"কই, কি বলচ!"

স্বামীর হঠাৎ একটি দীর্ঘশ্বাস পড়িল; কিন্তু মনের ভাবটা গোপন করিয়া হাসিয়া বেশ উৎসাহের সঙ্গে বলিল—"উঃ, খাসা হয়; কিন্তু তার পর?"

"তারপর অনেক দূর গিয়ে ভেসে উঠব—আমায় একজন মাঝি তুলবে—একটু চোখ খুলে বেলপুকুরের নাম করব.. নভেলে যেমন হয় গো..."

"নভেলে মিউজিয়মের কোঠাবাড়িতে কেউ ডুবে মরে না—চল ওঠ, অনেক বেলা হয়েচে।" বলিয়া স্বামী উঠিয়া পড়িল।

শ্বশুর, শাশুড়ী, স্বামী, সবাইকেই বোঝা যায়। চপলা মনে মনে বলে—"খুব চালাক সব, আচ্ছা, আমিও কম সেয়ানা নয়, দেখি..."

বাবার কাছে গোপনে পত্র যায়; কাঁদুনিতে মিথ্যা কথায় ভরা,—'এরা সব মারে—ঘরে চাবি দিয়ে রাখে—দু-চক্ষের বিষ হয়ে আছি!'...কখন কখনও এমনও থাকে—'পাড়ার মেয়েদের

কাছে আর আমার মুখ দেখাবার জো নেই ; যে-ই দেখে, বলে ওমা, কেমন পাষাণ বাপ মা গো ! এতদিন হ'ল মেয়েকে পাঠিয়েচে একবার নিয়ে যাবার নাম করে না ! ঐ দুধের মেয়ে...'

চিঠি যা আসে তাহাতে এ সবের উত্তর হিসাবে কিছুই থাকে না ; একরাশ উপদেশ থাকে মাত্র। চপলা মনে মনে বলে- 'চপীর ভাগ্যে সব সমান ; আচ্ছা বেশ...'

৩

দুপুরবেলা। শ্বশুর আপিসে, স্বামী কলেজে, ননদ স্কুলে। চপলা শাশুড়ী আর পিস্‌শাশুড়ীকে রামায়ণ পড়িয়া শুনাইতেছিল, তাঁহারা একে একে ঘুমাইয়া পড়িলেন। একটু পরে বই বন্ধ করিয়া বাহিরে আসিল। রামায়ণে তিনজনে আসিয়া পঞ্চবটী বনে আসিয়া বাসা বাঁধিয়াছেন। ঠিক এই জায়গাটিতে শাশুড়ীরা ঘুমাইয়া পড়িলেও চপলা বিন্ধ্যকাননের সেই অপূর্ব্ব বর্ণনা শেষ না করিয়া উঠিতে পারে নাই।...অযোধ্যার রামচন্দ্রের চেয়ে পঞ্চবটীর রামচন্দ্রকে বেশী ভাল লাগে। কাননচারিণী সীতার উপর একটা ঈর্ষামিশ্রিত সহানুভূতি জাগিয়া উঠিয়া মনটাকে তৃপ্তি আর অস্বস্তি দুইয়েই ভরিয়া তোলে।

বারান্দায় আসিয়া দাঁড়াইল। চাওয়া যায় না ; মনে হয় সারা কলিকাতাটায় যেন আগুন লাগিয়াছে—উঁচু নীচু লক্ষ বাড়ির দেওয়াল বাহিয়া ছাদ ফুঁড়িয়া শিখা লক্ লক্ করিয়া উঠিতেছে কি এক রকম শাদাটে নীল আগুনের- যাতে এতটুকু ধোঁয়ার স্নিগ্ধতা নেই। এই সময়ে বেলপুকুরের কথা বেশী করিয়া মনে পড়ে- দীঘির পাড়ে সেই অন্ধকার সপ্তপর্ণী গাছের তলা কালো জলের উপর তরতর ঢেউ...

"চিঠি আছে !" সঙ্গে সঙ্গে সদর দরজায় পিয়নের মুঠির ঘা পড়িল। চপলা তাড়াতাড়ি নামিয়া যাইতে যাইতে দরজার ফাঁক বাহিয়া একখানি পোষ্টকার্ড উঠানে আসিয়া পড়িল। বাবার চিঠি শ্বশুরকে লেখা।

পড়িল।—মামুলি চিঠি, তাহার উল্লেখও নাই। "আশা করি বাড়ির সর্ব্বাঙ্গীন কুশল"—এরই মধ্যে সে যতটুকু আসিয়া পড়ে।

স্বামীর পড়িবার ঘরে গিয়া বসিল। এটা-সেটা লইয়া খানিকটা নাড়াচাড়া করিয়া আবার বাবার চিঠিটা লইয়া পড়িল। বাবার চমৎকার লেখা ! এদের বাড়িতে কাহার লেখা এমন নয়। বলিতে নাই গুরুজন—কিন্তু শ্বশুরে লেখা ত একেবারে বিশ্রী ! স্বামীর লেখাটা অত খারাপ ন বটে, তা বলিয়া বাবার লেখার সামনে ঘেঁষিতে পারে না।...

স্বামীর গানের খাতাটা টানিয়া লইয়া তুলনা করিতে লাগিল।—কিসে আর কিসে ! ডাগর ডাগর ছাপার ম অক্ষর, ওপরে ঢেউখেলান মাত্রা এ এক জিনিষই আলাদা ...স্বামী বলে—'একটু কাঁচা লেখা'—কি সব পাকা লেখা নিজেদের !

লেখার দিকে বাবার ঝোঁক ছিল বড্ড ; চপলাকে লইয়া অনেকটা চেষ্টা করিয়াছিলেন। একেবারে বাবার মত লে হওয়া বরাতের কথা, তাহা হইলেও স্বামীকেও সে খুব হারাইয়া দিতে পারে।

লেখার কথাতেও বেলপুকুর আসিয়া পড়ে। বাবা-মা মধ্যে তর্ক হইতেছে। বাবা বলিতেছেন "চপীর লে দেখেই তো ওর শ্বশুর পছন্দ ক'রে ফেললে।"

মা বলিতেছেন—"আহা, আর ওর অমন চোখ, মু গড়ন বুঝি কিছু নয় ?"

আজকাল শ্বশুরবাড়িতে নানা মুখে প্রশংসা শুনি মা'র অত গুমরের 'চোখ, মুখ, গড়ন' সম্বন্ধে একটু কৌতূহ হইয়াছে একটা সজ্ঞানতা আসিয়া পড়িয়াছে। টেবিলে উপর হইতে হাত-আরশিটা তুলিয়া লইয়া প্রতিচ্ছায়ার দিকে চাহিল—হাসি হাসি সলজ্জ—যেন অন্য কাহার চোখ। বাপে বাড়ির আরশিতে এ-রকম ছায়া পড়িত না- যত চায় চোখদুটো যেন লজ্জায় ভরিয়া আসে...

"ছাই চোখ মুখ, ছাই গড়ন"—বলিয়া আরশিটা রাখিয়া দিল। অন্যমনস্ক হইয়া কলমটা লইয়া পোষ্টকার্ড দেখি লিখিতে লাগিল,—'অনেক দিন যাবৎ আপনাদের কোন সংবা না পাইয়া'...ঘাড় নাড়িয়া নাড়িয়া মিলাইতে লাগিল।—বে একটু আদল আসে। তবুও অনেক দিন অভ্যাস ছাড়ি গিয়াছে।

কি রকম একটা ঝোঁকের বশে লিখিতে লাগিল—'অনে দিন যাবৎ- অনেক দিন যাবৎ'—দুইবার চারবার—আটবার— দশবারেরটা অনেকটা মেলে। এখনও আছে তফাৎ, তবে বাপের মেয়ের লেখা বলিয়া দিব্য চেনা যায় বটে।

হঠাৎ কথাটা যেন মাথায় পাক দিয়া ঘুরিতে লাগিল—'বাপের মেয়ের লেখা...বাপের মেয়ের লেখা...'

চপলা আস্তে আস্তে কলমটা রাখিয়া দিয়া জানালার বাহিরে চাহিয়া দাঁতে নখ খুঁটিতে লাগিল। দৃষ্টি স্থির, ভ্রূ-দুটি কুঞ্চিত হইয়া খয়েরের টিপটির কাছে একসঙ্গে মিলিয়া গিয়াছে।... ক্রমে তাহার বুকের ঢিপঢিপানিটা বাড়িয়া গেল, সমস্ত মুখটা উজ্জ্বল হইয়া উঠিল এবং ঠোঁটের কোণে নিতান্ত অল্প একটু হাসির আভাস ফুটিয়া উঠিল।..."বাপের মেয়ের লেখা"...আর যদি ওটুকু তফাৎও মিটাইয়া ফেলা যায়!

মাথার মধ্যে একটি মতলব জাঁকিয়া উঠিতেছে,—চপলা একমনে সেটিকে বেশ ভাল করিয়া পরিস্ফুট করিয়া তুলিল। একবার উঠিয়া একটু ঘুরিয়া আসিল শাশুড়ীরা অকাতরে ঘুমাইতেছেন; শ্বশুরের ঘড়িতে মোটে একটা বাজিয়াছে। স্বামীর কলেজ বোধ হয় আজ চারটে পর্য্যন্ত এখনও ঢের সময়।

ঘরে আসিয়া পোষ্টকার্ডটি সামনে বইয়ের তাড়ার গায়ে হেলান দিয়া রাখিল, তাহার পর কতকগুলা কাগজ লইয়া ইস্তক "শ্রীশ্রীদুর্গা সহায়" থেকে "শ্রীঅখিলচন্দ্র দেবশর্ম্মণ" পর্য্যন্ত সমস্তখানি নকল করিতে লাগিয়া গেল।

দুইটা বাজিয়া গেল—আড়াইটা—তিনটা। কপালের ঘাম মুছিয়া মুছিয়া আঁচলখানি ভিজিয়া গিয়াছে। তা যাক্; ওদিকে প্রত্যেক অক্ষরের বাঁক, কোণকাণ, মাত্রা একেবারে বাবার লেখার মত হইয়া দাঁড়াইয়াছে,—মেয়ে লিখিয়াছে বলিয়া চিনুক দেখি কে চিনিবে!

তাহার পর আসল কাজ,—যার জন্যে এত মেহনৎ। বাপের চিঠি থেকে অক্ষর বাছিয়া বাছিয়া একটা আলাদা কাগজে সন্তর্পণে লিখিল—"পুনশ্চ। আর বৈবাহিক মহাশয়, আপনার বেহান কয়দিন থেকে একেবারে শয্যাধরা। একবার চপুকে দেখিবার জন্য বড়ই ব্যাকুল হইয়াছেন। শ্রীমান অজিত বাবাজীবনের সহিত অতি সত্বর পাঠাইয়া দেন তো ভাল হয়। ইতি

শ্রীঅখিলচন্দ্র দেবশর্ম্মণঃ"

কাগজখানি পোষ্টকার্ডের পাশে একেবারে শাঁটিয়া ধরিল। অবিকল বাবার লেখা! চপলা লেখাটুকু আরও আট-দশবার ভাল করিয়া মক্স করিয়া লইল, তাহার পর সর্ব্বসিদ্ধিদাত্রী দুর্গাকে স্মরণ করিয়া সমস্তটুকু বাবার পোষ্টকার্ডে, ঠিকানা লেখার দিকে খালি জায়গাটুকুতে সাবধানে লিখিয়া ফেলিল।

লিখিয়াই তাহার মুখটা শুকাইয়া গেল; কলমটা রাখিয়া দিয়া বলিল "ঐ যা!"

ঠিকানার কালির সঙ্গে এ কালি মোটেই মিস্ খায় না! উল্টাইয়া-পাল্টাইয়া দুই পিঠ তুলনা করিতে লাগিল। না, এ স্পষ্ট বোঝা যাইতেছে আজকের সদ্য লেখা। এ-চিঠি দিলেই তো সর্ব্বনাশ; না-দেওয়াও বিপজ্জনক,—এখন উপায়?...

ভাবিতে ভাবিতে সে নিতান্তই বিচলিত হইয়া উঠিল এবং তাহার কাজটা ক্রমে একটা অপরাধের আকারেই তাহার মনে প্রতীয়মান হইয়া উঠিতে লাগিল। ব্যাকুল হইয়া বলিল—"এ কি করলে মা-দুর্গা?—তা'হলে লেখাতে গেলে কেন?"

চপলার এখন পর্য্যন্ত বিশ্বাস মা-দুর্গা নিজের অন্যায়টুকু বুঝিতে পারিয়া হঠাৎ তাহার মাথায় আর একটু বুদ্ধি আনিয়া দিলেন।...সে তাড়াতাড়ি নিজের ঘরে গিয়া বাক্স খুলিয়া একটি চিঠি বাহির করিল, কাল দুপুরে বসিয়া সইকে খানিকটা লিখিয়াছিল, এখনও শেষ হয় নাই। কম্পিত বক্ষে চিঠিটার ভাঁজ খুলিয়া পোষ্টকার্ডে বাবার লেখার পাশে ধরিল,—একেবারে এককালি!

আশ্বস্ত হইয়া নিজের মনে বলিল "মা যে বলেন—ভাল কাজে বিঘ্নি অনেক, তা মিছে নয়। যাক্, কেটে গেল।"

বিকালে আসিয়া শ্বশুর অভ্যাসমত জিজ্ঞাসা করিলেন—"আজ কোন চিঠি-ফিটি এসেছিল গা শান্ত-মা?"

চপলা একটুও দ্বিধা না করিয়া উত্তর দিল "কই, না তো বাবা।"

দু-রকম কালির গরমিল মিটাইয়া চিঠিটা আসিল তাহার পরদিন; উঠানের একপাশেই পড়িয়া ছিল, শাশুড়ী তোলেন। শ্বশুর বালিসের নীচে আপিসের চাবি রাখিতে গিয়া আপনিই পাইলেন; চপলা সেদিন বাড়িতে ছিল না তখন।

পাশের বাড়ি হইতে বেড়াইয়া আসিয়া নিজের ঘরে ঢুকিয়া পড়িল। কেমন যেন শ্বশুরের সামনে আসিতে পা উঠিতেছে না, বুকটা ধড়াস্ ধড়াস্ করিতেছে।

ডাক পড়িল—"কই গো, চঞ্চলা-মাকে আজ দেখতে পাচ্ছি না কেন?"

যতটা সম্ভব সহজ ভাবেই আসিয়া দাঁড়াইল। "কি বাবা!" বলিয়া মুখ তুলিতেই চোখের পাতা কিন্তু নামিয়া আসিল।

"অমন শুকনো কেন মা?—আজ ঘুমোও নি, না?—এঃ—ই, দেখেচ—দুষ্টু পাড়া-বেড়ানী মেয়ের কাণ্ড!"

কাছে টানিয়া লইলেন—"অসুখ ক'রবে যে...বাবার চিঠি, এসেচে, দেখেচ?"

"কই না"—চোখ তুলিতেই আবার সঙ্গে সঙ্গে নামিয়া পড়িল। মুখটাও একটু রাঙা হইয়া উঠিয়াছে। শ্বশুর দেখিলেন, পাগলী মেয়ে,—বাপ লইয়া যায় না বলিয়া চিঠির নামেই অভিমান; ক'টা দিনই বা সে আসিয়াছে তাহা তো হিসাব করিয়া দেখিবে না।

বলিলেন—"এসেচে। আর তোমায় একবাব যেতে লিখেচেন বেহাই মশাই।"

আসল কথাটি জানাইবেন কি-না ভাবিতে লাগিলেন;—'ক'দিন থেকে শয্যাধরা—বেশ ভাবনার কথা।' বলিলেন—"বেয়ান ঠাকরুণের একটু অসুখ লিখেচেন। কিন্তু কেমন যেন একটু খাপছাড়া খাপছাড়া,—হঠাৎ শেষের দিকে পুনশ্চ দিয়ে একটু লেখা। আর, এই সেদিন চিঠি এল, কিচ্ছু তো লেখেন নি!...যাই হোক্ অজিত গিয়ে একবার তোমায় রেখে আসুক।"

সফলতার আনন্দে শরীর মনের সঙ্কোচটা কাটিয়া যাইতেছে; বুদ্ধিও খুলিতেছে।—চপলা বলিল—"খাপছাড়া যে ব'লচেন বাবা—বোধ হয় মনটা সুস্থির নেই। আর আগে লেখেন নি..."

বাপের অসঙ্গতির জন্য কন্যার দুশ্চিন্তা লক্ষ্য করিয়া এবং অদ্ভুত জবাবদিহি শুনিয়া শ্বশুর হাসিয়া উঠিলেন; বলিলেন—"বাপ নিশ্চয় গাঁজা-টাজা খায়;—উল্টা সোজা জ্ঞানগম্যি নেই।"

যাক্, কথাটা চপলা পূর্ব্বে অত খেয়াল করে নাই। বাবার গাঁজাখুরির অপবাদে যদি আপাতত ওটা চাপা পড়ে তো তাহার আপত্তি নাই।

মনে মনে খুশী হইয়া হাসিয়া বলিল—"যান, ঠাট্টা করচেন আপনি।"

মনে পড়িল, একটা কথা জিজ্ঞাসা করা হয় নাই, যাহা প্রথমেই জিজ্ঞাসা করা উচিত ছিল। প্রশ্ন করিল—"মার কি খুব অসুখ না-কি বাবা?—আমার তো ভয়ে হাত-পা যেন অবশ হয়ে আসচে,—হঠাৎ যেতে বলা কেন রে বাপু!"—মুখটা বিমর্ষ করিবারও চেষ্টা করিল। সরল আনন্দকে কৃত্রিম বিষাদে চাপা দিতে পারিল না। সেটুকু শ্বশুরের লক্ষ্য এড়াইল না; তবে, বাৎসল্য না-কি নিজেকেই নিজে প্রবঞ্চিত করে তাই ভাবিলেন—আহা, বড় ছেলেমানুষ, বাড়ি যাওয়ার আহ্লাদেই ও এখন আত্মবিস্মৃত;—ভালই, যত ভুলিয়া থাকে...

উত্তর দিলেন—"না, এই সামান্য একটু জ্বর। তবে, দেখতে চাইচেন, দেখে এস একবার।"—মুখে সহজ প্রফুল্লতা ভাবটা টানিয়া রাখিবার চেষ্টা।

বধূরও লক্ষ্য এড়াইল না। শ্বশুরকে প্রবঞ্চনা করার জন্য একটু অনুতাপও বোধ হয় হইল,—আহা বুড়া মানুষ তায় গুরুজন!...কিন্তু তখনই মনে পড়িল,—আর একটু প্রবঞ্চনা করা দরকার,—উচিত হিসাবেও, আবার ওই গোলমেলে চিঠিটা হস্তগত করিয়া ফেলিবার জন্যও। বলিল—"কই, চিঠিটা তো দেখলাম না বাবা; কি লিখেচেন দেখি না একবার।"

শ্বশুর বলিলেন—"হ্যাঁ, এই যে—"

এ-পকেট সে-পকেট খুঁজিলেন। বলিলেন—"কোথায় যে রাখলাম...দেব'খন খুঁজে...ভালই আছেন, এমন কিছু নয় যাও, একবার পাঁজিটা নিয়ে এস দিকিন।"

ভাবিলেন—একেবারে 'শয্যাধরা' লেখা রহিয়াছে, চিঠিটা দেখান ঠিক নয়। আহা, নিতান্ত ছেলেমানুষ, এক্ষেত্রে একটু প্রবঞ্চনা করাই ভাল।

করিলেনও।

বাক্সপত্র গুছাইতে গুছাইতে আবার হঠাৎ একটা কথা মনে উদয় হইয়া চপলার সর্ব্বশরীর যেন শিথিল করিয়া দিল,—শ্বশুর যে বাবাকে চিঠির উত্তর দিবেন! তাহা হইলেই তো সব কথা ফাঁস হইয়া যাইবে! আর, তাহার পর যে লাঞ্ছনা, যে-কেলেঙ্কারি তাহা ভাবিতেও যে গা শিহরিয়া ওঠে!...

এমনই অসহায় অবস্থা যে মা-দুর্গাকে খোশামোদ করিলেও কোন সুরাহা হইবার নয়। মরিয়া হইয়া ধিক্কার দিল—"এই

ছিল তোমার মনে মা, শেষকালে? তোমারও তো বাপের বাড়ি আছে, পাগলের মত ছুটে আসতে হয়..."

যুক্তিটা নিশ্চয় মা-দুর্গার মর্ম্মে লাগিল।...প্রথম ঘোরটা কাটিয়া গিয়া চপলার মাথাটা একটু পরিষ্কার হইল। শ্বশুরের কাছে গিয়া বলিল—"বাবা, বলছিলাম যে..."

"হ্যাঁ মা, বল..."

"এই বলছিলাম—আপনি বাবাকে চিঠিটা লিখে আমায় দিয়ে দেবেন; আমিও তার ওপর দুটো কথা লিখে ডাকে..."

"চিঠি লিখে তো কোন ফল হবে না, মা; তোমরা তো কাল সকালেই যাচ্চ। তাই ভাবচি..."

"হ্যাঁ বাবা, থাক্।" একটি স্বস্তির নিঃশ্বাস পড়িয়া বুকটি হালকা হইল।

"তাই ভাবছিলাম একটা না-হয় টেলিগ্রাম..."

সর্ব্বনাশ! চপলা একেবারে কপালে চোখ তুলিয়া বলিল—"টেলিগ্রাম!"

"হ্যাঁ মা, তাই ভাবছিলাম; কিন্তু হিসেব ক'রে দেখচি—সেও তো তোমাদের গাঁয়ে তোমাদের আগে পৌঁছুবে না।"

আর একটি স্বস্তির নিঃশ্বাস—বাবাঃ, ফাঁড়া যেন কাটিয়াও কাটে না! তাড়াতাড়ি বলিল "হ্যাঁ বাবা, আর মিচিমিচি পয়সা খরচও—এই মাগ্‌গি গণ্ডার দিন..."

বুদ্ধির জোয়ার নামিয়াছে। একটু থামিয়া বলিল—"আর এও তো ভেবে দেখতে হবে বাবা—মার অমন অসুখ, এর মধ্যে খুট্ ক'রে এক টেলিগ্রাম! শেষকালে কি হ'তে কি হয়ে পড়বে; আপনি-ই বলুন না?...তার চেয়ে আমার হাতে বরং ভাল ক'রে একটা চিঠি লিখে দেবেন—আমি গিয়েই বাবাকে দিয়ে দোব।"

অনাগতম্

শ্রীবিরামকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়

তোমারে খুঁজেছি আমি খুঁজিয়াছে প্রাণের পথিক,
নিবেদিতে বিকশিত প্রাণ-পুষ্প গন্ধের অঞ্জলি—
কৈশোরের হে কল্পনা, যৌবনের আনন্দ-প্রতীক,
পৃথিবীর খেলা-ঘরে কি খেলিনু তাই আজ বলি
জীবন-গোধূলি-লগ্নে;
—কত মোর রাত্রি আর দিবা
প্রতীক্ষার ক্লান্তি ল'য়ে শুধু তব আগমনী-গানে
ব্যর্থ হ'ল; কত না রঙীন স্বপ্ন প্রেম-পুষ্প-বিভা
ম্লান হ'ল কল্পনার কল্প-বনে!
মোর এই প্রাণে
আকাঙ্ক্ষার অভিনয় হ'ল নাকো আজও সমাপন;
দু-একটি সঙ্কল্পের ফুল্ল ফুল আজও আছে ফুটে
তোমার অর্চ্চনা লাগি;—তুমি আজও রহিলে স্বপন
হে বঁধুয়া, শূন্যতার হাহাকার জাগে প্রাণ-পুটে।

আমার তনুর তটে লক্ষ-কোটী কামনা-কপোত
কেঁদে কেঁদে ফিরে গেল; কত প্রিয় অতিথি-পথিক
দ্বার হ'তে গেল চ'লে পুষ্পিত যৌবনে; 'আত্মবোধ'
ক্ষুণ্ণ হ'লে হে আত্মীয়, এ জীবন হবে যে অলীক!
সকল দীনতা মোর এ প্রাণের সর্ব্ব গ্লানি ভুল,
কোমল বক্ষের তলে রাখিয়াছি মোহ-মুঠি ধরি
আসিবে বলিয়া তুমি! তুমি এলে লভিব অতুল
তব প্রেম-সঞ্জীবনী।—তাই ত এ প্রাণ-পাত্র ভরি
বেদনার অশ্রু-মুক্তা রাখিয়াছি,—জীবন করেছি ভোর
অপেক্ষার একক শয়নে;

তুমি ত আসিবে ব'লে,
এই দেহ-দেহলীতে পুলকের আলিম্পন মোর
আঁকিয়াছি,—কল্প-কারাকক্ষ ত্যজি এস আজ চ'লে!
হৃদয়ের শত তন্ত্রী তাই প্রিয় মিলন-উন্মুখ,
সমস্ত অন্তর মোর তব রূপে উঠিয়াছে ভরি;
এ চিত্ত-আনন্দ-রাগ, পরাণ-পদ্মের মধুটুক্
হে মর্ম্ম-মধুপ বঁধু, নিঃশেষিয়া লও আজ হরি'।

কয়েকখানি পুরাতন বাংলা নাটক

শ্রীজয়ন্তকুমার দাশ-গুপ্ত, এম-এ, পি-এইচ-ডি

রামনারায়ণ তর্করত্নের 'কুলীন কুলসর্ব্বস্ব' নাটকখানিকেই সাধারণতঃ বাংলা ভাষায় সর্ব্বপ্রথম মুদ্রিত নাটক বলিয়া এ-যাবৎ স্থান দেওয়া হইতেছিল। কিন্তু সম্প্রতি ইহার পূর্ব্ববর্ত্তী কয়েকখানি মুদ্রিত নাটকের সন্ধান পাওয়া গিয়াছে। এগুলির নাম এ দেশে অপরিজ্ঞাত না থাকিলেও এ সম্বন্ধে কোন আলোচনা এতদিন সম্ভবপর হয় নাই, কারণ নাটকগুলির সব কয়খানিই কেবলমাত্র বিলাতেরই কোন কোন পুস্তকাগারে আছে।

১৮২২ খৃষ্টাব্দে পণ্ডিত কাশীনাথ তর্কপঞ্চানন, পণ্ডিত গঙ্গাধর ন্যায়রত্ন ও পণ্ডিত রামকিঙ্কর শিরোমণি কৃষ্ণ মিশ্র রচিত প্রসিদ্ধ সংস্কৃত নাটক প্রবোধ চন্দ্রোদয়ের 'আত্মতত্ত্ব কৌমুদী' নামে এক বাংলা ব্যাখ্যা প্রকাশ করেন। ইহাকেই সর্ব্বপ্রথম মুদ্রিত বাংলা নাটক বলিতে হইবে। পুস্তকের আখ্যাপত্রের কিয়দংশ এইরূপ :—

গ্রন্থনাম আত্মতত্ত্ব কৌমুদী।

শ্রীশ্রীকৃষ্ণ মিশ্র কৃত প্রবোধ চন্দ্রোদয় নাটক শ্রীকাশীনাথ তর্ক পঞ্চানন শ্রীগঙ্গাধর ন্যায়রত্ন শ্রীরামকিঙ্কর শিরোমণি কৃত, সাধুভাষা রচিত তদীয়ার্থ-সংগ্রহ।

গ্রন্থের সংখ্যা ছয় অঙ্ক……
পুস্তকের মূল্য ৪ মুদ্রা চতুষ্টয় মাত্র।
মহেন্দ্রলাল প্রেসে মুদ্রাঙ্কিত হইল।
সন ১২২৯ সাল।

আত্মতত্ত্ব কৌমুদীর ভাষার নমুনা নিম্নোদ্ধৃত অংশ পাঠে সহজেই বুঝিতে পারা যাইবে :—

"যাহার ইন্দ্রিয় সকল বিষয় হইতে নিবৃত্ত হইয়াছে—এবম্ভূত মহাদেবের চৈতন্য স্বরূপ জ্যোতিকে আমরা নমস্কার করি যে চৈতন্য স্বরূপ জ্যোতিঃ সুষুম্না-নাম নাড়ীতে অবরুদ্ধ যে প্রাণ স্বরূপ বায়ু তাহার অবলম্বন দ্বারা ব্রহ্মরন্ধ্র স্পর্শ করিয়াছেন এবং শান্তরসে নিমগ্ন যে মানস তাহাতে প্রকাশিত যে আনন্দ তাহাতে নিবিড় অর্থাৎ ব্রহ্মস্বরূপ, এবং জগদ্ব্যাপি অর্থাৎ প্রভাপটল দ্বারা ব্রহ্মাণ্ড ব্যাপ্ত এবং যে চৈতন্য স্বরূপ জ্যোতিকে মহাদেব আপনার ললাটস্থ নেত্রের ছলেতে প্রকাশ করিয়াছেন সেই প্রকার আমরা মানিতেছি, অর্থাৎ মহাদেবের ললাটে নেত্র নহে কিন্তু বুঝি চৈতন্যস্বরূপ জ্যোতিই, ললাট ভেদ করিয়া উঠিতেছে।"

দ্বিতীয় নাটকখানি গোপীনাথ চক্রবর্ত্তীকৃত সংস্কৃত "কৌতুক সর্ব্বস্ব নাটক" অবলম্বনে হরিনাভি-নিবাসী পণ্ডিত রামচন্দ্র তর্কালঙ্কার রচিত এবং ১৮২৮ খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত। এখানি দুই অঙ্কে সমাপ্ত। নাটকের প্রধান চরিত্র কলিবৎসল রাজা, তাহার সেনাপতি সমর জম্বুক, সত্যাচার্য্য নামক জনৈক ব্রাহ্মণ, রাজার পারিষদগণ, রাণী, মিথ্যার্ণব জ্যোতিষী প্রভৃতি। ত্রিপদী ছন্দে গণেশ বন্দনা করিয়া নাটকখানি আরম্ভ হইয়াছে। ইহার প্রধান উদ্দেশ্য কলিযুগের পাপাচার-সমূহের বর্ণনা। কৌতুক সর্ব্বস্ব নাটকে গদ্য ও পদ্য উভয়ই ব্যবহৃত হইয়াছে। পদ্যের মধ্যে ত্রিপদী ও পয়ার ছন্দেরই ব্যবহারাধিক্য। এই নাটকখানিকে যথাযথ অনুবাদ বলা চলে না। মূল সংস্কৃতের সহিত স্থানে স্থানে বাংলা গদ্য ও পদ্যে ব্যাখ্যা দেওয়া আছে। কৌতুক সর্ব্বস্বের গদ্যাংশের ভাষা সংস্কৃতানুযায়ী :

"এই যে নবীনা বাক্য সরস্বতীর বীণার নিনাদ সদৃশ এবং অমৃতের মধুরতাকে ভৎর্সনা করিতেছে যে নবীনা বাক্য তদ্বারায় কবিরা সর্ব্বদা হর্ষযুক্ত হউন।"

জগদীশ্বর কৃত সংস্কৃত 'হাস্যার্ণব' নাটকের বাংলা অনুবাদের প্রকাশকাল সম্বন্ধে মতদ্বৈধ আছে। পাদ্রী লং ইহার প্রকাশকাল ১৮২২ খৃষ্টাব্দ বলেন। অন্য কয়েক জন লেখকও উহা স্বীকার করিয়া লইয়াছেন। ব্রিটিশ মিউজিয়মে যে হাস্যার্ণব নাটকখানি আছে তাহার আখ্যাপত্রে কোন তারিখ নাই। *Bibliotheca Orientalis* গ্রন্থে ১৮৩৫ খৃষ্টাব্দকে প্রকাশকাল বলা হইয়াছে। Schuyler কৃত *Bibliography of the Sanskrit Drama* পুস্তকে ১৮৪০ খৃষ্টাব্দ দেওয়া আছে। Bendall কিংবা Blumhardt কেহই ১৮৪০ খৃষ্টাব্দকে সঠিক বলিয়া গ্রহণ করিতে পারেন নাই। নাটকখানি দুই অঙ্কে সমাপ্ত।

হাস্যার্ণবের প্রধান চরিত্র নির্মর্য্যাদা নগরাধিপতি রাজা অন্যায়সিন্ধু, তাঁহার প্রধান চর অযথার্থবাদী, মন্ত্রী কুমতি বর্ম্মা, সেনাপতি রণজম্বুক, বিশ্বভণ্ড নামক পণ্ডিত ও তাঁহার শিষ্য কলহাঙ্কুর, ব্যাধিসিন্ধু বৈদ্য, মিথ্যার্ণব ব্রাহ্মণ, মদনান্ধ মিশ্র পণ্ডিত, মহানিন্দক আচার্য্য প্রভৃতি। কয়েকটি চরিত্রের বর্ণনা উল্লেখযোগ্য :—

"উপবাস দিবাভাগে আমিষাশী নিশিযোগে জটাধারী হাতে চারুদণ্ড।
কুলটাতে অভিলাস রক্তবস্ত্র বহির্বাস শঠের প্রধান বিশ্বভণ্ড।"

ব্যাধিসিন্ধু বৈদ্য :

"দুই পায়ে আছে গোদ অঙ্কুর সহিত।
পৃথিবী ধরিতে নারি কাঁপে হইয়া ভিত॥
হাতেতে অঞ্চল করি দিতেছে বাতাস।
ঝাঁকে ঝাঁকে যত মাছি উড়ে আসপাশ।
কাশির ধ্বনিতে দিক পুরিল আকাশ।
এইরূপে ব্যাধিসিন্ধু সভাতে প্রবেশ।"

রণজম্বুক সেনাপতি :

"আমার সমান বীর ত্রিভুবনে নাই।
যুদ্ধের শুনিলে নাম তখনই পলাই।"

'হাস্যার্ণব' নাটকখানি স্থানে স্থানে অশ্লীলতা দোষদুষ্ট, কারণ ইহাতে সমসাময়িক দুর্নীতির প্রতিচ্ছবি আছে। বিশ্বভণ্ড পণ্ডিত, মহানিন্দক আচার্য্য, মদনান্ধ মিশ্র কেহই চরিত্র হিসাবে উন্নত ছিলেন না। সমাজের প্রতিকৃতি হিসাবে এই নাটকের মূল্য আছে। পণ্ডিতপ্রবর উইলসন বলেন, যে-সকল ব্রাহ্মণকে এই নাটকে বিদ্রূপ করা হইয়াছে তাহারা কুলীন ও বামাচারী ছিলেন। গ্রন্থে কিন্তু কৌলীন্যপ্রথা-সম্বন্ধে কোন উল্লেখ নাই।

শ্রীহর্ষের 'রত্নাবলী' নাটকাবলম্বনে নীলমণি পাল রচিত বাংলা 'রত্নাবলী' নাটকখানি ১৮৪৯ খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত হয়। ইহার আখ্যাপত্র এইরূপ :

রত্নাবলী নাটিকা
শ্রীশ্রীহর্ষ কবি বিরচিতা।

শ্রীযুক্ত শিবশঙ্কর সেনের অনুমত্যনুসারে শ্রীনীলমণি পাল কর্তৃক বঙ্গভাষায় নানা ছন্দঃ প্রবন্ধে অনুবাদিত হইয়া শ্রীচন্দ্রমোহন শিদ্ধান্ত বাগীশ ভট্টাচার্য্য দ্বারা সংশোধন পূর্ব্বক

কলিকাতা
তত্ত্ববোধিনী যন্ত্রালয়ে
মুদ্রিত হইল
... ...
১৭৭১

পয়ার ছন্দে গণেশ-বন্দনার সহিত নাটকখানি আরম্ভ। তাহার পরে গুরুবন্দনা বা ভূমিকা। নীলমণি পালের 'রত্নাবলী'কে যথাযথ অনুবাদ বলা চলে না। শ্রীহর্ষের মূল নাটক অবলম্বন করিয়া তিনি অন্যান্য বিষয়ও গ্রন্থমধ্যে অবতারণা করিয়াছেন। এই সকলের মধ্যে শ্রীহর্ষের রাজধানীর বর্ণনা, রত্নাবলী সম্বন্ধে আখ্যান ও একটি জলযাত্রার বিবরণ বিশেষ উল্লেখযোগ্য। মূল নাটকের কথোপকথন স্থলে অনেক স্থানে মাত্র বাংলায় বর্ণনা আছে। নীলমণি পাল পয়ার, ত্রিপদী, লঘু ত্রিপদী, একাবলী, দীর্ঘ পয়ার, একাবলী অন্তযমক, তুনকাভাস, তোটক, ললিতলঘু, চৌপদী প্রভৃতি ছন্দের বহুল ব্যবহার করিয়াছেন। কিন্তু তাঁহার নাটকের বিশেষ কৃতিত্ব এই যে, তিনি পদ্যাংশে স্থানে স্থানে মৌলিকতা দেখাইয়াছেন :

"সরোজ আসনে ব্রহ্মা হংস আরোহণ।
বিধুকলা শিরে শোভে রুদ্র ত্রিলোচন॥
শঙ্খ চক্র গদা পদ্ম ধরি চারি হাতে।
পালন করেন বিষ্ণু গরুড় সহিতে॥
ঐরাবতো পরি ইন্দ্র করি আরোহণ।
শোভিছেন চতুর্দিকে অন্য দেব গণ॥
গন্ধর্ব্ব চারণ সবে অপ্সরা সহিত।
আমোদ প্রমোদ করে করে নৃত্যগীত॥"

চতুর্থ অঙ্কে গদ্যের ব্যবহার-প্রাচুর্য্য আছে ও তাহাতে নাটকখানির শেষাংশ সময়ে সময়ে নীরস মনে হয়।

এই নাটক কয়খানি অভিনীত হইয়াছিল বলিয়া আমাদের জানা নাই। কিন্তু প্রথম মুদ্রিত বাংলা নাট্যগ্রন্থ হিসাবে ইহাদের মূল্য সাহিত্যের ইতিহাসে সামান্য নহে।

বাংলার পাটচাষীর সমস্যা

শ্রীসুধীরকুমার লাহিড়ী

বাংলায় পাটের চাষ, পাট বিক্রয়ের ব্যবস্থা, পাটের দাম প্রভৃতি নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব কি-না এ সম্বন্ধে অনুসন্ধান করিবার জন্য সরকার এক কমিটি নিয়োগ করিয়াছেন। এই কমিটি তাঁহাদের অনুসন্ধান-কাজে নিযুক্ত আছেন। তুলার বাজার নিয়মিত করিবার জন্য মধ্য-প্রদেশ ও বেরারে যেরূপ আইন হইয়াছে, বাংলায় সেরূপ কোন আইন করা ভাল ও সম্ভব কি-না, পাটের আবাদ হইতে পাট বিক্রয় পর্য্যন্ত সমস্ত জিনিষটা নিয়ন্ত্রণ করিবার জন্য একটা স্থায়ী সঙ্ঘ গঠন করা সম্ভব কি-না, সম্ভব হইলে কি ভাবে গঠন করিলে তাহা কার্য্যকরী হইতে পারে, সমগ্র প্রদেশের জন্য এরূপ স্থায়ী সঙ্ঘ গঠিত হইয়া পাটের ব্যবসা নিয়ন্ত্রণ করিতে হইলে যে-অর্থের প্রয়োজন তাহা কোথা হইতে পাওয়া যাইবে, এইরূপ নিয়ন্ত্রণের দ্বারা পাটের দাম চড়িলে অন্য কোন সস্তা জিনিষ ইহার পরিবর্ত্তে ব্যবহৃত হইতে আরম্ভ হইবার সম্ভাবনা আছে কি-না, এখন যে প্রচুর পাট চাষ হয় তাহা না কমাইয়া অন্যান্য নূতন কাজে ইহাকে লাগান যাইতে পারে কি-না প্রভৃতি পাট সম্বন্ধে সব দিক দিয়া অনুসন্ধান ও আলোচনা করিয়া পরামর্শ দিবার ভারও এই কমিটির উপর ন্যস্ত হইয়াছে।

পাট-চাষ ও পাট-শিল্প সম্বন্ধে যাঁহাদের অভিজ্ঞতা আছে, বা কোন-না-কোনপ্রকারে যাঁহারা পাটের ব্যবসায়ে লিপ্ত আছেন, এই কমিটি এক বিশদ প্রশ্নপত্র প্রচার করিয়া তাঁহাদের মত ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়াছেন। পাটের উপর বাংলার উন্নতি অনেকটা পরিমাণে নির্ভর করে। এই কমিটির আলোচনা ও অনুসন্ধানের ফলে যাহাতে বাংলার পাট-সমস্যার একটা ভাল সমাধান হয় তজ্জন্য সকলেরই যথাসাধ্য চেষ্টা করা কর্ত্তব্য।

নানাকারণে পাট-সমস্যা বেশ জটিল। পাট-ব্যবসায়ে যাঁহারা লিপ্ত আছেন, তাঁহাদের পরস্পরের স্বার্থ সম্পূর্ণ এক নহে। বহু ধনশালী ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠান এই ব্যবসায়ে প্রচুর অর্থ নিয়োগ করিয়াছেন। তাঁহাদের স্বার্থের সঙ্গে গরীব কিন্তু লক্ষ লক্ষ পাট-চাষীর স্বার্থে যে কোন বিরোধ নাই, এমন কথা বলা যায় না। ১৯২১ সালের গণনা মতে চল্লিশ লক্ষ লোকের জীবিকা নির্ভর করে পাট-চাষের উপর। সেণ্ট্রাল ব্যাঙ্কিং এন্‌কোয়ারী কমিটির সংলগ্ন অভিজ্ঞ বিদেশী ব্যাঙ্কারদের কমিটির সদস্য মিষ্টার এ. পি. ম্যাক্‌ডুগাল হিসাব করিয়াছেন যে, ইহার মধ্যে প্রায় দশ লক্ষ লোক নিজেরা পাট চাষ করিয়া থাকে। পাটসমস্যার সমাধানে এই বিচ্ছিন্ন দরিদ্র চাষীদের কথাই সর্ব্বাগ্রে ভাবিতে হইবে। তাহারা পাট চাষ করিয়া যাহাতে ন্যায্য দাম পায় তাহার ব্যবস্থা করাই পাট সম্বন্ধে যে-কোন সিদ্ধান্তের মুখ্য লক্ষ্য হওয়া উচিত।

সব দিক দিয়া পাট সম্বন্ধে আলোচনা করা এই প্রবন্ধের উদ্দেশ্য নয়। পাট-বিক্রয়ের কোন ভাল ব্যবস্থা করা যায় কি-না কেবল তাহার আলোচনাই এই প্রবন্ধের উদ্দেশ্য। বর্ত্তমানে ব্যবসা-বাণিজ্য মন্দা হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে পাট বিক্রয়ের সুব্যবস্থার অভাব খুব বেশী অনুভূত হইয়াছে। অনেক ব্যক্তি ও সমিতি এসম্বন্ধে বহু আলোচনাও করিয়াছেন। কিন্তু কোন সুচিন্তিত প্রস্তাব কার্য্যে পরিণত করিবার জন্য সুসম্বদ্ধ কোন চেষ্টা আজ পর্য্যন্ত হয় নাই।

কৃষিজাত পণ্য বিক্রয়ের ভাল ব্যবস্থা না থাকায় আমাদের দেশের চাষীদের যে ক্ষতি হয় তাহার কথা কয়েক বৎসর পূর্ব্বে রাজকীয় কৃষি কমিশন বিশদভাবে আলোচনা করিয়াছিলেন। তাঁহারা বলেন, যদি কৃষিজাত বস্তুকে ভালমন্দ হিসাবে পৃথক পৃথক রাখিয়া, ওজন সর্ব্বদা ঠিক রাখিয়া ও অন্যান্য উপায়ে এই সকল পণ্যের বাজারকে নিয়ন্ত্রিত করিতে পারা যায় তাহা হইলে আমাদের দেশের চাষীর অবস্থার প্রভূত উন্নতি হইতে পারে। বঙ্গীয় তদন্ত কমিটি ভালমন্দ পাট কি ভাবে মেশান থাকে সে সম্বন্ধে আলোচনা করিয়া বলেন যে, কোন্ শ্রেণীর পাট কোন্ চালানে আছে ইহা বুঝিতে না পারায় কলিকাতার পাটের বাজারে কোন স্থিরতা রক্ষা করা কঠিন হইয়া পড়ে; মফঃস্বল হইতে যাহারা পাট আমদানী করে তাহারা অনেক

সময় বিষম ক্ষতিগ্রস্ত হয়। আমেরিকায় আইন করিয়া তুলার ওজন ও শ্রেণী যেমন ঠিক করিয়া দেওয়া হইয়াছে সেইরূপ কোন আইন বাংলার পাট সম্বন্ধে তাঁহারা করিতে বলেন। ক্রেতা ও বিক্রেতায় কোন বিরোধ হইলে আইনে গঠিত সালিসী সমিতি তাহার নিষ্পত্তি করিবে।

কৃষি-মাল বেচিবার সুনিয়ন্ত্রিত কোন বন্দোবস্ত না থাকায় দুনিয়ার বাজারে কিরূপে ভারতবর্ষ হটিয়া যাইতেছে, ভারতবর্ষ কৃষি-প্রধান মহাদেশ হইলেও বেচিবার বিধিবদ্ধ ব্যবস্থার অভাবে পৃথিবীর বাজারে আমাদের কৃষি-পণ্যের স্থান কেন পিছাইয়া পড়িতেছে, মিষ্টার ম্যাকডুগাল তাঁহার মন্তব্যে এই বিষয়টি ভাল করিয়া আলোচনা করিয়াছেন। মাল ভাল দামে ভাল বাজারে বেচিতে না পারিলে কেবল উৎপন্ন করিয়াই কেহ সম্পদশালী হইতে পারে না। ভারতবর্ষও পৃথিবীর বাজারে প্রতিষ্ঠালাভ করিতে না পারিলে চিরদিনই দরিদ্র হইয়া থাকিবে। তিনি আরও বলেন,—ভারতবর্ষের সর্ব্বাপেক্ষা বড় সমস্যা তাহার কৃষকের অবস্থার উন্নতি করা। ইহা করিতে পারিলে দেশের দারিদ্র্যও ঘুচিবে সঙ্গে সঙ্গে সমাজজীবনও উন্নতি লাভ করিবে। ইহা করিবার মাত্র দুইটি পথ আছে: একটি সমবায়—ব্যাপক অর্থে; অন্যটি কৃষিজাত পণ্য বেচিবার জন্য সুনিয়ন্ত্রিত বাজার। পাট বেচিবার সুব্যবস্থার জন্য ম্যাকডুগাল সাহেব যে বিশদ প্রস্তাব করিয়াছেন তাহাতে সমবায় নীতির বিশিষ্ট স্থান আছে।

বিক্রয়ের সুব্যবস্থার সঙ্গে মাল চলাচলের ভাল বন্দোবস্ত, যানবাহন ও পথঘাটের সুবিধা, রেলের মাশুল হ্রাস, আইনদ্বারা নিয়মিত বাজার ও হাট প্রতিষ্ঠা, সর্ব্বত্র এক ওজনের প্রচলন, কৃষিজাত পণ্যের শ্রেণী বিভাগ করিয়া উৎকৃষ্ট মাল বাজারে পাঠাইবার ব্যবস্থা, ভেজাল নিবারণ, সমবায় বিক্রয় সমিতির প্রতিষ্ঠা প্রভৃতি ঘনিষ্ঠ ভাবে যুক্ত। কৃষি-কমিশন ও বিভিন্ন প্রাদেশিক ব্যাঙ্কিং তদন্ত কমিটি এ সকল বিষয়ে যে-সব প্রস্তাব করিয়াছেন ভারতীয় ব্যাঙ্কিং কমিটি তাহার অনেকগুলি সমর্থন করিয়াছেন। রোমে আন্তর্জাতিক কৃষি প্রতিষ্ঠান (International Institute of Agriculture) নামে একটি প্রতিষ্ঠান আছে। এই প্রতিষ্ঠান ১৯২৯-৩০ সালে বিভিন্ন দেশের কৃষির অবস্থা সম্বন্ধে এক পুস্তক সম্প্রতি প্রকাশ করিয়াছেন। আটাশটি উন্নত জাতির কৃষি-ব্যবস্থার কথা এই পুস্তকে বর্ণিত হইয়াছে। কৃষি ও কৃষকের উন্নতির জন্য এই সকল দেশে যাহা করা হইয়াছে তাহার বর্ণনার পরে গ্রন্থে এই এই কথা লেখা হইয়াছে যে. বিভিন্ন দেশে অধুনা কৃষির উন্নতির জন্য যে নীতি অবলম্বন করা হইয়াছে তাহার মূল সূত্র কৃষিজাত পণ্যের বিক্রয়ের সুবন্দোবস্ত করা। বিক্রয়ের ভাল ব্যবস্থার উপরে কৃষির উন্নতি কতটা নির্ভর করে, ইহা হইতেই প্রমাণিত হয়। অন্য দেশ সম্বন্ধে ইহা যেমন সত্য বলা বাহুল্য ভারতবর্ষ সম্বন্ধেও ইহা সেইরূপ সত্য। পাট বিক্রয়ের সুব্যবস্থা সরকারী চেষ্টা ও যত্ন ছাড়া সম্ভবপর নহে। পাশ্চাত্য বড় বড় দেশেও অনেক স্থলেই প্রধানতঃ সরকারের চেষ্টা ও সাহায্যেই কৃষি পণ্য বিক্রয়ের ভাল ব্যবস্থা করা সম্ভব হইয়াছে।

কৃষি-মাল ও কৃষিজাত খাদ্যদ্রব্যাদি ক্রয়-বিক্রয়ের জন্য আমেরিকার যুক্ত রাজ্যে এক বিশদ আইন প্রস্তুত হইয়াছে। ১৯২৯ সালের কৃষিপণ্য বিক্রয় সম্বন্ধীয় আইনের উদ্দেশ্য (১) হঠাৎ দামের উঠা-নামা যতটা কম হয় তাহার চেষ্টা করা, (২) মাল সরবরাহের ভাল ব্যবস্থার দ্বারা অপচয় নিবারণ করা, (৩) সমবায় সমিতি গঠনে কৃষকদিগকে উৎসাহ দেওয়া, (৪) কোন কৃষিজাত দ্রব্য যাহাতে চাহিদার অতিরিক্ত উৎপন্ন না হয় এবং উৎপন্ন হইলেও ক্রয়-বিক্রয় যাহাতে বিধিভাবে নিয়ন্ত্রিত হয় তাহার ব্যবস্থা করা, ইত্যাদি। এই আইনে নিম্নলিখিত বিষয়ের জন্য সমবায় সমিতিকে ঋণদানের ব্যবস্থা আছে:—(১) মালবিক্রয়ের সুব্যবস্থা, (২) কৃষিজাত পণ্য সংরক্ষণের জন্য গোলা প্রভৃতি প্রতিষ্ঠা, (৩) বড় বড় যৌথকারবারীদের মধ্যে মাল লেনদেনের জন্য যেমন ক্লিয়ারিং হাউসের (clearing house) ব্যবস্থা আছে কৃষিজাত দ্রব্যের জন্যও সেইরূপ সমিতি প্রতিষ্ঠা, (৪) সমবায় সমিতির সভ্য বাড়াইবার জন্য প্রচারকার্য্য, (৫) মাল জমা দিবার সময়ে সভ্যগণকে অগ্রিম দাদনের ব্যবস্থা, ইত্যাদি। সমবায় সমিতি-সমূহকে বার্ষিক শতকরা চার টাকার বেশী সুদ দিতে হয় না। সমবায় সমিতিগুলিও বিচ্ছিন্নভাবে কৃষিজাত পণ্য বিক্রয়ের সব ব্যবস্থা করিতে পারে না। তাহাদেরও সহযোগ বা সংহতির প্রয়োজন। এই আইনে সে ব্যবস্থা করা হইয়াছে। এই আইন কার্য্যকরী হইতে হইলে এক বৃহৎ প্রতিষ্ঠান ও বহু

অর্থের প্রয়োজন। বলা বাহুল্য, তাহার ব্যবস্থাও এই আইনে আছে।

য়ুরোপেও অনেক দেশে সরকার কৃষির উন্নতির জন্য অনেক কিছু করিয়া থাকে। ফ্রান্সের কথাই ধরা যাক। ফরাসী দেশে কৃষির উন্নতির জন্য কেবল সমবায় সমিতি প্রতিষ্ঠা করিয়াই সরকার ক্ষান্ত হন নি, কৃষির জন্য প্রয়োজনীয় অর্থের বিশেষ ব্যবস্থা করিয়াছেন। জাতীয় কৃষি ঋণদান সমিতি বেশীর ভাগ সরকারী ব্যাঙ্ক অব্ ফ্রান্স-এর সাহায্যেই চলে। ১৯০০ হইতে ১৯২০ সাল পর্য্যন্ত কৃষির জন্য ঋণ দেওয়া হইয়াছে প্রায় ১১৭ কোটী ফ্রাঙ্ক। এই টাকার প্রায় অর্দ্ধেক দীর্ঘ মেয়াদী ঋণ। ফ্রান্সে কৃষি ঋণদান সমিতির সংখ্যা ৫,৭৩০, সভ্যসংখ্যা ৩,৮৩,০০০। ফ্রান্সে সমবায় সমিতির সংখ্যা ৯,০০০, সভ্যসংখ্যা ১২,২৫,০০০। ১৫০০টি সমিতি পনীরের ব্যবসায়ে লিপ্ত, ২৮৭৭টি সমিতি কৃষি উৎপাদন ও কৃষিপণ্য বিক্রয়ে ব্যাপৃত। ইহা ছাড়া অন্য নানাবিধ সমিতিও আছে।

বিখ্যাত অর্থনীতি বিশারদ অধ্যাপক চার্লস্ জিদ্ (Gide) ফ্রান্সে সমবায় সম্বন্ধে লিখিয়াছেন: কেহ কেহ মনে করেন, সরকারী সাহায্যে সমবায় স্ফূর্ত্তি পায় না; একথা যে সম্পূর্ণ সত্য নয় ফ্রান্সে তাহা প্রমাণিত হইয়াছে। তিনি বলেন যেখানে সাধারণে সমবায় সম্বন্ধে বিশেষ উৎসাহী ছিল না, ব্যক্তিগত চেষ্টাতে বিশেষ ফল যেখানে ফলিত না, সেখানে রাজসরকারের যত্ন ও অধ্যবসায়েই সমবায় এরূপ সাফল্য লাভ করিয়াছে।

য়ুরোপে কেবল ফ্রান্সই কৃষির উন্নতির জন্য যে সচেষ্ট তাহা নহে। ইংলণ্ডের রাজসরকার প্রতি বৎসর কৃষি ব্যবসায়ের উন্নতির জন্য প্রচুর অর্থ ব্যয় করেন। ১৯৩১ সালে কৃষিজাত পণ্য বিক্রয় সম্বন্ধীয় এক আইন পাশ হয়। এ সম্পর্কে একটি বড় প্রতিষ্ঠান গঠন করা হইয়াছে। এই সমিতির হাতে রাজকোষ হইতে প্রায় সাত কোটী টাকা দেওয়া হইয়াছে। এই টাকার সাহায্যে কৃষি-পণ্য বিক্রয়ের সুব্যবস্থার চেষ্টা করা হইতেছে। কৃষির উৎকর্ষের জন্য ইংলণ্ডের রাজসরকার কত যত্নবান তাহার আরও অনেক প্রমাণ আছে। চিনির জন্য বীট উৎপাদনে বাৎসরিক প্রায় কোটী টাকা পর্য্যন্ত ও গমের জন্য প্রায় তের কোটি টাকা পর্য্যন্ত সরকার যাহাতে ব্যয় করিতে পারেন তাহার ব্যবস্থা আছে। জমি সম্বন্ধীয় বহু আইনও কৃষির উৎকর্ষে সাহায্য করে। এই সকল বাবদেও রাজসরকার হইতে কম টাকা ব্যয় হয় না।

জার্ম্মানী, বেলজিয়াম, ডেনমার্ক, হল্যাণ্ড প্রভৃতি দেশেও সরকারী সাহায্যে কৃষির উন্নতির জন্য যথেষ্ট চেষ্টা করা হয়। কৃষি-মাল বিক্রয়ের সুব্যবস্থা ও সমবায়ের সাহায্যে উৎকৃষ্টতর কৃষিপণ্য উৎপাদন—প্রধানত এই দুই দিক দিয়া এই সকল দেশেও কৃষকের অবস্থা উন্নত করিবার চেষ্টা হইতেছে। শ্রীযুক্ত এণ্টর ও মারে 'ভূমি ও জীবন' (Land and Life) নামক নূতন গ্রন্থে জার্ম্মানী সম্বন্ধে লিখিয়াছেন—সরকারী সাহায্যে কৃষি-যানের এমন সুব্যবস্থা এদেশে হইয়াছে যাহার তুলনা অন্য দেশে পাওয়া কঠিন। খণ্ড খণ্ড বিচ্ছিন্ন জমিকে এক করিয়া চাষের সুবিধা করিতে হইলে, জমির উৎপাদিকা শক্তি বাড়াইতে হইলে বহু অর্থের প্রয়োজন। লড়াইয়ের আগে হইতে (ও তাহার পরে) জার্ম্মানীতে বহু প্রতিষ্ঠান গড়িয়া উঠিয়া কৃষি-ঋণের ব্যবস্থা করিয়াছে। গত কয়েক বৎসরের মধ্যে কৃষি সমবায় বিশেষ বিস্তৃতি লাভ করিয়াছে।

জাপানে রাজসরকার কৃষির উৎকর্ষের জন্য কি করেন তাহার বিবরণী ১৯৩১ সনের "কৃষি সমবায় বার্ষিকী" (Year-Book of Agricultural Co-operation, 1931) নামক পুস্তকে প্রদত্ত হইয়াছে। জাপানে অন্যান্য ব্যবসায়ের লভ্যাংশের উপরে যেমন ট্যাকস্ আছে কৃষি ব্যবসায়ের লভ্যাংশের উপর সেরূপ কোন ট্যাক্স নাই; যাহারা নিজেরা চাষ করে জমি যাহাতে তাহাদের হাতে যতটা সম্ভব থাকে তাহার জন্য জমি বন্ধক ক্রয় প্রভৃতির সময়ে চাষীকে রেজিষ্ট্রেসন ফি দিতে হয় না; কেন্দ্রীয় সমবায় ব্যাঙ্কের মধ্য দিয়া রাজ-সরকার অল্প সুদে চাষের উন্নতির জন্য টাকা ধার দেন; কৃষি-পণ্য সংরক্ষণের জন্য জাপান সরকার অর্থসাহায্য করেন। জাপানে কৃষি-সমবায় সরকারী যত্নে ও সাহায্যে বাড়িয়া উঠিয়াছে। কৃষি ঋণদান সমিতি সমবেত ভাবে চাষের যন্ত্রাদি ও সার ক্রয়, সমবেত ভাবে কৃষি-পণ্য বিক্রয়—এ সকলের পিছনে রাষ্ট্রশক্তির চেষ্টা ও যত্ন বিদ্যমান।

উপস্থিত কৃষিজাত দ্রব্যের মধ্যে পাট-ই আমাদের আলোচ্য বিষয়। পাটের বাজার পড়িয়া যাওয়ায় বাংলায় দারুণ অর্থ সঙ্কট হইয়াছে। সরকারের ও অন্যান্য

যাঁহাদের স্বার্থ এই ব্যাপারে নানাভাবে জড়িত তাঁহাদের সকলের এক হইয়া এই অর্থ কষ্ট দূর করিবার প্রকৃষ্ট পন্থা উদ্ভাবনের এই হইল সুযোগ। পাট বিক্রয়ের সুব্যবস্থার জন্য তিন রকমের প্রস্তাব হইয়াছে। প্রথমত, সরকারী কর্ত্তৃত্বে পাট সংক্রান্ত সকল ব্যাপার পরিচালিত করা। দ্বিতীয়ত, মিষ্টার ম্যাকডুগাল যেমন বলিয়াছেন পাট বিক্রয় নিয়ন্ত্রণ করিবার জন্য সেরূপ এক সঙ্ঘ প্রতিষ্ঠা। তৃতীয়ত, সমবায় পাট বিক্রয় সমিতি গঠন করিয়া পাট বিক্রয়ের সুব্যবস্থা করা। বর্ত্তমান অবস্থায় পাটবিক্রয়ের সম্পূর্ণ ও সকল ব্যবস্থা যদি সরকার নিজের কর্ত্তৃত্বাধীনে আনেন তাহা হইলে তাঁহার ব্যয় সঙ্কুলান করা কঠিন হইবে। তাহার উপর চাষীরা নিরক্ষর। সরকারী বিধিনিষেধের মর্ম্ম তাহারা নিজেরা পড়িয়া বুঝিতে পারিবে না বলিয়া নিম্নশ্রেণীর কর্ম্মচারীদের দ্বারা বে-আইনী জবরদস্তি যে কোথাও হইবে না, এ কথাও বলা যায় না। ম্যাকডুগাল সাহেব যেরূপ সমিতির প্রস্তাব করিয়াছেন তাহাতে চাষীদের দুঃখ ঘুচিবে না, হয়ত বাড়িয়াই যাইবে। এইরূপ সমিতির যাঁহারা কর্ত্তা হইবেন তাঁহারা ধনী, সঙ্ঘবদ্ধ ব্যবসায়ী কিম্বা উচ্চপদস্থ রাজকর্ম্মচারী। চাষীদের স্বার্থ তাঁহারা দেখিবেন এরূপ কল্পনা করা বৃথা। অন্যপক্ষে নিজেরা সম্পদশালী ও সঙ্ঘবদ্ধ বলিয়া তাঁহাদের স্বার্থ সম্পূর্ণ বজায় রাখিতে পারিবেন। এই জন্য পাট বিক্রয় সম্বন্ধে দ্বিতীয় প্রস্তাবও সমর্থন করা যায় না। পাট-ব্যবসায়ীরা স্বভাবতঃ চায় যত কম দামে পারে চাষীদের নিকট হইতে পাট কিনিতে ও যত বেশী দামে পারে বেচিতে। ম্যাকডুগাল সাহেবের হিসাবমত প্রায় দশ লক্ষ লোক নিজেরা পাট চাষ করে। যাহাতে বাংলার এত পাট-চাষী মুষ্টিমেয় ব্যবসায়ীর কবলে গিয়া না পড়ে তাহার ব্যবস্থা সরকারকেই করিতে হইবে। কেবলমাত্র সমবায় পাট-বিক্রয় সমিতি গঠন করিয়াই সরকার তাহা করিতে পারিবেন।

বাংলায় যে কয়টি পাট-বিক্রয় সমিতি গঠন করা হইয়াছিল তাহারা অকৃতকার্য্য হওয়ায় সমবায়নীতিতে এই সমস্যার সমাধান সম্ভব নয় অনেকে ইহা মনে করেন। এই ধারণা সম্পূর্ণ ভুল। সমবায় পাট-সমিতি সফল হয় নাই পরিচালনার দোষে, সমবায় নীতির দোষে নয়। গঠনের যে ত্রুটি পূর্ব্বকার সমিতিতে ছিল তাহা সংশোধন করিয়া এবং পূর্ব্বের ভুলের পুনরাবৃত্তি যাহাতে না হয় তাহার ব্যবস্থা করিয়া সমিতি গঠন করিলে তাহা বিফল হইবে কেন? ভুল সব ক্ষেত্রেই হয় বা হইতে পারে। প্রথম বারের ভুল আমরা অভিজ্ঞতার দ্বারা দ্বিতীয় বারে সংশোধন করিয়া লই। সকল প্রগতির এই নিয়ম। গঠনের দোষে সমবায় পাট-সমিতি একবার সফল হয় নাই বলিয়া নূতন ভাবে তাহার পুনর্গঠনের চেষ্টা করিব না, একথা মোটেই সমীচীন নহে।

সমবায় নীতিতে গঠিত কৃষি-পণ্য বিক্রয় সমিতি যে বাংলায় সর্ব্বক্ষেত্রেই বিফল হইয়াছে, একথাও বলা যায় না। খুব বড় না হইলেও ছোট দুই ক্ষেত্রে এরূপ সমিতি সফল হইয়াছে ও ভাল কাজ করিতেছে। ২৪-পরগণার গোসাবা সমিতি-সমূহের কথা ও রাজসাহী জেলার নওগাঁ গাঁজা বিক্রয় সমিতির কথা বলিতেছি। গোসাবা সুন্দরবনের নিকটে অবস্থিত। এই স্থানের প্রধান কৃষি ধান। স্থানীয় সমস্ত ধান সমবায় সমিতির হাত দিয়া বিক্রয় হয়। তাহার ফলে যাঁহারা চাষ করেন তাঁহারা প্রভূত উপকৃত হইয়াছেন। নওগাঁতে গাঁজার চাষ ও বিক্রয় দুই-ই সমবায় সমিতির সাহায্যে হয়। অন্য কৃষি-পণ্যের সঙ্গে গাঁজার অবশ্য তুলনা হয় না। ইহা সরকারের আবগারী বিভাগের অন্তর্গত। ইহার চাষ বা বিক্রয়ের অধিকার সাধারণের নাই।

সমবায় প্রণালীতে নওগাঁয় গাঁজার চাষ বা বিক্রয়ের ব্যবস্থার পূর্ব্বে চাষীদের অবস্থা অতি শোচনীয় ছিল। দালালদের অত্যাচারে এমন অবস্থা হয় যে, গাঁজা চাষ করিবার জন্য কেহ আর লাইসেন্স লইতে বা অনুমতি চাহিতে আসে না। সমবায় বিভাগ তখন চাষীদের সমবায় সমিতি গঠন করিয়া দালালের মধ্যবর্ত্তিতা ছাড়া গাঁজার চাষ ও বিক্রয়ের ব্যবস্থা করেন। গাঁজার চাষ বা বিক্রী যে-কেহ করিতে পারে না। এই কারণে নওগাঁয় সমবায় সমিতি গঠন করা ও উহাকে কার্য্যকরী করিয়া তোলা অনেকটা সহজ হইয়াছে, ইহা সত্য। কিন্তু সমবায় ছাড়া চাষীরা অন্য যে সুবিধা পাইয়াছে তাহা পূর্ব্বে তাহারা পায় নাই। চাষীরা এখন জানে যে, ন্যায্য দাম তাহারা পাইবে। পূর্ব্বের মত উৎপন্ন গাঁজা বৎসরের মধ্যে বিক্রয় না হইলে এখন আর আইন অনুযায়ী নষ্ট করিয়া ফেলিতে হয় না, কেন-না, এখন যতটা উৎপন্ন হয় সমস্তই সমবায় সমিতি কিনিয়া লয়। সব কাজই এখন সুশৃঙ্খল বিধি-

ব্যবস্থার মধ্য দিয়া হয়। সেজন্য সরকার বা কৃষক কেহই ক্ষতিগ্রস্ত হন না। এই ব্যবস্থার ফলে সমস্ত অঞ্চলের চেহারা ফিরিয়া গিয়াছে. স্বাবলম্বনে এক নূতন জীবনের আস্বাদ ইহারা পাইয়াছে। সমবায়ের দ্বারা যে আমাদের এই বাংলা দেশেও কৃষি-পণ্য বিক্রয়ের সুব্যবস্থা করা যায় গোসাবা ও নওগাঁতে তাহা প্রমাণিত হইয়াছে।

একটি, দুইটি, বা তিনটি গ্রাম লইয়া সমবায় ঋণদান সমিতির মতই সমবায় পাট-বিক্রয় সমিতি গঠন করিতে পারা যায়। সমস্ত বাংলা দেশে পাট-বিক্রয় সমিতি গঠন করিতে সময় লাগিবে, বোধ হয় দশ-বারো বৎসরের কম হইবে না; কিন্তু আমরা ছোট করিয়া আরম্ভ এখনই করিতে পার। গ্রাম্য পাট বিক্রয় সমিতিগুলির একটি করিয়া কেন্দ্রীয় সমিতি থাকিবে। মহকুমা শহরে বা যেখানে কেন্দ্রীয় সমবায় ব্যাঙ্ক আছে এরূপ স্থলে এই সকল সমিতি প্রতিষ্ঠিত হইতে পারিবে। কেন্দ্রীয় পাট বিক্রয় সমিতিতে সুদক্ষ কর্ম্মচারীর তত্ত্বাবধানে পাট বাছাই করিয়া ও তাহার শ্রেণী বিভাগ করিয়া গাঁইটে বাঁধা হইবে। কেন্দ্রীয় সমিতিগুলি কেন্দ্রীয় সমবায় ব্যাঙ্কের মত এক প্রাদেশিক সঙ্ঘের সহিত যুক্ত থাকিবে। এই ভাবে সমবায় নীতিতে সমস্ত পাট বেচিবার ব্যবস্থা করা যাইতে পারে। প্রাদেশিক সঙ্ঘ হইতে গ্রাম্য সমিতি পর্য্যন্ত প্রতিষ্ঠান সমবায় সমিতিসমূহের রেজিষ্ট্রারের অধীনে থাকিবে। অবশ্য পাট-সমিতিগুলির জন্য এক জন সহকারী রেজিষ্ট্রারের (Deputy Registrar) প্রয়োজন হইবে।

সমস্ত পাট যদি সমবায় সমিতির হাত দিয়া বিক্রয় হয় তাঁহা হইলে প্রতি মণ পাটের উপর এক পয়সা মাশুল ধার্য্য করিয়া বার্ষিক চার হইতে পাঁচ লক্ষ টাকা তোলা যাইতে পারে। মাশুলের অর্দ্ধেক ক্রেতা, আর অর্দ্ধেক বিক্রেতা দিবেন। পাট-সমিতির কাজ তত্ত্বাবধান করিবার জন্য সমবায় বিভাগে যে নূতন কর্ম্মচারী নিয়োগের ও ব্যবস্থা-বিধানের প্রয়োজন হইবে তাহার অর্থ এই ভাবে সহজে সংগ্রহ করা যাইতে পারে। এখন সমবায় বিভাগের জন্য সরকারের খরচ হয় (১৯৩১-৩২ সালের হিসাবমত) ৭,৬৪,০০০৲ টাকা। ইহার মধ্যে সমবায় সমিতিগুলি তাহাদের হিসাব পরীক্ষার জন্য [illegible] টাকা দেয়। সরকারকে বাকি ৫,২৭,০০০৲ টাকা দিতে হয়। কলিকাতায় যে প্রাদেশিক পাট সমবায় সঙ্ঘ প্রতিষ্ঠিত হইবে উহা বিশেষজ্ঞ নিযুক্ত করিয়া ভাল বাজারে যাহাতে পাট বিক্রয় হয় তাহার ব্যবস্থা করিবে। সমবায় পাট সমিতির প্রতিনিধি লইয়া এই সঙ্ঘ গঠিত হইবে, যদিও ইহার পরিচালনে সমবায় বিভাগের ও পাট ব্যবসায়ীদের পরামর্শ সর্ব্বদা লইতে হইবে। অনেকটা ইহাদের নির্দ্দেশ অনুযায়ী কার্য্যপ্রণালী স্থির করিতে হইবে। তবে ভোটের অধিকার বা কর্ত্তৃত্ব ইঁহাদের থাকিবে না। চাষীরা নিরক্ষর ও অনভিজ্ঞ বলিয়া প্রথম প্রথম অনেকটা ভার সমবায় বিভাগের উপর বাধ্য হইয়া ন্যস্ত থাকিবে, ক্রমশঃ প্রাদেশিক সঙ্ঘ সকল ভার গ্রহণ করিবেন।

প্রতি বৎসর কত পাট উৎপন্ন হইবে তাহার আনুমানিক হিসাব, অবশ্য ইঁহারাই প্রস্তুত করিবেন। পাটের নূতন নূতন ব্যবহার সম্বন্ধে অনুসন্ধান ও গবেষণার ব্যবস্থা করিতে হইবে। তাহার ফলে পাটের চাহিদা বৃদ্ধি পাইবে, উৎকৃষ্টতর পাটও উৎপন্ন হইবে। চাহিদার অতিরিক্ত পাট যাহাতে উৎপন্ন না হয় তাহার ব্যবস্থাও এই সঙ্ঘ করিতে পারিবেন। পাটের মূল্য তাহাতে হ্রাস পাইবে না। এই সঙ্ঘে সমবায় বিভাগের কর্ত্তৃপক্ষেরা ও পাট ব্যবসায়ীদিগের প্রতিনিধিরা পরামর্শদাতা হিসাবে থাকিবেন বলিয়া ইঁহারা পাটের মূল্যও অন্যায়রূপে সহজে বাড়াইতে পারিবেন না। এইরূপ সঙ্ঘ-গঠনের সর্ব্বাপেক্ষা বড় লাভ এই হইবে যে, এখন পাট লইয়া যে ফূর্ত্তি খেলা চলে তাহা চলা সম্ভব হইবে না।

পাটের মূল্যের স্থিরতা রক্ষা করা বড় কঠিন। প্রধানতঃ মাল সরবরাহের জন্য পাটের প্রয়োজন হয়। ইংলণ্ড, ফ্রান্স, ফিন্ল্যাণ্ড, হাঙ্গেরী, পোলাণ্ড, যুগোস্লাভিয়া. ইতালী. স্পেন, নরওয়ে, কানাডা, আমেরিকার যুক্তরাজ্য, জাপান. চীন প্রভৃতি বহু দেশ পাটের খরিদ্দার। এই সকল দেশে বাণিজ্যের পরিমাণের উপর পাটের চাহিদা ও পাটের মূল্য নির্ভর করে। ব্যবসা মন্দা পড়িলে পাটের প্রয়োজন কম হয়। অনেক স্থলে অন্য ব্যবস্থায় ইহার প্রয়োজনীয়তা কমিয়া গিয়াছে। এই অবস্থায় চাষ না কমাইলে দাম একেবারে পড়িয়া যায়। সমবায় সমিতির হাত দিয়া বাংলার সমস্ত পাট বিক্রয়ের ব্যবস্থা করার সঙ্গে সঙ্গে পাট-চাষ সম্বন্ধে বিশেষ আইনেরও প্রয়োজন হইবে।

সমবায় সমিতির সাহায্যে পাট বেচিতে হইলে চাষীকে দাদন বা অগ্রিম দিবার টাকার ব্যবস্থা করিতে হইবে। পাট-শুল্কের অন্ততঃ অর্দ্ধেকটা বাংলা সরকার পাইবেন, ইহা স্থির হইয়াছে। পাট-শুল্কের পরিমাণ সাড়ে তিন হইতে চার কোটী টাকা ধরা যাইতে পারে। বাংলা সরকার ইহার অর্দ্ধেকটা পাইলে তাহার কিছু অংশ যদি পাটচাষীর জন্য দেন তাহা হইলে এই টাকার ব্যবস্থা হইতে পারে। পাট সমিতি গঠন করিবার জন্য বাৎসরিক কিছু টাকা বরাদ্দ করিয়া এর আরও কিছু টাকা অগ্রিম ঋণ স্বরূপ দিবার ব্যবস্থা করিলে কাজ আরম্ভ করা যাইতে পারে। এই প্রথম উপায়। দ্বিতীয় উপায়, পাটের বন্ধকীতে টাকা তোলার ব্যবস্থা করা। পাট-সংরক্ষণের যদি ভাল ব্যবস্থা হয়, মূল্য যদি অনেকটা স্থির রাখিতে পারা যায় তাহা হইলে সমবায় সমিতির গোলায় যে পাট আসিয়া জমা হইবে সরকারের সাহায্যে তাহার বন্ধকীতে টাকা পাওয়া যাইতে পারে। তৃতীয় উপায়, সরকার সুদের দায়িত্ব গ্রহণ করিলে, মিউনিসিপ্যালিটি প্রভৃতি যেমন ঋণ গ্রহণ করেন সেই ভাবে টাকা ধার করিবার ব্যবস্থা করা। এই তিন উপায়ের যে-কোন একটির বা তিনটির সাহায্যে প্রয়োজনীয় অর্থের সংস্থান হইতে পারে।

পাট-চাষীরা পাট বেচিয়া ভাল দাম পাইলে কেবল যে তাহারাই লাভবান হইবে তাহা নহে, দেশের ধনবৃদ্ধির ফলে রাজসরকারও সমৃদ্ধ হইবেন। ভারতবর্ষের কোন কোন প্রদেশেও তুলা বা গমের চাষ বাড়াইবার জন্য খাল প্রভৃতি কাটিয়া সরকার বহু টাকা ব্যয় করিয়াছেন। বলা বাহুল্য, এই টাকা নষ্ট হয় নাই। এইভাবে যাহা খরচ হয় তাহা সুদে আসলে উঠিয়া আসে। বাংলা সরকার যদি সমবায় সমিতির সাহায্যে পাট-বিক্রয়ের ব্যবস্থা করিয়া চাষীর অবস্থার উন্নতির জন্য চেষ্টা করেন, তাহা হইলে তাঁহাদের এই বাবদে যে খরচ হইবে তাহাও বৃথা যাইবে না।

কৃষি-পণ্য বিক্রয়ের নানা উপায়ে সুব্যবস্থা করার চেষ্টা অন্যান্য দেশে গত কয়েক বৎসরের মধ্যে হইয়াছে। এই সকল ব্যবস্থা এবং চেষ্টার মধ্যে কোন কোন উপায় ফলবতী হইবে কি-না, এ সম্বন্ধে এখনও মত দেওয়ার সময় আসে নাই। কিন্তু এ-সকল দেশে এই সকল চেষ্টার মধ্যে সমবায় নীতির প্রয়োগ ও প্রসার একটি প্রধান উপায়। গঠনের বা পরিচালনের কোন ত্রুটি না থাকিলে সমবায়প্রণালী কোথাও বিফল হয় নাই। সমবায় নীতি নূতন নহে। প্রকৃষ্টভাবে প্রয়োগ করিতে পারিলে এই নীতির সাহায্যে আমরাও কৃতকার্য্য হইব এই আশা আমরা করিতে পারি।

বঙ্গীয় নাট্যশালার ইতিহাস—শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত ও ডক্টর শ্রীসুশীলকুমার দে লিখিত ভূমিকা সম্বলিত। বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদ্‌-মন্দির, কলিকাতা ১৩৪০ সাল। মূল্য ১॥০, সদস্য-পক্ষে ১।০।

নাট্যসাহিত্য বর্ত্তমান যুগে বাংলা দেশের এক বিশিষ্ট কীর্ত্তি। যদিও সবাক ও নির্ব্বাক চলচ্চিত্রের বহুল প্রচলন নাট্যশালার উন্নতির পথে যথেষ্ট অন্তরায়ের সৃষ্টি করিয়াছে তথাপি তাহা অবশ্যই সাময়িক মাত্র; বাঙালীর রসবোধ জাগ্রত থাকিলে যন্ত্রকে কলাশিল্পের নিকট হার মানিতে হইবে এবং নাট্যশালার ভবিষ্যৎ সমুজ্জ্বল থাকিবে। সুতরাং বাঙালীর রসবোধে বিশ্বাস আছে বলিয়া নাট্যশালার ইতিহাসের মর্য্যাদা বাংলা দেশে কোনও দিন ক্ষুণ্ণ হইবে না, একথা জোর করিয়া বলিতে পারা যায়। আলোচ্য পুস্তকখানিতে এই ইতিহাসের উজ্জ্বল চিত্র সুন্দর ভাবে ফুটিয়া উঠিয়াছে।

শ্রীযুত ব্রজেন্দ্রবাবু প্রণীত 'বঙ্গীয় নাট্যশালার ইতিহাস' দুই ভাগে বিভক্ত। প্রথম খণ্ডে 'সখের নাট্যশালা'র বিবরণ দেওয়া হইয়াছে; হেরাসিম লেবেডেফের প্রথম প্রচেষ্টা হইতে আরম্ভ করিয়া নাট্যশালা প্রতিষ্ঠার সূত্রপাত, বাংলা নাটকের প্রথম অভিনয়, স্কুল-কলেজে শেক্সপীয়রের নাটক-অভিনয়ের চেষ্টা: সাতুবাবুর বাড়িতে, বিদ্যোৎসাহিনী বেলগাছিয়া ও জোড়াসাঁকো প্রভৃতি রঙ্গমঞ্চে; কলিকাতায় ও মফস্বলে, কেমন করিয়া বাংলা নাটক ক্রমে বিকাশিত হইতে লাগিল গ্রন্থকার প্রমাণপঞ্জী-সহকারে তাহার বর্ণনা করিয়াছেন। দ্বিতীয় খণ্ডে ন্যাশনাল, ওরিয়েন্টাল, গ্রেট ন্যাশনাল, বেঙ্গল থিয়েটার ও ইণ্ডিয়ান ন্যাশনাল থিয়েটার, ইহাদের ইতিবৃত্ত দেওয়া হইয়াছে। প্রসঙ্গক্রমে লীলাবতী অভিনয়ের উদ্যোগ ও তারিখ, থিয়েটার-দমন-আইন প্রভৃতি প্রয়োজনীয় বিষয়ের আলোচনা আছে। ইং ১৮৭৬ সাল পর্য্যন্ত বঙ্গীয় নাট্যশালার ধারাবাহিক ইতিহাস ইহাতে পাওয়া যাইবে।

গ্রন্থকার 'কলিরাজার যাত্রা'কে প্রথম বাংলা প্যাণ্টোমাইম্‌ বলিয়াছেন, উহা ঠিক কি না সন্দেহ; কারণ প্যাণ্টোমাইমে অঙ্গভঙ্গী ও মূক অভিনয়ই প্রধান,—"প্রশ্নোত্তরক্রমে পরস্পর মৃদুমধুর বাকালাপ কৌশলাদি" থাকিলে তাহা প্যাণ্টোমাইম্‌ থাকে কি না বিচার্য্য। ইংরেজী প্যাণ্টোমাইম্‌ ও দেশী সং, এই উভয়ের মধ্যে কিছু পার্থক্য অবশ্য থাকিবে। লেখক কলিকাতায় ও মফস্বলে রামাভিষেক নাটকাভিনয়ের প্রসঙ্গে, ঢাকা ও তমলুকের কথা উল্লেখ করিয়াছেন; উক্ত নাটক কটকে মহাসমারোহে অভিনীত হইয়াছিল, এবং যদিও এই অভিনয়ের তারিখ ইং ১৮৭৬ সালের পর, সুতরাং গ্রন্থকারের আলোচনার বিষয়ীভূত নহে, তথাপি উহা আধুনিক উড়িয়া নাটকের পথ প্রদর্শন করিয়াছে, একথা স্মরণযোগ্য। মফস্বলে নাট্যাভিনয় সম্পর্কে রামনারায়ণ তর্করত্ন মহাশয়ের উৎসাহে হরিনাভিতে প্রতিষ্ঠিত বঙ্গনাট্য সমাজের কথা উল্লেখ করা যাইতে পারে। পত্রাঙ্ক ব্যাপারে কতকগুলি মুদ্রাকরপ্রমাদ রহিয়াছে; পরবর্ত্তী সংস্করণে সংশোধন বাঞ্ছনীয়। পুস্তকখানির একটি সূচী থাকিলে পাঠকের আরও সুবিধা হইত।

পরলোকগত মহেন্দ্রনাথ বিদ্যানিধি মহাশয় বহুবৎসর পূর্ব্বে যে কাজের সূচনা করিয়া গিয়াছেন, ব্রজেনবাবু এই পুস্তকখানি রচনা করিয়া তাহার পরিসমাপ্তি করিলেন, এজন্য বাঙালী পাঠক তাঁহার নিকট কৃতজ্ঞ থাকিবে। গ্রন্থকার যথার্থ ঐতিহাসিক; তাঁহার ভাষার কোথাও বিলাস নাই, ভাষার গতি স্বচ্ছ ও সরস অথচ অনাবশ্যক উচ্ছ্বাস-বর্জ্জিত; তাহাতে পাঠার্থীর যেমন সুবিধা, বিষয়ের বিশদ আলোচনার পক্ষে তেমনি অনুকূল। যাঁহারা ঐতিহাসিক দৃষ্টি লইয়া বঙ্গসাহিত্য আলোচনা করিতে চাহেন এই পুস্তক পাঠে তাঁহাদের যথেষ্ট সাহায্য হইবে। 'সংবাদপত্রে সেকালের কথা'র মতই "বঙ্গীয় নাট্যশালার ইতিহাস" লেখকের উৎসাহ ও বিচারবুদ্ধির পরিচয় দিতেছে। দুষ্প্রাপ্য পুরাতন সংবাদপত্র ও অন্যান্য বিবরণ হইতে সংগ্রহ করিয়া, অনুসন্ধিৎসু লেখক যে ধৈর্য্য ও পরিশ্রম সহকারে ইহা রচনা করিয়াছেন, তাহার জন্য তাঁহাকে ধন্যবাদ না দিয়া থাকা যায় না। বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ ইহা প্রকাশ করিয়া রসজ্ঞতা ও সুবিবেচনার পরিচয় দিয়াছেন। "বঙ্গীয় নাট্যশালার ইতিহাস" বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদ হইতে প্রকাশিত পুস্তকমালার গৌরব বৃদ্ধি করিবে।

দ্বীপান্তরে—শ্রীক্ষিতীশচন্দ্র বাগচী। বীণা লাইব্রেরী, ১৫ নং কলেজ স্কোয়ার কলিকাতা। দাম বার আনা। ১৯৩২।

কার্থেজ ও রোমের যুদ্ধকথার সঙ্গে সঙ্গে নিউমিডিয়ার অন্তর্বিবাদের কথা এই গ্রন্থে সুন্দরভাবে বলা হইয়াছে। হেলেন গ্রীক কন্যা, এট্‌না উপদ্রবে অতি শৈশবে গৃহহীন; কার্থেজের প্রধান পুরোহিত তাহাকে অগ্নিগর্ভ মলকদেবের সম্মুখে বলি দিতে গেলেন, কিন্তু ভাগ্য তাহা সুপ্রসন্ন রোমান সৈনিক ফুলভিয়াসের জন্য তাহার জীবন রক্ষা পাইল অদৃষ্টদেবতা হেলেনকে দ্বীপ হইতে দ্বীপান্তরে লইয়া যান সেই দ্বীপান্ত[illegible] হইতে পুস্তকের নামকরণ হইয়াছে। নিবা ও সিরণের প্রণয়কাহিনী [illegible]জিস্কার সরলতা ও সাহস ফুলভিয়াসের বল বুদ্ধি ও দেশভক্তি পাঠকে[illegible] মনের উপর একটা দাগ রাখিয়া যায়। প্রাচীন ইউরোপের পূর্ব্বপ্রান্তে[illegible] মানুষ ও প্রকৃতির বর্ণনা মনোরম হইয়াছে সারটার কথা ছবির [illegible] স্পষ্ট হইয়া দেখা দেয়। বিশেষভাবে শিশুদের জন্য লেখা হইলেও [illegible] পুস্তক প্রাপ্তবয়স্ক লোকেরও মনোরঞ্জন করিবে সুখপাঠ্য কাহিনী পড়ি[illegible] তাঁহারাও তৃপ্ত হইবেন। লেখকের রচনাভঙ্গীর প্রশংসা না করিয়া থা[illegible] যায় না।

বাংলার সমস্যা—শ্রীনলিনীকিশোর গুহ। বীণা লাইব্রে[illegible] কলিকাতা। মূল্য বার আনা। ১৩৩৯।

বঙ্গসাহিত্যে নলিনীবাবু অপরিচিত নহেন। তাঁহার চিন্তাশীল[illegible] লক্ষণ বহু প্রবন্ধে পাওয়া যায়, বর্ত্তমান পুস্তকে বাংলার সমস্যা তাঁহা[illegible] বিচলিত করিয়াছে। অস্পৃশ্যতার মর্ম্মকথাই এই সমস্যার স্বরূপ বাং[illegible] সমস্যা মান্দ্রাজের অস্পৃশ্যতা হইতে স্বতন্ত্র বটে; কিন্তু ইহার অস্তিত্ব[illegible] উড়াইয়া দেওয়া যায় না। শিক্ষায় বা রাষ্ট্রে এই ব্যাধি দেখা না দি[illegible] জলচল ব্যাপারে নাপিতের ক্ষৌরকর্ম্মে, দেবমন্দিরে প্রবেশের অধিকা[illegible] জাতিহিসাবে পুরোহিতের শ্রেণীভেদের উৎপত্তিতে—বহুরূপে বা[illegible] অস্পৃশ্যতা দেখা দিয়াছে। এই বাধা দূর করিতে হইলে হৃদয়দ্বার উ[illegible] করা চাই, ভাবাদর্শকে কাজে লাগান চাই, বাংলার বহু ভাবুক ও স[illegible]

অনেক বড় বড় কথা বলিয়া গিয়াছেন, কিন্তু বাংলাকে কার্য্যকুশল হইতে হইবে, "বাংলার পথ আজ খুলিয়া গিয়াছে—পাথেয় সঞ্চয়ের কর্ম্মকুশল কর্ম্মনিষ্ঠাই আজ বাঙালীর চাই—বাংলার সমস্যা ইহাই।"

গ্রন্থকারের এই উদার বাণীর সহিত কাহারও কোনও বিরোধ থাকিতে পারে না। মহাত্মা গান্ধীর লোকোত্তর ত্যাগের ফলে অস্পৃশ্যতাবর্জ্জন আজ হিন্দুর চিন্তাজীবন কর্ম্মজীবনের পুরোভাগ অধিকার করিয়াছে। বাণীকে কর্ম্মে পরিণত করিবার শক্তি যদি এই পুস্তকপাঠে উদ্বুদ্ধ হয় তাহা হইলে লেখকের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইবে। আমরা ইহার বহুল প্রচার কামনা করি।

পুস্তকখানির রচনারীতি সর্ব্বত্র সহজ নয়, মাঝে মাঝে যথেষ্ট জটিলতার সৃষ্টি হইয়াছে। "অস্পৃশ্যতা তথা জাতিভেদ ভারতের শুভচেতনা যতটা দূর করিতে সক্ষম হইয়াছে" (পৃঃ ৫) দুইবার পড়িয়া বুঝিতে হয়। "কথাটা বুঝিও"—এরূপ বক্তৃতাভঙ্গী এমন ধারা পুস্তকে মানায় না। "সব সমান এ যেমন সত্য, সব সমান নহে ইহাও তেমনি সত্য" (পৃ. ১৫) ঠিক 'তেমনি' কি? "মূঢ়তায় আদৌ সমান" (পৃ ১৮)—এখানে মূলতঃ অর্থে 'আদৌ' বাংলায় জলচল নহে। কূর্ম্মধর্ম্মের বহুগুণ সত্ত্বেও আত্মঘাতী সঙ্কীর্ণতা কি অবশ্যম্ভাবী ফল নহে? 'আদর্শনীয়' ও 'অগম্য'কে unseenable ও unapproachable (পৃ. ৪৮) দিয়া ব্যাখ্যা করার দিন চলিয়া গিয়াছে। ইহা ছাড়া পুস্তকে বহু মুদ্রাকর প্রমাদ রহিয়াছে। পরবর্ত্তী সংস্করণে সেগুলির সংশোধন নিতান্ত আবশ্যক।

শ্রীপ্রিয়রঞ্জন সেন

ইঙ্গিত—শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, এম্-এ প্রণীত। প্রাপ্তিস্থান বরদা এজেন্সী, কলেজ ষ্ট্রীট মার্কেট, কলিকাতা। মূল্য এক টাকা।

এই বইখানিতে লেখক অনেক নীতিকথার অবতারণা করিয়াছেন। ভূমিতে পাহাড়ে নদীতে, সাগরে, "পেটে একটা যন্ত্রণাবোধে" (১০ পৃ.), ছাগলের গাছপালা খাওয়ায় (২৩ পৃ.), ছাগলের পিঠে চড়িয়া ফিঙের ফড়িং ধরায় (৯৯ পৃ.),—এবং এইরূপ প্রকৃতির আরও নানা প্রকার লীলায় যে-সব ধর্ম্মোপদেশ লাভ করা যায় তারই ইঙ্গিত ইহাতে রহিয়াছে।

প্রকৃতির ছোটখাট ঘটনায় যে কোন শিক্ষালাভ করা যায় না এমন নহে; কিন্তু সেগুলি হয় কবির দৃষ্টিতে দেখিয়া তাঁহারই ভাষায় প্রকাশ করিতে হয় নয় ত দর্শন-বিজ্ঞানের বিচার-গবেষণার অন্তর্ভুক্ত করিয়া লইতে হয়। তাহা না হইলে জিনিষটি নিতান্তই শিশুপাঠ্য পুস্তকের আকার ধারণ করে। গাছের নিকট স্বতন্ত্রভাবে জীবন ধারণ শিক্ষা করা (৪১ পৃ.), জলের কাছে কূটবুদ্ধিকে ঘৃণা করিতে শিক্ষা করা (১৩৭ পৃ.), কিংবা পাঁক হইতে পদ্মের উদ্ভবে জাতিবিচারের তাৎপর্য্য বোধ করা (১৪৯ পৃ.), প্রবল অনুসন্ধিৎসা এবং চিন্তাশীলতার পরিচায়ক হইতে পারে; কিন্তু ইহাতে কাব্য ও দর্শনের মাঝখানে চিত্তের যে দোদুল্যমান অবস্থা প্রকাশ পায়, তাহা সকলে ঠিক একই ভাবে উপভোগ করিবে কি-না সন্দেহ। "পদ্মের মৃণাল" হেমচন্দ্রের কাব্যোচ্ছ্বাসের ভিত্তি হইয়াছিল। কিন্তু পদ্ম সম্বন্ধে বর্ত্তমান হেমচন্দ্র যাহা লিখিয়াছেন তাহা কাব্যও নয় দর্শনও নয়। যথা

'পাঁকে পদ্মফুল ফোটে দূর হইতেই সেই ফুলের শোভা দেখা ভাল। সৌন্দর্য্যে মুগ্ধ হইয়া উপভোগের জন্য সেই ফুল তুলিতে যাইতে নাই। তুলিতে গেলেই পাঁকে পড়িতে হয়। আর যদি পাঁকে নাই পড় তাহা হইলেও অন্ততঃ দুই এক ফোঁটা পাঁক ছিটকাইয়াও গায়ে লাগিতে পারে।" (৮ পৃ.) হুঁসিয়ার লোকের সদুপদেশ বটে!

প্রবন্ধ সাহিত্য বাংলায় আজকাল চলে কম। মাসিকের অঙ্গপুষ্টি হয় না বলিয়া সম্পাদকেরা অনেক সময় প্রবন্ধের চাহিদা দেখান বটে, কিন্তু সাহিত্যের স্বাধীন আসরে যা চলে তা চুটাক—অর্থাৎ "মৃদঙ্গের ইতিহাস" অথবা গোবিন্দদাসের করচার আশ্রয়ে লিখিত গল্প, অথবা এই ধরণেরই একটা কিছু। এক সময় প্রবন্ধেরও আদর ছিল, যখন বঙ্কিম-ভূদেব কিংবা কালীপ্রসন্ন ঘোষ প্রবন্ধ লিখিতেন। ইংরেজীতে বেকনের Essays এখনও ক্লাসিক'। আলোচ্য গ্রন্থের লেখক এই প্রবন্ধ সাহিত্যকে পুনরুজ্জীবিত করিতে চাহিয়াছেন, ইহা ভাল কথা। কিন্তু তাঁহার উদ্যম একেবারে শিশুদিগের জন্য না হইলে সাহিত্য-হিসাবে ইহার দাম বেশী হইত। বইখানার উৎসর্গপত্র দেখিয়া মনে হয় গ্রন্থকার বালকদিগের চরিত্রগঠনের জন্যই বিশেষ উদ্যোগী। সেই হিসাবে হয়ত তিনি কৃতকার্য্য হইবেন, অবশ্য যদি ছেলেরা বইখানা কিনিয়া পড়ে।

শ্রীউমেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য

আরতি—শ্রীমণীন্দ্রনাথ মণ্ডল প্রণীত। দাম ৷৶৹ আনা। এই গ্রন্থের কবিতাগুলি সঙ্গীতের রীতিতে রচিত। কবিতাগুলি মন্দ নহে।

Search-Light সন্ধান-দ্যুতি—শ্রীপ্রফুল্লকুমার রায় প্রণীত ও ৬নং হেয়ার ষ্ট্রীট, উয়ারী, ঢাকা হইতে প্রদ্যোতকুমার রায় কর্ত্তৃক প্রকাশিত। মূল্য এক টাকা। এই ক্ষুদ্র গ্রন্থখানি ইংরেজী ও বাংলা দুই অংশে বিভক্ত। প্রথম অংশে ইংরেজী ভাষায় যে কবিতাগুলি লিখিত হইয়াছে শেষ অংশে ঠিক তাহাই বাংলায় কাব্যাকারে ভাষান্তরিত। গ্রন্থের উদ্দেশ্য পরমার্থের সন্ধান। কাব্যাকারে ইহা একখানি ক্ষুদ্র তত্ত্বকথা মাত্র।

ধ্বস্তা—উক্ত গ্রন্থকার প্রণীত। নারীধর্ষণের ব্যাপার লইয়া পৌরাণিক ঘটনাকে আশ্রয় করিয়া ইহা কাব্যাকারে লিখিত। নারীর দেহ ধ্বস্ত হইলেও যে তার দেহ কলুষিত হয় না এই ক্ষুদ্র গ্রন্থে কাব্যাকারে তাহাই দেখাইবার চেষ্টা করা হইয়াছে। উদ্দেশ্য প্রশংসনীয় সন্দেহ নাই। রচনা-পদ্ধতি মামুলি।

সতীমন্ত্র—শ্রীভুবনমোহন দাশ কবিশেখর প্রণীত। শ্রীমতী অনুরূপা দেবী এই গ্রন্থের ভূমিকা লিখিয়াছেন। অতি প্রাচীন একটি বিখ্যাত সতীকাহিনীকে আশ্রয় করিয়া ইহা লিখিত। আমাদের দেশে সতীকাহিনীমূলক শত শত গ্রন্থ লিখিত হইলেও সতীগণের পুণ্যকাহিনী কোনদিনই পুরাতন হয় না সুতরাং এই গ্রন্থ প্রকাশে তাহার নূতনত্বের কোনও মর্য্যাদার হানি হয় নাই। গ্রন্থে দুইখানি ত্রিবর্ণ চিত্র আছে। ছাপা ভাল। ছন্দ সেকেলে হইলেও বিষয়বস্তুর পবিত্রতায় পতিপ্রাণা হিন্দুনারীর উপভোগ্য। দাম ১৷৹ সিকা।

শ্রীশৌরীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য

স্মৃতির স্বপ্ন—শ্রীনরেশচন্দ্র দাস-গুপ্ত এম-এ, বি-এল। ৯ নং কামারপাড়া লেন, বরাহনগর হইতে গ্রন্থকার কর্ত্তৃক প্রকাশিত।

বইখানি, বিখ্যাত বেলজিয়ান সাহিত্যিক মরিস মেটারলিঙ্কের "মোনাভ্যানা" নামক নাটিকার বঙ্গানুবাদ।

অনুবাদকের কাজ সব সময়ই সুকঠিন; কেন-না তাঁহাকে বাঁধন আর মুক্তি এই দুইয়ের মধ্যে সামঞ্জস্য রক্ষা করিতে করিতে চলিতে হয়। বাঁধন—মূলানুগমনে, আর মুক্তি নিজের ভাষার স্বাতন্ত্র্যরক্ষায়। এর অভাবে, রেলগাড়ী জাহাজ প্রভৃতির ইংরেজী নোটিসের নীচে, অথবা বায়স্কোপের চিত্রবিবরণীতে আমাদের সাধের বাংলা ভাষা যে কত ডাক ছাড়িয়া কাঁদিতেছে—সে খোঁজ সবাই রাখেন।

নরেশবাবু এই সামঞ্জস্য প্রভূত ভাবেই রক্ষা করিতে পারিয়াছেন বলিয়াই মনে হয়। অর্থাৎ তিনি মেটারলিঙ্কের প্রতিও অবিচার করেন নাই, বাঙালী পাঠকের প্রতিও অত্যাচার করেন নাই। ফলে বইখানি বেশ সুখপাঠ্য হইয়াছে।

'মোনাভ্যানা" মেটারলিঙ্কের একটি শ্রেষ্ঠ নাটিকা, এর বেশী আর পরিচয় দিব না। এটিকে বাঙালীর ঘরের জিনিস করিয়া অনুবাদক আমাদের কৃতজ্ঞতা অর্জ্জন করিয়াছেন। কাগজে বাঁধাই। ছাপা ভাল। মূল্য ১৲।

শ্রীবিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়

মাটির মেয়ে—শ্রীরাসবিহারী মণ্ডল প্রণীত। প্রকাশক গৌর-গোপাল মণ্ডল, ৪৪ নং কৈলাস বোস ষ্ট্রীট, কলিকাতা। দাম দুই টাকা।

এখানিও উপন্যাস। ইহার বিষয়বস্তু প্রেম। সেই জন্য গ্রন্থকার পুস্তকখানি "ক্ষুব্ধ বাসনা ও নিরাশ প্রণয়ের তপ্তশ্বাস যে-সব তরুণ তরুণীর আত্মাকে নিকষ কালো করে তুলেছে তাদের হাতে" তুলিয়া দিয়াছেন। কিন্তু শুনা ছিল আত্মা নিষ্কলুষ। আর ইহার মধ্যে তিনি যে আশার বাণী বিঘোষিত করিয়াছেন, তাহাতে বে-পরোয়া যাহারা তাহারা খুশী হইলেও নিরীহ বাঙালী গৃহস্থের মনে—বিশেষ করিয়া যাহার ঘরে পটলের মত সুন্দরী, যুবতী, চঞ্চলা ও রসময়ী ভার্য্যা বিরাজিত তাহার মনে গভীর আতঙ্কের সঞ্চার হওয়াই স্বাভাবিক। প্রেম ও লালসা এক নয়। অথচ প্রেমের নামে উদগ্র লালসাই ইহাতে ব্যক্ত করা হইয়াছে। নায়ক অনিল ও নায়িকা পটল বাংলার উপন্যাস-জগতে যে দুইটি পুরাতন চরিত্রের ব্যর্থ নকল তাহারা যে মানুষ এ-কথাটা কেবলমাত্র ঐ হীনবৃত্তি দ্বারাই প্রকাশিত হয় নাই। তবে ভাষার উপর লেখকের চমৎকার দখল। কয়েক জায়গায় রস বেশ জমাট ও ছবিগুলি জীবন্ত, কিন্তু গ্রন্থখানি পাঠ করিতে করিতে মনে প্রশান্তি আসে না, কোন একটি ভাবধারাও মনকে কল্পলোকের পথে তুলিয়া দিতে পারে না।

ছাপা কাগজ ভাল; মোটা মলাটের উপরে সজ্জাও বেশ।

শ্রীখগেন্দ্রনাথ মিত্র

সোণার ঘড়া—শ্রীযতীন সাহা প্রণীত ও শ্রীসমর দে চিত্রিত। এম সি সরকার এণ্ড সন্স, ১৫ কলেজ স্কোয়ার কলিকাতা। দাম চৌদ্দ আনা। পৃষ্ঠা-সংখ্যা ৬৬।

একটি সচিত্র গল্প। ইহা পাঠ করিয়া শিশুরা আনন্দ পাইবে।

ছোটদের গল্পগুচ্ছ—শ্রীমোহনলাল গঙ্গোপাধ্যায় সম্পাদিত। গ্রন্থ বিহার। ১২০-বি আশুতোষ মুখোপাধ্যায় রোড ভবানীপুর, কলিকাতা। দাম দেড় টাকা।

গল্পগুলি পাঁচটি অধ্যায়ে বিভক্ত—রূপ-কথা ও রূপক অলৌকিক ও অদ্ভুত, কাহিনী ও ইতিহাস পুরাণ সাধারণী। প্রত্যেক অধ্যায়ই খ্যাতনামা সাহিত্যিকদের রচনায় সমৃদ্ধ। শ্রীযুত অবনীন্দ্র নাথ ঠাকুর শ্রীযুত গগনেন্দ্রনাথ ঠাকুর শ্রীযুত নন্দলাল বসু প্রভৃতি শিল্পিগণের চিত্রে পুস্তকখানির সৌষ্ঠব বাড়িয়াছে। এরূপ পুস্তকের যথেষ্ট প্রয়োজন আছে।

শ্রীযোগেশচন্দ্র বাগল

লোহেলাণ্ড শিক্ষালয় ও তাহার বৈশিষ্ট্য

শ্রীসত্যকিঙ্কর চট্টোপাধ্যায়

জড়বাদী ইউরোপীয় সভ্যতা আজিকার দিনে যে খাত বাহিয়া চলিয়াছে, কেহ যদি তাহা হইতে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র ধারায় চলিতে উদ্যত হয় তাহা হইলে সে-বিষয়ে মানুষের কৌতূহলের আর সীমা থাকে না, এবং এই অভিনব প্রচেষ্টার পশ্চাতে কোন সুষ্ঠু উদ্দেশ্য আছে কি-না অথবা উহা কেবল সাময়িক উত্তেজনা বা অত্যধিক কল্পনার ফল কি-না, তাহা জানিবার জন্য ঔৎসুক্য হয়।

জার্মেনীর লোহেলাণ্ড স্কুলটি দেখিয়াও লোকের মনে সেই ভাবটাই জাগে। এই শিক্ষালয়টির সম্বন্ধে আগে যাহা শোনা গিয়াছে, তাহাতে মনে হয়, এটি যেন আধুনিক শিক্ষা-প্রণালীর বিরুদ্ধে একটি তীব্র অভিযান। এ-কথা স্বীকার করিতে হইবে যে, এই প্রতিষ্ঠানটির পরিকল্পনা ও কার্য্যকলাপে একটা অসমসাহসিকতার পরিচয় পাওয়া যায়। নানা বাধাবিপত্তি সত্ত্বেও উহার সাফল্য সকলকেই বিস্মিত করিয়া তোলে। লোহেলাণ্ড শিক্ষালয়টি কেবলমাত্র মেয়েদের শিক্ষার জন্যই পরিকল্পিত।

ইউরোপের আত্যন্তিক চিন্তাশীলতা ও ভাবপ্রবণতাই এ-যুগের মনুষ্যত্ব ধ্বংস করার অন্যতম যন্ত্র। ইহার হাত হইতে নিষ্কৃতি পাইয়া শিশুরা যাহাতে মানুষের মত জীবন যাপন করিতে পারে সেইরূপ ভাবে তাহাদিগকে শিক্ষাদান করিবার জন্য উপযুক্ত শিক্ষয়িত্রী ও অভিভাবিকা গড়িয়া তোলাই এই প্রতিষ্ঠানের মুখ্য উদ্দেশ্য। ১৯১২ খৃষ্টাব্দে এটি প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। লুইজ্ লাঙ্গার্ড ও হেডভিগ্ ফন্ রডেন নাম্নী দুইটি মহিলা ইহার প্রতিষ্ঠাত্রী। আসলে এই দুইটি মহিলা এবং তাঁহাদের জনকয়েক ছাত্রী মিলিয়া এই প্রতিষ্ঠানটি গড়িয়া তুলিয়াছেন। ইহার আদি প্রতিষ্ঠাত্রী ফ্রয়লাইন্ লাঙ্গার্ড

ফ্রাউ ফন্ রডেন্ জার্মেনীর বিভিন্ন প্রদেশে বাস করিতেন। কিরূপে তাঁহাদের দুই জনের ঘটনাক্রমে দেখা হয় এবং কেমন করিয়া সেই সাক্ষাৎ তাঁহাদিগকে পরস্পরের প্রতি আকৃষ্ট করে এবং কিরূপে এই সংকল্পটি তাঁহাদের চিন্তাশীল মস্তিষ্কে উদয় হয় তাহা তাঁহাদের কথাতেই জানিতে পারা যায়। সংকল্প একই সময়ে দুই জনের মনেই রূপ পরিগ্রহ করে। তাঁহারা বুঝিয়াছিলেন, কিছু একটা করিতেই হইবে। কিন্তু কি করিতে হইবে তাহা তাঁহারা কিছু ঠিক করিতে পারেন নাই। তাঁহারা সম্বলহীন হইয়া এবং কোন স্থান হইতে সাহায্য না পাইয়াই কাজ আরম্ভ করিয়া দিলেন। দিনরাত ক্রমাগত পরিশ্রম করিতে লাগিলেন। তাঁহাদের অদম্য উদ্যম, প্রবল ইচ্ছাশক্তির প্রভাবে সমস্ত বাধা-বিপত্তি দূরে ভাসিয়া গেল। অদৃষ্ট সুপ্রসন্ন হইল, বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হইল; আর্থিক অনটন এবং অন্যান্য বাধাবিঘ্ন উপেক্ষা করিয়া উহা ক্রমে উন্নতির পথে অগ্রসর হইতে লাগিল। বর্ত্তমানে শুধু জার্মেনী নহে, পৃথিবীর অন্যান্য দেশের শত শত শিক্ষিত লোকের মনোযোগও এই বিদ্যালয়ের দিকে আকৃষ্ট হইয়াছে।

লোহেলাণ্ড রন্ পর্ব্বতমালার মধ্যে একটি ক্ষুদ্র স্থান। ১৯১৯ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত সেখানে লোকজনের বাস মোটেই ছিল না বলিলেও মিথ্যা বলা হইবে না এবং এমন কি, তখন ইহার কোন নাম পর্য্যন্ত ছিল না। প্রতিষ্ঠাত্রীরা এই স্থানটি স্কুল-গৃহ তৈরির জন্য কিনিয়া লোহেলাণ্ড এই সুন্দর নামটি দিলেন। দেখিলে মনে হয়, লোহেলাণ্ড বিদ্যালয়ের ন্যায় প্রতিষ্ঠানের ইহাই যেন যোগ্যতম স্থান। চারিদিকে পার্ব্বত্য প্রদেশের নিস্তব্ধতা, বনভূমি, গোচারণ মাঠ এবং দূরে দূরে দুই-একটি ক্ষুদ্র গ্রাম ছবির মত দেখা যায়। আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, আমাদের দেশের প্রাচীন কালের ব্রহ্মচর্য্যাশ্রমের সহিত এই বিদ্যালয়টির মূলনীতির অনেকটা সাদৃশ্য আছে। এটিও উঁহাদের ন্যায় একাধারে আবাসস্থল ও শিক্ষাস্থল। ছাত্রী ও শিক্ষয়িত্রীরা এই স্থানে অথবা

দুইটি কারখানা —লোহেলাণ্ড

হেডভিগ -ফন্-রডেন ও একটি গ্রেট্-ডেন কুকুর
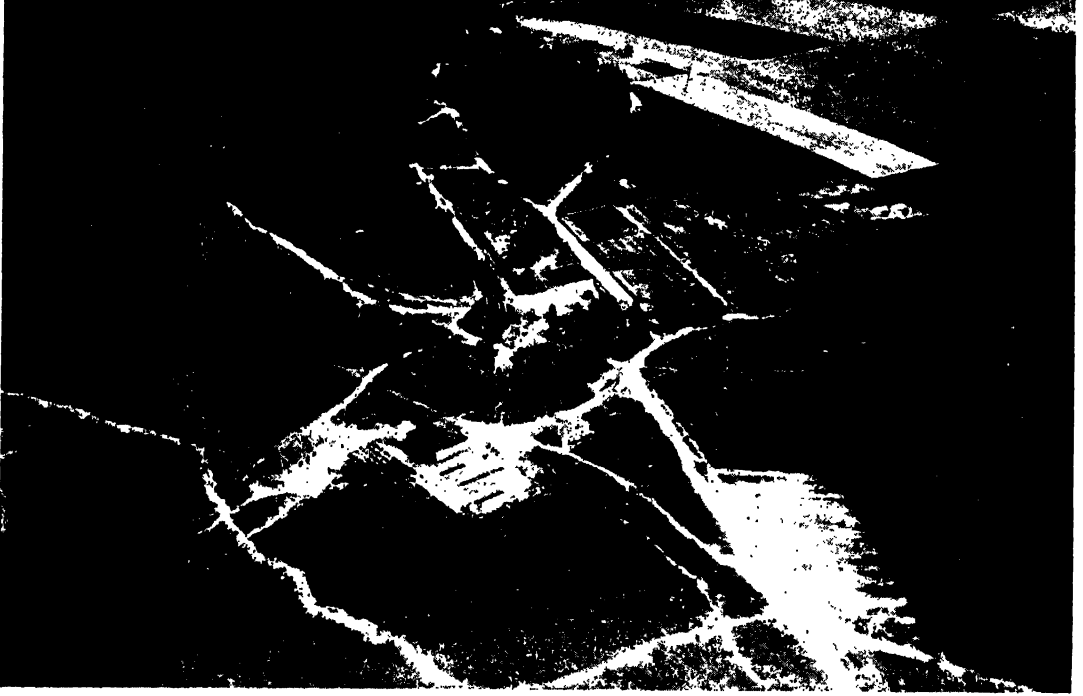
লোহেলাণ্ড স্কুলের দৃশ্য

নিকটস্থ গ্রামসমূহে বাস করেন। তাঁহাদের জীবনযাপন-প্রণালী যতদূর সম্ভব সরল, অনাড়ম্বর। তাঁহারা আধুনিক সভ্যতার কোলাহল ও প্রলোভন হইতে বহুদূরে থাকিয়া অধ্যয়ন ও অধ্যাপনায় ব্যাপৃত থাকেন।

উদ্যান ও বনভূমির দিকে চাহিতে চাহিতে যখন লোহে-লাণ্ডের দিকে অগ্রসর হওয়া যায় তখন সর্ব্বপ্রথমে যে-গৃহটি নজরে পড়ে সেইটিই শিক্ষালয়ের প্রধান গৃহ। বাড়িটি দেখিতে অতি চমৎকার, কাঠের তৈরি; সেইজন্যই বোধ হয় উহাকে 'হোল্‌ৎস্ হাউস' এই নাম দেওয়া হইয়াছে। প্রতিষ্ঠার দিনে এইটিই ছিল প্রধান কর্ম্মক্ষেত্র, কিন্তু বর্ত্তমানে ইহা রান্নাঘররূপে ব্যবহৃত হয়। ইহা ছাড়া আরও প্রায় বারটি বাড়ি আছে। সবকয়টিই লোহেলাণ্ডের পাথর দিয়া তৈরি। আড়ম্বরহীনতাই এই অট্টালিকাগুলির বৈশিষ্ট্য। 'ফ্রান্সিকুস্ বাউ'-ই প্রধান অট্টালিকা। এই স্থানে শিক্ষা দেওয়া হয়। বড় বড় লাল পাথর দিয়া এটি তৈরি। ইহার পরিকল্পনা ও গঠন-পারিপাট্য বিশেষ প্রশংসার যোগ্য। বিদ্যালয় গৃহটি দেখিলে কর্ত্তৃপক্ষের সুরুচি ও জ্ঞানের যথেষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়। গৃহটি দোতলা, এখনও শেষ হয় নাই। উপরের তলায় একটি অর্গ্যান আছে। সঙ্গীত ও শারীরচর্চ্চা অবশ্যশিক্ষণীয় বিষয় বলিয়া গণ্য। বিদ্যালয়ের একটি বিশেষ প্রথা এই যে, প্রতি সোমবারে সেই সপ্তাহের কাজের সূচনায় সকলে একত্র সমবেত হন। তখন একটি গান হয়; এই গানটি ঠিক সাধারণ ধরণের নহে। ইহা অন্তরের গভীরতম প্রদেশে প্রবেশ করিয়া মনোমধ্যে একটি প্রেরণার সৃষ্টি করে। এই প্রেরণায় অনুপ্রাণিত হইয়া সপ্তাহব্যাপী কাজ সুরু হয়।

তারপর যে-ঘরটি লোকের মনোযোগ আকর্ষণ করে সেটির নাম 'রুণ্ড বাউ'। এটি গোলাকার বলিয়া ইহাকে 'রুণ্ড বাউ' এই নাম দেওয়া হইয়াছে। আগে এখানে ব্যায়ামচর্চ্চা করা হইবে বলিয়া স্থির হয়, কিন্তু এখন এটি খাবার ঘরে পরিণত হইয়াছে। এখানে প্রায় একশত লোক একযোগে বসিয়া খাইতে পারে। ছাত্রী এবং শিক্ষয়িত্রীরা সকলেই এখানে একত্র আহার করেন। এখানে বলা দরকার যে, রান্না ও পরি-বেশনও সবই শিক্ষয়িত্রীদের তত্ত্বাবধানে ছাত্রীদের দ্বারাই হইয়া থাকে। টাট্‌কা ও পুষ্টিকর শাকসব্‌জী তাহাদের প্রধান খাদ্য।

খাবার যাহাতে সুস্বাদু ও স্বাস্থ্যকর হয় সেই ভাবেই রান্না করা হয়, অর্থাৎ অতিরিক্ত গুরুপাক দ্রব্যের ব্যবস্থা হয় না। খাওয়ার শেষে সকলে দাঁড়াইয়া হাত ধরিয়া ভগবানের উদ্দেশ্যে শ্রদ্ধা নিবেদন করে।

তারপর আবাসগৃহ। ইভা মেরায়া ডাইনহার্ট নামে একজন মহিলা শিক্ষয়িত্রীদের জন্য এই গৃহটি নিৰ্ম্মাণ করাইয়া দেন। তাঁহার নাম অনুসারে ইহার নাম হইয়াছে 'ইভা হাউস্'। এই গৃহটি ছোট হইলেও তেতলা। ইহার চারিদিকে দিগন্তপ্রসারী মনোরম দৃশ্য।

তারপর 'লাণ্ডহাউস্' অথবা উদ্যান বাটিকা। এটি ক্ষুদ্র এবং সৰ্ব্বশেষে অবস্থিত হইলেও কম উল্লেখযোগ্য নহে। কৃষি দ্রব্যে পরিপূর্ণ একটি উদ্যান ইহার চারি দিক বেষ্টন করিয়া রহিয়াছে। এই উদ্যানটি ডর্লে ৎসিমারমান নামে একটি শিক্ষয়িত্রীর তত্ত্বাবধানে ছাত্রীদের দ্বারা পরিচালিত হয়।

বয়ন-গৃহ—লোহেলাণ্ড
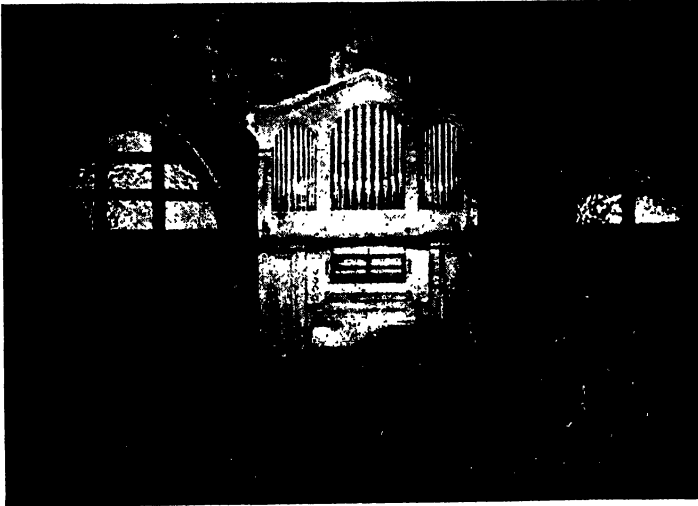
ফ্রান্সিস্কুস্ বাউ-এর অভ্যন্তর

ছাত্রীদের আবাসগৃহের সাজসজ্জার বিশেষ কোন আড়ম্বর নাই। আসবাবের মধ্যে একটি তক্তাপোষ, বই রাখিবার একটি শেল্‌ফ এবং একটি ক্ষুদ্র টেবিল্। তাহাদের প্রয়োজনের পক্ষে ইহাই যথেষ্ট বলিয়া গণ্য। ইউরোপের আর কোথাও শিক্ষার্থীরা এইরূপ আড়ম্বরহীন জীবন যাপনে অভ্যস্ত নহে।

এই প্রতিষ্ঠানের নেত্রীরা নিজেরা সকলেই পূর্ণমাত্রায় স্বার্থ ত্যাগ করিয়া ইহার কল্যাণকামনায় ব্যস্ত। তাঁহারা বেতন-স্বরূপ অর্থ গ্রহণ করেন না। তবে খাওয়া পরা এবং জীবন যাপনের একান্ত প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি পাইয়া থাকেন। কাজেই তাঁহাদের কাহারও নিজস্ব কিছুই নাই। ইহা ছাড়া, আরও বারজন শিক্ষয়িত্রী ও সাহায্যকারিণী আছেন। তাঁহারা সকলেই নিজের ইচ্ছায় কাজ করিয়া থাকেন। তাঁহাদের আদর্শানুরূপ কাজ করিবার সুযোগ পাইয়া তাঁহারা অত্যন্ত আনন্দ লাভ করেন। অকপটে কাজ করেন বলিয়া তাঁহারা সফল হন এবং এই সফলতাই তাঁহারা পুরস্কার-স্বরূপ জ্ঞান করেন।

এক কথায় বলিতে গেলে, লোহেলাণ্ড প্রতিষ্ঠানের দুইটি

কর্ম্মক্ষেত্র আছে,—একটি শিক্ষাবিভাগ যাহাকে 'সেমিনার' বলা হয় এবং অপরটি গৃহ ও কুটীরশিল্পের উপর ভিত্তি করিয়া জীবিকা অর্জ্জনের শিক্ষা-বিভাগ। শেষোক্তটি প্রধান না হইলেও উহার উৎকর্ষসাধন তাঁহাদের নিকট সমভাবে আবশ্যক

লাওহাউস্—লোহেলাও

বলিয়া গণ্য হওয়ায় তালিকাভুক্ত করা হইয়াছে। সর্ব্বত্র কলকারখানা ইত্যাদির প্রচুর উন্নতি হওয়ায় এই সমস্ত শিল্প বিলুপ্ত হইতে বসিয়াছে, সেইজন্য ইহাদের চর্চ্চা এই প্রতিষ্ঠানটির একমাত্র বৈশিষ্ট্য। ছাত্রীরা ইচ্ছা করিলে এই ব্যবসায়াত্মিকা শিক্ষা লাভ করিতে পারে। সমগ্র প্রতিষ্ঠানটি এরূপ ভাবে পরিচালিত যে, ছাত্রীদিগকে জীবিকা অর্জ্জনের উপযোগী ব্যবসা-শিক্ষার সুযোগ দিয়াও ইহা সম্পূর্ণরূপে স্বাবলম্বী, এমন কি, সেমিনারীর খানিকটা ব্যয়ও ইহার আয় হইতে ব্যয়িত হইতেছে।

কুটীরশিল্পের জন্য প্রায় বারটি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গৃহ বিচিত্র ধরণে তৈরি হইয়াছে। কোন রকম জাঁকজমক নাই, দেখিতে কতই না ক্ষুদ্র! কিন্তু ইহার মধ্যে প্রবেশ করিয়া কর্ম্মনিরত ছাত্রীদের দেখিলে মুগ্ধ না হইয়া থাকা যায় না। বয়নগৃহে একটি চরকা রহিয়াছে। কর্ম্মীরা এরূপ পারিপাট্য ও শৃঙ্খলার সহিত কার্য্য করে যে, দেখিলে মনে হয় যেন ইহা একটি পবিত্র মন্দির। কেহই পাদুকা পরিধান করিয়া ভিতরে প্রবেশ করে না। প্রত্যেকেরই এক জোড়া করিয়া পশমের জুতা আছে, উহা তাহারা সঙ্গে লইয়া যায় এবং কুটীরে প্রবেশ করিবার পূর্ব্বে পরিধান করে। এখানে রেশম ও পশমের দ্রব্য প্রচুর উৎপন্ন হয়। পরিকল্পনা ও বর্ণ-সমবায়ের বৈশিষ্ট্য তাহাদের সুরুচির পরিচয় দেয়। দ্রব্যগুলির বিষয় বলিতে গেলে বলিতে পারা যায় যে, আধুনিক কলের তৈরি সব চাইতে সস্তা দ্রব্যগুলি না কিনিয়া হাতে তৈরি জিনিষের সূক্ষ্মতা ও অকৃত্রিমতার জন্য সাধারণে প্রায়ই অতি উচ্চ মূল্যে ঐগুলি কিনিয়া থাকে।

তারপর ছুতারের ক্ষুদ্র কারখানা। এটি একান্তভাবে প্রত্যেকেরই মনোযোগ আকর্ষণ করে। একটি ক্ষুদ্র গৃহ অতি সাধারণ যন্ত্রপাতি দ্বারা সুসজ্জিত। গৃহের আকার দেখিয়া মনে হয় না যে, এখানে প্রচুর পরিমাণে উৎকৃষ্ট দ্রব্য তৈরি হইতে পারে। দেখিলেই বুঝিতে পারা যায় যে, এখানে সকলেই স্বেচ্ছায় মন-প্রাণ ঢালিয়া দিয়া কাজ করিতেছে। কর্ম্মিগণ ধীর গাম্ভীর্য্যের সহিত কাজ করিয়া যায়। গঠন-প্রণালীর পারিপাট্য দেখিলে তাহাদের একাগ্রতা, ঐকান্তিকতা ও একনিষ্ঠ প্রতিভার পরিচয় পাওয়া যায়। তাহারা কাঠের বাটী, বাতিদানী, বারকোষ এবং আরও অনেক জিনিষ প্রস্তুত করে। হস্তিদন্তের কাজও হয়। তাহাদের তৈরি জিনিষগুলি বিলাসের সামগ্রী হইলেও গৃহস্থের দৈনন্দিন প্রয়োজনে লাগে।

কারখানার অভ্যন্তর

কুমোরের কারখানাও একটি আছে, এটি খুব সহজ ধরণের এবং সবেমাত্র আরম্ভ হইয়াছে। নানাবিধ মাটি মিশাইয়া ঘট, মগ, কলসী ইত্যাদি তৈরি হয়। এ সমস্তই গৃহস্থের প্রয়োজনীয় দ্রব্য।

ইহা ছাড়া, তাহাদের দর্জ্জি বিভাগ, চর্ম্ম বিভাগ, ফোটো-গ্রাফ বিভাগ, উদ্যান বিভাগ, কৃষি ও পশুপালন বিভাগ আছে। তাহারা কুকুরও পালন করিয়া থাকে। লোহেলাণ্ডের 'গ্রেট-ডেন্' জাতীয় বৃহৎ কুকুর পৃথিবী-বিখ্যাত। কুকুরগুলি দেখিতে জমকালো ও কমনীয়। এগুলি সাধারণের খুব উপকারে আসে এবং ধনী ব্যক্তিরাও পুষিয়া থাকেন। ছাত্রীরা অন্যান্য গৃহপালিত জন্তুর সহিত কেমন অবাধে মেলামেশা করে ইহা একটি দেখিবার বিষয়। এই সমস্ত মূক জীব-জন্তুর নিকট ইহারা শিক্ষা করে যে, ইতর প্রাণীকে ভালবাসিলে মানুষ খাট হয় না, বরং মহৎ হইয়া উঠিবারই সুযোগ পায়।

লোহেলাণ্ড স্কুলে খেলা

শিক্ষালয়টি সমগ্র প্রতিষ্ঠানটির মধ্য-স্থলে অবস্থিত। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে শিক্ষয়িত্রী গড়িয়া তোলাই এই শিক্ষালয়ের মুখ্য উদ্দেশ্য। এ-যুগে মানুষের জীবনে কি কি একান্ত প্রয়োজনীয় সে-বিষয়ে ধ্যানধারণার বিন্দুমাত্র অভাব তাহাদের নাই। এ-যুগে সমগ্র জগতের সর্ব্বাপেক্ষা অভাব হইতেছে যথার্থ মানবতার,
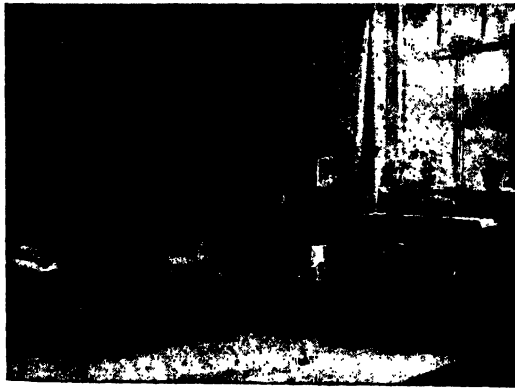
লোহেলাণ্ড স্কুলের একটি শয়ন-কক্ষ

মানবদেহধারী জীববিশেষ নহে। সে-ই যথার্থ মানব যাহার মানবোচিত গুণসমূহ অধিকমাত্রায় বিকাশ লাভ করিয়াছে। তাঁহারা যেন প্রতি মুহূর্ত্তে এই আদর্শেই অনুপ্রাণিত হইয়া জীবন যাপন করেন, অর্থাৎ তাঁহাদের ব্যক্তিত্ব যেন পূর্ণমাত্রায় বিদ্যমান থাকে। জগতে পর্য্যবেক্ষণ-গণ্ডী যেন তাঁহাদের বিশাল হয়, তাহা হইলে তাঁহারা উচ্চাঙ্গের অভিজ্ঞতা, দায়িত্ব জ্ঞান ও সুশৃঙ্খলার সহিত জীবন যাপন করিবার ক্ষমতা অর্জ্জন করিবেন। এই জ্ঞান তাহাদের হৃদয়ে প্রেমের সঞ্চার করিবে এবং স্বতঃই ইহাদিগকে পরোপকারের জন্য জীবন উৎসর্গ করিতে উদ্বুদ্ধ করিবে। যে-সকল শিক্ষয়িত্রী নিজেরা এই ভাবে শিক্ষা পাইয়া থাকেন তাহারাই ছাত্রীদের হৃদয়ে মনুষ্যোচিত গুণ বিকশিত করিয়া তুলিতে সমর্থ হন।

ছাত্রীদিগকে এইভাবে শিক্ষা দিতে হইলে শিক্ষয়িত্রীদের কি কি গুণ থাকা দরকার কর্ত্রীপক্ষের সে-বিষয়ে বিশেষ জ্ঞান রহিয়াছে। যে-সমস্ত শিক্ষয়িত্রী ছাত্রীদের গ্রহণের ক্ষমতা বিবেচনা না করিয়া নিজের নিপুণতা বয়োজ্যেষ্ঠতা ও অভিজ্ঞতার উপর নির্ভর করিয়া গায়ের জোরে তাহাদের তরুণ মস্তিষ্কে কিছু প্রবেশ করাইবার চেষ্টা করেন তাঁহারা মানবজাতির উন্নতির ঘোর প্রতিকূলতা করেন। তাঁহাদের মতে ছাত্রীই অধিকতর মনোযোগের বিষয়। মানবের যখন দেহ, মন ও আত্মা আছে, তখন জানিতে হইবে তাহার মধ্যে অসীম ক্ষমতা নিহিত রহিয়াছে। এই ক্ষমতাকে আমরা উদ্ভাবনী শক্তি বলিয়া থাকি। ইহা প্রত্যেকের মধ্যে সুপ্ত অবস্থায় থাকে। ইহাকে জাগরিত, বিকশিত এবং বর্দ্ধিত করিতে হইবে। এই জাগরণ ও বিকাশ আত্মচেষ্টা হইতে

জন্মলাভ করে। এই প্রকার জ্ঞানোদয় এবং উদ্ভাবনী শক্তির বিকাশ হইতেছে শিক্ষার মুখ্য উদ্দেশ্য। এই শক্তির উদ্বোধনে সাহায্য করাই শিক্ষকদের কর্ত্তব্য। শিক্ষয়িত্রী যেন মনে না করেন, ছাত্রী তাঁহারই মতের অনুকরণ করিবে। তিনি ছাত্রীকে

ক্রীড়ারত ছাত্রী

সত্যপথে চালিত করিবার জন্য উৎসাহ প্রদান করিবেন। এইরূপ উৎসাহ প্রদানের ফলে তাহার মনোবৃত্তিগুলি সম্যক বিকশিত হইবে।

এই শিক্ষালয়টির বৈশিষ্ট্য এই যে, শারীরচর্চ্চা ও অঙ্গ-সঞ্চালনাকে শিক্ষার অন্যতম প্রধান অঙ্গ বলিয়া ধার্য্য করা হইয়াছে। ব্যায়ামশিক্ষাই নিয়মানুবর্ত্তিতার মধ্য দিয়া আমাদিগকে মানসিক পরিণতি দান করিয়া থাকে। ব্যায়াম অভ্যাসে আমরা স্থান, আকৃতি ও গতি সম্বন্ধে বিশিষ্ট জ্ঞান লাভ করিতে পারি।

এই সকল অভিজ্ঞতা লাভ করিবার জন্য লোহেলাও শিক্ষালয়ের প্রতিষ্ঠাত্রীরা যে-পন্থা অবলম্বন করিয়াছেন তাহা সম্পূর্ণ অভিনব। এই পন্থা 'রোডেন লাঙ্গার্ড-এর জিম্‌নাষ্টিক প্রথা' বলিয়া সাধারণের নিকট পরিচিত। এই অভিনব প্রথা প্রচলিত শারীরচর্চ্চা-বিদ্যা হইতে স্বতন্ত্র রকমের। ইহার বিশেষত্ব এই যে, ইহাতে পেশীবহুল দেহের প্রতি তত লক্ষ্য না রাখিয়া মানবোচিত গুণের অধিকারী মানুষের প্রতিই বিশেষ লক্ষ্য রাখা হয়। পর্য্যবেক্ষণ, একাগ্রতা ও নিপুণতা ইত্যাদি মানসিক বৃত্তির যাহাতে উন্মেষ হইতে পারে, খাঁটি ব্যায়ামের সহিত তাহা অঙ্গীভূত করা হইয়াছে। সঙ্গীত, নক্সা, চিত্রাঙ্কণ ইত্যাদি এই সকল অনুশীলনীর অন্তর্ভুক্ত।

এখানকার শিক্ষাদান-কৌশল অধিকতর চিত্তাকর্ষক। শিক্ষণীয় বিষয়ের কোন নির্দ্দিষ্ট তালিকা এখানে নাই। ভিন্ন ভিন্ন ছাত্রী শিক্ষয়িত্রীর ভিন্ন ভিন্ন সমস্যা-স্বরূপ: প্রত্যেক ছাত্রীর নিকট বিভিন্ন প্রকারের প্রশ্ন উত্থাপিত করা হয়। তাহাকে তাহার অভিজ্ঞতা, চিন্তাশক্তি ও কল্পনার সাহায্যে ঐ প্রশ্নের সমাধান করিতে হয়। এই সমাধান-বিষয়ে শিক্ষয়িত্রীরা ছাত্রীদিগকে এইরূপভাবে সাহায্য প্রদান করেন যাহাতে তাহাদের দৈহিক, নৈতিক ও মানসিক বৃত্তি ক্রমশঃ পরিস্ফুরিত হয়। ব্যায়ামশিক্ষা এরূপ ভাবে দেওয়া হয় যে, ছাত্রীরা প্রথম হইতেই দেহ সুস্থ রাখিতে পারে এবং দিক ও স্বেচ্ছাগতির খুঁটিনাটি সম্বন্ধে ধারণা করিতে পারে। যাহাতে এই সকল বিষয়ের মূল নীতি হৃদয়ঙ্গম করিতে পারে সেইজন্য তাহাদিগকে নরদেহ, নরকঙ্কাল ও পেশীসমূহের বিষয় শিক্ষা দেওয়া হয়। চিকিৎসালয়ে যেরূপ নীরসভাবে দেহতত্ত্ব শিক্ষা দেওয়া হয় এখানে সেরূপ হয় না। জীবনযাপনের মূল সূত্রের সহিত ইহাদের যে ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ আছে তাহার উল্লেখ করিয়া এই শিক্ষা দেওয়া হয়। যেরূপ ব্যায়াম চেষ্টার ফলে কুব্জতা, খঞ্জতা ইত্যাদি শরীরের বিকৃতি অপসারিত হয় সেইরূপ ব্যায়াম এখানে শিক্ষা দেওয়া হয়।

ইহা ছাড়া, নানা প্রকার কলাবিদ্যাও তাহাদিগকে শেখানো হয়। তাহারা সঙ্গীত, চিত্রাঙ্কণ ও চিত্ররঞ্জন শিক্ষা করে। ইহাতে তাহাদের একাগ্রতা, একনিষ্ঠতা, আবৃত্তিশক্তি ও কল্পনাশক্তি বর্দ্ধিত হয়। পরিমিতি ও অনুপাত-বিষয়ে ধারণা জন্মাইবার জন্য তাহারা জ্যামিতি শিক্ষা করে। সামাজিকতা, দর্শন ও ইতিহাস ইত্যাদি উন্মেষকারী বিষয়গুলিও শেখানো হয়। এই সকল শিক্ষা মানুষকে মানবোচিত গুণসকলের অধিকারী করে।

একটি বিষয়ের উল্লেখ করা হয় নাই, তাহা এখানকার আমোদ-প্রমোদ। কর্ত্তৃপক্ষেরা নির্দ্দোষ আমোদ-প্রমোদের বিষয়েও সচেতন আছেন। নির্দ্দোষ আমোদ যে শুধু কল্পনাশক্তি জাগরিত করে তাহাই নহে, জীবনের দুঃখকে লঘু ও সহজ করিয়া তোলে; অন্তরে আনন্দ-অনুভূতির অভিব্যক্তি যে হাসি সেই হাসি মুখে ফুটাইয়া তোলে। অদ্ভুত অদ্ভুত

আখ্যান রঙ্গমঞ্চে অভিনীত হয়, মানবের বিভিন্ন-মনোভাব গুলিও রুচিকর ভাবে দেখানো হইয়া থাকে।

লোহেলাণ্ড শিক্ষালয়টি এখনও অগ্নিপরীক্ষার মধ্য দিয়া চলিয়াছে। ইহাকে আদর্শ বলিয়া গণ্য করা চলে কি না তাহা এখনও নিরাকরণ হয় নাই। কর্ত্তৃপক্ষ জানেন, কোন প্রথাই চিরস্থায়ী ও সর্ব্বাঙ্গসুন্দর হইতে পারে না। সময়ের পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে প্রথাগুলিকেও পরিবর্ত্তিত ও পরিশোধিত করিতে হয়। তাঁহাদের প্রণালী যে-কার্য্য নির্দ্দেশ করে তাহা মনুষ্যত্বকে উন্নতির দিকে লইয়া যায়। এজন্য তাঁহাদের কার্য্যপদ্ধতিতে এই কথা লিপিবদ্ধ হইয়াছে যে, যাঁহারা লোহেলাণ্ড বিদ্যালয় হইতে উপাধিপ্রাপ্ত হইয়াছেন তাঁহারা যেন প্রতি তিন বৎসর অন্তর অন্ততঃ একবার করিয়া সেখানে আসিয়া তাঁহাদের জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা মার্জ্জিত ও সংস্কৃত করিয়া লইয়া যান।

লোহেলাণ্ড শিক্ষালয়টি শৈশব অবস্থাতেই বিস্ময়কর সাফল্যলাভ করিয়াছে। উহা সমগ্র জগতে এক অভিনব পরিবর্ত্তন আনয়ন করিয়াছে। সর্ব্বাপেক্ষা দুষ্ট ও অ-বশ্য বালিকারা তাঁহাদের তত্ত্বাবধানে থাকিয়া অল্প দিনের মধ্যে সম্পূর্ণরূপে পরিবর্ত্তিত হইয়া গিয়াছে। তাহাদের গর্ব্ব চূর্ণ হইয়াছে এবং তাহারা যেরূপ উৎক্ষিপ্ত, অবিনীত ও অশাসনীয় ছিল আর সেরূপ নাই। তাহারা ধীর স্থির ও শান্ত স্বভাব হইয়াছে। তাই বলিয়া তাহারা তাহাদের সজীবতা হারায় নাই। আন্তরিক সন্তোষ-ব্যঞ্জক স্বাস্থ্য ও আনন্দ সকলেরই মুখে বিরাজ করিতেছে। ইহা দেখিলে

উন্মুক্ত স্থানে শিক্ষা

সকলকেই স্বীকার করিতে হইবে এ-যুগে যথার্থ শিক্ষালয়ের বাস্তবিকই অভাব।*

* মে মাসের 'মডার্ণ রিভিউ' পত্রে প্রকাশিত ডাঃ জে. সি গুপ্ত মহাশয়ের ইংরেজী প্রবন্ধ অবলম্বনে।

বিক্রমখোল-লিপি

শালিবাহন বা সাতবাহন রাজার শাসনলিপি

শ্রীহরিদাস পালিত

মধ্যপ্রদেশের বেঙ্গল নাগপুর রেলওয়ে ষ্টেশন বেলপাহাড় হইতে গ্রিনডোল সন্নিকটস্থ যৌগড় ষ্টেটের তিলীয়বাহল পল্লীর সন্নিকটে বিক্রমখোল নামক একটি গণ্ডশৈল-গাত্রে কিছুদিন হইল একটি লিপিমালা আবিষ্কৃত হইয়াছে। পাহাড়টি বেলে-পাথরের। দৈর্ঘ্যে ৪৫ ফুট এবং প্রস্থে ৭ ফুট স্থান ব্যাপিয়া লিপি বিদ্যমান। লিপিগুলি অসমতল অংশে খোদিত হইয়াছে, কতক রং দিয়া লেখা এবং কতক গভীরভাবে উৎকীর্ণ। রংটি বিলক্ষণ পাকা। নাগপুর জেলায় দেওটেক নামক স্থানে পূর্ব্বে এক লিপি আবিষ্কৃত হইয়াছিল। সেখানিতে চিকাম্বরী দেবীর উল্লেখ আছে। সেখানি শিবালয়ের একখানি প্রস্তরে উৎকীর্ণ হইয়াছিল। বর্ত্তমান বিক্রমখোল-লিপির বিবরণ ইণ্ডিয়ান এণ্টিকুয়েরী, ভল্যুম ৫২, মার্চ ১৯৩৩ সংখ্যক পত্রিকায় চিত্রসহ প্রকাশিত হইয়াছে। ইহা ব্যতীত কলিকাতার কোন কোন ব্যক্তি তথায় গিয়া উক্ত লিপির ছায়াচিত্র লইয়া আসিয়াছেন। উভয় চিত্রের সাহায্য অবলম্বনে উহার পাঠোদ্ধার করিতে ব্রতী হইয়া দেখিলাম. ইহাতে খরোষ্ঠী প্রভাব অতিরিক্ত মাত্রায় বিদ্যমান। দক্ষিণ হইতে বাম ক্রমে পড়িতে হয়।

বিক্রমখোল-লিপির পাঠ ব্যপদেশে অবগত হওয়া গিয়াছে, এই লিপি রাজা-বিশেষের বারংবার যুদ্ধের ফলে, নাগপুর-রাজ্য বিজিত হইবার অব্যবহিত পরেই--বিজয়লব্ধ রাজ্যের নবীন রাজার শাসনলিপি। তিনি যুদ্ধজয়ের পর একটি যজ্ঞ করিয়াছিলেন, সেই যজ্ঞকালে সমগ্র বন্দীদিগকে মুক্তি দেন।

সাতবাহন বা শালিবাহন নামক ইতিহাসপ্রসিদ্ধ রাজা বিক্রমখোল-লিপি খোদিত ও চিত্রিত করিয়াছিলেন। কথিত আছে, সাতবাহন অর্থে সিংহরূপী গন্ধর্ব্ব যাহার বাহন, তাঁহারই নাম সাতবাহন। শালিবাহন অর্থ পূর্ব্বরূপ। সাত বা শালি অর্থেও সিংহ। সম্ভবতঃ তাঁহার প্রিয় অশ্বের নাম ছিল-- সাত বা শালি এবং তাঁহার সঙ্গীতবিদ্যাবিৎ প্রধান মন্ত্রীর নামও ছিল সাত বা শালি। ইনি যে অব্দ প্রবর্ত্তিত করেন. উহাই 'শকাব্দ' নামে প্রচলিত হইয়াছে। অথবা তিনি সিংহাকৃতি রথে আরোহণ করিয়া ভ্রমণ করিতেন।

লিপিপাঠে দেখা যায়. সাঙ্কেতিক হিসাবে যুদ্ধজয় বা শাসন-লিপি উৎকীর্ণ হইবার কালটি 'রস-সির' পদদ্বারা ব্যক্ত করা হইয়াছে। রস ছয় এবং সির অর্থে সূর্য্য এক, বামাগতি অনুসারে তাঁহার বর্দ্ধমান রাজ্যাঙ্ক ১৬শ। সুতরাং তিনি সিংহাসন আরোহণ করিবার ১৬ ষোল বৎসরে এই যুদ্ধে জয়লাভ করিয়া বিক্রমখোল শৈলগাত্রে শাসন-লিপি লিখাইয়াছিলেন। খ্রীষ্ট-জন্মের ৭৮ বৎসরে তিনি শকাব্দ গণনা রীতি প্রবর্ত্তন করেন, অতএব এই ভীষণ যুদ্ধ জয়ের পরই রাজা শালিবাহন শকাব্দ প্রবর্ত্তিত করিয়া থাকিবেন। সুতরাং সিংহাসন-আরোহণের ১৬শ বৎসরে শকাব্দা আরম্ভ. এই হিসাব যদি সত্য হয়, তাহা হইলে শালিবাহন নিশ্চয় ৬০-৬২ খ্রীষ্টাব্দে সিংহাসন অধিরোহণ করিয়াছিলেন। অতএব সাতবাহন রাজা খ্রীষ্টাব্দের প্রথম শতকের প্রথম পাদে জন্মগ্রহণ করিয়া থাকিবেন। তবে যুদ্ধজয়ের সময় হইতে যদি শকাব্দ গণনা আরম্ভ হইয়া থাকে তাহা হইলে খ্রীষ্টাব্দের ৭৮ অব্দেই শকাব্দার আরম্ভ বিবেচনা করা যাইতে পারে। সম্ভবতঃ শকাব্দা গণনার আরম্ভকালটির মধ্যে ১৬শ বৎসরের গোলযোগ রহিয়া গিয়াছে।

বিক্রমখোল পাহাড় সন্নিকটে সম্ভবতঃ প্রাচীন রাজধানী ব. নগর অথবা তথায় এই ঘোরতর যুদ্ধাভিনয় হইয়া থাকিবে। 'বিক্রম' অর্থে শৌর্য্য. সাহস, আক্রমণ বুঝায় এবং 'খোল' অর্থে পাগড়ী (উষ্ণীষ)--"শৌর্য্যের উষ্ণীষ"—চরম আক্রমণের স্থান। সুতরাং শালিবাহন রাজা তথাকথিত স্থানে চরম আক্রমণ করিয়া শৌর্য্য বীর্য্য প্রদর্শন করিয়াছিলেন।

বিক্রমখোল-শৈল বালি পাথরের, সুতরাং অনেকটা কোমল। বোধ হয় অতি অল্প সময়ের মধ্যে খোদাই-কার্য্য

সমাধার চেষ্টা হইয়াছিল, বন্ধুর শৈলগাত্র সমতল করিয়া লইবারও অবকাশ হয় নাই। তদুপরি লিপিগুলি হাতের টানা লেখার মত অতি দ্রুত লিখিত হইয়াছিল। যে-যে অংশ খোদাই করিবার সুবিধা হয় নাই, সেই সেই অংশ রংদ্বারা লিখিত হইয়াছে, সুতরাং লিপিকর্ম্ম অতি অল্প সময়ের মধ্যেই সমাধা হইয়াছিল। এ-প্রকার জটিল লিপি ভারতে এ পর্য্যন্ত কোথাও আবিষ্কৃত হয় নাই।

শাসনলিপির ভাষা প্রাচীন নাগপুরী (রাঢ়ীয় ভাষা). লিপিগুলি মিশ্রলিপি, খরোষ্ঠী এবং প্রাচীন পালি অক্ষর। লেখা ভাঙা ও দ্রুত লিখন হেতু কতকটা ফার্সী লেখার মত দেখিতে হইয়াছে। সৈন্ধবী লিপির মুদ্রালিপিতে যেমন 'গুচ্ছলিপি' দুর্জ্ঞেয় হইয়াছে. সেই ধরণের 'গুচ্ছলিপি' শালিবাহন বিক্রম-খোল লেখমালায় বিদ্যমান রহিয়াছে। সম্ভবতঃ স্থান-সঙ্কুলানের জন্য গুচ্ছলিপির ব্যবহার করিতে হইয়াছে।

বিক্রমখোল-লিপির ভাষা সম্ভবতঃ খ্রীষ্ট প্রথম বা পূর্ব্বাব্দের দেশপ্রচলিত- 'নাগ প্রাকৃত ভাষা', নাগা. কোল এবং সমেতাল কথিত ভাষার মতও নয়. পালি প্রাকৃতও নয়। মনে হয় সাধারণ প্রাচীন নাগ প্রাকৃত ভাষার সহিত ভদ্র নাগরিক পালি ভাষার মিশ্রণে এই ভাষা। ইহাতে যে-সকল শব্দ বিদ্যমান রহিয়াছে, সেগুলি সমুদয়ই উত্তরী প্রাকৃত ভাষার শব্দ। সামান্য দক্ষিণী প্রাকৃত শব্দও বিদ্যমান রহিয়াছে। আশ্চর্য্যের বিষয়, লিপির প্রাকৃত শব্দগুলি সংস্কৃত ধাতুশব্দ-মধ্যে ধৃত হইয়াছে। ঠিক এই ব্যাপার সৈন্ধবী মুদ্রা-লিপিতেও দেখা যাইতেছে। অতএব বলা যাইতে পারে প্রাচীন ভারতের, প্রাচীন প্রাকৃত ভাষার অধিকাংশ শব্দই, সংস্কৃতের ধাতু বলিয়া গণ্য হইয়াছে। একাক্ষরকোষ এবং ধাতুমালায় একাক্ষর ও ধাতুশব্দগুলির যে অর্থ লিখিত রহিয়াছে উহার সাহায্যেই আলোচ্য শালিবাহন রাজার শাসন-লিপির পাঠোদ্ধার করা সম্ভব হইয়াছে। অথচ বিক্রমখোল-লিপির ভাষা সংস্কৃত নয়। প্রকৃত প্রাচীন নাগ-প্রাকৃত ভাষা। কোল হো প্রভৃতির কথিত ভাষার কিঞ্চিৎ ধ্বনি প্রকাশ করে মাত্র।

রাজা অশোকের সময়ের ভাষার সহিত (মাগধী পালি ভাষা) শালিবাহন রাজার লিপির ভাষার কোনই সাদৃশ্য নাই। অতএব মনে হয়, প্রাচীন নাগপুর রাজ্যে তথাকথিত কালে ঐ প্রকার ভাষাই প্রচলিত ছিল। সাধারণের বোধসৌকর্য্যার্থ দেশীয় ভাষাই ব্যবহৃত হইয়াছে। এই ভাষা প্রাচীন পশ্চিম-দক্ষিণ-রাঢ়ের ভাষা ছিল বলিয়াই অনুমান করা চলে। বঙ্গের (পশ্চিম) আদি ভাষা কতকটা বিক্রমখোল ভাষার

বিক্রমখোল লিপির অংশ

মতই ছিল। এই ভাষার বিষয় এ পর্য্যন্ত অবগত হওয়া যায় নাই। পালি ভাষায় ব্যবহৃত দু-চারিটি শব্দ ইহাতে পাওয়া যায়. যথা লজা (রাজা), ইস, পতি। শল শালি, সল শব্দে একশত বুঝায় প্রাচীন আদিজাতির। সল ও সত একই। সত. শত এক কথা।

পাঠোদ্ধারের বিস্তৃত বিবরণ প্রদত্ত হইল না। প্রত্যেক চিত্রটি ভারতীয় কোন্ ভাষার অক্ষর, প্রথমে ইহারই বিচার করিয়া অক্ষরগুলির পরিচয় গ্রহণ করা হইয়াছে, তৎপরে শব্দনির্ণয়ার্থ ধাতু আদর্শে, শব্দ সাজানো হইয়াছে এই উপায়ে বর্ণগুলি সাজাইয়া ভাষায় পরিবর্ত্তিত করিয়া--- সাহিত্যমুখী করিতে, যথেষ্ট পরিশ্রম এবং সময় অতিবাহিত হইয়াছে। যদিও ইহা প্রথমে পালি ভাষা বিবেচিত হইয়াছিল, কিন্তু পরে দেখা গেল, পালিভাষার সামান্য টান থাকিলেও ইহা পালি ভাষায় লিখিত নহে; সংস্কৃত ত নয়ই। সমেতাল বা কোল-হো ভাষাও নহে, অথচ যেন সামান্য আভাস আছে। ইহা কোন প্রচলিত ভাষা নহে, সম্ভবতঃ প্রাচীন নাগপুরীয় সাধারণ লোকের গ্রাম্য ভাষায় এই লেখমালা উৎকীর্ণ হইয়াছে। বর্ত্তমানকালে উৎকীর্ণ লিপির ভাষার প্রচলন নাই, দীর্ঘ কালে এই ভাষা পরিবর্ত্তিত হইয়া গিয়াছে। কোল, হড়, হো, মুণ্ডা প্রভৃতি

প্রাচীন জাতিরা এ ভাষা বুঝিতে পারে না, দুই-একটি শব্দ মাত্র বুঝিতে পারে। বর্ত্তমানে এ ভাষা অচল এবং অজ্ঞাত ভাষায় পরিণত হইয়াছে। সম্ভবতঃ এই প্রকারের কয়েকটি ভাষা লোপ পাইয়াছে।

প্রাচীন প্রাদেশিক ভাষা পরিবর্ত্তনের কারণগুলি অনুসন্ধান করিলে দেখা যায়, রাষ্ট্রীয় পরিবর্ত্তন ইহার বিশেষ কারণ-মধ্যে গণ্য হয়। রাষ্ট্রীয় ভাষা জাতিগত ভাবে দেশবাসীর উপর প্রভাব বিস্তার করে। নাগপুর প্রাচীনকালে একটি জেলা মাত্র ছিল না, সমগ্র সেন্ট্রাল বিভাগটি সুবিখ্যাত নাগ-রাজ্য ছিল। নাগদেশ বহুকাল স্বাধীন রাজ্যরূপে খ্যাতিও লাভ করিয়াছিল। বড় বড় মগধ রাজবংশ নাগ রাজ-ধারা হইতে উৎপন্ন হইয়া যশঃকীর্ত্তি রাখিয়া গিয়াছে। মগধ-রাজ শিশুনাগ প্রভৃতি বংশ আদৌ নাগরাজবংশীয়। মগধরাজ-শাসনে বহুদিন নাগরাজ্য শাসিত হইয়াছিল। নাগপুর পার্ব্বত্য অঞ্চলে এখন কয়েক স্থানে প্রাচীন দুর্গ নগরাদির ধ্বংসাবশেষ-চিহ্ন রহিয়াছে। রাজপুত জাতীয় প্রভাবে নাগপুর প্রভাবিত হইয়াছিল। সময়ে সময়ে গুপ্ত, পাল, সেন রাজন্যগণের রাষ্ট্র অন্তর্গতও হইয়াছিল। নাগ-পুরের প্রাচীন অধিবাসী এবং বৈদেশিক শিক্ষিত লোকেদের বংশ অধিকাংশই নাগপুর ত্যাগ করিয়া অন্যত্র চলিয়া গিয়াছে। অধিকাংশ নিম্নশ্রেণীর রাজপুতানাবাসী, মারহাট্টা, উৎকলী, বাংগালী, খোট্টা মাগধী প্রভৃতি পার্ব্বত্য জাতিসহ বাস করিয়া পাহাড়ী নাগপুরিয়া ভাষার বিকাশ করিয়াছে। সুপ্রাচীন নাগ ভাষা এখন বিদ্যমান নাই। বৈদিক, জৈন, বৌদ্ধ প্রভৃতি সাহিত্যে নাগগণের যে-সকল বিবরণ উল্লিখিত আছে, তাহাতে নাগজাতির শৌর্য্যবীর্য্যের কথাই ব্যক্ত করে। বিত্রাসুর প্রভৃতি নাগ বলিয়া উক্ত হইয়াছেন। নাগ অহি বা সর্প নহে, বোধ হয় স্বভাবটা সরল ছিল না এবং নাগ-কবলে পতিত হইলে আর উদ্ধারেরও উপায় থাকিত না। নাগপুর রাঢ়ের ন্যায় পারিপার্শ্বিক অতি প্রাচীন রাজ্য, নাগ জাতিও সুপ্রাচীন। ইহাদের আদি ভাষা কালপ্রভাবে, বিবিধ রাষ্ট্রীয় জাতি-প্রাধান্যে ধীরে ধীরে পরিবর্ত্তিত হইয়া অভিনব ভাষার বিকাশ করিয়াছে, সেই ভাষাগত কালস্রোতের অন্তর্গত কোন ভাষার স্মৃতিচিহ্ন বিক্রমখোল লেখমালায় আবদ্ধ হইয়া রহিয়াছে। ইহা সম্ভবতঃ পরিবর্ত্তন প্রণালীগত কোন এক অবস্থার ভাষা। এই প্রকার খ্রীষ্টাব্দের প্রথম শতকে অবশ্য বিদ্যমান ছিল। বর্ত্তমানে বাংলা, পশ্চিমা, উড়িয়া, দক্ষিণী এবং কয়েক প্রকার প্রাচীন পাহাড়ীয়া জাতির ব্যবহৃত ভাষার শব্দে নাগপুর মুখরিত হইয়া রহিয়াছে। বাংলা ভাষাও বহু রাষ্ট্রবিপ্লবের ফলে বৈদেশিক জনগণের সংঘট্টের হেতু এতাদৃশ সঙ্কর ভাষায় রূপান্তরিত হইয়াছে যে, প্রকৃত আদি বাংলা ভাষা কোন্‌টি বলা যায় না। অথচ বর্ত্তমান কাল প্রচলিত ভাষাই বাংলা ভাষা ব্যতীত অন্য কিছু নয়। বিশুদ্ধ বাংলা ভাষা, বোধ হয় সকল দেশের সকল ভাষাই—বিকৃত হইয়াছে, তদ্রূপ পরিবর্ত্তিত এবং বিকৃত হইয়াছে। এই কারণে শুদ্ধি মানসে সংস্কৃত পণ্ডিত বাঙালীরা বাংলা ভাষাকে সংস্কৃতজাত বলিয়া থাকেন। বাংলা ভাষা মিশ্রভাষা হইলেও কৃত্রিম ভাষাজাত নয়। অন্যান্য ভাষার প্রভাব যেমন বাংলা ভাষায় বিদ্যমান, তদ্রূপ সংস্কৃত প্রাধান্যও ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতগণের শাস্ত্রীয় প্রাধান্যে বিদ্যমান রহিয়াছে। প্রাকৃত বাংলা ভাষার শব্দ যথেষ্ট সংস্কৃত শব্দে বিদ্যমান রহিয়াছে। মূলের একতা হেতু বাংলা ভাষা সংস্কৃতজ বলিয়া বোধ হয়। সেইরূপ সংস্কৃতের দিক দিয়া দেখিলে দেখা যায়, সংস্কৃত দ্বিবিধ প্রাকৃত ভাষা হইতে জন্মলাভ করিয়াছে। সুতরাং সংস্কৃত প্রাকৃতজ ভাষা কৃত্রিম উপায়ে গ্রথিত।

বিক্রমখোল-লিপি বিবৃতি

আক্ষরিক পাঠ

জ (ত) ল (অ,উ)-ই (অ)-ছ-দ (ন)-ম-ল-অং-ট
র-জ (য)-ই-তা-ল-ঈ-অ-স-জ-ই (অ)
দ-ন-শ-ল-ই-স-জজ-জজ-জছ-আ-র-গ (গং)
অং-ব-গ্র-প্র-জ-গং-অ (গাং-গংঅ)-ই-ল-ই-জ-স-ল-স্ত্র
অ-জ-ষ-গ (গা)-লা (লি)-শু-ল-র-র-স-সি-র-ই-লু-ল।

শব্দগত পাঠ

জল (তল) ইছদ্ মলঅংট রজ তালীয়স্ ইদন শল ইস (সি)
জজ জজ জছ (অ) রগ (গং) অং যগ্র প্রজগং (গাং)
ইল (লি) ইজ (জি) সলস্ত্র অজ যগ (গা) লা (লি) অ,
(যগা ইঅংণ পরতি ?)
ইঅংণ পরতি মং (ই)ল (লি) শুল ই (অই=অং)
(ই?) ঈঅং পতি (ম্) মঅ (মং বা মাং) ইল (লি ?)
শুলর রস সির* ইলুল...

*রস সির—রস—৬, সির—সূর্যা ১, ১৬ রাজাঙ্কের সঙ্কেত বলিয়া মনে হয়। এখন নিশ্চয় বলা যায় না।

শব্দার্থ

খোল—পাগড়ী। জল—সমৃদ্ধি, আচ্ছাদন। জল—ঘাতনে (সেট)—জলতি, জাড্যম্ (বর্ণ দৃঢ়া দিভ্যঃ)

অপবার.ণ। অজ-গতিক্ষেপণয়োঃ (অজতি, অজতু), গতিক্ষেপণ, প্রেরণ, যাপন।

ইল—প্রেরণে (ইলতীতি, এলয়তি), শয়ন, গতি, ক্ষেপণ।

ঈজ—গতিকুৎসনয়োঃ (ঈজতে, ঈজিতা), নিন্দা। প্রা—পূরণে (প্রাতি, পপৌ, প্রাতা)।

জজ—(জাজ) যুদ্ধ (সেট্-জলতি, জাড্যম্ (বর্ণ দৃঢ়া দিভাঃ)—জড়িমা (দৃঢ়া দিত্বাদ্)।

তল—প্রতিষ্ঠা, গতি। প্রতিষ্ঠায়াম্ (তালয়তি, তালং-অচ, সংজ্ঞা-পূর্ব্বকত্বাৎ বৃদ্ধা ভাবঃ)

অট—(অটি—গতৌ), অণ্ট (সেট্)—অণ্টতে, অণ্টয়তি, অণ্টিটিষতে।

দন্তু—(দম্ভনে) সেট্—দভোতি, দম্ভ নোতু।

দন্শ—(দশনে)—দংশন, দীপ্তি, দৃষ্টি। (দন্স—দীপ্তি, দর্শন, দংশন)—দশতি দশতু।

যজ—দেবপূজা সঙ্গতি করণ দানেষ্ (যজতি, যজতু, যজেৎ, ঈজিব যাজ্যং যাগঃ)।

গল—অদনে,—ভক্ষণ, ক্ষরণ।

পার—তীর, কর্ম্ম সমাপ্তৌ। নদীর পর তীর, উদ্ধার প্রাপ্ত, নদীবিশেষ।

মল—ধারণ (সমশব্দ—মল্ল)।

ইন্দ—(ইন্দ)—পরমৈশ্বর্য্য।

ইষ—(স ষ স্থানে ছ প্রয়োগ)—ইচ্ছা, আভাক্ষ্য।

জছ—মোক্ষণ, মোক্ষ, অনাদর, বধ, মুক্তি, মোচন।

শল—শ্লাঘা, আচ্ছাদন, বেগ, গতি। গতৌ, হুল—(হিংসাসংবরণয়োশ্চেতি কশ্চিৎ)—শশাল, শলতি।

যগ—যাগ, যজ্ঞ।

ইলুল—(উকৃদিত্ব—মাঙ্গলিক ধ্বনি—উললু) ইল+উললু—ইলুল।

সীর—সূর্য্য।

শব্দগত অর্থ

সমৃদ্ধি শালী (শ্রেয়বান) এই ইদন শল,* হিংসা সম্বরণ শীল রাজা ইচ্ছা করেন, যুদ্ধে যুদ্ধে (বারংবার যুদ্ধ দ্বারা) প্রজাদিগকে মৃত্যু বরণ না করাইয়া মুক্তিদান করেন (যুদ্ধে পরাজিত বন্দী-দিগকে মুক্তিদান ইচ্ছা করেন)। লাজ সল (ইল-ইজ -লিজ্জি, লাজ, রাজ ইত্যাদি) অর্থাৎ রাজা সল (শল) কর্ম্ম সমাপ্ত হেতু (যুদ্ধে জয়লাভ কারণ) যাগ যজ্ঞ উদ্যাপন করিতে ইচ্ছা করিতেছেন। এই পতি (ঈঅং পতি ?) এই বিজয় রাজ্যের অধিপতি, ইল (লি) গুল পতি-সীর (সূর্য্য)- সূর্য্যবংশীয় নৃপ, অথবা সূর্য্য-বিক্রমী নৃপ,— ইহাই (সংবাদ বা ইচ্ছা) প্রেরণ করিলেন।

সংক্ষিপ্ত ভাবার্থ

বহু ঐশ্বর্য্যের অধিপতি, হিংসা সম্বরণকারী, এই শল (সল বা শালিবাহত—সাতবাহন) রাজা ইচ্ছা করেন যে, বারংবার যুদ্ধদ্বারা লোকদিগকে মৃত্যুমুখে প্রেরণ না করিয়া মুক্তিদান করেন, অথবা বন্দীদশাপ্রাপ্ত লোকদিগকে হত্যা না করিয়া মুক্তিদান করেন। রাজরাজ—সল, যুদ্ধাদি কর্ম্ম সমাপ্ত হেতু জয়লাভ করণে, যাগযজ্ঞ কর্ম্ম করিতে ইচ্ছা করিতেছেন। এই বিজয়লব্ধ রাজ্যের অধিপতি—ইলগুল—ঈশ্বর-সূর্য্য, বা সূর্য্যবংশীয় ইলগুল— এই ইচ্ছা (প্রজাগণের অবগতার্থ) প্রেরণ করিলেন।

---

* শল—শব্দের অর্থ হিংসা সংবরণ বুঝায় এবং নৃপতির নামও হইতে পারে, সম্ভবতঃ এস্থলে দুই অর্থই প্রকাশ করিতেছে। অনুমান—সাতবাহন এবং শালিবাহন একই ব্যক্তি। সাতবাহন অর্থে সাত' অর্থাৎ সিংহরূপী গন্ধর্ব্ব হইয়াছে বাহন যাহার। শালি-বাহন রাজা, ইনি শৈশব কালে তথাকথিত গন্ধর্ব্বকে বাহন করিয়া ভ্রমণ করিতেন। শালি—সিংহ বাহন যাহার। ইঁহার প্রবর্ত্তিত অব্দের নাম শকাব্দ। খ্রীষ্টজন্মের ৭৮ বৎসর পরে শকাব্দ গণনা আরম্ভ।

জমির অধিকার

শ্রীঅবিনাশচন্দ্র দত্ত, এম-এ, বি-এল্

আমাদের সমাজ-ব্যবস্থায় জমির অধিকারের সমস্যা একটি বড় সমস্যা। বাংলা দেশে প্রজাস্বত্বের ১৯২৮ সনের সংশোধিত আইন প্রজা ও মধ্যবিত্তের অবস্থার জটিলতা দূর না ক'রে, তাকে আরও সঙ্কটাপন্ন ক'রে তুলেছে। এক দিকে নানা অর্থনৈতিক কারণে কৃষিজাত দ্রব্যের মূল্যের অল্পতা এবং অন্য দিকে আইনের বিধানে কৃষকের জমির মূল্যের হ্রাস, জনসাধারণের আর্থিক দুর্দ্দশা বৃদ্ধি করেছে। আমাদের সমাজ-ব্যবস্থার কথা যাঁরা ভাবেন, তাঁদের লেখায় সময় সময় আমরা এ প্রসঙ্গের উল্লেখ দেখে থাকি। সমাজের বৃহত্তর কল্যাণের দিকে লক্ষ্য রেখে, এ সমস্যার সমাধান-বিষয়ে আরও বিশেষ আলোচনা এবং আন্দোলন হওয়া উচিত।

১৯৩১ সনের মার্চ্চ মাসে ভারতের জাতীয় কংগ্রেসের করাচী অধিবেশন মহাত্মা গান্ধীর যে প্রস্তাব গ্রহণ করেছিলেন, তাতে মজুর ও কৃষক উভয় শ্রেণী সম্বন্ধেই কংগ্রেসের অভিপ্রায় ব্যক্ত হয়েছে। উক্ত প্রস্তাবে কারখানা ও ভূমির উপর মজুর ও কৃষকের স্বত্ব সম্বন্ধে কংগ্রেস কিছু বলেন নি। কংগ্রেসের এই অর্থনৈতিক প্রস্তাবের ৮, ৯ ও ২০ দফায় এইরূপ বলা হয়েছে,—

"ভূমির রাজস্বের ও কৃষকের গরলায়েক (uneconomic) জমি-বাবদ দেয় খাজনার প্রভূত হ্রাস; এবং সেজন্য যতকাল প্রয়োজন, খাজনা থেকে অব্যাহতি।"

'নির্দ্দিষ্ট পরিমাণ আয়ের অতিরিক্ত কৃষির আয়ের উপর আয়-কর ধার্য্য করা।'

'প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ চড়া সুদের দমন।'

কংগ্রেসের নিখিল ভারতীয় রাষ্ট্রসমিতি ১৯৩২ সালের ১লা জানুয়ারি তারিখে বম্বের অধিবেশনে একটি প্রস্তাবে জমিদারদিগকেও আশ্বাস দিয়েছেন যে, জমিদাররা ন্যায়সঙ্গত ভাবে যে সম্পত্তি অর্জ্জন করেছেন, তা নষ্ট করার জন্য কংগ্রেসের কোনরূপ মতলব নেই।*

অধ্যাপক ডাঃ রাধাকমল মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের মত এই,—

"যে-কোন বিধিব্যবস্থায় হউক না কেন, জমিদারী স্বত্বের সংক্ষেপ করিয়া, জমির হস্তান্তর প্রতিরোধ করিয়া মজুর, বর্গাদার, আধিয়ার প্রভৃতিকে কায়েমী স্বত্ব দিয়া পল্লীসমাজের অনৈক্য দূর করিতেই হইবে। ধনী ও মধ্যবিত্ত শ্রেণী রাষ্ট্রিক স্বাধীনতা লাভ করিয়া তাহা দেশের ও দশের অকল্যাণে নিয়োজিত করিবে, যদি এই অনৈক্যের একটা সমাধান না হয়। লোকসংখ্যা বৃদ্ধিহেতু জমি ক্ষুদ্র হইতে ক্ষুদ্রতম হইয়া চলিয়াছে। ফলে অনেক প্রদেশে শতকরা ৪০ হইতে ৬০ জন কৃষকের জমির পরিমাণ এত ক্ষুদ্র যে, তাহাতে কৃষক-পরিবারের সঙ্কুলান হয় না। গ্রামে গ্রামে নিরবলম্বন শ্রমিক দলের সংখ্যা এই কারণেও বৃদ্ধি পাইতেছে। যদি দেশের অর্দ্ধেক পরিমাণ ক্ষেতে কেবলমাত্র কৃষি হইতে জীবিকানির্ব্বাহ অসম্ভব হইয়া পড়ে তবে সমাজে ঘোর অশান্তি, এমন কি, বিপ্লবও ঘটিবার সম্ভাবনা।"

ইহা নিরাকরণের তিনটি প্রধান উপায় তিনি নির্দ্দেশ করেছেন; যথা,—কৃষকের মৃত্যুর পর হয় জ্যেষ্ঠ, না-হয় কনিষ্ঠ পুত্র উত্তরাধিকারসূত্রে জমি পাবে; কৃষকবিশেষকে জমির খাজনা থেকে নিষ্কৃতি দেওয়া; এবং জন্মপ্রতিরোধের চেষ্টা।

মাটির অধিকারের সমস্যা বর্ত্তমানে শ্রেণীবিশেষের কাছে প্রবাসী-পুত্রের মায়ের স্নেহাধিকারের সমস্যার স্থানীয় হয়ে দাঁড়িয়েছে। কারণ, উক্ত শ্রেণীভুক্ত অনেককে বিদেশে ব্যবসা, চাকরি বা মজুরি করতে হয়, সেই আয় জমির সামান্য আয়ের সঙ্গে সংযুক্ত ক'রে পরিবার প্রতিপালন করতে হয়।

পৃথিবীর সমস্ত সভ্য দেশেই আজ ধনী ও নির্ধনের সংঘাত অল্প-বিস্তর জেগে উঠেছে। ভারতে এ সংঘাত যে খুব তীব্র হয় নি তার একটা কারণ এই যে, প্রাচীন কালে ধর্ম্মের নামে সম্প্রদায় গঠন ক'রে মানুষে মানুষে লড়াই হত, শিক্ষার অপ্রসারহেতু এবং কতগুলি বাহ্যিক কারণে ভারতের বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে সেই দ্বন্দ্বকে কৃত্রিমভাবে জাগিয়ে রাখা হয়েছে। হিন্দু-মুসলমানসমস্যা তার মধ্যে প্রধান। শ্রমিকদের নিয়ে অর্থনৈতিক শ্রেণীগঠনকার্য্য এখনও বেশী দূর অগ্রসর হয় নি ব'লে ধনিকের সঙ্গে তাদের বিবাদ এখনও তেমন জোরে বাধে নি। দ্বিতীয় কারণ,—ভারতের সমাজ

* "The Working Committee passed a resolution assuring zemindars that there was no design on their interests legitimately acquired—*A. P. News.*
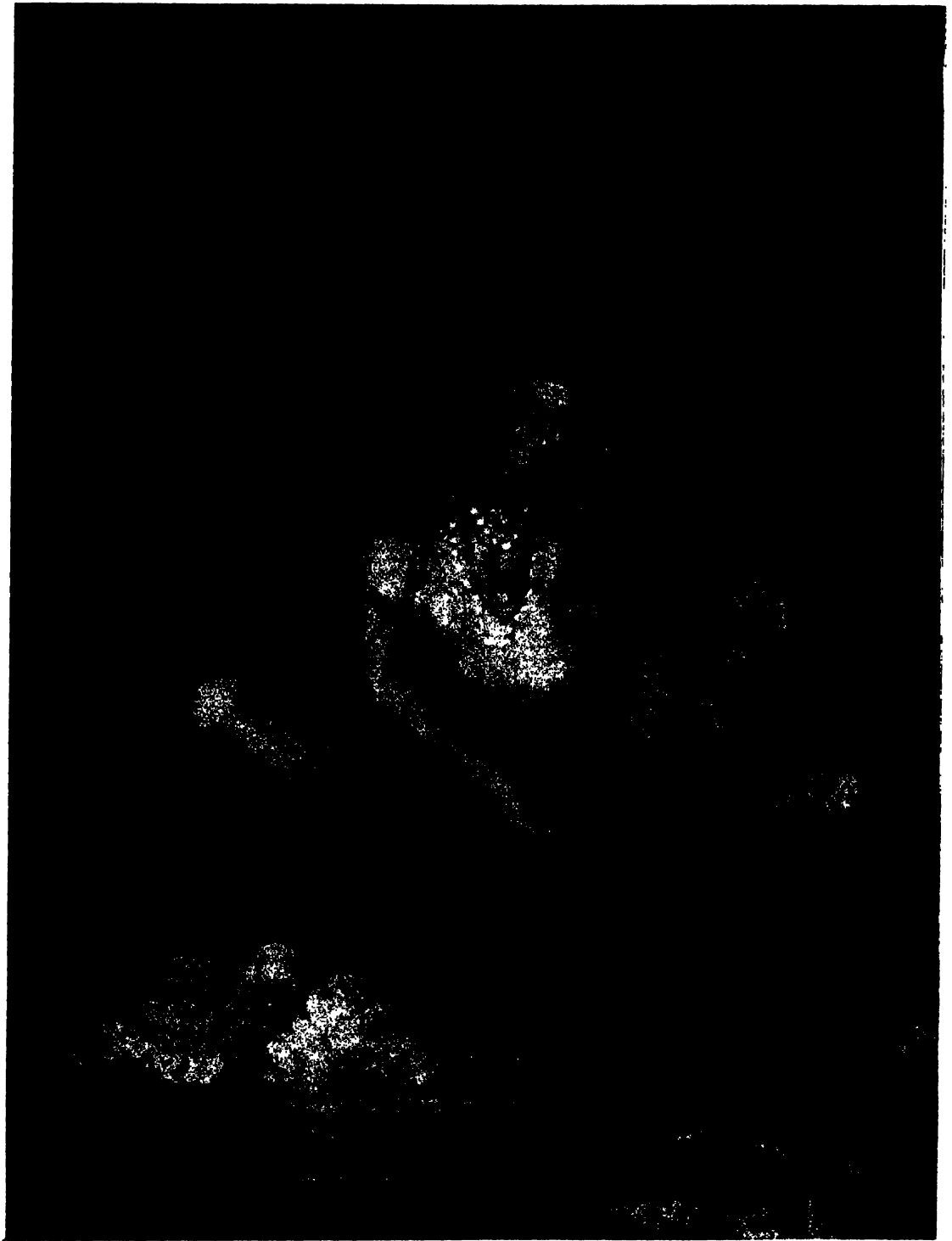
হর-পার্ব্বতী
শ্রীকালীপদ ঘোষাল

প্রবাসী প্রেস, কলিকাতা

এখনও প্রধানত পল্লীসমাজ। সেখানে ধনী ও নির্ধনের মধ্যে একটা আত্মীয়তা এখনও অনেক স্থলে জেগে আছে। উৎসবে, পূজাপার্ব্বণে, সামাজিক দানে ও কর্ম্মে ধনী তাঁর ঐশ্বর্য্য প্রকাশ করেন। পাশ্চাত্য সভ্যতায় ধনের দেয়াল মানুষের সহজ সম্বন্ধকে দূর ক'রে মানব-প্রকৃতির মধ্যে একটা বিপর্য্যয় ঘটিয়েছে। তাই রবীন্দ্রনাথের ভাষায়,—

"আজ, তীরে অগ্নিগিরি উৎপাত বাধিয়েচে বলে সমুদ্রকেই একমাত্র বন্ধু বলে এই ঘোষণা। তীরহীন সমুদ্রের রীতিমত পরিচয় যখন পাওয়া যাবে তখন কূলে ওঠবার জন্য আবার আকুপাকু করতে হবে।"

মধ্যবিত্তশ্রেণী মূলতঃ একটা স্বপ্রতিষ্ঠ ও স্বতন্ত্র শ্রেণী নয়। এক দিকে যেমন কোন বর্দ্ধিষ্ণু কৃষক ও মজুর পরিবার শিক্ষায় বিত্তে ও কর্ম্মে মধ্যবিত্তশ্রেণীতে উন্নীত হয়, অন্যদিকে তেমনি এক পুরুষের খুব ধনী ও জমিদার পরিবার পরবর্ত্তী পুরুষে মধ্যবিত্ত শ্রেণীতে গণ্য হতে পারেন। তাই উভয় কুলের প্রতিই মধ্যবিত্তদের দরদ থাকার কথা। এরিষ্টটল হ'তে ইদানিং স্যর জন্ সাইমন পর্য্যন্ত অনেক মনীষীই এই মধ্যবিত্তশ্রেণীর উপর তাঁদের আস্থা প্রকাশ করেছেন। এঁরাই সকল সমাজের ও রাষ্ট্রের মেরুদণ্ডস্বরূপ।

"মধ্যবিত্তশ্রেণীর জনসংখ্যা যখন উভয় প্রান্তের, কিংবা অন্তত এক প্রান্তের অনেক বেশী থাকে, তখনই কোন স্থায়ী রাষ্ট্রের সম্ভাবনা ঘটে।... যারা দুনিয়ায় মধ্যস্থের মতো বিশ্বাসী আর কেহ নাই; এবং মধ্যবিত্ত-শ্রেণী ধনী ও দরিদ্রের মধ্যে এই মধ্যস্থের পদ অধিকার করেন।"
—এরিষ্টটলের রাজনীতি।

ভারতীয় সমাজের বিশেষত্ব এই যে, তার শিক্ষিত, মধ্যবিত্ত শ্রেণী তথাকথিত সাধারণ শ্রেণীর সঙ্গে অন্তরের যোগ এবং আত্মীয়তা হারায় নি।

"ভারতীয় শিক্ষিত সমাজের স্বভাব অপূর্ব্ব বলে মনে হয়। এই এক শ্রেণীর লোক যাঁরা বিদ্বান ও কর্ম্মী, প্রায়শঃ যাঁরা পাশ্চাত্য ভাষায় ভাবেন এবং ঐ শিক্ষার সঙ্গে পাশ্চাত্য সভ্যতা ও রাষ্ট্রের নিয়ম ও সংস্কার সকল গ্রহণ করেন; অথচ, প্রাচ্যের আদিম সংস্কারে যাঁদের মন আচ্ছন্ন, ভারতের এরূপ জনসাধারণের সঙ্গে তাঁরা ঐকান্তিক একত্ব অনুভব করেন।"—সাইমন কমিশন রিপোর্ট, প্রথম খণ্ড।"

নূতন কোন বিধিব্যবস্থার প্রবর্ত্তন করার সময় আমাদিগকে একদিকে যেমন বর্ত্তমান জগতের ভাব ও কর্ম্মপ্রবাহের প্রেরণা গ্রহণ করতে হ'বে, অন্যদিকে তেমনি ভারতীয় সমাজের বৈশিষ্ট্য যথাসম্ভব রক্ষার জন্য মনোযোগী থাকতে হবে। জাতীয় চিত্তকে বু'ঝে তার ভাব ও বিকাশের ধারাকে অনুসরণ ক'রে কোন গতিশীল নূতন বিধানকে তার সঙ্গে মিলিয়ে মিশিয়ে নূতন আইনকানুন চালাতে হবে। ভারতীয় সমাজ-ব্যবস্থার মূল তত্ত্বটি হচ্ছে, জমিকে কেন্দ্র ক'রে সমষ্টিগত জীবনের বিকাশ এবং জীবনের সকল বিভাগে আধ্যাত্মিক উপলব্ধির প্রয়াস। তার আইন, নীতি ও সংহিতা তাদের প্রীতির প্রদীপ জালিয়ে মানুষের ওই যাত্রাপথ উজ্জ্বল করেছে। আমাদের সমাজ-ব্যবস্থার আদর্শ হবে মানুষের শ্রেয়ঃ ও পূর্ণতর জীবন, যা তার আত্মীয়তা ও মানবতা বিকাশের সুযোগ দান করবে। জমির অধিকার-ব্যবস্থায়ও উক্ত আদর্শ ভুলে গেলে আমরা জাতীয় লক্ষ্য হারিয়ে চল্‌ব।

জল ও বাতাসের মতই ভূমির উপর সকল মানুষের জন্মগত স্বাভাবিক অধিকার রয়ে গেছে। রাশিয়া সম্বন্ধে তাঁর কোন চিঠিতে রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন,—

"জমির স্বত্ব ন্যায়ত জমিদারের নয় সে চাষীর। কিন্তু চাষীকে জমির স্বত্ব দিলেই সে-স্বত্ব পর মুহূর্ত্তেই মহাজনের হাতে গিয়ে পড়বে তার দুঃখভার বাড়বে বই কমবে না।"

জমির স্বত্ব যে ন্যায়ত জমিদারের নয়, তাহা সত্য; কিন্তু তা যে চাষীর, তাও শেষ কথা নয়। আর চাষীরই যদি সমগ্র স্বত্ব ন্যায়ত হয়, তবে তাকে চিরন্তন শিশু ভেবে জমিদারকেই তার সুখ-দুঃখের বিধাতা ক'রে রাখা সমীচীন কি-না বিবেচ্য। আমাদের প্রজাস্বত্ব আইনে উক্ত ভাবই নিহিত আছে। ভারতের প্রাচীন সামাজিক ব্যবস্থায় জমি ছিল অনেক স্থলে সর্ব্বসাধারণের সম্পত্তি।

"তস্মাৎ ভূমৌ স্বকর্ম্মফলং ভুঞ্জানানাং সর্ব্বেষাং প্রাণিনাং সাধারণধনং।"

যে পরিবার বা গোষ্ঠীর যেখানে সুবিধা হয়েছে, সেখানেই সে ভূমি দখল ক'রে ভোগ করেছে। দখলিস্বত্বে (occupation) গ্রামিকগণ পূর্ব্বকালে ভূমির মালিক হয়েছে। অর্থনীতির নিয়মে দখলের শ্রমকেই জমির মূল্য হিসাবে ধরা যায়। ব্যবহারের উদ্বৃত্ত জমি গ্রামিকগণ ভিন্ন গ্রামের মজুরদের চাষ করতে দিয়েছে এবং বিনিময়ে রাজস্ব ছাড়াও কর হিসাবে তাদের কিছু প্রাপ্তি হয়েছে। আবহমানকালের যা রীতি, আজ যারা অর্থের মূল্যে জমি কিনবে, তাদের বেলাও তাই প্রযোজ্য হ'লে সামাজিক সাম্যের ব্যতিক্রম হয়ে বিপ্লব ঘটবার কোন আশঙ্কা নেই। রাজা উৎপন্ন শস্যের একাংশ যে কর-হিসাবে পেয়েছেন, তা শান্তিরক্ষার মূল্যস্বরূপে বলা যায়,—জমির মালিক ব'লে কি-না—এ সম্বন্ধে মতভেদ আছে। সমস্ত জমির মালিক হলেন দেশের রাজা,—একথা ইংরেজী আইনের গোড়ার কথা। প্রাচীন ভারতের রাজা যে-অধিকার

সম্ভবতঃ দাবী করেন নাই, দেওয়ানীর ফারমান নিয়ে ইংরেজ কোম্পানী সে সর্ব্বময় মালিকত্বের স্বয়ংসিদ্ধ কর্ত্তা হ'য়ে জমিদার, ইজারাদার, তালুকদার এবং নবাবী আমলের তহশিলদার ইত্যাদি উচ্চ কর্ম্মচারীদের ভূমির মালিক ব'লে চিরন্তন সনদ দান করেন।

"ভাবী সমাজে"র লেখক শ্রীযুক্ত নলিনীকান্ত গুপ্ত মহাশয় শূদ্রকেই চাষী অর্থে ব্যবহার ক'রে বলেন যে,—

"দাঁড়াইবার, বাঁচিবার ঠাঁই শূদ্রের থাকিলেও ব্রাহ্মণের, ক্ষত্রিয়ের, বৈশ্যেরও সে ঠাঁই দরকার। কিন্তু এই তিনবর্ণ দ্বিজাতি—অর্থাৎ শূদ্রের মত তাঁহারা একবার মাটিতে মাত্র জন্মেন নাই, মাটিতে জন্মিয়া আবার মাটি হইতে সরিয়া একটু দূরে আর একবার জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। জমি না থাকিলেও জমির উৎপন্নে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যের এক-একটা অংশের দাবী আছে—শূদ্রকে এ দাবী স্বীকার করিতে হইবে। কারণ সমস্ত সমাজের স্থিতি ও শুদ্ধির কথা ছাড়িয়া দিলেও, নিজের স্বার্থহিসাবেই শূদ্রের প্রয়োজন আছে আর আর বর্ণের সাহায্য সহযোগিতা। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য নিজ হাতে হাল চাষ করিতেছেন না বলিয়া জমির ফল হইতে ইঁহাদিগকে শূদ্র বঞ্চিত করিতে পারে না. করিলে তাহাকে আত্মঘাতী হইতে হইবে। জমি সকলের হইলেও তাহা গচ্ছিত আছে শূদ্রের হাতে, শূদ্রের কাজ (বৈশ্যের সহায়ে) এই গচ্ছিত ধনকে ফলাইয়া বাড়াইয়া তোলা।"

ব্রহ্মোত্তর ও জায়গির জমি ভারতীয় শিক্ষা ও সাধনার সহায়ক হয়েছে।

ভূমিস্বত্বের কথা সকল দিক থেকে আলোচনা করা এই এক প্রবন্ধে সম্ভবপর নয়। তাই বর্ত্তমানকালে বহুল আন্দোলনের বিষয়ীভূত মাত্র একটি প্রসঙ্গের এখানে আলোচনা করব। সেটি এই, যারা নিজে চাষী নয়, জমিতে তাদের রায়তিস্বত্ব অটুট থাকা উচিত কি-না। নিজেরা বাস করে না এরূপ বাড়িতে,—এমন কি, ভাড়া-না-দেওয়া ভাড়াটে বাড়িতেও, বাড়িওয়ালার স্বত্ব সম্বন্ধে কোন প্রশ্ন জাগে নি। ১৯২৮ সনে বাংলা দেশের ভূমি আইনের যে পরিবর্ত্তন ও সংশোধন হয়, তাহাতে প্রবাসী রায়তদের জমির স্বত্বের উপর আঘাত করা হয়েছে। ভাগচাষী বা জমিহীন জমির মজুরদের খানিকটা স্বত্ব দেওয়ার চেষ্টা হয়েছে। উক্ত সংশোধিত আইনে প্রজাদের অনেক প্রকার অসুবিধা ও অনিষ্টসাধন করা হয়েছে। সুখ ও সুবিধা অতি সামান্যই বিহিত হয়েছে। জমি বিক্রী করতে হ'লে জমিদারকে জমির দামের উপর শতকরা ২০৲ টাকা ফী, জমিদারের সদনে উক্ত ফী পাঠাইবার খরচ সমেত, কোবালা রেজিষ্ট্রি করার সময়েই দিতে হয়। ফলে, দেশে জমির বেচা-কেনা হ্রাস পেয়েছে, এবং জমির জামিনে টাকা সংগ্রহ করা কৃষকের পক্ষে দুঃসাধ্য হয়েছে। বিক্রয়কালে মূল্যের একটা বড় অংশ জমিদারের প্রাপ্য হওয়ায় জমির প্রকৃত দাম অনেক নেমে গেছে। তাতে জমি যে বিক্রী করবে না, তারও সম্পত্তির বাজার-দর অনেক কমে গেল। অভাবের সময় জমির জামিনে অর্থসংগ্রহ করা কৃষকের প্রয়োজন। জমিদার তাঁর অভাবের সময় জমিদারী-স্বত্ব বন্ধক রেখে টাকা ধার করতে পারেন। রায়তও তার প্রয়োজন অনুসারে রায়তিস্বত্ব বন্ধক রেখে যেন টাকা পায় সে অধিকার তার থাকা উচিত। প্রজাস্বত্বের সংশোধিত আইনে সর্ব্বাগ্রে ক্রয়ের অধিকার দ্বারা (প্রিএম্‌শ্যন দ্বারা) তার সে অধিকার ক্ষুণ্ণ করা হয়েছে। প্রিএম্‌শ্যানে জমিদারের একটা বিশেষ অধিকার এই যে, কোন জমি যখন বিক্রী হয়, তখন জমিদার জমির মূল্যের উপর শত করা ১০৲ টাকা অতিরিক্ত দিয়ে ক্রেতার কাছ থেকে উক্ত জমি নিজে গ্রহণ করতে পারেন। জমিদারের এই অধিকার প্রজার পক্ষে জমি বন্ধক রেখে টাকা ধার করার কালে একটা মস্ত প্রতিবন্ধক। পাওনাদারকে তার ন্যায্য পাওনার অনেক কমেও নিলামকালে সময় সময় জমি ডেকে রাখতে হয়। উক্ত ডাকের উপর শত করা ১০৲ টাকা দিয়ে জমিদার যদি জমি ফিরিয়ে নেন, তবে পাওনাদারকে ক্ষতিগ্রস্ত হতে হয়। কাজেই জমি বন্ধক রেখে অভাবের সময় টাকা সংগ্রহ করা কৃষকের পক্ষে দুঃসাধ্য ব্যাপার। জার্ম্মেনী, ফ্রান্স ও আমেরিকার মত কৃষি-বন্ধকী-ব্যাঙ্ক (Agricultural Mortgage Bank) আমাদের দেশে না থাকায় কৃষককে অতি কড়া সুদে মহাজনের নিকট হ'তে টাকা ধার করতে হয়। প্রজাস্বত্বের উপর প্রিএম্‌শ্যানের প্রলেপ থাকলে আমাদের দেশে কৃষি বন্ধকী-ব্যাঙ্ক গঠন করা সম্ভবপর হবে না।

রবীন্দ্রনাথ গ্রামবাসীদের প্রতি কোন বক্তৃতায় আগে বলেছেন,—

"মানুষের সকলের চেয়ে শ্রেষ্ঠ সম্পদ,—মানবত্ব। আগে পল্লীতে পল্লীতে কত পণ্ডিত কত ধনী কত মানী আপনার পল্লীকে, জন্মস্থানকে আপনার করে বাস করেছে। সমস্ত জীবন হয়তো নবাবের ঘরে, দরবারে কাজ করেছে। যা-কিছু সম্পদ তারা পল্লীতে এনেছে, সেই অর্থে টোল চলেছে, পাঠশালা বসেছে, রাস্তাঘাট হয়েছে, অতিথিশালা, যাত্রা পূজা-অর্চনায় গ্রামের মনপ্রাণ এক হয়ে মিলেছে। গ্রামে আমাদের দেশের প্রাণ-প্রতিষ্ঠা ছিল, তার কারণ শহরে তো সম্ভব নয়। অতএব সামাজিক মানুষ আশ্রয়

পায় গ্রামে। আমাদের খুব একটা বড় সম্পদ ছিল সে হচ্ছে আত্মীয়তা। এর চেয়ে বড় সম্পদ নাই। সমস্ত পশ্চিম মহাদেশে মানুষে মানুষে আত্মীয়তা অত্যন্ত ভাসা ভাসা। আমাদের দেশের লোক চায়,—পাণ্ডিত্য নয় ঐশ্বর্য্য নয়—চায় মানুষের আত্মার সম্পদ।"

মানুষের বৃহত্তর মঙ্গলের দিকে লক্ষ্য রেখেই সামাজিক ব্যবস্থা প্রণয়ন করা উচিত। পৃথিবীর লোকসংখ্যা বৃদ্ধি-হেতু মানুষের জীবনসংগ্রাম ক্রমেই কঠিন থেকে কঠিনতর হচ্ছে। কলকারখানার বিস্তৃতি ও জনবিরল নূতন দেশ দখল ও আবাদ ক'রে মানুষ খানিকটা হাঁফ ছেড়ে বেঁচেছে। শুধু জমির প্রসাদে যেখানে মানুষের গ্রাসাচ্ছাদনের সঙ্কুলান হয় না, কলের বাঁশির ডাকে সেখানকার নরনারী কারখানায় ও শহরে সমবেত হয়েছে। কলের বেদীমূলে মানুষের যে ভিড় জমেছে, সেখানে তার সমাজ বাঁধে নি, মিলন ঘটে নি। প্রেম ও আত্মীয়তার সূত্রে মানুষ সেখানে গ্রথিত হওয়ার সুযোগ সহজে পায় না ব'লে তা হ'তে মানবতা সেখানে পঙ্গু হয়ে আছে। এই কৃত্রিম জীবন থেকে মানুষ মুক্তির অনাবিল আস্বাদ পায়, যখন পল্লীর কোলে সে অবসরকালে আবার ফিরে আসে। অল্পকালের জন্য হ'লেও তা মানুষের বাঞ্ছনীয়। পল্লীর সঙ্গে এ সকল মানুষের,—কারখানার কর্ম্মী, শহরবাসী চাকরে, ব্যবসায়ী ইত্যাদির মিলনরক্ষার সোনার গ্রন্থি হ'ল পল্লীর কোলে একখানি জমি, পুকুর ও বাগানঘেরা ভদ্রাসন। বাড়ি বল্‌তে বাংলা দেশে আমরা তাই বুঝি। গৃহহীন, লক্ষ্মীহীন মানুষের সংখ্যাধিক্য সমাজের ও ব্যক্তির মহত্তর কল্যাণের অনুকূল নয়।

তাই একশ্রেণীর অর্থনীতিবিদ্‌, যাঁরা কারখানার কাজের সুবিধা হবে মনে ক'রে কলের মজুর ও প্রবাসী কর্ম্মীদের জমির স্বত্ব থেকে বঞ্চিত করতে চান, তাঁদের মত সমর্থনযোগ্য কি-না বিবেচ্য। এদেশে কলকারখানার মজুরদের খবর যাঁরা রাখেন, তাঁরা জানেন যে, সারা বছর মজুর-শ্রেণীকে কলের কাজের জন্য ধরে রাখা যায় না;—জমি চাষ ও আবাদের সময় অনেক মজুর কারখানার কাজ থেকে ছুটি নিয়ে দেশে যায়। এই সমস্যার সমাধানের জন্য যাঁরা আন্দোলন করেন, তাঁদের মধ্যে অনেকের প্রস্তাব এই যে, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ভূভাগের স্বত্ববান্‌ এই লোকদিগকে জমির স্বত্ব থেকে বঞ্চিত করা হোক। তাতে একদিকে কৃষির ও অন্যদিকে কারখানার কাজের অনেক সুবিধা হবে। আপাতদৃষ্টিতে দেখলে, কথাটা ভালই মনে হয়। কিন্তু মানুষের মহত্তর কল্যাণের সমস্যা এতে জড়িত আছে ব'লে আরও গভীরভাবে বিষয়টা বিচার করে দেখা উচিত। বাংলা দেশে প্রজাস্বত্ব আইনের গত সংশোধনের সময় কর্ত্তৃপক্ষ বিষয়টা এদিক থেকে ভেবে দেখেছেন কি-না বোঝা যায় না।

আমাদের প্রথম এবং প্রধান কথা এই যে,—জমিতে সকল মানুষেরই যে-কোনরূপ অধিকার থাকা উচিত। মহাজনই হোক বা প্রবাসী চাকরে, ব্যবসায়ী মধ্যবিত্ত মজুর, যে-ই হোক, অর্থের মূল্যে জমির স্বত্ব যে কিনবে, অথবা অধিকারের মূল্যে পতিত জমির স্বত্ব যে দখল করবে, তার যথার্থ আয় সে পাবেই। জমিকে অন্যান্য সম্পত্তির মত চাষীর নিজস্ব সম্পত্তিরূপে গণ্য করা উচিত, যাতে তার বেচা-কেনার স্বাধীন ও নির্ব্বিরোধ অধিকার থাকবে।

এখানে আর একটি প্রশ্ন এই উঠ্‌বে যে, উক্ত আদর্শসত্ত্বেও দেশে বহু সহস্র ভূমিহীন মজুর থাকবে, যারা বর্ত্তমানে বর্গাদার, আধিয়ার হয়ে, বা ফসল চাষ ও কাটার সময় এ-জেলায় সে-জেলায় ঘুরে জমির মজুরী করে। তাদের ব্যবস্থা কি হবে? এরূপ ভূমিহীন মজুরের সংখ্যা দেশে খুব বেশী মনে হওয়ায় ১৯২৮ সনের প্রজাস্বত্ব আইনে এই বর্গাদার ও ভূমিহীন মজুরদিগকে জমির স্বত্ব দেওয়ার ব্যবস্থা হয়েছে,—অধস্তন-রায়ত (under-raiyat) হিসাবে তাদের মেনে নিয়ে। কিন্তু তা সত্ত্বেও উক্ত শ্রেণীর মজুর এ-দেশে থাকবেই। মাঝে শুধু আর একটা মধ্যবিত্তশ্রেণীর সৃষ্টির সম্ভাবনা হ'ল। উর্দ্ধতন মধ্যবিত্তশ্রেণীকে জমি হ'তে ঠেলে সরিয়ে দেওয়া হ'ল। কিন্তু সমাজের কল্যাণ ও উন্নতির জন্য চিরন্তন গ্রামিক ও প্রবাসী গ্রামিকের মধ্যে অন্তত কিছুকাল একত্র বাস এবং তার ফলে ভাবের ও কর্ম্মের বিনিময় হওয়া উচিত। এরূপ মিলন, আমাদের বর্ত্তমান জীবনে, ব্যক্তি, সমাজ ও রাষ্ট্র—সকলের পক্ষেই মঙ্গলজনক হবে। ভূমিহীন ভূমি-মজুরের সমস্যা সমাজের অসাম্য ও আতঙ্কের বড় কারণ নয়। কারখানার সাধারণ শ্রেণীর মজুরের চেয়ে, অন্তত এই বাংলা দেশে, জমিহীন জমির মজুরদের আর্থিক, পারিবারিক ও সামাজিক অবস্থা অনেক বিষয়ে ভাল। কারখানার মজুরদের চেয়ে শ্রেয়ঃ সামাজিক জীবন তারা যাপন করে। বাংলার পল্লীজীবনের সঙ্গে যাঁরা পরিচিত, তাঁরা

জানেন যে, জমিহীন এই মজুরদের আর্থিক সচ্ছলতা নেহাৎ মন্দ নয়।

শুধু জমির মজুরীই যে তারা করে এরূপ নয়, কোন অঞ্চলে বর্ষাকালে তারা নৌকা চালায়, মাছ ধরে, কোথাও পাল্কী বয়, মাটি কাটে। দুধ, হাঁস, মোরগ, ডিম ইত্যাদি বিক্রী ক'রেও কিছু রোজগার করে। মেয়েরাও স্থতা কেটে, ধান ভেনে, চিঁড়া কুটে পারিবারিক আয় বাড়ায়। চাষী গৃহস্থের জমি চাষের জন্য যখন মজুরের প্রয়োজন, তখন এক শ্রেণীর লোক সে কাজের জন্য ত থাকবেই। কলকারখানার মজুরদের চেয়ে তারা অধিক স্বাধীন ও আনন্দের জীবন যাপন করে। প্রতিবাসী কোন প্রবাসীর জমি যদি সে ভাগে চাষ করে বা নির্দ্দিষ্ট হার ভাগে বা ভাগের মূল্যে চাষ করে, তবে উক্ত প্রবাসী প্রতিবাসীর চাষস্বত্ব তাহাকে অর্পণ করে সমাজের কোন্ কল্যাণ সাধিত হ'ল? জমিহীন মজুর, যার নিজের হাল-গরু নেই, সে অন্যের হাল-গরু দিন-হিসাবে খরিদ ক'রে প্রতিবাসীর জমি ভাগে চাষ করে। কোন ক্ষেত্রে জমির স্বত্বাধিকারী হালের ও বীজের মূল্য দিয়ে থাকেন। কোথাও হাল-গরুর মালিক কৃষক বীজ ও হাল নিজ হ'তে দিয়ে প্রবাসী প্রতিবাসীর জমি ভাগে বা ভাগের নির্দ্দিষ্ট হারে বা তন্মূল্যে,—আগরি (অগ্রিম) বা পাছরি (পশ্চাৎ) মূল্যে,—চাষ ক'রে থাকে। এসব ক্ষেত্রে ভাগদারকে জমির স্বত্ব দেওয়ার কোন প্রয়োজনীয়তা দেখা যায় না। উভয় পক্ষের স্থবিধা হেতুই এ প্রণালীতে জমির চাষ বহুকাল ধরে চলে আসছে। কিন্তু আমাদের বর্ত্তমান প্রজাস্বত্ব আইনে এরূপ ব্যবস্থার স্থান নেই। এরূপ কোন বন্দোবস্ত করলে প্রজাকে তার দখলীস্বত্ব হারাতে হবে এবং বর্গাদার অধস্তন-রায়ত হিসাবে সে স্বত্ব লাভ করবে। গ্রামের প্রতি প্রবাসীর স্বার্থের সম্পর্ক ও প্রীতির আকর্ষণ ছেদন ক'রে পল্লীগৃহ থেকে তাকে দূর ক'রে আমাদের আইনের বিধান সমাজের কোন্ হিতসাধন করবে?

মহাত্মা গান্ধী, রবীন্দ্রনাথ ও হেন্‌রী ফোর্ড সমাজের এই সমস্যাটিকে মানুষের বৃহত্তর কল্যাণের দিক থেকে ভেবে তাঁদের চিন্তাধারা প্রকাশ করেছেন। কলের বিরুদ্ধে গান্ধীজীর ও রবীন্দ্রনাথের যে অভিযোগ তাহা কারখানার কবলে মানবত্বার যে বিনষ্টি ঘটে থাকে, তারই কারণে। কারখানার মূলেই তো বর্ত্তমান সভ্যতার প্রতিষ্ঠা। পৃথিবী তার ধ্বংস চায় না,—চায় শ্রেয়ঃ ও কল্যাণের পথে তার পরিচালনা। কারখানার সহায়েই বর্ত্তমানের বড় বড় শহর গড়ে উঠেছে। চাই পল্লীর প্রাণের সঙ্গে শহরের প্রাণের একটা মিলনসূত্র আবিষ্কার করা। ভারতের পল্লীই এখনও তার প্রধান অঙ্গ। বড় কারখানার নাগরিক মজুরদের পল্লীর সঙ্গে যোগ রক্ষার ব্যবস্থা করা সমীচীন হবে। আর ছোট ছোট কলকারখানা তৈল বা ইলেকট্রিসিটির সাহায্যে পল্লীর এবং ছোট শহরের কোলে বসাতে হবে। এই আদর্শ অনুসারেই গান্ধীজী আফ্রিকায় ফিনিক্সের পল্লীপ্রান্তরে তাঁর ছাপাখানার প্রতিষ্ঠা করেন। ছাপাখানা ও কৃষিকাজ একসঙ্গে সেখানে পরিচালনা করেন।

অল্প জমির স্বত্ববান্ যে চাষী শহরের কারখানায় মজুরী করে, তাকে জমির অধিকার থেকে বঞ্চিত করার যে আন্দোলন চল্‌ছে, এবং আমাদের প্রজাস্বত্ব আইনের গতিও যে ও পথে, সে কথা উল্লেখ করেছি। এ সম্বন্ধে হেন্‌রী ফোর্ডের মত অনুরূপ।—

"এই ঋতু অনুযায়ী কাজের বিষয় ভেবে দেখুন। বছর-ভরা কাজের প্রণালীতে কতই না ক্ষতি! কৃষক যদি চাষ, আবাদ ও দানির (harvesting) সময় তার খামারের কাজের জন্য কারখানা থেকে ছুটি পায়, তাতে তার কত স্থবিধা হয়, এবং জীবনযাত্রাও কত সহজ হ'য়ে পড়ে। কৃষকেরও মন্দার সময় আছে। সে সময়ে কৃষক কারখানার কাজে এসে তার কৃষিকাজের জন্য প্রয়োজনীয় জিনিষ প্রস্তুতিতে সহায়তা করতে পারে। কারখানারও মন্দার সময় আছে। সে সময় কারখানার মজুর জমির কাজে গিয়ে শস্যাদি উৎপাদনের কাজে লাগতে পারে। এইভাবে আমরা মন্দাকে কাজের ভিতর থেকে বাতিল ক'রে দিয়ে কৃত্রিমতা ও স্বাভাবিকতার মধ্যে সমন্বয় সাধন করতে পারি।

এই ভাবে জীবনযাত্রার মধ্যে অধিকতর সামঞ্জস্য পাওয়া কম লাভের কথা নয়।'—হেন্‌রি ফোর্ড প্রণীত, 'আমার জীবন ও কর্ম্ম'।

জীবনের সফলতা অর্থে লোকের সাধারণ ধারণা এই যে, কোন বিশেষ পথে যিনি চরম উৎকর্ষ লাভ করলেন, কৃতকার্য্যতা তাঁরই সাধিত হ'ল। কিন্তু সফলতা ও সার্থকতা ভিন্ন জিনিষ। কোনদিকে বৈশিষ্ট্য লাভ না ক'রেও মানুষ তার জীবনকে প্রতি দলে বিকশিত ক'রে মানঃতার শ্রেয়ত্ব ও সার্থকতা লাভ করতে পারে। কলের মজুর তার কলেই নিমগ্ন থেকে কলের কাজে হয় তো বৈশিষ্ট্য লাভ করতে পারে, কিন্তু তার জীবনের একটা বড় দিকই তাতে পঙ্গু থেকে যাবে। তার বৃহত্তর সার্থকতা সে পাবে, জীবনকে অন্তর্দিকেও বিকশিত

করার সুযোগ যদি সে পায়। এদিকে পল্লীর কৃষকও কারখানার সংস্রবে এসে পল্লীর সঙ্গে যোগ রক্ষার সুযোগ পেলে তার অধিকতর কল্যাণ সাধিত হবে। অর্থ উপার্জ্জনের পক্ষেও এই দুটি জীবনের সহযোগ বিশেষ ফলপ্রসূ হবে। চাষী সারাবছর জমির কাজে নিযুক্ত থাকে না। অবসর সময় তার বৃথা নষ্ট হয়। উচ্চতর সামাজিক মর্য্যাদার দরুণ অনেক ক্ষেত্রে জমিহীন মজুরদের মত সব কাজেই সে হাত দিতে পারে না। তারপর বন্যা, অজন্মা ইত্যাদি কারণে দুর্ভিক্ষের প্রকোপে তাকে মাঝে মাঝে পড়তে হয়। সঞ্চিত অর্থের অনাধিক্য-হেতু এ সময় তার বড় কষ্ট হয়। এদিকে পৈত্রিক সম্পত্তি একাধিক ভাইয়ের মধ্যে বিভক্ত হয়ে, জমির আয়ে হয় তো একজনেরও পারিবারিক ব্যয় নির্ব্বাহ হয় না। এ-সব কারণে পল্লীর গৃহস্থকে চাকরি, ব্যবসা বা কারখানার কাজে নিযুক্ত হয়ে জমির আয়ের উপরেও স্বতন্ত্র উপার্জন ক'রে সংসার চালাতে হয়। আবার, কলকারখানা, ব্যবসা বা চাকুরিই যাঁদের উপার্জ্জনের একমাত্র পন্থা সঞ্চিত ধন দিয়ে জমি খরিদ করা এবং বেকার বা অবসরপ্রাপ্ত অবস্থায় একটি শান্ত পল্লীর কোলে আশ্রয় নিয়ে বসবাস করার আকাঙ্ক্ষা তাদেরও হওয়া স্বাভাবিক। এই উভয় অবস্থায় জমির উপর তার স্বত্ব থাকা আবশ্যক। আমাদের বর্ত্তমান প্রজাস্বত্ব আইনের ধারা এবং এদেশের কোন কোন অর্থ-নীতিজ্ঞের আধুনিক আন্দোলন ঠিক এই পথে নয়। শহরের সঙ্গে পল্লীর, কারখানার সঙ্গে জমির এবং সমষ্টির সঙ্গে ব্যষ্টির যোগ সাধন ক'রে ভারতীয় চিত্তের বৈশিষ্ট্যকে রক্ষা ক'রে সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় বিধিব্যবস্থার প্রবর্ত্তন করাই আমাদের লক্ষ্য হওয়া উচিত।

শৃঙ্খল

শ্রীসুধীরকুমার চৌধুরী

১৬

এবারেও নন্দের খোঁজ কেহ করিল না।

সমস্তটা দিন অজয় আশায় আশায় রহিল, নিজে হইতেই সে ফিরিয়া আসিবে। একাকী এত বড় ভুতুড়ে বাড়ীটাতে সমস্ত রাত্রি ভয়ের উদ্বেগে তাহার ঘুম আসিল না। হয়ত এখনই নন্দ আসিয়া পড়িবে; ঐ হয়ত বাহিরের উঠানে তাহার পায়ের শব্দ শোনা যাইতেছে; সে যা ছেলে, হয়ত অজয়ের ঘুম ভাঙাইতে চাহে না বলিয়া বারান্দায় পড়িয়াই নাক ডাকাইতেছে; এমনই ধারা সব আশাও সেইসঙ্গে জাগিয়া রহিল। কিন্তু নন্দ ফিরিল না।

পরের দিন রবিবার, আফিস-আদালত সব বন্ধ, খবর লইবার ইচ্ছা থাকিলেও খবর পাইবার উপায় নাই। সোমবারে উপর্য্যুপরি উপবাস ও অনিদ্রার ক্লান্তিতে অজয়ের চলচ্ছক্তি লোপ পাইয়াছে। মনকে বুঝাইল, এই অবস্থায় পড়িলে নন্দও ঠিক তাহারই মত ব্যবহার করিত। আশ্চর্য্য, এই বিপুল পৃথিবীতে সুখে দুঃখে দীর্ঘ আঠারোটা বৎসর অতিবাহিত করিয়াও এই প্রিয়দর্শন স্বল্পভাষী নিরহঙ্কার বালক নিজের জীবন দিয়া কাহারও জীবনকে গভীর ভাবে স্পর্শ করে নাই। নন্দের কেহ বন্ধু নাই।···অবশ্য ভাবিয়া দেখিতে গেলে অজয়েরও কেহ বন্ধু নাই। এই ত সুভদ্র। অজয়কে সে যে এত ভালবাসিত, পক্ষীমাতার মত ডানা মেলিয়া তাহাকে সারাক্ষণ সমস্ত-প্রকার আঘাত-অবমাননা হইতে আবৃত করিত, আজ সেই সুভদ্র অজয়ের এই নিদারুণ দুঃখের দিনে তাহার কথা একবারও কি মনে করে? কিন্তু বন্ধু বলিতে পৃথিবীতে সুভদ্রেরই বা কে আছে? বীণার কথা ক্রমাগত কানে বাজিতে থাকে—

'কোনো মানুষের কথাই কি ভাবেন একবারও...কেউ কারুর ভালোমন্দেও নেই আপনারা।'

...কিন্তু এমন যে বীণা, সেও কি অজয়ের কথা আজ একবার ভাবে? সে কোথায় আছে, কেমন আছে, বাঁচিয়া

আছে কি না জানিতে চায়? অজয় তবু ত নন্দের কথা সমস্তক্ষণই ভাবিতেছে। লালবাজারে গিয়া তাহার খোঁজই না-হয় করে নাই, কিন্তু এবার সে ফিরিলে দুইজনে অন্ততঃ পেট ভরিয়া যাহাতে খাইতে পায় সেজন্য প্রাণপণ করিয়া সে প্রস্তুত হইতেছে। আর তাহার অন্তর্যামী জানেন, নন্দ ফিরিয়া আসিলে সে খুসি হয়, অত্যন্ত বেশী খুসি হয়। আর কোনো কারণে না হউক, এই পুরান ভাঙা ভূতুড়ে বাড়ী, লোহার গরাদে দেওয়া সরু সরু দরজা-জানালা, মাকড়সার জালে জড়ান অন্ধকার আনাচ-কানাচ, আগাছার ঝাড়...সমস্ত রাত ধরিয়া দুতলার বারান্দায়, সিঁড়িতে, ছাতে কি যে সব দুপদাপ ফিস্‌ফাস্ শব্দ...যে-কোনো একটা মানুষ কাছে থাকিলে প্রাণে তবু ভরসা থাকে।

আধ-ময়লা বিছানাটাতে বালিসে বুকের ভর দিয়া উপুড় হইয়া পড়িয়া উপবাস-ক্লিষ্ট দেহে দিন-রাত অবিশ্রান্ত নাটকের পৃষ্ঠার পর পৃষ্ঠা লিখিতেছে, কাটিতেছে, আবার লিখিতেছে। কিন্তু দুর্ব্বল বুক দুরুদুরু করিয়া কাঁপে যে! কোনো-এক সময় বইটা শেষ হইবে এবং হয়ত আশাতীত সাফল্যের মধ্যে শেষ হইবে, এই চিন্তাই বইটিকে শেষ করিবার পথকে বাধার মত হইয়া জুড়িয়া থাকে, যত বেশী তাড়াতাড়ি করিতে যায় তত বেশী করিয়া দেরি হয়।

তবু সত্যসত্যই বইটি একদিন শেষ হইল। সেদিন অজয়ের সে কি আনন্দ। জীবনে আর কখনও আর কোনও কিছুতে এতখানি আনন্দ সে পায় নাই, নিজের কাছে মুক্তকণ্ঠে তাহা স্বীকার করিল। সেদিন একাদিক্রমে তৃতীয় দিনের উপবাস চলিতেছে। শেষ ডাল-ভাত-পুঁইয়ের-চচ্চড়ি খাওয়ার পর যে ছয়টি পয়সা বাকী ছিল তাহা দিয়া একদিস্তা কাগজ কিনিয়াছিল। তাহার পর হইতে মাঝে মাঝে কলতলায় গিয়া আঁজলা করিয়া জল খাইয়াছে, এক পয়সার ছোলাভাজাও এই ক'দিন জোটে নাই। কিন্তু সে কৃচ্ছ্র-সাধন তাহার সার্থক হইয়াছে। নিজের সম্বন্ধে নিরপেক্ষ বিচারের ক্ষমতা অজয়ের চেয়ে বেশী আর কাহার আছে? সে জানে, তাহার এই প্রথম উদ্যমেই বইটি আশাতীত-রূপ ভাল হইয়া উৎরাইয়াছে।

বইটিকে অভিনয় করাইবার চেষ্টা কাহার যোগে করিবে, কাহাকে প্রথম বইটি পড়িতে দিবে, আগে হইতেই তাহা ঠিক ছিল। ইউনিভার্সিটি ইন্‌ষ্টিটিউটের এক গানের জলসায় দুই বৎসর আগে লোকটির সঙ্গে তাহার প্রথম আলাপ। তখন পাথোয়াজে খুব ভাল হাত বলিয়াই কানাইয়ের একমাত্র প্রতিষ্ঠা। আজ বাংলা দেশে কানাইলাল ঘোষের নাম শোনে নাই এমন লোক বিরল। প্রতিভাবান্ অভিনেতা, কৃতী নাট্যকার এবং শক্তিশালী প্রযোজক বলিয়া তাহার নাম অন্ততঃ কলিকাতায় সকলের মুখে মুখে। সহরের শ্রেষ্ঠ যে নাটমন্দির তাহার উপর কানাইলালের একাধিপত্য। তখন সান্ধ্য অভিনয়ের এক পর্ব্ব শেষ হইয়া দ্বিতীয় পর্ব্বের আয়োজন চলিতেছে। রঙ্গমঞ্চের পিছনে এই দিক্‌টা দিয়া স্ত্রীদের এবং পুরুষদের পৃথক পৃথক গ্রীন্‌রুমে যাইবার রাস্তা। দুয়ের মাঝামাঝি জায়গায় কানাইলালের ঘর, একাধারে তাঁহার রূপসজ্জাগার ও বৈঠকখানা। ছোঁয়াচের ভয় অজয়ের মনে ছিল, কিন্তু এক কানাইলাল ভিন্ন আর কাহাকেও কোথাও সে দেখিতে পাইল না। অজয়কে দেখিবা-মাত্র কানাই চিনিতে পারিলেন, সৌজন্য সহকারে তাহাকে বসাইলেন, যত শীঘ্র সম্ভব নাটকের পাণ্ডুলিপি পড়িয়া দেখিবেন এ প্রতিশ্রুতিও না চাহিতেই আদায় হইল। সেদিন আর বেশী কথা বলিবার সময় ছিল না, আসিবার মুখে একটা চাকর দুপেয়ালা চা এবং কিছু খাবার রাখিয়া গিয়াছিল, সেগুলি শেষ না করিয়াই চলিয়া আসিতে হইল।

সে রাতটা ছটফট করিয়া কাটিল, পরের দিনটাও। কি ভুলই সে করিয়াছে, আজিকার দিনের মধ্যে বইটা পড়িয়া রাখিতে কানাইবাবুকে সে বলিয়া আসে নাই।...শরীর মন দুইই এলাইয়া পড়িতেছে, হয়ত কাল আর বিছানা ছাড়িয়া উঠিবার ক্ষমতা থাকিবে না। জানে, এক দিনেই কিছু আর বইটা কানাইবাবুর পড়া হইয়া যায় নাই; ইহাও জানে, এত বেশী গরজ প্রকাশ করিলে নিজেকে অত্যন্তই ছোট করা হইবে। তবু সন্ধ্যায় কে তাহার ক্ষুৎপীড়িত ক্লান্ত দেহটাকে জোর করিয়া টানিয়া কানাইয়ের দরজায় হাজির করিল।

কানাইয়ের ঘরে আজ দস্তুর মত লোকের ভিড়। সকলের সঙ্গে তাহার পরিচয় করিয়া দিবার ঘটা দেখিয়াই অজয় বুঝিল, বইটি পড়া হইয়াছে, এমন কি দলের মানুষগুলির মধ্যে তাহা লইয়া একপালা আলোচনাও হইয়া গিয়াছে।

এতটা সত্যই সে আশা করে নাই। কতক্ষণে ভিড় কাটিয়া যাইবে কম্পিতবক্ষে তাহারই প্রতীক্ষা করিতেছে এমন সময় কানাই বলিয়া উঠিলেন, "আপনার বইটা পড়লাম, খুব ভালো হয়েছে। ষ্টেজের সঙ্গে সাক্ষাৎ সম্বন্ধে পরিচয় নেই এমন মানুষের পক্ষে যে-ধরণের সব ভুল করা স্বাভাবিক, আপনি তাও কোথাও করেননি দেখছি। খুবই আশ্চর্য্য বল্‌তে হবে।"

কোনও কিছু লইয়া আশ্চর্য্য হওয়া অজয়ের স্বভাব নহে। আশাতীতের সঙ্গে, অভাবিতের সঙ্গে পরিচয় জীবনে আরও বহুবার তাহার হইয়াছে।

কানাই বলিলেন, "কিন্তু একটা কথা আপনি ভাবেননি। বইটা মুসলমান-ইতিহাস নিয়ে লেখা। বাংলা দেশে ত এর অভিনয় চলবে না।"

অজয় কিছুক্ষণ স্তব্ধ হইয়া রহিল, কথাটা ধারণা করিতে সময় লাগিতেছে, অবশেষে আম্‌তা আম্‌তা করিয়া বলিল, "সে কি, কেন?"

কানাই বলিলেন, "মুসলমানরা চটবে। শেষকালে কি আবার একটা riot বাধাবেন? আপনি জানেন না দেখছি, কিন্তু গত আঠারো বৎসর বাংলা দেশে মুসলমান-ইতিহাস নিয়ে লেখা কোনো নাটকের অভিনয় হয়নি।...দরকারই বা কি? হিন্দু ইতিহাস, বৌদ্ধ ইতিহাসে নাটকের প্লটের কি কিছু অভাব আছে? যত খুসি লিখুন না।"

ভাল করিয়া প্রতিবাদ করিতে পারে অজয়ের শরীর-মনে এতটা জোর আর অবশিষ্ট নাই। কহিল, "মুসলমানদের খুসি হওয়ার কথাই ত বইটার সবটাতে।"

কানাই কহিলেন, "তা কি জানি মশায়! নামগুলো বদ্‌লে বৌদ্ধ ক'রে দিন, আপদের শান্তি হয়ে যাক্‌। শাহজাহানকে করুন বিম্বিসার, আউরংজীবকে অজাতশত্রু, দেখুন কাল্‌কেই রিহার্স্যাল ধরিয়ে দিচ্ছি।"

অজয় কহিল, "নাম বদ্‌লে দেব কি মশায়? তা কখনো হয়?...চরিত্রগুলোর চাইতেও মুসলমান-ইতিহাসের ব্যাক-গ্রাউণ্ডটাই যে আসলে ঢের বড় জিনিষ বইটাতে।"

কানাই কহিল, "তা ত জানি, কিন্তু কি করুতে পারি বলুন?"

অজয় কহিল, "আপনি বইটা ভালো ক'রে আর একবার প'ড়ে দেখুন, আলমগীর চরিত্র আমি যে-রকম ক'রে গড়েছি তাতে মুসলমানদের সত্যিই খুব খুসি হবার কথা। তাঁর স্বভাবে এমন কিছু রাখিনি যা সত্যি সত্যি দোষের—"

কানাইলাল একটু হাসিয়া কহিলেন, "আপনি তাই ভাবছেন, কিন্তু ভারতে মুসলমান-ধর্ম্মের বিস্তৃতির চেষ্টার আসল উদ্দেশ্যটা তার ছিল রাজনৈতিক, একথা শুন্‌লে কোনো ধর্ম্মপ্রাণ মুসলমান আপনাকে ক্ষমা করবে না।"

একটি সুশ্রী চেহারার যুবক আয়নার সম্মুখে দাঁড়াইয়া তোয়ালে এবং নারিকেল তৈল সহযোগে মুখ হইতে গ্রীজ পেন্টের অবশেষ ঘসিয়া তুলিতেছিল, কহিল, "আলমগীরের কথা না-হয় ছেড়েই দাও না কানাই, কিন্তু ঐ যে শাহজাহান, তাকে অজয়বাবু করেছেন পাগলাটে, বুড়ো, ইডিয়ট,—সে ব্যক্তিও যে মুসলমান সেটা কেন ভাবছ না?"

একটি স্থূলদেহ ভদ্রলোক, সম্ভবতঃ অজয়েরই মত অভ্যাগত, হাসিয়া কহিলেন, "সত্যিই ওদের কথা কিছু বলা যায় না মশায়। কিসে যে চটবে, কিসে চটবে না, নিজেরাও তা জানে কি না সন্দেহ। সাধ্যমত ওদের না ঘাঁটানোই ভালো।"

পাণ্ডুলিপির খাতা-কয়টি একটা খবরের কাগজে মুড়িয়া লইয়া অজয় উঠিয়া পড়িল। কানাইলাল দরজা পর্য্যন্ত তাহাকে আগাইয়া দিলেন, কহিলেন, "আশা করি আপনি আমাকে ভুল বুঝবেন না! নিতান্ত নিরুপায় হয়েই বইটা ফেরাতে হ'ল। এমন একখানা বই অনেক তপস্যা ক'রেও পাওয়া যায় না, কিন্তু যা লক্ষ্মীছাড়া দেশ! যদি বৌদ্ধ-ইতিহাস নিয়ে কিছু লেখেন, সকলের আগে তার ওপর আমার দাবী রইল।"

পথে বাহির হইয়া অজয়ের মনে হইল, বইটা যে ফিরিয়া পাইয়াছে তাহা তত বড় দুর্ঘটনা নহে, কিন্তু আসিবার মুখে কালকের সেই খোঁড়া চাকরটা আজও যে সম্মুখের টেবিলে তাহার জন্য এক পেয়ালা চা আর খাবার রাখিয়া যায় নাই সেই দুঃখ কিছুতে সে ভুলিতে পারিতেছে না। ভাবিল, আজ কানাইয়ের ঘরে বহুজনসমাগম।—সে একলা থাকিলে চা আর খাবার আজও হয়ত তাহার জুটিয়াই যাইত। এখন আর ফিরিয়া যাওয়া যায় না, বইটা ফিরিয়া পাইবার পর আর বসিয়া থাকাও চলিত না।...বইটা পড়িয়া শেষ

করিতে কানাইলালের আরও কয়েকটা দিন দেরি হইলেই দেখা যাইতেছে ছিল ভাল।

নাঃ, সত্যিই এটা লক্ষ্মীছাড়া দেশ। এদেশে কাহারও কিছু লেখা উচিত নয়।—কাহারও কিছু করাই উচিত নয়।

অজয়ের শরীর কাঁপিতেছে, চলিতে গিয়া পা টলিতেছে। আস্তে আস্তে দু-এক পা করিয়া অগ্রসর হয় আর ভাবে, এখনই মাথা ঘুরিয়া পড়িয়া যাইবে। বুকের মধ্যে কেমন একটা ব্যথার চাপ। হৃৎপিণ্ডের প্রত্যেকটি স্পন্দনকে সে যেন লগুড়াঘাতের মত অনুভব করিতেছে।

একটা আলোর থাম ধরিয়া একটু বিশ্রাম করিয়া আবার চলিতে লাগিল।

অনেকদিন আগে শোনা বিমানের একটা কথা আজ এতদিন পর অজয়ের মনে লাগিয়াছে। সত্যই একটা লক্ষ্মীছাড়া দেশে জন্মাইয়াছে, ইহা ছাড়া তাহার আর কোনও অপরাধ নাই। মিথ্যামিথ্যি নিজেকে এতদিন সে তিরস্কার করিয়াছে। যদি আর কোনও দেশে জন্মাইত, হয়ত গান গাহিয়াই জীবনকে সর্ব্বপ্রকারে সমৃদ্ধ করিয়া তুলিতে পারিত। অন্ততঃ তাহার এতদিনের এত প্রাণপাত পরিশ্রম আজ এমন করিয়া এত তুচ্ছ কারণে ব্যর্থ হইত না। সে জানে বইটা ভাল হইয়াছে, আজ কানাইলালের ঘরের প্রতিটি মানুষের মুখভাবে, কানাইলালের নিজের প্রতিটি কথায় বারবার সেকথা ধরা পড়িয়াছে, সম্ভবতঃ বাজারে যে-সমস্ত বই সচরাচর চলে এবং প্রশংসা পায় সেগুলির তুলনায় বইটা ভালই হইয়াছে, তবু ইহা হইতে একবেলার ক্ষুন্নিবৃত্তির ব্যবস্থা করাও তাহার সাধ্যে নাই!

কিন্তু আজ আর এত কথা ভাবিতে ভাল লাগিতেছে না। লোভ করিবার, রাগ করিবার, অভিমান করিবার মত মনের অবস্থাও আজ তাহার নাই। পথের পাশে একটা খাবারের দোকান। রাশি রাশি কচুরি, শিঙাড়া, সন্দেশ, বরফি, পান্তুয়া স্তূপাকার করিয়া সাজান রহিয়াছে। ভাবিল, ইহার সমস্তই কি বিক্রয় হইবে? কতক নিশ্চয়ই ফেলা যাইবে। একটা শিঙাড়া পাইলে খাইয়া আকণ্ঠ-জলপান করিয়া সে কি গভীর তৃপ্তি লাভ করিতে পারে!

একবার সত্যই মনে হইল, অন্ধকারে লুকাইয়া হাত পাতে। কাহারও নিকট একটা পয়সা চাহিয়া লয়।...নিজের চিন্তাতে এত দুঃখেও নিজেরই তাহার হাসি পাইল। সত্যই সে কিছু আর হাত পাতিবে না, কিন্তু যদি পাতেই, একটা পয়সা তাহাকে কে দিবে? এদেশে ভিখারীকে ভিক্ষা দেওয়ার রেওয়াজ উঠিয়া যাইতেছে, তৎপরিবর্ত্তে তাহাকে খাটিয়া খাওয়ার সুপরামর্শ দেওয়া এখন রীতি। খাটিলেই খাইতে পাওয়া যায়, একথা বলিয়া নিজেকে এবং পরকে প্রবঞ্চনা করিতে কাহারও বাধে না।

কিছুদূর গিয়া আর চলিতে পারিল না, বুঝিল, দাঁড়াইয়া থাকাও চলিবে না। পাশে যে দোকান দেখিল তাহারই খোলা দরজায় ঢুকিয়া পড়িল এবং চৌকাঠ পার হইয়াই সশব্দে মাটিতে পড়িয়া গেল। মনে হইল, পায়ের নীচে হইতে হঠাৎ কে মাটি সরাইয়া লইল। হাঁটুর নীচে হইতে পা-দুইটা সেইসঙ্গে যেন তাহার নাই। চতুর্দ্দিকের পৃথিবী বন্‌বন্ করিয়া ঘুরিতেছে। অস্পষ্ট করিয়া অনুভব করিল, তাহাকে ঘিরিয়া ছোট ভিড় জমিয়াছে। কে একজন বলিল, "মিরগীর ব্যামো...বড়বয়ের ছিল, ও আমি দেখলেই চিন্‌তে পারি।" আর একজন কে পশ্চাৎ হইতে হাঁক দিয়া কহিল, "মুখটা একবার শুঁকে দেখ্ ত রে!" তৃতীয় ব্যক্তি মন্তব্য করিল, "না না, সেসব কিছু না, দেখ্‌ছ না কি রকম শাদাটে মুখ। বোধহয় হার্টের অসুখ। চোখেমুখে একটু জলের ঝাপটা দিতে পারলে উপকার হত।" কিন্তু অজয় কোথাকার কে, তাহার জন্য ক্লেশস্বীকার করিয়া কেহ আর জল আনিতে গেল না। কেবল একটু পরে অজয় উঠিয়া বসিবার চেষ্টা করিতেছে দেখিয়া শেষোক্ত মানুষটি তাহাকে ধরিয়া একটা টুলের উপর বসাইয়া দিল।

ভিড় ক্রমে কাটিয়া যাইতেছে। দূর হইতে দোকানী স্বয়ং মোটা গলায় হাঁক দিয়া কহিল, "কি মশাই, এখন একটু ভালো বোধ করছেন?"

অজয় বলিল, "ভালো। ধন্যবাদ। আর একটুক্ষণ বসতে পারি?"

দোকানী বলিল, "অবাধে। যতক্ষণ খুসি ব'সে যান। কি হয়েছিল আপনার?"

অজয় বলিল, "পায়ে পা বেধে প'ড়ে গেলাম। শরীরটা ভালো ছিল না।"

দোকানী বলিল, "কাছেই কি আপনার বাড়ী ?"

অজয় হাঁপাইয়া উঠিতেছিল, সংক্ষেপে কহিল, "না, দূরে।"

দোকানী বলিল, "যতক্ষণ দরকার জিরিয়ে একটা গাড়ী ডেকে চ'লে যান।" তারপর নিজের কাজে মন দিল।

বসিয়া বসিয়া অজয় ক্লান্ত অলস দৃষ্টিতে চতুর্দ্দিক্‌টাকে দেখিতে লাগিল।--পুরান বইয়ের দোকান। ইংরেজী, বাংলা, সংস্কৃত, হিন্দী, ওড়িয়া, গুজরাটী, সকল ভাষার বই। দশবৎসরের পুরাতন ডায়েরী, অকেজো রেলওয়ে টাইম-টেবল্‌, অপ্রচলিত আইনের কেতাব, ডজন ডজন রহিয়াছে। অবশ্য সেই সঙ্গে কাজের বইয়েরও অভাব নাই। অজয় বসিয়া থাকিতে থাকিতেই একটি কলেজের ছেলে গোটা ছয়-সাত বই রাখিয়া তিনটি টাকা লইয়া গেল। অজয়ের সহসা মনে হইল, তাহার চতুর্দ্দিক্‌ হইতে কালো অন্ধকারের স্তূপগুলি যেন টলিতে টলিতে সরিয়া গেল। একটা কালো কঠিন লোহার সিন্দুকের গায়ে মাথা খুঁড়িতেছিল, হঠাৎ দেখা গেল তাহার কুলুপে চাবি দেওয়া নাই। বিনা বাক্যব্যয়ে টুল ছাড়িয়া উঠিয়া সে বাড়ীর পথ ধরিল।

সন্ধ্যায় একপয়সার একটা শিঙাড়া চাহিয়া লইয়া খাইবার কথা যাহার মনে হইয়াছিল, রাত্রিতে এক সঙ্গে পাঁচপাঁচটা টাকা পাইয়াও যে সে খুব বেশী খুসি হইল তাহা নহে। অন্ততঃ খুসি যতটা হইল, ঠিক ততটাই অনুতাপ তাহার সঙ্গে মিশিয়া রহিল।...তাহার এত আদরের বইগুলি! লোকে পেটের দায়ে কোলের ছেলেকেও বিক্রয় করে শুনিয়াছিল, কথাটার অর্থ আজ হৃদয়ঙ্গম করিল। তাহাছাড়া, যদিও টাকার মূল্যে বইগুলির মূল্য হয় না, তবু এতগুলি বই, পাঁচটা মোটে টাকা!

এত যে দুর্ব্বল বোধ করিতেছিল, মাখন-সহযোগে দুইটুকরা রুটি এবং একটি অম্‌লেট পেটে পড়িতেই সে দৌর্ব্বল্য এবং ক্লান্তি কোথায় মিলাইয়া গেল। তিনদিন উপবাসী ছিল, ইচ্ছা করিলেই সেকথা এখন আর সে মনে না আনিতে পারে। কিন্তু তাহার এত আদরের বইগুলিকে রাত্রির অন্ধকারে সন্তর্পণে চোরাই মালের মত বহন করিয়া সে যে বিক্রয় করিয়া আসিয়াছে, সে কথাই কি মনে করিয়া রাখিবার? পৃথিবীতে এমন কি কথাই বা আছে যাহা মনে করিয়া রাখিতে পারিলে সে খুসি হয়? এতদিন ভবিষ্যৎ জীবনের স্বপ্ন লইয়া কাটিত, আজ গোলদীঘির পুরান-বইয়ের দোকানটা ছাড়াইয়া আর বেশীদূর অবধি নিজের ভবিষ্যৎকে চেষ্টা করিয়াও ত সে ভাবিতে পারিতেছে না। মনে পড়িল, দু-মাসের উপর হইতে চলিল তাহার পিতা তাহার খবর লন নাই। আর্থিক সম্বন্ধে শেষ হইবার পর সেও যে বৃদ্ধ পিতার সঙ্গে কোনও সম্বন্ধ রাখে নাই, তাহা ভাবিল না। কলিকাতার বন্ধুদের ইচ্ছা করিয়াই নিজে সে কিছু করিতে দেয় নাই, তবু তাহাদিগকে লইয়াও তাহার মনে অভিমানের শেষ নাই। আজ সকলকে সমস্ত-কিছুকে সে ভুলিয়া যাইতে চায়। চতুর্দ্দিক্‌ হইতে খণ্ডিত তাহার এই অতিক্ষুদ্র জীবনকে লইয়া অকারণে এত বেশী আড়ম্বর আর সে করিতে চাহে না। কোথাও তাহার জন্য কিছুমাত্র বেদনা জাগিতেছে না, তাহার অনাহারের দুঃখ কাহারও মুখের অন্নপানীয়কে বিস্বাদ করিতেছে না, এ স্বীকৃতি তাহার সমস্ত জীবনকে জুড়িয়া থাকুক। তাহার অতীত নাই, তাহার ভবিষ্যৎও নাই। পুরাতন অজয়, ঐন্দ্রিলাকে যে ভালবাসিত, দিনান্তে বীণাকে দেখিতে পাইলে যে খুসি হইত, তাহার যেন মৃত্যু হইয়াছে। এখনকার অজয়ের কোনও স্মৃতি নাই, সে-স্মৃতির আনন্দ-বেদনাও নাই। উপবাসে যেমন গ্লানি কাটিয়া গিয়া শরীরের মধ্যে একটি নির্ম্মল প্রসন্নতা আসে, তাহার এই বৈরাগ্যও তেমনই তাহার মনের মধ্যে একটি শুচি শুভ্র প্রসন্নতা আনিয়া দিল। কোনও কিছু লইয়া ক্ষুব্ধ হইবার, পীড়িত হইবার, অনুশোচনা করিবার তাহার আর কোনও প্রয়োজন রহিল না।

বিমান অভিনয়ে যোগ দেওয়াতে হয়ত অন্যদের লইয়া গোল হইবে, সুভদ্র এরূপ আশঙ্কা করিয়াছিল, দেখা গেল তাহার আশঙ্কা অমূলক। অত্যন্ত বেশী খুঁৎখুঁতে স্বভাব যাহাদের তাহারাও শেষ অবধি ইহা লইয়া কিছুমাত্র উচ্চবাচ্য করিল না। বীণা বলিল, "গোল যদি করত তাহলে ত বাঁচতাম। এদেশের লোকে কাউকে নিয়ে গোল করছে দেখলেও বুঝতাম মানুষকে তার প্রাপ্য মূল্য তারা দিতে শিখেছে।"

কিন্তু দেখা গেল, নিতান্ত রিহার্স্যাল দিবার জন্য জোর করিয়া যাহাদের ধরিয়া আনা হয়, তাহারা ভিন্ন অপর কেহ

ক্লাবে বড় একটা আর আসে না। চাঁদার পার্ট অনেকদিন হইল উঠাইয়া দেওয়া হইয়াছে, তাহাতে লাভের মধ্যে এই হইয়াছে রমাপ্রসাদও নিয়মিত আর আসে না। বীণাকে গোড়ার কয়েকটা দিন রোজই একবার অন্ততঃ দেখিতে পাওয়া যাইত; রিহার্সাল সুরু হইতেই সুলতা-প্রিয়গোপালকে উপরে টানিয়া লইয়া সে ব্রিজের আড্ডা জমাইত। সম্প্রতি তেতলায় ব্রিজের আড্ডা এত জমাট বাঁধিয়াছে যে সুলতা অথবা বীণা কাহারও আর সেখানে উপস্থিত থাকার প্রয়োজন হয় না। বীণা এতটা আশা করে নাই, তাহার পর হইতেই ক্লাবে আর সে আসে না। রমাপ্রসাদ মাঝে মাঝে যখন আসে তেতলাতেই চলিয়া যায়, প্রিয়গোপালের পাশে কাগজ পেন্সিল লইয়া বসিয়া স্কোরের হিসাব রাখে। ক্লাবের চাঁদা নাই অথচ ক্লাব আছে, এই জিনিসটা বুঝিতে তাহার আরও কিছুদিন লাগিবে।

সুভদ্র ছাড়া ক্লাবে আর নিয়মিত এখন যে আসে সে ঐন্দ্রিলা। সুলতাকেও সব দিন এখন দেখিতে পাওয়া যায় না, সুযোগ পাইলেই বালিগঞ্জে বীণার কাছে গিয়া জোটেন। মেয়েদের মধ্যে আরও কেহ কেহ, ছেলেদেরও দুএকজন লুকাইয়া বালিগঞ্জেই সান্ধ্য মজলিশ জমাইতে যায়, ঐন্দ্রিলা তাহা জানে। বিমানেরও খুব ইচ্ছা রিহার্সালটা হাজরা রোডে না হইয়া বালিগঞ্জে হয়, কিন্তু ঐন্দ্রিলা তাহাকে আমল দেয় না। মনে যাই থাকুক, মুখে বলে, "সেখানে গেলে কাজ ত হবে না, আড্ডাই হবে সারাক্ষণ। বলুন অভিনয়ে দরকার নেই, তারপর আড্ডা দিতে চলুন, আমি বাধা দেব না।" মনে যে কি আছে নিজেও সে ভাল করিয়া তাহা জানে না। বাড়ীতে মায়ের জ্বালায় দুদণ্ড তিষ্ঠানো এমনিতেই তাহার প্রায় অসাধ্য হইয়া উঠিয়াছিল, সম্প্রতি কন্যা অভিনয়ে নামিতেছে শুনিয়া তিনি আহার-নিদ্রা ত্যাগ করিয়া এমন কাণ্ড বাধাইয়াছেন যে দিনের মধ্যে খানিকটা সময়ও বাহিরে কোথাও পলাইয়া তাঁহাকে ভুলিয়া থাকিতে না পারিলে তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে সেও একদিন ক্ষেপিয়া যাইবে। কিন্তু কেবল মায়ের কাছ হইতে পলাইতেই যে সে ক্লাবে আসে তাহা বলিলে সত্যকথা বলা হইবে না। মায়ের উপর রাগ করিয়া খানিকটা আসে তাহা ঠিক, বীণার উপরে রাগ করিয়াও খানিকটা। ক্লাবে অজয় ছাড়া অন্য মানুষগুলি কি মানুষ নহে, যে একজনের অভাব হইতেই এমন করিয়া আর-সকলের সঙ্গে সম্পর্ক চুকাইয়া ফেলিতে হইবে? অথচ এই বীণাই কথায় কথায় মানুষে মানুষে সম্পর্ককে এত বড় করিবে, যেন তুচ্ছতম মানুষকেও তার শ্রেষ্ঠ মূল্যটি দিতে সে যেমন জানে এমন আর কেহ জানে না।

অজয়ের কথাও কি কোনও একরকম করিয়া ঐন্দ্রিলার মনে আছে? অজয় আগ্রহ করিয়া ঐন্দ্রিলাকে ক্লাবে ডাকিত, ঐন্দ্রিলাকে ক্লাবে দেখিতে পাইলে তাহার অন্ধকারাচ্ছন্ন মুখ উজ্জ্বল হইয়া উঠিত, এই চিন্তায় ঐন্দ্রিলার কি লুকান কোনও সুখ আছে? ক্লাবে আসিয়া সেই চিন্তা হইতে এতটুকু সুখও কি সে পায়?...সুভদ্র সুখী হইবে ভাবিয়া ক্লাবে অবশ্য সে ত আসেই।

ঐন্দ্রিলাকে ক্লাবে পাইয়া সুভদ্রের সবটুকুই যে সুখ তাহা নহে, বাছিয়া বাছিয়া ঠিক এই সময়েই ক্লাবের বনিয়াদে ভাঙন ধরিতেছে লক্ষ্য করিয়া তাহার দুঃখ বহুগুণ বেশী। এক এক করিয়া সভ্যসংখ্যা কমিতেছে। কিন্তু প্রাণপণ করিয়াও সুভদ্র কিছু করিতে পারে না। তাহার কেবলই মনে হয়, ঐন্দ্রিলাকে ডাকিয়া আনিয়া সে অপদস্থ করিল। শেষ অবধি অভিনয়ই যে হইবে তাহার ঠিক কি? যদি না হয়, অবস্থাটা খুবই চমৎকার দাঁড়াইবে সন্দেহ নাই। কিন্তু সুভদ্রের সে আকর্ষণী শক্তি নাই, আন্তরিকতার মধ্যে যাহার জন্ম, মানুষকে মানুষ যাহা দিয়া বাঁধিয়া রাখিতে পারে। তাহার জীবনের আরও গভীরতর জায়গায় কত মানুষ আসিয়া ঘুরিয়া গেল, কাহাকেও সে বাঁধিতে পারিল না ত, বাঁধিবার চেষ্টাই কখনও সে করে নাই, আজ অত্যন্ত বেশী বাহিরের জায়গায়, কেবলমাত্র কথার আদানপ্রদান উপলক্ষ্য করিয়া একদল মানুষকে ধরিয়া রাখিতে আশা করে সে কি সাহসে? সুভদ্রের দিন সত্যই বড় দুঃখে কাটিতেছে।

বিমান তাহার সঙ্গে তর্ক জুড়িয়া বলিতে চায়, ক্লাবের মানুষগুলির পরস্পর-সম্পর্কের মধ্যে একটুখানি আন্তরিকতার মশলা-সংযোগ করিবার চেষ্টা করিত একমাত্র বীণা। তাহাকে বাদ দিয়া ক্লাব জমাইবে আশা করিয়া থাকে যদি ত সুভদ্র ভুল করিয়াছে।

সুভদ্র বলে, "তাঁকে ত আর আমরা বাদ দিইনি. তিনিই আমাদের বাদ দিয়েছেন।"

বিমান বলে, "কিজন্যে দিয়েছেন তা ত তুমি জানোই ভালো

ক'রে। তোমার উচিত তাঁকে আবার ধ'রে আন্‌তে চেষ্টা করা।"

সুভদ্র বলে, "ওসব জোর-জবরদস্তিতে আমি বিশ্বাস করি না, তা ত জানোই।"

বিমান বলে, "কোথায় আর জানি। তোমার বিবেচনায় একমাত্র ঘুঁসির জোর ছাড়া আর কোনোরকমের জোরকে কেউ কাজে লাগাবে না। ক্লাবের কন্‌ষ্টিট্যুশনটা বদ্‌লে কুস্তির আখ্‌ড়া ক'রে নাও, সহজেই সব গোল মিটে যাবে।"

সুতরাং গোলটা আপাততঃ থাকিয়াই যায়।

বীণা বাড়ী ছাড়িয়া এই ক'দিন বাহির হয় নাই বটে, কিন্তু বাড়ীতে সে বসিয়া নাই। বীণা চুপচাপ বসিয়া আছে, এই অভাবনীয় দৃশ্য চোখে দেখিবার লোভে সময়ে-অসময়ে সুলতা আসিয়া হাজির হন, কিন্তু তাঁহার অভীষ্ট সিদ্ধ হয় না। সম্প্রতি দুতিনদিন দুই সখীতে অজয়ের ঠিকানা খুঁজিয়া বাহির করিবার নানাপ্রকার সম্ভব-অসম্ভব প্ল্যান লইয়া আলোচনা চলিতেছে। সুলতা মাঝেমাঝে বলেন, "ক্লাবে তুই কি সত্যিই আর যাবি না ঠিক করেছিস্?"

বীণা বলে, "তোমার কর্ত্তার ব্যবহারে আমি একেবারে মর্ম্মাহত হয়ে গিয়েছি, সুলতাদি। ক্লাব আর না। পুরুষ জাতের কাছ থেকে যত দূরে থাকা যায় ততই ভালো।"

সুলতা হাসিয়া বলেন, "তারিরই ব্যবস্থা কর্‌ছিস্ বটে।"

ব্যবস্থা আরও অনেক কিছুরই সে করে। অজয়ের তিরোধানের পর হইতেই সে স্থির করিয়াছিল, আশেপাশের কতকগুলি বিচ্ছিন্ন বিক্ষিপ্ত জীবনের মধ্যে একটু গ্রন্থি বাঁধিয়া দিতে চেষ্টা করিবে। প্রিয়গোপালের কাছে হার মানিয়াছে। বাড়ীতে ব্রিজের আড্ডা জমাইয়া তাঁহার মনকে গৃহাভিমুখী করিবে ভাবিয়াছিল; তিনি এখন রাত্রিতে বাড়ী থাকেন বটে, কিন্তু এমন ভাবে ব্রিজে ডুবিয়া থাকেন যে সে না থাকারই সামিল। হেমবালার সঙ্গে ঐন্দ্রিলার সম্পর্কের গলদ্ কোনখানে তাহা ঠিক ধরিতে পারে না বলিয়া সেদিকে বিশেষ কিছু করিতে পারে না কিন্তু আদরে যত্নে আপ্যায়নে পিসীমার মনোহরণ করিবার চেষ্টা বিধিমতে করে। তাহার নিকট যতখানি সমাদর পাওয়া উচিত ছিল তাহা এতদিন একেবারেই তিনি পান নাই, ইহা উপলব্ধি করিয়া সে লজ্জিত হয়। ঐন্দ্রিলাকে বীণাই বিপথে লইয়া যাইতেছে এই ধারণা এতদিন হেমবালার মনে ছিল। বীণা ক্লাবে যাওয়া বন্ধ করিবার পর ক্রমে সেটা কাটিয়া গিয়া ভ্রাতুষ্পুত্রী সম্বন্ধে তাঁহার স্বাভাবিক প্রসন্নতা ফিরিয়া আসিতেছে। ঐন্দ্রিলাকে ডাকিয়া বীণা একবার বলিয়াছিল, "ক্লাব তোর ভালো লাগে না বেশ বুঝ্‌তে পারি, শুধু শুধু একটা মানুষকে চটিয়ে যে কি সুখ পাস্ তা তুই-ই জানিস্।" অভিনয়ে ঐন্দ্রিলা পার্ট লইতে চাহিলে হেমবালার পক্ষ হইয়া বীণাও তাহাকে বিধিমতে বাধা দিয়াছিল। কিন্তু দেখা গেল ঐন্দ্রিলার আরও বেশী রোখ চাপিয়া গিয়াছে। অগত্যা বীণা ভাবিতেছে, কে জানে বাপু, হয়ত সুভদ্র-ঐন্দ্রিলার মধ্যেও লুকানো মনের সম্পর্ক কিছু একটা সত্যিই আছে। যদি নিশ্চয় করিয়া জানিতে পায়, না-হয় তাহাদের মধ্যেকার আড়াল ঘুচাইতে প্রাণপণ করে। এমন যে পুঁটি এবং ভবতোষ তাহাদেরও ইতিমধ্যে দুই দুইবার সে ডাকিয়া চা খাওয়াইয়াছে। পুটি তাহার পর হইতে বীণার আর পিছন ছাড়ে না। বীণার কাছে সে সেলাই শিখিতেছে। বীণা বলিয়াছে, "তোমার হষ্টেলের রাস্তা দিয়ে আর হাঁটবে না যদি কথা দেয়, ত তোমার রেশম পশম সুতো সমস্ত জোগাবার ভার ওকে দিই।"

আর সকলেরই কথা বীণা ভাবে, কেবল কি-কারণে বলা যায় না, বিমান সম্বন্ধে সে নিষ্ঠুর। বিমানের মন বলিয়া যে কিছু আছে তাহা বোঝা যায় না বলিয়া কি? সুলতা ইহাই লইয়া তাহাকে একবার তিরস্কার করিলে সে বলিয়াছিল, "কি জানি বাপু, সত্যি ওর ওপরে আমার কিছু রাগ নেই। তবে ওকে জব্দ কর্‌তে পার্‌লে আমার লাগে ভালো। একটা ঝাঁঝালো কথা ব'লে এই মনে ক'রে তৃপ্তি পাওয়া যায়, যে অন্ততঃ মানে বুঝতে গোল কর্‌বে না।"

বীণা কি অবশেষে সুভদ্রের ক্লাবের সমস্যারও একটা সমাধান করে? একটির পর একটি করিয়া সুভদ্রের ক্লাবের খসিয়া-পড়া মানুষগুলিকে সে কাছে টানে। বাড়ীতে ডাকে, না ডাকিতেও অনেকে আসে, সেই যাহারা সুযোগ পাইলেই বীণাকে ঘিরিয়া গোল হইয়া ভিড় করিত; মেয়ে পুরুষ দুয়েরাই। একদিন রিহার্সালের পর ঐন্দ্রিলাকে পৌঁছাইতে আসিয়া সুভদ্র দেখিয়া গেল, সেখানে পূরাদস্তর ক্লাব বসিয়াছে। সে যেমনটি চাহিতেছিল, তাহাই। এখানে এখন আর স্ত্রী-পুরুষ দুই দলে বিভক্ত হইয়া বসে নাই। একটি অপরূপ আত্মীয়তার

সূত্রে বীণা অলক্ষ্যে এই মানুষগুলিকে একসঙ্গে করিয়া গাঁথিয়া তুলিয়াছে। বীণার জন্মদিনের তখন আর বেশী দেরি নাই, সেই উপলক্ষ্যে শহরের বাহিরে কোথাও চড়িভাতি করিবার প্রস্তাব চলিতেছে। বীণা আপত্তি করিয়া বলিতেছে, "হাঁা, আমিও একটা মানুষ, আমার জন্মদিনে আবার চড়িভাতি হবে।"

একজন ভক্ত বলিল, "আর কারুর জন্মদিন কাছাকাছি নেই তার কর্‌ব কি?"

বীণা বলিল, "জন্মদিন নেই বা থাকুল কারুর।"

ভক্ত বলিল, "তা কি হয়? উৎসব কর্‌তে হলে জন্মদিন চাই। এই শিক্ষাই ত এতদিন ধ'রে আপনার কাছে পাওয়া। মানুষকে বড় ক'রে ধ'রে রেখে তারপর আর সব-কিছু।"

অনেক রাত অবধি সুলতাকে সেদিন বীণা ধরিয়া রাখিল। নিভৃতে তাঁহার বুকে মুখ লুকাইয়া কাঁদিয়া বলিল, "মানুষকে বড় ক'রে ওরা উৎসব কর্‌তে চায়, কিন্তু সেই একই কারণে আমার জীবনে যে কোনো উৎসব থাক্‌তে নেই, একথা ওদের আমি কি ক'রে বোঝাব?"

ইহারই দিন-তিনেক পরে আবার একবার অজয়ের দরজায় ঘা পড়িল।

দরজায় ঘা পড়া সম্বন্ধে অজয়ের মনে এখন একটা কুসংস্কারাপন্ন ভয়। তাড়াতাড়ি একটা জামা গায়ে দিয়া হাতের আঙুলে চুলগুলিকে ঠিক করিয়া বাহিরে আসিয়া সে দেখে, প্রিয়গোপাল ও সুলতা স্মিতমুখে দাঁড়াইয়া! এত বিস্মিত হইল, নমস্কার করিতে সুদ্ধ ভুলিয়া গেল। সুলতাই আগে নমস্কার করিয়া কহিলেন, "অজ্ঞাতবাস কাট্‌ল, শ্রীবৎস মহারাজ?"

অজয় বলিল, "কি ক'রে কাট্‌ল তাই ভাবছি; কারণ শনির প্রকোপ একেবারেই কাটেনি এখন পর্য্যন্ত।"

সুলতা বলিলেন, "তা না-ই কাটুক, সম্প্রতি এই শনি-ঠাকুরের প্রকোপটা সাম্‌লান ত! আপনি Box No. w332কে চিঠি লিখেছিলেন না? ইনিই হচ্ছেন Box No. w332."

প্রিয়গোপাল বিলাতী প্রথায় সম্মুখের দিকে ঈষৎ একটু ঝুঁকিলেন।

অজয়ের মনে পড়িল, মাত্র দুইদিন আগে খবরের কাগজে বিজ্ঞাপন দেখিয়াছিল, কে একজন গ্রন্থকার নিজের কয়েকটা ইংরেজী আইনের বই বাংলায় তর্জ্জমা করাইতে চান, ভাল বাংলা লেখা অভ্যাস আছে এমন একটি অনুবাদককে তাঁহার প্রয়োজন, মাসে ৫০৲ মাহিনা।—কাজটা পাইবে আশা করিয়া চিঠি লেখে নাই।

প্রিয়গোপাল কহিলেন, "তা ত হল, কিন্তু একি চেহারা করেছেন আপনি?"

সুলতা বলিলেন, "চিন্তা গো, চিন্তা! শ্রীবৎস মহারাজের উপমাটি অনেক বুঝেই আমি প্রয়োগ করেছি।"

প্রিয়গোপাল অত্যন্ত অবাক্ মুখ করিয়া কহিলেন, "কার চিন্তা?"

অজয় কহিল, "পেটের চিন্তা, আবার কিসের?"

প্রিয়গোপাল কহিলেন, "সুলতা এত সহজ অর্থে কথাটা প্রয়োগ কর্‌বার মেয়েই নয়।"

সুলতা কহিলেন, "সহজ এবং রূপক দুই অর্থেই প্রয়োগ করেছি।"

বহু পূর্ব্বেই যে অতিথিদের ভিতরে ডাকা উচিত ছিল, অজয় তাহা জানিত। ডাকিতে হইবেই, ইহাও তাহার অজানা ছিল না। তবু কি মনে করিয়া দেরি করিতেছিল সে বলিতে পারিবে না। কোনও অভাবিত উপায়ে সমস্যাটা মিটিয়া যাইবে, আজও কি এই আশাই সে করিতেছিল? সহসা সচকিত হইয়া বলিল, "ভেতরে আস্‌বেন না?"

সুলতা কহিলেন, "আপনি ডাক্‌লেই আস্‌তে পারি।"

সেই পরিত্যক্ত জীর্ণ বাড়ীটার গরাদে দেওয়া সঙ্কীর্ণ অন্ধকার স্যাঁৎসেঁতে ঘরটাতে জীর্ণ তক্তপোষের উপর অতিথিদের বসিতে দিয়া অজয় লজ্জায় মরিয়া যাইতে লাগিল। জানালাটাকে ভাল করিয়া খুলিয়া দিল, কেরাসিন কাঠের বাক্সটার মধ্য হইতে সুলতার জন্য একটা হাতপাখা বাহির করিল।

প্রিয়গোপাল কহিলেন, "আপনি বসুন।"

সুলতা কহিলেন, "বস্‌বেন এখন, সম্প্রতি তুমি একটু ওঠ দেখি!"

প্রিয়গোপাল উঠিলে দেয়ালের আলনায় লম্বিত একটি শাল পাড়িয়া লইয়া অজয়কে কহিলেন, "শীত ত কেটে গেছে, এটা নিশ্চয়ই আর এখন আপনার কিছু কাজে লাগে না?"

অজয় বলিল, "না, রাখবার আর জায়গা নেই, তাই ওটা ওখানে ঝুল্‌ছে।"

অজয়ের ময়লা বিছানা বালিশ সেই শালটা দিয়া সুলতা চাপা দিয়া দিলেন। ধূলিঝুল যথাসাধ্য ঝাড়িয়া কেরাসিন কাঠের টেবিলটাকে নিপুণ হাতে গুছাইয়া দিলেন। রেড়ীর তেলের বাতিদানটাকে টেবিলের নীচে চালান করিয়া বলিলেন, "দিনের বেলা এটা বাইরে থাক্‌বার কিছু কি দর্‌কার আছে ?" অজয়কে স্বীকার করিতে হইল, দর্‌কার নাই। নন্দ যে-গেলাসটাতে জল খাইত, এই ক'দিন সেটা মেজের এককোণে ধূলিধূসরিত হইয়া পড়িয়া আছে। সেটাকে ধুইয়া মুছিয়া জল গড়াইয়া টেবিলের উপর রাখিলেন, তারপর পিছনের স্বল্পপরিসর বাগান হইতে যে-একটি পল্লবিত আম্রশাখা মুকুলিত মঞ্জরীর অর্ঘ্য বহিয়া অজয়ের জানালার কাছে আসিয়া থামিয়া গিয়াছিল, হাত বাড়াইয়া তাহা হইতে কয়েকটি গুচ্ছ ভাঙিয়া লইয়া সেই গেলাসে সাজাইয়া দিলেন।

অজয় বিস্মিত বিমুগ্ধ দৃষ্টিতে চাহিয়া ছিল। প্রিয়গোপাল বলিলেন, "দেখছেন কি ? এখনো ত আসলই বাকী !"

সুলতা বলিলেন, "না, হয়েছে, আর বাকী কিছু নেই।"

প্রিয়গোপাল কহিলেন, "বাকী কিছু নেই কিরকম ? আমের বীচি থেকে গাছ হবে, বোল ধর্‌বে, আম ফল্‌বে, পাক্‌বে, সে খেলাগুলো আজ দেখাবে না ?"

সুলতা মৃদু হাসিলেন। অজয় বলিল, 'সত্যিই আপনি -- আপনি যাদু জানেন।"

প্রিয়গোপাল কহিলেন, 'তা আর বল্‌তে ? নইলে আমার মত মানুষ -- "

সুলতা কহিলেন, "থাক্ থাক্, তোমাকে যাদু কর্‌তে স্বয়ং Circeও পার্‌ত কিনা সন্দেহ, আমি ত কোন্ ছার !"

প্রিয়গোপাল কহিলেন, "দেখছেন ওর বিনয় ? নিজেকে Circeর সমকক্ষও মনে করে না।"

আরও কিছুক্ষণ বিশ্রম্ভালাপের পর অজয়কে বাহিরে বারান্দায় ডাকিয়া লইয়া সুলতা কহিলেন, "কাজটা আপনি কর্‌বেন ?"

অজয় বলিল, "আপনার কাছে কিছু ত আর লুকানো নেই। আমার পুরানো পরিচিত জগৎটায় ফিরে যাবার মত অবস্থায় আমি এখন আর নেই।"

সুলতা একটু ভাবিয়া লইয়া কহিলেন, "তা বেশ, আস্‌তে না চান, আস্‌বেন না। উনি আপনাকে কাজ বুঝিয়ে দিয়ে যাবেন, বাড়ী ব'সে কর্‌বেন।"

অজয় বলিল, "বেশ, কর্‌ব, কিন্তু পারিশ্রমিক ব'লে কিছু নিতে পার্‌ব না।"

সুলতা কহিলেন, "তা কি কখনো হয় ? তা কেন উনি আপনাকে কর্‌তে দেবেন ?"

অজয় নতমুখে ধীরভাবে বলিল, "কিছু মনে করবেন না, কিন্তু আপনাদের কাছ থেকে কোনও পরিশ্রমের মূল্য নিতেও আমি পার্‌ব না।"

সুলতা কহিলেন, "আপনি জিনিষটাকে কিভাবে দেখ্‌ছেন তা আমি একেবারেই বুঝতে পারিনি ভাববেন না। এ কাজটার কথা তাহলে থাকুক। কিন্তু আপনি খুবই worried বুঝতে পার্‌ছি, শরীরও আপনার ভেঙে গিয়েছে। এ রকম একলাটি এক কোণে প'ড়ে না থেকে বন্ধু-বান্ধব পাঁচজনের সঙ্গে মিলে চেষ্টা কর্‌লে, পাঁচজনকে চেষ্টা করতে দিলে অবস্থাটার প্রতিকার হওয়া কি আরও সহজ হ'ত না ?"

অজয় বলিল, "হয়ত হ'ত, কিন্তু বন্ধুবান্ধবদের সাহায্য নেবার দরকার সত্যিই আছে সেইটে ভালো ক'রে আগে জান্‌তে চাই।"

অজয়কে আড়চোখে একবার দেখিয়া লইয়া সুলতা কেবল কহিলেন, "হুঁ !"

প্রিয়গোপাল ভিতর হইতে ডাকিলেন, "হ'ল তোমাদের ? আর কতক্ষণ এই গরমে একলা ব'সে থাকব।"

সুলতা বলিলেন, "এই যে যাচ্ছি। শুনুন অজয়বাবু। আমারই ভুল হ'তে পারে, কিন্তু এটা ঠিক যে জিনিষটাকে আপনি যেভাবে দেখেন, আমরা সেভাবে দেখিনে। বন্ধুদের সাহায্যকে সব সময় কেবল সাহায্য হিসেবে নিতে হয় তা নয়, কর্তব্য হিসেবেও নিতে হয়। বন্ধুকে সাহায্য করেই মানুষের বন্ধুর প্রতি কর্তব্য শেষ হয় না, তার কাছে সাহায্য নিয়ে সে-কর্তব্যকে সম্পূর্ণ করতে হয়। সেটা না নিলে মমতার যে-অভাব প্রকাশ পায় তার কথা না-হয় ছেড়েই দিলাম। কিন্তু এটা বোঝা ত শক্ত নয়, সাহায্য নেবেন না ব'লে যাদের দূরে সরিয়ে রেখেছেন, আপনার কাছে সাহায্য প্রত্যাশা করা তাদেরও সেই সঙ্গে ক্ষতি করা ?"

অজয় বলিল, "কথাটাকে ওভাবে কখনো চিন্তা করিনি।"

সুলতা কহিলেন, "তাহলেই বুঝুন, বন্ধুত্বের ক্ষেত্রে দেওয়া নেওয়াতে বিশেষ তফাৎ নেই কিছু, একটিকে ছেড়ে আর একটির অস্তিত্বই সম্ভব নয়। বন্ধুদের স্নেহ-সহানুভূতি থেকে নিজেকে দূরে সরিয়ে রেখে, নিজে দুঃখ ভোগ ক'রে, সেই দুঃখ তাদের দিয়ে আপনি তাদের কোনো উপকার করছেন না। এইটেই বরং তাদের বলছেন. বন্ধুত্ব ভাবাবেগের জিনিস। মনেই তার উদয়, মনেই তার লয়। অপরের কাছ থেকে কোনো স্বার্থত্যাগ আশা করেন না এইজন্যেই যে নিজেও কারুর জন্যে কোনো স্বার্থত্যাগ করতে আপনি প্রস্তুত নন। পৃথিবীতে অপরের জন্যে স্বার্থত্যাগ, অপরের জন্যে চিন্তা, অপরের জন্যে হাসিমুখে দুঃখভোগ, এ-সমস্তের আপনার কাছে কোনো অর্থ নেই, কেবল নিজেকে নিয়ে থাকারই অর্থ আছে। স্বার্থবুদ্ধি থেকে কোনো কাজ করা আপনার সাধ্য নয় তা জানি, কিন্তু হৃদয়বৃত্তির ক্ষেত্রে আপনি অত্যন্ত স্বার্থপর মানুষ। আপনাকে আমি বলছি, আপনি দেখবেন।"

অজয় নীরবে দুই ঠোঁট চাপিয়া অধোবদনে দাঁড়াইয়াছিল, বলিয়া উঠিল, "আমাকে আর তিরস্কার করবেন না। যদি হবার হয় এইতেই আমার চৈতন্য হবে।"

সুলতা প্রিয়গোপালকে ডাকিয়া কহিলেন, "আমাদের হয়েছে, এসো তুমি, এইবার যাওয়া যাক্।" অজয়কে বলিলেন, "যদি কিছুমাত্র সহৃদয়তা আপনার মনে থাকে, আপনার উচিত হবে সুভদ্রের সঙ্গে দেখা করা, বীণার সঙ্গে দেখা করা।— আজ এই পর্য্যন্তই রইল।"

পথে আসিতে প্রিয়গোপাল কহিলেন, "বোঝাতে পারলে একটুও?"

সুলতা কহিলেন, "নিজে ইচ্ছে ক'রে যে ভুল বুঝবে তাকে বোঝানো আমার কর্ম্ম নয়। দুঃখ পেতে এবং দিতেই ওর ভালো লাগে। আসলে মনের দিক দিয়েও পুরোদস্তুর একটি সুইসাইডের টাইপ।"

প্রিয়গোপাল একটা হাই তুলিয়া কহিলেন, "তবু ওর মধ্যে কি দেখলে তোমরা সবাই মিলে কে জানে?"

সুলতা কহিলেন, "ওর দুঃখটাকেই দেখেছি।" তারপর চুপ করিয়া গেলেন।

ক্রমশঃ

আলোচনা

"বাংলার অবনত ও অনুন্নত জাতি"

বর্ত্তমান বর্ষের আষাঢ় মাসের 'প্রবাসী'র ৪০৬ পৃষ্ঠায় "বাংলার অবনত ও অনুন্নত জাতি" শীর্ষক প্রবন্ধে শ্রীযুক্ত রামানুজ কর লিখিয়াছেন, মেদিনীপুর ও হাওড়া জেলায় মাহিষ্য জাতি জল আচরণীয় বাঁকুড়া ও হুগলী জেলায় জল আচরণীয় নহে।

মেদিনীপুর ও হাওড়া জেলার মাহিষ্যগণের ন্যায় হুগলী জেলার মাহিষ্যও আচরণীয়। হুগলী জেলার আরামবাগ, শ্রীরামপুর, ও সদর মহকুমার বহু পল্লীতে মাহিষ্যের পৃষ্ট জল রাঢ়ীয় প্রভৃতি উচ্চ শ্রেণীর ব্রাহ্মণগণ বহু পূর্ব্ব হইতে নিঃসঙ্কোচে গ্রহণ করিয়া থাকেন। রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণ নিমন্ত্রিত হইয়া মাহিষ্যের বাড়ি ভোজনাদিও করেন। বাঁকুড়া জেলার মাহিষ্য জাতিও এই প্রকার জলাচরণীয়। মাহিষ্যজাতি বর্ণ ব্রাহ্মণ দ্বারা যাজিত হয় না এতজ্জন্য অনাচরণীয় নহে।

শ্রীবনমালী পাল

মেদিনীপুর ও হাওড়া জেলায় মাহিষ্য জল আচরণীয়, কিন্তু বাঁকুড়া ও হুগলী জেলায় জল আচরণীয় নহে—ইহা সম্পূর্ণ ভ্রান্ত উক্তি।

পূর্ব্বে অনাচরণীয় ছিল না এখনও নাই।

শ্রীঅযোধ্যানাথ বিদ্যাবিনোদ

লণ্ডনে ১১ই মাঘ

ইন্দুভূষণ সেন

•প্রথম যুগের খ্রীষ্টশিষ্যদের মধ্যে তাঁদের ধর্ম্মই সাম্যবাদ এনে দিয়েছিল। ব্রাহ্মসমাজেও প্রথম যুগে ব্রাহ্মধর্ম্মের আদর্শই সাম্যবাদ নিয়ে এসেছিল। "নরনারী সাধারণের সমান অধিকার," ব্রাহ্মসমাজের সংকীর্ত্তনের এই কথাগুলি কোন দিনই শুধু প্রচার করবার মত ব'লে বা কথার কথা ব'লে গ্রহণ করা হয়নি। একে কাজে পরিণত করা হয়েছিল। ঐ কীর্ত্তনের মূলে যে ভাবটি ছিল তা থেকেই পরে এই আদর্শ ফুটে উঠল যে, সম্প্রদায়, জাতি, বর্ণ, বংশ ও রীতিনীতি নির্ব্বিশেষে "আমরা সকলে সেই এক পিতার সন্তান"। এই ভাবধারার অনিবার্য্য ফল হ'ল, ভারতে সাম্যবাদ।

আজকাল যে আধুনিকতা ও স্বাজাতিকতা'র (modernism এবং nationalism) কথা লোকের মুখে এত শোনা যায় এ-সব ঐ ব্রাহ্মসমাজের প্রেরণায় উৎপন্ন সাম্যবাদের অনেক পরে এসেছে। যদি স্বাজাতিকতা গ্রহণ করতেই হয়, তবে রামমোহনের স্বাজাতিকতাই গ্রহণযোগ্য; এবং যদি আধুনিকতা গ্রহণ করতেই হয়, তবে শিবনাথের ও রবীন্দ্রনাথের আধুনিকতাই গ্রহণীয়।

প্রাচীন ভারতে মানবজীবনের সর্ব্বাঙ্গই ধর্ম্মের অন্তর্গত ব'লে ধরা হ'ত। সামাজিক আচার-ব্যবহার, নাগরিক বিধি-ব্যবস্থা, অর্থনীতি, রাষ্ট্রনীতি, বিভিন্ন রাজ্যের পরস্পরের প্রতি সম্বন্ধ,—এ সমস্তই ধর্ম্মের অঙ্গ বলে মনে করা হ'ত। আবার অতি-আধুনিক কালে আমাদের আচার্য্য শিবনাথ বলতেন, "ধর্ম্ম কেবল রবিবারের ব্যাপার নয়; প্রতি দিনের প্রতি ক্ষণের ব্যাপার।" দুই-ই এক কথা।

এতে দেখা যায়, প্রাচীন ও আধুনিক দুই-ই এক হ'তে পারে। আধুনিকতার সব কথাই যে নূতন, তা নয়। আধুনিকতার একটি ফল এই দেখা যায় যে, বর্ত্তমান কালে মানুষ মনে করে, প্রত্যেককেই বিশেষজ্ঞ হ'তে হবে, বিশেষ বিশেষ শিক্ষাগ্রহণ (specialization) করতে হবে। এ-বিষয়ে আমার বক্তব্য একটু পরেই বলচি।

উপরে বর্ণিত সংসারের সব বিভাগের উন্নতিসাধন এখন ভারতবর্ষে ধর্ম্ম-সম্পর্ক-বর্জ্জিত প্রতিষ্ঠান-সকলের হাতে গিয়ে পড়েছে। কিন্তু তাতে ব্রাহ্মসমাজের লজ্জিত হবার কোন হেতু নেই। কারণ, ঐ সকলের উন্নতির ও সংস্কারের মধ্যে যে কেন্দ্রীয় ভাবটি কাজ করচে, তাই হ'ল "সাম্য" অথবা "বিশ্বজনীন ভ্রাতৃত্ব"। এই মূল ভাবটি ত ব্রাহ্মসমাজেরই দান। ব্রাহ্মসমাজ আগে না এলে এ-সব কিছুই আজ সম্ভব হ'ত না। আজ এখানে আমরা যে কয়জন ব্রাহ্ম উপস্থিত আছি, আমরা যেন মনে রাখি যে আমাদেরই পিতা পিতামহ মাতামহ প্রভৃতি গুরুজনগণ এক যুগে সর্ব্ববিধ সংস্কারের অগ্রদূত হয়ে, কত ত্যাগ স্বীকার ক'রে এই আদর্শ প্রতিষ্ঠিত ক'রে দিয়ে গিয়েছেন। আজ আমরা তারই সুফল ভোগ করচি।

আমার সম্মুখে অল্পবয়স্ক যারা রয়েছ, তারা নিশ্চয়ই ভাবচ যে ভবিষ্যতে জীবনের কাজ বলে কোন্ কর্ম্মকে অবলম্বন করবে; রাজনীতি, না সমাজসংস্কার, না ধর্ম্ম? এই সম্পর্কে ধর্ম্মের নাম করাতে তোমরা আশ্চর্য্য হ'য়ো না। ধর্ম্মও ত শুধু পূজা উপাসনার ব্যাপার মাত্র নয়; তারও যে বিশাল কর্ম্মক্ষেত্র আছে। তোমরা কে কোন পথে যাবে?

আমি বলি, প্রত্যেকে নিজের মনোমত যে কোনও কর্ম্মক্ষেত্র খুঁজে নিও। আমি আজ কেবল তোমাদের কয়েকটি মূলসূত্র ধরিয়ে দিচ্চি; কয়েকটি মাপকাঠি দেখিয়ে দিচ্চি। অপরে তোমাদের ভাল বলে কি না, তা ভাববার কোন দরকার নেই; পরের কাছে নিজেদের সমর্থন (justify) করবার কোন দরকার নাই। তোমরা প্রত্যেকে যা দিয়ে নিজের কাছে নিজেকে সমর্থন করতে পারবে এমন কয়েকটি মাপকাঠি আজ আমি তোমাদের দেখিয়ে দিচি।

১। জীবনের কাজ ব'লে যাকে অবলম্বন করবে, তা এমন হওয়া দরকার যে, তাতে যেন সম্মুখে অনন্ত গতির পথ দেখতে পাওয়া যায়। যে পথে চলে অল্প পরেই পথ ফুরিয়ে যায়, বন্ধ গলির মত যে-পথ আর সম্মুখে অগ্রসর হ'তে দেয় না, এমন পথ তোমরা ধরবে না। যাতে একটা সহজ "চরম লক্ষ্য" আছে এমন পথে চলবেই না। এমন কি রাজনীতিতেও না। এমন কর্ম্ম অবলম্বন করা চাই যা হ'তে নিত্যই নূতন কিছু করবার কাজ সম্মুখে দেখতে পাওয়া যায়। মানবাত্মা অনন্ত গতি বিনা কখনও তৃপ্তি পায় না। "যো বৈ ভূমা, তৎ সুখং, নাল্পে সুখমস্তি" এই বাক্যটি এই অর্থেও সত্য।

জন্ ডিউই প্রমুখ মার্কিন পণ্ডিতের বই প'ড়ে আমার মনে এই আদর্শটি খুব দৃঢ়ভাবে মুদ্রিত হ'য়ে গিয়েছে। এই dynamic theory of lifeই হ'ল আমার প্রথম মাপকাঠি। কর্ম্মে নিত্য অগ্রগতিই মানব-মনের আনন্দ। কিন্তু সাধারণতঃ লোকে যাকে "শান্তি" বলে তা অবশ্য তাতে নেই।

২। তোমরা শুধু বিশেষজ্ঞতার চেষ্টা করবে না; জীবনের বিশালতার দিকেও দৃষ্টি রাখবে। বিশেষজ্ঞ হ'তে গিয়ে যারা জ্ঞানের কিংবা কর্ম্মের ক্ষেত্রকে ক্রমাগত বিশ্লেষণ করতে থাকে এবং ক্ষুদ্র হ'তে ক্ষুদ্রতর ক্ষেত্র অন্বেষণ করে, তারা অবশেষে কূপমণ্ডূক হয়ে পড়তে পারে। তোমরা মনে রাখবে যে, মানব-জীবনই বল, কি জ্ঞানজগতই বল, কি কর্ম্মজগতই বল— এদের প্রত্যেকটি এক ও অখণ্ড বস্তু। এদের বিশ্লেষণ করলে এরা আর সত্য থাকে না। সময়ে সময়ে ঊর্দ্ধে উঠে দৃষ্টিকে বিশাল ক'রে নিয়ে এ সমুদয়কে দেখতে হয়। কেবল নিজের অবলম্বিত ক্ষুদ্র কাজটির মধ্যে কিংবা নিজের বিশেষ জ্ঞানচর্চ্চার বিষয়টির মধ্যে নিজেকে আবদ্ধ রাখলে জীবনের প্রকৃত মূল্য বুঝতে পারা যায় না। এমন কি, এমন মানুষ নিজের অবলম্বিত জ্ঞানচর্চ্চার বিষয়টির অথবা কর্ম্মটিরও প্রকৃত মূল্য বুঝতে পারে না।

এই বিশালতার আদর্শটি আমার মনে আসে জগদীশচন্দ্র বসু মহাশয়ের সঙ্গে কথা বলে। তিনি সর্ব্বদাই বলেন শুধু বিশ্লেষণ নয়, সমন্বয়ও চাই; শুধু বিশেষ শিক্ষা-গ্রহণ নয়, হৃদয়ঙ্গম করাও চাই।

৩। আমরা কাজ করতে গিয়ে প্রায়ই দেখতে পাই যে, বাইরের অবস্থাগুলিকে (environmentকে) নিজের ইচ্ছামত ক'রে গ'ড়ে লওয়া সম্ভব হয় না। ডাইসি বলেছেন, বর্ত্তমান যুগে কোনও প্রতিষ্ঠানের বাহিরের অবস্থাকে বদলে নেওয়া একজন বা দুই চারিজন লোকের পক্ষে সম্ভব নয়—তাঁরা যত শক্তিশালী মানুষ হ'ন না কেন। পারিপার্শ্বিক অবস্থা বদলাবার জন্য কোন চেষ্টা করা হবে না, একথা আমি বলছি না। কিন্তু যতদিন পারিপার্শ্বিক অবস্থা আমার ইচ্ছামত পরিবর্ত্তিত না হয়, ততদিন কি আমি নিশ্চেষ্ট হয়ে ব'সে থাকব? না নিশ্চেষ্ট হ'য়ে থাকব না। যে পারিপার্শ্বিক অবস্থা রয়েছে, তাকেই এমন ক'রে ব্যবহার করব যে তারই মধ্যে অন্ততঃ কিছু পরিমাণে সফলতা লাভ হয়। এই ভাবে উদ্যোগী না হ'য়ে যদি আমরা শুধু পারিপার্শ্বিক প্রতিকূল অবস্থার দোষ কীর্ত্তন করতে থাকি, তবে তাতে মনুষ্যত্বের পরিচয় পাওয়া যায় না।

মহীশূর ইউনিভার্সিটির ভাইস চ্যান্সেলার স্যর ব্রজেন্দ্রনাথ শীল মহাশয় তাঁর অভিভাষণে এই মূলসূত্রটি, এই মাপকাঠিটি বেশ ভাল ক'রে দেখিয়ে দিয়েছেন। তোমরা মনে করবে, তোমরা এক এক জন যেন দাবাখেলার খেলোয়াড়। খেলার নিয়মের দ্বারা এবং প্রতিপক্ষের চালের দ্বারা তোমার হাত বাঁধা। কিন্তু সেই বাঁধনের মধ্যে থেকেই তোমাকে বাজি মাৎ করতে হবে।

৪। আমি আগেই তোমাদের বলেছি যে মানবজীবনের আদর্শ ক্রমাগত অগ্রসর হওয়া। গতিই আমাদের আদর্শ; স্থিতি বা শান্তি নয়। আজ-কাল অনেকে এই গতিশীলতার দোহাই দিয়ে বলেন "end justifies the means," অর্থাৎ কার্য্যসিদ্ধির জন্য ভাল মন্দ সব উপায়ই অবলম্বনীয়। কিন্তু গতিশীলতার দোহাই দিয়েই প্রমাণ করা যায় যে, এ কথা ঠিক নয়। কারণ গতিশীলতার আদর্শটি ঠিকমত গ্রহণ করলে তার অবশ্যম্ভাবী ফল এই যে, আজ যাহা end (উদ্দেশ্য) কাল তাহাই হবে means (উপায়)। উদ্দেশ্য বা উপায় কোনটিই চিরস্থির নয়; কিন্তু নৈতিক আদর্শগুলি (principles) স্থায়ী বস্তু। সুতরাং কোনও সাময়িক উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য উপায় অবলম্বন করতে গিয়ে, যে-সকল নৈতিক নিয়ম নিত্য ও শাশ্বত, তাদের বাদ দেওয়া অথবা অবমাননা করা চলে না।

৫। যদি আমাকে কেহ জিজ্ঞাসা করে যে, বর্ত্তমান কালে ইউরোপে বা ভারতবর্ষে, দেশের ও দশের কাজের ভিতরে মানুষের কোন্ দোষটি সর্ব্বাপেক্ষা অধিক স্পষ্ট হয়ে প্রকাশ পাচ্ছে, তবে আমি বলি, তা egotism অর্থাৎ অহঙ্কার ও আত্মগৌরবের ভাব। এ-কথা অবশ্যই সত্য যে, মানুষের আত্মশক্তিতে বিশ্বাস থাকা চাই; আপনাতে অনাস্থার ভাব যার মনকে দমিয়ে রাখে, তার দ্বারা সংসারে কোন কাজ হয় না। কিন্তু অপর দিকে অহঙ্কার ও আত্মগৌরবের ভাবকেও চেপে রাখা দরকার। নতুবা সঙ্ঘবদ্ধ ভাবে কোন কাজ করা অসম্ভব। বর্ত্তমান যুগে প্রায় সমুদয় কাজেরই পারিপার্শ্বিক অবস্থা এমন হ'য়ে দাঁড়িয়েছে যে, একজন একলা কাজ ক'রে প্রায় কিছুই ফল লাভ করতে পারে না। আমাদের ধর্ম্মশাস্ত্রে বলে, ঈশ্বরদর্শনের প্রথম সর্ত্তই হ'ল অহঙ্কার-নাশ। বর্ত্তমান যুগের কর্ম্মশাস্ত্রের কথাও তাই। যে-মানুষ অহঙ্কার ও আত্মগৌরবের ভাব খর্ব্ব করতে পারে না, সে কর্ম্মক্ষেত্রের অযোগ্য। অন্যের সঙ্গে মিলিত ভাবে কাজ করতে পারে না ব'লে এমন মানুষ জগতের কোনও বড় কাজের অংশী হ'তে পারে না।

৬। সর্ব্বোপরি মনে রেখো, মানবজীবনের সকল কাজেরই এক উদ্দেশ্য। সে উদ্দেশ্য এই যে, সমগ্র মানুষটি—তার শরীর মন ও আত্মা সবই—পূর্ণ বিকাশের সুযোগ পাবে; এবং জগতের সব মানুষই ঐ পূর্ণ বিকাশের সুযোগ লাভ করবে—সে মানুষ শ্রমজীবী, কি শূদ্র, কি মেথর, কি দাস, শ্বেতবর্ণ কিংবা কৃষ্ণবর্ণ, যাহাই হউক। এই আদর্শটিই আধুনিকতার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কথা।

তত্ত্ব-কৌমুদী, ১৬ই বৈশাখ ১৩৪০
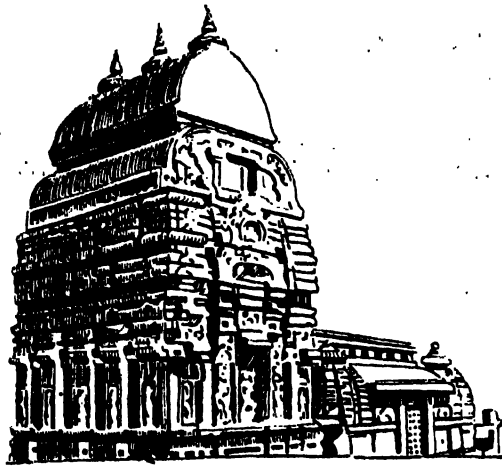
চতুর্ম্মুখ শিব—

শিবকে আমরা পঞ্চমুখ বলিয়াই জানি। তবু প্রাচীনকালে সময়ে সময়ে তাঁহার চতুর্ম্মুখ মূর্ত্তিও গঠিত হইত। মধ্যভারতের অজয়গড় রাজ্যে

চতুর্ম্মুখ শিব

চতুর্ম্মুখ শিব

নাচনা নামে একটি স্থান আছে। সেখানে চতুর্ম্মুখ শিবের একটি অতি সুন্দর মূর্ত্তি আছে। এই মূর্ত্তিটি অনুমান ৩২০—৩৫০ খৃষ্ট অব্দে গঠিত হয়।

গৃহকর্ম্মে শ্রমলাঘব —

সকল দেশের মেয়েদেরই বেশীর ভাগ সময় গৃহস্থালীতে কাটে। ইহার পর আবার সন্তানপালন ইত্যাদি ত আছেই। সেজন্য ঐশ্বর্য্যশালী পরিবারে জন্ম বা বিবাহ না হইলে লেখাপড়া করিয়া এবং অন্য উপায়ে নিজেদের উন্নতিসাধনের অবকাশে অনেক মেয়েরই ঘটে না। মেয়েদের এই অসুবিধা ও অতিপরিশ্রম দূর করিবার জন্য বর্ত্তমান কালে অনেক যন্ত্রপাতি আবিষ্কৃত হইয়াছে এবং ইউরোপ ও আমেরিকায় ব্যবহৃতও হইতেছে। এই সকল যন্ত্রপাতি আবিষ্কারের ফলে বর্ত্তমানকালের চাকরসমস্যাও অপেক্ষাকৃত সহজ হইয়া আসিয়াছে। এই সকল যন্ত্রের কিছু কিছু প্রচলন আমাদের দেশে হইলে আমাদের মেয়েদের অনেক সুবিধা হয়। অনেকে এই সকল যন্ত্রপাতির খবর জানেন না বলিয়া অথবা এগুলির ব্যবহার অত্যন্ত ব্যয়সাধ্য মনে করেন বলিয়া ইহাদের প্রবর্ত্তন করিতে ইতস্তত করিয়া থাকেন। প্রকৃত প্রস্তাবে এই সকল যন্ত্র এত দামী নয় যে, ইহাদের প্রচলন মধ্যবিত্ত পরিবারে একেবারে অসম্ভব। আমাদের দেশে বড় শহরে অনেকেরই মোটরকার আছে। একটি অল্পদামী মোটরকার কিনিতে যে টাকা ব্যয় হয়, তাহার দ্বারা একটি বড় পরিবারের রান্না, কাপড়কাচা, খাদ্যসংরক্ষণ ঘর পরিষ্কার প্রভৃতি কাজ অতিসহজ ও অল্পপরিশ্রমসাধ্য করিয়া ফেলিয়া যাইতে পারে। এই সকল যন্ত্র এত সুন্দর ও মজবুত করিয়া তৈরী যে যত্ন করিয়া ব্যবহার করিলে পনর-কুড়ি বৎসর স্থায়ী হইতে পারে। এই সকল যন্ত্রব্যবহারে মাসিক যে খরচ পড়ে তাহাও আমাদের অকর্ম্মণ্য ও অলস চাকরবাকর রাখার খরচ অপেক্ষা কম ভিন্ন বেশী হইবে না।

একটি সংসার চালাইবার জন্য যত প্রকার কাজ করিতে হয় তাহার

প্রত্যেকটির জন্যই কোন-না-কোন যন্ত্র আছে। আমরা ক্রমে ক্রমে উহাদের পরিচয় দিব। বর্ত্তমান সংখ্যায় দুইটি নূতন ধরণের উনুন, একটি ঝাঁট দিবার ও ধূলা ঝাড়িবার কল, এবং একটি কাপড় কাচিবার কলের কথা বলা হইল।

'ভাল্‌কান' গ্যাস কুকার

'আগা' কুকার—ইহাতে দিনে একবার মাত্র কয়লা দিবার প্রয়োজন হয়

আমাদের দেশে বর্ত্তমানে কয়লার উনুনে রান্না হইয়া থাকে। উহার চারিটি গুরুতর অসুবিধা—(১) যখন প্রয়োজন হয় তখনই আগুন পাওয়া না (২) ধরাইতে শ্রম ও সময় দুইই লাগে (৩) ধোঁয়ায় স্বাস্থ্যের অনিষ্ট হয়; এবং (৪) কয়লা-ঘুঁটেতে ঘরদুয়ার অপরিষ্কার হয়।

দুইটি 'ভ্যাকুয়াম ক্লীনার'
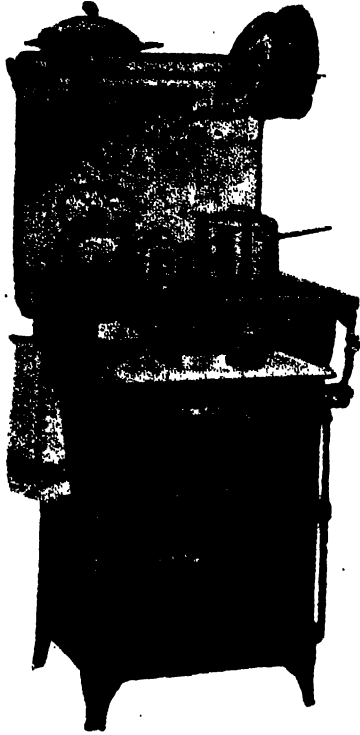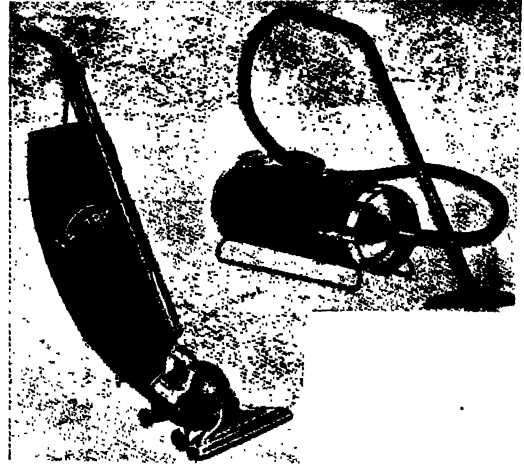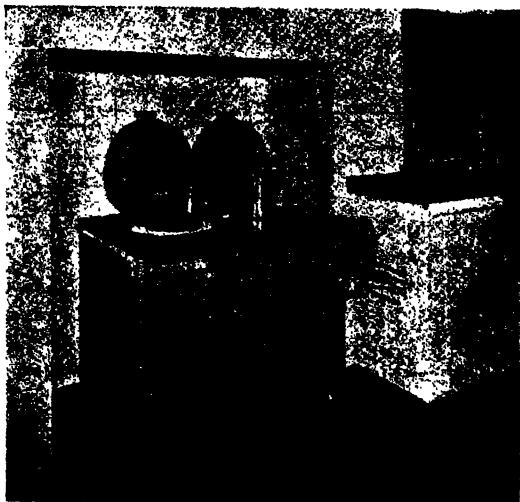
'ভ্যাকুয়াম ক্লীনার' দ্বারা আস্‌বাব পরিষ্কার

ইলেকট্রিক, গ্যাস বা নূতন ধরণের কয়লার উনুন ব্যবহারে এই সকল অসুবিধা নাই। এইসঙ্গে একটি গ্যাসের উনুন ও নূতন ধরণের একটি কয়লার উনুনের চিত্র দেওয়া হইল। গ্যাসের উনুনটিতে রান্না উপরে যেখানে সস্‌প্যান, কেটলী প্রভৃতি বসান আছে সেখানেও হইতে পারে, আবার
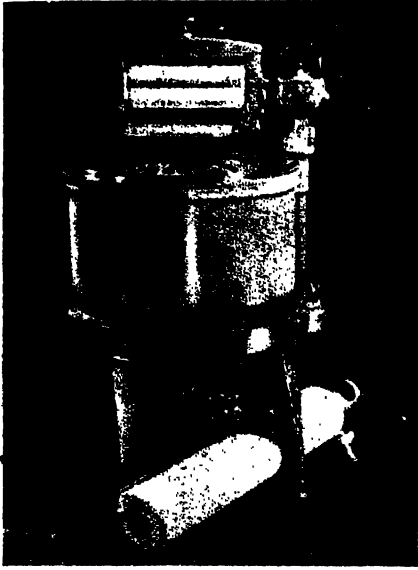
কাপড় কাচিবার ও ইস্ত্রী করিবার কল

নীচের বাক্সটিতেও হইতে পারে। নীচের বাক্সটির সম্মুখ দিকটা 'ফায়ার-প্রুফ' কাচের তৈরী। সুতরাং রান্না কিরূপ হইতেছে এবং কতদূর অগ্রসর হইয়াছে, তাহা বাক্স না খুলিয়াই দেখা যাইতে পারে। এই উনুনের রান্না করিবার জন্য সর্ব্বদা উপস্থিত থাকিবার প্রয়োজন নাই। কোন জিনিষ কতখানি রাঁধিতে কত তাপের প্রয়োজন তাহার একটি স্কেল এই উনুনের সঙ্গে আছে। এই স্কেল অনুযায়ী একটি চাকা ঘুরাইয়া দিলে রান্না শেষ হইলে উনুন আপনিই নিবিয়া যায়, জিনিষ নষ্ট হইবার ভয় থাকে না। দ্বিতীয় উনুনটি কয়লার, কিন্তু উহাতে দিনে একবার মাত্র কয়লা ভরিয়া দিতে হয়, তাহা হইতে চব্বিশ ঘণ্টা কুড়ি জনের রান্নার মত তাপ পাওয়া যায়; ইহাতে ধোঁয়া হয় না, এবং চব্বিশ ঘণ্টা জ্বালাইয়া রাখিতে পাঁচ সের হইতে সাত সের পরিমাণ কয়লা ব্যয় হয়।

ইহার পর যে যন্ত্রগুলির ছবি দেওয়া হইল সেগুলি ঝাঁট দিবার এবং ধূলা ঝাড়িবার যন্ত্র। ইহাদিগকে ভ্যাকুয়াম ক্লীনার বলে। এগুলি চালাইবার জন্য ইলেক্‌ট্রিকের প্রয়োজন হয়; কিন্তু কারেণ্ট খরচ অতি সামান্য—সাধারণ ইলেক্‌ট্রিক ল্যাম্পের মত। এই যন্ত্রের সাহায্যে মেজে হইতে আরম্ভ করিয়া বই পর্য্যন্ত সবই ঝাড়া মোছা যায়।

সর্ব্বশেষে একটি কাপড় কাচিবার যন্ত্র দেখান হইল। উহার মধ্যে কম্বল হইতে আরম্ভ করিয়া রুমাল পর্য্যন্ত কাচা যায়, এবং কাপড় ভিতরে ফেলিয়া দিলেই একেবারে নিংড়াইয়া বাহির হইয়া আসে, কোথাও হাত লাগাইবার প্রয়োজন হয় না। ইচ্ছা করিলে এই যন্ত্রটির সহিত ইস্ত্রি করিবার যন্ত্রও লাগাইয়া লওয়া যায়।

মহিলা-সংবাদ

স্বর্গীয়া স্বর্ণকুমারী দেবীর দৌহিত্রী শ্রীমতী কল্যাণী দেবী এ বৎসর বি-এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছেন। বৃহৎ সংসারের নিত্য কাজ কর্ম্মে ব্যাপৃত থাকিয়া অবসর সময়ে ইনি পড়াশুনা করিয়াছেন। শ্রীমতী কল্যাণী দেবী ছয়টি সন্তানের মাতা।

শ্রীমতী কল্যাণী দেবী (ছয়টি সন্তান সহ)

শ্রীমতী সুরভি সিংহ ব্রহ্মদেশে বেসিন শহরে ওকালতী আরম্ভ করিয়াছেন।

শ্রীমতী সুরভী সিংহ

—

আমেদাবাদের জেলা-জজ বেলগাঁও নিবাসী শ্রীযুত এন্‌-এস্‌ লোকুরের কন্যা শ্রীমতী বনমালা এন্‌ লোকুর বোম্বাই বিশ্ববিদ্যালয় হইতে প্রথম শ্রেণীর অনার্স-সহ বি-এ পাস করিয়াছেন। শ্রীমতী বনমালা অতিরিক্ত ভাষা হিসাবে সংস্কৃত লইয়াছিলেন। তাঁহার বয়স এখন উনিশ বৎসর। কর্ণাটক হইতে মহিলাদের মধ্যে তিনিই প্রথম এইরূপ সম্মানের সহিত বি-এ পাস করিলেন।

শ্রীমতী বনমালা এন্‌ লোকুর

উড়িষ্যা-নারীদের মধ্যে শ্রীমতী সরলা দেবী প্রথম কটক সেন্ট্রাল কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্কের ডিরেক্টর নিযুক্ত হইয়াছেন।

—

লাহোর হাইকোর্টের বিচারপতি শ্রীযুত জয়লালের কন্যা শ্রীমতী সারদা পঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয় হইতে বি-এল্‌ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছেন। তিনিই পঞ্জাবের প্রথম মহিলা আইন-গ্রাজুয়েট।

দেশ-বিদেশের কথা

বাংলা

শ্রীজীমূতকান্তি রায়—

শিল্পী শ্রীজীমূতকান্তি রায় মাত্র ১৯ বৎসর বয়সেই তাঁহার শিল্প-প্রতিভার বিশেষ পরিচয় দিয়াছিলেন। গত তিন বৎসর তিনিই তাঁহার পিতা শিল্পী যামিনীকান্ত রায়ের এক মাত্র সহকর্মী ছিলেন।

জীমূতকান্তি রায়

জীমূতকান্তি রামায়ণের চিত্রাদিতে পুরাতন বাংলার পটের পদ্ধতির যে নূতন ব্যবহার দেখাইয়াছিলেন তাহাতে ভবিষ্যতে তাঁহার বড় শিল্পী হইবার আশা ছিল। বাঁচিয়া থাকিলে পিতার সহকর্মী রূপে বাংলার এই পট-পদ্ধতিকে তিনি পুনঃ-প্রতিষ্ঠিত করিতে পারিতেন।

কৃতী বাঙালী যুবক—

শ্রীযুক্ত জয়ন্তকুমার দাশগুপ্ত সম্প্রতি বিশেষ কৃতিত্বের সহিত লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ের পিএইচ-ডি উপাধি লাভ করিয়া দেশে ফিরিয়া আসিয়াছেন। লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ের স্কুল অফ ওরিয়েণ্টাল ষ্টাডিজে তিনি বাংলার সহকারী অধ্যাপকের কার্য্যেও নিযুক্ত ছিলেন। তাঁহার থিসিস বিলাতে সার এডওয়ার্ড ডেনিসন রস প্রমুখ পণ্ডিত মণ্ডলীর নিকট হইতে প্রশংসা লাভ করিয়াছে। ডক্টর দাশগুপ্ত 'বুলেটিন অব দি স্কুল অফ ওরিয়েণ্টাল ষ্টাডিজ' নামক পত্রিকার অল্পসংখ্যক ভারতীয় লেখকদের একজন। এদেশীয় বহু ইংরেজী এবং বাংলা পত্রিকায় তিনি একজন নিয়মিত লেখক। বিলাতে অবস্থান কালে তিনি বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে ভারতীয় কৃষ্টি ও সভ্যতা সম্বন্ধে বক্তৃতা করিয়াছেন।

জীমূতকান্তি রায়ের আঁকা একখানি পট

প্রবাসী বাঙালীর কৃতিত্ব—

ডক্টর শ্রীরামকান্ত ভট্টাচার্য্য ভারত সরকারের Imperial Council of Agriculture হইতে লাক্ষা রিসার্চ অফিসা'র পদে নিযুক্ত হইয়া গত ১৭ই জুন 'নলডেরা' জাহাজে লণ্ডন যাত্রা করিয়াছেন। বাঁকুড়া জেলার বিষ্ণুপুর স্কুল হইতে ইনি প্রবেশিকা পরীক্ষা পাস করেন। পরে জব্বলপুর কলেজে পড়িয়া ১৯২৩ সনে বি-এস্‌সি ও এলাহাবাদ হইতে ১৯২৫ সনে এম্‌-এস্‌সি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। তাহার পর মধ্যপ্রদেশের

সরকারী বৃত্তির সাহায্যে বাঙ্গালোর ও লিভারপুলে সর্বসমেত পাঁচ বৎসর গবেষণা-কার্য্যে ব্যাপৃত থাকিয়া ১৯৩০ সনে পি-এইচ-ডি উপাধি প্রাপ্ত

শ্রীরামকান্ত ভট্টাচার্য্য

হন। ১৯৩১ সনে দেশে ফিরিয়া প্রায় দেড় বৎসর কাল কোচিন রাজ্যে টাটার সাবানের কারখানায় অধ্যক্ষের কার্য্য করেন। সাবান ও তৈল সম্বন্ধে ইঁহার বহু মৌলিক প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছে।

কৃতী বাঙালী ছাত্র—

শ্রীমান নীলবরণ ঘোষ ঢাকার নয়ানগরের মেজর এ-এম ঘোষের পুত্র।

শ্রীনীলবরণ ঘোষ ও দুই ভ্রাতা

তাঁহার বয়স এখন চতুর্দ্দশ বৎসর। বিলাতে বাগুেল্সের ডেভন পাবলিক স্কুলের প্রতিযোগিতা পরীক্ষায় শ্রীমান নীলবরণ প্রথম হইয়া তিন বৎসরের জন্য ফাউণ্ডেশন বৃত্তি লাভ করিয়াছেন। বিলাতে পাব্‌লিক স্কুলে কোন ভারতবাসী এযাবৎ এরূপ কৃতিত্ব প্রদর্শন করে নাই। আমরা তাঁহার উন্নতি কামনা করি।

ব্যবসায়ে কৃতী বাঙালী—

শ্রীযুক্ত সুরেশচন্দ্র মজুমদার সেণ্ট্রাল ব্যাঙ্ক অফ ইণ্ডিয়ার কলিকাতাস্থ মিউনিসিপাল মার্কেট শাখায় ম্যানেজারের কার্য্য করিয়া বিশেষ কৃতিত্ব প্রদর্শন করিয়াছেন। তিনি সম্প্রতি হিন্দুস্থান কো-অপারেটিভ ইন্সিওরেন্স কোম্পানীর বোম্বাই শাখায় ম্যানেজারের পদে নিযুক্ত হইয়াছেন। সুরেশবাবুর মত যোগ্য লোকের নিয়োগে হিন্দুস্থান বীমা কোম্পানী বিশেষ প্রশংসার্হ হইয়াছে।

শ্রীসুরেশচন্দ্র মজুমদার

এই প্রসঙ্গে বলা যায় যে, হিন্দুস্থান বীমা কোম্পানী দিন দিন উন্নতির পথে অগ্রসর হইতেছে। গত বৎসর এই কোম্পানী দুই কোটি টাকার বীমার কাজ করিয়াছে। ঐ বৎসরে এই কোম্পানীর বোম্বাই শাখাতেই প্রায় পঞ্চাশ লক্ষ টাকার কাজ হইয়াছে।

ভারতবর্ষ

প্রবাসী বঙ্গসাহিত্য-সম্মেলন—

প্রবাসী বঙ্গসাহিত্য-সম্মেলনের আগামী অধিবেশন গোরখপুরে হইবে। গোরখপুর নিজেই দর্শনীয় স্থান। তদ্ভিন্ন বৌদ্ধ ইতিহাসে বিখ্যাত কয়েকটি স্থান উহার নিকটবর্ত্তী। সম্মেলনের গত অধিবেশন প্রয়াগে হইয়াছিল। তাহার কয়েকটি চিত্র প্রকাশিত করিলাম।

প্রবাসী বঙ্গসাহিত্য-সম্মেলনের সভাপতি, অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি এবং মহিলা পুরুষ প্রতিনিধিবর্গ

প্রবাসী বঙ্গসাহিত্য-সম্মেলনে মহিলা প্রতিনিধিবর্গ ও সভানেত্রী

প্রবাসী বঙ্গসাহিত্য-সম্মেলনের সম্পাদক, সহকারী সম্পাদক ও কোষাধ্যক্ষ এবং শিল্প প্রদর্শনীর সম্পাদক

প্রথম মুসলমান আই-সি এস্—

শ্রীযুত এনিস আহমেদ রাসদি গত আই-সি-এস্ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছেন। দিল্লীতে প্রতি বৎসর এই পরীক্ষা লওয়া হয় এ যাবৎ এই পরীক্ষায় যাহারা উত্তীর্ণ হইয়াছেন তাহাদের মধ্যে শ্রীযুত রাসদিই প্রথম মুসলমান।

এনিস আহমেদ রাসদি

প্রত্যাবর্ত্তন

শ্রীকেদারনাথ চট্টোপাধ্যায়

কবি ত আকাশপথে দেশের মুখে যাত্রা করলেন। রইলাম আমরা দু-জন শেসরক্ষা করতে। ঠিক করা গেল, বাকি ক'টা দিন দেশটা দেখে তার পর ঘরের ছেলে ঘরে ফেরা যাবে। কিন্তু দেশ দেখার কথা ভাবা এক এবং সেটা কাজে পরিণত করা অন্য কথা। এদেশ দ্রষ্টব্য ও বিশেষ দ্রষ্টব্যে ভরা, সুতরাং মায়াকাননে পথহারা পথিকের মত কোন্‌দিকে যাওয়া যাবে তাই ভেবে ঠিক করা দায় হ'ল। উত্তরে অসুর দেশের নিনেভাহ্, খোরশাবাদ, বিরস্ নিমরুদ, অসুর, এরবিল, কাছাকাছি বাবিলনীয় সিপার বাবিলন, দক্ষিণে উর, লাগাশ, টেলো, এবং অন্য কুড়ি পঁচিশটি ঐতিহাসিক স্থল ত আছেই, উপরন্তু সেলুসিয়া, সামারা, টেসিফন এবং মুসলমানী তীর্থ কেরবেলা, নেজেফ্ ইত্যাদি অসংখ্য দেখবার জায়গা রয়েছে, এর মধ্যে সময়ে কুলায় এ রকম দেখে কতকগুলি বেছে নিতে হবে। ওদিকে মরুভূমিতে গ্রীষ্মের দুর্দ্দান্ত প্রতাপ আরম্ভ হয়েছে, উত্তাপ ১০০°-১০২° পর্য্যন্ত প্রায় সব জায়গাতেই, এবং যেদিকেই যাই ঐ মরুভূমি পার না হয়ে পথ নেই। ভেবে দেখলাম, সব দেখা মার্কিনী টুরিষ্টেরও অসাধ্য এবং বেশী ভাবতে গেলে কিছুই দেখা হবে না, সুতরাং প্রথমে উত্তর মুখে সীমানার দিকে যাওয়াই শ্রেয়।

ইতিপূর্ব্বেই আভ্যন্তরীণ বিভাগের মন্ত্রী-মহাশয়ের ওখানে

বাগদাদ। নদীতীরে উদ্যান-সম্মিলন

যাওয়া-আসা ক'রে শ্রীযুক্ত ইব্রাহিম বেগ হিল্‌মীর অনুগ্রহে তিনটি আদেশপত্র পেয়েছিলাম। একটি সকল প্রাদেশিক শাসনকর্ত্তাদের উপর- আমাদের যাতায়াত থাকা খাওয়া ইত্যাদির সমস্ত ব্যবস্থা করতে। দ্বিতীয়টি রেল-বিভাগের উপর—আমাদের মালপত্র সমেত ট্রেনে যাবার সকল ব্যবস্থা করতে। তৃতীয়টি অন্য সকল রাজকর্ম্মচারীদের উপর সকল বিষয়ে আমাদের সাহায্য করতে। প্রত্যেকটি চিঠিতেই রাজাদেশ অনুসারে মন্ত্রীমহাশয়ের স্বাক্ষর ছিল।

ইরাকী আরব যুবতী

বলা বাহুল্য, এই আদেশপত্রগুলি আলাদীনের দীপের কাজ দিয়েছিল, যখন যা প্রয়োজন তখনই তা পাওয়া গিয়েছিল।

* * *

৩০শে রাত্রে মোসলের পথে রওনা হওয়া গেল। কিরকুক্ পর্য্যন্ত ট্রেন, তারপর ১২০ মাইল মোটরে যেতে হবে। শ্রীযুক্ত হিল্‌মী ও অন্য বন্ধুরা এসে ষ্টেশনে বিদায় নিলেন। ট্রেনে গার্ড এবং একজন সামরিক বিভাগের উচ্চকর্ম্মচারীকে আমাদের বিষয় তাঁরা ব'লে দিলেন। ফলে

ইরাকী সাধারণ মুসলমান যুবতী

মহাসুখে খেয়ে-দেয়ে ঘুমিয়ে রাত্রি যাপন করলুম। ভোরে কিরকুক্ পৌছান গেল।

কিরকুক ষ্টেশনে গভর্ণর এবং প্রধান ম্যাজিষ্ট্রেট আমাদের অভ্যর্থনা ক'রে নিয়ে গেলেন। তাঁদের ইচ্ছা ছিল যে আমরা সেদিন ওখানে থেকে পরদিন মোসল্ যাই। আমাদের অন্য ব্যবস্থা শুনে তাঁরা দুঃখিত হলেন এবং বললেন (দোভাষী মারফৎ) যে ওখানেও দ্রষ্টব্য অনেক কিছু আছে। উপায় ছিল না, কাজেই সব অনুরোধ এড়িয়ে প্রাতরাশের পরই রওনা হওয়া গেল। বেলা তখন প্রায় দশটা, রোদও বেশ

প্রখর হয়ে উঠেছে, তবে এদিকটা একেবারে মরুভূমি নয় বলে তখনও বুঝিনি যে গরমটা পরে কি রকম হবে।

গাড়ীটা ভাল, যদিও টুরিং বডি হওয়ায় ধূলা ও গরম বাতাসের হল্‌কা একটু বেশীই লেগেছিল। চালক ভাঙা

ক্যালডীয় নারী। বধূবেশে

উর্দ্দু বল্‌তে পারে —যুদ্ধের সময় দিশী সৈন্যদের কাছে শিখেছিল। সঙ্গে এক জন সশস্ত্র সেপাই (আরব) সে নিজের ভাষা ছাড়া আর কিছু জানে না। ঘণ্টাখানেক জোরে গাড়ী চালাবার পর চারি ধারে উঁচুনীচু পাহাড়ের মধ্যে অনেকগুলি টিনের ঘর দেখা দিল। তারপর ছোটখাট একটি শহর দেখলাম। তার এক অংশে কতকগুলি সুন্দর 'বাংলো"-ধরণের বাড়ি, অন্যদিকে কুলির বস্তি ও প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড তেলের ট্যাঙ্ক এবং চারিদিক ছেয়ে সরুমোটা পাইপ লাইন রয়েছে। চালক বল্‌লেন, এই হ'ল এখানকার প্রসিদ্ধ তেলের খনি।

শহরের ভিতর দিয়ে পার হয়ে আসল খনির সীমানার মধ্যে ঢোকা গেল। রাস্তাঘাট অতি সুন্দর, সারাপথ কালো টার-ম্যাকাডম করা, এবং মাঝে মাঝে একটি ক'রে খুব উঁচু ইস্পাতের কড়ি বরগার তৈরী পিঞ্জর মঞ্চ। মঞ্চের মধ্যে মোটা ইস্পাতের নল দেখা যাচ্ছে, সেটা মাটির ভিতর কোন্ পাতালে চলে গেছে। এই নলের ভিতর দিয়ে পাতালের তেল খনির ভিতরের গ্যাসের চাপে উপরে ওঠে, এবং অন্য নল দিয়ে ব'য়ে দূরে প্রধান নলের ভিতরে চলে যায়। এই প্রধান নলটি কিরকুক্ হয়ে ৪০০ মাইল দূরে আবাদানের কাছে তেল চোয়ান কারখানা পর্য্যন্ত গিয়েছে, তেলের স্রোত খনি থেকে সেখান পর্য্যন্ত নিজের গতিতে চলে যায়। সেখানে তেল চুইয়ে পেট্রোল, কেরোসিন, মোটা তেল, খনিজ চর্ব্বি, অ্যাসফ্যাল্ট ইত্যাদিতে বিভক্ত করা হয়। এই পাতালের ঐশ্বর্য্যের জন্যই আজকালের যুদ্ধবিগ্রহ এবং আন্তর্জ্জাতিক গোলমালের সৃষ্টি, অথচ তার উৎপত্তিস্থলে কেবলমাত্র ইস্পাতের পিঞ্জর এবং ইঞ্জিনিয়ারদের ঘরবাড়ি, বাকী সব চুপচাপ, চারিধারে নির্জ্জন তৃণশস্প শূন্য প্রান্তর!

এখানকার খনি আবিষ্কার হয় "বাবা গুড়্‌গুড়্‌" নামে এক জায়গার প্রাকৃতিক অগ্নিকুণ্ড দেখে। সেখানে আমরা গিয়ে দেখলাম চারিদিকে পাহাড় ঢিপি ঘেরা একটু নাবাল জমি, পরিমাণে দু-তিন বিঘা মাত্র, তারই জায়গায় জায়গায় মাটিতে

অসংখ্য গর্ত্ত হয়ে গেছে। সেই গর্ত্তগুলির মুখ দিয়ে আগুনের শিখা দেখা যাচ্ছে, কখনও বেশী, কখনও কম, এবং মৃদু বিস্ফোরণের মত শব্দও মাঝে মাঝে শোনা যাচ্ছে। আরও কিছু দূরে দেখা গেল মাটির ফাটলের ভিতর দিয়ে অবিরাম ধূমরাশি উঠে চারিধার অন্ধকার ক'রে ফেলছে।

আরও খানিক এদিক ওদিক দেখে পুনর্ব্বার মোটরে ওঠা গেল। বেলা যতই এগিয়ে যায়, গরমও যেন আরও বিষম হয়ে উঠে। খানিক পরে বুঝতে পারলাম চড়াই আরম্ভ হয়েছে। সামনে কোনও উঁচু পাহাড় দেখা যায় না, দেখা যায় কেবল নীচু পাহাড়ের সারি—একটা পার হলেই তার চেয়ে উঁচু আর এক সারি।

নেবী য়ুনুস। নিনেভার এক অংশ এর নীচে আছে

কিরকুক। খনির ধুম উদ্গার

একটি ছোট শহরে পৌছান গেল, সেখানে এক দল ইংরেজ সৈন্য দুটি এরোপ্লেন মোটর লরীতে নিয়ে চলেছে দেখলাম। উত্তর সীমানায় পার্ব্বত্য অঞ্চলের এক শেখ বিদ্রোহী হয়েছেন, তাঁকে সায়েস্তা করার জন্য এই আয়োজন।

মরু-বহর

ছোট নদীর উপর সেতু দিয়ে পার হয়ে শহরে প্রবেশ ক'রে একটি ছোট সরাইয়ে চা খেয়ে একটু ঠাণ্ডা হওয়া গেল।

খানিক পরে আবার রওনা হলাম। এবার টাইগ্রিস নদী ক্রমেই কাছে এসে পড়েছে, বুঝলাম কিছু পরে পার হ'তে হবে।

কিরকুক। বাবা গুড়গুড়। দূরে তৈলবাহী নল

শেষে এক জায়গায় নদীর উঁচু পাড়ের গায়ে এসে রাস্তা শেষ হয়ে গেল। চালক মহাশয় বিনা বাক্যব্যয়ে সেই পাড়ের ঢালু গা দিয়ে মোটর চালিয়ে দিলেন। কোথাও গড়িয়ে, কোথাও পিছলে, কোথাও বা লাফিয়ে মোটর ত নদীর চড়ায় নেমে এল, কিন্তু ঐ কয়েক শ' গজের উৎরাইয়ের মধ্যেই আরব

যে, তিনি আমাদের এখানে আসা সম্বন্ধে কোনও খবর পেয়েছেন কি-না এবং যদি পেয়ে থাকেন তাহ'লে কি ব্যবস্থা হয়েছে। হোটেলওয়ালা বিদেশী (সিরীয় খ্রীষ্টান), সে প্রথমে টেলিফোন করতে চাইল না, পরে আদেশপত্রে নাজি পাশার স্বাক্ষর দেখে (ইনি নৃপতি ফৈজলের যুদ্ধবিগ্রহে সহায়ক এবং এখন আভ্যন্তরীণ বিভাগের মন্ত্রী) ভরসা ক'রে টেলিফোন করল। টেলিফোনে জবাব এল সেক্রেটারী বলছেন, গভর্ণর ঘুমোচ্ছেন এখন তাঁকে বিরক্ত করা চলবে না। হোটেলওয়ালাকে বললাম, "ঐ আদেশপত্রটা পড়ে শোনাও, তারপর ওদিক থেকে কি জবাব আসে দেখ।" সেটা পড়ে শোনাতে সেক্রেটারী মশায় গভর্ণরকে খবর দিতে গেলেন। ফের জবাব এল "গভর্ণর এ-বিষয়ে কোনও খবর পান নি, সুতরাং কিছু করতে পারবেন না এবং অসময়ে ঘুম ভাঙায় তিনি মহা বিরক্ত হয়েছেন" এই বলেই টেলিফোন কেটে দিল।

মোসল্। নদীর অন্যপার হইতে দৃশ্য

কি করা যায় তাই হোটেলওয়ালাকে বললাম, আর একবার ডেকে বল যে আমরা কবির সঙ্গে এদেশে এসেছি, এতদূর এসে যদি বৃথা ফিরে যেতে হয় ত বড়ই দুঃখিত হব। হোটেলওয়ালা কিছুতেই আর ফোন করতে রাজী নয়, সে বললে, "যা করেছি তার জন্যেই আমায় অশেষ বিব্রত হ'তে হবে, আর একবার বিরক্ত করলে রক্ষা থাকবে না, গভর্ণর
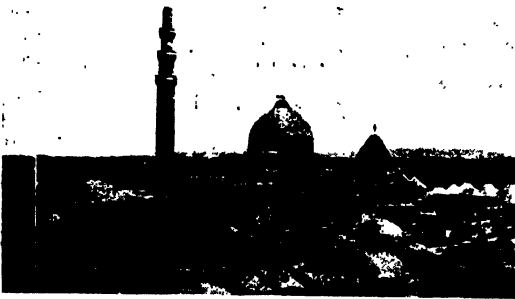
নেবী শীট। নিনেভার এক অংশ এর নীচে আছে

তুর্কী জেনারেল ছিলেন, নূতন আমলে ইরাকী হয়েছেন বটে, কিন্তু মেজাজ ঐ রকমই আছে।"

কিন্তু আমাদেরও অন্য উপায় নেই, কাজেই তাকে বললাম আমি লিখে দিচ্ছি যে আমিই জোর ক'রে টেলিফোন করিয়েছি এবং যদি কিছু তাতে গোলমাল হয় ত জবাবদিহি আমিই করব। এটা লিখে তাতে আদেশপত্রগুলির নকল রেখে আমার পাসপোর্টের নম্বর দিয়ে স্বাক্ষর করতে তবে সে ফের টেলিফোন করল। করবার পরই দেখি সে অনুনয়-বিনয় করছে, তার ছেলে পাশে দাঁড়িয়ে আমার চিঠির অনুবাদ ক'রে যাচ্ছে এবং সে সেটা ফোনে বলে যাচ্ছে। খানিক পরে সে মুখ চুণ ক'রে বললে, "কিছু হ'ল না, গভর্ণর ভয়ানক চটেছেন, তিনি বলছেন কিছু করতে পারবেন না এবং তাঁকে অসময়ে বিব্রত করার জন্য আমাকে দায়ী করছেন। আপনার কোন লাভ হ'ল না, মাঝ থেকে আমি বিপদে পড়লাম।" আমি বললাম "ভয় কি? আমি পুলিসে এজাহার দিয়ে সব ঠিক ক'রে রাখব।"

শেষ চেষ্টা হিসাবে তাকে বললাম, কিরকুকের গভর্ণরকে টেলিফোন ক'রে বলতে যে আমরা এখনই কিরকুক রওনা হচ্ছি, তিনি যেন অনুগ্রহ ক'রে পর দিন সকালের ট্রেনে আমাদের বাগদাদ ফেরার ব্যবস্থা করেন।

জবাব এল আমাদের এ-রকম হঠাৎ ফেরার কারণ কি? উত্তরে যা ঘটেছে জানাতে বল্লাম। ফের জবাব এল, আমরা যেন

অনুগ্রহ করে পনর মিনিট অপেক্ষা করি, এর মধ্যে কোনও খবর না পেলে তবে যেন রওয়ানা হই।

যা হয় হবে ভেবে স্নান আহার করতে গেলাম। সবে খাচ্ছি এমন সময় খবর এল গভর্ণর টেলিফোনে ডাকছেন। গিয়ে শুনলাম যে, কিরকুকের কর্ম্মচারীদের দোষে এই গোলমাল হয়েছে, মোসলের মেয়র এখনি আসছেন সমস্ত ব্যবস্থা করতে এবং আমরা যদি প্রয়োজন মনে করি তাহলে গভর্ণর স্বয়ং আসবেন। তাঁকে জানালাম যে, তাঁর আসবার কোনই প্রয়োজন নেই এবং অসময়ে বিরক্ত করার জন্য আমরা দুঃখিত। তাতে তিনি বললেন, আমরা এ রকম করেছি এর জন্য তিনি ধন্যবাদ দিচ্ছেন, কেন না, তা না হ'লে তাঁর অতিথির প্রতি অসম্মানের দোষ হ'ত। হাঁপ ছেড়ে বাঁচলাম, কিরকুকের চালক ও সেপাইকে ছেড়ে দিলাম, তারাও বাঁচল—কিন্তু বখশিস্ কিছুতেই নিল না, আরব অতিথির কাছে বখ্‌শিস্ কি নেবে এই বলে—অমিয় বাবুর মুখও প্রসন্ন হ'ল।

মেয়র মহাশয় এলেন। অল্পবয়স, কিন্তু আভিজাত্যের পূর্ণ লক্ষণযুক্ত, শুভ্রকান্তি প্রিয়দর্শন ব্যক্তি। তাঁর সঙ্গে বেরিয়ে পড়া গেল, হোটেলওয়ালার ছেলে চললেন সঙ্গে দোভাষী হিসাবে।

প্রথমে মোসলের শহর দেখে, নদীপার হয়ে নিনেভার স্তূপরাশি, পরে খোরশাবাদ, এই-সব দেখে অনেক রাত্রে হোটেলে ফিরে আসা গেল। পথে অনেক কথাই হয়েছিল যাতে বুঝলাম ইনি জগতের বিষয় অনেক খবরই রাখেন এবং সে সম্বন্ধে বিশেষ চিন্তাও ক'রে থাকেন।
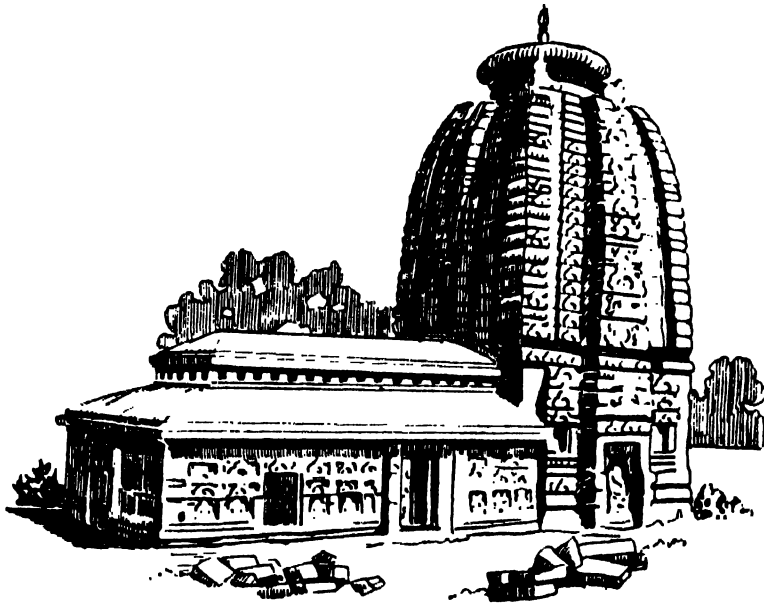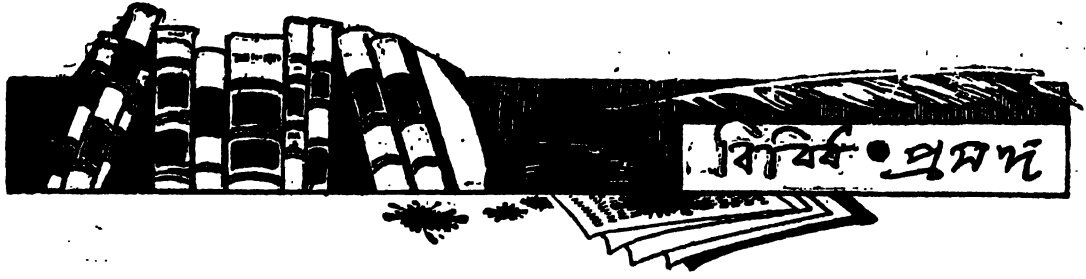
আমেরিকায় রবীন্দ্রনাথকে হত্যা করিবার চেষ্টা হইয়াছিল কি ?

গত ২৫শে আষাঢ়ের ষ্টেটস্‌ম্যান কাগজে একটা খবর বাহির হয়, যে, রবীন্দ্রনাথ যখন গত মহাযুদ্ধের সময় আমেরিকা ভ্রমণ করিতে যান, তখন সেখানে পঞ্জাবী গদর ("বিদ্রোহ") দলের লোকেরা তাঁহার প্রাণ বধ করিবার চেষ্টা করিয়াছিল। এ বিষয়ে প্রকৃত তথ্য জানিবার জন্য চিঠি লিখিয়াছিলাম। উত্তরে রবীন্দ্রনাথ জানাইয়াছেন—

"যখন সান্ ফ্রান্‌সিস্কোয় বক্তৃতায় আহূত হয়ে গিয়েছিলুম··· বোধ হয় ১৯১৬ খৃষ্টাব্দে একজন গুপ্তচর আমার হোটেলে এসে আমাকে খবর দিলে যে, সেখানকার গদর পার্টি আমাকে হত্যা করবার চক্রান্ত করচে— তাদের হাত থেকে আমাকে বাঁচাবার জন্যে এরা কয়েক জন সর্ব্বদা আমার সঙ্গে সঙ্গে থাকবার ব্যবস্থা করেচে। আমি বল্লুম, আমি বিশ্বাস করিনে।···সে বল্লে, তুমি বিশ্বাস করো বা না করো তোমাকে রক্ষা করা আমাদের কর্ত্তব্য, কারণ, তুমি আমাদের অতিথি। তারা হোটেলে আমাদের পাশের ঘরে স্থান নিলে। আমি যখন বক্তৃতা করতে যেতেম তারা আমার সঙ্গেই যেত, বক্তৃতার সময় প্ল্যাটফরমে আমার কাছেই বসত। ইতিমধ্যে এক দিন শুনতে পেলুম, হোটেলের লবি-তে কয়েক জন শিখদের মধ্যে আমার সম্পর্কে মারামারি হয়ে গিয়েছিল তাই নিয়ে হোটেলের কর্ত্তারা তাদের বের ক'রে দেয়। ঝগড়ার কারণ সম্বন্ধে আমি এই শুনেছিলুম যে, এক দল আমার সঙ্গে দেখা করতে চেয়েছিল, কিন্তু যারা আমার প্রতিকূল তারা বাধা দিতে এসেছিল। সত্য কারণটা কী নিশ্চিত জানবার উপায় ছিল না। শহরে প্রথম যখন এলুম এরা আমাকে বক্তৃতা দিতে ডেকেছিল। একটা জিনিষ লক্ষ্য করেছিলুম, আমাকে এরা অভ্যর্থনা করে নি, এবং অপ্রসন্ন ভাবে বসে ছিল— আমার বক্তৃতার ভাব কিছু বুঝতে পেরেছিল কি না জানি নে, বোধ হয় পারে নি। এদের এই অদ্ভুত আচরণ নিয়ে পিয়র্স‌নের সঙ্গে আমার আলোচনা হয়েছিল। সেবার আমেরিকায় আমার বক্তৃতার বিষয় ছিল ন্যাশনালিজ্‌ম্। পাশ্চাত্যে প্রচলিত ন্যাশনালিজমের বিরুদ্ধে আমি বলেছিলুম। পিয়র্স‌ন অনুমান করেছিলেন, হয় তো সেটা গদর দলের অনুমোদিত ছিল না। যাই হোক, তার পরে এদের সঙ্গে আর আমার সাক্ষাৎ হয় নি। না হবার একটা কারণ, আমার রক্ষকদের কাছ থেকে এরা বাধা পেয়েছিল। কোনো ভারতবর্ষীয় দল আমাকে হত্যা করবার সঙ্কল্প করেছে এ-কথা আমি শেষ পর্য্যন্ত বিশ্বাস করতে পারি নি,— যারা আমাকে রক্ষা করবার উপলক্ষ্যে সর্ব্বদা আমার অনুসরণ করত তাদের প্রতি আমি বারম্বার বিরক্তি প্রকাশ করেছি। সান্‌ফ্রান্সিস্কোর কাজ শেষ ক'রে যখন লস্ এঞ্জেলিস্-এ গেলেম তখনো এরা আমার সঙ্গে ছিল, কিন্তু আমার অগোচরে।"

—

শান্তিনিকেতনে বিদ্যালয়ের উৎপত্তি

আমরা সবাই জানি, শান্তিনিকেতনে ব্রহ্মচর্য্যাশ্রম নাম দিয়া বিদ্যালয় স্থাপন করেন রবীন্দ্রনাথ, এবং তাহাতে তাঁহার পিতৃদেব মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের সম্মতি ছিল। কয়েক বৎসর পূর্ব্বে অধুনালুপ্ত 'ক্যাথলিক হেরাল্ড অব্ ইণ্ডিয়া' নামক রোমান ক্যাথলিকদের কাগজে লিখিত হয়, যে, উহা ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায় স্থাপন করেন। ঐরূপ কথা সম্প্রতি আবার "রিন্যাসেণ্ট ইণ্ডিয়া" (Renascent India)"নবজাত ভারত" নামক একখানি পুস্তকে লিখিত হইয়াছে। উহার রোম্যান ক্যাথলিক গ্রন্থকার ডক্টর জ্যাকারিয়াস লিখিয়াছেন—

"They [Brahmabandhav Upadhyaya and Animananda] started in Calcutta a school for high-caste Hindus, . . .and after a few months were joined there by a third companion, Rabindranath Tagore, son of the famous Maharshi Devendra Nath Tagore, and of the same age as Upadhyaya. Rabindranath prevailed

upon them to transfer their school to a country-seat of his father, near Bolpur: and thus began Santiniketan. . . ."

শান্তিনিকেতনের উৎপত্তির এই বৃত্তান্ত ঠিক নয় জানিতাম। তথাপি এ-বিষয়ে রবীন্দ্রনাথের বক্তব্য জানিবার জন্য চিঠি লিখিয়াছিলাম। রবীন্দ্রনাথ দুর্বল থাকায় তাঁহার সেক্রেটরী শ্রীযুক্ত অমিয়চন্দ্র চক্রবর্ত্তী লিখিয়াছেন—

"রবীন্দ্রনাথ সংক্ষেপে এই কথা জানাইতে বলিলেন, যে, শান্তিনিকেতন আশ্রম প্রতিষ্ঠিত হইবার পর উপাধ্যায় ব্রহ্মবান্ধবের সহিত তাঁহার কলিকাতায় সাক্ষাৎ হয়। উপাধ্যায় কিছু দিন ধরিয়া রবীন্দ্রনাথের 'নৈবেদ্য' ও অন্যান্য গ্রন্থ সম্বন্ধে নানা পত্রিকায় অতি নিপুণ বিচক্ষণ সমালোচনা প্রকাশ করিতেছিলেন। তাহা পাঠ করিয়া রবীন্দ্রনাথ পূর্ব্বেই তাঁহার প্রতি আকৃষ্ট হন। রবীন্দ্রনাথের সহিত যখন উপাধ্যায়ের কলিকাতায় সাক্ষাৎ হয় তখন তিনি কবির নিকট প্রস্তাব করেন যে, তিনি এবং তাঁহার এক বন্ধু (অণিমানন্দ) কবির আশ্রমে যোগ দিতে ইচ্ছুক, যেহেতু আশ্রমের কাজ সম্বন্ধে তাঁহাদের পূর্ব্বের অভিজ্ঞতা আছে এবং দুই জনেই শান্তিনিকেতন আশ্রমের আদর্শ এবং কর্ম্ম সম্বন্ধে বিশেষ শ্রদ্ধাবান। রবীন্দ্রনাথ তাঁহাদের দুই জনকে বিশেষ আনন্দের সহিত আহ্বান করেন। অণিমানন্দকে তিনি জানিতেন না। যতদিন তাঁহারা শান্তিনিকেতনে ছিলেন কর্ম্মব্যবস্থার দিক হইতে এবং অন্যান্য নানা বিষয়ে তাঁহাদের সাহায্য বিশেষ কুশলপ্রদ হইয়াছিল।"

বহ্বারম্ভে লঘুক্রিয়া, না অক্রিয়া, না অপক্রিয়া?

যখন ভারতসচিব মণ্টেগু এবং বড়লাট চেম্সফোর্ডের আমলে ভারতবর্ষের শাসনপ্রণালী কতকটা সংশোধিত ও নূতন করা হয়, তখন বলা হইয়াছিল ভারতবর্ষকে ক্রমে ক্রমে জনসাধারণের নিকট অধিক হইতে অধিকতর দায়ী গবর্ন্মেণ্ট দেওয়া হইবে এবং সেই উদ্দেশ্যে দশ বৎসর পরে কমিশন বসাইয়া দেখা হইবে ভারতবর্ষের লোকেরা অধিকতর রাষ্ট্রীয় অধিকার পাইবার যোগ্য হইয়াছে কি-না। তদনুসারে সাইমন কমিশন বসে এবং তাহার সহকারী সমগ্রভারতীয় এবং প্রাদেশিক নানা কমিটি বসে। সাইমন কমিশন এবং তাহার সহযোগী কমিটি-সমূহ অনুসন্ধান করিয়া ও সাক্ষ্য লইয়া রিপোর্ট দেয়। রিপোর্টের সুপারিশসমূহ অনুসারে কাজ করিবার আগে ভারত-গবর্ন্মেণ্ট তৎসমুদয় আলোচনা ও বিবেচনা করিয়া নিজেদের মতামত প্রকাশ করেন। কিন্তু সাইমন কমিশন বা ভারত-গবর্ন্মেণ্ট কাহারও কোন প্রস্তাব অনুসারে কাজ হয় নাই। সুতরাং তাহার জন্য অর্থব্যয় ও পরিশ্রম বৃথা হইয়াছে।

অতঃপর ব্রিটিশ গবর্ন্মেণ্ট তথাকথিত গোল টেবিল বৈঠক বসান। তিন তিন দফা বহুদিনব্যাপী অধিবেশন এই গোল টেবিল বৈঠকের হয়। তাহার বিবেচনার্থ উপাদানসংগ্রহ ও সুপারিশ করিবার জন্য কতকগুলি কমিটিও কাজ করে। কমিটিগুলির রিপোর্ট বাহির হয়, গোল টেবিল বৈঠকের অধিবেশনগুলিরও রিপোর্ট বাহির হয়। কিন্তু এত টাকা খরচ এবং এই পরিশ্রমও ব্যর্থ হইয়াছে। কারণ, ব্রিটিশ গবর্ন্মেণ্ট হোয়াইট পেপার বা সাদা কাগজ নাম দিয়া যে প্রস্তাবসমষ্টি বাহির করিয়াছেন, তাহাতে গোল টেবিল বৈঠকের সমুদয় সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় নাই। হোয়াইট পেপারের প্রস্তাবগুলি অনুসারেও কাজ হইবে না। বিলাতী পার্লেমেণ্টের সাধারণ (কমন্স) ও অভিজাত (লর্ডস) কক্ষদ্বয়ের সভ্য কয়েক জন করিয়া লইয়া একটি জয়েণ্ট পার্লেমেণ্টারি কমিটি নিযুক্ত হইয়াছে। তাঁহারা সাক্ষ্য লইতেছেন, এবং অতঃপর রিপোর্ট দিবেন। হোয়াইট পেপারের কোন প্রস্তাব গ্রহণ করিতে এই কমিটি বাধ্য নহেন। সুতরাং হোয়াইট পেপারের প্রস্তাবাবলী রচনা ও প্রকাশ করিতে যে সময় শ্রম ও অর্থের ব্যয় হইয়াছে, তাহাকেও সার্থক বলা যায় না।

জয়েণ্ট পার্লেমেণ্টারি কমিটি রিপোর্ট দিলে ব্রিটিশ গবর্ন্মেণ্ট নূতন ভারতশাসন-বিধির বিল বা খসড়া প্রস্তুত করিবেন। তাহাতে তাঁহারা কমিটির রিপোর্ট অনুসরণ করিতে বাধ্য থাকিবেন না। সুতরাং কমিটির রিপোর্টটারও কোন চূড়ান্ততা থাকিবে না। ভারতশাসন-বিধি বিল পার্লেমেণ্টে যদি অপরিবর্ত্তিত বা পরিবর্ত্তিত আকারে পাস হয়—পাস না-হইতেও পারে, কারণ চার্চিল প্রমুখ একদল পার্লেমেণ্ট সভ্য বিরোধিতা করিবে, তাহা হইলেও আইনে পরিণত বিলটি অনুসারে যে অচিরে ভারতবর্ষে কাজ হইবে তাহা নহে। তৎপূর্ব্বে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক স্থাপিত হওয়া দরকার

এবং তাহা স্থাপনের যে-সব সর্ত্ত হোয়াইট পেপারে বর্ণিত আছে, সে-সব পূর্ণ হওয়া কঠিন। তদ্ভিন্ন, ভারতবর্ষের যে-আট কোটি লোক দেশী রাজাদের অধীনে বাস করে, তাহাদের মধ্যে অন্যন চারি কোটির নৃপতিরা তাঁহাদের রাজ্যগুলিকে ভারতীয় ফেডারেশ্যন বা সম্মিলিত রাষ্ট্রের অন্তর্ভূত করিতে রাজী হওয়া চাই। তাঁহাদের রাজী হওয়া বা না-হওয়া গবর্ন্মেণ্টের অপ্রকাশ্য ইঙ্গিতজাতীয় আদেশের উপর নির্ভর করিবে।

যাহা হউক, ধরিয়া লওয়া যাক্, যে, এই সমস্তই অল্পাধিক সময়ে হইয়া যাইবে। কিন্তু তাহার পরই নূতন শাসনবিধি প্রবর্ত্তিত হইবে না। অতঃপর পার্লেমেণ্টের সাধারণ ও অভিজাত কক্ষদ্বয় সম্মিলিত ভাবে ইংলণ্ডেশ্বরকে অনুরোধ করিবেন তাঁহারা তাহা করিতে বাধ্য নহেন—যে, তিনি ঘোষণাপত্র দ্বারা ভারতবর্ষে নূতন শাসনবিধি প্রবর্ত্তিত করুন। ব্রিটেন-নৃপতি এইরূপ ঘোষণা করিলে তবে ভারতবর্ষে নূতন আইনানুযায়ী শাসন-প্রণালী প্রবর্ত্তিত হইবে।

এ পর্য্যন্ত ভারতবর্ষকে নূতন শাসন-প্রণালী দিবার জন্য যে-সব কাজ হইয়া আসিতেছে, তাহাতে কিছু দিবার ইচ্ছা বা লক্ষণ দেখা যাইতেছে না। ইংরেজীতে যাহাকে বলে শেল্‌ভিং অর্থাৎ ফেলিয়া রাখা বা টালিয়া দেওয়া, ব্যাপারটা সেই জাতীয়, অথবা তার চেয়েও অনিষ্টকর কিছু। বিলাতী কর্ত্তারা যেন কত কম দেওয়া যায়, যাহা দেওয়া হইয়া গিয়াছে তাহার কত বেশী অংশ কৌশলপূর্ব্বক প্রত্যাহার করা যায়, এবং ব্রিটিশ প্রভুত্ব কি প্রকারে দৃঢ়তর ও স্থায়ী করা যায়, তাহাই আবিষ্কার করিবার চেষ্টা ক্রমাগত করিয়া আসিতেছেন!

কপট মিথ্যা ওজুহাৎ

হোয়াইট পেপারে ভবিষ্যৎ শাসন-বিধির যে আভাস পাওয়া যায়, তাহাতে শাসনকর্ত্তাদের প্রভুত্ব আরও বাড়াইবার এবং দেশের লোকদের সামান্য যে অধিকার আছে তাহা কমাইবার বন্দোবস্ত আছে। সুতরাং ওরূপ শাসন-প্রণালী আমরা চাই না। আমরা উহা চাই না এই কারণে, যে, উহাতে আমাদের ইষ্ট না হইয়া অনিষ্ট হইবে।

বিলাতে চার্চিল, লয়েড, ওডোয়াইয়ার প্রভৃতি ব্যক্তিরাও উহার বিরুদ্ধে আন্দোলন করিতেছে। তাহাদের আন্দোলনের যে কারণ প্রকাশ করা হইতেছে, তা ছাড়া অপ্রকাশ্য কারণও খুব সম্ভব আছে। প্রকাশ করা হইতেছে, যে, হোয়াইট পেপারে যে-সব প্রস্তাব আছে, তাহা কার্য্যে পরিণত হইলে ভারতবর্ষে ব্রিটিশ প্রভুত্ব লুপ্ত হইবে, এবং তাহার ফলে অরাজক অবস্থা উপস্থিত হইবে। চার্চিল ও তাহার দলের লোকেরা এই প্রস্তাব-সমূহকে য়্যাব্‌ডিকেশন অর্থাৎ রাজত্ব-ত্যাগ বা প্রভুত্ব-ত্যাগ বলিতেছে। কিন্তু বাস্তবিক এ কথা মিথ্যা। হোয়াইট পেপারে প্রকৃত প্রভুত্ব-ত্যাগের লেশমাত্রও নাই, ত্যাগের ছদ্মবেশে প্রভুত্ব বৃদ্ধি এবং নূতন ক্ষমতা গ্রহণই আছে। রাজত্ব-ত্যাগ বা প্রভুত্ব-ত্যাগের যে বিকট কোলাহল তোলা হইয়াছে, তাহার প্রকৃত উদ্দেশ্য বোধ হয় দু-রকম। প্রথম, দর বাড়ান। অর্থাৎ এই চীৎকারে বোকা ভারতবাসীরা মনে করিতে পারে, যে, তাহাদিগকে খুব বড় কিছু একটা দেওয়া হইতেছে এবং সেই ধারণাবশতঃ তাহারা হোয়াইট পেপার অনুযায়ী শাসনবিধি চাহিতে পারে; তাহা হইলে তাহাদের দাসত্ব ভাল করিয়া কায়েম হইবে, অথচ তাহারা মনে করিবে, যে, তাহারা স্বরাজ পাইতে বসিয়াছে। দ্বিতীয় উদ্দেশ্য, হোয়াইট পেপারের প্রস্তাবগুলাতে ব্রিটিশ-প্রভুত্ব রক্ষা করিবার ও বাড়াইবার জন্য যত রকম উপায় নির্দ্দেশিত আছে, তাহা অপেক্ষা আরও বেশী ঐরূপ উপায় বিধিবদ্ধ করান।

প্রকাশিত ও অপ্রকাশ্য উদ্দেশ্য সকল সিদ্ধ করিবার জন্য সাম্রাজ্যবাদীরা সকল রকম বৈধ বা গর্হিত উপায় অবলম্বন করিতেছে। 'য়্যাবডিকেশ্যন বা রাজ্যত্যাগ করা হইতেছে," এই মিথ্যা কোলাহল একটা উপায়। আর একটা উপায়, সাধারণতঃ প্রাচ্য লোকদের এবং বিশেষ করিয়া ভারতবর্ষীয় লোকদের স্বশাসনক্ষমতার অভাব ঘোষণা করা। যেমন বোম্বাইয়ের ভূতপূর্ব্ব গবর্ণর লর্ড লয়েড এক বক্তৃতায় বলিয়াছেন,

"I do not believe that responsible self-government can ever succeed in eastern countries."

"The story of self-government for India was a tragic one. There was no municipality in India which did not crash into bankruptcy again and again during the last few years."

"প্রাচ্য দেশসমূহে দায়িত্বপূর্ণ স্ব-শাসন কখনও সফল হইতে পারে বলিয়া আমি বিশ্বাস করি না।"

কেন জাপানে ও পারস্যে ত উহা সফল হইয়াছে? ওগুলি ত প্রাচ্য দেশ? অপর-শাসন অর্থাৎ ভারতবর্ষে ব্রিটিশ-শাসনই কি সফল হইয়াছে? তাহার নমুনা পরে দিতেছি।

"ভারতবর্ষে স্বায়ত্তশাসনের ইতিহাস দুঃখাবহ। ভারতবর্ষে এমন কোন মিউনিসিপালিটি নাই, যাহা গত কয়েক বৎসরে পুনঃ পুনঃ দেউলিয়া হয় নাই।"

ইহা সম্পূর্ণ মিথ্যা কথা, অথচ এই মিথ্যাবাদী লোকটা বোম্বাইয়ের গবর্ণর হইবার যোগ্য বিবেচিত হইয়াছিল। যদি ভারতবর্ষের প্রত্যেক মিউনিসিপালিটি বার-বার দেউলিয়া হইত, তাহা হইলে প্রত্যেক প্রাদেশিক গবর্ণর—স্বয়ং লর্ড লয়েডই সমুদয় মিউনিসিপালিটিতে স্বায়ত্তশাসন বন্ধ করিয়া ম্যাজিষ্ট্রেটী শাসন চালাইতেন—যাহা অতি অল্পসংখ্যক মিউনিসিপালিটিতে কখন কখন করা হইয়াছে। কিছু দিন পূর্ব্বে বিলাতের বিখ্যাত চুটকী প্রবন্ধের কাগজ টিট্‌বিট্‌সে তথাকার স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন প্রতিষ্ঠানগুলিতে যে-রূপ অপব্যয় আদির বৃত্তান্ত দেওয়া হইয়াছে, তাহাতে মনে হয় দোষটা ভারতবর্ষ অপেক্ষা বিলাতেই বেশী আছে।

—

কপট ওজুহাতের উপর প্রতিষ্ঠিত বিলাতী সংঘ

ভারতীয়দের স্বরাজ পাইবার চেষ্টা ব্যর্থ করিবার নিমিত্ত এক এক জন ইংরেজ কি করিতেছে, তাহা লিখিবার ও তাহার সমালোচনা করিবার সময় ও জায়গা নাই। থাকিলেও তাহা করা পণ্ডশ্রম হইত। কারণ, আমাদের কাগজ ইংরেজরা (১৪ জন বাদে) পড়ে না, ভারতীয়রা পয়সা খরচ করিয়া সত্য কথা টেলিগ্রাফ করিলে অধিকাংশ বা কোনই বিলাতী কাগজ তাহা ছাপে না, এবং সর্ব্বোপরি মনে রাখিতে হইবে, যে সত্য দেখিবে না ও শুনিবে না বলিয়া প্রতিজ্ঞা করিয়াছে তাহাকে সত্য জানান অসম্ভব। তথাপি ব্রিটিশ জাতির মধ্যে ভারতবর্ষ সম্বন্ধে অজ্ঞতা কত বেশী এবং তাহাদের মধ্যে কত বেশী লোক আত্মপ্রতারণা বা কপটতা করে, তাহার দৃষ্টান্তস্বরূপ ইণ্ডিয়া ডিফেন্‌স্ লীগ বা ভারত-রক্ষণ সংঘ নামক বিলাতী প্রতিষ্ঠানটির কিছু বর্ণনা দিতেছি।

লয়েড, কিপলিং, চার্চিল ইত্যাদি সমুদয় "ভারতরক্ষী" ইহার প্রধান সভ্য। ভারতবর্ষকে ইহাঁরা ভারতবাসীদের শাসন হইতে রক্ষা করিতে দৃঢ়সংকল্প। এই সংঘটি স্থাপন করিবার কারণ ও উদ্দেশ্য নিম্নলিখিত রূপ বর্ণিত হইয়াছে।

The publication of the Government's proposals for Indian Constitutional Reform (the White Paper) has created a sensation of great uneasiness throughout the British Empire.

The commitments of Parliament in regard to Indian Constitutional development must be honoured in letter and spirit, but equally binding are the obligations that Great Britain has incurred in regard to the welfare and advancement of the Indian peoples. The White Paper proposals in many important respects must cause profound and increasing anxiety to all who value the work that Britain has wrought in India. The establishment of so-called democratic institutions in the Provinces at the same time as responsible government is set up at the Centre would, in the existing state of Indian society, whatever the "safeguards," hazard the lives, the liberties, and the fortunes of 350,000,000 of our fellow subjects.

In particular the transference of the Judiciary and the Police is a step fraught with grave danger to all concerned.

No representative body of Indians accepts or can undertake to work such a Constitution.

To imperil the peace of India, to jeopardize the vast trade that has brought so much benefit and employment to both communities, to strike at the main and central strength of the British Empire by such an experiment would be, in our judgment, a fatal dereliction of duty.

It is right and imperative that those who desire to see the British mission in India faithfully discharged and the solidarity of the King's Dominions preserved should join themselves together in consultation and common action.

The India Defence League has been formed to give effect to the above stated principles, and to bring the question in all its aspects before the British people.

তাৎপর্য্য—

"ভারতবর্ষের শাসনসংস্কার-প্রস্তাব সম্বলিত হোয়াইট পেপার প্রকাশে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের সর্ব্বত্র বিশেষ ভাবনার উদ্রেক হইয়াছে।

ভারতবর্ষের শাসনসংস্কার সম্বন্ধে পার্লেমেণ্টের অঙ্গীকার অক্ষরে অক্ষরে প্রতিপালন করিতে হইবে বটে, কিন্তু ভারতবাসীদের মঙ্গল ও উন্নতির জন্য গ্রেট ব্রিটেনের দায়িত্বও স্বীকার করিতে হইবে। ভারতবর্ষে ব্রিটেনকৃত কার্য্য-সকল যাঁহারা মূল্যবান বিবেচনা করেন তাঁহাদের মনে হোয়াইট পেপারের প্রস্তাবসমূহ কতকগুলি দরকারী বিষয়ে গভীর ও ক্রমবর্দ্ধমান চিন্তার সৃষ্টি করিয়াছে। রক্ষাকবচগুলি থাকা সত্ত্বেও ভারতবর্ষের বর্ত্তমান অবস্থায় কেন্দ্রীয় গবর্ণমেণ্টের সঙ্গে সঙ্গে বিভিন্ন প্রদেশে গণতন্ত্রমূলক শাসন-প্রণালী প্রতিষ্ঠিত হইলে আমাদের ৩৫০,০০০,০০০ জন ভারতীয় ভ্রাতার জীবন, স্বাধীনতা এবং ধনসম্পদ বিপন্ন হইবে।

বিশেষতঃ, পুলিস ও বিচার বিভাগ হস্তান্তরিত হইলে বিশেষ বিপদের সম্ভাবনা। এইরূপ শাসন-প্রণালী ভারতবর্ষের কোন জনসমষ্টি গ্রহণ করেন না, বা গ্রহণ করিয়া কার্য্যকর করিতে পারিবেন না।

ভারতবর্ষের শান্তি বিপন্ন করিলে, যে-ব্যবসা ভারতবাসী ও ইংরেজ উভয় সম্প্রদায়ের এত উপকার করিয়াছে ও কার্য্য যোগাইয়াছে তাহা

নষ্ট হইতে দিলে, এরূপ শাসন প্রণালী প্রবর্ত্তন করিয়া ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের প্রধান ও কেন্দ্রীয় শক্তিকে ব্যাহত করিলে আমাদের বিবেচনায় কর্ত্তব্য-পালনে মারাত্মক ত্রুটি ঘটিবে।

ভারতবর্ষে ইংরেজের 'মিশন' পুরাপুরি সম্পন্ন হউক এবং ব্রিটিশ ডোমিনিয়নগুলি অচ্ছেদ্য বন্ধনে আবদ্ধ থাকুক ইহা যাঁহারা চান তাঁহাদের সম্মিলিত হইয়া পরামর্শ ও কার্য্য করিবার সময় আসিয়াছে।

এই সকল বিষয় কার্য্যে পরিণত করিবার ও তাহা ইংরেজ জনসাধারণের নিকট বিশদভাবে প্রচার করার জন্য ভারত-রক্ষণ সংঘ গঠিত হইল।

বর্ণনাপত্রটির সমুদয় অংশের আলোচনা করা অনাবশ্যক। কেবল একটি কথা সম্বন্ধে কিছু বলিতে চাই। সেইটিই প্রধান কথা। সংঘের কর্ত্তারা বলিতেছেন, ভারতবর্ষের লোকদের মঙ্গল ও উন্নতিপ্রগতির দায়িত্ব ব্রিটেন গ্রহণ করিয়াছেন, এবং তদুদ্দেশ্যে ব্রিটেন যাহা করিয়াছেন, হোয়াইট পেপারের প্রস্তাবগুলি কার্য্যে পরিণত হইলে তাহাতে বাধা পড়িবে।

এই ধরণের কতকগুলি কথা লর্ড রদারমিয়ার বিলাতী ডেলী মেল কাগজে ৯ই জুন লিখিয়াছেন। (ডেলী মেলের দৈনিক কাটতি কুড়ি লক্ষের উপর)। ভারতরক্ষণ সংঘের মূল কথাটার সহিত একসঙ্গে আলোচনার জন্য লর্ড রদারমিয়ারের কয়েকটা কথাও উদ্ধৃত করিতেছি। হোয়াইট পেপার অনুসারে কাজ হইলে ইংরেজরা ভারতবর্ষ হারাইবে, ইহা চার্চিল আদির মত, তাঁহারও মত।

তিনি বলেন—

"Before we went to India it was a land decimated constantly by famine, plague, and cholera."

"আমরা ভারতবর্ষে যাইবার আগে ইহা দুর্ভিক্ষ, প্লেগ এবং কলেরা দ্বারা সর্ব্বদা বিষম লোকক্ষয়াধীন ছিল।"

অর্থাৎ ইংরেজরা আসিবার পর ভারতবর্ষে দুর্ভিক্ষ, প্লেগ এবং কলেরা আর হয় নাই, এবং এখন ত হয়ই না! অধিকন্তু ইহাও ধ্রুব সত্য, যে, রদারমিয়ারের পূর্ব্বপুরুষেরা দুর্ভিক্ষ, প্লেগ, এবং কলেরার আকর্ষণে ভারতবর্ষে আসিয়াছিলেন, ধনের আকর্ষণে নহে!

যাহা হউক, ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদীরা যে বলিতেছেন, যে, তাঁহারা ভারতের মঙ্গলসাধন ও উন্নতিপ্রগতিবিধানের ভার লইয়াছেন এবং সেই ভার ত্যাগ করিতে পারেন না, এবং তাঁহারা তাহা ত্যাগ করিতে বাধ্য হইলে আমাদের ভীষণ দুর্গতি হইবে, সেই দুর্গতিটা বর্ত্তমান অবস্থা অপেক্ষা খারাপ হইবে কি-না, তাহা ভাবিবার বিষয়। ভাবিতে হইলে বর্ত্তমান অবস্থাটা কিরূপ জানা দরকার।

আধুনিক কালে কোন দেশের অবস্থা ভাল বলিলে, অন্য অনেক কিছুর মধ্যে ইহাও বুঝায় যে ঐ দেশে শিক্ষার বিস্তার হইয়াছে। অন্যান্য দেশের তুলনায় ভারতবর্ষে শিক্ষার অবস্থা কিরূপ দেখা যাক। ১৯৩১ সালের সেন্সস্ অনুসারে ভারতবর্ষের অধিবাসীদের মধ্যে শতকরা ৯১ (বিরানব্বই) জনের উপর নিরক্ষর। অন্য কতকগুলি দেশে কোন্ বৎসরে শতকরা কত জন নিরক্ষর ছিল, তাহার তালিকা প্রধানতঃ ১৯৩৩ সালের হুইটেকারের পঞ্জিকা হইতে নীচে দিতেছি।

দেশ	বৎসর	শতকরা কত জন নিরক্ষর
ভারতবর্ষ	১৯৩১	৯১ এর উপর
তুরস্ক	১৯২১	৯০
মিশর	১৯২৭	৮৫.৭
ব্রাজিল	১৯২০	৬৭
পোর্ত্তুগাল	১৯২০	৬৫
মেক্সিকো	১৯২১	৬৮.৯
সোভিয়েট রাশিয়া	১৯২৬	৪৮.৭
স্পেন	১৯২০	৪৬
গ্রীস	১৯২৮	৪১
পোল্যাণ্ড	১৯২১	৩২.৭
ইটালী	১৯২১	২৬.৮
আমেরিকার নিগ্রোরা	১৯৩০	১৬.৩

উপরের তালিকায় সব দেশগুলিরই অঙ্ক ভারতবর্ষের চেয়ে আগেকার সময়ের। তাহারা স্বাধীন বলিয়া ইতিমধ্যে শিক্ষায় অগ্রসর হইয়াছে। সোভিয়েট রাশিয়া গত পাঁচ বৎসরে এ-বিষয়ে বিস্ময়কর উন্নতি করিয়াছে। আমেরিকার নিগ্রোদের সম্বন্ধে মনে রাখিতে হইবে, যে, তাহারা ১৮৬৫ সালের ১৮ই ডিসেম্বর পর্য্যন্ত দাস (স্লেভ্) ছিল, তাহাদের লেখাপড়া করা ও তাহাদিগকে লেখাপড়া শেখান আইনানুসারে দণ্ডনীয় অপরাধ ছিল, এবং তাহাদের নিজের কোন আফ্রিকান্ বর্ণমালা বা সাহিত্য ছিল না। তাহারা দাসত্বমুক্ত হইবার পর এরূপ শিক্ষালাভের সুযোগ পাইয়াছে, যে, ৬৫ বৎসরে তাহাদের শতকরা ৮৩.৭ জন লিখনপঠনক্ষম হইয়াছে। অন্যদিকে, ভারতীয়দের প্রাচীন বর্ণমালা, সাহিত্য ও সভ্যতা ছিল, এবং এখনও আছে। তাহারা ব্রিটিশ-শাসনকালে শিক্ষার সুযোগ এরূপ পাইয়াছে, যে, তাহাদের মধ্যে শতকরা আট জনের কম লিখনপঠনক্ষম এবং বিরানব্বইয়ের অধিক নিরক্ষর।

আধুনিক কালে কোন দেশের অবস্থা ভাল বলিলে ইহাও বুঝায়, যে, ঐ দেশটিকে স্বাস্থ্যকর অবস্থায় রাখা হইয়াছে বলিয়া

এবং তথাকার লোকদের খাইবার পরিবার যথেষ্ট সঙ্গতি এবং সুস্থ থাকিবার অন্য সব উপায় থাকায় তাহাদের গড় আয়ুষ্কাল অন্যান্য সভ্যদেশের লোকদের আয়ুষ্কালের মোটামুটি সমান বা কাছাকাছি। কোন্ সময়ে কোন্ দেশে গড়ে মানুষ কত বৎসর বাঁচিবার আশা করিতে পারিত, তাহার একটি তালিকা নীচে দিতেছি।

কত বৎসর বাঁচিবার আশা করিতে পারে

দেশ।	খৃষ্টাব্দ।	পুরুষ।	নারী
নিউজীল্যাণ্ড	১৯২১—২২	৬২.৭৬	৬৫.৪৩
অষ্ট্রেলিয়া	১৯২০—২২	৫৯.১৬	৬৩.২৯
ডেন্মার্ক	১৯২১—২৫	৬০.৩০	৬১.৯০
ইংলণ্ড	১৯২০—২২	৫৫.৬২	৫৯.৫৮
নরোয়ে	১৯১১—২০	৫৫.৬২	৫৮.৭১
সুইডেন	১৯১১—২০	৫৫.৬০	৫৮.৩৮
আমেরিকার সম্মিলিত রাজ্য	১৯১৯—২০	৫৫.৩৩	৫৭.৫২
হল্যাণ্ড	১৯১০—২০	৫৫.১০	৫৭.১০
সুইজারল্যাণ্ড	১৯২০—২১	৫৪.৪৮	৫৭.৫০
ফ্রান্স	১৯০৮—১৩	৪৮.৫০	৫২.৩২
জার্মেনী	১৯১০—১১	৪৭.৪১	৫০.৬৮
ইটালী	১৯১০—১২	৪৬.৫৭	৪৭.৭৯
জাপান	১৯০৮—১৩	৪৪.২৫	৪৪.৭৩
ভারতবর্ষ	১৯০১—১০	২২.৫৯	২৩.৩১

ভারতবর্ষের যে অঙ্ক দেওয়া হইয়াছে, বর্ত্তমানেও উহা প্রায় অপরিবর্ত্তিত আছে। উহা হইতে ভারতবর্ষের আর্থিক ও স্বাস্থ্যিক অবস্থার পরিচয় পাওয়া যায়।

উপরের তালিকাগুলি হইতে বুঝা যাইবে, যে, শিক্ষা, এবং খাদ্যদ্রব্য, বস্ত্র, বাসস্থান ও স্বাস্থ্যের অন্যান্য ব্যবস্থায় ভারতবর্ষের অবস্থা অতি হীন। সুতরাং ভারতবর্ষের প্রভুত্ব ইংরেজের হাত হইতে গিয়া ভারতীয়দের হাতে আসিয়া পড়িলে যে ভয়ঙ্কর অবস্থা হইবে বলিয়া ভয় দেখান হইতেছে, তাহা আরও কিরূপ অপকৃষ্ট হইবে, তাহার বিশদ বর্ণনা আবশ্যক। নতুবা ভারতবর্ষের লোকেরা ভয় না পাইতেও পারে।

ভাইকাউণ্ট রদারমিয়্যারের প্রবন্ধ হইতে আরও কয়েকটি কথা উদ্ধৃত করিব। তিনি বলিতেছেন—

"The whole of the Indian agitation is a sham and hypocrisy. It is kept alive by the money of cotton mill-owners and money-lenders, who hope by forcing Britain out of her wonderful Empire in the East to have at their mercy a vast population to despoil and plunder."

"ভারতবর্ষীয় আন্দোলনের সবটাই ফাঁকি ও ভণ্ডামি। কাপড়ের মিলের মালিকদের ও মহাজনদের টাকা এই আন্দোলনকে বাঁচাইয়া রাখিয়াছে। ব্রিটেনকে প্রাচ্যে তাহার আশ্চর্য্য সাম্রাজ্য হইতে তাড়াইয়া দিয়া তাহারা এক বিশাল জন-সমষ্টিকে নিজেদের মুঠার মধ্যে পাইয়া লুণ্ঠন করিতে পারিবার আশা রাখে।"

ইহার উপর টিপ্পনী অনাবশ্যক। তবে লেখক অজ্ঞাতসারে নিজের প্রবন্ধেই যে টিপ্পনী করিয়াছেন, তাহা তুলিয়া দেওয়া অনাবশ্যক না হইতে পারে। তিনি লিখিয়াছেন-

"Britain is the most dangerously overpopulated country in the world. This overpopulation would not have been possible except for our association with India and our other Eastern Possessions. They brought great wealth to us to the extent, so it is computed, of more than a fifth of our national income and wealth.

"When we lose them a crisis of almost unparalleled gravity will occur, and the young men and women of the country will know that all that lies ahead of them is a life of searching and immeasurable poverty."

"পৃথিবীর মধ্যে ব্রিটেন সর্ব্বাপেক্ষা বিপজ্জনকরূপে অতিজনাকীর্ণ দেশ। ভারতবর্ষ এবং আমাদের অধিকৃত অন্যান্য প্রাচ্য দেশগুলির সহিত সংস্রব ব্যতিরেকে ইহা সম্ভব হইত না। গণনা করা হইয়াছে, যে, আমাদের জাতীয় আয় ও সম্পত্তির এক-পঞ্চমাংশের উপর প্রভূত ধন ভারতবর্ষ-আদি দেশ আমাদিগকে দিয়াছে।

"এ দেশগুলি আমরা হারাইলে প্রায় অতুলনীয়রূপে সঙ্গীন একটা সঙ্কট অবস্থা ঘটিবে, এবং আমাদের দেশের তরুণ তরুণীরা জানিবে, যে, তাহাদের সামনে দারুণ ও অপরিমেয় দারিদ্র্যের জীবন পড়িয়া রহিয়াছে।"

তাই বলুন! ভারতের মঙ্গলসাধনের এবং তাহার উন্নতি-প্রগতি-বিধানের দায়িত্ব ছাড়িতে পারেন না, সেটা মুখোস; আসল কথা, আপনারা ভারতবর্ষের ধনে ধনী হইয়াছেন, তাহার মায়া কাটাইতে পারেন না। বলিতেছেন, আপনাদিগকে তাড়াইয়া ভারতীয় বস্ত্রব্যবসায়ী ও মহাজনেরা সব টাকা লুটিবে। যদি তাহা সত্যই হয়—আমরা তাহা সত্য মনে করি না, তাহা হইলে তাহার মানে এই হইবে, যে, এক এক জন রদারমিয়্যারের জায়গায় এক এক জন করীমভাই বা সারাভাই ধনী হইবে। ইংরেজদের হাতে টাকা না গিয়া কতকগুলি ভারতীয়ের হাতে গেলে তাহাতে ভারতবর্ষের ক্ষতি কি? ভারতবর্ষের সব ধনী না হউক, কোন কোন ধনী ভারতের হিতার্থে টাকা দেন কিন্তু রদারমিয়্যাররা কি দেয়?

—

স্যর রাজেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়

স্যর রাজেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের অশীতিতম জন্মোৎসব

গত মাসে স্যর রাজেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের অশীতিতম জন্মোৎসব হইয়া গিয়াছে। আমরা এই উপলক্ষ্যে তাঁহাকে অভিনন্দিত করিতেছি এবং তাঁহার আরও দীর্ঘ জীবন কামনা করিতেছি। তাঁহার বয়স অধিক হইয়াছে বটে, কিন্তু তিনি বেশ কার্য্যক্ষম আছেন এবং নিজের কাজ নিয়মিত রূপে করিয়া থাকেন। এই জন্য ভারতবর্ষ আশা করিতে পারে, যে, তিনি আরও অনেক বৎসর নিজের নির্ব্বাচিত বৃত্তির অনুসরণ দ্বারা দেশকে সমৃদ্ধ করিতে পারিবেন, ভারতীয়দের কর্ম্মশক্তির খ্যাতি বৃদ্ধি করিতে পারিবেন, এবং সঙ্গে সঙ্গে নিজের নির্ব্বাচিত দেশহিতকর কার্য্যও করিতে থাকিবেন। তিনি বিখ্যাত ইঞ্জিনীয়ার,

পণ্যশিল্প-কারখানার মালিক ও ব্যবসায়ী বলিয়া সুবিদিত, কিন্তু তিনি যে বঙ্গের অন্যতম প্রধান হিতকর্মী, তাহা অনেকে জানেন না। নিজের কাজ সম্বন্ধে জ্ঞান, নিয়মিত শ্রমশীলতা এবং চরিত্রবত্তার বলে তিনি সামান্য অবস্থা হইতে কৃতিত্ব ও সমৃদ্ধির শিখরে উপনীত হইয়াছেন।

পাঁচটি লেডী টাটা বৃত্তি

বোম্বাইয়ের লেডী টাটার ন্যস্ত সম্পত্তির আয় হইতে পাচ জন ভারতীয় বৈজ্ঞানিক গবেষককে মাসিক দেড়শত টাকায় গবেষণা-বৃত্তি দেওয়া হইয়াছে। ইঁহারা মানুষের দুঃখনিবারণকল্পে নানাবিধ গবেষণা করিবেন। গবেষণা প্রধানতঃ ঔষধাদি বিষয়ক। যে পাচ জন বৃত্তি পাইয়াছেন, তাঁহাদের নাম—নীরদচন্দ্র দত্ত, এম্-এসসি; সুধেন্দুকুমার গাঙ্গুলী, এম্-বি; নরেন্দ্রনাথ ঘটক, এম্-এসসি; মাট্টেনগুণ্টা বেঙ্কট রাধাকৃষ্ণ রাও, এম্-বি, বি-এস্; এবং হরদয়াল শ্রীবাস্তব, এম্-এস। পাচ জনের মধ্যে তিনজন বাঙালী। তাহা হইলে দেখা যাইতেছে, সব বাঙালী যুবকের বৈজ্ঞানিক গবেষণা করিবার শক্তি লুপ্ত হয় নাই।

পরলোকগত জগদানন্দ রায়

শান্তিনিকেতনের অধ্যাপক শ্রীযুক্ত জগদানন্দ রায় মহাশয়ের আকস্মিক পরলোকগমনে অতীতের সহিত ঐ প্রতিষ্ঠানটির অন্যতম বন্ধনসূত্র ছিন্ন হইল। তিনি উহা প্রতিষ্ঠিত হইবার অল্পকাল পর হইতেই উহাতে শিক্ষা দিয়া আসিতেছিলেন, এবং কিছুদিন পূর্ব্বে অবসর গ্রহণ করিবার পরও একটি শ্রেণীতে শিক্ষা দিতেন। গণিত ও বিজ্ঞান শিখাইতে তিনি বিশেষ পারদর্শী ছিলেন। তাঁহার শিক্ষানৈপুণ্য এবং ছাত্রহিতৈষণার গুণে তিনি ছাত্রদের শ্রদ্ধা ও প্রীতি অর্জ্জন করিয়াছিলেন। যাঁহারা তাঁহার নিকট বিদ্যালয়ে শিক্ষালাভ করিয়াছেন, তাঁহারা ছাড়া অনেক বেশীসংখ্যক বাঙালী বালক-বালিকাকে তাঁহার ছাত্র বলিতে পারা যায়। নানা বৈজ্ঞানিক বিষয়ে তিনি সহজ ও সরস ভাষায় অনেক বাংলা বহি লিখিয়া গিয়াছেন। তাহা পড়িয়া ঐ সকল বালক-বালিকার এবং তাহাদের বয়োজ্যেষ্ঠদেরও বৈজ্ঞানিক বিষয়ে জ্ঞান জন্মিয়াছে। মৃত্যুর পূর্ব্ব পর্য্যন্তও তিনি এইরূপ পুস্তক রচনায় ব্যাপৃত ছিলেন। তিনি কার্য্যক্ষম ছিলেন, বয়সও বোধ করি ষাটের বড় বেশী হয় নাই। সেই জন্য আমরা আশা করিয়াছিলাম, তিনি আরও অনেক সহজ

জগদানন্দ রায়

বৈজ্ঞানিক বহি লিখিয়া যাইতে পারিবেন। বাংলা ভাষায় বৈজ্ঞানিক সাহিত্যের উন্নতি ও বিস্তৃতি সাধনার্থ একটি কার্য্যপদ্ধতি প্রস্তুত করিবার নিমিত্ত কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় একটি কমিটি নিযুক্ত করিয়াছেন। জগদানন্দ বাবু তাহার সভ্য ছিলেন।

শিশুরা নানা প্রাকৃতিক বিষয়ে ক্রমাগত 'কেন," "কেন," প্রশ্ন করে। তাহার উত্তরে তাহারা মনঃকল্পিত বাজে কথা শুনিতে পায়, কিংবা ধমক খায়। আমরা জগদানন্দ বাবুকে এইরূপ অনেক প্রশ্ন যথাসম্ভব সংগ্রহ করিয়া তাহার বৈজ্ঞানিক উত্তরপূর্ণ একখানি বাংলা বহি লিখিতে অনুরোধ করিয়াছিলাম। তিনি এই কাজ করিবার জন্য প্রস্তুত হইতেছিলেন।

জগদানন্দ বাবু বিজ্ঞানের অনুশীলন করিতেন এবং তাঁহার রসবোধও ছিল। তিনি একজন দক্ষ অভিনেতা ছিলেন।

মান্দ্রাজ প্রেসিডেন্সীতে বাঙালী

তামিল, তেলুগু, কানাড়ী ও মলয়ালম মান্দ্রাজ প্রেসিডেন্সীতে প্রচলিত চারিটি প্রধান ভাষা। বাংলা দেশে তামিল-ভাষী ৫৮৫৫ জন, তেলুগু-ভাষী ৩৩১১৫ জন, কানাড়ী-ভাষী ১০৯ জন এবং মলয়ালম ভাষী ৩৬৫ জন লোক ১৯৩১ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে লোকসংখ্যাগণনার সময় ছিল। ঐ সময়ে মান্দ্রাজ প্রেসিডেন্সীতে বঙ্গভাষী লোক ছিল মাত্র দুই হাজার; ১৯২১ সালে ছিল এক হাজার। আগেকার চেয়ে কিছু বেশী বাঙালী যে এখন মান্দ্রাজ প্রেসিডেন্সীতে উপার্জ্জন করিতেছে, ইহা মন্দের ভাল। কিন্তু বাঙালীদের মনে রাখিতে হইবে, যে, বঙ্গে বেকার-সমস্যা অন্য সব প্রদেশের চেয়ে কঠিন, বাঙালী নিজের দেশে খাইতে পায় না, অথচ অন্যান্য প্রদেশের যত লোক এখানে আসিয়া রোজগার করিতে পারে তদপেক্ষা খুব কম বাঙালী সেই সব প্রদেশে গিয়া উপার্জ্জন করে। বাঙালীদের বাংলা দেশের সব রকম শ্রমের কাজে প্রবৃত্ত হওয়া কর্ত্তব্য. শ্রমবিমুখতা একেবারে বর্জ্জন করা উচিত। বাঙালীরা অন্যান্য প্রদেশের লোকদের চেয়ে ঘরকুনো। এই দোষও পরিহার করা উচিত। শিক্ষিত বাঙালী তত ঘরকুনো নয় যত অশিক্ষিত বাঙালীরা ঘরকুনো।

দিল্লী প্রদেশে বাঙালী

১৯৩১ সালে ফেব্রুয়ারী মাসে লোকসংখ্যাগণনার সময় দিল্লী প্রদেশে বাঙালী ছিল ৬৬০০। ১৯২১ সালে সেখানে বাঙালী ছিল ২৭০০। ১৯৩১ সালে সেখানে ওড়িয়া ছিল ১০০, তেলুগু-ভাষী ১০০, তামিল-ভাষী ১৬০০, গুজরাটী ৮০০।

বাঙালীদের একটি অসুবিধা

ভারত-সাম্রাজ্যে বিস্তৃতিতে বড় যে-কয়টি প্রদেশ আছে, তাহার মধ্যে সরকারী বাংলা প্রদেশ সকলের চেয়ে ছোট, অথচ ইহার লোক-সংখ্যা সকলের চেয়ে বেশী। নীচের তালিকা হইতে ইহা বুঝা যাইবে।

প্রদেশ।	কত হাজার বর্গমাইল।	লোকসংখ্যা কত নিযুত।
ব্রহ্মদেশ	২৩৩.৭	১৪.৬৭
মান্দ্রাজ	১৪২.৩	৪৬.৭৪
বোম্বাই	১২৩.৬	২১.৮০
আগ্রা-আযোধ্যা	১০৬.৩	৪৮.৪১
মধ্যপ্রদেশ-বেরার	৯৯.৯	১৫.৫১
পঞ্জাব	৯৯.০	২৩.৫৮
বিহার-উড়িষ্যা	৮৩.০৫	৩৭.৬৮
বাংলা	৭৭.৫	৫০.১১
আসাম	৫৫.০	৮.৬২

আয়তন বা বিস্তৃতি অনুসারে প্রদেশগুলিকে উপরে প্রথম হইতে নবম স্থান পর্য্যন্ত সাজান হইয়াছে। বৃহত্ত্বে সকলের চেয়ে বড় প্রদেশ ব্রহ্মদেশ, সকলের চেয়ে ছোট আসাম, বাংলা দেশ অষ্টমস্থানীয়। লোকসংখ্যা অনুসারে এবং বসতির ঘনতা অনুসারে প্রদেশগুলির স্থান নীচে প্রদর্শিত হইল। বসতির ঘনতা প্রতিবর্গ মাইলের লোকসংখ্যা দ্বারা দেখান হইয়াছে।

প্রদেশ।	লোকসংখ্যানুসারে স্থান।	বর্গমাইল প্রতি বসতির ঘনতা	বসতির ঘনতা অনুসারে স্থান
ব্রহ্মদেশ	৮ম	৬৩	৯ম
মান্দ্রাজ	৩য়	৩২৯	৪র্থ
বোম্বাই	৬ষ্ঠ	১৭৬	৬ষ্ঠ
আগ্রা-অযোধ্যা	২য়	৪৫৫	২য়
মধ্যপ্রদেশ-বেরার	৭ম	১৫৫	৮ম
পঞ্জাব	৫ম	২৩৮	৫ম
বিহার-উড়িষ্যা	৪র্থ	৪৫৪	৩য়
বাংলা	১ম	৬৪৬	১ম
আসাম	৯ম	১৫৭	৭ম

বিস্তৃতিতে অষ্টমস্থানীয় বাংলা দেশ লোকসংখ্যায় প্রথম-স্থানীয় এবং বসতির ঘনতাতেও প্রথমস্থানীয়। ইহার মানে এই, যে, বাংলা দেশে সকলের চেয়ে বেশী লোক প্রায় সকলের চেয়ে ছোট ভূখণ্ডে বাস করিতেছে। ইহা বাঙালীদের অসুস্থতার এবং বেশী পরিমাণে বেকার হইবার একটি কারণ। অবশ্য তাহারা বিরলবসতি অঞ্চলে গিয়া বাস করিতে যে পারে না, তাহা নহে। কিন্তু উর্ব্বর ভূখণ্ডে পুরুষানুক্রমে থাকিতে অভ্যস্ত হওয়ায় তাহারা কতকটা ঘরকুনো, শ্রমবিমুখ ও উদ্যোগহীন হইয়াছে। ম্যালেরিয়া এই-সব দোষ বাড়াইয়াছে। কিন্তু এই-সব দোষের প্রতিকার মানুষের সাধ্যাতীত নহে।

বাংলা দেশটা স্বভাবতঃ ছোট নয়। যে-ভূখণ্ডের অধিকাংশ লোকের ভাষা বাংলা, তাহা ছোট নয়। বৃহৎ

এইরূপ ভূখণ্ডের কতকগুলি বিরলবসতি, স্বাস্থ্যকর ও খনিজে সমৃদ্ধ টুকরা বিহার-উড়িষ্যার এবং অন্য ঐরূপ কতকগুলি টুকরা আসামের সহিত জুড়িয়া দিয়া বাংলাকে ক্ষুদ্র দেশে পরিণত করা হইয়াছে। ইহাতে বাঙালীদের স্বাস্থ্যের ক্ষতি, জাতীয় শক্তির হ্রাস এবং উপার্জ্জনের অসুবিধা হইয়াছে।

আসামের অধিকাংশ অধিবাসীর ভাষা বাংলা।

বাংলা দেশকে কৃত্রিম উপায়ে ছোট করিবার পর আরও এক প্রকারে বাঙালীর অসুবিধা জন্মান হইয়াছে। অন্যান্য প্রদেশের লোকের বঙ্গে চাকরি ও সাধারণ শিক্ষা পাইবার কোন বাধা নাই। কিন্তু বঙ্গের বাহিরে বাঙালীদের চাকরি পাইবার বাধা আছে। বিহার-বাসী বাঙালীরা অধিকন্তু শিক্ষালয়ে ভর্ত্তি হইতে এবং পরীক্ষায় পারদর্শিতা অনুসারে বৃত্তি পাইতে বিহারীদের মত অধিকারী নহে। এরূপ বাধা অন্য কোথাও কোথাও আছে।

—

ভাষা অনুসারে প্রদেশভাগ স্বাভাবিক

যে-বৃহৎ ভূখণ্ডের প্রধান ভাষা বাংলা, তাহার সমস্তটি বঙ্গের অন্তর্গত রাখা উচিত ছিল। আগে ইংরেজ রাজত্বকালে আমাদেরই জীবিতকালে তাহাই ছিল। কিন্তু অন্য কোন কোন ভাষাভাষীদিগকে এক প্রাদেশিক শাসনের অধীন করিবার জন্য নূতন প্রদেশ গঠিত হইতেছে, অথচ বাঙালীর প্রতি অবিচারের প্রতিকার হইতেছে না। আমরা অন্য কোন ভাষাভাষীদের সুবিধায় আপত্তি করি না, বরং তাহাই চাই। কিন্তু আমাদের যে স্বাভাবিক সুবিধা ছিল, তাহা হইতে আমাদিগকে বঞ্চিত করিলে তাহা সহ্য করিতে পারি না, করা উচিত নহে।

এই অসুবিধা একটা সাময়িক রাজনৈতিক আন্দোলনের ব্যাপার মাত্র নহে। রাষ্ট্রের এবং প্রদেশের সীমা যে ভাষা অনুসারে নির্দ্ধারিত হওয়া স্বাভাবিক, তাহা অনেক বিখ্যাত লেখকের মত। এইচ জি ওয়েল্‌স্‌ তাঁহার "আউট্‌লাইন অব হিষ্টরী" পুস্তকে লিখিয়াছেন :—

"It is extraordinarily inconvenient to administer together the affairs of peoples speaking different languages and so reading different literatures and having different general ideas, the people who talk German and base their ideas on German literature, the people who talk Italian and base their ideas on Italian literature, the people who talk Polish and base their ideas on Polish literature, will all be far better off and most helpful and least obnoxious to the rest of mankind if they conduct their own affairs in their own idiom within the ring-fence of their own speech. Is it any wonder that one of the most popular songs in Germany during this [Napoleonic] period declared that wherever the German tongue was spoken there was the German Fatherland ?

"...There is a natural and necessary political map of the world...There is a best possible way of dividing any part of the world into administrative areas, and a best possible kind of government for every area, having regard to the speech and race of its inhabitants, .." – *Outline of History*, by H. G. Wells, Chap. 36, section 6.

তাৎপর্য্য—

বিভিন্ন-ভাষা-ভাষী, বিভিন্ন সাহিত্যের পাঠক, ও বিভিন্ন চিন্তাধারার অনুবর্ত্তী লোকসমষ্টিকে একত্র শাসন করা অতিশয় অসুবিধাজনক। যাহারা জার্ম্মান ভাষা বলে ও জার্ম্মান সাহিত্য হইতে ধারণা সংগ্রহ করে, যাহারা ইতালিয়ান ভাষা বলে এবং ইতালিয়ান সাহিত্য হইতে ধারণা সংগ্রহ করে, যাহারা পোলিশ ভাষা বলে ও পোলিশ সাহিত্য হইতে ধারণা সংগ্রহ করে, তাহারা সকলেই যদি নিজেদের ভাষার পরিবেষ্টনীর মধ্যে আবদ্ধ থাকিয়া নিজেদের ভাষাতেই কাজকর্ম্ম সম্পন্ন করে, তাহা হইলে তাহারা নিজেরাও ভাল থাকিবে এবং পৃথিবীর অন্যান্য জাতির বেশী উপকার ও কম অনিষ্ট করিবে। এই [অর্থাৎ নেপোলিয়নের] যুগে জার্ম্মেনীর একটি অতি জনপ্রিয় গানে বলা হইয়াছিল যে, যেখানে জার্ম্মান ভাষা বলা হয়, সেখানেই জার্ম্মানদের মাতৃভূমি—ইহা কিছুমাত্র আশ্চর্য্যের বিষয় নহে।

"...পৃথিবীর একটি স্বাভাবিক রাজনৈতিক মানচিত্র আছে...পৃথিবীকে রাষ্ট্রীয় বিভাগে ভাগ করিবার ও স্থান-বিশেষকে শাসন করিবার একটি সর্ব্বোৎকৃষ্ট উপায় আছে...সে উপায় অধিবাসীদের ভাষা ও জাতীয় বৈশিষ্ট্যের প্রতি দৃষ্টি রাখা।"

শাসন ও অন্যবিধ রাষ্ট্রীয় কার্য্যের জন্য সমুদয় বাংলাভাষী জেলা ও মহকুমাগুলিকে এক প্রদেশের অন্তর্গত করিবার চেষ্টা ছাড়িয়া দেওয়া উচিত নয়। এরূপ একীকরণ রাষ্ট্রশক্তির সহায়তার উপর নির্ভর করে, এবং সে সহায়তা আমাদের একান্ত ইচ্ছা ও তজ্জনিত একাগ্র চেষ্টা ব্যতিরেকে পাওয়া যাইবে না। এই একান্ত ইচ্ছাকে জাগাইয়া রাখিয়া বাড়াইতে হইলে সমুদয় বাঙালীর কতকগুলি সম্মিলিত অনুষ্ঠান প্রতি বৎসরই হওয়া আবশ্যক। যেমন সাহিত্যিক সম্মেলন। বাঙালীদের সাহিত্যিক সম্মেলন যেখানেই হউক, বঙ্গ বিহার উড়িষ্যা ছোটনাগপুর ও আসামের বাঙালীদের এবং অপর সকল প্রদেশের প্রবাসী বাঙালীদের তাহাতে নিমন্ত্রণ হওয়া উচিত, এবং এই সমুদয় অঞ্চলের বাঙালীদের বা তাঁহাদের প্রতিনিধিদের তাহাতে উপস্থিতি একান্ত বাঞ্ছনীয়।

—

ডাক্তার পি কে রায়ের জীবনচরিত

সচরাচর ডাক্তার পি কে রায় নামে উল্লিখিত স্বর্গীয় আচার্য্য প্রসন্নকুমার রায় মহাশয় এক জন বিখ্যাত শিক্ষাদাতা, সমাজ-সংস্কারক এবং দর্শনবিৎ ছিলেন। তাঁহার অনেক প্রবীণ ছাত্র এখনও জীবিত আছেন। অন্য অনেকেও তাঁহাকে জানিতেন ও শ্রদ্ধা করিতেন। তাঁহারা সকলে শুনিয়া সুখী হইবেন, যে, গৌহাটী কটন কলেজের প্রিন্সিপ্যাল শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র রায় ডক্টর প্রসন্নকুমার রায় মহাশয়ের একটি জীবনচরিত লিখিতে ব্রতী হইয়াছেন। সতীশ বাবু দর্শনবিৎ, শিক্ষানুরাগী, এবং ডক্টর রায়ের প্রতি শ্রদ্ধান্বিত। এইজন্য আমরা আশা করিতেছি, যে, এই কাজটি তাঁহার দ্বারা উত্তমরূপে নির্ব্বাহিত হইবে।

ডক্টর রায়ের পত্নী শ্রীযুক্তা সরলা রায় মহোদয়া তাঁহার স্বামীর ডায়েরী, চিঠিপত্র, অপ্রকাশিত রচনাবলীর হস্তলিপি প্রভৃতি অনেক উপাদান সতীশ বাবুকে দিয়াছেন। ডক্টর রায়ের অনেক সহকর্ম্মী ও ছাত্র সতীশ বাবুকে সাহায্য করিতে প্রতিশ্রুত হইয়াছেন। যাঁহাদের নিকট তাঁহার লিখিত চিঠিপত্র বা অন্য উপাদান আছে, তাঁহারা তৎসমুদয় সতীশ বাবুকে গৌহাটী কটন কলেজের ঠিকানায় কিংবা শ্রীযুক্তা সরলা রায়কে ভবানীপুর হরিশ মুখুজ্যে রোডস্থিত গোখলে মেমোরিয়্যাল স্কুলে পাঠাইলে সেগুলির সদ্ব্যবহার হইবে।

আচার্য্য প্রসন্নকুমার রায় মহাশয়ের মৃত্যুর পর আমরা 'প্রবাসী'তে তাঁহার সম্বন্ধে কিছু লিখিয়াছিলাম। তাহা উপলক্ষ্য করিয়া তাঁহার একজন প্রাচীন ছাত্র তাঁহার ঢাকায় শিক্ষকতার সময়কার অনেক কথা চিঠির দ্বারা আমাদিগকে জানাইয়াছিলেন। চিঠিটি কোন সময়ে ব্যবহার করিব বলিয়া রাখিয়াছিলাম, কিন্তু এখন খুঁজিয়া পাইতেছি না। যদি ঐ পত্রের লেখকের চোখে এই কথাগুলি পড়ে, তাহা হইলে তিনি শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র রায়ের সহিত পত্রব্যবহার করিলে প্রীত হইব।

—

বেলডাঙ্গায় "সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা"

১৮৩৯ খ্রীষ্টাব্দে ডাক্তার টেলার কোর্ট উইলিয়মের সরকারী মেডিক্যাল বোর্ডের অনুরোধে "টপোগ্রাফি অব্ ঢাকা" নামক একটি বহি লেখেন। ঐ পুস্তকের নবম অধ্যায়ে ২৫৭ লিখিত আছে :—

"Religious quarrel between the Hindus and Mahomedans are of rare occurrence. These two classes live in perfect peace and concord, and a majority of the individuals belonging to them have even overcome their prejudices so far as to smoke from the same *hookah.*"

তাৎপর্য্য।

হিন্দু ও মুসলমানের মধ্যে ধর্ম্মঘটিত বিবাদ বিসম্বাদ কদাচ ঘটিয়া থাকে। এই দুই সম্প্রদায় সম্পূর্ণ শান্তিতে ও সদ্ভাবে বাস করে। তাহাদের মধ্যে অধিকসংখ্যক লোক সংস্কারের মোহ এতটা দূর করিতে পারিয়াছে যে, একই হুঁকায় উভয় সম্প্রদায়ের লোক ধূমপান করিয়া থাকে।

১৮২৮ সালে ওয়ালটার হামিণ্টন কর্ত্তৃক লিখিত "ঈষ্ট ইণ্ডিয়া গেজেটিয়ার" প্রকাশিত হয়। উহা তিনি ঈষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর কোর্ট অব্ ডিরেক্টর্স্‌কে তাঁহাদের অনুমতি লইয়া উৎসর্গ করেন। সুতরাং ইহাকে প্রায় সরকারী বহি বলা চলে। ইহার দ্বিতীয় ভল্যুমে ভারতবর্ষের নানা প্রদেশে হিন্দু ও মুসলমানদের পরস্পরের প্রতিবেশী রূপে শান্তিতে বাসের অনেক উল্লেখ আছে। কেবল একটি কথা উদ্ধৃত করিতেছি। "The two religions are on the most friendly terms" (Vol. ii, p. 478). 'এই দুটি ধর্ম্মসম্প্রদায়ের মধ্যে খুব বেশী বন্ধুভাব আছে।" ইহা বঙ্গের অংশ-বিশেষের সম্বন্ধে লিখিত।

এক শতাব্দী পূর্ব্বেকার এই বন্ধুভাব এখন আর নাই। তাহার পরিবর্ত্তে শত্রুতা বাড়িতেছে। ইহাতে ভারতবর্ষের কোন হিত—শক্তিবৃদ্ধি ধনবৃদ্ধি বা সুখবৃদ্ধি—হইতেছে না।

"সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা" সম্বন্ধে আমাদের কিছু লিখিতে ইচ্ছা হয় না। সব কথা জানা যায় না, দেশী লোকদের পরিচালিত কাগজগুলির সংবাদদাতা ও সম্পাদকেরা যাহা জানিতে পারেন, তাহাও সব ছাপিতে পারেন না। আমরা যাহা জানিতে পারি, তাহা খবরের কাগজে প্রকাশিত বেসরকারী বিবরণ ও সরকারী বিজ্ঞপ্তি (কম্যুনিকে) পাঠের ফল। তাহা ত আমাদের পাঠকেরাও আগেই পড়িয়াছেন।

কোথাও দাঙ্গা হইলে গবন্মেণ্ট তাহা শীঘ্র বা অল্পাধিক বিলম্বে দমন করেন। সব অপরাধী ধৃত হয় না। সকলের চেয়ে বেশী অপরাধী যে বা যাহারা তাহারা প্রায়ই ধৃত হয় না। যাহা হউক, কতক লোকের শাস্তি হয়।

ইহা যথেষ্ট নহে। দাঙ্গা যাহাতে না হয়, তাহার মত মনোভাব উৎপন্ন করিবার চেষ্টা করা গবর্মেণ্টের উচিত। ইহা গবর্মেণ্টের কোন বড় বা ছোট ইংরেজ কর্ম্মচারী করেন বলিয়া আমরা অবগত নহি। যদি কেহ করিয়া থাকেন, তাহার ঐতিহাসিক বৃত্তান্ত আমাদিগকে জানাইলে আমরা তাহা মুদ্রিত করিব।

রাষ্ট্রীয় বিধি এবং শাসনপ্রণালীর সমুদয় অংশ এরূপ হওয়া উচিত, যাহার দ্বারা সাম্প্রদায়িক দর্প বা অসন্তোষ ও ঈর্ষ্যাদ্বেষ না-বাড়িয়া যথাসম্ভব কমে।

"দাঙ্গা" হইয়া গেলে উভয় সম্প্রদায়ের কতকগুলি লোক জোড়াতাড়া-দেওয়া শান্তি স্থাপনের চেষ্টা করেন। কিছু না-করার চেয়ে ইহা ভাল। কিন্তু যখন "দাঙ্গা" হয় না, তখন স্থায়ী শান্তির অনুকূল প্রতিবেশীজনোচিত মনোভাব উৎপাদনের চেষ্টা হইলে তবে কিছু সুফল হইতে পারে। এরূপ হিতকথা লিখিতেও ইচ্ছা হয় না। কারণ, ধর্ম্ম-সম্প্রদায়গুলির বা তাহাদের কোন একটির ইচ্ছা, প্রবৃত্তি, চেষ্টা ও স্বার্থের উপর সাম্প্রদায়িক শান্তি বিরাজ করা সকল সময়ে সম্পূর্ণ নির্ভর করিতে পারে না।

বেলডাঙ্গার "সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা" সম্বন্ধে কাগজে যাহা বাহির হইয়াছে, তাহা পড়িয়া মর্ম্মান্তিক বেদনা অনুভব করিয়াছি। আমরা যদি ঐ অঞ্চলের অধিবাসী হইতাম, তাহা হইলেও আমরা যে উহা নিবারণ করিতে পারিতাম—ন্যূনকল্পে তাহার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করিতে পারিতাম, জোর করিয়া এমন কথা বলিতে পারি না। কিন্তু শান্তিভঙ্গ হইবার পূর্ব্বেই তাহা নিবারণে সমর্থ যথেষ্ট প্রভাবশালী হিন্দু ও মুসলমান নেতা সর্ব্বত্র থাকিলে হয়ত বা কিছু সুফল হয়। 'হয়ত বা' বলিতেছি এই জন্য, যে, সদ্ভাব ও শান্তি রক্ষণ ও স্থাপন করিতে যাঁহারা উৎসুক তাঁহাদের প্রভাব স্থলবিশেষে ও সময়বিশেষে, যাহারা শান্তিভঙ্গ চায় তাহাদের প্রভাব অপেক্ষা কম হইতে পারে।

সদ্ভাব ও শান্তি রক্ষণ ও স্থাপনের চেষ্টা একান্ত ব্যর্থ হইলে, ইহাও বাঞ্ছনীয়, যে, যে-দল আততায়ী কর্ত্তৃক আক্রান্ত হইবে তাহারা প্রাণপণে আত্মরক্ষা করিবে। কারণ, যাহারা আক্রান্ত হইবে তাহারা প্রবল ভাবে আত্মরক্ষার চেষ্টা করিবে জানা থাকিলে আততায়ীদের আক্রমণেচ্ছা কম হইতে পারে কিংবা আক্রমণের ইচ্ছা মোটেই না হইতে পারে। তদ্ভিন্ন, আক্রান্ত হইলে দুর্ব্বলতা ও ভীরুতা বশতঃ আত্মরক্ষার চেষ্টা না করিয়া পড়িয়া পড়িয়া মার খাওয়া বা নিহত হওয়া অপেক্ষা আত্মরক্ষার চেষ্টা করিয়া আহত বা নিহত হওয়া শ্রেয়ঃ। ২৭শে আষাঢ়ের 'বঙ্গবাণী'তে প্রকাশিত নিম্নমুদ্রিত বৃত্তান্ত হইতে মনে হয়, বেলডাঙ্গা অঞ্চলে এক দিন এইরূপ অবস্থা ঘটিয়াছিল, যদিও তাহার পর দিন সে অবস্থার বিপর্য্যয় ঘটে।

> পরদিন খোলাখুলি ভাবে মুসলমানেরা হিন্দুদের উপর আক্রমণ করিতে আরম্ভ করে। বেলডাঙ্গার হিন্দুদের প্রতি তাহাদের প্রধান লক্ষ্য ছিল। কিন্তু বেলডাঙ্গা সুরক্ষিত হিন্দু-প্রধান স্থান বিধায় তাহারা বেলডাঙ্গার দুই মাইল দূরে নপুকুরিয়ার দিকে লক্ষ্য করে। সেখানে বহুসংখ্যক হিন্দু লাঠিয়ালের (গোয়ালার) বাস।
>
> মঙ্গলবার প্রাতঃকালে প্রায় পাঁচ হাজার মুসলমান এই গ্রাম আক্রমণ করে. অনেক মুসলমান অনেক দূর হইতে আসিয়াছিল। হিন্দুরা অতি বিক্রমের সহিত তাহাদিগকে বাধা দিতে থাকে, সারাদিন পুনঃ পুনঃ আক্রমণ করিয়াও হিন্দুদের প্রবল বাধায় বিশেষ কিছু করিতে না পারিয়া সন্ধ্যায় তাহারা ফিরিয়া যায়।
>
> কিন্তু পরদিন মুসলমানেরা আরও নূতন বলে বলীয়ান হইয়া, আরও পাঁচ হাজার লোক লইয়া গ্রাম আক্রমণ করে। আক্রমণকারীদের কাহারও কাহারও সঙ্গে তখন বন্দুক ছিল। এই দিন একজন দারোগার কর্ত্তৃত্বাধীনে এই গ্রামে সাত জন সশস্ত্র পুলিস মোতায়েন করা হইয়াছিল। পুলিস কয়েকবার গুলী করে; কিন্তু তাহাতে কোনও ফল না হওয়ায় এবং গুলী বারুদ শেষ হইয়া যাওয়ায় তাহারা চলিয়া যায়। ইহাতে গ্রামবাসীরাও নিরাশ হইয়া যায় এবং পূর্ব্বদিনের দৃঢ়তা আর রক্ষা করিতে না পারিয়া ছত্রভঙ্গ হইয়া পড়ে।

এখন সকল সম্প্রদায়ে মিলিয়া উৎপীড়িত, আহত ও ক্ষতিগ্রস্ত লোকদের এবং মৃত ব্যক্তিদের পরিবারবর্গের সাহায্যের ব্যবস্থা করিলে মঙ্গল হইবে।

ডাক্তার মোহম্মদ আলমের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত সাম্প্রদায়িকতা-বিরোধী সংঘের বঙ্গীয় প্রাদেশিক শাখার উদ্যোগে সভা হইয়াছিল। এই সভার পক্ষ হইতে যে-কমিটি নিযুক্ত হইয়াছে, তাহার সভ্যেরা বেলডাঙ্গার "দাঙ্গা" সম্বন্ধে অনুসন্ধান করিবেন।

হিন্দুদিগের পক্ষ হইতে এবং গবর্মেণ্টের পক্ষ হইতেও সম্ভবতঃ "দাঙ্গা"র উৎপত্তি সম্বন্ধে অনুসন্ধান হইবে। অনুসন্ধানকারীরা একটি বিষয় জানিবার চেষ্টা করিলে ভাল হয়। আগে আগে কোথাও কোথাও দেখা গিয়াছে, যে, মুসলমানেরা দল বাঁধিয়া যখন হিন্দুদিগকে আক্রমণ, তাহাদের ঘরবাড়ি বিনাশ, ও ধনসম্পত্তি লুট করিয়াছে, তখন এই রূপ গুজব কেহ কেহ রটাইয়া দিয়াছে, যে, এখন নবাবী আমল

আসিয়াছে, হিন্দুদের ঘরবাড়ি ধনসম্পত্তি লুট করিলে কোন শাস্তি হইবে না। ঢাকা ও তৎসন্নিহিত রোহিতপুর গ্রাম লুটের সময় এইরূপ গুজব রটিয়াছিল। এই প্রকার কোন গুজব আলোচ্য ঘটনাটার পূর্ব্বে রটিয়াছিল কি-না, অনুসন্ধানকারীদিগকে তাহা নির্দ্ধারণ করিতে অনুরোধ করিতেছি।

এইরূপ গুজব রটান নূতন ব্যাপার নহে, 'সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা"ও বঙ্গে নূতন নহে, যদিও এক শতাব্দী পূর্ব্বে তাহা বিরল ছিল। আগে আগে দেখা গিয়াছে, "সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা"র তথাকথিত কারণগুলা প্রকৃত কারণ নয়, প্রকৃত কারণ অন্য প্রকারের। তাহার ঐতিহাসিক দৃষ্টান্ত দিতেছি।

১৯০৭ সালে সুপ্রীম লেজিস্‌লেটিভ কৌন্সিল নামে অভিহিত তাৎকালিক ভারতবর্ষীয় ব্যবস্থাপক সভায় সিডীশ্যস্‌ মীটিংস্‌ (রাজদ্রোহোত্তেজক সভা) আইন নামক একটি আইন পাস হয়। উহা পাস হইবার আগে যে তর্কবিতর্ক হয়, তাহাতে অন্যতম সভ্য রাসবিহারী ঘোষ মহাশয়ও যোগ দিয়াছিলেন। তাঁহার বক্তৃতাবলীর সংগ্রহ-পুস্তকে সেদিনকার ব্যবস্থাপক সভার যে বক্তৃতা মুদ্রিত আছে, তাহা হইতে স্বর্গীয় মেজর বামনদাস বসু তাঁহার "ইণ্ডিয়া আণ্ডার দি ব্রিটিশ ক্রাউন" গ্রন্থে কোন কোন অংশ উদ্ধৃত করিয়াছেন। মেজর বসুর পুস্তকের ৪৪৬ পৃষ্ঠায় লিখিত হইয়াছে :—

Dr. Ghose then referred to the charge "that the Mahomedans were goaded to madness by the boycott movement of the Hindus; and that this view was the real cause of the general lawlessness of the lower classes among the Mahomedans which burst into flame in East Bengal." He quoted the evidence of several English magistrates to prove that the case was not so. He proceeded to say:

"At Jamalpur, where the disturbance began in the Mymensingh district, the first information lodged at the Police station contained no reference whatever to boycott or picketting. Mr. Beatson Bell, the trying Magistrate at Dewanganj, found that the boycott was not the cause of the disturbances. Another special Magistrate at Dewanganj, himself a Mahomedan gentleman of culture, remarked: 'There was not the least provocation for rioting; the common object of the rioters was evidently to molest the Hindus' In another case the same Magistrate observed: 'The evidence adduced on the side of the prosecution shows that, on the date of the riot, the accused had read over a notice to a crowd of Mussalmans and had told them that the Government and the Nawab Bahadur of Dacca had passed orders to the effect that nobody would be punished for plundering and oppressing the Hindus. So, after the Kali's image was broken by the Mussalmans, the shops of the Hindu traders were also plundered.'

Again, Mr. Barne Ville, the Sub-Divisional Officer of Jamalpur, in his report on the Melandahat riots said: "Some Mussalmans proclaimed by beat of drums that the Government had permitted to loot the Hindus." And in the Hargilchar abduction case, the same Magistrate remarked that the outrages were due to the announcement that the Government had permitted the Mahomedans to marry Hindu widows in *nika* form.

"The true explanation of the savage out-break is to be found in the 'red pamphlet' which was circulated so widely among the Mahomedans in East Bengal, and in which there is not a word about boycott or Hindu Volunteers. 'Ye Mussalmans,' said the red pamphlet, 'arise, awake, do not read in the same schools with Hindus. Do not buy anything from a Hindu shop. Do not touch any article manufactured by Hindu hands. Do not give any employment to a Hindu. Do not accept any degrading office under a Hindu; you are ignorant, but if you acquire knowledge, you can at once send all Hindus to *Jehannam* (hell). You form the majority of the population of this province. Among the cultivators also you form the majority. It is agriculture that is the source of wealth. The Hindu has no wealth of his own and has made himself rich only by despoiling you of your wealth...' The man who preached this *jihad* was only bound down to keep the peace for one year! You are probably surprised at such leniency. We in Bengal were not, or were only surprised to hear that the man had been bound down at all."—*Speeches of Dr. Rash Behari Ghose*, pp. 31-33.

উপরে "ইণ্ডিয়া আণ্ডার দি ব্রিটিশ ক্রাউন" গ্রন্থ হইতে যাহা উদ্ধৃত হইয়াছে, তাহাতে স্যর রাসবিহারী ঘোষ মুসলমান ও ইংরেজ ম্যাজিষ্ট্রেটদিগের কথা হইতে দেখাইয়াছেন, যে, ২৫ বৎসরেরও আগে মুসলমানেরা যে দল বাঁধিয়া হিন্দুদিগের উপর অত্যাচার করিয়াছিল তাহার কারণ তাহাদিগকে "লাল পুস্তিকা" প্রচার দ্বারা উত্তেজিত করা, তাহাদিগকে বলা, যে, গবর্ন্মেণ্ট এবং ঢাকার নবাব বাহাদুর বলিয়াছেন, যে, হিন্দুদিগকে মারপিট করিলে ও তাহাদের সম্পত্তি লুণ্ঠন করিলে কোন শাস্তি হইবে না, ইত্যাদি। পঁচিশ বৎসরেরও অধিক কাল পূর্ব্বে যাহা ঘটিয়াছিল, পরেও তাহা আবার ঘটিয়াছে। আলোচ্য "সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা" যে-যে কারণে ঘটিয়াছিল, এরূপ উত্তেজনা তাহার অন্যতম কারণ কি না, অনুসন্ধান করা আবশ্যক। কেহ উত্তেজিত করিয়া থাকিলে এবং প্ররোচনা দিয়া থাকিলে, তাহাকে খুঁজিয়া বাহির করা পুলিসের পক্ষে সোজা কাজ, তাহার শাস্তি দেওয়াইতেও পুলিস ও শাসন-বিভাগ ইচ্ছা করিলেই পারে।

রামমোহন রায়ের গ্রন্থাবলী

১৮৩৩ সনের ২৭শে সেপ্টেম্বর রাজা রামমোহন রায়ের মৃত্যু হয়। বর্ত্তমান বর্ষে তাঁহার মৃত্যুর শতবার্ষিকী করিবার আয়োজন হইতেছে। এই উপলক্ষে রামমোহনের গ্রন্থাবলীর একটি সম্পূর্ণ ও নির্ভুল সংস্করণ প্রকাশিত করিবার প্রস্তাব আছে। এই সংস্করণটি সম্পাদনের জন্য রামমোহনের গ্রন্থসমূহের প্রথম, অথবা প্রথম সংস্করণ অপ্রাপ্য হইলে যথাসম্ভব পুরাতন সংস্করণ দেখা আবশ্যক। 'প্রবাসী'র পাঠকদের মধ্যে কাহারও যদি এইরূপ সংস্করণ থাকে তাহা হইলে সেগুলির সংবাদ সম্পাদককে জানাইলে এবং সংস্করণগুলি দেখিবার সুযোগ দিলে একটি প্রয়োজনীয় ও মহৎ কার্য্যে সাহায্য করা হইবে।

বঙ্গে আইন ও শৃঙ্খলা-রক্ষা

বঙ্গে সন্ত্রাসক (টেরারিষ্ট) দল আছে এবং ১৯৩০ সাল হইতে এ-পর্য্যন্ত, অর্থাৎ প্রায় চারি বৎসরে, তাহারা ৩৮০ বার হত্যাদির চেষ্টা করিয়াছে ও তাহার ফলে ১১২ জন লোক নিহত হইয়াছে, অতএব যদি ভারতবর্ষে প্রাদেশিক আত্মকর্তৃত্ব স্থাপিত হয়, তাহা হইলে বঙ্গে আইন ও শৃঙ্খলা-রক্ষা (Law and Order) বিভাগের ভার মন্ত্রীদের উপর অর্পিত হওয়া উচিত নয়; এইরূপ আন্দোলন বিলাতে ও ভারতবর্ষে ইংরেজরা করিতেছে। বৎসরে ৩০।৩৫ জন সরকারী লোককে সন্ত্রাসকেরা খুন করিয়াছে বলিয়া বাঙালী মন্ত্রীরা 'আইন ও শৃঙ্খলা-রক্ষা' বিভাগের ভার পাইবে না। কিন্তু আয়ার্ল্যাণ্ড স্বায়ত্তশাসন পাইবার আগে একই বৎসরে ২৪২টা রাজনৈতিক হত্যা সেখানে হইয়াছিল, এবং তাহার পরেও এক বৎসরে ৬৪টা খুন সেখানে হইয়াছে। মনে রাখিতে হইবে, লোকসংখ্যা ও আয়তনে আয়ার্ল্যাণ্ড বঙ্গের চেয়ে অনেক ছোট দেশ। এইরূপ কম-বেশী খুন লাগিয়া থাকা সত্ত্বেও, ইংলণ্ড আয়ার্ল্যাণ্ডকে দমননীতি দ্বারা ঠাণ্ডা করিতে পারে নাই। তাহাকে বস্তুত পূর্ণস্বরাজ দিয়া খুশী করিতে হইয়াছে। ইংরেজরা সম্ভবতঃ মনে করেন, আইরিশরা দুর্দ্ধর্ষ জাতি বলিয়া তাহাদিগকে দমন করা যায় নাই, ভেতো বাঙালীকে দমন করা যাইবে। কিন্তু বঙ্গে ত ২৫ বৎসরেরও উপর রাজনৈতিক অশান্তি ও তাহার বিরুদ্ধে পূরাদম দমননীতি চলিয়া আসিতেছে, এখনও দেশ ঠাণ্ডা হয় নাই।

ইংরেজরা বলিতেছেন, রাজনৈতিক উপদ্রব আছে বলিয়াই বঙ্গে দেশী লোকের হাতে শান্তি স্থাপন ও রক্ষার ভার দেওয়া যাইতে পারে না। আমরা ঠিক্ তাহার উল্টা কথা বলি, এবং তাহা যুক্তিসঙ্গত। আমরা বলি, ইংরেজরা দমননীতির দ্বারা দেশকে শান্ত করিতে পারিতেছেন না, ইংরেজদের গবর্ন্মেণ্ট এফিশিয়েন্ট অর্থাৎ কার্য্যক্ষম নহে, অতএব এখন দেশী লোকের হাতে ভার দেওয়া হউক। দেশী লোকেরা আবশ্যক-মত জনগণকে সন্তুষ্ট করিয়া ও দুর্দ্দান্ত লোকদিগকে দমন করিয়া দেশে শান্তি স্থাপন ও রক্ষা করিবেন। লর্ড মর্লী ও মিণ্টো বার-বার বলিয়া গিয়াছেন, শুধু দমনের দ্বারা কিছু হইবে না।

ব্রিটিশ গবর্ন্মেণ্ট অপরাধী ধরিতে না পারিলে জেলা-কে জেলা, গ্রাম-কে গ্রাম, শহর-কে শহরের সব হিন্দুর শাস্তি দিতেছেন। যে-হেতু একটা সন্ত্রাসক দল আছে, অতএব বাংলা দেশকে পূরা প্রাদেশিক আত্মকর্তৃত্ব দেওয়া হইবে না, ইহা বলাও ঠিক সেই প্রকার পাইকারী শাস্তি। প্রায় চারি বৎসরে যে ৩৮০টা উপদ্রব হইয়াছে, তাহার প্রত্যেকটা যদি আলাদা আলাদা দলে করিয়া থাকে—সম্ভবতঃ একই দলে একাধিক উপদ্রব করিয়াছে—এবং যদি প্রত্যেক দলে গড়ে দশ জন বা এক শত জন লোক থাকে, তাহা হইলে মোট দোষীর সংখ্যা হয় ৩৮০০ বা ৩৮০০০। এই ৩৮০০০ লোকের দোষে শাস্তি হইবে বঙ্গের পাঁচ কোটি অধিবাসীর! চমৎকার সুবিচার!

বিলাতী ছোট কর্ত্তার ধমক

গত কলিকাতা কংগ্রেসের প্রতিনিধিদের উপর পুলিসের কোন কোন লোক অত্যাচার করিয়াছিল বলিয়া যে অভিযোগ পণ্ডিত মদনমোহন মালবীয় প্রকাশ করেন, সেই বিষয়ে বিলাতী পার্লেমেণ্টে আবার প্রশ্ন হওয়ায় সহকারী ভারত-সচিব মিঃ বাটলার বলিয়াছেন, যে, কেহ যদি আবার বলে অভিযোগগুলা সত্য, তাহা হইলে যথাযোগ্য ব্যবস্থা ("proper action") অবলম্বিত হইবে। এই সংবাদ ভারতবর্ষে পৌঁছিবার পরই পণ্ডিতজী আবার বলিয়াছেন, "আমি বিশ্বাস করি, অভিযোগগুলি সত্য, এবং প্রকাশ্য অনুসন্ধান চাই।" বিলাতী ছোট কর্ত্তা এখন কি করেন দেখা যাক্।

বঙ্গে অবাঙালী নামের বিকৃতি

অনেক বাংলা খবরের কাগজে বঙ্গের বাহিরের স্থানের নাম এবং অবাঙালী মানুষদের নাম বিকৃত করিয়া লেখা হয়। দৃষ্টান্ত দিতেছি। এখনও কেহ কেহ "গোখলে" নামটি "গোখেল" লেখেন। পণ্ডিত মদনমোহন মালবীয়, "মালব্য" নহেন, তিনি নিজে নাগরী অক্ষরেও মালবীয় লেখেন। পুনায় "পর্ণকুটীর"-অধিকারিণী "ঠ্যাকারসে" নহেন; তিনি "ঠাকরসী"। বাহাওলপুর (Bahawalpur) রাজ্যের হিন্দু প্রজাদের অভিযোগের বিষয় লিখিতে গিয়া অনেক বাংলা কাগজ রাজ্যটির নাম লিখিয়াছেন "ভাওয়ালপুর"। আরও দৃষ্টান্ত দেওয়া যাইতে পারে।

"নারীহরণের প্রতিকার"

নারীর উপর পাশব অত্যাচার বঙ্গের মুসলমানদের ও হিন্দুদের একটি অতীব লজ্জাকর ও দুঃখজনক কলঙ্ক। অত্যাচার হইয়া যাইবার পর সকল সম্প্রদায়ের লোকের একযোগে অপরাধীকে দণ্ডিত করিবার চেষ্টা ত করাই উচিত; কিন্তু অত্যাচারের উপক্রম হইবা মাত্র তাহাতে বাধা দেওয়া আরও আবশ্যক। যে-নারীর উপর অত্যাচার হইতে যাইতেছে, তিনি নিজে অস্ত্র ব্যবহার করিয়া এবং অন্য লোকেও অস্ত্র ব্যবহার করিয়া বা না-করিয়া যে এরূপ বাধা সফল ভাবে দিতে পারেন, তাহার অনেক দৃষ্টান্ত আছে। ঘটনাগুলি খবরের কাগজের পৃষ্ঠায় বিক্ষিপ্ত ভাবে থাকায় লোকের মনে থাকে না। শ্রীযুক্ত জিতেন্দ্রমোহন চৌধুরী এইরূপ পঞ্চাশটি দৃষ্টান্ত সংকলন করিয়া "নারী হরণের প্রতিকার" নাম দিয়া একটি বহি প্রকাশ করিয়াছেন। মূল্য আট আনা, ডাক মাশুল আলাদা। এই বহিখানি লিখন-পঠনক্ষম বাঙালী নারী ও পুরুষ মাত্রেরই পড়া উচিত। ইহা "কলিকাতার প্রধান প্রধান পুস্তকালয়ে ও গ্রাম দুহালিয়া, পোঃ আঃ ভুয়ারাবাজার, জিলা শ্রীহট্ট, ঠিকানায় গ্রন্থকারের নিকট পাওয়া যায়।"

বোধনা-নিকেতন

জড়বুদ্ধি ছেলেমেয়েদের জন্য ঝাড়গ্রামে গত ১৭ই আষাঢ় বোধনা-নিকেতন খোলা হইয়াছে। ঝাড়গ্রামের রাজা আগেই বোধনা-সমিতিকে প্রায় ২৫০ বিঘা জমি দিয়াছিলেন, প্রতিষ্ঠার দিন তিনি নিকেতনের প্রতিষ্ঠাতা-রূপে ১৩৪০ সালের জন্য দুই হাজার টাকা দান করিতে প্রতিশ্রুত হইয়াছেন। এই নিকেতনটি যে কিরূপ প্রয়োজনীয়, তাহা প্রতিষ্ঠার দিনে পঠিত এবং ইংরেজী ও বাংলা নানা কাগজে প্রকাশিত রবীন্দ্রনাথের বাণী হইতে শিক্ষিত সাধারণ জানিতে পারিয়াছেন। তিনি তাহাতে অন্যান্য কথার মধ্যে বলিয়াছেন, "এই পঙ্গুমনাদের যথোচিত শুশ্রূষা করার জন্য বিশেষ সাধনা ও অভিজ্ঞতার প্রয়োজন আছে। যে সংসার প্রধানত প্রকৃতিস্থদের জন্য সেখানে এদের উপযুক্ত ব্যবস্থা করা গৃহস্থের পক্ষে সহজসাধ্য নয়—এই জন্য বোধনা-নিকেতনের উদ্যোগ ও আয়োজন দেখে আনন্দিত হয়েছি।" ইহা ভিন্ন কবি 'প্রবাসী'র সম্পাদককে ব্যক্তিগত চিঠিতে লিখিয়াছেন, "এই কাজটির প্রয়োজন ও মহত্ত্ব সম্বন্ধে আমার সন্দেহ নেই।"

বোধনা-নিকেতনের অর্থাভাব খুব বেশী। থোক্ ঋণই এখনও প্রায় ২৫০০ টাকা আছে। তাহার পরও পাঁচ ছয় হাজার টাকা চাই। মাসিক নির্দ্দিষ্ট ব্যয় প্রায় চারি পাঁচ শত টাকা। অতি ক্ষুদ্র এবং বৃহৎ দান ২-১ টাউনশেণ্ড রোড, ভবানীপুর, কলিকাতা, ঠিকানায় নিকেতনের কোষাধ্যক্ষ রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়ের নামে প্রেরিত হইলে কৃতজ্ঞতার সহিত গৃহীত হইবে।

বঙ্গের রাজস্ব অতিরিক্তরূপ শোষণ

বাংলা দেশের যে সরকারী পাব্লিসিটি বোর্ড বা প্রচার সমিতি আছে, তাহার দ্বারা প্রকাশিত "প্রভিন্শ্যাল ফিন্যান্স আণ্ডার দি হোয়াইট পেপার" নামক পুস্তিকা হইতে নীচের তালিকাটি লইলাম। ইহা আধুনিক একটি বৎসরের রাজস্বের হিসাব। প্রত্যেক অঙ্কের পর তিনটি শূন্য উহ্য আছে।

প্রদেশ।	মোট রাজস্ব।	ভারত-সরকারের অংশ।	প্রদেশের অংশ।
বাংলা	৩৫২৩২১	২৪৫২৬৩	১০৭০৫৮
আগ্রা-অযোধ্যা	১৬১৯৪৮	৩৪৮৪১	১২৭১০৭
মান্দ্রাজ	২৪২৭৮৬	৭৩৮৫৩	১৬৮৯৩৩
বিহার-উড়িষ্যা	৬২১২৬	৪৪৫৩	৫৭৬৭৩
পঞ্জাব	১৩২০১৮	১৮৫৪৩	১১৩৪৭৫
বোম্বাই	৩৮২৮২৩	২২৬৯৮৪	১৫৫৮৩৯
মধ্যপ্রদেশ	৬০৭১২	৬০০৯	৫৪৭০৩
আসাম	২৯৬৯৭	৪৩১৫	২৫৩৮২

সরকারী পুস্তিকাটির তালিকায় ইহাও লেখা আছে, যে, বঙ্গের মোট রাজস্বের শতকরা ৩০·৩, আগ্রা-অযোধ্যার ৭৮·৪, মান্দ্রাজের ৬৯·৫, বিহার-উড়িষ্যার ৯২·৮, পঞ্জাবের ৮৫·৯, বোম্বাইয়ের ৪০·৭, মধ্যপ্রদেশের ৯০·১,

এবং আসামের ৮৫'৪ ঐ ঐ প্রদেশের প্রাদেশিক গবর্মেণ্ট প্রাদেশিক ব্যয়ের জন্ম পাইয়াছেন।

ইহা হইতে পাঠকেরা দেখিবেন, ভারত-গবর্মেণ্ট বাংলার রাজস্ব হইতে নিজের অংশ স্বরূপ সর্ব্বাপেক্ষা অধিক (সাড়ে চব্বিশ কোটি) টাকা লইয়াছেন, এবং বাংলাকে তাহার রাজস্বের শতকরা সর্ব্বাপেক্ষা কম অংশ খরচ করিতে দিয়াছেন!

—

বঙ্গের প্রতি আর এক ঘোর অবিচার

সরকারী জলসেচন-বিভাগের ১৯৩০-৩১ সালের রিপোর্ট বাহির হইয়াছে। প্রধানতঃ পশ্চিম-বঙ্গে এবং অন্য কোন কোন অঞ্চলেও চাষের জন্য জলসেচনের খুব দরকার। অথচ, যদিও ভারত-গবর্মেণ্ট বঙ্গের রাজস্ব খুব বেশী পরিমাণে শোষণ করেন, বঙ্গে সকলের চেয়ে কম জমিতে সরকারী জলসেচনের ব্যবস্থা আছে। কোন্ প্রদেশে কত একর্ জমিতে জলসেচনের সরকারী ব্যবস্থা আছে দেখুন।

পঞ্জাব ১১৪৮৫১৩৫, মান্দ্রাজ ৭৫৭৩০৪৩, বোম্বাই ৪০৩০০০, সিন্ধু ৩৭১৬০০০, বাংলা ৭২৫৩৩, আগ্রা-অযোধ্যা ২৯৮৮৭৮০, ব্রহ্মদেশ ২০৯৮২৬৬ বিহার-উড়িষ্যা ৮৮৯৬৮২, মধ্যপ্রদেশ ৪২৩২৩১, উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ ৪০৪৯৩৫।

—

বঙ্গে বালিকাদের উচ্চ শিক্ষা

বঙ্গে সংগৃহীত রাজস্ব অতিরিক্ত রূপে শোষিত হওয়ায় বাংলা-গবর্মেণ্ট শিক্ষার জন্ম অপেক্ষাকৃত কম ব্যয়ই করেন। বালিকাদের শিক্ষার জন্ম—বিশেষতঃ তাহাদের উচ্চ শিক্ষার জন্ম—অতি অল্প ব্যয় করেন, দেশের লোকেরাও কম ব্যয় করেন। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় আমাদিগকে গত ২৬শে জুন যে খবর দিয়াছেন, তাহাতে দেখা যায়, উহার এলাকাধীন ৩৫টি বালিকা-বিদ্যালয় হইতে ছাত্রীরা প্রবেশিকা পরীক্ষা দিতে পারে। তা ছাড়া আরও তিনটি বালিকা-বিদ্যালয় হইতে ছাত্রীরা ঢাকা ইণ্টারমিডিয়েট ও সেকেণ্ডারি এডুকেশন বোর্ডের প্রবেশিকা পরীক্ষা দেয়। এক দিকে মোট এই ৩৮টি উচ্চ বালিকা-বিদ্যালয়; অন্যদিকে ১৯৩০-৩১ সালেই ছিল ১০৫৫টি উচ্চ বালক-বিদ্যালয়—এখন আরও বাড়িয়া থাকিবে। উচ্চ বালিকা-বিদ্যালয়ের সংখ্যা আরও খুব বাড়ান উচিত।

—

বঙ্গের বেকার-সমস্যা

বঙ্গের বেকার-সমস্যা গুরুতর। কিন্তু ইহার সমাধান হইতে পারে না, এমন নয়। ভারতবর্ষে ও বঙ্গে স্বরাজ স্থাপিত হইলে বঙ্গে সংগৃহীত রাজস্বের আরও কয়েক কোটি টাকা বঙ্গের পাওয়া উচিত। তখন সর্ব্বত্র বিদ্যালয় খুলিয়া দিলে তাহাতে অনেক হাজার শিক্ষিত যুবক কাজ পাইতে পারে। এই সব বিদ্যালয়ে সাধারণ শিক্ষা দেওয়া ছাড়া চাষ এবং ছুতার, কামার ও তাঁতীর কাজ শেখান উচিত। বাৎসরিক রাজস্ব হইতেই যে বিদ্যালয়সমূহ খোলা যায় তাহা নহে। কয়েক কোটি টাকা সরকারী ঋণ লইয়া তাহার আয় হইতে ব্যয় নির্ব্বাহ হইতে পারে। মূলধন শোধ দিবার জন্ম সিঙ্কিং ফণ্ডের ব্যবস্থা করা যাইতে পারে। পুলিস-বিভাগে বিস্তর অবাঙালীকে কাজ দেওয়া হইয়াছে। স্বরাজের আমলে পুলিসের কাজ করার অগৌরব কমা উচিত এবং নিম্নশ্রেণীর পুলিসের কাজও শিক্ষিত যুবকদের করা ও পাওয়া উচিত।

কিন্তু এ-সব গেল কল্পনা বা আকাশকুসুম। বর্ত্তমান শাসনবিধির আমলেই কি করা যায় ভাবিতে হইবে। চাষের দিকে মন দিতে হইবে। আজকাল অনেক শিক্ষিত যুবক বলেন, তাঁহারা সব রকম সৎকাজ করিতে প্রস্তুত, সুতরাং আশা করি তাঁহারা চাষকে অগ্রাহ্য করিবেন না। তাঁহারা ইহাও মনে রাখিবেন, চাষ যাহাদের হাতে রাষ্ট্রের ক্ষমতাও শেষ পর্য্যন্ত তাহাদেরই হাতে। মর্লীর "রিকলেক্‌শ্যন্স" পুস্তকের প্রথম ভল্যুমের ১৭২ পৃষ্ঠায় আছে—

"There is no injustice in the observation that the balance of power in a state rests with the class that holds the balance of the land."

"এই মন্তব্যে অন্যায় কিছু নাই, যে, রাষ্ট্রে যাহাদের হাতে জমি থাকে, শক্তির তুলাদণ্ড তাহাদেরই হাতে।"

১৯২৯-৩০এর হিসাব অনুসারে বঙ্গে কিছুকাল-অকৃষ্ট জমি ছিল ৫৫৭৩৬৮৯ একর্ এবং চাষযোগ্য কিন্তু অকৃষ্ট জমি ছিল ৫৯৭১৪২৮ একর্—মোট ১১৫৪৫১১৭ একর্। এক একর্ কিঞ্চিদধিক তিন বিঘা। সুতরাং বঙ্গে এখনও ৩৪৬৩৫৩৫১, মোটামুটি সাড়ে তিন কোটি, বিঘা জমিতে চাষ হইতে পারে। ইহাতে অনেক লক্ষ লোকের অন্নসংস্থান হইতে পারে। অবশ্য চাষের দ্বারা এত লোকের অন্নসংস্থান করিতে হইলে গবর্মেণ্ট, জমিদার ও শিক্ষিত মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের লোকদের পরস্পর সহযোগিতা চাই।

সামান্য পরিমাণ জমিতে ভাল চাষের দ্বারাও যে সুফল পাওয়া যাইতে পারে, তাহার একটা দৃষ্টান্ত দি। মিঃ বারলি এখানে একজন সিভিলিয়ান ছিলেন, পেন্সান লইয়া বিলাত গিয়াছেন। সেখানে ইংরেজদের বেকার-সমস্যা সমাধান সম্পর্কীয় কাজ করিতেছেন। তিনি একজন বাঙালী ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেটকে লিখিয়াছেন, এক একজন বেকার লোককে কয়েক বর্গগজ জমি দেওয়া হয়, তাহাতে তাহারা গোল আলুর চাষ করে, উৎপন্ন আলু বিক্রীর ব্যবস্থা করা হয়, এবং বিক্রয়লব্ধ অর্থে তাহাদের ব্যয় নির্ব্বাহ হয়।

যে-সকল বেকার লোক চাষে লাগিবেন, বা কোন কোন

কুটির-শিল্পের কাজ করিবেন, তাঁহাদিগকে অল্প অথচ যথেষ্ট কিছু মূলধন উপযুক্ত সর্ত্তে দিবার ব্যবস্থা করিতে হইবে।

—

বঙ্গে চিনির কারখানা হওয়া উচিত কি না

ভারতীয় ইম্পীরিয়্যাল এগ্রিকালচার্যাল রিসার্চ কৌন্সিলের শর্করা-বিশেষজ্ঞ শ্রীযুক্ত আর সি শ্রীবাস্তব এইরূপ মত প্রচার করিয়াছেন, যে, বর্ত্তমানে ভারতে যত চিনির কারখানা স্থাপিত হইয়াছে বা নির্ম্মিত হইতেছে, তাহাতেই ১৯৩৪-৩৫ সাল নাগাদ এত চিনি উৎপন্ন হইবে, যে, তাহারা ভারতের চাহিদা মিটাইয়া উদ্বৃত্ত কিছু রপ্তানী করিতে বাধ্য হইবে, অতএব আর চিনির কারখানা স্থাপনের চেষ্টা যেন না হয়। তাঁহার হিসাবে ভুল আছে। তা ছাড়া, তিনি আগ্রা-অযোধ্যার লোক, নিজের প্রদেশেরই স্বার্থটা দেখিয়াছেন—সেখানেই সব চেয়ে বেশী চিনির কারখানা হইয়াছে। বঙ্গের প্রতি বিরূপতাও সম্ভবতঃ অনেকের আছে। তাহার একটি প্রমাণ দিতেছি। আগ্রা-অযোধ্যার চিনির কারখানা ও শ্রমিকদের সম্বন্ধে Sugar Industry & Labour in U. P. নামক একটি বহির সুপারিশ তিনি লিখিয়াছেন। ঐ বহির প্রথম পৃষ্ঠায় ভারতবর্ষের ছয়টি প্রদেশে আকের চাষের পরিমাণ দেওয়া আছে; বোম্বাইয়ের আছে, আসামের আছে; কিন্তু বঙ্গে তার চেয়ে বেশী আকের চাষ হইলেও বঙ্গের উল্লেখ মাত্র নাই!

—

রাজবন্দীদের যক্ষ্মারোগ

রাজবন্দীদের মধ্যে যক্ষ্মার প্রাদুর্ভাবের কারণ অনুসন্ধান-যোগ্য। সেদিন দেখিলাম, একখানি দৈনিকের এক সংখ্যাতেই এইরূপ চারিটি রোগীর খবর আছে। আরও অনেকের হইয়াছিল ও হইয়াছে। দেশে বা বিদেশে ইহাদের চিকিৎসার সুবিধা গবর্ন্মেণ্টের দেওয়া উচিত।

—

পুনায় কংগ্রেস-নেতাদের কন্‌ফারেন্স

আজ ৩০শে আষাঢ় শ্রাবণের প্রবাসীর শেষ পৃষ্ঠাগুলি ছাপা হইতেছে। আজ পুনায় কংগ্রেস-নেতাদের কন্‌ফারেন্সের কোনও শেষ সিদ্ধান্ত কলিকাতার প্রাতঃকালীন দৈনিকে না-থাকায় সে-বিষয়ে কিছু লিখিতে পারিলাম না।

—

বাংলা দেশ ও পাটশুল্ক

হোয়াইট পেপারে প্রস্তাব করা হইয়াছে, যে, বাংলার পাট হইতে যে রপ্তানীশুল্ক পাওয়া যায়, তাহার অর্দ্ধেক ভারত-গবর্ন্মেণ্ট এবং অর্দ্ধেক বঙ্গদেশ পাইবে। এখন সমস্তটাই ভারত-গবর্ন্মেণ্ট পায়। তৃতীয় গোল-টেবিল বৈঠকের সময় স্যর নৃপেন্দ্রনাথ সরকারের নেতৃত্বে বঙ্গের হিন্দু মুসলমান ইউরোপীয় সবাই পাটরপ্তানী শুল্কের সমস্তটিই বঙ্গের ন্যায্য পাওনা বলিয়া দাবি করিয়াছিলেন। কিন্তু বাংলা-গবর্ন্মেণ্টকে পাটরপ্তানী শুল্কের অর্দ্ধেক দিবার প্রস্তাব যখন জয়েণ্ট সিলেক্ট কমিটিতে উঠে, তখন লর্ড ইউষ্টেস্ পার্সী এবং স্যর পুরুষোত্তম-দাস ঠাকুরদাস ইহারও তীব্র প্রতিবাদ করেন।

স্যর পুরুষোত্তম দাস ঠাকুরদাসের নির্লজ্জতায় অবাক্ হইতে হয়। বোম্বাই প্রেসিডেন্সীর কাপড়, বোম্বাই প্রেসিডেন্সির লোকদের তৈরি নূন প্রভৃতি বাঙালীদিগকে বেশী দাম দিয়া কিনিয়া ব্যবহার করিতে হইবে; কিন্তু বোম্বাইয়ের কাপড়ের কলওয়ালারা বাংলা দেশের কয়লা ব্যবহার না করিয়া সেই দক্ষিণ-আফ্রিকার কয়লা ব্যবহার করেন যে দক্ষিণ-আফ্রিকা হইতে সব ভারতীয়কে তাড়াইয়া দিতে তথাকার শ্বেতকায়েরা সর্ব্বদা ব্যগ্র। আমরা বঙ্গবিভাগের সময়ে ও তাহার পরে বোম্বাই প্রেসিডেন্সীর কাপড় কিনিয়া কোটি কোটি টাকা স্যর পুরুষোত্তমদাসের ভ্রাতভাইদের দিয়াছি। সেই নিমক খাইয়া তিনি বঙ্গের চাষীদের উৎপন্ন পাট হইতে লব্ধ শুল্কের টাকার অর্দ্ধেকও সেই চাষীদের শিক্ষা স্বাস্থ্য কৃষি-উন্নতি প্রভৃতির জন্য বঙ্গের পাওয়া সহ্য করিতে পারেন না। বোম্বাইয়ের লোকদের তাঁহার এই আচরণের তীব্র প্রতিবাদ করা উচিত। বোম্বাই প্রেসিডেন্সীর কাপড় আদি পণ্যদ্রব্য বাঙালীদের যথাসাধ্য না-কেনা উচিত।

—

বিহারের বাঙালীদের প্রতি অবিচার

বিহার প্রদেশের অন্তর্গত স্থানসমূহের স্থায়ী বাসিন্দা বাঙালীদের শিক্ষা, শিক্ষাবৃত্তি, চাকরি প্রভৃতিতে বিহারীদের সমান অধিকার নাই। তাহা থাকিলে তাঁহারা ব্যবস্থাপক সভায় স্বতন্ত্র আসন চাহিতেন না। তাঁহারা উক্ত সব বিষয়ে বিহারীদের সমান অধিকার পাইবেন না, অথচ স্বতন্ত্র আসনও তাঁহাদিগকে দেওয়া হইবে না, ইহা বড় অন্যায়। তাঁহারা লীগ অব্ নেশুন্সের নিয়ম অনুসারে, ভিন্নভাষাভাষী বলিয়া, রক্ষাকবচ চাহিবার অধিকারী। অথচ জয়েণ্ট সিলেক্ট কমিটিতে তাঁহাদিগের প্রতিনিধিকে সাক্ষ্য দিতেই দেওয়া হইতেছে না।

নির্ব্বাসিত যক্ষ

শ্রীমণীন্দ্রভূষণ গুপ্ত

প্রবাসী প্রেস, কলিকাতা

"সত্যম্ শিবম্ সুন্দরম্"
"নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ"

৩৩শ ভাগ, ১ম খণ্ড — ভাদ্র, ১৩৪০ — ৫ম সংখ্যা

সত্যরূপ

অন্ধকারে জানি না কে এল কোথা হ'তে,—
মনে হ'ল তুমি,—
রাতের লতা-বিতান তারার আলোতে
উঠিল কুসুমি।
সাক্ষ্য আর কিছু নাই, আছে শুধু একটি স্বাক্ষর,
প্রভাত আলোকতলে মগ্ন হ'লে প্রসুপ্ত প্রহর
পড়িব তখন।
ততক্ষণ পূর্ণ করি থাক্ মোর নিস্তব্ধ অন্তর
তোমার স্মরণ॥

কত লোক ভিড় করে জীবনের পথে
উড়াইয়া ধূলি,
কত যে পতাকা ওড়ে কত রাজ-রথে
আকাশ আকুলি।
প্রহরে প্রহরে যাত্রী ধেয়ে চলে খেয়ার উদ্দেশে,
অতিথি আশ্রয় মাগে শ্রান্তদেহে মোর দ্বারে এসে
দিন অবসানে,—
দূরের কাহিনী বলে, তার পরে রজনীর শেষে
যায় দূরপানে॥

মায়ার আবর্ত্ত রচে আসায় যাওয়ায়
চঞ্চল সংসারে।
ছায়ার তরঙ্গ যেন ধাইছে হাওয়ায়
ভাঁটায় জোয়ারে।
উদ্ধ‍‍র্কণ্ঠে ডাকে কেহ, স্তব্ধ কেহ ঘরে এসে বসে,
প্রত্যহের জানাশোনা, তবু তারা দিবসে দিবসে
পরিচয়হীন।
এই কুজ্ঝটিকালোকে লুপ্ত হয়ে স্বপ্নের তামসে
কাটে জীর্ণ দীন ॥

সন্ধ্যার নৈঃশব্দ্য উঠে সহসা শিহরি
না কহিয়া কথা
কখন যে আসো কাছে, দাও ছিন্ন করি
মোর অস্পষ্টতা।
তখনি বুঝিতে পারি, আছি আমি একান্তই আছি
মহাকাল-দেবতার অন্তরের অতি কাছাকাছি
মহেন্দ্র মন্দিরে;
জাগ্রত জীবনলক্ষ্মী পরায় আপন মাল্যগাছি
উন্নমিত শিরে ॥

তখনি বুঝিতে পারি, বিশ্বের মহিমা
উচ্ছ্বসিয়া উঠি
রচিল, সত্তায় মোর সমর্পিয়া সীমা,
আপন দেউটি।
সৃষ্টির প্রাঙ্গণতলে চেতনার দীপশ্রেণী মাঝে
সে দীপে জ্বলেছে শিখা উৎসবের ঘোষণার কাজে;
সেই তো বাখানে
অনির্ব্বচনীয় প্রেম অন্তহীন বিস্ময়ে বিরাজে
দেহে মনে প্রাণে ॥

৫ই শ্রাবণ, ১৩৪০

আত্মদান

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

প্রভাতে ঘুম থেকে উঠে মন যেদিন শান্ত থাকে, কোনো চিন্তার দ্বারা বিক্ষুব্ধ না থাকে, তেমন মনে যে-চেতনার উদ্বোধন হয় সেটির সঙ্গে বিশ্বের প্রকাশের একটি সম্পূর্ণ মিল থাকে। প্রভাতের সেই প্রথম মুহূর্ত্তে যে-আনন্দ, পাখীর গানে পল্লব-মর্ম্মরে তরুলতায় চিক্কণ কিরণসম্পাতের মধ্যে যে-অনুভূতি, তার মধ্যে দিয়ে নিজের সঙ্গে বিশ্বের যে-যোগ সেটিকে জানি। দিনের কাজের মধ্যে নানা চিন্তায় নিরুদ্ধ হয়ে আমরা হারিয়ে যাই। তখন আর সে বিশ্ববোধের ভাবটি উজ্জ্বল থাকে না। প্রভাতে চিন্তার তরঙ্গ যখন শান্ত হয়ে আছে তখন আমি সকলের মধ্যে আছি; আপনার থেকে বেরিয়ে পরমা শান্তির সঙ্গে আমাদের যে যোগ, সেটিকে নূতন ক'রে উপলব্ধি করি। প্রভাতে পাখীর গানের মধ্যেও এই আনন্দ; যা-কিছু পরিচিত এই আকাশ বাতাস, তার মধ্যে পাখী আছে, সে হারায়নি। সমস্ত বিশ্বের সঙ্গে এই সত্য সম্বন্ধটি জান্‌বার দরকার ছিল। প্রভাতে কোলাহল নেই, বিশেষ প্রয়াস নেই, তাই বিশ্বের সঙ্গে আমার চিরন্তন যোগটি সহজেই অনুভব করি। প্রভাতের শুভ্র আলোকের লীলা যখন বাইরে তাকিয়ে দেখি তখন সহজেই আনন্দ হয়।

নদীর যে-অংশ তিন দিকে আবদ্ধ এক দিকে খোলা তাকে বলে নদীর কোল। পদ্মার কোলে নৌকায় আমি দীর্ঘ দিন বাস করেছি, সেখানকার জল বয় না, ডাঙার দিকে আবদ্ধ। সেই অবরোধের এক দিক দিয়ে স্রোত বয়ে যাচ্ছে, অবরোধে স্রোতের গতি নেই। সেখানে নদীর যেন দুটি রূপ দেখ্‌তে পেলুম। এক দিক ডাঙায় আট্‌কে গিয়ে তার যাত্রা-পথকে ভুলেছে, অপর দিকের স্রোত নিরন্তর বাধাহীন গতিতে সমুদ্রের দিকে চলেছে।

আমাদের জীবনের এম্‌নি দুটি রূপ আছে। এক দিকে সে অবরুদ্ধ; জীবনের অন্য দিক যে অসীম সত্যের দিকে ছুটে চলেছে সে কথাটা আমরা তখন উপলব্ধি করি না; তার গতি ডাঙার দিকে, সে বোবা জল, কথা কয় না, সংসারে বদ্ধ, অচল। সেখানে যে ফেনপুঞ্জ প্রবেশ করেছে সে ক্রমে জমে ওঠে—যত ফেলে-দেওয়া খসে-পড়া ভেসে-আসা জিনিষ আর বেরোবার পথ পায় না, পুঞ্জীভূত হয়ে ওঠে, পলি পড়ে ক্রমশ তার গভীরতা হ্রাস হয়ে আসে, অবরোধ সম্পূর্ণ হয়। নদীর সঙ্গে তার যে চিরন্তন যোগ তা সে আর খুঁজে পায় না। সংসার তার কাছে যতই বড় হয়ে ওঠে ততই বিশ্বের সঙ্গে তার সত্য যোগ ছিন্ন হয়ে যায়। তখন মনে করি আমিই বেশি, আমার সুখদুঃখের মূল্য সকল সত্যের চেয়ে বড়—ঐখানেই সত্য পীড়িত হয়, অহং যেখানে চিত্তস্রোতকে অবরুদ্ধ করে, বিশ্বের সঙ্গে তার যোগকে ভুলিয়ে দেয় সেখানেই সে মুহ্যমান হয়, সেখানে কণ্ঠে তার বাণী নেই, আপনাকে সে বিস্মৃত হয়েছে।

আমাদের জীবনের এই যে অংশ যেখানে সে নিজের সাংসারিক খ্যাতি-প্রতিপত্তি সুখ-দুঃখকেই বড় ক'রে দেখেছে একে অবজ্ঞা করব না। এটাতে আমাদের বিশেষ বিপদ নাও ঘটতে পারে, যদি যে-দিকটা খোলা আছে, ধারা যেদিকে রুদ্ধ হয়নি তার সঙ্গে আমাদের বিচ্ছেদ না ঘটে। নদীর কোলের যদি চৈতন্য থাকৃত তাহলে সে জান্‌ত যে, যেদিকে নদী আপনাকে দান করছে, গভীরতা যেখানে ব্যাহত হয়নি, স্বচ্ছতা যেখানে অনাবিল সেদিকেই সে সত্য। যদি সে চিন্তা করতে পারৃত তাহলে সে বুঝ্‌ত যে, যেদিকে সে সব ভাসিয়ে দিতে পারে সেদিকেই তার প্রকৃত পরিচয়। সে-দিকটা আমরা হয়ত প্রায়শই জীবনে অনুভব করি, যেদিকে আমরা শুধু সঞ্চয় করতে চাইনে, ইচ্ছে ক'রে ক্ষতিকেও চাই, দুঃখকেও চাই—সেইটেই স্রোতের দিক্। এমন প্রেম যদি আমাদের দেশের প্রতি বন্ধুর প্রতি বা কোনো সৌন্দর্য্যসৃষ্টির প্রতি হয়, তাহলে আমরা আপনাকে ভুলতে পারি—বুঝ্‌তে পারি, এ ত শুধু আমার নিজের দিকের কথা নয়। পরম প্রেমের এই আনন্দ যখন আমাদের আপনাকে ভুলিয়ে দেয় তখন মৃত্যুভয়ও চলে যায়, মৃত্যুকেও তখন অসত্য

বলে জানি। মৃত্যু সত্য যেখানে জীবন অবরুদ্ধ, কর্ম্ম যেখানে শুধু কর্ম্মই। কর্ম্মের আনন্দ জ্ঞানের আনন্দ প্রেমের আনন্দ আমাদের অসীমের স্পর্শ এনে দেয়, বলে, বেরিয়ে পড়, যেখানে লোহার সিন্দুকে তুমি নানান্ বস্তু সঞ্চয় করছ সেখানে ত সত্য নেই, বেরিয়ে এস। তখন তর্ক আসে, সব কি শূন্যতার মধ্যেই ঢেলে দিলুম? যা একান্তভাবেই ক্ষতি তা আনন্দ দেয় না, জীবন তাকে স্বীকার করে না। মনের মধ্যে একটা বিশ্বাস আছে, যা দিলুম তা শূন্যতায় দিলুম না, তাই ত দিতে পারি। নদীর স্রোত ত মৃত্যুর দিকে যাচ্ছে না, সে যাচ্ছে সমুদ্রের দিকে—সেই অসীম পূর্ণতার মধ্যে সে আপনাকে দান করে। তার যদি চেতনা থাকৃত তো সে বল্‌ত, এই দান করেই আমি সত্য হই; সমুদ্রপথ যদি আমার কাছে বন্ধ হ'ত তাহলে আমি কারারুদ্ধ হতুম। সত্যকার আত্মদানে অসীমের অভিমুখে আমাদের গতি, এই উপলব্ধি যখন হয় তখন আপনাকে দিতেই আনন্দ। এই আনন্দের অবকাশ আমাদের জীবনে প্রতিদিনই আসে, কিন্তু সব সময় তা আমরা বুঝিনে। গীতা বলেছেন, ফলের কামনা ক'রে কর্ম্ম কোরো না। তার অর্থ এই যে, কর্ম্মদ্বারা যে সত্যকে লাভ করি ফল-কামনাদ্বারা সেই সত্য হ'তে আমরা বঞ্চিত হই। আমাদের কর্ম্ম স্বার্থের জন্য নয়; তার মধ্যে যে দুঃখ আছে তাতেই আনন্দ পাব। নিজের মধ্যে যে অনন্তের রূপ আছে, সে বলে দুঃখে কী ভয়। সত্যকার দুঃখ সেখানেই যেখানে সেই রূপ হারিয়ে যায়। এই দুঃখ থেকে মুক্তি পাবার পথ অসীমের ক্ষেত্র; যেখানে সবই যাচ্ছে পরিপূর্ণের দিকে। দিনরাত্র বিশ্বের স্রোত বয়ে চলেছে; অবরোধকে যদি একান্ত ক'রে না তুলি তাহলে সে আমার যত কলুষ যত কালিমা সব নির্ম্মল ক'রে দেবে। অসীমের সঙ্গে অহং-সীমার এই যোগ নিরন্তর রাখ্‌তে হবে। একদিকে শোকদুঃখ ক্ষতি নিরানন্দ—এ অবরোধেরও গৌরব আছে যদি অসীমের সঙ্গে কল্যাণের সঙ্গে যোগরক্ষা ক'রে চল্‌তে পারে। নিখিল সত্যের সঙ্গে এই যোগরক্ষা ক'রে চলাই আমাদের সাধনা।

এমন অনেক লোক পৃথিবীতে আছেন যাঁরা পরম-পুরুষের অস্তিত্ব মানেন না। যদি তাঁরা ত্যাগের ধর্ম্ম গ্রহণ ক'রে থাকেন, সত্যের জন্য আত্মদানে আনন্দ লাভ করেন, তাহলে সেই সত্যই তাঁদের ব্রহ্ম। মুখের কথায় মাত্র যাঁরা ধার্ম্মিকতা প্রকাশ করেন, কোনো মূল্যই সে ধার্ম্মিকতার নেই। ত্যাগেই আনন্দিত হবার ধর্ম্ম যাঁদের মধ্যে আছে, তাঁরা স্বীকার করুন আর নাই করুন তাঁরাই সত্যের পূজক। তাঁদের আমরা প্রণাম করি। শুধু ভাষার অনৈক্যকেই বড় ক'রে দেখ্‌ব না। অনেকে আছেন যাঁরা ঈশ্বরকে স্বীকার করেন, কিন্তু ভীরু, বিষয়ী, ত্যাগের আনন্দ থেকে বঞ্চিত,—তাঁরা যতই ফোঁটা কেটে মালা ঘুরিয়ে বেড়ান্ না কেন, ত্যাগের আনন্দ থেকে তাঁরা বঞ্চিত, আত্মা তাঁদের অবরুদ্ধ, বিশ্বের কাছে নিজেকে দান ক'রে আনন্দিত হবার আলোর দিকের দরজা তাঁদের খোলা নেই—সত্যভ্রষ্ট হতভাগ্য তাঁরা। কোনো বাহ্যিকতা নয়, কোনো আচার-অনুষ্ঠান নয়—অন্তরতর স্বভাবকে যা উজ্জ্বল করে সেই আনন্দিত ত্যাগের সাধনা, অসীম সত্যকে স্বীকার করবার সাধনাই আমাদের সাধনা।*

২৫ মাঘ ১৩৩৪

*শান্তিনিকেতনে আচার্য্যের সম্ভাষণ। শ্রীপুলিনবিহারী সেন কর্ত্তৃক অনুলিখিত ও বক্তা কর্ত্তৃক সংশোধিত।

বর্ত্তমান শিক্ষাপদ্ধতি ও জীবন-সংগ্রামে তাহার মূল্য

শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র রায়

আমার স্মরণ আছে, প্রায় ষাট বৎসর পূর্ব্বে আমার পরলোকগত জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা প্রায়ই বলিতেন "পাশায় অধ্যয়নম্"। সেই সময় অন্ততঃ বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাপ পাইলেই একটি চাকুরি মিলিত. না-হয় ডাক্তারী ও ওকালতী দ্বারা রোজগারের পথ পরিষ্কার হইত, সেইজন্যই এই সমস্ত ডিগ্রির উপর একটি কৃত্রিম মূল্য নির্দ্ধারিত হইয়াছিল। বিশেষতঃ যে-ছেলে পরীক্ষায় যত উচ্চ স্থান অধিকার করিত তাহার তত মোটা মাহিনার চাকুরি মিলিত। জলপানী-পাওয়া ছেলেদের আরও আদর, এই রকম পাস-করা ছেলেদের হাতে কন্যা সম্প্রদান করিবার জন্য সমাজের বড় বড় লোকও লালায়িত হইত এবং বিবাহের বাজারে তাহারা নিলাম হইয়া সর্ব্বোচ্চ দরে বিক্রীত হইত। এই স্থানে একটি কথা অপ্রাসঙ্গিক হইলেও না-বলিয়া থাকিতে পারিলাম না। বরিশালের প্রথিতনামা অশ্বিনীবাবু বলিতেন, "আমি যদি জানিতাম যে এই ব্রজমোহন কলেজ স্থাপন করাতে অবিবাহিত কন্যার পিতার রক্ত শোষণ করিবার কল সৃষ্টি হইয়াছে, তাহা হইলে কখনও এই দুষ্কর্ম্মে প্রবৃত্ত হইতাম না।"

আমাদের বালকদের এই একমুখো শিক্ষাই যত রকম অনর্থ সৃষ্টি করিতেছে। মনে করুন, এক বাপের চার ছেলে, তাহাদের মধ্যে যে-ছেলের বিদ্যাশিক্ষার প্রতি ঐকান্তিক অনুরাগ আছে তাহাকেই বাছিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রেরণ করা উচিত। কিন্তু প্রত্যেক ছেলেকেই যে উপাধিধারী করিতে হইবে এরূপ অদ্ভুত বা উৎকট রীতি পৃথিবীতে আর কোথাও দেখা যায় না। ছেলেদের পিতামাতা ও অভিভাবকগণ তাঁহাদের অজ্ঞাতসারে যে কি সর্ব্বনাশের প্রশ্রয় দিতেছেন তাহা বলা যায় না। আজ শতাধিক বর্ষ যাবৎ অর্থাৎ হিন্দু কলেজ সংস্থাপনের পর হইতে আমাদের সমাজে এমন একটি হাওয়া প্রবাহিত হইতেছে যে, ছেলেরা ভাবে পাস না করিতে পারা একটি অপরাধ। কলিকাতার অনেক পাড়ায় যেখানে খুব ঘন বসতি এবং সূর্য্যাস্তের পর এক ছাদ হইতে অপর

অধুনা বাংলা দেশের শিক্ষা প্রায় অশিক্ষাতে পরিণত হইয়াছে। বস্তুত এই তথাকথিত শিক্ষার মোহে পড়িয়া বাংলার যুবকগণ তাহাদের ভবিষ্যৎকে একেবারে নষ্ট করিয়া ফেলিতেছে।

পুরাকাল হইতে স্কটল্যাণ্ড দেশে একপ্রকার প্রাথমিক শিক্ষা প্রচলিত আছে। বাংলা দেশের দুই একটি জেলার সমান এই ক্ষুদ্রায়তন দেশে চারিটি বিশ্ববিদ্যালয় এবং গ্রামে গ্রামে শত শত পাঠশালা বিদ্যমান। এই কারণে, ঐ দেশের সামান্য শ্রমজীবী এবং চাষীর ছেলেরাও প্রাথমিক শিক্ষা হইতে বঞ্চিত হয় নাই। মনীষী কার্লাইলের জীবনচরিত-পাঠে ইহা সম্যকরূপে উপলব্ধি করা যায়।

বাল্যকাল হইতে বালকের প্রতি দৃষ্টি রাখিলে বোঝা যায় যে, তাহার ভাবী উন্নতির আশা কিরূপ। একটি চল্‌তি প্রবাদ আছে, "উঠন্তি মূলোর পত্তনেই বোঝা যায়" অর্থাৎ কোন্ ছেলের দৌড় কত দূর এবং কোন্‌দিকে তাহার প্রতিভা খেলে তাহা বাল্যকাল হইতেই বুঝিতে পারা যায়।

কিন্তু আমাদের দেশে সর্ব্বনাশের মূল এই যে মা-বাপ ও অভিভাবকগণের ইচ্ছা—তাঁহাদের প্রত্যেক ছেলেই ইংরেজী বিদ্যালয়ে প্রবেশ করিবে এবং প্রবেশিকা পরীক্ষার পর বি-এ, বি-এস্‌সি, এম্ এ, এম্-এস্‌সি ইত্যাদি উপাধিতে ভূষিত হইবে। তাঁহাদের ধারণা বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইতে না পারিলে ভাবী জীবনযাত্রার পথ রুদ্ধ হইয়া যাইবে। এইজন্য জোরজবরদস্তি করিয়া প্রত্যেক ছেলেকেই পাস করান চাই এবং যদি দেখেন যে, কোন ছেলে ইংরেজীতে, সংস্কৃতে বা গণিতে একটু পশ্চাৎপদ অমনি প্রত্যেক বিষয়ের জন্য একটি করিয়া প্রাইভেট টিউটর রাখিয়া দেওয়া হয়, অবশ্য যদি অবস্থা সচ্ছল থাকে। যেন, জীবনের একমাত্র উদ্দেশ্য 'ডিগ্রী' ও 'নকরী' লাভ। আমার শৈশবাবস্থা হইতে এই ছড়াটি শুনিয়া আসিতেছি।

"লেখাপড়া করে যে-ই
গাড়ী ঘোড়া চড়ে সে-ই"

ছাদের মেয়েরা আলাপ-পরিচয় ও ভাবের আদান-প্রদান করিতে পারে, সেখানকার একটি কল্পনা-প্রসূত কথোপকথন উদ্ধৃত করিতেছি, "দেখ বোন, অমুকের ছেলেটি কেবল যে পাস করল তা নয়, ২০৲ জলপানিও পেয়েছে, কিন্তু আমার কি পোড়াকপাল! ছেলেটা এবার ফেল্ হয়েছে!" কিন্তু তখন তিনি ভুলিয়া যান যে অন্তরাল হইতে ছেলে কান পাতিয়া সব শুনিতেছে। আজ বহুদিন হইতে আমাদের সমাজের মধ্যে এই ভ্রান্ত ধারণা বদ্ধমূল যে. যে-ছেলে পরীক্ষা পাস করিতে পারিল না তাহার জীবন বিফল ও নিরর্থক। এই ধারণার যে কি বিষময় ফল ফলিতেছে তাহা বলিয়া শেষ করা যায় না। এমন অনেক ছেলেও দেখা যায় যাহারা পরীক্ষায় অকৃতকার্য্য হইয়া মুখ দেখাইতে লজ্জা পায়, এমন কি, আত্মহত্যাও করে। ইহার জন্য দায়ী মা-বাপ. অভিভাবকগণ ও সমাজ।

জগতের ইতিহাস আলোচনা করিলে দেখা যায়, পাস-করা ছেলের দ্বারা বড় একটা মহৎ কিছু সম্পাদিত হয় নাই। কারণ তাহারা আটঘাট-বাঁধা ধারাবাহিক কাজ ভিন্ন অন্য কিছু করিতে সক্ষম হয় না। পাস-করা ছেলে ও টুলোপণ্ডিত অনেকটা এক ধরণের। একটি প্রচলিত কথা আছে, ন্যায়পঞ্চানন বা তর্করত্ন মহাশয় গাড়ু হাতে করিয়া মাঠে প্রাতঃকৃত্য করিতে গিয়াছেন, কিন্তু ফিরিবার সময় ন্যায়শাস্ত্রের ফিকিরী আলোচনা করিতে করিতে তন্ময় ও অন্যমনস্ক হইয়া যখন গ্রামান্তরে চলিয়া গিয়াছেন, তখন তাঁহার চৈতন্য হইল। পুঁথিগত বিদ্যা যথার্থ ই ভয়ঙ্করী। কতকগুলি গৎ মুখস্থ করিয়া আওড়াইতে পারাই যে বিদ্যাশিক্ষা, এ ভ্রমাত্মক ধারণা যতদিন না আমাদের সমাজ হইতে দূরীভূত হয় ততদিন বাঙালী জাতির উদ্ধার নাই। উত্তর-পশ্চিম প্রদেশের ভূতপূর্ব্ব রাসায়নিক ডক্টর হ্যান্‌কিন একখানা পুস্তক লিখিয়াছেন। তিনি তাহাতে কেতাবী বিদ্যা বৈজ্ঞানিক ভাবে সমালোচনা করিয়াছেন। অর্থাৎ তিনি দেখাইয়াছেন যে, যদি ভবিষ্যৎ জীবনে উপার্জ্জন করিয়া খাইতে হয় তাহা হইলে এই শিক্ষা জীবনসংগ্রামে সহায়ক না হইয়া পরিপন্থীই হয়।

বিখ্যাত রবার্ট ক্লাইভ বাল্যকালে লেখাপড়ায় মনোনিবেশ করিতে না পারায় ডানপিটে ছেলেদের নেতা হইয়া নানা প্রকার লঙ্কাকাণ্ড করিতেন, কখনও বা উচ্চ গির্জ্জার শিখরে আরোহণ করিয়া ভয় দেখাইতেন যে, এইখান হইতে পড়িয়া মরিবেন। তাঁহার পিতা এই ডান্‌পিটে ছেলের হাত হইতে পরিত্রাণ পাইবার নিমিত্ত লণ্ডনে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর কর্ত্তৃপক্ষদের বলিয়া-কহিয়া পুত্রের জন্য একটা কেরাণীগিরি জুটাইয়া তাহাকে মাদ্রাজে প্রেরণ করেন। এই রবার্ট ক্লাইভ যে কি প্রকারে অসাধারণ কৃতিত্ব দেখাইয়া ভারতে ইংরেজ-রাজত্বের ভিত্তি স্থাপন করিয়াছেন তাহা এখানে বলা নিষ্প্রয়োজন।

ইদানীং সমগ্র আফ্রিকায় বৃটিশ সাম্রাজ্যের স্থাপনকর্ত্তা সিসিল্ রোড্‌স্ অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে কিছুদিন ছিলেন বটে, কিন্তু লেখাপড়ায় আদৌ পারদর্শিতা লাভ করিতে পারেন নাই।

দ্বিতীয় চার্লসের সময়ের একজন সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ধনী স্যর জোসাইয়া চাইল্‌ড্‌স্ একটি আপিসের ঝাড়ুদার ছিলেন। লেখাপড়ার বড় একটা ধার ধারিতেন না, কিন্তু স্বীয় প্রতিভাবলে উন্নতি লাভ করেন এবং সর্ব্বশেষে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর প্রধান পরিচালকের পদে প্রতিষ্ঠিত হইয়া প্রভূত ধনোপার্জ্জন করেন।

বাঙালী ছাত্র প্রায়ই নিজেকে বড় বুদ্ধিমান বলিয়া গর্ব্বানুভব করে, কিন্তু কথায় বলে যত চতুর তত ফতুর—কথা বেচিয়া খাওয়া কয়দিন চলে? 'শুধু কথায় চিঁড়ে ভেজে না'। বাঙালী ছেলেদের শৈশবাবস্থা হইতে এইরূপ চতুরতা অবলম্বন করা অর্থাৎ ফাঁকি দিয়া পাস করা একটা চরিত্রগত দোষ হইয়া দাঁড়াইয়াছে। আমি অর্দ্ধশতাব্দী ধরিয়া এই অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছি যে, বক্তৃতা-প্রসঙ্গে কোন বিষয় বিশদরূপে বুঝাইবার জন্য নানারকম দৃষ্টান্তের সহায়তায় যদি সেটুকু হৃদয়ঙ্গম করাইবার চেষ্টা করা যায়, তবে ছেলেরা কখনও মনোযোগ দিবে না এবং ইহার দরুণ যদি তাহাদিগকে ধমক্ দেওয়া যায় তাহা হইলে নির্লজ্জ ভাবে বলে 'মহাশয়, ও ত পরীক্ষা পাস করিতে লাগিবে না!' শুধু কলেজের ছেলেদের দোষারোপ করিতে চাহি না, স্কুলের ছেলেদের মধ্যেও এই পাপ ঢুকিয়াছে। বাল্যকালে আমরা যখন স্কুলের নিম্নশ্রেণীতে অধ্যয়ন করিতাম তখন অভিধান দেখিয়া শব্দার্থ বাহির করিতাম, এমন কি সময়ে সময়ে ওয়েবষ্টার দেখিয়া শব্দের প্রমাণ ও প্রয়োগ জানিতাম

কিন্তু ইদানীং অভিধান ব্যবহার করা প্রায় লোপ পাইয়াছে। দুই একটি ছেলের কাছে দুই-একখানি পকেট অভিধান দৃষ্ট হয় মাত্র। পাঠ্যপুস্তকের যে-কয়েকটি নির্দ্ধারিত গল্প থাকে তাহা অপেক্ষা অর্থপুস্তকের আয়তন দুই তিন গুণ হইবে। সময়ে সময়ে ইহা পঞ্জিকার ন্যায় কলেবরও ধারণ করে, সুতরাং অভিধান দেখিবার কোন প্রয়োজন হয় না। আবার কলেজের ছাত্রদের মধ্যে দেখা যায়, তাহারা ইংরেজী ভিন্ন রসায়ন, পদার্থবিজ্ঞান, ইতিহাস প্রভৃতির জন্য নির্দ্ধারিত পুস্তকের ধার ধারে না। আই-এ, আই-এস্‌সি, বি-এ, বি-এস্‌সি মাত্র দুই বৎসর করিয়া পড়িতে হয়। ইহার বার আনা সময়ই আলস্যে ও ঔদাস্যে অতিবাহিত হয়, কারণ তাহারা জানে যে পরীক্ষার দুই মাস আগে হইতে টীকা-টিপ্পনী ইত্যাদি কণ্ঠস্থ করিয়া বেশ পাস করা যাইবে, এমন কি, ছাত্রদের মধ্যে এই ধারণা বদ্ধমূল হইয়া আসিয়াছে যে, যাহারা যত নির্ব্বোধ তাহারাই তত বড় বড় পুস্তক পড়িয়া বৃথা সময় নষ্ট করে। প্রকৃত বিদ্যার্জ্জন বা জ্ঞানস্পৃহা বর্ত্তমানকালের ছাত্রবর্গের মন হইতে দিন দিন তিরোহিত হইতেছে এবং যাহা জ্ঞান তাহা কেবল ভাসা ভাসা। এখনকার উপাধিধারীদের মধ্যে পল্লবগ্রাহিতাই বিশেষভাবে দেখা যায়।

আমাদের ছেলেদের বাল্যকাল হইতে এই ধারণা জন্মাইয়া দেওয়া হয় যে, বিদ্যাশিক্ষা মানে ক্লাস-প্রমোশন ও পরীক্ষা-পাস; ইহা প্রকৃত শিক্ষার পথে প্রধান প্রতিবন্ধক। বিদ্যাশিক্ষা কখনও খানকয়েক পাঠ্যপুস্তকের মধ্যে সীমাবদ্ধ নহে। আমি বক্তৃতা-প্রসঙ্গে ও প্রবন্ধাদিতে এই কথা বলিয়া বলিয়া হয়রাণ হইয়াছি, যে, জগতে যাঁহারা সাহিত্য, বিজ্ঞান ও সমাজনীতিক্ষেত্রে অসাধারণত্ব দেখাইয়াছেন তাঁহারা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাঁধাবাঁধি নিয়মের বিশেষ ধার ধারিতেন না, কিন্তু তাঁহারা প্রত্যেকেই এক একজন গ্রন্থকীট ছিলেন। মার্কিন দেশীয় প্রসিদ্ধ দার্শনিক এমার্সন্ বলেন, যদি আমাকে কেহ কোন স্কুল পরিদর্শন করিতে বলেন তাহা হইলে বাজে বই হইতে কে কত জ্ঞানলাভ করিয়াছে তাহাই জানিতে চাই, কাহাকেও জিজ্ঞাসা করি তুমি নেপোলিয়ান সম্বন্ধে কি জান? কাহাকেও বা গ্যারিবল্ডি সম্বন্ধে প্রশ্ন করিয়া থাকি। আমাদের বাংলা দেশে যে কয়জন সাহিত্যক্ষেত্রে অসাধারণ কৃতিত্ব দেখাইয়াছেন, যথা—রবীন্দ্রনাথ, গিরীশচন্দ্র, শরৎচন্দ্র—ইঁহাদের প্রত্যেকেই অসংখ্য গ্রন্থ অধ্যয়ন করিয়াছেন। একা শরৎচন্দ্রের একখানি পুস্তিকা—'নারীর মূল্য'—পাঠ করিলে বোঝা যায় যে, ইঁহার কত গভীর পাণ্ডিত্য। এই পুস্তিকাখানির পাদটীকায় যে-সমস্ত গ্রন্থের উল্লেখ আছে আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ের বড় বড় উপাধিধারীরা তাহার নাম পর্য্যন্ত শোনেন নাই। এই সাহিত্যরথীত্রয় বিশ্ববিদ্যালয়ের ধার ধারেন নাই।

ছেলেদের জন্য প্রাইভেট টিউটর নিযুক্ত করা প্রকৃত বিদ্যালাভের আর একটি প্রধান অন্তরায়। ষাট বৎসর যাবৎ এই কলিকাতায় দেখিতেছি, যাহারা একটু অবস্থাপন্ন তাঁহাদের ধারণা যে, ছেলেদের জন্য মাষ্টার না রাখিলে তাহাদের বিদ্যাশিক্ষার ব্যাঘাত ঘটিবে। ইহাতে যে কেবল স্বাস্থ্যের বিশেষ ক্ষতি হয় তাহাই নয়, প্রকৃত জ্ঞানলাভেরও অন্তরায় ঘটে। একে ত ছেলেরা দশটার সময় তাড়াতাড়ি দুটি ভাত মুখে দিয়া ঊর্দ্ধশ্বাসে ছুটে, তাহার পর দশটা হইতে চারটা পর্য্যন্ত ক্লাসের পর ক্লাস, মাঝে মাত্র আধ ঘণ্টা টিফিন। ছুটি হইলেই বাড়ি আসিয়া কিছু জলযোগ গ্রহণ করে। স্বাস্থ্যের দিক দিয়া দেখিতে গেলে সেই সময় তাহাদের খেলাধূলার বিশেষ প্রয়োজন, কিন্তু দেখা যায়, ছেলেটি যেমন একটু হাঁফ ছাড়িল অমনি ভৃত্য আসিয়া খবর দিল যে, মাষ্টার বাবু আসিয়াছেন। বেচারাকে পুনরায় আবার পিঞ্জরাবদ্ধ করা হইল। শিক্ষক মহাশয়ও তাঁহার নিজের অস্তিত্ব সপ্রমাণ করিবার জন্য, ছেলেকে অভিধান খুলিতে এবং অঙ্ক বা জ্যামিতির অনুশীলন নিজের মাথা ঘামাইয়া করিতে দিবেন না। সব নিজেই সমাধান করিয়া দিবেন। ইহাতে ছেলের বুদ্ধিবৃত্তির পরিচালনা অভাবে কোন রকমেই বিকাশ পায় না, প্রকৃতপক্ষে তাহাকে তোতাপাখী করিয়া তোলা হয়। আমি অবশ্য এ-কথা স্বীকার করি যে, ছাত্র যদি কোন বিশেষ বিষয়ে একটু কাঁচা থাকে তাহা হইলে একটু সহায়তার প্রয়োজন হয়। কিন্তু প্রত্যেক ছেলের পিছনে শিক্ষক লাগাইয়া তাহাদের স্বাধীন চিন্তার পথ রুদ্ধ করা নিতান্তই গর্হিত। ইংরেজীতে একটি ছড়া আছে—

"Work while you work
Play while you play"

অর্থাৎ যখন পড়িবে মনোযোগ দিয়া পড়িবে, এবং যখন খেলিবে তখন অন্য কিছু করিবে না। কিন্তু অভিভাবকগণের হুকুম—কেবল 'পড় পড় পড়'। লাভের মধ্যে এই যে ছেলেরা পড়াশুনাকে একটি বিভীষিকা বলিয়া মনে করিয়া বসে, এবং স্কুলের ছুটির পরেই গৃহশিক্ষকের পাল্লায় পড়িয়া তাহাদের বুদ্ধি-বৃত্তি তীক্ষ্ণ হওয়া দূরে থাকুক একেবারে ভোতা হইয়া যায়।

বাঙালীর ছাত্রজীবনে আর একটি অভাব দৃষ্ট হয়, তাহা এই, ইহাতে কোন রকম বৈচিত্র্য নাই। জীবন-ধারা সুখকর করিতে হইলে প্রত্যেকেরই একটি খেয়াল পরিপোষণ করা নিতান্ত প্রয়োজন; ফুলের বাগান করা, সঙ্গীতচর্চ্চা, চিত্রবিদ্যা, দশ-পনর মাইল পদব্রজে ভ্রমণ এবং বনে জঙ্গলে চড়ুইভাতী বিশেষ আমোদ-জনক। অবশ্য কলিকাতায় স্থানসঙ্কীর্ণতায় ইহার কতকগুলি ব্যাপার সম্ভব হইয়া উঠে না, কিন্তু আবার নানা বিষয়ক বিদ্যার্জ্জন বা জ্ঞান-লাভ করিবার অপূর্ব্ব সুযোগ কলিকাতার ন্যায় অন্যত্র কোথাও নাই। আমি লণ্ডনে চিড়িয়াখানায় দেখিয়াছি যে, প্রত্যহ শত শত আবালবৃদ্ধবনিতা তথায় সমবেত হইয়া জীব-জন্তুর জীবনযাত্রাপ্রণালী পর্য্যবেক্ষণ করে এবং নানা প্রকার তথ্য সংগ্রহ করিয়া থাকে। অনেক সময় ইহা হইতে অনেকের মনে প্রাণিবিদ্যা শিখিবার একটি প্রেরণা জাগিয়া ওঠে, কিন্তু আমাদের এখানে তাহার কিছুমাত্র নিদর্শন পাওয়া যায় না। কলিকাতার যাদুঘরে একটি মাত্র কক্ষে এত শিখিবার জিনিষ আছে যে, তাহা বোধ হয় সমস্ত জীবনেও শেষ করা যায় না, ইহা ছাড়া বহু চিত্রশালাও আছে। কিন্তু বড়ই দুঃখের বিষয়, আমাদের চিড়িয়াখানা ও যাদুঘর প্রায়ই কালীঘাট-ফেরতা তীর্থযাত্রী দ্বারা পরিপূর্ণ হইয়া থাকে। আমাদের কলিকাতার ছেলেরা শৈশব কাল হইতে যেন জড়ভরত হইয়া থাকে।

আমি সময় সময় বিকাল সাড়ে পাঁচটার সময় সুকীয়া ষ্ট্রীট দিয়া কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট অতিক্রম করিয়া বরাবর বারাণসী ঘোষ ষ্ট্রীট দিয়া জোড়াসাঁকো পর্য্যন্ত যাই। আমি দেখিয়া অবাক্ হই, দশ-পনর-কুড়ি বৎসরের বালক হইতে আরম্ভ করিয়া চল্লিশ-পঞ্চাশ-ষাট-পঁয়ষট্টি বৎসরের বৃদ্ধ পর্য্যন্ত দু-ধারে রকের উপর প্রস্তরমূর্ত্তিবৎ নড়চড়বিহীন হইয়া গল্প-গুজব করিতেছে এবং এইরূপে সময়ের সদ্ব্যবহার ঘণ্টার পর ঘণ্টা করিতেছে। কিন্তু ইউরোপে যখন বাহিরে ক্রীড়া-কৌতু[ক] করিবার সুবিধা থাকে, শত শত নর-নারী সাধারণ উদ্যা[নে] বয়সানুসারে লম্ফঝম্ফ দৌড়া-দৌড়ি করে এবং বয়োবৃদ্ধের[া] মৃদুমন্দ ভাবে পদচারণা করিয়া থাকে। বাস্তবিকই আমাদে[র] জাত যেন মরা, কথায় বলে, "থোড় বড়ি খাড়া, খাড়া ব[ড়ি] থোড়"। আবহমান কাল হইতে প্রচলিত একটা সঙ্কীর্ণ গণ্ডী[র] ভিতর বাঙালীর জীবনধারা কেবলই ঘুরিয়া মরিতেছে, এব[ং] এই কারণে বদ্ধমূল সংস্কার তাহাদের হৃদয়ে দৃঢ়তর হইতেছে।

মূলকথা এই, যে-ব্যক্তি যথার্থ জ্ঞানলাভের প্রের[ণা] পাইয়াছে সে আত্মচেষ্টা দ্বারাই ক্রমশঃ উন্নতিলাভ করিবে[।] যে-কয়জন বাঙালী সাহিত্য-জগতে প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছে[ন] তাঁহাদের উল্লেখ পূর্ব্বে করিয়াছি। এখন কয়েক জন ভারত[-]বাসীর নাম করিতেছি যাঁহারা সাময়িক পত্র সম্পাদনে অসাধারণত্ব দেখাইয়াছেন। বিখ্যাত 'হিন্দু পেট্রিয়ট' পত্রিকা পর পর দুইজন প্রাতঃস্মরণীয় সম্পাদক হরিশ্চন্দ্র মুখোপাধ্যায় [ও] কৃষ্ণদাস পাল নিজ চেষ্টাবলে মানুষ হইয়াছিলেন। তাঁহার[া] ইংরেজীতে যে-সমস্ত প্রবন্ধ লিখিতেন, তাহার সমকক্ষ প্রব[ন্ধ] লিখিতে আজও পর্য্যন্ত কেহ সক্ষম হইয়াছেন কি-না সন্দেহ[।] 'অমৃতবাজার পত্রিকা'র সম্পাদক শিশিরকুমার ও মতিলাল [যে] কি প্রকার যোগ্যতার সহিত এই কার্য্য সম্পন্ন করিতেন তাহ[া] বলা নিষ্প্রয়োজন। আর একজনের কথা বলি, শ্রীযু[ক্ত] যজ্ঞেশ্বর চিন্তামণি (অবাঙালী)। তিনি জীবনের প্রথম বয়[সে] সামান্য একজন কেরাণী ছিলেন, কিন্তু আত্মচেষ্টা ও পুরুষকার বলে আজ ভারতের একটি শীর্ষস্থান অধিকার করিয়াছেন[।] কেবল 'লীডার' পত্রিকার সম্পাদনে নয়, রাজনীতিক্ষেত্রে[ও] তাঁহার ন্যায় ব্যক্তি অতীব বিরল। আর একজনের না[ম] করিয়াই শেষ করিব, ইনি পরলোকগত কেশবচন্দ্র রায় যিনি K. C. Roy of the Associated Press বলিয়া বিখ্যাত। শৈশবে যখন তিনি ফরিদপুর স্কুলে পড়িতে[ন] তখন তিনি খারাপ ছেলে বলিয়া পরিগণিত ছিলেন[।] অঙ্কশাস্ত্রে বিশেষ কাঁচা বলিয়া তিনি প্রায়ই ক্লাস-প্রমোশ[ন] পাইতেন না। কিন্তু নিজে নিজে চুরি করিয়া ইংরেজী সাহিত্য অধ্যয়ন করিতেন। এক সময় একজন ইংরেজ স্কুল-পরিদর্শক তাঁহাদের স্কুল পরিদর্শন করিতে আসিয়[া] উচ্চশ্রেণীর ছাত্রদিগকে ইংরেজীতে একটি প্রবন্ধ লিখিতে

বলেন। বালক কেশবচন্দ্রের প্রবন্ধটির বিশেষত্ব দেখিয়া তাঁহার তাক লাগিয়া গেল। ইনি প্রবেশিকা পাস করিতে অসমর্থ হইয়া কিছুদিন ইডেন হিন্দু হোষ্টেলে সামান্য বেতনে বাজারসরকারী করিলেন এবং এই সময় 'ইণ্ডিয়ান ডেলি নিউজ' পত্রিকায় ছোট ছোট প্রবন্ধ দিতেন। পরিশেষে তিনি এসোশিয়েটেড প্রেসের অধিনায়ক হন। বলা বাহুল্য এই কয়জনের কেহই বিশ্ববিদ্যালয়ের নিকট ঋণী নহেন।

ছাত্রদের নৈরাশ্যই বিদ্যাশিক্ষার একটি প্রধান প্রতিবন্ধক। এমন কি দেখা যায়, যাহারা কলেজে প্রবেশ করে তাহারা প্রথম হইতেই বিলক্ষণ উপলব্ধি করে এবং বলিতেও ত্রুটি করে না যে, পড়াশুনা করিয়া কি হইবে? হাজার হাজার গ্রাজুয়েট ইতিপূর্ব্বেই অন্নচিন্তা করিয়া হাহাকার করিতেছে। সেদিন কলেজ অব্ সায়ান্সে যাঁহারা পঞ্চম শ্রেণীতে আসিয়া ভর্ত্তি হইয়াছেন তাঁহাদের কয়েক দিন ধরিয়া প্রশ্ন করিলাম,—তোমরা কেন আসিয়াছ? তাঁহারা বলিলেন, মা বাপ ছাড়ে না, তাই। পাঠকপাঠিকাগণ হয়ত মনে করিতে পারেন যে, আমার এপ্রকার প্রশ্ন করিবার কারণ কি? কারণ এই যে, মাসাবধি নজর রাখিয়া দেখিলাম, কোনদিন একটি ছুটির অজুহাত পাইলেই তাহারা চম্পট দিবার জন্য প্রস্তুত। যদি বলেন, লেকচার হইবে না, কলেজে থাকিয়া কি করিবে? ইহার উত্তরে বলিব যে, রসায়ন শাস্ত্র পরীক্ষামূলক, সুতরাং হাতে-কলমে টেষ্ট টিউব লইয়া কাজ করা ইহার প্রধান অবলম্বন। আমরা প্রাক্‌টিক্যাল ক্লাস সর্ব্বদাই খুলিয়া রাখিতে প্রস্তুত আছি। কিন্তু আমি দেখিয়া অবাক্ হই যে, যাঁহারা বি-এস্‌সি-তে অনার্স লইয়া প্রবেশ করিয়াছেন তাঁহাদের মধ্যে বিদ্যাশিক্ষা বা জ্ঞানস্পৃহার কিছুমাত্র নিদর্শন পাওয়া যায় না। কাজেই মেসে যাইয়া আর একদফা দিবানিদ্রা, তাস ইত্যাদি ক্রীড়া তাহাদের নিকট অধিকতর প্রিয়।

বিশ্ব ও বিশ্বরূপ

শ্রীশৌরীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য

সংসার-বিরাগী যবে ছিন্ন করি সংসার বাঁধন,
বিশ্বেরে করিয়া ত্যাগ গেল বিশ্বরূপের সন্ধানে,
চারিদিক ঘিরে তার মুহুর্মুহু উঠিল আহ্বান.
"আয় বৎস ফিরে আয় রূপে রূপে আছি এইখানে।"
বৈরাগী চমকি চাহে,- আহ্বান উঠিল নীলাকাশে,
স্নেহ-বাহু দোলাইয়া ডাক দিল আকুল পবনে,
ডাকে ঊর্দ্ধে রবি শশী, নিম্নে ডাকে প্রিয়া কণ্ঠস্বরে.
ব্যাকুল দেবতা-কণ্ঠ ভেসে আসে নদী-শৈলে-বনে।

সিন্ধুজলে ফুলেফলে উঠে বিশ্বরূপের আহ্বান,
স্থাবর জঙ্গম ডাকে—"আয় মোর ভক্ত ফিরে আয়,"

বৈরাগী কাঁদিয়া কহে "নমি তোরে মায়ার বাঁধন,
ক্ষমা কর---ক্ষমা কর-- হে মায়াবী, বিদায়—বিদায়।"

ভক্তেরে দেবতা তবু ডাকে নিত্য হয়ে বিশ্বচারী,
বিশ্বেরে ছাড়িয়া হায় চলে বিশ্বরূপের ভিখারী।

সন্ধি

শ্রীযতীন্দ্রমোহন সিংহ

দ্বিতীয় খণ্ড

নীহারিকার কথা

১

এক দিন দাদা সন্ধ্যার সময় বেড়াইয়া আসিয়া আমাকে বলিল,—"নীরি, তোর জন্যে আজ একটা উপহার এনেছি, এই দ্যাখ্।" এই বলিয়া আমার হাতে একখানা 'ভারত-প্রভা' পত্রিকা দিল। আমি সেই পত্রিকার প্রথম পৃষ্ঠায় সূচীপত্রের উপর চোখ বুলাইতে গিয়া একটা লেখা দেখিলাম—"স্ত্রী-শিক্ষার পরিণাম।" আমি তৎক্ষণাৎ সেই প্রবন্ধটি পড়িয়া ফেলিলাম। পড়িতে পড়িতে আমার মনে ভয়ানক রাগ হইল। লেখক লিখিয়াছেন—

"পাশ্চাত্য দেশসমূহের অনুকরণে আমাদের দেশে যে স্ত্রীশিক্ষা প্রবর্ত্তিত হইয়াছে তাহার পরিণাম শুভ নহে। সেই সকল দেশেই ইহার বিষময় ফল দেখা যাইতেছে। লেখাপড়া শিখিয়া স্ত্রীলোকেরা পুরুষের সহিত সমস্ত বিষয়ে সমকক্ষতার দাবি করিতেছেন। শিক্ষিতা নারীগণ বিবাহে বিমুখ হইয়া পড়িতেছেন। তাঁহারা অনেকে পুরুষের ন্যায় স্বাধীন ভাবে জীবিকা অর্জ্জন করিয়া স্বাধীন ভাবে জীবন যাপন করিবার পক্ষপাতী হইয়া পড়িতেছেন। সন্তান-উৎপাদন ও সন্তান-পালনের দায়িত্ব তাঁহারা স্বীকার না করিয়া বিলাসিতার স্রোতে গা ভাসাইয়া দিতেছেন। তাঁহারা গৃহের সুখশান্তির স্থলে হোটেলের নিঃসঙ্গতা বেশী পছন্দ করেন। স্ত্রীজাতির এই প্রকার সম্পূর্ণ স্বাধীনতা সমাজস্থিতির পক্ষে কল্যাণকর নহে। মহর্ষি মনু যথার্থই বলিয়াছেন, স্ত্রীজাতি স্বাতন্ত্র্য পাওয়ার যোগ্য নহে। স্বগৃহে বাস, স্বামিসেবা, সন্তানপালন পরিজনের পরিচর্য্যা ইত্যাদি কর্ত্তব্য পালন ও তদনুরূপ শিক্ষালাভই এতদিন ধরিয়া আমাদের দেশে নারীর কর্ত্তব্য বলিয়া স্বীকৃত হইয়া আসিয়াছে। পাশ্চাত্য শিক্ষা পাইয়া আমাদের হিন্দুনারীগণ তাঁহাদের চিরন্তন আদর্শ ভুলিয়া যদি সকলে স্বাধীন হইয়া দাঁড়ান তবে তাহা আমাদের সমাজের পক্ষে ঘোর দুর্দ্দিন বলিতে হইবে।" ইত্যাদি ইত্যাদি।

এই লেখাটিতে লেখক নিজের নাম দিতে সাহস করেন নাই, দিয়াছেন একটি ছদ্মনাম—শ্রীদিবাকর শর্ম্মা।

আমার পড়া শেষ হইলে দাদা বলিল,—"কেমন দেখলি? তুই যে প্রবন্ধ লিখেছিলি, এই প্রবন্ধে তাতে আলোচিত সকল বিষয়ের আলোচনা করা হয়েছে, লেখক যে-সকল যুক্তি দিয়েছেন, তা একেবারে অকাট্য।"

আমি বলিলাম,—"তুমি থামো থামো। লেখকটি দেখছি, তোমারই দলের একজন গোঁড়া, একচক্ষু হরিণ। স্বর্গগত মহর্ষি মনুর সঙ্গে ঝগড়া করা অনাবশ্যক। কিন্তু তিনি যে স্ত্রীজাতিকে স্বাতন্ত্র্য পাওয়ার অযোগ্য বলেছেন, তা পুরুষরাই কি নারীপ্রভাববর্জ্জিত স্বাতন্ত্র্যের যোগ্য? যে-সব স্থানে পুরুষের সংখ্যা নারীর চেয়ে খুব বেশী এবং তাদের অনেকে পারিবারিক প্রভাবের সুবিধা হ'তে বঞ্চিত, সেখানে তাদের নৈতিক অবস্থা কি প্রকার? আচ্ছা দাদা, আমার মনে একটা সন্দেহ হচ্ছে, এই দিবাকর শর্ম্মা নিশ্চয়ই তুমি, আমাকে জব্দ করবার জন্যে এই প্রবন্ধ লিখেছ।"

দাদা হাসিয়া বলিল,—"আরে না না, তুই পাগল হয়েছিস্? আমার এ-সব লেখা আসে না। তুই কখনও আমাকে কিছু লিখতে দেখেছিস্?"

আমি বলিলাম,—"তিনি যিনিই হউন, আমি তাঁর এই লেখার একটা প্রতিবাদ করবো। তুমি আমার লেখাটি সম্পাদকের কাছে দিয়ে আসবে। দোহাই তোমার, দাদা, আমার এই কাজটুকু তোমাকে করতে হবে, যদিও তুমি আমার শত্রুপক্ষ।"

দাদা বলিল,—"আচ্ছা তুই লেখ ত, দেখা যাবে।"

আমি সেই দিনই অনেক রাত্রি জাগিয়া একটা প্রবন্ধ লিখিলাম। তাহাতে আমি লিখিলাম—

"পুরুষেরা আপন আপন প্রাধান্য বজায় রাখার জন্য এত দিন নারীকে নানা প্রকার কৌশলে ও শাস্ত্রবচন দ্বারা তাহাদের অধীন ও পদানত করিয়া রাখিয়াছে। কিন্তু নারী আর এই অত্যাচার সহ্য করিবে না। এখন উপযুক্ত শিক্ষা লাভ করিয়া নারী বুঝিতে পারিয়াছে সে কোন বিষয়েই পুরুষ অপেক্ষা হীন নহে। উপযুক্ত শিক্ষা পাইলে নারী জ্ঞানচর্চ্চায়, বৈষয়িক কার্য্যে, ব্যবসা-বাণিজ্যে, রাজনীতিক্ষেত্রে,—সর্ব্ববিষয়ে পুরুষের সমকক্ষতা লাভ করিতে পারে। পুরুষ সামান্য গ্রাসাচ্ছাদন দিয়া নারীকে যেন কেনা-বাঁদী করিয়া রাখিয়াছে, কিন্তু নারী এখন খাওয়া-পরার সুবিধার জন্য আজীবন পুরুষের দাসীবৃত্তি করিতে চায় না, নারী আত্মসম্মানে প্রবুদ্ধ হইয়া নিজের পায়ে ভর দিয়া দাঁড়াইতে চায়। নারী নিজের চেষ্টা দ্বারা নিজের জীবিকা উপার্জ্জন করিবে। নারী আর গৃহ-কারাগারে আবদ্ধ হইয়া থাকিবে না। নারী স্বাধীনবৃত্তি অবলম্বন করিলে, যাহাকে তোমরা সংসারধর্ম্ম প্রতিপালন করা বল, তাহা হইবে না সত্য—কিন্তু মনুষ্যত্ব বড়, না তোমাদের সংসারধর্ম্ম বড়? নারী এত কাল অজ্ঞানান্ধকারে মগ্ন ছিল,

আজ শিক্ষায় আলোক পাইয়া মনুষ্যত্বের সন্ধান পাইয়াছে। সে এখন শিক্ষা দ্বারা মনুষ্যোচিত গুণগ্রাম অর্জ্জন করিয়া স্বাধীন ভাবে জীবন যাপন করিয়া নারীজন্ম সার্থক করিবে। বিবাহ, সন্তানপালন ইত্যাদি প্রত্যেক নারীর অবশ্যকর্ত্তব্য নহে, সেগুলি বরং স্থলবিশেষে তাহার মনুষ্যত্ব লাভের অন্তরায়।"

এই রূপ আরও অনেক কথা খুব জোরালো ভাষায় লিখিলাম। নীচে নাম স্বাক্ষর করিলাম—শ্রীকুহেলিকা দেবী।

দাদা আমার লেখাটি পড়িয়া খুব হাসিল, বোধ হয় আমাকে রাগাইবার জন্য। আর আমার নাম-স্বাক্ষর দেখিয়া বলিল,—"তুই বুঝি কুহেলিকা হয়েছিস দিবাকরকে ঢাকবার জন্যে। কিন্তু মনে রাখিস্, সূর্য্যের কিরণ খরতর হয়ে উঠলে কুয়াসা কোথায় মিলিয়ে যায়।"

আমি বলিলাম,—"দেখা যাবে তোমার দিবাকরের তেজ কত।"

দাদা আমার শত্রুপক্ষ হইলেও আমার সহিত বিশ্বাস-ঘাতকতা করিল না। আমার প্রবন্ধটি 'ভারত-প্রভা'র সম্পাদকের নিকট দিয়া আসিল, এবং যথা সময়ে তাহা বাহির হইল। প্রবন্ধ বাহির হইলে আমার বন্ধু-মহলে খুব বাহবা পড়িয়া গেল। কিন্তু ইহার উত্তরে দিবাকর শর্ম্মা কি বলেন, তাহা জানিবার জন্য উৎসুক হইয়া রহিলাম।

এক দিন দাদা আসিয়া বলিল,—আমার প্রবন্ধে ছাত্র-মহলে একটা সাড়া পড়িয়া গিয়াছে। নারীর অধিকার লইয়া দুইটি দল হইয়াছে,—এক দল আমার স্বপক্ষে আর এক দল আমার বিপক্ষে। তাহাদের দুই দলে খুব তর্ক বাধিয়া গিয়াছে। আমি কিন্তু দিবাকর শর্ম্মা কি বলেন কেবল তাহাই জানিবার জন্য উৎসুক হইয়া রহিলাম।

এক মাস পরে দিবাকর শর্ম্মার জবাব বাহির হইল। তিনি লিখিয়াছেন,—

"নারীর সকল বিষয়ে পুরুষের সমান অধিকার লাভ করার দাবি ও চেষ্টা নিতান্ত অন্যায় ও প্রকৃতিবিরুদ্ধ। কি শারীরিক বলে, কি মানসিক শক্তিতে, কি নৈতিক উৎকর্ষে প্রকৃতি নারীর প্রতি অঙ্গে অপকর্ষের ছাপ মারিয়া দিয়াছে। নারীর শারীরিক গঠন পুরুষ অপেক্ষা অনেক বিষয়ে সম্পূর্ণ বিভিন্ন। গর্ভধারণ, স্তন্যদান দ্বারা সন্তান পালন অর্থাৎ মাতৃত্বই নারীজীবনের প্রধান উদ্দেশ্য বলিয়া মনে হয়। এই কারণে নারী শারীরিক সামর্থ্যে পুরুষ অপেক্ষা দুর্ব্বল হইবেই। শিক্ষালাভ করিয়া কোন কোন নারী মানসিক উৎকর্ষ দেখাইতেছেন সত্য—কেহ কেহ গ্রন্থাদি রচনা, বৈজ্ঞানিক অনুশীলনাদি করিতেছেন সত্য, কিন্তু এ-পর্য্যন্ত কেহই এ সকল বিষয়ে পুরুষের সমকক্ষ হইতে পারেন নাই, এ সকল তাঁহাদের এক প্রকার অনধিকারচর্চ্চা। যাঁহারা উচ্চশিক্ষা লাভ করিয়া পরীক্ষা পাস করিতেছেন, তাঁহারা অনেকেই গৃহধর্ম্মে বিমুখ হইতেছেন। তাঁহারা বিবাহ না করিয়া স্বাধীন বৃত্তি অবলম্বনের পক্ষপাতী। ইহা সম্পূর্ণ প্রকৃতিবিরুদ্ধ। প্রকৃতি দেবী নারীর দেহকে যেমন মাতৃত্বের উপযোগী করিয়া গঠন করিয়াছেন, সেইরূপ তাঁহার চিত্তবৃত্তিকেও মাতার উপযুক্ত অধিকতর ভাবপ্রবণ করিয়াছেন; নারীহৃদয় যেরূপ স্নেহপ্রেমাদি কোমল চিত্তবৃত্তির আধার, পুরুষের হৃদয় সেরূপ নহে। শিক্ষিতা নারীগণ বিবাহ ও সন্তান-পালন করিতে অনিচ্ছুক হইয়া সেই সকল কোমল চিত্তবৃত্তিকে শুকাইয়া মারিতেছেন। ইহা সমাজের পক্ষে কল্যাণকর নহে। ইহা নিতান্ত অস্বাভাবিক। ইউরোপে ফেমিনিষ্ট মুভমেণ্ট আরম্ভ হওয়ার পরে পারিবারিক জীবনযাত্রা হ্রাস হইতেছে। বিবাহের হ্রাসের সঙ্গে সঙ্গে সমাজিক পাপ বাড়িতেছে।

"পারিবারিক জীবনের অর্থ, পুরুষের নিজের সুখ-সুবিধার জন্য নারীকে দাসী করিয়া রাখা নহে, উভয়ে প্রেমের বন্ধনে আবদ্ধ হইয়া উভয়ের সুখ-শান্তির জন্য ও জাতির ভবিষ্যৎ মঙ্গলের জন্য পরস্পরের সহায়তা দ্বারা একত্র বাস করা। কেবল নারীরাই যে পুরুষদের অধীন তাহা নহে। পুরুষেরাও ভিন্ন ভিন্ন বয়সে মাতামহী, পিতামহী, মাতা, পত্নী, কন্যা, পুত্রবধূ, পৌত্রী ও দৌহিত্রীর প্রভাবের অধীন থাকে; অথচ 'স্ত্রীস্বাধীনতা'র অনুরূপ 'পুরুষস্বাধীনতা'র জন্য ত কোন আন্দোলন হয় না। পুরুষ বাহির হইতে অর্থোপার্জ্জন করিয়া আনিবে, নারী গৃহে থাকিয়া গৃহের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা হইয়া সেই অর্থ দ্বারা সুখশান্তির ব্যবস্থা করিবে। সকল সভ্য দেশে ও সকল সভ্য সমাজে এই প্রকার পারিবারিক শ্রমবিভাগ স্বীকৃত হইয়া আসিয়াছে। মনুষ্যত্ব কাহাকে বলে? মনুষ্যজীবনে পরার্থপরতা দ্বারাই মনুষ্যত্বের বিকাশ হয়, কেবল স্বতন্ত্র হইয়া পশুর ন্যায় আত্মসুখ ভোগ করিয়া জীবনযাপন মনুষ্যত্ব নহে।" ইত্যাদি, ইত্যাদি।

দিবাকর শর্ম্মার এই প্রবন্ধ পড়িয়া আমি স্তব্ধ হইয়া ভাবিতে লাগিলাম। লেখাটি চিন্তা-উদ্দীপক সন্দেহ নাই। তবে নারীর "কজ" (দাবির বল) যে নিতান্ত ধর্ম্মসঙ্গত, সে-বিষয়ে আমার মনে বিন্দুমাত্র সন্দেহ ছিল না। হঠাৎ এ-সকল যুক্তির জবাব আমার মনে আসিল না বটে, কিন্তু পরোক্ষ ভাবে অবিবাহিত জীবনের বিরুদ্ধে জঘন্য ইঙ্গিত প্রচার করাতে দিবাকর শর্ম্মার বিরুদ্ধে আমার মন বিরূপ হইয়া রহিল। দাদা আমার মনের ভাব লক্ষ্য করিয়া বলিল—"কেমন, এবার তুই বেশ জব্দ হয়েছিস। কেবল রাগে ফুললে কি হবে? দিবাকর এবার অকাট্য যুক্তিবাণে তোর সেই কুহেলিকা ছিন্নভিন্ন ক'রে দিয়েছে।"

আমি বলিলাম,—"তুমি ত এ কথা বলবেই। তুমি দেখতে পাবে আমি এ-সকল একতরফা যুক্তি কিরূপে খণ্ডন করি। তবে এ-সম্বন্ধে আমার আরও কিছু পড়াশুনা করতে হবে। নিপীড়িত স্ত্রীজাতি পুরুষের বহুযুগব্যাপী অত্যাচারের বিরুদ্ধে যে যুদ্ধ ঘোষণা করেছে, তা যে ধর্ম্মযুদ্ধ, আমার সে-বিষয়ে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই।"

দাদা বলিল,—"কিন্তু তুই এ-সকল রিভল্যুশনারি আইডিয়া (বিপ্লবজনক ভাব) ছড়িয়ে ঘরে ঘরে বিদ্রোহ ও অশান্তির সৃষ্টি করবি না কি ?"

আমি বলিলাম,—"ভয় নাই, দাদা, তোমার বউ আসুক। তাকে আমি এ-সকল কথা শেখাব না। সে তোমার শ্রীচরণের দাসী হয়ে থাকবে।"

দাদা হাসিয়া বলিল,—"আজকালকার দিনে কেউ কারও দাসী হয় না, পূর্ব্বেও ছিল না। 'গৃহিণী সচিবঃ সখী মিথঃ'— মনে আছে ত ?"

আমি বলিলাম,—"সে-সকল প্রাচীন আদর্শ (ideal) ত ভালই ছিল, তখন নারী আপনার আত্মসম্মান বজায় রেখে চলতে পারত। তাহার বিরুদ্ধে আমার কিছু বলবার নেই। সেকালের আদর্শ ছিল, যত্র নার্য্যস্তু পূজ্যন্তে রমন্তে তত্র দেবতাঃ। সুতরাং দিবাকর শর্ম্মা যে বলছেন, নৈতিক হিসাবেও নারী পুরুষের চেয়ে অপকৃষ্ট, সেটা সত্য ও শাস্ত্রীয় নয়। কারণ, যার নৈতিক হীনতা আছে, সে কেমন করে পূজ্য হ'তে পারে ?—আচ্ছা দাদা, তুমি যদি অনুমতি দাও তবে আমি তোমার জন্যে একটি বউ পছন্দ ক'রে আনি।"

দাদা বলিল,—"দূর হ, পোড়ারমুখী। নিজে বিয়ে করবি নে, আমাকে ভজাবার চেষ্টা। তোর মতন একটি বলশেভিক পেয়েছিস্ বুঝি ?"

আমি হাসিয়া বলিলাম,—"দাদা, তোমার রাগ না আমার লক্ষ্মী। তবে আজই মাকে বলি যে দাদার বিয়েতে মত হয়েছে।"

দাদা বলিল,—"আমার পরীক্ষা নিকটে, এখন ওসব কথা শুনতে চাইনে।"

দাদা এই বলিয়া চলিয়া যাইবার পরও দিবাকর শর্ম্মার কতকগুলা কথা আমার মনে খোঁচা দিতে লাগিল। পাশ্চাত্য দেশসকলে বিবাহের হ্রাসের সঙ্গে সঙ্গে সামাজিক পাপ বৃদ্ধির কথা 'ভারত-প্রভা'য় লেখা হইয়াছে। কিন্তু আমাদের দেশে বিবাহ করিতে সবাই, বিশেষতঃ নারীরা, ত বাধ্য ; তাহা সত্ত্বেও এ দেশেও ত ঐ পাপ রহিয়াছে এবং হয়ত বাড়িতেছে, এবং তাহার জন্য পুরুষরা কম দায়ী নয়, বরং বেশী। এ-সব কথা কি দিবাকর শর্ম্মার মনে ছিল না ? আর পাশ্চাত্য দেশে উচ্চ-শিক্ষিতারা অনেকেই বিবাহ করেন না, লেখা হইয়াছে। সে-বিষয়েও দিবাকর শর্ম্মার জ্ঞান খুব আধুনিক নয়। এই সেদিন 'ইণ্ডিয়া য়্যাণ্ড দি ওয়ার্ল্ড' মাসিকে একজন বিশেষ অভিজ্ঞা মার্কিন-মহিলা লিখিয়াছেন, ১৯০০ খ্রীষ্টাব্দের আগে পর্য্যন্ত অর্দ্ধেকের চেয়ে কম আমেরিকার মহিলা গ্রাজুয়েটেরা বিবাহ করিতেন এবং গড়ে তাঁহাদের একটি করিয়া সন্তান হইত ; কিন্তু গত কয় বৎসরের সংখ্যা বিশ্লেষণ করিয়া দেখা গিয়াছে, যে, শতকরা প্রায় ৭৫ জন এখন বিবাহ করেন এবং গড়ে তাঁহাদের দুই-তিনটি করিয়া সন্তান হয়। তিনি আরও লিখিয়াছেন, যে, আমেরিকার নারীকলেজসমূহ এখন ছাত্রী-দিগকে বিশেষ ভাবে গার্হস্থ্য জীবনের জন্য শিক্ষা দিবার ব্যবস্থা করিতেছেন, কিন্তু সবাইকেই বিবাহ করিতেই হইবে, এমন কথা তাঁহারা বলেন না।

৩

দাদার বিবাহের জন্য অনেক দিন হইতেই মা অনুযোগ করিতেছিলেন। দাদা কেবলই বলিত, "মা, আইবুড়ো বোন ঘরে থাকতে আমার বিয়ের জন্য এত ব্যস্ত হয়েছ কেন ? আগে নীরুর বিয়ে দাও দেখিনি ?" মা বলিতেন, "মেয়ের ত ধনুর্ভঙ্গ পণ, সে বি-এ পাস না ক'রে বিয়ে করবে না— কিন্তু বাছা, আমার বয়স ত কমছে না, বাড়ছেই, আমি যে আর একলা সংসারের ঝক্কি সামলাতে পারছি নে। আমার শেষ কালে একটু সুখ যদি হয়, তা ত তোরা হ'তে দিবি নে ?" এই বলিয়া মা একদিন চোখের জল ফেলিলেন। মায়ের চোখের জল দেখিয়া আমি দাদার পিছনে লাগিলাম। অবশেষে দাদা বলিল, "আচ্ছা ভাল একটা মেয়ে খুঁজে দ্যাখ্।" আমি বলিলাম—"অর্থাৎ সে-মেয়ে রূপে লক্ষ্মী ও গুণে সরস্বতী হবে ? এই ত ?" দাদা বলিল, "আমি তোর মত বিদুষী চাইনে।" আমি বলিলাম, "তোমার ভয় নেই, দাদা ; আমি এমন একটি মেয়ে খুজে আনবো যে, সে তোমার শ্রীচরণে দাসখত লিখে দেবে।"

বেথুন স্কুলের প্রাইজের দিন প্রমীলা নামে একটি মেয়েকে দেখিয়া সকলেই আকৃষ্ট হইয়াছিল। সে দ্বিতীয় শ্রেণীতে প্রথম হইয়া ম্যাট্রিক্ শ্রেণীতে উঠিয়াছিল। যেমন দেখিতে সুন্দরী, তেমনই খুব উৎকৃষ্ট আবৃত্তি করিয়াছিল। তবে গানে আর একটি কালো মেয়েই সকলের সেরা হইয়াছিল। ইহা

ামি অনেক স্থলে লক্ষ্য করিয়াছি, ফরসা মেয়েদের চেয়ে ালো মেয়েদেরই গলা অধিক মিষ্ট হয়, ইহার কারণ কোকিল ালো বলিয়া, নয় ত! আমি প্রমীলার বাপের নাম ও ড়ির ঠিকানা জানিয়া লইলাম এবং মাকে বলিয়া সেখানে টকী পাঠানো হইল। মেয়ের বাপ পূর্ব্ব হইতেই াহার বিবাহের জন্য পাত্র খুঁজিতেছিলেন, ম্যাট্রিক পাস লেই তিনি তাহার বিবাহ দিবেন এরূপ তাঁহার সঙ্কল্প ল। ঘর ও বরের কথা শুনিয়া তিনি সহজেই বিবাহে ত করিলেন। দাদা তাহার দুইটি বন্ধুর সহিত গিয়া মেয়ে খিয়া আসিল। দাদার হর্ষপ্রফুল্ল মুখ দেখিয়াই বুঝিলাম, 'নে পছন্দ হইয়াছে। আমি বলিলাম, "কেমন দাদা. কেমন খলে ?"

দাদা গম্ভীরভাবে বলিল. "কাকে ?"

আমি বলিলাম, "আবার কাকে ? এত ন্যাকা সেজো না। তামার বিয়ের ক'নেকে।"

দাদা বলিল, "না, তোর বিয়ের বরকে ?" আমি বলিলাম, সে কেমন ? তুমি ত নিজের বিয়ের ক'নে দেখতে গিয়েছিলে ? ামার কথা কেন ?"

দাদা বলিল. "দ্যাখ্ নীরি, খুব মজা হয়েছে। আমরা স বাড়িতে গিয়ে দেখি. আজানুলম্বিত ভুজ, দীর্ঘ নাসিকা, উন্নত ললাট, খুব ফরসা রঙ, সহাস্য বদন—"

আমি বিরক্ত হইয়া বলিলাম, "থামো, থামো, আর রূপ-র্ণনা শুনতে চাই নে. এখন নিজের কথা বল—"

দাদা বলিল, "আগে শোনই না—সহাস্য বদন একটি ছাকরা আমাদের অভ্যর্থনা ক'রে বসালে। আমার সঙ্গের প্রবোধ বললে, 'শঙ্কর বাবু যে, আপনি এখানে কি মনে ক'রে ?' সে ছোকরা হেসে বললে, 'এ যে আমাদেরই াড়ি, আপনারা আমার বোনকে দেখতে এসেছেন।'— শঙ্করকে আমি আগে এম-এ ক্লাসে দেখেছিলাম, তার সঙ্গে আলাপ ছিল না। তাকে দেখা মাত্রই এই চিন্তা তড়িৎ-প্রবাহের মতন আমার মনের মধ্যে প্রবাহিত হয়ে গেল, যে, নীরির জন্যে একে পাকড়াতে পারলে, তাকে খুব জব্দ রাখতে পারবে। এ রকম বীরত্বব্যঞ্জক মূর্ত্তি দেখে কোন্ মেয়ে তার চরণে দাসখত লিখে না দিয়ে থাকতে পারে ?"

আমি কোপ প্রকাশ করিয়া বলিলাম, "আমার ভাবনা তোমাকে ভাবতে হবে না, তুমি নিজের চরকায় তেল দাও। সে মেয়েটিকে কেমন দেখলে তাই বল—পছন্দ হয়েছে ত ?"

দাদা বলিল—"কেন তুই-ই ত পছন্দ করেছিলি—রূপে লক্ষ্মী গুণে সরস্বতী। তবে সরস্বতী ঠাকরুণের বড্ড বেশী লজ্জা দেখলাম। প্রাইজের সভায় না কি কত লোকের সামনে গান করেছিল, তাতে লজ্জা হয়নি; আর আমাদের তিন বেচারিকে দেখে এত লজ্জা—অনেক সাধ্যসাধনার পর একটা গান গাইলে।"

আমি বলিলাম,—"তা হবে না? তুমি যে বিয়ের বর হয়ে গিয়েছিলে। হাজার হোক হিন্দুর মেয়ে ত ?"

ইহার কয়েক দিন পরে ক'নের বাপ দাদাকে 'আশীর্ব্বাদ' করিবার জন্য কয়েক জন সাঙ্গোপাঙ্গ সহ আসিলেন। দাদা দূর হইতে দেখাইয়া আমাকে বলিল,—"ঐ দ্যাখ, সেই শঙ্কর আসছে। কেমন চেহারা?" আমি ঈষৎ কোপ প্রকাশ করিয়া বলিলাম—"তুমি দেখ গিয়ে। তোমার ভাবী শালা, তুমি ভাল বলবেই ত। এখন থেকেই এত দরদ।"

দাদা তাহাদিগকে অভ্যর্থনা করিয়া বসাইল, কারণ বাড়িতে অন্য পুরুষলোক ছিল না। আমি জলখাবার সাজাইয়া দিলাম। আশীর্ব্বাদ হইয়া গেলে, মা নিজেই জলখাবার ধরিয়া দিলেন। আমার তাঁহাদের সামনে যাইতে কেমন লজ্জা করিতে লাগিল। মা-ও যাইতে বলিলেন না, এত বড় মেয়ের বিয়ে হয় নাই কেন, অত-শত কৈফিয়ৎ দেওয়ার দরকার কি ? আমি কিন্তু আড়ালে থাকিয়া দাদার বর্ণিত সেই বীরপুরুষকে ভাল করিয়া দেখিলাম। একটা দর্শনীয় চেহারা বটে।

ইহার কয়েক দিন পরে আমাদের এক মামা আসিয়া ক'নেকে আশীর্ব্বাদ করিয়া আসিলেন। সঙ্গে দাদার দুইটি বন্ধুও গিয়াছিল।

বিবাহের দিন স্থির হইল। আমি প্রমীলাকে বধূবেশে দেখিবার জন্য উৎসুক হইলাম। এক শুভ দিনে শুভ ক্ষণে বিবাহ হইয়া গেল। দাদা বউ লইয়া ঘরে আসিল।

প্রমীলা আমাকে দেখিয়া আমার দিকে অনেক ক্ষণ চাহিয়া রহিল। আমি বলিলাম,—"কি গো, চেনা-চেনা ঠেকছে বুঝি ?"

সে হাসিয়া বলিল,—"আপনাকে বোধ হয় বেথুন কলেজে দেখেছি।"

আমি বলিলাম,—"আর সেই প্রাইজের দিন আমিও তোমার নাচুনি-কুঁদুনি দেখেছি। সেই মেঘনাদবধের প্রমীলার পার্ট কে য়্যাক্ট্ (act) করেছিল ? নামে প্রমীলা, কাজেও প্রমীলা হয়েছিলে, নয় কি !"

ইহা শুনিয়া সে লজ্জায় আঁচল দিয়া মুখ ঢাকিল। আমি বলিলাম,—"শোন্, ভাই, এখন থেকে আমাকে নীরুদি বলে ডাক্‌বি, আমি কিন্তু তোকে বৌদি ব'লে ডাকতে পারব না, আমি বলবো প্রমীলা—আমি একজন বলশেভিক, বুঝ্‌লি কি-না ? আমি দাদাকেই বড় মান্য করি !"

প্রমীলা বলিল,—"বলশেভিক মানে কি ?"

আমি পরিহাস করিয়া বলিলাম,—"তা জানিস নে, বলশেভিক মানে যারা বলের সেবা করে—বল মানে শক্তি অর্থাৎ কি-না ব্রূট ফোর্স (পাশবিক শক্তি)। আমি সামাজিক আইন-কানুন জোর ক'রে ভাঙতে চাই ! সেই জন্যে দেখতে পাচ্ছিস্, আমি ত তোর চেয়ে অনেক বড়, আমার সিঁথিতে সিঁদুর নেই—আমি বিয়ে করিনি।"

প্রমীলা বলিল—"আমার দাদাও কতকটা ঐ ভাবের—"

আমি বলিলাম,—"বটে ! তবে ত তাঁর সঙ্গে আমার খুব বন্ধুত্ব হবে, কিন্তু আমি তাঁকে বিয়ে করতে পারব না।"

সে বলিল,—"দাদাও বিয়ে করতে চান না—"

আমি বলিলাম,—"বেশ, বেশ। বিয়ের দরকার কি ? বন্ধুত্ব হ'লেই হ'ল।"

এই সময় দাদা হঠাৎ সেখানে আসিয়া উপস্থিত হইল। প্রমীলা অমনি মুখে ঘোমটা টানিয়া দিয়া বসিল। দাদা বলিল—"কি গো ! নীরু সুন্দরী, এখন থেকেই বউকে বুঝি তোমার মতে ভজাচ্ছ ?"

আমি বলিলাম—"ভজাতে হবে না দাদা, তোমার বউ যে একটি মস্ত বীরাঙ্গনা—

> "রাবণ শ্বশুর মম, মেঘনাদ স্বামী,
> আমি কি ডরাই সখি ভিখারী রাঘবে ?
> পশিব লঙ্কায় আজ নিজ ভুজবলে,
> দেখিব কেমনে মোরে নিবারে নৃমণি।"

ইনি ত সেই প্রমীলা। প্রাইজের দিন চমৎকার য়্যাক্ট করেছিল। তাই দেখেই ত তোমার গলায় এই মুক্তার মালা পরিয়ে দিয়েছি। কেমন, আমার পছন্দের প্রশংসা করবে না, দাদা।"

দাদা বলিল,—"থাম, থাম—তুই বড় ফাজিল। এখন বীরাঙ্গনার বীর ভ্রাতাটিকে দেখলে কি বলিস দেখা যাবে।"

আমি বলিলাম,—"তাঁর কথা শুনলেম—তিনি না কি আমারই মতন একজন 'বলশেভিক'—অর্থাৎ ওম্যান-হেটার (নারীবিদ্বেষী)—বিয়ে করতে চান না।"

দাদা বলিল,—"ওঃ, এর মধ্যেই এত খবরাখবর হয়ে গেছে। বেশ ত—'যোগ্যং যোগ্যেন যোজয়েৎ—' আমি যে জন্যে এসেছিলাম, তা যে ভুলে গেলাম—"

আমি বলিলাম,—"তা ভোল নাই—এই দেখ"—এই বলিয়া প্রমীলার মুখের কাপড় খুলিয়া দেখাইলাম।

দাদা ঈষৎ হাসিয়া কোপমিশ্রিত স্বরে বলিল,—"যা—তুই বড় ফাজিল। বউভাতের নিমন্ত্রণ কাকে কাকে করতে হবে তার একটা ফর্দ্দ করা চাই—তুই এখন উঠে আয়।"

৪

বউভাতের দিন অনেক আত্মীয়-কুটুম্ব ও বন্ধুবান্ধবের নিমন্ত্রণ হইল। দাদার কলেজের অনেক বন্ধু আসিল। ওদিকে কন্যাপক্ষেরও অনেক লোক আসিল। বৈঠকখানার একটা পাশের ঘরে যুবকদিগের বৈঠক বসিল। সেখানে হাসি-ঠাট্টা গল্প-গুজবের ফোয়ারা ছুটিল। আমি তফাতে দাঁড়াইয়া তাহা দেখিতেছিলাম। ঐ দলের একটি যুবক আর সকলের কথায় যোগ না দিয়া এক পাশে চুপ করিয়া বসিয়া ছিল। তাহার আকৃতি ও মুখের ভঙ্গিতে একটা বিশিষ্টতা ছিল। সে যেন ঐ দলের চেয়ে অনেক বিষয়ে পৃথক। দাদা সেখানে আসিতেই একটি ছোকরা বলিল,—"ওরে সুকুমার, তোর সম্বন্ধীকে ত দেখছি না ?" তখন আর একটি ছোকরা চারি দিকে তাকাইয়া বলিল,—"ঐ যে শঙ্কর বাবু ওখানে—আপনি চোরের মত ওখানে বসে আছেন কেন শঙ্কর বাবু, এদিকে আসুন।" শঙ্কর হাসিয়া বলিল,—"আমি এতক্ষণ আপনাদের কথা শুনছিলুম।"

দাদা শঙ্করকে উঠিয়া আসিবার জন্য ইঙ্গিত করিল। শঙ্কর উঠিয়া দাদার সঙ্গে বাহিরে আসিল। দাদা অমনি তাহাকে আমার কাছে আনিয়া বলিল—"শঙ্কর বাবু, এটি আমার বোন নীরু—ওর ভাল নাম নীহারিকা, ও বেথুনে বি-এ পড়ছে।"

আমি অমনি লজ্জায় জড়সড় হইয়া দাঁড়াইলাম।

র আমাকে একটি ক্ষুদ্র নমস্কার করিল। আমাকে হঠাৎ প অপ্রস্তুত করা দাদার ভারি অন্যায়। আমি মনে মনে ার উপর বিরক্ত হইলাম। কিন্তু ভদ্রলোকের সামনে । কিছু না বলিয়া বাহিরে সৌম্য ভাব দেখাইলাম। র আমার সঙ্গে কি আলাপ করিবে খুঁজিয়া না পাইয়া মত খাইয়া দাঁড়াইয়া রহিল। তখন আমি বলিলাম,—াপনার বোনকে দেখবেন আসুন।" এই বলিয়া প্রমীলা ঘরে সাজগোছ করিয়া বসিয়া ছিল, তাঁহাকে সেখানে লইয়া াম। দাদা আমাদের সঙ্গে না আসিয়া তাহার বন্ধুদের যোগ দিল।

আমি প্রমীলাকে বলিলাম,—"প্রমীলা, ঘোমটা খুলে দেখ, এসেছেন।"

শঙ্কর হাসিয়া বলিল,—"কি রে তুই যে একেবারে চেঙ্গির লি হয়ে ব'সে আছিস্।"

আমি বলিলাম,—"আপনার বোনের ভয়ানক লজ্জা, র বাবু। ইংরেজী-পড়া বউয়ের এত লজ্জা হবে কেন?"

আমার কথা শুনিয়া প্রমীলা মুখের ঘোমটা সরাইয়া রকে দেখিতে লাগিল। শঙ্কর বলিল,—"এই ত বেশ। জানেন কি, ওকে এখন কতক দিন খুব সাবধান হয়ে ত হবে, নতুন বউ কি-না। আপনার মতন উচ্চ-ক্ষতা ননদের হাতে পড়েছে, এটা ওর মস্ত সৌভাগ্য। পনি এখন ওকে যে-ভাবে চালাবেন, ও সেই ভাবেই ব। লোকে আবার ইংরেজী-পড়া বউদের পদে পদে ধরে জানেন ত। কথায় কথায় বলে, ফিরিঙ্গী ছে, লজ্জা সরম নেই, ইত্যাদি।"

আমি বলিলাম,—"তা খুব জানি। কিন্তু প্রমীলা যেভাবে ক, ওকে ইংরেজী-পড়া বউ ব'লে কারু সন্দেহ করবার জো । আমার কিন্তু এ-সম্বন্ধে মত কিছু ভিন্ন রকমের। ার মতে মেয়েদের এতটা নরম হয়ে চলা উচিত নয়। ের সেল্ফ-ইফেসমেণ্ট (আত্মবিলোপ) না ক'রে সেল্ফ-ার্শন্ (আত্মপ্রতিষ্ঠা) করার সময় এসেছে। এতদিন াদের সমাজে নারীর যে-আদর্শ স্বীকৃত হয়ে এসেছে মানে হচ্ছে নারীর কোন পৃথক সত্তা নাই, স্বামীর মধ্যে ার নিজের সত্তা ডুবিয়ে দেওয়াই হাইয়েষ্ট আইডিয়্যাল্ ত্তম আদর্শ)। আমি বলি নারীও মানুষ, তার একটা পৃথক ব্যক্তিত্ব আছে সে পুরুষের মধ্যে আত্মবিলোপ না ক'রেও তার জীবন সার্থক করতে পারে। কিন্তু আপনার সঙ্গে এই প্রথম পরিচয়েই লেকচ্যার দিয়ে আপনার কান ঝালাপালা করছি, শঙ্কর বাবু।"

শঙ্কর হাসিয়া বলিল,—"না না, আপনার কথা চমৎকার লাগছে। আপনি স্বাধীন ভাবে চিন্তা করেন দেখে খুশী হলেম। এ-সব কথা আজকাল কোন কোন মাসিক পত্রে আলোচিত হচ্ছে।"

আমি বলিলাম,—"'ভারত-প্রভা' পত্রিকায় বোধ হয় পড়েছেন।"

শঙ্কর বলিল,—"হাঁ। এটা বুঝি আপনাদের পড়বার ঘর? লাইব্রেরীতে বিস্তর বই দেখছি।"

আমি বলিলাম,—"ও-সব আমার বাবার বই। তিনি বই কিনতে বড় ভালবাসতেন। আপনার দরকার হ'লে বই নিয়ে পড়বেন। এখন আপনার সঙ্গে আমাদের খুব ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ হ'ল।"

শঙ্কর হাসিয়া বলিল,—"তাত বটে-ই। আপনার কথা শুনতে বেশ লাগে। আচ্ছা, আপনাকে কি ব'লে ডাকব? এই স্বদেশী যুগে 'মিস্ চ্যাটার্জ্জি', 'মিস্ ব্যানার্জ্জি', এ-সব অচল।"

আমি বলিলাম,—"আমার নাম নীহারিকা, দাদা নীরু ব'লে ডাকে।"

শঙ্কর বলিল,—"তাত শুনেছি, কিন্তু আমি—"

আমি হাসিয়া বলিলাম,—"আপনিও সেইরূপ একটা-কিছু সংক্ষেপ ক'রে নেবেন।"

এই সময়ে মা আসিয়া বলিলেন,—"ওরে নীরু, বউমাকে নিয়ে আয়, বউ দেখতে কত লোক এসেছে।"

পরে শঙ্করের পানে তাকাইতে শঙ্কর উঠিয়া তাঁহাকে প্রণাম করিল। তিনি বলিলেন—"বেঁচে থাক বাবা, আমার মাথায় যত চুল তত বছর পরমায়ু হোক্। কতক্ষণ এসেছ? বোনের সঙ্গে বুঝি কথা হচ্ছিল? বড় ভাল মেয়ে, এর মধ্যেই আমার নীরুর সঙ্গে কত ভাব হয়েছে।"

এই বলিয়া তিনি চলিয়া যাইতেই শঙ্কর উঠিয়া বাহিরে গেল, আমিও প্রমীলাকে লইয়া মা'র পিছনে পিছনে চলিলাম।

৫

বউভাতের সাত দিন পরে প্রমীলাকে লইয়া যাইবার জন্য শঙ্কর আবার আমাদের বাড়িতে আসিল। দাদা শঙ্করকে লাইব্রেরী-ঘরে বসাইয়া মাকে খবর দিতে গেল। তখন বেলা আটটা, আমি মায়ের কাছে বসিয়া তাঁহার রান্নার জন্য কুটনা কুটিতেছিলাম,—প্রমীলা তাঁহার পূজার সাজ গোছাইতেছিল। মা বলিলেন, "নীরু, ও-সব এখন থাকগে, তুই আগে চা তৈরি ক'রে নিয়ে যা, আর ঘরে কি কি খাবার আছে দ্যাখ—কুটুমের ছেলে বাড়িতে এসেছে। বউমা, তোমার দাদার সঙ্গে দেখা করবে, আমার সঙ্গে এস।"

মা প্রমীলাকে লইয়া বাহিরের দিকে গেলেন, আমি কেটলিতে চায়ের জল চড়াইয়া জলখাবার গুছাইতে লাগিলাম। মা ফিরিয়া আসিয়া বলিলেন,—"ছেলেটি বড় ভাল, শুনেছি খুব বিদ্বান, আবার এদিকে খুব নম্র, চোখ তুলে কথা কয় না। আর কি সুন্দর চেহারা, যেন একটি রাজপুত্তুর। বৌমা তার কাছে আছে, তুই যা জলখাবার নিয়ে যা।"

মা ও দাদা শঙ্করের প্রশংসায় পঞ্চমুখ। কিন্তু আমার কাছে এ-সব কথা কেন? আমি তাঁদের মতলব বুঝি বুঝতে পারিনে, আমি এতই মূর্খ!

ইতিমধ্যে দাদা আসিয়া বলিল,—"কি রে চা হ'ল? কত দেরি?"

আমি ঈষৎ কোপকটাক্ষ নিক্ষেপ করিয়া বলিলাম,—"দাদা, তোমার যে মস্ত তাগিদ দেখছি, শালা-সম্বন্ধী ত অনেকেরই আছে। জল গরম হয়েছে, এবার গুছিয়ে নিলেই হয়। তুমি এ জল নিয়ে যাও না? না না, তোমায় নিতে হবে না, তুমি তাদের বাড়ির নতুন জামাই। ঝি বাজার থেকে এখনও এল না—আচ্ছা, আমিই নিয়ে যাচ্ছি।"

দাদা চায়ের সরঞ্জামগুলো আনিয়া আমার সম্মুখে বসিল, আমি দুই পেয়ালা চা তৈয়ারি করিলাম এবং একখানা ট্রেতে চা, নিম্‌কি, সন্দেশ সাজাইয়া লইয়া দাদার পিছনে পিছনে লাইব্রেরী-ঘরে আসিলাম। আসিয়া দেখি, প্রমীলা জড়সড় হইয়া এক পাশে বসিয়া আছে, আর শঙ্কর একটা আলমারীর সামনে দাঁড়াইয়া বই দেখিতেছে। দাদার পিছনে আমাকে আসিতে দেখিয়া শঙ্কর বলিল,—"এই যে আপনি চা নিয়ে এসেছেন—নমস্কার, কিন্তু আমি ত এসেই সুকুমারকে বলেছি যে, আমি চা খেয়ে এসেছি, এখন কিছু খাব না। আপ[নি] এত কষ্ট ক'রে এ-সব কেন আনলেন?"

আমি একটু হাসিয়া বলিলাম,—"তা নয় আর একবা[র] খেলেন। কুটুম-বাড়ি এলে মিষ্টিমুখ করতে হয়।" এ[ই] বলিয়া চা ও জলখাবার টেবিলের উপর রাখিলাম। দা[দা] বলিল,—"শুভস্য শীঘ্রম্—এস হে শঙ্কর, এবার আরম্ভ ক[রা] যাক।"

এই বলিয়া একখানা নিমকি মুখে দিল। শঙ্কর খাইতে আরম্ভ করিল, এবং খাইতে খাইতে বলিল,—"কি[ন্তু] আপনি যে দাঁড়িয়ে রইলেন, আপনি বসুন।" আমি একখা[না] চেয়ারে বসিয়া বলিলাম,—"শঙ্কর বাবু, আপনার ফিজিক্যা[ল] য়্যাপিটাইটের (শারীরিক ক্ষুধার) চেয়ে ইন্‌টেলেক্‌চুয়্যা[ল] য়্যাপিটাইটই (মানসিক ক্ষুধাই) খুব বেশী দেখছি। আপ[নি] ওসব কি বই দেখছিলেন? আপনার কোন্ সবজে[ক্ট] (বিষয়) পড়তে ভাল লাগে?"

শঙ্কর চায়ে চুমুক দিতে দিতে বলিল—"নীরুদেবী, আপ[নি] জানবেন আমি একজন ভোরেশ্যাস রীডার (পেটুক পাঠক), অর্থাৎ গোপাল যেমন যা পায় তাই খায়, আমিও সেই র[কম] যা পাই তাই পড়ি।"

দাদা বলিল,—"তুমি মস্ত ভুল করলে, শঙ্কর। দ্বিতী[য়] ভাগের মানে জান না? গোপাল যা পায় তাই খায়, এ[র] মানে সে একজন ভোরেশ্যাস্ ঈটার (পেটুক) নয়, ত[া] হ'লে সে সুবোধ বালক হ'তে পারত না।"

আমি বলিলাম,—"শঙ্কর বাবু, আপনি ঠকেছেন, আপ[নি] গোপালের মতন সুবোধ বালক হ'তে পারলেন না। কি[ন্তু] আজকালকার দিনে এ রকম সুবোধ বালককে লোকে বেকু[ব] বলে। আপনার তা হয়ে কাজ নেই। আপনি কি বলছিলেন—"

শঙ্কর বলিল,—"আপনাকে ধন্যবাদ, এ যাত্রা আপ[নি] সুকুমারের হাত থেকে আমাকে বাঁচালেন। আমি বলছিলা[ম] কি, আমি যখন যে-বই পাই তাই পড়ি, তবে হিষ্টরিই আমা[র] সবজেক্ট (পাঠ্য বিষয়), সেই সব বই-ই বেশী পড়ি মধ্যে মধ্যে দু-একখানা ভাল নভেল পেলে, তাও পড়ি—ওনলি দি বেষ্ট বুক্‌স্ অব দি বেষ্ট অথার্স (কেবল শ্রে[ষ্ঠ] লেখকদিগের শ্রেষ্ঠ বই)।"

আমি বলিলাম,—"বাবা ইতিহাসের অধ্যাপক ছিলেন কি-না, আমাদের এখানে অনেক ইতিহাসের বই পাবেন, শঙ্কর বাবু। নভেলও অনেক আছে, তার অধিকাংশই ক্লাসিক্যাল অথারদের।"

দাদা বলিল,—"আমার এই ভগিনীটিকে দেখছ, শঙ্কর, ইনি কেবল নভেল পড়েই সময় কাটান। আজকাল আবার ঝোঁক হয়েছে ফেমিনিষ্ট লিটারেচারের (নারীপ্রগতির বইয়ের) দিকে, অর্থাৎ কি-না যে-সব বইয়ে স্ত্রীলোকদিগের সো-কল্‌ড্‌ রাইট্‌স্‌ (তথাকথিত অধিকার) নিয়ে পুরুষদের সঙ্গে একটা ঝগড়া বাধাতে চায়।"

শঙ্কর হাসিয়া বলিল,—"উনি সে-বিষয়ে নিজের মনোভাব আমাদের প্রথম আলাপের দিনই আমার কাছে ব্যক্ত করেছেন। তা মন্দ কি, আমার এ-বিষয়ে আপনাদের সঙ্গে খুব সিম্প্যাথি (সমবেদনা) আছে জানবেন, নীরু দেবী।"

আমি বলিলাম,—"দুর্ব্বল, অত্যাচরিত, অবলা জাতির প্রতি সকল শ্রেষ্ঠ পুরুষেরই সহানুভূতি থাকা উচিত। এ-সম্বন্ধে আমি আপনার সঙ্গে আরও আলোচনা করব, শঙ্কর বাবু।"

দাদা হাসিয়া বলিল, —"আর দিবাকর শর্ম্মার সঙ্গে?"

শঙ্কর বলিল,—"তিনি আবার কে?"

দাদা বলিল,—"কেন, তার প্রতি তোমার হিংসা হ'ল না কি, শঙ্কর।"

শঙ্কর বলিল,—"আমি তাঁকে চিনি না ত? যাঁর নাম কখনও শুনিনি, তাঁর প্রতি হিংসা হবে কেন?"

আমি কুপিত হইয়া বলিলাম,—"দাদা, তোমার মুখে কিছুই আটকায় না। ছিঃ।"

আমার এই তিরস্কার শুনিয়া দাদা মৃদু মৃদু হাসিতে লাগিল। শঙ্কর কিছু না বুঝিতে পারিয়া আমার মুখের দিকে তাকাইয়া রহিল। আমি দিবাকর শর্ম্মার সঙ্গে 'ভারত-প্রভা'র পৃষ্ঠায় বেনামীতে যে বাদানুবাদ চালাইতেছিলাম, তাহা শঙ্করের নিকট প্রকাশ করিতে অনিচ্ছুক হইয়া বলিলাম,—"শঙ্কর বাবু, আপনি 'ভারত-প্রভা' পত্রিকা পড়েন না?"

শঙ্কর বলিল,—"ঠিক নিয়ম-মত পড়ি না, কখন কখন পড়ি।"

আমি বলিলাম,—"ভাল ক'রে পড়বেন, তা হ'লে দিবাকর শর্ম্মাকে চিনতে পারবেন।"

এই বলিয়া আমি সেখান হইতে উঠিয়া গেলাম। সেদিন মধ্যাহ্নে আহারাদির পর শঙ্কর প্রমীলা ও দাদাকে সঙ্গে লইয়া বাড়ি রওনা হইল। দাদা দ্বিরাগমন শেষ করিয়া বউকে আবার সঙ্গে লইয়া আসিবে।

৬

এতদিন দাদার বিয়ের গোলমালে আমি লিখিবার অবসর পাই নাই, কিন্তু দিবাকর শর্ম্মার শেষ প্রবন্ধের একটা জবাব দেওয়ার জন্য আমার মন ব্যাকুল হইয়া উঠিল। এবার সময় পাইয়া কিছু কিছু লিখিতে আরম্ভ করিলাম। কিন্তু যাহা লিখিলাম তাহা অনেকটা ফাঁকা আওয়াজ, ইহা আমি নিজেই বুঝিতে পারিয়া তাহা ছিঁড়িয়া ফেলিলাম। দিবাকর লিখিয়াছে — প্রকৃতি নারীর প্রতি অঙ্গে ইন্‌ফিরিয়রিটির (পুরুষ অপেক্ষা হীনতার) ছাপ মারিয়া দিয়াছে,—এ-কথা পড়িলেই আমার গা জ্বালা করে। অথচ নারীর শারীরিক গঠন অধিকতর সৌন্দর্য্যবিকাশক হইলেও পুরুষ অপেক্ষা যে দুর্ব্বলতার পরিচায়ক তাহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। কিন্তু গায়ের জোরেই যে সব-কিছু হয় তা নয়। পৃথিবীর মহাপুরুষেরা সবাই বা অধিকাংশ মহামল্ল ছিলেন না। এমন কি, ইতিহাসে যাঁহারা যাঁহারা শৌর্য্যের জন্য, যোদ্ধৃতার জন্য, দিগ্বিজয়ী বলিয়া বিখ্যাত, তাঁহারা সবাই দৈহিক বলে বলীয়ান ছিলেন না। পক্ষান্তরে রাজনীতিজ্ঞতার এবং যুদ্ধক্ষেত্রে নেতৃত্বের জন্য প্রসিদ্ধ বীরাঙ্গনার নাম আমাদের দেশে ও অন্যত্র অনেক পাওয়া যায়। নারীদের যে শারীরিক সৌন্দর্য্যের কথা বলিলাম তাহাই নারীকে এক রকম মারিয়া রাখিয়াছে। নারী এই সৌন্দর্য্যের জন্যই ঘরে বাহিরে পুরুষের আকর্ষণের বস্তু হইয়া দাঁড়ায় এবং নানা প্রলোভনে পড়িয়া অনেক নারী আত্মসমর্পণ করিতে বাধ্য হয়। কিন্তু শারীরিক সৌন্দর্য্য নারীর একচেটিয়া নহে, তাহা পুরুষেরও যথেষ্ট আছে, বিশেষতঃ নারীর চোখে। এটাও নারীর একটা দুর্ব্বলতা। নারীর আর একটা প্রধান দুর্ব্বলতা হইতেছে, তাহার স্নেহ ও প্রেমপ্রবণ হৃদয়। এই দুর্ব্বলতার জন্য নারী অতি সহজেই পুরুষের নিকট ধরা দেয়। সম্প্রতি আমি ইহার একটা প্রমাণ চোখের সামনেই দেখিতেছি। বিবাহের পূর্ব্বে দাদা

প্রমীলাকে চিনিত না, প্রমীলাও দাদাকে চিনিত না। অথচ এই অত্যল্প সময়ের মধ্যে এই দুইটি মানুষ পরস্পরকে এত দূর আপনার করিয়া ফেলিয়াছে, যে, এখন এক জনের অদর্শনে আর এক জন থাকিতে পারে না। তাহাদের উভয়ের হৃদয়পদ্ম প্রেমের স্পর্শে ধীরে ধীরে দল মেলিতেছে। ইহার মধ্যে কোন প্রকার জোরজবরদস্তি নাই। এখানে নারী কিসের আকর্ষণে পুরুষের নিকট আত্মসমর্পণ করিল? সুতরাং দিবাকর যে নারীর দুর্ব্বলতার কথা লিখিয়াছে, তাহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই।

তবে নারী যে মানসিক উৎকর্ষে পুরুষ অপেক্ষা হীন, এ কথা আমি কিছুতেই স্বীকার করি না। অবশ্য শেকস্‌পীয়র, মিল্টন, কালিদাস, ভবভূতির ন্যায় কোন কবি অথবা নিউটন, ডারউইন, হার্ব্বার্ট স্পেন্সারের ন্যায় বৈজ্ঞানিক নারীজাতির মধ্যে জন্মায় নাই সত্য, কিন্তু ইঁহারা ঈশ্বরদত্ত প্রতিভাশালী মহাপুরুষ, ইঁহাদের কথা স্বতন্ত্র। আর এত কাল পুরুষজাতির মধ্যে জ্ঞানচর্চ্চা আবদ্ধ ছিল বলিয়া পুরুষেরাই সকল বিষয়ে উৎকর্ষ লাভ করিয়াছে। কিন্তু উপযুক্ত সুযোগ পাইলে কোন কোন নারীও যে তাহাদের সহজাত প্রতিভার পরিচয় দিতে পারে, সাহিত্যক্ষেত্রে এবং বিজ্ঞানের ক্ষেত্রেও তাহার অনেক পরিচয় পাওয়া গিয়াছে। মাদাম কুরী এক বার তাঁহার স্বামীর সঙ্গে পদার্থবিদ্যায় এবং আর এক বার একাই রসায়নী-বিদ্যায় নোবেল পুরস্কার পাইয়াছিলেন। জেন অ্যাডামস্ শান্তিস্থাপন চেষ্টার জন্য ঐ পুরস্কার পাইয়াছেন। সেল্মা লাগেরলুফ এবং গ্রাৎসিয়া দেলেদ্দা সাহিত্যে নোবেল প্রাইজ পাইয়াছেন।

সব রকম দৈহিক সামর্থ্যেই যে সব মেয়েরা পুরুষদের চেয়ে হীন, তাহাও সত্য নহে। যে সতর জন সাঁতার দিয়া ইংলিশ চ্যানেল পার হইয়াছেন, তার মধ্যে ছয় জন নারী।

উচ্চশিক্ষিতা নারী যদি পুরুষের অধীনতা-শৃঙ্খলে আবদ্ধ না হইয়া স্বাধীন বৃত্তি অবলম্বন করে, তাহাতে দোষ কি? এতাবৎকাল পুরুষজাতি নিজেদের সুখ-সুবিধার জন্য নারীকে সামাজিক আইন রচনা করিয়া অধীনতা-শৃঙ্খলে বাঁধিয়া রাখিয়াছে, নারী উচ্চশিক্ষা লাভ করিয়া এখন নিজের হীন অবস্থা বুঝিতে পারিয়াছে। পাশ্চাত্য জগতে অনেক মহীয়সী নারী পুরুষনিরপেক্ষ হইয়া নিজ নিজ উৎকর্ষের পরিচয় দিয়া জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিতেছেন। অবশ্য তাহাতে সকলস্থলে সন্তানপ্রসব, সন্তানপালনাদি গৃহধর্ম্ম হয় না; তাহা নাই-বা হইল? সকল নারীই অবশ্য সংসারধর্ম্ম ত্যাগ করিবে না। অন্ততঃ কতক নারীও যদি অন্য পথে যায়, তাহাতে সমাজের ক্ষতি কি? বহু-সংখ্যক পুরুষ ত সন্ন্যাসী হয়, কেহ কেহ ধর্ম্মার্থ সন্ন্যাসী না হইলেও চিরকুমার থাকিয়া বিজ্ঞানচর্চ্চা, মানবসেবা ইত্যাদি করিয়া থাকে। ভারতীয় নারীদের মধ্যেও মানব-হিতব্রতা চিরকুমারী নারীর একান্ত অভাব নাই। আমি এই সকল কথা লিখিয়া আর একটি প্রবন্ধ রচনা করিলাম। কিন্তু ইহাতে দিবাকর শর্ম্মার সকল কথার জবাব দেওয়া হইল না। সুতরাং তাহা আমার নিকটেই রাখিলাম।

দাদা তিন দিন শ্বশুরবাড়ি থাকিয়া বউকে লইয়া দ্বিরাগমন করিয়া আসিল। এবার প্রমীলা আমাদের বাড়িতেই স্থায়ী হইল। সে আমাকে বলিল,—"দাদার ইচ্ছা আমি ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষাটা দিয়ে পাস করি। আপনারা কি বলেন?"

আমি বলিলাম,—"আমার অবশ্যই মত আছে। দাদার কি মত তা তুই নিজে জিজ্ঞেস করলেই ত পারিস?"

প্রমীলা একটু সলজ্জ হাসির সহিত বলিল,—"তাঁর অমত নেই, তবে মা'র মত হবে কি-না জানা দরকার।"

আমি বলিলাম,—"দাদার মত হ'লে মা'র অমত কেন হবে? তুই ত আর স্কুলে পড়তে যাবিনে।"

প্রমীলা বলিল,—"বাড়িতে কি পড়া হবে? আমাকে কে পড়াবে?"

আমি বলিলাম,—"কেন, নিজে নিজে পড়বি—আর যা নিজে না বুঝতে পারিস্ দাদা বুঝিয়ে দেবে।"

প্রমীলা হাসিয়া বলিল,—"তা হয় না, তিনি তাঁর নিজের পড়া নিয়েই যে-রকম ব্যস্ত, তাঁর সময় হবে না।"

আমি বলিলাম,—"কিন্তু তোর স্কুলে যাওয়ায় মা'র মত হবে না। তোর দাদা বুঝি তোকে স্কুলে যেতে বলেছেন।"

প্রমীলা বলিল,—"না, তিনি তা বলবেন কেন? তবে তিনি বলছিলেন, এতদিন পরিশ্রম ক'রে পড়ে শেষকালে পরীক্ষা দেওয়া হ'ল না—দিতে পারলে ভাল হ'ত।"

আমি বলিলাম,—"তোর দাদা বুঝি তোকে বাড়িতে পড়াতেন?"

প্রমীলা বলিল,—"হাঁ, তিনি আমার জন্য অনেক খেটেছেন। তাঁর নিজের পড়ার ক্ষতি করেও আমাকে পড়াতেন।"

"তিনি বুঝি দিন-রাত কেবল বই পড়েন? সেদিন এখান থেকে ত কতকগুলি বই নিয়ে গেছেন।"

"কলেজের পাঠ্য বই ছাড়াও তিনি বাইরের বই অনেক পড়েন।"

"বাংলা বই কি মাসিক পত্র, এ-সব পড়েন না?"

"পড়েন বইকি? যখন যা পান, তাই পড়েন।"

"তা আমি তাঁর মুখেই শুনেছি। দ্বিতীয় ভাগের গোপালের মত। তোদের বাড়িতে 'ভারত-প্রভা' আসে!"

"না। তবে দাদা মধ্যে মধ্যে কোথা থেকে এনে পড়েন। আমিও সেটা পড়ে থাকি, বেশ ভাল ভাল লেখা থাকে। এ বাড়িতে ত আপনারা আনেন দেখছি।"

এই সময় দাদা আসিয়া বলিল,—"কি নীরু সুন্দরী, বউয়ের সঙ্গে শঙ্করের কথা কি হচ্ছে? শঙ্কর তোকে ভোলে নি, শীঘ্র আবার আসবে বলেছে।"

আমি কোপ প্রকাশ করিয়া বলিলাম—"তোমার শালার ভাবনায় আমি আহারনিদ্রা ত্যাগ ক'রে বসে আছি। দাদা, তুমি যদি অমন কর, তবে তিনি এবার এলে আমি তাঁর সামনে বেরুব না, বলে রাখছি।"

দাদা বলিল,—"রাগ করিস কেন? বউ যে-খবর দিতে পারেনি, আমি তা দিচ্ছি। শঙ্কর 'ভারত-প্রভা' অনেক সংখ্যা আনিয়ে দিবাকর শর্ম্মার প্রবন্ধও তোর লেখা পড়েছে। সে তোর মতাবলম্বী হয়েছে।"

আমি বলিলাম,—"দিবাকর শর্ম্মার প্রতিবাদ যে আমি করেছি, সে কথা তিনি কিরূপে জানলেন?"

দাদা হাসিয়া বলিল,—"কেন আমিই বলেছি।"

আমি রুষ্ট হইয়া বলিলাম,—"তুমি তা বলতে গেলে কেন?"

দাদা বলিল,—"কেন, তুই-ই ত তাকে 'ভারত-প্রভা' পড়তে বলেছিলি। তোর মনের ইচ্ছাটা খুবই ছিল, শঙ্কর তোর লেখা পড়ুক আর তোকে চিনুক। আমি তোর গোপন অভিপ্রায় অনুসারেই কাজ করেছি। এখন রাগ করলে কি হবে?"

আমি বলিলাম,—"এখন এত জানাজানি হয়ে গেল, আমি আর কিছু লিখব না। যা'ক সে কথা। দাদা, তুমি বউকে পড়াও না কেন? ওর ম্যাট্রিক পরীক্ষা দেবার খুব ইচ্ছা, ওর দাদারও খুব ইচ্ছা।"

দাদা বলিল,—"আমি নিজের পড়া নিয়েই ব্যস্ত, বউকে পড়াব কখন?"

আমি বলিলাম—'কেন শঙ্কর বাবুও ত নিজের পড়া ক'রে ওকে পড়াতেন?"

"শঙ্কর ইজ এ গুড বয়, আই য়্যাম এ ব্যাড বয় (শঙ্কর ভাল ছেলে, আমি মন্দ ছেলে)"—এই বলিয়া দাদা চলিয়া গেল। সেই দিন সন্ধ্যার পরে দাদা বউকে পড়াইতে আরম্ভ করিল।

ইহার পর দিনই শঙ্কর আসিয়া হাজির হইল। "সুকুমার কোথায়?" বলিয়া অন্দরের দিকে আসিল। দাদা তখন বাড়িতে ছিল না। আমি প্রমীলাকে তাহার নিকটে পাঠাইয়া দিলাম। প্রমীলা তাহাকে লইয়া লাইব্রেরী ঘরে বসিল। আমি সেখানে না গিয়া অন্য ঘরে একখানা বই হাতে করিয়া বসিয়া রহিলাম। কিন্তু শঙ্কর কি বলে তাহা শুনিবার জন্য কান খাড়া করিয়া রহিলাম।

শঙ্কর প্রমীলাকে বলিল,—"নীরু দেবী কোথায় রে?"

প্রমীলা বলিল,—"ঐ ঘরে ব'সে আছেন।"

"তিনি কি করছেন রে?"

"কিছু না, এমনি বসে আছেন।"

তারপর এক মিনিট চুপচাপ। পরে শঙ্কর বলিল,—"তিনি এখানে আসবেন না?"

প্রমীলা বলিল,—"তা কি জানি?"

অবশেষে শঙ্কর বলিল "তোদের এই বইগুলো নিয়েছিলাম; রেখে দে।"

এই বলিয়া শঙ্কর ঘরের বাহির হইতেই, আমি বারান্দায় বাহির হইয়া আসিলাম, এবং বলিলাম,—"আপনি এখনি চলে যাচ্ছেন যে? বসুন, দাদা এখনি আসবে।"

শঙ্কর আমার কথা শুনিয়া ঘরের দুয়ারে দাঁড়াইয়া বলিল,—"তার কাছে কোন দরকার নেই, এই ইয়ে—আপনার ইয়ে—আপনাদের বইগুলি দিতে এসেছিলাম।"

আমি বারান্দায় দাঁড়াইয়া বলিলাম,—"আর বই নেবেন না? যান ঘরের ভিতরে গিয়ে দেখুন।"

শঙ্কর আবার ঘরের ভিতর ঢুকিল। আমিও

তাহার পিছনে পিছনে ঢুকিলাম। আমাকে দেখিয়া শঙ্করের মুখ হর্ষোৎফুল্ল হইল। সে বলিল,—"নীরুদেবী, 'ভারত-প্রভা' পত্রিকায় আপনার লেখা পড়েছি।"

আমি বলিলাম,—"কুহেলিকা দেবীর লেখা বলুন।"

শঙ্কর বলিল,—"সে কুহেলিকা দেবী ত আপনি। আপনি খুব যথার্থ কথাই লিখেছেন।"

আমি বলিলাম,—"আপনি কি তবে দিবাকর শর্ম্মার শেষ প্রবন্ধটি পড়েন নাই?"

শঙ্কর বলিল,—"তা'ও পড়েছি। আমি তার যুক্তির মধ্যে অনেক ফ্যালাসি (ভ্রান্তযুক্তি) দেখাতে পারি। আপনি তার একটা জবাব অবশ্য লিখবেন, আমি আপনাকে সাহায্য করতে পারি।"

আমি বলিলাম,—"আমি কিছু কিছু লিখেছি, তবে যা লিখেছি তা আমার মনঃপূত হয়নি। আপনার ত অনেক পড়াশুনা আছে, আপনার সঙ্গে আলোচনা ক'রে লিখলে বোধ হয় ভাল হবে।"

শঙ্কর বলিল,—"আচ্ছা, আমি আর এক সময়ে আসব। কাল রবিবার, কালই বৈকালে আসতে পারি।"

এই সময়ে দাদা ঘরের মধ্যে ঢুকিয়া বলিল,—"এই যে শঙ্কর এসেছ। তোমাদের নিশ্চয়ই নারীদের বিয়ে করা উচিত নয়, চাকরি করা উচিত, এই সব আলোচনা হচ্ছে। তা নীরু সুন্দরী, তুমি শঙ্করকে এক জন ভাল চ্যাম্পিয়ন (পক্ষসমর্থক) পেয়েছ। এবার দিবাকরকে খুঁজে বের করতে পারলে দুই জনের মল্লযুদ্ধ বেধে যাবে। শঙ্কর, তুমি তার কোন খোঁজ পেলে?"

শঙ্কর বলিল—"তুমি একনিঃশ্বাসে এতগুলি কথা ব'লে গেলে, এর কোন্‌টার জবাব চাও?"

দাদা বলিল,—"কিন্তু চ্যাম্পিয়নগিরি করতে গিয়ে যেন স্বখাতসলিলে ডুবে ম'রো না। তোমরা ব'সে গল্প কর। আমি কাপড় ছেড়ে আসছি।"

শঙ্কর প্রমীলাকে বলিল,—"কেমন রে, তোর পড়াশুনা হচ্ছে ত?"

প্রমীলা বলিল,—"পড়ছি।"

শঙ্কর বলিল—"বেশ মনোযোগ দিয়ে পড়বি—পরীক্ষার ত আর বেশী দেরি নেই। আমি তবে এখন উঠি, কাল বৈকালে আবার আসব।"

ক্রমশঃ

রাজবিজয় নাটক

শ্রীসুশীলকুমার দে
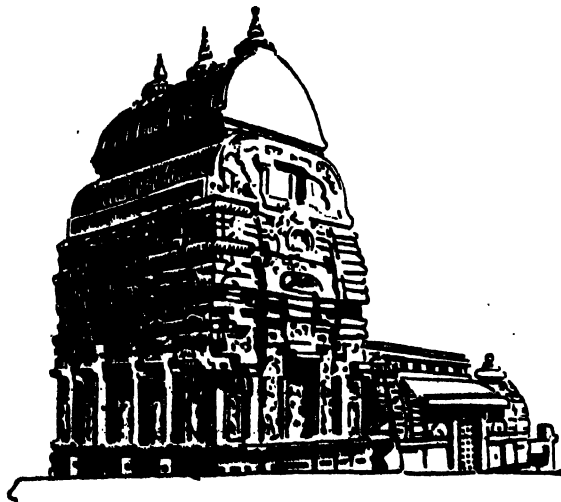
এতদিন পর্য্যন্ত আমাদের জানা ছিল প্রথম বঙ্গীয় নাট্যশালা বিদেশীর কীর্ত্তি। হেরাসিম লেবেডেফ নামে একজন রুশ-দেশবাসী কলিকাতার ২৫ নং ডুমতলাতে (বর্ত্তমান এজরা ষ্ট্রীট) এই নাট্যশালা স্থাপন করেন। ১৭৯৫ সনের ২৭এ নবেম্বর এখানে প্রথম অভিনয় হয়। অভিনীত নাটকখানি *The Disguise* নামক একখানি ইংরেজী মিলনান্ত নাটকের বঙ্গানুবাদ।

সম্প্রতি শ্রীযুক্ত হেমেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত একটি সাময়িক পত্রে লিখিয়াছেন :—

"লেবেডেফের অর্দ্ধশতাব্দী পূর্ব্বেও বাঙ্গলা নাটকের অভিনয় হইয়াছিল ইহাও বোধ হয় কেহ জানেন না।...সম্প্রতি আমরা বন্ধুবর ডাক্তার ধীরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় এম-এ, পি-এচ ডি মহাশয়ের নিকট অবগত হইলাম ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে একখানি হস্তলিখিত নাটক আছে। ঢাকার রাজবল্লভ সেনের আধিপত্যের সময়ে ইহা অভিনীত হয়। নাটকখানির নাম 'রাজবিজয়'।...সম্প্রতি উক্ত 'রাজবিজয়' নাটকখানি শ্রীযুক্ত অধ্যাপক সুবোধচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় এম-এ মহাশয় সঙ্কলন করিতেছেন। নাটকখানি প্রকাশিত হইলে পাঠক অনেক তথ্য অবগত হইবেন এবং বাঙ্গলার ইতিহাসেরও ইহা একটা অভিনব উপাদান বলিয়া গণ্য হইবে।"

ইহা সত্য হইলে বাস্তবিকই "অভিনব উপাদান" বলিয়া গণ্য হইত। কিন্তু 'রাজবিজয়' প্রথম বাঙ্গালা নাটক, এবং উহা রাজা রাজবল্লভের সময়ে অভিনীত হইয়াছিল—এই দুইটি উক্তিই অমূলক। নাটকখানি সংস্কৃত ভাষায় রচিত, সুতরাং বাঙ্গালা নাটক নহে। রাজা রাজবল্লভের সময়ে অভিনীত হইয়াছিল বলিয়া কোনও প্রমাণ পাওয়া যায় না, সুতরাং ইহা প্রথম অভিনীত বাঙ্গালা নাটক নহে।

দাশগুপ্ত মহাশয় স্বয়ং গ্রন্থখানি দেখেন নাই, অথবা এ-সম্বন্ধে কোন অনুসন্ধান করিবার চেষ্টাও করেন নাই; তিনি এই ভুল সংবাদটি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভূতপূর্ব্ব ছাত্র শ্রীমান্ ধীরেন্দ্রনাথ গাঙ্গুলীর নিকট পাইয়া লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। শ্রীমান্ ধীরেন্দ্রনাথ আবার এ সংবাদটি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পুঁথিরক্ষক শ্রীমান্ সুবোধচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের মারফৎ পাইয়াছেন। কেবলমাত্র শোনা কথা পরম্পরার উপর নির্ভর করিয়া কোন উক্তিকে ঐতিহাসিক তথ্য বলিয়া প্রচার করা সুধীজনোচিত নয়। এ-সম্বন্ধে অনুসন্ধান করিয়া আমি সুবোধচন্দ্রের নিকট পত্রোত্তরে যাহা জানিয়াছি, তাহা এইখানে উদ্ধৃত করিলে এই ভুলের উৎপত্তি কিরূপে হইয়াছিল তাহা জানা যাইবে। সুবোধচন্দ্র আমাকে লিখিয়াছেন (তারিখ ২৪।৬।৩৩)

"রাজবিজয় নাটকের একখানি খণ্ডিত পুঁথি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পুঁথিশালায় রহিয়াছে। নাটকখানি সম্ভবতঃ কোন বাঙ্গালী কবি রচিত, কিন্তু বাঙ্গালা নাটক নহে। প্রায় এক বৎসর পূর্ব্বে ডাঃ শ্রীযুক্ত ধীরেন্দ্রনাথ গাঙ্গুলী মহাশয় আমার নিকট হইতে বাঙ্গালী লিখিত নাটকের একটি তালিকা চাহিয়া লইয়াছিলেন। যতদূর মনে হয় সাময়িক পত্রের প্রবন্ধলেখক মহাশয় শ্রীযুক্ত হেমেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত ডাঃ গাঙ্গুলীর সংবাদটিকে ভুল বুঝিয়া বাঙ্গালীর নাটককে বাঙ্গালা নাটক বলিয়া পরিচয় দিয়াছেন।"

ইহার উপর কোনও মন্তব্য নিষ্প্রয়োজন।

আমি এই গ্রন্থ সম্বন্ধে অনুসন্ধান করিয়া শ্রীমান্ সুবোধচন্দ্রের সাহায্যে যাহা জানিতে পারিয়াছি, তাহা নিম্নে লিপিবদ্ধ করিলাম।

পুঁথিখানি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পুঁথিশালার নম্বর—৯৩৫সি। প্রাপ্তিস্থান—ফরিদপুর। পত্রসংখ্যা, ১-৭, ৯-১৬; ১৫শ পত্র ছিন্ন। পুঁথির অবস্থা ভাল নহে; হস্তলিপি কষ্ট করিয়া পড়িতে হয়। প্রতি পত্রে গড়ে সাতটি পংক্তি আছে। গ্রন্থের প্রতিপাদ্য বিষয়—রাজা রাজবল্লভের অনুষ্ঠিত কোন একটি যজ্ঞের বিবরণ। ১৫শ পত্রে একটি তারিখ দৃষ্ট হয়—"শাকে সিন্ধুমুনিরসৈকসংখ্যয়া......" কিন্তু অবশিষ্ট অংশ খণ্ডিত। এই তারিখটি, ১৬৭৭ শকাব্দ, সম্ভবতঃ পুঁথি-নকলের তারিখ; কিন্তু ইহা রচনাকাল অথবা লিপিকাল তাহা নিঃসন্দেহে বলা যায় না। নাটকের প্রথম অঙ্কের বর্ণনা এইরূপ—'রাজবিজয়-নাম-নাটকে যজ্ঞোদ্যম-নাম-প্রথমোঽঙ্কঃ"। যজ্ঞটি বৈদিক যজ্ঞ বলিয়া মনে হয়। শ্রীযুক্ত রসিকলাল গুপ্ত লিখিত "রাজবল্লভ" গ্রন্থ হইতে জানা যায় যে, রাজবল্লভ শ্রীখণ্ডে ভূতনাথ দেবের মন্দির প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন, এবং এই মন্দিরের প্রস্তরফলকে রাজবল্লভকে অগ্নিষ্টোম যজ্ঞের

অনুষ্ঠানকারী ও বাজপেয়ী বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে। এই সংবাদটি যদি ঠিক হয়, তবে রাজবল্লভ অগ্নিষ্টোম, বাজপেয় প্রভৃতি বৈদিক যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়া প্রসিদ্ধিলাভ করিয়াছিলেন বলিয়া মনে হয়, এবং বর্ত্তমান নাটকে তাঁহার বিজয়-সূচক এইরূপ কোনও যজ্ঞের বিবরণ দেওয়া হইয়াছে। নাটকের প্রথম অঙ্কে যজ্ঞের আয়োজন বর্ণিত হইয়াছে। কিন্তু ১৪শ হইতে ১৫শ পত্রে বৈদ্যের উপবীত-গ্রহণের আলোচনা দৃষ্ট হয়। এই দুইখানি পত্র নাটকের অংশ কি-না সন্দেহ। ১৬শ পত্রে পুনরায় যজ্ঞের বিবরণ রহিয়াছে। ইহার পর পুঁথি খণ্ডিত। পাত্রপাত্রীগণের মধ্যে রাজা রাজবল্লভ, সূত্রধার, প্রাকৃতভাষাভাষিণী নটী, প্রতীহার, দাক্ষিণাত্য বিপ্র ও রাজনগরীয় ভট্টাচার্য্যগণের উল্লেখ পাওয়া যায়। গ্রন্থকারের নাম অসম্পূর্ণ পুঁথিতে নাই। নাটকখানি জটিল সংস্কৃতভাষায় রচিত, সুতরাং অভিনয়োপযোগী বলিয়া মনে হয় না। ইহার উল্লেখ অন্য কোনও পুঁথিশালার তালিকায় আমরা পাই নাই।

চেকে সহি

শ্রীযোগেশচন্দ্র সেন, বি-এ (হারভার্ড)

ব্যাঙ্কিঙের বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে চেকের প্রচলনও দিন-দিন বৃদ্ধি পাইতেছে। আমেরিকা, বৃটেন এবং অন্যান্য উন্নত দেশে দেনা-পাওনার অধিকাংশ ভাগই চেক্ দ্বারা মিটান হয়, আমাদের দেশেও চেকের ব্যবহার ক্রমশই বাড়িতেছে। কিন্তু সাধারণের বিশ্বাস যে চেক্ ভাঙাইতে বেগ পাইতে হয় এবং সেই জন্যই অনেকে চেক্ লইতে চাহেন না। বাস্তবিক এই বিশ্বাস একান্তই ভুল, যদি চেকের টাকা পাইতে বিলম্ব হয় উহার কারণ অনেক সময়েই দেখা যায় যে চেকের পিছনে ঠিক-মত সহি করা হয় নাই। একটু ভাবিয়া দেখিলেই বোঝা যায় যে চেক্ দ্বারা দেনা-পাওনা শোধ করা কত সুবিধাজনক। প্রথমতঃ, দেনা-পাওনার আনা পাই পর্য্যন্ত চেক্ লিখিয়া দেওয়া যায় এবং নগদ টাকা দিতে গেলে যে ঝুঁকি পোহাইতে হয় তাহা হইতে রেহাই পাওয়া যায়। দ্বিতীয়তঃ, চেক্ অর্ডার এবং ক্রস্ করিয়া দিলে উহা কোন কারণে বিবাদ উপস্থিত হইলে একটি মূল্যবান প্রমাণ হয়। নগদ টাকা ঘরে রাখাতে যে-সব বিপদের সম্ভাবনা, ব্যাঙ্কে রাখিলে সে ভয় থাকে না। তাহা ছাড়া ব্যাঙ্কে টাকা থাকিলে এবং চেক্ দ্বারা দেনা-পাওনা মিটাইলে চলতি মুদ্রার অধিক পরিমাণে প্রয়োজন হয় না। ইহা ছাড়া সব চেয়ে সুবিধা এই যে ব্যাঙ্কে টাকা রাখিলে ব্যবসা-বাণিজ্যের অনেক সুবিধা হয়।

প্রথমতঃ, যিনি চেক্ কাটিবেন তাঁহাকে কয়েকটি কথা স্মরণ রাখিতে হইবে—যত টাকার চেক্ কাটিয়াছেন সেই পরিমাণ টাকা ব্যাঙ্কে জমা আছে কি না, ব্যাঙ্কে যে সহির নমুনা দিয়াছেন চেকে সেই-মত সহি করিয়াছেন কি না, চেকে তারিখ ঠিক আছে কি না, কেন না চেকে যে তারিখ লিখিত থাকে সেই তারিখ হইতে ছয় মাসের মধ্যে চেক্ না ভাঙাইলে ব্যাঙ্ক চেক্ পুরাণ বলিয়া ফেরৎ দিবে। চেকে যে টাকা লেখা হইয়াছে তাহা অক্ষরে এবং অঙ্কে এক হওয়া চাই। যেমন, যদি অক্ষরে লেখা থাকে এক শত পনর টাকা বার আনা ছয় পাই আর যদি অঙ্কে লিখা হয় ১১৫-১০-৬ পাই, তাহা হইলে ব্যাঙ্ক অক্ষরে এবং অঙ্কে মিলে না বলিয়া চেক্ ফেরৎ দিবে।

চেকের লেখায় কাটাকাটি অথবা কোন প্রকার পরিবর্ত্তন হইলে চেক্-লেখক সেই স্থানে তাঁহার পুরা নাম সহি করিবেন, সংক্ষিপ্ত সহি করিলে চলিবে না। মনে করুন চেকে লেখা আছে :—

Pay Babu Ram Chandra De or bearer,

এই স্থলে অর্থাৎ বেয়ারার চেক্ হইলে চেকের পিছনে সহি করিবার প্রয়োজন নাই এবং যে-ব্যাঙ্কের উপর চেক্ লেখা হইয়াছে সেই ব্যাঙ্কে গেলেই টাকা পাওয়া যাইবে। কিন্তু

যদি 'bearer' কাটিয়া 'order' লেখা যায় তাহা হইলে 'রামচন্দ্র দে'র সহি ছাড়া ব্যাঙ্ক টাকা দিবে না। চেকে 'bearer' শব্দটি কাটিয়া দিলেই, উপরে order না লেখা থাকিলেও চেক অর্ডার হইয়া যায়, যদিও বেয়ারার কাটিলে তাহার উপর অর্ডার লেখাই উচিত। কোন কোন ব্যাঙ্কের চেকে 'বেয়ারার'-এর পরিবর্তে শুধু 'অর্ডার' লেখা থাকে। এস্থলে চেক্-লেখক যদি ইহাকে বেয়ারার করিতে চাহেন তাহা হইলে অর্ডার কাটিয়া বেয়ারার লিখিতে হইবে এবং সেই স্থানে তাঁহাকে সহি করিতে হইবে। যদিও বেয়ারার চেক্‌কে অর্ডার করিলে সহি না করিলেও চলে, কিন্তু অর্ডার চেক্‌কে বেয়ারার করিলে সহি করিতেই হইবে।

অনেক সময় দেখা যায়, চেকের বাম দিকে দুটি লাইন টানিয়া লাইনের মাঝে 'এণ্ড কোং' লেখা হইয়াছে। ইহাকে crossing বলা হয়। ইহার উদ্দেশ্য এই যে এইরূপ চেকের টাকা ব্যাঙ্ক নগদ দিবে না, শুধু অন্য কোন ব্যাঙ্কের মারফতে আসিলেই ঐ ব্যাঙ্ককে দিবে। বেয়ারার অথবা অর্ডার চেক উভয়ই ক্রস্ করা যাইতে পারে। ক্রস্ করিলেই যে পিছনে সহি করিতে হইবে এমন নহে, অর্ডার না থাকিলে সহি করিবার কোন প্রয়োজন নাই। কখন কখন দেখা যায় যে ক্রসিঙের অর্থাৎ লাইন দুটির ভিতরে লেখা আছে not negotiable অথবা payee's account only, এ স্থলে যাহার নামে চেক্ লেখা হইয়াছে সে পিছনে সহি করিয়া অপরকে হস্তান্তর করিতে পারিবে না। চেক্ negotiable instrument, ইহার পিছনে সহি করিয়া একজন অন্যজনকে, এইরূপ বহু লোককে হস্তান্তর করিতে পারে, কিন্তু not negotiable লেখা থাকিলে হস্তান্তর করা যায় না।

শুধু অর্ডার চেক্ হইলে এবং ক্রসিং না থাকিলে ব্যাঙ্ক নগদ টাকা দিতে পারে, কিন্তু চেকে লিখিত ব্যক্তি, এবং যে ব্যক্তি চেক্ আনিয়াছে সেই ব্যক্তি একই কি না ইহার উপযুক্ত প্রমাণ না পাইলে ব্যাঙ্ক টাকা দিতে অস্বীকার করিতে পারে। কিন্তু যদি অন্য কোন ব্যাঙ্ক চেক্ আনে তাহা হইলে বিনা আপত্তিতে টাকা দিবে, কেন না দোষ-ত্রুটি হইলে যে-ব্যাঙ্ক চেক্ উপস্থিত করিয়াছে সেই ব্যাঙ্ক দায়ী হইবে।

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে, অর্ডার চেক্ হইলে পিছনে সহি করিতেই হইবে, কিন্তু মনে করুন Pay Ram Chandra De or bearer এইরূপ চেক্ লেখা হইলে যদি রামচন্দ্র দে, Pay Pitamber Pal or order এইরূপ লিখিয়া চেকের পিছনে নিজের নাম সহি করে তাহা হইলে যদিও চেক্ প্রথমে বেয়ারার ছিল তথাপি উহা এখন অর্ডার হইয়া গিয়াছে এবং পীতাম্বর পালের সহি না থাকিলে ব্যাঙ্ক টাকা দিবে না। বোম্বাই হাইকোর্টের একটি রায়ের ফলে এখন এই নিয়ম হইয়াছে. পূর্ব্বে বেয়ারার চেক্ হইলে পিছনে যত এবং যেমন সহিই থাকুক না কেন তাহাতে উহার বেয়ারারত্ব নষ্ট হইত না। পূর্ব্ব নিয়ম পুনঃপ্রচলিত করিবার জন্য একটি আইনের খসড়া প্রস্তুত হইয়াছে এবং আশা করা যায় শীঘ্রই উহা পাস হইবে।

চেকের পিছনে সহি করিবার নিয়ম এই যে, চেকে লিখিত ব্যক্তি তাহার পদবী অর্থাৎ বাবু, মৌলভি, মিষ্টার, মিসেস্, মিস, রায় বাহাদুর, খান বাহাদুর ইত্যাদি লিখিবে না। যদি চেকে লেখা হইয়া থাকে—

Pay Rai Ramchandra De Bahadur or order

তাহা হইলে সহি করিতে হইবে শুধু Ramchandra De. অনেক সময় দেখা যায় যে চেকে নাম ভুল লেখা হইয়াছে, যেমন Ramchunder Dey। এই স্থলে যেরূপ ভুল লেখা হইয়াছে পিছনে সেইরূপই প্রথম নাম সহি করিতে হইবে, পরে নীচে নিজের স্বাভাবিক স্বাক্ষর করিতে হইবে। অর্ডার চেকে যে-ভাবে নাম লেখা থাকে পিছনেও অবিকল সেইরূপ সহি করিতে হইবে, তাহা না হইলে ব্যাঙ্ক চেক্ ফেরৎ দিবে। চেকে যদি লেখা থাকে Pay Mrs. R. C. De or order এ স্থলে কিরূপ সহি করিতে হইবে? পদবী লিখিলে ভুল হইবে আর না লিখিলেও ভুল হইবে। এখানে সহি করিতে হইবে Premlata De, wife of R. C. De.

ইন্‌শিওরেন্স কোম্পানী পর্দ্দানশীন মহিলার নামে যে চেক্ দেয় উহা ভাঙাইতে অনেক সময় অসুবিধা হয়। এই সব চেকে নাম জাল হইবার সম্ভাবনা অধিক থাকে বলিয়া, মহিলাদিগকে কোন ম্যাজিষ্ট্রেটের সম্মুখে সহি করিতে হয় এবং ম্যাজিষ্ট্রেট তাঁহার সম্মুখে সহি করা হইয়াছে এইরূপ

লিখিয়া, নিজের নাম স্বাক্ষর করিয়া, কোর্টের মোহরের ছাপ দিলে তবে ব্যাঙ্ক চেকের টাকা দিবে। যদি মহিলা পর্দ্দানশীন না হন্ এবং ইংরেজীতে নাম স্বাক্ষর করেন তাহা হইলে ম্যাজিষ্ট্রেটের সম্মুখে সহি না করিলেও ব্যাঙ্ক টাকা দিতে পারে।

ব্যাঙ্ক হইতে যে-সব কারণে চেক্ ফেরৎ দেওয়া হয় তাহা অনেকে ঠিক বুঝিতে পারেন না বলিয়া এখানে সে-বিষয় কিছু বলা প্রয়োজন। সাধারণতঃ যে-সব কারণে চেক্ ফেরৎ দেওয়া হয় তাহার কয়েকটি এখানে উল্লেখ করিতেছি। Not arranged for (বন্দোবস্তের অভাব), বন্দোবস্তের অর্থ ব্যাঙ্কে উপযুক্ত জামিন রাখিয়া কর্জ্জ করিবার বন্দোবস্ত, exceeds arrangement (বন্দোবস্তের অতিরিক্ত), full cover not received (সম্পূর্ণ টাকা জমা নাই), refer to drawer (চেক্-লেখকের নিকট অনুসন্ধান করুন, অর্থাৎ তাঁহার জমা টাকা নামমাত্র)। এগুলির সব একই অর্থ, অর্থাৎ চেক্-লেখকের খাতায় চেক্ পাস হইবার মত টাকা জমা নাই। Effects not yet cleared, please present again, ইহার অর্থ এই যে চেক্-লেখকের খাতায় চেক্ পাস হইবার মত টাকা উপস্থিত নাই, তবে তিনিও চেক্ জমা দিয়াছেন এবং সেগুলির টাকা পাইলে তাঁহার লিখিত চেক্ পাস হইতে পারে।

অর্ডার চেক্ হইলে যাঁহার নামে চেক্ দেওয়া হইয়াছে তাঁহার সহির অভাব অথবা সহিতে ভুলের জন্য, চেক্ ফেরৎ দেওয়া হয়। ব্যাঙ্কে সহির যে নমুনা দেওয়া হইয়াছে উহার সহিত চেকে সহির অমিল; চেকে কোন প্রকার পরিবর্ত্তন হইলে, পরিবর্ত্তিত স্থানে চেক্-লেখকের পূর্ণ সহির প্রয়োজন; চেকে যে-তারিখ লিখিত হইয়াছে উহার পূর্ব্ববর্ত্তী কোন তারিখে উহা ভাঙাইতে পারা যায় না। মনে করুন যদি চেকে তারিখ থাকে ৫ই জুলাই ১৯৩৩, তাহা হইলে ৪ঠা জুলাই ঐ চেক্ ভাঙাইতে পারা যায় না। Payment stopped by drawer—চেক্-লেখক চেক্ ভাঙাইতে নিষেধ করিয়াছেন। চেক্ ভাঙাইবার পূর্ব্বে যদি চেক্-লেখক ব্যাঙ্কে সেই চেক্ ভাঙাইতে নিষেধ করিয়া পত্র লেখেন তাহা হইলে উপরোক্ত কারণ লিখিয়া ব্যাঙ্ক চেক্ ফেরৎ দিবে। যদি চেক্-লেখক উক্ত নিষেধ-পত্র প্রত্যাহার করেন তাহা হইলে ব্যাঙ্ক উহা ভাঙাইবে। মোটামুটি যে-সব কারণ উল্লেখ করা হইয়াছে সেই কারণেই প্রায় চেক্ ফেরৎ দেওয়া হয়।

মানভূম জেলার মন্দির

শ্রীনির্ম্মলকুমার বসু

বাংলা দেশ হইতে যে পথটি সোজাসুজি ভারতের পশ্চিমাঞ্চলে গিয়াছে, তাহা বর্দ্ধমান জেলায় দামোদর ও অজয় নদীর মধ্যবর্ত্তী উচ্চভূমির উপর দিয়া চলিয়া গিয়াছে। যেখানে বরাকর নদীর সহিত দামোদর নদ সম্মিলিত হইয়াছে, তাহার আশপাশের দেশটি আধা-পাহাড়ী ও আধা জংলী ধরণের। পশ্চিম হইতে যাহারা বাংলা দেশের বিরুদ্ধে অভিযান করিত তাহাদের গতি রোধ করিবার জন্য এই অঞ্চলে কয়েকজন প্রতাপশালী সামন্ত নরপতি রাজত্ব স্থাপনা করিয়াছিলেন।

যুদ্ধ-কৌশলের জন্য প্রয়োজন হইলেও দেশটি যে অনুর্ব্বর তাহা নহে। মানভূমের উত্তর ধারে যেমন দামোদর, মধ্যে ও দক্ষিণে তেমনি কাঁসাই ও সুবর্ণরেখা নদী প্রবাহিত হইয়াছে। এই সকল নদীর ধারে সময়ে সময়ে শহর গড়িয়া উঠিয়াছিল এবং সেই সব শহরে তখনকার রীতি-অনুযায়ী রাজা অথবা ধনী বণিক-মহাজনদের চেষ্টায় সুচারু কারুকার্য্য খচিত অনেকগুলি নির্ম্মিত হইয়াছিল। মানভূম জেলার মধ্যে দামোদর নদের ধারে তেলকুপি ও নিকটেই চেলিয়ামা বলিয়া দুইটি মন্দিরের কেন্দ্র আছে। তেমনি দক্ষিণে সুবর্ণরেখার তীরে ডুলমী বলিয়া একটি ক্ষুদ্র গ্রামে আমরা ভাঙা মন্দির ও পাথরের কয়েকটি ভাঙা মূর্ত্তি দেখিতে পাই। মধ্যে কাঁসাই নদীর কূলে বোড়াম ও কূলের কয়েক ক্রোশের মধ্যে ছড়রা, পাকবিড়রা প্রভৃতি স্থানে আরও কয়েকটি ভাঙা মন্দির ও বহু প্রাচীন পাথরের মূর্ত্তি পাওয়া যায়। এতদ্ভিন্ন পুরুলিয়ার উত্তরে পাড়াগ্রামেও কয়েকটি পুরাতন মন্দির আছে। বর্ত্তমান প্রবন্ধে আমরা মানভূমের মন্দিরগুলির সম্বন্ধে কিছু আলোচনা করিব, কেবল প্রসঙ্গক্রমে ভাস্কর্য্যের কথা যাহা আসিয়া পড়িবে তাহার উল্লেখ করিতে হইবে। যাহারা ভাস্কর্য্যের বিষয়ে বিশেষজ্ঞ তাহারা যদি মানভূমে উল্লিখিত কয়েকটি স্থানে অনুসন্ধান করিয়া স্থানীয় ইতিহাস উদ্ধার করেন, তাহা হইলে পশ্চিম-বাংলার প্রাচীন ইতিহাসের সম্বন্ধে আমরা অনেক নূতন জ্ঞান লাভ করিতে পারিব।

তেলকুপিতে একটি ভগ্ন-দেউল

মানভূমের সহিত কোনও সময়ে বোধ হয় দক্ষিণ-মগধ ও উড়িষ্যার ঘনিষ্ঠ যোগ ছিল। মানভূমে রাঢ়দেশের মত গৌড়ীয় গঠনের মন্দির থাকিলেও উড়িষ্যা অথবা গয়া জেলার মত অনেকগুলি মন্দির আছে। দামোদরের কূলে তেলকুপি বলিয়া যে-স্থানটির উল্লেখ করা হইয়াছে সেখানে দশ-বারটি বেশ পুরাতন মন্দির আছে। এগুলি উড়িষ্যার রেখ-জাতীয়

দেউল। ইহাদের বাড় তিন অঙ্গে রচিত, অর্থাৎ তাহাতে কেবল পাভাগ, জাংঘ ও বরণ্ড আছে। সে হিসাবে ইহারা উড়িষ্যার পুরাতন রেখ দেউলের সহিত একগোত্রে পড়ে,

তেলকুপি গ্রাম

কিন্তু ইহাদের গঠন এত হালকা ধরণের ও গর্ভের সহিত অনুপাতে ইহাদের উচ্চতা এত বেশী যে, উড়িষ্যার বদলে

তেলকুপিতে একটি অপেক্ষাকৃত আধুনিক মন্দির

গয়া জেলার কোঞ্চ, দেও প্রভৃতি স্থানের মন্দিরের সহিত এগুলিকে এক গোত্রে ফেলিতে হয়। কিন্তু পরবর্ত্তী মন্দিরগুলির সহিত ইহার একটি প্রধান তফাৎ হইল আঁলার আকৃতিতে। তেলকুপির মন্দিরগুলির আঁলা গয়া জেলার আঁলা অপেক্ষা অনেক চেপটা ও অনেক বড়। তাহাতে তেলকুপির রেখ দেউলগুলিকে একটি বৈশিষ্ট্য দান করিয়াছে।

তেলকুপির বাড় ও আঁলার সহিত যুক্ত ধ্বজা পুঁতিবার একটি পাথরের খাপেও আমরা উড়িষ্যার সহিত তাহার সম্বন্ধের খানিকটা অভাব দেখি। উড়িষ্যায় ত্রি-অঙ্গ-বাড়যুক্ত

বোড়ামে চতুর্ভুজ দেবীমূর্ত্তি, পার্শ্বে গণেশ ও কার্ত্তিক

রেখ-দেউলে জাংঘে সচরাচর একটি শিখর বসান থাকে, কিন্তু তৎপরিবর্ত্তে তেলকুপির জাংঘে কতকগুলি থামের আকৃতি খোদাই করিয়া দেওয়া হইয়াছে। ময়ূরভঞ্জের খিচিঙেও এই লক্ষণটি দেখিতে পাওয়া যায়। আঁলায় ধ্বজা পুঁতিবার জন্য খোপ তৈয়ারী করা রাজপুতানা, গুজরাট প্রভৃতি প্রদেশে খুব চল্‌তি আছে। মানভূম একসময়ে জৈনধর্ম্মের একটি

বড় কেন্দ্র ছিল। বর্ত্তমান লক্ষণটিতে আমরা সুদূর পশ্চিমের জৈনগণের প্রভাব কিছু দেখিতে পাই।

যাহাই হউক, উড়িষ্যার প্রভাব যে তেলকুপিতে একেবারে পড়ে নাই তাহা বলা চলে না। তেলকুপিতে একটি অপেক্ষাকৃত আধুনিক রেখ-দেউল আছে। তাহার সহিত একটি ভদ্র-দেউলও সংযুক্ত হইয়াছে। কিন্তু এই ভদ্র-দেউলের গঠনে শিল্পীরা এমন দু-একটি ভুল করিয়াছেন যাহাতে মনে হয় যে তাঁহারা ভদ্র-দেউল গঠনে আনাড়ী ছিলেন। প্রথমতঃ ভদ্রের পিঢ়াগুলি অসম্ভব রকম বড় করা হইয়াছে। দ্বিতীয়তঃ তাহাদের গণ্ডীর উপরে ঘণ্টা না বসাইয়া সোজাসুজি একটি রেখ-মস্তক বসাইয়া দেওয়া হইয়াছে। তৃতীয়তঃ, রেখ-দেউলটির তালজাংঘে বিরাল ও উপরজাংঘে বন্ধকাম না দিয়া শিল্পীরা তলজাংঘেই দুইটিকে গুঁজিয়া দিয়াছেন। সেখানেও আবার বিরাল উপরে ও বন্ধকাম নীচে রাখা হইয়াছে। এগুলি শিল্পাচারবিরুদ্ধ, অতএব উড়িষ্যার শিল্পে অনভিজ্ঞ লোকের তৈয়ারী বলিয়া ধরা যাইতে পারে। অথচ উড়িষ্যার সহিত

পাড়ায় ইঁট ও পাথরে তৈয়ারী দেউল

তেলকুপির যে সম্বন্ধ ছিল তাহা বিরাল প্রভৃতি মূর্ত্তির অস্তিত্বেই প্রমাণ করিয়া দিতেছে।

উড়িষ্যার সহিত তেলকুপির আরও একটি যোগসূত্রের সন্ধান পাওয়া যায়। প্রতি বৎসর বৈশাখ মাসের প্রথম

পাড়া-গ্রামে পাথরে নির্ম্মিত দেউল

পাকবিড়িয়ার মন্দিরের ক্ষুদ্র প্রতিকৃতি ও জৈন মূর্ত্তি

দিবসে তেলকুপিতে দামোদরের চড়ার উপর 'ছাতা-পরব' নামে একটি উৎসব অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। তখন বালির চড়ায় দুইটি বাঁশের বড় ছাতা পুঁতিয়া ফুলচন্দন দিয়া তাহাদের পূজা করা হয়। একটি স্থানীয় পঞ্চকোটের

ছড়রার নিকটে জিনগণের মূর্ত্তি অঙ্কিত পাথরের খণ্ড

রাজার নামে ও অপরটি, আশ্চর্য্যের বিষয়, পুরীর 'গজপতি সিং'-এর নামে স্থাপনা করা হয়। কত কাল পূর্ব্বে এই দেশটি হয়ত পুরী-রাজের অধীন ছিল, আজ তাঁহার রাজত্ব পর্য্যন্ত লুপ্ত হইয়া গিয়াছে, অথচ তাঁহার নাম আজও একটি সুদূর পল্লীতে পূজিত হইয়া আসিতেছে।

তেলকুপির মন্দিরগুলি পাথরের তৈয়ারী হইলেও এই সকল পাথর সংগ্রহ করা বোধ হয় কঠিন হইত। তাই কয়দিনের মধ্যে মানভূমের শিল্পিগণ পাথরের বদলে ইটে রেখ-দেউল গড়িতে আরম্ভ করিলেন। ফলতঃ মন্দিরের আকৃতিতেও খানিকটা পরিবর্ত্তন ঘটিয়া গেল। রেখ-দেউল পাথরে গড়িতে হইলে শিল্পিগণ খানিকদূর পর্য্যন্ত গড়িয়াই পাথরের প্রকাণ্ড কয়েকটি পাটা দিয়া একটি ছাত তৈয়ারী করিতেন ও দু-দিককার দেওয়ালকে পোক্তভাবে বাঁধিয়া দিতেন। ইট ব্যবহার করিলে কিন্তু তাহার উপায় থাকে না। তাই দেওয়ালকে বাহিরের দিকে খাড়া তুলিয়া যাইতে হয় ও ভিতরে লহড়া (corbel) রচনা করিয়া শেষে একটি বিন্দুতে মিলাইয়া দিতে হয়। ফলে গণ্ডীর কাটেনী নীচের দিকে কিছুই থাকে না, একেবারে শেষে হঠাৎ অত্যধিক কাটেনী দিয়া গর্ভগৃহকে ঢাকা দিতে হয়। মন্দিরের শীর্ষস্থানটি এইজন্য কমজোর হইয়া যায়। তাহার উপরে বড় বেকি বা আঁলা আর বসান যায় না, দুটিকেই

বোড়াম-গ্রামে ইটে তৈয়ারী দেউল

ছোট করিতে হয়। এই জন্য মানভূমের সর্ব্বত্র আমরা ইটের দেউলে ছোট আঁলা ও সোজা গণ্ডী দেখি। যে-সব মন্দির ভাঙিয়া গিয়াছে তাহা ঠিক গণ্ডীর মাথাতেই ভাঙিয়াছে। শুধু মানভূমে নয়, বীরভূম বা বর্দ্ধমান জেলায় যেখানেই

দেউল আছে তাহা, ইটের হইলে, মানভূমেরই মত একই ভাবে তৈয়ারী হইয়াছে ও একই ভাবে ভাঙ্গিয়াছে।

মানভূমে বোড়ামের কয়েকটি মন্দির দেখিলে ইটের মন্দিরের রচনা-কৌশল বুঝা যায়। আশ্চর্য্যের বিষয়, পাড়া গ্রামে ইটের গড়া দেউলের আকারে পাথরেও দেউল নির্ম্মিত হইয়াছিল। তখন বোধ হয় দেউলের গড়নটি লোকের পছন্দ হইয়াছিল ও তেলকুপির মত রেখ-দেউল নির্ম্মাণ করার কৌশল বোধ হয় তাহারা ভুলিয়া গিয়াছিল।

ডুলমি, বোড়াম, তেলকুপি প্রভৃতি স্থানে মন্দিরের মধ্যে বা আশপাশে গণেশ, কার্ত্তিক, দুর্গা, সূর্য্য প্রভৃতির মূর্ত্তি আছে। কিন্তু তাহা ভিন্ন সকল স্থানেই বহু জৈন মূর্ত্তি দেখা

তেলকুপির মন্দির-দ্বারে মনুষ্যকৌতুকী ও অন্যান্য মূর্ত্তি

যায়। ছড়রায় খাজুরাহার মত যুগল জৈন মূর্ত্তি ও তীর্থঙ্করদের মূর্ত্তিও যথেষ্ট পাওয়া যায়। কিন্তু বোধ হয় জৈনমূর্ত্তি বলিতে মানবাজারের নিকট লৌলাড়া ও পুঞ্চা গ্রামের কাছে পাকবিড়রায় সর্ব্বাপেক্ষা আশ্চর্য্যজনক মূর্ত্তি দেখিতে পাওয়া যায়। একটি সামান্য চালার মধ্যে হঠাৎ ৮ ফুট উচ্চ, নগ্ন জিনের মূর্ত্তি
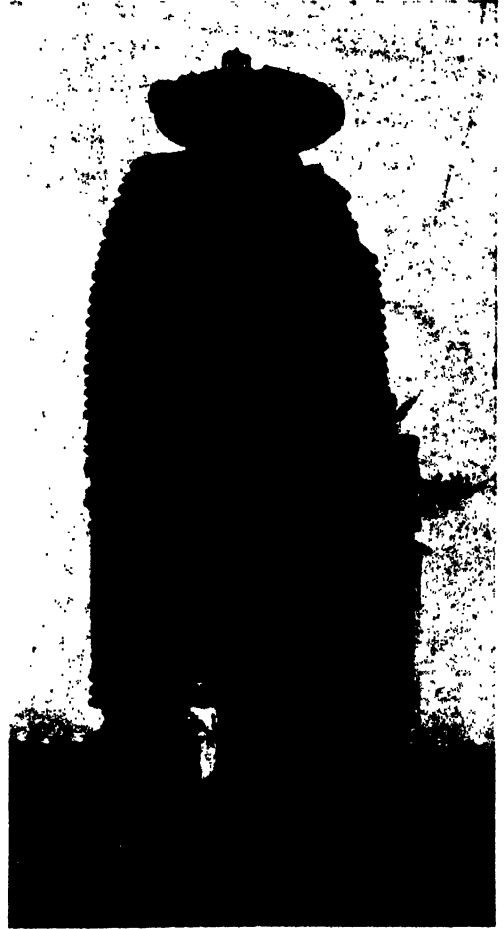
তেলকুপিতে রেখ-দেউল

দেখিয়া আমি আশ্চর্য্য হইয়া গিয়াছিলাম। অন্ধকার ঘর, খড়ের চাল ও কালোরঙের মূর্ত্তি বলিয়া ভাল ফটো লইতে পারি নাই। তবে মূর্ত্তিটি এতই ভাল যে, মনে হয় শিল্পামোদী যদি কেহ পুনরায় সেই স্থানে গিয়া ছবিটি লইয়া আসিতে পারেন তবে প্রাচীন ভাস্কর্য্যের একটি শ্রেষ্ঠ নিদর্শনের পরিচয় পাইয়া সকলে ধন্য হইবেন।

আদ্রা জংশনের নিকট শরাক বলিয়া একটি জাতির বাস

আছে। শরাক শ্রাবক শব্দের অপভ্রংশ হইতে পারে। ইহারা নিরামিষাশী। সূর্য্যাস্তের পর ইহাদের খাইতে আপত্তি নাই। সামাজিক ক্রিয়াকর্ম্মে ইহারা ব্রাহ্মণদের নিয়োগ করে। শরাকেরা বলে, মানবাজারের নিকট যে সকল কীর্ত্তি আছে তাহা ইহাদের পূর্ব্বপুরুষেরাই করিয়াছিলেন। হইতে পারে মানভূমে একসময়ে একটি বড় শিল্পকেন্দ্র ছিল। সেই সময়েই বোধ হয় দক্ষিণ মগধের মত কতকগুলি রেখ-দেউল এখানে গড়িয়া উঠে। তাহাতে যেমন আমরা একদিকে শৈলীর বৈশিষ্ট্য দেখি, অপরদিকে তেমনি পশ্চিম ভারতের সহিত কিছু যোগও দেখিতে পাই। অপরদিকে উড়িষ্যার সহিত পরবর্ত্তীকালে যে মানভূমের যোগ স্থাপিত হইয়াছিল তাহাও বিলক্ষণ বুঝিতে পারা যায়। আরও পরে হয়ত পাথরের বদলে ইট ব্যবহারের সঙ্গে সঙ্গে এখানে রেখ-দেউলের একটি বিশেষ রূপ সৃষ্টি হয় এবং তাহাই বাঁকুড়া, বীরভূম ও বর্দ্ধমান জেলায় দেউল নামে ক্রমশঃ বিস্তার লাভ করে। এইসব দেখিলে মানভূমকে স্থাপত্য-শিল্পের দিক হইতে একটি বড় জায়গা বলিতে হয় এবং মানভূমের ইতিহাস ভাল করিয়া অনুসন্ধান করার ও জানার প্রয়োজনীয়তা আমাদের নিকট বাড়িয়া যায়।

গ্যেটের স্বপ্ন

শ্রীআশুতোষ সান্যাল

আলো! আলো! আরও আলো! আরও খরতর,—
সুতীক্ষ্ণ কৃপাণসম, এই ভয়ঙ্কর
তমসারে ছিন্ন ভিন্ন দীর্ণ করি দিয়া,
আমরা আসিব ওরে সত্যের সে মহাদ্যুতি নিয়া।
এ জীবনে খালি,
দেখিব কি অনৃতের কূট চতুরালি?
শুধু ঐ আলেয়ার মায়া,
বিথারিবে নিশিদিন কায়াহীন ছায়া?
এ বিশ্বের
রহস্যের—
অন্তরালে বসি,
যে অদ্ভুত অ-পূর্ব্ব রূপসী
রচিতেছে অপরূপ কুহকের জাল—
বসি চিরকাল;—
উতারিব মোরা মায়া-অবগুণ্ঠ তার,—
একবার! ওগো একবার!
হবে যে দেখিতে,
সে কোন্ কুহকী বসি নিরালা নিভৃতে,
গাঁথিতেছে অহরহ অ-বিশ্রান্ত সৃষ্টির মালিকা!
জীবনের রবিরশ্মিশিখা,
কেন উঠে
ফুটে
তমিস্রার মহাজাল টুটে?
পুনরায়
কেন মুছে যায়?
সৃজনের পরে কেন তমান্ধ প্রলয়,
হেরি বিস্ময়?
কেন ঝ'রে যায় পড়ে যত ফুলদল—
ভরি ফুল দল?
হায়!
নাহি থাকে ঝ'রে যদি যায়,
বৃথা কেন মধুবায়ু তাদের ফুটায়?
ঐ মৃত্যু—ওরে একদিন,
করি নগ্ন—অবগুণ্ঠহীন
টেনে ফেলে দিতে হবে রহস্যের সিংহাসন হ'তে
সংসারের এই নিত্যস্রোতে!
একদা মানুষ মোরা প্রকৃতির বুকে
বিজয়ের মহোল্লাসে নৃত্য করি সুখে
বেড়াইব ঘুরে,
আর নানা সুরে
গাবে এই বিশ্বচরাচর,
করি কলস্বর—
"জয় জয় মানুষের জয়।"
নয় নয়
বেশী দূর নহে সে লগন,—
মানুষের মহাজাগরণ!

জগদানন্দ রায়

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

আমরা প্রত্যেকেই একটি ছোট ব্যক্তিগত সীমার মধ্যে নিজের বিশেষ পরিচয় দিয়ে থাকি। জীবনযাত্রার বিশেষ প্রয়োজন এবং অভ্যাস অনুসারে যাদের সঙ্গে আমাদের দৈনিক ব্যবহার তাদেরই পরিবেষ্টনের মধ্যে আমাদের প্রকাশ। সকলেই জানে সে প্রকাশের মধ্যে নিত্যতা নেই। এই রকমের ছোট ছোট সম্বন্ধসূত্র ছিন্ন হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই জীবনের এই অকিঞ্চিৎকর ভূমিকা লুপ্ত হয়ে যায়। কিন্তু এই যদি আমাদের একমাত্র পরিচয় হয় তা হ'লে মৃত্যুর মত শূন্যতা আর কী হ'তে পারে। প্রাণপণ চেষ্টায় প্রাণ-ধারণের দুঃখ স্বীকার কী জন্যে যদি মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে সত্তার সমগ্র পরিচয় নিঃশেষিত হয়ে যায়। মানুষের মন থেকে এ সংস্কার কিছুতেই ঘোচে না যে তার উদ্দেশ্য হচ্ছে বেঁচে থাকা, অথচ সে উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয় না. একদিন তাকে মরতেই হয়। মানুষ তবে কার উদ্দেশ্য সিদ্ধ করে? জীব প্রকৃতির। সে উদ্দেশ্য আর কিছু নয়, জীবপ্রবাহ রক্ষা ক'রে চলা।

সপরিবারে জগদানন্দ রায়

মরতে মরতেও আমরা নানা রকম তাগিদে তার সেই উদ্দেশ্য সাধন করি। প্রলোভনে, শাসনে ও মোহে প্রকৃতি ফাঁকি দিয়ে আপন কাজ করিয়ে নেয়। প্রতিদিন নগদ পাওনা দিয়ে খাটিয়ে নিয়ে কাজ শেষ হ'লেই এক নিমেষেই বিদায় দেয় শূন্যহাতে। বাইরে থেকে দেখলে ব্যক্তিগত জীবনের এই আরম্ভ এই শেষ। প্রকৃতির হাতে এই তার অবমাননা। কিন্তু তাই যদি একান্ত সত্য হয়, তা হ'লে প্রকৃতির প্রবঞ্চনার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করাকেই শ্রেয় বলতুম। কিন্তু মন তো তাতে সায় দেয় না।

আছি এই উপলব্ধিটাই আমার কাছে অন্তরতম। এই জন্য নিরতিশয় নাস্তিত্বের কোনো লক্ষণকে চোখে দেখলেও মনে তাকে মানতে এত বেশী বাধে। মৃত্যুকে আমরা বাইরে দেখি অথচ নিজের অন্তরে তার সম্পূর্ণ ধারণা কিছুতেই হয় না। তার প্রধান কারণ নিজেকে দেখি সকলের সঙ্গে জড়িয়ে,—আমার অস্তিত্ব সকলের অস্তিত্বের যোগে। উপনিষদ বলেছেন, নিজেকে যে অন্যের মধ্যে জানে সে-ই সত্যকে জানে। তার মৃত্যু নেই, মৃত্যু আছে স্বতন্ত্র আমির। অহমিকায় নিজেকে নিজের মধ্যেই রুদ্ধ করি, নিজেকে অন্যের মধ্যে বিস্তার করি প্রেমে। অহমিকায় নিজেকে আঁকড়ে থাকতে চাই, প্রেমে প্রাণকেও তুচ্ছ করতে পারি—কেন-না, প্রেমে অমৃত।

মানুষ সাধনা করে ভূমার, বৃহতের। সে বলেছে যা বড় তাতেই সুখ, দুঃখ ছোটকে নিয়ে। যা ছোট তা সমগ্রের থেকে অত্যন্ত বিচ্ছিন্ন বলেই অসত্য। তাই ছোট-খাটোর সঙ্গে জড়িত আমাদের যত দুঃখ। আমার ধন, আমার জন, আমার খ্যাতি, আমি-গণ্ডী দিয়ে স্বতন্ত্র-করা যা-কিছু, তাই

মৃত্যুর অধিকারে; তাকে নিয়েই যত বিরোধ, যত উদ্বেগ, যত কান্না। মানুষের সভ্যতার ইতিহাস তার অমর সম্পদ-সাধনার ইতিহাস। মানুষ মৃত্যুকে স্বীকার ক'রে এই ইতিহাসকে রচনা করছে, সকল দিক থেকে সে আপন উপলব্ধির সীমাকে যুগে যুগে বিস্তার ক'রে চলেছে বৃহতের মধ্যে। যা-কিছুতে সে চিরন্তনের স্বাদ পায় তাকে সেই পরিমাণেই সে বলে শ্রেষ্ঠ।

দুই শ্রেণীর বৃহৎ আছে। যশ্চায়মস্মিন্ আকাশে, আর যশ্চায়মস্মিন্ আত্মনি। এক হচ্চে আকাশে ব্যাপ্ত বস্তুর বৃহত্ব, আর হচ্চে আত্মায় আত্মায় যুক্ত আত্মার মহত্ব। বিষয়-রাজ্যে মানুষ স্বাধীনতা পায় জলে স্থলে আকাশে,—যাকে সে বলে প্রগতি। এই বস্তুজ্ঞানের সীমাকে সে অগ্রসর করতে করতে চলে। এই চলায় সে কর্তৃত্ব লাভ করে, সিদ্ধি লাভ করে। মুক্তিলাভ করে আত্মার ভূমায়, সেইখানে তার অমরতা। বস্তুকে তার বৃহৎস্বরূপে গ্রহণ করার দ্বারা আমরা ঐশ্বর্য্য পাই, আত্মাকে তার বৃহৎ ঔদার্য্যে দান করার দ্বারাই আমরা সত্যকে লাভ করি।

বৌদ্ধধর্ম্মে দেখি বলা হয়েচে, মুক্তির একটা প্রধান সোপান মৈত্রী। কর্ত্তব্যের পথে আমরা আপনাকে দিতে পারি পরের জন্যে। সেটা নিছক দেওয়া, তার মধ্যে নিজের মধ্যে পরকে ও পরের মধ্যে নিজেকে উপলব্ধি নেই। মৈত্রীর পথে যে দেওয়া তা নিছক কর্ত্তব্যের দান নয় তার মধ্যে আছে সত্য উপলব্ধি।

সংসারে সকলের বড় সাধনা অন্যের জন্য আপনাকে দান করা, কর্ত্তব্যবুদ্ধিতে নয়—মৈত্রীর আনন্দে অর্থাৎ ভালবেসে। মৈত্রীতেই অহংকার যথার্থ লুপ্ত হয়, নিজেকে ভুলতে পারি। যে পরিমাণে সেই ভুলি সেই পরিমাণেই বেঁচে থেকে আমরা অমৃতের অধিকারী হই। আমাদের সেই আমি যায় মৃত্যুতে সম্পূর্ণ লুপ্ত হয়ে যা অহমিকা দ্বারা খণ্ডিত।

আজকে যা বলতে এসেছি এই তার ভূমিকা।

আজ আশ্রমের পরম সুহৃদ জগদানন্দ রায়ের শ্রাদ্ধ-উপলক্ষ্যে তাঁকে স্মরণ করবার দিন। শ্রাদ্ধের দিনে মানুষের সেই প্রকাশকে উপলব্ধি করতে হবে যা তার মৃত্যুকে অতিক্রম ক'রে বিরাজ করে। জগদানন্দের সম্পূর্ণ পরিচয় হয়ত সকলে জানেন না। আমি ছিলেম তখন 'সাধনা'র লেখক এবং পরে তার সম্পাদক। সেই সময়ে তাঁর সঙ্গে আমার পরিচয়ের সূত্রপাত হয়। 'সাধনা'য় পাঠকদের তরফ থেকে বৈজ্ঞানিক প্রশ্ন থাকৃত। মাঝে মাঝে আমার কাছে তার এমন উত্তর এসেছে যার ভাষা স্বচ্ছ সরল—বৈজ্ঞানিক প্রসঙ্গে এমন প্রাঞ্জল বিবৃতি সর্ব্বদা দেখতে পাওয়া যায় না। পরে জানতে পেরেছি এগুলি জগদানন্দের লেখা, তিনি তাঁর স্ত্রীর নাম দিয়ে পাঠাতেন। তখনকার দিনে বৈজ্ঞানিক সমস্যার এরূপ সুন্দর উত্তর কোনো স্ত্রীলোক এমন সহজ ক'রে লিখতে পারেন ভেবে বিস্ময় বোধ করেছি। একদিন যখন জগদানন্দের সঙ্গে পরিচয় হ'ল তখন তাঁর দুঃস্থ অবস্থা এবং শরীর রুগ্ন। আমি তখন শিলাইদহে বিষয়কর্ম্মে রত। সাহায্য করবার অভিপ্রায়ে তাঁকে জমিদারী কর্ম্মে আহ্বান করলেম। সে-দিকেও তাঁর অভিজ্ঞতা ও কৃতিত্ব ছিল। মনে আক্ষেপ হ'ল—জমিদারী সেরেস্তা তাঁর উপযুক্ত কর্ম্মক্ষেত্র নয়, যদিও সেখানেও বড় কাজ করা যায় উদার হৃদয় নিয়ে। জগদানন্দ তার প্রমাণ দিয়েছেন। কিন্তু সেখানে তিনি বারংবার জ্বরে আক্রান্ত হয়ে অত্যন্ত দুর্ব্বল হয়ে পড়লেন। তাঁর অবস্থা দেখে মনে হ'ল তাকে বাঁচানো শক্ত হবে। তখন তাঁকে অধ্যাপনার ক্ষেত্রে আহ্বান ক'রে নিলুম শান্তি-নিকেতনের কাজে। আমার প্রয়োজন ছিল এমন সৎ লোক, যাঁরা সেবাধর্ম্ম গ্রহণ ক'রে এই কাজে নামতে পারবেন, ছাত্রদেরকে আত্মীয়জ্ঞানে নিজেদের শ্রেষ্ঠ দান দিতে পারবেন। বলা বাহুল্য, এ রকম মানুষ সহজে মেলে না। জগদানন্দ ছিলেন সেই শ্রেণীর লোক। স্বল্পায়ু কবি সতীশ রায় তখন বালক, বয়স উনিশের বেশি নয়। সেও এসে এই আশ্রম-গঠনের কাজে উৎসর্গ করলে আপনাকে। এঁর সহযোগী ছিলেন মনোরঞ্জন বাঁড়ুজ্যে, এখন ইনি সম্বলপুরের উকিল, সুবোধচন্দ্র মজুমদার, পরে ইনি জয়পুর ষ্টেটে কর্ম্মগ্রহণ ক'রে মারা গিয়েছেন।

বিদ্যাবুদ্ধির সম্বল অনেকের থাকে, সাহিত্যে বিজ্ঞানে কীর্ত্তিলাভ করতেও পারেন অনেকে, কিন্তু জগদানন্দের সেই দুর্লভ গুণ ছিল যার প্রেরণায় কাজের মধ্যে তিনি হৃদয় দিয়েছেন। তাঁর কাজ আনন্দের কাজ ছিল, শুধু কেবল কর্ত্তব্যের নয়। তার প্রধান কারণ, তাঁর হৃদয় ছিল সরস, তিনি ভালবাসতে পারতেন। আশ্রমের বালকদের প্রতি

তাঁর শাসন ছিল বাহ্যিক, স্নেহ ছিল আন্তরিক। অনেক শিক্ষক আছেন যাঁরা দূরত্ব রক্ষা ক'রে ছেলেদের কাছে মান বাঁচিয়ে চলতে চান্,—নিকট পরিচয়ে ছেলেদের কাছে তাঁদের মান বজায় থাকবে না এই আশঙ্কা তাঁদের ছাড়তে চায় না। জগদানন্দ একই কালে ছেলেদের সুহৃদও ছিলেন সঙ্গী ছিলেন অথচ শিক্ষক ছিলেন অধিনায়ক ছিলেন—ছেলেরা আপনারাই তাঁর সম্মান রেখে চলত—নিয়মের অনুবর্ত্তী হয়ে নয়, অন্তরের শ্রদ্ধা থেকে। সন্ধ্যার সময় ছাত্রদের নিয়ে তিনি গল্প বলতেন। মনোজ্ঞ ক'রে গল্প বলবার ক্ষমতা তাঁর ছিল। তিনি ছিলেন যথার্থ হাস্যরসিক, হাসতে জানতেন। তাঁর তর্জ্জনের মধ্যেও লুকোনো থাকত হাসি। সমস্ত দিন কর্ম্মের পর ছেলেদের ভার গ্রহণ করা সহজ নয়। কিন্তু তিনি তাঁর নির্দ্দিষ্ট কর্ত্তব্যের সীমানা অতিক্রম ক'রে স্বেচ্ছায় স্নেহে নিজেকে সম্পূর্ণ দান করতেন।

অনেকেই জানেন ক্লাসের বাইরেও ছেলেদের ডেকে ডেকে তাদের লেখাপড়ায় সাহায্য করতে কখনই তিনি আলস্য করতেন না। নিজের অবকাশ নষ্ট ক'রে অকাতরে সময় দিতেন তাদের জন্যে।

কর্ত্তব্যসাধনের দ্বারা দাবি চুকিয়ে দিয়ে প্রশংসা লাভ চলে। কর্ত্তব্যনিষ্ঠতাকে মূল্যবান ব'লেই লোকে জানে। দাবির বেশি যে দান সেটা কর্ত্তব্যের উপরে, সে ভালবাসার দান। সে অমূল্য. মানুষের চরিত্রে যেখানে অকৃত্রিম ভালবাসা সেইখানেই তার অমৃত। জগদানন্দের স্বভাবে দেখেছি সেই ভালবাসার প্রকাশ, যা সংসারের সাধারণ সীমা ছাড়িয়ে তাকে চিরন্তনের সঙ্গে যোগযুক্ত করেছে। আশ্রমে এই ভালবাসা-সাধনার আহ্বান আছে। নির্দ্দিষ্ট কর্ম্ম সাধন ক'রে তারপর ছুটি নিয়ে একটি ক্ষুদ্র পরিধির মধ্যে নিজেকে বদ্ধ রাখতে চান যাঁরা, সে রকম শিক্ষকের সত্তা এখানে ক্ষীণ অস্পষ্ট। এমন লোক এখানে অনেকে এসেছেন গেছেন পথের পথিকের মত। তাঁরা যখন থাকেন তখনো তাঁরা অপ্রকাশিত থাকেন, যখন যান তখনো কোনো চিহ্নই রেখে যান না।

এই যে আপনার প্রকাশ, এ ন মেধয়া ন বহুনা শ্রুতেন-- এ প্রকাশ ভালবাসায়, কেন-না, ভালবাসাতেই আত্মার পরিচয়। জগদানন্দের যে দান সে প্রাণবান, সে শুধু স্মৃতিপটে চিহ্ন রাখে না, তা একটি সক্রিয় শক্তি যা সৃষ্টিপ্রক্রিয়ার মধ্যে থেকে যায়। আমরা জানি বা না-জানি বিশ্ব জুড়ে এই প্রেম নিয়তই সৃষ্টির কাজ ক'রে চলেছে। কেবল শক্তি দান ক'রে সৃষ্টি হয় না, আত্মা আপনাকে দান করার দ্বারাই সৃষ্টিকে চালনা করে। বেদে তাই ঈশ্বরকে বলেছেন, "আত্মদা বলদা"। যেখানে আত্মা নেই শুধু বল সেখানে প্রলয়।

আমি এই জানি আমাদের আশ্রমের কাজ পুনরাবৃত্তির কাজ নয়, নিরন্তর সৃষ্টির কাজ। এখানে তাই আত্মদানের দাবি রাখি। এই দানে সীমা নেই। এ দশটা চারটের মধ্যে ঘের-দেওয়া কাজ নয়। এ যন্ত্র চালনা নয়, এ অনুপ্রাণন।

আজ শ্রাদ্ধের দিনে জগদানন্দের সেই আত্মদানের গৌরবকে স্বীকার করছি। এখানে তিনি তাঁর কর্ম্মের মধ্যে কেবল সিদ্ধি লাভ করেন নি অমৃত লাভ করেছেন। কেন-না তিনি ভালবেসেছেন আনন্দ পেয়েছেন। আপনার দানের দ্বারা উপলব্ধি করেছেন আপনাকে। তাই আজ শ্রাদ্ধবাসরে যে পারলৌকিক কর্ম্ম এটা তাঁর পারিবারিক কাজ নয় সমস্ত আশ্রমের কাজ। বেঁচে থেকে তিনি যে প্রীতি আকর্ষণ করেছিলেন তাকে স্মরণ ক'রে তাঁর পরলোকগত আত্মার উদ্দেশে সেই প্রীতির অর্ঘ্য নিবেদন করি। আশ্রমে তাঁর আসন চিরস্থায়ী হয়ে রইল।*

*পরলোকগত জগদানন্দ রায় মহাশয়ের শ্রাদ্ধবাসরে মন্দিরে প্রদত্ত বক্তৃতা।

সেকালের কথা

(প্রাচীন সংবাদপত্র হইতে সঙ্কলিত)

শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

সহমরণ-নিবারণে বেণ্টিঙ্ককে রামমোহন রায় প্রভৃতির মানপত্র-দান

লর্ড উইলিয়াম বেণ্টিঙ্ক আইন দ্বারা সহমরণ রহিত করিলে তাঁহাকে একখানি মানপত্র দিবার জন্য ১৮৩০ সনের ১৬ই জানুয়ারি তারিখ রাজা রামমোহন রায়, কালীনাথ রায় চৌধুরী প্রভৃতি গবর্ন্মেণ্ট হাউসে উপস্থিত হন। তথায় কালীনাথ রায় চৌধুরী প্রথমে মানপত্রখানি বাংলা ভাষায় পাঠ করেন; পরে উহার ইংরেজী তর্জমাও পঠিত হয়। এই মানপত্র রামমোহন রায়ের রচনা বলিয়া অনেকে মনে করেন; ইহার ইংরেজী অংশ রামমোহন রায়ের গ্রন্থাবলীতে স্থান পাইয়াছে। কিন্তু বাংলা অংশ এখনও মুদ্রিত হয় নাই, আমরা 'সমাচার দর্পণ' হইতে উহা উদ্ধৃত করিলাম।

(সমাচার দর্পণ, ২৩ জানুয়ারি ১৮৩০। ১১ মাঘ ১২৩৬)

মহামহিম শ্রীলশ্রীযুত লার্ড উলিয়ম কেবেণ্ডিশ বেণ্টিক গবর্নর্ জেনরল বাহাদুর ইন কৌন্সেল মহামহিমসু। কোর্ট উলিয়ম।

পরের নাম লিখিত কলিকাতা নগর স্থায়ি এবং তন্নিকটস্থ গ্রামনিবাসিরা শ্রীলশ্রীযুতের মহোপকারে প্রফুল্ল অন্তঃকরণসহিত এবং প্রচুর সম্ভ্রমপূর্ব্বক প্রার্থনা করিতেছি যে শ্রীলশ্রীযুতের অনুমতি ক্রমে সমীপস্থ হইয়া হিন্দু প্রজারদের স্ত্রী পরম্পরার জীবন রক্ষার নিমিত্ত মহামহিম ইদানীন্তন যে উপায়ের নিয়ম করিয়াছেন এবং স্বেচ্ছাপূর্ব্বক স্ত্রীবধকলঙ্ক আর আত্মঘাতের অতিশয় উৎসাহকারিরূপ দুর্নামহইতে চিরকালজন্য এ শরণাগত প্রজারদিগকে মোচন করিতে যে করুণাযুক্ত হইয়া সুসিদ্ধ যত্ন করিয়াছেন সেই পরমোপকারের পুনঃ২ স্বীকার নম্রতাপূর্ব্বক শ্রীলশ্রীযুতের সাক্ষাতে করিতে অনুমতিপ্রাপ্ত হয়। হিন্দু প্রধানেরা আপনং২ স্ত্রী পরম্পরার প্রতি অতিশয় সন্দিগ্ধচিত্ত হইয়া পরস্পর নির্ব্বাহের সাধারণ সেতুকে উল্লঙ্ঘন এবং অবলা জাতির রক্ষণাবেক্ষণ যে পুরুষের নিয়ত ধর্ম্ম তাহাকে অবজ্ঞা করিয়া বিধবারা উত্তরকালে কোনক্রমে অন্যাসক্ত না হইতে পান তন্নিমিত্ত আপনারদের অবাধিত ক্ষমতার উপর নির্ভরপূর্ব্বক ধর্ম্মছলে সজীব বিধবারা যে স্বামির মরণের পরেই শোকের ও নৈরাশ্যের প্রথম উন্মুখে আপনং২ শরীর দগ্ধ করেন এই রীতি চলিত করিলেন। ঐ স্ত্রী পরম্পরা দাহের রীতি স্বার্থপর এবং পরানুগামি ইতরলোকের ও অত্যন্ত মনোনীত হইবাতে তাহারাও তদনুরূপ ব্যবহারে ঝটিতি প্রবৃত্ত হইয়া আপনারদের অত্যন্ত মান্য শাস্ত্র উপনিষৎ ও ভগবদ্গীতাকে অবহেলন করিয়া এবং ভগবান মনু যিনি প্রথম ও সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ধর্ম্মবক্তা হন তাঁহার যে আজ্ঞা অর্থাৎ ক্ষমা অবলম্বন তপোরূপ ধর্ম্মযাজন আর আপনাকে কায়িক সুখহইতে রহিতকরণ-ইত্যাদি ধর্ম্ম আমরণান্ত বিধবা করিতে থাকিবেন ৫ অধ্যায় ১৫৮ শ্লোক তাহাকেও তুচ্ছ করিলেন। বাস্তবিক ইহারা স্ত্রী পরম্পরার প্রতি আপনং২ সন্দিগ্ধান্তঃকরণের সান্ত্বনার নিমিত্ত এইরূপ ব্যবহারে উদ্যত হইলেন কিন্তু লোকেতে এমত গর্হিত কর্ম্ম হইতে আপনারদিগকে নির্দ্দোষ করিবার মিথ্যা বাসনায় সাক্ষাৎ দুর্ব্বল শাস্ত্রের কতিপয় বচন যাহাতে স্বেচ্ছাপূর্ব্বক বিধবাকে স্বামির জ্বলচ্চিতারোহণ করিবার অনুমতি দিয়াছেন তাহা পাঠ করিতেন যেন তাঁহারা এরূপ স্ত্রীদাহ ব্যবহারকে শাস্ত্রের আজ্ঞানুসারে করিতেছিলেন কিন্তু স্ত্রীলোকের প্রতি সন্দেহযুক্ত হইয়া করেন নাই। বস্তুত ইহা অতিশয় সৌভাগ্য যে শ্রীলশ্রীযুত ইংগ্লণ্ডীয় এতদ্দেশাধিপতিরা যাঁহারদের আশ্রয়ে ঈশ্বরপ্রসাদাৎ এদেশীয় স্ত্রীপুরুষ তাবৎ প্রজারদের জীবন সমর্পিত হইয়াছে তাঁহারা বিশেষ অনুসন্ধানদ্বারা নিশ্চয়রূপ জানিলেন যে ঐ সকল দুর্ব্বল শাস্ত্রের বচন যাহাতে বিধবারদিগকে ইচ্ছাপূর্ব্বক জ্বলচ্চিতারোহণের অনুমতি আছে তাহাকে কার্য্যের দ্বারা অমান্য করিতে-ছিলেন এবং ঐ সকল বচনের শব্দের ও তাৎপর্য্যের সংপূর্ণমতে অন্যথা করিয়া পতিবিহীনারদের আত্ম অন্তরঙ্গেরা ঐ বিহ্বলারদের দাহকালীন তাহারদিগকে প্রায় বন্ধন করিতেন এবং তাহারা চিতাহইতে পলাইতে না পারেন এ নিমিত্ত তদ্যোগ্য রাশীকৃত তৃণকাষ্ঠাদিদ্বারা তাহারদের গাত্র আচ্ছন্ন করিতেন মনুষ্যস্বভাবের ও করুণার সর্ব্বথা বিরুদ্ধ এই ব্যাপার ভূরি স্থানে পোলীসের সংক্রান্ত আমলা যাহারা প্রাণির রক্ষার ও লোকের শান্তি ও সচ্ছন্দতার নিমিত্তে ব্যর্থ নিযুক্ত হইয়াছেন তাহারদের অস্পষ্ট অনুমতিক্রমে সম্পন্ন হইতেছিল।

অনেক স্থলে যেখানে সক্ষম মাজিষ্ট্রেট সাহেবের আশঙ্কায় পোলীসের এতদ্দেশীয় আমলারা আপনং২ ইচ্ছানুরূপ আচরণে নিবারিত ছিল কোনং২ বিধবা কিঞ্চিৎ দগ্ধ হইয়া চিতাহইতে পলায়ন পূর্ব্বক আপন প্রাণ রক্ষা করিয়াছেন কেহং২ বা ভয়ঙ্কর ব্যাপার দেখিয়া চিতার নিকটহইতে নিবৃত্ত হইলেন যাহার দ্বারা তাঁহারদের প্রবর্ত্তকেরদের মরণ তুল্য নৈরাশ জন্মিল। কোন স্থানে বিধবারদিগকে এরূপ মরণ উচিত নহে ইহা বিশেষ মনে বোধগম্য করাতে এবং তাঁহারদের রক্ষার ও যাবজ্জীবন প্রতিপালনের অঙ্গীকার করিবাতে তাঁহারা আপনারদের জাতি ও আত্মীয়কর্ত্তৃক ভর্ৎসন-রাশিকে আপনারদের উপর স্বীকার করিয়াও সহমরণহইতে নিবৃত্তা হইয়াছেন।

তাবৎ সহমরণঘটিত ব্যাপার যাহা স্বয়ং অতি দারুণ ও কুৎসিৎ এবং ইংগ্লণ্ডীয় অধিকারের নীতির অতি বিরুদ্ধ তাহার প্রণিধানপূর্ব্বক শ্রীলশ্রীযুত কৌন্সেলে বিচার ও করুণা উভয় প্রদর্শিত নীতির বিশেষানুষ্ঠানে উদ্যুক্ত হইয়া ইংগ্লণ্ডীয় নামের মহিমাসূচনার্থ আবশ্যক কর্ত্তব্য বোধ এই২ নিয়মকে নির্দ্ধারিত করিলেন যে শ্রীলশ্রীযুতের হিন্দুপ্রজারদের স্ত্রীলোকের প্রাণ রক্ষা অধিক যত্নপূর্ব্বক করিতে হইবেক এবং স্ত্রীলোকপ্রতি নির্দ্দয় ব্যবহার অতিশয় পাতক পুনর্ব্বার আর হইতে না পায় এবং হিন্দুরদের অতি প্রাচীন পরম পবিত্র ধর্ম্মকে তাঁহারা নিজে যেন তুচ্ছ না করেন। সংপ্রতি এ অধীনের জ্ঞাতসার হইল যে ঐ আজ্ঞানুসারে মাজিষ্ট্রেট সাহেবেরদের

প্রতি বিশেষরূপে লিপি প্রস্থাপিত হইয়াছে যে সর্ব্বোপায়ের দ্বারা শ্রীলশ্রীযুতের আজ্ঞাকে প্রতিপালন করেন।

শ্রীলশ্রীযুতের মহোচ্চপদের নিয়মের বিবেচনা করিয়া এ শরণাগত প্রজারা আপনারদের অন্তঃকরণের ভাবকে কোন প্রকাশিত সম্মানের চিহ্ন যাহা এমত স্থানে ব্যবহার্য্য হয় তদ্দ্বারা দর্শাইতে নিবারিত হইয়াছে কিন্তু এ অধীনেরদের অন্তঃকরণ ও ধর্ম্ম বারম্বার আজ্ঞা দিতেছেন যে এ শরণাগতেরা অন্তঃকরণের ভাব যাহা তাবৎ হিন্দুর প্রতি পরমানুগ্রাহক শ্রীলশ্রীযুতের এই চিরস্থায়ি মহোপকার কর্তৃক উৎপন্ন হইয়াছে তাহা সর্ব্বসাধারণ বিজ্ঞপ্তি করা যায় যদি এ সময় এ শরণাগতেরা তাচ্ছল্যপূর্ব্বক মৌনাবলম্বন করে তবে সর্ব্বথা কৃতঘ্ন ও প্রবঞ্চকরূপে গণিত হইবেক এ নিমিত্ত এ অধীনেরা এ নিবেদন পত্রীকে এই প্রার্থনাদ্বারা সমাপ্তি করিতেছে যে এ অধীনেরদের সর্ব্বান্তঃকরণসহিত শ্রীলশ্রীযুতের মহোপকারের অঙ্গীকাররূপ উপকার যাহা যদ্যপিও শ্রীলশ্রীযুতের মহোচ্চপদের যোগ্য হয় না তাহা কৃপাপূর্ব্বক গ্রাহ্য করেন। ও শ্রীলশ্রীযুতের এই পরম অনুগ্রহ কে এ অধীনের সহিত তুল্যরূপে প্রাপ্ত হইয়াছেন অথচ এই সকলসাধারণ কর্ম্মে অজ্ঞতা অথবা অসংস্কারপ্রযুক্ত অধীনেরদের সহিত ঐক্য হইলেন নাই তাঁহারদের এই ঔদাস্যকে কৃপাপূর্ব্বক ক্ষমা করেন সবিনয় নিবেদন মিতি।

কালীনাথ রায় চৌধুরী
রামমোহন রায়
দ্বারকানাথ ঠাকুর
প্রসন্নকুমার ঠাকুর
ইত্যাদি

"বাঙ্গলা ভাষা এত দরিদ্র কেন ?"

(সোমপ্রকাশ ৫ অক্টোবর ১৮৬৩। ২০ আশ্বিন ১২৭০)

সচরাচর আমরা শুনিতে পাই, বাঙ্গলা ভাষার প্রতি অনেকে এই বলিয়া দোষারোপ করেন বাঙ্গলা ভাষা এমনি দরিদ্র যে, ইহাতে সমুদায় অভিপ্রায় ব্যক্ত করা যায় না। এই দোষারোপ ন্যায্য কি না, বিবেচনা করা আবশ্যক। মানুষের একটী কদর্য্য স্বভাব আছে, মানুষ প্রায় আত্মদোষ স্বীকারে উন্মুখ হয় না। যে ডাক্তর রোগির রোগ নির্ণয়ে অসমর্থ হন, তিনি প্রায়ই রোগের প্রতি জটিলতা অথবা দুঃসাধ্যতা প্রভৃতি দোষের আরোপ করিয়া নিশ্চিন্ত হন। কিন্তু স্বয়ং যে রোগের নিদান নির্ণয়ে অসমর্থ হইলেন, তাহা স্বীকার করেন না। অনেকের অনেক কার্য্যে এইরূপ ব্যবহার দৃষ্ট হইয়া থাকে। বাঙ্গলা ভাষার প্রতি দোষারোপকারিরাও এইরূপে ভাষার দোষ দিয়া আপনারা হস্ত ক্ষালন করিয়া শুদ্ধ হন। কিন্তু যদি অনুধাবন করিয়া দেখা যায়, স্পষ্ট প্রতীয়মান হইবে, সেটী ভাষার দোষ নহে, যাঁহারা এই ভাষায় গ্রন্থ অথবা অন্য কিছু লিখিতে প্রবৃত্ত হন, তাহাদিগেরই দোষ ব্যক্ত করিবার ক্ষমতা নাই বলিয়াই তাঁহারা ইহাতে ভাব প্রকাশ করিতে পারেন না।

যদি এতদিন ইহাতে ভাল লোকে ভাব প্রকাশ করিতেন, তবে ইহার দীনদশা দূর হইয়া যাইত। নানাবিধ ভাব প্রকাশই কি ভাষার শ্রীবৃদ্ধির কারণ নহে? যে ভাষায় যত নূতন নূতন ভাব প্রকাশ হইতে থাকে, ততই কি তাহার দৈনন্দিন উন্নতি হয় না? অনেক কর্কশ ভাষাও প্রধান প্রধান গ্রন্থকারদিগের অশ্রুতপূর্ব্ব নূতন নূতন ভাব প্রকাশের গুণেই উৎকৃষ্ট ভাষা মধ্যে পরিগণিত হইয়াছে।

বর্ণৈঃ কতিপয়ৈরেব
গ্রথিতস্য স্বরৈরিব।
অনন্তা বাঙ্ময়স্যাহো
গেয়স্যেব বিচিত্রতা॥

নিষাদাদি কতিপয় স্বর দ্বারা কৃত যে সঙ্গীত শাস্ত্র, তাহার ন্যায় কতিপয় মাত্র অক্ষর দ্বারা রচিত যে শাস্ত্র, তাহা নানা প্রকার হয়।

ক খ প্রভৃতি কয়েকটি বর্ণকে সম্বল করিয়াই কি নানাবিধ শাস্ত্র রচিত হয় নাই? ভিন্ন ভিন্ন গ্রন্থে ও ভিন্ন ভিন্ন শাস্ত্রে কি নূতন নূতন অক্ষর সৃষ্টি দৃষ্ট হয়? একবিধ অক্ষর ও একবিধ শব্দ দ্বারাই নানা প্রকার গ্রন্থ রচিত হইতেছে। এরূপ হইবার কারণ কি? ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তির বুদ্ধি ও মনের ভাব প্রকাশ কি সেই বিভিন্নতার কারণ নয়? বঙ্গ ভাষার বাক্‌শক্তি নাই সুতরাং ইহাকে বঙ্গদেশীয় কুলবধূদিগের ন্যায় অকারণ দোষারোপ সহ্য করিতে হইতেছে।

বঙ্গ ভাষার প্রসূতি সংস্কৃত। সংস্কৃত ভাষা রত্নাকর তুল্য। তদ্দ্বারা যে ভাব প্রকাশ করা না যায় এমন ভাবই নাই। তাহা যদি হইল, বঙ্গভাষায় ঐরূপ ভাব প্রকাশ করা না যাইবে কেন? সংস্কৃত ভাষা অপত্যস্নেহ পরতন্ত্র হইয়া ইহার সমুদায় অভাবই দূর করিয়া দিতে পারেন। তবে যে তিনি সে অভাব দূর করিতেছেন না কেবল তাঁহার সেই স্নেহ উদ্দীপন করিয়া দিবার লোক অতি বিরল। বাঙ্গলা ভাষার একটী বিশেষ গুণ এই, ইহা উর্ব্বরা ভূমির তুল্য। ইহাতে যিনি যে শস্য উৎপাদন করিয়া লইতে চাহেন তিনি তাহাই লইতে পারেন। ইহাতে যেমন কোমল ও সরস রচনা হয় তেমনি প্রগাঢ় ও কর্কশ রচনাও হইতে পারে। ইহা শান্ত রসের যেরূপ উপযোগী বীর ও রৌদ্র প্রভৃতি রসেরও সেইরূপ।

অধিকসংখ্য ভাল লোকে নানা প্রকার ভাব প্রকাশ করিয়া বঙ্গভাষাকে অলঙ্কৃত করিতেছেন না তাহার এরূপ দুরদৃষ্ট কেন? কেহ এরূপ প্রশ্ন করিলে তাহার উত্তর দান কালে দুটী কারণ আমাদিগের বুদ্ধিপথে আবির্ভূত হইয়া থাকে এক ইংরাজীর সবিশেষ প্রাদুর্ভাব। ইংরাজী শিখিলে অল্প প্রযত্নে অধিক অর্থ উপার্জ্জিত হইবে এই লোভে মুগ্ধ হইয়া অনেকে অনন্যকর্ম্মা হইয়া তাহারই আরাধনা করিয়া থাকেন। বাঙ্গলা ভাষা তাঁহাদিগের ত্রিসীমায় যাইতে পারেন না। বাঙ্গলাভাষা যে, এদেশের একমাত্র উন্নতি ও গৌরবের কারণ তাহা তাঁহারা বুঝিতে চান না। দ্বিতীয় রাজা বিদেশীয়। রাজপুরুষেরা বিদ্যানুরাগী বটেন। কিন্তু বাঙ্গালী রাজা হইলে তিনি বাঙ্গলা ভাষার প্রতি সবিশেষ স্নেহ ও মমতা প্রকাশ করিতেন এবং বাঙ্গলা ভাষা নিঃসপত্নরূপে সেই রাজার হৃদয় অধিকার করিয়া লইতেন; রাজা বিদেশীয় হওয়াতে ইংরাজী প্রধান রূপে তাঁহার হৃদয় অধিকার করিয়া লইয়াছেন। বাঙ্গলা ভাষা তথায় স্বল্প মাত্র স্থান প্রাপ্ত হইয়াছেন।

আচার্য্য কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য্য

(সোমপ্রকাশ ৭ই জুলাই ১৮৬২)

খানাকুল কৃষ্ণনগরের সংস্কৃত ইংরাজী বিদ্যালয়।—গত ১৬ই জ্যৈষ্ঠ বৃহস্পতিবার (২৯ মে) খানাকুল কৃষ্ণনগরস্থ সংস্কৃত ইংরাজী বিদ্যালয়ের সাংবৎসরিক পারিতোষিকী ক্রিয়া সম্পন্ন হইয়াছে। শ্রীযুক্ত রামগোবিন্দ তর্কালঙ্কার সভাপতির আসন গ্রহণ করিলে পর শ্রীযুক্ত প্রসন্নকুমার সর্ব্বাধিকারী নিম্নলিখিত বিজ্ঞাপন পাঠ করেন। সভাস্থলে প্রায় ৪।৫ শত ভদ্র লোক উপস্থিত ছিলেন।

...আমাদের এই খানাকুল কৃষ্ণনগরস্থ ইংরেজী সংস্কৃত বিদ্যালয়ের চতুর্থ পারিতোষিক দিন অদ্য উপস্থিত।......অদ্য এই নূতন বিদ্যা মন্দিরে পাঠার্থীদিগের প্রথম প্রবেশ...। এই চারি বৎসর কাল পাঠশালার সমুদায় কার্য্য আমার পিতৃঠাকুর শ্রীযুক্ত যদুনাথ সর্ব্বাধিকারী মহাশয়ের বাটীতে সম্পাদিত হইয়া আসিতেছে।... বিদ্যামন্দিরটী যে এরূপ সুগঠন ও সুশ্রী দেখিতেছেন তাহা কেবল

তাঁহার অবিশ্রান্ত যত্ন, অক্লিষ্ট পরিশ্রম ও অবিচলিত অধ্যবসায় বলেই সম্পাদিত হইয়াছে।......

এক্ষণে শিক্ষক মহাশয়দিগের কথা নিবেদন করিব। আপনারা ছাত্রদিগের উৎসাহ বর্দ্ধনার্থ গত বৎসর এইরূপে সমবেত হইবার প্রায় দেড় মাস পরে শ্রীযুক্ত বাবু শ্যামাচরণ গঙ্গোপাধ্যায়, বি এ প্রধান শিক্ষকের পদ গ্রহণ করেন। যতদিন পর্য্যন্ত শ্যামাচরণ বাবু আগমন না করিয়াছিলেন, ততদিন শ্রীযুক্ত আনন্দকুমার সর্ব্বাধিকারী সবিশেষ যত্ন সহকারে প্রধান শিক্ষকের কার্য্য নির্ব্বাহ করিয়াছিলেন। শ্যামাচরণ বাবু শ্রাবণ মাস অবধি পৌষ মাস পর্য্যন্ত প্রধান শিক্ষকতা কার্য্যে নিযুক্ত ছিলেন।...শ্যামাচরণ বাবুর গমনের পর কয়েক দিবস শ্রীযুক্ত বাবু ললিতামোহন চট্টোপাধ্যায় বিশিষ্ট আগ্রহের সহিত বিনা বেতনে প্রধান শিক্ষকতা কর্ম্ম নির্ব্বাহ করিয়াছিলেন।...ললিতামোহন বাবু কয়েক দিন কর্ম্ম করিলে পরেই শ্রীযুক্ত বাবু কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য্য বি এ প্রধান শিক্ষকের পদ গ্রহণ করিয়া আমাদের এই বিদ্যালয়ের যৎপরোনাস্তি উপকার করিয়াছেন। তিনি সংস্কৃত ও ইংরেজী শাস্ত্রে যেরূপ ব্যুৎপন্ন শিক্ষাকার্য্যে যেরূপ আগ্রহযুক্ত ও পটু আমাদের এই বিদ্যালয়ের প্রতি তাঁহার যে রূপ স্নেহ দৃষ্টি এখানকার ছাত্রেরা তাঁহার প্রতি যেরূপ অনুরক্ত তিনি যেরূপ শান্তস্বভাব ও অমায়িক তাহাতে সমুদয় বিবেচনা করিলে আমাদের এই পাঠশালার পক্ষে তাঁহার মত অন্য শিক্ষক অতি বিরল অবশ্যই বলিতে হইবে। কিন্তু সুখ কি চিরস্থায়ী হয়? আমাদের এই বিদ্যালয়ের সৌভাগ্য কি চিরকালই অব্যাহত থাকিবে? কৃষ্ণকমল বাবু আর এখানে থাকিতে পারিবেন না, আগামি ২০এ জ্যৈষ্ঠ অবধি তাঁহাকে কলিকাতায় অবস্থিতি করিতে হইবে। শিক্ষাকার্য্যের গবর্ণমেণ্টের সর্ব্বপ্রধান কর্ম্মকর্ত্তা মহোদয়ের অভ্যর্থনায় তাঁহাকে প্রেসিডেন্সি কালেজের অন্যতম সহকারী অধ্যাপকের পদ গ্রহণ করিতে হইয়াছে। তাঁহার এখানকার কর্ম্ম পরিত্যাগ করিতে বড় ইচ্ছা ছিল না আমি সবিশেষ অনুরোধ করিয়া ও পরামর্শ দিয়া তাঁহাকে কর্ম্মটী স্বীকার করাইলাম। বুঝিতেছি যে এরূপ করিয়া আমাদের এই বিদ্যালয়ের বিলক্ষণ ক্ষতি করিলাম। কিন্তু বলিলে কি হয়, আমাদের এখানে মাসে ৮০ আশি টাকা মাত্র বেতন, নূতন কর্ম্মটীর মাসিক বেতন ২০০ দুই শত টাকা। কৃষ্ণকমল বাবুকে এ কর্ম্মটি গ্রহণ করিতে প্রবর্ত্তনা না দিলে, বন্ধুর মত কাজ না হইয়া নিতান্ত স্বার্থপর ব্যক্তির মত কাজ করা হইত। এক্ষণে ভরসা করি যে তিনি সচ্ছন্দ শরীরে ও সচ্ছন্দ মনে নূতন কর্ম্মটি করিতে থাকুন এবং ক্রমশঃ তাঁহার পদ বৃদ্ধি হইতে থাকুক।......

রিপোর্ট পাঠ সমাপ্ত হইলে পর বিদ্যালয়ের প্রথম শিক্ষক শ্রীযুক্ত কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য্য বি. এ, সভাপতি প্রভৃতির অভ্যর্থনানুসারে পরীক্ষার সময় যে সকল প্রশ্ন প্রদত্ত হইয়াছিল তন্মধ্যে কতকগুলি কয়েক জন ছাত্রকে জিজ্ঞাসা করিলেন ও তাহারা স্ব স্ব লিখিত উত্তর পত্রিকা হইতে পাঠ করিল। পরিশেষে কৃষ্ণকমল বাবু ছাত্রদিগকে কতকগুলি সদুপদেশ দিলেন, সভাপতি মহাশয় এবং অন্য অন্য বৃদ্ধেরা প্রসন্নবাবুকে আশীর্ব্বাদ করিতে লাগিলেন, ছাত্রেরা পারিতোষিক পুস্তক প্রাপ্ত হইল পরে সভা ভঙ্গ হইল।

(সোমপ্রকাশ ১০ নবেম্বর ১৮৬২। ২৫ কার্ত্তিক ১২৬৯)

বিবিধ সংবাদ।—২০এ কার্ত্তিক বুধবার।...প্রেসিডেন্সি কালেজের বাঙ্গালা সাহিত্যের অধ্যাপক বাবু রামচন্দ্র মিত্র পেন্সন লইয়া কর্ম্ম ত্যাগ করিয়াছেন। ৩৩ বৎসর তাঁহার কর্ম্ম করা হইয়াছে।......

(সোমপ্রকাশ ২২ ডিসেম্বর ১৮৬২। ৮ পৌষ ১২৬৯)

বিবিধ সংবাদ।—৩রা পৌষ বুধবার।...পরিদর্শক সম্পাদক বলেন, প্রেসিডেন্সি কালেজের বাঙ্গালা ভাষার প্রথম অধ্যাপক পদে শ্রীযুক্ত কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য্য, দ্বিতীয় পদে রাজকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায় নিয়োজিত হইয়াছেন।

গিরীন্দ্রনাথ ঠাকুরের মৃত্যু

(সংবাদ প্রভাকর ১৩ এপ্রিল ১৮৫৫। ১ বৈশাখ ১২৬২)

পৌষ, ১২৬১। ...যোড়াসাঁকো নিবাসি ধনরাশি বহুজন প্রতিপালক বাবু গিরীন্দ্রনাথ ঠাকুর মর্ত্যলীলা সম্বরণ করিয়াছেন।

হেমেন্দ্রনাথ ঠাকুরের বিবাহ

(সোমপ্রকাশ ১৪ ডিসেম্বর ১৮৬৩। ২৯ অগ্রহায়ণ ১২৭০)

বিবিধ সংবাদ।—গত ১৮ই অগ্রহায়ণ বৃহস্পতিবার কলিকাতা ব্রাহ্মসমাজের প্রধান আচার্য্য শ্রীযুক্ত বাবু দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের তৃতীয় পুত্র শ্রীযুক্ত হেমেন্দ্রনাথ ঠাকুরের সহিত সাঁত্রাগাছীর বাবু হরদেব চট্টোপাধ্যায়ের জ্যেষ্ঠা কন্যা নেপামনী দেবীর ব্রাহ্মমতে বিবাহ হইয়াছে। স্ত্রীআচার গ্রন্থি বন্ধন অর্ঘ দান ও অর্চ্চনা প্রভৃতি সকলই প্রচলিত বিবাহের রীত্যনুসারে হইয়াছিল, কেবল কয়েকটী সংস্কৃত মন্ত্র পাঠ ও ঠাকুর আনয়ন করা হয় নাই।...

ব্রাহ্মণ-পণ্ডিত

(সমাচার চন্দ্রিকা ৯ ফেব্রুয়ারি ১৮৫৭। ২৮ মাঘ ১২৬৩)

সমারোহ পূর্ব্বক আদ্য শ্রাদ্ধ।—আমরা গত বাসরীয় সমাচার চন্দ্রিকায় প্রকাশ করিয়াছিলাম আঁড়িয়াদহ নিবাসি রাজমান্য পণ্ডিত সদর আমীন ৺ শ্রীরাম তর্কালঙ্কার ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের জ্ঞান গঙ্গালাভ হইয়াছে, তাঁহার দিগ্বিজয়ী পুত্র যশোহরের প্রধান সদর আমীন শ্রীমান উপেন্দ্রচন্দ্র ন্যায়রত্ন ভট্টাচার্য্য মহাশয় রাজার মত পিতৃশ্রাদ্ধ সম্পন্ন করিয়াছেন তদ্বিস্তারিত ধার্ম্মিক পাঠকগণের জ্ঞাতব্য বটে ঐ শ্রাদ্ধে রজতময় ষোড়শ ৪ চতুষ্টয় থাল গাড়ু ঘড়া পীত্তলের রাশি২ বণাত শাল গরদ বস্ত্র নগদ মুদ্রা থাল পরিপূর্ণ দান উৎসর্গ করেন, নবদ্বীপ, বহিরগাছী, বেলপুকুর, উলা, শান্তিপুর ত্রিবেণী, কুমারহট্ট ভাটপাড়া প্রভৃতি কলিকাতা পর্য্যন্ত নানা সমাজের মহামহোপাধ্যায় অধ্যাপক ভট্টাচার্য্য মহাশয়দিগের চলিত পত্রে আহ্বানে সভাস্থ করেন, পরন্তু দান কর্ম্ম শ্রাদ্ধাঙ্গ ব্রতোৎসর্গাদি সমাধান্তে ৩০০০ তিন সহস্রাধিক ব্রাহ্মণকে লুচী মিষ্টান্ন সন্দেশ ক্ষীর দধি প্রচুর আহারে পরিতৃপ্ত করাণ পরদিবস ন্যূনাধিক ১০০০ সহস্র ব্রাহ্মণ অন্ন ভোজন পরিপাটি রূপে করেন অপরাপর স্ত্রী শূদ্রাদিও বহু লোকের আহার কয়েক দিবসাবধিই চলিতেছে শ্রাদ্ধের দিবস কাঙ্গালিও অনেক উপস্থিত হইয়াছিল তাহাদিগকেও বিদায় করিয়াছেন ব্রাহ্মণ পণ্ডিতদিগের বিদায় এবং সামাজিকতা ব্রাহ্মণগণের বিদায় হইতেছে সুপণ্ডিত বংশোধর শ্রাদ্ধ কর্ত্তা বাবু উপেন্দ্রচন্দ্র ন্যায়রত্ন মহাশয় শীলতা সৌজন্যতা দান শৌণ্ডত্ত গুণে পিতৃ কৃত্যে অত্যন্ত যশোস্বী হইয়াছেন।

(অরুণোদয় ১লা জুলাই ১৮৫৮)

পাক্ষিক সংবাদ।—...অবগতি হইল যে অস্মদ্দেশের অদ্বিতীয় নৈয়ায়িক নবদ্বীপস্থ শ্রীশ্রীরাম শিরোমণি মহাশয় কএক দিবস হইল পরলোক গমন করিয়াছেন।

(সমাচার চন্দ্রিকা ২৬ ফেব্রুয়ারি ১৮৫৭, বৃহস্পতিবার। ১৬ ফাল্গুন ১২৬৩)

মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিতগণের মৃত্যু।—আমরা বিলাপ বারিধি প্রবাহে নিমগ্ন হইয়া প্রকাশ করিতেছি সম্প্রতি সর্ব্ব সহা পৃথিবী ৪ চারিটি মহারত্নকে সংহার করিয়া শোভাহীন হইয়াছেন, কলিকাতার হাতীবাগান প্রবাসি অদ্বিতীয় স্মার্ত্ত মহামহোপাধ্যায় কাশীনাথ তর্কালঙ্কার ভট্টাচার্য্য উদরাময় রোগে গত বুধবারে সজ্ঞানে গঙ্গালাভ করিয়াছেন দ্বিতীয় ইহার কিঞ্চিৎ কাল পূর্ব্বে বাকলা চন্দ্রদ্বীপ নিবাসি ৺ গঙ্গাবাসি অদ্বিতীয় নৈয়ায়িক শিবচন্দ্র সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্যের কাশীপুরে ৺ গঙ্গালাভ হইয়াছে, খরিফলা নিবাসি ঋষি বিশেষ প্রধান স্মার্ত্ত হরিনারায়ণ তর্কসিদ্ধান্ত ভট্টাচার্য্য, তথা দেবীপুরধামাস নিবাসি প্রসিদ্ধ নৈয়ায়িক হরচন্দ্র ন্যায়বাগীশ মহাশয়দ্বয় স্বর্গারোহণ করাতে রাঢ়দেশ অন্ধকার হইয়াছে অতএব প্রাগুক্ত মহারত্ন চতুষ্টয়ের তিরোভাবে বঙ্গরাজ্য শোভাহীন হইয়াছেন।

তারাচাঁদ চক্রবর্ত্তী

(সংবাদ পূর্ণচন্দ্রোদয় ৭ ফেব্রুয়ারি ১৮৫১। ২৬ মাঘ ১২৫৭)

বর্দ্ধমানাধিপতির মন্ত্রী।—শ্রীযুত বাবু তারাচাঁদ চক্রবর্ত্তী বর্দ্ধমানাধিপতির মন্ত্রীস্বরূপে থাকিয়া কএক বৎসর রাজ সম্পর্কীয় কার্য্য উত্তম রূপ নির্ব্বাহ করাইতেছিলেন এবং তাঁহার গুণ গরিমায় সকলে সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহার গৌরব করিত উক্ত মহাশয় কিয়দ্দিন হইল আপন পদ পরিত্যাগ করিয়া এখান হইতে প্রস্থান করিয়াছেন এক্ষণে তৎপদে শ্রীযুত বাবু শম্ভুচন্দ্র ঘোষ নিযুক্ত হইয়াছেন। শ্রীযুত বাবু চন্দ্রশেখর দে ইতিপূর্ব্বে রাজদরবারের কর্ম্ম ত্যাগ করিয়াছিলেন বাবু তারাচাঁদ চক্রবর্ত্তীও ত্যাগ করিলেন কারণ কি বলিতে পারা যায় না।

দেশীয় লোকের জনহিতকর কার্য্য

(সংবাদ পূর্ণচন্দ্রোদয় ৩০ অক্টোবর ১৮৫০। ১৫ কার্ত্তিক ১২৫৭)

নূতন রাস্তা।—মৃত রামচন্দ্র মিত্রের বিধবা স্ত্রী কমলমণি দাসী দমদমা হইতে বিষ্ণুপুর পর্য্যন্ত এক নূতন বর্ত্ম প্রস্তুত করিয়া দিয়াছেন আমরা আরো শুনিলাম উক্তা স্ত্রীলোক গবর্ণমেণ্টে আবেদন করিয়াছেন যে তৎকৃত উক্ত কীর্ত্তি সাধারণ হিতার্থ অনুষ্ঠান নিচয়ের গ্রন্থে লিখিত হয়। [রসসাগর, ১০ কার্ত্তিক।]

(সংবাদ পূর্ণচন্দ্রোদয় ১৪ জানুয়ারি ১৮৫১। ২ মাঘ ১২৫৭)

আমরা আহ্লাদ পূর্ব্বক পাঠকবর্গের গোচরার্থ প্রকাশ করিতেছি যে এতন্নগরস্থ বড়বাজার নিবাসি অদ্বিতীয় ভাগ্যধর স্বর্গবাসি ধনরাশি ৺ বাবু রামতনু মল্লিক মহাশয়ের অতি পুণ্যশীলা এবং দান নিরতা বণিতা গত উত্তরায়ণ সংক্রমণ দিবসে জগন্নাথের ঘাটের মন্দির ও অট্টালিকা যাহা অতি ভগ্নাবস্থা হইয়াছিল তাহা পুনর্নির্ম্মাণ করাইয়া উৎসর্গ করিয়াছেন তদুপলক্ষে স্বীয় দলস্থ ব্রাহ্মণ সজ্জন ও কতিপয় গোস্বামীদিগকে আহ্বান করাইয়া নানা প্রকার মিষ্টান্ন ভোজন করাইয়া অতি উত্তম রক্তবর্ণের মূল্যবান এক২ বনাৎ দান করিয়াছেন তদ্ব্যতীত আত্মীয় কুটুম্ব ও অনুগত ব্যক্তিদিগকে কৃষ্ণবর্ণ এক২ বনাৎ উপঢৌকন স্বরূপ প্রদান করিয়াছেন। ঐ পুণ্যবতীর অনেকার্থ এইরূপ সৎ কর্ম্মে ব্যয় দৃষ্টে অনেকেই ধন্যবাদ করিয়াছেন।

(সমাচার চন্দ্রিকা ১৯ সেপ্টেম্বর ১৮৫৬। ৩ আশ্বিন ১২৬৩)

কীর্ত্তিমতী সতীবতিঃ।—...আমরা অধুনা যে সকল সৎকীর্ত্তিশালিনী শ্রীমতী রাসমণি দাসী, শ্রীমতি রাণী কাত্যায়নী প্রভৃতির বদান্যতার বিষয় সময়েং সমাচার চন্দ্রিকাতে প্রকাশ করিয়া থাকি, কিন্তু এতন্মহানগরীর পাথুরেঘাটা নিবাসিনী কোন বদান্য ধনীর বদান্যতা এবং কীর্ত্তি পতাকার বিষয় ইতপূর্ব্বে প্রকাশ করিতে বিস্মৃত হইয়াছিলাম, তাহা উচিত হয় নাই, কারণ সৎকর্ম্মের ব্যাখ্যা দ্বারা তাঁহাদিগকে সাহস প্রদান করা আমরা অবশ্য কর্ত্তব্য বলিয়া গণ্য করিয়া থাকি তাহাতে আরো তাঁহার তৎকর্ম্মের অনুরাগে পুণ্যকর্ম্মে অধিক প্রবৃত্ত হইতে থাকে, অতএব এই স্থলে ঐ পুণ্যবতীর বদান্যতা সৎকীর্ত্তির কিঞ্চিৎ ব্যাখ্যা না করিয়া লেখনীকে স্থির রাখিতে পারি না, অতএব যাঁহার যশোবর্ণনা করিব তাঁহার পরিচয় অগ্রেই দিতে হয়, মল্লিক বংশীয় প্রসিদ্ধ ধনী ৺ বাবু নিমাইচরণ মল্লিকের কনিষ্ঠ পুত্রবধূ ৺ বাবু মতিলাল মল্লিকের স্ত্রী ইনী, ইহার বদান্যতার বিষয় কি লিখিব? ইহার স্বামির মৃত্যুর পরাবধি নিরবধি বদান্যতা পুণ্য কর্ম্মাদির সদ্ব্যয়ে ধনের সার্থক করিতেছেন।

যাঁহারা মাহেশ বল্লভপুর গিয়াছেন তাহারা ঐ কীর্ত্তিশালিনীর কীর্ত্তি সকল স্বচক্ষে দেখিয়া আসিয়াছেন, বল্লভপুরের ঘাটের দুইপার্শ্বে দুই নহবদখানা তাহার কিঞ্চিৎ পশ্চিমাংশেই এক মনোহর রাসমঞ্চ নির্ম্মাণ করিয়া দিয়াছেন, তাহাতে এইক্ষণে রাসযাত্রার সময় তথাকার সিদ্ধ বিগ্রহ শ্রীশ্রী৺ রাধাবল্লভ দেবের রাসলীলা হইয়া থাকে এবং মাহেশের পূর্ব্বতনী শ্রীশ্রী৺ জগন্নাথ দেবের অধিকারি দিগের সহিত বল্লভপুরের ৺ রাধাবল্লভ দেবের সেবাত অধিকারি দিগের যে পর্য্যন্ত দ্বন্দ্ব হয় সেপর্য্যন্ত ৺ রথ যাত্রার সময়ে জগন্নাথ দেবের মাহেশ হইতে বল্লভপুরে শ্রীমন্দিরে আগমন হয় না মাহেশ হইতে কিছুদূর উত্তর পথের পার্শ্বে এক সামান্য আটচালা ঘরে গুণ্ডিচালয় হইত ঐ ঘরের ভগ্নদশায় লোকারণ্যের সময় বর্ষাকালে মহাক্লেশ হইল, এইক্ষণে ঐ পুণ্যবতী তথায় পাকা চাদনী উত্তম গুণ্ডিচালয় প্রস্তুত করিয়া দিয়াছেন, তথাকার ব্রাহ্মণ দিগকেও তৎকালে ভোগ রাগের অনেক টাকা বার্ষিক দিয়া থাকেন, এতদ্ভিন্ন তাঁহার বাটীতে অতিথ অভ্যাগত ব্রাহ্মণ বৈষ্ণব যত উপস্থিত হন কেহই বিমুখ হন না, ইহাঁদিগের সকলকেই কিঞ্চিৎ২ অর্থ দিয়া থাকেন, ঐ পুণ্যবতীর দানে ভিক্ষাজীবী অনেক দরিদ্র ব্রাহ্মণ বৈষ্ণব এতন্নগরে প্রাণ ধারণ করিতেছেন অতএব শাস্ত্রে আশীর্ব্বাদ করে। (দাতা চিরঞ্জীবতু) এমত দানশীলা মহিলা চিরজীবী হউন, তাঁহার অন্যান্য গুণ সময়ান্তরে প্রকাশ করিতে ত্রুটি করিব না।

(সোমপ্রকাশ ১১ই আগষ্ট ১৮৬২)

বিবিধ সংবাদ।—২২এ শ্রাবণ বুধবার।...শুনা গেল পদ্মমণি দাস (রাসমণির কন্যা) পাইক পাড়ার বিদ্যালয়ের জন্য প্রতি মাসে ১৪ টাকা চাঁদা দিবেন অঙ্গীকার করিয়াছেন। রাণী স্বর্ণময়ী পদ্মমণি প্রভৃতি কয়েক জন স্ত্রীলোক বিদ্যা বিষয়ে সবিশেষ উৎসাহ দিতেছেন।

হাবড়ার মুন্সেফী-পদে কবিবর হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

(সোমপ্রকাশ ২রা জুন ১৮৬২)

হাবড়ার মুন্সেফী আদালতটী...ভীষণ মূর্ত্তি ধারণ করিয়াছে।......এক্ষণে শ্রীযুক্ত বাবু হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় মুন্সেফী আসন অধিকার করিয়াছেন। ইনি উচ্চউপাধি প্রাপ্ত সুশিক্ষিত লোক ইঁহার দ্বারা সদ্বিচার লাভের প্রত্যাশা করিয়াছিলাম কিন্তু দুর্ভাগ্য বশতঃ ইঁহার কএকটা কার্য্যে নিতান্ত দুঃখিত হইয়াছি —"সাত্রাগাছী"

কৃষ্ণনগরে কবি রঙ্গলাল

(সোমপ্রকাশ ২১এ জুলাই ১৮৬২)

বিবিধ সংবাদ।—২রা শ্রাবণ বৃহস্পতিবার।...উক্ত পত্র প্রেরক [ইণ্ডিয়ান মিরারের কৃষ্ণনগরস্থ সংবাদ দাতা] আরও বলেন তত্রত্য আসেসর বাবু রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায় গবর্ণমেণ্টের আজ্ঞার বিরুদ্ধে গত বৎসর অপেক্ষা এ বৎসর ত্রিগুণ, চতুর্গুণ ইনকমটাক্স আদায় করিয়াছেন। হর্শেল সাহেব তাঁহাকে এ কার্য্য করিতে নিষেধ করিয়াছিলেন। নিষেধ করিলে কি হয়, গবর্ণমেণ্টের নিকটে প্রতিপত্তি চাই কি না।

বাস্তব

শ্রীসীতা দেবী

কলিকাতার শহরে হাত-পা ছড়াইয়া, বেশ আরাম করিয়া থাকিতে পায় অতি সৌভাগ্যবান মানুষে। সে-রকম মানুষের সংখ্যা অতি অল্প। রাজধানীতে গরিব লোকের যে পরিমাণ দুর্গতি, তাহা চোখে না দেখিলে কেহ বিশ্বাস করিবে না, সুতরাং তাহার বর্ণনা করিয়া লাভ নাই। মধ্যবিত্ত মানুষ এখানে নানারকম সুবিধা উপভোগ করে বটে, তবে আরাম বিশেষ পায় না, তবু পেটের দায়ে এবং অভ্যাসবশে শহর ছাড়িয়া কেহ কোথাও নড়ে না।

মনোরঞ্জনবাবু এই রকম একটি মধ্যবিত্ত গৃহস্থ ভদ্রলোক। বাড়িতে মানুষ কম নয়, আয় খুব বেশী নয়। বিধবা মা আছেন, নিজেরা স্বামী স্ত্রী এবং পাঁচটি ছেলেমেয়ে। দেশের বাড়ি হইতে আত্মীয়স্বজন এবং এধার-ওধার হইতে বন্ধুবান্ধব সদাসর্ব্বদাই বাড়িতে আসিয়া জোটেন। সুতরাং তিল ফেলিবার স্থান কোনো দিনই হয় না।

বড় রাস্তা হইতে অল্প একটু গলির ভিতর ঢুকিয়া মাঝারি-গোছের দোতলা একটি বাড়ি। একতলাটা মনোরঞ্জনবাবু ভাড়া লইয়াছেন, কারণ তাঁহার স্ত্রীর হৃদ্‌যন্ত্র কিঞ্চিৎ দুর্ব্বল, সিঁড়ি ওঠা-নামা করিতে ডাক্তারে বারণ করে। মাও বৃদ্ধা হইয়াছেন, বেশী উপর নীচে করা তাঁহারও পোষায় না। সেই জন্য একটু অসুবিধা থাকিলেও তাঁহারা নীচেই আছেন। উপর তলায় একটি ফিরিঙ্গী-পরিবার বাস করে।

ঘর মাত্র চারখানি; দুখানি মাঝারি, দুখানি ছোট। মনোরঞ্জনবাবু বিশেষ আধুনিক নয়, তবে একেবারে সেকেলেও নয়। তাঁহার বড় মেয়ে দুইটি কলেজে পড়ে, একজন ফার্ষ্ট ইয়ারে, একজন থার্ড ইয়ারে, এখনও বিবাহ হয় নাই। তিনি স্ত্রীশিক্ষার খুবই পক্ষপাতী, তবে স্ত্রী-পুরুষের মেলামেশার খুব যে পক্ষে তাহা নয়। কিন্তু তিনি একটু ভালমানুষ গোছের লোক, মতামত খুব বেশী জোরের সঙ্গে জাহির করিতে পারেন না। দুই-চারজন অনাত্মীয় ছেলেও মাঝে মাঝে বাড়িতে আসে, তাঁহার বড় ছেলের বন্ধু কেহ, কেহ বা ভগ্নীপতির আত্মীয় ইত্যাদি। গৃহিণীও তাহাদের সঙ্গে গল্প করেন, মেয়েরাও করে। আগে আগে সব ঘরেই সবরকম কাজ চলিত, এখন মেয়েরা বড় হইয়া, ছোট ঘর দুইখানির একখানিকে বসিবার ঘরে পরিণত করিয়াছে, অন্য ঘর দুইটিতে যে, যখন-তখন যাহার-তাহার প্রবেশ নিষেধ, তাহা বুঝাই-বার জন্য সেগুলির দরজাতে রঙীন খদ্দরের পরদা ঝুলাইয়া দেওয়া হইয়াছে। ঠাকুরমার ঘরের দরজা জানালায় খালি পরদা নাই, ও সব তিনি সহ্য করিতে পারেন না।

বসিবার ঘরটি দিনের বেলাতেই বসিবার ঘর, রাত্রে চেয়ার টিপয় সব ঠেলিয়া কোণে গাদা করিতে হয়, এবং মেঝেতে বিছানা পাতিয়া বাড়ির বড়ছেলে নটু শয়ন করে। অতিথি অভ্যাগত আসিলে তাহারাও শোয়। শোবার ঘর দুইখানির বড়টিতে কর্ত্তা গৃহিণী ছোট ছেলে মেয়ে দুইটিকে লইয়া শয়ন করেন, ছোট ঘরখানিতে সুলতা এবং সুজাতা থাকে।

অসহ্য গরমের দিন। দুপুর বেলাটা সমস্ত শহর যেন হাঁফাইতে থাকে। ভাগ্যবানের ঘরে বিজলি পাখা চলে, তাহাও যেন বায়ুর পরিবর্ত্তে অগ্নিকণা বিকিরণ করে। অভাগ্যবানেরা তালপাখার হাওয়া খাইয়া, ঠাণ্ডা মেঝেতে গড়াগড়ি দিয়া, চোখে মুখে জলের ঝপ্‌টা দিয়া কোনোমতে সময়টা কাটাইয়া দেয়।

মনোরঞ্জনবাবুর বাড়িতে পাখা নাই, তার উপর কাল হইতে বাড়িতে অতিথি সমাগম হইয়াছে। পশ্চিম হইতে রসিকবাবু স্ত্রী ও কন্যা লইয়া আসিয়া উঠিয়াছে। বহু বৎসর তাঁহারা ঘর ছাড়া, সম্প্রতি ছয় মাসের ছুটি লইয়া দেশে চলিয়াছেন। মাঝে কলিকাতায় দুই দিন বিশ্রাম করিয়া যাইতেছেন।

বিকাল বেলাটা সবে একটু ঝিরঝির করিয়া হাওয়া বহিতে সুরু করিয়াছে। ভিতর দিকে ছোট এক ফালি বারাণ্ডা আছে, তাহাতেই এধার-ওধার একটু পরদা

লাগাইয়া খাবার ঘরের কাজ চালান হয়। আগে খাওয়াটা যেখানে-সেখানে সারা হইত, কিন্তু তাহাতে সুলতার ভারি আপত্তি। এইটুকু বাড়ির মধ্যে চব্বিশ ঘণ্টা এঁটো বাসন পড়িয়া থাকিতে দেখিলে তাহার গা কেমন করে। সে-ই উদ্যোগী হইয়া বারাণ্ডাটিকে খাবার ঘরে পরিণত করিয়াছে। জায়গার অভাবে টেবিলে খাওয়াও চালাইয়াছে।

বিকালে সবাই চা খাইতে বসিয়াছেন। সুলতা ক্ষিপ্রহস্তে রুটিতে মাখন মাখাইতেছে, এবং প্লেটে স্তূপ করিয়া রাখিতেছে। সুজাতা চা ঢালিতে ব্যস্ত। আর একটি বড় প্লেটে রসগোল্লা এবং পাকা কলা। এগুলির আমদানি অতিথি-সম্বর্দ্ধনার জন্য। অন্যদিন শুধু রুটি মাখনেই কাজ চলে।

রসিকবাবুর স্ত্রী বলিলেন, "কানপুরে খাওয়া-দাওয়া কিছুরই সুখ নেই বাপু, একেবারে ছাতুখোর খোট্টা হয়ে যেতে হয়েছে। কিন্তু হাত-পা ছড়িয়ে থাকতে পাই। মস্ত বড় বাংলো, খান-দুই ঘর ত একেবারে খালি পড়ে থাকে, চাকরবাকরে ভূতের কেত্তন করে।"

মনোরঞ্জনবাবু বলিলেন, "আমরা মাছ-ভাত খাওয়ার সুখে আর সব কষ্ট ভুলে আছি। আচ্ছা, ওখানে আপনারা মাসে ক'দিন মাছ খান?"

রসিকবাবুর স্ত্রী উত্তর দিবার আগেই, তাঁহার মেয়ে অপর্ণা বলিল, "মাসে ক'দিন আবার, বছরে ক'দিন বলুন। তাও মাছ চিবচ্ছি কি খড় চিবচ্ছি, ভাল বোঝা যায় না।"

মনোরঞ্জনবাবু অপর্ণার উন্নত পরিপুষ্ট দেহটির দিকে চাহিয়া বলিলেন, "মা-লক্ষ্মীর স্বাস্থ্যের তাতে কিছু হানি হয়নি। আমার মেয়ে দু-জনকে বোধ-হয় তুমি একলা তুলে আছাড় দিতে পার।"

মেয়েরা সমস্বরে হাসিয়া উঠিল। সুলতা বলিল, "তিন ফুট ঘরের মধ্যে হাত-পাই নাড়া যায় না, তা গায়ে জোর হবে। তবু ত সুজাতা ছেলেবেলায় দু-চারবার স্কুলের স্পোর্টে প্রাইজ্ পেয়েছে, আমার ওদিকে কোনোই কৃতিত্ব নেই।"

রসিকবাবুর স্ত্রী বলিলেন, "এইবার ফিরবার বেলা তোমাদের দুই বোনকে নিয়ে যাব সঙ্গে ক'রে। দু-মাসে কি রকম শরীর সারে দেখো এখন।"

মনোরঞ্জনবাবুর স্ত্রী একটু আতঙ্কিত ভাবে বলিলেন, "বাবা, যা প্লেগের আড্ডা আপনাদের!"

রসিকবাবুর স্ত্রী বলিলেন, "তাই ব'লে কি সে দেশে মানুষ থাকে না? আমরা ত দশ বছর রয়েছি। না-হয় প্লেগের টিকে নিয়ে যাবে, তা হ'লে ছ'মাসের মত নিশ্চিন্দি।"

অপর্ণা বলিল, "বাবাঃ, এখানেই বা কম গরম কি? কানপুরে গায়ে ফোস্কা পড়ে, এখানে প্রায় সিদ্ধ হয়ে যাবার জোগাড়। একদিক দিয়ে এইটাই বিশ্রী বেশী। চট্‌পট্ চা খাওয়া শেষ ক'রে নিয়ে চল কোথাও একটু ঘুরে আসা যাক্। বাড়িতে টেঁকাই দায়।"

সুলতা প্লেটে করিয়া সকলকে রুটি, কলা এবং রসগোল্লা পরিবেশন করিতে লাগিল, সুজাতা চায়ের পেয়ালাগুলি এক এক করিয়া অগ্রসর করিয়া দিল। কেহ পূরা পেয়ালা খাইল, কেহ বা আধ পেয়ালা। খাবার প্রায় সকলেরই কিছু কিছু পড়িয়া রহিল। তাহার পর মেয়েরা বাহিরে যাইবার সাজসজ্জা করিতে উঠিয়া গেল।

অপর্ণাও সুজাতাদের ঘরে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছে। তাহার বাবা মা এখন পর্য্যন্ত এঘর-ওঘর করিয়া বেড়াইতেছেন। রসিকবাবু ত পশ্চিমের অভ্যাস-মত রাত্রে বারাণ্ডায়ই শুইয়াছিলেন, খাইবার টেবিলের উপর। তাহার স্ত্রী সারারাত এখান-ওখান করিয়া বেড়াইয়াছেন, কোথাও টিঁকিতে পারেন নাই। অপর্ণারও ঘরের গরমে ঘুম হয় নাই, তবু ঘরের ভিতর শুইয়া থাকিতেই সে বাধ্য হইয়াছে।

যথাসম্ভব হাল্কা কাপড়-চোপড় পরিয়া অতিথি তিনজন এবং মনোরঞ্জনবাবু সপুত্রকন্যা বাহির হইয়া গেলেন। গৃহিণী ঘরেই রহিয়া গেলেন, অতিথি সৎকারের ব্যবস্থা করিতে হইবে ত? ঠাকুরমা ত গঙ্গাস্নান ছাড়া আর কোনো কাজে কখনও বাহির হন না।

সকলে রাস্তায় বাহির হইয়া খানিকটা পায়ে হাঁটিয়াই পার হইয়া গেলেন। তাহার পর ট্রামে খানিক, আবার তাহার পর পদব্রজে। এইভাবে বালীগঞ্জের লেক্ ইত্যাদি সব ঘুরিয়া তাঁহারা বেশ খানিকটা রাত করিয়াই বাড়ি ফিরিয়া আসিলেন।

গৃহিণী বলিলেন, "খুব যা হোক্! ক'টা বেজেছে তার হুঁস্ আছে?"

মনোরঞ্জনবাবু বলিলেন, "যটাই বাজুক বাপু, দশটা রাত হবার আগে ঘরে যে ঢোকাই যায় না?"

গৃহিণী বলিলেন, "তা বেশ, দশটা বাজতে খুব বেশী দেরিও নেই। হাত-মুখ ধুয়ে সব খেতে ব'সো, ভাত জুড়িয়ে জল হয়ে গেল। বাহিরের সাজপোষাক ছাড়িয়া, হাতমুখ ধুইয়া সকলে আসিয়া খাইতে বসিল। ঘুরিয়া ফিরিয়া সকলের একটু ক্ষুধা হইয়াছিল, গরমও কমিয়া আসিয়াছে, সুতরাং রাত্রির খাবারটা আর ফেলা গেল না।

টেবিল ছাড়িয়া উঠিয়াই রসিকবাবু বলিলেন, "আমি তাহ'লে আজও এইখানেই আড্ডা গাড়ি, জানেন ত একেবারে জানোয়ার হয়ে গেছি, ঘরের ভিতর থাকতে হ'লে দম বন্ধ হয়ে আসে।"

বাড়ির গৃহিণী বলিলেন, "একেবারে একলা এই রকম থাকবেন? এ যে রাস্তারই সামিল? ওটুকু পাঁচিল থাকা না-থাকা সমান।"

রসিকবাবু হা হা করিয়া হাসিতে লাগিলেন। বলিলেন, "আমি সোনা রূপোও নয়, সুন্দরী মহিলাও নয়, আমার আর ভয় কিসের? সত্যিকারের রাস্তায়ই কত ঘুমিয়েছি তার কোনো আদি অন্ত আছে?"

অগত্যা কালকের ব্যবস্থাই আজও হইল। খাবার টেবিল ভাল করিয়া মুছিয়া তাহার উপর বিছানা পাতিয়া রসিকবাবু শুইয়া পড়িলেন। মনোরঞ্জনবাবু বসিবার ঘরে নটুর দলে গিয়া ভর্ত্তি হইলেন, রসিকবাবুর স্ত্রী বাড়ির গৃহিণীর সঙ্গেই শুইতে গেলেন।

অপর্ণা প্রবল আপত্তি অনুভব করা সত্ত্বেও সুলতা-সুজাতার সঙ্গে ঘরেই শুইতে গেল। সে জানে হাজার জেদ করিলেও এখানে কেহ তাহাকে বাহিরে শুইতে দিবে না। ও সব পশ্চিমী কাণ্ড পশ্চিমেই চলে।

ঘরের মেঝেয় একটা বিছানা করা হইল, কারণ তক্তপোষের উপর তিনটা মানুষ কিছু এই গরমে শুইয়া থাকিতে পারে না। সুলতা ত গরম পড়িয়া অবধি মেঝেতে মাদুর পাতিয়া শুইতেছিল, বিছানায় তাহার গায়ে যেন ছেঁকা লাগে। সুজাতা একটু আয়েসী মানুষ, অত মেঝেতে গড়াইতে তাহার ভাল লাগে না, সে খাটের উপরেই শোয়।

বিছানা দেখিয়া অপর্ণা বলিল, "আচ্ছা ভাই, আমার জন্যে আবার এত তোষক-চাদরের ঘটা কেন? এমনিতেই বলে আমার গায়ে ফোস্কা পড়ছে। আমাকেও একখানা মাদুরই দাও।"

সুলতা বিছানা উঠাইয়া ফেলিয়া একখানা জাপানী চিত্রবিচিত্র মাদুর আনিয়া অপর্ণার জন্য পাতিয়া দিল। বলিল, "আর কি চাই?"

অপর্ণা বলিল, "চাই অনেকখানি হাওয়া কিন্তু তা আর তুমি কোথা থেকে দেবে? জান্‌লা দুটোর সঙ্গে যদি দরজাটাও খোলা যেত, তাহ'লে তবু খানিকটা সুবিধে হ'ত।"

সুলতা বলিল, "বৈঠকখানায় নটু না থাকত যদি তাহলে মাঝের দরজাটা খুলে রাখতাম।"

অপর্ণা বলিল, "যাক, কি আর হবে? ঘুমিয়ে একবার পড়লে আর গরম ঠাণ্ডা জ্ঞান থাকবে না। ওঃ ভাল কথা, এক গেলাস জল রাখতে হবে। আমার আবার থেকে থেকে মাঝরাত্রে ভীষণ তেষ্টা পেয়ে যায়। এই, তুমি উঠছ কেন? আমি বুঝি আর এক গেলাস জলও গড়িয়ে আনতে পারি না?"

সে নিজেই উঠিয়া গেল, এবং খানিক পরে বাড়ির সব চেয়ে বড় কাঁসার গেলাসটায় এক গেলাস জল লইয়া ফিরিয়া আসিল। নিজের শিয়রের কাছে একখানা বই চাপা দিয়া সেটা রাখিয়া দিল।

রাত প্রায় এগারটা। আর দেরি না করিয়া সকলে শুইয়া পড়িল। খানিকক্ষণ মৃদু গুঞ্জন শোনা গেল, গোটা-তিন হাতপাখা নাড়ারও শব্দ পাওয়া গেল, তাহার পর একে একে হাতপাখা হাত হইতে খসিয়া পড়িল, কণ্ঠস্বরও নীরব হইয়া আসিল।

কলিকাতায় গ্রীষ্মের রাত্রে হাওয়ার অভাব হয় না, ঘরে তাহার প্রবেশ-পথ থাকিলেই হয়। মনোরঞ্জনবাবুর বাড়িতে একমাত্র রসিকবাবুই আরামে ঘুমাইতেছিলেন। ঘরের ভিতর জান্‌লার ফাঁকে থাকিয়া থাকিয়া দম্‌কা হাওয়া ঢুকিয়া পড়িতেছে, আবার গুমোট গরম। মেয়েদের জান্‌লায় আবার পর্দার বালাই, সে ঘরেই হাওয়া যাইতেছে সব চেয়ে কম।

অপর্ণা থাকিয়া থাকিয়া ঘুমাইতেছে, আবার গরমের আতিশয্যে মাঝে মাঝে ঘুম ছুটিয়াও যাইতেছে। বাহিরে হাওয়ার আঘাতে দরজা-জান্‌লা আর্ত্তনাদ করিয়া উঠিতেছে, শার্সি খড়খড়ি ঝন্‌ ঝন্‌ করিয়া বাজিতেছে, আর ভিতরে এই অবস্থা। আচ্ছা জালা! এ মেয়ে দুইটি ত দিব্য ঘুমাইতেছে, তাহারাই পশ্চিমে থাকিয়া আচ্ছা কুঅভ্যাস হইয়াছে। গরমে

খোলা উঠানে শুইতে না পাইলে ঘুমের সঙ্গে আর সম্পর্ক থাকে না।

আবার তন্দ্রা আসিয়া পড়িল। পাশের ঘরের দরজাটায় একটা শব্দ হইল না কি? নাঃ ও হাওয়ারই শব্দ। অপর্ণার চোখ আবার বুজিয়া আসিল, হাতপাখাখানা আবার মাদুরের উপর বিশ্রামলাভ করিল।

পাশের ঘরের দরজাটা আস্তে আস্তে খুলিয়া গেল। স্বলতার মায়ের ঘর হইতে কে এ ঘরে আসিতেছে? এ ত রমণী মূর্ত্তি নয়। ঘরের ভিতরটা ছায়াময়, বাহিরের রাস্তার আলো অতি অল্প একটুকু স্তিমিত হইয়া এই ঘরের এক কোণে আসিয়া পড়িয়াছে। আগন্তুক সেই আলোতেই বুঝিতে পারিল, খাটের উপর একটি এবং নীচে দুইটি তরুণী শুইয়া।

প্রথমে ধীর পদক্ষেপে সুজাতার খাটের পাশে গিয়া দাঁড়াইল। সুজাতা অঘোরে ঘুমাইতেছে। তাহার হাতে বা গলায় কোনো গহনা আছে কি-না ঝুঁকিয়া পড়িয়া পরীক্ষা করিয়া দেখিল। বিশেষ কিছু নাই, সুজাতা আধুনিক মেয়ে এবং বয়স সত্তেরো। এ সময় অনেক তরুণ চিত্তেই একটা অকারণ বৈরাগ্য দেখা দেয়, নরুণ পেড়ে ধুতি পরা, হাতে এক গাছি মাত্র সরু চুড়ি পরা ইত্যাদি নানা উপসর্গ আসিয়া জোটে। সুজাতাকে এখন সেই রোগে ধরিয়াছে।

লোকটা পা টিপিয়া টিপিয়া অপর্ণার কাছে আসিয়া দাঁড়াইল। অপর্ণার গায়ে গহনা আছে বটে। বড়লোকের একমাত্র মেয়ে, গলায় পাকা সোনার মস্ত এক ছড়া রুদ্রাক্ষ হার, হাতে চার গাছা করিয়া চুড়ি এবং মাদ্রাজী কঙ্কণ।

পকেট হইতে ছোট একটা ইলেক্‌ট্রিক টর্চ্চ বাহির করিয়া সে অপর্ণার হাতের গহনাগুলি পরীক্ষা করিতে লাগিল। কঙ্কণগুলি সুবিধাজনক জিনিষ বটে, খিল দেওয়া, সাবধানে খুলিতে পারিলেই হয়। টর্চ্চ নিবাইয়া পকেটে রাখিয়া চোর আস্তে আস্তে কঙ্কণ খুলিবার চেষ্টা করিতে লাগিল। খিল্‌ হইলে কি হয়? আঁট আছে বেশ। একটু বেশী জোরে টিপিতে গিয়া অপর্ণার হাতেই লাগিয়া গেল। একে তাহার ভাল ঘুম হয় নাই, তাহার উপর এই। এক ঝটকায় হাত সরাইয়া অপর্ণা সোজা হইয়া উঠিয়া বসিল।

মাঝরাত্রে ঘরের মধ্যে চোর দেখিলে, সাধারণ বাঙালী মেয়ে "মাগো, বাবা গো" করিয়া চেঁচাইয়া মূর্চ্ছা যাইত। অপর্ণা কিন্তু একটু অন্য ধাতুতে গঠিত, পশ্চিমে থাকিয়া থাকিয়া চুরি ডাকাতি দেখা তাহার অভ্যস্ত হইয়া গিয়াছে। সে মাদুর ছাড়িয়া লাফাইয়া উঠিতে যাইবামাত্র লোকটা সজোরে তাহার মুখ টিপিয়া ধরিল।

অপর্ণা দমিবার মেয়ে নয়। পা দিয়া স্বলতাকে জোরে এক গুঁতা দিয়া, চোরের হাত ছাড়াইবার জন্য ঝুটাপুটি বাধাইয়া দিল। স্বলতা সুজাতাও জাগিয়া উঠিয়া সমস্বরে চীৎকার করিয়া উঠিল। চোর অপর্ণাকে ছাড়িয়া দিয়া এক লাফে অন্য ঘরে প্রবেশ করিতে যাইতেছে, ঠিক সেই মুহূর্ত্তে অপর্ণা সেই আধ সের কাঁশার গেলাসটি তাহার মাথা লক্ষ্য করিয়া ছুঁড়িয়া মারিল।

লক্ষ্য ব্যর্থ হইল না। লোকটা আর্ত্তনাদ করিয়া বসিয়া পড়িল। কিন্তু আঘাত খুব যে গুরুতর হয় নাই তাহা বোঝা গেল, কারণ পরক্ষণেই সে উঠিয়া হুড়মুড় করিয়া পলায়ন করিল।

ইতিমধ্যে বাড়ির সকলে জাগিয়া উঠিয়াছে। মনোরঞ্জনবাবুর স্ত্রী এবং অপর্ণার মা প্রাণপণে চেঁচাইতেছেন, মনোরঞ্জনবাবু মেয়েদের ঘরে ছুটিয়া আসিয়াছেন, নটু চোরের পিছনে তাড়া করিয়াছে।

রসিকবাবু এক লাফে টেবিল হইতে নামিয়াই দেখিলেন, একটা লোক পাঁচিল টপ্‌কাইবার চেষ্টা করিতেছে। ছুটিয়া গিয়া তাহাকে চাপিয়া ধরিবার জোগাড় করিতেই সে ঝুপ করিয়া অন্য দিকে লাফাইয়া পড়িল, রসিকবাবুর হাতে থাকিয়া গেল তাহার পাঞ্জাবীর এক টুকরা এবং পাঁচিলের গায়ে কিছু রক্তচিহ্ন।

উপর তলার ফিরিঙ্গীদের ইলেক্‌ট্রিক আলো ফট্‌ ফট্‌ করিয়া জ্বলিয়া উঠিল। তাহাদের একজন ছেলে নীচে নামিয়া আসিল কি হইয়াছে জানিবার জন্য। নীচের তলার সকলেও লণ্ঠন জ্বালিয়া চারিদিক তন্ন তন্ন করিয়া দেখিতে লাগিল। একটা ত মার খাইয়া পলায়ন করিয়াছে, আবার কোথাও কেহ লুকাইয়া নাই ত?

কিন্তু আর কাহারও খোঁজ মিলিল না। মেয়েদের ঘরের মেঝেতে তখন রক্তে জলে ঢেউ খেলিতেছে। সে সব মুছিয়া পরিষ্কার করিয়া ফেলা হইল। নটু একটু আপত্তি করিতেছিল,

পুলিসে খবর দেওয়া তাহার ইচ্ছা। বাড়ির আর কেহ রাজী হইলেন না। চোর যখন কিছু নিতে পারে নাই, তখন আর অত হাঙ্গাম কেন ?

সুলতা বলিল, "তুমি আচ্ছা দেবীচৌধুরাণী ভাই, চোরটি আর কোনো দিন তোমাকে ভুলবে না।"

অপর্ণা তখনও চটিয়া ছিল, বলিল, "হাতের কাছে ভাল কিছু পেলাম না যে, নইলে ভাল ক'রে মনে রাখবার ব্যবস্থা করতাম।"

সুজাতা বলিল, "চোরটি সৌখীন মানুষ বটে, দেখছ না কাকাবাবুর হাতে পাঞ্জাবীর কাপড়ের যে স্যাম্পলটা রেখে গেছে সেটা তসরের ?"

সুলতা বলিল, "অবাক্ কাণ্ড বাবা! এত সেজে-গুজে চোর আসে নাকি? বোধ হয় অপর্ণাদি'র সঙ্গে প্রেমে পড়েছে।"

অপর্ণা বলিল, "তা আর না? এই মহিষমর্দ্দিনী মূর্ত্তি দেখলে কারো প্রেম-ট্রেম আসবে না বাবা। সে-সব তোমাদের মত ললিত লবঙ্গলতার মত চেহারা দেখলেই হয়।"

বাকি রাতটুকু কথা বলিয়াই সকলে কাটাইয়া দিল। চোর ঢুকিল কোন্ পথে? আবিষ্কৃত হইল যে বাথরুমের গলির দিকের দরজাটা কেমন করিয়া খোলা হইয়াছে। কি করিয়া যে খোলা থাকিল তাহা অনেক জল্পনা-কল্পনা করিয়াও কেহ স্থির করিতে পরিল না।

সকালে আত্মীয়স্বজনের মধ্যে সাড়া পড়িয়া গেল। অনেকে দেখা করিতে আসিল। চোরের গল্পই শুধু হইতে লাগিল কয়েক দিন ধরিয়া, তাহার পর আস্তে আস্তে সবাই তাহার কথা ভুলিয়া গেল।

কিন্তু পাঠক ভোলেন নাই বোধ হয়। এমন চোর কোথা হইতে আসিল ?

দিন-পনেরো আগের কথা। "বল্লরী"র সম্পাদক চিত্তরঞ্জনবাবু বসিয়া একমনে প্রুফ দেখিতেছেন। তাঁহার সহকারী খগেন একরাশ গল্প, কবিতা এবং প্রবন্ধের পাণ্ডুলিপি দুই ভাগ করিতেছে। কতকগুলির উপরে লেখা "অ" অর্থাৎ অমনোনীত, সেইগুলিই সংখ্যায় বেশী। ছোট স্তূপে যেগুলি স্থান পাইয়াছে, তাহার উপরে লেখা "ম"। গুটি-তিনচার মানুষ, আপিসের এদিক-ওদিক বসিয়া অপেক্ষা করিতেছে। কেহই কিছু করিতেছে না, দেখিবাই বুঝা যায় কোনো বিষয়ে উমেদারী করিতে আসিয়াছে।

একজন একটু পরে অগ্রসর হইয়া খগেনের পাশের টুলটায় গিয়া বসিল। অন্যদের কান বাঁচাইয়া নীচু গলায় জিজ্ঞাসা করিল, "আমার লেখাটা দেখা হয়েছে কি ?

খগেন সংক্ষেপে বলিল, "দেখেছি, চলবে না।"

লেখকের মুখখানা হতাশায় একেবারে কাল হইয়া উঠিল, বলিল, "চলবে-না কেন বলছেন? এটা আমি খুব সাবধানে মন দিয়ে লিখেছি, একবার এডিটারকে দেখালে হয় না ?"

খগেন একটু চটিয়া বলিল, "সব-কিছু যাতে তাঁকে দেখতে না হয়, সেই জন্যেই আমাদের থাকা। তা তিনি যদি দেখতে রাজী হন আমার কিছু আপত্তি নেই।" বলিয়া অমনোনীত স্তূপের ভিতর হইতে একখানি নীল মলাটের খাতা টানিয়া বাহির করিয়া সে যুবকের দিকে অগ্রসর করিয়া দিল।

যুবক একটু দমিয়া গিয়া বলিল, 'থাক, আপনি যখন বলছেন যে চলবেই না, তখন তাঁকে আর বিরক্ত করব না। কিন্তু কেন চলবে না সেটা একটু অনুগ্রহ ক'রে বলবেন কি? প্লটটা ত মন্দ নয়, ভাষা সম্বন্ধেও এবার যথেষ্ট সাবধান হয়েছি।"

খগেন বলিল, "আরে মশাই, আজকাল রিয়ালিজমের যুগ, ও-সব কল্পনার আকাশকুসুম কেউ চায় না এখন। বাংলা সাহিত্য থেকে রোমান্স এখন ঝেঁটিয়ে বিদায় করা হচ্ছে। এটা আমার নিজের বিবেচনায় ঠিক নয়, কিন্তু পাবলিক যা চায়, আমাদের তাই দিতে হবে ত ?"

লেখক জিজ্ঞাসা করিল, "একেবারেই অবাস্তব হয়েছে কি ?"

খগেন বলিল, "তা ছাড়া আর কি? এই ধরুন, আপনার নায়ক অরুণেন্দ্র যেখানে চিত্রলেখার ঘরে রাত্রে হঠাৎ ঢুকে পড়েছেন। এ জায়গাটা অবাস্তব না? ঘরে চোর দেখে কোন্ মেয়ে প্রেমে পড়ে মশায়? চেঁচিয়ে পাড়া মাথায় করত না ?"

লেখক রমেশ বলিল, "ও বিষয়ে কি আর 'জেনারেল রুল' কিছু আছে? হ'তেও ত পারে ?"

খগেন চটিয়া বলিল, "হ'তে ত মানুষের চারটে ঠ্যাংও

পারে। খবরের কাগজে ও-রকম কত পড়া যায়। কিন্তু সেটা নিয়ে ত আর সাহিত্য রচনা করা চলে-না?"

রমেশ বিমর্ষভাবে খাতাখানা হাতে করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল, বলিল, "আচ্ছা, আসি তবে, নমস্কার। দেখি যদি একটু বদলে-সদলে দিতে পারি।" বলিয়া ধীরে ধীরে আপিস হইতে বাহির হইবার জোগাড় করিল।

তাহার মুখ দেখিয়া এতক্ষণে খগেনের একটু মায়া হইল। বলিল, 'হ্যাঁ তাই দেখুন। ভাষা, ষ্টাইল্ ইত্যাদি সব বেশ ভালই হয়েছে, তবে কি-না ঐ যা বল্লাম। জিনিষটা "রিয়ালিষ্টিক্" হওয়া চাই। তা হলেই আর কোনো ভাবনা থাকত না, কর্‌করে পনেরটি টাকা নিয়ে বাড়ি যেতে পারতেন।"

রমেশ ধীরে ধীরে বাহির হইয়া গেল। আর একজন যুবকও তাহার সঙ্গে সঙ্গেই বাহির হইয়া আসিল। আপিসের বাড়িটা ছাড়াইবা মাত্র রমেশের কাঁধে হাত রাখিয়া বলিল, "আরে এতে অত দমে যেতে আছে? ওরা ত অমন বল্‌বেই, নইলে তাদের চলে না। যত ভাল লেখা পায়, সবই যদি ছাপ্‌তে হ'ত, তাহলে একখানার জায়গায় দশখানা 'বল্লরী' বার করতে হ'ত। পাব্‌লিক্ 'রিয়্যালিজম্' চায় না কচু! আমিও ত পাব্‌লিকের একজন, রিয়ালিজম্ ঘরে অষ্টপহর দেখছি, দেখে দেখে হাড়ে ঘুণ ধরে গেছে।"

রমেশ শুষ্ক হাসি হাসিয়া বলিল, "তুমি বন্ধুত্বের খাতিরে বলছ। সত্যিই ভাল হ'লে ওরা ফেরৎ দেবে কেন? আজকাল ভাল লেখা শস্তা নয়।"

মহীতোষ দমিবার ছেলে নয়, বলিল, "আরে 'রিয়ালিজম্' নিয়ে কখনও গল্প লেখা চলে? ও-সব একেবারে বাজে। আমাদের বাংলা দেশে রিয়াল জিনিষ তিনটি,—ম্যালেরিয়া, কন্যাদায়, আর কেরাণীর ঘরে দশ ছেলে। এ নিয়ে কত লিখবে তুমি? এ ক'টাকে লিখে লিখে সবাই তুলো ধোনা ক'রে দিয়েছে। এখন দায়ে পড়ে কল্পনার আশ্রয় নিতে হচ্ছে।"

রমেশ বলিল, "আমি ত সখের লেখক না হে, তাহলে লেখা ফেরৎ দিলে আমারও কিছু এসে যেত না। আমারও যে মাইনে ষাট টাকা এবং ঘরে অতি রিয়্যাল চারটি ছেলে-মেয়ে। পনেরটা টাকা হ'লে এ মাসের গোয়ালার বিল দেওয়া হয়ে যেত।"

মহীতোষ বলিল, "সে সবের ভাবনা কোন্ বেটা ভাব্‌ছে বল্? আচ্ছা বদলে দেখ্ যদি চলে।"

রমেশ কথা না বলিয়া নীরবে চলিতে লাগিল। বাড়ির কাছাকাছি আসিয়া বলিল. "বদ্‌লেই বা করব কি? যথেষ্ট রিয়ালিষ্টিক্ হবে কি-না কে জানে? আমাদের জীবনের অভিজ্ঞতাই বা কি? ঐ যা বলে'ছিস্ কন্যাদায়, ম্যালেরিয়া আর দশ ছেলে। সিনেমার কল্যাণে যদি বা দুটো একটা ভাল প্লট মাথায় আসে, তা সম্পাদকদের পছন্দ হয় না। আমেরিকান্ মেমকে সম্পাদকদের পছন্দ হয় না। আমেরিকান্ মেমকে যতই শাড়ী চাপা দাও, তার আদত রূপ বেরিয়েই পড়ে।"

রমেশের দরজা পর্য্যন্ত পৌঁছাইয়া দিয়া মহীতোষ ধীরে ধীরে নিজের বাড়ির দিকে অগ্রসর হইয়া চলিল। রমেশের ওখানে এক পেয়ালা চা খাইয়া যাইবার তাহার ইচ্ছা ছিল, এইমাত্র তাহার দারিদ্র্যের কাহিনী শুনিয়া তাহার সে স্পৃহা আর ছিল না। রমেশটার সঙ্গে বাল্যকাল হইতে তাহার আলাপ, এক স্কুলে পড়িয়াছে পর্য্যন্ত। হতভাগা অল্প বয়সে বিবাহ করিয়া একেবারে ভরাডুবি হইতে বসিয়াছে। দেখ না মহীতোষকে, দিব্য খায় দায়, ঘুরিয়া বেড়ায়। জীবনে আনন্দ উৎসাহ কিছু না থাক্, আপদ বালাইও কিছু নাই।

রমেশের কথা এক রকম ভুলিয়াই গিয়াছিল, সন্ধ্যার সময় দুইটা টাকা ধার চাহিতে আসিয়া সে নিজের অস্তিত্ব আবার ভালভাবে মনে পড়াইয়া দিল। মাসের শেষ মহীতোষ টাকা দিতে পারিল না বলিয়া তাহার মনটা আরও খারাপ হইয়া গেল। নাঃ এ ছোক্‌রার একটা ব্যবস্থা না করিলে আর চলে না।

চুরির দুই দিন পরের কথা। রমেশ ছোট মেয়েটাকে কোলে করিয়া গলিতে ঘুরিতেছে। স্ত্রী রান্নাঘরে ব্যস্ত। মহীতোষ আসিয়া আস্তে আস্তে তাহাদের রোয়াকের উপর বসিল। রমেশ ব্যস্ত হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, 'মাথায় ষ্টিকিং প্ল্যাষ্টার কেন রে? মাথা কাটল কি ক'রে?"

মহীতোষ ম্লান হাসি হাসিয়া বলিল, "রিয়ালিজমের সন্ধানে। তোর গল্প আগাগোড়া ভুল হয়েছে ভাই, সব বদলে লিখতে হবে।"

রমেশ হাঁ করিয়া রহিল। মহীতোষ বলিল, "আরে নে নে, অত ন্যাকা সাজতে হবে না। বৌদিকে বল্ এক পেয়ালা চা দিতে।"

রমেশ তাহার পাশে আসিয়া বসিয়া ভীতভাবে ফিস্ ফিস্ করিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "সত্যি গিয়েছিলি নাকি চুরি করতে?"

মহীতোষ বিরক্তভাবে উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিল, "চুরি করতে যাব কেন? কোন্ প্রয়োজনে? তবে ট্রেস্‌পাস্ (অনধিকারপ্রবেশ) করেছি বল্‌তে পারিস্। খগেনের কথা খাঁটি সত্যি রে। বাঙালীর মেয়ে ঘরে চোর ঢুকলে প্রেম করতে বসে না মোটেই।"

রমেশ ভীতু মানুষ, বলিল, "মাথার এই ঘা নিয়ে রাস্তায় বেরস্ নে। দিনকতক ঘরেই থাক্।"

মহীতোষ বলিল, "দুত্তোর। আমার কথা স্বপ্নেও কারও মাথায় আস্‌বে ভেবেছিস্। আমি সেফ (নিরাপদ) আছি।"

সবরমতী

শ্রীঅক্ষয়কুমার রায়

মহাত্মা গান্ধীর পত্র পাইয়া ২৯এ মার্চ্চ শান্তিনিকেতন হইতে সবরমতী রওনা হইলাম। আগ্রা হইয়া রাজপুতানার মরুভূমির ভিতর দিয়া গাড়ী চলিতে লাগিল; ভরতপুর, জয়পুর, আজমীর হইয়া এক দিন এক রাত্রির পর দিন দুপুরবেলা আমেদাবাদ পৌঁছিলাম। গরম ছিল খুব, গাড়ীর কাঠগুলি পর্য্যন্ত যেন আগুনে তাতিয়া উঠিয়াছে, সমস্ত দিনটা কেবল নেড়া পাহাড়, দিগন্তব্যাপী ধূ ধূ বালুভরা মাঠ, মাঝে মাঝে বাবলা ও কাঁটাগাছ ছাড়া আর বিশেষ কিছু চোখে পড়িল না। দূরে দূরে সব ষ্টেশন। ট্রেনের সঙ্গে একটি জলের গাড়ী ছিল। সেই জলই প্রতি ষ্টেশনে যাত্রীদের সরবরাহ করিতে হইত। সন্ধ্যার পূর্ব্বে দেখি, এক দল লোক উটের পিঠে মরুভূমির উপর দিয়া চলিয়াছে। ঠিক যেন ছবির মত মনে হইল। শেষরাত্রে আবার বেশ ঠাণ্ডা পড়িতে লাগিল।

আমেদাবাদের আগের ষ্টেশনই সবরমতী। সব গাড়ী সেখানে ধরে না বলিয়া, অল্প পরে ভিন্ন গাড়ীতে আসিয়া সবরমতীতে নামিলাম। আশ্রম সেখান হইতে প্রায় দেড় মাইল হইবে; পথে সবরমতী জেল পড়ে। যেমন দারুণ রৌদ্র, তেমনি গরম হাল্‌কা হাওয়ার, মনে হইল এই দেড় মাইল রাস্তা যেন আর শেষ হয় না। এই অবস্থায় আশ্রমে পৌঁছিয়া দেখি, আশ্রম যেন জনমানবশূন্য। বাহিরে এমন কোন লোক দেখি না যাকে জিজ্ঞাসা করি কোথায় উঠি। অল্প পরে একটা বাড়িতে প্রবেশ করা মাত্র ঘর হইতে একটি ভদ্রমহিলা আসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "কাকে চাই?" আমি বলিলাম, "মহাদেব দেশাই কোথায় আছেন?" তিনি মহাদেব দেশাই মহাশয়ের বাড়িটা দেখাইয়া দিলেন।

মহাদেব দেশাই তখন গরমের জন্য ঘরের দুয়ার জানালা বন্ধ করিয়া কাজ করিতেছিলেন। নেপালচন্দ্র রায় মহাশয়ের পত্রখানা হাতে দেওয়া মাত্র আমাকে বসিতে বলিলেন। ঘরের এক কোণ জোড়া গালিচা পাতা, আশেপাশে দেশ-বিদেশের সব খবরের কাগজ ছড়াইয়া আছে। দুইটি আলমারী-ভরা বই, দেয়ালে ভারতবর্ষ ও গুজরাটের বড় বড় মানচিত্র ঝুলিতেছে। দেয়ালে ঠেস দিয়া সামনে একটি ছোট ডেস্ক লইয়া 'ইয়ং ইণ্ডিয়া'র জন্য প্রবন্ধ লিখিতেছেন। শান্তি-নিকেতনের অনেকের কথাই খুব আগ্রহ সহকারে জিজ্ঞাসা করিলেন। আমার শরীরের অবস্থা দেখিয়া বলিলেন, "এখন আপনি স্নান আহার করিয়া বিশ্রাম করুন, পরে সব কথা হবে"—বলিয়া গুজরাটীতে কি লিখিয়া আমাকে আপিসে পাঠাইয়া দিলেন।

মহাদেব দেশাই লম্বাচওড়া গৌরকান্তি প্রিয়দর্শন সুপুরুষ। মুখে প্রশান্তভাব, স্নিগ্ধ হাসি লাগিয়াই রহিয়াছে। বাংলা বেশ বোঝেন, অল্প অল্প বলিতেও পারেন।

শান্তিনিকেতন হইতে রওনা হইয়া ১৯৩০ সনের ৩রা এপ্রিল সবরমতী পৌছিলাম।

আপিসে নারায়ণ দাস গান্ধী মহাশয়কে মহাদেব দেশাইয়ের পত্রখানা দেওয়া মাত্র তিনি আমাকে আপ্যায়ন সহকারে বসিতে বলিলেন। আপিসঘরটি জুড়িয়া মাদুর পাতা ছিল। তাহাতে টেবিল চেয়ার কিছুই নাই। দেয়ালে ঠেস দিয়া সাম্‌নে ডেস্ক লইয়া তিনটি মহিলা কাজ করিতেছিলেন - চিঠি-পত্রের জবাব, হিসাবপত্র, ইত্যাদি। মাঝে মাঝে নারায়ণ দাস গান্ধী মহাশয় গুজরাটীতে তাঁদের কাজকর্ম্ম সম্বন্ধে কি বলিতেছিলেন। ইতিমধ্যে একটি ভদ্রমহিলা আসিলেন। তাঁহার উপর আশ্রম-অতিথিদের দেখাশুনার ভার। তাঁহার কাপড় পরিধানের ধরণ দেখিয়া মনে হইল তিনি মহারাষ্ট্রীয়।

নারায়ণ দাস গান্ধী তাঁহার সঙ্গে আমাকে যাইতে বলিলেন। তিনি আমাকে একটা ঘর খুলিয়া দিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "এখন আপনি কি খাবেন ?"

অসময়ে অতিথিদের জন্য কি খাওয়ার ব্যবস্থা আছে তাহা জানি না বলিয়া বলিলাম, "খাওয়া যা-কিছু হলেই হবে। এখন স্নান বিশ্রামেরই বেশী দরকার।" শৌচ ও স্নানের জায়গা দেখাইয়া তিনি চলিয়া গেলেন। তৃপ্তি সহকারে স্নানটি সারিয়া ঘরে আসিয়া দেখি পরিষ্কার পরিচ্ছন্নভাবে ঘরটি ঝাঁট দেওয়া। নূতন মাটির কলসীতে জল ভরা। আমার কম্বল কাপড়গুলি বেশ গুছান। থালায় ঢাকা খাবার আছে। এক বাটী ঘোল, কয়েক টুক্‌রা পাউরুটি, কয়েকটি পাকা টমেটো। তৃপ্তি সহকারে সেগুলি খাইয়া শুইয়া পড়িলাম।

নীরব আশ্রমের বিশ্রামকক্ষটি বড়ই আরামদায়ক বোধ হইতে লাগিল। পথে এই কয়টা রাত্রি দিন কানের মধ্যে যে একটা বিকট শব্দ লাগিয়াছিল তাহা দূর হইয়া গেল। একটু বিশ্রাম করিবার পর শুনিলাম আমার পাশের ঘরে এক ভদ্রলোক চরকা চালাইতে চালাইতে গান করিতেছেন। গান ও গলা শুনিয়া মনে হইল বিদেশী কেহ হইবেন। পরে শুনিলাম তিনি মিঃ রেজিন্যাল্ড রেণল্ডস্।

বৈকাল ছয়টায় রাত্রির আহারের ঘণ্টা পড়িল, কুমারী প্রেম বেন আসিয়া বলিয়া গেলেন; "খাবারের ঘণ্টা পড়েছে। আপনি খেতে চলুন।"

নারায়ণ দাস গান্ধী আমার অপেক্ষায় দাঁড়াইয়া ছিলেন। তাঁহার সঙ্গেই খাবার ঘরে চলিলাম।

পরদিন ৪ঠা এপ্রিল মহাদেব দেশাই রণছোড় শেঠের সঙ্গে আমার ডাণ্ডি যাওয়ার সব বন্দোবস্ত করিয়া দিলেন।

দশ দিন পর আবার আশ্রমে ফিরিয়া আসিলাম। আশ্রমে যাহা দেখিয়াছি ও বুঝিয়াছি সংক্ষেপে তাহাই

প্রার্থনার স্থান

বলিবার চেষ্টা করিব। ইহাতে ভুলভ্রান্তিও যে থাকিতে পারে না এমন কথাও বলিতে পারি না।

সবরমতী নদীর একেবারে উপরেই আশ্রম, নদীর নাম অনুসারে আশ্রমের নাম হইয়াছে সবরমতী আশ্রম।

মহাত্মা গান্ধী দক্ষিণ আফ্রিকার কাজ শেষ করিয়া যখন ভারতবর্ষে ফিরিলেন, তখনও ভারতবর্ষের রাজনীতিতে তিনি সাক্ষাৎভাবে জড়িত হন নাই। সেই সময় বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথের নিজের আদর্শ অনুযায়ী শিক্ষা প্রবর্ত্তন দেখিয়া সস্ত্রীক জনকয়েক ছাত্র লইয়া তিনি কিছু কাল শান্তিনিকেতনে ছিলেন। পরে তিনি স্বতন্ত্রভাবে সবর-মতীতে শিক্ষার স্থান প্রতিষ্ঠা করিলেন। সেই অবধি শান্তিনিকেতনের উপর মহাত্মাজীর একটা আন্তরিক টান আছে। তাঁহার কর্ম্মময় জীবনে যখনই সময় পাইয়াছেন, তিনি শান্তিনিকেতনে কাটাইয়া গিয়াছেন। নদীটি পাহাড়ো নদী। অর্দ্ধ মাইলের উপর চওড়া। কেবল বালুর স্তর, তিন চার হাত জুড়িয়া খর স্রোত বহিয়া চলিয়াছে। কোথাও কোমর-জল, কোথাও গলা-জল, বর্ষার সময় কখনও কূল ছাপাইয়া জল চলিয়া যায়। নদীতে অসংখ্য মাছ,

জলে নামিলে গা ঠোক্‌রাইতে সুরু করিয়া দেয়। সে মাছ কেহ ধরেও না, খায়ও না। অপর পারেই আমেদাবাদ শহর, ঐদিকে তাকাইলে কেবল কাপড়ের কলের চিম্‌নি ও ধোঁয়াই চোখে পড়ে।

নদীর ধার দিয়া যে-রাস্তাটি আমেদাবাদ শহরে যাওয়ার পুলের সঙ্গে মিশিয়াছে, সেই রাস্তাটি আশ্রমকে দুই ভাগে বিভক্ত করিয়া রাখিয়া গিয়াছে।

নদীর ধার দিয়া পড়িল গোশালা, প্রার্থনার স্থান, মহাত্মাজীর ঘর। আমরা যে বাড়িতে ছিলাম তাহা আপিস
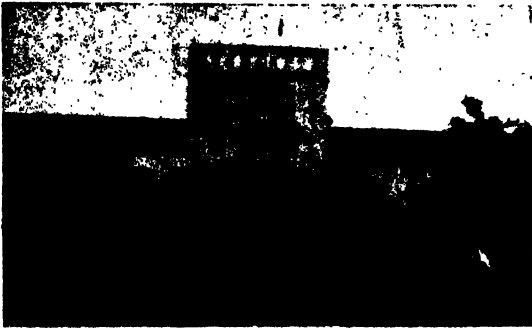
এই বাড়িতে মেয়েরা ও ছোট ছেলেরা থাকেন

ও কারখানা ঘর। রাস্তার অপর পারে চতুষ্কোণ প্রকাণ্ড দোতলা পাকা বাড়ি, মাঝখানে বড় উঠান। তাতে থাকেন মেয়ে ও ছোট ছেলেরা। ছাদের উপর প্রকাণ্ড জাতীয় পতাকা উড়িতেছ। বহুদূর হইতেও তাহা পথিকের চোখে পড়ে।

এই বাড়ির পিছনে রান্না ও খাবার ঘর, লাইব্রেরীর আশেপাশে সব ছোট ছোট বাড়ি আছে। তাহাতে সব ছাত্রই থাকেন। আশ্রমের বাড়িগুলির সবই পাকা দেওয়াল, ঢালু খোলার চালা, ভিটেটা সিমেন্ট করা। দক্ষিণ দিকে পড়িল বিবাহিত অধ্যাপকদের বাড়ি, টেনারী ঘর। আশে-পাশে উঁচু-নীচু মরুভূমির মত মাঠ পড়িয়া রহিয়াছে, বাবলা ও কাঁটা গাছে ভরা।

এই-সব বাড়ির ফাঁকে ফাঁকে যে সব জমি আছে তাহাতে ফলমূল শাকসবজী হয়। ছোট-বড় কয়েকটি ইঁদারা আছে, নদীর জলে কেবল স্নান ও কাপড় কাচা হয়।

আশ্রমের দৈনন্দিন কাজ ছিল এই—

রাত্রি চারটায় উঠিবার ঘণ্টা পড়িলে সকলকেই বিছা ছাড়িয়া উঠিতে হয়। তার বিশ মিনিট পরে উপাসনার ঘং পড়ে। আশ্রমবাসী সকলকেই উপাসনায় যোগ দিতে হয়।

তার দশ মিনিট পরে জল খাওয়ার ঘণ্টা পড়ে প্রত্যেকে স্ব স্ব বাটি ও গ্লাস লইয়া একে একে ঘরের এ কোণ হইতে জলখাবার লইয়া লাইন করিয়া খায়। দুই-তি টুক্‌রা গমের পাউরুটি তাহা আশ্রমেই তৈরি হয়, আ ঘন গম সিদ্ধ রস এক বাটি, তাতে মিষ্টি দেওয়া থাকে।

জলখাওয়ার পর যে যার কাজে লাগিয়া যায়।

ছেলেমেয়েরা মিলিয়া কাজ করে। রান্না, বাসনমাজ জলতোলা, আশ্রম পরিষ্কার করা, নিজ নিজ কাপড় কাচ পায়খানা পরিষ্কার প্রভৃতি নিজে নিজেই করে। পাচক ভৃত্য ধোপা মেথর বলিয়া কেহ নাই। সকলকেই স কাজ করিতে হয়। যে দিন যার উপর যে কাজের ভা পড়ে তাহা পূর্ব্ব দিন রাত্রে বলিয়া দেওয়া হয়।

বেলা এগারটায় দুপুরের খাওয়ার ঘণ্টা পড়ে। যে যা থালা বাটি গ্লাস লইয়া একই ঘরে ছেলে ও মেয়েরা দুই পংক্তিতে বসিয়া যায়। সকলের পাতে পরিবেশন হওয়া পর একটি ভদ্রমহিলা একটা ঘণ্টায় শব্দ করেন। তথা সকলে সমস্বরে এই প্রার্থনার মন্ত্রটি পড়িয়া খাইতে আরম্ভ করে।

"ওঁ সহনা ববতু সহ নৌ ভুনক্তু সহ বীর্য্যং করবাবহৈ
তেজস্বিনা বধীতমস্তু মা বিদ্বিষা বহৈ।
ওঁ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।"

মাড় সমেত আতপ চালের ভাত, রুটি ডাল তরকারী ঘি ঘোল; ডাল তরকারীতে হলুদ লঙ্কা বা অন্য কোন মসলা নাই, নুন-জলে সুসিদ্ধ। এতগুলি লোক এক সঙ্গে খাইতে বসিয়াছে অথচ কোন গোলমাল হৈ-চৈ নাই। পরিবেশন-কারিণীরা বার বার দেখিতেছেন কার কি চাই। দরকার হইলে পাশের লোকের সঙ্গে এমন ভাবে কথা বলেন যাতে কোন গোলমাল না হয়। নারায়ণ দাস গান্ধীকে বলিলাম, "রান্না ঘরের এই দৃশ্যটি আমার বড় ভাল লাগিতেছে।" তাঁহার সঙ্গে আমার আস্তে আস্তে কথা হইতেছিল। তিনি মিঃ রেণল্ডস্ ও কুমারী মীরা বেনের কথা বলিলেন।

তাঁহারাও সেই পংক্তিতে বসিয়া খাইতেছিলেন। যাঁহার

যখন খাওয়া শেষ হয় তিনি তখন তাঁহার পাত তুলিয়া চলিয়া যান। পাতে কেহ কিছু ফেলেন না।

আমার খাওয়া শেষ হইয়াছে দেখিয়া একটি মেয়ে আমার পাত তুলিতে আসিলেন। আমি তাঁহাকে বলিলাম, 'আমি ত এখন আর আপনাদের অতিথি না; আমি আপনাদেরই একজন।" মেয়েটি আর কোন পীড়াপীড়ি না করিয়া চলিয়া গেলেন।

একটা মোটা লোহার নলের মধ্যে মধ্যে দশ-বারটা ট্যাপ্ বসান আছে। তাহাতেই যে যার থালা বাটি মুখ ধোয়। সেই জল শাকসজীর ক্ষেতে গিয়া পড়ে। আমার পাশের কলে মহাত্মাজীর স্ত্রী তাঁর থালা বাটি ধুইতেছিলেন। আমি তাঁহাকে নমস্কার করাতে তিনি যেন জিজ্ঞাসুদৃষ্টিতে আমার দিকে চাহিয়া রহিলেন। আমি বলিলাম, "আমি শান্তিনিকেতন হইতে আসিয়াছি।" তিনি স্নেহশীলার ন্যায় জিজ্ঞাসা করিলেন, "সেখানে সব ভাল ত?" আমি বলিলাম,— "সকলেই ভাল।"

মিঃ রেণল্ডস্ খালি গায় খালি পায় ও এক হাফপ্যাণ্ট পরিয়া ছিলেন। থালা বাটি ধুইয়া তিনি ঘরে চলিয়া গেলেন।

দুপুরের আহারের পর একটা পর্য্যন্ত যে যার ঘরে বিশ্রাম বা পড়াশুনা করে। একটা হইতে পাঁচটা পর্য্যন্ত তাঁত-ঘরে কাজ চলে। সেখানে তুলার পাঁজ হইতে কাপড় বুনা পর্য্যন্ত সব কাজই হয়। সে সময় জাতীয় সপ্তাহ ছিল বলিয়া খদ্দরের জন্য সকলেই সময় দিত বেশী, অনেকে অন্য কাজও করিত। অহিংস সংগ্রামের জন্য ক্লাস সব বন্ধ ছিল। বেলা ৬টার সময় রাত্রির আহারের ঘণ্টা পড়িত। নিয়ম পদ্ধতি সব দুপুরের মতই। কেবল ভাতের স্থানে খিঁচুড়ী হইত, তাতেও কোন মস্‌লা ছিল না।

সূর্য্য অস্তের পর উপাসনার ঘণ্টা পড়ে। আশ্রমবাসী সকলেই একে একে প্রার্থনার স্থানে সমবেত হইলেন। বালুর উপর এক দিকে বসিয়া গেলেন মেয়েরা, অন্য দিকে বসিলেন ছেলেরা। নীচে দিয়া সবরমতী নদী বহিয়া চলিয়াছে, চারিদিকে গাছপালায় ঢাকা, উপরে নক্ষত্রখচিত নির্ম্মল আকাশ।

একটি অধ্যাপক তানপুরায় সুর দিয়া ভজন ধরিলেন,

"রঘুপতি রাঘব রাজারাম
পতিত পাবন সীতারাম।"

সকলে মিলিয়া সমস্বরে বার কয়েক গাহিবার ও অন্য সব স্তোত্র পাঠ করিবার পর আশ্রমের কার্য্যকর্ম্ম সম্বন্ধে আলোচনা হইতে লাগিল। আলোচনা সব গুজরাটীতে হইতেছিল বলিয়া বুঝিতে পারিলাম না। কিন্তু আমার মনে ছেলেবেলা

মহাত্মাজীর ঘর

হইতে রামায়ণ মহাভারতের গল্প শুনিয়া মুনি ঋষিদের আশ্রমের যে একটি ছবি ছিল, তাহা যেন জীবনে এই প্রথম উপলব্ধি করিতে লাগিলাম এই প্রার্থনার স্থানে। মহাত্মা গান্ধীও সকাল সন্ধ্যায় সকলকে লইয়া এই বালুর উপর বসিয়া উপাসনা করেন।

উপাসনার পর রাত্রি ৯টা পর্য্যন্ত কেউ কেউ গান, গল্প, দেশের আলোচনা ও ধর্ম্মের আলোচনা ইত্যাদি করিয়া কাটায়। সমস্ত দিনের পর সেই সময়টুকুই যেন ছুটি।

পরদিন নারায়ণ দাস গান্ধীকে বলিলাম, আমাকেও কিছু কাজ দিন। আমি ত বর্ত্তমানে আপনাদের অতিথি নই। তিনি একটু হাসিয়া বলিলেন, "আচ্ছা তা হবে।"

পর দিন আমার কাজ পড়িল আশ্রম পরিষ্কারের। আমি, রণছোড় শেঠ, রেণল্ডস্ এক বাড়ির ভিন্ন ভিন্ন ঘরে থাকিতাম। আমিও তাদের সঙ্গে কাজে লাগিয়া গেলাম। একটা সরু বাঁশের ডগায় ছড়ান ভাবে নারিকেল পাতার সরু কাঠি বাঁধা থাকে। একস্থানে দাঁড়াইয়া তিন-চার হাত দূরের আবর্জ্জনা সব টানিয়া আনিয়া এক স্থানে জড় করা হয়, পরে সবগুলি গর্ত্তে ফেলিয়া আগুন লাগাইয়া দেওয়া হইত। এই ভাবে যারা যে ঘরে থাকেন আশ-পাশের জায়গা সব তাঁরাই পরিষ্কার করেন। নেহাৎ দূর্ব্বাঘাসশূন্য বালুময় মরুভূমি বলিয়া, নতুবা এত যত্নে আশ্রম কত না সুন্দর দেখাইত।

মীরা বেনকেও আশ্রম পরিষ্কার করিতে কোন কোন দিন দেখিয়াছি।

স্থায়ী ও অস্থায়ী ভাবে কতকগুলি শৌচাগার আছে। স্থায়ী পায়খানার নীচে একটা টিন থাকে। শৌচাদির জল ভিন্ন টিনে পড়ে, পাশে স্তূপাকার বালুমাটি থাকে। যে যখন পায়খানা সারিয়া আসে মলের উপর বালু চাপা দিয়া আসে, তাহাতে কোন গন্ধ বা মাছি জমে না। পরে সেই মল ও মাটি সহ টিন দূরে সারের জন্য ফেলা হয়। অস্থায়ী পায়খানাগুলি সব ফলমূলের বাগানে থাকে। স্থানে স্থানে বিস্তর গর্ত্ত আছে, তাহাতে চতুষ্কোণ মোটা কাঠের মধ্যে চাটাই-ঘেরা. সেইগুলি গর্ত্তের উপর বসান থাকে। যে যখন পায়খানা সারিয়া আসেন, সে মাটি চাপা দিয়া আসে, তাহাতে পর পর গেলেও কাহারও কোন অসুবিধা হয় না। কোন গন্ধও থাকে না। এই ভাবে কয়েকদিন পর গর্ত্তটা ভরিয়া উঠিলে, অন্য গর্ত্তে বসাইয়া দেওয়া হয়। কিছু দিন পর মল সব মাটির সঙ্গে মিশিয়া গেলে, খুব ভাল সার হয়। তখন সেখানে বৃক্ষ—ফলমূলেরই বেশী—রোপণ করা হয়। খুব ভাল ভাল পেঁপে দেখিলাম। মীরা বেনকে প্রায়ই পায়খানা পরিষ্কার করিতে দেখিতাম।

আমি বলা সত্ত্বেও আমাকে পায়খানা পরিষ্কারের কাজ দিতেন না।

নদীতে স্নানের ও কাপড় কাচার জন্য ছেলেমেয়েদের ভিন্ন ভিন্ন ঘাট আছে। স্নানের সময় দেখিতাম ছোট ছেলেমেয়েরা নদীকে একেবারে তোলপাড় করিয়া তুলিত। জল ছিটাছিটি, হাসিতে হাসিতে গলিয়া ঢলিয়া স্রোতের মধ্যে গা ভাসাইয়া অনেক দূর চলিয়া যাইত। আবার বালুর উপর দিয়া দৌড়াইয়া আসিয়া জলে ঝাঁপাইয়া পড়িত। এই ভাবে তাদের অনেকক্ষণ জলখেলা চলিত। মরুনদীর প্রকৃত অভ্যর্থনা ও উপভোগ যেন এরাই করিতেছে। এদের এমন সরল স্ফূর্ত্তি ও হাসিভরা মুখ দেখিতে দেখিতে আমার কাপড় কাচার পরিশ্রম যেন অনেকটা লাঘব করিয়া দিত। একদিন একটি চঞ্চল প্রকৃতির ছেলে, জলখেলার ওস্তাদ, আমার পাশে চুপ করিয়া বসিয়া খাইয়া যাইতেছে দেখিয়া আমার হাসি পাইল। এক ভদ্রলোক জিজ্ঞাসা করিলেন. "কি, হাসছেন যে?" আমি কারণটা বলাতে তিনি বলিলেন "এর মধ্যেই চিনে নিয়েছেন।"

গোশালার বন্দোবস্ত বড় সুন্দর। গরু ষাঁড়গুলি বেশ হৃষ্টপুষ্ট, দেখিলেই মনে হয় তারা বেশ সুখী। ঘরগুলি পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন। কোথাও খড়কুটা গোবর জমিয়া থাকে না। অনবরত সেগুলি পরিষ্কার করিয়া গরুর ঘাসের জমিতে সারের জন্য ফেলা হয়। আশ্রমের মধ্যে এক গোশালার জন্যই ভৃত্য নিযুক্ত আছে।

একটা বড় জায়গায় দশ-বারটা বাছুর রাখা লইয়াছে, যে যার ইচ্ছামত চলাফেরা করে, মাঝখানে বড় একটা সৈন্ধব লবণের চাকা ঝুলিতেছে। যে যার ইচ্ছামত সেটা চাটে। কচি ঘাস পাতাও আছে। আমি একদিন কাছে গিয়া দাঁড়ান মাত্র একে একে সবগুলি কাছে আসিয়া গলা মাথায় হাত বুলাইয়া দেওয়ার জন্য হুড়াহুড়ি লাগাইয়া দিল। বাচ্চাগুলি বেশ হৃষ্টপুষ্ট, আহ্লাদে-আহ্লাদে গোছের চেহারা, দেখিলেই মনে হয় তাহাদের মাতৃ-স্তন যতটুকু প্রাপ্য তাহা হইতে তাহাদের বঞ্চিত করা হয় নাই। অবশিষ্ট দুধই আশ্রম-বাসীরা পায়।

একদিন আমার রান্নাঘরে জলতোলার কাজ পড়িল। একটা বড় ইন্দারায় অবিকল মালার আকারে ছোট ছোট সব টিনের পাত্র লাগান আছে। তাহাতে এমন ভাবে কল বসান, একটা ষাঁড় ঘানির মত ঘুরিলে সেই মালাটা অনবরত ইন্দারায় উঠা-নামা করিয়া প্রতি মিনিটে ভার ভার জল তোলে। সেই জল একটা বড় চৌবাচ্চায় গিয়া জমা হয়। সেখান হইতে একটা মোটা লোহার নল রান্না ঘরের নীচে চলিয়া গিয়াছে। সেখান হইতে পাম্প করিলে রান্নাঘরের উপরে যায়। বাকী জল থালা বাটি ধোয়ার জন্য জমা থাকে।

ষাঁড়টা বুঝিতে পারিয়াছিল তার যে চালক সে একজন নূতন আনাড়ি। কাজেই ঠিকমত ঘুরিতেছিল না। এইটা দূর হইতে একটি ভদ্রলোক লক্ষ্য করিয়া ষাঁড়টার চোখে একটা কাপড়ের টুক্‌রা বাঁধিয়া দিলেন। তখন ষাঁড়টা বেশ চলিতে লাগিল। ওদিকে ভারে ভারে জলও উঠিতে লাগিল।

এর মধ্যে দেখি মহাত্মাজীর স্ত্রী একটা তামার কলসীর গলায় দড়ি বাঁধিয়া সেই ইন্দারা হইতে জল তুলিতেছেন। দেখিয়া মনে হইল যেন কষ্ট করিয়াই জল তুলিতেছেন। আমি গিয়া কলসীটি তুলিয়া দিব ভাবিতেছি; আবার ভাবিলাম, আমি তুলিতে গেলে ভদ্রমহিলা না জানি কি
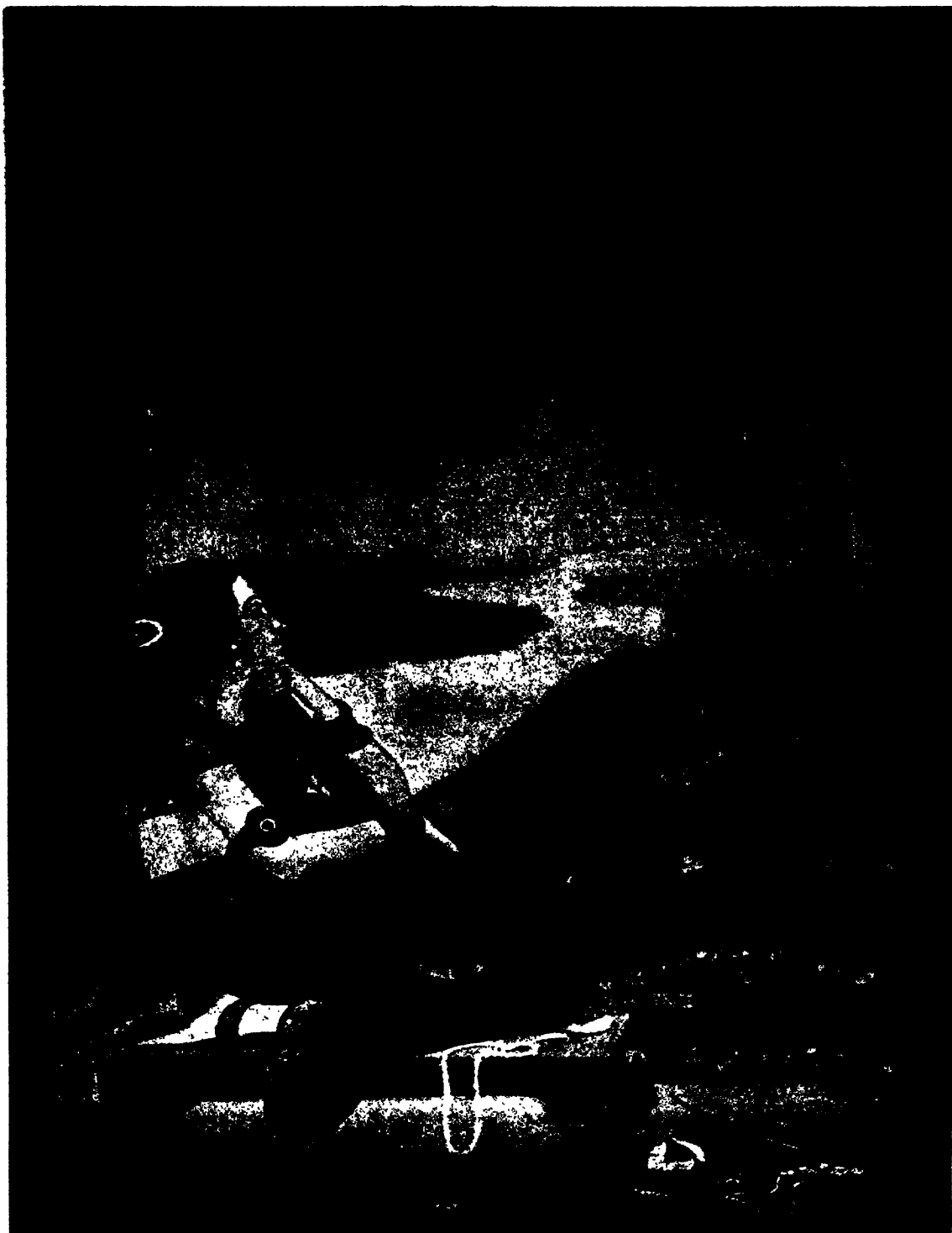
বিরহিণী

শ্রীবিনয়কৃষ্ণ সেনগুপ্ত

প্রবাসী প্রেস, কলিকাতা

ভাবেন। তাঁর ত জল তুলিয়া দেওয়ার ছেলেমেয়ের অভাব নাই। তবুও যখন নিজেই তুলিতেছেন এ অবস্থায় আমার যাওয়াটা ঠিক হইবে না। যাওয়া ঠিক কি-না এই দ্বন্দ্বে মনের মধ্যে বড় একটা অস্বস্তি বোধ করিতে লাগিলাম। ঘণ্টাখানেক পর এক ভদ্রলোক আসিয়া বলিলেন, "আর জল তুলতে হবে না।" ষাঁড়টাকে ঘরে রাখিয়া আসিতে বলিলেন। প্রকাণ্ড ষাঁড়টার গলার দড়ি ছাড়িয়া দেওয়া মাত্র আমাকে যেন পথ দেখাইয়া চলিতে লাগিল। গোশালায় গিয়াই তার ঘরে ঢুকিল, যেন তার কাজ শেষ হইল।

কয়েকটি ছোট ছেলেমেয়ের মুখে দেখিলাম বসন্তের দাগ। কয়েক দিন পূর্ব্বে আশ্রমে বসন্ত দেখা গিয়াছিল। তাহাতে একটি ছেলে মারা যায়। মহাত্মাজী না কি রাত্রিদিন রোগীদের সেবা-শুশ্রূষা লইয়া ব্যস্ত থাকিতেন।

সাধারণতঃ অসুখ-বিসুখে ঔষধ বেশী ব্যবহার না করিয়া প্রকৃতির উপর নির্ভর করিয়া থাকেন বেশী। জল আলো বাতাস পথ্য বিশ্রাম ইত্যাদির উপর বিশেষ দৃষ্টি রাখা হয়।

নারায়ণ দাস গান্ধী মহাত্মাজীর আত্মীয়, অতি অমায়িক ভদ্রলোক। সমস্ত মনপ্রাণ দিয়া যেন আশ্রমের কাজটি নিষ্ঠার সঙ্গে গ্রহণ করিয়াছেন। মুখখানা সব সময় হাসিতে ভরা। দেখিতাম ছেলেমেয়েদের যত আব্দার তাঁর কাছে।

আশ্রমে বাঙালী ছাড়া আর সমস্ত প্রদেশের ছেলেমেয়ে ছিল। কাগজ আসিত বিস্তর। বাঙালা কাগজগুলি বড় কেহ খুলিতেন না।

আশ্রমে প্রায় সব কাজই ছেলেমেয়েরা মিলিয়া মিশিয়াই করিতেন। অথচ পরস্পরের মধ্যে তাঁহাদের কোন প্রকার সঙ্কোচ দ্বিধা বা জড়তা ছিল না। সরল, শুদ্ধ ও সহজ ভাবে পরস্পর পরস্পরের সঙ্গে মেলা মেশা করিত। তার কারণ মনে হয় গুজরাট ও মহারাষ্ট্রে পরদা-প্রথা না থাকাতেই এতটা সম্ভবপর হইয়াছে, তার উপর মহাত্মাজীর প্রভাব ত আছেই। আশ্রমের সেই সব প্রদেশের ছেলে-মেয়েরাই ছিলেন বেশী।

অহিংস-সংগ্রামের উত্তেজনা সমস্ত ভারতবর্ষময় তখন দেখা দিয়াছিল, অথচ তাহার মূল উৎস সবরমতীতে কোন উত্তেজনার ভাব আদৌ ছিল না। ধীর স্থির ভাবে যে যার কাজ করিয়া চলিয়াছে।

এখানে পাচক, ভৃত্য, ধোপা, মেথর, ধনী, দরিদ্র, ব্রাহ্মণ, যবন বলিয়া কেহ কিছু নাই। আহারে, পোষাকে, পরিচ্ছদে বিধি-ব্যবস্থায় কোথাও কোন বৈষম্য নাই। ধর্ম্মে, সমাজে ও রাষ্ট্রে যে একটা মিথ্যা বৈষম্য চলিয়া আসিতেছে—তাহার কাছে মাথা না নোয়াইয়া সত্যকে আশ্রয় করিয়া দেশসেবাই যেন সবরমতীর আদর্শ।

প্রত্যেক মানুষের ব্যবহারিক জগত ও অন্তর্জগত বলিয়া দুইটা দিক আছে। এখানে ব্যবহারিক জগতে কাহারও সঙ্গে কোন পার্থক্য নাই। সকলকেই যাহার যাহা কাজ নিজেকেই করিয়া লইতে হয়।

আর অন্তর্জগতে যে যাহার শক্তি, রুচি অনুযায়ী যে যে-স্তরে উঠিয়াছে তাহাকে তাহার উপযুক্ত আদর যত্ন, সম্মান ভক্তি সকলে নিজেদের উপলব্ধি অনুযায়ী স্বতঃপ্রণোদিত হইয়াই দিয়া থাকে, কোন বিধিব্যবস্থা বা শ্রেণী ভাগ করিয়া তাহা আদায় করা হয় না।

মীরা বেন (মিস্ শ্লেড) ও মিঃ রেণল্ডসকে যখন দেখিতাম তখন মনে প্রশ্ন উঠিত তাঁহারা কোন প্রেরণায় এ জীবন যাপন করিতেছেন? মীরা বেন মুণ্ডিত মস্তকে মোটা পদ্দরের সাড়ী পড়িয়া রাতদিন এই গরমে খাটিয়া চলিয়াছেন। যে টানে বিলাতের সম্ভ্রান্ত ঘরের বৃটিশ য়্যাডমিরালের মেয়ে, আজন্ম সুখস্বাচ্ছন্দ্যে ভোগবিলাসে লালিত পালিত—তাঁর প্রাণে যখন বর্ত্তমান সভ্যতা ও বৈষম্যের দাহ জ্বলিয়া উঠিল—তখন ফরাসী দেশে মহামনীষী রমা রঁলা তাঁহাকে মহাত্মা গান্ধীর সন্ধান দিলেন, তারপর হইতে মহাত্মাজীর বই পড়িয়া তাঁর আদর্শের জন্য আত্মীয়স্বজন দেশধর্ম্ম সংস্কার সব ছাড়িয়া সবরমতীতে নিজকে নিবেদন করিয়া মীরা বেন নাম গ্রহণ করিলেন—

> "শুনে তোমার মুখের বাণী
> আসবে ঘেয়ে বনের প্রাণী;
> হয়ত রে তোর আপন ঘরে
> পাষাণ হিয়া গলবে না।
> তা বলে ভাবনা করা চলবে না—"

গান্ধী যেন অন্তরে এই বিশ্বাসকে উজ্জ্বল শিখার ন্যায় জ্বালিয়া, ঘোর তিমিরাবৃত বন্ধুর পথে মন্থর গতিতে একলা

চলিয়াছেন। যে তাপসের তপঃধারা ক্ষুদ্র অশ্বত্থের বীজ-কণারূপে লোকচক্ষুর অন্তরালে রহিয়াছে, কে জানে একদিন এই বীজকণা হইতে শত শত শাখা-প্রশাখা বিস্তার করিয়া কত শত তপ্ত প্রাণকে ছায়া ও আশ্রয় দান করিবে না।

রাত্রি চারটায় সুপ্তিতে শয়ন আশ্রমবাসীদের ঘণ্টায় ডাকিতে থাকে—"ওঠ জাগ, ওঠ জাগ, ওঠ জাগ।" সবরমতী নদীতীরে আশ্রমবাসী সকলে সমবেত হইয়া ভোরের শুকতারাকে সাম্নে রাখিয়া প্রার্থনা করে—

"ন ত্বহং কাময়ে রাজ্যং, ন স্বর্গং ন পুনর্ভবম্ ;
কাময়ে দুঃখ তপ্তানাং প্রাণিনামার্ত্তিনাশনম্ ॥

আমি রাজ্য চাহি না, স্বর্গ চাহি না, পুনর্জন্ম চাহি না আমি কেবল জীবগণের দুঃখ নাশ চাহিতেছি।

দেবাঃ ন জানন্তি

শ্রীনির্ম্মলকুমার রায়

রেল-গাড়ীতে কোথাও যাইতে হইলে আমার একটি নিয়ম আছে, একা থাকিলে আধ ঘণ্টা আর শ্রীমতী সঙ্গে থাকিলে ৪৫ মিনিট হাতে রাখিয়া বাহির হই। বন্ধু-বান্ধবেরা ঠাট্টা করিয়া বলেন, তোমার টিকিট কিনিতে হয় না; প্রথম শ্রেণীতে যাত্রীর ভিড় নাই, এ তোমার নার্ভাস্‌নেস্; তুমি রেল অফিসারের যোগ্যই নও। রেল অফিসারের যোগ্য যে নই তাহা জানি; টেনিস্ আসে না; বাজি রাখিয়া তাস খেলিতে চাই না; বোতলবাহিনীর আরাধনা করি না; কথা বলিতে অশ্রাব্য ইংরেজী বুলি আওড়াই না; এমন কি, ১৫ মিনিট প্ল্যাটফর্মে পায়চারি করিয়া ছাড়িবার পর চলন্ত গাড়ীতে লাফ দিয়া উঠি না, মনের দুঃখ মনে চাপিয়া বলি, গাড়ী ছাড়িবার ১ ঘণ্টা আগে ষ্টেশনে আসিলে কোন ক্ষতি নাই, কিন্তু এক মিনিট পরে আসিলে গাড়ী পাওয়া যায় না।

কিউল প্যাসেঞ্জার ৯নং প্ল্যাটফর্ম হইতে ১১-৪১ মিনিটের সময় ছাড়ে; হোটেল হইতে হাওড়া ষ্টেশনে যাইতে ১৫ মিনিট লাগে, ঘড়ি দেখিয়া ১০-৪০ মিনিটের সময় হোটেলের নীচে নামিলাম। শ্রীমতীকে এই প্রতিজ্ঞা করাইয়া লইয়া আসিয়াছিলাম যে, কলিকাতাতে নিতান্ত প্রয়োজন ব্যতিরেকে কিছু কিনিতে পারিবে না। কিন্তু দেখিলাম, পালং শাক, উচ্ছে, আলু, মুগডাল, আম, লিচু, গোলাপজাম কিছুই বাদ পড়ে নাই, জানিতাম প্রতিবাদ করা বৃথা, কারণ ইহাদের মধ্যে কোন্‌টাই বা নিতান্ত প্রয়োজনীয় নহে? বেশী বেশী শাক ও উচ্ছে খাইতে ডাক্তার আমাকে উপদেশ দিয়াছে; আলু মুগডাল ত জীবনযাত্রার পক্ষে একান্ত অপরিহার্য্য; আম, লিচু, গোলাপজাম প্রথম বাহির হইয়াছে, না কিনিলে চলে কি!

তবু একটু বিরক্ত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, নিজের বিছানা বাক্স ইত্যাদিতে ট্যাক্সি বোঝাই হয়েছে, তারপর এতগুলি জিনিষ কোথায় ধরবে। তিনি উত্তর দেওয়া প্রয়োজন মনে করিলেন না; ড্রাইভারের পাশে, আমার পা ও কোলের উপর সব জিনিষ চাপাইয়া দিলেন।

তিন দিন হোটেলে ছিলাম, ডাকাডাকি করিয়া, চেঁচাইয়া এক গ্লাস জল পর্য্যন্ত পাই নাই। সমস্ত ঘরখানি তিন দিনে একবারও সম্মার্জ্জিত হয় নাই; দুই বেলা ঠাণ্ডা ভাত ও লুচি গলাধঃকরণ করিয়াছি। কিন্তু যাইবার সময় দেখিলাম গেটের কাছে অন্ততঃ ছয় জন দাঁড়াইয়া আছে—দুইটি চাকর, ঠাকুর, দারোয়ানযুগল ও ঝাড়ুদার, প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলাম এক পয়সাও বক্‌শিস্ দিব না, আর কেনই বা দিব? হোটেলে টাকা দিয়াছি আবার এই উপদ্রব কেন? কিন্তু সেলামের উপর সেলাম পড়িতে লাগিল। বাক্স বিছানা বোঝাই করিবার অজুহাতে দুই চাকর ও দুই দারোয়ান মিলিয়া এমন অনাবশ্যক টানাটানি আরম্ভ করিল যে, পলাইতে পারিলে বাঁচি। মনি-ব্যাগটি খুলিয়া কয়েকটি আধুলি বাহির করিতে যাইব এমন সময় শ্রীমতী হাত হইতে বাজপাখীর মত ছোঁ মারিয়া ব্যাগটি ছিনাইয়া লইলেন এবং এমন ভাবে আমার দিকে চাহিলেন যেন মনে হইল কি একটা অপকর্ম্ম করিতে যাইতেছিলাম। সম্মানে আমার

াগিল। এতগুলি পুরুষের সম্মুখে নারীর কাছে এমন পমানিত হইলাম। বলিলাম, "এ কি অন্যায়, আমার টাকা ামি খরচ করতে পাব না? এ তোমার জুলুম। তিনি বারেও উত্তর দেওয়া নিষ্প্রয়োজন মনে করিলেন।"

মনটা খুঁৎ খুঁৎ করিতে লাগিল। যেমন করিয়া হোক াহাকে বুঝাইয়া দিতে হইবে যে, এ তাহার অন্যায়। যা াক, চাকরগুলি কিছু তো করিয়াছে। আর বেচারারা রীব মানুষ, অল্পই মাহিনা পায়। একটা সুযোগ খুঁজিতে গিলাম। চাহিয়া দেখি ট্যাক্সিটা পুরাণো, অনেক জায়গায় ঙ চটিয়া উঠিয়া গিয়াছে। হুডটা অসংখ্য বড় বড় তালিতে মন হইয়াছে, বুঝা যায় না যে, আসল হুডের অংশ বেশী তালি বেশী। ড্রাইভার একটি বাঙালী, ঘর্ম্মসিক্ত রুগ্ন চেহারা খিয়া বুঝিলাম তাহার তেমন সুবিধা চলিতেছে না। বিধা চলিলে অমন একটা বিশ্রী খাকি সার্ট গায়ে দেয় না, ার গাড়ীর রঙটা অন্ততঃ বদলায়। ঝাল মিটাইতে ই খারাপ ট্যাক্সির জন্য শ্রীমতীকেই দায়ী করিয়া বলিলাম, কি ছাই পুরাণো ট্যাক্সি, তোমার যেমন কাজ।" "নিয়ে যাবে ক তোমাকে হাওড়া ষ্টেশনে, গাড়ী নতুন পুরোণো দিয়ে কি বে, চললেই হ'ল।"

"কিন্তু গাড়ীর চেহারাটা দেখেছ, এর এবার মিউজিয়ামে ওয়া উচিত।"

"গাড়ী দেখবার জন্য নয় চড়বার জন্য।"

ততক্ষণ গাড়ী হ্যারিসন রোড ধরিয়া চলিতে আরম্ভ রিয়াছে। ড্রাইভার আমাদের কথাবার্ত্তা শুনিতে পাইয়াছে। বলিল, "হুজুর, যে খারাপ দিন পড়েছে তাতে পেটচালানই য়, কোন রকমে খেয়ে আছি।"

"বাঙালীদের পেটচালানো তো দায় হবেই, কলকাতা ভ'রে াঞ্জাবীরা ট্যাক্সি চালিয়ে রাজার হালে আছে, আর তোমাদের লছে না।"

"সে হুজুর বলবার কথা নয়! পাঞ্জাবীরা যা করে পয়সা রে তা বাঙালীর পক্ষে অসম্ভব।"

কিছুক্ষণ পূর্ব্বে একপশলা বৃষ্টি হইয়া গিয়াছে। একটা মোটের মত করিয়া উত্তাপের জ্বালা আরও বাড়িতেছিল। ই দ্বিপ্রহর রৌদ্রে ভাঙা ট্যাক্সিতে বসিয়া ড্রাইভারের দুঃখ-াহিনী শুনিবার আমার কোন আগ্রহ ছিল না পথের জনস্রোত আর দোকানের দিকে মনোযোগ দিলাম। চলন্ত যান হইতে চলমান জনস্রোত দেখিতে বেশ। খস্—স্ করিয়া কলেজ ষ্ট্রীটের মোড়ে গাড়ী থামিল। আবার চলিবার সময় ফট ফট করিয়া দুইবার মিস্‌ফায়ার করিল। একবার অস্বস্তি সহকারে ঘড়ির দিকে চাহিলাম, ৫৫ মিনিট বাকী আছে। চিত্তরঞ্জন এভিনিউ পার হইবার সময় গাড়ীটা আবার তিনটা শব্দ করিল এবং কেমন অসম গতিতে চলিতে লাগিল। যখন চলিতেছে, তখন খুব জোরেই; তারপরই আবার দু-একবার মিস্‌ফায়ার করিয়া হঠাৎ একেবারে আস্তে। আমি একবার ড্রাইভারের দিকে চাহিয়া বলিলাম, "কি হে?"

"হুজুর কিছু নয়।"

একটা শোঁ-ও—ও শব্দ হইতে লাগিল যেন কিছুতে বাতাস ঢুকিতেছে। দেখিলাম শ্রীমতীর মুখে ঈষৎ চঞ্চলতার ভাব। মনে মনে অত্যন্ত বিরক্ত হইতেছিলাম এবং পয়সা খরচ করিয়া অনর্থক এই অসুবিধা ভোগ করিবার জন্য তাঁহাকেই দায়ী করিতেছিলাম। আমাকে বক্‌শিস্ দিতে না দিয়া যে অন্যায় করিয়াছে তাহারই প্রতিফল স্বরূপ যে এরূপ হইতেছে তাহা এক একবার মনে হইতেছিল। কোনরকমে এবার ষ্টেশনে যাইতে পারিলেই হয়। ফট্ ফট্ খস্— স্ করিয়া একটা প্রকাণ্ড ধাক্কা খাইয়া গাড়ীটা চিৎপুরের মোড়ে একেবারে অতর্কিতে থামিয়া গেল। আর সহ্য করিতে পারিলাম না। বলিয়া উঠিলাম, "এবার নেও, গাড়ী ফেল্ নিশ্চিত। এই ড্রাইভার, দুসরা ট্যাক্সি বোলাও।"

"না হুজুর, এখনই গাড়ী চলবে," বলিয়া ড্রাইভার নামিয়া গাড়ীর বনেট খুলিল। শ্রীমতী নিজের ঘড়িটি দেখিয়া অত্যন্ত ধীরতার সহিত অভিমত প্রকাশ করিলেন এখনও ঢের সময় আছে, বিশেষ কিছু হয় নাই; তেল নাই। আমাকে নামিতে হুকুম করিলেন।

আমি মোটরের তেল পকেটে করিয়া বেড়াই না, ট্যাক্সিওয়ালাদের তেল না লইয়া রাস্তায় ট্যাক্সি বাহির করাও স্বাভাবিক ঘটনা নয়। অথচ উনি নির্ব্বিবাদে বলিলেন যে কিছু হয় নাই। ড্রাইভার প্লাগ কয়টি খুলিয়া সাফ করিল এবং যথাস্থানে লাগাইল, ষ্টার্ট দিতে চেষ্টা করিল; ব্যাটারি শব্দ করিয়া মরিল। কিন্তু লোহার যন্ত্রে প্রাণসঞ্চার হইল না। আমি ক্রমশঃই অসহিষ্ণু হইয়া উঠিতেছিলাম।

৪০ মিনিট বাকি। কাছেই মেলা গাড়ী, ডাকিলেই হয়। ড্রাইভার ক্রমাগতই আশ্বাস দিতেছিল, এখনই ঠিক হইয়া যাইবে। হঠাৎ শ্রীমতী পার্শ্ব ত্যাগ করিয়া ড্রাইভারের আসনে আসীন হইলেন এবং আমাদিগকে নিকটবর্ত্তী তেলের পাম্পের দিকে গাড়ী ঠেলিতে হুকুম করিলেন। আমি প্রতিবাদ করিয়া বলিলাম, "গাড়ী খারাপ হইয়াছে, ঠেলিয়া লাভ নাই।" তিনি শুধু গম্ভীর স্বরে বলিলেন, "কিছু হয় নাই, শুধু তেল নাই। . ঠেল।"

এক সময়ে মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং পাস করিয়াছিলাম। কিন্তু আজ তাহা কোন কাজেই লাগিল না। একটি কথা শুনিয়াছিলাম "হুকুমের নৌকো শুকনো ডাঙা দিয়ে চলে।" সেদিন বেলা ১১টায় চৈত্রের খররৌদ্রে ঘর্ম্মাক্ত কলেবরে জনসমাকুল চিৎপুরের মোড়ে এই প্রবাদ বাক্যটির অর্থ মর্ম্মে মর্ম্মে অনুভব করিলাম। গাড়ী পাম্পের কাছে পৌছিল; এক গ্যালন তেল লওয়া হইল, শুনিলাম তেলওয়ালার সঙ্গে ড্রাইভারের কি কথাবার্ত্তা হইতেছে। একবার ঘড়ির দিকে চাহিলাম, আর মনে মনে ওর এই অসীম সহিষ্ণুতা ও ড্রাইভার বেটার বজ্জাতি দেখিয়া চটিতে লাগিলাম। এ কি অন্যায়; এ গাড়ীতে আমাদের যাইতেই হইবে, মাত্র ২৫ মিনিট সময় আছে, সঙ্গে মালপত্র বড় কম নয়, গাড়ী বদলাইতে হইবে; বড় বাজারের ভিড় আছে, হঠাৎ রাস্তার লোক ধরিয়া এ কি করুণা! যাহা সন্দেহ করিয়াছিলাম তা-ই, ড্রাইভারের কাছে পয়সা নাই; সে বলিল, চার আনা কম পড়িয়াছে, অনর্থক সময় নষ্ট হইবার ভয়ে তৎক্ষণাৎ একটি সিকি খুলিয়া দিলাম। ড্রাইভার গাড়ী ষ্টার্ট দিল। গাড়ী একটু চলিল, কিন্তু যেমনই গীয়ার বদল করিতে যাইবে অমনি রাস্তার মাঝখানে থামিয়া গেল। ড্রাইভার গীয়ার ছাড়াইবার জন্য চেষ্টা করিল, কিন্তু ফল হইল না। হঠাৎ লোকটা ক্ষেপিয়া গেল না কি? প্রাণপণে ষ্টার্ট দিল। ব্যাটারি প্রাণশক্তি নিঃসরণের সঙ্গে সঙ্গে শব্দ করিয়া চলিল, কিন্তু গাড়ী নড়িল না। ড্রাইভারকে বুঝাইলাম, চেষ্টা বৃথা, ব্যাটারিটা নষ্ট হইয়েছে, এমন কি য়্যাকসিডেণ্ট হইতে পারে।

"না হুজুর, এখনই ঠিক হবে।"

শ্রীমতী মত প্রকাশ করিলেন, গাড়ীর কার্‌বুরেটার পেট্রোল ট্যাঙ্ক হইতে উঁচুতে অতএব তেল যাইতে সময় লাগে, এজন্য অস্থির হইয়া লাভ নাই। অনেক ঠেলাঠেলির পর গাড়ী চলিল, মনে মনে দুর্গানাম জপিতে লাগিলাম, কারণ জানিতাম হয় এই গাড়ীতেই ষ্টেশনে যাইতে হইবে নচেৎ যাওয়া হইবে না। ফট্‌-ফট্‌ করিয়া দুইবার মিসফায়ার হইল এবং কিছু কাঁচা পেট্রোলের ধোঁয়া বাহির হইল। হ্যারিসন রোডে গাড়ীখানা পড়িতেই একেবারে থামিয়া গেল, আর থাকিতে পারিলাম না, বলিলাম, "তোমার কি যাবার ইচ্ছা নাই? তুমি না হয় থাক। আমি পরের চাকরি করি, আমাকে যেতেই হবে"।

"আর পাঁচ মিনিট দেখ, তারপর এক ট্যাক্সি ডেকো।"

তখন ২০ মিনিট বাকি, ষ্টেশনে যাইতে অন্ততঃ ১০ মিনিট লাগিবে। ড্রাইভার বেটা নির্ল্লজ্জের মত বলিল, "তাই বেশ মা, আমি এই ঠিক ক'রে নিলাম আর কি; এই বলিয়া সে এটা সেটা খুলিতে বসাইতে লাগিল, মাঝে মাঝে এক একবার সেলফষ্টার্ট দেয়, কোন ফল হয় না। লোকটা এতক্ষণে ঘামিয়া উঠিয়াছে। তাহার মুখে একটা অসহায় ক্রোধের ভাব। যে যন্ত্রকে সে নিজের ইচ্ছামত চালাইয়াছে, যে তাহার অঙ্গুলির হেলনে দৌড়াইয়াছে, থামিয়াছে, যাহার প্রত্যেক অঙ্গ রন্ধ্র তাহার মুখস্থ সে অমন অবাধ্য হইল কি করিয়া। গাড়ীটার দিকে এক একবার তাকাইতে লাগিল। যেন বলিতে চায়, হায় রে লোহার যন্ত্র, এমন সময়ে এই বেইমানি করলি! অবস্থা তাহার সচ্ছল নহে। দিনের হয়ত এই প্রথম ভাড়া, অবশেষে পাঁচ মিনিট গেল। এবার শ্রীমতী জানাইলেন যে, আর দেরী করা চলে না, ড্রাইভার নূতন ট্যাক্সি ডাকিল এবং নিজেই জিনিষপত্র উঠাইয়া দিল, আমি প্রথমে গাড়ী থামিতেই মিটার দেখিয়া রাখিয়াছিলাম যে আট আনা উঠিয়াছে। হয়ত লোকটাকে দিতাম, কিন্তু তাহার বজ্জাতির জন্য মনে মনে অত্যন্ত চটিয়াছিলাম। বলিলাম "আমার চার আনা পয়সা ফিরিয়ে দাও।

লোকটা পকেটে হাত দিল। জানিতাম সেখানে কিছুই নাই। শ্রীমতী হঠাৎ তাঁহার হাতব্যাগটি খুলিয়া একটি টাকা হাতে লইয়া বলিলেন, "তোমার কোন দোষ নেই। হোটেল থেকে ষ্টেশন পাঁচসিকা ওঠে। সাহেব চার আনা দিয়েছেন। এই নাও একটাকা। এই ড্রাইভার, চালাও।"

শোঁ করিয়া নূতন চকচকে ট্যাক্সি চলিতে আরম্ভ করিল। শ্রীমতীর মুখের দিকে একবার বিস্মিত হইয়া চাহিলাম। ইহাকে লইয়াই কি আজ পাঁচ বৎসর ঘর করিতেছি।

উচ্চারণ ও বানান

শ্রীবীরেশ্বর সেন

মুদ্রাযন্ত্রের কার্য্যবিষয়ে আমি সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ। অজয় বাবুর প্রবন্ধ পড়িয়া বুঝিলাম যে, বাংলা মুদ্রাযন্ত্রের কার্য্য একটা অতিশয় দুষ্কর ব্যাপার। এই দুষ্কর ব্যাপারকে সুকর করা যায় কি না এই কঠিন সমস্যার একটা সরল সমাধান আমারও মনে উদিত হইয়াছে। তাহা অতি ঋজু এবং বিজ্ঞান ও যুক্তি সম্মত হইলেও বোধ হয় অদূর ভবিষ্যতের মধ্যে অবলম্বিত হইবে না। কেন-না, যাহা সর্ব্বাপেক্ষা সরল পন্থা লোকে তাহাই সর্ব্বাপেক্ষা কঠিন মনে করে। ধর্ম্মবিষয়, রাজনীতি বিষয়, সামাজিক বিষয়, এবং অন্য কোন বিষয়েই আমরা সরল যুক্তিযুক্ত এবং বৈজ্ঞানিক পন্থার অনুসরণ করি না। তথাপি আমার মনে যাহা হইয়াছে তাহা সংক্ষেপে বলিয়া ফেলি।

আমার মত এই যে, ক হইতে হ পর্য্যন্ত ৩৩টা ব্যঞ্জন বর্ণ থাকিবে। ইহা ছাড়া প্রচলিত য়, ড় ঢ়, ং, ঃ এবং ঁ থাকিবে। এই ৩৯টা ব্যঞ্জন বর্ণ ভিন্ন বাংলা এবং সংস্কৃত লিখিতে আর কোনও ব্যঞ্জনের প্রয়োজন নাই। একটা মাত্র ব দিয়া যখন সংস্কৃত লেখা বহুকাল হইতে চলিয়া আসিতেছে তখন এখনও চলিবে। কিন্তু ভিন্ন ভিন্ন দেশ হইতে আমাদের ভাষায় এমন কতকগুলি ধ্বনির আগম হইয়াছে যাহা আমরা সর্ব্বদাই ব্যবহার করিয়া থাকি। ঘড়িটা fast, pleasure party, leisure hour, violet ফুল, এরূপ আমরা সর্ব্বদাই বলিয়া থাকি। অর্থাৎ f, z, zh এবং v আমরা ইংরেজীর মতই উচ্চারণ করি। এই চারিটা ধ্বনি অভিধানে প্রদর্শন করিবার জন্য ফ, জ, ঝ-র নীচে বিন্দু এবং ভ় থাকা উচিত। ইহা ভিন্ন আরবী পারসী যে-সকল শব্দে খে, কাফ্ এবং গাইন্ আছে এমন বহু শব্দও বাংলায় প্রবেশ করিয়াছে এবং যাহা আমরা নিত্য ব্যবহার করি। এই সকল শব্দ আমরা একেবারে বাংলা করিয়া ফেলিয়াছি, যেমন—খয়রাৎ, খবর, খুব, কায়দা, গরিব, গুরবা। কিন্তু অভিধানে ধ্বনিগুলি নির্দ্দেশ করিবার জন্য খে, কাফ্ এবং গাইন্ স্থানে যথাক্রমে নীচে বিন্দুযুক্ত খ, ক এবং গ অথবা ঘ রাখা কর্ত্তব্য। সুতরাং ব্যঞ্জন বর্ণ মোট ৪৬টা।

স্বর বর্ণ ৯ ৯৯ ঌ লইয়া মোট ১৪টা থাকা উচিত। "সংস্কৃতে আছে কিন্তু বাঙ্গলায় ৯ ৯৯ ঌ নাই।" অন্তত এই কথাটা বাংলা ব্যাকরণে লিখিবার জন্যও ৯ ৯৯ ঌ থাকার প্রয়োজন। আর একটা থাকিবে হ (লুপ্ত অ)। অভিধানের জন্য সংস্কৃত অ এবং ইংরেজী cat শব্দের a জ্ঞাপন করিবার জন্য একটা অক্ষর থাকা উচিত বলিয়া মনে হয়। তাহা হইলে স্বর-সংখ্যা হয় ১৭টা। সুতরাং অক্ষরের মোট সংখ্যা হইবে ৬৩।

ব্যঞ্জন বর্ণগুলিকে সর্ব্বত্র হসন্ত বিবেচনা করিতে হইবে। তাহার পর স্বর বসিবে। অর্থাৎ যেরূপে রোমীয় এবং গ্রীক্ অক্ষর লিখিত হইয়া থাকে। যথা, কর্ত্তব্যপরায়ণ—ক অ র ত ত অ ব য অ প অ র আ য অ ণ। এরূপে লেখা ও ছাপা প্রথমদৃষ্টিতে বড়ই বীভৎস এবং বিভীষণ বোধ হইবে। কিন্তু গ্রীক্ এবং রোমীয় বর্ণ সকল যখন এইরূপ রীতিতে চলিতেছে তখন আমাদের এইরূপে লিখন ও মুদ্রণে এই রীতি অবলম্বন না করিবার লেশ মাত্র কারণ থাকিতে পারে না।*

এইরূপ লিখন ও মুদ্রণের প্রথা প্রবর্ত্তিত হইলে শিশুরা এখনকার এক-দশমাংশ সময়ে বর্ণমালা আয়ত্ত করিতে পারিবে। মুদ্রণকার্য্যের জটিলতা একেবারে অন্তর্হিত হইবে। আমরা যখন s t r e a m পড়িতে কিছুমাত্র অসুবিধা বোধ করি না, তখন স্ত্রী স্ ত্ র্ ঈ লিখিলেই বা অসুবিধা হইবে কেন? বয়োবৃদ্ধদিগেরও এই নূতন রীতি অভ্যাস করিতে এক মাসের অধিক লাগিবে না।

এরূপ করিলে বর্ণ এবং অক্ষর একার্থবাচক হইবে, স্বরের ও ব্যঞ্জনের মর্য্যাদা সমান হইবে, একটা অক্ষরের উপর আর একটা এবং তদুপরি আর একটা চড়িয়া বসিয়া থাকিতে পারিবে না। প্রচলিত প্রণালীতে স্বরগুলি ডায়াক্রিটিক্যাল চিহ্ন মাত্র। আরবী-পারসীর জের, জবর, পেশের মত।

প্রস্তাবিত পরিবর্ত্তনে বর্ণমালা হইতে অস্বাভাবিকতা একেবারে দূর হইবে। ক + ই = কি অর্থাৎ যে ই কয়ের পরবর্ত্তী তাহা অস্বাভাবিকভাবে পূর্ব্ববর্ত্তী হয়। তখন ফলা এবং া ি ী ু ূ ৃ ে ৈ ো ৌ একেবারে দূর হইবে।

কিন্তু আমাদের কি কখন এমন সুমতি হইবে যে, আমরা জটিলতা ও অস্বাভাবিকতা ত্যাগ করিয়া সরল ও স্বাভাবিক পন্থার অনুসরণ করিব? এবং আমাদের বর্ণগুলিকে স্বাধীনতা দিয়া আমরা নিজেও স্বাধীনতার পথে একটু অগ্রসর হইব?

এখন উচ্চারণ এবং বানানের কথা বলিব। অজয় বাবু একজন নাট্যশালার পরিচালকের কথা বলিয়াছেন যিনি হিংস্র শব্দটাকে হিংস্র রূপে উচ্চারণ করেন। উক্তিটায় আমোদ বোধ হইল। ইংলণ্ডে যাঁহারা ধর্ম্ম বা রাজনীতি বিষয়ে বক্তৃতা করেন তাঁহাদের উচ্চারণ আদর্শ। তাহা শুনিয়া অন্য লোক সেইরূপ উচ্চারণ করে। নাট্যশালায়ও অতি সাবধানে উচ্চারণ শেখান হয়। আমাদের কাছে বাংলা [illegible] উচ্চারণ যেন ধর্ত্তব্যের মধ্যেই নয়। আমরা (ং) অনুস্বারের সংস্কৃত উচ্চারণ করি না—ঙ রূপে উচ্চারণ করি। সুতরাং হিংস্র শব্দের উচ্চারণ হইবে হিঙস্র। কিন্তু ঙ টাকে স্বরান্ত করিয়া হিঙস্র বলা বড়ই অন্যায়। বাচ্ছা শব্দের সংস্কৃত উচ্চারণ বাচ্চা। এখন আর কেহই বাচিঙ্গা বলে না।

যজ্ঞ, বিজ্ঞ, জ্ঞান প্রভৃতি শব্দের সংস্কৃত উচ্চারণ, যজ্ঞ, বিজ্ঞ, জ্ঞান। আমরা যে এই উচ্চারণ গ্রহণ করিব তাহা বোধ হয় না। আমরা জ্ঞ কে গ্গ বলি। বঙ্গের বাহিরে জ্ঞ কে কেহ বলেন জ্ঞন, কেহ বলেন দ্ন।

এক ব্যক্তি জিজ্ঞাসা করিলেন যে জ্ঞান প্রভৃতি শব্দের জ্ঞ অংশ যে কখনও জ্ঞ রূপে উচ্চারিত হইত তাহার প্রমাণ কি? আমার উত্তর—সন্ধির সূত্রানুসারে তৎ + জ্ঞান = তজ্জ্ঞান। যদি জ্ঞ উচ্চারিত না হইত তাহা হইলে সন্ধির ফল তদ্‌জ্ঞান হইত।

বিদ্যানিধি মহাশয়ের লেখায় জানিলাম যে, ৺ হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয়ও অন্যান্য বাঙালী পণ্ডিতের মত অশুদ্ধ রূপে সংস্কৃত উচ্চারণ করিতেন—আর্য্য না বলিয়া আর্জ্য বলিতেন। শাস্ত্রী মহাশয়ের সহিত আলাপ ছিল, কিন্তু তাঁহাকে সংস্কৃত বলিতে শুনি নাই। সে যাহা হউক যজুর্বেদ পড়িবার সময় য কে জ-রূপে ব্যবহার করিতে হয়। যজুর্বেদ পড়িবার সময়ে সূর্য্য-কে সূর্জ্জ যে কে জে ইত্যাদি পড়িতে হয়:

---

* এইরূপ রীতি চালাইবার পক্ষে আমি বহুপূর্ব্বে লিখিয়াছিলাম।—প্রবাসীর সম্পাদক।

এই প্রসঙ্গে মনে একটা প্রশ্নের উদয় হইতেছে। কার্য্য শব্দের [illegible]লায় কাষ লেখা উচিত না কাজ লেখা উচিত। আমি নিজে কাজ [illegible]খি। কাষবাদীরা বলিবেন কার্য্য শব্দে যখন য আছে তখন কাষ [illegible]খাই ঠিক। কাজবাদীরা বলিবেন শব্দটা যখন সংস্কৃত নহে তখন [illegible]চ্চারণানুরূপ কাজ লেখাই উচিত। উত্তরে কাষবাদীরা বলিতে পারেন [illegible], যখন, যেমন, যে, প্রভৃতি শব্দও সংস্কৃত নহে; তবে সেই সেই [illegible] উচ্চারণানুযায়ী জ দিয়া লেখা হয় না কেন? কাজবাদীর পক্ষ হইয়া [illegible]মি বলি যাওয়া, যেমন প্রভৃতি শব্দে য দিয়া লেখা অনুচিত এবং কালে [illegible]হার সংশোধন হইবে। কিন্তু কাষ লিখিলে শরীরজ্ঞাপক সংস্কৃত কায় [illegible]ব্দের সহিত অভিন্ন হইয়া যায় বলিয়াও কাজ লেখা উচিত। কাষবাদীরা [illegible]স্কৃত পুত্র শব্দের বাংলায় পুঁৎ লেখেন। সেটাও আমার মতে বর্গীয় [illegible] দিয়া লেখা উচিত। তাঁহারা যখন সংস্কৃত অদ্য শব্দের বাংলায় আয [illegible]বং আযি না লিখিয়া আজ এবং আজি লিখিয়া থাকেন তখন সামঞ্জস্যের [illegible]ন্য তাঁহাদের কাজ লেখা উচিত।

য কারের উচ্চারণ বিষয়ে আমাদের সর্ব্বত্র সমভাব নাই। আমরা [illegible]য়োগ, নিয়োগ বলি, কিন্তু আবার সংযোগ বলি, যযাতি এবং যাযাবর-কে [illegible]মরা জাজাতি এবং জজাবর বলিয়া থাকি।

একই দেশের এক দল লোক কোন শব্দকে একরূপ এবং অন্য দল অন্য-[illegible]প উচ্চারণ করেন। কেহ বলেন বিল্‌বৃক্ষ, কেহ বলেন বিল্‌অবৃক্ষ। ইহা [illegible]ইয়া তর্কবিতর্কও শুনিয়াছি। বিল্‌বাদীরা বলেন, আমরা যখন বিল্‌ই [illegible]লি তখন বিল্‌বৃক্ষ বলাই উচিত। বিল্‌অ-বাদীরা বলেন যে বিল্ববৃক্ষ [illegible]খন একটা সংস্কৃত সমাস, তখন বিল্‌অবৃক্ষ বলাই উচিত। বিল্‌বাদী [illegible]ক জন বলিলেন তাহা হইলে সর্ব্বদাই রাম্‌চন্দ্র না বলিয়া রাম্‌অচন্দ্র বলাই [illegible]চিত। অত্যন্ত ঝাল একপ্রকার লঙ্কা আছে। তাহাকে লোকে বিল্‌লঙ্কা [illegible]লে। বিল্‌অ-বাদীরা কি তাহাকে বিল্‌অলঙ্কা বলিবেন?

কোন কোন লোক নিজে যেরূপ ভুল করেন অন্যের তদনুরূপ ভুল [illegible]খিলে অসহিষ্ণু হইয়া ঠাট্টা বিদ্রূপ করিয়া থাকেন। আসামীরা এককে [illegible] বলেন। উচ্চারণ আমাদের মত ন্যা। ইহা লইয়া দুই-এক জন [illegible]ঙ্গালীকে ঠাট্টা করিতে শুনিয়াছি। "এক শব্দের ক কি স্বার্থে ক? [illegible]ক নির্ব্বুদ্ধিতা!" কিন্তু বাঙ্গালীরা যে আলোককে, আলো বলেন সে-কথা [illegible]খনও তাঁহাদের মনে হয় না। আলোকের ক কি স্বার্থে ক? খাসিয়ারা [illegible] স্ত্রী[illegible]শব্দের পূর্ব্বে কা এবং পুংলিঙ্গ শব্দের পূর্ব্বে উ ব্যবহার [illegible]রেন। খাসিয়া ভাষায় কাটারি এবং কাচারি গৃহীত হইয়াছে। [illegible]ংরেজীতে কথা বলিবার সময় খাসিয়ারা কাচারি এবং কাটারিকে যথাক্রমে [illegible]রি এবং টারি বলেন এবং উমেশ বাবুকে মেশ বাবু বলিয়া থাকেন।

ইংরেজী V একটা মহাপ্রাণ বর্ণ। ল্যাটিন V এবং আমাদের অন্তঃস্থ [illegible] মহাপ্রাণ নহে। তথাপি, শব্দের প্রথমে সংস্কৃত ব স্থানে w এর পরিবর্ত্তে [illegible] দিয়া যে চলিতেছে তাহাই ভাল বোধ হয়। আমাদের ভ দন্তোষ্ঠ বর্ণ [illegible]ইলে ঠিক ইংরেজী v হইত। ইংরেজী v কখনও ব কখনও ভ দিয়া [illegible]লখা ভাল। কিন্তু ভ স্থানে v লেখা কখনই কর্ত্তব্য নহে। যেহেতু [illegible]হার জন্য bh নির্দ্ধারিত হইয়াছে। সুতরাং প্রভাস স্থলে Provas [illegible]লখা ভুল। আবার অম্বিকা বাবু নিজের নাম Amvika লিখিতেন—[illegible]হাও ভুল।

আবার কোন কোন জেলায় কোন কোন ইংরেজী শব্দের উচ্চারণ কৌতুকাবহ। শ্রীহট্টে hillyকে হিলি, sillyকে সিলি বলে। সেখানে [illegible] লোককে man of position না বলিয়া positional man [illegible]লে এবং অসময়কে বলে untime।

কলিকাতায় ন স্থানে ল এবং ল স্থানে ন শুনিতে পাওয়া যায়। নৌকাকে লৌকা এবং লোকসানকে নোকসান; লক্ষ্মীকে নক্ষী; নোণাকে লোণা; নুচিকে লুচি ইত্যাদি।

নদীয়া জেলা হইতে সমস্ত উত্তর-বঙ্গে শব্দের আদিতে র স্থানে অ এবং অ স্থানে র উচ্চারিত হয়। আম বাবুর বাগানের ভাল রামের কথা বোধ হয় সকলেই শুনিয়াছেন।

পূর্ব্ববঙ্গে তিনটা স স্থলে প্রায়ই হ উচ্চারিত হয়। স বলিবার যে অক্ষমতা কিছুমাত্র আছে তাহা নহে। কেন-না, তদ্দেশবাসীরা আস্পর্দ্ধা, শয়তান, পশু, বর্ষা, পয়সা প্রভৃতি বহু শব্দ শুদ্ধরূপে উচ্চারণ করিতে পারেন। তাঁহারা সেইরূপে হ স্থানে অ এবং বর্গের চতুর্থ বর্ণ স্থানে তৃতীয় বর্ণ উচ্চারণ করেন।

আসামে হ এবং স্পর্শবর্ণের সমস্ত মহাপ্রাণ বর্ণই উচ্চারিত হয়। কিন্তু তিনটা স স্থানেই হ হয়। তাঁহারা বৈশাখ-কে বহাগ, আষাঢ়-কে অহার, মাস-কে মাহ, হাঁস-কে হাঁহ্‌ বলেন। আমরা বলি আসুন বসুন, আসামীরা বলেন আহক্‌ বহক্‌, শ্রীহট্টীরা বলেন আউকা বউকা।

আসাম প্রভৃতি অঞ্চলে স স্থানে হ উচ্চারিত হয় বলিয়া একজন হাস্যরসিক এই মর্ম্মে একটা শ্লোক রচনা করিয়াছেন যে, পূর্ব্বদেশবাসীরা শতায়ুর্ভব বলিয়া আশীর্ব্বাদ করিবার পরিবর্ত্তে বলেন হতায়ুর্ভব। অতএব তাঁহাদের আশীর্ব্বাদ গ্রহণ করিবে না। শ্লোকটি এই—

> আশীর্ব্বাদং ন গৃহ্নিয়াৎ পূর্ব্বদেশ নিবাসিনাম্‌।
> শতায়ুর্ভব বক্তব্যে হতায়ুর্ভব ভব ভাষিনাম্‌॥

ইংরেজীতে বাংলা নামগুলিকে কখন কখন সঙ্কুচিত করা হয়, যেমন—কৃষ্ণনগর স্থলে কৃষ্ণগড়। গোয়ালন্দ যে প্রকৃতপক্ষে গোয়ালনন্দ তাহা সেখানকার লোকেও বোধ হয় এখনও অনেকে জানে না।

খৃষ্ট, খ্রিষ্ট, খ্রীষ্ট। প্রথম বানানটা অন্য দুইটা অপেক্ষা অল্প সময়ে এবং অল্প আয়াসে লেখা যায়। ঋকারের রি উচ্চারণ বাংলা দেশে সর্ব্বত্র প্রচলিত। পৈতৃক এবং পৈত্রিক দুই-ই শুদ্ধ। খৃষ্ট বানান সর্ব্বোৎকৃষ্ট। দীর্ঘ ঋ হইলে আরও ভাল হয়। খ্রীষ্ট গ্রীক্‌ অনুযায়ী বানান। অর্থাৎ ইহার ই ওটা অথবা ই বর্ণ দীর্ঘ। অতএব খ্রিষ্ট ভুল। দীর্ঘ ইকার হওয়াতেই ইংরেজীতে ক্রাইষ্ট হইয়াছে। যেমন, Pisa (পীসা) হইতে পাইসা যাহা হইতে মাড়োয়ারীদের পীসা হিন্দুস্থানীদের পৈসা এবং আমাদের পয়সা হইয়াছে।

ঋ সম্বন্ধে বিদ্যানিধি মহাশয় কিছু বলিয়াছেন। যাহারা ভাল লেখা-পড়া শেখে নাই তাহারা ত্রিঋ স্থানে পৃঃ লিখিলে প্রতিবাদের প্রয়োজন হয় না। কিন্তু শিক্ষিত লোক যখন মসৃণ, সরীসৃপ, সদৃশ, অন্তর্গৃহকে, মস্রিণ, সরীস্রিপ, সদ্রিশ, অন্তুগ্রিহ রূপে উচ্চারণ করেন তখন তীব্র প্রতিবাদ হওয়া উচিত। ঋর উচ্চারণ রুই হউক বা রিই হউক উহা ব্যঞ্জনস্পৃষ্ট নহে।

ইংরেজ না ইংরাজ? মূল শব্দ Angles, অথবা Anglais. তাহা হইতে English. হিন্দুস্থানীরা বলে আংরেজ। সুতরাং ইংরাজ অপেক্ষা ইংরেজ শুদ্ধ।

অনেক দিন হইল পড়িয়াছি যে, মানুষ যতরূপে স্বর উচ্চারণ করে তাহার সংখ্যা এক শতেরও অধিক। ঠিক সংখ্যাটা মনে নাই। ইহার প্রত্যেক ধ্বনির জন্য বিভিন্ন চিহ্ন রাখিবার চেষ্টা করা বাঞ্ছনীয়ও নহে, সম্ভবপরও নহে। ঊর্দ্ধকমা অথবা ঊর্দ্ধশূন্য কিম্বা ঊর্দ্ধপুচ্ছ ইহার কিছুমাত্র প্রয়োজন আছে বলিয়া আমি মনে করি না। না থাকাই বরং ভাল। ঘরের চাল এবং আহারের চাল কলিকাতায় একরূপেই উচ্চারিত হয়। কলিকাতার বাহিরে আহারের চালের মধ্যে একটু আপুষ্টিকণিক অথবা

আণুশ্রাবণিক একটা ই হয়ত আছে। তাহা না থাকিলে কলিকাতাবাসী তাহার মত এবং অন্যস্থানবাসী তাহার মত পড়িবেন। ইহা ত সুবিধারই কথা। উর্দ্দতে তম্ লিখিলে তুম্ পড়িতে হয়। তম্ লিখিয়া তাহার ডান দিকে একটা হা লিখিলে হাতিম পড়িতে হয়। আবার হা না লিখিয়া রুস্ লিখিলে রুস্তম পড়িতে হয়।

অনুরূপ কারণে 'করিতে' পদের সঙ্কুচিত আকার করতে শব্দে নূতন উর্দ্ধকমা প্রভৃতি সৃষ্টি না করিয়া কোরতে লেখাই ভাল। ওকারটা আমরা স্পষ্ট উচ্চারণ করিয়া থাকি এবং তাহা নূতন সৃষ্টিও নহে। তবে তাহাতে ভুল হইবে কেন? অমিশ্র অথবা ব্যঞ্জনসংযুক্ত ই বা উ ধ্বনির পূর্ব্বে অকার থাকিলে অ-কে ও-রূপে উচ্চারণ করা বাংলার প্রকৃতি। যথা হই, সই, শনি, রবি, শশী, হউক, করুক, বসুক, মরুক ইত্যাদি শত শত শব্দে। তবে অ যদি ভিন্ন শব্দ বা শব্দাংশ হয় তাহা হইলে ও-রূপে উচ্চারিত হয় না। যেমন অবিনাশ। চক্ষু শব্দকে আমরা চোক বলি, সেখানে চক লেখা নিতান্তই গর্হিত বোধ হয়। ভগিনী বা বহিন্ শব্দকে সঙ্কুচিত করিয়া আমরা বোন বলি; সেখানেও বন লেখা অশ্রদ্ধেয়। এইরূপ সকল শব্দে ও দিয়া লেখার প্রথা বহুদিন হইতে চলিয়া আসিতেছে। ঈশ্বর গুপ্ত লিখিয়াছেন

> প্রাণ খোল্‌তে হলেই বোল্‌তে হয়,
> পোড়াদেশের লোকের আচার দেখে চোম্‌তে পথে করি ভয়।

সেইরূপে করিয়া স্থলে কোরে নয় কেন? এবং হইল স্থলে হোলো লিখিলে দোষ কি? এখানে অন্যরূপ আর একটা প্রশ্ন মনে উদিত হইল। আমরা কোর্‌তে, খোর্‌তে ইত্যাদি লিখি কেন? বলি ত কোত্তে, খোত্তে ইত্যাদি। শ্যামাচরণ গাঙ্গুলীর Bengali Written and Spoken দ্রষ্টব্য। বিদ্যানিধি মহাশয়ের 'চাক্‌রে' কখনই 'চাকরের' দলভুক্ত হইয়া যাইবার আশঙ্কা নাই। চাক্‌রে লিখিলে কখনই কেহ ভুল বুঝিবে না।

হর্ঘা, পার্ঘা লিখিলে আমরা কখনই হওয়া, পাওয়া বলিব না। William শব্দ বাংলায় ৱিলিয়ম্ লিখিলে পঞ্জাবীরা ঠিকই পড়িবে, কিন্তু বাঙ্গালীরা বলিবে বিলিয়ম্। এইরূপ স্থলে আমাদের গ্রীকের অনুকরণ করা উচিত। গ্রীকে য এবং v বা w নাই। এই দুই ধ্বনি প্রকাশ করিতে হইলে ইএ এবং উঅ দিয়া লিখিতে হয়। রামানন্দবাবু একবার ওা চালাইতে চেষ্টা করিয়াছিলেন, কিন্তু চারিদিকে প্রতিবাদ হওয়ায় তিনি পাওা, দাওা ছাড়িয়া দিলেন। কিন্তু উহাতে দোষটা ছিল কি? এ ঐ ও ঔ এই চারিটাই যুক্তস্বর—দুইটি স্বরের মিশ্রণ। ইহার সহিত আর একটি স্বর যুক্ত করিলে কি পাতক হইতে পারে? ওা পড়িতে কাহারও ভুল হইবার সম্ভাবনা ছিল না।

একটা অবান্তর কথা বলিয়া এই প্রবন্ধের উপসংহার করিতেছি। বিদ্যানিধি মহাশয় লিখিয়াছেন, "বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ বাঙ্গলা ভাষা ও সাহিত্যের রক্ষক।" বাস্তবিক কি তাহাই? বহু পদস্থ লোকে বাংলা লিপিতে যে নানারূপ ভুল করেন তাহার বিরুদ্ধে পরিষদের দুই চারিজন সদস্য একত্র হইয়া কি কখনও প্রতিবাদ করিয়াছেন? অন্য পক্ষে একটা সাহিত্যিক বিষয়ে একজন বড়লোকের গুরুতর ভ্রম প্রদর্শন করিতে সাহিত্য-পরিষৎ যে দেন নাই তাহার অন্ততঃ একটা দৃষ্টান্ত বিদ্যানিধি মহাশয় উত্তমরূপেই অবগত আছেন।

বিদ্যানিধি মহাশয়ের প্রবন্ধে দেখিলাম যে তাঁহার, তাঁহাদের, তাঁহাকে প্রভৃতি বানান হইয়াছে। অর্থাৎ চন্দ্রবিন্দুটা শব্দ কয়েকটার প্রথম অক্ষরের উপরে না দিয়া দ্বিতীয় অক্ষরের উপরে দেওয়া হইয়াছে। এগুলি কি তাঁহার নিজের বানান না ছাপার ভুল?

অজয় বাবু বানান না লিখিয়া বাণান লিখিয়াছেন। বর্ণনা শব্দে মূর্দ্ধণ্য ণ আছে এবং বানান শব্দ বর্ণনা হইতে হইয়াছে বলিয়া যদি ণ দিতে হয় তাহা হইলে শ্রবণ শব্দজাত শুনা বা শোনা-ও ণ দিয়া লেখা উচিত।

খোলা জানালা

শ্রীফণীভূষণ রায়

ঝড়ো রাত্রি—বিদ্‌ঘুটে অন্ধকার—শ্রাবণ-আকাশে চন্দ্র তারকার চিহ্ন পর্য্যন্ত নাই। বড় রাস্তা—দু-ধারে জীর্ণশীর্ণ গাছপালা-গুল্ম—কতকগুলি লোক পায়ে হেঁটে চলছিল—ভারী পায়ে, ঠেকে ঠেকে অনেক রাত্রি হয়ে গিয়েছিল তাদের...রাস্তার দু-ধারে সারি সারি গ্যাসবাতিগুলো ধূমায়িত হয়ে জলছিল—শহরতলীর উপকণ্ঠে এসে একে একে সেগুলো অন্ধকারে মিলিয়ে গেল—এখন আর একটাও চোখে পড়ে না।

অসহ্য গরমে ঘরের ভিতর না থাকতে পেরে তরুণ লেখক সুশোভিত্ অবসন্ন শরীরে তার চেয়ার হ'তে উঠল—টেবিল-ল্যাম্পের চারদিকে মশার ভন্‌ভনানি তাকে অতিষ্ঠ ক'রে তুলেছিল। টেবিলের উপরে তার যে-লেখাটি শেষ হয়নি, সেটা প'ড়ে ছিল। তার দিকে নিরানন্দ দৃষ্টিতে বার-বার তাকিয়ে দেখল—সারাদিনের পরিশ্রমের পর এই যে কলম-চালানো এর মধ্যে কোন আনন্দ কিংবা প্রাণের টান থাকে না। যন্ত্রচালিতের মত লিখে যায়. সময়ে সময়ে অত্যন্ত অসহ্য ব'লে বোধ হয়। আজকের এই দারুণ গ্রীষ্মের রাত্রিতে তার পক্ষে আর একছত্র লেখাও অসম্ভব হয়ে পড়েছিল, সুতরাং সে রেগেমেগে বাতিটা নিবিয়ে দিল। ঢুলতে ঢুলতে সিঁড়ি বেয়ে চারতলা থেকে নেমে এল এবং জনশূন্য বুলভারের (রাস্তা) উপর পায়চারি করতে লাগল। অবশেষে একটা মদের দোকানের সামনে একটা খালি টেবিল দেখে বসে পড়ল। মদের দোকানটি তার বাড়ির সামনাসামনি রাস্তার ওধারে ছিল।

অসহ্য গরমের রাত্রি। সে বসবামাত্র ঢিলে পোষাক-পরা, ফিতে-খোলা জুতো পায়ে একজন বয় তাকে এক গ্লাস বীয়ার দিয়ে গেল, কিন্তু এমন বোট্‌কা গন্ধ যে গা বমি-বমি করে। একটু বাতাস দিলে মদের দোকান থেকে এমন গরম হাওয়া বেরিয়ে আসে, যে, মনে হয় যেন রোগীর ঘরের বদ্ধ বাতাস! বিরক্ত হয়ে লুদোভিক্ ভাবতে লাগল, এর চেয়ে নিজের ঘরে বসে থাকাই ভাল ছিল। মরিয়া হয়ে বিছানায় শুয়ে পড়ে থাকাই ঢের আরামজনক ছিল। পাস্কাল সত্যি সত্যি বলেছেন যে বিশ্রাম যদি করতে হয় তো নিজের ঘরে করাই ভাল। আরব-দেশীয় প্রবাদবাক্যেও আছে যে, বসে থাকার চেয়ে শুয়ে থাকা ভাল, আর শুয়ে থাকার চেয়ে মরে যাওয়া ভাল। মরে যাওয়া? তা একেবারে মন্দ হয় না, তার তো একজন নবীন সাহিত্যিকের ব্যর্থ জীবন। কোনো প্রতিষ্ঠাই সে লাভ করতে পারেনি—লাভ করবার মত ক্ষমতা যে আছে তাই বা কে জানে?...সুমুখ দিয়ে এই যে ঘোড়ার টানা ট্রাম রাস্তা চলেছে, কি একঘেয়ে লাগে, দশ দশ মিনিটের পর ট্রামগুলো আসে, ঘড়ং ঘড়ং করতে করতে এবং ধুলোবালি উড়িয়ে চলে যায়। তার জীবন-যাত্রাও যেন ঐ ট্রামগাড়ীর রাস্তার মত চলছে তো চলছেই, বেরস নীরস, শুষ্ক...ট্রামবাহী ঘোড়ার মত দানাপানির জন্য উদয়াস্ত খাটুনি, চমৎকার ব্যবসা—কলমপিষে, কথা বেচে রুটি রোজগার—আর যে উপায় নেই, অথচ বয়স হ'ল তার উনচল্লিশ। সকালবেলা ক্ষৌরকার্য্যের সময়ে মাথায় পাকা চুল বেশ দেখতে পায়!...যৌবন তার বৃথায় চলে গেল...তার গত যৌবনের সম্বল-স্বরূপ কই কিছু ত নেই, একটু স্মৃতি, একখানা মুখের চেহারা, এক ছত্র লেখা···যা বৃদ্ধের মনের কোণেও চিরসবুজের স্বপ্নমায়া চিরকাল রচনা ক'রে থাকে।

জাগ্রত অবস্থায় এই রকম দুঃস্বপ্ন দেখতে দেখতে লুদোভিক্ হঠাৎ সামনের দিকে তাকাল। ভাবছিল দু-এক চুমুক মদ খায়, এমন সময় হঠাৎ চোখে পড়ে গেল,—যে-বাড়িটায় সে থাকে সেই বাড়িটার পাঁচতলায়—একটা খোলা জানালা...।

ঐ বাড়ি এবং আশপাশের বাড়িতে সকলে তখন ঘুমিয়ে পড়েছে। সব চুপচাপ, নীরব, নিঝুম—অন্ধকার মেঘলা আকাশের নীচে বাড়িগুলো যেন সব দৈত্যের মত দাঁড়িয়ে। সেই সময় অন্ধকারের বুকে আলোকে উদ্ভাসিত খোলা জানালাটি এক অপূর্ব্ব সুন্দরই দেখাচ্ছিল। মনে হয় নীল সাগরের পারে যেন একটা জ্যোতিষ্মান্ আলোকস্তম্ভ উঠেছে। জানালাটি রইল কিছুক্ষণের জন্য খোলা, তার পর কে যেন একখানা শাদা পর্দ্দা টেনে দিলে। এখন একটু বাতাস বইলেই জলের তরঙ্গের মতন ওটা কেঁপে কেঁপে উঠে।

আচ্ছা, কারা ওখানে থাকে? লুদোভিক্ মনে মনে ভাবতে লাগল। তার এমন খারাপ লাগছিল, এমন নিঃসঙ্গ, অসহায় সর্ব্বপরিত্যক্ত ব'লে নিজেকে মনে হচ্ছিল, আর খোলা জানালার পথে কক্ষ-প্রদীপ এমন উজ্জ্বল ভাবে, মধুর ভাবে আনন্দ ও আলোক বিকীরণ ক'রে দীপ্ত হচ্ছিল—তার মনে হ'ল—অদ্ভুত কল্পনার খেয়ালে—যে ওরা যারা ওখানে থাকে তারা নিশ্চয়ই চিরসুখী। ওদের সুখের দীপ্তিই আজ আলোকের স্নিগ্ধ রশ্মিতে মূর্ত্তি লাভ করেছে। নিশ্চয়ই তাই—যারা মনের দুঃখে ঘর ছেড়ে রাতদুপুরে রাস্তায় রাস্তায় ঘুরে বেড়ায় তাদের একথা বুঝতে কোনই বিলম্ব হয় না। তাদের খোলা জানালার আলোকপাতে এ বার্ত্তার লিপি পড়তে কোনো দেরি হয় না। "সুখ ওখানে বিরাজ করে"...অন্ধকারের গহ্বর থেকে ঈর্ষ্যাবিমিশ্রিত আনন্দের দৃষ্টিতে দেখে দেখে তাদের মনেও একটা উজ্জ্বল ভবিষ্যতের কল্পনা জেগে ওঠে। মনে হয় জীবননাট্যের এক নূতন অঙ্কে তাদেরও অমনি সুখ হবে বা!

আচ্ছা, কে ওখানে থাকে—লুদোভিক্ নিজের মনে ভাবতে লাগল। এত রাত জেগে কে থাকে? লুদোভিকের মনে হ'ল, হয়ত বা তারই মত কোন লেখক, কোনো অজ্ঞাত-নামা কবি! হাঁ, সিঁড়ি দিয়ে ওঠা-নামার সময় একজন রোগাটে কম দামী পোষাক-পরা যুবককে সে দেখেছে। বহু বার পাশ কাটিয়ে গিয়েছে, হাতে তার সর্ব্বদাই একখানা-না-একখানা বই থাকতই, সেই হবে বা! লুদোভিক্ ভাবতে লাগল, ওকে নিশ্চয়ই সকাল বেলায় ছেলে পড়িয়ে, হুঁ, লাটিন বিদ্যার বিনিময়ে রুটি রোজগার করতে হয়, বাকী সময়টা কাব্য ও শিল্পের অনুশীলনে কাটিয়ে দেয়। ও গরিব, খুব গরিব, কিন্তু আত্মমর্য্যাদার জ্ঞান অসাধারণ। আর লিলি ফুলের মত ও পবিত্র, যৌবন ও যৌবনের স্বপ্নকে ও অক্ষুণ্ণ রেখেছে ওর হৃদয়ের মণিকোঠায়...নিশ্চয়ই ও কবিযশঃপ্রার্থী, তবে ওর জীবনের মহত্তম দৃষ্টির মূল্যে ও তা অর্জ্জন করতে চায়—যে দৃষ্টিতে তার জীবনের গভীর অনুভূতি, নীর রূপে

নীলাকাশের মত প্রতিবিম্বিত হবে। সৈনিক যেমন তরোয়ালকে সম্মান করে—ও ওর কলমকে সেই রকম সম্মানের চোখে দেখে। বরঞ্চ ও না খেয়ে মরবে তথাপি সাহিত্যের ক্ষেত্রে মুটেগিরি করা কিংবা পত্রিকার আপিসে গিয়ে করুণ নেত্রে দাঁড়িয়ে থাকা ওর দ্বারা কিছুতেই হবে না। ও জীবনকে উপভোগ করে নাই নিশ্চয়ই, এই আত্ম-সম্মানী তরুণ লেখক...জীবন কবিদের জীবনে আর কি কাজে লাগে, তাদের জীবনের সুষমাময় স্বপ্নগুলিকে ধূলিসাৎ ক'রে দেওয়া ছাড়া...লুদোভিক্ মনে করছিল এত রাত জেগে ও নিশ্চয়ই ওর জীবনের প্রথম কাব্য লিখছে—যৌবনের মহাকাব্য—যা একবার ছাড়া দু-বার কেউ লিখতে পারে না। ও একটা উপকথায় স্বপ্নপুরী রচনা ক'রে তুলছে—একটা অসম্ভব সৌন্দর্য্যের দেশ, যেখানে পাখীগুলো হবে ফুলগন্ধি আর ফুলগুলো পরীর মত ডানাওয়ালা, যেখানে নারী আকাশের তারার মত পবিত্র এবং কমনীয়, যেখানে কেবল প্রণয় এবং প্রণয়ের স্বপ্ন ছাড়া আর কিছু নেই—না, না, আছে সঙ্গীতের দিব্য উন্মাদনা যা ইন্দ্রিয়কে অবশ ক'রে আনে এবং নিদ্রাহীন রজনীর পরবর্ত্তী প্রভাতের মত একটা অর্দ্ধ-চেতন আবেশের সঞ্চার করে—যখন মনে হয়, হায় হায় জীবন কেন স্বপ্নের মত সুন্দর হ'ল না।

কিন্তু এখন তার কাব্য ভ্রূণস্থ শিশুর মত তার অন্তরের সঙ্গোপনে রয়েছে। তার অলিখিত কাব্য তার প্রিয়তম সঙ্গী লেখনীর মুখে। কাব্যটি তার যখন মূর্ত্তিলাভ করবে তখনও সে তার কল্পলোকের দৃষ্টি দিয়েই দেখবে...আচ্ছা, এখন কি করছে ঐ জিতেন্দ্রিয় তরুণ কবি—হয়ত বা বিছানায় আড়কাৎ হ'য়ে শুয়ে পড়েছে। পড়বার জন্য সেল্ফ থেকে তার হাজার-বার-পড়া প্রিয় কাব্যখানা তুলে নিয়েছে এবং সেই কাব্যের সতেজ ও সবুজ কল্পনার সংস্পর্শে এসে মন তার পাখ্না মেলে দিয়ে দূরদিগন্তে বন্ধনহীন অসীমের মধ্যে উধাও হয়ে গিয়েছে! না, এখনও বোধ হয় সে তার কাব্যরচনায় মশগুল হয়ে রয়েছে। তার জীবনের শ্রেষ্ঠ কাব্যের পংক্তি রচনায় ব্যস্ত রয়েছে, তবে অনেকক্ষণ লিখতে লিখতে সে শ্রান্ত হয়ে পড়ল—তখন সে চেয়ার ঘুরিয়ে বসে—তার কিশোর সুন্দর মাথাটি তার ঘাড়ের উপর হেলিয়ে—চোখ দুটী তার বুজে আসে। কখন তার হাতে আস্তে আস্তে থেমে যায়, কিন্তু স্বপ্নে সে দেখতে থাকে আবার যেন লেখা সুরু হয়েছে এবং কবিতা-লক্ষ্মী প্রসন্নদৃষ্টিতে এসে দাঁড়িয়েছেন। মঙ্গলময়ী, মনোহরা, মায়ের মত ভালবাসা, দেবীর মত সৌন্দর্য্য, আস্তে আস্তে তার চেয়ারের পিছনে এসে দাঁড়ালেন, তার ঘুমন্ত চোখের উপর তাঁর হাস্যোজ্জ্বল দৃষ্টি রেখে, হয়ত তাঁর পেলব হস্ত দিয়ে তার কপাল থেকে এলোমেলো চুলগুলি সরিয়ে দিলেন—তারপর তার কপালে দিলেন তাঁর সস্নেহের সুগভীর প্রসাদচুম্বন—সুমহৎ পুরস্কার...।

আচ্ছা, কারা ওখানে থাকে? ভাবতে লাগল লুদোভিক্। পতঙ্গ যেমন আলোর দিকে উন্মুখী হয় তার দৃষ্টিও তেমনি আলোক-উদ্ভাসিত জানালার দিকে নিবদ্ধ ছিল...হয়ত ওখানে কোন গৃহস্থ, তার ছেলেপুলে নিয়ে থাকে। শরৎকালের মত সে ফল-সমৃদ্ধ...হয়ত তার অবস্থা ততটা সচ্ছল নয়, কিন্তু স্বামি-স্ত্রীর মধ্যে গভীর ভালবাসা, পরস্পরের মধ্যে প্রাণের টান অফুরন্ত। লুদোভিক্ রবিবার দিন অনেক দম্পতীকে হাত-ধরাধরি ক'রে পায়চারি করতে দেখেছে—তাদেরই মত স্ত্রীর গায়ে সস্তাদরে কেনা পোষাক, গোলগাল চেহারা, হাসি হাসি মুখখানা—কোলের খোকাকে গাড়ীতে ঠেলে নিয়ে যায়—আর স্বামী সরকারী আপিসের কেরাণী, পদবৃদ্ধির সম্ভবনা আছে, খুব গ্রাসভারী লোক—তাদের যে-ছেলেটি স্কুলে পড়ে তার হাত ধরে সগর্ব্বে চলতে থাকে। ওরাই বোধ করি খোলা জানালার ঘরটায় থাকে, তবে মসিয়ের মাহিনা বোধ করি ৪০০ ফ্রাঁর বেশী হবে না—তারপর ছেলেপুলে আছে, তা একটু টানাটানি করতে হয় বইকি! ওরা প্রাতরাশ বাসি রান্না দিয়েই চালিয়ে দেয়, আর যে-ছেলেটি স্কুলে পড়ে সে খাবার ঘরে সোফার উপরে ঘুমোয়। ঐ সোফাটা আবার দিনের বেলায় অভ্যাগতদিগের জন্য রাখা হয়। আর সকলের ছোট্টটি—সকলের নয়নমণি—ওর জন্যই কিন্তু "ফ্যামিলি বজেট" ওলটপালট করতে হয়েছে। তবে সুখের বিষয় একটা বড় ডাক্তারী দোকানে হিসাব রাখবার চাকরি মসিয়ে পেয়ে গেছেন, তা'তে বছরে ছয়শ ফ্রাঁ আসবে। যাক্—ওদের বড় ছেলেটি ক্লাস ফাইভে পড়ে। গত বৎসর পরীক্ষায় প্রাইজ পেয়েছে। ওর জন্য মায়ের কি গর্ব্ব! কাজ করতে করতে পরিশ্রান্ত হ'লে স্ত্রীর অবসন্ন আরক্তিম মুখের পানে

তাকিয়ে সস্নেহ কণ্ঠে স্বামী বলে—থাক থাক, এস এখন, একটু জিরিয়ে নাও, খুব হয়েছে; খুব হয়েছে, আজকের মত একটু বিশ্রাম কর দিকিন...কিন্তু প্রায়ান্ধকার সন্ধ্যাতেও সেলাই ছেড়ে উঠতে স্ত্রী ইতস্ততঃ করে, তার নীরব দৃষ্টিতে এই কথা প্রকাশ পায়—আচ্ছা, তুমি সকালবেলায় উঠে ডাক্তারি দোকানে ছোট কেন? দুপুর রাত জেগে আবার হিসাব লিখতে বস কেন? কথান্তরে যখন এই স্নেহের অভিনয় চল্‌তে থাকে তখন পাশের ঘরে ব'সে ছেলেটি গ্রীক ব্যাকরণ পড়ে। শব্দরূপ, ধাতুরূপ, কারক, বিভক্তি, সমাস—গভীর অধ্যবসায় ছেলেটির...।

ভাবতে ভাবতে লুদোভিকের খুব হিংসা লাগ্‌তে লাগল। এক দণ্ডের জন্য যদি সে এ সুখ উপভোগ করতে পারত তবে জীবন বলি দিতে সে কুণ্ঠিত হ'ত না—কি অনির্ব্বচনীয় তৃপ্তি ও শান্তি ওদের, কি গভীর সুখ ওদের...।

অকস্মাৎ বড় বড় ফোঁটাতে বৃষ্টি পড়তে সুরু করল, সন্ সন্ ক'রে বাতাস বইতে লাগল, লুদোভিক্ দৌড়ে এসে বাসায় ঢুকল।

যদিও রাত অনেক হয়ে গিয়েছিল তবুও সে 'কঁসিয়ার্জ'কে (বাড়ির প্রহরীকে) ব'সে ব'সে সেলাই করতে দেখল। তাই এগিয়ে গিয়ে জিজ্ঞাসা করল—আচ্ছা, পাঁচতলায়, আমার ঘরের ঠিক উপরে, কে থাকে বলত!

হায় মঁসিয়ে, এখন ত আর কেউ থাকে না—মাস দুই যাবৎ একজন বুড়ো ঘরটায় থাকৃত—বেচারা ছিল বড় গরিব—ভাড়া এক পয়সাও দিতে পারেনি, তবে বাড়ির মালিক ভাড়ার জন্য কিছু বলেন নি—আজকে বেলা চারটার সময় সে মারা গিয়েছে...নীচ তলার 'কর্ত্রী ঠাকুরুণ' একখানা শাদা কাপড় দিলেন, তাই দিয়ে মৃত্যুদেহ আচ্ছাদিত করা হয়েছে—আর তা'র ত কেউ ছিল না না একজন বন্ধু, না একজন আত্মীয়—আমি নিজের খরচে মোমবাতি কিনে তার শেষ-শয্যার পার্শ্বে জ্বালিয়ে দিয়েছি—আহা বেচারা, তারপর কিছুক্ষণ আগে গিয়ে ওখানে ঘণ্টাখানেক বসেছিলাম এবং তার আত্মার সদ্‌গতির জন্য প্রার্থনা করলাম।*

* মূল ফরাসী হইতে

দ্রষ্টব্য

বর্ত্তমান সংখ্যার ৬১৮ পৃষ্ঠায় "মানভূম জেলার মন্দির" শীর্ষক প্রবন্ধে কতকগুলি পারিভাষিক শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে। পাঠকগণের সুবিধার জন্য সেগুলির অর্থ দেওয়া হইল।

রেখ-দেউল—৬২১ পৃষ্ঠায় দ্বিতীয় স্তম্ভে রেখ-দেউলের একটি চিত্র আছে। ইহার লক্ষণ হইল, দেওয়াল কিছুদূর খাড়া উঠিয়া তাহার পর হেলিয়া যায়। মন্দিরের যতখানি অংশ সোজা, তাহাকে 'বাড়' বলে। তাহার উপরের অংশটি 'গণ্ডী'। গণ্ডীর শীর্ষদেশের দৈর্ঘ্য তলদেশের দৈর্ঘ্য অপেক্ষা যত কম তাহাকে গণ্ডীর 'কাটেনী' (batter) বলে।

আঁলা—গণ্ডীর উপরে মন্দিরের শীর্ষে আমলকীর মত আকৃতিবিশিষ্ট, কিন্তু চেপটা যে বস্তুটি থাকে তাহাই আঁলা।

গর্ভ—মন্দিরের ভিতরের প্রকোষ্ঠ।

ভদ্র-দেউল—৬১৮ পৃষ্ঠায় প্রথম স্তম্ভে আধুনিক মন্দিরটির মধ্যে বাম ভাগের দেউলটি ভদ্র-দেউল। ইহাতে বাড়ের উপরে কতকগুলি থাক সাজাইয়া পিরামিডের মত একটি গণ্ডী রচনা করা হয়। প্রত্যেক থাককে 'পিড়া' বলে।

বেকি—গণ্ডী ও আঁলার মধ্যবর্ত্তী অংশ।

বাড়—রেখ বা ভদ্র দেউলে ভূমি হইতে যতখানি দেওয়াল খাড়া উঠে তাহার নীচের ও উপরের অংশে কাপড়ের পাড়ের মত কাজ করা থাকে। মধ্যবর্ত্তী অংশে কাজ থাকে না, তাহা সাদা (plain)। নীচের কাজ করা অংশের নাম 'পাভাগ', উপরেরটি 'বরণ্ড'; সাদা অংশের নাম 'জাংঘ'। বড় বড় মন্দিরে জাংঘ অত্যধিক দীর্ঘ হইলে তাহার মাঝখানে আবার কিছু অংশ কাজ করা থাকে, তাহাকে 'বান্ধনা' বলে। তখন জাংঘ দুই ভাগে বিভক্ত হইয়া যায়। নীচের অংশ 'তল-জাংঘ,' উপরেরটি 'উপর-জাংঘ'।

বিরাল—হাতীর উপরে সিংহ দুই পায়ে ভর দিয়া পিছনে ঘাড় ফিরাইয়া দাঁড়াইয়া থাকিলে যে মূর্ত্তি হয় তাহার নাম বিরাল।

বন্ধকাম—স্ত্রী ও পুরুষের অশ্লীল ভাবাপন্ন মূর্ত্তির নাম।

ভ্রম-সংশোধন।—গত শ্রাবণ মাসের 'প্রবাসী'র ৫০২ পৃষ্ঠায় "স্মৃতি-পাথেয়" শীর্ষক কবিতার নবম পংক্তিতে 'হে মহা অপরিচিত' স্থলে 'যে মহা অপরিচিত' এবং সপ্তদশ পংক্তিতে 'চিত্তে রেখে গিয়ে গেল চিরস্পর্শ খীর' স্থলে 'চিত্তে রেখে গিয়ে যায় চিরস্পর্শ খাঁর' পড়িতে হইবে।

নমস্কার-ব্যায়াম—(স্বাস্থ্য, কর্ম্মপটুতা এবং দীর্ঘজীবন লাভের উপায়)। লেখক প্যারিস বিশ্ববিদ্যালয়ের কেমিষ্ট শ্রীযতীন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী, বি-এ (কলিকাতা), এক-সি-এস্ (লণ্ডন)। ক্রাউন আট পেজী ৬৮ + ৷৶০ পৃষ্ঠা। মূল্য আট আনা। মুকুল বুক ডিপো ৫৬ নং হ্যারিসন রোড, কলিকাতা।

মহারাষ্ট্র দেশের ঔন্ধ রাজ্যের মহারাজা কর্তৃক এই ব্যায়াম-প্রণালী প্রবর্ত্তিত হয়। ইহা বেদোক্ত "সূর্য্যনমস্কার" প্রথার আধুনিক সংস্করণ। যাঁহারা সূর্য্যকে নমস্কার করিতে চান না, তাঁহারাও ব্যায়াম-প্রণালীটির অনুসরণ করিতে পারেন। পুস্তকখানিতে ব্যায়ামগুলির সহজ বর্ণনা আছে এবং ষোলখানি ছবি আছে। এই প্রণালী অনুসারে সমুদয় ব্যায়াম করিতে কোন খরচ নাই, কোন যন্ত্রাদি সরঞ্জামেরও আবশ্যক নাই; সময়ও কম লাগে। পুস্তকে লিখিত উপদেশ অনুসারে এই-সব ব্যায়াম করিলে স্বাস্থ্য ও কর্ম্মপটুতা লাভ করিতে পারা যায় বলিয়া আমাদের ধারণা হইয়াছে।

ভাষা ও সাহিত্য—ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাঙ্গালা ভাষা ও সাহিত্যের অধ্যাপক ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহ, এম-এ, বি-এল ডি-লিট, প্রণীত। ক্রাউন আট পেজী ১২৭ + ১০ পৃষ্ঠা। মূল্য বার আনা। প্রকাশক, আবদুল আজিজ খাঁ, দি ঢাকা লাইব্রেরী, ঢাকা।

এই পুস্তকখানি ১৫টি প্রবন্ধের সমষ্টি। তাহাদের নাম—আমাদের ভাষা সমস্যা, আমাদের সাহিত্যিক দরিদ্রতা, বাঙ্গালা সাহিত্য ও ছাত্রসমাজ সাহিত্যের রূপ (১), সাহিত্যের রূপ (২), পল্লীসাহিত্য, 'আমার কাহিনী ফুরলো,' বাঙ্গালা অভিধানে আমোদ, পোত্রভিদ্ ইন্দ্র, বাঙ্গালা বানান সমস্যা বাঙ্গালীর সংস্কৃত উচ্চারণ, বাঙ্গালা ভাষার একারের বক্র উচ্চারণ, বাঙ্গালা ভাষাতত্ত্বে রবীন্দ্রনাথ ভারতের সাধারণ ভাষা, বাঙ্গালী জীবনে মুসলমান প্রভাব। কয়েকটি প্রবন্ধ মুসলমান বাঙালীদের উদ্দেশ্যে লিখিত, কিন্তু সকল বাঙালীরই পাঠযোগ্য। অন্যগুলি—তাহাদেরই সংখ্যা বেশী—সমুদয় শিক্ষিত বাঙালীর জন্য লিখিত। লেখক সুপণ্ডিত ও শিক্ষিত অধ্যাপক। তিনি প্রবন্ধগুলি জ্ঞানবত্তার সহিত চিন্তাসহকারে লিখিয়াছেন এবং নিরপেক্ষ ভাবে লিখিবার চেষ্টা করিয়াছেন। তাঁহার এই পুস্তকখানির ভাষা 'মুসলমানী বাংলা' নহে।

জীবনস্মৃতি—শ্রীসুদক্ষিণা সেন। ডিমাই আট পেজী ২০৪ + ৷৶০ পৃষ্ঠা। ভারতাশ্রমের একটি চিত্র সম্বলিত। মূল্য এক টাকা। প্রাপ্তিস্থান ৫০ নং ল্যান্সডাউন রোড, কলিকাতা।

শ্রীযুক্তা সুদক্ষিণা সেন পরলোকগত ডিষ্ট্রিক্ট ও সেশুন্স জজ বৈদিক ও বৌদ্ধ সাহিত্যে সুপণ্ডিত অম্বিকাচরণ সেন মহাশয়ের বিধবা পত্নী। তিনি এখন বর্ষীয়সী। এই জন্য তাঁহার এই সরলভাষায় লিখিত সুখপাঠ্য পুস্তকখানিতে পঞ্চাশ বৎসর আগেকার বাঙালী হিন্দু ও ব্রাহ্ম সমাজের—বিশেষতঃ পূর্ব্ববঙ্গের সমাজের—একটি ছবি ফুটিয়া উঠিয়াছে। ইতিহাস বলিয়া লিখিত পুস্তকসমূহে সমাজ সম্বন্ধে যে জ্ঞান লব্ধ হয় না, এইরূপ পুস্তক হইতে তাহা পাওয়া যায়। অম্বিকাচরণ সেন মহাশয় ব্রাহ্মসমাজভুক্ত ছিলেন, লেখিকাও ব্রাহ্মসমাজের মহিলা। তাঁহারা উভয়েই প্রাচীনপন্থী হিন্দুসমাজে লালিতপালিত হন। এইজন্য পুস্তকখানি হিন্দুসমাজ ও তদন্তর্গত ব্রাহ্মসমাজ উভয়েরেই পঠনীয়। আমরা ইহা আগ্রহ সহকারে পড়িয়া আনন্দিত ও উপকৃত হইয়াছি। ইহার ছাপা, কাগজ ও বাঁধাই উৎকৃষ্ট।

রা. চ.

কাব্যপরিক্রমা—অজিতকুমার চক্রবর্ত্তী প্রণীত। বিশ্বভারতী-গ্রন্থালয়ে প্রাপ্তব্য। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বঙ্গভাষার রামতনু লাহিড়ী অধ্যাপক রায় খগেন্দ্রনাথ মিত্র বাহাদুর কর্তৃক লিখিত ভূমিকা এবং অধ্যাপক ডক্টর কালিদাস নাগ কর্তৃক পরিচয়, গ্রন্থকারের ও প্রকাশকের নিবেদন সম্বলিত। মূল্য সাধারণ সংস্করণের পাঁচ সিকা এবং বাঁধান বইয়ের দেড় টাকা।

অজিতকুমার বিচক্ষণ সমালোচক ও সাহিত্যরসিক ছিলেন। বিশেষতঃ তিনি রবীন্দ্র-সাহিত্যের নিপুণ জহরী ছিলেন। কাব্যপরিক্রমা রবীন্দ্রনাথের সাহিত্যতীর্থে পরিক্রমণ। কাব্যপরিক্রমা প্রথম সংস্করণে যাহা ছিল না, এমন দুইটি প্রবন্ধ এবং রবীন্দ্রনাথের ও অজিতকুমারের দুইটি চিত্র ইহাতে সন্নিবেশিত করিয়া ইহার প্রকাশক অজিতকুমারের পুত্র শ্রীমান্ অভিজিৎকুমার এই পুস্তকের উপাদেয়তা অধিকতর বর্দ্ধিত করিয়াছেন। ইহাতে রবীন্দ্রনাথের নিম্নলিখিত পুস্তক, কবিতা ও গানের সমালোচনা ও বিবৃতি আছে—১। রাজা, ২। জীবনদেবতা, ৩। ডাকঘর, ৪। জীবনস্মৃতি, ৫। ছিন্নপত্র, ৬। ধর্ম্মসঙ্গীত, ৭। গীতাঞ্জলি, ৮। গীতিমাল্য, ৯। জীবনদেবতার পরিশিষ্ট।

প্রথম ও শেষ বিষয় দুইটি অজিতকুমার মাসিকপত্রে (প্রবাসী ?) লিখিয়া গিয়াছিলেন, ইহা এই পুস্তকে নিবিষ্ট হওয়া পুস্তকখানির সম্পূর্ণতা সাধন করিল। অজিতকুমার ছিলেন রবীন্দ্রসাহিত্যের শ্রেষ্ঠ সমঝদার। তাঁহার পরে যাঁহারা রবীন্দ্রসাহিত্যের আলোচনা করিয়াছেন তাঁহারা অজিতকুমারের নির্দ্দেশই অনুসরণ করিয়াছেন। ইহাই অজিতকুমারের বিচক্ষণতার প্রকৃষ্ট পরিচয়। তিনি অল্প বয়সে যে পাণ্ডিত্য, সূক্ষ্ম সমালোচন-শক্তি, রসগ্রাহিতা, ও জটিল তত্ত্বের মধ্যে অনুপ্রবেশ দেখাইয়া গিয়াছেন, তাহাতে তিনি সকলেরই শ্রদ্ধা ও সম্মান পাইয়াছেন, পাইতেছেন এবং পাইবেন। বাংলা সাহিত্যের দুর্ভাগ্য যে তাঁহার ন্যায় বিচক্ষণ সমালোচক অল্পায়ু হইলেন। তাঁহার প্রতিভা পরিপক্বতালাভের পূর্ব্বেই তাঁহাকে আমরা হারাইলাম। তাঁহার পরে তাঁহার তুল্য সমালোচক তো আজও বঙ্গসাহিত্যের ক্ষেত্রে কেহ অবতীর্ণ হইলেন না। ইহাতেই তাঁহার অভাব আরও তীব্রভাবে অনুভব করিতে হয়। বাংলা সাহিত্য চুটকী লেখায় সমৃদ্ধ হইতেছে, কিন্তু গম্ভীর চিন্তাশীল বিষয়ের আলোচনা ও শ্রদ্ধান্বিত সমালোচনা এখন দুর্লভ। রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী মহাশয়, বলেন্দ্রনাথ ঠাকুর, সতীশচন্দ্র রায়, অজিতকুমার প্রভৃতি যে-ধরণের রচনার দ্বারা বঙ্গভাষাকে ভূষিত করিয়া গিয়াছেন, তাহার তুল্য রচনা এখন দেখা যায় না বলিয়া অজিতকুমারের রচনার বহুমূল্যতা সকলেই একবাক্যে স্বীকার করেন। রবীন্দ্র-সাহিত্যের রসগ্রহণ করিতে যাঁহাদের আগ্রহ আছে, তাঁহারা এই বই পাঠ করিলে বিশেষ সাহায্য পাইবেন এবং রবীন্দ্র-সাহিত্যের

মধ্যে অনুপ্রবেশের পথ দেখিতে পাইবেন। এই পুস্তকের বহুল প্রচার হওয়া একান্ত বাঞ্ছনীয়।

শ্রীচারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

কবিকঙ্কণ চণ্ডী—শ্রীকমলকৃষ্ণ বসু এম্‌. এ, বি-এল্‌। বুক কোম্পানী লিমিটেড কলিকাতা। মূল্য ৸৹ বাঁধাই এক টাকা। ১৩৪০।

মুকুন্দরামের চণ্ডীকাব্য পুরাণো বাংলার ভাণ্ডারে এক উজ্জ্বল রত্ন। উপক্রমণিকায় কবি মুকুন্দরাম চক্রবর্ত্তী কবিকঙ্কণের সময়, জীবনী, ছন্দ প্রভৃতি বিষয় লইয়া আলোচনা করিয়া লেখক পুরাতন কাব্যকথাকে আধুনিক বাংলা গদ্যের ছাঁচে ঢালিয়া সাজাইয়াছেন। লেখকের ভাষা প্রাঞ্জল ও প্রসাদগুণবিশিষ্ট; তাঁহার সাহিত্যানুরাগ যে অকৃত্রিম ও গভীর তাহা এই পুস্তক পাঠ করিলে অনায়াসেই বুঝিতে পারা যায়। এরূপ গ্রন্থ প্রণয়নে ও প্রকাশে আমাদের সমালোচনা-সাহিত্য পুষ্ট হইবে।

মূলকাব্য হইতে যে-সব গোটা পংক্তি উদ্ধৃত হইয়াছে তাহাদিগকে পদ্যের আকারে রাখিলে এবং অধুনালুপ্ত দুরূহ শব্দের অর্থ পাদটীকায় বা অন্যত্র দিলে পুস্তকখানি আরও উপাদেয় হইত।

খৃষ্টানুসরণ—অনুবাদক শ্রীসাবিত্রীপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায়। কলিকাতা খৃষ্টতত্ত্ব-প্রচার সমিতি। মূল্য দেড় টাকা। ১৯৩১।

মূল পুস্তকখানি জগতের অমূল্য সম্পদ। ইহার অনুবাদের উপাদেয়তা সম্বন্ধে পূর্ব্বাচার্য্যগণ অনেকেই বলিয়া গিয়াছেন; স্বামী বিবেকানন্দ খানিকটা অনুবাদ করিয়াও দেখাইয়া দিয়াছেন। সাবিত্রীবাবু সেই কাজ এতদিনে শেষ করিলেন বলিয়া পাঠকসমাজের ধন্যবাদার্হ। সাবিত্রীবাবুর প্রতিষ্ঠা আছে, প্রকাশকের সঙ্গে আমরাও একবাক্যে বলি—"বর্ত্তমান অনুবাদের সহিত শুধু যে মূল-গ্রন্থের বিষয়-বস্তুর মিল আছে তাহাই নহে,—তাহার ভাবপ্রকাশের অতুলনীয় সৌন্দর্য্য এবং মাধুর্য্যও ইহাতে বর্ত্তমান"—অবশ্য আংশিকভাবে। আমরা এই পুস্তকের বহুল প্রচার কামনা করি।

পুস্তকের স্থানে স্থানে দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি। 'ন-খৃষ্টিয়ান' নূতন কথা, 'অকৃত্রিমতার গুজুহাবটি'—কি? মুদ্রাকর-প্রমাদের পরিচয়ও একান্ত দুর্লভ নহে। 'রাজকীয় সম্পদ' ও 'পুণ্যসহভাগ' সাধারণ পাঠকের বুদ্ধির পক্ষে ক্লেশকর।

চন্দ্রশেখর-তত্ত্ব—শ্রীরাধারমণ চক্রবর্ত্তী, এম্‌-এ ও শ্রীসত্যকিঙ্কর মুখোপাধ্যায়, এম্‌-এ। মূল্য দশ আনা। কমলা বুক ডিপো লিমিটেড।

ইহাতে অল্প পরিসরের মধ্যে চন্দ্রশেখর সম্বন্ধে মোটামুটি সব কথা বলা হইয়াছে; মায় পাশ্চাত্য প্রভাব পর্য্যন্ত। পরীক্ষার্থীর জন্য বিশেষ করিয়া লেখা হইলেও ইহা সাধারণ পাঠকের কাজে আসিবে। পুস্তক আলোচনার পূর্ব্বে গ্রন্থকারের সংক্ষিপ্ত পরিচয় দেওয়া ভাল হইয়াছে; কারণ আমরা বঙ্কিমচন্দ্রকে ভুলিতে বসিয়াছি, তিনি আর 'মহার্ঘ' নহেন। গ্রন্থকারদ্বয়ের ভাষা প্রাঞ্জল; বক্তব্য বিষয় বুঝিতে কোনও কষ্ট হয় না।

ময়ূরপঙ্খী রাজকন্যা—শ্রীহেমদাকান্ত বন্দ্যোপাধ্যায়। দাশ গুপ্ত এণ্ড কোং ৫৪-৩ কলেজ ষ্ট্রীট, কলিকাতা। মূল্য আট আনা।

শিশুপাঠ্য চারিটি গল্পের সমষ্টি। প্রথম গল্প হইতে পুস্তকের নামকরণ। কিশোরমতি বালক-বালিকাগণের তৃপ্তিবিধান করিবে। প্রচ্ছদপট ও চিত্রগুলি সুন্দর। এক জায়গায় ভাষায় গোল হইয়াছে, 'লুটোপাটি দৌড় ঝাঁপটাই ছিল বড়—কিসের বা লেখাপড়ি কিসের বা নাওয়া খাওয়া।' অন্যথা সর্ব্বত্র লেখকের বর্ণনাভঙ্গী ও ভাষা মনোরম।

শ্রীপ্রিয়রঞ্জন সেন

রবীন্দ্রনাথ—শ্রীপ্রিয়লাল দাস প্রণীত। সেন ব্রাদার্স এণ্ড কোং, কলিকাতা (১৩৪০)। মূল্য ১৷৹

আলোচ্য গ্রন্থখানি রবীন্দ্র-কাব্য-সাহিত্যের একটি অভিনব অনুশীলন প্রচেষ্টা। গ্রন্থকার তাঁহার বিভিন্ন সময়ে লিখিত অনেকগুলি প্রবন্ধ একত্রে সংগ্রহ করিয়া এই পুস্তকখানি রচনা করিয়াছেন। গ্রন্থনিবদ্ধ প্রবন্ধকয়টিতে প্রিয়বাবু রবীন্দ্রনাথের কাব্যের, বিশেষতঃ তাঁহার গীতি-কবিতার, একটা অনুশীলনের প্রয়াস করিয়াছেন এবং তাঁহার এই চেষ্টা যে সফল হইয়াছে তাহা আমরা নিঃসন্দেহে বলিতে পারি। বিশ্বকবির কাব্যের সম্যক্‌ সমালোচনার সময় এখনও আসে নাই। পূজার সময় ধূপ-ধুনায় মন্দির অন্ধকার হইলে দেব মূর্ত্তির স্বরূপ দেখিবার সুযোগ তেমন ঘটিয়া উঠে না।

কিন্তু রবীন্দ্রনাথ বিশ্বকবি হইলেও তিনি বাঙালী এবং বাঙালীর কবি; বাঙালীর কবিকে বুঝিবার বাঙালী পাঠক একটা দাবি রাখে। প্রিয়বাবু যতদূর পারিয়াছেন সমালোচকের বক্তব্য বাদ দিয়া কবির নিজের উক্তির সহিত মিলাইয়া তাঁহার গীতিকবিতার আলোচনা করিয়াছেন, এবং ইহাতে রবীন্দ্রনাথকে বুঝিবার প্রিয়বাবুর যতটা সুবিধা হইয়াছে, তাঁহার এই গ্রন্থখানি সাধারণ পাঠকের রবীন্দ্র কাব্যানুশীলনে ততটা সুবিধা করিয়া দিবে, ইহাই গ্রন্থকারের বিশ্বাস।

কবিকে তাঁহার কাব্যের দিক হইতে অনুশীলন করিবার চেষ্টাই প্রিয়বাবুর উদ্দেশ্য। সে উদ্দেশ্য যে অনেকটা সিদ্ধ হইয়াছে, তাহা আমাদের স্বীকার করিতে কোনও প্রকার কুণ্ঠা নাই।

শ্রীসুরেন্দ্রনাথ কুমার

দায়ী—শ্রীপ্রভাবতী দেবী সরস্বতী ও হাসিরাশি দেবী। জি. এম. ব্রাদার্স। পৃ. ১৯৮। দাম দেড় টাকা।

উপন্যাসখানির ভাষা বেশ ঝরঝরে কিন্তু শরৎবাবুর অনুকরণ পদে পদে এত পরিস্ফুট যে পড়িতে পড়িতে সব সময় সেই কথাটাই মনকে পীড়া দেয়। হয়ত একথা বলা যাইতে পারে—বেশ ত অনুকরণ যদি সার্থক হয় তবে ত ভালই, এতে মন বিমুখ হয় কেন? কিন্তু এ তর্ক খাটে না—পাঠক চায় শিল্পীর নিজস্ব ব্যক্তিত্ব, নিজস্ব প্রতিভা। মন গোড়া থেকে যেখানে সঙ্কুচিত হইয়া থাকে, রসোপলব্ধি সেখানে নিবিড় হইয়া উঠিতে পারে না। তবুও বইখানির গল্পটি আমাদের ভাল লাগিয়াছে। 'শর্ব্বাণী' ও 'অপরাজিতা'র চরিত্র দুটি মনে রেখাপাত করিয়া যায়। ছাপা ও বাঁধাই ভাল।

আবার যখের ধন—শ্রীহেমেন্দ্রকুমার রায়। দেব সাহিত্য কুটীর। ২২।৫বি, ঝামাপুকুর লেন। কলিকাতা। দাম এক টাকা। পৃ. ১৭১।

হেমেন্দ্রবাবু শিশুদের জন্য গল্প লিখিয়া নাম করিয়াছেন। তাঁহার লিখিত শিশু-উপন্যাস 'যখের ধন'-এর বহুল প্রচার হইয়াছে—এখানিও সেইরূপ একটি 'অ্যাডভেঞ্চার'-এর কাহিনী। বইখানির ছাপা ও কাগজ ভাল, কিন্তু ছবিগুলি সুবিধা হয় নাই। বইয়ের প্রথমেই যে ছবিখানি দেওয়া হইয়াছে, তাহাতে গরিলার ছবিগুলি আর গরিলার মত নয়—নিতান্ত মনগড়া। গল্পটিও ভাল লাগিয়াছে এমন কথা বলিতে পারি না। বাঙালীর ছেলেকে পাকেচক্রে আফ্রিকাতে লইয়া গিয়া ফেলিলেই 'অ্যাডভেঞ্চার'-এর গল্প হয় না, নিতান্ত ঘেলো ধরণের ইংরেজী গল্পের অনুকরণ হইয়া দাঁড়াইয়াছে। আমাদের বিশ্বাস, হেমেন্দ্রবাবু পরিশ্রম করিয়া লিখিলে ইহা অপেক্ষা ভাল জিনিষের সৃষ্টি করিতে পারেন।

শ্রীবিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়

অর্থের সন্ধান—শ্রীচিত্তেন্দ্রনাথ মজুমদার প্রণীত এবং ১২৭ নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট শিশির পাবলিশিং হাউস হইতে প্রকাশিত। মূল্য ১৲টাকা।

ব্যবসায়-বাণিজ্যের প্রসারের উপর দেশের আর্থিক উন্নতি প্রতিষ্ঠিত। দেশের বর্ত্তমান আর্থিক দুরবস্থার দিনে ব্যবসায়-বাণিজ্যের প্রতিষ্ঠা ভিন্ন আমাদের গত্যন্তর নাই। কিন্তু সে-ক্ষেত্রেও কঠোর প্রতিযোগিতা, সুতরাং এই অবস্থায় সাফল্যমাত্রও লাভ করিতে হইলে কতকগুলি গুণ অর্জ্জন করা এবং কয়েকটি উপায় অবলম্বন করা আবশ্যক। এই গ্রন্থের ইহাই আলোচ্য বিষয়। গ্রন্থকার দেখাইয়াছেন যে, ব্যবসায়-ক্ষেত্রে সাফল্য লাভ করিতে হইলে প্রথমেই সেইরূপ মনোবৃত্তি গঠন করিতে হইবে, তৎপরে পদে পদে ভীতি ও দুশ্চিন্তা ত্যাগ করিয়া আত্মবিশ্বাসের বলে উচ্চাভিলাষ জাগাইয়া উদ্ভাবনী শক্তির সহায়তায় দৃঢ়সংকল্প হইয়া কার্য্যে অগ্রসর হইতে হইবে। ইহা ভিন্ন পরিশেষে গ্রন্থকার ব্যবসায়-ক্ষেত্রে যাঁহারা সাফল্য অর্জ্জন করিয়াছেন এমন কয়েকজন কৃতকর্ম্মা ব্যবসায়ীর জীবনী আলোচনা করিয়াছেন। পরিশিষ্ট ভাগে কতকগুলি শিল্প বিজ্ঞান ও বাণিজ্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সম্বন্ধে বিশদ সংবাদ লিপিবদ্ধ করিয়া গ্রন্থকার এই পুস্তকের উপযোগিতা আরও বর্দ্ধিত করিয়াছেন। পুস্তকের ভাষা সরল ও সুখপাঠ্য; মুদ্রণ ও বাঁধাই সুন্দর ও মনোরম। আশা করি এই পুস্তকের বহুল প্রচার হইয়া দেশে ব্যবসায় ও বাণিজ্যের দিকে সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করিবে।

শ্রীসুকুমাররঞ্জন দাশ

ছুঁচের ফোঁড়—(প্রথম খণ্ড) শ্রীহীরেন্দ্রমোহন ঘোষ। ইংরেজীতে সেলাই কাটছাঁট বোনা ইত্যাদির অসংখ্য সচিত্র পুস্তক ও পুস্তিকা আছে। বাংলা দেশে এই জাতীয় বইয়ের চলন ক্রমে ক্রমে হইতেছে। এই ছোট বইখানিতে শুধু ছুঁচের ফোঁড়ের রকমারি দ্বারা কি করিয়া নানা রকম শোভন নক্সা করা যায় তাহা ছবি ও কথার সাহায্যে ভাল করিয়া বোঝানো আছে। আঁকা ছবিকে হুবহু অনুকরণ না করিয়া ছুঁচের সুতার বুনানের বাহারের দিকে বিশেষ দৃষ্টি রাখাই লেখকের উদ্দেশ্য। বইখানির অন্যান্য খণ্ড প্রকাশিত হইলে ঘরে ও ইস্কুলে মেয়েদের সেলাই শিক্ষার অনেক সাহায্য হইবে।

সরল রামায়ণ—শ্রীমুকুন্দবিহারী চক্রবর্ত্তী, বি-এ। ছোট ছেলে মেয়েদের প্রাথমিক শিক্ষার জন্য প্রকাশিত। 'লক্ষ্মণ' ছাড়া আর কোন কথায় সমস্ত বইখানিতে সংযুক্ত বর্ণ ব্যবহার করা হয় নাই। শিশুরা কবিতা ভালবাসে বলিয়া বইখানি পদ্যে লিখিত। বইখানি সচিত্র। ১১৬ পৃষ্ঠায় শিশুরা সমস্ত রামায়ণের গল্প পদ্যে পড়িয়া আনন্দিত হইবে। তবে যে বয়সে (অর্থাৎ ৫ বৎসর) শিশুরা যুক্তাক্ষর বর্জ্জিত বই পড়ে সে বয়সে, "পাতকনাশিনী" "জীবলোকপতি" "কুলের ভাজন" "বিবাহিতা নারী ছিল রাজার শতেক" "ভবভয়হারী" "দেবার যোগ" "রাম-সীতা মেহভেদে অভেদ পরাণ" ইত্যাদি বোঝা অসম্ভব বলিলেই চলে। বইখানি শিশুদের উপযুক্ত ভাষায় লিখিলে সুখপাঠ্য হইবে।

শ

সন্তান পালন—শ্রীজ্ঞানেন্দ্রনাথ বাগচী, এল-এম-এস্ প্রণীত। প্রকাশক শ্রীরমাপ্রসাদ বিশ্বাস, পোঃ হালসা, কুষ্ঠী, নদীয়া। মূল্য ১৵০

শিশু-পালন সম্বন্ধে বাংলা ভাষায় যে দু-চারখানি বই আছে, তাহাদের মধ্যে এইখানি যে সকলের চেয়ে ভাল সে-বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। শিশুর খাদ্য সম্বন্ধে গ্রন্থকার যাহা বলিয়াছেন তাহার কিছু সংশোধন আবশ্যক এবং তিনি যে কয়েকটি "পেটেণ্ট ফুডের" নাম করিয়াছেন তাহা না করিলেই ভাল হইত, কারণ, প্রথমতঃ, পেটেণ্ট ফুড ব্যবহার করা যুক্তিযুক্ত নয় এবং দ্বিতীয়তঃ, পাঠকপাঠিকারা ইহাকে একপ্রকার বিজ্ঞাপন বলিয়া মনে করিতে পারেন।

"শিক্ষা," "শিশুর মনস্তত্ত্ব" এবং "মানসিক শিক্ষা," এই অধ্যায়গুলি অতি সুন্দর ভাবে লেখা হইয়াছে।

বানান ভুলগুলি সংশোধিত হওয়া আবশ্যক। লেখার ধরণ প্রশংসনীয় এবং ভাষা বেশ সরল। প্রত্যেক মাতাপিতারই বইখানি পড়া উচিত।

শ্রীগিরীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়

গুপ্তপ্রেস পুরাতন পঞ্জিকা সংগ্রহ—প্রথম খণ্ড। ১২৯০ সাল হইতে ১২৯৪ সাল; ইং ১৮৮৩।৮৪ হইতে ১৮৮৭।৮৮। গুপ্তপ্রেস পঞ্জিকার প্রধান গণক ও ব্যবস্থাপক ভট্টপল্লীনিবাসী পণ্ডিতপ্রবর শ্রীযুক্ত হরিচরণ স্মৃতিতর্ক বিদ্যারত্ন কর্ত্তৃক সম্পাদিত। মূল্য পাঁচ সিকা। রাজসংস্করণ—সাত সিকা।

কি জ্যোতিষশাস্ত্রব্যবসায়ী, কি সাধারণ লোক সকলেই পুরাতন পঞ্জিকার প্রয়োজন ও অভাব অনুভব করিয়া থাকেন। পনের বিশ বৎসর পূর্ব্বের কোনও তারিখ বা বার নির্দ্দিষ্ট রূপে জানিতে হইলে অনেক সময় বিশেষ অসুবিধায় পড়িতে হয়। সাধারণের এই অসুবিধা দূর করিবার জন্য প্রায় ত্রিশ বৎসর পূর্ব্বে 'বঙ্গবাসী' কার্য্যালয় হইতে ১২৫১—১৩১১ বঙ্গাব্দ বা ১৮৪৪—১৯০৪ খৃষ্টাব্দ এই ৬১ বৎসরের পুরাতন পঞ্জিকা দুই খণ্ডে প্রকাশিত হইয়াছিল। পরিশিষ্ট একখণ্ডে 'গ্রহসংস্কার' দেওয়া হইয়াছিল। সুন্দর ছাপা, সুদৃশ্য বাঁধাই ও উপযোগী বিষয়ের সন্নিবেশের জন্য এই গ্রন্থ সাধারণ্যে বিশেষ আদর লাভ করিয়াছিল। তবে সমগ্র গ্রন্থের দাম ২২৲ সাধারণের পক্ষে একটু বেশী হইয়াছিল অস্বীকার করা চলে না। বর্ত্তমানে গুপ্তপ্রেসের স্বত্বাধিকারীর যত্নে প্রকাশিত পুরাতন পঞ্জিকা-সংগ্রহ কেবল যে পূর্ব্বপ্রকাশিত গ্রন্থ অপেক্ষা স্বল্পমূল্য বলিয়া এমন নহে। ইহা জ্যোতিষশাস্ত্রব্যবসায়ীর প্রয়োজনীয় বিভিন্ন উপকরণে সমৃদ্ধ। সুগমক্ষে সন্নিবেশিত করণ রেবতী, অয়নাংশনাড়ী, হ্রেনস ও নেপচুন গ্রহের সায়ন-স্ফুটাগ্রাদি, লগ্নগণ্ড এবং গ্রন্থমধ্যে পাশ্চাত্য জ্যোতিষমতে ও সিদ্ধান্ত-রহস্য মতে গ্রহস্ফুট সায়ন ও নিরয়ন গ্রহস্ফুটাগ্রাদির উপযোগিতা সাধারণে উপলব্ধি করিতে পারিবেন না সত্য কিন্তু জ্যোতিষশাস্ত্রাভিজ্ঞ অথবা জ্যোতিষশাস্ত্রালোচনাকারী ব্যক্তির পক্ষে এগুলি খুবই মূল্যবান্। গ্রন্থমধ্যে মুদ্রাকরপ্রমাদের কিছু বাহুল্য দেখা যায়। ছয়পৃষ্ঠাব্যাপী এক দীর্ঘ শুদ্ধিপত্রে এই প্রমাদগুলি সংশোধন করা হইয়াছে সত্য, তবে গণিতবিষয়ক গ্রন্থে এ জাতীয় শুদ্ধিপত্র দিলেও গৌরবের বিষয় নহে। প্রাচীনকালে—মুদ্রিত পঞ্জিকা প্রকাশের পূর্ব্বে—হস্তলিখিত পুথির আকারে শতাধিক বৎসরের পুরাতন পঞ্জিকার সংগ্রহ লিপিবদ্ধ হইত; এখনও এরূপ পুথি কোন কোন পুথিশালায় পাওয়া যায়। সম্পাদক মহাশয় অবশ্য এগুলির কোনও উল্লেখ করা প্রয়োজন বোধ করেন নাই; কারণ তাঁহার গ্রন্থ ইতিহাস নহে। তবে বঙ্গবাসী কার্য্যালয়-প্রকাশিত গ্রন্থের ইঙ্গিত পর্য্যন্ত ভূমিকায় না থাকা ঠিক সঙ্গত বলিয়া মনে হইল না। কোন গ্রন্থ প্রকাশের সময় তজ্জাতীয় পূর্ব্ববর্ত্তী গ্রন্থের উল্লেখ করা এবং প্রসঙ্গক্রমে তাহা হইতে পর-প্রকাশিত গ্রন্থের বৈশিষ্ট্য নির্দ্দেশ করা বর্ত্তমানে একটা প্রথা হইয়া দাঁড়াইয়াছে এবং সে প্রথাকে অন্যায় মনে করা চলে না।

শ্রীচিন্তাহরণ চক্রবর্ত্তী

হরিনাথ মোক্তার

শ্রীসুধীরকুমার সেনগুপ্ত

সুরেশ আসিয়া বাড়ি পৌছিল ষষ্ঠীর দিন। তখন সারা গ্রামখানা ঢাকের বাদ্যে মুখরিত হইয়া উঠিয়াছে।

চন্দনপাড়া গাঁ-খানা নেহাৎ ছোট নয় এবং অতি বৃদ্ধ-বৃদ্ধাদের মুখে শোনা যায় যে তাহাদের পিতা-পিতামহের আমলে এই গ্রামখানির না-কি রূপৈশ্বর্য্যের অন্ত ছিল না। অতীতের প্রতি মানুষের শ্রদ্ধা দিনের পর দিন বাড়িয়া চলিয়াছে। কলিকাতায় থাকিতে সুরেশ এক বৎসর ধরিয়া ইম্পিরীয়াল লাইব্রেরীতে গিয়া এই গ্রামের অধুনালুপ্ত গৌরবময় ইতিহাস পুরাতন পুঁথির মধ্যে আবিষ্কার করিবার চেষ্টায় হিউয়েন সাং হইতে আরম্ভ করিয়া ফা-হিয়েন্, বার্ণিয়ার, ট্যাভার্ণিয়ার তন্ন তন্ন করিয়া ঘাঁটাঘাঁটি করিয়াছিল। ইহার মধ্যে সে ভিলেজ অর্গানিজেশনের মোটামুটি নিয়ম-গুলিও জানিয়া লইল এবং গরমের ছুটিতে নেতাদের বাড়িতে ছুটাছুটি করিয়া নিজের কর্ম্মপদ্ধতিরও একটা খস্ড়া প্রস্তুত করিয়া ফেলিল। পূজা আসিল, কলেজের ছুটি হইল। সুরেশ কয়েক দিন বাজার ঘোরাঘুরি করিয়া পূজার বাজারের সঙ্গে সঙ্গে কিছু দড়িদড়া, একটা জমি মাপিবার ফিতা, একটা হোমিওপ্যাথিক ঔষধের বাক্স, টিঞ্চার আয়োডিন, ফিনাইল ইত্যাদি অনেক কিছু কিনিয়া ফেলিল। তারপর বিরাট দুইটি পোর্টম্যান্টো মুটের মাথায় চাপাইয়া ষষ্ঠীর দিন সন্ধ্যাবেলা গ্রামে আসিয়া পৌছিল।

বাড়ি আসিয়া হাতে-মুখে জল দিয়া, চায়ের জল চাপাইতে বলিয়াই সে পোর্টম্যান্টো খুলিয়া খসড়া লইয়া বসিল।

মা বলিলেন,—আজ লেখাপড়া থাক্ সুরেশ, এই দুটো দিন পথে না খেয়ে না ঘুমিয়ে কাটিয়ে এলি—

সুরেশ খাতা হইতে মুখ না তুলিয়াই বলিল,—লেখাপড়া নয় মা, তার চেয়েও অনেক—

মা অতশত বুঝিতেন না, বলিলেন—তা যাই হোক্ বাবা, আজ তুলে রেখে দে, কাল দেখিস।

মায়ের সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ। সুরেশেরও ঘুম পাইতেছিল। খাতাখানা ভাজ করিতে করিতে সে বলিল—মা, আমাদের খাওয়ার জল কি বড়পুকুর থেকে আসে?

মা বলিলেন—না বাবা, সে জল কি আর মুখে তোল্‌বার জো আছে, পানায় সমস্ত পুকুর একেবারে ছেয়ে গেছে। বাঁড়ুয্যে-বাড়ির পশ্চিম দিকের সেই ছোট পুকুরটা এবার কাটানো হয়েছে, সেইটার জলই—

সুরেশ লাফাইয়া উঠিল—সেই ডোবার মত পুকুরটা, মা, সেটায় যে বছরে একটা দিনও সূর্য্যের আলো পড়তে পায় না—

মা বলিলেন —তার আর কি করব বল? এ ত কলকাত শহর নয়।

সুরেশ বলিতে গেল—তা ব'লে—

সুরেশের বৌদি কমলা রান্নাঘর হইতে মাকে ডাকিল। মা চলিয়া গেলেন। সুরেশ বাকী চা-টুকু গলায় ঢালিয়া স্তম্ভিত হইয়া ভাবিতে লাগিল যে ঐ পুকুরের জল খাইয়া তাহার মা-বৌদি যে আজ পর্য্যন্ত বাঁচিয়া আছেন এবং ভাইপো ভাইঝিরা নূতন কাপড় পরিয়া পূজার আমোদ করিবার অবসর পাইতেছে ইহাই পৃথিবীর অষ্টম আশ্চর্য্য। সে রাত্রে তাহার ভাল ঘুম হইল না।

পরদিন সকালে যখন তাহার ঘুম ভাঙ্গিল তখন কাঁচা রোদে আঙিনা ছাইয়া গিয়াছে। সুরেশ চোখে-মুখে জল দিয়াই বাড়ি হইতে বাহির হইয়া পড়িল। পথে হরিনাথ গাঙ্গুলীর সঙ্গে দেখা। হরিনাথ বয়সে প্রৌঢ়, জেলা কোর্টের মোক্তার, দেশহিতৈষী বলিয়াও যৎকিঞ্চিৎ নাম-সঞ্চয় করিয়াছেন। চন্দনপাড়া গ্রামের উন্নতিকল্পে তিনি না-কি বছর-পনের আগে একটা স্কীমও খাড়া করিয়াছিলেন এবং সেই সঙ্গে চন্দনপাড়া হিতৈষিণী ফণ্ড নাম দিয়া একটা ফণ্ডও খুলিয়াছিলেন। তাহার পর কি হইয়াছিল তাহা গ্রামবাসীরা আজ আর মনে করিয়া বলিতে পারে না। অবশ্য এই অসফলতার কারণ

নির্ণয় করিতে গিয়া হরিনাথ না-কি জেলায় ফিরিয়া গোটা-দুই বক্তৃতা দিয়াছিলেন এবং যাহারা সে বক্তৃতা শুনিয়া আসিয়াছিল তাহারা গ্রামবাসীদের আজও গাল পাড়ে।

সুরেশ হরিনাথের পায়ের ধূলা লইয়া কোনও ভূমিকা না করিয়াই কহিল—দাদা, আমি এই গাঁয়ের একেবারে আমূল সংস্কার করতে চাই।

হরিনাথ ব্যস্তভাবে বলিলেন—চমৎকার কথা! নিজেদের গাঁ নিজেরা তৈরি করবে না ত করতে আসবে কি ঐ ইংরেজেরা? এই কথা আমি আজ পনের বছর ধ'রে ব'লে আসছি। কিন্তু কে শোনে সে-সব কথা? তুমি আমার প্রিন্‌সিপল্‌স্ অব ভিলেজ অর্গানিজেশনটা দেখেছিলে ত? আমার মনে হয় ঐ স্কীম মত কাজ করলে—

সুরেশ বাধা দিয়া বলিল—না দাদা, দেশ এই পনের বছরে অনেক এগিয়ে এসেছে, আমি এটাকে আরও কালের সঙ্গে খাপ খাইয়ে নিতে চাই। বিশেষতঃ, কল্‌কাতায় নেতারা যে নতুন স্কীমটা নিয়ে মাথা ঘামাচ্ছেন, আমার মনে হয় সেটাকে আমাদের গাঁয়ে চালাতে পারলে—

হরিনাথ গাঙ্গুলী না দমিয়া বলিলেন—খুব সুন্দর বলেছ। আমিও এই কথাই চাঁদপুরহাটে বক্তৃতা দিতে গিয়ে পনের বছর আগে ব'লে এসেছিলাম। কালের সঙ্গে খাপ খাইয়ে না নিলে কোনও জিনিষই চলে না, তা ভালই হোক্ আর মন্দই হোক্। তা বেশ, পূজোর এই ক'টা দিন বাদেই কাজে নেমে পড়।

সুরেশ আনন্দে হরিনাথ গাঙ্গুলীর পা হইতে আর এক খাম্‌চা ধূলা লইয়া মাথায় দিয়া চলিয়া গেল।

অল্পকয়েক দিনের মধ্যেই সুরেশের দলে অনেক লোক জুটিয়া গেল। বিজয়া দশমীর দিন সে মনসাতলার মাঠে বক্তৃতা দিল এবং সভাক্ষেত্রেই প্রায় পঁচিশ জন যুবক স্বেচ্ছাসেবক তালিকায় নাম স্বাক্ষর করিল। তাহাদের মধ্যের মাতব্বরেরা সুরেশকে এতদূর আশ্বাসও দিল যে, অল্পদিনের ভিতর তাহারা স্বেচ্ছাসেবক-সংখ্যা এক শতে দাঁড় করাইয়া দিবে।

পরদিন ভোরে উঠিয়াই সুরেশ হরিনাথ গাঙ্গুলীর বাড়ি গেল। গাঙ্গুলী তখন তাঁহার স্কীমটা রিভাইজ করিতে বসিয়াছেন। সুরেশ যাইতেই খাতাখানা তাহার হাতে তুলিয়া দিয়া বলিলেন—"দেখ দেখি।" সুরেশ কয়েক জায়গায় আপত্তি করিল, হরিনাথ তখনই তাহা সংশোধন করিয়া দিলেন। নাম দেওয়া হইল "Chandanpara Village Organization and Social Reconstruction Scheme." আপিস সুরেশের বাড়িতেই হইল। বেলা দশটার সময় স্বেচ্ছাসেবক দল বন্দেমাতরম্ ধ্বনি করিতে করিতে সুরেশের বাড়ি উপস্থিত হইল। সুরেশ তখন সবে মাত্র খাইতে বসিয়াছে। কোনও মতে নাকে-মুখে গুঁজিয়া সে উহাদের সঙ্গে চলিয়া গেল।

প্রথম কাজ পুষ্করিণী সংস্কার ও বন নির্মূল। বলা দরকার, হালদার-পুকুর এবং গুঁইদের বাগান যাহাকে লোকে ভূতুড়ে ঝোপ বলিত তাহা লইয়াই ইহাদের প্রথম কার্য্য আরম্ভ হইল।

পরের দিন সকালে কাক চিল না ডাকিয়া উঠিতেই ক্যাব্‌লার মা কাঁদিতে কাঁদিতে সুরেশের বাড়ি আসিয়া উপস্থিত। ভূতুড়ে ঝোপ সংস্কারের সময় কে না-কি তাহার ঐ বাগান সংলগ্ন ফলন্ত পেপে গাছটিকেও নির্মূল করিয়া দিয়াছে। এ-রকম হইলে যে গরিবদের দেশে টেঁকা দায় হইবে এবং 'বন্দমাতার' দল যে দেশে শীঘ্রই বর্গীদের মত অরাজকতা আনিয়া ফেলিবে এ-কথাও সে বার-বার বলিতে ভুলিল না। সুরেশের দলের একজন ঐ ভোরে "গিয়াছে দেশ দুঃখ নাই" ইত্যাদি গাহিতে গাহিতে রাস্তা দিয়া যাইতেছিল। সে আসিয়া বলিল—বুড়ি, তোর গাছে সাপ ছিল।

ক্যাব্‌লার মা কাঁদিয়া-কুঁদিয়া শাপ-গাল দিয়া বলিল—'যাচ্ছি আমি আজই ফৌজদারে নালিশ করতে।" সে ভয় দেখাইয়া চলিয়া গেল।

সুরেশ অমিয়কে জিজ্ঞাসা করিল—গাছটা কে কাট্‌লো?

অমিয় উত্তর দিল—আমাদেরই কেউ হবে।

—কেন?

অমিয় হাসিয়া উঠিল, বলিল—বুঝতে পারছেন না? পেপে খাওয়ার জন্যে বোধ হয়।

—ছিঃ!

অমিয় চলিয়া গেল।

সুরেশ ক্যাব্‌লার মাকে ডাকিয়া গাছের দাম দিয়া দিল।

ইহার পর কিছুদিন বেশ নির্ঝঞ্ঝাটে কাটিল এবং কাজ

পুরাদমে চলিতে লাগিল। রহিমতুল্লা ও তাহার ভাইরা কিন্তু কিছুতেই তাহাদের পুকুর সংস্কার করিতে দিল না। তাহারা বলিল—বাবুরা কলকাতা থেকে কি ওষুধ এনে শিশি শিশি পুকুরে ঢালছে, এইবার পুকুরের সমস্ত মাছ মরে যাবে।

সুরেশ তাহাকে বুঝাইতে বসিয়া বলিল—এসব মিথ্যে কথা তোমাদের কে বললো, বল ত?

রহিমতুল্লার ভাই কাফায়েৎউল্লা ডাকপিয়ন ছলিমুদ্দির নাম করিল।

সুরেশ বলিল—মিথ্যে কথা। এই ত প্রায় তিনটা পুকুরে আমার ওষুধ ঢেলেছি, ক'টা মাছ মরেছে শুনি?

রহিমতুল্লার কিন্তু সেই এক কথা।—"ছলিমুদ্দি কি আমার কাছে মিথ্যা কথা বলবে? সে আমার শালিকে বিয়ে করেছে. রোজ তার বাড়িতে যাওয়া আসা—?"

সুরেশের দল কিন্তু তাহাদের কিছুতেই বুঝাইয়া উঠিতে পারিল না। ছলিমুদ্দিকে ডাকা হইল। সুরেশের প্রশ্নে সে উত্তর দিল যে তাহার ছেলে জেলায় এক বাঙালী বাবুর নিকট হইতে ঐ কথা শুনিয়া আসিয়াছে। হরিনাথ সুরেশকে ডাকিয়া বলিয়া দিলেন—তোমরা কাজ চালিয়ে যাও. থাক্ ওদের পুকুর পড়ে, যখন বুঝবে তখন নিজেরাই ছুটে আসবে। ঝাড়িয়া গোলমাল করার চেয়ে সুরেশ এই পরামর্শই যুক্তিযুক্ত বিবেচনা করিল। হরিনাথ গোপনে ডাকিয়া বলিয়া দিলেন—"ভায়া, ফণ্ড তোল, এ সব সাধারণের কাজে টাকাই হ'ল গোড়ার কথা, যত গুড় দেবে ততই মিষ্টি হবে, আর টাকা না হ'লে বড় বড় স্কীমও ফেঁসে যায়।" সুরেশের নিজের টাকায় কেনা সামান্য ভাণ্ডারও ক্রমে ফতুর হইয়া আসিয়াছিল, উৎসাহিত হইয়া বলিল—কিন্তু কি ভাবে করি বলুন দেখিনি? গানের দল বেঁধে ভিক্ষায় বেরুনো যাক্; কি বলেন?

হরিনাথ হাসিয়া বলিলেন—এ কি তোমার কল্‌কাতা যে অমনি দশ টাকার নোটে কাপড় ছেয়ে যাবে। এরা ভয়ানক কঞ্জুষ সুরেশ, সে-সম্বন্ধে তোমাদের কলকাতার ছেলেরা আইডিয়াই ক'রে উঠতে পারবে না। এদের কাছ থেকে টাকা আদায় করতে হ'লে বাঁকা আঙুল চাই। বুদ্ধি থাকলে এই সুজলা সুফলা শস্যশ্যামলা দেশে কি টাকার অভাব হয়?

সুরেশের দল বিস্ফারিত নেত্রে চাহিয়া রহিল। যেন হরিনাথের কল্পিত ব্যক্ত হইবামাত্র আকাশ হইতে ঝুর ঝুর করিয়া টাকা পড়িতে আরম্ভ হইবে। বিরাট উৎসুক্য লইয়া সকলে হরিনাথ গাঙ্গুলীর মুখের দিকে চাহিয়া রহিল।

হরিনাথ কিন্তু তত কাঁচা মানুষ নহেন, বলিলেন—সে বিকেলে হবে।

সুরেশের দল চলিয়া গেল।

বিকালে হরিনাথ গাঙ্গুলীর বাড়িতে কার্য্যকরী সমিতির সভা বসিল।

হরিনাথের পরামর্শ কিন্তু সুরেশের মনঃপূত হইল না। হরিনাথ ক্ষুণ্ণ হইলেন, কিন্তু মুখে কিছু বলিলেন না।

দু-একদিনের মধ্যেই সুরেশ ছোটখাট একটা দল লইয়া অর্থসংগ্রহের জন্য বাহির হইয়া পড়িল। হালদার-বাড়ির প্রাণনাথ হালদার গাঁয়ের মধ্যে একজন অর্থশালী ব্যক্তি। সুরেশ প্রাণনাথের সামনে খাতা খুলিয়া বলিল—গাঁয়ের উন্নতিকল্পে আপনার নামে চাঁদার খাতায় লিখলুম—

"কর কি, কর কি" বলিয়া হালদার সুরেশের কলমসুদ্ধ হাতখানা চাপিয়া ধরিলেন।—"কোন্ গাঁয়ের উন্নতিকল্পে?"

সুরেশ বলিল,—চন্দনপাড়ার।

হালদারের হাসিতে দলসুদ্ধ সকলের উৎসাহ কর্পূরের মত উবিয়া গেল। হালদার বলিলেন—চন্দনপাড়া আবার একটা গাঁ না কি, আরশুলা আবার পাখী হ'তে শিখল কবে? গাঁ ত চন্দনপাড়া, তার আবার উন্নতি, তার কল্পে, কত টাকা বললে?

অমিয় বলিয়া উঠিল—কেন দেবেন না, শুনি? আপনার পুকুর যে পরিষ্কার ক'রে দেওয়া হ'ল?

সুরেশ বলিল—ছিঃ অমিয়!

হালদার জবাব দিলেন—কে তোমাদের পুকুর পরিষ্কার করতে বলেছিল, জল আমরা এত দিন খাইনি, না বাঁচিনি?

সুরেশ আর তর্ক করিল না। অমিয়র হাত ধরিয়া টানিয়া লইয়া গেল। গ্রামের অতুল চক্রবর্ত্তী সুরেশের হাতে একটা সিকি দিয়া বলিল—পরামর্শ ক'রে এই দিয়ে যাও বাবা। বর-বর ঐ পেলেই তোমাদের গাঁ তিন দিনে স্বর্গ হয়ে যাবে।

অনাদি সুরেশের কানে কানে বলিল—বুড়োর অনেক টাকা আছে সুরেশ-দা, সব মাটির তলায় পোঁতা, চার দাও।

সুরেশ অমিয়র গা টিপিল। অমিয় বলিল—মোটে চার আনা দিলেন, আপনার মত লোকের নামে চার আনা লেখা দেখলে লোকে বেশী দিতে চাইবে কেন?

চক্রবর্ত্তী হাসিয়া বলিলেন—তোমাদের কথা বুঝেছি বাপু, কিছু বেশী লিখে নিতে চাও, তা যত ইচ্ছে লিখে নাও, আমিও লোকের কাছে তাই বল্‌বো এখন। মোদ্দা ব'লে দেও, কটাকা লিখলে।

সুরেশ হতাশ হইয়া ফিরিয়া গেল।

তিন দিন ঘুরিয়া মোট দুই টাকা ছয় আনা আদায় হইল। কিন্তু ঐ পর্য্যন্তই। লোকে বলে,—দেশোদ্ধার করতে হ'লেই তোমাদের ঝুড়ি ঝুড়ি টাকার দরকার পড়ে। কেন, গাঁয়ের উন্নতি করতে টাকা লাগে কিসে? পুকুর কাটবে, বন পরিষ্কার করবে, কোদাল চাও কোদাল দিচ্ছি, শাবল চাও শাবল দিচ্ছি, যা দরকার দিচ্ছি। তা না, টাকা চাই, ভলান্টিয়াররা মিলে ফিষ্টি লাগাবে বুঝি?

হরিনাথ সব শুনিয়া বলিলেন—বলিনি ভায়া, এ ধর্ম্ম-কর্ম্মর কাল না, আর পোলিটিকাল ফিল্ডে ধর্ম্মটর্ম্মর জায়গাও নেই। খাতা নিয়ে চাঁদা তুল্‌তে চাও ত ঝোপঝাড় দিনের পর দিন আকাশের দিকে প্রোমোশন পাবে আর পানায় মাঠ না পুকুর চেনা যাবে না।

অমিয়র কিন্তু আর চাঁদা চাহিয়া বেড়াইবার উৎসাহ নাই।

সুরেশ বলিল—আরও কয়েক দিন দেখি কি হয়?

সুরেশদের ভাঙা নাটমন্দিরে প্রায় দিন-পনের ধরিয়া পাঠশালা বসিতেছে। সেখানে গ্রামের ছেলেদের অবৈতনিক ভাবে শিক্ষা দেওয়া হয়। বেলা বারটার সময় স্কুল বসে, চারটার সময় ভাঙিয়া যায়। সেখানে সুরেশ অন্যান্য বিষয়ের সঙ্গে স্বাস্থ্যতত্ত্ব, বিজ্ঞান সম্বন্ধেও ছেলেদের উপদেশ দিতে আরম্ভ করিল। হারু মণ্ডলের ছেলে ক্ষুদিরাম যেদিন সুরেশের মুখে শোনা, 'চাঁদ কারও মুখ নয়, অথবা গাছের তলায় বসিয়া কোনও বুড়ি চরকা কাটে না, এবং চাঁদে বড় বড় গহ্বর থাকায় জায়গায় জায়গায় কালো দেখায়,' এই সব গল্প বাপের কাছে সবিস্তারে বলিল, সেদিন রাত্রেই হারু সুরেশের বাড়ি ছুটিয়া আসিল এবং বলিল—কর্ত্তা, আমার ছেলেকে কাল থেকে আর স্কুলে পাঠাব না। আপনি মশায় সকলকে খৃষ্টান ক'রে দিচ্ছেন।

সুরেশ হাসিয়া বলিল,—কেন?

হারু বলিল—আপনি ওদের কাছে বলেছেন, চাঁদ কিছু নয়, শুধু বালি আর পাহাড়—

সুরেশ হাসিয়া বলিল—তা বলেছিই ত।

হারু বলিল—যাকে আমরা চিরকাল ঠাকুরদেবতা ব'লে মেনে আস্‌ছি তাদের ওপর ভক্তি যদি এখন থেকেই আপনারা ছুটিয়ে দেন ত বড় হয়ে এরা কি শেষে বাপ-ঠাকুর্দ্দার ভিটেয় মেমের নাচ লাগাবে?

সুরেশের মন ভাল ছিল না, বলিল—আচ্ছা বিজ্ঞান যখন শেখানো হয় তখন তোমার ছেলেকে ছুটি দেব। ছেলেকে পাঠিও। বাপ-ঠাকুর্দ্দায় মতি ওর স্থির থাকবে।

হারু আশ্বাস পাইয়া চলিয়া গেল। সুরেশ আপন মনেই বলিয়া উঠিল—এই অন্ধ বিশ্বাসের হাত থেকে এরা মুক্তি পাবে কবে? একটা জাতি দিনের পর দিন অন্ধতা, ভীরুতা, দুর্ব্বলতায় জর্জ্জরিত হ'য়ে মৃত্যুর দিকে ছুটে চলেছে। এই অপঘাত মৃত্যুর হাত থেকে এদের রক্ষা করবে কে?

চন্দনপাড়া গ্রামের মুখ একটু চিক্ চিক্ করিতে আরম্ভ করিয়াছে। পুকুরগুলায় মানুষ পানীয় জল পায়, রাত্রে বাহির হইতে হইলে সাপের ভয়ে জীবন বীমা করিয়া রাখিতে হয় না। গ্রামের বিষ্টু আচার্য্য সেদিন সুরেশকে সামনে পাইয়া দুই হাত মাথায় দিয়া প্রাণ ভরিয়া আশীর্ব্বাদ করিলেন।

কিন্তু আশীর্ব্বাদে পেট ভরে না। সুরেশ নিজের টাকায় যা-কিছু জিনিষপত্র কিনিয়া আনিয়াছিল তাহা ফুরাইয়া গিয়াছে, চাঁদা মোট দুই টাকা ছয় আনা উঠিয়াছিল, এখন চলে কিসে?

আবার পরামর্শ চলিতে লাগিল। এদিকে দুধপুকুরের পাড়ে যেখানে আধ মাইল জায়গা ধরিয়া বন সমাকীর্ণ রহিয়াছে, সেই বন পরিষ্কার করিতে গিয়া আড়াই হাত মাটির তলায় সুরেশের দলের ছেলেরা এক শ্বেতপাথরের শিবমূর্ত্তি পাইল।

শিব দৈর্ঘ্যে দেড় ফুট হইবেন। সারা গাঁয়ে হৈ-চৈ পড়িয়া গেল। খবর পৌঁছিবা মাত্র হরিনাথ গাঙ্গুলী ছুটিতে ছুটিতে আসিয়া শিবের সামনে সাষ্টাঙ্গে শুইয়া পড়িলেন এবং মাথা খুঁড়িতে লাগিলেন।

গাঁয়ের ছেলে-বুড়ো-মেয়ে কেহই তখন আর জমিতে বাকী নাই। হরিনাথ মাথা তুলিয়া গদগদকণ্ঠে বলিতে লাগিলেন যে, এই দেবমূর্ত্তির কথা তিনি প্রাচীন পুঁথিতে পাইয়াছিলেন। ইহার নাম মুদ্গরেশ্বর। আওরংজীব যখন দিল্লীর সিংহাসনে তখন এই গ্রাম এবং আশপাশের চব্বিশখানি গ্রাম লইয়া নাম ছিল চন্দনী পরগণা এবং মুদ্গর রাজা এই রাজ্যের রাজা ছিলেন। এই চন্দনপাড়াই ছিল তাঁহার রাজধানী। যেখানে ঐ শিব প্রোথিত ছিলেন ঐ-খানেই ছিল মুদ্গরেশ্বরের বিরাট মন্দির। আশপাশের চব্বিশটা গ্রামের লোক দেবাদিদেবের পূজা দিতে এইখানে সমবেত হইত। মুদ্গর রাজার উপর আওরংজীব মোটেই সন্তুষ্ট ছিলেন না। বাঙালী রাজা ক্রমশঃই ক্ষমতাশালী হইয়া উঠিতেছেন দেখিয়া সম্রাট তাঁহাকে দমন করিতে সৈন্য পাঠাইয়া দিলেন। রাজা বিপদ দেখিয়া পাছে বিধর্ম্মী সৈন্যরা রাজ্য-দেবতাকে লাঞ্ছিত করে এই ভয়ে মাটি খুঁড়িয়া গোপনে মহাদেবকে এইখানে পুঁতিয়া রাখিলেন। রাজার ভয় অমূলক ছিল না। শীঘ্রই মোগল সৈন্য আসিয়া চন্দনী-রাজ্য ধ্বংস করিয়া ফেলিল। মুদ্গর পলাইয়া গেলেন। দেবাদিদেব সেই অবধি ঐখানেই চাপা রহিলেন। বৃষটিকেও যে প্রোথিত করা হইয়াছিল, ইহাও তিনি পুঁথিতে পাইয়াছেন, মাটি খুঁড়িলে নিশ্চয়ই বাহির হইবে।

গ্রামের লোকই কোদাল দিয়া মাটি খুঁড়িতে আরম্ভ করিল। সারা দুপুর খননের পর সন্ধ্যার প্রাক্কালে ষাঁড়টিও আবিষ্কৃত হইল। বৃষের নাকের আগা একটু ভাঙিয়া গিয়াছে। তা হউক, হরিনাথ বলিলেন—এত বড় জাগ্রত দেবতা সারা বাংলা দেশে আর ছিল না।

সুরেশ যাইবার সময় বলিয়া গেল এখানে মন্দির উঠিবে।

হরিনাথ মন্দির-নির্ম্মাণের জন্য সুরেশের হাতে পঞ্চাশ টাকা চাঁদা দিলেন।

পরের দিন সন্ধ্যায় মনসাতলার মাঠে চন্দনপাড়া এবং তাহার আশপাশের অনেকগুলি গ্রামের প্রতিনিধি লইয়া একটা সভা হইল। প্রত্যেক গ্রামের একজন করিয়া মাতব্বর লইয়া মুদ্গরেশ্বরের মন্দির নির্ম্মাণ কমিটি গঠিত হইল। হরিনাথ কোষাধ্যক্ষ এবং সুরেশ সম্পাদক নিযুক্ত হইল।

হরিনাথের কোষাধ্যক্ষ নির্ব্বাচনে কয়েক জন লোক একটু আপত্তি করিয়াছিল, কারণ পনের বছর আগেও না-কি কি একটা ফণ্ড খোলা হইয়াছিল এবং হরিনাথ হঠাৎ কর্ম্মস্থলে চলিয়া যাওয়ায় টাকার থলিটার আর কেহই উদ্দেশ পায় নাই। কিন্তু অমিয় যখন দাঁড়াইয়া বলিল যে, যাঁহাদের আপত্তি আছে তাঁহারা হাত তুলুন, তখন গোপাল তেলীর নাবালক ছেলেটা ছাড়া আর কেহই হাত উঠাইল না।

এবার আর চাঁদা চাহিয়া বেড়াইতে হইল না, সভাস্থলেই প্রায় পঞ্চাশ টাকা উঠিয়া গেল।

পরের দিন সন্ধ্যায় মন্দির-নির্ম্মাণ কমিটির এক অধিবেশন হইল এবং ঠিক হইল যে, ঐখানকার সমস্ত বন কাটিয়া নির্ম্মূল করা হইবে এবং যেখানে মহাদেব প্রোথিত ছিলেন সেই ভূমির উপরে মুদ্গরেশ্বরের মন্দির উঠিবে। মন্দিরের বিরাট প্রাঙ্গণে প্রতি বৎসরে নির্দ্দিষ্ট কয়েকটি উৎসবে মেলা বসিবে এবং সেজন্য একটা যাত্রীবাড়িও নির্ম্মিত হইবে। আরও কিছু টাকা উঠিলে নির্ম্মাণকার্য্য আরম্ভ হইতে পারে, ততদিন জঙ্গল পরিষ্কার হইতে থাকুক।

বিষ্টু সরকার আধাদামে দশ হাজার ইটের অর্ডার পাইল, টাকা পরে দিলেও চলিবে।

হরিনাথের উৎসাহের অন্ত নাই। প্রৌঢ় বয়সে তিনি যেন হস্তীর বল লইয়া কার্য্য করিতেছেন। টাকা মন্দ উঠিল না। বনও প্রায় সাফ হইয়া আসিল। ইট কাটা হইয়া পাঁজায় চড়িয়াছে, দুই-চারি দিনের মধ্যেই পোড়ানো শেষ হইবে।

হরিনাথ বলিলেন—মন্দির উঠলে, দেখতে দেখতে চন্দন-পাড়া বছর ঘুরে আসতে-না-আসতে শহর বনে যাবে।

সুরেশ বলিল—এইবার আমাদের পল্লীসংস্কারের কাজ আরম্ভ ক'রে দেওয়া যাক।

হরিনাথ বলিলেন—নিশ্চয়ই।

ইট আনিয়া স্তূপীকৃত করিয়া রাখা হইয়াছে।

মন্দিরের কাজ আরম্ভ হয়-হয় এমন সময় হালদারপাড়ায় দিকে এক তুমুল কাণ্ড বাধিয়া গেল। প্রাণনাথ হালদারের সঙ্গে তার জ্ঞাতিভ্রাতা জ্যোতি হালদারের অনেক দিন ধরিয়া একটা জমি লইয়া বিবাদ চলিতেছিল। সেদিন সকালে গ্রামে রাষ্ট্র হইয়া গেল যে, দুই দলই সর্দ্দার আনিয়া জমায়েৎ করিয়াছে এবং সন্ধ্যার পূর্ব্বেই দাঙ্গা বাধিবে।

সুরেশ আগের দিন রাত্রে রাজমিস্ত্রী সংগ্রহের জন্য জেলায় গিয়াছে। ঐ দিন সন্ধ্যায় সে চন্দনপাড়ায় ফিরিল। বাড়িতে পা দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই কথাটা তাহার কানে উঠিল। সে ছুটিয়া হালদারপাড়ার দিকে গেল।

হালদারপাড়ার কাছাকাছি পৌঁছিতেই সুরেশ ব্যাপারটার গুরুত্ব ও বীভৎসতা প্রত্যক্ষ করিয়া শিহরিয়া উঠিল। লাঠির শব্দে আর মানুষের চীৎকারে কান পাতা যায় না। মশালের আলোয় মনে হয় যেন সমস্ত গ্রামে আগুন ধরিয়া গিয়াছে। দ্বিশতাধিক মানুষ মৃত্যুর উৎসবে মাতিয়া উঠিয়াছে এবং জীবনের মূল্য যে কিছুই নহে তাহাই যেন লাঠির আগায় প্রমাণ করিতে লাগিয়া গিয়াছে।

প্রাণনাথ দাঙ্গাস্থলের একটু দূরে ছিলেন. সুরেশ ছুটিয়া গিয়া তাঁহার পা জড়াইয়া ধরিল,—সর্ব্বনাশ করছেন, এখনও থামুন।

প্রাণনাথ হালদার দাঁত খিঁচাইয়া উঠিলেন,—এ তোমার বাইবেলপড়া বুদ্ধি নয় সুরেশ, আমাদের জমিদারী চালিয়ে খেতে হয়, যাও, বাড়ি যাও।

সুরেশ মরিয়া হইয়া বলিল,—আপনাদের থামতেই হবে।

প্রাণনাথ নীরস ভাবে বলিলেন,—হুকুম দিয়েছি, এখন থামাবার সাধ্য আমার বাবারও নেই। তোমার ক্ষমতা থাকে থামাও।

সুরেশ ছুটিয়া হরিনাথের কাছে গেল। হরিনাথ বলিলেন—ক্ষেপেছ তুমি, ওর ভেতর গিয়ে থামাতে হ'লে মাথার চাঁদি বটপাতা হয়ে আকাশে উড়বে। পুলিসে খবর দিয়েছি।

—পুলিস ? সুরেশ চমকিয়া উঠিল।

নীরসভাবে হরিনাথ উত্তর দিলেন—আসবে বইকি! ইংরেজ রাজত্ব নয় ?

হরিনাথ মিথ্যা কথা বলেন নাই, পরের দিন বেলা দশটার সময় নাড়ুলের খালঘাটে পুলিসের নৌকা আসিয়া ভিড়িল। অনতিবিলম্বেই তদন্ত আরম্ভ হইল। তখন সর্দ্দারেরা কাটা-মাথা আর ইনাম লইয়া সরিয়া পড়িয়াছে। পুলিস দাঙ্গাকারী সন্দেহে কয়েক জন লোককে গ্রেপ্তার করিল। দাঙ্গাস্থলে ইন্‌সপেক্টর একখানি নাম-লেখা সিল্কের রুমাল কুড়াইয়া পাইলেন। রুমালের কোনে নাম পড়িয়া জিজ্ঞাসা করিলেন,—"সুরেশ কে ?" সন্ধান মিলিতে বিলম্ব হইল না। জ্যোতি হালদারের দলের লোকেরা সুরেশের উপর সন্তুষ্ট ছিল না। তাহারা সাক্ষ্য দিল যে, সুরেশও ও-পক্ষের হইয়া লড়িয়াছে এবং এনায়েৎ আলি বলিল যে, সে হাট হইতে ফিরিবার সময় সুরেশ বাবুকে মোটা বাঁশের লাঠি লইয়া এইদিকে ছুটিয়া আসিতে দেখিয়াছে। দাঙ্গাকারীদের সহিত সুরেশও চালান হইল।

কোর্টে কিন্তু সুরেশের বিরুদ্ধে সাক্ষীরা টিকিল না। মাসখানেক ধরিয়া বিচার চলিবার পর সে মুক্তি পাইল। কোর্ট হইতে বাহির হইবার সময় নীতীশ পিছন হইতে ডাকিল,—সুরেশ।

নীতীশ সুরেশের বাল্যবন্ধু, ল' পাস করিয়া এই কোর্টে প্র্যাকটিস করিতেছে। বলিতে গেলে তাহার তদ্বিরেই সুরেশ মুক্তি পাইয়াছে।

নীতীশ বলিল,—এখন করতে চাও কি ?

সুরেশ বলিল, আমি ওদের মানুষ করতে চাই। শিক্ষার অভাবই ওদের দিনের পর দিন জঘন্য ক'রে তুলেছে।

নীতীশ বলিল,—সর্ব্বনাশ, তুমি কি ক্ষেপেছ ? শিক্ষা দিয়ে মানুষ করবে কাকে, শিক্ষা পায়নি তাই রক্ষে। এর ওপর যদি তুমি ওদের শিক্ষিত করতে চাও, ত ওরা যে কি ভয়ানক হয়ে উঠবে তা ক্রিমিনোলজী পড়া আমরাও ঠাউরে উঠতে পারব না।

সুরেশ হতাশ ভাবে বলিল—তাহলে তুমি কি করতে বল ?

নীতীশ বলিল—ওদের জন্য কিছু না। মন যাদের এত ময়লা তাদের জন্য বাইরের জঙ্গল কেটে আর পাঁক পরিষ্কার ক'রে কতটুকু তুমি পৃথিবীর উপকার করবে ? বরং এদের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য যদি বাড়িয়ে দাও ত এরা নিশ্চিন্ত মনে আরও এই সব দিকে মন দিতে পারবে! তার চেয়ে যদি পার ত ওদের

ছেলেমেয়েগুলোকে মানুষ ক'রে তুলতে চেষ্টা কর এবং কায়মনোবাক্যে ভগবানের কাছে প্রার্থনা কর তারা যেন তাদের বাপ-খুড়োর মত না হয়।

সুরেশ কোর্ট হইতে বাহির হইয়া আসিল। নীতীশ পিছন হইতে জিজ্ঞাসা করিল,—এবার ল' দিচ্ছ ত?

উত্তরে সুরেশ কি বলিল, বোঝা গেল না।

গ্রামে পৌঁছিয়াই সুরেশ হরিনাথের বাড়ি গেল। হরিনাথ তখন দাওয়ায় বসিয়া তামাক টানিতেছেন। সুরেশ পায়ের ধুলা লইয়া বলিল—মন্দিরের কি করা যায়?

হরিনাথ বলিলেন—পাগল হয়েছ? এই গাঁয়ের মানুষে উপকার করে?

সুরেশ বলিল—তবে টাকাগুলো দিন, যার যার টাকা ফেরৎ দিয়ে দিই।

হরিনাথ একমুখ ধোঁয়া ছাড়িয়া বলিলেন,—কিসের টাকা?

সুরেশ বলিল—মন্দির তৈরির।

—ওঃ। টাকাটা দেওয়াব এখন। তোমায় পুলিসে ধরিয়েছিল বেটারা, ওদের আমি সোজায় ছাড়বো মনে করেছ? একটি পয়সাও দিচ্ছি না।

সুরেশ বলিল—গাঁয়ের লোকের দোষ কি? তারা ত আর আমায় ধরিয়ে দেয় নি।

হরিনাথ ভ্রূকুটি করিয়া বলিলেন—কল্‌কাতার শহরে কি বুদ্ধির চাষ একেবারে বসে গেছে যে এটুকুও মাথায় ঢোকেনি। গাঁয়ের লোক ধরায়নি, ধরিয়েছে এসে ও-গাঁয়ের গোবিন্দ মল্লিকের মামা, না? সাক্ষী দেবার সময় ত তেরোটা বেরিয়েছিল। চোরের দল! টাকাটা খাওয়াবো এখন।

সুরেশ হতাশভাবে বলিল—আমায় যে সবাই ধরবে?

হরিনাথ বলিলেন—যে ধরবে, ব'লো, হরিনাথ গাঙ্গুলীর কাছে নাও গে যাও। ত্রিশ বছর মোক্তারী করছি, এক বক্তৃতায় ওর পাঁচগুণ টাকার হিসেব মিলিয়ে দিতে পারি। আর কত টাকা আমারও খরচ হ'ল হিসেব ক'রে দেখ ত? ওই শিবমূর্ত্তিটি আমিই কিনেছিলেম আঠারো টাকা দিয়ে, আর ও ষাঁড়টার তখনকার দাম ছিল সাড়ে সাতটাকা, সেও আমার গেছে, আর চাঁদা দিয়েছি পঞ্চাশ টাকা।

সুরেশ বলিল—চাঁদার টাকা ত আপনারই কাছে।

হরিনাথ বলিলেন—আমি কি বল্‌ছি যে তোমার কাছে?

সুরেশ হরিনাথ গাঙ্গুলীর বাড়ি হইতে বাহির হইয়া পড়িল। বাড়ির কাছে পৌঁছিতেই দেখিল, স্বেচ্ছাসেবকের দল তাহার জন্য বসিয়া আছে। সুরেশকে দেখিয়াই তাহারা 'বন্দেমাতরম্' ধ্বনি করিয়া উঠিল। কাহারও সহিত কথা না বলিয়া সুরেশ বাড়ির মধ্যে ঢুকিয়া পড়িল।

পরের দিন সকালে সে মায়ের পায়ের ধুলা লইয়া কলিকাতায় চলিয়া গেল।

সুবর্ণ

শ্রীজগবন্ধু মুখোপাধ্যায়

নিকৃষ্ট ধাতুকে বিভিন্ন প্রণালী দ্বারা মূল্যবান ধাতুতে, বিশেষতঃ স্বর্ণে, পরিবর্ত্তিত করিবার উপায় প্রাচীন ভারতে ব্যাপক ভাবে অনুশীলিত হইয়াছিল—এই প্রবন্ধে সংক্ষেপে তাহার আলোচনা করিব।

সংস্কৃত সাহিত্যে ত্রিবিধ কাঞ্চনের উল্লেখ আছে। "তত্রৈকং রসবেধজং তদপরং জাতং স্বয়ং ভূমিজম্ কিঞ্চান্যদ্বহু লোহশঙ্কর ভবঞ্চেতি ত্রিধা কাঞ্চনম্।" প্রথম, রসবেধজ অর্থাৎ পারদযোগে কৃত্রিম উপায়ে প্রস্তুত; দ্বিতীয়, স্বভাবজ—মৃত্তিকায় উৎপন্ন সুবর্ণ; এবং তৃতীয় লৌহাদি ধাতুর সহিত শঙ্কর বা মিশ্র অবস্থায় প্রাপ্ত সুবর্ণ। এই তিন প্রকার ব্যতীত অন্য এক প্রকার সুবর্ণের উল্লেখ রুদ্রযামল তন্ত্রে ধাতুক্রিয়ায় দৃষ্ট হয়, উহাকে 'হীন হেম' বলে।

সুবর্ণ যে কৃত্রিম উপায়েও প্রস্তুত হইত তাহার উল্লেখ স্পষ্ট করিয়াই সংস্কৃত সাহিত্যে লিখিত আছে। "কৃত্রিমঞ্চাপি ভবতি তদ্রসেন্দ্রস্য বেধতঃ" অর্থাৎ পারদ দ্বারা বিদ্ধ হইলে কৃত্রিম সুবর্ণ প্রস্তুত হইতে পারে।

কৃত্রিম উপায়ে সুবর্ণ প্রস্তুত প্রণালী তন্ত্র ও পুরাণাদিতে দৃষ্ট হয়। গরুড় পুরাণে সুবর্ণ-করণ সম্বন্ধে ১৮৮ অধ্যায়ে আছে,—

অথ সুবর্ণ করণম্

মধ্বাজ্যং গুড়তাম্রঞ্চ করনামাক্ষিকং রসং।
ধমনার্চ্চ ভবেত্রোপ্যং সুবর্ণ করণং শৃণু॥
পীতং ধুস্তুর পুষ্পঞ্চ সীসকঞ্চ পলং মতং।
পাঠালাঙ্গল শাখা চ মূলমাবর্ত্তনাদ্ভবেৎ॥

পীত বর্ণ ধুতরা পুষ্প ও সীসক ধাতু ইহাদের প্রত্যেকটি এক পল অর্থাৎ আট তোলা লইয়া আকনাদির রস ও লাঙ্গলিয়ার রস দ্বারা মর্দ্দন করিয়া যথাবিধি অগ্নিতে দগ্ধ করিলে সুবর্ণ হইয়া থাকে।

অধিকাংশ তন্ত্রে শঙ্কর বক্তা ও পার্ব্বতী শ্রোতা সেই জন্য মাতৃকা ভেদ তন্ত্রে পঞ্চম পটলে এইরূপ লিখিত আছে—

(ক) শ্রীশঙ্কর উবাচ—

আনীয় পারদং দেবি স্থাপয়েৎ প্রস্তরোপরি।
তস্যোপরি জপেদষ্ট সর্ব্ব বন্ধ মাত্মকম্॥
সাষ্ট সহস্রং দেবেশি প্রজপেৎ সাধকাগ্রণী।
স্বয়ম্ভূপুষ্প সংযুক্তে বস্ত্রে চারুণ সন্নিভিঃ॥
সংস্থাপ্য পারদং দেবি মৃৎপাত্রে যুগলে শিবে।
পুষ্পযুক্তেন সূত্রেন বধ্নীয়াৎ বহু যত্নতঃ॥
মৃত্তিকয়া রজো নৈব ধান্যস্য পরমেশ্বরি।
লেপয়েদ্বহু যত্নেন রৌদ্রে শুষ্কানি কারয়েৎ॥
পুনশ্চ লেপয়েদ্ধীমান্ ততো বহ্নৌ বিনিক্ষিপেৎ।
অষ্টমী নবমী রাত্রৌ ক্ষিপেত্তৈব সুরেশ্বরী॥

(খ) অথবা

পরমেশানি মৃৎপাত্রে স্থাপয়েদ্রসং।
কদলীরসেন তদ্দ্রব্যং শোধয়েদ্বহু যত্নতঃ॥
ঘৃতনারী রসে নৈব তথৈব শোধনং চরেৎ।
এবং কৃতেতু গুটিকাঃ যদিস্যাদ্দৃঢ়বন্ধন'॥
ধুস্তুরঞ্চ সমানীয় মধ্যে পূরঞ্চ কারয়েৎ।
কৃষ্ণাখ্যা তুলসী যোগে তথা ঘৃতকুমারিকা॥
এবং কৃতে বহ্নি যোগে ভস্মস্যাৎ জায়তে কিল।
তস্য যোগে ভবেৎ স্বর্ণং ধনদায়া প্রসাদতঃ॥
বিবর্ণং জায়তে দ্রব্যং যদি পূজাং ন চারয়েৎ।

শ্রীশঙ্কর কহিলেন—

হে দেবি! পারদ আনয়ন করিয়া প্রস্তরোপরি স্থাপন করিয়া সাধকাগ্রগণ্য উহার উপর অষ্ট সহস্র সর্ব্ববন্ধমন্ত্রাত্মক মন্ত্র জপ করিবে। রক্ত বর্ণ স্বয়ম্ভূ পুষ্প সংযুক্ত বস্ত্রে পারদ রাখিয়া দুইটি মৃৎপাত্রে পারদ স্থাপন করিবে অর্থাৎ দুইটি মুষার দ্বারা আবদ্ধ করিবে। ঐ স্বয়ম্ভূ পুষ্পযুক্ত সূত্র দ্বারা বহু যত্ন করিয়া বাঁধিবে এবং ধান্য রজ অর্থাৎ কুঁড়া বা তুষ ও মৃত্তিকা দ্বারা বহু যত্নে প্রলেপ দিবে এবং পুনরায় ঐরূপ বুদ্ধিমান (সাধক) লেপিবে (যেহেতু নষ্ট না হয়) তারপর অগ্নিতে নিক্ষেপ করিবে (পারদ ভস্ম করিবার জন্য)। উপরিলিখিত স্বয়ম্ভূ পুষ্প লইয়া আমাদের একটু গোল বাধিয়াছিল। স্বয়ম্ভূ শব্দে যদিও ব্রহ্মাকে বুঝায় তথাপি তন্ত্রে শঙ্করের প্রাধান্য দেওয়ায় মহাদেবকে বুঝা মোটেই বিচিত্র নহে। স্বয়ম্ভূ মানে যদি মহাদেবই ধরি তবে তাঁহার ফুল অর্থাৎ ধুতুরা ফুলই হইবে—বিশেষতঃ স্বর্ণ প্রস্তুত প্রকরণে গ্রন্থান্তরে ধুস্তুর, পীতধুস্তুর প্রভৃতির উল্লেখ আছে। বিশেষতঃ গরুড় পুরাণে সুবর্ণ-করণ প্রকরণে পীত ধুস্তুরের স্পষ্ট

উল্লেখ আছে। কিন্তু অভিধানে "স্বয়ম্ভূ পুষ্প" শব্দ দেখিলাম না। তখন আমাদের বেশ একটু সন্দেহ হইল। এইরূপে প্রায় সুদীর্ঘ দশ বৎসর কাটিয়া গেল, পরে একটি নিম্ন শ্রেণীর তান্ত্রিক আভিচারিকের নিকট প্রথম শুনিলাম স্বয়ম্ভূ পুষ্প মানে ফুলই নয়—উহা নারীরক্তবিশেষ।

অথবা

পরমেশ্বরী মৃৎপাত্রে পারদ স্থাপন করিয়া বল্লী রসের দ্বারা বহু যত্ন করিয়া উহা শোধন করিবে। ঘৃতনারী রস দ্বারাও ঐ রূপে শোধন করিবে। এইরূপ করিলে যদি শক্ত গুটিকা হয় (বোধ হয় পারদ জমিয়া) ধুতুরা (ফল) আনয়ন করিয়া উহার মধ্যে শূন্য করিবে (বীজগুলি ফেলিয়া)। ঘৃতকুমারী ও কৃষ্ণতুলসীর দ্বারা (বোধ হয় শূন্য স্থানে পারদ রাখিয়া মুখ বন্ধ করিবে)। এই (খ) চিহ্নিত উদ্ধৃত অংশের ভিতর যে বল্লীরস ও ঘৃতনারী রসের উল্লেখ আছে তাহা কোন্ কোন্ উদ্ভিদকে বুঝাইতেছে তাহা বুঝা কঠিন। বল্লী শব্দে লতা বুঝায় এবং কৈবর্ত্তিকাও (দেশজ কৈমুড়া) বুঝায়। নাগবল্লী শব্দে পান (তাম্বুল) বুঝায়। ঘৃতনারী শব্দ অভিধানে নাই, কিন্তু ঘৃতকুমারী শব্দ আছে। ঘৃতনারী ও বল্লীর দ্বারা পান ও পারদ শোধক স্বনামখ্যাত গুল্ম ঘৃতকুমারীকে বুঝায় কি-না সে-সম্বন্ধে বিশেষ সন্দেহ আছে। কারণ আমরা বহু চেষ্টা করিয়াও পানের রস ও ঘৃতকুমারী রসের দ্বারা মৃৎপাত্রে পারদ রাখিয়া শোধন করিয়া কোন দিনই দৃঢ়বন্ধন গুটিকা প্রস্তুত করিতে পারি নাই। 'কোন দিনই' বলিবার উদ্দেশ্য মূল শ্লোকে আছে "যদিস্যাৎ গুটিকাং দৃঢ়বন্ধনং" দৃঢ়বন্ধন গুটিকা যে প্রত্যেক বারই হইবে এ কথা স্বয়ং মহাদেবও স্বীকার করেন নাই। যদি স্বীকার করিতেন তবে "যদিস্যাৎ" শব্দ প্রয়োগ করিতেন না। তবে আমাদের এই পরীক্ষায় একটি ত্রুটি আছে। পারদের অষ্টদোষ আছে। ঐ দোষ যুক্ত কি দোষ মুক্ত পারদ লইয়া পরীক্ষা করিতে হইবে তাহা সহজ জ্ঞানেই বুঝা যায়। আমরা পারদকে প্রথমতঃ রসোন রস ও পানের রসের দ্বারা শোধন করি, এই প্রকারে সংক্ষেপে শোধিত পারদ দেশীয় কবিরাজগণ বিশুদ্ধ বলিয়া ঔষধে প্রয়োগ করিয়া থাকেন। তবে কেহ কেহ হিঙ্গুলোত্থ পারদই বেশী বিশুদ্ধ বলিয়া মনে করেন। কবিরাজী সংগ্রহ পুস্তক রসেন্দ্রসারসংগ্রহে পান ও রসোন রসের দ্বারা সংক্ষেপে শোধনের বিধি আছে বলিয়াই কবিরাজগণ শ্রমলাঘব জন্য সংক্ষেপে পান ও রসোন রসের দ্বারা পারদকে বিশুদ্ধ করিয়া লইয়া থাকেন। পারদের অষ্ট দোষ কি কি?

> "নাগ বঙ্গো মলো বহ্নিঃ চাঞ্চল্যঞ্চ বিষম্ গিরি
> অসহ্যাগ্নির্মহা দোষা নিসর্গাঃ পারদে স্থিতাঃ ॥"

নাগ অর্থে শিষ ধাতু (lead) বঙ্গরাজ, মল (impurities in general), বহ্নি (latent heat) চাঞ্চল্য (instability), বিষ (acute poison), গিরি (impurities from rocks) অসহ্যাগ্নি (easily evaporated by fire), এই আটটি দোষ ঔষধে প্রযোজ্য পারদে রহিত করিয়া তবে ব্যবহার করিতে হয়। অষ্টদোষবর্জ্জিতপারদ (যদি প্রণালীমত দোষগুলি বর্জ্জিত হয়—শ্রমলাঘব জন্য যদি সংক্ষেপে শোধন না করা যায় তবে) মূর্চ্ছিত অর্থাৎ গুঁড়া হয়। মূর্চ্ছিত শব্দের অর্থ কি? মূর্চ্ছিত মানে মূর্ত্তিমান। পারদকে কি করিয়া তবে মূর্ত্তিমান করা যায়? পারদ স্বাভাবিক অবস্থায় অস্থির। এই অস্থির অবস্থা হইতে স্থির অবস্থায় না লইয়া যাইতে পারিলে ঔষধার্থে ত নয়ই, সব সময় রসায়ন কার্য্যেও ব্যবহারযোগ্য নয়। কবিরাজী পুস্তকে পারদের মূর্চ্ছন বিধি পৃথক করিয়া করিবার উপদেশ রস-সম্বন্ধীয় সাধারণ সংগ্রহ পুস্তকগুলি মাত্রেই দৃষ্ট হয়। তাহার কারণ বোধ হয় অষ্ট দোষ, পদ্ধতি অনুসারে দূর করিতে অন্ততঃ ছাপ্পান্ন দিনের প্রয়োজন। রৌদ্রের অভাব, মেঘ বৃষ্টি প্রভৃতি অনিবার্য্য কারণ থাকিলে আরও বেশী দিনের দরকার হয়। এই দীর্ঘ দুই মাস সময় আশু প্রয়োজনের পক্ষে কম প্রতিবন্ধক নয়। এই জন্যই হয়ত রস-সম্বন্ধীয় সাধারণ পুস্তকে গন্ধকযোগে পারদের মূর্চ্ছনবিধি আছে। এইরূপে গন্ধকযোগে মূর্চ্ছিত পারদকে কবিরাজী ভাষায় কজ্জলী বলে। ইহাতে পারদ বিশুদ্ধ অবস্থায় না থাকিয়া গন্ধকের সহিত মিশ্রিত হইয়া একটি মিশ্র পদার্থে পরিণত হয়। পারদভস্মের অশেষ গুণের কথা তন্ত্রে বিশেষ করিয়াই উল্লিখিত আছে। প্রাচীন ভারতে পারদ লইয়া যে কি ভীষণ প্রতিযোগিতা চলিয়াছিল তাহা বিভিন্ন তান্ত্রিক সম্প্রদায়ের পুস্তকগুলিতে বিভিন্ন প্রণালী দেখিলেই বেশ বুঝা যায়।

সংস্কৃত সাহিত্যে চারি প্রকার পারদের উল্লেখ দৃষ্ট হয়—

তত্র ভেদেন বিজ্ঞেয়ঃ শিববীর্য্যঃ চতুর্বিধঃ।
শ্বেতঃ রক্তঃ তথা পীতঃ কৃষ্ণং তত্তুৎ ভবেৎ ক্রমাৎ।

* * *

শ্বেতঃ শস্তঃ রুজাংনাসে রক্তঃ কিল রসায়নে।
ধাতো বাদেতু তৎপীতঃ খে গতো কৃষ্ণসেবক॥

শিববীর্য্য অর্থাৎ পারদ চারি প্রকার যথা—শ্বেত, রক্ত, পীত ও কৃষ্ণ বর্ণ। ইহার সন্ধান প্রাচীনেরা পাইয়াছিলেন। একমাত্র শ্বেতবর্ণ পারদ ব্যতীত রক্ত পীত বা কৃষ্ণ বর্ণ পারদ বিশুদ্ধ নয়—ঐগুলি মিশ্র পদার্থ বলিয়াই মনে হয়। শ্বেতবর্ণ পারদ ব্যাধি নাশে, রক্তবর্ণ পারদ রসায়ন কার্য্যে, পীতবর্ণ পারদ এক ধাতুকে অন্য ধাতুতে পরিবর্ত্তিত করণে ও আকাশে গমনে কৃষ্ণবর্ণ পারদ প্রশস্ত। ইহার ভিতর ধাতুরূপান্তরকারী পীতবর্ণ পারদ ব্যবহারের উপদেশ দেখিতেছি। এটি বিশেষ ভাবে লক্ষ্য করিবার বিষয়। যে বর্ণের পারদ যেকার্য্যে ব্যবহার প্রশস্ত লিখিত হইল, তাহা ব্যতীত অন্য কার্য্যে যে একেবারেই ব্যবহার্য্য নহে, ইহা যেন শ্লোকটির উদ্দেশ্য নহে। যে পারদ যেকার্য্যে প্রয়োগে প্রশস্ত লিখিত হইল উহা সেই কার্য্যে প্রয়োগ করিলে ফল বেশী সন্তোষজনক হইবে মাত্র এইরূপই মনে হয়।

এইবার আমরা মূল বিষয়ে ফিরিয়া আসিব। পূর্ব্বোক্ত পারদ ও গন্ধক দ্বারা যে সুবর্ণ উৎপাদনের চেষ্টা না হইয়াছিল তাহা নহে। এ সম্বন্ধে একটি প্রাচীন কিংবদন্তী উল্লেখ করিলেই সংশয় দূর হইবে—

"তেরি গন্ধক মেরি পারা
নাগ নাগিনী সে কর সঙ্করা
নাগ রসসে নাগিনী রস দেনা
ঝট্ পট্ কাঞ্চন কর লেনা।"

তামা লালবর্ণ, উহার সহিত শ্বেতবর্ণের একটি ধাতু মিশ্রিত করিলে উহার বর্ণ সুবর্ণের কাছাকাছি হয়। কেবল বর্ণ হইলেই হইবে না, ঐ বর্ণের স্থায়িত্ব ও ঐ মিশ্রধাতুর আপেক্ষিক গুরুত্ব (specific gravity) সুবর্ণ সদৃশ হওয়া চাই নচেৎ সুবর্ণ বলিয়া গ্রহণ করিবে কেন? পারদ বেশ শ্বেতবর্ণ বটে, কিন্তু পারদের তামার সহিত মিশ্রিত হইবার কিছু প্রতিবন্ধক আছে। তামা যে-উত্তাপে গলে পারদ সেই উত্তাপে বাষ্প হইয়া যায়। একারণ মিশ্রিত করা সহজসাধ্য নয়।

পারদকে বিশুদ্ধ করিয়া কোন কৌশলে জমাইয়া ও তাম্র যে উত্তাপে গলে সেইরূপ উত্তাপ সহ্য করিবার শক্তি দিতে পারিলেই সেই পারদ দ্বারা সুবর্ণ প্রস্তুত হইতে পারে। অথবা কোন কৌশলে বিশুদ্ধ পারদ ভস্ম করিতে পারিলে তাহার দ্বারা কৃত্রিম উপায়ে উৎকৃষ্ট সুবর্ণ প্রস্তুত হইতে পারে। পারদ জমাইতে পারিলে সহজে ভস্ম করা যায়। পারা জমাইবার দুই-একটি কৌশল সম্বন্ধে আলোচনা করা যাক্। সমান পরিমাণ পারদ ও তুতিয়া (তুত্থ) একত্র মর্দ্দন করিলে জমিয়া যায় এবং তাহার দ্বারা ইচ্ছানুরূপ দ্রব্যও প্রস্তুত হইতে পারে (যেমন আমরা মৃত্তিকা দ্বারা করিয়া থাকি)। কিন্তু ইহার দ্বারা উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইবে বলিয়া মনে হয় না, কারণ উক্ত মিশ্র পদার্থে তামা অপেক্ষা পারদের ভাগ অত্যন্ত বেশী।

অন্য বহু উপায়ে পারদ জমাইবার কৌশল তন্ত্রে দৃষ্ট হয়, তাহার একটি উদ্ধৃত করিতেছি—

পারদং আনয়েৎ সুধী।

* * *

প্রস্তরে চৈব সংস্থাপ্য কিণ্টি পত্র রসেন চ।
প্রণবেন সমালোচ্য কুর্য্যাৎ কর্দ্দমবৎ প্রিয়ে॥
নির্ম্মাণযোগ্যং তদ্দ্রব্যং যদি স্যাৎ সুর সুন্দরী।
তদা নির্ম্মায় তল্লিঙ্গং পুনঃ দৃঢ়তরং চরেৎ॥
খপুষ্প সংযুতে বপ্রে অঙ্গারে চ করিন্দকে।
কিঞ্চিদুষ্ণং প্রকর্ত্তব্যং যতো দৃঢ়তরং ভবেৎ।
ইতি মাতৃকাভেদ তন্ত্রে চম পটল।

প্রস্তরনির্ম্মিত পাত্রে পারদ রাখিয়া ঝুটী পাতার রসদ্বারা মর্দ্দন করিয়া কাদার ন্যায় করিবে, তৎপরে ঐ শিবলিঙ্গ পুনঃ দৃঢ়তর করিবার জন্য 'খ' পুষ্পসংযুক্ত বস্ত্রে (রাখিয়া) ঘুঁটের অগ্নিতে কিছু উষ্ণ করিবে। ঝুটী তিন-চার প্রকারের আছে। কোন্ প্রকারের ঝুটী ব্যবহার্য্য তাহাও চিন্তার বিষয়। তার পর 'খ' পুষ্প কি? ভারতীয় দর্শনশাস্ত্রের বিচার স্থলে খ-পুষ্প শশবিষাণ প্রভৃতি শব্দ শোনা যায়, উহার অর্থ অসম্ভব পদার্থ। যেমন খ অর্থে আকাশ ধরিলে খ-পুষ্প মানে আকাশকুসুম বুঝায়। শশবিষাণ অর্থে শশকের শৃঙ্গ অর্থাৎ চলিত কথায় ঘোড়ার ডিম বা ঘোড়ার শিঙের মত পদার্থ বুঝায়। তবে কি দেবাদিদেব মহাদেব বনজাত পুষ্প বিশেষের ধূম পান করিয়া ঐরূপ কিছু বলিলেন? বাস্তবিক ব্যাপার তাহা নহে। তন্ত্রে সর্ব্বদাই গোপন করিবার উপদেশ আছে, সেই জন্য স্থানবিশেষে সাধারণ ভাষায় না লিখিয়া

একটি মুগের ডালের পরিমাণ করিয়া কাতারি (কর্ত্তরিকা) দ্বারা কাটিয়া একটি বিলাতী মুচিতে (মূষা) করিয়া পনর-কুড়ি মিনিট খুব জোরে হাপর (ভস্ত্রা) সাহায্যে তাপ দিবার পর উহাতে কিছু সোহাগার গুঁড়া ছড়াইয়া দিলে উহা গলিয়া যায়। পরে যখন উহা জমাট বাঁধে তখন আঘাত করিলে ফাটিয়া যায় কি-না তাহা বলিতে পারি না।

দত্তাত্রেয় তন্ত্রে অন্য এক প্রকার সুবর্ণ প্রস্তুত প্রণালীর উল্লেখ আছে। এখন তাহারই উল্লেখ করিব :—

ঈশ্বর উবাচ—

গোমূত্রং হরিতালঞ্চ গন্ধকঞ্চ মনঃশিলা।
সমং সমং গৃহীত্বা তু যাবৎ শুষ্যতি পেঠয়েৎ।
একাদশ দিনং যাবৎ যত্নেন রক্ষয়েৎ শুচি।

* * *

তদ্বটীং গোলকং কৃত্বা বস্ত্রেণ বেষ্টয়েৎ পুনঃ।
মৃত্তিকাং লেপয়েত্তন্য ছায়া শুষ্কঞ্চ কারয়েৎ॥
গর্ত্তে কুণ্ডে বিনিক্ষিপ্তে পলাশ কাষ্ঠ বহ্নিনা।
জ্বালয়েদষ্ট যামন্তু নান্যথা শঙ্করোদিতম্॥
তদ্ভস্ম জায়তে সিদ্ধির্বিদ্ধি সিদ্ধি সমাকুলম্॥
তাম্র পাত্রে অগ্নি মধ্যে বিন্দুমাত্রং নিয়চ্ছতি।
তৎক্ষণাৎ জায়তে স্বর্ণঃ নান্যথা শঙ্করোদিতম্॥

মহাদেব দত্তাত্রেয়কে বলিলেন :—

গোমূত্র, হরিতাল, গন্ধক ও মনঃশিলা এই সকল দ্রব্য সমান পরিমাণে লইয়া মর্দ্দন করিতে থাকিবে যে-পর্য্যন্ত না শুষ্ক হয়। পরে বিশুদ্ধ স্থানে রাখিয়া দিবে। এগার দিন গত হইলে পূর্ব্ব পূর্ব্ব দ্রব্য গোলাকার করিয়া বস্ত্রদ্বারা বেষ্টন করিবে এবং মৃত্তিকার লেপ দিয়া একটি গর্ত্তের মধ্যে পলাশকাষ্ঠ রাখিয়া ও গোলক তাহার উপর রাখিবে এবং পলাশকাষ্ঠ দ্বারা অষ্টপ্রহর অর্থাৎ একদিন এক রাত্রি জ্বাল দিবে। পরে ঐ নিক্ষিপ্ত গোলকভস্ম সংগ্রহ করিয়া রাখিবে। এক খণ্ড তাম্রপাত্র অগ্নিতে দগ্ধ করিয়া উহাতে ঐ ভস্ম এক বিন্দু দিলে তৎক্ষণাৎ ঐ তাম্রপাত্র স্বর্ণে পরিণত হইবে, ইহা মহাদেব বলিয়াছেন, কদাচ অন্যথা হইবে না।

এখন আমরা সুবর্ণ তন্ত্র সম্বন্ধে আলোচনা করিব। মূল স্বর্ণ তন্ত্র সংগ্রহ করিতে পারি নাই, তবে উহার প্রকীর্ণাংশ যাহা সংগ্রহ করিতে পারিয়াছি সেই সম্বন্ধেই আলোচনা করিব। প্রাচীন তন্ত্রগুলির দু-চার পটল ভিন্ন সম্পূর্ণ একখানি তন্ত্র সংগ্রহ করা কঠিন হইয়া পড়িয়াছে। আর যাহাই সংগ্রহ হয় তাহা এতই অযত্নে রক্ষিত যে, উহা কীটদষ্ট, পাঠোদ্ধারের অযোগ্য অবস্থাতেই পাওয়া যায়। দু-চারটি পাতা অন্তরই দু-একটি পাতার কোন খোঁজই মিলে না, হয়ত কেহ নকল করিবার শ্রমলাঘব জন্য দয়া করিয়া অপহরণ করিয়াছেন। হয়ত এমন প্রয়োজনীয় অংশ অপহৃত হইয়াছে যে, তাহার পূরণ হওয়া অসম্ভব। স্বর্ণ তন্ত্র সম্বন্ধে এ দেশীয় তান্ত্রিকদিগের মধ্যে এইরূপ প্রবাদ আছে যে, উহার ১ খণ্ড 'রমনার' কালীবাড়িতে (ঢাকা) সযত্নে রক্ষিত আছে। কিন্তু উহা দেখিবার ইচ্ছা থাকিলেও সুযোগ করিয়া উঠিতে পারি নাই। পরশুরাম কশ্যপ ঋষিকে পৃথিবী দান করায় তাঁহার গুরু দেবাদিদেব মহাদেবের নিকট উপস্থিত হইয়া এইরূপ বলেন, "ভক্ষণং দেহি মে দেবং যদি পুত্রোঽস্মি শঙ্কর।" ইহার উত্তরে মহাদেব বলিতেছেন,

তত্রাদ্যংস্বর্ণ তাম্রস্য কল্পং শৃণু সুপুত্রক।
তৈলকন্দাবিষকন্দঃ সিদ্ধ কন্দ প্রকীর্ত্তিতঃ॥
কন্দঃকমল-বত্তিস্য পত্রানি বহুবচ্ছিদো।
তথৈবং তু মহৎ পত্রং তৈলং স্রবতি সর্ব্বদা॥
জল মধ্যে সদাপুত্র স্থাত্র এস প্রতিষ্ঠতে।
বিষকন্দেতি বিখ্যাতো বিষাচ্চ কায়নাশনঃ।
তৈলস্রাবী মহাকন্দঃ পরিত স্তৈলবজ্জলন্।
দশহস্তমিতে দেশে সরতে তৈলবজ্জলম্॥
মহাবিষধরঃ পুত্র তদধো বসতি ধ্রুবম্।
কন্দাধঃ কন্দচ্ছায়ায়াং নান্যত্র গচ্ছতি প্রিয়॥
তৎ পরীক্ষা বিধানার্থং কন্দে সূচীং প্রবেশয়েৎ।
সূচীস্রাবঃ ক্ষণাৎ পুত্র তৎকন্দস্তু সমাহরেৎ॥
তৎ কন্দং তু সমাদায় শুদ্ধ সূতং খনে ত্রিধা।
মূষায়াং নিক্ষিপেৎ তস্য তত্তৈলং তত্রনিক্ষিপেৎ॥
দীপ্তাগ্নিঃ তু মহায়াম বংশাঙ্গারেন দাপয়েৎ।
তৎক্ষণাম্ ত মায়াতি লক্ষ্য বেধী ভবেৎ সূত॥
ততঃ প্রতক্ষয়েত্রাম ক্ষুন্নিগ্রহারক ধ্রুবং।
তালং শুদ্ধং সমানীয় তত্তৈলেন খলেৎ সূত॥ ইত্যাদি

উক্ত শ্লোকের ব্যাখ্যা করা একেবারেই নিরর্থক। কারণ তৈলকন্দ সংগ্রহ না হইলে উক্ত প্রণালী পারদ লইয়া সাধনা করা চলিবে না। উপরের শ্লোকগুলি হইতে বুঝা গেল তৈলকন্দ, মহাকন্দ, বিষকন্দ প্রভৃতি দ্বারা যে কন্দ-জাতীয় উদ্ভিদকে বুঝায় তাহা জ্ঞাত না হইতে পারিলে উক্ত প্রণালী মতে দিব্য কাঞ্চন উৎপাদন অসম্ভব। তৈলকন্দকে সিদ্ধকন্দ বলে। ইহার পত্র হইতে সর্ব্বদা তৈলস্রাব হয়। বিষকন্দ নামে ইহা বিখ্যাত। ইহার বিষের দ্বারা দেহনাশ হয়। উক্ত কন্দ হইতে দশ হাত পরিমিত স্থানে তৈলবৎ জলসিক্ত থাকে। মহাবিষধর

সর্প উহার অধোদেশে বাস করে। উক্ত কন্দের নীচে বা ছায়ায় ঐ সর্প বাস করে, কদাপি অন্যত্র গমন করে না। কন্দ পরীক্ষা করিবার জন্য কন্দে সূচীবিদ্ধ করিবে। সূচী যদি বিগলিত হয় তবেই ঐ কন্দ গ্রহণ করিবে। প্রথম কথা, ঐ অদ্ভুত কন্দটি কোন কাল্পনিক কন্দ কি-না? দ্বিতীয়তঃ, অধুনালুপ্ত কোন কন্দ-জাতীয় উদ্ভিদ কি-না? অথবা বিস্মৃত বা দুষ্প্রাপ্য কন্দ কি-না? আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্রে ঐরূপ দু-একটি অদ্ভুত শক্তিসম্পন্ন উদ্ভিদের উল্লেখ আছে কিন্তু ব্যবহার নাই। যেমন, মেদা, মহামেদা, ঋদ্ধি, জীবক, ঋষিভক ইত্যাদি। সেইরূপ সোমবল্লীর অনেক প্রশংসা আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্রে দৃষ্ট হয়। ভারতের বিভিন্ন দেশোৎপন্ন সোমের বিশেষ বিশেষ গুণের কথাও আছে বটে, কিন্তু ব্যাবহারিক জীবনে সোমের কোন সন্ধানই পাই না।

এইবার দেখা যাক, তৈলকন্দ প্রভৃতির উল্লেখ একমাত্র স্বর্ণতন্ত্রেই আছে, না অন্য কোথাও দৃষ্ট হয়। তৈলকন্দ ও মহাকন্দ শব্দ আভিধানিকেরা জ্ঞাত ছিলেন। মহাকন্দ—রসোনকঃ। মূলকং। চাণক্য মূলকং। রক্তলসুনং—রাজপলাণ্ডু।

> তৈলকন্দ—কন্দবিশেষ দ্রাবক কন্দ, তিলাঙ্কিত দল।
> করবীর তিলাঙ্কিত চিত্র পত্রক। অম্লগুণা লোহদ্রবিত্বং।
> কটুত্বং। উষ্ণত্বং। বার্ত্তাপস্মার বিষশোক নাশত্বং
> রসস্য বন্ধ কারিত্বং। দেহসিদ্ধি কারিত্বঞ্চ।
> (রাজনির্ঘণ্ট)

রাজনির্ঘণ্টকার পঞ্চাসিদ্ধৌষধির কথাও বলিয়াছেন পঞ্চসিদ্ধৌষধি—পঞ্চ প্রকারের ওষধিবিশেষ। যথা—

> "তৈলকন্দ, সুধাকন্দ, ক্রোড়কন্দরুদন্তিকাঃ।
> সর্প নেত্র সুতা পঞ্চসিদ্ধৌষধি সংজ্ঞকঃ।"
> ইতি রাজনির্ঘণ্ট—

রাজপলাণ্ডু রক্তবর্ণ পলাণ্ডু; লাল পেঁয়াজ ইতি ভাষা। নৃপকন্দ, মহাকন্দ, রক্তকন্দ।

মহাকন্দ অর্থে রসুন, রক্তরসুন, রাজপলাণ্ডু প্রভৃতি বুঝায়। তৈলকন্দকে দ্রাবককন্দ বলে, যেহেতু উহাদ্বারা ধাতু দ্রব হয়। উহার গুণ বর্ণনা স্থানে বলা হইয়াছে লোহ দ্রাবিত্বং অর্থাৎ ধাতু দ্রব করিতে সক্ষম, রস অর্থাৎ পারদকে বদ্ধ করিতে সক্ষম ও দেহসিদ্ধকারী অর্থাৎ ক্ষুধা নিদ্রা ও জরানাশক। পঞ্চসিদ্ধৌষধির মধ্যে তৈলকন্দ একটি। অতএব তৈলকন্দের উল্লেখ একমাত্র স্বর্ণ তন্ত্রকার করেন নাই। অন্যত্রও দৃষ্ট হয়। ইহা দ্বারা মনে হয়, তৈলকন্দ কোন কাল্পনিক কন্দ নয়। উহা অধুনা দুষ্প্রাপ্য, বিস্মৃত কোন কন্দ বিশেষ। পঞ্জাব প্রদেশে প্রচলিত পলাণ্ডু, ও মুঙ্গের অঞ্চলে 'লাখম' বা লাখন তৈলকন্দ কি-না এইবার তাহার আলোচনা করিব। ৺সঞ্জীবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের 'পালামৌ' শীর্ষক ১ম প্রবন্ধে লিখিত আছে—পঞ্জাবদেশীয় কোন হিন্দু রাজা শ্রীক্ষেত্র যাইবার পথে মেদিনীপুরে দু-এক দিন অবস্থান করেন। তাঁহার পাকশালায় নিকট প্রচুর পলাণ্ডু দেখিয়া তথাকার হিন্দুগণ কারণ জিজ্ঞাসা করায় তিনি পেঁয়াজ অখাদ্য বলিয়া স্বীকার করেন নাই। তিনি বলেন, "ইহা পলাণ্ডু নহে। ইহাকে পেঁয়াজ বলে। পলাণ্ডু এক বিষাক্ত সামগ্রী, তাহা কেবল ঔষধে ব্যবহৃত হয়। সকল দেশে ইহা জন্মে না। সেই মাঠে জন্মে যে-মাঠের বায়ু দূষিত হইয়া থাকে। সেই ভয়ে কেহ সেই মাঠ দিয়া যাতায়াত করে না। সেই মাঠে আর কোন ফসল হয় না।"

মুঙ্গের অঞ্চলে পাহাড়িয়াদিগের ভিতর 'লাখম' নামক একটি কন্দ-জাতীয় উদ্ভিদের কথা শুনা যায়। লক্ষ প্রকার (অর্থাৎ বহু প্রকার) ব্যাধি আরোগ্য করে বলিয়াই উহার নাম 'লাখম' বা লাখন হইয়াছে। শুনা যায়, লাখমের নীচে বিষধর সর্প বাস করে এবং উহা তৈলস্রাবী। অনেক প্রবঞ্চক পাহাড়ী ও ভণ্ড সন্ন্যাসী তাদের জটা ছোট অবস্থা হইতে সাপের ন্যায় কুণ্ডলী পাকাইয়া কাটিয়া আনিয়া শুষ্ক করত কেহ বা সর্পের ঔষধ কেহ বা বাতের অব্যর্থ ঔষধ বলিয়া বিক্রয় করে এবং উহাকে অজ্ঞতাবশতঃ লাখম বলে। উপরের লিখিত পলাণ্ডু বা লাখম তৈলকন্দ কি-না তাহাই বা কে বলিবে?

বঙ্গদেশে কবিরাজ মহাশয়েরা যে-সব কন্দ-জাতীয় উদ্ভিদ ব্যবহার করেন তাহার ভিতর "শালমূলী" (স্থানীয় নাম ঘোট—বরিশাল) কন্দ উঠাইবার সময় অনেক সময়েই সর্পখোলস উহার নীচে ও পার্শ্বে দেখা যায়। শালমূলী তৈলস্রাবীও নহে কিংবা উহার কন্দে সূচীবিদ্ধ করিলে সূচী দ্রবও হয় না। অন্য কন্দ যেমন গোরসোন (বাতরাজ মূল) ভূমিকুষ্মাণ্ড, বরাহকন্দ (চামার আলু) প্রভৃতির সহিত তৈলকন্দ বা মহাকন্দের বা

বিষকন্দের সাদৃশ্য নাই। সম্ভবতঃ তৈলকন্দ, মহাকন্দ বা বিষকন্দ হয় দুষ্প্রাপ্য কোন কন্দ, না-হয় অধুনা দেশের জলবায়ুর বিপর্য্যয় ঘটায় বঙ্গদেশ হইতে উহা লুপ্ত হইয়াছে বলিয়া মনে হয়। বঙ্গের বাহিরে অন্য প্রদেশে জন্মে কি-না ইহা অনুসন্ধানের বিষয়।

তন্ত্র ও পুরাণাদিতে যে কেবল স্বর্ণ প্রস্তুত প্রণালীর উল্লেখ আছে তাহা নহে রৌপ্য প্রস্তুত প্রণালীর বহুবিধ কৌশলও লিখিত আছে। দত্তাত্রেয় তন্ত্রে ত্রয়োদশ পটলে ঈশ্বর দত্তাত্রেয় সম্বাদে এইরূপ লিখিত আছে—

> আনীয় বহু যত্নেন সম্বলং তোলকদ্বয়ং।
> অশীতি তোলকমানং কৃষ্ণধেনু সমুদ্ভবং॥
> দুগ্ধ আনীয় যত্নেন চাষ্টোত্তর শতং জপেৎ।
> বস্ত্র যুক্তেন সূত্রেন দুগ্ধ মধ্যে বিনিক্ষিপেৎ॥
> উত্তাপং জালয়েদ্ধীমান মন্দ মন্দেন বহ্নিনা।
> ত্রিপুবেনার্দ্ধ পর্য্যন্তমর্দ্ধশেষং ভবেৎ যদি॥
> তদৈবোত্তল্য তদ্দ্রব্যং দুগ্ধং তোয়ে বিনিক্ষেপেৎ।
> ততঃ পরীক্ষা কর্ত্তব্যা।
> নির্ধূমং পাবকে দ্রব্যং দৃষ্টা উত্থাপ্য যত্নতঃ।
> সার্দ্ধেন তোলকং তাম্রং বহ্নি মধ্যে বিনিক্ষেপেৎ।
> যথা বহ্নি তথা তাম্রং দৃষ্টা উত্থাপ্য যত্নতঃ।
> গুঞ্জা প্রমাণং তদ্দ্রব্যং নান্যথা শঙ্করোদিতম্॥

বহু যত্নপূর্ব্বক দুই তোলা 'সম্বল' আনিয়া বস্ত্রখণ্ডে পুঁটলি করিয়া সূত্রদ্বারা বাঁধিয়া আশী তোলা কৃষ্ণবর্ণ গাভীর দুগ্ধে নিক্ষেপ করিয়া মন্দ মন্দ জ্বাল দিবে। যখন ঐ দুগ্ধের অর্দ্ধেক শোষিত হইয়া অর্দ্ধেক মাত্র অবশিষ্ট থাকিবে তখন ঐ সম্বলের পুঁটলী দুধ হইতে উঠাইয়া জলের মধ্যে নিক্ষেপ করিবে। ঐ সম্বল জল হইতে উঠাইয়া অগ্নিমধ্যে নিক্ষেপ করিলে যদি ধূম বাহির না হয় তবেই উহা কার্য্যোপযোগী হইবে। অর্দ্ধ তোলা তাম্র অগ্নিমধ্যে দগ্ধ করিবে, যখন উহার বর্ণ অগ্নির ন্যায় হইবে তখন উহা অগ্নি হইতে উঠাইয়া উহাতে এক রতিমাত্র সম্বল দিলে উহা তৎক্ষণাৎ রৌপ্য হইবে, ইহা শঙ্করের উক্তি।

তন্ত্রের ভাষায় সম্বল অর্থে কোন্ দ্রব্য বুঝায় তাহা বুঝা কঠিন। টীকাকারদিগের নিকট সম্বল শব্দ এতই পরিচিত যে, তাঁহারা উহা দ্বারা কোন্ বস্তুকে বুঝায় তাহা নির্দ্দেশ করা আবশ্যক বোধ করেন নাই। আভিধানিকেরা সম্বল অর্থে জল ও পাথেয় বলিয়াছেন—এই অর্থ যে নয় তাহা সহজেই বুঝা যায়। তবে এইটি বেশ বুঝা যায়, তাম্রের পরমাণু পরিবর্ত্তিত হইয়া রৌপ্যের পরমাণুতে পরিণত হইল। অবশ্য এখানে আপত্তি হইতে পারে, ইহা যে বিশুদ্ধ রৌপ্য হইবে তাহার প্রমাণ কি? ইহাও রূপার ন্যায় কলাইবিশিষ্টও হইতে পারে। সেই জন্য আমরা স্বর্ণতন্ত্র হইতে অন্য কয়েকটি শ্লোক উদ্ধৃত করিয়া দেখাইব যে অবস্থাবিশেষে পারদযোগে এক ধাতু অন্য ধাতুতে পরিবর্ত্তিত হইতে পারে। অষ্ট ধাতুষু তৎসূতং দত্ত্বা কাঞ্চনতাং ব্রজেৎ। পারদের এমন অবস্থান্তর করা যাইতে পারে যাহা দ্বারা অষ্ট ধাতুই কাঞ্চনত্ব প্রাপ্ত হইবে।

> তন্বেলং তু সমাদায় তাম্রদ্রাবে বিনিক্ষেপেৎ।
> তৎক্ষণাৎ তাম্র বিধঃ স্যাৎ দিব্যং ভবতি কাঞ্চনং॥
> রঙ্গে কাংস্যে যদা দত্তাৎ তদারৌপ্যং ভবেৎ সুতম্।
> তাম্রে লৌহে তথা রীত্যাং তারে খর্পরে মুস্তকে।
> তৎক্ষণাৎ বেধমাত্রাত্তি দিব্যং ভবতি কাঞ্চনং॥

পূর্ব্বে পাইলাম আটটি ধাতুতেই পারদযোগে স্বর্ণ হইবে। তারপর প্রণালীবিশেষে পারদ রঙ্গ ও কাংস্যে দিলে উহা রৌপ্য হইবে এবং তাম্র ও লৌহাদিতে দিলে উহা তৎক্ষণাৎ কাঞ্চন হইবে।

শৃঙ্খল

শ্রীসুধীরকুমার চৌধুরী

১৭

কলেজের ফেরতা বাড়ী না গিয়া ঐন্দ্রিলা সেদিন সোজাসুজি হাজ্‌রা রোডে গিয়া হাজির হইল। একরাশ ধোপার কাপড়ের ওপার হইতে সুলতা কহিলেন,"কি রে ইলু, আজ যে এত সকাল সকাল ?" সে কথায় কোনও সদুত্তর তাহার মুখে জোগাইল না। সুলতার কচি ছেলেটাকে জুটাইয়া আনিয়া অনভ্যস্ত হাতে তাহাকে এমন চটকাইল, যে তাহার আর্তকণ্ঠের চীৎকারে সদসৎ কোনও প্রকার উত্তর শুনিবারই সুলতার আর অবসর রহিল না। সেই অবকাশে ছাতে চলিয়া আসিয়া আধ ঘণ্টা-খানেক পায়চারি করিয়া বেড়াইল।

হেমবালাকে লইয়া সত্যসত্যই ঐন্দ্রিলার বিপদের একশেষ হইয়াছে। ভ্রাতার সংসারে আসিয়া তাঁহার স্বভাবের সে তেজ কোথায় গিয়াছে, নিজের কন্যাকেও এখন সোজাসুজি কিছু বলিতে তিনি ভয় পান। কিছুদিন ধরিয়া কন্যা এবং ভ্রাতুস্পুত্রীকে লইয়া ভ্রাতার সঙ্গে সকাল-সন্ধ্যায় কি সমস্ত নিভৃত আলোচনা চলিতেছে। বীণার তাহাতে কিছুই আসিয়া যায় না, ব্যাপারটাকে লক্ষ্য করিবার যোগ্য বলিয়াই সে এত দিন মনে করে নাই ; কিন্তু ঐন্দ্রিলা আজ অকস্মাৎ সেই সূত্রে তাঁহাকে কঠিন কয়েকটা কথা শোনাইয়াছে। বলিয়াছে, পিতা হইতে কোনওদিন দিদি তোমাকে ত কম মান্য করে নাই, বলিবার যাহা তাহা তাহার মুখের উপর না বলিয়া তোমার ভাইয়ের মুখ দিয়া যদি তোমাকে বলিতে হয় তাহা হইলে নিজের সেই মান তুমি বজায় রাখিবে কিরূপে ? রাগের মাথায় আরও কিছু হয়ত বলিয়াছে, এখন সব ভাল করিয়া মনে নাই। হেমবালা সেই হইতে শয্যা লইয়াছেন। পায়ে ধরিয়া বিস্তর সাধাসাধি করিয়াও বীণা তাঁহাকে সকালের খাবার স্পর্শ করাইতে পারে নাই।

কলেজ হইতে ক্লান্ত দেহে বাড়ী ফিরিয়া সেই অপ্রীতিকর ব্যাপারের পুনরভিনয় দেখিতে তাহার ইচ্ছা করে নাই।

কিন্তু ঐন্দ্রিলা দেখিতে না চাহিলেই ত আর সঙ্গে সঙ্গে ব্যাপারটার অবসান হইয়া যাইবে না, যখনই বাড়ী ফিরুক হেমবালার দুর্দম অভিমান তাহার জন্য অপেক্ষা করিয়াই থাকিবে। ফিরিতে সে যত বেশী দেরী করিবে, হেমবালার অভিমান তত বেশী হইবে। কিন্তু আসল ভয় সেটা নয়। এতদিন কন্যা ছিল অভিমানের একমাত্র অবলম্বন। এবারে বীণার সংসারযাত্রার সঙ্গেও তাঁহার মান-অভিমানের পালা সুরু হইয়াছে। এই ভাবে চলিতে থাকিলে শেষ অবধি কোথায় গিয়া তিনি দাঁড়াইবেন কে জানে ?

হায় রে, যে ছিল রাজরাণী, বিনা অপরাধে তাহার আজ এ কি দুর্গতি ! ইহার চেয়েও বড় কি দুর্গতি তাঁহার কপালে লেখা আছে কে জানে ? যা ক্রোধন তাঁহার স্বভাব, স্বামীর সংসারের মত হঠাৎ কোন্‌দিন ভাইয়েরও সংসার ছাড়িয়া হয়ত একেবারে পথে গিয়া দাঁড়াইবেন। বাবা গো ! ভাবিতেও ঐন্দ্রিলার বুকের রক্ত যেন জমিয়া বরফ হইয়া আসে !

দেওয়ালের আলিসায় বাহুর ভর রাখিয়া দাঁড়াইয়া ঐন্দ্রিলা আর কোনও দিকে মনটাকে জোর করিয়া ফিরাইবার চেষ্টা করিতে লাগিল।

বেচারা সুভদ্রবাবু ! ক্লাবে এবার সত্যসত্যই ভাঙন ধরিয়াছে। বিসর্জনের অভিনয়ও হয়ত শেষ অবধি হইবে না, হওয়ার প্রয়োজনও কিছু নাই। কিন্তু ক্লাবের জন্য টাকা তুলিবার উদ্দেশ্যেই যে অভিনয়ের আয়োজন, ভদ্রলোক সেকথা একেবারেই ভুলিয়া গিয়াছেন। ক্লাব নিশ্চয় টিঁকিবে না জানিয়াও, রোজ ছুটাছুটি করিয়া লোক জুটাইয়া আনিয়া রিহার্সালের আসর জমানোটা ঠিক আছে। সুলতা বলেন, "ওকে তুই চিনিস্‌ না। ক্লাব নিশ্চয়ই টিঁকবে না, কেবল যে সেই কথাটাই তার জানা তা নয়, অভিনয় শেষ অবধি হবে না এও নিশ্চয় ক'রেই জানে। তবু যতদিন একজনও মানুষকে ধ'রে আনতে পারবে এনে সে রিহার্সাল দেওয়াবে।"

সত্যি, কথায় কথায় নিজের মতামত জাহির করা

সুভদ্রবাবুর স্বভাব, কিন্তু এই একটা জিনিস তাঁহার স্বভাবে আছে যা তাঁহার সমস্ত রকম মতবাদের বাহিরের। অন্ততঃ সে-সম্বন্ধে কোনও মতবাদ প্রচার করিতে কখনও তাঁহাকে শোনা যায় নাই। শুধুমাত্র কাজের মধ্যেই হয়ত ভদ্রলোকের মনের কিছু একটা আশ্রয় আছে, কে জানে। অথবা সমস্ত রকম কাজেরই প্রতি তাঁহার আসল মমতা এত কম, যে সেগুলির একেবারে মরামুখ না দেখা পর্য্যন্ত কিছুতেই দমিবার কথা তাঁহার মনে হয় না। একদিক্ দিয়া দেখিতে গেলে পুরুষ-মানুষ ছিচকাঁদুনে ন্যাকা না হইয়া এইরূপ হওয়াই ত ভাল।

হাতের কাজ চুকাইয়া আসিয়া ছাতের সিঁড়ির মুখ হইতে সুলতা ডাকিলেন, "ইলু!"

ঐন্দ্রিলা বলিল, "এসো।"

সুলতা অগ্রসর হইয়া আসিয়া বলিলেন, "না আর আস্‌ব না। জান্‌তে এলাম, তোর জন্যে কি চা কর্‌তে দেব, না বাড়ীই যাবি আমার সঙ্গে?"

ঐন্দ্রিলা বলিল, "তুমি এখুনি যাচ্ছ নাকি আমাদের বাড়ী?"

সুলতা কহিলেন, "হ্যাঁ। বিকেলে তোদের বাড়ী চা খাবার নেমন্তন্ন বীণাকে ধ'রে আদায় হয়েছে। অবিশ্যি তুই চাস্ ত এইখেনেই থেকে যেতে পারিস্।"

ঐন্দ্রিলা বলিল, "বাপ রে, বাড়ীতে তোমাকে চা খেতে ডেকেছে আর আমি থাক্‌ব না, দিদি কি তাহলে আমাকে আস্ত রাখবে?"

প্রিয়গোপাল তখনও কোর্ট হইতে ফিরেন নাই। ঐন্দ্রিলাকে লইয়া বালিগঞ্জে আসিয়া সুলতা দেখিলেন, বীণা বিপর্য্যয় কাণ্ড বাধাইয়া বসিয়া আছে। তাহার জানা অজানা ভক্তদের, বন্ধুদের, সকলকে চা খাইতে ডাকিয়াছে। হল্‌দে শেড দেওয়া আলোর মৃদু গাম্ভীর্য্য, ড্রয়িং রুম গম্ গম্ করিতেছে। বহুজনসমাবেশের মধ্যে কানাকানি করিয়া কথা বলা সহজ, ঘাড় সুদ্ধ বীণার মাথাটাকে একটু কাছে টানিয়া সুলতা কহিলেন, 'হ্যাঁরে, তুই এ করেছিস কি?"

বীণা কহিল, "কি করেছি?"

সুলতা কহিলেন, "তোকে নিভৃতে খবরটা দেব ব'লে এলাম, ইলুকে সুদ্ধ রেখে আসছিলাম, সে থাকতে চাইল না, আর তুই এদিকে বিশ্ব সুদ্ধকে জুটিয়ে নিয়ে ব'সে আছিস?"

বীণা মৃদু হাসিয়া কহিল, "সবাইকেই কি আর জুটিয়েছি, নিজে থেকেও কেউ কেউ জুটেছে। সে যাক। নিভৃতে কথা বল্‌বার সুযোগ তুমি এরপর ঢের পাবে। আসল যে কথাটা তোমার আমায় বলা দরকার, সে আমার শোনা হয়ে গিয়েছে।"

সুলতা বলিলেন, "সে কি, কার কাছে শুন্‌লি?"

বীণা বলিল, "তোমার কর্ত্তাকে হঠাৎ কি শুভমতিতে ধরল, দুপুরে টেলিফোন ক'রে আমায় সব বলেছেন।"

সুলতা গম্ভীর হইয়া গেলেন। বলিলেন, "নাঃ, পুরুষ জাতকে সত্যিই বিশ্বাস নেই। এতবার ক'রে বলতে বারণ করলাম, নিজে তোকে সারপ্রাইজ দেব ব'লে, প্রাণ ধ'রে সেটুকু স্বার্থত্যাগ আমার জন্যে আর করতে পারলেন না।"

বীণা কহিল, "যাক্, এ নিয়ে তুমি আর রাগ কোরো না সুলতাদি। রাগারাগি করা, দুঃখ করা আজকের দিনে বারণ।"

ঐন্দ্রিলা কহিল, "ব্যাপারখানা কি শুনি? কি তোমাদের হ'ল আজ হঠাৎ? আজকের দিনটা আমার চোখে ত এমন কিছু মহিমাময় ঠেকছে না, অন্য দিনগুলিরই মত বিটকেলই ত দেখতে পাচ্ছি। বরঞ্চ অন্যদিনের চেয়ে ঢের বেশী রাগারাগি ক'রে আজি সুরু করেছি।"

অনাহূত এবং রবাহূতদের দলে বিমান ছিল। অজয়ের খবরটা ততক্ষণে জানাজানি হইয়া গিয়াছে, অগ্রসর হইয়া আসিয়া হাসিয়া কহিল, "যার জন্যে এত ঘটা তাকেই কেন কোথাও দেখতে পাচ্ছি না?"

বীণা কহিল, "বেচারা একবার বাড়ী ছেড়ে পালিয়েছিল, তাকে দেখবার গরজ আপনাদের এত বেশী যে জ্বালাতন হয়ে এবারে দেশ ছেড়ে পালিয়েছে।"

ঐন্দ্রিলা কহিল, "অজয় বাবু ফিরেছেন?"

বিমান কহিল, "শীগগিরই ফিরবেন, খবর পাওয়া গিয়েছে।"

বীণা কহিল, "ভাগ্যিস বিমান বাবু ছিলেন, তাই খবরটা পাওয়া গেল।"

বিমান ঠোঁট টিপিয়া একটু হাসিল।

ঐন্দ্রিলা কহিল, "হেঁয়ালী না ক'রে, কি হয়েছে ছাই বল না।"

সুলতা সমস্ত ব্যাপার বিবৃত করিলেন।

অজয়ের কৃচ্ছ্রসাধনের বর্ণনা শুনিয়া ঐন্দ্রিলা ইহার পর একেবারেই গম্ভীর হইয়া গেল।

চা আসিয়া পড়িয়াছে। সঙ্গে সঙ্গে রাহু। বীণা উঠিয়া গিয়া আনুষঙ্গিক আহার্য্য পরিবেষণে রত হইল। বিমানের কি জানি কেন মুখে চোখে আজ খুসি উপচিয়া পড়িতেছে। বীণার নিকট হইতে ক্রমাগত মুখনাড়া পুরস্কার লাভ করা সত্ত্বেও কিছুতেই সে তাহার সঙ্গ ছাড়িতেছে না। কহিল, "যদি বলেন ত আপনাকে বৌবাজারে নিয়ে যাই।"

বীণা অতিষ্ঠ হইয়া উঠিয়াছিল, কহিল, "কেন, আমাকে আপনার সঙ্গে না দেখতে পেলে অজয় বাবু খুসি হবেন না ?"

বিমান এবারে জিভ-কাটিয়া বলিল, "বাপ রে, এতবড় কথা ম'রে গেলেও আমার মনে আসত না।"

বীণা হাসিয়া উঠিয়া কহিল, "ম'রে গেলে বড় ছোট কোনো রকম কথাই মানুষের মনে আসে না।"

বিমান বলিল, "আমি বলতে চাচ্ছি ম'রে গিয়ে নতুন ক'রে জন্মালেও আপনাকে আমার পাশে দে'খে কেউ খুসি হচ্ছে এমন কথা আমি ভাবতে পারতাম না।"

এবারে বীণা হার মানিল, ভয় পাইয়া তাড়াতাড়ি বলিল, "থাক, থাক, ঢের compliment দেওয়া হয়েছে, এবারে চুপ ক'রে এক জায়গায় ব'সে চা-টা খেয়ে নিন দেখি।"

সকলের একপালা চা খাওয়া হইয়া গেলে প্রিয়গোপালকে সঙ্গে করিয়া সুভদ্র আসিল। সমস্ত দিন নানা ধাঁদায় বাইরে বাইরে ঘুরিয়াছে, অজয়ের খবর সে কিছুই জানিত না। যথারীতি রিহার্সালে উপস্থিত হইবে মনে করিয়া ক্লাবে আসিয়াছিল, প্রিয়গোপাল তাহাকে ধরিয়া আনিয়াছেন। সেদিন ক্লাব সুরু হইতেই পূজারীদের কোরাসও সুরু হইয়াছে, ঝর ঝর রক্ত ঝরে কাটা মুণ্ডু বেয়ে, ডাকিনী নৃত্য করে... দেখিয়া শুনিয়া মনে হইতেছে, ডাকিনীর নৃত্য কি পদার্থ সে-বিষয়ে সাক্ষাৎ অভিজ্ঞতার কাহারও বিন্দুমাত্র অভাব নাই। সুভদ্র কখন আসিল, কখনই বা চলিয়া গেল কেহ তাহা আর সেদিন লক্ষ্য করিল না।

একপ্লেট স্যাণ্ডুইচ হাতে করিয়া বীণা আসিয়া সম্মুখে দাঁড়াইলে প্রিয়গোপাল কহিলেন, "দেখেছ ভদ্র, বীণা দেবী আসলে তোমার সবচেয়ে বড় rival। তুমি এত ক'রে যে ক্লাব জমাতে পারনি এখানে কেমন অবলীলায় তা জমেছে।—আমি ত তাই বলি, এসব কি পুরুষ মানুষের কাজ ?"

সুভদ্র উচ্চৈঃস্বরে হাসিয়া উঠিল।

প্রিয়গোপাল কহিলেন, "ছোড়ার pride ব'লে যদি কোনো জিনিষ থাকে। একটু দুঃখ কর্, তা না, হাসি হচ্ছে।"

বীণা তাড়াতাড়ি কহিল, "হাসবেন না ত কি! দুঃখ করবার হয়েছে কি শুনি ? ক্লাবটা সম্প্রতি নাহয় আমার বাড়ীতে বসছে, আসলে এটা ত সেই সুভদ্রবাবুরই ক্লাব ?"

প্রিয়গোপাল কহিলেন, "বীণা দেবীর লজিক মানুষ যদি জীবনের সব ক্ষেত্রে মান্‌তে পারত তাহলে ডিভোর্স ব'লে জিনিষটা পৃথিবীতে থাকৃত না।"

সুভদ্র কহিল, "মন্দিরা কেমন আছে, ভাল ?"

বীণা কহিল, "ওর আবার ভাল থাকা-থাকি কি ? দুদিন ভাল থাকে ত তিনদিন বিছানা নিয়ে শোয়। আজ উঠে-হেঁটে বেড়াচ্ছে।"

সুভদ্র কহিল, "একটু তাকে আন্‌তে বলুন না, দেখব।"

বেহারাদের একজনকে মন্দিরার সন্ধানে বীণা উপরে পাঠাইল। সে কিয়ৎক্ষণ পরে ফিরিয়া আসিয়া জানাইল, পিসীমা মন্দিরা বাবাকে নীচে আসিতে দিতেছেন না, বলিতেছেন, নীচের ভিড়ে গরমে তাহার অসুখ করিবে।

কথাটা শুনিতে পাইয়া ঐন্দ্রিলা ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া উপরে উঠিয়া গেল, সেদিন আর নামিল না। হৃষীকেশ কি একটা কাজে এই মহলে আসিয়াছিলেন, হেমবালাকে লইয়া গোলযোগ সুরু হওয়ার পর হইতে এই কয়দিনই মাঝে মাঝে তিনি আসিতেছেন। সকলে উৎসব করিতেছে, ঐন্দ্রিলা একাকী শয্যা গ্রহণ করিয়া পড়িয়া আছে দেখিয়া স্থির সিদ্ধান্ত করিলেন তাহার কিছু একটা অসুখ করিয়াছে। বারান্দায় দাঁড়াইয়া নানা রকম করিয়া তাহাকে জেরা করিলেন। ঐন্দ্রিলা কিছুতেই স্বীকার করিল না, তাহার কিছু হইয়াছে। ভাগিনেয়ী মিথ্যা কহে না, হৃষীকেশ জানিতেন। চিন্তাকুল মুখে প্রস্থান করিলেন।

বেশ রাত করিয়া চায়ের আসর ভাঙিলে সুলতাকে লইয়া বীণা উপরে আসিল। কহিল, "ইলু যে এত সকাল সকাল শুয়েছিস।...কিছু মনে কোরো না সুলতাদি।

আমি এই ধড়াচুড়োগুলো খুলে ফেলি। গরমে একেবারে মুচ্ছ পালাচ্ছে।"

সন্ধ্যাবেলাকার শাদা বেনারসীর সাজ এবং আনুষঙ্গিক অন্যান্য পোষাক খুলিয়া ফেলিয়া বীণা একখানি কোঁচানো সরুপাড় ঢাকাই কাপড় পরিয়া আসিল। এলো খোঁপা খুলিয়া ফেলিয়া মাথাটাকে একটা ঝাঁকানি দিল, টলটলে সুন্দর কপাল ঘিরিয়া, নিটোল গ্রীবামূল ছাইয়া স্ফীত কেশরাশি ছড়াইয়া পড়িল। তাহার দেহ ভরিয়া আজ উন্মুখ-যৌবনের জোয়ার ডাকিয়া যাইতেছে, কিছুতে তাহাকে সংবৃত করা যাইতেছে না। মুগ্ধদৃষ্টিতে কিছুক্ষণ তাহাকে দেখিয়া সুলতা কহিলেন, "সত্যি, অজয় লক্ষীছাড়ার বুদ্ধিসুদ্ধি যদি কিছু থাকত! কি জিনিস যে অপাত্রে বাজে খরচ হয়ে যাচ্ছে।"

ঐন্দ্রিলা বীণাদের দিকে পিছন করিয়া পাশ ফিরিয়া শুইল, কহিল, "বাবা, সুলতাদি পুরুষ হলে দিদির আর নিস্তার ছিল না।"

সুলতা কহিলেন, "তা ত ছিলই না। কিন্তু তোর হল কি হঠাৎ, jealousy? তুই যে কত সুন্দর সে আবার আমাকে বলতে হবে কেন, বলবার মানুষ ত হাজিরই ছিল। সবাই চ'লে যাবার পরেও বেচারা সুভদ্র অনেকক্ষণ চুপচাপ বসেছিল। অত চাল দেখিয়ে উঠে চ'লে এলি যে?"

ঐন্দ্রিলা কহিল, "হ্যাঁ, আমি ত সারাক্ষণই চাল দেখাতে ব্যস্ত।"

সুলতা তাহাকে ধরিয়া তুলিয়া বসাইয়া দিলেন। কহিলেন, "শোন্। আমরা ত ভেবে মাথামুণ্ডু কিছু ঠিক করতে পারছি না। অজয় কেন এল না বলতে পারিস্?"

ঐন্দ্রিলা কহিল, "তিনি কখন কি মনে ক'রে কি করেন তার সবই ত সারাক্ষণ তোমরা বুঝছ, এই একটা জায়গায় তাঁকে না-হয় না-ই বুঝলে।"

সুলতা কহিলেন, "আমার কিন্তু কথা কয়ে মনে হয়েছিল, ঠেলায় প'ড়ে বুদ্ধিসুদ্ধি এবারে খানিকটা হয়েছে। কিন্তু দেখতে পাচ্ছি সে বৃথা আশা।...কি রে বীণি, তুই যে কিছু বলছিস না?"

বীণা নিজের বিনুনি লইয়া ব্যস্ত ছিল কহিল, "কি আবার বলব?"

সুলতা কহিলেন, "বেশ, বেশ, যার বিয়ে তার মন নেই, পাড়াপড়শীর ঘুম নেই।"

ঐন্দ্রিলা কহিল, "মা গো মা, বিয়ে সুদ্ধু? কই, আগে ত সেকথা কিছু শুনিনি।"

এমন ভাবে বলিল, যেন সত্যসত্যই বিবাহের কথাই হইতেছিল। তাহার বলিবার ধরণে আমোদ পাইয়া বীণা এবং সুলতা দুজনেই উচ্চৈঃস্বরে হাসিয়া উঠিলেন।

নীচে হেমবালার ঘরের কয়েকটি জানালাই পরপর শব্দ করিয়া বন্ধ হইয়া গেল।

অনেক রাত হয়েছে, এবার যাই." বলিয়া সুলতা উঠিয়া যাইতেছিলেন, এবারে ঐন্দ্রিলা জোর করিয়া তাঁহাকে ধরিয়া বসাইল, কহিল, "কথাটা শেষ না ক'রে মোটেই যেতে পাবে না। কিছু এমন রাত হয়নি, আর হলেও তাতে কিছু এসে যায় না।"

বীণা কহিল, "হ্যাঁ, তোমার কর্ত্তা তোমার বিরহে মারা যাবেন না।"

সুলতা কহিলেন, "তুই লক্ষীছাড়ী থাকতে তা যাবেন না জানি। নয়ত কোর্টে ব'সে টেলিফোনে ফ্লার্ট করেন? এখন তোর মনের কথাটা কি শুনি; সত্যিসত্যিই মন নেই, না এও তোর একটা ঢং?"

বীণা কহিল, "সত্যিই নেই।"

সুলতা কহিলেন,"বেশ, কথা দে, যে, এর পর জ্বালাবি না।"

"অজয়-বাবু এলেন না ব'লে অন্ততঃ তোমার কাছে নাকে কাঁদব না।"

"বটে! তোর হল কি বল্ দেখি? হঠাৎ এমন মাতাজী তপস্বিনীর মত নিস্পৃহ ভাব?"

বীণা হাসিয়া কহিল, "অজয়বাবু আসুন না-আসুন তাতে আমার কিছু এসে যায় না।"

সুলতা কহিলেন, "কেন, কথাটা কি শুনিই না।"

বীণা কহিল, "তোমার কর্ত্তার কাছে থেকে তাঁর ঠিকানা নিয়েছি।"

"তারপর?"

"কাল ভোরে উঠেই নিজে যাব সেইখানে।"

সুলতা আবার উচ্চস্বরে হাসিতে গিয়া হেমবালার কথা ভাবিয়া মুখে হাত চাপা দিলেন। ঐন্দ্রিলা সেই হাসিতে

যোগ দিল না। একটু নড়িয়া বসিয়া কহিল, "দোহাই তোমার দিদি, ঐ কাজটি কোরো না। লোকটির মস্তিষ্কের স্ফীতি এমনিতেই কিছু কম নয়, সেটাকে আরো বাড়িয়ে দিয়ে তুমি তার কিছু উপকার করবে না।"

বীণাও হাসিতেছিল, হাসিতে হাসিতে কহিল, "তা স্ফীতি নাহয় একটু বাড়বেই। তার ঝুঁকি সামলাতে হবে ত আমাকেই?"

ঐন্দ্রিলা এবার একটু তীক্ষ্ণ কণ্ঠেই কহিল, "সেইটেই তুমি এখনো নিশ্চয় ক'রে জানো না।"

বীণার হাসিতে এবার অলক্ষ্যে অল্প-একটু বেদনা সঞ্চারিত হইয়া গেল। কহিল, "এবারে জেনে নেব। তুই যা ভয় করছিস তাই যদি হয়, ঝুঁকি সামলাবার ভার যদি আমি ছাড়া আর কারুর ওপরই পড়ে, তাহ্‌লে ত আমার আরোই ভাবনা করবার কথা নয়।"

ঐন্দ্রিলা কহিল, "বাবা, তোমার সঙ্গে কথায় পারি না। যা ভাল ব'লে বুঝি বলেছি, এবারে তোমার যা-খুসি কর গিয়ে।" বলিয়া সে আবার শুইয়া পড়িল।

বীণা আর হাসিতেছে না। ঐন্দ্রিলার কথা হয়ত তাহার মনে লাগিয়াছে। কিন্তু তৎপরক্ষণেই আবার হাসি। ঐন্দ্রিলার কথা তাহার মনে লাগে নাই।

সুলতা এতক্ষণ নীরব ছিলেন, এবারে কহিলেন, "ইলুর কথাটা সত্যি সত্যি ভেবে দেখ্‌বার মত বীণি, তা তুই যাই বলিস্। তুইই বা কি এমন বানের জলে ভেসে এসেছিস? নিজেকে না-ই বা এত সুলভ করলি। একদিক্ দিয়ে ভেবে দেখতে গেলে তোর যাওয়া ত হয়েছেই। আমি যে সত্যিসত্যিই ওঁর scribeএর সন্ধানে অজয়বাবুর দরবারে গিয়ে হাজির হইনি, সে ত তিনি বেশ ভাল ক'রেই জানেন? আমার যাওয়া মানেই তোর জন্যে যাওয়া।"

বীণা তবুও চেষ্টা করিয়া হাসিতেছে। ক্রমাগত বলিতেছে, "আমি বাপু যাবই, সে তোমরা যাই বল।"

প্রিয়গোপাল এবং সুলতা চলিয়া যাইবার পর অজয় অনেকক্ষণ শাল ঢাকা দেওয়া বিছানাটার উপর উপুড় হইয়া পড়িয়া রহিল। প্রথমেই নন্দকে মনে পড়িল। বেচারা নন্দ! পাছে অজয়ের মনে কোথাও কোনও বেদনার স্পর্শ লাগে এই ভয়ে জ্বরে ধুঁকিতে ধুঁকিতেও হাসিমুখ করিয়া সে চলিয়া গেল। আজ সে যে বাঁচিয়া আছে তাহার ঠিক কি? অথচ কেউ তাহার আর নাই জানিয়াও অজয় দুই পা হাঁটিয়া গিয়া তাহার খোঁজ লয় নাই। সুভদ্রকে কলহ করিয়া পাইয়াছিল, কলহ করিয়াই তাহাকে ছাড়িয়া আসিয়াছে, কিন্তু ছাড়িয়া আসিবার সময় তাহার দিকটা একমুহূর্ত্তের জন্যও সে চিন্তা করে নাই। সকলের কৌতূহলের পাত্র করিয়া তাহাকে রাখিয়া আসিয়াছে, আত্মপক্ষ সমর্থনের কোনও সুযোগ তাহাকে সে দিয়া আসে নাই। পিতাকে মনে পড়িল। তিনি না-হয় বড় আশায় নিরাশ হইয়া বেদনা পাইয়া দূরে রহিয়াছেন, কিন্তু সে কি বলিয়া এতদিন একটিবার তাঁহার সন্ধান লয় নাই? পিতার কর্ত্তব্য দেশ-কাল-পাত্র বিচারে সাধ্যাতিরিক্ত করিয়াই তিনি করিয়াছেন, কিন্তু পুত্রের কর্ত্তব্য সে নিজে কতটুকু করিয়াছে, যে, হিসাব করিয়া ওজন করিয়া অভিমান দিয়া অভিমানের ঋণ শোধ করিতে গেল? নিজের তরুণ হৃদয়ের এতটুকু বেদনায় তাহার অস্তিত্ব শুদ্ধ অবসন্ন হইয়া আসে, কিন্তু বৃদ্ধ পিতার বহু-বিফলতা, বহু-বেদনা জর্জ্জরিত হৃদয়ের দিকে কখনও কি সে চাহিয়া দেখিয়াছে? তিনি প্রায় প্রৌঢ়ত্বে উপনীত হইয়া বিবাহ করিয়াছিলেন সত্য, কিন্তু দুই বৎসরের অধিককাল বিবাহিত জীবন যাপন করা তাঁহার অদৃষ্টে ঘটিয়া উঠে নাই। তথাপি, আত্মীয়পরিজন সকলের আগ্রহাতিশয্য সত্ত্বেও দ্বিতীয়বার দারপরিগ্রহ করিতে কিছুতেই তিনি সম্মত হন নাই,—পাছে বিমাতার সংসারে কোনওরূপে অজয়ের কোনও অনাদর হয়। অত্যন্ত স্নেহপ্রবণ চিত্তের সমস্ত অনুরক্তি একমাত্র সন্তানের উপর উজাড় করিয়া তিনি ঢালিয়া দিয়াছিলেন। সেই পিতার হৃদয়স্বর্গ হইতে দ্বিধামাত্র না করিয়া নিজেকে সে নির্ব্বাসিত করিয়াছে। ছুটিতে বাড়ী গিয়া তাঁহাকে অসুস্থ দেখিয়া আসিয়াছে, ডানদিকের পাঁজরের কাছে অদ্ভুত একটা ব্যথা, থাকিয়া থাকিয়া জ্ঞান হারাইয়া ফেলেন। হয়ত এতদিন তিনি বাঁচিয়া নাই, হয়ত সেইজন্যই এতদিন অজয়ের খোঁজ হয় নাই।

সুলতা সত্যই বলিয়াছেন, অজয় স্বার্থপর। শুধু হৃদয়-বৃত্তির ক্ষেত্রে নহে, জীবনের সর্ব্বত্র সমস্ত কিছুতেই তাহার স্বার্থপরতা। ভাবিতে লাগিল, পিতা, নন্দ, সুভদ্র, ইহাদের

কাহাকেও কোনওদিন সত্য করিয়া সে ভালবাসে নাই। তাহার অন্তরে ভাবাবেগের যে একটি বিলাসিতা আছে শুধু তাহারই প্রয়োজনে অন্তরের মধ্যে ইহাদিগকে সে লইয়াছে। মনে হইল, হয়ত ঐন্দ্রিলাকেও সত্যসত্যই সে ভালবাসে নাই। ভালবাসিতেছে কল্পনা করিয়া নিজের মনের চতুর্দ্দিকে একটি মোহলোক সৃষ্টি করিয়াছে, আসলে ঐন্দ্রিলা অপেক্ষা ঐ মোহটিতেই তাহার বেশী প্রয়োজন। সত্য বটে, বেদনাই এই মোহের অধিকাংশ উপাদান, কিন্তু নিজেকে লইয়া ব্যথা পাওয়াও তাহার ব্যধিগ্রস্ত মনের এক বিলাসিতা। নতুবা ঐন্দ্রিলার জীবনে কোনও দুঃখবেদনা থাকা সম্ভব কিনা সেকথা কখনও সে চিন্তা করে নাই কেন?

একবার ভাবিল, এখনই ছুটিয়া বাহির হইয়া পড়ে, নন্দের খোঁজ লয়, সুভদ্রের হাত ধরিয়া তাহার ক্ষমা ভিক্ষা করে, পিতাকে চিঠি লেখে, বীণা-ঐন্দ্রিলার সঙ্গে দেখা করে। কিন্তু পলকে চতুর্দ্দিক্ হইতে অভিমান ভিড় করিয়া আসিল। পিতাকে এতদিন পর সে কি লিখিবে? লিখিবে, যাহা বুঝিয়াছিলাম, ভুল বুঝিয়াছিলাম, নিজের হাতে নিজেকে গড়িতে পারিব এই দর্প আমার মনে ছিল, সে-দর্প বিধাতা ভাল করিয়াই চূর্ণ করিয়াছেন। সুভদ্রকে কি বলিবে? বলিবে, তোমার স্নেহকে অপমান করিয়াছিলাম, তুমি আমাকে শাস্তি দাও নাই, শাস্তি দিবে না জানিয়াই আবার তোমার কাছে ফিরিয়া আসিয়াছি। নন্দের সঙ্গে দেখা করিয়াই বা তাহাকে সে কি বলিবে? বলিবে, তোমার কোনও কাজে আমি লাগি নাই। এতদিনের মধ্যে দুই পা হাঁটিয়া আসিয়া একবার তোমার খবর লইয়া যাইতে পারি নাই। আজ হঠাৎ এইদিকে আসিয়া পড়িয়াছি, ভাবিলাম, তোমাকে কিঞ্চিৎ পদধূলি দিয়া কৃতার্থ করিয়া যাই। আর ঐন্দ্রিলা!... এই যে তাহার অধোগতির পরিপূর্ণ মূর্ত্তিটিকে সুলতা এবং প্রিয়গোপাল আজ প্রত্যক্ষ করিয়া গেলেন, অজয় কি আশা করে ঐন্দ্রিলা সেকথার কিছু জানিবে না? আর না জানিলেই বা এই ধূলিধূসরিত মূর্ত্তি লইয়া তাহার সম্মুখে কোন্ মুখে গিয়া সে দাঁড়াইবে? কি তাহাকে বলিবে? বলিবে,—কিন্তু ইহার পর সহস্র কশাঘাতেও চিন্তা আর অগ্রসর হইতে চাহিল না।

সুলতাকে দেখিয়া অবধি প্রিয়-সংসর্গের জন্য উপবাসী চিত্ত লোলুপ হইয়াছিল, এবার নিজেরই মনের কাছ হইতে বাধা পাইয়া নিরুপায়তার দুঃখে বারম্বার সে ভাঙিয়া পড়িতে লাগিল। তাহার মন তাহার শত্রু। নতুবা তাহার ঈপ্সিত স্বর্গ এবং তাহার মধ্যে আজ এই মুহূর্ত্তে দেড় ক্রোশের মাত্র ব্যবধান। কিন্তু দূর হইতে লুকাইয়াও যে ঐন্দ্রিলাকে দেখিয়া আসিবে ততটুকু স্পর্দ্ধাও এই অদৃশ্য শত্রু তাহার জন্য আজ অবশিষ্ট রাখে নাই।

সে-রাত্রিতে সে ঘুমাইল না, মনের মধ্যেকার এই গোপন শত্রুকে বাছা বাছা নিষ্ঠুর আঘাত বৃষ্টি করিয়া জর্জ্জরিত করিতে লাগিল।

সকালে যে-অজয়ের ঘুম ভাঙিল, সে অজয় পীড়িত, আর্ত্ত, বিপন্ন। সে অজয় আর সহিতে পারিতেছে না। একটুখানি বিশ্রামের জন্য, বেদনার একটু বিরতির জন্য সে লালায়িত। চোখ চাহিয়া অবধি কি যে সে আশা করিতেছে, কাহাকে সে দেখিতে পাইবে ভাবিতেছে? অকারণে সারাক্ষণ উৎকর্ণ হইয়া আছে, কতবার ভুল করিয়া ভাবিয়াছে, বাহিরের দ্বারে কেহ করাঘাত করিতেছে।...যখন শেষ অবধি কেহ আসিল না, অকারণেই তাহার বিস্ময়ের অবধি রহিল না। তখন বুঝিল, তাহার মন তাহার নিজেরই অজ্ঞাতে আশা করিতেছিল, আর কেহ না আসুক, সুলতার নিকট খবর পাইয়া বীণা অন্ততঃ ছুটিয়া আসিবে। এমন যে বীণা, সেও কি আজ এই দুঃখের দিনে অজয়কে পরিত্যাগ করিয়াছে? সে সুলতার প্রিয়সখী, সুলতার মুখে অজয়ের দুর্গতির কাহিনী সে-ই সর্ব্বাগ্রে শুনিয়াছে।

পরের দিনও কেহ আসিল না, তার পরের দিনও না। বহুদিন পরে ধীরে অজয়ের মধ্যেকার দর্পী মানুষটা, ক্রোধন-স্বভাব মানুষটা মাথা তুলিতেছে। নিজেকে যত খুসি সে অবজ্ঞা করিতে পারে, আঘাতে অপমানে জর্জ্জরিত করিতে পারে, কিন্তু অপরে তাহাকে করুণার চক্ষে দেখিতেছে ইহা প্রাণ গেলেও সে সহিতে পারে না।

শান্ত সমাহিত চিত্ত লইয়া যে তপস্যায় প্রবৃত্ত হওয়ার তাহার কথা ছিল, অসহিষ্ণুতায় তাহার আয়োজন করিল। নিদারুণ অবজ্ঞায় নিজের চারিদিক্ হইতে দৃষ্টিকে ফিরাইয়া লইয়া প্রতি মানুষের নিভৃততম অন্তরের মধ্যে অসীমতার যে এক-একটি রুদ্ধ সিংহদ্বার একেবারে তাহার কপাটের উপর

আঘাতের পর আঘাত বৃষ্টি করিয়া বলিতে লাগিল, পৃথিবীর বিচারে যাহা সম্পদ, বারম্বার তাহা হইতে তুমি আমাকে বঞ্চিত করিয়েছ, আনন্দের পথ হইতে, প্রেমের পথ হইতে কোন্ সুদূরের অভিমুখে তুমি আমাকে ডাক দিতেছ। তুমি জানো, অন্ন লইয়া, তুচ্ছতা লইয়া কোনও দিন আমার তৃপ্তি হয় নাই। তুমি জানো, সমস্ত সুখের আশায় জলাঞ্জলি দিয়া একমাত্র তোমার ভরসায় আমি বসিয়া আছি। দ্বার খোল, হে বন্ধু, খোল দ্বার, বহু দুঃখের মধ্য দিয়া, বহু আত্মত্যাগের মধ্য দিয়া যে চরিতার্থতার পথ কাটা হয়, সেই পথে আমার হাত ধরিয়া আমাকে লইয়া চল। দুই দিন দুই রাত্রি অনাহারে অনিদ্রায় বধির অন্ধকারের বেদীতলে মাথা খুঁড়িয়া সে নিজেকে রক্তাক্ত করিল। বেদনার মূল্য চূড়ান্ত করিয়া দিয়া দিল। কোনও আশা, কোনও আনন্দ, কোনও অহঙ্কার নিজের জন্য রাখিল না। কিন্তু এত করিয়াও অন্ধকার একটুও কাটিল না। বধিরতায় সাড়া জাগিল না। কেবল দেহ-মন-প্রাণের সমস্ত শক্তিকে একটি মাত্র ধ্যানের মধ্যে সংহত করিয়া আনিয়া পরিপূর্ণ চৈতন্যের আলোয় নিজেকে দেখিতে গিয়া আবারও নিজেকে সে হারাইতে বসিল। নিজের মধ্যে নিজের ব্যক্তিত্বের অবসান হইয়া যাওয়া যে কি ভয়াবহ, অজয়ের তাহা অজানা ছিল না। সহসা মনে হইবে, তাহার মৃত্যু হইয়াছে। একটি অপরিচিত দেহ, অপরিচিত মন, অপরিচিত স্মৃতি আশ্রয় করিয়া সে পৃথিবীতে বিচরণ করিয়া বেড়াইতেছে। নিজের সম্বন্ধে কোনও দায়িত্বকে নিজের বলিয়া আর সে অনুভব করিবে না। হয়ত নিজের কোনও বাক্য, কোনও ব্যবহারকেও আর সে নিয়ন্ত্রিত করিতে পারিবে না। মনে মনে দেবতাকে ডাকিয়া কহিল, তোমার যাহা খুসি আমাকে লইয়া তুমি কর, যে দুঃখ ইচ্ছা হয় দাও, যাহা কাড়িতে চাও কাড়, কিন্তু আমার নিজের মধ্যে আমার একটু যে শেষ অবলম্বন তাহাকে এমন করিয়া বিপর্যস্ত করিও না। আমার আশৈশবের পরিচয়ের সুন্দর আমিটিকে তুমি আমায় ছাড়িয়া দাও, তারপর তোমার কাছে আর আমি কিছু চাহিব না।

কিন্তু সহসা কি হইল, এই নির্যাতিত দুঃখী সর্ব্বহারার জীবনেও বিদ্রোহের রূপ লইয়া পরিত্রাণ দেখা দিল। সহসা দুই হস্তের মুষ্টি দৃঢ়নিবদ্ধ করিয়া আকাশে চাহিয়া সে বলিল, না, এ নিরর্থক, নিরর্থক, আমার এই দুঃখের তপস্যার কোনও অর্থ নাই। নিজেকে বিড়ম্বিত করিয়া নিজের জন্য বা অপরের জন্য কোনও কাম্যফল আমি লাভ করি নাই। নিজের মধ্যে এবং নিজের বাহিরে সীমাহীন শূন্যতায় আমার জীবনব্যাপী বেদনাকে অপচয়িত করিয়াছি।

এই কয়দিন যে-দরজার গোড়ায় মাথা খুঁড়িয়া রক্তারক্তি করিয়াছিল, সেই দরজা খুলিল না বটে, কিন্তু অপর দিক্‌কার অপর একটা বন্ধ দরজা সহসা ঝনৎকার করিয়া খুলিয়া গেল। অজয়ের দেহ কণ্টকিত হইল। সে অনুভব করিল, শুধু তাই যে পাপ তাহা নহে, দুঃখ পাওয়া এবং দুঃখকে শিরোধার্য্য করাও মানুষের পাপ, অন্ততঃ তাহার জীবনে তাহার অন্ধকারের যে তপস্যা তাহাই তাহার সব চেয়ে বড় পাপ। যে পাপ তাহার বুদ্ধিতে পর্যন্ত সঞ্চারিত হইয়াছে। যে পাপ তাহাকে আত্মসর্ব্বস্ব করিয়াছে অথচ আত্মসর্ব্বস্ব বলিয়া নিজেকে চিনিতে দেয় নাই। যে পাপ সমস্ত প্রকার ত্রুটি-বিচ্যুতির সঙ্গে অতি সহজে তাহাকে সন্ধি করাইয়াছে। যে-পাপ বলিয়াছে, পরের জন্য কিছু করিবার তোমার সাধ্য কোথায়—নিজেকে লইয়াই তোমার দুর্ভোগের শেষ নাই। অনুভব করিল, পাছে অপরের জন্য ভাবিতে হয়, সেই ভয়ে নিজের জীবনে বেদনা পুঞ্জীভূত করিয়া নিজের জন্য ভাবনায় সে শেষ রাখে নাই।

সেই মুহূর্ত্তে স্থির করিল, দেবতার মধ্যে তাহার যে আশ্রয় নাই, নিজের মধ্যে তাহার যে আশ্রয় নাই, সেই আশ্রয় তাহার চারিপাশে পরিচিত প্রিয় মানুষগুলির মধ্যে তাহার আছে। মুহূর্ত্তের পরিচয়ে চিরকালের ভাবিয়া যাহাকে সে ভালবাসিয়েছে, সে-ই তাহার একমাত্র চিরকালের। ইহাদের সম্বন্ধে তাহার কর্ত্তব্যগুলিতে ইহার পর কিছুতেই সে আর ত্রুটি ঘটিতে দিবে না। কর্ত্তব্য হইতে নিজের দুঃখ-বেদনাকে বড় করিয়াছিল, এবারে নিজের জীবনে কোনও দুঃখ-বেদনার স্থান যথাসাধ্য সে আর রাখিবে না। সে সহজ হইবে, সে সুস্থ হইবে। অজয়ের চারিদিকে বাতাস যেন এতদিন জমাট বাঁধিয়াছিল, আজ এতক্ষণে সেই চাপ-বাঁধা বাতাস গলিতেছে, বুক ভরিয়া সে নিঃশ্বাস লইতে পারিতেছে।

আর দ্বিধামাত্র না করিয়া ফিরিয়া সে লালবাজারের পথ ধরিল। কিছুদিন আগে লালবাজারের থানার একতলার যে ঘরটায় কি একটা কাগজে সে সহি দিয়া গিয়াছিল, আজ

গুর্খা, সার্জ্জেন্ট, কয়েদী গাড়ী এবং রাইফ্‌লের ভিড় কাটাইয়া আবার সেটাতে ঢুকিতে যাইবে, পাশের বারান্দা হইতে ধুতি-পরা একটি রোগা কালো বাঙালী ভদ্রলোক ছুটিয়া আসিয়া তাহাকে বাধা দিলেন। হাসিয়া বলিলেন, "কি মশায়, আপনার যে দেখছি ভারি বেজায় গরজ। কোথায় চলেছেন, অমন ক'রে হনহনিয়ে। একটু দাঁড়ান, দুটো কথা হোক, পকেটগুলো দেখি আগে, তারপর ত ভেতরে যেতে পাবেন। কি নাম আপনার ?"

"শ্রীঅজয় রায়।"

"কাছাকাছিই কোথাও থাকেন বুঝি ?"

"আজ্ঞে হাঁ, এই বৌবাজারেই একটা গলিতে।"

"তা বৌবাজারের গলিগুলির কি নাম নেই ?"

এই যাঃ, গলির নামটা যে কি, অনাবশ্যক-বোধে অজয় একদিনও তাহার খোঁজ করে নাই। উপায় ? একেই ত তাহার এই পোষাক, এই চেহারা, তদুপরি নিজের ঠিকানা বলিতে না পারিলেই হইয়াছে আর কি ! তাড়াতাড়ি কহিল, "আমার সম্বন্ধে যা যা জানতে চান পরে সব শুনবেন এখন। সম্প্রতি আমার একটা উপকার করুন।"

"বটে ? তা বেশ, বলুন কি করতে হবে।"

"আমার একটি বন্ধুর খোঁজ নিয়ে দিন।"

"আপনার বন্ধু ? এমন স্থানে ? পুলিশে কাজ করেন বুঝি ?"

"আজ্ঞে না, এই ক'দিন আগে জানি না কেন তাকে ধ'রে আনা হয়েছে। শ্রীনন্দলাল মিত্র। আই-এ পড়ে।"

"নন্দলাল মিত্র...নন্দলাল মিত্র...উঁহু, মনে পড়ছে না। আই-এ, এখনকার দিনে অমন অনেকেই পড়ে। চার্জ্জটা কি ?"

"তা ত জানি না, তবে আমি বলতে পারি, কোনো অপরাধ করা তার স্বভাবে সম্ভবই নয়।"

"লোকটাকে যখন চোখেই দেখিনি এবং আমার কেস্ নয় তখন এ নিয়ে আপনার সঙ্গে আর তর্ক করব না। আপনার কথাই শিরোধার্য্য ক'রে নিচ্ছি।"

"তার সঙ্গে কোনো রকমে কি একবার দেখা হয় ?"

"আপনি তার কে হন ?"

"কেউ না। কিন্তু আসলে ভাইয়ের চেয়েও বেশী।"

"বেশী না হয়ে ঠিক মাপ-মতন ভাই হ'লে চেষ্টা ক'রে দেখা যেত। একজন উকীল সঙ্গে করে আনতে পারেন ?"

প্রিয়গোপালের নামটা কিছুতেই তখন অজয়ের মনে আসিল না। মাপ-মতন ভাইয়ের প্রসঙ্গেরপর মাপ-মতন উকীলদের কথাই সে ভাবিল, প্রিয়গোপাল ব্যারিষ্টার। উকীল বন্ধু তাহার কেহ নাই, বন্ধু নহে এমন উকীল জুটাইবার মত সঙ্গতি নাই।

বাড়ী ফিরিবার পথে আবার ইহাই মনে করিয়া খুসি হইতে চেষ্টা করিল যে, আসিবার সময় তাহাকে ডাকিয়া সেই রোগা কালো লোকটি তাহার গলির নামটা আবার জানিতে চাহে নাই। আশ্চর্য্য, বাড়ীর নম্বরটা সে ঠিক জানে, রাস্তার নামটাই জানে না, নামের পাটা কোথায় কোনদিকে আছে দেখিয়া আজই এই ত্রুটি সে সারিয়া লইবে।

কিন্তু রাস্তার নাম না-হয় জানা হইল, মনের উপর হইতে অবসাদের ভার ত নামিতেছে না। লালবাজারে অত্যন্ত অনাত্মীয় সমাবেশের মধ্যে এবং নন্দলালকে দেখিতে না পাইয়া সে-অবসাদ যেন আরও বাড়িয়াই গিয়াছে। না, মনটাতে কিছুতেই সে স্বাভাবিকতা ফিরাইয়া আনিতে পারিতেছে না। তাহার চারিপাশের পৃথিবীও যেন কেমন অবসন্ন, ব্যাধিগ্রস্ত। আজ সে যেদিকে চাহিতেছে কদর্য্যতা দেখিতেছে, উচ্ছৃঙ্খলতা ও অসাম্য দেখিতেছে, অস্বাস্থ্যের গ্লানি দেখিতেছে। চতুর্দ্দিকের এই সীমাহীন ব্যাধিক্লিন্নতার মধ্যে নিজের জন্য কোথায় কোন্ মন্ত্রবলে স্বাস্থ্যের নীড় সে রচনা করিতে চাহে ?...দুই পাশের পায়ে-চলা পথের অবর্ণনীয় নোংরামি। সন্দেশের দোকানের পাশে কুকুর-বিড়ালের মৃতদেহ চাপা দিয়া রাখিবার জায়গা। আজ সেখান হইতে একটা পূতিগন্ধময় ঘোড়ার শব সরানো হইতেছে। রোগ-বিগলিত-দেহ ভিক্ষুকের দলের পাশে বেলফুলের মালা বিকাইতেছে। পথের লোকের কুৎসিত অপরিচ্ছন্ন পোষাক, বিচিত্র ছাঁদের গতি। কেহ সোজা চলিতেছে না, একে অপরের গায়ে ধাক্কা লাগিয়া যাইতেছে, পায়ে পা ঠেকিতেছে, সকলেই যেন পা-দুটাকে টানিয়া চলিতেছে। মনে পড়িল, বিমান বলিত, সোজা হয়ে হাঁটেই না কি কেবল, সোজা হয়ে দাঁড়ায় না, সোজা হয়ে বসে না, সোজা হয়ে শোয় না পর্য্যন্ত, কুকুর-কুণ্ডলী পাকিয়ে প'ড়ে থাকে। একটা লোক কলার খোসাতে পা হড়কাইয়া পড়িতে পড়িতে সামলাইয়া গেল, উদ্দেশে বহুক্ষণ ধরিয়া গালি পাড়িল কিন্তু

খোসাটাকে সরাইয়া রাখিয়া গেল না, কাহার জন্য রাখিবে? একটি স্ত্রীলোক যাইতেছে, কাহারও বাড়ীর ঝি হইবে, একটি পাতলা শাড়ী মাত্র পরিয়াছে, রোদটা ওপাশে...

কলিকাতা! মনে মনে কালীঘাট হইতে বরানগর পর্য্যন্ত নিত্যকার দেখা পথঘাট, লোকজন, তাহাদের সুখদুঃখ আশা-ভঙ্গসম্বলিত জীবনযাত্রাকে বারম্বার মনের মধ্যে উল্টাইয়া পাল্টাইয়া সে ভাবিতে লাগিল। ইহার সমগ্রতায় কোথায় বহুযুগের ভারতবর্ষের তপস্যার রূপ, ইহার কোন্ স্তরে আর্য্য সভ্যতা, বৌদ্ধ সভ্যতা, ইস্‌লামীয় সভ্যতার অবশেষ প্রচ্ছন্ন রহিয়াছে, বিংশ শতাব্দীর ইউরোপই বা ইহার মধ্যে কোথায়? অপরাপর দেশের মানুষ আজ অতি-মানুষ হইয়া বিবর্ত্তিত হইবার সাধনা করিতেছে, কলিকাতার কদর্য্যতায় ব্যাধিজীর্ণতায় যথেচ্ছাচারে এ কি জিনিস মূর্ত্তি ধরিয়া উঠিতেছে? অতি-মানুষ? মানুষ? না তদপেক্ষা নিকৃষ্টতর কোনও জীব? অথবা কিছুই কি মূর্ত্তি ধরিয়া উঠিতেছে?

যে বাসে যাইতেছিল, আশান্বিত হৃদয়ে তাহার মধ্যে তাকাইল। একজন স্থূলকায় ঘাড়ের চুল চামড়া ঘেঁসিয়া ছাঁটা, হ্যাটবুট শোভিত বাঙালী ভদ্রলোক সম্ভবতঃ তাঁহার আফিসের ছোট সাহেবের মত নাক উঁচানো মুখভঙ্গি করিয়া বসিয়া আছেন, খর্ব্ব নাসিকাতে ভঙ্গিটা মানাইতেছে না। তাঁহার পাশে এক দরিদ্র মুসলমান বসিয়াছে, সতর্ক হইয়া তাহার ছোঁয়া বাঁচাইতেছেন। ঠিক সম্মুখেই একপাল ছেলেমেয়ে লইয়া একটি মহিলা জড়সড় হইয়া বসিয়া আছেন, মনে হইতেছে তিনি ভদ্রলোকের কেহ নহেন, কেননা ঠিক তাঁহার পাশেই একজন মাড়োয়ারী হাঁটুর উপরে কাপড় তুলিয়া পা উঠাইয়া বসিয়া একমনে তাঁহাকে নিরীক্ষণ করিতেছে।

বিরক্তিতে অজয়ের দাঁতে দাঁত বসিয়া যাইতেছিল, কিন্তু ক্রমে দেখিল, ইহারা কেহ শারীরিক সুস্থ নহে, সজীব নহে, স্বাভাবিক নহে, কেহ যে পেট ভরিয়া খাইতে পাইয়াছে এমন মনে হয় না, ইহাদের সকলেরই চোখে কি অব্যক্ত ভয়ের ভাব, যেন প্রত্যেকের জীবনের মর্ম্মস্থানটিতে কোন্ পুলিসের গ্রেপ্তারী পরোয়ানা আসিয়া পৌঁছিয়াছে। কেবল সেইখানে ইহারা সকলেই যেন পরম নির্লিপ্ততায় বিমানের ধরণে ঠোঁট টিপিয়া হাসিতেছে। চরমতম দুর্গতির মধ্যেও বিদ্রোহ করা কাহাকে বলে ইহারা জানে না।

একটি বৃদ্ধ গাড়ীর এক প্রান্ত হইতে প্রায় অপর প্রান্তে উপবিষ্ট অন্য একটি ভদ্রলোককে বলিতেছেন, "একটা দিন ছাড়া পাবার জো আছে? বাড়ীতে হাসপাতাল বসেছে। গিন্নির হৃদ্‌রোগ, এখনতখন বললেই হয়, মেজো মেয়ের সূতিকা, ছোট ছেলের আমাশা, যে ছেলেটা বি-এ দেবে এবারে সে আবার সম্ভবতঃ কালাজ্বর বাধিয়েছে, সকালে বিকালে জ্বর উঠছে, জানি না কি আছে অদৃষ্টে। একটা ত গেল বছর কলেরাতে গেল।"

অপর ভদ্রলোকটি একটা পান লইয়া মুখে পুরিতে পুরিতে বলিলেন, 'আমায় আর কি শোনাচ্ছেন মশাই? সব ম'রে-ঝ'রে ত দুটি নাৎনীতে ঠেকেছে। বড়টির এবার বিয়ের সম্বন্ধবাদ করব ভাবছিলাম, ডাক্তাররা টিবি সন্দেহ করছেন।"

ঘৃণা ক্রোধ এবং গ্লানি করুণায় রূপান্তরিত হইয়া যাইতেছে।

প্রথম ভদ্রলোকটি একটু পরে আবার কহিলেন, "মনে ক'রে শীগগির টিকে দেওয়াবেন। এবারে মড়কের বৎসর।"

দ্বিতীয় ভদ্রলোক একটু হাসিয়া যেন নিজের মনেই কহিলেন, "আর মশায়, সব বৎসরই মড়কের বৎসর।"

ঐ হাসিটি অজয় কিছুতে ভুলিতে পারিতেছে না। সে নিজে মাঝে মাঝে ঠোঁট টিপিয়া বিমানের ধরণে হাসে, সেও কি ঐ একই জাতের হাসি? ভাবে, ভারতবর্ষ ছাড়া আর কোনও দেশের মানুষ এই হাসি ঠিক এমনই করিয়া কি হাসিতে পারে? ভাবে, এই রোগ-শোক-দুঃখ-দারিদ্র্য, এই দুর্ভিক্ষ, মহামারী, অজ্ঞান, অস্বাস্থ্য, পরাধীনতা, ইহার মধ্যে কোথায় আমাদের গর্ব্ব?

নীরবে নতমস্তকে পুরান পোড়ো বাড়ীটাতে ঢুকিতে যাইতেছিল, সহসা বিদ্যুৎস্পৃষ্টের মত ফিরিয়া দাঁড়াইল। মন্ত্রমুগ্ধের ন্যায় দ্রুত পথ অতিবাহিত করিতে করিতে অর্দ্ধস্ফুট স্বরে বলিতে লাগিল, আমি সত্যের সাক্ষাৎকার লাভ করিয়াছি। যে-সত্যের প্রতীক্ষা ছিল আমার জীবনে, সেই সত্যকে আমি আজ প্রত্যক্ষ করিয়াছি। ইহাই সত্য, এই সত্য।

পথচারী লোক দু-একজন অবাক্ হইয়া দাঁড়াইয়া তাহাকে ফিরিয়া দেখিল।

আলোচনা

বিক্রমখোল-শিলালেখ

গত শ্রাবণ মাসের 'প্রবাসী'তে শ্রীযুত হরিদাস পালিত মহাশয়ের লিখিত বিক্রমখোল শৈ লেখের পাঠোদ্ধার বিষয়ক প্রবন্ধে বিক্রমখোলের অবস্থান সম্বন্ধে প্রবন্ধকার লিখিয়াছেন যে, উহা "বোগড় ষ্টেটের ভিলীরবাহল পল্লীর নিকটে অবস্থিত। প্রকৃতপ্রস্তাবে বিক্রমখোলের অবস্থান বেঙ্গলনাগপুর রেলওয়ের বেলপাহাড় ষ্টেশন হইতে সাত আট মাইল দূরে।

মূলতঃ গৈরিক বর্ণ দ্বারা অঙ্কিত চিহ্নের সবগুলিই যে মূল লেখের অংশ তাহা বলা যায় না। উৎকীর্ণ চিহ্নগুলির গভীরতা সর্ব্বত্র সমান নয়, দেখিলে তাহা সহজেই অনুমান করিতে পারা যায়। শ্রীযুত জায়সবাল মহাশয় অবশ্য রঞ্জিত চিহ্ন বা চিত্র কয়টিকে মূল লেখের অংশ বলিয়াই ধরিয়াছেন (*Indian Antiquary*, March, 1933), তাহা কতদূর সঙ্গত, প্রত্যক্ষদর্শী মাত্রের বিচার্য্য।

লেখটিতে চতুষ্পদ জন্তুটির যে চিত্র উৎকীর্ণ আছে সে-সম্বন্ধে লেখক-মহাশয় কোনরূপ উল্লেখ পর্য্যন্ত করেন নাই। দেওটেকে প্রাপ্ত শিলালেখের সহিত এই লেখের সম্বন্ধ কি তাহা কিছুই বুঝা গেল না।

বিক্রমখোল লেখটির প্রকৃত দৈর্ঘ্য ৪৫ ফুট এবং প্রস্থ ৭ ফুট—এই উক্তি সত্য নয়। প্রকৃতপ্রস্তাবে বিক্রমখোলের লিখিত অংশের পরিমাণ ৩২´ ফুট × ৬´ ফুট।

চিত্রখানাতে বিক্রমখোল লেখের প্রায় এক-পঞ্চমাংশ মাত্র বর্ত্তমান। লেখকের কল্পিত পাঠের অক্ষর-সংখ্যাও মূল লেখের অক্ষর-সংখ্যার প্রায় এক-পঞ্চমাংশ, লেখক এই ফটোখানারই 'পাঠোদ্ধার' করিয়াছেন কি-না তাহা স্পষ্ট করিয়া বলেন নাই।

হরিদাসবাবু তাঁহার পাঠোদ্ধার-প্রণালীর ক্রমসম্বন্ধে বিশেষ কিছুই লেখেন নাই: তাঁহার মতে "লিপিগুলি মিশ্রলিপি, খরোষ্ঠী এবং প্রাচীন পালি (ব্রাহ্মী ?) অক্ষর।" " "প্রত্যেক চিত্রটি ভারতীয় কোন্ ভাষার অক্ষর, প্রথমে ইহারই বিচার করিয়া অক্ষরগুলির পরিচয় গ্রহণ করা হইয়াছে।" এই উক্তি হইতে মনে হয়, খরোষ্ঠী, ব্রাহ্মী এবং ভারতীয় বিভিন্ন আধুনিক বর্ণমালা হইতে যদৃচ্ছাক্রমে অক্ষরের একত্র সমাবেশ করিয়া তিনি পাঠোদ্ধারে প্রয়াস পাইয়াছেন। ইহা কোন্ বিজ্ঞানসম্মত রীতি ?

পালিত মহাশয়ের মতে বিক্রমখোল-লিপির (অর্থাৎ তাঁহার কল্পিত পাঠের) ভাষা "খৃষ্টীয় প্রথম বা পূর্ব্বাব্দের দেশপ্রচলিত 'নাগ প্রাকৃত ভাষা' নাগা, কোল, সন্তোল কথিত ভাষার মতও নয় পালি প্রাকৃতও নয়।" উহা "প্রাচীন নাগপুরী (রাঢ়ীর ভাষা), এই ভাষা প্রাচীন পশ্চিম-দক্ষিণ রাঢ়ের ভাষা ছিল বলিয়াই অনুমান করা চলে। বঙ্গের (পশ্চিম) আদি ভাষা কতকটা বিক্রমখোল ভাষার মতই ছিল।" উহা "সম্ভবতঃ প্রাচীন নাগপুরীয় সাধারণ লোকের গ্রাম্য ভাষা" "প্রাচীন নাগ প্রাকৃত ভাষা" "সাধারণ প্রাচীন নাগ প্রাকৃত ভাষার সহিত ও ভদ্র নাগরিক পালিভাষার মিশ্রণে" জাত। "ইহাতে যে-সকল শব্দ বিদ্যমান রহিয়াছে, সেগুলি সমুদায়ই উত্তরী প্রাকৃত ভাষার শব্দ। সামান্য দক্ষিণী প্রাকৃত শব্দও বিদ্যমান রহিয়াছে।" "লিপির প্রাকৃত শব্দগুলি সংস্কৃতের ধাতু শব্দ মধ্যে ধৃত হইয়াছে।" "অথচ লিপির ভাষা সংস্কৃত নয়।"—এই সমস্ত অনুমানের সপক্ষে তিনি কোনরূপ প্রমাণ উপস্থিত করেন নাই; এবং তাঁহার কল্পিত পাঠের ব্যাখ্যাকল্পে সংস্কৃত ধাত্বর্থেরই সাহায্য লইয়াছেন।

আরও আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, 'লেখটির' ভাষা পালিত-মহাশয়ের টিপ্পনী-হিসাবে ধাতুসমষ্টির সমাবেশমাত্র। এইরূপ ধাতুমাত্র গঠিত ভাষার ব্যবহার কোন্ যুগে ছিল? এই ধরণের ভাষার নিদর্শন অন্ততঃ সুপ্রাচীন বৈদিক ভাষাতেও মিলে না, বৈদিক যুগের পূর্ব্বে কখনও প্রচলিত ছিল কি-না জানা নাই—আর, এ-সম্বন্ধে পণ্ডিতগণের কোনও সাক্ষ্য এ-পর্য্যন্ত পাওয়া যায় নাই। খৃষ্টীয় প্রথম শতাব্দীতে ঐরূপ ভাষার অস্তিত্বের অনুমান কতদূর সঙ্গত? এ সম্বন্ধে পালিত-মহাশয় আপন বক্তব্য প্রকাশ করিবেন কি?

জায়সবাল মহাশয়ের মতে বিক্রমখোল-লেখটি খৃঃ পূঃ পঞ্চদশ শতাব্দী অপেক্ষাও প্রাচীন (*Indian Antiquary*, March, 1933.)

বিক্রমখোল-লেখ সম্বন্ধে সর্ব্বসাধারণের অবগতির জন্য দুই-একটি কথা বলা উচিত মনে করি।

শ্রীযুক্ত কাশীপ্রসাদ জায়সবালের মতে (*Indian Antiquary*, March, 1933) বিক্রমখোল উৎকীর্ণ চিহ্নগুলি অক্ষর লিপি; এবং লেখটি সম্ভবতঃ বামাভিমুখী—তিনি দৃষ্টান্তস্বরূপ লেখটির বাম অংশের উল্লেখ করিয়াছেন। এই লেখের সহিত তিনি মোহেঞ্জোদাড়ো লিপির সাত আটটি অক্ষর বা চিহ্নের সাদৃশ্য দেখাইয়াছেন; কোনও কোনও চিহ্নের সহিত খরোষ্ঠী লিপির সাদৃশ্য দেখিতে পাইয়াও তিনি তাহা খরোষ্ঠী বলিয়া স্বীকার করেন নাই। তাঁহার মতে ঐ অক্ষর বা চিহ্নগুলিকে খরোষ্ঠী বলিয়া মনে করিলে ব্রাহ্মী ও খরোষ্ঠীর মূল এক বলিয়া স্বীকার করিতে হয়। তাঁহার মতে বিক্রমখোল লিপি ব্রাহ্মীলিপির পূর্ব্বতন রূপ। উহা আর্য্যলিপি না-ও হইতে পারে।

ভারতীয় বিভিন্ন প্রাচীন ও প্রাগৈতিহাসিক লিপির সহিত বিক্রমখোল-লেখের তুলনা করিলে দেখা যায়, উহার অন্যূন সতের-আঠারটি অক্ষর (বা চিহ্ন) ব্রাহ্মী লিপির অনুরূপ, দশ-বারটি খরোষ্ঠীর, বার-চৌদ্দটি সিন্ধু (মোহেঞ্জোদাড়ো শিল) লিপির সদৃশ। বিক্রমখোল-লেখের অন্ততঃ আঠার-কুড়িটি চিহ্নের সহিত রাজগীর বাণগঙ্গা লিপির সৌসাদৃশ্য বর্ত্তমান। সূক্ষ্মভাবে বিচার করিলে অধিকতর সাদৃশ্য মিলাও অসম্ভব নয়।

শ্রীরমেশচন্দ্র নিয়োগী

শ্রীযুক্ত হরিদাস পালিত মহাশয়ের যে প্রবন্ধটি প্রকাশিত হইয়াছে, তাহাতে সমস্ত বিষয়টির অল্প অংশ মাত্র আলোচিত হইয়াছে। বিক্রমখোল-লেখটির সামান্য এক অংশের ব্লক আমরাই ছাপিয়াছিলাম। তিনি লেখের কোন ফোটো পাঠান নাই। আমরা যে প্রবন্ধ ও ব্লক ছাপিয়াছি, তাহা কেবল কৌতূহল উদ্দীপনের নিমিত্ত।

সম্বলপুর জেলার ডেপুটী কমিশনার (ম্যাজিষ্ট্রেট) মহাশয়ও আমাদিগকে (ইংরেজীতে) চিঠি লিখিয়া জানাইয়াছেন, যে, বিক্রমখোল রোগড় ষ্টেটে অবস্থিত নহে, সম্বলপুর জেলার রামপুর জমিদারীতে অবস্থিত; প্রবন্ধে যে লেখা হইয়াছে, উহা বেলপাহাড় রেলওয়ে ষ্টেশনের

দূরে, তাহা ঠিক। সিবিলিয়ান ম্যাজিষ্ট্রেট মহাশয়ের মতে প্রবন্ধটিতে "a very interesting interpretation of the Vikramkhol inscriptions দেওয়া হইয়াছে।—প্রবাসীর সম্পাদক]

"শ্রমের মর্য্যাদা ও বাঙালীর বিমুখতা"

'প্রবাসী'র গত শ্রাবণ সংখ্যায় পরম শ্রদ্ধেয় আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় বলিয়াছেন—

"যশোর এবং খুলনার দৌলতপুর ও বাগেরহাট অঞ্চলে এখন অনেক বারুজীবী আছেন যাঁহারা পানের ব্যবসা করিয়া বেশ সঙ্গতিপন্ন হইয়াছেন। এমন কি এই শ্রেণীর দশ-বার জন পৈতৃক ব্যবসা অবলম্বন করিয়া নিজ বুদ্ধিবলে জমিদারীও করিয়া গিয়াছেন। কিন্তু এখন দেখা যায় কলেজের ধাপমাড়ান কেন, উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়ের দ্বিতীয় অথবা তৃতীয় শ্রেণী পর্য্যন্ত পড়িলে তাহাদের মাথা বিগড়াইয়া যায় এবং তাহারা ষাঁড়ের গোবরে পরিণত হয়।"

প্রথমতঃ পানের ব্যবসা (অর্থাৎ চাষ) করিয়া যে কেহ কোথাও জমিদারী করিতে পারিয়াছেন—সে কথা আমরা শুনি নাই। বাগেরহাট অঞ্চলের একজনের কথা জানি তিনি সুপারীর কারবার করিয়া বহু অর্থ উপার্জ্জন করেন পরে বুদ্ধি ও কৌশলযোগে নানা উপায়ে অনেক জমাজমি আয়ত্ত করিয়া ক্রমে জমিদার হইয়া পড়েন। এমন এক সময় ছিল যখন পানের চালানী কারবার বা পাইকারী কেনা-বেচা করিয়া অনেকে বেশ দু-পয়সা আয় করিয়াছেন। কিন্তু পাট-উৎপাদক সাধারণ বারুজীবীদের আর্থিক অবস্থা কোনদিনই ধান ও পাট-উৎপাদক সাধারণ কৃষকদের অবস্থার চেয়ে কোনো অংশে ভাল নহে। বর্ত্তমানে কি এক অজানা রোগে পানগাছগুলি দুই-এক বছরের মধ্যেই মরিয়া যায় বলিয়া কেহ হাতে সুবিধা করিয়া উঠিতে পারিতেছেন না। ইহার প্রতীকারের জন্য গবর্ণমেণ্টের কৃষি-বিশেষজ্ঞ ও অন্যান্য অনেক বৈজ্ঞানিকের সাহায্য প্রার্থনা করিয়াও কোন ফল পাওয়া যায় নাই,—কেহই এই রোগের কারণ নির্দ্দেশ বা কোনো ঔষধ আবিষ্কার করিতে সমর্থ হন নাই। তারপর আজকাল এই কৃষির প্রারম্ভিক ও আনুষঙ্গিক খরচ এত বাড়িয়া গিয়াছে যে নিজের জমিজমা থাকিলেও দৈনিক দশ-বার ঘণ্টা কাজ করিয়াও পরিবার প্রতিপালন দূরের কথা নিজেরই গ্রাসাচ্ছাদন সংগ্রহ করা দুষ্কর হইয়া পড়িয়াছে। ইহাই হইল এই শ্রেণীর সাধারণ লোকের ভিতরের কথা। অতএব এই ব্যবসা করিয়া সঙ্গতিপন্ন হইবার দিন আর নাই।

শেষ কথা, দৌলতপুর কলেজের চতুষ্পার্শ্বস্থ অঞ্চলে স্কুলের ছেলে কেন, অনেক কলেজের ছেলেও সুযোগ পাইলে পানের বরোজে (ক্ষেত্রে) তাহাদের বাপ খুড়ো-দাদার যথাসম্ভব সাহায্য করিয়া থাকে। ইহাতে কচিৎ দু-এক জন ছাড়া কেহ লজ্জা বা অপমান বোধ করে না। ম্যাট্রিকুলেশন পাস ও ফেল এরূপ বহু লোক, হাইস্কুলে শিক্ষকতা করেন গ্রামে থাকিয়া খুলনা শহরে চাকরি করেন এরূপ আই-এ, আই-এসসি পাস অনেকে লোকও পানের ব্যবসা করিতে কুণ্ঠা বোধ করেন না। দুই-তিন পুরুষ ধরিয়া চাকরি বা ব্যবসা করেন—এরূপ পরিবারের দু-একটি লোক ছাড়া এই শ্রেণীতে সত্যিকার বেকার যুবক খুব কমই আছে। তবু আবার বলি, এই ব্যবসা অবলম্বন করিয়া সচ্ছলভাবে জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিবার যুগ চলিয়া গিয়াছে।

শ্রীনগেন্দ্রনাথ দে, শ্রীরমেশচন্দ্র দাশ

উত্তর

বাগেরহাট কলেজ সংস্থাপন অবধি আমি বছরে অন্যূন একবার যাই এবং একজন সম্ভ্রান্ত আত্মীয় কৃতী বারুজীবী গৃহস্থের বাড়িতে অবস্থিতি করি। এই কলেজটি প্রধানতঃ বারুজীবী সম্প্রদায়ের কয়েক জন কৃতবিদ্য স্বদেশহিতৈষী স্থানীয় নেতা কর্ত্তৃক সংস্থাপিত বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। কিন্তু আমি দেখিয়া অবাক্ হইতেছি যে দশানি (বাগেরহাটের সন্নিকটস্থ গ্রাম) ও অন্যান্য অঞ্চলের যাঁহারা কলেজে একবার অধ্যয়ন করিয়াছেন তাঁহাদের কপাল পুড়িয়াছে—তাঁহারা একূল-ওকূল দুই কূলই হারাইয়াছেন।

পানের ব্যবসা করিয়া অনেকে প্রচুর অর্থ উপার্জ্জন করিয়াছেন। কিন্তু সেই অর্থ তাঁহারা জমিদারীতে নিয়োজিত করিয়াছেন কি-না ইহা অবান্তর কথা। প্রায়ই আমি দেখি যে, আমাদের দেশে যাঁহারা ব্যবসা দ্বারা অর্থ উপার্জ্জন করেন তাঁহারা সেই অর্থ মহাজনী, তেজারতি বা জমিতে ইনভেষ্ট করেন। আবার তেজারতি করিলে ভূসম্পত্তি হাঁটিয়া আসিয়া করতলস্থ হয়।

আমি শুনিয়া সুখী হইলাম দৌলতপুর অঞ্চলে বারুজীবী সন্তানগণ স্কুল কলেজে অধ্যয়ন করিয়াও শ্রমের মর্য্যাদা বোধ বজায় রাখিয়াছেন। অবশ্য, সেখানে পানের ব্যাধিতে যথেষ্ট ক্ষতি হইতেছে তাহা আমার অবিদিত নহে। সম্প্রতি আমি বেঙ্গল রিলিফ কমিটির অর্থাৎ খাদি প্রতিষ্ঠানের আওতাইতে যে খাদী আশ্রম আছে সেখানে কয়েক দিন অবস্থিতি করিয়া আসিলাম। ইহার সন্নিকট বাসুদেবপুর নামক ষ্টেশন হইতে পাঁচ-সাত গাড়ী (wagon load) বোঝাই পান B. N. W. Ry. *via* কাটিহার দিয়া বেহার ও পশ্চিম অঞ্চলে যায়। সে অঞ্চলের ব্যাপারীরা বেশ দু-পয়সা রোজগার করে। সুতরাং পানের ব্যবসা যে একেবারে লাভজনক নহে তাহা ভাবিবার কারণ নাই। মোট কথা, আমার বক্তব্য এই যে, স্থানবিশেষে ইহার ব্যতিক্রম হইতে পারে। কিন্তু একবার যদি বাবাজীরা উচ্চ শ্রেণী ইংরেজী বিদ্যালয়ের উচ্চতম শ্রেণী পর্য্যন্ত পৌঁছিলেন—কলেজের ধাপ মাড়াইলে তো কথা নাই—তাহা হইলে ঐ কেরাণীগিরি অর্থাৎ "বাবু"-শ্রেণী ভুক্ত হইয়া আজীবন vegetate করেন। ইহার উত্তর শ্রমের মর্য্যাদা ও আত্মোন্নতি বিষয়ক আরও ধারাবাহিক প্রবন্ধে দিবার সঙ্কল্প রহিল।

কলেজে শিক্ষিত কেন, সামান্য রকম ইংরেজী অক্ষর-জ্ঞানের পর 'স্পেলিং বুক' অধ্যয়ন করিলেই বাঙালী যে পৈতৃক ব্যবসা ত্যাগ করিয়া চাকরির জন্য লালায়িত হয়, ইহা যাঁহারা রাজনারায়ণ বসু কৃত 'সেকাল ও একাল' পড়িয়াছেন তাঁহারা জানেন।

১৮৫৯ খৃষ্টাব্দে পাঠশালায় ইংরেজী শিক্ষা প্রবর্ত্তন করা উচিত কি-না শিক্ষা-বিভাগের কর্ত্তা এ বিষয়ে রাজা রাধাকান্ত দেবের মত আহ্বান করেন। তিনি এই মর্ম্মের কথা বলেন,

"নূতন প্রতিষ্ঠিত স্কুলসমূহে সামান্য কিছু ইংরেজী শিক্ষা দেওয়ার যে বিধান করা হইয়াছিল তিনি তাহার সম্পূর্ণ বিরুদ্ধ। তিনি বলেন যে, ঐ প্রকার শিক্ষা পাইয়া কৃষক ও শ্রমজীবীদিগের বালকেরা স্ব স্ব জীবিকা-নির্ব্বাহোপযোগী কার্য্য পরিত্যাগ করতঃ গবর্ণমেণ্ট ও সওদাগরদিগের আপিসে কেরাণীগিরি চাকরির জন্য উমেদারী করিয়া বেড়ায় এবং অধিকাংশই চাকরি না পাইয়া সম্পূর্ণ অকর্ম্মণ্য হইয়া পড়ে।"

সার্ জন্ কামিং ১৯০৮ সনে *Report on Industries of Bengal* পুস্তকের এক স্থলে বলিতেছেন যে, বাঙালী ছুতার প্রায়ই কমিয়া আসিতেছে, কারণ তাহাদের ছেলেপিলেরা স্কুলে পড়ে এবং পৈতৃক ব্যবসা অবলম্বন করিতে ঘৃণা বোধ করে। কাজেই চীনে ছুতোরেরা ঐ ব্যবসা অবলম্বন করিয়াছে।

পত্রপ্রেরকদ্বয় আমার প্রতি যে অভিযোগ করিয়াছেন তাহা যে কতদূর অমূলক তাহা আমার আত্মচরিত (পৃ. ৪৪৭) হইতে দু-চার ছত্র উদ্ধৃত করিয়া প্রমাণ করিব।

বাগেরহাটে বারুজীবী সম্প্রদায় যে কেবল পানের ব্যবসা করেন তাহা নহে, সুপারীর ব্যাপারী হইয়াও অনেকে বেশ দু-পয়সা রোজগার করেন। কিন্তু দুঃখের বিষয়, তাঁহারা বাড়ির ছাড়িয়া বিদেশে যাইতে নারাজ। বারুজীবী শ্রীমানেরা যদি কূপমণ্ডুক হইয়া কেবল গ্রামের ভিতর না থাকিয়া একটুখানি আশেপাশে গিয়া চোখ মেলিয়া দেখেন, তাহা হইলে যে তাঁহাদের এক প্রকার বাড়ির দুয়ার হইতেই বিদেশী অশিক্ষিত ব্যাপারীরা কি প্রকারে লক্ষ লক্ষ টাকা লুঠিয়া লয় তাহা উপলব্ধি করিতে পারিবেন। বাগেরহাট ও বরিশাল ভৌগোলিক হিসাবে এক বলিলেও হয়।

"The export of betel-nut to Rangoon and Calcutta is the monopoly of Burmese, Chinese, and Bombay merchants all of whom have their agents at Patarhat drawing fat salaries varying from Rs. 1000 and upwards per month. They live with their families and the place in the exporting season bears the semblance of a Burmese town. Not far from the steamer ghat are the boundaries of each merchant within which hundreds of maunds of betel-nut are dried up daily or kept in stock ready for putting into sacks before exportation. Like the jute business in the Eastern districts of Bengal this trade in betel-nut is important, inasmuch as the total export varies from thirty to forty lakhs a year. But unfortunately for the people, the bulk of the profits derived from the trade of betel-nut goes into the pocket of the middlemen."

জ্যাক বলিয়াছেন, এ-অঞ্চল হইতে সত্তর-পঁচাত্তর লক্ষ টাকার সুপারী রপ্তানী হইয়া থাকে।

এতদ্ভিন্ন সিঙ্গাপুর হইতে ভারতবর্ষে বছরে প্রায় আড়াই কোটী টাকার সুপারী আমদানী হয়। সে উপলক্ষে আমি লিখিয়াছি—

"If the college-bred young man would only increase the yield of betel-nut by new plantations upon improved scientific methods..., they could earn several additional lakhs. But as Mr. Jack pathetically remarks, "The *Bhadralog* class of Barisal have as yet displayed no versatility or adaptability."

এই যে সত্তর-পঁচাত্তর লক্ষ টাকার সুপারীর ব্যবসা, middleman হিসাবে চীনে ও গুজরাটীরা (ভাটিয়া) অন্যূন শতকরা দশ টাকা পরিমাণ মুনাফা ধরিলে স্বচ্ছন্দে সাত আট লাখ টাকা রোজগার করে।

হায় বাঙ্গালী যুবক, তথাকথিত "বিদ্যার্জ্জনে"র দোহাই দিয়া তুমি অর্থনীতিক্ষেত্রে আত্মহত্যা করিতে বসিয়াছ এবং কেবল পরের ঘাড়ে দোষ চাপাইতেছ।

শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র রায়

এপার-ওপার

শ্রীনন্দগোপাল সেনগুপ্ত

ওপারে ঝলকে লক্ষ রঙীন বাতি,
এপারে গহন মেঘ-দুর্যোগ-রাতি ;
ঝর ঝর ধারা ঝরে ;—
ওপারের আলো শিহরি শিহরি,
এপারে আসিয়া পড়ে !
ওপারে রয়েছে সুধা—
এপারে বুকের কিনারে কিনারে কাঁদে অতৃপ্ত ক্ষুধা।
খেয়ার তরণী নাই,
এপারের ঘাট উৎসুক চোখে ওপারের পানে চায় !
ওপার আপন সুখের স্বপনে ভোর,
এপারে ঝঞ্ঝা গরজায় সুকঠোর ;
ওপারে শান্তি অগাধ সুপ্তি ঢালা,
এপারে বেদনা চির জাগ্রত, দুর্ব্বহ বিষ-জালা !
ওপার ডাকিছে আয়,
এপারে ব্যাকুল বুকের বাসনা গুমরিছে হতাশায় !
ওপারে সাজ গত উদ্বেগ আশা ;
এপারে অকূল লোনা আঁখি জলে, তল খুঁজে ফেরে ভাষা।
ওপারে মেঘের তলে,
এপারে হারানো আশার মাণিক কভু নিভে, কভু জলে,
ওপার দিতেছে দোল্
এপারে লহরী নেচে নেচে উঠে, তরী কাঁপে উতরোল !

প্রত্যাবর্ত্তন

শ্রীকেদারনাথ চট্টোপাধ্যায়

নিনেভায় দেখবার মধ্যে আছে কেবল যোজনব্যাপী বিরাট স্তূপ। কাছেই ঐরূপ দুটি স্তূপের উপর নেবী য়ুনুস ও নেবী শীট (ছবি পূর্ব্ব সংখ্যায় দ্রষ্টব্য) নামক দু জন পয়গম্বরের নামে স্থাপিত দুটি মুসলমানী তীর্থস্থান আছে। অনেকের মতে ঐ দুটি স্থানে খনন করলে অসুর-ইতিহাসের ও নিনেভা জনপদের অনেক তথ্য পাওয়া যেতে পারে. কিন্তু সে আশা এখনও সুদূরপরাহত; অন্ততপক্ষে ইরাকে মৌলভী মোল্লাদের আধুনিক শিক্ষা ও কৃষ্টি আরও অনেকটা অগ্রসর না হওয়া পর্য্যন্ত। একদিক দিয়ে এটা ভালই, কেন-না ঐ সব স্থানের প্রাচীন স্মারক নিদর্শনগুলি লুট হওয়ার এইটিই ছিল এতদিন একমাত্র অন্তরায়।

নিনেভায় অনেক বিদেশীই প্রত্নতত্ত্ব আলোচনার নামে দলবদ্ধভাবে লুট ক'রে গিয়েছেন। আধুনিক প্রথামত খননের চিহ্ন কোথাও নেই, কেন-না এখানে হয়েছে কেবলমাত্র খাত ও সুড়ঙ্গ কেটে অতীতের ধনৈশ্বর্য্য লুণ্ঠন, তাতে যা ছিল তার দশমাংশ গেছে বিদেশে এবং বাকী নয়-দশমাংশ হয়েছে একেবারে নষ্ট। বিদেশী ইতিহাসের পুস্তকের পাতায় পাতায় এই সকল প্রসিদ্ধ প্রত্নতাত্ত্বিকের প্রশংসা ছড়ান, এতদিন তাই প'ড়ে এসেছি, এবার এঁদের কীর্ত্তি দেখে এই সকল ধনলোভী তস্করদের আসল পরিচয় পেলাম। এদের না-ছিল জ্ঞানস্পৃহা, না-ছিল অতীত সভ্যতার প্রতি শ্রদ্ধা বা মায়ামমতা,---ছিল কেবলমাত্র পশ্চিমের প্রথা অনুযায়ী অল্পআয়াসে এবং অল্পব্যয়ে পরস্বাপহরণের চেষ্টা---তাতে অন্যের এবং জগতের যতই ক্ষতি হোক না কেন। সুখের বিষয়, এখন এদেশ সজাগ হয়েছে, সুতরাং ও রকম অবাধ চৌর্য্যবৃত্তি আর সম্ভব নয়। কাজেকাজেই এখন প্রত্নতত্ত্বের কাজ এদেশেও কতকটা বৈজ্ঞানিক ও সভ্য প্রথামতই হচ্ছে।

খোরসাবাদ বিরুস-নিমরুদ অসুর, বাবিলন - সর্ব্বত্রই ঐ ব্যবস্থা হয়েছে- বিদেশী যাদুঘরের ধনবৃদ্ধি এবং এদেশীয় সর্ব্বনাশ এতদিনে. অনুরূপ বন্দোবস্ত হওয়ায়, খাটি প্রত্নতত্ত্বের চর্চ্চা আরম্ভ হয়েছে। খোরসাবাদে সারগণের

খোরসাবাদ সারগণের স্নানাগার

প্রাসাদের আসল রূপ এখন প্রকাশ পাচ্ছে. তাই একটি ক'রে অনেক নূতন তথ্যও পাওয়া যাচ্ছে এবং প্রাচীন ধ্বংসাবশেষ রক্ষা ও সংস্কারের চেষ্টাও অল্পস্বল্প শুরু হয়েছে। তবে লুটের ব্যবস্থাও রয়ে গেছে। খোরসাবাদে একটি সুদীর্ঘ স্তম্ভ পাওয়া গেছে, সেটি দেবদারু-জাতীয় কাঠের তৈরি এবং তাহার প্রায় সমস্তটাই তামা বা কাঁসার ফলকে ঢাকা। ফলকগুলিতে অসংখ্য চিত্র ও কীলকলিপি রয়েছে. সেগুলির ব্যাখ্যা প্রকাশ হ'লে আমাদের অনেক নূতন তথ্য পাবার কথা।

*　　*　　*

ভোরে মোসল থেকে রওনা হওয়া গেল। গাড়ীটি বড় কিয়াট, চালক জাতিতে আরব এবং আমাদের হিসাবে মূক-বধির, কেন না. সে জানে শুধু আরবী ভাষা---যার সঙ্গে আমাদের পরিচয় একেবারেই নেই। যাই হোক, আমাদের কি কি প্রয়োজন, কোথায় কোথায় যেতে হবে, এসব তাকে হোটেলওয়ালা দোভাষী হিসেবে বুঝিয়ে দিলেন। তিনি কি
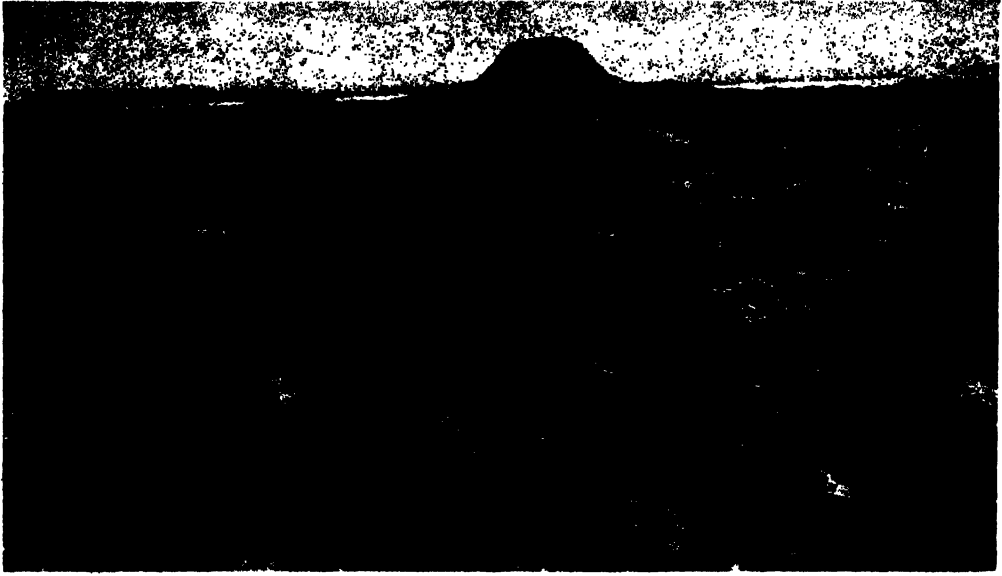
অসুর নগর। সাধারণ দৃশ্য

বোঝালেন তা তখন আমরা বুঝিনি, নইলে তখনই শুধরে নেবার চেষ্টা করতাম। যাই হোক, সে-সব কথা ক্রমশঃ প্রকাশ্য।

তারার আলোয় নির্ম্মল আকাশের নীচে মোটর ছুটে চলল, বাতাসে রাত্রির শৈত্যভাব তখনও বেশ রয়েছে। মোসল শহর তখন ঘুমে অচেতন, কেবলমাত্র ইউ-রোপমুখী লাইনের ষ্টেশন আলোর মালায় উজ্জ্বল হয়ে আছে, তার দিকে তাকিয়ে দুঃখের সঙ্গে বিদায় নিলুম। কথা ছিল ঐ পথে আঙ্গোরা হয়ে তুর্কী যাব, সে আর এ-যাত্রায় ঘটে উঠল না। গাড়ী দু-চার বার হুঙ্কার দিয়ে শহরের সীমানা ছাড়িয়ে উন্মুক্ত প্রান্তরের ভিতরে ছুটে চল্‌ল, মোসলের আলোর মালা দূর হ'তে দূরতর হয়ে ক্রমে মিলিয়ে গেল।

এ-দিকে পূবের আকাশের আঁধার পাত্‌লা হয়ে এল, ধীরে ধীরে উষার আলোয় দূরে নদীর এবং ডানদিকে নীচু পাহাড়-শ্রেণীর আবছায়া রক্তিম রূপ দেখা দিল। এই দুয়ের মধ্য দিয়ে প্রাচীন রাজপথ এঁকে বেঁকে চলেছে। একদিন এই পথ কত প্রবলপরাক্রান্ত অসুর বিজেতার রথচক্রের নির্ঘোষে নিনাদিত হয়ে থাকত, কত দুর্দ্ধর্ষ অসুর সেনানীর দৃপ্ত পদক্ষেপে প্রকম্পিত হ'ত, এখন সে-পথ নির্জ্জন নিস্তব্ধ। এই

অসুর নগর। 'জিগরট' মন্দির

উত্তর অঞ্চলেই আর্য্য পিতামহদিগের সঙ্গে অসুরদিগের প্রথম সংঘর্ষ হয়, এরই এক প্রান্তে বেদমন্ত্রোচ্চারী আর্য্যজাতির প্রাচীনতম পরিচয় প্রস্তরফলকে উৎকীর্ণ হয়।

*　　*　　*

সূর্য্যদেব দেখা দিলেন। বাতাসের ঝাপটাও কিছু কম তীক্ষ্ণ হ'ল। মরুময় দেশে দিনরাতের তাপের প্রভেদ আশ্চর্য্য, দিনে বিষম গরম, রাত্রে তেম্‌নিই ঠাণ্ডা। ছোট একটা চটিতে গিয়ে গাড়ী থামল চালক-মশায় নেমে চটির ভিতর ঢুকলেন। মিনিট-দুই পরে কিছু গরম চা খেয়ে তাজা হওয়া গেল, আরও মিনিট দশেক পরে চালক মশায়ের সহাস্য মূর্ত্তি দেখা গেল তারপরই আবার সেই পথ। ঘণ্টা-খানেক জোরে গাড়ী চলবার পর একটি বেশ বড় গ্রামে পৌঁছান গেল গ্রামের নাম "কালা শেরগাত"। এখানে ইংরেজী সাইনবোর্ড বড় কাবাবনসরাই গ্রামোফোনের শব্দ, এ সব দেখে শুনে বুঝলাম একটা কিছু দ্রষ্টব্যস্থানের কাছে পৌঁছেছি। এখানে আরও কিছু চা এবং সঙ্গের খাবারের সদ্ব্যবহার ক'রে ফের রওনা হওয়া গেল। অল্পক্ষণ পরেই গাড়ী পথঘাট ছেড়ে পাহাড় চড়া করতে লেগে গেল। ইরাকের মোটর গাছে চড়ে কিংবা সাঁতার কাটে কি না জানিনে, কিন্তু অন্য প্রকার গতির প্রায় সকল রকমই তার কাছে সহজসাধ্য এটা আমার দৃঢ় বিশ্বাস। যাই হোক, দু-চার বার একটু বেশী রকম কাত হয়ে হয়ে চড়াই শেষ হবার পর সামনে দেখলাম এক বিরাট নগরীর সমাধিস্থল। সমাধিস্থল বলছি এই কারণে যে, প্রায় চারিদিকে শূন্যগর্ভ কবরের মত বড় বড় গাত পড়ে রয়েছে। সেগুলির ভিতরে জঙ্গম যা-কিছু ছিল সবই স্থানান্তরিত হয়েছে পড়ে আছে দেয়াল মেঝে, সিঁড়ি, দিলান ইত্যাদির ভগ্নাবশেষ। তবু যা হোক, সেগুলিকে ভেঙেচুরে নষ্ট করা
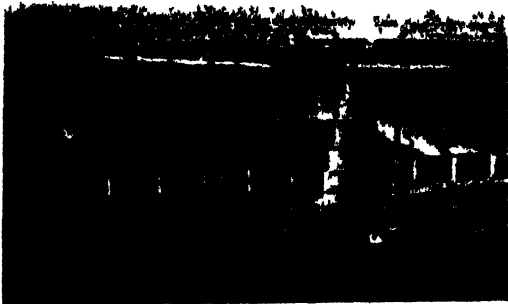
টেসিফোন। ৪০ বৎসর পূর্ব্বেকার অবস্থা

সামারা
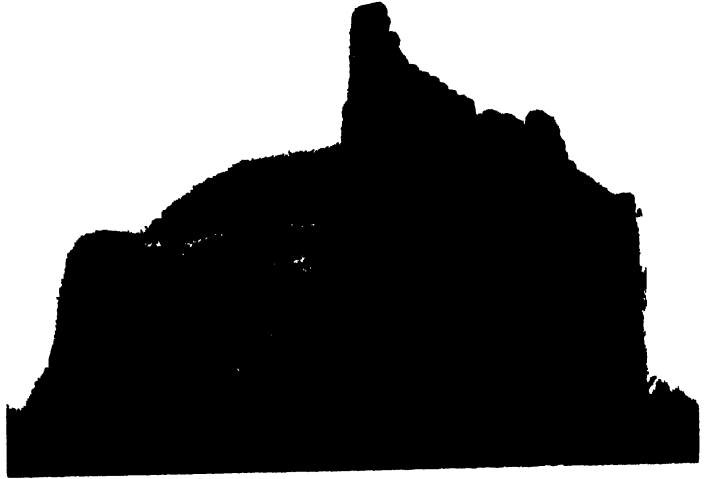
হয়নি, বরঞ্চ বৈজ্ঞানিক প্রথা-অনুযায়ী স্তূপ ব্যবচ্ছেদ করায় এর প্রাচীন পূর্ব্বের কঙ্কালের প্রায় সবটাই মনুষ্যগোচর হয়েছে। নগরের অন্য প্রান্তে একটি ছোট জিগরট শ্রেণীর মন্দির রয়েছে, তার পরেই দুর্গপ্রাকার। এদিকে পাহাড়টা প্রায় খাড়া হয়ে নদীতীর থেকে উঠেছে, নদীও এখানে বিশাল আয়তন, কেন না, বাঁধের মুখে বিরাট বাঁধ দিয়ে অসুর স্থপতিরা এখানে একটি হ্রদের সৃষ্টি করেছিলেন। সে বাঁধ এবং হ্রদ এখনও তাঁদের কীর্ত্তি চিহ্ন রূপে রয়েছে।

এই হ'ল প্রাচীন জগৎ-বিখ্যাত অসুর নগরের বর্ত্তমান অবস্থা। ঘরবাড়ি, স্নানাগার দেবদেবীর মন্দির, সবই রয়েছে নাই কেবল নগরের অধিবাসী বা তাদের ধনসম্পদের কোনও চিহ্ন। রাজপথ দিয়ে ঘুরে ঘুরে বাড়ি-ঘরের ব্যবস্থা দেখতে লাগ্‌লাম, দেখে মনে হ'ল তিন হাজার বৎসরে মনুষ্য-বসতির ব্যাপার যে খুব বেশী কিছু এগিয়েছে তা নয় দরজা জানালা, সিঁড়ি, স্নান, রন্ধন ইত্যাদির ব্যবস্থা, গৃহস্থালীর বন্দোবস্ত, জলনিকাশ, আবর্জ্জনা-বহিষ্কার,—এ সবেরই আয়োজন প্রায় আধুনিক বললেই চলে।

গৃহনির্ম্মাণ ইত্যাদিতে কাঁচা ইটের ব্যবহার খুবই ছিল দেখা গেল, তবে পোড়ান ইট টালি ইত্যাদিও খুবই ব্যবহৃত হ'ত।

দেখ্‌তে দেখ্‌তে ঘণ্টা দেড়-দুই কেটে গেল, এমন সময় দেখি চালক মশায় মহা উত্তেজিত হয়ে হাতঘড়ি দেখিয়ে

টেপিকোন। বর্ত্তমান অবস্থা

দুটো আঙুল তুলে কি বল্‌ছেন। আন্দাজ করলাম দেরি হয়ে গেছে। সূর্যের দিকে ইঙ্গিত করায় বুঝলাম রোদের কথাও বোধ হয় কিছু বলছেন, কাজেই তাড়াতাড়ি গিয়ে গাড়ীতে উঠে পড়া গেল। গাড়ীও সড় সড় ক'রে পাহাড়ের গা বেয়ে নীচে নেমে রাস্তায় এসে পড়ল।

* * * * *

মোসল থেকে অম্বুর (কালা শেরগাত) পর্য্যন্ত গাড়ী খুবই জোরে এসেছিল, রাস্তাও এতদূর এক রকম ভালই ছিল--অন্ততপক্ষে, অন্ধকারে তার অবস্থা বিশেষ কিছু বুঝিনি ব'লে অত বেগে চালান সত্ত্বেও কিছু মনে করিনি। অম্বুর নগর ছেড়ে কিছুদূর এগোবার পর দেখা গেল যে, রাজপথের কঙ্কালমাত্র রয়েছে অর্থাৎ বড় বড় পাথর পথের মধ্যে বসান আছে, কিন্তু সেগুলির মধ্যের ফাঁক থেকে ছোট পাথর বালি ইত্যাদি বেরিয়ে যাওয়ায় তার উপর হেঁটে চলাও প্রায় অসম্ভব হয়ে পড়েছে, গাড়ী চালান ত দূরের কথা। কাজেই পথটিকে পথনির্দ্দেশক হিসাবে ব্যবহার ক'রে তার পাশ দিয়ে যেতে হ'ল, শুধু যেখানে নদীনালা, সেখানে অল্পদূর ঐ পথ দিয়ে গিয়ে (সে সব জায়গায় দেখা গেল অল্পস্বল্প মেরামতও হয়েছে সাঁকো পার হ'তে হ'ল। এহেন অবস্থায় গাড়ীর বেগ কমাবার কথা, আরও বিশেষ ক'রে এই কারণে যে পথে এবার ক্রমাগত চড়াই উৎরাইয়ের পালা। কিন্তু চালক-মশায়ের সিদ্ধান্ত অন্য প্রকার কাজেই মোটর ক্রমে দ্রুত হ'তে দ্রুততর চলে শেষে এরকম বেগে ছুটতে লাগল যে, আমাদের অবস্থা সঙীন হয়ে দাঁড়াল।

উঁচুনীচু জমি তার গজ প্রতি দুটো-তিনটে বড় পাথর, গন্তব্য পথও বিষম আঁকাবাঁকা, তার উপর দিয়ে গাড়ী লাফিয়ে, দুলে, বিষম ধাক্কা দিয়ে তীরবেগে ছুটে চলল। আমরা দু-জন যাত্রী গাড়ীর সঙ্গে, পরস্পরের সঙ্গে, মালপত্রের সঙ্গে ঠোকাঠুকি খেয়ে গাড়ীর কোনও অংশ ধরে নিজেদের সামলাবার চেষ্টা করতে লাগলাম। বৃথা চেষ্টা, গাড়ী তখন ক্ষিপ্ত দানবের মত সর্ব্বাঙ্গ ঝাড়া দিয়ে খানা-খন্দ ডিঙিয়ে সশব্দে পথ গ্রাস করতে ছুটেছে। ভিতরের মালপত্র ও আমাদের অবস্থা তখন কুলোয় চাল-ঝাড়ার ব্যাপারে প্রতি

বাভিয়ন। 'বাভিয়নের সিংহ'

মুহূর্ত্তে উপরে নীচে, এপাশে ওপাশে, বিক্ষিপ্ত তণ্ডুলকণার মত! ড্রাইভারকে আমাদের অবস্থা বোঝাবার চেষ্টা করা গেল। কে বা শোনে কার কথা, আর শুনলেও বোঝেই বা কে? এতক্ষণে মনে পড়ল মোসলের হোটেলওয়ালাকে বলেছিলাম গাড়ী জোরে চালাবার কথা একে বল্‌তে,
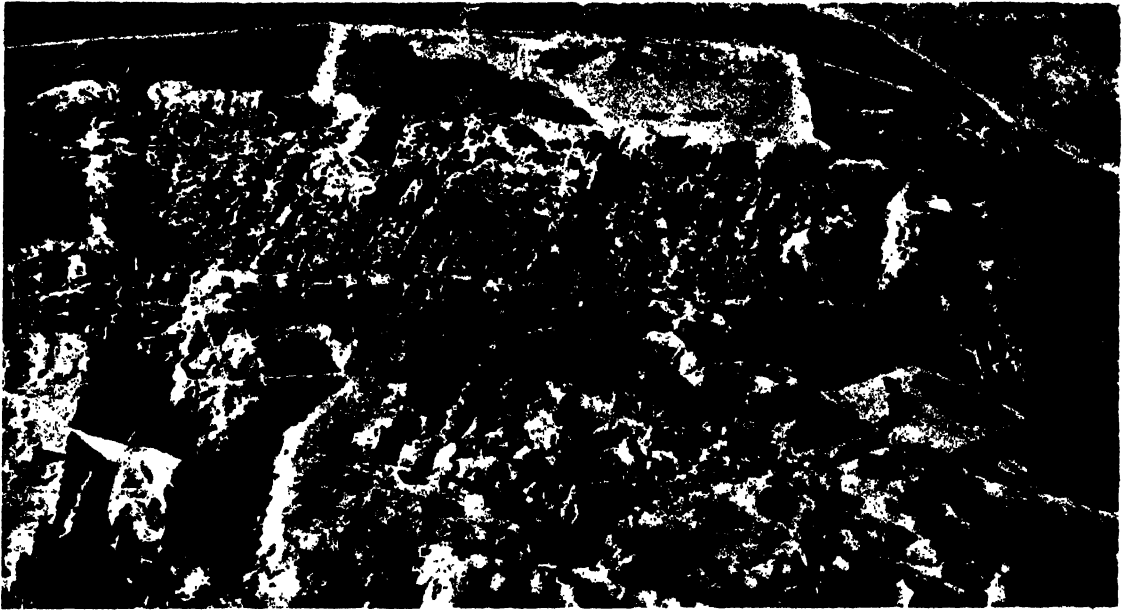
বাবিলন। আকাশ হইতে দৃশ্য

তখন যদি জানতাম জোরে চালানোর আরব ভাষায় অর্থ কি তবে অতি আস্তে যেতে বলতাম!

স্পিডোমিটারের কাঁটা ৯৫ থেকে ১০০ (কিলোমিটার) ঘরের মধ্যে কেঁপেই চলেছে, হিসেব ক'রে দেখলাম যে গতিবেগ ঘণ্টায় ৬০-৬৫ মাইল, সুতরাং চালক-মশায়ের দৃষ্টি পথের দিকে থাকাই ভাল ভেবে তাঁকে কিছু বলার চেষ্টা থেকে নিরস্ত হ'য়ে পথের দিকে নজর দেব্যার চেষ্টা করলাম। হঠাৎ সামনে দেখা গেল যে প· সমতল ছেড়ে সোজা অতলে নেমে গেছে। নীচে একটা বাঁক, তার পরেই প্রকাণ্ড এক নালার উপর একটা সাঁকো। গাড়ীর বেগ সমানই ছিল—বোধ হয় ড্রাইভার এই উৎরাইয়ের জন্য প্রস্তুত ছিল না—তার গতি-রোধের কোন চেষ্টা করার আগেই সে হুঙ্কার দিয়ে পাতালের পথে ঝাঁপিয়ে পড়ল। একবার স্পিডোমিটারের দিকে তাকালাম, কাঁটা ১২০তে গিয়ে কাঁপছে, তার পর আর খবর নাই।

বাবিলন। প্রাসাদের ধ্বংসাবশেষ

আমরা তখন ভাবনা-চিন্তার বাইরে, কিন্তু চালক-মশায়ের মাথা ঠিক ছিল (সে-কথা পরে বুঝেছিলাম)। তিনি ক্ষিপ্র হস্তে (ও পদে) গাড়ী ডিক্লচ, পরে ক্লচ ক'রে গিয়রে ফেললেন, এঞ্জিন কর্ণভেদী শব্দে আর্তনাদ ক'রে উঠল। গাড়ী থর্ থর্ ক'রে কাঁপতে লাগল, মনে হ'ল বুঝি বা তার অন্ত্র-নালী সব ঠিকরে বেরিয়ে আসবে। গতি মন্দ হয়ে এল, নির্ব্বিঘ্নে নীচে নেমে সাঁকো পার হওয়া গেল, চালক-মশায় মুখ ফিরিয়ে সহাস্য বদনে হাত নেড়ে কি একটা বললেন—

বোধ হয় যমকে ফাঁকি দেওয়া তাঁর ব্যবসা. এই কথা—তার পরই গাড়ী আবার উর্দ্ধশ্বাসে ছুটতে লাগল। দেশে ফিরে আসবার পর একজন বিশেষজ্ঞ বন্ধুকে এই ঘটনা বলতে তিনি বললেন, লোকটা মাঠে মারা যাচ্ছে. ওর স্থান ইউরোপ আমেরিকার রেসট্র্যাকে। সে যা হোক. অম্বর যুদ্ধরথের সামনে শত্রু মাত্রই কেন ছত্রভঙ্গ হয়ে যেত সেটা এত দিনে বুঝলাম, সে রথের সারথী আমাদের চালক-মশায়ের পূর্ব্ব-পুরুষরাই ছিলেন, সন্দেহ নেই!

বাবিলন। খননের দৃশ্য

* * *

দিগন্তব্যাপী মরুকান্তারে এসে পড়া গেল। যতদূর দেখা যায় জনমানবশূন্য তৃণশস্পহীন বালুসমুদ্র। সূর্য্যদেবও পূর্ণবিক্রম দেখাতে সুরু করলেন, মুখে নাকে কানে কাপড় চাপা, ভিজে তোয়ালে দিয়ে মাথা হাত ঘষা সত্ত্বেও গরমে সর্ব্বাঙ্গ জ্বালা করতে লাগল। অবস্থা যখন প্রায় শোচনীয় হয়ে এসেছে তখন দূরে কাঁটাতারে-ঘেরা একটি রেল ষ্টেশন দেখা দিল, ষ্টেশনটি "বিজে পয়েণ্ট"। সেখানে পৌঁছে, ট্রেনে বাগদাদ যাওয়া যায় কি-না খোঁজ নিয়ে হতাশ হয়ে ফিরলাম। ওখানে ওয়েটিং-রুমের ছায়ায় বসে, খাওয়া-দাওয়া সেরে আকণ্ঠ চা. লেমনেড জল খেয়ে আবার রওনা হওয়া গেল। আধ ঘণ্টার মধ্যে পথহীন বালুসমুদ্রে এসে পড়লাম, বেলা প্রায় দুপুর. বাতাস চিতানলের মত প্রচণ্ড গরম, সঙ্গে সঙ্গে মরুভূমিতে পবনদেবের লীলাখেলা সুরু হয়ে গেছে।

আরব ভাষায় প্রবাদ আছে "মরুভূমি ঈশ্বরের উদ্যান।" গ্রীষ্মকালের মরুভূমি যে দেবতার প্রমোদকানন সে-বিষয়ে সন্দেহ মাত্র নেই। উজ্জ্বল রৌদ্র-ঝলসিত আকাশে দিগন্ত রেখা মিলিয়ে গিয়েছে, ছোটবড় বালুস্তূপ মরুতলে বিচিত্র উর্ম্মিমালার সৃষ্টি করেছে, এমনি ক'রে দেখতে দেখতে মুহূর্ত্তের মধ্যে দৃশপটের পরিবর্ত্তন হ'ল। আকাশ তাম্রবর্ণ হয়ে গেল, দিগন্তরেখা অদৃশ্য যবনিকার অন্তরালে লুকাল, দৃষ্টিক্ষেত্র সীমাবদ্ধ হ'ল, মরুদেবতা ঘূর্ণিবাত্যায় আরোহণ ক'রে গগনস্পর্শী সহস্র হস্তপদ ক্ষেপণে তাণ্ডব নৃত্য সুরু করলেন। চক্ষের নিমেষে সীমাহীন দিগদিগন্ত ব্যাপী মরুভূমি, শত তোরণ সহস্র স্তম্ভযুক্ত বিরাট

বাবিলন। মারডুকের মন্দির

আয়তনে পরিণত হয়ে গেল, তার ভিতরে ইন্দ্রায়ুধ-বর্ণ বালুজাল, সূর্য্যদেবের আলোক-শরের ক্ষেপে স্পন্দিত ও উদ্ভাসিত হ'তে থাকল। আবার দৃশ্যপরিবর্ত্তন, আকাশ

পরিষ্কার হ'য়ে গেল, এবার মরুতল বায়ু-আলোড়িত সমুদ্রে পরিণত হ'ল।

*   *   *   *

রোদ. বাতাস. বালির আঁধি, ঘূর্ণিবাতাস সব তুচ্ছ ক'রে উল্কাবেগে মোটর ছুটে চল্‌ল, চালক কি ক'রে দিকনির্ণয় ক'রে ঐ প্রচণ্ড গরমের মধ্যে স্থিরভাবে গাড়ী চালালেন জানিনে। আমাদের শরীর ত ঝল্‌সে পুড়ে গেল, গরম বাতাসে নিঃশ্বাস-প্রশ্বাসও দুঃসহ কষ্টের ব্যাপার হ'য়ে দাঁড়াল। ঘণ্টা-দুই এমনি ক'রে যাবার পর দূরে সামারার জিগরট ছাচের মিনার এবং ঐ প্রসিদ্ধ তীর্থের মসজিদের মিনার গম্বুজ দেখা দিল। আমরা নদীর এপারে এসে থামলাম, নদী পার হয়ে গিয়ে দেখার সময় শক্তি দুয়েরই অভাব, কাজেই দূর থেকেই নমস্কার ক'রে বিদায় নিতে হ'ল। ঘণ্টাখানেক পরে বাগদাদে পৌঁছে সেই হোটেলে গিয়ে আশ্রয় নিলুম। চালক-মশায় এক পয়সাও বক্‌শিস নিলেন না, এমনই এঁদের অতিথি-বাৎসল্য।

মোসল থেকে বাগদাদ আমাদের পথে প্রায় ৩২০ মাইল। আমরা ভোর সাড়ে তিনটায় রওয়ানা হয়ে. পথে চটিতে, কালাশেরগাতে, অসুর নগরে, বিজে পয়েণ্টে এবং সামারায় সবসুদ্ধ প্রায় চার ঘণ্টা থেমে বেলা দুটার আগে বাগদাদের হোটেলে পৌঁছেছিলাম। পথের এক-তৃতীয়াংশ রাজপথ, বাকী অংশকে বিপথ বললে প্রশংসা করা হয়।

*   *   *   *

পরদিন ভোরে বন্ধুবান্ধবদের কাছে বিদায় নিয়ে মোটর-যোগে বাবিলন যাত্রা করা গেল। জিনিষপত্র টমাস কুকের জিম্মায় বাসরা চালান করলাম। কাছাকাছির মধ্যে টেসিফন এর আগেই দেখা হয়ে গিয়েছিল। শাশানীয় নৃপতিদিগের এই রাজপ্রাসাদের অবস্থা এখন অতিশয় জীর্ণ। প্রসিদ্ধ খিলানটির মধ্যে ফাট ধরেছে, দু-পাশের দেয়ালের একটি পড়ে গিয়েছে, অন্যটির সংস্কারের চেষ্টা চলেছে। এত বড় ও এত উঁচু খিলান এখনও জগতে দু-চারটির বেশী নেই। যখন এই প্রাসাদ রাজগৃহ হিসেবে ছিল তখনকার বর্ণনা পড়লে অলৌকিক ব'লে মনে হয়। আরব-অধিকারের পর থেকেই এর ধ্বংস সুরু হয় এবং পরে ইট-পাথর চুরির দরুণ শীঘ্রই এর এই জীর্ণ ভগ্নাংশ মাত্র থাকে। এর কাছেই হজরৎ মহম্মদের প্রিয় পার্শ্বচর সুলেমান পাকের কবর ও দরগাহ আছে। সেগুলি ও তার আশপাশের বস্তি কাছের গ্রাম সকল, এমন কি সুদূর বাগদাদেরও অংশ এই প্রাসাদ ও পুরীর ধ্বংসাবশেষ থেকে তৈরি হয়েছে। এখন আছে কেবল ঐ

বাবিলন। ইষ্টার তোরণ

খিলান এবং এক পাশের দেয়াল—অতীত গৌরবের স্মৃতিচিহ্ন হয়ে।

*   *   *   *

সকালে বাগদাদ থেকে রওনা হয়ে বাবিলন পৌঁছান গেল। এই বিশ্ববিখ্যাত নগরের বর্ণনা অল্পের মধ্যে করা অসম্ভব। এখন যা আছে তারও বর্ণনা ভ্রমণ-বৃত্তান্তের মধ্যে দেওয়া অসম্ভব। ইতিহাসের প্রথম যুগের শেষে এর পতন হয়, তার পূর্ব্বে অসুর, মিশরি, অক্কমনিয়া. গ্রীক রোমক সকল বিজেতারই চরম লক্ষ্যস্থল ছিল এই সমৃদ্ধিশালী নগরী। প্রাচীন জগতে ঐশ্বর্য্য এবং বাবিলন প্রায় এক অর্থ হয়ে দাঁড়িয়েছিল। এখনও ইষ্টার, মারডুক ইত্যাদির মন্দির এবং যোজন-ব্যাপী সৌধ অট্টালিকার ধ্বংসাবশেষ যার মধ্যে প্রসিদ্ধ ঝুলানো বাগান (hanging gardens) ইত্যাদিরও অবশিষ্ট আছে—যা আছে তা দেখলে সহজেই বিশ্বাস হয় পূর্ব্বকালে এর কি গৌরবময় অবস্থাই ছিল।

মন্দির বাড়ি প্রায়ই সব কাঁচা-পাকা ইট মিশান গাঁথুনি। পোড়ান ইটগুলি টালির মত বড় এবং খনিজ জতু (বাইটুমেন) দিয়ে গাঁথা। মন্দির ইত্যাদির দেয়ালে নক্‌সা-কাটা ইটের কারুকার্য্যে নানা চিত্র অঙ্কিত আছে। শহরের মাঝামাঝি বিখ্যাত প্রস্তরময় সিংহমূর্ত্তি আছে (বাবিলনের সিংহ।

অন্ত প্রস্তরমূর্ত্তি ইত্যাদি প্রায় সবই প্রত্নতত্ত্বের নামে লুণ্ঠিত হয়ে গেছে।

ঘুরে-ফিরে দেখে চক্ষু সার্থক করা গেল। ভাল ক'রে দেখা এক মাসেও সম্ভব নয়, সুতরাং সূক্ষ্মভাবে বর্ণনা করার চেষ্টা বৃথা।

বাবিলন দেখার পর মোটরে দেওয়ানিয়েহ্ ষ্টেশনে (৭৫ মাইল) গিয়ে শুনলাম ট্রেন সেই মাত্র চলে গেছে. অন্ত ট্রেন, মায় মাল গাড়ীও, চব্বিশ ঘণ্টার আগে পাওয়া যাবে না। এদিকে তার আগে না গেলে আমাদের উর দেখা হয় না। বিষম সমস্যাই হ'ল।

রাষ্ট্রগঠনের প্রথম সোপান

শ্রীউপেন্দ্রনাথ সেন

কংগ্রেস দেশবাসীর নিকট ভাবী স্বরাজের যৎকিঞ্চিৎ পরিচয় দিয়াছেন সর্ব্বপ্রথম করাচী অধিবেশনে। দেশবাসীর মৌলিক অধিকার সম্বন্ধে যে প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছে. তাহা হইতে স্পষ্টই বোঝা যায়, যে-স্বরাজ কংগ্রেসের স্পৃহনীয় তাহা প্রকৃতই শ্রমজীবী এবং কৃষককুলের মুক্তির সোপান হইবে। প্রস্তাবটি অতিশয় সংক্ষিপ্ত সন্দেহ নাই. কিন্তু মহাত্মাজীর বক্তৃতায় বিষয়টি একটু পরিস্ফুট হইয়াছে। খুব সম্ভব এক শ্রেণীর ভারতবাসীর পক্ষ হইতে ইহার তীব্র সমালোচনাও হইবে। দায়িত্বহীন শাসনযন্ত্র বিদেশীর হস্তে ন্যস্ত হইলে দেশের এক শ্রেণীর লোক নিজেদের স্বার্থ নিরাপদ করিয়া লইতে সক্ষম হয়। এই স্বার্থে আঘাত লাগিলে অনেক নিন্দা প্রতিবাদ মুখর হইয়া উঠা স্বাভাবিক। কিন্তু যাঁহারা দেশের প্রকৃত এবং স্থায়ী হিতকামনা করেন, তাঁহাদিগকে এই-জাতীয় সমালোচনা উপেক্ষা করিয়া চলিতে হইবে।

বাংলার সর্ব্বাঙ্গীন কল্যাণ সাধনের জন্য যে বিধি প্রণয়ন করা কর্ত্তব্য. আমি এই প্রবন্ধে তাহার আলোচনা করিয়াছি। ভরসা করি বাংলার ভাবী দেশীয় কর্ত্তৃপক্ষ ইহার মধ্যে অনেক চিন্তার সামগ্রী পাইবেন। তাঁহাদের হাতে প্রকৃত কর্ত্তৃত্ব ন্যস্ত হইলেই তাঁহাদিগকে অন্য বহুবিধ সংস্কারের মধ্যে প্রধানতঃ দুইটি প্রাকৃতিক এবং সামাজিক ব্যাধির প্রতিকার সাধনের জন্য তৎপর হইতে হইবে। প্রথমটি-পশ্চিম-বঙ্গের ম্যালেরিয়া ও পূর্ব্ব-বঙ্গের কচুরি পানার উচ্ছেদসাধন. দ্বিতীয়টি বঙ্গের কৃষককুলের আর্থিক দুর্গতি দূরীকরণ। এই উভয়বিধ ব্যাধির প্রতিকার বহু পরিশ্রম, বহু অর্থ এবং অপেক্ষা বহু সাহস সাপেক্ষ।

এই সমস্যার পূরণের জন্য যে পন্থা প্রকৃষ্ট এবং যে উপায়ে এই দরিদ্র দেশেও তজ্জন্য যথেষ্ট অর্থ সংগৃহীত হইতে পারে, আমার এই প্রবন্ধে তাহার আলোচনা করা যাইতেছে।

খুব সংক্ষেপে বলিতে গেলে আমার প্রস্তাব এই:—'জমিদার শ্রেণীকে অবসর প্রদান করাইয়া কৃষককেই একমাত্র ভূমির প্রকৃত অধিকারী করিয়া দেওয়া হউক। তাহারাই এই বিপুল অর্থ যোগাইয়া দেশের যাবতীয় সংগঠনমূলক অনুষ্ঠান সাফল্যমণ্ডিত করিতে সমর্থ হইবে।"

বাংলায় নিরপেক্ষ চিন্তাশীল লোকের অভাব নাই। স্বাধীন মতামতের প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শনে যাঁহারা অভ্যস্ত, তাঁহারা এই প্রস্তাবের দোষগুণ বিচার করিতে প্রবৃত্ত হইলে উপস্থিত সমস্যার সমাধান কার্য্য অনেক দূর অগ্রসর হইতে পারে। অবজ্ঞা ও সন্দেহের চক্ষে এই প্রস্তাবটিকে না দেখিয়া শিক্ষিত দেশবাসী ইহার আলোচনা করেন, এই উদ্দেশ্যেই এই প্রবন্ধ লিখিত হইয়াছে।

প্রস্তাবটির আলোচনায় প্রবৃত্ত হইতে গেলেই মনে সর্ব্বপ্রথমে এই প্রশ্ন উদিত হয়; ভূমির প্রকৃত অধিকারী কে?—রাজা, জমিদার, না কৃষক? প্রাচীন হিন্দুরাজত্বকালে রাজা ভূমির উৎপন্ন শস্যের ষষ্ঠাংশ করস্বরূপ গ্রহণ করিতেন; সুতরাং. করগৃহীতা রাজা ভূমির অধিকারী হইতে পারেন না। অতি প্রাচীনকালে পল্লীগোষ্ঠীই ভূমির অধিকারী ছিল বলিয়া মনে হয়। তাহারা গোষ্ঠীর প্রয়োজন-মত চতুঃপার্শ্বস্থ পতিত ভূমি কর্ষণ করিয়া নিজেদের ভরণপোষণের ব্যবস্থা করিত। ক্রমে গোষ্ঠীবন্ধন শিথিল হইয়া আসিলে

ভূসম্পত্তি প্রথমে ভিন্ন ভিন্ন যুক্তপরিবারের, তৎপর কালক্রমে ব্যক্তিবিশেষের সম্পত্তি হইয়া পড়ে। রাজা রাজ্যের সুশাসন ও শান্তি স্থাপনাদির ব্যয় নির্ব্বাহের জন্য কর পাইতে অধিকারী। পৃথিবীর সকল দেশেই এই নীতি অনুসৃত হইয়া আসিয়াছে। ভারতবর্ষে মুসলমান রাজত্বেই প্রথম জমিদারী-প্রথার সৃষ্টি হয়। জমিদারী এই আরবী কথাটিও ইহার এক প্রমাণ। এইরূপ অর্থসূচক শব্দ সংস্কৃতে আছে বলিয়া জানি না। কিন্তু মুসলমান আমলেও জমিদারগণ কেবলমাত্র নবাব বাদশাহদের করসংগ্রহকারী কর্ম্মচারী স্বরূপই ছিলেন। ব্রিটিশ রাজত্বের প্রারম্ভেও ইহাদের অবস্থার পরিবর্ত্তন হয় নাই। কিন্তু ইং ১৭৯৩ সালে লর্ড কর্ণওয়ালিস যখন বাংলায় চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত বিধিবদ্ধ করেন, তখনই কৃষককুলের সর্ব্বনাশের সূত্রপাত হইল। বিদেশী রাজপুরুষগণ জমিদার শ্রেণীকে যে অধিকার প্রদান করিয়া বসিলেন, তখন তাহার সমর্থনকারী কোনও বিধান বা দৃষ্টান্ত ছিল না। বিদেশী রাষ্ট্রশক্তি নিজ স্বার্থসিদ্ধির অনুরূপ শাসনপ্রণালীকে কিয়ৎ পরিমাণে সহজ করিবার অভিপ্রায়েই হয়ত চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত বিধিবদ্ধ করিয়াছিলেন; অথবা. ব্রিটিশ রাষ্ট্রশক্তিকে সমর্থন করিবার জন্য এক শ্রেণীর ধনী এবং প্রতাপশালী দেশীয় লোকের প্রয়োজন হইয়াছিল এই জন্যই মনে হয় চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত অনিষ্টকর বুঝিতে পারিয়াও পরবর্ত্তী ব্রিটিশ রাজপুরুষগণ ঐ ভ্রম সংশোধন করিতে পারিয়া উঠেন নাই।

চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের পর প্রজার উপর যে রকম অত্যাচার ও উৎপীড়ন আরম্ভ হইল, তাহা এখন ঐতিহাসিক তথ্যে পরিণত হইয়াছে। ঐ কার্য্যে তৎকালীন গবর্ণমেন্টকেও অজ্ঞাতসারে সাহায্য করিতে হইয়াছিল। তাহার প্রমাণ পঞ্চম ও সপ্তমের আইন দুইটি। অত্যাচারের মাত্রা ক্রমশঃ এতদূর বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইল, যে, নিঃসহায় কৃষককুলের কাতর ক্রন্দনে রাজপুরুষের ন্যায় বুদ্ধি বুঝি বা কিয়ৎপরিমাণে লজ্জিত হইয়া উঠিয়াছিল। তাহারই ফলে প্রথমে ১৮৫৯ সালে পরে ১৮৮৫ সালে প্রজাস্বত্ব-বিষয়ক আইনের সৃষ্টি হইল। কিন্তু তথাপি করগৃহীতা জমিদার এখনও ভূম্যধিকারী, আর যে হতভাগ্য জমি চাষ করিয়া সেই জমিদারের অন্ন যোগায়, অথচ তাহার নিজের এক বেলার অন্নও কখন কখন সঞ্চয় করিয়া রাখিতে পারে না, জমিতে তাহার অধিকার নামমাত্রই রহিল। যে নির্দ্দিষ্ট ভূমিখণ্ডে কৃষক অক্লান্ত পরিশ্রম করিয়া শস্য উৎপাদন করিয়া দেশের ধনবৃদ্ধির সহায়তা করিতেছে, তাহাতে ঐ কৃষকের অধিকার রহিল না। কিন্তু যাহারা ধন উৎপাদনে সাহায্য করে না, সেই শ্রেণীর লোকেরাই ভূমির প্রকৃত অধিকারী হইয়া গেল। এই ব্যবস্থা স্থায়ী হইতে পারে না। রাষ্ট্রশক্তি দেশীয় লোকের হস্তে ন্যস্ত হইলে এ ব্যবস্থার পরিবর্ত্তন করিতেই হইবে। রাশিয়াতে প্রজাতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হইবার সঙ্গে সঙ্গেই কৃষককুল নিজেদের অধিকার নিজেরাই সাব্যস্ত করিয়া লইয়াছিল। যুগ যুগান্তর ধরিয়া যে-সকল ভূমি জমিদারগণ অধিকার করিয়া রাখিয়াছিল, কৃষকগণ তাহা কাড়িয়া লইয়া নিজেরাই তাহার অধিকারী হইয়া বসিল। রাশিয়াতে এখন রাষ্ট্রশক্তি এবং কৃষকের মধ্যবর্ত্তী কোনও করগৃহীতা ভূম্যধিকারী নাই। ঐ রাষ্ট্রশক্তিও আবার কৃষক ও শ্রমজীবীদের প্রতিনিধি দ্বারা পরিচালিত। কৃষকগণ জমির উপস্বত্বের উপর নির্দ্দিষ্ট হারে কর দিয়া থাকে এবং তদ্বিনিময়ে রাষ্ট্রশক্তি বৈজ্ঞানিক প্রণালী সমস্ত উন্নত যন্ত্রপাতির সাহায্যে অধিকতর ফসল উৎপাদনের সহায়তা করিয়া দেশের শস্যসম্পদ অতি অল্প সময়ের মধ্যে বহুপরিমাণে বর্দ্ধিত করিতে সক্ষম হইয়াছে। রাশিয়াতে এই বিপ্লবে বহু রক্তপাত হইয়া গিয়াছে; কিন্তু ভারতবর্ষে আমরা চিরকালই অহিংসাপন্থী। স্বরাজ লাভ হইলেও আমরা কাহাকেও অন্যায়রূপে লুণ্ঠন করিতে দিতে পারিব না। সুতরাং ভবিষ্যতে দেশের ভূসম্পত্তিকে গণসম্পত্তিতে পরিণত করিবার ব্যবস্থা প্রবর্ত্তিত হইলে জমিদারগণের সর্ব্বস্বাপহরণ করা হইবে, এরূপ আশঙ্কা করিবার কারণ নাই।

এক সময় জাপানেও এই সমস্যার উদ্ভব হইয়াছিল। সেখানে মাতৃভূমির উন্নতি ও কল্যাণ কামনা করিয়া ক্ষমতাশালী ভূম্যধিকারীর দল নিজেদের প্রাচীন অধিকার ত্যাগ করিয়া নিজেদের আয়ের দশমাংশমাত্র বৃত্তি গ্রহণ করিয়া সন্তুষ্ট হইয়াছিলেন। বিকৃত বৌদ্ধধর্ম্মাবলম্বী জাপানে এই ত্যাগ সম্ভব হইলে, বুদ্ধের জন্মভূমিতে জমিদারগণ মাতৃভূমির কল্যাণের জন্য কি অনুরূপ ত্যাগ স্বীকার করিতে অক্ষম হইবেন? আমার এই প্রস্তাবে জমিদারগণকে শুধু মাত্র গৌরবের বিনিময়ে ত্যাগ স্বীকার করিতে বলিব না, বরঞ্চ

এই বিধানে তাঁহাদের উপযুক্ত বৃত্তির ব্যবস্থাই থাকিবে। যাঁহারা ভূসম্পত্তির আয়ের উপর জীবিকানির্ব্বাহ করিয়া থাকেন, তাঁহারা বলিয়া থাকেন, যে, ইহাতে মূলধনের উপর শতকরা ৬৲ ছয় টাকার বেশী লাভ হয় না। আমার এই বিধানে জমিদারগণের আয়ের অঙ্ক ইহারই অনুরূপ করিবার ব্যবস্থা হইয়াছে।

বাংলাদেশের বর্ত্তমান ভূমির রাজস্ব ২,৯৯,৭৪,৭৪৪ অর্থাৎ প্রায় তিন কোটী টাকা। হিসাব করিয়া দেখা গিয়াছে যে কৃষকগণ যে পরিমাণ খাজনা তাহাদের মালিককে দিয়া থাকে, তাহার (⅕) এক পঞ্চমাংশ, রাজস্ব-রূপে গৃহীত হইয়া থাকে। এই অনুপাত সরকারী রিপোর্টেই পাওয়া যায়। (Bengal Administration Report 1929-30 দেখুন।) সুতরাং বাংলার কৃষককুল বর্ত্তমান সময়ে অন্ততঃ পনর কোটী টাকা খাজনা মালিককে দিয়া থাকে, এইরূপ অনুমান করা অন্যায় হইবে না। আর এক দিক দিয়া হিসাব করিলেও এই অনুমান নির্ভুল বলিয়া মনে হয়। বাংলাদেশে ১,০৪,০১,৩৪১৲ অর্থাৎ কিঞ্চিৎ অধিক এক কোটী টাকা পথকর স্বরূপ আদায় হইয়া থাকে। আইন অনুসারে জমির বার্ষিক বন্দোবস্তী জমার উপর টাকা প্রতি এক আনা হারে পথকর ধার্য্য হইয়া থাকে। গবর্ণমেণ্টের রিপোর্টে প্রকাশ যে ঐ বন্দোবস্তী টাকার পরিমাণ পনর কোটী টাকার কিছু বেশী হইবে। অর্থাৎ বাংলা দেশে যে সমস্ত জমির উপর পথকর ধার্য্য হয়, তাহা প্রচলিত হারে বন্দোবস্ত দিলে পনর কোটি টাকা বার্ষিক খাজনা পাওয়া যাইতে পারে। অতএব এই সিদ্ধান্ত বিনা প্রতিবাদে গ্রহণ করিতে পারা যায় যে, বঙ্গের কৃষককুল প্রতিবৎসর পনর কোটি টাকা নিজেদের জমির করস্বরূপ প্রদান করিয়া থাকে। এই পনর কোটী টাকার মধ্যে গবর্ণমেণ্ট কেবলমাত্র তিন কোটী টাকা ভূমির রাজস্ব এবং এক কোটী টাকা পথকর বাবদ গ্রহণ করিয়া থাকেন; বাকী এগার কোটী টাকা মধ্যবর্ত্তী জমিদার শ্রেণী না থাকিলে রাজকোষ বহু পরিমাণে সমৃদ্ধিশালী হইতে পারিত। এই মধ্যবর্ত্তী জমিদারগণ দেশের ধন উৎপাদন ও বৃদ্ধিতে বিশেষ কিছু সাহায্যই করেন না, বরঞ্চ অনেকেই বিলাসিতা ও অপকর্ম্মে ঐ টাকা ব্যয় করিয়া থাকেন। অথচ কৃষককুল যে ঐ বিপুল অর্থ জমির করস্বরূপ প্রতি বৎসর দিয়া আসিতেছে, তাহার বিনিময়ে তাহারা কি সুবিধা ভোগ করিতেছে? এক হিসাবে উল্লেখযোগ্য কিছুই নহে। ম্যালেরিয়া ও অন্যান্য প্রতিকারযোগ্য ব্যাধির কবল হইতে তাহাদিগকে মুক্ত করিবার জন্য রাজকোষে অর্থাভাব। বিশুদ্ধ পানীয় জল পর্য্যন্ত তাহারা সকল স্থানে সংগ্রহ করিয়া উঠিতে পারে না। তাহাদের শিক্ষার ব্যবস্থার জন্য অর্থাভাব। তাহাদিগকে দুই বেলা পেট ভরিয়া খাইতে দিবার সংস্থান করিবার জন্যও রাজকোষে অর্থ নাই। গ্রাম্য মহাজনদের উৎপীড়ন ও শোষণ হইতে তাহাদিগকে রক্ষা করিবার জন্যও সরকারের হস্তে অর্থ নাই। ইতিহাসে দেখা যায়, এই শ্রেণীর দারুণ দুর্দ্দশায় পৃথিবীর কোনও কোনও দেশে বিপ্লবের সূত্রপাত হইয়াছে। সৌভাগ্যের বিষয়, ভারতের কৃষককুল অসম্ভব রকম অদৃষ্টবাদী এবং স্বভাবতঃ নিরুপদ্রব। যে বিপ্লব রাশিয়া এবং ফ্রান্সে সংঘটিত হইয়াছে, ভারতবর্ষে সম্প্রতি তেমন কিছু উপদ্রব হইবার আশঙ্কা নাই। ভবিষ্যতে বিপ্লবের সম্ভাবনা দূর করিবার জন্যই রাষ্ট্রশক্তি নিজেদের হস্তে আসিলে ভাবী নেতাগণকে সর্ব্বাগ্রে কৃষককুলের ন্যায্য অধিকার প্রত্যর্পণ করিতে হইবে। আর যাঁহারা সেই অধিকার এতদিন ভোগ করিয়া আসিতেছেন, সেই মুষ্টিমেয় করগৃহীতাগণের জন স্বতন্ত্র ব্যবস্থা করিতে হইবে। এই কার্য্য যুদ্ধবিগ্রহ ও রক্তপাত দ্বারা করিতে বলিতেছি না; জমিদার-গণের সর্ব্বস্বাপহরণ করিবার ব্যবস্থাও আমি দিতেছি না। বরং অধিকারচ্যুত করিয়া তাহাদের উপযুক্ত বৃত্তির ব্যবস্থাই করিতেছি। ইহা কি প্রকারে সম্ভব ও সহজ হইতে পারে, এখন তাহারই আলোচনায় প্রবৃত্ত হইব।

পূর্ব্বেই দেখান হইয়াছে, বাংলার কৃষকেরা বৎসরে পনর কোটী টাকা খাজনা দিয়া থাকে। ইহা হইতে ভূমির রাজস্ব তিন কোটী ও পথকর এক কোটী বাদ দিলে এগার কোটী টাকা অবশিষ্ট থাকে। ইহাই জমিদার শ্রেণীর লভ্যাংশ বলিয়া মনে হয়। কিন্তু প্রকৃতই এত টাকা তাহাদের ঘরে যায় না। কেন না, তহশীলের খরচ, মামলা মকদ্দমার খরচ তাহাদিগকে বহন করিতে হয়। তারপর প্রতি বৎসর ফসল আশানুরূপ হয় না বলিয়া খাজনা আদায়ও কম হইয়া থাকে। এইজন্য সাধারণতঃ জমিদারগণের মহালে প্রতি বৎসর খাজনা প্রায় চতুর্থাংশ অনাদায়ী অবস্থায় পড়িয়া থাকে। সুতরাং ঐ এগার

কোটী টাকা হইতে তহশীল খরচ শতকরা দশ টাকা হিসাবে ও স্থায়ী অনাদায়ী খাজনার পরিমাণ শতকরা পঁচিশ টাকা হিসাবে বাদ দিলে আনুমানিক সাড়ে সাত কোটী টাকা হয় ত জমিদারগণ ঘরে আনিতে পারেন। কিন্তু এই দুই তিন বৎসর তাহাও সম্ভব হইতেছে না। শস্যাদির মূল্য অসম্ভবরূপে হ্রাস পাওয়ায় ও আনুসঙ্গিক আরও অনেক জটিল অর্থনৈতিক কারণে বহুকাল হইতে ঋণভারে জর্জ্জরিত প্রজাগণ মালিকের সামান্য খাজনাও দিয়া উঠিতে পারিতেছে না। ফলে বহু ভূম্যধিকারীর সম্পত্তি রাজস্ব অনাদায়ের অপরাধে নীলাম হইয়া গিয়াছে এবং অনেকে নিজেদের সম্পত্তি কোর্ট অব ওয়ার্ডসের হাতে দিবার জন্য উৎসুক হইয়া আছেন। জমিদারগণের এই সঙ্কটকাল কত দিন চলিবে বলা কঠিন। এখন অধিকাংশ জমিদার গবর্ণমেণ্টের হাতে জমিদারী অর্পণ করিয়া শতকরা চার কি পাঁচ টাকা মুনফা পাইলেও সন্তুষ্ট থাকেন। জোর জবরদস্তি উৎপীড়ন শোষণের যুগ ক্রমশঃ চলিয়া যাইতেছে। আইনের বিধান মান্য করিয়া এবং অসদুপায় অবলম্বন না করিয়া কোনও ভূম্যধিকারীই এখন শতকরা ছয় টাকার বেশী লাভ করিতে পারিবেন না। সুতরাং এখন যদি এমন ব্যবস্থা করা হয় যে জমিদারগণ নিজের অধিকারের বিনিময়ে প্রতি বৎসর ঘরে বসিয়া নিজেদের আয়ের যুক্তিসঙ্গত অংশ পাইতে পারেন, তাহা হইলে তাঁহাদের আপত্তি হওয়া উচিত নয়। কারণ বিষয়সম্পত্তি রক্ষা ও মামলা মকদ্দমার নানারূপ ঝঞ্ঝাট, নায়েব তহশীলদারদের অশেষবিধ অপব্যবহার হইতে মুক্ত হইয়া তাঁহারা অন্য উপায়ে নিজেদের আয় বৃদ্ধির চেষ্টা করিতে পারিবেন।

এই সাড়ে সাত কোটী টাকা জমিদারগণের খাটি আয় ধরিয়া লইলে পনর গুণ হারে একশত সাড়ে বার কোটী টাকা জমিদারীর মূল্য হয়। আমার প্রস্তাব এই, যে, জমিদারগণকে শতকরা ছয় টাকা সুদে একশত সাড়ে বার কোটী টাকার 'বণ্ড' দেওয়া হউক। অবশ্য এই সুদের টাকার উপর আয়কর ধার্য্য করা কর্ত্তব্য। এই একশত সাড়ে বার কোটি টাকা 'বণ্ডের' সুদ প্রতি বৎসরে প্রায় সাত কোটী টাকা হইবে। এই ঋণভার ভাবী গবর্ণমেণ্ট বহন করিতে থাকিবেন। যতদিন সমগ্র টাকাই আমার বিধান মত আপনা হইতেই পরিশোধ হইয়া না যায়।

জমিদারগণকে এই প্রকার অবসর প্রদান করা হইলে গবর্ণমেণ্ট কৃষকদের নিকট হইতে পনর কোটী টাকা কর পাইবেন। শুধু ইহাই নহে, প্রজার স্বত্ব চিরকালের জন্য স্থায়ী ও নিরাপদ হইলে, তাহাদের জমি স্বাধীন ভাবে খরিদ বিক্রয় করিবার অধিকার সাব্যস্ত হইলে এবং তাহাদিগকে ম্যালেরিয়া ইত্যাদি ব্যাধি এবং গ্রাম্য মহাজনদের কবল হইতে রক্ষা করিবার ব্যবস্থা হইলে তাহারা শতকরা পঁচিশ হিসাবে বর্দ্ধিত খাজনা দিতেও আপত্তি করিবে না। এখনও জমিদারগণ শস্যের মূল্য বৃদ্ধির অজুহাতে আইনের বলে প্রজাদের করবৃদ্ধি করিয়া লইতেছেন। অনেক স্থানে টাকায় চারি আনার বেশী হারেও আদালত হইতে করবৃদ্ধির ডিক্রী হইতেছে। যখন প্রজাগণ বুঝিবে যে, জমিদার ও তাহার কর্ম্মচারীর ক্ষমতা হইতে তাহারা মুক্ত হইল, এবং সরকার বাহাদুর তাহাদিগকে ব্যাধি, দুর্ভিক্ষ ও মহাজনদের কবল হইতে উদ্ধার করিবার ব্যবস্থা করিতেছেন, তখন তাহারা প্রতি টাকায় চারি আনা বর্দ্ধিত খাজনা শুধু মাত্র কয়েক বৎসরের জন্য দিতে কিছুমাত্র আপত্তি করিবে না। আমার এই ব্যবস্থায় পনর বিশ বৎসর পরে প্রজার খাজনা ক্রমশঃ কম করিয়া দিবার সম্ভাবনা রহিয়াছে।

এখন হিসাব করিয়া দেখা যাউক, গবর্ণমেণ্ট কি প্রকারে এই ব্যবস্থা করিতে পারেন। জমিদারগণ অবসর প্রাপ্ত হইলে গবর্ণমেণ্ট এখনই পনর কোটী টাকা ভূমির কর পাইবেন। ইহার সঙ্গে শতকরা পঁচিশ হিসাবে বর্দ্ধিত কর যোগ দিলে ১৫+৩¾ = ১৮¾ কোটী টাকা গবর্ণমেণ্টের আয় হইবে। এই টাকা কি প্রকারে ব্যয় করা যাইতে পারে তাহার হিসাব নিয়ে দেওয়া গেল—

প্রজার নিকট হইতে বর্ত্তমান প্রাপ্ত খাজনা—

কোটী, ১৫, ০০,০০,০০০

টাকায় চার আনা হিসাবে বর্দ্ধিত খাজনা—

„ ৩,৭৫,০০,০০০

একুন „ ১৮,৭৫,০০,০০০

ইহা হইতে তহশীল খরচ (পরে লিখিত মত) বাদ দেওয়া হইল— ৭৫,০০,০০০

মোট উদ্বৃত্ত „ ১৮,০০,০০,০০০

ইহা হইতে পুনরায় বর্ত্তমান রাজস্ব তিন কোটী ও পথকর একক্কোটী একুন করিয়া চার কোটী বাদ দিলে—৪,০০,০০,০০০

বাকী থাকে কোটী ১৪,০০,০০,০০০

এই চোদ্দ কোটী টাকা ভাবী গবর্ণমেণ্টের উপরি পাওনা হইল। ইহা হইতে সাত কোটী টাকা জমিদারগণের বণ্ডের সুদ বাবদ প্রতি বৎসর দিয়াও সাত কোটী টাকা গবর্ণমেণ্টের হস্তে মজুত থাকিবে। এই বাকী সাতকোটী টাকা হইতে প্রতি বৎসর ৩ কোটী টাকা জমিদারগণের বণ্ডের আসল টাকা পরিশোধের জন্য চিহ্নিত করিয়া রাখিলে হিসাব করিয়া দেখা গিয়াছে, সুদ আসল ক্রমশঃ শোধ হইয়া বিশ একুশ বৎসরে সাড়ে এগার কোটী টাকা ঋণ সম্পূর্ণ পরিশোধ হইয়া যাইবে। এবং বিশ বৎসর পরে গবর্ণমেণ্ট কৃষকের করভার লঘু হইতে লঘুতর করিতে পারিবেন।

ঐ চোদ্দ কোটী টাকা হইতে বণ্ডের সুদ ও আসল আদায় জন্য দশ কোটী খরচ করিয়াও গবর্ণমেণ্টের হস্তে চার কোটি টাকা অবশিষ্ট থাকিবে। এই টাকা দ্বারা গবর্ণমেণ্ট তিনটি প্রধান সৎকার্য্য করিতে পারিবেন।

১। পশ্চিম-বঙ্গে ম্যালিরিয়ার প্রকোপ নিবারণ।

২। পূর্ব্ব-বঙ্গে কচুরি পানার উচ্ছেদ সাধন।

৩। গ্রাম্য মহাজনদের হস্ত হইতে কৃষককুলকে ঋণ মুক্ত করা।

এই শেষোক্ত কার্য্যের জন্য প্রতি বৎসর এক কোটী টাকা চিহ্নিত করিয়া রাখিলে আশা করা যায় কুড়ি পঁচিশ বৎসরে বঙ্গের কৃষককুল সম্পূর্ণ ঋণমুক্ত হইতে পারিবে। এই জন্য স্বতন্ত্র আইন করিয়া তাহাদিগকে রক্ষা করিতে হইবে. বাকী তিন কোটী টাকা প্রতি বৎসর ম্যালেরিয়া কচুরীপানার উচ্ছেদ সাধনে ব্যয় করিলে আশা করা যায় দশ বৎসরের মধ্যে বাংলা দেশ পুনরায় সত্যই সোনার বাংলায় পরিণত হইতে পারিবে।

আমাদের শিক্ষাপ্রাপ্ত যুবকদের অন্নসমস্যাও কঠিন সমস্যা হইয়া দাঁড়াইয়াছে। এই ব্যবস্থা কার্য্যে পরিণত হইলে বহু শিক্ষিত যুবকদেরও অন্নসংস্থানের উপায় হইতে পারিবে।

কি প্রকারে এই বিধান কার্য্যে পরিণত করা সহজ, এখন তাহারই আলোচনা করিতেছি। এই বিপুল ভূমিকর উশুল করিবার আয়োজনও বিপুল করিতে হইবে। সেই বন্দোবস্ত যত কম জটিল হয়, ততই মঙ্গল। আমার প্রস্তাব প্রত্যেক জিলাকে ১০০ বর্গ মাইল পরিমিত স্থান লইয়া অনেকগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কেন্দ্রে বিভক্ত করা যাইতে পারে। প্রতি কেন্দ্রে একজন এমন উপযুক্ত কর্ম্মচারী নিযুক্ত হইবেন, যিনি কৃষি, সাধারণের স্বাস্থ্য, আইন এবং ব্যাঙ্কিংএ শিক্ষাপ্রাপ্ত। বাংলা দেশে ৭৬,৮৪০ বর্গ মাইল স্থান সাতাশটি জিলায় বিভক্ত আছে। সুতরাং ঐ শ্রেণীর প্রায় আট শ'টি কেন্দ্রে দেশটিকে বিভক্ত করিতে হইবে এবং তজ্জন্য আট শ' কর্ম্মচারীর প্রয়োজন হইবে। আবার ঐ কর্ম্মচারীদের জন্য কেরানী, পিয়ন ইত্যাদিও চাই। ঐ কেন্দ্রীয় আফিসের খরচাদি এই ভাবে করা যাইতে পারে :—

প্রতি কেন্দ্রের জন্য

প্রধান কর্ম্মচারী	একজন	মাসিক বেতন ধরুন	১৫০৲
কেরানী	দুইজন	... ...	১০০৲
পিয়ন	চারজন	... ...	৬০৲
পথ খরচ ও অন্যান্য আপিস খরচ—		মাসিক	১৯০৲
		মোট মাসিক	৫০০৲

অতএব আট শ'টি কেন্দ্রের জন্য ৮০০ × ৫০০ = ৪০,০০০ চল্লিশ হাজার টাকা মাসে অথবা আটচল্লিশ লক্ষ, ধরুন পঞ্চাশ লক্ষ, টাকা প্রতি বৎসর খরচ হইবে। পূর্ব্বেই ভূমিকর আদায়ের তহশীল খরচ পঁচাত্তর লক্ষ টাকা দেখাইয়াছি। এই পঞ্চাশ লক্ষ টাকা বাদ দিলে বাকী পঁচিশ লক্ষ টাকা দ্বারা কৃষকদের জমির আবশ্যক মত সার্ভে ও তাহাদের জমাবন্দীর কাগজপত্র প্রয়োজন অনুসারে পরিবর্ত্তন করিয়া তাহাদের জমির পরিমাণ ও দেয় খাজনার নির্ভুল অঙ্ক প্রতি বৎসর নির্ণয় করিয়া রাখিবার কার্য্যে ব্যয় হইতে পারে।

এই ব্যবস্থা বিধিবদ্ধ হইলে জমিদারগণের অনেক কর্ম্মচারীর আয়ের সংস্থান লুপ্ত হইবে। তাহাদের মধ্যে যোগ্য লোকদিগকে গবর্ণমেণ্ট এই তহশীল কার্য্যে নিয়োগ করিতে পারিবেন।

এই আট শ' রাজস্ব বিভাগের কর্ম্মচারীর প্রধান কর্ত্তব্যের তালিকা নিম্নে দেওয়া গেল :—

১। ভূমিকর উশুল করা।

২। প্রতি কৃষকের জমি খরিদ বিক্রয় অথবা

উত্তরাধিকারী সূত্রে হস্তান্তর হইলে জমাবন্দীর বহি অনুরূপ সংশোধন করা।

৩। নামজারির দরখাস্ত শোনা এবং সীমা সরহদ্দ লইয়া বিবাদ হইলে তাহার মীমাংসা করা।

৪। কৃষকগণকে উন্নত প্রণালীতে কৃষিকার্য্য করিতে উৎসাহিত ও শিক্ষিত করা।

৫। পল্লী-ব্যাঙ্ক সমূহের কার্য্য পরিদর্শন।

৬। পল্লীর স্বাস্থ্য রক্ষার জন্য বিধিবদ্ধ প্রণালী অনুসারে কার্য্য করা।

আমার প্রস্তাবের স্থূল বিবরণ উপরে প্রদত্ত হইল। এই ব্যবস্থা প্রবর্ত্তিত হইলে কৃষক, জমিদার এবং গবর্ণমেণ্টের কি পরিমাণ সুবিধা হইবে, তাহারও একটু পরিচয় দেওয়া যাইতেছে :—

কৃষকের সুবিধা

১। জমির উপর তাহাদের অধিকার চিরস্থায়ী হইবে।

২। কর বৃদ্ধির আশঙ্কা দূর হইয়া বড় বড় করভার ক্রমশঃ লঘু হইতে লঘুতর হইবে।

৩। উৎপীড়ক জমিদার এবং তাহার কর্ম্মচারীর অশেষবিধ অত্যাচার ও উৎপীড়ন হইতে কৃষকগণ চিরকালের জন্য মুক্ত হইবে। (প্রত্যেক জমিদার উৎপীড়ক নহেন।)

৪। জমিদারের সঙ্গে কোনও মোকদ্দমা থাকিবে না।

৫। জমির স্বত্ব চিরস্থায়ী হওয়ায় এবং গবর্ণমেণ্টের চেষ্টায় কৃষিকার্য্যের উন্নতি সাধনের জন্য জমির মূল্য বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইবে।

৬। বিশেষ আইন দ্বারা কৃষকের ঋণ মোচনের ব্যবস্থা হইবে।

৭। ম্যালেরিয়া, কচুরিপানার উপদ্রব দূর হইলে কৃষকের নষ্ট স্বাস্থ্য ফিরিয়া আসিবে এবং স্বাধীনতার আস্বাদ পাইয়া কৃষককুল অধিকতর উদ্যমে ধনবৃদ্ধির জন্য পরিশ্রম করিতে প্রবৃত্ত হইবে।

৮। সর্ব্বশেষে তাহারা উপলব্ধি করিতে পারিবে যে তাহারাই দেশের প্রধান প্রকৃত অধিবাসী এবং দেশ প্রধানতঃ তাহাদেরই; তাহারাই রাষ্ট্রগঠনের ব্যয় বহন করিয়া দেশকে উন্নতির পথে অগ্রসর করিয়া দিয়াছে।

জমিদারশ্রেণীর সুবিধা

১। বিষয়সম্পত্তি রক্ষার ঝঞ্ঝাট হইতে চিরদিনের জন্য নিরুদ্বেগ হইয়া বৃত্তির টাকায় শান্তিতে থাকিতে পারিবেন।

২। মামলা মোকদ্দমা, দুর্ব্বৎসরের ভাবনা, কর্ম্মচারীদের অবহেলা অপহরণ, রাজস্ব আদায়ের দুশ্চিন্তা চিরকালের জন্য লোপ হইবে।

৩। জমিদারগণ এক সময় বহু অর্থ প্রাপ্ত হইয়া ভিন্ন উপায়ে অর্থ উপার্জ্জনের চেষ্টা করিতে পারিবেন। অবশ্য এই শ্রেণীর মধ্যে কেহ কেহ হয়ত এক সময় বহু টাকা পাইয়া বিলাসিতা ও অপকর্ম্মের মাত্রা বাড়াইয়া নিজেদের সর্ব্বনাশের রাস্তা সুগম করিয়া তুলিবেন। এই শ্রেণীর লোকদের কেহই রক্ষা করিতে বাধ্য নহে। কিন্তু বুদ্ধিমান উদ্যমশীল জমিদারগণ ঐ টাকা কোনও অর্থকর ব্যবসায়ে বা শিল্প-কার্য্যে খাটাইয়া নিজেদের অধিকতর আয়ের উপায় করিতে পারিবেন এবং সঙ্গে সঙ্গে অন্য বহুলোকও উহার মধ্য দিয়া নিজেদের অন্ন সংস্থান করিয়া লইতে পারিবে। ফলে, দেশ ক্রমশঃ ধনশালী হইয়া উঠিবে।

৪। তাঁহাদের এই ত্যাগের মহিমায় দেশের প্রকৃত কল্যাণ সাধিত হইতেছে এই অনুভূতি তাঁহাদিগকে আরও কল্যাণকর কার্য্যে প্রবৃত্ত হইতে উৎসাহিত করিবে।

গবর্ণমেণ্টের সুবিধা

১। রাষ্ট্রশাসনের কার্য্য অধিকতর সরল হইয়া যাইবে। বর্ত্তমানে ভূমিরাজস্ব সম্পর্কিত অনেক বিভাগ ও আফিস রহিয়াছে। তাহার আর প্রয়োজন থাকিবে না।

২। বিচার বিভাগের ভার লঘু হইবে। ভূমিসংক্রান্ত মামলা মোকদ্দমার সংখ্যা বহুপরিমাণে হ্রাস প্রাপ্ত হইবে।

৩। রাজকোষের আয় বৃদ্ধি হইবে। যদিও মোকদ্দমাদির সংখ্যা হ্রাসের দরুন ষ্ট্যাম্প ও রেজিষ্ট্রি বিভাগের আয় কিয়ৎপরিমাণে কমিয়া যাইবে, তথাপি কালক্রমে ভূমির করের আয় দ্বারা সে ক্ষতি পূরণ হইয়া রাজস্বের পরিমাণ বেশীই থাকিবে।

অবশেষে কৃষককুলের ঋণভারের কথা আলোচনা করা যাউক। বাংলার কৃষককুল ঋণভারে জর্জ্জরিত হইয়া অতিশয় দুর্দ্দশায় দিনপাত করিতেছে, সকলেই একথা জানেন। অনেকের

জমি মহাজনের কর্জের দায়ে আবদ্ধ আছে। তৈরী ফসল কৃষকের চক্ষের সম্মুখে অনেক স্থানে মহাজনের ঘরে চলিয়া যায়। মহাজনের ডিক্রীতে অনেক কৃষকের জমি বিক্রয় হইয়া গিয়াছে ও এখনও যাইতেছে। গবর্ণমেণ্ট এই দুর্দ্দশার কথা অবগত আছেন, কিন্তু অর্থাভাবে উল্লেখযোগ্য কোনও ব্যবস্থাই করিতে পারেন নাই। কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্ক স্থাপনে কোনও সুফলই হয় নাই। সুদের হার ঐ ব্যাঙ্কেও শতকরা বারো টাকা। সুতরাং ইহা দ্বারা দরিদ্র কৃষকের নিজেদের ঋণ ভার লাঘব হওয়া দূরে থাকুক, আর একটি নূতন মহাজনের উদ্ভব হইয়াছে।

এই বিরাট ব্যাপারের জন্য বিশেষ আইনের প্রয়োজন। বার্ষিক সুদের হার ছয় টাকার অধিক হইতে দেওয়া চলিবে না। কৃষকের জমি বহু বৎসরের জন্য বন্ধক রাখা আইনের বলে নিবারিত করিতে হইবে। বর্ত্তমান মহাজনগণের প্রাপ্য টাকা সহজ কিস্তিবন্দী মত ঐ ছয় টাকা সুদে পরিশোধ করিবার ব্যবস্থা করিতে হইবে। এই পরিশোধের দায়িত্ব গবর্ণমেণ্ট নূতন আইনের বলে নিজ হস্তে গ্রহণ করিবেন এবং কৃষকের আর্থিক অবস্থা বিচার করিয়া গবর্ণমেণ্ট কিস্তিবন্দীর অঙ্ক এবং সময় নির্দ্ধারণ করিবেন। আবশ্যক হইলে অর্থ-সাহায্যও করিতে হইবে।

যতদিন না কৃষককুল গ্রাম্য মহাজন ও করগৃহীতা জমিদারের প্রভাব হইতে মুক্ত হয়, ততদিন আমরা স্বরাজ লাভ করিলেও তাহাদের নিকট ঐ স্বরাজের কোন মূল্যই থাকিবে না।

বকের বন্ধু পানকৌড়ি

শ্রীসুনীলচন্দ্র সরকার

একান্ত বুনো সুন্দরবনের কিছু কিছু অংশের ওপর ক্ষৌরকার্য্য ক'রে সেগুলোকে সভ্যশ্রেণীভুক্ত ক'রে নেওয়া হয়েছে—এবং সেগুলো যে আর নিজের খেয়ালে গজানো অনাবাদী গাছের জঙ্গল নয়, এইটে বোঝাবার জন্যে সেগুলোর নাম দেওয়া হয়েছে 'আবাদ'।

কঙ্কনদীঘির বাঁকের কাছে এইরকম খানিকটা বনমুক্ত জমির মালিক হচ্ছে শ্রীভূপেন্দ্রনাথ বসু। বয়স সাতাশ আটাশ হবে, উত্তরাধিকারসূত্রে জমিদার, পয়সাকড়ি আছে। সবল সুস্থ চেহারা, চওড়া প্রসন্ন মুখ। খেলাধুলোয় ওস্তাদ, শিকারে বেশ হাত আছে, উচ্চৈঃস্বরে হাসে এবং কেউ কিছু বোকামি বা অন্যায় ক'রে ফেল্‌লে না রেগে বেশ স্মিতমধুর দৃষ্টিতে তার দিকে চায়।

শরৎকালের শেষ। ধানকাটা শেষ হয়ে গেছে, নৌকো বোঝাই দিতে পারলেই হয়। সেইজন্যেই ভূপেন সদলবলে আবাদে তার কাছারি-বাড়িটায় এসে উঠেছে। চাকরবাকর কর্মচারী প্রভৃতি ছাড়া একজন বন্ধুও সঙ্গে আছে—শচীন্দ্র সিংহ। ভূপেনের সহপাঠী ছিল, এখন তার আশ্রয়েই আছে; কিন্তু দু-জনের কেউই কথাটা স্বীকার করে না। ভূপেন এমন ভাব দেখায় যেন শচীন দয়া করেই তার বাড়িতে থাকতে সম্মত হয়েছে, আর শচীন প্রায়ই কথায় কথায় বলে যে সে শিগ্‌গীরই চলে যাবে—কিন্তু যায় না। গরিব ব'লেই শচীনের আত্মসম্মানজ্ঞানটা কিছু বেশী—উপকার স্বীকার করবার মত উদারতা তার নেই। এধারে লোকটা মন্দ নয়, কিন্তু হঠাৎ যদি তার সেণ্টিমেণ্টে ঘা লাগে তাহলে তাকে সামলানো মুস্কিল!

খড়ের চাল দেওয়া একখানি মাত্র মেটে ঘর এবং তার সাম্‌নে একটুখানি দাওয়া। কাছারি-ঘরের চারধার ঘিরে একটা মেটে দেওয়াল ছিল, কিন্তু গেল-বর্ষায় পড়ে গিয়েছে—কতকগুলো অসমান মাটির ঢিবি এখনও তার সাক্ষ্য দিচ্ছে। কাজেই ওই দাওয়ায় বসে যতদূর ইচ্ছে দৃষ্টি মেলে দেওয়া যায়!...মাঠের পর মাঠ, মাঝে মাঝে নারকেল কলাগাছে ঘেরা চাষীদের কুঁড়ে ঘর...আবার মাঠ...সাপের মত আঁকাবাঁকা আল আর টুক্‌রো

টুকরো আলোর চক্‌চকে জল...আর সকলের শেষে চন্দনপিড়ির খালের ওপারে সুন্দরবনের কালো রেখা—উদার বিস্তৃত [illegible] মধ্যে একটুখানি তীক্ষ্ণ ভয়ের আভাসের মত।

[illegible] তখন সাড়ে ন'টা হবেই। বেশ রোদ উঠে গিয়েছে। কিন্তু ভূপেনের মনে বেলা হয়ে যাওয়ার তাড়া যেন কিছুতেই লাগছে না। এই দিগন্ত-বিস্তৃত মাঠের ওপর রোদটা এমন-ভাবে ছড়িয়ে পড়ে যে, শুধু চোখে দেখে তার প্রখরতা অনুভব করা যায় না। অবশ্য কিছুকাল ধ'রে মাথায় এবং পিঠে সেবন করলে তার উগ্রতা সম্বন্ধে আর বিন্দুমাত্র সন্দেহ থাকে না। কিন্তু ভূপেনের এখনও সে সৌভাগ্য হয়নি। এই আধঘণ্টা হ'ল সে উঠেছে। খড়ের ছাউনির তলায় দাওয়ার ওপর একটা মাদুর পেতে সে সবান্ধবে উপবিষ্ট।

অন্যায়-রকম সকালে ওঠা শচীনের একটা বদ অভ্যাস। সে একটু ঠাট্টার সুরেই বললে—ওহে ভূপেন, এর মধ্যে উঠে পড়লে? সূর্য্য সবে আকাশের এক-চতুর্থাংশ অতিক্রম করেছেন। শুয়ে পড়, শুয়ে পড়—ওরে গঙ্গাধর, বাবুর তাকিয়াটা এগিয়ে দে, শেষকালে একটা অসুখ-বিসুখ ক'রে বসবে?

অলস ভাবে এক মুখ চুরুটের ধোঁয়া ছেড়ে ভূপেন হাসি-মুখে বললে—চিরকালটা তোমার একই রকম রয়ে গেল। ঐ যে ছেলেবেলায় কর্ণমর্দ্দনের সঙ্গে সঙ্গে প্রাতরুত্থানের উপদেশটুকু গলাধঃকরণ করেছিলে, এই বুড়ো বয়স পর্য্যন্ত তার প্রভাব কাটাতে পারলে না। বলি, আইনষ্টাইনের রিলেটিভিটির থিওরিটা কিছু জানা আছে কি? আরে মূর্খ, তোমার শহুরে ঘড়ি এই সুন্দরবনের বুনো সময়ের মানে কি? এক্ষেত্রে নির্ভয়ে তাকে উপেক্ষা করো।

—তাকে উপেক্ষা না হয় তোমার খাতিরে করতেও পারি, কিন্তু উদরের মধ্যে যে নির্ভুল ঘড়িটি ক্ষুধার ঘণ্টা বাজাচ্ছেন, তাকে ত উপেক্ষা করা সম্ভব নয়। বোধ হয় এক যুগ হ'ল উঠে ব'সে আছি, জমিদার-বাবুর আর ওঠবার নামই নেই। অথচ জমিদার-বাবু না উঠলে ক্ষুধা-শান্তির কোনো সম্ভাবনা নেই।

ভূপেন ব্যস্ত হয়ে বললে—সে কি কথা! ওরে গঙ্গাধর, [illegible] আনে বা। বেটাচ্ছেলে, বাবু এতক্ষণ হ'ল উঠেছেন, [illegible] জন্যে জিজ্ঞাসা করিস্ নি কেন?

গঙ্গাধর অতিশয় বিনীত ভাবে হাতজোড় ক'রে বললে—আজ্ঞে বাবু, ওঁর খিদে পেয়েছেন কি ক'রে বুঝবো বলুন। আমরা মুরুখ্যু মানুষ, আমাদের তো এই পিত্তায় হয় যে বন্ধুমানুষ—একসঙ্গে খাবে...

ভূপেন প্রচণ্ড ধমক দিয়ে উঠল—হারামজাদা, জিগ্যেস্ করতে পারিস্ নি, বাবুর কোনো দরকার আছে কি না?

শচীন বাধা দিলে—থাক্ থাক্, ধমক দিতে গিয়ে আরও খানিকটা সময় নষ্ট করো না, বরং তাড়াতাড়ি কিছু আনতে হুকুম করো।

আবাদের মত জ'লো জায়গায় তেলমাখানো মুড়ি এবং তার সঙ্গে ঝাল দিয়ে ভাজা ডিমের মাম্‌লেট ভালই লাগে। এবং তারপর যদি কল্‌কাতা থেকে এক-শ মাইল দূরবর্ত্তী এই বুনো জায়গায় এক কাপ সুগন্ধ দার্জ্জিলিং চা পাওয়া যায়, তাহলে অতিশয় অলস লোকেরও হঠাৎ উৎসাহ বোধ হবার কথা। ভূপেন তার দরোয়ান রামসিংহকে এক ডাক দিলে—এ রামসিং! বন্দুক নিকালো।

বন্দুক বার ক'রে দেখা গেল, কার্ত্তুজের বাক্স খালি! গোটাকতক 'এল্-জি' 'এস্-জি' আর 'রোট্যাক্স' পড়ে আছে, যা দিয়ে পাখী মারতে যাওয়া পাগলামি। ভূপেন ভয়ানক রেগে উঠল, রামসিংকে গালাগাল করতে লাগল—কেন সে সব গুলিগুলো খরচ ক'রে রেখে দিয়েছে। তারপরেই হঠাৎ হেসে উঠল, বললে—কুছ্ পরোয়া নেই—এই রোট্যাক্সেই কাঁক শিকার করব। মাংস পাওয়া যাক্ আর নাই যাক্, শিকার তো হবে। ওহে শচীন, আস্‌বে নাকি?

শচীন হেসে বললে—তোমার সঙ্গে দিগ্বিজয়ে বেরুতে আমার আপত্তি নেই। কিন্তু রোদ্দুরটা খুব মনোরম বোধ হবে না, তা আগে থাক্‌তেই ব'লে দিচ্ছি।

দুই বন্ধুতে চন্দনপিড়ি খালের দিকে রওনা হ'ল। সঙ্গে রইল রামসিং। আলের উঁচু উঁচু শক্ত মাটির ঢিপির ওপর দিয়ে চলা মহা বিরক্তিকর। মাঝে মাঝে আবার চুড়ো ক'রে আলের ওপর নূতন মাটি দেওয়া হয়েছে; সার্কাসে যারা দড়ির ওপর দিয়ে চলে তারা ছাড়া সে পথ দিয়ে আর কারুর চলা অসম্ভব। কাজেই মাঠ ভাঙতে হয়, অথচ নাড়াগুলো পায়ে বেঁধে, হঠাৎ থেকে থেকে কাদায় মধ্যে পা ডুবে যায়। খালের কাছাকাছি নীচু বুনো গাছের অজস্র

একটু একটু ক'রে ক্রমশঃ ঘন হয়ে উঠেছে। সেই বিচ্ছিন্ন জনগুলো এড়িয়ে ওরা খালের বাঁধের ওপর উঠল। তারপর বাঁধ ধরে সোজা দক্ষিণ দিকে চল্‌তে লাগল। খালটা যেখানে হঠাৎ বেঁকেছে সেখান পর্য্যন্ত কাছারি-বাড়ির দাওয়া থেকে গদাধর তাদের অস্পষ্ট মূর্ত্তি দেখতে পেল। তারপর আর তাদের দেখা গেল না। গদাধর তখন নিশ্চিন্ত মনে বাবুর বাক্স থেকে চুরি-করা চুরোটটা ধরিয়ে ফেল্‌লে।

বেলা প্রায় বারটার সময় খালি হাতে, কাদ মাখা পায়ে, রুক্ষ চুল এবং আরক্ত মুখে শিকারীর দল ফিরে এলে। ভূপেনের মুখের ভাব দেখে কর্ম্মচারীরা তার কাছে যেযতে ভরসা পেল না। বন্দুকটাকে দেওয়ালের গায়ে হেলিয়ে রেখে ভূপেন সেই কাদামাখা পায়েই মাদুরের ওপর বসে পড়ল। শচীন্ একটা জলচৌকিতে বসে বাল্‌তির জলে পায়ের কাদা পরিষ্কার করতে করতে খোঁচা দিয়ে বল্‌লে—ওহে, ওরা উনুনে কড়া চাপিয়ে রেখেছে—শিকারের থলিটা দিয়ে কারি রাঁধবার হুকুম দাও—

শিকার দেখতে পাওয়া যায় নি এমন নয়—কিন্তু বরাত দোষেই হোক আর কার্ত্তুজের দোষেই হোক—একটা পাখীও পাওয়া যায়নি। তাই ভূপেনের মন যথেষ্ট খারাপ হয়ে রয়েছে। তার ওপর এই ঠাট্টা তার সইল না। একটু কঠিন সুরেই ইংরিজি ক'রে যা বললে, তার অর্থ হচ্ছে—দ্যাখ, আড়ালে যা বল বল, কর্ম্মচারীদের সামনে এ ভাবে আমাকে নীচু ক'রো না। এ-কথা তুমিও জান যে শিকার না পাওয়া আমার দোষ নয়—

ভূপেন খুব 'সিরিয়াস্‌লি' কথাটা বললে, কিন্তু শচীন কথাটার গুরুত্ব না বুঝে হেসে উঠল। ইংরিজিতে বল্‌লে—সত্যি কথা বললে যদি তোমায় নীচু করা হয় তাহলে অবশ্যই আমার দোষ হয়েছে। তবে একথা ঠিক, এরকম রোদে সেদ্ধ হয়ে বুনো হাঁসের পেছনে দৌড়তে আর আমি প্রস্তুত নই।

ভূপেন সাধারণতঃ গুরুতর ভাবে রাগে না। যখন রাগে একেবারে নীরব হয়ে যায়। শচীনের কথার উত্তর দেবার কোনও চেষ্টা না ক'রে সে তাকিয়ায় ঠেস্ দিয়ে চুপ ক'রে রইল। গদাধর ভয়ে ভয়ে জিজ্ঞাসা করলে—বাবু, একটা চুরোট দেব?

ভূপেন মাথা নেড়ে জানালেন—না।

নেপথ্যে চাকর-মহলে ফিস্‌ফিস্ শব্দে বেশ একটু উত্তেজনা সৃষ্টি হ'ল। এদিকে বেলা বেড়ে যাচ্ছে—রাঁধা আ তরকারি ক্রমশই অখাদ্য হয়ে উঠছে, অথচ কার ঘাড়ে ওপর দুটো মাথা আছে যে বাবুকে সে-কথা বলতে যায় এর পরে যখন খেতে বসবেন তখন ত আর নিজের দো দেখবেন না—বামুনকেই গালাগাল করেন।

আদ্যনাথ কর্ম্মচারী তোবড়ান গাল আরও তুবড়ে ফিস্‌ফি করে বললে—ব্যাপারটা কি? শিকার না পেয়ে তো আর অনেক দিন ফিরেছেন, কিন্তু এমন—

গদাধর ফিস্‌ফিস্ ক'রে যতটা তীব্র ভাবে সম্ভব বললে—আরে, ব্যাপার যা কিছু ঘটিয়েচে ঐ চিম্‌সে লোকটা। পরের ভাতে আছে অথচ তেজ দেখেচ ত?

চিম্‌সে লোকটা যে শচীন একথা উপস্থিত সকলেই বুঝতে পারলে।

আদ্যনাথ চিন্তান্বিত মুখে বললে—রামসিংটাই বা গেল কোথায়? সে থাকলেও নয় ব্যাপারটা কি বোঝা যেত।

শচীনও ইতিমধ্যে গম্ভীর হয়ে উঠেছে। হাতে একখানা ইংরিজি নভেল নিয়ে বসেছে—পড়ছে কিনা বোঝা যাচ্ছে না।

বাইরে ঐ মাঠে-ফাটল-ধরান রোদের মত এদের নীরবতা রুক্ষ এবং অসহ্য হয়ে উঠল। মনে হ'ল যেন এদের মনগুলোর চার ধারে ফাটল ধরতে সুরু হয়েছে।

এমন সময় দৌড়তে দৌড়তে রামসিং-এর প্রবেশ। হাঁপাতে হাঁপাতে সে খবর দিলে যে অতি কাছেই খালধারে দুটো পাখী এসে বসেছে। কিন্তু এ খবরে ভূপেনের বিশে উৎসাহ দেখা গেল না। শচীন মুখ না তুলেই একটু মুচকি হাসি হাসলে, ভাবটা এই যে, এদের পাগলামি আবার সুরু হ'ল!

সে হাসি ভূপেনের চোখ এড়াল না। কাজেই সে বন্দুক নিয়ে উঠল। বেশী দূর যেতে হ'ল না—সামনের আলের ওপর উঠতেই পাখী দুটোকে দেখা গেল। খালের ধারে লম্বা লম্বা ঘাসের মধ্যে একটা বক নিঝুম হয়ে ব'সে রয়েছে—আর ঠিক তার সামনেই একটা পানকৌড়ি অনবরত জলের ভেতর ডুব দিচ্ছে। আর সামান্য কয় প এগিয়ে গেলে ঐ ঝোপটার আড়ালে ব'সে বেশ 'কভার' নেওয়া

[illegible]। ভূপেন সন্তর্পণে ঘাড় নীচু ক'রে সেই দিকে এগিয়ে [illegible]। এবার আর ফস্কালে চলবে না। পানকৌড়িটা এত কাছে এসেছে যে ঢিল ছুঁড়ে মারা যায়।

পানকৌড়িটা ডুব দিয়েছে—না, ঐ যে আবার ভেসে উঠেছে! ডাঙার দিকে যাচ্ছে, বকটা বসে আছে।...এই ঠিক সময়—দুটোকে একসঙ্গে। মুহূর্তের মধ্যে ভূপেন লক্ষ্য ঠিক ক'রে নিলে; রামসিং একদৌড়ে পাখীগুলো আনবার জন্যে প্রস্তুত।...কিন্তু একি!...হঠাৎ বন্দুক নামিয়ে নিয়ে ভূপেন স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে রইল, এবং কিছুক্ষণ পরে ফিরে এসে আলের ওপর দাঁড়াল।

রামসিং উৎকণ্ঠিত হয়ে জানালে—ওখানে দাঁড়াবেন না বাবু, পাখীদুটো ভাগবে। কিন্তু সে-কথা ভূপেনের কানেই গেল না।

তখন সে এক অদ্ভুত ব্যাপার দেখছে। পানকৌড়িটা জলে ডুবে মাছ ধরে নিজে খাচ্ছে না—ঠোঁটে চেপে বকটার কাছে নিয়ে যাচ্ছে। বকটা কপ কপ করে ঠোঁট নেড়ে মাছটা গিলে ফেলে আবার অতি শান্তভাবে অপেক্ষা করছে। মাঝে মাঝে যখন এক একটা মাছ পানকৌড়িটা নিজে খাচ্ছে তখন বকটা ঘাড় বাঁকিয়ে তার দিকে চাইছে—ভাবটা, বটে, নিজে খাওয়া হচ্ছে? আমার ভাগ কই? তাই দেখে পানকৌড়িটা তৎক্ষণাৎ তাকে আর একটা মাছ এনে দিচ্ছে।

নিজের চোখে না দেখলে ভূপেন বিশ্বাসই করত না। কিন্তু এ প্রত্যক্ষ সত্য।

আস্তে আস্তে শচীন ভূপেনের পাশে এসে দাঁড়াল। তাকে ডাকলে সে নিশ্চয়ই আসত না, বিদ্রূপই করত, কিন্তু ভূপেনের অদ্ভুত একাগ্র ভঙ্গী তাকে যেন জোর ক'রে উঠিয়ে আনলে। মৃদুস্বরে জিজ্ঞাসা করলে—ব্যাপার কি? তারপর ভূপেনের দৃষ্টি অনুসরণ ক'রে নিজেই দেখতে পেলে।

দুই বন্ধু খানিকক্ষণ স্তব্ধ হয়ে দেখতে লাগল। তারপর শচীন হঠাৎ উচ্চৈঃস্বরে হেসে উঠল। ভূপেন কারণ বুঝতে না পেরে সপ্রশ্নদৃষ্টিতে চাইল। শচীনের প্রাণ-খোলা হাসি [illegible] অজানতে তারও ঠোঁটে স্মিতহাসির রেখা দেখা দিল। [illegible] [illegible] এ [illegible] বললে—হেসে পাখীদুটোকে উড়িয়ে দিলে তো?

শচীন তার হাত ধরে ঝাঁকানি দিতে দিতে বললে—তুচ্ছ পরোয়া নেই। এখন যদি পাখীদুটো মরেও যায়, দুঃখ করবার কিছু নেই—ওরা স্বর্গে যাবে। পৃথিবীর ইতিহাসে যে-সব পশুপক্ষী মানুষের ভাগ্য নিয়ন্ত্রিত করেছে তার মধ্যে তোমার পানকৌড়ির স্থান তৃতীয়। প্রথম হচ্ছে, [illegible] ব্রুসের বন্ধু সেই মাকড়সা—দ্বিতীয়, এনসিয়েন্ট ম্যারিনারের এ্যালবেট্রেস্, আর তারপর তোমার এই পানকৌড়ি!

ভূপেন হেসে বললে—কিন্তু ভাগ্য-নিয়ন্ত্রণটা কি করলে?

শচীনের খুশীর আতিশয্য ক্রমশঃ নাটকীয় হয়ে উঠল। বললে—ওরা প্রমাণ করলে, সখ্যের যে মন্ত্রটি আমরা বাক্সর্বস্ব মানুষের দল তুলতে বসেচি, সেটা ওরা জানে। ফাঁকা কথার ওপর আমরা আকাশস্পর্শী সখ্যের ইমারৎ গড়ে তুলি, তাই মৃদু নিঃশ্বাসেও তা ভেঙে পড়ে। ওদের বন্ধুত্বের ভিত্তি হচ্ছে পারস্পরিক সাহায্য, নীরব প্রশ্নহীন আত্মত্যাগ। তাই অবলীলাক্রমে জীবনের শেষদিন পর্যন্ত ওরা বন্ধুই থেকে যাবে।

'পারস্পরিক' কথাটায় ভূপেনের আপত্তি ছিল, কিন্তু উল্লেখ করলে না। শচীনের হাতটা নিয়ে অল্প চাপ দিলে মাত্র।

এই ব্যাপারটা যে ওদের মনে খুব তীব্র হয়ে জেগে রইল এ-কথা বললে ভুল বলা হবে। কিন্তু এর পর দু-তিন দিন পর্যন্ত ওরা বন্ধুত্বের মধ্যে যেন একটা নূতন স্বাদ পেল। দু-জনেই পরস্পরকে খুশী করবার জন্যে সচেষ্ট রইল এবং চেষ্টা ক'রে লাভ করার মধ্যে যে একটা তৃপ্তি আছে তারই অনুভূতি ওদের খুশী ক'রে রাখলে। শচীনের মন থেকে আত্মাভিমান অনেক পরিমাণে পরিষ্কার হয়ে এল; বন্ধুর কাছে গ্রহণে অগৌরব নেই এবং দেওয়ার সময় তারও একদিন আসবে—এই কথা ভেবে সে মনে মনে বেশ স্বস্থ বোধ করলে। ভূপেন অনুতপ্ত হয়ে ভাবলে—বাস্তবিক, আমার মন মোটেই উদার নয়। ঋণস্বীকার ও যদি না-ই করে, তাতে আমার ক্ষুণ্ণ হবার কারণ কি? আমি কি কৃতজ্ঞতার লোভে ওকে সাহায্য করছি—না, বন্ধুত্বের জন্যে?

দূর বহুদূর পর্যন্ত মাঠ——শুধু মাঠ; বন্ধুর দুর্গম। আকাশ-প্রান্তে ঘোটা ক'রে কালো বনের দাগ টানা—তার এধারে এই বিস্তীর্ণ প্রান্তরগুলোর মধ্যে আর কোনো বড় গাছ নেই, শুধু আছে মাটির সঙ্গে মিশে থাকা বুনো গাছের ঝোপঝাড়। মাঝে মাঝে কচিৎ এক-আধটা শ্রীহীন তাল নারকেল বা বাবলা

গাছ অনাহারভাবে দাঁড়িয়ে আছে। ঐ ঝোপের সবুজ রেখা দেখে অনুমান করা যায় কোথায় কোথায় সুঁড়ি-খাল আছে। পথ চল্‌তে হ'লে এই খালগুলো এড়িয়ে চল্‌তে হয়, নইলে জলে নাম্‌তে হবে। নোনা জল, নোনা হাওয়া—মসৃণ কাচের ওপর নিঃশ্বাস ফেল্‌লে যেমন ঝাপ্‌সা হয়ে যায়, আকাশ সেইরকম ঝাপসা। আলস্য এখানে অবান্তর, অসুখের পূর্ব্বলক্ষণ। এখানে কেবল এক রকমের জীবন সম্ভব—কষ্টের জীবন, পরিশ্রমের জীবন। শরীর এবং মস্তিষ্ক চালনা করা চাই, নইলে নোনাধরা মাটির মত নিস্তেজ, বিস্বাদ, ঝুরঝুরে হয়ে আসবে।

সর্ব্বদা এই সজাগ কর্ম্মঠ থাকার চেষ্টার মধ্যে দিয়ে দুই বন্ধু বুঝতে পারলে সহযোগিতার দাম। শহরের আরামের গণ্ডীর মধ্যে থেকে একথা মনেই হয় না যে বন্ধুত্ব হীরের মত—কিংবা তার চেয়েও দুর্লভ এবং মূল্যবান্ সামগ্রী। কিন্তু এখানে এই যে পাশে চল্‌বার, কথা কইবার এবং মনোযোগ দেবার মত একজন বুদ্ধিমান্ সহৃদয় লোক পাওয়া গেছে এটা যেন একটা স্মরণীয় ব্যাপার, আদরের গৌরবের জিনিষ! এর মূল্য ভূপেন আর শচীন দু-জনেই উপলব্ধি করলে। ভোরবেলা ওই দূর মাঠের পথে উধাও হয়ে যাওয়া—সারা দুপুর ধরে তন্দ্রাজড়ান হাস্যরস কৌতুক-গুঞ্জন, সন্ধ্যার অন্ধকারে বাসার অতি কাছেই পথ হারানোর রোমাঞ্চকর অনুভূতি, রাত্রে পরস্পর কাছে থাকার প্রসন্ন নিরুদ্বেগ,—এর মধ্যে থেকে মাঝে মাঝে ওদের মনে হঠাৎ এই কথা জেগেছে—যদি ও না থাকৃত ?

এ-কথা ভেবে দু-জনের বেশ কৌতুক বোধ হত যে, তাদের এই বন্ধুত্বের পুনরুজ্জীবনের মূলে আছে দুটো নির্ব্বোধ পাখী! শুধু সেই একদিন নয়। প্রতিদিন কাছারি-বাড়ির সাম্‌নের পুকুরটায় নাইতে যাবার সময় ওরা পাখী-দুটোকে দেখতে পায়। ঠিক সাড়ে এগারটা বারটা আন্দাজ বেলায় বকটা সাঁ সাঁ ক'রে শাদা ডানা মেলে উড়ে এসে সেই খালটার পাড়ে বসবে এবং খানিকক্ষণ নিশ্চিন্ত স্থির হয়ে বসে থাক্‌বার পর একটু চঞ্চল এবং বোধ হয় বিরক্তভাবে ঘাড় ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে চারদিক চাইতে সুরু করবে। ভাবটা এই—ধুৎ, পানকৌড়ি-বন্ধুর তো এখনও দেখা নেই। ছোঁড়ার আর সব ভাল, শুধু ঐ এক দোষ—'অ্যাপয়েন্টমেন্ট' রাখতে পারে না!—এর পর হঠাৎ চক্ষের পলকে কোথা থেকে পানকৌড়িটা এসে জলে ঝাঁপিয়ে পড়বে এবং একোত্তমনে ব্যস্তভাবে জলে ডুব দেওয়া সুরু ক'রে দেবে।

শচীন মাঝে মাঝে রেগে ওঠে—নাঃ, ঐ বক-বেটাকে 'শুট্' করলে তবে রাগ যায়। বেটা শুধু বসে বসে গিল্‌বেন—যেন পানকৌড়িটা ওর মাইনে-করা চাকর! আবার মাছ দিতে একবার ভুলে গেলেই তেজ আছে! আর ঐ পানকৌড়িটা যে কি বোকা! কেন যে মূর্খ স্বার্থপর বকটার জন্যে এত ক'রে মরে!

ভূপেন এ আলোচনাকে বিপজ্জনক ব'লে মনে করে। এই থেকে কি কথা উঠে পড়বে কে জানে? হাসি দিয়ে কথাটাকে চাপা দেয়।

ক্রমশঃ কঙ্কনদীঘি ছেড়ে বাড়ি যাবার সময় নিকট হয়ে এল। ধানঝাড়া হয়ে গেছে। পরিষ্কার তক্‌তকে ক'রে নিকানো খামারে রাশি রাশি যেন সোনার স্তূপ জড়ো করা হয়েছে। হাজারমণি নৌকোর সন্ধানে লোক গেছে নামখানায়—কাকদ্বীপে। ধানের হিসেব শচীনের নখাগ্রে রয়েছে। প্রথমবার ঝাড়ায় কত ধান হয়েছে এবং গোমস্তা আশুনাথের জুচ্চুরি শচীন ধরে ফেলায় দ্বিতীয়বার ঝাড়ানোর ফলে কত হ'ল—তারই একটা মোট হিসেব করতে এবং চাষীগুলোকে ধমক-ধামক দিয়ে বিকেলটা মহা ব্যস্ততার মধ্যে কেটেছে।

সন্ধ্যেবেলায় কাজ-শেষের স্বস্তিটুকু ভাল ক'রে উপভোগ কর্‌বার জন্যে দুই বন্ধু আলের পথে বেড়াতে বেরুল। দু-এক দিনের মধ্যেই চলে যাবে তাই এই বুনো অদ্ভুত জায়গাটাকে যেন একটু বেশী ভাল লাগছিল। চন্দ্রপিড়ি খালের ধার দিয়ে বাসার দিকে উড়ন্ত ঝাক ঝাঁক কাঁক বক মাণিকজোড় দেখতে দেখতে, গরাণ গাছের কালো সবুজ ডালে ডালে বিচিত্র বন-শালিখের বাক্‌চাতুরী শুন্‌তে শুন্‌তে ওরা বহুদূর চলে যেত। কিন্তু হঠাৎ বাঁ-পাশের বন ঝোপটার মধ্যে কি একটা নড়ে উঠল এবং পরক্ষণেই দেখা গেল তাদের ঠিক সাম্‌নে দিয়ে একটা বরা পথ পার হয়ে মাঠের দিকে চলে গেল। রীতিমত ভয় পাবার কথা। ঐ একরোখা জন্তুগুলোকে বিশ্বাস নেই। কাজেই যথাসম্ভব ক্ষিপ্রপদে ফিরতে হ'ল।

ফেরবার পথের একমাত্র নির্দ্দেশ তাদের কাছারি-বাড়ির

আলো। এই বাঁধ ধ'রে চল্‌তে চল্‌তে হঠাৎ যেই বাঁ-ধারে আধ মাইল-টাক্ দূরে দু-তিনটে লণ্ঠনের আলো দেখা যাবে অম্‌নি মাঠের মধ্যে নেমে পড়তে হবে। তারপর টর্চ্চের সাহায্যে যতদূর সম্ভব কাদা এবং গর্ত্ত বাঁচিয়ে চল্‌তে হবে। শচীনের হঠাৎ কি খেয়াল হ'ল, বল্‌লে—আলো জ্বালিও না। এই অন্ধকারেই চলা যাক্। মাঝে মাঝে তোমার ঐ টর্চ্চের আলোর চেয়ে আবছা তারার আলো ঢের ভাল—

ভূপেন হেসে বল্‌লে—আর যদি বরার গায়ের ওপর পা তুলে দাও—

শচীন জিভ দিয়ে একটা শব্দ ক'রে বল্‌লে—সামান্য বরার ভয়ে এমন রোমান্সটা মাটি করবে?

তার পিঠে দু-একটা চাপড় মেরে ভূপেন বল্‌লে—ভাল, ভাল। তোমারও তাহলে রোমান্সের সখ হয়েচে? এ কিন্তু আমার সঙ্গে থাকার ফল—এ তোমাকে স্বীকার করতেই হবে। আমাকে তোমার ধন্যবাদ দেওয়া উচিত।

তারার অস্পষ্ট আলোয় ছড়ি দিয়ে মাটি হাতড়ে হাতড়ে দু-জনে চল্‌তে লাগল। আশে-পাশে চুপ ক'রে বসে-থাকা তিতি পাখীগুলো ভয় পেয়ে ডেকে উঠতে লাগল—টি-ট্টিহু! টি-টি-টি-ট্টিহু!

শচীন ঐ পাখীগুলোর মত আদুরে আদুরে ধরণের গলা ক'রে বল্‌লে—টিহু! টি-ট্টিহু!—এবং নিজের অকৃতকার্য্যতায় গলা ছেড়ে হেসে উঠল।

ভূপেন নীচু-গলায় জিগ্যেস্ করলে—কি হে, ব্যাপার কি? আজ যে বড়ই খোস্-মেজাজে আছ দেখতে পাই?

শচীন মহা উৎসাহে বল্‌লে—জানো, ওই পাখীগুলোর নাম টিট্টিভ। চাঁদনি-রাত হ'লে ওরা মাঠের মধ্যে চিৎ হয়ে শুয়ে পড়ে থাকে।

—যাঃ যত সব আজগুবি গল্প...

—সত্যি বল্‌ছি, চাষীদের জিগ্যেস্ করো। তাদের কাছেই শুনেছি। অস্তি সমুদ্রতীরে টিট্টিভদম্পতী বসতি স্ম।

—থাক্ থাক্—মনের উৎসাহে হিন্দুস্থানী ভাষা জবাই ক'রো, সহ্য করব, কিন্তু দেবভাষার ওপর আর এ অত্যাচার কেন? ব'লে ভূপেন হেসে উঠল।

কাছারি আর বেশী দূর নয়। ওদের খামারের কালো কালো বিচিলির গাদাগুলো কাছারি-বাড়ির আলোটাকে মাঝে মাঝে আড়াল করছে। দূর থেকে শোনা গেল খামারে কারা কথা কইছে। প্রথম যে-কথাটা শোনা গেল সেটা হচ্ছে এই—আরে না, টর্চ্চ জ্বালতে জ্বালতে আস্‌বে—দূর থেকে দেখা যাবেই। গলা আদ্যনাথের।

শচীন ভূপেনের হাত টিপে দিলে। দু-জনে নিঃশব্দে গাদাগুলোর আড়ালে আড়ালে অগ্রসর হ'তে লাগল।

—কিন্তু আদ্যাখুড়ো, নৌকোয় মাল তোলার সময় তো আবার ওজন হবে।

—আরে দূর, এ ত আর দাঁড়িপাল্লায় ওজন নয়। 'মানে' মাপা হবে। ঐখানে ক' বস্তা চিটে ধান আছে সে না ভাল ক'রে মিশিয়ে। 'চিটে'টা দিয়ে তার ওপর এক খামা ভাল ধান ছড়িয়ে দিস্। মাপ্‌ব ত আমিই।

— ওই শচীনবাবুকেই তো ভয়, নইলে আর...

বোঝা গেল শচীনের নামে রাগে আদ্যনাথ গর্‌গর্ করছে। বল্‌লে কে, ঐ বক বাবু? দাঁড়াও না, ওকে শেখাচ্ছি। আদ্যনাথ ঘোষালের সঙ্গে লাগার ফল বাছাধন এইবারে টের পাবেন—

—'বকবাবু' না কি বল্‌লে ঘোষাল? ওর ডাকনাম বুঝি?

আদ্যনাথ হা হা ক'রে হেসে উঠল। বল্‌লে—আরে না, দেখনি সেই যে পানকৌড়ি আর বক এসে ঐ খালে চরে? সেই থেকে আমি ওর নামকরণ করেচি—বকবাবু। বন্ধু! বন্ধু না হাতী। পরের মাথায় কাঁঠাল ভেঙে খেতে কার না মিষ্টি লাগে?

হাসির গর্‌রা উঠল।

ভূপেনের হাত ধ'রে শচীন টেনে রাখলে।

আবার আদ্যনাথের গলা—আর বাবুটিও হয়েচে তেম্‌নি আকাট মুখ্যু। ওর সম্পত্তি আর বেশী দিন নয়। লোকটাকে তাড়াতে পারলে বাঁচে, কিন্তু মুখ ফুটে একটা কথা বল্‌তে পারবেন না। কেওলীপ! বুঝলে হে—কেওলীপ!

বিভিন্ন গলায় হাসি মিলে একটা বিরাট ঝিঁঝিপোকার ডাকের মত শোনাচ্ছিল—হঠাৎ একেবারে স্তব্ধ হয়ে গেল।

তিন চারটে উঁচু উঁচু গাদা চারদিকে—তার মধ্যের জায়গাটুকু বেশ পরিষ্কার আর গরম। এক পাশে খানিকটা গর্ত্ত খুঁড়ে তার ভেতর হোব্‌লা কড় ইত্যাদির সাহায্যে

তামাকের আগুন তৈরি করা আছে—অন্ধকারের মধ্যে তার লাল্‌চে আভা দেখা যাচ্ছে। দু-খানা ছই খাটিয়ে এক-কোমর উঁচু তাঁবু তৈরি হয়েছে—রাত্রে দু-জন লোক তার তলায় শুয়ে ধান পাহারা দেবে। তার পাশে চারটে কালো মূর্ত্তি উবু হয়ে বসে আছে, যেন মাটি দিয়ে গড়া, নিষ্প্রাণ!

ভূপেন একান্ত শান্তস্বরে দ্বিতীয় বার ডাক্‌লে—কে, আদ্যনাথ না?

এবারেও আদ্যনাথ চুপ।

টর্চ্চের আলোয় দেখা গেল, একটা লোক 'চিটে' ধানের বস্তা হাতে ক'রে তুলেছে। বস্তাটা ধুপ ক'রে ফেলে দিয়ে সে বোকা ব'নে দাঁড়িয়ে রইল।

ভূপেন একজন চাষীকে জিগ্যেস্ করলে—হ্যা হে, গঙ্গারাম কোথায় বল্‌তে পার? রামসিংই বা কোথায় গিয়েচে?

লোকটা আদ্যনাথের ঘাড়ে সমস্ত দোষটা চাপাবার সদিচ্ছায় তাড়াতাড়ি বল্‌লে—আজ্ঞে, গঙ্গারাম কাছারিতে—রান্নার জোগাড় করছে। আর দরোয়ানজীকে ত ঘোষাল-মশায় হাটে পাঠিয়েচে, কেরাসিন তেল আন্‌তে।

—হুঁ, চলো শচীন। দু-জনে কাছারির দিকে এগোল।

সেদিন রাত্রে শোবার সময়। শচীন গম্ভীর হয়েই ছিল। ভূপেন জিগ্যেস্ করলে—ওদের কথায় তুমি নিশ্চয় কিছু মনে করোনি শচীন?

কথা কইবার ইচ্ছে নেই এমনভাবে শচীন উত্তর দিলে—না:, মনে করবার কি আছে? ওরা ত অন্যায় কিছু বলে নি।

—ওরা ছোটলোক। দোষের শাস্তি ত ওদের দিয়েচি। কিন্তু তুমি ত জান, আমার দিক থেকে—

ক'দিনের সৌহৃদ্যে যে আত্মাভিমান চাপা পড়েছিল সেইটেই হঠাৎ শচীনের মনে অত্যন্ত প্রখর হয়ে উঠেছে। কোনও কারণে এই আত্মাভিমানে ঘা লাগলে ও একেবারে কাণ্ডজ্ঞানহীন হয়ে ওঠে; ওর কথার মধ্যে যুক্তির লেশমাত্র থাকে না এবং কোনও রকম অবিচার করতেই ওর বাধে না। ভূপেনের কথার উত্তরে ও হঠাৎ অধৈর্য্যের ভাব প্রকাশ ক'রে ব'লে উঠল—But why do you apologise? I don't accuse you. [তোমার এ ক্ষমা-প্রার্থনার ভাব কেন? আমি তো তোমাকে কোন দোষ দিই নি?]

ভূপেনের মনটা ঠিক যেন দমিয়ে উঠল; প্রবল হয়ে এই কথাটা মনে বাজতে লাগল—অসহ্য, অসহ্য! কেন আমি ওর দয়ার উপর নির্ভর ক'রে আছি। কিন্তু ওর স্বাভাবিক সংযমের আবরণে ওর মনের কথা অপ্রকাশিত রইল।

সকাল সাতটায় ভূপেনের ঘুম ভাঙল। উঠে দেখলে এর মধ্যেই আজ শচীন একলা বেরিয়ে গেছে। আজ রাত্ত দুটোর জোয়ারে নৌকো ছাড়বে। ভূপেন উঠতেই তার সাম্‌নে বস্তা বস্তা ধান মেপে নৌকোয় বোঝাই দেওয়া হ'তে লাগল। ভূপেন একটা কাগজে নোট করতে করতে গঙ্গারামকে জিগ্যেস্ করলে—হ্যাঁরে, শচীন বাবু কখন বেরিয়েছেন? বেরোবার সময় কিছু ব'লে যান নি?

রামসিং উত্তর দিলে—জী হাঁ। বাবু যাবার সময় আমায় বন্দুক বার ক'রে দিতে বল্‌লেন। বল্‌লেন—আজ চলে যাব, একটু শিকার ক'রে আসা যাক্।

—বন্দুক নিয়ে গেছে? কার্ত্তুজ পেলে কোথায়?

—এল্‌-জি নিয়ে গেছেন হজুর।

বেলা এগারটা পর্য্যন্ত ধান মাপা আর বোঝাই দেওয়া চল্‌ল। তবু শচীনের দেখা নাই। ভূপেন মাঝে মাঝে উৎকণ্ঠিত হয়ে উঠতে লাগল—লোকটা গেল কোথায়? ক্রমশঃ ওর মনটা নরম হয়ে আসতে লাগল। এই কথা মনে করেও শচীনের দোষক্ষালনের চেষ্টা করলে যে, বাস্তবিক, ওর অবস্থা ওকে দুর্ব্বল করেছে, কাজেই ওকে আত্মাভিমানের বর্ম্ম এঁটে বসে থাকতে হয়। ভূপেন স্থির করলে, শচীন ফিরে এলে তার মন থেকে গ্লানিটুকু দূর ক'রে দিতে হবে।

এগারটার সময় ভূপেন ভাবলে—না:, মাথা গরম হয়ে উঠেছে—নেয়ে আসা যাক্। শচীন এলে একসঙ্গে খেতে বসা যাবে। ঘাটে গিয়ে দাঁত মাজতে মাজতে ভূপেন চন্দনপিড়ির দিকে চাইতে লাগল—শচীন আসছে কি না। বেশ রোদ! সকালবেলার ঠাণ্ডার পর অন্ততঃ খানিকক্ষণের জন্যে রোদটা মন্দ লাগছে না। এধার-ওধার চাইতে চাইতে হঠাৎ দেখলে সেই বকটা ছোট খালটার ওপর খানিকক্ষণ চক্রাকারে উড়ে খালের পাড়ে বসে পড়ল। ভূপেন ভাবলে, পানকৌড়িটা কোন্ দিক থেকে আসে দেখতে হবে। কিন্তু আশ্চর্য্যের কথা—আট-দশ মিনিট কেটে গেল, পানকৌড়িটা এল না। কি হ'ল তার? ভূপেনের মন খারাপ হয়ে

গেল। পানকৌড়িটাকে না দেখে সে কিছুতেই নাইতে নামতে পারছে না।

বকটা বন্‌বন্‌ ক'রে আকাশে খানিকটা উড়ল, আবার বসল, আবার একটা বৃহত্তর চক্র ক'রে উড়তে লাগল যদি বন্ধুর দেখা মেলে! এইভাবে প্রায় দশ মিনিট কাটবার পর বনের দিকে উড়ে চলে গেল।

নেমে উঠে এল বটে, কিন্তু ভূপেনের মনটা যেন শুক্‌নো পাতার মত কুঁক্‌ড়ে এল। আশঙ্কা...যেন একটা অমঙ্গল ঘনিয়ে আসছে!...এ বকটা সেই বক না হতেও পারে এ-কথা ভেবে বিশেষ স্বস্তি পেলে না।

বারটা বাজল—শচীনের দেখা নেই! হঠাৎ একটা একান্ত অর্থহীন খামখেয়ালী কথা ভূপেনের মনে এল—লোকটা নির্জনে গিয়ে আত্মহত্যা ক'রে বসেনি ত? ভূপেন নিজেই জানে কথাটা একেবারেই অবান্তর, অসম্ভব! এ রকম মনে হবার কোন যুক্তিই সে ভেবে পেল না।—নিছক পাগলামি! কিন্তু তবু এই অবাধ্য চিন্তাটা মনের মধ্যে কেবলি উঁচু হয়ে উঠতে লাগল—তাড়াতে পারা গেল না।

অবশেষে নিজেই শচীনকে খুঁজতে যাবে মনে করছে—এমন সময় রামসিং খবর দিলে, শচীনবাবু আসছেন। সে আসতেই ভূপেন তাকে স্নেহের অনুযোগে অপ্রতিভ ক'রে তুললে—কি হে, ভোরবেলা একলা বেরিয়ে গেলে, আমাকে একবার ডাকলেও না। এত বেলা পর্য্যন্ত করছিলে কি? ব্যাগটা ফুলো দেখছি যে—কিছু পেয়েছ তাহলে? কন্‌গ্রাচুলেশন্‌স্‌! কিন্তু রাগ ক'রে নিজের শরীর এভাবে নষ্ট করা উচিত? এখন নাও—একটু জিরিয়ে চট্‌ ক'রে নেয়ে নাও—খিদেতে মারা যাচ্ছি। পাখীটা গঙ্গারামকে দিয়ে দাও—তুমি নাইতে নাইতে রোষ্ট ক'রে দিক—

শচীন প্রথমে আশ্চর্য্য, তারপরে লজ্জিত এবং পরে প্রফুল্ল হয়ে উঠল। আশেপাশে আদ্যনাথ কোথায় লুকিয়েছিল, এই সুযোগে বেরিয়ে এসে একেবারে শচীনের পা জড়িয়ে ধরলে—বাবু, আমি দোষ করেছি, আমায় যে-কোনো শাস্তি দিন; কিন্তু একেবারে তাড়িয়ে দেবেন না—

লোকটার সত্যি অনুশোচনা হয়েছে ব'লে বোধ হ'ল। শচীন ব্যস্ত হয়ে বল্‌ল—কি মুস্কিল, আমায় বলছ কেন, বাবুকে বল—

ভূপেন বললে—না না, ও ঠিক জায়গায়ই বলেছে। ওর থাকা-না-থাকা সম্পূর্ণ তোমার ওপর নির্ভর করছে—

সস্নেহ কৃতজ্ঞ দৃষ্টিতে ভূপেনের দিকে চেয়ে শচীন বললে—আচ্ছা, আমার অনুরোধ—তুমি ওকে এবারের মত ক্ষমা কর—

কাল্‌কের ব্যাপারের পর কাছারি-বাড়ির গুমট-লাগা আবহাওয়া এতক্ষণে সহজ হয়ে এল। ওরা যখন খেতে বসল তখন আদ্যনাথ নিজে মাংস রান্নার তদারক করছে। শেষপাতে যখন আদ্যনাথ রোষ্ট-করা মাংস কেটে পরিবেশন করছে, তখন হঠাৎ ভূপেন বললে—পাখীটা কি? পানকৌড়ি ব'লে মনে হচ্ছে। ওহে, ভাল কথা,—আজ আর সেই পানকৌড়িটা আসে নি। বকটা অপেক্ষা ক'রে ক'রে উড়ে গেল। পানকৌড়িটার কি হয়েছে বলতে পার?

শচীন একটু মৃদু হেসে বললে—নিশ্চয় পারি। সে এখন দু-জন মান্যগণ্য ভদ্রলোকের জঠরে গিয়ে পক্ষীজন্ম সার্থক করছে।

চম্‌কে উঠে ভূপেন থাল থেকে হাত গুটিয়ে নিলে। উদ্বিগ্ন হয়ে জিগেস করলে—সত্যি বলছ? এইটেই সেই পানকৌড়ি? কি ক'রে জানলে?

শচীন খেতে খেতে থেমে থেমে বললে—প্রায় ক্রোশটাক দূরে দক্ষিণ দিকে দেখি ঐ জুটো পাখীই একটা জলার ওপর চরছে। বকটার ওপর আমার বরাবর রাগ। একবার ভাবলুম, দিই বেটাকে মেরে; আবার ভাবলুম, থাক্‌গে। মেরে দরকার নেই, ব্যাটাকে ভয় পাইয়ে দি। বন্দুক তুলে মিছিমিছি লক্ষ্য করলুম; ব্যাটা নিশ্চিন্ত হয়ে বসে কপ কপ ক'রে পানকৌড়ির দেওয়া একটা মাছ গলার মধ্যে চালাবার চেষ্টা করতে লাগল—নড়ল না। হঠাৎ ভয়ানক আক্রোশ হ'ল ওর স্বার্থপরতা দেখে। গুলি ক'রে দেখি, বকটা উড়ে যাচ্ছে, পানকৌড়িটা ম'রে ভেসে রয়েচে!—ওকি হে, উঠলে কেন? আরে দূর, তুমিও এত 'সেণ্টিমেণ্টাল'? তুমি না একজন নামজাদা শিকারী?

ততক্ষণে ভূপেন হাতটাত ধুয়ে এসে মাদুরে বসেছে। জোর ক'রে হেসে বললে—তুমি খেয়ে নাও ভাই, আজকে খেতে আমার তেমন প্রবৃত্তি হ'চ্ছে না—

শচীন হা হা ক'রে হেসে উঠল—নাঃ, একেবারে ছেলেমানুষ!

বাইরে থেকে অবশ্য কিছুই বোঝা গেল না। কিন্তু সেদিন সারা দুপুর ঐ কথাটাই ভূপেনের মনের মধ্যে তোলপাড় করতে লাগল।...পানকৌড়িটা আর আসবে না! নির্ব্বোধ বকটা আরও কদিন তাকে খুঁজবে, তার জন্যে প্রতীক্ষা করবে, কে জানে?...চন্দনপিড়ির ওপারের ঐ বনে কোনো এক গাছে ছিল ওর বাসা। ভোরের আলো চোখে লাগতেই আকাশের পথে রওনা হ'ত বন্ধুর সঙ্গে মেলবার জন্যে। হয়ত ওদের ভোরের প্রথম দেখার জায়গা ছিল চন্দনপিড়ির পাড়।...তাদের মধ্যে নীরব বোঝাপড়া ছিল কখন কোথায় যেতে হবে।...নিশ্চয় সূর্য্য দেখে ওরা সময় ঠিক করত। ঠিক সময়ের কিছু আগেই বকটা নির্দ্দিষ্ট জায়গায় এসে অপেক্ষা করত—বসে বসে মজা ক'রে খাওয়া ছাড়া তার ত আর কাজ নেই। পানকৌড়িটা আরও কোথায় কোথায় ঘুরে অবশেষে ব্যস্ত হয়ে এসে পৌঁছত। সারাদিন এইভাবে কাটিয়ে সন্ধ্যে হ'লে যে যার বাসায় যেত; যাবার সময় নীরব চোখের ভাষায় জানিয়ে যেত—আবার কাল দেখা হবে।...

আমার সাদাসিধে বন্ধুত্ব—এর মধ্যে সূক্ষ্মতা নেই, ন্যায়-অন্যায় বিচার নেই। কিন্তু বন্ধুত্ব—যা পেতে হ'লে হৃদয় থাকা চাই। ইংরিজিতে যাকে instinct বলে। শুধু তাই নয়, ঐ পানকৌড়িটার মধ্যে একটা স্নেহশীল একনিষ্ঠ হৃদয় ছিল।...শচীনের ওপর ক্রমশঃ একটা বিতৃষ্ণা ভূপেনের মনে সঞ্চিত হয়ে উঠতে লাগল। তার মনে হ'ল, বাল্মীকির অভিশপ্ত ক্রৌঞ্চঘাতক নিষাদের চেয়েও শচীন পাপী। কারণ সে যা নষ্ট করেচে তা সুলভ স্বাভাবিক কাম নয়—তা দুর্ল্লভ অসাধারণ বন্ধুত্ব!

সেই রাত্রে নৌকোয় চড়ে ধানের ওপর মাদুর বিছিয়ে গায়ে র‍্যাগ মুড়ি দিয়ে পাশাপাশি ওরা শুয়ে। চন্দনপিড়ি দিয়ে অতি মৃদু কুলকুল শব্দ ক'রে নৌকোটা ভেসে চলেছে। বাঁ-পাশে গভীর বন, বড় বড় গাছগুলো অন্ধকারে প্রেতের মত দাঁড়িয়ে রয়েছে, ডানদিকে ঝোপে ঢাকা বাঁধ। আকাশে অগুণ্তি তারা, জলের ওপর তার ছায়া পড়ে চিক্‌চিক্ করছে। চারিদিক নীরব নিস্তব্ধ! স্তব্ধতা ভঙ্গ ক'রে শচীন মৃদুস্বরে বললে—ভূপেন, ভেবে দেখলুম কালকে রাত্রে ঐ রকম রূঢ় হওয়া আমার উচিত হয় নি। জান তো আমি একটু খিট্‌খিটে মেজাজের লোক। কিছু মনে ক'রো না।

এ-রকম মোলায়েম সুরের কথা শচীনের কাছ থেকে অপ্রত্যাশিত। ভূপেন আশ্চর্য্য হ'ল, কিন্তু তার মন ভারী হয়েই রইল—সাড়া দিলে না। সে কিছুতেই বলতে পারলে না যে, সে কিছু মনে করে নি—ক্ষমা করেছে। তার মনে হ'তে লাগল যেন তার নিজের বুকের মধ্যেই পানকৌড়িটা মরে রয়েছে!...

ইউরোপে ভারতীয় শিল্প

শ্রীঅক্ষয়কুমার নন্দী

আমাদের দেশের লোকের বিশ্বাস, প্রাচ্যের কোন জিনিষই পাশ্চাত্যের বাজারে চলিবার মত নয়, আমাদের শিল্প-জাত দ্রব্যগুলিও বুঝি পাশ্চাত্যের অধিবাসীরা অবহেলার চক্ষে দেখে।

আমি দুইবার ইউরোপে ভারতের শিল্পজাত দ্রব্য লইয়া উপস্থিত হইয়াছি। আমার দ্বিতীয় বারের যাত্রা হইতে এ বিষয়ে যতটুকু অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছি, তাহার কিছু দেশের সম্মুখে উপস্থিত করিতেছি। আমার দুইবারের যাত্রাই ইউরোপের দুইটি বড় বড় প্রদর্শনী উপলক্ষে। প্রথম বার ১৯২৪ খৃষ্টাব্দে লণ্ডনে অনুষ্ঠিত বৃটিশ এম্পায়ার একজিবিশনে, দ্বিতীয় বার গত ১৯৩১ খৃষ্টাব্দে প্যারিসে অনুষ্ঠিত ইণ্টারন্তাশ-ন্তাল কলোনিয়াল একজিবিশনে।

প্যারিসের এই একজিবিশনটিতে ইউরোপ এবং আমেরিকার প্রায় সমস্ত স্বাধীন জাতির পক্ষ হইতে এক একটি বিশালায়তন বাড়ি নির্ম্মিত হইয়া তৎ তৎ দেশের শিল্প বাণিজ্য সংক্রান্ত প্রধান প্রধান বিষয় প্রদর্শিত হইয়াছিল এবং পৃথিবীর নানাস্থানে কম বেশী কোটি লোক এই একজিবিশনটি দেখিবার সৌভাগ্য লাভ করিয়াছিল।

প্রথম বারের যাত্রায় আমি ইংলণ্ড, স্কটলণ্ড ও আয়ার্লণ্ডের লোকদের ভারতীয় শিল্পদ্রব্যের উপর কিরূপ আকর্ষণ তাহাই বুঝিবার সুযোগ পাইয়াছিলাম। ইঁহারা ভারতের শিল্পকলার প্রকৃত মূল্য যতটুকু দিয়াছিলেন, তার চেয়ে বেশী সহানুভূতি দেখাইয়াছিলেন ইঁহাদের অধিকৃত দেশের শিল্প হিসাবে। বিজেতার কাছে আমরা এর বেশী আশা করিতে পারি না। কিন্তু আমরা তাহাদের নিকট এই অনুগ্রহ লাভের পরিবর্ত্তে যদি আমাদের দেশের বৈশিষ্ট্যকে ও-দেশের চক্ষে ধরিতে পারিতাম, তবেই আমাদের লাভ ছিল।

১৯৩১ খৃষ্টাব্দে দ্বিতীয় যাত্রায় ইউরোপের শিল্প বাণিজ্যের কেন্দ্রস্থল প্যারিস নগরীর আন্তর্জ্জাতিক প্রদর্শনীটিতে ভারতের শিল্পদ্রব্য লইয়া উপস্থিত হইয়া যাহা বুঝিতে পারিয়াছি, তাহাতে ভারতীয় শিল্পের প্রতি ইউরোপবাসীর আকর্ষণের যথেষ্ট পরিচয় পাইয়াছি। এখানে তাহারা ভারতীয় শিল্পের যে সম্মান দিয়াছে তাহা ভারতবাসীর ন্যায্য প্রাপ্য। প্রাচীন ভারতের শিল্প-গৌরবের প্রতি ইউরোপবাসীর যে শ্রদ্ধা ছিল, তাহা তাহারা এখনও হারায় নাই। এই শিল্পকে তাহারা দুই প্রকারে সম্মান দেয়,—প্রথমতঃ ভারতীয় দ্রব্য বলিয়া; দ্বিতীয়তঃ শিল্পের বৈচিত্র্যের দিক দিয়া। প্রশ্ন হইতে পারে, ইউরোপ শিল্পকলায় অনেক উন্নত, সারা জগৎকে তাহাদের শিল্প দিয়া ভরিয়া তুলিয়াছে; এ অবস্থায় ভারতের শিল্পদ্রব্য তাহারা কেন গ্রহণ করিবে? ইহার উত্তর এই—মানুষ শিল্পজাত দ্রব্য ব্যবহার করে শুধু ব্যবহারের সুবিধার উদ্দেশ্যে নহে, শিল্প অনুরাগের সঙ্গে তাহার প্রাণের অন্তর্নিহিত আনন্দের একটা যোগ আছে। ভারতকে তাহারা যে গৌরব দেয় সে গৌরবের মূল্য হিসাবেই ভারতের শিল্পদ্রব্য তাহারা একভাবে পছন্দ করে। দ্বিতীয় কথা এই—ভারতের অধিকাংশ শিল্পদ্রব্যই হস্তনির্ম্মিত; মানুষের সঙ্গে মানুষের যেমন একটা বিশেষ সম্বন্ধ আছে, যন্ত্রশিল্পের পরিবর্ত্তে হস্তনির্ম্মিত দ্রব্যের প্রতিও সেই হিসাবে মানুষের একটা বিশেষ টান আছে। যন্ত্রজাত শিল্পদ্রব্য ইউরোপকে ভারাক্রান্ত করিয়া তুলিয়াছে। এই জন্য তাহা ব্যবহারিক জগতে যতই কাজের হউক না কেন, শিল্পের প্রতি শ্রদ্ধার আনন্দ তাহাতে তাহারা পায় না। তারপর কথা এই,—কোন জিনিষের উপর যদি কোন ইতিহাসের বা কোন স্মৃতির ছাপ থাকে; তবে তাহার গৌরব আরও বেশী। এই সমস্ত দিক দিয়া ইউরোপবাসীদের নিকট ভারতের শিল্পের একটা আকর্ষণ আছে।

প্যারিস আন্তর্জ্জাতিক প্রদর্শনীতে ভারতীয় শিল্পদ্রব্য ব্যবসায়ীদের জন্য 'হিন্দুস্থান-প্যালেস' নামক বিরাট একটি বাড়ি নির্ম্মিত হইয়াছিল। ইউরোপের বিভিন্ন দেশের বহু ব্যবসায়ী এখানে ষ্টল লইয়া ভারতীয় শিল্পদ্রব্য বিক্রয় করিয়াছিলেন। ইঁহারা মিরাপণ্টায়, বার্সেলোনা, মার্সেলস, নিস, জেনোয়া,

নেপল্‌স্‌, ভিয়েনা, ভেনিস, বুখারেস্ত, কনস্তান্তিনোপল প্রভৃতি স্থান হইতে গিয়াছিলেন। এসিয়া খণ্ডের প্যালেস্তাইন, বাগদাদ হইতেও য়ীহুদি ব্যবসায়ীরা ভারতীয় দ্রব্য লইয়া উপস্থিত হইয়াছিলেন। ইঁহারা অনেকেই মেঝে মুড়িবার গালিচা, রেশম এবং সূতায় প্রস্তুত লতাপাতা-অঙ্কিত টেবিল ক্লথ, নানা প্রকার রুমাল, বহু পরিমাণে আমদানী করিয়াছিলেন। ভারতের খেঁকশিয়ালের চামড়া, গোসাপের চামড়া, সাপের চামড়া, পাখীর পালক, প্রজাপতির পাখা, হরিণের চামড়া, ভালুকের চামড়া, বাঘের চামড়া ইয়োরোপবাসীরা উচ্চ মূল্যে ক্রয় করিয়াছে। কাশী ও মোরাদাবাদের পিত্তল-শিল্প, জয়পুরের মার্ব্বেল পাথরের বাসন ও খেলেনা, কাশ্মীরের শাল খুব আদর পাইয়াছিল। ভারতীয় অম্বর পাথরের মালা, হস্তি-দন্তের মালা, চন্দনকাঠের মালা ফরাসী-মহিলাগণ গর্ব্বের সহিত বক্ষে ধারণ করিয়াছিলেন।

ফরাসী গভর্ণমেণ্ট এই একজিবিশনে ফ্রেঞ্চ ইণ্ডিয়া প্যাভিলিয়ন নামে একটি বাড়ি তৈয়ারী করিয়াছিলেন। ইহাতে চন্দননগর, পণ্ডিচেরী প্রভৃতি স্থান হইতে সংগৃহীত বহু শিল্পদ্রব্য উপস্থিত করা হইয়াছিল। উহার অনেক দ্রব্য প্যারিসের কলোনিয়াল মিউজিয়ামে রক্ষিত হইয়াছে।

এক্ষণে আমাদের বাংলার শিল্পদ্রব্যের কথা বলিব। বাংলার শিল্পদ্রব্যের প্রদর্শকমাত্র আমরাই ছিলাম। আমরা এখানে আমাদের কলিকাতাস্থ ইকনমিক জুয়েলারী ওয়ার্কসের একটি ষ্টল করিয়াছিলাম। মে হইতে অক্টোবর পর্য্যন্ত ছয় মাস কাল এই একজিবিশন চলিয়াছিল। ছয় মাসের জন্য আমাদের ষ্টলের জায়গার ভাড়া দিতে হইয়াছিল আঠার শত টাকা। ষ্টলটি সজ্জিত করিতে আমাদের আরও সাত শত টাকা অতিরিক্ত খরচ হইয়াছিল। আমরা এই ষ্টলে আমাদের কারখানায় প্রস্তুত অলঙ্কার ব্যতীত মুর্শিদাবাদের হস্তি-দন্তের প্রস্তুত নানাপ্রকার দ্রব্য, বাংলার নানা স্থানের সংগৃহীত পিত্তল-কাঁসার ক্যালি বাসন প্রভৃতি উপস্থিত করিয়াছিলাম।

আমাদের ষ্টল পরিচালনের জন্য একটি জার্ম্মান কুমারী এবং একটি রাশিয়ান কুমারী নিযুক্ত করিয়াছিলাম। জার্ম্মান কুমারীটি ইংরেজী, ফরাসী ও ইতালীয় ভাষা তার মাতৃভাষার মতই বলিতে পারিত। রাশিয়ান কুমারীটি ফরাসী ও ইংরেজী জানিত। তাহার মুখখানায় অনেকটা ভারতীয় ভাব ছিল। সে ভারতীয় নারীর মতই সাড়ী পরিতে ভালবাসিত। আমার দ্বাদশবর্ষীয়া কন্যা কুমারী অমলা নন্দী ইউরোপ দর্শন-মানসে আমার সঙ্গে গিয়াছিল। জার্ম্মান কুমারীটি তাহাকে ফরাসী ও ইংরেজী ভাষা শিক্ষায় সহায়তা করিত। পড়াশুনার অবকাশ কালে অমলা ষ্টলে আসিয়া দেখাশুনা করিত। রাশিয়ান কুমারীটিকে অমলা একেবারে ঘোমটা টানা বাঙালী বউ সাজাইয়া দিত; কপালে সিন্দুরের ফোঁটাটি পর্য্যন্ত। এদৃশ্য ইউরোপবাসীদের কাছে একান্তই অভিনব ছিল।

আমাদের বাংলার জিনিসগুলি ইউরোপবাসীরা পছন্দ করিত বটে, তথাপি সেগুলি তাহাদের ব্যবহারের সম্যক্‌ উপযোগীভাবে প্রস্তুত না হওয়ায় একটু অসুবিধা হইত। সে ত্রুটিগুলি সংশোধন করিয়া জিনিষ প্রস্তুত করা বেশী কিছু শক্ত কাজ নয়, কেবল সেই সেই জিনিষ সম্বন্ধে ইউরোপের রুচিটা বুঝিয়া লওয়া দরকার। যেমন,—আমাদের হাতীর দাঁতের মালাগুলি ছিল পঞ্চাশ হইতে পঞ্চান্ন ইঞ্চি দীর্ঘ, কিন্তু ফরাসী মহিলারা পছন্দ করে বিশ হইতে পঁচিশ ইঞ্চি মাত্র। কাজেই, মালাগুলি খুলিয়া আমাদের ছোট করিয়া গাঁথিয়া লইবার ব্যবস্থা করিতে হইয়াছিল। আইভরীর উপর চিত্র করা কতকগুলি মূল্যবান ছবি লইয়াছিলাম—দিল্লী হইতে সংগৃহীত, মোগল আমলের বাদশা-বেগমদের মূর্ত্তি এবং প্রাসাদাবলীর নক্সা। উহা ওজনে ভারী হইবার আশঙ্কায় কতকগুলি আ-বাঁধা ছবি লইয়াছিলাম; নমুনাস্বরূপ অল্প সংখ্যকই কাঠের ফ্রেমে বাঁধান ছবি লইয়াছিলাম। আ-বাঁধা ছবি লওয়ার আরও উদ্দেশ্য ছিল এই যে, গ্রাহকগণ আপন আপন রুচি অনুসারে বাঁধাইয়া লইতে পারিবে। ফলে, ফ্রেমে-বাঁধাগুলি আগে-আগেই বিক্রি হইয়া গেল। বোঝা গেল, ব্যবহারের সম্পূর্ণ উপযোগী করিয়া গ্রাহকের নিকট ধরিতে না পারিলে, গ্রাহকের মন জিনিষের প্রতি পূর্ণভাবে আকৃষ্ট হয় না। আ-বাঁধা ছবিগুলি পরে আমরা প্যারিসে দোকানদারদের কাছ হইতে বাঁধাইয়া লইয়াছিলাম; তাহাতে ফল দাঁড়াইল এই যে, ছবিগুলি যে ভারতীয় সে সম্বন্ধে গ্রাহকদের অনেকের সন্দেহ দাঁড়াইল। একথা অনেকেই অবগত আছেন, বর্ত্তমানে শিল্পদ্রব্যের প্রতি গ্রাহকদের মন আকৃষ্ট করিবার পক্ষে মূল বস্তুটির সৌন্দর্য্যই যথেষ্ট নহে, উহার আবরণটির যথাযথ চিত্তাকর্ষক করা চাই। [illegible] বাংলার শিল্প [illegible] [illegible] আদর পাবে না।

আর অসুবিধা ছিল এই যে, আমাদের কতকগুলি জিনিষ ছিল যাহাদের প্রত্যেকটি বিভিন্ন গঠনের। এক রকমের এক ডজন জিনিষ দেখাইবার উপায় ছিল না। কাজেই, ব্যবসায়ীদের কাছে সে-সব জিনিষ বিক্রয়ের কোন আশাই ছিল না। এই ভাবের বাংলার শিল্পকে ইউরোপে চালাইতে অনেক অসুবিধা ভোগ করিয়াছি। ফলে ইউরোপে আমাদের দেশের শিল্প-প্রচলনের সুবিধা-অসুবিধা অনেক-কিছু জানিয়া-শুনিয়া আসিয়াছি। ইউরোপের বাজারে আমাদের দেশের শিল্পের যে স্থান হইতে পারে, এ সম্বন্ধে অনেক আশা লইয়া আসিয়াছি।

বোম্বাই, গুজরাট, পেশোয়ার, পঞ্জাব, রাজপুতানা প্রভৃতি স্থানের অনেক ব্যবসায়ী ইংলণ্ডের স্থানে স্থানে ভারতীয় দ্রব্য বিক্রয় করিয়া থাকেন, কিন্তু কোন বাঙালী যুবককে দেখিয়াছি বলিয়া মনে হয় না। ইউরোপে ভারতীয় জিনিষ বিক্রয়কারী ব্যবসায়ীদের সম্বন্ধে একটু দুঃখের কথাও আছে। ইহাদের অনেকেই জাপান বা জার্ম্মেনীর প্রস্তুত জিনিষ ভারতীয় বলিয়া বিক্রয় করিয়া থাকেন। চেকোস্লো-ভাকিয়ার প্রস্তুত নানা রঙের কাঁচের বা ক'ড়ে মাটির মালা দার্জ্জিলিঙের পাথরের মালা বলিয়া ইউরোপের বাজারে কাটে। (বলা বাহুল্য আমাদের দেশে দার্জ্জিলিঙের মালা নামে যাহা প্রচলিত তাহাও চেকোস্লোভাকিয়ায় প্রস্তুত)। ভারতীয় লোকের হাতে বিক্রয় করিতে দেখিয়া লোকে সহজেই ভারতীয় শিল্প বলিয়া বিশ্বাস করে। ভারতীয় শিল্পের মর্য্যাদা এই ভাবে ক্ষুণ্ণ হইতে দেওয়া আমাদের ভারতীয় ব্যবসায়ীদের অযোগ্যতা ব্যতীত আর কি বলিব!

আমেরিকান প্রভৃতি বহু বৈদেশিক ভ্রমণকারী ইউরোপের নানা স্থানে ভ্রমণ করিতে আসিয়া থাকেন। তাঁহারা নানা দেশের নানাপ্রকার বিচিত্র বস্তু ক্রয় করিয়া থাকেন। এই প্রকার ভ্রমণকারীর সংখ্যা যে কত তাহা ঘরমুখো বাঙালী আমরা সহজে ধারণা করিতে পারি না। এই সকল বৈদেশিক যাত্রীর অর্থে ইউরোপের বহু বড় নগর পরিপুষ্ট হইতেছে। ইউরোপের দক্ষিণে ভূমধ্যসাগর তীরবর্ত্তী বন্দরগুলি, সুইজরল্যাণ্ডের স্বাস্থ্যকর অঞ্চলগুলি, প্যারিস, বার্লিন, ভেনিসের মত বড় শহরগুলিতে এতই যাত্রীর আমদানী যে, ইহাদের গতিবিধির নানাপ্রকার ব্যবস্থা করিবার জন্য বহু বহু বড় বড় কোম্পানী পরিচালিত ও পুষ্ট হইতেছে। আমাদের দেশেও 'আমেরিকান এক্সপ্রেস' 'টমাস কুক্ এণ্ড সন' কলিকাতা, দার্জ্জিলিং, বোধগয়া, বেনারস, দিল্লী, আগ্রা দেখাইয়া বিদেশী যাত্রীদের কাছ হইতে অনেক টাকা রোজগার করে। ইউরোপে এশিয়ার জাপান, চীন, ইন্দোচীন, পারস্য, আরব, প্যালেস্তাইন, বাগদাদ, ভারতবর্ষ প্রভৃতি সকল দেশেরই দোকান আছে এবং তাহারা দিন দিন বিশেষ উন্নতি লাভ করিতেছে। প্যারিসে গুজরাটী কয়েক জন ব্যবসায়ী পারস্য-সাগরের মুক্তা বিক্রয় করিয়া যথেষ্ট অর্থোপার্জ্জন করতঃ ওদেশে সম্মানের সহিত বসবাস করিতে-ছেন। দুঃখের বিষয়, মুক্তার কারবারও বর্ত্তমানে অচলপ্রায় হওয়ায় তাঁহাদের যথেষ্ট অসুবিধা হইতেছে। প্যারিসে ভারতীয় শিল্পদ্রব্যের খুব ভাল বাজার সৃষ্টি হইতে পারে। উপযুক্ত লোক এদিকে মনোযোগ দিলে যথেষ্ট সুবিধা হইবার আশা করা যায়।

ছয় মাস কাল প্যারিসের একজিবিশনটিতে আমাদের কার্য্য শেষ করিয়া আমি ইউরোপের অন্যান্য দেশের শিল্প বাণিজ্য দেখিবার জন্য ভ্রমণে বাহির হই এবং একে একে বেলজিয়ম, জার্ম্মেনী, অষ্ট্রিয়া, সুইজরল্যাণ্ড, ইটালি, প্রভৃতি দেশের শিল্প-কেন্দ্রগুলি পরিদর্শন করি। ভারতের প্রতি, ভারতীয় শিল্পের প্রতি তাহাদের সকলেরই যে একটা আকর্ষণ আছে তাহাও বুঝিয়াছি। তবে, কোন্ জিনিষ কোন দেশে কি ভাবে চলিতে পারে, ক্ষণিকের দেখাশুনার ফলে তাহার একটা ধারণা করা চলে না। একটি বিষয়ের কথা আমি নিশ্চিত রূপে বলিতে পারি যাহার বিরাট ব্যবসা ইউরোপে চলিতে পারে। আমাদের দেশের কতকগুলি কাঁচামাল যাহা অন্যত্র দুর্লভ, যেমন—তেঁতুল, খেজুর, চিনি, চিটাগুড়, মধু, মোম দ্রব্য, তিল, তিসি, সরিষা প্রভৃতি শস্য, নারিকেল কলা আম আনারস প্রভৃতি ফল, নানাবিধ ভেষজ দ্রব্য ইউরোপে চলিতে পারে। কার্য্য আরম্ভ করিলে ক্রমে আরও অনেক জিনিষের সন্ধান হইতে পারে যাহা আমরা ঐ সকল দেশে সরবরাহ করিতে পারি।

বিদেশী-বাণিজ্য সম্বন্ধে প্রধান কথা হইতেছে কাষ্টম-ডিউটি অর্থাৎ বাণিজ্য-শুল্ক লইয়া। ইহা বিদেশী-বাণিজ্যের বড়ই অন্তরায়। কোন্ দ্রব্য কোন্ দেশে পাঠাইতে কিরূপ কাষ্টম-ডিউটি দিতে হয় সর্ব্বাগ্রে তাহাই জানা আবশ্যক। গভর্ণমেণ্ট

পাবলিসিটি আপিসে ও কলিকাতা কাষ্টম হাউসে ইহার বিবরণ সম্বলিত পুস্তক কিনিতে পাওয়া যাইতে পারে। আমাদের দেশে যদি এমন কোন শিল্প-বাণিজ্য-পরিষদের সৃষ্টি হয়, যাহা এই রকম বৈদেশিক বাণিজ্যের জন্য চেষ্টা করিতে পারেন, তবে বিশেষ সুবিধা হয়। ইহার জন্য নানা প্রকার জিনিষের নমুনা ডাকযোগে নানা দেশে পাঠাইতে হয়। স্থানবিশেষে লোক পাঠাইয়াও কার্য্যালয় স্থাপন করিতে হয়। এরূপ গুরুতর কার্য্যে ব্যক্তিবিশেষের চেষ্টায় বেশী কিছু আশা করা যায় না, সম্মিলিত শক্তির প্রয়োজন। বর্ত্তমানের শিল্পবাণিজ্যের উন্নতি এই প্রকার কর্ম্মপ্রচেষ্টার উপরই প্রতিষ্ঠিত।

মহিলা-সংবাদ

শ্রীমতী পদ্মাবতী দেরাদুনস্থ কন্যা গুরুকুলে পাঁচ বৎসর কাল অধ্যয়ন করিয়া পঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয় হইতে প্রভাকর (হিন্দী অনার্স) পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া প্রথম শ্রেণীতে তৃতীয় স্থান অধিকার করিয়াছেন। তিনি দক্ষিণী মহিলাদের মধ্যে

শ্রীমতী পদ্মাবতী

শ্রীমতী সুজাতা রায়

সর্ব্বপ্রথম অনার্সসহ হিন্দী পরীক্ষা পাস করিলেন। তিনি অতঃপর কর্ণাটকে হিন্দী-প্রচার ও অন্যান্য লোকহিতকর কার্য্যে ব্যাপৃত থাকিবেন। সংবাদপত্রসেবী হওয়াও তাঁহার অভিপ্রেত।

শ্রীমতী সুজাতা রায় কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে ইংরেজী সাহিত্যে অনার্স লইয়া বি-এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছেন। অনার্স পরীক্ষায় তিনি প্রথম শ্রেণীতে প্রথম স্থান অধিকার করিয়াছেন।

'লীডার' পত্রিকার অন্যতম সম্পাদক পণ্ডিত কৃষ্ণকান্ত মেহ্‌তার কন্যা শ্রীমতী মনোরমা মেহ্‌তা এলাহাবাদ বিশ্ব-বিদ্যালয় হইতে বি-এ পাস করিয়াছেন। তিনি উক্ত বিশ্ব-বিদ্যালয়ে ইংরেজী সাহিত্যে এম-এ অধ্যয়ন করিতেছেন।

বোম্বাই শহরের পার্শী মহিলা শ্রীমতী গুলবাই কুভারজী কেরামওয়ালা হিসাব-পরীক্ষা ও হিসাব-রক্ষা বিষয়ে অধ্যয়ন করিয়া সরকারী ডিপ্লোমা প্রাপ্ত হইয়াছেন। মহিলাদের মধ্যে তিনিই প্রথম এই ডিপ্লোমা পাইলেন।

শ্রীমতী অমিয়া ঘোষ প্যারিসের পাস্তুর ইনষ্টিটিউট হইতে ভ্যাক্‌সিন, সেরা প্রভৃতি উৎপাদন সম্বন্ধে জ্ঞান লাভ করিয়া সম্প্রতি কলিকাতা প্রত্যাগমন করিয়াছেন।

শ্রীমতী জেবুন্নিসা খান দ্বিতীয় ভাষা হিসাবে সংস্কৃত লইয়া এবার বি-এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছেন।

শ্রীমতী মনোরমা মেহ্‌তা

শ্রীমতী জেবুন্নিসা খান

শ্রীমতী অমিয়া ঘোষ

শ্রীমতী গুলবাই কুভারজী কেরাষওয়ালা

বাংলা

দান—

ময়মনসিংহ জেলার নাগরপুর থানার অন্তর্গত পাকুটিয়ার শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রমোহন রায় চৌধুরী তাঁহার পিতার স্মৃতি রক্ষার্থ ৪১,০০০৲ টাকা দান করিয়া এক ট্রাষ্ট ফণ্ড গঠন করিয়াছেন। এই ফণ্ডের আয় দ্বারা পাকুটিয়া গ্রামে একটি দাতব্য চিকিৎসালয় পরিচালিত হইবে। উপেন-বাবু উক্ত চিকিৎসালয়ের জন্য একটি বাড়ি নির্ম্মাণ করিয়া দিতেও প্রস্তুত হইয়াছেন।

কাশিমবাজারের কুমার কমলারঞ্জন রায় বেলডাঙ্গা হিন্দু সাহায্য সমিতিতে দুই হাজার টাকা দান করিয়াছেন।

শিক্ষাকার্য্যে দান—

বর্দ্ধমানের অন্তর্গত শ্রীধরপুর গ্রামে ৺হীরালাল মুখোপাধ্যায় শিক্ষা প্রসারের জন্য কুড়ি হাজার টাকা দান করিয়াছিলেন। হীরালাল-বাবুর স্ত্রী শ্রীমতী কাত্যায়নী দেবীর অনুমত্যনুসারে এই টাকা দ্বারা সেখানে একটি চতুষ্পাঠী স্থাপন করিবার ব্যবস্থা হইয়াছে।

শ্রীযুত যতীন্দ্রনাথ ঘোষ হাওড়ার অন্তর্গত বুড়িখালিতে একটি উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার জন্য আঠার হাজার তিন শত বাসটি টাকা দান করিয়াছেন।

কিছুদিন পূর্ব্বে শ্রীযুক্ত আনন্দমোহন পোদ্দার, এম-এল-সি মহাশয় ঢাকার শ্রীমতী চারুশীলা দেবীর নারী কল্যাণার্থে প্রতিষ্ঠিত আনন্দ আশ্রমে ২৫০ টাকা দান করিয়াছেন।

দানবীরের তিরোধান—

বরিশালের প্রসিদ্ধ দানবীর, ব্যবসায়ী স্বর্গীয় তারিণীচরণ সাহা মহাশয় পরলোক গমন করিয়াছেন। তিনি বরিশালে মেডিকেল স্কুল স্থাপন কল্পে ১০০,০০০ টাকা দান করিয়াছিলেন। কিন্তু গভর্ণমেণ্ট বরিশালে মেডিকেল স্কুল স্থাপনে অনুমতি না দেওয়ায় তিনি স্বীয় প্রদত্ত টাকা ফেরৎ না লইয়া উহা অন্য জনহিতকর প্রতিষ্ঠানে দান করিয়াছেন।

কন্যার স্মৃতিরক্ষা—

ন্যাশন্যাল ইন্সিওরেন্স কোম্পানীর ঢাকার চিফ এজেণ্ট শ্রীযুক্ত পরেশচন্দ্র দাসগুপ্ত তাঁহার মৃত কন্যা পারুলবালার স্মৃতিরক্ষাকল্পে ঢাকা ইডেন কলেজে দুই হাজার টাকা দান করিয়াছেন। ঐ কলেজে যে বালিকা ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষায় সর্ব্বোচ্চ স্থান পাইয়া পড়িবে, তাহাকে ঐ টাকার সুদ হইতে প্রতিবর্ষে একটি স্বর্ণ পদক দেওয়া হইবে। আর বাকী টাকায় ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষোত্তীর্ণ ঐ কলেজের দুইজন দরিদ্র বালিকাকে কতক পুস্তক পুরস্কার দেওয়া হইবে।

বিদেশে কৃতী বাঙালী ভ্রাতৃ-যুগল—

ডাঃ হীরেন দে প্রায় পাঁচ বৎসর ধরিয়া লণ্ডনের সেণ্ট জর্জ্জ মেডিক্যাল স্কুল ও হাসপাতালে শিক্ষা লাভ করেন। তিনি লণ্ডনের বাম্পটন হাসপাতালে ক্ষয় ও ফুসফুস সংক্রান্ত রোগ সম্পর্কে পোষ্ট-গ্রাজুয়েট শিক্ষা লাভ করিয়াছেন। সম্প্রতি হীরেন-বাবু ইংলণ্ডের ডেভনপোর্টে রয়্যাল এলবার্ট হাসপাতাল ও আই-ইন্‌ফার্মারীতে জুনিয়র হাউস-সার্জ্জনের পদে নিযুক্ত হইয়াছেন। বাঙালী ডাক্তারের পক্ষে ইংলণ্ডে এইরূপ পদ লাভ বোধ হয় এই প্রথম।
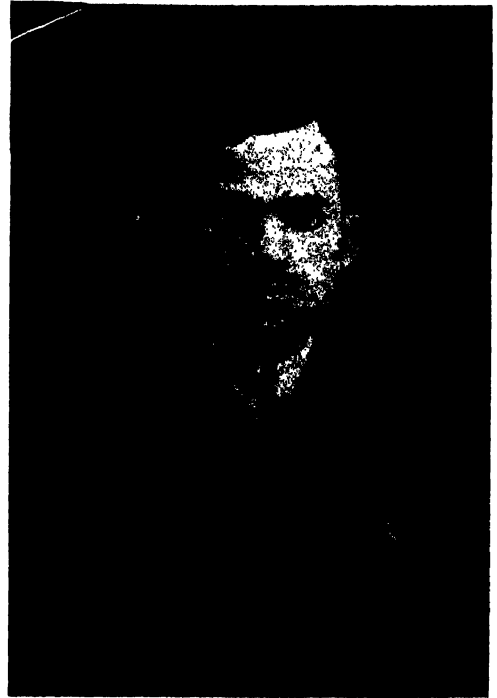
ডাঃ হীরেন দে

ডাঃ হীরেন দের ভ্রাতা শ্রীযুত নীরেন দে কেমব্রিজে কিংস কলেজে অধ্যয়ন করিয়া ট্রাইপস্ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছেন। নীরেন-বাবু সেখানে খেলায় বিশেষ কৃতিত্ব অর্জ্জন করিয়াছেন।

শ্রীনরেন দে

পরলোকে কৃষ্ণবিহারী বসু

১২৫৫ সালের ২৯এ মাঘ খুলনা জেলার অন্তর্গত পালসাপালি গ্রামে কৃষ্ণবিহারী বসু জন্ম গ্রহণ করেন। তিনি দরিদ্রের সন্তান ছিলেন। তিনি চব্বিশপরগণার অন্তর্গত বারুইপুর হইতে প্রবেশিকা পরীক্ষা পাস করিয়া বৃত্তিলাভ করেন। তিনি এই সময়ে রামতনু লাহিড়ীর ছাত্র ছিলেন।

কৃষ্ণবিহারী বসু

সম্মানের সহিত বি-এ পাশ করিয়া ১৮৭০ সনে তিনি বারাসত সরকারী উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়ে তৃতীয় শিক্ষক পদে নিযুক্ত হন এবং পরে ঐ স্কুলের প্রধান শিক্ষক পদে উন্নীত হন। এই সময়ে তিনি এম-এ, বি-এল পাশ করেন এবং বারাসতেরই স্থায়ী বাসিন্দা হন। নিজ গুণে তিনি ক্রমে বাংলার শিক্ষা বিভাগে ডি-পি-আইর পার্সোন্যাল এসিষ্টাণ্ট পর্য্যন্ত হইয়াছিলেন।

১৯০৫ সনে সরকারী চাকরি হইতে অবসর গ্রহণ করিয়া নানা দেশহিতকর কার্য্যে আত্মনিয়োগ করেন। বারাসত মিউনিসিপালিটির কর্ণধার হইয়া শহরের উন্নতি সাধন করেন। তিনি বেঙ্গল কেমিক্যাল ও ফার্ম্মাসিউটিকাল ওয়ার্কসের সঙ্গে আমরণ যুক্ত ছিলেন। তিনি ইহার একজন ডিরেক্টর ছিলেন। তিনি কয়েক বৎসর যাবৎ বিদ্যাসাগর-প্রতিষ্ঠিত হিন্দু ফেমিলি এনুয়িটি ফণ্ডের সম্পাদকের কার্য্য করেন ও পরে ইহার ডিরেক্টরও হইয়াছিলেন। কৃষ্ণবাবু *Guardian and Ward* এবং *Instruction Reader* নামে দুইখানি পুস্তক লিখিয়াছিলেন। তিনি গত ২০শে আষাঢ় পরলোকগমন করিয়াছেন।

শ্রীযুত ইন্দুভূষণ বড়ুয়া—

ইনি সম্প্রতি বিলাত হইতে প্রত্যাগমন করিয়াছেন। এখান হইতে বি-এস-সি এবং বি-টি পাশ করিয়া রেঙ্গুনে এক বৎসর কাল বিজ্ঞান বিষয়ে শিক্ষকতার কাজ করেন এবং সেখা হইতে ইংলণ্ডের স্কুল সমূহে

শ্রীযুত ইন্দুভূষণ বড়ুয়া

কি ভাবে বিজ্ঞান শিক্ষা দেওয়া হয় তাহা পর্য্যবেক্ষণ করিবার জন্য ১৯৩১ সনে বিলাত যান। সেখানে তিনি কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয় হইতে শিক্ষা-ডিপ্লোমা প্রাপ্ত হন। ডিপ্লোমা অধ্যয়ন কালে তাঁহাকে

তিন মাসের জন্ম সেখানকার এক সেকণ্ডারী স্কুলে পদার্থ বিদ্যা এবং রসায়ন শাস্ত্র পড়াইতে হইয়াছিল। স্কুলের হেডমাষ্টার তাঁহার রিপোর্টে মিঃ বড়ুয়ার প্রশংসা করিয়া বলেন, "মিঃ বড়ুয়া যে-ভাবে কৃতকার্য্যতার সহিত আমাদের স্কুলে পড়াইয়াছেন ইহাতে মনে হয় তিনি ভারতবর্ষে গিয়া অতি উঁচু দরের শিক্ষক হইবেন।"

প্রবাসে বাঙালীর কৃতিত্ব—

কলিকাতার শ্রীমান্ কল্যাণকুমার বসু এবার কেম্‌ব্রিজের এমানুয়েল কলেজ হইতে আইনে ট্রাইপস্ পরীক্ষায় প্রথম স্থান অধিকার করিয়া

শ্রীকল্যাণকুমার বসু

উত্তীর্ণ হইয়াছেন। ভারতবাসীদের মধ্যে শ্রীমান কল্যাণকুমারই সর্ব্বপ্রথম এই পরীক্ষায় প্রথম হইলেন। কল্যাণকুমার কলিকাতার ভূতপূর্ব্ব মেয়র শ্রীযুক্ত বিজয়কৃষ্ণ বসুর পুত্র।

শর্করা-শিল্প শিক্ষায় বাঙালী

জলপাইগুড়ি-নিবাসী শ্রীযুক্ত সুধীরচন্দ্র পাল বিহারের পাঁচরুখির শর্করা কারখানায় কার্য্য করিয়া এ-বিষয়ে অভিজ্ঞতা লাভ করেন এবং যুক্ত প্রদেশের তামকোহী কারখানায় কেমিষ্টের কার্য্য করেন। ইনি সম্প্রতি এবিষয়ে আরও অভিজ্ঞতা অর্জ্জনের জন্ম মরিসসে গমন করিয়াছেন। মরিসস দ্বীপে শর্করা প্রচুর পরিমাণে উৎপন্ন হয়।

শ্রীযুক্ত অমরেন্দ্রনাথ দাস—

শ্রীহট্ট-নিবাসী শ্রীযুক্ত অমরেন্দ্রনাথ দাস ম্যাঞ্চেষ্টারের "কলেজ অফ টেক্‌নলোজী" হইতে বস্ত্রশিল্প অধ্যয়ন করিয়া এ-বিষয়ে বিশেষ অভিজ্ঞতা অর্জ্জন করিয়াছেন।

শ্রীঅমরেন্দ্রনাথ দাস

শ্রীসুধীরচন্দ্র পাল

সৎকার্য্যে দান—

বসিরহাটের যোগী ছাত্রদের জন্ম জোহাদ বোর্ডিং ইনষ্টিটিউসন নির্ম্মাণ কল্পে বাবু সারদাপ্রসাদ দালাল ৪৪,৪৫০ টাকা দান করিয়াছেন।

রায়পুরে একটি মধ্য ইংরেজী বিদ্যালয়ের জন্ম মৌলবী মেরুদ্দীন সেখ অনুমান ১৫০০০ টাকা মূল্যের একখণ্ড জমি ও একটি পাকা বাড়ি দান করিয়াছেন।

পৃথিবীর সর্ব্বোচ্চ স্তম্ভ—

আগামী ১৯৩৭ সনে প্যারিসে যে বিরাট প্রদর্শনী হইবে তাহাতে একটি স্তম্ভ নির্ম্মাণের পরিকল্পনা হইয়াছে। স্তম্ভটি তেত্রিশ শত ফুট উঁচু হইবে। এই স্তম্ভে ষোল শত ফুট পর্য্যন্ত মোটরের রাস্তা থাকিবে। পরবর্ত্তী পথ লিফ্‌ট উঠিবার ব্যবস্থা হইয়াছে। মোটরের রাস্তা স্তম্ভের গা বাহিয়া ঘুরিয়া ঘুরিয়া উপরে উঠিয়াছে।
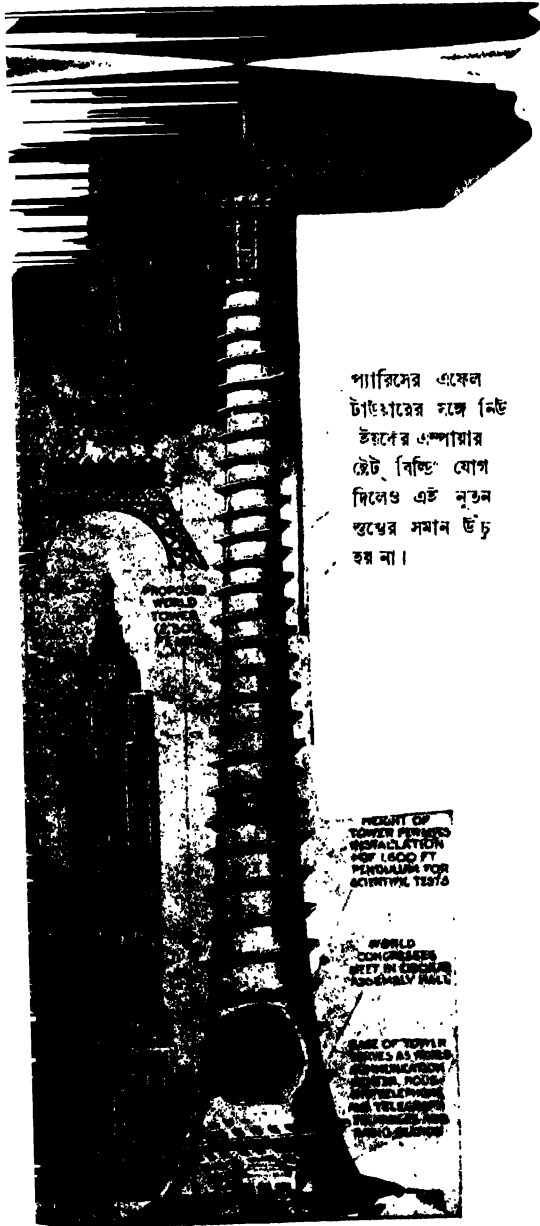
প্যারিসের এফেল টাওয়ারের সঙ্গে নিউ ইয়র্কের এম্পায়ার ষ্টেট্ বিল্ডিং যোগ দিলেও এই নূতন স্তম্ভের সমান উঁচু হয় না।
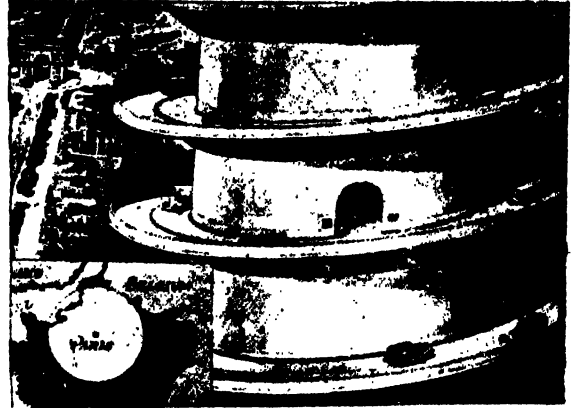
মোটর উঠিবার রাস্তা।

স্তম্ভের উপরিভাগে আবহাওয়ার মন্দির ও একটি আলোগৃহ থাকিবে। আলোটি এক শত কুড়ি মাইল দূর হইতে দেখা যাইবে। একটি পরীক্ষাগারও থাকিবে। এই স্থানে পরীক্ষাগারটি থাকায় ষোল শত ফুট লম্বা পেণ্ডুলাম বিশিষ্ট একটি যন্ত্রদ্বারা পৃথিবীর গতি লক্ষ্য করার ও মাধ্যাকর্ষণের নিয়ম পরীক্ষণের বিশেষ সুবিধা হইবে। উহার কিছু নিম্নে চারি শত ত্রিশ ফুট পরিধি বিশিষ্ট একটি গোলাকার হল থাকিবে। এই হলে জনসভা বসিবে। সংবাদ আদান-প্রদান আপিস ও ছাপাখানা স্তম্ভের নিম্ন স্তরে থাকিবে। এই সকলের ভাড়া হইতে চল্লিশ বৎসরে উহার নির্ম্মাণের ব্যয় উঠিয়া আসিবে।

রবারের চাকাযুক্ত ট্রাম—

কলিকাতা ও অন্যত্র রাস্তায় যে ট্রাম চলে তাহার ঘড়-ঘড়ানি শব্দে নিকটস্থ বাড়িতে তিষ্ঠানো দায় হইয়া উঠে। এইজন্য যথাসম্ভব শব্দহীন ট্রাম নির্ম্মাণ করিবার চেষ্টা চলিতেছিল। এই চেষ্টা সম্প্রতি সফলও হইয়াছে। এই ট্রামের গতিও অতি দ্রুত। অপর পৃষ্ঠার চিত্রটিতে উহার নমুনা দেওয়া হইল। এই ট্রামের চাকা মোটরের চাকার মত রবারের। কিন্তু উহা লাইনের উপর দিয়াই চলে।

পৃথিবীর সর্ব্বোচ্চ স্তম্ভ

রবারের চাকা-যুক্ত ট্রাম

আদর্শ রান্নাঘর (এই ঘরে রান্নার জন্ত কয়লা ব্যবহৃত হয়)

আদর্শ রান্নাঘর। এই ঘরে গ্যাস ব্যবহৃত হয়

আদর্শ রান্নাঘর—

গৃহস্থালীর কাজের সুবিধার জন্য বর্তমানকালে যে-সকল যন্ত্রপাতির আবিষ্কার হইয়াছে সে সম্বন্ধে গত সংখ্যায় কিছু বলা হইয়াছিল। এই সকল কাজের অধিকাংশই রান্নাঘরে সম্পন্ন হইয়া থাকে, সুতরাং গৃহকর্মের জন্য রান্নাঘরের সুশৃঙ্খল বন্দোবস্ত ও আসবাব-পত্র অতি প্রয়োজনীয়। কিন্তু আমাদের দেশে রান্নাঘরটিই বাড়ির সব ঘরের অপেক্ষা অপরিষ্কার ও বিশৃঙ্খল হইয়া থাকে এবং বাড়ির কোনো এক কোণে যেন তেন প্রকারেণ পুরিয়া দেওয়া হয়। ইউরোপ ও আমেরিকায় ঠিক তাহার উল্টা। সেখানে মধ্যবিত্ত গৃহস্থের ঘরে সব কাজ মেয়েরাই করেন বলিয়া রান্নাঘর সম্বন্ধে বিশেষ লক্ষ্য রাখা হয়। উহাতে যাহাতে আলো ও হাওয়া প্রচুর পরিমাণে আসে তাহার ব্যবস্থা করা হয় এবং কাজের সুবিধা ও শ্রম বাঁচাইবার উদ্দেশ্যে নানা যন্ত্রপাতি ও আসবাবপত্র ঠিক যেখানে যেটির প্রয়োজন হইতে পারে সেখানে রাখা হয়। বিলাতী রান্নাঘরের সুবন্দোবস্ত ও সৌষ্ঠবের দৃষ্টান্ত হিসাবে এখানে দুটি চিত্র প্রকাশ করা গেল। উহার প্রথমটিতে গতসংখ্যায় যে 'আগা কুকারের' বিবরণ দেওয়া হইয়াছিল তাহা ব্যবহৃত হইয়াছে চিত্রের ডান দিকে মাঝখানে এই উনুন দেখা যাইতেছে। ঠিক উপরে তাকের মধ্যে ডেকচি ও সস্‌প্যান সাজাইয়া রাখিবার জায়গা। উহাতে ছোট বড় অনেকগুলি ডেকচি সাজানো আছে। উনুনের দুইপাশে খাবার ও জিনিসপত্র রাখিবার আলমারী। উহার উপরে রান্নার জোগাড় ও

প্রাচীন গহনা পরা বর্মী মেয়ে ও ইউ রাণীর নকল

রান্না-করা তরকারী প্রভৃতি রাখা হয়। ধুইবার ও পরিষ্কার রাখিবার সুবিধার জন্য এই জায়গাটুকু কালো পুরু কাচে ঢাকা। দ্বিতীয় রান্নাঘরটিতে গ্যাস ব্যবহৃত হয়। উহাতে একটি 'নিউ ওয়ার্লড গ্যাসকুকার আছে। উহার একদিকে প্লেট প্রভৃতি রাখিবার একটি শেল্‌ফ দেখা যাইতেছে ঘরের আর এক ধারে থালা-বাসন ধুইবার জন্য 'সিঙ্ক' আছে। বলা বাহুল্য এই দুইটি ঘরেই দুধ, ফল রান্না করা বা কাঁচা মাংস ও তরকারী তাজা এবং নির্দ্দোষ রাখিবার জন্য রেফ্রিজারেটর আছে। বর্ত্তমান কালে ইউরোপ ও আমেরিকার প্রায় সব বাড়িতেই রেফ্রিজারেটর থাকে।

বর্ম্মী নারীর গহনা —

বিভিন্ন দেশে নানা ধরণের গহনা ব্যবহৃত হইয়া থাকে। ব্রহ্মদেশের জাতিবিশেষের নারীরা গলায় একরূপ গহনা পরে যাহা সমস্ত গলদেশ জুড়িয়া থাকে। তাছাড়া হাতেও অনেক প্যাঁচের বালা পরে। গহনাগুলি একটু নূতন ধরণের।

ফরমোসা দ্বীপের নরমুণ্ড শিকারী—

ফরমোসা দ্বীপে এক জাতীয় আদিম অধিবাসী আছে। তাহারা মানুষ মারিয়া মস্তক সংগ্রহ করিয়া থাকে। ইহাদের মধ্যে যে যত অধিক-সংখ্যক মস্তক শিকার করিতে পারে তাহার গৌরব তত বেশী। ফরমোসার মস্তক-শিকারী আদিম অধিবাসী, তাহাদের বাসস্থান এবং নরমুণ্ড সাজাইবার ঘর চিত্রে প্রদর্শিত হইল।

একদল নরমুণ্ড-শিকারী
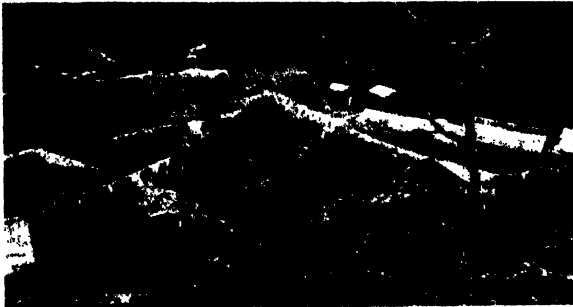
নরমুণ্ড-শিকারীদের বাসস্থান

নরমুণ্ডমালা
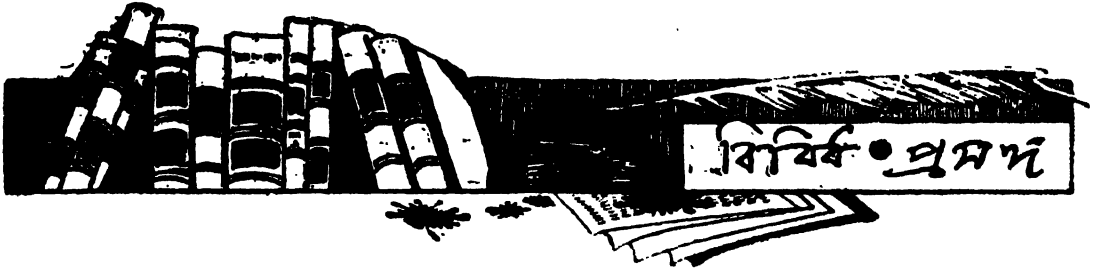
সবরমতী-আশ্রম-ভঙ্গ

মহাত্মা গান্ধী সবরমতী আশ্রম স্থাপন করিয়াছিলেন, ভাঙিয়াও দিলেন তিনি। কয়েক বৎসর পূর্ব্বে, উহার উদ্দেশ্য তখনও সিদ্ধ হয় নাই বলিয়া, তিনি উহার নাম দিয়াছিলেন উদ্যোগ-মন্দির।

এই আশ্রমটির সহিত আমাদের বাহিরের যোগ ছিল না, ইহা আমরা একবার মাত্র দেখিয়াছিলাম। কিন্তু ইহার লক্ষ্যের সহিত আমাদের যোগ ছিল,—যদিও কার্য্যপ্রণালীর সহিত যোগ ছিল না। সেই জন্য, ইহার তিরোভাবে বিষাদ অনুভব করিতেছি।

ইহার ঘরবাড়ি গাছপালা হয়ত থাকিবে। কিন্তু যাঁহাদিগকে ও যাঁহাদের নেতাকে লইয়া আশ্রম, তাঁহারা ও তাঁহাদের নেতা সেখানে আর থাকিবেন না; এবং তাঁহারা সেখানে যে-যে উদ্দেশ্যে যে-সব কাজ করিতেন, সেই সকল উদ্দেশ্যে সেই সব কাজ আর সেখানে হইবে না। মহাত্মাজী বলিয়াছেন, আশ্রমী যিনি যেখানে থাকিবেন, তিনি ও তাহাই আশ্রম হইবে।

জড়ৈশ্বর্য্যের ও তাহার বৃহত্ত্বের সম্মানের দিনে মহাত্মা গান্ধী এখানে মানুষের আধ্যাত্মিক মহত্ত্বের প্রতিষ্ঠা করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। ক্রমবর্দ্ধমান ভোগলালসার প্রাদুর্ভাবের দিনে তিনি সংযম ও চারিত্রিক পবিত্রতার আদর্শ স্থাপিত করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। কিন্তু তিনি আনন্দকে বাদ দেন নাই।

পৃথিবীর প্রায় সমুদয় সভ্য দেশে এখন ধনিকদের অর্থে স্থাপিত কারখানার যন্ত্রপাতিই যেন প্রভু এবং শ্রমিকরা তাহাদের দাস বা যন্ত্রপাতিরই একটা অঙ্গ। মহাত্মা গান্ধী ধনিকদের কারখানার কলের দাসত্ব মানুষের পক্ষে অপকারী জানিয়া, কলের বাহুল্যের ও জটিলতার এবং কারখানার পরিবর্ত্তে সহজ সরল সামান্য কলের সাহায্যে ঘরে ঘরে মানুষের একান্ত দরকারী জিনিসগুলি উৎপাদনের পক্ষপাতী, এবং তাহার প্রবর্ত্তন জন্য চরখায় সুতা কাটা ও হাতের তাঁতে তাহা হইতে কাপড় বোনা চালাইবার চেষ্টা করিয়া আসিতেছেন। এই প্রণালীতে কাজ হইলে মানুষের উপর কলের প্রভুত্বের পরিবর্ত্তে কলের উপর মানুষের স্বাভাবিক প্রভুত্ব রক্ষিত হয়; অধিকন্তু, হাজার হাজার শ্রমিকের দ্বারা বড় বড় কারখানায় বহুপরিমাণ পণ্য-দ্রব্য উৎপাদন প্রথার দ্বারা যে-সকল নৈতিক ও অন্যবিধ অমঙ্গল হইয়াছে, তাহা নিবারিত হয়। গান্ধীজীর উদ্দেশ্য ভাল। কিন্তু সেই উদ্দেশ্য, বৃহৎ ও জটিল যন্ত্রপাতি সমন্বিত বড় বড় কারখানা হাজার হাজার শ্রমিকের দ্বারা উন্নততর পদ্ধতি ও নিয়ম অনুসারে চালাইয়াও সিদ্ধ হইতে পারে কি না, তাহার স্বতন্ত্র আলোচনা হইতে পারে।

প্রত্যেক দেশে সেই দেশের মানুষদেরই কর্ত্তৃত্ব রক্ষিত বা পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হওয়া ন্যায্য ও মঙ্গলকর রাষ্ট্রীয় আদর্শ। এই আদর্শ ভারতবর্ষে প্রতিষ্ঠিত করিতে হইলে একাগ্র প্রযত্নের আবশ্যক। সেই প্রযত্ন যাঁহারা করিবেন, এরূপ কর্ম্মী প্রস্তুত করা এবং কর্ম্মী প্রস্তুত হইলে তাঁহাদিগকে সেই প্রযত্নে প্রবৃত্ত করা, গান্ধীজীর আশ্রমের অন্যতম লক্ষ্য ছিল। এই প্রযত্ন কোন্ পথ ধরিয়া করিতে হইবে, সে-বিষয়ে মতভেদ আগেও ছিল, এখনও আছে। কিন্তু প্রত্যেক দেশে সেই দেশের মানুষদেরই কর্ত্তৃত্ব রক্ষা বা পুনঃপ্রতিষ্ঠা যে বাঞ্ছনীয়, এ-বিষয়ে স্বাজাতিকদের কোন মতভেদ থাকিতে পারে না। কথিত হইয়াছে, যে, ইণ্ডিপেণ্ডেন্স অর্থাৎ স্বাধীনতা, অনধীনতা বা পূর্ণস্বরাজ অপেক্ষা ইণ্টারডিপেণ্ডেন্স অর্থাৎ পরস্পর-নির্ভরশীলতা বড় আদর্শ। সত্য; কিন্তু পূর্ণস্বরাজের সহিত পরস্পরনির্ভরশীলতার কোন একান্ত বিরোধ নাই, বরং পূর্ণস্বরাজ না থাকিলে প্রকৃত পরস্পরনির্ভরশীলতা থাকিতে পারে না। একটি দৃষ্টান্ত লউন। ফ্রান্স ও ব্রিটেনের মধ্যে

প্রকৃত পরস্পরনির্ভরশীলতা জন্মিতে ও থাকিতে পারে এই জন্য. আমেরিকা ও ব্রিটেনের মধ্যে প্রকৃত নির্ভরশীলতা জন্মিতে ও থাকিতে পারে এই জন্য, যে. তাহারা স্বেচ্ছায় ও স্বাধীনভাবে আলোচনা ও বিচার করিয়া পরস্পরনির্ভরশীলতার সর্ত্তগুলি স্থির করিতে পারে। কিন্তু ভারতবর্ষের পূর্ণস্বরাজ ও আত্মকর্ত্তৃত্ব না থাকায়. এবং ব্রিটেন ভারতবর্ষের মনিব হওয়ায়, ব্রিটেনে ও ভারতবর্ষে পরস্পরনির্ভরশীলতা নাই; এবং যত দিন তাহাদের উভয়ের মধ্যে বর্ত্তমান সম্বন্ধ থাকিবে, তত দিন তাহাদের মধ্যে পরস্পরনির্ভরশীলতা জন্মিবে না, ভারতবর্ষকে ব্রিটেনের মুখাপেক্ষী থাকিতে হইবে, ব্রিটেন কোন বিষয়ে ভারতবর্ষের মুখাপেক্ষী হইবে না।

সামাজিক, অর্থনৈতিক, পণ্যশৈল্পিক, রাষ্ট্রীয় ইত্যাদি সব বিষয়ে গান্ধীজীর আশ্রমের বিশেষত্ব এই, যে, তিনি সেখানে প্রতিপক্ষ বা প্রতিদ্বন্দ্বীর বৃহত্ত্ব দেখিয়া অভিভূত বা ভীত হন নাই। তিনি একা বা তাঁহার আশ্রমের আশ্রমীরা সংখ্যায় কম, এরূপ কোন চিন্তা তাঁহাকে সাহসহীন, উৎসাহহীন করে নাই। ধর্ম্মের বল, ন্যায়ের বল. সত্যের বলকেই তিনি শ্রেষ্ঠ বল জানিয়া কাজ করিয়া আসিতেছেন।

দৈহিক শ্রম দ্বারা অন্নবস্ত্রের সংস্থান করা আশ্রমের একটি নিয়ম ছিল। স্বয়ং গান্ধীজী বরাবর এই নিয়ম অনুসারে কাজ করিয়া আসিয়াছেন।

যখন তিনি সহচরবর্গ সহিত সমুদ্রকূলস্থিত ডাণ্ডী নামক স্থানে লবণ প্রস্তুত করিবার জন্য যাত্রা করেন, সেই সময় শান্তিনিকেতনের অন্যতম ভূতপূর্ব্ব কর্ম্মী শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার রায় সবরমতী আশ্রমে গিয়াছিলেন। প্রবাসীর বর্ত্তমান সংখ্যায় আশ্রমটি সম্বন্ধে তিনি যে প্রবন্ধ লিখিয়াছেন, তাহা হইতে উহার আভ্যন্তরীণ ব্যবস্থা সম্বন্ধে পাঠকেরা অনেক কথা জানিতে পারিবেন।

মধ্যপ্রদেশে সরকারী কলেজে ভারতীয় প্রিন্সিপ্যাল

বাংলা দেশে ইংরেজী শিক্ষার সূত্রপাত অন্য অনেক প্রদেশের আগে হইয়াছিল। কিন্তু বঙ্গেও এখনও সব সরকারী কলেজের প্রিন্সিপ্যাল দেশী হইতে নাই, এই কুসংস্কার মরিয়াও মরিতেছে না। সুতরাং অন্যত্র যে এই কুসংস্কার থাকিবে, তাহা আশ্চর্য্যের বিষয় নহে। মধ্যপ্রদেশের রাজধানী নাগপুরের মরিস কলেজ সরকারী কলেজ। ইতিপূর্ব্বে কোন দেশী লোক উহার স্থায়ী প্রিন্সিপ্যাল নিযুক্ত হন নাই। সেই জন্য আমরা অবগত হইয়া সুখী হইলাম, যে, শ্রীযুক্ত অতুলচন্দ্র

শ্রীযুক্ত অতুলচন্দ্র সেনগুপ্ত

সেনগুপ্ত সম্প্রতি ইহার স্থায়ী প্রিন্সিপ্যাল নিযুক্ত হইয়াছেন; কিছুকাল "একটিনি" করিতেছিলেন। তাঁহার যোগ্যতা সম্বন্ধে মধ্যপ্রদেশের প্রধান সংবাদপত্র "হিতবাদ" (*The Hitavada*) লিখিয়াছেন :—

> The confirmation of Mr. A. C. Sen Gupta in his present post, as the Principal of the Morris College. is bound to be received with great satisfaction by the people of the Province. The appointment is a much-coveted distinction indeed, for so far no Indian has been a permanent Principal of this premier college. It is superfluous to speak of Mr. Sen Gupta's qualifications to hold this position, and the local Government did well in confirming him as the Principal of the institution. We congratulate him on his appointment and are sure that he will acquit himself with credit and satisfaction to all concerned in his present position.

বলা আবশ্যক মনে করিতেছি, যে, "হিতবাদ" কাগজটির মালিক বা সম্পাদক বাঙালী নহেন। বঙ্গের বাহিরে আজ-

কালকার দিনে প্রবাসী বাঙালীর যোগ্যতার আদর খুব সাধারণ জিনিষ নহে বলিয়া সংবাদটির বিশেষত্ব আছে।

যতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্তের দেহান্ত

রাষ্ট্রনীতিক্ষেত্রে বঙ্গের অন্যতম প্রধান নেতা যতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্ত মহাশয়ের পরলোকযাত্রায় বঙ্গের যে ক্ষতি হইল, শীঘ্র তাহার পূরণের সম্ভাবনা দেখিতেছি না। তাঁহার স্থান অধিকার করিতে পারেন, বঙ্গীয় নেতাদের মধ্যে এমন কেহ নাই।

তিনি বন্দিদশায় কালযাপন করিতেছিলেন বটে, কিন্তু শীঘ্র হউক, বিলম্বে হউক, তাঁহার খালাস পাইবার সম্ভাবনা ছিল। মুক্তির পর তিনি আবার, হয়ত অল্পকালের জন্যই, দেশের সেবায় প্রবৃত্ত হইতে পারিতেন।

যতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্ত

কিন্তু এখন আর দেশ অল্পকালের জন্যও তাঁহার সেবা পাইবে না। এখন কেবল ভরসা এই, যে, তাঁহার জীবনের স্মৃতি অনেককে এমন করিয়া উদ্বুদ্ধ করিবে, যে, তাঁহাদের দ্বারাও দেশের প্রতি কর্ত্তব্য কিয়ৎ পরিমাণে পালিত হইতে পারিবে।

যতীন্দ্রমোহন নির্ভীক নেতা ছিলেন। তিনি যাহা সত্য মনে করিতেন. শাস্তির ভয়ে তাহা বলিতে নিরস্ত থাকিতেন না। এই জন্য তাঁহাকে অনেক বার কারারুদ্ধ হইতে হইয়াছিল। তাহাতে তিনি দমিয়া যান নাই। অনেক সত্য তথ্য আছে, যাহা জানিলেও যখন তখন প্রকাশ করিলে তাহাতে দেশের হিত হয় না। যে-সত্য বলা দেশহিতের জন্য আবশ্যক, ভয়ে তাহা বলিতে নিরস্ত থাকা অনুচিত। যতীন্দ্রমোহন এরূপ সত্য বলিতে কখনও পরাঙ্মুখ হন নাই। তাহা বলার জন্য যে তাঁহার কয়েকবার দণ্ড হইয়াছিল, তাহা আদালতে বিচারের পর হইয়াছিল। কিন্তু তাঁহার শেষ যে শাস্তি হয়, যাহা মরণান্ত শাস্তি, তাহা বিনা বিচারে এবং বিনা স্পষ্ট অভিযোগে হইয়াছিল। অথচ চট্টগ্রামের হিন্দুদের ঘরবাড়ি লুট ও অনেকের সম্পত্তি বিনাশের পর তিনি একাধিক বার বক্তৃতায় ও ছাপার অক্ষরে কোন কোন রাজকর্ম্মচারীর ও অন্য অনেক লোকদের বিরুদ্ধে যাহা প্রকাশ করিয়াছিলেন, তাহার জন্য তাঁহার বিরুদ্ধে মোকদ্দমা হইতে পারিত, এবং তাহা হইলে তিনি যাহা প্রকাশ করিয়াছিলেন তাহা যে প্রত্যাহার করিতেন না, তাহাও নিশ্চিত। কিন্তু গবন্মেণ্ট ইহার জন্য তাঁহার নামে মোকদ্দমা করেন নাই, তাঁহার বিচার হয় নাই। অতঃপর তিনি স্বাস্থ্যলাভের জন্য ইউরোপ যান। যখন ফিরিয়া আসেন, তখনও তিনি সুস্থ হন নাই। দেশে পদার্পণ করিবার পূর্ব্বেই গবন্মেণ্ট বিনা বিচারে তাঁহাকে বন্দী করেন। চট্টগ্রামের হিন্দুদের ঘরবাড়ি লুট সম্বন্ধে গবন্মেণ্ট অনুসন্ধান করাইয়াছিলেন, কিন্তু রিপোর্ট প্রকাশ করেন নাই। বহু বিলম্বে উহার সামান্য যে আভাস গবন্মেণ্ট-পক্ষ হইতে দেওয়া হয়, তাহাতে লোকের এই

ধারণা হইয়াছিল, যে, যতীন্দ্রমোহন যাহা প্রকাশ করিয়াছিলেন তাহা সত্য।

নির্ভীকতাই যতীন্দ্রমোহনের নেতৃত্বের একমাত্র কারণ ছিল না। দেশহিতকর কাজ অন্তরের সহিত করিতে গেলে অনেক সময় কেবল যে নিজের শক্তি ও সময় অকাতরে দিতে হয়, তাহা নহে, টাকাও দিতে হয় কখন কখন সর্ব্বস্বান্ত হইতে হয়। যতীন্দ্রমোহনের পুঁজিপাটা যাহা ছিল, তাহা তিনি দেশহিতার্থ ব্যয় করিয়াছিলেন, ঋণগ্রস্ত হইয়াছিলেন, ব্যারিষ্টারীতে পসার ছিল তাহাও ছাড়িয়া দিয়াছিলেন। একান্ত আবশ্যক হওয়াতে তিনি আবার আইনজীবী হইতে বাধ্য হন।

তিনি পাঁচ বার কলিকাতার মেয়র হইয়াছিলেন, এবং বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটির নেতৃস্থানীয়ও দীর্ঘকাল ছিলেন। এইরূপ পদগুলিকে কখনও স্বার্থসিদ্ধির উপায়রূপে তিনি ব্যবহার করেন নাই। মেয়রের পদের নিরপেক্ষতা ও সম্ভ্রম তিনি অক্ষুণ্ণ রাখিতে পারিয়াছিলেন।

তিনি কেবল রাজনৈতিক কার্য্য দ্বারাই দেশহিতের চেষ্টা করেন নাই, বঙ্গের পণ্যশিল্পাদির উন্নতির চেষ্টাও করিয়াছিলেন।

সুস্থ মানুষকেও বিনা বিচারে বন্দী করিলে গবর্ন্মেণ্টের অখ্যাতি হয়, অসুস্থ মানুষকে তাহা করিলে অখ্যাতি আরও বেশী হয়। তেমন মানুষের বন্দিদশায় মৃত্যু হইলে অখ্যাতি আরও বাড়ে। সত্য বটে, গবর্ন্মেণ্ট শেষটা তাঁহাকে স্বাস্থ্যকর স্থানে কতকটা স্বাধীন ভাবে থাকিতে দিয়াছিলেন। ইহা মন্দের ভাল। কিন্তু ফলে দেখা গেল, তখন আর তাঁহার সারিবার সময় ছিল না। মনের প্রফুল্লতা রোগীর আরোগ্যলাভে সাহায্য করে, অনেক রোগে নিরুদ্বেগতা ভিন্ন স্বাস্থ্যলাভ দুর্ঘট। সুতরাং যদি গবর্ন্মেণ্ট সেনগুপ্ত মহাশয়কে সুচিকিৎসক ও ভাল ঔষধ দিবার ব্যবস্থা করিয়াও থাকেন, তাহা হইলেও তাঁহার স্বাধীনতালোপ তাঁহাকে সুস্থ হইতে দেয় নাই।

যাহা হউক, ধনের জন্য, আরামের জন্য, স্বাস্থ্যের জন্য, আয়ু বাড়াইবার জন্য, পরিবারবর্গের স্বাচ্ছন্দ্যের জন্য সেনগুপ্ত মহাশয় যে তাঁহার পতাকা নামান নাই, ইহাতে শুধু তিনি নহেন, তাঁহার জাতিও গৌরবান্বিত হইয়াছে।

নিবার্য্য কোন কারণে কোন দেশের অজ্ঞাত অখ্যাত একটি মানুষও মরিলে তাহাতে সেই দেশের অগৌরব হয়। সুতরাং যতীন্দ্রমোহনের মত মানুষের বিনা বিচারে বন্দিদশায় মৃত্যু যে আমাদের কত বড় কলঙ্ক ও কিরূপ অক্ষমতার পরিচায়ক, তাহা সহজেই অনুমেয়।

—

জ্ঞানচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

সাতান্ন বৎসর বয়সে অবসরপ্রাপ্ত সব্‌জজ্‌ জ্ঞানচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় দেহত্যাগ করিয়াছেন। তিনি সর্ব্বসাধারণের পরিচিত ছিলেন না। রাজনৈতিক আন্দোলনে যোগ দিলে মানুষ সহজেই নামজাদা হইতে পারে।

জ্ঞানচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

সরকারী চাকরি করিতেন বলিয়া তিনি রাজনৈতিক আন্দোলনে যোগ দেন নাই। কিন্তু তাঁহার রাজনীতির জ্ঞান যে কিরূপ গভীর ও ব্যাপক ছিল, তাহা আমাদিগকে লিখিত তাঁহার চিঠিপত্র হইতে আমরা ভাল করিয়া জানিতাম। সমাজবিজ্ঞান, রাষ্ট্রনীতিবিজ্ঞান, ইতিহাস প্রভৃতি বিষয়ে তিনি পুরাতন বহি ত পড়িয়াই ছিলেন, নূতন বহিও প্রকাশ হইবা মাত্র ক্রয় করিয়া বা লাইব্রেরী হইতে আনিয়া পড়িতেন। কিন্তু তা বলিয়া তিনি গ্রন্থকীটজাতীয় মানুষ ছিলেন না। "পলিটিকাস্", এই ছদ্মনামে তিনি মডার্ণ রিভিউ কাগজে প্রবন্ধ লিখিয়া ও নানা পুস্তকের সমালোচনা করিয়া পাঠকবর্গকে তাঁহার বিস্তৃত অধ্যয়নের ফলভাগী করিতেন। আমরা মডার্ণ রিভিউ কাগজে এবং কখন কখন প্রবাসীতেও তাঁহার সংগৃহীত বহু বিখ্যাত লেখকের উক্তি ও মন্তব্য প্রকাশিত করিয়াছি। এখনও সেরূপ কিছু

উপকরণ আমাদের নিকট রহিয়াছে। তিনি কয়েকখানি পুস্তক লিখিবার জন্য অনেক বৎসর ধরিয়া প্রস্তুত হইতেছিলেন। কিন্তু তাঁহার প্রস্তুতির আদর্শ এত উচ্চ ছিল, যে, দুঃখের বিষয় কোন পুস্তকই তিনি লিখিয়া যাইতে পারেন নাই। প্রাচীন ভারতের বৌদ্ধ যুগ প্রভৃতি সম্বন্ধে তিনি খুব পড়াশুনা ও সংগ্রহ করিয়াছিলেন।

তাঁহার চিঠিপত্র হইতে আমরা সমসাময়িক অনেক রাজনৈতিক ঘটনা সম্বন্ধে নিগূঢ় সঙ্কেত পাইতাম এবং আমাদের লেখায় তাহা ব্যবহার করিতাম। তাঁহার মত আন্তরিক স্বাজাতিকতা ও বাঙালী-হিতৈষিতা কম লোকেরই দেখিয়াছি।

তিনি বাংলা ও ইংরেজী উভয় ভাষাতেই সুলেখক ছিলেন। ইংরেজীই বেশী লিখিতেন। আমরা যখন "প্রদীপ" নামক অধুনালুপ্ত মাসিক পত্র গত খ্রীষ্টীয় শতাব্দীতে বাহির করি, তাহাতেও তিনি কখন কখন প্রবন্ধ লিখিতেন। ১৮৯৯ খ্রীষ্টাব্দে রমেশচন্দ্র দত্ত মহাশয়ের সভাপতিত্বে লক্ষ্ণৌ শহরে কংগ্রেসের যে অধিবেশন হয়, তাহাতে তাঁহার সহিত আমাদের প্রথম চাক্ষুষ পরিচয় হয়। তখন তিনি সরকারী চাকরি গ্রহণ করেন নাই। তিনি কিছুকাল ত্রিপুরা রাজ্যে চাকরি করিয়াছিলেন। তিনি আমাদের শ্রদ্ধেয় ও হিতকারী বন্ধু ছিলেন।

স্যর পুরুষোত্তমদাস ঠাকুরদাস ও পাটরপ্তানী শুল্ক

মাসাধিক পূর্ব্বে প্রথমে একটি এংলো-ইণ্ডিয়ান কাগজে এই খবর প্রকাশিত হয়, যে, বিলাতে জয়েণ্ট সিলেক্ট কমিটিতে স্যর পুরুষোত্তমদাস ঠাকুরদাস বাংলা দেশের পাটরপ্তানী শুল্কের অর্দ্ধেক পাওয়ারও বিরোধিতা করিয়াছেন। তাহার পর এই সংবাদের সত্যতার উপর নির্ভর করিয়া দৈনিক ও সাপ্তাহিক নানা কাগজে মন্তব্য প্রকাশিত হয়। সংবাদটির অনেক দিন কোনও প্রতিবাদ হয় নাই। আমরা দৈনিক ও সাপ্তাহিক কাগজগুলির উপর নির্ভর করিয়া শ্রাবণের প্রবাসীতে ঐ বিষয়ে কিছু লিখিয়াছিলাম। সম্প্রতি শ্রীযুক্ত অমৃতলাল ওঝা লণ্ডনে স্যর পুরুষোত্তমদাসকে টেলিগ্রাম করিয়া জানিয়াছেন এবং দৈনিক কাগজগুলিতে লিখিয়াছেন, যে, সংবাদটি মিথ্যা, স্যর পুরুষোত্তমদাস পাটরপ্তানী শুল্ক বাংলা দেশের পাওয়ার বিরোধিতা করেন নাই। সংবাদটি যে মিথ্যা, ইহা সন্তোষের বিষয়। আমরা আমাদের গত মাসের মন্তব্যগুলি প্রত্যাহার করিলাম।

—

অনিলকুমার রায়চৌধুরী

শ্রীযুক্ত অনিলকুমার রায় চৌধুরীর অকাল মৃত্যুতে বাংলা দেশের, বিশেষ করিয়া হিন্দু বাঙালীদের, সাতিশয় ক্ষতি হইয়াছে। তিনি বঙ্গীয় প্রাদেশিক হিন্দুসভার সহকারী

অনিলকুমার রায় চৌধুরী

সম্পাদক, উহার হিন্দুনারী-রক্ষা সমিতির সম্পাদক, এবং হিন্দু অবলা-আশ্রম ও শিশু-সদনের সম্পাদক ছিলেন। তদ্ভিন্ন তিনি কোন কোন ব্যায়াম সমিতির পৃষ্ঠপোষক ছিলেন, এবং কংগ্রেসেরও একজন কর্ম্মিষ্ঠ সভ্য ছিলেন।

—

ডাক্তার শ্রীযুক্ত কেদারনাথ দাসের সম্মানলাভ

ডাক্তার কেদারনাথ দাস চিকিৎসাশাস্ত্রের স্ত্রীরোগ, ধাত্রীবিদ্যা প্রভৃতি বিষয়ে যে পাণ্ডিত্যমূলক গবেষণা করিয়াছেন তাহার জন্য জগতের সর্ব্বত্র তাঁহার নাম সুপরিচিত। স্ত্রীরোগাদি সম্বন্ধে তিনি একজন প্রধান বিশেষজ্ঞ বলিয়া অধুনা সর্ব্বত্র স্বীকৃত হইয়াছেন। চিকিৎসা-বিদ্যার প্রচার ও

প্রসার করেও তাঁহার কৃতিত্ব অনেক। তিনি কলিকাতার একমাত্র বে-সরকারী চিকিৎসা বিষয়ক কলেজে বহু বৎসর যাবৎ
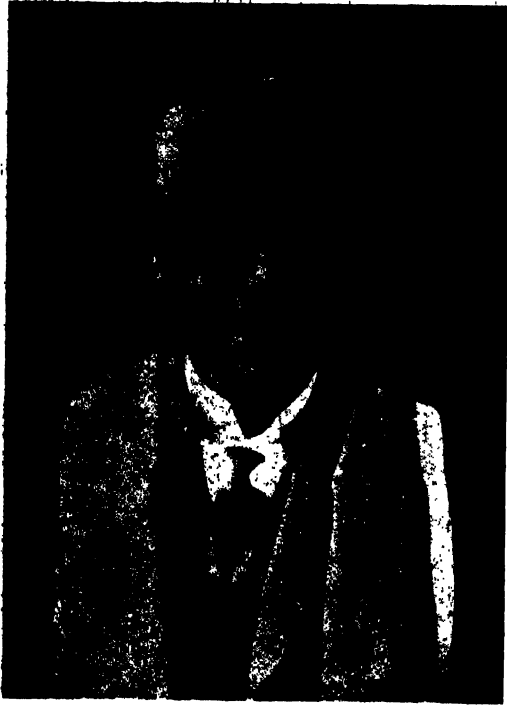
ডাক্তার শ্রীযুক্ত কেদারনাথ দাস

অতি যোগ্যতার সহিত অধ্যক্ষের কার্য্য করিয়া আসিতেছেন। তাঁহার মত কৃতী পুরুষের 'নাইট' উপাধি লাভে আমরা অতিশয় আনন্দিত হইয়াছি।

ধনিকদের কারখানা ও শ্রমিকদের আংশিক দাসত্ব

বাষ্পীয় বা বৈদ্যুতিক শক্তির দ্বারা চালিত বড় বড় যন্ত্রের দ্বারা বৃহৎ কারখানাসমূহে নানাবিধ পণ্য দ্রব্য যত শীঘ্র, যত বেশী পরিমাণে এবং যত কম খরচে প্রস্তুত হয়, মানুষ নিজের নিজের বাড়িতে বসিয়া তত বেশী পণ্য দ্রব্য তত দ্রুত ও তত সস্তায় উৎপন্ন করিতে পারে না। আগে কারিকরেরা নিজের নিজের বাড়িতে ও দোকানে যে-সব জিনিষ প্রস্তুত করিত, তাহার অধিকাংশই বড় বড় কারখানার প্রতিযোগিতার আর কারিকরদের বাড়িতে তৈরি হয় না। তাহাতে তাহাদের ক্ষতি হইয়াছে। অন্য দিকে অবশ্য হাজার হাজার শ্রমিকের অন্নসংস্থান হইয়াছে এবং কারখানার মালিক ধনিকেরা ধনশালী হইয়াছে। এক এক জন মানুষের হাতে প্রচুর অর্থ যাওয়া এবং অধিকাংশ লোকের কেবল অন্নবস্ত্রের সংস্থান কষ্টে হওয়া বাঞ্ছনীয় সামাজিক অবস্থা নহে। কতকগুলি লোক যে প্রভূত ধন সঞ্চয় করিতেছে, তাহার অনিষ্টকারিতার আলোচনা সম্প্রতি না করিয়া শ্রমিকদের কথাই কিঞ্চিৎ আলোচনা করি।

যে-সব বড় বড় কারখানায় প্রস্তুত পণ্য দ্রব্যের কাটতি আমাদের দেশে হয়, তাহার অধিকাংশ বিদেশে স্থিত। সুতরাং আমাদের দেশের ধনিক বা শ্রমিক কেহই তাহা হইতে লাভবান্ হয় না। আমাদের দেশের অনেক কারখানারও মালিক বিদেশীরা। সুতরাং তাহারও লাভের ভাগ আমাদের দেশের ধনিকেরা পায় না। ভারতবর্ষের কারখানা-সকলের শ্রমিকেরা কেহই কোথাও যথেষ্ট বেতন পায় না, এমন নয়। কিন্তু সাধারণতঃ তাহারা যাহা পায় তাহা পরিবারবর্গের প্রতিপালন, স্বাস্থ্যরক্ষা, সন্তানদের শিক্ষা, রোগের সময় চিকিৎসা, জ্ঞানোপার্জ্জন, এবং আনন্দে অবসরকাল যাপনের পক্ষে যথেষ্ট নহে। অথচ মালিকরা এসব বিষয়ে কোন অসুবিধা ভোগ করে না। কারখানা-সকলে উৎপন্ন ধনের এইরূপ ভাগবাঁটোয়ারা ন্যায়সঙ্গত নহে। ধনবিভাজন অধিকতর ন্যায়সঙ্গত হওয়া আবশ্যক। এক জায়গায় বিস্তর নিঃসম্পর্ক স্ত্রীলোক ও পুরুষ নিজ নিজ পারিবারিক, গ্রামীয় ও সামাজিক প্রভাব হইতে দূরে এবং শালীনতা রক্ষার অনুপযোগী গৃহে বাস করায় তাহাদের অনেকের নৈতিক অবনতিও ঘটে। অত্যধিক দৈহিক শ্রম হইতে উৎপন্ন ক্লান্তি ও অবসাদের পর তাহারা অনেকে, বিশুদ্ধ আনন্দের ব্যবস্থা না থাকায় এবং উত্তেজক মাদক দ্রব্য সহজলভ্য হওয়ায়, সুরাপায়ী হয় এবং আনুষঙ্গিক অন্য পাপাচারে লিপ্ত হয়। এই সকল অমঙ্গল ছাড়া, ধনিকদের বড় বড় কারখানায় পণ্যদ্রব্য উৎপাদন প্রথার আর এক দোষ এই, যে, শ্রমিকরা অন্যের দ্বারা যন্ত্রের মত চালিত হয়, কারখানা-পরিচালনের কোন ব্যবস্থা সম্বন্ধে তাহাদের কোন হাত থাকে না, এবং তাহাদের মতামতের কোন মূল্য নাই—কোন ব্যবস্থা অসহ্য হইলে তাহারা হয় ধর্ম্মঘট করিয়া নয় কাজ ছাড়িয়া দিয়া উপবাসের সম্মুখীন হয়।

পণ্য দ্রব্য উৎপাদনের জন্ত কারিকররা নিজের বাড়িতে থাকিয়া সাবেক প্রথা অনুসারে কাজ করিলে ঐরূপ অনেক অনিষ্ট না হইতে পারে বটে ; এবং চরখা ও হাতের তাঁতের বিস্তৃত প্রচলনের জন্ত গান্ধীজী যে চেষ্টা করিতেছেন, ঐরূপ নানা অনিষ্ট নিবারণ তাহার অন্যতম উদ্দেশ্যও বটে। কিন্তু কারিকরদের নিজ নিজ বাড়িতে উৎপন্ন পণ্য দ্রব্য দামে কারখানাজাত জিনিষের সঙ্গে প্রতিযোগিতা করিতে পারে না, কারিকররা বিজ্ঞাপন দেওয়া প্রভৃতি বিক্রীর উপায় অবলম্বনও ধনিকদের মত করিতে পারে না। এইরূপ নানা কারণে সকল পণ্য দ্রব্যই আগেকার মত কুটীরে নির্ম্মিত হইবার সম্ভাবনা কম। কিছু এখনও হয়, পরেও হয়ত হইতে থাকিবে। কিন্তু অনেক জিনিষই বড় বড় কারখানাতেই প্রস্তুত হইবে। সেগুলিকে শ্রমিকদের পক্ষে সব দিক্ দিয়া হিতকর কি প্রকারে করা যায়, ইহা আধুনিক সভ্য জগতের একটি প্রধান সমস্যা। এই সমস্যার সমাধানের চেষ্টাও সভ্য জগতে হইতেছে। তাহার কিছু বিবরণ প্রবাসীতে পরে দিবার ইচ্ছা আছে।

—

মানভূমে প্রাচীন মন্দির ও মূর্ত্তি

মানভূম জেলায় যে-সব প্রাচীন মন্দির ও মূর্ত্তি আছে, তাহাদের কয়েকটি সম্বন্ধে লিখিত বর্তমান সংখ্যায় মুদ্রিত প্রবন্ধে পাকবিড়রা গ্রামের একটি প্রকাণ্ড জৈন মূর্ত্তির উল্লেখ আছে। আমরা কয়েক বৎসর পূর্ব্বে যখন "হরিপদ সাহিত্য-মন্দির" প্রতিষ্ঠা উপলক্ষ্যে পুরুলিয়া যাই, তখন ঐ মূর্ত্তিটি দেখিয়া আসিয়াছিলাম। উহা কাল পাথরের নগ্ন মূর্ত্তি, সাড়ে সাত আট ফুট উঁচু হইবে। যে খড়ের ঘরটিতে উহা রক্ষিত আছে, তাহা আঁধার। ঘরটিতে ছোট ছোট আরও কয়েকটি কাল পাথরের মূর্ত্তি আছে। সেগুলি নারীমূর্ত্তি। বড় মূর্ত্তিটিকে এখন স্থানীয় লোকেরা ভৈরব বলিয়া পূজা করে, এবং ছাগবলি এই পূজার একটি অঙ্গ। গ্রামটির নাম আমরা পাতবিড়রা শুনিয়াছিলাম। তাহা আমাদের শুনিবার ভুল হইতে পারে।

—

স্যর নৃপেন্দ্রনাথ সরকারের অভ্যর্থনা

ভারতবর্ষের ভবিষ্যৎ শাসনবিধির যে আভাস "সাদা কাগজ" নামক পুস্তিকার প্রস্তাবগুলিতে পাওয়া যায়, তাহা হইতে বুঝিতে পারা গিয়াছে, যে, বাংলা দেশের প্রতি ঐ সব প্রস্তাবে খুব অবিচার করা হইয়াছে। বাংলা দেশের প্রাদেশিক গবর্ন্মেণ্টের ব্যয় নির্ব্বাহার্থ ভবিষ্যতে যত রাজস্ব পাইবার সম্ভাবনা বুঝা যাইতেছে, তাহাতে বঙ্গের আর্থিক দুর্দ্দশা এখনকারই মত থাকিয়া যাইবে। পাটরপ্তানী শুল্কের সবটা টাকা বাংলা দেশ পাইলে তবু বন্দোবস্তটা কিছু ন্যায্য হয়। উহা যাহাতে পাওয়া যায়, তাহার জন্য স্যর নৃপেন্দ্রনাথ সরকার বিলাতে খুব চেষ্টা করিয়াছেন। বাংলা গবন্মেণ্ট ঐ শুল্কটা রাজস্ব পাইলে, তাহার সুফল বঙ্গের সকল ধর্ম্মসম্প্রদায়ের লোক ভোগ করিবে; যাহাদের সংখ্যা বেশী তাহাদের সুবিধাই বেশী হইবে। অতএব, স্যর নৃপেন্দ্রনাথ সরকারের অভ্যর্থনার যে আয়োজন হইতেছে, তাহাতে সকল ধর্ম্ম-সম্প্রদায়ের যোগদানে কোন বাধা দেখিতেছি না। সভার উদ্যোক্তারা কাহাকেও বাদ না দিলে ভাল হয়।

সত্য বটে, তিনি হিন্দুদিগকে এবং "উচ্চ" বর্ণের হিন্দুদিগকে ব্যবস্থাপক সভায় অযথেষ্টসংখ্যক আসন দিয়ায় যে অবিচার হইয়াছে, সেই অবিচারের প্রতিকারচেষ্টাও করিয়াছেন। কিন্তু কাহারও প্রতি অবিচার করিয়া হিন্দুদিগকে ও "উচ্চ" বর্ণের হিন্দুদিগকে অধিক আসন দিতে তিনি বলেন নাই। সুতরাং শুধু এই কারণে, বঙ্গের যথেষ্ট রাজস্বপ্রাপ্তির পক্ষে তিনি যে প্রভূত চেষ্টা করিয়াছেন সে চেষ্টা কোন শ্রেণীর লোকদের দ্বারা অনাদৃত হইবার যোগ্য নহে।

অন্য একটি বিষয়ে তিনি যে চেষ্টা করিয়াছেন, তাহা সকল প্রদেশেরই উপকারার্থ। প্রত্যেক প্রদেশের হাইকোর্টকে তিনি তত্তৎপ্রদেশের গবর্ন্মেণ্টের অধীন না করিয়া কেন্দ্রীয় ভারত-গবর্ন্মেণ্টের অধীন করিবার পক্ষে যুক্তি দেখাইয়াছেন। এরূপ ব্যবস্থা হইলে হাইকোর্টের জজদের অধিকতর স্বাধীনতা থাকিবে, এবং রাজনৈতিক মোকদ্দমাতেও তাঁহাদের দ্বারা সুবিচারের সম্ভাবনা কমিবে না।

স্যর নৃপেন্দ্রনাথ সরকার শুধু বঙ্গের জন্যই যে চেষ্টা করিয়াছেন, তাহাও সফল হইলে সমগ্র ভারতের পক্ষে হিতকর হইবে। কারণ, অঙ্গগুলি লইয়াই সমগ্র, এবং যাহা কোন অঙ্গের পক্ষে হিতকর, তাহা সমগ্রের পক্ষেও হিতকর।

কংগ্রেসের কার্য্যপন্থা

গ্রামের, শহরের, জেলার, প্রদেশের, সমগ্রভারতের সব কংগ্রেস আফিস এবং দলবদ্ধভাবে কাজ করিবার সব সমিতি কংগ্রেসের য়্যাক্টিং প্রেসিডেন্ট আণে মহাশয় ভাঙিয়া দিয়াছেন এবং মহাত্মা গান্ধী এই কার্য্যের সমর্থন করিয়াছেন, উভয়ের বর্ণনাপত্র হইতে লোকে এইরূপ বুঝিয়াছিল। কোথাকারও ছোট বা বড় কংগ্রেস আফিস বা সমিতি উঠাইয়া দিবার ক্ষমতা বা অধিকার তাঁহার আছে কিনা, এবিষয়ে তর্কবিতর্ক হইয়াছে। তিনি বলিয়াছেন, তিনি সমগ্রভারতীয় কংগ্রেস-কমিটি উঠাইয়া দেন নাই। ইহাও কথিত হইয়াছে, যে, গবর্ন্মেণ্ট সমগ্রভারতীয় কংগ্রেস-কমিটিকে বে-আইনী ঘোষণা করেন নাই। তাহা হইলে ঐ কমিটির সভ্যদিগকে কোথাও আহ্বান করিয়া তাঁহাদিগকে কংগ্রেসের ভবিষ্যৎ কার্য্যপ্রণালী সম্বন্ধে আলোচনা করিতে বলা যাইতে পারে। কিন্তু কংগ্রেসও ত কখনও বেআইনী বলিয়া ঘোষিত হয় নাই। অথচ কলিকাতায় উহার গত অধিবেশন পুলিস না হইতে দিবার খুব চেষ্টা করিয়াছিল, এবং তাহা সত্ত্বেও অধিবেশন আরম্ভ হওয়ায় তাহা ভাঙিয়া দিয়াছিল। সুতরাং সমগ্রভারতীয় কংগ্রেস-কমিটির অধিবেশনও গবর্ন্মেণ্ট হইতে দিবেন কিনা নিশ্চিত বলা যায় না। অতএব, বর্ত্তমান অবস্থায় কংগ্রেস কি করিতে পারে না-পারে তাহাই বুঝিবার চেষ্টা করা ভাল।

মহাত্মাজীর অনুমোদিত আণে মহাশয়ের উপদেশপত্র অনুসারে কংগ্রেসের লোকেরা দলবদ্ধভাবে বা একা একা "গঠনমূলক" কার্য্য করিতে পারে। এই কাজগুলি বে-আইনী নয়। চরখায় সুতা কাটা ও কাটান, তাহা হইতে হাতের তাঁতে কাপড় বুনা ও বুনান, বর্ত্তমান প্রণালী অপেক্ষা অধিকতর স্বাস্থ্যকর ভাবে নর্দমা ও পায়খানা পরিষ্কার করা ও করান, অস্পৃশ্য ও অনাচরণীয়দিগকে শিক্ষাদান, তাহাদের মদ্যপানাদি দোষ দূরীকরণ, তাহাদের উপার্জ্জনের পথ করিয়া দিয়া আর্থিক উন্নতিসাধন, সমাজে তাহাদিগকে স্পৃশ্য ও আচরণীয় করা—এই সকল এবং এইরূপ নানা কাজ কংগ্রেসওয়ালারা করিতে পারেন। ইহার অধিকাংশ কাজ কংগ্রেসপন্থীরাই যে আরম্ভ করিয়াছেন বা এখন চালাইতেছেন, তাহা নয়। অন্যেরাও আগে ইহা করিয়াছেন, এবং এখনও করেন। তবে মহাত্মা গান্ধীর দৃষ্টান্তে উপদেশে কাজগুলি বিস্তৃততর ভাবে হইতেছে।

এই কাজগুলি ভাল, বেআইনীও নয়। কিন্তু বেআইনী নহে বলিয়াই যে নিরাপদ তাহা বলা যায় না। কারণ বাংলা দেশের অনেক যুবক এই রকম গঠনমূলক কাজই করিত, অথচ বিনা বিচারে তাহারা বন্দী হইয়া আছে। তাহাদের বিরুদ্ধে বেআইনী কাজ করার কোন প্রমাণ থাকিলে, কোন-না-কোন ষড়যন্ত্রের মোকদ্দমার বেড়াজালে তাহারা ধরা পড়িত। কংগ্রেসওয়ালারা সাধারণতঃ ভীরু নহেন। সুতরাং গঠনমূলক কাজগুলি সম্পূর্ণ নিরাপদ নহে বলিয়া যে তাঁহারা তাহা করিবেন না, এরূপ আশঙ্কার কারণ নাই।

রাজনৈতিক কার্য্যক্ষেত্রে কংগ্রেসের বিশেষত্ব অসহযোগ, আইন অমান্য করা, ট্যাক্স ও খাজনা না-দেওয়া, ইত্যাদি। এগুলি দলবদ্ধভাবে করিতে নিষেধ করা হইয়াছে। বলা হইয়াছে, যে, কংগ্রেসওয়ালারা একা একা নিজের দায়িত্বে কিছু গোপন না করিয়া কোন-না-কোন প্রকারে অসহযোগিতা করিতে পারেন, এবং করিবেন এরূপ আশা আণে মহাশয় প্রকাশ করিয়াছেন। কিছু গোপন রাখা সত্যাগ্রহের সহিত পূর্ণমাত্রায় খাপ খায় না বলিয়া গোপনীয়তা পরিহার করিতে বলা হইয়াছে। সত্য আচরণ যাঁহাদের লক্ষ্য, তাঁহারা টাকাকড়ি লুকাইয়া রাখিলে, গতিবিধির সংবাদ ও কার্য্যপ্রণালীর সংবাদ গোপন রাখিলে, তাহা ঠিক সত্যে আগ্রহ প্রকাশ করে না, এবং যাহা গোপন রাখা হইতেছে, তাহা প্রকাশিত হইলে—অন্ততঃ অসময়ে প্রকাশিত হইলে—আর্থিক ক্ষতি ও কাজের ক্ষতি হইবার ভয় থাকে। সুতরাং গোপনীয়তা সত্যাগ্রহের এবং নির্ভীকতার কতকটা পরিপন্থী বটে। কিন্তু সম্পূর্ণ খোলাখুলি ভাবে কোন বিদ্রোহাত্মক কাজ চালান যায় কিনা, কংগ্রেসওয়ালারা হয়ত তাহা ভাবিতেছেন। অসহযোগ আন্দোলন অহিংস বটে; কিন্তু সশস্ত্র স্বাধীনতা-যুদ্ধ যেমন বিদ্রোহ, ইহাও তেমনি বিদ্রোহ। ইতিহাসপাঠকেরা জানেন, সশস্ত্র যুদ্ধে কোন পক্ষ নিজের কার্য্যপ্রণালী, অভিযানের পথ, যুদ্ধের সরঞ্জামের পরিমাণ, অর্থবল, লোকবল প্রভৃতি অপর পক্ষকে জানায় না। ব্যক্তিগত ভাবে যাঁহারা সত্যাগ্রহী হইবেন, তাঁহাদের প্রত্যেককে গান্ধীজীর উপদেশ ঠিক পালন করিতে হইলে, আগে হইতে শাসন বা পুলিস বিভাগের রাজকর্ম্মচারী-

দিগকে জানাইতে হইবে, "আমি অমুক দিন অমুক সময় অমুক বিদেশী জিনিষের বা মদের দোকান পিকেট করিব, হাটিয়াই যাইব (কিংবা বাসে বা ট্রামে যাইব এবং তাহার জন্য আমার পুঁজি এই পরিমাণ আছে)" ; কিংবা "আমি আমার বাক্সে এত টাকা এত আনা এত পয়সা মৌজুদ থাকা সত্বেও খাজনা দিব না" ; কিংবা "আমি অহিংস অসহযোগ ও অহিংস আইনলঙ্ঘন প্রচার করিবার নিমিত্ত অমুক দিন অমুক ট্রেনে বা ষ্টীমারে অমুক স্থানে যাইব এবং তাহার জন্য আমার পাথেয় এত আছে" ; ইত্যাদি। এরূপ খবর দিলে কারাদণ্ড বা প্রহারভোগ অনিবার্য্য হইবে বটে, কিন্তু অসহযোগের মুখ্য উদ্দেশ্য সাক্ষাৎভাবে সিদ্ধ হইবে না। কংগ্রেস-কর্ম্মীদের এইরূপ দুঃখভোগে বিদেশীবস্ত্রবিক্রেতা, মদ্যবিক্রেতা, খাজনা-সংগ্রাহক, ট্যাক্সসংগ্রাহক প্রভৃতির হৃদয়ের পরিবর্ত্তন হইবে কিনা, তাহাও অনুমানসাপেক্ষ।

সরকারী কর্ম্মচারীবিশেষকে সব কথা না জানাইলে ব্যক্তিগতভাবেও সত্যপ্রিয় অসহযোগী হওয়া যাইবে না। প্রকৃত সন্ন্যাসীর পক্ষে এই নীতি অবলম্বন সাধ্যায়ত্ত হইতে পারে। গৃহী উহা অবলম্বন করিলে তাহার সম্পর্কীয় বা তাহার পোষ্য লোকদের তাহাতে অসুবিধা হইবার সম্ভাবনা। কারণ, যদি হাকিমকে ও পুলিসকে অসহযোগী নিজের পুঁজির খবর দেন এবং বলেন, যে, তাহার সমস্তটা বা কোন অংশ অসহযোগের জন্য ব্যয়িত হইবে, তাহা হইলে বর্ত্তমান কোন-না-কোন আইন অনুসারে উহা বাজেয়াপ্ত হইতে পারে না, আইনজ্ঞ কেহ এরূপ অভয় দিতে পারেন কিনা জানি না। যদি বাজেয়াপ্ত হইতে পারে, তাহা হইলে ব্যক্তিগত ভাবে অসহযোগী অথচ পূর্ণ সত্য-সেবক কাহারও গৃহস্থের দায়িত্ব লওয়া চলে না। কিন্তু ভারতবর্ষে ভেকধারী সন্ন্যাসী ও প্রকৃত সন্ন্যাসী বহু লক্ষ আছে। সুতরাং প্রকৃত সত্যসেবক অসহযোগী গৃহস্থ হইতে পারেন না বলিয়া কেহই অসহযোগী হইবেন না, ভারতবর্ষের মত দেশের গবর্ণ্মেণ্টের এরূপ নিশ্চিত ধারণা যুক্তিসঙ্গত হইবে না।

কিন্তু একথা ধ্রুব সত্য, এবং অসহযোগ আন্দোলনের আগেও এই ধারণা আমাদের মনে ছিল, যে, ভারতবর্ষের বর্ত্তমান রাজনৈতিক অবস্থায় এমন কোন ব্যক্তি পূর্ণ কর্ত্তব্যনিষ্ঠ ও সত্যপ্রিয় রাজনৈতিক নেতা কিংবা সংবাদপত্র-সম্পাদক হইতে পারেন না, যিনি গৃহস্থাশ্রমে থাকিতে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ, কিংবা যিনি সব সময়েই অন্ততঃ গার্হস্থ্য জীবন হেলায় ত্যাগ করিতে না-পারেন ; কারণ এরূপ কর্ত্তব্যনিষ্ঠ ও সত্যপ্রিয় লোকের কারাদণ্ড হওয়া কিংবা ছাপাখানা বা অন্য সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত হওয়া অসম্ভব নহে।

আগে মহাশয়ের ও গান্ধীজীর উপদেশ কংগ্রেসওয়ালার অক্ষরে অক্ষরে পালন করিবেন কিনা, তাহা তাঁহাদেরই নির্দ্ধার্য উহা কেহ পালন করিতে চাহিলে তাঁহাকে কি করিতে হইবে তাহাই অনুমান করিবার চেষ্টা আমরা করিয়াছি।

—

প্রদেশভেদে আইনের কার্য্যতঃ প্রভেদ

"সাদা কাগজ"টির প্রস্তাবসমূহ কার্য্যে পরিণত হইলে এক প্রদেশগুলি আত্মকর্তৃত্ব পাইলে ভারতবর্ষের ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশে দেওয়ানী ও ফৌজদারী আইনও কিছু কিছু পৃথক রকমের হইতে পারে। তাহাতে অনেক অসুবিধা হইবে। কিন্তু তাহা পরের কথা। এখনই আমরা একটা বিষয়ে দেখিতেছি, আইন কার্য্যতঃ বাংলা দেশে এক রকম এবং অন্যত্র আর এক রকম। অনেক খবর অন্য প্রদেশের গবর্ণ্মেণ্ট প্রকাশ করিতে দেন, বঙ্গে তাহা প্রকাশনীয় নহে। সম্প্রতিই ত মহাত্মা গান্ধীর অনেক কথা, যাহা অন্য প্রদেশের কাগজে বাহির হইয়াছে, তাহা বঙ্গের দৈনিকগুলি বাদ দিতে বাধ্য হইয়াছে।

ভাগ্যে ভারতবর্ষ দেশটা বড় এবং তজ্জন্য এক প্রদেশের কাগজ অন্য প্রদেশে পৌছিতে দেরি হয় ; নতুবা অপেক্ষাকৃত পূর্ণাঙ্গসংবাদবিশিষ্ট অন্য প্রদেশের কাগজগুলির কাটতি বাংলা দেশেই বাড়ায় বাঙালীদের কাগজগুলির কাটতি কমিয়া যাইত। অবশ্য ইহাতে নূতনত্ব কিছু থাকিত না। বঙ্গের বড় ব্যবসায়ার অধিকাংশ অবাঙালী ; বঙ্গে আসিয়া ডাকাতি অন্য প্রদেশের ডাকাতরাও করে ; বঙ্গে ইংরেজের কাগজের কাটতি বেশ আছে ; সুতরাং অবাঙালী ভারতীয়ের বঙ্গের বাহিরের কোন কাগজের কাটতি এখানে বেশী হইলে আশ্চর্য্যের বিষয় হইত না।

ভোটের জোর

বঙ্গের গবর্ণর তাঁহার ঢাকার একটি বক্তৃতায় বলিয়াছিলেন, যে, "the mischief of all doctrines of direct

action, of changing form and personnel of Government by violence, rather than by argument of the ballot box, is that there is no end to the process." বঙ্গে যাহাদিগকে সন্ত্রাসক বলা হয়, তাহারা কি উদ্দেশ্যে খুনখারাপী করে, জানি না। কিন্তু যদি তাহাদের উদ্দেশ্য গবর্ণর ঠিক্ জানিয়া থাকেন, তাহা হইলে তাঁহার বক্তৃতার এই অংশে সন্ত্রাসকদের বিরুদ্ধে তিনি যে যুক্তি প্রয়োগ করিয়াছেন, তাহা সত্য। যদি কোন প্রকারের শাসনপ্রণালীর উপর অসন্তুষ্ট কতকগুলি "মরীয়া" লোক জনকতক সরকারী কর্ম্মচারীকে মারিয়া সেই শাসন প্রণালী পরিবর্ত্তন করিতে এবং অন্য কতকগুলি লোককে নিহত লোকদের জায়গায় নিযুক্ত করিতে পারিত (যাহা কোন দেশে ঘটিয়াছে বলিয়া আমরা অবগত নহি), তাহা হইলে নূতন শাসনপ্রণালী ও নূতন কর্ম্মচারীদের উপর অসন্তুষ্ট অপর কতকগুলি "মরীয়া" লোকও ত ঐ প্রকার উপায় অবলম্বন করিতে পারিত। তাহা হইলে এরূপ রীতির শেষ কোথায়? সুতরাং বঙ্গের লাট অযৌক্তিক কথা বলেন নাই।

কিন্তু তিনি যে ভোটের জোরে শাসনপ্রণালী পরিবর্ত্তন এবং শাসকসমষ্টি পরিবর্ত্তনের কথা বলিয়াছেন, তাহা ভারতবর্ষের মত পরাধীন দেশে হইতে পারে কি? যে-সব স্বাধীন দেশে জনসাধারণের রাষ্ট্রীয় সর্ব্ববিধ ক্ষমতা আছে, তাহারা ভোটের জোরে তাহাদের শাসনপ্রণালী বদলাইতে পারে, কতকগুলি শাসক কর্ম্মচারীর বদলে অন্য কর্ম্মচারী নিযুক্ত করিতে বা করাইতে পারে। কিন্তু আমরা কোন ক্রমেই ভোটের জোরে গবর্ণর-জেনারাল, গবর্ণর, শাসনপরিষদের সভ্য, কমিশনার, ম্যাজিষ্ট্রেট প্রভৃতি বরখাস্ত ও নিয়োগ করিতে পারি না। এখন ভোটের জোরে বেচারা মন্ত্রীদের পদচ্যুতি ঘটিতে পারে বটে। কিন্তু হোয়াইট পেপার অনুসারে শাসনবিধি প্রণীত হইলে ব্যবস্থাপক সভাগুলির সে ক্ষমতাও কার্য্যতঃ থাকিবে না। ইংলণ্ডের ভোটারেরা ভোটের জোরে তাহাদের ও আমাদের উভয়েরই শাসনপ্রণালী ও শাসন-কার্য্যনির্ব্বাহক লোক বদলাইয়া দিতে পারে। কিন্তু তাহাতে আমাদের কী সান্ত্বনা আছে? আমরা চাই নিজেদের পছন্দমত শাসনপ্রণালী। ইতিপূর্ব্বে ভারতীয় ব্যবস্থাপক সভায় অধিকাংশ সভ্যের মতে "জাতীয় দাবি" ("National Demand")-সমর্থক প্রস্তাব একাধিক বার গৃহীত হইয়াছিল। কিন্তু তাহাতে ভারতবর্ষের শাসনপ্রণালী একটুও বদলায় নাই।

—

নৃত্য-সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের মত

যাঁহারা সকল রকম নৃত্যের—বিশেষতঃ বালিকা ও নারীদের সকল রকম নৃত্যের—বিরোধী, তাঁহারা রবীন্দ্রনাথকে সকল নাচের, এমন কি বাই-নাচেরও, সমর্থক মনে করেন। বলা বাহুল্য, তিনি বাস্তবিক তাহা নহেন। নৃত্য সম্বন্ধে তাঁহার মত উদয়শঙ্করকে তাঁহার নিম্নমুদ্রিত আশীর্ব্বাদ হইতে বুঝা যাইবে।

"উদয়শঙ্কর,

তুমি নৃত্যকলাকে সঙ্গিনী ক'রে পশ্চিম মহাদেশের জয়মাল্য নিয়ে বহুদিন পরে ফিরে এসেছ মাতৃভূমিতে। মাতৃভূমি তোমার জন্য রচনা ক'রে রেখেছে—জয়মাল্য নয়—আশীর্ব্বাদপূত বরণমাল্য। বাংলার কবির হাত থেকে আজ তুমি তা গ্রহণ করো।

"আশ্রম থেকে তোমাকে বিদায় দেবার পূর্ব্বে একটি কথা জানিয়ে রাখি। যে কোনো বিদ্যা প্রাণলোকের সৃষ্টি—যেমন নৃত্যবিদ্যা—তার সমৃদ্ধি এবং সংবৃদ্ধির সীমা নাই। আদর্শের কোনো একটি প্রান্তে থেমে তাকে ভারতীয় বা প্রাচ্য বা পাশ্চাত্য নামের দ্বারা চরম ভাবে শ্রেণীবদ্ধ করা বিহিত নয়, কারণ সেই অস্তিমতায় মৃত্যু প্রমাণ করে। তুমি দেশবিদেশের নৃত্যরসিকদের কাছ থেকে প্রভূত সম্মান পেয়েছ, কিন্তু আমি জানি তুমি মনে মনে অনুভব করেছ যে, তোমার সামনে সাধনার পথ এখনো দূরে প্রসারিত, এখনো তোমাকে নূতন প্রেরণা পেতে হবে, উদ্ভাবন করতে হবে নব নব কল্পমূর্ত্তি। আমাদের দেশে 'নবনবোন্মেষশালিনী বুদ্ধি'কেই প্রতিভা বলে। তোমার প্রতিভা আছে, সেই কারণেই আমরা আশা করতে পারি যে, তোমার সৃষ্টি কোনো অতীত যুগের অনুবৃত্তিনে বা প্রাদেশিক অভ্যস্ত সংস্কারে জড়িত হয়ে থাকবে না। প্রতিভা কোনো সীমাবদ্ধ সিদ্ধিতে সন্তুষ্ট থাকে না, অসন্তোষই তার জয়যাত্রাপথের সারথি। সেই পথে যে-সব তোরণ আছে তা থামবার জন্যে নয়, পেরিয়ে যাবার জন্যে।

"একদিন আমাদের দেশের চিত্তে নৃত্যের প্রবাহ ছিল উৎসব। সেই উৎসের পথ কালক্রমে অবরুদ্ধ হয়ে গেছে।

অবসাদগ্রস্ত দেশে আনন্দের সেই ভাষা আজ স্তব্ধ। তার শুষ্ক স্রোতঃপথে মাঝে মাঝে যেখানে তার অবশেষ আছে সে পঙ্কিল এবং ধারাবিহীন। তুমি এই নিরাশ্বাস দেশে নৃত্যকলাকে উৎসাহিত ক'রে আনন্দের এই বাণীকে আবার একবার জাগিয়ে তুলেছ।

"নৃত্যহারা দেশ অনেক সময় এ-কথা ভুলে যায় যে, নৃত্যকলা ভোগের উপকরণমাত্র নয়। মানবসমাজে নৃত্য সেইখানেই বেগবান, গতিশীল, সেইখানেই বিশুদ্ধ, যেখানে মানুষের বীর্য্য আছে। যে দেশে প্রাণের ঐশ্বর্য্য অপর্য্যাপ্ত, নৃত্যে সেখানে শৌর্য্যের বাণী পাওয়া যায়। শ্রাবণমেঘে নৃত্যের রূপ তড়িৎ-লতায়, তার নিত্যসহচর বজ্রাগ্নি। পৌরুষের দুর্গতি যেখানে ঘটে, সেখানে নৃত্য অন্তর্দ্ধান করে, কিংবা বিলাস-ব্যবসায়ীদের হাতে কুহকে আবিষ্ট হয়ে তেজ হারায়, স্বাস্থ্য হারায়, যেমন বাইজীর নাচ। এই পণ্যজীবিনী নৃত্যকলাকে তার দুর্ব্বলতা থেকে তার সমলতা থেকে উদ্ধার করো। সে মন ভোলাবার জন্যে নয়, মন জাগাবার জন্যে। বসন্তের বাতাস অরণ্যের প্রাণশক্তিকে বিচিত্র সৌন্দর্য্যে ও সফলতায় সমুৎসুক ক'রে তোলে। তোমার নৃত্যে ম্লানপ্রাণ দেশে সেই বসন্তের বাতাস জাগুক, তার সুপ্ত শক্তি উৎসাহের উদ্দাম ভাষায় সতেজে আত্মপ্রকাশ করতে উদ্যত হয়ে উঠুক, এই আমি কামনা করি। ইতি।"

কবির এই আশীর্ব্বচন গত ২৮শে আষাঢ় উদয়শঙ্করের শান্তিনিকেতন আশ্রম দর্শন ও তথায় নিজ নৃত্যপ্রদর্শন উপলক্ষ্যে উচ্চারিত হইয়াছিল। ইহা আশীর্ব্বাদ বলিয়া ইহাতে রবীন্দ্রনাথ স্বভাবতই সমালোচনা সুস্পষ্ট করেন নাই। কিন্তু কথাপ্রসঙ্গে উদয়শঙ্করের দলের কোন কোন নৃত্য সম্বন্ধে কবির মত আমরা জানিয়াছি। উদয়শঙ্করের নৃত্যশিক্ষা রাজপুতানার কোন কোন রাজধানীতে হইয়াছিল। মুসলমান আমলের বিলাস ও ভোগলালসার উদ্দীপক পেশাদার নর্ত্তকীদের নৃত্যই সেখানে চলিত আছে। বাইনাচকে ও বাইজীদের নিকট শিক্ষাপ্রাপ্ত লোকদের নাচকে কবি নিন্দনীয়, অবাঞ্ছনীয়, এবং সুরুচিসম্পন্ন দ্রষ্টাদের পীড়াদায়ক মনে করেন বলিয়া আমরা বুঝিয়াছি।

প্রশংসায় উদয়শঙ্কর অবহিত হইয়া যান নাই। তিনি নম্রপ্রকৃতি লোক। তাঁহার কৃতিত্ব সর্ব্বজনের লোকদের দ্বারা স্বীকৃত হইয়া থাকিলেও তিনি নিজে মনে করেন, যে, এখনও নৃত্যকলায় তাঁহার অনেক শিক্ষণীয় ও উদ্ভাবনীয় আছে। তিনি কবিকে বলিয়াছেন, আমেরিকা হইতে ফিরিয়া আসিয়া আবার শিক্ষালাভে যত্নবান হইবেন।

কবি মণিপুরের নৃত্যের প্রশংসা করিয়া থাকেন।

পাটরপ্তানী শুল্ক সম্বন্ধে কলিকাতাস্থ বোম্বাই-বণিকদের মত

পাটরপ্তানী শুল্কের অর্দ্ধাংশও বঙ্গদেশের পাইবার বিরুদ্ধে স্যর পুরুষোত্তমদাস ঠাকুরদাস লণ্ডনে জয়েণ্ট সিলেক্ট কমিটিতে মত প্রকাশ করিয়াছেন বলিয়া সংবাদ কলিকাতায় প্রকাশিত হইলে পর এখানে দেশী অনেক কাগজে এরূপ মতের তীব্র সমালোচনা হয়। তাহার পর শ্রীযুক্ত অমৃতলাল ওঝা এ-বিষয়ে স্যর পুরুষোত্তমদাসকে টেলিগ্রাফ করেন ও তাহার উত্তরে জানিতে পারেন, যে, স্যর পুরুষোত্তমদাস ঐরূপ মত প্রকাশ করেন নাই। ওঝা মহাশয় তাঁহাকে যে টেলিগ্রাম করেন, তাহাতে আছে, "Bombay opinion here supports Bengal claim." "এখানকার (অর্থাৎ কলিকাতার) বোম্বাই-মত বঙ্গের দাবির সমর্থন করে।" কিন্তু ৯ই জুলাইয়ের অমৃতবাজার পত্রিকার সম্পাদকীয় স্তম্ভে লিখিত হইয়াছিল, যে,

"an influential Association, composed predominantly of non-Bengal interests in Calcutta, could not be persuaded to sign a memorandum sent to the Secretary of State by the different leading Associations of Calcutta, including the British (Bengal) Chamber of Commerce, for a readjustment of the scheme for Provincial Finance and the transfer to this Province of the Jute Export Duty and a portion of the Income Tax raised in the Province."

ইহার তাৎপর্য্য এই, যে, ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশের প্রাপ্য রাজস্ব সম্বন্ধে পুনর্বিবেচনা করিবার নিমিত্ত এবং বাংলাকে পাটরপ্তানী শুল্কের টাকাটি এবং বঙ্গে সংগৃহীত ইন্‌কম্-ট্যাক্সের কিয়দংশ দিবার নিমিত্ত ভারত-সচিবের নিকট যে দরখাস্ত যায়, তাহা বঙ্গের ভিন্ন ভিন্ন সমিতি কর্ত্তৃক প্রেরিত হয়; তন্মধ্যে ইউরোপীয়দের বেঙ্গল চেম্বার অব কমার্সও একটি; কিন্তু কলিকাতার প্রধানতঃ অবাঙালী একটি প্রভাবশালী বণিক্‌-সমিতিকে ঐ দরখাস্তে দস্তখত করাইতে পারা যায় নাই। ইণ্ডিয়ান চেম্বার অব কমার্স ই সম্ভবতঃ এই সমিতি।

ইহাতে কলিকাতায় বোম্বাইওয়ালা বণিকদের প্রভাব খুব বেশী। সংবাদপত্রের মারফৎ ওঁরা মহাশয়ের জানান উচিত, যে, ইণ্ডিয়ান চেম্বার অব কমার্স উল্লিখিত দরখাস্তে দস্তখত করিয়াছিলেন কিনা।

—

মীরাট ষড়যন্ত্র মামলা

এলাহাবাদ হাইকোর্টের বিচারে মীরাট ষড়যন্ত্র মামলায় দণ্ডিত ২৭ জনের মধ্যে নয় জন বেকসুর খালাস পাইয়াছেন, অন্য পাঁচ জন এপর্য্যন্ত যতদিন জেলে ছিলেন তাহাই যথেষ্ট শাস্তি বলিয়া খালাস পাইয়াছেন, এবং বাকী সকলের দণ্ড খুব কমাইয়া দেওয়া হইয়াছে। যে জজ মীরাটে বিচার করেন, তাঁহার বিচারেই আগে চারি জন খালাস পাইয়াছিলেন। এই মামলাটির মত শোচনীয় প্রহসন ভারতবর্ষেও কম দেখা যায়। হাইকোর্টের মতে নির্দোষ কতকগুলি লোককে চারি বৎসর ধরিয়া কারাদণ্ড, মোকদ্দমার ব্যয়নির্ব্বাহ রূপ অর্থদণ্ড, কয়েক বৎসর ধরিয়া বেকার থাকিতে বাধ্য হওয়া রূপ অর্থদণ্ড, মানসিক উদ্বেগ, এবং স্বাস্থ্যভঙ্গ সহ্য করিতে হইয়াছে। ইঁহাদের ক্ষতিপূরণ হইবার নয়। অভিযুক্তদের মধ্যে মৃত ব্যক্তিদের ত কথাই নাই। তাঁহাদের স্বদেশবাসীও পরিবারবর্গের ক্ষতি কেহ পূরণ করিতে পারিবে না।

আমাদের বিবেচনায় এই মোকদ্দমাটা হওয়াই উচিত ছিল না। যদি হইল, তাহা হইলে বোম্বাই, কলিকাতা বা এলাহাবাদে না হইয়া মীরাটে কেন হইল, তাহার ন্যায়সঙ্গত কোন কারণ ছিল না। প্রথমেই কোন হাইকোর্টে, যেমন এলাহাবাদ হাইকোর্টে, মোকদ্দমা হইলে অন্ততঃ কতকগুলি লোক চারি বৎসর পূর্ব্বেই খালাস পাইত, এবং সরকারী টাকার ও বিচার-বিভাগের সময় ও শক্তির অপব্যয় হইত না, অভিযুক্তদেরও টাকার অপব্যয় হইত না। মস্কোতে অভিযুক্ত ইংরেজদের বিচার ও শাস্তি, এবং মীরাটে অভিযুক্ত ভারতীয় ও ইংরেজদের বিচার ও শাস্তির তুলনা করিয়া কোন সংবাদপত্র রুশিয়াকে অসভ্যতর বলিতে পারেন নাই, পারিবেন না।

এলাহাবাদ হাইকোর্টে মীরাট মামলার বিচারক জজ মহোদয়েরা বলিয়াছেন, "কোনও মতবাদে বিশ্বাস হইতে উৎপন্ন রাজনৈতিক অপরাধ সম্পর্কে অভিযুক্ত ব্যক্তিকে কঠোর শাস্তি দিলে সেই মতবাদে তাহার বিশ্বাস দৃঢ়তর হয় এবং অন্য লোকেরাও সেই মতাবলম্বী হইয়া অপরাধী হয়; ফলে জনসমাজে বিপদ ঘটে।" ইহা প্রাজ্ঞজনোচিত সত্য কথা।

—

মহাত্মাজীর কারাদণ্ড, মুক্তি ও আবার কারাদণ্ড

এ যেন ঠিক ছেলেখেলা, বা প্রহসন!

মহাত্মাজী কয়েক জন সঙ্গী লইয়া রাস নামক গ্রামে যাইতেছিলেন; ধরিয়া লইলাম ইংরেজ সরকারের নির্ম্মিত কোন একটা আইন লঙ্ঘন করিবার জন্য যাইতেছিলেন। সেই জন্য তাঁহাকে ধরিয়া জেলে বন্ধ করা হইল। কিন্তু অবিলম্বে আবার ছাড়িয়াও দেওয়া হইল! তাহার সোজা অর্থ এই, যে, তাঁহার রাস অভিমুখে যাইবার সঙ্কল্পটা অপরাধ নয়, কিংবা অতি তুচ্ছ অপরাধ।

তাঁহাকে ছাড়িয়া দিবার পর হুকুম দেওয়া হইল, তাঁহাকে একটা নির্দ্দিষ্ট সময়ের মধ্যে (আধ ঘণ্টার মধ্যে, মনে হইতেছে) য়েরাভডা গ্রাম ছাড়িয়া পুনায় যাইতে হইবে, কিন্তু পুনা ছাড়িয়া কোথাও যাইতে পারিবেন না। গান্ধীজীর মতামত ও মনের গতি বোম্বাই গবর্মেণ্টের অজ্ঞাত নহে। তাঁহারা জানিতেন, তিনি এ হুকুম মানিবেন না। অথচ ঐ প্রকার হুকুম দিয়া তাঁহারা তাঁহাকে একটা কৃত্রিম অপরাধে অপরাধী করিলেন, তিনি ঐ কৃত্রিম অপরাধে আপনাকে অপরাধী স্বীকার করিলেও, সাক্ষ্য লইয়া তাঁহার দস্তুরমত বিচার হইল, এবং তাহার পর এক বৎসরের জন্য শ্রমবিহীন কারারোধ দণ্ড হইল!

মহাত্মাজী দিন-কয়েকের মধ্যে দু-দুটা অপরাধ করিয়া ফেলিয়াছেন। প্রথমটার জন্য তাঁহাকে অর্দ্ধ সপ্তাহও জেলে থাকতে হয় নাই। দ্বিতীয়টার জন্য তাঁহাকে এক বৎসর জেলে থাকিতে হইবে। কিন্তু প্রথমটার চেয়ে দ্বিতীয়টা যে তিন শত বা এক শত বা পঞ্চাশ বা দশগুণ ভীষণ, তাহা বুঝিবার ত কোন উপায় দেখিতেছি না।

—

অন্যান্য কংগ্রেসওয়ালাদের কারাদণ্ড

মহাত্মাজীর পত্নী শ্রীমতী কস্তুরবাঈ, শ্রীযুক্ত রাজা-গোপালাচার্য্য, শ্রীযুক্ত মহাদেব দেশাই, শ্রীযুক্ত আনে, প্রভৃতি আরও অনেককে জেলে পাঠান হইয়াছে। মহাত্মাজীর পুত্র দেবদাস দিল্লীতে কিছুকাল সস্ত্রীক বাস করিতে গিয়াছিলেন, আইন অমান্য করিতে যান নাই। তাঁহাকে জেলে পাঠান

হইয়াছে, কিন্তু তাঁহার স্ত্রীকে কয়েদ করা হয় নাই। মহাত্মাজীর পুত্র হওয়াটা সন্দেহের কারণ বা অপরাধ, কিন্তু তাঁহার পুত্রবধূ হওয়া ও তাঁহার প্রধান সহচর-অনুচরের কন্যা হওয়াটা তদ্রূপ কিছু নহে!

অতঃপর আরও মুক্তি ও গ্রেপ্তার ও কয়েদ হইবে অনেক। ব্যক্তিগত আইনলঙ্ঘনের ফলে জেলে স্থানাভাব ঘটিলে ন্যূনতম বলপ্রয়োগ এবং মৃদুলাঠ্যাঘাত আরম্ভ হইতে পারিবে।

শ্রীযুক্ত রাজাগোপালাচার্য্যের এবং সবরমতী আশ্রমের মহিলাদের সশ্রম কারাদণ্ড কেন হইল, এবং ঐ মহিলাদের অধিকাংশকে তৃতীয় শ্রেণীর কয়েদী কেন করা হইল, আমরা বুঝিতে অক্ষম। বিচারকেরা যাহাতে এমন কিছু না করেন যাহা হইতে মনে হইতে পারে যে তাঁহাদের মনে প্রতিহিংসার ভাব রহিয়াছে, তাহা গবর্ন্মেণ্টের দেখা উচিত।

—

কংগ্রেস ও কৌন্সিল

কংগ্রেসওয়ালারা এবং লিবার্যাল, মডারেট বা উদারনৈতিক বলিয়া পরিচিত দলের অগ্রসর লোকেরা সমগ্রভারতীয় ব্যবস্থাপক সভায় এবং প্রাদেশিক ব্যবস্থাপক সভাগুলিতে প্রবেশ করিলে দেশের পক্ষে অনিষ্টকর আইনের বিরোধিতা এবং ইষ্টকর আইনের সমর্থন করিতে পারেন। ব্যবস্থাপক সভার সাহায্যে দেশের অনিষ্ট নিবারণ ও ইষ্ট সাধন অন্য যে-যে প্রকারে হইতে পারে, তাহাও তাঁহারা করিতে পারেন। কিন্তু হোয়াইট পেপারে ভারতবর্ষের ভবিষ্যৎ শাসনবিধির যে আভাস পাওয়া গিয়াছে, এবং যাহার উন্নতি না হইয়া বরং অবনতির সম্ভাবনা অধিক, তাহা হইতে বুঝা যায়, ভারতীয় ব্যবস্থাপক সভা দেশী রাজ্যের নৃপতিদের মনোনীত লোক, গবর্ন্মেণ্টের মনোনীত ইংরেজ, গবর্ন্মেণ্টপক্ষীয় মুসলমান ও "অবনত" হিন্দু প্রভৃতি দ্বারা এমন বোঝাই করা হইবে, যে, কংগ্রেসওয়ালা এবং অগ্রসর উদারনৈতিকরা বাকী সব আসনগুলি দখল করিতে পারিলেও, তাঁহারা তাহাতে সংখ্যাভূয়িষ্ঠ হইবেন না। প্রাদেশিক ব্যবস্থাপক সভাগুলিতে কিরূপ রাজনৈতিক মতের লোক কত জন করিয়া হইবার সম্ভাবনা, তাহা এক একটি প্রদেশ ধরিয়া দেখাইবার প্রয়োজন নাই। মোটের উপর বুঝিয়া রাখা যাইতে পারে, যে, মাদ্রাজে কংগ্রেসবিরোধী অ-ব্রাহ্মণ দলের প্রভাব এখন যেমন বেশী আছে, তেমনি থাকিবে। বাংলা, পঞ্জাব, উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ, সিন্ধু ও বালুচিস্থানে গবর্ন্মেণ্টের অনুগৃহীত মুসলমানদের প্রভাব বেশী হইবে। বোম্বাই, আগ্রা-অযোধ্যা, ও মধ্যপ্রদেশে কংগ্রেস ও অগ্রসর উদারনৈতিকরা একযোগে কাজ করিলে তাহারা ব্যবস্থাপক সভায় সংখ্যাভূয়িষ্ঠ হইতেও পারে। আসামে গবর্ন্মেণ্ট মুসলমানদিগকে ও ইউরোপীয়দিগকে যেরূপ অনুগ্রহ করিয়াছেন, তাহাতে তথাকার ব্যবস্থাপক সভায় স্বাজাতিক দলের প্রাধান্য হওয়ার সম্ভাবনা কম। উড়িষ্যা প্রদেশ নূতন গঠিত হইতেছে। সেখানে কি হইবে অনুমান করা কঠিন। বিহারে কংগ্রেসওয়ালা ও অগ্রসর লিবার্যালরা সম্মিলিত হইলে স্বাজাতিকদের প্রাধান্য হইতেও পারে।

মোটের উপর বলা যাইতে পারে, সমগ্রভারতীয় ব্যবস্থাপক সভায় এবং অধিকাংশ প্রাদেশিক ব্যবস্থাপক সভায় স্বাজাতিকদের প্রাধান্য হইবে না, প্রভাবও বেশী না হইবার সম্ভাবনা। তথাপি, আমাদের মতে কংগ্রেসওয়ালারা (তাঁহাদের বিবেকের বিরুদ্ধ না হইলে) এবং অগ্রসর লিবার্যালরা ব্যবস্থাপক সভাসমূহের যতগুলি সম্ভব আসন দখল করিতে পারিলে স্বাধীনতাসংগ্রামের সাহায্য করা হইবে। 'বিবেকের বিরুদ্ধ না হইলে' বলিতেছি এই জন্য, যে, এমন সব লোক থাকিতে পারেন যাঁহারা অকপটভাবে রাজানুগত্যের শপথ করিতে পারেন না, বা তদ্রূপ অন্য কোন বাধা যাঁহাদের আছে।

কংগ্রেসওয়ালারা ব্যবস্থাপক সভাসমূহের বাহিরে যাহা করেন তাহাতেও ত সদ্যসদ্য সাক্ষাৎভাবে স্বাধীনতালাভের সাহায্য হয় না। সুতরাং ব্যবস্থাপক সভায় স্বাজাতিকদের (ন্যাশন্যালিষ্টদের) ঘন ঘন বা এক বারও জিত না হইলে তাহাতেই বা দুঃখ কি? ব্যবস্থাপক সভাগুলিতেও পূর্ণ মাত্রায় সত্য কথা বলা যায় না, এবং যাহা বলা যায় তাহাও খবরের কাগজে সবটা প্রেস অফিসার ছাপিতে দেন না বটে। তথাপি যতটা সত্য বলা যায় ও ছাপা যায় তাহাই লাভ। ব্যবস্থাপক সভার বাহিরে ততটাও ত বলা বেআইনী।

আয়ার্ল্যাণ্ডের লোকেরা ব্যবস্থাপক সভার ভিতরে ও বাহিরে তাহাদের আন্দোলন চালাইয়া স্বাধীনতার পথে অনেকে

অগ্রসর হইয়াছে। আমাদেরও ভিতরের ও বাহিরের সব কার্য্যক্ষেত্রেই রাজনৈতিক কর্ম্মীদের পরিশ্রম করা উচিত।

মুসলমানদের, "অনুন্নত" হিন্দুদের এবং দেশী খ্রীষ্টিয়ানদের মধ্যে যাঁহারা স্বাজাতিক, তাঁহাদের কর্ত্তব্য তাঁহারা অনবগত নহেন। তাঁহারা স্বস্বশ্রেণীর যোগ্যতম স্বাজাতিকদিগকে ব্যবস্থাপক সভায় পাঠাইবার চেষ্টা করিলে হোয়াইট পেপারের প্রস্তাবগুলার দ্বারা ভারতীয়দিগের মধ্যে যে ভেদবুদ্ধি প্রখরতর করিবার এবং স্বাধীনতার অগ্রগতি রোধ করিবার চেষ্টা হইয়াছে, তাহা, খুব সামান্য পরিমাণে হইলেও, কিছু ব্যর্থ হইতে পারে।

—

জয়েণ্ট সিলেক্ট কমিটিতে সাম্প্রদায়িক ভাগবাঁটোয়ারা

জয়েণ্ট সিলেক্ট কমিটিতে ভারত-সচিব স্যর সামুয়েল হোর বলিয়াছেন, যে, ব্যবস্থাপক সভার আসনগুলির সাম্প্রদায়িক ভাগবাঁটোয়ারা ব্রিটিশ গবন্মেণ্ট যেরূপ করিয়াছেন, তাহা তাঁহাদের শেষ কথা, উহা আর বদলাইবে না। যেন রাষ্ট্রনীতিক্ষেত্রে শেষ কথা বলিয়া কোন জিনিষ আছে! ঐ ভাগবাঁটোয়ারা হোয়াইট পেপারের প্রস্তাবগুলির অন্তর্ভূত করা হইয়াছে। সমস্ত প্রস্তাবই বদলাইবার ক্ষমতা যখন সিলেক্ট কমিটির আছে, তখন কেবল সাম্প্রদায়িক ভাগবাঁটোয়ারাটাই কেন কমিটি বদলাইতে পারিবেন না জিজ্ঞাসা করায় ভারত-সচিব বলেন, তাঁহাদের উহার আলোচনা ও পরিবর্ত্তন করিবার ক্ষমতা আছে বটে, কিন্তু ওরূপ আলোচনায় তিনি বা গবন্মেণ্ট যোগ দিবেন না—তাঁহারা শেষ কথা বলিয়াছেন। ভারত-সচিব প্রভৃতি সরকারী লোকেরা আলোচনা করিতে কেন নারাজ, তাহা সুস্পষ্ট—তাঁহারা ভাগবাঁটোয়ারাটার সমর্থক ন্যায্য কোন যুক্তি উপস্থিত করিতে অসমর্থ। স্যর সামুয়েল হোর স্যর নৃপেন্দ্রনাথ সরকারের জেরায় যেমন কেবলই পাশ কাটাইতে বা উত্তর না-দিতে ব্যস্ত ছিলেন, তাহা হইতেই উহা বুঝা যায়। জয়েণ্ট সিলেক্ট কমিটিতে কোন কোন মুসলমান "প্রতিনিধি" বলেন, যে, তাঁহারা ইহা বিশ্বাস করিয়াই কমিটির কাজে যোগ দিতে আসিয়াছেন, যে, সাম্প্রদায়িক ভাগবাঁটোয়ারাটা বদলাইবে না। হোয়াইট পেপারের আর সব কিছু বদলাইতে পারে, কিন্তু ঐ জিনিষটা কেন গবন্মেণ্ট বদলাইবেন না তাহার কারণ মুসলমানদের ঐ উক্তির মধ্যে অনেকটা নিহিত আছে—গবন্মেণ্ট ভাগবাঁটোয়ারাতে মুসলমানদের প্রতি বিশেষ পক্ষপাতিত্ব করিয়া ও তাহাদের প্রতি অনুগ্রহ দেখাইয়া তাহাদিগকে হাত করিয়াছেন, তাহাদিগকে হাতছাড়া করিতে চান না।

স্যর সামুয়েল হোর আরও বলেন, আমরা ত সাম্প্রদায়িক কোন মীমাংসা করিতে চাই নাই; ভারতীয় নানা ধর্ম্ম-সম্প্রদায়ের লোকেরা আপোষে কোন নিষ্পত্তি করিতে না-পারায় আমরাই মীমাংসা করিতে বাধ্য হইয়াছি;- আমরা যাহা ন্যায্য মনে করিয়াছি, তাহা করিয়াছি; এখন উহা বদলাইতে গেলে শেষ মীমাংসা কখনও হইবে না, এবং ভারতীয় শাসনবিধিও রচিত হইবে না।

ইহার উত্তরে নানা কথা বলা যাইতে পারে। যদি ভারতবর্ষের লোকেরা আপোষে নিষ্পত্তি করিতে না পারিয়া থাকে, তাহা হইলেই কি অবিচার, অন্যায় ও পক্ষপাতিতা পূর্ণ ভাগবাঁটোয়ারা করিতে হইবে? হোয়াইট পেপারের অন্য সব প্রস্তাব পরিবর্ত্তনসাপেক্ষ হইলেও যদি সেই সব বিষয়ে শেষ মীমাংসা হইতে পারে এবং তৎসমুদয়কে ভিত্তি করিয়া ভবিষ্যৎ ভারতীয় শাসনবিধি রচিত হইতে পারে, তাহা হইলে শুধু সাম্প্রদায়িক ভাগবাঁটোয়ারাকে পরিবর্ত্তনসাপেক্ষ মনে করিলেই কেন শেষ মীমাংসা ও ভারত-শাসনবিধি রচনা অসম্ভব হইয়া যাইবে?

যদি সাম্প্রদায়িক ভাগবাঁটোয়ারাটা অনালোচ্য ও অপরি-বর্ত্তনীয়ই হয়, তাহা হইলে উহার সম্বন্ধে সাক্ষ্য দিবার জন্য ও উহার আলোচনা করিবার নিমিত্ত ভারতীয় প্রজাদের কষ্টে প্রদত্ত সরকারী টাকা খরচ করিয়া জয়েণ্ট সিলেক্ট কমিটিতে সাক্ষী হাজির করা হইয়াছে কেন?

—

ভারতীয়েরা কেন একমত হইতে পারে না

ভারতবর্ষের ভিন্ন ভিন্ন ধর্ম্মসম্প্রদায়ের লোকেরা যে একমত হইতে পারে নাই, এই কথাটা, আমাদিগকে খোঁটা দিবার জন্য, বার-বার শুনান হয়। কিন্তু তাহারা যে একমত হইতে পারে না, তাহার জন্য ইংরেজরা কতখানি দায়ী, সেটা তাহারা কেন ভুলিয়া যায়?

রোমান ক্যাথলিক ও প্রটেষ্টাণ্টরা একই খ্রীষ্টীয় ধর্ম্মের

অনুসরণ করে, অথচ অতীত কালে তাহারা ইংলণ্ডে ও ইউরোপের অন্য অনেক দেশে পরস্পরকে পুড়াইয়া মারিয়াছে এবং অন্য নানা প্রকারে নির্যাতন করিয়াছে। হিন্দু ও মুসলমান ভিন্নধর্মাবলম্বী, তাহাদের যদি গরমিল হয়, তাহা আশ্চর্য্যের বিষয় নহে। কিন্তু যে-যে শতাব্দীতে প্রটেষ্টাণ্ট ও রোমান ক্যাথলিক পরস্পরের প্রতি পূর্ব্বোক্ত ব্যবহার করিত, তখন হিন্দু-মুসলমানের পারস্পরিক ব্যবহার ততটা খারাপ ছিল না। ব্রিটিশ শাসন কালে হিন্দুমুসলমানের মনোমালিন্য বৃদ্ধির জন্য ইংরেজরা অনেকটা দায়ী। একথা অনেক বার বলা হইয়াছে। এই মনোমালিন্যের একটা প্রধান কারণ, সাম্প্রদায়িক স্বতন্ত্র প্রতিনিধিনির্ব্বাচকমণ্ডলী ("separate communal electorates")। মুসলমানেরা ইহা আপনা হইতে চায় নাই। লর্ড মিণ্টোর আমলে তাহাদিগকে ইহা চাহিতে শিখান হইয়াছিল। ইহা চাহিবার জন্য আগা খানের প্রমুখতায় যে মুসলমান ডেপুটেশ্যন লর্ড মিণ্টোর নিকট উপস্থিত হইয়াছিল, তাহাকে মৌলানা মোহম্মদ আলী কোকনদ কংগ্রেসের সভাপতিরূপে "কম্যাণ্ড্ পারফর্ম্যান্স" অর্থাৎ "আদেশ অনুসারে অভিনয়" বলিয়াছিলেন। অর্থাৎ মুসলমানদিগকে আগে হইতে গোপনে জানান হইয়াছিল, যে, তাহারা যেন বড়লাটের নিকট ডেপুটেশ্যন পাঠায়। মুর্শিদাবাদে বঙ্গীয় প্রাদেশিক কন্‌ফারেন্সের অভ্যর্থনা-সমিতির সভাপতিরূপে মৌলবী আবদুস সমদ মৌলানা সাহেবের উক্ত কথার সমর্থন করিয়াছিলেন। ইহার সমর্থন অন্যতম ভূতপূর্ব্ব ভারত-সচিব লর্ড মর্লীর "রিকলেক্‌শ্যন্স" বহিতে পাওয়া যায়। তিনি বড়লাট লর্ড মিণ্টোকে লিখিতেছেন :—

"I won't follow you again into our Mahometan dispute. Only I respectfully remind you once more that it was *your* early speech about their extra claims that first started the M. (Muslim) hare."—Morley's *Recollections*, voll. ii, p. 325.

গবর্ন্মেণ্ট কর্ত্তৃক প্রকাশিত একটি রিপোর্টেও এই তথ্যের প্রমাণ আছে। সাইমন কমিশনের ইণ্ডিয়ান সেন্ট্রাল কমিটির রিপোর্টের ১১৭ পৃষ্ঠায় আছে,—

"It was at the time of the Morley-Minto Reforms that the claim for communal electorates was advanced by the Muslims, inspired by certain officials. We will not bring forward the fact, which is now established beyond doubt, that there was no spontaneous demand by the Muslims at the time for separate electorates, but it was put forward by them at the instigation of an official whose name is now well known."

হিন্দুদের সহিত মুসলমানদের মিলনে বাধা সরকারী ইংরেজদের অনেক কাজের দ্বারা বরাবরই হইয়া আসিতেছে। তাহার একটা আধুনিক দৃষ্টান্ত দিতেছি। গত যুনিটি কন্‌ফারেন্সে যখন স্থির হইল, যে, সমগ্রভারতীয় ব্যবস্থাপক সভায় মুসলমানেরা শতকরা বত্রিশটি আসন পাইবে, অমনি স্যর সামুয়েল হোর নিলামের ডাক চড়াইয়া ঘোষণা করিলেন, তাহাদিগকে শতকরা ৩৩⅓টি আসন দেওয়া হইবে! মিলনে বাধা জন্মাইয়া যদি কেহ বলে, তোমরা আপোষে নিষ্পত্তি করিতে পার না, তাহা হইলে তাহার সঙ্গে কথা-কাটাকাটি করিতে প্রবৃত্তি হয় না।

—

মুসলমানদের সুবিধা হিন্দুদের অপ্রাপ্য

জয়েণ্ট সিলেক্ট কমিটিতে বঙ্গের ভূতপূর্ব্ব গবর্ণর লর্ড জেটল্যাণ্ড (আগে তিনি লর্ড রোনাল্ডশে ছিলেন) বলেন, যে, মুসলমানেরা যে-যে প্রদেশে সংখ্যান্যূন, তথায় যেমন তাহাদের সংখ্যার অনুপাতে প্রাপ্য অপেক্ষা বেশী আসন তাহারা ব্যবস্থাপক সভায় পাইয়াছে, বঙ্গে হিন্দুরা সংখ্যান্যূন বলিয়া তাহাদেরও সেইরূপ সংখ্যানুপাতে প্রাপ্য অপেক্ষা বেশী আসন পাওয়া উচিত। মুসলমান "প্রতিনিধিরা" ইহাতে আপত্তি করেন। লর্ড জেটল্যাণ্ড তখন হিন্দু বাঙালীদের দাবি আরও কম করিয়া অন্য প্রকারে বলেন। তিনি বলেন, যে, (ইউরোপীয়, ফিরিঙ্গী ও দেশী) খ্রীষ্টিয়ানদের জন্য নির্দ্দিষ্ট আসনগুলি এবং বণিক, শ্রমিক, বিশ্ববিদ্যালয় প্রভৃতি বিশেষ নির্ব্বাচক-মণ্ডলীর (special constituency-র) জন্য নির্দ্দিষ্ট আসনগুলি বাদে অন্য সব আসন মুসলমান ও হিন্দুদের মধ্যে তাহাদের লোক-সংখ্যার অনুপাতে ভাগ করিয়া দেওয়া হউক। অর্থাৎ যে-সব প্রদেশে মুসলমানেরা সংখ্যান্যূন তথায় তাহারা সংখ্যানুপাতে প্রাপ্য অপেক্ষা বেশী আসন পাইয়াছে, বঙ্গে হিন্দুরা (সমস্ত ২৫০ আসনের নহে) কেবল ১৯৯-টি আসনের তত অংশ প্রাপ্ত হউক, যাহা সংখ্যানুপাত অনুসারে তাহারা পাইতে পারে। মুসলমান "প্রতিনিধিরা" ইহাতেও আপত্তি করেন। তাঁহারা বলেন, এরূপ করিলে ব্যবস্থাপক সভায় জনমত ঠিক প্রকাশ পাইবে না! বঙ্গে তাঁহারা তাঁহাদের সংখ্যা অনুসারে বেশী আসন না পাইলে জনমত ঠিক প্রকাশ পাইবে না, কিন্তু অন্যত্র হিন্দুরা সংখ্যানুপাতে প্রাপ্য আসন অপেক্ষা কম পাইলেও

জনমত ঠিক প্রকাশ পাইবে! যে-সব প্রদেশে মুসলমানেরা সংখ্যানুপাতে প্রাপ্য অপেক্ষা বেশী আসন (weightage) পাইয়াছেন, সেখানে হিন্দুরা সংখ্যানুপাত অপেক্ষা কম পাইয়াছেন, তাহাতে জনমত কি প্রকারে ঠিক্ প্রকাশ পাইবে?

আসন-সংরক্ষণ ("reservation of seats") কখনও সংখ্যাভূয়িষ্ঠ সম্প্রদায়ের জন্য অভিপ্রেত হয় নাই। কিন্তু মুসলমান "প্রতিনিধি"দের তর্ক এইরূপ,—

"হিন্দুরা কতকগুলি প্রদেশের ব্যবস্থাপক সভায় নিশ্চয়ই অধিকাংশ আসন পাইবে, অতএব কোন কোন প্রদেশে আমাদের জন্যও অধিকাংশ আসন আইন দ্বারা নির্দ্দিষ্ট হউক।"

লর্ড জেট্‌ল্যাণ্ড এই যুক্তির যে উত্তর দেন, তাহাতে মুসলমান "প্রতিনিধি"রা নিরুত্তর হইয়া যান। তিনি যাহা বলেন তাহার তাৎপর্য্য এই, যে, হিন্দুদের জন্য কোথাও অধিকাংশ আসন আইনদ্বারা নির্দ্দিষ্ট করিবার প্রস্তাব হয় নাই; মুসলমানেরা আসন-সংরক্ষণ ও স্বতন্ত্র নির্ব্বাচন চাওয়াতে তাহাদের অভিলাষ অনুসারে তাহাদিগকে ঐ অধিকার দেওয়া হইয়াছে; সুতরাং হিন্দুরা যে-যে প্রদেশে সংখ্যাভূয়িষ্ঠ তাহারা তথায় অধিকাংশ আসন পাইবে। যদি মুসলমানেরা আসন-সংরক্ষণ ও স্বতন্ত্র নির্ব্বাচন না চাহিত, তাহা হইলে যোগ্যতা থাকিলে, যে-যে প্রদেশে তাহারা সংখ্যান্যূন, সেখানেও তাহারা অধিকাংশ আসন দখল করিবার সুযোগ পাইত। একটা দৃষ্টান্ত দিলে লর্ড জেট্‌ল্যাণ্ডের যুক্তি বুঝা আরও সহজ হইবে। আগ্রা-অযোধ্যা প্রদেশে মুসলমানেরা সমগ্র লোক-সংখ্যার শতকরা ১৫ অংশ। তাহাদিগকে শতকরা ৩০-টি আসন দেওয়া হইয়াছে। ইহার অধিক আসন দখল করিবার চেষ্টা তাঁহারা করিতে পারিবেন না। এত বেশী আসন তাঁহাদিগকে দেওয়াতেও হিন্দুদের জন্য অধিকাংশ আসন থাকিবে, যদিও আইন দ্বারা তাঁহাদের জন্য তাহা নির্দ্দিষ্ট থাকিবে না। কিন্তু যদি মুসলমানেরা আসন-সংরক্ষণ ও স্বতন্ত্র নির্ব্বাচন না চাহিয়া সম্মিলিত নির্ব্বাচন চাহিতেন, তাহা হইলে তাঁহারা যোগ্যতা থাকিলে শতকরা ৫১।৫২টি আসনও দখল করিবার চেষ্টা করিতে পারিতেন। মুসলমানেরা বোধ হয় চান, যে, যে-যে প্রদেশে তাঁহারা সংখ্যাভূয়িষ্ঠ সেখানে অধিকাংশ আসন তাঁহাদের জন্য আইন দ্বারা নির্দ্দিষ্ট থাকুক; এবং যে-সব প্রদেশে তাঁহারা সংখ্যান্যূন তথায় গুরুত্ববৃদ্ধি ("weightage") দ্বারা তাঁহাদিগকে সংখ্যানুপাতে প্রাপ্য অপেক্ষা অধিক আসন দেওয়া হউক—শতকরা ৫১টি দিলেও তাঁহারা আপত্তি করিবেন না! হিন্দুরা আসন-সংরক্ষণ, গুরুত্ববৃদ্ধি, স্বতন্ত্র নির্ব্বাচন, কিছুই চান না। এরূপ প্রকৃত গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় তাঁহারা অবাধ প্রতিযোগিতার ফলে তাঁহাদের সংখ্যানুপাতে প্রাপ্য অপেক্ষা কম আসন পাওয়া রূপ ক্ষতির সম্মুখীন হইতে প্রস্তুত আছেন।

কলিকাতা মিউনিসিপ্যাল বিল

কলিকাতা মিউনিসিপ্যাল বিল বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভায় পেশ হইয়া সিলেক্ট কমিটির হাতে গিয়াছে। জনমত নির্দ্ধারণের জন্য ইহা প্রচার করিবার প্রস্তাব খুব বেশীসংখ্যক সভ্যের মতে অগ্রাহ্য হইয়া গিয়াছে। ইহাতেই বুঝা যায় যে, ইহা গবর্ন্মেণ্ট অনায়াসে পাস করাইতে পারিবেন।

প্রস্তাবিত আইনের সমালোচনা আমরা আগেই 'মডার্ণ রিভিউ' ও 'প্রবাসী'তে করিয়াছি। বিলটি ব্যবস্থাপক সভায় পেশ হইবার পূর্ব্বে মিউনিসিপ্যালিটির মেয়র এবং সভ্যেরা কেহ কেহ ইহার প্রতিকূল সমালোচনা করিয়াছিলেন। পেশ হইবার পরেও মেয়র, ভূতপূর্ব্ব মেয়র ডাক্তার বিধানচন্দ্র রায়, এবং শ্রীযুক্ত নলিনীরঞ্জন সরকার, তুলসীচরণ গোস্বামী প্রভৃতি মন্ত্রী স্যর বিজয়প্রসাদ সিংহ-রায়ের বক্তৃতার সমালোচনা করিয়াছেন। ব্যবস্থাপক সভায় শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রকুমার বসু প্রভৃতি সভ্য বিলটার সমালোচনা করিতেছেন। সিলেক্ট কমিটির হাত হইতে উহা বাহির হইয়া আসিলে তাহার পর আবার ব্যবস্থাপক সভায় তর্কবিতর্ক হইবে। যদিও তাহাও ব্যর্থ হইবে, এবং বিলটা আইনে পরিণত হইবে, তথাপি উহার সব দোষ দেখান সভ্যদের কর্ত্তব্য।

আমরা এই বিলের সমর্থন করি নাই, বিরোধিতাই করিয়াছি। ইহা সত্য, যে, কলিকাতা মিউনিসিপালিটি সরকারী ও বেসরকারী ইংরেজদের প্রাধান্যের সময় যেরূপ ছিল, এখন মোটের উপর তাহা অপেক্ষা অনেক ভাল। কিন্তু ইহা বলাও কর্ত্তব্য, যে, মিউনিসিপালিটিতে স্বদেশ-

ওয়ালাদের প্রাধান্ত হওয়ার পর হইতে তাঁহাদের সকল দিক দিয়া আরও নিখুঁতভাবে ইহার কাজ চালান উচিত ছিল। তাহার দ্বারা তাঁহাদের কর্ত্তব্য করা হইত, এবং কলিকাতা মিউনিসিপালিটির ও স্বায়ত্তশাসনের শত্রুরা তাহা হইলে অনিষ্ট করিবার কোন ছিদ্র পাইত না।

—

আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় সম্বর্দ্ধনা-পুস্তক

আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় মহাশয়ের জনহিতকর জীবনের সত্তর বৎসর পূর্ণ হওয়া উপলক্ষ্যে তাঁহার সম্বর্দ্ধনার অন্যান্য আয়োজনের মধ্যে এই প্রস্তাব হইয়াছিল, যে, যাঁহারা তাঁহার গুণগ্রাহী তাঁহাদের রচিত প্রবন্ধাদি সম্বলিত একটি পুস্তক প্রকাশ করা হইবে। সম্প্রতি এই পুস্তকখানি প্রকাশিত হইয়াছে। ইহা উৎকৃষ্ট কাগজে সুমুদ্রিত এবং ইহার বাঁধাই সাদাসিধা হইলেও সুদৃশ্য। ইহা গেল বাহিরের কথা। ইহাতে যে-সব রচনা প্রকাশিত হইয়াছে, তাহার সংক্ষিপ্ত পরিচয় দেওয়া কঠিন। কতকগুলি রচনাকে রায়-মহাশয়ের প্রশস্তি বলা যাইতে পারে। ভারতীয়দিগের মধ্যে কবিসার্ব্বভৌম রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, মহাত্মা গান্ধী, আচার্য্য জগদীশচন্দ্র বসু প্রভৃতি এবং বিদেশীদের মধ্যে ডক্টর আর্ম্‌স্ট্রং, ডক্টর ডোনান, ডক্টর সাইমনসেন প্রভৃতি এইরূপ রচনা দ্বারা পুস্তকটিকে অলঙ্কৃত করিয়াছেন। এইগুলিতে রায়-মহাশয়ের সম্বন্ধে যাহা লেখা হইয়াছে, তাহা প্রশংসার জন্য প্রশংসা নহে, প্রত্যুত সত্য কথা। পুস্তকখানির বাকী ও অধিক অংশ বিদ্বান ও গুণী ব্যক্তিদের লেখা নানাবিধ মূল্যবান বৈজ্ঞানিক, সাহিত্যিক, ঐতিহাসিক, বাণিজ্যিক ও পণ্যশৈল্পিক প্রবন্ধে সমৃদ্ধ।

—

আগ্রা-অযোধ্যায় বাঙালী

১৯৩১ সালের সেন্সস্ রিপোর্ট অনুসারে আগ্রা-অযোধ্যা প্রদেশে মোট ২৭,২৩০ জন লোকের মাতৃভাষা বাংলা। ইহাদের মধ্যে সকল বয়সের স্ত্রীজাতীয় ও পুরুষজাতীয় মানুষ আছে। পুরুষজাতীয় লোকদের সংখ্যা ১৪,৩৬১ এবং স্ত্রীজাতীয় মানুষদের সংখ্যা ১২,৮৬৯। ইহা হইতে মনে হয়, আগ্রা-অযোধ্যায় অনেক বাঙালী তথায় সপরিবারে বাস করে, অনেকে তথাকার স্থায়ী বাসিন্দা হইয়া গিয়াছে অতএব ইহাদের রোজগার মোটামুটি আগ্রা-অযোধ্যাতেই ব্যয়িত ও সঞ্চিত হয়।

বাংলা দেশের কেবলমাত্র খাস্ কলিকাতা শহরেই হিন্দুস্থানী (হিন্দী ও উর্দু) ৪,৩৬,১২৩ জনের মাতৃভাষা। তন্মধ্যে বিহারী হিন্দী ২,৬১,৬৭৪ জনের মাতৃভাষা বলিয়া কলিকাতার সেন্সস্ রিপোর্টে লিখিত হইয়াছে। বাকী ১,৭৪,৪৪০ জনকে মোটামুটি আগ্রা-অযোধ্যা হইতে আগত মনে করা যাইতে পারে। ইহাদের মধ্যে স্ত্রীলোকের সংখ্যা কেবল ৪২,৩৮৭। সুতরাং ইহাদের অধিকাংশ বঙ্গে সপরিবারে বাস করে না, বঙ্গের স্থায়ী বাসিন্দা হয় নাই, এবং রোজগারের অনেক অংশ ইহারা আগ্রা-অযোধ্যায় প্রেরণ করে। পরে দেখা যাইবে, আগ্রা-অযোধ্যার বাঙালীদের একটা বৃহৎ অংশ কাশী ও বৃন্দাবনে তীর্থবাসী, রোজগারী নয়। পক্ষান্তরে বাংলার কোন জায়গা হিন্দীভাষীদের তীর্থবাসের জায়গা নয়, তাহারা সকলেই অর্থ-উপার্জ্জনের জন্য বা উপার্জ্জকের পোষ্যরূপে বঙ্গে বাস করে। তাহাদের মধ্যে যাহারা খাস কলিকাতাবাসী কেবল তাহাদেরই সংখ্যা দিয়াছি। এই সকল তথ্য হইতে বুঝা যাইবে, যে, কেবল কলিকাতাপ্রবাসী হিন্দুস্থানীদের তুলনাতেই আগ্রা-অযোধ্যা-প্রবাসী বাঙালীরা রোজগার কম করে, এবং রোজগারের অতি অল্প অংশই বাংলা দেশে পাঠায়।

আগ্রা-অযোধ্যার কোন্ জেলায় কত বাঙালী আছে, তাহা অতঃপর লিখিতেছি। বলা বাহুল্য, প্রত্যেক জেলায় সদর শহরটিতেই এই বাঙালীরা বেশীর ভাগ বাস করে। ডেরাডুন ৩৫১, সাহারানপুর ৭৪২, মুজঃফরনগর ৩৪, মীরাট ৭১৪, বুলন্দশহর ৯৩, আলীগড় ১৫১, মথুরা ৩১৬১, আগ্রা ৫৮৭, মৈনপুরী ৫২, এটাঃ ১৮, বরেলী ৩১৪, বিজনোর ১১, বদাউন ২৮, মোরাদাবাদ ২৩২, শাহজাহানপুর ১০২, পিলিভিত ২৩, ফররুখাবাদ ৪৭, এটাওয়া ১১৮, কানপুর ৯৮৯, ফতেপুর ৩৪, এলাহাবাদ ৫১০৯, ঝাঁসী ২৯৫, জালাউন ১৩, হামীরপুর ২০, বাঁদা ১৯, বারাণসী ৮৬৩৪, মির্জ্জাপুর ২৮৫, জৌনপুর ১১৬, গাজীপুর ২৪৭, বালিয়া ৯৩, গোরখপুর ৬৭৯, বস্তি ৪৩, আজমগড় ৩২, নৈনীতাল ৬৭, আলমোড়া ৩০, গাড়োয়াল ৩৬, লক্ষ্ণৌ ২৯১৫, উন্নাও ৮, রায় বরেলী ৬৭, সীতাপুর ৯৮, হরদোই ২০, খেরী

১১, ফরাক্কাবাদ ৮৮, গোণ্ডা ৬৫, বাহ্‌রাইচ ২২, সুলতানপুর ৮৬, পরতাবগড় ১৯, বড়বাঙ্কী ৪৭; দেশীয়রাজ্য—রামপুর ২৩২, টেহরী-গাঢ়োআল ১, বারাণসী ৬৪।

মথুরা জেলায় মথুরা ও বৃন্দাবন এই দুটি শহর তীর্থস্থান। এই জন্য এই জেলায় তীর্থবাসী বাঙালী অনেক—প্রধানতঃ বৃন্দাবনে। বারাণসীতেই বাঙালীর সংখ্যা সর্ব্বাপেক্ষা বেশী। তাহার কারণ উহা তীর্থস্থান। এলাহাবাদ ও লক্ষ্ণৌতে বাঙালীদের গমন ও বাস প্রধানতঃ সরকারি চাকরী, ওকালতী ও ডাক্তারী উপলক্ষ্যে। অন্য সব জায়গায় প্রত্যেকটিতে বাঙালীর সংখ্যা হাজারের কম, অনেক জেলায় এক শতেরও কম।

কোন কোন জায়গায় বাঙালীর সংখ্যা কম হইলেও তাঁহারা নিজেদের কন্যাদের জন্য বিদ্যালয় চালান; যেমন মীরাট জেলায় আবালবৃদ্ধবনিতা বাঙালীর সংখ্যা ৭১৪ হইলেও মীরাট শহরের বাঙালীরা একটি বালিকা বিদ্যালয় চালান।

আগ্রা-অযোধ্যার কোন্ জেলায় কত বাঙালী আছে, তাহার সংখ্যাগুলি আমাদের নিকট নীরস নহে। যেখানে যেখানে বাংলা ভাষা কথিত হয়, সেগুলি এক একটি ছোট বাংলা দেশ। সংখ্যাগুলি সেই সব ক্ষুদ্র বাংলার খবর আমাদিগকে দেয়।

আমরা যদি সকল প্রদেশের বাঙালীর সহিত অন্ততঃ সাহিত্যিক সম্পর্ক রাখিতে পারি, তাহা হইলে তাঁহাদের ও আমাদের আনন্দ ও শক্তি বাড়িবে।

গোরখপুরে আগামী প্রবাসী বঙ্গসাহিত্য-সম্মেলন

আগে আগে যাহাই ঘটিয়া থাকুক, এখন প্রবাসী কোন বাঙালী গৃহস্থালী নাই, যেখানে বাংলা কাগজ বা পুস্তক একখানিও নাই। এই সব পরিবারে বাংলা ভাষা কথিত হয়। অনেক প্রবাসী বাঙালী বাংলা সাহিত্যের চর্চ্চা করিয়া থাকেন।

প্রবাসী বাঙালীদের মধ্যে বাংলা সাহিত্যের চর্চ্চা সংরক্ষণ ও বর্দ্ধন প্রবাসী বঙ্গসাহিত্য-সম্মেলনের প্রধান উদ্দেশ্য। গত বৎসর ইহার অধিবেশন প্রয়াগে হইয়াছিল; এ বৎসর শীতকালে গোরখপুরে হইবে। গোরখপুর জেলায় মোটে ৬৭৯ জন বাঙালীর বাস। তাহার মধ্যে শিশুরা আনন্দবর্দ্ধন ও কোলাহলবর্দ্ধন ছাড়া আর কিছু করিবেন না। বাকী ভদ্রলোক ও ভদ্রমহিলারা যে এইরূপ একটি কাজের গুরু ভার লইয়াছেন ইহা তাঁহাদের উৎসাহের পরিচায়ক। তাঁহারা অবশ্য আশা করেন, যে, অন্যান্য স্থানের প্রবাসী বাঙালীরা সকল রকমে তাঁহাদের সাহায্য করিবেন। বঙ্গ-নিবাসী বাঙালীরা যথাসময়ে গোরখপুর গেলে তাহাতেই তথাকার বাঙালীরা আপ্যায়িত ও উৎসাহিত হইবেন।

কিন্তু আমরা তাঁহাদিগকে শুধু আপ্যায়িত করিবার জন্যই সেখানে যাইতে বলিতেছি না। উপাসকসম্প্রদায়-বিশেষের ইতিহাসে গোরখপুর প্রসিদ্ধ স্থান বলিয়া দর্শনীয়। তদ্ভিন্ন এখান হইতে বুদ্ধদেবের মহাপরিনির্ব্বাণের স্থান কুশীনগর এবং জন্মস্থান কপিলবাস্তু বেশী দূর নয়। সম্মেলনের উদ্যোক্তারা এই স্থান দুটি দেখিবার ব্যবস্থা সম্ভবতঃ করিবেন। বিস্তারিত সংবাদ পরে পাওয়া যাইবে।

ঢাকায় রামমোহন শতবার্ষিকী

ঢাকা শহরের হিন্দু খ্রীষ্টিয়ান মুসলমান ও ব্রাহ্ম অনেকের সম্মিলিত চেষ্টায় রামমোহন রায়ের মৃত্যুর পর শত বর্ষ অতীত হওয়া উপলক্ষ্যে তাঁহার প্রতি নানা প্রকারে শ্রদ্ধা নিবেদিত হইতেছে দেখিয়া আনন্দিত হইয়াছি। গত ৫ই আগষ্ট হইতে বক্তৃতাদি হইতেছে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস্ চ্যান্সেলার মিঃ ল্যাংলী একটি সভায় সভাপতির কাজ করিয়াছিলেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাস, বিজ্ঞান, দর্শন, সাহিত্য, বাংলা প্রভৃতির অনেক অধ্যাপক রামমোহন রায় সম্বন্ধে বক্তৃতা দিয়াছেন ও দিবেন। তিনি জীবনের অন্য অনেক ক্ষেত্রের মত শিক্ষাক্ষেত্রেও নূতন ধারার প্রবর্ত্তক। অধ্যাপকবর্গের তাঁহার প্রতি সম্মানপ্রদর্শন স্বাভাবিক।

বিধবা-বিবাহের বিরুদ্ধে একটি ভিত্তিহীন যুক্তি

বর্ত্তমান আগষ্ট মাসের ইংরেজী "প্রবুদ্ধ ভারত" মাসিক পত্রে ভারতীয় নারীদিগের সম্বন্ধে স্বামী বিবেকানন্দের নানাবিধ মত তাঁহার গ্রন্থাবলী হইতে একটি প্রবন্ধের আকারে সংকলিত হইয়াছে। প্রবন্ধটি সারবান্ ও চিন্তার উদ্দীপক।

কিন্তু ইহাতে বিধবা-বিবাহের বিরুদ্ধে একটি যুক্তি প্রযুক্ত হইয়াছে, যাহার ভিত্তীভূত তথ্য সত্য নহে। যুক্তিটি নীচে উদ্ধৃত করিতেছি।

"Of this custom two points should be specially observed: (a) Widow-marriage takes place among the lower classes. (b) Among the higher classes the number of women is greater than that of men. Now, if it be the rule to marry every girl, it is difficult enough to get one husband apiece; then how to get, by and by, two or three for each? Therefore, has society put one party under disadvantage, *i. e.*, it does not let her have a second husband, who has had one; if it did, one maid would have to go without a husband. On the other hand, widow-marriage obtains in communities having a greater number of men than women, as in their case the objection stated above does not exist."

যে-সব স্ত্রীজাতীয়া শিশু বা বালিকা পতির সহিত কোন দৈহিক বা আত্মিক সম্বন্ধ স্থাপিত হইবার সম্ভাবনার বয়সের আগেই বিধবা হয়, তাহারা একবার পতি পাইয়াছিল বলিয়া মনে করা ন্যায়সঙ্গত ও যুক্তিসঙ্গত কি-না, এবং তাহারা একবার পতি পাইয়াছিল বলিয়া তাহাদের পুনরায় বিবাহে আপত্তি করা ন্যায়সঙ্গত কি-না, সে প্রশ্ন তুলিব না। স্বামী বিবেকানন্দ হিন্দু সমাজের এবং হিন্দু সামাজিক বিধির বিষয়ই বলিতেছেন, এবং বলিতেছেন যে, হিন্দুদের উচ্চশ্রেণীসমূহের মধ্যে পুরুষ অপেক্ষা নারীর সংখ্যা বেশী। ইহা সত্য নহে। বাংলা দেশের কথা ধরুন। ১৯৩১ সালের সেন্সস অনুসারে প্রত্যেক এক হাজার পুরুষে বঙ্গে কতকগুলি শ্রেণীর বা জাতির স্ত্রীলোকের সংখ্যা দিতেছি;—বৈদ্য ৯২২, ব্রাহ্মণ ৮৪৭, ব্রাহ্ম ৭৬৩, কায়স্থ ৯০১, আগরওয়ালা ৬৮৬, মাহিষ্য ৯৫২, সাহা ৯৫০, ইত্যাদি। কেবল বাউরী এবং জা'ত-বৈষ্ণবদের মধ্যে পুরুষের চেয়ে স্ত্রীলোকের সংখ্যা বেশী; কিন্তু তাহারা উচ্চশ্রেণীর বলিয়া গণিত হয় না এবং তাহাদের মধ্যে বিধবা-বিবাহ প্রচলিত আছে। ১৯২১ সালের সেন্সসেও অবস্থা এইরূপ ছিল। প্রতি এক হাজার পুরুষে স্ত্রীলোক ছিল বৈদ্যদের মধ্যে ৯৬৫, ব্রাহ্মণদের মধ্যে ৮৪৫, কায়স্থদের মধ্যে ৯১১, সাহাদের মধ্যে ৯৫৩, সুবর্ণবণিকদের মধ্যে ৯৫৩, ইত্যাদি। ঐ সেন্সসেও হিন্দু জাতির মধ্যে জা'ত-বৈষ্ণব ও বাউরীদের মধ্যেই স্ত্রীলোকদের সংখ্যা বেশী ছিল। যদি জানিতে পারা যায়, যে, স্বামীজী কোন্ সালে ঐ যুক্তি প্রয়োগ করিয়াছিলেন, তাহা হইলে উহা তখনও ভিত্তিহীন ছিল কি না স্থির করিতে পারা যায়। প্রত্যেক হিন্দু জা'তের কথা আলাদা করিয়া বলা এখন অনাবশ্যক, কিন্তু পাঠকেরা জানিয়া রাখুন, যে, ১৮৮১ সাল হইতে এ-পর্য্যন্ত, অর্থাৎ পঞ্চাশ বৎসরের অধিক সময় ব্যাপিয়া বাংলা দেশে পুরুষ অপেক্ষা স্ত্রীলোকের সংখ্যা বরাবর কম আছে এবং তাহাদের সংখ্যা ক্রমাগত কমিয়া আসিতেছে। এখন হিন্দু সমাজে, দুটি নিম্ন শ্রেণী ছাড়া, আর সব শ্রেণীতে পুরুষ অপেক্ষা স্ত্রীলোকের সংখ্যা কম আছে বলিয়া স্বামীজীর যুক্তি অনুসারে বাল-বিধবাদের বিবাহে কোন আপত্তি থাকা উচিত নয়।

—

বেলডাঙা ও বঙ্গের লাট

বঙ্গীয় প্রাদেশিক হিন্দু সভার পক্ষ হইতে শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত প্রমুখ কয়েক জন সভ্য বেলডাঙার লুট-তরাজ খুন-খারাবী সম্বন্ধে লাট সাহেবকে তাঁহাদের বক্তব্য জানাইতে গিয়াছিলেন। কি কথা হইয়াছিল প্রকাশ পায় নাই। অনেক লোকের ধারণা, আগেকার এই প্রকার অনেক লুণ্ঠন ও রক্তপাতের মত এই ব্যাপারটাও হঠাৎ ঘটে নাই, বুদ্ধিমান্ লোকেরা আগে হইতে আয়োজন করিয়া ঘটাইয়াছিল। ইহা সত্য কি-না অনুসন্ধান হওয়া উচিত। সত্য হইলে উদ্যোক্তাদের শাস্তি হওয়া আবশ্যক। যে-সকল আহাম্মক অসভ্য লোক লুট মারামারি করে, তাহারা অবশ্য দণ্ড পাইবার যোগ্য, কিন্তু যাহারা তাহাদিগকে প্ররোচিত ও উত্তেজিত করে, তাহাদের অধিকতর সাজা হওয়া আবশ্যক। নতুবা এই রকম ব্যাপার কখনও বন্ধ হইবে না। লাট সাহেবের মত এইরূপ কিনা, তাহা অজ্ঞাত।

—

বঙ্গে চাকরিতে বাঙালীর দাবী সাব্যস্ত!

একটা ভারী আশ্চর্য্য ঘটনা ঘটিয়াছে! বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভায় শ্রীযুক্ত মুনীন্দ্রদেব রায় মহাশয়ের এই প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছে, যে,

"In filling appointments under the Government of Bengal none but Bengalees or men domiciled in Bengal be in future recruited except in cases where specialized knowledge is necessary, or no suitable candidate, either a Bengalee or one domiciled in Bengal, is forthcoming."

বঙ্গের বড় দুর্দ্দিন যে, বঙ্গে বাঙালী সরকারী চাকরি পাইবে, ইহার জন্য নিয়ম করিতে হইল। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্ত্তারা এই নিয়মটা আগে হইতে মানিয়া চলিলে মন্দ হইত না।

দের সরকারী বড় সাহেবেরা ও মন্ত্রীরা "স্পেশ্যালাইজড্ নলিজ্" বলিতে কি বুঝেন এবং ভবিষ্যতে তাঁহাদের পদাধিকারীরা কি বুঝিবেন, অনুমান করা কঠিন। ভবিষ্যতেও বাঙালী এঞ্জিনীয়ার এবং বাঙালী সুশিক্ষিতা মহিলা থাকা সত্ত্বেও অন্য প্রদেশ হইতে এঞ্জিনীয়ার ও লেডী প্রিন্সিপ্যাল আমদানী করা হইবে কি?

—

বেথুন কলেজের প্রিন্সিপ্যালের পদ

বেথুন কলেজের মহিলা প্রিন্সিপ্যালের পদ শীঘ্র খালি হইবে। কর্ম্মখালির বিজ্ঞাপন বহু পূর্ব্বে বাহির হইয়া গিয়াছে। ইহাতে "স্পেশ্যালাইজ্ড্ নলিজের" দরকার হইবে না ত?

—

স্বর্গীয় বিহারীলাল মিত্র মহাশয়ের দান

স্বর্গীয় বিহারীলাল মিত্র মহাশয় উইল দ্বারা নারীশিক্ষার উন্নতি ও বিস্তৃতির জন্য কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়কে মাসিক চারি হাজার টাকা দানের ব্যবস্থা করিয়া গিয়াছেন। শুনিলাম, কলিকাতার কোন কোন উচ্চ বালিকা-বিদ্যালয়ের কর্ত্তৃপক্ষ এই টাকা হইতে সাহায্য পাইবার চেষ্টা করিতেছেন। বিশ্ববিদ্যালয় কি ভাবে এই টাকা খরচ করিবেন, জানি না। কিন্তু যদি উচ্চ বালিকা-বিদ্যালয়ের জন্য ইহা খরচ করা স্থির হয়, তাহা হইলে কলিকাতায় খরচ করিবার আগে মফঃস্বলের সেই সব জেলার ও শহরের কথা ভাবা উচিত, যেখানে একটি করিয়াও উচ্চ বালিকা-বিদ্যালয় নাই। আমরা কাহারও টাকা পাইবার বিরোধী নই। কিন্তু তেলো মাথায় তেল ঢালিবার আগে রুক্ষ কেশের দিকে দৃষ্টি দেওয়া ন্যায়সঙ্গত।

—

বঙ্গের বেকার-সমস্যার প্রতিকার

কয়েক দিন পূর্ব্বে বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার এক অধিবেশনে শ্রীযুক্ত আনন্দমোহন পোদ্দার এই প্রস্তাব করেন, যে, বাংলার বেকারসমস্যা নিদারুণ হইয়াছে বলিয়া এ-বিষয়ে অনুসন্ধানপূর্ব্বক প্রতিকারের উপায় নির্দ্দেশ করিবার জন্য চৌদ্দ জন সভ্যকে লইয়া একটি কমিটি গঠিত হউক এবং ইহাতে বিশেষজ্ঞ হিসাবে আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় মহাশয়কে লওয়া হউক। প্রায় তিন ঘণ্টা ধরিয়া প্রস্তাবটির আলোচনা হয়। তখন অন্যতম মন্ত্রী মিঃ ফারোকী কিয়ৎপরিমাণে সহানুভূতিসূচক উত্তর দিবার পর প্রস্তাবটি প্রত্যাহৃত হয়। এরূপ কমিটি নিয়োগ ও তাহার দ্বারা অনুসন্ধানানন্তর উপায়নির্দ্ধারণের আমরা বিরোধী নহি। কিন্তু উপায় নির্দ্ধারিত হইলে অবলম্বিত হইবে ত? কুটীরশিল্প, উন্নত বৈজ্ঞানিক কৃষি, বড় বড় কারখানা, প্রভৃতি যে-কোন উপায়ে অল্প বা অধিক বাঙালীর অন্ন হয়, তাহার সমস্তই অবলম্বনযোগ্য। সরকারী কুব্যবস্থাও বঙ্গের বেকার-সমস্যার একটা কারণ। বঙ্গে সংগৃহীত রাজস্ব ভারত-গবন্মেণ্ট অন্য সকল প্রদেশের রাজস্বের বেশী শোষণ করেন। অথচ বাঙালী সৈনিক হইতে পারে না। সৈনিক হইয়া এবং সৈনিকদের আবশ্যক জিনিষ জোগাইয়া পঞ্জাবীরা ধনী হইয়াছে। সরকারী জলসেচনব্যবস্থা বঙ্গে সর্ব্বাপেক্ষা কম। যথোচিত ব্যবস্থা হইলে জলসেচন-বিভাগে অনেক বাঙালী কাজ পাইত, এবং চাষ বৃদ্ধি হওয়ায় তাহাতেও আরও অনেক বাঙালীর অন্ন হইত। বঙ্গে পুলিস-বিভাগে বিস্তর অবাঙালী আছে। বাঙালী নিযুক্ত করিলে তাহাতেও বেকারসমস্যার কিছু সমাধান হইত। বঙ্গে সংগৃহীত রাজস্বের ন্যূনকল্পে আরও পাঁচ ছয় কোটি টাকা বঙ্গের পাওয়া উচিত। তাহা পাইলে গঠনমূলক স্বাস্থ্য কৃষি শিল্প শিক্ষা প্রভৃতি বিভাগ দ্বারা বেকারসমস্যা সমাধানের কতকটা সফল চেষ্টা সাক্ষাৎ ও পরোক্ষ ভাবে হইতে পারিত।

মসজিদের সম্মুখে বা নিকটে বাজনা

ডাক্তার রাফিউদ্দীন আহমেদ সংবাদপত্রে লিখিয়াছেন, যে, মসজিদের সম্মুখে বাজনা নিষিদ্ধ, এরূপ কোন ধারণার প্রমাণ তিনি মরক্কো, মিশর, আরব বা তুরস্কে পান নাই, এবং ভারতবর্ষ ছাড়া এরূপ কোন ধারণা অন্য কোন দেশে নাই।

আর এক জন মুসলমান এই প্রকারের মত প্রকাশ করিয়াছেন। তিনি একটি মসজিদের ইমাম।

> হুগলী জেলার বলাগড় থানার ইনছুরা গ্রামে বিষহরি পূজার মেলা উপলক্ষে, ঢাক, ঢোল, প্রভৃতি বাজনা লইয়া লোকেরা গ্রামে মিছিল করিয়া যায়। তাহাদিগকে ঐ গ্রামের প্রধান রাস্তায় মসজিদের সম্মুখ দিয়া পূজার স্থানে যাইতে হয়। মসজিদের ইমাম মৌলবী মহম্মদ মৈন্নুদ্দিন মিছিলকে বাজনা বাজাইয়া যাইতে বলেন। মৌলবী সাহেব তাহাদিগকে বলেন যে, কেলাজা ও নিকটস্থ স্থানের সাম্প্রদায়িক হত্যাকাণ্ড প্রভৃতি মুসলমান জাতি ও প্রকৃত মুসলমান ধর্ম্মের লজ্জার

বিরত হইয়াছে। ভগবানের নিজের সৃষ্ট মানব: জগতের শ্রেষ্ঠ জীব। সেই মানব যখন ভগবান লাভের প্রার্থনা-স্থান মসজিদের নিকটে সামান্ত বাজনা বাজাইবার অজুহাতে অন্য সম্প্রদারভুক্ত মানুষকে খুন জখম করে, তাহা যে কত বড় পাপ তাহা নির্ণয় করা যায় না। যে-সব তথাকথিত মুসলমান এরূপ কাজ করে তাহারা অতি গর্হিত কাজ করে এবং তাহা কিছুতেই পয়গম্বর হজরত মহম্মদের সম্মত নহে।—সঞ্জীবনী।

—

বঙ্গে চিনির কারখানার প্রয়োজনীয়তা

বিদেশী চিনির উপর গবর্ন্মেণ্ট পনর বৎসরের জন্য শুল্ক বসাইয়াছেন বলিয়া তাহার দাম বাড়িয়া গিয়াছে, এবং ঐ বর্দ্ধিত দামের চেয়ে কিছু কম দামে দেশী চিনি বিক্রি করা যায়। এই কারণে গত তিন বৎসরে দেশী চিনির কারখানা ভারতবর্ষে ত্রিশটি হইতে এক শ চব্বিশটি হইয়াছে। কিন্তু অধিকাংশ কারখানা আগ্রা-অযোধ্যা ও বিহার প্রদেশে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, বঙ্গে উল্লেখযোগ্য একটি কি দুটি হইয়াছে। ফলে বঙ্গের লোকেরা আগেকার সস্তা বিদেশী চিনির পরিবর্ত্তে এখনকার মহার্ঘ্য (বঙ্গের বাহিরে প্রস্তুত) দেশী চিনি খাইতেছে; সস্তা বিদেশী চিনি ও মহার্ঘ্য দেশী চিনির দামের প্রভেদটা লাভ। এই লাভ বঙ্গের বাহিরের লোকেরা পাইতেছে। কিন্তু বাঙালীরা তাহাদের কারখানা না-থাকায় পাইতেছে না। এই জন্য বঙ্গে চিনির কারখানা হওয়া উচিত। ভাল জা'তের আকের চাষের উপযুক্ত জমী বঙ্গের অনেক জেলায় আছে। কৃষিবিভাগ পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছেন, যে, বঙ্গে উৎপন্ন আকে শর্করার অংশ বিহার এবং আগ্রা-অযোধ্যার আকের চেয়ে বেশী আছে। বঙ্গে উৎপন্ন চিনিকে ঐ দুই প্রদেশে উৎপন্ন চিনির মত বেশী রেলভাড়া দিয়া বঙ্গে আনিতে হইবে না, তাহাও একটা সুবিধা। বঙ্গে অনেক জায়গায় জমী ছোট ছোট টুকরাতে বিভক্ত। তাহা চিনির কারখানার জন্য আক চাষের পক্ষে অসুবিধাজনক। কিন্তু এ অসুবিধার প্রতিকার অসাধ্য নহে, এবং বিস্তীর্ণ ইক্ষুক্ষেত্রও বঙ্গে হইতে পারে। ইহা প্রমাণ করা যায়, যে, আকের চাষ পাটের চাষের চেয়ে কৃষকদের পক্ষে অধিকতর লাভজনক।

—

হিন্দু-মুসলমানের অমিলন সম্বন্ধে গজনবী সাহেবের মত

বিলাতী 'মর্ণিং পোষ্ট' কাগজে মিঃ এ এইচ্ গজনবী একখানা চিঠিতে লিখিয়াছেন, যে, শাসন-সম্পর্কীয় উচ্চতর চাকরিগুলাতে হিন্দুদের সংখ্যাধিক্য ভারতবর্ষে হিন্দু-মুসলমানে মিল হইবার একটা প্রবলতম বাধা। এই বাধা দূর করিবার জন্য তিনি প্রস্তাব করিয়াছেন, যে, ঐসব কাজের একটানির্দ্দিষ্ট অংশ আইন দ্বারা মুসলমানদের জন্য রাখা হউক।

মুসলমান উমেদারেরা যদি হিন্দুদের চেয়ে যোগ্যতর বা সমান যোগ্য হন, তাহা হইলে ত তাঁহারা যোগ্যতার জোরেই যথেষ্ট চাকরি পাইতে পারেন, আইনের আবশ্যক নাই; কারণ তাঁহাদিগকে চাকরি দিতেই ত গবর্ন্মেণ্ট ব্যগ্র, না-দিতে ব্যগ্র নহেন। কিন্তু যদি মুসলমান উমেদারেরা হিন্দুদের চেয়ে কম যোগ্য হওয়া সত্ত্বেও তাঁহাদিগকে চাকরি দিতে হয়, তাহা হইলে যোগ্যতর হিন্দু উমেদারদের প্রতি অবিচার করিয়া তাহা দিতে হইবে, তাহা হইলে রাজকার্য্য অপেক্ষাকৃত কম দক্ষতা সহকারে নির্ব্বাহিত হইবে এবং তাহার কুফল হিন্দু মুসলমান খ্রীষ্টিয়ান বৌদ্ধ শিখ আদি সকল সম্প্রদায়ের লোককে ভোগ করিতে হইবে। অধিকন্তু ইহাতে যোগ্যতর হিন্দুরা অসন্তুষ্ট হইবে। মিলনের জন্য উভয় পক্ষের সন্তোষ আবশ্যক, শুধু মুসলমান খুশী হইলেই মিলন হইবে না।

গজনবী সাহেব আরও লিখিয়াছেন, যে, শিক্ষাবিষয়ে মুসলমানদের অসুবিধা ১৮২৮ সালে তাহাদের নিষ্কর জমী গবর্ন্মেণ্ট বাজেয়াপ্ত করিয়া লওয়ার ('resumption proceedings of 1828) সময় হইতে হইয়াছে; উহার দ্বারা গবর্ন্মেণ্টের রাজস্ব ৮,০০,০০০ পাউণ্ড হইতে বাড়িয়া ৩০,০০০,০০০ পর্য্যন্ত হয়। ঐসব জমী হিন্দুরা ক্রয় করে। গজনবী সাহেব অনেকগুলি ভুল করিয়াছেন। তাহা মডার্ণ রিভিউ কাগজে সংশোধিত হইবে। আপাততঃ দু-একটা কথা বলিতেছি। তাঁহার হিসাব ঠিক বলিয়া ধরিয়া লইলে দেখা যাইতেছে, বাজেয়াপ্তী জমীসমূহের মুসলমান মালিকেরা বার্ষিক বাইশ লক্ষ পাউণ্ড অর্থাৎ মুদ্রা-বিনিময়ের তৎকালীন হারে দু-কোটি কুড়ি লক্ষ টাকা আয় ভোগ করিতেছিলেন। যখন জমীগুলা বাজেয়াপ্ত হইল, তখন এই প্রভূত-আয়-ভোক্তা মুসলমানেরা তাঁহাদের সঞ্চিত অর্থে কেন তাহা কিনিয়া লইতে পারিলেন না? এই কারণে নয় কি, যে, তাঁহারা কেবল বিনা শ্রমে লব্ধ টাকা উড়াইয়াছিলেন, সঞ্চয় করেন নাই? তাহাদের তখন সেই দশা ঘটিয়াছিল, এখন যেমন খাজনা দিতে অসমর্থ জমিদারদের অবস্থা হইয়াছে।

মুসলমানরা যে শিক্ষায় অনগ্রসর, তাহার প্রকৃত কারণ অন্য অনেক আছে। সরকারী এবং সরকারী-সাহায্যপ্রাপ্ত সব শিক্ষালয়ে হিন্দু ও মুসলমানের পড়িবার সমান অধিকার আছে। সরকারী প্রতিষ্ঠানসমূহে শিক্ষা পাইবার জন্য মুসলমান ছাত্রদিগকে অনেক বিশেষ সুবিধা দেওয়া হইয়াছে যাহা হিন্দুছাত্রদিগকে দেওয়া হয় নাই। মুসলমানদের জন্য আলাদা সহকারী ডিরেক্টর, ইন্‌স্পেক্টর ইত্যাদি আছে, যাহা হিন্দুদের জন্য নাই। তা ছাড়া, বিশেষ করিয়া মুসলমানদের জন্য বাংলা-গবর্মেণ্ট অন্যূন বার্ষিক ১৫। ১৬ লক্ষ টাকা খরচ করেন, বিশেষ করিয়া হিন্দুদের জন্য খরচ ইহার কাছ দিয়াও যায় না। এই সকল সুবিধা সত্ত্বেও মুসলমানেরা যে শিক্ষায় অনগ্রসর তাহার প্রকৃত কারণগুলা প্রকৃত মুসলমানহিতৈষীরা দূর করিতে চেষ্টা করুন। তাহা না করিয়া কেবল হিন্দুদের ঈর্ষ্যা করিলে তাহাতে মুসলমানদের জ্ঞানবৃদ্ধি ও যোগ্যতাবৃদ্ধি হইবে না।

—

উড়িষ্যায় প্রচুর বারিপাত ও বন্যা

গত মাসে উড়িষ্যায় এরূপ অতিবৃষ্টি হইয়াছে যাহা গত দশ বৎসরের মধ্যে হয় নাই। তাহাতে অনেক ঘর-বাড়ি পড়িয়া গিয়া হাজার হাজার লোক গৃহহীন হইয়াছে। উড়িষ্যার এবং উড়িষ্যার বাহিরের সঙ্গতিপন্ন লোকদের বিপন্ন লোকদিগকে সাহায্য দেওয়া কর্ত্তব্য। মেদিনীপুরেও খুব বন্যা হইয়াছে।

—

রিভলভারের প্রাচুর্য্য

খবরের কাগজে প্রায়ই পড়া যায়, অমুক লোক রিভলভার সহ ধৃত হইয়াছে, অমুক ছাত্র অমুক ছাত্রী রিভলভার সহ ধৃত হইয়াছে। এই সকল রিভলভার আসে কোথা হইতে? বেআইনীভাবে রিভলভার আমদানী ও বিক্রী যাহারা করে, তাহাদিগকে ধরিবার হয়ত তত চেষ্টা নাই, যত চেষ্টা আছে ঐ সব রিভলভার-অধিকারীদিগকে ধরিতে। অথবা যদি চেষ্টা থাকে, তাহা সফল হয় না কেন? ব্যর্থতার কোন গোপনীয় কারণ আছে কি?

—

ব্যবস্থাপক সভায় যতীন্দ্রমোহনের জন্য শোকপ্রকাশ

গত ৮ই আগষ্ট বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার কাজ আরম্ভ হইবার পূর্ব্বে উহার সভাপতি রাজা স্যর মন্মথনাথ রায়-চৌধুরী স্বর্গীয় যতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্তের মৃত্যুতে শোক প্রকাশ করেন। ঠিকই করিয়াছেন। তাহা হইলে, বন্দীদশায় মৃত জননায়কের জন্য সরকারী প্রতিষ্ঠানে শোক প্রকাশ করা চলে? হাইকোর্ট প্রভৃতি আদালত কি বলেন? রায়-চৌধুরী মহাশয় আরও দুই জনের মৃত্যুতে শোক প্রকাশ করেন।

—

ময়মনসিংহে "জনসাহিত্য"

বাংলা সাহিত্যের ভাষা প্রায় এক হইয়াছে। শিক্ষিত বাঙালীর কথিত ভাষাও এক হইতে যাইতেছে। যাহারা প্রত্যেক জেলার কথিত ভাষায় বহি লিখিবার চেষ্টা করিতেছে, তাহারা দেশের শত্রু। ময়মনসিংহে "জনসাহিত্য" নাম দিয়া এইরূপ শত্রুতা করিতে চেষ্টিত জনকতক লোক দেখা দিয়াছে।

—

পূজার বাজার

গৃহস্থেরা শীঘ্রই পূজার বাজার করিতে আরম্ভ করিবেন। তাঁহারা মনে রাখিবেন, সকল মাপের ধুতি, শাড়ী, নানা রকমের জামার কাপড়, জুতা, ছেলেদের টুপি, আয়না, চিরুনী, সাবান, গন্ধদ্রব্য প্রভৃতি জিনিষ দেশী পাওয়া যায়। দেশী কিনিবেন। দেশদ্রোহিতা করিবেন না।

—

বিজ্ঞাপনদাতাদের প্রতি

দুর্গাপূজা উপলক্ষে আগামী আশ্বিন সংখ্যা প্রবাসী ২০শে ভাদ্র এবং কার্ত্তিক সংখ্যা প্রবাসী ১লা আশ্বিন প্রকাশিত হইবে। বিজ্ঞাপনের কপিগুলি আশ্বিন সংখ্যার জন্য ১০ই ভাদ্র ও কার্ত্তিক সংখ্যার জন্য ২১শে ভাদ্রের মধ্যে প্রবাসী কার্য্যালয়ে পৌঁছান আবশ্যক।

বিজ্ঞাপন-কার্য্যাধ্যক্ষ।

১২০।২ আপার সার্কুলার রোড কলিকাতা, প্রবাসী প্রেস হইতে শ্রীমাণিকচন্দ্র দাস কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

"সত্যম্ শিবম্ সুন্দরম্"
"নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ"

৩৩শ ভাগ, ১ম খণ্ড | আশ্বিন, ১৩৪০ | ৬ষ্ঠ সংখ্যা

আশ্রম-বিদ্যালয়ের সূচনা

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

'জীবনস্মৃতি'তে লিখেছি, আমার বয়স যখন অল্প ছিল তখনকার স্কুলের রীতিপ্রকৃতি এবং শিক্ষক ও ছাত্রদের আচরণ আমার পক্ষে নিতান্ত দুঃসহ হয়ে উঠেছিল। তখনকার শিক্ষাবিধির মধ্যে কোনো রস ছিল না, কিন্তু সেইটেই আমার অসহিষ্ণুতার একমাত্র কারণ নয়। কলকাতা শহরে আমি প্রায় বন্দী অবস্থায় ছিলেম। কিন্তু বাড়িতে তবুও বন্ধনের ফাঁকে ফাঁকে বাইরের প্রকৃতির সঙ্গে আমার একটা আনন্দের সম্বন্ধ জন্মে গিয়েছিল। বাড়ির দক্ষিণ দিকের পুকুরের জলে সকাল-সন্ধ্যার ছায়া এপার-ওপার করত—হাঁসগুলো দিত সাঁতার, গুগলি তুলত জলে ডুব দিয়ে, আষাঢ়ের জলে-ভরা নীলবর্ণ পুঞ্জ পুঞ্জ মেঘ সার-বাঁধা নারকেল গাছের মাথার উপরে ঘনিয়ে আনত বর্ষার গম্ভীর সমারোহ। দক্ষিণের দিকে যে বাগানটা ছিল ঐখানেই নানা রঙে ঋতুর পরে ঋতুর আমন্ত্রণ আসত উৎসুক দৃষ্টির পথে আমার হৃদয়ের মধ্যে।

শিশুর জীবনের সঙ্গে বিশ্বপ্রকৃতির এই যে আদিম কালের যোগ, প্রাণমনের বিকাশের পক্ষে এর যে কত বড় মূল্য তা আশা করি ঘোরতর সাহরিক লোককেও বোঝাবার দরকার নেই। ইস্কুল যখন নীরস পাঠ্য, কঠোর শাসনবিধি, ও প্রভুত্বপ্রিয় শিক্ষকদের নির্বিচার অন্যায় নির্মমতায় বিশ্বের সঙ্গে বালকের সেই মিলনের বৈচিত্র্যকে চাপা দিয়ে তার দিনগুলিকে নির্জীব নিরালোক নিষ্ঠুর ক'রে তুলেছিল তখন প্রতিকারহীন বেদনায় মনের মধ্যে ব্যর্থ বিদ্রোহ উঠেছিল একান্ত চঞ্চল হয়ে। যখন আমার বয়স তেরো, তখন এডুকেশন-বিভাগীয় দাঁড়ের শিকল ছিন্ন ক'রে বেরিয়ে পড়েছিলেম। তার পর থেকে যে-বিদ্যালয়ে হলেম ভর্তি, তাকে যথার্থই বলা যায় বিশ্ববিদ্যালয়। সেখানে আমার ছুটি ছিল না, কেন-না, অবিশ্রাম কাজের মধ্যেই পেয়েছি ছুটি। কোনো কোনো দিন পড়েছি রাত দুটো পর্য্যন্ত। তখনকার অপ্রখর আলোকের যুগে রাত্রে সমস্ত পাড়া নিস্তব্ধ, মাঝে মাঝে শোনা যেত "হরিবোল" শ্মশানযাত্রীদের কণ্ঠ থেকে। ভেরেণ্ডা তেলের সেজের প্রদীপে দুটো সলতের মধ্যে একটা সলতে নিবিয়ে দিতুম, তাতে শিখার তেজ হ্রাস হ'ত কিন্তু হ'ত আয়ুবৃদ্ধি। মাঝে মাঝে অন্তঃপুর থেকে বড়দিদি এসে জোর ক'রে আমার বই কেড়ে নিয়ে আমাকে পাঠিয়ে দিতেন বিছানায়। তখন আমি যে-সব বই পড়বার চেষ্টা করেছি কোনো কোনো গুরুজন তা আমার হাতে দেখে মনে করেছেন স্পর্দ্ধা। শিক্ষার কারাগার থেকে বেরিয়ে এসে যখন শিক্ষার স্বাধীনতা পেলুম, তখন কাজ বেড়ে গেল অনেক বেশি, অথচ ভার গেল কমে।

তার পরে সংসারে প্রবেশ করলেম ; রথীন্দ্রনাথকে পড়াবার সমস্যা এল সামনে। তখন প্রচলিত প্রথায় তাকে

ইস্কুলে পাঠালে আমার দায় হ'ত লঘু এবং আত্মীয়-বান্ধবেরা সেইটেই প্রত্যাশা করেছিলেন। কিন্তু বিশ্বক্ষেত্র থেকে যে-শিক্ষালয় বিচ্ছিন্ন সেখানে তাকে পাঠানো আমার পক্ষে ছিল অসম্ভব। আমার ধারণা ছিল, অন্ততঃ জীবনের আরম্ভকালে, নগরবাস প্রাণের পুষ্টি ও মনের প্রথম বিকাশের পক্ষে অনুকূল নয়। বিশ্বপ্রকৃতির অনুপ্রেরণা থেকে বিচ্ছেদ তার একমাত্র কারণ নয়। শহরে যানবাহন ও প্রাণযাত্রার অন্যান্য নানাবিধ সুযোগ থাকে, তাতে সম্পূর্ণ দেহচালনা ও চারি দিকের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা লাভে শিশুরা বঞ্চিত হয়; বাহ্য বিষয়ে আত্মনির্ভর চিরদিনের মত তাদের শিথিল হয়ে যায়। প্রশ্রয়প্রাপ্ত যে-সব বাগানের গাছ উপর থেকেই জলসেচনের সুযোগ পায় তারা উপরে উপরেই মাটির সঙ্গে সংলগ্ন থাকে গভীর ভূমিতে শিকড় চালিয়ে দিয়ে, স্বাধীন-জীবী হবার শিক্ষা তাদের হয় না, মানুষের পক্ষেও সেই রকম। দেহটাকে সম্যকরূপে ব্যবহার করবার যে শিক্ষা প্রকৃতি আমাদের কাছে দাবী করে এবং নাগরিক 'ভদ্দর' শ্রেণীর রীতির কাছে যেটা উপেক্ষিত অবজ্ঞাভাজন, তার অভাব দুঃখ আমার জীবনে আজ পর্য্যন্ত আমি অনুভব করি। তাই সে সময়ে আমি কলকাতা শহর প্রায় বর্জ্জন করেছিলেম। তখন সপরিজনে থাকতেম শিলাইদহে। সেখানে আমাদের জীবনযাপনের পদ্ধতি ছিল নিতান্তই সাদাসিধে। সেটা সম্ভব হয়েছিল তার কারণ যে-সমাজে আমরা মানুষ সে-সমাজে প্রচলিত প্রাণযাত্রার রীতি ও আদর্শ এখানে পৌঁছতে পারত না, এমন কি, তখনকার দিনে নগরবাসী মধ্যবিত্ত লোকেরাও যে-সকল আরামে ও আড়ম্বরে অভ্যস্ত, তাও ছিল আমাদের থেকে বহু দূরে। বড় শহরে পরস্পরের অনুকরণে ও প্রতিযোগিতায় যে-অভ্যাসগুলি অপরিহার্য্যরূপে গড়ে ওঠে সেখানে তার সম্ভাবনামাত্র ছিল না।

শিলাইদহে বিশ্বপ্রকৃতির নিকটসান্নিধ্যে রথীন্দ্রনাথ যে-রকম ছাড়া পেয়েছিল সে-রকম মুক্তি তখনকার কালের সম্পন্ন অবস্থার গৃহস্থেরা আপন ঘরের ছেলেদের পক্ষে অনুপযোগী ব'লেই জানত এবং তার মধ্যে যে বিপদের আশঙ্কা আছে, তারা ভয় করত তা স্বীকার করতে। রথী সেই বয়সে ডিঙি বেয়েছে নদীতে। সেই ডিঙিতে ক'রে চল্‌তি স্টীমার থেকে সে প্রতিদিন রুটি নামিয়ে আনত, তাই নিয়ে স্টীমারের সারঙ আপত্তি করেছে বার-বার। চরে বনঝাউয়ের জঙ্গলে সে বেরোত শিকার করতে কোনোদিন বা ফিরে এসেছে সমস্ত দিন পরে অপরাহ্ণে। তা নিয়ে ঘরে উদ্বেগ ছিল না তা বলতে পারি নে, কিন্তু সে উদ্বেগ থেকে নিজেদের বাঁচাবার জন্যে বালকের স্বাধীন সঞ্চরণ খর্ব্ব করা হয়নি। যখন রথীর বয়স ছিল ষোলর নীচে তখন আমি তাকে কয়েক জন তীর্থ-যাত্রীর সঙ্গে পদব্রজে কেদারনাথ-ভ্রমণে পাঠিয়েছি, তা নিয়ে ভর্ৎসনা স্বীকার করেছি আত্মীয়দের কাছ থেকে, কিন্তু একদিকে প্রকৃতির ক্ষেত্রে অন্যদিকে সাধারণ দেশবাসীদের সম্বন্ধে যে কষ্টসহিষ্ণু অভিজ্ঞতা আমি তার শিক্ষার অত্যাবশ্যক অঙ্গ ব'লে জানতুম তার থেকে তাকে স্নেহের ভীরুতাবশত বঞ্চিত করিনি।

শিলাইদহে কুঠিবাড়ির চারদিকে যে জমি ছিল, প্রজাদের মধ্যে নতুন ফসল প্রচারের উদ্দেশ্যে সেখানে নানা পরীক্ষায় লেগেছিলেম। এই পরীক্ষাব্যাপারে সরকারী কৃষি বিভাগের বিশেষজ্ঞদের সহায়তা অত্যধিক পরিমাণেই মিলেছিল। তাঁদের আদিষ্ট উপাদানের তালিকা দেখে চিচেস্টারে যারা এগ্রিকালচারাল্ কলেজে পাস করেনি এমন সব চাষীরা হেসেছিল; তাদেরই হাসিটা টিঁকেছিল শেষ পর্য্যন্ত। মরার লক্ষণ আসন্ন হ'লেও শ্রদ্ধাবান রোগীরা যেমন ক'রে চিকিৎসকের সমস্ত উপদেশ অক্ষুণ্ণ রেখে পালন করে, পঞ্চাশ বিঘে জমিতে আলুচাষের পরীক্ষায় সরকারী কৃষিতত্ত্বপ্রবীণদের নির্দ্দেশ সেই রকম একান্ত নিষ্ঠার সঙ্গেই পালন করেছি। তাঁরাও আমার ভরসা জাগিয়ে রাখবার জন্যে পরিদর্শনকার্য্যে সর্ব্বদাই যাতায়াত করেছেন। তারই বহুব্যয়সাধ্য ব্যর্থতার প্রহসন নিয়ে বন্ধুবর জগদীশচন্দ্র আজও প্রায় মাঝে মাঝে হেসে থাকেন। কিন্তু তারও চেয়ে প্রবল অট্টহাস্য নীরবে ধ্বনিত হয়েছিল চাষরু নামধারী একহাত-কাটা সেই রাজবংশী চাষীর ঘরে, যে-ব্যক্তি পাঁচ কাঠা জমির উপযুক্ত বীজ নিয়ে কৃষিতত্ত্ববিদের সকল উপদেশই অগ্রাহ্য ক'রে আমার চেয়ে প্রচুরতর ফললাভ করেছিল। চাষবাস-সম্বন্ধীয় যে-সব পরীক্ষাব্যাপারের মধ্যে বালক বেড়ে উঠেছিল তারই একটা নমুনা দেবার জন্যে এই গল্পটা বলা গেল; পাঠকেরা হাসতে চান হাসুন কিন্তু এ কথা যেন মানেন যে শিক্ষার অঙ্গরূপে এই ব্যর্থতাও ব্যর্থ নয়। এত বড় অদ্ভুত অপব্যয়ে আমি যে প্রবৃত্ত হয়েছিলুম তার

বুইক্রাফটের মূল্য চাষকে বোঝাবার সুযোগ হয়নি, সে এখন পরলোকে।

এরই সঙ্গে সঙ্গে পুঁথিগত বিদ্যার আয়োজন ছিল সে-কথা বলা বাহুল্য। এক পাগলা-মেজাজের চালচুলোহীন ইংরেজ শিক্ষক হঠাৎ গেল জুটে। তার পড়াবার কায়দা খুবই ভাল, আরও ভাল এই যে, কাজে ফাঁকি দেওয়া তার ধাতে ছিল না। মাঝে মাঝে মদ খাবার দুর্নিবার উত্তেজনায় সে পালিয়ে গেছে কলকাতায়, তারপরে মাথা হেঁট ক'রে ফিরে এসেছে লজ্জিত অনুতপ্ত চিত্তে। কিন্তু কোনোদিন শিলাইদহে মত্ততায় আত্মবিস্মৃত হয়ে ছাত্রদের কাছে শ্রদ্ধা হারাবার কোনো কারণ ঘটায় নি। ভৃত্যদের ভাষা বুঝতে পারত না সেটাকে অনেক সময়ে সে মনে করেছে ভৃত্যদেরই অসৌজন্য। তা ছাড়া সে আমার প্রাচীন মুসলমান চাকরকে তার পিতৃদত্ত ফটিক নামে কোনো মতেই ডাকত না। তাকে অকারণে সম্বোধন করত সলেমান। এর মনস্তত্ত্বরহস্য কী জানিনে। এতে বার-বার অসুবিধা ঘটত। কারণ চাষাঘরের সেই চাকরটি বরাবরই ভুলত তার অপরিচিত নামের মর্য্যাদা।

আরও কিছু বলবার কথা আছে। লরেন্সকে পেয়ে বসল রেশমের চাষের নেশায়। শিলাইদহের নিকটবর্ত্তী কুমারখালি ঈষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির আমলে রেশম-ব্যবসায়ের একটা প্রধান আড্ডা ছিল। সেখানকার রেশমের বিশিষ্টতা খ্যাতি লাভ করেছিল বিদেশী হাটে। সেখানে ছিল রেশমের মস্ত বড় কুঠি। একদা রেশমের তাঁত বন্ধ হ'ল সমস্ত বাংলা দেশে, পূর্ব্বস্মৃতির স্বপ্নাবিষ্ট হয়ে কুঠি রইল শূন্য পড়ে। যখন পিতৃঋণের প্রকাণ্ড বোঝা আমার পিতার সংসার চেপে ধরল বোধ করি তারই কোনো এক সময়ে তিনি রেলওয়ে কোম্পানিকে এই কুঠি বিক্রি করেন। সে সময়ে গোরাই নদীর উপরে ব্রিজ তৈরি হচ্চে। এই সেকেলে প্রাসাদের প্রভূত ইটপাথর ভেঙে নিয়ে সেই কোম্পানি নদীর বেগ ঠেকাবার কাজে সেগুলো জলাঞ্জলি দিলে। কিন্তু যেমন বাংলার তাঁতীর দুর্দ্দিনকে কেউ ঠেকাতে পারলে না, যেমন সাংসারিক দুর্য্যোগে পিতামহের বিপুল ঐশ্বর্য্যের ধ্বংস কিছুতে ঠেকানো গেল না—তেমনি কুঠিবাড়ির ভগ্নাবশেষ নিয়ে নদীর ভাঙন রোধ মানলে না;—সমস্তই গেল ভেসে; ঐশ্বর্য্যের চিহ্নগুলোকে কালস্রোত যেটুকু রেখেছিল নদীস্রোতে তাকে দিলে ভাসিয়ে।

লরেন্সের কানে গেল রেশমের সেই ইতিবৃত্ত। ওর মনে লাগল আর একবার সেই চেষ্টার প্রবর্ত্তন করলে ফল পাওয়া যেতে পারে; দুর্গতি যদি খুব বেশি হয় অন্তত আলুর চাষকে ছাড়িয়ে যাবে না। চিঠি লিখে যথারীতি বিশেষজ্ঞদের কাছ থেকে সে খবর আনালে। কীটদের আহার জোগাবার জন্যে প্রয়োজন ভেরেণ্ডা গাছের। তাড়াতাড়ি জন্মানো গেল কিছু গাছ কিন্তু লরেন্সের সবুর সইল না। রাজশাহী থেকে গুটি আনিয়ে পালনে প্রবৃত্ত হ'ল অচিরাৎ। প্রথমত বিশেষজ্ঞদের কথাকে বেদবাক্য ব'লে মানলে না, নিজের মতে নতুন পরীক্ষা করতে করতে চলল। কীটগুলোর ক্ষুদে ক্ষুদে মুখ, ক্ষুদে ক্ষুদে গ্রাস কিন্তু ক্ষুধার অবসান নেই। তাদের বংশবৃদ্ধি হ'তে লাগল খাদ্যের পরিমিত আয়োজনকে লঙ্ঘন ক'রে। গাড়ি ক'রে দূর দূর থেকে অনবরত পাতার জোগান চলল। লরেন্সের বিছানাপত্র, তার চৌকি টেবিল, খাতা বই, তার টুপি পকেট কোর্ত্তা—সর্ব্বত্রই হ'ল গুটির জনতা। তার ঘর দুর্গম হয়ে উঠল দুর্গন্ধের ঘন আবেষ্টনে। প্রচুর ব্যয় ও অক্লান্ত অধ্যবসায়ের পর মাল জন্মল বিস্তর, বিশেষজ্ঞেরা বললেন অতি উৎকৃষ্ট, এ জাতের রেশমের এমন সাদা রং হয় না। প্রত্যক্ষ দেখতে পাওয়া গেল সফলতার রূপ কেবল একটুখানি ত্রুটি রয়ে গেল। লরেন্স বাজার যাচাই ক'রে জানলে তখনকার দিনে এ মালের কাটতি অল্প, তার দাম সামান্য। বন্ধ হ'ল ভেরেণ্ডা পাতার অনবরত গাড়ি চলাচল, অনেক দিন পড়ে রইল জালাভরা গুটিগুলো; তারপরে তাদের কী ঘটল তার কোনো হিসেব আজ কোথাও নেই। সেদিন বাংলা দেশে এই গুটিগুলোর উৎপত্তি হ'ল অসময়ে। কিন্তু যে-শিক্ষালয় খুলেছিলেম তার সময় পালন তারা করেছিল।

আমাদের পণ্ডিত ছিলেন শিবধন বিদ্যার্ণব। বাংলা আর সংস্কৃত শেখানো ছিল তাঁর কাজ, আর তিনি ব্রাহ্মধর্ম্ম-গ্রন্থ থেকে উপনিষদের শ্লোক ব্যাখ্যা ক'রে আবৃত্তি করাতেন। তাঁর বিশুদ্ধ সংস্কৃত উচ্চারণে পিতৃদেব তাঁর প্রতি বিশেষ প্রসন্ন ছিলেন। বাল্যকাল থেকে প্রাচীন ভারতবর্ষের তপোবনের যে-আদর্শ আমার মনে ছিল, তার কাজ এমনি ক'রে সুরু হয়েছিল কিন্তু তার মূর্ত্তি সম্যক উপাদানে গড়ে ওঠেনি।

দীর্ঘকাল ধ'রে শিক্ষা-সম্বন্ধে আমার মনের মধ্যে যে মতটি সক্রিয় ছিল, মোটের উপর সেটি হচ্ছে এই যে, শিক্ষা হবে প্রতিদিনের জীবনযাত্রার নিকট অঙ্গ, চলবে তার সঙ্গে এক তালে এক সুরে, সেটা ক্লাসনামধারী খাঁচার জিনিষ হবে না। আর যে-বিশ্বপ্রকৃতি প্রতিনিয়ত প্রত্যক্ষ ও অপ্রত্যক্ষ ভাবে আমাদের দেহে মনে শিক্ষাবিস্তার করে সেও এর সঙ্গে হবে মিলিত। প্রকৃতির এই শিক্ষালয়ের একটা অঙ্গ পর্য্যবেক্ষণ আর একটা পরীক্ষা, এবং সকলের চেয়ে বড় তার কাজ প্রাণের মধ্যে আনন্দসঞ্চার। এই গেল বাহ্য প্রকৃতি। আর আছে দেশের অন্তঃপ্রকৃতি, তারও বিশেষ রস আছে, রং আছে, ধ্বনি আছে। ভারতবর্ষের চিরকালের যে চিত্ত, সেটার আশ্রয় সংস্কৃত ভাষায়। এই ভাষার তীর্থপথ দিয়ে আমরা দেশের চিন্ময় প্রকৃতির স্পর্শ পাব, তাকে অন্তরে গ্রহণ করব, শিক্ষার এই লক্ষ্য মনে আমার দৃঢ় ছিল। ইংরেজি ভাষার ভিতর দিয়ে নানা জ্ঞাতব্য বিষয় আমরা জানতে পারি, সেগুলি অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। কিন্তু সংস্কৃত ভাষার একটা আনন্দ আছে, সে রঞ্জিত করে আমাদের মনের আকাশকে, তার মধ্যে আছে একটি গভীর বাণী, বিশ্বপ্রকৃতির মতই সে আমাদের শান্তি দেয় এবং চিন্তাকে মর্য্যাদা দিয়ে থাকে।

যে-শিক্ষাতত্ত্বকে আমি শ্রদ্ধা করি তার ভূমিকা হ'ল এইখানে। এতে যথেষ্ট সাহসের প্রয়োজন ছিল, কেন-না, এর পথ অনভ্যস্ত, এবং চরম ফল অপরীক্ষিত। এই শিক্ষাকে শেষ পর্য্যন্ত চালনা করবার শক্তি আমার ছিল না, কিন্তু এর 'পরে নিষ্ঠা আমার অবিচলিত। এর সমর্থন ছিল না দেশের কোথাও। তার একটা প্রমাণ বলি। একদিকে অরণ্যবাসে দেশের উন্মুক্ত বিশ্বপ্রকৃতি আর একদিকে গুরুগৃহবাসে দেশের শুদ্ধতম উচ্চতম সংস্কৃতি—এই উভয়ের ঘনিষ্ঠ সংস্পর্শে তপোবনে একদা যে-নিয়মে শিক্ষা চলত আমি কোনো এক বক্তৃতায় তার প্রতি আমার শ্রদ্ধা ব্যাখ্যা করেছিলেম। বলেছিলেম আধুনিককালে শিক্ষার উপাদান অনেক বাড়াতে হবে সন্দেহ নেই কিন্তু তার রূপটি তার রসটি তৈরি হয়ে উঠবে প্রকৃতির সহযোগে, এবং যিনি শিক্ষা দান করবেন তাঁর অন্তরঙ্গ আধ্যাত্মিক সংসর্গে। শুনে সেদিন গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় বলেছিলেন এ কথাটি কবি-জনোচিত, কবি এর অত্যাবশ্যকতা যতটা কল্পনা করেছেন আধুনিক কালে ততটা স্বীকার করা যায় না। আমি প্রত্যুত্তরে তাঁকে বলেছিলেম, বিশ্বপ্রকৃতি ক্লাসে ডেস্কের সামনে বসে মাষ্টারি করেন না, কিন্তু জলেস্থলে আকাশে তাঁর ক্লাস খুলে আমাদের মনকে তিনি যে প্রবল শক্তিতে গড়ে তোলেন কোনো মাষ্টার কি তা পারে? আরবের মানুষকে কি আরবের মরুভূমিই গড়ে তোলে নি—সেই মানুষই বিচিত্র ফলশস্য-শালিনী নীলনদী তীরবর্ত্তী-ভূমিতে যদি জন্ম নিত, তা হ'লে কি তার প্রকৃতি অন্য রকম হ'ত না? যে প্রকৃতি সজীব বিচিত্র, আর যে শহর নির্জ্জীব পাথরে বাঁধানো, চিত্তগঠন সম্বন্ধে তাদের প্রভাবের প্রবল প্রভেদ নিঃসংশয়।

এ-কথা নিশ্চিত জানি, যদি আমি বাল্যকাল থেকে অধিকাংশ সময়ই শহরে আবদ্ধ থাকতেম তবে তার প্রভাবটা প্রচুর পরিমাণেই প্রকাশ পেত আমার চিন্তায় আমার রচনায়। বিদ্যায় বুদ্ধিতে সেটা বিশেষভাবে অনুভব করা যেত কি না জানিনে কিন্তু ধাত হ'ত অন্য প্রকারের। বিশ্বের অযাচিত দান থেকে যে-পরিমাণে নিয়ত বঞ্চিত হতেম সেই পরিমাণে বিশ্বকে প্রতিদানের সম্পদে আমার স্বভাবে দারিদ্র্য থেকে যেত। এই রকম আন্তরিক জিনিষটার বাজারদর নেই ব'লেই এর অভাব সম্বন্ধে যে-মানুষ স্বচ্ছন্দে নিশ্চেতন থাকে সে-রকম বেদনাহীন হতভাগ্য যে কৃপাপাত্র তা অন্তর্যামী জানেন। সংসারযাত্রায় সে যেমনি কৃতকৃত্য হোক্ মানবজন্মের পূর্ণতায় সে চিরদিন থেকে যায় অকৃতার্থ।

সেইদিনই আমি প্রথম মনে করলেম শুধু মুখের কথায় ফল হবে না; কেন-না, এ-সব কথা এখনকার কালের অভ্যাস-বিরুদ্ধ। এই চিন্তাটা কেবলই মনের মধ্যে আন্দোলিত হ'তে লাগল যে এই আদর্শকে যতটা পারি কর্ম্মক্ষেত্রে রচনা ক'রে তুলতে হবে। তপোবনের বাহ্য অনুকরণ যাকে বলা যেতে পারে তা অগ্রাহ্য, কেন-না, এখনকার দিনে তা অসঙ্গত, তা মিথ্যে। তার ভিতরকার সত্যটিকে আধুনিক জীবনযাত্রার আধারে প্রতিষ্ঠিত করা চাই।

তার কিছুকাল পূর্ব্বে শান্তিনিকেতন-আশ্রম পিতৃদেব জনসাধারণকে উৎসর্গ ক'রে দিয়েছিলেন। বিশেষ নিয়ম পালন ক'রে অতিথিরা যাতে দুই-তিন দিন আধ্যাত্মিক শান্তির সাধনা করতে পারেন এই ছিল তাঁর সঙ্কল্প। এ জন্য উপাসনামন্দির

লাইব্রেরী ও অন্যান্য ব্যবস্থা ছিল যথোচিত। কদাচিৎ সেই উদ্দেশ্যে কেউ কেউ এখানে আসতেন, কিন্তু অধিকাংশ লোক আসতেন ছুটি যাপন করবার সুযোগে এবং বায়ুপরিবর্ত্তনের সাহায্যে শারীরিক আরোগ্যসাধনায়।

আমার বয়স যখন অল্প পিতৃদেবের সঙ্গে ভ্রমণে বের হয়েছিলেম। ঘর ছেড়ে সেই আমার প্রথম বাহিরে যাত্রা। ইটকাঠের অরণ্য থেকে অবারিত আকাশের মধ্যে বৃহৎ মুক্তি এই প্রথম আমি ভোগ করেছি। প্রথম বললে সম্পূর্ণ ঠিক বলা হয় না। এর পূর্ব্বে কলকাতায় একবার যখন ডেঙ্গু জ্বর সংক্রামক হয়ে উঠেছিল তখন আমার গুরুজনদের সঙ্গে আশ্রয় নিয়েছিলেম গঙ্গার ধারে লালাবাবুদের বাগানে। বসুন্ধরার উন্মুক্ত প্রাঙ্গণে সুদূরব্যাপ্ত আস্তরণের একটি প্রান্তে সেদিন আমার বসবার আসন জুটেছিল। সমস্ত দিন বিরাটের মধ্যে মনকে ছাড়া দিয়ে আমার বিস্ময়ের এবং আনন্দের ক্লান্তি ছিল না। কিন্তু তখনও আমি আমাদের পূর্ব্ব নিয়মে ছিলেম বন্দী, অবাধে বেড়ানো ছিল নিষিদ্ধ। অর্থাৎ কলকাতায় ছিলেম ঢাকা খাঁচার পাখী, কেবল চলার স্বাধীনতা নয় চোখের স্বাধীনতাও ছিল সঙ্কীর্ণ, এখানে রইলুম দাঁড়ের পাখী, আকাশ খোলা চারিদিকে কিন্তু পায়ে শিকল। শান্তিনিকেতনে এসেই আমার জীবনে প্রথম সম্পূর্ণ ছাড়া পেয়েছি বিশ্বপ্রকৃতির মধ্যে। উপনয়নের পরেই আমি এখানে এসেছি। উপনয়ন অনুষ্ঠানে ভূর্ভুবঃ স্বর্লোকের মধ্যে চেতনাকে পরিব্যাপ্ত করবার যে দীক্ষা পেয়েছিলেম পিতৃদেবের কাছ থেকে,—এখানে বিশ্বদেবতার কাছ থেকে পেয়েছিলেম সেই দীক্ষাই। আমার জীবন নিতান্তই অসম্পূর্ণ থাকত প্রথম বয়সে এই সুযোগ যদি আমার না ঘটত। পিতৃদেব কোনো নিষেধ বা শাসন দিয়ে আমাকে বেষ্টন করেন নি। সকালবেলায় অল্প কিছুক্ষণ তাঁর কাছে ইংরেজি ও সংস্কৃত পড়তেম, তারপরে আমার অবাধ ছুটি। বোলপুর শহর তখন স্ফীত হয়ে ওঠেনি। চালের কলের ধোঁয়া আকাশকে কলুষিত আর তার দুর্গন্ধ সমল করেনি মলয় বাতাসকে। মাঠের মাঝখান দিয়ে যে লাল মাটির পথ চলে গেছে তাতে লোকচলাচল ছিল অল্পই। বাঁধের জল ছিল পরিপূর্ণ প্রসারিত, চারদিক থেকে পলি-পড়া চাষের জমি তাকে কোণ-ঠেসা করে আনে নি। তার পশ্চিমের উঁচু পাড়ির উপর অক্ষুণ্ণ ছিল ঘন তালগাছের শ্রেণী। যাকে আমরা খোয়াই বলি, অর্থাৎ কাঁকুরে জমির মধ্যে দিয়ে বর্ষার জলধারায় আঁকাবাঁকা উঁচুনীচু খোদাই পথ, সে ছিল নানা জাতের নানা আকৃতির পাথরে পরিকীর্ণ, কোনোটাতে শির-কাটা পাতার ছাপ, কোনোটা লম্বা আঁশওয়ালা কাঠের টুকরোর মত, কোনোটা স্ফটিকের দানা সাজানো, কোনোটা অগ্নিগলিত মসৃণ। মনে আছে, ১৮৭০ খৃষ্টাব্দের ফরাসী-প্রুসীয় যুদ্ধের পরে একজন ফরাসী সৈনিক আমাদের বাড়িতে আশ্রয় নিয়েছিল; সে ফরাসী-রান্না রেঁধে খাওয়াত আমার দাদাদের, আর তাঁদের ফরাসী ভাষা শেখাত। তখন আমার দাদারা একবার বোলপুরে এসেছিলেন, সে ছিল সঙ্গে। একটা ছোট হাতুড়ি নিয়ে আর একটা থলি কোমরে ঝুলিয়ে সে এই খোয়াইয়ে দুর্লভ পাথর সন্ধান ক'রে বেড়াত। একদিন একটা বড়গোছের স্ফটিক সে পেয়েছিল, সেটাকে আঙটির মত বাঁধিয়ে কলকাতার কোন্ ধনীর কাছে বেচেছিল আশী টাকায়। আমিও সমস্ত দুপুরবেলা খোয়াইয়ে প্রবেশ ক'রে নানারকম পাথর সংগ্রহ করেছি, ধন উপার্জ্জনের লোভে নয়, পাথর উপার্জ্জন করতেই। মাঠের জল চুঁইয়ে সেই খোয়াইয়ের এক জায়গায় উপরের ডাঙা থেকে ছোট ঝরণা ঝরে পড়ত। সেখানে জমেছিল একটি ছোট জলাশয়, তার সাদাটে ঘোলা জল, আমার পক্ষে ডুব দিয়ে স্নান করবার মত যথেষ্ট গভীর। সেই ডোবাটা উপ্‌চিয়ে ক্ষীণ স্বচ্ছ জলের স্রোত ঝিরঝির ক'রে বয়ে যেত নানা শাখা-প্রশাখায়, ছোট ছোট মাছ সেই স্রোতে উজান মুখে সাঁতার কাটত। আমি জলের ধার বেয়ে বেয়ে আবিষ্কার করতে বেরতুম সেই শিশু ভূবিভাগের নতুন নতুন বালখিল্য গিরিনদী। মাঝে মাঝে পাওয়া যেত পাড়ির গায়ে গহ্বর। তার মধ্যে নিজেকে প্রচ্ছন্ন ক'রে অচেনা জিয়োগ্রাফির মধ্যে ভ্রমণকারীর গৌরব অনুভব করতুম। খোয়াইয়ের স্থানে স্থানে যেখানে মাটি জমা সেখানে বেঁটে বেঁটে বুনো জাম বুনো খেজুর—কোথাও বা ঘন কাশ লম্বা হয়ে উঠেছে। উপরে দূর মাঠে গোরু চরছে, সাঁওতালরা কোথাও করছে চাষ, কোথাও চলেছে পথহীন প্রান্তরে আর্ত্তস্বরে গোরুর গাড়ি, কিন্তু এই খোয়াইয়ের গহ্বরে জনপ্রাণী নেই। ছায়ায় রৌদ্রে বিচিত্র লাল কাঁকরের এই নিভৃত জগৎ, না-দেয় ফল, না-

নের ফুল, না উৎপন্ন করে ফসল, এখানে না আছে কোনো জীবজন্তুর বাসা ; এখানে কেবল দেখি কোনো আর্টিষ্ট-বিধাতার বিনা কারণে একখানা যেমন-তেমন ছবি আঁকবার সখ ; উপরে মেঘহীন নীল আকাশ রৌদ্রে পাণ্ডুর আর নীচে লাল কাঁকরের রং পড়েছে মোটা তুলিতে নানা রকমের বাঁকাচোরা বন্ধুর রেখায়, সৃষ্টিকর্ত্তার ছেলেমানুষী ছাড়া এর মধ্যে আর কিছুই দেখা যায় না। বালকের খেলার সঙ্গেই এর রচনার ছন্দের মিল ; এর পাহাড়, এর নদী, এর জলাশয়, এর গুহাগহ্বর সবই বালকের মনেরই পরিমাপে। এইখানে একলা আপন মনে আমার বেলা কেটেছে অনেক দিন, কেউ আমার কাজের হিসাব চায় নি, কারও কাছে আমার সময়ের জবাবদিহি ছিল না। এখন এ খোওয়াইয়ের সে চেহারা নেই। বৎসরে বৎসরে রাস্তা-মেরামতের মসলা এর উপর থেকে চেঁচে নিয়ে একে নগ্ন দরিদ্র ক'রে দিয়েছে, চ'লে গেছে এর বৈচিত্র্য, এর স্বাভাবিক লাবণ্য। তখন শান্তিনিকেতনে আর একটি রোমান্টিক অর্থাৎ কাহিনীরসের জিনিষ ছিল। যে-সর্দ্দার ছিল এই বাগানের প্রহরী, এককালে সে-ই ছিল ডাকাতের দলের নায়ক। তখন সে বৃদ্ধ, দীর্ঘ তার দেহ, মাংসের বাহুল্যমাত্র নেই, শ্যামবর্ণ, তীক্ষ্ণ চোখের দৃষ্টি, লম্বা বাঁশের লাঠি হাতে, কণ্ঠস্বরটা ভাঙা ভাঙা গোছের। বোধ হয় সকলে জানেন, আজ শান্তিনিকেতনে যে অতিপ্রাচীন যুগল ছাতিমগাছ মালতীলতায় আচ্ছন্ন, এককালে মস্ত মাঠের মধ্যে ঐ দুটি ছাড়া আর গাছ ছিল না। ঐ গাছতলা ছিল ডাকাতের আড্ডা। ছায়াপ্রত্যাশী অনেক ক্লান্ত পথিক এই ছাতিম তলায় হয় ধন নয় প্রাণ নয় দুই-ই হারিয়েছে সেই শিথিল রাষ্ট্রশাসনের কালে। এই সর্দ্দার সেই ডাকাতি-কাহিনীর শেষ পরিচ্ছেদের শেষ পরিশিষ্ট ব'লেই খ্যাত। বামাচারী তান্ত্রিক শাক্তের এই দেশে মা-কালীর খর্পরে এ যে নররক্ত জোগায়নি তা আমি বিশ্বাস করিনে। আশ্রমের সম্পর্কে কোনো রক্তচক্ষু রক্ততিলক-লাঞ্ছিত ভদ্রবংশের শাক্তকে জানতুম যিনি মহামাংসপ্রসাদভোগ করেছেন ব'লে জনশ্রুতি কানে এসেছে।

একদা এই দুটিমাত্র ছাতিম গাছের ছায়া লক্ষ্য ক'রে দূরপথযাত্রী পথিকেরা বিশ্রামের আশায় এখানে আসত. আমার পিতৃদেবও রায়পুরের ভুবন সিংহের বাড়িতে নিমন্ত্রণ সেরে পাল্কী ক'রে যখন একদিন ফিরছিলেন তখন মাঠের মাঝখানে এই দুটি গাছের আহ্বান তাঁর মনে এসে পৌচেছিল। এইখানে শান্তির প্রত্যাশায় রায়পুরের সিংহদের কাছ থেকে এই জমি তিনি দানগ্রহণ করেছিলেন। একখানি একতলা বাড়ি পত্তন ক'রে এবং রুক্ষ রিক্তভূমিতে অনেকগুলি গাছ রোপণ ক'রে সাধনার জন্য এখানে তিনি মাঝে মাঝে আশ্রয় গ্রহণ করতেন। সেই সময়ে প্রায়ই তাঁর ছিল হিমালয়ে নির্জ্জন বাস। যখন রেললাইন স্থাপিত হ'ল, তখন বোলপুর ষ্টেশন ছিল পশ্চিমে যাবার পথে, অন্য লাইন তখন ছিল না। তাই হিমালয়ে যাবার মুখে বোলপুরে পিতা তাঁর প্রথম যাত্রা ভঙ্গ করতেন। আমি যে-বারে তাঁর সঙ্গে এলুম সে-বারেও ড্যালহৌসী পাহাড়ে যাবার পথে তিনি বোলপুরে অবতরণ করেন। আমার মনে পড়ে সকালবেলায় সূর্য্য ওঠবার পূর্ব্বে তিনি ধ্যানে বসতেন অসমাপ্ত জলশূন্য পুষ্করিণীর দক্ষিণ পাড়ির উপরে। সূর্য্যাস্তকালে তাঁর ধ্যানের আসন ছিল ছাতিম-তলায়। এখন ছাতিম গাছ বেষ্টন ক'রে অনেক গাছপালা হয়েছে তখন তার কিছুই ছিল না, সামনে অবারিত মাঠ পশ্চিমদিগন্ত পর্য্যন্ত ছিল একটানা। আমার 'পরে কটি বিশেষ কাজের ভার ছিল। ভগবদ্গীতা গ্রন্থে কতকগুলি শ্লোক তিনি চিহ্নিত ক'রে দিয়েছিলেন, আমি প্রতিদিন কিছু কিছু তাই কপি ক'রে দিতুম তাঁকে। তারপরে সন্ধ্যাবেলা খোলা আকাশের নীচে ব'সে সৌরজগতের গ্রহমণ্ডলের বিবরণ বলতেন আমাকে, আমি শুনতুম একান্ত ঔৎসুক্যের সঙ্গে। মনে পড়ে আমি তাঁর মুখের সেই জ্যোতিষের ব্যাখ্যা লিখে তাঁকে শুনিয়েছিলুম। এই বর্ণনা থেকে বোঝা যাবে শান্তিনিকেতনের কোন্ ছবি আমার মনের মধ্যে কোন্ রসে ছাপা হয়ে গেছে। প্রথমত সেই বালক বয়সে এখানকার প্রকৃতির কাছ থেকে যে আমন্ত্রণ পেয়েছিলেম, এখানকার অনবরুদ্ধ আকাশ ও মাঠ, দূর হ'তে প্রতিভাত নীলাভ শাল ও তালশ্রেণীর সমুচ্চ শাখাপুঞ্জে শ্যামলা শান্তি, স্মৃতির সম্পদরূপে চিরকাল আমার স্বভাবের অন্তর্ভুক্ত হয়ে গেছে। তারপরে এই আকাশে এই আলোকে দেখেছি সকালে বিকালে পিতৃদেবের পূজার নিঃশব্দ নিবেদন, তার গভীর গাম্ভীর্য্য। তখন এখানে আর কিছুই ছিল না, না-ছিল এত গাছপালা, না-ছিল মানুষের এবং কাজের এত ভিড়, কেবল দূরব্যাপী নিস্তব্ধতার মধ্যে ছিল একটি নির্ম্মল মহিমা।

তারপরে সেদিনকার বালক যখন যৌবনের প্রৌঢ়বিভাগে তখন বালকদের শিক্ষার তপোবন তাকে দূরে খুঁজতে হবে কেন? আমি পিতাকে গিয়ে জানালেম শান্তিনিকেতন এখন প্রায় শূন্য অবস্থায়, সেখানে যদি একটি আদর্শ বিদ্যালয় স্থাপন করতে পারি তা হ'লে তাকে সার্থকতা দেওয়া হয়। তিনি তখনই উৎসাহের সঙ্গে সম্মতি দিলেন। বাধা ছিল আমার আত্মীয়দের দিক থেকে। পাছে শান্তিনিকেতনের প্রকৃতির পরিবর্ত্তন ঘটে যায় এই ছিল তাঁদের আশঙ্কা। এখনকার কালের জোয়ারজলে নানাদিক থেকে ভাবের পরিবর্ত্তন আবর্ত্ত রচনা ক'রে আসবে না এ আশা করা যায় না—যদি তার থেকে এড়াবার ইচ্ছা করি তা হ'লে আদর্শকে বিশুদ্ধ রাখতে গিয়ে তাকে নির্জীব ক'রে রাখতে হয়। গাছপালা জীবজন্তু প্রভৃতি প্রাণবান বস্তুমাত্রেরই মধ্যে একই সময়ে বিকৃতি ও সংস্কৃতি চলতেই থাকে, এই বৈপরীত্যের ক্রিয়াকে অত্যন্ত ভয় করতে গেলে প্রাণের সঙ্গে ব্যবহার বন্ধ রাখতে হয়। এই তর্ক নিয়ে আমার সঙ্কল্পসাধনে কিছুদিন প্রবলভাবেই ব্যাঘাত চলেছিল।

এই তো বাইরের বাধা। অপর দিকে আমার আর্থিক সঙ্গতি নিতান্ত সামান্য ছিল, আর বিদ্যালয়ের বিধিব্যবস্থা সম্বন্ধে অভিজ্ঞতা ছিলই না। সাধ্য-মত কিছু কিছু আয়োজন করছি আর এই কথা নিয়ে আমার আলাপ এগোচ্চে নানা লোকের সঙ্গে। এমনি অগোচরভাবে ভিৎপত্তন চলছিল। কিন্তু বিদ্যালয়ের কাজে শান্তিনিকেতন আশ্রমকে তখন আমার অধিকারে পেয়েছিলেম। এই সময়ে একটি তরুণ যুবকের সঙ্গে আমার আলাপ হ'ল, তাকে বালক বললেই হয়। বোধ করি আঠারো পেরিয়ে সে উনিশে পড়েছে। তার নাম সতীশচন্দ্র রায়, কলেজে পড়ে, বি-এ ক্লাসে। তার বন্ধু অজিতকুমার চক্রবর্ত্তী সতীশের লেখা কবিতার খাতা কিছুদিন পূর্ব্বে আমার হাতে দিয়ে গিয়েছিল। পড়ে দেখে আমার সন্দেহমাত্র ছিল না যে, এই ছেলেটির প্রতিভা আছে, কেবলমাত্র লেখবার ক্ষমতা নয়। কিছুদিন পরে বন্ধুকে সঙ্গে নিয়ে সতীশ এলেন আমার কাছে। শান্ত নম্র, স্বল্পভাষী, সৌম্যমূর্ত্তি, দেখে মন স্বতই আকৃষ্ট হয়। সতীশকে আমি শক্তিশালী ব'লে জেনেছিলেম ব'লেই তার রচনায় যেখানে শৈথিল্য দেখেছি স্পষ্ট ক'রে নির্দ্দেশ করতে সঙ্কোচ বোধ করিনি। বিশেষভাবে ছন্দ নিয়ে তার লেখার প্রত্যেক লাইন ধ'রে আমি আলোচনা করেছি। অজিত আমার কঠোর বিচারে বিচলিত হয়েছিল কিন্তু সতীশ সহজেই প্রশান্ত সঙ্গে স্বীকার ক'রে নিতে পারলে। অল্প দিনেই সতীশের যে পরিচয় পাওয়া গেল আমাকে তা বিস্মিত করেছিল। যেমন গভীর তেমনি বিস্তৃত ছিল তার সাহিত্যরসের অভিজ্ঞতা। ব্রাউনিঙের কবিতা সে যে-রকম ক'রে আত্মগত করেছিল এমন দেখা যায় না। শেক্সপীয়রের রচনায় যেমন ছিল তার অধিকার তেমনি আনন্দ। আমার এই বিশ্বাস দৃঢ় ছিল যে, সতীশের কাব্যরচনায় একটা বলিষ্ঠ নাট্যপ্রকৃতির বিকাশ দেখা দেবে, এবং সেই দিক থেকে সে একটা সম্পূর্ণ নতুন পথের প্রবর্ত্তন করবে বাংলা-সাহিত্যে। তার স্বভাবে একটি দুর্ল্লভ লক্ষণ দেখেছি, যদিও তার বয়স কাঁচা তবু নিজের রচনার 'পরে তার অন্ধ আসক্তি ছিল না। সেগুলিকে আপনার থেকে বাইরে রেখে সে দেখতে পারত, এবং নির্ম্মমভাবে সেগুলিকে বাইরে ফেলে দেওয়া তার পক্ষে ছিল সহজ। তাই তার সেদিনকার লেখার কোনো চিহ্ন অনতিকাল পরেও আমি দেখিনি। এর থেকে স্পষ্ট বোঝা যেত তার কবি-স্বভাবের যে বৈশিষ্ট্য ছিল তাকে বলা যেতে পারে বহিরাশ্রয়িতা (objectivity)। বিশ্লেষণ ও ধারণাশক্তি তার যথেষ্ট ছিল কিন্তু স্বভাবের যে পরিচয় আমাকে তার দিকে অত্যন্ত আকর্ষণ করেছিল, সে তার মনের স্পর্শচেতনা। যে-জগতে সে জন্মেছিল তার কোথাও ছিল না তার ঔদাসীন্য। একই কালে ভোগের দ্বারা এবং ত্যাগের দ্বারা সর্ব্বত্র আপন অধিকার প্রসারিত করবার শক্তি নিয়েই সে এসেছিল। তার অনুরাগ ছিল আনন্দ ছিল নানাদিকে ব্যাপক কিন্তু তার আসক্তি ছিল না। মনে আছে আমি তাকে একদিন বলেছিলেম, তুমি কবি ভর্ত্তৃহরি, এই পৃথিবীতে তুমি রাজা এবং তুমি সন্ন্যাসী।

সে-সময়ে আমার মনের মধ্যে নিরত ছিল শান্তিনিকেতন আশ্রমের সংকল্পনা। আমার নতুন-পাওয়া বালক-বন্ধুর সঙ্গে আমার সেই আলাপ চলত। তার স্বাভাবিক ধ্যানদৃষ্টিতে সমস্তটাকে সে দেখতে পেত প্রত্যক্ষ। উত্তরের যে উপাখ্যানটি সে লিখেছিল তাতে সেই ছবিটিকে সে আঁকতে চেষ্টা করেছে।

অবশেষে আনন্দের উৎসাহ সে আর সম্বরণ করতে পারলে না। সে বললে, "আমাকে আপনার কাজে নিন।" খুব খুশী হলেম কিন্তু কিছুতে তখন রাজি হলেম না। অবস্থা তাদের ভাল নয় জানতেম। বি-এ পাস করে এবং পরে আইনের পরীক্ষা দিয়ে সে সংসার চালাতে পারবে, তার অভিভাবকদের এই ইচ্ছা ছিল সন্দেহ নেই। তখনকার মত আমি তাকে ঠেকিয়ে রেখে দিলেম।

এমন সময়ে ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায়ের সঙ্গে আমার পরিচয় ক্রমশ ঘনিষ্ঠ হয়ে উঠল। আমার নৈবেদ্যের কবিতাগুলি প্রকাশ হচ্ছিল তার কিছুকাল পূর্ব্বে। এই কবিতাগুলি তাঁর অত্যন্ত প্রিয় ছিল। তাঁর সম্পাদিত *Twentieth Century* পত্রিকায় এই রচনাগুলির যে-প্রশংসা তিনি ব্যক্ত করেছিলেন, সেকালে সে-রকম উদার প্রশংসা আমি আর কোথাও পাইনি। বস্তুত এর অনেক কাল পরে এই সকল কবিতার কিছু অংশ এবং খেয়া ও গীতাঞ্জলি থেকে এই জাতীয় কবিতার ইংরেজি অনুবাদের যোগে যে-সম্মান পেয়েছিলেম, তিনি আমাকে সেই রকম অকুণ্ঠিত সম্মান দিয়েছিলেন সেই সময়েই। এই পরিচয় উপলক্ষেই তিনি জানতে পেরেছিলেন আমার সঙ্কল্প, এবং খবর পেয়েছিলেন যে শান্তিনিকেতনে বিদ্যালয়-স্থাপনের প্রস্তাবে আমি পিতার সম্মতি পেয়েছি। তিনি আমাকে বললেন, এই সঙ্কল্পকে কার্য্যে প্রতিষ্ঠিত করতে বিলম্ব করবার কোনো প্রয়োজন নেই। তিনি তাঁর কয়েকটি অনুগত শিষ্য ও ছাত্র নিয়ে আশ্রমের কাজে প্রবেশ করলেন। তখনই আমার তরফে ছাত্র ছিল রথীন্দ্রনাথ, ও তার কনিষ্ঠ শমীন্দ্রনাথ, আর অল্প কয়েক জনকে তিনি যোগ ক'রে দিলেন। সংখ্যা অল্প না হ'লে বিদ্যালয়ের সম্পূর্ণতা অসম্ভব হ'ত। তার কারণ, প্রাচীন আদর্শ অনুসারে আমার এই ছিল মত, যে, শিক্ষাদানব্যাপারে গুরু ও শিষ্যের সম্বন্ধ হওয়া উচিত আধ্যাত্মিক। অর্থাৎ শিক্ষা দেওয়াটা গুরুর আপন সাধনারই প্রধান অঙ্গ। বিদ্যার সম্পদ যে পেয়েছে তার নিজেরই নিঃস্বার্থ দায়িত্ব সেই সম্পদ দান করা। আমাদের সমাজে এই মহৎ দায়িত্ব আধুনিক কাল পর্য্যন্ত স্বীকৃত হয়েছে। এখন তার লোপ হচ্ছে ক্রমশই।

তখন যে-কয়টি ছাত্র নিয়ে বিদ্যালয়ের আরম্ভ হ'ল তাদের কাছ থেকে বেতন বা আহার্য্য ব্যয় নেওয়া হ'ত না, তাদের জীবনযাত্রার প্রায় সমস্ত দায় নিজের স্বল্প সম্বল থেকেই স্বীকার করেছি। অধ্যাপনার অধিকাংশ ভার যদি উপাধ্যায় ও শ্রীযুক্ত রেবাচাঁদ—তাঁর এখনকার উপাধি অণিমানন্দ—বহন না করতেন তা হ'লে কাজ চালানো একেবারে অসাধ্য হ'ত। তখনকার আয়োজন ছিল দরিদ্রের মত, আহার-ব্যবহার ছিল দরিদ্রের আদর্শে। তখন উপাধ্যায় আমাকে যে গুরুদেব উপাধি দিয়েছিলেন আজ পর্য্যন্ত আশ্রমবাসীদের কাছে আমাকে সেই উপাধি বহন করতে হচ্চে।—আশ্রমের আরম্ভ থেকে বহুকাল পর্য্যন্ত তার আর্থিক ভার আমার পক্ষে যেমন দুর্ব্বহ হয়েছে, এই উপাধিটিও তেমনি। অর্থকৃচ্ছ্র এবং এই উপাধি কোনোটাকেই আরামে বহন করতে পারি নে কিন্তু দুটো বোঝাই যে-ভাগ্য আমার স্কন্ধে চাপিয়েছেন তাঁর হাতের দানস্বরূপ এই দুঃখ এবং লাঞ্ছনা থেকে শেষ পর্য্যন্তই নিষ্কৃতি পাবার আশা রাখিনে।

শান্তিনিকেতন বিদ্যালয়ের সূচনার মূল কথাটা বিস্তারিত ক'রে জানালুম। এই সঙ্গে উপাধ্যায়ের কাছে আমার অপরিশোধনীয় কৃতজ্ঞতা স্বীকার করি। তারপরে সেই কবি বালক সতীশের কথাটাও শেষ ক'রে দিই।

বি-এ পরীক্ষা তার আসন্ন হয়ে এল। অধ্যাপকেরা তার কাছে আশা করেছিল খুব বড় রকমেরই কৃতিত্ব। ঠিক সেই সময়েই সে পরীক্ষা দিল না। তার ভয় হ'ল সে পাস করবে। পাস করলেই তার উপরে সংসারের যে সমস্ত দাবি চেপে বসবে তার পীড়ন ও প্রলোভন থেকে মুক্তি পাওয়া পাছে তার পক্ষে অসাধ্য হয় এইজন্যেই সে পিছিয়ে গেল শেষ মুহূর্ত্তে। সংসারের দিক থেকে জীবনে সে একটা মস্ত ট্র্যাজিডির পত্তন করলে। আমি তার আর্থিক অভাব কিছু পরিমাণে পূরণ করবার যতই চেষ্টা করেছি কিছুতেই তাকে রাজি করতে পারিনি। মাঝে মাঝে গোপনে তাদের বাড়িতে পাঠিয়েছি টাকা। কিন্তু সে সামান্য। তখন আমার বিক্রি করবার যোগ্য যা-কিছু ছিল প্রায় সব শেষ হয়ে গেছে, অন্তঃপুরের সম্বল এবং বাইরের সম্বল। কয়েকটা আয় জনক বইয়ের বিক্রয়স্বত্ব কয়েক বৎসরের মেয়াদে দিয়েছি পরের হাতে। হিসাবের দুর্ব্বোধ জটিলতায় সে মেয়াদ অতিক্রম করতে অতি দীর্ঘকাল লেগেছে। সমুদ্রতীরবাসের লোভে পুরীতে একটা

বাড়ি করেছিলুম। সে বাড়ি একদিনও ভোগ করবার পূর্ব্বে আশ্রমের ক্ষুধার দাবিতে বিক্রি হয়ে গেল। তার পরে যে-সম্বল বাকি রইল তাকে বলে উচ্চহারের হৃদে দেনা করবার ক্রেডিট। সতীশ জেনেশুনেই এখানকার সেই অগাধ দারিদ্র্যের মধ্যে ঝাঁপ দিয়েছিল প্রসন্ন মনে। কিন্তু তার আনন্দের অবধি ছিল না, এখানকার প্রকৃতির সংসর্গের আনন্দ, সাহিত্যসম্ভোগের আনন্দ, প্রতিমুহূর্ত্তে আত্মনিবেদনের আনন্দ।

এই অপর্য্যাপ্ত আনন্দ সে সঞ্চার করত তার ছাত্রদের মনে মনে পড়ে কতদিন তাকে পাশে নিয়ে শালবীথিকায় পায়চারি করেছি নানা তত্ত্বের আলোচনা করতে করতে,—রাত্রি এগারোটা দুপুর হয়ে যেত—সমস্ত আশ্রম হ'ত নিস্তব্ধ নিদ্রামগ্ন। তারই কথা মনে ক'রে আমি লিখেছি :—

কতদিন এই পাতা-ঝরা
বীথিকায়, পুষ্পগন্ধে বসন্তের আগমনী ভরা
সায়াহ্নে দু-জনে মোরা ছায়াতে অঙ্কিত চন্দ্রালোকে
ফিরেছি গুঞ্জিত আলাপনে। তার সেই মুগ্ধ চোখে
বিশ্ব দেখা দিয়েছিল নন্দন-মন্দার রঙে রাঙা ;
যৌবন-তুফান-লাগা সেদিনের কত নিদ্রাভাঙা
জ্যোৎস্না মুগ্ধ রজনীর সৌহার্দ্দ্যের সুধারসধারা
তোমার ছায়ার মাঝে দেখা দিল, হয়ে গেল সারা।
গভীর আনন্দক্ষণ কতদিন তব মঞ্জরীতে
একান্ত মিশিয়াছিল একখানি অখণ্ড সঙ্গীতে
আলোকে আলাপে হাস্যে, বনের চঞ্চল আন্দোলনে,
বাতাসের উদাস নিশ্বাসে।—

এমন অবিমিশ্র শ্রদ্ধা, অবিচলিত অকৃত্রিম প্রীতি, এমন সর্ব্বভারবাহী সর্ব্বত্যাগী সৌহার্দ্দ্য জীবনে কত যে দুর্লভ তা এই সত্তর বৎসরের অভিজ্ঞতায় জেনেছি। তাই সেই আমার কিশোর বন্ধুর অকাল তিরোভাবের বেদনা আজ পর্য্যন্ত কিছুতেই ভুলতে পারিনি।

এই আশ্রম বিদ্যালয়ের সুদূর আরম্ভকালের প্রথম সংকলন, তার দুঃখ তার আনন্দ, তার অভাব তার পূর্ণতা, তার প্রিয় সঙ্গ, প্রিয় বিচ্ছেদ, নিষ্ঠুর বিরুদ্ধতা ও অযাচিত আনুকূল্যের অল্পই কিছু আভাস দিলেম এই লেখায়। তার পরে, শুধু আমাদের ইচ্ছা নয়, কালের ধর্ম্ম কাজ করছে ; এনেছে কত পরিবর্ত্তন, কত নতুন আশা ও ব্যর্থতা, কত সুহৃদের অভাবনীয় আত্মনিবেদন, কত অজানা লোকের অহৈতুক শত্রুতা, কত মিথ্যা নিন্দা ও প্রশংসা, কত দুঃসাধ্য সমস্যা—আর্থিক ও পারমার্থিক। পারিতোষিক পাই বা না-পাই নিজের ক্ষতি করেছি সাধ্যের শেষ সীমা পর্য্যন্ত ;—অবশেষে ক্লান্ত দেহ ও জীর্ণ স্বাস্থ্য নিয়ে আমারও বিদায় নেবার দিন এল—প্রণাম ক'রে যাই তাঁকে যিনি সুদীর্ঘ কঠোর দুর্গম পথে আমাকে এতকাল চালনা ক'রে নিয়ে এসেছেন। এই এতকালের সাধনার বিফলতা প্রকাশ পায় বাইরে, এর সার্থকতার সম্পূর্ণ প্রমাণ থেকে যায় অলিখিত ইতিহাসের অদৃশ্য অক্ষরে।*

* কেহ কেহ এমন কথা লিখেছেন যে, উপাধ্যায় ও রেবাচাঁদ খৃষ্টান ছিলেন, তাই নিয়ে পিতৃদেব আপত্তি করেছিলেন। এ-কথা সত্য নয়। আমি নিজে জানি এই কথা তুলে আমাদের কোনো আত্মীয় তাঁর কাছে অভিযোগ করেছিলেন। তিনি কেবল এই কথাটি বলেছিলেন, "তোমরা কিছু ভেবো না। ওখানকার জন্যে কোনো ভয় নেই। আমি ওখানে শান্তং শিবমদ্বৈতমের প্রতিষ্ঠা ক'রে এসেছি।"

শান্তিনিকেতনে পঠিত।

ক্ষীরদাত্রী

শ্রীনির্ম্মলকুমার রায়

আপিসে বসিয়া কাগজ সহি করিতেছি। কত কি ছাই-ভস্ম! কুষ্টিয়ার ষ্টেশনমাষ্টারের রান্নাঘরের একটি কড়া ভাঙিয়াছে, গোয়ালন্দঘাটে অছিমদ্দি শেখ রেলের আড়াই ফুট জমি বেদখল করিয়াছে, ভাটিয়াপাড়ার লক্ষ্মণ খালাসী এক দিনের ছুটি চায়, এমন কত কি! চক্ষু বুজিয়া সহি চালাইতেছি, আর মাঝে মাঝে চক্ষু মেলিয়া বাহিরের শীতশেষের নির্ম্মেঘ আকাশের নীলিমা দেখিতেছি, এমন সময়ে একজন গৈরিক-বসনধারী পঞ্জাবী ছোকরা সাধু ঘরে প্রবেশ করিল। যেমন ইহারা হয়। বেশ ফিটফাট পোষাক, হাতে নোটবুক ও পেন্সিল, মুখে ইংরেজী বাংলা হিন্দী মিশ্রিত বুলি। ভাবিলাম লোকটা বুঝি এই আরম্ভ করে, "Money come right hand, money goes left hand" কিংবা "two girls love you but you love one girl" ইত্যাদি, কিন্তু সে তেমন কিছুই করিল না, গম্ভীর ভাবে ঘরে প্রবেশ করিয়া বলিল, 'আপকা জ্যোতিষ পর বিশ্‌ওয়াস্ নাহি আছে।' আমি মুচকি হাসিয়া বলিলাম, 'বিশ্‌ওয়াস্ বড় কম আছে।'

সে যেন প্রস্তুত হইয়াই ছিল, হঠাৎ তীক্ষ্নদৃষ্টি আমার মুখ-মণ্ডলের উপর স্থাপন করিয়া বলিল, 'আপকা মা-জী তিন সাল মারা গেল।' কথাটার কি প্রভাব আমার উপরে হয়, সে যেন তাহাই লক্ষ্য করিতেছিল। আমি অট্টহাস্য করিয়া বলিলাম, 'সাধুজী ঝুটা হায়, মা-জী এ অভাগা জন্মিতেই মারা গেছেন।"

লোকটা কিছুমাত্র দমিল না, বরঞ্চ অত্যন্ত প্রশান্ত ভাবে বলিল, 'সাধু ঝুটা হবে, কিন্তু জ্যোতিষ ঝুটা নাহি হবে। আপ বিস্‌কা দুধ পিয়া ও তিন সাল মারা গেল।'

কথাটা এমন কিছু কঠিন নহে। আমার বহু দিনের পুরাতন ভৃত্য সবই জানে; আর তাহার কাছ হইতে কোন খবর বাহির করা কিছুই কঠিন নহে। তবে লোকটার বলিবার বাহাদুরী আছে। ভূমিষ্ঠ হইয়াই পিসিমার স্তন্যে বর্দ্ধিত হইয়াছিলাম।

নিজের কাজে মন দিলাম। গোড়াই নদীর জলের মাপ, বড় সাহেবের জরুরি তার, তারপর আদালতের শমন। পুঁটুলি-বাঁধা হলদে কাগজে পৃষ্ঠাব্যাপী হিন্দী লেখা, অনেক কষ্ট করিয়া উদ্ধার করিলাম, ছাপরার রামদয়াল সিং বনাম কুমিল্লার সুখন্ত দে মোকদ্দমা—রাজমহল কোর্ট হইতে আমার সাক্ষী তলব হইয়াছে। ব্যাপার আশ্চর্য্য কম নয়! কোথায় রাজমহল, কোথায় ছাপরা, আর কোথায় কুমিল্লা। কে এই রামদয়াল সিং, আর কে-ই বা এই সুখন্ত দে। কিসের মোকদ্দমা আর আমারই বা সাক্ষীর প্রয়োজন কি জন্য? ছাপরা কোনদিন যাই নাই; কুমিল্লা ষ্টেশনে জীবনে একরাত্রি অসহ্য মশক দংশন সহ্য করিয়াছি, আর রাজমহল?—হাঁ, বহুদিন পূর্ব্বে।

বিশেষ কিছু মনে নাই। যোজনপ্রসারিত সৈকতরেখার মধ্যে ক্ষীণকায়া মন্দস্রোতা গঙ্গা। সম্মুখে দিগন্তবিস্তারী বালুচর, কাশবনে পরিপূর্ণ, বামে ঈষৎ নীলাভ রাজমহল-শ্রেণীর অনুচ্চ পর্ব্বতমালা। গঙ্গা একটা প্রকাণ্ড বাঁক দিয়া সূর্য্যালোক-ঝলসিত বিস্তৃত বালুচরের মধ্যে এদিকে-সেদিকে জলরেখা বিস্তার করিয়া চলিয়াছে। পর্ব্বতমালা যেন গঙ্গাকে ধারে ধারে রাখিয়া নিজের অস্পষ্ট মহিমা প্রকাশ করিতে করিতে চলিয়াছে। ধূ ধূ মনে পড়ে, একদিন 'সঙ্গ্-ই' দালানে বসিয়া নদী ও পাহাড়ের এই অপূর্ব্ব খেলা দেখিয়াছি। গঙ্গার বুকে মাঝে মাঝে প্রকাণ্ড নৌকা দু-ঘুণ্টি পাল উড়াইয়া চলিয়াছে। আর বেশী কিছু মনে নাই। এতদিন পরে এমন কি ঘটনা ঘটিল যে রাজবাড়ি হইতে রাজমহলে সাক্ষী দিতে হইবে?

আদালতের শমন; অগ্রাহ্য করিবার উপায় নাই। হাওড়া হইতে কিউল প্যাসেঞ্জারে চাপিলাম। খানা-জংশন পার হইয়া আস্তে আস্তে বাংলার রূপ বদলাইতে লাগিল। ক্রমে দিগন্তবিস্তারী ধানক্ষেত ছাড়াইয়া অনুর্ব্বর লালমাটির দেশে প্রবেশ করিলাম। তৃণহীন অঙ্গহীন কঙ্করময় মাঠের এখানে-

সেখানে দু-একটি ধানের ক্ষেত আর উচ্চ তালের শ্রেণী। এ-দেশে ফুলের বাগান রচনা করিয়া সন্ধ্যা সকালে ছয়-সাত মাইল হাঁটিয়া হাওয়া বদলান চলে, কিন্তু ক্ষেত চষিয়া, পুকুর কাটিয়া বসবাস করা চলে না।

ঘুমাইয়া পড়িয়াছিলাম। জাগিয়া দেখি সূর্য্য অস্ত যাইতেছে। সমস্ত আকাশে একটি অনাবিল শান্তি। লালের প্রাচুর্য্যে নিবিড় নীলিমা অতিসমৃদ্ধ হইয়া উঠে নাই। শীতশেষের ঈষৎ পাতলা কুয়াসা দ্যুতিমান সন্ধ্যালোককে কোমল করিয়া দিয়াছে। অদূরে লাল 'মুরামের' খনিতমুখে সেই আলোক একটি সোনার স্বপ্ন রচনা করিতেছে। দূরে রেখাকারে অনুচ্চ পর্ব্বতমালা। সন্ধ্যার পেলব আকাশপটে নিজের বহিরাবয়ব রেখা অপূর্ব্ব সুকুমারতার সহিত ফুটাইয়া তুলিয়াছে। ঊর্দ্ধের তরঙ্গায়িত সীমারেখা একটি স্বাভাবিক অবিচ্ছিন্নতার দ্বারা নিজেকে প্রবাহিত করিয়া চলিয়াছে,—কোন জ্যামিতিক ঋজুতা কিংবা বক্রতা দ্বারা দৃশ্যটিকে নষ্ট করে নাই।

বরহরবা ষ্টেশন ছাড়াইয়া চলিলাম। বহুদিন পূর্ব্বেকার কথা মনে হইতে লাগিল। কিছু দূরেই ফুদ্‌কিপুর 'ব্লকহাট,' সেখান হইতে চার মাইল দূরে পাহাড়ের পাদদেশে অনেক দিন বাস করিয়াছি। অন্ধকারে কিছুই দেখা যাইতেছিল না, তবু দু-চারটা পাহাড়ের নাম মনে ছিল বলিয়া নির্দ্দেশ করিতে চেষ্টা পাইলাম। সীতা-পাহাড়, চাল-পাহাড়, গদাই টুঙ্গি, আরও কত কি। অদূরে পাহাড়ের গায়ে আগুন জ্বলিয়া উঠিয়াছে। শীতের শেষে পাহাড়িয়ারা জঙ্গল পোড়াইবার জন্য পাহাড়ে আগুন ধরাইয়া দেয়; আর তাহা দিনের পর দিন জ্বলিতে থাকে। দিনে বিশেষ কিছু বুঝা যায় না, কারণ বহুবিস্তৃত অগ্নি অর্দ্ধশুষ্ক গাছপালার সংস্পর্শে আসিয়া বেশী শিখা উৎপাদন করে না। কিন্তু রাত্রিতে সেই সামান্য শিখা এবং জ্বলন্ত অঙ্গারের আভা অন্ধকারের মধ্যে ফুটিয়া উঠে। এই-সব আগুন দেখিতে বড় সুন্দর, চতুর্দ্দিকে একটি নীরন্ধ্র সীমাহীনতা, ভূপৃষ্ঠের অসমতা সম্পূর্ণভাবে সমাহিত হইয়া থাকে আর ইহার মধ্যে এখানে-সেখানে উর্দ্ধে-নিম্নে নানাবিধ বক্ররেখাকারে আগুন জ্বলিতে থাকে।

তিনপাহাড়ে গাড়ী বদলাইয়া রাজমহলের গাড়ীতে উঠিলাম। বড় বড় বিল, চষা ক্ষেত আর অবাধ হাওয়াতে জানাইয়া দিল গঙ্গার দিকে চলিয়াছি। রাত্রির অন্ধকারে বুঝিলাম এই বিশ বৎসরে রাজমহলের উন্নতির মধ্যে হইয়াছে তাহার ঘনসন্নিবিষ্ট জঙ্গল আর শৃগালদলের চীৎকার। ষ্টেশনে নামিয়াই একেবারে জিনিষপত্র লইয়া আমার চিরপ্রিয় 'সঙ্গ-ই' দালানে গেলাম। চারিদিক খোলা; সম্মুখে গঙ্গা। জানিতাম শীত লাগিবে বেশ কিন্তু রেলের বিশ্রামাগারের দুর্গন্ধের চেয়ে ত ভাল।

খাওয়া-দাওয়া সমাধা করিয়া একটি দিব্য নিশ্চিন্ততা উপভোগ করিতে চেষ্টা পাইতেছিলাম। মাঝে মাঝে মনের কোণে আদালতের মোকদ্দমা কি লইয়া এই চিন্তাটা উঁকি মারিতে চেষ্টা করিতেছিল; কিন্তু বাহিরে জ্যোৎস্না-কল্লোলিত নদী ও বালুচরের দিকে চাহিয়া তাহা ভুলিতে চেষ্টা করিতেছি। বাঁ-দিকে নদী যেখানে বাঁকিয়া গিয়াছে সেখানে এই শীতেও নদীর প্রশস্ততা বেশ। পাহাড়ের শ্রেণীও বেশ পরিস্ফুট হইয়া উঠিয়াছে। অনতিদূরে একটি ভাঙা মসজিদ ছিল। সেবার দেখিয়াছিলাম সংস্কার অভাবে জীর্ণ, এবার দেখিলাম তাহা মেরামত হইয়াছে; অর্থাৎ সর্ব্বাঙ্গব্যাপিয়া কাহারা চুণ লেপন করিয়াছে। আকবর-আমলের সেই মসজিদ্ ইংরেজ আমলে এই নীরব জ্যোৎস্নারাত্রিতে যেন দাঁত দেখাইয়া হাসিতেছে।

দূরে দেখিতে পাইলাম তিনটি মনুষ্যমূর্ত্তি তারের বেড়া পার হইয়া কয়লাস্তূপের পাশ দিয়া এদিকে আসিতেছে। প্রথমটি বৃদ্ধ পুরুষ, তার পরেরটি প্রৌঢ়া স্ত্রীলোক এবং সকলের পশ্চাতে এক যুবক। এই রাত্রিতে এই জনহীন স্থানে কে আসিবে? আমারই মত কোন যাত্রী হইতে পারে। কৌতূহলের বশবর্ত্তী হইয়া বাহিরে বারান্দায় আসিলাম। স্পষ্ট জ্যোৎস্নালোকে আগন্তুকদিগকে দেখিতে পাইলাম। কি একটা মনে হইল! কিন্তু মুহূর্ত্তমধ্যে এক অভাবনীয় ঘটনা ঘটিল। বৃদ্ধ ও বৃদ্ধা একসঙ্গে আমার পায়ে পড়িয়া কাঁদিয়া কাঁদিয়া বলিতে লাগিল, 'হুজুর আমাদের বাঁচান।' কিছুদূরে যুবকটি অধোবদনে দাঁড়াইয়া রহিল। ব্যাপার কিছুই বুঝিতে পারিলাম না। ইহারা কে? কি অপরাধ করিয়াছে, আমার খবর পাইল কি করিয়া? আর আমার পায়ে পড়িয়া কাঁদেই বা কেন? জিজ্ঞাসা করিলাম, 'তোমরা কে?'

কোন শব্দ নাই। রমণীটি উচ্ছ্বসিত কান্নার বেগ কোন-মতে দমন করিয়া বলিল, 'হুজুর আমার এ ছেলে গেলে আমি

আর বাঁচব না'। বড় অদ্ভুত কথা! কিসের ছেলে—কোথায় যাইবে! ভাল লাগিল না। কোথায় নিশ্চিন্ত মনে প্রকৃতির শোভা দেখিব, না এই বাহিরে দাঁড়াইয়া অপরিচিত নরনারীর ক্রন্দন শুনিতেছি। একটু গরম হইয়া বলিলাম, 'কে তোমরা শীগ্‌গির বল, নইলে চলে যাও' বলিয়া পা টানিয়া লইলাম। লোকটা উঠিয়া দাঁড়াইল এবং অতি কাতরস্বরে বলিল, 'হুজুর আমি সুধন্য' বলিয়াই সে নিশ্চিন্ত হইল, যেন পৃথিবীর এই অগণন জনপ্রবাহের মধ্যে সুধন্য নামক ব্যক্তিটি সর্ব্বপ্রসিদ্ধ, যেন একমাত্র নাম বলিলেই রাজবাড়ির রেলের ইঞ্জিনিয়ার রাজমহলের 'সঙ্গ ই' দালানে বসিয়া মুহূর্ত্তমধ্যে তাহাকে চিনিয়া ফেলিবে, যেন আমি নিশিদিন ঐ একটি নামই জপ করি। রাগতস্বরে জিজ্ঞাসা করিলাম, 'সুধন্য? সুধন্য কে?'

—আজ্ঞে রক্সোবাঁধের ঘরামী।

রক্সোবাঁধ! রক্সোবাঁধ কোথায়? বেশী দূরে নয়। আমার সঙ্গে কি সম্পর্ক? বহুদিন পূর্ব্বে ছিলাম বটে। লোকটা আমার মুখের দিকে চাহিয়া ছিল। তাহার মুখের উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ করিলাম, মনে হইল চিনি। চওড়া চিবুক, লম্বা নাক, অত্যন্ত নরমসুরে কথা, প্রায় স্ত্রীলোকের মত; দাড়ি গোঁফ কামান, শুধু বয়স বাড়িয়াছে, চুল পাকিয়াছে। লোকটা খুব ভাল ঘরামীর কাজ করিত। আমার ফুল-বাগানের সুন্দর বেড়া বাঁধিয়া দিয়াছিল। পায়ের কাছে তাহার স্ত্রী পড়িয়া ছিল; তাহার কান্নার বিরাম ছিল না। তাহাকে দেখাইয়া বলিলাম, 'এ কে?'

—আমার স্ত্রী।

—আর ঐ?

—আমার ছেলে।

সুধন্য তাহার ছেলেকে ইঙ্গিত করিতেই সে আমাকে নমস্কার করিল। মুখ তুলিতে তাহার চোখে চোখ পড়িল, চমকিয়া উঠিলাম। এ মুখ যেন কোথায় দেখিয়াছি। স্মৃতি-বিস্মৃতিতে জড়ান কিন্তু অত্যন্ত স্পষ্ট এবং ব্যক্ত। মানসপটে সহস্র সহস্র মূর্ত্তি মুদ্রিত হইয়া রহিয়াছে; বাহিরের চক্ষু দৈনন্দিন জীবনের গুটিকয়েক মুখ লইয়া ব্যাপৃত থাকে। কিন্তু সময়ে ঘটনার সমাবেশে হঠাৎ বহুদিনের বিস্মৃত মুখ চোখের সম্মুখে শরীরী হইয়া জাগিয়া উঠে। কোথায় দেখিয়াছি ইহাকে? কোন্ বনে—কোন্ নদীতে—কোন পাহাড়ে? বাংলার শ্যামল পল্লীকুঞ্জে, না সাঁওতাল পরগণার রুক্ষ নিরলঙ্কার পর্ব্বত-পাদদেশে? পরিপূর্ণ শান্তির সংসার-নীড়ে, না নিষ্ঠুর চিতার রিক্ত ইন্ধনে?

হঠাৎ কৌতূহল দমন করিতে না পারিয়া দুই হাতে অতি নিবিড় যত্নের সহিত যুবকের মুখখানি জ্যোৎস্নার দিকে তুলিয়া ধরিলাম এবং অত্যন্ত মনোযোগের সহিত তাহা নিরীক্ষণ করিতে লাগিলাম। সে বোধ হয় আমার অদ্ভুত আচরণে বিস্মিত হইয়া থাকিবে। অপূর্ব্ব সাদৃশ্য! আর কিছু না দেখিলেও ঠোঁটের কোণের ঐ বক্রতাটুকু দেখিয়াই বলিতে পারিতাম, এ কে। মুহূর্ত্তে বিশ বৎসরের বিস্মৃতি-কুয়াসা কাটিয়া গেল। হু হু করিয়া ঘটনার পর ঘটনা মনে হইতে লাগিল। জীবনের প্রারম্ভে একদিন যে অভিনয়ে যোগদান করিয়াছিলাম তখন মনে হইয়াছিল তাহার বুঝি যবনিকা পতন হইয়া গেল। কে জানিত আজ বিশ বৎসর পরে আবার তাহার পট উত্তোলিত হইবে! অত্যন্ত আবেগবিচলিত কণ্ঠে কহিলাম, 'সুধন্য, এ যে—' আর বলিতে পারিলাম না। স্বামি-স্ত্রী দু-জনে পা জড়াইয়া ধরিল। স্নেহাতুরা জননী কেবলই বলিতে লাগিল, 'এ আমার ছেলে, আমার বুকের ধন। অভাগিনীর একমাত্র সম্বল।'

* * *

বহু বৎসর পূর্ব্বে সারা-সেতুর জন্য পাথর সরবরাহ করিবার ভার প্রাপ্ত হইয়া এই অঞ্চলে আসি। ই-আই-রেলওয়ের লুপ লাইনের ১৮৯ মাইলের প্রায় মাইল চারি দূরে পাকটোরি পাহাড়ের নীচে তাঁবু ফেলিয়া বসবাস করিতে থাকি। প্রথমে মনটা বড় দমিয়া গিয়াছিল, কি করিয়া এই নির্জ্জন প্রবাসে দিন কাটাইব। কিন্তু প্রকৃতির শোভা মনোরম, ছোট ছোট প্রস্তরময় পাহাড়। শীত-তাপের আকুঞ্চন-প্রসারণে পাথর অল্প অল্প করিয়া ভাঙিয়া যায়। তারপর বৃষ্টির নিপীড়নে স্মরণাতীত যুগের সেই কৃষ্ণপ্রস্তর ক্ষয়িত হইয়া লাল মাটিতে পরিণত হয়। মানবচক্ষুর অন্তরালে দিবারাত্রি ব্যাপিয়া প্রকৃতির এই রূপান্তর চলিতেছে। পাহাড়ের গাত্র ব্যাপিয়া চিরেতা কণ্টিকারি, ভাঁট, কালমেঘ প্রভৃতি অশেষবিধ চারা গাছ। এখানে-সেখানে অনুচ্চ শালবন আর সরিকা গাছ। পাদদেশের তরঙ্গায়িত ভূমি মহুয়া বনে পরিপূর্ণ। তারপরেই ধানক্ষেত, দূর হইতে মনে হয় যেন ধানক্ষেতের মধ্য হইতেই পাহাড়

উঠিয়া গিয়াছে। দূরে দূরে ক্ষুদ্র জলাশয় বেষ্টন করিয়া তালের সারি। উপরে উঠিলে সবুজ ধানক্ষেতের চারিধারে মাটির আল আর উর্দ্ধোত্থিত তালের সারি ছবির মত দেখায়। মালিটোক পাহাড় হইতে দূরে অর্দ্ধবৃত্তাকার রজত রেখাকারে গঙ্গা দেখা যায়।

ছিল মোটে এক ওভার্সিয়ারের ঘর। দেখিতে দেখিতে নিজের, ডাক্তারের, কেরাণীদের, ঠিকাদারদের, কুলি-মজুরদের ঘর উঠিতে লাগিল। নির্জ্জন পাহাড়ের পাদদেশে একটি বড় রকমের গ্রাম বসিয়া গেল। নিকটে সাওতাল গ্রাম রক্‌সোবাঁধ। সাঁওতালদের ছেলেরা সারাদিন বাঁশী বাজাইয়া গরু চরায়। জোয়ান মেয়ে পুরুষেরা সারাদিন পাথর ভাঙে আর রাত্রিতে 'পচাই' খাইয়া দলে দলে গান গায় আর নাচে।

দিন মন্দ যাইতেছিল না। সমস্ত দিন বন্দুক কাঁধে করিয়া তিত্তিরের পশ্চাতে ধাওয়া করি আর নবলব্ধ ক্যামেরা লইয়া যেখানে-সেখানে ছবি তুলিয়া বেড়াই।

আমাদের নূতন কলোনিতে ক্রমে ক্রমে সুখ-দুঃখের ও সামাজিকতার আঘাত আসিয়া লাগিতে আরম্ভ করিল। আমার পাচক ব্রাহ্মণ মুচি চাকরের তোলা জলে স্নান করিয়া দোসাদ ঠেলাওয়ালাদের দ্বারা একঘরে হইল। ডাক-পিওন লক্ষীরাম চাপরাসী প্রতাপের সঙ্গে পদমর্য্যাদা লইয়া লাঠালাঠি করিল। ইহার মধ্যে একদিন দেখিলাম হলদে কাপড় পরা অবগুণ্ঠিতা একটি স্ত্রীলোক একটি ছোট ছেলের হাত ধরিয়া ফিটার রামদয়ালের ঘরে প্রবেশ করিল। সমস্ত কলোনিতে স্ত্রীলোক ছিল না, তাই সকলের দৃষ্টি সেদিকে পড়িল। কোন বিষয়ে কৌতূহল প্রদর্শন করা আমার পক্ষে অনুচিত। রাত্রিতে ওভারসিয়ার রোহিণী বাবু আসিয়া বলিলেন যে, রামদয়ালের স্ত্রী আসিয়াছে, সে আসন্নপ্রসবা, দেশে তাহার কেহ নাই, অনবরত ম্যালেরিয়ায় ভুগিতেছিল তাই নিজেই চলিয়া আসিয়াছে।

আমাদের নূতন ডাক্তার একটি শক্ত রোগী পাইয়া অত্যন্ত উৎসাহ ও মনোযোগের সহিত দেখিতে লাগিলেন। রামদয়াল জাতিতে ছত্রি। বেশ অবস্থাপন্ন লোক, অতএব তাহার স্ত্রী পর্দ্দার আড়ালে থাকে। একে আসন্নপ্রসবা, তাহাতে ম্যালেরিয়ায় ভুগিয়া রক্তশূন্য, অথচ ডাক্তারের উপায় ছিল না যে তাহাকে ভাল করিয়া দেখে। যাহা হউক, আমার ভয়ে, ডাক্তারের উপদেশে, রামদয়ালের মধ্যবর্ত্তিতায় তাহার স্ত্রীর চিকিৎসা চলিতে লাগিল। ভোরে একবার, রাত্রিতে একবার ডাক্তারকে তাহার অবস্থা জিজ্ঞাসা করা আমাদের একটা নিত্যকার ব্যাপারের মধ্যে দাঁড়াইল। যেদিন জ্বর কম হইত সকলে বলিতাম, 'কেমন ডাক্তার বাবু আজ একটু ভাল ?' ডাক্তার হাসিয়া উত্তর দিত, 'ভাল বলা যায় না, তবে আরও খারাপ হইতে পারিত !'

একে একে মহুয়া গাছের সমস্ত পাতা ঝরিয়া যাইতে লাগিল। প্রত্যেকটি ডালপালা নির্ম্মল আকাশে আপনাকে স্পষ্ট করিয়া বিস্তার করিল। যতদূর দৃষ্টি যায় কেবল পত্রশূন্য রিক্ত মহুয়া গাছ। কিন্তু দেখিতে দেখিতে গাছগুলি পুষ্প-সম্ভারে ভরিয়া উঠিল। মহুয়া ফুলের মদির গন্ধে চতুর্দ্দিকের আকাশ-বাতাস মাতাল হইয়া উঠিল। এমন উগ্র গন্ধ যে কিছুক্ষণ বাহিরে থাকিলে মাথা ঘোরে। সেদিন পূর্ণিমা। জ্যোৎস্নালোকে পুষ্পিত মহুয়ার ডালপালাগুলি অত্যন্ত স্পষ্ট দেখা যাইতেছে। দূরে রক্‌সোবাঁধের শালতলায় এরই মধ্যে সাওতাল নরনারী একত্র হইয়া নাচিতে আরম্ভ করিয়াছে। এমন সময়ে দেখিলাম ডাক্তার অত্যন্ত ব্যস্তসমস্ত ভাবে ছুটাছুটি করিতেছে। ব্যাপার কি ? রামদয়ালের স্ত্রীর অবস্থা ভাল নয়। অসহ্য বেদনায় এবং অবিশ্রান্ত রক্তস্রাবে তাহার অবস্থা ক্রমশঃ খারাপ হইয়া পড়িতেছে। বেদনা না-কি দিনেই আরম্ভ হইয়াছিল কিন্তু ডাক্তারকে বলে নাই। এখন অত্যন্ত বাড়াবাড়ি দেখিয়া নিরুপায় হইয়া তাহার শরণাপন্ন হইয়াছে। ডাক্তার ঘণ্টাখানেক পরে ফিরিয়া আসিল। জিজ্ঞাসা করিলাম, 'কেমন ?' বিমর্ষ ভাবে তিনি বলিলেন, কিছু বলা যায় না। প্রসূতি যেরূপ দুর্ব্বল হইয়া পড়িতেছে তাহাতে যে-কোন মুহূর্ত্তে বিপদ হইতে পারে। আমি রক্‌সোবাঁধের বড়সাহেব, রামদয়াল আমার অধীনে ৩০৲ টাকা বেতনে সামান্য 'ফিটার' মিস্ত্রী, তাহার স্ত্রীর বিপদে আমার কি ? কিন্তু মনটা আশঙ্কায় আকুল হইয়া উঠিল। এরূপ বিপদের আঘাত একদিন সহ্য করিয়াছি, তাই কি এই ব্যাকুলতা ? না মানবগোষ্ঠীর মধ্যে যে একটি বিশ্বব্যাপী মৈত্রী আছে, এ তাহারই প্রভাব ?

শেষরাত্রির দিকে খবর পাওয়া গেল, একটি ছেলে হইয়াছে, বেশ সুস্থ এবং সুন্দর, মাও অনেকটা ভাল। ভোরের বেলা

ডাক্তার খবর দিল আর বিশেষ কোন ভয়ের কারণ নাই। প্রসূতি যদিও খুব দুর্ব্বল তথাপি আশা করা যায় শীঘ্রই ভাল হইয়া উঠিবে। মোটেই জ্বর নাই। সকলে মিলিয়া ছেলে দেখিলাম, বেশ বড় মোটাসোটা ছেলে। মাথায় একরাশি চুল। মনে মনে নিশ্চিন্ত হইলাম, আমাদের কলোনিতে এই প্রথম জন্ম।

বৈকালে ডাক্তার আসিয়া খবর দিল রামদয়ালের স্ত্রী মারা গিয়াছে; heart failure। স্তম্ভিত হইলাম, বাংলা দেশের বাঙালী বড় চাকুরে আমি, আমার এই পশ্চিমা ফিটারের অজ্ঞাতনামা স্ত্রীর জন্য প্রাণটা ছাঁৎ করিয়া উঠিল। দেখিতে দেখিতে রামদয়াল তাহার ছোট ছেলেটির হাত ধরিয়া উপস্থিত হইল, আমার পায়ের কাছে বসিয়া পড়িল। সে বেশী কান্নাকাটি করিল না; বলিল, 'হুজুর, ওর কপালে লেখা ছিল এখানে মরবে। আমি গরিব মানুষ, এত ডাক্তার, দাওয়াই কোথায় মিলত; আর আপনার মত লোকের দয়া কি আমি জীবনে ভুলব?' কর্ম্মকার, ছুতার, ঠেলাওয়ালা, চাপরাশী সকলে একবাক্যে বলিল যে, রামদয়ালের স্ত্রীর মত ভাগ্যবতী ললনা এ-যুগে দেখা যায় না। মরিত তো সে নিশ্চয়ই, কিন্তু এমন করিয়া শাখা সিঁদুর লইয়া, স্বামীর পায়ে মাথা রাখিয়া, পাসকরা ডাক্তারের দাওয়াই খাইয়া, বড়সাহেবের অসীম অনুগ্রহ লইয়া এবং সর্ব্বশেষে পেটেরটিকে খালাস করিয়া কে কবে মরিয়াছে!

রামদয়াল শব্দ করিল না। আমার মুখের দিকে চাহিয়া বলিল, 'হুজুর, আমার একটা আরজি আছে।'

—কি?

—ওর একখানা ছবি লইতে হইবে।

রাজী হইলাম। মুখের কাপড় সরাইয়া রামদয়ালই কেশগুচ্ছ সযতনে সাজাইয়া দিল। চাহিয়া দেখিলাম, মুখখানি অত্যন্ত সুকুমার, রক্তাল্পতাজনিত ঈষৎ পাংশুল; কিন্তু তাহাতেই বুঝি মৃত্যুর কালিমা তেমন আচ্ছন্ন করিতে পারে নাই। চোখ দুটি বেশ বড় এবং গোল, উপর ঠোঁটের ডান দিকে ঈষৎ বক্রতা, দুটি দাঁতের অংশ-বিশেষ দেখা যায়; যেন দ্বিতীয়ার চাঁদের করুণ হাসি! ফটো তুলিয়া লইলাম। সকলে মিলিয়া প্রস্তাব করিল যে মুখাগ্নি করিয়া দেহ গঙ্গাজলে ফেলিয়া দিবে। আমি প্রতিবাদ করিলাম, যখন হিন্দু, পোড়াইতেই হইবে, কাঠের অভাব নাই, কয়েকখানা পুরান 'স্লিপার' দিলেই হইবে। সকলে সমারোহ করিয়া রামদয়ালের স্ত্রীকে পোড়াইতে লইয়া গেল।

ডাক্তার আসিয়া বলিল, 'যে মরিল তাহাকে তো পোড়াইয়া ফেলিলেই হইবে, কিন্তু যে বাঁচিয়া রহিল তাহার উপায় কি? ছেলেটি বেশ সুস্থ; ইহাকে কি করিয়া বাঁচান যায়?' এ চিন্তা এতক্ষণ মাথায় আসে নাই। ডাক্তারকে বলিলাম, 'যাহা হয় করুন; আমি মৃতদেহ সংকার হইয়া গেলেই এদিকে মনোযোগ দিব।'

চিতা সাজাইতে সাজাইতে সন্ধ্যা হইয়া আসিল। পশ্চাতে মালিটোক পাহাড়, নীচে মহুয়াবনের পাশ দিয়া ফুদকিপুর পাথর সাইডিং গঙ্গার দিকে চলিয়া গিয়াছে; তাহারই পাশে পুরান স্লিপারের চিতাশয্যায় মৃতদেহ স্থাপিত হইল। জ্যোৎস্নালোকে কিছুকালমধ্যেই চতুর্দ্দিক প্লাবিত হইয়া গেল। চালপাহাড়ের মাথায় যে শালগাছটা দাঁড়াইয়া আছে তাহার পত্রহীন ঋজু দেহের দারুবস্তু জ্যোৎস্নালোকে অত্যন্ত প্রখর হইয়া প্রকাশিত হইল। সেই নীরব জ্যোৎস্নালোকে মহুয়া ফুলের মদির গন্ধে মালিটোক পাহাড়ের পাদদেশে চিতাশয্যায় শায়িতা বেহারী রমণীর সুকুমার মুখমণ্ডল আমার হৃদয়পটে অঙ্কিত হইয়া রহিল।

পরদিন হইতেই মৃতের কথা কেহ বড় ভাবিল না। সকলেই কি করিয়া ছেলেটিকে বাঁচান যায় সে-দিকে নজর দিল। কোন স্ত্রীলোক আমাদের কলোনিতে ছিল না। ডাক্তার তাঁহার ধাত্রী-বিদ্যার বই দেখিয়া বহু কষ্টে এটা-সেটা মিশাইয়া দু-দিনের শিশুর উপযোগী দুধ তৈরি করিল। কিন্তু ছেলেকে খাওয়ান লইয়াই হইল মুস্কিল। আমাদের মধ্যে রোহিণীবাবুর পাঁচ-ছয়টি ছেলেমেয়ে আছে, অতএব তিনিই অভিজ্ঞ। কিন্তু তাঁহার দ্বারা কোন উপকার হইল না। ডাক্তারও ছেলের বাপ। কিন্তু বাপেরা কেহই ছেলেকে দুধ খাওয়াইবার বিদ্যা অর্জ্জন করে নাই। একজন লোককে 'ফিডিং' বোতল আনিতে ভাগলপুরে পাঠান হইল। ইতিমধ্যে ঘড়ি ধরিয়া ন্যাকড়া ভিজাইয়া, তুলা ভিজাইয়া, এমন কি সরুমুখ বোতলের মুখে রবারের টুকরা বাঁধিয়া এবং তাহাতে ছিদ্র করিয়া অনেক চেষ্টা হইতে লাগিল। ছেলে কাঁদিয়া খুন। এক আউন্স খায় তো তিন আউন্স বমি করে।

ছেলের জামা-কাপড় লইয়াও বড় কম বিপদ হইল না। আমার ঠাকুর কোনক্রমে পাঞ্জাবীর হাতা কাটিয়া একটা জামা তৈরি করিল। তার পরদিন ফিডিং বোতল আসিল। মাপের মাপে মাপে, ঘড়ির কাঁটায় কাঁটায় খাওয়ান চলিতে লাগিল এবং দিনে অন্ততঃ দুই বার পাথর-মাপা স্প্রিং ব্যালান্স দিয়া শিশুর ওজন পরীক্ষা চলিতে লাগিল। কিছুতেই কিছু হইল না। দিনে দিনে ছেলে শুকাইয়া যাইতে লাগিল এবং এমন করিয়া চলিলে যে বেশী দিন বাঁচিয়া থাকিবে না এ-চিন্তায় আমাদের মন বিমর্ষ হইয়া উঠিল।

অত্যন্ত দুর্ভাবনায় দিন যাইতেছিল। রামদয়ালের কিন্তু বিশেষ কোন ভাবনা দেখা গেল না, শুধু ছোট ছেলেটাকে লইয়া সে বিব্রত হইল। পাহাড়ে কাজ করিতে যাইবার সময় তাহাকে ফেলিয়া যাইবার উপায় নাই; তাহার পিছে পিছে কাঁদিতে কাঁদিতে যাইবে। হলদে কাপড়-পরা কোন মুখাড় রমণী দেখিলেই 'মা যায় মা যায়' বলিয়া পিছে ছুটিবে।

এমন সময় একদিন সুধন্য ও তাহার স্ত্রী আসিয়া উপস্থিত হইল। সুধন্যর বয়স চল্লিশের কাছাকাছি হইবে, কুমিল্লা জেলায় বাড়ি; ঘরামীর কাজ করে। রোহিণী বাবু বহুদিন পূর্ব্বেই তাহাকে আসিতে পত্র দিয়াছিলেন, কিন্তু এতদিন না আসিতে আশা ছাড়িয়া দিয়াছিলেন। সে আসিয়া জানাইল যে, অত্যন্ত বিপদে পড়িয়া ইসে আটকাইয়া ছিল। তাহার কোন ছেলেমেয়ে ছিল না। মাস-দুই পূর্ব্বে একটি ছেলে হইয়া পনের দিন পর মারা গিয়াছে। স্ত্রীর শরীরটা সারিবার জন্যই সে এতদিন অপেক্ষা করিয়াছে।

সুধন্যর স্ত্রী আসিয়া রামদয়ালের ছেলেকে কোলে তুলিয়া লইল। এই নারীর আজীবনসঞ্চিত মাতৃস্নেহ যেন সদ্যোজাত বিদেশী ছেলেটিকে দেখিয়া উপছিয়া উঠিল। আমরা সকলে নিশ্চিন্ত হইলাম। ছেলেকে লইয়া সুধন্যের স্ত্রী যে কি করিবে ভাবিয়া পাইত না, স্নান করাইয়া, পাউডার মাখাইয়া, জামা গায়ে দিয়া সে ছেলে মানুষ করিতে লাগিল। দেখিতে দেখিতে ছেলের চেহারা ফিরিয়া গেল।

কিছুদিন পরে আমাদের কাজ শেষ হইয়া আসিল। একদিন যেখানে গড়িবার পালা আরম্ভ হইয়াছিল আজ সেখানে ভাঙিবার দিন আসিল। রামদয়াল এক দিন চুপি চুপি আমার কাছে আসিয়া বলিল, 'হুজুর, আমার ছেলের কি হইবে?' লোকটার মনোভাব বুঝিতে পারিলাম না। মনে মনে একটা আঁচ করিয়া লইলাম। হয়ত লোকটা ছেলে ফিরাইয়া লইতে চায়। অত্যন্ত বিরক্ত হইলাম। যে-ছেলের প্রতি তাহার কোন মমতাই ছিল না, যে-ছেলে সুধন্যর স্ত্রীর স্তন্য পান না করিলে আজ বাঁচিয়া থাকিত না, তাহাকে ফিরাইয়া লইবে সে কোন মুখে? কোথায় সে সুধন্য ও তাহার স্ত্রীর কাছে চিরকৃতজ্ঞ থাকিবে, না সে পিতৃত্বের দাবি জানাইতেছে। আমার মনোভাব বুঝিয়াই হোক কিংবা অন্য কোন কারণেই হোক রামদয়াল বলিল, 'আমার আর কিছু আরজি নাই। ছেলে সুধন্য নিক, কিন্তু যদি ও কোনকালে দেশে ফিরিয়া যাইতে চায়, তবে যেন যায়। আমি আমার জমিজমা সবই ওকে ভাগ করিয়া দিব।'

কিছুদিন পরেই সুধন্য ও তাহার স্ত্রী রামদয়ালের ছেলেকে লইয়া চলিয়া গেল। মনে মনে ভাবিলাম এই অভিনয়ের আজ আরম্ভ হইল, এর যবনিকা পতন কোথায় হইবে? ছাপরা জেলার রামদয়ালের ছেলে রক্সোবাধে জন্মগ্রহণ করিল। ভাগ্যস্রোতে সে কুমিল্লার কোন নিভৃত গ্রামে বাঙালী পিতামাতার আশ্রয়ে গিয়া পড়িল। কয়েক দিন পরে সুধন্যর পত্র আসিল যে, ছেলেটি আমাশয় হইয়া মারা গিয়াছে। যাক, নিশ্চিন্ত হওয়া গেল, ও নাটকের এখানেই শেষ। তখন কে জানিত এত বৎসর পরে আবার তাহার যবনিকা উঠিবে।

* * *

বোধ হয় তন্ময়ের মত হইয়া গিয়াছিলাম। কিছু লক্ষ্য করি নাই। দেখিলাম ছেলেটি চলিয়া গিয়াছে, কিন্তু সুধন্য ও তাহার স্ত্রী তেমনি পায়ের কাছে পড়িয়া আছে। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, 'সত্য ক'রে বল সুধন্য, এ ছেলে কার?' সুধন্য চুপ করিয়া রহিল। তাহার স্ত্রী বলিল, 'ছেলে আমার, দশ মাস দশ দিন পেটে ধরেছি, নিজের বুকের রক্ত দিয়ে একে মানুষ করেছি। হুজুর, আমার একটি বই দুটি নাই।'

আমার সমস্ত মন সমস্ত বিবেক বলিতে লাগিল, এ রামদয়ালের ছেলে।

'সুধন্য, এ রামদয়ালের ছেলে।' তাহার স্ত্রী বলিল, 'সে ছেলে রক্সো ছাড়বার কয়েক দিন পরেই মারা যায়। হুজুর পরের ছেলে নিয়ে আমি কি করব। আমরা গরিব, অত দিনের কথা, কোন সাক্ষী নাই; আপনার কথার উপর সব নির্ভর

করে। যদি আমার ছেলে চলে যায়, গঙ্গার জলে আত্মহত্যা করব। আপনাকে কথা দিতে হবে, আমার হয়ে সাক্ষী দেবেন।'

—আমি সত্য কথা বলব।

—সত্য কথা এ আমার ছেলে।

অনেক বুঝাইয়া তাহাদিগকে বিদায় করিলাম। বহু প্রকার বিভিন্নমুখী চিন্তা আসিয়া বিব্রত করিতে লাগিল। কোন্‌টা সত্য? চিতাশয্যায় শায়িত সেই মুখের সহিত এ যে বিষম সাদৃশ্য! আবার এও সত্য যে সুধন্য তখনই চিঠি দিয়াছিল যে ছেলে মারা গিয়াছে। সে কি এতদিন পূর্ব্বেই এমন মিথ্যা কথা লিখিয়াছিল? না—এ বোধ হয় সুধন্যেরই ছেলে, কিন্তু ঐ যে ঠোঁটের বক্রতাটুকু, রামদয়ালের স্ত্রীর মুখের সহিত এর অনেক মিলে। শত যুক্তি প্রমাণ সত্ত্বেও আমি মানিব না। আমার সমস্ত মন সমস্ত বিবেক বলিতেছে—এ রামদয়ালের ছেলে। আদালতে দাঁড়াইয়া আমি মিথ্যা কথা বলিতে পারিব না। আমি সত্য কথাই বলিব। পরমুহূর্ত্তেই জগতের যত স্নেহময়ী জননীর মুখমণ্ডল মনে ভাসিয়া উঠিতে লাগিল। এ কি অপূর্ব্ব লীলা! তিলে তিলে আপন দেহ ক্ষয় করিয়া জীবনসঞ্চিত যত সুধা দিয়া মানবশিশুকে বাঁচাইবার এ কি প্রচেষ্টা! মনে হইল সে-দিনের কথা, যেদিন এই শিশুটি পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করিয়াছিল, অত্যন্ত নিঃস্ব, রিক্ত। জন্মিয়াই সে মাতৃস্তন্য পাইল না। বহু বৎসর ধরিয়া সে সুধন্য-দম্পতীর স্নেহচ্ছায়াতলে মানুষ হইয়াছে। কোথায় থাকিত সে, যদি-না সুধন্যের স্ত্রী আপনার স্তন্যদানে তাহাকে মানুষ করিত। যদিই বা মালিটোকের পাদদেশে ভস্মীভূতদেহা সেই বেহারী রমণী তাহার জন্মদান করিয়া থাকে তাহাতে কি আসে যায়?

পরদিন ভোরে কোর্ট বসিল। রাজমহলে উকিল-আমলা বেশী নাই। তবু সে-দিন শহরের সমস্ত লোক এই অদ্ভুত মোকদ্দমার ফলাফল জানিতে কাছারিতে উপস্থিত হইল। আমি সাক্ষী দিতে দাঁড়াইলাম। একপাশে সুধন্য ও তাহার স্ত্রী দাঁড়াইয়া আছে; অন্যদিকে রামদয়াল সিং, দেখিয়াই চিনিলাম। কোটরগত প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড চক্ষু, প্রশস্ত কপাল। রামদয়ালের উকিল বলিল, সে আমার সহিত একটু কথা বলিতে চায়। অন্য পক্ষের উকিল মহা আপত্তি করিল। রামদয়ালই আমাকে সাক্ষী মানিয়াছে, অতএব [illegible] [illegible] করিলেন না। রামদয়াল এক পা, এক পা করিয়া [illegible] [illegible] এবং হঠাৎ আমার পা জড়াইয়া ধরিয়া কহিল, '[illegible], সচ বাত বোলিয়ে।'

আদালতের হলফ লইলাম; মিথ্যা বলিব না; সত্য গোপন করিব না। দুই পক্ষের উকিলে নানারূপ বাদানুবাদ হইতে লাগিল। সমস্ত রাত্রি মন সন্দেহে দোল খাইয়াছে। কিন্তু এখন একরূপ ঠিকই করিয়াছি সত্য কথা বলিব।

উকিল জেরা করিল, কবে রামদয়ালের ছেলে হয়, কবে তাহার স্ত্রী মারা যায়, কবে সুধন্য চলিয়া যায়, ইত্যাদি। যতটা মনে ছিল উত্তর দিলাম। এক-একটা প্রশ্ন হইতেছে আর সুধন্যের স্ত্রীর মুখ আশঙ্কায় উদ্বেল হইয়া উঠিতেছে; আর যেই জবাব দিতেছি সে নিশ্চিন্ত হইতেছে। অবিরল ধারে তাহার দুই গণ্ড বহিয়া অশ্রু ঝরিতেছে। সুধন্যের পক্ষের উকিল জেরা করিল, একথা সত্য কি-না যে সুধন্য 'রক্সোবাঁধ' ছাড়িয়া যাইবার কিছুদিন পরেই একখানা চিঠি দিয়াছিল যে রামদয়ালের ছেলে মারা গিয়াছে।

'সত্য'।

রামদয়ালের উকিল জেরা করিল যে, আমি সে-বিষয় যাচাই করিয়া দেখিয়াছিলাম কি-না?

'না'।

'আপনি রামদয়ালের মৃতা স্ত্রীর একখানা ফটো লইয়াছিলেন কি-না?'

'হাঁ'।

'সেখানা আছে কি-না?'

'না, বহু দিনের কথা, হারাইয়া গিয়াছে।'

'আপনি বলিতে পারেন কি-না যে, রামদয়ালের মৃতা স্ত্রীর সহিত এ ছেলের মুখের অপূর্ব্ব সাদৃশ্য আছে।

প্রতিপক্ষের উকিল আপত্তি করিল যে, সাক্ষীর মতামত গ্রাহ্য নহে; সে যাহা জানে তাহাই বলিবে। যাহা মনে করে তাহার কোন মূল্য নাই। হঠাৎ জবাব দিতে পারিলাম না। বাহিরের দিকে চাহিয়া দেখিলাম ক্ষীণকায়া স্রোতস্বতী গঙ্গা মন্থর গমনে চলিয়াছে। প্রভাত-সূর্য্যের উজ্জ্বল আলোকে জলধারা ও বালুচর ঝকঝক করিতেছে। ভিতরে সুধন্যের স্ত্রীর মুখে বিশ্বের যত কাতরতা, অবিরল অশ্রুধারে দুই গণ্ড

ভাঙিয়া গিয়াছে। সন্তানহীনা এই বধিরা নারীর জীবনের যত প্রয়োজন ঐ একটি মাত্র ছেলেকে লইয়া। হাকিম জিজ্ঞাসা করিল, 'আপনি কি বলেন ?'

'ছেলে সুখন্তর'।

তারপর কি হইল বিশেষ কিছু মনে নাই। একটা গোলমাল, রামদয়ালের কান্না, সুখন্তের স্ত্রী উচ্ছ্বসিত ক্রন্দন-বেগ না থামাইতে পারিয়া তাহার ছেলেকে জড়াইয়া ধরিল।

* * *

এখনও মাঝে মাঝে বিবেকের দংশন অনুভব করি। আদালতে দাঁড়াইয়া হলফ পড়িয়া মিথ্যা কথা বলিয়াছি। কিন্তু পরমুহূর্তেই পিসিমার মুখখানি মনে পড়ে। মা কে ? জন্মদাত্রী না ক্ষীরদাত্রী ?

জাতীয় সঙ্কট ও রসায়ন শাস্ত্র

শ্রীপুলিনবিহারী সরকার, এম্-এস-সি

রসায়ন শাস্ত্র গত শতাব্দীতে বিজ্ঞান-হিসাবে আশাতীত উন্নতি লাভ করিলেও জাতির বাঁচিয়া থাকিবার পক্ষে কত অপরিহার্য্য তাহা বুঝিতে আরম্ভ করিয়াছি আমরা মহাযুদ্ধের পর। রসায়ন-বিদ্যার জ্ঞান কত বড় শক্তিশালী অস্ত্র, যুদ্ধের সময় সমগ্র ইউরোপ তাহা মর্ম্মে মর্ম্মে অনুভব করিয়াছে। নিরস্ত্রীকরণ সমস্যা জটিলতর করিয়া তুলিয়াছে আজ জার্ম্মানীর সুবৃহৎ রাসায়নিক কারখানাগুলি। জাতির আত্মরক্ষায় কিমিতি বিজ্ঞান কতখানি সাহায্য করিতে পারে, শান্তির সময় জাতির অর্থনৈতিক দুর্গতির দিনে এবং স্বাস্থ্য-সঙ্কটে ইহা কত অপরিহার্য্য এই প্রবন্ধে তাহাই আলোচনা করিব। যুদ্ধ করা ভাল কাজ কি-না, এবং যুদ্ধে বিজ্ঞানের সাহায্যে নরহত্যা সমর্থনযোগ্য কি-না সে প্রশ্ন তুলিব না। কারণ, তাহা শুধু নিষ্ফল নয়, অপ্রাসঙ্গিক। ক্রমবর্দ্ধমান জনসংখ্যা ও অভাববৃদ্ধিকারী সভ্যতা যতদিন থাকিবে ততদিন মারামারি কাটাকাটির অবসান হইবে না।

পৃথিবীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ শক্তিগুলির বিরুদ্ধে প্রায় এক বৎসর যুদ্ধ করিয়া জার্ম্মানী বুঝিল—যুদ্ধের নূতন কোন উপায় উদ্ভাবন করিতে না পারিলে ধ্বংস তাহার অনিবার্য্য ; ক্ষিপ্তপ্রায় প্রবল প্রতিপক্ষ তাহাকে একেবারে পিষিয়া ফেলিবে। জার্ম্মানী ক্ষুদ্র দেশ—ব্রিটেনের মত পৃথিবীব্যাপী বিপুল সাম্রাজ্য তাহার নাই ; তাহার সৈন্য-সংখ্যাও ব্রিটেনের মত অগণিত নয়। অর্থসম্পদ তাহার আছে প্রচুর কিন্তু সৈন্য-ক্ষয় কমাইতে না পারিলে অল্পকাল মধ্যেই তাহাকে পরাজয় স্বীকার করিতে হইবে। কাইজারের কূট রাজনীতি ও হিণ্ডেনবার্গের অসাধারণ সমরকৌশল অজ্ঞাত দূরের কথা—আত্মরক্ষার পক্ষেও যথেষ্ট মনে হইল না। জার্ম্মানীর জাতীয় জীবনে সেদিন জীবন-মরণের যে ভীষণ সমস্যা দেখা দিয়াছিল, তাহার সমাধান করিলেন রাসায়নিক হাবার ও তাঁহার সহকর্ম্মিগণ। অভিনব বিস্ফোরক ও বিষাক্ত রাসায়নিক দ্রব্য প্রচুর পরিমাণে প্রস্তুত করিয়া জার্ম্মানগণ রাসায়নিক যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইল, নিত্যনূতন অদ্ভুত উপায়ে বিপক্ষকে বিপর্য্যস্ত করিয়া তুলিল। অতি-বড় কবিকল্পনায় যাহা কেহ ভাবিতে পারে নাই তাহাই সম্ভব হইতে লাগিল। সমস্ত জগৎ জার্ম্মানীর উদ্ভট রণ-পদ্ধতি দেখিয়া বিস্ময়ে অভিভূত হইল।

১৯১৫ সনের ২২শে এপ্রিল জার্ম্মানগণ ফরাসী সৈন্যদের দিকে তরলীভূত ক্লোরিন্ (liquid chlorine) নিক্ষেপ করে। মুহূর্ত্তমধ্যে ইহা পীতবর্ণ গ্যাসে পরিণত হইয়া সমস্ত আকাশ ছাইয়া ফেলে। ফলে আধ ঘণ্টার মধ্যে পাঁচ হাজারের অধিক ফরাসী সৈন্য শ্বাসরুদ্ধ হইয়া মৃত্যুমুখে পতিত হয়। পঞ্চাশটা কামান জার্ম্মানদের হস্তগত হয়। বলা বাহুল্য, এক জন জার্ম্মান সৈন্যও আহত বা নিহত হয় নাই। যন্ত্রের সাহায্যে ক্লোরিন্ সজোরে নিক্ষেপ করিতে কয়েক জন লোকের প্রয়োজন হইয়াছিল মাত্র। তখন হইতে শান্তি-স্থাপনের দিন পর্য্যন্ত (১১ই নবেম্বর ১৯১৮) রাসায়নিক যুদ্ধ চলিয়াছিল। প্রেক্ষাগারে প্রস্তুত কঠিন, তরল ও বায়বীয় নানা প্রকার রাসায়নিক দ্রব্য ব্যবহৃত হইয়াছে। বিপক্ষকে নানা ভাবে জব্দ করিবার জন্য বিভিন্ন গুণবিশিষ্ট দ্রব্য উদ্ভাবিত হইয়াছিল। তাহাদিগকে উজ্জ্বল দিবালোকে দিশাহারা করিয়া দিতে নানা প্রকার রঙীন গ্যাস্ পরস্পর

থাকিতে তাহাদের 'শ্বাসকষ্ট' উপস্থিত করিতে দৃশ্য ও অদৃশ্য বিষাক্ত গ্যাস্‌; অকারণে তাহাদের অশ্রুবন্যা প্রবাহিত করিতে, পুরু জামা ও বুট রক্ষিত দেহে অসংখ্য ফোস্কা দ্বারা কৃত্রিম 'বসন্তের বিজয় টীকা' আঁকিয়া দিতে, অমঙ্গলের কিছু মাত্র কারণ না থাকিলেও শত সহস্র সৈন্যকে একযোগে অবিরাম হাঁচিতে বাধ্য করিতে বহুবিধ দ্রব্য ব্যবহৃত হইয়াছিল। ইহার সবগুলিই জার্মানগণ প্রথম ব্যবহার করে; মিত্রশক্তি পরে অনুকরণ করিয়াছিল মাত্র। রসায়ন বিদ্যায় জার্মানীর তুল্য উন্নত দেশ পৃথিবীতে নাই—কিমিতি বিজ্ঞানকে জার্মান শাস্ত্র বলিলে অত্যুক্তি হয় না। সুবৃহৎ রাসায়নিক কারখানাগুলি যাহা শান্তির সময় নানা ঔষধ, রং ও ফটোগ্রাফির জিনিষ দৈনিক হাজার হাজার মণ উৎপন্ন করিত—যুদ্ধের সময় সামরিক দ্রব্যসম্ভার প্রস্তুত করিতে ব্যবহৃত হইয়াছিল। ইউরোপের অন্য কোন জাতির এমন বিরাট রাসায়নিক কারখানা, এমন সুদক্ষ কারিকর ও এমন মনীষাসম্পন্ন বৈজ্ঞানিক নাই। তাই জার্মানীর এই অভিনব যুদ্ধ-প্রক্রিয়ার প্রত্যুত্তর দিতে ইংলণ্ড ও ফ্রান্সকে গলদ্‌ঘর্ম্ম হইতে হইয়াছিল। রসায়ন-বিদ্যার সাহায্যে লোকক্ষয় হ্রাস করিয়া জার্মানী সমবেত প্রবল শক্তিগুলির বিরুদ্ধে দীর্ঘকাল টিকিয়া ছিল। বিপুল সৈন্যবাহিনী লইয়াও মিত্র-শক্তি তেমন সুবিধা করিয়া উঠিতে পারেন নাই।

যুদ্ধের পূর্ব্বে ইংলণ্ড ঔষধ ও রঙের জন্য জার্মানীর উপর অনেক পরিমাণে নির্ভর করিত। যুদ্ধের সময় আমদানী বন্ধ হইয়া গেল। নিত্যব্যবহার্য্য ঔষধগুলি দেশে প্রস্তুত করিতে না পারিলে বিনা-চিকিৎসায় দেশের লোক প্রাণ হারাইত। এই সঙ্কটকালে ব্রিটিশ-দ্বীপপুঞ্জের চল্লিশটি বিশ্ববিদ্যালয়ের রাসায়নিক প্রেক্ষাগার (chemical laboratories) নানাবিধ ঔষধ ও যুদ্ধের জন্য রাসায়নিক দ্রব্য ইত্যাদি প্রস্তুত করিতে ব্যবহৃত হইয়াছিল। সে-দেশের বিখ্যাত রাসায়নিকগণ অধ্যাপনা ও গবেষণা স্থগিত রাখিয়া দেশের দুর্গতি দূর করিতে আত্মনিয়োগ করিলেন। রসায়ন-পারদর্শী জার্মানদের নিকট মিত্রশক্তির পরাজয় অবশ্যম্ভাবী হইত যদি-না ইংরেজ ও ফরাসী বৈজ্ঞানিকগণ নানাবিধ বিষাক্ত দ্রব্য ও বিস্ফোরক প্রস্তুত ও সৈন্যদের জন্য নানা প্রকার সংরক্ষণী (Protectors) উদ্ভাবন করিতে সমর্থ হইতেন। পৃথিবীর অধিকাংশ পটাশ-ঘটিত লবণ (Potassium salts) জার্মানী হইতে সরবরাহ হইত। জমির সার হিসাবে ইহা অপরিহার্য্য বলা যাইতে পারে। সুযোগ বুঝিয়া জার্মানী ইহার রপ্তানী একেবারে বন্ধ করিয়া দিল। ইংলণ্ডের জমি আমাদের মত উর্ব্বর নয়। সারের অভাবে কৃষকের অবস্থা শোচনীয় হইবার উপক্রম হইল। ইংলণ্ড ও আমেরিকায় তখন সমুদ্রজাত উদ্ভিদ পুড়াইয়া তাহার ছাই হইতে পটাশ তৈয়ারী হইতে লাগিল। জার্মানীর চাল মিত্রশক্তি ব্যর্থ করিয়া দিল।

বাষ্পের সাহায্যে যে-সব ইঞ্জিন বা যন্ত্র চলে, তাহার চিম্‌নি হইতে অবিরত ধূম উঠিতে থাকে। পরীক্ষা করিয়া দেখা গিয়াছে, অদগ্ধ অতি ক্ষুদ্র অঙ্গারকণা ব্যতীত ধূম আর কিছুই নহে। যুদ্ধের সময় রণপোত কিংবা মাল-বোঝাই জাহাজ অথবা কারখানার চুল্লী হইতে অনর্গল ধূম উঠিতে থাকিলে দূর হইতে শত্রুপক্ষ তাহা সহজে দেখিতে পায়। জলপথে কিংবা আকাশপথে কামান দিয়া সেগুলি ধ্বংস করা সহজ হয়। বিদ্যুতের সাহায্যে চিম্‌নি হইতে ধোঁয়া উঠা নিবারণ করিয়া জাহাজ ও কারখানাগুলি অপেক্ষাকৃত নিরাপদ করা হইয়াছিল।

অনেক কাঁচা মালের জন্য জার্মানীকে পৃথিবীর অন্যান্য দেশের উপর নির্ভর করিতে হয়। যুদ্ধের সময় মিত্রশক্তির সুনিপুণ নৌবাহিনী বহির্জগৎ হইতে জার্মানীতে কোন মাল যাইতে দিত না। জার্মানীকে এই 'ভাতে মারিবার' চেষ্টা রাসায়নিক একেবারে ব্যর্থ করিয়া দিল। আমেরিকার চিলি প্রদেশ হইতে সোরা (sodium nitrate) আমদানী করিয়া জার্মানী নাইট্রিক য়্যাসিড প্রস্তুত করিত। যুদ্ধের জন্য এই জিনিষটি অত্যাবশ্যক। সর্ব্বপ্রকার বিস্ফোরক তৈয়ার করিতে ইহার প্রয়োজন হয়। ডিনামাইট্ (dynamite), গান কটন্ (gun cotton) টি, এন, টি (T. N. T.) প্রভৃতি নাইট্রিক য়্যাসিড ছাড়া হয় না। কোন উপায়ে নাইট্রিক য়্যাসিড প্রস্তুতের উপাদানগুলি পৃথিবী হইতে দূর করিয়া দিতে পারিলে চিরদিনের জন্য সভ্য জগতের যুদ্ধ-রোগ-দূর হইয়া যাইত। সুতরাং নাইট্রিক য়্যাসিড অভাবে জার্মানীর অবস্থা সহজেই

অনুদের। জার্মান বিজ্ঞানিক হাবার্ বাতাস হইতে নাইট্রোজেন এবং জল হইতে হাইড্রোজেন্ লইয়া অ্যামোনিয়া প্রস্তুত করিলেন। বায়ুমণ্ডলের অক্সিজেন্ সাহায্যে তাহা হইতে নাইট্রিক য়্যাসিড প্রস্তুত হইতে লাগিল। জল ও বাতাসের অভাব ইংরেজ ঘটাইতে পারে নাই—তাই হাজার হাজার মণ য়্যাসিড এইভাবে প্রস্তুত হইতে লাগিল। মরণোন্মুখ জার্মান জাতি বিজ্ঞানের কৃপায় বাঁচিয়া গেল। বিদেশ হইতে গন্ধক বা পিরাইটস্ (Pyrites) আমদানী বন্ধ হওয়ায় সাল্‌ফিউরিক য়্যাসিড তৈয়ারী করা অসম্ভব হইয়া উঠিল। এমন রাসায়নিক কারখানা অল্পই আছে যাহাতে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ ভাবে এই জিনিষটির প্রয়োজন না-হয়। বস্তুতঃ, দেশের পণ্যোন্নতি (industrial development) এই য়্যাসিডটির উপর অনেক পরিমাণে নির্ভর করে। সেই জন্যই একজন বিখ্যাত ব্যক্তি বলিয়াছিলেন, "যে-দেশ যত সাল্‌ফিউরিক য়্যাসিড ব্যবহার করে সে-দেশ তত সভ্য।" কিছুদিনের জন্য 'অসভ্য' সাজিতে জার্মানীর তেমন-কিছু আপত্তি ছিল না। কিন্তু যুদ্ধের সময় রাসায়নিক কারখানাগুলি বন্ধ হইয়া গেলে মৃত্যু হইত একমাত্র পরিণতি। এখানেও বৈজ্ঞানিক দেশকে রক্ষা করিল। ক্যাল্‌সিয়াম্ সাল্‌ফেট হইতে নব আবিষ্কৃত উপায়ে সাল্‌ফিউরিক য়্যাসিড প্রস্তুত হইতে লাগিল। সোরা হইতে নাইট্রিক য়্যাসিড তৈয়ার করিতে প্রচুর পরিমাণে সাল্‌ফিউরিক য়্যাসিড আবশ্যক হইত। বাতাস ও জল হইতে নাইট্রিক য়্যাসিড হওয়ায় ইহার চাহিদা অনেকটা কমিয়া গেল। বায়ুমণ্ডলের অফুরন্ত ভাণ্ডার হইতে হাবার্ যে অ্যামোনিয়া তৈয়ার করিলেন সাল্‌ফিউরিক য়্যাসিড সংযোগে তাহাই জমির উৎকৃষ্ট সার-হিসাবে ব্যবহৃত হইতে লাগিল। যুদ্ধের সময় জার্মানী বাতাস হইতে খাদ্য সংগ্রহ করিতেছে, এই জনরব উঠিয়াছিল। তাহার মূল এইখানে। জার্মানীর অত্যদ্ভুত কার্য্যকলাপে সমস্ত জগৎ এমন স্তম্ভিত হইয়া গিয়াছিল যে জার্মানীর সম্বন্ধে যে-কোন উদ্ভট গুজব সত্য বলিয়া বিশ্বাস করিতে কাহারও এতটুকু বাধিত না।

কিন্তু জার্মানীর চরম দুর্গতি উপস্থিত হইল তৈলবীজের আমদানী বন্ধ হওয়ায়। খাদ্য-হিসাবে স্নেহপদার্থের স্থান অতি শীর্ষে। ডিনামাইট প্রস্তুত করিতে প্রচুর পরিমাণে গ্লিসিরিন্ (glycerin) দরকার হয়। যুদ্ধের পূর্ব্বে পৃথিবীতে প্রতি বৎসর আট হাজার টন্ গ্লিসিরিন্ উৎপন্ন হইত—আর ইহার শেষ বিন্দু আসিত নানাপ্রকার উদ্ভিজ্জ ও প্রাণিজ তৈল বা চর্ব্বি হইতে। মৎস্য ও অন্যান্য সামুদ্রিক জীব হইতে তৈল সংগ্রহ করা জার্মানীর পক্ষে সম্ভব নয়। চাউল, গম ইত্যাদি শ্বেতসার (starch) জাতীয় পদার্থ হইতে সন্ধান প্রক্রিয়ায় (fermentation) প্রতিমাসে দশ হাজার টন্ গ্লিসিরিন্ প্রস্তুত হইতে লাগিল। কেরোসিন্ হইতে রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় তৈলের য়্যাসিডগুলি তৈয়ারী হইল। উভয়ের সংযোগে জার্মানী কৃত্রিম স্নেহপদার্থ প্রস্তুত করিল। বলা বাহুল্য, এই উভয় প্রক্রিয়া জার্মানগণ যুদ্ধের সময় আবিষ্কার করিয়াছে। জৈব রসায়নের ইতিহাসে এক নূতন অধ্যায় সংযোজিত হইল। যুদ্ধের সময় খাদ্য-হিসাবে এই কৃত্রিম চর্ব্বি প্রচুর পরিমাণে ব্যবহৃত হইয়াছে। বিষ্ঠা হইতে রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় অপরিবর্ত্তিত চর্ব্বি উদ্ধার করিয়া তৈলের অভাব কথঞ্চিৎ দূর করা হইল। "Necessity is the mother of invention" সত্য কথা বটে। ইহার যে-কোন সমস্যার সমাধান করিতে না পারিলে জার্মানীকে যুদ্ধবিরতির বহুপূর্ব্বে আত্মসমর্পণ করিতে হইত।

যুদ্ধ ছাড়াও জাতির সঙ্কট উপস্থিত হয় এবং অনেক ক্ষেত্রে তাহার গুরুত্ব যুদ্ধের চেয়ে এতটুকুও কম নয়। কতকগুলি সমস্যা জাতি-বিশেষের নিজস্ব—কতকগুলি সমগ্র মানবজাতির। উভয় ক্ষেত্রেই রাসায়নিক অনেক-কিছু করিয়াছে। বর্ত্তমান সভ্যতার অন্যতম শ্রেষ্ঠ দান উড়ো জাহাজ ও মোটর গাড়ী। আমেরিকার প্রতি পাঁচ জন লোকের একটি করিয়া মোটর আছে। ইহা না হইলে আভিজাত্য অচল। অদূর ভবিষ্যতে হয়ত শুনিব ইহা সাবান অথবা সাল্‌ফিউরিক য়্যাসিডের মত সভ্যতার একটা মাপকাঠি। কিন্তু উড়ো জাহাজ ও মোটরের একমাত্র খাদ্য পেট্রোল যে-পরিমাণে উদরস্থ হইতেছে, ভূতত্ত্ব-বিদ্‌গণ মনে করেন ইহাদের বিশ্বগ্রাসী ক্ষুধার নিবৃত্তি করিতে জননী বসুন্ধরা আর বেশী দিন পারিয়া উঠিবেন না। সভ্যজগতের এই সমস্যার সমাধান রাসায়নিক এখনই অনেকটা করিয়া ফেলিয়াছে। পৃথিবীতে কেরোসিনের তুলনায় কয়লার পরিমাণ অনেক বেশী। কয়লা হইতে রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় তরল ইন্ধন (liquid fuel) প্রস্তুত হইতেছে। উদ্ভিদ্ ও

মেঙ্গাস হইতে সুরা (power alcohol) প্রস্তুত হইয়া ইন্ধনরূপে ব্যবহৃত হইতেছে।

কেরোসিন হইতে লুব্রিকেটিং অয়েল প্রস্তুত হয়। যান্ত্রিক সভ্যতার শেষ দিন ঘনাইয়া আসিবে কেরোসিন দুর্লভ হইয়া উঠিলে। তৈলমর্দন ব্যতীত সর্ব্বপ্রকার যন্ত্র অচল। উত্তাপে প্রাণিজ বা উদ্ভিজ্জ তৈল কাজে লাগে না। নানা উপায়ে কৃত্রিম লুব্রিক্যাণ্ট তৈয়ার করিয়া রাসায়নিক ধনিকের অনিদ্রা দূর করিয়াছে—বর্ত্তমান সভ্যতার পরমায়ু বৃদ্ধি করিয়াছে।

ক্রমবর্দ্ধমান জাতির সব চেয়ে কঠিন সমস্যা—'অন্নচিন্তা চমৎকারা'। এক কলা শস্যের স্থানে দুই কলা উৎপাদনকারীকে সেই জন্যই পৃথিবীর সমস্ত দার্শনিক, রাজনীতিক প্রভৃতির চেয়ে শ্রেষ্ঠতর বলা হইয়াছে। এমন 'সুজলা সুফলা' দেশ অল্পই আছে যেখানে আমাদের দেশের ন্যায় 'মা-লক্ষ্মী' পথে-ঘাটে বিরাজ করিয়া অহেতুক কৃপা করেন। কৃত্রিম সার-যোগে সেখানে একের জায়গায় দুই নয়, বহু কলা শস্য উৎপন্ন হইতেছে। এই কৃতিত্বের অধিকারী রাসায়নিক। পঙ্গপালের উৎপাত হইতে শস্য রক্ষা করিতে না-পারিলে কৃষকের দুর্গতির সীমা থাকে না। দৃষ্টান্ত-স্বরূপ বলা যাইতে পারে—১৯১৮ সনে আমেরিকার ক্যানসাস ষ্টেটে আর্সেনিক-যোগে প্রায় ষাট লক্ষ ডলারের শস্য রক্ষা পায়। নতুবা সে-দেশের লোকের অবস্থা কি হইত তাহা অনুমান করা শক্ত নয়। কচুরীপানার আবির্ভাবে বাংলার কৃষকদের দুর্দ্দশা চরমসীমায় পৌছিয়াছে। পল্লীগ্রামের স্বাস্থ্য নষ্ট হইয়াছে। অধ্যাপক হেমেন্দ্রকুমার সেন দেখাইয়াছেন, কি করিয়া ইহা হইতে সুরা ও পটাস্ লবণ তৈয়ার করিয়া লাভবান্ হওয়া যায়। দাম দিয়া কচুরী কিনিলে অচিরে দেশ কচুরীপানা-শূন্য হইবে।

জাতির স্বাস্থ্য তার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সম্পদ। সমস্ত দেশে যখন কোন দুরারোগ্য ব্যাধি পরিব্যাপ্ত হইয়া পড়ে, দেশের সে বড় দুর্দ্দিন। বেশী দিনের কথা নয়, কালাজ্বর বাংলা দেশ উজাড় করিতেছিল। ডাঃ ব্রহ্মচারীর আবিষ্কৃত 'ইউরিয়া ষ্টিবামিন' বাঙালীকে সে সঙ্কট হইতে উদ্ধার করিয়াছে। প্রায় সর্ব্বপ্রকার ব্যাধির প্রতিষেধকই রাসায়নিক প্রেক্ষাগারে আবিষ্কৃত হইয়াছে, নতুবা কলেরা বসন্ত প্রভৃতি রোগে দেশের কি দুরবস্থা করিত

দেশের ধনবৃদ্ধির সমস্যা যেমন চিরন্তন, তাহার সমাধানের চেষ্টাও তেমনি প্রাচীন কাল হইতেই বিপুল। লোহাকে সোনা করিবার জন্য রাসায়নিক কোন্ যুগ হইতে 'পরশ পাথর' খুঁজিয়া ফিরিতেছে তাহা বলা শক্ত। সন্ধান তাহার আজও মিলে নাই, তবে চেষ্টারও বিরতি নাই। এই ত কিছুদিন আগেও জার্ম্মানী হইতে পারদকে সোনা করিবার গুজব রটিয়াছিল। বর্ত্তমানে অর্থনৈতিক সঙ্কট ভীষণ আকার ধারণ করিয়াছে। সভ্যতার প্রসার ও জনসংখ্যা বৃদ্ধি ইহার অন্যতম প্রধান কারণ। অপরের মুখের গ্রাস কাড়িয়া লইবার বিরাট্ প্রয়াস নানাপ্রকার আন্তর্জাতিক সভাসমিতি করিয়া, বহুবিধ মুখরোচক বাণী প্রচার দ্বারা বিপুল বেগে চলিতেছে। দেশের আর্থিক দুর্গতি দূর করিতে রসায়ন-বিদ্যার স্থান সর্ব্বাগ্রে। জার্ম্মানী ও জাপান তাহার প্রকৃষ্ট প্রমাণ দিয়াছে। কৃত্রিম নীল প্রস্তুত করিয়া জার্ম্মানী ইংলণ্ড ও ভারতের নীলের চাষ চিরদিনের জন্য বন্ধ করিয়া দিয়াছে। ১৯১৩ সনে জার্ম্মানী বিশ লক্ষ পাউণ্ডের কৃত্রিম নীল উৎপন্ন করিয়াছে। আল্‌কাত্‌রা হইতে শত শত রং বাহির করিয়া জার্ম্মানী আজ রঙের রাজা সাজিয়াছে। সমস্ত পৃথিবীর রং সরবরাহ করে জার্ম্মানী প্রায় একা। রাসায়নিক দ্রব্য বিক্রী করিয়া জার্ম্মানী লক্ষ লক্ষ টাকা উপার্জ্জন করিতেছে। তাই যুদ্ধ-অবসানের অত্যল্প কাল মধ্যেই আবার জার্ম্মানী মাথা তুলিয়া দাঁড়াইয়াছে। জগতের অন্য কোন জাতির পক্ষে ইহা সম্ভব হইত কি-না সন্দেহ। ভারতের অফুরন্ত কাঁচা মাল লইয়া পাশ্চাত্ত্য দেশ ও জাপান অর্থশালী, আর সোনার ভারত আজ কাগজের ভারতে পরিণত হইতে চলিয়াছে। এই সমস্যার সমাধান করিতে হইলে 'বিশুদ্ধ' রসায়নের গবেষণা অন্ততঃ কিছুদিনের জন্য স্থগিত রাখিয়া সমস্ত বিশ্ববিদ্যালয় ও বৈজ্ঞানিক প্রতিষ্ঠানগুলির প্রেক্ষাগারে ফলিত-রসায়নের চর্চ্চা করিতে হইবে। জগতে প্রতিষ্ঠালাভ আজ আর সহজ নাই, বিশেষতঃ পরাধীন জাতির পক্ষে। কবিতা পাঠ করিয়া, সূক্ষ্ম দার্শনিক তত্ত্ব ও ধর্ম্মালোচনা করিয়া দীনা ভারতমাতার জন্য জগৎসভায় আসন দখল করিবার কল্পনা বাতুলতা মাত্র। সকল চিন্তার সেরা এই বড় উদরের চিন্তা—রসায়ন শাস্ত্র তাহা দূর করিবার উপায় বলিয়া দিবে।

সন্ধি

শ্রীযতীন্দ্রমোহন সিংহ

দ্বিতীয় খণ্ড

নীহারিকার কথা

৭

পর দিন বৈকালে দাদা ও আমি লাইব্রেরী-ঘরে বসিয়াছিলাম, তখন শঙ্কর আসিয়া ডাকিল, "সুকুমার আছ?"

দাদা বাহিরে গেল এবং শঙ্করের সঙ্গে আর একটি যুবককে দেখিয়া বলিল, "ইনি কে?"

শঙ্কর বলিল,—"ইঁহার পরিচয় এক কথায় দিতে হ'লে বলব, ইনি আমার হারানো-মাণিক।"

দাদা কিছু বুঝিতে না পারিয়া ফ্যাল্ ফ্যাল্ করিয়া তাহার দিকে চাহিয়া রহিল এবং তাহাদের উভয়কে লাইব্রেরী-ঘরে ডাকিয়া আনিল। আমি বেগতিক দেখিয়া বাহির হইয়া পড়িলাম, এবং সেই মাণিকের পরিচয়লাভের জন্য উৎকর্ণ হইয়া পাশের ঘরে বসিয়া রহিলাম

আসনগ্রহণের পর শঙ্কর বলিল,—'ইনি আমার বাল্য-বন্ধু, এঁর নাম কিশোরকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, আমরা একসঙ্গে অনেক দিন কৃষ্ণনগর স্কুলে পড়েছিলাম, আমাদের দুই জনের এতদূর ভাব হয়েছিল, যে, আমরা দুই দেহে এক আত্মা বললেই হয়। আমাদের বৃদ্ধ পণ্ডিত-মশায় আমাদের নাম দিয়েছিলেন 'মাণিকজোড়।' আমাদের জোড়-ভাঙা হওয়ার পরে, ছয়-সাত বৎসর খোঁজ-খবর ছিল না, পরে আজ হঠাৎ তোমাদের বাড়ির কাছে রাস্তায় দেখা হ'ল। কিশোর কৃষ্ণনগর কলেজ থেকে আই-এস্‌সি পাস ক'রে এখানে মেডিক্যাল কলেজে পড়ছে। প্রমীলার এখানে বিয়ে হয়েছে শুনে তাকে দেখতে চাইলে। আমি একে সেই জন্যে নিয়ে এসেছি।"

দাদা আগন্তুককে বলিল,—"এবার আপনার কোন্ ইয়ার?"

আগন্তুক বিনীতভাবে বলিলেন, "এবার আমার ফিফ্‌থ্ ইয়ার।"

দাদা বলিল,—"আপনি কোথায় থাকেন?"

আগন্তুক বলিলেন,—"আপনাদের গলিতে আসতে যে গলিটা পড়ে, সেই গলিতে একটা মেসে থাকি।"

শঙ্কর বলিল,—"আচ্ছা, তুই ত এই কয় বছর কলকাতায় আছিস্, তোকে একদিনও দেখতে পাইনি কেন? বড়ই আশ্চর্য্য!"

আগন্তুক বলিলেন,—"তোমার ভবানীপুর যে অনেক দূরে। আমার ত বাসা আর কলেজ, কলেজ আর বাসা করতে হয়, বেড়াবার ফুরসুৎ কোথায়?"

দাদা বলিল,—"অর্থাৎ আপনি একজন গুড্ বয়, বুঝা গেল। আপনার তাহ'লে খেলাধূলা কি অন্য কোন রকম রিক্রিয়েশন (আমোদ-প্রমোদ) নেই?"

আগন্তুক বলিল—"খেলাধূলা আর কি করবো? আমরা যে-বার কৃষ্ণনগরে সেকেণ্ড ক্লাসে পড়ি, সে-বার এক দিন ফুটবল খেলতে গিয়ে পায়ে জখম হওয়ায় প্রায় এক মাস শয্যাগত ছিলাম, শঙ্করই তার সাক্ষী। সেই অবধি ও-সব আসুরিক খেলার দিকে আর ঘেঁসিনে। তবে ঘরে ব'সে কিছু কিছু সাহিত্যচর্চ্চা করি—আমার সেই এক রিক্রিয়েশন।"

শঙ্কর বলিল,—"তুই বুঝি তাহ'লে একজন সাহিত্যিক হয়েছিস্? সে খবর ত জানতুম না। তুই কিছু লিখিস্?"

কিশোর হাসিয়া বলিল,—"মাঝে মাঝে দুই-একটা ছোট-গল্প লিখি, আবার কখন-কখন দুই-একটা প্রবন্ধও লিখি।"

শঙ্কর বলিল,—"বেশ, বেশ, তোর লেখাগুলি আমি পড়ে দেখবো। আমি সেগুলি কোন নামজাদা মাসিক পত্রিকায় ছাপতে দেব।"

কিশোর বিনয়ের সহিত বলিল—"তার দুই-একটা মাসিক পত্রিকায় ছাপা হয়েছে। আমি তোমাকে সেগুলি পড়তে দেব। এবার প্রমীলাকে ডাক, ভাই।"

এই কথা শুনিয়া দাদা বাহির হইয়া আমাকে খুঁজিতে আসিল। আমাকে ঘরের কোণে একখানা বই হাতে করিয়া

বসিয়া থাকিতে দেখিয়া বলিল—"কি গো নীরুসুন্দরী! আড়ি পেতে কি শোনা হচ্ছে? এ ছোকরাটিকে কেমন লাগছে? ইনি একজন সাহিত্যিক, তোর সঙ্গে আলাপ করিয়ে দেব। এখন উঠে যা দিখিন্—বউকে পাঠিয়ে দে, আর কিছু জলখাবার ও চায়ের জোগাড় কর্।"

আমি বলিলাম,—"তোমার শালার অন্তরঙ্গ বন্ধু, দুই দেহে এক আত্মা, তাঁর খাতির করতে হবেই ত! কিন্তু আমি ব'লে রাখছি, আমি যার-তার সামনে বেরুতে পারবো না। আমি প্রমীলাকে ডেকে দিচ্ছি।"

এই বলিয়া আমি উপরে গিয়া মাকে আগন্তুকের কথা বলিলাম। তিনি ঝিকে ডাকিয়া চায়ের জল চড়াইতে বলিলেন, ভাঁড়ার ঘরে কি কি খাবার আছে, তাহা দেখিতে গেলেন। আমি প্রমীলাকে বলিলাম,—"চল গো, তোমার তলব পড়েছে। তোমার দাদার কে এক বন্ধু এসেছে—তারা না-কি দুই দেহে এক-প্রাণ, তোমাকে দেখতে চাইছে।"

প্রমীলা মাথার চুলটা ঠিক করিয়া লইয়া, একখানা নীলাম্বরী শাড়ী পরিয়া আমার সঙ্গে আসিল। আমি তাহাকে লাইব্রেরী-ঘরের দরজা পর্য্যন্ত পৌঁছাইয়া দিয়া সরিয়া পড়িলাম, কিন্তু শঙ্করের সতর্ক দৃষ্টি এড়াইতে পারিলাম না। প্রমীলা ঘরে ঢুকিতেই শঙ্কর বলিল, "প্রমীলা, এই ভাখ কে এসেছে—একে চিনতে পারছিস্, কৃষ্ণনগরের সেই কিশোর—তোর কিশোর দাদা।"

প্রমীলা হাসিয়া কিশোরের পায়ের নীচে গড় করিল এবং তাহার পাশে চেয়ারের হাতল ধরিয়া দাঁড়াইল। কিশোর বলিল, "তুই কত বড়টি হয়েছিস, প্রমীলা—তোকে ত চেনাই কঠিন। এই ক'বছরে চেহারার কত পরিবর্ত্তন!"

প্রমীলা বলিল,—"তুমি এখন কোথায় থাক, কিশোর-দা?"

কিশোর বলিল,—"আমি ত এই ক'বছর কলকাতায়ই আছি, তোদের বাড়ির কাছেই একটা মেসে থাকি। আজ হঠাৎ শঙ্করের সঙ্গে দেখা হ'ল। তুই না-কি ম্যাট্রিকুলেশন পর্য্যন্ত পড়েছিস্?"

প্রমীলা বলিল,—"হাঁ, এবার পরীক্ষা দেওয়ার কথা ছিল।"

কিশোর বলিল,—"পরীক্ষা দিবি না?"

প্রমীলা ম্লানমুখে বলিল,—"জানি না। তুমি কি পড়ছ কিশোর-দা?"

কিশোর বলিল,—"আমি মেডিক্যাল কলেজে পড়ছি। অনেক দিন পরে তোকে দেখে বড় খুশী হলেম, বোন। সেই ছোটবেলার কথা মনে পড়ে? শনিবারের দিন স্কুল ছুটি হ'লে তোদের বাসায় গিয়ে আমি আর শঙ্কর ফুলগাছে চ'ড়ে ফুল পাড়তাম আর তুই ফুল কুড়োতিস্। বারোয়ারী পূজার সময় একদিন যাত্রাগান শুনতে গিয়ে তুই হারিয়ে গিয়েছিলি, আমি তোকে দেখতে পেয়ে তোদের বাসায় পৌঁছিয়ে দিয়েছিলাম।"

প্রমীলা বলিল,—"আর যখন তুমি ফুটবল খেলতে গিয়ে পা ভেঙে প'ড়ে ছিলে, আমি এক দিন দাদার সঙ্গে তোমাকে দেখতে গিয়েছিলাম। তুমি আমাকে কমলালেবু খেতে দিয়েছিলে।"

এই সময় দাদা ঘরে ঢুকিয়া বলিল,—"তোমাদের আলাপ বেশ জমে উঠেছে দেখছি, ওল্ড ডেস্ রিকল্ড—পূর্ব্বস্মৃতি জেগে উঠেছে—যথা প্রতাপ শৈবলিনী, পার্ব্বতী দেবদাস—"

এই কথা শুনিয়া শঙ্কর ও কিশোর হাসিয়া উঠিল। প্রমীলা হাসিয়া পেছন ফিরিয়া দাঁড়াইল এবং দাদার প্রতি কোপদৃষ্টি হানিতে লাগিল।

দাদা বলিল,—"কিশোর বাবু আপনি মনে রাখবেন আই য়্যাম নট জেলাস অব ইউ (আমি আপনাকে ঈর্ষা করি না) —এখন একটু মিষ্টিমুখ করতে হবে।"

এই কথা বলতে-না-বলতে ঝি একটা ট্রেতে করিয়া তিন কাপ চা ও তিনখানা ডিশে জলখাবার আনিল। প্রমীলা সেগুলি তিন জনের সামনে ধরিয়া দিল। তাহারা খাইতে আরম্ভ করিল। শঙ্কর খাইতে খাইতে দাদাকে বলিল, "আজ নীরুদেবীকে যে দেখছিনে?"

দাদা বলিল,—"সে আজ গা ঢাকা দিয়েছে।"

কিশোর জিজ্ঞাসা করিলেন, "তিনি কে?"

দাদা বলিল,—"নীরু আমার ছোট বোন,—বি-এ পড়ছে, শঙ্করের সঙ্গে তার মধ্যে মধ্যে সাহিত্য-আলোচনা হয়।"

কিশোর শঙ্করকে বলিল,—"তাহ'লে আজ আমি তোমার সঙ্গে এসে তোমাদের সাহিত্য-আলোচনার ব্যাঘাত করলাম।"

শঙ্কর বলিল,—"না, না, তুমি আসাতে এঁরা সকলেই

কিশোরকাল আনন্দিত হয়েছেন। প্রমীলার ত কথাই নাই, সে তোমাকে অনেক কাল পরে দেখতে পেলে। আমাদের সাহিত্যচর্চ্চার কোন মূল্য নেই। আমি সাহিত্যিক নই,—তবে নীরুদেবী সময় সময় লেখেন।"

কিশোর আমার কথা আর কিছু জিজ্ঞাসা করিল না। আমি কি বিষয়ে কোন্ কাগজে লিখি একথা ত শঙ্করকে জিজ্ঞাসা করিতে পারিত। লোকটি যেন কি রকম! শঙ্কর যেরূপ খোলা অন্তঃকরণের লোক, ইনি সে-রকম নন—ইঁহার মনের কথা সহজে টের পাওয়া যায় না। যা'ক, আমার তা'তে বয়ে গেল!

খাওয়া শেষ হইলে কিশোর বলিল,—"শঙ্কর, তুমি আরও বসবে নাকি? আমি এখন চললুম—আমার আবার কলেজে ডিউটি আছে—সন্ধ্যা সাতটায়। সুকুমার বাবু, আবার দেখা হবে, আপনাদের বাড়ির কাছেই ত থাকি। আপনাদের সৌজন্যের জন্য ধন্যবাদ।"

শঙ্কর বলিল,—"আমি ত তোর সঙ্গে যাচ্ছি।"

দাদা বলিল,—"আপনি মাঝে মাঝে আমাদের বাড়িতে আসবেন কিশোর বাবু, কোন সঙ্কোচ করবেন না।"

শঙ্কর ও কিশোর বাহির হইতেই মা আসিয়া তাহাদের সম্মুখে দাঁড়াইলেন। তাহারা মাকে প্রণাম করিল, তিনি আশীর্ব্বাদ করিয়া বলিলেন, "বাবা, আমি তোমাদের আমোদ-প্রমোদ দেখলে বড় খুশী হই। কাল সন্ধ্যার পরে তোমরা দু-জনে এখানে এসে খাবে।"

কিশোর আগে আগে দাদার সঙ্গে বাহির হইল। শঙ্কর বোধ হয় আমার সন্ধানে চারিদিকে তাকাইতে লাগিল। কিন্তু আমি বাহির হইলাম না। মায়ের ভাব দেখিয়া আমি চটিয়া গেলাম। আমাকে ফাঁদে আটকাবার এসব ফন্দী নয় ত? একজনই যথেষ্ট ছিল, আবার আর একজন আসিয়া জুটিল। আমি দাদাকে বলিলাম,—"দাদা, এসব কি হচ্ছে? তুমিই বোধ হয় তোমার বন্ধুদের নিমন্ত্রণ করবার জন্য মাকে পরামর্শ দিয়েছিলে। আমি এত দূর বোকা নই যে, তোমাদের গুপ্ত অভিসন্ধি বুঝতে পারিনি। বেশ, তোমার বন্ধুদের নিয়ে কাল তুমি আমোদ-প্রমোদ কোরো, আমি ব'লে রাখ্‌ছি আমি তাদের সামনে বেরুব না।"

দাদা হাসিয়া বলিল,—"তুই চটিস্ কেন? তুই ত শঙ্করকে তোর লেখা সম্বন্ধে আলোচনা করবার জন্য আসতে বলেছিলি? আর তার বন্ধু কিশোর, সেও একজন সাহিত্যিক। তোদের সাহিত্যচর্চ্চা বেশ জ'মে উঠবে, সেইজন্যেই ত আমি মাকে দিয়ে তাদের নিমন্ত্রণ করালুম। এতে আমার আবার কি দুরভিসন্ধি থাকতে পারে?"

৮

পরদিন সন্ধ্যার পর আমি মায়ের কাছে বসিয়া কিস্‌মিস্ বাছিতেছিলাম, প্রমীলা পান সাজিতেছিল, তখন শঙ্কর ও তাহার বন্ধু বৈঠকখানায় আসিয়া দাদাকে ডাকিল। দাদা অনেকক্ষণ পূর্ব্বে বাজারে সন্দেশ আনিতে গিয়াছিল, তখনও ফেরে নাই। মা আমার ও প্রমীলার দিকে তাকাইয়া বলিলেন, "যাও, তোমরা গিয়ে ওদের বসাও।" আমি প্রমীলার গা টিপিয়া বলিলাম—"তুই যা।" মা বলিলেন,—"তুইও যা না, বৌমার একলা যাওয়া ভাল দেখায় না।"

আমি মার কথার প্রতিবাদ করিবার সাহস পাইলাম না। আমরা দুই জনে সেই আগন্তুকদ্বয়ের অভ্যর্থনা করিতে চলিলাম। প্রমীলা আগেই চুল বাঁধিয়া সাজগোজ করিয়া প্রস্তুত হইয়াছিল, আমিও কি-জানি-কেন একখানা ভাল শাড়ী পরিয়াছিলাম। আমি প্রমীলাকে ঘরের মধ্যে ঠেলিয়া দিয়া দুয়ারের কাছে দাঁড়াইলাম। শঙ্কর আমাকে দেখিতে পাইয়া আমার নিকটে আসিয়া বলিল, "আপনিও আসুন না, নীরু-দেবী। এখানে আর কেউ নেই, একে ত সেদিনই দেখেছেন, এ আমার বাল্যবন্ধু কিশোর।"

শঙ্করের এই কথার পরে আমি আর পলাইতে পারিলাম না। আমি বলিলাম, "আপনারা ভিতরে লাইব্রেরী-ঘরে এসে বসুন। দাদা বাইরে গিয়েছে, এখ্‌খুনি আসবে।"

আমি এই বলিতে তাহারা বাহির হইয়া আসিল ও কিশোর আমার সম্মুখে আসিয়া আমাকে ছোট একটি নমস্কার করিল। আমিও প্রতিনমস্কার করিলাম এবং তাহাদিগকে সঙ্গে করিয়া আনিয়া লাইব্রেরী-ঘরে বসাইলাম। প্রমীলাও সেখানে আসিয়া উভয়কে প্রণাম করিল।

শঙ্কর বলিল,—"নীরুদেবী, আপনি কিশোরের সঙ্গে আলাপ করতে কোন সঙ্কোচ বোধ করবেন না, কিশোর আমার বাল্যকালের বন্ধু, আমরা যেন দুই দেহে এক আত্মা, অনেক ছাড়াছাড়ির পরে আবার আমরা মিলিত হয়েছি।

আমার কোন-একটা কথা না বলিলে ভাল দেখায় না, তাই বলিলাম, "বাল্যকালের বন্ধুত্ব বড়ই মধুর।" কিশোরের দিকে চাহিয়া বলিলাম, "আপনাকে পূর্ব্বে যেন কোথায় দেখেছি।"

কিশোর একটু হাসিয়া বলিল,—"আপনাকে ত আমি প্রায় রোজই দেখতে পাই, আপনি আমাদের বাসার সম্মুখ দিয়ে গিয়ে আপনাদের কলেজের বাসে ওঠেন।"

আমি বলিলাম,—"তাই না-কি? আপনি ত মেডিক্যাল কলেজে পড়েন, আবার সাহিত্যচর্চ্চাও করেন, শুনলুম।"

কিশোর বলিল—"আমার সাহিত্যচর্চ্চার কোন মূল্য নেই। কলেজে ডিউটি করতে গিয়ে অনেক সময় চুপ ক'রে ব'সে থাকতে হয়, বড় বিরক্ত লাগে। তাই সময় কাটাবার জন্ত দুই-একখানা বই পড়ি। আবার অবসর-মত এক-আধটু লিখি।"

শঙ্কর বলিল,—"তোর কোন্ কোন্ লেখা মাসিক পত্রিকায় বেরিয়েছে সেদিন বলছিলি?"

কিশোর বলিল,—"হাঁ, আমার চার পাঁচটি গল্প 'বৈজয়ন্তী' পত্রিকায় ছাপা হয়েছে, আর দুই-তিনটি প্রবন্ধ 'ভারতপ্রভা' পত্রিকায় বেরিয়েছে।"

আমি বলিলাম, 'বৈজয়ন্তী' দেখি নাই, 'ভারতপ্রভা' আমাদের আসে। আপনার গল্পগুলি অনুগ্রহ ক'রে পড়তে দেবেন।"

কিশোর বলিল,—"আমি কালই দিয়ে যাব। আপনি কি লেখেন জানতে পারি কি?"

আমি বলিলাম,—"আমার আবার লেখা! তা পড়বার অযোগ্য।"

শঙ্কর কি বলিতে যাইতেছিল, আমি তাহাকে ইঙ্গিত করিয়া নিষেধ করিলাম। তবুও সে বলিল, "উনি স্ত্রীজাতির অধিকার ও পুরুষজাতির অধিকার সম্বন্ধে আলোচনা করছেন। সে-সম্বন্ধে কয়েকটি প্রবন্ধ 'ভারতপ্রভায়' বেরিয়েছে।

এই কথা শুনিয়া কিশোর যেন কিঞ্চিৎ বিমনা হইয়া কতক্ষণ কি ভাবিল, পরে আমার দিকে তাকাইয়া বলিল, "আমি সে প্রবন্ধ পড়েছি, কিন্তু তাহার লেখিকা ত প্রহেলিকা দেবী?"

শঙ্কর হাসিয়া বলিল,—"প্রহেলিকা. তুই ত বেশ নাম বের করেছিস্"; এই বলিয়া আমার দিকে তাকাইল। আমিও হাসিলাম। কিশোর আমাদের হাসির অর্থ না বুঝিয়া হতভম্বের মত চাহিয়া রহিল।

শঙ্কর বলিল,—"প্রহেলিকা নয় রে—কুহেলিকা দেবী।"

কিশোর বলিল,—"আমার ভুল হয়েছিল। আমি মাফ চাইছি।"

আমি হাসিয়া বলিলাম,—"আপনি মাফ চাওয়ার কি কাজ করেছেন, কিশোর বাবু? এ-সব আপনাদের ইংরেজী কায়দা।"

শঙ্কর বলিল,—"সেই কুহেলিকা দেবী কে জানিস্? এই ইনি।"

কিশোর বলিল,—"তাই না কি? তাহ'লে আমার ত আজ বড় সৌভাগ্য, আপনার দর্শন পেলাম। যার সঙ্গে আপনার বাদপ্রতিবাদ হচ্ছে তার নাম ত দিবাকর শর্ম্মা?"

আমি বলিলাম,—"হাঁ, আমি তাঁর শেষ প্রবন্ধের জবাব এখনও দিই নি, শীঘ্রই দিতে হবে।"

শঙ্কর বলিল,—"সে-সম্বন্ধে আজ আমাদের আলোচনা হবার কথা আছে।"

কিশোর বলিল,—"তাহ'লে তুমিও ওঁর সঙ্গে এক-মতাবলম্বী?"

শঙ্কর বলিল,—"হাঁ"।

এই সময়ে হঠাৎ দাদা আসিয়া বলিল,—"কেবল এক-মতাবলম্বী নয়, শঙ্কর হচ্ছে নারীর চ্যাম্পিয়ান। আজ যদি শঙ্কর দিবাকর শর্ম্মার দেখা পায়, তবে এক চপেটাঘাতে সেই স্ত্রীজাতির অবমাননাকারী পাপাত্মা দুঃশাসনের মস্তক চূর্ণ করিয়া দিতে প্রস্তুত আছে।"

দাদা অভিনয়ের ভঙ্গিতে এ-কথা বলায় আমরা সকলে হাসিয়া উঠিলাম। তখন কিশোর বলিল, "নীরু দেবী, আপনি শুনে আশ্চর্য্য হবেন, সেই পাপাত্মা দুঃশাসন আর কেউ নয়—আমি।"

এ কি শুনিলাম! এ যেন নীল আকাশ হইতে বজ্রপাত। কিশোরের কথায় আমরা সকলেই বিস্মিত হইয়া পরস্পরের মুখচাওয়া-চাওয়ি করিতে লাগিলাম। তখন আমার মনের মধ্যে কিরূপ ভাবের উদয় হইল, তাহা বর্ণনা করা দুঃসাধ্য। যে দিবাকর শর্ম্মাকে এই দুই তিন মাস যাবৎ আমার মানস-পটে অঙ্কিত করিয়া তাহার বিরুদ্ধে ঘোরতর বিদ্বেষ পোষণ

করিয়া আসিতেছি, সেই ছদ্মবেশী পুরুষ আমার সম্মুখে উপস্থিত। আমি তাঁহাকে কি বলিয়া সম্বোধন করিব খুঁজিয়া পাইলাম না।

দাদা আমার সেই মানসিক বিহ্বলতা লক্ষ্য করিয়া তাহার স্বভাবসিদ্ধ পরিহাসের সহিত বলিল,—"ওহ্, হোয়াট্ এ কন্‌ফেস্‌ন্, কিশোরবাবু! আপনার এই স্বীকারোক্তি কি যথার্থ? আপনিই কি তবে সেই পাপাত্মা দুঃশাসন? তবে এস ভাই শঙ্কর, দুই বন্ধুতে লেগে যাও গদাযুদ্ধ করতে। আমি মানস চক্ষে দেখছি, একদিন বাস্তবিকই তোমাদের দুই বন্ধুর মধ্যে ডুয়েল্ (দ্বন্দ্বযুদ্ধ) হবে।"

শঙ্করও কিশোরের অপ্রত্যাশিত বাক্য শুনিয়া খুব আশ্চর্য্য হইয়াছিল এবং দিবাকর শর্ম্মার প্রতি আমার মনোভাব স্মরণ করিয়া দমিয়া গিয়াছিল। এবার দাদার কথার একটা উত্তর দেওয়া উচিত মনে করিয়া বলিল—"আমি দুই প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বীকে এক ঠাঁই ক'রে দিয়েছি। মসীযুদ্ধে তাঁরা কেউই কম নন। এবার তাঁরা বাগ্‌যুদ্ধ করুন।"

দাদা বলিল,—"না, আর যুদ্ধ করতে হবে না। আজ নিতান্ত অপ্রত্যাশিত ভাবে দুই প্রতিদ্বন্দ্বীর সাক্ষাৎ ঘটেছে, এতে ঈশ্বরের অভিপ্রায়ের স্পষ্ট ইঙ্গিত দেখতে পাচ্ছি, যেন উভয়ের মধ্যে সন্ধিস্থাপন হবে। তুই কি বলিস্, নীরু?"

আমি ইহার কোন উত্তর না দিয়া বলিলাম, "তোমরা কি কেবল তর্কবিতর্ক করেই সময় কাটাবে, দাদা। প্রমীলা একটা গান করুক না, তোমরা শোন। আমার অনেক কাজ আছে, আমি চললুম।"

এই বলিয়া প্রমীলাকে অর্গ্যানের সম্মুখে বসাইয়া দিয়া আমি রান্নাঘরে গেলাম। প্রমীলা একটা গান ধরিল।

তিন-চারটা গান হওয়ার পরে, আহারের ঠাঁই করা হইল। তাহারা তিন জনে খাইতে বসিল। আমি পরিবেশন করিলাম। মা আসিয়া কাছে বসিলেন। আহারান্তে শঙ্কর ও কিশোর বিদায় হইল।

আমি সেই রাত্রে বিছানায় শুইয়া এই আশ্চর্য্য ঘটনা চিন্তা করিতে লাগিলাম। দিবাকরের সঙ্গে আমার এ-পর্য্যন্ত যে বাদ-প্রতিবাদ হইয়াছে, তাহা ধারাবাহিকক্রমে আমার মনের মধ্যে উদিত হইল। দিবাকরের শেষ প্রবন্ধটি মনে পড়িয়া তাহার কোন কোন যুক্তির সারবত্তা বুঝিতে পারিয়া আমার চিত্ত যে তাহার প্রতি শ্রদ্ধাপূর্ণ হইয়াছিল, তাহাও স্মরণ করিলাম। কিন্তু আজ সেই দিবাকর ছদ্মনামধারী আসল ব্যক্তিকে সম্মুখে পাইয়া আমার মন আবার বিদ্বেষপূর্ণ হইল কেন? কিশোরকে যতটুকু দেখিয়াছি, ব্যক্তিগত ভাবে তাহাকে ত ভালই লাগিয়াছে। তবে শঙ্করের সহিত তাহার বিশিষ্টতা লক্ষ্য করিবার বিষয়। শঙ্করের অনেকটা খোলাখুলি ভাব, কিশোর বড় গম্ভীর; শঙ্কর বড় আলগাভাবে কথা কয়, কিশোরের প্রত্যেকটি বাক্য যেন নিক্তিতে ওজন করা। কিন্তু তবুও কিশোরের মধ্যে এরূপ কিছু নাই, যাহাতে তাহার প্রতি বিদ্বেষ আসিতে পারে। তাহা সত্ত্বেও, তাহার প্রবন্ধের কতকগুলি কথা আমার স্মরণ হওয়ায়, নারীজাতির অবমাননাকারী এই উদ্ধত যুবকের প্রতি আমার চিত্ত কিছুতেই প্রসন্নতা লাভ করিতে পারিল না। এই কিশোর না লিখিয়াছিল—জ্ঞান-বিজ্ঞানের অনুশীলন নারীর অনধিকারচর্চ্চা; নারীর স্বাধীনভাবে জীবিকা অর্জ্জনের চেষ্টা নিতান্ত হাস্যকর; কোন কোন পাশ্চাত্য দেশে স্ত্রীশিক্ষার প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে নারীর বিবাহ কমিয়া যাইতেছে ও সেই অনুপাতে সামাজিক পাপ বাড়িতেছে, ইত্যাদি। নারীজাতির সম্বন্ধে এরূপ লজ্জাজনক কথা যাহার কলম দিয়া বাহির হইয়াছে, আমি তাহাকে কি প্রকারে ঘৃণা না করিয়া থাকিতে পারি? এই সকল কথা চিন্তা করিতে করিতে আমি ঘুমাইয়া পড়িলাম।

৯

রাত্রি প্রভাত হইতে-না-হইতেই মায়ের কাতরানি শুনিয়া আমি জাগিয়া উঠিলাম। আমি তাঁহার ঘরেই শুই, অথচ নিদ্রায় এতদূর অভিভূত হইয়াছিলাম যে, তাঁহার যন্ত্রণা টের পাই নাই। আমি ধড়মড় করিয়া উঠিয়া মার পাশে গিয়া বলিলাম—"মা, কি হয়েছে? এত কাতরাচ্ছ কেন?" মা তখন পিঠে হাত দিয়া বলিলেন,—"দ্যাখ্, এক জায়গায় কি হয়েছে, যেন ফুলে উঠেছে, বড় যন্ত্রণা।" আমি হাত দিয়া দেখিলাম একটা ব্রণের মত কতকটা জায়গা নিয়ে উঠেছে। আমি মাকে বলিলাম—"একটু সামান্য ফুলা, তুমি অল্পেতেই বড় অধীর হয়ে পড়, মা।" এই বলিয়া দাদাকে ডাকিতে গেলাম; দাদার উঠিতে কিছু বিলম্ব হইল। দাদা আসিয়া দেখিয়া

বলিল, "একটা ব্রণের মত দেখা যাচ্ছে, এখনও কিছু বোঝা যাচ্ছে না।" এই বলিয়া বাহিরের ঘরে গেল। তখন বেলা প্রায় সাতটা।

একটু পরে দাদা কয়েকখানা বই হাতে করিয়া আসিয়া বলিল,—"নীরু, কিশোর তোকে এই কয়খানা মাসিক পত্রিকা দিতে এসেছে। তাকে ডাকবো?"

আমার যেন মনে হইল, কিশোর বলিয়াছিল, তাহার কয়টি গল্প 'বৈজয়ন্তী' পত্রিকায় বাহির হইয়াছে, সেগুলি আমাকে পড়িতে দিবে। আমি বলিলাম, "দেখা করবার দরকার কি?" পরক্ষণেই ভাবিয়া বলিলাম, "আচ্ছা, তাঁকে ডাকো, মাকে দেখাই, তিনি ত ডাক্তারী পড়েন।"

কিশোর দাদার সঙ্গে আসিল। আমি একটু মৃদু হাসিয়া তাহাকে বলিলাম, "এত সকালেই বই নিয়ে এসেছেন? আপনার বুঝি এজন্য রাত্রে ঘুম হয় নি?"

কিশোর হাসিয়া বলিল,—"আমি সকালেই কলেজে যাব, সেজন্য এখনই বই নিয়ে এসেছি। আমার লেখা কয়টি পড়ে দেখবেন ও আপনার কেমন লাগে অকপট চিত্তে বলবেন। আচ্ছা, তবে এখন আসি, নমস্কার।"

আমি বলিলাম,—"একেবারেই নমস্কার ক'রে বসলেন, একটু সবুর করুন। আপনি ত ডাক্তার, আপনাকে একটু কাজে লাগাচ্ছি। মার পিঠে কি রকম একটা যন্ত্রণা হয়েছে, আপনি দয়া ক'রে একটু দেখবেন?"

কিশোর বলিল,—"আমি ত এখনও ডাক্তার হইনি, হবু ডাক্তার। তাঁকে দেখবো সে আর বেশী কথা কি—চলুন দেখে আসি।"

এই বলিয়া কিশোর দাদার ও আমার সঙ্গে গিয়া মাকে দেখিল। বেদনার স্থান হাত দিয়া টিপিয়া দেখিয়া বলিল— "যেরূপ যন্ত্রণা হয়েছে, বোধ হয় একটা ফোড়া-টোড়া কিছু বেরোবে। এখন একটু টিংচার আইওডিন লাগিয়ে দিন, ঘরে আছে ত?"

আমি বলিলাম, "না।" তখন কিশোর দাদাকে বলিল, "সুকুমারবাবু, আপনি আমার সঙ্গে আসুন, আমার বাসায় আছে, নিয়ে আসবেন, আর আমার বাসাটাও চিনে আসবেন, এই কাছেই আমি থাকি। যখন কোন প্রয়োজন হয় আমাকে জানাতে একটুও কুণ্ঠিত হবেন না।"

পাঁচ মিনিট পরেই দাদা ঔষধ লইয়া আসিয়া বলিল, "কিশোর বাবু খুব কাছেই থাকে, ঐ রাস্তার ধারে। বাসাটি বেশ। তার দোতলার ঘরটিতে সে একলাই থাকে, ঘরটি বেশ সাজানো। তার ঘরে নানারকম ওষুধপত্র আছে।"

আমি দাদার হাত হইতে ছোট শিশিটা লইয়া মায়ের পিঠে ঔষধ লাগাইয়া দিলাম। কিন্তু মা'র পিঠের যন্ত্রণা কমিল না, রাত্রে আরও বাড়িল এবং সেই সঙ্গে জ্বর হইল। আমি কাছে বসিয়াছিলাম, মা একটুও ঘুমাইতে পারিলেন না, কেবল ছটফট করিয়া কাটাইলেন। রাত্রি ভোর হইলে আমি দাদাকে কিশোরের নিকট পাঠাইলাম। কিশোর তখনই আসিয়া মায়ের অবস্থা দেখিয়া বলিল—"আমি যা সন্দেহ করেছিলাম, তাই বোধ হয় হবে। আমি কারবাঙ্কল হওয়ার আশঙ্কা করছি। একজন ডাক্তার দেখালে ভাল হয়। যদি বলেন ত আমাদের কলেজের হাউস-সার্জন স্মরথ বাবুকে এনে দেখাতে পারি। আমি ডেকে আনলে চার টাকা ফি দিলেই চলবে।"

দাদা ও আমি এ-কথা শুনিয়া বিচলিত হইলাম। দাদা বলিল—"তা আপনি যা ভাল মনে করেন তাই করুন, কিশোর বাবু। আপনার এ-সব বিষয়ে অনেক জানা-শুনা আছে। ডাক্তার কখন আসবেন? আমি কি তবে কলেজে যাওয়া বন্ধ করব?"

কিশোর বলিল,—"আমি এখনই কলেজে যাচ্ছি, এগারটার সময় আমি স্মরথ বাবুকে সঙ্গে ক'রে নিয়ে আসব। আপনারা একজন থাকলেই চলবে।"

এই বলিয়া কিশোর বাবু বাহির হইল। দাদাকে কলেজে যাইতে দিয়া আমিই মা'র কাছে রহিলাম। প্রমীলাও সময় সময় আসিয়া বসিতে লাগিল।

ঠিক এগারটার সময় কিশোর ডাক্তারকে সঙ্গে লইয়া আসিল। ডাক্তার বাবু মাকে ভাল করিয়া দেখিয়া বলিলেন— "এটা কারবাঙ্কলই হয়েছে, সেই জন্যই জ্বর হয়েছে। চিন্তার কোন কারণ নেই।" এই বলিয়া তিনি একটা প্রেস্‌ক্রিপশন্ লিখিয়া কিশোরের হাতে দিয়া বলিলেন,— "এই প্রলেপটা লাগাতে হবে, আর এই মিক্সচারটা খেতে হবে, এতে যন্ত্রণা কমে যাবে। যন্ত্রণা কমলেই জ্বরও যাবে। কি রকম থাকেন আমাকে জানাবে।"

কিশোর ডাক্তারের ফি চারি টাকা আমার নিকট হইতে লইয়া ডাক্তারের হাতে দিল। ডাক্তার বাবু বলিলেন,—"তুমি ত জান আমার ফি আট টাকা।"

কিশোর বলিল,—"ইনি আমার এক বোনের শাশুড়ী, আপনাকে একটু বিবেচনা করতে হবে, আমি আপনাকে পূরা ফি দেব না।"

ইহা শুনিয়া ডাক্তার বাবু একটু হাসিয়া সেই চারি টাকা লইয়া বিদায় হইলেন। সেই প্রেস্‌ক্রিপশন্ হাতে করিয়া কিশোর আমাকে বলিল,—"আমাকে আর একটা টাকা দিন ত, আমি ওষুধটা এনে দিয়ে যাই, সুকুমার বাবু কখন আসবেন ঠিক নেই।"

আমি বলিলাম,—"আপনি আমাদের জন্য অনেক পরিশ্রম করছেন, আপনাকে কি ব'লে ধন্যবাদ দেব জানি নে।" এই বলিয়া তাঁহার হাতে টাকা দিলাম।

কিশোর বলিল,—"আপনি আবার সেই বিলাতী কায়দা আরম্ভ করলেন দেখছি।"

এই সময়ে প্রমীলা আসিয়া বলিল—"কিশোর-দা, মা বলছেন, তুমি এখানে খেয়ে যাবে।"

কিশোর হাসিয়া বলিল,—"শুনে সুখী হ'লেম, বাস্তবিক এই হচ্ছে আমাদের দেশী কায়দা। আমার বাসায় ভাত প্রস্তুত, তা কে খাবে বল্ দিখিন্? খাওয়ার জন্যে কি, এই পরশু খেয়েছি, মা ভাল হয়ে উঠুন আর এক দিন খুব আমোদ ক'রে খাব। প্রমীলা, তোর দাদা বুঝি আর আসে নি?"

প্রমীলা বলিল,—"না, হয়ত আজ আসতে পারেন।" কিশোর আমার দিকে চাহিয়া বলিল,—"ভাল কথা, ঘরে যদি শিশি থাকে তবে একটা দিন। অনর্থক কেন চারটা পয়সা লাগবে।"

আমি একটা খালি শিশি আনিয়া তাঁহার হাতে দিলাম। কিশোর "ঘাবড়াবেন না" আমাকে এই বলিয়া চলিয়া গেল। প্রায় আধ ঘণ্টা পরে ওষুধ লইয়া আসিল, এবং প্রলেপটা যত্নে মায়ের পিঠে লাগাইয়া দিল। আমি বলিলাম—"আপনার আজ ভাত খেতে বড্ড দেরি হয়ে গেল।"

কিশোর হাসিয়া বলিল,—"আমার কলেজ থেকে আসতে রোজই দেরি হয়, আজ বরং অনেক সকালে এসেছি। ইনি রাত্রে কেমন থাকেন কাল ভোরে আমাকে জানাবেন।" এই বলিয়া চলিয়া গেল।

মাকে তিন ঘণ্টা অন্তর ওষুধ খাওয়াইতে লাগিলাম। কিন্তু তাঁহার যন্ত্রণা উত্তরোত্তর বাড়িতে লাগিল। সেদিন রাত্রে খুব বেশী জর হইল। পর দিন সকালে দাদা গিয়া আবার কিশোরকে ডাকিয়া আনিল। কিশোর দেখিয়া বলিল—"আর একবার সুরথ বাবুকে দেখান যাক।" আমরাও সেই মত করিলাম। আজ দাদা কলেজে না গিয়া বাড়িতে রহিল, আমি কলেজে গেলাম।

কলেজ হইতে বেলা পাঁচটার সময় আসিয়া শুনিলাম সুরথ বাবু ডাক্তার আসিয়া দেখিয়া গিয়াছেন. কিন্তু ঔষধের কোন পরিবর্ত্তন করেন নাই। দাদা তখন ছিল, পরে কলেজে গিয়াছে। একটু পরেই দাদা শঙ্করের সহিত আসিল। প্রমীলা তাহাদের চা ও জলখাবার আনিয়া দিল।

শঙ্কর চা খাইতে খাইতে বলিল, -"নীরু দেবী, আমরা কিশোরের বাসায় গিয়াছিলাম, সে এখনও কলেজ থেকে ফেরে নাই। তার ডাক্তারী বিদ্যা আপনাদের কতকটা কাজে লাগছে জেনে খুব সুখী হলেম। আমরা ত নেহাৎ আনাড়ি।"

আমি বলিলাম,—"তিনি খুব কাজ করছেন। সে ত আপনার বন্ধুত্বের অনুরোধে। সেজন্য আপনাকেই আগে ধন্যবাদ দিতে হয়।"

শঙ্কর বলিল, "কেবল আমার খাতিরে নয় জানবেন। আপনার সঙ্গেও সাহিত্যক্ষেত্রে তার বন্ধুত্ব হয়েছে।"

আমি হাসিয়া বলিলাম,—"বন্ধুত্ব, না শত্রুতা?"

দাদা বলিল,—"শত্রুভাবে তিন জন্মে, মিত্রভাবে ছয় জন্মে সামীপ্য লাভ হয় জানিস ত—যেমন হিরণ্যকশিপুর হয়েছিল।"

এই কথায় সকলে হাসিয়া উঠিল, কিন্তু হাসির পর শঙ্করের মুখ একটু ম্লান হইল আমি লক্ষ্য করিলাম।

সেদিন সন্ধ্যার পরে মা'র খুব জর হইল, থার্ম্মোমিটার দিয়া দেখিলাম ১০৪.৬ ডিগ্রি। তাহার সঙ্গে ডিলীরিয়ামও আরম্ভ হইল। আমি শিয়রে বসিয়া মাথায় জলপটি দিতে লাগিলাম। প্রমীলা পায়ের দিকে বসিয়াছিল। দাদা ঘুমাইয়াছিল, পরে দাদা আসিয়া বসিলে আমি ঘুমাইব এরূপ স্থির হইয়াছিল। আমি প্রমীলাকেও ঘুমাইতে পাঠাইয়া দিলাম।

রাত্রি তিনটার পর হইতে মায়ের জর কমিতে লাগিল ও ডিলীরিয়াম থামিয়া হঁস হইল। মা জল খাইতে চাহিলেন। আমি জল দিলাম ও দাদাকে ডাকিয়া বসাইয়া আমি আমার বিছানায় শুইয়া পড়িলাম। কিন্তু শীঘ্র আমার ঘুম আসিল না, আমি চুপ করিয়া পড়িয়া রহিলাম। মা চক্ষু মেলিয়া চাহিয়া দাদাকে দেখিয়া বলিলেন, "কে—বাবা এসেছ ?"

দাদা বলিল, "হাঁ মা, তুমি এবার একটু ঘুমোও, জরটা এখনই ছেড়ে যাবে।"

মা বলিলেন,—"বাবা, আমার চোখে কি ঘুম আছে রে। আমি আর বাঁচবো না, বড় যন্ত্রণা, আমাকে পাশ ফিরিয়ে দে, আমি তোর সঙ্গে দুটো কথা কই।...বাবা, আমার এই এক মস্ত ভাবনা, আমি মরে গেলে নীরীর দশা কি হবে। তার যদি এক জায়গায় বিয়ে দিয়ে যেতে পারতুম, তাহ'লে আমি শান্তিতে মরতে পারতুম। আমার কথাই সে শুনছে না, আমি গেলে তোকে কি গ্রাহ্য করবে ?"

দাদা বলিল, "মা তুমি মরবে না, সেরে উঠে নীরুর বিয়ে দিও।"

মা বলিলেন,—"না রে না—আমার এবার আর রক্ষে নেই। নীরী কেন যে এমন জেদ করলে বুঝি না। সকল মেয়েই ত সময়-মতন বিয়ে-থা করে—ওর কি জেদ হয়েছে বি-এ পাস না দিয়ে বিয়ে করবে না। সেই বি-এ পাস দিয়েও যা বিয়ে করে কি-না তার ঠিক কি ? আমি ত দেখে যেতে পারলুম না।"

দাদা বলিল,—"তুমি সেরে উঠেই ওর বিয়ে দিও মা; বি-এ পাস করার অপেক্ষা ক'রো না।"

মা বলিলেন,—"কিন্তু সে ছেলেই বা কোথায় ? আমরা যে-পাত্র ঠিক করবো, ওর কি সে-পাত্র পছন্দ হবে ? তোর শালা শঙ্কর ছেলেটি বেশ—যেমন রূপ, তেমনি লেখাপড়া শিখেছে, বাপের অবস্থাও খুব ভাল, কিন্তু এক ঘরে দুই সম্বন্ধ, এই পাল্‌টা কাজ আমি পছন্দ করি না। আর ওর বাপ যেমন বড়-মানুষ, তাঁর খাঁইও হবে তেমনি বড়। হয়ত পাঁচ-সাত হাজার হেঁকে বসবে, আমরা তা কোত্থেকে দেবো ? তার পর ছেলে ল-পাস দিয়ে কতদিনে কি রোজগার করবে তার ঠিক নেই। ওর চেয়ে বরং আমি ঐ কিশোর ছেলেটি বেশী পছন্দ করি।...এ মেডিক্যাল কলেজে পড়ছে, শীঘ্রই পাস ক'রে বেরুবে, তখন নিজেই কত পয়সা রোজগার করবে। ঐ যে ডাক্তারটি আমাকে দেখছেন, ওর বয়েসও ত বেশী নয়। উনি আট টাকা ফি চাইলেন—কিশোর ছেলে বড় ভাল—সে বললে ইনি আমার এক বোনের শাশুড়ী, এই ব'লে ডাক্তারের হাতে চারটি টাকা গুঁজে দিলে। ডাক্তারটিও ভালমানুষ, আর কিছু বললে না। কিশোরও ত এই রকম রোজগার করবে। ওরা মফস্বলের লোক, কলকাতার লোকদের যতটা খাঁই, ওদের তত খাঁই হবে না। আমি বৌমার কাছে শুনেছি, ওদেরও অবস্থা মন্দ নয়, কৃষ্ণনগর শহরে বড় বাড়ি আছে, ওর বাবা সেখানে একজন বড় উকীল ছিলেন, তিনি মারা গিয়েছেন। ওর মা বড় ভাল-মানুষ, ওর বড়ভাই কি চাকরি করেন, তিনিই সংসার চালাচ্ছেন।—উঃ, আমাকে একটু জল দে।"

দাদা মাকে জল খাইতে দিয়া বলিল,—"মা, তুমি আর বেশী কথা ব'লো না, গলা শুকিয়ে যাচ্ছে, এখন একটু ঘুমোও। তুমি সেরে উঠে নীরুর বিয়ের সম্বন্ধ ঠিক ক'রো।"

মা চুপ করিলেন। দাদা পাশে বসিয়া বাতাস করিতে লাগিল। আমি কপটনিদ্রায় পড়িয়া থাকিয়া এই সকল কথা শুনিলাম এবং এই সকল কথা ভাবিতে ভাবিতে ঘুমাইয়া পড়িলাম।

১০

সকালে উঠিয়া দাদার সঙ্গে দেখা হইল। দাদা আমাকে নির্জনে পাইয়া মায়ের কথাগুলি সব বলিল। আমি একটু রুষ্ট হইয়া বলিলাম,—"দাদা, আমি আর এখন কচি খুকীটি নই। আমার বয়েস হয়েছে, আমি লেখাপড়া শিখেছি, আমার ভাল মন্দ বিচার করার ক্ষমতা হয়েছে, আমাকে এ-বিষয়ে স্বাধীনতা দিতে হবে। যদি তা না দেবে, তবে অল্প বয়সে আমাকে বিয়ে দিয়ে ফেললেই হ'ত। অবশ্য মা'র মনে যাতে কষ্ট না-হয়, যাতে তিনি সুখী হন আমার তা দেখা একান্ত কর্ত্তব্য। কিন্তু তিনি প্রাচীন সংস্কারের বশবর্ত্তী হয়ে চলেন, তাঁর সকল দিক বিবেচনা করবার শক্তি নেই। তিনি ভাল হয়ে উঠুন, আমি তাঁকে আমার কথা ভাল ক'রে বুঝিয়ে বলবো। এখন তুমি একবার কিশোর বাবুর কাছে যাও, তিনি যেন ডাক্তারকে একটু সকালে নিয়ে আসেন। আমি মায়ের কাছে যাই।"

কিশোর প্রায় সাড়ে দশটার সময় ডাক্তারকে লইয়া আসিল। ডাক্তার যথারীতি মাকে পরীক্ষা করিয়া দেখিলেন এবং ফি লইয়া বিদায় হইলেন। ঔষধের কোন পরিবর্ত্তন করিলেন না। আমি কিশোরকে একটু অপেক্ষা করিতে বলিলাম এবং প্রমীলাকে মা'র কাছে বসাইয়া রাখিয়া তাঁহাকে লাইব্রেরী-ঘরে লইয়া গেলাম। গত রাত্রে মা'র মুখে কিশোরের সম্বন্ধে যে-সকল কথা শুনিয়াছিলাম, তাহা সত্ত্বেও তাহার সঙ্গে নির্জ্জনে বসিয়া আলাপ করিতে আমার একটুও লজ্জা বোধ হইল না।

আমি বলিলাম,—"কিশোরবাবু, আজ ডাক্তার বাবুর মুখের ভাবটা যেন কেমন-কেমন দেখলুম, আপনি ঠিক ক'রে বলুন ত মা'র অবস্থা কেমন?"

কিশোর বলিল,—"অবস্থা সীরিয়াস্ (কঠিন) সে-বিষয়ে সন্দেহ নাই, তবে এখনও কোন ভয়ের কারণ নেই।"

আমি বলিলাম,—"রাত্রে অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত হাই ফীভার (প্রবল জ্বর) ছিল, সঙ্গে সঙ্গে ডিলীরিয়ামও ছিল। ফোড়ার জন্যে ডিলীরিয়াম হয় কেন?"

কিশোর বলিল,—"ফোড়ার জন্যে ত নয়, জ্বরের জন্যে। জ্বর কমার সঙ্গে সঙ্গে ডিলীরিয়ামও কমিয়াছিল। জ্বর বাড়বার সময় মাথায় ও কপালে জলপটি দিলে ডিলীরিয়াম হ'ত না। রাত্রে ওঁর কাছে থাকেন কে?"

আমি বলিলাম,—"কাল প্রথম রাত্রে—প্রায় ৩টা পর্য্যন্ত, আমি ছিলুম, পরে দাদা ছিল।"

কিশোর বলিল,—"আপনারা ত রোগী নার্স (শুশ্রূষা) করতে অভ্যস্ত নন। আচ্ছা, আমি এক কথা বলি, আজ আমার রাত্রে মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে ডিউটী নেই, আমি এসে আজ ওঁর কাছে থাকব, আপনি কি বলেন?"

আমি বলিলাম—"আপনাকে এত কষ্ট করতে আমি বলতে পারি নে।"

কিশোর বলিল,—"আমার তাতে কোন কষ্ট নেই। আমি ত রোজ রোজ ঐ কাজ করছি, আমার ত কোন কষ্ট হবে না।"

আমি বলিলাম,—"তবে আজ আপনি রাত্রে এখানে দাদার সঙ্গে থাকেন।"

কিশোর একটু হাসিয়া বলিল,—"খাওয়ার জন্যে কি? ভাল কথা, আপনি আমার গল্প ক'টি পড়বার সময় পেয়েছিলেন?"

আমি বলিলাম—"ছুটো পড়েছি 'মায়াবিনী' আর 'কলঙ্কিনী।' আপনার লেখায় একটা মাদকতা আছে। পড়তে আরম্ভ করলে শেষ না-ক'রে থাকা যায় না; কিন্তু আপনি স্ত্রীজাতিকে বড় হীনচক্ষে দেখেন।"

কিশোর বলিল,—"আপনি আমাকে হঠাৎ এরূপ বিচার করবেন না। আমার সব বক্তব্য আপনি এখনও জানতে পারেন নি। যাক্, সে-সব অন্য দিন হবে। আজ তবে এখন আসি।"

এই বলিয়া কিশোর প্রস্থান করিল। আমার মন্তব্য শুনিয়া কিশোর যেন মনে কিঞ্চিৎ আঘাত পাইল। কিন্তু আমি কি করিব, আমার যাহা অকপট ধারণা তাহা প্রকাশ না-করিয়া থাকিতে পারিলাম না।

সেদিন বৈকালে চারটার সময় শঙ্করের সঙ্গে দাদা কলেজ হইতে আসিল। আমি তখন মায়ের কাছে বসিয়াছিলাম, প্রমীলা পাশের ঘরে তাহার বই পড়িতেছিল। শঙ্কর প্রথমে মাকে দেখিতে আসিয়া আমার নিকট সকল অবস্থা শুনিল। সে জানিতে পারিল, কিশোর প্রত্যহ ডাক্তার লইয়া আসিতেছে এবং আজ রাত্রে এখানে আসিয়া থাকিবে। 'প্রমীলা কোথায়' জিজ্ঞাসা করায়, আমি তাহাকে পাশের ঘর দেখাইয়া দিলাম। প্রমীলার সহিত তাহার কি কথা হয় তাহা শুনিবার জন্য আমি কান পাতিয়া রহিলাম।

শঙ্কর প্রথমে প্রমীলাকে তাহার পড়াশুনা কিরূপ চলিতেছে জিজ্ঞাসা করিল, পরে কিশোর কখন আসে কখন যায়, ইত্যাদি খুঁটিয়া খুঁটিয়া জিজ্ঞাসা করিল। আজ কিশোর লাইব্রেরী-ঘরে বসিয়া আমার সঙ্গে অনেকক্ষণ আলাপ করিয়াছে, এ-কথাও জানিতে পারিল। এই সকল কথা শুনিয়া সে বিষণ্ণ মুখে বাহির হইয়া আসিল এবং দাদার সঙ্গে লাইব্রেরী-ঘরে বসিল।

আমি প্রমীলাকে মা'র কাছে বসিতে বলিয়া তাহাদের চা ও জলখাবার দিতে যাইলাম।

চা খাইতে খাইতে শঙ্কর বলিল—"মা'র অবস্থা ত ভাল বোধ হচ্ছে না, কি বল সুকুমার?"

আমি বলিলাম,—"দাদা ডাক্তার আসার সময় ছিল না। ডাক্তার দেখার পরে আমি কিশোর বাবুকে বিশেষ ক'রে জিজ্ঞেস করলুম, তিনি বললেন, খুব—সীরিয়াস্

(ব্যারাম কঠিন) সন্দেহ নাই, তবে বিশেষ ভয়ের কারণ নেই।"

শঙ্কর মুখ বিকৃত করিয়া বলিল,—"কিশোর ত সামান্য একজন ষ্টুডেণ্ট (ছাত্র), তার মতের একটা মূল্য কি? সে যে ডাক্তার এনেছে তাঁরও তেমন অভিজ্ঞতা আছে ব'লে বোধ হয় না। আমি বলি কি, জ্বরটা যখন কম্‌ছে না, আর একজন বড় ডাক্তারকে দেখালে ভাল হয়।"

আমি বলিলাম,—"তা বেশ। কিশোর বাবু সন্ধ্যার পরেই আসবেন, তিনি আজ এখানে খাবেন ও মা'র কাছে রাত্রে থাকবেন ব'লে গেছেন। তাঁর সঙ্গে পরামর্শ ক'রে আর যে ভাল ডাক্তার হয় তাঁকে আনান যাবে।"

শঙ্কর বলিল,—"নীরু দেবী, আমার বড় লজ্জা করছে,— কিশোর একজন সম্পূর্ণ নিঃসম্পর্কীয় লোক, সে এতটা করছে, আর আমি কিছু করতে পারছি না।"

আমি বলিলাম "আপনি ত ডাক্তার নন, আর আপনার বাড়ি অনেক দূরে।"

শঙ্কর বলিল—"আচ্ছা, আজ আমিও এখানে থাকব।"

দাদা হাসিয়া বলিল,—"বহুৎ আচ্ছা।"

আমি শঙ্করের এই ভাবটি দেখিয়া মনে মনে হাসিলাম। যাহাকে সে নিজের অন্তরঙ্গ বন্ধু বলিয়া পরিচয় দিয়াছিল, তাহার উপর সে এতদূর ঈর্ষ্যান্বিত। আমার বোধ হইল, কিশোর যে ঘন-ঘন এখানে আসে, আমার সহিত মেলামেশা করে, শঙ্কর ইহা আদৌ পছন্দ করে না।

সন্ধ্যার পর কিশোর আসিয়া দাদাকে ডাকিল। দাদা ও শঙ্কর তখন লাইব্রেরী-ঘরে বসিয়াছিল, আমি মা'র কাছে ছিলাম। আমি তাঁহার হাঁক শুনিয়া বাহিরে আসিয়া তাঁহাকে সঙ্গে করিয়া লাইব্রেরী-ঘরে লইয়া গেলাম। দাদা বলিল, "আসুন কিশোর বাবু; আপনার বন্ধুও এসেছেন।"

শঙ্কর বলিল,—"কি রে কিশোর, তুই যে মস্ত ডাক্তার হয়ে পড়েছিস?"

কিশোর বসিয়া বলিল,—"এখনও হইনি, হবার আশা রাখি। তুমি কখন এলে শঙ্কর-দা?"

শঙ্কর বলিল,—"এই বৈকালে কলেজ থেকে এখানে এসেছি, আজ আর বাড়ি যাব না।"

কিশোর আমার দিকে চাহিয়া বলিল,—"আপনার মা এ-বেলা কেমন আছেন? জ্বর কি আরও বেড়েছে?"

আমি বলিলাম,—"আপনি এসে দেখুন।"

কিশোর আমার সঙ্গে মাকে দেখিতে আসিল। শঙ্কর এবং দাদাও পিছনে পিছনে আসিল।

কিশোর থার্ম্মোমিটার লাগাইয়া মায়ের পাশে বসিল। মা চোখ মেলিয়া তাহাকে দেখিয়া বলিলেন, "বাবা এসেছ— বড় কষ্ট বোধ হচ্ছে। পিঠে বড় যন্ত্রণা—"

শঙ্কর ও দাদা পাশের একটা তক্তপোষের উপর বসিল। আমি মায়ের কাছে দাঁড়াইয়া রহিলাম। কিশোর আমাকে জিজ্ঞাসা করিল, "খেয়েছেন কিছু?"

আমি বলিলাম,—"দুধ-বার্লি দিয়েছিলাম, কিছু খেতে চান না, অনেক কষ্টে একটু খেয়েছেন।"

থার্ম্মোমিটার দেখিয়া কিশোর বলিল,—"জ্বর এখন ১০৩। বোধ হয় আরও বাড়বে। কিন্তু কিছু খাওয়া দরকার, ষ্ট্রেংথ মেণ্টেন করতে হবে, যেন বেশী দুর্ব্বল হয়ে না পড়েন। চলুন আমরা ও-ঘরে যাই।"

দাদা, শঙ্কর ও কিশোর লাইব্রেরী-ঘরে গেল। আমি প্রমীলাকে ডাকিয়া দিয়া তাহাদের নিকটে গেলাম। তত ক্ষণ প্রমীলার রান্না শেষ হইয়াছিল।

শঙ্কর কিশোরকে বলিল,—"রোগীর অবস্থা কেমন দেখছিস্? তোর ডাক্তার কি বলেন?"

কিশোর বলিল,—"সুরথ বাবু বলেন, কার্বাঙ্কল ডেভেলাপ করছে, সেই জন্যেই এত হাই ফীভার, তবে অপারেশন্ করতে হবে কি-না, আরও দুই-এক দিন না গেলে বলা যায় না। কেস্ সীরিয়াস তাতে সন্দেহ নেই, ম্যালিগন্যাণ্ট টাইপ না হ'লে বাঁচি।"

শঙ্কর বলিল,—"কিন্তু অনেক ডাক্তার রোগ ঠিক সময়ে ধরতে পারে না, শেষটা এমন সময়ে ধরে যে তখন টু লেট হয়ে পড়ে। তোর এ ডাক্তারের বেশী এক্সপীরিয়েন্স (অভিজ্ঞতা) আছে ব'লে মনে হয় না। আমি বলি কি, আর একজন নামজাদা ডাক্তার দেখান যাক্।"

দাদা বলিল,—"তাতে আপত্তি কি, কিশোর বাবু? আর একজন বড় ডাক্তারকে কনসাল্ট করবার জন্যে আনা যেতে পারে।"

কিশোর বলিল,—"কোন আপত্তি নেই, সে ত ভাল কথা; তবে যত বড় ডাক্তারের কাছে যাবেন তত টাকার শ্রাদ্ধ, শেষটায় ফল কিন্তু একই দাঁড়ায়।'

আমি বলিলাম,—"কিশোর বাবু, আপনি ঐ যে অপারেশনের কথা বল্লেন, সেটা যাতে না-করতে হয় সেইরূপ চিকিৎসা করা দরকার। মা এ বুড়ো বয়সে ত ঐ দুর্ব্বল শরীরে অপারেশন সহ্য করতে পারবেন না।"

কিশোর বলিল,—"এই ডাক্তার ত সেই রকম ওষুধই দিচ্ছেন।"

দাদা বলিল,—"কিন্তু তাতে ত কিছু ফল দেখছি নে। আচ্ছা, কনসাল্ট করবার জন্যে কোন্ ডাক্তারকে আনা যেতে পারে?"

শঙ্কর বলিল,—"ডাঃ ডি এন পাকড়াশীকেই ত আজকাল লোকে ভাল সার্জ্জন বলে, তাঁকে দেখান যেতে পারে।"

দাদা বলিল,—"পাকড়াশী কি? তিনি বোধ হয় শাঁড়াশী দিয়ে পাকড়িয়ে ধরেন। নাম শুনেই ভয় হয়। কিশোরবাবু কি বলেন?"

কিশোর বলিল,—"আমি ডাঃ পাকড়াশীর নাম শুনেছি, তবে তাঁকে কখনও দেখি নি, তাঁর চিকিৎসা সম্বন্ধেও আমার কিছু জানা নেই।"

শঙ্কর বলিল,—"তুই তাকে দেখবি কোত্থেকে? তোর কারবার ত কেবল কলেজ আর বাসা, বাসা আর কলেজ নিয়ে। ডাঃ পাকড়াশী বিলাতে ডাক্তারী পাস ক'রে সেখানে পাঁচ বছর প্রাক্‌টিস্ করেছিলেন। তিনি ভবানীপুরে আমাদের পাড়ায় অনেক রোগী আরাম করেছেন। অপারেশনে তাঁর মতন হাতসাফাই ডাক্তার কলকাতায় আজকাল খুব কমই আছেন।"

আমি বলিলাম,—"ঐ যে আপনি অপারেশনের কথা বলছেন শঙ্করবাবু, ওতে আমার বড্ড ভয় করে।"

শঙ্কর বলিল,—"সে ডাক্তারকে ডাকলেই যে তিনি এসে শাঁড়াশী দিয়ে পাকড়িয়ে ধরবেন আর ছুরি বের ক'রে কাটা আরম্ভ করবেন, তার কোন মানে নেই। অপারেশন যাতে করতে না হয়, তিনি ত অবশ্য প্রথমে সেই চেষ্টাই করবেন।"

দাদা বলিল,—"আচ্ছা, তবে তুমি কাল সকালেই তাঁর কাছে গিয়ে তাঁকে পাকড়াবে আর তাঁর আসার সময় ঠিক ক'রে জানাবে, সেই অনুসারে কিশোর বাবুও সুরথ বাবু ডাক্তারকে আনার বন্দোবস্ত করবেন।"

শঙ্কর বলিল,—"আচ্ছা তাই হবে, আমি মেডিক্যাল কলেজে গিয়া কিশোরকে জানাব। তাঁর কি ষোল টাকা দিতে হবে।"

দাদা বলিল,- "তা দেওয়া যাবে।"

আমি তখন আহারের তত্ত্বাবধান করিতে গেলাম। খাওয়ার সময় কিশোর আমাকে বলিল, "আপনারা এ কয় রাত্রি জেগেছেন; আপনারা আজ ঘুমুবেন, আমি আজ রোগীর কাছে বসব।"

শঙ্কর বলিল,—"প্রথম রাতে আমি তাঁর কাছে বসব, কিশোর বারটার পরে বসিস্।"

কিশোর বলিল,—"তুমি নেহাৎ আনাড়ি, তুমি রোগীর নার্সিঙের (শুশ্রূষার) কি জান? আমার ত ঐ হচ্ছে নিত্য কাজ। আমি যখন এসেছি, তখন আর কাউকে কষ্ট পেতে হবে না। কলেজের ডিউটীতে গেলে ত আমার রাত জাগতে হ'ত?"

আমি বলিলাম,—"রাত বারটা পর্য্যন্ত আমরা সকলেই একরূপ জেগে থাকি, তখন আপনাদের কারু দরকার নেই। কিশোরবাবু, আপনি এখন ঘুমিয়ে নিন, বারটার পরে আপনি গিয়ে বসবেন, আর ডিলীরিয়াম যাতে না হয় সেই ব্যবস্থা করবেন।"

কিশোর বলিল,—"সে ব্যবস্থা ক'রতে হ'লে ত আমাকেই আগে রোগীর কাছে থাকতে হবে।"

খাওয়া শেষ হইলে কিশোর পান হাতে করিয়া মায়ের ঘরে গিয়া বসিল। দাদা এবং শঙ্কর গল্প করিতে করিতে সেখানে গেল। আমি ও প্রমীলা খাইতে গেলাম।

আমি খাইয়া আসিয়া দেখি, কিশোর মা'র মাথায় আইস্‌ব্যাগ দিয়াছে। আমি বলিলাম, "আপনি এবার উঠুন, আমি বারটা পর্য্যন্ত বসি, পরে আপনি আসবেন।"

দাদা তাহার অনেক পূর্ব্বেই আমার বিছানায় শুইয়া পড়িয়াছিল, শঙ্কর ঢুলু ঢুলু নেত্রে সেখানে বসিয়াছিল, আমার কথা শুনিয়া কান খাড়া করিয়া বসিল। আমি বলিলাম, "দাদা, যাও তোমার বিছানায় গিয়া শোও, শঙ্করবাবুকেও তাঁর বিছানা দেখিয়ে দাও।"

কিন্তু শঙ্কর যেন যাইতে অনিচ্ছুক, কিশোর কি করে তাহা না দেখিয়া উঠিবে না। আমি নিতান্ত জিদ করিতে কিশোর উঠিল, শঙ্করও তাহার পিছনে পিছনে ঘরের বাহির হইয়া গেল।

মা'র জ্বর ক্রমেই বাড়িতে লাগিল। আমি আইস্‌ব্যাগ লাগাইয়া বসিয়া রহিলাম। মা সময় সময় "আঃ উঃ" করিয়া যন্ত্রণায় ছটফট করিতে লাগিলেন। ক্রমে কথারও জড়তা হইল। রাত্রি বারটা বাজিতেই কিশোর আসিয়া বলিল—"এবার আপনি উঠুন।"

আমি বলিলাম,—"ঠিক ঘড়ির কাঁটায় কাঁটায় এসেছেন, আপনি বুঝি ঘুমোন নাই?"

কিশোর হাসিয়া বলিল,—"ঘুমিয়েছিলুম বইকি, তবে আমার অভ্যাস আছে, যখন উঠবো মনে ক'রে শুই ঠিক তখনই ঘুম ভেঙে যায়। উনি দেখছি খুব ছটফট করছেন।"

আমি বলিলাম,—"একটুও ঘুম হয়নি, বোধ হয় যন্ত্রণা খুব বেড়েছে, তবে ডিলীরিয়াম এখনও হয়নি।"

আমাদের কথা হইতেছে এই সময় শঙ্কর আসিল। আমি বলিলাম, "আপনি কেন উঠে এলেন, শঙ্করবাবু? এবার ত আপনার বন্ধুর পালা।"

শঙ্কর বলিল,—"আমিও বন্ধুর সঙ্গে বসবো।" শঙ্করের এই কথা আমার ভাল লাগিল না।

কিশোর বলিল, "তোমার যদি একান্তই রাত জাগবার ইচ্ছা হয়ে থাকে, তবে তিনটার সময় তোমাকে ডেকে দেবো, তুমি এখন শোও গিয়ে। নীরু দেবী, আপনিও আর সময় নষ্ট করবেন না, শুয়ে পড়ুন।"

কিন্তু আমার বিছানা ত সেই ঘরে। শঙ্কর কিশোরকে আমার বিছানার কাছে রাখিয়া কিরূপে অন্য ঘরে যাবে? কিন্তু না গিয়াই বা উপায় কি। কতক ক্ষণ ইতস্ততঃ করিয়া অগত্যা শঙ্করকে উঠিতে হইল। আমি মায়ের খাটের পাশে অন্য খাটে আমার বিছানায় শুইয়া পড়িলাম। কিশোর তাহার চেয়ারটা ঘুরাইয়া লইয়া আমার দিকে পিছন ফিরিয়া বসিল। আমার শয়নের আর অন্য ঘর ছিল না; থাকিলে আমি সেখানে শুইতাম না।

আমি কত ক্ষণ ঘুমাইয়াছিলাম ঠিক বলিতে পারি না। হঠাৎ ঘুম ভাঙিতেই চোখ মেলিয়া দেখিলাম, কিশোর আমার অনাবৃত মুখের পানে সতৃষ্ণ নয়নে তাকাইয়া আছে। তাহার চোখে আমার চোখ পড়াতেই আমি জানি না কেন, আমার ঠোঁটে হাসির রেখা ফুটিয়া উঠিল, কিন্তু পরক্ষণেই আমি কাপড় দিয়া মুখ ঢাকিয়া ফেলিলাম। কিশোর তাহার অপ্রতিভ ভাব ঢাকিবার জন্য বলিল, "এই যে আপনি জেগেছেন, আপনি জাগেন কি-না তাই দেখছিলুম। আর একটু ঘুমুন, এখন সবে ১টা।"

আমি কিছু না বলিয়া পাশ ফিরিয়া শুইলাম। তখন আমার মনে একটু ক্রোধের সঞ্চার হইল। এই পুরুষগুলো আমাদিগকে কি মনে করে? মেয়েদের প্রতি তাদের এত লোভ কেন? কিশোর ত আমাকে আজ অনেক বারই দেখিয়াছে, আমি ত ঘোমটা দিই না। আমার মুখ ত সব সময়েই দেখিতে পায়, তবে আবার এই চুরি করিয়া দেখার মানে কি? এই কিশোরকে ত আমি নিতান্ত শিষ্ট ও ভদ্র বলিয়া জানিতাম। তাহার এইরূপ ব্যবহার? এ সংসারে কাহাকেও সম্পূর্ণ বিশ্বাস করা যায় না। এই জন্যই বোধ হয় শঙ্কর এখানে পাহারা দিতে আসিয়াছিল।

এইরূপ ভাবিতে ভাবিতে আমি চুপ করিয়া পড়িয়া রহিলাম, কিন্তু মা'র ফোড়ার যন্ত্রণা শেষ রাত্রে অত্যন্ত বৃদ্ধি পাইল। ডিলীরিয়াম ছিল না বটে, কিন্তু তিনি যেন বেহুঁশ হইয়া পড়িয়া রহিলেন। আমার আর ঘুম আসিল না, কিশোরও ঠায় মায়ের শিয়রে বসিয়া রহিল। কতক ক্ষণ পরে শঙ্করও আসিল সে বেচারীরও সোয়াস্তি ছিল না, মনে নানা প্রকার সন্দেহ। ইহাদের দুই জনের ভাব দেখিয়া অতি দুঃখেও আমার মনে হাসি পাইতেছিল। এইরূপে রাত ভোর হইল।

ক্রমশ

ফরিদপুরের একটি পুরাতন গ্রাম

শ্রীঅজিতকুমার মুখোপাধ্যায়

একটি প্রাচীন ও সমৃদ্ধ গ্রামের জীবনধারা থেকে বাংলাদেশের পল্লীজীবন-প্রবাহ বুঝ্‌বার উদ্দেশ্যেই ফরিদপুর জেলার বালিয়াকান্দি থানার অন্তর্গত নলিয়া গ্রামটিকে খাড়া করেছি। এ অঞ্চলে রাজা সীতারামের আসবার পূর্ব্বে নলিয়া জঙ্গল ও নলবন দ্বারা আচ্ছাদিত ছিল। উত্তর দিকের রাজত্ব সুদৃঢ় করবার উদ্দেশ্যে, এই নদীবহুল ছোট গ্রামটি তাকে আকৃষ্ট করেছিল, যাকে তিনি একটি সমৃদ্ধ নগরে পরিণত করেছিলেন। তাঁর সময়ের কীর্ত্তির মধ্যে কোন মতে মাথা উঁচু ক'রে দাঁড়িয়ে আছে জয়দুর্গা, শ্যামরায়, গোবিন্দরায় ও শিবের মন্দিরটি। মন্দিরগুলির চারিদিকে বেষ্টিত প্রাচীর-গাত্রে অঙ্কিত ছবি ও অন্যান্য বহু মন্দির আজ আর নেই, সেখানে শুধু দেখতে পাই বিরাট ভগ্নস্তূপ, তার উপর ছোট-বড় বহু বটগাছ। এই সব মন্দিরের কারুকার্য্য, ইট খোদাই করা মূর্ত্তি, সবই গ্রামের কুমারেরা করেছিল এখনও এদের বংশধরেরা বেঁচে আছে। রাজা সীতারামের প্রধান কীর্ত্তি জয়দুর্গার মন্দিরকেই 'জোড় বাংলা' বলা হয়। সামনের রোয়াক দিয়ে প্রবেশপথ অতিক্রম করলেই বারান্দা। এই বারান্দাটাই জোড় বাংলার একটি বাংলা। তারপরেই মন্দিরাভ্যন্তরের প্রবেশদ্বার। দ্বারের উপরের প্রাচীরেও নানা কারুকার্য। মন্দিরের মধ্যে বেদীর উপরে সিংহারূঢ়া মহিষাসুর-বধোদ্যতা জয়দুর্গার মূর্ত্তি ও অন্যান্য মূর্ত্তি। এর দক্ষিণেই গোবিন্দরায়ের 'খলাট'।

এ ছাড়া একটি সবচেয়ে উঁচু শিবের মন্দির আছে, কিন্তু তাকে যেভাবে বটগাছে ঢেকে ফেলেছে তাতে তার আর বেশী দিন উঁচু হয়ে থাকতে হবে না। মন্দিরটির গায়ে মহাবীর, দশ অবতার ইত্যাদি বহু খোদাই করা মূর্ত্তি আছে। অদ্ভুত বিগ্রহ ও মূর্ত্তি ভিন্ন কাঠের বৈরাগী, বোষ্টমী, মাটির দয়াময়ী ও কাঠের কালাচান্দই সমধিক প্রসিদ্ধ। বৈরাগী জোড়াসন হ'য়ে মালা জপ্‌ছে, গলায় মালা; মাথার চুল বেণী ক'রে মাথার উপরে বাঁধা। পাশে লজ্জাজড়িত নয়নে দাঁড়িয়ে আছে তার বোষ্টমী ছোট একটি ছেলে কোলে ক'রে। ছেলেটি এক হাতে মায়ের একটি স্তন ধরে আছে ভয় পাছে কেউ কেড়ে নেয়। দীঘির দক্ষিণ পাবে দয়াময়ীর ঘর। এখানে ব'সে মেয়েরা গান করে,

> "কালীঘাটের কালী গো মা কৈলাসের ভবানী
> বৃন্দাবনের রাধাপ্যারী, গোকুলের গোপিনী
> গো মা বসন পর
>
> দক্ষিণে চলিছ মা গো ওমা হইয়া দিগম্বরা
> কার মানবজনম সফল ক'রলে গো মা
> হয়ে দশভুজা, গো মা বসন পর।
>
> এমা ঘাটে ঘাটে করি পূজা পুষ্প উজান ধায়
> সঙ্কটে পড়েছি মা গো, মোদের রক্ষা করতে হয়
> গো মা বসন পর।"

যখন দোল আসত তখন গ্রামের মেয়েরা শ্যামরায়, গোবিন্দরায় ইত্যাদি ঠাকুরদের বরণ ক'রে 'গন্তে' পাঠিয়ে দিতেন। 'গন্তে'র চারখানা পাল্কীর মধ্যে মাত্র একখানা আছে। চৈত্র মাসে নলিয়ায় কালাচাঁদেরই অনুরূপ পাট ঠাকুরপূজা হয়। সাধারণ চড়কপূজা থেকে পার্থক্য এই যে এ পূজার আয়োজন সাত দিন পূর্ব্ব থেকেই আরম্ভ হয় ও সে উপলক্ষে প্রচুর পরিমাণে নৃত্যগীত হয়ে থাকে। এক একটি দলে একজন ক'রে কর্ত্তা থাকে, তাকে বলা হয় 'বালা'। এই সাতদিন ধ'রে নৃত্যগীত ক'রে চৈত্র-সংক্রান্তির দিন পাট পূজা শেষ হয়। লোকনৃত্যের আবিষ্কারক, শ্রদ্ধেয় গুরুসদয় দত্ত মহাশয় এই "চড়ক গম্ভীরা দল" সিউড়ী এক্সিবিশন্‌ এবং সম্প্রতি গড়ের পার্কের উৎসবে নিয়ে এসেছিলেন। দত্ত মহাশয় এই নৃত্যের আখ্যা দিয়েছেন ধর্ম্মনৃত্য (Religious Dance and Songs)। 'দশ অবতার', 'জালা ধূপ', 'ফুল সন্ন্যাস,' 'শ্লোক,' 'চালান' এবং 'বায়েন' নৃত্যই এই পূজায় সমধিক প্রসিদ্ধ। প্রথম দিন একদল জয়দুর্গার মন্দিরে আর একদল গ্রামের উত্তরে 'হরিঠাকুর' বাড়িতে দশ অবতার নৃত্য,

ক'রে থাকে। 'বালা' এবং তার শিষ্যেরা সার বেঁধে ধুনুচি সামনে রেখে বন্দনা ক'রে নৃত্য করতে থাকে। বালা শ্লোকগুলি ব'লে ভঙ্গীগুলি দেখিয়ে দেওয়ার পর শিষ্যেরা ঢাকের তালে তালে নৃত্য আরম্ভ করে। তারপর বালা গান গেয়ে

জয়দুর্গা

'দশ অবতারে'র বিভিন্ন দশটি ভঙ্গী নৃত্যে দেখিয়ে দেয়। 'দশ অবতার' বলার পূর্ব্বে ধুনুচি সাম্‌নে রেখেই বালা ব'লে ওঠে,

> "ভাদুরাম কুমোরেরা সাতে পাঁচে ভাই
> মাটিখানি ছেনিয়ে করলেন এক ঠাই
> মাটিখানি ছেনিয়ে তুলে দিলেন চাকে
> সুবর্ণ ধুপতি হ'ল আড়াইটি পাকে
> রবি দিলেন শুকিয়ে ব্রহ্মা দিলেন পুড়িয়ে
> গুরু দিলেন বর
> আজ এই ধুপতি শুদ্ধ কর ভোলা মহেশ্বর।"

শ্লোকটি ব'লেই বালা ও শিষ্যেরা এই ভাবটি ফুটিয়ে তুলবে নৃত্যের মধ্য দিয়ে। 'কৃষ্ণলীলা' গেয়ে গেয়ে তারা প্রত্যেক গ্রামের বাড়ি থেকে পুরস্কার নিয়ে আসে। এই গানের সঙ্গে যে নৃত্য হয়ে থাকে তাকে বলা হয় "শ্লোক নৃত্য," শ্লোক মানে ছড়া, এর মধ্যে রাইমিলন, নৌকা বিলাস, বংশীহরণ ইত্যাদি ছড়াই প্রসিদ্ধ। এখানে শুধু বংশীহরণ সম্বন্ধে কিছু বলব। অদূরে কানাই মধুর স্বরে যমুনার তীরে ব'সে বাঁশী বাজাচ্ছেন, তা শুনে রাধা ও সখীদের 'ধড় ছ্যাইড়া প্রাণ কাইড়া লইয়া যায়।' সবাই ঠিক করলেন, কানাইয়ের বাঁশী চুরি করতে হবে। এসব মতলব টের পেয়ে চতুর কানাই "হাতের বাঁশী ছাইড়্যা দিয়ে কালকূট ভুজঙ্গ হইয়ে দংশিলেন শ্রীমতীর গায়।' রাধা যন্ত্রণায় অজ্ঞান হয়ে ঢুলে পড়লেন, সখীরা তাদের ধরাধরি ক'রে নিয়ে এল। তখন রাধা ঘোষণা ক'রে দিলেন, যে তার অসুখ ভাল ক'রে দিবে, তাকে তার গলার হার পুরস্কার দিবেন। এ কথা শুনে কানাই বৈদ্যরূপে রাধার অসুখ সারিয়ে দিলেন এবং রাধা তাঁর গলার হার দিতে চাইলে।

> "বৈদ্যরাজ বলে রাই, গলার হারের কার্য্য নাই
> দিবা মোরে প্রেম-আলিঙ্গন।
> যদি দয়া কর রাই, প্রেম-আলিঙ্গন আমি চাই,
> অন্য ধনের নাহি প্রয়োজন।
> তখন রাইয়ে ঘিরে যত সখীগণ, কি আনন্দ মনে মনে,
> দরশনে পূর্ণ হ'ল আশ
> দেহ যৈবন সমর্পিয়ে, বৈদ্যরাজ-সম্ভাষিয়ে,
> করিলেন প্রেম প্রকাশ।"

এরাই কিছু দিন পরে বৈশাখ মাসে 'কাল বৈশাখী' পূজা ক'রে থাকে। এর অন্য নাম 'নীলপূজা'। শিষ্যেরা নীল ও অন্যান্য জিনিষ মাথায় ক'রে দাঁড়ায় আর বালা খুব জোরালো মন্ত্র ব'লে তার সাম্‌নে ধূপ দিতে থাকে। একটি মন্ত্র

> "মোচ্‌ রা শিঙ্গে মোচ্‌ রা শিঙ্গে মোচর পা'য়ে চলে,
> নরত চলে ধাপবনে নরত চলে জলে,
> শুনতে যদি চাস্ ওলো মোচ্‌ রা শিঙ্গের কথা
> ভূত প্রেত সঙ্গে ক'রে দেও দেখি দেখা।"

এই ভাবে যখন গ্রামের দক্ষিণ পাড়া ভয়ানক ভাবে শাক্ত হয়ে আসে, ঠিক উত্তর পাড়ায় এই সময় বৈষ্ণব ধর্ম্মে দীক্ষিত এমন একজনকে দেখতে পাই যাঁর জন্য নলিয়া গ্রাম ঐ রসে ডুবে গিয়েছিল। এঁর নাম ঠাকুর পদ্মলোচন। ঠাকুর-বাড়ির প্রসিদ্ধ তমাল গাছের জন্যেই বোধ হয় বিদ্যাপতির গানটি গ্রামের ছেলেমেয়ের মুখে এখনও শুনতে পাওয়া যায়,—

> "সখিয়ে, না পোড়াও রাধা অঙ্গ, না ভাসাও জলে
> মরিলে তুলিয়ে রেখো তমালেরি ডালে।"

এই ভাবে ঠাকুর পদ্মলোচনের সংস্পর্শে এসে নলিয়ার উত্তর পাড়া অত্যন্ত জমকালো হয়ে ওঠে। ঠাকুরবাড়িতে

যে কাঠের তৈরি সিংহাসনটি আছে, তা তিন ভাগে ভাগ করা যায়। স্বর্গ, মর্ত্ত্য, পাতাল এই ত্রিভুবনের কল্পনা নিয়ে মিস্ত্রী এই সিংহাসনটি গড়েছিল।

ঠাকুরবাড়ির ঠিক পাশেই ৺ন্যায়ভূষণ পণ্ডিত মহাশয় বিরাট টোল খুলেছিলেন ও তার সামনে একটি পুকুর করিয়েছিলেন। এখন সে টোলও নেই, পুকুরও নেই, আছে শুধু টোলবাগান ও একটা এঁদো পুকুর।

গ্রামের এই আনন্দের মাঝে মেয়েরা তাদের কতটুকু স্থান ক'রে নিয়েছিলেন সে সম্বন্ধে কিছু বলব। নলিয়া গ্রামের মেয়েরা একরূপ 'ঘাঘর জ্বানি' খেলা করে ছড়া বা কবিতার মধ্য দিয়ে, একজন বলে, 'এতটুকু পানি' সবাই তখন বলে, 'ঘাঘর জ্বানি'। তখনও বলে, 'এই পথ দিয়ে যাবো.' এরা ব'লে ওঠে 'কোদাল, দাও ইত্যাদি ফেলে মারবো'।

বৈরাগী ও বোষ্টমী

বরষার প্রথম দিনে গ্রামের ছোট ছোট মেয়েরা এক হাতে আঁচল ধ'রে ঘুরে ঘুরে নেচে ব'লে থাকে,

"ওলো মেঘারাণী
হাত-পা ধুয়ে ফেলাও পানি।
চিনে বনে চিক্ চিকেনী
ধান বনে হাঁটু পানি
কলতলায় গলা জল
গপ্ গপাইয়ে নাইমা পড়।"

এইভাবে গ্রামের মেয়েরা প্রথম দিনের মেঘকে নৃত্যে, কথা ও ভঙ্গীতে পৃথিবীতে আহ্বান করে। তাদের

শ্যামরায়ের মন্দির
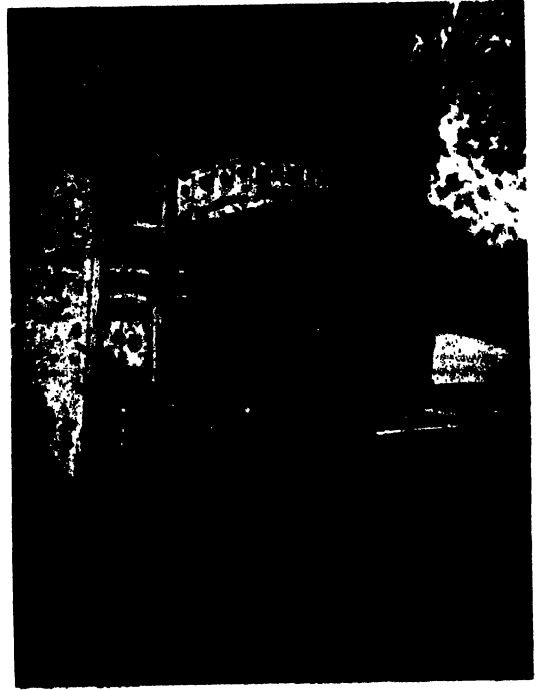
আমের বাঁশী যদি না বাজত অমনি বলে উঠত, "টিম্ টিম্ টিম্, ভায শালিকের ডিম, বাঁশী যদি না বাজিস্ ত কচু বনে ফালায়া দিব, গা পাজয়ে, মর্ মর্ মর্।" শীতকালে সমস্ত গ্রামের আঙিনা ব্রত-আলপনায় ভ'রে উঠত। এই-সব আলপনা ও ব্রতকথার মধ্য দিয়ে ছোট মেয়েরা তাদের ভবিষ্যৎ জীবন গ'ড়ে তোলবার আভাস পেত। গ্রামে সাধারণত দেখি কুমারী মেয়েরাই আলপনা, ব্রতকথায় বিশেষ অগ্রণী। নলিয়া গ্রামে যতগুলি ব্রতকথা ও আলপনা দেখেছি তাতে আমার মনে হয় যে, ব্রতকথার আলপনা সম্পূর্ণ অন্য প্রকৃতির। এক একটি খণ্ড খণ্ড ছবির মত, ঐগুলিকে ব্রতকাহিনীর চিত্র-প্রসাধন বলা যায়। এই সমস্ত আলপনা প্রায়ই গ্রাম্যজীবনের পারিপার্শ্বিক ...[illegible] থেকে

নেওয়া। আলপনায় মানুষ, পাখী, মাছ, গাছ, ঘোড়া, হাতী, চন্দ্র, সূর্য্য, তারা, এমন কি হাট বাজার, রান্নাঘর ইত্যাদি সমস্তই আঁকা হয়। জোড়া পাখী, পুরুষ-স্ত্রী, শিব-দুর্গার যে যুগল চিত্র, তা ঐক্য ও ভালবাসার প্রতীক।

চৈত্রমাসে নলিয়ায় তারার ব্রত একটি দেখবার

"দশ অবতার নৃত্য"—রাম অবতার

জিনিষ। প্রকাণ্ড আঙিনা ভ'রে তারার ব্রতের আলপনা, ফুল দিয়ে পূজো করছে কুমারী মেয়েরা,

"বোল বোল তারা তোমারে করি সাক্ষী
যে ত যে করি আমরা পঞ্চম প্রাণী।
স্বর্গ হতে হর জিজ্ঞাসা করেন,
গৌরী, মর্ত্ত্যে কিসের ব্রত হয়?
গৌরী বলেন, তারার ব্রত।
তারার ব্রত ক'রলে কি ফল হয়?
কুবেরের মত ধন হয়
লক্ষ্মী-সরস্বতীর মত কন্যা হয়
কার্ত্তিক-গণেশের মত পুত্র হয়
লক্ষ্মণের মত দেওর হয়
রামের মত পতি পায়
জনকের মত বাপ পায়
দুর্গার মত সোহাগী হয়
কর্ণের মত দাতা হয়
দশরথের মত শ্বশুর পায়। ইত্যাদি

গ্রামে যারা কুমারী মেয়ে তাদের প্রাণে প্রচুর আনন্দ, সর্ব্বত্রই তাদের সাড়া, এদের শিক্ষকতা করতেন গাঁয়ের ঠাকুরমারা। ছোট ছোট মেয়েরা তাদের কাছে আলপনা, ব্রতকথা, কাঁথা শেলাই শেখে, আমসত্বের ছাচ, পিঠে তৈরি করবার নানারূপ ছাঁচ শেখে, তাদের কাছে এসে পুতুল গড়ে, গল্প শোনে, 'আগড়ুম বাগড়ুম', 'ইকরী মিকরী চাম চিকরী' খেলা করে। আমি এই নলিয়ায় একজন বৃদ্ধার কাছে মধুমালার শাস্ত্র সংগ্রহ করতে গিয়ে অবাক হয়ে গিয়েছিলাম, তাদের গল্প বলবার ভঙ্গী দেখে। পচাত্তর বছরের বুড়ী, এখনও তার গানের গলা অতি চমৎকার আছে। যখন মদনকুমার নিবিড় বনের মধ্য দিয়ে যেতে যেতে মধুমালার দেখা পেল তখন বুড়ী

"মদন যায় যায় ফিরে চায়, গলার মালা হাতে তার,
মদন ধীরে যায়।"

ব'লে যে ভাটিয়াল সুরে গেয়ে উঠেছিলেন তার রেশ এখনও আমার কানে স্পষ্ট বাজে। মদনকুমার চলে গেলে মধুমালা তার মেঘবরণ চুলের একগাছি নদীর জলে ভাসিয়ে দিয়ে বলে উঠল,

"কুচবরণ কন্যারে তার মেঘবরণ ক্যাশ
ও নদী কইয়ো তারে মধুমালার ভাশ।"

মধুমালাকে যখন তার সখিরা সান্ত্বনা দিতে লাগল তখ
মধুমালা বলে,

"পীরিতি রতন পীরিতি যতন পীরিতি গলার হার
পীরিতি কইর‍্যা যেজন মরেরে সফল জীবন তার।

সেদিন আমি ভেবেছিলাম আজকালকার গাঁয়ের মেয়েরা

যে বহুদিনের যত্নের এই অমূল্য পদার্থ ঠাকুমাটিকে এক কোণ-ঠাসা ক'রে দিলে, তারা ভাববার সময় পেল না ইনি দেশের ও জাতির কত বড় সম্পদ। আর একদিন আমি গ্রামের উত্তর পাড়ায় ছড়া সংগ্রহের আশায় এক ঠাকুরমার কাছে যাই, দেখি বাড়িতে ঠাকুরমা ভীষণ চীৎকার করছেন এই ব'লে, "মনুষ্যি জন্মি এ দেহি নাই, কি যে ন্যাদা পড়া শিহে চিঠি নেহ, আমরাও চিঠি নেহিছি, তিনি যখন উত্তরে চাকরী করতে গেছেন দুই চার কথায় বলতাম। অমনি ঠাকুমাটি গুন্ গুন্ ক'রে ধ'রে দিলেন,

হ্যাচড়া পূজা

"আঁচলে বাঁধাছে সর্ব্বদায় সে আমায়
কেমন ক'রে তার ভালবাসা পাশরিব।
সে যে রূপেরি রূপ আমি মনে মনে ভুলে রব।
অন্তরে বাঁধাছে সর্ব্বদায় সে আমায়
কেমন ক'রে তার ভালবাসা পাশরিব।
সে যে মধুর কথা, আমার হৃদয়ে রয়েছে গাথা,
আমি কেমন ক'রে তোমায় ভুলে
না দেখে প্রাণ ধ'রে রব?"

নলিয়ায় মাঘ মাসে কুমারীরা (সব শ্রেণীর) 'মাঘমণ্ডলে'র ব্রত ক'রে থাকে। খুব ভোরে বনফুল দিয়ে একটি ফুলগাছের চারদিকে পাচ-ছয়টি মেয়ে ব্রত গান গেয়ে নেচে বনদুর্গার পূজা অর্থাৎ মাঘমণ্ডলের ব্রত ক'রে থাকে। কুমারী মেয়ের জীবনের ব্যথা-বেদনের আভাস পাওয়া যায় এই ব্রতকথায়
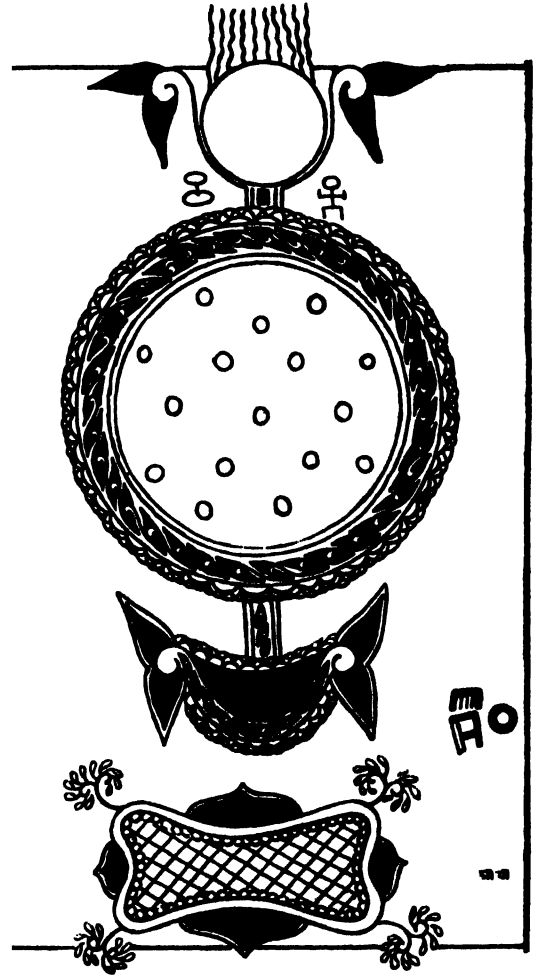
ভাদুলির ব্রত

ও তাদের নৃত্যের ভঙ্গীতে। সমস্ত ছড়াটি উল্লেখ করা অসম্ভব, তবে যেখানে নৃত্য আছে সেটুকু দিচ্ছি।

"হ্যাচরা ঠাউরোনলো হ্যাচরা চুল
তাই দিয়ে গোতে না লো সোহাগড়ার ফুল।
সোহাগড়ার ফুল না লো বেড়ার মাটি
বেড়ার মাটি না লো, ঝিয়ে করে
পাড়া ভ'রে ছেম্‌রীরা জয়জোকার পাড়ে।

জয় দেবো না লো জোকার দেব
সোনার ভাইধন কোলে তু'ল নেব।

(২)

ভাচরা ঠাউরনের পূজো ক'রব
খাটখানি তার কই ?
মালিনী লো সই !
আছে আছে খাটখানি তার বাগুনগোর পাড়া
বাগুন গোর (কায়স্থ ইত্যাদি) সাত ভেমরী পুজো করে তারা।"

কাঁথা শেলাই, সিকা তৈরি, এর আবার সুন্দর সুন্দর নাম আছে,—'গুজরী দোলা', 'কোত্তর খুপী', 'ফুলঝুমকো,'

দশ অবতার নৃত্যে—কৃষ্ণ অবতার

'পদ্ম পোগল', 'কালপাশা' ইত্যাদি। এই গ্রামের একশ' বছর পূর্ব্বে একটি দশ বছরের মেয়ে রমণীমোহন ঘোষ নামে একটি ছেলেকে ভালোবেসে দু-বছর ধ'রে একখানা কাঁথা শেলাই ক'রে ছেলেটিকে তার ভালোবাসার নিদর্শন-স্বরূপ উপহার দিয়েছিল। এদের বিয়ে হওয়ার পরেই দু-জনেই মারা যায় এবং তাদের স্মৃতিচিহ্নস্বরূপ এই কাঁথাখানা সযত্নে তুলে রাখা হয়েছে। এই-সব ছেঁড়া কাঁথা কত পুরানো স্মৃতি নিয়ে বাংলার এ-গাঁও ও-গাঁওয়ের পানে তাকিয়ে মরে।

এর পরে নলিয়া গ্রামে বয়স্থা ও কুমারী মেয়েদের চরম বিকাশ দেখতে পাই বিবাহ-অনুষ্ঠানে। সাধারণত পূর্ব্ব-বঙ্গের বিবাহব্যাপার একটি বিরাট অনুষ্ঠান। এখনও যেখানে একটু প্রাচীন প্রথায় বিবাহ হয় সেখানে প্রচুর পরিমাণে গান ও নাচ হয়ে থাকে। বিবাহের বহু অঙ্গ আছে এবং প্রায় এক হাজার গান বিবাহের সময় গীত হয়ে থাকে ও প্রায় প্রত্যেক বিবাহের অনুষ্ঠানগুলিতেই মেয়েরা নৃত্য ক'রে থাকেন। শ্রদ্ধেয় গুরুসদয় দত্ত মহাশয় এই নলিয়া গ্রামের বিবাহ-অনুষ্ঠান আদ্যোপান্ত বহু অর্থব্যয়ে চলচ্চিত্র ক'রে রেখেছেন এবং অনেকেই তার পরিচয় বহু পূর্ব্বেই পেয়েছেন। বিবাহের সময় যে সধবা মহিলারা গায়ে হলুদ দেয়, স্নান করান, বরণ করা, গঙ্গা পূজা করা ইত্যাদি বিবাহের এ-সব কার্য্যাদি সম্পন্ন করেন তাঁদেরকে এয়ো বলা হয়। আজ গ্রাম থেকে ভদ্রমহিলাদের গান করাটা উঠে গিয়েছে ও যাচ্ছে। প্রাচীনাদের মধ্যে যাঁরা আছেন তাঁরা এখনও এক এক সময় গান করে থাকেন, কিন্তু নতুন যাঁরা আসছেন তাঁরা তো এ-সব জানেনও না, করেনও না, শেখেনও না। গ্রামে যে-সব বৃদ্ধা গান ও নাচ জানতেন তাঁরাও একে একে সরে পড়ছেন, নতুন কেউ আগ্রহ ক'রে শেখেও না, কাজেই এ-সব ক্রমেই উঠে যাচ্ছে। গানগুলির সহজ, সরল ধারা অথচ একটি সংযত গাম্ভীর্য্যপূর্ণ এবং লীলায়িত সুর ও নৃত্যের ভঙ্গী মনোমুগ্ধকর। সাহিত্য ও সঙ্গীত উভয়ের দিক থেকেই যে এগুলির একটি বিশিষ্ট স্থান আছে তাতে কোন সন্দেহ নেই। বিবাহের পূর্ব্বে বরপক্ষ ও কন্যাপক্ষ উভয়ে পত্র লেখেন, একে বলা হয় 'পত্রলেখা'। তারপর উভয় পক্ষই মেয়ে-ছেলেকে "আশীর্ব্বাদ" ক'রে যান। এই সময় এয়োরা আশীর্ব্বাদের বহু গান ক'রে থাকেন। উভয় পক্ষে 'লগ্নপত্র' ঠিক হয়ে গেলে 'হলুদ কোটা' হয়। এই সময় এয়োরা হলুদ কোটার গান ক'রে থাকেন। হলুদ কোটা পর ছেলে ও মেয়েকে স্নান করান হয় ও এই সময় এয়োরা যে গান ক'রে থাকেন, তাকে বলা হয় 'নাওয়ানোর গান'। উভয় বাড়িতেই 'আনন্দ নাড়ু' তৈরি হয়, তারপর খুবড়জ পূজা হয়ে থাকে। খুব ভোরে

বিবাহের পূর্ব্বের দিন বর 'দধিমঙ্গল' বা 'অধিবাস' ক'রে থাকে, এই সময় এয়োরা বসে 'অধিবাসে'র গান করেন। বিয়ের দিন ছেলেকে প্রাতঃকালে পূর্ব্বপুরুষের শ্রাদ্ধ-তর্পণাদি করিতে হয়। একে 'বৃদ্ধি শ্রাদ্ধ' বলা হয় এবং এতে কি করতে হয় তা এয়োদের 'বৃদ্ধির' গানে স্পষ্ট ক'রে জানা যায়। তারপর ষষ্ঠীপূজো ক'রে তার ব্রতকথা বলা হয়। বিকালে কন্যার বাড়িতে এয়োরা গ্রামের পুকুরে গঙ্গাপূজা করতে যান এবং সেখানে গান গেয়ে গঙ্গা বরণের নৃত্য ক'রে থাকেন। গঙ্গাবরণের একটি গান.

"সখি দ্যাখ দ্যাখ বেলা হ'ল গগনে
সখি চল যাই গঙ্গা বরণে।
আমি যাইব গঙ্গার কূল
তুলব জবা ফুল
আমি তুলব ফুল, গাঁথব মালা দিব মায়ের চরণে।
আমি তুলব কুসুম ফুল
যাইয়ে মায়ের কূল
আমি ভ'রব জল করব পূজা
দিব মায়ের চরণে
সখি চল যাই গঙ্গা বরণে।"

পুকুরের এপারের মেয়েরা 'জলকেটে' কলসী পূর্ণ করতে থাকলে, ওপারের মেয়েরা ব'লে ওঠে, 'কি কর তোমরা?' তখন এপারের 'সোহাগীরা' বলবে 'বর অথবা ক'নের সোহাগ

হ্যাচড়া পূজা—প্রণাম

ভরি।' এই সোহাগভরা জল নিয়ে বাড়িতে এসে পাত্র অথবা পাত্রীকে স্নান করান হয় এবং 'ছত্র ধরা' হয়। এই সময় মেয়েরা ধূপতি নাচন ক'রে গান গেয়ে থাকেন। তারপর নাপিত বর অথবা ক'নের হাতে হলুদ সুতার ডোর বেঁধে দেয়, একে 'কোরকাম' বলে। সন্ধ্যার সময় পাত্রের বাড়িতে 'পাত্র সাজান'র গান এয়োরা এরূপ করেন,—

"সখি চল চল চল সখি অযোধ্যার ঐ ভুবনে।
আমরা সাজাব রাম ঐ গুণধাম
চল যাই সকালে।
আমি আগে যাইয়ে সাজাইব ঐ রাম
বিজয়বসন্তরে।
আমি এই চলিলাম চন্দন আনতে বানের দোকানে
সখি চল ... ... বিজয়বসন্তরে।"

এই ভাবে বস্ত্র, বলয়, কাজল, নূপুর, মুকুট ইত্যাদি দিয়ে সাজিয়ে গান গাওয়া হয়। তারপর বরের মা তার হাত দুধ

ব্রত নৃত্য

দিয়ে ধুয়ে ছেলেকে আশীর্ব্বাদ ক'রে বিয়ে করতে পাঠিয়ে দেন। একে 'কনুই ধোওয়ান' বলে এবং আশীর্ব্বাদের সময় এয়োরা এই গান ক'রে থাকেন,

"আমি যাবো সেই অশোকবনে, জানকীর অন্বেষণে,
ওই জানকীরে আনতে গেলে, মাধন কি কি লাগে গো?
পুরায় ওই হলুদ লাগে বানিয়ার চন্দন লাগে
জানকীরে আনতে গেলে এই সব লাগে গো।
আমি যাবো ... ... লাগে গো।"

এরূপে বেনের চন্দন, দীপের কাজল, তাঁতীর বস্ত্র, শিবের শঙ্খ, মালীর মুকুট ইত্যাদি লাগে, এই ব'লে গান করা হয়। বরের দলবলে পাত্রীর বাটীতে যাওয়ার নাম 'চলন' এবং এই সময় এয়োরা 'চলনের গান' ক'রে থাকেন। এদিকে ক'নের বাড়িতে ক'নেকে স্নান করানোর পরই

"মাদল পূজা" ও তার নৃত্য মেয়েরা ক'রে থাকেন। বর যখন কন্যার বাটীর দ্বারে উপস্থিত হন তখন তাকে "দৃষ্টি প্রদীপ" দেখান হয়। একে 'পাত্রবন্দীকরণ'ও বলা হয়। এই সময় এয়োরা ক'নেকে সাজাতে থাকেন ও 'পাত্রী

বিবাহ নৃত্যে বিদায়

সাজান'র গান করেন। বরকে 'আঁধার ঘর' দেখানর পর, বিবাহের সময় বরের চারদিকে ক'নেকে সাত বার প্রদক্ষিণ করার পরই বর ও কনেকে পরস্পর দৃষ্টিবিনিময় করতে হয়, অর্থাৎ দু-জনেই উভয়ের মুখ দেখে, একে 'শুভদৃষ্টি' অথবা 'মুখচন্দ্রিকা' বলা হয়। এর পর 'মালা বদল' হ'লে এয়োরা যে গানটি ক'রে থাকেন তা এই—

"তুমি যে সুন্দর রাম রে, সীতারে করবা বিয়ে,
কি কি গয়না আনছ রাম রে সীতার লাগিয়ে?
এনেছি এনেছি গয়না পেটরাটি ভরিয়ে
ধর সীতে পর গয়না পেটরাটি খুলিয়ে।"

এইরূপে বস্ত্র, শঙ্খ, সিন্দুর ইত্যাদি দিয়ে গানটি করা হয়ে থাকে। পরে 'কুশবন্ধন' হয় এবং এ সময় নাপিত বিবাহ-সভায় 'গৌরবচন' ছড়া আবৃত্তি করে। বিবাহ হয়ে গেলে বাসরঘরে নানারূপ খেলা হয়। একে 'জো'খেলা বলা হয় এবং এয়োরা 'বাসরঘরের' বহু গান ক'রে থাকেন। প্রাতঃকালে এয়োরা বর ও ক'নে যে ঘরে শুয়ে আছে সেই ঘরে এসে তাদের শয্যা তুলবার জন্য বরের কাছে পুরস্কার চেয়ে থাকেন এবং এই সময় তাঁরা যে ঠাট্টা বিদ্রূপ ক'রে গান করেন তাকে বলা হয়, 'সেজ তুলনীর' গান। এর পর বাসিবিবাহ হয়। বর ও ক'নেকে পাশাপাশি দাঁড় করান হয় এবং ক'নেকে সিন্দুর দিয়ে বরের পিঠে একটি ছবি এঁকে বলতে হয়, "তোমার মনে চিরদিনের জন্যে আঁকা রইলাম।" বরও ক'নের পিঠে একটি ছবি এঁকে উপরোক্ত কথাটি ব'লে থাকে। বরের কোলের কাছে ক'নেকে দাঁড় করানোর পর. বর ক'নের নাভিস্থল স্পর্শ ক'রে ক'নের মাথায় সিন্দুর পরিয়ে দেয়। এই সময়ও এয়োরা বাসিবিবাহে'র বহু গান করেন। বাসিবিবাহের রাত্রিকে 'কালরাত্র' বলা হয় এবং এই রাত্রে বর ও কন্যা পৃথক ভাবে শুয়ে থাকে। খুব ভোরে উঠে বর ও ক'নেকে 'কাকস্নান' করতে হয় এবং রাত্রে 'ফুলশয্যা'র সময় এয়োরা তাদের নিয়ে কিছুক্ষণ খেলা ও ঠাট্টাবিদ্রূপ করে এই গানটি করেন.

"যাতি, যূতি, কুটরাজ, বেলা, গন্ধরাজ ফুল, কৃষ্ণকলি
নবকলি অর্দ্ধ বিকসিত, তাতে বনমালী হরষিত।
তুমি যাও হে নাগর প্যারী বিচ্ছেদে হ'য়ে আছেন
ঘুমে কাতর।
আমি এই আসিলাম বানের চন্দন গৃহেতে থুয়ে।

এখানেও দীপের কাজল, তাঁতীর বস্ত্র, মালীর মালা গৃহেতে রেখে,

"তুমি যাও হে নাগর প্যারী বিচ্ছেদে হয়ে আছেন
ঘুমে কাতর।"

তার পরের দিন বিদেয় নিয়ে বর ক'নেকে নিয়ে নিজের বাড়িতে ফিরে আসেন, বিদায়ের সময় শুধু নির্ব্বাক নৃত্যের ভঙ্গীতে এয়োরা এদের বিদায় দিয়ে থাকেন। বরের বাড়িতে 'বৌ-পরিচয়' হয়ে যাওয়ার পর 'বৌ-ভাত' হয়। বরের মা যখন নূতন বধূকে এবং ছেলেকে বরণ ক'রে ঘরে আনেন তখন দু-জনকেই বরণ করার সময় এয়োরা এই গানটি গেয়ে থাকেন,

"রামের মা বরণ করে
ছেলকে চুলে মাজা পড়ে,
কি বরণ করে গো ও রামের সোহাগিনী।
রামের মা বরণ করে
হাতের কঙ্কন ঝিকমিক করে
কি বরণ করে গো ও রামের সোহাগিনী।
রামের মা বরণ করে
পায়ের নূপুর খ'সে পড়ে
কি বরণ ক'রে গো ও রামের সোহাগিনী।"

এখন গ্রামে বিবাহের সময় বহু অঙ্গই তুলে দেওয়া হয়েছে, বিবাহের পরিপূর্ণ অঙ্গটি আমাকে গ্রামের প্রাচীনাদের কাছ থেকে সংগ্রহ করতে হয়েছে। এ সমস্ত গান ও বিবাহের পূর্ণ অঙ্গগুলি এখনও নলিয়া গ্রামের শ্রীযুক্তা ভুবন-মোহিনী দেবী, শ্রীমতী, শ্রীনগেন্দ্রবালা দেবী ও শ্রীমতী মায় মুখুজ্যে প্রমুখ মহিলারা জানেন এবং করিয়া থাকেন। এখন সে গ্রামে ঠাকুমা পাওয়া দুষ্কর। কুমার, মিস্ত্রী, পটুয়া নেই, গ্রামকে এখন আর বিশেষভাবে কবিগান, যাত্রা, রামায়ণ-গান, সখি-সংবাদ ইত্যাদি মুখরিত করে না। গ্রামে কোন কোন সময়ে বিবাহের পরে দ্বিতীয় বিবাহ হইয়া থাকে। সাধারণতঃ বিবাহের অনির্দ্দিষ্ট কালের পর এই দ্বিতীয় বিবাহ হয়। দ্বিতীয় বিবাহে কোন পূজার্চ্চনা নেই, যদি কেউ রবীন্দ্রনাথের 'শাপমোচন' দেখে থাকেন তবে বুঝতে পারবেন যে শুধু নৃত্যের ভঙ্গীতে নির্ব্বাক হয়ে এই দ্বিতীয় বিবাহ-উৎসব গ্রামের এয়োরা সম্পন্ন ক'রে থাকেন। নতুন বউ, স্বামী বিদেশে, দ্বিতীয় বিবাহ উপস্থিত, এয়োরা নতুন বউয়ের ব্যথা, আশা-আকাঙ্ক্ষা নির্ব্বাক নৃত্যের ভঙ্গীতে ফুটিয়ে তোলেন। দ্বিতীয় বিবাহের প্রথম অঙ্কেই দেখতে পাই যে, এয়োরা 'কাদামাটি' নৃত্য করছে। আঙিনায় কাদা ক'রে সমস্ত এয়োরা ক'নেকে নিয়ে কত 'ধানকাটা' 'মলন' 'হলচালন' 'ধানহিটান' 'ধাননিড়ান' 'চাল বা'র করা' নৃত্য ক'রে থাকেন।

এই সময় এয়োরা 'দৈবক ঠাকুর' প্রহসন ক'রে থাকেন। তারপর বহু নৃত্য ও গান করার পর সমস্ত এয়োরা 'কাদামাটি' মেখে ক'নেকে নিয়ে স্নান করতে যান। পুকুর-ঘাটে স্নান করার পর ক'নেকে কলসীতে জল ভরতে হয়; এই সময় এয়োরা একটু দূর থেকে নিম্নলিখিত গানটি করেন। গানের ভাব এই যে, কৃষ্ণ বাড়িতে এসে রাধাকে জল তুলতে দেখে বলছেন,—

"জল ভর লো বিরহিণী জ ল নিয়ে ঢেউ
বদন তুলে কহ কথা ঘাটে নাই আর কেউ
কেমন তোমার মাতা পিতা কেমন তোমার হিয়ে
একেলা এসেছ ঘাটে কলসী কাঁখে নিয়ে!
হেথা থেকে যাও রে কিছু কে আনল ডাকিয়ে
একলা এ সড়ি ঘাটে পাষাণ বুকে নিয়ে!
আপনারি ধন ছাপায়ে রেখেছি আপনি
তাইতে কেন হওলো বেজার রাধাবিনোদিনী?
বেজার কেন হব কিন্তু বেজার কেন হব
তুমি মন্দ হ'লে পরে কোথায় যাইয়া রব?
কড়ার কড়া পানের বিয়ে তাও না দিতে পার
নিকড়ে কদম্বর পুপ কোলে ফেলে মার:
নিজধন ছাঙ্গাইয়া কানাই বিয়েই বা কেন কর
কেবল পরের রমণী দেখ্যা চোখ টাটায়ে মর:
বিয়ে ত করিব রাধে বিয়ে ত করিব
তোমার মত সুন্দরী রাধে কোথায় যাইয়া পাব?
আমার মত সুন্দরী কিন্তু নাহি যদি পাও
গলেতে কলসী বাঁইধা জলে ডুবে যাও।
কোথায় পাব কলসী রাধে কোথায় পাব দড়ি।
তোমার চার গাছি দাও লোটন ক'রে রাখি।
তুমি আমার গয়া, গঙ্গা, তুমি বারাণসী
তুমি হও যমুনার জল
তোমার অঙ্গে দব সাঁতার কি করিব কলসী।"

এইভাবে দুটি জীবনের মিলন-উৎসব শেষ হয়।

এই প্রবন্ধের রেখাচিত্রগুলি শ্রীযুক্ত গুরুসদয় দত্ত মহাশয় গৃহীত আলোকচিত্র হইতে তরুণশিল্পী শ্রীকুলদারঞ্জন চৌধুরী অনুগ্রহ করে এঁকে দিয়েছেন, তাঁর কাছে আমি বিশেষভাবে ঋণী এবং কৃতজ্ঞ রইলাম—লেখক।
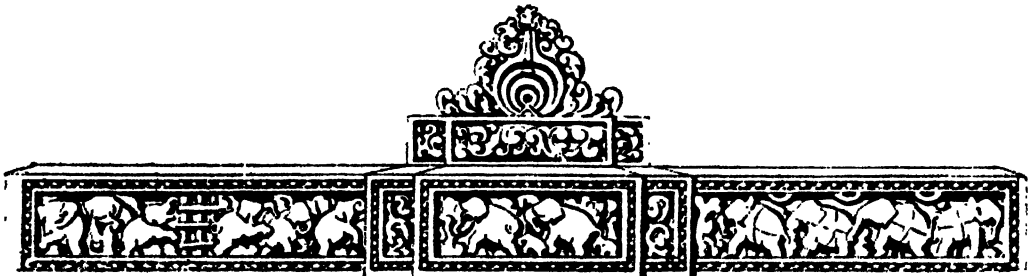
দীর্ঘমিয়াদী ঋণদান ও জমিবন্ধকী ব্যাঙ্ক

শ্রীসুকুমাররঞ্জন দাশ, এম-এ., পিএইচ ডি

কিছুদিন হইতে কৃষক-সম্প্রদায় ও ভূম্যধিকারিগণকে এই ভীষণ অর্থসঙ্কটের হাত হইতে রক্ষা করিবার জন্য জমিবন্ধকী ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠার কথা উঠিয়াছে। সম্ভবতঃ ভারতীয় ব্যবস্থা-পরিষদের আগামী অধিবেশনে এই বিষয়ের বিশদ আলোচনা হইবে। গত তিন-চার বৎসর ধরিয়া বাংলার তথা ভারতের কৃষক-সম্প্রদায়ের এবং সেই কারণে ভূম্যধিকারিগণেরও আর্থিক অবস্থা অত্যন্ত শোচনীয় হইয়া পড়িয়াছে। এই নিমিত্ত তাহাদিগের মধ্যে অতি সত্বর দীর্ঘমিয়াদী ঋণদানের ব্যবস্থা করিবার কথা চলিয়াছে। দুইটি কারণে কৃষকদিগের এইরূপ অবস্থা হইয়াছে। প্রথমতঃ, কৃষকগণ তাহাদিগের উৎপন্ন শস্যের যেরূপ মূল্যের আশা করিয়াছিল, দেশের ব্যবসায়-বাণিজ্যের অবনত অবস্থার জন্য তাহারা সেই আশানুরূপ মূল্য লাভ করিতে পারিতেছে না, এমন কি অনেক স্থলে অল্প মূল্যে উৎপন্ন শস্য বিক্রয় করিতে বাধ্য হইতেছে। কিন্তু এই অত্যধিক মূল্য-লাভের আশায় তাহারা পূর্ব্বে ঋণদান সমিতিগুলি হইতে কিংবা অন্যত্র হইতে যে-পরিমাণ ঋণ গ্রহণ করিয়াছে, এখন উৎপন্ন শস্যের বিক্রয়লব্ধ অর্থ হইতে সেই ঋণের কিস্তির টাকা পরিশোধ করা দূরে থাকুক,সুদের টাকাও কিছুমাত্র দিতে পারিতেছে না। এই অবস্থার জন্য কৃষকেরা অনেকাংশে দায়ী নহে। উৎপন্ন শস্যের মূল্য ব্যবসায়-বাণিজ্যের অধঃপতনের নিমিত্ত যে এতটা হ্রাসপ্রাপ্ত হইবে, তাহা তাহারা কেন, অনেক পণ্ডিত অর্থনীতিবিদেরাও বুঝিতে পারেন নাই। কৃষকদিগের যখন এই অবস্থা, তখন তাহাদিগের অর্থেই ধনবান্ ভূম্যধিকারিগণেরও অবস্থা শোচনীয় হইয়া পড়িতে বাধ্য; তাহারা প্রজাদিগের নিকট হইতে বিশেষ কিছু আদায় করিতে পারিতেছেন না, অথচ নিজেদের চালচলন বজায় রাখিতে এবং গবর্ণমেণ্টের কিস্তির টাকা দিতে অর্থের প্রয়োজন। সুতরাং বিষয়-সম্পত্তি সব নীলামে উঠিতে চলিয়াছে। দ্বিতীয়তঃ, অনেক স্থলে বর্ষার প্লাবনে কৃষকদিগের উৎপন্ন শস্য নষ্ট হইয়া গিয়াছে। সেই সকল স্থানের কৃষকগণ একেবারে সম্বলহীন হইয়া পড়িয়াছে; ফলে জমিদারদিগেরও ভীষণ অর্থসঙ্কট উপস্থিত হইয়াছে।

কৃষকগণ অধিকাংশ স্থলে সমবায়-ঋণদান সমিতি হইতে ঋণগ্রহণ করিয়াছে। এক্ষণে তাহারা দুর্দ্দশার চরমসীমায় উপস্থিত হওয়ায় ঋণদান-সমিতিগুলির অবস্থাও সঙ্কটাপন্ন হইয়াছে। অল্প মূলধন বেশী দিন আটকাইয়া থাকিলে ঋণদান-সমিতিগুলির কার্য্য চালাইবার বিশেষ অসুবিধা হইয়া পড়ে, কারণ ঋণদান সমিতিগুলিতে গচ্ছিত অর্থের মিয়াদ অল্প; সেই অর্থ দিয়া দীর্ঘমিয়াদী ঋণদান উহাদিগের পক্ষে অসম্ভব, কিন্তু অবস্থা এখন যেরূপ দাঁড়াইয়াছে তাহাতে ঋণদান-সমিতিগুলি ঋণের অর্থ আদায় করিতে পারিতেছে না। সমবায়-ঋণদান সমিতিতে তিন বৎসর মিয়াদে দীর্ঘমিয়াদী ঋণ দিবার বিধি আছে, কৃষকদিগের বর্ত্তমান অবস্থায় তিন বৎসরের মধ্যে ঐ ঋণ শোধ দেওয়া তাহাদিগের পক্ষে অসম্ভব। আবার যে দেনা কৃষকেরা অনেক সময়ে পূর্ব্বপুরুষদিগের আমল হইতে বহন করিয়া আসিতে থাকে, দেশীয় মহাজনকে সুদ চালাইয়া চালাইয়া দলিল পরিবর্ত্তন করিয়া যাহা এতদিন চলিয়া আসিতেছিল, তাহা এই অর্থসঙ্কটের সময়ে তিন বৎসরের মধ্যে সুদ ও আসলে তাহারা পরিশোধ করিয়া ফেলিবে ইহাও আশা করা যাইতে পারে না। সুতরাং ঋণদান সমিতিগুলির একমাত্র উপায়—ঋণগ্রস্ত কৃষকদিগের সমস্ত সম্পত্তি নিলামে বিক্রয়ের দ্বারা ঋণের টাকা আদায় করিয়া লওয়া। অথচ ইহাতে এই আর্থিক সঙ্কটের দিনে বিশেষ সুবিধা হইবে বলিয়া মনে হয় না। অনেক স্থলে নিলামে ক্রেতার অভাবে অতি অল্প মূল্যে ঋণগ্রস্ত সম্পত্তির বিক্রয় হইতে পারে, ইহার ফলে ঋণদান-সমিতিগুলি নিজেদের অর্থের সমুদয় অংশ আদায় করিতে পারিবে না এবং কৃষকদিগেরও সমস্ত সম্পত্তি নিলামে বিক্রয়ের নিমিত্ত তাহাদিগের বাঁচিয়া থাকিবার কোনও উপায় থাকিবে না। এই সকল কারণে এই কথা

স্বতঃই মনে হয় যে, এমন কোনও ব্যবস্থার সম্ভাবনা আছে কি না যাহাতে কৃষকদিগের দীর্ঘমিয়াদী ঋণদানের সুবিধা হয়, অথচ ঋণদান-সমিতিগুলি ক্ষতিগ্রস্ত না হয় অথবা তাহাদিগকে দীর্ঘকালের জন্য টাকা আটকাইয়া থাকিলে কার্য্য চালাইবার পক্ষে অসুবিধা ভোগ করিতে না হয়।

এ-দেশের অর্থনীতিবিৎ বিশেষজ্ঞগণ কৃষকদিগের দীর্ঘমিয়াদী ঋণদানের প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে একমত হইয়াছেন। ভারতীয় ব্যাঙ্ক-অনুসন্ধান-সমিতিও এ-বিষয়ে সকলের বিশেষ দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছেন। তাহারা দেখাইয়াছেন যে কৃষকদিগের সর্ব্বসমেত ঋণের পরিমাণ প্রায় সাত শত কোটি টাকা এবং এই কারণে ঋণের পরিমাণ ক্রমশঃ পরিশোধ করিবার জন্য কৃষকদিগকে দীর্ঘমিয়াদী ঋণদানের ব্যবস্থা করা একান্ত প্রয়োজনীয়। এই সমস্যার সমাধানের নিমিত্ত ভারতীয় ব্যাঙ্ক-অনুসন্ধান-সমিতি প্রাদেশিক জমিবন্ধকী ব্যাঙ্ক ও জেলা জমিবন্ধকী ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠার কথা বলিয়াছেন। ইহা ভিন্ন টাউনসেণ্ড সাহেবের সভাপতিত্বে সমবায় তদন্ত কমিটিও এইরূপ ব্যাঙ্ক-স্থাপনের উপদেশ দিয়াছিলেন; কৃষি-সম্বন্ধে রাজকীয় তদন্ত সমিতিও কৃষকদিগের মধ্যে দীর্ঘমিয়াদী ঋণদানের ব্যবস্থা করিয়া তাহাদিগের জমির আবশ্যক উন্নতিসাধনের জন্য জমিবন্ধক প্রতিষ্ঠান গড়িয়া তুলিবার পরামর্শ দিয়াছেন। এই সকল ব্যবস্থা কিরূপে কার্য্যে পরিণত করা যাইতে পারে এবং তাহার জন্য কি ভাবে মূলধন সংগ্রহ করা যাইতে পারে, তাহা বিশেষ ভাবে ভাবিয়া দেখা প্রয়োজন।

এই বিষয়ে মান্দ্রাজ ভারতের সকল প্রদেশের অগ্রগামী হইয়াছে। মান্দ্রাজের সমবায় জমিবন্ধকী ব্যাঙ্ক এই উদ্দেশ্যেই প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। এই ব্যাঙ্কের লক্ষ্য সমবায়-ঋণদান-সমিতিগুলিকে অর্থসাহায্য করা, যাহাতে উহারা কৃষকদিগের দীর্ঘমিয়াদী ঋণদান ব্যবস্থা করিতে পারে এবং পরে বন্ধকী জমি উক্ত জমিবন্ধক ব্যাঙ্কের নামে নির্দ্দিষ্ট করিয়া দিয়া নিজেদের পরিচালনার পূর্ব্বোক্ত অসুবিধা দূর করিতে পারে। ইউরোপ ও আমেরিকার জমিবন্ধকী ঋণদান-সমিতিগুলির আদর্শে এই ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। ইহার কার্য্যপ্রণালী অনেকটা এইরূপ:—বিশ বৎসরের মিয়াদী এবং বিশেষ অবস্থায় প্রয়োজন হইলে দশ বৎসরের মিয়াদী ডিবেঞ্চার (debenture) সাধারণের নিকট বিক্রয়ের জন্য উপস্থাপিত করা হয়। সাধারণতঃ ডিবেঞ্চারের উপর শতকরা পাঁচ কি ছয় টাকা সুদ দেওয়া হইয়া থাকে; ডিবেঞ্চার ক্রয় করিবার সময়ে দরখাস্তের সহিত শতকরা পঞ্চাশ টাকা এবং বিক্রয় স্থির হইলে নির্দ্দিষ্ট সময়ের মধ্যে অবশিষ্ট শতকরা পঞ্চাশ টাকা মিটাইয়া দিতে হইবে। ১০০০ টাকা, ৫০০ টাকা বা নিম্নতম সংখ্যায় ১০০ টাকা মূল্যের ডিবেঞ্চার বিক্রয়ার্থ উপস্থিত করা যাইতে পারে। এই প্রসঙ্গে বলিয়া রাখা আবশ্যক যে, পূর্ব্বোক্ত ডিবেঞ্চারগুলি যদি অন্যান্য সিকিউরিটিস্-এর মত গবর্ণমেণ্টের অনুমোদিত না হয়, তাহা হইলে সাধারণের নিকট উহাদিগের বিক্রয় একপ্রকার অসম্ভব হইয়া পড়ে। এই ব্যাপার লইয়া মান্দ্রাজে জমিবন্ধকী ব্যাঙ্কের বিশেষ অসুবিধায় পড়িতে হইয়াছিল। সম্প্রতি উহাদিগকে অন্যান্য সিকিউরিটিস্-এর ন্যায় গ্রহণযোগ্য বলিয়া মান্দ্রাজ গবর্ণমেণ্ট ঘোষিত করিয়াছেন। ইহা ভিন্ন সাধারণের নিকট ডিবেঞ্চারগুলি যাহাতে গ্রাহ্য হয়, তাহার জন্য অন্যান্য ব্যবস্থাও করা হইয়াছে।

এক্ষণে দেখিতে হইবে কিরূপ ব্যবস্থা করিলে অতি সত্বর ডিবেঞ্চারগুলি বিক্রয় করিয়া অর্থ সংগ্রহ করিতে পারা যায়। কেবল ব্যক্তিগত ক্রেতার নিকট ডিবেঞ্চার বিক্রয় করিতে চেষ্টা করিলে অনেক সময়ে এত অধিক বিলম্ব হইতে পারে যাহাতে অনেক অসুবিধা হইবার সম্ভাবনা, অথচ অতি সত্বর অর্থ সংগ্রহ না হইলে ঋণের টাকা দাদন দেওয়া যাইবে না। এরূপ স্থলে ভারতীয় বীমা কোম্পানিগুলির সহযোগিতা পাইলে জমি বন্ধকী ব্যাঙ্কের অর্থ সংগ্রহের সহজ উপায় হইতে পারে। বীমা কোম্পানিগুলি সংগৃহীত অর্থ ভালরূপে গচ্ছিত রাখিবার ব্যবস্থা করিয়া থাকে; যাহাতে সুদও বেশী পাওয়া যায় অথচ গচ্ছিত অর্থের কোনও ক্ষতি না হয়, এইরূপ ভাল ব্যবস্থা দেখিয়া বীমা কোম্পানীগুলি অর্থ গচ্ছিত রাখে। সাধারণতঃ তাহারা নিরাপদ ব্যবস্থার নিমিত্ত গবর্ণমেণ্ট বা মিউনিসিপ্যাল কাগজ ক্রয় করিয়া থাকে; ইহাতে গচ্ছিত অর্থের কোনও ক্ষতি হইবার ভয় থাকে না বটে, কিন্তু কাগজের দামের প্রায়ই হ্রাস হইতে দেখা যায়, এই কারণে আবার কতকটা অর্থ কাগজের বাজার-দরের হ্রাসের অনুপাতে পৃথক্ ভাবে গচ্ছিত রাখিতে হয়। সুতরাং এইরূপ ব্যবস্থা বীমা কোম্পানীগুলির পক্ষে সকল সময়ে খুব সমীচীন বলিয়া মনে হয় না। জমিবন্ধকী ব্যাঙ্কগুলি

সাধারণের নিকট চারিদিকের আট ঘাট বাঁধিয়া যে ডিবেঞ্চার উপস্থিত করিয়া থাকে, তাহা নিরাপদ ব্যবস্থার দিক হইতে কোনরূপ আশঙ্কাজনক নহে, সুতরাং এই সকল ডিবেঞ্চার ক্রয় করিয়া জমিবন্ধকী ব্যাঙ্কসমূহে বীমা কোম্পানীগুলি অনায়াসে সংগৃহীত অর্থ গচ্ছিত রাখিতে পারে। ইহাতে বীমা-কোম্পানীগুলির নিজেদের কোনরূপ ক্ষতির ত আশঙ্কাই নাই, অথচ জমিবন্ধক ব্যাঙ্কসমূহের অর্থসংগ্রহের একটা সুন্দর ব্যবস্থা হইতে পারে এবং সঙ্গে সঙ্গে বীমা কোম্পানীগুলির দ্বারা পল্লীসংগঠনের বিশেষ সাহায্য হইতে পারে। এই বিষয়ে সমগ্র বীমা কোম্পানীগুলির সর্ব্বপ্রথমেই পথপ্রদর্শক হওয়া আবশ্যক। পাশ্চাত্য দেশের বীমা কোম্পানীগুলি এই প্রকারের জমিবন্ধক প্রতিষ্ঠানে প্রচুর অর্থ গচ্ছিত রাখিয়া দেশের কৃষক-সম্প্রদায়ের বিশেষ উন্নতিবিধান করিতেছে। এই বিষয়ে আমেরিকা ও জার্ম্মানীতে কত নূতন নূতন উপায় উদ্ভাবিত হইতেছে।

আর একটি উপায়ে বীমা কোম্পানীগুলি জমিবন্ধক ব্যাঙ্ক-সমূহের সহিত সংযোগিতা করিতে পারে। ইহাতে কৃষক-দিগের পক্ষেও জমির বন্ধক খালাস করিবার সহজ উপায় বিহিত হইবে। যদি জমিবন্ধকী ব্যাঙ্ক হইতে কোন কৃষক কুড়ি বৎসরের জন্য জমিবন্ধক দিয়া এক হাজার টাকার ঋণগ্রহণ করে, তাহা হইলে বৎসরে বৎসরে তাহাকে ব্যাঙ্কে যে কিস্তির টাকা দিতে হয়, তাহা হইতে কতকটা সুদ বাবদ রাখিয়া অবশিষ্ট টাকা দিয়া ব্যাঙ্ক সহজেই সেই কৃষকের নামে কোন বীমা কোম্পানীতে এক হাজার টাকার বীমা করিতে পারে; প্রতি বৎসর যেমন পাওনার টাকা কমিয়া আসিবে বীমার পরিমাণও কমিয়া যাইবে. এই প্রকারে কয়েক বৎসরের মধ্যে জমি বন্ধক খালাস হইয়া যাইবে এবং ঋণও পরিশোধিত হইবে। এই ব্যবস্থায় আর একটি সুবিধা আছে, যদি মাত্র কয়েক বারের কিস্তি দিয়া কৃষকটি মৃত্যুমুখে পতিত হয়, তাহা হইলে অন্য ব্যবস্থায় তাহার জমির বন্ধক খালাস ত হয়ই না, উপরন্তু ঋণভার তাহার উত্তরাধিকারীর উপর গিয়া পড়ে। কিন্তু বীমা করা থাকিলে, কৃষকের মৃত্যুর পরে বীমা কোম্পানী হইতে যে অর্থ পাওয়া যাইবে. তাহা হইতে জমির বন্ধক মুক্ত হইবে এবং ঋণভারেরও পরিশোধ হইবে। ইহাতে জমিবন্ধকী ব্যাঙ্কের পক্ষেও ভাল, তাহারও ঋণদানের টাকার ক্ষতি হইবার কোন সম্ভাবনা নাই। এই বিষয়ে গত বর্ষের সেপ্টেম্বর মাসের 'ইনসিওরেন্স হেরাল্ড' পত্রিকায় বীমা বিশেষজ্ঞ মহীশূর বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক কে. বি. মাধব, এম্ এ, এ-আই-এ (লণ্ডন) মহাশয় বিশদ আলোচনা করিয়া দেখাইয়াছেন যে, বীমা কোম্পানীর ও জমিবন্ধকী ব্যাঙ্কের এইরূপ সহযোগিতা একান্ত বাঞ্ছনীয়। বস্তুতঃ পাশ্চাত্য দেশের এই সম্বন্ধে বিধিব্যবস্থার একটু অনুসন্ধান করিলে দেখা যায় যে, সেই দেশের বীমা কোম্পানী-গুলি কত অভিনব প্রণালীতে কৃষককুলের সহায়তা করিতেছে। আমাদিগের দেশেও সেইরূপ ব্যবস্থা হইতে পারে কি-না. সকলেরই চিন্তা করিয়া দেখা প্রয়োজন।

সম্প্রতি এ দেশের কৃষক-সম্প্রদায়ের এবং সেই সঙ্গে জমিদারদিগের এইরূপ শোচনীয় অবস্থা হইয়া পড়িয়াছে যে তাহাদিগের আর্থিক মুক্তির জন্য এবং সেই সঙ্গে গ্রামের উন্নতিসাধনের জন্য দীর্ঘমিয়াদী ঋণদানের উত্তম ব্যবস্থা করিবার সময় আসিয়াছে। এই ব্যবস্থা করিতে হইলে অর্থনীতিবিৎ বিশেষজ্ঞদিগের মতে জমিবন্ধকী ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠা করা নিতান্ত আবশ্যক। আবার এই ব্যাঙ্কগুলির অর্থসংগ্রহের উপায় বিধানের জন্য দেশের বীমা কোম্পানীগুলির সহযোগিতার প্রয়োজন। কি উপায়ে এই ব্যবস্থা সুসম্পন্ন হইতে পারে তাহা সকলেরই চিন্তার বিষয়। কৃষক সম্প্রদায়ের আর্থিক উন্নতি না হইলে যে দেশের কৃষিকার্য্যের তথা দেশের আর্থিক অবস্থার পরিবর্ত্তন হইতে পারে না, ইহা কেহই অস্বীকার করিতে পারিবে না। এইজন্যই বিশেষভাবে এই বিষয়ে দেশের মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী মাত্রেরই দৃষ্টি আকৃষ্ট হইয়াছে, সকলেই মনে করিতেছেন যে, একটা সুষ্ঠু ব্যবস্থা ভাবিয়া বাহির করিবার সময় আসিয়াছে। এখন সত্বর সেই ব্যবস্থা কার্য্যে পরিণত হইলেই সকল দিক দিয়া জাতির ও দেশের কল্যাণ হয়।

আমগাছ

শ্রীক্ষীরোদচন্দ্র দেব

শ্রীহট্ট জেলার সদরে ছিল আমার উকীলবাবুর পেশা। কিন্তু গ্রাম্য মক্কেল,—বিশেষতঃ জৈন্তা পরগণার মক্কেল তার বড় একটা ছিল না। গ্রাম হইতে সচরাচর যে দুই-এক জন মক্কেল আসিত, চাল-চলনে শহুরে মক্কেলের সঙ্গে তাদের তফাৎ ছিল অল্প। রতনবাবু, আফতাবউদ্দীন প্রভৃতিকে ঠিক পাড়াগেঁয়ে বলা চলে না। তবু মাঝে মাঝে লাল ফিতা-বাঁধা ফাইলের পরিবর্তে ময়লা কাপড়ের পুঁটুলির ভিতর হইতে আঁকা-বাঁকা দস্তখতের ঝুড়ি ঝুড়ি তৌজি-চিঠা উকীলবাবুর বৈঠকখানায় পল্লীর আবহাওয়া একটু-আধটু বহিয়া আনিত।

কিন্তু বহুর অভাব পূরণ করিয়াছিল একজন। তার নাম ইস্মাইল আলী। জৈন্তায় তার বাস। ঐ পরগণার স্থানীয় অধিবাসীর প্রকৃষ্ট নিদর্শন বলিয়াই সে আমাদের নিকট পরিচিত ছিল। আমার মনে হয়, পল্লীর অকৃত্রিম সারল্যে শহরের সভ্যতাকীর্ণ জটিলতা সরস করিয়া ইস্মাইল আলীর মত দুই-একটি মক্কেলই আইনজীবীর একঘেয়ে জীবনে বৈচিত্র্য সৃষ্টি করে। ভারিক্কি মন মাঝে মাঝে হাল্কা করিতে তাই তার মামলার প্রয়োজনীয়তাও ছিল বোধ হয় খুবই।

শহরে মাড়োয়ারী মক্কেল হয়ত তার সুবৃহৎ খাতা লইয়া উপস্থিত। মগজ জুড়িয়া অঙ্কের সংখ্যা ছারপোকার ন্যায় কিল্‌বিল্‌ করিতেছে। উকীল মক্কেল দু-জনেই মাথা চুলকাইতেছেন। ঠিক সেই সময় বাম হাতে ডাবাহুঁকায় বসানো পুরা দেড় হাত লম্বা বাঁশের নল হইতে ঠোঁটের ফাঁক দিয়া অতি আরামে ধোঁয়া ছাড়িতে ছাড়িতে 'ছালাম!—মোক্তার ছাব! ভালাভালি ত?' বলিয়া ইস্মাইল আলী হাজির হইলেন। ইসমাইল আলীর নিকট উকীল-মোক্তারে কোন তারতম্য ছিল না। স্যর আশুতোষ প্রতিষ্ঠিত এত বড় একটা বিশাল ল-কলেজকে সামান্য একটু শ্রদ্ধা প্রদর্শন করিতে তার আগ্রহ আমরা কোন কালে লক্ষ্য করি নাই। তার উপর, 'শ', 'ষ' ও 'স'—এই তিনটিকে একদম ছাঁটিয়া দিয়া একমাত্র 'ছ'কে কায়েম করায় বাংলা বর্ণমালার জটিলতা কি পরিমাণ হ্রাস পাইয়াছে, যোগেশ বিদ্যানিধি মহাশয়ই তার বিচার করিতে পারেন।

ইস্মাইল আলীকে ঘরে প্রবেশ করিতে দেখিলেই উকীলবাবুর মুখ অতর্কিতে উজ্জ্বল হইয়া উঠিত।

"আরে—, চৌধুরী সাহেব যে। বসুন, বসুন! ওরে কে আছিস, তামুক দিয়ে যা। ..তার পর ?—খবর কি ?"

অমনি নানা অঙ্গভঙ্গীসহকারে ইস্মাইল আলী নিজ ভাষায় মামলার কাহিনী বিবৃত করিতেন। উকীলবাবু হাসিতেন। মামলার ইতিহাস এমনই কৌতুকোদ্দীপক যে, না-হাসিয়া থাকা যায় না। কিন্তু তবু শ্রোতাদের কল্পনায় একটি স্নিগ্ধোজ্জ্বল মধুর ছবি ফুটিয়া উঠিত। দূরে নীল আকাশের গায়ে নীল পাহাড় মিশিয়া আছে। সুবিস্তীর্ণ সবুজ মাঠের কোলে ছোট ছোট খড়ো ঘর। মাঝে মাঝে শালুকবনে ঘেরা বিল। তারই কিনারায় কিনারায় মাছরাঙা, ডাহুক টুপাটুপ ডুব দিতেছে। আরাম ঘেরা স্বল্পপরিসর এই বৈঠকখানার সহিত উকীলবাবু তা অদলবদল করিতে সদাই রাজী থাকিতেন কি-না জানি না; কিন্তু কোন কালেই যে তাঁর মন ধূলিধূসর নথিপত্র কিংবা কীটদষ্ট আইন বই ছাড়িয়া বাংলা মায়ের ঐ শ্যামল কোলে ছুটিয়া যাইতে ব্যগ্র হইয়া উঠিত না, এমন কথা জোর করিয়া বলা চলে না।

বছর-দুই আগে বৈঠকখানায় আইনের বড় বড় বাঁধানো বই দেখিয়া বিস্ময় বিস্ফারিত নেত্রে ইস্মাইল আলী আমাকে একদিন জিজ্ঞাসা করিয়াছিল, সবসুদ্ধ কয়খানা বই পড়িলে বড় উকীল হওয়া যায়। আমি হঠাৎ বলিয়া উঠি—'বিয়াল্লিশখানা।' কারণ বহুদিন এই অঞ্চলে মুহুরীগিরি করায় ইস্মাইল আলীকে প্রবোধ দিবার ভার আমারই ছিল। ইস্মাইল আলী তখন জানিতে চায়, আমাদের উকীলবাবু বিয়াল্লিশখানার বিয়াল্লিশখানাই পড়িয়াছেন কি-না। সবগুলো পড়িয়া ফেলিলে হয়ত তার অবিশ্বাস হইতে পারে ভাবিয়া

(কারণ উকীলবাবুর মাত্র বারো বছর প্র্যাক্‌টিস্ হইয়াছিল) আমি চটু করিয়া জবাব দিলাম, "না, চল্লিশখানা পড়েছেন। দু-খানা এখনও পড়ার বাকী।" সমজদারের মত মাথা নাড়িয়া ইস্‌মাইল আলী বলিয়াছিল, "তা হবে। 'ছরুৎবাবু' (শরৎবাবু এখানকার বড় উকীল) 'বিয়াল্লিছ' খানাই পড়েছেন তা হ'লে। মোক্তার 'ছাব'কে বাকী দু-খানা তাড়াতাড়ি প'ড়ে ফেলতে বলো।" এর পর হইতে উকীলবাবুর অপরিমেয় শক্তিমত্তা, অগাধ পাণ্ডিত্য এবং সূচ্যগ্র তীক্ষ্ণবুদ্ধির প্রতি ইসমাইল আলীর অখণ্ড বিশ্বাস জন্মিয়াছিল। গ্রামে ফিরিয়া পাড়া-প্রতিবেশীকে সে বুঝাইবার চেষ্টা করিত যে, হাকিমকে 'বক্তিমা' দিয়া বুঝাইতে তার উকীলের আর দ্বিতীয় নাই। ইস্‌মাইল আলীকে হরেক রকম সলা-পরামর্শ দিতে দিতে উকীলবাবুর যে বিরক্তি ধরিত না তাহা নয়, কিন্তু ক্রমাগত মুখ বাঁকাইয়া মামলাশুনানীর দিন নিজে অনুপস্থিত থাকার সম্ভাবনা জানাইতেই যখন লুকানো কাছার খুঁট হইতে একটি একটি করিয়া রৌপ্য-মুদ্রা বাহির হইতে থাকিত তখন ছিপি-খোলা কর্পূরের শিশির মত মন হইতে সব বিরক্তি উবিয়া গিয়া চোখে-মুখে চাপা হাসি ছিটকাইয়া পড়িত।

প্রায় আড়াই বছর পূর্ব্বে ইস্‌মাইল আলী নূরী বিবির উপর এক মামলা রুজু করে। উভয় পক্ষে বিবাদের বিষয় ছিল এতই হাস্যকর যে, ইহা লইয়া আদালত অপেক্ষা গল্প কিংবা কবিতা লিখিয়া মাসিক সম্পাদকের দ্বারস্থ হওয়াই বাঞ্ছনীয় মনে হইত।

ঝগড়ার মূলে এক আমগাছ। তাতে আবার এমন ফলও ধরিত না যে 'জ্যৈষ্ঠের ঝড়ে আম কুড়াবার ধুম' পড়িয়া যাইত। ইস্‌মাইল আলীর সবজী বাগান এবং নূরী বিবির ধানক্ষেতের সীমানায় একটা খুব পুরাতন আমগাছ ছিল। একদিন ইহারই ডালপালার ছায়ায় বসিয়া উভয়ের পূর্ব্বপুরুষ তামাক টানিতে টানিতে গল্প-গুজবে মাতিয়া শ্রান্তি দূর করিতেন। কিন্তু একদিন নূরী বিবি গাছ হইতে সমস্ত আম পাড়িয়া লয়। আর যায় কোথা? ফলে যদিও নূরী বিবির ভাগ্যে পুরামাত্রায় এক ঝুড়ি টোকো আম লাভ হয় নাই, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গেই ইস্‌মাইল আলী অনধিকারপ্রবেশ ও ক্ষতিপূরণের দাবি করিয়া দুই পৃষ্ঠা ব্যাপিয়া উকীলের নোটিশ একখানা নূরী বিবির নিকট পাঠাইয়া দেয়।

সেই হইতে এই আমগাছ উপলক্ষ্য করিয়া উভয় পক্ষে বহু মামলা-মোকদ্দমা গজাইয়া উঠিয়াছে। নোটিশজারির পর স্বত্ব, সীমানা, ব্যবহার স্বত্ব, জানালা-অবরোধ ইত্যাদির জন্য অনেক মামলা হইয়া গিয়াছে, কিন্তু সমস্তের মধ্যেই আমগাছটি একটি বিশিষ্ট স্থান জুড়িয়া বসিয়াছিল। বাস্তবিক পক্ষে, আমাদের নিকট ইস্‌মাইল আলী ও আমগাছ এক অবিচ্ছেদ্য সত্তায় পরিণত হইয়া গিয়াছিল। ইস্‌মাইল আলীকে আমগাছ হইতে পৃথক করিয়া দেখিবার ক্ষমতাই আমাদের সকলের লুপ্ত হইয়া পড়িয়াছিল।

তাহাকে ঘরে ঢুকিতে দেখিলেই আমরা যেমন বলিতাম— "তারপর চৌধুরী সাহেব, আমগাছের খবর কি?" (চৌধুরী বলিয়া ডাকিলে ইস্‌মাইল আলীর আনন্দের সীমা থাকিত না।) আমাদের উকীলবাবুও অমনি সাদা কাগজ টানিয়া লইয়া তার উপর একটি লাইন আঁকিতে আঁকিতে বলিতেন, "তা হ'লে, এই হ'ল আমগাছ। তার এক হাত উত্তরে... ইত্যাদি।" ইস্‌মাইল আলীও তখনই আমগাছের প্রতি লুব্ধ প্রতিবেশিনীর নিত্য-নূতন লালসার আনুপূর্ব্বিক ইতিহাস আওড়াইতে থাকিত।

কোন-না-কোন পক্ষের হার-জিতে অন্য সব মোকদ্দমা কবে শেষ হইয়া গিয়াছে, কিন্তু চরখার সুতার মত আমগাছের মামলা ক্রমশই টানিয়া চলিল। এই মোকদ্দমা এমন অস্বাভাবিক দীর্ঘকাল ধরিয়া চলার কারণ কি বলিতে পারিব না। হয়ত বা দখলের প্রশ্ন হইতে স্বত্বের প্রশ্ন আসিয়া পড়িয়াছিল কিংবা মামলা টানিয়া লম্বা করিতে পারিলে উকীলেরই লাভ। কিন্তু ইস্‌মাইল আলীর সঙ্গে দেখা হইলেই সে বলিত, "আমার আমগাছের মামলার কতদূর?"

"বেশী দেরি নয়। শুধু উকীলের তর্ক বাকী।"

"তা যখনই শেষ হোক আপত্তি নেই। কিন্তু দেখবেন মুহুরীবাবু, বিবির যাতে খুব পয়সা খরচ হয়। এক মোকদ্দমা যেঁটেই চোখে সর্ষে ফুল দেখবে, আর কি!"

ইসমাইল আলী একাগ্রচিত্তে কামনা করিত, দুনিয়ার যতকিছু আপদ-বালাই নূরী বিবির মাথায় ভাঙিয়া পড়ুক। সত্যই,—বিপত্নীক, অপুত্রক ইস্‌মাইল আলীর মূল্যবান সম্পত্তি ভোগ করিবার সে ছাড়া আর কেহই ছিল না। মানুষের সকল রকম সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যই নিরাপদে ভোগ করিবার সুযোগ

-কি ভগবান তার করিয়া দিয়াছিলেন। কিন্তু কোথা হইতে রী বিবির পেটের ভিতর এই হিংসবৃত্তি গজাইয়া উঠিল! রপর হইতেই যতসব অশান্তির উৎপত্তি! ইস্‌মাইল লীর জমির তিন দিকেই নূরী বিবির জমি। তবু যদি রস্পরে সদ্ভাব থাকিত। কিন্তু তা নয়। নূরী বিবির জমি -কি হিংস্র পশুর মত হাঁ করিয়া ইস্‌মাইল আলীর জমি গ্রাস করিতে প্রতিমুহূর্ত্ত সুযোগ খুঁজিতেছে। সীমা-নির্দ্দেশক শের বেড়া ত নয়, যেন এক পাটি ধারালো দাঁত -- কখন যে কান্ দিকে কামড়াইয়া ধরে ঠিক কি!

সীমানা ঠিক রাখার জন্য চিহ্ন বসাইতে গিয়াও প্রতি বছরই একে অন্যের খানিকটা জমি আত্মসাৎ করার চেষ্টায় ছিল। কিন্তু আমাদের মক্কেলের বদ্ধমূল ধারণাই জন্মিয়া গিয়াছিল যে, নূরী বিবির ঘরটাই না-কি তার বাড়ির দিকে ক্রমশ সরিয়া আসিতেছে। ওর চালার খড়গুলি যেন দিন দিন ধারালো হইয়া তীরের মত তার দিকে উঁচাইয়া উঠিতেছে। আর নূরী বিবির ঘরের চাল হইতেই নির্লজ্জ লাউ-কুমড়াগুলো চোরের মত নিঃশব্দে ইস্‌মাইল আলীর বেড়ার ভিতর ঢুকিয়া পড়িয়াছে।

প্রকৃতপক্ষে কে যে কাহাকে জুলুম করিতেছে এ-কথা ঠিক করিয়া বলা শক্ত। ইস্‌মাইল আলীর বর্ণনাই যে আমরা সত্য বলিয়া বিশ্বাস করিতাম, ইহা বলিলে সত্যের অপলাপ করা হয়। বাস্তবিক, কল্পিত অত্যাচারে লোকটা এতই উত্যক্ত হইয়া উঠিয়াছিল যে, জমি-বাড়ি বিক্রী করিয়া অন্যত্র চলিয়া যাইবার ইচ্ছা প্রায়ই আমাদের নিকট প্রকাশ করিত। কিন্তু সে-ইচ্ছা কার্য্যে পরিণত করিবার জন্য কখনও তাহাকে বিশেষ চেষ্টিত দেখি নাই। প্রতিবেশিনী সম্বন্ধে কত অদ্ভুত গল্পই সে বলিত! নূরী বিবির বাড়ির চারদিকে সর্ব্বদাই একটা জীন্ ঘুরিয়া বেড়ায়। সে না-কি নিজেও একটা ডাইনী। কি সব তুক্-তাক্ করিয়া সে-ই স্বামী বেচারাকে অকালে পটল তুলিতে পাঠাইয়াছিল! সব কথা মন দিয়া শুনিলে রাত্রে আমাদেরই গায় কাঁটা দিত।

ইতিমধ্যে কয়েকটি মামলাই হইয়া গেল। এই কিছুদিন আগেও নূরী বিবির একটা বাঁশ ইস্‌মাইল আলীর হদ্দের উপর শূন্যে ঝুঁকিয়া পড়িয়াছিল। মুন্সেফ বাবুর রায়ের তাড়নায় বাঁশটিকে আবার স্বস্থানে ফিরিয়া যাইতে হয়।

আমাদের মক্কেলের বেড়া হইতে দুইটি বাঁশের খুঁটি সরাইয়া নেওয়ার জন্য নূরী বিবির বিরুদ্ধে ক্ষতিপূরণের মোকদ্দমার একটি খসড়া তৈয়ার করিতে করিতে উকীলবাবু কাগজে একটা লাইন টানিয়া বলিলেন, "এই হচ্ছে আমগাছ।"

তাঁহাকে শুধরাইয়া ইস্‌মাইল আলী বলিল, " 'হচ্ছে' নয়, 'ছিল'—"

বলিতে ভুলিয়া গিয়াছি, মোকদ্দমার সাক্ষী-প্রমাণ শেষ করিয়া উকীলদের তর্ক পর্য্যন্ত দুর্ভাগা আমগাছটিকে টিকাইয়া রাখা গেল না। এক রাত্রির প্রবল ঝড়ে সে ধরাশায়ী হইতে উপড়াইয়া যায়। দু-এক দিন পরই কে গভীর নিশীথে কেরোসিন-সংযোগে তাহার সৎকার করে এবং জ্বলন্ত উল্কার মতই সে তার গৌরবময় বৃক্ষলীলা সংবরণ করে। কিন্তু ইহাতে মামলার কিছুই যায় আসে নাই। দগ্ধ বৃক্ষের অঙ্গার উপেক্ষা করিয়াই মোকদ্দমাটি স্বভাবিক শম্বুক গতিতে ধীরে-সুস্থে অগ্রসর হইতেছিল। আইন-অনুসারে নালিসের হেতু যখন একবার উদ্ভব হইয়াছে, তখন ভস্মাবশেষ আমগাছকেও খাড়া থাকিতে হইবে—শুধু খাড়া নয়, সে ডালপালা মেলিবে, ফসল ধরিবে- এবং আমগুলি পূর্ব্বের ন্যায় টক লাগিবে।

ক্ষতিপূরণের মামলার আরজী লেখার কিছুদিন পরই আবার ইসমাইল আসিয়া বৈঠকখানায় দর্শন দিল।

উকীলবাবু তাহাকে অভ্যর্থনা করিয়া বসাইয়া বলিলেন 'চৌধুরী সাহেবের মামলা অনেক দিন হ'ল রুজু হয়েছে দেখবেন, বেড়া থেকে আর কিছুই সরাবেন না। খুঁটি নিয়ে যাবার পর যেমনটি ছিল ঠিক তেম্‌নি যেন থাকে।"

"হুঁ! আমায় কাঁচা 'ছাওয়াল' ঠাউরালেন দেখছি! খুঁটি চুরি যাবার পরে বেড়া যেমন ছিল, ঠিক তেম্‌নি আছে।"

"বেশ, বেশ। কমিশনার তদন্তে গেলে সরজমির অবস্থাটা যেন হুবহু দেখে আসতে পারেন।"

ইসমাইল আলী মাতব্বরী চালে মাথা নাড়িয়া বলিল, 'কিন্তু আরেক 'গাঁইট' যে বাঁধল, মোক্তার ছাব।" এই বলিয়াই দুই হাতের দুই আঙুলে কড়া লাগাইয়া গাঁটের জটিলতা সম্বন্ধে উকীলবাবুকে চাক্ষুষ উদাহরণ দেখাইল।

উকীলবাবু জিজ্ঞাসা করিলে, "কি গাঁট?"

"বেড়ার যে জায়গা থেকে খুঁটি তুলে নিয়েছে সেখানটায় মস্ত বড় ফাঁক হওয়ায় নূরী বিবির মোরগগুলো আমার হদ্দের

ভিতর ঢুকে তরিতরকারী সব উজাড় ক'রে ফেলছে। আমার স্ত্রীও মোরগ পুষত—কি সুন্দর ছানা, 'আণ্ডা' ছিল 'রাবের' মত মিষ্টি। হাঁস, পায়রা, মোরগে আমার ওনার বেজায় শখ ছিল। কি সুন্দর গলা ফুলিয়ে তারা ডাকত! কেমন ডানা মেলে ঘুরে বেড়াত!—আর নূরী বিবিও মোরগ পুষে! শুধু পোষা নয়, হাঁস মোরগের একেবারে হাট বসিয়ে দিয়েছে। বেচে দু-পয়সা ঘরে আনবে, তা নয়, শুধু আমাকে জ্বালিয়ে পুড়িয়ে মারবে। সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত প্যাক্-প্যাক্, কোঁকর কোঁ ডাক লেগেই আছে। এই বেড়ার ফাঁকে গলা বাড়াচ্ছে, ত অই হুড়াহুড়ি করছে, না-হয় পাঁচিল ডিঙিয়ে আমার বাগানে এসে উড়ে পড়ছে! এখন আবার বেড়ায় ফাঁক পেয়ে তরি-তরকারীর মূল পর্য্যন্ত খুঁড়ে খাচ্ছে! বাগানটা যেন দুষমনগুলোর আস্তানা হয়ে উঠেছে। বন্দুকের 'লাইসিনি'র জন্য দরখাস্ত লেখাতে আপনার কাছে এসেছি। বন্দুকটা একবার হাতে পেলে হয়!—বাছারা বাগানে ঢুকেছেন কি অমনি গুড়ুম!"

"এতে লাভ? তারচেয়ে এক কাজ কর। তার হাঁস মোরগ তোমার বাগানে ঢুকলেই ধ'রে খোঁয়াড়ে দিতে থাক। এতে বিবিও পয়সা দিতে দিতে হয়রান হয়ে যাবে, তোমারও আইন বাঁচিয়ে চলা হবে।"

এই পরামর্শের অল্পদিন পরই ইসমাইল আলী অত্যন্ত উত্তেজিত হইয়া বৈঠকখানায় ঢুকিল।

উকীলবাবু জিজ্ঞাসা করিলেন, "কেমন? মোরগ সব ধরেছিলে তো?"

"ধরেছিলুম বইকি!"

"তাতে ফল কিছু হ'ল?"

"খুব হয়েছে। এই যে দেখুন—" বলিয়া ইস্মাইল আলী ফেজ খুলিয়া ফাড়া মাথাটা দেখাইল।

"তাই তো! এ যে রীতিমত লড়াই হয়ে গেছে দেখছি!"

"লড়াই ব'লে লড়াই!—ভয়ে গাঁয়ের লোক সব থ খেয়ে গেছে। মোরগগুলো ধরে নিয়ে খোঁয়াড়ে চলেছি, অমনি নূরী বিবির দলের লোক পিছন পিছন ছুটে এল। চোর ডাকাত পাজি—কত কি তো বল্লেই, তার উপর জোর ক'রে আমার হাত থেকে মোরগগুলো ছিনিয়ে নিয়ে গেল। উল্টে আমি যেমন তাড়া ক'রে গেছি, অমনি বেড়া থেকে আরেকটা খুঁটি উপড়ে আমার মাথায় বসিয়ে দিলে এক ঘা। কি বলব মোল্লার ছাব, তখন ইরাদ হ'ল,—আমার বাঁচলেই বা কি আর মরলেই বা কি! বেড়া ভেঙে আমিও একটা খুঁটি তুলে নিয়ে 'দাঁড়া ব্যাটার' বলে যেমন ছুটতে গেছি, অম্নি হা—হা ক'রে পাড়ার লোক সব এসে কোমর জাপ্টে ধরল। তা না হ'লে কি যে রক্তারক্তি কাণ্ড হয়ে যেত—উঃ!"

"বটে? আস্পর্দ্ধা তো কম নয়! এবার বাছাধনরা মজা টের পাবেন! কে কে হাঙ্গামায় ছিল, নূরী বিবি কোথায় দাঁড়িয়েছিল—ঘটনাটা একটির পর একটি বেশ ক'রে গুছিয়ে বল দিকিন্। এখখুনি একটা নালিশ লিখে দিচ্ছি। আজই ফৌজদারীতে দায়ের ক'রে ফেল। তারপর শুনানীর তারিখ পড়লে, আমি নিজে গিয়ে মামলা চালাব।"

এর পর কিছু কাল ইস্মাইল আলীর আর দেখা না পাওয়ায় আমাদের আশ্চর্য্য বোধ হইতেছিল। ইতিমধ্যে আমগাছের মোকদ্দমার রায় বাহির হইয়া গেল। ইস্মাইল আলী মামলা জিতিয়াছে।

বহুদিন পর সে যখন আবার আমাদের বৈঠকখানায় ঢুকিল, উকীলবাবু উল্লাসে তাকিয়া ছাড়িয়া উঠিয়া মোকদ্দমার রায়খানা উর্দ্ধে ঘুরাইতে ঘুরাইতে বলিলেন, "এই যে!—আসুন, আসুন, চৌধুরীসাহেব! মামলা আমরা জিতে নিয়েছি।"

কিন্তু আশ্চর্য্যের কথা, ইস্মাইল আলী এ-খবরে মোটেই উৎফুল্ল হইল না। চোখ দুটিতে হর্ষের চিহ্ন ফুটিতে-না-ফুটিতেই লজ্জা আসিয়া তাহার স্থান জুড়িয়া বসিল।

"আরে! চৌধুরীসাহেব যে লজ্জায় মাটিতে মিশে যাবেন দেখছি! আপনার হ'ল কি? মাথা-ফাড়ার ফৌজদারী মামলা হেরে গেছেন বুঝি?"

"না।"

"না? তবে কি? শুনুন, শুনুন, হাকিমের রায়খানা একবার পড়ে যাই, শুনুন। খবর শুনে বিবির টনক নড়ে যাবে। এক-দু টাকা নয়, একেবারে পঞ্চান্ন টাকা দশ আনা খরচায় ডিক্রী হয়েছে—"

"ডিক্রী তো হ'ল সত্যি—কিন্তু বড্ড দেরিতে!"

"এ দেরি কিছু নয়। মামলা করতে গেলে অমন দেরি হয়েই থাকে।"

মাথা চুলকাইতে চুলকাইতে ইস্‌মাইল আলী বলিল, "কিন্তু নূরী বিবির সঙ্গে যে আমার—"

তার মুখের কথা লুফিয়া লইয়া উকীলবাবু বলিলেন, "আপোষ হয়ে গিয়েছে বুঝি ?"

"এজ্ঞে 'আকৃত' *—"

"বল কি ? নূরী বিবির সঙ্গে ?—তোমার ?—বিয়ে ।—কিছুই যে বুঝতে পাচ্ছি নে ! খবরটা খুলে বল তো ?—"

"খবর ভালই। মাথা-ফাড়ার মামলাই তার উৎপত্তি। বিচারের ভার পড়ল ঐ বুড়ো হাকিমবাবুর উপর। আপনি নিশ্চয়ই তাকে চিনেন ?"

"চিনি না, খুব চিনি। মোকদ্দমার নথি হাতে নিয়েই দু-পক্ষকে বলবেন—আপোষ কর। কেন বাপু, এ কি জমিদারী বিচার করতে বসেছ ? এ যে ইংরেজের বিচার—চুল-চেরা তর্ক হবে, আইন নজীর ঘাঁটতে হবে, তবে তো ? তা নয়, কেবল আপোষ কর—আপোষ কর—" উকীল বাবু হাকিমের উপর অত্যন্ত চটিয়া গিয়াছিলেন।

"ঠিক, ঠিক ! বড় পুরোনো হাকিম ! কদ্দিন থেকে এখানেই হাকিমাতি করছেন, ভেবে দেখুন ! কারও নাড়ী-নক্ষত্র জানতে বাকী নেই !...তারপর সেদিনকার ঘটনাটা শুনুন। মামলার তো ডাক পড়ল। এজলাসে ঢুকে দেখি হাকিম মাথা নুইয়ে কি লিখছেন। আরদালী আমাকে আর নূরী বিবিকে পাশাপাশি দাঁড় করিয়ে রাখলে। প্রথমটা সব চুপচাপ। হঠাৎ নূরী বিবি আমার কানের কাছে মুখ এনে 'মুখপোড়া' ব'লে গালি দিলে। রাগ সামলাতে না পেরে আমিও তাকে উল্টে গালি পাড়লুম। ক্রমে হাতা-হাতির উপক্রম। গোলমাল শুনে হাকিম মুখ তুলে চাইলেন। 'চাপরাশী ! পিঞ্জরামে লে যাও' ব'লে গারদের দিকে আঙুল দেখালেন। গলা-ধাক্কা দিতে দিতে চাপরাশী আমাদের দু-জনকে কোর্ট-হাজতে নিয়ে গেল। সেখানে ঢুকে আচ্ছা ক'রে গায়ের ঝাল মিটিয়ে ঝগড়া সুরু হ'ল। কারও কোনো কেলেঙ্কারী বাদ পড়ল না। কিছু সময় পর আবার এজলাসে ডাক পড়ল। সত্যি বলতে কি, ঝগড়া ক'রে দু-জনেরই মন যেন অনেকটা হাল্কা হয়ে গিয়েছিল। আদালত-ঘরে গিয়ে দেখি, হাকিম মুচকি মুচকি হাসছেন। আমাদের দেখে হাত থেকে কলম নামিয়ে বললেন, 'কেমন ? সব বলা হয়ে গেছে ? নতুন কোন জখম হয়নি ত ? এখন দু-জনেই বাড়ি যাও। দিনরাত খুঁটিনাটি নিয়ে আর আদালতে ছুটে এসো না। এতে খরচান্ত তো হবেই, তার উপর হাঙ্গামা হুজ্জৎ বাড়ে কত !"

"ঐ হাকিমের রোগই এই। কেন বাপু ! বিচার করবে তুমি ! এই সব মাতব্বরী চালের জন্য সরকার তো আর মাইনে গুণছে না !...তারপর কি হ'ল ? যেমন ব'লে দিয়েছিলুম, তেম্‌নি মামলা চালালে ?"

লজ্জায় কাঁচুমাচু হইয়া ইস্‌মাইল আলী বলিল, "কি আর করি বলুন। হাকিমের হুকুম শুনে নূরী বিবির দিকে চাইতে গিয়ে দু-জনে ফিক্ ক'রে হেসে উঠলুম !"

দাঁতমুখ খিঁচাইয়া উকীলবাবু বলিলেন, "বেশ করেছ ! শুনে শরীর একেবারে জুড়িয়ে গেল ! এখন আমার কাছে আসা কেন ? তোমার হাকিমবাবুই বোধ করি বিয়েতে মোল্লার কাজ করবেন ?—"

"এজ্ঞে—আমরা যখন হেসে উঠলাম তখন হাকিম কাছে ডেকে বললেন, 'শোন মিঞা ! তোমার ইস্ত্রী নেই, ওরও সোয়ামী নেই। বাড়ি গিয়ে বিবিকে নিকা ক'রে ফেল।—" শুনেই নূরী বিবি এক হাত ঘোমটা টেনে এজলাসের বাহিরে চলে গেল। হাকিম হুকুম লিখলেন—আপোষে মামলা খারিজ। আমিও ভাবতে ভাবতে বাড়ি ফিরলুম। ভাবছিলুম কি যে বিবি তো দেখতে খুব খারাপ নয়। কথায় বলে,

পান, পানি, নারী
তিন-ই জৈন্তাপুরী।

তার উপর আবার কেমন গোছানো মেয়েলোক ! আমাদের জায়গাজমিও কাছাকাছি। বাড়ি ফিরে এসে বিবির ঘরের পানে ভাল রকম নজর করলুম। লাউ-কুমড়োগুলোর খুব যত্ন আত্তি নেয়, বলতেই হবে। এক একটা ইয়া মোটা ! আমার বেড়া ডিঙিয়ে পড়েছে সত্যি, কিন্তু দেখলে চোখ জুড়োয় ! মোরগগুলো জ্বালা-যন্ত্রণা দেয় বটে, কিন্তু কি পুরুষ্টু !—ঘরের দিকে চেয়ে আছি, এমন সময় হঠাৎ নূরী বিবির চোখে চোখ পড়ল। অম্‌নি বিবি জিভ কেটে ভিতরে চলে গেল। তারপর—বুঝলেন কি না—"

---

* মুসলমানদের মধ্যে 'পাকা-দেখার' প্রথা।

রাগে অগ্নিশর্ম্মা হইয়া উকীলবাবু বলিলেন,—"সব বুঝেছি! কিছু বাকী নেই! এখন আমার কাছে এসেছ কি করতে? বিয়ের কাবিন লিখে দেব না-কি?"

"এজ্ঞে না! ও-কাজ গাঁয়ের মুহুরীই সেরে নেবে। আপনার কাছে অন্য কাজে, এসেছি।"

"কি কাজ, বল।"

"আমরা দু'জনে যুক্তি ক'রে দেখলুম, এখন থেকে জায়গা-জমি সব এক হয়ে গেল। কিন্তু নূরী বিবির জমির পুবে পড়েছে সয়ফতোল্লার জোত। লোকটা ভারি পাজী। নূরী বিবির ক্ষেতের আইল দু-হাত পশ্চিমে ঠেলে পাট ফলিয়েছে। আবার নূরী বিবিরই পুকুর পাড় দিয়ে রাস্তা ক'রে বলছে, ওদিকে তার বন্দ-বস্ত রয়েছে—"

মুহূর্ত্তমধ্যে উকীলবাবু আপন গড়গড়ার জলন্ত কল্কেটা নিজ হাতে ইসমাইল আলীর ডাবা-হুঁকার মাথায় বসাইয়া দিয়া প্রায় চেঁচাইয়া উঠিলেন, "সবুর, সবুর, চৌধুরী সাহেব! ধীরে—ধীরে! সব কথাই নালিশা আর্‌জীতে লিখে নিতে হবে কি-না! আমি নিবটা বদলে নিচ্ছি, দাঁড়ান্...ওরে কে আছিস, আর একটা কল্‌কে নিয়ে আয় তো..."

তারপর কাগজে একটা লাইন টানিয়া গম্ভীর ভাবে মাথা নাড়িতে নাড়িতে বলিলেন,—

"ঠিক ঠিক...এইখানে—হ্যাঁ, এইখানেই ছিল আমগাছ।"*

* আখ্যান-ভাগ চেকোসোল্‌ভাকিয়ার লেখক চেক্‌-এর একটি গল্প হইতে গৃহীত।

স্বরাট্ স্বাধীন

শ্রীকামিনী রায়

প্রভু যার প্রাণে মন্ত্র দিয়া করিলা আপন ভাবে ভাবী,
তারে নিজ সহকর্ম্মিরূপে নিরন্তর করিছেন দাবী।
তাই তাঁর বাণী শুনিবারে নিশিদিন জাগিয়া সে রয়,
অপলক তাঁর দৃষ্টি সনে করিবারে দৃষ্টি বিনিময়
অবহিত থাকে ঊর্দ্ধমুখে। সুখ দুঃখ চরণের পাশে
ছুটিয়া লুটিয়া চলে যায়, আবার গরজি ফিরে আসে;
সে দিকে ভ্রূক্ষেপ কোথা তার? বায়ুসিন্ধু করে মাতামাতি
বজ্র লয়ে নামিছে বরষা, সব কিছু লবে শিরপাতি।
আয় ঘরে, ঘরে আয় বলি কত কেহ পিছু হতে ডাকে,
যোয়া যে রে একান্ত আপন, কারে সঁপে দিলি আপনাকে?

সিন্ধুবক্ষ বিক্ষোভিয়া আসে ঐ দেখ ঝটিকা দুর্ব্বার,
আঁধার আসিছে ঘনাইয়া, পথ খুঁজে পাবি না যে আর!
কি করিবি আঁধারে দাঁড়ায়ে, বজ্রাঘাতে মরি কিবা ফল?
যতক্ষণ দৈবের উৎপাত আরামে রহিবি গৃহে, চল।—
সে ডাক পৌঁছে না কর্ণে তার; মহাকাশে ভীমবজ্র মাঝে
প্রলয়ের অব্যক্ত সঙ্গীত ব্যক্ত হয়ে তার কানে বাজে।
ধীর শান্ত তীর গিরিসম অচল, অটল, শঙ্কাহীন
সে জন, যাহারে বিশ্বনাথ করেছেন স্বরাট্ স্বাধীন—
তাঁর প্রেমাধীন।

অবতারবাদ

শ্রীনগেন্দ্রনাথ গুপ্ত

ঈশ্বর মনুষ্য রূপে ধরাতলে অবতীর্ণ হন এ বিশ্বাস কোন কোন জাতিতে আছে। সকল ধর্ম্মে, সকল জাতিতে নাই। প্রাচীন মিসর দেশে, রোমে, গ্রীসে, চীনে অবতার মানিত না। মিসরে ফেরো-উপাধিধারী রাজাদিগকে সাক্ষাৎ-দেবতা বলিত, রোমে সীজর-বংশীয় রাজাদিগকে দেবতা বলিয়া অভিষেক করা হইত, কিন্তু এই সকল প্রাচীন দেশে একেশ্বরবাদ ছিল না।* ইহুদীদের বিশ্বাস কোন অলৌকিক ক্ষমতাশালী পুরুষ মেসায়ারূপে অবতীর্ণ হইবেন। মেসায়া অর্থে তৈলদ্বারা অভিষিক্ত। ইহুদীরা যে অবতার মানে, মনুষ্য আকারে ঈশ্বরের আবির্ভাব, এরূপ মনে হয় না। মূসা, ডানিয়েল, জেরিমায়া, ইহারা ভবিষ্যদ্দর্শী সিদ্ধপুরুষ হইতে পারেন, কিন্তু ঈশ্বরের অবতার নহেন। ইহুদীদের ধর্ম্মে কোন অভিনব অভিমত প্রচারিত হইবারও সম্ভাবনা নাই। জাতি-হিসাবে ইহুদীরা অত্যন্ত দীর্ঘজীবী। প্রাচীন মিসর দেশে ইহারা দাসত্ব করিত, মিসরের রাজপুরুষেরা ইহাদিগকে অত্যন্ত উৎপীড়ন করিত, মূসা ইহাদিগকে দাসত্ব হইতে মুক্ত করেন। গ্রীক ও রোমান অপেক্ষা ইহুদী প্রাচীন জাতি। মিসরবাসী, গ্রীক, রোমান সকলেই লুপ্ত হইয়াছে, ইহুদী জাতি লুপ্ত হয় নাই কিন্তু ছত্রভঙ্গ হইয়া জগতের সর্ব্বত্র বিক্ষিপ্ত হইয়া পড়িয়াছে। ইহাদের ধর্ম্মের নূতন বিকাশ হইবার কিছুমাত্র সম্ভাবনা নাই। খৃষ্টিয়ানেরা যিশুখৃষ্টকে মেসায়া ও ঈশ্বরের পুত্র বলিয়া স্বীকার করেন। মনুষ্যলোকে দেবতাদিগের অপত্য উৎপন্ন হইত এ বিশ্বাস অপর জাতির মধ্যেও ছিল, কিন্তু যিশু স্বয়ং ঈশ্বরের পুত্র। যিশু নিজেকে সর্ব্বদা মানব-সন্তান বলিতেন, খৃষ্টানদের মতে তিনি ঈশ্বরের পুত্র, অর্থাৎ অবতার। তিনি একমাত্র অবতার, যে-ধর্ম্ম তিনি প্রচার করিয়াছিলেন তাহাতে আর কোন অবতার আবির্ভূত হইতে পারেন না। ইসলাম ধর্ম্মে অবতার হইতেই পারে না। ইসলামে দীক্ষিত হইবার জন্য যে কলমা আবৃত্তি করিতে হয় তাহাতে ঈশ্বরের নামের সঙ্গে পয়গম্বর মহম্মদের নামের উল্লেখ আছে বটে, কিন্তু মহম্মদ যে ঈশ্বরের প্রেরিত পুরুষ, অবতার নহেন, তাহা স্পষ্টাক্ষরে বলা হইয়াছে—লা ইলাহা ইল্লিল্লা মহম্মদ রসূল অল্লাহ্—ঈশ্বর ব্যতীত ঈশ্বর নাই, মহম্মদ ঈশ্বরের প্রেরিত পুরুষ (রসূল)। রসূল অথবা হবীব শব্দের অর্থে পয়গম্বর। পয়গাম শব্দের অর্থ সংবাদ; যিনি ঈশ্বরের সংবাদ আনয়ন করেন তিনি পয়গম্বর। বৌদ্ধধর্ম্মে ঈশ্বরবাদ নাই, সুতরাং অবতারের কোন কথা নাই। কলমার ন্যায় বৌদ্ধধর্ম্মের দীক্ষামন্ত্রে বুদ্ধের নাম আছে:—

> বুদ্ধং সরনং গচ্ছামি
> ধম্মং সরনং গচ্ছামি
> সংঘং সরনং গচ্ছামি।

এই মন্ত্রে বুদ্ধ দেবতা নহেন, লোকগুরু। বৌদ্ধধর্ম্ম অবলম্বন করিতে হইলে বুদ্ধ, ধর্ম্ম ও সংঘের শরণাপন্ন হইতে হইবে।

বিবেচনা করিয়া দেখিলে একমাত্র ভারতবর্ষেই অবতারবাদে সাধারণ বিশ্বাস দেখিতে পাওয়া যায়। অগ্নি-উপাসক পার্সি-সম্প্রদায় জারাথুস্ট্রকে অবতার বলেন না, পয়গম্বর বলেন। হিন্দুদের যেমন অবতারে বিশ্বাস এমন আর কোন জাতিতে নাই। হিন্দু নামটি যেমন আধুনিক অবতারবাদও সেইরূপ আধুনিক। যাহারা হিন্দু বলিয়া পরিচয় দেন তাঁহারা হিন্দু শব্দের উৎপত্তি সম্বন্ধে কিছু জানেন? কোন প্রাচীন অথবা অপেক্ষাকৃত আধুনিক সংস্কৃত গ্রন্থে হিন্দু শব্দ নাই। উহা সংস্কৃত শব্দই নয়। হিব্রু, জেন্দ, ফার্সি, পশ্‌তো ভাষায় হিন্দু শব্দের উৎপত্তি পাওয়া যায়, সংস্কৃতে নাই। আর্য্যধর্ম্মের প্রথম অবস্থায়, অর্থাৎ বৈদিক যুগে, অবতারের কোন উল্লেখ নাই। শ্রুতি অথবা স্মৃতিতে কোথাও অবতারের নামগন্ধ নাই। উপনিষদে

* একজন একেশ্বরবাদী মিসর-নৃপতির উল্লেখ ইতিহাসে পাওয়া যায়।

ঈশ্বরের ধারণা এত গভীর, এত সূক্ষ্ম যে তাহাতে অবতারবাদের স্থান নাই। সকল জাতির ধর্ম্মগ্রন্থে ঈশ্বরের কল্পনা একপ্রকার নয়। যে-জাতির চিন্তা বা ধ্যানশক্তি যেমন, সে জাতির ঈশ্বরের ধারণাও সেইরূপ। উপনিষদে যেমন নির্গুণ ব্রহ্মের প্রস্তাবনা, এরূপ আর কোন গ্রন্থে দেখিতে পাওয়া যায় না। উপনিষদের ব্রহ্মন্ এবং বাইবেল ও কোরাণের ঈশ্বর স্বতন্ত্র, অর্থাৎ ধারণা অন্য রূপ।

ব্রহ্মন্ কিরূপ?

যচ্চক্ষুষা ন পশ্যতি যেন চক্ষূংষি পশ্যতি।
যচ্ছ্রোত্রেণ ন শৃণোতি যেন শ্রোত্রমিদং শ্রুতম্।
তদেব ব্রহ্ম ত্বং বিদ্ধি নেদং যদিদমুপাসতে॥

যাঁহাকে চক্ষু দেখিতে পায় না কিন্তু যাঁহার কারণে চক্ষু দেখিতে পায়, যাঁহাকে কর্ণ শ্রবণ করে না কিন্তু যাঁহার কারণে শ্রবণ শুনিতে পায় তাঁহাকেই ব্রহ্ম বলিয়া জানিবে।

ব্রহ্ম সম্বন্ধে এরূপ গূঢ় ও গুহ্য অনুভূতি বাইবেল অথবা কোরাণে দেখিতে পাওয়া যায় না। বাইবেলের পূর্ব্বাংশে কথিত আছে, ঈশ্বর অপরাহ্নকালে পাদচারণ করিতেছেন, আদম এবং হবা নগ্ন অবস্থায় আছেন অথবা লজ্জা-বস্ত্ররূপে ডুম্বুর পত্রের কৌপীন পরিধান করিয়াছেন কি-না তাহা লক্ষ্য করিতেছেন। বাইবেলের ঈশ্বর উপনিষদের ব্রহ্ম নহেন।

বৈদিক যুগে আর্য্যজাতি অবতার জানিত না। ঋষিদিগের মধ্যে অনেকে মহাপুরুষ কিন্তু কাহাকেও অবতার অথবা সাক্ষাৎ ঈশ্বর বলা হইত না। যাগযজ্ঞের সমারোহ ছিল, কিন্তু অবতারবাদ ছিল না, মূর্ত্তিপূজাও ছিল না। পৌরাণিক যুগে এই দুইয়ের আরম্ভ। অবতারবাদের মধ্যে দশাবতারই প্রশস্ত। জয়দেব গোস্বামী এবং শঙ্করাচার্য্য দশাবতার স্তোত্র রচনা করিয়াছেন।

প্রথম তিন অবতার মৎস্য, কূর্ম্ম ও বরাহ। ইহার অর্থ কি? ইহা বিবর্ত্তনবাদ অথবা জীবসৃষ্টি-প্রকরণের পর্য্যায়। বিজ্ঞানশাস্ত্রে ইহাকেই ইভোলিউশন বলে। মৎস্য, কূর্ম্ম ও বরাহের কেহ পূজা করে না, অথচ জন্তুর যে উপাসনা হয় না তাহাও বলিতে পারা যায় না। প্রাচীন মিসর জাতি সুসভ্য, ক্ষমতাশালী, অসামান্য কুশলী। তাহারা কুম্ভীর পূজা করিত, কুম্ভীরের মুখে জীবন্ত মনুষ্য ভোগ দিত। ইহা এক প্রকার নরবলি। হিন্দুরা গোমাতার পূজা করেন। মূর্ত্তিপূজা পুরাকালে অনেক সভ্য জাতির মধ্যে প্রচলিত ছিল। মিসরে, ফিনিশিয়ায়, বাবিলনে, গ্রীসে, দেবদেবীর মূর্ত্তি গঠিত ও পূজিত হইত। কোন কোন জাতিতে নরবলিরও প্রথা ছিল। উপাসনার আধার নানাবিধ। জীবজন্তুর পূজা ত আছেই, তাহা ছাড়া মানুষ স্বহস্ত-নির্ম্মিত মৃত্তিকা, পাষাণ অথবা ধাতুনির্ম্মিত মূর্ত্তিকেও দেবতা বলিয়া পূজা করে। অনেক মূর্ত্তির পূজা করিয়া তাহাদিগকে বিসর্জ্জন করে।

অবতারবাদের সূচনা পৌরাণিক যুগে। এ যুগে ব্রহ্মের কল্পনা তিরস্করণীর অন্তরালে অবস্থিত, ত্রিমূর্ত্তির প্রতিষ্ঠাই প্রবল। ব্রহ্মা, বিষ্ণু অথবা মহেশ্বর ইঁহাদের কেহই ব্রহ্ম নহেন। ইঁহারা দেবতা কিন্তু ইঁহাদিগের স্থান ব্রহ্মের নীচে। যিনি উপনিষদোক্ত একমেবাদ্বিতীয় তাঁহার পার্শ্বে আর কাহারও স্থান নাই। পুরাণেও ব্রহ্মা অথবা মহেশ্বরের অবতারের কোন উল্লেখ নাই, একমাত্র বিষ্ণুর অবতারের কথা আছে। এক সম্প্রদায়ের মতে শঙ্করাচার্য্য মহাদেবের অবতার কিন্তু সে মত আধুনিক, পৌরাণিক নহে। পৌরাণিক মতে ব্রহ্মা অথবা মহেশ্বরের অবতার নাই। যে দশ অবতারের উল্লেখ আছে তাঁহারা সকলেই বিষ্ণুর অবতার।

একমাত্র ভগবদ্গীতায় অবতারবাদের বিস্তারিত ও বিশদ ব্যাখ্যা দেখিতে পাওয়া যায়। সেই ব্যাখ্যা অনুসারে অবতারবাদ বিচার করিতে হয়। অবতারের আবির্ভাবের কি কারণ এবং কোন্ সময় অবতার ধরাতলে জন্মগ্রহণ করেন গীতায় তাহা স্পষ্টাক্ষরে কথিত হইয়াছে।

যদা যদাহি ধর্ম্মস্য গ্লানির্ভবতি ভারত।
অভ্যুত্থানমধর্ম্মস্য তদাত্মানং সৃজাম্যহম্॥
পরিত্রাণায় সাধূনাং বিনাশায় চ দুষ্কৃতাম্।
ধর্ম্ম সংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে॥

হে ভারত, যে-যে সময়ে ধর্ম্মের হানি হয় এবং অধর্ম্মের প্রাদুর্ভাব হয় সেই সময়ে আমি আপনাকে সৃষ্টি করি। সাধুদিগের রক্ষার জন্য, দুষ্টদিগের বিনাশের নিমিত্ত এবং ধর্ম্মের সংস্থাপনের নিমিত্ত আমি প্রতি যুগে অবতীর্ণ হইয়া থাকি।

ইহা হইতে বুঝিতে হইবে যে, ধর্ম্মের গ্লানি অথবা হানি না হইলে অবতারের আবির্ভাব হইবে না এবং এই আবির্ভাবের নির্দ্দিষ্ট কাল ব্যবধান আছে। যুগ বলিতে চারি যুগ বুঝায় না, কারণ তাহা হইলে অবতারের সংখ্যা চারের অধিক হয় না। অথচ যুগে যুগে বলিতে দীর্ঘকালের ব্যবধান বুঝায়, যখন-তখন অবতার ভূমিষ্ঠ হইতে পারেন না।

অবতার সম্বন্ধে গীতায় যে নিয়ম উক্ত হইয়াছে প্রথম তিন অবতারে সে নিয়ম পালিত হইতে পারে না, কারণ কূর্ম অথবা বরাহের দ্বারা ধর্ম সংস্থাপিত অথবা দুষ্টের দমন এবং সাধুর পরিত্রাণ হয় না। চতুর্থ অবতারও মানবাকৃতি নয়, নৃসিংহ। হিরণ্যকশিপু সেই মূর্ত্তি দেখিয়া বলিয়াছিল, "অহো এ কি আশ্চর্য্য! এ মৃগও নহে, মনুষ্যও নহে, কোন্ প্রাণী?" নরসিংহ অবতার হিরণ্যকশিপুকে সংহার করিয়া, প্রহ্লাদকে অভয় ও বর প্রদান করিয়া অন্তর্হিত হইলেন, আর কোন ক্রিয়া সাধন করেন নাই।

বামন অবতারের রহস্য অত্যন্ত জটিল। দৈত্যরাজ বলি স্বীয় পরাক্রমে ও বলবীর্য্যে ইন্দ্র প্রভৃতি দেবতাদিগকে পরাভব করিয়া ত্রৈলোক্যের অধিপতি হইলেন। কিন্তু বলি যে ধর্ম-লোপ করিয়াছিলেন, অথবা ধর্ম্মের হানি করিয়াছিলেন এমন কথার উল্লেখ ভাগবতে কিংবা অপর কোন গ্রন্থে নাই। বলি সত্যবাদী, তাঁহার তুল্য দাতা কেহ ছিল না। বলি কর্ত্তৃক পরাভূত হইয়া ইন্দ্রাদি দেবগণ বিষ্ণুর শরণাপন্ন হইলেন। বিষ্ণু ইচ্ছা করিলে বলপূর্ব্বক বলিকে পরাভব করিয়া স্বর্গরাজ্য পুনরায় ইন্দ্রকে অর্পণ করিতে পারিতেন। কিন্তু তিনি বল-প্রয়োগ করিলেন না, ছল অবলম্বন করিলেন। অদিতির গর্ভে বামন-রূপে অবতীর্ণ হইলেন। বলিরাজের যজ্ঞস্থলে উপনীত হইয়া যে-সময় বামন-রূপী বিষ্ণু ত্রিপাদ ভূমি প্রার্থনা করিলেন তখন দৈত্যগুরু শুক্রাচার্য্য তপোবলে প্রকৃত তথ্য জানিতে পারিয়া বলিকে নিষেধ করিয়াছিলেন, বলিয়াছিলেন এই মায়া-রূপী বামন স্বয়ং বিষ্ণু, ত্রিপাদ ভূমি গ্রহণ করিবার কৌশলে তিন পদে তিন লোক আক্রমণ করিবেন, তুমি সর্ব্বস্বান্ত হইবে। বলি সগর্ব্বে উত্তর করিলেন, আমি প্রহ্লাদের পৌত্র, যাহা বলিয়াছি তাহা কখন মিথ্যা হইবে না, অঙ্গীকার পালন করিব। বামন বিশ্বরূপ ধারণ করিয়া দুই পদ বিক্ষেপে সমস্ত স্বর্গমর্ত্ত্য পরিব্যাপ্ত করিলে তৃতীয় পদক্ষেপের স্থান রহিল না। বলি বরুণপাশে বদ্ধ হইলেন। বামনরূপী বিষ্ণুর আদেশে বলি প্রবঞ্চনা ও মিথ্যা কথার অপরাধে নরকবাসে দণ্ডিত হইলেন। বলি যে নিজে বঞ্চিত হইয়াছেন সে অনুযোগ তিনি করিলেন না। তাঁহার এক মাত্র ভয় পাছে তাঁহার প্রতিশ্রুতি মিথ্যা হয়, তাঁহার অঙ্গীকার পালিত না হয়। বন্ধনে অথবা নরকগমনে তাঁহার কিছু মাত্র আশঙ্কা ছিল না। অবিচলিত চিত্তে বলি বিষ্ণুকে বলিলেন, আমি মিথ্যা বলি নাই, আমার বাক্য বঞ্চনাবাক্য নহে। আপনি আপনার তৃতীয় পদ আমার মস্তকে স্থাপন করুন। আপনি আমার প্রতি যে দণ্ড বিধান করিয়াছেন তাহা অনুগ্রহ। বলির উত্তর প্রহ্লাদের পৌত্রের উপযুক্ত।

বলিকে বামন-রূপী বিষ্ণু মিথ্যাবাদী ও বঞ্চনাকারী বলিয়াছিলেন। উভয় অনুযোগই অমূলক। বলি মিথ্যা কথা বলেন নাই, প্রবঞ্চনাও করেন নাই। বিষ্ণুই বামনাকার ধারণ করিয়া বলিকে ছলনা করিয়াছিলেন। বলি খর্ব্বকায় বামনকে ত্রিপাদ মাত্রা ভূমি দান করিতে স্বীকার করিয়া-ছিলেন, বিশ্বব্যাপী বিশ্বরূপ বিষ্ণুকে ভূমি দিতে অঙ্গীকার করেন নাই। ত্রিবিক্রমকে বলি স্বচ্ছন্দে বলিতে পারিতেন, আপনি বিশ্বরূপ প্রতিসংহার করুন। যে মূর্ত্তি ধারণ করিয়া আপনি আমার নিকট ত্রিপাদ ভূমি প্রার্থনা করিয়াছেন সেই আকারে আমি আপনাকে দান করিতে স্বীকার করিয়াছি, অন্য রূপ প্রতিগ্রহ করিয়া আপনি তাহার অধিক ভূমি অধিকার করিতে পারেন না। আপনি বামন-মূর্ত্তিতে দানপ্রার্থী হইয়া আমাকে বঞ্চনা করিয়াছেন। এ-কথার উত্তরে বিষ্ণু কি বলিতে পারিতেন? বলিকে ছলনা করাই তাঁহার উদ্দেশ্য, সেই কারণেই তিনি ক্ষুদ্রমূর্ত্তি বামন হইয়া আসিয়াছিলেন। ছলনা ও বঞ্চনা করা কি অবতারের কর্ত্তব্য? বলির বিরুদ্ধে এক মাত্র অভিযোগ তিনি বলপূর্ব্বক ইন্দ্রের স্বর্গরাজ্য গ্রহণ করিয়াছিলেন। এরূপ চিরকাল হইয়া থাকে। বলবান দুর্ব্বলের সম্পত্তি কাড়িয়া লয়। দেবতা-দিগকে সহায়তা করাই যদি বিষ্ণুর অভীষ্ট তাহা হইলে তিনি ন্যায়যুদ্ধে বলিকে পরাজয় করিয়া ইন্দ্রের রাজ্য ইন্দ্রকে অর্পণ করিলেন না কেন? ছদ্মমূর্ত্তিতে ভিক্ষার ছলনা করিয়া দৈত্যরাজকে বঞ্চনা করিলেন কেন? বলি দুষ্টপ্রকৃতি বা অধর্ম্মাচারী এরূপ অপবাদ ছিল না। তিনি মহদাশয়, দানে মুক্তহস্ত, সত্যপ্রিয়, মিথ্যাকে ঘৃণা করিতেন, ইহার যথেষ্ট পরিচয় রহিয়াছে। বামন-অবতারে গীতায় কথিত অবতারের কার্য্যের সার্থকতা কিরূপে সিদ্ধ হইল তাহা বুঝিতে পারা যায় না। কাহাকেও ছলনা করা অবতারের অযোগ্য, কারণ ইহা খলের আচরণ। বামন অবতারে বলিকে ছলনা করিয়া নির্যাতন করা ব্যতীত বিষ্ণু ধর্ম সংস্থাপনের অবকাশ

দুষ্টের দমন ও সাধুদিগের পরিত্রাণের নিমিত্ত কিছুই করেন নাই।

তাহার পর পরশুরাম অবতার। জয়দেবের বর্ণনা—

> ক্ষত্রিয়রুধিরময়ে জগদপগতপাপম্।
> স্নপয়সি পয়সি শমিতভবতাপম্।
> কেশব ধৃত ভৃগুপতিরূপ জয় জগদীশ হরে॥

পরশুরাম অবতার হইয়া কি করিয়াছিলেন? কিরূপে দুষ্টের শাসন সাধুর পরিত্রাণ এবং ধর্ম্ম সংস্থাপন করিয়াছিলেন? রাজা কার্ত্তবীর্য্যার্জ্জুন পরশুরামের পিতা জমদগ্নিকে বধ করেন। এই এক ক্ষত্রিয়ের অপরাধে পরশুরাম বার-বার ধরণীকে নিঃক্ষত্রিয় করেন। যথার্থই যে পৃথিবী একেবারে ক্ষত্রিয়শূন্য হইয়াছিল তাহা নহে, কেন-না, তাহা হইলে রাজা দশরথ, জনক বা অপর কোন ক্ষত্রিয় রক্ষা পাইতেন না। মিথিলাতে বিবাহ করিয়া রামচন্দ্র যে-সময় পিতা দশরথের সহিত অযোধ্যায় ফিরিতেছেন সেই সময় পরশুরামের সহিত পথে দেখা হয়। পরশুরামের আকৃতি সৌম্য শান্ত ঋষিমূর্ত্তি নহে, ভীমাকারং কালাগ্নিমিব দুঃসহম্। স্কন্ধে কুঠার, হস্তে বিদ্যুৎপুঞ্জসমপ্রভ ধনু ও একটি ভীষণ শর। জামদগ্ন্য রাম দাশরথি রামকে বলিলেন, তোমার বীর্য্যের ও হরধনুর্ভঙ্গের বিষয় সমস্তই আমি শুনিয়াছি। তুমি এই ধনুকে এই শর সংযোগ করিয়া স্বীয় বল প্রদর্শন কর। তুমি এই ধনু আকর্ষণ করিতে পারিলে আমি তোমার সহিত দ্বন্দ্বযুদ্ধ করিব। রাজা দশরথ ভীত হইয়া পরশুরামকে এই নির্ম্মম সঙ্কল্প হইতে নিবৃত্ত হইবার নিমিত্ত অনুনয় করিলেন কিন্তু পরশুরাম তাঁহার কথায় কর্ণপাত করিলেন না, রামকে সম্বোধন করিয়া আত্মশ্লাঘা করিতে লাগিলেন। বলিলেন, আমি পিতৃবধ সংবাদ শ্রবণে ক্রুদ্ধ হইয়া অনেক বার ক্ষত্রিয় জাতি উৎসন্ন করিয়াছি। এমন কি, সদ্যোজাত ও গর্ভস্থ ক্ষত্রিয় বালক পর্য্যন্ত বিনাশ করিয়াছি।

ভ্রূণঘাতী পরশুরামও অবতার!

রামচন্দ্র সেই ধনু গ্রহণ করিয়া তাহাতে অবলীলাক্রমে জ্যা আরোপণ করিয়া শরযোজনা করিয়া পরশুরামকে বলিলেন, তুমি ব্রাহ্মণ, এজন্য তোমাকে হত্যা করিব না। কিন্তু তোমার গতিশক্তি অথবা তোমার তপোর্জ্জিত অপ্রতিম লোক বিনাশ করিব। দুর্দ্দর্প পরশুরাম জড়ীভূত হইয়া রামচন্দ্রকে মিনতি করিয়া কহিলেন, আমার গতিশক্তি বিনাশ করিবেন না, আমি তপোবলে যে সকল অপ্রতিম লোক অর্জ্জন করিয়াছি তৎসমুদয় ঐ দিব্য বাণ দ্বারা শীঘ্র নিহত করুন। আমি বুঝিলাম যে আপনি অক্ষয় মধুহন্তা সুরেশ্বর বিষ্ণু।

যদি রামচন্দ্র বিষ্ণুর অবতার তাহা হইলে পরশুরাম কাহার অবতার? ঘোর প্রতিহিংসা সাধন ব্যতীত পরশুরাম আর কিছুই করেন নাই। পরশুরাম ভীষণ সংহারমূর্ত্তি, ক্ষত্রিয়-নিধন ব্যতীত তিনি জগতের কোনরূপ মঙ্গল সাধন করেন নাই। পরশুরাম অবতার হইলে জঙ্গীস খাঁ এবং নাদীর শাহকে অবতার বলিলে দোষ কি? বিশেষ এক অবতার বর্ত্তমান থাকিতে আর এক অবতারের আবির্ভাব হইবার কথা গীতায় উক্ত হয় নাই। যুগে যুগে স্বতন্ত্র মূর্ত্তির সম্ভব হইবে, গীতায় ইহাই কথিত হইয়াছে। যুগপৎ দুই অবতারের উল্লেখ নাই। এরূপ হইবার কোন প্রয়োজনও নাই।

রামায়ণে লিখিত আছে রাম বিষ্ণুর অর্দ্ধাংশ, সর্ব্বলোক-নমস্কৃতং বিষ্ণোরর্দ্ধং। ভরত বিষ্ণুর চারি অংশের একাংশ কিন্তু তাঁহাকে কেহই অবতার বলে না। আদি কবি বাল্মীকির মহাকাব্যে রামের অলৌকিক চরিত্র আদ্যোপান্ত বর্ণিত হইয়াছে। উত্তর-ভারতে প্রতি বৎসর রামলীলা অভিনীত হয়। রামনাম উচ্চারণ করিয়া লোকে রসনা পবিত্র করে, মুমূর্ষুর কর্ণে রাম নাম শোনায়।

রামাবতারের পর কৃষ্ণাবতার। দশাবতারের মধ্যে শ্রীকৃষ্ণের নাম নাই। জয়দেবের স্তোত্রে সকলেই কেশব অর্থাৎ বিষ্ণুমূর্ত্তি। বলরাম অবতার কথিত হইয়াছেন।

> বহসি বপুষি বিশদে বসনং জলদাভম্।
> হলহতিভীতি মিলিত যমুনাভম্।
> কেশব ধৃত হলধররূপ জয় জগদীশ হরে॥

বলরাম অবতারের কোনরূপ বিশেষত্ব প্রকাশ করেন নাই। তাঁহার অলৌকিক শক্তির একমাত্র প্রমাণ তিনি হলের মুখে যমুনাকে আকর্ষণ করিয়াছিলেন। নদী কেন, মনুষ্যের কৌশলে সমুদ্রও নূতন খাদে প্রবাহিত হয়। লেসেপ্স সুয়েজ ও পানামা নহর নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। তাঁহাকে কি অবতার বলিতে হইবে?

বুদ্ধদেবকে অবতার স্বীকার করিয়া আর্য্যজাতি উদারতার পরিচয় দিয়াছেন। বুদ্ধ সনাতন ধর্ম্মবিদ্বেষী জাতিভেদ বর্জ্জিত, বেদবিধির নিন্দা করিতেন, ব্রাহ্মণের প্রাধান্য স্বীকার করিতেন না,

দেবতা মানিতেন না, নিজের সম্প্রদায়ের মধ্যে জাতিবিচার লোপ করিয়াছিলেন। বুদ্ধদেব পরলোকগত হইলে বৌদ্ধদিগকে-কিরূপ পীড়ন করা হইত তাহা সকলেই জানেন। শঙ্করাচার্য্যের দিগ্বিজয়ের পর কুমারিলভট্টের উত্তেজনায় শত শত নিরপরাধী বৌদ্ধ ভিক্ষুদিগকে নৃশংসভাবে হত্যা করা হয়। ক্ষপণক বিদ্রূপাত্মক শব্দ, বৌদ্ধ সন্ন্যাসীকে ক্ষপণক বলিত। মনুসংহিতায় বৌদ্ধ ব্রহ্মচারিণীর সহিত ব্যভিচার করিলে অপরাধীর লঘু দণ্ডের বিধি আছে। বৌদ্ধধর্ম ভারত হইতে নির্ব্বাসিত হইয়াছে। বুদ্ধ অবতার হইলেও তাঁহার উপাসনা হিন্দুধর্ম্মে নিষিদ্ধ।

দশাবতারে ভবিষ্যতে একমাত্র অবতারের উল্লেখ আছে। তিনি কল্কী অবতার।

> ম্লেচ্ছনিবহনিধনে কলয়সি করবালং।
> ধূমকেতুমিব কিমপি করালম্।
> কেশব ধৃত কল্কী শরীর জয় জগদীশ হরে॥

ধূমকেতুর তুল্য করালমূর্ত্তি কল্কী ম্লেচ্ছসমূহকে নিধন করিবার নিমিত্ত অবতীর্ণ হইবেন।

অবতারদিগের মধ্যে রামচন্দ্র ও শ্রীকৃষ্ণ ব্যতীত আর কাহারও পূজা হয় না। প্রথম তিন অবতারকে ছাড়িয়া দিয়া নৃসিংহ, বামন, পরশুরাম ও হলধরের পূজা কুত্রাপি দেখিতে পাওয়া যায় না।

রামায়ণে রামচন্দ্রকে বিষ্ণুর অর্দ্ধাংশ নির্দ্দেশ করা হইয়াছে কিন্তু গীতায় শ্রীকৃষ্ণ নিজেকে সাক্ষাৎ ব্রহ্ম বলিয়া পরিচয় দিয়াছেন। শ্রীকৃষ্ণ বলিতেছেন,

> যস্মাৎ ক্ষরমতীতোঽহমক্ষরাদপি চোত্তমঃ।
> অতোঽস্মি লোকে বেদে চ প্রথিতঃ পুরুষোত্তমঃ॥

আমি ক্ষর হইতে অতীত এবং অক্ষর হইতে পরমোৎকৃষ্ট এইজন্য লোক ও বেদ মধ্যে আমার নাম পুরুষোত্তম বলিয়া প্রসিদ্ধ।

দিব্যচক্ষু প্রাপ্ত হইয়া কৃষ্ণের বিশ্বরূপ দর্শন করিয়া অভিভূত-চিত্তে অর্জ্জুন বলিতেছেন,

> ত্বমক্ষরং পরমং বেদিতব্যম্
> ত্বমস্য বিশ্বস্য পরং নিধানম্।
> ত্বমব্যয়ঃ শাশ্বত ধর্ম্মগোপ্তা
> সনাতনস্ত্বং পুরুষো মতো মে॥

তুমি পরম অক্ষর ও তুমিই জ্ঞাতব্য, তুমি এই জগতের পরম আশ্রয় ও তুমি অব্যয়, তুমি নিত্যধর্ম্ম প্রতিপালক এবং তুমিই সনাতন পরমাত্মা পুরুষ ইহাতে কিছুমাত্র সংশয় নাই।

রামচন্দ্র ও কৃষ্ণের চরিত্রের তুলনা করিলে অনেক প্রভেদ লক্ষিত হয়। রাম নিতান্ত সরল প্রকৃতি, সত্যপ্রাণ, প্রজাবৎসল। কৃষ্ণ অলৌকিক কর্ম্মা কিন্তু অসাধারণ বিষয়বুদ্ধি-সম্পন্ন, মন্ত্রণায় কুশলী, রাজধর্ম্মে তাঁহার গভীর অভিজ্ঞতা।

গীতা মূল মহাভারতের অংশ কিংবা পরে সংযোজিত হইয়াছে এ-প্রবন্ধে সে-কথা বিচার্য্য নহে। কিন্তু গীতা যে বুদ্ধদেবের পরে রচিত, তাহার প্রমাণ গীতাতেই পাওয়া যায়। কর্ম্মবাদ বুদ্ধদেবের আবিষ্কৃত বা তাঁহার কর্ত্তৃক প্রথম প্রচারিত নহে। কিন্তু তাঁহার শিক্ষার মূলে এই মত যে জীব নিজের চেষ্টা ব্যতীত কর্ম্মফল হইতে মুক্ত হইতে পারে না এবং স্বোপার্জ্জিত কর্ম্মফল আর কাহাকেও অর্পণ করিতে পারে না। জীবন ও মৃত্যু উভয়ই ক্লেশকর কিন্তু কর্ম্মের শেষ না হইলে জীবন্মুক্তি হইতে পারে না। কর্ম্ম একেবারে ক্ষয় হইলে জীব নির্ব্বাণ লাভ করে। গীতায় প্রচারিত নিষ্কাম কর্ম্ম অতি মহৎ আদর্শ, কিন্তু এই শিক্ষা দ্বারা বুদ্ধদেবের মত খণ্ডিত হয়। ফলের কামনা না করিয়া, ফলের প্রতি কোন লক্ষ্য না রাখিয়া, মানুষ কর্ম্ম আচরণ করিবে এবং কর্ম্মফল শ্রীকৃষ্ণে অর্পণ করিবে এই শিক্ষা মহৎ হইলেও ইহা দ্বারা মানুষের নিজের দায়িত্ব লাঘব হয়, ফলাফলের বিচারের চিন্তা তাহাকে করিতে হয় না, মুক্তির ভাবনা তাহাকে ভাবিতে হয় না।

কালক্রমে অবতারবাদ অত্যন্ত শিথিল হইয়া আসিয়াছে। পৌরাণিক প্রথম যুগে অবতার বলিতে বিষ্ণুর অবতার বুঝাইত, ব্রহ্মের নহে। রামায়ণের মতে রামচন্দ্র বিষ্ণুর আংশিক অবতার, পূর্ণাবতার নহেন। গীতাতে শ্রীকৃষ্ণ আপনাকে ব্রহ্ম হইতে অভিন্ন বলিয়াছেন। এখন আর অবতারের সংখ্যা নির্দ্দিষ্ট নাই, অবতারের আবির্ভাবেরও কালাকালের স্থিরতা নাই। অবতারের লক্ষণও বিশেষ সূক্ষ্মভাবে পরীক্ষিত হয় না। এক সম্প্রদায় যাহাকে অবতার বলিয়া স্বীকার করে, অপর সম্প্রদায় তাহা করে না। বলা বাহুল্য যে অবতারে ও সাধারণ মনুষ্যে শারীরিক কোন প্রভেদ নাই। মানুষ যেমন জন্মজরামৃত্যুর অধীন অবতারও সেইরূপ। অবতারের এমন কোন অলৌকিক শক্তি নাই যাহার বলে তিনি দৈহিক নিয়ম লঙ্ঘন করিতে পারেন।

বৈদিক ও ঔপনিষদিক যুগে অবতারের কল্পনা ছিল না। উপনিষদে যে ব্রহ্মের উল্লেখ আছে, তিনি বাক্য ও কল্পনার অতীত, অরূপ, অমূর্ত্ত, নিরাকার। তিনি মানব দেহ পরিগ্রহ করিয়া ধরাতলে অবতীর্ণ হইবেন ইহা কল্পনার অগোচর। যিনি ইচ্ছাময় তাঁহার ইচ্ছাতেই ধর্ম্মের সংস্থাপন, শিষ্টের পালন ও দুষ্টের দমন হইতে পারে। এজন্য তাঁহাকে মানব-দেহ ধারণ করিতে হইবে কেন? ইহাতে কি তাঁহার সর্ব্বশক্তিমত্তার লাঘব করা হয় না? যে-যুগে ব্রহ্মকে অন্তরালে স্থাপন করিয়া ঐশী শক্তি ত্রিধা বিভক্ত করা হয়, তিন প্রধান দেবতার হস্তে সৃষ্টির ভার ন্যস্ত হয় সেই সময় হইতে অথবা তাহার কিছু পরে অবতারের কল্পনা। প্রথমে ব্রহ্মের অবতার কল্পনা করিতে কাহারও সাহস হয় নাই, বিষ্ণুর অবতারই কল্পিত হইত। গীতাতে বিষ্ণু ও ব্রহ্মকে অভিন্ন করা হইয়াছে। বামনাকারে বিষ্ণু যে বিশ্বরূপ ধারণ করিয়াছিলেন এবং কুরুক্ষেত্রে শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনকে যে বিশ্বরূপ প্রদর্শন করাইয়াছিলেন এই দুই মূর্ত্তিতে বিশেষ কোন প্রভেদ নাই। দুই মূর্ত্তিই বিশ্বজগতের প্রতিচ্ছবি। বলি দেখিলেন,

> নাভ্যাং নভঃ কুক্ষিযু সপ্ত সিন্ধূন্
> উরুক্রমস্যোরসি চক্ষমালাম্।

নাভিস্থলে আকাশ, কুক্ষিদেশে সপ্তসমুদ্র, বক্ষঃস্থলে নক্ষত্রনিচয়। শ্রীকৃষ্ণের বিশ্বরূপ দর্শন করিয়া অর্জ্জুন বলিতেছেন।

> নান্তং ন মধ্যং ন পুনস্তবাদিং
> পশ্যামি বিশ্বেশ্বর বিশ্বরূপ।

হে বিশ্বেশ্বর বিশ্বরূপ! তোমার অন্ত, মধ্য, আদি দেখিতে পাইতেছি না।

যাহার আদি নাই, অন্ত নাই, সে মূর্ত্তি কি প্রকার? যাহা দ্বারা মূর্ত্তি নিরূপণ করিতে পারা যায় তাহার কিছুই নাই। অনাদি অনন্ত ব্রহ্মেরই উপাধি।

অবতারবাদে বিশ্বাসের মূলে ঈশ্বরের দর্শনলাভের আকাঙ্ক্ষা। বৈদিক যুগের আরম্ভে ঋষিগণ জড় প্রকৃতির শক্তিসমূহে দৈবশক্তির বিকাশ দেখিতেন এবং অগ্নি, বায়ু, পর্জ্জন্য প্রভৃতিকে দেবতা বলিয়া উপাসনা করিতেন। ক্রমে উপনিষদের যুগে একেশ্বরবাদের ভিত্তি দৃঢ়রূপে সংস্থাপিত হইল। তাহাতে যেমন ব্রহ্মের অস্তিত্ব স্থির হইল সেইরূপ ব্রহ্মের রূপ নিরূপণ করা কঠিন হইল। ব্রহ্ম ইন্দ্রিয়শক্তির অতীত, চক্ষু তাঁহাকে দেখিতে পায় না, কর্ণ তাঁহাকে শুনিতে পায় না। একমাত্র ধ্যান-ধারণায় তাঁহার উপলব্ধি হয়। সে-কালে যদি কেহ বলিত ঈশ্বর মনুষ্যের আকার ধারণ করিয়া মনুষ্যসমাজে আবির্ভূত হন তাহা হইলে ঋষিগণ তাহাকে বাতুল অথবা নাস্তিক স্থির করিতেন। পৌরাণিক যুগে পূর্ব্ব যুগের একাগ্রতা ও ধ্যানশক্তি রহিল না, সকল বিষয়ে শিথিলতা লক্ষ্য হইতে আরম্ভ হইল। ঈশ্বর স্বয়ং মানব-দেহ ধারণ করেন এরূপ মত প্রথমে প্রচারিত হইল না। বিষ্ণু প্রধান দেবতা, কিন্তু তাঁহার স্থান উপনিষদোক্ত ব্রহ্মের নীচে। প্রথমে বিষ্ণু অবতারের সূচনা কল্পিত হইল। সহসা তাঁহার মনুষ্যমূর্ত্তি কেহ কল্পনা করিতে পারিল না। এই কারণে প্রথমে মীন, কমঠ, শূকর অবতার কল্পিত হইল। তাহার পর নৃসিংহরূপী অদ্ভুত জীব বিষ্ণুর অবতার বলিয়া পরিগণিত হইলেন। নরসিংহের পর খর্ব্বাকৃতি, বিরূপ বামন অবতার। পরশুরাম ভীমদর্শন, দুর্নিরীক্ষ্য। রামায়ণে তাঁহার মূর্ত্তির বর্ণনা পাঠ করিলে হৃৎকম্প হয়। সহজ মনুষ্যের আকৃতিতে প্রথম অবতার রামচন্দ্র। নয়নাভিরাম দিব্য দূর্ব্বাদলশ্যাম কান্তি রঘুকুলতিলক দেবতুল্য রামচন্দ্রকে অবতার মনে করিতে কোন দ্বিধা হয় না।

এখন অবতারবাদে বিষ্ণু ও ব্রহ্মে কোন প্রভেদ নাই। সম্প্রতি যে-সকল অবতার আবির্ভূত হইয়াছেন তাঁহাদের শিষ্যগণের মতে তাঁহারা সাক্ষাৎ ঈশ্বর, তাঁহাদিগকে দেখিলেই ঈশ্বরের দর্শন হইল। অবতার সাধারণ মানুষের ন্যায় অনিত্য কিন্তু তাহা হইলেও তিনি ঈশ্বর স্বয়ং। তাঁহার অর্চ্চনা করিলেই ঈশ্বরের উপাসনা হইল।

আশাহত

শ্রীরামপদ মুখোপাধ্যায়

পাঁচ ভাইয়ের মধ্যে মনোনীত সর্ব্বকনিষ্ঠ এবং পাড়াপ্রতিবেশীর মতে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। উপার্জ্জনের ক্ষেত্রে তার কৃতিত্বের পরিচয় আপাতত আচ্ছন্ন থাকিলেও তরল অন্ধকারের ও-পারে উষার অরুণচ্ছটার মতই অত্যন্ত স্পষ্ট। শিক্ষার ডিগ্রি আহরণে সে অতিমাত্রায় যত্নশীল।

বড় বাড়ি হইলেও বিত্তের দিক হইতে সে নাম-গৌরব অধুনা কিছু ক্ষুণ্ণ হইয়াছে, কিছু বা বিস্তার দিক দিয়াও। বিশ্ববিদ্যালয়ের মোটা থাম বাহির হইতে দেখিয়া কেহ দীর্ঘ-নিঃশ্বাস ফেলিয়াছে, ভিতরে ঢুকিয়া কেহ-বা মনঃক্ষোভ মিটাইয়াছে, কিন্তু সে প্রবেশও অত্যন্ত দুর্লভ। তারপর, বড় বাড়ির আয়তনের স্ফীতিতে বধূরা এ-বাড়িতে আসিয়াছে পণে ও অলঙ্কারে যথেষ্ট গুরুত্ব লইয়া এবং বড়র মর্য্যাদায় বহুদিন হইতে সোনারূপার সে গুরুভার কমিতে আরম্ভ হইয়াছে। বিদ্যালয়ের কৃপা কৃপণের মত বলিয়া কেরানী ছাড়া কেহই জজ ম্যাজিষ্ট্রেট হয় নাই; আশীর উর্দ্ধে উঠিতে চারি ভাইয়েরই সামর্থ্যে কুলায় নাই। এদিকে সন্তান-সন্ততিতে বধূরা পরিপূর্ণ জননী হইয়া সংসারে শাখা-প্রশাখা বিস্তার করিয়াছেন। বিরলপত্র বলিয়া শাখার ফাঁকে ফাঁকে তীব্র রৌদ্রের উত্তাপ সংসারকে সর্ব্বক্ষণই আতপ্ত করিয়া তুলে। উত্তাপে বাড়িয়া উঠে কোলাহল; এমন কোলাহল যে কান পাতা কঠিন। কিন্তু চারি ভাইয়ের আশ্চর্য্য দেহের ও মনের মিল। দেহের প্রচুর শক্তি ধৈর্য্যকে দিয়াছে লৌহের কাঠিন্য, মনের একাগ্র কামনা সর্ব্বপ্রকার অশান্তি কলরব ছাপাইয়া একটি মাত্র সুরকেই দিয়াছে প্রাধান্য। সে কামনায় উগ্রতা না থাকিলে মনোনীতও চারের কোঠাতেই পড়িয়া থাকিত, বিদ্যালয়ের সৌধশ্রেণীতে হয়ত বা তার প্রবেশলাভই ঘটিত না। ভাইয়েদের বিদ্যাবিমুখতার ক্ষোভের আড়ালে মনোনীত যেন একটি প্রদীপ। বড় বাড়ির ঘন অন্ধকার দূর করিতে এ প্রদীপে তেল সলিতা না যোগাইলে শুধু সুখ্যাতি নহে, ইট, কাঠ, ভিত্তির ধ্বংসের সঙ্গে নাম-বিলুপ্তির ভবিষ্যৎ ভয়। সেই ভয় এড়াইতেই ত কোলাহলের মধ্যেও চারি ভাইয়ের সুর-সমতায় এই সহিষ্ণুতা।

মনোনীতও সংসার সম্বন্ধে মোটেই অচেতন নহে। আপন পাঠ্যবিষয়ে অখণ্ড মনোযোগ দিয়া সংসারকে অগ্রাহ্য করিবার প্রবৃত্তি তার কোন দিন জাগে নাই। পৈতৃক আমলের বড় বাড়ি সংস্কার-অভাবে হতশ্রী। ভাইয়েদের উপার্জ্জনে সে-মালিন্য ঘুচিবে না। বাহিরের মত ভিতরেও ভাঙন। বউদিদিরা যে-সব বাড়ি হইতে আসিয়াছেন সেখানে আভিজাত্যের রশ্মি প্রখর, স্বর্ণের চাকচিক্যও আছে। বড় বংশের ধারাই এই, বাহিরে ও ভিতরে গৌরবের রংটা অত্যন্ত গাঢ় এবং পাকা। যদি রঙে রং না মিলে ত ছেঁড়া কাপড়ে নূতন তালির মত সর্ব্বদাই সে দৃষ্টিকে খোঁচা দিতে থাকে। বউদিদিদের মনে সে রঙের ছাপ অত্যন্ত স্পষ্ট। শুধু ফাঁকা আভিজাত্য লইয়া মন ভরে না, অর্থের দিক দিয়া ইহাদের ছিদ্র বহু। এবং ছিদ্রপথে যে-সব কুৎসিত গ্লানি নিন্দা সংসারের আকাশ আচ্ছন্ন করে, সংসারী সেই অন্ধকারে পথ ভুল করিবে তার আর আশ্চর্য্য কি! মনের মধ্যে বন্ধনের পর বন্ধন জমিয়া আলোবায়ু-বঞ্চিত সঙ্কীর্ণতম এক কারাগারের সৃষ্টি হয়। মনোনীত সে কারাগারের বিভীষিকা প্রত্যহ প্রত্যক্ষ করিতেছে। সে যে কত ক্ষুদ্র তুচ্ছাতিতুচ্ছ বিষয় লইয়া প্রাচীর রচনা করে ভাবিলে আশ্চর্য্য হইতে হয়!

মনোনীত মনে মনে প্রতিজ্ঞা করিয়াছে, এ বেদনা দূর করিবার ভার একমাত্র তাহারই।

শেষ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া মনোনীত অবশ্য বিশ্ববিদ্যালয়ের আশ্রয় ত্যাগ করিল না, প্রোফেসারই হইল। মাহিনা অত্যধিক না হইলেও ভবিষ্যতের ভরসা আছে। মায়ের অঞ্চল ছাড়িয়া বিদেশযাত্রার সময়ে কোন-কোন সন্তানের ভীরুতা যেমন মমতার আবরণে উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠে, মনোনীত অবশ্য ভারতীর অঞ্চলচ্যুতির বেলায় ততটা মমতা পোষণ করে নাই। তবে, হাঁ, এ-বিষয়ে তার দুর্ব্বলতা ছিল বইকি! আর

একটি বিষয়ে সে গোপন আশা পোষণ করিত। বাহিরে অর্থ ও ভিতরে শান্তি দুটিই এ-সংসারের পক্ষে অত্যাবশ্যক। সে একটির ভার লইয়াছে, দ্বিতীয় কর্ত্তব্য যাহাকে সে জীবন-সঙ্গিনী করিবে, তাহার। এ-বিষয়ে সে বিত্তের বিচার করিবে না, আভিজাত্যের অভিমানও রাখিবে না, কিংবা অশিক্ষা বা কুশিক্ষার জঞ্জাল আনিয়া সংসার ভরাইবে না। এমন সঙ্গিনী চাই, বিদ্যাকে আশ্রয় করিয়া যে সংসারে আলোই বিলাইতে পারে; অত্যন্ত তীব্র বা উজ্জল আলো নহে, প্রয়োজন মতে যার মধ্যে স্নিগ্ধতাও প্রচুর। যে বিদ্যার উত্তাপ দিয়া জনগণকে আকুল করিবে, সে নহে। বিদ্যার প্রসন্নতা দিয়া যে প্রীতি বিলাইতে পারিবে, মেদুর আকাশের মতই যে নমনীয়, অস্তমান সূর্য্যের মত যে বর্ণ-গৌরবে সম্পৎশালী কিংবা প্রত্যূষের পরিপূর্ণতা যার সমগ্র আচরণে, একমাত্র সে-ই। ছিন্নসূত্রে সংযোগ-সাধনে তার দক্ষতা থাকা চাই, ধৈর্য্যে সে হাসিকে অধরকোণে বাঁধিয়া রাখিবে এবং ব্যবহারে মৌখিক সৌজন্য না মাখাইয়া অন্তরে মমতার ভাণ্ডার খুলিয়া দিবে। সে মমতা সংসারের প্রতি, পরিজনের প্রতি। এক হাতে বিদ্যার আলো, অন্য হাতে বীণা—স্নেহে, মমতায়, ভক্তিতে, প্রসন্নতায়, শান্তিতে ও শৃঙ্খলায় যে বীণার তারে অহরহ ঝঙ্কার উঠিবে। এমনই এক প্রীতিমতী বধূ।

প্রোফেসারি জুটিতেই দাদারা চঞ্চল হইয়া উঠিলেন। কয়েকখানি মোটর এ-বাড়ির দুয়ারে আসিয়া লাগিতেই মনোনীত দাদাদের কাছে মনের ইচ্ছা খুলিয়া বলিল।

মনঃক্ষুণ্ণ হইবার কিছু ছিল না। ব্যথী বলিয়াই তাঁহারা ব্যথা বুঝিলেন। বলিলেন,—সেই ভাল। আমরা জঞ্জালে সংসার ভরিয়েছি, তুমি আন গৃহলক্ষ্মী। তাঁর কৃপায় যদি আমরা বেঁচে যাই।

অবশ্য অনুপমার আগমনের ইতিহাস লিপিবদ্ধ করিতে হইলে একটি রমণীয় রোমান্সের সূচনা করিলেই ভাল হইত, কিন্তু আমাদের অতি সাধারণ মনোনীত—এমন ভাবে এ পরিচ্ছেদের শেষ করিয়াছে যে, রং ফলাইয়াও চিত্র ত নহেই, কাব্যাংশের অল্লায়ু বুদ্‌বুদের ফেনাতেই ধরিয়া রাখা যায় না।

অনুপমা আসিল। সংসারের সংশয় পিছনে ছায়া ফেলিল না, ধর্ম্মের সংস্কারও কিছুমাত্র বাতাস তুলিল না। সে-আগমন নদীবন্যার মত আকস্মিক নহে, বর্ষাস্ফীত নদীর মত অত্যন্ত সহজ।

সঞ্চারিণী পল্লবিনী লতা নহে, বিদ্যুৎ-শিখাও নহে, রূপ দেখিয়া কথা ভুলিয়া যাইতে হয় এমনটাও নহে। এমন কি, এ বাড়ির যে-কোন বউয়ের সঙ্গে তুলনা দিলে মেয়েটিকে খাট করিতে হয়। না আভিজাত্য, না বিত্ত। বিদ্যার খ্যাতি গেজেটের পাতায়ই আছে, বাহুল্যহীন—অতি সাধারণ শাড়ি ব্লাউজের মধ্যে নাই। পায়ে জুতা থাকিলে সে খ্যাতির কতকটা বা অনুমান করা যাইত। সাধে কি বড়বৌ নাক উপর দিকে কুঁচকাইয়া অধরকোণে 'চুক' শব্দ (আক্ষেপ কিংবা অবজ্ঞাও হইতে পারে) করিয়া বলিয়াছিলেন,—ওমা এমন! আমরা বলি কি না কি? ও-বাড়ির পাঁচীর মায়ের মতই সাদাসিদে! বিদ্যে না ছাই! কে জানে গেজেটওয়ালারা কার নাম ছাপতে কার নামই বা ছেপেচে? পোড়াকপাল!

মেয়েটি ঢেঙা ও রংটা চাপাই বলিতে হইবে। হাত-পায়ের লালিত্য তেমনই বা কোথায়? মন্দের ভাল নাকটি আছে, অর্থাৎ থাঁদা নহে। কপালটিও ছোট। মাথার চুল? বাঁধা না থাকিলে ফুটের হিসাবে মাপিয়া ভালমন্দ একটা বলা যাইত। তবে খোঁপা দেখিয়া অনুমান হয়, নেহাৎ খর্ব্বকায়া শতমুখী নহে। কিন্তু বলাও যায় না, গুছি দিয়া চুল বাঁধার অভ্যাস আজকাল না থাকিলেও নববধূর উপর সে-সন্দেহ রাখিতে দোষ কি?

মেজবৌয়ের এই সব মন্তব্যে কান দিয়াও ন'বৌ বলিয়াছিল,—কিন্তু দিদি, চোখ? বইয়ে পড়েচি—চোখে দেখিনি হরিণ কেমন! ওর চোখ দেখে মনে হয়, মানুষের চোখই সব চেয়ে ভাল। ঘন ভুরু যেন তুলি দিয়ে আঁকা দুর্গা-ঠাকরুণের মত। তার নীচেয় ভাসন্ত কালো কুচকুচে তারায় ভরা—আশ্চর্য্য চোখ! চাইলে ত পদ্ম ফুটল, বুজলে ত পদ্ম-পাপড়ির উপর সরু তুলিতে কে যেন কালো রেখা টেনে দিলে।

আমরা জানি সে চোখ তার চেয়েও সুন্দর। উপরের সৌন্দর্য্য তার মুখচন্দ্র পরেও নহে, হরিণীর আকর্ণ-বিস্তৃতিতেও নহে, সে সৌন্দর্য্য এমন পরিপূর্ণ—এমন আশ্চর্য্য...

চাহনির মধ্য দিয়া সমস্ত অন্তরখানি কে যেন আঁকিয়া ধরিয়াছে। ঘন ভ্রূতে বিলাস বা ভঙ্গী নাই। কালো তারায় চঞ্চল খঞ্জনও খেলা করে না। কোথায় বিদ্যুৎ, কোথায়ই বা বহ্নি! উষার প্রথম বিকাশের মতই স্নিগ্ধ প্রসন্নতা, গভীর নিশীথের উদারতা এবং রাত্রিশেষে শিশিরে স্নান সারিয়া তাপসী ধরিত্রীর মতই শুভ্রচারিণী। অজ্ঞানের অন্ধকার ত নাই-ই, অথচ জ্ঞানের অহঙ্কারও নাই। ক্ষুদ্র ললাটে স্বল্পে পরিতুষ্টির মসৃণতা এবং পাতলা ঠোঁটে সারল্য মাখা। দাক্ষিণ্যভরা কোমল করতল এবং পৃথিবীকে ভালবাসিবার শান্ত জ্যোতি ঐ দৃষ্টির মধ্যেই স্পষ্টতর। ঐ দৃষ্টিতে স্নেহ এবং প্রেম আছে। মা আছে, প্রিয়াও আছে; মমতাময়ী নারী ও শান্তিদায়িনী সেবিকাও আছে। বুদ্ধির উজ্জ্বল দীপ্তিতে মন্ত্রণা বা অভয় মিলিবে। দৃষ্টিবিনিময়ে এত কথা না জানিলে কি মনোনীতের আপন হইয়া অনুপমা এ-গৃহে প্রবেশ করিতে পারিত?

অনুপমা বড়বৌয়ের পা ছুঁইয়া প্রণাম করিতেই তিনি স্নেহে গলিয়া পড়িয়া তাহার চিবুক ধরিয়া চুমা খাইয়া বলিলেন,—আহা! থাক—থাক। জন্ম এয়োস্ত্রী হও। না থাক্ রূপ, গুণে ঘর আলো কর। পয়মন্ত হ'লেই হ'ল।

মেজকে মেজদি বলিয়া ডাকিতে তিনি ত বুকের মধ্যেই টানিয়া লইলেন। সেজ বৌয়ের আনন্দে গলা বুজিয়া গিয়া কোন আশীর্ব্বাণীই উচ্চারণ করিতে পারিলেন না।

ন'বৌ কেবল মুগ্ধার মত বলিল,—কি সুন্দর তোমার চোখ দুটি, ভাই! ইচ্ছে করে কেবলই দেখি।

নববধূর সম্মোহনী শক্তিতে ভাসুররা পরম খুশী হইলেন। মনোনীতের শ্রদ্ধা বাড়িয়া গেল। কিন্তু আনন্দে আত্মহারা না হইলে ক্ষুদ্র এক টুকরা মনের খবর জানিয়া তাঁহারা বিস্মিতই হইতেন। বেশ-বাসে অত্যন্ত সাধারণ, বিদ্যাবুদ্ধির দীপ্তিকে বিনয়মণ্ডিত এবং ব্যবহারে অতি সহজ না হইলে অনুপমার ত বাহুময় বাতাসে মিলাইত। আসল কথা,—উঁচু জায়গায় দাঁড়াইয়া নীচের লোককে করুণা করার গৌরব আছে, কিন্তু খাট হইয়া শ্রদ্ধা চয়ন করিতে গেলেই যত গোল।

অনুপমার ঘরের সম্মুখে প্রশস্ত বারান্দা। এক ধারে টেবিল চেয়ার, ভাসুরদের কেহ কেহ হয়ত টেবিলে বসিয়া চা পান করিয়া থাকেন। ভাঙা খেলনা এখানে-ওখানে ছড়ানো। বারান্দার রেলিঙে শাড়ি, শেমিজ, ধুতি, ছোট ছেলেদের জামার রাশি মেলিয়া দেওয়া আছে। বৃষ্টির আশঙ্কা ছিল না বলিয়া সেগুলি সকাল পর্য্যন্ত শুকাইতেছিল। মেঝের এক পাশে ছোটয় বড়য় অনেকগুলি জুতা। কোনটা চকচকে, কোনটা কাদায়-ধূলায় কদর্য্য। কেডস্-গুলার অবস্থা দেখিলে ডাষ্টবীনে ফেলিয়া দিতেই সাধ হয়। একটা চেয়ারের উপর বেণ্টের রাশি। তা ছাড়া বারান্দার মেঝেয় প্রচুর ধূলা আছে, কাগজ ছেঁড়া আছে, আলুপটলের খোসা, ঘুঁটের কুচি, কাঠকয়লার লেখা ইত্যাদি বহু জিনিষই আছে।

সকালে উঠিয়া মনোনীত বাহির হইয়া গিয়াছে। শয্যায় শুইয়া থাকা অশোভন, অথচ নূতন বধূর কোন কর্ম্মে হাত দেওয়াও চলে না। বিছানা হইতে উঠিয়া অনুপমা টুকি-টাকি জিনিষগুলি গুছাইতে লাগিল। এমন সময় বারান্দা ঝাঁট দেওয়ার শব্দে সে জানালা দিয়া দেখিল, বড় বধূ জঞ্জাল পরিষ্কার করিতেছেন। হাতের ঝাঁটা এমন দ্রুত চলিতেছে যে, অন্তরের বিরক্তি যে-কাহারও চক্ষুতে ধরা পড়ে। কিন্তু জঞ্জাল সাফ্ করিবার এ-কি রীতি? এক ধার হইতে সাফ্ না করিয়া খালি মাঝখানটাই তিনি ঝাঁটাইতে লাগিলেন। অনুপমার সব চেয়ে আশ্চর্য্য বোধ হইল, খানিকটা ঝাঁট দিয়া তিনি সশব্দে সম্মার্জ্জনী ফেলিয়া সিঁড়ি দিয়া নামিয়া গেলেন। বড়দি কি রুষ্টা হইয়াছেন? ঘর হইতে বাহির হইয়া সে বাকী বারান্দাটু সাফ করিবে কি-না ভাবিতেছে, এমন সময় ও-পাশের দুয়ার খুলিয়া রোরুদ্যমান ছেলে-কোলে মেজবউয়ের আবির্ভাব সদ্য ঘুম ভাঙায় চোখ-মুখ ফুলা-ফুলা। ছেলের কান্নায় কঠোর দৃষ্টিতে শাসন-ইঙ্গিত, পায়ের গতি শ্লথ। মেজবউ বারান্দায় ঢুকিয়াই অদূরে পতিত ঝাঁটার পানে একবার ক্রূর দৃষ্টিতে চাহিয়া কোলের ছেলেটাকে দুম্ করিয়া মাটিতে বসাইয়া দিলেন এবং তাহার উচ্চ চীৎকারে দৃক্‌পাত না করিয়া বারান্দা ঝাঁট দিতে লাগিলেন।

ছেলেটাকে কোলে লইবার জন্ম অনুপমা খিল খুলিয়া বাহিরে আসিবার উদ্যোগ করিতেই ঘোমটা টানিয়া ঘরের মধ্যেই ঢুকিয়া পড়িল। মেজভাসুর খোকাকে কোলে লইয়া

দুলাইতে দুলাইতে সিঁড়ি দিয়া নামিয়া গেলেন। মেজবউ আপন মনে খানিকটা ঝাঁট দিয়া বড়বউয়ের নীতি অনুসরণ করিলেন।

অনুপমার বিস্ময় উত্তরোত্তর বাড়িতেছিল। ঝাঁট দিবার আশ্চর্য্য পদ্ধতিতে যত না বিস্ময়, বারান্দার যে-যে অংশ দু-জনে সাফ করিলেন সেই অংশ এমন সমান যে, যে কোন এঞ্জিনীয়ার মাপিয়া এক চুল কম-বেশী বাহির করিতে পারিবে না। আশ্চর্য্য! মুখখানা জানালা দিয়া খানিকটা বেশীই বাহির হইয়াছিল, চক্ষুতে বিস্ময় ও কৌতূহল মাখানো। সহসা বাহিরে সেজবউয়ের কণ্ঠস্বরে তাহার চমক ভাঙিল—কে লো, ছোট—কি দেখচিস্? এবার আমার পালা।—

বলিয়া বারান্দার পানে চাহিয়া বলিলেন,—ওপরে—চারখানা ঘরের কোলে চওড়া বারান্দা, ছেলেরা রাতদিনই খেলা করে, নোঙ্‌রাও হয়। কর্ত্তারা রাগ করেন ব'লে সকালটায় আমরা পালা ক'রে ঝাঁট দিই। বড়দির তিনটে থাম, আমার আর মেজদিরও তাই। আর এই তিনটে সেজোর। আজ ছটা থাম আমাকেই সারতে হবে।—বলিয়া ঝাঁটা তুলিয়া কর্ম্মে প্রবৃত্ত হইলেন।

খানিক ঝাঁট দিয়া বলিতে লাগিলেন,—ন'বউ চালাক মেয়ে, নীচের ঘরে থাকে; বারান্দা নেই—এ দায়ও নেই। আচ্ছা, তুমিই বল ত ভাই, এ কাজ কি আমাদের? এত বড় বাড়ি মাবেই, ঝি টিম্ টিম্ করচে একজন। তাও ঠিকে। বাসন মাজে, কয়লা ভাঙে, রান্নাঘর ধুয়ে মুছে দেয়, ব্যস্। আমাদের গতর জল।

অনুপমা তাড়াতাড়ি বাহির হইয়া মৃদুস্বরে কহিল,—আমায় দিন না, সেজদি, আমি ঝাঁট দিই।

সেজবউ হাত সরাইয়া হাসিয়া কহিলেন,—কথা দেখ। নতুন বোয়ের কি কোন কাজে হাত দিতে আছে, না, আমরাই দিতে দেব? তবে ভেবো না, ভাই—ঘর যখন পেয়েছ, পালাও পাবে। দিন-কতক সবুর কর না।

ঝাঁট দেওয়া শেষ হইলে এঘর-ওঘর হইতে গুটিদশেক নানাকার ছেলেমেয়ে বাহির হইয়া বারান্দায় আসিল। চড়াচাপড়টা বা আদরটা সকলেই অযাচিত আদায় করিয়াছে, মুখগুলি বিরক্তির কান্নার থমথমে। কাহারও কাহারও ফুঁপানো তখনও চলিতেছে। সিঁড়িতে পুনরায় পদশব্দ শোনা গেল। বড়বউ ও মেজবউ উঠিয়া আসিলেন। আসিয়া বারান্দায় মেলিয়া-দেওয়া জামা-কাপড় প্যান্ট ও চেয়ারের বেল্টগুলি লইয়া ছেলেমেয়েদের গায়ে আঁটিতে লাগিলেন। সেজবউও ঝাঁটা ফেলিয়া তিনটি ছেলেকে একধারে টানিয়া লইলেন। বড়বউয়ের পাঁচ, মেজর দুই, সেজ ত ইতিপূর্ব্বেই বাকী কয়টিকে টানিয়া লইয়াছেন। বারান্দা-ভাগের মত ছেলেগুলির সাজসজ্জা শেষ হইলে বউয়েরা একযোগে নামিয়া গেলেন।

অনুপমা হতবুদ্ধির মত কি করিবে ভাবিয়া পাইল না। এমন সময় মনোনীত পিছন হইতে আসিয়া মৃদুস্বরে বলিল,—ঘরে এস।

ঘরে আসিয়া মনোনীত বলিতে লাগিল,—অবাক হবার কিছু নেই, অনু। এ সংসারের সবটাই ভাঙা। বাইরের মত ভেতরটাও। তোমায় এই সব এক ক'রে প্রাণপ্রতিষ্ঠা করতে হবে। তোমায় ত বলেচি আগে—

অনুপমা কুণ্ঠিতস্বরে বলিল,—আমি জানি। কিন্তু নতুন বউ ব'লে ওঁরা আমায় কোন কাজে হাত দিতে দেন না যে!

মনোনীত বলিল,—আজ নতুন আছ, দেখ। দু-দিন পরে ফিরে এলে আর নতুন থাকবে না। আজ শুধু দেখে রাখ, কোথায় এর ফাঁক, কোথায় বা গলদ!

অনুপমা ঈষৎ ঘাড় নাড়িয়া বলিল,—আমি পারবো। কোন জিনিষ গ'ড়তে আমার এত আনন্দ!

মনোনীত বলিল,—তোমার চোখের দৃষ্টি আমায় ব'লে দিয়েচে, তুমি কি। পরিপূর্ণতার আভাসে আমি অভয় পেয়েচি! আমি জানি গড়তে, শ্রী দিতে—

অনুপমা সলজ্জ অনুযোগ করিল,—কি যে বলচেন! আমায় কালই কেন পাঠিয়ে দিন না, পরশু আবার নিয়ে আসবেন। একবার ঘুরে এলেই ত পুরোনো হব।

হাসিয়া মনোনীত বলিল,—এত তাড়া কেন?

একটু থামিয়া বলিল,—জান অনু, আমার রাজারা দেবতা। আমার যা-কিছু কৃতিত্ব ওঁদের তপস্যারই ফল। উপেক্ষিতা ঊর্ম্মিলার ত্যাগ না থাকলে লক্ষ্মণ জগতের আদর্শ হতেন না। অথচ ঊর্ম্মিলাকে আমরা সাধারণ ব'লেই জানি। কাঠ, কয়লা বা তেল-লবণের খবর কে রাখে, উজ্জ্বল আত্মার আলোয় সবাই মুগ্ধ হয়।

অনুপমা মাথাটা অল্প নামাইয়া নীরবে এই আত্মত্যাগের প্রতি শ্রদ্ধা জানাইল হয়ত।

সপ্তাহের মধ্যে অনুপমা বাপের বাড়ি হইতে ফিরিয়া আসিল। শাশুড়ী থাকিলে এত শীঘ্র সে পুরাতনের পর্য্যায়ে পড়িত না।

অতি প্রত্যূষে উঠিয়া অনুপমা সমস্ত বারান্দা পরিপাটী করিয়া ঝাঁট দিল। ময়লা জুতাগুলিকে কালি মাখাইয়া গুছাইয়া রাখিল। খোকাদের কাপড় জামা প্যান্ট এমন জায়গায় রাখিল, যেখান হইতে অনায়াসে বাছিয়া লওয়া যায়।

বড়বউ ঘরের বাহির হইয়া সাশ্চর্য্যে কহিলেন,—ও মা, ও কি। তুমি একা সব ঝাঁট দিলে?

অনুপমা অল্প হাসিয়া মাথা নীচু করিয়া কহিল,—কতটুকুই বা বারান্দা! বড়দি, আর একটি আব্দার আমার রাখতে হবে।

বড়বউ মনে মনে যথেষ্ট আনন্দিত হইয়াছিলেন। হাসিমুখে জিজ্ঞাসা করিলেন,—কি লো?

—খোকা-খুকুদের ভার আমায় দিতে হবে। ওদের খাওয়ানো, ধোয়ানো, কাপড় জামা পরানো সব আমিই করবো। ছোটবোনের এ কথাটি রাখতেই হবে, বড়দি।

বড়বউ আনন্দ আর চাপিয়া রাখিতে পারিলেন না, অনুপমার চিবুক ধরিয়া পর-পর কয়েকটি চুমা খাইয়া গদ-গদ স্বরে কহিলেন,—জন্মএয়োস্ত্রী হ'য়ে বেঁচে থাক্‌, কেন করবি নে।

বলিতে বলিতে দেখিলেন মেজ ও সেজ বউ আসিয়া পিছনে দাঁড়াইয়াছে।

বড়বউ তাহাদের দিকে ফিরিয়া হাসিমুখে বলিলেন,—শুনেছিস, ছোট বলচে ঘর-বারান্দা ঝাঁট আমিই দেব, ছেলেমেয়েদের খাওয়া-পরাবার ভারও আমার। ঐ একরত্তি মেয়ে, ধন্যি সাহস বাপু! কিন্তু তাও বলি, জান না ত তোমার ভাসুরকে, দেওরগুলিও তেমনি। একমন, একপ্রাণ। হয়ত বলবেন, নতুন বউকে এত খাটানো তোমাদের উচিত কি?

অনুপমা তাড়াতাড়ি বলিল,—না বড়দি, আপনাদের পায়ে পড়ি, ওঁদের একটু বুঝিয়ে বলবেন। কাজ করতে আমার ভারি আনন্দ। কাজ না করলেই যেন হাঁপিয়ে উঠি। বলবেন ত, দিদি?

বড়বউ আর কেহ উত্তর দিবার পূর্ব্বে বলিল,—বলবো গো বলবো। তেমন ভাসুরই তোমার নন, আমার কথা কোন দিন অমান্য করে না।

আর একটি চুম্বন দিয়া বড়বউ নীচে নামিয়া গেল।

সেজবউ বলিলেন,—বড়দি ভারি স্বার্থপর। এই কচি মেয়েটার ঘাড়ে সব চাপিয়ে চললেন সাবান মেখে চান করতে!

অনুপমা সেজবউয়ের একখানি হাত ধরিয়া মৃদুস্বরে কহিল,—না সেজদি, অমত করবেন না। যদি কষ্টই আমার হ'ত ত সেধে এ-ভার নেব কেন? আচ্ছা, কথা রইল কষ্ট হ'লে আপনাদের জানাব। আমি আপনাদের ছোট বোন, আদর, আবদার, ঝগড়া যা-কিছু সবই ত আপনাদের নিয়ে।

সেজবউ অবশ্য এ-কথায় গলিয়া গেলেন। স্তবস্তুতিতে দেবতারা প্রসন্ন হন মানুষ ত কোন্ ছার! তথাপি ঠোঁটের কোণে অল্প একটু বাঁকা হাসি হাসিয়া বলিলেন,—পারলেই ভাল। তবে ওঁরা যাতে না দোষেন, সে-ব্যবস্থাটা তুমিই ক'রো। আমরা ত বড়দির মত স্বামীকে কথা মান্য করাতে শেখাইনি!

সে চলিয়া গেলে মেজবউ বলিলেন,—ওটার একটু মুখ-দোষ আছে। কিন্তু যা বলে উচিতই বলে। তুমি লক্ষ্মীবউ, হয়ত পারবে, তবু—

অনুপমা বলিল,—আর তবু নয়, দিন্ খোকাকে আমার কোলে। আপনারা স্নান ক'রে নিন গে, ওদিকের সব আমি ঠিক করবো।

ন'বউ হাসিতে হাসিতে উপরে আসিয়া বলিল,—কলতলায় দিদিদের মুখে তোমার সুখ্যাত ত ধরে না। এমন লক্ষ্মীবউ না-কি এ বাড়িতে আসেনি। কিন্তু লক্ষ্মী হয়ত হ'তে পার, আমি দেখচি তুমি গণেশজননী। শুধু ঐ চোখ দুটিতে সব রয়েচে। কি সুন্দর তোমার চোখ দুটি, ভাই!

অনুপমাও হাসিয়া বলিল,—এ-চোখ আপনার বোনের মত নয় কি, ন'দি?

ন'বউ ভ্রুভঙ্গী করিয়া বলিল,—কখনও নয়। আমার বোন কুরূপ, কুঁচ কুঁচ চোখ তার; আমাকে তুমি বলে, তুইও বলে।

অনুপমা এই প্রায়-সমবয়সী স্নেহশীলা নারীর অতি সন্নিকট-বর্ত্তিনী হইয়া গদ-গদ স্বরে বলিল,—তুমিই ত আমার দিদি।

ন'বউয়ের চক্ষু অশ্রুবাষ্পে ভরিয়া উঠিল। অনুপমার মাথাটা বুকের উপর ঈষৎ চাপিয়া বলিল,—আমি জানি, এমন চোখ যার সে ত সকলকে বশ করবেই। বাঘ, বুনোহাতী থেকে ইঁদুরটাকে পর্য্যন্ত। মুখ আমার মিষ্টি নয়, কথাগুলো কাঠের চেলা। হয়ত এ-চেলা কতবার তোর পিঠেও পড়বে, কিন্তু জানবি, মারটা আমি সত্যিই মারি। মুখে আদর দেখিয়ে মনের বিষ চেপে রাখতে পারিনে। পারিনে বলেই ত ওপরে আমার ঠাঁই হয়নি।

কয় মাসের মধ্যে ভাঙা বাড়ি মেরামত হইল। ভিতরের কোলাহলও অনুপমার সেবা-দক্ষতায় একেবারে শান্ত হইয়া গেল। দু-বেলা বারান্দা পরিষ্কার করিয়া অনুপমা দক্ষিণ দিকের টেবিলে চায়ের সরঞ্জামগুলি আগাইয়া দেয়। কর্ম্মক্লান্ত ভাসুরেরা ঘরে-তৈয়ারি সিঙাড়া নিমকীর সঙ্গে হাসিগল্পে চায়ের পেয়ালায় চুমুক দিয়া স্বর্গসুখ উপভোগ করেন। ছেলে-মেয়েগুলার চেহারা পর্য্যন্ত ফিরিয়া গিয়াছে। মনোনীতের মুখে মৃদু হাসি লাগিয়াই আছে। সাধনার শেষে কাম্য ফল লাভের মত মুখে একটি দিব্য জ্যোতি।

সুখী, মনোনীত সবদিক দিয়াই সুখী।

ন'বউ মাঝে মাঝে বলে,—কি সুন্দর তোর চোখ দুটি ভাই! মেয়ে-পুরুষ সবাইকে ভেড়া বানিয়ে ছাড়লি? কিন্তু, সাবধান! বাঘকে নিরামিষ খাইয়ে রাখলেও রক্তের গন্ধ তাকে পাগল করবেই, সেটা তার স্বভাবগত। তোর ঐ হাত দুটি যেদিন একটু কুঁড়েমি করবে, কি শরীর বিকল হবে, সেদিন অতি সুখের ঘুম ভেঙে দেখবি ওরাই করেচে তোমার মৃত্যুপাত।

অনুপমা হাসিয়া বলে,—দিদি কি ছোট বোনের সুখ-দুঃখ দেখে না?

ন'বউ হাসিয়া উত্তর দেয়,—দেখে না আবার। কিন্তু পাতানো-সম্পর্কের আবার টান!

এই কথায় অনুপমার মনে অল্প একটু ছায়া পড়ে। পাতানো সম্পর্ক! এই প্রাণপাতের মূল্য কি সম্পর্কের পলকা সুতোয় ওজন করা চলে? না, এই মনঢালা ভালবাসার অযত্নে দান অন্তরে বহিয়া উদাসীন থাকা যায়? গড়িতে কার না আনন্দ? জগতে যে-কোন কিছুর সৃষ্টিতে যত আনন্দ, সমগ্র জীবনের এত পরিপূর্ণতা আর কোথায়? ছেলেবেলায় কাদার ডেলা দিয়া কিম্ভূতকিমাকার মূর্ত্তি গড়িয়া কি সে উল্লাস? রুমালের উপর সামান্য ফুল তুলিতে, সুতো দিয়া চটের আসন ভরিতে, সেলাই, রন্ধন, পরিপাটী কর্ম্মের শৃঙ্খলা, কিসে না মন নাচিয়া উঠে, মাতিয়া উঠে! পড়িয়া পাস করা, বই লেখা কোন্ কৃতিত্বে আয়ুকে উজ্জ্বল করে না! এই সংসার শতচ্ছিদ্র, কোলাহলময়—ভাঙা সংসার, সেবা দিয়া সহানুভূতি দিয়া প্রাণের সমস্ত কামনা মিশাইয়া অনুপমা ইহার শৃঙ্খলা ও শ্রী ফিরাইয়া আনিয়াছে। বিধাতার বিশ্ব-রচনার মত এই দুর্লভ গৌরব অনুপমার।

পরস্পরের শুভবুদ্ধি যেখানে জাগ্রত, স্বার্থের বাঁধন সেখানে ঢিলা না হইয়া পারে না। তোমার দুঃখে আমার চোখে জল ঝরিলে তবে ত তুমি মুখের খাবার খাওয়াইয়া আমায় স্নেহ বিলাইবে। অন্তরের সঙ্গে সন্ধি করিয়া যে-কাজ করা যায়, ত্রুটিতে বা অপরাধে সেখানে যুদ্ধের হুঙ্কার উঠা বিচিত্র নহে। কিন্তু হৃদয় যেখানে সমস্ত বৃত্তিকে যুক্ত করিয়া কাজে নামে, সেখানে কাজের গলদ ধরিবে কে?

হৃদয় দিলেই হৃদয়কে স্পর্শ করা যায়। অপরিচিত স্বামী আজ অন্তর জুড়িয়া আছেন, এই স্পর্শের সংযোগে। অপরিচিত পরিজন স্নেহসমাকুল চিত্তে তাহাকে যে সোহাগ করেন, খাদ তার এতটুকু নাই। ন'দিদির মত সন্দেহের বিষ সে পুষিয়া রাখিবে না!

এমনই আরও কয়েক মাস সুশৃঙ্খলে চলিয়া গেলে একদিন কাজ করিতে করিতে অনুপমা ক্লান্তি বোধ করিল। মনের মধ্যে অদম্য উৎসাহ, দেহ আলস্যে ভরা। মনের শ্রান্তি ইহা নহে অনুপমা বেশ বুঝিল, কিন্তু সুখের এতটুকু প্রত্যাশা কোথা হইতে অস্ফুট সুর তুলিতেছে সে বুঝিতে পারিল না।

ন'বউকে কথাটা বলিতেই সে হাসিয়া বলিল,—নেকী! তোকে সুখী ক'রতে যে আসচে সে যে রাজার দুলাল। অনাদর সে সইবে কেন!

অনুপমা মুখ শুকাইয়া বলিল,—তবে কি হবে ন'দিদি? আমি যে দিন-দিন অথর্ব্ব হ'য়ে পড়বো!

ন'বউ বলিল,—পড়লেই বা! সে রক্ত জুড়িয়ে আসচে, তার দাবি অগ্রাহ্য করা তোর চলবে না। কাল থেকে আমি ব'লে দেব যে যার কাজ করেন যেন।

অনুপমা অনুনয়ের স্বরে বলিল,—না, ন'দিদি, না। আরও দিনকতক যাক।

ন'বউ তর্জ্জনী তুলিয়া বলিল,—চুপ! আমি ভালবাসা বা শান্তিকে কখনও মিথ্যা দিয়ে ঢাকতে শিখিনি। আমি তোর দিদি, স্নেহ ও শাসন তোকে মানতেই হবে।

অনুপমা কথা কহিল না, ধীরে ধীরে আপনার ঘরে ঢুকিল। কিসের যেন আশঙ্কা তাহাকে চাপিয়া ধরিল। ঘর সাজাইতে সাজাইতে সে যেন সহসা অসুস্থ হইয়া পড়িয়াছে! কে জানে শান্তির সংসারে গুঞ্জন উঠিবে কি-না? স্ফুটতর গুঞ্জনে যদি কোলাহল টানিয়া আনে?...তবু সংসারসৃষ্টির উল্লাসের মত অতটা উগ্র না হইলেও, মৃদু আনন্দের মিশ্রধ্বনিতে অন্তর কণ্টকিত হইয়া উঠিতেছে। যে-অবুঝ নিঃশব্দে ভ্রূণের রূপ ধরিয়া আবির্ভূত হইতেছে, সে-ও ত এক আশ্চর্য্য সৃষ্টি! কবির কাব্য লেখার মত অপূর্ব্ব প্রসাদে মন গুন্ গুন্ করিতেছে! সমস্ত তন্ত্রীতে আজ বীণার ঝঙ্কার।

ঐ পল্টুর মতই নরম তুল তুলে...মুখে নির্ব্বোধ হাসি, চোখে অজ্ঞান দৃষ্টি, সুন্দর চাঁপাফুলের মত রং, ননীতে গড়া নরম হাত, বুকে চাপিয়া ধরিলে বুকের মধ্যে কি যেন ধীরে ধীরে আবেশে মুদিয়া আসে—ওষ্ঠ ভরিয়া অন্তরের সে-ক্ষীরধারা উপচিয়া পড়ে—তেমনই নিদ্রালস পরম আশ্চর্য্য রক্তের শিশু। আসিতেছে। সংসার-রচনার শ্রেষ্ঠ শতদল বুঝি তারই তুল-তুলে পায়ের ছোঁয়ায় বিকশিত হইবে! এই ঘরে কাকলী ধ্বনিতে প্রাণ জুড়াইবে! ওরে নির্ব্বোধ যাদুকর! এত—এত ত্বরা তোর কিসের? শান্তি-আসনখানি পাতা হইয়াছে, কিন্তু সংশয়ে মন পরিপূর্ণ। আঘাত খাইয়া শান্তি এখনও সহিষ্ণুতা পায় নাই। তোরই মত সে কোমল, ভঙ্গুর; আতপ-তাপে বুঝি বা গলিয়া পড়িবে! তবু, তোকে যে আদর না করিয়া পারি না। অনিমন্ত্রিত, অনাহূত, হয়ত বা অবহেলিত। তবু তুই আয়। তোর আগমনের আঘাত দিয়াই সংসারের সহিষ্ণুতা আমি পরীক্ষা করিব। সব সৃষ্টির সেরা সৃষ্টি তোরই মধ্যে আমার সংসারের কামনা, তোরই জন্য আমি সংসারকে জাগাইয়া তুলিয়াছি! আজ আমার হৃদ্—অবসর। আঃ!

পরের দিন বারান্দায় ঝাঁট পড়িল না। বড়বউ একটু অবাক্ হইয়া অনুপমার জানালায় উঁকি দিলেন। দেখিলেন, আপাদমস্তক ঢাকিয়া সে শুইয়া আছে। শরীর খারাপ হইয়াছে ভাবিয়া তিনি ঝাঁটাগাছি তুলিয়া লইলেন এবং সমস্ত বারান্দাটা একাই ঝাঁট দিয়া ফেলিলেন। ভাগের কথা আজ তাঁহার মনেও হইল না।

ছেলেমেয়েগুলা কাকীমার ঘরে আসিয়া কলরব জুড়িয়া দিল।

অনুপমা হাসিমুখে বলিল,—যাও মাণিক, তোমাদের মায় কাছে যাও। আমার অসুখ করেচে।

ন'বউ আসিয়া বলিল,—হুঁ, শুভ বর। নষ্ট নড়ন চড়ন, এই ত চাই।

অনুপমা হাসিয়া উঠিল।

ন'বউ মুখার মত বলিল,—তোর সুন্দর চোখের জ্যোতি যেন বেড়েচে, হাসিটিও প্রাণের। কেমন, পরমনিধি আসচে কি-না?—অনুপমা হাসিয়া মুখ নামাইল।

ন'বউ বলিল,—ওরে, ওরা ছোট বটে, কিন্তু আস্ত ডাকাত। একেবারে ফতুর ক'রে ছাড়ে। তবু মনে হয়, সব খুইয়ে বুঝি মাণিকটাই আঁচলে বাঁধলাম।

তারপর আরও দুই দিন গেল, বড়বউ একাই সব করিলেন। চতুর্থ দিনে রোদে বারান্দা ভরিয়া গেলেও বড়—বউয়ের দুয়ার খুলিল না। সে-দিন মেজ-বউকে ঝাঁটা হাতে করিতে হইল। আরও দিনকয়েক পরে আসিলেন সেজবউ।

তারপর একদিন তিনিও কাজে ইস্তফা দিয়া সকলকে শুনাইয়া বলিলেন,—রোজ রোজ এ ময়দান ঝেঁটুনো কি আমার কাজ? ছোটর অসুখ ক'রে থাকে, বেশ ত, আগের মত ভাগ হোক। সকলের তিনটে ক'রে থাম, আমি না-হয় ছোটর ক'টা নিলাম। এর বেশী পারবও না, তার কথাও নয়।

যেদিন ভাগে বারান্দা সাফ হইল, সেদিন অনুপমা চোখের জল চাপিয়া রাখিতে পারিল না। হায় রে আশা! বালির বাঁধে সে বন্যা রুধিবার প্রয়াস করিয়াছিল!

কয়টা দিনই বা!

না, শক্তি থাকিতে সে নিজের সৃষ্টি ধ্বংস করিতে দিবে

না। অনাদরে যে নিষ্ঠুর আসিল, সে অবহেলাই ভোগ করুক। রাজপুত্রকে কাঙাল সাজাইতে হয় সে-ও ভাল, রচনা সে আবর্জ্জনায় ভরাইতে পারিবে না।

সে উঠিয়া বারান্দায় আসিয়াছে এমন সময়ে ন'বউ আসিয়া উপস্থিত। হাত ধরিয়া ঘরের মধ্যে আনিয়া তাহাকে খাটে বসাইয়া ন'বউ বলিল,—ছি! কাঁদচ?

অনুপমা ন'বউয়ের আঁচলে মুখ ঢাকিয়া বলিল,—তুমি জান না ন'দি, কি সর্ব্বনাশ আজ আমার হ'ল! এত ক'রে প্রাণ ঢেলে শেষে—

চোখের জল মুছাইয়া দিতে দিতে ন'বউ বলিল,—এমনিই হয়। কাঁচা মানুষের নরম মন ছোঁওয়া যায়, কিন্তু ভাই ঝুনো সংসারীর বুকে মাথা কুটে রক্ত বার করলেও সেখানকার দরজা একটু ফাঁক হয় না। মিথ্যে কেঁদে মরিস কেন? এক কাজ কর্, দিনকতক না-হয় বাপের বাড়ি গিয়ে থাক। চোখে না সইতে পারিস, দূরে থাকাই ভাল।

অনুপমা বলিল,—কিন্তু ন'দি, ফিরে এসে আমি কি দেখবো? কি পাব?

ন'বউ শাসনের স্বরে বলিল,—পাবে কচু। ছাই গাদায় চাষ দিলে ভাল ফসল ফলে কখনও?

তথাপি অনুপমা কাঁদিতেছে দেখিয়া ন'বউ দুই হাত দিয়া তাহাকে কোলের কাছে টানিয়া আনিয়া বলিল,—তুই বড় অবুঝ। যেটা আসচে তার মুখ চেয়েও না-কাঁদা তোর উচিত। ওরে জানিস না, মন গুমরে থাকা, কান্না, অভিমান—এই সব দিয়ে তুই সুন্দর ফলটিকে মাটি করতে চাস?

অনুপমা ঈষৎ বিস্ময়ে জিজ্ঞাসা করিল,—মাটি হবে কেন?

ন'বউ বলিল,—সন্তান কি জানিস্? তোরই দেহের একটা অংশ। যতক্ষণ সে আলাদা না হয়, ততক্ষণ তোর মনই তার মন। তাই ত বলছিলুম রে ওরা রাজা—অনাদর সয় না। মা যদি মনমরা হয়ে থাকে, ঝগড়াটে হয়, কাঁদে—ছেলেতেও সে-স্বভাব পায়। মায়ের ভালমন্দ ছেলেতেও বর্ত্তায়।

অনুপমা তাড়াতাড়ি চোখের জল মুছিয়া বলিল,—সে ত ভারি স্বার্থপর! আপন গণ্ডা কড়ায়-ক্রান্তিতে বুঝে নেবে, আমার পানে চাইবে না?

ন'বউ হাসিয়া বলিল,—হ্যাঁ লো—হ্যাঁ, তবু সে মাণিক,—সাত রাজার ধন।

অনুপমা বলিল,—ন-দি, ভাল শিক্ষা দিলে কি মন্দ শিক্ষা দিলে বুঝতে পারলুম না। আমার সংসার রইল পড়ে, তার জন্ম সব খোয়াবার দুঃখ আমার সইতে হবে। বেশ, তাই হোক।

বাপের বাড়ি সে গেল না। মনে মনে ভাবিল, কোলাহলে কান না পাতিলেই হইল। যত ঝড় যত তুফানই উঠুক, চাই কি সৃষ্টিবিপর্য্যয় ঘটিলেও সে থাকিবে নির্ব্বিকার, অটল এবং প্রসন্ন। অবিক্ষুব্ধ চিত্তে প্রফুল্লতার পদ্ম বিকশিত হউক এবং সংসারের সমস্ত-কিছুর উপর সেই পদ্মগন্ধ ব্যাপ্ত হইয়া যাক। সন্তান আসিবে—বিকশিত দলের উপর পা রাখিয়া দেবশিশুর মত পূর্ণিমার লাবণ্য দেহে মাখিয়া সন্ধ্যাতারাকে নয়নে ভরিয়া অপরাহ্ণ আকাশের মতই সুদূর বিস্তীর্ণ সৌন্দর্য্যে রূপবান্। শস্যশ্যামল মাঠের মত মৃদু বায়ুতরঙ্গায়িত এবং নদীকণ্ঠের মতই কলচ্ছোসিত। স্বাস্থ্যে, সুষমায়, প্রীতিতে এবং প্রাণসম্পদে অজস্র।

চাই আয়োজন। সন্তানের পরিপূর্ণতা মায়েরই দায়িত্বে। সংসারকে নিয়ে রাখিয়া সে আসিবে। এবং হয়ত বা একদিন উদার বক্ষোমধ্যে এই সৃষ্টিকে টানিয়া আনিয়া নূতন ভূষণ পরাইবে, নূতন প্রাণে শক্তি আনিয়া দিবে।

বারান্দা-ভাগের মত ছেলেগুলাও ভাগে পড়িল। বারান্দার দক্ষিণ দিকের টেবিল আবার উত্তর কোণে সরিয়া গেল এবং তার নীচে ময়লা জুতার রাশি জমা হইতে লাগিল। কাপড়, জামা, প্যাণ্ট, বেণ্টে আবার বিশৃঙ্খলা আসিল। কর্ত্তারা দিনকতক চায়ের অনুযোগ করিয়া অবশেষে চা খাওয়া ছাড়িয়াই দিলেন। তরকারী মুখে তুলিয়া ভাতের গ্রাস যেন গলা দিয়া নামিতে চাহে না। এ-নিয়ম অবশ্য চিরদিনই ছিল। কিন্তু অভ্যাস-বদলের সঙ্গে সঙ্গে রুচিবিকৃতি ঘটিয়াছিল।

একদিন বড়বউ স্পষ্ট সকলকে শুনাইয়া বলিলেন,—যা রয়-সয় তাই ভাল। তোর বাপু এ মৌটুসকীপনা না করলেই কি হ'ত না? সব বিগড়ে দেওয়া। ছেলে যেন কারও হয় না, এমন 'ধরগো' 'ধরগো' ভাব কই আমাদের ত হয় নি! আট মাস অবধি খেটেচি-খুটেচি তারপর ন'-পড়তেই খাটুনি কমেচে।—এ যে সবই বিবিয়ানা ঢং বাপু। ছেলে হ'লে বোধ হয় মেমসাহেবদের মত নার্স রাখবে, নিজে মাই দেবে না।

অনুপমা শুনিয়া চোখের জলে বুক ভাসাইবার আয়োজন করিতেছিল, তাড়াতাড়ি একখানা বই খুলিয়া বসিল। এ-বিষ কানে আসে আসুক, অন্তরে সে আশ্রয় দিবে না। সন্তানকে এ হলাহল পান করাইয়া সে জর্জ্জরিত করিবে না।

আর একদিন।

বড়বউ মেজবউকে উদ্দেশ করিয়া বলিলেন,- ছেলেটা যে ক'কিয়ে গেল ধরুনা লো। তোরা ত রাজরাণী নোস্, বিদ্যেও নেই, তোদের ও-সব আদিখ্যেতা সাজবে কেন? মেজ-বউ মুখ বাঁকাইয়া উত্তর দিল,—কে জানে দিদি. নিজের ছেলে হবে ব'লে পরের ছেলে ছুঁতেও ঘেন্না করে! আমরা ত বাপু এমন হিংসে কখনও করতে পারি নে।

বড়বউ টপ করিয়া মেজবউয়ের ছেলেকে কোলে তুলিয়া বলিলেন,—পারলুম এটাকে কোলে না তুলে নিয়ে? ও-সব কাঠ প্রাণ—সব পারে।

সেজবউকে আসিতে দেখিয়া বলিলেন, কি লো সেজ, ছেলেটা অমন জরেবাকুরে হ'ল কেন? যত্নআত্তি পাচ্ছে না বুঝি?

সেজবউ কটু করিয়া উত্তর দিল,—খুড়ী জেঠির আত্তি লোকদেখানো,- ওতে কি আর ছেলের গায়ে মাস লাগে।

বড়বউ সে-কথা গায়ে না মাখিয়া চোখ টিপিয়া ইসারায় অনুপমার ঘর দেখাইয়া উচ্চৈঃস্বরেই বলিলেন,—শুয়ে আছেন, রাণী। মন ভাল থাকবে, দেহ ভাল থাকবে, তবে ত ভাল ছেলে কোলে পাবে। লেখাপড়ার গুণ যদি জানতিস তোর ছেলের দশা অমন হ'ত না।

মেজবউ বলিল,—না-কি ঘর সাজানো হচ্ছে?

বড়বউ মুখ মচকাইয়া বলিল,—সে কত! এই ছবি, এই ফুলের তোড়া, এই এসেন্স, এই কাপড়—আসচেই আসচে। ছোটঠাকুরপোকে ত আঁচলে বেঁধেছে! কোন্ দিন না ব'লে বসে ওদের খরচ আমি চালাতে পারবো না।

সেজবউ বলিল,—খরচ কি উনিই দিচ্ছেন না কি? ওরা বুঝি গরুর ঘাস কাটতে দশটায় ভাত খেয়ে বেরোয়? মরণ!

মেজবউ বলিল,—সমস্ত দিন ঘরে ব'সে করে কি?

বড়বউ ঠোঁট উল্টাইয়া বলিলেন.—সজ্জাগজ্জা, ফুল-পোকা, বিছানায় গতর এলিয়ে বই পড়া, এই সব আর কি। সেদিন দেখলুম নতুন ছেলের জন্যে উলের জামা মোজা বোনা হচ্ছে! হোক, আমরা দেখি। আমাদের গুলো ত উলের জামা না গায়ে দিয়ে মরে ভূত হয়ে গেল. ওরটা যদি বেঁচে-বর্ত্তে থাকে!

এমন বিষাক্ত তীরেও কি মর্ম্মভেদ হইয়া চোখের জল বাহির হয় না? অনুপমা আর পারিল না, হু হু করিয়া দু-চোখে অশ্রু নামিল। ইচ্ছা হইল দুয়ার খুলিয়া ইঁহাদের পায়ের উপর আছাড় খাইয়া সে মিনতি করিয়া বলে, ওগো. এত দিনের সেবার মূল্য কি এমনই করিয়া ব্যর্থ হইয়া যায়! সংসারকে আমি ভালবাসিলাম সে ভালবাসায় আমার আশ্রয় মিলিবে না? তোমরা আমায় সে ভালবাসার একটুখানি দাও, আমি নিজের জন্য ভিক্ষা করিতে চাহি না. শুধু এটার জন্য। এ পূর্ণিমার আলোতেই আসুক, অমাবস্যার অন্ধকারে উহাকে টানিয়া আনিতে চাহি না।

ন'বউয়ের কথা মনে পড়িল,- এরা বুনো সংসারী, মনের মধ্যে কে এদের ঘা বসায়! •

দুয়ার আর খোলা হইল না. সে বিছানায় লুটাইয়া পড়িল। কাঁদিতে কাঁদিতে এক সময়ে সে উঠিয়া বসিল।

মনের মধ্যে দারুণ অশান্তি। কান্নার সমুদ্র ঠেলিয়া নোনা জলের পর্ব্বতপ্রমাণ ঢেউ উত্তাল হইয়া উঠিতেছে। চোখের শুষ্ক জলরেখার উপরেই এ স্ফুলিঙ্গকে সঞ্চিত করিয়া রাখিয়াছিল? উঃ মাগো! কান দিয়া এ-বিষ মনের মধ্যে ঢুকিয়াছে। এত হিংসা, এত কুৎসা কেন?

কখন দাঁতে দাঁত চাপিয়া গিয়াছিল, হাতের মুঠাও শক্ত হইয়া উঠিয়াছিল, অকস্মাৎ আয়নার পানে চাহিয়া অনুপমা শিহরিয়া উঠিল।

ন'বউ এই ভাসন্ত চোখের সঙ্কুচিতপ্রায় দৃষ্টি দেখিয়া তেমনই মুগ্ধকণ্ঠে কি বলিতে পারিত, কি সুন্দর তোমার চোখ দুটি, ভাই।

কুঞ্চিত ভ্রূ এত কদর্য্য, উপরের ললাটেও সে কুঞ্চন সম্প্রসারিত। বিষের ক্রিয়া শিরায় শিরায় আরম্ভ হইয়াছে। বুঝি আলোয় সে আসিতে পারিল না! প্রসন্নতার কমল বুঝি রাত্রির অন্ধকারে নয়ন মুদিল! কুঞ্চিত শীর্ণ কুৎসিত সন্তান অনন্ত বুভুক্ষা লইয়া আসিবে। কাঙালের মত—কৃপণের মত! হতবল, হত আশা, সঙ্কীর্ণ মন! বিষণ্ণ বর্ষা-আকাশের মতই ক্ষুণ্ণস্বাস্থ্য ও বক্রদৃষ্টি।

আবার নয়ন ছাপাইয়া অশ্রু নামিল। অনুপমা আবার বিছানায় লুটাইয়া পড়িল।

দিনের পর দিন যায়। প্রত্যহের বিষাক্ত শরগুলি অন্তরে আসিয়া বিঁধে। শত চেষ্টায়ও অনুপমা সেগুলিকে বাহির করিতে পারে না। কখনও চোখে অশ্রু নামে, কখনও বা অগ্নিশিখা জ্বলিয়া উঠে। ভাবে দূর হউক সংসার. বাপের বাড়ি চলিয়া যাই। কিন্তু স্বামীর মুখের পানে চাহিয়া কথাটা আর বলিতে পারে না। তিনি নিত্য হাসিমুখে আসিয়া সংসারের কথাই বলেন। এ-সংসারে শান্তির হাওয়া লাগিয়াছে, প্রাণ আসিয়াছে এবং ভবিষ্যতে কত লোক এই বাড়ির পানে চাহিয়া আদর্শ খুঁজিয়া পাইবে!

স্বামীর অনর্গল আশা-উল্লাসের কাহিনীর তলায় অনুপমার এ ক্ষুদ্র অভিযোগ তলাইয়া যায়। নিজের উপর নিজের ঘৃণা বোধ হয়। দিন দিন সে কোথায় নামিতেছে? স্বামীর উদার হৃদয়ের স্পর্শে দিনের সঞ্চিত গ্লানি ধুইয়া মুছিয়া মনটি নির্ম্মল হইয়া উঠে। চক্ষুতে আনন্দ দীপ্তি উছলিয়া পড়ে।

সে দীপ্তি দেখিয়া স্বামী বলেন,—অনু, তুমিই পারবে। ও-দৃষ্টিকে আমি ভুল বুঝি নি।

কিন্তু দিনের আলোয় রাত্রির প্রশান্তি কোথায় চলিয়া যায়।

সে-দিন অনুপমা কাপড় কাচিয়া আসিয়া দেখে, তার অত সাধের ছবিখানা কে কাচ ভাঙিয়া ছিঁড়িয়া রাখিয়াছে। ছবিখানি সে সখ করিয়া কিনিয়া আনিয়াছিল। প্রসন্ন মাতৃ-মূর্ত্তি, কোলে তাঁর সন্তান। দৃষ্টিতে জগৎসংসার চরাচর লুপ্ত। শুধু সন্তানের প্রতি অসীম প্রীতি— অগাধ স্নেহ। নির্নিমেষ দৃষ্টি সেই সন্তানমায়ায় সুষুপ্ত।...বড় সাধের ছবি, অত উঁচু হইতে কে টানিয়া ভাঙিল? ছোটদের কাজ ইহা নহে।

নয়নে আবার অগ্নিশিখা জ্বলিল। দাঁতে দাঁত চাপিয়া অনুপমা নিস্তব্ধ পাষাণমূর্ত্তির মতই ছিন্ন ছবির পানে চাহিয়া রহিল।

অত্যাচারের মাত্রা ক্রমশঃই বাড়িতে লাগিল। আর এক দিন ফুলদানীটা ভাঙিয়া গেল। বইয়ের অধিকাংশ পাতাই কে ছিড়িয়া রাখে। আলমারীর গায়ে চুণের আঁক-জোঁক, বিছানার উপর ছোট ছোট পায়ের ধুলাকাদার দাগ। অনুপমা কি করিবে? দুয়ারে কুলুপ লাগাইয়া কিছু নীচে যাওয়া যায় না। স্বামীকে এই সব ক্ষুদ্র বিষয় বলিতে তার লজ্জা করে। অথচ প্রতিকারহীন মনে নিত্য এই সবের মালিন্য জমা হইতে থাকে। ঘৃণা ক্রোধ দুঃখ দিব্য আসন পাতিয়া মনকে দখল করিতেছে। সম্মুখে অমাবস্যা, গাঢ় দুর্ভেদ্য নিশ্ছিদ্র অন্ধকার। তাহারই মাঝে অধোগামী হইতে হইতে অনুপমা ভাবে, মৃত্যু কি এর চেয়েও ভীষণ. এর চেয়েও কুৎসিত?

তার পর যে-দিন খোকার জন্য বোনা উলের মোজা ও জামাকে টুকরা টুকরা করিয়া ছিঁড়িয়া রাখিয়াছে দেখা গেল, সে-দিন দুর্জ্জয় ক্রোধে ফুলিয়া অনুপমা অস্পষ্ট ভাবে বলিয়া ফেলিল, —হিংসুক, এরা হিংসুক।

রাত্রিতে মনোনীত হাসি মুখে সংসারের কি একটা কথা বলিতেই অনুপমা অকস্মাৎ বলিয়া উঠিল,—আমি কালই বাপের বাড়ি যাব।

রূঢ় কণ্ঠস্বরে চমকিত হইয়া মনোনীত বলিল,— কেন, হঠাৎ?—অনুপমা তেমনই স্বরে উত্তর দিল, তোমার কি চোখ মেলে একবার কোন দিকে চাইতে নেই? দেখ দেখি, ঘরখানা কি ছিল, কি হয়েচে! ছবি ছেঁড়া, ফুলদানী ভাঙা; বই, খাট, আলমারী, দেয়াল, আয়না এ-সব কিছুই তোমার নজরে পড়ে না? আজ দেখ এই কীর্ত্তি!— বলিয়া ছেঁড়া উলগুলি সে মনোনীতের কোলের উপর একরূপ ছুঁড়িয়াই ফেলিয়া দিল।

উলগুলিকে নাড়িতে নাড়িতে মনোনীত দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া বলিল,—বুঝেছি, আবার ভাঙন ধরেচে। কিন্তু অনু, সহ্য করবো ব'লেই ত আমরা এই ব্রত নিয়েছিলাম।

অনুপমা উত্তর দিল,— সহ্যেরও একটা সীমা আছে। আমার শরীর খারাপ, কাজ পারি না, ওঁরা কত কথাই বলেন। একটা পেটে এসেচে ব'লে ওঁদের হিংসে।

মনোনীত কিছুক্ষণ স্তব্ধ হইয়া রহিল। অতি কষ্টে বুকের নিঃশ্বাসকে ঠেলিয়া দিয়া ধীরে ধীরে বলিল,—সন্তানের জন্য সংসারকে তুমি পৃথক ক'রে দিলে, অনু!

মনোনীতের ঐ কয়টি মৃদু কথার অন্তর্নিহিত বেদনা অনুপমা বুঝিল। বুকের মধ্যে সহসা কে যেন উত্তাল হইয়া উঠিল; চোখ ঠেলিয়া জল আসিল।

কিন্তু না, এ দুর্ব্বলতা। সন্তানকে সে সংসারের জন্য বলিদান দিতে পারিবে না। নিষ্পাপ, নির্ম্মল অতিথি। সে আসিবে পূর্ণিমার আলোয়—শুভ্র, সুন্দর, জ্যোতির্ম্ময়। সে রাজা··রাজকর তাহাকে দিতেই হইবে। মা হইয়া অনুপমা কিছুতেই তাহাকে অনাদরের ধুলায় নামাইয়া কালো করিতে পারিবে না। সংসারকে সুন্দর রাখিতে সন্তানকে সে কুৎসিত করিবে না।

দাঁতে ঠোঁট চাপিয়া অনুপমা পরিষ্কার কণ্ঠে বলিল,—হয় সংসার, নয় ছেলে—একটাকে বাঁচাতেই হবে। আমি মা, ছেলের ভার নিলাম, তুমি সংসারকেই দেখো।

আবার বহুক্ষণ নিস্তব্ধতা। বহুক্ষণ পরে মনোনীত শয্যা হইতে উঠিয়া ধীরে ধীরে টেবিলের কাছে আসিয়া দাঁড়াইল ও ডান হাত দিয়া টেবিলল্যাম্পের বোতাম ঘুরাইয়া আলোটাকে উজ্জ্বল করিয়া দিল।

অনুপমা তখনও দাঁতে ঠোঁট চাপিয়া চেয়ারে বসিয়া আছে। স্পন্দহীন বাক্যহীন। সেই ভাসন্ত চোখের কালো তারায় বিস্ফারিত দৃষ্টি, অনুপমার সমস্ত সৌন্দর্য্যকে যে-দৃষ্টি প্রাণ দিয়াছে, যে-দৃষ্টিতে সমগ্র অন্তর উদ্ভাসিত হইয়া উঠে, যে-দৃষ্টি দেখিয়া মনোনীত সংসার গড়িবার মহৎ স্বপ্নে বিভোর হইয়াছিল!

সেই দৃষ্টিপথে সুন্দর অন্তরখানি বহুক্ষণ আশামুগ্ধের মত চাহিয়া রহিল। কি দেখিল, সে-ই জানে। আলোটার বোতাম ঘোরাইয়া আবার সে ঘরখানি প্রায় অন্ধকার করিয়া দিল। তারপর তেমনই ধীরে ধীরে শয্যার অভিমুখে চলিতে লাগিল।

'স্বপ্নো নু মায়া নু'

শ্রীযতীন্দ্রমোহন বাগচী

এক ফালি জ্যোৎস্নাসম প্রিয়া মোর রহিয়াছে মিশি
শুভ্র শয্যাটির সাথে—মূর্চ্ছাতুরা পূর্ণিমার নিশি!
শ্রাবণের আর্দ্র বায়ে কেতকীর গন্ধ ভেসে আসে
দক্ষিণের বাতায়নে; নিশীথের নিঃশব্দ আকাশে
কথা কও, কথা কও—ক্লিষ্ট কণ্ঠে কোথা কোন্ পাখী
দূর হ'তে আরও দূরে উড়ে-উড়ে চলিয়াছে ডাকি!
একটানা ঝিল্লিধ্বনি চলে শুধু স্বপ্নজাল বুনে
শ্রান্তিহীন গুঞ্জরণে—ঘুম যায় রাত্রি তাই শুনে।

সুন্দরের স্বপ্নাবেশ জীবনের কোলাহল-পারে;
তন্দ্রার তমিস্রা টুটি জ্যোৎস্না ফেটে পড়ে চারিধারে
মুগ্ধ জাগরণসম,- অথবা সে জাগ্রত স্বপন—
জীবন পড়িছে ঢুলি, ঘুম ভেঙে চাহে কি মরণ?

স্বপ্নসম এ জীবন অমিলে ও গরমিলে ভরা—
ধরার ধারণাবন্ধে দু-দিন চাহে না দিতে ধরা!
স্বপ্নের কি দোষ তবে? গাহ স্বপ্নসুন্দরের জয়—
হোক্ তা ক্ষণিক মিথ্যা,—জীবন ত তার বেশী নয়।

জুয়াঙ্গ জাতি

শ্রীনির্ম্মলকুমার বসু

উড়িষ্যা প্রদেশটিকে মোটামুটি দুই ভাগে ভাগ করা যায়। সমুদ্রের কূলে যে সমতল অংশটি আছে তাহাকে স্থানীয় লোকেরা মোগলবন্দী বলিয়া থাকে এবং তাহার পশ্চিমে যে গভীর অরণ্যময় পার্ব্বত্য প্রদেশ আছে তাহাকে গড়জাত বলে। উড়িষ্যা প্রদেশ মোটের উপর পশ্চিম ও উত্তর-পশ্চিম হইতে পূর্ব্ব ও দক্ষিণ-পূর্ব্ব দিকে ঢালু। উড়িষ্যায় নদীর

মানি

সংখ্যা বহু। কলিকাতা হইতে পুরী যাইতে হইলে কত যে বড় বড় নদী পড়ে তাহার ঠিকানা নাই। সুবর্ণরেখা, ব্রাহ্মণী, বৈতরণী, মহানদী প্রভৃতি তাহাদের মধ্যে প্রধান। তাহা ছাড়া শাখা-প্রশাখা যেগুলি আছে, তাহাদের সংখ্যা দশ বারটির কম নহে। এই সকল নদী গড়জাতের পার্ব্বত্য অংশ ভেদ করিয়া আসিয়াছে। পাহাড়ের মধ্যে যেখান দিয়া নদী বহিয়া যায়, সেখানকার দৃশ্য অতি রমণীয়। কোথাও বা গভীর খাদ, দুই পাশে ঘন বনে ঢাকা পাহাড়, বায়ুচলাচলের অভাবে

জনৈক জুয়াঙ্গ

সমস্ত স্থানটি একরকম ভিজা গরমে ভর্ত্তি হইয়া আছে; আবার কোথাও-বা নদী বেশ প্রশস্ত হইয়া গিয়াছে, মাঝে বালুর চরে চকাচকি বসিয়া বিশ্রাম করিতেছে অথবা কুমীর শুষ্ক কৃষ্ণবর্ণ কাঠের মত পড়িয়া আছে, অথবা হাঁ করিয়া রোদ পোহাইতেছে। দুই পাশে ঘন শালের বন, ঈষদুন্নত জমির উপর যেন সবুজের ঢেউ খেলিয়া গিয়াছে। এমন দৃশ্য উড়িষ্যার গড়জাতে বহু স্থানে দেখা যায়।

মোগলবন্দীতে যে-সকল উড়িয়া-ভাষাভাষী চাষীরা বাস

..রে তাহারা বহুদিন ধরিয়া গড়জাতের নদীর ধারে ..রে নিজের বসতি বিস্তার করিতেছে। পাড়ের জমি ..র্বরা, অল্প চেষ্টায় সেখানে ভাল ফসল হয় বলিয়া তাহারা নদীর কূল ছাড়িয়া দূরে যাইতে চায় না। সেখানেই গ্রাম বাঁধে, ক্রমে মন্দির নির্মাণ করে, রাজা হয়, গড় হয়, আর স্থানীয় লোকেরা নদীর কূল ছাড়িয়া ক্রমশঃ জঙ্গলের মধ্যে আশ্রয় গ্রহণ করিতে চলিয়া যায়। বহুদিন ধরিয়া এমনি একটা সম্বন্ধ উড়িয়াদের সহিত জঙ্গলের শবর, কোল প্রভৃতি জাতির চলিয়া আসিতেছে। তাহারা জঙ্গলে শিকার করিয়া খায়, অল্প স্বল্প চাষ করে, তাহাও তেমন ভাল নয়। চাষীদের প্লাবনে যখন নদীর তীরে টিকা কঠিন হয় তখন জঙ্গলীরা বনের মধ্যে সরিয়া পড়ে।

চাষীরা ইহাদের ঘৃণা করে, ছোঁয় না, অথচ যখন কাজের দরকার হয় তখন ইহাদের সাহায্য লইতেও ছাড়ে না। জুয়াঙ ইহাদেরই মধ্যে একটি জাতি। আমি যখন প্রথম জুয়াঙদের মধ্যে যাই তখন তাহারা জিজ্ঞাসা করিল, "আপনার কি কুলির দরকার?" আমি যে তাহাদের ভাষা শিখিতে আসিয়াছি, তাহাদের সঙ্গে মিশিতে আসিয়াছি এ-কথা তাহারা আদৌ বিশ্বাস করিল না। ক্রমে আলাপ-সালাপের পর যখন তাহাদের মধ্যে বসিয়া গান-বাজনা শুনিতেছি তখন পার্শ্ববর্তী গ্রামের এক জন ব্রাহ্মণ জনমজুরের খোঁজে একদিন সেখানে আসিয়া পড়িল। সে ত ভাষা-শেখার কথা শুনিয়া হাসিয়াই ফেলিল। বলিল, 'বাবু ওদের তো ভাষা নাই। বাঁদরেরা যেমন কুঁইকাঁই করে, ওদেরও সেই রকম স্বর আছে।' ভাবিলাম, হায় রে, সুখে দুঃখে পাশাপাশি থাকিয়াও মানুষে এমন করিয়া মানুষের সহিত ব্যবধান সৃষ্টি করে, তাহাকে মানুষ বলিয়া পর্য্যন্ত ভাবিতে পারে না, ইহার চেয়ে দুঃখের কথা আর কিছু হইতে পারে না।

একজন বর্দ্ধিষ্ণু জুয়াঙের বাড়ি—প্রাঙ্গণে পত্র-পরিহিতা একটি নারী

মাল্যগিরি পাহাড়ের একটি অংশ

জুয়াঙ্গেরা উড়িয়া বোঝে, বলিতে পারে। তবে সে উড়িয়া কটক-পুরীর উড়িয়ার মত শুদ্ধ নয়, প্রথমে উচ্চারণের পার্থক্যের জন্য একটু বুঝিতে কষ্ট হয়, ক্রমে কানে সহিয়া যায়। নিজেদের মধ্যে কিন্তু তাহারা আপন ভাষা বলে। সেই

পূজারত একজন জুয়াঙ্গ

ভাষা কতকটা কোল, কতকটা খড়িয়া ভাষার মত। তাহা শিখিবার জন্য একবার আয়োজন করিয়া পাল-লহড়া নামে একটি ক্ষুদ্র গড়জাতে গিয়া উপস্থিত হইলাম।

পাল-লহড়া রাজ্যের পূর্ব্ব প্রান্তে অর্দ্ধচন্দ্রাকার রূপ ধারণ করিয়া একটি পর্ব্বতশ্রেণী আছে। তাহার নাম মালা-গিরি। যেন মালার মত রাজ্যের এক প্রান্ত বেড়িয়া আছে বলিয়া তাহার এই নাম। ঘন বনে মালাগিরির পাদদেশ আচ্ছন্ন, মধ্যে মধ্যে ছোট নদী-নালা তাহা ভেদ করিয়া গিয়াছে। বাঘ ভালুকের ত কথাই নাই, হাতী, বন্য মহিষ প্রভৃতি জন্তুরও এখানে অভাব নাই। তাহাদের পায়ের চাপে শবরদের ধানক্ষেতগুলি মথিত হইয়া যায়, অতি কষ্টে ফসলের তিন-ভাগের একভাগ বাঁচাইতে পারিলেই চাষীরা যথেষ্ট পাইয়াছি মনে করে। একদিন রাত্রে তাঁবুতে শুইয়া আছি, এক শত গজ দূরে নদীর ধারে হঠাৎ খুব টিন বাজিতে লাগিল। পরের দিন শুনিলাম রাত্রে আখের ক্ষেতে হাতী আসিয়াছিল, তাহাকে তাড়ানোর চেষ্টায় চাষীরা অত চেঁচামেচি করিয়াছিল। এমন প্রায়ই হইত।

বনের মধ্যে সারাদিন কাজের পর যখন বেড়াইতে যাইতাম তখন হয়ত বা হঠাৎ কোনও ভারি খুরবিশিষ্ট জন্তুর পায়ের আওয়াজ পাইলাম। বনের অন্তরালে যেন কেহ কাহাকেও সবেগে অনুসরণ করিতেছে। তাহার পরেই হঠাৎ হরিণের গলার ডাক পাইলাম। বুঝিলাম কোনও হরিণ হয়ত তাহার সঙ্গিনীর পিছনে দৌড়াইতেছে ও নিমেষের মধ্যে সমস্ত উপত্যকাটি ঘুরিয়া আসিতেছে। হরিণীরা খানিক ছুটিয়া যায় আবার দাঁড়ায়, আবার ছোটে আবার দাঁড়ায়, যেন নিরীহ ভাল মানুষটি। হরিণ হঠাৎ তাহাকে সন্ধান

বনের মধ্যে চাষের জন্য কিছু খোলা জমি

করিয়া তীরবেগে লতাপাতার ফাঁকে ফাঁকে ছুটিয়া চলে, দেখিতে না পাইলে ডাকে, এমনি করিয়া তাহাদের মধ্যে খেলা চলে।

প্রাতরাশের জন্ম তাড়ি নামান হইতেছে

একটি জুয়াঙ্গ রমণী পাটি বুনিতেছে

গ্রামের পাশে সারগাদা। সময়ে অসময়ে হঠাৎ সেদিকে নজর পড়িলে দেখিতাম, বন্য কুক্কুটেরা মহানন্দে তাহার উপর ভোজ লাগাইয়াছে। গ্রামের মোরগের মতই দেখিতে, তবে মাথার ঝুটি কিছু ছোট, শরীরের গড়ন আরও ছিপছিপে ধরণের। নিঃশব্দে খায়, মাঝে মাঝে ঝটাপটি করে, তাহাও গলা না খুলিয়া এবং হঠাৎ ভয় পাইলে নিঃশব্দে উড়িয়া গিয়া গাছের ডালে আশ্রয় লয়। তাহার পরক্ষণেই আবার কোথায় মিলাইয়া যায়, ধরা যায় না।

কয়েক জন জুয়াঙ্গ কাজ করিতেছে অথবা মদ্যপান করিতেছে

এমনিধারা বনজঙ্গলের মধ্যে জুয়াঙ্গদের বাস। আমি একটি বিশাল তেঁতুল গাছের কাছে তাঁবু ফেলিয়া ছিলাম। বনে প্রায়ই হনুমানের হুপ-হাপ শব্দ শোনা যাইত, কিন্তু তেঁতুলগাছে তেঁতুলে ভর্তি, একদিনও তাহাতে আসিয়া বসিত না। আশ্চর্য্য হইয়া একদিন শবরদের জিজ্ঞাসা করিলাম, তাহারা বলিল, "বাবু, এ গাঁয়ে যে জুয়াঙ্গেরা বসবাস করে, তাহাদের ত্রিসীমানার মধ্যে হনুমান আসিবে না।" তাহারা নাকি বানর হনুমান খুব পছন্দ করে। একবার

একটিকে পাইলে গ্রামসুদ্ধ লোক মিলিয়া যতক্ষণ না তাহাকে মারিতেছে ততক্ষণ রক্ষা নাই।

বাস্তবিক জুয়াঙ্গেরা সবই খায়। সকালে উঠিয়া পুরুষেরা বনে কাঠ কাটিত, চুপড়ী তৈয়ারী করার জন্য বাঁশ আনিতে চলিয়া যায়, আর স্ত্রীলোকেরা ফল-মূল, কন্দ, লালপিঁপড়ার ডিম প্রভৃতি সংগ্রহ করিতে যায়। লালপিঁপড়ার ডিম তাহাদের খুব প্রিয় খাদ্য। আগে জুয়াঙ্গেরা বনে শিকার করিয়া খাইত. আজকাল সে-সব জঙ্গল রাজার খাস হইয়া যাওয়ায় শিকার বন্ধ হইয়াছে,

কণ্টলা গ্রামের মাংগাং ও তাহার সম্মুখে নাচের জন্য খোলা জায়গা

পত্র-পরিহিতা একটি রমণী

পত্র পরিধার রীতি

তাহাদের দুর্দ্দশার সীমা নাই। কোনও রকমে বাঁশের জিনিষ-পত্র বিক্রয় করিয়া দিন গুজরান করে।

জুয়াঙ্গদের গ্রামগুলি ছোট। কোনটিতে দশ ঘর, কোনটিতে বা দুই-তিন ঘর মাত্র লোকের বাস। গ্রামের মধ্যে

একটি করিয়া চার চালা ঘর থাকে, তাহাকে বলে মজাং অথবা দরবার। অতিথিসজ্জন আসিলে এখানেই আশ্রয় দেয়, গল্প-গুজব করে। আবার এই ঘরেতেই তাহাদের যাহা কিছু পূজাপাট তাহাও করে। গ্রামের যত অবিবাহিত পুরুষ তাহাদের মজাঙে থাকিতে হয়। হঠাৎ শত্রু আসিলে তাহারাই সকলকে ডাকিয়া দিবে ও যুদ্ধের প্রথম চোট নিজেরাই গ্রহণ করিবে। কাহারও মজুরের প্রয়োজন হইলে মজাঙের যুবকেরা অগ্রণী হইয়া কাজ করিয়া আসিবে। মজাংই হইল জুয়াঙদের বৃহত্তর সামাজিক জীবনের কেন্দ্র। প্রতি সন্ধ্যায় মজাঙের সম্মুখে খোলা জমিটুকুতে স্ত্রীলোকেরা হাতধরাধরি করিয়া নাচে এবং পুরুষেরা সম্মুখে ছাড়াছাড়ি ভাবে তাল রাখিয়া তাহাদের সহিত চাঙ্গু বাজাইতে থাকে। মজাং-ঘরের যে দুইটি খুঁটি, জুয়াঙদের বিশ্বাস তাহাতেই জগতের আদি কারণ বুঢ়াম বুঢ়া ও বুঢ়াম বুঢ়ির বাস। তাহার কাছে কাল রঙের মুরগী বলি দিতে হয়। অথচ তিনি স্বয়ং তেজোময়, অগ্নিতে তাঁহার অধিষ্ঠান। মজাঙে সর্ব্বদা কুণ্ডের মধ্যে যে আগুন জ্বলিতে থাকে তাহা তাঁহারই কৃপায় হইতেছে। চাঙ্গুর চামড়া বাজাই-বার আগে যখন আগুনে সেঁকিয়া লইতে হয় তখন তিনিই আসিয়া চাঙ্গুতে অধিষ্ঠিত হন, চাঙ্গুর আওয়াজ তাঁহারই গলার আওয়াজ। আগুনের তাপ না লইলে চাঙ্গু কি নিজের শক্তিতে বাজিতে পারে?

একদিন জুয়াঙদের একটি পূজা দেখিতে গেলাম। পূজার উপকরণ অতি সামান্য, মন্ত্র তদপেক্ষা সরল। আমি যাহাতে তাহাদের ভাষা সহজে শিখিতে পারি এই জন্য পূজা দেওয়াইয়াছিলাম। মানি নামে আমার শিক্ষক, ও গ্রামের অগ্রণী, স্নান করিয়া একটু আগুন জ্বালিল, তাহাতে ধুনা দিল ও শালপাতার একটি প্রদীপ করিয়া তাহা সূর্য্যের দিকে একটু উঁচু করিয়া ধরিয়া বলিল "সত্যা যেমতো যাসিকে তলে বাহাসিন্দরী উপরে ধর্ম্ম দেবতা, বাবুরে আইঙ্গ লাগাতাইজে সামুইসেরে। বেগাবেগী মোরনে ঠারেরে।"

অনুবাদ—"নীচে বসুন্ধরা সত্য, উপরে ধর্ম্মদেবতা, তিনিও সত্য। তোমাদের কাছে প্রার্থনা করিতেছি, বাবুকে আমাদের ভাষা শীঘ্র আনিয়া দাও।"

১ তাহার পর আরম্ভ হইল পূজার পালা। ভিজানো আলোচাল পিণ্ডের মত নয়টি জায়গায় মাটিতে রাখা হইল এবং তাহার পর দুইটি কাল মুরগী তাহার উপর ছাড়িয়া দেওয়া হইল। মুরগী দুটি চাল খাইবার সঙ্গে সঙ্গে তাহাদের ধরিয়া বলি দেওয়া হইল ও রক্ত মজাঙের চাঙ্গুর উপর ছড়াইয়া দেওয়া হইল। পূজাও শেষ হইল। তাহার পর সারাদিন ধরিয়া খাওয়া-দাওয়া ও নাচগান চলিতে লাগিল।

পূজার মন্ত্র যেমন সোজা, দেবতার কাছে চাওয়াও তেমনি সরল ধরণের। দেবতার মধ্যেও কোনও বাছাই নাই, সবাই ভাল, সকলকেই সন্তুষ্ট করিতে হয়। চালের পিণ্ড দিবার সময়ে মানি বলিতে লাগিল :—

গলা বুঢ়াম বুঢ়া পায়ে সেনা
তলে বাহাসিন্দরি আমডে পায়েসেনা
লক্ষ্মী দেবতা আমডে পায়েনা
যেতেকে বুঢ়ারিকি, গলা বাবুকে
ঠারেরে মেডেঙ্কেনাতে, আকে
পায়েসেনায়েতে

—আচ্ছা বুঢ়াম বুড়া নাও
নীচে বসুন্ধরা তুমিও নাও
লক্ষ্মী দেবতা তুমিও নাও
যত দেবতারা! আচ্ছা বাবুকে
ভাষা আনিয়া দাও (?) তোমরা সকলে
নিয়ে নাও

সহজ ঋজু ভাষা, কোনও গোলমাল নাই, যে-কেহ পূজা করিতে পারে, কেবল বিবাহিত হইলেই হইল। এমনিধারা সহজ জীবন জুয়াঙেরা যাপন করে। বাহিরের লোকের সঙ্গে তাহাদের খুব বেশী সম্পর্ক নাই। পাহাড়, জঙ্গল, জীবজন্তুর সহিত সাক্ষাৎ কারবার রাখে। ইহাদের জীবন যে সুখের তাহা নহে। দারিদ্র্য আছে, অনাহার আছে, রোগ আছে, অত্যাচার আছে, তবু সন্ধ্যায় নাচগান লইয়া, মদ্যপান করিয়া একরকম করিয়া দিন তাহাদের কাটিয়া যায়। দুঃখের কথা তাহারা বেশী ভাবে না, দুঃখকে স্বীকার করিয়া লইয়াছে; কেবল দুঃখের অরণ্যের মধ্যে ফাঁকে ফাঁকে যতটুকু সুধা পাওয়া যায় তাহাকেই কাঙালের মত নিঃশেষে শোষণ করিয়া লয়, অনাহার অত্যাচারের কথা ভাবিয়া সেটুকু আনন্দকে পঙ্কিল করিতে চাহে না।

পণপ্রথা ও একখানি তামিল শিলালিপি

শ্রীদীনেশচন্দ্র সরকার, এম-এ

সংবাদপত্রে আমরা প্রায়ই উচ্চশ্রেণীর হিন্দুকুমারীগণের হৃদয়-বিদারক আত্মহত্যার সংবাদ পাঠ করি। এই সকল দুঃসংবাদে সহৃদয় ব্যক্তিমাত্রেরই চক্ষু অশ্রুসিক্ত হয়। এ-দেশে এখন দু-একটি 'বিনাপণ-বিবাহ-সমিতি' স্থাপিত হইয়াছে এবং দু-একজন হৃদয়বান্ নিঃস্বার্থ যুবকও দেখা যাইতেছে বটে; কিন্তু এখনও উচ্চশ্রেণীর হিন্দুগণের সমাজে উৎকট বরপণ প্রচলিত রহিয়াছে। বঙ্গদেশের সমাজ-ধুরন্ধরগণ সমাজের এই দারুণ ব্যাধিটি দূর করিবার জন্য এ-পর্য্যন্ত কোনরূপ সামাজিক চেষ্টা করিয়াছেন বলিয়া আমি শুনি নাই।

জগতের সকল সমাজেই কোন-না-কোন প্রকার পণপ্রথা বিদ্যমান আছে। কিন্তু আমাদের দেশে কন্যার বিবাহ একরূপ বাধ্যতামূলক বলিয়াই এই সকল হৃদয়বিদারক ঘটনার উদ্ভব হইয়া থাকে।

এ ত গেল বরপণের কথা। পক্ষান্তরে অনুসন্ধিৎসু ব্যক্তিমাত্রেই অবগত আছেন, আমাদের তথাকথিত 'অনুন্নত সম্প্রদায়গুলি' কন্যাপণের বিষে কিরূপ জর্জ্জরিত। 'বিয়ের কড়ি' জোটাইতেই অনেকের 'পারের কড়ি' জোটাইবার বেলা আসিয়া উপস্থিত হয়; সুতরাং পত্নীর পরিপূর্ণ যৌবনে তাহাকে বিধবা করিয়া যাওয়া ব্যতীত আর গত্যন্তর থাকে না। আবার অধিকাংশ 'অনুন্নত সম্প্রদায়েই' বিধবা-বিবাহ অপ্রচলিত। সুতরাং সমস্যার উপর সমস্যা জড়াইয়া ভয়ানক জটিলতার সৃষ্টি হইয়াছে। সমস্যাগুলির কথা অনেকেরই শোনা আছে; কিন্তু কয়জন 'সমাজপতি' এই সকল সামাজিক ব্যাধি দূর করিতে প্রয়াস পাইয়াছেন?

সেদিন প্রসিদ্ধ জার্ম্মান্ পণ্ডিত হুল্ট্‌শ কর্ত্তৃক সম্পাদিত "দক্ষিণ-ভারতীয় লেখমালা—১ম ভাগে"র (*South Indian Inscriptions*, Vol. I., ed. by Hultzsch, pp. 82 ff.) পাতা উল্টাইতে উল্টাইতে একখানি তামিল শিলালিপি আমার চোখে পড়িল। যাঁহারা পণসমস্যাটির সম্বন্ধে চিন্তা করিয়া থাকেন, তাঁহারা এই লিপিখানি পাঠ করিয়া আনন্দলাভ করিবেন সন্দেহ নাই। সাধারণ পাঠকও দেখিবেন যে, সকল যুগে ভারতের সকল প্রদেশের সকল সম্প্রদায়ের সমাজ অধুনাতন বঙ্গসমাজের মত মেরুদণ্ডহীন ছিল না;—সমাজ-পতিগণও একতা এবং সঙ্ঘবদ্ধতাহীন ছিলেন না। খৃষ্টীয় পঞ্চদশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে দাক্ষিণাত্যের একটি দেশের ব্রাহ্মণ-সমাজ পণপ্রথা বিদূরিত করিবার জন্য যে-কার্য্য করিয়াছিলেন তাহা আমাদের স্থান, কাল এবং অবস্থার উপযোগী কি-না, আমি সে-বিচার করিতে যাইতেছি না। তবে, ইহা অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে যে, সমাজের কল্যাণের জন্য যে-সকল ব্রাহ্মণসন্তান কন্যাপণ প্রথার নির্ব্বাসনকল্পে সঙ্ঘবদ্ধ হইয়া চুক্তিপত্রে স্বাক্ষর করিয়াছিলেন, তাঁহাদের উদ্দেশ্য সফলই হোক, বিফলই হোক—এই হতভাগ্য, নিরুদ্যম বঙ্গবাসিগণের পক্ষে তাঁহারা সকলেই নমস্য।

অনুশাসনখানি মাদ্রাজের অন্তর্গত বিরিঞ্চিপুর নামক স্থানে একটি মন্দিরগাত্রে খোদিত পাওয়া গিয়াছে। ইহা বিজয়নগরের অধিপতি বীরপ্রতাপ দেবরায় মহারাজের রাজত্ব-কালে, শকাতীত ১৩৪৭ অব্দে (১৪২৬ খৃষ্টাব্দে) পড়ৈবীড়ু রাজ্যের বিভিন্ন সম্প্রদায়ভুক্ত বহুসংখ্যক ব্রাহ্মণের স্বাক্ষরিত একখানি চুক্তি পত্রের প্রতিলিপিমাত্র। বিখ্যাত প্রত্নতত্ত্ববিৎ সিউএল্ (*List of Antiquities*, i. p. 170) বলেন যে, উত্তর-আর্কট জেলার অন্তর্গত পডবেড়ু নামক স্থানই পূর্ব্বকালে পড়ৈবীড়ু রাজ্যের প্রধান নগর ছিল। সুতরাং আধুনিক আর্কট-অঞ্চলকেই প্রাচীন পড়ৈবীড়ু রাজ্য বলিয়া ধরা যাইতে পারে। চুক্তিপত্রের কন্নডিগ (কানাড়ী), তমিঢ় (তামিল), তেলুঙ্গ (তেলুগু), ইলাল (লাট) প্রভৃতি পড়ৈবীড়ুরাজ্য-বাসী বিভিন্ন শ্রেণীর ব্রাহ্মণের উল্লেখ আছে। এই চুক্তিতে নির্দ্ধারিত হইয়াছে যে, কোন ব্রাহ্মণ বরপক্ষের নিকট হইতে অর্থগ্রহণ করিয়া কন্যার বিবাহ দিতে পারিবেন না এবং কোন বরও কন্যার পিতাকে শুল্ক দিয়া কন্যাগ্রহণ করিতে পারিবেন না। এই নিয়ম যে-ব্রাহ্মণ লঙ্ঘন করিবেন, তাঁহাকে

রাজদণ্ড ত ভোগ করিতেই হইবে, উপরন্তু ব্রাহ্মণসমাজ হইতেও তাঁহাকে তাড়াইয়া দেওয়া হইবে।

চুক্তিপত্রটির নিম্নদেশে বহুসংখ্যক ব্যক্তির এবং তাঁহাদের বাসস্থানের নাম লিখিত আছে। এই অংশ নষ্ট হইয়া যাওয়ায় ভাল করিয়া পড়িতে পারা যায় নাই। যাহা হউক, ইহা হইতে বুঝিতে পারা যাইতেছে যে, পডৈবীড়ু রাজ্যের সর্ব্বত্র হইতে বিভিন্ন সমাজের প্রতিনিধিগণ এক মহাসভায় সমবেত হইয়াছিলেন এবং পণপ্রথাকে সমাজের অহিতকর এবং হিন্দুশাস্ত্রের অননুমোদিত দেখিয়া, ঐরূপ কঠোর ব্যবস্থার প্রবর্ত্তন করিয়াছিলেন। শাস্ত্রজ্ঞ মাত্রেই অবগত আছেন যে, পণমূলক বিবাহকে স্মৃতিতে 'আসুর বিবাহ' বলিয়া নিন্দা করা হইয়াছে। ভগবান্ মনু (মনুসংহিতা, ৩য় অধ্যায়, ৩১ শ্লোক) আসুর বিবাহের এইরূপ সংজ্ঞা দিয়াছেন—

> জ্ঞাতিভ্যো দ্রবিণং দত্ত্বা কন্যায়ৈ চৈব শক্তিতঃ।
> কন্যাপ্রদানং স্বাচ্ছন্দ্যাদাসুরো ধর্ম্ম উচ্যতে॥

অর্থাৎ "শাস্ত্রমতে নয়, পরন্তু স্বেচ্ছামতে কন্যার পিত্রাদিকে এবং কন্যাকে অর্থ দিয়া যে কন্যাগ্রহণ,—তাহাকে আসুর বিবাহ বলে।" এই বিবাহের ফলে "ক্রূরকর্ম্মা, মিথ্যাবাদী, ধর্ম্ম-ও বেদ-বিদ্বেষী পুত্রসকল জন্মগ্রহণ করে।" (ঐ, ৪১ শ্লোক)।

নিম্নে আমরা তামিল লিপিটি এবং উহার বঙ্গানুবাদ প্রদান করিলাম। তামিল লেখটিকে বঙ্গাক্ষরে লিখিতে গিয়া, তামিল বর্ণমালার ১৫শ এবং ১৭শ ব্যঞ্জনবর্ণ দুটিকে যথাক্রমে "ঢ়" এবং "ড়" এর দ্বারা প্রকাশ করা গেল। তামিলের অতিরিক্ত মূর্দ্ধণ্য "ণ" টি এবং মূর্দ্ধণ্য "ল"টিকে ণ* এবং ল*—এইরূপে তারকা-চিহ্নিত করিয়া প্রকাশ করিলাম।

মূল

শুভমস্তু স্বস্তি। শ্রীমন্মহারাজাধিরাজপরমেশ্বরাণ* শ্রীবীরপ্রতাপ-দেবরায় মহারায় প্রিথিবিরাজ্যং পণ্ণী অরুলা*নিন্‌র্‌ শকাব্দং ১৩৪৭ তিন্‌* মেল্ চেল্লা নিন্‌ড় বিশ্বাবসুবর্ষং পঙ্গুনি* মা° ৩ দি° বধিয়ূম্ বুদন্* কিঢ়মৈয়ুম্ পেড্‌ড় অনুষত্তু নাল্* পডৈবীড়ু ইরাজ্যত্তু অশেষবিদ্য-মহাজনঙ্গল্*ম্ অর্কপুষ্করিণী গোপীনাথসন্নিধিয়িলে ধর্ম্মস্থাপনসমযপত্রম্ পণ্ণী কুডুত্তপডি ইন্‌ড়ৈ নাল্* মুদলাগ ইন্দপ্পডৈবীড়্ রাজ্যত্তু ব্রাহ্মণ রিল কন্নডিগর তমিঢ়র্ তেলুঙ্গ। ইলালর্ মুদলাণ* অশেষগোত্রত্তু অশেষসূত্রত্তিল্ অশেষ-শাখৈয়িলবর্গল্*ম্ বিবাহম্ পণ্ণ্ মিডত্তু কন্যাদানমাগ বিবাহং পণ্ণকডবরাগবুম্ : কন্যাদানম্ পণ্ণামল্ পোণ* বাঙ্গিয়েণ কুডুত্তাল্, পোণ* কুডুত্তু বিবাহম্ পণ্ণীণা*ল্ ইরাজদণ্ডত্তুক্কুম্ উট্‌পট্টু ব্রাহ্মণ্যত্তুক্কুম্ পুডম্বাগকডবারেন্‌ড় পণ্ণীন ধর্ম্মস্থাপনসময়পত্রম্। ইপ্পডিক্কু অশেষবিদ্য মহাজনঙ্গল্* এড়ত্তু। * * * * * *

বঙ্গানুবাদ

শুভমস্তু স্বস্তি। শ্রীমন্মহারাজাধিরাজ পরমেশ্বর শ্রীবীরপ্রতাপ মহারাজ সানন্দে পৃথিবীরাজ্য ভোগ করিবার কালে, ১৩৪৭ শকবৎসর অতীত হওয়ার পর বর্ত্তমান বিশ্বাবসুবর্ষের ফাল্গুন মাসে ৩রা তারিখ বুধবার ষষ্ঠী, অনুরাধা নক্ষত্রে—পডৈবীড়ু রাজ্যের অশেষবিদ্য মহাজনগণ কর্ত্তৃক অর্কপুষ্করিণী মন্দিরস্থ গোপীনাথ বিগ্রহ সন্নিধানে রচিত ধর্ম্মস্থাপন-চুক্তিপত্রানুসারে অদ্য হইতে এই পডৈবীড়ু রাজ্যের নানা গোত্র, নানা সূত্র ও নানা শাখার কাণাড়ী, তামিল, তেলুগু, লাট প্রভৃতি ব্রাহ্মণেরা কোন বিবাহ সম্পাদন করিলে উহা কন্যাদানরূপে সম্পাদন করিবেন। কেহ কন্যাদান না করিলে—(অর্থাৎ) সুবর্ণ গ্রহণ করিয়া কন্যা দিলে এবং সুবর্ণ দান করিয়া বিবাহসম্পাদন করিলে রাজদণ্ডভাগী হইবেন এবং সুবর্ণ ব্রাহ্মণ্য হইতে বিতাড়িত হইবেন, এই মর্ম্মে এই ধর্ম্মস্থাপন-চুক্তিপত্র রচিত হইল। এই স্থানে অশেষবিদ্য মহাজনগণের স্বাক্ষর। * * * * *

'স্পেশালাইজেশান'

শ্রীআশা দেবী

১

নরেন তেতালার ছাদে বেড়াইতে বেড়াইতে কহিল, 'বিবাহটা অস্বাভাবিক।'

ছাদের মধ্যস্থলে একটা বেতের হাল্কা টেবিল, তাহারই চারিদিকে বসিয়া নরেনের গুটি তিন-চার বন্ধু একত্র হইয়া চা পান করিতেছে। সময়টা সন্ধ্যা উত্তীর্ণপ্রায়। কিন্তু এখনও আকাশে আলোর অবশেষ আছে। নরেনের চা খাওয়া হইয়া গেছে, পেয়ালাটা নামাইয়া রাখিয়া সে অন্ধকার অস্পষ্ট আলোয় ছাদে পাদচারণা করিতে আরম্ভ করিয়াছে। বার-দুই এক প্রান্ত হইতে আর এক প্রান্ত পরিক্রমা করিয়া অবশেষে খাপছাড়া ভাবে মন্তব্য প্রকাশ করিল, 'বিবাহ বস্তুটা নিরতিশয় অস্বাভাবিক।'

সুরেশ ধীরেসুস্থে তর্কের উদ্যোগ করিয়া কহিল, 'এ একটা কথার মত কথা বটে, যাহার আজিও কোন কূলকিনারা পাওয়া যায় নাই।'

নরেশ রুমালে মুখ মুছিয়া কহিল, 'রোলা জন ক্রিস্টোফারে বলেন...'

সুকুমার ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া কহিল, 'যদি তর্ক করিতে হয় আপন ভাষায় করিতে হইবে। কোন 'জন ক্রিস্টোফার' হইতে কথা ধার করিতে দিব না।'

নরেশ ক্ষুণ্ণ হইয়া কহিল, 'তোমার জুলুম। বেশ তাহাই সই, আমার মতে বিবাহবস্তুটা ব্যক্তিগত জীবনে স্বাভাবিক নয় এবং অবিবাহিত থাকাটা ততোধিক অস্বাভাবিক।'

সুকুমার তাহার রীম্‌লেশ চশমার ঝলক লাগাইয়া কহিল, 'কিন্তু ইহার সমাধান আছে ...ফ্রী লভ...

সুরেশ থামাইয়া দিয়া কহিল, 'যাইতে দাও ও-সকল ইম্‌ময়্যাল কথা, ফ্রী লভ আবার কি! সংসারে সর্ব্বত্রই যদি অবাধে ফ্রী লভের চর্চ্চা চলে তবে দুর্ব্বলদের গতি কি হইবে?'

নরেন ঘুরিয়া আসিয়া তাহার চৌকিটা পুনরায় যথাস্থানে টানিয়া বসিয়া পড়িয়া কহিল, 'তোমরা কেহই আমার কথার উদ্দেশ্যটা ধরিতে পার নাই, আপনাদের মধ্যেই মারামারি করিতেছ। বিবাহ করা আমার মতে অস্বাভাবিক এইজন্য যে, স্ত্রীজাতি আকারে-প্রকারে স্বভাবে হৃদয়বৃত্তিতে সকল দিকে পুরুষদের সহিত আলাদা, তাই তাহাদের সহিত বিবাহে সুখ হইতে পারে না।'

সুরেশ বিস্ময়ে দুই চক্ষু বিস্ফারিত করিয়া কহিল, 'অনেক সাহিত্যে, এবং লোকমুখে বিবাহের বিরুদ্ধে বিস্তর যুক্তি শুনিয়াছি, কিন্তু তোমার মুখের এই কথা নূতনত্বে সকলকে ছাড়াইয়া গিয়াছে।'

নরেশ হাসিয়া গড়াইয়া পড়িল, 'তোমার বিবাহে বাধা নাই, বাধা আছে স্ত্রীজাতির সহিত বিবাহে, কিন্তু জগতের আদিযুগ হইতে আবহমানকাল এই প্রথা চলিয়া আসিতেছে। পুরুষের সহিত কখনও পুরুষের বিবাহ হইতে শোনা যায় নাই।'

সুকুমার গম্ভীর হইয়া কহিল, 'নরেন, বিভিন্ন উপাদান না হইলে সৃষ্টি হয় না, পজিটিভ এবং নেগেটিভ বিদ্যুৎকণার মিলন না হইলে বিদ্যুৎসঞ্চারময়ী প্রেমের জন্ম হয় না।'

নরেন এতক্ষণ চায়ের প্লেটের উপর চামচ দিয়া জলতরঙ্গের গৎ বাজাইতেছিল, হঠাৎ উঠিয়া দাঁড়াইয়া কহিল, 'তোমরা যেন কেহ চলিয়া যাইও না, আমি মিনিট-দশের ভিতর এখনই আসিতেছি।'

পরক্ষণেই ছাদের আলিসার উপর হইতে ঝুঁকিয়া পড়িয়া বন্ধুরা দেখিল, জোৎস্নায় একটা আলো তীরের মত ছুটিয়া চলিয়াছে, মোটর-বাইকের গর্জ্জনে সন্ধ্যার স্তিমিত আবেশ বিদীর্ণপ্রায়। পেট্রোলের গন্ধ এখান অবধি আসিতেছে। তিনজনে একটা করিয়া সিগ্রেট ধরাইয়া চুপচাপ বসিয়া রহিল। মিনিট-দশেক পরে সিঁড়িতে পায়ের আওয়াজ পাওয়া গেল। ঢিলা পায়জামায় মোটর-বাইকের তেলের দাগ লাগাইয়া রুক্ষ, অবিন্যস্ত চুলে নরেন আবার তেতালার ছাদে আসিয়া উঠিল।

আধপোড়া চুরুটটা আঙুলে চাপিয়া সুকুমার প্রশ্ন করিল, 'এটা কি হ'ল?'

নরেন হাসিয়া কহিল, 'বল ত কি হইল? ঘুরিয়া আসা গেল পরের ষ্টেশন হইতে।'

সুরেশ বিস্ময়ে চোখের তারা বড় করিয়া বলিল, 'পরের ষ্টেশন মানে শাবর হইতে?'

নরেন তাচ্ছিল্যের সহিত কহিল, 'পাঁচ বছর পরে আমি যখন এরোপ্লেনের চালক হইব তখন...তখন It's a question of only ten seconds!'

সুকুমার কহিল, 'এরোপ্লেনের চালক! তবে যে শুনিতেছিলাম তুমি য়ুনিভার্সিটির জলধি মন্থন-করা একটি রত্ন। তোমার পরীক্ষার খাতা সযত্নে রাখিয়া দেওয়া হয়, সে-সব রেকর্ড ব্রেকিং খাতা! এবং এবারে তুমি ফিজিক্সে এত ভাল এম-এস্‌সি দিয়াছ যে প্রফেসরেরা আশা করেন তুমি এইবারেও পাটনা য়ুনিভার্সিটিতে প্রথম হইবে।'

ফিজিক্সের কথায় নরেন উৎসাহিত হইয়া কহিল, 'এম-এস সি পাস করিলেই আমি ফিজিক্স লইয়া রিসার্চ্চ করিতে আরম্ভ করিব। আমার অনেক দিনের আশা...'

সুকুমার মাঝখানেই কহিল, 'তবে?'

নরেন। তবে কি? ও এরোপ্লেনের কথা? (একটু হাসিয়া) আমি জীবনে স্পেশালাইজেশান মানি না। ফিজিক্স বাছিয়া লইয়াছি বলিয়া যে চিরজীবন ফিজিক্সের ভারবাহী পসরা হইয়া থাকিতে হইবে ইহার চেয়ে হৃদয়হীন বস্তু আর কি হইতে পারে?

নরেশ কহিল, 'কিন্তু অবশেষে তোমাকে স্পেশালাইজেশান মানিতেই হইবে। আজকালকার দিনে কেবল এক একটি বিষয় এত দুরধিগম্য এবং জটিল হইয়া উঠিতেছে যে, অলিতে-গলিতে চোখের স্পেশালাইজড, দাঁতের স্পেশালাইজড গজাইয়া উঠিতেছে। শুধু ডাক্তারকে লোকে বিশ্বাস করে না।'

নরেন। সেই ত এ যুগের যত প্রকার অন্তর্লীন হাস্যকরতা আছে তাহারই একটা প্রচণ্ড নমুনা। এখনকার যুগের পণ্ডিতেরা কেহ-বা এক একটি সচল শরীরতত্ত্ব নয় এক একটি বৈশিষ্ট্যবিশিষ্ট মনোবিজ্ঞান। এই সকল কিম্ভূতকিমাকার জীববাদে তাহারা যে একজন পুরা মানুষ সে-কথাটা ক্রমশঃ ভুলিয়া যাইবার যো হইয়াছে। স্পেশালাইজেশানের প্রসার বাড়িতেছে এবং তাহার অতিকায় আকারের তলায় মানুষের পুষ্পিত, সকল দিকে পরিপূর্ণ অনির্ব্বচনীয় ব্যক্তিত্ব চাপা পড়িয়া যাইতেছে।

সুরেশ হাসিয়া কহিল, 'ঠিক ঠিক, ধর, আমাদের কলেজের নবনীবাবুকে। ভদ্রলোক বুঝি ইতিহাসের প্রফেসর। হিন্দী সাহিত্যে এব্রাহাম খাঁয়ের দানের বিষয়ে তাঁহাকে ষোল ঘণ্টা বকিতে দাও, তথাপি তাঁহার বলিবার কথা ফুরায় না। এদিকে অন্যান্য বিষয়ে প্রসঙ্গতঃ বলিয়া থাকেন 'নৌকাডুবির' বিনোদিনী এবং 'গোরা'র কমলা।'

নরেন উত্তেজিত হইয়া এধার হইতে ওধার সবেগে পায়চারি করিতে করিতে কহিল, 'এই স্পেশালাইজেশানের বিরুদ্ধে আমি মূর্ত্তিমান বিদ্রোহ। আমি দেখাইব যে, স্পেশালাইজেশান না মানিয়াও লোকে মানুষ হইতে পারে। তাই আমি ঠিক করিয়াছি ডি-এসসির থিসীস্ লিখিতে লিখিতে শেক্সপীয়র পড়িব এবং দশ মিনিটে মোটর-বাইক চড়িয়া শাবর ছাড়াইয়া কাহালগাঁয়ের ওদিকে চলিয়া যাইব এবং এই মুহূর্ত্তে...'

সুরেশ সভয়ে কহিল, 'স্পেশালাইজেশান না মানিলে এই মুহূর্ত্তে আবার কি করিবে?'

গঙ্গার একেবারে কিনারে নরেনদের বাড়ি। গ্রীষ্মকালে গঙ্গার জল বহু দূরে সরিয়া গিয়াছে, তীরের উপর গুটিকতক কালো বড় বড় পাথর ঝুঁকিয়া রহিয়াছে।

নরেন কহিল, 'আমি এই মুহূর্ত্তে পাথরের উপর হইতে লাফাইয়া পনের মিনিটের মধ্যে সাঁতার দিয়া ওপারে যাইব। তোমরা উপর হইতে দেখ।'

বন্ধুবর্গ বিস্মিত, স্তম্ভিত, বিমূঢ় হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল। জলে ঝাঁপাইয়া পড়ার শব্দ শোনা গেল। শুক্লপক্ষের অনতিস্ফুট নরম জ্যোৎস্নায় স্ত্রীলোকের মত রমণীয় সুকুমার দেহ অবলীলাক্রমে অতি দ্রুত সন্তরণ দিতেছে দেখা গেল।

সুকুমার একটা নিঃশ্বাস ফেলিয়া চেয়ারে আসিয়া বসিল। ভাবিয়াছিল আজিকার সন্ধ্যায় চা এবং চুরুট সহযোগে আপন ও'রিজিন্যাল্ ওজস্বী ভাষায় কিছু বলিবে এবং বলিয়া নরেন ও অন্যান্য সকলকে তাক লাগাইয়া দিবে। সে আশা সফল হইল না।

২

সৌরীন বাবু স্ত্রীকে ডাকিয়া কহিলেন, 'আজিকার গেজেটে খবর বাহির হইয়াছে নরেন এম-এসসিতে প্রথম শ্রেণীতে প্রথম হইয়াছে।'

নরেনের মা কহিলেন, 'ভালই।'

সৌরীন বাবু কহিলেন, 'কিন্তু আর তাহাকে ঠেকাইয়া রাখা যাইবে না। তাহার সঙ্গে কথা ছিল পরীক্ষার ফল এমনি ভাল হইলে তাহাকে বিলাত পাঠাইতে হইবে।'

নরেনের মা। তোমাকে আবার সে-কথা কবে বলিল? যতই বাড়াবাড়ি করুক আমি জানি নরেনের ধাতে হৈ-হৈ করা সয় না। সে চায় নিরিবিলি এক কোণে বসিয়া কাজ করিতে।

সৌরীন। আমি তাহা মনে করি না। নরেনের প্রতিভা সর্ব্বদাই সক্রিয়, চঞ্চল। ও যদি ইউরোপে যায় তাহাতে ওর ভালই হইবে। তাহা ছাড়া যখন যাইবার জিদ ধরিয়াছে তখন যাইবেই, কাহারও কথা শুনিবে না।

নরেনের মা। যদি তাই হয় তবে যাক। কিন্তু আমার ইচ্ছা ছিল বিবাহ করিয়া যাক।

সৌরীন বাবু রীতিমত দীক্ষিত ব্রাহ্ম। বিবাহ সম্বন্ধে উদার মতামত পোষণ করেন, কহিলেন, 'নরেনের বিবাহে রুচি নাই। আর বিদেশে যদি পাঠাইতে হয় বিশ্বাস করিয়া পাঠান উচিত। অবিশ্বাসের বশে বিবাহের ছলে তাহাকে বাঁধিয়া রাখিয়া পাঠান তাহার পক্ষে আত্মঅমর্য্যাদাকর।'

নরেনের মা ঈষৎ তাচ্ছিল্যের সহিত হাসিয়া কহিলেন, 'বিবাহে অমন সকলেরই একটু-আধটু অরুচি থাকে। আচ্ছা, দেখা যাক। তবে এইটুকু তোমাকে জানাইয়া রাখিলাম যে নরেন নিজে ইচ্ছা করিয়া বিবাহ না করিলে তাহাকে আমি জিদ করিব না।'

* * * *

বন্ধুরা কহিতেছে, 'নরেন, তুমি এত ভাল রেজাল্ট করিয়াছ তখন নিশ্চয়ই লুকাইয়া জীবনের আর সব দিক হইতে সময় চুরি করিয়া ফিজিক্স দিয়াছ, আর ইহাকেই ত বলে স্পেশ্যালাইজেশান।'

নরেন সবেগে মাথা নাড়িয়া কহে, 'কখন না—তোমরা অমুক ফিজিক্সের প্রফেসারকে জান? যিনি আইনষ্টাইনের থিওরি কিছু কিছু পরিবর্ত্তন করিয়াছেন? জান, তিনি তুর্গেনিভ পড়েন, সেতার বাজান এবং নিঃশব্দে তারার দিকে চাহিয়া থাকেন।' তবুও বন্ধুরা নরেনকে উত্যক্ত করিতে ছাড়ে না।

ইতিমধ্যে স্পেশালাইজেশানের পাপকে পরিহার করিতে মোটর-বাইকে চড়িয়া নরেন হো হো করিয়া ঘুরিয়া বেড়াইতেছে, কবিতা লিখিতেছে, গঙ্গায় ডাইভ মারিতেছে, কিন্তু এততেও শান্তি নাই। বন্ধুদের তর্কে হারাইতে না পারিয়া তাহাদের দেখাইয়া দেখাইয়া সম্প্রতি আর এক প্রকৃষ্টতার চর্চ্চা চলিতেছে ফটোতোলা।

ডার্ক-রুমের অভাবে সে রাত্রি জাগিয়া ফটো ডেভালাপ করে এবং তাহার মা যখন পান সাজেন, মেনী যখন দুধ খাইতে মুখ বিকৃত করে—সকল অবস্থায় সকলকার ফটো যখন-তখন তুলিয়া সবাইকে যৎপরোনাস্তি অপ্রতিভ করিয়া তুলিতেছে।

মা আসিয়া কহিলেন, 'নরেন তুই ত না বলিতে কহিতে সবাইকার ফটো তুলিয়া আমাদের উদ্ব্যস্ত করিয়া মারিতেছিস, এখন একটি কাজের মত কাজ কর দেখি।'

নরেন মোটর-বাইক ধুইতেছিল, মুখ তুলিয়া চাহিল।

'দেখ, একটি মেয়েকে দেখিয়া পছন্দ করিবার জন্য বর-পক্ষীয়েরা ফটো চাহিয়া পাঠাইয়াছেন। কিন্তু এদিকে মেয়ের বাপের তত টাকা পয়সা নাই, কোথা পাইবে ফটো তুলিয়া অপব্যয় করিতে। তা তুই এমনি সেই মেয়েটির ফটো তুলিয়া দে।'

নরেন উৎসাহের আতিশয্যে ঝাড়ন ফেলিয়া দিয়া কহিল, 'পেশাদার ফটোগ্রাফারের চেয়ে আমার ফটো ঢের স্বাভাবিক ও সুন্দর। তুমি কি বল মা? স্পেশালাইজেশান তুমি মান কি? আমি মানি না। তাই যাহারা ফটো তুলিতেই সমস্ত সময় কাটায়, ফটোতোলা যাহাদের ব্যবসায় তাহাদের দ্বারা ফটো তোলান আমি পছন্দ করি না। আমি চাই পৃথিবী হইতে সমস্ত প্রকার স্পেশালাইজেশান যাহাতে উঠিয়া যায়।'

মা উৎসাহ দিয়া কহিলেন, 'ঠিক ঠিক, আমিও ত তাহাই বলি। ফটোতোলা যাহাদের জীবিকা তাহাদের চেয়ে আমাদের নরেন বিন্দুমাত্র খারাপ ফটো তোলে না।'

নরেন আবার কহিল, 'হাঁ, আর যদি সেই মেয়ের চেহারা তেমন ভাল না হয় তথাপি লেশমাত্র উদ্বেগের কারণ নাই। আমি এমন কায়দায় নেগেটিভ প্লেটের উপর এমন কৌশলে রি-টাচ করিয়া ফটো তুলিয়া দিব যে...'

মা হাসিয়া কহিলেন, 'তবে ত আরও ভাল, কারণ সেই য়েটি দেখিতে তেমন কিছু নয়।'

নরেন তখনই মোটর-বাইক ফেলিয়া উপরে চলিয়া গেল াট-হোল্ডারে প্লেট পরাইতে।

কয়েক দিন হইতে সে বসিবার ঘরের একাংশ ঘিরিয়া একটি র্ক-রুম তৈয়ারী করিয়াছে। বিকালবেলায় চা খাইবার সময় বলিলেন, 'নরেন, এইবার সেই মেয়ের বাড়ি যা, বেলা ড়িয়া আসিতেছে।'

নরেন সবেগে মাথা নাড়িয়া কহিল, 'কক্ষনো না, সেই মেয়েই ামার ষ্টুডিওতে আসিবে।' মা হাসিয়া বলিলেন, 'ভারি ত ারে আধখানা ষ্টুডিও। কিন্তু মেয়েদের মানমর্য্যাদা কত চ্ছু ভাবিয়া চলিতে হয়, সে আসিবে কি করিয়া? ইচ্ছা রিলেই ত আর তোর মত মোটরবাইকে উনপঞ্চাশবায়ুতে ার করিয়া তাহার উড়িয়া বেড়ান সাজে না।'

নরেন ভ্রূ কুঞ্চিত করিয়া কহিল, 'খালি মানমর্য্যাদা! কিন্তু াসল কথাটা এই যে, মানের বোঝাটা ফেলিয়া দিলেও তামাদের সাধ্য নাই যে, আমার মত মোটরবাইকে পঞ্চাশ াইলের স্পীড্ লাগাও।'

মা আবার উৎসাহ দিয়া কহিলেন, 'নাই ত। আর সইজন্যই ত তোকে বলিতেছি তুই যা। ওই ক্যামেরা-্যামেরাগুলা লইয়া যাইতে হইবে, আজ আর মোটরবাইকে লিবে না। তুই লক্ষ্মীছেলের মত মোটরে চড়িয়া ব'স, সে তাকে ঠিক জায়গায় লইয়া যাইবে।'

নরেন সম্মত হইয়া কহিল, 'আচ্ছা।'

'কিন্তু শীঘ্র যা। একেবারে রোদ পড়িয়া গেলে ভাল ফটো হইবে না।'

নরেন কহিল, 'তাড়াতাড়ি আমি পারিব না। আমার ক্রীম মাখিতে পাঞ্জাবী বদলাইতে বেশ খানিকটা সময় লাগিবে। আমি স্পেশালাইজেশান মানি না তাই প্রসাধন মানি। লোকে যেন আমাকে দেখিয়া না বলিতে পারে যে, য়ুনিভার্সিটির জলধিমন্থনরত্ন একেবারে সাজগোজ করিতে জানে না, রসকষের লেশ নাই। তুমি কি বল মা? তুমি কি স্পেশালাইজেশান মান?'

(হাসিয়া) 'মোটেই না।'

৩

মোটর আসিয়া নির্দিষ্ট বাড়ির সম্মুখে দাঁড়াইল। নরেন যদি অতিশয় আত্মভোলা না হইত তবে একবার চাহিয়াই অনায়াসে বুঝিতে পারিত যে, এমন বাড়ি যাহাদের, তাহাদের বাড়ির মেয়েকে পয়সার অভাবে সখের ফটোগ্রাফারের কাছে ফটো তোলাইতে হয় না, কিন্তু নরেন তখন উত্যক্ত হইয়া নীলার আংটিটা একবার এ-আঙুলে আবার খুলিয়া অন্য আঙুলে পরিতেছিল এবং বুঝিয়া উঠিতে পারিতেছিল না, গায়ের চাদরখানা কি ভাবে জড়াইয়া লইলে লোকে বুঝিতে পারে যে, হাঁ এ ছেলেটি বেশভূষা করিতে জানে বটে। অন্ততঃ য়ুনিভার্সিটিতে নাইন্টি পার্সেন্ট বাগাইতে সে যে জীবনটাকে কেবলমাত্র ফিজিক্সের কোঠায় আবদ্ধ করে নাই এ পরিচয়টুকু তাহারা নিঃসন্দেহে বুঝিতে পারে। কিন্তু চাদরের ভঙ্গীটা মনঃপূত হয় না। এমনই বিরক্ত অবস্থায় ক্যামেরা-ঘাড়ে গেটের ভিতর ঢুকিয়া দেখিল একটি মেয়ে সাজি হাতে সামনের বাগানে ফুল তুলিতেছে। সোজা তাহার কাছে গিয়া কহিল, 'আপনাদের বাড়িতে কে ফটো তুলিবে জানেন?'

মেয়েটি সবিস্ময়ে তাহার প্রতি চাহিল।

উপরের ঘরের বাতায়ন হইতে নরেনের মায়ের বাল্যসখী উর্ম্মিলা দেবী ক্যামেরা-ঘাড়ে অতিশয় সুশ্রী, প্রিয়দর্শন নরেনকে এবং তাহার পাশে স্মিতমুখী বিস্মিতা লীলাকে একত্রে দেখিয়া পুলকিত হইয়া ভাবিলেন সই মিথ্যা বলে নাই। এমন মিলন দৈবে ঘটে। যেন ইহারা দু-জনের জন্য সৃষ্টি হইয়াছে।

লীলা অবাক হইয়া নরেনের দিকে চাহিয়া মাথায় আঁচল টানিয়া দিয়া কহিল, 'ক্ষমা করিবেন। এ বাড়িতে কেহ ফটো তুলিবে বলিয়া আমার জানা নাই।' নরেন অধীর হইয়া কহিল, 'আপনি কিছুই জানেন না। পাঁচটা প্রায় বাজে, ভিতর হইতে জানিয়া আসিয়া আমায় বলুন শীঘ্র বাড়িতে কোন্ মেয়ের বিবাহের ঠিক হইয়াছে এবং বরপক্ষদের দেখাইবার জন্য কাহার ফটো চাই?'

লীলা লজ্জায় লাল হইয়া কহিল, 'আমি যতদূর জানি আমাদের বাড়িতে কোন মেয়ের উক্ত কারণে ফটো চাই না। আপনি নিশ্চয় ভুল করিয়াছেন।'

নরেন হতাশ হইয়া কহিল, 'তা হবে। ড্রাইভার বোধ হয়

আমাকে ভুল ঠিকানায় লইয়া আসিয়াছে। অথচ আজ ভুল শোধরাইবার সময় নাই। দিলেন আপনি আজ আমার সমস্ত বিকালটা মাটি করিয়া। কোন কিছুই হইল না।'

লীলা রাগ করিয়া কহিল, 'আমি নষ্ট করিলাম! বেশ ত আপনি।'

নরেন কিছুমাত্র লজ্জিত না হইয়া কহিল 'না হয় আপনি করেন নাই। কিন্তু আমার পক্ষে ফল একই। যে-ই করুক, বিকালটা আজ গেল। হোপলেস্‌লি গেল!'

এই অদ্ভুত যুবককে দেখিয়া তাহার কমনীয় চেহারা এবং ছেলেমানুষের মত কথাবার্ত্তায় অপরিচয়ের সংকোচ সত্ত্বেও লীলার মনে একটি সুমিষ্ট কৌতুক রস জাগিতেছিল। ঈষৎ হাস্যের সহিত কহিল, 'সময়ের প্রতি এত মমতা? কি করেন? ফটোতোলার ব্যবসায়?'

নরেন কহিল, 'না, ফটোতোলা আমার পেশা নয়। স্পেশালাইজেশান আমি মানি না, এবং বোধ করি আপনিও মানেন না। কিন্তু...আচ্ছা নমস্কার, যাই তাহা হইলে।'

লীলার হাসি পাইল। যাক এতক্ষণ পরে তবু ভদ্রতার একটা অত্যাবশ্যক অঙ্গ ইঁহার মনে পড়িয়াছে। ফুলের সাজিটা মাটিতে নামাইয়া দুই হাত জড়ো করিয়া সেও প্রতি-নমস্কার করিল। নরেন গেটের রাস্তার দিকে পা বাড়াইয়াছে এমন সময় লীলার ভাই অনাথ উনিশ-কুড়ি বছরের এক যুবক পিছন হইতে নরেনের কাঁধে হাত রাখিয়া কহিল, 'কোথায় যান! আমাদের বাড়িতে আজ আপনার ফটো তুলিবার কথা ছিল না?'

নরেন ফিরিয়া দাঁড়াইয়া কহিল, 'আপনারা কি যে গোলমাল করেন!'

অনাথ হাসিয়া কহিল, 'ভিতরে চলুন, আপনিই সমস্ত গোলযোগ ঠিক হইয়া যাইবে।'

আধ ঘণ্টাখানেক পরে ফ্যানের তলায় বরফ-সংযুক্ত গোলাপজল সুগন্ধি দলিত তরমুজা খাইতে খাইতে নরেন প্রশ্ন করিল, 'আপনাদের আজ একখানা ফটো তোলাইবার কথা ছিল, সে-কথা বুঝি একেবারে ভুলিয়া বসিয়াছিলেন।'

উর্ম্মিলা কহিলেন, 'ছিল বটে দরকার কিন্তু এখন আর তত জরুরি নয়। বরের সহিত হঠাৎ ক'নের দেখা হইয়া যায়। তাই ছবিতে দেখার আর প্রয়োজন নাই। কিন্তু আজ ত বাবা সময় গেছে, কাল একটিবার নিশ্চয় মনে করিয়া আসিও।'

নরেন। আপনাদের বাড়ির সকলে হেঁয়ালীর মত করিয়া কথা বলে। এইমাত্র বলিলেন, ফটোর দরকার নাই। তবে আবার খামোখা আসিব কেন?'

উর্ম্মিলা। বরের বাড়ির লোকের ফটোর দরকার নাই। কিন্তু আমাদের আছে। আমাদের মেয়েটি পরের বাড়ি চলিয়া যাইবে তাহার একখানি ছবিও কি আমাদের কাছে থাকিবে না?'

কথাটা নরেনের সমীচীন বোধ হইল। কহিল, 'আচ্ছা আপনাদের জন্যই ত। তবে স্বাভাবিক হইলেই চলিবে, কি বলেন? আমাকে আর কষ্ট করিয়া রি-টাচ করিয়া অতি-মাত্রায় ভাল করিতে হইবে না?'

উর্ম্মিলা। না, তাহার দরকার নাই। যেমন দেখিতে তুমি ঠিক তেমনটি তুলিয়া দিও।

৪

বন্ধুরা কহিল, 'নরেন, তুমি অত ঘন ঘন অমুক বাড়িতে যাও কেন? এদিকে এত বক্তৃতা দাও আর জগতের এত বাড়ি থাকিতে ওই একটি মাত্র বাড়ির সঙ্কীর্ণ সীমায় আপনার সমস্ত মনকে ডুবাইয়া দিতেও ছাড় না, জান না কি তাতে স্পেশালাইজেশানের প্রবৃত্তিকে প্রশ্রয় দেওয়া হয়?'

নরেন অপ্রস্তুত হইয়া কহিল, 'কি করিব, ওদের বাড়ির ছেলে অনাথ ফিজিক্সে কাঁচা, এবং এই সামনের বছরে বি-এসসি দিবে; তাই তাহার মা ধরিয়াছেন তাহাকে একটু দেখিয়া দিতে।'

বন্ধুরা কহিল, 'আর ওদের বাড়ির মেয়ের ফটো কেন তোমার য়্যালবামে?'

নরেন। ওদের বাড়ির মেয়ের শীঘ্রই বিবাহ হইবে। তাই তাহার মা অনুরোধ করিয়াছিলেন একখানা ফটো তুলিয়া দিতে। আর তোমরা ত জানই যে আমি যত ফটো তুলি তাহার প্রত্যেকটার কপি আমার য়্যালবামে থাকে। মধ্যে মধ্যে তুলনা মূলক সমালোচনা করিয়া দেখি কোন্‌টা ভাল হইয়াছে।

বন্ধুরা মুখ টিপিয়া হাসিয়া বলে, 'বোধ করি এ ফটোখানি ভালমন্দের বাহিরে। কিন্তু দেখিতেছি ওঁদের বাড়ির মা
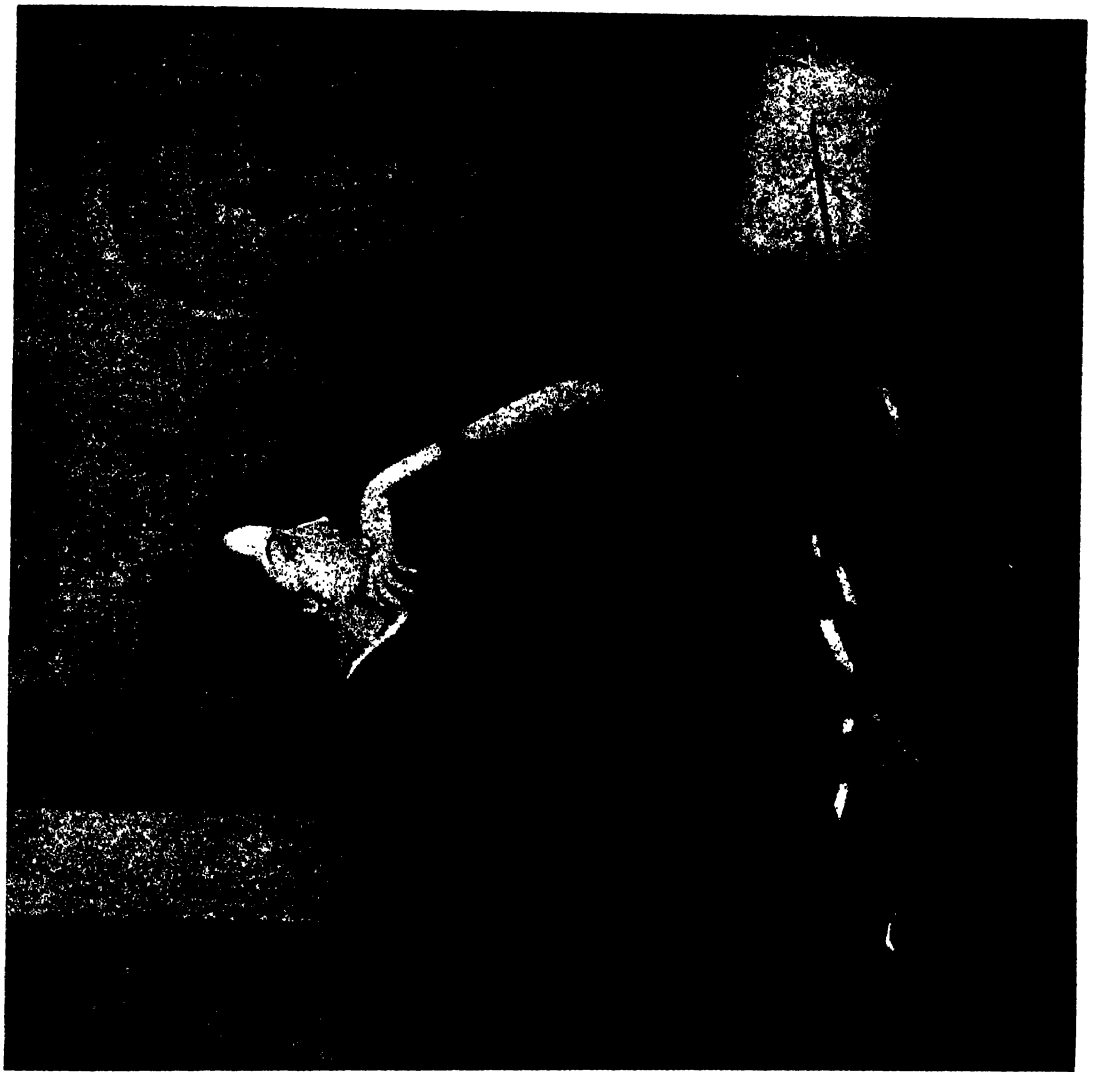
তোমাকে যখন-তখন যা-তা অনুরোধ করিয়া অনুগৃহীত করিতেছেন, বিচিত্র ব্যাপার! না না, নরেন, এ সকল ভাল কথা নহে। বুঝিতে পার না যে জগতের মাঝে আপনাকে ছড়াইয়া না দিয়া একটি মাত্র মুখের প্রতি অনিমেষ দৃষ্টি নিবদ্ধ করিলে তাহাতে করিয়া স্পেশালাইজেশনকে স্থান ছাড়িয়া দেওয়া হয়।'

নরেন অন্যমনস্ক হইয়া কি যেন ভাবিতেছিল, চমকিয়া উঠিল, 'কি বলিতেছিলে? স্পেশালাইজেশান! না না, তোমরা কি যে বলো।'...কিন্তু কথাটা পুরাপুরি শেষ হইবার আগেই ছাদের উপর হইতে ম্লান সন্ধ্যার আলোয় উদ্ভাসিত গঙ্গার দিকে চাহিয়া সে আবার অন্যমনা হইয়া গেল। তৎক্ষণাৎ উঠিয়া পড়িয়া স্পেশালাইজেশানের প্রায়শ্চিত্ত করিতে পঁয়তাল্লিশ মাইল বেগে মোটর-বাইক ছুটাইল না। গঙ্গার জলে ঝাঁপাইয়া পড়িবার শব্দও উপর হইতে শোনা গেল না। সুকুমার সেই দিনের ব্যর্থ সুযোগ এই অবসরে ফলাইয়া তুলিবার অভিপ্রায়ে আর একবার ফ্রী লভের প্রসঙ্গ পাড়িবার চেষ্টা করিল কহিল, 'দেখ নরেনের সেই দিনের কথাটা আমার ভারী মনে লাগিয়াছিল। রেঁালা বলেন বিবাহ বস্তুটা এতই প্রকৃতি-বিরুদ্ধ যে...এ যেন প্রকৃতিকে দ্বন্দ্বযুদ্ধে আহ্বান করা অথচ ফ্রী লভ '

কিন্তু বৃথাই এ সকল বড় বড় এবং ভাল ভাল কথার অবতারণা। নরেন হাতের মুঠায় চুলগুলা চাপিয়া ধরিয়া অন্যমনস্ক দৃষ্টিতে গঙ্গার দিকে চাহিয়া আছে। তাহাকে দেখিলে মনে হয় কোন অন্তর্লীন আবেগের আন্দোলনে তাহার যৌবনের উপর হইতে একটা অগোচর অংশের পর্দা উঠিয়া গিয়াছে, এবং গঙ্গাপারের অস্ফুট বনরেখার মত যে-জগতের ঈষৎ আভাস পাওয়া যাইতেছে তাহার গভীরতা এবং মাদকতা আজিকার এই উষ্ণ চৈত্রসন্ধ্যার বাতাসের মতই চঞ্চল। সে চঞ্চলতার স্পর্শে নরেশ সুরেশ ইহারাও যেন কেমন বিমনা হইয়া পড়িয়াছে; নিরতিশয় অবলীলাক্রমে ফাজলামো করিয়া যাইতে তাহাদের কোথায় বাধিতেছে। তাই আজিও বড় রকমের মুখবন্ধ দিয়া কথা আরম্ভ করিলেও সুকুমারের ফ্রী লভের চর্চ্চা জমিল না।

* * *

রাত্রির মাঝামাঝি ঝড় উঠিল। নিকষ অন্ধকারের গা চিরিয়া মধ্যে মধ্যে বিদ্যুতের আলো ঝলসাইয়া উঠিতে লাগিল। এবং অবশেষে ঝড়ের উদ্দামতাকে শান্ত করিয়া শুরু হইল বড় বড় ফোঁটায় বৃষ্টি। কতদিনের পর বৃষ্টি, আর ভিজা মাটির সে কি সুন্দর, কি মধুর গন্ধ! বসন্তকালের যৌবনোত্তপ্ত পৃথিবীর দেহসৌরভ যেন ঝড়ের উত্তলা ঘন নিঃশ্বাসের সহিত, বৃষ্টির অশ্রুস্নিগ্ধ চুম্বনের সহিত চারিদিকে বিকীর্ণ হইতে লাগিল।

নরেনের মাথার কাছের জানালাটা খোলা ছিল। সেখান হইতে প্রচুর জলের ছাট আসিতেছে, ঘুম ভাঙিয়া গেল। উঠিয়া আসিয়া সে ইলেকট্রিকের সুইচটা টিপিয়া দিল। বিজলি বাতির উজ্জ্বল আলো সম্মুখের খোলা জানালা দিয়া বাহিরের বাগানের জলস্নাত গাছপালার উপর গিয়া পড়িল। মনের মধ্যে একটা অন্যমনস্ক ভাব। নিঃশব্দ মাঝরাত্রিতে এই যে ঘুম ভাঙিয়া উঠিয়া জানালার কাছে দাঁড়ান, বৃষ্টির শীকরকণায় এই যে মাথার চুল, বেশ-বাস, অনাবৃত বাহু আপন মনে ভিজান এ সবের ভিতর এমন কি বেদনা আছে, এত কি মোহময় আনন্দ যে নরেনের কিছুতেই সরিয়া যাইতে ইচ্ছা করে না।

এতদিন নরেন কেবল নিজেকে যা-নয় তাই প্রমাণ করিয়া আসিয়াছে। জগতের সকল চঞ্চলতায় আপনাকে ভাঙিয়া টুকরা টুকরা করিয়া যোগদান করাকেই মনের বিকাশ মনের সর্ব্বাঙ্গীন পরিণতি, এমনিতর বড় বড় নাম দিয়া আসিয়াছে। স্থির হইয়া ধ্যানবদ্ধভাবে কোন বস্তুর চিন্তা মাত্রকে স্পেশালাইজেশান বলিয়া অবজ্ঞা প্রকাশ করিয়াছে। কিন্তু আজকাল তাহার এমন পরিবর্ত্তন কেন? সর্ব্বদাই কর্ম্ম-ব্যস্তভাবে একটা-কিছু পরের পর করিয়া যাইবার আবেগ প্রশমিত হইয়া আসিয়াছে। সমস্ত মন তাহার এমন করিয়া কাহাকে স্পর্শ করিয়াছে যে চুপ করিয়া একা বসিয়া উল্টাইয়া পাল্টাইয়া তাহাকেই অনুভব করিতে ইচ্ছা করে? একই বস্তুর মাঝে নিমগ্ন হইয়া থাকা যে তাহার চিরকালের শত্রু স্পেশালাইজেশানকে আদর দেওয়া—এমন কথাটাও ভুলিবার যো হইয়াছে।

কিছুক্ষণ পরে আলো নিবাইয়া দিয়া শিয়রের কাছের জানালাটা বন্ধ করিয়া নরেন আবার মশারীর মধ্যে আসিয়া ঢুকিল। বাহিরে বৃষ্টি উত্তরোত্তর বাড়িতেছে, ছাদের পাইপ হইতে অশ্রান্ত জল নিঃসরণের শব্দ শোনা যাইতেছে।

নিদ্রাবিহীন চোখে অন্ধকারে শুধু চুপ করিয়া শুইয়া থাকা যে এত মধুর সে-কথা নরেন এতদিন এমন করিয়া ভুলিয়াছিল কি করিয়া! তাহার নিজেরই এক এক সময় অবাক লাগে। জীবনের সমস্ত উদ্দেশ্য সকল কলরবকে ছাপাইয়া কেবল একটা স্পর্শের আনন্দ সারা মনকে আচ্ছন্ন করিয়া আছে। সেদিনের সেই অসীম প্রিয়স্পর্শ দেখিতে দেখিতে এত সর্ব্বব্যাপী হইয়া উঠিল যে, কোথাও আর তাহাকে ধরান যায় না।

* * *

সেদিন অনাথ আসিয়া ধরিল, 'নরেন-দা, আপনি ত স্পেশালাইজেশান ভালবাসেন না?'

নরেন। একেবারেই না।

অনাথ। তবে চলুন আপনি যে বিশেষ করিয়া আমার ফিজিক্সের মাষ্টার হইবেন তাহা কেন? আজ আমি আপনার কাছে সাঁতার শিখিব।

নরেন খুশী হইয়া কহিল, 'চল চল। আমার জীবনের অভিপ্রায় একমাত্র তুমি ধরিতে পারিয়াছ। ঠিক তোমার মতই ছাত্র আমি চাই।'

অনাথ সগর্ব্বে কহিল 'আমি আপনার শিষ্য। আমরা স্পেশালাইজেশান মানি না, এই আমাদের গর্ব্ব, এই আমাদের অভ্রভেদী অহঙ্কার!'

নিরতিশয় উল্লাসে দুইজনে গঙ্গাতীরে আসিয়া দাঁড়াইল। কিন্তু সেদিন বিধি প্রসন্ন ছিলেন না। গঙ্গাতীরের সুতীক্ষ্ণ নুড়ি পাথরের সূচীমুখের ন্যায় অগ্রভাগ নরেনের পায়ে বিদ্ধ হইয়া গেল। অনাথ সেটাকে কোনরূপে তুলিয়া দিয়া নিজের রুমালে করিয়া ক্ষতস্থানটা বাঁধিয়া দিল। বিশেষ কোন ফল হইল না। তবুও অত্যন্ত যন্ত্রণায় নরেন সেই গঙ্গার কূলে বালুকার উপরেই বসিয়া পড়িল।

অনাথ ভয় পাইয়া কহিল, 'নরেন-দা, গঙ্গার ধারের কাঁকর পায়ে ফুটিলে প্রায়ই সেপ্‌টিক হয়। তুমি ভাল ডাক্তারকে দিয়া ব্যাণ্ডেজ করাও। বল ত আমি এখনই বাইকে করিয়া গিয়া ডাকিয়া আনি।'

নরেন সুস্পষ্ট অবজ্ঞার সহিত কহিল, 'ডাক্তারের উপর এত বিশ্বাস কেন? তাহারা বিশেষভাবে ডাক্তারী বিদ্যার চর্চ্চা করিয়াছে বলিয়া? ডাক্তারের দরকার দেখি না, আমি স্পেশালাইজেশান মানি না। তুমি ফার্ষ্ট এড্ জান না?'

স্পষ্টই দেখা যাইতেছিল অনাথের ফার্ষ্ট এড্ এবং রুমালের ব্যাণ্ডেজে কোন কাজ হইতেছে না। রক্তনিঃসরণে সমস্ত রুমালটা ভিজিয়া লাল টকটকে হইয়া উঠিয়াছে। অবশেষে অনাথ তাহাকে আপনাদের বাড়িতে লইয়া গেল। উর্ম্মিল আশ্বাস দিয়া কহিলেন, 'এত ভয় কি অনাথ, এখনই লীল আসিয়া সমস্ত ঠিক করিয়া দিতেছে।'

এ-বাড়িতে যখন যাহা আকস্মিক দুর্ঘটনা হয়, লীলা তাহার ডাক্তারী করে। মাথা বেদনা করিলে ডাল্‌কামারা ত্রিশ-শক্তির পাউডার দেয়, তরকারী বানাইতে গিয়া আঙুল কাটিয়া ফেলিলে আর্ণিকামণ্ট দিয়া জলপটি বাঁধিয়া দেয়। বাহিরের ঘরে একটা সোফার উপর নরেনকে বসাইয়া লীলা টিঞ্চার আয়োডিন, কার্ব্বলিক সোপ, বরিক পাউডার সমস্ত উপকরণ পাড়িয়া নিপুণ হস্তে পরিষ্কার করিয়া গরম জলে ধৌত করিয়া ব্যাণ্ডেজ বাঁধিয়া দিল।

নরেন কেমন আচ্ছন্নের মত চুপ করিয়া বসিয়া ছিল। অনাথ আশ্বস্ত হইয়া কহিল, 'বাঁচা গেল ভাই লীলা। নরেন-দা আবার ডাক্তার ডাকিতে চাহেন না, এই এক মুস্কিল কি-না!'

লীলা সকৌতুকে কহিল, 'কেন?'

নরেনের হইয়া অনাথ জবাব দিল, বলিল, 'নরেন-দা বলেন, বিশ্ববিধানে এক-একজন সকলদিকে সম্পূর্ণ মানুষ হইয়া উঠিবে, সে নিজেই সমস্ত জ্ঞান সমস্ত বিভাগের কিছু কিছু স্বাদ গ্রহণ করিবে। তাই বিশেষ করিয়া এক-একটা বিশেষ কোঠায় কেহ ডাক্তার কেহ বৈজ্ঞানিক এমন কথার কোন মানে নাই। আর আমার নিজেরও তাই মত।'

লীলা আমোদ পাইয়া কহিল, 'সত্য না-কি নরেন-বাবু? এমন ওজস্বী মত কোথায় পাইলেন?'

কিন্তু প্রাণের মত প্রসঙ্গ পাইয়াও নরেন সোজা হইয়া বসিয়া দু-চার কথা গুছাইয়া বলিবার উদ্যোগ করিল না। সোফার গায়ে হেলান দিয়া চুপ করিয়া চক্ষু বুজিয়া বসিয়া রহিল।

লীলা আবার বলিল, 'দাদা, তুমি যে দিবারাত্রি নরেন বাবুর সহিত স্পেশালাইজেশান লইয়া তর্কের ঝড় বহাও, একটা দিকের সহিত আমার সম্পূর্ণ সায় আছে। এ-যুগের যত প্রকার হাস্যকরতা তাহার সর্ব্বপ্রধান ট্রাজেডি এই

'স্পেশালাইজেশান'। এখন জ্ঞানের এক একটা বিভাগের সামান্যতম টুকরা অংশকেও এমন জটিল এবং কষ্টায়ত্ত করা হইয়াছে যে, স্পেশালাইজেশান ছাড়া মানুষের গতি নাই।'

অনাথ উত্তেজিত হইয়া কহিল, 'আর তাহাতে জ্ঞানের যতই পরাকাষ্ঠা দেখান হোক, মানুষের কি তাহাতে শান্তি আছে? মানুষ চায় একটা পুরা মানুষ হইতে, অথচ একটি মানুষের পরিমিত আয়ুষ্কালে এ-যুগের চোখে কোন বিষয়ে বিশেষজ্ঞ হইতে গেলে সেই একই বিষয়ে তাহাকে এত খাটিতে হইবে যে, অপর সকল ক্ষেত্রে সে একেবারে শিশুর মতন। ধর, আমাদের কলেজের শৈলেশ লাহাকে, সে ইতিহাসে অনার্স লইয়াছে। ইতিহাসের বইয়েতে তাহার আগাগোড়া একেবারে মোড়া। সেদিন মহাত্মা গান্ধীর প্রায়োপবেশনের জন্য আমাদের ক্লাসের ছেলেরা নানা প্রকার আলোচনা করিতেছিল, শৈলেশ বইয়ের পাতা হইতে দৃষ্টি তুলিয়া এমন অভিভূতের মত আমাদের দিকে চাহিল, তাহার কাছে ভারতবর্ষের মানে কেবল মার্শম্যান সাহেবের হিষ্ট্রী অব ইণ্ডিয়ার মধ্যেই আবদ্ধ! এমন স্পেশালাইজেশানকে আমরা অবজ্ঞা করি!'

লীলা কহিল, 'কথাটা একদিক হইতে ঠিক এবং এ-যুগের এই অতি-স্পেশালাইজেশান-প্রবণতাকে আর বাড়িতে না দেওয়াই উচিত। কিন্তু এ-কথাটা তোমরা অস্বীকার কর কি করিয়া যে, কেবল সখের নৈপুণ্যে, কেবল য্যামেচার হইয়া থাকিবার কোমল দায়িত্বহীনতায় জগতে কোন স্থায়ী সম্পদ দেওয়া যায় না। রবীন্দ্রনাথের পঞ্চাশ বৎসরের প্রাত্যহিক সাধনা তাঁহার লেখাকে অমরত্ব দিয়াছে। অতবড় প্রতিভাবান পুরুষকেও এক হিসাবে স্পেশালাইজেশান মানিতে হইয়াছে।'

অনাথ বিপন্ন হইয়া নরেনের দিকে চাহিল, ভাবখানা এই যে, নরেন-দা ইচ্ছা করিলেই অমন নিশ্চেষ্ট হইয়া না থাকিয়া চোখা-চোখা বাণে লীলার কথাকে খণ্ড খণ্ড করিয়া দিতে পারেন।

কিন্তু নরেনের লেশমাত্র উৎসাহ দেখা গেল না, সোফার গায়ে হেলান দিয়া সে অন্যমনস্ক আবিষ্ট হইয়া পড়িয়া রহিয়াছে। সারাক্ষণ যুদ্ধ করিয়া শ্রান্ত হইয়া পড়িলে মুখ-চোখের যেরূপ ভাব হয়, নরেনের মুখের চেহারা অনেকটা সেই রকম। সেই দিকে কিছু কাল চাহিয়া লীলার সমস্ত মন সহসা ব্যথিত হইয়া উঠিল।

সুপ্তোত্থিতের মত এক সময় চাহিয়া নরেন কহিল, 'আজ ত আর সাঁতার শেখান হইল না। চল অনাথ, ফিজিক্সের বহির মধ্যেই ডুবমারা যাক।'

লীলা চলিয়া যাইতে যাইতে ফিরিয়া কহিল, 'না না, আজ পড়াশোনা থাক। আজ আপনার শরীর ভাল নাই। দাদা, তুমি যেন তোমার স্বভাবমত তাঁহাকে অনর্থক ব্যস্ত করিয়া তুলিও না। তাঁহার বিশ্রামের দরকার।'

নরেন বাধ্য ছেলের মত আবার চক্ষু নিমীলিত করিল।

*   *   *

বৃষ্টির অশ্রান্ত শব্দের সহিত পায়ের উপর কয়েকটি অঙ্গুলির অসীম প্রিয়স্পর্শ, সেইটুকু স্পর্শ সমস্ত জগতকে ছাপাইয়া, সারা মনকে আচ্ছন্ন করিয়া কোথাও যেন আর আপনাকে ধরাইতে পারিতেছে না। অবশেষে এই মোহময় স্পর্শ অনুভূতির মাঝে নিদ্রাহীন রাত্রির মাদকতা আরও প্রগাঢ় হইয়া উঠিতে লাগিল। বহু দিন পরে প্রবল বৃষ্টিপাতে ভূমিতল হইতে উত্থিত ঘন সুগন্ধ সেই স্পর্শের স্মৃতিকে আকুল করিয়া মনের মাঝে ঘনাইয়া আনিতে লাগিল।

৫

নরেনের ইনফ্লুয়েঞ্জা হইয়াছে খবর পাইয়া উর্মিলা দেখিতে আসিয়াছেন। দেখা-শোনা শেষ হইলে নরেনের মা লীলাকে কহিলেন, 'এইখানে একটুখানি বোস না মা। আমার সংসারের কাজের নানা ঝঞ্চাটে সকল সময় বসিতে পাই না. নরেন একলা থাকিয়া শরীরটাকে আরও মাটি করিতেছে।'

লীলা আনত মুখে নরেনের মাথার কাছে একটা চৌকিতে বসিল, কোলের কাছে একটি পাচ ছয় বছরের ফুটফুটে মেয়ে। মেয়েটির চেহারা দেখিতে ভারী মিষ্ট। অনেকটা লীলার সহিত মুখের আদল আসে।

নরেন সেই ছোট্ট খুকীটির দিকে চাহিয়া ছিল, কহিল, 'এটি আপনার কে হয়?'

লীলা। এটি আমার দিদির মেয়ে। দিদি মারা যাওয়ার পর হইতেই আমাদের কাছে আছে।

নরেন তাহাকে আপনার শয্যার একাংশে ডাকিয়া আনিয়

তাহার সুন্দর ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র আঙুল, আঙুরের মত টসটসে গাল, নরম রেশমের মত সুচিক্কণ কালো চুল, নাড়িয়া চাড়িয়া খেলা করিতে করিতে কহিল, 'ভারী সুন্দর খুকী।'

বাহিরে সূর্য্যাস্ত হইতেছে, পশ্চিমের খোলা জানালা দিয়া রাঙা আলোয় ঘর ভরিয়া গিয়াছে। লীলা চৌকি ছাড়িয়া সেই জানালার কাছে গেল, গরাদে ধরিয়া সেইখানেই বসিল। তাহার মুখখানি পাশ হইতে দেখা যাইতেছে, বাম গালের উপর একটি কালো তিল। নরেন খুকীকে আদর করিতে করিতে দেখিল খুকুর গালেও সেইরূপ ছোট্ট তিল। সহসা বলিয়া ফেলিল, 'আপনার যদি কখনো মেয়ে হয় সে দেখিতে ঠিক আপনার মতই হইবে নিশ্চয়। অবিকল আপনার মত সুন্দরী...'

লীলা লজ্জায় লাল হইয় কহিল, 'স্পেশালাইজেশানের সঙ্গে অহোরাত্রি মারামারি করিতে করিতে কি করিয়া সাধারণ ভদ্র কথাবার্ত্তা কহিতে হয়, তাহাও কি ভুলিয়া গেছেন না কি?'

নরেন বিপন্নের মত চাহিয়া আহত স্বরে কহিল, 'হয়ত অন্যমনস্ক হইয়া অপরাধের কিছু বলিয়াছি, ক্ষমা করুন।'

নরেনের রোগশীর্ণ, আহত, অপ্রতিভ মুখের দিকে চাহিয়া অনুতাপবিদ্ধ হইয়া লীলার ভারী ইচ্ছা হইতে লাগিল বলে, না না কিছুমাত্র অপরাধ করেন নাই, শুধু কথার কি দাম? যে কথাটা বলিতেছে তাহারই সহিত মিশাইয়া লইয়া যদি না কথাকে বিচার করিতে পারি তবে সে কিসের বিচার! আপনার মত পরিপূর্ণ আত্মবিস্মৃতির মাঝে ওকথা অমন করিয়া কে বলিতে পারিত? আপনাকে বাদ দিয়া শুধুমাত্র কথাটাকে বিচার করিবার ক্ষমতা আমার নাই...আরও অনেক কিছুই তাহার বলিতে ইচ্ছা করিতেছিল কিন্তু নরেন খুকুর হাত ছাড়িয়া দিয়া ততক্ষণে অভিমানে পাশ ফিরিয়া শুইয়াছে। দেওয়ালের দিকে তাহার মুখ ফেরান, একবার কেবল হাত বাড়াইয়া শালটা গায়ের উপর টানিয়া দিল।

বাড়ি যাইবার সময় হইয়াছে বলিয়া উর্ম্মিলা লীলাকে ডাকিলেন। ঘনায়মান সন্ধ্যার অন্ধকারে একজন অভিমান করিয়া চক্ষু মুদিয়া রহিল, এবং সেই নিঃশব্দ কক্ষতলে আর একজন তাহার অনুচ্চারিত ক্ষমা প্রার্থনাকে ফেলিয়া আসিয়া নীরবে ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল।

* * *

নরেন আসিয়া উঠিয়া স্পেশালাইজেশানের বিরুদ্ধে আর এক মাত্রায় সশস্ত্র হইবার জন্য ডোয়ার্কিন হইতে একটা এস্রাজ কিনিয়া বাজাইতে সুরু করিয়াছে। তাহার মোটর-বাইকে এখন ক্রমশঃ ধূলা জমিতেছে। একলা থাকিতেই অত্যন্ত ভাল লাগে। কোন অনাস্বাদিত বেদনাকে নির্জ্জনে বসিয়া একটু একটু করিয়া উপভোগ করিতে কামনা হয়। যখন খুশী য়্যাকসিডেন্টকে উপেক্ষা করিয়া ওই হাল্কা বাইকটায় পঁয়তাল্লিশ মাইলের বেগ দিয়া যত্র-তত্র হো হো করিয়া ঘুরিয়া আসিতে ইচ্ছা করে না। বন্ধুরা ঠোঁট মুচকাইয়া হাসিয়া কহে—নরেনের প্রকৃতিতে এইবার স্থাণুর মত অচল ভাব দেখা যাইতেছে। আর বেশী দেরি নাই, এইবার সে য়ুনিভার্সিটির রত্নের মত ক্ষীণদৃষ্টি, উপবেশনপ্রিয় মাণিকটি হইয়া ডি-এস্‌সির জন্য প্রাণপাত করিবে। স্পেশালাইজেশান জাঁকিয়া আসন লইল, আর কিছুতেই ঠেকাইয়া রাখিতে পারিবে না তুমি! তাহাদের প্রতিবাদ করিতে নরেন এস্রাজ বাজান ধরিয়াছে।

মাথায় রুক্ষ চুলগুলা হাতে করিয়া এলোমেলো করিতে করিতে নরেন এস্রাজটা সুমুখে রাখিয়া বসিয়া ছিল। মা আসিয়া কহিলেন, 'বিবাহ সম্বন্ধীয় তোর মতামতটা কেমন রে?'

নরেন। আমি বিবাহের বিরোধী।

মা। তোর এই মতটা কতকালের?

নরেন। বহু দিনের, যবে হইতে আমার আপন মতামত বলিয়া একটা বালাই আছে, এইরূপ অনুভব করিতে সুরু করিয়াছি।

মা। আ সর্ব্বনাশ! তবে যে তুই রাতদিন স্পেশালাইজেশানকে গালি পাড়িস্? একই মত আদ্যন্ত কাল হইতে মানিলে তুই জগতের আর সব ভিন্ন মতামতের জন্য পথ রাখিয়াছিস্ কই? ইহাকে যদি মতের স্পেশালাইজেশান না বলে তবে আর কি বলা যাইতে পারে?

নরেন মাথার চুলগুলা ছাড়িয়া দিয়া কহিল, 'তাই ত, তোমার কথাটা এতদিন আমি ভাবিয়া দেখি নাই। ভয়ানক ষ্ট্রাইকিং কথা!'

মা। আচ্ছা আচ্ছা এইবার বসিয়া খুব করিয়া ভাব্। (আঁচলের আড়াল হইতে একটা ছবি বাহির করিয়া) আর চাহিয়া দেখ্ ত এই ছবিটি যে-মেয়ের তাহাকে বিবাহ করিতে তোর কোন আপত্তি আছে?'

নরেন চাহিয়া দেখিল লীলার যে ফটো তাহার অ্যালবামে আছে তাহারই একখানি কপি। সেদিন লীলা মায়ের আদেশে অনিচ্ছাসত্ত্বেও ফটো তোলাইয়াছিল। ঈষৎ বিরক্তি-কুঞ্চিত ভ্রূলতা এবং জোর করিয়া রাজী করানোর জন্য অধরোষ্ঠে একটু অভিমানের কম্পন।

নরেন। বিবাহ বস্তুটায় আমি বিশ্বাস করি না।

মা। বলিলাম না যে স্পেশালাইজেশানকে অমান্য করিতে হইলেই তোর এতদিনকার এই মতটা বদলান দরকার।

নরেন আবার হাত দিয়া অনর্থক মাথার চুলগুলিকে বিপর্য্যস্ত করিতে লাগিল। সেদিনের অস্ত আভায় তন্ময় লীলার মুখের একাংশ, পাশ ফেরান। আর সেই সুন্দর থুকীটি। কল্পনায় আসে লীলারও ঠিক ওই রকম একটি থুকী, আরও ছোট, আর মায়ের গালের কাল তিলটি হুবহু তেমনি করিয়া ফুটিয়াছে। এ সমস্ত কথা মনে পড়িতেই, কোথায় একটা বেদনা বাজে। মন দর্প করিয়া বলে 'আমি বিশ্বাস করি বিবাহের চেয়ে বড় বস্তুতে।' কিন্তু মনের এই দম্ভের অগোচরেও একটা অংশে অদৃশ্য প্রত্যহপুঞ্জিত বেদনার ভার তাহাতে কমে না।

নরেন এস্রাজের তারে টুংটাং করিতে করিতে কহিল, 'শোন, এই চারিটা সুর—ধৈবত, গান্ধার, রেখাব আর মধ্যম। এই চারিটা সুর কানে না থাকিলে কোনদিনও..'

মা এস্রাজটা কাড়িয়া লইয়া কহিলেন, 'বাজে বকিস না। দিবারাত্রি তোর বেসুরো বাজনা শুনিয়া কান ঝালাপালা হইয়া গেল।'

নরেন খোলা জানলা দিয়া গঙ্গার দিকে চাহিয়া কেমন যেন অন্যমনস্ক হইয়া গেল। এস্রাজটা হাতের কাছে ছিল না, মা সরাইয়া রাখিয়াছেন, পাশে রাখা এস্রাজের ছড়িতে রজন ঘষিতে ঘষিতে কি যে বলিল সে-কথা খুব পরিষ্কার করিয়া আজিও তাহার স্মরণ হয় না। উচ্ছ্বাসের বেগ কমিয়া যাইতে, বলা যখন শেষ হইয়া গেল তখন আতঙ্কে অভিভূত হইয়া দেখিল মা স্মিতহাস্যে উদ্ভাসিত হইয়া আনন্দচঞ্চল লঘু পদক্ষেপে বাহির হইয়া যাইতেছেন।

* * *

কথা ছিল বিবাহের ছয় মাস পরে নরেন বিলাত যাইবে। কিন্তু ছয় মাস পরে কার্য্যকালে দেখা গেল, পাটনা সায়ান্স কলেজ তাহাকে ফিজিক্সের চেয়ার দেওয়াতে সে দিব্য প্রফেসর বনিয়া গিয়া কলেজে একমনে অধ্যাপনা করে বাড়তির-ভাগ সময়টায় রিসার্চ্চ চলে।

বন্ধুরা বলে, 'কলেজের ল্যাবরেটরিতে না হয় মানা গেল রিসার্চ্চ কর। কিন্তু বাড়ি হইতেও যে বাহির হইতে চাও না সেখানে কিসের রিসার্চ্চ চলে?'

নরেন বলে, 'বাড়িতেও ফিজিক্সের গবেষণা চালাই, বিষয়টা এত জটিল!'

বন্ধুরা আমল না দিয়া উত্তর দেয়, 'বাজে কথা।'

সেদিন নরেনের বাড়িতে চা খাইতে খাইতে বন্ধুরা কৌতুক করিয়া কহিল, 'ভাই লীলাবৌদি, আপনার অশেষ গুণ আছে স্বীকার করি, কিন্তু সবচেয়ে বেশী গুণ এই, যে-নরেন কিছুদিন আগে পর্যান্ত প্রত্যেক কাজ এবং কথাকে চুনিয়া চুনিয়া বিচার করিত কোথায় কতটুকু স্পেশালাইজেশানের গন্ধ রহিয়াছে, এখন সেই নরেন প্রবলবেগে স্পেশালাইজেশানের ভক্ত হইয়া উঠিতেছে, বাড়িতে আপনি এবং কলেজে ফিজিক্স।'

নরেন চা'য়ের পেয়ালাটা রাখিয়া চমকিয়া উঠিয়া কহিল, 'তাই ত! আমি এই কয়েক মাস কেবল ফিজিক্স পড়িয়াছি। এক লাইন কবিতা লিখি নাই, এস্রাজে যে ছায়ানট সুরটা লীলার কাছে শিখিতে শুরু করিয়াছিলাম সেটারও আর চর্চ্চা হয় নাই। সেই আমি! যে একদিন কেবলমাত্র মতের স্পেশালাইজেশানকে অমান্য করিতে বিবাহে সম্মতি দিয়াছিল...'

চাকর আসিয়া খবর দিল, বাহিরে প্রফেসর অমলবাবু নরেনের সহিত দেখা করিবার জন্য অপেক্ষা করিতেছেন। নরেন অল্পক্ষণের জন্য বাহিরে গেলে লীলা শঙ্কিত মুখে চাহিয়া কহিল, 'ভাই সুকুমার ঠাকুরপো, সুরেশ ঠাকুর পো আপনাদের সহিত কথা আছে। শুনুন আমি আপনাদের রুমালের চারিদিকে রেশমের ফুলকাটা পাড় সেলাই করিয়া দিব'

নরেশ উৎসাহিত হইয়া কহিল, 'আর অমনি আমার সেই অর্দ্ধসমাপ্ত রাইটিং প্যাডটা?'

লীলা। হাঁ, আর সিল্কের উপর সমুদ্রের ঝিনুক বসাইয়া চমৎকার রাইটিং প্যাড তৈয়ারী করিয়া দিব। না-হয় রোজ চা'য়ের সহিত নিজের হাতে মাংসের সিঙাড়া ভাজিয়া খাওয়াইব, কিন্তু তাহার বদলে একটি কথা আছে।

উৎসুক বন্ধুমণ্ডলী কহিল, 'কি কথা? কি সে এমন কথা?'

লীলা। দয়া করিয়া ওঁকে স্পেশালাইজেশানের বিরুদ্ধে সশস্ত্র করিবেন না। উনি যা ভালবাসেন তাহাতেই ডুবিয়া আছেন, এখন মাঝখান হইতে পাগোখা স্পেশালাইজেশানের বিভীষিকা স্মরণ করাইয়া দিবেন না।

বন্ধুরা। কেন, কেন? মনে করাইয়া দিলেই বা কি হইবে?

লীলা। কি যে হইবে কিছু বলা যায় কি? হয়ত বিদ্রোহের বহ্নিবেগে হঠাৎ মোটর-বাইকে যথেষ্ট পেট্রোল না লইয়া রাজগীর জঙ্গলে পাড়ি দিবেন। হয়ত রাত্রি জাগিয়া জাগিয়া আবার ফটো ডেভালাপ সুরু করিবেন, এস্রাজের ছড়ি ঘষিয়া হাতে কড়া পড়াইবেন হয়ত...হয়ত (বলিতে বলিতে লীলা শিহরিয়া উঠিল) সামনের নভেম্বরে বিলাত যাইবার টিকিট কিনিয়া বসিবেন।

বন্ধুরা সহাস্যে। আচ্ছা আচ্ছা। আপনি নির্ভয়ে থাকুন, আমরা কথা দিতেছি আর মনে করাইয়া দিব না। কিন্তু আপনি আমাদের উৎকোচের কথাটা স্মরণ থাকে যেন!

তরুকুমার

শ্রীচুণীলাল বন্দ্যোপাধ্যায়

ধরিত্রীর বুক চিরি অকস্মাৎ—হে তরুকুমার!
বাহিরিয়া এলে তুমি রহস্যের খুলি মণিদ্বার!
মুগ্ধ নীলাকাশ ঐ তোমা হেরি রহিল চাহিয়া।
কুঞ্জে কুঞ্জে শত কণ্ঠে বিহঙ্গেরা উঠিল গাহিয়া।
আলোর পরশমণি পরশিল যেমনি আসিয়া
অঙ্গে অঙ্গে ঝলমল কি লাবণ্য উঠিল ভাসিয়া?
প্রতি দিন পলে পলে সবুজের শুধু রেখা টানি!
এঁকে দাও বিশ্বপটে অনন্তের পূর্ণ-করা বাণী!
ধরারে করেছ ধন্য ধরণীর স্তন্য পান করি।
পত্র পুষ্প অলঙ্কারে জননীর অঙ্গ দিলে ভরি।
অহল্যারে মুক্ত তুমি করিয়াছ ব্রহ্মশাপ হ'তে।
ধূলায় ধূলায় আজি মন্দাকিনীধারা বয় স্রোতে।
মাটি আজ হল মা-টি জগৎ হইল জগদ্ধাত্রী।
বুকে পেয়ে অনন্তের এই বোবা অনাহূত যাত্রী।
ওরে শিশু ভোলানাথ, ওরে জগতের আদি কবি!
নিশিদিন রচিতেছ পূর্ণতার একখানি ছবি।
স্বপনের মত যাহা মার বুকে ছিল রে গোপন!
সেই তুমি—সেই তুমি—জননীর নাড়ীছেঁড়া ধন।
যে-মন্ত্র জপিত পৃথ্বী নিশিদিন আপনার মনে।
তারে তুমি প্রাণ দিয়ে রেখে গেলে অনন্তের কানে।
যাহা পাও তাই দাও বিলাইয়া সকলের ঘরে।
রাখ নাই কিছু তুমি এ জগতে আপনার তরে।
বস্তুর বন্ধন হ'তে মুক্ত তুমি—তুমি আশুতোষ।
তোমার সঞ্চয় নাই—লোভ নাই, নাই ক্ষোভ রোষ।
হে মায়াবি জাদুকর—তব জাদুদণ্ডের পরশে।
আলোকের ছদ্মবেশ মুহুর্মুহু পড়ে খ'সে খ'সে।
আপন সবুজ কক্ষে তাই তুমি ব'সে চিরকাল।
ক্ষণে ক্ষণে রচিতেছ বরণের চারু ইন্দ্রজাল।
শুভ্র আলো দুগ্ধ মাঝে সপ্ত রং লুকাইয়া আছে।
তাহারে ধরিয়া তুমি ফুটাইয়া তোল গাছে গাছে।
দিবসের শেষে যবে ভেঙে যায় আলোকের মায়া।
ধরণীর অঙ্গে অঙ্গে পড়ে এসে অসীমের ছায়া।
গরজি গ্রাসিতে আসে তিমিরের অন্ধ পারাবার।
সহসা খুলিয়া যায় অনন্তের জ্যোতির্ময় দ্বার।
অসীম দোলায় চড়ি এ ধরণী শিশুটির মত।
ঘুমাইয়া পড়ে বুকে শিয়রে প্রদীপ জ্বলে শত।
তারপর সারা রাত শুধু ঘুমপাড়ানীর সুর।
বস্তুহীন হয়ে হয় এ জগৎ শুধু মায়াপুর।
মহাকাশ মহাবৃক্ষে ফুটে ওঠে আলোকের ফুল।
অসীমের কানে কানে দোলে যেন হীরকের দুল।
কুসুমে কুসুমে তব আছে মধু আছে যে সৌরভ।
মরণ তাহার ভালে এঁকে দেয় মরার গৌরব।
মরণের মধু ওরা কোন দিন করে নাই পান,
সুখে দুঃখে বুকে বুকে জাগে নাই জীবনের গান।
তাই এই প্রাণহীন জ্যোতির্ময় পুতুলের দল।
কাঁহার ইঙ্গিতে শুধু সারা রাত করে ঝলমল।
মৃত্যু এসে দেয় নাই অশুচির আবরণ খুলে।
রাবণের চিতা হ'য়ে জ্বলে তাই অনন্তের কূলে।
তোমার কুসুমে আছে জীবনের প্রথম স্পন্দন।
মরে মরে করিতেছে মরণেরে মধুর নন্দন।
যুগে যুগে কত রূপে হইতেছে তব রূপান্তর।
'মরা মরা' মন্ত্র জ'পে জীবনেরে করিছ সুন্দর।
কালেরে রেখেছ তুমি বন্দী ক'রে শাখায় শাখায়।
নিশিদিন তারি জয় মর্ম্মরিছে পাতায় পাতায়।
সবুজ খাতায় তুমি কালো কালো অচল অক্ষর।
আপনার হাতে লেখা সুন্দরের প্রথম স্বাক্ষর।

ব্যবসায়-ক্ষেত্রে বাঙালী

শ্রীনলিনীরঞ্জন সরকার

সুদূর অতীতে বাংলার ব্যবসায়ী সম্প্রদায় দেশে বিদেশে, এমন কি দুস্তর সমুদ্র অতিক্রম করিয়াও একদা যে বাণিজ্য-সমৃদ্ধি বিস্তার করিয়াছিলেন, তাহা এখন কেবলমাত্র ঐতিহাসিক আখ্যায়িকায় পরিণত হইয়াছে। বিগত শতাব্দীতে তাহাদের ব্যবসায়িক উদ্যম ক্রমশঃ সঙ্কুচিত হইয়া বর্ত্তমানে এমন শিথিল হইয়া পড়িয়াছে যে, অতীত গৌরবের তুলনায় আজ বাঙালী-পরিচালিত ব্যবসানুষ্ঠানের বর্ত্তমান অবস্থাকে পরম মর্ম্মন্তুদ বলিয়া মনে হয়। কলকারখানার আবিষ্কার এবং প্রতিষ্ঠার পরে ঊনবিংশ শতাব্দীতে পৃথিবীর বাণিজ্য-সম্পর্কে যে আমূল পরিবর্ত্তনের সূচনা হয়, তাহার ঢেউ বাংলায়ও আসিয়া পৌঁছিয়াছিল সন্দেহ নাই কিন্তু তাহার কতটুকু সুবিধা আমরা আয়ত্ত করিতে পারিয়াছি ? বাংলার প্রধান শিল্প চট কল, চা-বাগান, কয়লার খনি—আমরা যে দিকেই তাকাই না কেন, প্রথমাবস্থায় তাহার সমস্তই বিদেশীয়গণের উদ্যোগে প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছে। এই বিদেশীয়গণের অনুসরণ করিয়া বাঙালী কোন কোন ক্ষেত্রে শিল্প প্রতিষ্ঠায় উদ্যোগী হইয়াছেন বটে, কিন্তু বাংলার সমগ্র শিল্পসম্পদের তুলনায় তাহা অতি সামান্য বলিতে হইবে।

ব্যবসায়-ক্ষেত্রে বাঙালীর বর্ত্তমান অবস্থা আরও হীন. এস্থলে কেবল ইংরেজ বণিক নয়, ভারতের বিভিন্ন প্রদেশের অ-বাঙালী ব্যবসায়িগণও ক্রমশঃ বাঙালী ব্যবসায়ীদিগকে স্থানচ্যুত করিয়াছেন। অন্যান্য প্রদেশে ইহার বিপরীত অবস্থা দেখিতে পাওয়া যায়। ইংরেজ সেখানে কোন কোন বিষয়ে প্রধান ব্যবসায়ী হইলেও সকল প্রকার ব্যবসায় প্রধানতঃ দেশবাসীর হাতে। আমাদের ঔদাসীন্যে এবং অনুদ্যমের ফলে আমাদের নিজের ঘরে কেবল ইংরেজ নয়, অবাঙালীও ব্যবসায় বিস্তার করিয়া ধনাগমের সুবিধা করিয়া লইয়াছে। অর্থাগমের দিক দিয়া দেখিলে পাটের ব্যবসায় বাংলার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। উহার অন্তর্বাণিজ্য, বিদেশী রপ্তানী এবং যান্ত্রিক উপায়ে বস্ত্রাদি প্রস্তুত-করণ—সকল ক্ষেত্রেই বাঙালীর স্থান আজ অতি সঙ্কীর্ণ। যে অন্তর্বাণিজ্যে বাঙালী তথাপি সংকিঞ্চিৎ স্থান অধিকার করিয়াছিলেন তাহাও আজ লুপ্তপ্রায়। কলিকাতায় হাটখোলা অঞ্চলে যে সকল সমৃদ্ধ পাটব্যবসায়ীর নাম সুপরিচিত ছিল, তাহাদের সংখ্যা ইদানীং একেবারে মুষ্টিমেয় হইয়া পড়িয়াছে। বাঙালী পাট ব্যবসায়ী বলিলে অতঃপর ফড়িয়া, ব্যাপারী এবং কতিপয় আড়তদার মাত্র বুঝাইবে। বাংলার লবণ এবং চামড়ার ব্যবসায় সম্পূর্ণ অ-বাঙালী দ্বারা পরিচালিত, ধানচালের ব্যবসায়ও ক্রমশঃ বাঙালীর হাত হইতে সরিয়া মাড়োয়ারী ব্যবসায়ীগণের হাতে পড়িয়াছে, তামাক ব্যবসায়ের নিয়ন্তা এখন সুদূর বর্ম্মা মুলুক হইতে আগত দালাল। এমন কি কয়লার ব্যবসায়েও এখন বাঙালীর স্থান আশঙ্কাজনক হইয়া পড়িয়াছে। বাংলায় উৎপন্ন চা ফসলের বিক্রয়-ব্যবস্থা করিতেছে কতিপয় ইংরেজ ব্যবসায়ী, চায়ের উৎপাদন কার্য্যও মুখ্যতঃ ইংরেজ ব্যবসায়ীর হাতে। বাঙালী যাহা করিতেছে তাহা অতি সামান্য মাত্র।

যে ব্যাঙ্ক ব্যবসা-বাণিজ্যের প্রধান সহায় বাংলায় তাহা আজ সম্পূর্ণরূপে ইংরেজ এবং বিদেশী পরিচালিত। স্বদেশী প্রতিষ্ঠান যে দুই-একটি আছে, তাহাও অবাঙালী।

জীবন-বীমা ব্যবসায়ের গতিও ঐরূপ ছিল। হয় ইংরেজ, নতুবা অবাঙালী কোম্পানী বঙ্গদেশে এই ব্যবসায়ের একচ্ছত্র অধিকারী ছিল, মাত্র বিগত কয়েক বৎসরের মধ্যে বাঙালী এক্ষেত্রে উত্তরোত্তর প্রতিষ্ঠা লাভ করিতেছে। বাংলার ক্ষেত্রোৎপন্ন এবং অন্যান্য পণ্যসম্ভারের দালালি ব্যবসায়, যাহা পূর্ব্বে বাঙালীরই হাতে ছিল, আজ তাহা ইংরেজ এবং অবাঙালীর একচেটিয়া। এক্সচেঞ্জ, লবণ, পাট শস্য প্রভৃতির দালালগণের মধ্যে বাঙালীর স্থান শূন্যপ্রায়। বাংলায় বিদেশ হইতে আমদানী এবং সেই সকল দেশে রপ্তানীর পরিমাণ বিপুল, কিন্তু আমদানী-রপ্তানীর ব্যবসায় প্রায় সকল স্থলেই ইংরেজের আয়ত্তাধীন। অবাঙালীও অনেকে সে-স্থান অধিকার করিয়াছেন, বাঙালী একেবারে নাই বলিলেও

অত্যুক্তি হইবে না। এই প্রসঙ্গে তুলা-শিল্পের কথা উল্লেখ করা যাইতে পারে। তুলাকলের প্রস্তুত কাপড় বাংলা দেশ যথেষ্ট পরিমাণে ব্যবহার করে, কিন্তু তাহার প্রয়োজনীয় বস্ত্রের সম্পূর্ণ সরবরাহ বাংলার কলগুলির দ্বারা হয় না। এই নিত্যপ্রয়োজনীয় পরিধেয় বস্ত্রের জন্য বোম্বাই বা আমেদাবাদের দ্বারস্থ হইতে হয়। শুধু তাহাই নহে। বহিঃপ্রদেশ হইতে আনীত বস্ত্রের বিক্রয়ের ব্যবস্থাও অবাঙালীর হাতে। বস্ত্রশিল্পের ন্যায় অন্যান্য শিল্পেও এই একই অবস্থা পরিদৃষ্ট হয়। আপন প্রয়োজনীয় দ্রব্যের জন্য বাংলা পরমুখাপেক্ষী : নিজে সেই দ্রব্য আনয়ন করিয়া আপনজনের মধ্যে তাহা বিক্রয় করিবার সুযোগও তাহার নাই। এইরূপে শিল্পবাণিজ্যের সকল ক্ষেত্রেই বাঙালী যে পিছাইয়া পড়িয়াছেন তাহা সকলেই বুঝিতে পারিতেছেন। কলকারখানার ক্ষেত্রেও বাঙালীর এই দুর্দ্দশা। নূতন শিল্পের প্রতিষ্ঠা সম্বন্ধে বাঙালী অগ্রণী, কিন্তু ক্রয়বিক্রয়, যথাসময়ে অর্থের ব্যবস্থা, ক্রেতার চাহিদা নিরূপণ, বিক্রীত দ্রব্যের মূল্য উদ্ধার এই সকল বিষয়ে পরমুখাপেক্ষী হওয়ায় অধিকাংশ প্রতিষ্ঠানই হয় অন্যপ্রদেশের ব্যবসায়ীর করতলগত বা গতায়ু হইতেছে। উপযুক্ত মূলধন না লইয়া কারবার আরম্ভ করা বাঙালীর ব্যবসায়ের ধ্বংসের অন্যতম কারণ। বেঙ্গল কেমিক্যালের ন্যায় দুই-একটি প্রতিষ্ঠান আর্থিক সচ্ছলতার মধ্যে কার্য্যপরিচালনা করিয়া সাফল্যলাভ করিয়াছে সন্দেহ নাই। কিন্তু অধিকাংশ ক্ষেত্রেই দেখা যায় বিচ্ছিন্নভাবে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শিল্পপ্রতিষ্ঠান কায়ক্লেশে নিজেদের অস্তিত্ব বজায় রাখিতেছে। তাহাদের মূলধনের অভাব, পরস্পরের মধ্যে সমবেত ভাবে কার্য্য নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থা নাই এবং তাহারা নিজেদের প্রস্তুত দ্রব্যসামগ্রী বাজারে বিক্রয় করিবার জন্য উপযুক্ত ব্যবস্থাও করিতে পারে না। এই বিষয়ে বাঙালী দোকানদারের বিরুদ্ধেও অভিযোগ আমরা শুনিয়াছি। শুনা যায় যে, যদিও সাধারণ বাঙালী ক্রেতা এ প্রদেশজাত দ্রব্য ক্রয়ে উৎসুক তাহা সত্ত্বেও দোকানদার মহাশয়গণ বাঙালীর প্রতিষ্ঠান হইতে অসম্ভব কম মূল্যে এবং অত্যধিক দীর্ঘ মেয়াদে ক্রয় করিতে চাহেন। বাঙালী প্রতিষ্ঠানগুলির যথেষ্ট অর্থবল না থাকায় এইরূপ সর্ত্তে পণ্য বিক্রয় করিয়া ক্ষতিগ্রস্ত হইতে থাকে।

বাংলায় বাঙালীর এ দুর্গতি একদিনে সংঘটিত হয় নাই। ইহার ইতিহাস অনুধাবন করিলে দেখা যায় যে, চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের পর জমিদারী এবং ভূসম্পত্তির প্রতি বাঙালীর আকর্ষণ বৃদ্ধি পাওয়া ইহার একটি প্রধান কারণ। ভূ-স্বত্বের স্থিতিশীলতা, নিরাপদ অবস্থা এবং সামাজিক সম্মান সম্বন্ধে বাঙালীর মনে এতদিন যে বদ্ধমূল ধারণা ছিল, তাহাই ইহার মূল কারণ। ইহার ফলে স্বভাবতই বাংলার অধিবাসী ব্যবসায় ও শিল্পের প্রতি বিমুখ হইয়া পড়িয়াছেন। তারপর স্কুল, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার সঙ্গে সঙ্গে বিদ্যামূলক অর্থ-উপার্জ্জনের পথ সুগম হইল এবং উহা দ্বারা সমাজের উচ্চ স্তরে উঠিবার উপায়ও হইয়া গেল। ফলে, যে যে প্রকারেই অর্থ সঞ্চয় করুক না কেন, সঞ্চিত অর্থ ভূ-সম্পত্তি অর্জ্জনেই নিয়োজিত হইল। ব্যবসায়ীর লাভ, জমিদারীর লভ্যাংশ, চাকুরিজীবির উদ্বৃত্ত ব্যবসায়ে নিয়োজিত হইল না। ব্যবসায়-পরিচালনের ফলে লেন-দেন সম্পর্কে যে-সকল পদ্ধতি এবং সুবিধা-সুযোগ সৃষ্টি হয়, বাংলা দেশে তাহাও হইল না। যে সামান্য ব্যবসা-বাণিজ্য অবশিষ্ট থাকিল, তাহা অর্দ্ধ-শিক্ষিত বা অশিক্ষিত সম্প্রদায়ের মধ্যে নিবদ্ধ হইয়া পড়িল। বহির্জ্জগতের উন্নত প্রণালী বা প্রতিযোগিতার ক্ষেত্রে তাহাদের দাঁড়াইবার সামর্থ্য ছিল না। গতানুগতিক পদ্ধতিতে চলিবার ফলে ব্যবসাবাণিজ্য স্রোতস্বিনীর স্রোত লুপ্ত হইয়া পঙ্কিল পল্বলে পরিণত হইল।

সে আজ বহুকালের কথা নয়। প্রিন্স দ্বারকানাথ ঠাকুর অনন্যসাধারণ ব্যবসায়ী বলিয়াই দেশে বিদেশে প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছিলেন। তাঁহার ব্যবসায় দ্বারা সঞ্চিত বিপুল অর্থ ভূসম্পত্তি সঞ্চয়ে নিয়োজিত হইল। তাঁহার বংশধরেরা জমিদার হইলেন, ব্যবসায় করিলেন না। দ্বারকানাথের পরে ঠাকুর-বংশের কয়েক জন ব্যবসায়ের চেষ্টা করিয়াছিলেন, কিন্তু সুনিয়ন্ত্রিত কার্য্যপ্রণালীর অভাবে তাঁহারা সাফল্য লাভ করিতে পারেন নাই। সুবিখ্যাত ব্যবসায়ী প্রাণকৃষ্ণ লাহার গদি আজও বর্ত্তমান, কিন্তু তাঁহার বংশধরগণ আজ প্রধানতঃ জমিদার বলিয়াই সুপ্রতিষ্ঠিত। তাঁহারা নিজেদের কর্ম্মক্ষমতা বিদ্যালোচনায় ব্যাপৃত রাখিয়াছেন। তাঁহাদের কারবারের পরিমাণ বৃদ্ধি ত হয়ই নাই, বরং সঙ্কোচ লাভ করিয়াছে। তাঁহাদের সঞ্চিত অতুল অর্থরাশি শিল্পবাণিজ্যে ব্যয়িত না-হইয়া কলিকাতা শহরে বহু সংখ্যক অট্টালিকায়

সৃষ্টি করিয়াছে। অনেক ক্ষেত্রে প্রভূত অর্থ কোম্পানীর কাগজে আবদ্ধ হইয়া রহিয়াছে। যদি একটি সুচিন্তিত কর্ম্ম-তালিকা প্রবর্ত্তন করিয়া দেশীয় শিল্পবাণিজ্যের সাহায্যকল্পে এই অর্থ আকৃষ্ট করা যায় তবে হয়ত পতনোন্মুখ বাঙালীর পুনরুত্থানের পন্থা হইতে পারে। বেশী লোকের প্রয়োজন হয় না, একমাত্র লাহা-পরিবারই তাঁহাদের অর্থদ্বারা বাংলার ভাগ্য পরিবর্ত্তন করিতে পারেন। সুখের বিষয়, এদিকে তাঁহাদের দৃষ্টি আকৃষ্ট হইতেছে এবং দুই-একটি শিল্প-প্রতিষ্ঠানে তাহার নিদর্শন পাওয়া গিয়াছে। কলিকাতায় অনেক স্বনামখ্যাত পরিবার আছেন, যাঁহাদের পূর্ব্বপুরুষ বিদেশী কোম্পানীগণের মুৎসুদ্দি থাকিয়া প্রভূত অর্থ এবং খ্যাতি সঞ্চয় করিয়াছিলেন। তাঁহাদের বংশধরগণ আজ হয় জমিদার, নয় উকিল ব্যারিষ্টার হইয়া ব্যবসায়শিল্পের পথ ত্যাগ করিয়াছেন। এই প্রসঙ্গে হাটখোলার স্বর্গীয় দ্বারকানাথ দত্তের নাম উল্লেখযোগ্য। তাঁহার পুত্র স্বনামখ্যাত শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত যদি তাঁহার পিতার ব্যবসায়ে লিপ্ত থাকিতেন, তবে তাঁহার পক্ষে দ্বিতীয় স্যর রাজেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় হওয়া কিছুমাত্র বিস্ময়ের বিষয় হইত না। আজ দ্বারকানাথের আসন বিখ্যাত গোয়েঙ্কা-পরিবার অধিকার করিয়াছেন। আমার উদাহরণের উদ্দেশ্য ইহা নয় যে, হীরেন্দ্রনাথ তাঁহার অসাধারণ প্রতিভা এবং বিদ্যাসম্ভারে বাংলার জ্ঞানভাণ্ডার পূর্ণ করেন নাই অথবা তাঁহার আইন-ব্যবসায়ের দ্বারা বাংলা দেশ উপকৃত হয় নাই। বস্তুতঃ তাঁহার স্থান অধিকার করিতে পারেন এমন ব্যক্তি আজ বিরল। এই জ্ঞানভাণ্ডার পূর্ণ করা যে প্রয়োজনীয় তাহা আমরা সকলেই স্বীকার করি। কিন্তু আমার বক্তব্য এই যে, বাংলার মেধাবী এবং প্রতিভাবান ব্যক্তিগণ ব্যবসায়শিল্পের পথ পরিত্যাগ করিয়াছেন বলিয়া বাংলার আজ এই দুরবস্থা। মফঃস্বলের অবস্থাও তদনুরূপ। ভাগ্যকুলের রায় এবং লৌহজঙ্গের পালচৌধুরী পরিবার বাংলার অন্তর্বাণিজ্য বহু পরিমাণে আয়ত্তাধীন করিয়াছিলেন। তাঁহাদের মধ্যে কেহ কেহ এখনও ব্যবসায়ে লিপ্ত আছেন। কিন্তু প্রধানতঃ তাঁহারা জমিদারী এবং জমিদারীতে লগ্নী কারবারের জন্য খ্যাত। এই প্রসঙ্গে রাজা জানকীনাথ রায়ের প্রশংসনীয় উদ্যম উল্লেখযোগ্য। এই বৃদ্ধ বয়সেও তিনি শিল্পবাণিজ্য প্রসারের চেষ্টায় ব্যাপৃত আছেন এবং তাঁহার পরিচালিত পাটকল ও জলযান প্রতিষ্ঠান সাফল্যের পথে অগ্রসর হইতেছে।

ভূসম্পত্তির স্থিতিশীলতা এবং লাভ এতকাল সমস্ত বাঙালীকে এমনি করিয়া কেবল জমিজমা খরিদ করিবার দিকে আকর্ষণ করিয়াছে, আর সেই সুযোগে বাংলার ব্যবসায় ভিন্ন প্রদেশের আগন্তুক উদ্যোগী ব্যবসায়ী সম্প্রদায় আয়ত্ত করিয়া লইয়াছেন।

এখন পুনর্ব্বার ঐরূপ উদ্বৃত্ত বা সঞ্চিত অর্থ ব্যবসায়-বাণিজ্যে ও শিল্পপ্রতিষ্ঠানে আকর্ষণ করিতে হইবে। সম্মানের প্রশ্ন আজ আর নাই, অন্য প্রদেশের ধনকুবের ব্যবসায়ী ও কারখানার অধিকারীদিগের সামাজিক স্থান সে প্রশ্নের সমাধান করিয়া দিয়াছে। এখন কেবলমাত্র ব্যবসায়বাণিজ্যে ও শিল্প-প্রতিষ্ঠানে নিযুক্ত অর্থের নিরাপদ স্থিতির প্রশ্ন উঠিতে পারে। এই সমস্যার পূরণ সহজ নয়; কিন্তু অসাধ্যও নয়, কেন-না সংসারে যাবতীয় ধনসম্পত্তি রক্ষা বা বিনাশ প্রায় সবই এক অর্থনীতির মূলসূত্রের উপর অধিষ্ঠিত। ভূসম্পত্তি ক্রয়ের পূর্ব্বে বিবেচনা করা প্রয়োজন সে সম্পত্তির রক্ষণাবেক্ষণ, তত্ত্বাবধান ইত্যাদি কি ভাবে হইতে পারিবে, তাহার উর্ব্বরতা কি প্রকার এবং উৎপন্ন ফসলের মূল্যই বা কি হইতে পারে। তাহার পর প্রজার স্বভাব, তাহার উপর খাজনা আদায় নির্ভর করে, অজন্মার বৎসরে সরকারী খাজনা ও চাষীকে ঋণদান ইত্যাদি নানা প্রশ্নের বিচার করিয়া তবে মুনাফার কথা আসে, যাহার অনুপাতে মূল্য নির্দ্ধারিত হয়। কিন্তু মূলসূত্র এই যে, সকল বিষয়ে নিজে অনুসন্ধান এবং যতদূর সম্ভব নিজে তত্ত্বাবধান না করিতে পারিলে সে ব্যাপারে ক্ষতি অবশ্যম্ভাবী। ব্যবসায়-বাণিজ্যে ও শিল্পপ্রতিষ্ঠানেও ঐ একই অবস্থা। কারবারের বিভিন্ন বিভাগের তত্ত্বাবধান করিবেন যাঁহারা তাঁহারা অভিজ্ঞ কি-না; কাঁচা মাল ক্রয় ও সরবরাহের বিশেষ সুবিধা আছে কিনা; উৎপন্ন পণ্যের উৎকর্ষতা ও বৈশিষ্ট্য কিরূপ, বিশেষজ্ঞ কারিগরগণ কিরূপ কুশলী এবং কর্ম্মঠ, বাজার মন্দার জন্য কি ব্যবস্থা হইতে পারে, ক্রয়-বিক্রয়ের ব্যবস্থা কিরূপ, যন্ত্রপাতি সংরক্ষণ, মেরামত ইত্যাদির জন্য কত খরচ হইতে পারে,—এই সকল প্রশ্নের সন্তোষজনক উত্তর পাইলে মূলধনের পরিমাণ নিরূপণ হইতে পারে। ঐ মূলধন সম্পূর্ণ আয়ত্ত না হইলে কার্য্যারম্ভ হওয়া উচিত নহে এবং কার্য্যারম্ভের পূর্ব্বে

(অর্থাৎ পণ্য উৎপাদনের পূর্ব্বে) মূলধনের অতি অল্পাংশের অধিক খরচ হওয়াও উচিত নহে—যাহাতে কারবার আরম্ভ না হইলে মূলধনের প্রায় সমস্তই ফেরৎ আসে। এইরূপ ব্যবস্থা করিলে সম্ভবতঃ ব্যবসায় ও শিল্পে পুনর্ব্বার ঐরূপ অর্থ নিয়োজিত হইতে পারে। কেবলমাত্র অসম্ভব লাভের প্রলোভনে তাহা আর আসিবে বলিয়া মনে হয় না।

অনেক ধনশালী জমিদার ব্যবসাবাণিজ্যে অর্থনিয়োগ করিতে অস্বীকৃত হন এই জন্য যে, তাঁহাদের পক্ষে কারবারের সঙ্গে সাক্ষাৎভাবে সংশ্লিষ্ট থাকা সম্ভব নহে এবং সেই কারণে তাঁহাদের প্রদত্ত অর্থের নিরাপদ স্থিতি সম্বন্ধে নিশ্চিন্ত হইতে পারেন না। এখানে আমার বক্তব্য, এই-সব জমিদার অধিকাংশ ক্ষেত্রেই কর্ম্মচারীদের উপর সম্পূর্ণ কার্য্যভার অর্পিত রাখেন এবং অনেক ক্ষেত্রে নিজেরা প্রায়ই দূরস্থানে বাস করেন। যদি জমিদারী-পরিচালনায় তাঁহারা কর্ম্মচারীর উপর নির্ভর করিতে পারেন, তবে শিল্পবাণিজ্যক্ষেত্রে তাঁহারা অভিজ্ঞ কর্ম্মকারকের উপর সম্পূর্ণ আস্থা স্থাপন করিতে পারিবেন না কেন, তাহা আমি বুঝিতে পারি না।

বাংলায় লোকসংখ্যা বৃদ্ধি, বেকার-সমস্যা, ভূসম্পত্তিতে লাভের হ্রাস, ব্যবসায় মন্দার দরুণ কৃষিবিপর্য্যয় ইত্যাদি কারণে আজ বাঙালীর ভূসম্পত্তির মোহ কাটিয়া যাইতেছে কিন্তু ইতিমধ্যে বাংলার শিল্পব্যবসায়ক্ষেত্রে ইংরেজ এবং ভারতের ভিন্ন প্রদেশবাসিগণ এমনি বিস্তৃত বনিয়াদের উপর আত্মপ্রতিষ্ঠা করিয়া লইয়াছে যে, সেখানে আমাদের কোনও স্থান করিয়া লওয়া এখন অত্যন্ত আয়াসসাধ্য ব্যাপার হইয়া পড়িয়াছে। সে যাহা হউক, বাঙালীকে ইহার পর প্রাণপণ শক্তিতে এই সকল ক্ষেত্রেই প্রতিষ্ঠিত হইতে হইবে, নতুবা তাহার আত্মরক্ষার উপায় থাকিবে না। এই নব জাগরণের প্রথমাবস্থায় বৃহৎ শিল্পকারখানা নির্ম্মাণ করিয়া বাঙালীর পক্ষে জীবিকার্জ্জনের যথেষ্ট ব্যবস্থা করিয়া লওয়া সহসা সম্ভবপর বলিয়া মনে হয় না। এবিষয়ে বিদেশী এবং দেশী কারখানার উৎকট প্রতিযোগিতা বাঙালীর প্রচেষ্টার উপর গুরুভার চাপাইয়া রাখিয়াছে। অনেক ঐকান্তিকতা, অতিরিক্ত সাধনা এবং সমবেত চেষ্টা দ্বারা সফল হইতে হইবে।

আমাদের দেশে বিশেষজ্ঞের একান্ত অভাব নাই, অভাব কেবলমাত্র দূরদর্শিতার এবং সঙ্ঘবদ্ধ চেষ্টার। কোনও ব্যবসায় বা শিল্পপ্রতিষ্ঠানের সূচনার পূর্ব্বে বহু বিষয়ে অনুসন্ধান প্রয়োজন, ইহা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। ঐ সকল বিভিন্ন অংশের জন্য বিভিন্ন প্রকারের শক্তি ও অভিজ্ঞতার প্রয়োজন, যাহা কোন একজনের থাকা সম্ভব নহে, সুতরাং অনেক অভিজ্ঞ ব্যক্তির সমবেত চেষ্টা ভিন্ন এবিষয়ে সাফল্য সম্ভব নহে। এবং এবিষয়ে সন্দেহমাত্র নাই যে, ব্যবসায় ইত্যাদির আরম্ভের পূর্ব্বেই ইঁহাদের সহায়তা বিশেষ প্রয়োজন, অভিজ্ঞ ব্যক্তিদের সুবিবেচিত মত ভিন্ন কার্য্যারম্ভ উচিত নহে। অবশ্য ইংরেজী 'nothing venture nothing gain' প্রবাদের সার্থকতা আছে, বিশেষজ্ঞ দুরূহ বলিলেও নিরাশ হওয়া বাঞ্ছনীয় নহে, কেন-না তাহা হইলে বর্ত্তমান অবস্থায় বাঙালীর পক্ষে জড়ভরত হইয়া থাকা ভিন্ন উপায় নাই, কিন্তু দুস্তর সাগরে পাড়ি দিবার পূর্ব্বে জলের গভীরতা এবং স্রোতের শক্তির বিষয় জানা কর্ত্তব্য। কিন্তু আমার মনে হয় বাংলার আভ্যন্তরীণ ব্যবসায়ে আত্মনিয়োগ করিলে বাঙালী এখনও তাহার স্থান করিয়া লইতে পারে। এই আভ্যন্তরীণ ব্যবসায়ক্ষেত্র যে কত বড় তাহা আমরা অনেকে জানিও না। ভারতের বহির্বাণিজ্য অপেক্ষা আভ্যন্তরীণ বাণিজ্য অনেক পরিমাণে বেশী এবং বহু লোক এই ব্যবসায়ে লিপ্ত থাকিতে পারেন।

কিন্তু এই বিষয়ে মনোযোগ আকর্ষণ করিবার অর্থ এই নয় যে, বাঙালীর পক্ষে বহির্বাণিজ্যে মন দিবার প্রয়োজন নাই। অথবা শিল্পোন্নতির চেষ্টা ত্যাগ করিতে হইবে। বস্তুতঃ আমাদের লুপ্তশিল্পের পুনরুদ্ধার ও নূতন শিল্প প্রতিষ্ঠা করিতেই হইবে। বহির্বাণিজ্যে মনোনিবেশ করাও আমাদের নিতান্ত প্রয়োজন। আমি কেবল কোন্‌টি অপেক্ষাকৃত সহজসাধ্য হইবে তাহারই উল্লেখ করিতেছি মাত্র। বহির্বাণিজ্য বা শিল্পোন্নতির ব্যবস্থা সময়সাপেক্ষ। কিন্তু ততদিন আমাদিগকে নিষ্ক্রিয় হইয়া থাকিলে চলিবে না। অনতিবিলম্বে আমাদিগকে আভ্যন্তরীণ বাণিজ্যে আত্মনিয়োগ করিয়া আমাদের অর্থনৈতিক জগতে উত্থানের প্রথম সোপান প্রস্তুত করিতে হইবে। কিন্তু সে যাহা হউক, বর্ত্তমানে শিল্প, বহির্বাণিজ্য বা আভ্যন্তরীণ ব্যবসায়, সকল ক্ষেত্রেই যে বাঙালীর সুযোগ সঙ্কীর্ণ হইয়া আসিয়াছে, সে-কথা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। এই সুযোগের সঙ্কীর্ণতার

জন্যই সুনিয়ন্ত্রিত প্রচেষ্টার আবশ্যক। আজ এই পরিবর্ত্তনের সূচনাকালে বাঙালীর শিল্পবাণিজ্যে কোন প্রচেষ্টা ব্যর্থ হইলে তাহার বিমুখতা আরও বৃদ্ধি পাইবে এবং সে বিমুখতা যে বাঙালী জাতিকে ধ্বংসের দিকেই লইয়া যাইবে তাহাতে অনুমাত্র সন্দেহ নাই।

আমি এখন আপনাদিগকে ব্যবসায়শিল্পে বাঙালীর হীনাবস্থা ইদানীং কিরূপ প্রকট হইয়া উঠিয়াছে, সে-সম্বন্ধে কয়েকটি প্রমাণ দিতেছি।

১৯৩১ খৃষ্টাব্দের আদমসুমারীতে জীবিকার্জ্জনের উপায় অনুসারে বাংলার অধিবাসিগণের যে সংখ্যা বিভাগ করা হইয়াছে, ১৯২১ খৃষ্টাব্দের অনুরূপ সংখ্যাপাতের সহিত তাহার বৈষম্য লক্ষ্য করিলে বিশেষ উদ্বেগের সৃষ্টি করিবে। আমি মাত্র কয়েকটি সংখ্যার উল্লেখ করিতেছি।

(শতকরা হিসাব)

	১৯২১	১৯৩১
কৃষি এবং পশুপালন	৭১·৯২	৬৮ ৩৪
খনিজ ধাতুসংগ্রহ	০·৪১	০·২৯
শিল্প-প্রতিষ্ঠান	১০·০০	৮·৮০
যান-বাহন	২·৩২	১·৯৩
ব্যবসায়বাণিজ্য	৫·৯১	৬·৪৩
ভৃত্যোচিত কার্য্য	২ ৭৪	৫·৫৮
বিশেষ কোন জীবিকার্জ্জন ব্যবস্থার অভাব	২·৮০	৪ ৩৩

মাত্র দশ বৎসরের মধ্যে বাংলায় জীবিকার্জ্জনের উপায় সম্বন্ধে যে পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে তাহাতে বাঙালীর অবস্থার কিরূপ দ্রুত অবনতি ঘটিতেছে তাহা উপলব্ধ হইবে। ১৯২১ খৃষ্টাব্দের তুলনায় ১৯৩১ খৃষ্টাব্দে বাংলায় ব্যবসায়িগণের যে সংখ্যা বৃদ্ধি হইয়াছে তাহাও সম্যক পর্য্যবেক্ষণ করিলে নিরুৎসাহ হইতে হয়। এ বিষয়ে ১৯৩১ খৃষ্টাব্দের আদমসুমারীতেই বিবৃত রহিয়াছে যে, যে-সকল ব্যবসায়ে বাঙালী ব্যবসায়ীর সংখ্যার বৃদ্ধি হইয়াছে তাহার অধিকাংশই অপ্রধান। বস্তুতঃ পাটব্যবসায়িগণের মধ্যে ১৯২১ হইতে ১৯৩১ খৃষ্টাব্দের মধ্যে ১৬,৮৬০ হইতে ৩,৮৯৮-এ সংখ্যা হ্রাস ঘটিয়াছে। বর্ত্তমান ব্যবসায় মন্দা এই সংখ্যা-হ্রাসের অন্যতম কারণ হইলেও এ-কথা সত্য যে, ইহা বাঙালীর পাটব্যবসায় হইতে স্থানচ্যুতির পরিচায়ক। উক্ত আদমসুমারীতে বাংলার কুটীরশিল্পগুলি কিরূপ ক্রমশঃ ধ্বংসের মুখে পতিত হইতেছে তাহা বিবৃত বর্ণিত হইয়াছে। বাংলার রেশম শিল্প, সতরঞ্চি বয়ন প্রভৃতি এখন সংশয়াপন্ন অবস্থায় উপনীত হইয়াছে।

বাঙালার এই চরম দুর্গতিতে যে জীবনরক্ষার সমস্যা ঘোরতর হইয়া উঠিয়াছে, তাহাতে এই প্রশ্নই মনে উদয় হয় যে, সম্প্রতি বাঙালীর বিমুখতা দূর করিবার চেষ্টা সত্ত্বেও তাহার পক্ষে ব্যবসায়ক্ষেত্রে অগ্রসর হওয়া সম্ভবপর হইতেছে না কেন?

আমার মনে হয় যে, ইহার অন্যতম মুখ্য কারণ হইল বাঙালী ব্যবসায়ী সম্প্রদায়ের ব্যাপক দৃষ্টি এবং সুনিয়ন্ত্রিত উদ্যমের অভাব। বাঙালী ব্যবসায়ী এতদিন তাঁহার সঙ্কীর্ণ কর্ম্ম-কেন্দ্রে বসিয়া যে জড়ত্ব প্রাপ্ত হইয়াছেন, তাহা হইতে মুক্তিলাভ করিতে হইবে। নতুবা পুনরায় শক্তিসঞ্চয়ের সম্ভাবনা তাঁহার পক্ষে সুদূরপরাহত। বর্ত্তমানে সর্ব্বদেশে ক্ষুদ্রবৃহৎ-নির্ব্বিশেষে সকল ব্যবসায়শিল্পই পৃথিবীব্যাপী অর্থনৈতিক প্রভাবের দ্বারা প্রভাবান্বিত হইতেছে। এই প্রভাবের প্রগতি সম্বন্ধে উদাসীন থাকিলে কোন ব্যবসায়শিল্পই এখন আত্মরক্ষায় সক্ষম হইবে না। এই বিশ্বশক্তি এখন নানারূপে আত্মপ্রকাশ করিতেছে। এক দিকে যেমন উন্নততর শিল্পোৎপাদন ব্যবস্থার মধ্য দিয়া ইহার প্রকাশ দেখা যাইবে তেমনি বিভিন্ন দেশের শুল্ক ব্যবস্থা, অর্থ-বিনিময় নিয়ন্ত্রণ, যান-বাহন ব্যবস্থা ইত্যাদির মধ্য দিয়া ইহার প্রভাব অভিব্যক্ত হইতেছে। যাহারা এই বিশ্বশক্তির দৈনন্দিন প্রগতির দিকে লক্ষ্য রাখিয়া আত্মরক্ষার প্রচেষ্টায় অবহিত হইবেন, তাঁহারাই ইহার সংঘাত প্রতিরোধ করিতে সক্ষম হইবেন। যাহারা এ বিষয়ে উদাসীন ও নিশ্চেষ্ট থাকিবে তাহাদের পক্ষে ধ্বংস অবশ্যম্ভাবী। এই সংযোগের অভাবে বাঙালীর ব্যবসায়শিল্পে কিরূপ অনর্থ ঘটিতেছে দু-একটি দৃষ্টান্ত হইতেই আপনারা তাহা সম্যক উপলব্ধি করিবেন।

আজ মাত্র একমাস কাল পূর্ব্বে ঢাকা শহরনিবাসী এক 'কুশিদা' বস্ত্রব্যবসায়ী কলিকাতায় আমার সহিত সাক্ষাৎ করেন। তাঁহার নিকটেই আমি প্রথম জানিতে পারি যে, ঢাকায় মাত্র দশ-পনর বৎসর পূর্ব্বেও 'মসলিন' এবং 'কুশিদা' বস্ত্র বিক্রয় বিশেষ লাভজনক ব্যবসায় ছিল। ঢাকা শহরের সন্নিকটস্থ গৃহস্থ পরিবারের মহিলাগণ অবসর সময়ে মহাজনের নিকট হইতে প্রাপ্ত বস্ত্রখণ্ডের উপর রেশমী সূতা দ্বারা নক্সা আঁকিয়া এই 'কুশিদা' বস্ত্র প্রস্তুত করিতেন। এইরূপে

প্রায় দু-চার হাজার গৃহস্থ পরিবারের অর্থোপার্জনের সহায়তা হইত। দশ-পনর বৎসর পূর্ব্বেও প্রায় তিন-চার লক্ষ টাকার কুশিদা বস্ত্র, জেদ্দা, আল্‌জিরিয়া, টিউনিস্, কন্‌ষ্টান্টিনোপল্, সিঙ্গাপুর প্রভৃতি স্থানে রপ্তানী হইত। এই রপ্তানী বাণিজ্যের সহিত ঢাকার ব্যবসায়িগণের কোন সম্বন্ধ ছিল না। তাঁহারা স্ব স্ব উৎপন্ন মাল কলিকাতায় অবাঙালী রপ্তানীকার কোম্পানীর নিকট নগদ মূল্যপ্রাপ্তির চুক্তিতে পাঠাইতেন মাত্র। আজ চার-পাঁচ বৎসরের মধ্যে এই কুশিদা বস্ত্র রপ্তানীর ব্যাপারে ঘোরতর বিপর্য্যয় ঘটিয়াছে। সর্ব্বসমেত রপ্তানীর মূল্য এখন মাত্র ত্রিশ-চল্লিশ হাজার টাকায় আসিয়া দাঁড়াইয়াছে; অর্থাৎ ঢাকার কুশিদা বস্ত্রশিল্প এখন ধ্বংসপ্রায় হইয়া আসিয়াছে বুঝিতে হইবে। এই বিপত্তি নিরাকরণের জন্য বেঙ্গল ন্যাশনাল চেম্বারের সহায়তায় কোন ব্যবস্থা করা যাইতে পারে কি-না তাহাই আলোচনা করিবার জন্য ঢাকানিবাসী এক ব্যবসায়ী মহোদয় আমার সহিত সাক্ষাৎ করেন। আমরা এ-বিষয়ে যথাসাধ্য অনুসন্ধান করিতেছি। কিন্তু এই একটি মাত্র দৃষ্টান্তই বাংলার মফঃস্বলের ব্যবসায়িগণের পক্ষে পরম শিক্ষণীয় বলিয়া মনে হইবে। আমি ঢাকা শহরের এই কুশিদা ব্যবসায়ীর রপ্তানী বাণিজ্য বিষয়ে অজ্ঞতা দেখিয়া যুগপৎ বিস্মিত এবং হতাশ হইয়াছি। তাঁহারই মুখে শুনিয়াছি যে, তিনি কয়েক দিন পূর্ব্বে ব্রিটিশ ট্রেড কমিশনারের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া এ-সম্বন্ধে আলোচনা করেন, এবং কেন বিগত কয়েক বৎসর বিভিন্ন দেশে 'কুশিদা'র আমদানী হ্রাস পাইয়াছে সে-বিষয়ে অজ্ঞতা প্রকাশ করিলে, ট্রেড কমিশনার স্পষ্ট জবাব দেন যে, বর্ত্তমান যুগে যে-ব্যবসায়ী বিশ্ববাণিজ্যের অবস্থা সম্বন্ধে এরূপ উদাসীন থাকিবে, তাহার পক্ষে ইহাই অনিবার্য্য শাস্তি। ঢাকার কুশিদা বস্ত্রের চাহিদা হ্রাস একদিনে হয় নাই, ক্রমে ক্রমে হইয়াছে। যখনই চাহিদা হ্রাস হইতে আরম্ভ করিয়াছিল, তখনই ঢাকার ব্যবসায়িগণ অনুসন্ধান করিতে পারিতেন উহার কারণ কি। যে-সকল দেশে মাল রপ্তানী হইত সেখানে শুল্কবৃদ্ধি হইয়াছে, কি, সে দেশের লোকের রুচি পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে। কারণ জানিতে পারিলে নিরাকরণের উপায় নির্দ্ধারণ করিতে পারা যায়—অন্ততঃ চেষ্টা করা যায়। ব্রিটিশ ট্রেড কমিশনারের উক্তি অর্থহীন নয়।

ইহার পর প্রশ্ন উঠিবে, বিশ্ববাণিজ্যের প্রগতির সহিত বাংলার মফঃস্বল ব্যবসায়িগণের যোগসূত্র স্থাপনের উপায় কি? আমার মনে হয়, ইহার একমাত্র উপায় ব্যবসায়িগণের সংহতি এবং কলিকাতার কোন কেন্দ্রীয় ব্যবসায়সংঘের সহিত তাহার সংযোগসৃষ্টি। কলিকাতা অন্তর্ব্বাণিজ্য এবং বহির্ব্বাণিজ্যের কেন্দ্রস্থল। সেখানেই এই ব্যাপারের সকল তথ্য সংগ্রহ, মতামত প্রকাশ এবং রীতিপদ্ধতির আলোচনা করিবার জন্য ব্যবস্থা ও সুযোগ রহিয়াছে—সুতরাং বাংলার ব্যবসায়শিল্পের প্রসারের উপায় কলিকাতাকে কেন্দ্র করিয়াই করিতে হইবে। বাংলার প্রত্যেক জেলাকে কেন্দ্র করিয়া যদি ব্যবসায়িগণের সঙ্ঘ সৃষ্টি হয় এবং সেই সঙ্ঘগুলি যদি কলিকাতায় প্রাদেশিক কেন্দ্রীয় সঙ্ঘের সহিত সংযোজিত থাকে, তাহা হইলে অনায়াসেই সমগ্র বিশ্বশক্তির সহিত যোগ স্থাপন সম্ভব হইতে পারে। প্রতি বৎসরে কোন কেন্দ্রস্থানে সমস্ত বাংলা দেশের ব্যবসায়িগণের একটি সম্মিলন করা যায় কি-না, এ-বিষয়ে বেঙ্গল ন্যাশনাল চেম্বার অফ্ কমার্স চিন্তা করিতেছেন। আমার মনে হয় এরূপ একটি সম্মিলনের বিশেষ প্রয়োজন আছে। এখানে নানা স্থানের ব্যবসায়ীরা সমবেত হইয়া পরস্পরের সহিত সম্মিলিত কার্য্যপ্রণালীর আলোচনা করিতে পারেন এবং তৎসঙ্গে বাণিজ্য-সম্পর্কীয় নানারূপ সমস্যার সমাধানেরও চেষ্টা হইতে পারে। বিভিন্ন স্থানে নানারূপ রাজনৈতিক সম্মিলনের ফলেই আজ দেশে এরূপ রাজনৈতিক জাগরণ আসিয়াছে। ব্যবসাক্ষেত্রেও আমাদের এইরূপ জাগরণ আনিতে হইবে, তাহা না হইলে আমাদের বর্ত্তমান হীন অবস্থা শীঘ্র নিরাকরণের আশা নাই।

এই প্রকার সংহতি, পরস্পর যোগাযোগ স্থাপনের সম্ভাবনীয়তা সম্বন্ধে আমি দু-একটি কথা বলিতে চাই। বাংলার মফঃস্বলে এখনও যে শিল্পব্যবসায় প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে, দেশের অর্থনৈতিক সংস্থানে তাহাকে কখনও উপেক্ষা করিলে চলিবে না। বস্তুতঃ সমগ্র দেশের পক্ষ হইতে বিবেচনা করিলে, কৃষির সহিত ইহাদিগকেও মফঃস্বল বাংলার আর্থিক মেরুদণ্ড বলিয়া মনে করিতে হইবে। সেই কারণে ইহার যথাসম্ভব উন্নতি সাধন করিবার জন্য আমাদিগকে কর্ম্ম-তৎপর হইতে হইবে। উদাহরণস্বরূপ, কাঁসা পিত্তল তামা

শিল্পের য়্যালুমিনিয়ামের প্রতিযোগিতায় বর্ত্তমান দুরবস্থার কথা উল্লেখ করা যাইতে পারে। অথচ ঐ সকল ধাতুর উপর কলাই ইলেকট্রোপ্লেট করা বা বিভিন্ন আকারের দ্রব্যের চাহিদা এখনও যথেষ্টই আছে। কাঁসারীকে আধুনিক প্রথায় শিক্ষা, কাঁচা মালের ও আধুনিক যন্ত্রপাতির ব্যবস্থা করিয়া দিলে তাহার বংশগত কলাকৌশলের প্রভাবে সে এখনও তাহার অবস্থার পরিবর্ত্তন করিতে পারে। বর্ত্তমান আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের সংঘাতে ইহাদের রূপ বদলাইবার প্রয়োজন হইতে পারে, কিন্তু, যে-কোন অবস্থাতেই হউক, এই সকল ব্যবসায় এবং শিল্পকে জীবিত রাখিয়া তাহাদিগকে ক্রমশঃ শক্তিশালী করিয়া তোলা আমাদের একটি প্রধান কর্ত্তব্য। বাংলার কুটীর-শিল্পগুলি অনেক স্থলে মুমূর্ষুপ্রায় হইয়া রহিয়াছে। এই শিল্পগুলিকে উন্নততর পরিচালনপদ্ধতি গ্রহণ করিবার জন্য অনুপ্রাণিত করিতে হইবে। মুখ্যতঃ ইহা গবর্ণমেণ্টের কৃষি-শিল্পবিভাগের কর্ত্তব্য। কিন্তু অর্থাভাব এবং সম্যক মনোযোগের অভাবে গবর্ণমেণ্টের এই বিভাগ এ-বিষয়ে নিষ্ক্রিয় হইয়া রহিয়াছে বলিলে অত্যুক্তি হয় না। কিছুকাল পূর্ব্বে বাংলার মফঃস্বলে বিবিধ কুটীরশিল্পের অবস্থা জানিবার উদ্দেশ্যে এই বিভাগে কতিপয় বিশেষ কর্ম্মচারী নিযুক্ত করিবার প্রস্তাব হইয়াছিল। কিন্তু তাহাও কার্য্যকরী হয় নাই। ফলে বাংলার কুটীরশিল্পের বর্ত্তমান অবস্থা সম্বন্ধে আমাদের সকলেরই ধারণা স্পষ্ট ও সঠিক নয় এবং সে বিষয়ে আমরা যাহা বলি তাহা নিতান্তই অনুমানসাপেক্ষ। যে স্থলে শিল্পবিশেষের বর্ত্তমান অবস্থা এবং সমস্যা সম্বন্ধেই আমাদের সঠিক ধারণা নাই, সেখানে তাহার উন্নতি সাধন সম্ভব হইতে পারে কি করিয়া? এ বিষয়ে আমার মনে হয় যে, বাংলার শিল্পগুলি যদি আমার পূর্ব্ব বর্ণিতরূপ জেলা-সংঘের সহিত সম্মিলিত হয় এবং কলিকাতার কোন কেন্দ্রীয় প্রতিষ্ঠানের সহিত যোগ স্থাপন করে, তাহা হইলে নানা প্রকারে এই শিল্পগুলির সংরক্ষণ এবং উন্নতিসাধন ব্যবস্থা উদ্ভাবিত হইতে পারে এবং উক্ত শিল্পের সহায়তা করাও সম্ভবপর হয়। এ বিষয়ে আমার অভিজ্ঞতা হইতেই আমি দু'-একটি বিষয়ের উল্লেখ করিতেছি। আজ প্রায় দুই বৎসর পূর্ব্বে ভারত-গবর্ণমেণ্টের চিফ কণ্ট্রোলার অব ষ্টোর্স্, বেঙ্গল ন্যাশনাল চেম্বার অফ কমার্সের কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতির সহিত সাক্ষাৎকালে বিবিধ বিষয়ের আলোচনা করেন। বাঙ্গালা এবং ভারত-গবর্ণমেণ্ট এদেশে প্রস্তুত বহু দ্রব্য ক্রয় করেন। সৈনিক বিভাগ, রেলওয়ে দপ্তর প্রভৃতিতে ব্যবহৃত হইতে পারে এমন অনেক দ্রব্য এদেশে প্রস্তুত হয়। বাংলা গবর্ণমেণ্ট অনেক স্থলে ভারতীয় ষ্টোর্স বিভাগকে মাল খরিদ করিবার ভার প্রদান করেন। এই সকল বিষয় বিবেচনা করিয়া আমরা চিফ ষ্টোর্স্ কণ্ট্রোলারের নিকট এই প্রস্তাব করি যে, বাংলার প্রাদেশিক গবর্ণমেণ্ট ভারতীয় ষ্টোর্স বিভাগকে যে-সকল মাল ক্রয় করিবার ভার অর্পণ করিবে সে সম্বন্ধে বাংলার কারখানার মালিকগণ এবং কুটীরশিল্পি-গণ যাহাতে বিক্রয়ের বিশেষ সুবিধা পায় তাহার ব্যবস্থা করিতে হইবে। অধিকন্তু ভারত-গবর্ণমেণ্টও যে-সকল মাল ক্রয় করিবেন, সে সম্বন্ধেও উক্ত সুবিধার ব্যবস্থা করিতে হইবে। বাংলা হইতে ষ্টোর্স্ বিভাগের ক্রয়ের জন্য কি কি মাল পাওয়া যাইতে পারে তাহার মূল্যতালিকা প্রস্তুত, এবং তাহা কিরূপ ব্যবস্থায় সংগ্রহ করা সম্ভবপর ইত্যাদি বিষয়ে গবর্ণমেণ্টের ষ্টোর্স্ বিভাগ এবং বাংলার ব্যবসায়ী এবং কুটীরশিল্পিগণের মধ্যে বেঙ্গল ন্যাশনাল চেম্বারের পক্ষে যোগ স্থাপন করা সম্ভবপর কি-না ইত্যাদি প্রসঙ্গের আলোচনা হইয়াছিল। কণ্ট্রোলার অফ ষ্টোর্স্ আমাদের এই প্রস্তাবে সম্পূর্ণ সহানুভূতি জ্ঞাপন করেন। কিন্তু আমাদের প্রস্তাবিত পদ্ধতি অনুসারে কার্য্যে উদ্যোগী হইবার সময় আমাদের এই অভিজ্ঞতা হয় যে, মফঃস্বলবাসী ব্যবসায়ী এবং শিল্পিগণ সংঘবদ্ধ না হইবার দরুণ এবং তাহাদের সহিত বেঙ্গল ন্যাশনাল চেম্বারের কোন সংযোগ না থাকার দরুণ আমাদের প্রস্তাব কার্য্যকর করা দুঃসাধ্য। বর্ত্তমানে মফঃস্বলের কোন্ কোন্ ব্যবসায়ী এবং কারখানার মালিক রহিয়াছেন এবং তাঁহারা কি কি দ্রব্য সরবরাহ করিতে পারেন তাহা আমরা উপযুক্ত সময়ে সঠিক রূপে জানিতে পারি না এবং সেই কারণে ষ্টোর্স বিভাগেরও কখন কি জিনিষ প্রয়োজন তাহা ইহাদিগকে জানাইয়া দিবার উপায় আমরা করিতে পারি না।

সংঘবদ্ধতা বাংলার পক্ষে এখন কিরূপ আবশ্যক হইয়াছে

তাহা আর একটি দৃষ্টান্ত হইতে আপনারা বুঝিতে পারিবেন। ভারত গবর্ণমেণ্ট প্রতি বৎসর রেলওয়ে সেতু গৃহাদি নির্ম্মাণের জন্য বহুব্যয়সাপেক্ষ যে-সকল কণ্ট্রাক্ট দিয়া থাকেন, তাহা বর্ত্তমানে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই বোম্বাই বা পঞ্জাব প্রদেশের কণ্ট্রাক্টারগণ পাইয়া থাকেন। সেকালে এরূপ ছিল না। ঈষ্ট ইণ্ডিয়ান রেলওয়ে ইত্যাদি নির্ম্মাণে স্বর্গীয় নীলকমল মিত্র প্রমুখ অনেক বাঙালীই বহু ধনাগম করিয়াছিলেন। ব্যক্তিগত ভাবে বাংলার কণ্ট্রাক্টরগণের যথেষ্ট সঙ্গতি এবং উদ্যোগ নাই বলিয়া তাঁহারা অনেক সময় এই প্রকার বড় বড় কণ্ট্রাক্ট সংগ্রহ করিতে পারেন না। দৃষ্টান্ত স্বরূপ ভারতের রাজধানী নয়া দিল্লী শহর গঠনের কথা উল্লেখ করা যাইতে পারে। এই মহানগরীর সংস্থাপন করিতে কোটী কোটী টাকা ব্যয় হইয়াছে, কিন্তু পরিতাপ এই যে, বাঙালী কণ্ট্রাক্টর এই বিরাট নগরগঠনে কেবল রাস্তার দুই ধারে গ্যাসবাতির থাম সরবরাহের সুযোগ পাইয়াছেন মাত্র। আমার মনে হয়, যদি ইঁহারা একতাবদ্ধ হন এবং সঙ্ঘবদ্ধভাবে কার্য্য উদ্যোগী হন, তাহা হইলে বড় বড় কণ্ট্রাক্টের অংশ পরিমাণ আমরাও লাভ করিতে পারি।

চীফ কণ্ট্রোলারের সহিত আলোচনার ফলে বাংলার মফঃস্বল ব্যবসায়শিল্পে সংহতির অভাবে যে এক গুরুতর সমস্যা রহিয়াছে তাহা বিশেষ করিয়া আমাদের চক্ষুর সম্মুখে উপস্থিত হইয়াছে। বাংলার ব্যবসায়ী ও শিল্পিগণ সঙ্ঘবদ্ধ না হইলে আমাদের চেম্বারের পক্ষ হইতে তাহাদের সহায়তা করা সুকঠিন হইয়া উঠিবে। এ সম্বন্ধে আরও একটি বিষয় প্রণিধান করা কর্ত্তব্য। বিশ্বশক্তির প্রভাবে বঙ্গদেশে বহুভাবে ব্যবসায়শিল্পের বিপর্য্যয় ঘটিতেছে। সুবিধা অপেক্ষা অসুবিধা ক্রমশঃ বাড়িয়া চলিয়াছে। কিন্তু সমস্যা সমাধানের জন্য সকলেই সচেষ্ট। তাহারা স্বদেশ এবং বিদেশের সকল তথ্য সম্পূর্ণরূপে জানে, জানি না কেবল আমরাই। তবে সঙ্ঘবদ্ধ হইয়া সমবেত চেষ্টা করিতে পারিলে আমদের পথ পরিষ্কার হইবেই সন্দেহ নাই।

মফঃস্বলের ব্যবসায়িগণের পক্ষেও এই যে কথা বলা যাইতে পারে তাহা পূর্ব্ববর্ণিত হুণ্ডিদা ব্যবসায়ীর ব্যাপার হইতে উপলব্ধি হইবে। মফঃস্বলের ব্যবসায় ক্ষেত্রেও যে রপ্তানি বাণিজ্যের সহিত সাক্ষাৎভাবে সম্বন্ধ রহিয়াছে এমন নয়। কোন কোন ব্যবসায় হয়ত কেবল একটি জেলাতেই কেন্দ্র করিয়া পরিচালিত হইতেছে। আবার কোন ব্যবসায় হয়ত একাধিক জেলার মধ্যে সন্নিবদ্ধ রহিয়াছে। কিন্তু এই প্রকার ব্যবসায়ের পক্ষেও বিশ্ববাণিজ্য সম্বন্ধে উদাসীন থাকিলে চলিবে না। এই প্রকার কত ব্যবসায় যে আমদানী বাণিজ্যের দ্বারা বিপর্য্যস্ত হইয়া পড়িয়াছে, তাহার বিস্তারিত আলোচনা এ ক্ষেত্রে সম্ভব নয়। ফরিদপুরের ব্যবসায় সম্বন্ধে আলোচনা করিয়া আমি জানিতে পারিয়াছি যে, ঐ অঞ্চলের প্রধান ব্যবসায়িক পণ্যগুলি সমস্তই বহির্বাণিজ্যের সহিত ঘনিষ্ঠ ভাবে সংশ্লিষ্ট। সর্ব্বপ্রধান পণ্য পাট যে মুখ্যতঃ বহির্বাণিজ্যের উপর নির্ভরশীল সে-বিষয়ে আলোচনা নিষ্প্রয়োজন। আমি অনুসন্ধান করিয়া জানিতে পারিয়াছি যে, ঐ জেলার বাঙালী পাটব্যবসায়ীর সংখ্যা ক্রমশঃই হ্রাস পাইতেছে। ফরিদপুরের ন্যায় ব্যবসায় কেন্দ্রে বাঙালীর প্রচেষ্টায় পাটের গাঁইট বাঁধিবার জন্য আজ পর্য্যন্ত একটিও প্রেস প্রতিষ্ঠিত হয় নাই, ইহা পরম পরিতাপের বিষয়। ফরিদপুরের উৎপন্ন ধনিয়াও দেশে বিদেশে রপ্তানি হইতেছে, রশুন ব্যবসায়ও এখন ফরিদপুরের একটি প্রধান ব্যবসায় বলিয়া বিবেচিত হয়। প্রতি বৎসর ফরিদপুর হইতে বহু পরিমাণ রশুন সুদূর ব্রহ্মদেশে রপ্তানি হয়। এই দুইটি ব্যবসায় যাহাতে সুপরিচালিত হয় ও স্থায়িত্ব লাভ করিতে পারে সে-বিষয়ে সতর্ক হইতে হইবে। এই রশুনের ব্যবসায় উপলক্ষ্য করিয়াই আমার বক্তব্য বুঝাইতে চেষ্টা করিব। আমার বিশ্বাস ফরিদপুরের রশুন যে ব্রহ্মে বিক্রয় হয় সে-বিষয়ে ফরিদপুরের রশুন ব্যবসায়ী কোন খোঁজই রাখেন না এবং রাখাও প্রয়োজন মনে করেন না। উৎপন্ন জিনিষ বিক্রয় হইলেই হইল। কেন এবং কোথায় বিক্রয় হয়; আবার অকস্মাৎ একদিন কেন যে বিক্রয় বন্ধ হইয়া যায় তাহা আমরা বুঝিতেই পারি না—ভাবি অদৃষ্টের খেলা। আসল কথা অন্যান্য দেশ ত ইতিমধ্যে বসিয়া থাকে নাই—তাহারাও রশুন উৎপন্ন করে। তাহাদের দেশের গবর্ণমেণ্ট তাহাদের সহায়—সরকারী বিভাগের সাহায্যে অথবা নিজেরাই বৈজ্ঞানিকের সাহায্যে তাহারা কৃষিবিদ্যায় উৎকর্ষ লাভ করে। পৃথিবীর কোথায় রশুনের চাহিদা আছে দেশবিদেশ হইতে সে খোঁজ লয়;—সে দেশের লোক কিরূপ রশুনই বা পছন্দ করে তাহাও জানিয়া

লয়। তারপর একদিন যখন সেই উন্নতপ্রণালীতে উৎপন্ন রশুন উক্ত দেশের বাজার সম্পূর্ণ একচেটিয়া করিয়া লয় তখন ফরিদপুরের রশুন ব্যবসায়ী হইতে রশুন-উৎপন্নকারী কৃষকের জীবিকা নষ্ট হইয়া যায়। কৃষক না খাইয়া মরে, ব্যবসায়ী দেউলিয়া হয়, মহাজন সুদ পায় না, জমিদার খাজনা পায় না। মহাজন, জমিদার মাছ কিনিতে পারে না, অতএব মৎস্য-ব্যবসায়ী নষ্ট হইয়া যায়, কাপড় কিনিতে পারে না, অতএব বস্ত্রব্যবসায়ী নষ্ট হইয়া যায়।

আমাদের দেশের বিরাট মূর্খতার পরিচায়ক একটি প্রবাদ আছে, আদার ব্যাপারীকে জাহাজের খবর লইতে নাই। আমি নিবেদন করি, জাহাজের খোঁজ লয় নাই বলিয়াই আজ আদার ব্যাপারী মরিতে বসিয়াছে এবং সঙ্গে সঙ্গে আমরা সকলে সহমরণে যাইতেছি। আজ আদার ব্যাপারীকে কেবল জাহাজের সংবাদ নয় দেশবিদেশের বাণিজ্যের, দেশবিদেশের লোকের পছন্দের, দেশবিদেশের উৎপন্ন দ্রব্যের মূল্যের সংবাদ লইতে হইবে। কৃষিতত্ত্ববিদের সহিত, কৃষকের সহিত ব্যবসায়ীর, ব্যবসায়ীর সহিত অর্থনীতিজ্ঞের ঘনিষ্ঠ যোগ স্থাপন করিতে হইবে। কিন্তু একা এ কাজ সম্ভব নহে বলিয়াই সঙ্ঘ গঠন করাই এখন প্রধান কর্ত্তব্য বলিয়া মনে করিতেছি। জমিদারেরও এখানে যথেষ্ট কর্ত্তব্য আছে, তাঁহারও এই সঙ্ঘে যোগদান করা উচিত। মনে রাখিবেন আমাদের উন্নতির প্রধান অন্তরায় আমাদের মনের জড়তা এবং অজ্ঞানতা। যদি এই মানসিক জড়তা দূর না হয়, যদি জগতের ব্যবসায়ের নূতন পদ্ধতি আয়ত্ত করিতে না পারি, তবে আমাদিগকে কেহই রক্ষা করিতে পারিবে না। একদিন রেশমের চাষ ছিল, উদ্যোগের অভাবে অন্যদেশ সে ব্যবসায় কাড়িয়া লইল। নীল আসিল, তাহাও উঠিয়া গেল। পাটও যাইবার মধ্যে। আখ লইয়া চেষ্টা চলিতেছে। কিন্তু সনাতন পদ্ধতিতে সর্ব্বনাশকে ঠেকাইয়া রাখা চলিবে না। সঙ্ঘবদ্ধতার প্রয়োজন রহিয়াছে।

সঙ্ঘবদ্ধতার প্রয়োজন সম্বন্ধে দু-একটা কথা বলিয়া আমি এই প্রসঙ্গ শেষ করিব। সঙ্ঘ প্রতিষ্ঠা যে কেবল বাংলার ব্যবসায়ীর পক্ষেই প্রয়োজন এমন নয়। বস্তুতঃ ইউরোপ, আমেরিকা, জাপান প্রভৃতি ব্যবসায়শিল্পে উন্নততর দেশে আজও সঙ্ঘসৃষ্টির প্রয়োজন প্রচারিত হইতেছে। ইংলণ্ড, ফ্রান্স, জার্ম্মেনী প্রভৃতি দেশে ব্যবসায়ী কারখানার মালিকের পক্ষে সঙ্ঘভুক্ত হওয়া অনিবার্য্য হইয়া পড়িয়াছে। এই সকল দেশে ব্যবসায়শিল্প এখন ব্যাপকভাবে সঙ্ঘ কর্ত্তৃক নিয়ন্ত্রিত হইতেছে বলিয়াই দ্রুতগতি উন্নতির পথে অগ্রসর হইয়া আন্তর্জ্জাতিক প্রতিযোগিতায় অন্যান্য দেশকে অতিক্রম করিয়া যাইতেছে। ইদানীং ইংলণ্ডে ব্যালফোর কমিটি তাহাদের বিবরণীতে এ-বিষয়ে যে অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন তাহা বিশেষ প্রণিধানযোগ্য। ইউরোপের কতিপয় দেশে বিস্তৃত সঙ্ঘনিয়ন্ত্রণের কথা উল্লেখ করিয়া উক্ত কমিটি বলিয়াছেন,—"ইংলণ্ডের ব্যবসায় সঙ্ঘগুলির মেম্বারের অপ্রাচুর্য্য ও তাহাদের আর্থিক সংস্থানের অপ্রতুলতা তাহাদের কর্ম্মক্ষমতাকে দুর্ব্বল করিয়া রাখিয়াছে। আমরা আমাদের তদন্তে ব্যাপৃত থাকাকালীন ফ্রান্স এবং জার্ম্মেনীর সুনিয়ন্ত্রিত এবং বৃহৎ ব্যবসায় সঙ্ঘগুলির কার্য্যকলাপ যাহা লক্ষ্য করিয়াছি, তাহাতে আমাদের মনে কিঞ্চিৎ ঈর্ষার সঞ্চার করিয়াছে। এই দেশগুলিতে ব্যবসায়ী মাত্রেরই সঙ্ঘভুক্ত না হইলে চলে না।" আজ ইংলণ্ডের মত ব্যবসায়শিল্পে অগ্রগণ্য দেশেও, তথায় ব্যবসায়ী সঙ্ঘ নিয়ন্ত্রণের যথেষ্ট ব্যবস্থা নাই বলিয়া ফ্রান্স ও জার্ম্মেনীকে ঈর্ষা করিতেছে। ইহার পর ভারতবর্ষের মত দেশে ব্যবসায় সঙ্ঘ সংস্থাপনের আবশ্যকতা সম্বন্ধে বিস্তারিত যুক্তি প্রদর্শন করা নিষ্প্রয়োজন। আমাদের দেশের ক্ষুদ্র কারবারগুলিকে এবং কুটীরশিল্পগুলিকে জাপানী প্রথা অনুযায়ী কেন্দ্রীয় ক্রয়বিক্রয় প্রতিষ্ঠানের সহিত যুক্ত করিলে সুফল হইতে পারে। ঐ প্রতিষ্ঠানগুলি যৌথ কারবাররূপে স্থাপিত হয় এবং উহারা কাঁচা মাল সরবরাহ, উৎপন্ন দ্রব্যাদি একত্রে সংগ্রহ করিয়া থাকে এবং ক্রয়বিক্রয় ইত্যাদি করিয়া ক্ষুদ্র প্রতিষ্ঠানগুলির অর্থাভাবজনিত সমস্যা পূরণ করে। ক্ষুদ্র প্রতিষ্ঠানগুলি উহাদের নির্দ্দেশমত বিভিন্ন প্রকারের এবং নির্দ্দিষ্ট পরিমাণের দ্রব্যাদি প্রস্তুত করাতে পরস্পরের প্রতিযোগিতা এবং চাহিদার-অতিরিক্ত জিনিষ উৎপন্ন করিবার বিপদ হইতে উদ্ধার পায়। এইখানে আর একটি প্রসঙ্গের অবতারণা করা বিশেষ প্রয়োজন মনে করি। বাংলা দেশে বাঙালীর পরিচালিত প্রকৃত কমার্শিয়াল ব্যাঙ্ক একটিও নাই। যে-কয়টি কমার্শিয়াল ব্যাঙ্ক কাজ করিতেছে তাহাদের প্রায়

দবগুলিই ইংরেজের দ্বারা পরিচালিত; অবশিষ্ট দুই একটি অবাঙালীর কর্ত্তৃত্বাধীন। বাঙালী পরিচালিত কমার্শিয়াল ব্যাঙ্কের প্রস্তাব হইলে, লোকে বেঙ্গল ন্যাশনাল ব্যাঙ্কের দৃষ্টান্তে ভীত হয়। বিগত অভিজ্ঞতা আমাদিগকে কার্য্যহীনতার পথে পরিচালিত করিলে চলিবে না, সে অভিজ্ঞতার দ্বারা যেন আমরা ভবিষ্যতে সাবধানে ও সতর্কতার সহিত নূতন ব্যাঙ্কের কার্য্য পরিচালনা করিতে পারি।

প্রতি ব্যবসায়কেন্দ্রে একটি কমার্শিয়াল ব্যাঙ্কের প্রতিষ্ঠার প্রয়োজন,— সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। বাংলার মফঃস্বল শহরে খাঁটি কমার্শিয়াল ব্যাঙ্ক এখনও প্রতিষ্ঠালাভ করে নাই। বাংলায় আট শতের অধিক লোন আপিস সংস্থাপিত হইয়াছে সত্য, কিন্তু তাহার কোনটিই নিছক কমার্শিয়াল ব্যাঙ্কের কার্য্যপদ্ধতির দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হইতেছে না। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই এই লোন আপিসগুলি তাহাদের সংগৃহীত আমানতের টাকা স্থাবর সম্পত্তি জামিন রাখিয়া লগ্নী করিয়াছে এবং এখন ব্যবসায় মন্দার দরুণ সেই টাকা আদায় করা এক প্রকার অসম্ভব হইয়া পড়িয়াছে। এ-বিষয় সকলেই অবগত আছেন। এই অবস্থার দিকে লক্ষ্য রাখিয়াই আমি কমার্শিয়াল ব্যাঙ্ক সম্বন্ধে দু-একটি কথা বলিতে চাই। কমার্শিয়াল ব্যাঙ্কে সাধারণতঃ অল্পকালের জন্য টাকা আমানত রাখা হয়, সুতরাং ইহার লগ্নীকার্য্য এমনভাবে হওয়া উচিত যে, উপযুক্ত সময়ে এবং অনায়াসে আপনা হইতেই ঋণের টাকা আদায় হইয়া আসে। এই নিয়মের ব্যতিক্রম করিলে সাধারণতঃ কমার্শিয়াল ব্যাঙ্ক ক্ষতিগ্রস্ত হয়। পূর্ব্বে বাঙালীর চেষ্টায় প্রতিষ্ঠিত কমার্শিয়াল ব্যাঙ্কগুলি বিনষ্ট হওয়ার প্রধান কারণ এই নিয়মের অনমুবর্ত্তিতা। ব্যাঙ্ক স্থাপন করিলেই যে-কোন শিল্পের এবং ব্যবসায়ের সাহায্য করিতে হইবে, এই উৎসাহে আমরা কমার্শিয়াল ব্যাঙ্কিং পদ্ধতির এই মূলসূত্র ভুলিয়া যাই। এমনও দেখিতে পাওয়া গিয়াছে, কমার্শিয়াল ব্যাঙ্কের যে মুখ্য কাজ অর্থাৎ ব্যবসায় পরিচালনকল্পে ঋণ দান করা, তাহার স্থলে উক্ত ব্যাঙ্ক কোন কোন কোম্পানীকে সূচনা কালে তাহাদিগকে স্থাপিত করিতেও ঋণদান করিয়াছেন। বলা বাহুল্য, উহা অত্যন্ত বিপজ্জনক এবং কমার্শিয়াল ব্যাঙ্কিং প্রথার বিরোধী কাজ। এ-কথাও অস্বীকার করা চলে না যে, কোন কোন স্থলে প্রবঞ্চনা, তঞ্চকতা প্রভৃতিও দেখা গিয়াছে। কিন্তু ইহাও সত্য যে, কার্য্যপ্রণালী সুনিয়মবদ্ধ হইলে এবং কর্ত্তৃপক্ষের তীক্ষ্ণ দৃষ্টি থাকিলে, ঐ সকল বিপদ হইতে রক্ষা পাওয়া যায়। এ-যাবৎ আমাদের দেশে, বিশেষতঃ মফঃস্বল শহরে, কমার্শিয়াল ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠার এক অন্তরায় রহিয়াছে, যথেষ্ট ব্যবসায়িক লেনদেনমূলক হস্তান্তর-করণ উপযোগী নিদর্শনপত্রের অভাব অর্থাৎ ইংরেজীতে যাহাকে credit instruments বলে। কিন্তু তাহা হইলেও এখন হুণ্ডীর প্রচলন ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইতেছে। মফঃস্বল ব্যাঙ্কের সহিত কলিকাতার ব্যাঙ্কের যোগাযোগ স্থাপনার ফলে এই সকল হুণ্ডী বিক্রয় করা এখন সহজসাধ্য হইতেছে। রেলওয়ে রসিদের উপর টাকা ধার দিবার প্রথাও ক্রমশঃ বিস্তার লাভ করিতেছে। ব্যাঙ্কিং তদন্ত কমিটির অনুমোদিত লাইসেন্সপ্রাপ্ত গুদামের প্রতিষ্ঠা হইলে গুদাম রসিদের উপরও লেনদেন চলিতে পারিবে।

কিন্তু আমি এই কমার্শিয়াল ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠার প্রসঙ্গে একটি বিষয়ের দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে চাই। বাঙালীর ব্যবসায়িক প্রতিভা এখনও বিভিন্নমুখী হইতে পারে নাই। যখনই কোন ব্যবসায় বা শিল্প লাভজনক বলিয়া মনে হইয়াছে, তখনই বাঙালীর উদ্যম কেবল সেই দিকেই বিস্তৃতভাবে নিয়োজিত হইয়াছে। ফলে, টান যোগানের বৈষম্য ও অন্তঃপ্রতিযোগিতার দরুণ সেই ব্যবসায় বা শিল্পের কদর অনেক স্থলে নষ্ট হইয়াছে। এইরূপ নষ্ট হইবার বা প্রসারলাভ না করিবার কারণ এই যে, সম্যক রূপ কার্য্য করিবার শক্তি এবং সামর্থ্যের অভাবে প্রতিষ্ঠানগুলি কখনও বল সঞ্চয় করিয়া বড় হইতে পারে নাই। অভাবে এবং অজ্ঞতায় উহারা অনেকেই অর্দ্ধপথে শুষ্ক হইয়া রহিয়াছে। বাংলার লোন আপিস, চা বাগান, কয়লার খনি, সাবানের কারখানা প্রভৃতির ইতিহাস এইরূপ অভিজ্ঞতার পরিচায়ক। ইহার জন্যই বাঙালীর ব্যবসায়িক উদ্যম তেমন প্রতিষ্ঠা বা প্রতিপত্তি লাভ করিতে সক্ষম হইতেছে না। বাঙালীর উদ্যম এরূপ বিক্ষিপ্ত ভাবে নিয়োজিত হইতে থাকিলে ব্যবসায় শিল্পে বাঙালীর পক্ষে শক্তিলাভ করা সুদূরপরাহতই থাকিবে। আমাদের চেষ্টা কেবল সমবেত হইলে চলিবে না; সুনিয়ন্ত্রিতও হওয়া চাই। বিভিন্ন প্রকারের এক একটি আদর্শ শিল্প বা ব্যবসায়

প্রতিষ্ঠান গড়িয়া তুলিতে হইবে। ইহাতে যথেষ্ট একতা-বোধ এবং আন্তরিকতা থাকা চাই। বাঙালীর ব্যবসায়শিল্পে এই প্রকারে শক্তি প্রয়োগ করিতে পারিলে, আবার বাঙালীর ব্যবসায়িক উদ্যমে জনসাধারণের আস্থা ফিরিয়া আসিবে। বিদেশে এখন কার্টেল বা মার্জার ব্যবস্থায় বহু প্রতিষ্ঠান সঙ্ঘবদ্ধ হইয়া এইরূপে পরস্পরের সহিত প্রতি-যোগিতা প্রতিহিংসা ছাড়িয়া শক্তি সমাবেশ পূর্ব্বক বিদেশী শক্তির বিরুদ্ধে অভিযান আরম্ভ করিয়াছে। এখানে ঐরূপ ব্যবস্থা সম্ভব কিনা চিন্তা করা প্রয়োজন।

বাংলার লোকবলের অভাব নাই। যে-সমস্ত শিক্ষিত বাঙালী কর্ম্মহীন অবস্থায় বসিয়া আছেন বা ব্যবহারাজীবরূপে নিজেদের কর্ম্মহীনতা আবৃত করিয়া রাখিয়াছেন, তাঁহাদের সেই শিক্ষাও একটি জাতীয় সম্পদ। এই শিক্ষিত ব্যক্তি-দিগকে ব্যবসায়ক্ষেত্রে নিয়োজিত করিলে আশাতীত ফল পাওয়া যাইতে পারে। অর্দ্ধ-শিক্ষিত অবাঙালী ব্যবসায়ক্ষেত্রে বিশেষ পারদর্শিতা লাভ করিতেছেন। শিক্ষিত বাঙালী সুপরিচালিত হইলে তদপেক্ষা অধিক সাফল্যলাভ করিবে বলিয়া আমার বিশ্বাস।

ব্যবসায়ী ও কারখানাসকল সঙ্ঘবদ্ধ হইলে উঁহাদের প্রভাব ও প্রতিপত্তি গবর্ণমেণ্ট স্বীকার করিবেন এবং কলি-কাতার কেন্দ্রসংঘও সবল হইবে। ফলে, যানবাহন, ষ্টীমার রেল ইত্যাদির স্থাপনে এ প্রদেশের ব্যবসায়িগণের সুবিধা অসুবিধার প্রশ্ন বিবেচিত হইবে।

আর একটি কথা বলিয়াই আমি আমার বক্তব্য শেষ করিব। আজ কয়েক বৎসর যাবৎ যে নিদারুণ ব্যবসায় মন্দা সমগ্র পৃথিবীর ব্যবসায়-বাণিজ্যের উপর বিভীষিকার ছায়া পাত করিয়াছে আমরাও তাহা হইতে মুক্তি পাই নাই। বস্তুতঃ, পৃথিবীর অনেক দেশ অপেক্ষা ভারতবর্ষ এই ব্যবসায় মন্দার দরুণ গুরুতররূপে ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে। আবার ভারতবর্ষের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে বাংলা। কয়েকটি অঙ্কপাত হইতেই এই ক্ষতির পরিমাণ পরিকল্পনা করিতে পারা যাইবে। ১৯২০-২১ খৃষ্টাব্দ হইতে ১৯২৯-৩০ খৃষ্টাব্দ এই দশ বৎসরের গড়পড়তা হিসাবে বাংলার কৃষক সম্প্রদায় তাহাদের বিক্রয়যোগ্য বিভিন্ন ফসলের দরুণ দর পাইয়াছে প্রায় ৭২২ কোটি টাকা। এই কৃষিপণ্যের বিক্রয় মূল্য ১৯৩০-৩১ খৃষ্টাব্দে ৫৩ কোটি টাকা হইতে হ্রাস পাইয়া ১৯৩১-৩২ খৃষ্টাব্দে ৪০ কোটি টাকায় আসিয়া দাঁড়াইয়াছে; ১৯৩২-৩৩ খৃষ্টাব্দে এই মূল্যের পরিমাণ হইয়াছে মাত্র কিঞ্চিদধিক ৩২½ কোটি টাকা অর্থাৎ বাংলার কৃষকসম্প্রদায়ের ফসল বিক্রয়ের একত্রিত আয় অর্দ্ধেক অপেক্ষাও কমিয়া গিয়াছে। বাংলার প্রধান ফসল পাট, যাহার দরুণ বাংলার কৃষকবর্গের গড়পড়তা সমষ্টি আয় ছিল প্রায় ৩৫½ কোটি টাকা; তাহার পরিমাণে বিগত তিন বৎসরে যথাক্রমে ১৭½ কোটি হইতে ১০½ কোটিতে নামিয়া ১৯৩২-৩৩ খৃষ্টাব্দে মাত্র ৮ কোটি ৬২ লক্ষ টাকায় দাঁড়াইয়াছে। অর্থাৎ পাটের দরুণ বাংলার চাষীর আয় গড়পড়তায় আয়ের এক-চতুর্থাংশেরও কম হইয়া গিয়াছে। এমতাবস্থায় বাংলার ব্যবসায়শিল্পগুলির মধ্যে বিপর্য্যয় ঘটিয়াছে। এই বিপর্য্যয় নিরোধ করিবার প্রকৃষ্ট পন্থা দেশের মুদ্রা প্রচলনের পরিমাণ বাড়াইয়া বাজার দর বৃদ্ধির সহায়তা করা। এই উপায়ে মূল্য বৃদ্ধি করিতে গেলে টাকার সহিত বিলাতী মুদ্রার বিনিময় হার নির্দ্ধারিত রাখা অসম্ভব হইয়া পড়ে। ভারত-সরকার এক্সচেঞ্জ হারে কোন পরিবর্ত্তন করিতে একান্ত বিমুখ। দেশের কৃষি শিল্প বাণিজ্যে যেমন বিপর্য্যয়ই ঘটুক না কেন, এক্সচেঞ্জের সমতা রক্ষা করাই তাহাদের একমাত্র লক্ষ্য হইয়া পড়িয়াছে। আমাদের এই চক্ষুর সম্মুখে দেশের পর দেশ মুদ্রা বিনিময়ের প্রশ্ন অগ্রাহ্য করিয়া তাহাদের স্ব স্ব অর্থপ্রচলন ব্যবস্থার পরিবর্ত্তন সাধন করিতেছে এবং তাহার সহায়তায় দেশের কৃষি, বাণিজ্য ও শিল্পে স্বার্থসংরক্ষণের জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করিতেছে। জাপান, যুক্তরাষ্ট্র, এমন কি ইংলণ্ড পর্য্যন্ত এই পথ অনুসরণ করিয়া চলিয়াছে—আমরা নিঃসহায়, তাই দিনের পর দিন আমরা নিদারুণ ক্ষতির গুরুভার বহন করিতে বাধ্য হইতেছি; কাজেই এবিষয়ে কোন আশার কথা বলিবার আমার সামর্থ্য নাই, তবু আমার মনে হয়, কৃষিবিপর্য্যয়ের জন্য আমাদের ব্যবসায় ও শিল্প যেরূপ ক্ষতিগ্রস্ত হইতেছে, তাহা হইতে ইহাদিগকে জমি-বন্ধকী ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠা করিয়া আংশিক পরিমাণে মুক্তি দেওয়া যাইতে পারে। এই প্রকার ব্যাঙ্ক বন্ধকী ঋণের দায়িত্ব গ্রহণ করিলে, যে পরিমাণ টাকা ব্যবসায় শিল্পে আকৃষ্ট হইবার সম্ভাবনা থাকিবে, তাহা

উপেক্ষণীয় নয়। আমি এই প্রকার ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠা বিষয়ে বিগত সেপ্টেম্বর মাসে কলিকাতা ইউনিভার্সিটি ইনষ্টিটিউটে বিস্তারিত আলোচনা করিয়াছি। সুতরাং পুনরুক্তি হইতে বিরত হইলাম।

আজ আমাদের সুজলা সুফলা শস্যশ্যামলা বাংলায় অর্থনৈতিক সমস্যা জটিল হইতে জটিলতর হইয়া উঠিয়াছে। সমস্ত দেশবাসীর জন্য আমরা দুই বেলা দুই মুঠা অন্নের সংস্থান এবং মায়ের দেওয়া মোটা কাপড় সংগ্রহ করিবার শক্তি হারাইতে বসিয়াছি। কিন্তু এই দুঃসহ অবস্থাও আমাকে নিরুৎসাহ করিতে পারে নাই। সুজলা সুফলা বাংলার কৃষিসম্পদ যাহাই থাকুক, এখন আর তাহা দেশবাসীর ভরণপোষণের পক্ষে যথেষ্ট নহে। এজন্যই আমাদিগকে এখন শিল্পব্যবসায়ের দিকে আত্মনিয়োগ করিয়া সমগ্র বাঙালী জাতির আর্থিক সংস্থানের ভিত্তি প্রশস্ত এবং সুদৃঢ় করিয়া লইতে হইবে। ব্যবসায় শিল্পকে আর এখন জীবনের গৌণ অবলম্বন স্বরূপ গ্রহণ করিলে চলিবে না। যাঁহারা ব্যবসায় শিল্পে ব্যাপৃত রহিয়াছেন তাঁহাদের এখন ক্রমশঃ ভূসম্পত্তি অর্জ্জনের আকাঙ্ক্ষা ত্যাগ করিয়া, কি করিলে বাঙালী ব্যবসায় শিল্পে ক্রমাগত উন্নতির পথে অগ্রসর হইতে পারিবে, সে-বিষয়ে অবহিত হইতে হইবে। এজন্য আজ বাঙালীর সব-চেয়ে বেশী প্রয়োজন সঙ্ঘ শক্তির; কেবল তাহাই নয়, সমগ্র বাঙালী জাতির বিভিন্ন শ্রেণীর মধ্যে যে আর্থিক পরস্পর নির্ভরশীলতা রহিয়াছে, তাহাও আমাদিগকে সম্যক উপলব্ধি করিতে হইবে। বর্ত্তমান ব্যবসায় মন্দা আমাদের যতই কঠোরভাবে আঘাত করুক না কেন, ইহা আমাদের নিকট আজ কৃষি-বাণিজ্য-শিল্পের ঘনিষ্ঠ সংযোগ সম্বন্ধে সচেতন করিয়া দিয়াছে। ব্যবসায়ী ও কারখানার মালিকের চাহিদা নাই, তাই চাষীর আবাদী ফসল আজ চরম সস্তা দরে বিকাইতেছে। চাষীরও ফসলের দাম নাই বলিয়া চরম অর্থাভাব ঘটিয়াছে। জিনিষ কিনিবার সামর্থ্য তাহার আসিবে কোথা হইতে? তাই ব্যবসায় শিল্পও পুষ্টিলাভ করিতেছে না। আজ কবির ভাষায় আমরা সকলেই বুঝিতে পারিয়াছি—

> "সকলের তরে সকলে আমরা
> প্রত্যেকে আমরা পরের তরে ॥"

ছুটির দাবী

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

প্রীতিনমস্কার

বৈষ্ণবপদাবলীতে তুমি রাধিকার বয়ঃসন্ধির কথা নিশ্চয় পড়েচ। যৌবন-শৈশবের মধ্যে দ্বন্দ্ব—কখনও বা লজ্জা আসে, কখনও বা লজ্জা করতে ভোলে। সত্তর বছর বয়স আর এক বয়ঃসন্ধি—জীবনমৃত্যুর মাঝখানে। যেন চিরদিনই বেঁচে থাকব এই সংস্কারটা ঘুচতে চায় না অথচ মুহূর্ত্তে মুহূর্ত্তে তার প্রতিবাদ চলতে থাকে। এতকাল স্রোতটা যে পথে চল্‌ছিল সে পথে বাধা এসে পৌঁছল অথচ বাধাটাকে সম্পূর্ণ মেনে নেবার জন্যে মনটা প্রস্তুত হয়নি। সহজে মেনে নেওয়া তখনই সম্ভব হয় যখন মৃত্যুর দরবারে চালটা বেশ দুরস্ত হয়ে আসে। সে চালটা আগেকার একেবারে উল্টো। বোঁটাটাকে শক্ত ক'রে ধ'রে থাকাই ফলের পক্ষে অত্যাবশ্যক যখন ফল থাকে কাঁচা, সে সময়ে বন্ধনটাকে তার মানা চাই, আনন্দের সঙ্গে বীর্য্যের সঙ্গে। যখন পাকল তখন বোঁটা আঁকড়ে থাকাই বিপত্তি। সত্তর বছর বয়সে অবসাদ আসে, কেন-না তখন স্রোতে যে ভাঁটার টান ধরেছে, যে-টানে সমুদ্রের মুখে নিয়ে চলে, তার সঙ্গে পরিচয় নেই ব'লে তাকে সহজে বিশ্বাস করতে পারিনে ব'লে ভিতরে ভিতরে মনটা উজান মুখে লগি ঠেলাঠেলি করতে থাকে—তাতে তরী এগোয় না, ন যযৌ ন তস্থৌ হয়ে কাঁপতে থাকে, চাড় লাগতে থাকে তার পাঁজরাটাতে। সংসারের এতকালকার সমস্ত আয়োজনটাই উজোন-ঘাট-

মুখো, সেইখানকার হাট-বাজারেই সমস্ত তার বেচাকেনা। শেষ পর্য্যন্ত সেই মূল্য আদায়ের প্রলোভনটা ছাড়তে পারলেই দ্বন্দ্ব যায় মিটে, মন হয় শান্ত। নিজের কথাটা বলি, কিছুকাল থেকে ছুটির জন্যে উৎসুক হয়ে আছি। থেকে থেকে পাব্লিক নামক নির্ম্মম মনিবের কাছে দরখাস্ত জারি করছি—যুক্তি বের ক'রে ছুটির যোগ্যতার দলিল দেখাচ্চি। মনিব বলচেন, বয়স হয়েচে তাতে কী—দেখচি তো যথেষ্ট তাগিদ দিলে কাজ করতেও পারো। অতএব কাজ আদায় করবই, যুক্তি রাখো তুলে। আমার পক্ষে বলবার এই শক্তি কিছুই যদি বাকি না থাকে তাহ'লে সত্তরের পরের পালা জমাব কী নিয়ে। সে পালাটা তো তোমাদের দরবারের নয়। অতএব এই শক্তিটুকু যদি তোমাদের কাজেই আটক ক'রে রাখো তবে সেটাকে বলব অপহরণ। এত কাল যদি তোমাদের ফরমাসে গাফিলি ক'রে থাকি—তাহ'লে সন্ধ্যের পরেও বাতি জ্বেলে overtime [ওভারটাইম্] খাটালে ভালমানুষের মতো সেটা মেনে নিতে হবে—সংসারের বড়বাবুদের কাছে নালিশ জানাব না। অন্তত আমার সম্বন্ধে কর্ত্তাদের সে কথা বলবার মুখ নেই। আমার একটা জন্মে দুটো জন্মের মতোই কাজ চুকিয়ে দিয়ে বসে আছি—কেবলই যে বকশিস্ মিলেছে তা নয়, গাল খেয়েছি দু-জন্মের বহর পেরিয়ে—অতএব চিত্রগুপ্তের যদি ধর্ম্মবুদ্ধি থাকে, আর যদি এই বাংলা দেশেই ফিরতি গাড়ীতে আমার ভাবী জন্ম রওনা ক'রে দেন, তাহ'লে সেবারটায় যাতে গায়ে ফুঁ দিয়ে দিন কাটাতে পারি এমন ক্রেডিট তিনি দিয়ে দেবেন এবং সেবারকার মত বাঙালীর মুখেও আমার নিন্দেটা যথাসম্ভব ভ্যাল্‌সা যাতে হয় তার ব্যবস্থা করবেন। কাঁচা বয়সে কলমের ড্রাইভারি করেছি দিনে রাতে, খোরাকী পাই-বা না-পাই, রথ হাঁকিয়ে পথ চলারও মজা আছে—তাই বাইরের মনিবের চোখ রাঙানি খেয়েছি বিস্তর, কিন্তু অন্তরের মনিব পিঠে সহাস্য চাপড় মেরে অনেকবার বলেছেন সাবাস্। কিন্তু আর কেন, আপিসের শেষ ঘণ্টা বেজে গেল। গোধূলির আলোতে আর দাপাদাপি করতে একটুও ভাল লাগে না। কিন্তু মিটছে না বাইরের মনিবের দাবী। আগে ঘোড়া আমার সামনে থেকে টানতো এখন এরা পিছন থেকে ঠেলা লাগাচ্চে। ঘোড়াটা কাহিল হয়েছে বটে, কিন্তু চাকাটা তো ভাঙেনি, তাই ঠেলা মারলে চলে। সেই কারণে বয়সের কৈফিয়ৎটা অগ্রাহ্য হয়ে গেল। তোমার চিঠিতে যে অবসাদের কথা লিখেচ সেটার বোঝা আমারও মনের মধ্যে চেপে আছে—যাকে কর্ত্তব্য নাম দিয়ে পশ্চিমের ওস্তাদরা বাহাদুরী দিয়ে থাকে সেই অকালকর্ত্তব্যের বোঝা। সেই পশ্চিমের পালোয়ানি ভঙ্গীতেই এরাও আওয়াজ ক'রে বলচে, দেশের কাজ বাকি আছে, মানুষের হিতের ফর্দ্দ এখনও শেষ হয়নি অতএব পথের মাঝখানে যে পর্য্যন্ত না মুখ থুবড়িয়ে পড়ো, সে পর্য্যন্ত লাগাম খিচকে খিচকে তোমাকে ছুট করাবই, কেন-না সেটা মহৎ কর্ত্তব্য। একেবারে বাজে কথা। যে পর্য্যন্ত পৃথিবীতে মানুষ থাকবে সে পর্য্যন্ত তার হিতের দাবী চলবে অফুরাণ হয়ে—কিন্তু ব্যক্তিগত মানুষের জীবনে আগাগোড়া সমস্ত দিনটাই মধ্যাহ্ন নয়। যে শক্তি দিয়ে একটা বয়স পর্য্যন্ত তাকে কাজ করতেই হবে সেই শক্তির পরিশেষটুকু দিয়েই তাকে কাজের হীম কাজের উত্তাপ শান্ত ক'রে আনতেই হবে। লোকহিতের দাবিত্ব তার অসীম নয়; তার প্রমাণ, না ম'রে তার উপায় নেই। কর্ম্মধারা চলতে থাকবে লোকধারায়, একটা প্রদীপের আলো দিয়েই চিরকালের আলো জ্বলবে না—শিখার পরে শিখার আগমন হবে নতুন নতুন প্রদীপের মুখে। একথা মনে করা অহঙ্কার, কেন-না সেটা ঘোরতর মিথ্যে, যে, পৃথিবীতে আলো জ্বালিয়ে রাখবার ভার আমারই পরে। এ জন্মে এ যুগে কিছু লিখেচি কিছু কাজ করেচি সেটা খ্যাতির যোগ্য ব'লে গ্রাহ্য হয়েচে কিন্তু মনে নিশ্চিত জানি, যে-সীমার মধ্যে সেটা ভাল সেই সীমার মধ্যেই তাকে থামতে হবে যদি আপন মূল্য সে বজায় রাখতে চায়। আগামী যুগ নতুন ধারায় নতুন পদ্ধতিতে আপন প্রকাশের সন্ধান করবে। না যদি করে, যদি পুনরাবৃত্তির চক্রপথে সে ঘুরতে থাকে তাহ'লে সেটাতে তার পুরুষকার নষ্ট হয়। তুমি জানো হাল আমলের অনেক লেখক আমার সম্বন্ধে অসহিষ্ণু হয়েচেন। সেটাকে আমি মনে করি সজীব চিত্তের বিদ্রোহ। যতক্ষণ পর্য্যন্ত তাঁরা নবযুগের বিশিষ্টতাকে নিজের কীর্ত্তিতে যথার্থই প্রতিষ্ঠিত করতে না পারবেন ততক্ষণ পর্য্যন্ত তাঁরা আমাকে খর্ব্ব করবার প্রাণপণ চেষ্টা করবেন আমি জানি—কিন্তু এর কোনো প্রয়োজনই হবে না—আমার প্রাপ্যকে অতি সহজেই স্বীকার করতে পারবেন

যাঁরা নিজের দাবীকে নিঃসংশয়ে দাঁড় করাতে পারবেন মহাকালের সামনে। আমার এ-কথার অর্থ হচ্চে এই যে, থামতে যদি জানি তবেই জীবনের রচনাটা সুষমা লাভ করতে পারে। সকল আর্টেরই প্রধান অঙ্গ ঠিক জায়গায় থামা। সেদিন একটা গল্প শুনলুম, একদিন কোনো ওস্তাদী গানের বৈঠকে শরৎকে নিয়ে যাবার জন্যে তাঁর বন্ধুরা টানাটানি করেছিল। তিনি ছিলেন নারাজ। বন্ধুরা তাঁকে জানালেন এরা ভাল গাইতে পারে—তিনি বললেন গাইতে পারে সে তো জানি, কিন্তু থামতে পারে কি? কথাটা পাকা। ঐ প্রশ্ন আমার প্রতিও তিনি প্রয়োগ করতে পারেন। আমি দোহাই দিয়ে তাঁকে বলতে পারি—থামবার জন্যে আমার সমস্ত মনপ্রাণ উৎসুক—কিন্তু পূর্ব্ব-কর্ম্মফলের ঝোঁকে কর্ম্মের দাবী থামতে চাচ্চে না। অসম্মত হ'তে মন ক্লিষ্ট হয়, সম্মত হ'তে তার ক্লেশ আরও অনেক বেশী। তাই বার-বার মনে করচি জীবনের শেষ নিন্দা এবার কুড়োব, লোকে আমাকে বলবে আমি কর্ত্তব্যে উদাসীন—কর্ত্তব্য বন্ধ ক'রে দেবার দুঃসাহস দেখিয়ে তার পরে যথাসময়ে বিদায় নেব।

তুমি আমাকে জিজ্ঞাসা করবে তার পরে। হয়ত ভাবচ আমার একটা আধ্যাত্মিক প্রোগ্রাম আছে। সে কথা বলতে পারিনে, কেন-না ওটা কোমর বেঁধে বলবার কথা নয়। দিনের আলো যখন নিববে তখন রাতের তারা হয়ত উঠবে জ্বলে, ইলেকট্রিক আলো জ্বালিয়ে দিনকে টানাটানি করতে থাকলেই সেই নক্ষত্রলোক চাপা পড়ে। অতএব যেটা সচেষ্টভাবে সঙ্কল্প করতে পারি সেটা হচ্চে এই, কৃত্রিম আলোর ইন্‌জেক্‌শন দিয়ে মেয়াদ উত্তীর্ণ দিনকে অস্বাভাবিকভাবে ধড়ফড়িয়ে রাখব না—তাহলেই সন্ধ্যাবেলাকার মর্য্যাদা আপনি রক্ষিত হবে। আমি একান্তমনে ভালবেসেছি বিশ্বপৃথিবীকে, মনে করি ছুটি পেলেই ভাল ক'রে জানালাটা খুলে একবার সমস্ত মন দিয়ে তার দিকে চেয়ে দেখি। সমস্ত মন ব'লে ওঠে—আনন্দরূপমমৃতং যদ্বিভাতি। আরও একটা সখ আছে—দেশবিদেশের মানুষ ছবিতে লেখাতে নানা মূর্ত্তিতে নানা রসে আপনার নিত্য স্বরূপ প্রকাশ করেচে, অন্য সমস্ত দায়িত্ব ত্যাগ ক'রে তারই পরিচয় ভাল ক'রে নেব। আমার কোনো আত্মীয় তাঁর নানা বিষয়ের অনেকগুলি বই হঠাৎ আমাকে পাঠিয়ে দিয়েচেন। তারা আমার দ্বারের কাছে অপেক্ষা ক'রে আছে যেতে আসতে তাদের দিকে চোখ পড়ে আর মন বলে কর্ত্তব্যের শান্তিপর্ব্বে যুদ্ধবিগ্রহ রেখে অস্ত্রশস্ত্র ফেলে দিয়ে এদেরই রস উৎসের ধারায় তৃষ্ণা মেটাব। অনেকদিন এই শান্তিময় আনন্দ থেকে বঞ্চিত আছি। এই প্রোগ্রামকে আধ্যাত্মিক সংজ্ঞা দেবে কি-না জানিনে, কিন্তু আপাতত আমার পক্ষে এই যথেষ্ট। এই চিঠিতে আমার নিজের কথা ব'লে তোমার কথার উত্তর দিলুম, এতেই বোধ হয় কথাটা পরিষ্কার হবে। আমরা প্রাচ্যভূখণ্ডের লোক, কাজের দিনের অবসানে কর্ত্তব্যের প্রতি বৈরাগ্য স্বীকার করতে কিছুমাত্র সঙ্কোচ বোধ ক'রো না। ইতি ২১ আগষ্ট, ১৯৩৩।

তোমাদের

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

শ্রীকেদারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়কে লিখিত।

পুস্তক পরিচয়

বন্যা—উপন্যাস। শ্রীযুক্তা সীতা দেবী প্রণীত। ডবল ক্রাউন র‍্যান্টিক কাগজে ১৬ পেজী আকারে ছাপা, ৩১২ পৃষ্ঠা। মূল্য আড়াই টাকা। প্রকাশক—গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স।

এই পুস্তকখানি যখন 'ভারতবর্ষ' পত্রিকায় ধারাবাহিক ভাবে প্রকাশিত হইতেছিল তখনই মাসের পর মাস পরম আগ্রহের সহিত পাঠ করিয়াছি। পুস্তক-পরিচয় প্রদান উপলক্ষ্যে আবার আগাগোড়া পড়িলাম। বিবিধ সমস্যার সমাবেশে এমন চিন্তার উদ্রেককারী পুস্তক শীঘ্র পাঠ করিয়াছি বলিয়া মনে পড়ে না। লেখিকার স্বচ্ছ ভাষা, গল্প বলিবার স্বাভাবিক অনাড়ম্বর ভঙ্গী, যথাস্থানে যথোপযুক্ত রসসৃষ্টির ক্ষমতা পুস্তকখানিকে নিরতিশয় সুখপাঠ্য করিয়াছে। সমস্যাগুলি যেখানে ঘনাইয়া উঠিয়াছে, চিন্তাশীল ব্যক্তিমাত্রেই সেই সকল স্থানে পুস্তক বন্ধ করিয়া ভাবনা-সাগরে ডুবিয়া যাইতে বাধ্য হইবেন।

বাল্যবিবাহ ও গৌরীদানের ফল, সমাজে অজ্ঞানের অন্ধকার, নারীর স্বাবলম্বনের আবশ্যকতা বেমিল বিবাহবন্ধন হইতে হিন্দুনারীর মুক্তির অধিকার ইত্যাদি বহুবিধ সমস্যা এই উপন্যাসখানিতে অতি নিপুণতা সহকারে আলোচিত হইয়াছে। হিন্দু সমাজকে এই সকল সমস্যার উত্তর একদিন দিতে হইবেই হইবে এবং *Uncle Tom's Cabin* যেমন দাসত্ব-প্রথা উচ্ছেদের উত্তেজক হইয়াছিল—এই উপন্যাসখানিও তেমনি এই সকল সমস্যা সমাধানের উত্তেজক হইবে সন্দেহ নাই। কলিকাতার দেশী ফিল্ম কোম্পানীগুলির রসবোধ থাকিলে উপন্যাসখানিকে শীঘ্রই টকিতে রূপান্তরিত দেখিব, সেই বিষয়েও সন্দেহ নাই। কিন্তু—। ইহার পরেও আবার কিন্তু থাকিতে পারে? হাঁ, আছে। উপন্যাসখানিতে রসের অভাব নাই,—লেখিকার তরুণী শিক্ষিতা নারীর চরিত্রচিত্রণ পরম উপভোগ্য। কিন্তু সমস্যা-বাহুল্যের জন্যই হউক বা অন্য কোন কারণেই হউক পুস্তক-পাঠান্তে রসপিপাসুর গভীর রসপিপাসা যেন পরিতৃপ্ত হয় না।—মনে হয়, উপন্যাস লেখায় লেখিকা চমৎকার কৃতিত্ব দেখাইয়াছেন, কিন্তু উহা অনুশীলনের ফল যতটা, স্বাভাবিক ভগবদ্দত্ত ক্ষমতার ফল ততটা নহে। এই উপন্যাসখানি ভাবাইতে, আনন্দ দিতে জন্মগ্রহণ করিয়াছে, কিন্তু ইহার আয়ু অল্প।

শ্রীনলিনীকান্ত ভট্টশালী

শ্রীগৌরাঙ্গ—শ্রীপ্রফুল্লকুমার সরকার বিরচিত। ২০-২১ ডি, এল, রায় ষ্ট্রীট হইতে শরচ্চন্দ্র চক্রবর্ত্তী এণ্ড সন্স কর্ত্তৃক প্রকাশিত; মূল্য দেড় টাকা।

শ্রীগৌরাঙ্গদেবের জীবনকথা ইতঃপূর্ব্বে যাঁহারা লিখিয়াছেন, তাঁহাদের মধ্যে একদিকে কবি ভক্তের নিরঙ্কুশ কল্পনা ও অতিপ্রাকৃত বর্ণনা, অন্যদিকে শ্রদ্ধাহীন ও সংশয়াত্মার অবিশ্বাস ও উপেক্ষা। এই দুই শ্রেণীর কেহই জীবনচরিত লিখিবার উপযুক্ত বলিয়া মনে হয় না। পূর্ব্বতন বৈষ্ণবাচার্য্যগণের প্রতি সমুচিত শ্রদ্ধা প্রদর্শনপূর্ব্বকও বলিতে বাধ্য হইতেছি যে, তাঁহারা ভক্তির আতিশয্যে অনেক স্থানে শ্রীগৌরাঙ্গের জীবনে অতিপ্রাকৃত ও অতিরঞ্জিত ঘটনার সমাবেশ করিয়াছেন. আবার অল্পদিন পূর্ব্বে প্রকাশিত একখানি বিপুলকায় গ্রন্থে শ্রীগৌরাঙ্গদেবকে উন্মাদ প্রতিপন্ন করিবারও চেষ্টা হইয়াছিল। এই সমস্ত কারণে শ্রীগৌরাঙ্গদেবের অতুলনীয় জীবনকথা, তাঁহার অনন্যসাধারণ ভক্তির কাহিনী তাঁহার ভারতময় হরিনাম প্রচারের অনুপমেয় ইতিহাস, তাঁহার সর্ব্বজীবে সমভাবে আলিঙ্গনের অবদান বর্ত্তমানের পাশ্চাত্য-শিক্ষিত ব্যক্তিগণের নিকট যথোচিত সমাদর লাভ করে নাই। এই পরম ভক্ত ও পরম উদাসীন জীবনচরিতকারদিগের দ্বারা সম্পূর্ণ প্রভাবিত না হইয়া শ্রীমান্ প্রফুল্লকুমার নানা গ্রন্থ হইতে শ্রীগৌরাঙ্গের জীবনকথা অতি প্রাঞ্জল ভাষায় লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। বলা বাহুল্য, যিনিই শ্রীগৌরাঙ্গের পবিত্র জীবনকথা লিখিবেন তাঁহাকেই শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃত ও শ্রীচৈতন্যভাগবত হইতে অনেক তথ্য সংগ্রহ করিতে হইবে; শ্রীমান্ প্রফুল্লও তাহা করিয়াছেন কিন্তু তিনি ভক্তি-প্রবাহে একেবারে ভাসিয়া যান নাই, তিনি অসঙ্কোচে সত্য-নির্দ্ধারণের চেষ্টা করিয়াছেন এবং ভক্তিভরে তাহা লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। তাঁহার শ্রীগৌরাঙ্গ গ্রন্থের ইহাই বিশেষত্ব। এই সুলিখিত, সুন্দর গ্রন্থখানি যে যথেষ্ট সমাদর লাভ করিবে, সে-সম্বন্ধে আমরা নিঃসন্দেহ।

শ্রীজলধর সেন

যক্ষ্মা-প্রশমন—শ্রীবিধুভূষণ পাল, এল-এম-এস্ প্রণীত। মূল্য ॥০, প্রবাসী প্রেস।

ডাক্তার পাল ঢাকা মেডিকেল স্কুলের শিক্ষক। শিশুমঙ্গল-সমিতির কোনো অধিবেশন উপলক্ষ্যে এই প্রবন্ধ পঠিত হইয়াছিল। যক্ষ্মা কাহাকে বলে, কিরূপে সংক্রামিত ও কি উপায়ে নিবারিত হয়, এই সমুদয় বিষয় আলোচনা করিয়া গ্রন্থকার দেশের হিতসাধন করিয়াছেন। বাংলা দেশে যক্ষ্মার উত্তরোত্তর বৃদ্ধি বিশেষ চিন্তার বিষয়। কলিকাতা কর্পোরেশনের স্বাস্থ্যরক্ষক যক্ষ্মার কারণ অনুসন্ধান করিয়া বলিয়াছেন, স্ত্রীলোকদের মৃত্যু এই রোগে পুরুষদের অপেক্ষা পাঁচ-ছয়গুণ অধিক। ইহার গৌণ কারণ অবরোধ-প্রথা, মুক্তবায়ু ও রৌদ্র সেবনের অভাব, দুগ্ধ প্রভৃতি পুষ্টিকর ও সংক্রামক রোগ নিবারক খাদ্যের অভাব, অল্প বয়সে গর্ভসঞ্চার এবং অল্প সময়ে পুনঃ পুনঃ প্রসব। পূর্ব্বকালে বিশ্বাস ছিল সন্তান উত্তরাধিকারীসূত্রে বিষয়ের ন্যায় এই রোগও পাইয়া থাকে। কিছুদিন পূর্ব্বে বিশেষজ্ঞেরা বলিয়াছিলেন, এই রোগ গর্ভে সঞ্চারিত হয় না; ফুল রোগবীজাণুর শিশুদেহে প্রবেশ অবরোধ করে। আধুনিক গবেষণার ফলে জানা যায়, বসন্ত বীজাণুর ন্যায় যক্ষ্মাবীজাণুও শিশুদেহে সংক্রামিত হইতে পারে, কিন্তু সম্ভাবনা অতি অল্প। যাহা হউক, বিধুবাবুর ন্যায় শিক্ষকেরা এবং স্বাস্থ্যরক্ষকেরা এই বিষয়ে যতই আলোচনা এবং জ্ঞানবিস্তারের চেষ্টা করিবেন ততই দেশের মঙ্গল। দারিদ্র্যই যে রোগের একমাত্র কারণ এই মীমাংসা করিয়া এবং সম্প্রতি দারিদ্র্য নিবারণের সম্ভাবনা নাই দেখিয়া নিশ্চেষ্ট থাকা আলস্য ও অজ্ঞতার পরিচায়ক।

শ্রীসুন্দরীমোহন দাস

ভোরের সানাই—আজিজুল হাকিম। ঢাকা লাইব্রেরী ঢাকা। দাম এক টাকা, পৃঃ ৫২।

সমালোচ্য বইখানিতে পঁচিশটি কবিতা আছে, নবীন কবির পক্ষে ইহার অনেকগুলিই আশাতিরিক্ত সুন্দর। প্রকাশভঙ্গীর দিক দিয়া

ত্রুটি আছে, কিন্তু সরস সত্তের অনুভূতির প্রসাদে অনেকটা সামলাইয়া গিয়াছে। কবিতাগুলি 'খেয়ালী' ও 'মরমী' এই দুই শ্রেণীতে ভাগ হইয়াছে। খেয়ালীর কবিতা অনেকটা গতানুগতিক, তাই শেষোক্ত শ্রেণী বেশী ভাল লাগিল।

মরুসেনা—আজিজুল হাকিম। ঢাকা লাইব্রেরী, ঢাকা। দাম দশ আনা। পৃঃ ২০।

মুসলমান ও হিন্দুর পাঁচটি পৌরাণিক মহচ্চরিত্রের উপর পাঁচটি কবিতা।

ছায়াসীতা—শ্রীশৈলেন্দ্রনাথ ঘোষ। বরেন্দ্র লাইব্রেরী, কোল্‌কাতা ২০৪ কর্ণোওয়ালিস ষ্ট্রীট। দাম এ্যাক্ টাকা আট আনা। পৃঃ ১৩৯।

উপরে প্রকাশক ও মূল্যাদির পরিচয়চ্ছলে যে বানান দেওয়া হইয়াছে উহা লেখকের নিজস্ব, এবং দীর্ঘ ১৩৯ পৃষ্ঠা ধরিয়া এই ধরণের এবং ইহার চেয়েও উৎকটতর বানান চলিয়াছে। কৈফিয়তে অন্যান্য কথার মধ্যে বলা হইয়াছে, লেখকের এক ডাচ বন্ধু একদা 'খেলা' পড়িয়া 'খ্যালা' উচ্চারণ করিতে পারেন নাই, সেই সূত্রেই এই বানান-সংস্কারের কল্পনা। ডাচ বন্ধু থাকা গৌরবের বিষয়, সন্দেহ নাই; কিন্তু একটি শ্বেতচর্ম্মের বোধসৌকর্য্যার্থে গোটা বাংলা দেশের কাঁধে এই বানানের যুগল চাপাইয়া দেওয়া নির্দ্দয়তা;—বিশেষতঃ এই সময়টায় যখন বাংলা হরপের সংখ্যাল্পতার জন্য পণ্ডিতেরা রীতিমত মাথা ঘামাইয়া মরিতেছেন। প্রত্যেক ভাষাতেই কমবেশী বানান ও উচ্চারণের গোঁজামিল চলিয়া থাকে, অপরাধটা একমাত্র বাংলা ভাষারই নহে। অতএব অকস্মাৎ অতিরিক্ত রকম উতলা হইয়া পড়িয়া বাংলা শব্দকে অনাবশ্যক অক্ষরভারাক্রান্ত করিবার হেতু নাই। তা ছাড়া, ভাষার একটা হেস্তনেস্ত করিব এইরূপ সাধুসঙ্কল্প লইয়া গল্প বলিতে গেলে গল্পটাই সর্ব্বাগ্রে মাটি চাপা পড়িয়া যায়—যেমন ঘটিয়াছে আলোচ্য বইখানিতে। বস্তুতঃ 'ছায়াসীতা'র গল্পটি হয়ত জমিতে পারিত, কিন্তু প্রতি পদে বানানের হোঁচট খাইতে খাইতে মন রসের আশা ছাড়িয়া রাশ ছিঁড়িয়া পলায়।

স্মৃতিরেখা — শ্রীচারুধন বন্দ্যোপাধ্যায়। প্রকাশক—শ্রীশরৎ-কুমার হোড়, ১১ ভীম ঘোষ বাই লেন, কলিকাতা। দাম দেড় টাকা। কাপড়ে বাঁধা। পৃঃ ২৪৫।

এই উপন্যাসের গোড়ার দিকে পাত্রপাত্রীগুলি ছড়াইয়া পড়িয়া উপসংহার ভাগে ঠিক ঠিক আসিয়া মিলিল। অর্থাৎ পৃথিবী যে গোল, বইটা তাহাই প্রমাণ করে। লেখক প্রায় কোন চরিত্রেই জীবন সঞ্চার করিতে পারেন নাই, সকলেই লম্বা লম্বা বক্তৃতা করিতে মজবুত। প্রবল বক্তৃতা-তরঙ্গে ডুবিয়া গল্পটি মারা পড়িয়াছে। অনাবশ্যক চরিত্রেরও আমদানী হইয়াছে যেমন একটি সুলতা। এই সব ছাঁটিয়া ফেলিতে পারিলে বইটা মন্দ দাঁড়াইত না। কারণ লেখকের বাংলা লিখিবার হাত আছে, ভাষা বেশ ঝরঝরে।

রেশমী ফাঁস—রহস্যচক্র সিরিজ, মনোরঞ্জন চক্রবর্ত্তী সম্পাদিত। শরচ্চন্দ্র চক্রবর্ত্তী এণ্ড সন্স, ২১ নন্দকুমার চৌধুরী লেন, কলিকাতা। বার আনা।

ডিটেকটিভ উপন্যাস। আখ্যানভাগ সম্ভবতঃ কোন বিলাতী বই হইতে গৃহীত। এই ধরণের বই বাজারে আরও অনেক রকম দেখা যায়, কিন্তু তাহাদের ভাব ও ভাষা এমন উৎকট বিলাতী যে, ইংরেজীতে অনুবাদ না করিয়া সাধারণ পাঠকের বুঝিবার জো নাই। আলোচ্য বইটি কিন্তু সে ধরণের নয়। ঘটনা-পরিস্থিতিতে বিদেশী গন্ধ ধরা যায় না; ভাষা শ্লীল, গল্পটিও কৌতূহলোদ্দীপক।

শ্রীমনোজ বসু

ক্লিনিক্যাল মেটিরিয়া মেডিকা এণ্ড থেরাপিউটিক্‌স্—শ্রীউপেন্দ্রনাথ সরকার প্রণীত। অষ্টম খণ্ড সমাপ্ত। প্রকাশক এন্, এন্, রায় এণ্ড কোং। রেগুলার হোমিও ফার্মেসী, ৮৫-এ ক্লাইভ ষ্ট্রীট, কলিকাতা। ডিমাই ৮ পেজী, পৃঃ ২৪৮। দাম দেড় টাকা।

বইখানির কয়েকখানি পাতা উল্টাইলেই বোঝা যায়, এখানির প্রণয়নে লেখককে গুরুতর শ্রমস্বীকার করিতে হইয়াছে। কারণ কেণ্ট, ফ্যারিংটন, ক্লাৰ্ক, য়্যালেন, ক্লার্ক ইত্যাদি বিখ্যাত লেখকের পুস্তকাবলী হইতে মূলতত্ত্ব সংগ্রহ করিয়া তিনি এই পুস্তকে সন্নিবেশ করিয়াছেন। সেদিক দিয়া দেখিতে গেলে বইখানির তুল্য বই বাংলা ভাষায় নাই বলিলেই চলে। বইখানির ভিতরে কয়েকটি মূল্যবান বিষয় লক্ষ্য করিবার আছে। যথা—প্রথম, ঔষধগুলির তুলনামূলক ব্যাখ্যা। এই তুলনা লেখক অতীব যত্নসহকারে এবং খুঁটিনাটির প্রতি বিশেষ লক্ষ্য রাখিয়া করিয়াছেন। সদৃশ লক্ষণরাজি সমন্বিত বহু ঔষধ বর্ত্তমান থাকাতে এইরূপ তুলনায় বিশেষ উপকার পাওয়া যায়। দ্বিতীয়, প্রত্যেক ঔষধের সর্ব্বপ্রধান ও বিশিষ্ট লক্ষণগুলি স্বতন্ত্রভাবে দেওয়াতে শিক্ষার্থীর অত্যন্ত সুবিধা হইয়াছে। তৃতীয় কয়েকটি রোগ-বিবরণী ও তাহার চিকিৎসা বইটিতে সংযোজনা করায় ইহা সুখপাঠ্য হইয়াছে।

বইখানিতে কিন্তু ঔষধগুলির বিন্যাসে কোনও বিশিষ্ট নিয়ম অবলম্বন করা হয় নাই। সাধারণতঃ ঔষধের প্রথম অক্ষর ধরিয়া বর্ণমালার বিন্যাস অনুসারে ঔষধগুলি পর-পর বর্ণিত হইয়া থাকে। এস্থলে সেরূপ কোনও নিয়মানুবর্ত্তিতা দেখা গেল না। পাঠার্থীর ইহাতে সময়ে সময়ে বিশেষ অসুবিধা হইবার সম্ভাবনা। বইটির স্থানে স্থানে বানান-ভুল পরিলক্ষিত হইল।

সব কয়টি খণ্ড পাঠ করিবার পূর্ব্বে সম্পূর্ণ মতামত প্রকাশ করা সম্ভব নয়। তবে প্রথম খণ্ড হইতেই এই আভাস পাওয়া যায় যে, সম্পূর্ণ পুস্তকখানি হোমিওপ্যাথি ও ছাত্রমণ্ডলীর পক্ষে একটি বিশেষ সাহায্যকারী পুস্তক হইবে।

ডি. এন্. দে

আমার ব্যবসাজীবন—রায়-সাহেব বিনোদবিহারী সাধু।

গ্রন্থকার আলোচ্য গ্রন্থে তাঁহার নিজ ব্যবসাজীবনের অভিজ্ঞতা অকপটে ব্যক্ত করিয়াছেন। এক্ষণে তিনি ধনী হইয়াছেন, সরকার হইতে রায়-সাহেব উপাধি পাইয়াছেন; কিন্তু তিনি নিজে বাল্যে "হাটে ও বাজারের মধ্যে বসিয়া খুচরা এক এক টেমী করিয়া কেরোসিন তৈল বিক্রয়" করিবার কথা বলিতে আদৌ লজ্জিত হন নাই। কি গুণে তিনি ব্যবসায়ে উন্নতিলাভ করিয়াছেন তাহা একটি ঘটনা হইতে বেশ বুঝা যাইবে।

"অনেকে হাটে টেমী ও তেল কেনে—কিন্তু পলিতা অভাবে টেমী হাট হইতে জ্বালিয়া লইয়া বাটী যাইতে পারে না। এই মনে করিয়া পরবর্ত্তী হাট হইতে আমি বাটী হইতে কিছু ন্যাকড়া সংগ্রহ করিয়া তেল বেচিবার সময় তাহা কাছে রাখিয়া দিতাম—খরিদ্দারগণের আবশ্যকমত তাহা বিনামূল্যে খরিদ্দারগণকে দিতাম" এইরূপে "আমার তেল ও টেমী বিক্রয় খুব বাড়িয়া গেল।"

বইখানি পড়িতে আমাদের খুব ভাল লাগিয়াছে; ভাষা সরল; ভাব-প্রকাশে গ্রন্থকারের কৃতিত্ব আছে। সাধারণে এই পুস্তকপাঠে অনেক সাংসারিক খুঁটিনাটির বিষয় জানিতে পারিবেন; চিন্তাশীল পাঠক আমাদের জাতীয় দুর্দ্দশার—ব্যবসা-বাণিজ্যে অপারদর্শিতার হেতু স্পষ্ট দেখিতে পাইবেন।

শ্রীযতীন্দ্রমোহন দত্ত

তত্ত্ববিজ্ঞান (Metaphysics)—সাধু শান্তিনাথ।

"স্বতন্ত্রবিচারবিহীন শ্রদ্ধাজড় হইয়া প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য কোন সিদ্ধান্তই অভ্রান্তরূপে স্বীকার্য্য নহে" (পৃ. ২), গ্রন্থকারের এই উক্তি আমরা সর্ব্বান্তঃকরণে অনুমোদন করি। তিনি যদি তাঁহার এই সিদ্ধান্ত মুক্তহৃদয়ে অনুসরণ করেন তবে তিনি সত্যে উপনীত হইতে পারিবেন। তাঁহার এ গ্রন্থের বিচার এখন স্থগিত রাখিতে হইতেছে এইজন্য যে, তিনি নানা স্থানেই পরে যে গ্রন্থসকল লিখিবেন তার উপর বরাত দিয়াছেন। দ্বিতীয়তঃ, বই বাংলায়ই বটে, কিন্তু বিচারে এত বেশী সংস্কৃত পারিভাষিক শব্দ যে সাধারণ বাঙালী পাঠকের উহা সহজে বোধগম্য হইবে না।

শ্রীধীরেন্দ্রনাথ বেদান্তবাগীশ

কথা-গুচ্ছ—শ্রীসুধীরচন্দ্র সরকার সম্পাদিত। শ্রীপ্রমথ চৌধুরী লিখিত ভূমিকা সম্বলিত। কলিকাতা, ১৫ কলেজ স্কোয়ার, এম-সি সরকার এণ্ড সন্স লিমিটেড কর্তৃক প্রকাশিত। মূল্য তিন টাকা, সিল্ক বাঁধাই চারি টাকা।

বিলাতে কয়েক বৎসর ধরিয়া ছোট গল্পের নানা ধরণের চয়ন প্রকাশিত হইতেছে। এই রেওয়াজ এ দেশেও আসিয়া পড়িবে উহা প্রায় ধরাই ছিল। কিন্তু উহাকে সর্ব্বপ্রথমে কার্য্যে পরিণত করিবার কৃতিত্ব দেখাইয়াছেন এম-সি সরকার এণ্ড সন্স। ইঁহাদের প্রকাশিত এই সুদৃশ্য বইখানি বাংলা সাহিত্যানুরাগীর বহুদিনের একটি আকাঙ্ক্ষা পূরণ করিবে।

বাংলা সাহিত্যের পাঠক-পাঠিকাদের বিরুদ্ধে ছোট গল্পের লেখক ও প্রকাশকদের একটি গুরুতর অভিযোগ আছে। সে অভিযোগ এই যে, তাঁহারা ছোট গল্প অতি আগ্রহের সহিত পড়িলেও ছোট গল্পের বই কেনেন না। সেজন্য প্রকাশকেরা ছোট গল্পের সমষ্টি গ্রন্থাকারে ছাপাইয়া লেখকদিগকে উৎসাহিত করিতে পারেন না। 'কথা-গুচ্ছ' ছোট গল্পের বইয়ের এই অনাদর দূর করিবে বলিয়া আশা করা যায়, কারণ ইহাতে গল্পের বইয়ের একটি প্রধান দোষ অবর্ত্তমান। একই লেখকের অনেকগুলি গল্পের সমষ্টিতে সাধারণতঃ একটু বৈচিত্র্যের অভাব থাকে। এ পুস্তকটি বহু লেখকের রচনা হইতে সঙ্কলিত বলিয়া উহাতে এই দোষ থাকিবার নয়।

'কথা-গুচ্ছ' রবীন্দ্রনাথ হইতে আরম্ভ করিয়া অপেক্ষাকৃত স্বল্পকালপরিচিত লেখক পর্য্যন্ত তেত্রিশ জন গল্পলেখকের ছত্রিশটি গল্পের সমষ্টি। ইঁহাদের মধ্যে একমাত্র প্রভাতকুমার, রবীন্দ্রনাথ, ও শরৎচন্দ্রের দুইটি করিয়া গল্প আছে, অপর সকলেরই একটি করিয়া। চয়ন-রীতি সম্বন্ধে সম্পাদক স্বীকার করিতেছেন যে, কোনো নির্ব্বাচনই সকল-শ্রেণীর পাঠক-পাঠিকাকে সন্তুষ্ট করিতে পারে না। ইহা খুবই সত্য; সুতরাং কোন প্রিয় গল্প না পাইলেই সঙ্কলয়িতার সহিত ঝগড়া না করিয়া নির্দ্দিষ্ট আয়তনের মধ্যে কতগুলি ভাল জিনিষ পাওয়া গেল তাহা দেখাই সকলের কর্ত্তব্য। 'কথা-গুচ্ছ' যে-সকল লেখকের যে-সব গল্প গৃহীত হইয়াছে তাহা ছাড়া উৎকৃষ্ট রচনা তাঁহাদের আরও অনেক আছে। কিন্তু সেই সঙ্গে ইহাও স্বীকার করা উচিত যে, যেগুলি গৃহীত হইয়াছে তাহার সবগুলিই বাংলা গল্পের উৎকৃষ্ট নিদর্শন। যে-কোন সঙ্কলনের পক্ষে ইহাই গৌরবের বিষয়।

বইখানির দাম তিন টাকা। ছাপা, পৃষ্ঠাসংখ্যা ও বাঁধাইয়ের কথা বিবেচনা করিয়া দেখিলে এই দাম কিছুই নয়। কিন্তু আমাদের দেশের ধরণ একটু বিচিত্র বলিয়া প্রকাশক মহাশয়কে এ-প্রসঙ্গে একটি গল্প বলা প্রয়োজন মনে করিতেছি। গল্পটি অক্ষরে অক্ষরে সত্য। বর্ত্তমান সমালোচকেরই এক বন্ধু একখণ্ড 'কথা-গুচ্ছ' লইয়া 'বাসে' আসিতেছিলেন, এমন সময়ে একটি সুবেশ ভদ্রলোক বইটি দেখিতে চাহিলেন। বইটি তাঁহাকে দেওয়া হইল। তিনি উল্টাইয়া পাল্টাইয়া দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "দাম কত?" উত্তর হইল, "তিন টাকা।" আবার প্রশ্ন হইল, "ক'টি গল্প আছে?" "ছত্রিশটি।" শেষ জবাব হইল, "গল্প-প্রতি চার আনা? না, মশায়।"

শ্রীনীরদচন্দ্র চৌধুরী

ভ্রম-সংশোধন

গত শ্রাবণ মাসের 'প্রবাসী'তে শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র সেন মহাশয়ের 'চেকে সহি' নামে একটি প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছে। "অনেক পাঠক" প্রবন্ধের একটি অংশের প্রতি লেখকের দৃষ্টি আকর্ষণ করায় যোগেশবাবু নিম্নলিখিত শুদ্ধিপত্রটি আমাদিগকে পাঠাইয়াছেন:— পৃ. ৬১৫। "কিন্তু not negotiable লেখা থাকিলে হস্তান্তর করা যায় না" স্থলে এইরূপ পড়িতে হইবে:—"কিন্তু not negotiable লেখা থাকিলে হস্তান্তর করায় ব্যাঘাত ঘটে।"

গত ভাদ্র মাসের 'প্রবাসী'র ৭০৯ পৃষ্ঠার প্রথম পাটিতে 'পরলোকে কৃষ্ণবিহারী বসু' স্থলে 'পরলোকে কুঞ্জবিহারী বসু' এবং ছবির নীচে 'কৃষ্ণবিহারী বসু' স্থলে 'কুঞ্জবিহারী বসু' পড়িতে হইবে।

শ্রমের মর্য্যাদা ও বাঙালীর অন্নসমস্যায় পরাজয়—ঝাড়ুদারী ও ভাবী উন্নতির সোপান

শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র রায়

বিখ্যাত ধনকুবের ও দানবীর এণ্ড্রু কার্ণেগীর কথা আমি অনেকবার সাময়িক পত্রে বিবৃত করিয়াছি। তিনি বাল্যকালে দারিদ্র্যের সহিত সংগ্রাম করেন এবং নিজের চেষ্টায় পৃথিবীর মধ্যে একজন সর্ব্বশ্রেষ্ঠ লৌহকারখানার মালিক হন। তাঁহার জীবন-সংগ্রামের ইতিহাস পড়িলে কৌতূহলাবিষ্ট হইতে হয়। কোনও রকমে অনেক চেষ্টার পর তিনি একটি এঞ্জিন্ চালাইবার ভারপ্রাপ্ত হন। তাঁহাকে যে কেবল 'ফায়ারম্যান'-এর কাজ করিতে হইত তাহা নয়—নেকড়া ও তৈল দিয়া পিতলের অংশগুলি পরিষ্কারও করিতে হইত। বলা বাহুল্য, তিনি সমস্ত দিন অক্লান্ত পরিশ্রমের পর যখন বাড়ি ফিরিয়া আসিতেন তখন চেহারা ভূতের মত কালো। সাবান দিয়া পরিষ্কৃত হইলেও খাইবার সময়ে পিতল-মিশ্রিত তেলের গন্ধে তাঁহার বমি আসিত। প্রথম সপ্তাহে যখন মাত্র তিন চার টাকা মজুরী পাইলেন তখন তাঁহার আনন্দের সীমা রহিল না। তিনি আত্মচরিতে বলিতেছেন, "আমি ভাবী জীবনে তাহার পর বহু কোটী টাকা রোজগার করিয়াছি, কিন্তু যেদিন আমার পিতার হাতে প্রথম সপ্তাহের রোজগার-স্বরূপ উপরিলিখিত পারিশ্রমিক অর্পণ করিতে পারিলাম সেই দিন স্বতঃই আমার মনে হইল যে এখন আর আমার দরিদ্র মা-বাপের উপর আমি নির্ভরশীল নই। আমার ভরণপোষণের ভার এখন আমি নিজেই গ্রহণ করিতে সক্ষম।" ইহাই প্রকৃত পুরুষকারের লক্ষণ। এখানে এইটুকু বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে, শ্রমজীবীদিগের পাঠাগার ও বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চাঙ্গের শিক্ষার জন্য কার্ণেগী প্রায় দেড় শত কোটী টাকা দান করিয়া যান। তাঁহার রচিত একখানি গ্রন্থ আমার নিকট রহিয়াছে, তাহার নাম *The Empire of Business* অর্থাৎ "ব্যবসায়ের সাম্রাজ্য"। তাহার প্রথম পৃষ্ঠার প্রথম কয়েক ছত্র উদ্ধৃত করিলাম :—

"It is well that young men should begin at the beginning and occupy the most subordinate positions. Many of the leading business men of Pittsburg had a serious responsibility thrust upon them at the very threshold of their career. They were introduced to the broom, and spent the first hours of their business lives sweeping out the office."

"নিম্নতম অবস্থা বা চাকরি হইতে জীবন-সংগ্রাম আরম্ভ করা সাধারণ যুবকদিগের পক্ষে মঙ্গলপ্রদ। পিট্‌স্‌বার্গের অনেক প্রধান ব্যবসায়ী লোককে তাহাদের জীবনযাত্রার প্রাক্কালেই গুরুতর দায়িত্বের বোঝা বহন করিতে হইয়াছিল। তাহাদিগকে ঝাড়ুদারের কাজ করিতে হইয়াছিল এবং ব্যবসায়ী জীবনের দৈনিক প্রথম কয়েক ঘণ্টা আপিস-ঘর সম্মার্জ্জনী দ্বারা পরিষ্কার করিতে হইত।"

আর একজন ক্ষণজন্মা পুরুষের নাম করিতেছি। ইনি নিগ্রোজাতির কর্ম্মবীর বিখ্যাত বুকার টি ওয়াশিংটন। আমেরিকায় নিয়ম আছে, যদি কোন ছাত্র গ্রীষ্মকালে যখন বিদ্যালয় বন্ধ থাকে তখন সম্মার্জ্জনী হস্তে সমস্ত ঘর-দুয়ার পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করে, তাহা হইলে মজুরী-স্বরূপ অবকাশের পর বিনা-বেতনে সেখানে পড়িতে পায়। দারিদ্র্য-নিপীড়িত বুকারের বিদ্যাশিক্ষার জন্য প্রবল আকাঙ্ক্ষা ছিল। কিন্তু তিনি কপর্দ্দকশূন্য। একদিন তিনি হ্যাম্পটনের বিদ্যা-মন্দিরে সেখানকার কর্ত্তৃপক্ষের নিকট আসিয়া হাজির হইলেন। প্রধান শিক্ষয়িত্রী তাঁহাকে কিরূপভাবে গ্রহণ করিলেন সে-সম্বন্ধে তাঁহার আত্মচরিতের বঙ্গানুবাদ "নিগ্রোজাতির কর্ম্মবীর" হইতে কিয়দংশ উদ্ধৃত করা হইল,—

"প্রধান শিক্ষয়িত্রী আমার বেশভূষা ইত্যাদি দেখিয়া তাঁহাদের যোগ্য ছাত্র বিবেচনা করিলেন বলিয়া বোধ হইল না। বোধ হয় বুঝিয়াছিলেন—এ একটা সং, ছেলেখেলা করিতে আসিয়াছে। অবশ্য একেবারে তাড়াইয়াও দিলেন না। আমি তাঁহার আশপাশে ঘুরিতে লাগিলাম। নানাভাবে আমার যোগ্যতা, বুদ্ধিমত্তা এবং শিখিবার আকাঙ্ক্ষার পরিচয় দিতে চেষ্টা করিলাম। ইতিমধ্যে কত নূতন নূতন ছাত্র আসিয়া ভর্ত্তি হইল। আমার মনে হইতে লাগিল—

আমাকে ভর্ত্তি করিলে ইহাদের কাহারও অপেক্ষা আমি নিন্দনীয় ফল দেখাইব না।

"কয়েক ঘণ্টা পরে শিক্ষয়িত্রী আমার উপর সদয় হইলেন। তিনি বলিলেন, 'ওখানে ঝাঁটা আছে, ওটা লইয়া পার্শ্বের ঘর পরিষ্কার কর ত।'

"আমি বুঝিলাম, ইহাই আমার পরীক্ষা। রাফ্‌নার-পত্নীর গৃহে আমি যে শিক্ষা পাইয়াছি এইবার তাহার যাচাই হইতেছে। ভাল কথা, আমি মহানন্দে ঘর পরিষ্কার করিতে গেলাম।

"ঘরটা একবার দুইবার তিনবার ঝাড়িলাম। একটা ন্যাকড়ার ঝাড়ন ছিল, তাহা হইতে ধূলিরাশি বাহির করিয়া ফেলিলাম। দেওয়ালে আশপাশে অলি-গলিতে যেখানে যেটুকু ময়লা জমিয়াছিল সমস্তই পরিষ্কার করিলাম। বেঞ্চ, টেবিল, চেয়ার, ডেস্ক ইত্যাদি কাঠের সমস্ত আস্‌বাবই ঝাড়িয়া চক্‌চকে করিয়া রাখিলাম। শিক্ষয়িত্রীকে জানাইলাম ঝাড়া হইয়াছে। তিনিও 'ইয়াঙ্কি' (American) রমণী। তিনি খুঁটিনাটি সর্ব্বত্রই তন্নতন্ন করিয়া দেখিলেন। টেবিলের উপর আঙুল দিয়া বুঝিলেন ময়লা কিছুই নাই। নিজের রুমাল বাহির করিয়া পরীক্ষা করিলেন—চেয়ারের কোণ হইতেও কিছু বাহির হয় কি-না। পরে আমার দিকে তাকাইয়া বলিলেন, 'দেখিতেছি, ছোক্‌রা বেশ কাজের।' আমি 'পাস' হইলাম।"

* * *

"হ্যাম্পটনের প্রধান শিক্ষয়িত্রী, আমার পরীক্ষাকর্ত্রীর নাম ছিল কুমারী মেরী এক্‌ ম্যাকি। আমাকে নিজের খরচ নিজেই চালাইতে হইবে শুনিয়া তিনি আমাকে বিদ্যালয়ের একটি খান্‌সামার কাজ করিতে দিলেন। আমাকে ঘরগুলি দেখিতে শুনিতে হইত। খুব সকালে উঠিয়া বাড়ির আগুন জ্বালিয়া দিতে হইত। উনুন ধরাইয়া দিতে হইত। খাটুনী যথেষ্ট ছিল, কিন্তু ইহাতে আমার ভরণপোষণের প্রায় সমস্ত খরচই পাইতাম।

"হ্যাম্পটন বিদ্যালয়ের বহির্দৃশ্য পূর্ব্বে বর্ণনা করিয়াছি। এক্ষণে ভিতরকার কথা কিছু বলি। মিস্ ম্যাকি আমার জননীর ন্যায় স্নেহশীলা ছিলেন। তাঁহার সাহায্যে ও উৎসাহে আমি সেখানে অনেক উপকার পাইয়াছি। তাঁহাকে আমার জীবনের অন্যতম গঠনকর্ত্রী বিবেচনা করিয়া থাকি।"*

ইংলণ্ডের নৃপতি দ্বিতীয় চার্লসের সময়ে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর প্রধান কর্ত্তা জোশিয়া চাইল্ড প্রথমে ঝাড়ুদার হইয়া একটি সওদাগরের হৌসে প্রবেশ লাভ করেন এবং ক্রমশঃ নিজের প্রতিভাবলে পর পর উন্নতি লাভ করিয়া প্রভূত ধনোপার্জ্জন করেন, ইহা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। দরকার হইলে ঐ প্রকার আরও অনেক উদাহরণ দেওয়া যাইতে পারে। আজকাল জার্ম্মান দেশের হর্ত্তাকর্ত্তা বিধাতা য়্যাডল্‌ফ্‌ হিট্‌লার সম্বন্ধে দুই-এক কথা বলি। তাহার এক জীবনচরিতে পড়িতেছি যে, বাল্যকালেই পিতৃহীন হইয়া তিনি মিউনিক নগরে অন্নচিন্তায় ঘুরিতে লাগিলেন। অনেক কষ্টে একটি কাজ জুটিল।

"He became a builder's labourer. His function was to cart the rubbish away. He had to get up before the sun. When the whistle signalled noon he dropped the wheel-barrow, drank his bott'e of milk and ate his black bread."—

"তিনি একটি রাজমিস্ত্রির নিকট মজুরের চাকরি পাইলেন। তাঁহার কাজ ছিল ঠেলাগাড়ী করিয়া দূরে রাবিশ ফেলিয়া দেওয়া। তাঁহাকে সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্বে উঠিতে হইত। যখন বাঁশীর ধ্বনি জানাইয়া দিত যে দুপুর হইয়াছে তিনি তাঁহার মালচালান হাতগাড়ী ছাড়িয়া আসিয়া বোতল হইতে দুধ পান করিতেন এবং তাঁহার রুটি খাইতেন।"

কিন্তু পূর্ব্ব প্রবন্ধে র‍্যামজে ম্যাকডোনাল্ড, মুসোলিনী, ষ্টালিন প্রভৃতির বিবরণে যেমন উল্লেখ করিয়াছি, তেমনি ইনিও অবসর-মত পুস্তককীট ছিলেন। "Reading history was Adolf's great passion—he was a voracious reader of popular histories, when he was barely thirteen."

—ইতিহাস পাঠে য়্যাডল্‌ফের ভীষণ আসক্তি ছিল। মাত্র তের বছর বয়সের সময় হইতেই তিনি সাধারণের বোধগম্য ইতিহাসের বইগুলি অতি আগ্রহের সহিত পাঠ করিতেন।

আর একজন ঝাড়ুদারের কথা বলি। লর্ড রেডিং যখন প্রথমবার কলিকাতায় পদার্পণ করেন তখন তিনি 'ক্যাবিন বয়' হইয়া আসেন। 'ক্যাবিন বয়' মানে এই যে তাঁহাকে আরোহিগণের ভৃত্য হইয়া জাহাজের কেবিন্ (বৈঠকঘর), সেলুন্ প্রভৃতি ঝাড়পোঁছ এবং আরোহিগণের জুতা বুরুশ পর্য্যন্ত করিতে হইত। বলা বাহুল্য, লর্ড রেডিং যখন দ্বিতীয়বার কলিকাতায় আসেন তখন রাজপ্রতিনিধি হইয়া।

* অধ্যাপক বিনয়কুমার সরকার কর্ত্তৃক বঙ্গানুবাদ।

এখন আমাদের শ্রীমানদের কথা বলিতেছি। তাঁহারা কলেজে, এমন কি স্কুলের উচ্চশ্রেণীতে পড়িলেই ঝাড়ু হাতে করা কিংবা হাটবাজার করা মর্য্যাদার হানিকর বলিয়া মনে করেন। কলেজের কোন যুবককে যদি বাজার হইতে হাতে তরিতরকারীপূর্ণ চুবড়ী ও খাড়াইতে মাছ আনিতে বলা হয়—অবশ্য সঙ্গে চাকর না থাকিলে—তাহা হইলে তিনি বিভ্রাটে পড়েন। পাড়াগাঁয়েও দেখা যায়, সাবেক কালের গৃহস্থগণ নিজেরাই হাট-বাজার করেন—কারণ ক'জনের বাড়িতে চাকর আছে? কিন্তু স্কুলের উচ্চশ্রেণীর শ্রীমানেরা তাঁহাদের বাপ খুড়ার ন্যায় ঐ সকল কাজ করিতে নারাজ (আর কলেজের ছাত্রের ত কথাই নাই)। আজকাল পাড়াগাঁয়ে শতকরা ৯৫ জন লোকের দুধ জোটা ভার। অবশ্য ইহার একটা কারণ এই যে, গোচারণের মাঠ নাই। বিশেষতঃ পূর্ব্ববঙ্গে পাট আবাদের কল্যাণে সমস্ত পড়ো জমি বিলি হইয়া গিয়াছে। কিন্তু এই যে দুধের দুর্ভিক্ষ ইহার অপর একটি কারণ আছে। যাঁহারা সাবেক কালের লোক, বিশেষতঃ বৃদ্ধ মহিলা, তাঁহারা গো-সেবা হিন্দুধর্ম্মের একটি অঙ্গ বলিয়া গণ্য করিতেন এবং নিয়মিত গোয়াল পরিষ্কার করা দৈনন্দিন কাজের অঙ্গ মনে করিতেন। বিশ-পঁচিশ বৎসর পূর্ব্বে আমার নিজের অভিজ্ঞতার কথা বলিতেছি। আমার জ্ঞাতিসম্পর্কে একজন ঠাকুরমা—যিনি তাঁহার বাস্তুভিটায় একমাত্র বাসিন্দা—প্রায়ই আমাকে সর-সহ এক বাটি দুধ আনিয়া উপহার দিতেন। আমাদের নিজ পৈত্রিক বাটিতে অন্যূন পনের বিঘা ডাঙা ফাঁকা জমি আছে। কিন্তু আমার ভ্রাতুষ্পুত্রগণ প্রায়ই দুগ্ধ পান করিতে পাইতেন না, নেহাৎ কোলের শিশুদের জন্য যাহা দরকার তাহাই কিনিয়া সংগ্রহ করা হইত। কিন্তু এই বৃদ্ধা ঠাকুরমা দুধ সরবরাহ করিতে পারিতেন, তাহার কারণ এই যে তিনি দিনের মধ্যে তাঁহার লম্বা দড়িসংলগ্ন গাভীটি খোঁটা সরাইয়া নানা স্থানে বাঁধিয়া গাভীটি চরাইতেন। এতদ্ভিন্ন যত ভাতের ফেন, তরকারীর খোসা এবং ঢেঁকিশালে ধান ভানা হইলে পরিত্যক্ত চাউলের কুঁড়া—এ সমস্ত তিনি যত্নসহকারে গাভীটিকে খাওয়াইতেন। আমার আত্মচরিতে আমার মাতা-ঠাকুরাণী কি প্রকারে গো-সেবা করিতেন তাহার বিবরণ দিয়াছি। এখনও প্রাচীনারা এই প্রকার গো-সেবা করেন। কিন্তু যদি ঠাকুরমা বা দিদিমা' পীড়িতা হইয়া পড়িলেন তবে আর রক্ষা নাই। যদি বাড়ির ছেলেকে বলিলেন, "বাবা, আমি ত দেখিতেছ শয্যাশায়ী। গাইগরুর বড় দুর্দ্দশা। তুমি একটু গোয়ালের দিকে নজর দিবে।" বলা বাহুল্য, শ্রীমান্ তাহা হইলে বোধ হয় বড়ই সঙ্কটাপন্ন ও কষ্টসাধ্য অবস্থার মধ্যে পড়িয়া যান। গোমূত্রাদিতে হাত দেওয়া তাঁহাদের নিকট অপমানজনক।

কলেজ-অফ-সায়েন্সে আমার সঙ্গে নিয়তই আট-দশ জন পোষ্ট-গ্রাজুয়েট ছাত্র অবস্থিতি করেন। চৌতালায় যে প্রকাণ্ড চিলের ঘর আছে, সেখানে হু হু করিয়া দক্ষিণে হাওয়া প্রবাহিত হয়। ঘরটি এমন প্রশস্ত যে পাশাপাশি তিনখানি তক্তপোষ পড়ে। এইখানে পাঁচ-ছয় জন অবস্থান করেন এবং সিঁড়ির নীচে অপর অপর স্থানে দুই-তিন জন থাকেন। ইঁহারা মৌলিক গবেষণায় প্রবৃত্ত; কেহ কেহ বা 'ডক্টর-অফ-সায়ান্স'-এর প্রয়াসী।' একদিন ইঁহাদের মধ্যে এক জনকে এনণ্ড কার্ণেগীর উপরিলিখিত বিবরণটি পড়াইয়া শুনাইলাম, এবং তাঁহাকে পরীক্ষা করিবার জন্য বলিলাম, "বাপু হে, আমার নিজের ঘরটি তুমি এই প্রকার ঝাড়ু দিয়া পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখিবে।" শ্রীমান্ দেখিলাম মুখ কাঁচুমাচু। কিন্তু অনুরোধ এড়াইতে না পারিয়া প্রথম দিন কোনও রকমে একটু ঝাঁটা বুলাইলেন। দ্বিতীয় দিন আরও অনিচ্ছার সহিত নিয়ম রক্ষা করিলেন। তৃতীয় দিনও দেখিলাম যে ময়লা বাহির না করিয়া কোথাও বা আলমারীর নীচে, কোথাও বা তক্তপোষের পায়ার ফাঁকে জমায়েৎ করিয়া রাখিয়াছেন। আমি বেগতিক দেখিয়া বলিলাম, 'বাপু, আর দরকার নাই, এখন হইতে আমি অন্য ব্যবস্থা করিতেছি।" শ্রীমানেরা যে চৌতালায় থাকেন সে তক্তপোষগুলির নীচে এক পরদা ধূলা সর্ব্বদাই জমায়েৎ থাকে এবং খবরের কাগজগুলি সিঁড়ি ও ছাদের উপর চারিদিকে বাতাসের সঙ্গে ঘুরিয়া বেড়ায়। শুধু তাই নয়, খাবার খাইয়া শালপাতাগুলি ছাদে ফেলিয়া দেওয়া হয়। অথচ তক্তপোষের এক হাত তফাতে আলিসা আছে—তাহার বাহিরে ফেলা ভয়ানক আয়াসসাধ্য।—ঐটুকু ঘটিয়া উঠে না। আমি প্রত্যহ অতি প্রত্যূষে এই বিশাল ছাদে আধঘণ্টাকাল বেড়াই। তখন আমার প্রধান

কাজ হইতেছে ঐ কাগজ ও পাতাগুলি অপসারিত করা, কারণ ঐগুলি নর্দ্দমার মুখ আটকায় এবং বৃষ্টির পর জলনিকাশের পথ বন্ধ করে।

আমি ইদানীং 'প্রবাসী' ভিন্ন অনেকগুলি সাময়িক পত্রিকায় বাঙালীর অলসতা ও শ্রমবিমুখতা বিষয়ে অনেক প্রবন্ধ ছড়াইতেছি এবং গত কুড়ি-পচিশ বৎসর যাবৎ ছড়াইয়া আসিয়াছি। কিন্তু এক এক সময়ে মনে হয় যেন অরণ্যে রোদন করিতেছি।

অন্নসমস্যায় যে বাঙালী অবাঙালীর সহিত প্রতিযোগিতায় দিন-দিন হটিয়া যাইতেছে ইহার প্রধান কারণ অলসতা ও শ্রমবিমুখতা বাঙালীর যেন অস্থিমজ্জাগত। আমি প্রায়ই বলিয়া থাকি, অর্থনীতিক হিসাবে বাঙালী যে মাড়োয়ারীর দ্বারা পরাজিত হইয়াছে তাহার প্রধান কারণ এই অলসতা ও দীর্ঘসূত্রিতা। এখনও শত শত মাড়োয়ারী প্রতি বৎসর লোটাকম্বল সম্বল করিয়া এবং দিনান্তে প্রকৃতপক্ষেই ছাতু খাইয়া সামান্য রকমে ব্যবসা সুরু করে এবং ক্রমান্বয়ে পাঁচ-সাত-দশ বছর পরে নিজে দোকানদার, এমন কি গদিয়ানী হইয়া ব্যবসা ফাঁদিয়া বসে।

সাধক দ্বিজেন্দ্রনাথ

শ্রীসুধীরচন্দ্র কর

ঐ দূরে দেখা যায় ধূসর প্রান্তর
বন্ধুর বিরলতৃণ উদার গম্ভীর,
ওরই বুকে রাজে তব শ্মশানবাসর
ছত্র নাই, পত্র নাই, ওঠেনি মন্দির।
দিনের প্রথম ডালি নব রৌদ্র বানে
রবিকর হ'তে ঝরে বেদীচারিধারে,
বিহগ-বিহগীদল বৈতালিক তানে
ঊর্দ্ধ দিয়া নন্দি যায় স্মরিয়া তোমারে।
বায়ু বহে ধীরে স্বল্প তৃণ দুলাইয়া
অলক্ষ্য সে নিসর্গের চামর ব্যজন,
পুষ্প নাই, আছে রক্তকঙ্করের হিয়া
লালিমায় লেপিয়াছে চাতালে চন্দন।

ধূপ ধূনো কোথা, শুধু শুষ্ক ধূলাবালি,
গোষ্ঠধেনু-কণ্ঠে বাজে ঘণ্টা কোলাহল,
দিগ্‌বালা স্বর্ণথালে সাজায়ে বৈকালী
আরতি করিয়া যায় দিনান্তে কেবল।
নাহি আসে সাধু সন্ত, নাহি মিলে মেলা
আজও কেহ করে না এ তীর্থপর্য্যটন,
শুধু হেরি ভোর হ'তে অপরাহ্ণ বেলা
রাখালেরা আশপাশে করে গোচারণ।
তুমি চ'লে গেছ তব রয়েছে আভাস
হে তপস্বী জ্ঞানবৃদ্ধ চিরশিশু প্রাণ,
তারে ঘিরে আছে শান্ত দীপ্ত নীলাকাশ,—
দেহে নাই আছ মনে অমৃত সন্তান॥

পাণ্ডুয়া

শ্রীসত্যকৃষ্ণ রায়-চৌধুরী

সাড়ে তিনটার সময় গাড়ী এসে থামল আদিনা ষ্টেশনে। উত্তরবঙ্গের ছোটখাট ষ্টেশনের পর্য্যায়ভুক্ত এ ষ্টেশনটি, পাণ্ডুয়ায় যেতে হ'লে এখানে নামতে হয়। দুই জন প্রাণী এ জায়গায় নিযুক্ত আছে দেখলাম। একজন আপ এণ্ড ডাউন সিগনাল করে; আর একজন ঘটাং ঘটাং ক'রে দু-চারখানা টিকেট দিয়েই এসে দরজা আগলায়। মোট সাতজন পাণ্ডুয়া যাত্রী এখানে নামলাম। আমরা তিনজন; বাকী স্ত্রী-পুরুষ নিয়ে চারজন সুদূর লক্ষ্ণৌ থেকে আসছে তীর্থ করতে। যাত্রীদের নিয়ে যাবার জন্যে মাত্র একখানি গরুর গাড়ী বর্ত্তমান, গাড়ীখানি তাদেরকেই ছেড়ে দেওয়া হ'ল।

আমাদের সঙ্গে জিনিষপত্র নেহাৎ কম ছিল না। কিছু জিনিষ চাকরটার মাথায় তুলে দিয়ে বাকীগুলো আমরা দুজনে পিঠে বেঁধে নিলাম। গাড়োয়ানকে জিজ্ঞেস ক'রে জানলাম মাইল-সাতেক পথ যেতে হবে হেঁটে; সামনে একটা বড় রাস্তা পাব, সেটার বাঁ-দিকের রাস্তা ধ'রে সোজা যেতে হবে। শুনে মনটা দমে গেল, কেন-না পূবের রবি তখন

একলাখী মসজিদ

পশ্চিমের গায়ে ঢলে পড়েছে। সন্ধ্যের পূর্ব্বে নির্দ্দিষ্ট জায়গায় পৌছান যাবে না। অথচ এই জায়গাতেই সাহেব-সুবোরা আসেন সখের শিকার করতে। ভারী মুস্কিলে পড়লাম। মনে জোর এনে এগিয়ে চল্‌লাম তিন জনেই। সোজা প্রশস্ত পথ, দুধারের শস্যক্ষেত্র নানা জাতীয় শস্যে পূর্ণ। কিছু পেকেছে, কিছু পাকি পাকি অবস্থায়। সবুজে-সবুজ মাঠটার এক ঘেয়ে ভাব ভেঙে দিচ্ছে মাঝে মাঝে হাল্কা রঙে দু-চারটা আঁকাবাঁকা টান। বনফুলের গন্ধ নিয়ে ঠাণ্ডা বাতাস বয়ে চলেছে। থেকে থেকে বিরণী ঝাড়ের ফাঁকে ফাঁকে কাশফুলগুলো নুয়ে পড়ছে। বাঁশ ঝোপের মাথার উপর চাঁদ ত উঠল ব'লে, রাস্তার দু-ধারে নুয়ে পড়-জায়গাটায় কল্‌মী ফুলগুলো যে এখনও ফুটল না। বেউড়বাঁশ বেতস্‌লতা কল্কেফুল ঝুম্‌কোলতা আরও অনেকে নিজেকে অপরের অঙ্গে জড়িয়ে নিয়ে অপরের সঙ্গে নিজের, নিজের সঙ্গে
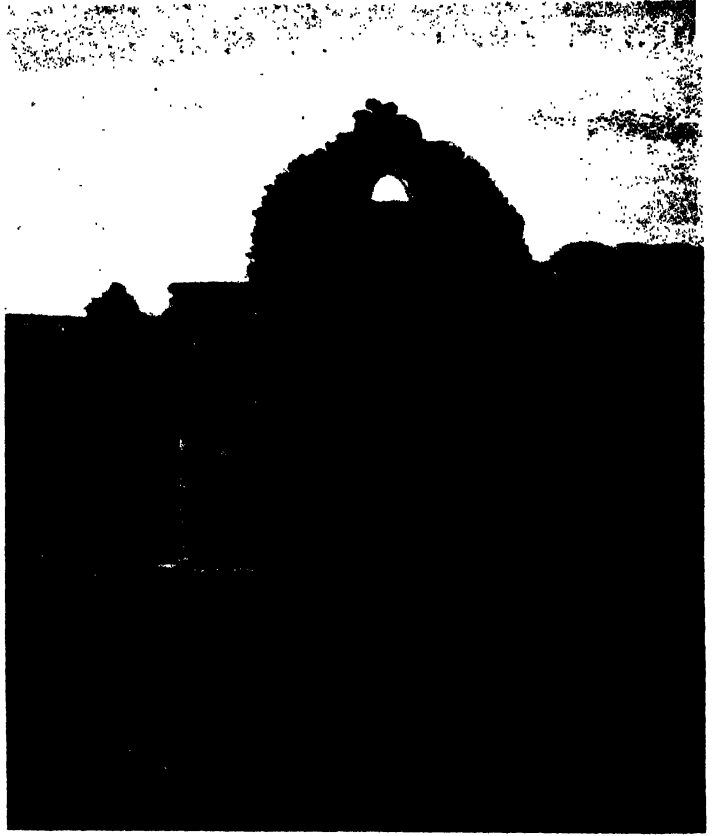
আদিনা মসজিদের পশ্চিম দেওয়ালের মাঝের অংশ

পীর সাহেবের মসজিদ

অপরের পরিচয় করিয়ে নিচ্ছে। এদিকে আমাদের যে আর কারু সঙ্গে পরিচয় হচ্ছে না, এই যা মুস্কিল। ভয়ের সঙ্গে পরিচয়টা যে মাত্রা ছাড়িয়ে যেতে বসেছে। কারু মুখ দিয়ে কথাটি নেই, চলেছি ত চলেইছি। শুকনো পাতার উপর মর্‌ মর্‌ শব্দ হলেই গা'টা কাঁটা দিয়ে ওঠে, বুকের ভেতর টিপ টিপ্‌ করতে থাকে।

একটু পরেই দেখা গেল চারজন লোক মশাল হাতে ক'রে এদিকেই আসছে। কাছে আসতেই জিজ্ঞেস করলাম, 'মেলা কতদূর হবে বাপু?'

তারা বললে, "মেলা কালকেই ভেঙে গেছে।'

মহা মুস্কিলে পড়লাম, কেন-না জানা ছিল মুসলমানদের উৎসব উপলক্ষে এইখানে অনেক লোকের সমাগম হয়। সেই জন্য ছোটখাট মেলাও হয়। উৎসব ফুরোলে মেলাও ভেঙে

ধায়, লোকজনও সব চলে যায়। জনবিরল জায়গা গভীর, গভীর হ'য়ে ওঠে। যারা বাসিন্দা তারা বাস করে বাঁশবনের

আদিনা মস্‌জিদের বৃহৎ খিলান

ভেসে আসা গুম-গুমানি শব্দটা ক্রমশই নিজের দিকে টান মারছে।

আলো! আলোর আলো! মুহূর্তে আঁধার ভেদ ক'রে শত দীপ ভেসে উঠল। যাত্রীরা জমা হয়েছে গাছের তলে, ঝোপের আড়ালে, মাঠে ও ঘাটে। ফকিরেরা থেকে থেকে দিচ্ছে হুঙ্কার, 'আল্লা হো আকবর।' মোল্লা মৌলবীরা অনবরত খাচ্ছে পান, আলোচনা করছে পীরপয়গম্বরের। মুস্কিল আসানের দীপদানিটা পয়সার ভারে ভারী হয়ে উঠেছে। ভিড় লেগেছে সিধে দেওয়ার জায়গাটায়। সে যাকে পায় টান্ মেরে পিছনে দেয় ফেলে। একটা হৈ হৈ, রৈ রৈ ব্যাপার। সব গোলমালকে ছাপিয়ে মস্‌জিদের ঘণ্টা বেজে উঠলো—ঢং ঢং ঢং। সবাই ত্রস্তব্যস্ত হয়ে পড়ল। যে-যার বোঁচকা বাক্স খুলে রঙীন পোষাক পরতে সুরু করলে। চোগা-চাপকান্ লাগালে। মেয়েরা শাড়ী-ওড়নায় নিজেদের দেহ ঢাকলে।

দ্বিতীয় ঘণ্টায় রাতের প্রথম প্রহরে, রজব চাঁদে বাইশে উরুষ উৎসব (কুতুব সাহেবের পিতার শ্রাদ্ধোৎসব) আরম্ভ হবে। আর বেশী দেরি নেই। দলে দলে লোক মস্‌জিদের দিকে চলতে সুরু করেছে। জমিদার-তালুকদার, আমীর-ফকির, মোল্লা-মৌলবী। সবাই মসজিদের সামনের জায়গায় দাঁড়িয়ে দ্বিতীয় ঘণ্টার জন্য অপেক্ষা করছে। ভূতে-ধরা ছেলেমেয়েদের ভূত ছাড়াবার জন্তে ভূতুড়ে ঘরটার ভেতর

ভেতরেই। খুঁজে পেতে সময় লাগে। তাদের জিজ্ঞেস করলাম, 'এখন উপায় ?'

বললে উপায় আছে। বাইশ হাজারীর কাজ শেষ হয়ে গেছে বটে; অনেক লোক চলেও গেছে। বাকী যারা আছে ছয় হাজারীতে উরুষ উৎসব সেরে দু দিন পরেই চলে যাবে। "সেটা আবার কতদূরে ?"

"কাছেই, পোয়াটাক মাইল হবে।"

আবার চলতে সুরু করলাম। আঁধারে আঁধার জমাট বেঁধেছে দুপাশে। তবু পথ পরিষ্কার চেনা যাচ্ছে দূর হতে

কতকগুলি কষ্টিপাথরের থাম

কষ্টিপাথরের থামের উপরে খোদাই করা ঘণ্টা

নীচে সিল্কের কাপড়ে ঢাকা পীরদের কবর; এদের চারি পাশ একবার ঘুরে চলে গেল পাকঘরে সবাই।

আজ কোন ভোজের নেই। সবাই পূর্ণ ভাণ্ডে কাঠি দেবে। সবার স্পর্শে পবিত্র হয়ে উঠবে পীরের সম্মান। সারারাত ব্যাপী সিন্নি পাক হবে। কাল সকাল থেকেই সকলে পীরের প্রসাদ লাভ করবে। যে জায়গাটিতে এই

সোনা মসজিদ

সব ক্রিয়া কর্ম্ম হচ্ছে সে জায়গাটি বহু প্রাচীন। ছোট ছোট ইটে তৈরি অনেকটা জায়গা প্রাচীরে ঘেরা। এরই ভেতর উত্তর-পশ্চিম কোণে মস্‌জিদ। তারই পাশে পীর, পীরের পুত্রকন্যার ও আত্মীয়স্বজনদের কবর। সামনে পুকুর, পুকুরের চার পাড় হিন্দুদের দেবদেবীর মূর্ত্তি ও ফুল খোদাই-করা কাল পাথরে বাঁধান। কোন ভগ্ন প্রাসাদ হ'তে এনেছে এই পাথরগুলি। এই পুকুরের জল সবাই খায়, আবার এতেই সবাই নায়।... আর না রাত হ'ল অনেক। তবু এরা ছাড়তে চায় না। যে-যার মন্তব্য প্রকাশ ক'রেই চলেছে। এখন শুনতে চাই না, তবু শোনায়। ছাড়াতে চাই, তবু ছাড়ে না। হিন্দুদের এত বড় রাজ্যটা কি ক'রে মুসলমানদের হাতে এল তার সাক্ষী নাকি পাশের লোকটা; আর যে হাতে তুলে দিলে সে ত বিশ্বাসঘাতক গোয়ালাটা, আর সেই সাতাস-ঘরার ইতিহাসে জড়িত জীবৎকুণ্ডটা। আর যে-সব গুজব

দিয়ে তাদের বার-বার ঘুরিয়ে আনছে। আবার ঢং ঢং ঢং। প্রধান ব্যক্তিরা মঙ্গলঘট মাথায় চাপালে। ঘটের মুখ নূতন কাপড়ের টুকরো দিয়ে দিলে ঢেকে। চলেছে সবাই পুণ্য-সলিলে। কেউ দোলাচ্ছে চামর, কেউ বা ছড়ায় আতর। ঝাণ্ডার আশে-পাশে জলছে দীপ। ধূপদানী হ'তে উঠছে ধূপের ধোঁয়া। আনলে ভরে ঘটে ঘটে তীর্থবারি। চাঁদোয়ার
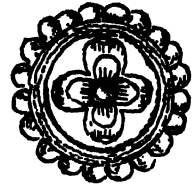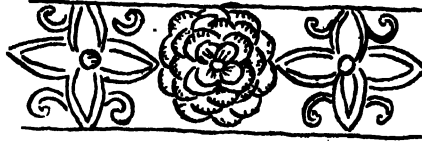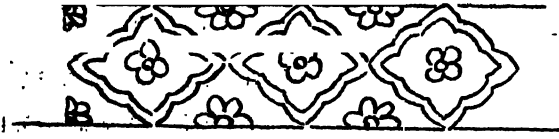
পাথরের উপরের কারুকার্য্যের নমুনা

সে-সব ভুয়ো, আসলে খাঁটি সত্য হ'ল নাকি এইটে। এই ব'লে টেনে নিয়ে এল আমাদেরই বাসায়।

পরদিন সকাল। আবার চলার পথে পাড়ি জমালাম। আবার সেই দু-ধারে জঙ্গল। চলেছি আদিনা মস্‌জিদ দেখতে। শিশির-ভেজা দূর্ব্বাগুলো টলটল করছে। ঘোমটা-পরা ছোট ইটে তৈরি দেয়ালগুলো উঁকি মারছে। কোথাও বা ছাদ পড়ে যাওয়ার কাল পাথরের থামগুলো দু-একটা সরু লতাকে জড়িয়ে নিয়ে কোন রকমে নিজেদের অস্তিত্ব বজায় রেখেছে।

এতক্ষণে বিশ্ববিখ্যাত আদিনা মস্‌জিদের কাছে পৌঁছলাম। দূর হ'তে সমস্ত জায়গাটা তার দিয়ে ঘেরা। দরজার পাশে সাবধানের বাণী নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে বিজ্ঞাপনটা। অনেকটা জায়গার উপর এই মস্‌জিদ। এরই বাম দিকের পাথরের সিঁড়ি বেয়ে উপরে উঠতে যাচ্ছি, দেখি কষ্টিপাথরের দরজার ঠিক মাঝখানটায় মাথার উপর তাকের ভেতর খোদাই-করা একটি গণেশ-মূর্ত্তি। আবার একটুখানি এগিয়ে ভেতরে ঢুকবার দরজার কাছে এসেছি, সেখানেও দেখি হিন্দুদের দেবদেবীর মূর্ত্তি ও নানা রকম লতাপাতা, ফুল খোদাই-করা কারুশিল্প। অনেকগুলো ছোট ছোট সুন্দর মূর্ত্তি কঠিন বস্তুর আঘাতে খেয়ে নষ্ট হ'য়ে গেছে। মসজিদের ভেতর একটি পাথরের এই মঞ্চ, এই মঞ্চখানি কতকগুলো বড় বড় পাথরের থামকে আশ্রয় ক'রে আছে। আবার এই থামগুলোকে আশ্রয় ক'রেই হয়েছে বড় বড় গম্বুজ। এরই পশ্চিম দেয়ালে অনেকগুলি পাথরের খিলান। নানা রকম ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ডিজাইনে ভর্ত্তি।

সিঁড়ি বেয়ে নামলেম সামনের খোলা মাঠটায়।

থামের অংশ ও কারুকার্য্য
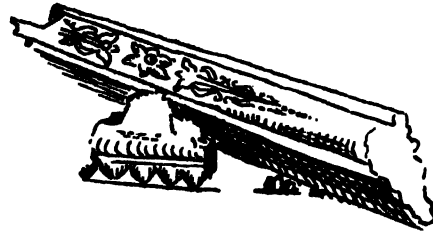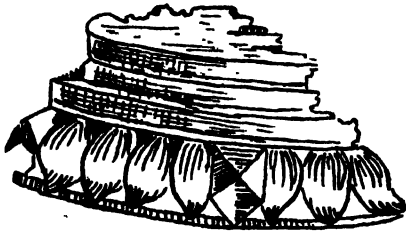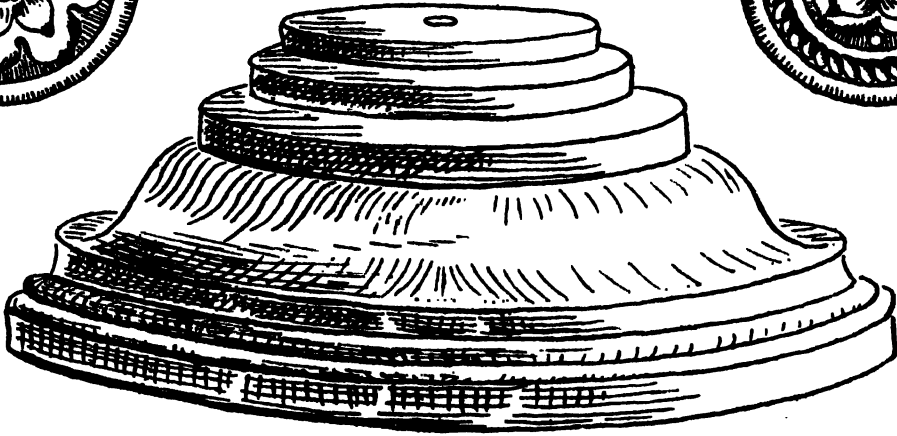
এ মাঠটা উনিশ-কুড়ি বিঘা আন্দাজ হ'বে। এরই চারিপাশে ছিল ৩৬০টা গম্বুজ। অধিকাংশই লোপ পেয়েছে। পশ্চিম ধারের ঠিক মাঝখানকার গম্বুজটা ছিল দেখবার মত, কিন্তু মাথাটা গিয়েছে এর পড়ে। অবশিষ্ট দেয়ালটা যা বর্ত্তমানে আছে তা হাত পঁয়ত্রিশেক উঁচু হবে। এরই ডানদিকের উত্তর-পশ্চিম কোণে আগাগোড়া অলঙ্কারে ঢাকা কষ্টিপাথরের মহামূল্য সিংহাসন। মাঝখানটায় কারুকার্য্যখচিত কষ্টি-পাথরের খিলান। মাথার উপরে একটা

জলনিকাশের জন্ত কষ্টিপাথরের হাতীর মুখ ও একটি তামার [illegible]

পাথরের উপর কারুকার্য্য
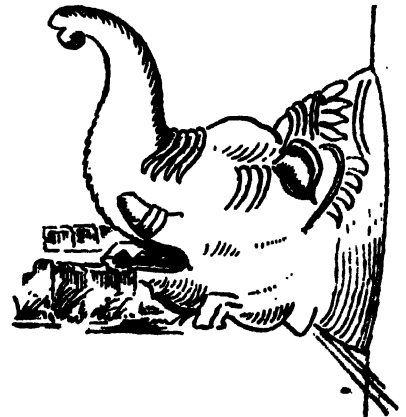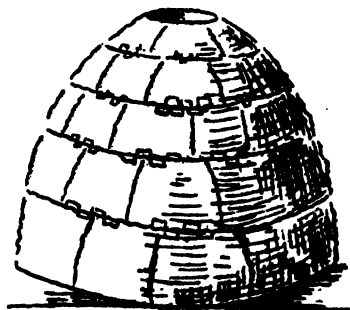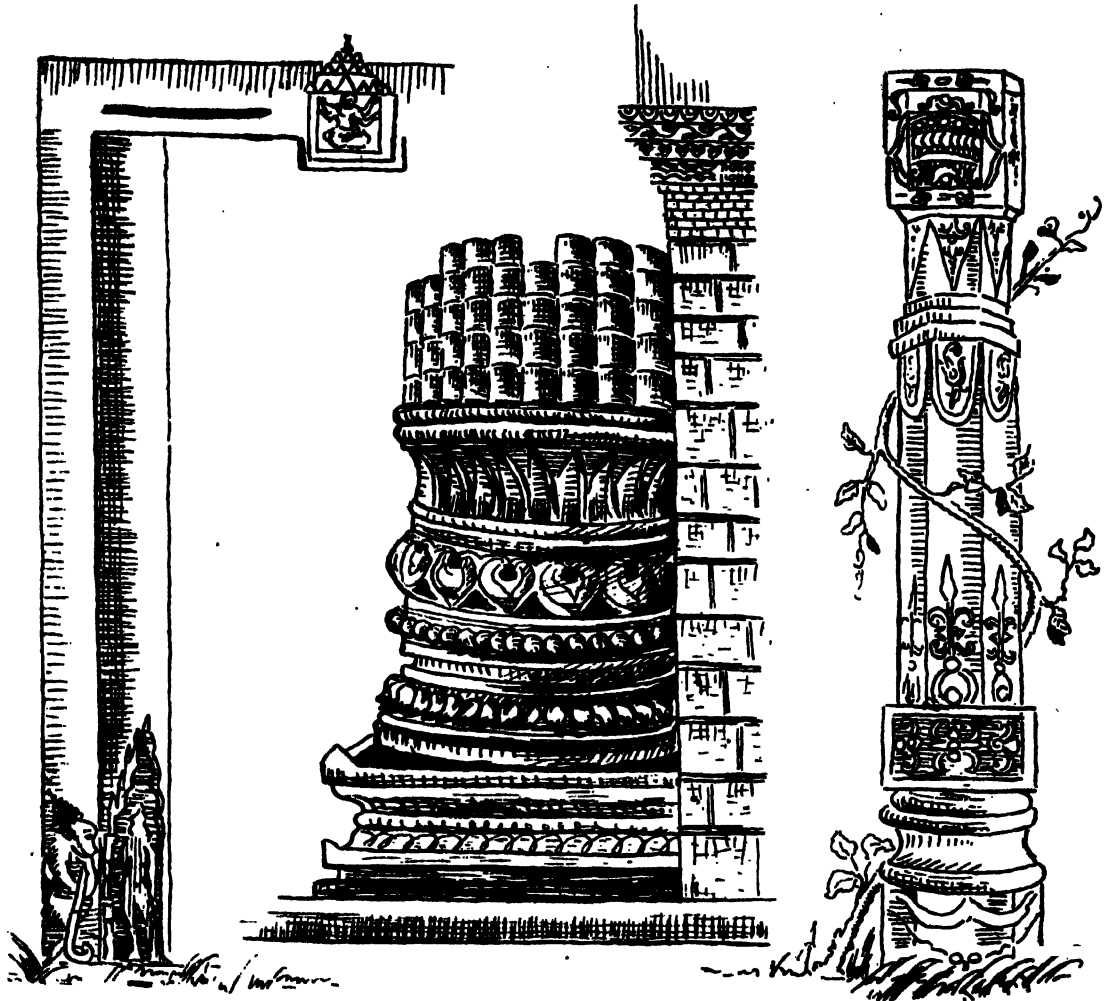
বড় গর্ত্ত। শোনা যায়, এখানটায় ছিল একখানি মূল্যবান মণি। মণি হারিয়ে শূন্য আধার অন্ধকার। পাথরগুলো চক্‌চকে ঝক্‌ঝকে, এইমাত্র শিশির-জলে নেয়ে উঠেছে। লোকজনের চিহ্ন পর্য্যন্ত নেই।

একলক্ষী মস্‌জিদের পেছন দিকেই দেখলেম সোনা মস্‌জিদ। বড় বড় কাল পাথরে আগাগোড়া তৈরি, মেঝে থেকে আরম্ভ ক'রে দেয়ালগুলো পর্য্যন্ত। এটার ভেতরেও আছে অনেকগুলি খিলান ছোট ছোট তাক্‌; আর একটু-খানি ডান ধারে আদিনা মস্‌জিদের মতই একটি সিংহাসন। কারুশিল্প ত আছেই। এর সামনের দিকেই পর পর গোটা-কয়েক দরজা। ডানে-বাঁয়ের দরজাগুলো জালের মত ছেঁদা করা বড় একখানা পাথরে বন্ধ। এ দেশ পাথরের নয়; অথচ সেই মান্ধাতার আমলে এই দামী হাতীপ্রমাণ পাথরগুলো আস্‌ল কি ক'রে ভেবে পাইনে। এখানে কালোয় কালো চক্‌চকে কষ্টিপাথর ছাড়া মার্ব্বেল পাথর নেই।

এই গৌড়-পাণ্ডুয়ায় আছে মিনার, গম্বুজ, সোজা-বাঁকা-শোওয়ান মনোরম সব লাইন, আর নিটোল চাঁছা-মাজা
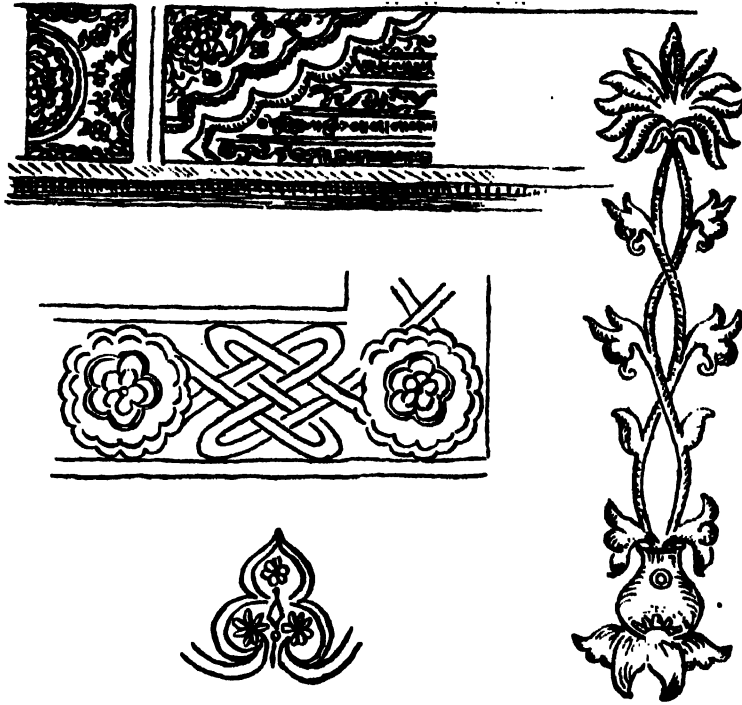
একলক্ষী মসজিদ ও আদিনা মসজিদের কারুকার্য

কার্নিস। আবার মস্‌জিদেরও অভাব নেই। বাইশ হাজারী এষ্টেটের একটা মস্‌জিদ আছে। পীরসাহেব এখানে ধর্ম্মালোচনা করতেন। তাই তাঁর কোরাণ, ঝাণ্ডা, চামর যত্নে বেদীর উপর রাখা হয়েছে। এখানে যাত্রীদের থাকার বেশ বন্দোবস্ত আছে, খাবারটা বাদে। খাবার সঙ্গে না নিয়ে গেলে নাকাল হতে হবে। আদিনা মস্‌জিদের সামনে ডাকবাঙলোয় থাকা চলে কিন্তু খাবার সঙ্গে থাকা চাই। জঙ্গলে, জঙ্গলে বিস্তর পুকুর, শুধু যে এই পনর-বিশ মাইলের ভেতরেই সব সঞ্চিত আছে, তা নয়। ষাট-সত্তর মাইলের ভেতর স্রষ্টার নব নব সৃষ্টি ছড়িয়ে পড়েছে! কাছেই কলিগাঁও ব'লে একটা গ্রাম আছে, সেখানকার মন্দির ও মস্‌জিদ্‌ অতি চমৎকার। মস্‌জিদটা আকারে খুব ছোট হ'লেও ষ্টাইলে করেছে মাৎ। এর আগাগোড়া প্রত্যেকটি লাইন নিজের বৈশিষ্ট্য বজায় রেখে চলেছে। এটা দেখে মনে হয় যেন জ্ঞানগরিমায় ভরপুর আত্মভোলা মাটির মানুষ। এ যেন খাদে-গাওয়া করুণ সুরের সঙ্গীত। চাংলা পড়েছে, গায়ে থেকে ইট খসে পড়েছে, জল শুষে শুষে স্যাঁৎসোতে হয়ে রয়েছে; কোন্‌ দিন বা ধ্বসে পড়বে। এই বহু যুগের বহু পুরাতন সৃষ্টিগুলি মানুষের চোখে নূতন ভাবে ধরা দিতেই আছে।

শৃঙ্খল

শ্রীসুধীরকুমার চৌধুরী

(১৮)

চৈত্র অপরাহ্নের প্রখরতর রৌদ্র, তবু অজয় বালিগঞ্জ অবধি সমস্ত পথ হাঁটিয়াই আসিল। আজও অনাহূত আসিল, এবং অসময়ে আসিতেছে এই সংশয়কে মনে স্থান দিল না। কবে এক নিভৃত সন্ধ্যায় ঐন্দ্রিলাকে স্পর্দ্ধা করিয়া কি বলিয়াছিল, ঐন্দ্রিলা সে কথা ভুলিয়াছে কিন্তু সে নিজে ভোলে নাই। আজ তাহার সেই স্পর্দ্ধিত প্রতিশ্রুতির ঋণ শোধ করিবার পালা। আজ ঐন্দ্রিলাকে সে বলিবে বলিয়া আসিয়াছে, আমি ক্লান্তি মানি নাই, দেশের বহু দুর্ভাগ্যের, অশেষ প্রকার দুর্গতির, একটিমাত্র যে মূলগত রহস্য, তাহা আজ আমার কাছে স্পষ্ট হইয়া গিয়াছে। অন্ধকারের অতলতল হইতে সত্যের সেই মহামণিটিকে তোমারই জন্য আমি উদ্ধার করিয়া আনিয়াছি।

কিন্তু বেহারা আসিয়া সেলাম করিয়া দাঁড়াইলে, ঐন্দ্রিলাকে খবর দিতে বলিতে তাহার বাধিল। প্রথমতঃ বীণা এ গৃহের অধিষ্ঠাত্রী, তদুপরি ঐন্দ্রিলাকে আজ তাহার প্রয়োজন অত্যন্ত গভীর বলিয়াই বাহিরে সে কথাটা প্রকাশ করিয়া বলিতে তাহার ইচ্ছা করিল না। বেহারাকে বড় দিদিমণির সন্ধানে উপরে পাঠাইয়া, একতলার বসিবার ঘরে কম্পিতবক্ষে সে অপেক্ষা করিতে লাগিল। একটু পরে বেহারা আসিয়া খবর দিল, বড়দিদিমণি কি কাজে বাহির হইয়া গিয়াছেন, কখন ফিরিবেন তাহাও কিছু বলিয়া যান নাই। তখনও লোকটাকে ফিরিয়া উপরে পাঠাইতে তাহার ইচ্ছা করিল না। অজয় কে যে তাহার জন্য নিঃসম্পর্কিত একটা মানুষ এত করিয়া খাটিয়া মরিবে? দরজার কাছে দাঁড়াইয়া ইতস্ততঃ করিতেছে, এমন সময় রাহু ছুটিয়া আসিয়া তাহার হাত চাপিয়া ধরিল। কহিল, "চায়ের সময় হয়ে গিয়েছে, চা খেয়ে যাবেন, বসুন। আমি ছোড়দিকে ডেকে আন্‌ছি।" সঙ্গে সঙ্গেই দুম্‌দাম্ শব্দ করিয়া লাফাইতে লাফাইতে সে উপরে চলিয়া গেল।

ঐন্দ্রিলা নামিয়া আসিয়া কহিল, "বসুন। দিদি কখন ফিরবে তার কিছু ঠিক নেই যদিও। মন্দিরা আবার গুছিয়ে অসুখ বাধিয়েছে, এই দু' দিন বাড়ী ছেড়ে একবারও বেরতে পায়নি বেচারা। আজকেই জ্বরটা ছেড়েছে, আমারও কলেজ নেই, ফাঁক পেয়ে তাই একটু বেরিয়েছে।"

অজয় কিছু শুনিল কিনা সে-ই জানে, কহিল, "ও। আর সবাই বেশ ভাল আছেন?"

ঐন্দ্রিলা কহিল, "ভালই ত আছি। আপনি?"

অজয় কহিল, "ভাল।"

তাহার পর কথা আর অগ্রসর হইতে চাহিল না। অজয় ভাল আছে এই কথাটিকে ঐন্দ্রিলা এমন নির্ব্বিবাদে স্বীকার করিয়া লইল বলিয়াই যেন অজয়ের উন্মুখ মন ক্ষোভে আড়ষ্ট হইয়া রহিল। ইহার পর মন্দিরা কাঁদিতেছে বলিয়া হেমবালা যখন সংবাদ পাঠাইলেন, তখন আর দ্বিধামাত্র না করিয়া সে উঠিয়া পড়িল। "চা খেয়ে যান। না, চা খেয়ে যেতে হবে," বলিয়া রাহু অনেক টানাটানি করিল, কিন্তু কিছুতেই অজয়কে ধরিয়া রাখিতে পারিল না।

ওয়েলিংটন স্কোয়ারের বাড়ীর দরজায়ই বিমানের সঙ্গে দেখা। রোল্‌ড্‌ গোল্‌ড্‌ বাঁধান ছড়ি ঘুরাইয়া সে বাহির হইয়া চলিয়াছে। যেন কিছুই ঘটে নাই এমনই ভাবে সে বলিল, "বালিগঞ্জে গিয়েছিলে?" কেবল অলক্ষিতে অজয়ের একটি হাতকে নিজের হাতে লইয়া আস্তে একটু টিপিল।

আর কি বলিবে ভাবিয়া না পাইয়া অজয় কহিল, "বীণাদেবী বাড়ী নেই, অসুস্থ মন্দিরাকে নিয়ে তাঁর বোন ভারি ব্যস্ত, তুমি কি ও-বাড়ীই যাবে এখন?"

বিমান কহিল, "পাগল! এতদিন পরে দেখা, তোমাকে মোটেই আজ ছাড়ছি না।"

"অজয় ফিরিয়া তাহার হাতটিকে একটু টিপিয়া দিল। দুই বন্ধুতে হাঁটিয়াই চলিল। ক্রমে ক্রমে বিমান অজয়কে

ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলিল। নিজে হইতে কিছুই প্রায় তাহাকে বলিতে হইল না। কিন্তু যে কথাটি সব চেয়ে আজ তাহার বেশী বলিবার, বারেবারেই গলার কাছে আসিয়া তাহা বাধিয়া গেল। চারিপাশের পরম নিশ্চিন্ত জীবনযাত্রা, তাহার মধ্যে ঐ একটিমাত্র কথাই কিছুতেই কেমন খাপ খাইতে চাহিল না। মনের মধ্যে অন্ধকারের সঙ্গে অজয়ের দীর্ঘ দিনব্যাপী সংগ্রাম এবং সে সংগ্রামের শেষে তাহার আজিকার এই জয়লাভ, যেন অজয়েরই কাছে অভাবনীয়। পৃথিবীর আর কোথাও হইতে তাহার ঠিক মূল্যটি সে পাইবে না।

কহিল, "সুভদ্রের কথা যে একবারও বলছ না? তার কি খবর?"

বিমান কহিল, "এই ক'দিন কিছু-না-কিছু একটা নিয়ে সে এত অস্থির ছিল, যে সব দিন তার সঙ্গে দেখাও হয়নি আমার।"

অজয় কহিল, "রিহার্সাল চলছে?"

বিমান কহিল, "উঁহু। আমার একটা মোটা মতন পার্ট ছিল, কিন্তু শেষ অবধি আমি করব না বলাতে সব ভেস্তে গিয়েছে।"

অজয় বলিল, "তুমিও পার্ট নিয়েছিলে নাকি? নিয়েছিলে যদি ত করলে না কেন?"

বিমান বলিল, "আমি বলেছিলাম টাকাই যদি নিতে হয় ত তার ভাগ অভিনেতাদের দেওয়া হোক্, অন্তত যারা চাইবে তাদের। এদেশে সবরকম কুকার্য্যের দাম আছে, সে দাম দিতে বা নিতে কেউ লজ্জা পায় না। কিন্তু যত দোষ আর্টের। ছবি-আঁকিয়েরা লিখিয়েরা, গাইয়েরা অভিনেতারা অন্যদের মনোরঞ্জন করবে, কিন্তু নিজেরা দুবেলা পেট ভ'রে খেতেও পাবে না, এ নিয়ম খাটবে না। আমার দলে যে একজনকেও পাইনি, তা বুঝতেই পারছ।"

অজয় কহিল, "সুভদ্র খুব চটেছে তোমার ওপর?"

বিমান কহিল, "ও কি কখনও কারো ওপর চটে? চটতে হলে দরদ থাকা চাই। সেই জিনিবটির ওর মধ্যে অতি মারাত্মক অভাব।"

একটুক্ষণ চুপ করিয়া কাটিলে পর অজয় কহিল, "তারপর অভিনয় ক'রে কিছু রোজগার করতে ত পেলে না, ছবি-টবি বিক্রী হচ্ছে? কি ক'রে চলছে তোমার?"

বিমান কহিল, "আমার দিন যেমন ক'রে চলে। আমার ভাণ্ডার আছে ভরে, তোমা-সবাকার ঘরে ঘরে। কিন্তু সে বিদ্যা তোমার ত আয়ত্ত নেই, তোমার দিন কি ক'রে চলছে?"

অজয় একটু ইতস্ততঃ করিয়া বলিল, "বই বেচে।"

বিমান কহিল, "দোকান করেছ?"

অজয় হাসিয়া কহিল, "হ্যাঁ, দোকান করবারই মত অবস্থা বটে।"

বিমান কহিল, "তবে কি ফেরি?"

অজয় কহিল, "তা ফেরি বলতে পার, তবে তুমি যা ভাবছ, তা নয়। কলেজের টেক্স্টগুলো বইয়ের দোকানে বিক্রী করে ক'রে চালাচ্ছি!"

বিমান অকস্মাৎ অনেকখানি উৎসাহ প্রকাশ করিয়া প্রায় চেঁচাইয়া উঠিল, কহিল, "পুরনো বই বেচে সত্যি এতদিন চালান যায়? আশ্চর্য্য, কথাটা আগে কখনও ভাবিনি। বাড়ীতে আমার কতগুলো পুরনো বই প'ড়ে আছে এখনও যেন," কিন্তু পরক্ষণেই একেবারে বিমর্ষ গম্ভীর হইয়া গেল। কহিল, "ঢের হাঁটা হয়েছে, এবারে চল একটা বাসে কিম্বা ট্রামে উঠি। ট্রামগুলোই ভাল এ পাড়ার, কপালজোর থাকে ত সুন্দরী শ্বেতাঙ্গিনী দু-একটির দেখা পাওয়া যেতেও পারে।"

অজয় কহিল, "সেইটেই কি আসল দরকার না, সত্যি সত্যি কোথাও যাওয়ার মতলব আছে?"

বিমান কহিল, "আসল দরকার কোনটা জানি না, তবে তোমার বৌবাজারের বাড়ীটাতে একবার যেতে চাই সেটা ঠিক।"

অজয় কহিল, "কি হবে সেখানে গিয়ে?"

বিমান কহিল, "কেবল বইগুলোই বেচেছ, না আর যা-কিছু ছিল সবই ঐ ক'রে গেছে দে'খে আসব।"

অজয় কহিল, "না, এতদূর এখনো নামিনি।"

বিমান কহিল, "নামনি, নামবে শীগ্‌গিরই। সময় থাকতে থাকতে সেগুলোকে উদ্ধার ক'রে আনা যাক্, তারপর তুমিও এস। নয়ত গতিক যা দেখছি, কোনদিন নিজেকে শুদ্ধ বেচে দিয়ে ব'সে থাকবে।"

অজয় বলিল, "সেটা করতে পারলে মন্দ হত না, অন্ততঃ

আস্থাটা সেই রকমই প্রায় দাঁড়িয়েছে। তোমার নিমন্ত্রণটা অবশ্য গ্রহণ করছি না, বৌবাজারের খালি বাড়ীটাতেই ফিরে যেতে হবে আমাকে। কিন্তু তোমাকে বল্‌তে বাধা নেই, কালকের দিনটাও যে কি ক'রে আমার চল্‌বে, তা আমি জানি না।"

বিমান কহিল, "নিজে সাধ ক'রে যদি দুঃখ ডেকে আন, অন্যে আর কি করতে পারে?"

অজয় কহিল, "এতদিন তাই করেছিলাম, কিন্তু আজ তোমাকে সত্যিই বল্‌ছি, দুঃখে আমার অরুচি ধ'রে গিয়েছে। আসলে ওটা রুচি-অরুচির ব্যাপারই মোটে নয়, দুঃখ পাওয়াটাই মানুষের পাপ।" অজয়ের গলা কাঁপিয়া গেল, কহিল, "আমি কি যে অনুভব করছি, কথা দিয়ে তা বোঝাতে পারছি না। একটা কোথাও চল, স্থির হয়ে একটু বস্‌বে। আমি যা বল্‌তে চাই, তা ভাল করে তোমাকে বুঝিয়ে বল্‌ব।"

বিমান কহিল, "তুমি কি বল্‌তে চাও, তা তোমার মুখ দেখেই আমি বুঝতে পারছি। আজ সারাদিন খেয়েছ কিছু?"

অজয় কহিল, "খেয়েছি, কিন্তু কথাটা ত' নয়।"

বিমান কহিল, "কথাটা যাই হোক, সে পরে শোনা যাবে, আপাততঃ আমি তোমায় বলে রাখছি তুমি একটি আস্ত গাধা।"

অজয় কহিল, "কেন গাধামীটা কি দেখলে?"

বিমান কহিল, "সেই কবে থেকে তোমার দুশোটা টাকা পড়ে আছে আমার কাছে, গিয়ে যে দিয়ে আস্‌ব তার শুদ্ধ উপায় রেখে যাওনি।"

অজয় কহিল, "আমার দুশো টাকা? বাবা পাঠিয়েছেন?"

বিমান কহিল, "মোটেই তোমার বাবা পাঠাননি, তাহলে সে টাকা আমি সর্ব্বাগ্রে তোমার বাবাকে ফিরে পাঠাতাম, আমাকে ত তুমি জানই। কুড়িটা টাকা আমাকে ধার দিয়েছিলে মনে নেই? সেইটেই সুদে বেড়ে এতখানি হয়েছে।"

অজয় কহিল, "কি যে আবোল তাবোল বকছ, কুড়ি টাকা দুমাসের সুদে বেড়ে দুশো হয়?"

বিমান কহিল, "দু মাসেরও দরকার হয়নি, তোমার টাকায় রেস্ খেলতে গিয়ে একদিন দাঁও মেরে ফিরেছি। অর্দ্ধেকটা নিজের পাওনা ব'লে নিয়েছি, তোমার ভাগটা সেই থেকে আমার কাছে প'ড়ে আছে।" মনে মনে কহিল, আমার সত্যিই বুদ্ধি আছে, টাকাটা মাকে ফিরে দিতে গেলে মহা গোলযোগের সৃষ্টি হত। অজয়কে কোনো রকম ক'রে গছিয়ে, তারপর তার কাছ থেকে ধার নিলেই হবে। ভাগ্যিস্ ও এসে পড়্‌ল। আজ ভোরেই ভাব্‌ছিলাম, ঢের ত সংযম অভ্যাস করা হয়েছে, এবার নিজেই নিয়ে খরচ ক'রে দেব।

রেসে জেতা টাকা বলিয়া অজয় প্রচুর আপত্তি করিল, কিন্তু বিমান কিছুতেই শুনিল না। কহিল, "দুঃখে না তোমার অরুচি ধ'রে গিয়েছে? কোনো রকমের রেস্‌ও খেলবে না, আবার পৃথিবীতে সুখীও হবে, এমন অঘটন কখনও ঘটবে আশা কোরো না।"

ওয়েলিংটন স্কোয়ারের বাড়ী হইতে টাকাটা সংগ্রহ করিয়া আসিয়া, দুইজনে আবার গড়ের মাঠের পথ ধরিল। বিমান কহিল, "এতটাই বুদ্ধি যখন তোমার হয়েছে, তখন সুখ বলতে কি বোঝায়, চল আজকের দিনে তা একটু পরখ ক'রে দেখবে।"

অজয় কহিল, "তাই চল। সত্যি, জীবনটাকে একটু উপলব্ধি করতেই চাই। কিরকম যে হয়ে গিয়েছি, নিজের বলতে কেউ কোথাও নেই, কিছু নেই, কেমন ক'রে জানব যে বেঁচে আছি?"

বিমান বলিল, "বেশীদূর জান্‌তে দেবার সাহস আমারও নেই, তবু চল দেখি কতদূর কি করতে পারি।"

ততক্ষণ সন্ধ্যা হইয়া গিয়াছে। বিমানের পরিচিত দীপালোকিত সেই হোটেলে দুই বন্ধুতে ঢুকিয়া পড়িল। বিমান কহিল, "তোমাকেই খাওয়াতে হবে কিন্তু!"

অজয় কহিল, "তুমি খাবে, সে আর কতবড় কথা? কি খেতে চাও বল।"

খানসামা মেনুকার্ড লইয়া আসিলে, অজয় বাছা বাছা খাবারের ফর্দ্দ করিল, শুনিয়া বিমান কহিল, "শুধু শুধু কতকগুলো খাবার খেয়ে কি হবে? বয়, ওয়াইন্ লিষ্ট্‌টা নিয়ে এস ত দেখি।"

অজয় আসন ছাড়িয়া উঠিয়া পড়িল, প্রায় চীৎকার করিয়া কহিল, "না, বিমান না। ঐটি কিছুতেই চলবে না।"

বিমান কহিল, "আঃ, অমন ক'রে চেঁচাচ্ছ কেন? বয়-বাবুর্চিগুলো শুনলে কি ভাববে বল দেখি? তোমারই না হয় চলবেনা, আমার ত চিরকালই চলছে, আজই বা তার ব্যতিক্রম কেন হতে যাবে?"

বয় আসিয়া ওয়াইন্ লিষ্ট্ রাখিয়া দাঁড়াইল। বিমান আঙুল বুলাইয়া লিষ্ট্ দেখিতে লাগিল, বলিল, "ব্র্যাণ্ডি গন্ধের জন্যে খেতে পারবে না, হুইস্কি ভাল লাগবে না, ককটেল্ মেয়েরা খায়, পোর্ট রুগীদের জন্যে ব্যবস্থা। আচ্ছা, তুমি ত কবি? হোয়াইট্ ওয়াইন্ একদিন একটু খেয়ে দেখ।"

অজয় বলিয়া উঠিল, "হোয়াইট্, রেড কিছুই আমি খাব না, তা তুমি বেশ জান। তুমি নিজে কি খাবে, সেইটেই বল না?

অর্ডার দেওয়া হইয়া গেলে, বয় আসিয়া দুজনের সম্মুখে দুইটি খালি ওয়াইন্ গ্লাশ রাখিয়া গেল। অজয় নিজের গেলাশটাকে ঠেলিয়া টেবিলের মাঝখানে সরাইয়া দিয়া বলিল, "এই একটি জিনিষকে সত্যি সত্যি আমি ভয় করি।"

বিমান কহিল, "তা ত করই। দুঃখেই কেবল অরুচি ধরেছে, সুখে রুচি হতে তোমার এখনও ঢের দেরি। সম্প্রতি বয়টা আসছে, ওর সামনে খুব বেশী গোল কোরো না। গেলাশটা তুলে আমার গেলাশের সঙ্গে ঠেকিয়ে, একটু অন্ততঃ মুখের কাছে ধোরো। নইলে এ যা হোটেল, আমাকে শুদ্ধ এর পর কেউ আর সেলাম করবে না।

স্বচ্ছ, শুভ্র দলিত দ্রাক্ষারসে দুইটি পাত্র পূর্ণ করিয়া, বয় জিজ্ঞাসা করিল, "কুছ খানা হুজুর?"

বিমান বলিল, "দাঁড়াও দেখছি।" তারপর মেন্যু কার্ডে মুখ আড়াল করিয়া ইংরেজী ভাষার সহায়তায় অজয়কে ধমকাইয়া কহিল, "ফর্ হেভন্স্ সেক্, এই নিয়ে এখানে একটা সীন্ কোরো না। ঐটুকু ত জিনিষ, পেটে পড়লে তোমার মহাভারত অশুদ্ধ হয়ে যাবে না। ওটুকু খেয়ে ফেল, এরপর না হয় আর খাবে না।"

অতি সন্তর্পণে পাত্রটি উঠাইয়া লইয়া অজয় এক চুমুক পান করিল। বরফ দেওয়া দ্রাক্ষারস সমস্তদিনের ক্লান্তির পর মুখে অতি সুস্বাদু লাগিল। খানসামা খাবারের অর্ডার লইয়া চলিয়া গেলে সন্তর্পণে আর এক চুমুক পান করিল।

বিমান বলিল, "কি রকম লাগ্ছে?"

অজয় বলিল, "খেতে কিছু মন্দ লাগ্ছে না।"

বিমান বলিল, "সে কথা বলছি না। খেয়ে কিছু খারাপ লাগ্ছে? তরল অগ্নি পান করছ ব'লে মনে হচ্ছে?"

অজয় বলিল, "না ত।"

বিমান নিজের পাত্রটি নিঃশেষ করিয়া বলিল, "বাকিটুকু খেয়ে ফেল। এ জিনিষটা নামেই মদ, যে কোনোরকম ফলের রস, পেটে গিয়ে খানিকক্ষণ থাকলে ঐ হয়।"

দ্বিতীয় পাত্রও যখন নিঃশেষ হইবার মুখে তখন অজয় ভাবিতে লাগিল, জিনিষটাতে য়াল্কহল্ জাতীয় নিশ্চয়ই কিছু নাই, দুই পাত্র খাইয়াও সে কোনও পরিবর্তন অনুভব করিতেছে না ত? চিন্তাসূত্র কাটিয়াও যাইতেছে না, চতুর্দিক সম্বন্ধে তাহার উপলব্ধিও সমান সজাগ রহিয়াছে। জিনিষটা তাহার মুখে সত্যই অত্যন্ত সুস্বাদু বোধ হইতেছে, তাহা ছাড়া এতগুলি টাকা খরচ করিয়া কিনিয়া শেষে বিমান সবটা খাইয়া উঠিতে না পারিলে, হয়ত ফেলিয়াই যাইতে হইবে। তৃতীয় পাত্র যখন ঢালা হইল, তখন ইহাই ভাবিয়া সে আর আপত্তি করিল না।

বুঝিল, সে সত্যই তৃষ্ণার্ত হইয়াছিল, তৃষ্ণাটা মিটিয়া গিয়া এখন তাহার ভাল বোধ হইতেছে। হঠাৎ এতগুলি টাকা হাতে পাইয়া, মন হইতে যে একটা দুর্ভাবনার গুরুভার নামিয়া গিয়াছে, তাহার জন্যও শরীরটা আজ অনেকটা হাল্কা বোধ হইতেছে। আজ বহুদিন পর সহজ মানুষের মত আলোভরা উৎসবভরা পৃথিবীর দিকে সে চাহিতে পারিতেছে। তাহার চতুর্দ্দিকে প্রবহমান, প্রখর আলোর স্রোতকে আজ তাহার অত্যন্ত ভাল লাগিল। দুই চোখ দিয়া সেই আলোককে সে যেন দ্রাক্ষারসেরই মত পান করিতে লাগিল। হোটেলের একোণ ওকোণ হইতে মাঝে মাঝে নারীকণ্ঠের কলহাসির শব্দ ভাসিয়া আসিতেছিল। সে হাসির শব্দও আজ তাহার কাছে আঙুরের নির্য্যাসের মতই সুস্বাদু লাগিতে লাগিল। বসিয়া বসিয়া এক-একটি হাসির শব্দ হইতে অন্তরালবর্ত্তিনী এক-একটি অদৃশ্য নারীকে সে মূর্ত্তি দিবার চেষ্টা করিতেছে, এমন সময় বিমান বলিল, "আচ্ছা তুমি ত কবি? মনে আছে সেই কবিতাটা, যাতে একজন পারসিক সূফী বলছেন, ওগো সাকী, তোমার ঐ ঝুঁটি

স্ফটিকের পাত্র ভ'রে সুদৃশ্য, সুস্বাদু, সুরভিত, সুশীতল সুরা আমার হাতে এনে দাও, আর আমার কানে কানে অবিশ্রান্ত বল, এ সুরা, সুরা, সুরা।"

অজয়কে স্বীকার করিতে হইল, কবিতাটি তাহার পরিচিত নহে। অর্থটাও হঠাৎ বোধগম্য হইল না, বলিল, "খেতে দেওয়াই কি যথেষ্ট নয়? কানে কানে বলতে হবে কেন?"

বিমান কহিল, "কবি হয়েও বুঝলে না? চোখ দিয়ে দে'খে, জিহ্বায় আস্বাদ গ্রহণ ক'রে, নিঃশ্বাসে সৌরভ নিয়ে, হাতের স্পর্শে কাছে পেয়েও মন তৃপ্ত হয় না, এমনি সে জিনিষ। কান দিয়েও তাকে শুনতে ইচ্ছে করে।"

অজয় একেবারে চমৎকৃত হইয়া গেল। বহুক্ষণ ধরিয়া ফিরিয়া ফিরিয়া কবিতাটির উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করিল। এরূপ সুন্দর কবিতা হাফিজের দেশ ছাড়া আর কোথাও লেখাই হইতে পারে না, বলিল। বিমানকে বারবার করিয়া অনুরোধ করিল, কবিটির কি নাম, এবং কোথায় কবিতাটি সে পড়িতে পাইতে পারে, বিমান যেন নিশ্চয় সে খবর তাহাকে দেয়।

বিমান ভ্রূ কুঞ্চিত করিয়া শুনিতেছিল, হঠাৎ কহিল, "বল দেখি, she sells sea-shells on the sea-shore?"

অজয় কহিল, "she sells sea-shells on the sea-shore। কিন্তু হঠাৎ ওকথা যে?"

বিমান বলিল, "কিছু না। এইবার বল তোমার কথা। স্থির হয়ে ব'সে যা আমাকে শোনাতে চাইছিলে। হঠাৎ এ অঘটন কেন ঘটল, দুঃখে তোমার অরুচি ধ'রে গেল।"

এবারে গভীর আবেগের ভাষায় অজয় তাহার বক্তব্যটিকে ব্যক্ত করিল। কহিল, "একথাটা আমার বরাবর মনে হত যে আলাদা ক'রে আমাদের দেশের বহুমুখী সমস্যাগুলিকে মেটাতে চেষ্টা করলে কোনদিন মিটবে না। সেগুলিকে একসঙ্গে ক'রে একটিমাত্র বৃহত্তর সমস্যার মধ্যে ধ'রে যেদিন দেখতে পাব, সেইদিন তাদের সমাধান সম্ভব হবে। সেই সাধনাই ছিল এতদিন আমার জীবনে, যে জন্যে কোনো দুঃখকে আমি দুঃখ মনে করি নি, কোনো আত্মনির্যাতন আমার কঠিন মনে হয় নি। সে সাধনার পথে সিদ্ধিলাভ আমার ঘটেছে। আমি বুঝতে পেরেছি আমাদের সমস্ত দুর্ভাগ্যের গোড়া কোনখানে। অতীতের কোনো এক সময়ে, আমাদের সভ্যতা আমাদের শিখিয়েছে, দুঃখকে সম্মান করতে, ভিক্ষাবৃত্তিকে মর্য্যাদার আসনে বসাতে, এবং সুখী হবার মানুষের স্বাভাবিক প্রবৃত্তিটাকে গায়ের জোরে অবজ্ঞা করতে। আমি ভারতবর্ষের বাইরে কখনও যাই নি, তবু আমার মনে হয়, আর কোনো দেশের মানুষ দুঃখকে ঠিক এমন ক'রে এতখানি বড় করেনি। জীবনকে প্রতিপদে প্রত্যাখ্যান, বৈরাগ্য দিয়ে তাকে অপমান, সেই অপমানের প্রতিদান দেশব্যাপী লাঞ্ছনার মধ্য দিয়ে আমরা পাচ্ছি। মনুষ্য-জীবন অনিত্য ব'লে প্রতিবেশী মানুষকে পর্য্যন্ত আমরা শ্রদ্ধা করতে ভুলে যাচ্ছি। এ জাতি দুঃখ পাবে না ত পাবে কে? দুঃখভোগে আমাদের লজ্জা নেই। চরমতম অমর্য্যাদায় আমাদের লজ্জা নেই।... কেবল লজ্জা নেই? তাই নিয়ে গর্ব্ব করতে চাইলেই আমরা করতে পারি। সেই গৌরবেরই ইমারত এত যুগ ধ'রে আমরা তৈরি করেছি। আমাদের বহুসহস্র বৎসরের ইতিহাস দুর্গতির চরম তলায় তলিয়ে যাবার সাধনার ইতিহাস।"

বিমান ঠোঁট টিপিয়া একটু হাসিল। অজয় কহিল, "হাসছ যে?"

বিমান কহিল, "তোমার সত্যিই ধারণা, এইটেই আমাদের দেশের একমাত্র সমস্যা? তা তোমার বেশী দোষ নেই। আমি তোমাকে এমন আরো দশটা সমস্যার কথা এই মুহূর্ত্তে বলতে পারি যার, যে কোনো একটার থেকেই একটা দেশের ভারতবর্ষের সমান দুর্গতি হতে পারে। কোন্‌টাকে ফেলে কোন্‌টাকে দেখবে? তুমি যা বলছ, তার মানে এই দাঁড়ায় যে আমাদের দেশের সমস্ত দুর্ভাগ্যের সূত্রপাত সেইদিন, যেদিন আমরা দেশের মনকে অন্তর্ম্মুখী হতে ডাক দিয়েছি। দুদিক্ সামলান যায় না। ভারতবর্ষের আত্মিকতা তার পার্থিব সুখ-সুবিধার বিরোধী। এক নিলে আর ছাড়তে হয়। আমরা খুব স্পিরিচুয়াল জাত ব'লে গর্ব্বও করব, আবার যারা ঘোর বস্তুবাদী তাদের সঙ্গে বস্তুর বখরা নিয়ে কাড়াকাড়ি করব এ হয় না। আত্মাকেই ভারতবর্ষ যদি কামনা ক'রে থাকে, তবে কায়মনোবাক্যে তাকে ত্যাগী হতে হবে। সে ত্যাগ, ত্যাগের বিলাস নয়, সে ত্যাগের মূর্ত্তি বিকট। সে ত্যাগ দুর্ভিক্ষে, মহামারীতে, অজ্ঞানে, অস্বাস্থ্যে, পরাধীনতায়। আর পার্থিব প্রতিযোগিতার আসরে নামবার ইচ্ছা যদি মনে থাকে, তাহলে আত্মিকতার, অতীন্দ্রিয়ের, জীবনাতীতের দোহাই পাড়া চলবে না।

বনবালা

শ্রীপঞ্চানন কর্ম্মকার

প্রবাসী প্রেস, কলিকাতা

জীবনকেই কায়মনোবাক্যে আঁকড়ে ধরতে হবে, স্বাভাবিক চিন্তাকে, স্বাভাবিক বুদ্ধিকে, স্বাভাবিক বিচারকে। তোমাকে খুব বেশী শক্ত ক'রে দেওয়া আমার অভিপ্রায় নয়, নয়ত বলতাম, সে অবস্থায় প্রয়োজন হলে রেস্‌ও খেলতে হবে এবং দ্রাক্ষারসে অরুচি থাকলে চলবে না।"

বিমান তাহার কথা ভাল করিয়া না বুঝিয়াই তর্ক সুরু করিয়াছে, ইহা হৃদয়ঙ্গম করা সত্ত্বেও ছাড়িয়া দেওয়া চিন্তা-সূত্রের শেষ আবার কুড়াইয়া লওয়া অজয়ের কঠিন হইল। সে কহিল, "আজ অন্ততঃ অরুচির পরিচয় আমি কিছু দিচ্ছি না। গেলাসটা আবার ভ'রে দাও।"

ইহার পর আরও এক ঘণ্টা ধরিয়া উচ্ছ্বসিত ভাষায় একই প্রসঙ্গের আলোচনা চলিল। দুইজনেরই মনের চারি-পাশ হইতে সমস্ত প্রকার বাধার আড়াল ক্রমে ক্রমে খসিয়া যাওয়াতে এমন সমস্ত-গভীর উপলব্ধির কথা প্রকাশ পাইল, যাহার সঙ্গে ইতিপূর্ব্বে নিজেদেরও তাহাদের পরিচয় ছিল না। আজ তাহাদের ভয় রহিল না, ভিতরের এবং বাহিরের কোনও জুজুর শাসনকে আজ তাহারা মান্য করিল না। আজ কয়েকটি মুহূর্ত্ত তাহারা মুক্ত হইয়া বাঁচিল। ক্রমে কথায় অসংলগ্নতা দেখা দিল, বিষয় হইতে বিষয়ান্তরে তাহাদের আলোচনা আগুনের মত সঞ্চরণ করিয়া ফিরিতে লাগিল। কিন্তু তাহাদের অভিভূত মনের সম্মুখেও তাহাদের দেশ সারাক্ষণ জাগিয়া রহিল। বিমান চিরদিনের মত আজও এই বলিয়া শেষ করিল, যে একটা হতভাগা দেশে তাহারা জন্মিয়াছে, সে দেশের কোনও সমস্যা কোনওদিন মিটিবে না। শুধু শুধু তাহা লইয়া ভাবিয়া কি হইবে? অতএব—

বিমানের কথার শেষের দিক্‌টা অজয়ের কেমন যেন কানে পৌঁছিল না। হঠাৎ মনে হইল চোখের সম্মুখে সব কিছু যেন নৃত্য করিয়া বেড়াইতেছে। শরীরটাও ঠিক সুস্থ বোধ হইতেছে না। যেন শুইতে পারিলে ভাল বোধ হইত। "এখন উঠতে হচ্ছে," বলিয়াই উঠিয়া পড়িল।

বিমান বলিল, "দাঁড়াও, বিলের টাকাটা দিয়ে নাও আগে।"

অজয় বলিল, "বয়কে ডাক।" বয় বিল লইয়া আসিলে, তাহার পাওনা চুকাইয়া দিয়া অজয় বলিল, "এবারে চল, আর বসতে ভাল পাচ্ছি না, শরীর খারাপ লাগছে।"

বৌবাজারের বাড়ীটাতে, অন্ধকারে শিথিল কম্পিত হস্তে তালাতে চাবি ঢুকাইতে গিয়া, পায়ে কিসের একটা শীতল স্পর্শ অনুভব করিল। চোখ হইতে তন্দ্রা এবং মোহের ঘোর কতকটা কাটিয়া গেল। আতঙ্কে এক পা পিছাইয়া গিয়া জড়িতস্বরে বলিল, "কে?"

অন্ধকার নড়িয়া উঠিল, উত্তর হইল, "আমি নন্দ।"

তাহাকে কিছু না বলিয়াই অজয় সোজাসুজি বিছানায় গিয়া শুইয়া পড়িল। নন্দ একটু অবাক্ হইয়া তাহার পায়ের কাছে বিছানার এক কোণে জড়সড় হইয়া বসিল। সন্তর্পণে তাহার পায়ে হাত রাখিয়া বলিল, "অজয়দা, অসুখ করেছে কিছু?"

তন্দ্রার মধ্যেও অজয়ের মনে পড়িল, সে মাতাল। দেব-শিশুর মত নিষ্পাপ এই ছেলেটি, দুঃখের আগুনে বারংবার যাহার অগ্নিশুদ্ধি হইয়া গিয়াছে, সে অজয়ের চরণস্পর্শ করিতেছে। সবেগে সে পা সরাইয়া লইল। নন্দ বলিল, "কি হয়েছে অজয়দা? কেন এমন করছেন?"

অজয় কেবল বলিল, "কিছু হয়নি।"

ইহার পর অস্পষ্ট করিয়া অনুভব করিল, কাতর, ভয়াকুল দৃষ্টিতে নন্দ তাহার মুখের দিকে তাকাইয়া আছে। একবার সে বলিল, "ডাক্তার ডাকব কি?"

অজয় আতঙ্কিত হইয়া কহিল, "না, না, কাউকে ডাকতে হবে না। বলছি ত কিছুই হয়নি।"

তারপর আবার মোহের ঘোর তাহার চৈতন্যকে ঘিরিয়া আসিল।

নন্দ বসিয়াছিল, উঠিয়া পড়িল। আজ এতদিন ধরিয়া এই মুহূর্ত্তটিরই প্রতীক্ষায় কি সে হাসিমুখে এত দুঃখ ভোগ করিয়াছে? দুঃখের মূল্য দিয়া অজয়ের যে দ্বিগুণিত স্নেহকে সে পাইবে আশা করিয়াছিল তাহার পরিচয় কি এই? বিকালে পাঁচটায় সে ছাড়া পাইয়াছে, তাহার পর হইতে অজয়ের জন্য পথ চাহিয়া রাত এগারোটা অবধি সে কাটাইয়াছে। তাহার এত আগ্রহ ভরা পথ চাওয়ারও কি এই পুরস্কার? অজয় শিরে হাত দিয়া তাহাকে আশীর্ব্বাদ করে নাই, এমন কি একবার জানিতেও চাহে নাই সে কেমন আছে, কোথায়, কোন্ অবস্থায় এতদিন সে ছিল।

অজয় ঘুমায় নাই, জাগিয়াও ঠিক ছিল না। মোহাবিষ্ট মন লইয়াও সে অনুভব করিল, কি একটা বিষম গোলযোগের সৃষ্টি সে করিয়াছে। অথচ এমন সাধ্য নাই যে উঠিয়া সেই গোল মিটাইয়া দেয়। মাথা তুলিতেও তাহার কষ্ট হইতেছিল। তাহা ছাড়া কিছু বলিতে গিয়া ধরা পড়িবার ভয়ও আছে। ভয়টা নিজের জন্য তত নয়, নন্দের জন্য যত। বুঝিতে পারিতেছিল, ধরা পড়িলে নন্দেরই প্রতি অত্যন্ত নিষ্ঠুরতা করা হইবে।

ভোরের দিকে ঘুমটা কেমন হঠাৎ ভাঙিয়া গেল। যেন সুইচ টিপিতেই মুহূর্ত্তে জাগরণের আলোর প্লাবনে ঘর ভরিয়া ভাসিয়া গেল। দেখিল নন্দ ঘুমাইতেছে। কি আশ্চর্য্য! পূর্ব্বরাত্রির ব্যবহারের জন্য অজয়ের মনে লজ্জা বা ধিক্কারের লেশমাত্র নাই। নন্দকে জাগাইয়া তুলিয়া সে বলিল না, এতদিন তোমার প্রণাম গ্রহণ করিয়া আসিয়াছি, সে অধিকার সত্যই আমার আজ নাই। আমি অধঃপতনের শেষ সীমা পর্য্যন্ত ঘুরিয়া আসিয়াছি। কাল আমার ব্যবহারে তোমার প্রতি যে রূঢ়তা প্রকাশ পাইয়াছে, আমাকে ঘৃণা করিয়া, তোমার মন হইতে চির দিনের জন্য আমাকে নির্ব্বাসিত করিয়া তুমি তাহার প্রতিদান দাও। আমাকে কিছুতেই ক্ষমা করিও না। কাল রাত্রির যে অভিজ্ঞতা, সে যেন তাহার অভিজ্ঞতা নয়, এমনই ভাবে নন্দকে ঠেলিয়া তুলিল। বলিল, "ওঠ, ওঠ, আর কত ঘুমবে?"

নন্দ ধড়মড় করিয়া উঠিয়া বসিয়া এমন প্রসন্ন হাস্যে মুখটিকে ভরিয়া তুলিল যেন সত্যই কোথাও কিছু হয় নাই। যেন নিজেই অত্যন্ত অপরাধ করিয়াছে, এমনই ভাবে বলিল, "বাবা, এত বেলা হয়ে গেছে, বুঝতেই পারিনি।"

অজয় বলিল, "চল, আজ রবিবার দিনটা যে দিকে দুচোখ যায়, টো টো ক'রে ঘুরে আসি। পথে যেতে যেতে তোমার সব খবর শুনব।"

দুইজনে তাড়াতাড়ি হাত মুখ ধুইয়া, কাপড় জামা পরিয়া বাহির হইতে যাইবে, রাস্তার দরজার কাছে বীণা তাহাদের গতিরোধ করিল। অজয় কহিল, "এ কি, আপনি?"

নন্দ সন্তর্পণে একপাশে সরিয়া গেলে বীণা কহিল, "আমি ব'লেই ত মনে হচ্ছে। চিনতে যে পেরেছেন এই ঢের।"

অজয় কহিল, "নিজে কষ্ট ক'রে কেন এলেন? আমায় খবর দিলেই ত হ'ত।"

বীণা বলিল, "বেশ ত, নিজেই না হয় খবরটা দিচ্ছি। এবার চলুন।"

অজয় বলিল, "কোথায়?"

বীণা বলিল, "কোথায় আবার? আমাদের বাড়ীতে। আপনার সঙ্গে আমার অনেক কথা আছে। কাল বিকেলে সুলতাদিকে সঙ্গে ক'রে এসে দুবার ঘুরে গেছি। মেয়েটা হঠাৎ অসুখে পড়ল, তা না হ'লে আরো আগেই আসতাম।"

অজয় বলিল, "আজকের দিনটা বাদ থাক্।"

বীণা দৃঢ় কণ্ঠে বলিল, "আজকেই আপনাকে যেতে হবে।"

অজয় মনে মনে আজিকার দিনটা নন্দের জন্য নিবেদন করিয়া রাখিয়াছিল। ভাবিয়া রাখিয়াছিল, সমস্ত দিন তাহাকে লইয়া বেড়াইয়া, তাহাকে হোটেলে খাওয়াইয়া, সিনেমা দেখাইয়া, কল্যকার রূঢ়তার পাপের প্রায়শ্চিত্ত করিবে। বলিল, "আপনি দয়া ক'রে এই একটা দিন আমাকে মাপ করবেন, আমি কাল নিশ্চয়ই যাব, কথা দিচ্ছি।"

বীণা বলিল, "পৃথিবী শুদ্ধ সকলে কেবল আপনাকেই দয়া করতে থাকবে, আপনি কারুর দিকে দেখবেন না, এই ব্যবস্থাটা হ'লে আপনার খুব সুবিধা হয় জানি, কিন্তু সেই সুবিধা এই একটা দিন অন্ততঃ আপনাকে আমি দেব না।"

অজয় অত্যন্ত বিপন্ন বোধ করিতে লাগিল। বীণাকে দেখিবামাত্র তাহার দেহমনের এই কয়দিনের সঞ্চিত গ্লানি পলকে কোথায় মিলাইয়া গিয়াছিল। বসন্তের স্বর্ণিম প্রভাত বহুদিন পরে আজ আবার অতিথির রূপে তাহার হৃদয়দ্বারে ঘা দিল। আলোকমণ্ডিত নীলাকাশ, সুখস্পর্শ দক্ষিণ বাতাসে চ্যুত মঞ্জরীর সৌরভ, পথতরুশাখায় পাখীদের কলগান, এই সমস্তই এতদিন ধরিয়া তাহার মন হইতে কত দূরে চলিয়া গিয়াছিল। আজ আবার একখানি প্রিয়মুখের পরিচয়পত্র সঙ্গে লইয়া, পরমাত্মীয়ের রূপে তাহার চেতনার দ্বারে আসিয়া ভিড় করিল। এক এক করিয়া অন্তরের প্রীতির অর্ঘ্য দিয়া, তাহাদের সে হৃদয়ের ভিতর লইতেছিল। বিগত দিনগুলির অন্ধকারের স্মৃতি, হেয়তার, পরাজয়ের, বেদনার গ্লানি, এ-সমস্তকেই জঞ্জালের মত দূরে ফেলিয়া, তাহাদের জন্য সে স্থান করিয়া লইতেছিল।

দুঃখে সত্যই তাহার অরুচি ধরিয়া গিয়াছিল। তাহার সমস্ত হৃদয় ভরিয়া আজ বিদ্রোহ। বড় ইচ্ছা করিতেছিল, বীণার নিমন্ত্রণ গ্রহণ করে। বীণার উজ্জল বাসন্তী রঙের শাড়ী, তাহার রূপজ্যোতি কে আজ উজ্জলতর করিতেছিল। সে যে ঐন্দ্রিলার আত্মীয়া, সেদিনকার মুক্ত প্রভাতাকাশের নীচে সেই মুহূর্ত্তটিতে সেই উপলব্ধির আর তুলনা ছিল না। এক পরিপূর্ণ অপরূপ সৌন্দর্য্যলোক হইতে, তাহার অযাচিত সাদর আহ্বান আসিতেছিল। অজয়ের বুক দুঃসহ আনন্দে দুর্দ্দমনীয় লোভে দুরু দুরু করিয়া কাঁপিতেছিল। তবু নন্দের মুখের দিকে চাহিয়া, প্রাণপণ চেষ্টায় এ লোভকে সে সম্বরণ করিল। আজ এই দিনটিকে দুঃখী নন্দ, স্বজনহীন দেবানুগ্রহবঞ্চিত নন্দকে মনে মনে সে দান করিয়া রাখিয়াছে। যে জিনিষ দুঃখের পাওনা সে জিনিষের ভাগ আনন্দকে, ঐশ্বর্য্যকে প্রাণ ধরিয়া কিছুতেই সে দিতে পারিল না। ভিখারীর অন্নমুষ্টি কাড়িয়া লইয়া, উৎসবের নৈবেদ্য সাজাইতে তাহার মন উঠিল না।

কিন্তু বীণাকে সে কথা বলিতে পারিল না, বীণা বুঝিলও না। অধীর হইয়া বলিল, "চলুন।"

অজয় মৃদুস্বরে বলিল, "আপনাকে মিনতি ক'রে বল্‌ছি, আজকের দিনটা কেবল আমাকে ক্ষমা করুন্।"

বীণার ঠোঁটদুটি একবার মৃদু কাঁপিয়া উঠিল, কিন্তু তখনই নিজেকে দমন করিয়া, এবং একহাতে শাড়ীর প্রান্ত সম্বরণ করিয়া সে ফিরিল। বাহিরে Erskine দাঁড়াইয়াছিল, ড্রাইভার পশ্চাতের দিকে হাত বাড়াইয়া দরজা খুলিয়া দিল। দ্রুতপদে গাড়ীতে উঠিয়া, স্থির দৃষ্টিতে সম্মুখের দিকে চাহিয়া নিশ্চল হইয়া বসিল। গ্যাসের আবেগে গাড়ী চঞ্চল হইয়া উঠিল।

সে যে কত আনন্দ করিয়া আসিয়াছিল, এবং কি বেদনা লইয়া ফিরিয়া যাইতেছে, বেদনা জিনিষটার সঙ্গে অত্যন্ত গভীর পরিচয় থাকাতে, অজয়ের তাহা বুঝিতে কিছুমাত্র দেরি হইল না। গাড়ী চলিতে আরম্ভ করিতেই ছুটিয়া বীণার পাশে গিয়া গাড়ীর সঙ্গে প্রায় ছুটিতে ছুটিতেই বলিল, "আমায় ক্ষমা করলেন, ব'লে যান্।"

বীণা তাহার দিকে চাহিল না। এক মুহূর্ত্ত চুপ করিয়া থাকিয়া বলিল, "ক্ষমা ক'রেই এসেছিলাম।"

একরাশ ধূলা উড়াইয়া গাড়ী দ্রুত বাহির হইয়া গেল। বসন্তের প্রভাতে গাড়ীঘোড়ার শব্দ, তীব্র রৌদ্র, ধূলি-ধূমাচ্ছন্ন বাতাস, রাস্তার পিচ ও পেট্রোলের গন্ধ ভিন্ন আর কিছু রহিল না।

ক্রমশঃ

মহিলা সংবাদ

এবার এম-এ পরীক্ষায় ঢাকা ইউনিসিটি হইতে দুইটি মহিলা প্রথম বিভাগে সর্ব্বপ্রথম স্থান অধিকার করিয়া উত্তীর্ণ হইয়াছেন। শ্রীমতী করুণাকণা গুপ্ত ইতিহাসে শতকরা সত্তর নম্বরের অধিক পাইয়া পাস করিয়াছেন, ইহার জন্য তিনি স্বর্ণপদক পুরস্কার পাইবার যোগ্য হইয়াছেন। শ্রীমতী অশোকা সেন-গুপ্ত সংস্কৃত ও বাংলা সাহিত্যে উত্তীর্ণ হইয়াছেন।

শ্রীযুক্তা সীতাবাঈ আন্নিগেরী দ্বাদশ বৎসর বয়সে বিধবা হন। অধ্যাপক কার্ভের পুণাস্থ বিধবা আশ্রমে ১৯০৫ সনে শিক্ষা আরম্ভ করেন। তিনি পুণার মহিলা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে ১৯২২ সনে জি-এ পরীক্ষা পাস করেন। তিনি অতঃপর বিধবা আশ্রম সমিতির জীবন-সভ্য হন। তিনি ১৯২৫ সন হইতে মহিলা বিশ্ববিদ্যালয়ে কার্য্য আরম্ভ করেন। তিনি এই বিশ্ববিদ্যালয়ের বোম্বাই শহরস্থ হাই স্কুলের ভার গ্রহণ করেন। তাঁহার আমলে বিদ্যালয়ের ছাত্রী সংখ্যা দুই শত পঁচাত্তর পর্য্যন্ত হইয়াছিল।

তিনি পুণাতে অধ্যয়ন কালেই লেডী ঠাকর্সীর সঙ্গিনীরূপে আমেরিকায় গমন করেন। তাঁহার আমেরিকার কোনো কলেজে অধ্যয়ন করিবার বাসনা বলবতী হয়। তিনি পুণায় ফিরিয়া আসিলে অধ্যাপক কার্ভের চেষ্টায় ক্যালিফর্ণিয়ার মিল্‌স্ কলেজে অধ্যয়ন করিবার জন্য বৃত্তি লাভ করিয়াছিলেন। তিনি এখান হইতে 'হোম ইকনমিক্‌স্ (গার্হস্থ্য বিদ্যা) প্রধান বিষয়, এবং শরীরতত্ত্ব, খাদ্যতত্ত্ব প্রভৃতি বিষয় লইয়া বি-এ পাস করিয়াছেন।

বাংলা

স্বামীর স্মৃতি-রক্ষার্থ দান—

কলিকাতা করপোরেশনের ডিষ্ট্রিক্ট হেল্থ অফিসার পরলোকগত ডাক্তার ।সন্তকুমার ঘোষ মহাশয়ের স্মৃতি-রক্ষার্থ তাঁহার পত্নী শ্রীমতী কুসুমকুমারী ঘোষ কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের হস্তে চারি হাজার পাঁচ শত টাকা অর্পণ করিয়াছেন। বাংলার ছাত্রসমাজের স্বাস্থ্য সম্বন্ধে জ্ঞানবর্দ্ধনের ব্যবস্থা করাই এই দানের উদ্দেশ্য। এই টাকার আয় হইতে প্রতি বৎসর স্বাস্থ্য বিষয়ক সর্ব্বোৎকৃষ্ট প্রবন্ধের জন্য পঞ্চাশ টাকা মূল্যের "বসন্ত মেডেল" নামে একটি স্বর্ণপদক দেওয়া হইবে। বিশ্ববিদ্যালয় প্রতি তৃতীয় বৎসরে স্বাস্থ্য সম্বন্ধে বক্তৃতা দেওয়ারও ব্যবস্থা করিয়াছেন। এই বক্তৃতাগুলির নাম হইবে "বসন্ত লেকচার্স" এবং দক্ষিণা তিন শত টাকা।

শ্রীযুক্ত ক্ষিতীশচন্দ্র রায়

ভাস্কর্য্যে কৃতী বাঙালী—

পুরুলিয়া-নিবাসী অবসর-প্রাপ্ত সিভিল সার্জ্জন রায়বাহাদুর বরদাকান্ত রায় মহাশয়ের তৃতীয় পুত্র শ্রীযুক্ত ক্ষিতীশচন্দ্র রায় লণ্ডনের 'রয়্যাল কলেজ অফ্ আর্টস্' হইতে এ-আর-সি-এ (ভাস্কর্য্য বিদ্যা) পরীক্ষায় কৃতিত্বের সহিত উত্তীর্ণ হইয়াছেন। সেখানে তিন বৎসর অধ্যয়ন করিলে এই পরীক্ষা দেওয়া যায়। ক্ষিতীশ-বাবু দুই বৎসরেই এই পরীক্ষা দেওয়ায় উপযুক্ত বিবেচিত হইয়াছিলেন। তাঁহার কৃত 'শকুন্তলা' লণ্ডন 'রয়্যাল একাডেমি অফ্ আর্টস' গৃহে ৭ই আগষ্ট অবধি প্রদর্শিত হইয়াছে। তিনি শান্তিনিকেতন ও বম্বে স্কুল অফ্ আর্টসের প্রাক্তন ছাত্র। ক্ষিতীশ বাবুর নির্ম্মিত কতকগুলি মূর্ত্তির প্রতিলিপি এখানে দেওয়া গেল।
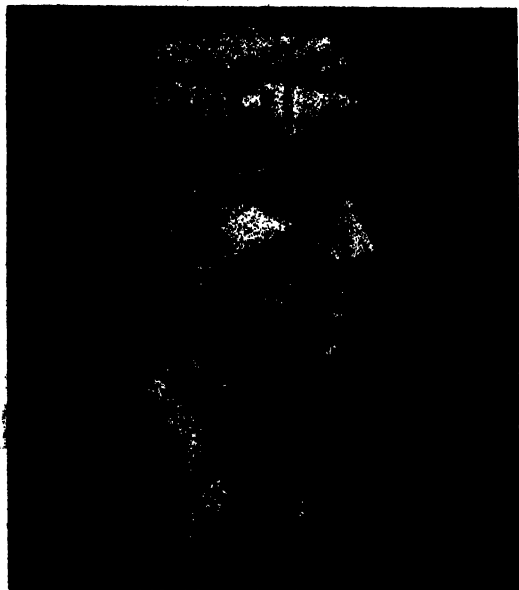
শকুন্তলা

পুরুষমূর্ত্তি

সুর ও তাল

আবক্ষ মর্মরমূর্ত্তি

নারীমূর্ত্তি

শ্রীযুত অনাথবন্ধু রায়

লাইনোটাইপ শিক্ষায় বাঙালী—

শ্রীযুত পশুপতি ঘোষ টাইপ তৈয়ারী শিক্ষা করিবার জন্য বিলাতে গমন করিয়াছেন। তিনি সেখানে 'লাইনোটাইপ' শিক্ষা শেষ করিয়াছেন। তিনি 'মনো টাইপ' কিছু কিছু শিখিয়া মেসার্স আর-পি ব্যানারমান এণ্ড সন্স কোম্পানীর টাইপ তৈয়ারীর কারখানায় শিক্ষানবিশী করিয়াছিলেন। পশুপতি-বাবু সুষ্ঠু ভাবে টাইপ তৈয়ারী শিখিয়া আসিলে ছাপাখানার বিশেষ উপকার হইবে।

এরোপ্লেন চালন ও নির্ম্মাণে বাঙালী—

শ্রীযুত অনাথবন্ধু রায় বিলাতের নানা বিখ্যাত কারখানায় এরোপ্লেন নির্ম্মাণ ও মেরামত কার্য্য শিক্ষায় ব্যাপৃত ছিলেন। এই সকল কারখানা হইতে এই কার্য্যে কৃতিত্বসূচক নানা সার্টিফিকেটও লাভ করিয়াছেন। অনাথ-বাবু এরোপ্লেন চালনও শিক্ষা করিয়াছেন। তাঁহার উন্নতি কামনীয়।

শ্রীযুত পশুপতি ঘোষ
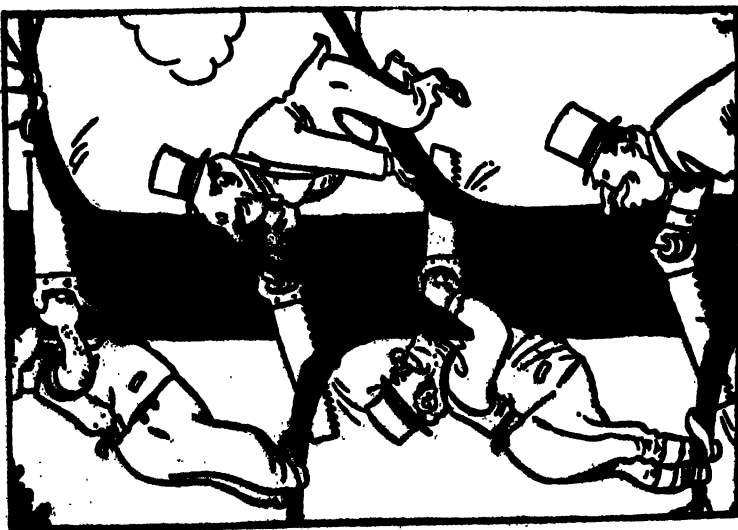
সর্ব্বজাতীয় অর্থনৈতিক সম্মেলনের ব্যর্থতায় রুশিয়ার বিদ্রূপ

লণ্ডনে সম্প্রতি যে সর্ব্বজাতীয় অর্থনৈতিক সম্মেলন হইয়া গিয়াছে, তাহাতে প্রত্যেক দেশই নিজের স্বার্থ বজায় রাখিয়া অপরের স্বার্থের ক্ষতি করিতে চাহিয়াছিল। ফলে, এই সম্মেলনের উদ্দেশ্য একেবারে পণ্ড হইয়া যায়। এই জিনিষটি রুশিয়ার বিখ্যাত পত্রিকা প্রাভ্‌ডার ব্যঙ্গচিত্রে সুন্দরভাবে পরিস্ফুট হইয়াছে।
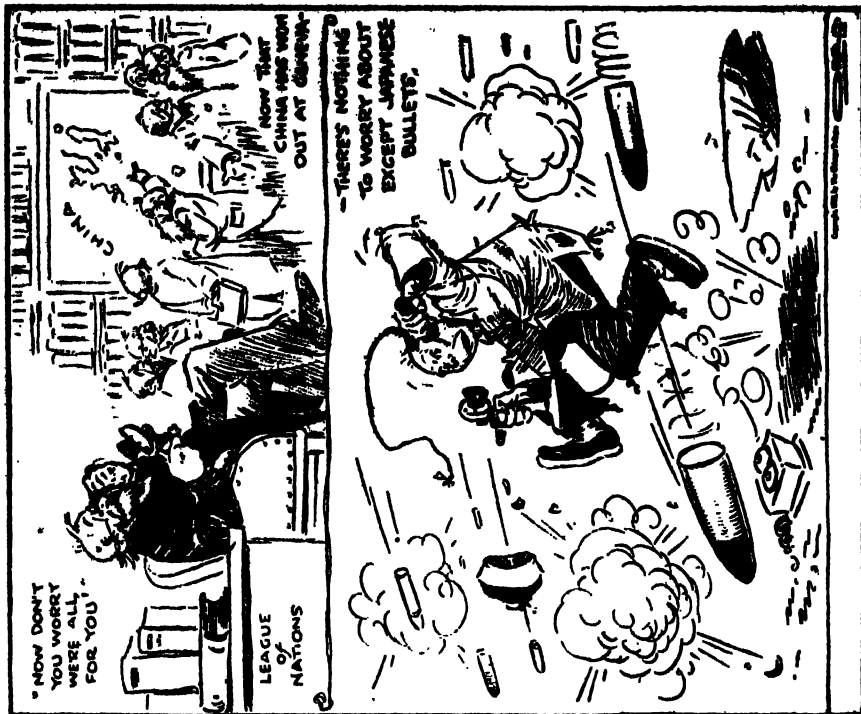
চীনের দুর্দ্দিন

চীনে প্রদেশের পর প্রদেশ জাপান অধিকার করিয়া লইল। এদিকে 'লীগ অফ্ নেশন্‌স্' চীনকে বলিতেছেন,—'মা ভৈঃ! আমরা তোমাদেরই পক্ষে!' চীন উত্তর দিতেছে,—'জাপানী গোলাগুলি ছাড়া আর কিসেরই বা ভয়!'

সৌভাগ্য

শ্রীরাধিকারঞ্জন গঙ্গোপাধ্যায়

অন্ধকার সবেমাত্র কাটিয়া ভোরের আলো দেখা দিয়াছে। এত ভোরে নগরবাসী শীলের ঘুম কোনদিনই ভাঙিতে এযাবৎ কাল দেখা যায় নাই। ব্যাপারটা অসাধারণ বটে, কিন্তু কারণ বর্ত্তমান। নগরবাসীর অতি নিকট আত্মীয় কে এক যুধিষ্ঠির শীল—নগরবাসীর বড় মাসীর একমাত্র সন্তান—না কি পত্রের দ্বারা জানাইয়াছে, তাহাকে বিশেষ কার্য্যোপলক্ষে একবার ঢাকা যাইতে হইবে এবং পথে নগরবাসীর বাড়ি পড়ে বলিয়া সেখানে দুই দিন এ যাত্রা থাকিয়া যাইবে। নগরবাসী যুধিষ্ঠিরকে কতবার কতভাবে কত অনুরোধ করিয়া ব্যর্থ হইয়াছে। যুধিষ্ঠির 'যাই—যাইব' করিয়া এতদিন আত্মীয়তা কোনরকমে বজায় রাখিয়াছে মাত্র, কিন্তু নগরবাসীর একান্ত বাসনা কোনদিনই এপর্য্যন্ত পূর্ণ সে করে নাই। নগরবাসী এমন পর্য্যন্ত কতবার বলিয়াছে, যে উজ্জ্বলার আদর যত্ন কোনদিন না পাইয়াছে তাহার জীবনই বৃথা। আর উজ্জ্বলাকে দেখাও বড় কম তৃপ্তির কথা না। এই উজ্জ্বলা নগরবাসীর স্ত্রী। আসলে নগরবাসী চায়, তাহার সৌভাগ্য আত্মীয়স্বজন বন্ধুবান্ধবকে ডাকিয়া ডাকিয়া দেখাইতে; কিন্তু যুধিষ্ঠিরকে সে এত কিছু প্রলোভন দেখাইয়াও কোনদিন তাহার সৌভাগ্য চাক্ষুষ করাইতে পারে নাই। আজ তাহার সেই আকাঙ্ক্ষিত দিন আসিয়াছে। নগরবাসীকে আর পায় কে! যুধিষ্ঠির এতদিনে তাহার নিজের গরজেই আসিবে লিখিয়াছে। কাজেই নগরবাসীর এত ভোরে ঘুম ভাঙা উজ্জ্বলার চোখে যত বিস্ময়ের বস্তুই হউক না কেন, অস্বাভাবিক একেবারেই নয়।

নগরবাসী উঠিয়াই গোয়ালঘরের দিকে একবার গেল এবং অল্প পরেই সেখান হইতে একখানি বৈঠা, মাছ মারিবার একটা কোঁচ ও একটা ট্যাটা বাহির করিয়া আনিয়া উঠানে আসিয়া দাঁড়াইল। উজ্জ্বলা এই-সব আয়োজন দেখিয়া সবিস্ময়ে প্রশ্ন করিল, আজকের দিনে আবার এ সব কেন? আজ না তোমার মাসতুতো ভাইয়ের আসার কথা আছে? আজ ও-সব নিয়ে বেরিয়ে গেলে চলবে কেন? তুমি বেরিয়ে গেলে সে যদি সত্যিসত্যি এসে হাজিরই হয় তো তার উপযুক্ত আদর আপ্যায়ন করবে কে শুনি?

নগরবাসী বলিল, আদর আপ্যায়নের জন্য তুমিই তো রইলে, আর এসবও তো আমার তারই জন্যে। মাঠে নতুন জল এসেচে. খানক্ষেতে গেলে পরে কোন্ না দু-চারটে কাছিম মিলবে শুনি। যদি মেলে তবে যুধিষ্ঠির কি খুশীই হবে একবার ভাব দিকি। আর ওকে আমার বলাই আছে, বর্ষাকালে এখানে এলে কাছিম খাইয়ে ওর অরুচি ধরিয়ে তবে আমার নাম।

নগরবাসীর ইহা যে শুধু বাগাড়ম্বর মাত্র নয় তাহা উজ্জ্বলা বিশ্বাস করে। কাজেই কিছুমাত্র বিস্মিত না হইয়া বলিল, সে তো তুমি পারই জানি, কিন্তু আজ সে আসবে আর দু দিন যখন থাকবেই লিখেচে—তখন আজ কি না বেরুলেই হতো না? আরও বিশেষ ক'রে সে আসবে নতুন মনিষ্যি—আমিও তাকে কখনও দেখিনি, সেও আমাকে কখনও দেখেনি,—অবস্থাটা যে কেমন দাঁড়াবে সে আমি এখনই বুঝতে পারচি।

নগরবাসী মৃদু একটু হাসিয়া বলিল, সে ভয় তোমার নেই বউ। যুধিষ্ঠির আমাদের বড় চৌকস ছেলে—ও মুহূর্ত্তেই দেখ না কেমন সব আলাপ জমিয়ে তোলে। আর এসে যখন শুনবে সে যে আমি তারই জন্যে—তখন সে কি খুশী হবে সে একবার ভাব দিকি। যুধিষ্ঠিরের জন্যে এটুকু না করলে আমার চলবে কেন—সে যে আমার বড়মাসীর বড় আদরের ছেলে গো! আজই না হয় আমাদের আসা যাওয়া নেই—নইলে যুধিষ্ঠির আর আমি তো এক মায়ের পেটের ভাই বললেই চলে। নয় কি?

উজ্জ্বলা আর কোন কথাই কহিল না। নগরবাসী উজ্জ্বলাকে যুধিষ্ঠিরের আদর আপ্যায়ন সম্বন্ধে যথাযথ উপদেশ দিয়া খিড়কী দরজার খালে হিজলগাছের সঙ্গে বাঁধা ছোট নৌকাটিতে গিয়া উঠিয়া বসিল। নতুন বর্ষা আসিলে প্রতি

বৎসরই নগরবাসী কাছিম শিকার করিতে গাঁয়ের পশ্চিমের মাঠে বাহির হইয়া যায়। ইহা তাহার নেশা। আজ যুধিষ্ঠিরের আগমন উপলক্ষে সে এত ভোরে বাহির হইয়া গেল। মনে মনে এই বলিয়া সে বাহির হইয়া গেল যে, ভগবান যেন তাহার মুখ রাখেন!

নগরবাসীর বাড়ি ফিরিতে বেলা প্রায় দ্বিপ্রহর হইয়া গেল। ওদিকে তাহার কথা কিন্তু ঠিকই ফলিয়াছে। সে বাড়ি ফিরিয়া দেখিল, যুধিষ্ঠির ইতিমধ্যেই সে বাড়িতে পুরাতন হইয়া জমাইয়া তুলিয়াছে। ভাল করিয়া তেল মাখিয়া শুধু গায়ে যুধিষ্ঠির নগরবাসীর ঘরের দাওয়ার উপর যেখানটিতে নগরবাসী নিত্য পরিশ্রমান্তে আসিয়া খুঁটিতে ঠেস দিয়া বসিয়া দিব্য আরামে তামাকু সেবন করিয়া ক্লান্তি বিনোদন করে ঠিক সেখানটিতে নগরবাসীর মত বসিয়াই তামাক টানিতেছে, আর উজ্জ্বলার সঙ্গে কত রাজ্যের গল্পই যে ফাঁদিয়া বসিয়াছে তাহার আর ইয়ত্তা নাই। নগরবাসী বৈঠা, কোঁচ ও ট্যাটা হাতে দাওয়ার ঠিক নামায় উঠানে আসিয়া দাঁড়াইয়া এমনভাবে উজ্জ্বলার পানে চাহিল যে তাহাতেই সে বুঝাইয়া দিল,—তাহার কথা না ফলিয়া তো উপায় নাই; যুধিষ্ঠির চিরদিনই অমন মিশুক, নতুন লোককে পুরাতন করিয়া লইতে তাহার বড় বেশী সময়ের প্রয়োজন কোনদিনই হয় না।

যুধিষ্ঠির তাড়াতাড়ি হুঁকাটি ঘরের বেড়ার সঙ্গে ঠেস দিয়া দাঁড় করাইয়া রাখিয়া উঠানে নামিয়া নগরবাসীকে প্রণাম করিয়া উঠিয়া বলিল,—কেমন, কথা ঠিক রেখেচি কিনা দেখ এইবার। এ তুমি জানবে নগরবাসী-দা, যুধিষ্ঠিরের কথার খেলাপ কোনদিন হবে না।..মাইরি, এ তোমার ভারী অন্যায় কিন্তু নগরবাসীদা, বৌদি যে এমন মাইডিয়ার' প্যাটার্ণের লোক তা তুমি কোনদিনই আমাকে বলনি। বললে পরে আমি কবেই এসে একদিন হাজির হতাম।

নগরবাসী সগর্ব্বে একটু হাসিয়া বলিল,—বলিনি, নিশ্চয় বলেচি। এ তোর মিথ্যে অভিযোগ যুধিষ্ঠির।

যুধিষ্ঠির একটু ফিক করিয়া হাসিল, তারপরে বলিল, কিন্তু—তা'বলে—এতটাই কি বলেচ কোনদিন?

উজ্জ্বলা যুধিষ্ঠিরের কথার তাৎপর্য্য ঠিক ধরিতে না পারিলেও অনুমান কতকটা করিতে পারিয়াছিল, কাজেই লজ্জিত হইয়া অন্য কথা তুলিতে চেষ্টা পাইল। বলিল, কাছিম মিললো না তো?

যুধিষ্ঠিরও সঙ্গে সঙ্গে বলিয়া উঠিল, ভাল কথা নগরবাসী-দা, আমি আজ আসব তুমি জানই, তবু তুমি শিকারে বেরিয়ে গেছ, তোমার কি রকম আক্কেল বল তো? যাক্, কিছু শিকার মিললো কি?

নগরবাসী আর একবার সগর্ব্বে একটু হাসিল, তারপরে বলিল, মন ক'রে বেরিয়ে কোনদিন খালি হাতে ফিরে এসেচি কিনা তা তোর বৌদিকেই একবার জিগ্যেস্ করে দেখ না। খিড়কী দরজায় নৌকা বাঁধা আছে, তারই পাটাতন তুলে দেখগে যা। কিন্তু সবে নতুন জল, এখনও বড় কাছিম চলতে সুরু করেনি। তবে নেহাৎ ছোটও না একেবারে। আয়, দেখবি আয় না।

বলিয়া নগরবাসী তাহার শিকারের সাজসরঞ্জাম উঠানেই নামাইয়া রাখিল। যুধিষ্ঠির আবার হুঁকাটি হাতে তুলিয়া লইয়া নগরবাসীর পিছু পিছু খিড়কীর দিকে চলিল। উজ্জ্বলাও তাহাদের সঙ্গে চলিল।

যুধিষ্ঠিরের বেশ আসর জমানো স্বভাব,—সে একদিনেই সাতরাজ্যের কথা তুলিয়া নগরবাসী ও উজ্জ্বলাকে তাক লাগাইয়া দিল। নগরবাসী যুধিষ্ঠিরকে পূর্ব্ব হইতেই চিনিত এবং স্ত্রীর কাছে এই যুধিষ্ঠিরের কথা সে এত বেশী করিয়াই বলিয়াছে যে, যুধিষ্ঠির যদি এমন করিয়া সত্যসত্যই উজ্জ্বলাকে তাক লাগাইয়া দিতে না পারিত তো তাহার মুখ দেখানোই ভার হইয়া উঠিত। তাহার খুশী আর ধরিতেছিল না। তাহার বড়মাসীর বড় আদরের একমাত্র সন্তানের যে অশেষ গুণপণা সে স্ত্রীর কাছে টীকা-টিপ্পনি সহ ব্যাখ্যা করিয়াছে তাহার কিছু পরিচয় যদি সে উজ্জ্বলার কাছে না দিতে পারিত তো নগরবাসীর পক্ষে তাহা যেমন দুঃখদায়ক হইত, তেমনই আবার লজ্জাকর হইয়া দাঁড়াইত। যুধিষ্ঠির তাহার মুখ রাখিয়াছে—মান বাঁচাইয়াছে। আর নগরবাসী যুধিষ্ঠির সম্বন্ধে অনেক কথা একটু অতিরঞ্জিত করিয়া বলিয়াছে সত্য, কিন্তু যুধিষ্ঠির সম্বন্ধে সে-সব একেবারে মিথ্যা কথাও তো না। তা লোকে অমন অতিরঞ্জিত করিয়া একটু বলিয়াই

থাকে। যুধিষ্ঠির মিশুক, যুধিষ্ঠির খেয়ালী, আড্ডাবাজ, আসর-মাতানে, হল্লা হৈ-চৈয়ের পাণ্ডাঠাকুর, যুধিষ্ঠির গাইয়ে বাজিয়ে তালিমবাজ, যুধিষ্ঠির মুখ-মিষ্টি—প্রাণখোলা, যুধিষ্ঠির রঙ্গতামাসা ভালবাসে, ঝামেলা পছন্দ করে না, কারও সাতেও নেই পাঁচেও নেই, পরকে সব দিয়ে-থুয়ে তার আনন্দ, আপনভোলা—সন্ন্যাসী মানুষ বলিলেই চলে। এককথায় নগরবাসী ভূভারতে অমন আর একটিও দেখে নাই। উজ্জ্বলা এত শুনিয়াই শেষে বলিয়াছিল, যেহেতু সে তোমার বড় মাসীর ছেলে।

কিন্তু হেতু যাহাই হউক, নগরবাসী যে অতগুলি বাছা বাছা বিশেষণে যুধিষ্ঠিরকে ভূষিত করিয়া উজ্জ্বলার চোখের সামনে উজ্জ্বল করিয়া তুলিয়া ধরিয়াছে তাহা সে মনপ্রাণ দিয়া বিশ্বাস করে বলিয়াই ধরিয়াছে। সেদিকে নগরবাসী নিজেকে কোনদিনই ফাঁকি দিতে শেখে নাই। নগরবাসী বানাইয়া কোনদিনই কিছু বলে না। সপ্রমাণিত এবং চাক্ষুষ করা জিনিষই সে লোকের কাছে বলে।

উজ্জ্বলা যুধিষ্ঠিরের সঙ্গে আলাপ করিয়া তৃপ্ত হইয়াছে দেখিয়া নগরবাসী সগর্ব্বে একবার বলিল, কি, আমার কথা ঠিক না? বড়মাসী আমার ছেলের মত ছেলে পেয়েচে কিন্তু। হাজারগণ্ডা ছেলে হওয়ার চেয়ে এমন একটা হওয়া কতবড় ভাগ্যের কথা বল তো?

উজ্জ্বলা মাথা নাড়িয়া বলিল, তা ঠিক বই কি! আর বড়মাসী তোমার অমন সতী-লক্ষ্মী মেয়েমানুষ—তার এমন ভাগ্যি হবে না তো হবে কার শুনি?

নগরবাসীর আহ্লাদের আর সীমা ছিল না।

যুধিষ্ঠির বৈকালে নগরবাসীর ছোট নৌকাখানি লইয়া একটু গাঁয়ের এ-পাশ ও-পাশ ঘুরিয়া দেখিয়া আসিতে বাহির হইয়াছিল। বাড়ি ফিরিতে তাহার সন্ধ্যা হইয়া গেল। নগরবাসী তখন পাড়ায় বন্ধু-বান্ধবকে জানাইতে বাহির হইয়াছিল, তাহার বড়মাসীর ছেলে যুধিষ্ঠির—যাহার কথা সে এতদিন তাহাদের কাছে বলিয়া বেড়াইয়াছে সে কার্য্যগতিকে দুইদিন এখানে থাকিতে আসিয়াছে, আজ রাত্রে সে একটু গান বাজনার আসর জমাইতে চায়, পরে না কেহ অনুযোগ করে বা আপশোষ করে, সেই কারণেই তাহাদের সে জানাইতে আসিয়াছে। আর একথাও ঠিক যে, অমন গান-বাজনা ইতিপূর্ব্বে তাহারা বড় বেশী শোনে নাই।

রাত্রে নগরবাসীর উঠান ও দাওয়া পাড়ার লোকে ছাইয়া গেল। দক্ষিণপাড়ার বিধু মল্লিকের বাড়িতে গ্রামের থিয়েটার পার্টির দু-একটি রীডশূন্য একটা হারমোনিয়ম আছে, বাঁয়া-তবলাও একটা আছে সত্য, তাহারই জন্য লোক পাঠানো হইল। হারমোনিয়ম আসিল, কিন্তু বাঁয়া-তবলা আর আসিল না। কারণ, বাঁয়াটি কিছুদিন যাবৎ না-কি একটু বেতালা বাজিতেছিল এবং সেটির অযত্নের সুবর্ণ-সুযোগ খল ইঁদুরের লক্ষ্য এড়াইতে পারে নাই,- যাহা কর্ত্তব্য তাহাই করিয়াছে।

যুধিষ্ঠির হারমোনিয়ম দেখিয়া প্রথম নাক সিঁটকাইল, পরে গান ধরিল। তাহার নাক সিঁটকানো বেয়াদবি হয় নাই নিশ্চয়ই। গান সে ভালই গায়।

লোকজন বিদায় লইয়া গেলে যুধিষ্ঠির যখন উজ্জ্বলার কাছে আসিয়া তাহার হাত-ঘড়িটি খুলিয়া তাহাকে যত্ন করিয়া তুলিয়া রাখিতে বলিল, তখন উজ্জ্বলা একেবারে অত্যুগ্র আনন্দাবেগে যুধিষ্ঠিরের একটা হাত জড়াইয়া ধরিয়া বলিল, তোমার অদ্ভুত ক্ষমতা ঠাকুরপো! এত গুণ তোমায় কে দিলে?

যুধিষ্ঠির এতটাই একেবারে আশা করে নাই। একটু লজ্জিত হইয়া তাই বলিল, য্-যাও, আর ঠাট্টা করতে হবে না বৌদি। এসব শুনলে আমার এমন লজ্জা করে!

উজ্জ্বলা উত্তরে কি যে বলিবে ভাবিয়া পাইতেছিল না। বলিল, তোমার দাদা ব'লতো বটে, কিন্তু কোনদিন কি বিশ্বাস করেছি ছাই! আমার বরাতে আবার এমন ঠাকুরপো জুটবে! আজ দশজনার কাছে বুক ফুলিয়ে দাঁড়াবার মত একটা পথ হ'ল তবু।

যুধিষ্ঠির অগত্যা বলিয়া ফেলিল, তোমার মত একজন বৌদি আছে জানাও যে ভাগ্যের কথা বৌদি।

উজ্জ্বলা খুশী হইয়া গা দোলাইয়া লজ্জার বিনীত অভিনয় করিয়া চলিয়া যাইতেছিল। যুধিষ্ঠির তাড়াতাড়ি বলিল, ভাল কথা বৌদি, তোমাকে বলতে ভুলে গেচি। আমার ঘড়িটা দেখতে অতি সাধারণ বটে, কিন্তু ওটার দাম অনেক— ৭৫৲ টাকা। একটু সাবধান ক'রে রেখো। আর তা ছাড়াও ওটা বাঘমারীর জমিদার-বাড়িতে একবার যাত্রা গাইতে গিয়ে পেয়েছিলাম। আমার গান শুনে জমিদারের

এক মেয়ে তার হাত থেকে ওটা আমাকে খুলে দিয়েছিল। কাজেই ওর দাম শুধু টাকায় হয় না। খুব সাবধান ক'রে রেখো কিন্তু।

কথাটা উজ্জ্বলার বিশ্বাস করিতে দ্বিধা বোধ হইল না। কারণ, যুধিষ্ঠির তাহার গানের যে পরিচয় দিয়াছে তাহাতে উজ্জ্বলার চোখে ব্যাপারটা সন্দেহ করিবার মত কিছু নাই। সে বলিল, তা যত্ন ক'রেই রাখব'খন ঠাকুরপো।

বলিয়া উজ্জ্বলা তাহা তাহার ঘরে রাখিতে যাইতেছিল। যুধিষ্ঠির সঙ্গে সঙ্গে ঘরে ঢুকিয়া বলিল, তুমি সাবধান ক'রে আগে ওটাকে তুলে রাখো বৌদি—এই আমার চোখের সুমুখে, নইলে খোয়া গেলে আমার আপশোষের আর সীমা থাকবে না।

আচ্ছা, আচ্ছা, এই দেখ তোমার সামনেই বাক্সে তুলে রাখচি।—বলিয়া উজ্জ্বলা তাহার বাক্সে রাখিতে গেল।

যুধিষ্ঠির তাড়াতাড়ি বলিল, যা তা বাক্সে রেখো না বৌদি, তোমার গহনা-পত্তর যে-বাক্সে থাকে সেই বাক্সেই রাখ।

আচ্ছা, তাই, তাই।—বলিয়া উজ্জ্বলা তাহার গহনার বাক্সেই তুলিয়া রাখিল।

যুধিষ্ঠির একটা তৃপ্তির নিঃশ্বাস ফেলিয়া বলিল, এতক্ষণে আমার স্বস্তি! এ ঘড়িটা যেন হ'য়েচে আমার এক জ্বালা! না পারি খোয়াতে, না পারি সাবধানে রাখতে।

উজ্জ্বলা বলিল, সত্যিকারের গর্ব্বের জিনিষ হ'লেই এ অবস্থা মানুষের হয়। তুমি কি বলচো ঠাকুরপো, আমারই শুনে ওর ওপরে কেমন মায়া প'ড়ে গেচে। ও খোয়া যাবার ভয় আর তোমার নেই ঠাকুরপো। আর যদি যায় তো সঙ্গে আমার গয়না-পত্তর গুলোও যাবে তো? আমার যা-কিছু গয়না সবই তো এরই মধ্যে।

যুধিষ্ঠির বলিল, সেই জন্যেই তো একেবারে নিশ্চিন্ত হ'তে পেরেচি, নইলে ঘুমুতে কি পারতাম না কি সারারাত!

উজ্জ্বলা একটু না হাসিয়া থাকিতে পারিল না। বলিল, বাবা! বাবা!

দুই দিন থাকিয়া কাল সকালে যুধিষ্ঠিরের চলিয়া যাওয়ার কথা। নগরবাসী বা উজ্জ্বলা কেহই তাহাকে যাইতে দিতে রাজী হয় না। তাহাদের সনির্ব্বন্ধ অনুরোধের আর সীমা-পরিসীমা নাই। কিন্তু যুধিষ্ঠির বিশেষ কার্য্যের হিড়িকে পড়িয়া আসিয়াছে, কাজেই আর একদিনও এ-যাত্রা থাকা তাহার পক্ষে সম্ভব নয়। অনেক রাত্রে সেদিন নগরবাসী ও উজ্জ্বলা শুইতে গেল। মন তাহাদের আদৌ ভাল ছিল না। তাহাদের একমাত্র সান্ত্বনা এই যে, যুধিষ্ঠির একপক্ষকাল মধ্যেই আবার আসিবার প্রতিশ্রুতি দিয়াছে। রাত অনেক হইয়া গিয়াছিল। যুধিষ্ঠিরের অশেষ গুণের পর্য্যালোচনা অল্পে থামাইয়াই তাহারা ঘুমাইয়া পড়িল।

যুধিষ্ঠিরের সকালে যাওয়ার কথা। তাহারই গরজে অতি ভোরে সেদিন নগরবাসী ও উজ্জ্বলার ঘুম ভাঙিল। যুধিষ্ঠিরকে ডাকিয়া তুলিয়া দিতে আসিয়া নগরবাসী দেখিল, যুধিষ্ঠিরের ঘরের দরজা খোলা, কিন্তু যুধিষ্ঠির ঘরে নাই। যুধিষ্ঠিরের এত ভোরে ঘুম ভাঙিল যে কি করিয়া তাহা নগরবাসী ভাবিয়া পাইতেছিল না, আর সে গেলই বা কোথায়। সকল সম্ভব অসম্ভব স্থানেই যুধিষ্ঠিরের খোঁজ করা হইল, কিন্তু সন্ধান মিলিল না। ক্রমে বেলা হইতে লাগিল, তবু যুধিষ্ঠির আসিল না। তবে কি সে চলিয়া গেল, উজ্জ্বলা বলিল, না তার ঘড়ি যে আমার কাছে পড়ে রইল, সে কি তা ফেলে যেতে পারে কখনও।

দশটা এগারটা করিয়া বেলা একটা বাজিয়া গেল, কিন্তু যুধিষ্ঠির তখনও আসিল না। নগরবাসী ও উজ্জ্বলা মহা দুর্ভাবনায় পড়িয়া গেল। গ্রামের সর্ব্বত্র তাহার সন্ধান করিয়াও হদিস মিলিল না। বৈকালেও যখন সে ফিরিয়া আসিল না তখন তাহাদের ধারণা হইল যে, হয়ত সে ঢাকা চলিয়া গিয়াছে, পাছে তাহারা কোন বাধা জন্মায় এই ভয়ে রাত থাকিতেই উঠিয়া দেখা না করিয়াই চলিয়া গিয়াছে, আবার ফেরার পথে হয়ত এখানে হইয়া যাইবে।

রাত্রে উজ্জ্বলার কেমন একবার খেয়াল হইল যুধিষ্ঠিরের হাতঘড়িটা ঠিক যথাস্থানে আছে কি-না দেখিতে। বাক্স খুলিয়াই উজ্জ্বলা মাথায় হাত দিয়া বসিয়া পড়িল,—তাই তো...

উজ্জ্বলার মুখ দিয়া আর কিছুই বাহির হইল না।

কিছুক্ষণ পরে উজ্জ্বলা সহসা চীৎকার করিয়া উঠিল, ওগো, আমার গয়নাপত্তর সব কে নিয়ে গেল গো-ও-ও..

নগরবাসী ছুটিয়া আসিল। বলিল, কি, অমন ক'রে—চীৎকার করচ কেন শুনি?

উজ্জ্বলা বলিল, আমার গয়না। ওগো আমার অত সাধের গয়না কে নিলে শুনি?

নগরবাসী বিশেষ বিচলিত হইয়া বলিল, কি? তোমার গয়না?

হ্যাঁ গো, হ্যাঁ, আমার গয়না। ওগো, তোমার গুণের সাগর সেই মাসতুতো ভাইয়েরই নিশ্চয় এই কাণ্ড!—বলিয়া উজ্জ্বলা ডাক ছাড়িয়া কাঁদিতে যাইতেছিল।

নগরবাসী তাড়াতাড়ি তাহার হাতটা ধরিয়া ফেলিয়া বলিল, আঃ, চীৎকার ক'রে বাড়ি মাথায় করো না। সে এমন কাজ কখখনও করতে পারে না, আমি জানি। মিথ্যে তাকে বদনামের ভাগী করো না। তুমি কি পাগল হলে না-কি বউ, সে আর যাই করুক, চুরি তা ব'লে কখনই করবে না। সে তো যার তার ছেলে নয়—সে আমার বড়মাসীর ছেলে। বড় মাসী আমার একটা নামডাকওয়ালা ঘরের মেয়ে। তুমি কি যে বল বউ!

উজ্জ্বলা তথাপি চীৎকার করিয়াই বলিল, হোক্‌গে সে তোমার নামডাকওয়ালা বড় মাসীর ছেলে, তবু সে ছাড়া এ আর কারও কাজ নয়। তাই ঘড়ি রাখার ফাঁকে আমার গয়নার বাক্স দেখা। বাপ্‌রে, ঠগ্‌ আর বলে কাকে!

নগরবাসী চটিয়া গিয়াছিল। সে বলিল, ফের যা-তা সব তার নামে বলতে সুরু করলে তো? তুমি কি তাকে স্বচক্ষে নিতে দেখেচ, যে এ-সব বলচ?

আবার দেখে মানুষ কেমন ক'রে!—বলিয়া উজ্জ্বলা চোখে কাপড় তুলিয়া দিয়া বলিল, ঠাকুরপো, এই কি তোমার মানুষের মত কাজ হ'ল? আমি এই খোয়া যাবার ভয়েই যে একদিনের তরেও ভাল ক'রে হাতে দিয়ে বেড়াইনি! এই কি তোমার ধর্ম্ম হ'ল, না ভগবান এ সহ্য করবেন?

নগরবাসী মহা বিপদে পড়িয়া গেল। উজ্জ্বলাকে যখন কোন ক্রমেই আর থামাইতে পারে না তখন সে নিজেই একবার উজ্জ্বলার গহনার বাক্সটা ভাল করিয়া দেখিল। তাহাতে একখানি গহনাও নাই, এমন কি যুধিষ্ঠিরের ঘড়িটিও নাই। নগরবাসী অগত্যা আশ্বাস দিল যে, আবার সে যেমন করিয়া পারুক নতুন করিয়া সকল গহনা গড়াইয়া দিবে, কিন্তু উজ্জ্বলা তাহাতেও শান্ত হইল না। গহনা যে-ই লইয়া গিয়া থাকুক না কেন সে যে উজ্জ্বলার ডাইনীবুড়ীর মত পঁচিশ হাত জলের নীচের কৌটায় ভীমরুলের মত রক্ষিত প্রাণ লইয়া গিয়াছে সে বিষয়ে আর সন্দেহ নাই। এ জ্বালা তাহার কিছুতেই আর মিটিবার নয়।

সাতদিন খোঁজাখুঁজির পর নগরবাসী একদিন তিন মাইল দূরের থানায় একটা ডায়রী করিয়া আসিল। উজ্জ্বলার দৃঢ় বিশ্বাস,—যুধিষ্ঠির ভিন্ন এ দুষ্কার্য্য কাহারও দ্বারা সম্ভব নয়। নগরবাসী কিছুতেই তাহা বিশ্বাস করে না। নগরবাসী বলে, যদি একবার সন্ধান পাই চোরের তো তাকে জেল খাটিয়ে তবে আমার নাম। উজ্জ্বলা সে-সব কিছুই বলে না, সে আপন ব্যথায় মরিয়া আছে। এতগুলি গহনা চোর ধরা পড়িলেই কি আর সে তাহা ফিরাইয়া পাইবে? হয় ত সে বিক্রী করিয়া দিয়া ধরা পড়িবে—তাহাতে তাহার লাভ কি? উজ্জ্বলার শুধু মনে হয়, যুধিষ্ঠিরকে পাইলে সে একবার তাহাকে ছিঁড়িয়া খায়। কিন্তু যুধিষ্ঠিরের আর কোন পাত্তাই নাই।

ইহারও দিন দুই পরে একদিন থানার দারোগাবাবুর সঙ্গে দুইজন চৌকিদার যুধিষ্ঠিরকে ধরিয়া লইয়া নগরবাসীর বাড়ি আসিয়া হাজির।

নগরবাসী বিস্ময়ে ডুবিয়া গেল একেবারে। এ কি! যুধিষ্ঠিরের এ অবস্থা কেন?

নগরবাসীর সম্মুখে আনিয়া যুধিষ্ঠিরকে দাঁড় করাইয়া দিতেই যুধিষ্ঠির একেবারে ভূমিতে নগরবাসীর পায়ের কাছে লুটাইয়া পড়িয়া বলিল, নগরবাসীদা, এ যাত্রা আমাকে বাঁচাও!

নগরবাসী তড়াক্ করিয়া দুই হাত পিছাইয়া গিয়া সরোষে গর্জ্জিয়া উঠিয়া কহিল, জোচ্চোর! বড়মাসীর ছেলে হ'য়ে তোর এই কীর্ত্তি! আবার বলে কি-না 'বাঁচাও'। না, কখখনও না। তোকে দশ বছর জেল খাটিয়ে তবে আমার নাম। তুমি আমাকে আজও চেনোনি শূয়ার! বড় ভালবাসতাম কি-না, তাই তার শোধ নেওয়া হ'ল এমনি ক'রে। আচ্ছা, আমিও এইবার তোমাকে একহাত নিয়ে তবে ছাড়ব।

যুধিষ্ঠির কি যেন বলিতে যাইতেছিল, দারোগাবাবু পায়ের জুতা দিয়া তাহাকে একটা ঠোক্কর মারিয়া বলিলেন, চুপ্। আর কোন কথা না।

তারপরে নগরবাসীর দিকে ফিরিয়া হাতের কতকগুলি গহনা-পত্তর বাহির করিয়া বলিলেন, তোমার স্ত্রীর গহনা এসব? আর তাকে একবার ডাক, সে এ-সব চিনতে পারে কি-না দেখা যাক্।

উজ্জ্বলা বহুপূর্ব্বেই দাওয়ায় আসিয়া দাঁড়াইয়া ছিল। নগরবাসী ডাকিতেই সে উঠানে নামিয়া আসিল। যুধিষ্ঠির এমন সময়—চীৎকার করিয়া উঠিল, বৌদিগো—

দারোগাবাবু 'খবরদার' বলিয়া আর একটা ঠোক্কর মারিলেন। তারপরে গহনাগুলি উজ্জ্বলাকে দেখাইয়া বলিলেন, এ গয়নাগুলো চিনতে পার?

উজ্জ্বলা একটুও বিচলিত না হইয়া বলিল, হুঁ, এগুলো আমারই।

দারোগাবাবু বলিলেন, এগুলো চুরি গেছে ব'লে থানায় তোমার স্বামী ডায়রী ক'রে আসে?

উজ্জ্বলা ত্রস্তে একবার স্বামীর দিকে চাহিয়া লইয়া বলিল, না, চুরি যাবে কেন? আমি নিজে থেকেই ঠাকুরপোকে দিয়েছিলাম ওগুলো বিক্রী করতে। দুর্ব্বৎসর পড়ায় টাকা-পয়সার টানাটানিতেই—

নগরবাসী ক্ষিপ্তের মত বলিয়া উঠিল, না, মিথ্যে কথা দারোগাসাহেব, সব মিথ্যে কথা। ওকে বাঁচাবার জন্যে এসব কথা ওর। মেয়েমানুষ—কান্না দেখলেই গলে যায় একেবারে। জোচ্চোর যুধিষ্ঠির জেল খেটে আসুক দু'পাঁচ বছর। তাই আমি চাই। পাপের ওর উচিত শাস্তি হোক্।

উজ্জ্বলা আরও দৃঢ় হইয়া উঠিল। বলিল, কেন মিথ্যে ঠাকুরপোকে চোর অপবাদ দিচ্ছ? তুমি তো এসবের কিছুই খোঁজ রাখো না। আমার হাত দিয়ে যা হ'য়েচে আমাকেই তা বলতে দাও।

নগরবাসী বিস্ময়ে স্তম্ভিত হইয়া গেল। এ উজ্জ্বলার হইয়াছে কি? একটা পাষণ্ডের কান্নায় হৃদয় তাহার গলিয়া গেল না-কি?

দারোগাবাবু সমস্তই বুঝিলেন। এ ব্যাপারের গলদ যে কোথায় তাহা তাঁহার এত কালের অভিজ্ঞতায় সহজেই প্রতীয়মান হইল। মৃদু একটু হাসিয়া শেষে নগরবাসীকে বলিলেন, আর কেন নগরবাসী, অনেক রঙ্গই তো এ-পর্য্যন্ত হ'লো।

তারপরে চৌকিদারদের যুধিষ্ঠিরের হাতের রজ্জু-বন্ধন খুলিয়া দিতে বলিলেন।

যুধিষ্ঠিরের বন্ধন খুলিয়া দেওয়ার পরেও সে স্তম্ভিত হইয়া সেখানে বসিয়া রহিল।

সকলে বিদায় লইয়া চলিয়া গেলে যুধিষ্ঠির সহসা উজ্জ্বলার দুই পা সবলে আঁকড়াইয়া ধরিয়া কাঁদিয়া ফেলিয়া বলিল, আমাকে কেন বাঁচাতে গেলে বৌদি? আমি জেল খেটে আসতাম সেই আমার ভাল হ'ত।

উজ্জ্বলা অতি কষ্টে, যুধিষ্ঠিরের কান্না দেখিয়া অশ্রু সংবরণ করিয়া বলিল, না, সে ভাল হ'ত না। আমাকে তবে তুমি কোনদিনই চিনতে না।

যুধিষ্ঠির আর কিছুই বলিতে পারিল না, নিজের উপর একান্ত ঘৃণায় শুধু উজ্জ্বলার পা দুইটির উপরে মাথা কুটিয়া মরিতে লাগিল।

উজ্জ্বলা বলিল, আঃ, ওঠো ঠাকুরপো। মানুষ কি ভুল কখনও করে না জীবনে?

যুধিষ্ঠির তথাপি উজ্জ্বলার পা ছাড়িল না। বলিল, করে, করে, কিন্তু তার শাস্তি এ নয়—

প্রত্যাবর্ত্তন

শ্রীকেদারনাথ চট্টোপাধ্যায়

উভয় সঙ্কটই উপস্থিত হ'ল। দেওয়ানিয়েহ্ ষ্টেশনে একদিন বসে থেকে ট্রেন ধরলে হয় 'উর' দেখার আশা ছাড়তে হয়, নইলে বসরায় গিয়ে জাহাজ ধরার সময় থাকে না। এদিকে উর না দেখে ফিরলে মুখ দেখান ভার হয়। সুতরাং ভেবেচিন্তে ঠিক করা গেল মোটরেই উর রওনা হওয়া যাবে। দেওয়ানিয়ের ষ্টেশনমাষ্টার (পাঞ্জাবী ভদ্রলোক) এবং হাওয়া আপিসের কর্ত্তা (হিন্দুস্থানী ভদ্রলোক) দুজনে একবাক্যে বললেন, আমার এ সঙ্কল্প দুঃসাধ্য ও বিপজ্জনক, কেন না, একে তো রাস্তা নেই, তার উপর আরব-দস্যুর ভয় বিশেষ আছে। রাস্তা নেই তার জন্যে ভাবনা ছিল না—ইরাকের মোটর রাস্তাঘাটের অপেক্ষা রাখে না - কিন্তু দস্যুর কথায় একটু ভাবতে হ'ল কেন-না এরা বললেন, মোটরচালকই হয়ত দস্যুর হাতে নিয়ে যাবে—এ রকম ঘটনা আগে অনেক হয়েছে।

দুগ্ধদোহন। উর

সাত-পাঁচ ভেবে নাজি পাশার স্বাক্ষরযুক্ত পরোয়ানা (প্রাদেশিক গভর্ণরদিগের উপর) এবং ষ্টেশনমাষ্টার মহাশয়ের সাহায্যে লেখা এক চিঠি দেওয়ানিয়ের প্রধান ম্যাজিষ্ট্রেটের কাছে পাঠান গেল। চিঠিতে অনুরোধ ছিল,
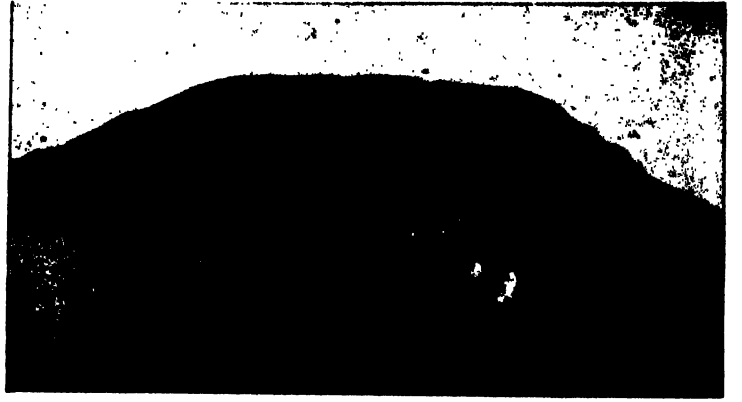
উর-নিন্নুর জিগরট। উর

তিনি গাড়ী ও একজন সেপাইয়ের ব্যবস্থা করে যেন আমাদের বাধিত করেন, খরচ আমরাই দেব, তাতে তিনি কিছু মনে না করেন, তবে চালক ও গাড়ীর মালিক বিশ্বস্ত হয় এটা তিনি যেন পুলিশকে দিয়ে অনুসন্ধান করিয়ে দেন। পত্রোত্তরে ঘণ্টাখানেক পরে একটি ভাল গাড়ী, চালক, যন্ত্রী এবং এক
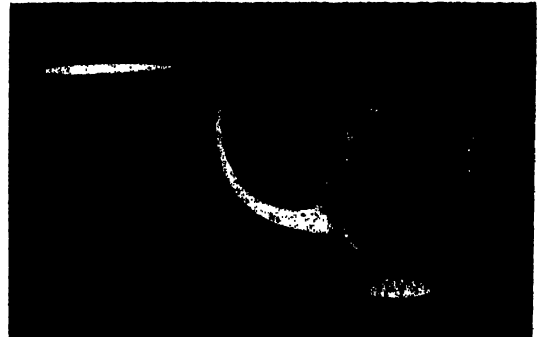
রাণীর সমাধিতে প্রাপ্ত স্বর্ণময় পাত্র। উর

সেপাই এসে উপস্থিত হ'ল। সঙ্গে ম্যাজিষ্ট্রেটের চিঠি- তিনি সব পাঠাচ্ছেন, বাগদাদ থেকে অনুমতি নেবার সময় নেই ব'লে তিনি ভাড়া দিতে পারলেন না, তার জন্যে যেন তাঁকে ক্ষমা করা হয়। তাঁকে ধন্যবাদ দিয়ে চিঠি পাঠালাম। ইতিমধ্যে

রাজসমাধিতে প্রাপ্ত তাম্র (ঝিনুক বসান) বৃষশির। নীচে ঝিনুক বসান চিত্রিত কাষ্ঠ ফলক। উর

দেখি যে চালক মুখ কাঁচুমাচু করে ষ্টেশনমাষ্টারকে কি বলছে এবং তিনি খুব হাসছেন। ব্যাপার কি জানতে চাওয়ায় তিনি বললেন সে জানতে চাচ্ছে কি দোষে ওকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। যখন সে বুঝল যে, গ্রেপ্তার নয় খন্দের জোটান, তখন সে-ও খুব হেসে বললে তবে তাকে খাবার জন্য ও পেট্রোল আনবার জন্য ছুটি দেওয়া হোক। সেপাই তাতে নারাজ, তার হুকুম সে যেন ওকে নজরবন্দী রাখে।

রাজসমাধিতে প্রাপ্ত তার-বাদ্যযন্ত্র। উর
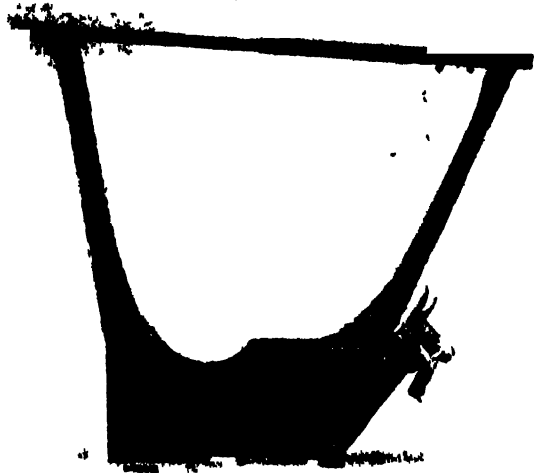
শেষে রফা হ'ল, চালক সেপাই সবাই মিলে খেয়ে ও পেট্রোল এনে রাত্রে ষ্টেশনে থাকবে।

ষ্টেশনমাষ্টার মহাশয়ের সৌজন্যে খেয়ে-দেয়ে ক্যাম্পখাটে শুয়ে রাত কাটান গেল। দিনে হাওয়া আপিসের

অট্টালিকার ধ্বংসাবশেষ। উর

তাপমানে ১২৯ ডিগ্রি দেখেছিলাম, রাত্রে কম্বল গায়ে দিতে হয়েছিল।

* * *

রাত থাকতে রওনা হয়ে বেলা ন'টা নাগাদ উর পৌঁছান

গেল। অর্দ্ধেক পথ রেল লাইন বেয়ে আসতে হয়েছিল। প্রত্যেক ষ্টেশনেই আটকাবার চেষ্টা করে, কিন্তু সেখানে নেমে পড়ে আরও কিছু দূর গিয়ে রেলের বাঁধ চড়াও করায় সে বাধায় আমাদের গতিরোধ হয়নি।

উর জংশন এবং ধ্বংসাবশেষ মরুভূমির মধ্যে দাঁড়িয়ে

রাজসমাধিতে প্রাপ্ত রাণীর গহনা। মূর্ত্তি আনুমানিক। উর

আছে। সমস্ত শীত ও বসন্ত কাল এখানে খনন ও উদ্ধার কাজ চলে, তারপর সশস্ত্র শাস্ত্রীর হাতে সমস্ত ছেড়ে খননকারীরা বিদেশে চলে যান।

এখানে একটি খুব ভাল বিশ্রাম-আগার (ডাকবাংলো) আছে। সাধারণের জন্য তার মাশুল অতি বিষম, সুখের বিষয় আমাদের কিছুই লাগেনি। এখান থেকে ধ্বংসাবশেষ মাইল দেড় দূরে মরুভূমির মধ্যে। এখানকার ষ্টেশনমাষ্টার (মাদ্রাজী ভদ্রলোক) আমাদের নিয়ে ঐ দারুণ গরমেই সমস্ত দেখালেন। তিনি সঙ্গে ছিলেন ব'লে রক্ষীর দল সমস্ত খুলে দেখাল।

* * *

উর বাইবেলে উক্ত "ক্যালডীয়" জাতির প্রাচীন রাজপুরী। অনুমান ছয় সাত হাজার বৎসর পূর্ব্বে

উর-নিশ্মর নামাঙ্কিত অস্ত্র ধার: কস্তা। উর

ইউফ্রেটিস্-টাইগ্রিস সঙ্গমের জলাভূমিতে চর পড়ে ডাঙ্গা জমির সৃষ্টি হয়। ঐখানে আদিম আক্কাদীয় জাতির লোকেরা আসিয়া আবাদ ও বসতি করে। এদের অবস্থা তখন প্রায় বর্ব্বরতুল্য, তবে পশুপালন, কৃষি এবং ধীবরবৃত্তি এদের আয়ত্ত ছিল। বেড়াঝাপের উপর মাটির প্রলেপ দিয়ে ঘর-বাড়ি, চকমকি পাথর কেটে অস্ত্রশস্ত্র, হাতে গড়ে নক্সা কেটে আগুনে পুড়িয়ে মাটির বাসন, পশুর লোম এবং গাছের তন্তু থেকে তাঁতে বুনে কাপড়চোপড়, এ-সবই তারা তৈরি করতে পারত। এই আদিম জাতির দেশ পূর্ব্বাঞ্চল থেকে "সুমের" নামে সভ্য জাতি এসে জয় করে। তাদের অবস্থা তখনই অনেক উন্নত, তারা সোনারূপা, তাম্রকাংস ইত্যাদি ধাতুর ব্যবহার জানত, ইট পাথর দিয়ে অট্টালিকা তৈরি, পাথর, পোড়ামাটির টালির উপর

লেখন এ-সবই তারা জানত। এই স্থমের জাতির এ অঞ্চলে প্রধান নগর ছিল উর, এবং বাইবেলে বর্ণিত মহাপ্লাবনের পরে আক্কাদিয় জাতির ধ্বংসের পরে এই সমস্ত দক্ষিণ প্রদেশই উহাদের করায়ত্ত হয়।

বাইবেলের মহাপ্লাবন এত দিন প্রায় রূপকথার ক্ষেত্রেই

আদিম নৌকার প্রতিরূপ। উর

ছিল। জনপ্রবাদ এবং অনেক জাতির পুরাণে আছে বলে ঐতিহাসিকেরা ওকে একেবারে তুচ্ছ বলে বাদ দেন নাই। কিন্তু নোহ্ কে ছিলেন, কবে এবং কোথায় এই প্রলয় কাণ্ড হয় সে বিষয়ে অনুমান এবং তর্ক ছাড়া আর কোন মীমাংসার

রাজার সমাধিতে প্রাপ্ত ভোজন পাত্র। উর

উপায় ছিল না। ১৯২৯ খৃষ্টাব্দের বসন্ত কালে উর খননকারীরা প্রায় চল্লিশ ফুট বালি, বেলেমাটি, রাবিশ এবং ধ্বংসাবশিষ্ট কেটে খুঁড়ে শক্ত এবং সমতল পলিমাটির স্তরে এসে পৌছান। অধিকাংশ লোকেই তখন সাব্যস্ত করেন যে, ঐ স্তর আদিম জলাভূমির চরের স্তর, কিন্তু শ্রীযুক্ত উলি মাপ-জরিপের ফলে বুঝলেন যে, ঐ স্তর জলাভূমি অপেক্ষা অনেক উচুতে রয়েছে। তারপর আরও আট ফুট খননের পর আবার বালি, বেলেমাটি এবং ধ্বংসাবশিষ্টের স্তর পাওয়া গেল, যার ফলে এটা প্রমাণ হয়ে গেল যে, ঐ আট ফুট পলিমাটির স্তর প্লাবনের জল থিতিয়ে এসেছে। সাধারণ প্লাবনে দু-এক ইঞ্চির বেশী পলি পড়ে না, স্থতরাং কত বড় ভয়ঙ্কর মহাপ্লাবনের ফলে আট ফুট পলি পড়ে সেটা সহজেই বুঝা যায়। এই মহাপ্লাবন প্রায় পাঁচ হাজার বৎসর পূর্ব্বে ঘটেছিল এবং অনুমান চল্লিশ-পঞ্চাশ হাজার বর্গ মাইল ব্যাপী হয়। এই প্লাবন যে বাইবেল উক্ত মহাপ্লাবন সে বিষয়ে খুবই কম সন্দেহ আছে।

* * * * *

উর এবং মোহেন্‌জোদড়ো মানবজাতির সভ্যতার ইতিহাস প্রায় দু-হাজার বৎসর পেছিয়ে নিয়ে গেছে। উরে অবশ্য অত দিন আগেকার নিদর্শন এখনও কিছু পাওয়া যায় নাই —মোহেন্‌জোদড়োতে পাওয়া গিয়াছে। কিন্তু উরের স্থমের জাতির প্রথম পরিচয়ই পূর্ণ সভ্য জাতির, স্থতরাং স্থমের জাতি যে উর আসিবার বহু পূর্ব্বেই সভ্যতার ক্ষেত্রে অনেক অগ্রসর হয়েছিল, সে-বিষয়ে সন্দেহ নেই। এখানেই খৃঃ পূঃ ৩৫০০ (আনুমানিক) বৎসরের সভ্যতার নিদর্শন রয়েছে এবং

সবুজ প্রস্তরে নির্ম্মিত অস্থর জাতির নরের মূর্ত্তি। উর
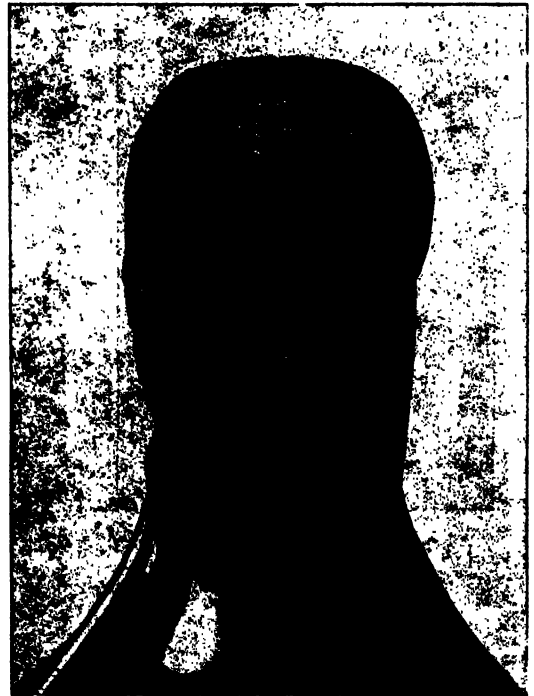
সে সময় থেকে খৃঃ পূঃ ষষ্ঠ শতকের আরম্ভ পর্য্যন্ত উরের ইতিহাস এখন মোটামুটি জানা গিয়াছে।

উরে প্রধান ও বিস্তৃত নগরীর ধ্বংসাবশেষ এখন ধীরে ধীরে উদ্ধার হয়ে চলেছে। নগরীর প্রধান ½ অংশ মাইল

দীর্ঘ এবং ½ মাইল প্রস্থ। ইহার বাহিরে (অল উবেদ ইত্যাদি) আরও ছোটখাট বসতি ছিল, গ্রাম বা শহরতলী কি ছিল তাহা এখনও বুঝা যায় নাই। নগরীর মধ্যে প্রধান দ্রষ্টব্য নৃপতি উর নিম্মুর চন্দ্রদেবীকে উৎসর্গীকৃত বিরাট জিগরট ধ্বংসাবশিষ্ট ছিল তাহাও তিনি নষ্ট করেন এবং বাকীটুকু আশপাশের আরবের দল সস্তায় ইটের খোঁজে আরও নষ্ট করে। অন্যান্য অংশের মধ্যে রাজসমাধিগুলির কয়েকটি প্রাচীনকালেই লুট হইয়া যায়, বাকীগুলি খনন ও উদ্ধার

বৃষনর উপদেবতা এঙ্কিডু। উর

প্রস্তরমূর্ত্তি, চক্ষু নীলম ও ঝিনুক নির্ম্মিত। উর

মন্দির, রাজারাণীদিগের সমাধিস্থল, নেবুকেডনজরের মন্দির, আব্রাহামের সমসাময়িক অট্টালিকার ধ্বংসাবশেষ ইত্যাদি। উর নিম্মুর জিগরট খৃঃ পূঃ দ্বাত্রিংশ শতকে নির্ম্মিত হয়। ইহার উপরের অংশ ১৮৫৪ খৃষ্টাব্দে টেলর নামে ইংরাজ কর্ম্মচারী মাটি খুঁড়িয়া বাহির করেন। তিনি বৃটিশ মিউজিয়ামের জন্য লুটের সন্ধানে ছিলেন, কাজেই যেটুকু হওয়ার পর বহু ধনরত্ন পাওয়া গিয়াছে এবং উ। সম্বন্ধেও অনেক নূতন তথ্য জানা গিয়াছে।

আড়াই হাজার বৎসরের মধ্যে আক্কাদীয়, সুমের, বাবিল, অসুর, কাস্সাইট জাতীয় আর্য্য ইত্যাদি নানা জাতির জয়-পরাজয়ের বিবরণ এই নগরীর ইতিহাসের সঙ্গে জড়িত হয়ে আছে। মন্দির নির্ম্মাণ, লুণ্ঠন, পুনঃপ্রতিষ্ঠা, সংরক্ষণ ইত্যাদি

বাস্‌রা। খাল ও বাজার

যাহারা করিয়াছিল সকলেই নিজ কার্য্যের পরিচয় লিখিত অক্ষরে রাখিয়া গিয়াছে। সর্ব্বশেষে পারসীক কুরুষ বাবিলন জয়ের পর উর জয় করার সঙ্গে সঙ্গে জরথুষ্ট্রি মতের প্রবর্ত্তন করায় উরের নগরদেবী এবং অন্য দেবতার পূজা বন্ধ হয় এবং সঙ্গে সঙ্গে ইহার পতনও আরম্ভ হয়। সেই সময়ের পর আরও আড়াই হাজার বৎসর কেটে গিয়েছে, জ্যোতির্ব্বিদ্যা, অঙ্কশাস্ত্র ইত্যাদির নানা বিদ্যার প্রধান পীঠ ক্যালডীয়দের উর নগরীর খ্যাতি চিরকাল ধরেই চলে আস্‌ছে, কিন্তু তার চিহ্নমাত্রও এতদিন লোকচক্ষুর গোচর ছিল না। এতদিন পরে তাহার পুনরাবিষ্কার হয়েছে।

রাজসমাধি এবং অন্যান্য অংশের সংরক্ষণের চেষ্টা চল্‌ছে, কিন্তু মরুভূমির বালি সর্ব্বগ্রাসী এবং এদেশের আর্থিক সামর্থ্য কম—বিদেশী ত কাজ গুছিয়ে সরেই পড়বে—সুতরাং ভয় হয় যে উদ্ধার ও রক্ষার চেষ্টার ফলে ধ্বংসের কাজটা এগিয়েই যাবে।

* * *

আমাদের দেখা হয়ে গেল। চারিদিকে বড় বড় টালির স্তূপ, সেগুলির গায়ে পাঁচ হাজার বৎসর আগেকার রাজাদের নাম লেখা, মাঝে মাঝে প্রকাণ্ড বাড়ির দেয়াল ভিৎ খুঁড়ে বার করা রয়েছে, বাড়িগুলি দোমহলা-তিন মহলা চকমিলান বাড়ির মত। রান্নাঘর, উঠান, কূয়া, স্নানের ঘর, জল-নিকাশের ও জঞ্জাল ফেলার পথ, এ সবই উত্তর-পশ্চিম ভারতের পুরাণো ঘর-বাড়ির মত। রাজসমাধির গহ্বরগুলি মাটির ভিতর নেমে গিয়েছে, তার কোন্‌টিতে কোন পথ দিয়ে চোর ঢুকেছিল তাদের সিঁদের পথ কোথায়, সে-সব এখন দেখা যাচ্ছে। পাঁচ হাজার বৎসর আগেকার মন্দির, তিন হাজার বৎসর আগে তার রক্ষার জন্য শেষ চেষ্টা হয়েছিল, তার আসল অংশ এবং 'সংরক্ষিত' অংশ দুইয়ের প্রভেদ স্পষ্ট বুঝা যায়, যেমন এখন আমাদের দেশের "সংরক্ষিত" মন্দির ইত্যাদিতে দেখা যায়।

উরে প্রাপ্ত নানা দ্রব্য বাগদাদে ইরাক মিউজিয়ামে দেখেছিলাম, আরও অনেক কিছু দেশের বাইরে চলে গিয়েছে। সেগুলি কোন্‌টি কোথায় পাওয়া গিয়েছিল সে-সব স্থানগুলি দেখা হ'ল।

* * *

রাত্রে ট্রেনে চড়ে পরদিন বাস্‌রায় পৌঁছলাম। বাস্‌রায় বর্ণনার উপযুক্ত বিশেষ কিছুই নেই, তবে কয়েক মাইল দূরে "জুবের" নামক প্রসিদ্ধ আরব পীরের দরগা আছে, তার পথে আরবীয় পারস্য-অভিযানের প্রথম যুগের কতকগুলি নিদর্শন আছে। জুবেরের আরব শেখের পুত্র আমাদের অতি যত্নে সেখানে নিয়ে গিয়েছিলেন। বাস্‌রার "রৈস্‌বালাদীয়ে" (মেয়র) আমাদের খুব খাতির-যত্ন করে সমস্ত দেখিয়েছিলেন।

বিকালের দিকে জাহাজে ওঠা গেল। এসেছিলাম শূন্যপথে, ঘুরেছিলাম স্থলপথে, দেশে ফিরলাম জলপথে।
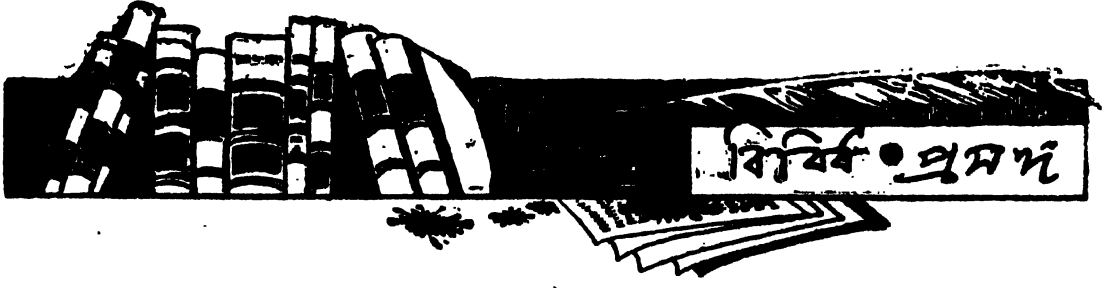
বঙ্গে নারীহরণ

গত ২১শে জুলাই বঙ্গের গবর্ণর ঢাকায় এক বক্তৃতায় বলেন যে, বঙ্গে নারীহরণাদি অপরাধের সংখ্যা বেশী দেখা যাইতেছে, কিন্তু সত্য সত্যই ঐরূপ অপরাধ বাড়িতেছে, না-কতকগুলি সমিতির ন্যায্য সুচেষ্টায় আগেকার চেয়ে অধিক-সংখ্যক অপরাধ পুলিসের ও সর্ব্বসাধারণের গোচর হইতেছে, তাহা বলা যায় না। ওরূপ অপরাধের সংখ্যা বাড়ুক বা না বাড়ুক, নারীহরণাদি অপরাধ যত ঘটিতেছে, তাহা অত্যন্ত দুঃখকর, উদ্বেগজনক ও লজ্জার বিষয়। গবর্ণর আরও বলেন, বঙ্গে যে ওরূপ অপরাধ অন্য প্রত্যেক প্রদেশের চেয়ে বেশী হয়, ঠিক করিয়া তাহা বলা যায় না। বঙ্গে সকল প্রদেশের চেয়ে ঐপ্রকার অপরাধ বেশী হউক বা না হউক, যাহা হয়, তাহাও বঙ্গীয় হিন্দু ও মুসলমানদের এবং ইংরেজ-রাজত্বের একটা গুরুতর কলঙ্ক।

১৯৩ সালের ৩০শে আগষ্ট বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভায় শ্রীযুক্ত কিশোরীমোহন চৌধুরীর একটি প্রশ্নের উত্তরে রীড সাহেব বলেন, "হাঁ, আমি মনে করি, আধুনিক কয়েক বৎসরে ঐরূপ অপরাধ বাড়িয়াছে।" এবৎসর কিন্তু ঐরূপ প্রশ্নের জবাবে ব্যবস্থাপক সভায় প্রেন্টিস্ সাহেব বলেন, "সংখ্যাগুলা বাড়ে কমে; তাহা হইতে নিশ্চিত সিদ্ধান্ত করা যায় না, যে, ঐরূপ অপরাধ বাড়িতেছে।"

নারীহরণ ভারতবর্ষের সব প্রদেশেই অল্পাধিক হয়; বেশী হয় বাংলা, পঞ্জাব, উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ এবং সিন্ধু দেশে। এই সব প্রদেশেরই অমুসলমানেরা ভীরু নহে, যদিও প্রত্যেকটিতেই তাহারা সংখ্যায় মুসলমানদের চেয়ে কম।

নারীহরণাদি নিবারণের জন্য গবর্মেণ্ট কি করিতেছেন, তাহার উত্তরে গবর্ণর তাঁহার পূর্ব্বোক্ত বক্তৃতায় বলেন, যে, ১৯৩০ সালে পুলিস-বিভাগের কর্ম্মচারীদিগকে একটি চিঠি লিখিয়া, ঐরূপ অপরাধ যাহারা করে, তাহাদিগকে দণ্ডিত করিবার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করিতে বলা হয়।" এই চিঠিতে যে কোন ফল হয় নাই তাহা ১৯৩২ সালের ৩০শে আগষ্টে প্রদত্ত রীড সাহেবের জবাব হইতে বুঝা যায়। অথচ ঐ বৎসর ৩০শে সেপ্টেম্বর যখন কুমার মুনীন্দ্রদেব রায় মহাশয় ব্যবস্থাপক সভায় প্রশ্ন করেন, যে, গবর্মেণ্ট এরূপ অপরাধ দমনার্থ কোন বিশেষ উপায় অবলম্বন করা সমীচীন মনে করেন কি-না, তখন রীড সাহেব কেবল পূর্ব্বোক্ত পুলিস-বিভাগীয় চিঠিটির উল্লেখ করেন। বর্ত্তমান বৎসর ২২শে আগষ্ট শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র রায় চৌধুরী ঐরূপ প্রশ্ন করিয়া কোন উত্তর পান নাই। তিনি ঐ দিন আর একটি প্রশ্ন করেন "নিম্ন আদালতসমূহকে এই প্রকার সব অপরাধের জন্য কঠিন শাস্তি দিতে উপদেশ দিবার নিমিত্ত গবর্মেণ্ট হাইকোর্টকে অনুরোধ করা পরামর্শসিদ্ধ কি-না বিবেচনা করিতেছেন কি?" উত্তরে প্রেন্টিস্ সাহেব বলেন, "না।" অথচ ঐ প্রেন্টিস সাহেবই ঐ দিন অন্য একটি প্রশ্নের উত্তরে বলেন, "গবর্মেণ্ট অবগত হইয়াছেন, যে, ঐরূপ অপরাধগুলার জন্য আইনে সর্ব্বোচ্চ যে দণ্ড আছে সাধারণতঃ তাহা অপেক্ষা কম শাস্তি দেওয়া হয়।"

ঐ রকম পৈশাচিক দৌরাত্ম্য খুব হইতেছে, গবর্মেণ্ট জানিয়াছেন তাহার জন্য আদালতসমূহ সাধারণতঃ আইন-নির্দ্দিষ্ট সর্ব্বোচ্চ দণ্ড দেয় না, অথচ গবর্মেণ্ট নূতন কোন উপায় অবলম্বন করা দূরে থাক, হাইকোর্ট দ্বারা নিম্ন আদালতগুলিকে আইনানুমোদিত কঠোরতর শাস্তি দিবার জন্য উপদেশও দেওয়াইতে চান না।

পাঠকেরা অবগত আছেন, যে, প্রায় ৫০ বৎসর পূর্ব্বে দলবদ্ধ হইয়া নারীহরণের জন্য, অষ্ট্রেলিয়ার নজীর অনুসারে, বিচারপতি সৈয়দ আমীর আলী প্রাণদণ্ডের ব্যবস্থা করিবার জন্য গবর্মেণ্টকে অনুরোধ করেন। গবর্মেণ্ট তাহাতে রাজী না-হওয়ায় তিনি ও অন্য কোন কোন জজ ঐ প্রকার

মোকদ্দমা তাঁহাদের নিকট আসিলেই উচ্চতম দণ্ড দিতেন। তাহাতে সুফল ফলিয়াছিল।

সম্প্রতি আমেরিকার ক্যান্সাস্ সিটির মেয়রের কন্যাকে উইলিয়ম ম্যাকগি নামক একটা লোক হরণ করায় তাহার প্রাণদণ্ড হইয়াছে। আমেরিকার গবর্ন্মেণ্ট এরূপ অপরাধ দমনার্থ দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইয়াছেন, এবং এই কাজের জন্য স্বতন্ত্র পুলিসবাহিনী গঠন করিতেছেন।

আমরা নারীহরণকারীদের প্রাণদণ্ড চাহিতেছি না, যদিও কোন কোন অপরাধের জন্য যদি প্রাণদণ্ড থাকে, তাহা হইলে এরূপ দুর্ব্বৃত্ততার জন্য প্রাণদণ্ড অন্যায় হয় না। আমরা চাহিতেছি, উহার জন্য যাবজ্জীবন কারাবাস, ভ্যাসেক্টমী, অপহৃতা নারীকে খুঁজিয়া না পাওয়া গেলে অপরাধীর সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করা, এবং অপহৃতা নারীকে নানাস্থানে লুকাইয়া লুকাইয়া ঘুরাইয়া বেড়াইলে যাহাদের বাড়িতে দুর্ব্বৃত্তেরা তাহাকে রাখে, দুর্ব্বৃত্তদের সহায়ক সেই দুর্ব্বৃত্ত আশ্রয়দাতাদেরও কঠোর শাস্তি।

নারীহরণ দমন করিবার জন্য গবর্ন্মেণ্টের আইন উক্ত প্রকার হওয়া উচিত। এই কার্য্যে যে-সব পুলিস কর্ম্মচারীর অবহেলা বা অযোগ্যতা প্রমাণিত হইবে, তাহাদেরও বিভাগীয় শাস্তি হওয়া উচিত।

গবর্ন্মেণ্ট সর্ব্বপ্রকারে সচেষ্ট না-হইলে এই পাপের দমন হওয়া কঠিন। কিন্তু কেবল গবর্ন্মেণ্টের উপর নির্ভর করিয়া থাকিলে চলিবে না। দেশের লোকদিগকে প্রাণপণ চেষ্টায় ইহার প্রতিকার করিতে হইবে। মুসলমান ও হিন্দু উভয় সম্প্রদায়ের লোক যত্নবান্ হইলে এই পাপের দমন কতকটা সহজ হয়। কিন্তু এক সম্প্রদায় কিছু করিতেছে না বলিয়া অন্য সম্প্রদায়ের নিশ্চেষ্ট থাকা সামাজিক মৃত্যুর তুল্য হইবে।

সর্ব্বোপরি নারীদিগকে জাগাইতে এবং উৎসাহিত করিতে হইবে। তাঁহাদের আত্মরক্ষা ও সতীত্বরক্ষা করিতে গেলে যদি অত্যাচারীর অঙ্গহানি বা প্রাণহানি হয়, তাহা করিবার আইনসঙ্গত ও ন্যায়সঙ্গত অধিকার অত্যাচরিতা নারীর আছে।

বঙ্গীয় প্রাদেশিক হিন্দুসভা বর্ত্তমান সেপ্টেম্বর মাসের প্রথম সপ্তাহটি নারীরক্ষা সপ্তাহ বলিয়া ঘোষণা করিয়াছেন। এই সপ্তাহে সর্ব্বত্র গ্রামে ও নগরে এই বিষয়টির প্রতি সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হইবে, এবং নারীরক্ষার জন্য এবং দুর্ব্বৃত্তদের বিরুদ্ধে মোকদ্দমা চালাইবার জন্য যে অর্থের প্রয়োজন হয়, তাহা সংগ্রহ করা হইবে। এই অত্যাবশ্যক কাজটির জন্য সামান্য দানও সামান্য নয়, খুব বেশী দানও অত্যধিক নহে। প্রত্যেকেরই কিছু দেওয়া চাই।

দুর্ব্বৃত্তেরা নানা ছলে নারীদিগকে পিত্রালয় ও শ্বশুরালয় হইতে হরণ করে। কখন বলে, তোমার মা পীড়িত, দেখা করিবে চল; কখন বা বলে, তোমার স্বামী পীড়িত, দেখা করিবে চল; কখন বা তীর্থ দেখাইবার লোভ দেখায়। এইরূপ নানা কথায় যাহাতে তাহারা প্রতারিত না হয়, তজ্জন্য বিহিত প্রচারকার্য্য সকল গ্রামে—বিশেষতঃ পূর্ব্ব ও উত্তর বঙ্গে এবং আসামে—হওয়া আবশ্যক।

—

স্যর বিপিনকৃষ্ণ বসু
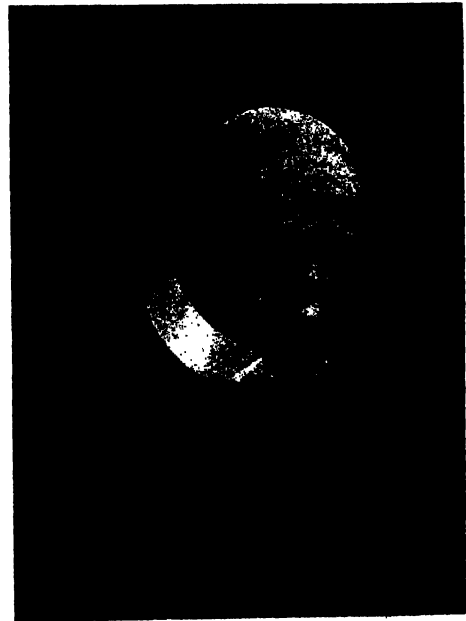
বাংলা দেশের বাহিরে যে-সব বাঙালী বঙ্গের নাম উজ্জ্বল

স্যর বিপিনকৃষ্ণ বসু

করিয়াছেন, স্যর বিপিনকৃষ্ণ বসু তাঁহাদের মধ্যে অন্যতম। তিনি ইস্কুল কলেজে শিক্ষা সমাপ্ত করিয়া কর্ম্মক্ষেত্রে প্রবিষ্ট হইবার সময় আগত হইলে মধ্যপ্রদেশকে তাঁহার কার্য্যক্ষেত্র নির্ব্বাচন করেন। তাঁহার রচিত একখানি মুদ্রিত আত্ম-

চরিত্র দেখিয়াছিলাম। তাহা হইতে অবগত হইয়াছিলাম, যে, তিনি কিছু দিন জব্বলপুরে ছিলেন। তাহার পর নাগপুরেই তাঁহার জীবন অতিবাহিত হয়। তিনি সুপণ্ডিত, এবং বিচক্ষণ আইনজীবী ছিলেন। বর্ত্তমান ভারতবর্ষীয় ব্যবস্থাপক সভা স্থাপিত হইবার পূর্ব্বে যে সুপ্রীম লেজিস্লেটিভ কৌন্সিল ছিল, তিনি কিছু কাল তাহার সভ্য ছিলেন। মধ্যপ্রদেশের ব্যবস্থাপক সভারও তিনি সভ্য ছিলেন। নাগপুর মিউনিসিপালিটীর তিনি এক জন প্রধান কর্ম্মী ছিলেন। নাগপুর বিশ্ববিদ্যালয় অনেকটা তাঁহার হাতে গড়া জিনিষ। তিনি উহার প্রথম ভাইস্-চ্যান্সেলার ছিলেন এবং একাধিক বার ঐ পদ অলঙ্কৃত করেন। মধ্যপ্রদেশের অন্য নানাবিধ সৎকার্য্যের সহিত তাঁহার কর্ম্মময় যোগ ছিল। ঐ প্রদেশে তিনি ঘরবাড়ি করিয়া তথাকার অধিবাসী হইয়াছিলেন, এবং তথাকার লোকেরাও তাঁহাকে আপনাদের একজন মনে করিত এবং শ্রদ্ধা ও সম্মান করিত। বিরাশী বৎসর বয়সে সম্প্রতি কলিকাতায় তাঁহার মৃত্যু হইয়াছে।

—

স্যর বিপিনকৃষ্ণ বসু সম্বন্ধে মধ্যপ্রদেশীয়দের মত

বাঙালী স্যর বিপিনকৃষ্ণ বসুর কৃতিত্ব সম্বন্ধে উচ্চ ধারণা পোষণ করা বাঙালীদের পক্ষে স্বাভাবিক। কিন্তু তিনি যে মধ্যপ্রদেশে ষাট বৎসর পরিশ্রম করিয়াছিলেন তথাকার অধিবাসীরাও তাঁহার সম্বন্ধে উচ্চ ধারণা পোষণ করায় কোন সন্দেহই থাকিতেছে না, যে, তিনি নানা দিক দিয়া সেই প্রদেশের অনেক উপকার করিয়াছেন। তথাকার নানা সরকারী ও বেসরকারী লোকদের এবং নানা সমিতির মত হইতে ইহা বুঝা যায়। এই সকল মত নাগপুরের "হিতবাদ" নামক ইংরেজী খবরের কাগজে বাহির হইয়াছে। উহা হইতে কতকগুলি তথ্য ও মত সংকলন করিয়া দিতেছি।

তিনি ১৮৭২ সালে জব্বলপুরের হিতকারিণী সভা উচ্চ বিদ্যালয়ের হেড্‌মাষ্টার হইয়া তথায় গমন করেন। তাঁহার স্বাস্থ্য ভাল ছিল না। জব্বলপুরে স্বাস্থ্যের উন্নতি হওয়ায় তিনি মধ্যপ্রদেশেই থাকিয়া যাইতে মনস্থ করেন, এবং পরে তথাকার রাজধানী নাগপুর যান।

তাঁহার মৃত্যুর পর নাগপুরের মিউনিসিপ্যাল আফিস, বিশ্ববিদ্যালয় আফিস, সমুদয় শিক্ষালয়, এবং হাইকো জেলা আদালতসমূহ বন্ধ করা হয়। হাইকোর্টের প্রধান জজ বলেন, তাঁহার জীবনের কার্য্যাবলী মধ্যপ্রদেশে অবিস্মরণীয় হইয়া থাকিবে।

"Sir Bipin was a great administrator, the imprint of which he has left on the Nagpur University, which was the crowning glory of his life." "The following epitaph may be inscribed on his tomb : 'Know ye that a prince among men has fallen'."

বার্ এসোসিয়েশুনের উপ-সভাপতি শ্রীযুক্ত এস্ ওয়াই দেশমুখ বলেন :—

"Sir Bipin was a maker of the history of this province and was among those who are to be enshrined for ever in their hearts."

অনেক নেতৃস্থানীয় লোকেই বলিয়াছেন, যে, তিনি মধ্যপ্রদেশে রাজনৈতিক, শিক্ষাবিষয়ক, সমাজসংস্কারবিষয়ক, এবং অন্য সকল রকম লোকহিতকর কার্য্যক্ষেত্রে প্রধান কিংবা অন্যতম প্রধান কর্ম্মী ছিলেন। তাঁহার নির্ম্মল চরিত্র, সত্যবাদিতা, নিজের নাম জাহির করিবার অপ্রবৃত্তি, তীক্ষ্ণ বুদ্ধি, সহকারিতার ভাব, একাগ্রতা, অধ্যবসায়, শ্রমশক্তি, এবং সকল কার্য্যক্ষেত্রে কিছু গড়িয়া তুলিবার প্রবৃত্তি ও শক্তির প্রশংসা অনেকেই করিয়াছেন। "হিতবাদ" কাগজের সম্পাদকীয় স্তম্ভে তাঁহার সম্বন্ধে অনেক কথা লিখিত হইয়াছে। তাহা হইতে কিছু উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি।

"Men of such intellectual eminence and public spirit as those of Sir Bipin were in those early times sorely needed at the centre, the metropolis, of the new province."

"New times will, of course, bring new men to the fore. But however great might be the gifts of the new generation of our young hopefuls, the qualities of steadiness of aim and purpose, the high degree of integrity and capacity for strenuous work which the subject of this short and inadequate notice displayed will be rare indeed." "There was no subject, too small or too great, there was no subject of importance, political, economic, educational or civic, relating to this Province, to which he had not contributed something of value." "To attempt to review the career of such a man as Sir Bipin would be almost tantamount to reviewing the history of the growth of this province during the last sixty years."...

"It would be a long time indeed before Nagpur produces a man even in a remote degree comparable to him."

—

বঙ্গের নানা জেলায় বন্যা

মেদিনীপুর, বীরভূম, মুর্শিদাবাদ, চট্টগ্রাম, নদীয়া, রাজশাহী প্রভৃতি জেলায় অতিবৃষ্টিজনিত বন্যা হইয়াছে। তাহার ফলে

অনেক গ্রাম জলমগ্ন হইয়াছে, ঘরবাড়ি পড়িয়া বা ভাসিয়া গিয়াছে, গোমহিষাদি গৃহপালিত পশুর মৃত্যু হইয়াছে, মানুষের মৃত্যু যে একেবারেই হয় নাই এরূপ বলা যায় না, না হইয়া থাকলেই ভাল। শস্যও সর্ব্বত্র বিস্তর নষ্ট হইবে। তাহাতে খাদ্যের দুষ্প্রাপ্যতা ঘটিবে। বন্যার দরুন নানাবিধ রোগের প্রাদুর্ভাবও হইবে। বিপন্ন লোকদের গৃহনির্ম্মাণ, অন্নবস্ত্রের ও চিকিৎসার বন্দোবস্ত, চাষের পশুক্রয় প্রভৃতির জন্য বিস্তর অর্থের প্রয়োজন হইবে। অর্থসংগ্রহের চেষ্টা হইতেছে। বাংলা দেশে বিশেষ করিয়া বাঙালী সাধারণ লোকদের হাতে টাকা বেশী নাই। গবর্ন্মেণ্টের এখন মুক্তহস্ত হওয়া উচিত। ভারত-গবর্ন্মেণ্ট বাংলা-গবর্ন্মেণ্টকে গরিব করিয়া রাখিয়াছেন। অন্য সব প্রদেশের চেয়ে বাংলা দেশ হইতেই সংগৃহীত রাজস্ব বেশী পরিমাণে লইয়া বাংলা সরকারকে দরিদ্র করা হইয়াছে। পাটরপ্তানী শুল্ক বসাইবার পর হইতে রাজস্বের কেবল ঐ আকর হইতেই ভারত-গবর্ন্মেণ্ট পঞ্চাশ কোটি টাকা লইয়াছেন। এখন তাহারই দু-চার কোটি বা এক আধ কোটি ফিরাইয়া দিলে বঙ্গের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা হইবে। কিন্তু যাঁহারা আইন-সঙ্গত শোষণ করেন, তাঁহাদের নিকট হইতে কৃতজ্ঞতার আশা করা দুরাশা। সুতরাং বাংলা-গবর্ন্মেণ্ট ভারত-গবর্ন্মেণ্টের নিকট ভিক্ষা করিয়া দেখুন।

মহেশচন্দ্র আতর্থী

শ্রীযুক্ত মহেশচন্দ্র আতর্থী মহাশয়ের মৃত্যুতে বাংলা দেশের নারীরক্ষকদের মধ্যে প্রধানতম কর্ম্মীর তিরোভাব হইল। বৃদ্ধ বয়সে তিনি যেরূপ উৎসাহ ও সাহসের সহিত এই কাজ করিতেন তাহা যুবকদের মধ্যেও অল্পই দেখা যায়। তিনি অনেকগুলি হিন্দু-বিধবার বিবাহ দিয়াছিলেন। "সঞ্জীবনী" সত্যই লিখিয়াছেন :--

বাংলা দেশে যাঁহারা নরসেবাপরায়ণ ও ভগবদ্ভক্ত কর্ম্মবীর বলিয়া বিখ্যাত মহেশচন্দ্র আতর্থী তাঁহাদের অন্যতম ছিলেন। আমরা শোকদগ্ধ হৃদয়ে প্রকাশ করিতেছি যে, গত মঙ্গলবার অপরাহ্ণ আড়াই ঘটিকার সময় তিনি দেহত্যাগ করিয়া অমরলোকে গমন করিয়াছেন।

মহেশচন্দ্র জেনারেল পোষ্টাফিসে কাজ করিতেন। ১৯২৪ খৃষ্টাব্দে

মহেশচন্দ্র আতর্থী

নারীরক্ষা সমিতি প্রতিষ্ঠিত হয়। তিনি রাজকার্য্য হইতে অবসর গ্রহণ করিয়া ১৯২৭ খৃষ্টাব্দে নারীরক্ষা সমিতির কার্য্যে আত্মোৎসর্গ করেন।

১৮৯১ সালে গিরিজা নাম্নী একটি বালিকা বেথুন স্কুলে পড়িত। কোন যুবক তাহাকে বিপথগামিনী করিবার জন্য পাগল হইয়া উঠে। তাহার বাঞ্ছা পূর্ণ না হওয়াতে একদিন গিরিজা যখন স্কুলের গাড়ী হইতে নামিতেছিল, তখন ঐ যুবক তাহাকে আক্রমণ করে। মহেশচন্দ্র নিকটেই থাকিতেন, তিনি বালিকার উদ্ধারের জন্য দৌড়াইয়া যান। যুবক তাহার মস্তকে অস্ত্রাঘাত করে। তিনি রক্তাক্ত কলেবর হন, তবু বালিকাকে ছাড়িয়া দেন নাই। তিনি বালিকাকে যুবকের কবল হইতে উদ্ধার করিয়াছিলেন। মহেশচন্দ্র বহুদিন ছুরিকাঘাতের জন্য শয্যাশায়ী ছিলেন। মৃত্যুকাল পর্য্যন্ত তাঁহার কপালে গভীর আঘাতের চিহ্ন ছিল।

নারীরক্ষা সমিতির কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়া তিনি বাংলার বহু জেলায় গমন পূর্ব্বক বহু অপহৃতা নারীকে উদ্ধার করিয়াছিলেন। বহু নারী-হরণকারীকে রাজদ্বারে উপস্থিত করিয়া তাহাদিগকে দণ্ডনীয় করিয়াছিলেন।

শান্তিনিকেতনে দ্বিজেন্দ্রনাথ ও মহাত্মা গান্ধী

শান্তিনিকেতনে রবীন্দ্রনাথ ও মহাত্মা গান্ধী
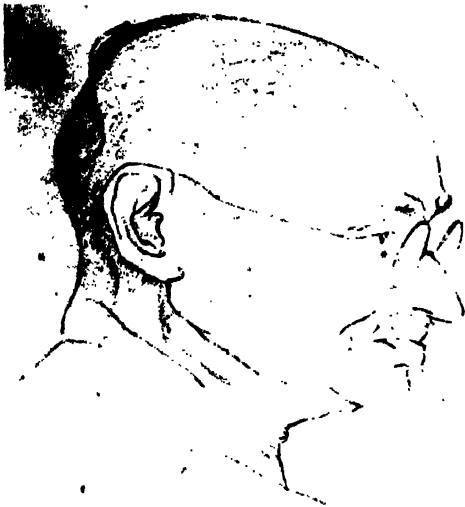
মহাত্মা গান্ধী
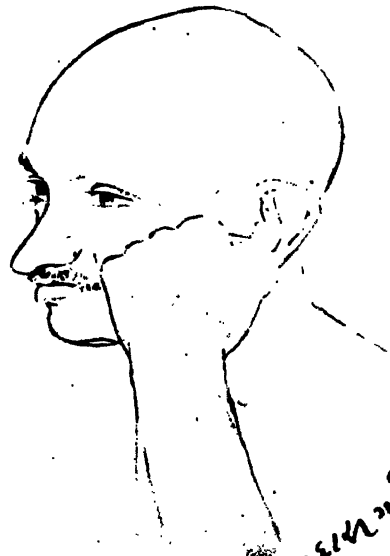
শ্রীকনু দেশাই কর্তৃক অঙ্কিত রেখাচিত্র হইতে তাঁহার সৌজন্যে

স্যর রাজেন্দ্রনাথের একটি প্রশংসা

স্যর রাজেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের অশীতিতম জন্মোৎসব উপলক্ষ্যে তিনি নানা শ্রেণীর ও মতের বাঙালীদের দ্বারা অভিনন্দিত ও প্রশংসিত হইয়াছিলেন। বঙ্গের বাহিরে অবাঙালীদের দ্বারাও তিনি প্রশংসিত হইয়াছেন। তাহার একটি দৃষ্টান্ত এলাহাবাদের লীডার কাগজে সম্পাদকীয় প্রশংসা। এই কাগজটির স্বত্বাধিকারীরা ও সম্পাদকগণ বাঙালী নহেন। ইহাতে যথাসময়ে লিখিত হইয়াছিল :—

Bengal has produced giants among men—celebrities who achieved imperishable fame in varied fields of human endeavour, in law and letters, in philosophy and science, and in art and education. And it was left to Sir Rajendra Nath Mookerjee to establish that in hard-headed business maters, too, the Bengalees did not lag behind any other race in India. The position he has long ago established for himself as a captain of industry and commerce is at once alike an eloquent refutation of the general charge that the Bengali is only a bundle of emotions and an illustration of Indian enterprise. He has been described as a self-made man and as the architect of his own fortune. One can, therefore, hardly underrate the significance of his message when he says that 'self-reliance and a resolute determination form the paving stones of the road to success', and that in spite of apparent failures 'persistency and renewed efforts ultimately bear fruit'. Sir Rajendra Nath himself is one of the greatest living examples of the above dictum, which deserves to be treated as a national motto. At eighty, he is, as the saying goes, still in the saddle. May he have many more years of happy and active life.

—

উপবাসে বিপৎসম্ভাবনায় মহাত্মাজীর মুক্তি

মহাত্মা গান্ধীকে অনুন্নত হিন্দুদের হিতার্থে কাজ করিবার নিমিত্ত পূর্ব্বে জেলে থাকিতে যেমন অবাধ সুবিধা দেওয়া হইয়াছিল, তাঁহার শেষ কারাদণ্ডের পর তাঁহাকে ততটা সুবিধা না-দেওয়ায় তিনি বলেন, যে, ইহা তাঁহার কাজ করিবার পক্ষে যথেষ্ট নহে, অনুন্নত হিন্দুদের সেবা তাঁহার প্রাণবায়ুর মত একান্ত আবশ্যক বলিয়া তিনি তদ্ব্যতিরেকে বাঁচিতে পারেন না, এবং সেই জন্য তিনি প্রায়োপবেশন করিতেছেন। গবর্মেণ্ট তাঁহার উপবাসের কয়েক দিন পর্য্যন্ত অটল ছিলেন। তাহার পর যখন দেখিলেন, যে, অতঃপর হয় তাঁহাকে জোর করিয়া খাওয়াইতে হইবে নয় তাঁহার মৃত্যু হইবে, তাঁহার শারীরিক অবস্থা এইরূপ হইয়াছে, তখন গবর্ণমেণ্ট তাঁহাকে মুক্তি দিলেন।

গান্ধীজী তাঁহার স্বাভাবিক স্বাস্থ্য ফিরিয়া পাইলে আবার কোন-না-কোন প্রকারে কোন-না-কোন আইন অমান্য করিতে পারেন, সুতরাং আবার তাঁহার কারাদণ্ড হইতে পারে ও কারাগারে অনুন্নতহিন্দুসেবার অবাধ সুবিধা না পাইলে তিনি আবার প্রায়োপবেশন করিতে পারেন। এই জন্য, গবর্মেণ্ট তাঁহাকে তাঁহার শেষ কারাদণ্ডের পর তাঁহার অনুন্নতহিন্দুসেবার সুযোগ কেন সীমাবদ্ধ করিয়াছিলেন, তাহার প্রধান প্রধান কারণগুলির যুক্তিসঙ্গততা পরীক্ষা করা আবশ্যক।

গবর্মেণ্ট বলেন, মিঃ গান্ধীকে এবারেও যথেষ্ট সুবিধা দেওয়া হইয়াছিল। কিন্তু সেবার কাজ যাঁহার করিবার কথা তাঁহার মতে উহা যথেষ্ট নহে; যথেষ্ট হইলে কেবল জেদ বশতঃ কিংবা গবর্মেণ্টকে পরাজিত করিবার উদ্দেশ্যে তিনি বলিতেন না, যে, উহা যথেষ্ট নহে। তদ্ভিন্ন, গবর্মেণ্ট আগে যখন তাঁহাকে অবাধ সুবিধা দিয়াছিলেন, ইহা বুঝিয়াই তাহা তাঁহাকে দিয়াছিলেন, যে, সুবিধা অবাধ না হইলে মহাত্মাজী অনুন্নত-হিন্দুসেবা যথেষ্টরূপে করিতে পারিবেন না। গবর্মেণ্ট গত বৎসর (১৯৩২) ৩রা নবেম্বর যে হুকুম জারি করেন, তাহাতে ইহা স্পষ্ট স্বীকৃত হইয়াছে। যথা—

The Government of India recognize in view of the considerations stated in Mr. Gandhi's letters of October 18 and 24 that, if he is to carry out the programme he has set before himself in regard to the removal of untouchability which they had not before fully appreciated, it is necessary that he should have freedom in regard to visitors and correspondence on matters strictly limited to the removal of untouchability.

They also recognize that if Mr. Gandhi's activities in this matter are to be fully effective, there can be no restriction on publicity.

They do not wish to interpose obstacles to Mr. Gandhi's efforts in connection with the problem of untouchability. They are removing all restrictions on visitors, correspondence and publicity in regard to matters which in Mr. Gandhi's own words have no reference to civil disobedience and are strictly limited to the removal of untouchability.

They note that Mr. Gandhi contemplates the presence of officials at interviews and inspection then and there of the correspondence, should the Government at any time consider such procedure as desirable.

এই সরকারী হুকুম হইতে বুঝা যাইবে, যে, গবর্মেণ্ট বাহিরের লোকদের সহিত সাক্ষাৎকার, তাহাদের সহিত পত্রব্যবহার, এবং গান্ধীজীর মত প্রকাশ ও প্রচার সম্বন্ধে সমুদয় বাধানিষেধ রদ করিয়াছিলেন সেই সব বিষয়ে, যাহা সুস্পষ্টরূপে অস্পৃশ্যতাদূরীকরণবিষয়ক এবং যাহাদের সহিত

নিরুপদ্রব আইনলঙ্ঘনের কোন সম্পর্ক নাই। গবর্মেণ্ট কখনও বাঞ্ছনীয় মনে করিলে গান্ধীজীর সহিত অপরের সাক্ষাৎকারের সময় সরকারী কর্ম্মচারীরা উপস্থিত থাকিবে এবং তাঁহার ও তাঁহাকে লিখিত পত্রসমূহ প্রাপ্তি ও প্রেরণের সময়ই সরকারী কর্ম্মচারীদের দ্বারা পরীক্ষিত হইবে, গান্ধীজী ইহাতে সম্মত ছিলেন।

এবার গবর্মেণ্ট যে গান্ধীজীর সুবিধা অবাধ না রাখিয়া সীমাবদ্ধ করিয়াছিলেন, গবর্মেণ্টকর্ত্তৃক উল্লিখিত তাহার প্রধান কারণগুলি আলোচ্য।

একটা কারণ এই, যে, তখন গান্ধীজী ছিলেন রাজবন্দী (State prisoner), এবার হন সাধারণ বন্দী। কিন্তু গান্ধীজী বলিয়াছেন, সেবার গবর্মেণ্ট যে তাঁহাকে অবাধ সুবিধা দিয়াছিলেন, তাহা তাঁহার ন্যায্য পাওনা বলিয়াই দিয়াছিলেন, তিনি রাজবন্দী বলিয়া দেন নাই। তা ছাড়া, বোম্বাই-গবর্মেণ্ট এবারেও ত তাঁহাকে রাজবন্দীই রাখিতে পারিতেন। তাঁহাকে ছাড়িয়া দিয়া হুকুম দেওয়া হইল, তিনি পুনা ছাড়িয়া কোথাও যাইতে পারিবেন না। জানাই ছিল, তিনি এ হুকুম মানিবেন না। তিনি হুকুম মানিলেন না, বিচার হইল, এক বৎসর অশ্রম কারাদণ্ড হইল। এমন মনে করাও ত যুক্তিসঙ্গত ও ন্যায়সঙ্গত হইতে পারে, যে, তিনি এবার সাধারণ বন্দী অতএব রাজবন্দীর সুবিধা পাইতে পারেন না, এই ওজুহাতটা উপস্থিত করিবার সুবিধা সৃষ্টি করিবার জন্যই বোম্বাই-গবর্মেণ্ট তাঁহাকে ছাড়িয়া দিয়া এমন একটা হুকুম দিলেন যাহা তিনি অমান্য করিবেন জানা ছিল ও যাহা অমান্য করায় তিনি বিচারিত সাধারণ বন্দী বলিয়া পরিগণিত হইলেন।

তিনি রাজবন্দী বলিয়াই যদি বোম্বাই-গবর্মেণ্ট তাঁহাকে আগে অবাধ সুবিধা দিয়া থাকেন, তাহা হইলে গবর্মেণ্টকে দেখাইতে হইবে, যে, রাজবন্দীদিগকে এরূপ সুবিধা দিবার ব্যবস্থা আছে এবং গান্ধীজী ছাড়া অন্ততঃ অন্য এক জন রাজবন্দীকেও কখনও এরূপ সুবিধা দেওয়া হইয়াছিল। গবর্মেণ্ট তাহা দেখাইতে পারিবেন না। প্রকৃত কথা এই, যে, গান্ধীজী গান্ধীজী বলিয়াই তাঁহাকে সুযোগ দেওয়া হইয়াছিল ও হইয়া থাকে।

গবর্মেণ্টের আর এক যুক্তি এই, যে, তখনকার অবস্থায় গান্ধীজীকে যত সুবিধা দেওয়া হইয়াছিল, বর্ত্তমান অবস্থায় তত দেওয়া যায় না, বা দেওয়া অনাবশ্যক। গবর্মেণ্ট অস্পৃশ্যতার অবস্থা অনুসারেই গান্ধীজীকে তাহা দূরীকরণের চেষ্টা করিবার সুযোগ দিয়াছিলেন। অস্পৃশ্যতা তখন ছিল, এখনও আছে, অতি সামান্যমাত্র কমিয়াছে। সুতরাং এখনও উহা দূরীকরণের নিমিত্ত গান্ধীজীর পূর্ণ শক্তি প্রয়োগ করিবার অবাধ সুবিধা পাওয়া আবশ্যক।

রাজনৈতিক অবস্থার পরিবর্ত্তন অবশ্য হইয়াছে, কিন্তু গবর্মেণ্ট ত সেটাকে একটা যুক্তি রূপে উপস্থিত করেন নাই। আগে যখন গান্ধীজীকে অস্পৃশ্যতাদূরীকরণ আন্দোলন জেল হইতে চালাইবার সুযোগ দেওয়া হয়, তখন নিরুপদ্রব আইনলঙ্ঘন প্রচেষ্টা কতকটা ব্যাপকভাবে চলিতেছিল। জেল হইতে গান্ধীজী অন্য কাজে মন দেওয়ায় কংগ্রেস-ওয়ালারা অনেকে আইনলঙ্ঘন ছাড়িয়া অস্পৃশ্যতাদূরীকরণে লাগিয়া গেল। ইহাতে গবর্মেণ্ট নিশ্চয়ই অখুশী হন নাই। এখন আইনলঙ্ঘন প্রচেষ্টা কংগ্রেসকর্ত্তৃপক্ষ কার্য্যতঃ বন্ধ করিয়া দিয়াছেন, কংগ্রেস ভাঙিয়া দিয়াছেন বলিলেও চলে। সুতরাং আগেকার বারে যদি কংগ্রেসওয়ালাদের শক্তিকে প্রকারান্তরে আইনলঙ্ঘন প্রচেষ্টা হইতে অন্য দিকে চালিত করিবার প্রয়োজন গবর্মেণ্ট অনুভব করিয়া থাকেন, এবারে সেরূপ কোন প্রয়োজন নাই। অবস্থার পরিবর্ত্তন এই প্রকারে হইয়াছে বটে। কিন্তু গবর্মেণ্ট ত বলিতেছেন না, যে, তাঁহারা এই কারণে গান্ধীজীকে পূর্ব্বাপেক্ষা কম সুবিধা দিবার প্রস্তাব করিয়াছিলেন।

গবর্মেণ্ট পক্ষের আর এক যুক্তি, জেলের ডিসিপ্লিন্ অর্থাৎ নিয়মানুবর্ত্তিতা রক্ষা করা দরকার। কিন্তু অন্য কয়েদীদিগকে যতটুকু ও যে-প্রকারের সুবিধা দেওয়া হয়, গান্ধীজীকে তার চেয়ে কিছু বেশী ও অন্য প্রকার সুবিধা দিলেই যে নিয়মলঙ্ঘন হইবে। তাঁহাকে অবাধ সুবিধা দিলে যেমন অন্য কয়েদীরা দেখিবে, যে, তিনি নিয়মের বাহিরে অ-সাধারণ কয়েদী, সীমাবদ্ধ সুবিধা দিলেও তেমনি দেখিবে যে তিনি নিয়মের বাহিরে অ-সাধারণ কয়েদী।

আর একটা কথা গবর্মেণ্ট বলিয়াছেন, যে, তিনি যে-কয়দিন জেলের বাহিরে, স্বাধীন ছিলেন, তখন তত অধিকাংশ সময় ও শক্তি অনুন্নতহিন্দুসেবায় নিয়োগ করেন নাই।

এই সরকারী যুক্তির গূঢ় উদ্দেশ্য এই, যে, গান্ধীজী ত জেলের বাহিরে পুরামাত্রায় উক্ত সেবার কাজ করেন না, তাহা না করাতেও বাঁচিয়া থাকেন, সুতরাং জেলের বাহিরে যাহা তাঁহার প্রাণবায়ুবৎ নহে, জেলে আবদ্ধ হইলেই তাহা তাঁহার প্রাণবায়ু হইতে পারে না। ইহার উত্তরে গান্ধীজী বলিয়াছেন, তিনি যে-কয়দিন স্বাধীন ও কর্ম্মক্ষম ছিলেন তাহার অধিকাংশ সময় অনুন্নতহিন্দুসেবাতেই নিযুক্ত করিয়া ছিলেন। তা ছাড়া, গান্ধীজী যাহা প্রয়োগ করেন নাই, এরূপ যুক্তিও আছে। গান্ধীজী এমন কোন প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইয়া জেল হইতে খালাস পান নাই, যে, অনুন্নত-হিন্দুসেবা ভিন্ন অন্য কোন কাজ করিবেন না। তাঁহার মত লোকের স্বাধীন অবস্থায় নানা গুরুতর কাজ জোটে যাহা ফেলিয়া রাখা যায় না—যেমন কংগ্রেসের কাজ গুটান, সবরমতী আশ্রম গুটান। জেলে তাঁহার এসব উপজীব্য জুটিতে পারে না। সুতরাং সেখানে অনুন্নতহিন্দুসেবা তাঁহার প্রাণবায়ুবৎ মনে হওয়া নিতান্ত আশ্চর্য্যের বিষয় নহে।

গবর্মেণ্ট এবার তাঁহাকে মুক্তি দিবার আগে এই প্রস্তাব করিয়াছিলেন, যে, যদি তিনি বলেন আর আইনলঙ্ঘন প্রচেষ্টার সঙ্গে কোন সম্পর্ক রাখিবেন না, তাহা হইলে তাঁহাকে তৎক্ষণাৎ খালাস দেওয়া হইবে। গবর্মেণ্ট তাঁহাকে কেন এত খেলো মনে করিলেন, বুঝা কঠিন।

—

গবর্মেণ্টের গান্ধী সমস্যা

গবর্মেণ্টের নানা সমস্যার মধ্যে গান্ধীজীও একটি। গবর্মেণ্টের কার্য্যাবলী ও কার্য্যপদ্ধতি দেখিলে মনে হয়, তাঁহারা যেন গান্ধীজীকে ও সর্ব্বসাধারণকে ক্রমাগত বুঝাইতে চাহিতেছেন, যে, তিনি আর দশ জন মানুষের মত এক জন মানুষ, জেলেও তিনি এক জন সাধারণ কয়েদী, কিন্তু তিনি যেন সরকার বাহাদুরকে কার্য্যতঃ স্বীকার করাইতেছেন, যে, তাঁহার বিশেষত্ব ও অসাধারণত্ব আছে!

—

অনুন্নতহিন্দুসেবা সম্বন্ধে গান্ধীজীর মনোভাব

অনুন্নতহিন্দুসেবাকে জীবনের শ্রেষ্ঠ কাজ মনে করিয়া স্বাধীন অবস্থাতে গান্ধীজী কেবল তাহাই বা প্রধানতঃ তাহাই করিতে পারেন। কেহ তাহাতে বাধা দিতে পারে না। সুতরাং তিনি স্বাধীন থাকিবার সময় তাঁহার এরূপ কথা বলিবার উপলক্ষ্য ঘটিতে পারে না, যে, উক্ত সেবাকার্য্য তাঁহার প্রাণবায়ুস্বরূপ, তাহা করিতে না পাইলে তিনি বাঁচিবেন না। জেলে তিনি লোকহিতকর কেবল ঐ কাজটি করিবার সরকারী অনুমতি পাইয়াছিলেন—প্রথমতঃ অবাধভাবে, সম্প্রতি সর্ত্তাধীনভাবে। সেই জন্য উহা তাঁহার প্রাণবায়ুবৎ মনে হওয়া স্বাভাবিক। উহা অতি শ্রেষ্ঠ কাজ বটে। কিন্তু "উহা করিতে না পাইলে আমি না-খাইয়া মরিব", এরূপ প্রতিজ্ঞা করা তাঁহার মত ঈশ্বরবিশ্বাসী লোকের যোগ্য হইয়াছিল বলিয়া আমরা মনে করি না। তিনি নিজে নিজের স্রষ্টা নহেন, সুতরাং নিজের প্রাণ এই প্রকারে নষ্ট করিবার অধিকার তাঁহার নাই। কোন মহৎ কাজ করিতে গিয়া যদি মৃত্যু আসে আসুক, মৃত্যুর ভয়ে বা মৃত্যু নিশ্চিত জানিয়াও তাহা হইতে নিরস্ত হওয়া উচিত নহে। দ্বিজেন্দ্রলালের "নন্দলালে"র মত দেশহিতার্থ প্রাণটাকে বাঁচাইয়া রাখাও উচিত নহে। কিন্তু বিশেষ কোন একটি সুযোগ না পাইলে আমি মরিব, এরূপ প্রতিজ্ঞা করায় ঈশ্বরের বিধাতৃত্বে কার্য্যতঃ অবিশ্বাস প্রদর্শন করা হয়। কেন-না, সেই সুযোগটি আপাততঃ না মিলিলেও ভগবৎ-কৃপায় পরে তাহা কিংবা তাহা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ সুযোগ মিলিতে পারে। তাহা মিলুক, বা না-মিলুক সকলেরই মনে রাখা উচিত, "They also serve who only stand and wait." "যাহারা প্রভুর আদেশের অপেক্ষায় দাঁড়াইয়া থাকে, তাহারাও সেবা করে।" সেই আদেশ না-পাওয়া পর্য্যন্ত ভক্ত সাধকেরা ধ্যানধারণায় কালযাপন করিতে পারেন। গান্ধীজী অবশ্য মনে করেন, তিনি প্রায়োপবেশনের প্রত্যেক বারই ভগবৎপ্রত্যাদেশে তাহা করিয়াছেন। তাঁহার সেরূপ ধারণা সত্য না ভ্রান্ত, তাহা বলিবার অধিকার আমাদের নাই। কিন্তু মহত্তমেরও কার্য্যের ও উক্তির যুক্তিযুক্ততা আলোচনা করিবার অধিকার ক্ষুদ্রতমেরও আছে। মহাত্মা গান্ধীর মত নেতার দৃষ্টান্তের অনুসরণ অনেকেই করেন বলিয়া তাঁহার কার্য্যের আলোচনা করা কর্ত্তব্যও বটে। সেই জন্য আমরা সঙ্কোচের সহিত সেই কর্ত্তব্য পালন করিতেছি।

তাঁহাকে মুক্তি দিতে মহাত্মা গান্ধী গবর্মেণ্টকে বাধ্য করিবার জন্য যদি প্রায়োপবেশন করিতেন, তাহা হইলে তাঁহার উপবাসের আলোচনা সেই দিক্ দিয়া করিতাম; কিন্তু তিনি নিজেই বলিয়াছিলেন তাঁহার উপবাসের উদ্দেশ্য তাহা ছিল না—

> "I do indeed want permission, but only if the Government believe that justice demands it and not because I propose to deprive myself of food if it is not granted. That deprivation is intended for my consolation."

> "আমি বাস্তবিক [অনুন্নতহিন্দুসেবা করিবার] অনুমতি চাই বটে; কিন্তু যদি গবর্মেণ্ট মনে করেন ন্যায়ত ঐ অনুমতি আমার প্রাপ্য তাহা হইলেই উহা চাই, অনুমতি প্রদত্ত না হইলে আমি উপবাস করিব এ কারণে আমি গবর্মেণ্টকে অনুমতি দিতে বলি না। উপবাস শুধু আমার সান্ত্বনার জন্য।"

মহাত্মা গান্ধী অনেকবার বলিয়াছেন, তিনি উপবাস দ্বারা গবর্মেণ্টের উপর বা দেশের লোকদের উপর চাপ দিতে চান না। কিন্তু তাঁহার উদ্দেশ্য যাহাই হউক, উভয়ের উপরই তাঁহার উপবাসের চাপ পড়িয়া থাকে।

বন্যায় অপেক্ষাকৃত স্থায়ী প্রতিকার

বন্যায় বিপন্ন লোকদের গ্রাস আচ্ছাদন গৃহ চিকিৎসা এই সকলের ব্যবস্থা হওয়া কর্ত্তব্য এবং তাহা অল্প বা অধিক পরিমাণে হইয়া থাকে। কিন্তু অপেক্ষাকৃত স্থায়ী প্রতিকার করা অসম্ভব নহে। তাহার চেষ্টা জার্ম্মেনী, আমেরিকা, ফ্রান্স প্রভৃতি নানা দেশে হইতেছে। কি প্রকারে তাহা হইতে পারে, সেই বিষয়ে অধ্যাপক মেঘনাদ সাহা মডার্ণ রিভিউ কাগজে একটি প্রবন্ধ লিখিয়াছিলেন। আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়ের সংবর্দ্ধনার্থ যে বহিখানি প্রকাশিত হইয়াছে, তাহাতে অধ্যাপক সাহা ঐবিষয়ে একটি বিস্তৃততর প্রবন্ধ লিখিয়াছেন। উহা ভারতবর্ষের সকল প্রদেশের লোকদের ও গবন্মে´ন্টসমূহের পড়া ও কাজে লাগান উচিত; কারণ বন্যা সব প্রদেশেই হয়।

নারীহরণ সম্বন্ধে "মুসলমান" কাগজের উক্তি

গত ২৮শে জুলাইয়ের সাপ্তাহিক "মুসলমান" কাগজ নারীহরণ বিষয়টির আলোচনা উপলক্ষ্যে সদুপদেশ দিয়াছেন এবং হিন্দু সমাজের দোষ উদ্‌ঘাটন করিয়াছেন। হিন্দুসমাজের প্রকৃত দোষত্রুটির উল্লেখ যিনিই করুন, তাহাতে আপত্তি হওয়া উচিত নয়। কিন্তু হিন্দুসমাজের দোষ দেখিতে, দেখাইতে এবং তাহার প্রতিকার ও সংশোধন করিতে যত হিন্দু যত্নবান, মুসলমান সমাজের দোষত্রুটি দেখিতে, দেখাইতে ও সংশোধন করিতে তত মুসলমান যত্নবান্ কিনা, মুসলমান সমাজহিতৈষী মুসলমানগণ তাহাও বিবেচনা করিবেন।

"মুসলমান" লিখিয়াছেন :—

"So far as the cases of abduction are concerned, they are less frequent in the Muslim community on account of the provision of widow-marriage made by the Muslim law."

তাৎপর্য্য। "মুসলমানী সমাজবিধিতে বিধবাবিবাহের ব্যবস্থা থাকায় মুসলমান সমাজে নারীহরণের সংখ্যা অপেক্ষাকৃত কম।"

মুসলমানদের দ্বারা মুসলমান-সমাজের নারী কম অপহৃতা হয়, ইহা সব সময়ে সত্য নহে। গত খ্রীষ্টীয় ১৯৩২ সালে ২৫শে আগষ্ট বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভায় শ্রীযুক্ত কিশোরীমোহন চৌধুরীর কতকগুলি নারীহরণবিষয়ক প্রশ্নের উত্তরে স্বরাষ্ট্র-সচিব মাননীয় রীড সাহেব একটি বিস্তারিত বিবরণ ব্যবস্থাপক সভার লাইব্রেরীর টেবিলে স্থাপন করেন। উহা খুব লম্বা বলিয়া সমস্তটি কোন কাগজে বাহির হয় নাই, কিন্তু চুম্বক দেশী বাংলা ও ইংরেজী অনেক কাগজে বাহির হইয়াছিল। বিবরণটিতে কলিকাতা ও বঙ্গের প্রত্যেক জেলায় মোট অপহরণের সংখ্যা, লাঞ্ছিতা হিন্দুনারীর সংখ্যা, লাঞ্ছিতা মুসলমান নারীর সংখ্যা, দুর্বৃত্ত মুসলমানের দ্বারা লাঞ্ছিতা হিন্দুনারীর সংখ্যা, দুর্বৃত্ত হিন্দুদ্বারা লাঞ্ছিতা হিন্দুনারীর সংখ্যা, দুর্বৃত্ত মুসলমানের দ্বারা লাঞ্ছিতা মুসলমান-নারীর সংখ্যা, দুর্বৃত্ত হিন্দুদ্বারা লাঞ্ছিতা মুসলমান-নারীর সংখ্যা, হিন্দুমুসলমান দুর্বৃত্তদের দ্বারা লাঞ্ছিতা নারীর সংখ্যা, দণ্ডিত আসামীদের সংখ্যা, ইত্যাদি বৃত্তান্ত ১৯২৬ হইতে ১৯৩১ পর্য্যন্ত ছয় বৎসরের জন্য দেওয়া হইয়াছিল। সকল সংখ্যা দিবার স্থান নাই, প্রয়োজনও নাই। "মুসলমান" কাগজ মুসলমান-নারী বেশী অপহৃতা হয় না লিখিয়াছেন, সেই জন্য তাহাদের সংখ্যাই ১৩৩৯ সালের ১১ই ভাদ্র তারিখের "বঙ্গবাণী" হইতে দিতেছি।

দুর্বৃত্ত মুসলমান দ্বারা লাঞ্ছিতা মুসলমান নারী

সাল।	১৯২৬।	১৯২৭।	১৯২৮।	১৯২৯।	১৯৩০।	১৯৩১
সংখ্যা।	৪৮০	৫৬৮	৬৫৩	৬৫৩	৫২৬	৫৬৪

দুর্বৃত্ত হিন্দু দ্বারা লাঞ্ছিতা মুসলমান নারী

সাল।	১৯২৬।	১৯২৭।	১৯২৮।	১৯২৯।	১৯৩০।	১৯৩১
সংখ্যা।	৯	৩	১০	৮	৬	৮

তাহা হইলে দেখা যাইতেছে, যে, ঐ ছয় বৎসরে পুলিস ৩৪৮৮টি মুস্লিম নারীর অপহরণের নালিশ পাইয়াছিল বা লিপিবদ্ধ করিয়াছিল।

১৩৩৯ সালের ১৬ই ভাদ্র তারিখের 'সঞ্জীবনী' অনুসারে ঐ ছয় বৎসরে নিগৃহীতা হিন্দু-নারীর মোট সংখ্যা ৩৪৯৯, নিগৃহীতা মুসলমান-নারীর মোট সংখ্যা ৩৫১৩।

থানায় নালিশ করিলেও পুলিস তাহা লিখিয়া লয় না বা তদন্ত করে না, সংবাদপত্রে এরূপ অভিযোগ বিরল নহে। অধিকন্তু, যত নারী অপহৃতা হয় তাহার সমুদয় সংবাদ থানায় পৌছে না, কম অংশই পৌছে। হিন্দু ও মুসলমান উভয় সমাজের লোকই এরূপ সংবাদ থানায় দিতে অধিক বা অল্প অনিচ্ছুক। হিন্দুসমাজে জাতি যাইবার ভয় থাকায় এবং লাঞ্ছিতা নারীর পরিত্যক্তা হইবার ভয় থাকায় হিন্দু নারীহরণের সংবাদ থানায় পৌছে আরও কম।

কাহারা "অনুন্নত" পদবী চায় না

বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভায় প্রশ্নের উত্তরে সরকার পক্ষ হইতে বলা হইয়াছে, যে, বঙ্গের নিম্নলিখিত জাতিসমূহ অনুন্নত শ্রেণীসমূহের অন্তর্ভূত হইতে আপত্তি জানাইয়াছে—বাগদী, ভুঁইমালী, ধোবা, হাড়ী, জালিক কৈবর্ত্ত, ঝালো মালো বা মালো, কালোয়ার, কপালী, খণ্ডাইত, কোন্‌ওআর, লোধা, লোহার, মল্ল, মুচী, নাগর, নমঃশূদ্র, নাথ, মুনিয়া, ওরাওঁ, পোদ, পুণ্ড্রী, রাজবংশী, রাজু, শাগিদপেশা, সুকলী, ও শুঁড়ী।

বাংলা-গবন্মে´ণ্ট গত ১৭শে জানুয়ারী অনুন্নত জাতি-সমূহের বিবেচনাধীন ও পরিবর্ত্তনসাপেক্ষ যে তালিকা প্রকাশ করেন, তাহাতে লেখা ছিল, যে, তেলী ও কলু প্রভৃতি কয়েকটি জাতিকে ঐ বর্গ হইতে বাদ দেওয়া হইয়াছে, কারণ তাহারা তালিকাভুক্ত হইতে আপত্তি করিয়াছিল। এইরূপ বাদ দেওয়া ন্যায়সঙ্গত হইয়াছিল। সেই নজীর অনুসারে, অন্য যে-সকল জাতি অনুন্নত অভিহিত হইতে চায় না, তাহাদিগকেও তালিকা হইতে বাদ দেওয়া উচিত।

কাহারা "অনুন্নত", বাংলা গবন্মে‍ণ্টের পক্ষ হইতে সে বিষয়ে শীঘ্র একটি বিবৃতি প্রকাশিত হইবে। সরকারী বর্দ্দ বাহির হইলেই যে তাহা চরম ও চূড়ান্ত বলিয়া মানিয়া লইতে হইবে, এমন নয়। গবন্মে‍ণ্ট যে-কোন জাতিকে কার্য্যতঃ ছোটলোক বলিলেই তাঁহারা কেন আপনাদিগকে ছোটলোক বলিয়া স্বীকার করিবেন? কিসের লোভে তাঁহারা ছোটলোক হইবেন? এই লোভে যে "নীচ জা'ত" বলিয়া অভিহিত জাতিদের মধ্যে কোন কোন জাতির এক আধ জন লোক ব্যবস্থাপক সভার সদস্য হইতে পারিবে? ইহা নিতান্ত আহাম্মকী। তাহাদের জন্য সংরক্ষিত আসনের সংখ্যা ৩০। সুতরাং ন্যূনকল্পে ৫৬টি জাতির একজন লোকও একটিও আসন পাইবে না। কোন কোন জাতির একাধিক লোক আসন পাইতে পারে। তাহা হইলে ৫৬র চেয়ে আরও অধিক জাতির লোকদের একজনও ব্যবস্থাপক সভার সভ্য হইতে পারিবে না, অথচ তাহাদিগকে মানিয়া লইতে হইবে. যে, তাহারা হীন, ছোটলোক, নীচ জা'ত।

সবাই শিক্ষায় অগ্রসর হইতে চেষ্টা করুন, শিক্ষার জোরে ব্যবস্থাপক সভায় প্রবেশ করিতে যত্নবান্ হউন। এক এক জন মানুষ. এক একটা জা'ত কয়েক বৎসরের মধ্যে অশিক্ষিত শ্রেণী হইতে শিক্ষিত শ্রেণীতে আপনাদিগকে উন্নত করিতে পারেন। কিন্তু যে-সব জা'ত আপনাদিগকে নীচ জা'ত বলিয়া মানিয়া লইবেন, তাঁহাদের এই হীনতার ছাপ সহজে মুছিবে না। গবন্মে‍ণ্ট হিন্দু সমাজকে দুই ভাগে বিভক্ত করিয়া উহার ক্রমবর্দ্ধমান একতার পথে ব্যাঘাত জন্মাইয়াছেন। এই ব্যাঘাত দূর তাঁহারা কখন করিবেন? কখনও করিবেন কি?

পুনা চুক্তিও হিন্দুসমাজের দ্বিখণ্ডিতত্ব মানিয়া লইয়া একতার পথে বাধা জন্মাইয়াছে। "অনুন্নতত্ব," "হীনতা," কতকগুলি জাতিকে মানাইয়া লইয়া তাহার বিনিময়ে কয়েকটি বেশী আসন পুনা চুক্তি তাহাদিগকে দেওয়াইয়াছে। কিন্তু হিন্দুসমাজের এরূপ দ্বিখণ্ডিতত্ব মানিয়া না-লইয়া কংগ্রেসের নেতারা কেন এরূপ ব্যবস্থার জন্য লড়িলেন না, যে, যে-সব জাতি শিক্ষায় সকলের চেয়ে অনগ্রসর, তাহাদিগের মধ্য হইতে যোগ্যতম লোক বাছিয়া তাঁহাদিগকে ব্যবস্থাপক সভার সভ্যপদপ্রার্থী খাড়া করা হইবে?

—

অনুন্নতদের শিক্ষার সরকারী ব্যয়

বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভায় প্রশ্নের সরকারী উত্তর হইতে জানা যায়, এই প্রদেশে অনুন্নতদের শিক্ষার জন্য গবন্মে‍ণ্ট গত ৫ বৎসর বাৎসরিক প্রায় ১,১৫,২২১ টাকা খরচ করিয়াছেন। অনুন্নত শ্রেণীসমূহের ছাত্রদের জন্য নিম্নলিখিত সরকারী বৃত্তিগুলি নির্দ্দিষ্ট আছে:—

১টি [illegible] বৃত্তি, দুই বৎসরের জন্য মাসিক ৩০৲ টাকা (ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়)। [illegible] এক বৎসরের নিমিত্ত মাসিক ৩০৲ টাকা। অনুন্নত ও মুসলমান ছাত্রদের নিমিত্ত ২টী গ্রাজুয়েট বৃত্তি মাসিক ৩০৲ টাকা করিয়া ১ বৎসরের নিমিত্ত (ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়)। অনুন্নত ও মুসলমান ছাত্রদের নিমিত্ত মাসিক ১০৲ টাকা করিয়া ২ বৎসরের জন্য তিনটি [illegible] বৃত্তি (ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়), ঢাকার আসানুল্লা ইঞ্জিনীয়ারিং স্কুলে মাসিক ১০৲ টাকা করিয়া ২ বৎসরের জন্য ছয়টী বৃত্তি, অনুন্নত ও মুসলমান ছাত্রদের জন্য পাঁচটী সিনিয়র বৃত্তি। মাসিক ১৫৲ টাকা হিসাবে দুই বৎসরের নিমিত্ত। ঢাকা বোর্ডে একটা সিনিয়র বৃত্তি, মাসিক ১৫৲ টাকা করিয়া দুই বৎসরের জন্য। মাসিক ১০৲ টাকা করিয়া দুই বৎসরের জন্য পাঁচটা বৃত্তি, ঢাকা বোর্ডে মাসিক ১০৲ টাকা করিয়া দুই বৎসরের জন্য একটা বৃত্তি। মধ্য বিদ্যালয়ে ৪০টী বৃত্তি, মাসিক ৪ টাকা করিয়া ৪ বৎসরের জন্য। ৬৬টী প্রাইমারী বৃত্তি মাসিক ৩ টাকা করিয়া দুই বৎসরের জন্য। ৩৬টী প্রাইমারী বৃত্তি মাসিক দুই টাকা করিয়া দুই বৎসরের জন্য।

উপরের তালিকায় দেখিতেছি, কয়েকটি বৃত্তি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য চিহ্নিত করিয়া রাখা হইয়াছে। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য ত একটিও চিহ্নিত দেখিতেছি না। ইহার কারণ কি? ঢাকার সম্বন্ধে আমাদের মনে বিন্দুমাত্রও বিরুদ্ধ ভাব নাই। বরং আমরা মনে করি, বিস্তৃত-খোলা ময়দানে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সুরম্য অট্টালিকাসমূহে অধ্যাপনা কক্ষ-সমূহ, লাইব্রেরী, বৈজ্ঞানিক পরীক্ষাগার, ভাল ভাল অধ্যাপক, অধ্যাপক ও ছাত্রছাত্রীদের বাসগৃহ, প্রভৃতি সুবন্দোবস্ত সত্ত্বেও যে রাজনৈতিক উপদ্রবে ঢাকায় যথেষ্ট ছাত্রছাত্রী হয় না, ইহা নিতান্ত দুঃখের বিষয়।

বৃত্তিগুলির কয়েকটি মুসলমান ও অনুন্নত হিন্দুছাত্রদের জন্য। অনুন্নত হিন্দুদের জন্য অভিপ্রেত বন্দোবস্তের সুবিধা যেমন কতকটা এই প্রকারে মুসলমানদিগকে দেওয়া হইয়াছে, মুসলমানদের জন্য অভিপ্রেত বন্দোবস্তের সুবিধা সেইরূপ কিয়ৎ পরিমাণে হিন্দুদিগকে দেওয়া হয় বলিয়া আমরা অবগত নহি।

অনুন্নত হিন্দুদের শিক্ষার ব্যয় বাৎসরিক ১,১৫,২২১ টাকা। ইহাতে মুসলমানদেরও কিঞ্চিৎ ভাগ আছে। সুতরাং কেবল অনুন্নত হিন্দুদের জন্য বার্ষিক ব্যয় এক লক্ষ টাকা ধরিলে অন্যায় হইবে না।

যে ছিয়াশিটি হিন্দু জাতি সরকারী তালিকা অনুসারে অনুন্নত, তাহাদের লোক সংখ্যা ৯৩,৩৬,৬২৪। তাহা হইলে সরকার বাহাদুর বিশেষ করিয়া তাহাদের শিক্ষার জন্য বৎসরে মাথা পিছু দুই পাই অর্থাৎ এক পয়সার দুই-তৃতীয়াংশ ব্যয় করেন! মাসে এক পাইয়ের ষষ্ঠ অংশ! কম বদান্যতা নহে!

বিশেষ করিয়া মুসলমানদের শিক্ষার জন্য কয়েকটি মোট ব্যয় বাদ দিলেও তাহাদের জন্য বাৎসরিক ব্যয় মোটামুটি পনর লাখ টাকা হয়। সরকারি তালিকা অনুসারে যত অনুন্নত হিন্দুদের সংখ্যা যত, মুসলমানদের সংখ্যা মোটামুটি তাহার তিনগুণ। অতএব বিশেষ করিয়া মুসলমানদের শিক্ষার জন্য যখন পনর লাখ টাকা খরচ করা হয়, তখন বিশেষ করিয়া অনুন্নত হিন্দুদের জন্য ন্যূনকল্পে পাঁচ লাখ টাকা খরচ করা উচিত। মুসলমানদের জন্য [illegible]

[সর]কারী শিক্ষা-ডিরেক্টর, ইন্‌স্পেক্টর প্রভৃতি আছে। [অ]নুন্নত হিন্দুজাতিদের জন্য নাই কেন? অনেক অনুন্নত [হি]ন্দুজাতি শিক্ষায় মুসলমানদের চেয়ে ঢের বেশী অনগ্রসর।

—

অনুন্নত হিন্দুজাতিদের জন্য ব্যবস্থাপক সভায় আসনের সংখ্যা

বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভায় সরকারী উত্তর অনুসারে যে [যে] জাতি নীচ জা'ত বা হীন জা'ত বা ছোট লোক অভিহিত [হ]ইতে আপত্তি করিয়াছেন, তাঁহাদের লোকসংখ্যা নীচে [দি]তেছি।

বাগদী	৯৮৭৫৭০
ভুঁইমালী	৭২৮০৪
ধোবা	২২৯৬৭২
হাড়ী	১৩২৪০১
জালিক কৈবর্ত্ত	৩৫২০৭২
ঝালো মালো	১৯৮০৯৯
কালোয়ারু	১৩৫৪০
কপালী	১৬৫৫৮৯
খণ্ডাইত	৩৫০৮০
কোল্‌ওআর	১৩১
লোধা	১১০০১
লোহার	৫০১৮২
মল	১১১৪২২
মুচী	৪১৪২২১
মাগর	১৬১৬৪
নমঃশূদ্র	২০৯৪৯৫৭
নাথ	৩৮৪৬৩৪
নুনিয়া	২৮১০০
ওরাওঁ	২২৮১৬১
পোদ	৬৬৭৭৩১
পুণ্ড্রী	৩১২৫৫
রাজবংশী	১৮০৬৩৯০
রাজু	৫৬৭৭৮
শাগির্দপেশা	৩৩৩
সুন্নী	৩৮৬০
শুঁড়ী	৭৬৯২০
আপত্তিকারীদের মোট সংখ্যা	৮১৬৯০৬৯

সরকারী তালিকার অন্তর্ভূত অনুন্নতদের সংখ্যা ৯৩,৩৬,-৬২৪। ইহা হইতে আপত্তিকারীদের সংখ্যা ৮১,৬৯,০৬৯ বাদ দিলে বাকী থাকে ১১,৬৭,৫৫৫। গবর্মেণ্ট সাম্প্রদায়িক ভাগবাঁটোয়ারা অনুসারে ২,২২,১২,০৬৯ হিন্দু, ৫২৯৪১৯ আদিম জাতি, ৩৩০১৬৩ বৌদ্ধ এবং ২২১২০ অন্যান্য লোকের, অর্থাৎ মোট ২৩০৯৪১৭১ জন মানুষের জন্য বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভায় হিসাব করিয়া আশীটি আসন চিহ্নিত করিয়া রাখিয়াছেন। তাহার মানে প্রত্যেক ২৮৮৬৭৭ জনের সমষ্টির জন্য আলাদা করিয়া এক একটি আসন রাখিয়াছেন। প্রত্যেক ২৮৮৬৭৭ জনের সমষ্টি যদি একটি আসন পায়, তাহা হইলে আপত্তিকারীদিগকে বাদ দিয়া যে ১১,৬৭,৫৫৫ জন বাকী থাকে, তাহাদের প্রাপ্য হয় ৪·০৪টি অর্থাৎ প্রায় ৪টি আসন, ত্রিশটি নহে। ইহাও বেশী। কারণ, মান্দ্রাজে কেবল প্রকৃত অস্পৃশ্যদিগের জন্য আলাদা করিয়া আসন রাখা হইয়াছে, বঙ্গে সে-রকমের অস্পৃশ্য ঢের কম।

আমরা কোন জাতিকে অস্পৃশ্য মনে করি না, সে রকম ব্যবহারও করি না। যাহাদিগকে অনেকে অস্পৃশ্য মনে করে, তাহাদেরও ব্যবস্থাপক সভায় প্রতিনিধি হইবার ও পাঠাইবার অধিকার থাকা উচিত। এই নীতি কার্য্যতঃ অনুসরণ করিবার নিমিত্ত স্বাজাতিকেরা নিজেদের মধ্যে একটি নিয়ম করিয়া শিক্ষায় সর্ব্বাপেক্ষা অনগ্রসর যে সব জাতির একজন লোকও এপর্য্যন্ত অবাধ প্রতিযোগিতায় কৌন্সিলে যাইতে পারে নাই, তাহাদের মধ্য হইতে কয়েকজন যোগ্য লোক বাছিয়া তাহাদিগকে সদস্য-পদপ্রার্থী দাঁড় করাইলে ও তাহাদিগকে ভোট দিলে ও দেওয়াইলে ভাল হয়। কংগ্রেসওয়ালারা যখন সকলে কৌন্সিল-প্রবেশের বিরোধী ছিলেন, তখন কৌন্সিলগুলিকে হাস্যাস্পদ করিবার জন্য অস্পৃশ্য বা অনাচরণীয় বলিয়া বিবেচিত কয়েক জন লোককে সদস্যপদপ্রার্থী দাঁড় করাইয়া তাহাদিগকে কৌন্সিলে-পাঠাইয়াছিলেন। আগে বিদ্রূপ করিয়া যাহা করা হইয়াছিল, অতঃপর তাহা লোকহিতার্থ গম্ভীরভাবে করা উচিত এবং করা অসাধ্য নহে।

—

বড়লাটের দুটি-বক্তৃতা

বড়লাট লর্ড উইলিংডন সম্প্রতি ভারতীয় রাষ্ট্র-পরিষদ (Council of State) ও ব্যবস্থাপক সভার (Legislative Assemblyর) সম্মিলিত অধিবেশনে একটি এবং ব্যবস্থাপক সভার সভাপতি স্যর ষণ্মুখম্ চেটির প্রদত্ত ভোজে একটি বক্তৃতা করিয়াছেন। দুটিতে তিনি রাজনৈতিক ও অর্থ-নৈতিক নানা বিষয়ে নিজের মত প্রকাশ করিয়াছেন। তাঁহার সকল কথার বিস্তারিত সমালোচনা করিবার স্থান ও সময় আমাদের নাই, প্রয়োজনও নাই। কেবল কয়েকটা কথার আলোচনা করিব।

ভারতবর্ষের সাধারণঅবস্থানিচয়

প্রথম বক্তৃতায় তিনি বলেন,

"The general conditions in India today are more satisfactory in many ways than they have been for a considerable period,..."

গবর্মেণ্টের দিক হইতে এ-কথা বলা ঠিক, যে, ভারতবর্ষে সাধারণ অবস্থানিচয় দীর্ঘকাল যেরূপ ছিল, এখন তার চেয়ে সন্তোষজনক। কারণ, কংগ্রেস ছত্রভঙ্গ হইয়াছে এবং উহার কর্ত্তৃপক্ষ উহাকে ভাঙিয়া দিয়াছেন—এখন গবর্মেণ্টের বিরুদ্ধাচরণ করিতে প্রস্তুত ও সমর্থ কোন প্রবল ও শৃঙ্খলাবদ্ধ বড় দল নাই। কিন্তু গভীর ভাবে চিন্তা করিলে বড়লাট বুঝিতে পারিতেন, যে, অবস্থা আগেকার চেয়ে অসন্তোষকর হইয়াছে। এখন কংগ্রেসের দল ভাঙিয়া গিয়াছে বটে, কিন্তু কংগ্রেসওয়ালারা এবং তাহাদের সহিত সহানুভূতিকারীরা

ঠিক আগেকার মতই গবর্ণ্মেণ্টের উপর অসন্তুষ্ট, বরং বেশী। আগে উদারনৈতিকেরা গবর্ণ্মেণ্টের উপর মৃদুভাবে অসন্তুষ্ট থাকিলেও মনে করিত, যে, গবর্ণ্মেণ্ট কংগ্রেসের দাবী মঞ্জুর না করিলেও তাহাদের দাবী অনেকটা মঞ্জুর করিবে। কিন্তু অদম্য আশাশীল এত বড় মডারেট যে স্যর তেজ বাহাদুর সপ্রু, তিনিও এখন নিরাশ হইয়াছেন। এখন ব্রিটিশ ভারতের অধিকাংশ রাজনৈতিকমতিবিশিষ্ট লোক অসন্তুষ্ট, এবং ভারতের অদূর ভবিষ্যৎ অন্ধকারময় দেখিতেছেন। কেবল অল্পসংখ্যক স্বাজাতিক মুসলমান ছাড়া অন্য অনেক মুসলমান চাকরীবাকরী পাইবার প্রত্যাশায় এবং ইংরেজের অধীনে হিন্দুদের উপর প্রভুত্ব করিবার আশায় খুশী আছে। অসন্তুষ্ট অধিকাংশ "ব্রিটিশভারতীয়"-দিগের অসন্তোষ ও নৈরাশ্য কি আকারে প্রকাশ পাইবে, তাহা ঠিক করিয়া বলা যায় না। তবে, তাহা অনুমান করিবার মত উপকরণ সর্ব্বসাধারণের গোচর কতকটা আছে, গবর্ণ্মেণ্টেরও আছে। সন্ত্রাসবাদ ও সন্ত্রাসক দল বঙ্গে নির্ম্মূল না হইলেও বলহীন হইয়াছে মনে হয় কিন্তু অন্যদিকে দেখা যাইতেছে, যে, সন্ত্রাসবাদ ভারতের নানা প্রদেশে ছড়াইয়া পড়িয়াছে। উপায়ান্তর দ্বারা ভারতবর্ষের রাষ্ট্রীয় অবস্থার উন্নতি সম্বন্ধে লোকে নিরাশ হইলে সেই নৈরাশ্য হইতে যে সন্ত্রাসবাদের উদ্ভব ও পুষ্টিলাভ হইতে পারে, তাহা জয়েণ্ট পার্লেমেণ্টারী কমিটির সম্মুখে ব্যারিষ্টার শ্রীযুক্ত বিজয়চন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের সাক্ষ্যে ব্যক্ত হইয়াছিল। বিলাত হইতে বোম্বাই প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া পঞ্জাবের ভাই পরমানন্দ যে বিবৃতি প্রদান করিয়াছেন, তাহার মধ্যে ইহা উল্লিখিত আছে। তিনি লিখিয়াছেন :—

The Joint Select Committee is practically convinced that the Communal Award does not satisfy any section of the Hindus and that the White Paper proposals based on that Award are not meant to create even a particle of good-will and confidence in the Hindu community as such. Our protest could not find a stronger expression than it found in an answer made by Mr. Chatterji to a question put by Sir Hubert Carr, who wanted Mr. Chatterji to say whether he considered that terrorism would die out under the White Paper regime or whether it would continue against a popularly elected government.

Mr. Chatterji said in reply: 'If the regime suggested in the White Paper goes through and materializes a permanent communal majority, unalterable by any appeal to the electorates, in that case the revolutionary movement would get worse.'

On this, Lord Salisbury said: 'Why so?'

Mr. Chatterji.—'Because it would create such a terrible disappointment to the whole of the Hindus in Bengal that the material for the growth of the revolutionary feeling would be very much deepened.'

Lord Salisbury.—'You mean, because there would be no other method of redress.'

Mr. Chatterji.—That is so. We are trying our last method before this Committee and if we get no release here, I am afraid, the terrorist movement would get a tremendous fillip.'

দেশীরাজ্যসমূহ রক্ষা আইন

বড়লাট এই মর্ম্মের কথা বলেন, যে, ব্রিটিশ ভারতের গবর্ণ্মেণ্টকে উল্টাইয়া দিবার বা অচল করিবার নিমিত্ত কোন প্রচেষ্টা দেশী রাজ্যগুলিতে হইলে দেশী রাজ্যগুলি তাহা দমন করিতে সর্ব্বদা চেষ্টা করিয়া থাকেন। সেইরূপ যদি দেশী রাজ্যগুলির প্রতি বিদ্রোহীভাবাপন্ন কোন প্রচেষ্টা ব্রিটিশ ভারতবর্ষ হইতে বা দেশী রাজ্যগুলিতে প্রবিষ্ট ব্রিটিশ-ভারতীয়দের দ্বারা হয়, তাহা হইলে তাহা ও তাহাদিগকে দমন করা ব্রিটিশ-ভারত গবর্ণ্মেণ্টের কর্ত্তব্য। তাঁহার মতে, যে দেশীরাজ্য-সংরক্ষণ আইন হইতেছে, তাহা এই পারস্পরিক সাহায্যনীতির উপর প্রতিষ্ঠিত। এই আইনের সমর্থন আমরা করিতেছি না। কিন্তু যদি ইহার কোন কোন অংশ সমর্থনযোগ্য হয়, তাহা হইলে উক্ত নীতি অনুসারে কাজ ও আইন অনেক আগে হইলে ঠিক হইত। হিন্দু নৃপতির অধীন বৃহত্তম রাজ্য কাশ্মীরে মুসলমানদের উদ্দেশ্যসিদ্ধি এবং অনেক ইংরেজের উদ্দেশ্য সিদ্ধি হইয়া গিয়াছে। অন্যতম হিন্দু নৃপতির রাজ্য আলোয়ারেও তাহা হইয়াছে। উপদ্রব দ্বারা এই উভয় রাজ্যে যাহা ঘটিয়াছে, হিন্দুরা যদি মুসলমান নৃপতিদের রাজ্যসম্বন্ধে উপদ্রব দ্বারা তাহা ঘটাইবার চেষ্টা করে, তাহাতে বাধা দেওয়া ব্রিটিশ গবর্ণ্মেণ্ট সম্ভবতঃ কর্ত্তব্য মনে করেন। মুসলমানদের দ্বারা হিন্দু নৃপতির রাজ্যে উপদ্রব ঘটিবার পূর্ব্বে বা ঘটিবামাত্র এই কর্ত্তব্যবুদ্ধি জাগ্রত হইলে ঠিক হইত।

রিজার্ভ ব্যাঙ্ক

রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অচিরে প্রতিষ্ঠিত হইবার আশা বড়লাট দিয়াছেন। দেশের লোকেদের পক্ষ হইতে ইহাকে আশা না বলিয়া আশঙ্কা বলা যাইতে পারে। কারণ, এই ব্যাঙ্কের উপর কর্ত্তৃত্ব ভারতীয় মহাজাতির থাকিবে না, ব্রিটিশ গবর্ণ্মেণ্টের ও ইংরেজদের থাকিবে; এবং তাহারা প্রথমতঃ ও প্রধানতঃ ইংলণ্ড ও ইংরেজদের সুবিধা ও স্বার্থের দিকে দৃষ্টি রাখিয়া ইহার কার্য্য পরিচালন করিবে।

ভবিষ্যৎ রাজনৈতিক সংগ্রাম

ভারতবর্ষের ভবিষ্যৎ রাজনৈতিক সংগ্রাম (political struggle) সম্বন্ধে বড়লাট বলেন :—

"The struggle will no longer be between those who would break and those who would uphold the law, or between those who would maintain and those who would destroy British connection, but between policies for meeting the practical problems of the day."

বড়লাট আশা করেন, যে, অতঃপর আর কোন রাজনৈতিক দল আইনভঙ্গ করিতে কিম্বা ভারতবর্ষের সহিত ইংলণ্ডের সম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন করিতে চেষ্টা করিবে না, অতঃপর ভারতীয় ভিন্ন ভিন্ন রাজনৈতিক দলের প্রতিদ্বন্দ্বিতা হইবে "কেজো" সমস্যাসমূহের সমাধানের পলিসি বা রীতি লইয়া। আমরা বড়লাট [illegible] ...

যাত জ্ঞান আমাদের আছে। ইতিহাসে দেখিতে পাই, কোন স্বাধীনতাকামী পরাধীন দেশেরই স্বাধীনতার প্রথম প্রচেষ্টা ব্যর্থ হইলেও পঁচিশ-ত্রিশ বৎসরে নির্মূল হয় নাই। অবশ্য, যদি ভারতীয় মানবপ্রকৃতি অন্যান্য দেশের মানবপ্রকৃতি হইতে মূলতঃ ও সম্পূর্ণ পৃথক্ হয়, তাহা হইলে বড়লাটের উক্তি সত্য হইতেও পারে। কিন্তু ঐ "যদি"টা সামান্য "যদি" নয়।

ভারতবর্ষের শেষ লক্ষ্য!

এই বক্তৃতাটির শেষে বড়লাট কেন্দ্রীয় ব্যবস্থাপক সভার সকল সদস্যকে ভারতবর্ষের শেষ লক্ষ্যের দিকে তাহাকে অগ্রসর করিবার জন্য চেষ্টা করিতে অনুরোধ করেন। শেষ লক্ষ্যটা, তাঁহার ঘোষিত মতে, ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের সমান অংশীরূপে তাহার ভাগ্যগঠন করা! আমরা নিজের দেশের ভবিষ্যৎ গড়িবার যোগ্যই বিবেচিত হইতেছি না, ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের ভাগ্য গড়িব আমরা! তাহাও আবার সমান অংশীরূপে! বড়লাট কি মনে করেন, প্রবোধবাক্যে ভারতীয়দের বিশ্বাস-প্রবণতার কোনই সীমা নাই?

স্তর ষন্মুখম্ চেট্টির প্রদত্ত ভোজেও বড়লাট এই ধরণের কথা বলেন :—

"Whatever were the demerits of the policy which he decided on in consultation with his colleagues there, it had the one merit of complete consistency. That policy was to push on with the reforms as far as they could go so as to help India towards responsible government, Home Rule, or Dominion Status. His Excellency was not afraid of any of these expressions (hear, hear), as he had always said in his various speeches that he wanted to push India on to an absolutely equal position with other Dominions under the Crown."

বড়লাট দায়িত্বপূর্ণ গবর্মেণ্ট, হোমরুল, বা ডোমীনিয়ন ষ্ট্যাটস্, কোন শব্দ ব্যবহার করিতে ভয় পান না বলিয়াছেন। ঠিকই বলিয়াছেন! কারণ, জয়েণ্ট পার্লেমেণ্টারী কমিটির আলোচনায় এবং তাহার পূর্ব্বেও স্থির হইয়া গিয়াছে, যে, ব্রিটিশ সাম্রাজ্ঞী ও সম্রাটগণ এবং বর্ত্তমান প্রধান মন্ত্রী হইতে আরম্ভ করিয়া ভূতপূর্ব্ব বড়লাটাদি রাজ-পুরুষেরা ভারতবর্ষের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছেন, তাহার মানে কোন অঙ্গীকার বা প্রতিশ্রুতি নহে। সুতরাং বর্ত্তমান বড়লাট যে শব্দ বা শব্দসমষ্টিই ব্যবহার করুন—এমন কি, যদি তিনি পূর্ণস্বরাজ বা পূর্ণ স্বাধীনতা ব্যবহার করেন—তাহা ইংলণ্ডীয় রাজপুরুষেরা ব্রিটিশ গবর্মেণ্টের প্রতিশ্রুতি মনে করিতে বাধ্য হইবেন না।

বড়লাট বলিয়াছেন, তিনি ভারতবর্ষকে অন্য সব ডোমীনিয়নের সমানতার দিকে ঠেলিয়া লইয়া যাইতে চান। তাঁহার উক্তির অকপটতাকে সন্দেহ করিবার অধিকার আমাদের নাই। কিন্তু যদি কাহাকেও উত্তর দিকে লইয়া যাইতে হয়, তাহা হইলে তাহাকে দক্ষিণ অভিমুখে ঠেলিয়া লইয়া গেলে সে উদ্দেশ্য কেমন করিয়া সিদ্ধ হইতে পারে, আমরা বুঝিতে

হোয়াইট পেপার

হোয়াইট পেপারের প্রস্তাবগুলাতে ভারতবর্ষের ভবিষ্য রাষ্ট্রশাসন-বিধির যে ছবি পাওয়া যায়, তাহাতে আমরা আশ্বস্ত না হইয়া আতঙ্কিত হইয়াছি। বড়লাট কিন্তু তাহার খুব প্রশংসা করিয়াছেন। করুন।

বড়লাটের বক্তৃতার অসাময়িকত্ব।

ভারতবর্ষে কৃষিজীবী, ব্যবসাদার, বণিক, শিল্পী, ব্যারিষ্টার উকীল, মোক্তার, কেরানী, শ্রমিক, ধনিক, অধ্যাপক শিক্ষক প্রভৃতি অধিকাংশেরই আর্থিক অবস্থা আগেকার চেয়ে খারাপ হইয়াছে। দেশে বেকারসমস্যা সঙ্গীন হইয়া উঠিয়াছে চুরিডাকাতি খুব হইতেছে। নারীহরণ বৃদ্ধি পাইয়া চলিতেছে বন্যায় লোকে বিপন্ন হইয়াছে।...

এমন সময়ে বড়লাটের উল্লাসপূর্ণ বক্তৃতার সত্যানুসারিতা আমরা উপলব্ধি করিতে অসমর্থ।

ভারতীয় মত প্রকাশের পূর্ণতম সুবিধা

জয়েণ্ট সিলেক্ট কমিটির উল্লেখ করিয়া বড়লাট বলেন :—
"আমি ভেবে আহ্লাদিত হচ্ছি, যে, পার্লেমেণ্টের কাছে শেষ সিদ্ধান্তের জন্য যখন এ-পর্য্যন্ত কৃত কাজ আসবে, তার আগে গড়াপিটার অবস্থায় ভারতবর্ষীয় মতকে নিজের প্রভাব অনুভব করাবার জন্যে পূর্ণতম সুযোগ দেওয়া হয়েছে।" এ-কথাটা সত্য হইতে পারে আর দুটা কথা যোগ করিলে। যথা—যাহাকে ভারতবর্ষীয় মত বলা হইতেছে তাহা গবর্মেণ্টের মনোনীত লোকদের মত, ভারতীয়দের নির্ব্বাচিত প্রতিনিধিদের মত নয়। গবর্মেণ্ট চতুরতার সহিত যাহাদিগকে মনোনীত করিয়াছিলেন, তাহাদের মধ্যে অল্পসংখ্যক লোক ভারতের প্রতিনিধি হইবার যোগ্য, বাকী অধিকাংশ লোকেরা সম্প্রদায় ও শ্রেণীবিশেষের ক্ষুদ্র স্বার্থসিদ্ধিতে মন দিয়াছে, ভারতবর্ষের প্রকৃত ও ভিত্তীভূত মঙ্গলের প্রতি দৃষ্টিপাত করে নাই। দ্বিতীয় কথা এই, যে, গবর্মেণ্ট যাহাদিগকে মনোনীত করিয়াছিলেন, তাহাদেরও সকলকে আত্মপ্রকাশের পূর্ণতম সুবিধা দেওয়া হয় নাই। সাম্প্রদায়িক ভাগবাটোয়ারাটাতে হিন্দুদের প্রতি ঘোরতর অবিচার করা হইয়াছে এবং সেটাকে হোয়াইট-পেপারের অঙ্গীভূত করা হইয়াছে। ভারতসচিব স্তর সামুয়েল হোর বলিয়াছেন, সেটা অপরিবর্ত্তনীয়। তাহা হইলে জয়েণ্ট পার্লেমেণ্টারী কমিটিতে ভারতীয় মত যতটুকু প্রকাশ-সুবিধা পাইয়াছে, তাহারই বা মূল্য কি?

ডাক্তার শ্রীমতী মুথুলক্ষ্মী রেড্ডী লণ্ডনে জয়েণ্ট পার্লেমেণ্টারী কমিটির সম্মুখে ভারতনারীদের পক্ষ হইতে সাক্ষ্য দিতে গিয়াছিলেন। তিনি দেশে ফিরিয়া আসিয়া বলিয়াছেন, ভারতনারীদের পক্ষের কথা জানাইবার যথেষ্ট সুযোগ তিনি ও অন্য ভারতীয় "মহিলাপ্রতিনিধি"রা পান নাই।

নিরুপদ্রব আইনপ্রতিরোধ অবৈধ কি না

বড়লাট তাঁহার একটি বক্তৃতায় বলিয়াছেন, যে, তিনি বড়লাট হইয়া ভারতে পদার্পণ করিয়া দেখিলেন, অবৈধ ("unconstitutional") নিরুপদ্রব আইনলঙ্ঘন ("civil disobedience") চলিতেছে, কংগ্রেস এক জন ডিক্টেটরের অধীনতায় চলিতেছে, ইত্যাদি। কিন্তু বস্তুতঃ যখন তিনি ভারতবর্ষে আসেন, তখন গান্ধী-আরুইন চুক্তি স্বাক্ষরিত হওয়ায় আইন অমান্য করা বন্ধ হইয়া গিয়াছিল। সরকারী কর্ম্মচারীদের পক্ষ হইতে ঐ চুক্তিভঙ্গ আরম্ভ হয়, এবং পরে পরে অনেক অর্ডিন্যান্স জারী হয়। সরকারী কর্ম্মচারীরা কোন কোন বিষয়ে চুক্তিভঙ্গ না করিলে, এবং মহাত্মা গান্ধী যে শান্তিপ্রবণতা ও সদ্ভাব লইয়া ঐ চুক্তি করেন এবং যাহা স্থায়ী করিবার জন্য তিনি সচেষ্ট ছিলেন, তাহা সরকারী সহযোগিতা ও উৎসাহের পরিবর্ত্তে বিরোধিতা না পাইলে, নিরুপদ্রব আইনলঙ্ঘন-প্রচেষ্টা পুনর্ব্বার আরব্ধ হইত না।

নিরুপদ্রব আইনপ্রতিরোধ প্রচেষ্টাকে বড়লাট অবৈধ বলিয়াছেন। আন্‌-ল-ফুল অর্থাৎ আইনবিরুদ্ধ এবং আন্‌-কন্‌স্টিটিউশ্যন্যাল অর্থাৎ রাষ্ট্রের ভিত্তিভূত বিধির বিরুদ্ধ, উভয়ের মধ্যে প্রভেদ আছে। সচরাচর যাহা বেআইনী নহে, যেমন বিদেশী পণ্য বয়কট করিতে বলা, তাহা নূতন আইন পাস্ করিয়া বে-আইনী করা যাইতে পারে। কিন্তু যাহা আনকন্‌স্টিটিউশ্যন্যাল নয়, নূতন আইন করিয়া তাহাকে সাধারণতঃ আনকন্‌স্টিটিউশ্যন্যাল বানান যায় না। লর্ড হার্ডিং যখন ভারতবর্ষের গবর্ণর-জেনার‍্যাল ছিলেন, তখন দক্ষিণআফ্রিকানিবাসী ভারতীয়েরা গান্ধীজীর নেতৃত্বে নিরুপদ্রব ও অহিংসভাবে আইন প্রতিরোধ চালাইতেছিলেন। লর্ড হার্ডিং এই প্রচেষ্টাকে কন্‌স্টিটিউশ্যন্যাল অর্থাৎ বৈধ বলিয়াছিলেন।

ভারতবর্ষ সম্পর্কে ব্রিটিশ গবর্ন্মেণ্ট নিরুপদ্রব আইনলঙ্ঘন এবং সন্ত্রাসনবাদ উভয়কেই কার্য্যতঃ এক পর্য্যায়ে ফেলিয়া বিচক্ষণ রাজনীতিজ্ঞতার পরিচয় দেন নাই।

—

মেদিনীপুরে পুনর্ব্বার ম্যাজিষ্ট্রেট হত্যা

বড়লাটের দুটি বক্তৃতা সম্বন্ধে আমাদের উপরিলিখিত মন্তব্য প্রায় শেষ করিয়াছি, এমন সময় খবরের কাগজে মেদিনীপুরের ম্যাজিষ্ট্রেট বার্জ সাহেবের হত্যার সংবাদ দেখিলাম। তাঁহার বিধবা পত্নীর নিদারুণ শোকে আমরা আন্তরিক সমবেদনা জ্ঞাপন করিতেছি।

এইরূপ রাজকর্ম্মচারী হত্যার তীব্র নিন্দা আমাদের পঠিত সমুদয় দেশী সংবাদপত্রে দেখিয়াছি। ইহাও বার-বার লিখিত হইয়াছে, যে, এই প্রকার হত্যার দ্বারা ভারতবর্ষকে স্বাধীন করা যাইবে না। কিন্তু সংবাদপত্রে প্রকাশিত এইরূপ নিন্দা ও এইরূপ মতপ্রকাশ দ্বারা রাজকর্ম্মচারী হত্যা নিবারিত হয় নাই। যদি সংবাদপত্রসমূহ কিংবা একটিও সংবাদপত্র এরূপ হত্যানীতির প্রশংসা, সমর্থন বা দোষক্ষালন করিত, তাহা হইলে তাহার দরুন হত্যার সংখ্যা খুবসম্ভব বাড়িত। কিন্তু সংবাদপত্রে এরূপ লেখার কেবল একটি মাত্র দৃষ্টান্ত আমাদের মনে পড়ে। তাহাও অনেক বৎসর আগেকার কথা। বহু বৎসর পূর্ব্বে লুপ্ত "যুগান্তর" কাগজের শেষ সংখ্যা প্রত্যেকখানি এক টাকা দুই টাকা দামে বিক্রী হইয়াছিল। তাহাতে এই ধরণের লেখা ছিল বলিয়া আমাদের অস্পষ্ট স্মৃতি আছে। তাহার পর আর এরূপ লেখা দেখি নাই।

ইংরেজদের কাগজ, ইংরেজদের সভাসমিতি, এবং ব্যক্তিগত ভাবে অধিকাংশ ইংরেজ দেশী সংবাদপত্রসমূহকে সন্ত্রাসবাদ ও সন্ত্রাসকদের কাজের জন্য দায়ী করিবেন। তাহা কতটা ন্যায়সঙ্গত, আমাদের পূর্ব্বলিখিত কথাগুলি হইতে বুঝা যাইবে।

সংবাদপত্রসম্পাদকদের উভয় সঙ্কট। তাঁহারা সন্ত্রাসবাদ ও সন্ত্রাসকদের নিন্দা করিলে কপটতার অভিযোগে অভিযুক্ত হন, না করিলে সন্ত্রাসবাদ ও সন্ত্রাসকদের উৎসাহদাতা—ন্যূনকল্পে প্রশ্রয়দাতা, বিবেচিত হন। তাঁহাদিগকে এরূপ মনে করা ন্যায়সঙ্গত কি না, অভিযোক্তারা বিবেচনা করিবেন।

সংবাদপত্রের বিরুদ্ধে, সভাসমিতির বিরুদ্ধে, কঠোর আইন প্রণয়নের দাবী হইবে। এরূপ দাবী আগেও হইয়াছে। প্রকাশ্য সভাসমিতির অধিবেশন দীর্ঘকালের জন্য বন্ধ অনেকবার করা হইয়াছে। সংবাদপত্রের বিরুদ্ধে কড়া আইন অনেকবার হইয়াছে, এখন যাহা আছে তাহাও কম কড়া নহে। যদি আরও কড়া আইন কর্ত্তৃপক্ষ করিতে চান, কিম্বা সংবাদপত্র ও ছাপাখানা, অবশ্য ইংরেজদের ছাড়া সব বন্ধ করিয়া দিতে চান, তাহাও করিয়া দেখিতে পারেন। চোখ থাকা ভাল নয়।

ইউরোপীয়দের ক্রুদ্ধ হইবার যথেষ্ট কারণ আছে। রাগের মাথায় তাহাদের অনেকের মনে প্রতিশোধ লওয়ার চিন্তাও আসিতে পারে। কিন্তু এ উপায়ও একাধিক বার অবলম্বিত হইয়া গিয়াছে। তাহাতে স্থায়ী কোন ফল হয় নাই। পাইকারী জরিমানা, নিগ্রহ পুলিস বসান, সেনাদল বসান, এ-সব উপায়েরও পরীক্ষা হইয়া গিয়াছে।

সন্ত্রাসবাদ নির্মূল করিবার উপায় আলোচনা

বেসরকারী লোকদের হত্যার মত রাজকর্মচারীদের হত্যাও একেবারে বন্ধ হইয়া যায়, ইহা আমরা অন্তরের সহিত চাই। কিন্তু এই ফল লাভের কোন অমোঘ উপায় নির্দেশ করিতে আমরা অসমর্থ। তাহার একটা কারণ, সন্ত্রাসকেরা কি উদ্দেশ্যে হত্যা করে, তাহা আমরা জানি না। উচ্চপদস্থ রাজপুরুষদের বক্তৃতা-আদি হইতে মনে হয়, তাঁহারা মনে করেন, সন্ত্রাসকেরা ভারতবর্ষের রাষ্ট্রীয় উন্নতি সাধন, শাসনপ্রণালীর পরিবর্তন এবং স্বাধীনতা লাভের জন্য ইহা করে। যদি এই অনুমান বা সিদ্ধান্ত ঠিক্ হয়, তাহা হইলে ভারতবর্ষের রাষ্ট্রীয় ব্যাপারসমূহে ভারতীয়দিগের চূড়ান্ত কর্তৃত্ব স্থাপন করিয়া দিলে সন্ত্রাসবাদ বিনষ্ট হইতে পারে। ব্রিটিশ গবন্মে´ণ্ট এখনই একেবারে যদি তাহা করিতে না চান বা না পারেন, তাহা হইলে কখন ভারতীয়দের আত্মকর্তৃত্ব স্থাপিত হইবে, পার্লেমেণ্ট দ্বারা তাহা সুস্পষ্টরূপে নির্দিষ্ট হউক, এবং তাহার এরূপ প্রণালী নির্দিষ্ট হউক যাহার দ্বারা পুনরায় কমিশন, কমিটি, পার্লেমেণ্টারী বিচার ইত্যাদি ব্যতিরেকে আত্মকর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে।

কংগ্রেসের চেষ্টা ব্যর্থ হইয়াছে, মডারেটদের চেষ্টা বিফল হইয়াছে; সুতরাং নৈরাশ্য বিপ্লবীদিগকে উত্তেজিত করিতেছে, ইহাও অনেকে মনে করেন। ইহা সত্য হইলে, গবন্মে´ণ্ট কার্য্য দ্বারা, শুধু বাক্য দ্বারা নহে, নৈরাশ্যের পরিবর্তে আশার সঞ্চার করিয়া দেখিতে পারেন।

সকল দেশেই এমন মানুষ বিস্তর আছে, যাহারা রাজনীতির ধার ধারে না, টাকাকড়ি রোজগার করিতে ও খরচ করিয়া আরামে থাকিতে চায়। তাহাদের রোজগারের কোন উপায় না থাকিলে তাহাদের শূন্য মনে অন্য নানা কল্পনা জাগে। সরকারী লোকদের কথা হইতে জানা যায়, যে বিপ্লবীরা এই প্রকার বেকার লোকদের মধ্য হইতে লোক সংগ্রহ করিয়া নিজেদের দল পুষ্ট করে। ইহা যদি সত্য হয়, তাহা হইলে গবন্মে´ণ্টের বেকার-সমস্যা সমাধানের আন্তরিক চেষ্টা করা কর্তব্য। দেশে বিপ্লববাদ না থাকিলেও তাহা করা গবন্মে´ণ্টের কর্তব্য হইত। সেদিন শ্রীযুক্ত দেবীপ্রসাদ খৈতানের সভাপতিত্বে বঙ্গীয় বেকার যুবক সমিতির কন্‌ফারেন্স হইয়া গিয়াছে। খৈতান মহাশয়ের বক্তৃতায় সমাধানের কোন কোন পথ নির্দিষ্ট হইয়াছে।

সকল দেশের যুবকদের সাহসের কাজ করিবার ইচ্ছা, বিপদের সম্মুখীন হইবার ইচ্ছা আছে। বাঙালী যুবকদেরও এই ইচ্ছা আছে। কিন্তু এই ইচ্ছা পূর্ণ করিবার আইনসঙ্গত যত রকম সুযোগ সুবিধা উপায় অন্য অনেক দেশে আছে, বঙ্গে ও ভারতবর্ষে বাঙালীর ছেলেদের সম্মুখে তাহা নাই। অনেকে অনুমান করেন, এই কারণে—বিপদের আহ্বানে আকৃষ্ট হইয়া, অনেক যুবক বিপ্লবীদের দলে যোগ দেয়। গবন্মে´ণ্ট বঙ্গের যুবকদিগকে আইনসঙ্গত ভাবে শক্তি, সাহস ও পৌরুষ দেখাইবার সকল রকম সুবিধা দিতে পারেন কি-না বিবেচনা করিতে পারেন।

কোন্ রাজকর্মচারী কি কারণে নিহত হন, বলা কঠিন। অনেক স্থলে রাজনৈতিক কারণে তাঁহারা নিহত হন, ইহা খুবই সম্ভব। কিন্তু কোন কোন স্থলে ইহাও অসম্ভব নহে, যে, কোন কোন কর্মচারী এমন কোন বে-আইনী অত্যাচার করিয়াছেন বা করাইয়াছেন যাহার জন্য অনেকের মনে প্রতিহিংসার ভাব আসিয়াছে। এইরূপ সব স্থলে হত্যার কারণ রাজনৈতিক নহে কিন্তু প্রতিহিংসামূলক। অবশ্য প্রতিহিংসামূলক হইলেও তাহা দণ্ডার্হ। ব্রিটিশ গবন্মে´ণ্টের পক্ষে ইহা মনে করা স্বাভাবিক, যে, তাঁহাদের কর্মচারীরা, বিশেষ করিয়া ব্রিটিশ কর্মচারীরা, ভুল চুক করেন না, বে-আইনী অত্যাচার করেন না। সাধারণতঃ ইহা সত্য বলিয়া ধরিয়া লইলেও, ইহার ব্যতিক্রম স্থল নাই বা হইতে পারে না, গবন্মে´ণ্টের পক্ষে এরূপ মনে করা রাজনৈতিক বিচক্ষণতা বা মানবপ্রকৃতিজ্ঞানের পরিচায়ক হইবে না।

যাহারা বেআইনী কাজ করে, তাহা রাজনৈতিক কারণে করুক বা অন্য কোন কারণে করুক, তাহাদিগকে দমন করা সকল গবন্মেণ্টের কর্তব্য। সুতরাং সন্ত্রাসকদিগকে দমন

চলিতে থাকিবে। তাহা ছাড়া গবর্মেণ্ট কি করিতে পারেন তাহাই ছিল আমাদের আলোচ্য।

বঙ্গে সরকারী ব্যয়সংক্ষেপ

সরকারী ব্যয়সংক্ষেপ সম্বন্ধে রিপোর্ট দিবার নিমিত্ত বাংলা গবর্মেণ্ট গত বৎসর এপ্রিল মাসে একটি কমিটি নিযুক্ত করেন। যথাসময়ে এই কমিটি তাঁহাদের রিপোর্ট পেশ করেন। গবর্মেণ্ট কমিটির যে-যে সুপারিশ গ্রহণ করিয়াছেন সম্প্রতি তাহা প্রকাশিত হইয়াছে। কতকগুলি মোটামাহিনার চাকরী আছে, যাহা বাদ দিলে সরকারী কাজ চলিবার কোন ব্যাঘাত হয় না, অথচ ব্যয় অনেক কমে। যেমন ডিবিজ্যন্তাল কমিশনারের পদগুলি। ব্যয়সংক্ষেপ কমিটিও এই পদগুলির তিনটি উঠাইয়া দিতে বলিয়াছিলেন। কিন্তু সরকার প্রধানতঃ ছোট ছোট অনেক চাকর্যের পদগুলিই ছাঁটিয়া দিয়াছেন। তাহাতে অনেক গরীবের অন্ন মারা যাইবে, এবং অসন্তোষের ক্ষেত্র বিস্তৃততর হইবে। বড় চাকর্যে কয়েক জনের কাজ গেলে তাহাদের অন্ন মারা যাইত না; সঞ্চিত অর্থ এবং মোটা পেন্সানে তাহাদের বেশ আরামে দিন গুজরান হইত। কিন্তু তাহাদের চাকরী ছাঁটিতে গেলে সিবিলিয়ান-সমষ্টিকে অসন্তুষ্ট করিতে হইত। সিবিলিয়ান-রাজে তাহা অচিন্তনীয়।

প্রতিবৎসর বজেটে শিক্ষাবিভাগের চেয়ে পুলিস বিভাগে অনেক বেশী টাকার বরাদ্দ হয়। কিন্তু ছাঁটের বেলায় দেখিতেছি, শিক্ষাবিভাগের ছাঁট ১,৯৬,৭৯৭ টাকা এবং পুলিসের ছাঁট ২,৮৭,৮৮৭ টাকা। পুলিসের ছাঁট আরও অনেক বেশী হওয়া উচিত ছিল। কিন্তু সন্ত্রাস উৎপাদনের চেষ্টা এখনও বাংলা দেশে লয় পায় নাই। সুতরাং এখন পুলিস ব্যয় কমাইবার কথা না তোলাই ভাল।

শিক্ষাবিভাগে কতকগুলি অধ্যাপকের পদ উঠাইয়া দেওয়া হইয়াছে। যে-যে কলেজের পদ তুলিয়া দেওয়া হইল, তাহাদের প্রয়োজন সম্বন্ধে যথেষ্ট জ্ঞান না থাকায় এই সিদ্ধান্ত ঠিক হইয়াছে কি-না বলিতে পারিলাম না। ট্রেনিং কলেজ দুটি, বাণিজ্যিক শিক্ষালয়টি, সংস্কৃত কলেজ ও স্কুল এবং হিন্দু স্কুল যে থাকিল, ইহা সন্তোষের বিষয়।

গবর্মেণ্ট সকল প্রদেশের চেয়ে বাংলাদেশে জনস্বাস্থ্যের জন্য কম খরচ করেন। সেই কম খরচ হইতে আবার বার্ষিক ১,৭৫,২৮০ টাকা কমান হইল।

চিকিৎসা, সাধারণ স্বাস্থ্য ও পশুশিল্প বিভাগে সরকারী ব্যয় যথেষ্ট ছিল না, তাহা আরও কমান হইল।

—

প্রসন্ননারায়ণ চৌধুরী

রায় বাহাদুর প্রসন্ন নারায়ণ চৌধুরী সংস্কৃত সাহিত্যে, দর্শনে, আইনে ও প্রত্নতত্ত্বে সুপণ্ডিত ও বিদ্যোৎসাহী ছিলেন। প্রায় আশী বৎসর বয়সে তাঁহার মৃত্যু হইয়াছে। তিনি প্রায় তেত্রিশ বৎসর ওকালতী করিয়া ঐ ব্যবসা হইতে অবসর গ্রহণ করেন।

তিনি বহুসংখ্যক ছাত্রকে আহার ও বাসস্থান দিতেন, এবং অর্থসাহায্য করিতেন। তাঁহার চেষ্টায় নিজগ্রামে "ভারেঙ্গা একাডেমী" নামক হাই স্কুল স্থাপিত হয় এবং মাতার নামে হরসুন্দরী চতুষ্পাঠী নামক একটি চতুষ্পাঠী স্থাপিত হয় এবং পাবনা শহরের প্রসিদ্ধ দর্শন টোলটি স্থাপিত হয়। ইহার প্রত্যেকটির জন্যই তিনি বহু অর্থ সাহায্য করিয়াছেন। বাংলায় প্রত্নতত্ত্ববিদ্‌গণের মধ্যে প্রসন্ননারায়ণ সর্বপ্রথম দলের অন্যতম। মাধাইনগরের তাম্রশাসন সম্বন্ধে তাঁহার পাঠোদ্ধারই শুদ্ধ বলিয়া বিদ্বৎসমাজে গৃহীত হয়। তিনি গাম্ভীর্য শাঙ্করভাষ্য এবং সায়ন ভাষ্য সমেত চারি প্রকার টীকা সহ প্রকাশ করেন। আইন সম্বন্ধে তাঁহার দুইখানি পুস্তক আছে। একখানি Confessions and Evidence of Accomplices উক্ত বিষয়ে লিখিত গ্রন্থের মধ্যে শ্রেষ্ঠ গ্রন্থ বলিয়া পরিগণিত হইয়াছে। তাঁহার অপর পুস্তক "Prosecution in False Cases"-টিও আদৃত হইয়াছে। তাঁহার প্রণীত 'প্রমোদ' নামে হাস্যরস সম্বন্ধে একখানি পুস্তক আছে। এতদ্ব্যতীত কোন কোন মাসিক পত্রে তাঁহার অনেক সুলিখিত প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছে। তিনি অনেক বৎসর পাবনা শহরের মিউনিসিপ্যালিটির চেয়ারম্যান ছিলেন এবং পাবনা শহরের অনেক উন্নতি সাধন করিয়াছিলেন।

রাজা সত্যনিরঞ্জন চক্রবর্ত্তী

বীরভূম জেলার হেতমপুরের রাজা সত্যনিরঞ্জন চক্রবর্ত্তী বাহাদুর সম্প্রতি পরলোক গমন করিয়াছেন। তিনি দানশীল ছিলেন। হেতমপুর কলেজ, সিউড়ীর জলের কল, বক্রেশ্বর সেতু প্রভৃতি তাঁহার দানশীলতার নিদর্শন।

—

পণ্ডিত জওআহরলাল নেহরুর মুক্তি

পণ্ডিত জওআহর লাল নেহরুর ১২ই সেপ্টেম্বর জেল হইতে মুক্তি পাইবার কথা ছিল। তাঁহার মাতা শ্রীযুক্তা স্বরূপরাণী নেহরু মহোদয়া কঠিন ব্যাধিগ্রস্ত হওয়ায় গবর্মেণ্ট তাঁহাকে কয়েক দিন আগে খালাস দিয়া সুবিবেচনার কাজ করিয়াছেন। শ্রীযুক্তা স্বরূপরাণী নেহরু বীরজায়া, বীরের জননী এবং স্বয়ং বীরাঙ্গনা। তাঁহার বয়স অনেক হইয়াছে। তথাপি তিনি রোগমুক্ত হইতে পারেন। যদি তিনি রোগমুক্ত হইয়া, যে মাতৃভূমির জন্য পতি-পুত্র-দুহিতা-পুত্রবধূর সহিত এত ত্যাগস্বীকার করিয়াছেন এবং এত দুঃখ ভোগ করিয়াছেন, তাঁহাকে অধীনতা-পাশ হইতে মুক্ত দেখিয়া যাইতে পারেন, তাহা হইলে তাঁহার আনন্দের সীমা থাকিবে না, এবং তাঁহার আনন্দে তাঁহার স্বদেশবাসী নরনারী সকলেই আনন্দিত হইবেন।

কংগ্রেসপন্থী এবং অন্যান্য রাজনৈতিক মতাবলম্বী দেশনায়কদিগকে এখন কর্ত্তব্য স্থির করিতে হইবে। এ-সময় পণ্ডিত জওআহরলালের মুক্তি সুবিধাজনক হইয়াছে। তিনি পরামর্শে যোগ দিতে পারিবেন।

—

বাবু রাজেন্দ্রপ্রসাদ পীড়িত

বিহারের প্রসিদ্ধ নেতা বাবু রাজেন্দ্রপ্রসাদ হাজারীবাগ জেলে কঠিন পীড়ায় ভুগিতেছেন। জেলে কঠিন পীড়ার চিকিৎসার সকল রকম সুব্যবস্থা হওয়া কঠিন। তাঁহাকে গবর্মেণ্ট অবিলম্বে বিনা সর্ত্তে খালাস দিলে সুবিবেচনা ও সদাশয়তার কাজ হইবে।

—

কংগ্রেস কি অকর্ম্মণ্য হইল?

পঞ্জাবের অন্যতম কংগ্রেসনেতা সর্দ্দার শার্দ্দূল সিংহ কবীশর কংগ্রেসের অস্থায়ী সভাপতি ছিলেন। পিকেটিং করিবার অপরাধে তাঁহার ছয় মাস কারাদণ্ড হইয়াছে। কংগ্রেসপন্থীরা অভিযুক্ত হইলে সাধারণতঃ আদালতে আত্মপক্ষ সমর্থন করেন না। এই সুযোগে লাহোরের এক আদালতে তাঁহার বিচারের সময় বিচারক কোন সাক্ষ্য না লইয়াই তাঁহাকে জেলে পাঠাইয়াছেন, যে-দোকানে সর্দ্দার সাহেব পিকেটিং করিতে গিয়াছিলেন বলিয়া অভিযোগ, সেই দোকানদারকে পর্য্যন্ত আদালত ডাকেন নাই।

সর্দ্দার সাহেব জেলে যাইবার আগে বলিয়া গিয়াছেন, তিনি কাহাকেও তাঁহার পরবর্ত্তী অস্থায়ী সভাপতি নিযুক্ত করিয়া যাইবেন না; কংগ্রেসের করাচী অধিবেশনের সভাপতি শ্রীযুক্ত বল্লভভাই পটেল মহাশয় স্থায়ী সভাপতি, সভাপতির সমুদয় ক্ষমতা অতঃপর তাঁহাতে অর্শিবে। পটেল মহাশয় স্বদেশভক্ত, ত্যাগী ও বিচক্ষণ ব্যক্তি। তাঁহার হাতে ক্ষমতা থাওয়ায় কোন আপত্তি নাই। কিন্তু কংগ্রেসওয়ালারা দাবী করেন, এবং আমরাও জানি, যে, এ-বৎসর প্রায় ছয় মাস হইল কলিকাতায় কংগ্রেসের এক অধিবেশন হইয়াছিল এবং পণ্ডিত মদনমোহন মালবীয় তাহার সভাপতি মনোনীত হইয়াছিলেন, কিন্তু তিনি সভাপতিত্ব করিতে আসিবার পথে গ্রেপ্তার হওয়ায় শ্রীযুক্তা নেলী সেন-গুপ্তা এই অধিবেশনে সভানেত্রীর কাজ করেন। অতএব কংগ্রেস-সভাপতির সমুদয় ক্ষমতা আমাদের বিবেচনায় হয় পণ্ডিত মদনমোহন মালবীয়, নয় শ্রীযুক্তা নেলী সেন-গুপ্তার হাতে আসাই যুক্তিসঙ্গত।

এ বিষয়ে সিদ্ধান্ত যাহাই হউক, পঞ্চাশ বৎসরের প্রসিদ্ধ প্রতিষ্ঠান কংগ্রেসকে বিনষ্ট করা বা বিলুপ্ত হইতে দেওয়া কাহারও পক্ষে উচিত হইবে না। যে-সেনাপতি বা সেনাপতিবৃন্দ যুদ্ধের কেবল একটি কৌশল ও প্রণালী জানেন, তাঁহারা বড় সেনাপতি নহেন। কংগ্রেস অবশ্য সশস্ত্র যুদ্ধ করেন নাই, করিতে চানও নাই, কিন্তু তাহা হইলেও স্বরাজ-সংগ্রাম ত চালাইতেছিলেন? এই অহিংস সংগ্রাম কি কেবল অসহযোগ ও নিরুপদ্রব আইনলঙ্ঘন দ্বারাই চলিতে পারে? ইহা চালাইবার কি অন্য উপায় নাই?

মহাত্মা গান্ধী স্বয়ং উপায় চিন্তা করিতেছেন এবং উদারনৈতিক নেতাদের সহিতও পরামর্শ করিতেছেন। সকলের সমবেত আলোচনা ও পরামর্শের ফলে কোন সুপন্থা নির্দ্ধারিত হইলে সন্তোষের বিষয় হইবে।

দামোদর খাল

পশ্চিম বঙ্গ যথাসময়ে যথেষ্ট বারিপাতের নিশ্চয়তার উপর নির্ভর করিতে পারে না। আগে ইহার কয়েকটি জেলায় জলসেচনের নানা উপায় ছিল। সেগুলি নষ্ট হইয়া যাওয়ার পর ব্রিটিশ রাজত্বে পশ্চিম বঙ্গের কৃষিকার্য্যের জন্য যথেষ্ট কোন ব্যবস্থা হয় নাই। সম্প্রতি দামোদর খাল খোলা হইয়াছে। ইহা হইতে বর্দ্ধমান জেলার তিন শত বর্গমাইলের উপর ভূখণ্ড জল পাইবে। বলা হইয়াছে, যে, এই খাল দ্বারা জলসেচন, পানীয় ও স্নানীয় জল সরবরাহ, এবং স্বাস্থ্যোন্নতি, এই ত্রিবিধ উপকার সাধিত হইবে। হইলে সুখের বিষয় হইবে।

শ্রীযুক্ত বিজয়চন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের সাক্ষ্য

ব্যারিষ্টার শ্রীযুক্ত বিজয়চন্দ্র চট্টোপাধ্যায় লণ্ডনে জয়েণ্ট পার্লেমেণ্টারী কমিটির সম্মুখে সাক্ষ্য দিতে গিয়াছিলেন। তিনি সেখানে কি বলিয়াছিলেন, তাহার যথাযথ ও পুরা বৃত্তান্ত কোন কাগজে বাহির হয় নাই। কিন্তু তাঁহার বিরুদ্ধে দু-একটা টেলিগ্রাম বিলাত হইতে এদেশে আসে—কে পাঠাইয়াছিল জানা নাই, তিনিও জানেন না। টেলিগ্রামগুলা অবলম্বন করিয়া কোন কোন কাগজে তাঁহাকে আক্রমণ করা হয়। তিনি কলিকাতা ফিরিয়া আসিবার কিছু আগে আমরা হিন্দু মহাসভার কর্ম্মিষ্ঠ সভাপতি ডাঃ মুঞ্জের একখানি চিঠি পাই। তাহাতে তিনি চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের সাক্ষ্যের ভূয়সী প্রশংসা করিয়াছেন এবং বলিয়াছেন যে বঙ্গের হিন্দুরা তাঁহাকে যেন পুনর্ব্বার অক্টোবরের গোড়ায় আবার বিলাত পাঠাইয়া দেন; তখন দেখাসাক্ষাৎ ও অন্যান্য উপায়ে কিছু কাজ হইতে পারে।

চট্টোপাধ্যায় মহাশয় কলিকাতায় ফিরিয়া আসিয়া লিবার্টি সংবাদপত্রে নিজের সাক্ষ্যের যে চুম্বক প্রকাশ করিয়াছেন, তাহাতে মোটের উপর কোন আপত্তির কারণ দেখিতেছি না। হোয়াইট পেপার অনুযায়ী শাসনপ্রণালী রচিত হইলে ভারতে, বিশেষ করিয়া বঙ্গে, সাম্প্রদায়িক বিবাদ যে-আকার ধারণ করিবে, তাহা বিজয় বাবুর অনুমিত "আনন্দ মঠ"বৎ হইবে বলিয়া আমাদের মনে হয় না, কিন্তু গুরুতর একটা কিছু

পঞ্জাবের ভাই পরমানন্দ বিজয়বাবুর সাক্ষ্যের এক অংশ যেরূপ দিয়াছেন, তাহা অন্যত্র উদ্ধৃত হইয়াছে। তিনিও বিজয় বাবুর খুব প্রশংসা করিয়াছেন।

বিলাতী উগ্র রক্ষণশীলদের অভিনয়

আমরা বরাবর বলিয়া আসিতেছি, যেমন যাত্রার দলের রাম ও রাবণ বাস্তবিক পরস্পরের শত্রু নহে, কেবল শত্রুতার অভিনয় করে এবং উভয়েরই উদ্দেশ্য নিজেদের ব্যবসা চালান, তেমনি বিলাতী রাজনৈতিক প্রতিদ্বন্দ্বীরা ভারতবর্ষ সম্বন্ধে পরস্পরের শত্রু নহে, উভয় পক্ষই ভারতবর্ষে ব্রিটেনের স্বার্থ রক্ষা করিতে চায়। চার্চিল প্রমুখ উগ্র রক্ষণশীলেরা হোয়াইট পেপারকে আক্রমণ করিতেছে আমাদের চক্ষে উহার দাম বাড়াইবার জন্য, এবং হোয়াইট পেপারের প্রণেতা ব্রিটিশ গবন্মেণ্ট সেই সুযোগে আমাদিগকে বলিতেছে, "দেখ, আমরা তোমাদিগকে এমন একটা জিনিষ দিতে চাই, ওরা কিন্তু দিতে রাজী নয়; আমরা তোমাদিগকে আরও বেশী দিবার চেষ্টা করিতাম, কিন্তু ওদের বিরোধিতায় আমরা বেশী কিছু করিতে পারিতেছি না।"

উকীল শ্রীযুক্ত অশ্বিনীকুমার ঘোষ বাংলা দেশের মহাজন সভার পক্ষ হইতে জয়েণ্ট পার্লেমেণ্টারী কমিটিতে সাক্ষ্য দিতে গিয়াছিলেন। ফিরিয়া আসিয়া তিনিও উল্লিখিত মর্ম্মের কথা বলিয়াছেন।

লর্ড সল্‌স্‌বেরীর চাল

পাঠকেরা অন্যত্র দেখিবেন, বড়লাট লর্ড উইলিংডন তাঁহার একটা বক্তৃতায় হোয়াইট পেপারের প্রশংসা করিয়াছেন এবং এই মর্ম্মের কথা বলিয়াছেন, যে, তিনি ভারতবর্ষকে ডোমীনিয়নত্বের অভিমুখে ঠেলিয়া লইয়া যাইতে চান। ইহাতে বিলাতের অন্যতম গোঁড়া রক্ষণশীল চটিয়াছেন বা চটিবার ভাণ করিয়াছেন। তিনি [illegible]য়াছেন, বড়লাটের কথায় হয় ত ভারতীয়েরা শিশুর আকাশের চাঁদ চাওয়ার মত হোয়াইট পেপারের শাসনবিধিটা চাহিয়া বসিবে, এবং বড়লাটের ডোমীনিয়নত্বের দিকে ভারতবর্ষকে লইয়া যাইবার অভিপ্রায়কে [illegible]

গবর্ন্মেণ্টের ভারতবর্ষকে ডোমীনিয়ন দিবার অঙ্গীকার মনে করিবে

লর্ড লদ্যবেরী নিশ্চিন্ত হউন। ভারতীয়েরা বুঝিয়াছে, কোন ইংরেজের কথাই স্বরাজ দানের প্লেজ বা অঙ্গীকার নহে।

—

আণ্ডামানের রাজনৈতিক বন্দীদের কথা

ভারতবর্ষীয় ব্যবস্থাপক সভায় প্রশ্নোত্তরের খবরের কাগজের রিপোর্টে দেখিলাম, আণ্ডামানের রাজনৈতিক বন্দীদের কোন কোন অভিযোগ দূর করা হইয়াছে। হইয়া থাকিলে ভাল। কিন্তু সব অভিযোগই দূর করা উচিত; এবং সকলের চেয়ে বড় অভিযোগ যে তাহাদিগকে আণ্ডামানে প্রেরণ ও তথায় আটক রাখা, তাহাও দূর করা উচিত। সেখানে বন্দী ও রাজকর্মচারী ছাড়া অন্য লোক নাই, সুতরাং এমন জনমত নাই যাহা দ্বারা জেল-কর্মচারীদের অন্যায় আচরণের প্রতিবাদ ও প্রতিকার হইতে পারে। অতএব ভবিষ্যতেও এরূপ অবস্থা ঘটিতে পারে যাহার জন্য বন্দীরা প্রায়োপবেশন করিতে বাধ্য হইতে পারে। গবর্ন্মেণ্ট যে কিছু অভিযোগের প্রতিকার করিয়াছেন, তাহা হইতেই বুঝা যায়, যে, বন্দীরা অকারণ প্রায়োপবেশন করে নাই। যথাসময়ে অভিযোগের প্রতিকার হইলে তাহারা প্রায়োপবেশন করিত না, এবং তিন জনের মৃত্যুও হইত না। "ঐ তিন জনের মৃত্যুর জন্য দায়ী কে?" এই প্রশ্নের উত্তরে স্বরাষ্ট্রসচিব স্যর হ্যারি হেগ বলেন, "তাহারা নিজেই নিজেদের মৃত্যুর জন্য দায়ী।" এবং ইহার পর রিপোর্টে বন্ধনীর মধ্যে আছে "ল্যাফটার" অর্থাৎ হাস্য। এইরূপ উত্তরে হাসিল কোন্ ব্যক্তি জানি না। এরূপ শোচনীয় ও লজ্জাকর ঘটনায় হাসিবার কি আছে, বুঝি না।

—

অনুন্নত শ্রেণীসমূহের উন্নতিবিধায়িনী সমিতি

বাংলা ও আসামের অনুন্নত শ্রেণীসমূহের উন্নতিবিধায়িনী সমিতি গত ২৪ বৎসর শিক্ষাদান ও অন্যান্য উপায়ে লোক-হিত সাধন করিয়া আসিয়েছেন। এই সমিতি নিম্নলিখিত প্রকারের কাজ করিয়া থাকেন—সাধারণ শিক্ষা, স্ত্রী-শিক্ষা ও শিল্প শিক্ষা, বিধবাদিগকে শিক্ষয়িত্রীর কাজ শিখান, সাধারণ পাঠাগার ও লাইব্রেরী স্থাপন, কো-অপারেটিভ সমিতি স্থাপন, ব্রতী বালক দল গঠন, স্বাস্থ্য রক্ষা ও সমাজ সংস্কার সম্বন্ধে ম্যাজিক লণ্ঠন সহযোগে বক্তৃতা দান, রোগীর শুশ্রূষা শিখান, বনজঙ্গল কাটিয়া ম্যালেরিয়া দূরীকরণ, সালিসীর দ্বারা বিবাদভঞ্জন, ইত্যাদি। সমিতির বিদ্যালয়ের সংখ্যা এখন ৪৪৪টি এবং ছাত্র ও ছাত্রীর সংখ্যা ১৭,০৭৩। কলিকাতায় ইহার আপিসের ঠিকানা ৩২-১-১ বীডন ষ্ট্রীট। সম্পাদক শ্রীযুক্ত ডাক্তার প্রাণকৃষ্ণ আচার্য্য। সমিতির অর্থের প্রয়োজন খুব বেশী।

সংস্কৃত পরিষদ ও সংস্কৃত শিক্ষা

সংস্কৃত পরিষদের গত উপাধিবিতরণ সভায় বিচারপতি মন্মথনাথ মুখোপাধ্যায় মহাশয় ভারতবর্ষের প্রাচীন কালের ও প্রাচীনকালাগত শিক্ষাপ্রণালীর সম্বন্ধে একটি হৃদয়গ্রাহী বক্তৃতা করেন, এবং বঙ্গের গবর্ণর বলেন, সংস্কৃত শিক্ষার প্রতি গবর্ন্মেণ্ট উদাসীন, এই ধারণা সম্পূর্ণরূপে ভিত্তিহীন।

—

বোধনা-নিকেতন

মেদিনীপুর জেলার ঝাড়গ্রামে অবস্থিত বোধনা-নিকেতনে জড়বুদ্ধি ছেলেমেয়েদিগকে রাখিয়া তাহাদের স্বাস্থ্যের ও শিক্ষার উন্নতির চেষ্টা করা হয়। নিয়মাবলী জানিবার এবং টাকাকড়ি পাঠাইবার ঠিকানা—সম্পাদক শ্রীগিরিজাভূষণ মুখোপাধ্যায়, ৬৫ বিজয় মুখুজ্যে গলি, ভবানীপুর, কলিকাতা। অতি সামান্য হইতে খুব বেশী অর্থ কৃতজ্ঞতার সহিত গৃহীত হয়।

[illegible] প্রবাসী প্রেস হইতে শ্রীমাণিকচন্দ্র দাস কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।